চকচকে চঞ্চল চোখ—এই মেয়ের। নাম যদি না জানেন বল্‌বো—বায়োস্কোপে আপনার রুচি নেই মোটে। রূপসী শ্রীমতী রাধারাণী পৌরাণিক ও আধুনিক চিত্রে মানিয়ে যায় মেয়ের চোখে কাজলের মত। শ্রীমতীর অতি আধুনিক উপস্থিতি হচ্ছে ন্যাশনাল থিয়েটার্স্ এর "ডাকু-কা-শীকার" এ, মুক্তি প্রতীক্ষায়।

৩৬০

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৭ই পৌষ, ১৩৪২—2nd January, 1936. } ১ম সংখ্যা

নব বর্ষে

"খেয়ালী" পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিল—অর্থাৎ "খেয়ালী"র শৈশব অতিক্রান্ত হইল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সে সপ্রমাণ করিয়াছে যে বয়সে শিশু হইলেও শক্তিতে ও কার্য্যে সে শিশু নহে: তাহার শক্তির পরিচয়ে ভুক্তভোগী সচকিত ও জনসাধারণ চমৎকৃত।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে "খেয়ালী" যখন জন্মলাভ করে তখন আমরা বলিয়াছিলাম ঃ—

"কোনও দলের মাদল বাজাইতে "খেয়ালী" জন্মগ্রহণ করে নাই। ন্যায়ের পথে তার গতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার অভিযান।……

দেশের অগ্রগতির পথে যে সব কণ্টক আজ ত্যাগী পান্থদের চরণযুগল ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, "খেয়ালী" আপনার খেয়ালে সেগুলি একটি একটি করিয়া তুলিতে থাকিবে। কণ্টককুল অপসৃত করিতে তাহাকেও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু সে লাঞ্ছনাকে বরণ করিয়াই সে এই ব্রতে আত্মনিয়োগ করিবে।…

…"খেয়ালী" সত্য কথা বলিবে; প্রিয় কথা বলিবে কিন্তু "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" নীতি সে মানিবেনা। অপ্রিয় সত্য কঠোর হইলেও নির্ভীকভাবে তাহা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

আজ সারা বাঙ্গলার জনসাধারণ জানেন যে, "খেয়ালী" মিথ্যা দম্ভোক্তি করে নাই; তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। শুধু অতীত নহে, ভবিষ্যতেও এই আদর্শের যে তিলমাত্র ব্যত্যয় হইবে না,—তাহা বলাই বাহুল্য।

গত বৎসর "খেয়ালী"র পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে, ভণ্ডের মুখোস খুলিতে গিয়া তাহাকে দুঃখ ও লাঞ্ছনা বরণ করিতে হইয়াছে; তাহার কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু ও পথের সহযাত্রী তাহার অগ্রগতির সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া বিদায় লইয়াছেন। দুঃখের কথা হইলেও সেজন্য খেদ করিয়া লাভ নাই। সকলে সব পারেনা। জীবনের অগ্রগতিতে যে কয়দিন তাঁহাদের সহযোগিতা লাভ করিয়াছি তজ্জন্য আজ তাঁহাদিগকে পুনরায় সপ্রীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অতীতের আস্ফালনই যাহার একমাত্র অবলম্বন, জীবন তাহার শেষ হইয়াছে। অতীতের কৃতিত্বই "খেয়ালী"র একমাত্র সম্বল নহে। তাহার কানে আজ বাজিতেছে ভবিষ্যতের পূর্ণ পরিণতির আহ্বান। সে ডাকে সে আজ সানন্দ মনে সাড়া দিবে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নীতি, কংগ্রেসের আদর্শই "খেয়ালী" অনুসরণ করিবে। কংগ্রেসে বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর দান চিরস্মরণীয়। ইদানীংএর মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙ্গলার কংগ্রেসকে এক নূতন রূপ, নূতন শক্তি দান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পতাকাতলে ফরওয়ার্ড-সঙ্ঘে বহু শক্তিমান কংগ্রেসকর্ম্মী সমবেত হইয়াছিলেন। কাল ও ঘটনার আবর্ত্তে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সেই দল এখন ছিন্নভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আজিও সেই আদর্শের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাই আমরা মনে প্রাণে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্ব স্বীকার করি এবং বিশ্বাস করি তাঁহার নেতৃত্ব একদিন দেশবন্ধুর স্বপ্নকে সফল করিবে।

কংগ্রেসের কনক-জয়ন্তী হইয়া গেল। এই পঞ্চাশ বৎসর মধ্যবিত্তদের রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ হিসাবে যেটুকু উন্নতি ও শক্তি আশা করা যায়, কংগ্রেস তাহার পরিচয় দান করিয়াছে। অতীতের পুরাতন চলতি পথে পুনরাবর্ত্তন না করিয়া কংগ্রেসের কর্ত্তব্য এখন নূতন পথে অগ্রসর হওয়া—এবং সে পথ বামতন্ত্রী (Left Wingers) সোশ্যালিষ্টদের পথ। কমিউনিজম্ হইতে ভিন্ন, নিয়মানুগ যে সোশ্যালিজম—যাহা অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করিয়া ধন-বণ্টনকে (Distribution of Wealth) সাহায্য করে, আমরা সেই সোশ্যালিজমে বিশ্বাস করি এবং আমরা আশা করি যে, অচির ভবিষ্যতে কংগ্রেসের মধ্যে একটি পার্লামেণ্টারী সোশ্যালিষ্ট দল গড়িয়া উঠিবে যাহার কার্য্যতালিকা হইবে চাষের ভূমি, কয়লার খনি এবং রেলওয়ে প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যবসায়গুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে ও ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস প্রভৃতি ব্যবসায়কে মিউনিসিপ্যাল সম্পত্তিতে পরিণত করিবার চেষ্টা। এই কার্য্যতালিকায় "খেয়ালী"র আস্থা আছে এবং নিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত কংগ্রেসের মধ্যে এই আদর্শ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, "খেয়ালী" সেই মতবাদ প্রচার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—আজিকার দিনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইটুকুই তাহার বক্তব্য।

(বিলাসী)

কণ্ঠহার

প্রযোজক—রাধা ফিল্ম কোম্পানী

গল্প—দাশরথি মুখোপাধ্যায়

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা } জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ সহকারী—হরি ভঞ্জ

আলোক-চিত্র—যশোবন্ত ওয়াশীকর

শব্দযন্ত্রী—ভূপেন ঘোষ

সুর-শিল্পী } অনাথ বসু, মৃণাল ঘোষ ও কুমার মিত্র

চিত্র-সম্পাদক—ভোলানাথ আঢ্য ও রাজেন দাস

প্রথম মুক্তি—রূপবাণী; ২২শে ডিসেম্বর '৩৫

কে বলে বাঙলা নতুনের নয়নাভিরাম দেশ নয়! রাজনীতিক্ষেত্রে, সমাজ জীবন, এমন কী আমোদ-প্রমোদের ভেতরও বাঙলার স্বকীয়তা দেশ দেশ নন্দিত হ'য়েছে। এ সত্ত্বেও বাঙ্গালী আজ সবার নীচে। প্রশ্ন ওঠে যদি কেন? উত্তর পাবে সোজাসুজি বাঙ্গালী লোটা-কম্বলের বরাত নিয়ে জন্মেছে—দারিদ্র্য তার মহাশত্রু, ঐ এগুতে চাচ্ছে দারিদ্র্য চোখ রাঙিয়ে বেত্রাঘাত কোরে বলছে—আর এগুসনে। শক্তি তোর আছে, বুদ্ধি অপরিসীম কিন্তু রসদ তোর কই! কিন্তু বুক ঠুকে সে তবুও দারিদ্র্যের অবরোধ পথের বাধা না মেনে ছুটে চলেছে।

নতুনের পথে যাত্রার জন্য সিনেমাক্ষেত্রে আজ যে বাতাস বইছে—সে বাতাসের মাদকতা শক্তি আজ সিনেমার পাড়াপড়শীদের কোরেছে মাতাল। পুরাণোকে পায়ে দলে তারা চলেছে অগ্রগতির পথে। নতুন কী ভাবে সিনেমাক্ষেত্রে তার বাসা বাঁধছে—সে খবর আপনাদের প্রায়ই দিচ্ছি—আজও দেব, তাই এ উপক্রমণিকা।

হ্যাঁ, আসল বক্তব্য। "কণ্ঠহার" 'রাধা'র আধুনিক গোয়েন্দা-চিত্র। কী বললেন, গোয়েন্দা-চিত্র তা'তে হ'য়েছে কী? না হয়নি কিছু, ছবি কথা কইতে শেখার পর গোয়েন্দা-চিত্র আমদানী এদেশে একেবারে আনকোরা। হ্যাঁ, তা, যা বলেছেন। রঙ্গমঞ্চে এ নাটকের অভিনয় হয় খুব সুখ্যাতির সঙ্গে। ছবিতেও ছবিত্ব যে প্রকাশ পাবে তা' গল্প যাদের জানা ছিল তারাই আগে আঁচ কোরে রেখেছিলেন। একটা সুখের সংসার ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য একদিকে স্বার্থান্বেষী চক্রীদের চক্র; আর একদিকে দুর্ব্বল দু'তিনটি লোকের আত্মরক্ষার চেষ্টা। গল্পটি একদিকে যেমনি করুণ, আর একদিকে তেমনি কোরে তুলেছে উত্তেজক। অবশেষে ধর্ম্মের শাসনে অধর্ম্মকে পেতে হ'ল শাস্তি—এই হ'চ্ছে গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।

জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যে চিত্রখনির এক পাকা জহুরী। ফিল্ম-ফিতের ওপর নক্সা কুঁদেছেন তিনি গজের 'পর গজ—যা' জোড়া কোরলে হয়ত' সারা পৃথিবীটার সীমানা মেপে আনতে পারে সেই ফিতেগুলো। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছেন তিনি বহু, চিত্ররাজ্যের লোকদের মনের খবরও অগোচরে নেই তাঁর। সেজন্য "কণ্ঠহারে"র চিত্রনাট্য রচনায় তিনি সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ কোরে কতকটা সাফল্য মণ্ডিত হ'য়েছেন। আর পরিচালনা ব্যাপারেও বাঁড়ুয্যে মশাই লোকের হৃদয়তন্ত্রীর তারগুলো যা'তে সুখ-দুঃখের সুরের রাগিণীর সঙ্গে তালে তালে নেচে ওঠে—সেদিকে নজর রেখেছেন। আততায়ী ও পুলিশের জলপথে ও ব্যোমপথে মোটর বোটে ও উড়োজাহাজে ধাবন-অনুধাবন—এত উত্তেজনার সৃষ্টি করে যা' দেখে লোকে যুগপৎ বিস্ময়ে অভিভূত না হ'য়ে পারে না।

ছবিখানির আলোক-চিত্র মন্দ নয়। ভাল বলতে পারতাম, আর ভাল বলতে দ্বিধা থাকত না—যদি ক্যামেরার কারিকুরি ওয়াশীকর সাহেব একটু মগজ খাটিয়ে মকস কোরতে পারতেন। হ্যাঁ, আপনারা যদি বলেন, ফটোগ্রাফী কী পরিষ্কার হয় না? আমরা অমনি চট্ কোরে বলব, আপনারা ভুল বুঝেছেন। আমরা সেকথা মোটেই বলিনি। আমরা বলছি, আধুনিক পর্য্যায়ে পড়ে নি। সোজা কথায় আপনি কল্পনা করুন, সহরে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের একটি মেয়ের।

আর শব্দযন্ত্রের কাজও আমাদের মনের মত হয় নি। 'ব্যাকগ্রাউণ্ড নয়েজ' পাওয়া যাচ্ছিল, শিল্পীদের কথার অসমতাও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল।

গান রচনা ও গানের সুরের মধ্যে ছবিখানার বিশেষত্ব নজরে পড়ল না।

সম্পাদনা মোটের ওপর ভাল। আড্ডার দৃশ্যগুলোর ওপর অল্প স্বল্প কাঁচির কসরৎ কোরলে মন্দ হ'ত না।

এবার অভিনয়ের পালা।

নায়িকা কানন যে সবচেয়ে ভাল অভিনয় কোরেছেন, একথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু কানন, নীহারিকা কানন, তোমার কাছ থেকে আমরা আরও বেশী ভাল অভিনয় আশা কোরেছিলাম। তুমি হয়ত' বলবে ও-ধরণের

ভূমিকা তোমার nature suiting নয়। কিন্তু তা' বলে কী হবে! অভিনেত্রী যখন হ'য়েছ—তখন তোমায় পরিচিত হ'তে হবে বিশ্বসংসারের মানব মানবীদের সঙ্গে—শিখতে হবে তাদের ভাব ও ভাষা তবেই হতে পারবে তুমি অভিনেত্রীরাণী। চেষ্টা কর, তোমার ভবিষ্যৎ পথে সোনালি আলোর রেখা দেখা দিচ্ছে

নায়ক জহর—তার অভিনয় স্থানে স্থানে আমাদের খুব আনন্দ দিয়েছে, আবার কোথাওবা তার অভিনয়ে জড়তা আমাদের মুহ্যমান কোরেছে। জহর তোমাকে হ'তে হবে আর একটু সংযত। আর একটা বদ অভ্যাস তোমায় এখুনি ছাড়তে হবে—তুমি হাংলার মত একই সময়ে অনেক ছবিতে নেব না। নাম যদি চাও তা'হলে এ অভ্যাস তোমায় ছাড়তেই হবে।

কূট-চক্রী রণলালের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় দর্শক সাধারণের মনে রেখাপাত কোরেছে কিন্তু তার শক্তি অনুযায়ী তার কাছ থেকে আরও ভাল অভিনয় আশা কোরেছিলাম।

গোয়েন্দা বিনয়ের ভূমিকায় ভূমেন রায়কে চলনসই বলা যেতে পারে।

হ্যাঁ, শ্রীমান মন্তুর শ্যামল আমাদের বেশ লেগেছে। ছেলেটি অভিনয়ে অনেক বুড়োকেও হার মানিয়েছে। বাঙলাদেশে 'বেবিষ্টার'-এর সময় পড়েছে দেখছি। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তিনটে হাউসে তিনজন শিশু-অভিনেতার অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই আমাদের কথার সত্যতা সপ্রমাণ কোরবেন।

প্রভুভক্ত ভৃত্য মধুর মধুত্ব কিছুমাত্র আস্বাদ কোরতে পারিনি। নির্মলবাবুকে এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে চাইনা—শুধু এইটুকু আমাদের অনুরোধ মঞ্চে তিনি থাকুন—পর্দায় আমরা ওঁকে দেখতে চাই না।

ধীরাজের লম্পট গৌরীকান্ত আমাদের ভাল লেগেছে। আর ভাল লেগেছে রাধারাণীর মোহিনী—গান ও অভিনয় দুই-ই। পদ্ম ছ্যাবলামি কোরতে পারে জানি—কিন্তু ছ্যাবলামির পার্টে নামলেই যে অনাবৃত দেহকে শিথিল কোরে লোকের চোখের সামনে ধরতে হবে—এ ধারণা হ'ল তার কোথা থেকে! পদ্ম, তুমি অভিনয় করা ভুলে তোমার দেহ দেখিয়ে লোককে আকৃষ্ট কোরতে চেয়েছিলে। কিন্তু 'যৌবন কী আছে সই'—তাই সব দিক থেকে তোমার রঙ্গিলা হ'য়েছে ব্যর্থ।

অন্যান্য ছোট ভূমিকার মধ্যে মৃণাল ঘোষের মুরারী ও কুমার মিত্রের নরহরি ভাল হ'য়েছে। তুলসী চক্রবর্তীর নবীনকৃষ্ণ চরিত্রোপযোগী হ'য়েছে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, 'কণ্ঠহার" বাঙলা চিত্ররাজ্যে এক নব-উন্মাদনার সৃষ্টি কোরেছে। এবং এর জন্য কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি, আমাদের অন্তরের শুভেচ্ছা।

স্বয়ম্বরা

প্রযোজক—এভারগ্রীন পিকচার্স।
পরিচালক—বি, ডি, লাহা।
চিত্র-শিল্পী—দেবী ঘোষ।
শ্রেষ্ঠাংশে—ভূপেন চক্রবর্ত্তী, জনা দেবী, নমিতা রায়, ললিত মিত্র, হরিসুন্দরী (ব্লাকী), জীবন সাহা প্রভৃতি।
প্রথম মুক্তি—"রূপকথায়" ১৪ই ডিসেম্বর '৩৫

বাজারের গুজবের সঙ্গে আমাদের মত এক নয়। এভারগ্রীনের দু'নম্বর ছবি 'আহা মরি' কিছু না হ'লেও ছবিখানা দেখে কেউ যে হাউস থেকে বেরুবার সময় কর্তৃপক্ষের আত্মীয়স্বজনদের গুণগান গাইবেন না, একথা বলা যেতে পারে। প্রচেষ্টা এদের নতুন—সেজন্য সমালোচকের চোখে এদের ছবির মাপকাঠি যদি নির্দেশ করা যায়, তা' হ'লে এদের প্রতি অবিচার করা হবে।

একটি সুদর্শন বেকার-যুবক কী কোরে একজন শিক্ষিতা ও ধনী যুবতীর প্রেমে পড়ে এবং কী কোরেইবা তারা মিলিত হ'য়ে বিবাহিত হয়—সংক্ষেপে এইটিই হ'চ্ছে ছবির মূল কথা। এই ছোট্ট ব্যাপারটি টেনে হিঁচড়ে বড় ছবিতে পরিণত করায় পরিচালক সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নি। ছোট ব্যঙ্গ-চিত্র হিসাবে ছবিখানাকে দাঁড় করালে পরিচালকের গুণপনা প্রকাশ পেতো বেশী। পরিচালকের পরিচালনার ভেতর টেক্‌নিক ফেক্‌নিকের বালাই নেই বড় বেশী। যা হ'ক ওদিকে না এগিয়ে যে গল্পটিকে সাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা কোরেছেন—এটাই ভাল। আর ছবিখানার সম্পাদক মশাই মাঝে মাঝে যদি ফিল্মের মায়া ত্যাগ কোরে কাঁচি চালাতেন, তা' হ'লে গল্পটির রস আরও ঘনীভূত হবার সুযোগ পেত।

আলোকচিত্র বিভাগে বৃদ্ধ দেবী ঘোষকে সবাক্ চিত্রে এই প্রথম ছবি তুলতে দেখলাম। সিধে আর পরিস্কার ছবি ছাড়া ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে আর কোনও বিশেষণ নেই।

শব্দযন্ত্রীকে ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হ'য়ে কাজ কোরতে হবে; নইলে তাঁর পশার জমার আশা নেই।

অভিনয়ে নায়ক অসিত—ভূপেন চক্রবর্ত্তী আর নায়িকা কল্পনা—জনা দেবী ভাল অভিনয় কোরেছেন। তবে ভবিষ্যতে আরও ভাল অভিনয় কোরতে হ'লে এদের ক্যামেরা ভূতের ভয় কাটাতে হবে। নমিতার সুধা রায়ে তার নিজস্বতাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। সুধীরার স্বামী ছোট হ'লেও ভাল। হরিসুন্দরীর 'কবিনী' চমৎকার কিন্তু তার বামন স্বামীকে যোগ করার সার্থকতা কী? ছোট পার্টের ভেতর ললিত মিত্রের দারোয়ান সকলের ভাল লাগবে।

যা' হ'ক প্রতিষ্ঠানটি নতুন। সিনেমা শিল্পে এরা দাঁড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা

কোরেছেন, তা' এদের কাজকর্ম্মের ভেতরই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এমনিভাবে একতা আর প্রচেষ্টা থাকলে ভবিষ্যতে এরা যে চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠিত হবেন—এ ভবিষ্যদ্বাণী বোধ হয় অসমীচীন নয়।

খাস-দখল

প্রযোজনা—সিনেমা পিক্‌চার্স সিণ্ডিকেট
গল্প—৺অমৃতলাল বসু
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—রমেশচন্দ্র দত্ত
শব্দযন্ত্রী—বাবাদাস চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী—চারু ঘোষ
সুরশিল্পী—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা—সুনীল মিত্র

ভূমিকা—ঠাকুর্দ্দা :—যোগেশ চৌধুরী, লোকেন—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, মোহিত—শৈলেন পাল (নিউ থিয়েটার্স), নিতাই—চানী দত্ত, রমেশ—নৃপেন চক্রবর্ত্তী, সুরেশ—আলোক দত্ত, সারদা—হরিধন মুখোপাধ্যায়, শেখর—নলিনীকান্ত সরকার, মোক্ষদা—পদ্মাবতী, গিরিবালা—রেণুকা রায়, বিধু—উষাবতী (পটল), আহ্লাদী—নগেন্দ্রবালা, নিত্যবালা—সুবাসিনী (কিন্নরকণ্ঠী), লাবণ্য—সুরমা, মহালক্ষ্মী—হরিসুন্দরী (ব্লাকী) প্রভৃতি।

প্রথম মুক্তি—'ছায়া,' শুক্রবার ২৭শে ডিসেম্বর '৩৫

দুর্জ্জয় সাহস আর দুর্দ্দমনীয় প্রচেষ্টা এই দু'য়ের ভেতর থেকেই জন্ম নিয়েছে "খাস-দখল"। কিছুদিন আগে আমরা বলেছিলাম, "চানী দত্ত চিত্ররাজ্যের হারকিউলিস।" সে কথার সত্যতা আজ সপ্রমাণ হ'ল। কেউ কী কখনও ভাবতে পারে, কেউ কী কখনও বিশ্বাস করে যে গ্রে ষ্ট্রীটের এক তেলের কলের ভেতর থেকে এক ভাঙ্গা ক্যামেরা, এক দিশী কথা-কইবার যন্ত্র, কয়েক হাজার ফিল্ম-ফিতে আর গুটি কতক আর্টিষ্ট নিয়ে এক ছবি তৈরী হবে—আর সে ছবি আত্মপ্রকাশ কোরবে সাধারণের চোখের সামনে। আপনারা একথা অবিশ্বাস কোরলেও আমাদের বিশ্বাস ছিল, একাগ্রতা মানুষকে করে জয়যুক্ত—তার দুর্গম পথে ফুটে ওঠে পঙ্কতিলক। "খাস-দখল" ভাল ছবি কী খারাপ ছবি তা' আলোচনা কোরতে আমাদের ইচ্ছে হ'চ্ছে না। কলম আজ ছুটে চল্‌ছে এই 'ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দারদে'র প্রশংসা কোরতে; কিন্তু উপায় নেই, সমালোচকের কার্য্য বড় কঠিন—দশজনকে শোনাতে হবে যা' সত্য তাই। তাই পড়ে তারা কাউকে দেবে দুয়ো আর কাউকেবা বল্‌বে বেশ বেশ। সেজন্য ভূমিকা আর দীর্ঘ না কোরে এগুই নিজের কাজে।

"খাস-দখল" রসরাজ অমৃতলাল বসুর এক হাস্যরস প্রস্রবন। মঞ্চে এর অভিনয়, এখনও পর্য্যন্ত, না হাসতে জানা এই গম্ভীরমুখো বাঙালীগুলোর মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে। এর গল্পের সঙ্গে বাঙালী মাত্রেই পরিচিত আছেন। কী কোরে লোকেন আর মোহিত নিজ নিজ হারানো 'খাস' 'দখল' পেলো এ কথা বোধ হয় এখনও কেউ ভোলেন নি। গল্পের বিষয়টি ষ্টেজে যেমন জমেছিল পর্দ্দায় সে রকম জমার কিছুমাত্র বাধা ছিল না, যদি চিত্রনাট্যকার লম্বা লম্বা সংলাপ কেটে আর আজে বাজে দৃশ্য এনে ছবিখানাকে ভারাক্রান্ত কোরে না তুলতেন। চার কী পাঁচ রীলের মধ্যে ছবিখানা যদি তোলা হ'ত, তা' হ'লে এই গল্পটির রস আরও দানা বাঁধবার সুযোগ পেত।

পরিচালনা ব্যাপারে রমেশ দত্ত ওরফে চানী দত্ত নতুন কিছু না কোরে মোটামুটিভাবে একাজ শেষ কোরেছেন। 'টেম্পো' সম্বন্ধে চানীবাবু যদি আর একটু দৃষ্টি রাখতেন, তা' হ'লে তাঁর পরিচালনার গুণ আরও কতকটা প্রকাশ পেত।

ছবিখানার সবচেয়ে নিন্দনীয় বিষয় হ'য়েছে আলোক-চিত্র আর শব্দ-সংযোজনা। এত flat আর আবছা ছবি এযুগে চলে বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। শব্দযন্ত্রের কাজও অবিশ্যি খারাপ হ'য়েছে কিন্তু স্বদেশী শব্দযন্ত্র 'সিণ্টোফোনে' এরা কাজ কোরেছেন বলে প্রশংসা না কোরে পারা যায় না। ঐই যন্ত্রে এই প্রথম ছবি সুতরাং ভবিষ্যতে এই যন্ত্রের আরও দু'এক খানা তোলা ছবি না দেখে এ সম্বন্ধে আপাতত: কারও কোনও মন্তব্য ব্যক্ত করা সমীচীন নয়। এ ছবিকে First experiment বলা ছাড়া আর কিছু অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করা যায় না। তবে কর্ত্তৃপক্ষ যদি ছবিখানাতে আগাগোড়া নেপথ্য-সঙ্গীত সংযোগ কোরতেন তা' হ'লে ছবিখানার ভেতর 'ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড নয়েজ' বোধ হয় অতটা কানে লাগত না।

সুরশিল্পী গানের সুরগুলো মন্দ দেন নি আর সেইজন্যই "যায় যায় যায় কলির রাজত্ব বুঝি যায়", "সজনি কো কহ আওব মাধাই" ও "কর কর আরোহণ প্রেমের স্যন্দনে" দু' একটা গান বেশ শ্রুতিমধুর হ'য়েছে।

সম্পাদনা বিষয়ে এখনও কসাইয়ের মত নির্দ্দয় হ'য়ে যদি ফিল্মের ওপর কাঁচি চালানো যায়, তা' হ'লে ছবির গতি আর

সামঞ্জস্য অনেকটা ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রায় সবাই মোটামুটি কাজ চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বিশ্রী লাগল পদ্মাবতীর অভিনয় ও চেহারা—দু'ইই। তার মুখে ইংরেজী বুকনিগুলো শুনলে মৃত সাহেব মেমেরাও কবর থেকে লাফিয়ে উঠবে। যেমন, Hurry up-কে—হরি আপ্, Morning-কে মোনিং আর কত ছাই মনেও যে নেই। এ ধরণের পার্টে শ্রীমতীকে কেউ-ই যেন আর না নামান আর শ্রীমতীও যেন নেমে দুর্ণাম না কেনেন—এই আমাদের ইচ্ছে। শৈলেন পালের মোহিত আমাদের বেশ লেগেছে। ভূমেন রায় এই ভূমিকাটি আগাগোড়া অভিনয় করেন কিন্তু কোন কারণে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হওয়ায় শৈলেনবাবু মাত্র তিন দিনের মধ্যে এই কঠিন ভূমিকাটি অভিনয় করেন, তিনি এমন সময় পাননি যা'তে পার্টটি একবার পড়ে বুঝে তারপর ক্যামেরার সামনে হাজির হন। এই দিকেও পাল মশায়ের কৃতিত্ব কম নয়। নিতাইয়ের 'Is the' পার্টে নেমেছিলেন, পরিচালক স্বয়ং। হাঁসির ভূমিকায়—এর শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে আগেই—এবার তা' বজায় রয়েছে অটুট-ভাবে। দেখিনি, শুনেছি গ্রন্থকার স্বয়ং এই অংশে নামতেন—তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তা' হ'লে চানীবাবুকে প্রশংসা কোরতেন—এ বিশ্বাস আমাদের হয়। ঠাকুর্দার ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী স্বভাব-সুলভ মধুর অভিনয় করেছেন। তবে মেক-আপটা আর হাত মুখ নাড়ার দিকে একটু দৃষ্টি দিলে ভাল হত। ইন্দুবাবুর লোকেন মন্দ নয়। রমেশ, সুরেশ ও সারদা আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল।

নলিনীকান্ত সরকারের গান দু'খানা ভালই। হ্যাঁ, আর একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাল—গিরিবালারূপে শ্রীমতী রেণুকা রায়। গলা ভাল চেহারাও মিষ্টি। প্রথমবারে ক্যামেরার ঈগল চোখের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী মাঝে মাঝে একটু ভড়কালেও ভবিষ্যতে ভাল পরিচালকের হাতে পড়লে ঘষে মেজে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। পটলের বিধু মঞ্চের ছাপ পড়েছে। নগেন্দ্রবালার আহ্লাদী ভাল। ব্রাকীর মহালক্ষ্মীতে কিছু নেই। কিন্নরকণ্ঠী সুহাসিনীর গান কার না ভাল লাগে—আমাদেরও তাই লেগেছে। অন্যান্য পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রগুলো অনুল্লেখ-যোগ্য।

পরিশেষে আমরা শুধু এইটুকু বলতে চাই, এই ছবিখানার ভেতর দোষত্রুটি থাকলেও—এর ফিল্ম ফিতেগুলো ছাড়া অন্তর বাইর একেবারে খাঁটি স্বদেশী মার্কা। সে হিসাবে সকলেরই এ ছবিখানাকে স্নেহের চোখে দেখা উচিৎ।

নারী প্রগতি

এই সঙ্গে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার গীত "নারী প্রগতি" গীতি-কথা দেখানো হয়। এখানির ভাব ও কল্পনা প্রনিধানযোগ্য।

বঙ্গীয় নাট্য সঙ্ঘ

গেল ২০এ ডিসেম্বর 'নাট্য নিকেতন' রঙ্গমঞ্চে বঙ্গীয় নাট্য সঙ্ঘ কর্ত্তৃক দুটী নাটকের অভিনয় হয়েছিল। আমরা এই নবীন সম্প্রদায়ের তরুণ শিল্পীদের অভিনয় দেখে বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলাম। বিশেষ করে ফণি বিদ্যাবিনোদ, অনাথ চক্রবর্ত্তী, তারক বাগচীর অভিনয় প্রশংসনীয়। আরো উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে এই সম্প্রদায়ের নর্ত্তকীদের নাচে; এবং তাদের মধ্যে কৃষ্ণভামিনী, রাধারাণী এবং কনার নাচ আমাদের বেশ লেগেছে।

কালী ফিল্মস্

এরা অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতীয় একাদশের ক্রিকেট খেলার ছবি তুলেছেন এবং তা' এখন 'উত্তরায়' দেখানো হ'চ্ছে। নিউজ রীল তোলার এ প্রতিষ্ঠানটির উৎসাহ সব চেয়ে বেশী।

মডার্ণ ইণ্ডিয়া টকীজ্

এই নামে যে নতুন প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হ'ল তার মালিকরা এসেছেন দিল্লী থেকে এখানে ব্যবসা কোরতে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে দিন সাতেকের মধ্যেই এদের ছবি তোলা সুরু হবে—পরিচালনা কোরবেন "ডি, জি"। তিনি সহকারী নিয়েছেন আমাদের ও জনসাধারণের পরিচিত "খেয়ালীর" ভূতপূর্ব্ব প্রকাশক শ্রীসুধীরকুমার সরকারকে। নিউ থিয়েটার্সের 'বি' ইউনিটের কর্ম্ম-কর্ত্তার করুণাপ্রার্থী হ'য়েছিলেন ইনি বহু প্রকারে। অবশেষে দরদী বন্ধু 'ডি জি'-র কল্যাণে তার সুরাহা হ'য়েছে। এবার সুমতি হ'লে সুখী হব।

ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া

"পথের শেষে" প্রায় শেষ হ'য়েছে।

প্যারাডাইজ্

গত ২১শে ডিসেম্বর রাধা-ইষ্ট ইণ্ডিয়ার নতুন ছবিঘর "প্যারাডাইজে"-র দোর খোলা হ'য়েছে। এই অনুষ্ঠানে সিনেমা-সংক্রান্ত নাম-করা সব কটিই চেনা-মুখকে দেখা গেল। ছবিঘরটি ছবির মতই হ'য়েছে।
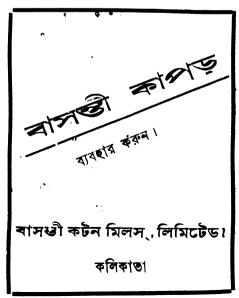
ফি

ল্ম

স

প্রথম নৈবেদ্য—

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের

শ্রেষ্ঠ সমাজ-চিত্র

পরপারে

পরিচালক ও চিত্র-শিল্পী } যতীন দাস

শ্রেষ্ঠাংশে :

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(নিউ থিয়েটার্সের সৌজন্যে)

জ্যোৎস্না গুপ্তা

? ? ?

বিবিধ

কর্পোরেশন নির্ব্বাচন

কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্ব্বাচন আগামী মার্চ্চ মাসে হইবে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এখন হইতেই পল্লীতে পল্লীতে বিভিন্ন প্রার্থীরা নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সমর্থন লাভের জন্য আসর সরগরম করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বর্ত্তমান কাউন্সিলার আছেন তাঁহাদের তো কথাই নাই; তাঁহারা ইতিমধ্যে কেহ বা নিজের পল্লীতে স্বাস্থ্য-শিল্পী-প্রদর্শনী খুলিয়া নিজের গুণপনা জাহির করিতে ব্যস্ত, কেহ বা অকারণেই দাতাকর্ণ সাজিয়া পল্লীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ যত ক্লাব ও সভাসমিতি আছে ইতর বিশেষ নির্ব্বিশেষে অর্থ সাহায্য করিতে সুরু করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান কাউন্সিলারবৃন্দ বা যাঁহারা 'হবু' তাঁহারা হয়তো ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে কলিকাতার জনসাধারণ পূর্ব্বেকার ন্যায় এখনও তেমনিই নির্ব্বোধ আছে যে তাহাদিগকে আগেকার মতই ধাপ্পা দিয়া কাজ সমাধা হইবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক উহার বিপরীত। অর্থাৎ এত সহজে বা কোনও স্তোক-বাক্য ভুলিয়া সহরের করদাতারা অযোগ্য ব্যক্তিকে সমর্থন করিবে না। কলিকাতার করদাতাগণ এতদিনে ঠেকিয়া শিখিয়াছে—তাহারা তুলা দণ্ডে ওজন করিয়া যাহার গুণাবলী এবং পল্লীকে সেবা করিবার আগ্রহ অন্যাপেক্ষা সমধিক দেখিবে তাহাকেই তাহারা এবার নির্ব্বাচনে সমর্থন করিবে। তবে একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বিভিন্ন পল্লীতে নির্ব্বাচন প্রার্থীগণের মধ্যে যাহারা কংগ্রেস ছাপ পাইবেন তাহাদের নির্ব্বাচনের আশাই বেশী।

কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের মনে হয় যে, যাঁহারা কংগ্রেস পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রার্থীদিগের যোগ্যতার পরিমাপ করিবেন তাঁহাদের উচিৎ যত বেশী সম্ভব তত নূতন প্রার্থীগণের সমর্থন করা। কেননা আমরা মনে করি একই ব্যক্তিকে বহুদিন কাল কর্পোরেশনে রাখিলে সেই ব্যক্তির কার্য্য-ক্ষমতায় ভাঁটা পড়িয়া যায়, তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে শৈথিল্য আসিয়া পড়ে। সেই কারণে আমাদের বক্তব্য যে বর্ত্তমানে কর্পোরেশনে যাঁহারা নয় বৎসর বা তাহারও অধিককাল কাউন্সিলার পদে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদের উচিৎ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করা এবং কংগ্রেসী কর্ত্তৃক উক্ত ব্যক্তিগণকে সমর্থন না করা। অবশ্য এই নীতি প্রতিপালিত হইলে কোন কোন উপযুক্ত ব্যক্তিও কাউন্সিলার হইতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের কর্পোরেশনে থাকিবার ব্যবস্থাও আছে "অল্ডারম্যান" রূপে।

কোন্নগর পাঠ-চক্র

শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম-এ-র সভাপতিত্বে গত ২৮শে ডিসেম্বর রবিবার 'কোন্নগর পাঠ-চক্র' ও 'শিবচন্দ্র' স্মৃতিসভার সপ্ত বার্ষিকী অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। প্রায় এক সহস্র পুরুষ ও মহিলা এই সভায় যোগদান করেন। তন্মধ্যে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী অমৃতানন্দজী ও রাধারমণ চৌধুরী (প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ), রঘুনাথ দত্ত (ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স), চৈতন্য দেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুধীর বসু প্রভৃতি।

শিবচন্দ্র দেবের ছবিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয় এবং শিবচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা প্রভৃতি পঠিত হয়।

কোন্নগর পাঠ-চক্রের রিপোর্ট পাঠের পর আনন্দবাজারের শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় দুইটি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কুমারী গীতা মিত্র প্রভৃতির সঙ্গীতে ও কুমারী মঞ্জুলিকা ভট্টাচার্য্যের নৃত্য অত্যন্ত মনোরম হইয়াছিল।

পরলোকে বিধুমুখী দেবী

গত ৬ই পৌষ রবিবার রাত্রি ১১টার সময় জমিদার শ্রীযুক্তবাবু হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের মাতাঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা বিধুমুখী দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। গত

৺বিধুমুখী দেবী

কল্য শ্রীযুক্ত হরিহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ২৩নং রাসবিহারী এভিনিউস্থ ভবনে তাঁহার আদ্যকৃত্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত দেখা গিয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীপ্রমথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ এ, টি, মুখার্জ্জী, মিঃ পি, মুখার্জ্জী, মিঃ ডি, এন, মুখার্জ্জী, মিঃ এস, মিত্র, মিঃ বি, মল্লিক, মিঃ পি, গুপ্ত, মিঃ বি, চ্যাটার্জ্জী, ডাঃ কে, ভট্টাচার্য্য শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার, শ্রীবিশ্বাবসু রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বালিকার কৃতিত্ব

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় এবার যে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে সমগ্র জনমণ্ডলী ভারতবর্ষের নিজস্ব অন্যতম বাদ্যযন্ত্র সেতার বা সপ্ততন্ত্রী বীণার প্রসংশাই একমুখে করিয়াছেন। গৌরীপুরের প্রফেসর এনায়েৎ খাঁই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতার বাদক। তিনি তাঁহার শিষ্যা কুমারী রেণুকা সাহার কৃতিত্বে গর্ব্বিত।

কুমারী রেণুকা সাহা প্রফেসর এনায়েৎ খাঁ এবং শ্রী অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্যের নিকট সেতার বাজনা শিক্ষা করেন এবং প্রথম হইয়া গত বৎসরের এই প্রতিযোগিতায় সম্মানে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। নেপালের প্রধান কমাণ্ডিং জেনারেল স্যার মোহন সামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা, কে, সি আই, ই, প্রভৃতি রাজন্যবর্গ কুমারী সাহাকে তিনটী স্বর্ণপদক দান করিয়াছেন। এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া দুইটী রৌপ্যপদক দান করিয়াছেন।

কুমারী রেণুকা সাহা মেধাবী ছাত্রী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। রেণুকা আদর্শ বাঙ্গালী বালিকা; লেখা-পড়া সঙ্গীত ও খেলাধূলা সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সমান কৃতিত্ব।

কুমারী রেণুকা এবারকার প্রতিযোগিতায় এই অসামান্য কৃতিত্বে নিখিল ভারত মহাসভায় তাহার পরিচয় দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। এইরূপ সম্মানের সৌভাগ্য খুব কমজনের ভাগ্যেই হইয়া থাকে।

রেণুকা প্রিন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা।

কুমারী রেণুকা সাহা

বাগ্‌বাজারের ভবিষ্যদ্বাণী

Delphia Oracle যাহা বলিত তাহাই ঘটিত। আমাদের বাগ্‌বাজারের সহযোগী অনুরূপ ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। এবার উপাধিবর্ষণের পূর্ব্বাভাষ হিসাবে তাঁহারা বলিয়াছিলেন নলিনীরঞ্জন সরকার 'স্যার' এবং ডেপুটী ডিরেক্টার অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ মিঃ এস, সি, মিত্র সি, আই, ই, হইবেন। বাগ্‌বাজারের নলিনীপ্রেম কাহারও অজ্ঞাত নাই অতএব তাঁহাকে এইভাবে প্রলুব্ধ ও হতাশ করার License হয় তো তাঁহাদের আছে, কিন্তু অজাতশত্রু বন্ধুবর মিঃ এস, সি, মিত্রকে লইয়া এইরূপ রসিকতার মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মিঃ মিত্র অমৃতবাজারের অন্যতম অংশীদার। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বা ইচ্ছা করিলে অন্য উপায়ে তাঁহারা সঠিক সংবাদ অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া নিজেদের অংশীদারিকে এই ভাবে গুজবের দ্বারা পীড়িত করার মধ্যে যে অভদ্রতা আছে তাহা তাঁহারা কবে বুঝিবেন?

সঙ্গীত-সভা

গত ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় কলিকাতা মিউজিক্ এসোসিয়েসনের উদ্যোগে ৪৬নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয়ের বাটীতে স্বর্গীয় ওস্তাদ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের অষ্টম বার্ষিক স্মৃতি উৎসব অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই সভায় সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ননীগোপাল মতিলাল, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্র শীল প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গের খেয়াল গান গাহিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধমুগ্ধ করেন। কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও সৌকত আলি খাঁর যন্ত্রসঙ্গীত অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী, কুমারী বিভাস, কুমারী দেব বর্ম্মণ, কুমারী গীতা রায় প্রভৃতি গায়ক গায়িকার গান এবং কুমারী শোভা কুণ্ডুর সেতারও অতি চমৎকার হইয়াছিল। রাত্রি ১১॥০ টায় সভা ভঙ্গ হয়।

বেঙ্গল ষ্টোরস্ "খেয়ালী"

গত ৪৮শ সংখ্যা "খেয়ালী"তে (২৬শে অগ্রহায়ণ) "বেঙ্গল ষ্টোরস্‌এ সাম্প্রদায়িকতা" শীর্ষক এক সংবাদে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালী ম্যানেজার হইতে আরম্ভ করিয়া অনেককে সেখানকার চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং সেই স্থলে মাড়োয়ারী আমদানী করা হইতেছে। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে সহসা নিম্নোল্লিখিতের ন্যায় বেঙ্গল ষ্টোরস্ আমাদের পত্রযোগে এক অদ্ভুত অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন—নিম্নোল্লিখিতের ন্যায়ই তাহাতে সঙ্গতির লেশ নাই। সেই পত্রখানি এবং আমাদের তরফ হইতে তাহার যথাযোগ্য উত্তর নিম্নে মুদ্রিত হইল :—

B E N G A L S T O R E S Ltd.

8A, CHOWRINGHEE PLACE,

Managing Agents:—
BIRLA BROS., LTD.

Ref No. V/O-4078.

The Editor,
"Kheyali",
9, Ranmoy Road,
Bhowanipore,
C a l c u t t a.

Dear Sir,

Our attention has been drawn to the comments that were published in the columns of your esteemed paper a few days ago regarding this Stores about its supposed "recent arrangements and consequent dismissal of a few Bengali Staff."

So we shall beg to request you kindly to inform us the source of getting your such informations at an early date.

Thanking you.

Yours faithfully,
For BENGAL STORES LTD.
(Sd) S. Bhattacharji
for Manager.

Manager,
Bengal Stores Ltd.,
8 A Chowringhee Place,
Calcutta.

Re :—Bengal Stores & Kheyali

Dear Sir,

We are surprised to receive your letter No V/O-4078 dated 1st January 1936 wherein you have requested us to inform you the source of our informations regarding recent arrangements and consequent dismissal of a number of Bengalee employees of Bengal Stores Ltd.

It is sheer impertinence to make such a request to a newspaper or a journal and we hereby refuse to comply with your request.

If, however, you have got anything to say with regard to the dismissal of your Bengalee employees, we shall duly publish them in columns of Kheyali.

In the discharge of our public duties we have given publicity to the news with a view to voice the grievances of the Bengalee employees and to redress their grievances and to draw the attention of the public to the relations between the non-Bengali employers and the Bengalee employees of the Bengal stores Ltd.

Thanking you.

Yours faithfully,
B.R.,* J.B.
for National Newspapers Ltd.
(Sd) B. Roy Chowdhury.

অতঃপর এ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল এবং এবিষয়ে আমরা 'বেঙ্গল ষ্টোরস্'এর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য আবাহন করি :—

(১) মিঃ ব্যানার্জ্জীকে বরখাস্ত করিয়া সেইস্থানে কে এক দামোদরদাস ডালমিয়াকে ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে উক্ত ডালমিয়াকে সংগঠনকারী বলিয়া নামকরণ করা হয়, কিন্তু ম্যানেজার বলিয়া উক্ত পদে কাহাকেও স্থাপন করা হয় নাই। Mr. Dalmiaই উক্ত পদে de facto ম্যানেজার।

(২) কিছুদিন পূর্ব্বে বিগত ছয় মাসের মধ্যে বিরলা ব্রাদার্সের পরিচালিত কলিকাতার কেশোরাম কটন মিলস্ ও দিল্লী মিলের ধর্ম্মঘট হইয়াছিল।

(৩) বেঙ্গল ষ্টোরস্‌এ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী ও অবাঙ্গালী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ কয়েক মাস হইতেই অল্প বিস্তর চলিতেছে। শেষবার যখন ৪/৫ জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করা হয় তখন বাকী সকল কর্ম্মচারীই একসঙ্গে দোকান হইতে বাহির হইয়া যায় এবং হয় উহাদের পুনর্নিয়োগ ও না হয় তাহাদের সকলকে একযোগে বরখাস্ত করা হউক—এই দাবী করে। অবশেষে তাহারা মিঃ খইতানের নিকট যায় এবং যতদিন না মিঃ বিরলা ফিরিয়া আসেন ততদিন তাহাদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া মিঃ খৈতান আশ্বাস দেন।

(৪) বর্ত্তমানে ম্যানেজার পদে কেহই নাই। মিঃ ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে সহকারী ম্যানেজারের পদে বৃত ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি ম্যানেজারের বকলমে চিঠিপত্র সই করিয়া থাকেন। মিঃ ব্যানার্জ্জির শূন্য আসনে কাহাকে বসান হইয়াছে—মিঃ ভট্টাচার্য্যকে না মিঃ ডালমিয়াকে?

মাড়োয়াড়ীর অর্থে পুষ্ট ও পরিচালিত কলিকাতার পণ্যশালা বেঙ্গল ষ্টোর্সএ বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে আমরা তাহার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। স্থান বিশেষে রায় বাহাদুর রামদেও চোখানি ও

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রীকুমুদেশ সেন

—দ্বিতীয় পত্র—

শ্রদ্ধাস্পদেষু…

ট্রেণে আসতে আসতে বারংবার এ কথাই মনে হচ্ছিল যে ভারতবর্ষে প্রতি ঘটনাতে এত সময় নষ্ট হয় কেন? যে সময় কলোম্বো থেকে কলকাতা পৌছতে লাগে সে সময়ে ইটালী উপকূল হ'তে ইংলণ্ডের আর এক প্রান্তে উপনীত হতে পারা যায়। ইহা শুদ্ধ মাত্র দ্রুতগামী রেলের অভাবের জন্যই নয়…ইহার প্রকৃত কারণ আমাদের দেশের লোকের জড়তা। ইঁহারা সময়কে সংক্ষিপ্ত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। চার দিনের স্থলে তিন দিনে যদি ঐ কয়েক শত মাইল অতিক্রম করা যায় তাহ'লে যে কতখানি উপকার হয় তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করবার মনোভাব আমাদের দেশে এখনও গঠিত হয় নাই। ইহা বিচিত্র কিছু নয় কারণ এই মনোভাব সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে কারণে গো-যান থেকে আমরা বাষ্প-যানের যুগে এসেছি ঠিক সেই কারণেই অন্য দেশে বাষ্প-যানের স্থানে বিমানপোতের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। বর্ত্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে গতি। মানুষ অগ্রসর হতে চায়, তার চলার পথে কোনও অন্তরায় সে সহ্য করে না, তাই যারা অক্ষম……যারা তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে না, তাদের পিছিয়ে পড়তে হয় এবং কালক্রমে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। ইংরাজীতে ইহাকেই বলে "Survival of the fittest" এবং আমাদের দেশেও যেদিন অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নততর হবে সেদিন হইতে অধিকতর কার্য্যকারিতা দেখতে পাব। এভাবে আচ্ছন্ন হয়ে কতখানি পথ যে অতিক্রম করলাম তা লক্ষ্য করি নাই। যখন প্রথম চমক্ ভাঙ্গল তখন দেখি দূরে দিকচক্রবাল অস্ফুট সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। কী শান্ত সুন্দর মুহূর্ত্ত…বহুদূর প্রসারী মাঠের পর মাঠ তার শস্যশীর্ষে সূর্য্য কিরণ মণ্ডিত হয়ে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করেছে। ঠিক এমন দৃশ্য বহুদিনের মধ্যে চোখে পড়ে নাই! ক্রমে ক্রমে আলোর রেখা স্পষ্টতর হয়ে উঠল এবং এমনি সময়ে আমাদের গাড়ী এসে থামল বড় একটা ষ্টেশনে।

ঠিক ইহার পূর্ব্বে আর কখন মনকে এরকম করে আর কোনও ঘটনা আলোড়িত করে নাই। মানুষের সকল কার্য্যেরই উপযুক্ত সময় ও স্থান আছে। কিন্তু কেউ যখন সে কথা বিস্মৃত হয়ে ঘরের কার্য্য বাইরে সমাধা করবার প্রয়াস করে তখন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কি ন্যায় সঙ্গত নয়? হয়তঃ এ প্রসঙ্গের অবতারণা অনেকের নিকট অবাস্তর ও নিম্নরুচির ইঙ্গিত করবে কিন্তু সুধী যাঁরা তাঁরা আমার যুক্তির সারবত্তা আশা করি প্রণিধান করবেন। সংসারে এমন অনেক জিনিষ আছে যা আমাদের অভ্যাসগত হয়ে গিয়েছে কিন্তু ঠিক সেই কারণেই কি তাকে সহ্য করা শিক্ষিতের কর্ত্তব্য? প্রকাশ্য স্থানে বিশেষ করে রেল ষ্টেশনে, যেখানে বহু অপরিচিতের সমাগম হয়, সেখানে জিহ্বা পরিষ্কার করা অথবা মলমূত্র পরিত্যাগ করা কতদূর সমীচিন তা কি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি? কথা উঠতে পারে যে যাহারা অশিক্ষিত মাত্র, তাহারাই এরূপ আচরণ করে…কিন্তু ইহা সত্য নহে। এইরূপ ব্যবহার, শিক্ষা ও অশিক্ষার উপর নির্ভর করে না; ইহা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে অভ্যাসের উপর এবং এই অভ্যাস পরিবর্ত্তনীয়। আজ যদি ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম্ থেকে জলের কলগুলি তুলে নেওয়া হয় তা হ'লে ভদ্রমহোদয়গণ কি করবেন? আমার মনে হয় যে রেলযাত্রীগণের যে সমিতি আছে তাহার প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে এই দিকে রেল কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ভাল জল সরবার ব্যবস্থা শুধুই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে করবার কি কারণ আছে? যাহারা মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন তাহাদের কি এই দিকে কোনও দাবী নাই?

চিন্তাশীলতার গৌরব আমি করি না… প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের বোঝা বহন করবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা অসমীচিন বলে মনে হয় তা সমালোচনা করবার অধিকার সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমূলচাঁদ আগরওয়ালা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীবৃন্দের প্রতি যে সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি। শোষক শকুনি বা বসন্তের কোকিলরূপে বিরাজ করিলে মাড়োয়ারী ধনীসম্প্রদায় স্বীয় ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবেন।
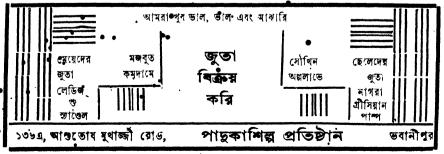
প্রত্যেক নরনারীরই আছে। কী ভাবে উপরোক্ত এই পরিবর্ত্তন সাধিত হতে পারে তাহা কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করবেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসেবে সুরুচিকে যা আঘাত করে,.তার তিরোধান শ্রেয়ঃ মনে করে আমি আমার নিবেদন জ্ঞাপন করলাম।

ধীরে ধীরে গাড়ী ষ্টেশন পরিত্যাগ করে অগ্রসর হল, তার গতি 'যতই দ্রুত হতে দ্রুততর হতে থাকল, আমারও গম্য স্থান নিকটবর্ত্তী হয়ে উঠল। আশা ও নিরাশা, উদ্বেগ ও আনন্দের ভারে মন অভিভূত হল। ভাবছিলাম, যা দূর থেকে পরম রমণীয় ও আকাঙ্খার বস্তু বলে মনে হয়, সত্যই কি তা শেষ পর্য্যন্ত রমণীয়ই থাকিবে? অথবা 'ইহা বহ্নি মুখে পতঙ্গের ন্যায় আমাকে আকৃষ্ট করছে পরে যখন যথাস্থানে উপনীত হব তখন দেখব মৃগ-তৃষ্ণিকার মতন আমার কল্পনা লোকের সমগ্র আবেগ ও উন্মাদনা, আমার ধ্যানের যে মূর্ত্তি তা বাস্তবিক মানব মনের চাপে নিষ্পেষিত হয়ে···ছিন্ন ভিন্ন ভাবে অনাদর ধুলায় বিলুণ্ঠিত হবে। সংসারে অনেক কিছু সহ্য করা যায় কিন্তু সহানুভূতি নহে। শত্রুতা ও ঘৃণা হাসিমুখে বহন করা চলতে পারে, কিন্তু অনুকম্পা ও সহানুভূতির পশ্চাতে মিত্ররূপে যে শত্রু বর্ত্তমান রয়েছে, তার অস্তিত্ব মনকে জর্জ্জরিত করে তোলে।

ক'দিনেরই বা জীবন। কিন্তু মানুষের লোভাতুর চিত্ত তার জীবনের স্বল্পতা কি উপলব্ধি কর্ত্তে পারে? যদি তা সম্ভব হত তবে অনেক নীচতা ও খলতার হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেতাম।

কিন্তু আমার এ চিন্তা সম্পূর্ণভাবে আমার নিজেরই। বাইরের লোক হয়তঃ ইহাকে বাচালতা বলে উপহাস করবে সেজন্য ইহার সমাপ্তি এখানেই হোক্।

হাওড়াতে এসে পৌছলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে এসে দেখি কয়েকজন বন্ধু ষ্টেশনে এসেছেন···তাঁদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে মনে মনে বললাম, জীবননাট্যের দুই অঙ্কেরই যবনিকা পতন হ'ল, এবার তৃতীয় অঙ্কের শেষ কোথায়??

ইতি—

কুমুদেশ সেন।

(ক্রমশঃ)

অক্ষয়কুমার সরকারকে লিখিত]

রঙীন আলোর সম্মিলন

সাতশ' রঙএর সাতশ' আলো শীতের কুয়াসায় জোনাকীর মত জ্ব'লে।

গত বৃহস্পতিবার নিউ থিয়েটার্সে-এর 'এ' ইউনিটে বেজে উঠ্‌লো উৎসবের শঙ্খ। সন্ধ্যের পর চণ্ডী ঘোষ রোডে তাই রঙীন আলোর সম্মিলন। ক্যামেরা, ক্ল্যাপ্‌ষ্টিক্‌, আর অ্যাকোয়োষ্টিক সেদিন শুনেছে ঘুম পাড়ানি গান। অতিথি অভ্যাগতর 'কোলা-হলে 'Silence please' ষ্টুডিয়ো সেদিন মুখর।' নিয়ম-কানুনের সেদিনকার মত ছুটি। 'ধূমপান নিষেধ'টি তাই সিগ্রেট্‌এর ধোঁয়ায় অন্ধকার।

ষ্টুডিয়োর ভেতর ঝক্‌মকে একখানা ষ্টেজ দাঁড়িয়েছে। কত সারি সারি চেয়ার। আর, কত শাড়ির পাড়ে রামধনু! আর, কতো শালের পাড়ের অজন্তা! 'সন্ধ্যের প্যারী'র গন্ধ হাল্‌কা পাথায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লম্বা ওভারকোট্‌ পরা (হ্যাঁ ঠাণ্ডা—টালিগঞ্জেই বেশী) ছবিবাবুর 'So late'এর 'স্বাগতম্‌' শোন্‌বার পর ভেতরে শুন্‌লুম পৃথ্বিরাজবাবু করবেন আবৃত্তি। এ পৃথ্বিরাজ 'ডাকু মনসুর' কিম্বা 'গৃহদাহের' নয়—এ পৃথ্বিরাজ সেই যুগের—যখন ক্লিওপেট্রা সাসির মত গ্রীস্‌কে বানিয়েছে শূয়োর। পৃথ্বিরাজ আন্‌টনি কিনা। 'হ্যাঁ' গ্রীকদেরই মত তার স্বাস্থ্য বটে!

তারপর মিঃ সাইগল টাক আর হাত নেড়ে আরম্ভ করলেন 'বোলোরে পাপিয়া'। কিন্তু, তারপরে বাংলা কীর্ত্তনখানা সত্যই ভারী সুন্দর।

বিজয় আর বিনয় মল্লিকের জোর দেখানোর পালা তারপর। বিনয় ভাঙ্গলে ডাব, বিজয় গলার নলীতে লোহা বাঁকালে। দেখবার মত জিনিষ বটে! আর, বিজয় মল্লিকের পেশী-সঞ্চালন—সে কে না দেখেছে!

তারপর—এখন বিশ্রাম। হেমন্তবাবুর উপদেশ মত গরম চা খেয়ে গরম হ'য়ে নেয়া গেলো।

ফিরে এসে সভা দেখি নিস্তব্ধ। যেন সবাই সবাইকে হাতের ভেতর রেখেই হারিয়ে ফেলেছে। ওস্তাদ বাজাচ্ছেন স্বরোদ, আর তব্‌লা ধরেছে রাইচাঁদ নিজে। এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায়। সত্যি, স্বরোদ আর সঙ্গতের এহেন অপূর্ব্ব সম্মিলন আগে আর দেখি নি। কথায় বলে—বাঁশী বাজিয়ে বাঘকে নাকি বশ করা যেতো—এ কথা সেদিন বিশ্বাস হ'লো।

রাইচাঁদের বাজ্‌নার সঙ্গে নাচ তারপর। মলিনা, একজন ভদ্রলোক আরেকজন মেয়ের সঙ্গে নাচলে। মলিনার নুপুর পরা পা দেখলুম এখনও নাচতে ভোলে নি। বাতাসে আঁচল উড়িয়ে নুপুরের ঘন ঘন রিনি রিনি। রাইচাঁদের বাজনা বাজে, সবাই আগে তাকেই বলে চিনি চিনি।

চারটি মেয়ের নাচ তারপর। সুন্দর তাদের মুখ। রাইচাঁদের বাজনা এবারও মাত করলে।

তারপর সিনেমা। রঙীন বিদেশী এক কার্টুন। এরপর নিউ থিয়েটার্স'এরই তোলা উপভোগ্য ছোট্ট একটি ছবি।—রাতের আকাশে চাঁদ উঠেছে। রাজকুমারীর মত সাথী নিয়ে পাহাড়ী প্রেমের গান গাইতে গাইতে চলেছে বোট্‌ চালিয়ে। রূপও সুরের সুধা বরিষণ। কিন্তু, তারপর দেখানো হ'লো—কোথায় চাঁদনী রাত, আর কোথায় সুখের সে সরোবর। এ সিনেমায় একটি মায়া মাত্র! শেষ হ'লো গান। গম্ভীরভাবে পরিচালক মশাই বসে-ছিলেন, ইসারায় তিনি সব থামালেন। জিজ্ঞেস করলেন সব ঠিক? 'হ্যাঁ'। জলের যে কল্‌কলানি তার জন্ম হচ্ছিলো একটি বাল্‌তীতে। 'চাঁদ কোথায় আকাশের?' সূতো বেয়ে চাঁদ নেবে আসে—যেন ঘুড়ি। গোত্তা মারতে গিয়ে 'ভো কাট্টা'।

···ফেরবার সময় পাহাড়ীর মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফিরে আসি। পাহাড়ীর বড় তাড়াতাড়ি! সাড়ে ন'টার শো'র নিউ এম্পায়ারের ওর টিকিট্‌ কাটা আছে কিনা!

হে মোর অপরিচিতা

[উপন্যাস]

শ্রীসুপ্রিয় সোম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১০)

যদিও সত্যিই আমি বহুদিন তনিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেম না, তবুও মনে মনে তনিমার চিন্তায় ব্যস্ত রইলেম। মনে মনে তনিমাকে মন থেকে ছাড়াতে যাই, কিন্তু ছাড়াতে গেলেই এক নিদারুণ ব্যথা বাজে, স্থির থাকতে পারি না। যখন কাজের চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে মেসে ফিরে আসি, তখন ভাবি তনিমার কথা; বাতাসের স্পর্শ গায়ে এসে লাগে। ধীরে ধীরে তন্দ্রা আসে। মনে হয় তনিমা তার স্নেহ-শীতল হাত দুটী আমার কপালে রেখে আমার দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে ছলছল চোখে চেয়ে আছে। হয়ত তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসছে, নিজে আর উঠ্তে পারি না, তনিমা জল গড়িয়ে আমার কাছে ধরলে, আমি তৃষ্ণা মেটালেম।

মনের এমনি অবস্থায় অনেক সময় মনে হতো—যাই একবার তনিমার সঙ্গে দেখা করে আসি, কিন্তু বন্ধু-বিচ্ছেদের ভয়ে পা আর এগোত না। তা ছাড়া মনে হতো নির্ম্মলের সুমুখ থেকে তনিমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা হয়ত অন্যায় হবে, আর তনিমার যোগ্য বর নির্ম্মলই।

একদিন বিকেল বেলায় মেসে শুয়ে আছি, এমন সময় নির্ম্মলকে আমার ঘরে ঢুকতে দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে চমকে উঠ্লেম। তাকে আমি আশা করিনি, হঠাৎ সে কেন এলো? আনন্দ হলো, তনিমাদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ তুলে দিয়ে হয়ত নির্ম্মল আমাকে পূর্ব্বেকার মত আবার ভালবাসতে শিখেছে। কিন্তু তখনও আমার জান্তে বাকী ছিলো যে একবার যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসে, সেখানে অনেক বড়ো বড়ো বন্ধুত্বও বিনষ্ট হয়।

শুয়ে আছিস যে অবেলায়? শরীরটা ভাল নেই বুঝি? নির্ম্মল ঘরে ঢুকেই প্রথম প্রশ্ন করলে।

আমার বিছানা ছাড়া তাকে বসতে দেবার আর কোনো স্থান ছিলো না। নিজে উঠে পড়ে তাকে সেখানে বসুতে বল্লেম। সে বসলো।

অনেক দিনের পর পুরাতন বন্ধুকে পেয়ে আমি যেন বড় একটু বেশী রকমের চঞ্চল হয়ে পড়লেম। কী যে করব আর কী যে না করব, এ ঠিক করে উঠ্তে কষ্ট হলো। মনে হলো আমি আনন্দের তীব্র সুরা পান করে যেন মাতাল হয়ে উঠেচি। এ কী কল্পনা করা যায় বন্ধু নির্ম্মল আবার মেসে উঠে আমার সঙ্গে আলাপ করবে, আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে!

চাকরকে দিয়ে দু'কাপ চা আন্তে পাঠিয়ে বল্লেম—না, শরীর আমার ভালই আছে। এমনি শুয়েছিলেম, কোনো কাজ ছিলো না তাই।

চাকরী-বাকরী কিছু ঠিক-ঠাক হলো?

বল্লেম, কোথায়?

নবকিশোরদের বাড়ীতে গিয়ে তোর সব কথা শুনলুম। এইবারে একটা চাকরী-বাকরী জোগাড় করে নে। বাবার অফিসে একটা কেরাণীর দরকার আছে। মাইনে চল্লিশ টাকা। তুই করিস্ ত' দ্যাখ।

আমার চাকরী ঘটিত অংশটার সম্বন্ধে কোনো কথা না বলে নির্ম্মলের প্রথম অংশটা নিয়ে পড়লেম। জিজ্ঞাসা করলেম, নবকিশোরবাবুদের বাড়ী তুই কবে গিয়েছিলি?

ও বল্লে, কাল।

তারপর একটু থেমে বল্লে, তাছাড়া আমাকেই ওদের বাড়ীতে প্রায়ই যেতে হয়। আর কী করাই বা যায়! তনিমার বাবার বড় ইচ্ছে তনিমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেন, আর আমাকে মেয়েটা বড় ভালও বাসে। আর বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন ওখানেই করি।

এ প্রসঙ্গের উত্থাপনার কোনো প্রয়োজন ছিলো কিনা জানি না। তবে নির্ম্মল বোধ হয় আমাকে শুনিয়ে দিতে চায়, ওদের বাড়ীতে আমার কোনো স্থান নেই, আর না যাওয়াই ভালো। আমি মনে যেমন একধারে আমোদ অনুভব করতে লাগলেম, নির্ম্মলের মনের গতি লক্ষ্য করে, তেমনি আবার একটু আহতও হলেম। আমার এই আঘাত পাওয়ার কারণটা বলি।

নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করলেম, তোমার তাহলে বিয়ের সমস্তই ঠিক হয়ে গেছে বলো?

সে বল্লে, তা এক রকম হয়ে গেছে বই কি। কেবল আশীর্ব্বাদ! তোমাকে নিমন্ত্রণ করবো নিশ্চয়ই।

মুহূর্ত্তের জন্যে আমার মনটাকে স্থির রাখতে পারলেম না। বড় চঞ্চল হয়ে উঠলেম। তনিমা কী তাহলে আমাকে সত্যিই ত্যাগ করলে! কি জানি, হয়ত আমাদের ভেতরে সত্যিকারের ভালবাসা গড়ে ওঠে নি। দুঃখ করে আর করব কী, এতেই আমার আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, এইত আমার নিয়তি।

মুখে হাসি ভরিয়ে নির্ম্মলকে অভিনন্দন দিয়ে বল্লেম, কয়েকদিন ধরে আমাদের তাহলে ভোজের সুরু হবে দেখচি। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ,—কী বলো?

যার বিয়ে তারত বেশী আনন্দিত ও উৎফুল্ল হওয়া উচিত। সে কিন্তু আমার হাসিতে প্রাণখুলে যোগ দিল না। বিয়ের কথাটা চাপা দিয়ে বল্লে, তুই চাকরীটা নিবি কিনা বল্‌লি না ত?

নির্ম্মলকে আমার চাকরীর জন্যে বেশ একটু উদ্বিগ্ন দেখলাম। আমার পক্ষে আনন্দ হওয়াই উচিত ছিলো, কিন্তু কেন জানি না, আমি উৎফুল্ল হতে পারলেম না। আমার তখন আর্থিক অবস্থার যা চরম, সে অবস্থায় চল্লিশ টাকা কেন পঁচিশ টাকার কোনো স্থায়ী চাকরী পেলে তা করতে আমার এতটুকু দ্বিধা ছিলো না। কিন্তু নির্ম্মলের এই দয়ার দান নিতে কুণ্ঠিত হলেম। যেন আমার পৌরুষে গিয়ে বাধল। নির্ম্মলকে বল্লেম, এর মধ্যেই চাকরী করতে সুরু করবো! তার জন্যে ত সমস্ত জীবন পড়ে রয়েছে। আর চাকরী করতে আরম্ভ করলে পড়া-শোনা মোটেই হবে না।

নির্ম্মল বিস্মিত হয়ে বল্লে, তুই কি আবার পড়চিস নাকি?

বল্লেম, প্রাইভেটে এম-এটা দোব ভাবছি।

নির্ম্মল চাটা অর্দ্ধেক খেয়েই অনেকটা রাগ করে চলে গেলো। আমিও তাকে বসতে অনুরোধ করিনি, জানি করলেও ফল হতো না। সেদিন সমস্ত সন্ধ্যেটা ও পরের দিনও অনেক বেলা পর্য্যন্ত মেঝে শুয়ে বসে বই পড়ে কাটিয়ে দিলেম, বাইরে বেরোতে সাহস হোল না। ক্ষুদ্র টিউসানিটা পর্য্যন্ত কামাই গেলো। তনিমার আশীর্ব্বাদ—তনিমার বিয়ে! যদি নবকিশোর আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসে না পায় এইজন্যেই আমার গৃহবাস! তনিমার বিয়ে হয়ে যাবে, তাকে আর একবারটী দেখব না! নির্ম্মলের হাতে গিয়ে পড়লে যে তনিমার সঙ্গে দেখা করা আমার দুষ্কর হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিলো না, তা'ছাড়া যে মেয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিলো সে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তার সঙ্গে সে ভাবে আলাপ-পরিচয় করাটা বড় লজ্জা-জনক। অন্ততঃ আমার এই মনে হয়েছিলো।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল। নবকিশোরবাবুর দেখা মিল্‌ল না। আমার বুকটা ভয়ে দুর দুর করে উঠল। শেষ সম্বল তনিমা, তাও বুঝি গেলো। বেঁচে থাকার সুখ বুঝি আর নেই। মরুভূমিতে বাস করে লাভ কী! যদি মানুষের স্নেহ-মমতা, ভালবাসা নাই পেলেম, তাহলে বাঁচবার কি কোনো অর্থ আছে। শুধু গাছপালা, ইট-পাথর নিয়ে যদি দিন কাটান যেতো, যদি খাওয়া-দাওয়া-ঘুমটাই সব হোত, তাহলে জেলের কয়েদীর ভাবনা ছিলো কিসের? এইজন্যেই ত মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন মানুষ, এইজন্যেই ত সকলে চারিধারে স্নেহের বন্ধন সৃষ্টি করে। এ যদি না থাকে, তাহলে জীবন যাত্রায় সুখ থাকে না। তার স্বাদ যায় হারিয়ে।

যেদিন আশীর্ব্বাদের দিন বলে ঠিক হয়েছিলো, সেইদিন বিকেল বেলায় গত দিনের মত চুপ করে শুয়ে আছি, নির্ম্মল এসে ঢুকলো।

সে এসেই বল্লে যে তার বাবার অসুখ হওয়াতে আশীর্ব্বাদের দিন আজ স্থগিত রইলো। পরে কিন্তু জান্‌তে পেরেছিলেম তা নয়, তনিমার ঘোর আপত্তি থাকাতে তনিমার বাবা নির্ম্মলের সঙ্গে বিয়ের কথা এখন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তনিমার আপত্তির কারণ, আর কেউ না জান্‌লেও নির্ম্মল জান্‌তে পেরেছিলো, নবকিশোরও যে কতকটা এর ইঙ্গিত পায় নি, তা নয়। নির্ম্মলের সমস্ত রাগ আমার ওপর এসে পড়ল। কিন্তু নির্ম্মল যে আমার ওপরে কোন রাগ করেছে সে খবর আমি সেদিন সেই অপরাহ্নে বুঝতে পারিনি! বুঝতে যদি পারতেম, তাহলে অনেক কষ্ট থেকে বেঁচে যেতে পারতেম এ ঠিক।

নির্ম্মল বেশ মিষ্টিসুরে কথা কইতে লাগল। তনিমার সঙ্গে তার বিয়ে হবার কল্পনা, কত আশার কথা, কত ভালবাসার কাহিনী শেষ করে সে বল্লে, তুই এরকম মন-মরা হয়ে যাচ্ছিস্ কেন? চল, বেড়িয়ে আসি।

বহুকাল হলো বিকেলবেলায় বেড়াতে যাইনি। অনেক আগে সন্ধ্যায় আমার বেড়াবার সঙ্গী ছিলো নির্ম্মল। আমরা দুটী বন্ধুতে মিলে ভবিষ্যৎ জীবনের নানা স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোনদিন লেকে, কোনদিন বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের বাগানে বেড়াতে যেতেম। আমাদের এই নিয়মিত সান্ধ্য ভ্রমণ দেখে বন্ধুরা বলত, তোদের দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া যায়!

সেই দুই বন্ধু মিলে আবার বেড়াতে যাবো শুনে আমার মনে যে আনন্দ হলো তার ভাষা নেই। তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেম।

পথে চলতে চলতে অনেক কথাই হতে লাগল।

নির্ম্মল বল্লে, তোর ত আর এখন দেখবার শোনবার লোক বড় কেউ নেই, তুই বিয়ে-থা করে ফেল্। আর বাবার আফিসের চাকরীটা নিয়ে নে, বোকামি করিস নি।

আমি প্রথমে অত বুঝতে পারিনি,

আমাকে চাকরী দোবার জন্যে এত আগ্রহ, কেন? আর হঠাৎ মেয়েদের মত আমাকে বিয়ে করতে বলার উদ্দেশ্য বা কী! কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলেম ওর উদ্দেশ্য ছিল কী! নির্ম্মল চেয়েছিলো আমাকে যত শীঘ্র বিয়ে দিয়ে দিতে। আমার বিয়ে হয়ে গেলে তনিমার দিকে ও নিশ্চিন্ত হতে পারত।

আমি কিছুতেই রাজী হলেম না দেখে নির্ম্মল শেষে বড় রেগে উঠতে লাগল। আমি তার মনোভাব দেখে ভারী আশ্চর্য্য বোধ করলেম।

তার এই ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখে আমি একটু চিন্তিত মুখে উত্তর দিলেম, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

আগুণ জ্বলে উঠল। চীৎকার করে বল্লে, না, না অত ভেবে দেখবার সময় নেই। তোমার অবস্থা তুমি নিজেও বুঝতে পারচ না, তোমার এরকম ভাবে থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে!

বন্ধু-প্রীতির প্রতি আমায় কিছুমাত্র অবিশ্বাস ছিলো না। তবু মনে হলো বলি, মাথাটা খারাপ হলো কার? আমার না নির্ম্মলের?

আমি কোন কথা না বলে পথ চলে যেতে লাগলেম।

নির্ম্মল আবার জোর গলায় বল্লে, কই, মত হলো তোর? তোকে চাকরী করে দিচ্ছি, তোকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি, তোর অত ভাববার আবার আছে কী: টাকা কড়ি যদি তোর এ জন্যে দরকার হয় আমি দোব। চল্ মেয়ে দেখে আসি, আমি একটা মেয়ে ঠিক করে রেখেছি।

বিস্ময়ের সীমা রইলো না। নির্ম্মলের মনের ভাব আমার কাছে স্বচ্ছ সরল হয়ে দেখা দিলে। মনে করলেম, আমার জন্যে তাহলে এই ছেলেটী অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়েচে। একটু দুঃখও হলো না যে তা নয়। কিন্তু আমি কিছুতেই নির্ম্মলের কথায় রাজী হতে পারলেম না।

অনুনয়ের সুরে বল্লেম, এ জন্যে তোকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোর কথা রাখতে পারলেম না, আমাকে ক্ষমা করিস। বলেই মেসে ফিরে এলেম।

[ক্রমশঃ]

শ্রীদুর্ব্বাসা

ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশন্‌ঃ—টুর্ণামেণ্ট পরিচালনা ও তদুদ্দেশ্যে নিয়মাবলী প্রণয়ণের জন্য এসোসিয়েশন্ একটি সাব-কমিটি গঠন করেছেন। এই সাব-কমিটির মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীতীশ মিত্র, শ্রীযুক্ত নির্ম্মল সরকার, শ্রীযুক্ত পি, গুপ্ত এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশ বসু। শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু সাব-কমিটির অন্তর্ভুক্ত না হয়েও উক্ত কমিটিকে বিশেষভাবে সাহায্য করছেন। টুর্ণামেণ্ট সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সঙ্কলিত হয়েছে এবং ঐ নিয়মগুলি এসোসিয়েশনের ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনে অনুমোদিত হবে। এই নিয়ম পাশ হলে বর্ত্তমান ব্রীজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হবে। এর পর কোন রেজিষ্টার্ড ক্লাব এসোসিয়েশনের অনুমোদিত কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবেন না এবং কোন রেজিষ্টার্ড টুর্ণামেণ্টও রেজিষ্টার্ড ক্লাবের সভ্য ব্যতীত অন্য কাকেও ঐ প্রতিযোগিতায় খেলবার অনুমতি দিতে পারবেন না। কবে থেকে এ নিয়ম বিধিবদ্ধ হবে তা' এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই তবে শোনা যাচ্ছে যে ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে এই নিয়মে টুর্ণামেণ্ট সমূহ পরিচালিত হবে।

এসোসিয়েশনের কার্য্য বেশ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। সুদূর আসাম ও কটক প্রভৃতি স্থান হতে বিভিন্ন ক্লাব সমূহ ইহাতে যোগদান করছেন। সম্পাদক যতীশবাবু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রেজিষ্টার্ড ক্লাবের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যেরূপ পরিশ্রম করছেন তাতে মনে হয় শীঘ্রই এই এসোসিয়েশন্ সার্থকনামা হতে পারবে। যতীশবাবুর এই নিরলস উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রেজিষ্টার্ড ক্লাব সমূহের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। যাদের সে তালিকা প্রয়োজন তাঁরা সম্পাদক মহাশয়ের সহিত ৬নং এস-

প্ল্যানেড্ ইষ্ট বাটীতে সাক্ষাৎ করে মুদ্রিত তালিকা গ্রহণ করতে পারেন।

নানা অবস্থায় চতুর্থ ব্যক্তির ডাক:—পর পর তিনজন পাশ দেবার পর চতুর্থ ব্যক্তির কি কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে গত বারের খেয়ালীতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এবারে আর আর অবস্থায় চতুর্থব্যক্তির কিরূপ ডাক হবে সে বিষয়ে কিছু বল্‌তে চাই। প্রথমতঃ প্রথম ব্যক্তির তাস-বণ্টন করে

ইস্কাবন—গোলাম ×, ×।
হরতন—×, ×, ×।
রুহিতন—×, ×, ×।
চিঁড়িতন—সাহেব, দশ, নয়, আটা।

ইস্কাবন—বিবি, ×, ×, ×, ×, ×।
হরতন—×, ×।
রুহিতন—×, ×, ×।
চিড়িতন— ×, ×।

ইস্কাবন—টেক্কা, ×।
হরতন—টেক্কা, গোলাম, দশ, নয়, ×।
রুহিতন—টেক্কা, ×, ×, ×।
চিঁড়িতন— গোলাম, ×।

ইস্কাবন—সাহেব, ×।
হরতন—সাহেব, বিবি, ×।
রুহিতন—সাহেব, বিবি, ×।
চিঁড়িতন—টেক্কা, বিবি, ×, ×, ×।

ডাক দিবার পর দু'জন পাশ দিয়ে গেলেন, এখন চতুর্থব্যক্তি কি করবেন? মনে করুন 'দ' তাস দিয়ে একটি ফেরাইএ ডাক দিয়েছেন; অতঃপর পর পর দুইজনই পাশ দিলেন আর আপনি চতুর্থ ব্যক্তি নিম্নলিখিতরূপ তাস পেয়েছেন। ইস্কাবন—×, ×; হরতন—টেক্কা, গোলাম, দশ; নয়, আটা; রুহিতন—টেক্কা, ×, ×; চিঁড়িতন—গোলাম, ×।

এখন আপনি কি করবেন? আপাতদৃষ্টিতে দুইটী হরতন ডাক দেওয়া বিশেষ ভীতিপ্রদ বলে মনে হয় না। কিন্তু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে অধিকাংশ সময় এরূপ ডাকে বিপক্ষদল তিনটী ফেরাইএর খেলা করে নিয়ে যায়। এরূপ হাতে এবং এরূপ অবস্থায় আবাহনমূলক ডবল (Informatory Double) দেওয়াই বিধেয়, কারণ এই ডাকের উত্তরে আপনার খেঁড়ীকে ডাকতেই হবে। সুতরাং এখন 'দ'র পক্ষে ফেরাইএর ডাক ডেকে নিয়ে গেম করা প্রায় অসাধ্য; পক্ষান্তরে দুইটী হরতনে ডাক দিলে বিপক্ষ দলকে আপনার হাতের অবস্থা বিশেষ করে বলে দেওয়া হত। এই হাতেই বিপক্ষদল কি ভাবে খেলা করেছিলেন তা' নিয়ে দেওয়া হল।

'দ' তাস দিয়ে একটি ফেরাইএ ডাক দিলেন (যেভাবে খেলা হয়েছিল তাই দেওয়া হল, অবশ্য এখানে তাঁর চিঁড়িতন রঙে ডাক দেওয়া উচিত ছিল), তারপর দুইজনই পাশ দিলেন এবং চতুর্থ ব্যক্তি দুইটি হরতনে ডাক দিলেন। অবশেষে 'দ' তিনটী ফেরাইএ ডাক দিয়ে খেলা করে নিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি ফেরাইএর ডাকে ডবল দিলে তাঁর খেঁড়ী দুইটি ইস্কাবনে ডাক দিতেন, তখন 'দ'র পক্ষে তিনটী ফেরাইএ ডাক দেওয়া বেশ শক্ত হত। সুতরাং তাঁদের পক্ষে তিনটী ফেরাইএর খেলা করা অসাধ্য। এরূপ আর একটি হাত দেখিয়ে বল্‌বার চেষ্টা করব যে চতুর্থ ব্যক্তির কিরূপ চিন্তাহীন ডাকের ফলে বিপক্ষদল স্লাম করে চলে গেলেন। (নীচের চার্ট দেখুন)

'দ' তাস দিয়ে দুইটী ফেরাইএর ডাক দিলেন (যদিও এ ক্ষেত্রে তার ডাক হওয়া উচিৎ ছিল দুইটি চিঁড়িতন)। তারপর 'প' পাশ দিলেন, খেঁড়ী ডাকলেন তিনটী রুহিতন এবং চতুর্থ ব্যক্তি ডাকলেন তিনটী ইস্কাবন। যেমন এই ডাকটী হল তৎক্ষণাৎ 'দ' নিজের হাত দেখে বুঝে নিলেন যে চতুর্থ ব্যক্তি খানকতক ইস্কাবন, চিঁড়িতনের টেক্কা আর হরতনের সাহেব পেয়েছেন। কাজে কাজেই

ইস্কাবন—×।
হরতন—×, ×, ×।
রুহিতন—সাহেব, বিবি, গোলাম, ×, ×, ×।
চিঁড়িতন—×, ×, ×।

ইস্কাবন—×, ×।
হরতন—সাহেব, গোলাম, ×, ×, ×, ×।
রুহিতন—×, ×।
চিঁড়িতন—×, ×, ×।

ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, দশ, নয়, ×, ×, ×, ×।
হরতন—×।
রুহিতন—×, ×।
চিঁড়িতন—টেক্কা, ×।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি।
হরতন—টেক্কা, বিবি, ×।
রুহিতন—টেক্কা, ×, ×।
চিঁড়িতন—সাহেব, বিবি, গোলাম, দশ, নয়।

তিনি কোনরূপ দ্বিধাবোধ না করেই একেবারে ছয়খানি ফেরাইএ ডাক দিলেন। অবশ্য তারা যেরূপ তাস পেয়েছেন তাতে কোনরূপেই ছয়টি ফেয়াইএর ডাক বন্ধ করা যায় না কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তি না ডাক দিলে 'দ'র পক্ষে গ্রামে যাওয়া একেবারেই অসাধ্য।

তবে এ প্রবন্ধে এরূপ বল্‌তে চাই না যে খুব ভালো তাস না পেলে চতুর্থ ব্যক্তি ডাক দেবেন না কিম্বা তাঁর বাম পাশের ব্যক্তির ডাকে তিনি তার মুখ খুল্‌বেন না। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে যখনই তিনি ডাক দেবেন কিম্বা ডাকের উপর ডাক দিবেন তখন যেন খুব বিবেচনার সহিত বলেন। যদি কোন বিষয়ে তাঁর সন্দেহ থাকে তো যেন তিনি মোটেই ডাক না দেন, তাতে বরঞ্চ তিনি দেখ্‌বেন যে তার বিশেষ লোক্‌সান হয় নাই পরন্তু ভাল হাত থাকা সত্বেও বিবেচনা করে পাশ দিয়ে অনেক সময় তিনিই জিতেছেন।

বাসন্তী সঙ্ঘ:—বিগত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার দিবস এই সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত অকসন্ ব্রীজ টুর্ণামেন্টের পারিতোষিক বিতরণ সভার আয়োজন হয়েছিল। যথাসময়ে আবাহন গীতির সহিত সভাপতি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী এম,-এ, বি,-এল মহাশয়কে সুস্বাগতম করা হয় এবং তৎপরে সেক্রেটারী মহাশয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠের পর পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সমাধা হয়। অতঃপর কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ সময়োচিত সুচিন্তিত বক্তৃতা আলোচনায় সঙ্ঘের প্রাঙ্গণটিকে মুখরিত করে তোলেন এবং গীতবাদ্যাদি ও ভূরি ভোজনের পর এই সভার কার্য্য শেষ হয়। গীতবাদ্যাদির মধ্যে কল্যাণীয়া শ্রীনীলিমা ভাদুড়ীর কণ্ঠসঙ্গীত ও শ্রীশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরোদ আশাতীতরূপে এই অনুষ্ঠানের উপযুক্ত আবহাওয়া বজায় রেখেছিল। এ স্থলে একটি কথা আমরা না বলে পারলাম না। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন যে কলিকাতায় যেরূপ ব্রীজ খেলার প্রচলন হয়েছে তা'তে বিশেষ ভয়ের কারণ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে আমরা একটি কথা জিজ্ঞাসা করব যে দত্ত ম'শায় কি জানেন না যে ভারতবর্ষ ব্যতীত সকল সুসভ্য জাতিরই একটি 'ক্লাব-লাইফ' বর্ত্তমান,—দিবসের শ্রান্তি, ক্লান্তি অবসাদের পর প্রত্যেকেই যে যাঁর ক্লাবে আমোদ, আহ্লাদ, ক্রীড়া ও আলোচনায় মস্‌গুল হয়ে শ্রান্তি অপনোদন করে থাকেন এবং এই সময়েই তাঁরা নানাবিধ লোকের সহিত আলাপ-আলোচনা ও মেলামেশার সুযোগ পান। বাঙলাদেশ যেখানে স্বার্থপরায়ণ ও কূপ-মণ্ডুকের অভাব নেই সেখানে এরূপ মেলা-মেশা ও পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদান যে কিরূপ কার্য্যকরী তা' কি দত্ত মশায় জানেন না? আর আজ সমগ্র কলিকাতায় এই অপূর্ব্ব

তরুবালা
৺রসরাজ অমৃতলাল বসুর অমৃত-লেখনী প্রসূত
: শ্রেষ্ঠাংশে :
অহীন্দ্র চৌধুরী
জহর গাঙ্গুলী
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
কার্ত্তিক রায়
পণ্টু গাঙ্গুলী
জ্যোৎস্না
পদ্মাবতী
পারুলবালা
হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
শৈলেন চৌধুরী
আশু বোস (এমেচার)
নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রভা
বীণা
প্রভাবতী
নগেন্দ্রবালা
কমলা
পরিচালক
সুশীল মজুমদার
: একমাত্র সত্বাধিকারী :
রীতেন এণ্ড কোং
৬৮, ধর্ম্মতলা-ষ্ট্রীট
কলিকাতা
টেলিফোন : কলিকাতা
টেলিগ্রাম :
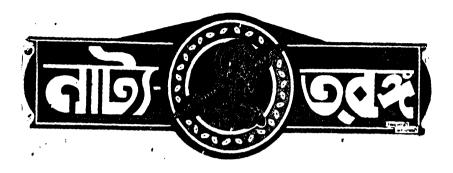
রঙমহলে "চরিত্রহীন"

বাঙলার অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার "চরিত্রহীন" নূতন রূপ লইয়া রঙ্গমঞ্চে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। নাটকাকারে ইহার রূপ দান করিয়াছেন যশস্বী নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। মহাভারতের মত এই বিরাট উপন্যাসখানিকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে নাট্যরূপদাতাকে যে কতখানি বেগ পাইতে হইয়াছে, কত কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সংলাপ ও পিচুয়েশানে মিলিয়া মূল উপন্যাসে যে রস দানা বাঁধিবার অবকাশ পাইয়াছে তাহা আগাগোড়া অবিকৃতভাবে অভিনীত নাটকে মিলাইয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই। উপন্যাসের অঙ্গহানি না করিয়া উহার সমগ্ররস যথা-যথভাবে পরিবেশন করা যখন নাটকাকারে অসম্ভব তখন উহার জন্য অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই। মূল উপন্যাসের যে মাধুর্য্য রসবেত্তার চিত্তকে নানাভাবে আলোড়িত করিয়া অন্তরকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে—নাটকে ঘটনা সৃষ্টির অভাবে তাহা সমগ্রভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই—একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

সতীশ ও সাবিত্রীকে আশ্রয় করিয়া যে রোমান্সের আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি, কিরণময়ী উপেন্দ্র ও সতীশ পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া, পরিচয়ের সূত্রপাতে যে আত্মীয়তার আরম্ভ ও শেষ, উপেন্দ্রের দাম্পত্য জীবনে সুরবালার আধিপত্য, স্বামীর একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম এবং সে মধুর সংসার ঘিরিয়া বিবাহিত জীবনের যে মনোরম চিত্র—মূল উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে—অভিনীত নাটকে আমরা তাহার আংশিক ছায়ামাত্র দেখিতে পাই। দিবাকরকে ক্রীড়নক করিয়া কিরণময়ীর প্রেমের খেলা এবং নিদারুণ প্রতিহিংসার ধারাবাহিক আলেখ্যও নাটকে পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই। মূল উপন্যাসে, এক উপেক্ষিতা নারীর সারাজীবনের বেদনার কাহিনী আর একজন সমবেদনা-কাতর, প্রেম-প্রতিহত, হতভাগ্যকে আশ্রয় করিয়া যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাহার প্রেরণা, পাঠকের চিত্তকে নানাভাবে আলোড়িত করিয়া অধীর করিয়া তোলে, দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত ঘটনা-সৃষ্টির অভাবে, অভিনীত নাটকে সেই বেদনার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী—কিরণময়ী ও সতীশের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে নাই।

সুযোগ প্রত্যেকের দ্বারে বহন করে হাজির হয়েছে ব্রীজ খেলা।

স্যাটার্ণ ক্লাব:—এই একটি ক্লাব যেখানে উদীয়মান তরুণ সুক্রীড়কের সংখ্যা কম নয়। এই ক্লাবের খ্যাতি দিন দিন এমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যে আমাদের মনে হয় এঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি এরা বোসপাড়া এপোলো ক্লাব পরিচালিত টুর্ণামেণ্ট জয় করে আর একবার বিজয় মাল্য অর্জ্জন করেছেন। উক্ত ফ্যাইন্যালের দিন শ্রীদেবব্রত দত্ত ও শ্রীঅমর মুখার্জ্জির খেলা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয় এবং দর্শকমণ্ডলীর উপভোগ্য হয়েছিল। আমরা দিন দিন এই ব্রীজ সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনা করি।

নাটকের কোন একটি দৃশ্যেও সতীশ ও কিরণময়ীর নিভৃতে বাক্যালাপের সুযোগ না ঘটায়, পরস্পরের বেদনাক্লিষ্ট অন্তরের অবরুদ্ধ উৎস বাহিরে প্রকাশিত হইবার অবকাশ পায় নাই। সতীশ ও কিরণময়ীর অন্তরের প্রচ্ছন্ন বেদনার কাহিনী, নাটকে অধিকতর সুস্পষ্ট হইলে উহার অভিনয় সর্ব্বাংশে হৃদয়গ্রাহী হইত। নাটকে যাহার ইঙ্গিত আমাদের প্রাণে সামান্য পরশ দিয়া যায় মাত্র, তাহাই সুপরিস্ফুট হইলে, আমাদের অনুভূতিকে সচেতন করিয়া তাহারই মাঝে সমবেদনার পরিপূর্ণ আবেদন লাভ করিত। এদিক দিয়া নাট্যরূপদাতার পরিকল্পনা, সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যলাভ করে নাই, ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। সতীশ ও সাবিত্রী উভয়ের অন্তর দ্বন্দ্বের অন্তরালেও যে রহস্যটুকু সতীশের নিকট প্রচ্ছন্ন ছিল, সাবিত্রীর সেই ঐকান্তিক স্নেহ ও ভালবাসার গোপন উৎসটুকুও, নাটকে যথাযথ মূল উপন্যাসের Suspense রক্ষা করিয়া, গড়িয়া উঠে নাই। নাট্যরূপদাতা, মূল উপন্যাস হইতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য Episode চয়ন করিয়া, নাটকাকারে যে মাল্য রচনা করিয়াছেন, তাহার যোগ-সূত্র সর্ব্বত্র সুরক্ষিত না হওয়ার দরুণ—ফুলগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এ যেন শিশিরবাবুর American Edition 'সীতা'র মত নাটককারে "চরিত্রহীনের" abridged edition বা সুলভ ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র।

তথাপি, অভিনীত নাটক মূল উপন্যাসের সবটুকু রস সমানভাবে পরিবেশিত না হইলেও রঙ্গমঞ্চে আমাদের "চরিত্রহীনে"র অভিনয় ভালই লাগিয়াছে। শরৎচন্দ্রের রচনা বাংলার প্রাণের জিনিষ এবং বাঙ্গালীর চিরআদরের। চরিত্রগুলি কাল্পনিক হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্র, সূর্য্যমুখীর মতই যেন প্রত্যেকটি নর-নারীই আমাদের কত পরিচিত, কত অন্তরঙ্গ! সুতরাং অন্তরে যাহার ছাপ বহু পূর্ব্বে চিরস্থায়ী হইয়া আছে। রঙ্গমঞ্চে তাহারই রূপ, আংশিক হইলেও যে আমাদের অনেকখানি তৃপ্তি দিতে পারিবে—ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

অভিনয়ে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ দান করিয়াছেন—উপেন্দ্র ও সতীশের ভূমিকায়, যথাক্রমে বাংলার দুই শক্তিমান নট—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দুইটি চরিত্র, দুইটি অভিনেতার Sentiment-এর সহিত চমৎকার খাপ খাইয়াছে এবং অপরাপর চরিত্রের তুলনায় এই দুইটি চরিত্রই নাটকে অধিকতর বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। নটজীবনে মনোরঞ্জনবাবু এবং রতীনবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়-প্রতিভার নিদর্শন হিসাবে এই দুইটি ভূমিকা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ইঁহাদের অভিনয়ে উভয় চরিত্রই

যেন রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। "দিবাকর' চরিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য যতটুকু সুযোগ পাইয়াছিলেন, দেখিলাম তাঁহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন। ব্যারিষ্টার শশাঙ্ক ও যতীশের ভূমিকায় যথাক্রমে জীতেন গোস্বামী ও প্রভাত সিংহের অভিনয়ও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ভৃত্য বেহারীর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য এবং অতিশয় স্বাভাবিক ভাবে অভিনীত হইয়াছে। উপেন্দ্রের পিতা শিবপ্রসাদের ভূমিকায় যোগেশচন্দ্রকে মানাইয়াছিল চমৎকার। কিন্তু নাট্যকার স্বয়ং এই চরিত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়াই বোধ করি, শিবপ্রসাদ চরিত্রটিকে তিনি নিজে ইচ্ছামত বাড়াইয়া লইয়াছেন।—ফলে উহা "পথের সাথীর" বৃদ্ধটির মতই garrulous হইয়া পড়িয়াছে।—যাহার সহিত মূল উপন্যাসের মিল সামান্যই! ছোটোখাটো অপরাপর প্রায় সবগুলি ভূমিকাই বেশ সুঅভিনীত হইয়াছে। নরেশচন্দ্রের ডাক্তার চরিত্র ক্ষুদ্র হইলেও চমৎকার।

কিন্তু পুরুষ-ভূমিকাগুলির তুলনায় স্ত্রী-ভূমিকাগুলির সব কটি আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে নাই। সাবিত্রী ও কিরণময়ীর ভূমিকায়, যথাক্রমে শ্রীমতী পুতুল ও শান্তি গুপ্তা যেন—far short of our conception! এই দুইটি ভূমিকায়, যথাযোগ্য অভিনয় করিবার যোগ্যতা, বর্ত্তমানে বাংলার রঙ্গমঞ্চে খুব কম অভিনেত্রীরই আছে। চরিত্র দুইটির মধ্যেও কিরণময়ী পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করে নাই। 'মহেশ্বরী ও যতীশের জননীর ভূমিকা দুইটি যোগ্যতার সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং শ্রীমতী সুহাসিনীর সুরবালাও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। সুরবালা আর একটু পরিস্ফুট হইলে আরও ভাল হইত। সরোজিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী পদ্মাবতীকে মানায় নাই এবং অভিনয়েও তিনি সাবলীলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মোক্ষদার চরিত্র এবং কিরণময়ীর শাশুড়ী ও তাহার বাটীর দাসীর চরিত্র—সব কয়টাই বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে।

বিষয়-বস্তু হিসাবে এই নাটকের প্রযোজনায় নরেশচন্দ্র মিত্র এবং সতু সেন মহাশয়দ্বয়—উভয়েরই পাকাহাতের ছাপ আছে। পরিশেষে বক্তব্য—মূল উপন্যাসের রস, অভিনীত নাটকে ষোলআনা না মিলিলেও শরৎচন্দ্রের রসাল সংলাপ এবং, চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টির গুণে, উহার যতটুকুর বিকাশ নাটকে ঘটিয়াছে, ততটুকুই উপভোগ্য। (—সু)

নাট্যনিকেতনে "বিদ্যা-সুন্দর"

রঙ্গমঞ্চে আজকাল Heavy Drama-র যুগ চলিতেছে। নৃত্য-গীত-বহুল অপেরা বা গীতি-নাটিকার অভিনয়, এক মিনার্ভা ছাড়া সহরের অপরাপর রঙ্গালয়ে প্রায় দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। দর্শক সাধারণের রুচি হয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তথাপি একথা স্বীকার্য্য যে হাল্কা হাস্যরস বা নৃত্য-গীতপ্রধান নাটিকার আবেদন অতীতেও যেমন ছিল সার্ব্বজনীন, বর্ত্তমানেও তেমনি রহিয়াছে। এই সন্ধিক্ষণে, নাট্যনিকেতনের বর্ত্তমান পরিচালক সঙ্ঘ "বিদ্যা-সুন্দরের" মত একখানি গীতি-নাটিকা দর্শক সাধারণকে উপহার দিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। Appetiser হিসাবে এই শ্রেণীর গীতি-নাটিকা বর্ত্তমান Heavy Drama-র বাজারে যে বিশেষ উপাদেয় ও কাম্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাট্যকার শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের অমর কাব্য "বিদ্যা-সুন্দর" অবলম্বনে কল্পনার সাহায্যে অনেকগুলি পারিপার্শিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে, রঙ্গালয়ের উপযোগী করিয়া এই নাটিকাখানি রচনা করিয়াছেন। অভিনয়কাল সংক্ষিপ্ত না করিয়া, অনেকগুলি অবান্তর বিষয়ের
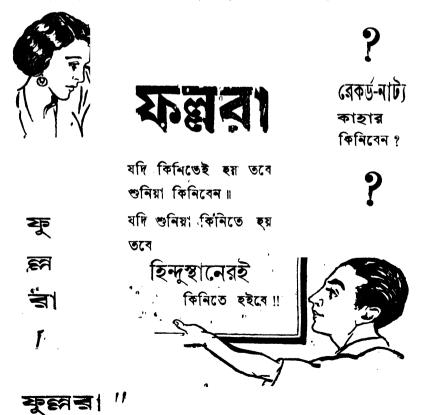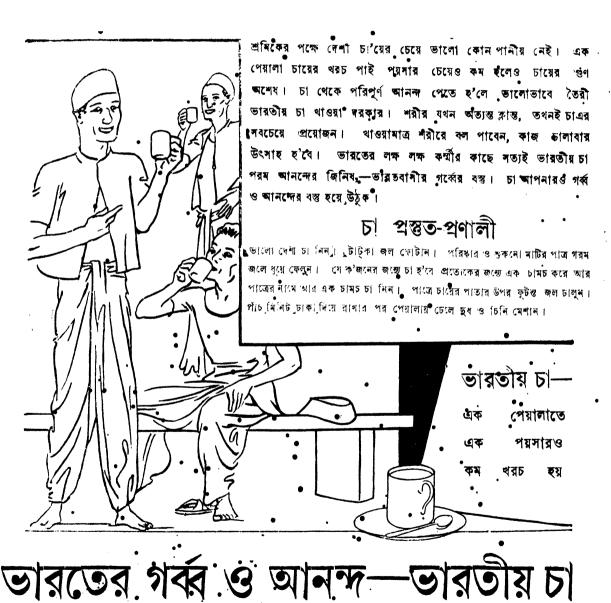
যোগাযোগে নাটকের অবয়ব অকারণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, অনেকস্থলে রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। অভিনীত অংশ বাড়াইয়া, চতুর্থ অঙ্কে বিভাগ না করিয়া আরও সংক্ষিপ্ত করিলে ভাল হইত—রস দানা বাঁধিবার অধিক সুযোগ লাভ করিত। নাট্যকার প্রাচীনপন্থী এবং নাটকের ভাষাতেও আধুনিকতার ছাপ নাই। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী, সুমার্জ্জিত ও সূক্ষ্ম হিউমারের পরিবর্ত্তে, যত্রতত্র নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামীর সাহায্যে নাট্যকার আসর মাত করিয়াছেন। সেদিক দিয়া এই নাটিকাখানি কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট অঞ্চলে অভিনীত না হইয়া সেই সনাতন মিনার্ভার আসরে হইলেই শোভন হইত।

সমগ্র নাটকের মধ্যে একটি মাত্র নারী-চরিত্রই অপরাপর সকল চরিত্রকে ছাপাইয়া অনিন্দ্যনীয় অভিনয়-মাধুর্য্যে, প্রাণরসে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এটি নাটকের মেরুদণ্ড—'হীরা মালিনী'র চরিত্র। এই চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বাপেক্ষা 'চৌখস' অভিনেত্রী—শ্রীমতী নীহারবালা। হাস্যে-লাস্যে, নৃত্যে-গীতে ও ভঙ্গিমায়, রঙ্গমঞ্চে, হীরা মালিনীর চরিত্রটি সেদিন সকল দিক দিয়াই প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই শ্রেণীর চরিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে শ্রীমতী অদ্বিতীয়া এবং দেখিলাম ছায়া-চিত্রে প্রদর্শিত 'মালিনী' অপেক্ষা, রঙ্গমঞ্চের এই রক্তমাংসের 'মালিনী' অনেক বেশী মিষ্ট, অনেক বেশী উপভোগ্য।

মালিনীর পরেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা—কাঞ্চি রাজকুমার সুন্দরের। এই চরিত্রে শক্তিমান ও প্রিয়দর্শন নট জহর গঙ্গোপাধ্যায় স্বভাব সঙ্গত সুঅভিনয় করিয়া আমাদের যথেষ্ট তৃপ্তি দিয়াছেন। ইহার পরেই পাগল সাধকের চরিত্রে প্রতিভাবান নট রবি রায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। এই

রঙ্গমঞ্চে "রীতিমত নাটক" অভিনয় দর্শনে

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

(মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, সম্প্রতি নব-নাট্য-মন্দির রঙ্গমঞ্চে "রীতিমত নাটকের" অভিনয় দর্শনে অন্তরে যে যুগপৎ, রীতিমত আনন্দ ও রীতিমত বেদনা পাইয়াছি—তাহার রীতিমত সমালোচনা করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছি। শুধু এইটুকু বলিতে পারি, বর্ত্তমান বাংলার লক্ষ্যভ্রষ্ট তরুণ-তরুণীর দল ইহার অভিনয় দর্শনে হয়ত' সত্যপথের সন্ধান পাইবেন। "রীতিমত নাটক" অন্তরে যেটুকু রেখাপাত করিয়াছে তাহার একটু আভাস দিলামমাত্র। ইতি বিনীত—লেখক)

জীবনের রঙ্গভূমে, কত গান, কত অভিনয়—তা'র স্মৃতি কতটুকু রয় ?
সকলে পশ্চাতে রাখি,' সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, "রীতিমত নাটকের" মহা-অভিনয় !

*

কেবা নয় অভিনেতা ? মিটাইতে পারে কেবা, জীবন প্রবাহ মাঝে বিলাসের জের,
নিয়তি-তুলির টানে, পাপ ও পুণ্যের রংএ, মান রাখিয়াছে তাই পাদ-প্রদীপের !
পাশ্চাত্য কৃষ্টির বিষ, হজম না হ'লে বিষ, নিয়ত ফুটিয়া উঠে, অস্থি ও মজ্জায়
ব্লাউজ ও প্যান্ট লুনে, ঢাকি তাই সঙ্গোপনে, পরিপাটি প্রসাধনে, বিলাতী সজ্জায় !
না মিটে প্রেমের তৃষা বিনা পরকীয়া—তাহারি সন্ধানে ফেরে শৃগালের দল
পাতানো ভাশুর আর বৌ'দি দেবরে—পান করে এক সাথে সেই হলাহল !
ভগ্নীরে পড়ায় 'শেলী' বুলি মিল্টনের, বিচক্ষণ দাদা তা'র—জ্ঞানে প্রফেসার
হজম না হ'লে হায়, জানেনা পরম দায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেই বিষের উদ্গার !
প্রেমের কৌলিন্য নাই, জাতি ও বিচার, যৌবন সায়রে পাতা, পতি-ধরা জাল—
কে কোথায় পড়ে ধরা, মিটাতে প্রেমের খেলা, অন্তিমে জানে না হায়, শুধু নাজেহাল !
নিভৃত মিলনে আশা, অন্তরে জাগায় তৃষা, যুবক-যুবতী তাই করে ঘর-বার,
একদা প্রভাতে দেখে দাদা প্রফেসার, শোফার-লাভার সাথে ভগিনী ফেরার !

*

মিটিল প্রেমের তৃষা দুদিনেতে হায় ; জঠরে অন্নের ক্ষুধা মিটিবার নয়
কুলবধূ অবশেষে, বাণী-থিয়েটারে এসে, নটী-গিরি গোলামীতে, প্রাণে বেঁচে রয়।
বুড়া বাপে দিয়ে ফাঁকি, প্রথম পত্নীরে ঢাকি,' তরুণী প্রেমিকা সাথে নব অভিসার—
জুয়াচুরী পড়ে ধরা,' নিজ ভুলে দিশেহারা, বাকী শুধু বেঁচে মরা, অপমান সার !
এদিকে বোনের শোকে, দাদা প্রায় শিঙে ফোঁকে, নারী জাতি তা'র কাছে, শুধু বিষময়
পত্নীর প্রণয় ছাড়ু, নিয়ত সন্দেহ তা'র, কে কোথা কাটিল সিঁধ, এই শুধু ভয় !
কবি ও ডাক্তারে মিলে, এক জোড়া উড়োচিলে, 'স্বাগতা' বধূরে হায়, বুঝি ঠোকরায়—
বিধি কী সাধিল বাদ, প্রফেসার উন্মাদ, যাহারে নিকটে পায়, মারিবারে ধায় !
প্রতি অঙ্কে জমে প্লট, তাহারি বিচিত্র পট, "রীতিমত নাটকের" চলিয়াছে জের—
অপরূপ, অভিনব,—সে কাহিনী কত ক'ব ? 'শিশির রাখিল আজ মান বোতলের !

*

জীবনের রঙ্গভূমে, কত ঢং-এ, কত ছলে, চলিয়াছে প্রতি পলে, শুধু অভিনয়
বহুরূপী মানবের আছে এক খাঁটি রূপ, নিও যদি পার তা'র সত্য পরিচয় !

শ্রেণীর টাইপ-চরিত্রের সুঅভিনয়ে রায় মহাশয়ের দক্ষতা আছে এবং সেদিন তিনি তাঁহার অভিনয়-শক্তির পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার রূপ-সজ্জাও বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে অপরাপর ছোটখাটো ভূমিকাগুলি চলনসই। রাজকুমারী বিদ্যার চরিত্রও বেশ সুঅভিনীত হইয়াছে। এই ভূমিকার মানরক্ষা করিয়াছেন—শ্রীমতী চারুবালা।

অভিনীত নাটিকায় ভারতচন্দ্রের অনেক মূল গান স্থানলাভ করিয়াছে এবং তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সনাতন বিদ্যাসুন্দরের প্রচলিত সুরই অবিকৃতভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের গানের যাঁহারা অনুরাগী তাঁহাদের কাছে এগুলি ভালই লাগিবে, সন্দেহ নাই।

নৃত্য-পরিকল্পনায় মৌলিকত্বের বিশেষ ছাপ না থাকিলেও মাধুর্য্যের অভাব নাই সে কারণ, ইহার কৃতিত্বের জন্য ষোল আনা প্রশংসার দাবী করিতে পারেন—শিক্ষয়িত্রী নীহারবালা। অনেক তথাকথিত নৃত্য-পরিকল্পনাকারী অপেক্ষা শ্রীমতীর এ বিভাগে বিশেষ দক্ষতা আছে এবং তিনি তাহার পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

মোট কথা, বিদ্যাসুন্দর আধুনিক রুচির উপযোগী করিয়া সম্পূর্ণ মডার্ণ ছাঁচে গঠিত না হইলেও তাহা সাধারণ দর্শকদের যে তৃপ্তি দিতে পারিবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।—(সু)

পতিতপাবন পতিতুণ্ডী

পর্দ্দার বাহিরে

আমরা যারা কায করি অর্থাৎ যারা রোজগার করে খাই তাদের ঘরের জীবন আর বাহিরের জীবন দুটো কি এক? এক কিছুতেই নয়। এই ঘরের মানুষ আর বাইরের মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। অফিসে যে লোক কথনো হাসে না, যে লোক খুব

লাওনেল ব্যারীমুর

কম কথা বলে, তাও বা যা বলে তা এমন মেজাজে বলে যে অন্যের বুক কেঁপে উঠে।—লোকে আড়ালে গিয়ে গালাগালি করে। তাকেই আমরা বাড়ীতে দেখি হাসি ছাড়া কথা কয়না। লোকে আড়ালে বলে: ভগবান ওঁকে বাচিয়ে রাখুন উনি যে আমাদের বাপ মা। তেমনি পর্দ্দায় আমরা যাদের দেখলেই ভাবি লোকটা বদমায়েস, পর্দ্দার বাইরে হয়ত সে লোকের মত ভালো লোক খুব কম দেখা যায়। এতো গেলো মানুষের স্বভাবের কথা। এ ছাড়া আরো অনেক জিনিষ আছে যেটার একদিকের সঙ্গে অন্য দিকের মিল দেখা যায় না। এই ধরুন লাওনেল ব্যারিমুরকে আপনারা কী ভাবেন। যা ভাবেন তা আপনারা মনে রাখুন আমার বলবার দরকার নেই। আমি একটা খবর বলে দি—উনি অর্থাৎ লাওনেল ব্যারিমুর এ্যামেরিকান এচেচার্স সোসাইটির একজন মনোনীত মেম্বার। এই সোসাইটি-টি হচ্ছে নানা রকম কলাশিল্প ও গীতবাদ্য সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান।

ব্যাঙ্কের পরিচালিকা

জীন হারলো এতদিন পুরাতন পুস্তক সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের সভ্যা ছিলেন; এই

বার হলেন বেভার্লি হিল্‌সএর চেম্বার অব কমার্সের সভ্যা ও হলিউড ব্যাঙ্কের একজন পরিচালিকা।

রণবিদ্ লিউস ষ্টোন

লিউস ষ্টোন আর্মি রিসার্ভের একজন পুরাতন ও দক্ষ মেজর। আরো জানিয়ে রাখি দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার অশ্ববাহিনীর একজন সেনাপতি তো বটেই এবং যোগাড়েও বটে। সেখানে তার কাছ থেকে যুব শক্তি দীক্ষা লাভ করে।

সার্ব্বজনীনতা

হলিউডের খ্যাতনামা ষ্টারদের, পর্দা বাদ দিয়েও জন সাধারণের কাছে একজন 'বড় কেউকেটা হবার সাধ যে প্রবল ভাবে আছে তা চরম ভাবে উপলব্ধি করা যায়, ওয়ালেস বিয়ারির কাছে। ওয়ালেস বিয়ারি এতদিন সাধারণের কাছ থেকে বেশ দূরেই ছিলেন। তাঁর নিজের এরোপ্লেন নিয়ে ওড়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিলনা। সম্প্রতি তিনি সাধারণের সঙ্গে জনসাধারণের কাজে বেশ মন প্রাণ দিয়েই লেগে গেছেন।

ওয়ালেস বিয়ারী

ওয়ালেস এখন ওখানকার বিমান প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। শুধু তাই নয়, কী করে উড্ডীয়মান হওয়া আরো উন্নত প্রণালীর হতে পারে সে বিষয়েও ওঁর চেষ্টার অন্ত নেই। এবং ওঁর সম্বন্ধে আরো যা বলবার মত তা হচ্ছে উনি এখন 'আমেরিকান নেভাল এয়ার রিসার্ভ লেফ্‌টেন্যান্ট কমাণ্ডার'। সামান্য ছোট খাটো নয় নিশ্চয়ই, এঁ্যা—কী বলেন।

১৯৩৬ সালের ছবি

বছর শেষ হতে চললো। আবার নতুন বছর আসছে। কত তারকা উঠল কত পড়ল। তাদের নাম এখন আমি করব না, পরে বলব। এখন বলে রাখছি, মেট্রোর সিংহটা গর্জ্জে উঠে যে কথানা আগামী বছরের ছবির নাম করে ফেলেছে—সেইটেই এখন বলে দিই।

১। "মারী এ্যান্টয়নেট"—নরমা শিয়ারার নামবে নায়িকা হয়ে।

২। "অলিভার টুইষ্ট" নামবে ফ্রেডি বারথোলোমিউ!
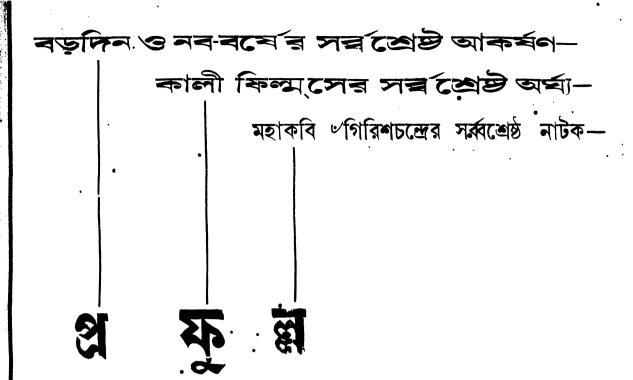
বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মেলনে, বাঙলার চিত্রজগতে
এক নবপ্রেরণা আনয়ন করিয়াছে।

এতৎসহ

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতীয় একাদশ
টেষ্ট খেলা।

উ ত্ত রা—

১৩৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—শ্যামবাজার
টেলিফোন—বড়বাজার ২২০২

শনিবার ৪ঠা জানুয়ারী
হ ই তে স গৌ র বে
৪র্থ সপ্তাহ

প্রত্যহ তিনবার অভিনয়
৩টা, ৬-১৫ ও ৯-৩০টা
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় হইতেছে।
ফ্রি ও কমপ্লিমেণ্টারী পাশ একেবারে বন্ধ।

৩। "কিম্"—খুব সম্ভব ফ্রেডি বারথোলো-মিউ কিম্বা ভারত থেকে কোন ছেলে নেওয়া হবে।

৪। "ক্যাপটেন্স কারেজিয়াস্"—ফ্রেডি বারথোলোমিউ, তা যদি না হয় তা হলে আমেরিকা থেকে কোন ছেলে নেওয়া হবে।

৫। 'দি গুড্ আর্থ'।

৬। 'প্রিজনার অব জেন্দা'।

৭। 'লিভিং ইন এ বিগ ওয়ে'।

৮। 'দি ডিস্টাফ সাইড'।

৯। 'ফর্টি ডেজ অব মুসা ডাব'।

আরো ছ খানার নাম কয়েকদিন বাদে আপনাদের বলব। আপাততঃ এই খবর ওরা আমায় পাঠিয়েছে। আমিও তাই আপনাদের শুনিয়ে দিলাম।

খুচরো খবর

মায় ওয়েষ্টের ছবি সব চেয়ে বেশী পয়সা দেয়।

* * *

বেশী টাকা খরচ করে যার সব ছবি তোলা হয় তার নাম সিসিল বি ডি মিলে।

* * *

ওয়ালি বিয়ারীর যে ছবি এবার আমরা দেখব তার নাম হচ্ছে 'দা উইলডারনেস্'।

* * *

'দা উইলডারনেস্' ছবি পরিচালনা কচ্ছেন 'ক্ল্যারেন্স ব্রাউন'।

* * *

ছায়াজগতের সঙ্গে চার্লি যাদের পরিচয় করে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে যাদের নাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তারা হচ্ছে জ্যাকি কুগান, এ্যাডল্ফ মাঞ্জু।

* * *

মায় ওয়েষ্ট ব্যবসাদার হলেও ওর লোকের প্রতি সহানুভূতি আছে।

"গজল"

কথা ও সুর শ্রীসুনীল কুমার দাশগুপ্ত

বন্ধু ওগো, প্রাণ কাঁদে হায়
তোমার গজল গানে,
সুর সেতো নয় সুর-মায়াবী
ডাক্‌ছে গজল গানে।
বাঁধ্‌বো বাসা সুরের বুকে
কাটবে দিবস মিলন-সুখে
মিল্‌বো মোরা প্রাণে প্রাণে
তোমার গজল গানে।
পূর্ণিমার ওই জোছনা-রাতে
সাজিয়ে দিও ফুলেল্ হাতে,
অশ্রু দিও মোর কবরে
তোমার গজল গানে।

চার্লস্ বয়্যার ও লরেটা ইয়ং প্যারামাউন্টের "সাংহাই" চিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন। উপরের ছবি দেখলেই আপনারা সে সত্যটা কতকটা বুঝবেন।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৪শে পৌষ, ১৩৪২—9th January, 1936. } ২য় সংখ্যা

বেঙ্গল ষ্টোরস্ ও বাঙ্গালী

"নিজবাসভূমে পরবাসী হ'লে"—এই কথাটি বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যেরূপ খাটে, সেরূপ বোধহয় আর কাহারও সম্বন্ধে নহে। বাঙ্গালী উদার, বাঙ্গালীর আতিথেয়তা প্রবাদবাক্যের প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাই প্রথম হইতেই সে নিশ্চিন্তমনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভ্রাতৃবৃন্দকে স্বীয় প্রদেশে স্থান দিয়া আসিয়াছে। তাহার এই Opendoor Policy, তাহার সার্ব্বভৌম উদারতা আজ তাহার বিরুদ্ধে গিয়াছে। আজ নিতান্ত দুঃখের সহিত সে দেখিতেছে যে, তাহার মুখের গ্রাস লইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বেশ ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইতেছে; কেবল সে-ই শস্যশ্যামলা বাঙ্গলার সন্তান হইয়াও অনাহারে বা অল্পাহারে কাল কাটাইতেছে। ইহা কি অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস নহে?

ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা সঙ্কীর্ণতম প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী। আমরা এ কথা বলি না যে, বাঙ্গলা কেবল বাঙ্গালীদের জন্য—অন্য কাহারও এখানে প্রবেশাধিকার নাই। পারস্পারিক আদান-প্রদানে আমরা বিশ্বাসী। কিন্তু আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, আমাদের নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর দাবী সর্ব্বাগ্রে, কথায় ও কাজে ইহা সপ্রমাণ করিবার একান্ত প্রয়োজন।

সম্প্রতি বেঙ্গল ষ্টোরস্‌এ বাঙ্গালী বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার ফলেই পূর্ব্বের বহুবিদিত কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করিতে হইল। মাড়োয়ারী সম্প্রদায় বাঙ্গলা দেশে আসিয়া স্বীয় অধ্যবসায়বলে যদি অর্থোপার্জ্জন করেন তাহাতে আমরা আপত্তি করি না। আমাদের শুধু বক্তব্য যে, যে-দেশে বসিয়া তাঁহারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন সেই দেশবাসীর সহিত ব্যবহারে যেন একটা সকৃতজ্ঞ ভদ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'বেঙ্গল ষ্টোরস্'এ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের লইয়া যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা একান্ত পরিতাপের বিষয়। এ সম্বন্ধে আমরা 'বেঙ্গল ষ্টোরস্' এর কর্ত্তৃপক্ষের বিবৃতির প্রতীক্ষা করিতেছি; সেইজন্য কোনও রূঢ় বা অপ্রিয় মন্তব্য বর্ত্তমানে আমরা করিতে চাহি না। এখন শুধু কর্ত্তৃপক্ষকে এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে বাঙ্গলায় বসিয়া ব্যবসায় চালাইতে হইলে বাঙ্গালীর সহৃদয় সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য্য। বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহারের পরিণাম ফল যে শুভ নহে একথা তাঁহারা যত শীঘ্র বুঝেন, ততই ভাল।

শ্রীএকলব্য

অলিম্পিকের খবর

ফুটবল উৎসাহীরা জেনে খুশী হবেন যে জার্ম্মানীতে অলিম্পিকের সঙ্গে যে আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে তাতে অনেক দেশ থেকেই ইতিমধ্যে নাম দেওয়া হয়েছে এবং সবচেয়ে আনন্দের খবর যে ভারতবর্ষ থেকেও একটি দল ঐ প্রতিযোগিতায় যোগ দিবে। আজ পর্য্যন্ত ১৫টা দেশ এতে যোগ দেবে বলে জানিয়েছে; তারা হচ্ছে: ভারতবর্ষ, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া মিশর, ইস্থোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড, হায়তী দ্বীপ, হাঙ্গেরী, ইটালী, জাপান, নরওয়ে, পেরু, পোল্যাণ্ড, সুইডেন এবং আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য।

* * *

অলিম্পিক কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করেছেন যে অলিম্পিক উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি যাঁরা আসবেন তাঁদের বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতামঞ্চে একটি করে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করা হবে। যাঁদের আবাহন করা হবে তাঁরা এক একটি মহাদেশের পক্ষে বলবেন —যেমন ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা ইত্যাদি। আজ পর্য্যন্ত যা ঠিক হয়েছে তাতে জানা যায় ইউরোপের তরফে বক্তৃতা করবেন বিখ্যাত সুইডিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ স্বেন হেডিন। অবিশ্যি ডাঃ হেডিন আরো একটা বক্তৃতা অলিম্পিক ষ্টাডিয়ামে দেবেন। রিস্ আর্কেওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সভাপতি ডাঃ উইগ্যাণ্ড জার্ম্মানীর পক্ষে বক্তৃতা করবেন।

* * *

যাঁরা জার্ম্মানীতে অলিম্পিকে যোগ দিবেন বা প্রতিযোগীদের সঙ্গে যাবেন, তাঁরা যে সব জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে যাবেন তার উপর কোন শুল্ক লাগবে না বলে জার্ম্মান সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তবে শুধু এ সম্বন্ধে একটু বিধি-নিষেধ আছে। যিনি কোন জিনিষ নিয়ে যাবেন তাঁকে স্থানীয় অলিম্পিক কমিটির কাছ থেকে একখানা এই মর্ম্মে চিঠি নিতে হবে যে তাঁরা যা কিছু নিয়ে যাচ্ছেন তা সবই প্রতিযোগীদের জন্যে। এবং যতখানি করে নিয়ে যাচ্ছেন তা সবই ঐ দলের প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়।

কিছুদিন আগে আমরা অলিম্পিকে চারু-শিল্প প্রদর্শনী বিষয়ে যে সংবাদ দিয়েছিলাম তার পরে, আমরা জেনেছি যে ইতিমধ্যে ১১টী দেশ এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করবে বলে জানিয়েছে। তারা হচ্ছে:— অষ্ট্রিয়া, চেকো শ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, ইটালী, জাপান, পোলাণ্ড, সুইডেন, স্পেন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও যুগোশ্লাভিয়া। এ ছাড়াও আরো কয়েকটী দেশ, যেমন, বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড, গ্রীস, ল্যাটাভিয়া, লাক্সেমবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মধ্য মার্কিন রাজ্যসমূহ।

এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ইটালীতে সবচেয়ে বেশী সাড়া পড়ে গেছে। অলিম্পিকে তাদের প্রতিনিধি মনোনয়নের সুবিধের জন্যে তারা তিনমাস ধরে (জানুয়ারী থেকে মার্চ্চ) এক বিরাট প্রদর্শনী খুলেছেন। এই সঙ্গেই ইটালী পক্ষে কে কে সাহিত্য ও সঙ্গীতে প্রতিযোগী হিসেবে যাবে তাও নির্দ্ধারণ করার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

* * *

অলিম্পিকের "ক্রীড়া-ক্ষেত্রে"র অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক লোক আসছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন রাজ-প্রতিনিধি, সাংবাদিক, বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক অনুষ্ঠানকারী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা দেখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

কোলকাতায় "ক্রিকেট-সপ্তাহ"

কোলকাতায় ক্রিকেট সপ্তাহের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। যতখানি আশা আনন্দ নিয়ে ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ খেলা দেখতে ইডেন গার্ডেনে গিয়েছিলো ততখানি আনন্দ তারা পায়নি। তার কারণ দ্বিবিধ—(১) অকালে বৃষ্টি, (২) অসঙ্গত দল মনোনয়ন। ক্রিকেট সপ্তাহে খেলা হয়েছিলো তিনটী—দুটী অষ্ট্রেলিয়ার খেলা আর একটী বড়লাটের একাদশ বনাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ। আবার এ ছাড়া আরও দুটী ম্যাচ খেলা হয়েছিলো—(১) কুচবিহারের মহারাজার একাদশ বনাম অষ্ট্রেলিয়া, (২) ট্যারাণ্টের একাদশ বনাম ভিজিয়ানাগ্রামের একাদশ। শেষোক্ত খেলা দুটো অবশ্য "পাদপূরণ" হিসেবে ধরা যেতে পারে এবং ঐ সম্বন্ধে আমরা কোন আলোচনা করবোনা।

ক্রিকেট সপ্তাহের প্রথম খেলা বড়লাটের একাদশ বনাম বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ। এই খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

এই খেলাটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে উজির আলীর ২৬৮ রান (আউট হন নাই) এবং বড়-লাটের দলে দ্বিতীয় ইনিংসে অমরনাথের ১৪৯ রান (আউট হন নাই)।

* * *

অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম খেলা হয় বাঙ্গলা ও আসামের মিলিত দলের সঙ্গে। এই খেলাতে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হয়েছে। বাঙ্গলা ও আসামের একজন খেলোয়াড়ও স্থান পায়নি এবং মোট এগারো জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন ভারতীয় ছিল। তবে সুখের কথা এই খেলাতে বাঙ্গালী খেল্যোয়াড়রাই বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এরিয়ান্সের কমল ভট্টাচার্য্য ও সুশীলবাবুর জন্যেই বাঙ্গলা ও আসাম দলকে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেলেও 'বেইজ্জত' হতে হয়নি।

অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় খেলা সি, কে, নাইডু দলের সঙ্গে "Unofficial Test." এই খেলাটি হবার কথা ছিল চারদিন কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবেই দুদিনে শেষ হয়েছে। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা যে প্রথম দিনেই দুই পক্ষেরই এক ইনিংস করে খেলা শেষ! বিশেষজ্ঞ যারা তারা মাথা নেড়ে বলবে আগের দিনের বৃষ্টির জন্যে মাঠের Pitch খারাপ ছিল, তাই বোলাররা অত সহজেই ব্যাট্‌সম্যানদের আউট করে দিতে পেরেছে। তারপর দিন আবার যেন গোড়া থেকেই খেলা সুরু। সেদিনও ভারতীয় দল কোনরকমে টেনে হিঁচড়ে কষ্ট করে পৌনে তিনটে পর্য্যন্ত ব্যাট করলে, তারপর অষ্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নামলো এবং ৫টা বাজবার দশ মিনিট আগেই খেলা শেষ—ভারতবর্ষ ৮ উইকেটে হেরে গেছে!

আগামী ১০ই, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী লাহোরে পাতিয়ালা মহারাজার অষ্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে ভারতীয় এক দলের যে Unofficial Test খেলা হ'বে তাতে বিখ্যাত বাঙ্গালী খেলোয়াড় মিঃ এস, ব্যানার্জ্জী স্থান লাভ ক'রেছেন। বাঙ্গালী ক্রিকেটা-মোদীদের পক্ষে এটা সবিশেষ সুসংবাদ সন্দেহ নেই। লাহোর ম্যাচের ভারতীয় একাদশের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল:—উজির আলি (ক্যাপ্টেন), সি, কে, নাইডু, পাতিয়ালার যুবরাজ, নাজির আলি, এল, অমরনাথ, এস, এম, নিসার, বাকা জিলানী খাঁ, আমির এলাহি, এস, ব্যানার্জ্জী, আর, পি, মেহেরোমজী, জে, এন, ভায়া।

রিজার্ভ:—লাল সিং, মামুদ সালাউদ্দিন (আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়), ডি, আর, পুরী, এবং রোসান লাল (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়)।

বিবাহ

বিমল চন্দ্র ঘোষ

তেইশ বছর কাটলো ধীরে ধীরে
কল্পনা মোর রইল পড়ে
পেরিয়ে আসা স্বপ্ননদীর তীরে।
সুপ্ত মনের আঁধার ঘরে
কিশোর কালের ছবি,
হারিয়ে ফেলে ব্যাকুল হ'ল
আমার, জীবন-কবি।
ভাসলো আঁখি-নীরে,
তেইশ বছর যখন আমার
কাটলো ধীরে ধীরে।

ফাগুন এসে হঠাৎ দিল
যৌবনেরে ডাক,
বললে প্রেমে পূর্ণ কর—
মনের কোথাও রয়না যেন ফাঁক।
প্রেমের পরশ, প্রিয়ার পরশ
তনুর পরশ বিনা,
যাত্রী, তোমায় বাজবে নাকো
চরম সুখের বীণা?
বাজলো শুভের শাঁখ
ফাগুন এসে যেদিন দিল
যৌবনেরে ডাক।

সভার মাঝে প্রিয়ার পরিচয়,
যেদিন হ'ল, নারীর কাছে
সেদিন আমার পরম পরাজয়?
ঐ টুকুত বয়স তাহার
পঞ্চদশের কোঠা,
অনাঘ্রাতা গন্ধরেণু
সদ্য মুকুল ফোটা।
আমার চোখে অসুন্দরী নয়
রূপ দেখে তাই বুকের পুরুষ
মানলো পরাজয়॥

তা'র সাথে গো আজকে আমার বিয়ে!
প্রেম কুসুমের পাপড়ীগুলি
তাইতো কেবল কাঁপছে থরথরিয়ে,
আড়াল থেকে অনঙ্গদেব
হানলো ধনুঃশর
বক্ষে আমার রইল বিপুল
বন্যা অতঃপর;
বরণ তা'রে ক'রবো কি ধন দিয়ে?
সভায় দেখা প্রিয়ার সাথে
যখন হ'বে বিয়ে॥

ফাগুন এসে আবার দিল ডাক,
মোর প্রিয়ারে যখন দিল
সপ্ত মধুর পাক—
মিলন সুখের স্বপ্নে বিভোর
আমার তনু ঘিরে;
স্বর্গ হ'তে লক্ষ্মীরাণী
মর্ত্তে এল ফিরে?
এয়োর হাতে বাজলো শুভের শাঁখ
ধন্য শুভদৃষ্টি মোদের
সপ্ত মধুর পাক?

জ্যোৎস্নারাতে ফুলের শয়ন পাতা,
মধুর ফুলশয্যাতে মোর—
যখন প্রিয়া রাখলো বুকে মাথা—
সেই সে চিরন্তনের লীলা
আমার জীবন 'পরে
পূর্ণ হ'ল, যেমন হ'ত
লক্ষ যুগান্তরে।
ধন্য তুমি, ধন্য মিলনধাতা!
আমার প্রেমের সিন্দূরেতে—
রাঙলো প্রিয়ার মাথা।

আজকে তেইশ বছর শেষে
ভাবছি মনে মনে,
কেমন কোরে ফুটলো বিয়ের
কুসুম শুভক্ষণে
হাতছানিতে ডাকলো আকাশ
গাইল বনের পাখী
যেদিন প্রিয়া খুললো হাতের
হলুদবরণ-রাখী।
বিস্ময়ে আজ ভাবছি মনে মনে
সংসারেতে যাত্রী হ'লাম—
কেমন ক'রে আজকে শুভক্ষণে?

বিয়ের মুকুল ফুটলো আকাশ জুড়ে
কিশোর দিনের স্বপনপাখী,
কোন্ অসীমে কোথায় গেল উড়ে?
ঐ যে আমার পঞ্চদশী
জীবনপথের সাথী!
দুঃখেসুখে গান গেয়ে কি
চলবে দিবসরাতি?

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

গেল বছরের শেষ দিন বড়লাট বাহাদুর, লেডি উইলিংডন, বাঙলার লাট, সেনা-নায়ক, স্যার হেন্‌রী ক্রেগ, স্যার জি, এস্ বাজপাই, স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস্, স্যার মহম্মদ জাফ্‌রুল্লা, টেগোর ও বর্দ্ধমান অধিপতি, হায়দ্রাবাদের কুমার, স্যার আলেকজেন্দার মারে, স্যার নলিনীরঞ্জন চ্যাটার্জ্জি, রিচমণ্ডের ডাচ্ প্রভৃতি বিশিষ্ট অতিথিগণসহ নিউ থিয়েটার্সের বড় ষ্টুডিও পরিদর্শন করেন।

বড়লাট বাহাদুর আর লেডী উইলিংডন বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মীদের কার্য্য পরিদর্শন কোরে আর ভারতের এই অতি-আধুনিক ষ্টুডিওর ব্যবস্থাবলী দেখে বিশেষ আপ্যায়িত হন এবং ষ্টুডিওর কর্তৃপক্ষকে প্রশংসাপত্র দান কোরে গৌরবান্বিত করেন।

কালী ফিল্মস্

সুকুমার দাশগুপ্তের হিন্দী "প্রফুল্ল"-র মহলা বসেছে।

গুণময় বাড়ুয্যের "পরভৃতিকা"-র চরিত্র নির্ব্বাচন শেষ হ'য়েছে। মহলা শিগ্‌গির বসবে। গুণময়ের গুণের অন্ত নেই—তিনি একজন দরদী শিল্পী। সেজন্য আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর পরিচালনায় "পরভৃতিকা" কালী ফিল্মসের আর একখানা শ্রেষ্ঠ চিত্র হবে।

গাঙ্গুলী মশাইয়ের নিজের পরিচালনায় "কাল-পরিণয়" আস্তে আস্তে তোলা হ'চ্ছে।

দেবকী বসু সম্বন্ধে মাঝে আমরা একটু আশান্বিত হ'য়েছিলাম—কিন্তু দিন দিন তাঁর সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হ'য়ে পড়ছি। কী জানি, এ অজ্ঞাত রহস্যের জাল কবে উদ্‌ঘাটিত হবে!

দেবদত্ত ফিল্ম কোম্পানী

জ্যোতিষ বাড়ুয্যে 'রাধা ফিল্ম' ছেড়েছেন সঙ্গে আছেন সহকারী হরি ভঞ্জ। এঁরা একটা নতুন ফিল্ম কোম্পানী গড়েছেন, নাম "দেবদত্ত ফিল্ম কোম্পানী"। শোনা যাচ্ছে, ষ্টুডিও হবে এদের নিজের, আর ছবি তোলাও আরম্ভ হবে অতি শীগ্‌গির। খবরটা খুবই ভাল, যদি প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা থাকে।

চন্দ্র ফিল্মস্

যতীন দাসের পরিচালনায় তোলা হবে এদের "পরপারে"—এ খবর আর কারও অজানা নেই। মহলা চলছে এদের জোরে। যে সকল শিল্পীরা এ ছবিতে নামছেন, তাঁদের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। প্রবোধ দাশ আলোক-চিত্রে ভারত-জোড়া সুনাম কিনেছেন—সুতরাং এ যোগাযোগে যে "পরপারে" বাঙালীর ছায়ারাজ্যে এক বিশিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত হবে—একথা বলাই বাহুল্য।

পপুলার পিক্‌চার্স

এদের নিশিকান্ত বসু রায়ের "ধর্ষিতা"-র মহলা চল্‌ছে। শীঘ্রই ছবিখানা যা'তে তোলা সুরু হয় তার জন্য যামিনী মিত্তির আর সতু সেন বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। হ্যাঁ, অনেকদিন বসে আছেন এরা, শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হ'লে শত্রুদের মিচকি হাসিতে ছাই পড়ে।

কোয়ালিটী পিক্‌চার্স

বায়োস্কোপের খোঁজ যাঁরা রাখেন, তাঁরা এ নতুন প্রতিষ্ঠানটির নাম শুনেছেন। এরা "ব্যথার দান" ছবি তুলছেন—এ খবরও সবাই পেয়েছেন। এদের মহলা সুরু হ'য়েছে—এর বেশী আর কিছু খবর আমাদের জানা নেই।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

এদের "বাঙ্গালী" প্রায় অর্দ্ধেক তোলা হ'য়েছে। চারু রায় লুপ্ত সুনাম উদ্ধারের জন্যে শুনলাম, এবার মরিয়া হ'য়ে উঠেছেন —কিন্তু আমাদের ভয় হয় "বাঙ্গালী"-র মত বইয়ে তিনি কতদূর সফলতালাভ কোরবেন।

রাধা ফিল্ম

এদের "কৃষ্ণ-সুদামা" এখনো তোলা হ'চ্ছে। "কণ্ঠহারে"-র অনতিবিলম্বেই ছবিখানার মুক্তির জন্য কর্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন।

এরপরে এরা "কেলোর কীর্ত্তি" তুলছেন। ফনি বর্ম্মন কোরবেন ছবিখানার পরিচালনা।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

আমাদের মাই ডিয়ার মুখুয্যে মশাইকে সেদিন দেখলুম একটু বিষণ্ণ, আর মাথা দেখলুম নেড়া। শুনলুম তাঁর মাতৃ-বিয়োগ

হ'য়েছে—শুনে আমাদেরও দুঃখ হ'ল। তারপর ছবির কথা জিজ্ঞেস কোর্‌লাম। বল্লেন, অনেকটা এগিয়েছে। আর শুন্‌লাম একজন ভদ্রঘরের মেয়ে নামছে—লম্বা সিঁদুর আর লম্বা ঘোমটা—দু'টো বিশেষণ যোগ কোর্‌লেন তিনি।

রাঁতেন এণ্ড কোং

পায়োনিওর ফিল্মে তোলা এদের "তরুবালা" মুক্তির পথ চেয়ে রয়েছে। নব-নির্ম্মিত "শ্রী" চিত্রগৃহে ছবিখানা অবিলম্বেই আত্মপ্রকাশ কোরবে।

মহানিশা ফিল্মস

শিশির মল্লিকের তত্ত্বাবধানে আর নরেশ মিত্তিরের পরিচালনায় "মহানিশা"-র রেঙ্গুনের বাইরের কয়েকটা দৃশ্য ছাড়া আর সব শেষ হ'য়েছে। ছবিখানার সবই ভাল, কিন্তু বড়ুয়া ষ্টুডিওর দু'জন অশোক সেন আলোক-চিত্রশিল্পী আর শম্ভু সিং শব্দযন্ত্রী এরা দু'জন শেষ অবধি যে কী ফল প্রসব কোরবেন—তা' বলা শক্ত!

চিত্রা

"ভাগ্যচক্র" এত পুরণো হ'ল—তবুও কিন্তু দর্শকের কমতি নেই কিছু। আরও কিছুদিন চলবে।

উত্তরা

"প্রফুল্ল" কোলকাতার বাজার মাৎ কোরে রেখেছে। ভীড় হ'চ্ছে যেমনি, দর্শক ফিরছে তেমনি।

রূপবাণী

"কণ্ঠহার"-এর রহস্য খোলার জন্যও সাধারণের কম আগ্রহ নয়, তাই এখানেও ভীড় জমছে বেশ।

রূপকথা

এখানে "স্বয়ম্বরা"র আসর বেশ জমেছে।

শ্রী

আসছে ১৮ই সম্ভবতঃ 'শ্রী'-র দোর খোলা হবে। দেখ্‌লুম 'শ্রী' সত্যই শ্রীমণ্ডিত হ'য়েছে।

পূর্ণ

এ হপ্তায় পূর্ণর প্রত্যহ এক একখানি বাংলা ছবি দেখানো হবে—আসছে হপ্তায় এখানে আসছে "প্রফুল্ল"।

বাংলা ছায়া-চিত্রে অভিনেত্রী নির্ব্বাচন

শ্রীনলিনেশ সেন

আজকাল বাংলা ছায়াচিত্রের আদর যে অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা হয়ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ছবি তোলার প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাও ক্রমশঃ স্ফীত হইতেছে এবং প্রতিযোগিতা বশতঃই বাংলা ছবির উন্নতি বিকাশ হইতেছে। প্রত্যেক কোম্পানীই ভাল ভাল ছবি তুলিয়া নিজেদের সম্মান এবং সুনাম রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত এবং তাহারই ফলে আজ বাঙ্গালীর মুখে বাংলা ছবির বিশেষ নিন্দা ও বিদ্রূপ-বাণী শুনিতে পাওয়া যায় না; যদিও এমন অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন যাহারা বাংলা ছবির নামেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন। অবিশ্যি নিজেদের বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে এই সম্প্রদায় কুণ্ঠিত এবং সেজন্যই ইহাদের মন্তব্যে এমন কিছু আসে যায় না। সর্ব্বদিক দিয়াই বাঙ্গালীর ছবি আজ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং প্রভৃতির দিক দিয়াও এমন কিছু মারাত্মক ও অমার্জ্জনীয় ভুল আজকাল পরিলক্ষিত হয় না। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যারম্ভের সময় হইতে, বিশেষতঃ সবাকযুগের আরম্ভকাল হইতে, বাংলার বহু প্রতিভাবান অভিনেতা ও অভিনেত্রী, বহু সুকণ্ঠ গায়ক ও গায়িকাগণ আসিয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ সাহচর্য্যের ফলেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি পাকা ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাই বোধহয় এ পর্য্যন্ত একমাত্র ব্যবসায়ক্ষেত্র, যাহাতে বাংলার টাকা বাংলাতেই থাকিতেছে। যদিও ইহাদের লভ্যাংশের প্রতি নজর পড়াতে অন্য প্রদেশাগত বহু ব্যবসায়ী আসিয়া এই ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে এবং বাংলা ছবি তুলিয়া তাহারাও বেশ দু'পয়সা লাভ করিয়া পকেট ভর্ত্তি করিতেছে

যাহা হউক, বাংলা ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত বর্ণনা এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বাংলা ছবির দর্শক সংখ্যা অন্যান্য ছবি হইতে অনেক বেশী এবং বহু সপ্তাহ ধরিয়া এক একটি ছবি একই প্রেক্ষাগৃহে দেখান হয়। বাঙ্গালী মহিলাগণও আসিয়া এই সমস্ত ছবি দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে আজকাল বাংলা ছবি বাঙ্গালীর সহানুভূতি প্রচুর পরিমাণেই পাইতেছে এবং উত্তরোত্তর এই সমস্ত ছবির শ্রীবৃদ্ধি হইলে যে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশাগত ছবির কদর অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।......

কিন্তু চারিদিক হইতে নানা প্রকারের সহানুভূতি লাভ করিয়াও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বত্বাধিকারিগণ বা ডিরেক্টরগণ যেন অভিনেতা ও অভেনেত্রী নির্ব্বাচনে ততটা মনোযোগী নন। এইস্থানে আসিয়াই একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্যের সম্মুখীন হইতে হয়। অভিনেতা নির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ কোন মন্তব্য করিবার নাই। তাহারা মোটামুটি মন্দ নয়। কিন্তু অভিনেত্রীদের লইয়াই মুস্কিলে পড়িতে হয়, বিশেষতঃ যাহারা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। অবিশ্যি তাঁহারা অভিনয় ভালই করেন এবং সঙ্গীতেও তাঁহাদের অনেকে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই তো সব নয়। দৈহিক সৌষ্ঠব ও কমনীয়তা থাকাও একান্ত প্রয়োজনীয় এবং বাঞ্ছনীয়। কেহ শুধু কথা বা গানের জন্যই তো আর বায়স্কোপ দেখিতে যায় না। তাহা হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বা পর্দ্দার দিকে পিছন ফিরিয়া, কথা ও সঙ্গীত শ্রবণ করতঃ, শুধু বাহবা দিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। অভিনেত্রী নির্ব্বাচন কোন ছবিতেই আশাপ্রদ নয়। তবে একথার উত্তরে ডিরেক্টরগণ বলিতে পারেন যে এবম্বিধ অভিনেত্রী নির্ব্বাচনে তাহাদের ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না। দিনের পর দিন দর্শকদের ভিড় তো লাগিয়াই আছে। কিন্তু এই প্রকারের মনোবৃত্তি থাকাও তো ঠিক নয়। বাংলা ছবিতে ভিড় লাগিয়া আছে বলিয়াই যে তাহা একেবারে সর্ব্বদিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্বের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা নয়। বাংলা ছবি বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ সকলের নিকট সহজবোধ্য। ক্ষণিক আনন্দের জন্য তাঁহারা বিদেশী ছবি দেখিয়া মস্তিষ্কের উপর অহেতুক ভার চাপাইতে রাজী নন। বাংলা ছবির পরিচিত আবহাওয়ার মধ্যে প্রত্যেক দর্শক-ই নিজেকে মাখাইয়া চলিতে পারেন। এইজন্য বাংলা ছবি, কিছু কিছু অসামঞ্জস্য থাকা সত্বেও, বাংলা দেশে এত চলে।...

স্বত্বাধিকারিগণ যদি এই কাজ করিয়া শুধু লাভবান ব্যবসাদার হইতে ইচ্ছা করেন তবে বাংলা ছবির আর বিশেষ কোন উন্নতি সাধন হইবে না। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে ইহার মধ্যে শুধু ব্যবসাদারী নাই, একটা আর্টের দিক-ও রহিয়াছে। সেই আর্টের ধারাকে পরিস্ফুট করিলে, আমার মনে হয়, তাহাদের ব্যবসার পক্ষে কোনই ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ আরো অনেক পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি হয়। গত কয়েক মাস হইল কলিকাতা সহরে যে ছবিটি একটা ঘোরতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতেও এই গলদ পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় যে দুইটি অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করিয়াছেন, তাহাদের দেহের পার্থক্য একটি হাস্যস্পদ ব্যাপার, যদিও তাঁহারা অভিনয় ভালই করিয়াছেন। প্রেমিক-প্রেমিকার ভূমিকায় তাঁহারা যে একেবারেই অচল তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আধুনিক ষোড়শী বা অষ্টাদশী নায়িকার ঐ প্রকার দেহভার ও পরিধি যে কোনক্রমেই চলিতে পারে না তাহা নিঃসন্দেহ। প্রেম নিবেদন করিবার বদলে যদি তিনি তাহার প্রেমিককে পুত্রস্নেহে বুকে টানিয়া শিরচুম্বন করিতেন তবে আরো বেশী স্বাভাবিক হইত। শুধু একটি নয়, প্রায় সব ছবিতেই এই গলদ রহিয়াছে। দুই একটি অভিনেত্রী ছাড়া আর সকলেরই—"শরীলে আর পদথ নেই।"...

যাহা হউক, ডিরেক্টারগণ যদি এ বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন তবে ভাল

হয়। নূতন অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে শরীর পালন করিবার রীতি শিক্ষা প্রদান করাও উচিত। শুধু ডিরেক্টরগণ নহে, এই সঙ্গে অভিনেত্রীগণের দৃষ্টিও আমি এই দিকে আকর্ষণ করি। তাহারা যদি এই শিল্পকে শুধু টাকা রোজগার করিবার কল মনে না করিয়া, ইহাকে একটি উচ্চাঙ্গের আর্ট হিসাবে ইহার সাধনা করেন তবে বাংলা দেশে ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। আর টাকা রোজগারের দিক দিয়া ধরিলেও, এই আর্টের পরিপূর্ণতা সাধন করা দরকার। ইহাতেও কম পয়সা নাই। এই বিষয়ে বিদেশী ছবির সঙ্গে তুলনা করিলে বাংলা ছবির স্থান, অধুনা ভাল হওয়া সত্বেও, অনেক নীচে নামিয়া যায়। বিদেশের অভিনেত্রীগণ নানাপ্রকার ব্যায়াম চর্চ্চার দ্বারা বরাবর তাহাদের শরীর ঠিক একই ভাবে রাখিয়াছেন এবং তাঁহারা ছায়াচিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশুনা করিয়া থাকেন। এবং তাঁহারা যে ইহা কেবল "art for art's sake" করিয়া থাকেন, তাহা নয়। শুনিয়াছি, যথেষ্ট পয়সাও তাঁহারা রোজগার করিয়া থাকেন। সেই আদর্শে যদি আমাদের দেশের অভিনেত্রীগণ নিজেদের গঠন করেন এবং অনাবশ্যক মেদ-মাংস ও পরিধি বৃদ্ধি না করিয়া সংযমের পথে নিজেদের পরিচালিত করেন, তবে মনে হয়, তাঁহাদের অভিনয় আরো ভাল হইবে এবং তাহাতেই বিদেশী এবং দেশী ছবির ষ্ট্যাণ্ডার্ড এক-ই স্তরে আসিয়া পৌছিবে।......

বিবিধ

অরসিকেষু রসনিবেদন

গত সপ্তাহে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' ব্যর্থ ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে আমরা লিখিয়াছিলাম মিঃ এস্, সি, মিত্র 'পত্রিকার' একজন অংশীদার। ইহাতে কেহ কেহ আমাদের নিকট তাঁহার অংশের পরিমাণ জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে অংশীদার কথাটা Pickwickian senseএ ব্যবহার করা হইয়াছে। তাঁহার সহিত 'পত্রিকার' সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের প্রগাঢ় বন্ধুত্বই আমাদের উদ্দিষ্ট এবং আমাদের বিশ্বাস সেই বন্ধুত্ব তাঁহার সম্বন্ধে অযথা সংবাদ প্রকাশে 'অমৃতবাজার'কে বিরত রাখিবে এ আশা করা অসঙ্গত নহে। এই সঙ্গেই আমরা 'পত্রিকার' বিজ্ঞ সম্পাদককে বলিব বাংলায় 'নাইটহুড' মাত্র দুই জনের উপর বর্ষিত হয় নাই কারণ স্যার জ্যোৎস্না ঘোষাল 'পত্রিকা'-পরিচালকদের মতই বাঙ্গালী।

শোক-সংবাদ

ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যালের পিতা রজনীকান্ত সান্ন্যাল মহাশয় পরিণত বয়সে গত রবিবার ডাঃ সান্ন্যালের বালিগঞ্জ-নিবাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা ডাঃ সান্ন্যাল ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারের অন্যান্য পরিজনবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

বালিকা শক্তি-সঙ্ঘ

দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার সভানেতৃত্বে বালিকা শক্তি-সঙ্ঘের পঞ্চম বাৎসরিক ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। ব্যায়াম-শিক্ষক প্রোঃ জ্যোতিষচন্দ্র দত্তের অধিনায়কত্বে মেয়েরা অতি সুন্দর ভাবে ক্রীড়া কৌতুক দেখাইয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন। শোভা, পুষ্প, চাঁপার লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। উৎসবে প্রায় ৮৯শত লোকের সমাগম হইয়াছিল।

ভবানীপুর এথ্‌লেটিক ক্লাব

সম্প্রতি ভবানীপুর মিত্র স্কুলে প্রোঃ জ্যোতিষচন্দ্র দত্তের প্রতিষ্ঠিত ভবানীপুর এথ্‌লেটিক্ ক্লাবের সপ্তদশ বার্ষিক ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন-গ্রহণ করেন।

জ্যোতিষবাবুর বিবরণী হইতে জানা যায় যে সতর বছর আগে মাত্র চার পাঁচ জন তরুণ কর্ত্তৃক যে সমিতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহার সভ্যসংখ্যা অনেক। সমিতির উদ্দেশ্য—বাংলার যুবকদের সহজ

খেয়ালী মানহানি মামলা

সোমবার ১৩ই জানুয়ারী আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ও সেসান্স জজ মিঃ এ, এন সেনের এজলাসে "খেয়ালী"-র মানহানির মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ হইবে।

এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ বসু, কানাইলাল দত্ত ও সুধীর বসুর সহিত আসামী পক্ষের মামলা পরিচালনা করিবেন।

এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, তাহাদের চরিত্র গঠনে সহযোগিতা, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করিয়া হৃদ্যতা স্থাপন, আর্ত্ত-পীড়িত ও জনসাধারণের সেবা এবং দৈহিক বলের নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক ক্রীড়া কৌশল দেখাইয়া বাংলার যুবকগণকে দেহ সাধনার দিকে আকৃষ্ট করা।

অতিরিক্ত জনসমাগমে ক্রীড়া প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সব কয়টি খেলাই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীমান দুলাল ও পূর্ণের প্যারালাল বার ও দড়ির উপর রিঙ্গের খেলা, অধীর ও সুধীরের চেয়ার কেস ও অরবিন্দের এরিয়াল, ভূতনাথের জাগলিং ও ব্যালেন্স, শিশিরের ল্যাডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সুক্ষ্ম ক্রীড়া কৌশল দেখিয়া প্রত্যেকই ব্যায়াম শিক্ষক প্রোঃ জ্যোতিষচন্দ্র দত্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নাকুয়ার বদলে নরুণ

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ স্বনামধন্য ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সী কলেজকে তেলে জলে মিশ্ খাওয়াবার যে অমূল্য উপদেশ গভর্ণমেন্টকে দিয়েছিলেন—তার পুরস্কার হিসাবে নববর্ষে "নাইটহুড" পাওয়ার রঙীন স্বপ্ন তাঁহাকে মশগুল করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু হায়! সে স্বপ্ন আর বাস্তবে পরিণত হইল না।

তবে তাঁর ক্ষোভের কারণ বিশেষ কিছু নাই। "নাকুয়ার বদলে নরুণের" মত তিনি বেশ গালভরা একটা উপাধি পণ্ডিতদের কাছ থেকে পেয়েছেন। পণ্ডিত ম'শায়দের motto—"অপমানকে অমৃতের মত তারিফ করবে"—এবার তাঁরা এই উক্তির সার্থকতা দেখিয়েছেন। সংস্কৃত কলেজের কনভোকেশনে ডক্টর দাশগুপ্ত পণ্ডিত মহাশয়দের যে অম্লমধুর অন্তর ও বাহির টিপুনী দিয়াছিলেন তাহাতে আত্মহারা হইয়া কতিপয় পণ্ডিত অধ্যক্ষ মহাশয়কে "মহাবিদ্যা-কেলেঙ্কার"—এই অপূর্ব্ব উপাধিভূষণে ভূষিত ক'রেছেন। আর এ কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্যতম সংস্কৃত অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী, এম, এ, পি, আর, এস্, পি, এচ, ডি। আমরা বলি—"রাই, রহু ধৈর্য্যং"! 'নাইটহুড' এর পরের ক্ষেপে

বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ সংস্কৃত অধ্যাপক

শুনিলাম দাশগুপ্ত সাহেব, তাঁর কোন অন্তরঙ্গ ভক্তের কাছে বলেছেন যে ভাইস্ চ্যান্সেলর মহোদয় "আশুতোষ চেয়ার" লইবার জন্যে তাঁকে বড়ই পীড়াপীড়ি করছেন। তাঁর একটা মহা অসুবিধা—আশুতোষ অধ্যাপকের ঘরের পাশে রিসার্চের উপযোগী কোন Ante-room নাই। শুধু এই কারণেই যদি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়—তবে তাহার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের মনে হয় প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত বিভাগের মত পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের সংস্কৃত বিভাগটাও সংস্কৃত কলেজে চালান করিলে মন্দ হয় না।

যদি এ কাজ নেহাৎই অসম্ভব হয়, তবে আশুতোষ অধ্যাপকের পদ পূরণ করা হবে একটা মস্ত সমস্যা। এ পদের জন্য প্রার্থী আছেন—সদ্যোজাত মহামহোপাধ্যায় ডক্টর বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক প্রবীন প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুর (বোলপুরের নহেন), ও ছাত্রবৎসল সুপণ্ডিত অধ্যাপক ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদবাবু সম্প্রতি ন্যায়ের অধ্যাপকপদ যে ভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছেন তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রার্থী ছিলেন না, এমন একজন যোগ্যতম ব্যক্তিকে তিনি ডাকিয়া আনিয়া ন্যায়ের আসনে বসাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন বোলপুরের কুহকে মুগ্ধ হইয়া তাঁর পিতৃনামাঙ্কিত আসনের মর্য্যাদা নষ্ট না করেন।

আমাদের মনে হয়, কোন একজন যোগ্য ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া এই পদ দেওয়াও বরং ভাল। প্রার্থী নন অথচ এমন লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই আছেন।

বিচিত্র অনুষ্ঠান

শুক্রবার ২০শে ডিসেম্বর ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ. হলে এক অভিনব জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শেলী মুখার্জ্জি, আরতি ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি প্রাচ্যনৃত্য, সঙ্গীতভারতীর বালিকাদের ঐক্যতানবাদন, সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতরত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ ও খেয়াল গান দর্শকগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল এই অনুষ্ঠানে সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেছিলেন। এই সাহায্য রজনীর সমস্ত অর্থ সরযূ সদনের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পিত হয়।

বীকন্ ইনসিওরেন্স

কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্ভোকেট, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থানীয় ডিরেক্টর ও লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির ভূতপূর্ব্ব সভ্য শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি, এল, উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরূপে যোগদান করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রবাবু বহুদিন ধরে ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত আছেন, সুতরাং তাঁহার সাহচর্য্যে এই প্রতিষ্ঠানটির যে উত্তরোত্তর গৌরববৃদ্ধি হবে, একথা বলাই বাহুল্য।

করপোরেশন নির্ব্বাচন

শ্রীসত্যবাদী

কলিকাতা কর্পোরেশনের আসন্ন নির্ব্বাচনে একটি অখণ্ড কংগ্রেসী দল গঠন করিবার মানসে বাঙলা কংগ্রেসের বিভিন্ন দল ও উপদল সম্মিলিত হইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দ্দেশে ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি নির্ব্বাচনী সমিতি (Election Board) গঠিত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে বাঙলা কংগ্রেসের বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হয়।

প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাঙলা কংগ্রেসে সম্মিলিত দল গঠনে সহায়তা করিবার সঙ্কল্প অনুমোদন করিয়াছেন।

আরও প্রকাশ যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রকাশ্যে কংগ্রেসে যোগদান না করিলেও কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা এই মিলন-প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিতেছি।

গত সংখ্যায় কর্পোরেশন নির্ব্বাচন শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি কর্পোরেশনে নয় বৎসর বা তদূর্দ্ধ-কাল কাউন্সিলার রূপে বিরাজমান আছেন তাঁহাদের যেন আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস কর্ত্তৃক সমর্থন না করা হয়। ইহা ব্যতীত কংগ্রেস কর্ত্তৃক এমন সকল ব্যক্তিকেও সমর্থন না করা উচিৎ যাহাদের কর্পোরেশনে কাজের বিশেষ কোন পরিচয় নাই। এই সকল ব্যক্তিকে কর্পোরেশন গৃহের শোভাবর্দ্ধনকারী হিসাবে রাখিবার কোন সার্থকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কোন দলবিশেষের 'পার্টি-ফাণ্ড' বৃদ্ধি করিবার মানসে অন্যান্য অনেক স্থানে কাহাকেও রাখিলে আমরা আপত্তি করিব না। কিন্তু পৌরহিতকর প্রতিষ্ঠানে ঐ রকম ব্যক্তিদের রাখার অর্থ জনহিতকর কার্য্যের পথে বাধাসৃষ্টি। আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-কর্ত্তাদের বর্ত্তমান কাউন্সিলারগণের কাহাকেও মনোনয়ন করিবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে উপরোক্ত ব্যক্তি-গণের—গত যে কয় বৎসর তাঁহারা কাউন্সিলাররূপে বিরাজমান আছেন, সেই কয় বৎসরের— জনহিতকর কাজের পরিচয় কি। অনুসন্ধান করিলে এরূপ অনেক ব্যক্তিরই সন্ধান পাওয়া যাইবে যাহাদের কর্ম্মতৎপরতা গত কয় বৎসরের মধ্যে শুধু নির্ব্বাচনের প্রাক্কালেই দৃষ্ট হইয়াছিল; অন্যান্য সময়ে তাহাদের দ্বারা জন-সেবার কথা দূরে থাকুক, কর্পোরেশন সভায় আসিবার সময় পর্য্যন্ত তাহারা করিয়া উঠিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কাউন্সিলারবৃন্দের মধ্যে এই শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তি আছেন তাহাদের অবিলম্বে কর্পোরেশন হইতে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২১ নং ওয়ার্ডের প্রতিনিধি ডাঃ সুবোধচন্দ্র ঘোষ গত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার পল্লীর কি উপকার বা অন্য কোন রকমে সেবা করিয়াছেন বলিয়া কাহারও জানা নাই। তাঁহার পক্ষের অজুহাত তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা। এই অজুহাত যদি সত্য বলিয়াই ধরা যায় তো তাঁহার উচিৎ স্বেচ্ছায় আগামী নির্ব্বাচনে সরিয়া দাঁড়ান।

কিছুদিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে, ২১নং ওয়ার্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় পুনরায় আগামী নির্ব্বাচনে ঐ পল্লী হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন, কিন্তু অতঃপর সোনা গিয়াছে যে অমৃতবাবু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন না দাঁড়াইবার স্থির-সঙ্কল্প করিয়াছেন। অমৃতবাবু নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইলে অবশ্য অতীব আনন্দের কথা হইত এবং তিনি যে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতেন তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তিনি যখন একান্তই ব্যক্তিগত কারণে দাঁড়াইতে পারিবেন না তখন আমাদের মনে হয় কোন উৎসাহী কংগ্রেস কর্ম্মীকে ঐ পল্লী হইতে কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনয়ন করা সকল দিক হইতেই কাম্য।

৪নং ওয়ার্ডে শুনা যাইতেছে যে, ১৯৩০ সালের পরাজিত প্রার্থী শ্রীহিরণ্যকুমার মিত্র আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিবেন। বিশাল জমিদারী ও বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক শ্রীযুক্ত মিত্র নিজের পল্লীর উন্নতি-বিধানকল্পে কি কাজ করিয়াছেন তাহা ঐ পল্লীর অধিবাসীবর্গের অপরিজ্ঞাত থাকিলেও নারিকেলডাঙ্গা খালপারের বাসিন্দারা জানেন যে মিত্র মহাশয় কিরূপ বদান্য প্রকৃতির। নিজের পল্লীর উন্নতি-বিধান বিষয়ে বিশেষ মনযোগী না হইলেও খালের পূর্ব্ব পারে মিত্র মহাশয়ের দান-খয়রচ অসামান্য। যাহা হউক চার নম্বর পল্লীতে শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্ব্বাচন-সুনিশ্চিত। অতএব বাকী থাকেন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের লাহা পরিবারের জামাতা শ্রীনলিনচন্দ্র পাল। সুতরাং মিত্র বনাম পাল নির্ব্বাচন যুদ্ধে কে জয়ী হইবেন তাহা বলা সুকঠিন হইলেও ঐ পল্লীতে নির্ব্বাচন-যুদ্ধ (যদি মিত্র মহাশয় বাস্তবিকই শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করেন) যে উপভোগ্য দৃশ্য হইবে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি।

১১নং পল্লীর প্রতিনিধি নটবরচন্দ্রের লীলাখেলার বিষয়ে "খেয়ালী"তে পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে। গত তিন বৎসর পল্লীর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগ্যতার কোনই পরিচয় দিতে পারেন নাই। রাজবন্দী শ্রদ্ধেয় বিপিন গাঙ্গুলীর পরিত্যক্ত আসনে কেন তাঁহাকে মধ্য কলিকাতার কংগ্রেস কর্ম্মীগণ এবং একাদশ নং পল্লীর করদাতাগণ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহা সত্যই গভীর গবেষণার বিষয়। তবে আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে উক্ত পল্লীর নির্ব্বাচকমণ্ডলী এবং কংগ্রেসকর্ম্মীবৃন্দ আগামী নির্ব্বাচনে একজন ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দীকে প্রতিনিধিত্বে বরণ করিবেন।

২৭ নম্বর পল্লীতে শ্রীযুক্ত শাসমলের মৃত্যুর পরে ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত যে কর্ম্মপন্থা স্বীকার করিয়া নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সমর্থনলাভ করিয়াছিলেন ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তিনি সেই কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারেন নাই; অধিকন্তু কোন অপরিজ্ঞাত কারণে তিনি বর্ত্তমানে কর্পোরেশনে কোন দলবিশেষের ক্রীড়নক-রূপে বিরাজ করিতেছেন। পল্লীসেবার অযোগ্যতা ডাঃ দাসগুপ্তের যথেষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে। আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহাকে কাউন্সিলার পদ হইতে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সহযোগিতায় ২৭নং পল্লীর অধিবাসীরা অপসারণ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

২২নং ওয়ার্ডে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব প্রবল হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। বর্ত্তমান কাউন্সিলার-দ্বয় শ্রীযুক্ত ধীরেন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় নয় বৎসরাধিককাল কাউন্সিলার রূপে বিরাজ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই—তাঁহারা পুনর্নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন বলিয়া প্রকাশ। তদ্ভিন্ন ৺ স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ দ্বিজেন ঘোষ, ভবানীপুরের মল্লিক পরিবারের শ্রীযুক্ত প্রকাশ মল্লিক ও ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ জুয়েলার ও ব্যাঙ্কার মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোংর সুযোগ্য ম্যানেজিং পার্টনার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী শঙ্কর মিত্র নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে যোগদান করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন।

অকুর পাউডার

শ্রীসুধীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সহরের শেষ দিক্‌টাতে যেখানে বড় রাস্তাটা তিনমুখো হোয়ে ছুট্ দিয়েছে—তারই এক পাশে একটা ওষুধের দোকান। সামনেটায় লাল নীল আলোর অক্ষরে নিজেদের তৈরী-ওষুধের বিজ্ঞাপন দেওয়া। দরজার গায় বাঁকা অক্ষরে ডাক্তার অকুর নাম লেখা।

এই দোকানটি অকুর নিজস্ব নয়, এখানে সে সকালে আর রাত্রে দু'ঘণ্টা ক'রে বসে, দু'চারজন রোগীকে দেখে, উপদেশ দেয়, ওষুধ সম্বন্ধে প্রোপাগাণ্ডা করে—এইই তার কাজ। বছরখানেক ধরে অকু রাত্রে নানান রকম ওষুধপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে আস্‌ছে—লোকে বলে—আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে।

সকালে ঠিক সময়মত অকু প্রায়ই পৌঁছুতে পারে না—রোগী এসে বসে থাকে। প্রাতঃ-ভোজনটা বে ড়াতে বেড়াতে যেয়ে রমণীবাবুদের ওখানেই সে সারে, ওখান থেকে দোকানে আস্‌তে দেরী হোয়ে যায়। রমণীবাবুর লিলি বলে এক মেয়ে আছে, দোকানটাও বাড়ী থেকে একটু দূরে। ভূমিকার কোন প্রয়োজন নেই;—লিলিকে অকুর একটু ভাল লেগেছে। তার সকল চিন্তাই লিলিকে ঘিরে, সব কল্পনাই ওকে নিয়ে; আবিষ্কার ক'রে বড় হ'বার প্রবৃত্তিও জাগিয়েছে ঐ লিলি। কিন্তু অকু বড় ভীতু, বড় লাজুক। অন্তরে অন্তরে সে তার ক্ষমতা, মর্য্যাদা সম্বন্ধে খুবই সজ্ঞান, কিন্তু বাইরে সে বড় দুর্ব্বল, বড় অন্ধ। তার পোষাক পরিচ্ছদে সৌকর্য্যের প্রচেষ্টা আছে কিন্তু প্রকাশ নেই—এইটেই তাকে হাস্যাস্পদ ক'রে তোলে। জামা কাপড়ে সুগন্ধের বদলে এ্যামোনিয়ার গন্ধই পাওয়া যায়. বেশী,—হাতে, রুমালে নানারকম রাসায়নিক পদার্থের দাগ।

অকুর আবিষ্কৃত ওষুধের—মনা-ই হোচ্ছে বড় ক্যান্‌ভাসার। তিনিও চাইছেন লিলির ঠোঁটে পূর্ব্বরাগের হাসিটুকু—ঐ হাসিটুকু মানুষের জীবনকে ওলট্ পালট্ ক'রে দেয়। কিন্তু মনা বাইরে বড় সপ্রতিভ,—সমস্ত চেহারাটায় একটা অস্বাভাবিক জানি জানি ভাব থাকলেও প্রয়োজনমত সে বেশ বোকা সাজতেও পারে, কল্পনাকে সে আদৌ আমল দেয় না, সব কিছুকেই সে মুঠোর মাঝে পেতে চায়, তার বাইরের 'পাওয়াকে' সে পাওয়া বলে না।

মনা অকুর ক্যান্‌ভাসার, বন্ধু। ঐ দোকান থেকে প্রায়ই সে নানারকম ওষুধও কেনে।

সেদিন বিকেল বেলা মনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর ভাবে বসে আছে, তার দিকে পেছন দিয়ে কি যেন একটা ওষুধ পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছে অকু।

মনা ব'ললে,—অকু অনেক ওষুধ ত' আবিষ্কার ক'রেছ, আমি যেরকম চাই ঠিক তেমনি একটা ওষুধ দিতে পার? অনেকক্ষণ ধরে মনার মুখের দিকে অকু তাকিয়ে রইলো, না, ইয়ারকি ক'রছে না! অকু একটু গম্ভীর হোয়ে বললে,—তোর কোটটা খুলে ফেল্,. ও আমি বেশ বুঝেছি, তোর বুকটার পাশে একটা ব্যথা—তা' একটা মালিশ দিয়ে দিচ্ছি।

মনা একটু হাসল, পরে বলল, আরে না, কোন মালিশ চাই না। কিন্তু রোগের জায়গাটা ঠিকই আবিষ্কার ক'রেছ,—কোটের নীচেই,—বুকের পাশেই বটে;—জিনিয়াস্!

অকু,—আজ রাত্রেই আমরা পালাচ্ছি, আমি আর লিলি—আজ রাতেই বিয়ে,—বুঝলে? অকুর বাঁহাতটার উপর নাইট্রিক

এ্যাসিডের শিশিটা কাত হোয়ে পড়ে গেল, টের পেলে না। মনার মুখের হাসিটা একটু ম্লান হোয়ে এল, বললে,—কিন্তু সে পর্য্যন্ত তার মতিস্থির থাকলে হয়! আজ এক সপ্তা'হ ধরে কেমন যে একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলেছে, সকাল বেলায় যদি বলে "হ্যাঁ", সন্ধ্যেবেলায়ই বলবে 'না'। মেয়েরা ঠিক্ যেন মাছুকারির মত, অমনি চকচকে অমনি অস্থির পিচ্ছিল, মুঠোয় ভেতর চেপে ধরে রাখা যায় না। কিন্তু আজকে দুদিন ধরে দু'মনা ভাবটা যেন একটু ক'মেছে,—এতদিন ধরে আর 'না' করে নি। আর ভাই মাত্র পাঁচ ঘণ্টা আছে—কি জানি কখন আবার পিছলিয়ে পড়ে।

"হ্যাঁ, তুমি ওষুধ চাইলে না'!"

মনা অনেকখানি বাজে বকার জন্যে—একটু যেন লজ্জিতও; পরে আবার বলতে লাগল,—কিন্তু এসব ফ্যাসাদের মধ্যে আমি যেতুম না। জানই ত' শুধু টাকার জন্যে, একলক্ষ টাকা! ওদিকে আমি বাড়ী ভাড়া ক'রে রেখেছি, প্রকৃত ঠিক্, খাবার দাবার আয়োজনও একরকম সব ঠিক্, এখন লিলি যদি বেঁকে না বসে!

মনা একটুখানি থামল; অকু বললে,—আসল কথাটা কি! ওষুধ কিসের! তোমার এসব ঘ্যান্ ঘ্যানানি রাখ।

দেখ, রমণীবাবু দু'চোখে আমায় দেখতে পারেন না; এই সপ্তাহখানেক ধরে লিলিকে একরকম দোরের বার হোতে মানা।

আমাকে মাপ করিস্' ভাই, আমাকে এখুনি এই এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা করতে হোচ্ছে—দু'মাস ধরে—কিছুতেই হোয়ে উঠছে না।

মনা একটু ইতস্ততঃ ক'রে, সপ্রতিভ-ভাবে বললে,—আচ্ছা অকু,—এমন কোন ওষুধ বার ক'রতে পারিস্ নি,—মনে কর একটা মেয়েকে যদি খাওয়াস্—সে অমনি তোর ভালবাসায় নিজেকে ভাসিয়ে দেবে—? ঘৃণায় অকুর ঠোঁট দুটো বিকৃত ভঙ্গিতে আড়ামোড়া ছাড়তে লাগল। মনা বলে চলল,—নরেন বলছিল—বিলেতে নাকি কে একজন কি একটা ওষুধ সোডার সঙ্গে মিশিয়ে একজনকে খাইয়ে দিয়েছিল, ফলে তাদের ভালবাসা গাঢ়তর হয়,—সপ্তাহখানেক পরে নাকি বিয়েও হোয়ে যায়। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল যে,—কি হে পড়নি! আমি ভেবেছিলাম, এমন যদি কোন ওষুধ থাকে যা খাইয়ে দিলে আমার সাথে পালিয়ে যাবার একটা প্রবৃত্তি জাগাবে, একটা শক্তি, একটা আকর্ষণ—বুঝলে। বেশীক্ষণ নয়—ঘণ্টাদু'য়েক যদি কাজ করে—তাহোলেই—ব্যাস্।

তোমাদের এই পালিয়ে যাবার পাগলামীটা কখন?

রাত ন'টায়। গোটা সাতেকের মধ্যে খেয়ে তারপর মাথাধরার ছুতো ক'রে লিলি শুতে যাবে। ওদের বুড়িঝি পেছনের দরজা খোলা রাখবে, ওখান দিয়ে যেয়ে লিলির জানলার কাছে আমি পৌঁছব; কিন্তু তখন যদি লিলি বেঁকে বসে! হ্যাঁ অকু, তুমি কি একটা ঐ ধরণের ওষুধ আবিষ্কার ক'রতে পার না,—ইচ্ছে করলে—।

নাকের ডগাটা একটু চুলকিয়ে নিয়ে অকু বললে,—দেখ মনা, এসব বড্ড গোপনীয়। কাউকে দেবার জন্যে নয়। আচ্ছা তোকে দিচ্ছি'—বুঝবি আমার ওষুধের শক্তি, দেখিস্ লিলি কেমন উদ্বিগ্ন হোয়ে ওঠে তোর জন্যে।

অকু পেছনের ঘরে যেয়ে—মরফিয়া মেশানো দু'টো সলিউবল্ ট্যাবলেট্‌কে গুঁড়ো ক'রলে, একটু সুগার্ অব মিল্ক মেশালে, তারপর বেশ ক'রে একটা সাদা কাগজে মোড়ক করলে একটু ভাবলে,—না লিলির কোন ক্ষতি হবে না, শুধু ঘুম, ভয়ানক ভাবে ঘুমিয়ে পড়বে সে, আর কিছু নয়।

মোড়কটি এনে মনার হাতে দিয়ে অকু বললে,—একটা তরলপদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিস্। মনা খুব খুসী হোয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। এরপরে অকু যা ক'রলে, তা খুবই স্বাভাবিক। একজন লোক পাঠিয়ে রমণীবাবুকে খবর দিয়ে জানিয়ে দিলে পালিয়ে যাবার সকল ষড়যন্ত্র।

রমণীবাবু লোকটা খুব মোটাসোটা, একটু ভুঁড়িওয়ালা—বাংলাদেশে স্যাচারাল্ হেল্‌থ বলতে যা বুঝি। যাই হোক্, তিনি বেশ চটপটে, বললেন,—কিছু ভাববেন না অকুবাবু—। ঐ ফক্কড় ছোঁড়া ত', হুঁ। লিলির পাশের ঘরটাতেই আমি থাকি। আগে থাকতে কোন আভাস্ কাউকে দিচ্ছি না, ঐ ঝিকে-ও না। খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় ইজি চেয়ারটা পেতে বন্দুক নিয়েই অপেক্ষা ক'রব। যদি সে আসে—বুঝছেন,—বরবেশে তাকে ফিরতে হবে না, এ্যাম্বুলেন্স।

লিলি ত' মরফিয়ার ঘোরে নিদ্রায় অভিভূত; ওদিকে রক্তকৃষ্ণাতুর পিতা বন্দুক হাতে অপেক্ষা ক'রছেন; মনা নিঃশঙ্কচিত্তে ঐ মরণের পথে এগিয়ে চ'লেছে, ঐ, ঐ রমণীবাবু বন্দুক্ তুললেন; এ্যাম্বুলেন্স! অকু আর ভাবতে পারলে না। সারাটা রাত একটা অস্বাভাবিক অসোয়াস্তিতে কাটল, কেউত' একটা খবর দিতে এল না! সকাল আটটার সময় অকু রমণীবাবুর বাড়ীর দিকে চলল খবরটা জানতে। আহা-হা, বেচারী। কিন্তু একি! মোটর থেকে নেমে এদিকে আসছে ও কে! মনা! ওর মুখে জয়ের দীপ্তি, বুকভরা আনন্দের উচ্ছ্বাস ওর চোখে! অকুর হাতটা ধরে খুশির সঙ্গে নেড়ে দিলে মনা; অকু আস্তে ক'রে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে; মনা বললে—খুসীর উচ্ছ্বাসে ঝড়ের মত,—

লিলি ঠিক্ বেরিয়ে এল—সাড়ে ন'টায়। তারপর সেই ভাড়াটে বাড়ীতে উঠলাম্। সকাল সকাল উঠে চা ডিম্ সব ক'রলে নিজে হাতে, এই ত' খেয়ে আস্‌ছি, তোমাকে সুখবরটা দিতে। অকু আজ আমি লিলিকে পেলাম। বিবাহের বন্ধনে সে বাঁধা পড়েছে। মনে যাই থাক, বাইরে, আর দু'মনা ক'রবে না। হ্যাঁ ভাল কথা তোমার নেমন্তন্ন, যেয়ো আজ দুপুরে,—ঐ বরফকলটার ওখানে বাসা, এক শ' তিন নম্বর,—বুঝলে।

"সেই পাউডার!" অকুর গলায় কথাটা যেন আটকে গেল। "ওঃ, সেইটে! তা বেশ কাজ করেছে। খেতে বসলুম, লিলির দিকে তাকিয়ে মনে হোল ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ও আর বিগড়োবে না,—ওষুধটা পকেটেই রেখে দিলাম্। কিন্তু হঠাৎ রমণীবাবুর দিকে চোখ পড়তেই মনে হোল তাইত, ভাবী জামাতার দিকে ওঁর তেমনি সুদৃষ্টি নেই! অনেক কষ্টের আবিষ্কার হে, তাই একটা ফাঁক মত পাউডারটা—রমণীবাবুর কাফির ভেতর—, বুঝলে।

(বিদেশী গল্পের ছায়াপাতে)

রূপসীর চিঠি

শ্রীবিজয় শঙ্কর গুপ্ত

রূপসীর নামের সঙ্গে রূপের সামঞ্জস্য একেবারেই ছিল না। জগতের অভিধানে 'অসম্ভব' কথার স্থান নেই, কুৎসিত কুরূপারও 'সুন্দরী' নাম দেখা গেছে। রূপসীর জীবনেও এমনি একটা বৈসাদৃশ্য ছিল। চেহারার মধ্যে বিরুদ্ধ ও কুৎসিত ভাবটা ঢেকে দেবার জন্যেই বুঝি বাপ মা রূপসী নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের চেষ্টা বিধাতার পরোয়ানার কতটুকু রদ করতে পারে!

রূপসীর রূপের খুঁৎটুকু গুণ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টায় মা বাপ তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। সেখানে রূপসী অসাধারণ কিছু আয়ত্ত করতে না পারলেও গান ও লেখাপড়ার দিক দিয়ে যৎসামান্য সুখ্যাতি সে অর্জ্জন করলে।

দেখতে দেখতে রূপসীর বয়স বেড়ে উঠল। সাধারণ গরীবের সংসারে অখ্যাতির ভয়ে যখন স্কুলে পাঠান অসম্ভব হ'য়ে উঠল, তখন চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বাপ মা তার বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন।

অনেক চেষ্টার পর সম্বন্ধ জোগাড় হয়, মেয়ে দেখার দিনও স্থির হয়, কিন্তু গরীব ব্রজমোহনের সাধ্যাতীত জলযোগের সদ্ব্যবহার করেই তারা চলে যায়; 'পরে খবর দেব বলে' একখানা পোষ্টকার্ড লিখে জানাতেও তারা পরিশ্রম বোধ করে। অপেক্ষা করে করে জবাব না পেয়ে একদিন আফিসের ফেরৎ ব্রজমোহন নিজে গিয়েই হাজির হ'ন। মেয়ে দেখে আসার মন্তব্যটুকু তারা যা প্রকাশ করে, সেটুকু শ্লীলতার গণ্ডী পেরিয়ে যায়। বলে, "অমন কুচ্ছিত মেয়ে দেখিয়ে আবার মত জানতে এসেছেন?"—ব্রজমোহনের বুকের ভেতরটা ধবক করে ওঠে, লজ্জায় সে এতটুকু হ'য়ে যায়। উত্তর দেবার কীই বা আছে, মেয়ে তার সত্যই কুৎসিত। বাপ হিসাবে মেয়ের ওপর তার অগাধ স্নেহ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর স্নেহ ও আদর ত অপরের মন্তব্যের প্রতিরোধ করিতে পারে না। গভীর দুঃখে ব্রজমোহন এক পা এক পা করে সেখান থেকে বেড়িয়ে আসে। বাড়ীতে এ সব কথা সে গোপন করে, কাউকে বলে না।

মেয়ের বিয়ের জন্য খোসামোদ করে করে ব্রজমোহন বিরক্ত হ'য়ে ওঠে, এক সময় নিজের কাঙালপনায় নিজেরই লজ্জা বোধ হয়। রূপসী সব বুঝতে পারে, বাপের অপমানের খোঁচাগুলো তার বুকেও কিছু কম আঘাত করে না।

অনেক চেষ্টা করার পর, পয়সা খরচ করে ব্রজমোহন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপন দেখে একদিন ছুটীর দিনে একজন এসে হাজির হ'ল। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। দেহের গঠন এবং পোষাক পরিচ্ছদ দেখে লোকটাকে আদৌ শ্রদ্ধা হয় না।

লোকটী নিজেই প্রকাশ করলে, বললে "আমি নিজেই পাত্র, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এলাম, আমার স্ত্রী গত মাসে মারা গেছেন, ছোট ছোট পাঁচটী ছেলে পিলে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি। আমি এমনি একটী মেয়েই খুঁজছিলাম—ঐ ওপারের মিলে বাইসমেনীর কাজ করি, বামুনের ছেলে বটে, বেশীত লেখাপড়া শিখিনি, ঠেলেঠুলে মাইনর ক্লাস অবধি উঠেছিলাম—তা মন্দ কি হয়, ওপরটাইম খেটে মাস গেলে "চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা হয়"—হঠাৎ একটা কাশির বেগ লোকটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। কাশির ঝোঁক থামলে আবার লোকটা বলে "হ্যাঁ, মিথ্যে বলে লাভ কি, সব কথা খুলে বলাই ভাল,

আমার মশায় হাঁপানির রোগ আছে, তা' বলে মরণের ভয় নেই, পিসী বলে গেছে এ আমাদের বংশগত রোগ, এতে পরমায়ু বাড়ে বই কমে না।"

ব্রজমোহনের তখন বড় শঙ্কটাপন্ন অবস্থা। মনে মনে ভাবে, মেয়েটার বরাতে যা আছে তাই হ'বে, ভেবে লাভ কি। ব্রজমোহন লোকটাকে অপেক্ষা করতে বলে রূপসীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। মিনিট দুই তিন দেখার পরেই লোকটা বলে "যান, নিয়ে যান, দেখা হ'য়ে গেছে।" মেয়েকে কোন জিজ্ঞাসা বাদ না করাতে ব্রজমোহন উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, ভাবে ওর বরাতে যা আছে তাই হবে। আর বয়েস,—এমন কি আর বেশী, যাক্ ভালই হ'ল, রূপসী আমার একেবারে ভরা সংসারের গিন্নী হ'য়ে যাবে। তবুও একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, তাই ব্রজমোহন জিজ্ঞাসা করে "কেমন দেখলেন?"—লোকটা দাঁড়িয়ে ওঠে, কর্কশকণ্ঠে বলে "বিজ্ঞাপন কোনকালেই সত্যি হয় না, চিরকালই ধাপ্পাবাজী।" খানিকটা থেমে আবার বলে "বয়েস বেশীই হোক্, আর দোজবরেই হই,—তা' বলে এত কুচ্ছিত মেয়ে কেউ বিয়ে করে নাকি?—এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে এখনও চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা উপায় করি, কেন পাত্তর কি খারাপ নাকি?" লোকটা অভদ্রের মতো শক্ত শক্ত গোটাকতক কথা শুনিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পাশের ঘর থেকে রূপসী সবই শোনে, লোকটার কঠিন কথাগুলো ধারাল ছুরির মতো তার বুকের ভেতর গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে বেঁধে।

ব্রজমোহনের ধৈর্য্য অসীম, এতেও সে নিরস্ত হয় না। ঘা খেয়ে খেয়ে তার মনের চামড়াটা বোধ হয় কঠিন হ'য়ে গেছে। বাপের দুরবস্থা ভেবে এক এক সময় রূপসীর গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছা হয়। মনে মনে বলে "ভগবান এই কুৎসিত দেহটাকে কোনরকমে বদলে দিতে পারো না?"—ভগবানের এসব তুচ্ছ কথা শোনার মতো অবসর কই? ভেবে ভেবে রূপসীর ঘুম হয় না, রাত্রে সে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। গভীর রাত্রে এক একদিন ঘুম ভেঙে রূপসী জেগে ওঠে, অগাধ আশায় বুক বেঁধে আরসির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, নিঃশব্দে অনেকক্ষণ নিজের মুখের প্রতিচ্ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে—। হতাশ হয়ে আরসী নামিয়ে রাখতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বিছানায় এসে উপুর হয়ে শু'য়ে প'ড়ে সে কাঁদতে আরম্ভ করে। বলে, "ভগবান কেন এমন স্বপ্ন দেখালে?" চিন্তার উষ্ণতায় সে রাত্রে স্বপ্ন দেখে যে কোন ঐশী শক্তির প্রভাবে, সে যেন হঠাৎ সুন্দরী হয়ে গেছে, রূপসী নাম তার স্বার্থক হয়েছে।

নীচের তলার ইভা ও ইন্দুমতী দুজনেই কাল শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে।

রূপসীর সঙ্গে তাদের খুব ভাব, কতদিন একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছে, দিনের পর দিন কতো গল্প করেছে, কতো ছুটির দুপুর লুডো খেলে কাটিয়েছে। আজ আর রূপসী তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারে না। কেমন একটা গভীর সঙ্কোচ রূপসীকে জড়িয়ে থাকে, মনে হয়, ওরা যেন কতো ওপরে উঠে গেছে। ইভা যদি কোনি দুপুরে আসে ত', রূপসী ঘুমের ভাণ করে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে থাকে, বহু ডাকা-ডাকিতেও সাড়া দেয় না, যেন কতো অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ইভা ফিরে যায়। ইন্দুমতী ত নাগালই পায় না। এমনি করে রূপসী অনেকদিন এড়িয়ে চলে, কিন্তু একদিন তাকে ধরা পড়তেই হয়।

সেদিন দুপুরে রূপসী একেবারে ইভার সামনে পড়ে যায়, হাতদুটো জড়িয়ে ধরে ইভা বলে "হ্যারে রূপসী, তুই কি আমাদের বয়কট করলি নাকি ভাই? দুপুরে এলে ঘরে খিল দিয়ে ঘুমোস্, কেন বল দিকি?" রূপসী উত্তর দিতে পারে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হাত ধরে রূপসীকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ইভা শ্বশুরবাড়ীর এবং আরও কতো রকমের গল্প করিতে থাকে। খানিকপরে ইন্দুমতীও এসে উপস্থিত হয়, তারপর তারা পালা করে শ্বশুর বাড়ীর গল্প করে যায়। রূপসী চুপ করে শোনে যেন সে আরব্য উপন্যাসের কথা শুনছে। একসময় ইন্দুমতী দাঁড়িয়ে ওঠে, বলে "ইভা চল্লুম, কাল সারারাত জেগে চিঠি লিখেছি ভাই, দুপুরে চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমুইগে।"

ইভা বলে, সারারাত লিখেছিস?— কি লিখেছিস্ দেখানা ভাই। ইন্দুমতী চিঠি নিয়ে আসে, বলে "চারপাতা লিখতে হোল ভাই, এবারে চিঠিতে লিখেছে চারপাতা জোড়া চিঠি না হ'লে রাগ করবে।" ইন্দুমতী চিঠিখানা পড়ে শোনায়, রূপসীও শোনে। সে অবাক হয়ে ভাবে, তাইত এই এক কথা পঞ্চাশবার করে পড়বার ধৈর্য্য কেমন করে থাকে?—

ইভাও বলে ওঠে "এই কথাইত বার-বার লিখেছিস।"

ইন্দু জবাব দেয় "কি করি বল—চার-পাতা ভর্ত্তি না করলে আবার রাগ করবে যে।"

ইভা বলে "আমি কিন্তু ভাই চিঠি দেব না বলেছি, হপ্তায় চারখানা চিঠি দেবার কথা ছিল, তিনখানা দিয়েছে।" ইন্দু বলে "তা তিনখানা দিয়েছে ত বাপু।"

উঁ, আমার বুঝি অভিমান হয় না? —কেন দেব? রূপসী অবাক হ'য়ে ভাবে চারখানার জায়গায় তিনখানা চিঠি দিলে অপরের অভিমান হয়, এ কেমন করে সম্ভব রূপসী তা' ভেবে পায় না।

নীচে পিয়ন হাঁকে, ইভা ছুটে যায়, বলে "ঐ বোধ হয় গণ্ডা ভর্ত্তি হ'ল।" খানিক বাদে একখানা খাম হাতে করে আসে। খামখানা খোলা মাত্রই ইন্দু ঝুঁকে পড়ে! ইভা চিঠিখানা পড়ে যায়। কতো স্বপ্নরচনা, কতো বিচিত্র কাহিনী চিঠির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

চিঠিখানা শেষ করে ইভা বলে মাথা ধরার খোঁজ নিয়েছে কেন জানিস?— একদিন বড্ড মাথা ধরেছিল, তা' মিথ্যে বলব না, সারারাত হাওয়া করেছে আর মাথা টিপে দিয়েছে। ইন্দু বলে "সে ভাই আমারও, একদিন পায়ে একখানা কাঠের পিড়ে পড়ে গিয়েছিল, এমন কিছুই হয়নি বলে কই দেখি কোথা লেগেছে বলে পায়ে হাত দিতে যায়। আমি রাগ করলুম, সে কি—পায়ে হাত দেবে কি?—আমি দুম্ করে মাথার দিব্যি দিলে, বললে "যে না দেখতে দেবে, সে আমার মাথা খাবে।" যত বলি লাগেনি, সে কি শোনে, সারারাত ব্যাথা ঠাওর করে করে উল্টে ব্যথা করে দিলে।" রূপসী এ সব কথা বেশ ভাল করে বুঝতে পারে না বটে তথাপি তার অন্য একটা দিক যেন ধীরে ধীরে আলোকিত হ'য়ে ওঠে।

বছর ঘুরে আসে, তথাপি রূপসীর বিয়ে হয় না। ইভা, ইন্দু শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। রূপসীর আজকাল বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়।

ইভা ও ইন্দুর চিঠির কথা অকারণে মনে পড়ে যায়। রূপসীর অপরিসর' চিন্তার জগতও রঙীন আলোয় বিচিত্র হ'য়ে ওঠে, রূপসী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

'একদিন ব্রজমোহন আপিস থেকে একটু উৎফুল্ল হ'য়ে ফেরেন। রূপসীর মা সেটুকু লক্ষ্য করে কারণ জিজ্ঞাসা করলে ব্রজমোহন বলিল আজ আফিসের একটি ছেলের হাতে পায়ে ধরে 'রাজী করিয়েছি। প্রথম পক্ষের স্ত্রী তার মারা গেছে, বয়সও কম মাইনেও বেশ পায়। আমায় কথা দিয়েছে যে নিশ্চয়ই সে ব্রাহ্মণকে কন্যাদায়' হতে অব্যাহতি দেবে। —আহা অতি সৎছেলে, ব্রজমোহনের 'চোখদুটো আনন্দে উজ্জল হয়ে ওঠে। রূপসী কিন্তু আবার একটা নতুন বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। ভাবে, না জানি আবার কোন এক বিপদ ঘটবে।

পরদিন রবিবার। ব্রজমোহনের আফিসের সেই ছেলেটা রূপসীকে দেখতে এল। এবারে রূপসীর পরীক্ষার পালা, ব্রজমোহনের সঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে রূপসী ঘরের মধ্যে দাঁড়াল।

মেয়ে দেখান। শেষ করে, ব্রজমোহন বললেন তাহলে দিন ঠিক করি দেবেন?

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে দেবেন বলে দেখুন কথা আমি আপনাকে না জেনেই দিয়েছিলাম, এখন দেখছি, অসম্ভব, আপনার মেয়ে যে এত কুৎসিত একথা আমি ভাবতেই পারিনে। —আমার দ্বারা কিছুতেই হ'বে না বরঞ্চ অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখুন। —দেবেন উঠে চলে গেল।

রূপসীর মা জানলার ফাঁক দিয়ে সমস্ত ব্যাপার শুনলেন। এত অপমান তাঁর সহ্য হ'ল না, তিনি চীৎকার করে উঠলেন, বললেন উঃ! কি শত্রুই পেটে ধরেছিলুম দাঁড়িয়ে অপমান করে গেল—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। অমন মেয়ের মরণও হয় না, আমরা হ'লে গলায় দড়ী দিতুম! ব্রজমোহন অপরাধীর মতো এসে দাঁড়াল। রূপসীর মায়ের রাগ সেদিন চড়ে গেছে, তিনি আরও চীৎকার করে বলতে লাগলেন "এই যে এতখানি শরীর ভেবে ভেবে পাত হ'য়ে যাচ্ছে, কেন? কিসের জন্যে?—ও মেয়ে মরুগ আমি সিন্নি দেব।" —হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর কান্নায় ভারি হ'য়ে উঠল, বললেন "উঃ কি কম্মি বল দিকি, অনেক দুঃখে এমন কথা মুখ দিয়ে বার হয়, নয়ত মেয়েকে কেউ এমন বলে?

রূপসী তখন ওঘরে উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে কাঁদছে, মনে মনে বলছে—"তাই হোক্ ভগবান, আমার মরণ দাও,—আর পারিনে।" সেদিন রূপসীর মনটা সারাদিন খারাপ হ'য়ে থাকে। খাবার সময় মা তার আদর করে বলে "খা মা, রাগ করিসনি, হ্যাঁরে, মা কি মেয়েকে অমন কথা বল্‌তে পারে না! বড্ড রাগ হয়েছিল, তাই বলেছি, খেয়ে নে রাগ করিসনি।"

রূপসী ভেঙে পড়ে, কান্নায় সমস্ত দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হ'য়ে আসে।

রাত্রে রূপসীর ঘুম হয় না, বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিতে থাকে। কি একটা অসম্ভব বেদনা সমস্ত মনটাকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষিত করে। অখণ্ড একটা বেদনার সমুদ্র ফুলে ফুলে ওঠে রুদ্ধ বেদনায়। সকলে নিদ্রা গেল, রূপসী উঠে বসে, চিঠি লেখার সাজ-সরঞ্জাম বার করে চিঠি লিখতে বসে, কাকে লিখবে তা' জানে না, তবু রূপসী কলম ধরে অনেক কথাই ভাবে, অবশেষে অনেক কষ্টে লেখে :—

প্রিয়তম, তুমি এলে না, অনেকদিন আশায় রইলাম। কিন্তু দিন গেল, তুমি এলে না। আর পারিনে, এমন করে আর কতো কষ্ট দেবে?—আমার কি অভিমান হয় না?—কেন সইব? আমি আর সইব না। আমি তোমার ওপর কখনও অভিমান করিনি। এই শেষ অভিমান করে চললাম। আর ফিরব না। তুমি যখন আসবে—আমি তখন দূরে—অনেক দূরে।

ইতি—

তোমার রূপসী

রূপসী চিঠিখানাকে খামে ভরে ওপরে ঠিকানা লিখলে।

—শ্রীমানসকুমার।

বিছানার তলায় চিঠিখানা সযত্নে রেখে দিয়ে রূপসী ব্রজমোহনের আফিমের কৌটো খুললে, সব কটা বড়ী একসঙ্গে খেয়ে বিছানায়, গিয়ে শুল।

* * *

সকালে ব্রজমোহনের ঘরে গোলমাল লেগে গেল। রূপসীর মা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। নীচের তলার ইন্দুর মা, ইভার মা সকলে ছুটে এল।

রূপসী তখন অনেক—অনেকদূরে চলে গেছে।

পুলিশের বিশ্বাস হ'ল না, রূপসীর দেহ ময়নার জন্য পাঠান হ'ল।

মৃত রূপসীর বিছানাটা সামনে দোরগোড়ায় ফেলে দেওয়া হ'ল। রূপসীর প্রেমপত্রখানা হাওয়ায় উড়ে একটু দূরে গিয়ে পড়ল। তারপর পথিকের পায়ে পায়ে রূপসীর চিঠিখানা গলির সীমানা পার হয়ে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত পৌছিল! লোকের পায়ে পায়ে, যানবাহনের পেষনে নিষ্পেষিত হ'য়ে রূপসীর মনের বাসনা বিলীন হয়ে গেল, কেউ তার খোঁজ পর্য্যন্ত জানতে পারলে না।

অনেকদিন যাবৎ কোন সমস্যা না দেওয়ায় আমাদের পাঠকবর্গ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এমন কি কেহ কেহ সমস্যার নিমিত্ত পত্র লিখেছেন তাই তাঁদের পরিতৃপ্তির জন্য এ সংখ্যায় আমরা দুইটী সমস্যা প্রকাশ করলাম। আশা করি এই দুইটী সমস্যাই তাঁদের আনন্দ দান করবে।

ইস্কাবন—সাহেব, নয়, সাতা।
হরতন—নয়, আটা, সাতা ছক্কা।
রুহিতন—টেক্কা।
চিঁড়িতন—নাই।

ইস্কাবন—দশ, আটা, চৌকা
হরতন—টেক্কা, দশ
রুহিতন—সাতা।
চিঁড়িতন—বিবি।

উ
প পূ
দ

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি।
হরতন—বিবি, চৌকা, তিরি।
রুহিতন—ছক্কা, দুরি।
চিড়িতন—টেক্কা।

ইস্কাবন—গোলাম।
হরতন—সাহেব, গোলাম, দুরি।
রুহিতন—বিবি, তিরি।
চিঁড়িতন—গোলাম, আটা।

ফেরাইএর খেলা, 'দ' খেলবেন। বিপক্ষদল যেরূপেই বাধা দিন না কেন 'উ' এবং 'দ'কে সাতখানি পিট নিতেই হবে।

(২)

পার্শ্বেলিখিত ক্ষেত্রে হরতন রঙ, 'দ' খেলবেন। অপর পক্ষের বাধা সত্বেও 'উ' এবং 'দ'কে সাতখানি পিট পেতে হবে।

ইস্কাবন—বিবি, দশ, আটা।
হরতন—গোলাম।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—দশ, নয়, আটা, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—নয়, ছক্কা, পাঞ্জা।
হরতন—নয়।
রুহিতন—ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা।
চিড়িতন—বিবি।

ইস্কাবন—গোলাম।
হরতন—সাতা।
রুহিতন—গোলাম, নয়, আটা।
চিঁড়িতন—সাহেব, চৌকা, তিরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, চৌকা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, সাতা, তিরি।
চিঁড়িতন—টেক্কা, গোলাম।

ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশন:—বিগত ১৩ই ডিসেম্বর এই এসোসিয়েশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হয়েছিল। এই সভায় কমিটি কতিপয় আবশ্যকীয় নিয়ম পাশ করেন। এই নিয়মগুলি কার্য্যকরী হলে ব্রীজ টুর্নামেণ্টমহলে অনেক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হবে। ব্রীজ সাধারণের অবগতির জন্য এসোসিয়েশনের সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত নিয়মগুলি খেয়ালীতে প্রকাশিত করবার জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা এই নিয়মগুলি নিয়ে প্রকাশ করলাম।

(1) All clubs applying for registration of tournaments or for renewal thereof shall undertake to be bound and abide by the rules and regulations and bye-laws of the Association in force at the time.

(2) No affiliated club, association or body or any member thereof shall take part in any tournament which is not registered with the Association and no registered tournament shall allow any unaffiliated club, association or body to participate in it except with the previous consent in writing of the Honorary Secretary. Any club, association or body, or any member thereof offending against this rule shall be sus-

pended or otherwise dealt with as the Council may think fit.

(3) No suspended player, officer or member of any affiliated club or association or body or of any registered tournament shall be allowed to participate in any registered tournament during the period of his suspension except with the special permission in writing of the council previously obtained.

(4) No player shall play for more than one club, association or body in the same year except with the previous permission of the Hony. Secretary. In such cases the player concerned shall have to submit his application to the Hony. Secretary with a fee of Rs 2/- only together with a clearance certificate from the Secretary of the club which he intends to leave. Where such certificates are unreasonably withhold the Hony. Secy. may nevertheless record a transfer.

(5) The above rules will be operated from 1st. January 1936.

ব্রীজ সংবাদ

জোড়হাট সান্‌ডে ক্লাব :— জোরহাট 'সান্‌ডে ক্লাবে'র উদ্যোগে বিগত ১৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ এক ঘটিকায় অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব চারুচন্দ্র পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে এঁদের অকসন্ ব্রীজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ হয়ে গেছে। হাবড়া 'সান্‌ডে ক্লাব' ও 'আন্দুল ব্রীজ ক্লাব' ফাইন্যাল খেলায় প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটী বেশ সুষ্ঠুরূপেই পরিচালিত হয়েছিল।

লুনার এণ্ড ফুল্‌স কম্বাইণ্ড ক্লাব :— বিগত ২২শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় জাষ্টিস্ অনিলপ্রকাশ বসু এম-এ, বি-এল, বার-এট-ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'লুনার এণ্ড ফুল্‌স ক্লাবে'র পরিচালনায় সুকুমার মেমোরিয়াল ব্রীজ প্রতিযোগিতার পঞ্চদশ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সমাধা হয়। কর্তৃপক্ষের সুপরিচালনায় উপস্থিত জনসাধারণ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছিলেন।

শোভাবাজার রাজবাটী ক্লাব :— গত ৩০শে ডিসেম্বর সোমবার সাত ঘটিকায় হিজ্ হাইনেস্ পাতিয়ালার যুবরাজের সভাপতিত্বে শোভাবাজার রাজবাটী ক্লাবের অকসন্ সিঙ্গলিকেট ও ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণ সম্পূর্ণ হয়। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতার পর গীতবাদ্যাদি ও জলযোগান্তে এই অনুষ্ঠানটী 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হয়।

থেটা বেটা ক্লাব :— থেটা বেটা ক্লাবের পরিচালনায় বিগত ৩০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় সমগ্র ভারত ডুপ্লিকেট-কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের আয়োজন হয়েছিল। যথা সময়ে মাননীয় জাষ্টিস্ এস, কে, ঘোষ আই-সি-এস, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁর পত্নী থেটা বেটা ক্লাব প্রদত্ত একটি সুবর্ণ নির্ম্মিত কাপ ও অন্যান্য পারিতোষিক বিতরণের ভার গ্রহণ করেন। নানাবিধ আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতা ও জলযোগের পর সভা ভঙ্গ হয়।

আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড্ ফোর্স ক্লাব :— এই ক্লাবের পরিচালনায় অকসন্ ব্রীজ প্রতিযোগিতায় উপেন্দ্র মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড বের হবে। আগামী ১০ই জানুয়ারী নাম গ্রহণের শেষ দিন। এঁদের ঠিকানা, ৩৯-১-এ, জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড, কলিকাতা।

গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ :— এই সমিতির উদ্যোগে উৎপল মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড বের হয়েছে। গত ২৫শে ডিসেম্বর প্রবেশ পত্র গ্রহণ করবার শেষ দিন ছিল। এঁদের ঠিকানা, ২৯, শ্রীরামধন রোড, শালিখা, হাবড়া।

বিপিনবিহারী উপেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউট :— এঁদের চেষ্টায় অকসন্ ব্রীজ প্রতিযোগিতায় রাধারাণী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ বের হয়েছে। এঁদের ঠিকানা, রামকালী মুখার্জ্জি লেন, পোঃ কাশীপুর, সিঁথি।

হে মোর অপরিচিতা

[উপন্যাস]

শ্রীসুপ্রিয় সোম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১১)

সেদিন আমি নির্ম্মলের কথাকে উড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেম। এখন ভাবি, একজন সংসারাভিজ্ঞ বিচক্ষণ পরিণামদর্শী লোক হলে আমার জায়গায় কী করতো? আমি একেবারে এক মুহূর্ত্তে বলে যেতে পারি, নির্ম্মলের অনুরোধ সে আগ্রহ করতে পারত, না। অর্দ্ধেক রাজত্ব, সঙ্গে রাজকন্যা, চাকরী আর তার সঙ্গে বিবাহের বধূ, কম কথা! আমি বোকা, আমি ছেলেমানুষ, তাই সেদিন নির্ম্মলের অনুরোধকে রাখতে পারি নি। চালাক লোকে ওসব ভাবপ্রবণতা মনেও স্থান দেয় না। সে অক্লেশে তনিমার কথা ভুলে গিয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসত। কিন্তু আমি যে তখনও সেই, কৈশোরের স্বপ্ন নিয়ে যৌবনের দিনগুলো কাটাতে সুরু করেছি, তখনও বুকে এক রঙীন কল্পনা, চোখে কবিতার আমেজ, মাথায় ভালবাসার নেশা! সংসারের চাকায় চাকায় ঘুরে তখনও খুব বেশী শক্ত হয়ে ওঠিনি। যদিও আমি যে আঘাত পেয়েছিলেম, তাতে শক্ত হয়ে ওঠা উচিত ছিলো। কিন্তু আমার মনটা ছিলো কাব্যের রসে ভরপুর! তাই আঘাতকে আঘাত বলে খুব ভাবতে পারিনি। এখন ভাবি, একদিক দিয়ে আমার ভাবপ্রবণ মন আমাকে যেমন সব আঘাত নীরবে সহ্য করতে শিখিয়েছিলো, অন্যদিক দিয়ে ঠিক তেমনি বেদনাও তারা আমাকে দিয়েছে। আর সে বেদনা যদি না পেতেম, তাহলে এ কাহিনী বলত কে?

সেদিন সকালে ব্যায়াম করে ছাত থেকে নেমে এসে আমার অতীত জীবনকে নিয়ে একটু আলোচনা করচি, এমন সময় বাইরে এক ভদ্রলোক আর একজনকে বলচেন শুনলেম, এখানে অসিতবাবু থাকেন?

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি নবকিশোরবাবু।

স্বাগত, স্বাগত বলে ভদ্রলোককে যথেষ্ট খাতির করে ঘরের ভেতরে বসালেম।

নবকিশোরবাবু আমাকে তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ করে বল্লেন, আমার আজ অনেক কাজ আছে, আমি বসব না, চলি।

কাজের দোহাই দিয়ে যে লোক চলে যেতে চায়, তাকে থামান যায় না। আর অনেকক্ষেত্রে আমিও এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে অনেক অনুরোধ কাটিয়ে আসি।

নবকিশোরবাবু চলে গেলেন, আমি বাধা দিলেম না।

আজ বহুদিন হলো আমি এদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাইনি। আজ এতদিনের পর হঠাৎ কেন আমাকে নিমন্ত্রণ করলে তার অর্থ আমার কাছে ঠিক বোধগম্য হলো না। অথচ কোনো উৎসব-উপলক্ষে যে এ নিমন্ত্রণ তা নয়, এমনি।

আমি একটু আগেই গিয়ে পড়েছিলাম। তখন সন্ধ্যার আসরে কেউ আসেনি, কেবল আমি একা।

তনিমার সঙ্গে দেখা হলো—রৌদ্রের তাপে শুকনো ফুলটীর মত তার চেহারা।

গড়পাড় মিতালী সম্মিলনী:— বিগত ২৮শে ডিসেম্বর এই সম্মিলনীর অকসন্ ব্রীজ টুর্ণামেণ্টের ফাইন্যাল খেলা শেষ হয়েছে।

সান্ধ্য সঙ্ঘ:— সান্ধ্য সঙ্ঘের অকসন্ সিঙ্গলস্, অকসন্ ডুপ্লিকেট ও কণ্ট্রাক্ট সিঙ্গলস্ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ ৫ই জানুয়ারী থেকে।

গায়ে তেমন পোষাকের কিছুমাত্র আড়ম্বর নেই।

ভারী গলায় বল্লে, তোমার কী হলো বলোত ?

মৃদু হেসে বল্লেম, কী আবার হবে ?

কণ্ঠস্বরে অভিমান সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। বল্লে, না, কিছু হয়ে দরকার নেই। কিন্তু শরীরটা রাখতে হবে ত ?

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া উত্তর দিলেম, কেন, সেখানে আবার কী হলো ?

নিজে দেখতে পাও না ? ঘরেতে একটা আরসীও রাখনি বুঝি !

হেসে বল্লেম, তা অবশ্য একটা আছে। তবে সেটাতে হয়ত' খারাপ চেহারা ভাল দেখায়, আর তোমার মত ভাল চেহারা খারাপ দেখায়।

আমার ইঙ্গিতে তনিমার বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। আমি যে তার চেহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক খারাপ হয়ে গেচে এটাই উল্লেখ করচি তা সে বুঝতে পেরেছিলো। তাই সে একটু করুণ হাস্‌লে। তারপরে বল্লে, দেখ দিকিনি, আমি কেবল দিন দিন সুন্দর হচ্চি, আগের চেয়ে কত মোটা হয়েচি।

শেষের দিকে তার গলার স্বরটা একটু কেঁপে উঠল। আমি এটা লক্ষ্য করে বল্লেম, শরীরের প্রতি একটু যত্ন নিও। আমার কাছে গেলে তোমার ত' অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, সেত বেশ বুঝতেই পারচ। স্বাস্থ্য যদি সম্পদ হয়, এটা গরীবদেরই বেশী।

আমার কথায় তনিমার কণ্ঠস্বর অনেক তরল হয়ে গেলো। সে মৃদু হেসে বল্লে, সেটা বুঝি আমার একারই দরকার, তোমার নয় ?

আমি জোর গলায় হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেম, কেন আমার স্বাস্থ্য আবার খারাপ কোথায় ? দেখ দিকিনি, কত লম্বা শরীর, কত প্রশস্ত বুক, কত মাংসপেশী বহুল হাত—বলে হো হো করে প্রায় চীৎকার করে উঠলেম।

হয়ত গর্ব্বের মত শোনাবে, কিন্তু একথা সত্যি যে আমার স্বাস্থ্য চিরকালই খুব ভালো ছিল আর দেহটা সুবিশাল না হলেও বিপুল যে ছিলো সে বিষয়ে কোনো তর্ক উঠতে পারে না। তবে বাড়ী ছাড়া অবধি নানা চিন্তায় হয়ত ওপরের চাকচিক্যটা গিয়েছিলো, আর সেইটুকু লক্ষ্য করে তনিমার এই আশঙ্কা !

আবার উচ্চ হাসিতে সেও যোগদান না করে পারলে না। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে কণ্ঠে অনির্ব্বচনীয় সোহাগ ঢেলে বল্লে, দেখ, যখন দেহটা তোমার একারই ছিলো, তখনকার কথা আলাদা। কিন্তু ওটাতে এখন আমার' অধিকার আছে। ওটাকে যা ইচ্ছে তাই করলে চল্‌বে না। তারপর সামান্য একটু অভিনয়ের সুরে বল্লে, এটা আমার অনুরোধ নয় একেবারে হুকুম !

আমি ত হেসে ফেলে মাথা নীচু করে বল্লেম, যথা আজ্ঞা দেবী !

আমরা দু'জনেই উচ্চ হাস্য করে উঠতে যাবো ঠিক এমন সময় নির্ম্মল ও নবকিশোরকে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে আমাদের মুখ থেকে হাসি উড়ে গেলো।

তনিমা মুহূর্ত্তের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও তাকে সামলে নিতে বেশী দেরী হলো না। সে বেশ হেসে নির্ম্মলের দিকে চেয়ে বল্লে, নির্ম্মলদার যে আজ এত দেরী ?

নির্ম্মলের চোখ দিয়ে তখন আগুণ ঠিকরে পড়চে। সে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলে, তা হ'লে তোমারই অসুবিধে হতো।

নবকিশোর তনিমাকে উদ্দেশ করে বল্লে, তুই যে এখন কাপড় জামা পরিস্ নি।
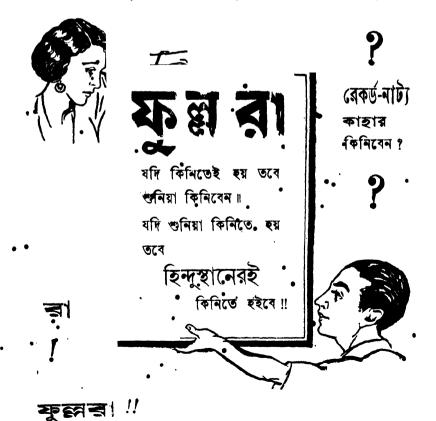
তনিমা উদাসকণ্ঠে উত্তর দিলে: আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। আজ আর আমি তোমাদের গান শোনাতে পারব না।

নবকিশোর রাগ করে উঠল। গলার স্বর রুক্ষ করে বল্লে, এতগুলো লোককে নিমন্ত্রণ করে এলুম কী জন্যে? তারা কি শুধু তোমার হাতের এক কাপ চা খাবার জন্যে আসবে।

তনিমা তেমনি শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলে: আগে তাঁরা সকলে আসুন, তারপরে তার কথা।

কেউ যদিও না আসেন এঁরা দুজনে এসেচেন।

ওঁরা ত ঘরের লোক। তনিমা হেসে উত্তর দিলে।

নির্ম্মল ঘরের লোক হতে পারে কিন্তু অসিতবাবু ভাববেন কী?

আমার দিকে চোখ তুলে ধরে মৃদু একটু হেসে তনিমা বল্লে, যা ওঁর মন চায়।

সে ভেতরে চলে গেলো।

আমি নির্ম্মলের দিকে দৃষ্টি ফেলে দেখলেম, হিংস্র ব্যাঘ্রের মত তার দুটো চোখ জ্বল্ জ্বল্ করচে।

সেদিন কিন্তু একটা বড় মজা দেখলেম, নির্ম্মলের অন্য কোনো বন্ধু বান্ধবের আর আগমন হলো না! অনেকক্ষণ পরে আমি নবকিশোরকে বল্লেম, এইবার আমি উঠি নবকিশোরবাবু!

নবকিশোরবাবু ভয়ানক আগ্রহ দেখিয়ে বল্লেন, আরে তাও কী হয়! আপনাদের মতন লোকের দর্শন পাওয়া একটা মস্ত বড় সৌভাগ্য তার ওপরে আপনাদের সঙ্গলাভ তার চেয়ে অধিক সৌভাগ্য।

শেষের দিকে নবকিশোরের গলার স্বরে যেন বেশ একটা শ্লেষের সুর পেলেম। কিন্তু সেটা আমার ভুল হতে পারে এই ভেবে নবকিশোরের কথাটা এমনি একটা উপহাস বলে ধরে নিতে আমার কষ্ট হলো না।

একটু পরে নির্ম্মল বল্লে, তাসটা নিয়ে এসো না হে। খেলা যাক্।

এমন সময় তনিমা এসে ঢুকল। তার পরণে বেলের পানা রঙের ফিন্‌ফিনে শাড়ী—ভেতরে লাল সেমিজকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। পায়ে কালো পেটেন্ট—বার্ণিশ করা রোম্যান গ্রীসীয়ান শ্লীপার। একটা কালো রঙের ব্লাউজে বুক ঢাকা, তবে দুখানি বাহু, সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ। শ্বেত বাহুদ্বয় কালো রঙের ব্লাউজের ওপরে পড়ে মানিয়েচে অপরূপ। রূপ দেখলে সকলেরই আনন্দ হয়, আমার হলো, আমি তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, কিন্তু তনিমা আমার দিকে একটীবারও চাইলে না।

নির্ম্মল আর তনিমাতে হলো পার্টনার, আমাতে আর নবকিশোরবাবুতে বসলেম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলার ফলাফল বোঝা গেলো। আমরা হেরে যেতে লাগলেম।

নির্ম্মল একসময়ে বলে উঠ্‌ল, রাবিশ। কথাটা আমাকে উদ্দেশ করে বলা হলো। নবকিশোর নির্ম্মলের কথায় সায় দিয়ে আমাকে আক্রমণ করে বল্লে, অসিতবাবু যদি ওখানে রঙ না খেলেন তাহলে আমরা কন্‌ট্র্যাক্ট ফুল্‌ফিল করতে পারি।

কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলেম যে ওখানে রঙ না খেলাটা কত অন্যায় হোত। কিন্তু আমার কথা কেই বা শোনে। নির্ম্মল ও নবকিশোর দু'জনে মিলে তখন আমাকে যা তা বলে যাচ্ছে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেম। মনে হলো, আমাকে অপমান করবার জন্যেই কি এরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলো! আমি এদের অতিথি, এ ভাবে অপমান করাটার উদ্দেশ্য কী?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত তনিমা চুপ করে ছিলো।

পতিতপাবন পতিতুণ্ডী

নববর্ষে

ট্যাপ্ ট্যাপ্! ট্যাপ্টি-ট্যাপ্! ট্যাপ্ ট্যাপ্! নাচ চলেছে তন্বী মেয়ের। সেই কমনীয়তা, সেই চমৎকারীতা! ছন্দ আর ঝঙ্কার নিয়ে ফিরল নাকি প্যাভলোভা! দেখচনা তার পা। পদক্ষেপে পদ্ম ফুল ফুটচে নাকি। মুগ্ধকর আর মহান ওরাই,—ওই পদক্ষেপ, পারো ওর পদক্ষেপ গুণতে। আর ওর কমং-তনু—হাস্যময়ী, লাস্যময়ী, বিম্বাধরা—চুম্বন চঞ্চল অনুরাগ আভায় ও দেদীপ্যমান।—তোমাকে নববর্ষের অভিবাদন পাঠালে, চুম্বন পাঠালে তুমি গ্রহণ কর।

ওকে তুমি চিনতে পারলে না! ওকেই আমি নববর্ষে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। দেখেছ 'ব্রডওয়ে মেলডি অব্

এইবার যখন নির্ম্মল আমাকে উদ্দেশ করে বল্লে, যেমন মোটা চেহারা তেমনি মোটা বুদ্ধি।

উত্তরে তনিমা নির্ম্মলের দিকে চেয়ে এমন এক হাসি ঠোঁটের কোণে ছড়িয়ে দিলে যা অতীব অপমান কর। এভাবে হাসির উদ্দেশ্য—নির্ম্মলকে মেনে নেওয়া আর তার কথাকে সমর্থন করা। তনিমা কোনো কথা আর কইলে না, আর ঐ হাসিটুকু দিয়েই শেষ করলে।

আমি বড়ো অপমান বোধ করলেম। মৃদু হেসে বল্লেম, আমি বিশেষ খেলতে টেল্‌তে জানি না, আমাকে ছেড়ে দিন নবকিশোরবাবু!

(ক্রমশঃ)

নাইনটিন থার্টিসিক্স্'এ। ছায়ার মায়া জগতের উজ্জল আকাশে তারা হ'য়ে ও ফুটে উঠেচে এই প্রথম। আমরা ওকে নববর্ষের অভিবাদন পাঠালুম।

সে তাকে ভালবাসে

চমকে গেলেন নাকি এই কথাটা শুনে। সাইমন সিমনের নাম বোধহয় আপনাদের সবাইয়ের জানা নেই। তার নামটা আপনারা জেনে রাখুন। ১৯৩৬ সালের আর একখানা ছবির নাম আমি বলে দিচ্ছি। ছবিখানার নাম হচ্ছে 'আণ্ডার টু ফ্ল্যাগস্' নামবে রোনাল্ড্ কোলম্যানের সঙ্গে সাইমন সিমন। সাইমন মেয়েটি হচ্ছে পুরোপুরি ফরাসী অর্থাৎ ফরাসী ভাষা ছাড়া আর কিছুই জানে না। হলিউডে এসে ইংরাজিতে অভিনয় করতে হবে তাই উঠে পড়ে লেগে গেছে ইংরিজি শিখতে। সেই সিমন যখন প্যারী ছাড়ল তখন সবাই লিখেলে, দেখ, মিলে মিশে থেকো—আর মিষ্টি কথা কয়ো। সিমনও তাই রোনাল্ড কোলম্যানের কাছে প্রথম ইংরিজিতে মুখ খুল্লে: আই লফ্ ইউ টু মাচ। এই লফ'-কথাটা যে লভ হবে তা এখনও ঠিক তার হয়নি, তা আমি খবর পেয়েছি। তবু এর মতই মেয়ে হলিউডে এসে তৈরী হয় গার্বো, মার্লিন, এ্যানা—এমনিই হলিউড আর এমনিই নিয়ে আছে সে সারা জগতের বিস্ময়!

ইংরিজি শিক্ষায়

ছোটি মেয়ে শার্লি। তা ছোট হলে কি হয় বড়র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জন্মেছে যে সে।

শার্লি টেম্পল

ইংরিজির প্রথম পাতার সঙ্গে পরিচয় হবার সঙ্গেই ফ্রেঞ্চ শেখবার তার সাধ। শুধু সাধ তো নয়, সত্যিই সে শিখচে। আর সে যে কত মনোযোগ দিয়ে শিখচে তাও
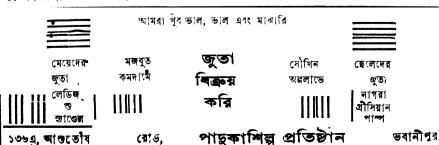
আপনারা আমার কাছে কত শুনেচেন। কিন্তু যে উদ্যম নিয়ে সাইমন ইংরিজি শিখচে তা আপনারা তো জানেন না। শুনুন তবে বলি: সেদিন 'দি লিট্‌লেষ্ট রিবেল' ছবি তোলার কাজ শেষ হয়ে গেলে, লোক এলো যখন সেটের জিনীষ তুলতে হঠাৎ তারা কয়েক খানা ছেলেদের ইংরিজি গল্পের বই কুড়িয়ে পেলে। তারা ভাবলে শার্লির। আর ভাবাও আশ্চর্য্য নয় কারণ শার্লি টেম্পলই ওই বইগুলো পড়ে। কাজেই লোক ছুটল শার্লির বাড়ি বই দিয়ে আসতে। লোক ফিরল বই হাতে। মালিক যখন সত্যিই খুঁজে পাওয়া গেলো তখন দেখা গেলো, মালিক হচ্ছে সাইমন।

সাইমন বলে; ওতেই ইংরিজি শেখা যায় ভালো। গল্পে মন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি ভাষ্যটাও শেখা যায়। এই সব বইয়ের অক্ষরগুলো যে বড় বড় আর বাক্যগুলিও হচ্ছে সহজ ও সরল।

শার্লি আর সাইমন

শার্লি আর সাইমনের দেখা হবে। একজন শিখচে ফ্রেঞ্চ আর একজন শিখচে ইংরিজি। এবেশ মজার ব্যাপার। কী ভাষায় কথা হবে এই নিয়ে দুজনের ভাবনা। অবশেষে ঠিক হ'লো ফ্রেঞ্চ ভাষাতেই হবে। সাইমনের বুক-কাঁপা থামল; 'কী জানি শার্লির কাছে আবার ভুল বলে ফেলে! ইংরিজি কথাগুলো যে উচ্চারণ বিশ্রী কিছুতেই আর ওর ঠিক হচ্ছে না।

শার্লির দম্ভ বেশী। দেশ বিদেশে তার খ্যাতি। সেই নিজে থেকে খবর পাঠিয়েছে ফরাসী ভাষায় কথা হবে। ছ মাস ধরে ফরাসী ভাষা পড়ছে সেটা কি এমনি যাবে। কিন্তু তারপর সেদিন শার্লিকে ফরাসী ভাষায় কথা কওয়া ছাড়তে হোল্ এই বলে মিস সাইমন অমন করে আমরা ফরাসী কথা বলি না, বলি কি?—সাইমন শুধু হাসলো।

প্রপ-ম্যান বা প্রপ-ম্যয়

প্রপ্-ম্যান কথাটা আমরা খুব শুনতে পাই। প্রপ্‌ম্যান হচ্ছে যারা সেটের জিনিষ পত্র তোলে, রাখে, বা সাজিয়ে দেয়। এদের কাযের ভার কম নয়। আমি জানি একবার একখানা সেটেতে ছবিতে একটা চাবি দরকার হয়। সেই ছোট চাবি তাদের প্রায় পঞ্চাশটা তৈরী করে রাখতে হয়েছিল। পাছে কোন দিন চাবি না পেলে সুটিং বন্ধ হয়ে যায়। আর বাস্তবিক একদিনের চাবি অন্যদিন পাওয়া যায়নি। কারণ প্রত্যহ একজন না একজন সে চাবি নিয়ে নিত, ছবির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। এমনি সব কিছু ভেবে তাদের কায করতে হয়।

নববর্ষে ডলরেস কষ্টেলো

আবার আমরা ডলরেস কষ্টেলোকে ছবিতে দেখতে পাবো। কবে দেখেছেন আপনাদের মনে আছে কি! যাক সে কথা। সেদিনের কথা মনে আছে, যেদিন জন ব্যারিম্যুর ডলরেসের গলায় হীরের হার দুলিয়ে দেয়। সেই হার আবার ব্যরিমুর খুলে নিয়েচে। উঃ সেদিন কোর্টে কি ভিড়। বিয়ে বিয়ে ছাই বিয়ে! ওদের আবার বিয়ে!

খুচরো খবর

১। ডেলমোর ডেভিস্ হচ্ছেন চিত্র-নাট্য লেথক; "কে ফ্রান্সিস-এর সঙ্গে তাঁর ভয়ানক মেলামেশা চলেছে। তারপর—তারপর আপনারা বুঝুন।

২। এ্যারল্ লে ম্যান হচ্ছেন একজন ব্যাণ্ডবাদক; এলিনার পাওয়ালকে ভাল-বেসেছে। ওদের দু'জনের ছাড়াছাড়ি নেই। ঠিক ক'রেছে গাঁটছড়া বাঁধবে।

৩। লিনো মার্টিনি ও এ্যানিটা লুইস যে এক সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় প্রেমে পড়েছে।

৪। নর্ম্মা শিয়ারের স্বামী থ্যালবার্গের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক ঘুরে ফিরেছেন।

৫। ফ্রেডারিক মার্চের স্ত্রীর নাম ফ্লোরেন্স এলব্রিজ, দেশ বিদেশে ঘুরে এইবার ফিরেছে।

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন—দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

শ্রীতানসেন

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্ষ্টিটিউটে বিগত ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর এই তিন দিন ধরিয়া মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় প্রায় সকল সঙ্গীতজ্ঞই ইহাতে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং বাংলার বাহির হইতেও অনেক বিশিষ্ট গুণিজন আহূত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের উদ্যো-ক্তৃবর্গের আপ্রাণ চেষ্টায় ও আমন্ত্রিত গুণিগণের সহৃদয় আনুকূল্যে সম্মেলন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সম্পর্কে পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের নিঃস্বার্থ চেষ্টার ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

২৯শে ডিসেম্বর রবিবার সকাল ১০টার সময় সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সন্তোষের মহারাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে পণ্ডিত শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী, বেদান্ত-তীর্থ, এম-এ, পি, আর, এস মহোদয় সুললিত ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বেদমন্ত্রোচ্চারণে স্বস্তিবাচন ও সঙ্গীতপারিজাত হইতে আবৃত্তি করেন। অতঃপর স্বর্গত পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "গান্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয়ে"র ছাত্রগণ কর্তৃক উদ্বোধন-প্রার্থনা-সঙ্গীত গীত হইলে কলিকাতা "বাসন্তী বিদ্যাবীথি"র ছাত্রীবৃন্দ সুপ্রসিদ্ধ "জনগণমন অধিনায়ক" গানটী সমবেত কণ্ঠে গান করেন এবং তৎপরে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

প্রথমে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর অভিভাষণ পাঠ করেন। মহারাজের অভিভাষণে মৌলিকতার বিশেষ কিছু ছিল না—তবে সঙ্গীতের উপযোগিতা বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে বক্তব্য এই যে, এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে কেবল অনুরোধ করিলে বিশেষ কি ফল হইবে তাহা আমরা বুঝি না। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে সঙ্গীতের প্রচার করা অভিমত হয় তবে কার্য্যতঃ যাহা সম্ভবপর হইতে পারে সেইরূপ বিশেষ চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর সাধারণসমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় এক সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। সাধারণসমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর বর্ত্তমান বৎসরের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গিরিজা কিশোর ঘোষ বিগত বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করেন। সাধারণ প্রথানুসারে বিগত বৎসরের সেক্রেটারী মহাশয়ের এই রিপোর্ট পাঠ করা উচিত ছিল। কিন্তু যে গূঢ় কারণে ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারীকে এই বৎসর পদচ্যুত করা হইয়াছে তাহার জন্য তাঁহাকে নিয়মানুসারে রিপোর্ট পড়িতে না দেওয়াটা সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া অনুমোদন করা যায় না। সম্মেলনের সভাপতি নাটোরাধিপতি অসুস্থতা-নিবন্ধন অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁহার প্রেরিত পত্র শ্রীযুক্ত দামোদর খান্না পাঠ করেন। তৎপরে স্বর্গত নাড়াজোলের কুমার ও দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্য শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার কার্য্য শেষ হইলে পর সঙ্গীতের demonstration আরম্ভ হয়।

সর্ব্বপ্রথম পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরজী সম্প্রদায়ের শ্রীযুক্ত ভি, এন, ঠক্কর আশাবরী রাগের দুখানি খেয়াল গান করেন। তৎপর উক্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাচীন ছাত্র কশলকর মহাশয় (প্রয়াগ-সঙ্গীত-সমিতির উদ্যোক্তা)

একটী সারঙ্গের খেয়াল গান করেন। কশলকরের পর গৌরীপুরের কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে আলাহিয়া-বিলাবল রাগের আলাপ করেন। সুধীজন সমাজে বীরেন্দ্র কিশোরের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তবে যাঁহার উপর পরিচালনার ভার ছিল (এলাহাবাদের অধ্যাপক ডক্‌টর ডি, আর, ভট্টাচার্য্য) তিনি কুমার বাহাদুরকে যে ভাবে পরিচিত করিয়া দিলেন তাহা বাংলাদেশের সুধীসমাজে কুমার বাহাদুরের যে প্রতিষ্ঠা আছে তদ্বিষয়ে প্রফেসর মহোদয়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞতারই প্রকাশক। মেগাফোন রেকর্ডের বাদক বলিয়াই কুমার বাহাদুর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত নহেন—তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট গুণী—ভারতের বিশিষ্ট গুণিগণকে কুমার বাহাদুর, তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন—কুমার বাহাদুর স্বয়ং অনেক গুণীর নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন সুতরাং সুপ্রতিষ্ঠিত কুমার বাহাদুরকে কেবল রেকর্ডের বাদক বলিয়া পরিচয় দিলে সুরুচির প্রকাশ পায় না। কুমার বাহাদুরের পর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বরোদীয়া গুণী হাফেজ আলি খাঁ সাহেব বাহাদুরী টোড়ি, ভৈরবী ও সারঙ্গের গৎ ও আলাপ ইত্যাদি করেন। তাঁহার বাদ্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। তাঁহার সহিত সঙ্গত করিয়া দিলেন সুপ্রসিদ্ধ পাখোয়াজী বিজয় সিং—ইনি সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী পর্ব্বত সিং-এর সুযোগ্য পুত্র—এবং কুদেও সিংজীর ঘরওয়ানা। যোগ্য যন্ত্রীর সহিত যোগ্য মৃদঙ্গীর সঙ্গত প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না—সুতরাং এই দুর্লভ সমাবেশ অতীব অপূর্ব্ব হইয়াছিল। প্রফেসার হাফেজ আলি খাঁর স্বরোদের পর ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সুযোগ্য ছাত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিলীপচন্দ্র বেদী—রামকলী রাগের দুইখানি খেয়াল ও ভৈরবীর একটি ঠুম্‌রী গাহিয়াছিলেন—তাঁহার সঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল—তবে পরিচালক মহাশয়ের অসাবধানতার ফলে—উপযুক্ত সঙ্গতের নির্ব্বাচন না হওয়ায়—মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের বিশেষ রসভঙ্গ হইতেছিল। যাহা হউক, পণ্ডিত বেদীর অসাধারণ প্রতিভা ও নৈপুণ্যের জন্য সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের নিকট তাঁহার গান বিশেষ আদৃত হয়। তানকর্ত্তবের রীতি, রাগশুদ্ধি এবং ঠুংরীগানের অলঙ্কার সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞান উচ্চশ্রেণীর কলাবিদেরই পরিচয় দিয়াছিল। বেলা ১১৷৹ ঘটিকার সময় সকালের প্রোগ্রাম শেষ হয়।

বেলা ৪ ঘটিকার সময় Music Competitionএ যে সকল বালক বালিকারা প্রাইজ পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে ৬ জনের demonstration হইয়া যাইবার পর বাংলার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যো-

পাধ্যায় মহাশয় পূরবী ও হাম্বীর রাগের দু'খানি ধ্রুপদ গান করেন। ইঁহার সহিত শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র মিত্র পাখোয়াজ সঙ্গত করেন। তাহার পর আমেদাবাদের শঙ্কর ব্যাস দুখানি মুলতানীর খেয়াল ও একখানি মাঢ়ের ঠুমরী গাহিয়াছিলেন—তাঁহার ঠুমরী গানখানি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। ইহার পর শ্রীসত্যকিঙ্কর ব্যানার্জ্জী শ্রী রাগের দুইখানি গান গাহেন—তাঁহার গানের মৌলিকত্ব প্রশংসনীয়। তাহার পর সমবেত কণ্ঠে কুমারী গীতা দাস ও আরতি দাসের একখানি ধ্রুপদ ও ঠুমরী গান হইল। ইঁহাদের একজন নাকি "গীতশ্রী" কিন্তু ইঁহাদের গানে কোন "শ্রী"ই ছিল না। পরে বাংলার প্রবীণ সেতারী জিতেনবাবু একখানি ভীমপলশ্রী বাজান—তাহার সহিত তাঁহার পুত্রও জোড় বাজাইয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীমান্ রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একখানি কেদারার খেয়াল গাহেন। শ্রীমানের রাগ, লয় ও বাণীশুদ্ধির দিকে প্রণিধান আবশ্যক। তৎপরে বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ বেহালা বাদক প্রোঃ ধুন্দিরাজ পলুস্কর জয়জয়ন্তী রাগের আলাপ ও গৎ বাজান—ইহার পর শ্রীসুনিল বাগচী একটী বাংলা
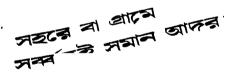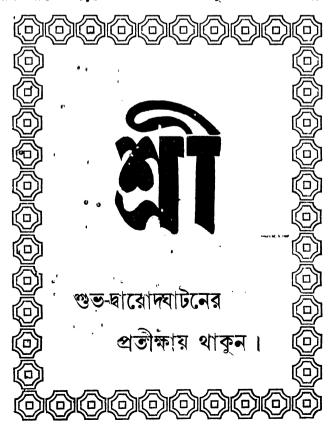
গান গাহেন। Demonstrationএর আসরে এরূপ গান যে চলিতে পারে না—তাহা বুঝিয়া অনিলবাবুর না গাওয়াই সুবিবেচনার পরিচয় হইত। ইহার পর শ্রীযুক্ত অনাথ বসু দু'খানি গান করেন; দুই প্রকার স্বরে গান করিতে পারেন বলিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে বিশেষ আদর করেন—আমাদের মনে হয় যে স্বরসাধনায় কণ্ঠ লইয়া ব্যভিচার করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। গান না গাহিয়া অনাথবাবু তবলার দিকে কিছু মন দিলে উন্নতি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা আছে—তিনি যে কেন সে বিষয়ে চেষ্টা না করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। তাহার পর দারভাঙ্গার রামেশ্বর পাঠক সেতারে পুরিয়ার আলাপ ও বিহারীর গৎ বাজান—তাঁহার হাত বিশেষ কড়া হইলেও, বাজাইবার গুণে মন্দ লাগে নাই। ইহার পরে উল্লেখযোগ্য হইতেছে স্বর্গত পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর মহোদয়ের স্বনামধন্য ছাত্র প্রোফেসর নারায়ণ রাও ব্যাসের গান। ইনি দরবারী কানাড়া ও আড়ানার দুইখানি প্রসিদ্ধ খেয়াল ও একটী সুললিত ঠুমরী গান করেন। তিনি বিলম্বিত খেয়ালের অতি প্রসিদ্ধ "মোবারক বাদী" গানটী এরূপ দক্ষতার সহিত গাহিয়াছিলেন যে উহা সুরশিল্পীগণের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমান বাংলায় দরবারীর এই গানটী অতি বিকৃতভাবে ওস্তাদ মহলেও গীত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রোফেসর ব্যাস ইহার সমুচিত গৌরব রক্ষা করিয়া যে ভাবে গাহিয়াছিলেন তাহাতে অতি অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি হইয়াছিল। প্রোফেসর ব্যাসের বাণী, লয়, সুর, তাঁহার ভাবশুদ্ধি, তাঁহার সাত্ত্বিক প্রাণের পরিস্ফূর্ত্তি সকল সহৃদয় চিত্তকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল—তাঁহার শুদ্ধ ভাবপ্রবণ সঙ্গীত গঙ্গা প্রবাহের ন্যায়ই নির্ম্মল—তাঁহার শুদ্ধমুদ্রা সঙ্গীত-শিল্পীমাত্রেরই বিশেষ ভাবে অনুকরণীয় হওয়া উচিত। ইহার পর মাষ্টার যোগের হারমোনিয়ম, প্রোফেসর হার্ষে ও খাঁয়ের কণ্ঠ সঙ্গীত, প্রোফেসর আঠাওলের এসরাজ এবং প্রোফেসর যোশীর কণ্ঠ সঙ্গীত হইয়াছিল। তাহার পর এলাহাবাদের কুমারী আশা ওঝা নৃত্য করেন। ইঁহার নৃত্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পরিচালক ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে কুমারীর পরিচয় প্রদান করেন—তাহাতে আপত্তির বিষয় থাকিলেও আমরা সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না—তবে গত ৮ বৎসর ধরিয়া এলাহাবাদ সঙ্গীত সম্মেলনের সহিত জড়িত থাকিয়াও এবং গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সম্মেলনে তাঁহার family, "best musical family" বলিয়া পুরস্কার পাইয়া আসিলেও তিনি যে "ঝাঁপ-তাল"কে কেমন করিয়া "the most difficult tal" বলিলেন—তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যাহা হউক, কুমারী আশা ওঝা যে নৃত্য করিয়াছিলেন তাহা প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য না হইলেও ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রসিদ্ধ কথক সম্প্রদায়ের নৃত্যের ভগ্নাবশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যদিও উক্ত সম্প্রদায়ের নৃত্যে যে সকল সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তাহার বিশেষ কিছুই ইহার নৃত্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাই তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ইহার নৃত্য উপভোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু সম্মেলনের তৃতীয় দিবসে "দাদরা" তালে না নাচিলে বিশেষ ভাল হইত। রাত্রি প্রায় ১।৷৹ ঘটিকার সময় প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন সোমবার সকাল ৮৷৷৹টার সময় আরম্ভ হয়। Prize Winners দের Demonstration হইয়া যাইবার পর সঙ্গীতজ্ঞগণের Demonstration আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় "ঠোড়ী" ও "জৌনপুরী" রাগে দুইখানি ধ্রুপদ গাহিলেন। তাঁহার পর এলাহাবাদের আর, কে, পটবর্দ্ধন বেহালায় আলাহিয়া-বিলাবল ও ভৈরবীর গৎ বাজাইলে বাংলার প্রবীণ শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমথ বন্দ্যো-পাধ্যায় "সুর-অয়ন" ও "রুদ্রবীণা" বাজাইয়া-ছিলেন। তৎপরে বেলগাঁওর Child-prodigy মাষ্টার কুমার গন্ধর্ব্ব সুললিত কণ্ঠে আশাবরী ও ভৈরব রাগের—খেয়াল গাহিয়াছিলেন। এই শিশুর প্রতিভা অনন্যসাধারণ; তাহার লয়, সুর, ও তানকর্ত্তব্যের পদ্ধতি বাংলার অনেক পরিণত বয়স্ক গায়কের চৈতন্যের সঞ্চার করিয়া দেওয়া উচিত। গন্ধর্ব্বের সহিত তবলা-সঙ্গত করিয়াছিলেন তাঁহারই ন্যায় একটি অল্পবয়স্ক বালক—শ্রীমান্ রামাকিষণ—অল্পবয়সে সঙ্গতে এরূপ অধিকার বড় একটা দেখা যায় না। তাহার পর দানীবাবুর ধ্রুপদ হইল। তাঁহার পর গান্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডি, এন্ পটবর্দ্ধন গান করেন। তাঁহার বিলাসখানি টোড়ির খেয়াল সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। তাঁহার লয়, তান, ও স্বরগ্রাম প্রণালী তাঁহার অন্যান্য সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেয়। Conferenceএর তৃতীয় দিবসে তাঁহার তিরানা গান অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আলোচ্য দিবসেও তিনি একটি তিরানা ও একটি ভৈরবী ঠুংরী "যোগী মাত যাও" গাহিয়া সহৃদয়-গণের মনোরঞ্জন করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সেতারবাদন ও প্রোঃ শঙ্কররাও তিওয়ারীর কণ্ঠসঙ্গীতের পর বেলা ১টার সময় পূর্ব্বাহ্নে সভাভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিবসের সান্ধ্য অধিবেশন ও তৃতীয় দিবসের অধিবেশনের বিবরণী আগামী সংখ্যায় প্রকাশ্য।

এবারের Conferenceএর প্রধানতম আকর্ষণ ইন্দোরের সুপ্রসিদ্ধ গুণী সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীনসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব। তিনি অধিবেশনের শেষ দুই দিন গাহিয়া-ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনাও আগামী সংখ্যায় প্রকাশ্য।
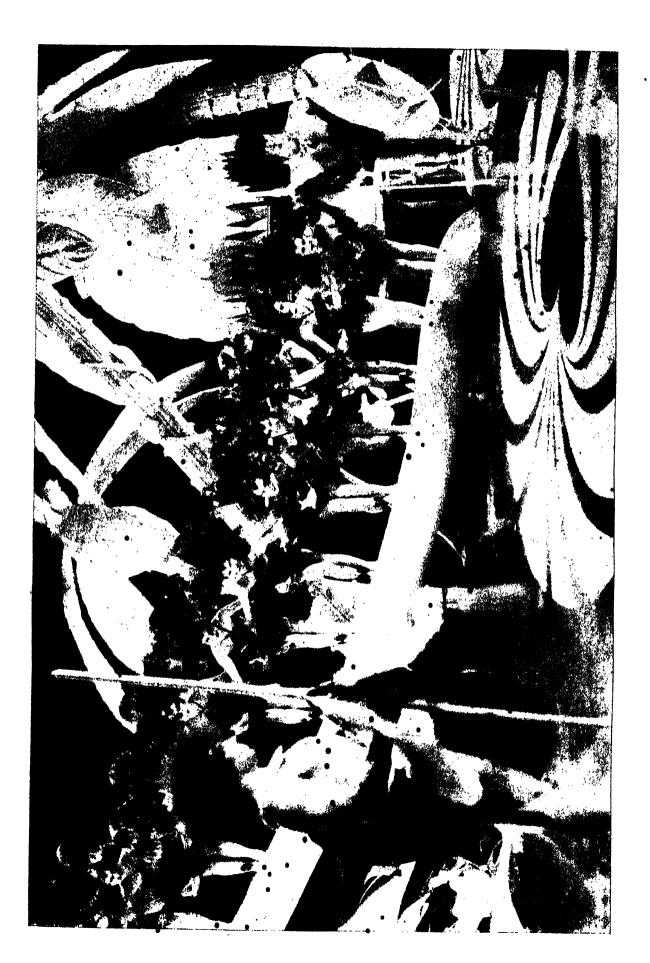
দি বিগ্‌ ব্রডকাষ্ট অফ্‌ ১৯৩৬" প্যারামাউন্টের একখানা নাম-করা ছবি। তারই একটি চমকে দৃশ্য—এটি দেখ্‌লেই ছবিখানা যে ভাল তা বোঝা শক্ত নয়! এতে অভিনয় কোরেছেন বিঙ্‌ ক্রস্‌বি, জ্যাক ওকী, বার্ণস্‌ এণ্ড এলেন, লাইডা রবার্টি

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন পার্ক ৩
৯, রামময় রোড্, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা বৃহস্পতিবার ২রা মাঘ, ১৩৪২, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৬

আসন্ন নির্ব্বাচন ও শরৎচন্দ্র

গত সংখ্যার "খেয়ালী"-তে কর্পোরেশন নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বাঙ্‌লা কংগ্রেসের সম্মিলিত দল গঠন সম্বন্ধে আমরা যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে সহযোগী "বসুমতী" সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিয়াছেন যে—

কংগ্রেসী উপদলগুলির বিবাদভঞ্জনের পালা কতদূর অগ্রসর হইল তাহা বাহিরের লোকের জানিবার উপায় নাই ; তবে আমাদের এক সহযোগী লিখিয়াছেন যে, করপোরেশনের আগামী নির্ব্বাচন চালাইবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দ্দেশে ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে শীঘ্রই একটি ইলেকসন বোর্ড গঠিত হইবে। এবং এতদিন যাঁহারা দুইটি কংগ্রেসী উপদলের পাণ্ডা হিসাবে দলাদলি পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারাই নাকি করপোরেশনের নির্ব্বাচন আসন্ন দেখিয়া বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি, স্বয়ং শ্রীমান কিরণশঙ্কর রায় নাকি "শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাঙ্গলা কংগ্রেসে সম্মিলিত দল গঠনে সহায়তা করিবার সঙ্কল্প অনুমোদন করিয়াছেন।"

যাঁহারা এতদিন সাপ হইয়া কামড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই আজ ওঝা হইয়া মন্ত্র পড়িতে দেখিয়া আমরা যে খুব আশান্বিত হইয়াছি তাহা বলা চলে না। যাঁহারা এতদিন সঙ্কীর্ণ উপদলগত স্বার্থ-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া বাঙ্গলার কংগ্রেস ও কলিকাতা কর্পোরেশন গ্রাস করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছিলেন, রাতারাতি যে তাঁহারা মনের ময়লা ধুইয়া ফেলিয়া নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিলেন, ইহা বাঞ্ছনীয় হইলেও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমাদের সন্দেহ হয় যে, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর উপর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কমিটী কর্ত্তৃক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন পরিচালনা করিবার ভার দেওয়া হইতেছে দেখিয়া এই সমস্ত উপদলীয় নেতারা আপন আপন উপদলের স্বার্থ যথাসম্ভব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই শরৎ বাবুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন : এবং সদস্য মনোনয়নের সময় কোন্ দল কতজন আপনার লোক ঐ তালিকাভুক্ত করিতে পারেন তাহা ভিন্ন ইঁহাদের অন্য কোন লক্ষ্য থাকিবে না। শরৎবাবু যদি পুরাতন উপদলগুলির পাণ্ডাদের লইয়া ইলেকসন বোর্ড গঠন করেন, তাহা হইলে উহার ভিতর দলাদলির বীজ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া যাইবে এবং নির্ব্বাচন শেষ হইবার পর আবার তাহা বীভৎসরূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, বাঙ্‌লা কংগ্রেসের বিরোধ না মিটিলে শরৎবাবু কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন না। আমরা শরৎবাবুর এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় সহযোগী "বসুমতী" এই মিলন প্রচেষ্টার সাফল্যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা এতদিন সাপ হইয়া কামড়াইয়াছিলেন, তাঁহারাই আজ ওঝা হইয়া মন্ত্র পড়িতেছেন, সহযোগী এ সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন? বাঙ্‌লার বৃহত্তর কল্যাণকল্পে ও বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে উপদলগত সঙ্কীর্ণতার ক্ষুরধার যদি মলিন হইয়া পড়ে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ কি? এই মিলন প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে সহযোগী সন্দেহাকুল হইলেও, আমাদের মনে হয়, যে শীঘ্রই বিগত দশ বৎসরের পুঞ্জীভূত আত্মঘাতী কলহের অবসান হইবে।

সহযোগী আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রীফের গাদার ভিতর শরৎবাবু যেরূপে আত্মগোপন করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে নির্ব্বাচনের কাজে তিনি বেশী সময় দিতে পারিবেন না। ইহা সত্য যে শরৎবাবু মুক্তির পর নেতৃহীন কলিকাতা হাইকোর্টে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন ; কিন্তু ব্রীফের

চাপে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সমাধি অতীতেও হয় নাই—ভবিষ্যতেও হইবে না। ইহা কি সহযোগীকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, ব্রীফের মোহ যদি তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য হইত—তাহা হইলে গত পনের বৎসরে কংগ্রেস ও "ফরোয়ার্ডের" অঙ্গন হইতে স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান হইত—তাহা কি সহযোগীর প্রবন্ধ-লেখক "ফরোয়ার্ডের" স্বীয় কর্ম্মজীবনের নজীর হইতে স্বীকার করেন না?

আজ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই কলিকাতা পৌরজনের পক্ষ হইতে ইলেকট্রিক এনকোয়ারী কমিটির সমক্ষে শরৎবাবু যে সারগর্ভ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কথা হয়ত সহযোগী এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই। উক্ত সাক্ষ্যর দিবস কলিকাতা হাইকোর্টের কতগুলি ব্রীফের মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি কয় সহস্র মুদ্রার লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন, তাহা সহযোগী একবার অনুসন্ধান করিয়া জানিবেন কি?

আমরা সহযোগীকে আশ্বাস দিতেছি যে, বাঙ্লায় অখণ্ড কংগ্রেসী দল গঠনের প্রচেষ্টা সফল হইলে শরৎবাবু ব্রীফের গাদার ভিতর হইতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া নির্ব্বাচনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন। কংগ্রেসের ভিতরের দলাদলি না মিটিলে কংগ্রেসের ছাপ দিয়া কাহাকেও যেন নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে না নামান হয়—এইরূপ অভিমত সুভাষচন্দ্রও প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা আরও অবগত হইলাম যে, বাঙ্লার কোনও উপদল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কলিকাতায় আসিয়া কলহ নিষ্পত্তি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তার করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতায় আসিবেন কিনা? শরৎবাবু শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এখানে আসিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সন্দেহাকুল সহযোগীকে আমরা জানাইতেছি যে, বিশেষ কোন অপ্রত্যাশিত অঘটন না ঘটিলে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বাঙ্লা কংগ্রেসের কলহের অবসান হইবে।

সম্মিলিত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শরৎবাবু যদি আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন করিবার ভার প্রাপ্ত হন তাহা হইলে কংগ্রেসী প্রার্থী মনোনয়নে তাঁহার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সহযোগীর সহিত আমরাও একমত যে, "প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা বর্ত্তমান কংগ্রেসী সদস্যরূপে কর্পোরেশনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে খাঁটি কংগ্রেসী কর্ম্মীর সংখ্যা নিতান্তই বিরল...... বৎসরের ৩৬০ দিন যাঁহারা অকংগ্রেসীর মত জীবন-যাপন করিয়া পাঁচ দিনের জন্য খদ্দরের ধুতি ভাড়া করিয়া কংগ্রেসী দলে ভিড়িয়া পড়েন এবং কংগ্রেসী তিলক কপালে পরিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হন", তাঁহাদিগকে পুনরায় মনোনীত করিলে পূর্ব্বাপরের ন্যায় আর একটি প্রহসনের অভিনয় অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্ব্বাচন শেষ হইতে না হইতেই কংগ্রেসী দল বিখণ্ডিত উপদলের সমষ্টিতে পরিণত হইবে। আর যাঁহারা নয় বৎসর বা তদূর্দ্ধ-কাল কর্পোরেশনে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের কাহাকেও কংগ্রেসের ছাপ প্রদান করা কর্ত্তব্য নয়। এই নীতি পূর্ণভাবে অবলম্বিত হইলে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকেও কাউন্সিলার পদের জন্য মনোনীত করা যাইতে পারে না। তবে সন্তোষবাবু যে বিনা বাধায় অল্ডারম্যানরূপে কর্পোরেশনে প্রবেশ করিতে পারেন—ইহা সুনিশ্চিত; কারণ কর্পোরেশনে তাঁহার অবস্থান প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য। এবং আগামী নিব্বাচনে যতদূর সম্ভব পুরাতন সদস্যদের বাদ দিয়া নূতন সদস্য মনোনীত করা উচিত। এবং এইভাবে মনোনয়ন করিলেই কর্পোরেশনে দলাদলির বীজ যাহা লুক্কায়িত আছে তাহার বিনাশ হইবে।

-:০:-

বেঙ্গল ষ্টোরস্ ও বাঙ্গালী

গত ১৭ই পৌষের 'খেয়ালী'তে বেঙ্গল ষ্টোরস্এ সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে বেঙ্গল ষ্টোরস্ ও আমাদের মধ্যে যে পত্রের আদান প্রদান হইয়াছিল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। গত সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, বাঙ্গলা দেশে থাকিয়া বাঙ্গালীদের নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া যদি মাড়োয়ারী সম্প্রদায় ধনী হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে।

ইহার পর আমরা বেঙ্গল ষ্টোরস্ হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইয়াছি :—

মাননীয় "খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু

বেঙ্গল ষ্টোরস্ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আপনার পত্রিকায় যে সমস্ত ভ্রান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য আমার এই পত্রখানা প্রকাশিত হইলে সুখী হইব।

মিঃ রমাপতি ব্যানার্জ্জি বেঙ্গল ষ্টোরসএর ম্যানেজাররূপে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি সাময়িক ছুটীতে (temporary leave) আছেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে নিম্ন স্বাক্ষরকারী স্বীয় কর্ত্তব্য ও তৎসহ ম্যানেজারের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। সুতরাং ম্যানেজারের পদচ্যুতি ও অন্যান্য সংবাদের কোন প্রকার ভিত্তি নাই।

ব্যবসায়ের প্রসারতা, উন্নতি ও অবস্থান্তরের সহিত কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কর্ম্মচ্যুতি, সময়ে সময়ে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই হিসাবে ষ্টোরস্এর দুই একজন কর্ম্মচারীর নিয়োগ অথবা কর্ম্মচ্যুতি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িলে তাহা পরিচালকবর্গ নিজেদের কর্ত্তব্য অনুযায়ী সম্পাদন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে আপনার পত্রিকায় এই প্রকার কর্ম্মচ্যুতি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাদেশিকতা বা অন্য কোন প্রকার অভিসন্ধি নাই।

কিছুদিন হয় বাবু দামোদর দাস ডালমিয়াকে হেড অফিস হইতে ষ্টোরসএ special officer রূপে পাঠান হইয়াছে।

আশা করি ষ্টোরস সম্বন্ধে অবান্তর সংবাদে বিশ্বাস করিয়া অন্যায় অবিচার করিবেন না। ইতি

নিবেদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সহ-ম্যানেজার—

বেঙ্গল ষ্টোরসএর উক্ত পত্রের সহিত যদি বাস্তব ঘটনায় যথাযথ মিল থাকিত তাহা হইলে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ক্ষেত্রে কবির উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে হইতেছে—"Things are not what they seem."

অযোগ্যতা, অক্ষমতা প্রভৃতির জন্য কর্ম্মচারীর কর্ম্মচ্যুতি যদি ঘটে তাহা হইলে বলিবার কিছুই থাকে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, যে সমস্ত কর্ম্মচারী তিন বৎসর যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছেন, অতীতে যাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই নাই এরূপ কর্ম্মচারীর কর্ম্মচ্যুতি ঘটিল কেন? এসিষ্ট্যান্ট পারচেজার (ক্রয় বিভাগের সহকারী) ধীরেন মুখার্জ্জিকে কেনই বা প্রথমে কর্ম্মচ্যুত করা হয় এবং কেনই বা পরে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতিপত্র প্রত্যাহার করা হয়, সে কথা কর্ত্তৃপক্ষদের জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? মিঃ আর, সি, ব্যানার্জ্জি, ধীরেন মুখার্জ্জি, জিতেন্দ্রচন্দ্র কুমার প্রভৃতিকে কি জন্য কর্ম্মচ্যুত করা হয়? মিঃ আর, সি, ব্যানার্জ্জির চাঁকুরী নাই,—অথচ মাসমাহিয়ানার খাতায় তাঁহার নাম আছে—ইহা কি কৌতুককর নহে?

সহ-ম্যানেজার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পত্রে আমাদিগকে জানাইতেছেন যে—"কিছুদিন হয় বাবু দামোদরদাস ডালমিয়াকে হেড-অফিস হইতে ষ্টোরসএ Special officer রূপে পাঠানো হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে বুঝাইতে চান যে, ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়াছে, মিঃ ডালমিয়ার নিয়োগের অন্য কোনও নিগূঢ় কারণ নাই। কিন্তু সত্যই কি তাই? আমরা এ সম্বন্ধে মিঃ ভট্টাচার্য্য তথা বেঙ্গল ষ্টোরসএর কর্ত্তৃপক্ষকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই।

(১) নভেম্বরের শেষে—২৩শে তারিখে—শ্রীযুক্ত রমাপতি ব্যানার্জ্জির উপর বাবু দামোদরদাস ডালমিয়াকে অবিলম্বে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিবার আদেশ করিয়া পত্র আসিয়াছিল কিনা?

(২) ৩রা ডিসেম্বর তারিখে মিঃ ব্যানার্জ্জির স্থানে কাজ করিবার জন্য আদেশ করিয়া মিঃ এস, এন, ভট্টাচার্য্যের নিকট কোনো পত্র আসিয়াছিল কি না? উক্ত পত্রে বাবু দামোদরদাস ডালমিয়া বেঙ্গল ষ্টোরস পুনর্গঠন (Re-organise) করিতে যাইতেছেন, অতএব মিঃ ভট্টাচার্য্য যেন তাঁহার সমস্ত কর্ম্মচারী লইয়া ডালমিয়াকে সাহায্য করেন—এরূপ অনুরোধ ছিল কিনা?

(৩) হেড-অফিস হইতে পত্রযোগে মিঃ ডালমিয়ার নূতন কার্য্যাবলী বন্ধ করা

শ্রীশান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তত্ত্বাবধানে

ফিল্ম

কোম্পানীর

প্রথম অবদান

৺ডি, এল, রায়ের

পরপারে

ঃ শ্রেষ্ঠাংশে ঃ

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(এম, টির সৌজন্যে)

অহীন্দ্র চৌধুরী
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
সন্তোষ সিংহ
শৈলেন চৌধুরী
অনুপম ঘটক
জ্যোৎস্না গুপ্তা
বীণা দেবী
নিভাননী দেবী
নগেন্দ্রবালা

ঃ পরিচালনা ঃ

যতীন দাস

ঃ সুরশিল্পী ঃ

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

হইয়াছে কিনা? যদি তাঁহার নিয়োগের মধ্যে কোনো গলদ্ বা রহস্য না থাকিবে তাহা হইলে এরূপ আদেশ কেন আসিল?

মিঃ ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন :—

"রমাপতি ব্যানার্জ্জী বেঙ্গল ষ্টোরস্-এর ম্যানেজাররূপে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি সাময়িক ছুটীতে আছেন।...

ইহার উত্তরে মিঃ ভট্টাচার্য্যকে আমরা জিজ্ঞাসা করি :—

(১) মিঃ ব্যানার্জ্জী কি ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছিলেন? আমরা যতদূর জানি তিনি কোনো ছুটীর দরখাস্ত করেন নাই।

(২) তাঁহাকে কতদিনের দেওয়া হইয়াছে?

(৩) ম্যানেজারের পদটি কি হইল? মিঃ ভট্টাচার্য্য কি মিঃ ডালমিয়ার আদেশ অনুসারেই কাজকর্ম্ম করিতেছেন না?

এই প্রসঙ্গে মিঃ ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে দুই একটি অপ্রিয় সত্য আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। অবাঙ্গালী যখন বাঙ্গালীর সহিত দুর্ব্ব্যবহার করে তখন ব্যপারটা তবু বুঝা যায় কিন্তু তিনি বাঙ্গালী হইয়া কিরূপে অন্যায়ের সমর্থনে এইরূপ অর্দ্ধসত্য লিখিয়াছেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ঘরের শত্রু বিভীষণ হইয়াই কি তিনি নিজেকে বিখ্যাত বা কুখ্যাত করিতে চান্? গত দুই মাসের মধ্যে যে কয়জন পুরাতন লোককে বরখাস্ত করা হইয়াছে তাহার কারণ কি? এবং তাহার স্থলে কেনই বা চারজন নূতন লোককে নিযুক্ত করা হইয়াছে? এ সম্বন্ধে এই বাঙ্গালীদ্রোহী সহ-ম্যানেজারটি কি বলেন?

বাবু দামোদারদাস ডালমিয়ার কার্য্যকালের প্রারম্ভ হইতে এক নূতন অভিযোগ আমাদের কানে আসিতেছে। এই দোকানের মনোহারী ও বিলাসদ্রব্যের (Novelty goods) সবটাই নাকি এখন আর স্বদেশী নহে! কোনো কোনো ক্রেতা এরূপ অভিযোগও আমাদের নিকট করিয়াছেন যে, দোয়াতদান, ইলেকটিক আলোকদান, সেলুলয়েডের গহনার বাক্স প্রভৃতি বিদেশী বলিয়াই মনে হয় অর্থাৎ ইহাদের কোনটি বা অষ্ট্রীয়ায়, কোনটি বা ইংলণ্ডে প্রস্তুত (যেমন চুল আঁচড়াইবার বুরুশ) বলিয়া মনে হয়। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশেই কোথায় প্রস্তুত তাহার ছাপ না থাকায় তাঁহাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়াছে। এই অভিযোগ কতদূর সত্য আমরা জানি না কিন্তু সত্য হইলে একটা স্বদেশী ভাণ্ডারের পক্ষে ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে?

শুনিতে পাই 'বেঙ্গল ষ্টোরস্' এর 'পরামর্শ সমিতিতে (Advisory Board) লেডী অরুণকুমার সিংহ, মিসেস্ এস্, কে, সেন, কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি ও হরিপদ ভট্টাচার্য্য আছেন। ইহাঁদের ন্যায় শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন বাঙ্গালীরা পরামর্শ সমিতিতে থাকা সত্ত্বেও বেঙ্গল ষ্টোরস্এ যদি অন্যায় সাম্প্রদায়িকতা চলে, তবে কি দুঃখের বিষয় নহে? অলস যোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া অবিলম্বে ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করুন—ইহাঁদের নিকট এরূপ অনুরোধ কি অরণ্যে রোদনের সামিলই হইবে?

শিক্ষক চাই

ভবানীপুর অঞ্চলে একটি স্কুলের ছাত্রকে সকালে সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা করিয়া পড়াইবার জন্য একজন বি-এ পাশ শিক্ষক চাই। ক C/o "খেয়ালী" এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

কলিকাতা গ্রন্থাগার সম্মিলন

গত রবিবার খাঁ বাহাদুর আসাদুল্লার সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে কলিকাতা গ্রন্থাগার সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্যার হরিশঙ্কর পাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

রাজা ক্ষিতিন্দ্র দেব রায় মহাশয়, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, মিঃ ও, সি, গাঙ্গুলী, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডেপুটী মেয়র সনৎ রায় চোধুরী, মিঃ কে, পি, চট্টোপাধ্যায়, কুমার হিরণ্য মিত্র, শ্রীহরিহর শেঠ, সুধীর বসু ও তিনকড়ি দত্ত প্রভৃতি সম্মিলনে যোগদান করিয়াছেন।

কলিকাতা গ্রন্থাগার সমিতি গঠিত হওয়া পর্য্যন্ত যে অস্থায়ী বোর্ড কার্য্য করিবেন তাহার সম্পাদক রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীসুধীর বসু, মিঃ ডি, সি, মল্লিক ও শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়।

শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের বহু উৎসাহী কর্ম্মী এই সম্মিলনের সাফল্যকল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন

নেপচ্যুন এ্যাসিওরেন্স কোম্পানী

১০৯, পার্শিবাজার ষ্ট্রীট, বোম্বাইয়ের উপরোক্ত কোম্পানীটি ১৯৩২ সাল মে মাস হইতে জীবন বীমার কাজ আরম্ভ করে। এই তিন বৎসরের মধ্যে এই দিকের সাফল্য এই কোম্পানীর সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। ১৯৩৫ সালের ৩১শে জুলাই যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে কোম্পানী ৩০০২টি পলিসিতে ১৮৫০০০০৲ টাকার জীবন বীমা সংগ্রহ করিয়াছে। উক্ত বৎসরের প্রথমে Life fundএর টাকার পরিমাণ ছিল৪৬৬২২৲

টাকা। বৎসরের শেষে সমস্ত দাবী মিটাইয়া ও খরচ খরচার পরও Life fundএর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,২৭,২৭৪ টাকা। কলিকাতায় ১২ নং ড্যালহৌসী স্কোয়ারে ইহার শাখা অফিস আছে এবং বাঙ্গলা ও আসামেও এই কোম্পানী কাজ করিতেছে ভাল। আমরা নেপ্‌চ্যুনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

নয় বৎসরের গণ্ডী
কোন কোন কাউন্সিলার অতিক্রম করিয়াছেন

কর্পোরেসনে যাঁহারা নয় বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল কংগ্রেস সদস্য পদে বৃত আছেন আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহাদের স্থলে নূতন প্রার্থী মনোনয়ন করা বাঞ্ছনীয়। নিম্নলিখিত কাউন্সিলার গণ নয় বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল কর্পোরেশনে সদস্য হিসাবে আছেন। নয় বৎসরের নীতি অনুসৃত হইলে ইঁহাদের স্থলে নূতন প্রার্থীকে কংগ্রেস মনোনয়ন-ছাপ দেওয়াই শ্রেয়।

ওয়ার্ড নং	
২।	স্যার হরিশঙ্কর পাল
৩।	অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ
৪।	শ্রীনলিন পাল
৫।	শ্রীরাম শেঠ
৬।	শ্রীমদন বর্ম্মন
৭।	ডি, পি, খৈতান
”	কুমার কৃষ্ণ কুমার
৮।	শ্রী প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা
১০।	শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ
১৮।	শ্রীসনৎ কুমার রায় চৌধুরী

ওয়ার্ড নং	
১৯।	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার
২২।	শ্রীধীরেন ঘোষ
”	শ্রীভূপেন ব্যানার্জ্জী
২৩।	শ্রীফনীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
২৪।	শ্রীসন্তোষকুমার বসু
২৮।	শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর
”	শ্রীবিধুভূষণ সরকার
২৯।	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল
৩	শ্রীপুলিন বিহারী সাউ
৩২।	শ্রীজিতেন্দ্রিয়নাথ বসু

আবৃত্তি, তর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা

হাওড়া সজ্ঞ পাঠাগারের উদ্যোগে এবং শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকানাই লাল সরকারের প্রচেষ্টায় হাওড়াতে শীঘ্রই একটি রচনা, তর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কীয় বিষয়গুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

১। আবৃত্তি :—

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জীবন দেবতা" (কেবল স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য)।

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দান" (ভেবেছিলাম চেয়ে নেব…ইত্যাদি) (কেবল স্কুল ছাত্রীদিগের জন্য)

২। তর্ক :—

"ভারতের অতীতে ফিরে যাওয়া উচিৎ" (স্কুল ও কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদিগের জন্য)

৩। রচনা :—

"সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সাহিত্যের প্রভাব" (বাঙ্গালাতে ৪০০ লাইনের মধ্যে লিখিতে হইবে। স্কুল ও কলেজ ছাত্র ও ছাত্রীদিগের জন্য)

নিয়মাবলী :—

আবৃত্তি ও তর্ক বিষয়ে প্রতিযোগীগণ নিজ নিজ স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষের পরিচয় পত্র সহ আগামী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে নাম পাঠাইবেন। তর্ক প্রতিযোগিতা দুই দলের মধ্যে হইবে এবং প্রতি দলে দুইজন ছাত্র বা ছাত্রী থাকিবে। রচনা প্রতিযোগি-গণ স্বীয় রচনা আপনার স্কুল, কলেজের অধ্যক্ষের মারফৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ইহা ব্যতীত আরো কিছু জানিতে হইলে শ্রীকানাইলাল সরকার, সাধনা পাব্লিক লাইব্রেরী, ২৫নং নিলমনি মল্লিক লেন, হাওড়া, বা টেলিফোন নং ৫০ হাওড়ায় অনুসন্ধান করিতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার

উদীয়মান গায়ক

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার ইনি এই বৎসরের ২য় বার্ষিক নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনীতে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি খেয়াল, ঠুংরী ও বাংলা গানে অল্প দিনের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বহু সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া সকলের প্রিয়-পাত্র হইয়াছেন।

সতীশবাবু কাশীর বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র। আমরা এই উদীয়মান গায়কের সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

শেষাংশ পরপৃষ্ঠায় দেখুন

(বিলাসী)

নৃপেন্দ্রনাথের অভিনন্দন

গতপূর্ব্ব মঙ্গলবার নিউ থিয়েটার্সের বড় ষ্টুডিও নৃপেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে সম্মিলিত হয়। এই উপলক্ষে নাচ-গান, খাওয়া দাওয়া বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

পরের দিন আবার দু'নম্বর ষ্টুডিওর কর্তৃপক্ষও অনুরূপ উৎসবের আয়োজন কোরে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কে, সি, এস্ আইকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এর পরে যে বিচিত্র অনুষ্ঠান হয় তার মধ্যে তিমিরবরণের ঐক্যতান বাদন, শচীনদেব বর্ম্মনের গান, সুপ্রসিদ্ধ 'ডি-জি'র কন্যার প্রাচ্য-নৃত্য, অমিয় ভট্টাচার্যের সেতার, তিমির-বরণসহ রাই বড়ালের সরোদ ও তবলা, হরিপদ রায়ের কীর্ত্তন, এম, পি, পাঁড়ের ম্যাজিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর তার চেয়েও বেশী উল্লেখযোগ্য—সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সমাগত অতিথিগণকে বিশেষভাবে জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। বজ্রমুষ্টি মিত্তির মশাই মুক্তহস্ত হয়েচেন—সুখবর বটে!

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

নববর্ষের উপহার

আমরা নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলি হইতে এই বৎসরের জন্য নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

১। জি, ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং
২। আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং
৩। বিকন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
৪। বসু ব্রাদার্স
৫। কন্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব এসিয়া
৬। রেমিংটন টাইপ রাইটার
৭। যতীশ ব্রাদার্স
৮। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক
৯। আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী
১০। ইলেকট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
১১। হিমালয় এসিওরেন্স কোং লিঃ
১২। নেপিয়র ইনসিওরেন্স কোং
১৩। জেহুইন ইনসিওরেন্স কোং

চিত্র-শিল্পী সম্মানিত

বিমল রায় নিউ থিয়েটার্সের উঠ্‌তি আলোকচিত্রশিল্পী। "দেবদাস" তুলে বড়ুয়া যেমনি সোনালি গৌরবের উঁচু সিঁড়িতে উঠেছেন, বিমলও তেমনি বিমল আনন্দ দিয়েছেন ছায়াবাদীদের। তাঁর এ গৌরবের যৎকিঞ্চিৎ সম্মান দিয়েছেন "দেবদাসের" হিন্দি সংস্করণের নায়ক সাইগাল—একটা রূপোর হাতঘড়ি তাঁকে উপহার দিয়ে।

নিউ থিয়েটার্স

দেশ-বিদেশ, শত্রু-মিত্র "দেবদাস" ছবি দেখে প্রমথেশ বড়ুয়াকে স্থান দিয়েছে পরিচালকদের মধ্যে শীর্ষে। তিনি এখন তুল্‌ছেন শরৎচন্দ্রের আর একখানা ছবি "গৃহদাহ"। বড়ুয়ার মহাচিন্তা, তাঁর "দেবদাস" তাঁকে যে সম্মানে ভূষিত কোরেছে—এবার তাঁকে উঠ্‌তে হবে তারও ওপরে। হ্যাঁ, আমরা বলি ভাবনার কিছু নেই—তিনি জয়যুক্ত হবেন, নিশ্চয়ই এবার তাঁর "গৃহদাহে"-র আগুণে চিত্রাকাশে রামধনুর সপ্তরঙের শোভায় দেশ-বিদেশের লোকের চোখ ফিরিয়ে দেবে সেইদিকে। সেদিন আগত ঐ।

* * *

"মিলিওনেয়ার" বা "ক্রোড়পতি" উর্দ্দু ছবি তুলেছেন হেমচন্দ্র। আর এতে নায়ক-নায়িকা হ'চ্ছেন সাইগাল আর মলিনা। আর বাঙলার দুই জনপ্রিয় নট—দুর্গাদাস বাঁড়ুয্যে ও অমর মল্লিক—দু'টি অদ্ভুত অংশে নাম্‌ছেন—এ খবর অনেকেরই জানা আছে। "ক্রোড়পতি" শীঘ্রই আসছে: আর এর যে ট্রেলার হ'য়েছে তা' সত্যই অপূর্ব্ব।

* * * *

শরৎচন্দ্রের "বিজয়া" দু'নম্বর ষ্টুডিওতে তোলার তোড়জোড় চলছে। নিউ থিয়েটার্সের প্রচার-কর্ত্তা আমাদের জানিয়েছেন যে, এখানি ঐ ষ্টুডিওর প্রথম বড় বাঙলা ছবি। খবরটা কী ঠিক? বোধ হয় না। আমাদের যতদূর স্মরণ হয় "মীরাবাঈ" এই ইউনিটের প্রথম বড় বাঙলা ছবি! অবশ্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার পূর্ব্বে এ ছবি তোলা হয়। মিত্তির মশাই কী বলেন? চাটুয্যে মশাই ও মিত্তির মশাইয়ের মধ্যে কি কোন যোগাযোগ নেই?

বি-ইউনিটের কক্ষ হ'তে দীনেশদা'র আক্ষেপধ্বনি শোনা যাচ্ছিল :—

"আর কতকাল রইব বসে
দুয়ার খুলে প্রভু আমার ?"

এমন সময় মিত্তির মশাইয়ের মোটরের হর্ণ বেজে ওঠাতে সে আক্ষেপধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেল! এবং তার পরেই বোধহয় প্রচার-কর্তার নিকট SOS খবর গেল যে "বিজয়ার" বরণ শীগ্‌গির হ'বে। প্রচার-কর্তাও সোৎসাহে তাই. প্রচার করে দিলেন। চন্দ্রা, বিশ্বনাথ, পাহাড়ী, মল্লিক ও সাইগল "বিজয়ার" অঙ্গাভরণ হবেন! নলিনীর ভূমিকায় কে অবতীর্ণা হবেন তাতো প্রচারকর্তা মশাই জানান নি! এটা কি Last minute surprise হ'বে—না settled fact? মিত্তির মশাই কি বলেন ?

* * *

প্রফুল্ল রায়ের হাতে হিন্দী "দেনা-পাওনা"র কাজ জোরে এগিয়ে চলেছে। এমনিভাবে কাজ চল্‌লে দু'মাসের ভেতরই ছবিখানা শেষ হবে—আশা হয়।

* * *

"ডি-জি"-র "অচিনপ্রিয়া" সম্পাদনা কক্ষে বন্দী। মুক্তি পাবে কবে ?

কান্তি গার্ল

মডার্ণ টকিজের "কান্তি গার্লে"র শুটিং আরম্ভ হয়েচে। পরিচালক 'ডি জি' পূর্ণোদ্যমে কোমর বেঁধে কাজে লেগেচেন এবং শ্রীসুধীর সরকার ব্যক্তিবিশেষের স্তাবকতা পরিহার করে 'ডি জি'কে যথাসাধ্য সাহায্য করচেন। তবে এ সুমতি কত দিন থাকে তাই জল্পনার বিষয়—অবশেষে "টানে প্রাণ যায়রে ভেসে…" না হয়।

কালী ফিল্মস

গুণময় বাঁড়ুয্যের "পরভৃতিকা"র চরিত্র নির্ব্বাচন প্রায় শেষ হ'য়েছে। ফেব্রুয়ারীর গোড়াতেই শূটিং আরম্ভ হবার সম্ভাবনা আছে।

রীতেন এণ্ড কোং

এদের "তরুবালা" ফেব্রুয়ারীর গোড়াতেই 'শ্রী'-তে আসচে। "তরুবালা"-র সঙ্গীত পরিচালনা কোরেছেন শ্রীনীরেন লাহিড়ী। সহপাঠী বন্ধু হিসাবে নীরেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। গানে তার স্বাতন্ত্র্য দেখে আমরা বহুবার মুগ্ধ হ'য়েছি—এ বিষয়ে বন্ধুবরের হাতেখড়ি হ'লেও আমাদের বিশ্বাস সে সবায়ের পাবে প্রশংসা।

এই সঙ্গে সমর ঘোষ ওরফে শ্যামসুন্দরের একটি নৃত্য-চিত্র দেখানো হবে। এ বিষয়ে শ্যামসুন্দরের খ্যাতি আছে—আমাদের ধারণা সে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

গুল হামিদের "থায়বার পাশ", কারদারের "বাঘে সিপাহী" আর শেঠীর "নূরে ওহাদাৎ" উর্দ্দু ছবিগুলি তোলা হ'চ্ছে।

আর জ্যোতিষ মুখুয্যের "পায়ের-ধূলো"-ও অর্দ্ধেকের ওপর শেষ হ'ল।

শ্রী

পুরণো কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের রূপ ফিরে গেছে—সত্যই সে "শ্রী" নামে শ্রীমণ্ডিত হ'য়েছে। হারুদা' সেদিন আমাদের ছবি-ঘরটির ভেতর-বাইর দেখালেন—দেখে আমরা সত্যই এঁদের রুচির প্রশংসা করেছি।

আসচে শনিবার থেকে ছবিঘরটির দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে সুপ্রসিদ্ধ ছবি "কুইন অফ্ দি জাঙ্গল" দিয়ে। আমরা ছবিঘরটির জনপ্রিয়তা কামনা করি।

কোয়ালিটি পিক্‌চার্স

এদের "ব্যাথার দান" ছবির সুটিং সুরু হ'য়েছে ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে। ছবিখানা যাতে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নামের কদর রাখতে পারে তার জন্যে পরিচালক হেম গুপ্তের চেষ্টার অন্ত নেই।

এই সঙ্গে এঁরা ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের লেখা "জোয়ার-ভাঁটা" নামে তিন রীলের হাসির ছবি তুলবেন—লেখক ছবিখানা পরিচালনা কোরবেন স্বয়ং।

চন্দ্র ফিল্মস

এই দল নতুন হ'লেও এঁদের উদ্যোগ আয়োজন প্রশংসনীয়। শিল্পী সমাবেশ এঁরা যা কোরেছেন তা কোন নতুন প্রতিষ্ঠানের কল্পনাতীত। যতীন দাস মহলা নিয়ে ব্যস্ত আছেন—ছবি তুলতে আরম্ভ কোরবেন আসছে ২০শে থেকে। কৃষ্ণচন্দ্র দে সঙ্গীত পরিচালনা কোরবেন—এও একটা ভাল খবর।

পপুলার পিক্‌চার্স

এঁদের "ধর্ষিতা"-র নতুন নাম হ'ল "অভিশপ্তা"। ছবিখানা বাঙ্‌লা ও হিন্দি দু'ভাষায় তোলা হবে। এ ছবিখানা সম্বন্ধে জবর খবর হ'চ্ছে—এতে যাঁরা স্ত্রীভূমিকায় নাম্‌ছেন সকলেই শিক্ষিতা ও ভদ্রবংশসম্ভূতা—এঁদের মধ্যে সবচেয়ে আগে উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী শীলা হালদার ও ডলি চৌধুরীর নাম। ব্যাপারটি যদি স্থায়ী হয় তা হ'লে যামিনী মিত্তিরকে আমরা জানাব আমাদের অন্তরের শুভেচ্ছা। পুরুষ ভূমিকায় নামছেন নরেশ মিত্র, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, আর নায়ক সাজবেন নতুন লোক শ্রীপ্রমোদ রায় চৌধুরী। আর একজন পুরুষ ভূমিকায় আছেন—তিনি সকলের প্রিয় সেই ধীরেন ঘোষ—'নাচঘরে'-র ম্যানেজারের পদে ব্রতী। আমরা শুধু ভাবছি 'নাচঘরের' ভূতপূর্ব সম্পাদকের বীজ শেষ অবধি 'নাচঘরের' সবাইয়ের শরীরে প্রবেশ কোরছে। তাই নয় কি ?

রূপবাণী

এখানে "কণ্ঠহার" দেখবার জন্যে বেশ ভিড় জমছে। ছবিখানা ভালভাবে এখনও কিছুদিন চল্‌বে মনে হয়।

"খেয়ালী" মামলার আপীল

বিচার্য্য প্রবন্ধগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

"কমলা-কুঞ্জ" ও "হীরামালিনী"-র তাৎপর্য্য

"কমলার মধু" ধনসম্পদের প্রভাব—নারীর যৌবন লাবণ্য নহে

'বাগবাজার'—অমৃতবাজার পত্রিকা

—মিঃ পি, এন, ব্যানার্জ্জির যুক্তিপূর্ণ সওয়াল—

গত সোমবার আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এ, এন, সেনের এজলাসে খেয়ালী মানহানি মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ হয়। এই মামলার আসামী যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর এজেন্সী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের মানহানির ষড়যন্ত্র করিবার দায়ে বিভিন্ন দফায় আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক মোট ১৮ মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। প্রথম আপীলকারী সাপ্তাহিক খেয়ালীর সম্পাদক এবং দ্বিতীয় আপীলকারী উহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত চারিটী প্রবন্ধ সম্পর্কে মানহানির অভিযোগ আনা হয়। প্রথমতঃ, এই মামলায় তিন জন আসামী ছিল কিন্তু তৃতীয় অসামী এস, কে, সরকার ক্ষমা প্রার্থনা করিবার পর উপরোক্ত দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা চলে এবং তাহারা দণ্ডিত হয়।

আপীলকারীদের পক্ষে এডভোকেট মিঃ পি, এন. ব্যানার্জ্জি বলেন, যে প্রবন্ধ গুলি সম্পর্কে বাদী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল মানহানির মামলা আনিয়াছিলেন তাহাতে বাদী ছাড়া আরও তিন ব্যক্তি, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধায়, স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহরায় ও নলিনীরঞ্জন সরকারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছিল। অথচ শেষোক্ত তিন জনের কেহই মামলা করেন নাই। অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, আসামীরা ডাঃ সান্যালকে "বামার দালাল" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল; বিচারে তাহাদের ১৮ মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। মিঃ ব্যানার্জ্জির মতে এই অভিযোগে বস্তুতঃপক্ষে কাহাকেও দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহার মতে, বর্ত্তমান মামলায় যেরূপ দণ্ড দেওয়া হইয়াছে তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদ্ভুত।

প্রবন্ধগুলি, মানহানিকর কিনা ?

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলেন, অভিযোগে চারিটী প্রবন্ধ মানহানিকর বলিয়া ধরা হয়। উহার প্রথমটি ১৯৩৫ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত হয়। ঐ সময় সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক এবং এস, কে, সরকার (ক্ষমা প্রার্থনা করার স্বরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যতম আসামী) মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিল। উক্ত প্রবন্ধে বলা হয় যে, নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মামলা যাহাতে প্রকাশিত না হয় তজ্জন্য তদ্বির করিতে ডাঃ স্যান্যাল ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন পত্রিকার কার্য্যালয়ে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ ১৯৩৫ সালে ২১শে মার্চ্চ প্রকাশিত হয়। এস, কে, সরকার তখন ঐ পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক। মিঃ ব্যানার্জ্জির মতে উক্ত প্রবন্ধ মানহানিকর হইতে পারে, কিন্তু তাহা ডাঃ সান্যালের পক্ষে মানহানিকর নহে।

অতঃপর মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন যে, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধ ১৯৩৫ সালের ২৫শে এপ্রিল ও ২রা মে তারিখে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় প্রবন্ধে যে বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ তাহাই চতুর্থ প্রবন্ধে শেষ করা হয় কিন্তু প্রবন্ধদ্বয়ে এমন কিছুই নাই, যাহার জন্য আপীলকারীদের নামে মানহানির অভিযোগ আনা যাইতে পারে। উপরন্তু উক্ত পত্রিকার নীতির জন্য উহার পরিচালকমণ্ডলীকেই দায়ী এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের বিষয়েই তাঁহাদিগকেই দায়ী করা উচিত ছিল। প্রবন্ধের অর্থ এবং প্রকাশের উদ্দেশ্য কি তাহা যোগজীবন ও সত্যরঞ্জনের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তাহারা ঐ পত্রিকার কর্ম্মচারী মাত্র। মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন—কল্পনার আশ্রয় লইলেও উক্ত প্রবন্ধগুলি মানহানিকর বলিয়া ধরা যায় না। প্রবন্ধ-লেখকের বক্তব্য বিষয় অস্পষ্ট রাখার ইচ্ছা থাকিলে, যে কোন লোকে উহা তাহার পক্ষে মানহানিকর মনে করিতে পারে। বস্তুত পক্ষে লেখকের উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করিয়াছেন যে প্রবন্ধের "কূটার্থ স্পষ্ট" এবং এমন সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা আইনতঃ অগ্রাহ্য করা উচিত ছিল। মিঃ ব্যানার্জ্জির মতে কূটার্থ যদি স্পষ্টই হইত,

তবে উহা কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য সাক্ষীর জবানবন্দীর উপর নির্ভর করা হইত না। সে-ক্ষেত্রে কোন মামলাই চলিত না। তিনি বলেন যে, কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল একথা তাঁহার মক্কেলগণ জানিত বটে, কিন্তু বাদীকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য তাহাদের ছিল না।

প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য

অতঃপর মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন, তৃতীয় প্রবন্ধে স্যার বিজয়প্রসাদের গৃহের সম্মুখে কবিরাজ অনাথনাথ রায়কে প্রহার করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে লেখক শুধু জানিতে চাহিয়াছেন যে, ডাঃ সান্যাল 'অসহযোগী' হইয়াও মারপিটের পূর্ব্বে কি করিয়া স্যার বিজয়ের বাড়ীতে থাকিতে পারেন। কিন্তু অভিযোগে অন্য কথার অবতারণা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কমলা নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে ডাঃ সান্যাল স্যার বিজয়-প্রসাদের গৃহে গিয়াছিলেন। কিন্তু কমলা নামে কোন স্ত্রীলোক বাগবাজারে থাকে বলিয়া ফরিয়াদী পক্ষ দেখাইতে পারেন নাই। আসামীপক্ষ দেখাইয়াছে যে, "বাগ-বাজার" অর্থ "অমৃতবাজার পত্রিকা" এবং "কমলা" অর্থ "ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী" উক্ত প্রবন্ধের অর্থ দাঁড়ায় এই,—"অমৃতবাজার পত্রিকা" আপনাদের উভয়েরই (স্যার বিজয়প্রসাদ ও নলিনী রঞ্জন সরকার) পৃষ্ঠপোষক; তাই আপনাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল স্যার বিজয়প্রসাদ ও নলিনীরঞ্জন সরকারের মধ্যস্থ হিসাবে গিয়াছিলেন; কমলা নাম্নী কোন স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে যান নাই।

চতুর্থ প্রবন্ধেও ডাঃ সান্যালের স্যার বিজয়ের গৃহে গমনের কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। তাহাতে নলিনী রঞ্জন সরকারের মেয়রের পদে উন্নীত হওয়ার কথা আছে। স্যার বিজয়প্রসাদের চেষ্টায়ই ইহা সম্ভব হইয়াছিল—উক্ত প্রবন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে।

মিঃ ব্যানার্জ্জির মতে, ইহা আদৌ আপত্তিকর নহে। ডাঃ সান্যালকে বেশ্যার দালাল বলিয়া অভিহিত করা আসামীদের উদ্দেশ্য ছিল না। ঐ প্রবন্ধ দ্বারা তাহারা ডাঃ সান্যালের মানহানিও করে নাই।

মানহানি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

অতঃপর মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন, যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির ষড়যন্ত্রের অভিযোগও আনা যায় না। সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে এমন কিছু পাওয়া যায় না—যদ্দারা বলা যাইতে পারে যে, আপীলকারীদের কোন দুরভিসন্ধি ছিল। মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন যে, কোন স্ত্রীলোকের গৃহে দুই ব্যক্তির মধ্যে সৌহার্দ্দ্য হইতে পারে না, সে ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বরং সম্ভবপর।

উপসংহারে তিনি রায়ের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট যোগজীবন ও সত্যরঞ্জন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছেন; এমন কি কাঠগড়ার উপর সাক্ষী বিশেষের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ পর্য্যন্ত তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অতঃপর মিঃ ব্যানার্জ্জি সুদীর্ঘ রায়টী পাঠ করেন।

মঙ্গলবারের শুনানী

আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ শ্রীযুত এ, এন, সেনের এজলাসে গত মঙ্গলবার খেয়ালী মানহানি মামলার আপীলের আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

এই দিনে মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে শ্রীযুত পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী পক্ষ হইতে পুনরায় সওয়াল করেন। শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রথম প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন এস, আর, মুখোপাধ্যায় খেয়ালীপত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং এস, কে, সরকার উক্ত পত্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন। শ্রীযুত সরকার ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাঁহাকে নিস্কৃতি প্রদান করা হইয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি মানহানিকর ছিল না। যদি তাহা হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা দ্বারা উহার লক্ষীভূত ব্যক্তির কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। উক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের নামও উল্লিখিত হইয়াছিল। তিনি সাক্ষী হিসাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধ মানহানিকর তাহা তিনি বলেন নাই। ডাঃ সায়্যাল ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রবন্ধে যে সকল দলের নিকট যাইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি ঐ সকল দলের নিকট গিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, উক্ত প্রবন্ধ পড়িয়া আবেদনকারী ক্ষুণ্ণ হইলেন কেন তিনি (শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়) তাহা বুঝাইতে অসমর্থ। ইহাতে আবেদনকারীর জ্ঞানবুদ্ধি বা নৈতিক-চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করা হয় নাই। প্রবন্ধে কেবল রাত্রিতে পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহে গমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ডাঃ সায়্যাল তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাত্রি ৮৷৷টার সময় শ্রীযুত গুপ্তের বাড়ীতে গিয়াছিলেন; নিশীথ রাত্রে যান নাই। কিন্তু শ্রীযুত গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, ডাঃ সায়্যাল তাঁহার নিকট হইতে প্রায় রাত্রি ১২টার সময় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অন্যান্য সাক্ষীগণের সাক্ষ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একজন সাক্ষী বলেন, উহাকে নিশীথ রাত্রি বলিলে ঠিক বলা হয় না। ইহা কিরূপে মানহানিজনক হইতে পারে, তাহা বুঝা যাইতেছে না, কার্য্যতঃ তাহারা একটা চাঞ্চল্যকর মামলায় সংবাদ চাপা দিবার জন্য গিয়াছিলেন। পরন্তু উক্ত নিবন্ধে শ্রীযুত এন, আর, সরকারের অপরাধের কথাও উল্লিখিত হয় নাই।

তাহার পর শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শ্রীযুত এন, আর, সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ডাঃ সায়্যাল সংবাদ চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এই কথা খেয়ালী পত্রের পাঠকগণকে জানানই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ হিসাবেই লেখক উক্ত নিবন্ধে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

আদালত—যখন উক্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তখন যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন কি?

১ বন্দ্যোপাধ্যায়—না, তিনি পরে সং হইয়াছিলেন।

তদনন্তর শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ব্যাপারকে অপরাধ বলা চলে না। তিনি আরও বলেন, এরূপ অপরাধ সকলেই প্রতি দিন করিতেছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে সওয়াল

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ২১শে মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত হয়। এস, কে, সরকার ঐ সময়ে খেয়ালী পত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন। প্রবন্ধটি মানহানিকর সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা এরূপভাবে লিখিত হইয়াছিল যে, এজন্য নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির অভিযোগ করিবার কিছু ছিল না। কিন্তু এস, কে, সরকার ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাহাকে নিস্কৃতি দান করা হইয়াছে।

নলিনী-বিজয়

অতঃপর শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন; অপর দুইটি প্রবন্ধের মধ্যে একটি ২৫শে এপ্রিল তারিখে এবং অপরটি ২রা মে তারিখে প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় খেয়ালী পত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রথমটিরই পুনরাবৃত্তি বিশেষ। যদি কমলাকুঞ্জ শব্দের অর্থ কোন স্ত্রীলোকের বিলাসকুঞ্জ হয় এবং তাহার আবাসস্থল বাগবাজারে ছিল ধরা হয়, তাহা হইলে বিষয়টি এইরূপ দাঁড়ায় যে, ডাঃ সান্যাল শ্রীযুত এন, আর, সরকার ও স্যার বিজয়প্রসাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপন ব্যাপারে দৌত্য করিয়াছিলেন। আর এই সম্প্রীতি বাগবাজারে কমলার গৃহ হইতে সমুদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইহাতেও ডাঃ সান্যাল যে স্ত্রীলোক-সংগ্রাহক ছিলেন ইহা প্রমাণিত হয় না। কেননা স্ত্রীলোকটিও পূর্ব্ব হইতেই শ্রীযুত সরকার ও সার বিজয়প্রসাদের করায়ত্ত ছিল এবং পূর্ব্বেই তাহার বাড়ীতে তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। তাহার পর ডাঃ সান্যাল তথায় গিয়াছিলেন; ঐ অংশে বলা হইয়াছে যে,—"প্রেম হইয়াছে"। কিন্তু সুবিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নাই।

তৃতীয় প্রবন্ধে স্যার বিজয়প্রসাদের বাড়ীতে ডাঃ সান্যালের উপস্থিতি ও শ্রীযুত অনাথ কবিরাজকে প্রহারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। স্যার বিজয়প্রসাদের সহিত ডাঃ সান্যালের কোনরূপ আত্মীয়তা বা সম্পর্ক আছে কিনা আলোচ্য নিবন্ধে লেখক তাহা জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

আদালত—সেই মামলার কি হইয়াছিল?

শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়—মামলার আপোষ মীমাংসা হইয়াছিল।

সৌভাগ্যের বরপুত্র

কমলা শব্দের অর্থ বিবৃতি করিতে যাইয়া শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, 'ইহা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ নহে। ইহার অর্থ 'ধনসম্পদের অধিশ্বরী, কমলা শব্দটি লক্ষ্মী শব্দ অপেক্ষা শ্রুতিমধুর। কুঞ্জ শব্দের অর্থ স্বর্গীয় প্রেমের কুঞ্জ হইতে পারে। কমলা-কুঞ্জ শব্দে ইহাও বুঝাইতে পারে যে, তাঁহারা দেবী কমলার প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, ইঁহারা উভয়েই সৌভাগ্যের বরপুত্র' ছিলেন। বাগবাজার অর্থে অমৃতবাজার পত্রিকা ভিন্ন অপর কিছু বুঝাইতেছে না।

আদালত:—লেখক সেই বন্ধুত্ব দোষদুষ্ট মনে করিতেছেন কি? উত্তরে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাহা নহে। ইহাতে রাজা ক্ষৌণীশচন্দ্রের কথাও বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, শ্রীযুত এন, আর, সরকার তাঁহার নিকট নিজে যাইতেন এবং স্যার বিজয়প্রসাদের নিকট নিজে না যাইয়াই ডাঃ সান্যালকে পাঠাইতেন।

পরে শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাদী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, কমলা বাগবাজারের 'একটি স্ত্রীলোক। কিন্তু অভিযুক্ত পক্ষের মতে উহাতে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে সৌভাগ্যের বরপুত্রদ্বয়ের মধ্যে সম্প্রীতি জন্মিবার কথা বলা হইয়াছে। একটি স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব না জন্মিয়া সম্প্রীতি জন্মান সম্ভবপর কি? শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, অপর কতকগুলি প্রবন্ধে বাগবাজারের সঙ্গে সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার নামও উল্লিখিত হইয়াছে।

উপমা ও আক্ষরিক অর্থ

শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "হীরা মালিনী" শব্দটি একটি উপমা ব্যতীত অপর আর কিছুই নহে। সুবিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবিয়াছেন, হীরামালিনী যখন দুশ্চরিত্রা ছিল তখন তাহার সঙ্গে যে লোকটীর তুলনা করা হইয়াছে সেও দুশ্চরিত্র। যদি কোনও ব্যবহারজীব বলেন যে, তাহার বৃত্তি বেশ্যাবৃত্তির ন্যায়, তাহা হইলে সেই ব্যবহারজীবকে কেহ বেশ্যা বলিয়া ধরিবেন কি? এ ক্ষেত্রে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। হীরামালিনী শব্দটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না। অভিযুক্ত পক্ষ ডাঃ সান্যালকে স্ত্রীলোক-সংগ্রহকারী বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, স্যার বিজয়প্রসাদ ও শ্রীযুত নলিনী সরকারের মধ্যে তিনি মধ্যস্থতা করিতেন। ডাঃ সান্যাল শ্রীযুত সরকারের দূতরূপে স্যার বিজয় প্রসাদের নিকট যাইতেন। এই জন্য তাঁহাকে হীরামালিনী বলা হইয়াছে।

শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কমলার মধু শব্দের অর্থ ধনসম্পদের প্রভাব—স্ত্রীলোকের যৌবন-লাবণ্য নহে।

বুধবারে মিঃ জে, কে, মুখোপাধ্যায়ের সওয়ালের পর মিঃ ব্যানার্জ্জির প্রত্যুত্তরে পুনরায় সওয়াল করিলে মামলার রায় মুলতুবী থাকে।

ব্যবহারজীব শ্রীযুত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুধীর বসু, শ্রীযুত কানাই লাল দত্ত, শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত পার্ব্বতীশঙ্কর বসু ও শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ বসু আপীলের আবেদনকারীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, এবং সরকারী উকিল শ্রীযুত জে, কে, মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত এ, কে, ভাদুড়ী ও শ্রীযুত সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অপর পক্ষে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হে মোর অপরিচিতা

[উপন্যাস]

শ্রীসুপ্রিয় সোম

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নির্ম্মল হো হো করে হেসে উঠে বল্লে, জান না কী হে: তুমিইও এর মধ্যে খেলোয়াড় ?

তনিমাও হাস্‌লে, কিন্তু সে হাসিতে বিষ ছাড়া আর কিছুই মেশান ছিলো না বলে মনে হলো।

হঠাৎ মনে সন্দেহ উপস্থিত হলো। হয়ত তনিমা আমাকে নিয়ে এ-পর্য্যন্ত খেলা করে এসেচে, আমাকে সত্যিকারের ভালবাসেনি। আর সেটাই ত সম্ভব! আমার মত লোকের পক্ষে ভালবাসা পাওয়া একটা মস্ত বড় সৌভাগ্যের কথা, অত সৌভাগ্য আমার জীবনে কখনো সম্ভব হতে পারে! কিন্তু তনিমার অভিনয় আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠল যখন সে নির্ম্মলকে বল্লে, চলুন নির্ম্মল-দা, আজ সিনেমায় যাই। সাড়ে ন-টা বাজতে এখন দেরী আছে।

নির্ম্মল রাজী হয়ে গেলো, তনিমাকে ও নবকিশোরকে সঙ্গে নিয়ে মটরে ওঠল। নির্ম্মল বা তনিমা কেউ আমার সঙ্গে কোনো কথা কইলে না, কেবল নবকিশোরবাবু অতিথি নারায়ণ এই কথাটা বোধ হয় স্মরণ করে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লে, আসুন অসিতবাবু, আপনাকেও মেসে পৌঁছে দিয়ে যাই!

আমি নমস্কার করে উত্তর দিলেম, না আমি যাই, ধন্যবাদ।

নবকিশোর প্রতি নমস্কারটুকু পর্য্যন্ত করলে না। তারা সকলে হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে গেলো। তনিমার হাসিটাও তীরের মত আমার বুকের ভেতরে এসে নিষ্ঠুরভাবে বড় বিঁধতে লাগল।

পথ হেঁটে চলেচি, টলচি না এটা ঠিক, কিন্তু খুব সুস্থ মানুষের মত যে যাচ্চি না এবেশ বুঝতে পারলেম। নির্ম্মল ও নবকিশোরবাবু আমাকে যা অপমান করেচে সেটা আমার খুব বেশী বলে মনে হলো না, কিন্তু তনিমার হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন আমার বুকে আগুণ জ্বালিয়ে দিলে! আমার সঙ্গে পরিচয়ের থেকে তার সমস্ত আচরণ মনে মনে বিচার করে দেখছিলেম। আমাদের ভালবাসাটা বড় তাড়াতাড়ি হয়েছিলো, এত শীঘ্র কখন ভালবাসা হতে পারে না! আমার মনের খবর তনিমা আগে থাক্‌তেই জান্‌তে পেরেছিলো, তাই হয়ত যেদিন আমার মুখ দিয়ে তাকে আমি ভালবাসি একথা শুনলে, সেদিন হয়ত হঠাৎ তার মনে জেগে ওঠল আমাকে নিয়ে খেলা করবার এক দুর্দ্দমনীয় বাসনা! পারলে না তার মনের ভেতরের বড়লোকী ভাবকে ঘুচিয়ে দিতে, এই গরীবের জীবনটাকে নিয়ে একটা অভিনয় করবার ইচ্ছে জেগে উঠল। আমি গরীব, আমার কেউ নেই, আর আমাকে নিয়েই ওর যত সাধ জেগে উঠল। অথবা নানা ভাবে বড়লোকেরা গরীবদের বুকের রক্ত শুষে নিয়েচে এটাও তারই হয়ত একটা উদাহরণ।

মনে মনে একটা আপোষ করে নিলেম, এই আমার হয়ত নিয়তি! আমার ভাগ্যের গতি দুর্ণিবার, কার সাধ্য ঠেকায়! কিন্তু ওখানেই যে আমার ভাগ্যের বাতি শেষ হয়ে যায়নি, সেটা আমার জান্‌তে বাকী ছিলো। যখন ওটুকুও তনিমাদের বাড়ীতে গিয়ে পেলেম, বরঞ্চ তনিমার ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত হলেম বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেম। ভাবলেম, কোনো বাঁধা নেই আমার, না আছে পেছনে আর না আছে সুমুখে, একেবারে বাঁধন-হারা আমি। কারু মুখ চেয়ে আমার কষ্ট পাবার নেই, কারু হাসি আমার জীবনে অনুপ্রেরণা আনবে

না। আমি থেকে যাবো একটা অচল পর্ব্বতের মত নির্ব্বিকার, উদাসীন। গেছে মা, গেছে বাপ, গেছে বৌদি, গেলো তনিমা! একেবারে একলা। একপক্ষে আমিই ত সুখী!

তনিমা ডেকে পাঠিয়েছিলো কেন তা জানি না। সেদিনকার অপমানের কথা ভেবে প্রথমে ভেবেছিলেম তনিমাদের বাড়ীতে যাবো না, কিন্তু আরও একটা কথা মনে পড়ল। যদি আমি যাই, তা'হলে অপমানকারীদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমি যে অপমানিত বোধ করেচি ও আহত হয়েচি এটা আরোও বেশী করে ওদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে, তনিমাও বুঝবে তাই। আমি যাবোই স্থির করলেম। আমাকে যে অপমান করা হয়েছিলো এটা যে আমি বুঝতে পারিনি এটাই জানাবার জন্যে আমাকে যেতে হলো। যখন তনিমাদের বাড়ীতে গিয়ে পৌছলেম, তখন বেলা ৩টা, আমি ইচ্ছে করেই এ সময়ে এসেছিলেম, কেন না আমার ধারণা ছিলো ও সময় নবকিশোর কলেজ থেকে বাড়ী ফেরে না। আমার অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে ছিলো না, কেবল তনিমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে ছিলো, আর সেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

আমি পৌছতেই দেখতে পেলেম ঘরের ভেতর থেকে বেশ হাসির কোলাহল এসে চারিধার মুখর করে তুলচে। ভেতরে ঢুকে দেখলেম—যেটা আমি মোটেই আশা করিনি তাই। দুটো চেয়ারে, টেবিলের ওপরে পা তুলে দুই বন্ধু বসে আছে আর তনিমা টেবিলের একধারে আছে নতমুখে দাঁড়িয়ে। আমার এই অকস্মাৎ আগমনে তনিমা ছাড়া সকলেই চমকে ওঠল। নবকিশোর বল্লে, কি অসিতবাবু, হঠাৎ যে এ সময়ে?

তনিমার দিকে একবার চেয়ে দেখলেম। সে যেন হঠাৎ ভীত ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠেচে। আমার দিকে সে না চেয়ে মাথা তেমনি আনত করে রইলো। ভাবলেম, বলি তনিমা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো তাই আমার এই আকস্মিক আগমন। স্বেচ্ছায় আমি আসিনি। কিন্তু তনিমার মুখ দেখে আমার কষ্ট হলো—কোথায় যে ঠিক ব্যথাটা লাগল তা বুঝতে পারলেম না। উত্তর দিতে দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে বল্লেম, নির্ম্মল একটা চাকরীর কথা বলেছিলো সেইজন্যে এখানে এলেম। ওর বাড়ীতে গিয়ে দেখা পেলেম না, ভাবলেম এখানে থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।

নবকিশোর নির্ম্মলকে ঠেলে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, কী হে, তুমি নাকি অসিতবাবুকে চাকরী করে দেবে বলেছিলে? তা আমাকে একটা দাওনা ভাই।

নির্ম্মলও হাস্‌তে লাগল। ভারী হাসির বিষয়। শেষে বল্লে, চাকরী দেবার লোকই বটে আমি। ও যেমন একটা বোকা, ওকে

নিয়ে আমি একটু খেলে দেখছিলেম, ও সেটা বুঝতে পারেনি।

এ কথায় আমার মনে হলো, এরা সকলেই আমাকে নিয়ে খেলে দেখছি, ব্যাপার কী? খেলনা হিসেবে আমার তাহলে দাম আছে বুঝতে হবে। আমার ব্যথাও লাগল না, অথচ উদাসীনও রইলেম না। বরঞ্চ যদি কিছু হয়ে থাকে ত' হয়েছিলো একটা আনন্দ; মানুষ মজা দেখে কতকটা কৌতুক অনুভব করে অনেকটা সেই রকম।

এটা কিন্তু সত্যি নয়। পরে আমি একথাটা জানতে পেরেছিলেম। নির্ম্মল আমাকে বন্ধুপ্রেমের জলন্ত উদাহরণ দেখাতে নিঃস্বার্থভাবে চাকরী দিতে চায় নি। চেয়েছিলো অন্য কারণে, নিজের প্রাণের দায়ে। কিন্তু যখন ঘটনা-চক্রে সে জানতে পারলে তনিমাকে তার পিতা তাকে ছাড়া আর কারুর হাতেই তুলে দেবেন না, আর তনিমার বিশেষ আপত্তি পেলে না, তখন সে আর আমাকে চাকরী দেবে কী জন্যে! নিঃস্বার্থভাবে নিষ্কাম হয়ে কোন কাজ করবার যুগ আমরা অনেকদিন হলো পেছনে ফেলে এসেচি। অবশ্য আমিও যে চাকরী পাবার জন্যে ও কথাটা বলেছিলেম তা নয়, এই আকস্মিক অভ্যাগমের একটা হেতু নির্দ্দেশ করতে হবে বলেই ওকথা বলতে হয়েছিলো।

আমি তনিমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বল্লেম, এক কাপ চা খাওয়াবেন?

তনিমা আনচি বলে সেখান থেকে চলে গেলো।

তনিমা চলে যেতেই নির্ম্মল নবকিশোরকে বল্লে, তুমি এরকম একটা বর্ব্বরকে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে দাও কেন?

উত্তরে নবকিশোর শুধু হাসলে। সেই হাসিটুকু নিদারুণ।

নির্ম্মল বলে যেতে লাগল: তনু কি ওর দাসী বাঁদী যে ও তার উপরে হুকুম করলে। ভদ্রলোকের পাড়ায় মেশাত' অভ্যাস নেই, একটা অসভ্য বর্ব্বর কোথাকার! একে এভাবে প্রশ্রয় দিও না।

আমি ভয়ানক বিস্মিত হয়ে গেলেম। এর প্রত্যুত্তরে নবকিশোরের মুখ থেকে কোনো প্রতিবাদ শুনব বলেই আমি আশা করেছিলেম, কিন্তু সেভাবে আশা করাটা যে আমার মত লোকের পক্ষে অন্যায়, এ শিক্ষাটা তখনও আমার হয় নি। তাই আমি নিজেই এই অবমাননা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে বল্লেম, আমি যা বলেচি তা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কিনা জানি না। তোমাকেও কত সময়ে বলতে দেখেচি।

আমি নির্ম্মলের নজির তুলেছিলেম ওর সঙ্গে আমার তুলনা করতে নয়, শুধু এটা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নয় এটাই জানাতে। কিন্তু নির্ম্মলের তখন মনের অবস্থা যে সুরে বাঁধা সে বুঝলে অন্য প্রকারে। দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। কণ্ঠে বিষ ঢেলে দিয়ে বল্লে: যার চাল নেই, চুলো নেই, বাড়ী নেই, ঘর নেই, যার দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে ভাত জোটে না, তার সঙ্গে আমার সঙ্গে তুলনা! তুমি আর আমি! তোমার সঙ্গে আমার তুলনা করতে একটু লজ্জা কোরল না, তুই এত বেহায়া হয়ে গেছিস্।

আমি কী একটা হয়ত' বলতেম, কিন্তু নির্ম্মল আমাকে বাধা দিয়ে বল্লে, আজ বাদে কাল তনিমা আমার বউ হবে, আমি যা ওকে বলতে পারি, তুমি ওকে তাই বলতে পারো! একেবারে ব্রুট্!

মনে হলো, আজ কি আমাকে এরা আবার অপমান করবার জন্যে ডেকে এনেছিলো! সেদিন অপমান করে হয়ত ওদের সাধ মেটেনি, বরং তা দ্বিগুণ হয়ে জেগে উঠেছিলো, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের রক্তের আস্বাদ দ্বিগুণিত ক্ষুধার মত। আমাকে কি এরা অপমান করে পিষে ফেলতে চায়! আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার কি অন্য উপায় ছিলো না, কেন আমাকে অপমান করবার জন্যে এই ঘৃণ্য ছল খোঁজা। আজ বোধ হয় আমি না আসতে পারি ভেবে তনিমাকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছিলো, ওরা জানে তনিমার ডাককে অগ্রাহ্য করবার শক্তি আমার নেই।

(ক্রমশঃ)

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন—দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

শ্রীঅহোবল

৩০শে ডিসেম্বর সোমবার বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় দিবসের সান্ধ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ Prize Winnersদের demonstration হইয়া যাইবার পর বাংলার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "পুরিয়া" ও "পুরিয়া ধানেশ্রী" রাগের দুই খানি খেয়াল গান করেন। সময়োচিত রাগ-নির্ব্বাচন ও যথোপযুক্ত শুদ্ধ রীতিতে গান দুইখানি গীত হইবার জন্য শ্রোতৃবর্গের বিশেষ তৃপ্তি হইয়াছিল। ইহার পর শ্রীমান্ বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী সেতারে খাম্বাজের একটি গৎ বাজান। ইঁহার সহিত শ্রীযুক্ত জ্ঞান মজুমদারের তবলা-সঙ্গত উপভোগ্য হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীযুক্তা মায়াদেবী বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে দুই খানি ইমনের খেয়াল গান করেন। তাঁর তান ও স্বরগ্রামের প্রণালী সত্যই প্রশংসনীয়; তবে ভবিষ্যতে তিনি যদি তান-বৈচিত্র্যের দিকে আরও অবহিতা হন—তাহা হইলে তাঁহার গান আরও উৎকৃষ্ট হইবে। বর্ত্তমানে আমরা বাংলার বিশিষ্ট ওস্তাদদেরও মুখে যাহা শুনিতে পাই—তাহাতে আমাদের ধারণা হইয়াছে যেন তানের monotony কম বেশী সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান এবং ইহা শুধরাইয়া লওয়া বিশেষ শক্ত। যাহা হউক, শ্রীযুক্তা মায়াদেবীর প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ ধারণা আছে—তিনি যত্ন লইলে দিন দিন আরও উন্নতি করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহার পরে শ্রীযুক্ত গোবিন্দবাবু নাক্‌ফোঁপা হার্‌মোনিয়ামে সিন্ধুড়া রাগের ঠুম্‌রী বাজাইলে, কুমারী বীণাপাণি মুখার্জ্জী ইমনের খেয়াল গাহিলেন। কুমারীর গান প্রশংসনীয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মেঘরাগের একখানি খেয়াল ও একটি ঠুম্‌রী গান। ইঁহার সহিত সঙ্গত করেন শ্রীযুক্ত সর্জু প্রসাদ মিশির। ইহার পর মাষ্টার কুমার গন্ধর্ব একটি শুদ্ধ কল্যাণের খেয়াল ও বিখ্যাত ঠুম্‌রী "পিয়া বিন্ নাহি আওত চয়ন" ও একটি ভজন গান করেন। বালকের ঠুম্‌রী গানটি শুনিবার সময় মনে হইতেছিল যেন স্বনামধন্য গুণিপ্রবর আবদুল করিম খাঁ সাহেবের সুললিত সুরলহরী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া, প্রাণকে স্পর্শ করিল। বালকের অপূর্ব্ব কলাকৌশল দেখিয়া আমাদের চিত্ত যখন অনির্ব্বচনীয় রসোপভোগ করিতেছে, তখন পরিচালক মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে তরুণ শিল্পী কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মন্ একখানি নয়, তিন তিন খানি বাংলা গান শুনাইবেন। ধন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বুদ্ধি! Science লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের ললিত কলার আসরে স্থান না হওয়াই উচিত। শাস্ত্রে নাকি বলে যে শুষ্ক তার্কিকের রসোপলব্ধি হইতেই পারে না—আজ আমরা সে সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলাম। প্রথমতঃ classical music এর আসরে তথাকথিত বাংলা গানের প্রবেশ যে কত অসমীচীন তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই জানেন।
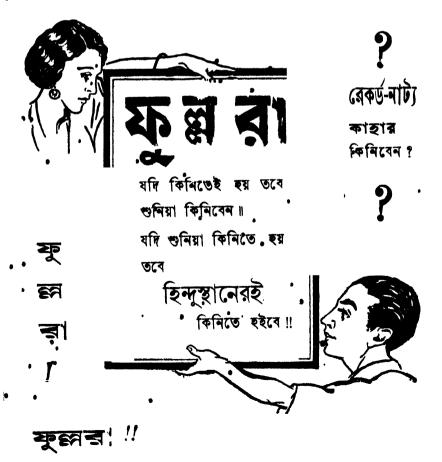
দ্বিতীয়তঃ বাংলা গান গাহিবারও একটা রীতি আছে। কুমারের উচ্চারণের অশুদ্ধি, সুরের ব্যভিচার, লয়ের অজ্ঞতা—এই তিনটী মিলিত হইয়া যে কিরূপ বিসদৃশ হইয়াছিল তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন—তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। একটী গান গাহিলেও না হয় কোনরূপে চলিত কিন্তু উপর্য্যুপরি সুর-তান-লয়-বিহীন গান শোনার মত ধৈর্য্য অন্ততঃ আমাদের নাই। তবে গায়কের অনুরাগী ভক্তবৃন্দের অভাব সে আসরে ছিল না। ইহার পর কুমারী গীতা রায়ের গান। আমরা পূর্ব্বে ইহার গান শুনিয়াছিলাম কিন্তু সেদিনের মত নিরাশ আমরা কোন দিনই হই নাই। ইহার পর লাহোরের প্রোঃ করম ইলাহির তবলা-বাদন। ইনি বৃদ্ধ, ইঁহার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব না—যাহা হউক, তাঁহার লহরা—তাঁহার পূর্ব্ব গৌরবের ভগ্নাবশেষ—আমাদের অনেকখানি তৃপ্তি দিয়াছিল।

তারপর নাটোর দরবারের বর্ত্তমান সেতারী প্রোঃ সফিউল্লা খাঁ সুরবাহারে পঞ্চমের আলাপ ও সিতারে একটি রাগমালার গৎ বাজাইলেন। মন্দ লাগিল না। তবে সেতারের সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে পর আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভারত প্রসিদ্ধ গুণিশ্রেষ্ঠ স্বর্গতঃ ইমদাদ্ খাঁ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র, যন্ত্র সঙ্গীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও যাঁহাকে অত্যুক্তি হয় না সেই এনায়েৎ খাঁ সাহেবের কথাই কেবল মনে পড়ে—সুতরাং অন্য কোন সেতারীর কলাকৌশলের যথাযোগ্য সমালোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। চন্দ্রের জ্যোতিতে গ্রহনক্ষত্রাদির জ্যোতি যেরূপ প্রকাশ পাইতে পায় না—এনায়েৎ খাঁ সাহেবের বাজনা যাঁহারা শুনিয়াছেন—তাঁহাদের কাছে অন্য সেতারীর প্রতিভাও সেইভাবে উন্মেষিত হয় না। এনায়েৎ খাঁ সাহেব বর্ত্তমানে অসুস্থ হইয়া কলিকাতার বাহিরে গিয়াছেন—এজন্য কন্‌ফারেন্সে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই—আশা করি আগামী কন্‌ফারেন্সে তিনি যোগদান করিয়া আমাদের তৃপ্তিবিধান করিবেন। ইহার পর কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর অপূর্ব্ব (?) নৃত্য। আমরা উদ্যোক্তৃবর্গের আয়োজনের কোনরূপ বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নহি, কিন্তু কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর নৃত্য এবং ইহার পর মহারাজ বোস ও ডলি দত্তের ন্যাকামি যে ভদ্রসমাজে সম্পূর্ণ অচল—ইহা উদ্যোক্তৃবর্গের বিবেচনা করা উচিত ছিল। কুমারী ভাদুড়ীর সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিব—সে বালিকা; কিন্তু—বোস ও দত্ত—যাহাদের বেশ বয়স হইয়াছে—তাহারা যে এতদূর নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিতে পারে—তাহা কল্পনারও অতীত। ইঁহারা আবার উদয়শঙ্করের নৃত্যের অনুকরণ করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন—এমন কি, তাঁহার বেশভূষার ত্রুটিবিচ্যুতিরও! এই দুই নৃত্য-পুঙ্গবের

নাচের পূর্ব্বেই কুমারী আশা ওঝার তরুণ ভ্রাতা মাষ্টার নারায়ণ ওঝা কত্থক সম্প্রদায়ী নৃত্য করিয়াছিল। আমরা দুটী নিকৃষ্ট itemএর মাঝে এই বালকের তাল-লয়শুদ্ধ নৃত্য দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। নাচের পালা সাঙ্গ হইবার পর বাংলার ওস্তাদ প্রোঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী দরবারী কানাড়ার দুখানি খেয়াল (একখানি বিলম্বিত ও একখানি দ্রুত লয়ের) ও একটি ঠুংরী শুনাইলেন। গিরিজাবাবুর খেয়াল গান মোটেই জমে নাই—আগের রাত্রে প্রোঃ নারায়ণ রাও ব্যাসের অনবদ্য সঙ্গীত লহরী আমাদের মনের উপর অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—তিনি বিলম্বিত লয়ে দরবারীর যে রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—তাহাতে পর দিন গিরিজাবাবুর গান মোটেই effective হইল না। প্রোঃ নারায়ণরাও ব্যাসের বাণী-শুদ্ধি, তাঁহার তান ও লয়ের উপর অসাধারণ দক্ষতা ও বৈচিত্র্য—তাঁহার ভাবশুদ্ধি, তাঁহার বিলম্বিত লয়ের যথারীতি গতি—ইহার কোনটাই গিরিজাবাবুর গানে আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। ইহার উপর ব্যাসের সুললিত কণ্ঠের সহিত তুলনায় গিরিজাবাবুর শুষ্ক ও কর্কশ কণ্ঠের contrast, বড়ই অসহনীয় হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া আমাদের সেদিন এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে গিরিজাবাবুর খেয়াল গানের কোনও গৌরব নাই কারণ খেয়াল ও ঠুংরীর মধ্যে যে তানগত বৈশিষ্ট্য আছে, গিরিজাবাবুর গানে তাহা একেবারেই দেখিতে পাওয়া গেল না। আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিব না; তবে সঙ্গীতরত্নাকর ন্যাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব যেভাবে তাঁহার অনুপম demon-strationএর দ্বারা খেয়াল ও ঠুংরীর তানের standard সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, গিরিজাবাবু যদি একান্তই খেয়াল গান তাহা হইলে যেন সেদিকে বিশেষ প্রণিধান করেন। এই তো গেল গিরিজা-বাবুর খেয়াল সম্বন্ধে বক্তব্য। তাহা ছাড়া, গিরিজাবাবুর গানে আমরা প্রোঃ ব্যাসের কলাকৌশলের যে কয়েকটি ব্যর্থ অনুকরণ লক্ষ্য করিলাম—তাহাতে তাঁহার গানের উপর আমরা কোন মর্য্যাদা দিতে ইচ্ছা করি না। আর গিরিজাবাবু সেদিন দ্রুতলয়ের যে কানাড়া গাহিলেন—সেখানি পূর্ব্বরাত্রের প্রোফেসর ব্যাস কর্ত্তৃক গীত বিলম্বিত লয়ের চিরপ্রসিদ্ধ দরবারী বলিয়াই বোধ হইল। উভয়ের বৈসাদৃশ্য এত বেশী, এবং গিরিজাবাবুর রীতি এতই অশোভন ঠেকিল—যে সে সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। ইহার পর গিরিজা-বাবুর ঠুংরী গান। গিরিজাবাবু বাঙালীর মধ্যে ঠুংরী অতি সুন্দর গান বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল কিন্তু কনফারেন্সে নাসিরু-উদ্দিন খাঁ সাহেব ঠুংরীর যে আদর্শ আমাদের চোখে ধরিয়া দিয়াছেন; গত বৎসর ফৈয়াজ খাঁ সাহেবও যেভাবে ঠুংরী গাহিবার রীতি

দেখাইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান বৎসরে প্রোঃ নারায়ণ রাও ব্যাসও যেভাবে গাহিলেন—এ সকলের সহিত তুলনা করিলে গিরিজাবাবুর ঠুংরী গানও নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। যাহা হউক গিরিজাবাবুর খেয়াল অপেক্ষা ঠুংরী গানের চাল আমাদের ভালই লাগে—এবং তিনি যদি খেয়াল না গাহিয়া কেবল ঠুংরীই গান—তাহা হইলে আমরা তাঁহার ঠুংরী গানের কদর দিতে প্রস্তুত আছি। যাহা হউক, জনৈক কলাভক্ত ধনীর কৃপায় দুইটী পেল্লাই কাপ গিরিজাবাবুর ভাগ্যে জুটিয়াছে—এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ্য।

গিরিজাবাবুর পর প্রোঃ ওয়ালিউল্লা সেতারে দরবারী আলাপ ও বিহারীর একখানি গৎ বাজাইলেন। ইঁহার সহিত সঙ্গত করিয়াছিলেন ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল্ সি, মহাশয়। বাজনা ও সঙ্গত অতীব উপভোগ্যই হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু অরসিক পরিচালক মহাশয় বার বার লালবাতি জ্বালাইয়া ইঁহাদের উঠাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে রসোপভোগেরও লালবাতি জ্বলিল। Demonstrationএর আসরে রামা শ্যামাকে যথেচ্ছা সময় দিতে পরিচালক মহাশয় মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু এই দুইটী বিশিষ্ট গুণীর সমাবেশ তাঁহার বোধ হয় অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। বলিহারী পরিচালনার! কলিকাতার বাজারে এলাহাবাদী মাল বেপরোয়া না চালাইলেই বোধ হয় কর্তৃপক্ষেরা ভাল করিতেন। যাহা হউক ইহার পর প্রোঃ হাফিজ আলি খাঁর স্বরোদ আরম্ভ হইল। ইঁহার বাজান সম্বন্ধে সমালোচনার আর কোন আবশ্যক করে না। খাঁ সাহেব অতি সুন্দর বাজাইলেন—খাঁ সাহেব মালিগোরার আলাপ করিয়া, যথাক্রমে দুর্গা, তিলঙ ও পিলুর গৎ বাজাইলেন। ইঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে music demonstration দিবার সময় ইনি রাগের নামটী বলিয়া দিলে ভাল করিতেন—কারণ বহু শিক্ষার্থীও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিল।

ইহার পর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য ইন্দোর দরবারের সুপ্রসিদ্ধ কলাবিৎ প্রাতঃস্মরণীয় বৈরাম খাঁর বংশধর, তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী আলাবন্দে খাঁর সুযোগ্য পুত্র সঙ্গীতরত্নাকর নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব গান আরম্ভ করিলেন। সুরভারতীকে সংস্কৃত শ্লোকে অভিবন্দন করিয়া, খাঁ সাহেব সঙ্গীত সাধনার চরমোৎকর্ষ—"আলাপ" আরম্ভ করেন। তাঁহার আলাপের অনিন্দ্যসুন্দর অপূর্ব্ব পদ্ধতি আমরা আর কখন কাহারও নিকট শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—সঙ্গীত জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্, সুরভারতীর একনিষ্ঠ সাধক প্রোঃ নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব—যখন আলাপ আরম্ভ করিলেন—শ্রোতৃবর্গ তখন চিত্রার্পিতের ন্যায়, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান-পরিশূন্য অন্তরে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর নির্ম্মল সাত্ত্বিক রস অনুভব করিয়াছিলেন। প্রোঃ নাসিরুদ্দীনের গান সম্বন্ধে যাঁহাদের পূর্ব্বে কোন ধারণা ছিল না এবং সাধারণতঃ ধ্রুপদের সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশেষ কিছু ধারণা নাই—অপেক্ষাকৃত হাল্কা সঙ্গীতের অনুরাগী যাঁহারা, এতাদৃশ শ্রোতৃবর্গকে যখন গুণিপ্রবর বলিলেন "দেখি, আমার গান আরম্ভ হইলে তোমরা কেমন করিয়া উঠিয়া যাও" তখন হয়তো কাহারও বা চিত্ত তাঁহার এই উক্তিতে দম্ভের বা অভিমানের গন্ধ আছে বলিয়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার গান মধ্যরাত্রের পর আরম্ভ হইলেও, পলকহীন নেত্রে শ্রোতৃবর্গ যখন উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, তখন মনে হইল যে তাঁহার ঐ উক্তি বৃথা দম্ভের দ্বারা অনুবিদ্ধ নহে, উহা তেজস্বীর ভূতার্থব্যাহৃতি। মানব দীর্ঘতপস্যার পরেও এরূপ সুরলহরীর অধিকারী হইতে পারে কি না—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। নাসিরের মধ্যে দেবদত্ত ঐশ্বর্য্য আছে—লোকোত্তর বিভূতি আছে—শাপভ্রষ্ট সাধকের মত মনুষ্যলোকে তাঁহার জন্ম হইয়াছে নহিলে এ কণ্ঠ, সঙ্গীতে এ অনন্যসাধারণ নৈসর্গিক প্রতিভা বহু সাধনায়ও সম্ভব হইতে পারে না। আমাদের কেবলই মনে হইতেছিল যে নাসির ইহলোকের বস্তু নহে—সে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক নহে—তাহার রাজ্য আরও উপরে—যেখানে বাণী লীন, যেখানে কেবল একমাত্র সুরব্রহ্ম বিরাজমান, সেই মহনীয় লোকে নির্গুণ ব্রহ্মসাধনায় মগ্ন এই তপস্বী। আমরা নাসিরের সম্বন্ধে সাধারণভাবে সমালোচনা করিব না—কারণ সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহার সমালোচনা করিলে, আমাদের সমালোচনারই গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে—তিনি সমালোচনার অতীত তীরে!

রাত্রি ২ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

বিগত ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার, বেলা ৮৷৷০ সময় তৃতীয় দিবসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রথমে Prize Winner দের

demonstration হইয়া যাইবার পর পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরজীর পুত্র শ্রীমান্ বাপু পলুস্কর টোড়ির একখানি খেয়াল গাহিলেন। তাঁহার গানের পদ্ধতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। ইহার পর শ্রীচম্মু মিশ্র টোড়ির একখানি খেয়াল গাহিলে শ্রীমান্ রাধিকামোহন মৈত্র সরোদে ললিত ও ভৈরবী বাজাইলেন শ্রীমানের শিক্ষা উত্তম এবং ইঁহার ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। ইহার সহিত শ্রীসূর্য্যকুমার পাল তবলা-সঙ্গত করেন। অল্প বয়সে ইনিও বেশ নিপুণতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার পর মিঃ আপ্তে আসাবরীর একখানি খেয়াল গাহিলে প্রোঃ যোডাস একখানি ভৈরবী গাহিলেন। তারপর গান সুরু করিলেন প্রোঃ বিজয় মুখোপাধ্যায়। ভদ্রলোক কেন যে সঙ্গীতের আসরে গাহিতে আসেন—তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইঁহার কণ্ঠ দিন দিন এরূপ বিকৃত হইয়া পড়িতেছে, যে আর চলে না—গানটী আবার আরম্ভ করিয়াছিলেন "বিলাসখানি টোড়ি"র। পূর্ব্বদিন সকালে প্রোঃ পটবর্দ্ধনের অপূর্ব্ব বিলাসখানি শুনিবার পর, কাণে তখনও সুরের ঝঙ্কার বাজিতেছিল—বিজয়বাবুর গান সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্মৃতি যে কোথায় লুপ্ত হল—শ্রোতৃবর্গ তাহা আর খুঁজিয়া পাইলেন না। বিজয়বাবু একটা "শ্যামাসঙ্গীত" গাহিলে আমরা বড়ই সুখী হইতাম। ইহার পর তেলিনীপাড়ার জিতেনবাবু (কালোবাবু) ভৈরবীর টপ্পা গাহিলেন—বয়োধিক্য নিবন্ধন যদিও তাঁহার আর সে কণ্ঠসৌন্দর্য্য নাই—তথাপি শুদ্ধ চালের (যাহা প্রায় বাংলায় শেষ হইয়া আসিয়াছে) সাবেকী টপ্পা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রোঃ সৌকৎ আলী সুর শৃঙ্গারে টোড়ি বাজান—ইঁহার ঘরওয়ানা ও শিক্ষা উত্তম—ইনি সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্রী মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের বংশধর ও তাঁহার নিকট হইতেই যাবতীয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ইহার বাদন-নৈপুণ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ইহার পর বাংলার প্রথিতযশাঃ ধ্রুপদী স্বর্গত মহিম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়—গৌড়সারঙ্গের অপূর্ব্ব ধ্রুপদ গাহিয়া নিজের প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। ললিতবাবুর রাগ-বিস্তার প্রণালী প্রশংসনীয়—ইহাতে ধ্রুপদের মর্য্যাদা যথোচিতভাবে রক্ষিত হইয়াছিল—অধিকন্ত, ইঁহার সুকণ্ঠ, স্বরলালিত্য ও সূক্ষ্ম লয়-বোধ—সেদিন সহৃদয় শ্রোতা মাত্রেরই বিশিষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ললিতবাবুর পর প্রোঃ যোশী ভিন্নষড়জ ও ভৈরবীর খেয়াল গাহিলে মথুরার প্রোঃ কুলকর্ণি সুমধুরভাবে বেহালা বাজান। ইহার পর শ্রীসুনীল বসু "গুর্জ্জরী টোড়ির" একখানি খেয়াল গাহিলেন। খেয়াল গান কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে শ্রীমানের ধারণা আরও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।

ইঁহার তান অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া বোধ হইল। গলায় সুরের স্থিতি আদৌ নাই—তাল সম্বন্ধেও ইনি বিশেষ কাঁচা—শ্রীমান্ মনে হয়, record-এর মারফৎ নকল-নবিশী আরম্ভ করিয়াছেন—তাঁহার বোঝা উচিত যে assimilation করিবার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন হয়—সে প্রতিভা যে তাঁহার নাই—এ বিষয়েও তাঁহার চৈতন্য হওয়া উচিত। আমাদের ধারণা. মিথ্যা না হইলে—তিনি নাকি এই বয়সেই একজন প্রোফেসর বনিয়াছেন। ইঁহাকে demonstration-এর আসরে বাহির করা অপেক্ষা হাঁটিয়া যব মাড়ান ভাল। যাহা হউক, আমরা নিস্তার পাইলাম। বৃদ্ধ নগেন বাবু আভীরী রাগের খেয়াল গাহিলেন। অনেকদিন পরে প্রকাশ্য আসরে নগেন্দ্রবাবুর গান শুনিয়া আমরা তৃপ্ত হইলাম। ইহার পর প্রোঃ নারায়ণ ব্যানের গান হইবার কথা ছিল কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় প্রোঃ নাসিরুদ্দীন খাঁ সাহেবকে প্রোগ্রামে দেওয়া হয়। খাঁ সাহেব ভারতীয় হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রের কয়েকটী মূল কথার আলোচনা করিয়া টোড়ির আলাপ করেন। তাহার পর উপস্থিত সমবেত শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে দুইখানি অতি প্রসিদ্ধ ভজন—"শ্রীরামচন্দ্র কৃপাল ভজ মন" ও "অরগুণ চিত ন ধরো" গাহিয়া অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার বাণীর স্পষ্টতা, সুরের অভিনব লালিত্য, ও গতির লীলায়িত ছন্দ, সর্ব্বোপরি তাঁহার তান ও লয়ের অনিন্দ্যসুন্দর বৈচিত্র্য, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ভাব শুদ্ধি—সকলের মন-প্রাণ হরণ করিয়াছিল। পূর্ব্ব দিন রাত্রে তিনি আলাপ ও ধ্রুপদ গাহিয়াছিলেন। সে বিষয়েও তাঁহার যেরূপ অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছিল, এদিনও ভজনের মধ্যে সেই সাত্বিক প্রতিভার পরিস্ফুরণই অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার অনিতরসাধারণ প্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও চিরদিন আমাদের স্মৃতি পথে জাগরূক থাকিবে। তাঁহার হিন্দু দর্শনের উপর অগাধ শ্রদ্ধা, তাঁহার শাস্ত্র পাণ্ডিত্য, তাঁহার সদাচার, তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহার, তাঁহার সাত্বিক ভাব দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহার দ্বারা মহান্ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনও ভেদ তাঁহার কাছে নাই—পাত্র নির্ব্বিশেষে গুণের সমাদরই তিনি করিয়া থাকেন—আমাদের মনে হয় আজিকার দিনে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতই হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের পূর্ণপ্রতীক।

বেলা ১১॥০টার সময় পূর্ব্বাহ্নের অধিবেশন শেষ হয়। বেলা ৩॥০টার সময় সঙ্গীত বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠের পর, prize-winner দের demonstration শেষ হইলে রায়গড় ষ্টেটের প্রসিদ্ধ নর্ত্তক শ্রীকার্ত্তিকরাম তাঁহার নৃত্য কৌশল প্রদর্শন করেন। তারপর শ্রীযুক্ত পবন বিশ্বাসের ঢোল-বাদ্য অতীব উপভোগ্য হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাকে কেন যে নির্দ্দিষ্ট সময়ও দেওয়া হইল না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহার পর মনসব আলির সানাই হইলে বোম্বের প্রোঃ যোশী ভিমপলশ্রীর একখানি খেয়াল গাহিলেন। তাহার পর জিতেনবাবুর সারেঙ্গী ভাল জমিল না। শ্রীজ্যোতির্ষ চিত্রকরের পাঁচ তবলার বাদ্য আমাদের ভাল লাগে নাই। তারপর শ্রীমান্ বসন্তকুমার মিত্র একখানি পুরিয়ার ধ্রুপদ গাহিলেন। ইহাদের যে কোন demonstration এ স্থান দেওয়া হয় তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। ইহার পর শ্রীমান শচীন্দ্র দাস (মতিলাল) একখানি "হেমছায়া" ও আর একখানি "আড়ানায়" খেয়াল গাহিলেন। শ্রীমান্ শুদ্ধ হেম. বা শুদ্ধ ছায়া গাহিলে আমরা তাঁহার গানের তারিফ করিতাম—কিন্তু "হেমছায়া" প্রভৃতি

জগাখিচুড়ী রাগের ব্যর্থ বিকাশের চেষ্টায় কেন যে তিনি নিজের প্রতিভার অপব্যবহার করেন—বুঝিনা। হেমছায়ার মধ্যে না পাইলাম হেমের রূপ না পাইলাম ছায়ার রূপ; যাহা পাওয়া গেল তাহা বেহাগের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার আড়ানাটী মন্দ হয় নাই। তাঁহার কণ্ঠের দৈন্য দেখিয়া আমাদের সত্যই দুঃখ হইল। শ্রীমান্‌কে বড় nervous বলিয়া বোধ হইল—নইলে এত হাত-পা ছোড়া দেখিলাম কেন? ইহা তো পূর্ব্বে দেখা যাইত না—যাহা হউক, ভবিষ্যতে গায়ক একটু সতর্ক হইলে—আমরা সুখী হইব। শ্রীমান্ একখানি ঠুংরী গাহিলেন না কেন? লাল বাতির ভয়ে নাকি? ইহার পর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রবীণ খেয়ালিয়া শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দাস (অন্ধ-গায়ক) মহাশয় একখানি অতি উচ্চাঙ্গের "রাজশ্রী" রাগের খেয়াল গাহিলেন। শুদ্ধ, বিলম্বিত লয়ের যথার্থরূপ ও রাগশুদ্ধি বাঙ্গালী গায়কদের মধ্যে একমাত্র ইঁহার গানেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বাস্তবিক, বৃদ্ধ সাতকড়িবাবু বাঙ্গলার গায়কসমাজের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন এবং তিনি আজ যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন—তাঁহার পর আর কেহই সেই আসনের মর্য্যাদা রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। Conferenceএ তাঁহাকে কুড়ি মিনিট সময় না দিয়া কেন কর্ত্তৃপক্ষরা ১৫ মিনিটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কৈফিয়ৎ চাহিলে কোন সদুত্তর মিলিবে কি? ইহার পর দুই তিনটি কুমারীর গান হইল—ইহার মধ্যে কুমারী গৌরীরাণীর ধ্রুপদ গান উপভোগ্য হইয়াছিল। কুমারী প্রতিভা মিত্রের গানও ভাল লাগিল।

ইহার পর মাষ্টার কুমার গন্ধর্ব্ব খাম্বাবতী ও বসন্তের দু'খানি খেয়াল ও একখানি ঠুংরী গান করেন। ইহার গান সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বদিনের মত ইনি আমাদের বিশেষ তৃপ্তি দিয়াছিলেন। ইহার পর পণ্ডিত দিলীপচন্দ্র বেদী গাহিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইল কিন্তু তাহার পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয়টি মাল—যাহা বাহির হইল—তাহা একেবারেই বস্তাপচা—যেমন নীরদ লাহিড়ীর সেতার, তেমনি শ্রীবাস্তবের হোলীর ঠুংরী (typical চ্যা-রা-রা class!) তেমনি হরিহর রায়ের আহা মরি "বাহার"! বাঁচিলাম জ্ঞানবাবুকে পাইয়া। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী জয়জয়ন্তী, মালকোষ ও বেহাগের যথাক্রমে তিনটী খেয়াল গাহিলেন। বহুদিন পরে তাঁহার গান শুনিয়া তৃপ্তি হইল—আশা করি জ্ঞানবাবু তাঁহার form maintain করিবেন। তবে তান অপেক্ষা সুরের বিস্তারেই জ্ঞানবাবুর বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়—তানের ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিলে তিনি বাস্তবিকই একজন প্রথম শ্রেণীর গায়ক বলিয়া পরিগণিত হইবেন। তৃতীয় গানটীর সময় রাইচাঁদ বড়াল মহাশয়ের সঙ্গত ও খুশী মহম্মদের হার্ম্মোনিয়ম বাদ্য গানটিকে সত্যই শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার পর তারাপদ চক্রবর্ত্তীর খেয়াল না হইলে বড় ভাল হইত—জ্ঞানবাবুর গানের পরেই জ্ঞানবাবুর ব্যর্থ-অনুকরণের pantomime খাড়া। কল্যান—পরিচালক মহাশয়ের রসবোধের পরিচয় দেয় নাই। যাহা হউক ইহার পর শ্রীযুক্ত দিলীপচন্দ্র বেদী, "রাত-কা-ললিত" নামক স্বরচিত রাগ গাহেন—রাগটীর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া গেল না কোন অংশে ভয়রোঁ, কোথাও ললিত, কোথাও জয়জয়ন্তী কোথাও সিন্দুড়া কোথাও বা কর্ণাটকী রাগের ছায়া দেখিতে পাওয়া গেল—আমরা এরূপ সংমিশ্রণের চিরকালই বিরোধী। সনাতন কাল হইতে যে সকল রাগ, প্রসিদ্ধ হইয়া

গান

কথা ও সুর :-শ্রীসুনীলকুমার দাশগুপ্ত

মালকোষ—তেওড়া

ওগো, আমার মনের হরিণ
হারিয়ে গেছে বনে,
আজো তার করুণ-চাওয়া
জাগে আমার মনে।
তার মন-ভুলানো উদাস্-গানে
ঘুম্ ভেঙ্গে যায় রোজ বিহানে
আজো তার গোপন কথা
বনের শিউলী সনে।
আজো হায়, ডাক্‌ছে পাখী
গুল্-বাগানে গাইছে শাখী
মজনু কাঁদে পিয়ার তরে
বনের হরিণ সনে॥

আছে—সেগুলির রীতিমত রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই স্বপ্রতিভার আসল পরিচয় মিলে—দিলীপ বেদী গুণী, সে বিষয়ে অবশ্য আমাদের সন্দেহ নাই—কিন্তু তাঁহার এ প্রচেষ্টা আমরা সমর্থন করি না। গাহিবার গুণে অবশ্য রাগরূপ কতকটা বজায় ছিল—শুনিতেও মন্দ লাগে নাই—কিন্তু তানগুলির সন্নিবেশ মোটেই সুবিধার হয় নাই। তাঁহার ঠুংরী গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল—ঠুংরী গানে পণ্ডিত বেদী harmonisation এর যে তরকিফ্ দেখাইলেন—তাহাতে আমরা সবিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ যে কাহার মুখ দেখিয়া সেদিন সভায় আসিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই—পণ্ডিত বেদী আসরে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়া উঠিবার পরই পরিচালক মহাশয় শ্রোতৃবর্গের কর্ণ-সহ জমাইবার জন্য যে ব্যবস্থা করিলেন—তাহাতে আমরা

হতভম্ব হইলাম। পাঠক, শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে হ্রেষারব কখনও শুনিয়াছেন কি? আমাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল—শ্রীমান্ হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্যামরাগে একখানি ধ্রুপদ সুরু-করিলেন। Hell-let loose!

যাক্ বাঁচা গেল—ইহার পর স্বর্গত গুণিপ্রবর শিবসেবক মিশ্রের সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্র ও তাঁহার ভ্রাতা বিষ্ণুসেবক মিশ্র—পঞ্চম রাগের একখানি খেয়াল গাহিলেন। পণ্ডিত রামকিষণের গান অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল—রাগ শুদ্ধি, লয়ের বৈচিত্র্য ও কণ্ঠসৌন্দর্য্যের সমন্বয়ে —ইঁহাদের সঙ্গীতে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি হইয়াছিল। পণ্ডিত রামকিষণের সহিত সঙ্গত করিয়াছিলেন প্রোঃ সরযু মিশ্র—ইহার সঙ্গত নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়। পঞ্চমের পর তাঁহার সিন্ধুড়া ও কাফি সিন্ধুর ঠুংরী গানও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের একমাত্র বক্তব্য যে পণ্ডিতজী সনাতন রীতি অনুসারে তানপুরা লইয়া কেন গান গাহেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, তাঁহার মত গুণী হার্ম্মোনিয়ম ছাড়িয়া গাহিলেই, তাঁহার গানের মর্য্যাদা আরও বাড়ে—এ বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

ইহার পর কুমারী আশা ওঝার নৃত্য হয়। কুমারীর লয়ের কার্য্য প্রশংসনীয়। তবে নৃত্যোপযোগী সুষমার একান্ত অভাব আমাদের রসবোধকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। আর তাহা ছাড়া, কুমারী যে সব পড়নের উপর নাচলেন—তাহার মধ্যে যথোপযুক্ত তোড়ার একান্ত অভাব থাকাতে কথক সম্প্রদায়ী নৃত্যের যে বিশেষত্ব—তাহার গৌরব অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। পরিশেষে বক্তব্য এই যে নাচিবার সময় লহরা ও সঙ্গতের প্রাধান্যের অন্তরালে—কুমারীর লয়চ্যুতিও আমাদের দৃষ্টিকে মধ্যে মধ্যে আকর্ষণ করিতেছিল—ইহা কিন্তু তাঁহার নৃত্যের একটী বিশেষ অমার্জ্জনীয় দোষ—কথক সম্প্রদায়ের নৃত্যে তালের বৈশিষ্ট্য একটী প্রধানতম গৌরব—আশা করি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুমারী এ বিষয়ে সাবধান হইবেন। এতদ্ব্যতীত, এই দিন নৃত্যের সময় প্রথমে ভাবোজ্জ্বল নৃত্য আরম্ভ করিয়া—তরল নৃত্যে অবসান করাও নিয়মবিরুদ্ধ হইয়াছিল। কুমারীর পক্ষে দাদ্‌রা তালে ভাও-বাতলানও সুরুচিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করা যায় না।

কুমারীর নৃত্যের পর পটবর্দ্ধনের জয়-জয়ন্তীর খেয়াল ও তিরানা আমোদের বিশেষ তৃপ্তি দিয়াছিল। পটবর্দ্ধনজীর পর প্রোঃ নারায়ণ ব্যাস গৌড়মল্লারের একখানি খেয়াল গাহিলেন—তৎপরে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে প্রোঃ ব্যাস তাহার লোকপ্রিয় মালগুঞ্জীর ঠুংরী "মুরলীকে ধুন শুনি" গানটী গাহিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করেন। তারপর প্রোঃ রমেশচন্দ্র তবলা-তরঙ্গে রাগেশ্রী বাজাইলেন। তাঁহার অনুপম বাদনপ্রণালী সকলকেই তৃপ্ত করিয়াছিল।

ইহার পর কুমারী আশা ওঝার শিক্ষক প্রোঃ মোহনলাল নৃত্য করেন। ইঁহার যে অনুপাতে নাম শুনিয়াছিলাম নৃত্যে তাহার কোন পরিচয়ই পাইলাম না—আমরা শম্ভুপ্রসাদের অনুপম নৃত্য দেখিয়াছিলাম—ইঁহার নৃত্য দেখিয়া হতাশ হইলাম।

"তুমি"

শ্রীমায়ারাণী বিশ্বাস

(তুমি) প্রজাপতি হয়ে ফুল রেণু লয়ে
ফোটাও পাপড়ি গুলি,
(তুমি) বারি রূপে এসে, ধুয়ে দাও মোর
সোহাগে অঙ্গ ধূলি॥
(তুমি) অনিল রূপে এসে, বুলাও অঙ্গে মোর
মধুর পরশ লতা,
(তুমি) কিরণ রূপে এসে, জোছনা রাতে বসি
শোনাও প্রেম-বারতা॥
(তুমি) আলোক রূপে এসে, শিয়রেতে বসি
গাও অস্ফুট গান।
(তুমি) ভিখারী রূপে এসে, অঙ্গন দ্বারে বসি
লহ নিঃশেষ দান।
হে ভিখারী মোর, মম পাশে তুমি
আসিয়াছ পথ ভুলি
যদি লয়েছ আমার ভিক্ষার শেষ (হে ভিখারী)
(তবে) দাও তব পদধূলি॥

—

ইহার পর শ্রীযুক্ত দামোদর দাস খান্না মহাশয় কন্‌ফারেন্সের পক্ষ হইতে যথোচিত ধন্যবাদাদি প্রদান করিলে রাত্রি ৩৷৹ ঘটিকার সময় অধিবেশন সমাপ্ত হইল।

(অধিবেশন সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী মন্তব্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশ্য।)

—

মার্লিন ডিয়েট্রিশ

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

মে ওয়েষ্ট

এ্যাসটায়ার-রোজার্স

কী বিশ্রী গুজব! গুজবের নেই মাথা মুণ্ডু। কথা উঠেছে জিনজার রোজার্স আর. এ্যাসটায়ার নাকি এক সঙ্গে আর ছবিতে নামবে না। কত লোকের ঘুম গেল উবে। টস্ টস্ ক'রে গড়িয়ে পড়ল চোখের জল। নাওয়া নেই খাওয়া নেই। চিঠি ছুটল হলিউডে। চিঠির পর চিঠি। কে তার হিসেব দেয়। তাদের নাম ধাম টুকে রাখতে গেলে ডিক্সনারীর মত একখানা বই তৈরী হয়ে যায়। কে তার খবর দেবে! বাজে বাজে একেবারে বাজে। ও গুজব কে যে রটালে। কে জানে এ কারুর হিংসে কিনা। চায়ের টেবিলে বসে তাই হয়ত গল্প করেছে। নিষ্ঠুর জানে নাত কত লোকের প্রাণে আঘাত দিলে। এইত সেদিনের কথা, জানেনা ত লোকে জিনজার রোজার্স কত খানি রক্ত জল করল। 'টেমড' ছবিখানায় সে নেমেছে। আর সে নামায় তার কম করে পনেরো পাউণ্ড ওজন কমে গেছে। ওর বাড়ীতে কোনদিন যদি আপনি যেতেন দেখতে পেতেন তার সেই সব পুরোণো পোষাক অর্থাৎ ব্লাউজ্ স্কার্ট এই সব ছোট হয়ে গিয়েছে। সেই রোজার্সকে এখন ছুটীতে বাড়ীতে বসে গায়ের মাংস বাড়াতে হচ্ছে। কে জানে আবার আরো যদি কমতে সুরু করে তা হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবতেও পারা যায় না। তা জিন-জার গায়ের মাংস বাড়াবার জন্যে ছুটীতে থাকলে কি হয়? ফ্রেড এ্যাসটায়ারের সঙ্গে ও বইয়ের ঠিক ক'রে ফেলেছে; সে বইখানার নাম হচ্ছে 'ফলো দি ফ্লিট।'

দুই বন্ধু

লোকে বলে, সত্যি মিথ্যে তারাই জানে মায় ওয়েষ্ট আর মার্লিনে দু'জনের মনের মধ্যে একটু রেশারেশি আছে। দুজনেই নিজকে ভাবছে সে নাকি অপরের চেয়ে বড়। এর মধ্যে কতটা সত্যি আছে বলা শক্ত। কার অন্তরে কী আছে কে জানে। আমি জানি কিন্তু একটা খবর যে, প্যারামাউন্ট ষ্টুডিওতে অবসরে মায় আর মার্লিন দুজনে একটা ঘরে বসে গল্প করে। সই করে, উপহার দিয়ে সময় কাটায়। তাই ভাবি এদের কোনটা সত্যি।

ফ্রেডি বারথোলোমিউ

কে আসছে

ভালো কথা মনে পড়েছে। বুড়ো ফ্রেড আসটায়ারের টাকা কড়ি ভোগ করবার যোগ্য অধিকারী আসছে যে। সে কি আর আজকের কথা! হলিউডের মাটীতে পা দিয়েছে ফ্রে আসটায়ার এই বছর ছয়েক। এতদিন পরে এইবার তার পায়ের নাচের তালে রঙের দেশের সোনার শিশু পদ্ম আঁখি মেলবার বার্ত্তা জানিয়েছে। আমরা তারা শুভ কামনা করে আপনাদের জানিয়ে দিলাম। এ্যাসটায়ার ত জানে না যে এখবর এরই মধ্যে' আমার কানে এসে পৌছে গেছে। তার এই লজ্জা, এই গৌরব সে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলো। সে পারলে না! ছায়ালোকের বাসিন্দা যে সে।

ত্রিশহাজার পাউণ্ড

ব্যাপারটা আপনাদের শোনবার মত তাই বলে রাখছি। জর্জ্জ আরলিস ব্রিটিশ গোমো পিকচার্স এর হয়ে 'মিসটার হোবে বলে ছবিখানায় নামছেন এ খবর আমি আপনাদের আগেই দিয়েছি। সেদিন

ছবিখানা তোলা শেষ হয়ে গিয়েছে। চুক্তি অনুসারে এতে জর্জ্জ আরলিসের সময় বেশী লেগেছে। এবং এর জন্য তাঁর দাবী হয়েছে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড। মাইকেল ব্যালকন হচ্ছেন্‌ গোমো পিকচার্সের প্রোডাকশন-ম্যানেজার। নির্দ্ধারিত দিনে এরই কাছে, জর্জ্জ আরলিস একখানা চিরকুট পাঠান, ব্যালকন তাঁকে ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের এক-খানা চেক দেন। আরলিস্‌ চেক দেখে বলেন: আমার মনে হয় এটা নেওয়া উচিৎ নয়।. না, না, অন্য কারণ ভাববেন না। শুদ্ধ সেটা চেক বলেই তিনি সেটা নিতে অস্বীকার ক'রেছিলেন। বুঝুন ব্যাপার খানা। সেদিন খবর পেয়েছি যেমন ভাবে তিনি টাকা চেয়েছিলেন তেমনি ভাবেই পেয়েছেন।

চার্লস বিকফোর্ড

চার্লস বিকফোর্ড শার্লি টেম্পলের সঙ্গে "দি লিটলেষ্ট রিবেল" ছবিতে নামছিলেন আপনারা জানেন। কিন্তু বেচারার আর নামা হোল না। এখন কিছু দিনের জন্যে তাঁর কোন ছবিতেই নামা হবে না। সেদিন সেটের ওপর সিংহের সঙ্গে হুড়মুড়ি ক'রতে ক'রতে তাঁর চোট লাগে, তার ফলে এই ব্যাপার। খবর পেয়েছি তিনি বেশ ভাল হ'য়ে উঠেছেন তবে একেবারে সেরে উঠতে এখনও তাঁর বেশ কিছুদিন লাগবে।

খুচরো খবর

মায় ওয়েষ্ট এবং মার্লিন দুজনেই বড় মোটর চড়তে ভাল বাসেন এবং দুজনেরই তা আছে।

• • •

ফ্রেডি বারথোলোমিউর জন্মদিনে নেলসন এডি খুব বড় একখানা মোটর গাড়ী উপহার দিয়েছেন।

* * *

জেসি ম্যাথুস আবার হলিউডে ফিরে আসছেন।

হুগলি জেলা সাহিত্য সম্মেলন—দ্বিতীয় অধিবেশন

গত ৫ই জানুয়ারী চাতরা গ্রামে হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হয়ে গেছে। সভায় অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবন্ধাদি পাঠ করেছিলেন। এরূপ সম্মেলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রথম অধিবেশনের বিবরণীতে প্রকাশিত উদ্যোক্তাগণের কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য :······

"গতানুগতিক চিন্তার বাইরে একটু বিবেচনা করে দেখলেই বোঝা যায়, সকল দেশেই সাহিত্য বহুলোকের মুখে অন্ন যোগাচ্ছে এবং আমাদের দেশে তার আশ্রিতের সংখ্যা দিন দিন ততই বেড়ে যাবে যতই আমাদের মধ্যে জাগবে সাহিত্যের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতি।

গ্রামে গ্রামে এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি সৃষ্টি করার পরিমণ্ডল রচনার জন্যেই প্রয়োজন সাহিত্য-সমিতি ও সাহিত্য-সম্মেলনের।

ভদ্রমহোদয়গণ, যদি সত্যকথা বলার অনুমতি দেন, তাহলে এ কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে আজ ভারতবর্ষে অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিকীরণ যেমন একান্ত দরকার, বাংলার শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে তেমনি একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েচে জ্ঞান সম্প্রসারণের। আমরা অনেকেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে সেই-যে গ্রন্থের সংস্পর্শ ত্যাগ করি তারপর কমলার কৃপালাভের সাধনায় এতই একাগ্র হয়ে পড়ি যে অবসর জুটলেও পড়াশোনা কথার উৎসাহ আর জাগে না। এর ফলে শিক্ষা আমাদের পরিণত হয়েচে ডিগ্রিতে। মনের সঙ্গে অধীত বিদ্যার যোগ ঘটে না,—তাই তা শুধু বাইরের মুখোস হয়েই থাকে। আমাদের পোষাকী ডিগ্রির পিছনে আটপৌরে সাধারণ চিন্তাধারা নিয়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে যে মনটি বাস করে তার সঙ্গে অশিক্ষিতের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। এই অপরিমেয় দৈন্য থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলতে হবে সমষ্টিগতভাবে পড়াশোনা,—তর্ক আলোচনা করার পরিমণ্ডল। এ কাজ হুগলী জেলার পক্ষে খুব দুঃসাধ্য নয়।"

আনন্দের বিষয়, এই সম্মেলন যাতে স্থায়ী হয় এবং একটি কেন্দ্রীয় জেলা সাহিত্য সমিতি গড়ে ওঠে তার জন্য সভায় নিম্নলিখিত ভদ্র লোকদিগকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েচে :

১। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।
২। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ।
৩। „ ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বি, এল।
৪। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। „ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল।
৬। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষাল, বি, এল।
৭। „ সুবোধ রায়, সম্পাদক, "চিত্রালী"।
৮। „ হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।
৯। „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
১০। „ ইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
১১। „ উপেন্দ্রনাথ সেন।
১২। „ চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়।
১৩। „ রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
১৪। „ কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় (সভা আহ্বানকারী)

সন্দেহজনক ডবল বা Close Double :—অকসন্ বা কন্ট্রাক্ট খেলায় একটুতেই ডবল দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। যেখানে মোটে এক পিটে খেলা মরে এরূপ সন্দেহজনক স্থলে ডবল না দেওয়াই বিধেয়। কারণ এই সন্দেহজনক ডবলের দ্বারায় বিপক্ষদলকে হাতের অবস্থা এরূপভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যাতে অধিকাংশ সময় বিপক্ষদল অতি অনায়াসে খেলা করে নেন্ বা মাত্র একটি পিট কম পান, যে স্থলে এমনি সাধারণভাবে খেলতে হলে হয়তো বা দুইটী বা তিনটী পিট কম হত। আমাদের এখানকার প্রতিযোগিতায় প্রায়ই এরূপ ভুল করতে দেখা যায়, তাই বাধ্য হয়ে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলবার জন্য অগ্রসর হচ্ছি। মনে করুন তাস-বণ্টন করবার পর হাত পেয়েছেন নিম্নলিখিত রূপ।

ইস্কাবন—টেক্কা, ছক্কা, পাঞ্জা।
হরতন—নয়।
রুহিতন—গোলাম, আটা, চৌকা, দুরি।
চিঁড়িতন—সাহেব, বিবি, আটা, পাঞ্জা, চৌকা।

ইস্কাবন—গোলাম, দশ, তিরি,
হরতন—তিরি, দুরি।
রুহিতন—সাহেব, ছক্কা, তিরি।
চিঁড়িতন—টেক্কা, গোলাম, তিরি, দুরি।

ইস্কাবন—আটা, চৌকা।
হরতন—বিবি, গোলাম, দশ, সাতা, পাঞ্জা, চৌকা
রুহিতন—বিবি, নয়, সাতা, পাঞ্জা
চিঁড়িতন—সাতা।

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, নয়, সাতা।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, আটা, ছক্কা
রুহিতন—টেক্কা, দশ।
চিঁড়িতন—দশ, নয়, ছক্কা।

উক্ত হাতে ডাক হয়েছে এইরূপ,

'দ'	'প'
একটি ইস্কাবন।	পাশ।
তিনটি ফেরাই।	ডবল।
পাশ।	
'উ'	**'পূ'**
দুইটি চিঁড়িতন।	তিনটি হরতন
পাশ।	পাশ।

প্রথমে 'প' হরতনের এক তাস খেললেন। অতঃপর ডাককারী তাঁর খেঁড়ীর হাত দেখে বেশ বুঝতে পারলেন যে 'প' কেবল চিঁড়িতনে দুইখানি পিট ধরবার তাস্ হাতে রেখে ডবল দিয়েছেন। কাজে কাজেই হাতে পিট নিয়ে চিড়িতন finesse করলে অতি সহজেই তিনটী ফেরাইয়ের খেলা করা যায়। কিন্তু যদি তিনি উক্ত ডবল না দিতেন তবে হয়তো এরূপ খেলা খুবই শক্ত হত এবং ডাককারীর খেলা মরে যেত। নিয়ে আরও একটি হাত দেখুন।

ডাক চলল নিম্নলিখিতরূপ,

'উ'	'পূ'
পাশ।	পাশ।
ডবল।	পাশ।
পাশ।	পাশ।

ইস্কাবন—গোলাম, আটা, চৌকা।
হরতন—আটা, ছক্কা।
রুহিতন—সাহেব, পাঞ্জা।
চিঁড়িতন—গোলাম, দশ, নয়, সাতা, পাঞ্জা, দুরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, দশ, ছক্কা, পাঞ্জা
হরতন—সাতা, পাঞ্জা।
রুহিতন—আটা, চৌকা।
চিঁড়িতন—সাহেব, বিবি, ছক্কা, চৌকা, তিরি।

ইস্কাবন—বিবি, নয়, সাতা, তিরি।
হরতন—গোলাম, দশ, চৌকা, দুরি।
রুহিতন—বিবি, নয়, ছক্কা, দুরি।
চিড়িতন—টেক্কা

ইস্কাবন—সাহেব, দুরি।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, নয়, তিরি।
রুহিতন—টেক্কা, গোলাম, দশ, সাতা, তিরি
চিঁড়িতন—আটা।

পাশ।	ডবল।
পাশ।	ডবল।
তিনটি হরতন।	ডবল।
পাশ।	

একটি হরতন।	দুইটি চিঁড়িতন।
পাশ।	দুইটি ইস্কাবন।
দুইটি ফেরাই।	পাশ।
তিনটি রুহিতন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।
পাশ।	পাশ।

এ ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ 'পূ' ডবল দিয়ে বেশ ভাল করে ডাকদারকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁর হাতে রুহিতনে পিট ধরবার মত তাস আছে, অতএব ডাকদার finesse করে খেলা করে নিতে পারেন। যদি এই ডবল না দেওয়া হত তা' হ'লে 'দ' রুহিতনের টেক্কা সাহেব খেলে নিয়ে পুনরায় একটি রুহিতন খেলে খেঁড়ীকে দিয়ে রঙ তুরুপ করাতেন কিন্তু পুনরায় নিজ হাতে খেলা আনা তাঁর পক্ষে বিশেষ শক্ত হত এবং ফলে তাঁকে হয়তো খেসারৎ দিতে হত।

কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :—নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হল, আপনারা উত্তর না দেখে সমাধান করে আমাদের উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্বেন।

(১) 'উ' এবং 'দ' ভাল্নারেব্ল। 'দ' ডেকেছেন একটি রুহিতন, 'প' দিলেন পাশ। এখন 'উ' কি ডাকবেন? 'উ'র হাতে আছে ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, বিবি আটা, সাতা, তিরি, দুরি; হরতন—বিবি, পাঞ্জা; রুহিতন—নাই; চিঁড়িতন—দশ, নয়, সাতা, তিরি।

(২) 'দ' পাশ দিয়েছেন, 'প' ডেকেছেন একটি হরতন, 'উ' ডেকেছেন একটি ফেরাই। এখন 'পূ' কি বল্বেন? 'পূ' পেয়েছেন ইস্কাবন—সাহেব, চৌকা, দুরি; হরতন—টেক্কা, দশ, নয়, আটা; রুহিতন—সাহেব, পাঞ্জা; চিড়িতন—টেক্কা, দশ, সাতা, তিরি।

(৩) 'দ' ডেকেছেন একটি ইস্কাবন। এখন 'প'কে ডাকৃতে হবে। নিম্নলিখিতরূপ তাস পেয়ে 'প' কি বল্বেন?

ইস্কাবন—টেক্কা, দশ, পাঞ্জা, তিরি
হরতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি,
রুহিতন—সাহেব, গোলাম, নয়, চৌকা;
চিড়িতন—টেক্কা।

(৪) 'দ' তাস দিয়ে ডাক দিয়েছেন একটি ইস্কাবন। অতঃপর নিম্নলিখিতরূপ তাস থাক্লে 'প' কি ডাক্বেন?

ইস্কাবন—নয়; হরতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, চৌকা; রুহিতন—সাহেব, গোলাম, চৌকা, তিরি; চিড়িতন—সাহেব, দশ, সাতা, চৌকা।

(৫) 'দ' ডেকেছেন একটি চিড়িতন, 'প' ডেকেছেন একটি হরতন। নিম্নলিখিত তাস হাতে নিয়ে 'উ' কি করবেন?

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, দশ; হরতন—সাহেব, বিবি, দশ, আটা, সাতা, ছক্কা; রুহিতন—পাঞ্জা, চৌকা; চিঁড়িতন—সাহেব, চৌকা।

(১) 'উ' ডাক্বেন চারটি ইস্কাবন। এ ডাকে 'দ' বুঝতে পারলেন যে যেহেতু তাঁর খেড়ী forcing take out করতে পারলেন না তখন তাঁর হাতে তিনটি বা সাড়ে তিনটি অনারের পিট নাই এবং ইস্কাবনই তাঁর একমাত্র রঙ ও হাতে ইস্কাবন অনেকগুলি। সুতরাং 'দ' এই স্থানেই ডাক ছেড়ে দেবেন।

(২) এ ক্ষেত্রে 'পূ'র ডবল দেওয়া উচিত। অতঃপর যদি সকলে পাশ দেন, তবে 'উ'কে ভয়ানক খেসারত দিতে হবে। পক্ষান্তরে 'উ' কিংবা 'দ' যদি রুহিতন ডেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, তা' হলে 'পূ' যথাক্রমে হরতন ডেকে যেতে পারেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর খেড়ীকে তাঁর হাতের শক্তি জ্ঞাপন করতে পারবেন।

(৩) 'দ'র একটি ইস্কাবন ডাকের পর, এ স্থলে 'প'র ডাকা উচিত দুইটি ইস্কাবন। 'দ' হয়তো ভুয়া ডাক (Psychic Bid) দিয়েছেন। 'দ' যদি কিছু না ডাকতেন তবে 'প' দুইটি হরতনে ডাক আরম্ভ করতেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে খেড়ীকে নিজ হাতের শক্তি জ্ঞাপন করবার জন্য বিপক্ষ-দলের একটি ইস্কাবন ডাকের উপর দুইটি ইস্কাবনের ডাক দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

(৪) 'প' ডবল দেবেন। 'Take out double' দেবার পক্ষে 'প'র হাত চমৎকার। খেড়ী যে রঙেই ডাক দিন না কেন 'প' তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন। এ ডবলে তাঁর খেড়ী তাঁর হাতের অনারের শক্তি, এমন কি তাঁর হাতের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবেন। কিন্তু হরতনে ডাক দিলে এরূপ সুবিধা হত না।

(৫) এ ক্ষেত্রে 'উ'র ডবল দেওয়াই বিধেয়। অতঃপর 'পূ' অন্য যে ডাক দিয়েই পালাবার চেষ্টা করুন না, হয় 'উ' এবং 'দ' মোটা খেসারৎ পাবেন অথবা রঙ করে খেলা নিতে পারবেন।

ভ্রম-সংশোধন :—গত সপ্তাহের খেয়ালীতে যে দুইটি সমস্যা প্রকাশিত হয়েছিল তন্মধ্যে প্রথম সমস্যায় (ফেরাইএর খেলা, 'দ' খেলবেন) একটু ভুল আছে। উক্ত সমস্যায় 'উ' এবং 'দ'কে সাতটি পিট নিতে হবে বলা হয়েছে, সে স্থলে চারটি পিট নিতে হবে—হওয়াই উচিত।

"দি বিগ্ ব্রডকাষ্ট অফ্ ১৯৩৬" প্যারামাউণ্টের একখানা নাম-করা ছবি। তারই একটি ঝক্‌মকে দৃশ্য—এটি দেখলেই ছবিখানা যে ভাল তা' বোঝা শক্ত নয়। এতে অভিনয় কোরেছেন বিঙ্ ক্রস্‌বি, জ্যাক ওকী, বার্ণস্ এণ্ড এলেন, লাইডা রবার্টি বিল রবিনসন্ প্রভৃতি। ছবিখানা 'মেট্রো'-র দেখানো হ'চ্ছে।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৯ই মাঘ, ১৩৪২—23rd January, 1936. } ৪র্থ সংখ্যা

নয় বৎসরের সীমানা

যে সকল কাউন্সিলার গত নয় বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে করপোরেশানের সদস্যপদ অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাদের অবসর গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য এবং সে সুমতি যদি তাঁহাদের না হয় তাহা হইলে এবারের আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস হইতে তাঁহাদের নির্ব্বাচন-টিকিট না দেওয়াই কর্ত্তব্য—এই কথা আমরা একাধিকবার বলিয়াছি। ইহাতে কেহ কেহ আমাদের প্রশ্ন করিয়াছেন যে, আমরা নয় বৎসরের সীমানা নির্দ্দেশ করিলাম কেন? ইহার উত্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা জানাইতেছি।

বাঙ্গলায় একটি কথা আছে—বার বার তিনবার। যে কোনো প্রচেষ্টা, যে কোনো কার্য্য—একাদিক্রমে তিনবার করিবার পর তাহার সংশ্রব ত্যাগ করা উচিত—অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও এই ধারণা বলবতী আছে। তদ্ভিন্ন মানুষের স্বভাবের এক চিরন্তন দুর্ব্বলতা আছে। তাহা হইতেছে অভ্যাসের জড়তা। নূতনত্বের মধ্যে যে একটা উত্তেজনা, আনন্দ আছে তাহা মানুষের কর্ম্মপ্রবণতাকে জাগাইয়া রাখে ও বাড়াইয়া তুলে। প্রাত্যহিক অভ্যাসের বাঁধা রাস্তায় সে কলুর চোখবাঁধা বলদের মত ঘুরিয়া বেড়ায়—তাহার মধ্যে না থাকে নিত্যনূতন চিন্তা বা কর্ম্ম করিবার নবীন উৎসাহ। অতএব নয় বৎসর ধরিয়া যে সকল করপোরেশান-সদস্য মাটী আঁকড়িয়া পড়িয়া আছেন, তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য অত্যন্ত ঢিমে-তেতালাভাবে করিয়া দুকুঁড়ি সাত বজায় রাখিয়া চলিতেছেন—ইহার বহু প্রমাণ আছে।

সাধারণতঃ প্রৌঢ় বয়সে বা প্রৌঢ় বয়স পার হইবার পরই অধিকাংশ কাউন্সিলার করপোরেশানে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তাহার পর নয় বৎসর কাটিয়া গেলে অনেকেই শক্তির শেষ সীমায় আসিয়া পড়েন। সাধারণ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হইয়া জনসাধারণের কল্যাণার্থ বিনা-পারিশ্রমিকে কাজ করার সাধারণ নাম—"ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।" এই অপ্রিয় ও স্বার্থহীন কার্য্যে চাই যৌবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সকল দেশের সকল জাতির সঙ্ঘশক্তির উন্নতিকল্পে নবীন শক্তিকে (Fresh Blood) আবাহন করা হয়। অতএব এই নয় বৎসরের প্রাচীন কাউন্সিলারগণ যদি আপনাদের পদমর্য্যাদার সুবিধা ভুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য দেশের ও দশের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই স্বেচ্ছায় নবীনদের পথ ছাড়িয়া দিবেন। "যৌবনে দাও রাজটীকা"—এই উক্তি শুধু কবির নহে, কর্ম্মীরও। কাব্যজগতের চেয়ে কর্ম্মজগতেও ইহা কম সত্য নহে। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুবশক্তি কি অসাধ্য সাধন করিয়াছে কংগ্রেসের তাহা অজানা নাই। অতএব আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আমাদের কথার সত্যতা ও যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিয়া নয় বৎসরের সীমানা-উত্তীর্ণ কাউন্সিলারদের করপোরেশানে প্রবেশের আর কোনো সুযোগ দিবেন না।

বিবিধ

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

গত ১৫ই পৌষের 'চারু মিহির'—"কাউন্সিল পদপ্রার্থী" শিরোনামায় নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন :—

"জনরবে প্রকাশ, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর জেনারল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনী সরকার মহাশয় পূর্ব্ব ময়মনসিংহ অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে আগামী বঙ্গীয় কাউন্সিলে সদস্য পদপ্রার্থী হইবেন। রায় উমেশচন্দ্র চাকলাদার বাহাদুর বেঙ্গল ন্যাশানেল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিরূপে কাউন্সিলে প্রবেশ লাভের চেষ্টায় আছেন। আরও প্রকাশ, সন্তোষের রাজা (অধুনা মহারাজা) অনারেবল স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী পূর্ব্ববঙ্গ ভূম্যধিকারী সভা হইতে কাউন্সিলে সদস্য পদপ্রার্থী হইবেন। জানা গিয়াছে উক্ত ভূম্যধিকারী সভা রাজা বাহাদুরকে এখন পর্য্যন্ত কোনরূপ আশ্বাস প্রদান করিতে পারেন নাই।"

মহারাজা মন্মথনাথ প্রার্থী হইলে, বোধ হয়, ভাগ্যকুলের প্রসিদ্ধ মহাজনদিগের সমর্থন লাভ করিবেন। কারণ যাহাই কেন হউক না, তাঁহারা, বোধহয়, মহারাজাকে সমর্থন করিবেন। রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদার হিন্দুস্থানের এজেন্ট—কিন্তু no one has the right to put a limit to a man's ambition. আর নলিনীরঞ্জন সরকার—যাহার সম্বন্ধে বীণার সহিত ব্যাভিচারের মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছেন—তিনি সত্য কথা বলেন নাই এবং তাঁহার চরিত্রও সন্দেহাতীত নহে—তিনিই বা কম যাইবেন কেন? তিনি যখন তাঁহার বিদ্যা লইয়াই বৎসরে হিন্দুস্থান হইতে প্রায় লক্ষ টাকা সঙ্গত উপায়ে লাভ করেন, তখন, এই কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুবা, তিনি কি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না? তাঁহার কীর্ত্তিকথা কে না জানে? নদীয়ার মহারাজা আজ মৃত—কিন্তু—নলিনী নির্ব্বাচিত হইলে অবশ্যই মন্ত্রী হইবার চেষ্টাও করিবে—হিন্দুস্থানে ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগের ব্যবস্থাও হইয়াছে, সুতরাং পথ নিষ্কণ্টক। তখন স্যার বিজয়প্রসাদ কি করিবেন?

একি সত্য?

পত্রান্তরে প্রকাশ 'অমৃতবাজার পত্রিকার' অন্যতম অংশীদার, জয়েণ্ট এডিটার ও তুষারকান্তির অনুপস্থিতি কালে খাস সম্পাদক, যিনি অগ্রজ শিশিরকুমারের সহিত একযোগে কলিকাতা কর্পোরেশনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী শ্রীপরমানন্দ দত্ত জয়নগর মিউনি-

সিপ্যালিটীর কমিশনার হইবার জন্য নির্ব্বাচনের সিংহদ্বার ব্যবহার না করিয়া সরকারী মনোনয়নের পশ্চাদ্বার পথে গমন করিয়াছেন। কথাটা সত্য কিনা, তাহা 'অমৃত বাজার' বিবরিয়া বলিবেন কি? পরমানন্দ বাবু অবশ্য বলিতে পারেন, তিনি মতিবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও তাঁহার মতের উত্তরাধিকারী না-ও হইতে পারেন, কিন্তু nationalist বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানকারী পত্রের সম্পাদক যদি সরকারের মনোনয়ন গ্রহণ করেন, তবে কি বলিতে হয় না।—

"কি আর রেখেছ বাকি রে?"

বর্দ্ধমানের বিজয় প্রসাদ

ইনি রাজা মণিলালের "রাজা দাদা" নহেন, পরন্তু তাঁহার ভ্রাতা ও রায় বাহাদুর ললিত মোহন সিংহ রায়ের জামাতার পুত্র স্যার বিজয় প্রসাদ। নূতন নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ইনি নাকি বর্দ্ধমানের সব দুঃখ (সমেত দামোদরের বন্যা) মোচন করিবেন—এমন আশার কারণ দিয়াছেন। কিন্তু 'বঙ্গবাণীতে' দেখিতেছি, বর্দ্ধমানবাসীরা এখনও বন্যাবারণের উপায় না হওয়ায় শঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন! তবে কি বিজয় প্রসাদ যাহা আশা দিয়াছেন, সে বেদান্তের মায়া?

বেঙ্গল ষ্টোরসে বাঙ্গালী বিদ্বেষ

বেঙ্গল ষ্টোরসে বাঙ্গালী বিদ্বেষ সম্বন্ধে আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে "খেয়ালী"তে প্রকাশিত ষ্টোর-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে ষ্টোরের মিঃ ভট্টাচার্য্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহার প্রত্যুত্তরে আমরা মিঃ ভট্টাচার্য্য তথা ষ্টোরস-কর্তৃপক্ষকে যে কয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার সম্বন্ধে মিঃ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার প্রভুগণ নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। আমাদের প্রশ্নের জবাব দিবার অক্ষমতা ষ্টোরসের বিরুদ্ধে প্রকাশিত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত করে। সম্প্রতি দেশবন্ধু-ভগিনী শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী বেঙ্গল ষ্টোরসের কর্তৃপক্ষকে একখানি পত্র লিখিয়া সমস্ত গণ্ডগোল সুবিবেচনার সহিত সমাধান করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবীর অনুরোধ রক্ষা করা হইলেই সর্ব্বথা মঙ্গল। তাঁহার পত্রখানির হুবহু নকল নিম্নে মুদ্রিত হইল।

The Managing Agents
Bengal Stores Ltd,
Calcutta.

Dear Sirs,

It is with the greatest pain that I take up my pen to-day. I have been following the newspapers' reports of the troubles that are going on between the Bengalee employees and the management. Hitherto I have not paid very much attention, but the explanatory letter of the Asst. Manager has convinced me that there is some serious trouble. I have taken interest in the Stores since it was started. I have persuaded many of my friends to visit the Stores for all their purchases. I have sent many marriage parties to the Stores. I am a constant visitor there, not only for my purchases but for observance also. I have always seen a very cordial relationship between the Marwari and Bengalee employees. Then why these troubles started?

I request you with all the emphasis I can command to deal with the matter with greatest tact and impartiality. If the trouble goes on, the Stores will be doomed. The majority of the purchasers are Bengalees—as you know; they will want to go to the bottom of the whole thing. There will be a great public scandal, which should not be allowed to take place, and I am afraid the matter will not rest there. The other concerns of the authorities will suffer.

The whole thing has upset me so much that I have had to get up from my sick-bed to send this letter.

Before I stop I request you to be very tactful and amend the matter satisfactorily.

Yours truly,
Sd/ Urmila Devi
(Sister of Late C. R. Das.)

করপোরেশন নির্ব্বাচন

বড়বাজারের কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত সীতারাম সাকসেরিয়ার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যানডন

সহ বর্ত্তমান কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত সপ্তাহে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রেস প্রতিনিধি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার কলিকাতায় আগমন বাঙ্গলার কংগ্রেসী কলহের নিষ্পত্তির ব্যাপার সংক্রান্তে নহে—সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গলার বিভিন্ন কংগ্রেস দলের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন ও যে মিলন ফরমুলা রচনা করিবেন তিনি সুধু তাহারই সমর্থন ও অনুমোদন করিবেন। ব্রহ্মণ্যতেজোদ্দীপ্ত সহযোগী "বসুমতী" এই মিলন প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ফলাহারের নিমন্ত্রণ পাইলেও" ব্রাহ্মণপ্রবরেরা না আঁচান পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া অনুচিত। এই সর্ব্বজনবিদিত প্রবাদবাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াও, বর্ত্তমানে বাঙলা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন ঘটনাসমূহের ঘাত-প্রতিঘাত ও তাহার পরিণতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা আশান্বিত যে, বাঙলা কংগ্রেসে একটি অখণ্ড দল গড়িয়া উঠিবে।

সুরেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন কার্য্যকরী হইবার সময় হইতেই করপোরেশনে কংগ্রেসীদলের প্রাধান্য প্রবল হইয়াছে। কিন্তু দেশবন্ধু ও সেনগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যু ও বসুভ্রাতৃদ্বয়ের অবরোধের পর করপোরেশনে কংগ্রেসীদল হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিধা-বিভক্ত কংগ্রেসীদল কভু ইয়োরোপীয় দলের সহিত মিতালী করিয়া, কভু মনোনীত দলের সহিত মিলিত হইয়া আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছেন। আদর্শ-চ্যুত কংগ্রেসীদল হিসাবে করপোরেশনে অবস্থান অপেক্ষা কংগ্রেসের পক্ষে করপোরেশনে প্রবেশ না করাই শ্রেয়। তবে যদি একটি শক্তিশালী সংখ্যা-গরিষ্ট দলে আবদ্ধ হইয়া কংগ্রেসী সদস্যগণ একযোগে কার্য্য করিতে পারেন তাহা হইলে কংগ্রেসের পক্ষে আসন্ন নির্ব্বাচনে যোগদান করাই উচিৎ। ইউরোরোপীয় সদস্যগণের কৃপাপ্রার্থী কংগ্রেসীদল যে কংগ্রেসের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবেন না তাহা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি উপদলীয় নেতাদের বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইবার প্রয়োজন নাই।

সম্মিলিত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আসন্ন নির্ব্বাচনে যদি কংগ্রেস-প্রার্থী মনোনীত করা হয় তাহা হইলে নবম-বার্ষিকী নীতি গ্রহণ করা কংগ্রেসের পক্ষে শ্রেয়। যে সমস্ত কাউন্সিলার নয় বৎসরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি। তন্মধ্যে ৩নং ওয়ার্ডের প্রতিনিধি ভগ্নস্বাস্থ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষের পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পুনরায় কর্পোরেশনের কার্য্যে যোগদান করা হয়ত সম্ভবপর হইবে না। বহু করদাতাদের মনে হয় যে, রাজ-জামাতা শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল জলসরবরাহ সমিতির সভাপতি পদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে পারেন নাই। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শেঠ মিষ্টভাষী অজাতশত্রু হইলেও তাঁহার অবসর গ্রহণ করা উচিৎ। ৭নং ওয়ার্ডের শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ কুমারকে কেহ কখনও কর্পোরেশন সভায় দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার মত দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে পুনরায় মনোনীত না করাই যুক্তিযুক্ত। ২২নং ওয়ার্ডে শ্রীযুক্ত ধীরেন্ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে নবীন উৎসাহী ব্যক্তিকে মনোনীত করিলে তাঁহাদের জয় সুনিশ্চিত। খালপারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সাহু ও শ্রীজিতেন্দ্রিয়নাথ বসু স্মরণাতীতকাল হইতে কর্পোরেশনে বিরাজ করিতেছেন। হিমানী ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসী মনোনয়ন পাইলে যে নির্ব্বাচিত হইবেন তাহা সুনিশ্চিত। জিতেনবাবুর ন্যায় কৃতী ও কর্ম্মঠ ব্যক্তি কর্পোরেশনের বহু জনহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিতে পারিবেন।

আমরা আগামী সংখ্যায় কর্পোরেশন নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিব।

"কল্পনা"

শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "কল্পনা" আগামী ৩০শে মাঘ হইতে নিয়মিত পাক্ষিকভাবে প্রকাশিত হইবে। বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার রচনা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, আলোচনা ইত্যাদি ইহাতে স্থান পাইবে। আর্টপ্লেট ছবি ও সমস্ত পত্রিকা খানি আর্টপেপারে মোড়া। দাম প্রতিসংখ্যা মাত্র ৩ পয়সা। এই পত্রিকাখানি মুখার্জ্জি পাবলিশিং হাউস, ৭৮নং কাশীপুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইবে।

মধু মাসের মধুর বারতা

আমাদের শ্রীদুর্ব্বাসা সংবাদ দিয়াছেন যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্রীজ খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুনের প্রথমে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন বলিয়া স্থির-সঙ্কল্প করিয়াছেন। Bohemian মণিদার ভাবী বধূকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আমাদের কোন অধ্যাপক পুরোহিত বন্ধু মনোনয়নের ছাপ দিয়া আসিয়াছেন। মণিদা ও ভাবী বৌদিদির সম্মানার্থে আগামী শ্রীসরস্বতী পূজার দিন ৪১নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে একটী ব্রীজ প্রতিযোগিতার আসর বসিবে। অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কি সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন?

মিতালী সঙ্ঘ

আগামী মঙ্গলবার ২৮শে জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে ৭২নং কাঁশারী পাড়া রোডস্থিত মিতালী সঙ্ঘের সাদর নিমন্ত্রণ পাইয়াছি। শ্রীপঞ্চমী দিবসে ইঁহাদের বাণী-অর্চনা সার্থক হউক—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

প্রেসিডেন্সী কলেজ "ফাউন্ডার্স ডে"

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের "ফাউন্ডার্স ডে" (Founders' Day) গত ২০শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভূতপূর্ব্ব ছাত্র হিসাবে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

কংগ্রেস-সভাপতির আবির্ভাবে মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক্, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও মিঃ এ, কে, চন্দ যেরূপ ব্যস্ততার সহিত সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন তাহা যেরূপ অশোভন তদ্রূপ অভদ্রোচিত হইয়াছিল। সরকারী চাকরী করিলে যে সামাজিক অনুষ্ঠানে অভদ্রতা না করিলেও চাকরী বজায় থাকে তাহা কি ইঁহাদের সমঝাইয়া দিতে হইবে? লেডী বি, এল, মিত্র প্রভৃতি অন্যান্য "এ্যারিষ্টোক্রেটিক" মহিলাদের সভা-ত্যাগও তদ্রূপ অশোভন হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তিনি ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের বাসিন্দা ছিলেন। তৎকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে তাঁহার এক কক্ষবাসী (Room-mate) ছিলেন। বহুদিন পরে অধ্যাপক ঘোষ ও অধ্যাপক চারুচন্দ্রের সন্দর্শনে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অস্থায়ী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠন

সকল দলের সন্তোষ বিধানে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত পরামর্শ করিয়া কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ অস্থায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠন করিয়া নিম্নলিখিত কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলী ও কর্ম্মকর্ত্তাগণকে মনোনীত করিয়াছেন :—

সভাপতি—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
সহঃ সভাপতি—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মৈত্র
ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
মোঃ আবদুল্লাহিল বাকী
সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
সহঃ সম্পাদক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়
শ্রীহরেন ঘোষ
শ্রীহারাণচন্দ্র ঘোষচৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ—কুমার দেবেন্দ্রলাল খান
কার্য্য নির্ব্বাহকমণ্ডলীর
সদস্যবৃন্দ—শ্রীকিরণশঙ্কর রায়
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
শ্রী জে, সি, গুপ্ত
ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
মৌঃ আস্রাফউদ্দীন চৌধুরী
শ্রীধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
শ্রীনেপালচন্দ্র রায়
নিন বসু
শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেব
শ্রীহেমন্তকুমার বসু
ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত
শ্রীপরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ জীবনরতন ধর
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
শ্রীবিভূতিভূষণ হাজরা
অছিমুদ্দিন আহমদ্
ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র
ও
রেজাউল করিম।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলার কংগ্রেসী কলহের অবসান-কল্পে অদ্যাবধি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন; সুতরাং বর্ত্তমানে অস্থায়ী প্রাদেশিক সমিতির সম্পাদকরূপে যে তিনি বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারিবেন তাহা আমরা আশা করি।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও ক্যাপ্টেন দত্ত শ্রীযুক্ত সুরেশ মজুমদারের সহিত মিলন প্রচেষ্টা সফল করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারাও উক্ত সমিতিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে মনোনীত হইয়াছেন।

তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বিনয় বসু, শ্রীযুক্ত পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মী কংগ্রেস সেবকরাও উক্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিগত কয়েক বৎসরের পুঞ্জীভূত কলহের অবসান হইয়া শক্তিশালী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বাংলায় গড়িয়া উঠুক—ইহাই আমরা কামনা করি।

অষ্ট্রেলিয়ার পরাজয়

অবশেষে সত্যিই অষ্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষে দেশী দলের কাছে পরাজিত হোল! বোম্বাইতে অতিশয় পুষ্ট দল যা করতে পারেনি, কোলকাতায় খুব কম রানে অষ্ট্রেলিয়ানদের আউট করে দিয়েও যা সম্ভব হয় নি, লাহোরে তরুণ অখ্যাত খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিয়ে মেজর উজির আলি অষ্ট্রেলিয়াদের হারিয়ে দিয়েছেন। সত্যিই খেলার দিন যখন নির্ব্বাচিত ধনুর্দ্ধর খেলোয়াড়দের খেলার মাঠে অনুপস্থিত দেখলাম এবং তার জায়গায় ঐ অখ্যাত যুবকরা বুক ঠুকে মাঠে নামলো, তখন বাস্তবিকই সন্দেহ ছিল যে হয়তো বোম্বাই, কোলকাতার চেয়েও লাহোরে অষ্ট্রেলিয়ানদের কাছে ভারতবর্ষকে আরো বিশ্রীভাবে হেরে যেতে হবে। আমরা সন্দেহ মোটেই অকারণে করিনি; যে দলে অমরনাথ, অমর সিং, মার্চ্চেন্ট, জয়, সি, কে, নাইডুর মত বিচক্ষণ খেলোয়াড় নেই, সে দল কেমন করে অষ্ট্রেলিয়ার 'পাকা' খেলোয়াড় দলের সঙ্গে লড়বে, তা সত্যিই আমরা ভেবে উঠতে পারিনি। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সকল সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণ করে উজির আলীর তরুণ দল অষ্ট্রেলিয়ান দলকে হারিয়ে দিয়েছে।

এই জয়ে আমাদের আরো বেশী আনন্দ হবার কারণ হচ্ছে যে এই প্রথমবার আন্তর্জ্জাতিক ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ জয়ী হোল। এর আগে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের খেলা হয়েছে ৫টী তার একটীও ভারতবর্ষ জিততে পারেনি।

দ্বিতীয় কারণ এবার সর্ব্বপ্রথম আন্তর্জ্জাতিক খেলায় একজন তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড় ভারতবর্ষের পক্ষে খেলবার জন্যে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এস, ব্যানার্জ্জি আজ নিখিল ভারত ক্রিকেট দরবারে বাংলার মুখ রেখে এসেছেন। ভারতবর্ষ দলের দ্বিতীয় ইনিংসে যদি ব্যানার্জ্জি অত ভাল খেলতে না পারতেন, তবে ম্যাচের ফলাফল কি হত তা বলা বড় শক্ত।

আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে অষ্ট্রেলিয়ান দল এমন কিছু মারাত্মক রকমের শক্তিশালী দল নয়। নিজের উপর বিশ্বাস রেখে যদি তাদের সঙ্গে খেলা যায় তো ওদের হারিয়ে দেওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। এতদিন পরে উজির আলীর দল এই কথাটি ঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলে মনে হচ্ছে। আমাদের মনে হয় ঠিক হয় জন্যেই তারাই জিততে পেরেছে।

খেলার ফলাফল (সংক্ষিপ্তভাবে):—

ভারতবর্ষ

১ম ইনিংস—১৪৯ (মেহেরোমজী—২৬, উজির আলি—১৬; লেদার ৩৮ রাণে ৩, নেগেল ১২ রাণে ৪ ও মেয়ার ৮ রাণে ২ উইকেট)।

২য় ইনিংস—৩০১ (এস, ব্যানার্জ্জি—৭০; উজির আলি—৯২, তাপ্পা—২৭, সৈয়দ—২৬, আমির এলাহি—২৬, সালাউদ্দিন—২৩; লেদার ১০২ রাণে ৫ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া

১ম ইনিংস—১৬৬ (ম্যাকার্টনি ৩৪, মরিসবি ২৩, রাইডার ২১, লেদার ২১; নিসার ৭২ রাণে ৪, আমীর এলাহি ১৫ রাণে ৩ ও বাকা জিলানী ৪৫ রাণে ২ উইকেট)

২য় ইনিংস—২১৬ (রাইডার ৭০, মরিসবি ৩৫, অক্সেনহ্যাম ৩০; বাকা জিলানী ১৬ রাণে ৪, নিসার ৮০ রাণে ৪ উইকেট)

* * *

লাহোরের ম্যাচের পর অষ্ট্রেলিয়া দল পাটিয়ালায় রাজেন্দ্র জিমখানার সঙ্গে খেলে

ড্র করেছে। তারপরে তারা এখন দিল্লীতে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে খেলছে। এই খেলাটি সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুর জন্যে পুরো তিন দিন না খেলা হয়ে ছ'দিনের পর অমীমাংসিত হিসেবে শেষ হয়েছে।

আন্তপ্রাদেশিক ক্রিকেট

কোলকাতায় ইডেন গার্ডেনে আন্ত-প্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগীতার দুটো খেলা হয়ে গেল। প্রথম, বাঙ্গলা ও আসাম দলের সঙ্গে মধ্য প্রদেশ ও বেরার। এই খেলায় বাঙ্গলা ও আসাম জয়ী হওয়ায়, তারা মধ্যভারত ও রাজপুতানার সঙ্গে খেলবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই খেলা নিয়মানুযায়ী ড্র হলেও বাঙ্গলা ও আসাম দল প্রথম ইনিংসে বেশী রাণ করায় তাদের জয়ী বলে ধরা হয়েছে। বাঙ্গলা ও আসাম দল এরপরে মাদ্রাজে দক্ষিণ বিভাগের জয়ী মাদ্রাজ দলের সঙ্গে মাদ্রাজে খেলবে।

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টসের উদ্বোধন উৎসব

গেল ১৫ই জানুয়ারী বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টসের উদ্বোধন উৎসব হয়ে গেল। পুরোহিত ছিলেন বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর। ১৯৩৫ সালের হাস্যকর ব্যাপার যারা ভুলতে পারেন নি সেই রকমের দর্শকদের ভীড়ই হয়েছিল বেশী। যাহোক এ বছরে অলিম্পিকের একটি বিষয়ে উন্নতি হয়েছে দেখা গেল। পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী "সাত-আওয়াজ"-এ অলিম্পিকের উদ্বোধন ঘোষণা করতে গিয়ে গেল বছরে অলিম্পিকের কর্ত্তারা হাসির রসদ জুগিয়েছিলেন প্রচুর। যে পিস্তল দিয়ে শব্দ করা হচ্ছিল, চতুর্থ শব্দের সময় সে রীতিমত সত্যাগ্রহ সুরু করে দিল। বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে গেল। শেষে দ্বিতীয় পিস্তলের সাহায্যে এ প্রহসনের যবনিকা পতন হয়।

এ বছরে বোমার সাহায্যে অলিম্পিকের ঘোষণা হতে দেখে দর্শকদের মধ্যে যদি কেউ মনক্ষুণ্ণ হ'য়ে থাকেন তাহলে তাদের আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

ভলিবল ও অলিম্পিক

লাহোরে "ইণ্ডিয়া অলিম্পিকে" এ বছরে ভলিবলেরও প্রতিযোগিতা হবে। বাঙ্গলার খেলোয়াড় বাছাই করা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে—যদি সরকারীভাবে এখনও ঘোষণা করা হয়নি। আমরা জানতে পেরেছি যে কোলকাতার বাস্তবিক গুণী খেলোয়াড়রা অলিম্পিকের বাছাই দেখে অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন হবারই কথা, কারণ বাংলা দেশে অলিম্পিকের মধ্যে এমন একজনও নেই যার ভলিবল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রকম ধারণা আছে এদেরি একজন হোমরাচোমরা লোকরে সেদিন আমরা বলতে শুনেছি যে তিনি চান ভলিবল খেলোয়াড়রা সাত ফুট না হোক অন্ততঃ ছফুট লম্বা হবে—তা সে খেলা জানুক আর নাই জানুক। আপনাদের মধ্যে যদি কেউ ছফুট লম্বা থাকেন ত আমাদের জানাবেন। আমরা নিশ্চয়ই তাকে লাহোরে "ইণ্ডিয়া অলিম্পিকে" ঘুরিয়ে আনব।

(বিলাসী)

কালী ফিল্মস্

দেবকী বসুর "সোনার সংসার" এথানে তোলা হবে না। দেবকীবাবু এই ছবিথানা ঈষ্ট ইণ্ডিয়ায় তুলবেন—এরূপ প্রকাশ।

* * *

সুকুমার দাশগুপ্তের হিন্দি "প্রফুল্ল"-র মহলা বলেছে। শূটিং অনতিবিলম্বেই সুরু করবার চেষ্টা চলছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

"পথের শেষে"-র কাজ শীগ্‌গির শেষ করবার জন্যে মুখুয্যে মশাইকে এই দারুণ শীতেও মাঝে মাঝে ঘেমে ভিজে যেতে দেখা যাচ্ছে। "পথের শেষে"-র শেষ সীমানায় পৌছুতে না পারা পর্য্যন্ত তাঁর যে দুশ্চিন্তা কাটছে না—এমনি ভাব তাঁর মুখে আজকাল যেন ফুটে উঠেছে।

রীতেন এণ্ড কোং

এদের "তরুবালা" শনিবার ৩লা ফেব্রুয়ারী থেকে 'শ্রী'-তে মুক্তিলাভ কোরবে। সুশীল মজুমদারের গুণে আর অপূর্ব্ব শিল্পী-সমন্বয়ে ছবিথানা যে লোকপ্রিয় হবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

মায়াপুরী ষ্টুডিও

চানী দত্ত এই নামে আবার ষ্টুডিও খুলেছেন। ছবি তোলা সুরু হয়েছে—নাম, "রাজগী" বা "কৃষ্ণহীন বৃন্দাবন"। ভূমিকা-লিপি হয়েছে—

রাধা—রেণুকা রায়

কৃষ্ণ—জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী

অন্যান্য ভূমিকা—সুরমা, ভারতী, সত্য, কমলা, প্রতিমা, হরিধন মুখোপাধ্যায়, চানি দত্ত, সুনীল দাস প্রভৃতি। ছবিথানা পরিচালনা কোরবেন স্বয়ং চানী দত্ত, সঙ্গীত পরিচালক হচ্ছেন সন্তোষ দে।

ভারতলক্ষ্মী

এথানে চারু রায়ের হাতে "বাঙ্গালী" প্রায় আধাআধি শেষ হ'য়ে এল।

দেবদত্ত ফিল্মস্

বারাকপুরে দেবদত্ত ফিল্মসের তোড়জোড় চলেছে খুব। ষ্টুডিও তৈরি হচ্ছে, আর্টিষ্টদের কনট্রাক্ট হচ্ছে, আরো কত কী। মোট কথা জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যে ও হরিভঞ্জ এবার একটা কিছু না কোরে ছাড়বেন না। কালী ফিল্মসের ক্যামেরাম্যান সুরেশ দাস এই দলে যোগ দিয়েছেন।

রীতেন এণ্ড কোং-র "তরুবালা" ছবির পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার

পপুলার পিক্‌চার্স

যামিনী মিত্তির আর সতু সেন এবার নতুন একটা কিছু করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

বেঙ্গল টকীজ
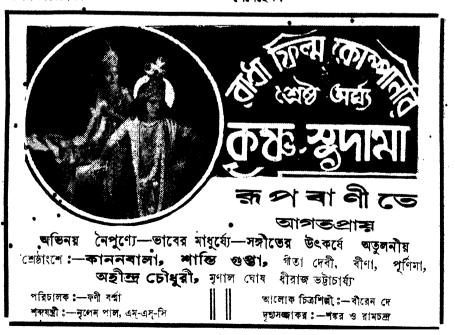
এদের "ওয়ান্ ফেটাল নাইট" ফাটুস বলে। অনেকদিন ধরে পেকে রয়েছে এবার ফাটবারই পালা। মধু বোসের পরের ছবি কী হবে?

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া টকীজ

এদের উর্দ্দু ছবি "প্রেমলক্ষ্য" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। ইনামুল হকের স্বীয় তত্ত্বাবধানে ছবিখানা যে জনপ্রিয় হবে—একথা বলাই বাহুল্য।

ন্যাশন্যাল থিয়েটার্স

এদের উর্দ্দু ছবি "ড়ার্কি-কা-শীকার" মুক্তপ্রায়। এরপরে এদের একখানা বাঙলা আর একখানা উর্দ্দু ছবি উঠবে। দাদা আর বুলিসাহেবের চেষ্টার অন্ত নেই।

এভারগ্রীন পিক্‌চার্স

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "বিয়ের খাতা" এদের হবে পরবর্ত্তী ছবি। ছোট হলেও এ প্রতিষ্ঠানটি উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

"শ্রী"-র উদ্বোধন

গেল শনিবার "শ্রী"-র উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হ'য়েছে। "শ্রী" যে শ্রীমণ্ডিত হ'য়েছে যাঁরা "শ্রী"-কে দর্শন কোরেছেন তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার কোরবেন একথা। এক্সিবিটার্স সিণ্ডিকেট বহু অর্থব্যয়ে সাধারণের জন্যে যে নতুন চিত্রগৃহটির দ্বারোদ্ঘাটন কোরলেন তার জন্যে সকলের কাছেই তাঁরা পাবেন অজস্র ধন্যবাদ।

এম্পায়ারে নাচের আসর

গেল মঙ্গলবার আর বুধবার সন্ধ্যেয় এম্পায়ার মঞ্চে Children's Fresh Air and Excursion Societyর সাহায্যকল্পে বসেছিল এক চমৎকার নাচের আসর। নানানরঙের আলো, রং-বেরংয়ের শাড়ী আর সুন্দরীদের চটুল চাহনী চোখে চকোলেট আর 'লোভিনার' ফেরী—এ সব মিলে

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

"নারী-বাহু মাঝে তাহা পড়ে নাকো ধরা"

দুই দেহ, এক মন, অভিন্ন হৃদয়
আনন্দ নদীতে যেন সুধাস্রোত বয়
ললিত-সবিতা দোঁহে জীবনের তরী
বাহিছে মধুর বায়ে; মিলন শর্ব্বরী
সকল আঁধার দেছে জ্যোছনায় ঢাকি'
জীবন সুরভি হ'ল ফুল-রেণু মাখি।

পুরাতন দিবসের বন্ধুর স্মরণে
আসিল অবনী সেথা; সস্নেহ বরণে
বান্ধবে ললিত হাসি' লইল যে ডাকি;
সবিতা পরাল হাতে বান্ধবীর রাখী।

দিন যায়—ক্রমে আসে আর একজন
সৌম্য, শান্ত, মধুভাষী, প্রিয় দরশন
অজয়,—অবনী-সখা; ত্রয়ী এক সাথে
বন্ধুর জীবন পথে ধরি হাতে হাতে
চলিল যে আগুসরি', ভেবেছিল সবে
এই সখ্য প্রীতি কভু শেষ নাহি হ'বে
দুঃখ, ব্যথা, আঘাতেরে করিয়া বিলীন
স্বার্থহীন আনন্দেতে কেটে যাবে দিন।
বিধাতৃ-নয়নে হায় অলক্ষ্যে তখন
ফুটেছিল যেই হাসি—কে করে বর্ণন!

কার লাগি' কার মনে বাজে বীণা বেণু;
কোন্ অতিথির লাগি বিছাইয়া রেণু
কুসুম বসিয়া থাকে—কেহ কি তা' জানে
মরমের গূঢ় কথা কোনো অভিধানে
কেহ তো পেলনা খুঁজে, বিহ্বল ব্যাকুল
মানুষ করিছে তাই পদে পদে ভুল!
অজয়ের লাগি হেরি সবিতার চোখে
উজল প্রীতির দীপ্তি, তার হৃদি-লোকে
অজয়ের তরে হেরি বন্ধুর আসন,
শুনিয়া সবিতা মুখে সুপ্রিয় ভাষণ
বন্ধু অজয়ের তরে, ললিতের মনে
জ্বলিল হিংসার জ্বালা অতি অকারণে!

ক্রুর মিথ্যা সন্দেহেতে ছাইল গগন,
উজল সবিতা-দীপ্তি আঁধারে মগন!
অবনী আনিয়া মিথ্যা নিন্দার সম্ভূতি
এ বিদ্বেষ-বহ্নিকুণ্ডে দানিল আহুতি।

আত্মপরায়ণ হায় মানবের মন
প্রতি পদক্ষেপে নিত্য করিয়া গণন
হিসাব করিছে হেথা লাভ আর ক্ষতি,
ক্ষীণ ক্ষুদ্র শক্তি ল'য়ে জীবনের গতি
বৃথা রোধিবারে চায়; কাপুরুষ হ'য়ে
জীবনেতে বীরভোগ্যা রমণীরে লয়ে
ব্যর্থ অভিযান তার, দুর্ব্বলতা-ফাঁদে
আপনি পড়িয়া বাঁধা প্রাণ তার কাঁদে।

অজয়ের পূর্ণমনে তাই জাগে আজি
জীবনের শত চিত্র যেন ছায়াবাজী!
মুক্ত মনে মুক্ত চোখে দেখিতে যে জানে
সেই বুঝিয়াছে এই জীবনের মানে।
জীবনের নিত্যস্রোতে বিচিত্র লীলায়
কতলোক কতজনে মাধুরী বিলায়
কে হিসাব রাখে তার হও মুক্তপাখী
নিজ পক্ষশক্তি 'পরে সুবিশ্বাস রাখি'
উড়ে চল এক দেশ হ'তে দেশান্তরে;
খাঁচার বন্ধনমাঝে কঠিন নিগড়ে
কেন গো পড়িবে বাঁধা? সোণার শিকল
লোহার শিকল সম করিয়া বিকল
স্বাধীনতা লয় হরি'। অসীম এ ধরা—
নারী বাহুমাঝে তাহা পড়ে নাকো ধরা;
নিমেষের প্রেম চেয়ে বড় এ জীবন
সর্ব্বগ্রাসী মোহ-লিপ্সা সেতো উদ্বন্ধন!
'কর্ম্মময় এ জীবনে নাহি তার ঠাঁই
বৃথা হিংসা, বৃথা দ্বেষ, কলহ বৃথাই।
স্রোতমুখে অজয়ের তরী চলে ধীরে
অবনী ললিত কাঁদে দাঁড়াইয়া তীরে।

রূপ-তরঙ্গ

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

সেদিনের সন্ধ্যেটা যে মনোহারী হয়েছিল তা না বললেও চলে। যে মহৎ উদ্দেশ্যে এই নাচের অনুষ্ঠান হোয়েছিল তার সহায়তা করতে সহরের অভিজাত সম্প্রদায়ই শুধু নয়, সাধারণ লোকও সেদিন এসেছিল অনেক।

অর্কেষ্ট্রা বাজনা আর নাচ হয়েছিল বিভিন্ন কল্পনার অনেকগুলো। তার মধ্যে আমাদের বেশ ভাল লেগেছে শ্রীমতী সাধনা বসুর 'রাধিকা'র নাচ, লতা দত্ত এবং বুলবুলের 'সাপুড়িয়ার নাচ' আর 'শিব ও নর্ত্তকী'র নাচ। শ্রীমতী সাধনার সাধনালব্ধ সুন্দর কলাজ্ঞান সেই পুরোণো দিনের মত এখনো তেমনি সুন্দর আছে দেখে বাস্তবিকই আমরা সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম—তিনি এখনো সহরের এই শ্রেণীর নৃত্যকলাপ্রিয় সমাজের সম্রাজ্ঞী!

এই প্রসঙ্গে সেদিনকার অনুষ্ঠাতৃদের রুচিজ্ঞান সম্বন্ধে দু'একটি সত্যি,—অপ্রিয়ও হয়তো, কথা না বলে পারিনে।

"আপনি করলে লীলা-খেলা
পাপ লিখলে পরের বেলা"—

দেবতাদের পৌরাণিক কাহিনী পুড়ে তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করে এবং নিজের মানবীয় দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে কোন্ রসিক এই ছড়াটি লিখেছিল জানা নেই, কিন্তু বাঙ্গলার এ একটা অতি প্রচলিত ছড়া। ছড়াটি শুনে হাসতে পারা যায়, কিন্তু কেউ যদি এই ছড়ার অন্তর্নিহিত মনোভাবকে বাস্তব রূপ দিতে যায় অর্থাৎ দেবতাদের লীলার মানবীয় অনুবর্ত্তনের চেষ্টা করে, তাহ'লে সম্ভবতঃ শিক্ষিত সমাজ তার রুচির প্রশংসা করবে না।

এই রকম রুচি-বিগর্হিত ব্যাপার আমরা ১৪ই তারিখে এম্পায়ার থিয়েটারে 'শিব ও নর্ত্তকী' নাচে দেখেছি।

এই নাচের মধ্যে আছে ছদ্মবেশী শিব ও এক নর্ত্তকী নাচতে নাচতে দুজনে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বাস্তবভাবে মঞ্চে এই দৃশ্য দেখানো এবং ঘুম বোঝাবার জন্যে দুটি যুবক-যুবতীকে (তারমধ্যে একজন বিবাহিতা নারী) পাশাপাশি শুইয়ে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে জঘন্য যৌন আবেদনপূর্ণ রুচির পরিচয় আছে তার নিন্দার যোগ্য ভাষা আমাদের নাই।

২১নং ওয়ার্ডের প্রতিনিধি

ডাঃ সুবোধচন্দ্র ঘোষ

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারকে মেয়র নির্ব্বাচনের সময় কোন পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন তাহা তিনি করদাতাদের স্মরণ করাইয়া দিবেন কি?

"কথা-কলি"

প্রতি বছরই আমাদের হরেনদা নতুন-কিছু অনেকদিন হ'লো ক'রে আসছেন। আমোদ-প্রমোদের গণ্ডির ভেতর এ পড়লেও, হরেনদার এই 'নতুন-কিছু'তে একটি বিশেষত্ব সবার চোখে পড়ে। সেটি হচ্ছে প্রমোদ-ছলে ভারতীয় কোন নৃত্যকলার উৎকর্ষ সাধন।

এ নৃত্যের প্রতি অনু পরমাণুতে ভারতের ধূলো সোণার মত চিকচিক করে। বিদেশীয় লাল আভার নীচে শিব-নর্ত্তকীর এ চুম্বন-লীলা নয়। এতে ছড়িয়ে থাকে ভারতের একমাত্র নিজস্ব এক ছটা, দেশী আলোয় এ আয়নার মত উজ্জ্বল।

উদয়শঙ্কর, বর্ম্মার সেই মিয়া তান্ চি, হরেনদা—এবার আপনার কী?

জবাব এসেচে ডাকে—"কথা-কলি"।

জিনিষটি আর কিছু নয়। লটি মিটার কিম্বা স্বপন রে'কে জিজ্ঞেস্ করুন—তারা চটপট্ বলবে—'ট্যাব্‌লো'।

কথা যে শুধু মুখ কয় না—এ আমরা জানি। নতুন এ নৃত্যনাট্যে "কথা-কলি" হচ্ছে নির্ব্বাক অভিনয়। মনের কথা মুখে না ব'লে এর ভাষা হচ্ছে ভাবে। ভাব আবার প্রাচ্য নাচের নিখুঁত ছন্দ লীলায়। সেই ছন্দের সুন্দর সুরে এর গান, তার তানে এর মনোরম সঙ্গত।

শ্রীশঙ্করণ নাম্বুদ্রি

রামায়ণের কিষ্কিন্ধা-বাসী বলে মাদ্রাজীদের আমরা ঠাট্টা করলেও জানি সুর-কলায় এদের অদ্ভুত জ্ঞান। "কথা-কলি"র বিখ্যাত প্রবর্ত্তক হচ্ছেন এই শ্রীশঙ্করণ নাম্বুদ্রি। ইনি যে সে লোক নন—উদয়শঙ্করও এঁর কাছে নাচের নানান-রূপ শিখে এসেছেন।

এই নাম্বুদ্রির নৃত্য-খ্যাতি নৃত্যরসিকদের কাছে অবিদিত নয়। সেই বিখ্যাত নর্ত্তক সদলবলে এবার এসেছেন কলকাতায়। এ দলের নাম হচ্ছে 'কেরালা কলালয়ম্'। এ নৃত্যকলা কোমলতর করবার জন্য যোগদান করেছেন—

শ্রীমতী কনকলতা

বাংলার হরিণ-নয়না সোনার সেই উর্ব্বশী মেয়ে। চটুল চলনে যার চঞ্চল নুপুর। আর —দেবেন্দ্রশঙ্কর, রাজেন্দ্রশঙ্কর, কামিনীশঙ্কর। এককথায়—শঙ্কর-সংসার।

শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের এই অভিনব অবদান আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার আরম্ভ হবে। স্থান নিউ এম্পায়ার।

মেয়র নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে

যে সমস্ত কাউন্সিলার কর্পোরেশনের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আবেদন করিয়া মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন

২১নং ওয়ার্ডের প্রতিনিধি

ডাঃ সুবোধ ঘোষ

কি

তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম?

সন্তানিকা

শ্রীবিশ্বায়ক ভট্টাচার্য্য

(কবিতা)

আজ এই ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘের উদার পট ভূমিকায়
তুমি কোন কথা বললে না সখি!
এই ক্ষুব্ধতা রইলো আমার মনে যে, একে তুমি
পরিপূর্ণ ক'রে তুললোনা তোমার
বলশালী বাগ্মিতায়।
আমাদের আজকের মিলন মহিমান্বিত হলোনা
তোমার আত্মসমর্পণের রমণীয় রোমাঞ্চে।
হায় সন্তানিকা!

কতোদিন পরে দেখা হ'ল বলোত
তোমার সঙ্গে?
এক যুগ কি তারো বেশী কি
আরো বেশী।
আজ কি মনে পড়বে তোমার
সেদিনের কথা—
যেদিন তোমার সদ্য-পুষ্পিত
কৌমার্য্যের কুঞ্জে
আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলে?
বিহ্বল বিস্মৃতিতে আমার বুকে মাথা
রেখে বলেছিলে
"তোমাকে আমি ভুলবোনা-ভুলবোনা।
যেখানে থাকি, যেমন থাকি,
পরম পরিতৃপ্তিতে
স্মরণ করবো তোমার দানের অসচ্ছলতা।"
একি মিথ্যা?

সুদীর্ঘ সাত বছর পরে—
আজ যখন তোমার দেখা পেলাম
এই অখ্যাত পল্লীপ্রান্তে
তখন তুমি নিজের চারিদিকে তুলেছ
এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর
পুত্র কলত্রের স্নেহ আর শাসনের
সহজ মীমাংসা সাধনে।
তোমার মধ্যেকার সেই তন্বী
তরুণী গেছে মরে—
নেই তার অধর রক্তিমা,—নেই
দুঃসাহসিক জীবনাভিযান।
অন্ন আর বস্ত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি
নিয়োগ করে
আজ তুমি অবিরাম উচ্চারণ
করে চলেছ
স্থিতির মরন মন্ত্র।

তাইতো আজ যখন আবার
তোমাকে টেনে নিতে গেলাম
বহুদিন পরে আমার সুদৃঢ় বাহুবন্ধনে—
তখন কোথায় যেন কাদের একটি ছেলে
কেঁদে উঠলো
তুমি বললে—"আমার খোকা উঠেছে।"
দাঁড়ালেনা, চিন্তা করলেনা, ছুটে চলে গেলে
স্নেহার্ত্ত পশুর মত নিজের
খোকাকে দেখতে।
কিন্তু একি ভ্রান্তি!

সন্তান? সেতো স্বামী-স্ত্রীর বিমুগ্ধ
জীবনযাত্রায়
ক্লান্তির ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।
এই সহজ সত্য যখনই তুমি ভুলেছ
তখনই হয়েছে তোমার মৃত্যু।
কায়িক নয়—মানসিক। ছিলে প্রিয়া,
হয়েছ জননী
হায় সন্তানিকা!

দুর্জ্ঞেয়

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

একটি সন্তানের জননী অল্পবয়স্ক রেখা বুঝিতে পারিল না কি করিয়া তাহার নবজাত শিশুটি ভূমিষ্ট হইবার তিন দিন পরেই মরিয়া গেল। গুরুতর আঘাত তাহার শোকাচ্ছন্ন কোমল হৃদয়ে যে নিষ্ঠুর গভীর রেখা টানিয়া দিয়া গেল তাহা মুখ বুজিয়া সহ্য করিবার ক্ষমতাও বুঝি তাহার নাই। দুর্ব্বিসহ বেদনায় দেহের প্রতিটি রেখা কঠিন হইয়া ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের তটে অশ্রুর প্রবল বন্যা নামিয়া আসে। রঞ্জন তাহার স্ত্রীর বর্ণনাতীত শোকার্ত্ত অবস্থা নিজের চোখে দেখিয়া নিজেরই উদ্গত অশ্রুকে দমন করিতে পারে না। ইহার উপর রেখাকে সে কী বলিয়া সান্ত্বনা দিবে।

তবুও অসহায় কণ্ঠে বলে: তুমি রাত-দিন অমন করে যদি কাঁদ রেখা, আমি কাকে নিয়ে থাকবো বলতো?

বিষণ্ণ-মুখে হাসি আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া উত্তর দেয়: না, না, আমি আর কাঁদবো না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে দেখা যায়, তাহার জোর-করিয়া-আনা হাসি মুখ দুর্য্যোগের ঘন অন্ধকারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে।

—রোজ একই কথার পুনরাবৃত্তি করে আমায় ভোলাতে চেষ্টা করো না। ওকি আবার তুমি কাঁদচো?

—কই না।

—তুমি কাঁদচো, আবার না বলচো।

একথার কোন জবাব না দিয়া রেখা উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই রঞ্জন বলিল: যেয়োনা, রেখা, একটা কথা বলি শোন।

—রান্নাঘরে তরকারীটা ঢাকা দিতে ভুলে গিয়েচি, ওটার ব্যবস্থা করেই আসচি —বেড়ালের যে উপদ্রব এখুনি হয়তো মুখ দিয়ে বসবে।

—বৌমা তো রয়েচে, যাহোক করবেথ'ন।

—কি বলছিলে?

চল না দিন কতক কোথাও বেড়িয়ে আসি। তোমার মনের ও-ভাবটা কেটে যাবে।

—এখান থেকে এক পাও নড়তে পারবো না।

—তা হলে তোমার বাপ-মার কাছে অন্ততঃ দিন দশেক থেকে এসো।

—এখন কোথাও যেতে আমার ভাল লাগচে না।

কেশবপুরের জমিদার বংশের শেষ প্রদীপ রঞ্জনের সংসার বলিতে সে নিজে। কর্ত্তাদের আমলের চাকর-বাকরের কোলাহলে প্রকাণ্ড তিন মহল নির্জ্জন বাড়ীটি সদা-সর্ব্বদা মুখর হইয়া আছে। এদের লইয়াই রঞ্জনের সংসার।

অথচ ত্রিশ বৎসর আগে এতো বড় একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে বোস বংশের পরিবারবর্গেরই এতটুকু মাথাগুজিবার সঙ্কুলান হইত না। বাড়ীতে সারা বৎসর ধরিয়া ক্রিয়াকলাপ লাগিয়াই আছে। দুর্গাপূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। গাঁয়ের কোন ব্যক্তি সাতদিন ধরিয়া বাড়ীতে হাঁড়ি চড়াইতে পারিত না—জমিদার বাড়ীর কড়া হুকুম।

এই কয়েক বৎসরের ব্যবধানে অত বড় একটা সংসার দেখিতে দেখিতে চোখের নিমেষে কী করিয়া ধ্বংস হইয়া গেল গাঁয়ের কোন লোকই বুঝিবার অবসর পাইল না। তবুও প্রকাশ্যে তাহারা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল: এ-বংশে নিশ্চয় কেউ কোন গুরুতর পাপ করেচে, তা না হলে এত বড় সংসার এ রকমভাবে নষ্ট হয়।

কর্ত্তাদের আমলে যে-সমস্ত পূজা-পার্ব্বণ হইত তাহা এখনও রঞ্জন বজায় রাখিয়াছে নামে। সে সমারোহ আর নাই, উৎসব-আয়োজনের ব্যগ্র-ব্যাকুলতা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। জমিদার বাড়ীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আর পাতা পড়িতে দেখা যায় না। অর্থের অপ্রতুলতাই ইহার কারণ নয়। সংসারে এতগুলি জীবনের অচিন্তনীয় অকাল অবসানে রঞ্জনের সমারোহ করিয়া কোন ক্রিয়া-কলাপ করিতে ইচ্ছা হয় না।

একদিন রঞ্জনকে নিভৃতে পাইয়া বৃদ্ধ নায়েব রাজীবলোচন বলিলেন: আর এ রকম করে কদ্দিন চলবে, খোকাবাবু?

—কী হয়েছে জ্যাঠামশাই? কেউ কি আপনাকে মানচে না?

—না, না, তা নয়।

—তবে?

—এইবার একটি বৌমা না আনলে চলে না।

—দেখতেই তো পাচ্ছেন সংসারের হালচাল। এর ওপর কি আমাকে বিয়ে করতে পরামর্শ দেন।

নায়েব মশাই বুঝিতে পারিলেন কত বড় দুঃখে এবং ক্ষোভে রঞ্জন এই কথাটি বলিতেছে। এ-কথা বলা তাহার পক্ষে মোটেই অযৌক্তিক নয়। তবুও তিনি বলিলেন: না খোকাবাবু তা হয় না। পলাশগঞ্জের জমিদারকে আমি নিজে থেকেই কথা দিয়েছি। মেয়েটি আমার আগেই দেখা ছিল।

রেণ, যা ভালো হয় তাই করুন।

রঞ্জনের সঙ্গে রেখার বিবাহ হইয়া গেল। অনাড়ম্বর বিবাহ প্রচুর অর্থ থাকা স্বত্বেও—কোন জাঁকজমক হইল না। সাধারণ গৃহস্থের বেশে সে বিবাহ করিতে গেল। সঙ্গে গেলেন শুধু নায়েব মশাই এবং জন কতক পাল্কি-বেহারা।

পরদিন রঞ্জন রেখাকে লইয়া বাড়ী আসিলে পাশের বাড়ীর সম্পর্কে কাকীমা বউকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইলেন।

নব পরিণীতা রেখা প্রকাণ্ড প্রাসাদসম জমিদার গৃহে পদার্পণ করিয়া অসংখ্য দাস-দাসী ছাড়া সংসারে আপনার বলিতে আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ঝি মোক্ষদা বাড়ীর গিন্নী বলিলেই চলে। সে বধূকে গৃহে লইয়া গিয়া বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। রঞ্জন তখন কি একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে।

বৌভাত উপলক্ষে রঞ্জন গ্রামের কাউকে নেমন্তন্ন করিল না। নায়েব মশাইয়ের অনুরোধ সে উপেক্ষা করিল।

সাতদিন হইতে চলিল রেখা এখানে আসিয়াছে। নির্জ্জন বাড়ীর মধ্যে একাকী বন্দিনী অবস্থায় থাকিতে তাহার মন বসিতেছে না। মোক্ষদা একদিন রেখাকে সঙ্গে করিয়া প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রত্যেকটি কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিল। নিত্য-ব্যবহৃত তিন চারটি কক্ষ ছাড়া সব কক্ষগুলি অপরিষ্কার, আবর্জ্জনার স্তূপে পরিণত। সংস্কারের অভাবে সব ঘরের দেয়ালেই ফাটল ধরিয়াছে। মাঝে মাঝে বর্ষার জলের ছাতা স্পষ্ট দেখা যায়। আলসের ধারে এখানে ওখানে বটগাছের চারা নির্ব্বিবাদ আপনার শিকড় প্রসারিত করিয়া ফাটলের মধ্য দিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে পরম নিশ্চিন্তে অসংখ্য শাখা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। কড়িবরগাগুলি জরাজীর্ণ, যে-কোন মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া পড়িয়া যাইতে পারে। নববধূ মুখটি বুজিয়া দেখিয়া চলে, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে না।

অধিক রাত পর্য্যন্ত জমিদারী সংক্রান্ত কাজ করিয়া খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া রঞ্জন যখন শোবার ঘরে আসিয়া ঢোকে নববধূ রেখা তখন স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর এবং হতাশ হইয়া ঘুমে-ঢুলে পড়া চোখদুটি বারংবার রগড়াইয়া নির্জ্জন কক্ষে গভীর উৎকণ্ঠায় খাটের এক প্রান্তে জড়সড় হইয়া শুইয়া পড়ে। ঘুমন্ত রেখাকে জাগাইয়া অযথা বিরক্ত করিতে রঞ্জনের আর ইচ্ছা হয় না। খাটে শুইয়া পড়িতেই সারাদিনের অবসাদগ্রস্ত শরীরে ঘুমের কোমল পরশ নামিয়া আসে।

রেখাকে বেশী যত্ন-আত্তি করিতে রঞ্জনের সাহসে কুলাইয়া ওঠে না। একটি চিন্তা সদাসর্ব্বদাই তাহার মনে উঁকি মারিয়া ওঠে : বলা যায় না তাহার যেমন ভাঙ্গা বরাত নববধূকে সুখের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। কাজ কি রেখার সুখস্বাচ্ছন্দের উপর কড়া নজর রাখিয়া। গতানুগতিকভাবে সময় যেমন চলিয়া যায় তেমনি ভাবে রেখা সংসারের একপাশে পড়িয়া থাকুক, সমস্ত অভাব অভিযোগের নিষ্পত্তি তাই সে লোকজনের উপর ফেলিয়া দিবে।

একদিন সকাল সকাল শুইতে আসিয়া রঞ্জন দেখিল রেখা খাটের উপর শুইয়া হ্যারিকেনের আলোর সাহায্যে কী একটা বই পড়িতেছে। হঠাৎ তাহার মনে একটা দুষ্টু খেয়াল চাপিয়া গেল। সে পা টিপিয়া টিপিয়া খাটের ধারে আসিয়া রেখা কী বই পড়িতেছে উঁকি মারিয়া দেখিতে যাইতেই তাহার দেহের ছায়া সামনে পড়িল। রেখা চমকিয়া দৃষ্টি ফিরাতেই দেখিল স্বামী তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। লজ্জায় কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিবার চেষ্টা করিতেই রঞ্জন তাহার অধরে অতর্কিত ছাপা আঁকিয়া দিয়া নিজের বাহুবন্ধনের মধ্যে রেখাকে টানিয়া লইয়া বলিল : দুষ্টু, এ-কদিন কেন জানাওনি যে বই পড়তে তুমি ভালবাস।

লজ্জায় এবং সঙ্কোচে নববধূর কিছুক্ষণের জন্য মুখ দিয়া বাক্য সরিল না। তবুও জোর করিয়া বলিল : কাকে বলবো?

তরুবালা
৺রসরাজ অমৃতলাল বসুর অমৃত-লেখনী প্রসূত
: শ্রেষ্ঠাংশে :
অহীন্দ্র চৌধুরী
জহর গাঙ্গুলী
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
কার্ত্তিক রায়
পন্টু গাঙ্গুলী
জ্যোৎস্না
পদ্মাবতী
পারুলবালা
হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
শৈলেন চৌধুরী
আশু বোস (এমেচার)
নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রভা
বীণা
প্রভাবতী
নগেন্দ্রবালা
কমলা (ঝরিয়া)
পরিচালক
সুশীল মজুমদার
সঙ্গীত পরিচালক
নারেন লাহিড়ী
শ্রী
ফোন : বড়বাজার ১৫১৫
শুভ-উদ্বোধন—শনিবার ১লা ফেব্রুয়ারী '৩৬

—কেন? বাড়ীতে এত লোকজন ত রয়েচে, যাকে দিয়ে হোক খবর দিলেই ত পারতে।

—লোক জনের মারফতে তোমাকে কোন কথা বলে পাঠাতে আমার কেমন যেন লজ্জা লাগে। তুমি নিজেও ত একবার খোঁজ-খবর নিতে পারতে।

অন্তরের গোপন ব্যথা ব্যক্ত না করিয়া রঞ্জন কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলিল: ভুল হয়ে গেছে।

—দাঁড়াও দরজাটা খিল দিয়ে আসি। বাড়ীর কেউ হয়তো এসে পড়তে পারে বলিয়া রেখা উঠিয়া গেল। ইতিমধ্যে, রঞ্জন বিছানার উপর আপনার ক্লান্ত অবশ দেহটিকে বিছানায় দিয়াছে।

হ্যারিকেনের আলোটি একটু কমাইয়া দিয়া রেখা স্বামীর পাশে আসিয়া শুইতেই রঞ্জন বলিল: এ-বাড়ীতে থাকতে তোমার বুঝি ভয় করে?

কোন কথা না বলিয়া রেখা স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইলো।

স্তিমিত আলোকে রেখার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রঞ্জন বলিল: কই উত্তর দিলে না?

—একটা কথা বলবো রাগ করবে না?

—রাগ কেন করতে যাব? স্বচ্ছন্দে বলতে পার। তোমার অসুবিধের কথা আমায় না জানালে আমি কী করে তার ব্যবস্থা করবো?

—তুমি আমাকে ছেড়ে বেশীক্ষণ বাইরে থেকো না।—কেন?

এতবড় বাড়ীতে একলা থাকতে আমার ভয় করে।

—একলা কী রকম? এতো লোকজন রয়েচে।

—ঝি-চাকরদের সঙ্গে রাতদিন কী কথা কইবো বলতো? ওদের সঙ্গে অতো মেশামিশি করতে ভাল লাগে না।

রঞ্জন বুঝিতে পারিল রেখা আভাষে ইঙ্গিতে কী কথা বুঝাইতেছে। কিন্তু কোন উপায় নাই। তাহার মনের কোণে একটি আতঙ্ক ভয়াবহ মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া ওঠে: রেখাকে একান্ত আপনার করিয়া পাইবার চেষ্টা করিলেই তাহাকে হারাইবার সম্ভাবনা সব চাইতে বেশী।

রঞ্জনের হাতের আঙুলগুলো নাড়িতে নাড়িতে রেখা বলে: কী চমৎকার তোমার আঙুলের গড়ন। ভারী লোভ হয়।

—রঞ্জন হাসিয়া বলে: নাওনা, কেটে দেবো?

—যাও, তাই বুঝি বলচি।

—আমি যখন তোমাদের ওখানে বিয়ে করতে গিয়েছিলুম তখন তুমি কী করছিলে বলতো?

—কনে-চন্দন পড়বো না বলে তুমুল ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছিলুম।

—হঠাৎ তখন এ-খেয়াল চেপেছিল কেন?

সারাদিন বাড়ীর সকলে আমায় জোর করে উপোস করিয়ে রেখেছিল। তারপর এ-সব সাজগোজ আমার ভাল লাগছিল না।

—তারপর?

হঠাৎ বাইরের লোকের চীৎকার কানে এলো: বর এসেচে, শাঁক বাজা। বর এসেচে শুনে যেই লুকাতে যাবো আমার এক বন্ধু অমিয়া জোর করে আমায় টেনে নিয়ে গেল ছাদে।

—কেন?

—তোমাকে দেখবার জন্য।

—তুমি গেলে?

—কী করবো সমস্তদিন উপোস থাকার দরুণ সারাদেহে কেমন যেন ঝিমঝিম করছিল। প্রতিবাদ করবার মত সামর্থও ছিল না—আর কেই-বা তখন শুনতো।

—কি দেখলে?

—পালকি থেকে নামতেই আমাদের বাড়ীর চাকর ভোলা তোমায় কোলে কোরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বৈঠকখানায় নামিয়ে দিলে।

অমিয়া জিজ্ঞাসা করলে: কেমন দেখলিরে তোর বরকে? পছন্দ হয়, রেখা?

—আমার খুব নিন্দে করেছিলে নিশ্চয়—দেখতেতো খুব ভাল নয়, অপছন্দ হবারই তো কথা।

—যাও জানিনা।

চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

নবপরিণীতা রেখার সলজ্জ আড়ষ্টভাব আর নাই। যে অনাঘ্রাত স্ফুটোন্মুখ কোরকটি যৌবন-বৃন্তে থাকিয়া আপনার অন্তরের সৌরভ সযতনে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল আজ সে পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া প্রকাশের আনন্দ-ব্যথায় সহস্র পাপড়ি মেলিয়া ধরিয়াছে। রেখার দেহের কূলে কূলে লাবণ্যের পেলব আভার কমনীয় দীপ্তি। নয়ন কোণে সীমাহীন বিস্ফারিত বিস্ময়। হাসিলে সুডৌল গণ্ডদেশে যে রেখাটি ফুটিয়া ওঠে তাহার কুঞ্চন ভঙ্গিটি অপূর্ব্ব। কথা বলিবার ধারাটি অপূর্ব্ব, অননুকরণীয়। বাড়ীর ঝি-চাকরেরা মায়ের নাম করিতে আত্মহারা হইয়া ওঠে। রঞ্জনও রেখার দিকে অপার বিস্ময়ে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। মুখ দিয়া কোন কথা সরে না। এত আনন্দ সে কী করিয়া সহ্য করিবে?

যে-নারীটি এতদিন যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল, যাহার আবির্ভাবে রঞ্জনের ভাগ্যাকাশ সহসা দুর্য্যোগের ঘনান্ধকারে ছাইয়া গেল তাহাকে রঞ্জন আমাদের চিনাইয়া দিবে। নমিতা তাহার ভাগ্নে-বৌ। অতবড় মুখরা মেয়েমানুষ সচরাচর দেখা যায় না। ছেলেবেলায় কে যে তাহার ওইরূপ নামকরণ করিয়াছিল তাহা জানা নাই। ভয়ঙ্করী কিংবা ওই জাতীয় কোন নাম রাখিলে বোধ হয় ভাল মানাইত।

সম্প্রতি রঞ্জনের সংসারে তাহার ভাগ্নে অসিত পরিবার ও একটি ছেলে লইয়া উঠিয়াছে। রঞ্জন কোনোরূপ আপত্তি জানায় নাই। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদের থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

নমিতা আসা অবধি রঞ্জনের সংসারে অশান্তি নানারূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রত্যহ তাহার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ রেখাকে শুনিতে হয়। ইহার ঠেলায় সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে নমিতা মোক্ষদারি কাছ হইতে ভাঁড়ারের চাবিটি হস্তগত করিয়া লইয়াছে। তাহার দাপটে বাড়ীর ঝি-চাকরদের টুঁ শব্দ করিবার যো নাই। নমিতার ব্যবহারে রেখা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেও কোনো কথা বলে নাই।

একদিন রেখার সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেল।

ব্যাপারটি সামান্য। একজন ভিখারীকে একমুঠা চাল দেওয়াকে উপলক্ষ করিয়া নমিতা কোমর বাঁধিয়া যে ভাবে মোক্ষদার সহিত ঝগড়া করিল তাহা স্বকর্ণে শুনিয়া রেখা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

নমিতা বলে: দেখ্ মোক্ষদা; চোখের উপর যেভাবে তুই চুরি করতে আরম্ভ করেচিস; বেশীদিন এখানে তোকে রাখা চলবেনা।
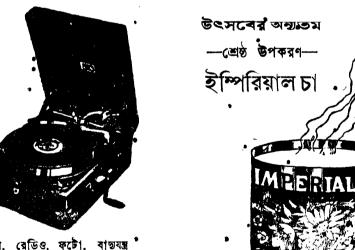
—সে কি গো। বুড়ো হতে চল্লুম আজ পর্য্যন্ত এ-অপবাদ যে কেউ আমাকে দিতে সাহস করেনি।

—আমি যে হাতে হাতে ধরলুম, এর ওপর তুই আবার মিথ্যা কথা বলে ঢাকা দিতে চাস। তাইতো বলি ভাঁড়ারের জিনিষপত্তর রোজ এত কমে কী করে।

—কী দেখলে বলতো?

—কী যে দেখিনি তাই বল। ও মিনসেটা তোর কে? রোজ দুপুরবেলা ওর সঙ্গে গলির পথে ফিস্‌ফিস্ করে কী কথা বলিস বলতো? ভিক্ষে কি আমরা কাউকে দিইনি। কাপড়ের তলায় অত অত করে জিনিষ না নিয়ে গিয়ে কি ভিক্ষে দেওয়া হয় না।

মোক্ষদা রাগে মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়া ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল: একটু মুখ সামলে কথা বোলো। এতক্ষণ খাতির করে তোমার কথা বলছিলুম।

—কী করবি তাই শুনি?

—পরের ধনের পোদ্দারি করচো এতেই এই। বাপ-ভাইয়ের জিনিষ হতো তো হাতে মাথা কাটতে দেখছি।

এ-যে নেহাত গালিগালাজ। কি করিয়া নমিতা ইহা নীরবে সহ্য করিবে? অগত্যা রাগে ফাটিয়া পড়িল: তোর এ-বাড়ী থেকে যদি অন্ন না ওঠাতে পারি তো আমার নাম পালটে দিস।

—কী কর তাই দেখা যাবে বলিয়া মোক্ষদা হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গনে নমিতা যে অভিনয় করিল রেখা স্বচক্ষে তাহা দেখিল। নীচে নামিয়া আসিয়া বলিল: কী হয়েচে নমিতা? অতো চেঁচামেচি হচ্ছিল কেন?

কপট কান্নায় ভাণ করিয়া কাপড়ের খোঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে নমিতা বলিল: ঝি-চাকরে এ রকম অপমান করবে জানলে এ-বাড়ী মাড়াতুম না।

—কেন, কী হয়েছে?

—ইহার উত্তরে ঘটনাটিকে মিথ্যার আবরণে অতিরঞ্জিত করিয়া যে-ভাবে নমিতা রেখার কাছে ব্যক্ত করিল তাহা শুনিবার ধৈর্য্য তাহার নাই। বলিল: আচ্ছা, উনি আসুন, যা হোক একটা ব্যবস্থা করবো। —বলিয়া নিজের ঘরে আসিয়া রেখা চুপ করিয়া বসিল।

প্রত্যহ দুপুরে রঞ্জন যেমন খাইতে আসে আজও সে খাইতে বসিয়াছে। পাখার বাতাস করিতে করিতে কথাবার্ত্তার ফাঁকে রেখা আসল কথা তুলিল: অসিতকে বুঝিয়ে ব'লো, নমিতা যে-রকম আরম্ভ করেছে ওদের থাকা এখানে আর চলবে না।

—প্রায়ই তো টুকরো টুকরো কথা আসে। আজ আবার কী হলো?

উত্তরে যাহা শুনিল তাহাতে রঞ্জনের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বলিল: আচ্ছা অসিতকে বলে এর যাহোক একটা মীমাংসা করবো। অবস্থা খারাপ বলে ওদের এখানে আমি নিজে আনিয়েচি। চলে যেতে বলা ভাল দেখায় না।

—যেতে আমি বলি না। কিন্তু এ-রকম ব্যাপার যদি নিত্য চলে তাহলে ওদের এখানে থাকা অসম্ভব।

—এর ব্যবস্থা আমি করচি।

বিকালের দিকে দপ্তরখানায় অসিতকে নির্জ্জনে পাইয়া রঞ্জন সমস্ত ঘটনা যথাযথ প্রকাশ করিল।

অসিত চুপ করিয়া রহিল। কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না।

রাতে শুইতে আসিয়া অসিত বলিল: এসব কী শুনচি? যার অনুগ্রহে এখানে মাথাগোজবার স্থান পেয়েছি তারই বাড়ীর লোকের সঙ্গে যেচে ঝগড়া করবে? বলি এতখানি বয়স তো হতে চল্লো এইটুকু বোধশক্তিও কি তোমার নেই?

—আমার যথেষ্ট আছে। তোমার ঘটে একটুও নেই। তা'নৈলে তুমি অমন কথা বল।

—কেন?

—একথাও কি তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি?

—ভেঙ্গেই বলনা।

—জমিদারী সেরেস্তায় এদ্দিন কি করতে কাজ করেছিলে বলতো ?

—তাতে কি হয়েচে।

—আঃ আমার কপাল। এরকম সুযোগ আর কখনও কি পাবে। অন্দরের যা কিছু ব্যবস্থা সে-সব আমিই করবোখন তুমি বাইরের সমস্ত গোতজাত জেনে নাও।

—জেনে কী লাভ হবে বলতো ?

—ছেলেটা যে রয়েচে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে না—বলিয়া স্বামীর কাণে কাণে যে কথা কয়টি উচ্চারণ করিল তাহাতে অজিত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এ-কথা সে যে কল্পনায় আনিতে পারে নাই।

—এ-কথা তুমি কী করে ভাবো বলতো।

—নিজের আখের আর কবে বুঝবে ?

কয়দিন ধরিয়া একটা কথা রেখাকে বলি বলি করিয়াও রঞ্জন বলিতে পারিতেছে না। যে অসহায় শিশুটি ভ্রূণ আকারে রেখার জঠরের একটি নিভৃত কোণে কোন রকমে স্থান করিয়া লইয়াছে তাহার কথা স্মরণ করিয়া রঞ্জনের আনন্দের সীমা নাই। অথচ এই সামান্য ব্যাপারটি স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করিতে যত রাজ্যের লজ্জা সঙ্কোচ আসিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দেয়।

আজকাল সব সময়ে রঞ্জন জমীদারীর কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া যায়। আনন্দ-চঞ্চল মনের রাশকে কিছুতেই বাগে আনিতে পারে না। চোখ বুজিলেই মনে হয় কোরা চওড়া লাল পাড় সাড়ি পরিয়া ছোট শিশুটিকে কোলে করিয়া রেখা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির উৎস তাহার স্নায়ুমণ্ডলীকে চঞ্চল করিয়া তোলে।

যে-প্রেম এতদিন দৈহিক প্রয়োজনের সীমার মধ্যে বন্দী ছিল আজ তাহা বিচিত্র সম্ভাবনায় অসীম হইয়া উঠিয়াছে। আজ সে সত্য সত্যই স্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাইবার উপযুক্ত ভাষা খুজিয়া পায় না।

একদিন রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে রঞ্জন আনন্দের আতিশয্যে বিছানায় শুইয়া কথাটি রেখাকে না বলিয়া থাকিতে পারিল না।

প্রত্যুত্তরে রেখা বলে: এ-কথা তোমায় কে বল্লে ?

—কে আবার বলবে ? ওইটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে। এইবার আমার অন্ন উঠলো।

—কেন ?

—খোকাকে পেয়ে আমার কথা কি তোমার মনে থাকবে রেখা। তোমার এক কণা ভালবাসা পাবার জন্যে তখন কত সাধ্যি সাধনা করতে হবে।

—কী যে বল তার ঠিক নেই। দেখে নিয়ো খোকার জন্যে তখন আলাদা ভালবাসা জন্মাবে।

—খোকার কি নাম রাখবে বলতো ?

সে আমি কী করে জানবো ?

—আহাঃ, তোমার ইচ্ছেটা বলতে তো কোনো বাঁধা নেই।

—তুমি যা রাখবে তাই আমার পছন্দ

এমন করিয়া তাহারা কত অর্থহীন কথ কল্পনার গাঁথুনি দিয়া গাঁথিয়া চলে অনাগত খোকার আগমন সম্ভাবনায় তাহার যে সপ্নময় নতুন জগতের সৃষ্টি করিয় চলিয়াছে তাহা বুঝি নিখিলের কোন নরনারীর ভাগ্যে আজ পর্য্যন্ত ঘটিয় উঠে নাই।

এদিকে আর একটি নারীর মনে এতটুকু শান্তি নাই। সে রঞ্জনের ভাগে-বৌ নমিতা হিংসা তাহার লক্ষ বিশাক্ত ফণা বিস্তার করিয়া দংশনে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত এব জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। রেখার সন্তান হইলে তাহার ক্ষতি যে কত তাহা সে বুঝিতে পারে। অথচ ইহার আশু প্রতিবিধান করার কোনো সম্ভাবনা সে দেখিতে পায়না

ছেলে ভূমিষ্ট হইবার দিন যত ঘনাইয় আসে একটা অজানা আশঙ্কা রেখার মনে আপনা হইতেই কাজ করিয়া যায়। চোখে ইহা ধরা পড়িয়া যায়। বলে: কী হয়েচে বলতো ? যত দিন যাচ্ছে তত যেন তোমাকে মনমরা দেখচি।

—না, না, এমন তো কিছু হয়নি।

—দেখ এ-সময় কোন কথা গোপন করা আমি মোটেই পছন্দ করিনা। এরকম ধোঁকার মধ্যে রাখতে চাইচো কেন?

—বড্ড ভয় করে। কী যে হবে—

—আমি তো বুঝেচি। তোমার কিসের ভাবনা বলতো?

—খুব যে ভাবচি তা নয়।

—তবে?

—নমিতা ছেলে হবার যে ভয় দেখিয়েচে, তাতে আমার হাত পা আসচে না।

—কী বলেচে?

—সে আমি বলতে পারবো না।

—ও কি হচ্চে, রেখা?

রেখা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। স্বামীর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যে-কয়টি কথা উচ্চারণ করিল তাহাতে রঞ্জনের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। তবুও সে নিজের ভয়কে দমন করিয়া রাখিয়া রেখাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিল: ও কথা নিয়ে অতো কী ভাবচো বলতো? ছেলে আপনা আপনি হবে। ভয় কিসের?

একদিন সত্য সত্যই সকালের দিকে ভয় এবং আশঙ্কাকে উপেক্ষা করিয়া রেখা নির্ব্বিঘ্নে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। অর্দ্ধ-চৈতন্য নির্জ্জীব অবস্থায় সে একটি ঘরের কোণে মেঝের উপর বিছানায় শুইয়া আছে। জ্ঞান হওয়ার পর চক্ষু মেলিয়া পাশেই সদ্যজাত শিশুটিকে দেখিয়া সে সমস্ত দুঃখকষ্ট নিমেষের মধ্যে ভুলিয়া গেল। রঞ্জন তখন কী একটা কাজে ভিন গাঁয়ে গিয়াছিল। দুপুর রৌদ্রে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া এ শুভ সংবাদ শুনিয়া সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। নায়েব মহাশয় রঞ্জন আসিবার আগেই তাহার শ্বশুর বাড়ীতে এ শুভ সমাচার লোক মারফতে পাঠাইয়া দিয়াছে।

রঞ্জন ইহারই মধ্যে কল্পনায় দেখে: ছেছেটি ছয়মাসের হইলে তাহার অন্নপ্রাশনে কিরূপ সমারোহ করিবে। গরীব-দুঃখী কাহারও কোন অভাব সে রাখিবেনা।

কিন্তু চতুর্থ দিন নিশুতি রাতে একটি অঘটন ঘটিয়া গেল। যে শিশুটির জন্মগ্রহণে বাড়ীতে আনন্দের হাট বসিয়াগিয়াছিল তাহার অপরিকল্পনীয় অকাল মৃত্যুতে কে যেন সারাবাড়ীতে নিরানন্দের নিষ্ঠুর যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। চোখের নিমেষে কী যে ঘটিয়া গেল তাহা বুঝিবার শক্তি রেখার ছিল না।

মেয়ের খোকাটি মারা যাওয়ার খবর পাইয়া রেখার মা জামাইবাড়ীতে আসিলেন। আঁতুড় উঠিয়া যাইবার পর কিছুদিনের জন্য মেয়েকে নিজের কাছে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু রেখা একটিবারও মায়ের কথায় সায় দিল না।

আঁতুড় উঠিয়া যাইবার পর যে দিন প্রথম সে স্বামীর কাছে রাত্রে শুইতে আসিল সে একটি ভীষণ মুহূর্ত্ত। বিনিদ্র রজনী কাটিয়া গেল, রঞ্জন রেখাকে সান্ত্বনা দিবার একটি কথাও খুঁজিয়া পাইল না। রেখাও কোনো কথা না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

দেখিতে দেখিতে মাস ছয়েকের মধ্যে রেখার হাতে অসংখ্য মাদুলি উঠিল। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কোনো পর্ব্বই বাকী রহিল না। এত করা সত্বেও তাহাদের মনে যে গভীর ক্ষত চিহ্ন রহিয়া গেল তাহা ঠিক পূর্ব্ববৎ জল জল করিতে লাগিল।

সন্তানের শোক ভুলিয়া থাকিবার জন্য রঞ্জন সদাসর্ব্বদাই জমীদারারীর কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করে। কিন্তু রেখা কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাহা পারে না। সে যে সন্তানের জননী। এ-কথা সে কী করিয়া ভুলিয়া থাকিবে।
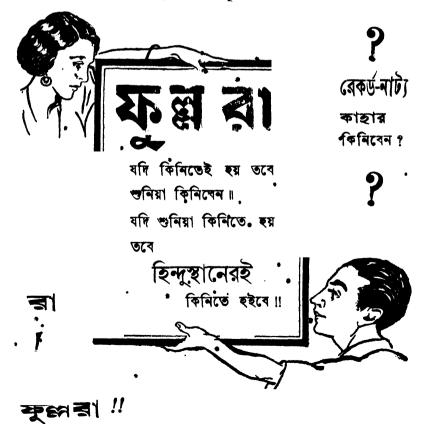
দিনের পর দিন চলিয়া যায়। রাত্রি আসে তাহার গভীর রহস্যের অবগুণ্ঠিত রহস্য লইয়া। আবার পূর্ব্বাকাশ উষার নবীন আলোয় রঞ্জিত হইয়া আর একটি নূতন দিনের সূচনা করে।

বছর দেড়েক পরের ঘটনা।

রঞ্জন বুঝিয়াছে-আর একটি শিশুর আসিবার কাল প্রায় আসন্ন। এবার কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকিল না। কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার আনিয়া দেখাইল। এবং শিশুটি আসিবার আগে ভিতরে ভিতরে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিল। কারণ, তাহার ধারণা হইয়াছিল যে প্রসবের সময় নিশ্চয় কিছু গোলমাল হওয়ার ফলে প্রথম সন্তানটী বাঁচে নাই।

রেখারও মনে আতঙ্কের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। আঁতুড়ে সে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিবার অব্যবহিত পরেই খোকার মৃত্যু হইয়াছিল। স্বপ্নের ভয়াবহ বিভীষিকা সে কিছুতেই মন হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। একবার সে ভাবে: স্বপ্ন সর্ব্বৈব মিথ্যা। পর মুহূর্ত্তে আর একটা চিন্তা মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া উঠে: না, স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। তাহার ভাগ্যে যে সত্য সত্যই ফলিয়া গিয়াছে।

একদিন রাতে সে স্বামীকে বলিল: এ সময় নমিতাদের এখানে রেখোনা।

—কেন?

—আঁতুড় ঘরে যে স্বপ্ন দেখেছিলুম তাতে ওদের এখানে দিনকতক না রাখাই ভাল।

—কী হয়েছিল তাই বল না?

—বিশ্বাস করবে?

—না শুনে কি করে বলি।

—যে-দিন রাতে খোকা মারা গেল তার কিছু আগে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছিলুম। মনে হলো একটি অপরিচিতা অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিতা নারী আমার খোকাকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে মেরে আমাদের পুকুর পাড়ে ফণী মনসার ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলে।

—তারপর?

—ঘুমটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে ভেঙ্গে যেতেই চেয়ে দেখলুম খোকা আমার পাশেই রয়েছে। মনে হলো নমিতার মত একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই তো খোকাকে আর পেলুম না।

—ও তোমার স্বপ্ন। এও কি কখনও সম্ভব হতে পারে।

—সে যাই হোক এবার রাতে তুমি একটু সতর্ক থেকো।

—আচ্ছা।

এবারও খোকা আসিল। বাড়ীতে যেন বর্গীর হাঙ্গামা পড়িয়া গিয়াছে। রঞ্জনের চোখে ঘুম নাই। গত তিন চারিদিন সে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছে।

পঞ্চম দিন রাতে রঞ্জন বিছানায় শুইয়া নানারকম চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ একটি শিশুর অসহায় অস্ফুট ক্রন্দন শুনিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিল। প্রথমে সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। আঁতুড় ঘরের দিকে একটু অগ্রসর হইতেই সে দেখিল একটি নারী চুপিচুপি রেখার ঘর হইতে বাহির হইয়া অসিতের ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

—নিশ্চল পাথরের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল রঞ্জন!

শ্রীদুর্ব্বাসা

চার্ব্বাকের চিঠি :—

মাননীয় শ্রীদুর্ব্বাসা মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত নিবন্ধটি 'খেয়ালীতে' প্রকাশ করিবেন কি? আশা করি মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল,—কোনরূপ আশ্রমপীড়া প্রভৃতি নাই।

ভবদীয়,

শ্রীচার্ব্বাক।

কলিকাতা ও কন্ট্রাক্ট ব্রীজ।

নিখিল ভারত কন্ট্রাক্ট-ব্রীজ-প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। কলিকাতার ব্রীজ মহলের মুরুব্বিরা অনেকেই অনেক রকমের আলোচনা করলেন। কেউ বললেন,—এমন সুবন্দোবস্ত আর কোন প্রতিযোগিতায় হয়নি। কেউ বললেন,—সমগ্র ভারতে এ ধরণের প্রতিযোগিতা এর আগে আর হয়নি। কেউ বললেন,—কলিকাতায় এখন "ক্রিকেট সপ্তাহ" চলছে—না, "ব্রীজ সপ্তাহ" চলছে। আবার কেউ বা বললেন,—সমগ্র ভারতের ব্রীজ-প্রতিযোগিগণকে একত্রিত করবার এত বড় বিরাট ও মহান্ conception আর কেউ এর আগে ধারণাও করতে পারেনি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের পঞ্চুদা এসেছিলেন বড়দিনের বন্ধে এখানে বেড়াতে। দাদা আমাদের সর্ব্ববিষয়েই মৌলিক। তাই এ বিষয়ে দাদার মতামতটা কি জানবার জন্য বড় উৎসুক্য হল। দাদা আমার কথা স্থির-ভাবে শুনলেন। তারপর সিগ্রেরের কুণ্ডলীকৃত ধূমের কয়েকটি বৃত্ত ঠোঁটের মধ্য দিয়ে উপর্য্যুপরি বার করে আমায় বললেন, "কথাটা আমিও ভেবেছি এবং সত্যও উদ্ঘাটন করেছি। তোকে বলতে পারি, কিন্তু সাবধান কাউকে বলিস্ না।" এই বলে দাদা নিম্নলিখিত গূঢ় তথ্য কয়টী অতি গোপনে আমায় শোনালেন। আমিও তা যথাসাধ্য গোপন করবার জন্য 'খেয়ালীতে' প্রকাশ করছি।

(১) ভারতবর্ষের পুরাতন ভূগোলিক সংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে নিখিল ভারত বলতে বোঝায় 'কলিকাতা, পাটনা, ও হায়দ্রাবাদ। প্রমাণ,—'খেটা বেটা অল্-ইণ্ডিয়া-গোল্ড-কাপ টুর্ণামেণ্ট।'

(২) কলিকাতার খেলোয়াড়গণই সারা বাঙলার অবিসম্বাদিত প্রতিনিধি। প্রমাণ,—ইডেন গার্ডেনে নিখিল বাঙলার ক্রিকেট টীম, আর শ্যামবাজারের ব্রীজের আসরে কলিকাতা ব্যতীত বাঙলার অন্য ক্লাবের অনুপস্থিতি।

(৩) কলিকাতার যে কোন ব্রীজ ক্লাব অন্য জায়গার যে কোন ব্রীজ ক্লাবের চেয়ে নূন্যতর। প্রমাণ, হায়দ্রাবাদের ফিনিক্স ক্লাবের নিকট কলিকাতার সর্ব্ববিজয়ী ক্লাব ল্যান্সডাউনের সর্ব্ববিষয়ে শোচনীয় পরাজয়। বাইরের এই একটি মাত্র ক্লাবের সঙ্গেই কলিকাতার ক্লাব সমূহ খেলেছিলেন।

(৪) "বাঙালীর একতা নাই"—এটি ভ্রমাত্মক কথা। প্রমাণ, ফাইন্যাল খেলার দিন প্রত্যেক বাঙালী কর্ত্তৃক ল্যান্সডাউনের পরাজয় কামনা। এ বিষয়ে কারও মতদ্বৈধ ছিল না।

(৫) ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালীই অর্থবান জাতি। প্রমাণ, সমগ্র ভারতের সাতটী মাত্র ক্লাব যেখানে ২০৲ টাকা চাঁদা দিতে সমর্থ কেবল কলিকাতার আঠারটী ক্লাব সে কার্য্যে পারদর্শী।

(৬) বিলেত ফেরৎ বাঙালার চেয়ে আফ্রিকা ফেরৎ বাঙালীই, ইংরাজীতে বেশী ব্যুৎপন্ন। প্রমাণ যথা,……

এই সময়ে সিগারের ধোঁয়ায় দাদার কাশি বড় বেড়ে উঠল। কাশিতে কাশিতে মুখ চোখ লাল। তিনি হাতের ইঙ্গিতে আমায় চলে যেতে বললেন। কেননা দাদার দ্বিতীয় পক্ষ স্বয়ং এসে বুকে না হাত বুলালে দাদার কাশি নাকি থামতে চায় না। কাজে কাজেই চলে আসতে বাধ্য হলুম। শেষ কথাটা আর শোনা হল না।

চার্ব্বাক ও শ্রীদুর্ব্বাসা একপন্থী ও একমতাবলম্বী নহেন। পণ্ডুদা উদ্ভাবিত অদ্ভুত সত্যপূর্ণ তথ্যগুলি চার্ব্বাকের চারুবাক্যে ও আগ্রহাতিশয্যেই 'খেয়ালীর' বুকে প্রকাশ পেল। যদি এতে ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত কোন কটাক্ষ থাকে, তাহলে তা পণ্ডুদা ও চার্ব্বাকের চক্রান্ত।

একটি সমস্যা

নিয়ে একটি সমস্যা দেওয়া হল। ফেরাই এর খেলা 'দ' খেলবে। বিপক্ষদলের প্রতিরোধ সত্ত্বেও 'উ' এবং 'দ'কে পাঁচখানি পিট নিতে হবে।

ইস্কাবন—বিবি, আটা, ছক্কা।
হরতন—আটা, সাতা।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—টেক্কা, আটা, দুরি।

ইস্কাবন—চৌকা।
হরতন—বিবি, ছক্কা, পাঞ্জা।
রুহিতন—আটা।
চিঁড়িতন—সাহেব, বিবি, সাতা।

পূ

ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, দশ সাতা
হরতন—নাই।
রুহিতন—বিবি, ছক্কা, তিরি।
চিঁড়িতন—দশ।

ইস্কাবন—টেক্কা, পাঞ্জা, দুরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—দশ, সাতা, পাঞ্জা।
চিঁড়িতন—চৌকা, তিরি।
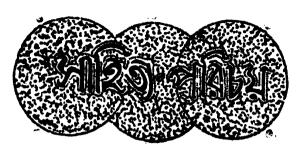
মানময়ী গার্লস্ কলেজ—শ্রীসুশীল রায়। জে, দি, ব্যানার্জ্জি; ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত সুশীল রায় একজন তরুণ সাহিত্যিক। তাঁর পূর্ব্ব প্রকাশিত 'একদা' উপন্যাসখানি অনেকের কাছেই প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেছে। এ নাটকখানি তাঁর নবীন প্রচেষ্টা হলেও এতে তাঁর কৃতিত্ব বজায় আছে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তারুণ্যের দোহাই দিয়ে সুশীল বাবু বাজারে নকল অথবা সস্তা জিনিষ আমদানী করেন নি। মুখবন্ধে লেখা আছে তাঁর নাটকখানি রবীন্দ্র মৈত্রের "মানময়ী গার্লস্ স্কুলের" কন্‌টিনিউএশন। অর্থাৎ শেষোক্ত গ্রন্থের গুটী কয়েক চরিত্র সুশীল বাবুর নাটকে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়েছে। মানস ও নীহারিকা, দামোদর ও মানময়ী, রাজু ও চপল—এদের সবারই দর্শন আবার পাওয়া যায়, এবং তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। তবে গল্পের ধারা একই স্রোতে প্রবাহিত না হয়ে অন্য স্রোতে চালিত হয়েছে। তাতে ফল ভালো ছাড়া মন্দ হয় নি। কারণ রবীন্দ্র মৈত্রের যে বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত প্রতিভা, তাঁর অপূর্ব্ব রসজ্ঞান, তাঁর অপরূপ লিপি-চাতুর্য্য ও সজীব চরিত্র সৃষ্টি—এ সকলের ব্যর্থ অনুকরণ বাঞ্ছনীয় নয়। সুশীল বাবুও তাই অক্ষম অনুকরণ না করে' গল্পাংশের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটী নূতন চরিত্র আমাদের কাছে বেশ ভালই লেগেছে, কথোপকথনও বেশ সরস ও উপভোগ্য হয়েছে। তবে দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যটীতে একটু রুচিবিকার ঘটেছে; কিন্তু মোটের উপর সুশীল বাবুর এই নূতন নাটিকাখানির আমরা প্রশংসা করি—যে প্রশংসা সর্ব্বতোভাবে তাঁর প্রাপ্য, তাঁর বইএর সমস্ত গুণ বাদ দিলেও একটী-কে অন্ততঃ অস্বীকার করা যাবে না। সেটী তাঁর একান্ত মৌলিক সৃষ্টি—অভিনব 'শ্যামচাঁদ'।

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

হে মোর অপরিচিতা

[উপন্যাস]

শ্রীসুপ্রিয় সোম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি একবার নবকিশোরবাবুর দিকে সমর্থনের জন্যে নিঃসহায় চোখে চাইলেম। সে বেশ সহজ কণ্ঠেই বল্লে, সত্যিই ত অসিত বাবু নির্ম্মলের সঙ্গে কি আপনার তুলনা করা সাজে।

অপমানে, লজ্জায়, কতখানি রাঙ্গা হয়ে ওঠেছিলেম তা জানি না, তবে যে আমার মাথা তৎক্ষণাৎ লুকিয়ে পরবার জন্যে কোনো আশ্রয় চাইছিল সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নেই। সীতার তবুও এ বিষয়ে অনেক সুবিধে ছিলো। আমার পায়ের তলায় ধরণীও দ্বিধা হলেন না, আকাশ থেকে কোনো অদৃশ্য হাতও আমাকে তুলে নিলে না, অপমানের লজ্জা আর দুঃখের বেদনা নিয়ে সেখানেই বসে রইলেম—নিশ্চল, নিঃসাড়। না পারলেম উঠে চলে যেতে, না পারলেম কোনো কথা কইতে। টাকার ঝাঁজে বিস্ময়েরও যে সীমা ছিলো তাও ত বলতে পারি না।

বোধ হয় আমাকে এতখানি অপমান করেও নির্ম্মলের মনের বাসনা অচরিতার্থ থেকে গেলো তাই সে আবার বল্লে, ও এখানে আসে কি জন্যে তাই বা কে জানে! ওর চরিত্র সম্বন্ধেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

নবকিশোর আমার হয়ে কোনো কথা কইলে না। বরং দেখে মনে হল সে বেশ এই অপমানটা ভোগ করে মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করচে।

যে অপমান আমার মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়েছিল, সেই আবার আমাকে কথা কইতে শেখালে। আমি দৃপ্ত কণ্ঠে বল্লেম, নির্ম্মল, তুমি যে এত অধঃপাতে গিয়েচ তা জানতেম না।

চুপ কর রাস্কেল। নবকিশোর যদি তোমাকে এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না বলে, আমি বলব।

নির্ম্মল বাঘের মত গর্জ্জন করে উঠল। শাণিত কণ্ঠে জবাব দিলেম, যে আমি যাচ্চি। এই সব নিয়ে তুমি ভদ্রতার বড়াই করো কোন লজ্জায়?

তুমি আমাকে ভদ্রতা শেখাবে, বেবি।

বলেই নির্ম্মল সুমুখে একটা কালির দোয়াত ছিল সেটা তুলে নিয়ে আমার মাথা লক্ষ করে মারলে। আমি ঠিক সেই সময় উঠতে যাচ্ছিলেম, কপালে এসে লাগতেই কপালটা ধরে বসে পড়লেম। ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল।

এমন সময় তনিমা চা নিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা যখন বুঝলে, তখন ক্ষিপ্রহস্তে চা টা টেবিলের ওপরে রেখে দিয়ে চাকরকে জল আনতে বল্লে। তীর বেগে সে একটা রুমাল ছিঁড়ে নিয়ে আমার কপালের রক্তটা মুছে দিতে এলো। তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেম, ভদ্রতা জ্ঞানটা আমার নেই বলেই তাই, না হলে তোমাকে আজ শিক্ষা দিয়ে যাবার মত শক্তি আমার ছিল।

নির্ম্মলের ভয়ে মুখ শুকিয়ে এসেছিল। কলেজের ব্যায়ামাগারের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে আমার নাম ছিলো, তা সে জানে। যে ভাবাবেগে আমাকে আঘাত করেছিল, তা মুহূর্ত্ত মধ্যেই নিভে গেচে। মুখে বল্লে, তুমি আমাকে মারবে নাকি?

তারপরেই চীৎকার করে ডাকতে লাগলো দারোয়ান, দারোয়ান।

হেসে বল্লেম, অত ভয় নেই, বর্ব্বরেরা মারামারি করে না, করে ভদ্রবেশী যারা তারাই।

একবার তনিমার দিকে চেয়ে দেখলেম। তার মুখে কে যেন অকস্মাৎ কালি ঢেলে দিয়েচে। আশঙ্কায় তার সমস্ত চোখ ভরে আছে। নবকিশোর বাবুকে হেসে বল্লেম, আচ্ছা নমস্কার, আসি।

প্রায় দরজার কাছে এসেচি, তনিমা ছুটে এসে আমার উপরে পড়লো। একেই আমার মাথা ঘুরছিল, আঘাতটা একটু বেশী রকমেরই হয়েছিল বলে। তার ওপরে তনিমা আমার কাছে এসে দাঁড়াতে কেমন একটু চমকে গিয়ে দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেম।

জ্ঞান হলে দেখলেম একটা ঘরে আমি শুয়ে আছি— চাকরদের ঘর হবে বলেই মনে হল। নবকিশোর আর তনিমা আমার মাথার শিয়রে, নির্মলকে দেখতে পেলেম না। একটু পরে নবকিশোর বেরিয়ে গেল, রইলো একা তনিমা। প্রথমে আমি অবস্থাটা ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি, কিন্তু ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনাটা মনের ওপরে ভেসে উঠল। আমার উপরে ঝুঁকে পরে তনিমা জিজ্ঞাসা করলে এখন কেমন বোধ করচ?

উত্তর দিতে হলো না, ঘড়ীতে ৭টা বেজে গেল শুনতে পেলেম। ওঠতে যাব, তনিমা আমার বুকটা চেপে ধরে শুইয়ে দিয়ে বল্লে, আজ আর তোমাকে আমি চলে যেতে দেব না, আজ তোমাকে এখানেই থাকতে হবে!

আমার পড়াতে যেতে হবে জানি। অনেক দিন কামাই করেছি আর কামাই করা চলে না। তাই তাড়াতাড়ি তনিমার দুখানি হাত জোর করে সরিয়ে দিয়ে উঠে বল্লেম, কেন, এখনো সাধ মেটেনি বুঝি!

আমার কথাটা তনিমা বুঝতে পারলে না বলেই মনে হলো, অর্থহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, তোমার আজ মেসে যাওয়া কিছুতেই হবে না, যদি এর থেকে বড় কোনো অসুখ হয় কে তোমাকে দেখবে বলতো?

আমার মনের স্বাভাবিক অবস্থা হলে আমি তনিমার কথাটাকে অবহেলা করতে পারতেম না, কেননা কথাগুলো একেবারে নারীর বুকের স্নেহ নিয়ে বেরিয়ে আসছিলো। তখনও আমি তনিমাকে আমার এই নিদারুণ অপমানের কারণ বলেই জানি। কিন্তু আমার মন তখন অপমানে জর্জ্জরিত, তনিমাকে বিদ্রূপ করে উত্তর দিলেম, কেন দয়া নাকি? গরীব বটে, কিন্তু ভিক্ষুক নই।

বলে চলে আসতে যাব, তনিমা আবার বাধা দিলে, তাকে অনেকটা ঠেলে ফেলেই বলে এলেম কেবল এইটুকু বলবার আছে যে গরীবের সঙ্গে এ বড় মানুষী খেলা না খেল্লেই পারতে।

এই অপমান, এই আঘাত নিয়ে আমি পড়াবার জন্যে ছাত্রের বাড়ী উপস্থিত হলেম। সেদিন মাস কাবার হয়ে গিয়েছিলো, অত আমার খেয়াল ছিল না। ছাত্র আমার হাতে পনরটা টাকা দিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন বলবার জন্যে ইতস্ততঃ করতে লাগল। আমি টাকা হাতে পেয়ে বেশ খুশী মনে বল্লেম, কিছু বলবে, কী বলো।

ছাত্রটি কুণ্ঠিত অন্তরে বল্লে, আজ থেকে আমাকে আর পড়াতে হবে না, বাবা বলে দিয়েছেন।

আমি আর কথাটি কইলেম না। হঠাৎ, কেন জানি না, একটা প্রচণ্ড রকমের আনন্দ হলো, প্রায় হাততালি দিয়ে লাফাতে লাফাতে পথের মাঝখানে অন্ধের মত এসে দাঁড়ালেম। পেছনে, সুমুখে, এপাশে ওপাশে ঘরে বাইরে সব একাকার হয়ে গেল। কেবল মনে মনে একবার বল্লেম, বাঃ! বাঃ! জগৎটা কত সুন্দর!

আজ যখন আফিসের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পর ম্লানায়মান পৃথিবীর ওপরে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তে চেয়ে থাকি, আর আমার সুমুখে থাকে একটা দীর্ঘ রাত্রির মধুর আলস্য তখন মনে পড়ে সেদিনকার সেই অপমান আর বেদনা। এখন ভাবি আমি পাগল হয়ে যাই নি কেন, যা বেদনা সেদিন আমার বুকে এসে লেগেছিলো, তাতে আমার বুকটা ভেঙ্গে যাওয়াই উচিৎ ছিলো, বোধহয় নিতান্ত শক্ত বুক বলে ধাক্কা সামলে নিতে পেরেছিলেম। প্রথমতঃ নির্মল আমাকে অপমান করেছিলো, আমাকে মারতেও তার বাধে নি। কিন্তু এটাও খুব বড়ো হয়েই সেদিন দেখা দেয় নি। মনে হয়েছিলো, তনিমা বুঝি বড় পরিষ্কার হয়ে গেলো, আজ এই নিষ্ঠুর আঘাতের ভেতর দিয়ে তার সঙ্গে আমার নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'লো ও তার সমস্ত অভিনয় ও খেলা ধরা পড়ল।

সেই ভুলটুকুই মর্ম্মান্তিক। সমস্ত জগত একত্র হয়ে আমাকে যেভাবে আঘাত দিয়েছিলো তাতে আমি যত ব্যাথাই পাই, আমার এই নিজের কল্পনা গড়া ভুল আমাকে তার চেয়ে সহস্রগুণ বেদনা দিয়ে-

ছিলো। আজ ভাবি, সেদিন তনিমাকে রূঢ় কথা বলে যে আঘাত দিয়েচি তার কোন ক্ষমা নেই। কেন তার ওপুরে এই অবিচার করলেম, কেন আমার হঠাৎ ঈর্ষা জেগে ওঠল, কেন একটু ভাল করে বিচার করে দেখলেম না! মনে অনুতাপ আসে, অনুশোচনায় বুক ভরে যায়।

এই ত' গেলো মনের দিকের কথা। তারপরে যখন সেই দিনই ক্ষুব্ধ অন্তরে ছাত্রের কাছে শুনলেম সেই নিদারুণ বাণী, তখন মুখের গ্রাসটুকুও গেলো। সে চিন্তা ও দুঃখ খুব কম নয়। ভাবলেম, যেমন সকলে করে, ঠিক তেমনি ধারাই। বিধাতা কি আমাকে বিদ্ধ করবার জন্যে একটার পর একটি এমন তীক্ষ্ণধার বাণ ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু যত তীক্ষ্ণ বাণই হোক আমি যন্ত্রণা পেলেম না, পেলেম এক অপূর্ব্ব আনন্দ যা আমি কোনোদিন অনুভব করিনি। মনে হলো যেন মাথার থেকে অনেক বোঝা, অনেক চিন্তা ঝড়ো হাওয়া মেঘের মত সরে যেতে লাগল, আমি অনেক হাল্কা হয়ে একেবারে মহাশূণ্যে উড়ে যেতে লেগেচি। যদি সেদিন অত আনন্দ না হতো, তাহলে বোধ হয় সত্যিই আমি পাগল হয়ে যেতেম। একপক্ষে ভালই হলো। জীবনের গতি যে ধারে যাবে সেত যাবেই—কিন্তু মনের ভেতরে গভীর দুঃখ পুষে রেখে মন্দ ছাড়া ভাল ত হবেই না। নেপোলিয়ানের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। Serene alike in peace and danger. জীবনটা যুদ্ধই ত বটে, এর চেয়ে মহাযুদ্ধ কথনো রাজনৈতিক ইতিহাসে পাওয়া যাই নি। এতে জয়ী হতে গেলে অমন ভয় পেলে চলবে না, চলবে না বীরের মত জন্যে দুঃখ হয়, কেন তা জানি না। ওকে মনে পড়লেই আমার মনে পড়ে শিক্ষার কথা! যে শিক্ষার জন্যে আজ জগৎ জুড়ে এত মহাসমারোহ, এত অর্থ ব্যয় এত পরিশ্রম ও একান্ত চেষ্টা তার ফল কী-ই বা হচ্ছে। শিক্ষা আর সভ্যতা দিলে কতটুকু, মানুষকে কতখানি মানুষ করলে; ফিরে যাও দিকিনি একবার আদিম যুগে, বর্ব্বরদের ভেতরে বাস করে তুলনা কর তোমাদের এই উজ্জ্বল সভ্যতার সঙ্গে, শিক্ষার সঙ্গে। বিচার করো, বিশ্লেষণ করো, কী দেখতে পাও? সে যুগের মানুষ ও যা ছিলো, এ যুগের মানুষর ঠিক তেমনিটিই আছে, কেবল রূপের হয়েছে পরিবর্ত্তন, আর কিছুই নয়। মানুষের ওপরে মানুষ ঠিক তেমনি অত্যাচার করেচে, যুদ্ধ তেমনি বাধচে, এর গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে ও। তখন না হোক মানুষ বেঁধে যেতো না, এখন তারা খায় বেঁধে। কিন্তু খায় তারা এটা ঠিক। তখন মানুষ যুদ্ধ করত, এখনও করে। তবে তখন করত ঢিল ছুঁড়ে, তীর ছুঁড়ে, এখন গুলি ছুঁড়ে, গ্যাস ফাটিয়ে। বলো আমাকে, বলো তোমরা মানুষের রূপের পরিবর্ত্তন ছাড়া অন্য কিছু হয়েচে কিনা। আগাগোড়া ভুল হয়ে গেছে, কিছুই মানুষ শিক্ষা লাভ করেনি। ভেঙ্গে ফেলো তোমাদের শিক্ষা-নিকেতন, পুড়িয়ে ফেলো তোমাদের বইগুলো। নূতন করে পত্তন করো; যে ভুল করেচ, সে ভুল আর করো না। দেখবে তোমাদের জগতেই স্বর্গ নেমে আসবে। তাই মনে হয় আরো কিছুকাল গেলে মানুষ এটা বুঝতে শিখবে। সত্যযুগ, স্বর্ণযুগ পেতে এখনও মানুষকে বহু বহু বর্ষ সাধনা করতে হবে। মানুষই হয়ে উঠবে ভগবান। ভগবান কোনদিন ছিলো না, তার জন্য অতীতে নয়, ভবিষ্যতে তার দেখা মিলবে।

(ক্রমশঃ)

ওপারের ছায়া

পতিতপাবন পতিতুণ্ডি

পরলোকে জন গিলবার্ট!

হলিউডের চিত্রাকাশ থেকে আর একটি তারকা, যেথায় রুডলফ ভলান্টিনো লন চ্যানি, উইলি রোজার্স ফুটে উঠেছে সেই খানে চলে গেলো। আমরা তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

গিলবার্টের শেষ ছবি হচ্ছে "ক্যাপটেন হেটস্ দি সি"। আর তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি "কুইন ক্রিশ্চিনা। মনে আছে বোধহয় আপনাদের—গার্ব্বো তাঁকে এই ছবিতে নামতে অনুরোধ করেন। লোকে বলে গার্ব্বোর প্রিয়তম হচ্ছে জন গিলবার্ট নির্ব্বাক যুগে গার্ব্বোর ছবির গিলবার্ট ছিল আদর্শ হিরো। গিলবার্টের মনে সুখ ছিল না, সে নিজেকে ভয়ানক অসুখী ভাবতো। দিন কতক আগে ভার্জিনিয়া ব্রুশের সঙ্গে তাঁর সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। শেষ দিন গুলো তাঁর ভয়ানক মনোকষ্টে কেটেছে। ভগবান হয়ত তাঁকে শান্তিতে রাখবার জন্যেই নিজের কাছে টেনে নিলেম।

ছবি ও হেপবার্ণ

ক্যাথারিন হেপ্বার্ণ মেয়েটিকে দেখতে কি রকম সেটা আর নতুন করে নাইবা বলা হোল! সে কথাতো বলা হয়েছে অনেকদিন আগেই। কিন্তু তার গুণ! সত্যই তার গুণের তুলনা মেলা ভার। তার বাইরের চেয়ে অন্তরটা বড়, তাইতো লোকের কাছে নাম করতে পেরেছে। ওর অভিনয়ে অন্তরের দরদ, সে কথা কাকে বলে দিতে হবে? তবু কেটির কথা বলতে আমরা পঞ্চমুখ, না বলে থাকতে পারি না!

"সিলভিয়া স্কারলেট" ছবিখানার ছুটো পরিচ্ছেদ কী যে কষ্ট করে তুলতে হয়েছে তা বলা যায় না। ষ্টুডিওর নিয়ম অনুযায়ী ডবল নিয়ে কাজ করা যেত, কিন্তু সে তা নেয়নি। তিন দিন প্রশান্ত সাগরের ঠাণ্ডা ও সুগভীর বারি রাশির সঙ্গে যুদ্ধ করেও সে বাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এবং লাফিয়েও ছিল শুধু ছবিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে বলে।

সেদিন

সেদিন আগুন জ্বলল। হু হু করে ধরে উঠল গাছ আর পাতা। ডালে ডালে চলল হাউয়ের খেলা। সারা বনখানা লালে লাল। সূর্য্য এসে ওইখানেই বুঝি ডুব দিয়েছে। ম্যালিবু পাহাড়ের বাসিন্দাদের আজ ভয়ের সীমা নেই। তাদের চিৎকারে, আর্ত্তনাদে, পাহাড় খানি মুখরিত, কণ্টকিত। বিশ্রী ঝাঁঝাল, গরম ধোঁয়ায় তাদের দম আটকে আসচে যে। তবু সেই ধূমায়মান রক্তবহ্নির অন্তরে কে ছুটি ধূলি-ধূসরিতা কালিমা মাখা তরুণী অভয় হস্তে শান্তি বিতরণ করছে, কেউ তার খোঁজ নেবার অবসর পাচ্ছে না। তাদের পরণে সাদা ফ্রক খোচায় ছিড়ে ছিড়ে বেড়ে উঠেছে সে দিকে তাদের দৃষ্টিপাত নেই। কাঁটা গাছ আর শুক্‌নো ডাল তাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মুখখানা কালিমা-ময় হয়ে উঠেছে। তারা ছুটচে গরম কাফির ভাড় হাতে করে। যে বীরে সৈনিক পুরুষেরা প্রাণপণে এই আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে তাদের দেখে কে। সেই কথাটা যে কেবল তারাই বুঝছে।

তারপর আগুন নিভলো! লোকে খোঁজ করলে কে ছুটি সেই মহীয়সী নারী। অনেক কষ্টে তারা সেদিন খোঁজ পেয়েছে যে একজন মিরনা লয় অপরে গারট্রুড ওমস্টেড্। মিরনার পরিচয়—আমি আর কি দেব, গারট্রুড এর পরিচয়—পরিচালক রবার্ট লিওনার্ডের সে হচ্ছে সহধর্ম্মিনী।

ডবলের দরকার নেই

ডবলের দরকার নেই ক্যাথারিন হেপবার্ণের। বলছি কেন! কয়েকটি চমকপ্রদ দৃশ্য তোলা হয়ে গেল "সিলভিয়া স্কারলেটের" কিটি পড়ল অসুখে। প্রিন্সেস্ ন্যাটালিকে উদ্ধার করার দৃশ্যটা তোলার জন্যে তাকে প্রশান্ত মহাসাগরের ভয়াবহ স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে তিন দিন ধরে। তারপর কষ্ট সহ্য করেছে কত রকমে। কষ্ট সহ্য করে বলেই তো তারা পায় বাদ্‌শার মত অর্থ, আর সূর্য্যের আলোর মত যশ। সে কথা যাক্। কেটি সেদিন পড়ল অসুখে। ডাক্তার বল্লে: এখন আর ছবি তোলান হবে না। ছুটী নাও। কে সে কথা শোনে। ছদিন পরে অসুখ সারলে কেটি ছুটল শুটীং করতে। পরিচালক বল্লেন: না কেটি এখন তোমার কায করা হবে না। রোমাঞ্চকর চমকপ্রদ দৃশ্যগুলো ডবল দিয়ে সেরে নি তারপর তুমি এসো। আর এতে বিপদও আছে; তোমার নেমে দরকার নেই। কেটি উত্তর দিলে: কেন আমি অপরের জীবনকে বিপন্ন করতে দেব, যখন আমি সেটা করলে সাধারণের কাছ থেকে নাম পেতে পারি। এমন না হলে উত্তর। এমনিধারা বল্‌তে পারে বলেই ওরা আজ এত বড় হয়েছে।

নতুন জুয়াচোর

জুয়াচোর দেখা যায় নানা রকমের। কিন্তু ওদেশে যেমন জুয়াচোর দেখা যায় এমন বোধ হয় জগতে আর কোথাও দেখা যায় না। সম্প্রতি হলিউডে একদল জুয়াচোর দেখা দিয়েছে যারা বলে বেড়াচ্ছে যে তারা শার্লি টেম্পলকে অমন নিখুঁত অভিনয় করতে আর কথাবার্ত্তা কইতে শিখিয়েচে। এ খবর শার্লির মায়ের কানে পৌছেচে, তিনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি ছাড়া শার্লিকে অভিনয় করতে বা নিখুঁত কথাবার্ত্তা কইতে আর কেউ শেখান নি। আরো জানিয়ে দিয়েছেন যে কেউ যেন প্রতারিত না হয়ে তাঁদের ছেলে মেয়েদের ওই সব লোকেদের কাছে শিক্ষা করতে না দেন।

মদনের শর

জ্যাক ওকে তার কানে প্রেমের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে। কাকে যে সে মাল্য অর্পণ করবে এ-কথা আমার পক্ষে বলা বিশেষ শক্ত হয়ে উঠেছে কিন্তু। শুনতে পাচ্ছি ভেনিটা ভার্ডেন নিউ ইয়র্ক থিয়েটারের অভিনেত্রী সে তার সঙ্গে আংটী বদল করবে বলে জ্যাক ঠিক করেছে। কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছে না। কারণ ওর নাম অনেক মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এবং সত্যিই কার সঙ্গে মন্ত্র পড়বে তা বলা শক্ত। আমি যতদূর জানতাম তাতে মনে হোত মার্শা হাণ্টকে ও বেশী ভালবাসে; এখন কী হয় বলা শক্ত!

খুচরো খবর

১। চার্লি চ্যাপলিনের "মডার্ণ টাইমস" তোলা শেষ হয়েছে।

২। আলেকজান্দার কোর্ডা হচ্ছেন হাঙ্গেরী দেশবাসী।

৩। এলিনার পাওয়েল শীঘ্রই একখানা নতুন ছবিতে নামবে।

৪। রোণাল্ড কোলম্যান আবার গোঁফ রাখছেন।

৫। ফ্রেডি বারথলোমিউ নামবে "লিটল লর্ড ফন্টলরয়" ছবিতে।

খেয়ালী চিত্রপট—

মুখে রূপোলী কোমলতা শ্রীমতী মলিনা আজ অনেকদিন পরে আবার নাব্‌ছে বাংলা ছবিতে। মৃণালের অংশ এর "গৃহদাহে।"

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন পার্ক ৩২৪

৯, রামময় রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা বৃহস্পতিবার ১৬ই মাঘ, ১৩৪২, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৬

বেঙ্গল ষ্টোরস্-এর ভবিষ্যৎ

সত্য প্রচার করা এবং অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে জনমত উদ্বুদ্ধ করা—সংবাদপত্রের ইহাই অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপালন করিতে গিয়া যে সংবাদপত্র দুঃখ ও ক্ষতি সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না—সংবাদপত্রের আদর্শের পতাকা উড্ডীন রাখার গর্ব্ব সে-ই করিতে পারে। সংবাদপত্রের এই আদর্শ-পালনের গৌরব 'খেয়ালী'র আছে। বেঙ্গল ষ্টোরস্-এর কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ ও একচেটিয়া মাড়োয়ারী-প্রীতির প্লাবন আরম্ভ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে "খেয়ালী"ই প্রথমে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহা দেশবন্ধু-ভগিনী শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবীর মত দেশসেবিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আমাদের প্রচারকার্য্য সার্থক মনে করিতেছি।

"বেঙ্গল ষ্টোরস্"-এর সহ-ম্যানেজার মিঃ ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয় পত্রের আলোচনাকালে আমরা বলিয়াছিলাম :—"বেঙ্গল ষ্টোরস্"-এর উক্ত পত্রের সহিত যদি বাস্তব ঘটনার যথাযথ মিল থাকিত তাহা হইলে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইতাম। কিন্তু এক্ষেত্রে কবির উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে হইতেছে—"Things are not what they seem." শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবীর পত্র গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে : তিনি তাহাতে লিখিতেছেন...... the explanatory letter of the Asst. Manager has convinced me that there is some serious trouble.

শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবী শুধুই যে একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি তাহাই নহে, তিনি 'ষ্টোরস্'-এর একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষিকা। তাঁহার পত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, 'ষ্টোরস্'-এর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিতদের বিবাহ ও অন্যান্য কর্ম্মোপলক্ষে জিনিষপত্র কিনিবার জন্য 'ষ্টোরস্-এ পাঠাইয়াছেন এবং নিজেও প্রায়ই সেখানে যান। 'ষ্টোরস্'-এ যে অন্যায় নীতি অনুসৃত হইতেছে তাহার পরিণাম 'ষ্টোরস্'-এর পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর হইতে পারে তাহা ভাবিয়া তিনি এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন যে, রোগশয্যা হইতে কোনরূপে উঠিয়া তিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছেন। আশা করি 'ষ্টোরস্'-এর এই একান্ত কল্যাণকামী বিশিষ্ট ব্যক্তির সাবধানবাণী কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অবহেলিত হইবে না।

গত ৩য় সংখ্যা (২রা পৌষ তারিখের) 'খেয়ালী'তে আমরা মিঃ ভট্টাচার্য্যের পত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, মিঃ ভট্টাচার্য্য সত্য গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সংখ্যাতেই আমরা তাঁহাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিয়াছিলাম। প্রায় পক্ষাধিকাল অতীত হইলেও তিনি সে সম্বন্ধে নীরব। এই নিরুপায় নীরবতাই কি প্রমাণ করেনা যে, তাঁহার উত্তর দিবার কিছুই নাই ?

মানুষ মাত্রেরই ভুল-ত্রুটী হইতে পারে। 'বেঙ্গল ষ্টোরস্'-এর কর্ত্তৃপক্ষও এ নিয়মের বাহিরে নহেন। কিন্তু মানুষের কর্ত্তব্য হইতেছে জানিতে পারিলে এই ভুল-ত্রুটী সংশোধন করা। 'বেঙ্গল ষ্টোরস্'-এর কর্ত্তৃপক্ষ যদি তাহা না করেন, যদি তাঁহারা জাগিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অচির ভবিষ্যতে তাঁহারা হাড়ে হাড়ে বুঝিবেন যে, চালাকীর দ্বারা সব সময়েই সুবিধা হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি—"শোষক শকুনি বা বসন্তের কোকিলরূপে বিরাজ করিলে মাড়োয়ারী ধনীসম্প্রদায় স্বীয় ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবেন।" শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবীও তাঁহার পত্রে ম্যানেজিং এজেন্টস্দের লিখিয়াছেন—"I requst you with all the emphasis I can command to deal with the matter with greatest tact and impartiality. If the trouble goes on, the Stores will be doomed." আমরা তাই আজ ষ্টোরস্-কর্ত্তৃপক্ষকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, তাঁহারা কি চান, বাঙ্গলার সহযোগিতা না বিরোধিতা,

'খেয়ালী" মানহানির মামলা — আপীলের রায়

"মানিকজোড়কে চিনিয়া রাখুন"

শীর্ষক প্রবন্ধ মানহানিকর নহে

—মিঃ এ, এন, সেনের সিদ্ধান্ত

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অব্যাহতি

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নাকচ

শ্রীযোগজীবনের দণ্ড হ্রাস

গত শনিবার আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এ, এন, সেন 'খেয়ালী' মানহানি মামলার আপীলের রায় দিয়াছেন। ঐ মামলায় হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মচারী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের মানহানি এবং মানহানির ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে 'খেয়ালী'র সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকে ১৮ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। জজ সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে খালাস দিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানহানির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়া মানহানির অভিযোগে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন; কিন্তু তাঁহার কারাদণ্ডের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ৯ মাস করা হইয়াছে।

সত্যরঞ্জনকে 'মাণিক জোড়কে চিনিয়া রাখুন' শীর্ষক এক প্রবন্ধ সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। 'খেয়ালী'র যে সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তিনি ঐ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন। 'বিবিধ' ও "নলিনী—বিজয়" দুইটি প্রবন্ধ যে দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল ঐ দুই সংখ্যার সম্পাদকরূপে যোগজীবনকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

জজ রায়ে বলেন, 'ষড়যন্ত্রের অভিযোগ টিকিতে পারে না; ফরিয়াদী তাঁহার আরজীতে কিংবা প্রাথমিক জবানবন্দীতে আসামীদ্বয়ের মধ্যে কোন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের উল্লেখ করেন নাই। মামলা গত ৩রা মে তারিখে রুজু হইয়া থাকিলেও, ১৩ই জুলাই তারিখে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আভাষ দেওয়া হয়। ১৩ই জুলাই তারিখে ফরিয়াদীকে পুনরায় আহ্বান করিয়া তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। উহার পূর্ব্বে ষড়যন্ত্রের একমাত্র সাক্ষাৎ প্রমাণ—অক্ষয়কুমার সরকার' এবং হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা ও বর্ত্তমান আসামীদ্বয় 'খেয়ালী'র সম্পাদকীয় নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন, এই মর্ম্মে ফরিয়াদীর উক্তি। আমার মনে হয়, ফরিয়াদীর সাক্ষ্যের এই অংশ বিশ্বাস করা যায় না। নলিনাক্ষ তাঁহার আরজীতে বলিয়াছেন যে তিনি সন্দেহ করেন যে, আপত্তিকর প্রবন্ধ সমূহের লেখক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ এবং 'খেয়ালী'র প্রকৃত ম্যানেজার অক্ষয়কুমার সরকার। ফরিয়াদী যাঁহাদের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আরোপ করেন তাঁহারাই তাহাকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন ইহা নিতান্তই অসম্ভবপর।"

জজ সাক্ষ্য প্রমাণ এবং আইনঘটিত বিষয় আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, আসামীদ্বয় মানহানির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অপরাধী নহেন। সেই জন্য তিনি তাঁহাদিগকে ঐ অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

হিন্দুস্থানের নৈশ-দূত

সত্যরঞ্জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে জজ বলেন যে, তাঁহাকে "মাণিক জোড়কে চিনিয়া রাখুন" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ফরিয়াদীর সুনাম নষ্ট করিবার অভিপ্রায় ছিল কিনা নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়ের সত্য মিথ্যা বিচার করা অনাবশ্যক। ফরিয়াদী আদালতকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, তিনি হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে রক্ষার জন্য নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানীর বিবরণ যাহাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা সত্য হইতেও পারে, নাও পারে, তিনি নলিনীরঞ্জন সরকারের এজেন্টরূপে গিয়াছিলেন প্রবন্ধে ইহা বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে উহাতে তাঁহাকে ও সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের দূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি কোনও

ব্যক্তি তাহার বন্ধুর বিরুদ্ধে আনীত কোন কেলেঙ্কারীর মামলার বিবরণ যাহাতে সংবাদপত্রে না প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থা করে তবে সে ঐ কার্য্য দ্বারা সাধারণের নিকট আপন মর্য্যাদা হানি করিতেছে ইহা বলা যাইতে পারে না। কোনও ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে বলিলে তাহার অবমাননা হয় না।

ঐ প্রবন্ধের শিরোনামায় এইরূপ ইঙ্গিত আছে যে ঐ দুই ব্যক্তি কোন অসঙ্গত কার্য্য করিতেছিলেন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছু আসে যায় না। যদি ঐ প্রবন্ধে কোন ইঙ্গিত করা হইত অথবা নলিনাক্ষ ও সাবিত্রীপ্রসন্ন কি করিতেছেন তাহা অনুমান করিবার ভার জনসাধারণের উপর দেওয়া হইত, তাহা হইলে বলা যাইত যে, ঐ প্রবন্ধ মানহানিকর। কিন্তু ইহাতে ইঙ্গিত অপেক্ষা বেশী কিছু আছে। সমগ্র প্রবন্ধটি পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় নলিনীরঞ্জন সরকারের মামলা যাহাতে প্রকাশিত না হয়, তজ্জন্য এই ব্যক্তিরা কোনও কোনও সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর নিকট গিয়াছিলেন। অবশ্যই এই কথা সত্য যে, প্রবন্ধ পড়িয়া বুঝা যায়, প্রবন্ধ লেখকের মতে, যাহা করা হইয়াছিল তাহা করা উচিত হয় নাই; যদি প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে মানহানিকর না হয়, তাহা প্রবন্ধ-লেখকের মতামতে উহা মানহানিকর হইতে পারে না। নলিনাক্ষ ও সাবিত্রীকে যে হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর নৈশ-দূত বলা হইয়াছে এবং গভীর রাত্রিতে তাঁহারা নির্জ্জন রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন বলা হইয়াছে, তাহাতে রং ফলান হইয়াছে মাত্র; উহা বিশেষ ধর্ত্তব্য নহে। এইরূপ অলঙ্কার ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়াই যে মানহানির অভিযোগ টিকিতে পারে, আমি মনে করি না।

প্রবন্ধের অর্থ

অতঃপর যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, যে দুইটি প্রবন্ধ আপত্তি করা হইয়াছে উহার প্রথমটীর শেষাংশই আপত্তিকর।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানহানির অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে হইলে দোষারোপকারী মর্য্যাদাহানির অভিপ্রায়ে কোন লোকের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিয়াছিল বলিয়া সব সময়ে প্রমান করিবার প্রয়োজন হয় না। ফরিয়াদী পক্ষ যদি ইহা সপ্রমান করিতে সমর্থ হন যে, উক্ত প্রকার দোষারোপ দ্বারা উক্ত লোকের মর্য্যাদাহানি হইতে পারে বলিয়া লেখক অথবা প্রকাশকের জানা ছিল কিংবা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল তাহা হইলে যথেষ্ট হইল। সুতরাং কোন লোক যদি বেপরোয়াভাবে এমন ভাষা ব্যবহার করে যাহা স্বাভাবিক ভাবে আপাতদৃষ্টিতে মানহানিকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, তাহা হইলে সে, তাহার ভাষা রূপক অর্থে এবং অন্য প্রকার অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল—এই রূপ কথা বলিয়া তাহার কার্য্যের পরিণাম-ফলের হাত হইতে রেহাই পাইতে পারিবে না।

শেষোক্ত প্রবন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া জজ বলেন, লেখক বলিতে চাহিতেছেন যে, নলিনাক্ষ স্যার বিজয় ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় লইয়া দূতিয়ালী করিতেন না, পরন্তু এমন বিষয় লইয়া দূতিয়ালী করিয়াছিলেন যাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। "হীরা মালিনী" কথাটী ব্যবহার করিয়া এবং নলিনাক্ষ কেন হীরা মালিনীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ না করিবার পক্ষে কারণ থাকিতে পারে এইরূপ কথা বলিয়া সুস্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোক জোগাড় করিয়া দেওয়ার ব্যাপার সম্পর্কেই নলিনাক্ষ স্যার বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। আলোচ্য প্রবন্ধের শেষাংশে উক্ত প্রকার ইঙ্গিত অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

জজ যোগজীবনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উপরোক্ত মতে যোগজীবনের প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাদেশ সংশোধন করেন।

ছায়ালোক আকাশে অভিনেতা-অভিনেত্রীর অপূর্ব্ব সমাবেশ

এরূপ অতুলনীয় অভিনব সবাক-চিত্র ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ইহা হইবে অত্যন্ত আনন্দের। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের "পরপারে" নাট্য-জগতে অমর। সবাক-চিত্রে ইহার রূপদাতা চন্দ্র ফিল্মস্। চন্দ্র ফিল্মস্-এর এই অভিনব অবদান গল্পে, গুণে ও গানে সবার প্রাণে আনিবে রোমাঞ্চের শিহরণ। বিনা দ্বিধায়, বিনা বিচারে সকলে এই চিত্রখানা দেখিয়া অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিবেন। অভিজ্ঞ অভিনেতা-অভিনেত্রী বাংলাদেশে অল্প, কিন্তু সকলেরই সমাবেশ এই চিত্রে। সুরশিল্পী সেই বিখ্যাত অন্ধ-গায়ক, আর অভিনব—এই চিত্রের পরিচালক এক ক্যামেরাম্যান।

চন্দ্র ফিল্মস্-এর অবদান

প র পা রে
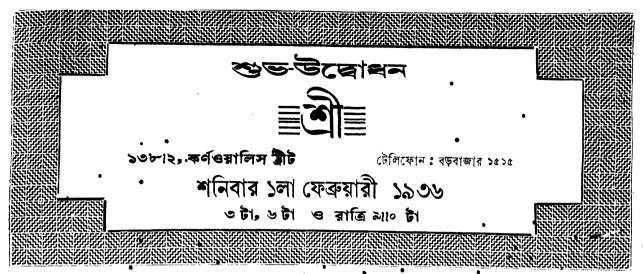
রীতেন এণ্ড কোম্পানীর
প্রথম বাঙ্‌লা বাণী-চিত্র

স্বর্গীয় অমৃতলাল বসুর
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-চিত্র

তরুবালা

অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্র—অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতৃ সম্মেলন

ঃ শ্রেষ্ঠাংশে ঃ

অহীন্দ্র চৌধুরী
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
জহর গাঙ্গুলী
শৈলেন চৌধুরী
কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি
কার্ত্তিক রায়
আশুতোষ বসু (এমেচার)
নন্দলাল মুখার্জ্জি (")
পল্টু গাঙ্গুলী (")
বিমল ঘোষ (")

জ্যোৎস্না গুপ্তা
বীণা
প্রভা
পদ্মাবতী
নগেন্দ্রবালা
হরিসুন্দরী (ব্লাকী)
প্রভাবতী
পারুলবালা
সুহাসিনী
কমলা (ঝরিয়া)

পরিচালক ঃ সুশীল মজুমদার

পাইওনিয়র ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত

প্রত্যহ অগ্রিম টিকিট পাইবেন—সকাল ৯ টা—১১ টা ও ১ টা—রাত্রি ৯ টা

একদিন পূর্ব্বে চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট
অগ্রিম পাইবেন।

হে মোর অপরিচিতা

[উপন্যাস]

শ্রীসুপ্রিয় সোম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাক, এসব কথা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আমার ইতিহাসটুকু শেষ করে নিই।

সেদিন মেসে ফিরে এসে মেসের সাড়ে বার টাকা চুকিয়ে দিয়ে হাতে আড়াই টাকা মাত্র সম্বল করে আবার বৃহৎ জগতের মুখোমুখি দাঁড়ালেম। আর একদিনের কথা মনে পড়ে। সেদিন তবু ছিলো পনর টাকার টিউসানী, আর ছিলো বৌদির স্নেহ, তনিমার ভালবাসা। আজ কিন্তু কী নিয়ে থাক্‌ব, কাকে করব আশ্রয়! মাত্র এই রাত্রিটুকু, কাল সকালে মেস ছেড়ে চলে যেতে হবে, না ছেড়ে গেলে টাকা দোব কোত্থেকে? কোনো আশা নেই, কোনো ভরসা নেই। সুমুখে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই গাঢ় তমিস্রা, আলোর রেখাটুকু পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বিছানায় শুয়ে পড়লেম। ক্রমে ক্রমে শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা ঝিমিয়ে এলো, ভুলে গেলেম এই কঠিন বর্ত্তমান, কেবল থেকে থেকে জেগে ওঠ্‌তে লাগ্‌ল তনিমার কথা, তনিমার মুখ, তার সোহাগের বাণী, আমার জন্যে তার উদ্বেগ ও আশঙ্কা! কিন্তু সেও মিলিয়ে গেচে!

*   *   *

হঠাৎ একটা আনন্দ প্রবাহ আমাকে চঞ্চল করে দিলে। আকাশে বাতাসে বেজে উঠ্‌ল বাঁশী! এতদিনের রুদ্ধ বেদনা আমার বুক থেকে সরে গেলো, তনিমাকে পেলেম। তনিমা, আমার—তনিমা।

বিয়ে, আজ আমার বিয়ে। হঠাৎ একটা মোটা চাকরী পেয়ে গেলেম। তনিমার বাবা তনিমাকে আমার হাতে তুলে দিতে আপত্তি করলেন না। তনিমাও আমাকে বুকে করে তুলে নিলে, বল্লে, তোমার সঙ্গে অভিনয় করিনি গো, করেছিলুম নির্ম্মলদার সঙ্গে। তোমাকে কী ভুল্‌তে পারা যায়!

চোখ তুলে বল্লেম, আমাকে ক্ষমা করো তনু!

ক্ষমা, ক্ষমা আবার কেন? তনিমা হেসে বল্লে। ক্ষমা টমা হবে না আমার কাছে, শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে। সে বড় কঠিন শাস্তি।

বলেই আমার মুখটাকে সবলে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে আমাকে চুম্বন করলে। মাথার চুলগুলো নাড়তে লাগ্‌ল। আমি ছেলেমানুষের মত তার বুকে মাথা দিয়ে তার বুকের ভাষা শুনতে লাগ্‌লেম।

আমার গালে তার নরম হাতের স্নেহ-স্পর্শ দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে: তুমি বড় ক্লান্ত, না?

আমি সত্যিই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেম। কথাটা পর্য্যন্ত আর কইতে ইচ্ছে করছিলো না, কেবল ইচ্ছে করছিলো তনিমার বুকের ওপরে মাথা হেলান দিয়ে যুগযুগান্তর থাকি শুয়ে।

উত্তর দিলেম খুব আস্তে: আঃ একটু চুপ করো না, তনু। আমাকে উপভোগ করতে দাও!

তনু মৃদু হাস্‌লে। কত মধুর সেই হাসি, আর কত স্নেহ সেই চোখে! বল্লে: কী উপভোগ করচ শুনি!

বল্লেম, তোমার অন্তরের বুক-ভরা স্নেহ আর নিবিড় ভালবাসা। তোমার কাছে ওটুকু পাবার জন্যেই যে আমি পাগল তনু।

তনু বসে রইলো তেমনি—আমার মাথাটা তার বুকে আরও কবলে আঁকড়ে ধরে।

আবার ডাকলেম, তনু ?

কী বলচো! তনিমা স্নেহসূচক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

বড় ভয় হচ্ছে তনু।

ভয়, ভয় আবার কিসের ?

ভয় হচ্ছে তোমাকে হয়ত হারাব!

সহজ হেসে একটা সান্ত্বনার স্বরে তনিমা বল্লে, অত তোমায় ভয় করতে হবে না গো, আমি মরব না। আমি মরলে তোমায় দেখবে কে, তোমার যে কেউ নেই।

আমি নিশ্চিন্ত হলেম। যেন ঐটুকুই চেয়েছিলেম তার কাছে। আঘাত পেয়ে পেয়ে মনটা এত দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিলো যে সুখের সামান্য একটু দৃষ্টান্ত দেখলেই মনে হতো, হয়ত' ঐটুকুও হারাব। এমনিই হয়। যারা কেবল জীবনে ব্যর্থ হতে থাকে, তারা সহজে সাফল্যের কামনা করতে পারে না, তাদের আত্মবিশ্বাস যেন হারিয়ে যায়।

আমি তনিমাকে আরো নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরলেম। সেও আমাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে বসে রইলে।

বিয়ে হয়ে গেলো। ফুলশয্যার রাত্রি। আমাদের পালঙ্কের ওপরে বিছানা করা হয়েচে, সমস্ত পালঙ্কটার চারিদিকে ফুলে ফুলে সাজান। নীল আলো জ্বলচে ঘরে। তনিমাতে আমাতে পাশাপাশি শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই, হঠাৎ খাটটা নড়ে উঠতেই আমরা উঠে বসলেম।

চারিধারে শাঁক বাজতে আরম্ভ করেচে। আমার চোখে তখনও ঘুমের ঘোর, শরীরের এক মধুর চঞ্চলতা, মনে এক অপরূপ তৃপ্তি। নিদ্রিত তনিমাকে জাগিয়ে দেবার আশায় ঘাড় ফেরাতেই চাকরটা আমাকে চা দিয়ে গেলো। গত রাত্রের স্বপ্ন নিষ্ঠুর বর্ত্তমানের শান বাঁধান মেজেতে পড়ে খান খান হয়ে চুরমার হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলেম, শাঁক বাজচে কেন রে!

একটু আগে যে ভূমিকম্প হয়েছিলো বাবু! আপনি বুঝি টের পান নি।

আমি গম্ভীরভাবে বল্লেম, না, পাই নি।

চাকরটা চলে গেলো।

তখনও দু একটা শাঁক বাজছিলো। এ শঙ্খধ্বনি মিলনের নয়—বিচ্ছেদের, সৃষ্টির নয়—ধ্বংসের। তবু আশে পাশে যেন খুঁজতে লাগলেম তনিমাকে। স্বপ্নের তনিমা আমার চোখের সামনে এখনও যেন জ্বল্ জ্বল্ করচে। সর্ব্বাঙ্গে একটা নিবিড় ব্যথা অনুভব করলেম। ছেলেমানুষকে কোন জিনিষ দেবার আশা দেখিয়ে তাকে না দিলে তার মনের যেমন অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি অবস্থা আমার মনের হলো। একটু কাঁদলে যেন সুখ পাই এমনি ধারা।

বাইরে ট্রাম, গাড়ীর শব্দ, মোটরের হর্ণ ফেরী-ওয়ালার চীৎকার বর্ত্তমানকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দিলে। চাটা ঢক্ ঢক্ করে গিলে ওঠে পড়লেম। চাকরকে ডেকে তার আসবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেম। নোবার আমার কিছুই ছিলো না, মূল্যবান জিনিটির মধ্যে আমার একটা চামড়ার সুটকেশ। আর 'একটা জিনিষ ছিলো—সেটা আমার মার ছোট ক্যাস বাক্স, উত্তরাধিকারী সূত্রে দাদার দৃষ্টি এড়িয়ে একমাত্র এটাই আমার ওপরে এসে পড়েছিলো। সুটকেশটা একটা বোঝা বলে মনে হলো, সেটা আর নেব না ভাবলেম, কেবল মার ফটোটা বেঁধে নিলেম একটা কাগজে। ক্যাস বাক্সটাও নিতে হবে, প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে সেটার খুব বেশী দাম থাক আর না থাক, মনের দিক দিয়ে তার যা দাম ছিলো তা অবহেলা করবার নয়। সেটাকে হাতে করে তুলে নিয়েই স্নেহময়ী মার হাতের স্পর্শ যেন অনুভব করতে পেলেম। এই মরচে পড়া টিনের ক্যাসবাক্সটা মা তাঁর জীবনে কত সহস্র বার যে উন্মুক্ত করেছিলেন তা আজ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তবে তার ওপরে যে মার হাতের ছাপটুকু লেগে আছে এ বেশ উপলব্ধি করতে পারি।

চাকরটা তখনও এলো না। আবার তার নাম ধরে ডাকলেম। সে আসতেই বল্লেম, ওরে, আমি মেস ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। ম্যানেজার বাবুকে বলে দিস্।

আমি অবশ্য আগের দিন রাত্রেও তাঁকে জানিয়েছিলেম।

আর 'পথ' বলিতেই চাকরটা আমাকে কথা বলতে দিলে না।

বাবু আমার বক্শিস্।

চাকরটার মুখের দিকে চাইলেম। মেস ছেড়ে চলে আসার সময় কিম্বা পূজা-পার্ব্বণে চাকরদের কিছু কিছু বক্শিস দিতে হয় এই সনাতন নিয়ম। হয়ত আমার অবস্থা জানালে চাকরটা আমাকে রেহাই দিতো। কিন্তু আমার সে ইচ্ছে হলো না। যখন সবই হারাতে বসেছি আর আড়াই টাকার মায়া করেই বা লাভ কী? নিঃস্ব যখন হয়েইচি তখন পরিপূর্ণভাবে নিঃস্বতাকে বরণ করি। এ-টাকা আমাকে এমন কিছু সুখের পথের সৃষ্টি করে দেবে না। কিন্তু অত তখন মনে হয়নি, চাকরটার হাতে পকেট থেকে আড়াইটে টাকা তুলে দিলেম।

প্রায় আনন্দে কেঁদে ফেলে চাকরটা বল্লে, বাবু এত দিলেন......।

সে একটু হতবুদ্ধিও হয়ে গিয়েছিলো। আবার মস্তিষ্কের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছিলো কিনা তাই বা কে জানে! আমি কিছু বলতে যাবো, সে কাপড়ের ভেতরে ট্যাকে আড়াইটে টাকা গুঁজে নিয়ে বল্লে, আমি আপনার বিছানা-পত্র তুলে দিয়ে আসচি বাবু, মুটে ডাকতে হবে না।

আমি বল্লেম, এই বিছানা-পত্রগুলো আর সুটকেশটা আমি তোকে দিয়ে গেলেম যদু। তুই নে।

আমাকে দিয়ে গেলেন বাবু, আমি নোব। আপনার দরকার হবে না।

চাকরটার চোখে জল।

আমি নির্ব্বিকার কণ্ঠে তেমনি বল্লেম, না হবে না যদু! নে তুই নে, ভয় কি। আমি তোকে দিয়ে গেলেম যে!

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। জীবনে এটা লক্ষ্য করে দেখেছি যখন মানুষ যত রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে আসতে থাকে, তখন সে তার রিক্ততাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে হাতে যা অবশিষ্ট থাকে তা বিলিয়ে দেয়, ছড়িয়ে ফেলে। আর দিতে দিতে তার দেওয়ার নেশা যায় বেড়ে। অন্ততঃ আমার জীবনে অনেকবার আমি এ অভিজ্ঞতা লাভ করেচি। আবার দেখেছি যখন পেতে সুরু করি, তখন সামান্য একটা রুমাল হারালে পর্য্যন্ত মনের দুঃখের অবধি থাকে না।

ধীরে ধীরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেম। কর্ম্মকোলাহল কলিকাতা নগরীর জনস্রোত হু হু করে বয়ে চলেছে। কোথায় যাব, কোন পথ অবলম্বন করব, কোন লক্ষ্য আমার, কিছুই জানি না। তখন আমার নিরুদ্দেশের যাত্রা!

খানিকটা পথ এগিয়েচি, চাকরটা ছুটে এসে পেছনে ডাকলে, বাবু—

চমকে উঠলেম।

আপনাকে ম্যানেজার বাবু একবার ডাকচেন।

আমি যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠলেম। কিছু পাওয়ানা আছে নাকি? পাওয়ানা? যদি কিছু সত্যিই থাকে, তাহলে দোব কোথেকে। একটা আধলাও দোবার ক্ষমতা নেই আমার। ধীর মন্থর পদে ম্যানেজার বাবুর কাছে এসে দাঁড়ালেম।

ম্যানেজার বাবু বল্লেন, অজিতবাবু, কালরাত্রে বড় ভুল হয়ে গিয়েছিলো। আপনার একটা চিঠি পড়ে আছে।

ম্যানেজার বাবু চিঠিটা আমার হাতে দিলেন। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। ৩০্ টাকা মাইনের একটা কেরাণীগিরি জুটেচে।

(ক্রমশঃ)

মাতার কর্ত্তব্য

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ এম-বি

আমাদের দেশে সাধারণতঃ মেয়েদের কৈশোর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ হয়। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মেয়েদের সম্পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্মিবার পূর্ব্বেই তাহাদের ঘাড়ে মস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়ে "মাতৃত্ব"। নিজের শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান না জন্মাতেই তাহাদের শিশু পালন করিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এই সব জননীরা যে কি প্রকারে সন্তান পালন করেন তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। এদেশের মেয়েরা যখন প্রথম সন্তানের জননী হন, তখন তাহাদের শিশু-পালন সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান থাকে না।

এদেশে সাধারণ সূতিকাগৃহ যে ভাবে তৈরী হয়, তাহাতে এই শীত ঋতুতে সদ্যোজাত শিশু অতি সহজে সর্দ্দি কাশিতে আক্রান্ত হয়। শিশু পালনে অনভিজ্ঞা কিশোরী মাতা, এই শিশুর উপযুক্ত যত্ন করিতে পারেন না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমাবস্থায় সামান্য সর্দ্দি কাশীকে অবহেলা করিবার ফলে ফুস ফুস দুর্ব্বল হইয়া অদূর ভবিষ্যতে ইহা দুরারোগ্য ভীষণ ক্ষয়রোগের আবাসস্থল হইয়া পড়ে, ইহা দেখা যায়। কাজেই জননীর প্রধান কর্ত্তব্য সন্তানকে অতি সতর্কভাবে পালন করা; যাহাতে সন্তান সর্দ্দি কাশিতে আক্রান্ত না হয়। ঠাণ্ডা পড়িলেই গরম জামা কাপড়ে শিশুর শরীর আচ্ছাদিত করা এবং সর্দ্দি কাশিতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই উপযুক্ত ঔষধ খাওয়ান কর্ত্তব্য। সর্দ্দি কাশি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে "সুইজারল্যাণ্ডের" রচি কোম্পানীর "সিরোলিন" অব্যর্থ ঔষধ। রোগ নিবারণ করিতে হইলে শীতকালে সামান্য সর্দ্দি কাশি হইবামাত্র শিশুগণকে প্রতিদিন নিয়মিত "সিরোলীন" খাওয়াইলে ফুসফুস্ সবল হয় এবং রোগবীজাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও ফুসফুস্ সম্বন্ধীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(বিলাসী)

ভাগ্য-চক্র (হিন্দী)

প্রযোজক—নিউ থিয়েটার্স

পরিচালক, চিত্র-নাট্য ও আলোক-চিত্র—নীতীন বসু

শ্রেষ্ঠাংশে:—পাহাড়ী সান্যাল, উমা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নবাব, দেববালা, বিশ্বনাথ প্রভৃতি।

কলিকাতায় মুক্তি—নিউ সিনেমা। শুক্রবার, ২৪শে জানুয়ারী '৩৬।

বাঙ্লা "ভাগ্য-চক্র" সবাইকে কোরেছিল মুগ্ধ। আর হিন্দী "ভাগ্য-চক্র"-ও যে সাধারণের কাছ থেকে অনুরূপ প্রশংসায় ভূষিত হবে—এ ধারণা আমাদের এবং জনসাধারণের আগে থেকে জানা ছিল।

ছবিখানার পরিচালনা, আলোক-চিত্র, শব্দগ্রহণ, দৃশ্য-পট, সম্পাদনা আর টেক্‌নিক্যাল কোয়ালিটীর কথা পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে। বাঙ্লা সংস্করণের সমালোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আমরা যে অভিমত ব্যক্ত কোরেছি, তার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন, শুধু এখানে অভিনয় সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা কোরব।

বাঙ্লা সংস্করণে বিভিন্নাংশে আমরা যে সমস্ত অভিনেতৃদের দেখেছি হিন্দি সংস্করণের মুখ্যাংশেও তাদের অনেককেই দেখলাম। নায়ক পাহাড়ী ও নায়িকা উমা পূর্ব্বের মতই প্রশংসা পাবার যোগ্য। এমন কী মনে হল, বাঙ্লাতে পাহাড়ীর স্থানে স্থানে যে প্রাণের যোগ ছিল না—হিন্দীতে সে দোষ সংশোধিত হ'য়েছে। থিয়েটারের ম্যানেজাররূপে নবাব ও তেওয়ারী (বাঙ্লায় মিঃ রায়) রূপে বাবুলালের অভিনয় অমর মল্লিক ও দুর্গাদাসের সমপর্য্যায়ে পৌছুতে পারেনি। বিশ্বনাথের শ্যামলাল বাঙ্লা সংস্করণের মতই উল্লেখযোগ্য নয়। দেববালার অভিনয় প্রশংসনীয়। কেলোর মা নিভাননীরই ভাল—আজমৎ নিভাননীর কাছ ঘেঁষতেও পারেন নি। কৃষ্ণচন্দ্র দের সুরদাসের গান ও অভিনয় সত্যই প্রাণস্পর্শী। বাঙ্লার চেয়েও হিন্দীতে আরও যেন ভাবের আবেশ দেখা গেল। অন্যান্য ভূমিকাগুলি সুঅভিনীত হ'য়েছে।

আমাদের মনে হয় বাঙ্লার মত এই হিন্দী সংস্করণও সবাইকে আনন্দ দেবে এবং দীর্ঘদিন ধরে ছবিখানা সব জায়গারই পর্দ্দা জুড়ে থাক্‌বে।

কালী ফিল্মস্

"কালী পরিণয়ে"-র শূটিং গাঙ্গুলী মশাইয়ের হাতে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। মায়া, রাণী, কিন্নরকণ্ঠী সুবাসিনী, জহর গাঙ্গুলী, জীবন গাঙ্গুলী প্রভৃতি এই ছবির বিভিন্নাংশে নাম্‌ছেন।

* * *

"হিন্দী প্রফুল্লে"র মহলা চল্‌ছে। বিভিন্ন ভূমিকার জন্যে অভিনেতৃ নির্ব্বাচন শেষ হ'য়েছে। আমরা শুনলাম, নাম-ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্য কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীমতী পার্ব্বতীকে নিয়োজিত কোরেছেন। শ্রীমতী হিন্দী "চণ্ডীদাসে" ও "বলিদানে" অভিনয় কোরে সুনাম অর্জ্জন কোরেছেন; সুতরাং এই ছবিতেও তিনি যে পূর্ব্ব যশ অক্ষুন্ন রাখবেন—এ বিশ্বাস আমাদের হয়। শ্রীমতী যে আজ এই যশের সোনালি পথে এগিয়ে চলেছেন, এর জন্য আংশিক প্রশংসার দাবী কোরতে পারেন শ্রীসুধা ঘোষ। কারণ তিনিই শ্রীমতীকে প্রথমে ছায়ার মায়ায় ফেলেন। আরও সুখবর হ'চ্ছে, নীরেন লাহিড়ী এই ছবির সঙ্গীত-পরিচালক। বন্ধুবর নীরেনের সঙ্গে ছায়াবাসীদের পরিচয় বিশেষ নেই—"তরুবালা" ছবি দেখলে সকলেই বুঝতে পারবেন, সে একজন গুণী-শিল্পী—ভবিষ্যতের পথে সোনালি আলো তার পথ দেখাচ্ছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

সেদিন মুখুয্যে মশাইকে দেখলাম ভারি খুসী। মনের ভাবে বুঝলাম, ছবিখানি তাঁর মনের মত হ'চ্ছে, তাই তাঁর মনেও দিচ্ছে কাতাকুতু। মুখুয্যে মশাইয়ের "পথের শেষে" শেষের দিকেই এগিয়ে চলেছে। ছবিখানা ভাল করবার জন্যে খাটছেন তিনি খুব। তাঁর শ্রম সার্থক হ'ক।

* * *

এদের উর্দ্দু ছবি "খায়বার পাশ", "নূরে-ওহাদাৎ" ও "বাঘী সিপাহী" আর তেলেগু

"সতী অনুসূয়া" ও "ধ্রুব" প্রায় শেষ হ'য়ে এল।

এরপরে এই প্রতিষ্ঠানে দেবকী বোস 'কালী ফিল্মসে' যে "সোনার সংসার" নামে ছবি তোলার সঙ্কল্প কোরেছিলেন, সেখানা বাঙ্লা আর হিন্দীতে তোলা হবে।

বেঙ্গল টকীজ

মধু বোসের "ওয়ান্ ফেটাল নাইট" হিন্দী ছবি কবে যে মুক্তিলাভ কোরবে তা' বলা শক্ত! তার ওপর বাজারে ছবিখানা সম্বন্ধে নানা গুজব উড়ে বেড়াচ্ছে। বাজারের গুজবে আমাদের বিশ্বাস হয় না। তাঁকে আমরা গুণী বলেই জানি—সুতরাং তাঁর সাধনা ব্যর্থ হবে কেন?

স্বাগতম্

—সুভাষচন্দ্রের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

১০ই মার্চ্চ বোম্বাইয়ে অবতরণ

আমাদের ডাব্‌লিনস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে বাংলার জননায়ক বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী "ভিক্টোরিয়া" জাহাজে ভারত অভিমুখে রওনা হইবেন ও ১০ই মার্চ্চ বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করিবেন।

সুভাষচন্দ্র বর্ত্তমানে ডাব্‌লিনে অবস্থান করিতেছেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারত অভিমুখে রওনা হইবার পূর্ব্বে তিনি ব্রাসেল্‌স্, এ্যাণ্টোয়ার্প ও প্যারিস পরিভ্রমণ করিবেন।

রূপ-মহল

'রূপ-মহলে' "আবুল-হাসান" আবার দেখলাম। এত সুঅভিনীত ও সুগঠিত নাটক আমরা বহুদিন দেখেনি। প্রযোজনা ও অভিনয় আমাদের অভূতপূর্ব্ব আনন্দ দিয়েছে। দুর্গাদাস, গণেশ গোস্বামী, সন্তোষ সিংহ, কালীগুপ্ত, রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত মিত্রের অভিনয় পূর্ব্বের চেয়ে অনেক উন্নত হ'য়েছে। মোট কথা Teamwork হিসেবে এমন সুঅভিনীত নাটক খুব কমই হ'য়েছে। শ্যামবাজার অঞ্চলে এই সম্প্রদায় যদি অভিনয় করবার সুযোগ পেতেন তা' হ'লে বড়দিন আর নববর্ষের বাজার এরা মাত কোরতেন। আমরা এই সম্প্রদায়ের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

প্রাইমা ফিল্মস্

স্ক্রীণ কর্পোরেশন, তথা রূপবাণী কর্তৃপক্ষীয়গণ সবাক্ চিত্রাবলী পরিবেশনের জন্য উক্ত নামে ৭৬-৩ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট কলিকাতা ঠিকানায় একটী নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা কোরে রাধা ফিল্ম কোম্পানীর নূতন পৌরাণিক চিত্র "কৃষ্ণ সুদামার" একমাত্র স্বত্ব ক্রয় কোরেছেন। আমরা এই নূতন প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

রূপবাণী

রাধা ফিল্মের জনপ্রিয় রোমহর্ষক চিত্র "কণ্ঠহার" আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার থেকে সপ্তম সপ্তাহে পদার্পন কোরবে।

রাধা ফিল্ম

"কৃষ্ণ-সুদামা" এখন সম্পাদনা কক্ষে। ছবিখানার সাফল্যের জন্যে ফনি বর্ম্মা, হরিপদ বাড়ুয্যে ও চিত্ত ঘোষ উঠে পড়ে লেগেছেন। গুণীদের গুণের পরিচয় পেলেই আমরা সন্তুষ্ট হব।

চন্দ্র ফিল্মস্

এদের "পরপারে"-র শূটিং সুরু হ'য়েছে। যতীন দাশ একজন পাকা জহুরী; তিনি যে ছবিখানাকে প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে ফেলতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। তার ওপর ভায়া প্রবোধ রয়েছে—যাঁর গুণ আজ সারা ভারত ছড়িয়ে পড়েছে।

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

ম্যাক্স ইভান্স আর উনা মারকেল ঘোড়ায় চড়তে বড় ভালবাসে। তাই অপূর্ব্ব সাজে এদের দু'জনকেই একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়োতে. হলিউডের অনেকেই দেখে.

বিয়েতে নেই বাধা

এলিস মুর—এলিস্ জয়েসের উনিস বছরের মেয়ে সে। তা হলে কি হয়! রংমহলের রঙীণ প্রজাপতিটা কোথা থেকে উড়ে এসে তার গায়ের ওপর বসে পড়েছে। তাইতো সে পাড়ি জমালো—সুদূরে, সেই ইয়মাতে। ফেলিক্স্ নাইটকে ভালবাসে কিনা? তাই তারই সঙ্গে দিয়েছিল একেবারে চম্পট, মেট্রোর সঙ্গে যেদিন চুক্তি আবদ্ধ হয়েছিল ঠিক তার পর দিনই। আক ফিরে ফিরে এসেছে সে। পর্দ্দায় তার নিজের নতুন নতুন ছায়া দেখায় মায়া কাটাতে পারলে না।

আর ফেলিক্স্ সে হচ্ছে গাইয়ে—ওস্তাদ। ওর আগেকার সেই ঐক্যতান বাজিয়ের দল ছেড়ে হলিউডের গাইয়ের খাতায় নাম লিখিয়েছে। ফেলিক্স্-এর ইন• টুর্ল্যাণ্ড" ছবি। ওতে ফেলিকস্ যে নেমেছিল। ওইটেই ওর প্রথম ছবি।

এ্যানের জিত হোল

হলিউড আনন্দে উৎফুল্ল হোল!—

এ্যান যে যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। যুদ্ধ! যুদ্ধ! হ্যাঁ যুদ্ধ! এ যুদ্ধ ছাড়া আর কী। ঘরোয়া বিবাদ যখন চরম অবস্থায় ওঠে তখন সেটাকে যুদ্ধ ছাড়া আর কি বলব। আপনাদের যা ইচ্ছে হয় বলুন, আমি একে যুদ্ধই বল্লাম। এ যুদ্ধের বার্ত্তা কিন্তু এর আগে আমি আপনাদের কাছে এনেছিলাম। এইবার ফলাফল জানাচ্ছি।—এ্যান জিতেছে! ক্যালিফোর্নিয়ার বিচারে হুকুম হয়েছে যে জেন অর্থাৎ এ্যান হার্ডিং-এর মেয়ে তার মায়ের কাছেই থাকবে। জানেন বোধ হয় এ মামলা এনেছিলো এ্যানের আগেকার স্বামী, হ্যারী ব্যানিষ্টার। তার মতে এ্যান অনুপযুক্ত। কিন্তু এ্যান যে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত সেকথা লেভাডা কোর্টে একবার প্রমানিত হয়েছিল, এবারেও হোল। এখন থেকে জেন বারো মাস তার মায়ের কাছেই থাকবে। তবে ব্যানিষ্টার ইচ্ছা করলে কখন সখন ইচ্ছানুযায়ী জেনকে নিয়ে যেতে পারেন! শান্তি! শান্তি! শান্তি এলো এ্যানের জীবনে। এইবার আনন্দে, সতেজে, সক্রিয়তায় আবার এ্যান কাজে লাগবে।

ডলরেস কষ্টেলো ফিরে এলো

চার বছর পর আবার ডলরেস কষ্টেলো ফিরে এলো পর্দ্দায় তার দেদীপ্যমান উজ্জ্বল ছায়া ধরাতে। সুন্দরী শীঘ্র তার কাজে লেগে যাবে। এবারকার তার প্রথম কাজ হবে শুনিছি 'লিট্ল লর্ড ফণ্টলরয়' ছবিতে। ছবিখানায় নামছে' ফ্রেডি বার-থোলোমিউ।

অনেকদিনের জন্যে চুক্তিতে আবদ্ধ করেছেন। এবং ডলরেসও ভেবেছে—ওই তার একমাত্র পথ। যে পথ দিয়ে স্থির লক্ষ্য রেখে যেতে পারলে আবার একদিন তার পূর্ব্বের সুনাম ফিরে আসবে।

জন ব্যারিমুরের গতদিনের প্রিয়তমা—সহধর্ম্মিনী আবার তার সেই পাহাড়ের ওপর প্রিয় বাড়ীখানায় ফিরে গেছে। ডলরেস বিচ্ছেদ মামলায় ব্যারিমুরের কাছ থেকে ওটাই পেয়েছে।

ওই বাড়ী যেখানে তার সন্তানেরা জন্মেছিলো—যেখানে এতদিনের প্রতিদিনকার সুখ দুঃখ জড়িয়ে আছে—সেইখানে ও সমস্ত বিষাদ, সমস্ত দুঃখ ভুলে গিয়ে আজকের দিনের আনন্দ নিয়ে থাকতে পারবে এই—ওর বিশ্বাস।

তার কি হবে

শীলা ব্রাউনিং হলিউডের তন্বী তরুণী মেয়ে। ঘূর্ণায়মান শানানো ইস্পাতের মত ঝকঝকে দৃষ্টি, মুখের ওপর যৌবনের উৎসব কামনার ব্যগ্র জৌলস আর অলকে পুরুষের চাওয়া আঙ্গুরের গুচ্ছ। ফানুসের ওপর চড়ে ফুর ফুরিয়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন ও কেঁদে ফেল্লে। আবার হেন্‌রি উইলক্‌কক্সন ছুটী চেয়েছে যে। সে ভয় পেয়েছে, বুকের উপর কে যেন হাতুড়ী পিটছে। কে জানে থামবে কিনা। হেন্‌রিকে যদি যুদ্ধে যেতে হয়।

হেন্‌রি হচ্ছে লণ্ডনের ছেলে আর কিংস্ আর্ম্মির একজন কর্ম্মচারী। আমি বলে রাখি—হেনরীকে যুদ্ধে যেতে হয়নি আর ইটালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধে তাকে যেতে হবে তাও মনে হয় না।

হেনরি মন্ত্র পড়বে

শার্লি মন ঠিক করেছে আর সে বসে থাকবে না। এইবার একদিন শীঘ্রী হেনরী ফণ্ডার সঙ্গে বেদীর সামনে মন্ত্র পড়ে নেবে। হেনরি ফণ্ডাকে যারা চেনেন না তাদের বলে দি, উনি হচ্ছেন মার্গারেট সুলিভ্যানের পূর্ব্বের স্বামী।

আর একটা মজার কথা হচ্ছে এই যে শার্লি আর হেনরি দুজনেই ওমাহা বলে এক গ্রামের এক জায়গার লোক। অথচ দুজনের কারো কোন পরিচয় ছিল না। এই তাদের প্রথম পরিচয় অর্থাৎ একবছর আগে যখন ওরা একসঙ্গে একটা ছবিতে নামে।

খুচরো খবর

১। জিন হারলো চুলে রং দিয়ে মেক আপ করতে সুরু করে।

২। কে ফ্রান্সিসের পোষাকের দিকে নজর বেশী।

প্রথম দেখা

শ্রীমাখনমতী দেবী

যেদিন প্রথম হেরিনু তোমায়
আপনা হারানু ক্ষণে।
না জানি কখন সারাটি হিয়ায়
সঁপে দিনু ও চরণে॥
নিবে কিনা তুমি দেখিনি ভাবিয়া
করি নাই কিছু আশ।
হয়েছিনু সুখী শুধু বিকাইয়া
নিরমল ভালবাসা॥
সাধনা কামনা তুমি যে আমার
তুমি যে দেহের প্রাণ।
কত নিশি হায়, ধেয়ানে তোমার
হয়ে গেছে অবসান॥
চাহিবার আগে দিয়াছিনু ধরা
সেই ত গৌরব মানি।
জীবন সফল হ'ল আজি মোর
শুনিয়া অমিয় বাণী॥

বিবিধ

রাজবন্দীদের শিক্ষা

বিগত ২১শে নভেম্বর "খেয়ালী"তে রাজবন্দীদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা দেখিতেছি একেবারে অমূলক নহে। মিঃ এস, কে, সেন নাকি ইউনাইটেড প্রেসের মারফতে বলিয়াছিলেন যে প্রায় এক হাজার আটক আসামীকে বিনা বেতনে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান করা হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম মিঃ এস, কে, সেন এরূপ কোনও কথা বলেন নাই। রাজবন্দীদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটী পরিকল্পনা সরকারের বিচারাধীন আছে বটে; কিন্তু সে সম্বন্ধে এখনও কোনও শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই বলিয়াই আমরা জানি। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে এক হাজার রাজবন্দীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থার সংবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন। "ইউনাইটেড প্রেসে"র এরূপ ভিত্তিহীন একটা সংবাদ প্রচারের অর্থ কি?

কুমুদেশ সেন নহেন!

শ্রীকুমুদেশ সেন আমাদের জানাইয়াছেন যে, শ্রীপাহাড়ী সান্ন্যাল, কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ, মিঃ সাইগল, শ্রীহরিপদ রায় প্রভৃতি সুগায়কবৃন্দ নাকি তাঁহাকে "খেয়ালী"র সঙ্গীত সম্মেলনের সমালোচক কি না জিজ্ঞাসা করিয়া বিব্রত করিয়াছেন। কুমুদেশ বাবু তাঁহার বন্ধুবর্গের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হইয়া আমাদিগকে এক পত্রাঘাত করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছেন। কুমুদেশ বাবুর বন্ধুবর্গের অবগতির জন্য আমরা প্রকাশ্যে জানাইতেছি যে তিনি আমাদের সঙ্গীত সমালোচক নহেন। সাংবাদিক রীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আমরা সমালোচকের নাম প্রকাশ করিতে অক্ষম। তবে তিনি যে বিশেষ গুণী ব্যক্তি তাহা বোধহয় কুমুদেশ বাবুকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

শ্রীধুন্দবীর
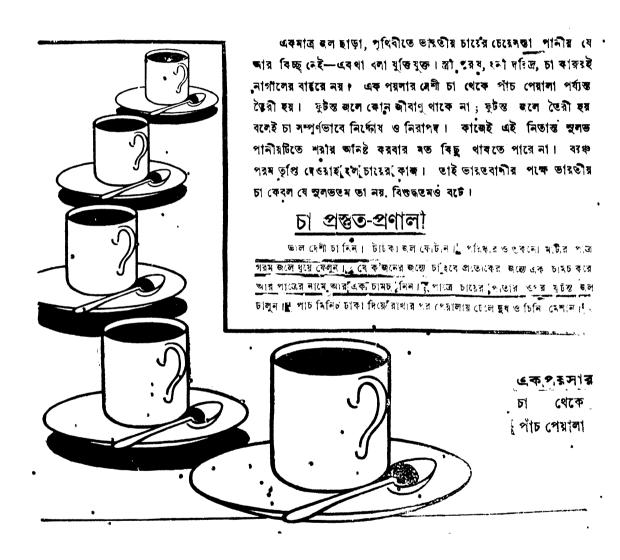
নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী গত দুই সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা অধিবেশনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিব। সে বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে আমরা ধ্বংসমূলক সমালোচনার পক্ষপাতী নহি—ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের বক্তব্য উপনিবদ্ধ করিব।

এবারে যাঁহারা সম্মেলনের উদ্যোগী ছিলেন তাঁহাদের সাধু চেষ্টার প্রশংসা করিয়া আমরা আলোচনা আরম্ভ করিতেছি। সপ্তাহকাল ধরিয়া কলিকাতা-নগরীতে সঙ্গীতের আয়োজন করিয়া (প্রথমে competition ও পরে conference) উদ্যোক্তৃবর্গ সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই যে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা যে অল্প সময়ের মধ্যে এই আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই বৎসরে অনূন ৬০০ শত ছাত্র ছাত্রী competitionএ যোগদান করিয়াছিল। সপ্তাহকালের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যে কত পরিশ্রম-সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমেয়। পরীক্ষক-নির্ব্বাচন বিষয়ে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিতে পারে—হয়তো বা যোগ্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করা নাও হইতে পারে (আমাদেরও এবিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে মত-ভেদ থাকিতে পারে এবং আমরা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অনুমোদনও করি না), কিন্তু তাহা বলিয়া "competitionটী কিছুই হয় নাই" বা "ইহার কোনও গৌরব নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ দুরভিসন্ধি-মূলক মতের পরিপোষণ করা সুরুচিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। কোনও মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিলে কোথায় সহায়তা পাওয়া যাইবে, না কেবল নিন্দা ও শ্লেষপূর্ণ কুটিল সমালোচনা—বাংলার মাটির ও জলহাওয়ার বোধ হয় ক্রমশঃ একটা বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যাহা হউক, আমরা যেমন একদিকে competitionএর উদ্যোক্তৃবর্গের সাধু উদ্যম দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি অন্য-দিকে তেমনি আমরা পরীক্ষার্থিগণের অভি-ভাবকবর্গের অকাতর সহযোগিতারও সাধুবাদ দিতেছি। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, অভিভাবকগণের আনুকূল্য এভাবে না পাইলে উদ্যোক্তৃবর্গ কখনই সফলকাম হইতে পারিতেন না। আমরা দেখিয়া সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছি যে বর্ত্তমানে আমাদের দেশের সঙ্গীতানুরাগী ছাত্রছাত্রীগণ বাংলা সঙ্গীত অপেক্ষা classical সঙ্গীতের চর্চায় অধিক-ভাবে মনোনিবেশ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে, অল্পবয়স্ক বালিকাগণের বিশেষ সাফল্যের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

Conference সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা একটী কথা বলিব। উদ্যোক্তৃবর্গ প্রোগ্রাম পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন স্বনামধন্য ডক্টর শ্রীযুক্ত ডি, আর, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্বন্ধে কোন পরিচয় আবশ্যক করে না। প্রাণিবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিলেও তিনি সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগী—এলাহাবাদ music conferenceএর তিনিই সুযোগ্য কর্ণধার। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন—music conferenceএ যোগদান করা অবশ্য তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—কিন্তু উদ্যোক্তৃবর্গ শুধু অধিবেশনের নহে, competitionএরও programme পরিচালনার ভার তাঁদের উপর চাপাইলেন। বাংলা দেশ চিরকালই অতিথিসৎকার করিয়া আসিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর ঘোরতর পরিশ্রমসাপেক্ষ কর্ম্মভার অর্পণ করা কি উদ্যোক্তৃবর্গের ভাল হইল? অতিথি কোথায় একটু আনন্দ উপভোগ করিবেন—না এই দারুণ শীতেও শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত হইয়া, programme পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার বাজারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে রেহাই দেয়, এমন কোন পরহিত-প্রাণকে অগ্রণী হইতে তো আমরা দেখিলাম না—কারণ কি? ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সেবা-ধর্ম্ম, না উদ্যোক্তৃবর্গের মুন্সীয়ানা?

Conference সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বলিতে হইবে যে কর্ত্তৃপক্ষ উহাকে representative করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাংলার conference; বাংলার প্রায় সকল গায়ক ও বাদকই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে উদ্যোক্তৃবর্গ কেবল classical musicএরই conference করেন নাই; বাংলার তথাকথিত সঙ্গীত—বাউল, ভাটিয়ালী, গজল, কীর্ত্তন ইত্যাদিরও demonstration-এর আয়োজন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বোঝা উচিত ছিল যে, যে আসরে classical

music এর demonstrationএর ব্যবস্থা করা হইয়াছে—সেই আসরে বাংলা সঙ্গীতের demonstration হইলে প্রকৃত রসসৃষ্টি হইতে পারে না। Classical musicএর demonstrationএ যেখানে কুমার গন্ধর্ব্বের ন্যায় prodigyর অপূর্ব্ব সঙ্গীতলহরী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত সমাহিত, ঠিক তাহার পরই শচীন্দ্র দেববর্ম্মণের (১) মঞ্জুরাতে তন্দ্রা কেন হে প্রিয় (২) নতুন ফাগুন যবে (৩) ঝন্ ঝন্ ঝন্ মন্দিরা বাজে প্রভৃতি modern songs যে সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের রসবোধকে কি ভাবে পীড়া দিয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। প্রোঃ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়াল গান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়কে কীর্ত্তন গাহিতে দিয়া আসরের ভাব নষ্ট করিতে দেওয়াও যে কর্ত্তৃপক্ষের অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা মাত্র দুইটীর উল্লেখ করিলাম এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত অনায়াসেই উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আমরা অবশ্য বলিতে চাহি না যে বাংলা গানের demonstration নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু যখন উহার demonstration দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষ আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ উচিত ছিল:—(১) বাংলা গানের জন্য এক বেলা পৃথক্ আসর করা (২) উপযুক্ত ব্যক্তিকে demonstrationএর জন্য নির্ব্বাচন করা। classical গানের মধ্যে বাংলা গানের সন্নিবেশ রসবোধের পরিচয় দেয় না এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিলে বিষয়েরই গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়।

বাংলা গানের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা এখন classical সঙ্গীতের demonstrationএর কয়েকটা বিশেষ অমার্জ্জনীয় ত্রুটী দেখাইব। Demonstrationএর মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে যে সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে এবং বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতের standard সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা। অতএব যাঁহারা প্রকৃত গুণী, যাঁহাদের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে তাঁহাদেরই demonstrationএ নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। কিন্তু উদ্যোক্তৃবর্গ এমন কয়েকটী গায়ককে demonstrationএ গাহিতে দিয়াছিলেন, যাঁহারা demonstration দিবার তো সম্পূর্ণই অনুপযুক্ত, এমন কি অনেকে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের নিকট ও কিছুকাল ধরিয়া তালিম লইতে পারেন। প্রকৃত গুণিগণ ব্যতীত সঙ্গীতে যাঁহারা advanced student তাঁহারাও যাহাতে নিজ নিজ শিক্ষার পরিচয় দিতে পারেন তাহার জন্য demonstrationএ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করাও প্রয়োজন। তবে ইহা দেখিতে হইবে যে গুণীগণের যে আসরে গানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—সেই আসরেই তাঁহারা না গাহেন। মুড়ি মিছরির একদর করা উচিত নহে। তবে কাঁহারা ওস্তাদ পর্য্যায়ভুক্ত আর কাঁহারাই বা advanced students যে বিষয়ে সাধারণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপযুক্ত ধারণা না থাকার জন্য তাঁহারা গোলমাল করিতে পারেন বটে কিন্তু যাঁহারা সম্মেলনের আয়োজন করেন—সঙ্গীতের আদর্শ সম্বন্ধে যাঁহারা সচেতন, শ্রোতৃবর্গকে যাঁহারা তৃপ্তি দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহারা যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া এই নির্ব্বাচন করিতে সৎসাহসান্বিত না হন, তাহা হইলে আমরা সম্মেলনের আয়োজনের যে কি সার্থকতা—তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না।

ইহা ছাড়াও আমাদের আর একটি বিশেষ বক্তব্য আছে কতকগুলি অর্ব্বাচীন গায়ককে programme-এ স্থান দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে বিসদৃশ ব্যবস্থা করেন—তাহা উপস্থিত সুধীবর্গ ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। বাহির হইতে কয়েক জন বড় বড় গুণী আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের ও বাংলার বিখ্যাত গায়কদের গান শুনিবার জন্য শ্রোতৃবর্গ ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন—অথচ কতকগুলি অতি নিকৃষ্ট স্তরের গান; বাদ্য ও নৃত্যাদি পরিচালক মহাশয় পরিবেশন করিতেছেন। লোকের ধৈর্য্যের ও সময়ের যে মূল্য আছে—সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন—দ্বিতীয় দিন রাত্রি ১টার সময় নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের গান হইল—তৃতীয় দিবস রাত্রি ১॥০টার সময় প্রোঃ ব্যাস গাহিলেন—সময় নাই বলিয়া প্রোঃ পটবর্দ্ধনকে তৃতীয় দিবস রাত্রে অল্প কালের জন্য গাহিতে দেওয়া হইল—বাংলার প্রসিদ্ধ খেয়ালিয়া সাতকড়িবাবুকে ১৫ মিনিট বাইতে না বাইতেই লাল বাতি দেখাইয়া উঠিতে বলা হইল। সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বাবুকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করিতে হইল—গিরিজাবাবু সেক্রেটারী মহাশয়দের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াও আধ ঘণ্টার বেশী সময় পাইলেন না—কখন লালবাতি জ্বলিয়া উঠিবে—সেই দিকে সভয়ে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া গান খারাপ করিয়া ফেলিলেন

—আরও কত যে ঘটিল তাহা পাঠকদের নিকট আর কত জানাইব। কিন্তু সময়ের অভাব নাই—শচীন্দ্র দেব বর্ম্মন তিনখানি সুদীর্ঘ গান গাহিবেন—তারপর শ্রীশৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিহর রায়, শ্রীযুক্ত সুনীল বসু, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মিত্র, কুমারী গীতা রায়, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু মুখার্জ্জি, কুমারী গীতা দাস, কুমারী আরতি দাস—ইঁহাদের তো গাহিতে দিতেই হবে! কর্ত্তৃপক্ষের কি সুবিবেচনা!! পাঠক ভুল বুঝিবেন না—শুধু বাংলার 4th rate এরাই যে চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছেন তা নয়—বাহির হইতে অভ্যাগতদের মধ্যেও যে কত nth. rate মাল আসিয়াছিল—তাহার ইয়ত্তা নেই। আমরা নাম করিব না—পাঠক, ভুল করিয়া আমাদের Ante-Bengalee spirit বলিয়া মনে করিবেন না—ইহা শুধু অভ্যাগতদের প্রতি সৌজন্য। তবে কর্ত্তৃপক্ষ আগামী বৎসরে যদি বস্তাপচা কোন মাল বাহির হইতে আমদানী করেন—আমরা কিন্তু ছাড়িব না।

এতো গেল গানের পালা। নাচ সম্বন্ধে মহারাজ বোস ও জলিদত্ত যে কি ভীষণ বীভৎস ও কিরূপ ন্যাকরজনক—তাহা দেখিলেও ঘৃণা বোধ হয়। কিসের মারফৎ যে ইঁহারা demonstration-এ স্থান পাইলেন—তাহা কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণকে জানাইবেন কি? এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রী ভীষ্মদেব চ্যাটার্জ্জি, শ্রীপঙ্কজ মল্লিক, শ্রীযুক্ত সাইগাল, শ্রীপাহাড়ী সান্ন্যাল, শ্রীযামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি তথাকথিত কলাবিদ্‌গণ আসরে না গাহিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। Advanced student হিসাবে মিসেস্ মায়া দেবী, শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত শচীন দাস (মতিলাল) প্রভৃতির পৃথকভাবে গাহিবার বা বাজাইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত। শ্রীযুক্ত অনিল বাগচীও না গাহিলে ভাল করিতেন।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে demonstration এর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে স্বেচ্ছায় পারিতোষক প্রদানের রীতি আমরা মোটেই সমর্থন করি না। পারিতোষিক যদি দিতেই হয়—তাহা হইলে উহা কোন কমিটির মধ্য দিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তি বিশেষের হয়তো কোন গায়কের গান ভাল লাগিবার বিশেষ কোন কারণ থাকিতে পারে—কিন্তু এমন গায়ক যদি সহৃদয় সাধারণকে তৃপ্তি দিতে না পারে, তাহা হইলে সেই গায়কের পুরস্কার পাওয়া, সুধী সমজদারদের কাছে বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়। ব্যক্তি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন—ইহা আমাদের ইচ্ছা নহে—এই জন্য আমরা নামোল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটেই Conference এ ভাল গাহিতে পারিলেন না—হইতে পারে, তিনি তাঁহার ভক্তদের কাছে অতি প্রিয় এবং এমন কি নিজেকে ভারত প্রসিদ্ধ গায়ক বলিয়াও অভিমান করেন—তথাপি বহুমূল্য পুরস্কারাদি তিনি পাইলেন—কিন্তু ইহাতে যে গৌরব বৃদ্ধি পায় না বরং ক্ষুদ্র মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া জনসাধারণ শ্রদ্ধা হারায়—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাহা ছাড়া একজন গায়ক গাহিবার পূর্ব্বে যদি ক্রমাগত অন্য গায়কদের পারিতোষিক ঘোষণা করা হয়—তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত গায়কের পক্ষে তাহার সঙ্গীতোপযোগী atmosphere সৃষ্টি করা—বড়ই কঠিন হয়। ইহা যে কেবলমাত্র আমাদেরই মন্তব্য, তাহা নহে—Conference এ যে সকল বিশিষ্ট গুণী উপস্থিত ছিলেন—তাঁহারাও ব্যক্তি বিশেষকে এ ভাবে পুরস্কৃত করা অনুমোদন করেন নাই। কারণ—ইহার অন্তরালে প্রায়ই যে সকল গোপন আয়োজন চলে—তাহা আর কাহারো বুঝিতে বাকী থাকে না। এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী মন্তব্য বারান্তরে প্রকাশ্য।

চলার-পথে

শ্রীহর প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

চট্-কলের কুলী-কোয়ার্টার।

বেলা তখন আন্দাজ এগারটা হইবে। কলের একদফা কাজ সারিয়া পুরুষ ও নারীর বিপুল জনস্রোত ও বিচিত্র কোলাহলের সহিত মনুয়া তখন কোয়ার্টারে ফিরিতেছিল। কোয়ার্টারের সাম্‌নে আসিয়া সে দেখে, তাহাদের ঠিক পাশের কামরাটি যাহা এই গত সপ্তাহ হইতে খালি পড়িয়াছিল—লাইন সর্দ্দার তাহার তালা খুলিতেছে এবং সর্দ্দারের পিছনে একটি বলিষ্ঠ যুবক হাতে লোটা এবং কাঁদে প্রকাণ্ড এক লাঠিতে কালো কম্বলে জড়ান মাঝারি গোছের একটি মোট লইয়া দাঁড়াইয়া। সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় দফা কাজ সারিয়া মনুয়া যখন কোয়ার্টারে ফিরিল—পাশের সেই কামরাটিতে তখন টেমির আলো জ্বলিতেছে।

দীর্ঘ একটানা গম্ভীর সুরে কলের বাঁশী বাজিয়া চলিয়াছে; মুহূর্ত্ত পরে, তাহারই সঙ্গে সুর মিলাইয়া দূরতর অপর একটি কলের ক্ষীণ-স্বর বাঁশী যেন দীর্ঘতার পাল্লা দিয়া বাজিতে সুরু করিয়াছে। বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে সারা কুলী লাইন জাগিয়া উঠিল। রাত্রি সাড়ে চারিটা। মনুয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আপন বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

লাইনের সাম্‌নের জলের কল হইতে হাত মুখ ধুইয়া মনুয়া কামরায় ঢুকিতে যাইবে, দেখে পাশের কামরার সেই নূতন যুবকটি ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দুপুর বেলা স্নান করিবার জন্য হাতে একটি বাল্‌তি লইয়া মনুয়া যখন জল-কলের নিকট হাজির হইল—যুবকটি তখন একটি লোটা লইয়া কল হইতে খানিকটা তফাতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার, পরে যাহারা আসিয়াছিল তাহারাও স্নান সারিয়া ফিরিল, মনুয়ারও স্নান হইয়া গিয়াছিল, ফিরিবার সময় দেখিল তখনও যুবকটি সেইখানে দাঁড়াইয়া। দেখিতে দেখিতে নূতন সপ্তাহ ঘুরিয়া আসিল এবং সেই অপরিচিত যুবকটি কুলী লাইনের অভ্যস্ত জীবন যাত্রার ছন্দে আপন অতীতকে হারাইয়া ফেলিল! তাহার আকার এবং গমনাগমন লাইনের কাহারও আর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা—কৌতূহল জাগাইয়া তোলে না।

লাইনের দুই সারি মুখোমুখি চল্লিশ খানা কামরার মধ্য দিয়া এক অপ্রশস্ত পথ এবং তাহারই মাঝে একটি মাত্র জলের কল। ভোর রাত্রে এবং দুপুর বেলা কলের নিকট অস্বাভাবিক ভীড় ও জল লইয়া বচসা এবং হাতাহাতি লাগিয়াই আছে। এই কলের ধারে মনুয়ার সহিত যুবকটির প্রত্যহ দেখা হয়।

সেদিন কলের নিকট লোটা হাতে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার পর, কাজে যাইতে দেরী হইয়া যাইবে দেখিয়া যেই যুবকটি লোটা কলের মুখে ধরিয়াছে; অমনি সদ্য-আগত একটি রমণী উচ্চকণ্ঠে তাহাকে কটু কথা বলিতে বলিতে আপন বাল্‌তির ধাক্কায় তাহার লোটাটি ঠেলিয়া দিয়া বাল্‌তি ভরিতে আরম্ভ করিল। মনুয়া নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল—কেন জানি না, সহসা সে সেই রমণীটির সহিত ঝগড়া করিয়া বসিল। যুবকটি বিস্মিত নয়নে মনুয়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

এখন মনুয়ার সহিত দেখা হইলে যুবকটি তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে—মনুয়া দৃষ্টি নামাইয়া লয়।

মনুয়াদের ঠিক পাশের কামরা,—তাই নিঃসঙ্গ এই যুবকটির জীবন-যাত্রার অনেক কিছুই মনুয়ার চোখে পড়ে। রন্ধন করিতে তাহাকে সে কোনও দিন দেখে নাই—তাহার কেমন যেন বিস্ময় লাগে। একদিন দুপুর বেলা কাজ হইতে ফিরিয়া কৌতূহলী নয়ন তাহার উন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়া, যুবকটি ঘরের এক কোনে বসিয়া ছাতু মাখিতেছে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। আর একদিন সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষে কোয়ার্টারে ফিরিবার পথে মনুয়া দেখে যুবকটি দোকান হইতে রুটি কিনিতেছে। সে ভাবিয়া পায় না কলের

উদয়াস্ত হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর কেমন করিয়া ইহাতে একটি বলিষ্ঠ যুবকের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে আর; এইরূপে কতদিনই বা সে তাহার কাজ বজায় রাখিবে। যদি অসুখে পড়ে—এই বিদেশে—একলা·········!

কলের সাতটার বাঁশী এই কিছুক্ষণ আগে বাজিয়া গেল। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ সন্ধ্যার অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। ছুটির পর দলে দলে কুলী, পুরুষ ও রমণী বিকট উল্লাস ধ্বনিতে সন্ধ্যার নিস্তরঙ্গ বায়ুমণ্ডল মথিত করিয়া, নদীর খর স্রোতের মত কলের গেট হইতে বাহির হইয়া সম্মুখের বড় রাস্তা নিমেষে ছাইয়া ফেলিল। টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিয়াছে—দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। তখন গতিশীল সেই জনতা, অস্বাভাবিক উচ্চ চীৎকার করিতে করিতে আশ্রয়ের নিমিত্ত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কোন দল রাস্তার ধারের বড় গাছের তলায়, কোন দল দোকানে, কোনও দল বা সম্মুখস্থ বাড়ীর রোয়াকে গিয়া উঠিল; আর অধিকাংশ সোল্লাসে ভিজিতে ভিজিতে ও নানা প্রকার রাগিণী ভাঁজিতে ভাঁজিতে পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

মনুয়াদের পাশের কামরার সেই যুবকটি ভিজিয়া ভিজিয়া কিছুদূর আসার পর, আর পারিল না—নিকটেই একটি বাড়ীর বারান্দা দেখিতে পাইয়া সেইখানে গিয়া উঠিল। মিউনিসিপ্যালিটির দূরতর আলোর ম্লানতর রশ্মি আসিয়া সেখানে পড়িয়াছে—বারান্দার এক কোণে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া তাহার মনে হইল। সাগ্রহে একটু আগাইয়া আসিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর, সে দেখিল একটি রমণী সিক্ত পরিচ্ছদে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল—সারা আকাশ অন্ধকারে লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে সে রমণীটির নিকট আগাইয়া আসিয়া মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথায় থাকেন" ?

রমণী নিরুত্তর

"আপনি কেন লজ্জা ক'রছেন—আপনার কোন ভয় নেই।"

এইবার রমণীটি কথা বলিল—"আমি তিন নম্বর লাইনের ন'-য়ের কামরায় থাকি।"

যুবকটি সবিস্ময়ে আরও নিকটে আগাইয়া আসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখে—সে দিন জল লইয়া কল তলায় তাহার হইয়া অপর একটি রমণীর সহিত যে ঝগড়া করিয়াছিল—এ, সেই মেয়েটি।

চোখোচোখি হইয়া গেল—দু'জনেই নির্ব্বাক।

অবিরাম ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, শব্দের সেই অন্ধকারের মধ্যে মুখোমুখি দু'জনে নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া।—

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। তা'রপর, তা'রপর দুজনে কত কথা—তাহার দেশ কোথায়, কেন সে দেশ হইতে আসিয়াছে, দেশে তাহার কে আছে···?

যুবক জিজ্ঞাসা করে—কেন সে সেদিন কল-তলায় তাহার হইয়া অপরের সহিত ঝগড়া করিতে গেল, কেন সে তাহার দিকে প্রায়ই চাহিয়া থাকে—তাহা না হইলে ত' ...যাক্।

এখন প্রায়ই দু'জনে কাজে যাইবার সময় একই সঙ্গে কোয়ার্টার হইতে বাহির হয়; খানিকটা পথ অগ্রাইয়া গিয়া, তাহারা গল্প সুরু করিয়া দেয়—সে কত কথা। মনুয়া বলে—এম্নি করিয়া ছাতু ও দোকানের রুটি খাইয়া আর কতদিন চলিবে! দেশ হইতে যখন সে এখানে প্রথম আসে তখন তাহার চেহারা কেমন ছিল, আর আজ সে কত রোগা হইয়া গিয়াছে। সুখনলাল সে কথা ঘুরাইয়া দিয়া অন্য কথা পাড়ে—মনুয়া কিন্তু ছাড়ে না।

কলের ছুটির পর সুখনলাল বড় রাস্তার মোড়ে মনুয়ার জন্য অপেক্ষা করে, আর যেদিন মনুয়া আগে বাহির হয় সে সুখন-লালের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাদের গতিবিধি চালচলন লাইনের কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। আঠার বৎসরের সমর্থ মেয়ের, এক অপরিচিত যুবকের সহিত এইরূপ মেলামেশায় কুলী-লাইন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কল-তলায় মনুয়ার সহিত দেখা হইলে মেয়েরা হাসে, গা টেপাটেপি করে। সেদিন সমবয়স্কা একটি মেয়ে মনুয়াকে একলা পাইয়া এমন এক কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিল যে—মনুয়া তাহার সহিত কথা বন্ধ করিয়া দিল। লাইনের যুবকের দল মনুয়ার দিকে আড়-চোখে চাহিয়া হাসে—সুযোগ পাইলে ঠাট্টা ইয়ারকি দিতেও ছাড়ে না। মনুয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মনুয়ার অভিভাবিকা তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমার কাছে—একদিন লাইনের মাতব্বরেরা আসিয়া তাহাদের অভিযোগ জানাইল ও সাবধান করিয়া দিল। বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে বলে—"এতটুকু বেলা থেকে ওকে আমি মানুষ ক'রেছি—ওকে আমি চিনি।" মাতব্বরেরা ফিরিয়া যায়।

মনুয়া ও সুখনকে লইয়া লাইনময় রঙ্গীন আলোচনা চলে—তাহাদের দেখিয়া হাসি ঠাট্টা ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠে। একত্রে কলে যাওয়া-আসা তাহাদের অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সেই সদাহাস্য-চপল মেয়েটি এখন রাস্তা একপাশ দিয়া, মুখ বুজিয়া কলে যাতায়া করে—অযত্ন-মলিন তাহার বেশভূষা। এখ সুখনলালের সহিত চোখাচোখি হইয়া গে অধরের কোনে তাহার একটু ম্লান হা ফুটিয়া উঠে—পরক্ষণেই সে দৃষ্টি আন করে।

সুখনলাল দুইদিন কাজে যায় না। তাহার কামরার খোলা দরজার মধ্য দিয়া মনুয়ার উৎসুক দৃষ্টি কি যেন খুঁজিয়া ফেরে —কিছুই দেখা যায় না। কলের বাঁশী বাজিয়া উঠে—তাড়াতাড়ি সে কাজে যায়। আনমনে সে পথ চলে,—সমবেত কণ্ঠের হৈঃ হৈঃ একটা শব্দ উঠিতেই চমক ভাঙ্গিয়া তাড়াতাড়ি সে পথের একপাশে সরিয়া দাঁড়ায়। আর একটু হইলেই মাল-বোঝাই ঐ লরীর তলায়......যাক্, বাঁচিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা কাজ হইতে ফিরিয়া সে রাঁধিবার আয়োজন করিতেছে,—হঠাৎ, পাশের কামরা হইতে কাতরানির শব্দ আসিয়া তাহার কানে লাগিল। কাজ থামাইয়া সে কান পাতিয়া শুনে, তাহার পর উঠিয়া পড়িয়া কামরার দরজার কাছে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে—আবার শব্দ, আর সে থাকিতে পারিল না, দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মেঝেয় একখণ্ড ভাঙ্গা ইটের উপর একটি টেমি অজস্র ধোঁয়া উদ্গীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে ও ঘরের একপাশে একটি দড়ির খাটিয়ার উপর কালো কম্বল মুড়ি দিয়া সুখনলাল এপাশ ওপাশ করিতেছে। ছুটিয়া গিয়া মনুয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখে যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে, চোখ জবাফুলের মত টকটকে লাল; অবাক হইয়া সুখনলাল মনুয়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মনুয়া জিজ্ঞাসা স্বরে—"কিছু খাওনি?"

"না।"

"আমায় খবর দাওনি কেন?"

তাহার দিকে চাহিয়া সুখনলাল অদ্ভুত একপ্রকার হাসিয়া উঠে। মনুয়ার ভয় হয়!

তাহার পর যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সুখনলাল বলিল—"তুমি আর এস'না—যাও, যাও"। মনুয়া ধীরে ধীরে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে থাকে।

কামরায় ফিরিয়া ঘণ্টাখানেক পরে সে এক বাটি সাবু লইয়া সুখনলালকে জোর করিয়া খাওয়াইল—কেরোসিনের টেমি নিভাইয়া সেখানে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া আসিল। রাত্রে মনুয়া ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না—দুই তিনবার উঠিয়া সুখনলালকে দেখিয়া আসিল।

পরদিন বেলা এগারটার সময় কাজ হইতে ফিরিবার পথে আঁচলের খুঁট হইতে দুইটি পয়সা খুলিয়া দোকান হইতে সে এক পয়সার সাবু ও এক পয়সার মিছরি লইয়া আসিল।

কামরায় ফিরিয়া সাবু তৈয়ারী করিয়া মনুয়া সুখনকে দিতে যাইবে, ঠাকুমা বলিল—"দেখ মা, লোকে যখন কথা বলে তখন কাজ কি অচেনা! একটা লোকের জন্যে..."

মনুয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠে—"ওকে দেখবার যে কেউ—" আর সে বলিতে পারে না।

ঠাকুমা চুপ করিয়া যায়।

মনুয়া ও সুখনকে লইয়া কুলী-লাইন আবার গুঞ্জরিয়া উঠে। সেদিন পথে লছমীর সহিত মনুয়ার দেখা হইতেই, লছমী বেশ একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া যেই সুখনলালের কথা পাড়িয়াছে অমনি, মনুয়া তীব্রকণ্ঠে তাহাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিতেই সে থামিয়া গেল। মনুয়াকে কেহ আক্রমণ করিলে সে আর মুখ বুজিয়া সহ্য করে না, বেশ করিয়া শুনাইয়া দেয়—তাহাদের সহিত রীতিমত ঝগড়া করে।

পাঁচ ছয়দিন পরে, অতি কষ্টে সুখনলাল আজ খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। তাহাকে সাবু দিতে আসিয়া আজ প্রথম
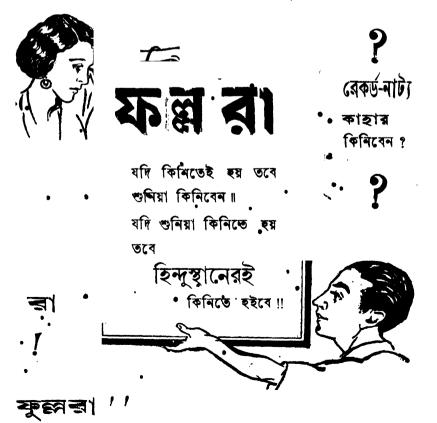
তাহার আকারের দিকে মনুয়ার দৃষ্টি পড়িল। সেই সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের এই পরিণতিতে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল, কোনমতে নিজেকে দমন করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কেমন মনে হ'চ্ছে ?"

সুখনলালের রোগ-পাণ্ডুর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠে, বলে—"তোমার দয়া জীবনে আমি ভুলতে পারবো না।"

মনুয়া বলে—"কি এমন আর আমি করেছি, পথের রুগী যে তারও লোকে সেবা করে। পাশের কামারায় কেউ রোগের যন্ত্রণায় ছটফট্ ক'রলে কে এমন নিষ্ঠুর আছে যে চুপ করে থাকে।"

সুখন বলে—"পাশে আরও ত' কামরা ছিল।"

মনুয়া উত্তর দিতে পারে না।

পরদিন।

সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে—মনুয়া এখনও কাজ হইতে ফেরে নাই। টিপ টিপ করিয়া সারাদিন বৃষ্টি পড়িতেছে—একঘেয়ে, অবিরাম। সম্মুখের জানালা খোলা; আপন খাটিয়ায় শুইয়া বর্ষায় সেই আসন্ন সন্ধ্যার ধোঁয়াটে বিবর্ণ আকাশের পানে চাহিয়া সীমাহীন চিন্তার পাথারে সে ডুবিয়া যায়। এমনি শুইয়া শুইয়া আর কতদিন চলিবে! কাল কি খাইবে তাহার সঙ্গতি পর্য্যন্ত নাই। দিন কয়েক হইল লাইন সর্দ্দারের নিকট তাহার পিতলের থালাটি বন্ধক রাখিয়া যে কয় আনা সে পাইয়াছিল তাহাও নিঃশেষিত—মাত্র পাঁচটি পয়সা আর পড়িয়া আছে। শরীরে এখনও এমন বল পায় নাই যে কাজে লাগে। কলের সেই হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির কথা মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা ছাড়া আর উপায় বা কি! না, সে আগামী সোমবার হইতে কাজে লাগিবে যত কষ্টই হউক না কেন।...কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে,—ছুটির পর কুলীরা হল্লা করিতে করিতে দলে দলে লাইনে ফিরিতেছে। তাহাদের হল্লার শব্দে সুখনলালের চমক ভাঙ্গিল। খোলা জানালার মধ্য দিয়া লাইনের আলো তির্য্যক্‌ভাবে ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—সুখনলাল খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসিল।—ঐ মনুয়াও ফিরিতেছে! সুখন উঠিয়া পড়িয়া আপন টেমিটি জ্বালিল।

রবিবার—দুপুরবেলা। এই কিছুক্ষণ হইল মনুয়া চলিয়া গিয়াছে। কাল সোমবার হইতে তাহাকে আবার কাজে লাগিতে হইবে—সেই কাজ! সে কেমন যেন একটা বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল; ঘর হইতে সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। জল-কলের নিকট মেয়েরা জল লইয়া ঝগড়া করিতেছে। তাহারই কিছু দূরে লাইনের সেই কালো ঠ্যাং ভাঙ্গা কুকুরটা রৌদ্রে শুইয়া জিব্ বাহির করিয়া ক্রমাগত হাঁপাইতেছে। দুইটা কাক্ কাপড় শুকাইতে দিবার তারের উপর বসিয়া বিশ্রী একঘেয়ে চীৎকার করিয়া চলিয়াছে—সুখনলাল আবার ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। তাহার পর অনাবশ্যক এটা ওটা নাড়াচাড়া করিয়া খাটিয়ার উপর অলস-ভাবে বসিয়া পড়িল।

হঠাৎ দরজার নিকট নাল্ লাগানো জুতোর খটা-খট্ শব্দ ও জলদ গম্ভীর স্বরে—"সুখনলাল হ্যায় ?" শুনিতেই শশব্যস্তে সে দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। লাইন সর্দ্দার,—সেলাম্ করিয়া সুখন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"এ্যাই, তোমরা নকরী ছুট্ গিয়া। কাল রোজ কামরা খালি কর্‌না চাহি। জরুর চাহি—সমঝা।"

সুখন একবার ঢোঁক গিলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল—

"ইসমে কোন বাত্ নাহি"—বলিয়া লাইন সর্দ্দার চলিয়া গেল।

সুখন ধীরে ধীরে গিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রে সেদিন আর সে কিছু খাইল না। লাইনে একটি প্রাণীও আর জাগিয়া নাই—সমস্ত নিঝুম, নিঃস্তব্ধ; মাঝে মাঝে বহুদূর হইতে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। রাত্রি একটা কি দেড়টা হইবে আপন খাটিয়ার উপর সুখনলাল তখনও জাগিয়া।

......কলের বাঁশী বাজিয়া চলিয়াছে—রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটে নাই। মনু[illegible] সুখনের কামরার নিকট আসিয়া দেখে—দরজা খোলা; ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিল। ধূম উদ্গীর্ণ করিতে করিতে নির্ব্বাণোন্মুখ টেমিটি তখনও জ্বলিতেছে ও সুখনলাল অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, বহুবার ডাকিয়াও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না। তখন জোরে জোরে সে সুখনের গা ঠেলিতেই,—রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু ঈষদুন্মিলীত করিয়া সে মনুয়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

"আজ থেকে কাজে লাগবে ব'লেছিলে যে—যা'বে না ?"

জড়িতকণ্ঠে সুখন উত্তর দেয় "না"।

"কেন—কি হ'ল আবার ?"

একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনুয়ার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সে চাহিয়া থাকে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মনুয়া জিজ্ঞাসা করে—"আবার কি অসুখ ক'রেছে ?"

তবুও সুখন চাহিয়া থাকে; উত্[illegible] দেয় না।

মনুয়া আরও নিকটে আগাইয়া আসি[illegible] তাহার কপালে হাত দিতে যায়—

সুখন বলিয়া উঠিল—"না, না অসু[illegible] আমার করেনি,—কাজে জবাব—" আর [illegible] বলিতে পারে না।

মনুয়ার দুই নয়ন জল-ভারাক্রান্ত হই[illegible] উঠে; বলে—"কি ক'রবে তা' হ'লে ?"

"দেশে যা'ব ভাবছি।"

"কবে ?"

"আজই,—বিকালের গাড়ীতে।"

দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া থাকে।

কামরা হইতে ঠাকুমা ডাক দিয়া বলে—"মনুয়া কাজে যাবি না মা—বেলা যে অনেক হ'ল।"

ধীর পদক্ষেপে মনুয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আপন বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়ে। ঠাকুমা ব্যস্ত হইয়া নিকটে আসিয়া গায়ে কপালে হাত দিয়া দেখে—"কি হ'ল মা?"

"বড্ড পেট ব্যথা ক'রছে" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শোয়।

'তা' হ'লে ডাক্তার-বাবুর কাছ থেকে ওযুধ আনি" বলিতে বলিতে বৃদ্ধা অগ্রসর হয়।

মনুয়া নিষেধ করে, বলে—"ব্যস্ত হ'য়োনা তুমি—বিশ্রাম নিলেই সেরে যা'বে।"

জানালার মধ্য দিয়া সুখনলালের খাটিয়ার উপর তীব্র রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে—সে উঠিয়া বসিল। অনাহার ও দুশ্চিন্তায় সারা রাত্রি তাহার কাটিয়াছে; আকণ্ঠ পিপাসা, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। মেঝেয় লোটায় করা জল ছিল—ঢক্ ঢক্ করিয়া তাহার অর্দ্ধেকটা সে পান করিয়া ফেলিল। লাইনে এখন আর কোলাহল শুনা যাইতেছে না, সকলেই কাজে গিয়াছে—মনুয়াও গিয়াছে নিশ্চয়ই! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার খাটিয়ার উপর আসিয়া বসিল। অসহ্য ক্ষুধা;—সেদিনকার খানিকটা ছাতু পড়িয়াছিল, সে তাহাই মাখিতে বসিয়া গেল।

আজই তাহাকে কামরা ছাড়িয়া দিতে হইবে—লাইন সর্দ্দারের হুকুম। কোন কথা সে শুনিতে চাহে না। খানিকক্ষণ বসিয়া সে কি ভাবিল, তাহার পর উঠিয়া পড়িয়া খাটিয়ায় পাতা চটের তলা হইতে ছুরি বাহির করিয়া আপন কণ্ঠের, কালো কার দিয়া বাঁধা রূপার 'তাবিজ' কাটিয়া পিরাণের পকেটে পুরিল ও কামরায় তালা লাগাইয়া বাজারের অভিমুখে রওনা হইল।

'তাবিজ' বিক্রয় করিয়া, মুদির দোকানে যে কয়েক আনা তাহার ঋণ ছিল পরিশোধ করিল। হ্যাঁ,—এখনও ত' তাহার সমস্ত ঋণ শোধ হয় নাই! মনুয়ার—

যখন সে কোয়ার্টারে ফিরিল তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। ঐ মনুয়াদের কামরা! মুহূর্ত্তের জন্য সুখনলাল একবার দাঁড়াইয়া পড়িল।

মোট-ঘাট্ বাঁধিয়া সে খাটিয়ায় শুইয়াছিল। পাঁচটা বাজিয়া গেল—আর ত' অপেক্ষা করা যায় না। কলের ছুটি হইতে এখনও অনেক, অনেক দেরী! মোট-ঘাট্ লইয়া সে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মনুয়াদের কামরার দরজা খোলা। ঐ তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা বারান্দায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার দৃষ্টি খোলা দরজার মধ্য দিয়া কামরার ভিতর কি যেন খুঁজিয়া আসিল, তাহার পর সশব্দে একটি নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে নিঃস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিগত দিনের এক মধ্যাহ্নে অপরিচিত সে, যেমনভাবে এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—আজ, ঠিক সেই ভাবেই তাহার দীর্ঘ লাঠির আগায় মোটটি তুলিয়া লইয়া ধীর পদক্ষেপে ষ্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।...

ঐ ষ্টেশন দেখা যাইতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ আসিবে এবং তাহারই সহিত এখানকার সমস্ত যোগ তাহার জীবন হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে! এই আসন্ন-বিচ্ছেদের সন্ধিক্ষণে কত কথাই না আজ তাহার মনকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। দুঃসহ বেদনায় তাহার দেহের প্রতি শিরা উপশিরা যেন ছিঁড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতে লাগিল—এই পরিদৃশ্যমান বহিঃপ্রকৃতি তাহার চোখের সামনে রূপহীন ঝাপ্সা হইয়া আসিল।......উপায় যে নাই। তাহাকে যে যাইতেই হইবে।—

টিকিট কাটার পর প্লাট্ফর্ম্মে মোট্-ঘাট্ নামাইয়া তাহারই উপর বসিয়া ট্রেণের জন্য সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।......দূরে সিগনাল পড়িল। ঐ!—গাড়ী আসিবার প্রথম ঘণ্টাও বাজিয়া গেল। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটা তাহার রাগ-পাণ্ডুর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—নিম্ন দৃষ্টিতে গালে হাত দিয়া সুখন তখনও চুপ করিয়া বসিয়া। সহসা ঠিক তাহার পিছনে কাহার

মৃদু পদশব্দ হইতেই চকিত হইয়া সে ফিরিয়া চাহিল—

—মনুয়া !!

দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে চাহিয়া—কাহারও মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। ধীরে ধীরে সুখন মনুয়ার হাতখানি আপন মুঠার মধ্যে লইতেই আনত দৃষ্টি মনুয়ার নয়ন হইতে উষ্ণ দুই চারি ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া তাহার হাতের উপর ঝরিয়া পড়িল।

বিরাটকায় দৈত্যের মত সশব্দে লৌহ-ইঞ্জিন্ প্ল্যাটফর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে—সুখন মনুয়াকে টানিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

—মোট্ ঘাট্ তুলিয়া কামরার দরজার সামনে আসিয়া সুখন দাঁড়াইল। মনুয়া তাহার সজল আঁখি দুটি তুলিয়া সুখনের মুখের প্রতি চাহিল—নয়নের কোনে তাহার অশ্রু-রেখা চিক্ চিক্ করিতেছে।

বাঁশী বাজাইয়া ট্রেন ছাড়িয়া দিল। নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত মনুয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়াইয়া;—মৃদু বাতাসে অবিন্যস্ত তাহার কেশপাশ রক্তিম গণ্ডদেশে আন্দোলিত হইতেছে—পলকহীন সকরুণ দৃষ্টিতে যুগান্তের অকথিত বেদনা। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লানতর আলোয় গতিশীল ট্রেন হইতে দূরতর ক্রমবিলীয়মান সেই মুখখানি যতই অস্পষ্ট হইয়া আসে—অধিকতর ঔৎসুক্যের সহিত নয়ন বিস্ফারিত করিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুখন তাহাই দেখিতে চাহে।. আবেগাকুল অশ্রুজড়িত নয়নের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে দূরের বহুদূরের সেই মুখখানি, তাহার নয়নের অতি সন্নিকটে যেন জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। দ্রুতগতিতে ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে........। দুই হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ব্যাকুলতম আগ্রহে যখন পুনরায় সে ফিরিয়া চাহিল—দৃষ্টির বাহিরে সে মুখ তখন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।

শ্রীদুর্ব্বাসা

তাসের বোধ (Card Sense) :—ইহা সকলেরই বিদিত যে কোন কোন খেলোয়াড়ের এমন একটি অদ্ভুত শক্তি আছে যে তার দ্বারা তাঁরা ডাক শুনে বা খেলা দেখে অতি সহজেই বড় তাসের (High Cards) অবস্থা সবিশেষ নির্দ্ধারণ করতে পারেন। অথচ এইরূপ ডাক শুনে বা খেলা দেখে হাত বিশেষে বড় তাসের অবস্থা নির্ণয় করা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণের পক্ষে অতীব আশ্চর্য্যজনক এবং ভয়ানক কষ্টকর বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বিশেষ ক্ষমতা লাভ মোটেই ভগবানের পক্ষপাতিত্ব নয়, বরং অতি অনায়াসে সকলেই এই শক্তি অর্জ্জন করতে পারেন; অবশ্য কিঞ্চিৎ বুদ্ধিসাপেক্ষ এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই যে ব্রীজ খেলার যে সকল সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ক্রীড়কেরা ডাক দেন, ডবল দেন বা পাশ দেন সেই বিষয়গুলি মনে মনে বিশ্লেষণ করে নিলে অতি সহজেই প্রতি হাতের বড় তাসের অবস্থা অনুভূতির মধ্যে এসে পড়ে। যদিও প্রথম প্রথম একটু আধটু গোলমাল ঠেকবে তবু অনবরত এরূপ অভ্যাসের দরুণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখ্‌তে পাবেন যে আপনার তাসের বোধ কিরূপ দ্রুততর উন্নতিলাভ করেছে।

মনে করুন দক্ষিণ ব্যক্তি একটি ইস্কাবন ডেকেছেন, আর আপনি পশ্চিমে বসেছেন আর আপনার হাতে আছে—

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, দশ, ×; হরতন—×, ×; রুহিতন—সাহেব, গোলাম ×; চিড়িতন—×, ×, ×, ×।

এখন আপনি অনায়াসেই বুঝতে পারছেন যে কি তাস নিয়ে দক্ষিণ ব্যক্তি ডাক দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সাহেব সমেত ইস্কাবনের পাঁচখানি, আর অপর তিন রঙের মধ্যে দুইটি অনারের পিট তাঁর হাতে আছে (কেন না আপনার জানা আছে যে আড়াই খানি অনারের পিট হাতে না থাকলে ডাক হয় না)। আপনার হাত অনুযায়ী আপনাকে পাশ দিতেই হল। অতঃপর দক্ষিণের খেঁড়ী বল্‌লেন দুইটি হরতন। এবার আপনি বুঝতে পারলেন যে উত্তরের হাতে দেড়খানি অনারের পিট আছে এবং হরতন রঙে ডাক যোগ্য তাস আছে। যদি এঁর হাতে তিনখানি অনারের পিট থাকৃত, তা' হলে ইনি শক্তিব্যঞ্জক ডাক দিতেন অর্থাৎ 'Forcing Take out' করতেন। আপনার খেঁড়ীর পাশ দেবার পর দক্ষিণ আবার ইস্কাবন ডাক্‌লেন। এই ডাকে আপনি বুঝতে পারলেন যে দক্ষিণ হরতন রঙ পছন্দ করছেন না এবং তাঁর হাতে সাহেব গোলাম নিয়ে পাঁচখানি কিংবা ছয়খানি ইস্কাবন ও রুহিতনের টেক্কা, চিড়িতনের টেক্কা অথবা সাহেব, বিবি নিয়ে দুইখানি অনারের পিট বর্ত্তমান। এখন বুঝে দেখুন যে দক্ষিণের হাতে হরতন যখন অল্প, আর আপনার হাতে যখন দুইখানি রঙ বর্ত্তমান, তখন আপনার খেঁড়ী নিশ্চয়ই অনারের পিট সমেত

খান কয়েক হরতন রঙ পেয়েছেন। সুতরাং কোন উপায়ে মুখ্য রঙে (Major Suit) অথবা ফেয়াইএর খেলায় বিপক্ষদলের গেম হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এবারেও আপনি পাশ দিলেন বলে উত্তর তিনটি হরতন ডেকে নিলেন। ফলতঃ বোঝা গেল তাঁর হাতে হরতন বেশী এবং ইস্কাবন অত্যন্ত কম। অতঃপর আপনার খেঁড়ী হরতন বেশী থাকা সত্ত্বেও পাশ দিয়ে গেলেন; কেন না পাছে বিপক্ষদল ইস্কাবন ডাকে পালিয়ে যান। এবার দক্ষিণ তিনটী ফেরাই ডেকে নিলেন। এমতবস্থায় তাঁর এই ডাকে নির্ব্বিবাদে আপনি ডবল দিতে পারেন। এখন উত্তর যদি হরতন রঙে পালিয়ে যান তা' হলে আপনার খেঁড়ী নিঃসন্দেহে ডবল দিতে পারবেন, কেন না তিনি এখন জানেন যে ইস্কাবনে আপনার প্রচুর শক্তি বর্ত্তমান। নিম্নে এ বিষয়ে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

উত্তর একটি ইস্কাবন ডাক দিয়েছেন। আপনার খেঁড়ী ডাকলেন দুইটি হরতন এবং দক্ষিণ ডাক্‌লেন তিনটি রুহিতন। এখন আপনি পশ্চিমে বসেছেন এবং নিম্নলিখিতরূপ তাস পেয়েছেন।

ইস্কাবন—×, ×, ×; হরতন—×, ×; রুহিতন—টেক্কা, বিবি, দশ; চিঁড়িতন—টেক্কা, সাহেব, ×, ×, ×।

এ-ক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার খেঁড়ী হরতন রঙের শক্তিশালী এবং ইস্কাবনেও তাঁর কিছু শক্তি বর্ত্তমান। কারণ প্রথমতঃ ইস্কাবন ডাককারীর খেঁড়ী (অর্থাৎ দক্ষিণ) ইস্কাবনে ডাক দিলেন না, এবং দ্বিতীয়তঃ ইস্কাবন রঙে আপনি দুর্ব্বল। যদি উত্তরের হাতে লম্বা ইস্কাবন থাক্‌ত তিনি তা' হলে তিনটি ইস্কাবন ডেকে নিতেন। অথচ হরতন কম থাকায় আপনিও আপনার খেঁড়ীকে সাহায্য করতে পারেন না অর্থাৎ তিনটী হরতন ডাক্‌তে পারেন না; আবার তিনটী চিঁড়িতনে ডাক দিলেও আপনার খেঁড়ী হয় ত ডাক ছেড়ে দিবেন কিংবা ডাক আরও বেড়ে যেতে পারে। অতএব এই জন্য তিনটি ফেরাই-এ ডাক দেওয়াই আপনার কর্ত্তব্য; কারণ আপনার খেঁড়ীর ক্ষমতা হরতন আর ইস্কাবনে এবং তদুপরি চিঁড়িতন আর রুহিতনে আপনার শক্তি বর্ত্তমান।

গড়পাড় মিতালী সম্মিলনী:—

বিগত ১৮ই জানুয়ারী শনিবার দিবসে সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় 'রামমোহন রায় হলে' কলিকাতার ডেপুটী মেয়র মিঃ সনৎকুমার রায়চৌধুরী এম এ, বি-এল, মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সম্মিলনীর অকসন্ ব্রীজ, প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণ কার্য্যের সমাধা হয়। গত ২৯শে ডিসেম্বর এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা সংঘটিত হয়, তার ফলে হাবড়া সানডে ক্লাব কলিকাতার ল্যান্সডাউন ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয়-

মুকুট অর্জ্জন করেন। ফাইন্যালের দিন বাস্তবিকই উভয় পক্ষের খেলা অত্যন্ত উচ্চ ধরণের হয়েছিল এবং সমাগত ক্রীড় সাধারণের উপভোগ্য হয়েছিল। অবশ্য এই প্রতিযোগিতার সকল ক্রীড়াই সুযোগ্য কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বেশ সুচারুরূপে পরিচালিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে এই সুপরিচালনার নিমিত্ত এঁদের ক্লাব কমিটি এবং শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রীড়ামোদী সম্প্রদায়ের ধন্যবাদার্হ। উপরন্তু এরা ইতিমধ্যেই ইণ্ডিয়ান ক্রীড় এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ক্লাব ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়কে প্রতিযোগিতার খেলায় খেলবার অনুমতি দেন নাই। তজ্জন্য এরা আর্থিক ক্ষতিও অনেক সহ্য করেছেন। এসোসিয়েশনের জন্য অম্লান-বদনে এই ক্ষতি স্বীকার, এসোসিয়েশনের প্রতি এদের অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অন্যান্য নিয়মানুবর্ত্তিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিকই এ সম্বন্ধে এদের অক্লান্ত পরিশ্রম, আপ্রাণ চেষ্টা, অবিরাম উদ্যম যেন আদর্শ স্থানীয়। এই আদর্শ যেন অন্যান্য ক্রীড় সমিতিগুলিকে প্রবুদ্ধ করে। যদি অপরাপর ক্লাবগুলি সত্যই এদের অনুকরণ করেন তবে ক্রীড় এসোসিয়েশন যে সত্বর সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নাই। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা শ্রীহট্টের এম, সি, কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল্ মিঃ এস, সি, সেন এবং মিঃ এন, সি, সেন, হেড এসিষ্ট্যাণ্ট, বি, এম, এ, মহোদয়দ্বয়ের বদান্যতা, সহৃদয়তা এবং অমায়িকতার উল্লেখ না করে তাঁদের উভয়ের প্রতি অন্যায় ব্যবহারে ইচ্ছুক নই। এই সম্মিলনীর প্রতি এদের অনুগ্রহ যে এতই অপরিসীম এবং এদের ঋণ অপরিশোধনীয়। কারণ এদের দানের উপরেই এই প্রতিযোগিতার কাপ দুইটী নির্ম্মিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে বিজয়ী দল যে কাপটি লাভ করেছেন সেটি কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাপ বললে অত্যুক্তি হয় না। এজন্য ক্রীড় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমরা উভয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। যা' হোক পুরস্কার বিতরণের পর মাননীয় সভাপতি মহাশয় একটি ভাবগর্ভ বক্তৃতা দানে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন এবং অতঃপর ভূরি ভোজনের পর এই অনুষ্ঠানের কার্য্য শেষ হয়। পরিশেষে সম্মিলনীর সভ্যগণ কর্ত্তৃক ৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" এবং রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনীত হয়। সাধারণ নাট্যালয়ের কথা বাদ দিলে রঙ্গমঞ্চে এই নাটক দুইটীর রূপদান খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছিল বলা যায়।

বাঙ্গলা সাহিত্যে
আরবী ফারসী শব্দ
মুসলমান সাহিত্যিকগণের বিবৃতি

বাঙ্গলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুদিন যাবত সাময়িক পত্রে আলোচনা হইতেছে। মুসলিম সাহিত্যিক সমাজের পক্ষ হইতে এ-সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

বাঙ্গলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার আজ নূতন নহে। কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম পর্য্যন্ত সকলেই অল্পবিস্তর আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এ লইয়া আজকাল যেভাবে নানাপ্রকার প্রশ্ন উঠিতেছে, ঐ ধরণের প্রশ্ন অতীতে কখনো উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

দেখিতেছি আজকাল এক শ্রেণীর সাহিত্যিক তথাকথিত 'বিদেশী' শব্দের নাম শুনিলেই আঁতকিয়া উঠিতেছেন। অন্য এক দল অনাবশ্যকভাবে বিদেশী শব্দের আমদানী করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। একথা আজ আমরা পরিষ্কার বলিয়া দিতে চাই যে আমরা এই কোন দলেরই নহি।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এককালে বাঙ্গলা সাহিত্য মুসলমান নওয়াব আমীরদের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়াছিল এবং মুসলমান জন-সাধারণও বহুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলাকে মাতৃভাষারূপে বরণ করিয়া লইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে নানা কারণে বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমান প্রভাব কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সেই প্রভাব একেবারে তিরোহিত হইয়াছে একথা কেহ বলিতে পারেন না। বরং মনে হয়, বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানী প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বাঙ্গলার এই দুর্দ্দিনে ভাষার শ্রী ফিরাইয়া আনিতে হইলে মুসলিম ভাবধারার আমদানী প্রকৃষ্ট পন্থা।

বিদেশী ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি বিদেশী শব্দ সুপ্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছে।

বাঙ্গলার মতো জীবন্ত ভাষার পক্ষে এ শ্রেণীর শব্দের প্রয়োজন এখনো শেষ হইয়া যায় নাই। ভবিষ্যতে মুসলিম চিন্তাধারার সহিত বাঙ্গালী সাহিত্যিক-সমাজের পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠতর হইবে তখন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই বাঙ্গলায় আরো অধিক সংখ্যক আরবী ফরাসী শব্দের প্রচলন হইবে। ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য এই যে নূতন শব্দ ও ভাবধারার আমদানী, যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা করি না। চারিদিকের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া বৈশিষ্ট্যবাদীরা অচলায়তন সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু আলোক-পন্থী যাঁরা তাঁরা আলোকরশ্মিকে বরণ করিয়া লইবেনই।

বাঙ্গলার মুসলিম ভাবধারা প্রকাশ করিবার জন্য এবং কাব্য ও কথা-সাহিত্যে মুসলিম আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন মত আরবী ফারসী শব্দ আমরা ব্যবহার করিব। তবে বিনা প্রয়োজনে বিদেশী শব্দ আমদানী করিয়া খিচুড়ী ভাষা সৃষ্টির আমরা পক্ষপাতী নহি।

আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারের ব্যাপারে প্রয়োজন ছাড়া অন্য একটি বিষয়ও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। নূতন ভাবধারার দোহাই দিয়া আমরা অসুন্দর-কিছু চালাইতে যেন চেষ্টা না করি। এ-বিষয়ে 'প্রয়োজন' এবং 'সৌন্দর্য্যবোধ'ই হইবে আমাদের মাপকাঠি।

রাষ্ট্রনৈতিক কারণে উত্তর-ভারতে উর্দ্দু ও ও হিন্দী দুইটি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভাষা সৃষ্টির আমরা পক্ষপাতী নহি। হিন্দু মুসলমান ভাবধারার সমন্বয়ে ভবিষ্যতের বঙ্গসাহিত্য গড়িয়া উঠুক, ইহাই আমাদের কামনা।

কাজী নজরুল ইসলাম
আবুল কালাম শামসুদ্দীন
(মাসিক মোহাম্মদী)
আবুল মনসুর আহমদ
(দি মুসলমান ও খাদেম)
মুহম্মদ হবিবুল্লাহ (বুলবুল)
আবদুল কাদির (জয়তী)
মুজিবর রহমান খাঁ
(সাপ্তাহিক মোহাম্মদী),
শামসুন নাহার (সর্ববঙ্গ মহিলা-সমিতি)
মোহাম্মদ মোদাব্বের (সাহিত্য-মজলিস)

চিঠি-পত্র

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মিলনী ও সম্পাদকের বিবরণী

(১)

"খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

গত ২৪শে পৌষ এবং ২রা মাঘের 'খেয়ালী' পত্রিকায় নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সম্বন্ধে দুই ছদ্মনামে দুইটি প্রবন্ধে অযথা কয়েকজন সঙ্গীতবিদ্ গুণী সম্বন্ধে হীন ও অন্যায় কটূক্তি করিয়াছেন। সম্মেলনে সম্পাদক হিসাবে কয়েকটী বিবৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। সমালোচকদ্বয় যে কয়েকজন গুণীকে অসার সমালোচনায় হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হইতেছেন স্বনামধন্য সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়। বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের বহু সঙ্গীত-কেন্দ্রে তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীত-প্রতিভা দ্বারা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীকে তিনি যে গৌরব আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা কাহারো নিকট অবিদিত নাই। গত বৎসর এবং বর্ত্তমান বৎসরে নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে স্থানীয় সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতে তিনি যে ভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন উপস্থিত বাঙ্গালী মাত্রেই গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন, তাছাড়া আলোচ্য বর্ষেই দিল্লী, কানপুর, আগ্রা, মৃজাপুর প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত-সম্মেলনে তিনি যে ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্ব্বের বিষয়। আলোচ্য সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ কালে গিরিজা বাবু প্রসঙ্গে ঠিকই বলিয়াছিলেন "সঙ্গীত গুরু স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও তাঁহার সুযোগ্য কৃতী শিষ্য গিরিজাবাবুর প্রতিভায় আজ বাংলা দেশ জগতের সঙ্গীতাসরে যাইতে অগ্রণী ...ইত্যাদি"। পরে সমালোচক দুরন্ধর একটি হাস্যকর অভিযোগ করিয়া তাঁহার সঙ্গীত জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন—"পূর্ব্বরাত্রে প্রোঃ নারায়ণ ব্যাসের বিলম্বিত লয়ের দরবারী খানি গিরিজাবাবু কর্ত্তৃক দ্রুতলয়ে কানাড়ায় গীত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার গানের রীতি বড়ই অশোভন ঠেকিল..."। বড় আসরে বা বহুগুণী সংস্পর্শে যিনিই আসিয়াছেন তিনিই জানেন বড় বড় ওস্তাদের ঘরোয়ানার একই গান বিভিন্ন ভাবে গীত হইয়া থাকে তাহাতে সমালোচনার কিছুই থাকেনা। গিরিজাবাবুর বাণীশুদ্ধি সম্বন্ধেও কটাক্ষপাত করিয়া ইনি 'বাণী' জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। গিরিজাবাবু হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ ভাবেই কৃতবিদ্য, তাঁহার উচ্চারণ ও অভিব্যক্তি একেবারেই নিখুঁত তাহা হিন্দুস্থানী মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

তৎপরে সমালোচক পুঙ্গব তাঁহার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন এক কথায়, যথা—"গিরিজাবাবুর শুষ্ক ও কর্কশ কণ্ঠের Contrast বড়ই অসহনীয় হইয়াছিল।" দেশ ও বিদেশে গিরিজাবাবুর ভক্ত ও শত্রু দুই-ই আছে, কিন্তু গিরিজাবাবুর কণ্ঠস্বর যে "কর্কশ" তাহা এই প্রথম শুনিলাম। এ সম্বন্ধে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন কারণ গিরিজা বাবুর স্বভাবসিদ্ধ স্বর মাধুর্য্যে মুগ্ধ নন এ রকম পরিচিত কোন ভদ্রলোক-এর নাম আমার মনে পড়ে না। আলোচ্য সম্মেলনে গিরিজাবাবুর গান যে কত উচ্চাঙ্গের এবং কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল তাহা তাঁহার

গান সমাপ্তির পর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-কোলাহলই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোন অবাঙ্গালী গুণমুগ্ধ ভদ্রলোক দুইটী প্রকাণ্ড 'কাপ' তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন বলিয়া সমালোচক চূড়ামণি যে নীচ ইঙ্গিতটুকু করিয়াছেন তাহা অশেষ নিন্দনীয়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া গিরিজাবাবুর ছাত্র-ছাত্রীগণ বাংলার বাহিরে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় নিয়মিতভাবে সসম্মানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভার আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া আজ বাংলাকে সঙ্গীত-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

স্বনাম ধন্য কুমার শচীন দেব বর্ম্মণের যশ ও প্রতিষ্ঠা এই সমালোচক পুঙ্গবকে যথেষ্ট বেদনা দিয়াছে দেখিলাম। তাঁহার প্রথম অভিযোগ "Classical music-এর আসরে তথাকথিত বাংলা গানের প্রবেশ অসমীচীন……"

বাংলা গানের উপর বাঙ্গালীর লেখায় এই যে উম্মা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সত্যই উপভোগ্য। তাছাড়া তাঁহার তিনটি নির্জ্জলা মিথ্যা কথার কী জবাব দিব ভাবিয়া পাইতেছিনা। যথা "কুমারের উচ্চারণের অশুদ্ধি—সুরের ব্যাভিচার ও লয়ের অজ্ঞতা।" বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি কুমার শচীন দেবের গান শোনেন নাই—তাঁহাদের প্রত্যেকেই শচীন বাবুর গানের ভক্ত—বেসুরা বেতালা লোকের এত ভক্ত যে কী প্রকারে সম্ভব হয় তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বাংলা গানে শচীন বাবু যে বৈশিষ্ট্য' ও ঢঙ্ আনিয়াছেন তাহা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁহার অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি আছে তাহা সকলেই জানেন—তাহার উপর তিনি একজন উচ্চ দরের শিল্পী ও স্রষ্টা। তাঁহার সুর ও রস সৃষ্টি অতুলনীয়। সঙ্গীত সম্মেলনে শচীন বাবু তিনটী গান গাহিয়াছেন বলিয়া সমালোচক পুঙ্গব ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছেন কিন্তু প্রত্যেক গান শেষে পূর্ণ-প্রেক্ষাগার হইতে অবিরত করতালি আনন্দোচ্ছ্বাস এবং আর একটী গাহিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ—এ গুলি কী শচীন বাবুর জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন নহে? অবশ্য সমালোচক চূড়ামণি অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে সেটুকু স্বীকার করেছেন, যথা—"গায়কের অনুরাগী ভক্তবৃন্দের অভাব সে আসরে ছিল না।" তাঁর এই বেদনার অভিব্যক্তিটুকু সত্যই মনোহর ও উপভোগ্য এবং অনুকম্পার বিষয় সন্দেহ নাই।

গীতশ্রী কুমারী গীতা ও আরতি দাস সম্বন্ধে এই লেখক হীন কটূক্তি করিয়াছেন। এই বৎসর এলাহাবাদে নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে কুমারী গীতা ও আরতি যে সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন তাহা সত্যই অভিনব ও অবর্ণনীয়। উপস্থিত সমস্ত গায়ক, গুণী ও গুণগ্রাহীবৃন্দ তাঁহাদের দুই ভগ্নীর প্রশংসায় মুখর মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন। আলোচ্য সঙ্গীত সম্মেলনে তাহাদের গান হইয়াছিল অনবদ্য। নানাদেশ হইতে সমাগত গুণীবৃন্দ তাহাদের লয় ও সুরের অভিব্যক্তি দেখিয়া বিস্মিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাহা উক্ত সম্মেলনে-উপস্থিত সকলেই অবগত আছেন।

ভারত বিখ্যাত প্রবীন ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের প্রিয় শিষ্য তরুণ ও সর্ব্বজনপ্রিয় গায়ক শ্রীযুক্ত শচীন দাশ সম্বন্ধে—সমালোচক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা শুধুই অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

শ্রীমান শচীন দাস,—সুকণ্ঠ বিজয় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিহর রায়, শ্রীমান যামিনী গাঙ্গুলী, শ্রীমান রথীন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অনাথ বোস্ সকলকেই ইনি অযথা কটূক্তি করিয়াছেন! অথচ জনপ্রিয়তা হিসাবে ইঁহারা কেহই কম নন, এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত সভায় এই বৎসর ইঁহারা সকলেই বিশেষভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হইয়াছেন। আলোচ্য সম্মেলনেও তাঁহাদের গান সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে সমাদৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অনাথ বসু মহাশয়ের অপরাধ তিনি ভগবানদত্ত ক্ষমতায় দুই রকম গলায় গান গাহিতে পারেন যাহা সত্যই অলৌকিক। তিনি বিখ্যাত খেয়ালী স্বর্গীয় লছমী প্রসাদ মিশ্র মহাশয়ের ছাত্র এবং খেয়াল ও ঠুংরীতে বিশেষ দক্ষ। ইতি

—বিনীত

শ্রীকেশরী সিং নাহার

২৬ নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(২)

"খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

"খেয়ালী"র গত ২রা মাঘের সংখ্যায় শ্রীঅহবোল লিখিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের বিবরণী পাঠ করিয়া প্রথমেই মনে হইল লেখক তাঁহার সুদীর্ঘ সমালোচনায় সঙ্গীতকলার নিরপেক্ষ সমালোচনা না করিয়া ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনায় উৎসাহী হইয়াছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞান সম্বল করিয়া সঙ্গীত সমালোচনার ছদ্মাবরণে লেখক কোন গুণীকে দুর্বোধ্য শব্দ সংযোজনার দ্বারা একেবারে স্বর্গে তুলিয়াছেন, আবার কাহাকেও নির্দ্দয়ভাবে নরকে নামাইয়াছেন। ভারতবিখ্যাত গুণী নাসিরুদ্দিন খাঁর সঙ্গীত নৈপুণ্য অসাধারণ সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু গোয়ালিয়রের যন্ত্রশিল্পী হাফিজ আলি খাঁর শরদবাদ্য যে অদ্বিতীয় ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু নাসিরুদ্দিনের গেরুয়া পাগড়ি ও সংস্কৃত স্তোত্র সমালোচক মহাশয়কে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছে যে এক পৃষ্ঠাব্যাপী বিশেষণ প্রয়োগের পর ক্লান্ত হইয়া অবশেষে তিনি তাঁহার মধ্যে "দেবদত্ত ঐশ্বর্য্য" ও "লোকত্তর বিভূতি" দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর হাফিজ আলির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই সমালোচক মহাশয়

শিক্ষার্থীদের পক্ষ হইতে তাহার ত্রুটি ধরিলেন যে তিনি রাগিনীর নাম বলিয়া দেন নাই। এইরূপ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচক মহাশয় নিজেও কি একজন?

বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ যন্ত্রশিল্পী সফিউল্লা খাঁর সুরবাহার ও সেতার বাদ্য শ্রবণ করিয়া সমালোচক এনায়েৎ খাঁর জন্য অশ্রু মোচন করিয়াছেন। ইহাতে সফিউল্লার বাদ্যের কতটুকু সমালোচনা হইয়াছে তাহা একমাত্র লেখক নিজেই বুঝেন। বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তীর গান শুনিয়া প্রোঃ নারায়ণ ব্যাসের স্মৃতি লেখককে ব্যাকুল করিয়াছে। বিশেষ করিয়া গিরিজা বাবুর সমালোচনায় লেখকের ব্যক্তিগত আক্রোশ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি গিরিজা বাবুর পুরস্কার প্রাপ্তি সম্বন্ধেও কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। সঙ্গীতজ্ঞগণ চিরদিনই কলাভক্ত ধনী কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়া থাকেন। ইহাতে গিরিজা বাবুর কি এমন অন্যায় হইল তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। এ বিষয়ে সমালোচক মহাশয় ভবিষ্যতে কি গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন এবং তাহাতে সঙ্গীতশিল্পের কি মহান উপকার সাধিত হইবে তাহার প্রতীক্ষায় আমরা রহিলাম।

সুবিখ্যাত শিল্পী-শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত মতিলাল, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র গোস্বামী এবং লাহোরের শ্রীযুক্ত দিলীপচাঁদ বেদীর তান এবং রাগ-রাগিনীর শুদ্ধতা সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় কটাক্ষ করিয়াছেন। 'প্রবীন' সমালোচক মহাশয়ের ছদ্ম নামের আবরণটি উন্মোচিত হইলে এবং তিনি কোন্ সুরলোকে প্রাপ্তব্য তাহা জানিতে পারিলে উক্ত তিনজন "শিশু" শিল্পী তাঁহার নিকট হইতে রাগ রাগিনীর শুদ্ধতা শিক্ষা করিয়া আসিতে পারেন। *

হাওড়া বিনীত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

* [নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের বিবরণী ও তাহার সমালোচনা "খেয়ালীতে" কয়েক সংখ্যা যাবৎ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, আমরা সঙ্গীতকলার নিরপেক্ষ সমালোচনারই পক্ষপাতী। সুতরাং এতৎপ্রসঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতোৎসাহী সুধীবৃন্দের যদি কোন বক্তব্য থাকে, তাহা আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব। আমরা কোনও ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের উপাসক নহি। আমরা ভিন্নমতাবলম্বী লেখকগণকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা সমালোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও আক্রমণ যথাসাধ্য পরিহার করিবেন। সম্মেলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশরী সিং নাহার যে পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছাড়া কোনরূপ গঠনমূলক বা সুচিন্তিত সমালোচনা নাই। কৃতি শিল্পীদেরও নৈপুণ্য ও অনৈপুণ্যের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গিরিজাবাবু, কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ যে বিশেষ জনপ্রিয় সে সম্বন্ধে যে কোনও প্রশংসা পত্রের প্রয়োজন নাই তাহা বোধ হয় নাহার মহাশয়ও স্বীকার করিবেন গুণীর নৈপুণ্যের বিশ্লেষণ ও অক্ষমের ব্যর্থতার বিশ্লেষণই প্রয়োজন। এই নীতি স্মরণ রাখিয়া যে সমস্ত সমালোচক সমালোচনা পাঠাইবেন, শুধু সেই লেখাগুলি পত্রস্থ হইবে।

সঃ খেঃ]

বিশ্ব-প্রেমিক

শ্রীশশিভূষণ বারিক

সব দেশের লোক এক ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে পরস্পর পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালবাসবে এই কি বিশ্বপ্রেম? না, মানুষ মানুষকে মানুষ বলে ভালবাসবে, এই বিশ্বপ্রেম? তবে বিশ্বপ্রেমিকরা তাঁদের দেশে বিশ্ব প্রেমিক বলে বড় খাতির পান না। একটু কেমন যেন তাঁদের আড় চোখে দেখে যুবকরা। যুবকদের আগেকার আর তেমন জিনিষের বা ঘটনার শুধু ভাল দিকটা—রঙীন দিকটা—দেখবার ভুলটুকু নেই। তারা এযুগে এটুকু সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে। এটা ভাল কি মন্দ তার বিচার অন্য কেউ করুক। কেন না, ঘরে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প লেগেই আছে। তার জন্যে বাহির থেকে একপয়সা সাহায্য তুলবার সাধু প্রচেষ্টা নেই অথচ বাহিরে একটা কিছু হলে সেটা গুরুতর থেকে গুরুতম হয়ে উঠে এই বিশ্বপ্রেমিকদের কাছে। হয় তো যুবকরা এটুকু দুর্ব্বলতা তাঁদের ধরে ফেলেছে। তবে বিশ্বপ্রেমিকরা সব দেশেই দু-দশ জন আছেন। তাঁরা মধ্যে মধ্যে তাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেন নিজেদের সভা সমিতিতে। আর যেখানে তাঁদের উপস্থিতি গোলযোগ বাধাতে পারে বা যেখানে সামান্যও গোল-যোগের ভয় আছে, সেখানে তাঁরা উপস্থিত না হ'য়ে, তাঁদের বেশ চমকপ্রদ নূতন নূতন বাণী প্রেরণ করে বিশ্বের মঙ্গল কামনা করে আসছেন। তবে তাঁরা যে-সব সভা সমিতিতে যাতায়াত করেন সে-সব সভা সমিতি পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা-বাদের কেন্দ্র। আমাদের দেশের এমন সভাও তো আছে। এসভা বিলেতের সভার সভ্যদের প্রসংসা করলেন। বিলাতের সভা করলেন এঁদের প্রশংসা। ফরাসী দেশের সভা আবার করলেন কামস্কাটকার। মন্দ মন্দ নয়। এই রকম করে এরা এদের পদ বেশ বাঁড়িয়ে রেখেছেন। রাখুক গে তাঁরা। যুবকরা এটা টের পেয়েছে সেটুকু জানিয়ে রাখা ভাল। জেনে রাখাও ভাল। কেন না পরিণত বয়সে কোন্ না এমন সভার সভ্য হতে পারলে একটা বিশ্বপ্রেমিকও বনে যেতে পারি কেউ না কেউ আমরা। তবে যেন কেউ সহসা একটা প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে না বসেন, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। তা নয় এদের অবস্থা। এরা ওদিকে যাই কেন না হন, বিদ্যায়,

বুদ্ধিতে, বড় কেউ কম যান না। তাঁরা যে যার দিকে একজন মহারথী। কেউ বা কবি, কেউ বা সাহিত্যিক, কেউ বা রাজনীতিবিদ, কেউ বা ডাক্তার কেউ বা আরও কত না কি। এরা? এরা এক এক বিষয়ে এক এক জাঁদরেল জাদরেল লোক।

বরাত এদের সুপ্রসন্ন। লোকে নিজের নাম জাহির করবার জন্য কাগজওয়ালাদের দ্বারস্থ। আর কাগজওয়ালারা যে কোন দেশের দুর্য্যোগে এদের দ্বারস্থ। ব্যাপারটা একবার বুঝুন দেখি। যাকে বলে অষ্টাদশ বৃহস্পতি। তবে বিশ্বপ্রেমিকের চেয়ে তার বড় গাছ বা বিশাল শাল্মলী তরু কোথায়? তবু যে কেন যুবকরা এটা দেখেন না বড় আশ্চর্য্যের কথা। তাঁরা তো আর চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে কিছু গুছিয়ে নেবার তালে ঘুরছেন না। তবে চাঁদার খাতায় তাঁদের নাম সবার আগে তো রাখতে কসুর করনা বাপুরা। বলবে, জানি, যে তা না হলে দেশের বোকারা যে উপুড়হস্ত করবে না। বেশ কথা। তাঁরা যে সই করে দেন সেটাই বা কম কি। তাঁদের নামের দৌলতে যা ওঠে তাতেই কত দুর্গত না দুর্য্যোগে অন্ন পাচ্ছে।

যুবকরা যে তাঁদের দাঁড় চোখে দেখে সেটা তাদের স্বাদেশিকতার জন্য। মানতে তো হবেই স্বাদেশীকতার চেয়ে বিশ্বপ্রেম কত বড়। প্রত্যেকের স্বদেশ বিশ্বের একটা অংশ মাত্র। বিশ্ব তাঁর অংশের চেয়ে বড়; এতো জ্যামিতিক সত্য। তাই যুবকদের মন এখনো উচ্চস্তরে ওঠেনি তাই তাদের প্রতি সন্দেহ। পাহাড়ে উঠলে নীচেকার সব উঁচুনীচু ভাব আর চোখে পড়ে না। যারা তাঁদের স্থান উঁচুতে করে নিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তো নীচেকার লোকদের তো পঙক্তি ভোজনে বসান যায় না। তাঁরা তো বলেছেনেই যে জগতের অগণিত লোকের মধ্যে আমরা শূন্যের সামিল। এমন একদিনই ছিল যখন লোকে তোমাদের মত স্বদেশিকতার ধারণা তাদের হত না। তাই বলে কি তোমরা জগতে হেয়। তা নয়। তেমনি তোমরা ধারণা করতে পারছ না বিশ্বপ্রেমিকরা এখন হেয় বলে কি আমাদের বিশ্বে স্থান নেই। আমরাই যে ভবিষ্যতের অগ্রদূত হয়ে এসেছি। তাই আমাদের সংখ্যা আজ গুণে নেওয়া যায় এক এক করে। নানা দেশের গণ্ডী যখন মিশিয়ে একাকার হয়ে যাবে তখন বিশ্ব কি উপলব্ধি করবে?

এ আত্মপ্রসাদ বিশ্বপ্রেমিকদের সত্যই একচেটিয়া। সত্যই বিশ্বের মধ্যে ক্ষুদ্র খণ্ড বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন অংশগুলি কোনও বিপর্য্যয়ে তালগোল পাকিয়ে যায় আমরা তখন, কোথায় খুঁজে পাব আমাদের প্রত্যেকের 'বিশিষ্ট সত্ত্বাবান সীমাবদ্ধ স্বদেশকে। তখন যে সীমাহীন অসীম এসে আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রণতি দাবী করছেন! তখন যে আমাদের ভয়ানক ভয় করবে। অর্জ্জুনকে যখন শ্রীভগবান বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তখন কি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য একটা প্রাণফাটা ক্রন্দন বেরুয়নি? অর্জ্জুনের দশা এত খারাপ হলে তো আমাদের আর কথা নেই।

কিন্তু মুস্কিল তো ঐখানে। বিশ্বপ্রেমিক হতে চাইলে যে হওয়া যায় না। মন যে কেমন রঙীন কাঁচ প'রে বসেছে, সে যে তা আর খুলে ফেলতে চায় না। মানুষের অভ্যাস ছাড়ান দুষ্কর; প্রথম থেকে তাহলে আমাদের বিশ্বপ্রেম শেখা বা শেখান উচিত ছিল। স্বদেশপ্রেম মনে যে ঢুকেছে, আর কি বেরুতে চায়?

অভ্যাস তো তোমরা ছাড়তে পারবে না।' তবে মারামারি যুদ্ধ জগতে লেগে আছে তোমাদের সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ। স্বাদেশিকতা স্বদেশের পক্ষে যতই মঙ্গলকর হক না কেন বিশ্বের পক্ষে তত মঙ্গলকর নয়। এই সঙ্কীর্ণ মত তোমাদের ছাড়তে হবে। সঙ্কীর্ণতা না ছাড়লে জগতে শান্তি আসবে কোথা থেকে? জগতে একটা রাষ্ট্র-সঙ্ঘ করা হ'ক। 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্র আবার দেশে দেশে ধ্বনিত হক। তাহলে এতো যে 'সমরোপকরণ' বাড়ছে—তার হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে—সেটা থেমে যাবে হঠাৎ। বিশ্বপ্রেমের ভিতর এতো আছে তা তোমরা যুবকরা দেখতে পাচ্ছ না। সে-দৃষ্টি তোমাদের আসে নি।

তা বটে। ওই যে রাষ্ট্র সঙ্ঘের কথা বলা হয় তা তো করা হয়েছে উড্রো উইলসনের দৌলতে। তাতে সমরের অবসান হ'ক বা না হ'ক তার আতঙ্ক তো রাষ্ট্রগুলিকে ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে বসেছে। আর ঐ মামদো ভূত তাদের সমরোপকরণ এমনি হারে এমনি দ্রুতগতিতে বাড়াচ্ছে যে দেশের সরকারের লভ্যাংশের অধিকাংশই সমরের উপকরণাদির জন্য ব্যয় হচ্ছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে যেন একটা পাল্লাপাল্লি চলছে। এর যে পরিণতি কি তা তো সহজেই বোঝা যায়। যার মারণ-অস্ত্র বেশী সে যার কম তার টুটি টিপে ধরছে। চীনের দুর্দ্দশা তো দেখা গেছে। হাবসী কাফ্রীদের অবস্থা দুদিন পরে চীনের মত দাঁড়াবে।

যে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান চাঁই সে তো তার সাম্রাজ্য বজায় রাখতে গুলিগোলা ব্যবহার করতে, অন্য রাষ্ট্রকে সরবরাহ করতে যে পিছুপাও দেখছি নে। এই মারামারি কাটাকাটির পাল্লায় কিযে দাঁড়াবে তা এখন সাহস করে বলা যায় না। তবে বিশ্বপ্রেমের দোহাই তো কাউকে পাড়তে দেখছি নে। শুধু কিছুদিন আগে কাগজে একটা খবর পাওয়া গেছিল যে বিশ্বপ্রেমিকদের একটা নিখিল সভা হয়ে বসবে। তাতে মুসোলিনিকে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করা উচিত। শুধু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াতে পারেন জাপানের সম্রাট। কার পক্ষে বিশ্বপ্রেমিকরা বেশী হাত তোলেন দেখা যায় তাহলে।

তোমরা যুবকরা বয়সের মর্য্যাদা রাখতে জান না। তোমাদের মুখে পাকা কথা শোভা পায় না। দুর্য্যোগ তো তোমাদের মাঝে। মগজ তোমাদের স্বাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত কর, দেখবে বিশ্ব শান্তির বিমল শোভায় উদ্ভাসিত হয়ে তোমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তোমরা জানার মধ্যে জান ডেঁপোমী আর কিছু জান না। এ-মন্তব্যের উপর আর আমাদের কথা চলে না। কারণ ব্যক্তিগত আক্রমণের যুক্তি যখন প্রয়োগ করেছেন বিশ্বপ্রেমিকরা তখন হয় তো দণ্ডাঘাতের প্রচণ্ড যুক্তি পশ্চাতে আছে বিশ্বপ্রেমিকদের। তাই যাতে ওঁদের ভণ্ডামির মুখোস খসে না পড়ে তাই করা যাক। আর তর্ক না করাই ভাল।

ঝক্‌ঝকে মেয়ে ক্লদেৎ কলবার্টের নাম ছড়িয়ে পড়্‌ছে—আগুণের ফুল্‌কির মত। "শী ম্যারেড্‌ হার বসে" তাঁর অভিনয় দেখে সকলেই হ'য়েছে বিস্মিত।

পরিচালক
টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ [illegible], রামময় রোড, কলিকাতা | টেলিফোন পার্ক [illegible]
সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৃহস্পতিবার [illegible]শে মাঘ, ১৩৪২, [illegible] ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

বিদায়, বিদায়……

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—"খোস খবরের ঝুটাও ভাল।" তদনুসারে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আভ্যন্তরীণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এতদিনে বাঙলার দলাদলির অবসান হইবে'। আমাদের সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া সহযোগী 'বসুমতী' আমাদের প্রতি মোলায়েম ব্যঙ্গোক্তি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"সহযোগীর কংগ্রেসী খাত-প্রতিঘাতের জ্ঞান এখনও যে বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠে নাই" ইত্যাদি। দাদার এই ব্যঙ্গমিশ্রিত তিরস্কার আমরা মাথা পাতিয়া লইতেছি। দাদার সহিত সময়ে সময়ে মতভেদ হইলেও আমরা চিরদিন স্বীকার করিয়াছি যে, রাজনীতিতে আমরা তাঁহারই শিষ্য; আর, গুরুর অন্তর্দৃষ্টি যে শিষ্য অপেক্ষা অধিক হইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নির্দ্দেশের পরই অমৃতবাজারের কলকাঠি নাড়িয়া দুরভিসন্ধিযুক্ত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ ও সত্যের বিপর্য্যয়ের দ্বারা প্রাদেশিক কমিটীর সদস্যদের দুই দলে—মজুমদারের দল ও রায়ের দল—বিভক্ত করিয়া যিনিই তালিকা বাহির করুন না কেন, তিনি যে দেশের ঘোর শত্রু—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং এই দলাদলি প্রচেষ্টার অন্তরাল হইতে বাঙ্গলা কংগ্রেসের শনি শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের যে বীভৎস স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আজ আর কাহারও নিকট গোপন করিবার উপায় নাই। পত্রিকায় প্রকাশিত এই তালিকা যে কতদূর ভ্রান্ত ও দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত তাহা শ্রীযুক্ত মৈত্র ও বাঙ্গলার অন্যান্য নেতা ও কর্ম্মীবৃন্দের পরবর্ত্তী প্রতিবাদ ও বিশ্লেষণে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের আবেদন, অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রের মিলনপ্রচেষ্টা ও বাঙ্গলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের সম্মিলিত ইচ্ছা ব্যর্থ করিয়া যে ব্যক্তি দলাদলির আগুনে শেষ ইন্ধন যোগাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহাকে বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে চিরদিনের মত বহিষ্কার করা উচিত—এ বিষয়ে আজ আর বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও ক্যাপ্টেন দত্ত উভয়েই মিলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের মনোভাব কি তাহা আমরা জানি না। তবে, আশা করি ষড়যন্ত্রকারীর মায়া-মরীচিকায় ভুলিয়া তাঁহাদের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি চোরাবালিতে পদার্পণ করিবেন না!

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে চাঁদ ধরিবার জন্য ক্রন্দনমিশ্রিত দুষ্ট শিশুর মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। যখন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র মিলনের জন্য ঐকান্তিক আবেদন করিলেন এবং ঘরের কলহ মিটাইবার জন্য বাহিরের সাহায্য না লওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করিলেন, এবং বাঙ্গলার সকলেই যখন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে শালিস মানিয়া লইলেন, তখন কিরণবাবু বায়না ধরিলেন "আমরা রাজেন্দ্রপ্রসাদ তথা ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দ্দেশ চাই।" এখন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্দ্দেশ পাইয়া আবার নাকে কাঁদিতেছেন—"আমাকে পথে বসানো হইল—এ বড় অন্যায়!" বাল্যকালে অত্যধিক আদরে কিরণবাবু মাতুলালয়ে মানুষ হইয়াছিলেন কি না, তাহা আমাদের জানা নাই, কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে, রাজনীতিক্ষেত্র মাতুলালয় নহে। স্বার্থপ্রণোদিত অন্যায় আব্দার এখানে চলিবে না। পরিণত বয়সে শিশুর মত নাকে কান্না যে ক্লীবের লক্ষণ, তাহা কি তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বলিয়া দিতে হইবে?

সহযোগী "বসুমতী" বলিতেছেন—"শুনা যাইতেছে যে, কিরণশঙ্করী দল—অর্থাৎ ডাক্তার বিধানচন্দ্র,

ডজন মাতব্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে একবার শেষ কামড় না মারিয়া রণক্ষেত্র ছাড়িবেন না।" কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এই সমরায়োজনের রসদ আসিবে কোথা হইতে? কমলার বরপুত্র নলিনীরঞ্জন তাহা অবশ্য যোগাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার আয়াসলব্ধ অর্থ এইভাবে অপব্যয় করিতে কি তিনি রাজী হইবেন? কংগ্রেসের তাঁহার সাহায্যে যেটুকু লাভ ও সুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি এখন অন্য পন্থা ধরিয়া সাগর-পারে নবতর ভাগ্যান্বেষণে যাইবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন। তবে কি এই নির্ব্বাচনপর্ব্বের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা তেওতার জমিদারী হইতে আসিবে? এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তেওতার জমিদারীর বাৎসরিক মুনাফা কত? সহযোগী "বসুমতী" বারবার কিরণবাবুকে "কুমার বাহাদুর" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। একি ব্যাজস্তুতি? আর "বসুমতী"-আখ্যাত এই কুমার বাহাদুর তাঁহার বাৎসরিক মুনাফা হইতে কয়টি মুদ্রা এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের জন্য, দেশের ও দশের জন্য ব্যয় করিয়াছেন?

ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দ্দেশের প্রতিবাদস্বরূপ কিরণবাবু তাঁহার দলভুক্ত কংগ্রেসকর্ম্মীদের পদত্যাগ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আহ্বান ব্যর্থ হইয়াছে—কেহই তাঁহার ডাকে সাড়া দিল না। লজ্জা থাকিলে এই ব্যর্থ নেতৃত্বের অপমানকর অভিনয় ত্যাগ করিয়া তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিয়া মনে হয় লজ্জা জিনিষটা তিনি পুরুষোত্তমকে দান করিয়া আসিয়াছেন। অতএব কোনোরূপে ইঁহাকে লজ্জা দেওয়া যাইবে না—ইঁহাকে দিতে হইবে আক্কেল। বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গলার অপমানের প্রধান উপলক্ষ্য, বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রের এই শনির যদি শেষ পর্য্যন্ত কর্পোরেশন-নির্ব্বাচনে নামিবার ধৃষ্টতা হয়, আশা করি তার সমুচিত শিক্ষা দিতে দেশবাসী কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিবেন না।

-:০:-

বিবিধ

বেঙ্গল ষ্টোরস্ ও বাঙ্গালী

"বেঙ্গল ষ্টোরস"এ বাঙ্গালী বিদ্বেষ ও তাহার ফলে কর্ম্মচারী ও জনসাধারণের মনে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বি, এম্, বিরলা কার্য্যোপলক্ষে বাঙ্গলার বাহিরে ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সময়েই এই সকল গোলোযোগ ঘটিয়াছিল। আমরা অবগত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত বি, এম, বিরলা কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথমেই এদিকে নজর দিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যে কয়েকজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে পুনরায় চাকুরীতে বাহাল করা হইয়াছে। আমরা আরও অবগত হইলাম যে, বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের মধ্যে পার্থক্য করার ভেদনীতি কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে সমর্থন করেন না ও ভবিষ্যতেও করিবেন না, এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। বাবু দামোদর দাস দালমিয়া বা অন্য কোনো মাড়োয়ারীকে ষ্টোরের ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইবে না। কে ম্যানেজার হইবেন তাহা এখনও স্থির না হইলেও, একজন বাঙ্গালী যে উক্ত পদে বাহাল হইবেন, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত এস্, এন, ভট্টাচার্য্য অস্থায়ীভাবে ম্যানেজারের কাজ করিবেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালায় ব্যবসায় করিতে হইলে বাঙ্গালীদের প্রীতি ও সহযোগিতা তাঁহাদের অর্জ্জন করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিরলা নিজেও একথা জানেন ও মানেন—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার পদে নির্ব্বাচনে তাঁহার জয়লাভই ইহার প্রমাণ।

'বেঙ্গল ষ্টোরস্'এর মত একটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হউক, ইহা আমরা কখনই চাহি না। যেটুকু অপ্রিয় সমালোচনা আমরা করিয়াছিলাম, তাহা সংবাদপত্রের গুরুদায়িত্বজ্ঞান হইতে। যথোপযুক্ত পথে চলিলে তাঁহারা আমাদের সহযোগিতা ও সমর্থনই পাইবেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কখনও আবার অন্যায় বা অনাচার দেখি, তাহা হইলে অপ্রিয় হইলেও আমরা আমাদের কর্ত্তব্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইব না।

ঘুঘুর বাসা ভাঙতে হবে

সহযোগী "বাতায়ন" কলিকাতা কর্পোরেশন নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে গত সংখ্যায় লিখিয়াছেন "যতদূর মনে হয় এবারে করদাতারা নিজ নিজ পল্লীতে নূতন ব্যক্তিকে মনোনয়ন করবার চেষ্টা করচেন। আমাদের এই ধারণা যে অমূলক নয় তা কতকগুলি ওয়ার্ডের যা সংবাদ পেয়েছি তা থেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। যেমন ২২নং ওয়ার্ডের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, 'এবারে ঘুঘুর বাসা ভাঙতেই হবে। প্রতিবার যে একই লোক কাউনসিলার হয়ে মৌরসীপাট্টা করবে তা আর হতে দেব না।' এই উক্তির মধ্যে যে সত্য আছে তা আমরা স্বীকার করি, এবং ওয়ার্ডের উন্নতি করতে হলে যে নূতন লোককে সুযোগ দিতে হবে, এটাই যে সমীচীন তা বলা বাহুল্য।"

ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, আমাদের প্রবর্ত্তিত নবম বার্ষিকী নীতি সহযোগী "বসুমতী ও "বাতায়ন" কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত নীতি অনুযায়ী সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

শুভ-বিবাহ

ইউনাইটেড প্রেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্তের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নীলিমার সহিত বরিশালের গৈলা নিবাসী ৺কালীচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান সুনীল কুমারের শুভ-বিবাহ গত রবিবার ১৬, রাসবিহারী এভেনিউ ভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নব-দম্পতীর শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ব্যাড্‌মিন্‌টন প্রতিযোগিতা

গত রবিবার রাসবিহারী এভেনিউস্থিত নিউ পার্কে অনারেবল মিঃ বি, কে, বসুর সভাপতিত্বে কালীঘাটের 'বেঙ্গল ইয়ং মেনস এসোসিয়েশনে'র সপ্তম বার্ষিক 'বেঙ্গল

চলচ্চিত্রাকাশে

প্রোজ্জ্বল অভিনেতৃ-তারকার অপূর্ব্ব সম্মেলন

চিত্রাকারে

ডি, এল, রায়ের

অমর-লেখনী-নিঃসৃত রঙ্গমঞ্চের বিজয়-বৈজয়ন্তী

পরপারে

নববর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবদান

চন্দ্র ফিল্ম কোম্পানীর

প্রথম অর্ঘ্য !

হাসি ও কান্না—আগ্রহ ও উদ্দীপনার অশেষ উৎস !

অভিনব সুর ও সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস !

-বৈশিষ্ট্য-

জনপ্রিয় আলোকচিত্র-শিল্পীর পরিচালনা

-বৈশিষ্ট্য-

সুর জগতের অন্ধ পূজারীর সুর সমন্বিত গীতাঞ্জলি

=আকিঞ্চন=

সুধী দর্শকের শুভাশীষ

চিত্র গগনের সমুজ্জ্বল

তারকাবৃন্দ

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূমেন রায়, শ্রীশৈলেন চৌধুরী, শ্রীসন্তোষ সিংহ, শ্রীঅনুপম ঘটক, শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা, শ্রীমতী বীণাপানি, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, শ্রীমতী নিভাননী প্রভৃতি

সত্ত্বাধিকারী—

নাথ চন্দ্র

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যার সমাধান:—বিগত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যার খেয়ালীতে প্রকাশিত সমস্যা দুইটীর সমাধান নিম্নে প্রকাশিত হল। প্রথম সমস্যাটির উত্তর দিতে কেহই সমর্থ হন নাই এমন কি অনেকেই অসম্ভব জানিয়েছেন। আশা করি তাঁরা নিম্নলিখিত সমালোচনা দেখে সুখী হবেন।

ফেরাইএর খেলা, 'দ' খেলবেন। বিপক্ষ দলের বাধাদান সত্ত্বেও 'উ' এবং 'দ'কে

ইস্কাবন—সাহেব, নয়, সাতা।
হরতন—নয়, আটা, সাতা, ছক্কা।
রুহিতন—টেক্কা।
চিঁড়িতন—নাই।

ইস্কাবন—দশ, আটা, পাঞ্জা, চৌকা।
হরতন—টেক্কা, দশ।
রুহিতন—সাতা।
চিঁড়িতন—বিবি।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি।
হরতন—বিবি, চৌকা, তিরি।
রুহিতন—ছক্কা, দুরি।
চিঁড়িতন—টেক্কা।

ইস্কাবন—গোলাম।
হরতন—সাহেব, গোলাম, দুরি।
রুহিতন—তিরি।
চিঁড়িতন—গোলাম, আটা।

তাঁদের মিলিত হস্তে চারখানি পিট নিতে হবে।

'দ' চিঁড়ের আটা খেললেন, 'উ' হরতনের ছক্কা পাশালেন এবং 'পূ' পিটখানি ধরলেন। যদি 'পূ' পর পর ইস্কাবনের টেক্কা এবং বিবি খেলেন তবে 'দ' হরতনের দুরি পাশাবেন এবং 'উ' ইস্কাবনের বিবির পিট ছেড়ে দেবেন। এখন যদি 'পূ' রুহিতন খেলেন 'উ' টেক্কা দিয়ে পিট নিয়ে হরতন খেলবেন আর 'পূ' যদি রুহিতনের পরিবর্ত্তে হরতন খেলেই থাকেন তা' হলেও ফল একই।

চিঁড়ের পিট নিয়ে কিম্বা চিঁড়ের এবং ইস্কাবনের টেক্কার পিট নিয়ে 'পূ' যদি রুহিতন খেলেন, 'উ' পিট নিয়ে হরতন খেলবেন।

অথবা চিঁড়ের পিট নিয়ে যদি 'পূ' হরতন খেলেন, 'দ' হরতনের গোলাম দিয়ে যাবেন। এখন যদি 'প' টেক্কা মেরে হরতনের দশ খেলেন, 'দ' সাহেব দিয়ে পিট নিয়ে চিঁড়ের পিটখানি নিয়ে নেবেন। এ-ক্ষেত্রে 'উ' একখানি ইস্কাবন পাশিয়ে যাবেন। অতঃপর 'উ' রুহিতনের টেক্কার পিট নিয়ে হরতনের নয় খেলবেন। পরে তিনি আর একটি পিট পাবেন।

হরতনের পিট নিয়ে যদি 'প' ইস্কাবনে চাল দেন তবে 'উ'র ছোট তাস পাশ দেবার পর 'পূ' পিট নিয়ে নিশ্চয়ই পুনরায় হরতন খেলবেন।

এ খেলায় 'দ'র প্রধান উদ্দেশ্য হবে যে 'প' যেন চিঁড়ের গোলামের খেলায় রুহিতন না পাশিয়ে যান কেন না তা' হলে রুহিতন না খেলে 'দ, হরতন খেলতে বাধ্য হবেন।

(২)

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে হরতন রঙ, 'দ' খেলবেন। সম্মিলিত হস্তে 'উ' এবং 'দ'কে সাতখানি পিট নিতে হবে। শিবপুরের শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় এবং ঠাকুর ক্যাসেল্ ষ্ট্রীটের শ্রীজয়দেব শেঠ ও শ্রীবীরেন বসাক এই সমস্যাটির নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন।

চ্যাম্পিয়নশিপ ব্যাডমিন্টন' প্রতিযোগিতার শেষ খেলা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

পারিতোষিক বিতরণী সভা

গত শনিবার বৈকালে বৈশ্যশাস্ত্রপীঠ-গৃহে 'কলিকাতা ওয়ার্কিং ম্যান্স ইনসটিটিউটে'র বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ইস্কাবন—বিবি, দশ, আটা।
হরতন—গোলাম।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—দশ, নয়, আটা, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—নয়, ছক্কা, পাঞ্জা।
হরতন—নয়।
রুহিতন—ছকা, পাঞ্জা, চৌকা।
চিঁড়িতন—বিবি।

	উ	
প		পূ
	দ	

ইস্কাবন—গোলাম।
হরতন—সাতা।
রুহিতন—গোলাম, নয়, আটা।
চিঁড়িতন—সাহেব, চৌকা, তিরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, চৌকা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, সাতা, তিরি
চিঁড়িতন—টেক্কা, গোলাম।

'দ' চিঁড়ের টেক্কা খেলে পিট নিয়ে ইস্কাবনের চৌকা খেল্‌লেন। 'উ' পিট নিয়ে রঙ বের করে দিলেন। রঙের পিটে 'দ' ইস্কাবন পাশালেন। এখন 'উ' পুনরায় দু'তাস ইস্কাবন খেল্‌লেন, 'দ' 'পূ'র পাশ অনুযায়ী পাশ দিয়ে গেলেন। এইজন্য 'প' 'দ'কে রুহিতনে তিনটী পিট কিম্বা রুহিতনে দুইটী এবং চিঁড়িতনে একটি পিট দিতে বাধ্য হলেন।

'প' যদি ইস্কাবনের নয় গোড়াতেই দিয়ে যান তবে 'উ' ইস্কাবনের আটার পিট পেয়ে যাচ্ছেন; এবং পরে চিঁড়িতনে 'পূ'কে পিট ধরালেন। সুতরাং 'দ' এখন রুহিতনে দুইখানি পিট পাচ্ছেন।

ব্রীজ খেলায় চালের নিয়ম এবং সংজ্ঞা:—রঙকর্ত্তা তাঁর খেঁড়ীর হাত দেখে খেল্‌তে পান বলে তাঁর বিশেষ সুবিধা হয় কিন্তু বিপক্ষদলের পক্ষে সে সুবিধা হয় না। কাজে কাজেই এ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম উদ্ভাবিত হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী খেললে ক্রীড়কের খেঁড়ী তাঁর হাতে কি আছে না আছে অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারেন। মোটামুটি সেই নিয়মগুলি নিয়ে প্রবৃত্ত হল।

(১) প্রথম নিয়ম হচ্ছে এই যে যখনই কোন বড় তাস খেলা হবে তখনই বুঝতে হবে যে সেই তাসের পরবর্ত্তী তাসগুলি ক্রীড়কের হস্তে বর্ত্তমান। মনে করুন আপনার খেঁড়ী সাহেব খেল্‌লেন তখনই আপনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর হাতে শুধু বা অন্যান্য ছোট তাস সমেত বিবি গোলাম বা বিবি দশ বর্ত্তমান; আর যদি তিনি বিবি খেলেন তা' হলে বুঝতে হবে যে তাঁর হাতে গোলাম দশ বা গোলাম নয় এবং গোলাম খেললে দশ নয় বর্ত্তমান ইত্যাদি। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে যখন অন্যান্য ছোট তাস সমেত টেক্কা সাহেব ক্রীড়কের হাতে থাকে কারণ টেক্কা, সাহেব, × ও সাহেব, বিবি, গোলাম এই দুই অবস্থায়ই সাহেব খেলা হয়ে থাকে। উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী অবশ্য টেক্কা খেলা উচিত হলেও এ ক্ষেত্রে সাহেব খেলাই বিধেয়। কেন না ক্রীড়কের খেড়ী যখন দেখলেন যে তাঁর খেড়ী সাহেব দিয়ে পিট ধরলেন তখন তিনি বুঝ্‌তে পারবেন যে টেক্কাখানি খুব সম্ভব তাঁর হাতেই আছে। অন্যথা বিপক্ষদল নিশ্চয়ই টেক্কা দিয়ে পিটখানি নিয়ে নিতেন। কিন্তু অন্যান্য তাসের বেলা কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, যেমন বিবি খেল্‌লেই বুঝতে পারব যে ক্রীড়কের হাতে সাহেব নাই বা গোলাম খেল্‌লে বুঝবো যে তাঁর হাতে বিবির অনুপস্থিতি ঘোষিত হচ্ছে। ফেরাইএর খেলায় যদি উলোট পালোট ভাবে বড় তাসগুলি (Incomplete sequence) খেলোয়াড়ের হাতে থাকে তবে সেই বড় তাসগুলির মধ্যবর্ত্তী কোন তাস প্রথমে খেলাই ভালো। উদাহরণ স্বরূপ:—সাহেব, গোলাম, দশ, ×, × প্রভৃতি থাকলে গোলাম খেলাই ভাল কিম্বা বিবি, দশ, নয়, × প্রভৃতি থাক্‌লে দশ পেড়ে খেলাই সুপ্রশস্ত।

(২) "Rule of Eleven" :—"Rule of Eleven" আর কিছুই নয় একটি সহজ ফরমুলা এবং এটি হচ্ছে ব্রীজ খেলায় চাল দেবার আর একটি নিয়ম। ক্রীড়কের হাতে যদি এক রঙের অনেকগুলি তাস থাকে অথচ পর পর বড় তাস না হয় (Not in perfect sequence) তখন এই দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী সেই তাসের মধ্যে চতুর্থ বড় তাসখানি (Fourth best) খেলাই বিধেয়। যেমন বিবি, নয়, তিরি, দুরি হাতে থাকলে দুরি খেলাই সমুচিত এবং সাহেব, আটা, পাঞ্জা, চৌকা, তিরির মধ্যে চৌকা খেলাই প্রশস্ত। ফলতঃ ক্রীড়কের খেঁড়ী এই খেলা দেখে অনায়াসেই তাঁর হাতে সেই রঙের পরিমাণ এবং পরিমাপ (Length and strength) দুইয়েরই ধারণা করতে পারবেন। এই "Rule of Eleven" নিয়মটী হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অথচ বিশেষ শক্ত নয়। কারণ এই নিয়ম থেকে জানা যায় যে যে তাসটি খেলা হবে এগারো থেকে সেই তাসখানির সংখ্যা বাদ দিলে যা' অবশিষ্ট থাকবে সেই কয়খানি বড় তাস আপনাদের তিন জনের মধ্যে আছে। কিন্তু আপনি আপনার তাস ও Dummyর তাস দেখতে পাচ্ছেন সুতরাং এখন রঙকর্ত্তার হাতে সেই রঙের কি বড় তাস বর্ত্তমান তা বুঝে নিতে পারেন। মনে করুন ইস্কাবনের পাঁচ খেলা হয়েছে।

ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, আটা, ছক্কা

'প' ইস্কাবনের পাঞ্জা খেলেছেন।	(Dummy) (আপনি)	ইস্কাবন—বিবি, নয়, চৌকা

আপনার হাতে আছে বিবি, নয়, চৌকা আর রঙকর্ত্তার খেঁড়ীর হাতে আছে সাহেব, গোলাম, আটা, ছক্কা। এখন হিসাব করুন রঙকর্ত্তার হাতে কি কি বড় তাস আছে। এগারো থেকে পাঁচ বাদ দিলে থাকে ছয়, অতএব এই ছয়খানি বড় তাস আছে আপনাদের তিনজনের মধ্যে। এখন আপনি দেখলেন আপনার হাতে দুইখানি বড় তাস এবং রঙকর্ত্তার খেঁড়ীর হাতে চারখানি। সুতরাং সর্ব্বসমেত ছয়খানি বড় তাসই আপনাদের উভয়ের হাতে আছে। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে রঙকর্ত্তার হাতে মোটেই পাঁচের চেয়ে বড় তাস নেই। ফলতঃ Dummy যা' খেলবেন আপনি তার উপরের তাসখানি দিয়ে পিট নিতে পারেন। Dummy যদি গোলাম মারেন আপনি বিবি দিয়ে কিংবা Dummy যদি আটা খেলেন তবে নয় দিয়ে পিঠ নিতে পারেন আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে অন্যান্য নিয়মগুলি ও তার উদাহরণ পাঠকবর্গকে বিশদভাবে জানাব।

(বিলাসী)

তরুবালা

প্রযোজক : রীতেন এণ্ড কোং
গল্প : স্বর্গীয় অমৃত লাল বসু
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুশীল মজুমদার
চিত্রশিল্পী : পল [illegible] ও মঞ্জু
শব্দযন্ত্রী : এ, [illegible]
সুরশিল্পী : নীরেন্দ্র লাহিড়ী
রসায়নাগার : ডি, জি, গুপ্ত
চরিত্র : মৃত্যুঞ্জয়—শচীন্দ্র চৌধুরী, শ্রী-মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, [illegible]—জহর গাঙ্গুলী, [illegible]—শৈলেন চৌধুরী, হীরালাল—[illegible] মুখোপাধ্যায়, হারাণ—[illegible] বসু ([illegible]), আমোদিনী—[illegible] তরুবালা— জোৎস্না গুপ্তা, পারুল—বীণা, সহচরী পদ্মাবতী।

প্রথম মুক্তি : "শ্রী", ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬।

রীতেন এণ্ড কোম্পানীর প্রথম ছবি "তরুবালা"। প্রথম ছবি তুলে সাধারণতঃ আমাদের এখানকার প্রতিষ্ঠানগুলো এ অবধি যে 'সার্টিফিকেটে' ভূষিত হ'য়েছে—"তরুবালা" সে গোষ্ঠীভুক্ত নয়। সেজন্য আমরা পূর্ব্ব থেকেই সাধারণকে সাবধান কোরছি, কোম্পানীর প্রথম ছবি সম্বন্ধে যে বদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল আছে তাদের—"তরুবালা" দেখার পর সে ভ্রান্ত ধারণা তাদের মন থেকে দূরে সরে যাবে।

আমাদের সেই সর্ব্বঘটের সর্ব্বময় কর্ত্তা, কিছুতেই নেই অথচ সব তাতেই বিরাজমান হারু চাটুয্যে (Better known as হারুদা') এ ছবির গৌরবের অংশীদার কতটুকু, তা' সাধারণের জানা না থাকলেও আমাদের জানা আছে বেশ। সেই জন্যই আমরা আগেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলার পথে চলব।

"তরুবালা" রসরাজ অমৃতলালের অমৃত-লেখনী প্রসূত নাটক। নাটক হিসাবে রঙ্গমঞ্চে এর চাহিদা হয়ত' অনেক বেশী; কিন্তু ছায়াছবির পক্ষে গল্পটির উপযোগিতা সেই পরিমাণে কম। তবে চিত্রনাট্য-লেখক যদি গল্পটিকে অদল বদল কোরে ছায়াছবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন—তা' হ'লে গল্পের আকর্ষণ আরো কিছু বাড়তো। কিন্তু চিত্রনাট্য-লেখক সে পথ না মাড়িয়ে নাটক-টিকে ক্ষুদ্র সংস্করণে (Concise Form) দর্শকের কাছে উপস্থাপিত করার চেষ্টা কোরেছেন। তার ফলে, গল্পের শ্যাম ও কুল দুই-ই হারিয়ে গেছে। গল্পের গতি কখনও ঘোড়া, কখনওবা হাতীর মত চলেছ। গোড়ার দিকে ঘটনার অসামঞ্জস্যতা আর শেষের
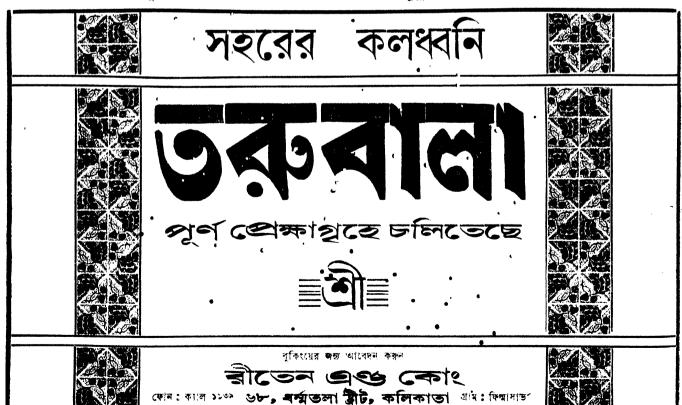
দিকে অখিলের বাড়ী আর পারুলের বাড়ী—পারুলের বাড়ী আর অখিলের বাড়ী এই এক-ঘেঁয়েমিতে গল্পটিকে কোরেছে ভারাক্রান্ত। গল্পের বিষয়-বস্তু বহু-পুরাণো ও বহু-প্রসিদ্ধ সেজন্য তা' ঘেঁটে আর আমরা পুঁথি বাড়িয়ে তুলতে চাইনা।

পরিচালনা ব্যাপারে সুশীল মজুমদার আমাদের নিরাশ করেননি। গল্পের মেরুদণ্ড যদি শক্ত হ'ত, তা' হ'লে পরিচালনায় তাঁর কৃতিত্ব আরও প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যা' হ'ক, ভবিষ্যতে আমরা সুশীল মজুমদারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কোরতে পারলে ভারি আনন্দ লাভ কোর্‌ব।

ছবিখানার আলোক-চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজ সম্বন্ধে জোর কোরেও আমরা কোনও প্রশংসা করার সুযোগ পেলাম না। এর দোষগুণ আমরা যদি বিশ্লেষণ কোরতে বসি তা' হ'লে এক ইতিহাস গড়ে উঠ্‌বে। সে দুঃসাহস বা উৎসাহ নেই—শুধু আমরা এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব—এই দু' বিভাগের কাজ সমালোচনার বাইরে।

সঙ্গীত-পরিচালনা হ'য়েছে চমৎকার। এতক্ষণ পরে একটা বিষয়ের আমরা প্রাণখুলে প্রশংসা কোরছি। নীরেনের সুর জ্ঞান

আছে, প্রাণে আছে কবির কল্পনা—তাই ছবিখানায় সঙ্গে মিশে এক অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি কোরেছে। এ বিষয়ে এর হাতে-খড়ি হ'লেও ইনি অনেক নাম-জাদার গর্ব্ব কোরেছেন খর্ব্ব। নীরেনের কাছ থেকে এর চেয়েও বেশী কিছু ভবিষ্যতে আশা করি—আর বিশ্বাস দশজনে পাবেও তা।

সম্পাদকের কাঁচি শেষের দিকে কৃপণ হ'য়ে পড়েছে। কাঁচির কসরৎ শেষাংশে আরও দেখাতে হবে। তা'তে শেষার্দ্ধের 'Monotony' কতকটা ভাঙ্‌তে পারে।

অভিনয় আমাদের ভাল লেগেছে সবচেয়ে শৈলেন চৌধুরীর বেহারী ও কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের হীরালাল। শৈলেন বাবু এতদিন সিনেমায় অভিনয় কোরেছেন, কিন্তু এত সুন্দর অভিনয় তিনি কোরতে পারেন, এ ধারণা আমাদের ছিল না। এতদিন পরে তাঁকে প্রশংসা করবার সুযোগ পেয়ে সত্যই আমরা আনন্দলাভ কোরলাম। কেষ্টবাবুর অভিনয়ও হ'য়েছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিখুঁত।

অহীন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুঞ্জয় হ'য়েছে—একেবারে মঞ্চানুরূপ। মনোরঞ্জনের বেণীও তাই। জহরের অখিল মন্দ নয় কিন্তু ইংরেজী উচ্চারণ দোষদুষ্ট। আশু বোসের হারাণে একটা সুন্দর 'টাইপ' ফুটে উঠেছে! অন্যান্য ভূমিকা অনুল্লেখযোগ্য।

স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে জ্যোৎস্না তবুও কতকটা মান রেখেছেন। এ ধরণের করুণ ভূমিকায় ভবিষ্যতে তাঁর উন্নতির সম্ভাবনা আছে। প্রভার আমোদিনী চলনসই। পদ্মাবতীর সহচরী একেবারে অচল। প্রভাবতীর দামিনী বিশেষত্বহীন। কমলা (ঝরিয়া) ও সুহাসিনীর দু'খানা গান মন্দ নয়।

বীণার পারুল সম্বন্ধে আলোচনা কোর্‌তে গেলে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের অনেক অপ্রিয় সত্য বল্‌তে হবে। সুতরাং নারীর প্রতি কটূক্তি না কোরে শুধু তাঁকে আমরা বলি—বীণা, ছায়াপটে তুমি আর ও-মুখ দেখিও না। যতদিন পর্য্যন্ত তুমি না ফিরিঙ্গি বাজারের ঢঙ ছাড়তে পার, আর যতদিন পর্য্যন্ত তুমি বাণী শুদ্ধ না কোর্‌তে পার আর অভিনয় জিনিষটা কী বুঝ্‌তে না পার, ততদিন তুমি পর্দায় নেমে দর্শকদের আর খেপিয়ে তুল না। আর ইংরেজি বুলি আওড়াবার দুঃসাহস ভবিষ্যতে যেন তোমার না হয়—ওটা তোমার ধাতে সইবে না। তুমি যদি নিজে এসে কোনদিন "তরুবালা" দেখ, তা' হ'লে দর্শকরা তোমায় বুঝিয়ে দেবে তোমার অভিনয়ের মূল্য এ ছবিতে এক কানাকড়িও নয়।

'রাজনটীতে" তোমার তবু রূপের একটা জৌলুস ছিল, এ ছবিতে দেখলুম তাও নেই। লীলা তাই সত্যি বলছি, তুমি অভিনয় শিক্ষা না কোরে আর গরীব বাঙ্গালীর ছবিগুলো ভবিষ্যতে এমনি ভাবে নষ্ট কোরনা।

নগেন্দ্রবালার প্রশংসনীয় 'বাবা 'যোগেশ'-র কথাই স্মরণ করাচ্ছিলো। অন্যান্য ভূমিকা আলোচনার বাইরে।

যা' হ'ক আমরা শুধু দর্শকদের এইটুকু বলব, প্রথম ছবি হিসেবে দোষে গুণে এখানি দর্শকদের হাসিকান্নায় মশগুল কোরবে।

নিউ থিয়েটার্স

বড়ুয়ার "গৃহদাহে"-র শূটিং দিন নেই রাত্তির নেই—অবিশ্রান্তভাবে চল্‌ছে। শোনা যাচ্ছে, ছবিখানা নাকি নিউ থিয়েটার্সের জয়ী ছবিগুলোরও শীর্ষে স্থান পাবে। আর এতে নাকি বড়ুয়া, যমুনা, মলিনা ও মল্লিকের অভিনয় হ'য়েছে অতুলনীয়। আর একটি ছোট ভূমিকা সবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরবে—সেটি হ'চ্ছে অহী সান্যালের 'রঘু'। এই ভূমিকায় অহীবাবু একটি 'টাইপ' সৃষ্টি কোরবেন বিশ্বাস হয়।

কালী ফিল্মস

"কাল-পরিণয়ে"-র শূটিং অনেকটা এগিয়েছে। এতে জহর, জীবন, তিনকড়ি মায়া, রাণী, চানী দত্ত অভিনয় কোরছেন আর তাদের অভিনয় শুনলাম নির্ব্বাকের মতই ভাল হচ্ছে।

* * *

সুকুমার দাশগুপ্তের হিন্দী "প্রফুল্ল"-র শূটিং আসছে ১৫ই থেকে নিয়মিত চল্‌বে।

রূপবাণী

এ হপ্তাই "কণ্ঠহারের" শেষ হপ্তা। যাঁরা এই চিত্ত-চাঞ্চল্যকর ছবিখানা দেখেননি তাঁরা এ ছবিখানা দেখবার সুযোগ মাত্র আর কয়েকদিনের জন্যে পাবেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

এই প্রতিষ্ঠানে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক দেবকী বসু, "সোনার সংসার" তুলছেন তা' পূর্ব্বে জানিয়েছি। বেকার-সমস্যার এক মর্ম্মন্তুদ কাহিনী এই "সোনার-সংসার।" শুনলাম, লেখক অতি সুকৌশলে গল্পটি চিত্রান্তরিত কোরেছেন এবং গল্পটি যে সবায়ের মনে লাগবে, গল্পের ঘটনা শুনে তা' আমরা বেশ বুঝেছি।

* * * *

বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-প্রযোজক ও প্রসিদ্ধ শিকারী ভূতপূর্ব্ব রয়েল এয়ার ফোর্স ও ভারতীয় সৈন্যের সভ্য কাপ্তেন এন্‌, ঈ, ফ্রান্‌কলিন ভারতে এসেছেন ভারতীয় বন্য-চিত্র তোল্‌বার জন্যে।

ফ্রান্‌কলিন-গ্রান্‌ভিলের ভারত পর্য্যটনের ইউনিট্‌ তৈরী হ'য়েছে—এতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর সত্বাধিকারী মিঃ বি, এল, খেম্‌কা সভ্যরূপে যোগদান করেছেন আর ঈষ্ট ইণ্ডিয়ার যন্ত্রপাতি এই পর্য্যটকদের কাজে ব্যবহৃত হবার সুযোগ দিয়ে মিঃ খেম্‌কা সদাশয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

এরা প্রথম তুলবেন "ফিল নিশিন" ("He Who Rides The Elephant")। এ ছাড়া ছোট ছোট কয়েকটি বিষয় তোলা হবে—সেগুলো ভারতীয় রাজ্যসমূহকে

কেন্দ্রীভূত কোরে। এই বিষয়ে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ও ভারতীয় রাজরাজড়ারা বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ কোরেছেন। এদের বিরাট অভিযান জয়যুক্ত হ'ক।

* * *

জ্যোতিষ মুখুয্যের "পথের শেষে" জোরে শেষের পথে এগুচ্ছে।

রাধা ফিল্ম

এদের "কৃষ্ণ-সুদামা" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে—আসচে ২৯শে 'রূপবাণী'তে হবে এর শুভ-উদ্বোধন।

* * *

বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষে"-র সবাক-চিত্র স্বত্ব এঁরা কিনেছেন। ছবিখানা তোলার কর্তৃপক্ষ জল্পনা-কল্পনা কোরছেন।

* * *

তড়িৎ বসু নবদ্বীপের নর্ত্তকীদের নৃত্য নিয়ে এই দেশের একখানা ছবি তুলবেন বলে প্রকাশ। ছবিখানা হ'বে মালায়ন ভাষায়।

এভারগ্রীন পিক্‌চার্স

এরা আপাততঃ ছবি তোলা বন্ধ রেখে ষ্টুডিও ভাড়া দেবেন। আবার তৈরী হ'য়ে তবে এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন। মতলব মন্দ নয়।

চন্দ্র ফিল্মস্

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে এদের "পরপারে"-র শুটিং চলছে। অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা শান্তিময় বাড়ুয্যে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী যতীন দাশ ও সমবেত কর্ম্মীবৃন্দের আপ্রাণ চেষ্টা—যারা দেখেছেন, তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার কোরবেন "পরপারে" ১৯৩৬ সালের চিত্রাকাশে হ'বে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

শ্রীভারতলক্ষ্মী

এখানে চারু রায়ের "বাঙালী" অনেকটা এগিয়েছে।

পপুলার পিক্‌চার্স

এদের ছবির নাকি আবার নতুন নাম হ'য়েছে "আবর্ত্তন"। এবার নিয়ে নাম বদল হ'ল তিনবার। বার বার তিনবার এ প্রবাদ-বাক্য যদি সত্য হয়, তা' হ'লে এ নামটাই বোধ হয় হবে স্থায়ী। ছবিখানা তোলা হ'চ্ছে বাঙলা আর হিন্দীতে।

মহানিশা ফিল্মস্

দু' একটি বাইরের দৃশ্য ছাড়া এদের "মহানিশা"-র অন্যান্য দৃশ্য সব তোলা শেষ হ'য়েছে।

কোয়ালিটি পিকচার্স

হেম গুপ্তের পরিচালনায় "ব্যথার দান" আর ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের ছোট ব্যঙ্গচিত্র "জোয়ার ভাঁটা" শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে তোলা হ'চ্ছে বলে প্রকাশ।

দেবদত্ত ফিল্মস্

চিত্ররাজ্যের ধুরন্ধর জ্যোতিষ বাড়ুয্যে আর তাঁর সহকারীবৃন্দ ষ্টুডিওটি যা'তে শীগ্রই গাঁথা শেষ হয়, তাঁর জন্যে খুব খাটছেন। আপনাদের আগেই জানিয়েছি ষ্টুডিওটি বারাকপুরে হ'চ্ছে। এতে সমর ঘোষ হ'লেন শব্দযন্ত্রী আর গীতা ঘোষ—চিত্রশিল্পী! আমরা এদের জয় কামনা করি।

কসমোপলিটান পিক্‌চার্স

রঙমহলের আর একটা ইউনিট। হোতা হ'চ্ছেন, অমর ঘোষ আর প্রভাত সিংহ—এই নামে যে একটা দল খাড়া কোরেছেন তা' পূর্ব্বেই আপনাদের খবর দিয়েছি। সম্প্রতি এঁরা ছবি তুলবেন খবর পাওয়া গেল। প্রথম ছবি হ'বে "বাঙলার মেয়ে"। স্বাগতম্।

বিশ্বভারত ফিল্মস লিঃ

এটিও একটি নতুন দল। এদের প্রথম ছবি হবে "দেবী ফুল্লরা"। আরও খবর পরে পাবেন।

ভারতী পিক্‌চার্স

'ছায়া' কর্তৃপক এই নামে শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে "শকুন্তলা" তোলা শীগ্‌গির সুরু কোরবেন।

মডার্ণ ইণ্ডিয়া টকীজ

'ডি-জি'-র "কান্‌ট্রি গার্ল" ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে প্রায় শেষ হ'য়ে এল।

বেঙ্গল টকীজ

এদের "ওয়ান্ ফেটাল্ নাইটে"-র সাড়া শব্দ নেই। আমাদের কোনও বিশ্বাসী বন্ধু ছবিখানা দেখে আমাদের কানে কানে বলে গেলেন—"যাচ্ছে তাই"। কথাটা শুনে আমাদের ভাল লাগ্‌ল না—শুধু মধু বোসের জন্য।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া টকীজ

ইসামুল হকের "প্রেম লক্ষ্য" উর্দ্দু ছবি শীগ্রই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দেখাবার ব্যবস্থা চলছে। ছবিখানা ভাল হবে শোনা যাচ্ছে।

ন্যাশনাল থিয়েটার্স

এদের প্রথম উর্দ্দু ছবি "ডাব্বি-কা-শিকার" জায়গায় জায়গায় দেখাবার আয়োজন চলছে। পরের উর্দ্দু ছবি "কুইন অফ হার্টস" আরম্ভ হ'য়েছে।

ভারতীয় চা

ভারতের পরম সুলভ পানীয়

চা প্রস্তুত করার প্রণালী

উৎকৃষ্ট ভারতীয় চা ব্যবহার করিবেন।

২। সম্ভব হইলে মাটির পাত্র ব্যবহার করিবেন। প্রত্যেকের জন্য এক চামচ চা এবং এক চামচ অতিরিক্ত চা দিবেন।

৩। দেখিবেন যেন জল টগবগ করিয়া ফোটে।

৪। আগে চা দিয়া তাহার উপর ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিবেন।

৫। চা অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ভিজিতে দিবেন; তাহার পর চিনি ও দুগ্ধ দিয়া পান করিবেন।

ভারতীয় চা এত সুলভ যে প্রত্যেকেই দৈনিক বহুবার উহা পান করিতে পারে। ভারতীয় চা লক্ষ লক্ষ লোককে প্রতিদিন আনন্দ প্রদান করিতেছে। কে না জানে যে অন্যান্য পানীয় অপেক্ষা এই বিশুদ্ধ পানীয় তেজস্কর ও স্নিগ্ধকর?

ভারতীয় চা ভারতের নিজস্ব পানীয়, উহা ভারতে উৎপন্ন হয় এবং উহা ভারতীয়দের পরিশ্রমলব্ধ। কেন আপনারা দেশজাত এই চা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন না? আপনার পরিবারের জন্য উহা আজই ক্রয় করুন।

আপনার পানীয়—আপনার স্বদেশজাত

ভারতীয় চা

I. K. 8.

হে মোর অপরিচিতা

[উপন্যাস]

শ্রীসুপ্রিয় সোম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সামান্য ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি জোটাতে আমার যে আনন্দ হলো তার আমি ভাষা দিতে পারি না। তবে আনন্দ যে হয়েছিলো, আমি চাকরী পাবার জন্যেই তা নয়, হয়েছিলো অন্য কারণে। ভেবেছিলেম যদি তনিমার সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল হয়, যদি এ সত্যিই হয় তাকে আমি ভুল বুঝেচি তাহ'লে তনিমাকে আমি পাবো, তাকে নিয়ে সংসার গুছিয়ে নোব—ছোট্ট একটী সংসার, যেথানে আর্থিক অভাব তনিমার স্নেহ ভালবাসায় ঢেকে যাবে। হলোই বা আমি ত্রিশ টাকার চাকরী করি, এতে আমাদের কোন কষ্ট হবে না। তার ওপরে যদি একটা টিউসানী জোগাড় করে নিতে পারি আমাদের পয়সা খায় কে? তবে তনিমাকে আমি চাকরী করতে দেবো না, তাও কথনো হয়?

সে আমি সইতে পারবো না। আর যদি অবস্থা আমাদের এমন মন্দই হয়ে আসে যে টাকা না হলে আমাদের আর চলবে না, তথন নাহোক সে চাকরী করলেই বা! যা হয় সে হবে'থন, এখন তনিমার খোঁজ পাই কোথায়? যে অপমান সেখানে পেযেচি, আর সেখানে যাওয়া যেতে পারে না, আর তনিমার মনের অবস্থাও যদি ঠিক বুঝতে পারতেম, তাহলে হয়ত' সমস্ত অপমান মাথার ওপরে নিয়ে যেতে পারতেম, কিন্তু তার মনটা কেমন যেন আমার কাছে একটা রহস্য হয়ে রয়েচে। আর একটা কথা মনে পড়ল। আজ ত' প্রায় মাস খানেক হয়ে গেচে। তনিমার সঙ্গে নির্ম্মলের বিয়ে হয়ে যায় নি ত'! ভাবতে শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে, মুখ সাদা হয়ে যায়। না, না, তা কথনো হতে পারে, তাহ'লে একটা খবরও কি আমার কাণে এসে পৌছত না! মনকে সান্ত্বনা দিয়ে পোষ মানাই।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় আফিস থেকে ফিরে এসে ঘরে শুয়ে আছি, চাকর এসে একথানা চিঠি দিয়ে গেলো। খুলেই দেথি চিঠি আসচে তনিমার কাছ থেকে।

পড়লেম।

তুমি কেমন আছ জানতে ইচ্ছে করে। তোমাকে দেথবার বাসনাও যে হয় না সে কথা বলতে পারি না। শরীরের প্রতি একটু যত্ন নিও, ভালভাবে থেকো।

আর একটা কথা। এ কথাটা আমি পরে বুঝতে পেরেছিলুম। তুমি আমার ভালবাসাকে সন্দেহ করেছিলে। কিন্তু সেটা তোমার ভুল। ভুলটা যেদিন প্রমাণ হবে সে দিন কিন্তু আমাকে একটু জানিও। আমি সেদিনটার অপেক্ষায় বসে থাকব।

পরে জানতে পেরেছিলেম, সেটা কতথানি ভ্রম। তনিমার পিতার হঠাৎ ব্যবসায়ে কিছু টাকা লোকসান হয়ে যাওয়ায় তিনি বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েন। নির্ম্মল সেই টাকা দিয়ে তনিমার পিতাকে সাহায্য করে। তনিমা তার পিতাকে মনোকষ্ট হতে বাঁচাতে নির্ম্মলের সঙ্গে অভিনয় সুরু করেছিলো, তাকে এতটুকু ভালবাসা দিতে পারে নি। আর এই অভিনয়টাই আমি সত্যি বলে ধরে নিজে কষ্ট পেয়েচি; একটা মেয়েকে কষ্ট দিয়েছি।

চিঠিটা পড়ে হঠাৎ আমার সন্দেহ হলো হয়ত তনিমার কোনো অসুখ হয়েচে। চিঠির অক্ষরগুলোর ভেতর থেকে যেন তার আভাস সুস্পষ্ট!

কিন্তু আমি তনিমাদের বাড়ীতে যেতে পারি না। কেমন করে যাবো? সেদিনকার অপমান এত পুরাতন নয় যে ভুলে যেতে পারি। হতে পারে তনিমা আমাকে ভালবাসে, করে শ্রদ্ধা-ভক্তি। কিন্তু তাদের বাড়ীতে অপমানিত হয়ে আবার তাদের বাড়ীতে যাই কী করে? আমিও ত' সাধারণ রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষ, মানসম্ভ্রম বলে জিনিষগুলো আমারও আছে ত!

একদিন ডালহাউসী স্কোয়ারে হঠাৎ নবকিশোরের সঙ্গে দেখা। আমি প্রথমে দেথতে পাই নি, সেই আমাকে দেখেছিলো।

চীৎকার করে ডাকতে সুরু করলে: অসিত বাবু, অসিত বাবু!

আমি ফিরে তাকিয়ে তার কাছে এসে বল্লেম, ভালত?

নবকিশোর জানালে ভালো। তবে তনিমার শরীরটা কিছুদিন থেকে বড় খারাপ যাচ্চে, নবকিশোর বল্লে। মুখে তার যেন একটু আশঙ্কার ছায়া পড়ল।

আমি সমস্ত লক্ষ্য করলেম, কিন্তু নিজের আগ্রহ কিছুই দেখালেম না।

নবকিশোরবাবু বল্লে, আপনার কাছে আমরা বড় লজ্জিত অসিতবাবু, সেদিনকার সেই ঘটনাটা—

বাধা দিলেম। সেই অপ্রিয় কথাটা আবার উঠুক এ আমার ইচ্ছে নয়।

নবকিশোর কিন্তু আবার বলতে লাগল, নির্ম্মলও বড় লজ্জিত এ জন্যে। সে সেই জন্যে আপনার সঙ্গে আর দেখা পর্য্যন্ত করতে পারলে না।

জিজ্ঞাসা করলেম, কেমন আছে সে?

সে ত এখানে নেই। আজ চারদিন হলো সে বিলেত রওনা হয়েচে। তার হয়ে আমাকে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলেচে।

আমি এ সমস্ত প্রসঙ্গ একেবারে এড়িয়ে গেলেম। ইচ্ছে হলো, বড় নিদারুণ হচ্ছে, একবার জিজ্ঞাসা করি, তনিমার কোনও অসুখ করেচে কি না। কিন্তু একটা নাম-হীন সঙ্কোচ এসে বাধা দিলে। চুপ করে রইলেম।

এক সঙ্গেই বাসে আস্‌ছিলেম। আমার মস পড়ে আগে, তারপরে নবকিশোরকে নামতে হয়। আমি 'নমস্কার' বলে নেমে যাচ্ছিলেম।

নবকিশোর আমার হাত ধরে বল্লে: চলুন আমাদের বাড়ী। অনেকদিন এধারে আসেন না।

আমি আপত্তি করলেম।

—এখন আফিস থেকে ফিরচি, নাইতে-টাইতে হবে, হাতে মুখে কালি লেগে রয়েচে—তাতে আর কী, তবে যাবো'খন আর একদিন।

না, না তা হবে না। চলুন আজই।

আমার আপত্তি টেকল না। বাসের উপরে একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হয় দেখে নবকিশোরের প্রস্তাবকে আর অগ্রাহ্য করতে ইচ্ছে হলো না। কুণ্ঠিত অন্তরে, ভয়ে ও আনন্দে, তনিমাদের বাড়ীর দিকে এগোতে লাগলেম।

তনিমাদের বাড়ীর কাছে এসে যখন দাঁড়ালেম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সুমুখের বারান্দার দিকে একবার চেয়ে দেখলেম, কোনো সাড়ার দর্শন পেলেম না।

বাড়ীর ভেতরে ঢুকেই নবকিশোর ডাকলে, তনু, তনু—পথের বন্ধুকে আজ ধরে এনেচি রে!

তনু বেরিয়ে এলো—ম্লান মূর্ত্তি, রুক্ষ কেশ, শুকনো মুখ।

তনু হাসলে বড় সকরুণ। বল্লে, কোত্থেকে ভদ্রলোককে ডাকাতি করে আনলে দাদা?

পথের বন্ধুকে পথ ছাড়া আর আনবো কোত্থেকে, বলে নবকিশোর হেসে যেন ইচ্ছে করেই তনিমাকে ও আমাকে একলা রেখে চলে গেলো।

ঘরের ভেতরে আমি আর তনিমা, তনিমা আর আমি। উভয়ের অন্তরের ভাষা উভয়েই অন্তর দিয়ে শুনচে। মুখ আমাদের নীরব।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ করে কাটিয়ে দিলেম, তনিমাও কোন কথা কইলে না, আমিও কোনো কথা কইতে পারলেম না। বড় বেয়াড়া ঠেকতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলেম, তনু তোমার দাদাকে একবার ডেকে দেবে? আমি যাব।

দাদাই বুঝি তোমার আপনার হলো সবচেয়ে। অভিমান স্নিগ্ধকণ্ঠে তনু কথা-গুলো বলে ভেতরে চলে গেলো। একটু পরেই বেরিয়ে এসে বল্লে, দাদা বাড়ী নেই।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেম এর মধ্যেই কখন বেরিয়ে গেলেন।

তেমনি অভিমান করে তনু উত্তর দিলে; জানি না।

আবার কিছুক্ষণ সমস্ত, চুপ-চাপ।

আমি কথা কইলেম: আমি আসি তনু।

তনিমার ঠোঁট দুটো মৃদু কেঁপে উঠল। বল্লে আচ্ছা এসো।

দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেম। পেছনে ডাক পড়ল।

একটা কথার উত্তর দিয়ে যাবে?

তনিমার চোখ দুটো ছল ছল করচে।

বল্লেম, বলো?

আমার বিষয়ে তুমি যে সন্দেহ করেচ সেটা মিথ্যে প্রমাণ হলে আমাকে একবার জানিয়ে যেও।

আমার গতি রুদ্ধ হলো যেতে পারলেম না। ফিরে এসে আবার বসলেম।

তনিমা আমার কাছে উঠে এলো। আমার কপালের ঘামটা নিজের আচল দিয়ে মুছে দিতে দিতে বল্লে; বড্ড ঘেমেচ দেখচি যে।

অশ্রুতে আমার গলা ধরে এলো। পুরুষের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই অশ্রু রোধ করতে পারলেম না। চোখের জল আমার কাপড়ে মুছে বল্লেম, তনু, আমার চাকরী হয়েচে, তুমি যাবে না?

যাবো না! যাবার জন্যে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

বেশ আগ্রহ সহকারে তনিমা উত্তর দিলে। তবু মনে হলো, পূর্ব্বের মত তার আর যেন আগ্রহ নেই, তার কণ্ঠস্বরে সেটুকু প্রকাশ পেলো।

তবু বল্লেম, তুমি আমার মত গরীবের কাছে গিয়ে থাকবে কেমন করে' ততটুকু দুঃখ বা অভাব সহ্য করা তোমার ত অভ্যাস নেই।

পরিহাস করে তনিমা হেসে বল্লে, বাপরে, এত বড় লোকের মেয়েকে রাখবে কী করে!

তারপরে তার হাসি, তার পরিহাস মুহূর্ত্তের মধ্যে লোপ পেলে। গম্ভীর হয়ে বল্লে; আমি যে কী চাই তা তুমি বুঝতে পারো না কেন? টাকা কড়িই যদি আমার লক্ষ্য হোত, তবে বিয়ে করবার লোকের অভাব হোত না। কিন্তু আমি তা চাইনি। আমি যা চেয়েছিলেম, তা তোমার মধ্যে পেয়েচি, আমাকে সে আশা মেটাতে দাও।

সেদিন আমি কথাগুলো ঠিক যে বুঝতে পেরেছিলেম এ কথা বলতে পারি না। এখন কতকটা বুঝি। নারী চায় সেবা করতে, পুরুষ চায় সেটা নিতে, সেটা

চিঠি-পত্র

নিখিল-বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলন

"খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়—সমীপেষু,

আপনার গত কয়েক সপ্তাহের "খেয়ালী"তে All Bangal Music Conference সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি—ইহাতে আপনি অনেক কঠোর অপ্রিয় সত্য বলিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আজকালকার দিনে সঙ্গীতের যেরূপ আবহাওয়া চলিতেছে, তাহাতে Addison-এর মতন এইরূপ সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। আমিও এই বিষয়ে কিছু সমালোচনা করিতে চাই এবং তাই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।

গত ডিসেম্বর মাসে নিখিল-বঙ্গীয় সঙ্গীত কলার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন খুব জাঁক-জমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে এবং ইহার উদ্যোক্তাদের সাধু প্রয়াস ধন্য। কিন্তু কেবলমাত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না—যাহাতে আগামীবারে এই অধিবেশন আরো সুসম্পন্ন হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমি কিছু সাধু সমালোচনা নিয়ে করিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং আশা করি কর্তৃপক্ষগণ সেদিকে যেন লক্ষ্য রাখেন।

সঙ্গীতের প্রতিযোগীতা

প্রথমে আমি সঙ্গীতের প্রতিযোগীতা সম্বন্ধে কিছু বলিব। এ বৎসরে প্রতিযোগিগণের সংখ্যা ৫০০।৬০০ হইয়াছিল। ইহা সত্যই নিখিল বঙ্গীয় সঙ্গীতকলার পক্ষে গৌরবের বিষয়। কারণ এলাহাবাদে গত ভারতীয় সঙ্গীতের অধিবেশনেও এইরূপ প্রতিযোগীর সংখ্যা হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিযোগিগণের বিচার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা আদৌ সুবিধাজনক হয় নাই। অবশ্য তাঁহাদের একটি ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিল যে যাঁহাদের ছাত্র বা ছাত্রিগণ প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই সকল সঙ্গীতগুরুকে বিচারকের আসন দেন নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের বিচারক নির্ব্বাচন সাধু হয় নাই। যে বিষয়ে যিনি Specialist অর্থাৎ Theoretical এবং Practical উভয় দিকেই তাঁহাকেই মাত্র সেই বিষয়ের বিচারের ভার দেওয়া উচিত ছিল। একজন তবলার তরুণ প্রতিযোগী পারিতোষিক বিতরণী সভায় সর্ব্বসমক্ষে জোর গলায় এই বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার পদক প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—ইহাই কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট eye-opener হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহারা এই সহজ excuse দিতে পারেন যে এইরূপ বিচারক কোথায় পাওয়া যায়। তাহার উত্তরে আমি বলিব যে বিভিন্নদেশ হইতে demonstration দিবার জন্য যে ওস্তাদদিগকে আনয়ন করা হয় তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে বাছিয়া লইয়া এই কার্য্যভার দিলে এই সমস্যার সুমীমাংসা হয় এবং তাহা হইলে প্রতিযোগিগণের আর কোনরূপ grievance থাকে না। আর একটি কথা; জুরী বিচারের ন্যায় বিচারকদিগের Board এর উপর বিচারের ভার অর্পণ না করিয়া University পরীক্ষার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন বিচারকের উপর প্রতিযোগীগণকে বিভাগ করিয়া বিচারের ভার দিতে হয়। এইরূপ করিলে বিচারকদিগকে আর সকাল ৮টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত এবং পুনরায় বেলা ৩টা হইতে রাত ১০টা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া বসিয়া অযথা ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া বিচারকে অবিচারে পরিণত করিতে বাধ্য হইতে হয় না এবং তাহারই ফলে কোন কোন প্রতিযোগীকে ৮।১০ মিনিটের পরিবর্ত্তে ২।৩ মিনিটের মধ্যে ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাদের মনকে অকারণ কষ্ট দিবার কারণ হইতে হয় না। আশা করি কর্তৃপক্ষগণ আমার Suggestion-এর দিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টিপাত করিবেন।

সঙ্গীতের Demonstration

ইহার পর ২৯, ৩০, ৩১ ডিসেম্বর মাসে কর্তৃপক্ষগণ সঙ্গীতের demonstration সম্বন্ধে যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহার বিষয়ে আমি কিছু বলিতে চাই। আমার প্রথম বক্তব্য এই যে যদিও এই আয়োজনকে নিখিল-বঙ্গীয় সঙ্গীতকলার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন বলিয়া নামকরণ হইয়াছিল, তথাপি All-India Music Conference হইতে যে ইহার পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝা গেল

পেতে। যেখানেই পুরুষের বুক সেবা পাবার আশায় লালায়িত হয়ে উঠেচে সেখানেই নারী স্থির থাকতে পারে নি। তার ধর্ম্মই সে হবে। আধুনিকা হলে কী হবে, তনিমা কেমন করে তার মধ্যে নিহিত ধর্ম্মকে ভুলবে। আর আমার যে এটুকু বড় প্রয়োজন সে তা বুঝতে পেরেছিলো। তাই দেখা যায়, নারীর ভালবাসা, গৃহহীন, লক্ষ্মী-ছাড়া, বহু কষ্টে ভেঙ্গে-পড়া, অনেক সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত পুরুষকে ক্লেশ করে যত সহজে ও সুন্দরভাবে গড়ে উঠেচে, সত্যকার ও স্থায়ী হয়েচে, আর কোনো প্রকারেই তা হয়নি। আজ বৌদির কথাটা স্মরণ করতে পারি।

(ক্রমশঃ)

না। কিন্তু তাহাতেও আপত্তি ছিল না যদি কর্তৃপক্ষগণ বাঙ্গালী Artist দিগকে সমান সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এই প্রসঙ্গে একটী রূঢ় সত্য কিছু অবান্তর হইলেও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রাদেশিক ভাব ষোল আনার উপর সকলের মনে বিরাজ করে। Behar for Beharis এই ধ্বনি আজ বিহার কেন, প্রায় সকল প্রদেশেই শুনা যায় এক বাঙ্গলা ছাড়া। বাঙ্গালী আজ আপন ভোলা হইয়া উদার হইয়াছে—Bengal has become the playground of all nations—এই কলিকাতা সহরে শিখ, মান্দ্রাজী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বসবাস কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ইহারা পারতপক্ষে একটি কপর্দ্দকও অপর জাতিকে দেয় না—প্রত্যেকেই তাহাদের জাতীয় দোকান হইতে যাবতীয় দ্রব্য সওদা করে—করে না কেবল বাঙ্গালী।

আর আমার মনে হয় এই mentality সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও প্রকাশ পাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ সাহেবের কথা বলিব। তিনি একজন মস্ত বড় ওস্তাদ, কারণ তিনি গোয়ালিয়র হইতে আসিয়াছেন এবং বড়ালবাবুদের নেকনজরে পড়িয়াছিলেন। এবার তিনি demonstration-এর প্রথম দিন বাজাইতে বসিলেন—চতুর্দ্দিক হইতে প্রচুর করতালি হইল। তারপর তিনি বাজাইতে আরম্ভ করিলেন—তিনি বাঙ্গলাদেশে বহুদিন ছিলেন এবং বেশ বুঝেন যে এস্থানে সাধারণ শ্রোতাগণের কর্ণের দৈর্ঘ্য কিছু বেশী লম্বা এবং তাই তাহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য আলাপের নামে ব্যভিচার করিয়া ঠুংরী বাজাইয়া হাত তালির উপর হাততালি পাইয়া গেলেন। একজনও কেহ সাহস করিয়া বলিল না যে আমরা প্রকৃত আলাপ শুনিতে চাই—স্বরোদে ঠুংরী শুনিতে প্রস্তুত নহি—তিনি যদি আজ এতবড় আসরে এই বাজনা বাজান, তাহা হইলে স্বরোদ সেতারে রাগ রাগিনীর আলাপের পরিবর্ত্তে অদূর ভবিষ্যতে "কে নিবি ফুল" বাজাইয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার পদ্ধতি হইবে। আর এক কথা কলিকাতা সহরে তিনি বহুদিন ছিলেন—বাঙ্গলা দেশ হইতে বাঙ্গালী তাঁহাকে যে অর্থ দিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে তিনি বাঙ্গালীকে কি দিয়াছেন আমরা কি তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে পারি—বড়ালবাবুদের বাড়ীতে তিনি বহুদিন ছিলেন, কিন্তু কয়টি বাঙ্গালীকে তিনি আসরে বাজাইবার মত উপযুক্ত করিয়াছেন? যদি একজনকেও এরূপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও বুঝিতাম বাঙ্গলার অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। কিন্তু উদার বাঙ্গালী আজ তাহা বুঝিয়াও তাঁহার নামে লালা পড়িতে থাকে, আর সেইজন্য demonstration-এ বাজাইবার জন্য কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে দুইদিনের pro-

gramme-এ দিয়াছেন। আর ইহার contrast দেখাইবার জন্য আমি একজন বাঙালী স্বরোদ বাদ্য-যন্ত্রীর নাম করিব। তিনি হইতেছেন বাঙালীর গৌরব শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু। কিন্তু হায় তিনি যে বাঙালী, তিনি যে মাত্র টুপি, পাগড়ীবিহীন ধীরেনবাবু—তাই তাঁর ভাগ্যে কর্তৃপক্ষগণ মাত্র ১৫ মিনিটের programme দিয়া অসীম করুণা দেখাইয়াছিলেন এবং সেইজন্যে তিনি সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি আজ ৪৫ বৎসর ধরিয়া সঙ্গীতের সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার ফলে আজ তাহাকে মাত্র ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে সেই বিদ্যা প্রকাশ করিতে হইবে। ইহা কি বাতুলতা নহে—বাঙ্গালায় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁহার সাধনা অতুলনীয়—তিনি বিখ্যাত স্বরোদ বাদ্যযন্ত্রী ৺কৌকুভ খাঁ ও ৺করামৎউল্লা খাঁর শিষ্য—স্বরোদ যন্ত্রে বাঙ্গালীর মধ্যে একমাত্র তাঁহাদের representative বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁহার দানও অতুলনীয়—শিশু হইতে প্রবীন পর্য্যন্ত সকলকেই তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডার অযাচিতভাবে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—তাঁহারই শিষ্য কিশোর শ্যামকুমার গাঙ্গুলী স্বরোদ-বাদ্য বাজাইয়া এ বৎসর এলাহাবাদে নিখিল ভারতীয় সঙ্গীতের বৈঠকে ২ দিন বাজাইয়া সমগ্র শ্রোতামণ্ডলীকে চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহারই গুরুর ভাগ্যে বঙ্গীয় সঙ্গীতের অধিবেশনে মাত্র ১৫ মিনিট বাজাইবার জন্য কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা—ইহা কি অদৃষ্টের পরিহাস নহে। তাই আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সঙ্গীতের অধিবেশনে একজন সেক্রেটারী মহাশয় ধীরেন বাবুর শিষ্য থাকা সত্বেও বাঙ্গালী বলিয়াই টুপি ও পাগড়ীর অভাবে আজ তাঁহার এই দুর্দ্দশা—আজ তিনি যে ধুতি, চাদর পরিহিত ধীরুবাবু মাত্র। কিন্তু কর্তৃপক্ষগণ ইহার সহজ মীমাংসা করিবেন এই বলিয়া যে তাহাদের programme এবার খুব বেশী বড় ছিল এবং বহু artist-এর সমাগম হইয়াছিল এবং সেই জন্য ধীরেনবাবু প্রভৃতি artist-কে বেশী সময় দিতে পারা যায় নাই। ইহার উত্তরে আমি তাঁহাদিগকে এই বলিতে চাই যে programme অযথাভাবে বড় করা হইয়াছে এবং অযথাভাবে অনেক সময় নষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম হইতেছে প্রতিযোগিগণের demonstration দিবার জন্য ৩ দিনে ৬।৭ ঘণ্টা সময় প্রায় দেওয়া হইয়াছে। তারপর Modern Bengali Songs এর জন্যও অনেক সময় গিয়াছে, তারপর Oriental Dancing প্রভৃতিতেও অনেক সময় গিয়াছে। এইরূপে দেখা যায় কর্তৃপক্ষগণ অনেক সময় নষ্ট করিয়াছেন যাহা তাঁহারা অন্যভাবে সদ্ব্যয় করিতে পারিতেন। প্রতিযোগিগণের demonstration বিষয় আমি এই বলিতে চাই যে তাহাদের বাজনা প্রতিযোগীতার সময় ২০শে হইতে ২৭শে পর্য্যন্ত public এর সমক্ষেই হইয়াছে—আবার তাঁহাদিগের জন্য demonstration এর ৩ দিনের মধ্যে অত সময় না দিলেই ভাল হইত। যদি একান্ত তাঁহাদের দ্বারা demonstration দেওয়াতেই হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্য হইতে ২।৪ জনকে বাছিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা demonstration করাইলে ভাল হইত। আমি অবশ্য competitorদিগকে নিরুৎসাহ করিতে চাই না—তবে নাসিরুদ্দিন, দিলীপ বেদী, নারায়ণ ভ্যাস্ প্রভৃতি গুণীদিগের সমাগম যেখানে বহুল অর্থব্যয় করিয়া হইয়াছে, তাঁহাদের গান বন্ধ রাখিয়া এইরূপে সময় ক্ষেপন করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। আর প্রতিযোগিগণের তরফ হইতে আমি এই বলিতে চাই যে তাহাদেরও এইরূপ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত প্রাণ ভরিয়া শুনা উচিৎ—কারণ এরূপ সঙ্গীত তাঁহাদের আদর্শস্বরূপ হইবে – নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের মতন ওস্তাদকে তাঁহারা সকল সময়ে শুনিতে পাইবেন না—সুতরাং তাঁহাদের গান আরো অধিকক্ষণ শুনাইবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল—গান শুনিয়া যেন কাহারও পেট ভরিল না। আর আধুনিক বাঙ্গলা গানের গায়কদিগের বিষয় বা oriental নৃত্যকলার demonstratorদিগের বিষয় আমি এই বলিতে চাই—যে তাঁহাদের দুঃসাহস প্রশংসনীয়—যে গান বা যে নাচ বৈঠকখানায় কচি মেয়েদের পক্ষে শোভা পায়, সেই গান

…বা নাচ কিনা এই আসরে যেখানে এইরূপ বিশিষ্ট ওস্তাদের সমাগম হইয়াছে, তাঁহাদের সমক্ষে প্রদর্শন করার দুঃসাহসকে মস্তিকের বিকৃতি ছাড়া আর কি বলিতে পারা যায়? যাই হোক এই সকল বিশিষ্ট ওস্তাদ বাঙ্গলা দেশের নিজস্ব সঙ্গীত সম্বন্ধে যে কিরূপ idea লইয়া গেলেন, তাহা ভাবিলেও কষ্ট হয়—অথচ আমাদের মধ্যে বীরেনবাবুর ন্যায় গুণী ব্যক্তি থাকা সত্বেও আজ বাঙ্গালীর মুখ হেঁট হইল। আমি আর বেশী বলিতে চাই না। আর একটি বিষয় বলিয়াই আমার সমালোচনা শেষ করিব। কর্ত্তৃপক্ষগণ তবলার দিকটায় একেবারেই লক্ষ্য দেন নাই—টালার নাটুবাবু বা হীরুবাবু যাঁহারা বাঙ্গালীর মধ্যে তবলার অগ্রগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাদিগকে এই অধিবেশনে দেখিতে পাইলাম না—programme-এ তবলা artist দিগের মধ্যে তাঁহাদের নাম-পাত সাজানো রহিয়াছে বটে,—কিন্তু programme এ তাহাদের লহরা বাজাইবার কোন স্থান কাল দেওয়া হয় নাই—সেইজন্যেই বোধ হয় তাঁহারা conference-এ যোগ দান করেন নাই এবং তাহার ফলে তবলার দিকটা একেবারে অচল হইয়াছিল। আমার বড়ই দুঃখ হয় যে দিলীপ বেদী প্রভৃতির সহিত বাজাইবার উপযুক্ত তবলাবাদক পাওয়া গেল না এবং তাঁহারা বাঙ্গালীর তবলা বাজান সম্বন্ধে কিরূপ impression লইয়া গেলেন ইহা ভাবিলেও কষ্ট হয়।

আশা করি আগামীবারের conference-এর সময় এই সকল দিকে নজর দিয়া যাহাতে conference সুসম্পন্ন হইয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি হয়, সেইদিকে কর্ত্তৃপক্ষগণ যত্নবান হইবেন—তাহা হইলেই আমার এই সমালোচনা সার্থক হইবে।

ইতি—

শ্রীনির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়
ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড
কলিকাতা

[শ্রীনির্ম্মল চট্টোপাধ্যায় যে সমস্ত তথ্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক সমালোচনা করিয়াছেন তাহার প্রতি আমরা নিখিল বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—সঃ খেঃ]

(২)

"খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

গত কয়েক সংখ্যা "খেয়ালী"তে বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ দেখিলাম। তার মধ্যে তিনটী প্রবন্ধ ছদ্মনামে—এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গুণীকে হীন প্রতিপন্ন করা। আর দুইটী পত্র বা প্রবন্ধে (একটী শ্রীযুক্ত কেশরী নাহার ও অপরটী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য) কয়েকজনকে প্রশংসা করেছেন। উক্ত তিনটী প্রবন্ধের লেখকই একজন কারণ "তানসেন" ও "অঘোবল" দুই জনের প্রবন্ধের শেষেই পরের প্রবন্ধে কী লেখা হবে, তার আভাস দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া তিনটী প্রবন্ধের ভাষা এবং উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ একই—যথা:—কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা। তারপর কয়েকজন জনপ্রিয় গায়ক গায়িকাকে "4th. Rate" বলার উদ্দেশ্য কী হতে পারে? শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সাইগল এবং শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যালকে "তথাকথিত কলাবিদ্" বলা হইয়াছে। "তথাকথিত" বলিতে ইংরাজীতে যাহাকে "So Called" বলা হয় তাহাই বুঝায়। শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব, মিঃ সাইগাল ও শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যালের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের নীচু করিতে চাই না—কারণ

তেইশে মাঘ

শ্রীমনসা চট্টোপাধ্যায়

গীতার বিয়ে। তারিখ সুদ্ধ সবি ঠিক। কিন্তু গীতা হিমাংশুকে বিয়ে করতে চায়নি মোটেই। সে জানতো, হিমাংশু রিণিকে ভালবাসে আর সে-ভালবাসায় পায় তারা বিপুল আনন্দ। রিণিকে তবু বিয়ে করলে না সে। গীতা আশ্চর্য্য হলো, বিস্মিত হ'লো। হিমাংশুকে তার বিয়ে করতে হবে একথা ভাবতে গীতার মন অনেক সময় ভারি হয়ে উঠে দুঃখে, ব্যথায়। তার প্রাণের গোপন-তলে কোন অভাব যেন হামাগুড়ি দিয়ে ফেরে। অস্পষ্ট তার মনে পড়ে সরোজের কথা। সরোজকে সে ভালবেসেছিল প্রাণ দিয়ে, অন্ধ হয়ে। তার মনে হ'লো- দু'বছর আগেকার কথা, সরোজ যখন ঢাকায় ছিল তাদের পাশের বাড়ীর ভাড়াটে হ'য়ে। কিন্তু এই দীর্ঘ দু'বছর সে কলিকাতায় আছে। মাঝে মাঝে গীতাকে চিঠি লেখে আবার উত্তরও দেয় গীতা। এই দু'বছর আগে রমনার মাঠে বেড়াতে বেড়াতে একদিন বলেছিল সরোজ: "সত্যি গীতা, তোমাকে আমার খুবই ভাল লাগে। যেন ব্রাউনিঙের কবিতা। সারা জীবন ব্রাউনিঙ নিয়ে কাটিয়ে দিলেও প্রতিদিন তা' বিচিত্রতম সৌন্দর্য্য নিয়ে ফুটে উঠে। তুমিও ব্রাউনিঙের কবিতার মত সুন্দর, মধুর। আর জানো গীতা, একা এবা কিছুই ভাল লাগে না আমার প্রায়ই একথা মনে হয়—যখনি আমি কোন ভাল জিনিষের সংস্পর্শে আসি, তার উপভোগ কিছুতেই যথেষ্ট এবং সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তাকে বুকের ভেতর পেতে পারি আপন বলে'।'

তারপর বিশ তারিখ বিকেল বেলা গীতা নিজের ঘরে বসে' তার একটা ব্লাউজের বুকে টিপ-বোতাম পড়াচ্ছিল। ঠিক এমন সময় যেন একটা ঝাপ্‌টা হাওয়ায় দরজাটা গেল খুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক যুবক ঢুকলো সে-ঘরে। তার চোখ দু'টো আগুনের ফুলকির মতো জ্বলছিল আর চুলগুলো উস্‌কো খুস্‌কো। দেখলেই যেন মনে হয় দু' তিন রাত ধরে সে ঘুমোয়নি। ঘরে ঢুকেই কোনরূপ মিথ্যা অভিনয় না-করে' রুদ্ধস্বরে বল্লে: 'গীতা, সত্যি ?'

সেলাই ফেলে গীতা উঠে দাঁড়ালো। সরোজকে সে চিনতে পেরেছে। দু' বছর আগে তার সঙ্গে শেষ দেখা। ষ্টেশনে এগিয়ে দিয়ে এসেছিল। ঢাকা থেকে সেই ও যায় আর, আসেনি।

আস্তে শুষ্ক কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলে গীতা—'কোলকাতা থেকে কবে এলে ?'

—'এইতো আজকেই। খবর শুনেই ছুটে এসেছি। বল, আমি যা' শুনেছি তা' কি সত্য ?'

গীতা একবার সরোজের চোখের দিকে তাকালো। তারপর পাথরের মতো কঠিন সুরে বল্লে—'হ্যাঁ, সত্য'।'

মুহূর্ত্তে সরোজের সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার ইচ্ছা হলো গীতাকে খুন করতে।

আবার একটু ঝাঁঝালো সুরে বলে গীতা—'শুনি, তুমি, এখানে এসেছ কেন ? এতদিন বুঝি মনে ছিল না!'

সঙ্গীত বিষয়ে যাহার সামান্য পরিচয় আছে, তিনিই অবগত আছেন সঙ্গীত জগতে তাঁহাদের স্থান কোথায় !

বিনীত

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাস

১১নং পালিত ষ্ট্রীট,

বালীগঞ্জ।

[সঙ্গীত বিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞ নহি। সুতরাং কোন গুণীর শ্রেণী নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ, মিঃ মাংগল ও শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল যে বিশেষ জনপ্রিয় শিল্পী সে সম্বন্ধে কোনরূপ সার্টিফিকেটের যে প্রয়োজন নাই তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে কলাবিদ্ হিসাবে তাঁহারা কোন পর্য্যায়ে পড়েন তাহা বিশেষজ্ঞদের বিচার্য্য।

—সঃ রোঃ]

—'আমি এসেছি' সরোজ একটু চিন্তা করে বল্লে, 'তোমাকে জিগ্‌গেস করতে যে আমি ছাড়া কে আর তোমাকে বিয়ে করতে পারে?' একটু থেমে আবার 'হ্যাঁ বেশ, কবে তারিখ করেছ শুনি?'

—'তেইশে মাঘ।'।

—'না, তুমি বিয়ে করতে পারবে না।'

—যাও, এখান থেকে চলে যাও বলছি। না-হয় অপমানিত হয়ে যাবে।

—'আমায় অপমান করবে! বেশ ভা'ল কথা! কিন্তু জেনো গীতা, আমি শুধু হাতে আসিনি। অনেক সাক্ষী নিয়ে এসেছি। এই গ্যাখ—(সরোজ তার পকেট থেকে একরাশ চিঠি বার করে' দিলে।)

গীতা আর সহ্য করতে পারলে না।' তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু সরোজ তাকে বাধা' দিলে। তারপর দরজার খিল এঁটে একটা বর্ব্বর উগ্রতায় সে চেঁচিয়ে উঠলো:

—এখন বিচার করে' গ্যাখ গীতা, তোমাকে স্ত্রী বলবার অধিকার আমার আছে কিনা। কিছুতেই পালাতে পারবে না। গ্যাখ, এই চিঠিখানা পরে গ্যাখ তুমি কী লিখেছিলে। না-হয় শোন আমিই পড়ছি—'তোমাকে দেখলেই আমার বুক ফেটে যেতে চায়। কত কথা বলব বলে ভাবি কিন্তু শেষটায় কিছুই মনে আসেনা শুধু নিরাশার বেদনায় বুক ভরে উঠে। আমি কষ্ট আমাকে দিও না। আঁধারের পর আলো আসে,' বাস্তবিকই এটা ইউনিভারস্যাল্ ট্রুথ। কিন্তু এ অসহ্য ব্যথার পর কি আবার, ওগো বলতে পার, মিলনের অফুরন্ত আনন্দে ভরে উঠবে আমাদের জীবন?'—আবার শোন এ চিঠিটায় কি লিখিছিলে: 'ওগো সর্ব্বস্ব, আমার জীবনের সুখ, শান্তি সবি গ্যাছে, বাকি আছে শুধু তিক্ত অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাস। সত্যিই তুমি আমাকে বিয়ে করো, তা' না হলে আর বাঁচবো না আমি! রোজই তোমাকে স্বপ্নে দেখি। আয়ো দেখি, তোমার বুকে, ছোট পাখীর মতো বুকে আমায় টেনে নিয়ে অবিশ্রান্ত, অনবরত কত কথা তুমি বলে যাচ্ছ। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের এক একটা রঙিন ছবি। তারপর স্বপ্নের মায়া যখন সত্যিই খসে পড়ে আমার মন থেকে, অনাগত আনন্দোচ্ছ্বাসে বুকখানা তখনো যেন দুলে উঠে।'—এসব কি তোমার লেখা নয় গীতা! আচ্ছা এইটে শোন: 'জোছনা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে। কেবল চাঁদের দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগচে খুব, আর তোমার কথা মনে পড়্‌ছে। তোমাকে ভালবেসেছি। এই ভালবাসার জন্য যদি প্রয়োজন হয় অনায়াসেই প্রাণ দিতে পারি। জেনে রেখো যে ভালবাসতে জানে, ভালবাসার বস্তুর জন্য সে আবার প্রাণ দিতেও জানে। হ্যাঁ, আরেক কথা, পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বল্লে সরোজ: 'গীতা আমায় ক্ষমা

করো। আমার সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছি। তুমি বল, একটীবার বল গীতা, নইলে আমি যে বাঁচবো না! তুমি আমাকে বাঁচাও।'

ধাক্কা দিয়ে সরোজের হাত সরিয়ে গীতা উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলো: অসম্ভব—নিতান্তই অসম্ভব। কিছুতেই তা' হতে পারে না।

অকস্মাৎ একটা বীভৎস অট্টহাসিতে সমস্ত ঘর ভরে উঠল। তারপর গীতা সরোজের দিকে তাকিয়ে দেখলে, দু'টো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো তার চোখ জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুনে। সমস্ত শরীর যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠছে কেবল। কপালের শিরাগুলো স্পষ্ট জেগে উঠেছে। গীতা আর এক মুহূর্ত্তও তার দিকে তাকাতে পারলে না। ভয়ে তার বুকের রক্ত যেন জমাট হয়ে আসছিল। তারপর ঘরের দরজা খুলে বিকট অট্টহাসিতে সমস্ত ঘর মুখরিত ক'রে সরোজ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গীতা এবার স্পষ্টই বুঝতে পারলে সরোজ পাগল হয়েছে। কিছুতেই তার স্বাভাবিক প্রকৃতি এ-নয়।

পরদিন নির্জ্জন সন্ধ্যায় পার্কের একটা কোনে বসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে হিমাংশুকে সে যা' বল্লে তাও নিতান্ত স্বাভাবিক প্রকৃতির লোকের পক্ষে অসম্ভব।' অনেক কথা বল্লে সে: তার জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা আর কোথায় কোন রহস্যের 'অন্তরালে লুক্কায়িত তার মূল-সূত্র। নির্ব্বোধের মতো শুনলো হিমাংশু কিন্তু কোন কথাই বেরুল না তার মুখ দিয়ে। সে যেন বজ্রাহত। অনেকক্ষণ অর্থশূণ্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে নিতান্ত আস্তে, চুপি চুপি সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

আমার গলা থেকে নিয়ে সেদিন তুমি আমায় হারটা পরেছিলে। তোমার গলায় গিয়ে হারটা আমার ধন্য হয়েছে। অনেক দিনের বাসনা আমার পূর্ণ হয়েছে।— সবি কী ভুলে গেছ গীতা? কিছুই কী মনে পড়ে না? এমন কী 'ইতি'র আগে প্রায় সব চিঠিতেই তুমি লিখতে—'আমার চুমা নিও'। তারপর লিখতে তোমার নাম। আদর করে যে নামে তোমায় ডাকতুম আমি। এই ছ্যাখ তুমি লিখেছ 'ইতি' তোমার খুকু। এ-সব যে তোমারই হাতের লেখা। অস্বীকার করবার জো নেই। আর এই নাও তোমার রুমাল চারখানা, যা' আমাকে উপহার দিয়েছিলে। বেশ স্বীকার করলুম গীতা, তুমি আমায় ভালবাসনি, কিন্তু এ-সব লেখার আর দেওয়ার মানে কি? বল? ওকি চুপ করে আছ যে?

বালিশের বুকে মাথা গুজে' গীতা নিজেকে শান্ত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল কিন্তু সে আর পারলে না। তার দুই চোখে ভেঙ্গে এলো জল। তারপর আস্তে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে: তোমার পায়ে পড়ি একটু আস্তে। শুনছো না পাশের ঘরে—'আর কোন কথা বেরোল না।

সরোজ মুহূর্ত্তে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলো: 'ড্যাম ইওর পাশের ঘর। আমি কী অন্যায় বলছি? যে অধিকার সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত তারি দাবী করছি শুধু। তুমি কী স্বীকার করতে চাও না যে ব্রিচ্ অফ্ প্রমিসের মামলায় তোমাকে আমি ফেলতে পারি?'

এইবার গীতা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। সুর তার সশব্দ, আর্ত্ত-উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। স্পষ্টই সরোজ বুঝলে, গীতা কাঁদছে। চক্ষের পলকে গীতার কাছে ছুটে এসে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে উন্মাদের মতো একটা চুমা খেল তার ঠোঁটে। তারপর·········।

তেইশ তারিখ রাত্রি। এই সময়েই গীতার বিয়ের লগ্ন। সারাদিন কাঁদতে কাঁদতে গীতা ঘুমিয়ে পড়েছে ঠিক সন্ধ্যার আগেই। আর হিমাংশুরও কোন খোঁজ নেই। তবে শোনা গেল, সে নাকি বম্বে মেলে চড়ে বসেছে। রাত্রির অস্পষ্ট অন্ধকারে চলন্ত ট্রেন থেকে নিজেকে ছুড়ে ফেলে দেবে এই তার মতলব।

নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

আসরে শুধু ভাঙা কাঁসী

(শ্রীবৈজু বাওরা)

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা গত সপ্তাহের প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। সম্মেলনের আয়োজন সফল করিতে গেলে অনেক দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং বিরাট আয়োজনে যে দোষত্রুটী অনিবার্য্য তাহা উদ্যোক্তৃবর্গের অবিদিত নহে। তবে ভবিষ্যতে যে সকল সম্মেলন হইবে সেগুলি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমরা কয়েকটী বিশেষ বিশেষ দোষত্রুটীর উল্লেখ করিয়াছি—আমাদের আলোচনা সর্ব্বতোভাবে গঠনমূলক বলিয়া বিবেচিত হইলে, শ্রম সার্থক হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আরো দু'একটী দোষ ত্রুটীর আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং ইহা অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত যে গুণীগণ demonstration-এর দ্বারা শিক্ষার্থীবর্গকে ও সঙ্গীতরসিক সুধীবৃন্দকে সঙ্গীতের standard সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। সে উদ্দেশ্য সফল করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে যে যাহাতে সঙ্গীতের proper atmosphere সৃষ্ট হইতে পারে। কেবল উপযুক্ত গুণীর নির্ব্বাচন করিলেই চলিবে না—দেখিতে হইবে যে সেই সকল গুণীগণ যাহাতে স্বকীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিবার সম্পূর্ণ সুবিধা পান—তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে—সে দিকে সামান্য ত্রুটী লক্ষিত হইলে সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য যে অসিদ্ধ হইবে—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এখন দেখা যাউক বর্ত্তমান সম্মেলনে "কি ভাবে দোষ ত্রুটী ঘটিয়াছিল। বাংলার যাঁহারা গুণী তাঁহাদের কেহই কুড়ি মিনিটের অধিক সময় পান নাই—অবশ্য, অনেক অনুরোধ করিয়া অথবা লাল বাতিকে উপেক্ষা করিয়া কয়েকজন আধ ঘণ্টা বা ৩৫ মিনিট ছিনাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন—ইহা যে কিরূপ বিসদৃশ ও নিন্দিত ব্যাপার তাহা আর আমরা কি বলিব? যাহা হউক, কুড়ি মিনিট বা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে আসরে গান আরম্ভ করিয়া স্বকীয় বিদ্যাবত্তার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যে কিরূপ অসম্ভব, তাহা উদ্যোক্তৃবর্গের ধারণার বহির্ভূত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। আমরা অবশ্য এ কথা বলি না যে সকলকে তিন চার ঘণ্টা করিয়া গাহিবার সময় দিতে হইবে—অন্ততঃ দুইখানি গান ভাল করিয়া গাহিবার সুযোগ ও সুবিধা তো দেওয়া উচিত। অনেক গুণী অবশ্য স্বল্পকালের মধ্যেই দুইখানি গান গাহিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া কোন গানেরই রূপ আশানুরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। তাহার পর আর একটী বিশেষ কথা এই যে গানের উপযোগী আসর করিতে গেলে পর অপেক্ষাকৃত গুরু-সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত লঘু সঙ্গীতের পর্য্যবসান করা একান্ত বিধেয়। অথবা, এক আসরে কেবল ধ্রুপদের ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয় আসরে খেয়ালের, তৃতীয় আসরে টপ্পা, ঠুমরী প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও চলিতে পারে। কিন্তু একজন ধ্রুপদ গাহিলেন, অপর একজন তাহার পর আসিয়া একটী কীর্ত্তন গাহিলেন, তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া শুধু তবলাই সুরু করিলেন আবার একজন খেয়াল গাইয়া ঠুমরী গাহিলেন তাহার পর একটী বাংলা গানও হইল তারপর কেহ বা নাচিলেন—

আবার একজন ধ্রুপদ গাহিতে বসিলেন—এরূপ বিসদৃশ আয়োজন এই সম্মেলনে যে কতগুলি হইয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা কিন্তু এই ত্রুটি কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না।

দোষ ত্রুটীর কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা এবার সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আলোচনা করিব। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন হইয়া আসিতেছে। এবং প্রত্যেক সম্মেলনেই ভারতবর্ষের প্রখ্যাত নামা কয়েকজন শিল্পী নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন কিন্তু এই সকল সম্মেলনে আমরা একটী বিশেষ ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আলোচ্য সম্মেলনেও আমরা সে ত্রুটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম। সম্মেলন গুলি এখন কেবল জলসার নামান্তর হইয়া দাঁড়াইতেছে। সম্মেলনে বিশিষ্ট গুণীগণের শিক্ষার উৎকর্ষের তারতম্য সম্বন্ধে যথারীতি আলোচনা হওয়া উচিত। বৈশিষ্ট্যেরও একটা তারতম্য আছে তাহার বিষয়ে যদি আলোচনা না করা যায় তাহা হইলে শিল্পীগণের মধ্যে সাধনার প্রাণ চলিয়া যাইবে। কারণ যেখানে সমালোচক নাই বা যেখানে শিক্ষার যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া হয় না, সেখানে উদাসীন ভাব বৃদ্ধি পাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। তবে গুনের রীতিমত বিশ্লেষণ হইলে, গুণীরাও শিক্ষার উৎকর্ষের দিকে সবিশেষ সাবধান হইবেন—আর সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট ঘরওয়ানাও অব্যাহত ভাবে শিষ্যপরম্পরায় চলিতে থাকিবে—এই জন্য আমাদের স্থির বিশ্বাস যে যাঁহারা সঙ্গীতের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, ঘরোয়ানার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ যাহারা একান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন—তাঁহারা কেবল সম্মেলনের নামে জলসার আয়োজন করিলে অন্যায়ই করিতেছেন বলিতে হইবে। আর, তাহা ছাড়া, গুণীগণের বিদ্যাবত্তা নিকষপাষাণে স্থির করিয়া—তাঁহাদিগকে উপযুক্ত ভাবে পুরস্কার করাও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। আর সকলের চেয়েও ইহাই আমাদের কাছে সমীচীন বলিয়া বোধহয় যে প্রত্যেক সম্মেলনে সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে ওস্তাদগণের একটা সারগর্ভ আলোচনা হয়—একটী গান হয়তো ঘরওয়ানা বিশেষে বিভিন্ন ভাবে গীত হইয়া থাকে কিন্তু কোন ঘরওয়ানায় সেই গানটী সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ রূপে গাওয়া হয়—তাহা যদি সুধীগণ প্রকাশ্য সভাতে আলোচনা করেন তাহা হইলে রাগ ও Style এর রূপ সম্বন্ধে সঙ্গীতরসিক মাত্রেই উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন—আর ইহাতে যাহারা অন্তঃসার-শূন্য এবং সাধারণের অজ্ঞতার advantage লইয়া ঘরোয়ানার দোহাই দিয়া নিজেদের অপকর্ষ প্রচ্ছন্ন করিয়া উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিতে চান—তাঁহারাও ধরা পড়েন। ৺রাধিকা গোস্বামীর শিষ্য যদি "এরি হারি ননদীয়া" "দগা দয়লো না" প্রভৃতি হাল্কা ঠুমরী গান গাহিয়া গোঁসাইজীর ঘরওয়ানা বলিয়া শ্রোতৃসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহা হইলে গোঁসাইজীর ঘরওয়ানা তাঁহার দ্বারাই সুরক্ষিত হইতেছে এবং বাংলার মুখ জগতের আসরে তিনিই উজ্জ্বল করিয়াছেন—বলিয়া মনে করা চলিবে কি? সেইরূপ উজীর খাঁ বা মহম্মদ আলি খাঁর নিকট তালিম লইয়াছেন—অথচ ঠুমরী গায়ক বলিয়াই তাহার প্রসিদ্ধি—পাঠক, এ হেন গায়কের কতখানি ঘরোয়ানা গৌরব আছে বলিয়া মনে করিতে পারেন? এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ হেন গায়ক যদি ছম্মন সাহেব, গণপত্ রাও ভইয়া সাহেব, মৌজুদ্দীন খাঁ সাহেবের নিকট ঠুমরী শিখিয়াছেন বলিয়া নিজের ঠুমরী গানের

কদর দাবী করেন—পাঠক, সে দাবী পূরণ করিতে রাজী আছেন কি? যাঁহার দ্বারা একটী ঘরোয়ানারও যথোপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে দেখা যায় না—তাঁহার দ্বারা বহু ঘরোয়ানার গৌরব অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে এ কথা, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে "ঘরোয়ানার" অর্থ-বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্যের মর্ম্ম, অন্ততঃ যাঁহারা বিন্দুমাত্র বোঝেন—তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা অবশ্য কোনও বিশেষ "ঘরোয়ানা"র আলোচনা করিতেছি না—কারণ আমরা যথার্থ "ঘরোয়ানা" ও সেই গোষ্ঠীর গুণীদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান তবে যে সকল গায়ক শুধু ঘরোয়ানারই দোহাই দেন অর্থাৎ আমি অমুকের কাছে শিখিয়াছি, তমুকের কাছে শিখিয়াছি সুতরাং আমরাই একমাত্র "ঘরোয়ানা-প্রদীপ"—অথচ যেসব গায়কদের গানের রীতিবিকৃতি যথেষ্ট সন্দেহাত্মক—সেই সকল গায়ক যথার্থই সেই সকল ঘরোয়ানার গান শিখিয়াছেন কিনা (আশে পাশে অনেকেই ঘুরিয়া থাকিতে পারেন—তাহাতে তো আর শিক্ষা হয় না)—এবং যৎটুকু গলা দিয়া বাহির করেন তাহার কৌলীন্য আছে কি না—সম্মেলনে discussion হইলে পর, ভাল, মন্দ—সকলই বাহির হইয়া পড়িতে পারে। গত বৎসর সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে বাংলার একজন বিশিষ্ট গায়ক "প্রদীপকি" গাহিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন কিন্তু যাহা গাহিলেন তাহা "বারোঁয়া" ছাড়া আর কিছুই নহে—ঘোষণা করিয়াছিলেন লক্ষ্ণৌএর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটী প্রসাদ। কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রোতার কর্ণে রাগটী "প্রদীপকি" বলিয়া বোধ না হওয়ায়, তাঁহারা প্রোঃ ধূর্জ্জটীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধূর্জ্জটীবাবুর পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী প্রোঃ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব। প্রকাশ্য সভাস্থলে গায়ক বিশেষের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে—এই বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় ধূর্জ্জটীবাবু ঈষৎ হাসিয়া খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন—খাঁ সাহেব বলিলেন—ইহা তো 'বারোঁয়া'—ইহা 'প্রদীপকি' নহে। তখন শ্রোতৃবৃন্দ অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিল—'প্রদীপকি' কি কোন ঘরোয়ানার মতে 'বারোঁয়া' বলিয়াই প্রসিদ্ধ—খাঁ সাহেব বিরক্তভাবে বলিলেন—"কোন কালে নহে"। তারপরই সেই গায়কটি আবার একটি বাগেশ্রী গাহিলেন—প্রোঃ আলাউদ্দীন এবার আপনা হইতে পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোকগুলিকে বলিলেন—"এই গায়কটি বাগেশ্রীতে যেভাবে পঞ্চম লয়ে গাইতেছেন উহা রীতিবিরুদ্ধ।" অবশ্য এ লইয়া কোন মীমাংসা না হইয়া নীরবেই ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি হইল। আমরা কিন্তু বলিতে চাই যে সম্মেলনে যদি এই সকল বিষয়ের মীমাংসা না হয় তাহা হইলে ভারতীয় সঙ্গীতের যথার্থ উন্নতি সাধিত হওয়া কোনরূপেই সম্ভবপর নয়—এবং রাগ-রাগিনী যেভাবে বর্ত্তমানে গীত হইয়া থাকে তাহার শুদ্ধাশুদ্ধিও নির্ণীত হওয়া অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে রাগরাগিনীর স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও গায়কীর synthesis করিয়া standard নিরূপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং এই জন্য সম্মেলনে কর্তৃপক্ষের ইহা করা উচিত যে কয়েকটি বিশিষ্ট রাগ নির্ব্বাচন করিয়া—বিশিষ্ট গুণীদের সেই বিষয়ে demonstration-এর দ্বারা নিজ নিজ style-এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে সুযোগ দেওয়া ও ঐ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট রাগরূপের আদর্শ প্রণয়ন করা। যখন কালস্রোতে সম্প্রদায় উচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে তখন যতদূর সম্ভব, সময় থাকিতে সঙ্গীতের আদর্শ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করা কি বাঞ্ছনীয় নহে?

বাংলার কন্‌ফারেন্স—এই সেদিনও এই বাংলার আকাশ-বাতাস রামদাস গোস্বামী, যদু ভট্ট, নুলো গোপাল, লক্ষ্মীকান্ত বাবাজী, রাধিকা গোস্বামী, অঘোর চক্রবর্ত্তী, মহিম মুখোপাধ্যায়, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় গুণী-জনের স্বরলহরীতে ধ্বনিত হইত—কিন্তু আজ—কই কাহাকেও তো দেখা যায় না—যিনি আজ সুরবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া সুরভারতীর সাধনায় অসংখ্য বাঙ্গালী শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের আলোক দেখাইবেন? যাঁহারা কর্ণধার হইবার যোগ্য, সঙ্গীত সাধনায় যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে একজন তো আজ বিশ্বনাথক্ষেত্রে যোগ সাধনায় মগ্ন—আর দু' একজনও যাঁহারা আছেন—তাঁহারাও far from madding crowd! আসরে শুধু ভাঙা কাঁসী!

[বিগত নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের বিবরণী ও সমালোচনা এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। চারিজন বিশিষ্ট সঙ্গীত-রসিক "খেয়ালীর" পক্ষ হইতে সম্মেলনে যোগদান করিয়া সম্মেলনের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা প্রসূত এই প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গীত-রসিক জনসাধারণের কোনও রূপ গঠনমূলক সমালোচনা পাইলে আমরা আনন্দের সহিত সংগ্রহ করিব।

সম্পাদক সঃ খেঃ]

পতিতপাবন পতিভুণ্ডী

জেনেট ম্যাক্‌ডোনাল্ড

জেনেটের নামে অনেক গুজব। সে গুজবে সবার ওপর যার নাম পাওয়া যায় সে হচ্ছে জেন্ রেমণ্ড্। লোকে বলছে, তার সঙ্গেই নাকি তার—। কিন্তু তাহলে কি হয়, জেন্ রেমণ্ডের বাগদত্তা যে বব্ রিচি। অবশ্য 'রোজ মেরি' ছবিতে টাহো লেকের ধারে ছবি তোলার সময় প্রেমের কোন আকর্ষণই লোকে ধরতে পারেনি তবু তারা জানত অদূর ভবিষ্যতে বব্ রিচিতে আর জেন্ রেমণ্ড-এ যে বিয়ে এ কথা সত্যি! সত্যি। সে কথা যাক্! উপস্থিত রিচি চলেছে ইংলণ্ডে ছবিতে কাজ করতে। আর ওদিকের খবর!—আমি জানি না আপনারা আশা করুন।

জোয়ান ক্রফোর্ড

জোয়ান ক্রফোর্ড আর ফ্র্যাঙ্কট টোনে যে বিয়ে হয়ে গেছে এ খবর আমি অনেকদিন আগেই দিয়েছি। কিন্তু ওই ঝক্ ঝকে চক্ চকে প্রেমময়ী মোহিনী মূর্ত্তির অন্তরে যে জাগ্রত তৃষ্ণা দু দুটো-বছর ধরে শুধু পরীক্ষার জন্যে গোপনে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল সেকথা আপনাদের জানাই নি। তাই আজ জানাচ্ছি ১৯৩৩ সালে একদিন্ জোয়ানের বিয়ের ঠিক হয়েছিল এই ফ্র্যাঙ্কট টোন-এর সঙ্গেই। জোয়ান কিন্তু সেদিন বিয়ের সব ঠিক হওয়াতেও বিয়ে করতে রাজী হয়নি। আবার আজ প্রায় তিন বছর পরে সেই ফ্র্যাঙ্কট টোনকেই বিয়ে করেছে ও জানিয়ে দিয়েছে যে তার প্রথম বিয়ের যন্ত্রণা তাকে এত ব্যথা দিয়েছিল যে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার আগে এইটেই হয়েছিল প্রথম প্রতিজ্ঞা যে দু-বছর ধরে পরীক্ষা না করে সে আর বিয়ে করবে না। তাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। তাদের মাঝখানে কোন

জোয়ান ক্রফোর্ড

ঝগড়া কোন অশান্তি দেখা দেয় নি। দুটো বছর তাদের আশায়, আনন্দে উদগ্রীবতায় কেটেছে এইবার তারা বিয়ে করলে।

গ্রেস মুর

গ্রেস মুর মেয়েটি পারে না কি? সে নাচতে পারে, সে গাইতে পারে, সে বাজাতে পারে—আরো পারে—সে পারে অভিনয় করতে। কিন্তু তার ওপর যা পারে তা হচ্ছে

গ্রেস মুর

লিখতে। প্রবন্ধ লিখতে, গল্প লিখতে সে একেবারে ওস্তাদ। সম্প্রতি খবর পেয়েছি যে ওদেশের কাগজওয়ালাদের এমনি কতকগুলো লেখা বেচেছে এবং তাতে পয়সা পেয়েছেও অনেক। সে পয়সার হিসেব আমি পেয়েছি—এর পরে জানাব।

কি ব্যাপার!

আজও ওরা বেশ ভাবনায় আছে। টবি উইং আর জ্যাকি কুগানকে নিয়ে ওদের খানিকটা সময় ভাবতে হচ্ছে। জ্যাকি কুগান বড়লোক অর্থাৎ ক্রোড়পতি—একুশ বছর বয়স হলে কি হয়, প্রেমের বাজারে এরই মধ্যে বেজায় রকম বেসাতি সুরু করেছে। আর তার পক্ষে এমন করে একা একা কড়ি কাঠ গোনা ভাল দেখায় কি? টবি আর জ্যাকিকে দেখা যেত একসঙ্গে পথে, ঘাটে, মাঠে—মোটরের বুকে, পার্টির হলে, রেঁস্তোরার টেবিলে। তারপর কি যে হোল তাদের মনের গোলমাল!—ব্যস্ অমনি তফাৎ। বড়লোকদের বড় মন কিনা!

আজকাল আবার দেখা যাচ্ছে বেটি গেবল্-এর সঙ্গে। এরপরও হয়ত দেখা যাবে কত বেটি কত রিনি কত জিনির সঙ্গে। ওসব ওরা ভাবেও না, ভ্রূক্ষেপও করে না। তাইতো সেদিন বেটি এক বিরাট ভোজ দিয়েছিল। দেওয়ার উদ্দেশ্য জ্যাকির একুশ বছরের জন্মতিথি উৎসব। এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিল দুশো জনের ওপর তবু একজনকে দেখতে পাওয়া যায় নি, সে হচ্ছে টবি।

টবি উইং

তাই বলে টবি বসে নেই। তাকেও আবার তেমনি ভাবেই দেখা যাচ্ছে ;—সেই রকম টেবিলেতে হাসি, গলা জড়িয়ে মোটরে চড়া, আর এসেন্স-স্নোর গন্ধে সবায়ের নাক ঝাঁঝিয়ে দেওয়া ; সব ঠিক তেমনি আগেকার মতনই আছে। জ্যাকি কুগানের সঙ্গে আর তার নাম বেরোয় এ সে পছন্দ করে না। ও প্রেমের ব্যাপারের প্রচার হওয়ায় তার ঘোরতর আপত্তি। তবু শোনে কে ? যদিও তারা জ্যাকির বদলে টবির পাশে টম ব্রাউনকেই দেখছে আর বেটি গেবলের সঙ্গে দেখছে জ্যাকি কুগা'ন।

পরের ছবি

সিসিল-বি-দে-মিলের পরের ছবি ঠিক হয়ে গেছে। আগেকার মত লোকজন, হৈ হৈ গোলমাল আর ঘটনার পর ঘটনা দিয়ে এ ছবি তৈরী হবে। ছবিখানার নাম হচ্ছে 'স্যামসন্ এ্যাণ্ড ডেলিলা'। অবশ্য পর্দার ছবির জন্যেই এই নামকরণ করা হয়েছে তা নয়ত ওর একটা আলাদা নামও আছে। ডি-মিলে এরই মধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন ডেলিলার অংশে কাকে নামাবেন। যিনি নামছেন ডেলিলার অংশে তিনি নীলাক্ষি, সুন্দরী এবং যে ভূমিকা তাকে দেওয়া হয় তা ভাল করে অভিনয় করবার মত তার আছে এবং তাঁর নামের দুটো প্রথম অক্ষর হচ্ছে এম, ডব্লিউ। এইবার আপনারা কে বলতে পারেন বলুন কি নাম ?

খুচরো খবর

হুইলার ও উইলসির ছবিতে ডরোথি লির নামা হচ্ছে এই আঠারবার।

* * *

বিল পাওয়েল ও জিন হারলোর প্রেমের ব্যাপারটা হচ্ছে একেবারে বাজে।

* * *

ক্লার্ক গেবল তিনমাস সাউথ আমেরিকায় কাটিয়ে হলিউডে ফিরেছে।

* * *

জিন হারলো নামছে 'রিফ র‍্যাফ' ছবিতে।

* * *

শার্লি টেম্পল সপ্তাহে চার হাজার পাউণ্ড রোজগার করছে।

* * *

ডরোথি লির সঙ্গে মার্শাল ডাফিল্ড্-এর সকল সম্বন্ধ চুকে গেছে।

* * *

ভিরি ট্যান্সডেল হচ্ছেন এ্যাডলফ্ মঁজুর স্ত্রী।

শ্রীনটশেখর

ছায়ায় যবদ্বীপ ও বলিনৃত্য

গত শুক্রবার ৩১শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬-১৫ মিঃ "ছায়া" চিত্রগৃহে বলি ও যবদ্বীপের নৃত্যের উদ্বোধন দিন। এই নৃত্যের আয়োজন ক'রে "ছায়া"র কর্মকর্ত্তা বিশেষ রুচি ও কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সাধারণের কাছ থেকে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।

এই বলি ও যাভার নৃত্য-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি।

প্রথমেই আমাদের বক্তব্য—সেদিন প্রেক্ষাগৃহে আমরা যেরূপ দর্শক-সমাগমের দৈন্য লক্ষ্য করলাম, তা'তে মনে হোলো যে—'নন্-ষ্টপ্ রেভু' দেখবার জন্যে মজা-ভোগ-পিয়াসী দর্শকের অভাব হয় না, কিন্তু এই অপরূপ নৃত্য দেখে রস উপভোগ করবার মত কি বাঙালী দর্শক গ'ড়ে ওঠেনি?—যাই হোক্—এই প্রশ্ন তুলে মিথ্যা বিলাপ ক'রে কোনো ফল নাই—এই দেশের তথাকথিত মিউজিক্-ডিরেক্টর, সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীরা কবে অবহিত হ'বেন? তাঁদের জ্ঞান-লাভ কি একেবারে শেষ হয়ে গেছে?—শিখবার কি তাঁদের আর কিছুই বাকি নেই? এই নৃত্য দেখলে আমাদের মনে হয়—তাঁদের নূতন জ্ঞানোদয় হোতো।

* * *

ঠিক্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্কেষ্ট্রা বেজে উঠ্লো। কয়েক মিনিট পরে বিচিত্র বর্ণে-শোভিত যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেক্ষাগৃহের আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল।

প্রথমেই "দেবদাসী নৃত্য" আরম্ভ হোলো। এই নৃত্যে দেবীজা ও দেবী রত্না-র অঙ্গহার ও অপূর্ব্ব ভঙ্গী স্বভাব-সুন্দর অনুপম বলা যায়। তারপরেই বলির দু'টি দেশজ নৃত্য হোলো। একটি মনোরম ছন্দোবিলাস নৃত্য—"গরুড়ের পক্ষ-নৃত্য"। এই নৃত্যে দেবী রত্নার নৃত্য-কৌশল প্রশংসনীয়। কিন্তু এর পূর্ব্বে দেবী রত্নার "একপক্ষ-নৃত্য" দেহ-ভঙ্গীর বৈচিত্র মনোমুগ্ধকর। এর পরেই দেবীমায়া ও কতকগুলি অন্যান্য নর্ত্তকীর "ঈগল-নাচ" বেশ একটি দুই দলের কলহের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল।

"অর্জ্জুন"-নামক নৃত্যটি শৃঙ্গার ও করুণ-রস-মিশ্রিত। এই নৃত্যে অর্জ্জুন-বেশী দেবী পূজা ও সুভদ্রারূপে দেবী রত্না অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই দু'জন শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীর নৃত্যের ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে ভাগবত চিত্রটি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

"ইন্দ্রপূজা" নৃত্যটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এ-টি ভাবে, রসে ও ছন্দে জগতের একটি শ্রেষ্ঠ নৃত্য রূপে পরিগণিত হ'তে পারে। দেবীজার 'আত্মোৎসর্গ-নৃত্য' সকলের মনে রেখাপাত ক'রেছিল।—"সমর নৃত্যে" ওয়ার্ণা ও ওয়ানির যুগ্ম নৃত্য প্রশংসাযোগ্য। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর লাগলো "সুমাত্রার ঘুমপাড়ানী" গানটি। দেবী রত্নার সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সুর ও কয়েকটি গায়িকার মিলিতকণ্ঠের ধুয়া মনোহর রসের সৃষ্টি ক'রেছিল। আর "মোমো"-র প্রেমের গানটি বিদেশী ভাষায় রচিত হ'লেও গাইবার ভাব-ভঙ্গীতে বেশ আনন্দ দিয়েছিল।—সর্ব্বশেষে "রক্ত-তৃষিতা"-র নৃত্যে দেবীজা ও বন্দিনীরূপে দেবী রত্না অভূতপূর্ব্ব নৃত্য-কৌশল দেখিয়েছিলেন।

* * *

এই "রয়্যাল বলিনিজ নৃত্য সম্প্রদায়ে"-র আমরা উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। এ-র রস পরিবেশন সার্থক হ'য়ে উঠুক্।

* * *

উদ্বোধনের দিন অবনীন্দ্রনাথ, অশোক নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি শিল্পী ও কলারসিক ভদ্র মহোদয়গণ প্রধান দর্শক ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের মতামত ইতোমধ্যে কাগজে কাগজে প্রচারিত হ'য়েছে।—পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রী ম'শায় এই নৃত্য সম্বন্ধে সেদিন সন্ধ্যায় যে সংক্ষিপ্ত মত দিয়েছিলেন, বর্ত্তমানে তাই এখানে উদ্ধৃত করলাম; এবং আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি—তিনি ভবিষ্যতে একটি সবিস্তার সমালোচনা লিখ্‌বেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।—

* * *

শাস্ত্রী ম'শায়ের মতটি এই—

"পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নটরাজ মহেশ্বরের আঙ্গিক অভিনয়ের অভিব্যক্তি এ নিখিল ভুবন। জগতের সকল বাঙ্ময়ের মধ্য দিয়া তাঁহার বাচিক অভিনয়ের প্রকাশ। চন্দ্রতারকার দীপ্তিতে তাঁহার আহার্য্য অভিনয়ের দীপ্তি।—এ সত্য পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলাম সে দিন বলি ও যবদ্বীপের প্রাচ্য নৃত্য সম্প্রদায়ের নৃত্য দর্শনে। এই প্রাচ্য নৃত্য সম্প্রদায়ের আঙ্গিক, বাচিক ও আহার্য্য অভিনয়াত্মক নৃত্য ও নৃত্যে নটরাজের মহিমার বিশিষ্ট বিকাশ আছে—এ-কথা সহৃদয় সুধী দর্শকমাত্রেই স্বীকার করিবেন"।

* * *

এই নৃত্য সম্প্রদায়ের সেট্-সিন্ সাজান ও সরান্ এ দেশের রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের শেখ্‌বার যোগ্য। আমরা ঘড়ি ধরে দেখেছি তা এ রকম সেট্-সিন্ একটা সাজাতে বা সরাতে ৩০ সেকেণ্ড থেকে এক মিনিটের বেশী লাগে নি!

পড়ায় মনোযোগ নেই ছাত্রীর, মাষ্টার শুধু বইয়ের ওপর মাথা গুঁজেই থাকে। কোয়ালিটি পিক্‌চার্স-এর "ব্যাথার দানে" শিশুবালা তাই ভাবে। আর মাষ্টার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য পড়ে বই। চিত্রখানির পরিচালনা হেম গুপ্তের, পরিবেশনা—চলন্তিক।

টেলিগ্রাম 'ভারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ, [illegible], রামময় রোড, কলিকাতা — টেলিফোন পার্ক [illegible]

[illegible] বর্ষ, [illegible] সংখ্যা, বৃহস্পতিবার [illegible]শে মাঘ, ১৩৪[illegible], [illegible] ফেব্রুয়ারী [illegible]

করপোরেশান-নির্ব্বাচন

কলিকাতা করপোরেশানের নির্ব্বাচন আসন্নপ্রায়। এই সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি যে আবেদন প্রচার করিতেছেন তাহাতে দেখা যায়—"বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সংশ্লিষ্ট জেলা কংগ্রেস কমিটীসমূহের সহযোগিতায়" কলিকাতা করপোরেশানের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন পরিচালনা করিবেন। ইহা বাস্তবিকই আনন্দের কথা। বিগত দুইবার করপোরেশানের সাধারণ নির্ব্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সহিত জেলা কংগ্রেস কমিটীসমূহের সংঘর্ষের ফলে শুধুই যে একটা বিসদৃশ দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল তাহাই নহে, নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যেও আদর্শের ঐক্য না থাকাতে করপোরেশানের মধ্যে কংগ্রেসের শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। এবারে সেই সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। আশা করা যায়, এবারের এই সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে করপোরেশানের মধ্যে কংগ্রেস তাহার হৃত আসন পুনরধিকার করিয়া দেশের ও দশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

এই আশা সফল করিতে হইলে নির্ব্বাচনপ্রার্থী-মনোনয়নে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে বিশেষ সাবধানতা ও বিচক্ষণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে যে প্রসঙ্গের বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি সেই "নবম বার্ষিকী নীতি" তাঁহাদিগকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিই। নয় বৎসরের কর্ম্মক্লান্ত চিরাচরিত অভ্যাসের "খাঁটাপড়া" সদস্যদের নিকট হইতে কর্ম্মতৎপরতার দিক দিয়া বেশী কিছু আশা করা দুরাশা মাত্র। কোনো জমিতে মৌরসীপাট্টা সর্ত্ত জন্মিলে যেমন জমির অধিকারী সেখানে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তেমনি অন্যান্য, বিশেষতঃ জনসাধারণের কার্য্যেও। সেইজন্য করপোরেশানের প্রতিনিধিত্ব কার্য্যে মৌরসীপাট্টা জন্মিয়াছে এ ধারণা যাহাতে কাহারও না জন্মিতে পারে, সেদিকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

তাঁহাদের নিকট আমাদের আর একটি বিনীত অনুরোধ আছে। সেই অনুরোধ এই—তাঁহারা যেন মক্কেলহীন তথা আক্কেলহীন ব্যবহারজীবিদের নির্ব্বাচনপ্রার্থীরূপে মনোনয়ন না করেন। করপোরেশানের কার্য্যে নানা প্রলোভন আছে এবং এই সকল "Briefless" উকীল যে সব সময়ে সেই সকল প্রলোভনের ঊর্দ্ধে উঠিবেন, তাহা বোধ হয় আশা করা যায় না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী নির্ব্বাচন-প্রার্থী মনোনয়নের চরমভার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উপর অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বিচার ও নির্দ্দেশের উপর আমাদের গভীর আস্থা আছে। প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক আন্দোলনে তারুণ্যশক্তি কি অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে সে ইতিহাস তাঁহার সুবিদিত। তাই আমরা আশা করি করপোরেশানের ধমনীতে তিনি তরুণ রক্তের প্রবাহ আনিয়া তাহাকে নবজীবন ও নবশক্তিতে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবেন।

পরিশেষে আমরা কলিকাতার নাগরিকগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন কংগ্রেস নির্ব্বাচিত ভিন্ন অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন না করেন। দেশবন্ধু দাশের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা করপোরেশানে বাঙ্গালীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই আদর্শের পূর্ণ সফলতার জন্য তাঁহাদের সহযোগিতা ও সাহায্য পাওয়া যাইবে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

নিখিল-বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলন

(১)

মাননীয়

"খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

গত ১৬ই মাঘের "খেয়ালী"তে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে শ্রীঅহোবলের সমালোচনার যে সমালোচনা করিয়াছেন সে প্রসঙ্গে দু' একটী কথা বলিতে হইতেছে। নামটীর বানান "অহবোল" কি "অহোবল" এই জ্ঞান-সমালোচক—সমালোচকের নাই। "লোকোত্তর" কথাটীকে তিনি "লোকন্তর" ভাবিয়াছেন (ইহা বাহান্তরের প্রভাব নয় তো ?)। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীকে "জ্ঞানচন্দ্র" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আর সেদিন গাহিলেন শ্রীযুক্ত শচীন দাস (ওরফে মতিলাল) সমালোচনার জ্বালায় জ্বলিলেনও তিনি কিন্তু মাঝখান হইতে সহানুভূতি ও সমর্থন পেলেন "শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত মতিলাল" যিনি সে আসরে মোটেই গাহেন নাই। এইরূপ পক্ষ সমর্থনের বহর দেখিয়া আমাদের একটী অতি পুরাতন মজলিসী গল্প মনে পড়িল।

দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় বিরাট জল্‌সা। বহু গন্ধর্ব্ব অপ্সরা কিন্নর প্রভৃতি শিল্পীরা গাহিতেছেন। গীতের বিচারের ভার দেবর্ষি নারদের উপর। মা লক্ষ্মী আসিতে পারেন নাই—প্রতিনিধিরূপে তাঁর প্রিয় বাহন পেচককে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মার বিশেষ অনুরোধ পেচকের শিশুপুত্রটী যেন আসরে গাহিবার একটু অবকাশ পায়। কিছুক্ষণ গান হইবার পর দেবর্ষি বলিলেন বিশেষ কার্য্যে আমায় অন্যত্র যাইতে হইবে—অতএব আমার অনুরোধ মা লক্ষ্মীর প্রিয় বরপুত্র পেচকরাজ আমার স্থানে বিচার আসন গ্রহণ করুন। পেচকরাজের গম্ভীর আকৃতি দেখিয়া মহাবিজ্ঞবোধে দেবগণ সকলেই সানন্দে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তুম্বুরু, হা হা, হু হু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের গান উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরীগণের নৃত্য এবং সর্ব্বশেষে পেচকশিশুর স্বাভাবিক কণ্ঠে একখানি উচ্চাঙ্গের গান (বোধহয় বর্ত্তমানের খেয়াল গানের অনুরূপ) সমাপ্ত হইল। এবার পুরস্কার বিতরণের পালা। দেবরাজ পেচকরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কমলানন্দন! শিল্পীগণের মধ্যে যাহাকে আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন—তাহার গলায় এই পারিজাত মাল্যটী অর্পণ করুন" মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না করিয়া পেচকরাজ নিজ নন্দনের গলদেশে গন্ধর্ব্ববাঞ্ছিত সেই পারিজাত মাল্য অর্পণ করিলেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগার হইতে অবিরত করতালি, আনন্দোচ্ছ্বাস এবং আর একটী গাহিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উঠিতে লাগিল।

ইতি—

বিনীত

শ্রীচক্রধারী

(২)

মাননীয়

"খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

গত ২৩শে মাঘের "খেয়ালী"তে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাস শ্রীধুন্দবীরের সমালোচনার যে প্রতিবাদ করেছেন—তাতে তাঁর পক্ষপাত দোষ স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীধুন্দবীর—কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টো, পঙ্কজ মল্লিক, সাইগল, পাহাড়ী সান্যাল ও যামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতিকে "তথাকথিত-কলাবিদ" বলে গাল দিয়েছেন, কিন্তু ধীরেন বাবু পক্ষ সমর্থন করলেন শুধু তিন জনের—ভীষ্মদেব, সাইগল ও পাহাড়ীর—বোধহয় বাকী তিনজনকে (কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক ও যামিনী গাঙ্গুলী) তিনি "তথা কথিত" বলেই মনে করেন। কৃষ্ণচন্দ্র দেকে এইভাবে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা কি ধীরেন বাবুর উচিত হয়েছে ?

তারপর, শ্রীবৈজু বাওরার সমালোচনা। তিনি "বাংলার আকাশ বাতাস" কেবল কয়েকজন পরলোকগত সুরবৃদ্ধের "স্বর-লহরীতে ধ্বনিত" হতে শুনেছেন কিন্তু তিনি কি শিশির ভাতড়ীর "সীতা"য় কৃষ্ণ দের গলায়—"জয় সীতাপতি" "অন্ধকারের অন্তরেতে" অথবা চণ্ডীদাস ফিল্মে ব্রাহ্মণ বেশী কৃষ্ণবাবুর "ফিরে চল" অথবা রেকর্ডে তাঁর "শতেক বরষ পরে" কীর্ত্তন প্রভৃতি

শোনেন নি? আমাদের মনে হয় শুনে থাকলে তিনি উক্ত মন্তব্য করতেন না। "মীরাবাই"য়ে পাহাড়ী সান্যালের "ইত ঘন গরজে" গানখানিও বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে রেখেছে। সমালোচক প্রবর কি সে ফিল্মখানিও দেখেন নি? সমালোচক মশায়ের এ দিকে একটু হুঁসিয়ার হওয়া উচিত ছিল।

ইতি

বিনীত—শ্রীশার্দ্দুল সিং কাহার

(৩)

মাননীয় "খেয়ালী" সম্পাদক

সমীপেষু—

এবারকার নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন সম্বন্ধে শ্রীতান সেন ও শ্রীঅহোবল "খেয়ালী"তে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীতান সেন সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নেই। কারণ তাহার আলোচনা বিশেষ নিন্দনীয় হয় নাই। যদিও কুমারী গীতা দাশ ও শ্রীরথীন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লেখায় একটু ভুল হইয়াছে। কিন্তু শ্রীঅহোবল যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিতে আমি ইচ্ছা করি, কেন না আমিও সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ নহি এবং অধিবেশনের কয়দিনই আমি ইনষ্টিটিউটে উপস্থিত ছিলাম।

শ্রীঅহোবল সঙ্গীত রত্নাকর নাসিরুদ্দিন খাঁ, প্রোঃ নারায়ণ রাও ব্যাস, পটবর্দ্ধন, হাফেজ আলি খাঁ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞগণের বিষয় আলোচনা বেশ ভাল ভাবেই করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে আলোচনা মানেই শুধু বাঙ্গলার গুণীবৃন্দকে দোষারোপ করা নয় এবং হিন্দুস্থানীয় গায়কগণকে উচ্চ আসন দেওয়া মাত্র। অবশ্য আমি ইহাও স্বীকার করি যে পশ্চিমাঞ্চলের গায়কদের তুলনায় বাঙ্গলার নিকৃষ্ট গায়কও ছিল। কিন্তু বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠগুণী শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্বন্ধে যাহা উক্তি করিয়াছেন তাহা সত্যই অসাধারণ এবং এর বিপক্ষে লিখিয়া শ্রীঅহোবল সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তারপর ইহা ব্যতীত বাংলায় আরও দুইজন শ্রেষ্ঠ গায়ক শ্রীসুনীল বসু ও শ্রীশচীন দাশ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন। বাংলার বিখ্যাত কয়জন সঙ্গীত সাধকের নাম করিতে হইলে প্রোঃ গিরিজা শঙ্কর, জ্ঞান গোস্বামী, সুনীল বসু, শচীন দাশ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি শুধু বলি না যে মাত্র এই কয়জনেই বাংলার শ্রেষ্ঠ গায়ক;—এ

কয়জন সঙ্গীতাচার্য্য গোপালবাবু, দানীবাবু, সাতকড়িবাবু, ভীষ্মদেববাবু প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদি শ্রীমান সুনীল বসু ও শচীন দাশ এতই নিকৃষ্ট শ্রেণীর গায়ক হইতেন তাহা হইলে এত অল্প বয়সে প্রায় সমগ্র ভারতে এত সুনাম কনথই অর্জ্জন করিতে পারিতেন না; তা ছাড়া এঁদের শিক্ষা ও সাধনাও অতি উচ্চশ্রেণীর। প্রো: দিলীপ বেদীর সম্বন্ধে আর কোনও নিন্দা না করিয়া "রাতকা ললিত" রাগ সম্বন্ধে নিন্দা করা হইয়াছে; শ্রীঅহোবল কি মনে করেন যে নূতন কোনও রাগের সৃষ্টি অবাঞ্ছনীয়।

শ্রীদেবকুমার মুখার্জ্জি।
৫৭বি হিন্দুস্থান পার্ক
বালিগঞ্জ।

(৪)

"খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

"খেয়ালী"র গত ১৬ই মাঘের সংখ্যায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চিঠি পড়িয়া দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন "গোয়ালিয়ারের" যন্ত্রশিল্পী হাফিজ আলি খাঁর স্বরোদ বাদ্য যে অদ্বিতীয় ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত"। এই 'অদ্বিতীয়' বাদক সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। তিনি সম্মিলনীতে বাজাইয়াছিলেন দুই দিন, কিন্তু কোন দিনই এই বাদকের কাছ হইতে একটি রাগও পূর্ণভাবে শুনিতে পাই নাই, 'রাগ' 'রাগিনী'র আলাপে ও গতে আমরা চারিটি তুক পাই যথা:— অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এবং তারপর তান ও জোড়। কিন্তু তিনি পূর্ণভাবে একটি রাগও বাজান নাই। দ্বিতীয়ত দশ মিনিটে দুই তিনটি রাগ শেষ করিয়া ধরিলেন ঠুংরী। (খাঁ সাহেবের হাত খুব সুরেলা। তিনি ঠুংরী খুব ভাল বাজান স্বীকার করি; কিন্তু ঠুংরী স্বরোদের জিনিষ নয় ঠুংরী চলে সারেঙ্গীতে। স্বরোদে ঠুংরী বাজান খাঁ সাহেবের নূতন আবিষ্কার।) স্বরোদে ঠুংরী শুনিতে ভাল হয় কিন্তু তাহাতে স্বরোদের মর্য্যাদা কত বাড়ে তাহা (প্রকৃত গুণী ব্যতীত অন্যের অজ্ঞাত)। (স্বরোদে যখন 'অদ্বিতীয়' বাদকেরা নূতন নূতন জিনিষ বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন কিছুদিনের মধ্যে কোন 'অদ্বিতীয়' স্বরোদ বাদকের কাছ থেকে এবার স্বরোদে 'থ্যামটা' এবং 'ভাটিয়ালী' শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব কি? এ বিষয়ে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব আমাদের পূজ্য কারণ, কখন স্বরোদে ঠুংরী বাজান না।)

তৃতীয়তঃ খাঁ সাহেবের সহিত সঙ্গত হইয়াছিল পাখোয়াজের, কিন্তু তিনি বাজাইয়াছিলেন ত্রিতালী তাও দ্রুত ঢিমা নয়।

রূপ-তরঙ্গ

[বিলাসী]
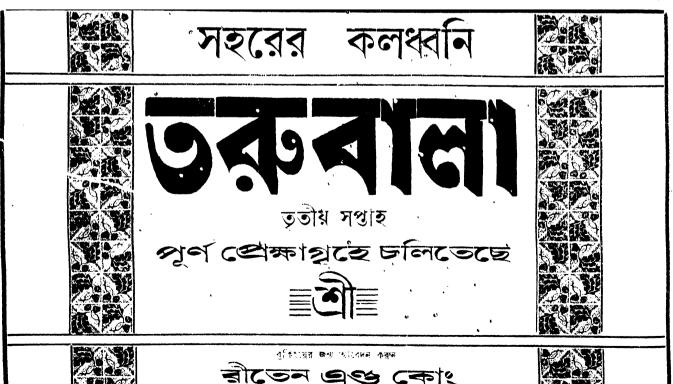
কালী ফিল্মস্-এর আগামী চিত্র "পরভৃতিকা"র নায়িকা শ্রীমতী বীণা।

নূতন নায়িকা—

কালী ফিল্মস্এর গুণময়বাবু পণ করে' বসলেন—তাঁর "পরভৃতিকা"য় নতুন একটি মেয়ে নাবাতেই হবে।

এ বিষয়ে সমস্বরে তাঁকে আমরা উৎসাহিত করেছিলুম। কারণ, ছবির পর ছবিতে মামুলী সেই এক মুখ বাংলা দেশে বাসি খাবারের মত বিস্বাদ হয়ে উঠেছিলো।

কিন্তু, এখানে টলিউড্ থাকলেও হলিউডের হাওয়া যে একেবারে নেই তা আমরা জানি। পর্দার ওপর ফেলবার মত মুখ এক লাখে একটি পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ! আর, পাওয়া গেলেও হাওয়া সেখানে অন্যরকম। ছায়ারাজ্যে সাদা স্বভাবের অভাব সেখানে নাকি ভূতের মত ভীতিপ্রদ!

গুণময়বাবুর এ পণ কলকাতার প্রতি পাড়ায় পাড়ায় হ'লো প্রচারিত। কালী ফিল্মস্এর ষ্টুডিয়োয় তাই অনেক মেয়ের আগমন। কতো মোট্কা মেয়ে, হোঁত্কা মেয়ে, ট্যাঙ্গা মেয়ে, বেঁটে মেয়ে, কালো মেয়ে, সাদা মেয়ে, ট্যারা মেয়ে, মেয়ে আর মেয়ে।

কিন্তু, ক্যামেরার ঈগল চোখ অনেক চেষ্টায়ও লম্বা চুল ছাড়া কোন মেয়েই তাঁদের ভেতর খুঁজে পেলে না।

গুণময়বাবু প্রমাদ গুণ্লেন।

গাড়ি নিয়ে তন্ন তন্ন আরম্ভ হ'লো খোঁজ। নাকের থেকে হীরে হারালে মেয়েরা যেমন খোঁজে। কিন্তু, ফলে হ'লো একদিনে দুটো স্মেলিং সল্ট্ কেনা!

'কেন?' শ্রীবিলাসী ক্যাভেণ্ডারের ধোঁয়ার ওপর প্রশ্ন করলে।

'বমি আসে যে!'

নায়কের ভূমিকায় শ্রীজহর গাঙ্গুলী

'সেটা অসম্ভব। পেটে কিছু থাকলে তো!' 'আরে বাবা,' বলে গুণময় 'নাড়ী শুদ্ধ উল্টে আসে।'...

যাক্, দিন যায়। নতুন নায়িকা আর মেলেনা।

অনেক খোঁজ খবরের পর—অনেকখানি পরিশ্রম, অনেকখানি ঘাম, অনেকগুলো সিগ্রেটকে ছাই করবার পর একদিন বিকেলে ওয়েলিংটনে জ্বলে উঠ্লো আশার প্রদীপ-আলো।

মেয়েটি নাকি কাছাকাছি কোন সেলায়ের কলে কাজ করে। ভেলভেট্-স্যাণ্ডেল্, লাল-নীল প্যারাসোল—মেয়েটি টুকটুক ট্রামে নাকি আসে। চিকন কালো ভুরুর নীচে তার নাকি কাজল-টানা হরিণ-চোখ।

(আমাদের ভারতে সঙ্গীত-শিল্পে যথেষ্ট পরিমাণে তাল আছে, কিন্তু যাহার কাছে একটি তাল ব্যতীত অন্য কোন তালের কিছুই শোনা গেল না তাঁহাকে 'অদ্বিতীয়' বলি কিরূপে।) (এতগুলি দোষ থাকা সত্ত্বেও) কি করিয়া (একটি) শিল্পীকে 'অদ্বিতীয়' বলা যায় তাহা আমি ভাবিয়া পাই না।

ইতি—

মোহনলাল মুখোপাধ্যায়
২২নং সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড
খিদিরপুর।
কলিকাতা

তার মুখে নাকি মন-ভোলানো আভা। তার চেহারায় নাকি রূপ-কুমারী ওড়না ওড়ায়!

সে রোজই আসে, আশেপাশে সবাই জানে। কিন্তু; বিশেষ ক'রে সেইদিনই আর আসেনা।

সূর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অপেক্ষা চললো। মোটরের মেশিনটা যেন অ্যাস্‌পিরিন্ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লো। সাস্‌ভ্যালিতে ঝরে পড়্‌লো গরম চায়ের ঝরণা। গুণময়বাবুর মুখে ভক্‌ভক্ সিগ্রেটের ভল্‌ক্যানো।

ট্রাম চলে, বাস চলে আর চলে লোক। নতুন এ ডিরেকটার—সবই নতুন করে' দেখ্‌তে আরম্ভ করলে। সুদূর প্রবাস থেকে গুণময় ওয়েলিংটনে যেন নতুন এক অতিথি!

ঢং ঢং বাজে ঘড়ি, একসুরে চ'লে সময়।

সবই হয়,—

তবে, সেদিন সেই মেয়েটি আর আসে না।

গুণময় ঠিক করলে—একটু পরে সে গুণবে আকাশে ক'টি তারা!

তারপর—হঠাৎ—ঐ তো!

গাড়ি থেকে গুণময় লাফিয়ে পড়লো।

অল্প একটু অভিবাদন, তারপরই—

'আপনি কি সিনেমায় নাব্‌তে চান?'

অপরিচিত। অদ্ভুত প্রশ্ন। মেয়েটি প্রথমে একটু লজ্জা পেলে। তার গাল হ'লো লাল।

কিন্তু, মনের ভেতর উথলে উঠলো তার কতদিনের সোণালী সেই স্বপ্ন। সিনেমা দেখবার পর সেই তার শিহরণ! তার সেই অধীর অভিলাষ!

সবই এতদিন উড়ে গেছে। যেন বর্ষার পর রামধনু।

মুখের আগে মন বলে উঠলো কথা। সে চিরদিনই ছায়ার মায়ায় ভুল্‌তে চেয়েছে।......

নায়িকার নাম

কালী ফিল্মস্ এর "পরভৃতিকা"র সেই মেয়েটিই হয়েছে নায়িকা। নাম—বীণা।

আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি তাকে পর্দ্দার ওপর দেখতে। আর ভাবছি—গুণময়-বাবুর এতো যে উদ্যম, এতো যে পরিশ্রম, এ নিশ্চয়ই সাফল্যে সোণালী হয়ে উঠবে।

কালী ফিল্মস্

সুকুমার দাশগুপ্তের হিন্দী "প্রফুল্ল"র শুটিং শীঘ্রই সুরু হবে—আপাততঃ মহলা জোরে চলেছে। চরিত্র-নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ না হ'লেও মূল-শিল্পী নির্ব্বাচন হ'য়েছে। এখানে তার আভাষ দেওয়া গেল।

যোগেশ—মনিলাল, রমেশ—জীবন গাঙ্গুলী, সুরেশ—বেনু লাহিড়ী, শিবনাথ—ইস্‌রৎ খাঁ, পীতাম্বর—নূর মহম্মদ, প্রফুল্ল—পার্ব্বতী, জগমনি—সারা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

মহামান্য ত্রিপুরাধিপতি ও তাঁর এ, ডি,
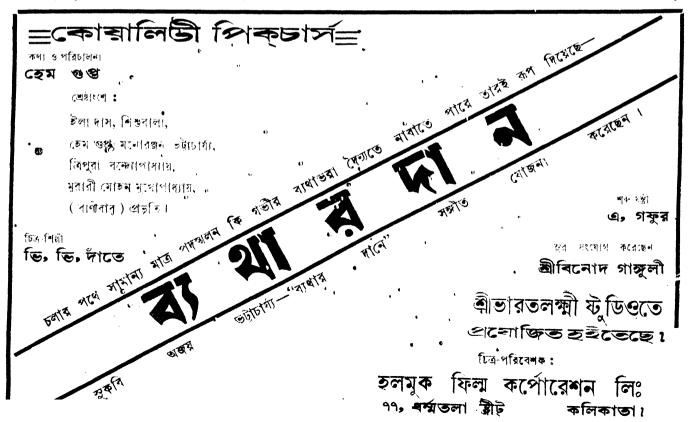
সি. মিলিটারী সেক্রেটারী, মিঃ সি, বি, দেশাই (ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্সের সেক্রেটারী) ও স্বীয় কর্ম্মচারিগণসহ গত সোমবার বিকেলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিও পরিদর্শন করেন। তাঁর ষ্টুডিওর প্রবেশকালে এই ষ্টুডিওর সত্বাধিকারী মিঃ বি, এল, খেমকা, প্রচার-সম্পাদক শ্রীসুধীর সান্যাল এবং জেনারল ম্যানেজার মিঃ ডব্লিউ, জে, ময়লান কর্ত্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন। তারপর সান্যাল তাঁকে ষ্টুডিওর বিভিন্ন বিভাগের বিশিষ্ট ব্যক্তি মিঃ সুলমাষ্টার—পরিস্ফুটনাগারাধ্যক্ষ, ক্যাপ্টেন ফ্রান্‌কলিন—ফ্রান্‌কলিন-গ্রান্‌ভিলের ভারতীয় ইউনিটের কর্ত্তা, দেবকী বসু, জি, আর শেঠী, গুল হামিদ ও মজহার খাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মহামান্য ত্রিপুরাধিপতি শেঠীর "নূরে-এ-ওহাদতে"র শূটিং দেখে বিশেষ আপ্যায়িত হন এবং সন্ধ্যার পর সবাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নেন।

নতুন বছরের নতুন হাওয়ায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া হ'য়েছে মশ্‌গুল। ফ্রান্‌কলিন-গ্রান্‌ভিল ভারতীয় ইউনিটের সভ্যরূপে এই ষ্টুডিওর কর্ত্তা মিঃ বি, এল, খেম্‌কা যোগদান কোরেছেন এবং এদের বন্য-চিত্র সরবরাহের ভার নিয়েছেন।

* * *

আর একটা বিষয় মিঃ খেম্‌কা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন, সেটি হ'চ্ছে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক দেবকী বসুকে এই প্রতিষ্ঠানে এনে। তিনি হিন্দী ও বাঙ্‌লাতে "সোণার-সংসার" তোল্‌বার ব্যবস্থা কোর্‌ছেন আর মিঃ খেমকা এই ছবিখানার সাফল্যের জন্যে শক্তিমত চেষ্টা কোরছেন—তার এ জয়যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হ'ক।

* * *

"খাঁয়বার পাশ", "নূরে-ওহাদৎ" হিন্দী ছবি—বাঙ্‌লা ছবি "পথের শেষে"—তেলেগু ছবি "ধ্রুব" ও "সতী অনসূয়া" প্রভৃতি মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

কোয়ালিটী পিক্‌চার্স

এদের "ব্যথার দান" শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে প্রায় শেষ হ'য়ে এল। প্রকাশ যে, ছবির গল্পটি অতি-আধুনিক ঘটনার এক মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী, আর হেম গুপ্ত আপ্রাণ চেষ্টা কোর্‌ছেন সেটিকে সুন্দরতর করবার জন্যে। আশা করা যায়, ছবিটি সমবেত চেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হবে।

মৌরসী পাট্টা ভাঙতে হবে!

"যাঁরা একাধিকক্রম তিনবার ইলেকসান সাগর পার হয়ে মৌরসীপাট্টা বিছিয়ে কর্পোরেশনের সভা আলোকিত (?) করে বসে আছেন তাঁদের এবার সরে দাঁড়ান দরকার।"

—বাতায়ন ২৪শে মাঘ

"একটি কথা"-র একটি দৃশ্য

তরুণের আবাহন

"তরুণ যারা—যাদের আছে সেবার স্পৃহা, যাদের আছে উৎসাহ ও অবসর, যারা সত্যিকারের কর্ম্মী, তাদের chance দিয়ে দেখলে ক্ষতি হবে না কিছুই। দলাদলির অবসানও হয়ত তাতে ঘটতে পারে।"

—বাতায়ন ২৪শে মাঘ

শ্রী

এখানে "তরুবালা" বেশ চল্‌ছে। ছবিটি যে সাধারণের কত প্রিয় হ'য়েছে তা' এখানকার জনসমাগমেই উপলব্ধি করা যায়। আমরা আশা করি রীতেনের প্রথম ছবি রীতেনকে দ্বিতীয় ছবি তোলায় উদ্বুদ্ধ কোর্‌বে।

রূপবাণী

যাঁরা রোমাঞ্চ ও ভ্রমণ ভালবাসেন তাদের পক্ষে আসচে হপ্তায় এখানে বিশেষ লোভনীয় আকর্ষণ হ'চ্ছে ইউনিভার্সেলের "ঈষ্ট অফ জাভা"।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এখানে সারা রাত্তির হবে "মানময়ী গার্লস্ স্কুল", "দক্ষযজ্ঞ", "অবশেষে" ও "চণ্ডীদাস"। ছবি ক'খানা জনপ্রিয় সন্দেহ নেই!

চলচ্চিত্রাকাশে

প্রোজ্জ্বল অভিনেতৃ-তারকার অপূর্ব্ব সম্মেলন

চিত্রাকারে

ডি, এল, রায়ের

অমর-লেখনী-নিঃসৃত রঙ্গমঞ্চের বিজয়-বৈজয়ন্তী

পরপারে

নববর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবদান

চন্দ্র ফিল্ম কোম্পানীর

প্রথম অর্ঘ্য!

হাসি ও কান্না—আগ্রহ ও উদ্দীপনার অশেষ উৎস!

অভিনব সুর ও সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস!

-বৈশিষ্ট্য-

জনপ্রিয় আলোকচিত্র-শিল্পীর পরিচালনা

-বৈশিষ্ট্য-

সুর জগতের অন্ধ পূজারীর সুর সমন্বিত গীতাঞ্জলি

=আকিঞ্চন=

সুধী দর্শকের শুভাশীষ

চিত্র গগনের সমুজ্জ্বল

তারকাবৃন্দ
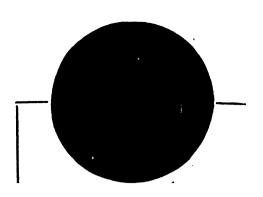
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূমেন রায়, শ্রীশৈলেন চৌধুরী, শ্রীসন্তোষ সিংহ, শ্রীঅনুপম ঘটক, শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা, শ্রীমতী বীণাপানি, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, শ্রীমতী নিভাননী প্রভৃতি

—সত্ত্বাধিকারী—

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চন্দ্র
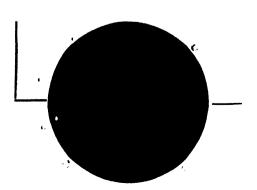
উত্তরা

এখানে "প্রফুল্লে"-র এই শেষ হপ্তা। গিরীশচন্দ্রের অমর নাটক—বাঙালী সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক মর্ম্মন্তুদ কাহিনী "প্রফুল্ল" আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই দেখা উচিত।

প্যারাডাইজ

প্রাসাদোপম চিত্রগৃহ প্যারাডাইজে, প্রভাতের "মহাত্মা" চিত্র বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে।

রূপকথা

আসচে শুক্রবার থেকে এই ছবিঘরে "দেবদাস" ও "অবশেষে" দেখানো হবে। নিউ থিয়েটার্সে'র বি, এন, সরকার, অরোরার শ্রীঅনাদি বসু ও রূপকথার মিঃ এস, সি, মল্লিকের সৌজন্যে শুক্রবারের বিক্রির সমস্ত টাকা সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হবে।

"খেয়ালী" মামলার উপসংহার

হাইকোর্টে আবেদন অগ্রাহ্য | বিদায়ী সম্পাদকের আত্মসমর্পণ

'নলিনী-বিজয়' শীর্ষক প্রবন্ধের জের

খেয়ালী মানহানি মামলায় দণ্ডিত খেয়ালী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযোগজীবন ব্যানার্জ্জির পক্ষ হইতে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীলের আবেদন করা হইয়াছিল। সোমবার বিচারপতি মিঃ কানলিফ ও বিচারপতি মিঃ হেণ্ডারসন তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ও ৫০২ ধারা মতে যোগজীবনবাবুকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ১৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ২৪ পরগণার জিলা জজের নিকট আপীল করিলে জজ আসামীর দণ্ডকাল হ্রাস করিয়া তাঁহার প্রতি নয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দিয়াছিলেন।

আপীলের আবেদন অগ্রাহ্য করিবার কালে বিচারপতি মিঃ কানলিফ, নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা অনাবশ্যক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।'

মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি, মিঃ এস, সি তালুকদার ও অজিতকুমার দত্ত দরখাস্তকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

হাইকোর্টে আপীলের আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ায় "খেয়ালী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় নয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ উদ্দেশ্যে সোমবার আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আত্মসমর্পণ করেন।

কারাবরণের পূর্ব্বে "খেয়ালী"র অন্যান্য সহকর্ম্মী শ্রীসুবোধ রায়, শ্রীবিশ্বাবসু রায় চৌধুরী, শ্রীরমেশচন্দ্র গুপ্ত ও পরিচালক বোর্ডের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীর বসু, শ্রীকালী শঙ্কর মিত্র ও বি, সরকার যোগজীবনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

শ্রীদুর্ব্বাসা

তাসের চাল ও তার সংজ্ঞা :— কোন্ অবস্থায় কখন কি চাল দেওয়া যুক্তিযুক্ত সে সম্বন্ধে গত সপ্তাহে কিঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে। এবারে তার অন্যান্য নিয়মগুলি এবং তার উদাহরণ আপনাদের জানাব। তাসের চাল দেবার তৃতীয় নিয়ম হচ্ছে এই যে যখন আপনার হাতে কোন রঙে অল্প তাস থাকে, অর্থাৎ চারখানি তাসের চেয়েও কম তাস থাকে তবে সাধারণতঃ সর্ব্বোচ্চ তাসখানি পেড়ে খেলাই বিধেয়। বিশেষতঃ যখন আপনার হাতে এই রঙের বড় তাস থাকবে না তখন এই নিয়ম লঙ্ঘন না করাই সঙ্গত। কোন রঙে নয়, সাত্তা বা আটা, ছক্কা এই ধরণের মাত্র দুইখানি তাস থাকলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাসটিই প্রথমে খেলা উচিত। এমন কি এই অবস্থায় কোন হাতে শুধু টেক্কা সাহেব থাকলেও প্রথমে টেক্কা খেলে নিয়ে তবে সাহেব খেলা উচিত। কেন না অন্য ক্ষেত্রে কোন রঙে টেক্কা সাহেব ব্যতীত অন্য ছোট তাস হাতে থাকলে গোড়ায় সাহেব খেলাই নিয়মসঙ্গত। সুতরাং কোন রঙে টেক্কা পেড়ে খেলা হলেই বুঝতে হবে যে ক্রীড়কের হাতে এই টেক্কা সাহেব ব্যতীত সেই রঙে আর কোন তাস নাই। যদি কোন রঙে অনার বিহীন তিনখানি তাস আপনার হাতে থাকে, তা' হলে প্রথমে বড় তাসখানি পেড়েই খেলতে হবে। অতএব কোন রঙে নয়, সাত্তা, তিরি থাকলে নিয়ম অনুযায়ী আপনার চাল হবে নয় পেড়ে খেলা। কিন্তু যদি টেক্কা, সাহেব, বিবি বা গোলাম একরঙে তিনখানি তাস থাকে তা' হলে ছোট তাস খেলাই আপনার পক্ষে ভাল। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে এই রঙ পেড়ে খেলাই নীতিবিরুদ্ধ; কারণ কোন রঙে একটি অনার সমেত বা অনানুক্রমিক একাধিক অনার সমেত (honours not in sequence) তিন তাস নিয়ে সেই রঙে খেলা আরম্ভ করা কদাচ সমীচীন নয়।

(৪) রঙের খেলায় খেঁড়ীর কথিত রঙে খেলা আরম্ভ করতে হলে তিনখানি বা তন্নিম্ন তাস নিয়ে সর্ব্বোচ্চ তাসখানি খেলাই সুফল-প্রদায়ক। অন্যথা যদি ক্রীড়কের হাতে খেঁড়ীর কথিত রঙে চারখানি তদূদ্ধ তাস থাকে তবে শক্তির পর্য্যায়ানুযায়ী চতুর্থ তাসখানি পেড়ে খেলা সুবিধাজনক। অপর পক্ষে হাতে টেক্কা বা ক্রমানুযায়ী সুসজ্জিত অনার বর্ত্তমান থাকলে স্বতন্ত্র কথা; এ ক্ষেত্রে বড় তাসের দ্বারা চাল আরম্ভ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রথম চালের তাৎপর্য্য :— যখন কোন রঙে প্রথম খেলা হয় আরম্ভ-কারীর চাল দেখে অনেক তথ্য আবিষ্কার করা যায়। আরম্ভকারীর প্রথম তাস দেখেই বিশ্লেষণ করা উচিত কেন তিনি উক্ত তাসখানি প্রথমে খেললেন। তাঁর হাতে কি কি তাস থাকা সম্ভব এরূপ বিচারে সুন্দররূপে আয়ত্ত করা যায়। কোন তাসে কিরূপ ধারণা করা সঙ্গত নিম্নে লিখিত হল।

(১) টেক্কা পেড়ে খেললে বুঝতে হবে যে সম্ভবতঃ ক্রীড়কের হাতে সেই রঙের স্বল্প তাস বর্ত্তমান, অর্থাৎ হয় তাঁর হাতে শুধু টেক্কা না হয় তো টেক্কা সাহেব আছে। কখন কখন সাহেববিহীন পাঁচ বা তদূদ্ধ তাস সমেত টেক্কা হাতে থাকলে টেক্কা পেড়ে খেলা হয়ে থাকে। তবে যদি টেক্কা পেড়ে খেলবার পর সেই রঙের ছোট তাস খেলা হয় তা' হলে ক্রীড়কের হাতে যে সাহেব নাই ইহা সুনিশ্চিত। খেঁড়ীর কথিত রঙে যদি আরম্ভকারী টেক্কা পেড়ে খেলেন তবে কোন বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করা যায় না।

(২) সাহেব পেড়ে খেলা হলে বুঝতে হবে যে ক্রীড়কের হাতে টেক্কা সাহেব বা সাহেব বিবি সমেত তিন তাস বর্ত্তমান। যদি আরম্ভকারীর হাতে টেক্কা না থাকে অথচ তিনি সাহেব পেড়ে খেলেন তা' হলে বুঝতে হবে সাহেব বিবি ব্যতীত তাঁর হাতে গোলাম বা দশ আছেই। কিন্তু অন্যান্য অনারবিহীন সাহেব থাকলেও খেঁড়ীর কথিত রঙে প্রথমে খেলা যায়।

(৩) প্রথমে বিবি বা গোলাম খেলা হলে

বুঝতে হবে বিবি বা গোলাম শীর্ষক তিন বা তদুর্দ্ধ তাস তাঁর হাতে বর্ত্তমান। কখন কখন সাহেব, গোলাম, দশ সমেত চার বা তদুর্দ্ধ তাস নিয়ে গোলাম পেড়ে খেলা যায়। আবার কখন মাত্র বিবি গোলাম বা গোলাম দশ থাক্‌লেও যথাক্রমে বিবি বা গোলাম পেড়ে খেলা হয়। একক বিবি বা গোলাম আদৌ আশা করা যায় না।

(৪) প্রথমে দশ খেলা হলে কিছুই ধারণা করা সম্ভবপর নয়। দুই, তিন, চার বা তদুর্দ্ধ তাস হাতে থাক্‌লে প্রথমে দশ চাল দেওয়া চল্‌তে পারে। কখন কখন বিবি, দশ, নয় সমেত দীর্ঘ রঙ থাকলে দশ পেড়ে খেলা হয়; আবার এক তাসেও দশ পেড়ে খেলা হয়ে থাকে।

(৫) আরম্ভকারী নয় বা আটা খেল্‌লে বুঝতে হবে যে তাঁর হাতে এই রঙে খুব সম্ভব দুই তাস আছে কিম্বা তিন তাস থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। কখন কখন একতাসও হতে পারে।

(৬) আরম্ভকারী সাতা, ছক্কা বা পাঞ্জা খেল্‌লে বোঝা উচিত যে, হয় তাঁর হাতে এই রঙের অত্যন্ত অল্প তাস আছে এবং উক্ত তাসখানি তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নয় দীর্ঘ তাস বর্ত্তমান এবং তন্মধ্যে উক্ত তাসখানি শক্তির পর্য্যায়ে চতুর্থ তাস। অবশ্য "Rule of Eleven" নিয়ম দ্বারা বোঝা যায় যে তাঁর হাতে উক্ত রঙে স্বল্প তাস কি দীর্ঘ তাস বর্ত্তমান। এগারো থেকে আরম্ভকারীর তাসের সংখ্যা বাদ দিলে অনেক সময় দেখতে পাবেন যে আপনার হাতে এবং রঙ কর্ত্তার খেঁড়ীর হাতে এতগুলি বড় তাস আছে যে উক্ত তাস তাঁর শক্তির পর্য্যায়ে চতুর্থ স্থান পেতেই পারে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁর হাতে স্বল্প তাস বর্ত্তমান, অন্যথা তাঁর হাতে দীর্ঘ তাস আছেই।

(৭) চৌকা বা তিরি খেলা হলে বোঝা উচিত উক্ত রঙে ক্রীড়কের হাতে দীর্ঘ তাস বর্ত্তমান এবং উক্ত তাসখানি শক্তির পর্য্যায়ে চতুর্থ তাস। যদি তন্নিম্ন তাস বা তাসগুলি আপনার হাতে বা রঙ কর্ত্তার খেঁড়ীর হাতে থাকে বা প্রথম পিটেই ফেলা হয় ত' হলে সঠিক নিরূপণ করা যায় যে আরম্ভকারীর হাতে ঐ রঙের মোট চারখানি তাসই বর্ত্তমান। অন্যথা তাঁর হাতে পাঁচখানি তাস থাকা সম্ভবপর। এ চৌকা বা তিরি একতাসে কি না অন্যান্য হাত পর্য্যবেক্ষণ করে সঠিক নির্দ্ধারণ করা যায়।

(৮) আরম্ভকারী যদি দুরি খেলেন তবে বুঝতে হবে যে তাঁর হাতে সেই রঙে হয় ঠিক চারখানি তাস নয় মাত্র একখানি তাস (উক্ত তাস) বর্ত্তমান। কখন কখন একখানি অনার সমেত তিন তাস রঙ নিয়ে খেল্‌তে বাধ্য হলে একেবারে ছোট তাসখানিই খেলা বিধেয়। মনে করুন আপনার হাতে আছে সাহেব, সাতা, দুরি বা বিবি, পাঞ্জা, দুরি কিম্বা গোলাম, আটা, দুরি, তখন আপনাকে দুরি পেড়েই খেল্‌তে হবে।

———

কর্পোরেশন সংবাদ

প্রকাশ যে, আসন্ন মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ২১ নম্বর ওয়ার্ড হইতে রায় বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের মনোনয়ন প্রার্থী হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিশিষ্ট অধ্যাপক আমাদের জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং তিনি ৩ নম্বর ওয়ার্ড হইতে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়াছেন।

প্রকাশ যে, ২৭ নম্বর ওয়ার্ড হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য ঘোষ কংগ্রেস মনোনয়ন প্রার্থী হইয়াছেন। মিঃ এন, সি, সেনও নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইবেন বলিয়া প্রকাশ।

তরুণ প্রখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দাস ২৫ নম্বর ওয়ার্ড হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। ইনি খিদিরপুর সুইমিং ক্লাবের সম্পাদক, তত্রত্য উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহ-সম্পাদক এবং হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর সদস্য। অর্থাৎ খিদিরপুরের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এইরূপ উৎসাহী কর্ম্মী কর্পোরেশনের সদস্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, উক্ত ওয়ার্ড হইতে অমরবাবুই প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন। সে সংবাদ তবে কি ভুল? তাহাই যদি হয় তবে আরও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, তবে আমরা যে শুনিয়াছিলাম অমরবাবুই খিদিরপুর বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাণস্বরূপ, সে সংবাদও কি ভুল?

কালিঘাট ব্যায়াম সমিতি

গত ৯ই ফেব্রুয়ারি রবিবার অপরাহ্নে কালিঘাট ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গনে উক্ত সমিতির তৃতীয় বার্ষিক ব্যায়াম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও মিসেস্ জে, সি, মুখার্জ্জী পারিতোষিক বিতরণ করেন। প্রদর্শনী সভায় ডাঃ বিষ্ণুপদ ব্যানার্জ্জি এম, বি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী এম, কম, রায় সুধীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, অধ্যাপক হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, ডাঃ কে, ভট্টাচার্য্য এম-বি, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন বি,এ, প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রদর্শনীতে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ কর্ত্তৃক একদিকে গতিশীল দুইটি মোটরকারের গতিরোধ, শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিপরীত দিকে গতিশীল দুইটি মোটরের গতিরোধ, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মোটর দুর্ঘটনা, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কড়ি বাঁকানো ও মৃত্যু-লম্ফ (Fatal jump), শ্রীমথুরা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক পিরামিড ও প্যারালেল্ বার, শ্রীচারু চৌধুরী কর্ত্তৃক বুকের উপর পাথর চাপানো প্রভৃতি ব্যায়াম ক্রীড়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বালক বিভাগের পরিচালক শ্রীবলরাম দাসের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

সরস্বতী পূজা

ভবানীপুর এথ্লেটিক ক্লাবের উনবিংশ বাৎসরিক সরস্বতী পূজা সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূজার দিন নানারূপ গীত-বাদ্যাদির আয়োজন হইয়াছিল। ঐদিন বিভিন্ন সমিতির সম্পাদকগণ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত সকলকেই আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। পরদিন বিরাট শোভাযাত্রা-সহকারে প্রতিমা-বিসর্জ্জন হয়।

সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর উদ্যোগে বালিকা শক্তি সঙ্ঘেও অনুরূপ পূজা (পট) ও উৎসবাদি হইয়াছিল।

শুভ-বিবাহ

গত শনিবার সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিচালক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পারুল দেবীর সহিত জোড়াসাঁকোর শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র শ্রীমান

শ্রীঃ পারুল

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নব-দম্পতির শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

* * *

গত মঙ্গলবার কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ক্রীড়-খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

* * *

গত শনিবার বেঙ্গল টেলের শ্রীমোহিত রায়চৌধুরীর শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

ভবানীপুর সবুজ সমিতি

গত শনিবার—৮ই ফেব্রুয়ারী ভবানী-পুর সবুজ সমিতি কর্ত্তৃক ৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের সাজাহান অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও মোটের উপর উপভোগ্য হইয়াছিল। সাধারণ এ্যামেচার ক্লাবের নিকট ইহার চেয়ে বেশী আশা করিতে পারিনা। সাজাহানের ভূমিকায় বীরেশ্বর বাবুর অভিনয় সুন্দর বলা যাইতে পারে। জাহানারার ভূমিকায় বিভূতি বাবুর অভিনয় দর্শকের প্রাণে আনন্দ দান করিয়াছিল। ঔরংজীবের ভূমিকায় পুরাতন অভিনেতা ডাক্তার রমেশ বাবুর নিকট আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহা পাই নাই। পিয়ারার ভূমিকায় গোবর্দ্ধন বাবুর গানগুলি উপভোগ্য হইয়াছিল। সুজার ভূমিকায় করুণা বাবু ও দিলদারের ভূমিকায় সূর্য্য বাবু বেশ স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। অভিনয় শেষে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী শঙ্কর মিত্র চারিটী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ দুইটী ও ধীরেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাব একটী পদক উপহার প্রদান করিয়া সমিতির সভ্যগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

শতাব্দী সংসদে বাণী পূজা

ভবানীপুর শতাব্দী সংসদে মহাসমারোহে বাণীপূজার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সংসদের সকল সভ্যগণ বাণীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। সন্ধ্যায় সংসদের সভ্যগণ কর্ত্তৃক "সাবিত্রী" গীতাভিনয় হয়। এই গীতাভিনয় বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

অরসিকাসু

শ্রীইনা দেবী

মাষ্টার মশাই এখন ছাত্রের চেয়েও বেশী অমনোযোগী—ছাত্র এখন হিষ্ট্রি বইয়ের সাতের পাতা নয়ের পাতা বারোর পাতা পড়িয়া পাঁচ পাতা পড়িয়া ফেলে, প্রথমটি ও শেষেরটি কষিয়া অঙ্কের উদাহারণ মালা শেষ করে মাষ্টারের তাহা আর লক্ষ্যে আসে না। সকাল বেলা আসিয়া নিজের চেয়ারটিতে বসেন 'ল' বইটার পাতা ওল্টান ও দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া আকাশ পানে চাহিয়া থাকেন। দুই ঘণ্টার ডিউটি মনে হয় যেন কত শীগগির কাটিয়া যায়। দশটা বাজিয়া যায় মাষ্টার মহাশয় তবুও যান না। অগত্যা হীরেন আপন মনেই বলে দশটা বেজে গেল। ওঃ! আজ আবার প্রথম পিরিয়ডেই অঙ্ক, দেরী হয়ে গেলতো দেখছি। মাষ্টার মহাশয় তখন "দশটা বেজে গেল তাইতো" বলিয়া ত্রস্তে ব্যস্তে উঠিয়া পড়েন। কিন্তু এরকমটি আগে ছিল না। এ রকম কড়া মাষ্টারের হাতে হীরেন কখনও পড়ে নাই। দশটা বাজিয়া যায় তবু মাষ্টার ওঠে না। বিকেলে আসিয়া নিজে ফুটবল গ্রাউণ্ডে নিয়া যায়। রাত্রের ডিউটি এমনকি ছুটীর দিনেও কামাই নাই। ফোর্থ ক্লাশের ছেলে হইলেও বয়সে হীরেন ঠিক ফোর্থ-ক্লাশের মত নয়। আড্ডা বন্ধ হওয়ায় সে যা জব্দ হইয়াছিল তা আর বলিবার নয়। এতদিনে যে মাষ্টার মশায়ের সুমতি হইয়াছে তাহার জন্যে উঠানের কালী বাড়ীতে তাহার একটাকা পূজা মানা আছে। মাষ্টারের কিন্তু দক্ষিণের জানালার কাছে পূর্ব্বদিকে মুখকরা চেয়ারখানি। চেয়ারখানা আগে উত্তর দিকে ছিল কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের আজকাল এত অধিক গরম লাগা আরম্ভ হইয়াছে যে জানালার কাছে চেয়ারটি আর না আনিলে চলিল না। কিন্তু হীরেনের লক্ষ্মী হইয়াছে উহাই, কেন না যে দিন হইতে চেয়ারটি পূবমুখো হইয়াছে সেইদিন হইতে মাষ্টার মশাইয়েরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পড়াশুনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও নাই আর ফুটবলের চতুর্দ্দশ পুরুষের গুণগানও নাই। ফুটবলের চাঁদমুখের জায়গা বুঝিবা অন্যেই অধিকার করিল। মাষ্টার মশায়ের মনটাও কোমল হইয়াছে। দুঘণ্টার মধ্যে পাঁচ মিনিট ছুটীও হীরেন পাইত না অথচ সরস্বতী পূজার চাঁদা সংগ্রহের জন্য সেদিন তিনি না চাহিতেই দুঘণ্টার ছুটী মঞ্জুর করিয়া দিলেন, পূজা দেওয়া কি বৃথা হয়।

কিন্তু মাষ্টার পড়িয়াছে বড়ই বিপদে। দক্ষিণের জানালা দিয়া আকাশ দেখিতেই চোখ পড়ে পাশের বাড়ীর একটি জানালা আর রোজই প্রভাতে একখানা ফুলের মত মুখ তাহার পানেই চাহিয়া থাকে। সদ্য ভিজা চুলগুলি এলাইয়া দিয়াছে—পরণে একখানা কালো রঙের সাড়ী। দিব্য ফুটফুটে রঙ সুন্দর মুখখানি। মাষ্টারের যে সুন্দর বলিয়া সুখ্যাতি আছে তাহা এতদিনে সার্থক হইল। কিন্তু তাহার 'ল' কলেজ আর মোহন বাগান সমস্তই ক্রমে ঐ জানালাই বুঝি গ্রাস করে। এ আবিষ্কারটি তাহার বেশীদিন হয় নাই। সেদিন সকাল বেলাই রুমমেটের সহিত বিবাদ করিয়া সুনীলের মেজাজ গরম ছিল। টিউসানিতে আসিয়া ছাত্রকে দুটো অঙ্ক দিয়া এই জানালাটির কাছে আসিয়া বসিয়াছিল—অভিলাষ যে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া মাথাটা ঠাণ্ডা হইবে। কিন্তু ইহা হইতে হইল বিপদের সূত্রপাত। জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া গিয়া একবার যেই উপরদিকে চোখ তুলিয়াছে অমনি চোখাচোখি হইয়া গেল। মেয়েটি এতক্ষণ ঐখানেই বসিয়াছিল তাহাতো সে দেখে নাই। কি দেখিতেছিল? তাহাকে কি? কি জানি হইতেও পারে। সুনীলের রূপের গরব ছিল; কিন্তু আজ একটি কিশোরী যে গোপনে বসিয়া তাহাকেই দেখিতেছিল এ কথা মনে হইতেই তাহার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল। ঝগড়া করিয়া আসিয়া চুলটাও আজ আচড়ান হয় নাই—জামাটাও ভাল পরিষ্কার নয়। হাতদিয়া চুলগুলি পাট করিতে করিতে অপ্রস্তুতের মত সুনীল বসিয়া পড়িল, মনে করিল আর তাকাইবে না। বাস্তবিক আজ পর্য্যন্ত নিজের প্রিয় ফুটবল ছাড়া অন্যদিকে সে তাকায় নাই। বিশেষতঃ এ বিষয়ে তাহার একটি বিশেষ লজ্জা ছিল। কিন্তু এ তার কি হইল। কিছুক্ষণ অন্যদিকে মন দিয়া থাকিতে থাকিতে মনটা আবার কেমন যেন হইয়া উঠিল। চোখ দুইটা যেন বিদ্রোহ করিয়া ঐ দিকেই তাকাইতে চায়। অগত্যা সুনীল একবার আড়ে তাকাইয়া

…েলিল। কি বিপদ! মেয়েটি তখনও …েমনি করিয়া তাকাইয়া আছে। আচ্ছা …নির্লজ্জতো মেয়েটি। কিন্তু তাহা হউক; …েখিতে বেশ! কাহার মত হইবে? কৈ …েনা কাহারও সহিত তুলনা হয় না। ও …েন কেমন একটি পৃথক রকমের সুন্দর। …চোখ দুইটি—আচ্ছা ইহাকেই কি কবিরা …ঞ্জন আঁখি' বলে। কি জানি।

বেরসিক ছাত্র দুইটি এই সময়েই ডাকিয়া …লিল, 'মাষ্টার মশাই দেখুন না অঙ্কটা …লছে না, দুত্তোর অঙ্ক'।

কিন্তু মেয়েটিও সেই সময় উঠিয়া গেল। অগত্যা সুনীল অঙ্কতেই মন দেয়।

হীরেন কিন্তু অবাক হইয়া যায়। মাষ্টার মশায়ের কথাগুলি যেন মিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

তার পরদিন সুনীল আরও ভোরে আসিয়া উপস্থিত হয়। হীরেনের তখনও জলখাবার খাওয়া হয় নাই। তবু বলে …াহোক আমি বসছি ততক্ষণ।

ভাগ্যে হাতে একটি বই আনিয়াছিল। …াই বই পড়ার দোহাই দিয়া আসিয়া বসে। আশা তাহার নিষ্ফলও হয় নাই। ক্ষণপরেই মেয়েটি আসিয়া দাঁড়ায়। চুড়ীর রিন ঝিন শব্দটা এত স্পষ্ট যে, ভুল হয় যেন তাহার পাশেই দাঁড়াইয়াছে। চোখাচোখি হইতেই মেয়েটি হাসিয়া ফেলে। সুনীলের রক্তস্রোতের গতি সহসা প্রবল হইয়া উঠে। 'কি দুষ্ট মেয়েটি'।

রোজই এমন হয়।

সারাদিন সুনীলের মনটা ছটফট করে কখন রাত পোহাইবে। কতবার মনে হয় কে মেয়েটি। কাদের মেয়ে, নাম কি? হীরেনকে জিজ্ঞাসা করিলেই তো সব মিটিয়া যায়—কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করে—। নেহাৎ বড়লোকের ছেলে বলিয়াই তো নতুবা বয়স তো উহার হইয়াছে। বোঝে তো সবই। তারপর একেই তাহার অন্যমনস্কতায় হীরেন যেন কেমন চাপা হাসি হাসে। সুনীল মধ্যে মধ্যে তো একরকম অসাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু আর কাহাকেই বা বলে। পড়াইতে আসিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া বসিয়া সেই সামান্য ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া যৌবনের প্রথম অনুভূতি দিয়া কল্পনার জাল বুনে।

আচ্ছা, মেয়েটির সহিত তাহার বিবাহ হয়। এখন তো হইতেও পারে তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না। তাহলে এই ব্যাপারটিকে সে কিছুতেই ভুলিবে না। প্রথম পরিচয়ের সময় রবিবাবুর একটা পদ্য বলিলে হয় না। এমন ঘটনা লইয়া কবি তো বহুতই কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু সে কি ছাই পড়িয়াছে একটি। বারীণটা মাঝে মাঝে আওড়ায় তাই শুনিয়াছে।—নাঃ ভাল হয় নাই কালই বারীণের কাছে একটা শিখিয়া লইতে হইবে।

বলিবে হয়তো তোমায় আমি প্রথম দেখেই চিনেছিলাম রাণী যে তুমি আমার। —রাণী! নামটা বড় পুরাণো না: কিন্তু আর কি ই বা বলা যায়। এত মিষ্ট কথা কি আর পুরানো হয়? ইহা কি পুরানো, তবু বড় মিষ্ট! হয়তো বলিবে কি অসভ্য তুমি, অমন করে অন্যের বাড়ীর দিকে হাঁ, করে চেয়ে থাকে কথনো? উত্তরে সে বলিবে আর তুমি? তুমিই তো আগে লুকিয়ে আমায় দেখতে। দেখো আর যেন কারও পানে চেও টেও না উত্তরে বধুর সুন্দর মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া যাইবে। সে রাগিয়া মুখ ফিরাইবে। সুনীল আবার খানিকক্ষণ সাধাসাধি করিবে।—

'মাষ্টার মশায়'

সুনীল বিভোর।

মাষ্টার মশাই ট্রানশ্লেসনের প্যাসেজটি একটু দেখে দিন না।

ট্রানশ্লেসন! ওর অমন ছবিখানি মাটি করিয়া দিল।

ধুত্তোর ট্রানশ্লেসন্। বইখানি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। সুনীল দুই হাতে কপালটা চাপিয়া ধরিয়া বলে আজ থাক হীরু, মাথাটা বড্ড ধরেছে। আমি উঠি আজ, আজ যেন তাহার নেশা ধরিয়াছে। মেসে আসিয়া কোনদিন যাহা করে নাই তাই করে—চীৎপাত হইয়া শুইয়া শুইয়া সেই সব সুখ স্বপ্নের মদিরা পান করে। মেসের চাকর জগবন্ধু ডাকিয়া দেয় তবে গিয়া খায়। খাইয়া আসিয়াই আবার শুইয়া পড়ে।

কোথায় কোথায় যাওয়ার কথা ছিল, কলেজ ছিল কিন্তু কিসের কলেজ আর কিসের কাজ—যে মদিরা সে পান করিয়াছে। বিকেলে একটা ম্যাচ ছিল যাবার কথা তার আগেই ঠিক—কিন্তু তাহার দেখা নাই। অগত্যা ফণী আসিল। তাহার খোঁজ নিতে গিয়া দেখে অবাক্—সেই সুনীল সে কিনা চৌকীর উপর এপাশ ওপাশ করিতেছে। বলিল কিরে অসুখ নাকি? জ্বর?

সুনীল জবাব দিল না। গলাটা যেন ভারী ভারী 'তবে? যাবিনে? হাত ঘড়িটা একবার দেখিয়া বলিল আর মাত্র কুড়ি মিনিট টাইম্। তৈরী হয়ে নে।'

সুনীল তেমনি ভাবে থাকিয়া বলিল 'তোরা যা'। 'তার মানে? যাবিনে তুই?' ফণী যেন আকাশ হইতে পড়ে। ফুটবল যাহার প্রাণ দুই ডিগ্রী জ্বর লইয়া যে ফুটবল খেলিতে গিয়াছে, ফুটবল যাহার মানসী বলিয়া বন্ধু মহলে কত পরিহাস চলিয়াছে, একি সেই সুনীল।

বলিল কিরে 'কি হোল তোর?'

'কি আবার হবে, কিছু না। যা না তোরা'

ফণী তবু বলে 'বল না রে কি হয়েছে।'

সুনীল রাগিয়া বলিল বলছি 'কিছু না।'

'প্রেমরোগ'? এতো দেখছি তারই লক্ষণ। সুস্থ লোকের জল ভাল না লাগা মানে রোগ, আর তোর ফুটবলে অরুচি মানে প্রেমরোগ—এর চিকিৎসা—।

সুনীল গজ্জাইয়া ওঠে—আর তোমার চিকিৎসা করতে হবে না। বেরো বলছি। রোগ ঠাওরাচ্ছেন—এক ঘুঁসিতে দাঁতকটা সব নামিয়ে দেব।

কিন্তু দাঁত ভাঙ্গিলেই যদি ব্যাধি তাহার সারিত। একখানি মুখ রাতদিনই তাহার চোখের সামনে ভাসে। প্রথম বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া বাবার মুখও এমনি রাতদিন চোখের সামনে ভাসিত আর যেদিন ম্যাচে জিতিয়া আসিত সেদিন ও ফুটবলের চাঁদ-মুখ তাহার চোখের সামনে হইতে নড়িতে চাহিত না। এ ওরে কি? আচ্ছা মেয়েটির কথাই বা সে এত ভাবে কেন? ও তার কে? তার সঙ্গে সামান্য একটা মুখের পরিচয়ও নাই। নিজেকে সে এত যে সংযত করিতে চেষ্টা করে তবু কেন সব ভাসিয়া যায়। মেয়েটি যে তাহাকেই দেখে এর তো কোন প্রমাণ নাই। অন্য কিছুও তো দেখিতে পারে। কিন্তু, না—তা'হলে কি রোজই ঐ সময়ে আসিতে হয়। সে ওকেই দেখে। আর না দেখিবেই বা কেন? সুনীলের মত চেহারা কটা লোকের আছে? কিন্তু ওকি শুধু অমন দূর হইতেই সুনীলকে পাগল করিবে, কাছে ও আসিবে না ধরাও দিবে না? আচ্ছা—বিয়ের কথা তুলিলে কেমন হয়। কিন্তু কথা পাড়ে কে? কেন কোন বন্ধুকে দিয়ে বলাইলেই হইবে। ঐ জীবনের বড়দাদার সঙ্গেই তো তার আলাপ আছে। কিন্তু বিবাহ তো এই কয়মাস পরে তাহার ল ফাইনালটা না হইয়া গেলে তো আর হইবে না। এতদিন? ঠিক্ ঠিক্! কোন ছুতায় উহার সহিত আলাপ করিয়া নিলে হয় না। কেন হইবে না। এই যে এত লোকে এত রাশি রাশি গল্প উপন্যাস লেখে সবই কি এমনি মিথ্যা হইতে পারে। তা হইলে কি আর বাজার চলিত। পরদিন—উপক্রমণিকার পাতা খোলাই থাকিল মাষ্টার মশাই গল্প ফাঁদিলেন।

আচ্ছা হীরু, বেথুনের বাস্ তোমাদের এ-পাড়ায় আসে না?

হীরু একটু দুষ্ট হাসি ঠোঁটের তলায় গোপন করিয়া বলিল—কেন স্যর?

সুনীল অপ্রতিভ মুখে বলিল আমার এক চেনা ভদ্রলোক এই পাড়ায় বাসা নিয়েছেন। তাঁর মেয়েকে দেবেন কিনা তাই বলছিলেন।

হ্যাঁ স্যার, আসে। ঐতো ও বাড়ীর যুথি দি যেত। তাও এখন ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে কিনা তাই আর যায় না।

যুথিদি! নামটি বেশ তো! বাঃ ফার্ষ্ট ইয়ার! মেয়েটির পড়াশুনায় মাথা আছে। চোখ দুইটা তাই অত উজ্জ্বল না—বেশ মেয়েটি বেশ।

কিন্তু এখন তো আর ইস্কুল যায় না। কোন কলেজে পড়ে তবে? নাঃ আলাপের সুবিধা হয় কৈ? হীরেনকে জিজ্ঞাসা করিবে? না ছোঁড়াটা বুঝিয়াছে যেন—মুখের ভাব দেখ না। ভালো ডেপো ছেলে বাপু। এ সময়ে নভেলের গল্পর মত ঐ যুথির একটি ছোট ভাই আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহার কপালে কি তাও হইতে নাই। আজ আবার অদৃষ্টও নেহাৎ মন্দ! এতবার তাকাইয়াও তাহার পিপাসাকুল দৃষ্টি একান্তই ব্যর্থ হইল। নাঃ জগতে সুখ-শান্তি সত্যই নাই।

একটুখানি আশা ধরিয়া সুনীল ঠিক সাড়ে দশটার সময় নিত্য হাজিরা দিতে লাগিল। ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে যখন তখন কে জানে কোন বাস টাস অথবা প্রাইভেট

কারও তো আসিয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু কৈ? কাঁহাতক আর ফুটপাথে পায়চারী করা যায়। ধরা পড়ারও সম্ভাবনা আছে লোকেই বা কি মনে করিবে? যাঃ! যেখানে বাঘের ভয়, সন্ধ্যা কি সেইখানেই হইতে হয়! সামনা সামনি দেখা ফণীর সঙ্গে? কিরে এখানে হঠাৎ?

কিইবা বলে! 'না—এই একটু—'

এই একটু কি? ফণী যেন হাসি চাপিতেছে। কি বলা যায়? মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল আমার এক বন্ধু গেছে এই বাড়ীতে তাই তার জন্যে—

'তা আর দাড়িয়ে কি হবে? তুই আয়না আমার সঙ্গে। না, না, সে কি হয়, কথা দিয়েছি যখন সে কি ভাববে।

কি আবার ভাববে—চলনা।

'না, না সে খুব ইনটিমেট্ তো নয়—তা ছাড়া একটু হাতে রাখা দরকার তাকে।'

'অগত্যা' বলিয়া ফণী চলিয়া গেল। যে নাছোড়বান্দা—গেল যে এই ভাগ্যি। এত চেষ্টা কিন্তু বৃথাই। কোথায় কি? হতাশ হইয়া সুনীল যখন মেসে ফিরিল তখন সাড়ে এগারটা।

কয়দিন এমনি চলিল। মনটা আর ভাল লাগে না। শরতের নীল আকাশ মনে হয় যেন কাল মেঘে ঢাকা। ট্রামবাসের শব্দ কাণে যেন বিষ ঢালে। ফুটবল যে 'ফুটবল তার নাম শুনিলেও যেন গায়ে জ্বালা ধরে। পড়াইতে, পড়িতে কিছুতেই মন নাই। পাশের বাড়ীর জানালাতে আবার স্ক্রীন উঠিয়াছে। কেন বাপু। সে তো কিছু চাহে নাই শুধু না হয় একটু দেখিত। তা'তে তো তোমাদের কিছু ক্ষতি হইত না—ক্ষইয়াও যাইত না। কি কুক্ষণে যে সে দেখিয়াছিল তা'কে। এমন গ্রহে মানুষ পড়ে পড়াশুনা গিয়াছে চুলায়। পড়িতে কি চাই ইচ্ছা করে—পাশ যে কি করিয়া করিবে। শুধু চোখের দেখা—এ কি প্রেম না নেশা।

মাথা ঠাণ্ডা করিতে সে রওনা হইল লেকের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাসে উঠিয়াই তাহার যে কি হইল তাহা সে আর ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিবে না! কোন মতে পাশের বেঞ্চিটা ধরিয়া সামলাইয়া লইল। যাহার জন্য তাহার শান্ত প্রকৃতি এত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে সেই—ঐ তো যুথিই তো, সীট্ও পাইয়াছে ঠিক উহার পিছনের বেঞ্চিতেই, একবার ভাল করিয়া সুনীল দেখিয়া লইল। পিছন হইতে যে টুকু দেখা যায়, এলো খোঁপা, শাড়ীর আঁচলটুকু, মুখের অস্পষ্ট আভাষ, তাই যেন তার রক্ত চলাচল দ্রুত করিয়া দিল।

যুথি, সেই যুথি। হায় ভগবান আলাপ করিবার যদি একটা সুযোগ ঘটাইয়া দাও। সুনীলের যখন ঐ অবস্থা তখন একবার পিছন দিকে তাকাইল। তারপর ভ্রু দুইটি একটু নাচাইয়া ফিক করিয়া একটু হাসিয়া জানালা দিয়া বাহির পানে চাহিয়া রহিল। সুনীল যেন ক্রমেই দ্রবীভূত হইতেছে। মনে মনে শতবার বলিতেছে "আজিকার এ ক্ষণ হয়োনা নিঃশেষ।" মেয়েটি বোধহয় বীরধর্ম্ম জানে না; তাই ঐ আহতকে ঐটুকু সময়ের মধ্যে হাসি এবং দৃষ্টির অনেকগুলি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিয়া তুলিল।

সুনীল যে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারে না। সে যেন আর তাহাতে নাই—এ যেন ভক্তের সমাধি। টুং করিয়া একটু শব্দ হইয়া বাস্ থামিতে তাহার খেয়াল হইল। মেয়েটি তখন নামিয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া মেয়েটির ঘাড়ের উপরই বোধ হয় পড়িয়াছিল। তাহার হাত হইতে একখানা বই পড়িয়া গেল। সুনীল ব্যস্ত হইয়া বইখানি তুলিয়া দিল।

'থ্যাঙ্কস্' বলিয়া বইখানি তুলিয়া নিয়া মেয়েটি মুখ টিপিয়া কেমন যেন হাসিল।

সুনীল নামিয়া পড়িল। মেয়েটি ফুটপাথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। সুনীলও স্পাইয়ের মত অন্য ফুটপাথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। ঠিক তাহার পিছু পিছু যাইতে কেমন যেন লজ্জা করিতে ছিল। মেয়েটি কি তাহাকে ডাকিল? তাহার ঐ টেপা হাসিটুকু আর ঐ চঞ্চল চোখ দু'টি কি একটা ইঙ্গিত দিল না। কি জানি। সত্যিই কি কিছুই বলিল? কি তবে উদ্দেশ্য, সে কি কিছু বলিবে, তার এতদিনের আশা কি সিদ্ধ হইবে তবে। ভগবান তাহার ডাক তাহলে বুঝি সত্যই শুনিয়াছেন। ঐ যে গেট্ দেওয়া বাড়ীটার পাশেই একটা পার্ক না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ জায়গাই বেশ উপযুক্ত। যুথি কি তাহাকে সেইখানেই লইয়া যাইতেছে নাকি? কিন্তু কৈ? গেট দেওয়ার বাড়ীটার কাছে আসিয়া যুথি একটু থামিল। সুনীল আর থাকিতে পারিল না। রাস্তা পার হইয়া একেবারে যুথির নিকটে আসিয়া হাজির। যুথি তখন গেট খুলিতেছে।

সুনীল মরিয়া হইয়া ডাকিল 'একটু শুনবেন।'

চেতনমিতি

শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ল্যাবরেটারী ইনচার্জ্জ, রাধা ফিল্ম কোম্পানী

আলোকচিত্রণ বিজ্ঞানে চেতনমিতি এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছে। আজ যে চলচ্চিত্র-শিল্প দ্রুতবেগে মানবের কল্পনাসীমা ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহারও অগ্রদূত চেতনমিতি। যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র বর্ত্তমান যুগের দ্রুত প্রসারণশীল চলচ্চিত্র-শিল্প-সৌধের ভিত্তিশিলা স্থাপন করিয়াছে, এই স্থানে তাহার সংক্ষিপ্ত জন্মকথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ক্লদে (Claudet) দাগের প্রবর্ত্তিত ধাতু ফলকের (Daguerreo-type plate) চেতনাঙ্ক (speed) নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত "আলোকচিত্রমান" যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। এই যন্ত্র সাহায্যে কোনও আলোকচেতন পদার্থের উপর সুস্পষ্ট চিহ্নপাতনের উপযোগী আলোক সংস্পর্শ (exposure) নির্দ্ধারিত করা যাইত। যদিও এই অসংস্কৃত পদ্ধতি (crude method) সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ছিল না, তবুও একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে এই অসম্পূর্ণ যন্ত্রই পরবর্ত্তীকালের চেতনমিতি শাস্ত্রের গোড়া পত্তন করিয়াছে।

ফার্ডিনাণ্ড হার্টার (Ferdinand Hurter) নামক একজন সুইজার্লাণ্ডবাসী শৈশবে রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া রঞ্জন বিজ্ঞানে (Dye-chemistry) বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। পরিণত বয়সে তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া ইউনাইটেড্ আলকালি কোম্পানীর (United Alkali company) প্রধান রাসায়নিকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ঐ সময়ে বেরো. সি ড্রিফিল্ড (Vero C. Driffield) নামক একজন ইংরাজ যন্ত্রবিদ্ উপরিউক্ত কার্য্যালয়ে যোগদান করেন, এবং অল্পকাল মধ্যে উভয়ের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই দুই বৈজ্ঞানিকের মিলন চেতনমিতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা, কারণ ইহাদেরই সংযুক্ত গবেষণার ফলে আধুনিক চেতনমিতি শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। আলোকচিত্রণ বিদ্যার অনুশীলনে ড্রিফিল্ডের প্রকৃতিগত অনুরাগ ছিল, এবং অবসর সময়ে প্রায়ই তিনি এবিষয়ের গবেষণা ও পরীক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ড্রিফিল্ডের সাহচর্য্যে হার্টারের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হইল, এবং দুই বন্ধু মিলিয়া আলোকচিত্রণ বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহারা আলোকচেতন পদার্থের উপর আলোকের প্রভাব সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই প্রকারের কার্য্য সেই সময় অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল, কারণ, তখনও জিলাটিন ফলকের আবিষ্কার হয় নাই, একমাত্র কলোডিয়ন্ ফলকই প্রচলিত ছিল। এতদ্ভিন্ন তখন আলোকসংস্পর্শের নির্দ্ধারণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল, এবিষয়ে আলোকচিত্রকরদিগকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইত। সুতরাং আলোকসংস্পর্শ নির্দ্ধারণই হার্টার ও ড্রিফিল্ডের প্রথম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

উত্তরে যুথি ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে একবার ঘাড় ফিরাইল। তারপর সুনীলের আকুল দৃষ্টিকে স্তম্ভিত করিয়া দুইটি পদ্মপেলব ওষ্ঠপুটের অন্তরাল হইতে রসনার শাণিত ছুরীর মত ক্ষণমাত্র উঁকি দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুনীল যখন পায়ের তলায় মাটি পাইল যুথি তখন নাই।

ধরণী দ্বিধা হও।

এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রথমতঃ দিবালোক-রশ্মির রাসায়ণিক শক্তি নিরূপণে মনোনিবেশ করিলেন, এবং ইহার ফলে রশ্মিমান যন্ত্রের (Actinometer) আবিষ্কার হইল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হাটার ও ড্রিফিল্ডের প্রথম সংযুক্ত গবেষণা প্রকাশিত হইল। এই মৌলিক প্রবন্ধে আলোকচিত্রণ ফলকের সচেতনতা (sensitivity) নির্দ্ধারণের এক নূতন উপায় বিবৃত হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব (density), স্বচ্ছতা (transparency) ও অস্বচ্ছতা (opacity) এবং ইহাদিগের পরিমাপন সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইল। বিকাশন (development), ক্রমবিন্যাস (gradation), তীব্রকরণ (intensification), লঘুকরণ (reduction) এবং চেতনাঙ্ক পরিমাপন সম্বন্ধেও সর্ব্বত্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইল।

হাটার ও ড্রিফিল্ড রেখাচিত্রদ্বারা (graphically) আলোকচেতন মণ্ডের (photo emulsion) উপর আলোকের ক্রিয়া নির্দ্ধারণের এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বিভিন্ন ক্রমের আলোক সংস্পর্শ ও তদনুবর্ত্তী ঋণাত্মক (negative) চিত্রের ঘনত্ব পরস্পরের বিপরীত বিন্দুপাত (plot) করিয়া এই রেখাচিত্র পাওয়া যায়। ইহাই এইচ্ এবং ডি রেখাচিত্র নামে বিশ্রুত।

ঋণাত্মক চিত্রে অসমঘাতী (hetero-geneous) রৌপ্যমাত্রা বিদ্যমান। ইহাতে বিভিন্ন আলোক সংস্পর্শের প্রভাব যথাযথভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। মণ্ডপৃষ্ঠ (emulsion surface) সমরূপে আলোক স্পৃষ্ট হইলে এই অসুবিধা থাকে না। এই উদ্দেশ্যে হাটার ও ড্রিফিল্ড চেতনমান যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। একটী প্রমাণ (standard) স্পার্মাসেটি (Spermaceti) বর্ত্তিকা, একটী ঘূর্ণ্যমান খণ্ডচক্র (sector wheel) এবং একটী ফলকাধার এই যন্ত্রের অঙ্গ। পরীক্ষনীয় আলোকচেতনফলকসহ ফলকাধার খণ্ডচক্রের পশ্চাতে এবং স্পার্মাসেটী বর্ত্তিকা উহার সম্মুখে স্থাপিত ছিল। খণ্ডচক্রে পরপর নয়টি কোণবিশিষ্ট ছিদ্র (angular aperture) ছিল; প্রথমটী ১৮০ ডিগ্রী, দ্বিতীয়টী ৯০ ডিগ্রী, তৃতীয়টী ৪৫ ডিগ্রী, চতুর্থটী ২২॥ ডিগ্রী, এবং এইরূপ প্রত্যেক পরবর্ত্তী ছিদ্র পূর্ব্ব ছিদ্রের অর্দ্ধেক।

পরবর্ত্তী যুগের অধিকতর সুসংস্কৃত চেতনমান প্রায় তিন ফুট দীর্ঘ একটী আয়তাকার বাক্স। বাক্সের একদিকে দীপ কক্ষে একটী প্রমাণ পেণ্টন (pentone) দীপ এবং অপরদিকে পূর্ব্বোক্তরূপ খণ্ডচক্র ও তৎপশ্চাতে ফলকাধার প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত একটী লম্বা ছিদ্র। ফলকাধারের আবরণ উঠাইয়া এবং খণ্ডচক্রটী ঘুরাইয়া আলোক সংস্পর্শ করা হয়।

হাটার ও ড্রিফিল্ড চেতনমান যন্ত্রে একখানা আলোকচিত্রণফলক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আলোকস্পৃষ্ট করিয়া উহা পরে

বিকাশিত (develop) করিলেন। বিকাশন-কার্য্য সম্পন্ন হইলে উহার পরবর্ত্তী প্রক্রিয়া হইল ঘনত্ব নিরূপণ। এই উদ্দেশ্যে হার্টার ও ড্রিফিল্ড একটী তৈলবিন্দু দীপ্তিমানের (greasepot photometer) সাহায্য লইয়াছেন। আজকাল ঘনত্ব নিরূপণের নিমিত্ত ঘনত্বমান যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে।

ঘনত্ব নিরূপিত হইলে আলোক সংস্পর্শ ও ঘনত্বের সম্বন্ধজ্ঞাপক রেখাচিত্র অঙ্কিত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে চেতনমানের খণ্ডচক্রে নয়টী কোণবিশিষ্ট ছিদ্র আছে, এবং এই ছিদ্রগুলি ক্রমান্বয়ে দুইএর অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং নয় ক্রমের আলোক সংস্পর্শও উত্তরোত্তর ঐ অনুপাতে বর্দ্ধিত। ঘনত্ব অস্বচ্ছতার (opacity) সাধারণ লঘুগণক (natural logarithm), অর্থাৎ ইহা একটী লঘুগণকীয় আবলম্বা (logarithmic function)। অতএব, রেখাচিত্রে আলোক সংস্পর্শেরও লঘুগণক বিন্দুপাত (plot) করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সারনীতে (table) চেতনমানের বিভিন্ন ক্রমের আলোক সংস্পর্শ লঘুগণকীয় মানসহ প্রদর্শিত হইল।—

ক্রম সংখ্যা	আপেক্ষিক আলোক সংস্পর্শ	লঘুগণকীয় মান
১	১	০·০০।
২	২	০·৩০।
৩	৪	০·৬০।
৪	৮	০·৯০।
৫	১৬	১·২০।
৬	৩২	১·৫০।
৭	৬৪	১·৮০।
৮	১২৮	২·১০।
৯	২৫৬	২·৪০।

নিম্নদর্শিত রেখাচিত্রে এই সকল লঘুগণকীয় মান অনুবর্ত্তী ঘনত্বের বিপরীত বিন্দুপাত করা হইয়াছে,—

হার্টার এবং ড্রিফিল্ডের রেখাচিত্র

আলোক স্পর্শের লঘুগণক
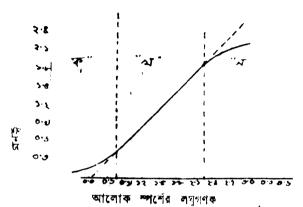
পূর্ব্বচিত্রে প্রদর্শিত লক্ষণবক্র (characteristic curve) তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 'ক' অংশে লক্ষণবক্রের ঢাল (slope) ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং ইহাই ন্যূনালোকস্পর্শ (under exposure) ভাগ। 'খ' অংশে বক্রের গতি সরল এবং যথার্থ আলোকস্পর্শ সূচিত হয়। সরল রেখাতে ইহাও নির্দ্দেশ করে যে ঘনত্ব আলোক সংস্পর্শের সমানুপাতে বর্দ্ধিত হয়।

'গ' অংশ অত্যালোক স্পর্শ (over exposure) ভাগ, এই অংশে বক্রের ঢাল ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। এই প্রকার লক্ষণবক্র হইতে হার্টার ও ড্রিফিল্ড কয়েকটী প্রয়োজনীয় নিয়তাঙ্ক (constant) নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যথা, চেতনাঙ্ক (speed), আলোক স্পর্শ প্রসার (latitude of exposure), ও বিকাশন গুণাঙ্ক অথবা গ্যামা (development factor or gamma)।

চেতনাঙ্ক গণনা করিতে প্রথমতঃ মণ্ডের জড়ত্ব (inertia) নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইচ এবং ডি বক্রের সরলাংশ প্রসারিত করিলে যেখানে আলোক স্পর্শের অক্ষ (axis) কর্ত্তিত হয়, সেই বিন্দুতে meter-candle-secondএ কক্ষে আলোকস্পর্শের মানকে (value) জড়ত্ব বলা হয়। জড়ত্বের ব্যুৎক্রমকে (reciprocal) একটী নিত্যরাশি (constant number) দ্বারা গুণ করিলে মণ্ডের চেতনাঙ্ক পাওয়া যায়। হার্টার ও

ড্রিফিল্ডের প্রণালীতে এই নিত্যরাশি ৩৪। নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা জড়ত্ব ও চেতনাঙ্কের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে।—

চ= $\frac{১}{জ}$ × ৩৪। চ=চেতনাঙ্ক; জ=জড়ত্ব।

আলোক সংস্পর্শ অক্ষের উপর লক্ষণবক্রের সরলাংশের পরিক্ষেপের (projection) অন্তর্বর্ত্তী আলোকস্পর্শের' একক সংখ্যা আলোকস্পর্শ প্রসার নির্দ্দেশ করে।

লক্ষণ বক্রের সরলাংশ আলোকস্পর্শের অক্ষের সহিত যে কোণের সৃষ্টি করে ঐ কোণের স্পর্শজ্যাকে (tangent) গ্যামা অথবা বিকাশনগুণাঙ্ক বলা হয়। গ্যামা আলোক-চিত্রণমণ্ডের বিকাশন মাত্রা।

এইচ এবং ডি প্রণালী ছাড়া চেতনাঙ্ক নির্দ্ধারণের আরও কয়েকটী প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু, কোনটীই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হয় নাই। এই সকল প্রথা মণ্ডের একই ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা দুরূহ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ৩৪ সংখ্যাকে মণ্ডের জড়ত্ব দ্বারা ভাগ করিলে এইচ এবং ডি চেতনাঙ্ক সংখ্যা পাওয়া যায়। ৫০ সংখ্যাকে জড়ত্ব দ্বারা ভাগ করিলে ওয়াট্‌কিন্ (Watkin) চেতনাঙ্ক সংখ্যা পাওয়া যায়। ওয়াট্‌কিন্ চেতনাঙ্ক সংখ্যার বর্গমূল সম্বলিত একটী সূত্র(formula) হইতে হ্বাইন্(Wynn) সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহা f/x এই সাঙ্কেতিক দ্বারা সূচিত হয়। এইচ এবং ডি প্রথায় চেতনাঙ্ক লিখিত সংখ্যার সমানুপাতী, অর্থাৎ ২০০ চিহ্নিত ফিল্মের চেতনাঙ্ক ১০০ চিহ্নিত ফিল্মের চেতনাঙ্কের দ্বিগুণ। হ্বাইন্ প্রথায় আপেক্ষিক চেতনাঙ্ক উল্লিখিত সংখ্যার বর্গফলের সমানুপাতী। f/64 চিহ্নিত মণ্ডের চেতনাঙ্ক f/128 চিহ্নিত মণ্ডের চেতনাঙ্কের এক চতুর্থ অংশ। জার্ম্মানী, বেলজিয়ম ও মধ্য ইউরোপের অন্যান্য দেশে এইচ এবং ডি প্রথার প্রচলন নাই, ঐ সকল স্থানে শিনার ডিগ্রীতে চেতনাঙ্ক সূচিত হয়। এইচ এবং ডি প্রথায় মণ্ডের যে ধর্ম্মের বিবেচনা করা হয় শিনার (scheiner) প্রথায় তাহা ছাড়া ভিন্ন ধর্ম্মের বিবেচনা করা হয়, সুতরাং এইচ এবং ডি সংখ্যায় শিনার সংখ্যার কোন নির্দ্দিষ্ট তুল্যাঙ্ক (equivalent) নাই। সুতরাং এইচ এবং ডি সংখ্যাকে শিনার ডিগ্রীতে রূপান্তরিত করা দুরূহ। অথচ, অনেক আলোকতড়িৎ কোষ (photo-electric cell) শিনার ডিগ্রীতে চিহ্নিত থাকাতে উক্ত দুই প্রথার সম্বন্ধ জানা না থাকিলে আলোক সংস্পর্শ কার্য্যে অনেক অসুবিধা হয়। নিম্নপ্রদর্শিত সারণীতে (table) কয়েকটী এইচ এবং ডি সংখ্যার শিনার ডিগ্রীতে তুল্যাঙ্ক প্রদত্ত হইল।—

এইচ এবং ডি	শিনার
১৫০	১৪
২৪০	১৬
৩০০	১৭
৩৯০	১৮
৫০০	১৯
৬৩০	২০
৮০০	২১
১০৫০	২২
১৩০০	২৩
১৭০০	২৪

(ক্রমশঃ)

হে মোর অপরিচিতা

[উপন্যাস]

শ্রীসুপ্রিয় সোম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি যখন একাগ্রমনে তনিমার কথাটা ভাবছিলেম, সেই সময় তনিমা আমার কপালে ফেলে-পড়া চুলগুলো ভাল করে সরিয়ে দিয়ে ঘামটা মুছিয়ে দিচ্ছিলো। তার হাতটা আমার কপালের ক্ষত চিহ্নতে গিয়ে লাগল, অনুভব করতে পারলেম। অনেকক্ষণ ধরে তনিমা সেই চিহ্নটাকে দেখতে লাগল। আমি যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছি এমন ভাব দেখালেম। কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলেম সেই ক্ষত চিহ্নের ওপরে তনিমার ওষ্ঠ-ঠোঁটের স্পর্শ। সারা অঙ্গে শিহরণ জেগে উঠ্‌ল। মনে পড়লো একটা ছেলেবেলাকার কথা। পড়ে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত পেয়েছিলেম আর মা সেই স্থানটা চুমু খেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ব্যথা সেরে গেছে কিনা। নারীর এই দিকটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয়।

তনিমা একেবারে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে আমার গলার বোতামটা পরিয়ে দিলে। সেটা খোলা ছিলো। আমি ছেলেমানুষের মত সব সহ্য করে যেতে লাগলেম। ইচ্ছে করতে লাগলো তনিমাকে কাছে টেনে নিই, ওর কোলে ঘুমিয়ে পড়ি।

এ কি তোমার জামার যে দুটো বোতাম নেই! তনিমা প্রশ্ন করলে।

মৃদু হেসে বল্লাম, না নেই।

পরিয়ে নিতে পার নি?

আজকে গিয়ে নোব।

তনিমা হেসে ফেল্লে। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, কালকে যদি এসো, তাহলেও দেখব ওগুলো পরান হয় নি।

কেমন করে জান্‌লে, প্রশ্ন করলেম।

মাথা নেড়ে ছেলেমানুষের মত বল্লে, সে আমি জেনেচি। দেখো, আমার কথা ঠিক কিনা।

বড় রাগ হলো। আমি কি সত্যিই এত অসহায় নিজের বোতামগুলো পর্য্যন্ত পরিয়ে নিতে পারি না! বাড়ীতে এসে আগে বোতামগুলো পরিয়ে নিয়ে তবে অন্য কাজে মন দিলেম।

তনিমাকে পাবার আশা দুরন্ত হয়ে উঠতে লাগল। কর্ম্মক্লান্ত হয়ে যখন ফিরে এসে শুয়ে পড়তেম আমার অর্দ্ধ-মলিন বিছানার ওপরে, তখন মনে হতো তনিমার কথা, সে কাছে নেই বলে একটা বেদনাও অনুভব করতেম। যখন এত শ্রান্ত হয়ে পড়ি যে জলের গ্লাসটার জল গড়িয়ে খেতে ইচ্ছে করে না, তখন মনে পড়ে তনিমাকে। যখন বিছানাটা ঝেড়ে ঝুড়ে নিজে পরিস্কার করে নিই, তখনও যে একবার তাকে মনে পড়ে না এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু সবচেয়ে তারে মনে পড়ে তখন, যখন সংসারের অবিচারের ও অত্যাচারের ঘুর্ণিপাকে পড়ে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারি না, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেল্‌তে থাকি। এমনি সময়ে মনে হয় একজনকে ধরে রাখবার বড় প্রয়োজন হয়েচে. একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখবার বাসনা দুর্দ্দান্ত হয়ে ওঠেচে, যে আমাকে ভালবাসে, যাকে আমিও বাসি ভালো। এমনি একজন আমার চিন্তাক্লিষ্ট মাথার ওপরে ছোট্ট একখানি নরম হাত রাখবে, সে আমার দিকে দুটী স্নেহ-কাতর চোখ তুলে চেয়ে জগতের যা কিছু গ্লানি, দুঃখ, অবিচার, অত্যাচার সমস্ত আমার মন থেকে নিমেষে মুছে ফেল্‌বে। জীবনে এক এক সময় মনে হয় জীবনটাকে যেন আর চালিয়ে নিতে পারি না, বড় দুর্ব্বল, বড় পঙ্গু হয়ে গিয়েচ; আন্তরিক ইচ্ছে হয় জীবনটার শেষ অধ্যায়ের পূর্ণচ্ছেদ বসিয়ে দিই, করি

আত্মহত্যা ; এই সময়ে একটুমাত্র স্নেহ-স্পর্শ ও এক ফোঁটা আদরের বাণী আবার জীবনের পরিপূর্ণ তিক্ততাকে মেরে ফেলে মধুর ঐশ্বর্য্যায় ভরিয়ে তোলো। কেন, কেন পুরুষ চেয়েচে নারীকে? শুধুই কি তার দেহের জন্যে, করতে তার নগ্ন-সৌন্দর্য্যের উপভোগ? হয়ত তাই, হয়ত এই সত্যি যে মানুষের উপবাসী দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে পুরুষ ও নারীর সৃষ্টি হয়েছিলো, একজন আর একজনের মুখাপেক্ষী শুধু রক্তের লালসার জন্যেই, আর কিছুই নয়। কিন্তু আমার জীবনটাকে আলোচনা করে দেখতে গেলে দেখতে পাই আমি ঠিক নারীকে ও জন্যেই চাই নি।

সুখের লাগিয়া সংসার পাতবার ইচ্ছে করলেম। তনিমাকে জেনে এসেচি, আমি যে তার সম্বন্ধে কত ভয়ানক অবিচার করেছিলেম, সে জন্যে মনে মনে অনুতাপ হলো। কিন্তু আর নয়, দেরী করা আর চলেনা, ও পুরুষই ঘর বাঁধবার নিবিড় হ'চ্ছে। কিন্তু ঘর বাঁধতে আর হলো না, আগে থাক্‌তেই তার মাল মসলাগুলো পুড়ে গেলো। নবকিশোর এসে বলে গেলো, তনিমার প্রায় একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর। অজ্ঞানের মত হয়ে আছে, ভুল বক্‌চে, আপনাকে সে দেখতে চায়।

মনে পড়ে সেদিন কত দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ছুটে গিয়েছিলেম, জামাটা উল্টো পরে গিয়েছিলেম তা' যতক্ষণ না নবকিশোর দেখিয়ে দিলে ততক্ষণ খেয়ালই হয় নি। কিন্তু তিন চারদিন পরেই জ্বর কমে গেলো, তনিমাও বেশ সুস্থভাবে কথাবার্ত্তা কইতে লাগল। আমাকে তনিমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে হয়, সকলেই চায় তাদের বাড়ীতেই আমি থাকি। আমি থাক্‌লে তনিমা নাকি অনেক সুস্থ বোধ করে, অনেক হাসে, কথাবার্ত্তা কয়।

তনিমার মা ছিলো না একথা এ পর্য্যন্ত বলা হয় নি। তাই যা কিছু সেবা-শুশ্রূষা ঝি-চাকরেরা করেছিলো আর যতদিন জ্বর বেশী ছিলো, ততদিন একটা নার্স ও নিযুক্ত হয়েছিলো। আমরাও যতদূর সাধ্য সেবা-যত্ন করেছিলেম।

সেদিন আফিস থেকে ফিরে এসে দেখ্‌লেম, বাড়ীতে কেউ নেই, নবকিশোর ও তাঁর বাবা উভয়ই বেরিয়ে গেছেন।

তনিমার ছোট ভাইটীও কোথায় খেলা করতে গেছে। বাইরে ঘরে কাপড় জামা বদ্‌লে তনিমার সঙ্গে দেখা করতে তনিমার ঘরে এসে দেখ্‌লেম, সে নেই। বিছানা শূন্য পড়ে আছে। বেশ মনে আছে ; চমকে উঠেছিলাম। জ্বর এখনো একেবারে ছাড়েনি, শরীর তার বড় দুর্ব্বল, আর সে গেলো কোথায়! পেছন ফিরে তাকাতেই দেখ্‌তে পেলেম, ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে দুর্ব্বল শরীরে একটা রেকাবীতে কিছু ফলমূল নিয়ে সে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালো। বিস্ময়ে আমি একটু হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেম। একটু পরে বল্লেম, কোথায় গিয়েছিলে আর কেনই বা গিয়েছিলে? এ বড় অন্যায়। তোমার যে বড়ো দুর্ব্বল শরীর। সে হাস্‌লো, মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। আমার কোনো কথার সে উত্তর দিলে না, রেকাবীটা রেখে আবার ফিরে গেলো।

ওর আচরণ দেখে সত্যি বল্‌চি আমার বিস্ময়ের সীমা ছিলো না। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম।

কিছুক্ষণ পরে তনিমা ফিরলো—হাতে চায়ের বাটী। আমি একটু রেগে ওঠেছিলুম বল্লেম, তুমি শিক্ষিত হয়ে এটুকু বোঝ না যে অসুস্থ শরীরে চলা-ফেরা করলে অসুখ বাড়ে।

তনিমা হাসলে, কিন্তু কোনো উত্তর দিলে না। আমার গলায় এবারে স্নেহের সুর। বল্লেম, ছিঃ তুমি বড় ছেলেমানুষী করচো তনু।

তনিমা হেসে উত্তর দিলে, বসো, বল্‌চি।

আমি বসে পড়লেম। তনিমা আমার সুমুখে রেকাবীটা ধরে বল্লে, খাও।

আমি বল্লেম, খাচ্চি। তুমি মাটীতে রেখে দাও না। রোজই-ত চাকর খাবার নিয়ে আসে, তুমি আজ আবার কেন খাবার

আনতে গেলে? তোমার কী হয়েচে বলোত?

ভূতে ধরেচে, বলে ছেলেমানুষের মত উচ্চ হেসে উঠল। তারপর তার মুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে এলো, গলা হয়ে উঠল ভারী। বল্লে, সংসারটা কেমন ভাবে করব, তাই একটু দেখে রাখছি।

জিজ্ঞাসা করলেম, এইরকম করে কী সংসার করতে হয় নাকি?

হ্যাঁ, হয়।

এই বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তুমি এমনধারা কেন বলোত?

তুমিই ত আমার বিংশ শতাব্দীর উপরে আঘাত করলে। নিষ্ঠুর!

সে হেসে উঠল খিল্‌খিলিয়ে। সে হাসি উপভোগ করলেম, মেঘের ভেতর দিয়ে চাঁদ উঠলে যেমন উপভোগ করি, ঠিক তেমনিধারা। কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে বল্লেম, ছিঃ ছিঃ এ তোমার বড় ছেলেমানুষী! আঃ তুমি মাটিতে রেকাবটা রাখো না আমি খাচ্চি। তোমার হাতটা যে কাঁপচে।

তা কাঁপুক, তুমি খেয়ে নাও আগে।

তার কণ্ঠস্বর আদেশের মত বেরিয়ে এলো অথচ তা কত স্নেহপূর্ণ! আমি তার হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি পারি খেয়ে নিয়ে তাকে মুক্তি দিলেম। চা খেতে খেতে বল্লেম: তুমি শুয়ে পড়ো তনু, আর বসে থেকো না।

তার বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিলো এ বেশ বুঝেছিলেম। তবু সে বল্লে, না, শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, আপিসে তোমাদের বড় কষ্ট হয় না?

বল্লেম, হলে কী হবে, তেমনি মাস গেলে টাকাটা পকেটে আসে।

আচ্ছা, যারা অফিসে চাকরী করে তারা আজকালকার আধুনিক মেয়েদের বিয়ে করে ত?

বড় অদ্ভুত প্রশ্ন! হেসে বল্লেম, কেন করবে না?

তাদের স্বামীদের ত বড় কষ্ট।

জিজ্ঞাসা করলেম, কেন?

বল্লে, আজকালকার অনেক মেয়েরাই স্বামীকে যত্ন-টত্ন করে না। স্বামী তাদের দোসর মাত্র।

উত্তর দিলেম এই ত চাই। বউ হবে, friend companion তুমিই ত একটু যা বেখাপ্পা হয়েচ দেখচি।

একটু ভেবে তমিস্রা বল্লে, বউ যে ঠিক স্বামীর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবে তা অত জানি না। তবে তারা যে গৃহলক্ষ্মী হবে, এটা মানি। অনেক শুনতে পাই যে স্বামী আফিস থেকে এসে দেখলেন, স্ত্রী বাড়ী নেই, বেড়াতে গেচে। এটা কী ঠিক? আফিসে খাটতে করে এসে বাড়ীতে যদি একটু স্ত্রীর হাতের যত্ন না পায়, তাহলে সেটা কী বড়ো কষ্টকর নয়? আজকালকার মেয়েরা কেবল স্ফূর্তিই করলে, একটুও স্বামীকে তাদের দেখবে না? অথচ স্বামীকে ত কত কষ্ট করে রোজগার করতে হয়। তুমিই বলো না? আমি যা বলচি ঠিক কিনা?

ঠিক কি অঠিক অত কথা তখন ভেবে দেখিনি, আজও যে খুব এটা ভেবে রেখেচি তা নয়, সেদিন আমি তনিমাকে আমার কোনো মন্তব্যই দিই নি। তবে বল্লেম: তনিমাকে রাগাবার জন্যে: তুমি বড্ড পুরাণো আমলের লোক তোমাকে নিয়ে আমার চলবে না।

(ক্রমশঃ)

বলি ও যবদ্বীপের নৃত্য

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌

বলি, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি একদিন "বৃহত্তর ভারতে"র অন্তর্ভুক্ত ছিল,—ও আজ পর্য্যন্ত বলি ও ভারতের মধ্যে যে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে—সে সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিবৃন্দ বহু গবেষণা করিয়াছেন। অতএব, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইল।

বলির সভ্যতা—হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার মিশ্রণে গঠিত। বৌদ্ধধর্ম্ম বলিদ্বীপে বহুকাল পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে সঞ্চারিত হয় নাই—ইহাই গবেষকগণের অভিমত। এ দেশীয় হিন্দুগণের তিনটি স্তর—(১) পঞ্চোপাসক, (২) শৈব ও (৩) বৈষ্ণব।

বলিদ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। এ জন্য উহার নানারূপ কবিত্বময় নামকরণও হইয়াছে, যথা—"নন্দন কানন", "চরম স্বর্গ" "সৌন্দর্য্য ও "কল্পনার দ্বীপ" ইত্যাদি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এই দ্বীপটির অধিবাসীদিগের অন্তর ও বাহ্য সৌন্দর্য্যও দ্বীপটিকে পাশ্চাত্য জাতিগণের নিকট বিশেষ লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদিগের দেহসৌষ্ঠব যেমন রমণীয়, চিন্তাধারা, চারুকলাজ্ঞান প্রভৃতিও তেমনি অপূর্ব্ব। যখন এ দেশের পূজার্থিনী নারীগণ মস্তকে পুষ্পফলাদির উপহার ও অর্ঘ্য বহন করিয়া নীরবে তালে তালে পদক্ষেপ করিতে করিতে সূর্য্য, পর্জ্জন্য বা শস্যাধিপতির মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হ'ন, তখনকার সে দৃশ্য কদাপি ভুলিবার নয়। মনে হয়, যেন অষ্টধাতুর সচল প্রতিমার সারি চলিয়াছে। মন্দিরের গ্যামেলানের বাদ্যের ইঙ্গিতে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের গতি তাল লয় বদ্ধ নৃত্যে পরিণত হয়। দেব—"পুরা" বা মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন বা প্রান্তর মধ্যস্থ বিশাল বটতলই বলির নৃত্যাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এ হেন সুন্দর বলিদ্বীপের "প্রাচ্য নৃত্য সম্প্রদায়" কলিকাতায় আসিয়াছে শুনিয়া বলিদ্বীপের দেশী নৃত্য দর্শনের আগ্রহ বিশেষ জন্মিয়াছিল। গত ৩১শে জানুয়ারী "ছায়া" কর্ত্তৃপক্ষের আবাহনে সে আগ্রহ মিটিয়াছে। অবশ্য এ নৃত্যের প্রদর্শনীতে যে বলি বা যবদ্বীপের প্রকৃত রূপ পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইঁহারা কয়েকটি নৃত্যের মধ্য দিয়া বলির প্রকৃত রূপের যে আভাস দিয়াছেন, তাহা ভুলিবার নয়। বলির পূর্ণ রূপ না ফুটিতে পাওয়ার কারণ,—(১) এই নৃত্য সম্প্রদায়ের সকল শিল্পী বলিদ্বীপের বা যবদ্বীপের অধিবাসী নহেন;—অনুমান হইল, বিজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণও কোন কোন শিল্পীর দেহে বর্ত্তমান; —এ জন্য জাতীয় সম্প্রদায়িকতা ইঁহারা পুরা মাত্রায় রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না; (২) এ দেশের যে কোন "রঙ্গমঞ্চে" বলির সে প্রাকৃতিক শোভা—সে অকৃত্রিম পটভূমিকা—সে অপরূপ রসভাব সমুজ্জ্বল পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করা অসম্ভব। তবে কৃত্রিমতার ভিতর দিয়া যতটুকু স্বাভাবিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা সম্ভব, ততটুকু করিতে ইঁহারা চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। অল্প-আয়াসে—অল্প সময়ের মধ্যে—মঞ্চের উপর এরূপ সুদূর প্রাচ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা আমাদিগের দেশীয় রঙ্গালয় কর্ত্তৃপক্ষ-গণের পক্ষে অনুকরণযোগ্য বলিয়াই বিবেচনা হয়।

একটি জিনিষ আমাদিগকে বড়ই পীড়া দিয়াছে। সেটা এই সম্প্রদায়ের কনসার্ট। "গ্যামেলানে"র সহিত "স্যাক্সোফোনে"র মিলন প্রয়াস 'তেলে জলে মিশ্ খাওয়াইবার' চেষ্টার মতই ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইল। আর সেই জন্য যে সকল নৃত্যে এই কনসার্ট বাজিতেছিল না, সেই সকল নৃত্যই সর্ব্বাপেক্ষা

চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এই সব দেশী নৃত্যের মধ্যে আবার "Buyan" (Sumatran Cradle Song) বা সুমাত্রার গ্রাম্যবালিকাগণের ছেলেভুলান-ঘুমপাড়ান গান, দেশীয় ভাষায়, দেশীয় সুরে, দেশীয় তালে গীত হইয়া এক অপূর্ব্ব মায়ালোকের সৃষ্টি করিয়াছিল। সমগ্র প্রোগ্রামের মধ্যে এই অংশটুকুই আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল। গায়িকা শ্রীমতী রত্না দেবীর ভাষা অবোধ্য হইলেও বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল তাঁহার গান। আর সরলা গ্রাম্যকিশোরীর ভূমিকায় তাঁহার নৃত্যাভিনয়ও হইয়াছিল অতি মধুর ও উজ্জ্বল। তাঁহার সঙ্গিনীগণও এই দৃশ্যে সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। "Temple dance of Fatimma" বা মন্দিরের দেবদাসী নৃত্যে শ্রীমতী জা দেবী, শ্রীমতী রত্না দেবী ও অন্যান্য নর্ত্তকীবৃন্দের নৃত্যে বেশ একটি প্রাচ্য আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল নৃত্যেই দেখা গেল, নর্ত্তকীগণের "পায়ের কাজ" অপেক্ষা দেহভঙ্গীই অধিকতর প্রশংসার দাবী করিতে পারে। অবশ্য এটুকু বলিতেই হইবে যে, সঙ্গীতের বা সঙ্গতের তালে পা সকলেরই পড়িতেছিল; কিন্তু উহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তাল বা লয়ের কাজ কিছুই ছিল না। পক্ষান্তরে, নটীগণের (বিশেষ করিয়া জা ও রত্নার) "কটিরেচক" ও "গ্রীবারেচক" অতিশয় সুষমামণ্ডিত বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রযুক্ত হইতেছিল। আর একটি জিনিষ ছিল বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার। জার হস্তের অঙ্গুলিগুলিতে কয়েকটি কঠিন "মুদ্রাভাষা"র পরিচয় পাওয়া গেল। হেমন্তের শীত সমীরণের নিষ্ঠুর স্পর্শে শুষ্কপ্রায় বৃক্ষপর্ণগুলি যে ভাবে ঝরিয়া পড়ে, ঠিক সেইরূপ অননুকরণীয় ভঙ্গীতে জার অঙ্গুলী সঞ্চালন কলারসিকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অবশ্য তাঁহার অন্যান্য সহচরীবৃন্দও ইহার অনুকরণের চেষ্টা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু আমাদিগের নিকট ঐগুলি ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইল। পক্ষীর উড্ডয়নগতির অনুকরণে বলির "ব্যজন নৃত্য" একটা উপভোগ্য বস্তু। দুই পক্ষ সঞ্চালনে ("গরুড়") বা এক পক্ষ সঞ্চালনে ("লাসেম") রত্না বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। দুই দল পক্ষীর (ঈগলের) ঝগড়া নৃত্যচ্ছন্দে দেখাইবার ছলে শ্রীমতী মায়া, শ্রীমতী লেলা প্রভৃতি বালিকাগণ ব্যজন নৃত্যের অন্যান্য বহু কৌশল প্রদর্শন করেন। "অর্জ্জুন" নৃত্যটি বৈচিত্র্যময়। বলির অর্জ্জুন ভারতের কামজয়ী মহাবীর অর্জ্জুন নহেন; ইনি বরং বায়রণের "ডন জুয়ান"—পরদারপ্রেমলোলুপ। আর সুভদ্রাও অর্জ্জুনের ঘরণী নহেন—অর্জ্জুনের চিরশত্রু ভূরিশ্রবার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী। অর্জ্জুনের প্রেম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া সতীত্ব রক্ষার আগ্রহে তিনি যেরূপ অবলীলাক্রমে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, তাহাতে বলিদ্বীপবাসীদিগের সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্জ্জুনরূপিনী জার অভিনয় যেমন উজ্জ্বল, সুভদ্রাবেশিনী রত্না কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যানের অভিনয়ও তেমনি সুসংযত। এত বড় একটা প্রেমের দৃশ্যের মূক অভিনয় কতদূর সংযত অথচ সুকুমার হইতে পারে, তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। পাশ্চাত্যে বা বর্ত্তমান বাঙলাদেশে এরূপ দৃশ্যাভিনয়ে চুম্বন ও আলিঙ্গনের স্রোত বহিয়া যাইত; কিন্তু বলি নৃত্যের বৈশিষ্ট্য দেখা গেল যে, পরস্পরের একবারও অঙ্গ স্পর্শ ঘটে নাই। "Amboina Nights" এর "বংশনাড়ী" বাদ্যের, তালে তালে নৃত্যটি নূতন ধরণের। "Wario" বা সমুদ্র তীরে বসিয়া তরুণ তরুণীগণের মিলিত কণ্ঠের প্রেমসঙ্গীতটির নূতনত্ব লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ইহাতেও উচ্ছৃঙ্খলতা বিন্দুমাত্র নাই। Pentjak Minangkaban বা জাভার গ্রাম্যক্রীড়া—ছুরিকাসহযোগে জিজুৎসু ক্রীড়ার অনুরূপ। ইহা যেরূপ কৌশলসাপেক্ষ, তেমনই রোমাঞ্চকর। "ইন্দ্র পূজা" বা বলির কিরীচনৃত্যও ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক। দেবতার ভাবে আবিষ্ট কিশোরীগণ কিরীচ লইয়া নৃত্য করিতে করিতে নিজ নিজ অঙ্গে ছুরিকাঘাত করেন। নিষ্পাপ বালিকাগণের দেহ অক্ষত থাকিয়া যায়; কিন্তু চরিত্রহীনার রক্ষা থাকে না। এই কিরীচ নৃত্যে জা অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। "The Vengeance of Holy Batur" বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে "শুকাবতী পুরাধ" বংশের দৃশ্যটি (set scene)

মঞ্চে অতি সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল। অপরাধিনী দেবদাসীর ভূমিকায় অবৈধ প্রণয়রূপ অপরাধের গুরুভারে প্রপীড়িতা, ও দেবতার রোষচিহ্ন দর্শনে ভীতিস্তব্ধা বিস্ময় বিমূঢ়া রত্নার ভাবাভিব্যক্তি হইয়াছিল অপূর্ব্ব। তাঁহার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থিনী ভগিনীরূপিণী আর ভয়বিহ্বল কাতর মুখ-ছবি আকুলতার অভিনয়-দর্শনে চক্ষুর জল সম্বরণ করা কঠিন হইয়াছিল। "পাপুয়ার" যুদ্ধনৃত্যে ওয়ার্ণা-ওয়ার্ণীর ডাকিনীবেশে লম্ফঝম্প উৎকট রৌদ্ররস সৃষ্টি করিয়াছিল। Legong-এর অতিরিক্ত পরিচয় অনাবশ্যক সিনেমার কল্যাণে ইহা এদেশে পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। "The Fall Borobudur" নৃত্যেও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম ভাবের অভিব্যক্তির অভাব হয় নাই। Kronchong (জাভার Serenade) এ ছোট্ট বালিকা Momo (জাভার "শার্লি টেম্পল")-র মুখ চোখের কৌতুককর ভঙ্গী ও সতেজ উচ্চ মধুর কণ্ঠে দর্শকবৃন্দকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। এই শিশুটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। "Chalon Arang" বা ডাকিনী নৃত্যে ডাকিনীবেশিনী রূপসজ্জা ও অভিনয় নিখুঁত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাকিনী কবলিতা রত্নার অভিনয় একটু মৃদু হইলেও করুণ রসের অবতারণা করিতে কোন বাধা উৎপাদন করে নাই।

বলি নৃত্যের বৈশিষ্ট্য—বলির অধিবাসীদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধাটুকু নৃত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশের চেষ্টা। ধর্ম্মহীন নরনারী দেবতার কোপে অচিরে বিধ্বস্ত হয়, তাহাদের কিছুতেই রক্ষা নাই—ইহাই বলির অধিকাংশ নৃত্যের প্রতিপাদ্য আদর্শ। এই আদর্শ ধরিয়া আছে বলিয়াই বলির শিল্পীদিগের মধ্যে এমন সুষ্ঠু সংযম—এমন অপূর্ব্ব নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের মনে হয়, নৃত্যের এইরূপ ধর্ম্মভাবমূলক আদর্শ বর্ত্তমান বাঙলার নর্ত্তকগণের অনুকরণ করা উচিত। বর্ত্তমান বাঙলার ফিল্মশিল্প পঙ্কিল প্রেমের আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এ-আবর্জ্জনা পূতিগন্ধ দূর করিতে হইলে এইরূপ সম্প্রদায়ের সাহায্যে দুই চারিখানি উজ্জ্বল মধুর পল্লীচিত্র তুলিয়া রাখিলে ভাল হয়। আরও একটা কথা।—এইরূপ কোন সম্প্রদায়ের সাহায্যে আমাদের রামায়ণ, মহাভারতের কোন কাহিনী বা কৃষ্ণলীলা অথবা রামলীলা চিত্ররূপে রূপান্তরিত করিলে বেশ নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। এ-দেশের ফিল্মশিল্পের কর্ণধারগণ সেদিকে একটু অবহিত হইবেন কি?

পতিতপাবন পতিতুণ্ডী

সিডনি আর কার্ফ

আমরা কিন্তু ও গুজব সেদিন বিশ্বাস করিনি, আজও করি না। কারণ অমন গুজব হলিউডের হাওয়ায় রোজ কত জন্মাচ্ছে, কত মরছে। কিন্তু এই গুজব না হলে হলিউডও বাঁচতে পারে না—ওটা যেন অক্সিজেনের মত। ওটা ওদের চাই-ই। একটা গুজব জন্মাবে আর একটা মরবে। তাতেই তাই নিয়ে ওদের আনন্দ, ওদের বেদনা, ওদের দুঃখ সুখ। তাই বলে রাখছি ওদের গুজব নিয়ে আমাদের মাতামাতি করবার একেবারে কিছু নেই। সেদিন যখন আমার কাছে খবর এলো যে সিলভিয়া সিডনি আর বেনেট কার্ফ হলিউড থেকে বিদায় নেবে কিম্বা তা যদি না নেয়, সে ছবিতে নামবে না—এটা একেবারে ঠিক। আমি কিন্তু ওই কথাটা একেবারে মনের কোণে ঠাঁই দিই নি। তাই আজ যখন আবার খবর এলো—সিলভিয়া আর কার্ফের গার্হস্থ্য-জীবন এতটুকু বাধা পাবে না; সিলভিয়া সিডনির ছবির কাজে এবং বেনেট কার্ফ খুব সুখেই আছে, সিলভিয়াকে 'ট্রেল অব দি লোনসাম পাইন' ছবির সুটিং-এ ছেড়ে তখন আমার হাসি এলো। মনে মনে বললুম—এ সত্য তো আমরা অনেকদিন আগেই আবিষ্কার করেছি।

চাষা হতে পারত

গালাগালি দিইনি। চাষা কথাটা কি নিন্দের। ভাল চাষ করতে পারা যে

বরিস কারলফ

ভগবানের আশীর্ব্বাদ বিনা হয় না। ওটা যে জীবনের একটা বড় শিক্ষা। সে শিক্ষা আর যার না থাক বরিস কারলফের যে আছে সেটা আমি জানি। বরিস-এর মত চরিত্রাভিনেতা হলিউডে খুব কম কিন্তু তার চেয়ে

কম মেলে ওর মত কৃষক। ও বলে:—ওর পেশা হোল অভিনয় করা আর চাষ করা হোল ওর কাজ। চাষ থেকে আসে সারা বছরের ফল তরী-তরকারী; তাইতেই চলে বরিসের খাওয়া। তারপর খাওয়ার পর যা বাঁচে তা যায় হাটে। এই হাট সমবছরে যে টাকা এনেছে তা হাজার পাউণ্ডেরও ওপর। তাই হলিউডের লোকেরা বলাবলি করে 'দি ম্যান ইন দি হো' ছবিতে বরিসের সত্যকার চরিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। ওই ছবিতে কারলফ নামছে কি না!

এডি ক্যান্টর লাফাচ্ছে

একদল লোক আসে যারা এডি ক্যান্টরকে ভয়ানক ভালবাসে। সত্যিই ভালবাসার মতই বটে। এই বুড়ো বয়সে কী অভিনয়, কী নাচ, কী গান করে সে। আর বুড়ো বলব না! যার অত বড় বড় অতগুলো ছেলে মেয়ে তাকে বুড়ো ছাড়া আর কী বলি! কিন্তু তাহলে কী হয় বুড়ো চলেছে 'সুট দি সুট্‌স্‌' ছবিতে একটা দৃশ্যে ছবি দিতে। ব্যাপারটা হচ্ছে এডি প্যারাসুট থেকে পড়ে যাবে, পড়ে যাবে বলে, একেবারে মাটীতে নয়। সেইজন্যে জাল বিছানো হচ্ছে; এ জাল অবশ্য আমরা পর্দায় দেখতে পাব না। তাই সেই জালটা জোর করে এঁটে তিন মাইল জুড়ে বাঁধা হচ্ছে। সেই জালের দড়ি হচ্ছে সিকি ইঞ্চি পুরু। আর এক একটা ভেতরের চৌকোণ হচ্ছে ছ ইঞ্চি ক'রে। জালটা যখন বাঁধা হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে একুশ হাজারটা চৌকোণ ওই জালের মধ্যে তৈরী হয়েছে। পাইপের সঙ্গে জালটা বাঁধা হয়েছে আর তার সঙ্গে লাগান হয়েছে বড় বড় স্প্রীং। হাসির খোরাক জোগাতে রসিকটি যখন লাফিয়ে পড়বেন তখন জালটি হাওয়ার ওপর তাকে ছুড়ে দেবে অনেকখানি। তারপর সেদিনের ছবি তোলা শেষ হবে।

জোসেফাইন বলবে না

আগামী বসন্তকালে ক্লার্ক গেবল্‌ দক্ষিণ আমেরিকায় শিকারে বেরোবে এই তার মতলব। শৌর্য্য ও বীর্য্যের অবতার সে! সে কি আর বসে থাকতে পারে। তবু কেউ কেউ বলে একথা উদয় হয়েছে ওর বিচ্ছেদ বেদনা থেকেই।

অভিনেতার আগামী বিচ্ছেদ এই খবরই দিচ্ছে যে সে অনেক সুশ্রী সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছে আর তার পিছন-লাগা কাগজ-ওয়ালাদের চোখে ধুলো দিয়ে সে বেড়াচ্ছে।

আর একটা কথা বলে দি; জোসেফাইন ডিলন হচ্ছে ক্লার্ক গেবলের প্রথম স্ত্রী। তাঁর কাছে একটি উৎসাহী রেডিও কোম্পানী এই বলে আবেদন করেন যে তিনি যদি ক্লার্ক গেবলের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের পূর্ব্ব-স্মৃতি সম্বন্ধে বেতারে কিছু বক্তৃতা দেন তা হ'লে তার মূল্য স্বরূপ ওই কোম্পানী প্রচুর অর্থ তাঁকে দেবেন।

জোসেফাইন সক্রোধে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি কিছু বলবেন না।

হারলো জানে না কী?

সেদিন মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের কর্ত্তারা বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গিয়েছিল যখন তারা শুনলে যে জীন হারলো সর্ট হ্যাণ্ড লিখতে আর টাইপ করতে ভয়ানক ওস্তাদ।

ব্যাপারটা হচ্ছে যে জীনকে নতুন ছবিতে সেক্রেটারির অভিনয় করতে হবে কাজেই কর্ত্তারা ঠিক করলেন, তাকে এই দুটো জিনিষ শিখে নিতে হবে।

পরে দেখা গেলো জীন টাইপ করা শিখে রেখেছে সখ করে নয়; তার ফ্যানদের সব চিঠির সে নিজে টাইপ করে উত্তর দেয় এবং সর্টহ্যাণ্ড শেখা কাজে লাগে সমস্ত লেখা ছোট করে টুকে নেবার জন্যে।

খুচরো খবর

কায়রো ফ্রান্সিস বলরুমে নাচত।

* * *

অ্যাণ্ডি ডিভাইল লাইট হাউসের ফায়ার ম্যান ছিল।

* * *

ফ্রেডি বারথোলোমিউর প্রিয় ষ্টাররা হচ্ছে টম মিক্স, বাক্‌ জোনস্‌ এবং কেন মেনার্ড।

* * *

দিন কতক আগে পর্য্যন্ত ক্যাথারিণ হেপবার্ণ-এর প্রিয়তম ছিল লিল্যাণ্ড হেওয়ার্ড। সম্প্রতি সেটা বুঝি মুছল।

* * *

পর্দ্দার ছবিতে এবং পর্দ্দার বাহিরে সব সময়েই মে ওয়েষ্ট মুক্তার মালা পরে। এটা নাকি তার একটা কুসংস্কার।

প্যারামাউন্টের "শিপ্ কাফে" একখানা নাম-করা ছবি। কোল্‌কাতায় ছবিখানা আস্‌চে শিগ্‌গির। ওপরে কার্ল ব্রিসন দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কাফের সুন্দরীরা

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি াক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৭ই ফাল্গুন ১৩৪২—20th February, 1936. } ৮ম সংখ্যা

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর মুক্তি

প্রায় তিন বৎসরকাল বিনা বিচারে বন্দী থাকিবার পর শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের স্বাগত-অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহার ন্যায় বাগ্মী, কর্ম্মী ও দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি বিরল। তাঁহার দেশ-হিতৈষণার গভীরতা ও আন্তরিকতা একাধিকবার দুঃখের কষ্টি পাথরে কষিত হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহার ন্যায় দেশের সুসন্তান পুনরায় দেশ-মাতৃকার কোলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে রাজনীতিক্ষেত্রের ভিতরের ও বাহিরের—সারা দেশের লোকই আনন্দিত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বহুদিন হইতে দেশের নানা প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধভাবে এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে বিনা বিচারে বন্দী রাজনৈতিক কয়েদীগণের মুক্তির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট এইরূপ দাবী করিয়া আসিতেছেন। এতদিন পরে ধীরে ধীরে সরকার সেই দাবীর ন্যায্য, মূল্য ও সময়োচিত যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন, ইহা আনন্দের কথা। আমরা আশা করি, এখন হইতে সরকার এই নীতির অনুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিনাবিচারে বন্দী সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদীগণকে মুক্তিদান করিবেন। আমাদের বিশ্বাস এই নীতি পূর্ণভাবে অনুসৃত হইলে দেশে এমন একটা শান্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে, যাহাতে শাসক ও শাসিত উভয়েরই কল্যাণ হইবে।

দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস, স্থান ও কালভেদে ইহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেই জ্ঞান দান করিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী শিল্পবাণিজ্যের পথনির্দ্দেশকের কাজ অতিশয় সুষ্ঠুরূপেই পরিচালনা করিয়াছিলেন। অর্দ্ধ পথেই সেই কাজ বন্ধ হইয়াছিল। আশা করি তিনি তাঁহার সেই অর্দ্ধ সমাপ্ত কাজ এখন আবার নবোদ্যমে পুনরারম্ভ করিয়া দিবেন। মুক্তির পর তাঁহার কর্পোরেশনের পূর্ব্বপদ—প্রচার বিভাগের ভার—তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন ও কর্ম্মে সাফল্য কামনা করি।

শ্রাবণের অপরাহ্ন।

আকাশ ভরা ঘন মেঘ, অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী, বৃষ্টির আর বিরাম নাই। সকলে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

অবলা উদাসভাবে বলে উঠল, আজ আর বায়স্কোপে যাওয়া হ'ল না—যে জল!

গোলক হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, এই বর্ষাকালটা ভারী বদ্ হাওয়া—কোথাও যাবার যো নাই!

সিগারেটের পর সিগারেট শেষ হয়ে যায় তবুও জল থামবার নাম নাই!

বিনয় উদাসভাবে গান ধরে :—

"আজি তোমায় পড়ে মনে
এই ভরা বাদল দিনে!"

বরদা অমনি লাফিয়ে গানটা লুফে নিলে, ভরা বাদলে বিরহ? কার সে সৌভাগ্য বিনয়?

বিনয় নিরুত্তর—

একে ভরা বাদল তাতে আবার বিনয়ের মুখের গল্প···এ রকম সুযোগ গোবর্দ্ধনের মত ছেলে ছাড়তে পারে না! তাই ধরে বস্‌ল 'তোকে বল্‌তেই হবে।'

বিনয়ের চোখের পাতা দুইটী ভিজে উঠল'।

'তোর যদি বাধা থাকে বিনয়, তা'হলে তুই বলিস্‌নি' পরেশ বল্লে।···

না, তোদের কাছে আবার বাধা কিসের? অতনুকে জানিস্‌তো সে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে গান গাইতে আস'ত! সে আর আমি একবার জগদীশপুরে বেড়াতে যাই। আমরা দু'জনে অতনুর মামার বাড়ীতে উঠলাম। অতনুর মামা বেশ আমোদ-প্রিয় লোক ছিলেন। প্রত্যহ সকালে তাঁর বাড়ীতে চা দেবীর আরাধনা হ'ত······বেশ আধুনিক মতে। আজ আমরা দু'জন নূতন অতিথি চা-টেবিলে। আমাদের দেখে একজন তরুণী বল্লেন, অজিৎবাবু, এরা বোধহয় আপনার কেউ হন্?

হ্যাঁ রেখা, তোমায় এখনও বলা হয় নি। এই অতনু হচ্ছে আমার ভাগিনা, আর ইঁনি অতনুর বন্ধু বিনয়।

বাঃ!...তা'হলে আপনারাও আমার
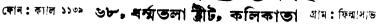
বন্ধু জানবেন। এই বলে রেখা চেয়ারখানা সরিয়ে এনে আমাদের কাছে বেশ গল্প জমিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে করে গেল আমাদের চা খাবার নিমন্ত্রণ।

সুন্দরী তরুণীর নিমন্ত্রণ!...আহ্বান!!... তরুণ হয়ে এই প্রথম পেলাম। মনটা পড়ে রইল কেবল সময়ের অপেক্ষায়। যাবার কিছু আগে অতনু বল্লে, আমার ভাই যাওয়া হ'ল না. তুই যা। আমি এক্ষুণি কোলকাতা যাব মাসিমাকে নিয়ে, বিশেষ দরকার, কাল ফিরব। কি বলে অতনু! আমি রইব একা এর মামার বাড়ী আর এ যাবে চলে? মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, বল্লাম্ চল্ আমিও তোর সাথে বাড়ী যাই! কোথা হতে ওর মামা অজিৎবাবু এসে বল্লে, তাকি হয় বাবা; ওরা যাচ্ছে আমিত' রয়েছি! তাছাড়া রেখার ওখানে না গেলে সে বড় অভিমান করবে। ভেসে গেল আমার সব কথা, শেষে যেতে হ'ল আমায় একা। না উদাস,...না মাতোয়ারা ...। মনটা যেন হয়ে রইল ঝরা ফুলের পাপড়ী।

নির্দ্ধারিত সময়ে বাড়ী থেকে বের হই...পা চলে আর বুকটা কাঁপে...। অপরিচিত স্থান আর অপরিচিত সে...রেখা! আস্তে আস্তে তাদের বাড়ী যাই, দেখি 'সম্মুখে ফটকে দাঁড়িয়ে রেখা; আমায় দেখে হেঁসে বল্লে, আপনি বেশ লোক বিনয় বাবু, আমি সারাটা দিন আপনার পথ পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি,...আসুন! আদর আপ্যায়নে আমাকে করে ফেল্লে বশ। আমার মুখে সব কথা শুনে রেখা বল্লে, আপনিও' যদি চলে যেতেন বিনয় বাবু, তা' হলে...কথা না শেষ করে মৃদু হেঁসে আবার বলে বড়ই দুঃখ পেতাম। কেন জানেন?...উপেক্ষা বলে! হঠাৎ মুখ থেকে বেড়িয়ে যায় উপেক্ষা?... তোমায়...? বল কি রেখা? ছিঃ ছিঃ লজ্জায় ম্লান হয়ে উঠি নিজের কথা নিজে শুনে! রেখা আবার হাঁসে, হাঁসে আর বলে, বিনয় বাবু আপনি আমায় তুমিই বল্‌বেন। বড় লজ্জা পেয়েছেন না? কথাটা বলে! দেখুন, বিনয় বাবু! আমার আপনার বল্‌তে দূর সম্পর্কের এক মামা ছাড়া আর কেউ নেই! কিন্তু আমার এমন বরাত তিনিও ভবঘুরে...। কথার শেষে রেখার চোখে জল দেখা দেয়। আপনাকে যদি বন্ধুভাবে পাই তা'হলে এই একা থাকা থেকে কিছুদিন রেহাই পাই। আনন্দে চোখ বুজে বিনয় কেবল শুনে যায়। রেখা কাছে সরে এসে বলে, আচ্ছা বিনয় বাবু আপনি কেন আমার বাড়ীতে থাকুন না? দু'জনে গল্পে বেশ দিনগুলো কাটানো যাবে।

দিনের পর দিন যায়, বন্ধুত্ব ক্রমশঃ ভালবাসায় দাঁড়ায়। সত্যই বন্ধু, সে বড়ই সুন্দরী। সুন্দর তার দুটি আঁখি, যেন আকাশের দুইটী উজ্জ্বল তারকা। বয়সে সে সতের নয়তো নিশ্চয় আঠারো। সুগোল তার দুটি বাহু। উন্নত বক্ষ।

আমার বাড়ী হ'তে ডাক আসে ফেরবার তরে; যাওয়া আর হয় না, রেখার জ্বর দেখা দেয়। জ্বর ক্রমশঃ টাইফয়েডে দাড়ায়! ডাক্তার আসে, রেখা ভুল বকে—বিনয় বাবু আপনি যদি চলে যান তা হ'লে আমি কিছুতেই বাঁচবো না...না!...না!! আমি বাঁচবো না! আপনি কেন চলে যাবেন বিনয় বাবু? আপনাকে আমি সবই তো দিয়েছি!' তবে কেন যাবেন? পুরুষ নিষ্ঠুর! ওঃ! বিনয় বাবু আমি কি দোষ করেছিলেন? হ্যাঁ...ভালবাসি, আমি তোমায় বড় ভালবাসি। বাস্তবিক আপনি কেমন সুন্দর! দেখি আপনার হাতটা। প্রতিশোধ দোব?

"ডাক্তার বাবু এ আবার কি রকম ভুল বকছে?"

"রকম নহে হে, এ সব হচ্ছে বিগত দিনের ঘটনা। বিনয় বাবু, আপনি এত উতলা হবেন না। হয়তো সেরে যেতেও পারে। আমি চল্লেম, জল জোর আস্‌ছে।" আবার সুরু হলো রেখার কথা—অতসী তুই কি বল্‌তে চাস, বিনয় বাবু আমাকে ফাঁকি দেবেন? আচ্ছা রেবা তুই বল্‌তো বিনয় বাবু কেমন লোক? তোর পেতে ইচ্ছে হয় না? যদি ভালবাসতে হয়তো বিনয় বাবুকে।
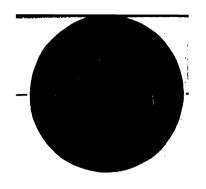
এই তো সেদিন শাস্তা তার মাষ্টারকে ভালবেসে তার সঙ্গে বেড়িয়ে কোথায় চলে গেল। কোন্ সুদূরে···শুধু ভালবেসে। আচ্ছা অলকা, বিনয় বাবু বেশ রসিক না? দেওয়ালটা কি রকম নড়ছে দেখ্! এখুনি বোধ হয় পড়ে যাবে! আমায় ধরো! ধরো !!···

রেখা, রেখা! আমি ত' তোমার কাছেই আছি রেখা! দাঁড়াও তোমায় ভাল করে শুইয়ে দিই! একি···? রেখা! রেখা !!··· চলে গেলে !!! নিস্তব্ধ কক্ষ! রেখার অ-সা-ড় দেহের পাশে বসে আমি···!

বাহিরে বৃষ্টির তাণ্ডব লীলা চলেছে··· ভীষণ বেগে!

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যার উত্তর:—গত সমস্যার উত্তর নিয়ে দেওয়া হল। কেউই এই সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারেন নি।

হরতন দিয়ে গেলেন। 'উ'ও তদ্রূপ চাললেন। পরে ইস্কাবনের পিটখানি 'দ' ধরলেন, এখন 'প' কি পাশাবেন?

ইস্কাবন—বিবি, আটা, ছক্কা।
হরতন—আটা, সাতা।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—টেক্কা, আটা, দুরি।

ইস্কাবন—চৌকা।
হরতন—বিবি, ছক্কা, পাঞ্জা।
রুহিতন—আটা।
চিঁড়িতন—সাহেব, বিবি, সাতা।
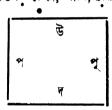
ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, দশ, সাতা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—বিবি, ছক্কা, তিরি।
চিঁড়িতন—দশ।

ইস্কাবন—টেক্কা, পাঞ্জা, দুরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—দশ, সাতা, পাঞ্জা।
চিঁড়িতন—চৌকা, তিরি।

ফেরাইএর খেলা, 'দ' খেল্‌বেন বিপক্ষ দল যতই বাধা দিক্ না কেন 'উ' এবং 'দ'কে পাঁচখানি পিট নিতে হবে।

'দ' রুহিতনের দশ খেল্‌বেন 'উ' ইস্কাবনের আটা পাশাবেন। যদি 'পূ' পিট নিয়ে পুনরায় রুহিতন খেলেন তা' হলে 'দ' রুহিতনে দুইটী পিট নেবেন, আর 'উ' ইস্কাবনের বিবিটী এবং ছোট তাসখানি পাশিয়ে যাবেন। এখন 'দ' চিড়ে খেল্‌লেন; তা'তে 'প' এবং 'উ' যথাক্রমে ছোট তাস দিয়ে গেলেন। 'পূ' পিট নিয়ে ইস্কাবনের সাহেব খেল্‌লেন; এ পিটে 'দ'ও ছোট তাস দিয়ে গেলেন। অতঃপর 'প' দুই তাস চিড়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন বলে একতাস

যদি প্রথম রুহিতনের খেলায় 'পূ' ছোট তাস দিয়ে যান, তা' হলে পিট নিয়ে 'দ' কে একতাস চিড়ে খেল্‌তে হবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় পিটের বেলায় রুহিতন না খেলে 'পূ' চিড়িতন খেলেন, তবে 'প' কে চিড়িতনের বড় তাস দিতে হবে; তা' না হলে 'উ' ছোট তাস দিয়ে যাবেন। সুতরাং 'উ' চিড়িতনের টেক্কার পিট নিয়ে ইস্কাবনের ছক্কা পেড়ে খেল্‌লেন। এ স্থলে 'পূ' কিছুতেই ছোট তাস দিতে পারেন না। 'দ' পিটখানি নিয়ে রুহিতনের সাতা পেড়ে খেল্‌লেন এবং তৎপরে চিড়িতনে চাল দিলেন। ইহার ফলে 'উ' হরতনে এবং চিড়িতনে

পিট পেয়ে গেলেন। প্রথমে চিড়িতন পেড়ে না খেলাই ভাল। এ ক্ষেত্রে 'প'র বিবি দেবার পর, 'উ' টেক্কা দিয়ে পিট নিয়ে ইস্কাবনে চাল দিলেন। 'দ' যখন রুহিতন ফেল্লেন 'পূ' বিবি দিয়ে পিট নিয়ে ইস্কাবনের সাহেবের পিট নিলেন। কিন্তু ফলতঃ 'দ' দুইখানি রুহিতনের পিট পেয়ে গেলেন। যদি 'উ' চিড়ের বিবিতে ছোট তাস দিয়ে যান 'প'কে সাহেব খেল্তে হচ্ছে।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, দশ, তিরি, দুরি।
হরতন—সাহেব, দশ।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—নাই।

ইস্কাবন—গোলাম, সাতা, পাঞ্জা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—বিবি, পাঞ্জা।
চিঁড়িতন—নয়, আটা।

ইস্কাবন—নয়, আটা, ছক্কা, চৌকা।
হরতন—টেক্কা, বিবি।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—বিবি

ইস্কাবন—সাহেব।
হরতন—ছক্কা, পাঞ্জা।
রুহিতন—সাহেব, সাতা।
চিঁড়িতন—গোলাম, চৌকা।

খানি সংগ্রহ করে চিঁড়ের গোলাম খেল্লেন; তা'তে 'উ' হরতনের দশ দিয়ে গেলেন। অতঃপর 'দ'র রুহিতনের সাতা খেলার দরুণ 'প' পিট পেয়ে গেলেন। 'উ' সে ক্ষেত্রে হরতনের সাহেব ঘুলিয়ে গেলেন।
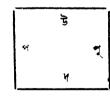
যদি 'পূ' তৃতীয় এবং চতুর্থ পিটের বেলায় যথাক্রমে হরতনের টেক্কা এবং বিবি পেড়ে খেলেন, 'উ' পিট নিয়ে ইস্কাবনের দশ পেড়ে খেল্বেন, যদি তৎপূর্ব্বে 'প' রুহিতন পাশিয়ে থাকেন। কিন্তু যদি 'প' ইস্কাবন পাশিয়ে যান তবে 'উ' যথাক্রমে ইস্কাবনের টেক্কা বিবি দশ খেলে যাবেন।

প্রথমে ইস্কাবনের সাহেব পেড়ে খেলে পিট নিয়ে চিঁড়ে খেলে 'পূ'কে পিট ধরান ভাল নয়; কেন না তা'তে 'পূ' তৎক্ষণাৎ ইস্কাবন খেলে 'পূ'কে পরপর তিনখানি পিট ধরিয়ে দেবেন এবং অবশেষে হরতনের সাহেব বিবির পিট আদায় করবেন।

আর একটী সমস্যা :—পাঠকবর্গের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য ও চার হাত বিশ্লেষণ করে খেলা শিখ্বার নিমিত্ত নিয়ে আরও একটি সমস্যা দেওয়া হল। আশা করি এইটী অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

হরতন রঙ, 'দ' খেল্বেন। বিপক্ষদলের সর্ব্বপ্রকার বাধা সত্ত্বেও 'উ' এবং 'দ'কে সম্মিলিত হস্তে সব কয়খানি পিট নিতে হবে।

(২) শ্রীজয়দেব শেঠ ও শ্রীবীরেন বসাকের অনুরোধে উপরে লিখিত সমস্যাটীর উত্তর দেওয়া হল। তাঁদের উভয়ের সমাধান নির্ভুল হইয়াছে।

ফেরাইএর খেলা, 'দ' খেল্বেন। 'উ' এবং 'দ'র মিলিত হস্তে পাঁচখানি পিট পাওয়া চাইই তা' বিপক্ষদল যতই বাধা দিন না কেন।

'দ' রুহিতনের সাহেব পেড়ে খেল্লেন। 'উ' এবং 'পূ' ইস্কাবন পাশিয়ে গেলেন। অতঃপর 'দ' চিঁড়ের চৌকা খেল্লেন, 'উ' একতাস ইস্কাবন পাশালেন। 'পূ' পিটখানি নিয়ে ইস্কাবনের ছক্কা খেল্লেন। 'দ' পিট-

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, আটা, তিরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা।
চিঁড়িতন—টেক্কা, নয়, তিরি।

ইস্কাবন—দশ, নয়,
হরতন—নাই।
রুহিতন—বিবি, তিরি।
চিঁড়িতন—বিবি, আটা, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—বিবি, সাতা, ছক্কা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—সাহেব, পাঞ্জা।
চিঁড়িতন—দশ, সাতা, ছক্কা।

ইস্কাবন—সাহেব, দুরি।
হরতন—সাতা।
রুহিতন—দশ, সাতা।
চিঁড়িতন—সাহেব, গোলাম, চৌকা।

শ্রীএকলব্য

ইংলণ্ডগামী ভারতীয় ক্রিকেট দল

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় ইংলণ্ডগামী ভারতীয় ক্রিকেট দল গঠিত হইয়াছে। নিম্নে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম দেওয়া হইল :—

১। বিজয়নগরের মহারাজকুমার (ক্যাপ্টেন)
২। মেজর সি, কে, নাইডু
৩। উজীর আলী
৪। এস, ব্যানার্জ্জি
৫। এল্, অমরনাথ
৬। বিজয় মার্চ্চেন্ট
৭। বাকা জিলানী
৮। আমীর ইলাহি
৯। মুস্তাক আলী
১০। মেহেরমজী
১১। এল্, পি, জয়
১২। মহম্মদ নিশার
১৩। এম, জে, গোপালন
১৪। পি, ই, পালিয়া
১৫। হিন্দেলকার
১৬। এস, এম, হোসেন
১৭। রামস্বামী

পাতিয়ালার যুবরাজকেও এই দলে নেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অমর সিং, দিলওয়ার হোসেন ও জাহাঙ্গীর খাঁ এই দলকে টেষ্ট ম্যাচ খেলার সময় সাহায্য করিবেন। এমন কি, বিশেষ কোন খেলা থাকিলেও উক্ত তিনজন খেলোয়াড় ভারতীয় দলের স'হত যোগ দিবেন। মেজর ব্রিটেন জোন্স উক্ত দলের ম্যানেজার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতীয় দলের নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণের মধ্যে সি, এস, নাইডু ও ভায়া দলভুক্ত হন নাই। ইঁহারা দুইজন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড। ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এই দুইজনকে দল হইতে বাদ দিলেন কেমন করিয়া আমরা বুঝিতেছি না। উক্ত দলে রামস্বামী ও এস, এম, হোসেন কিরূপে স্থান পাইলেন তাহার সঙ্গত কারণ কী হইতে পারে? গত দুই বৎসরের মধ্যে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং কোন বিষয়েই উক্ত খেলোয়াড়গণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রবর্ত্তক

ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবারর্ত্তা আধুনিক কালে অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ব্যারণ কুবারর্ত্তাকে 'নোবেল' পুরস্কার দিবার জন্য নরওয়ের অলিম্পিক কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন।

• বহু দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

* * *

মাঠে আবার মরসুম লাগিয়া গিয়াছে। গত শুক্রবার হইতে হকি খেলা আরম্ভ হইয়াছে। খেলার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল।

শুক্রবারের খেলা

মোহনবাগান বনাম লিলুয়া—৫—০
কাষ্টমস „ আরমেনিয়ান—৫—০
সেণ্ট জোসেফ „ মেডিকেল মিলিটারী ১-০

শনিবারের খেলা

ক্যালকাটা বনাম ড্যালহাউসী—৭—১
জ্যাভেরিয়ান „ বি, জি, প্রেস—২—০
ভবানীপুর „ আরমেনিয়ান—২—১
পুলিশ „ ই, বি, আর—০—০

সোমবারের খেলা

মোহনবাগান বনাম ড্যালহাউসী—১—০
আরমেনিয়ান „ লিলুয়া—১—০
পুলিশ „ ডিভন্স—২—১

মঙ্গলবারের খেলা

ক্যালকাটা বনাম বি, জি, প্রেস—৩—৪
রেঞ্জার্স „ মেডিকেল মিলি—২—০
ই, বি, আর „ ভবানীপুর—০—০

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

আগামী রবিবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী ভবানীপুর সবুজ সমিতির উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুষ্পমাল্য সুসজ্জিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি সহ এক শোভাযাত্রা বাহির হইবে। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান কর্ত্তৃক এই শোভাযাত্রা আয়োজনের ভার ভবানীপুর সবুজ সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছে। ভবানীপুর সবুজ সমিতির কর্ত্তৃবৃন্দ এই মহৎ অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সকলের সহায়তা কামনা করেন।

(বিলাসী)

একটি কথা

প্রযোজক : শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

গল্প, চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা } শ্রীতুলসী লাহিড়ী

আলোক-চিত্র : শ্রীবিভূতি দাস

শব্দযন্ত্রী : এ, গফুর

চরিত্র : শিবু মণ্ডল—তুলসী লাহিড়ী, মটুক—সমর রায়, কৃষক—আব্বাস উদ্দীন আহমেদ, মালতী—কমলা (ঝরিয়া) চাঁদি—নগেন্দ্রবালা প্রভৃতি।

প্রথম মুক্তি : "ছায়া", ৮ই ফেব্রুয়ারী '৩৮

"একটী কথা" সম্বন্ধে দু'টি কথা বলা যায় না। আশ্চর্য্য হই, এমন ছবিও ছত্রিশ সালে জন্মায়—আর জন্মালেও তা' কেমন কোরে আলোক পায় প্রথম শ্রেণীর ছবিঘরে!—এটা একটা দুঃসাহস, মস্ত বড় দুঃসাহস—এ ছাড়া তা' আর কোন যুক্তি আমাদের মগজে ঢোকে না।

ছবিখানার গল্পটি রাবিশ। পাড়াগেঁয়ে ছেলে-মেয়ে মটুক আর মালতীর প্রণয়—প্রণয়ে বাধা-বিপত্তি—পরে মিলন, এই একটি পুরণো সেকেলে ঘটনা নিয়ে চার রীল জুড়েছে—আবার তার ভেতর গানের পাল্লাবাজী।

চিত্র-নাট্য, পরিচালনা বলে কোন পদার্থই নেই। আর এ পদার্থগুলো যে সিনেমার প্রাণ একথাও বোধ হয় তুলসী লাহিড়ীর জানা নেই—তা' হ'লে অভিনয় ছেড়ে পরিচালক হবার জন্যে এমন মরিয়া হ'য়ে উঠতেন না তিনি। আমরা এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বল্‌তে চাই না—শুধু এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট, "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

শব্দযন্ত্র ও আলোকচিত্রও তথৈবচ। তবুও প্রথমোক্ত বিষয়টি বরদাস্ত করা যায়—এই যা।

"একটী কথা"-য় তুলসী লাহিড়ী

ছবিখানার গানগুলোর সুর নেহাৎ মন্দ নয়। দৃশ্য নির্ব্বাচন চলনসই।

অভিনয় সম্বন্ধে বল্‌তে গেলে "মটুক" কোনরূপে কাজ চালিয়েছে। কমলা ঝরিয়ার গান মন্দ নয়—তবে নায়িকার ভূমিকায় নামার দুঃসাহস ভবিষ্যতে তাঁর যেন না হয়। তুলসী লাহিড়ীর সেই একঘেঁয়ে ন্যাকামি দেখে লোকে অতিষ্ঠ হ'য়েছে—নতুন কিছু করার চেষ্টা না কোর্‌লে তার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়। আব্বাস উদ্দীনের ভূমিকা চলনসই। নগেন্দ্রবালাও তাই। অন্যান্য ভূমিকাগুলো উল্লেখযোগ্য নয়।

মোট কথা, এমন ছবি ভবিষ্যতে যেন জন্ম না নেয়—আর দৈব-দুর্ব্বিপাকে জন্মালেও কোনও প্রথম শ্রেণী চিত্রগৃহ তা' দেখিয়ে যেন তাদের নাম খারাপ না করেন।

নিউ থিয়েটার্স

বাঙ্‌লা "গৃহদাহ" তারই হিন্দী "মঞ্জিল" প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শেষ হ'য়েছে। বাঙ্‌লা সংস্করণ এপ্রিলের গোড়াতেই 'চিত্রা'-য় দেখাবার ব্যবস্থা চল্‌ছে।

* * *

নীতীন বসুর "ধূপ-ছাঁওন" দিল্লী, লাহোর, বম্বেতে বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি কোরেছে। নীতীন বাবু পরবর্ত্তী ছবির কাজ শীঘ্রই সুরু কোরবেন—সম্ভবতঃ ইংরেজী গল্প অবলম্বনে।

* * *

দীনেশ দা'-র খবর কী? মাঝে আলো জ্বলে ওঠে আবার নিভে যায়। শীঘ্রই ছবি তোলা আরম্ভ হবে এই শুনে আস্‌ছি বছর খানেক ধরে। কিন্তু কই?

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

আস্‌ছে ঈদে গুল হামিদ পরিচালিত "খায়বার পাশ" ভারতের দশটি বিভিন্ন জায়গায় মুক্তি পাবে বলে প্রকাশ। "খায়বার

...শ" ভাল ছবি হবে, কারণ পরিচালকের ওপর আস্থা আছে আমাদের।

রাধা ফিল্ম

আসচে ২৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার রূপবাণীতে "কৃষ্ণ-সুদামা" মুক্তি পাবে। অপূর্ব্ব অভিনেতৃ সম্মেলনে এই ভক্তিমূলক ছবিখানা যে রসিকচিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত কোরবে—এ বিশ্বাস হয়। এই সঙ্গে এঁদের...লের একখানা হাসির ছবি দেখানো হবে—নাম. "ঝিন্‌ঝিনিয়ার জের" এতে আছে, ...মার মিত্তির, তারক বাগচী ও অনাথ বসু।

* * *

মালয় বাণী-চিত্র "ডাঃ সামসী" বলি নর্ত্তকীদের দিয়ে রুশীয় পরিচালক ডব্লিউ, ...মানোফের পরিচালনায় তোলা হ'চ্ছে। ...ড়িং বসু এই ছবিতে টেক্‌নিক্যাল পরিচালকের কাজ কোরছেন।

তেলেগু ছবি "লঙ্কাদাহনে"-র কাজ সুরু হ'য়েছে।

এদের পরের বাংলা ছবি হ'চ্ছে বঙ্কিম-চন্দ্রের "বিষবৃক্ষ"। খুব সম্ভব চারটি বিশিষ্ট চরিত্র—কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী, দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্র যথাক্রমে কাননবালা, শান্তি গুপ্তা, মৃণাল ঘোষ ও অহীন্দ্র চৌধুরীর ওপর ভার অর্পিত হবে। ছবিখানা পরিচালনা কোরবেন ফনি বর্ম্মা।

এই সঙ্গে হাসির ছবি "কেলোর কীর্ত্তি" তোলা হবে।

কণ্ঠহার

"কণ্ঠহার" ঢাকার মুকুল থিয়েটারে পূর্ব্বাপর রেকর্ড ভেঙ্গেছে—ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্সের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ তার পেয়েছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কারদার আর দেবকী বসু এই ষ্টুডিও সরগরম কোরে রাখ্‌বেন এবার। কারদারের "বাঘে সিপাহী"-র মহলা শেষ হ'য়েছে—শূটিং সুরু হ'তে দেরী নেই। দেবকী বাবুর ছবির মহলা চল্‌ছে শীঘ্রই শূটিং আরম্ভ হবে। হ্যাঁ, কারা এ ছবিতে নামছেন বলি। হিন্দীতে—রামপিয়ারী, মেনকা, গুল হামিদ, মজাহার, বিজয়কুমার, পাহেলওয়ান, বিনয় গোস্বামী, হাসানদিন, নন্দকিশোর, নির্ম্মল বাঁড়ুয্যে, দীবেন দাস, রঞ্জিৎ রায় প্রভৃতি। আর বাঙলাতে নামছেন, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়া দেবী, মেনকা, জীবন গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। চরিত্র নির্ব্বাচন হ'য়েছে বেশ লোভনীয়। তাই নয় কী?

* * *

জ্যোতিষ মুখুয্যের "পথের শেষে" মুক্তি প্রতীক্ষায়। মুখুয্যে মশাইয়ের কাজ বেশ হাল্‌কা হ'য়েছে তা' ষ্টুডিওয় গেলেই সবাই

বুঝবে। কারণ, ষ্টুডিওর মজলিশী আড্ডায় রাজনটীর গান আর নাচের ছন্দে তাঁকেও যোগ দিতে দেখা যাচ্ছে। ভায়া প্রবোধ-এর সাক্ষী।

চন্দ্র ফিল্মস্

এরা এখন বহির্দৃশ্য তোলায় ব্যস্ত। ছবিখানাকে শীঘ্রই লোকচক্ষু গোচর করবার জন্যে কর্তৃপক্ষের চেষ্টার অন্ত নেই। যে রকম সহযোগিতার ভেতর কাজ চলছে, তা'তে মনে হয় "পরপারে" সাধারণকে দেবে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ।

ইণ্ডিয়া পিকচার্স

এতদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি সকলের কাছে পরিচিত ছিল রাধা ফিল্মের চিত্র-পরিবেশক বলে। কিন্তু এরা ছবি তোলাও সুরু কোরবেন—এটা নিশ্চয়ই সুখের কথা। নরেশ সেনগুপ্তের "অভয়ের বিয়ে" তোলবার আয়োজন চলছে। শীঘ্রই কাজ সুরু হবে—কোল্‌কাতার কোন একটি বড় ষ্টুডিওতে।

দেবদত্ত ফিল্মস্

এদের ষ্টুডিও তৈরির কাজ বেশ চলছে। প্রথম ছবি তোলা হবে তামিল। পরে বাজারে গুজব "পোষ্যপুত্র" আর শোনা যায় শরৎচন্দ্রের একটা গল্প বাঙ্‌লায় তোলা হবে। যা হ'ক একটু কিছু যে হবে এটা নিশ্চয়ই।

বিবিধ

নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ

কলিকাতা করপোরেশনের আসন্ন নির্ব্বাচনে ৬নং ওয়ার্ড হইতে জোড়াসাঁকো রাজবাটীর রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পৌত্র কুমার শৈলেন্দ্র নারায়ণ রায় এম্-এ, বি-এল্ অন্যতম প্রার্থী হইবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের মনোনয়ন-প্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহার পিতামহ রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় ৩৪ বৎসর যাবৎ একাদিক্রমে কলিকাতা করপোরেশনের কমিশনার ছিলেন। গড়পার ও শ্যামবাজার সংযুক্ত দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্ তাঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থে নামকরণ করা হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গশ্রী কটন মিলের তিনি অন্যতম ডিরেক্টার। কংগ্রেসের মনোনয়নের ছাপ পাইলে তিনি জনসেবার সুযোগ সদ্ব্যবহার করিয়া বংশ গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবেন, ইহা আমরা আশা করি।

বিয়ে-পাগলা-বুড়োর কাহিনী

গত শনিবার বাংলা ২রা ফাল্গুন, ইংরাজী ১৫ই ফেব্রুয়ারী এক অভিনব বিবাহ বিভ্রাট হইয়া গিয়াছে।

সিমলা ষ্ট্রীটে কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমীর (বালক ও বালিকাদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়) হেড মাষ্টার শ্রীফণীন্দ্র নাথ গুপ্ত, বয়স আন্দাজ ৬০, বিবাহের জন্য প্রায় পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হাওড়া, ৭৭/১ খুরুট রোডে শ্রীহরিহর সেন মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা সপ্তদশ বয়স্কা কনকলতার সহিত তাঁহার বিবাহ ঠিক হইয়া যায়। কন্যার পিতা অতি দরিদ্র। ইনি রাইটার্স বিল্ডিংএ আই, বি তে অতি সামান্য বেতনে কর্ম্ম করেন। বিশেষতঃ তাঁহার একটি উপযুক্ত পুত্র সম্প্রতি মারা যাওয়ায় কিঞ্চিৎ মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। এই সুযোগে ফণীবাবু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে তাঁহার সহিত বিনাপণে বিবাহ দিতে রাজী করান।

ইতিমধ্যে সিমলা পাড়ার কয়েকটি উৎসাহী যুবক এই অভিনব বিবাহের সংবাদ জানিতে পারিয়া, বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

যুবকবৃন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ভারত প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গোপীমোহন রায়ের পৌত্র এবং ই, আই, রেলের ষ্টোরস্ বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে দায়মুক্ত করিতে সম্মত হন।

অবশেষে শনিবারে উভয় বরই কন্যার বাটীতে পৌঁছান। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফণীবাবু তাঁহার লোকজন, নাপিত, পুরোহিত, টোপর ইত্যাদি লইয়া ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া আসেন। এই সময় সমবেত লোকজনের বিচিত্র কোলাহল, ধিক্কার, উলুধ্বনিতে এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হয়। বৃদ্ধ ফণীন্দ্র বাবু হতাশ হইয়া বরযাত্রীদল লইয়া ফিরিতে

বাধ্য হ'ন ও কৃষ্ণ বাবুর সহিত কনকলতার নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হয়।

রামকৃষ্ণ নগর কীর্ত্তন

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী রবিবার সকাল ৬৷৷০টার সময় ভবানীপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্নিকটস্থ 'নরদার্ণ পার্ক' হইতে এক নগরকীর্ত্তন বাহির হইবে। এই উৎসব যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য কলিকাতাবাসীর উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শুভ-বিবাহ

গত ২৫শে মাঘ জয়নগরস্থ মজিলপুর নিবাসী শ্রীসতীশ চন্দ্র সরকারের কন্যা শ্রীমতী বিভারাণীর সহিত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নবদম্পতীর শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

* * *

সুগায়ক শ্রীকুমুদেশ সেনের ভ্রাতা শ্রীমান নলিনেশ সেনের সহিত শ্রীমতী রমা দেবীর শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

হুগলী জেলা সাহিত্য পরিষদ্

গত ২রা ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র রায়ের চুঁচুড়াস্থ গৃহে একটি সাধারণ সভায় হুগলী জেলা সাহিত্য পরিষদ্ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত ও নিয়মাবলী গঠিত হইয়া গিয়াছে।

পরিষদের উদ্দেশ্য

(১) জেলার সাহিত্যিকগণের পাণ্ডুলিপি, জীবনী, পুস্তক, লোকসাহিত্য প্রভৃতি সংগ্রহ ও প্রকাশ

(২) জেলার ঐতিহাসিক স্মৃতি সংরক্ষণ প্রভৃতি।

জেলার যে কোনো সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান বার্ষিক ১৲ টাকা চাঁদা দিয়া এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন। জেলার বা জেলার স্বার্থে সহানুভূতিসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি বার্ষিক এক টাকা চাঁদা বা একটী মৌলিক প্রবন্ধ দিয়া এই পরিষদের সভ্য হইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় (সহ সভাপতিদ্বয়), শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (কোষাধ্যক্ষ), শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় (সাধারণ সম্পাদক) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, প্রচার বিভাগ) শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সহযোগী সম্পাদক) প্রভৃতিকে লইয়া একটি কার্য্যঃ পরিচালক সংসদ গঠিত হইয়াছে।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈদ্যবাটীস্থ "পল্লীমধু" গৃহে কার্য্যপরিচালক সংসদের এক সভা হয়। এই সভায় স্থির হয়—হুগলী জেলা ও বাহিরের বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও পরিষদের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিগণকে সহযোগী সভ্য করা হইবে। এই সহযোগী সভ্য সংখ্যা ১৫ জনের অনধিক হইবে। সাধারণ সভ্যদের দেয় চাঁদা সম্বন্ধে ইঁহাদের কোনো বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না। তবে তাঁহারা স্বেচ্ছায় কোনো অর্থ সাহায্য করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহযোগী সভ্য নির্ব্বাচিত করা হয়:—(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (২) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (৩) শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী (৪) শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৫) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, (৬) শ্রীযুক্ত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, (৭) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, (৮) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (৯) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১০) অধ্যাপক রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, (১১) শ্রীযুক্তা সুধীরচন্দ্র রায়, (১২) শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩) শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত।

আগামী ১লা মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকায় হুগলী জেলা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে শ্রীরামপুর টাউনহলে রামকৃষ্ণ স্মৃতিপূজার জন্য একটি সভা হইবে।

শতাব্দী সংসদ্

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৫৩নং চক্রবেড়িয়া রোডে ৺সারদা ঘোষালের আদি ভবনে ভবানীপুর শতাব্দী সংসদ কর্ত্তৃক "সাবিত্রী" নাটকের দ্বাদশ রজনী মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছে। "দ্যুমৎসেনের" ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর অশ্বপতির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র ভড়ের অভিনয় মন্দ হয় নাই। সত্যবানের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বাবু রণেন্দ্রনাথ ঘোষালের অভিনয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তুম্বুরুর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস ও নারদের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার ঘোষের অভিনয় ভালই হইয়াছিল। মালবীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিভূষণ রায় ও শৈব্যার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য্যের অভিনয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই।

বিবেক ও মুক্তিরামের সুমধুর সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সংসদের সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের 'সুর-সংযোজনা সবিশেষ প্রশংসনীয়।

ইষ্ট লাইব্রেরী

৫৩, সারপেন্টাইন লেনের উক্ত লাইব্রেরীর উদ্যোগে আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারী একটি রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে। স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা যাহাতে এই বিষয়ে উৎসাহী হয়, সেই উদ্দেশ্যেই কর্ত্তৃপক্ষের এই আয়োজন। যাঁহারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে চান, তাঁহারা বিশদ বিবরণ উপরোক্ত ঠিকানা হইতে অনুসন্ধান করুন।

নাট্য-তরঙ্গ

শ্রীনটশেখর

নিউ এম্পায়ারে "কথাকলি"

গত বুধবার নিউ এম্পায়ারে "কথাকলি" নৃত্যের আসর বসে। এই নৃত্যের গুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রি তাঁর দলবলসহ যে নৃত্যকলা সাধারণকে দেখান তা' রসিকমনে চিরদিন জাগরুক থাক্‌বে। "কথাকলি" নৃত্যের নামই এতদিন আমরা শুনে আস্‌ছি কিন্তু তাঁর ভেতর যে এত সূক্ষ্ম কলাজ্ঞান আছে তা' আমরা আগে বুঝি নি। আর এই সঙ্গে শ্রীমতী কনকলতা, রাজেন্দ্র শঙ্কর ও দেবেন্দ্র শঙ্করের নৃত্য আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

"কথাকলি" ভারতের প্রাচীনতম নৃত্য। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে মূক অভিনয়ই এই নৃত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই নাম্বুদ্রি ও তাঁর দল অঙ্গভঙ্গিও মুদ্রার ভেতর দিয়ে সেদিন যে অপূর্ব্ব নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন তা' সত্যই অপূর্ব্ব! ভাষা নেই ব্যাখ্যা করবার।

আমরা পরিশেষে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা শ্রীহরেন ঘোষকে আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ জানাচ্ছি—কারণ তাঁরই উদ্যোগে এই অপূর্ব্ব অনুষ্ঠানের সজ্ঘটন হ'য়েছিল।

নাট্য-নিকেতন

নাট্য-নিকেতনের ভাঙ্গা আসর আবার যেন জোড়া লাগছে। অহীন্দ্র, নির্ম্মলেন্দু, রবি রায়, ভূমেন, জহর, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতি এতগুলো শক্তিমান নটের একত্র সম্মেলন অধুনা কোন রঙ্গমঞ্চেই নেই। এরপর বোঝার ওপর শাঁকের আঁটি। নরেশ মিত্তির এই দলে আস্‌ছেন—এমন কী কৃষ্ণচন্দ্র দে'রও এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া আশ্চর্য্য নয়! এরা সকলেই এদের পরবর্ত্তী বিজ্ঞাপিত "কেদার রায়" নাটকে আত্মপ্রকাশ কোরবেন। বাঙ্গলার বারোজন ভূম্যাধিকারীর মধ্যে কেদার রায় একজন। তার কাহিনী রোমাঞ্চ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। নাট্যকার রমেশ গোস্বামী যদি নাটকখানির ঘটনা সন্নিবেশ যথাযথভাবে কোরতে পারেন, তা' হ'লে "কেদার রায়" সাফল্যমণ্ডিত হবে—একথা বলাই বাহুল্য।

নব-নাট্যমন্দির

এই সম্প্রদায় এবার শরৎ-সাহিত্য থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাত দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত "যোগাযোগ" নাটকাকারে গ্রথিত কোরছেন নব-নাট্য-মন্দিরের পরবর্ত্তী আকর্ষণের জন্য। "যোগাযোগ" এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে কতদূর যোগাযোগ রক্ষা কোরবে তা' এখন থেকে ভবিষ্যৎ-বাণী করা সুকঠিন।

রূপমহল

এখানে ভূপেন বাঁড়ুয্যের "ব্রহ্মতেজে"-র মহলা শিগ্‌গীর বস্‌বে। "আবুল-হাসান" এখনও আসর জমিয়ে রেখেছে—তাই কর্ত্তৃপক্ষের তাড়া নেই বই খোল্‌বার। তবে গুড ফ্রাইডের ভেতরই "ব্রহ্মতেজ" রঙ্গমঞ্চে তার তেজ বিকীর্ণ কোরবে—একথা সুনিশ্চিত।

ভারতীয় চা

অবসাদ ও তন্দ্রালসতা দূর করে

চা প্রস্তুত করার প্রণালী

১। উৎকৃষ্ট ভারতীয় চা ব্যবহার করিবেন ;

২। সম্ভব হইলে মাটীর পাত্র ব্যবহার করিবেন ; প্রত্যেকের জন্য এক চামচ চা এবং এক চামচ অতিরিক্ত দিবেন ;

৩। দেখিবেন যেন জল টগবগ করিয়া ফোটে।

৪। আগে চা দিয়া তাহার উপর ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিবেন ;

৫। চা অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ভিজাতে দিবেন ; তাহার পর চিনি ও দুগ্ধ দিয়া পান করিবেন।

ভারতীয় চা'র যে কেবল অত্যাশ্চর্য্য স্নিগ্ধকর গুণ আছে তা নয় ; ইহা সুলভ, নির্দ্দোষ ও বলকারক পানীয় এবং ভারতীয়শ্রমে ভারতে উৎপন্ন ও প্রস্তুত। বাস্তবিকই ইহা ভারতের নিজের জিনিষ, অথচ ভারতবাসীর মধ্যে এ যাবৎ উহা খুব বিস্তৃত ভাবে আদৃত নয়। ইহার আস্বাদ অনুভব করিয়া না থাকিলে আজই এক পেয়ালা চা পান করুন।

প্রকৃতই স্বদেশোৎপন্ন—ভারতীয় চা

I. K. 9

হে মোর অপরিচিতা

[উপন্যাস]

শ্রীসুপ্রিয় সোম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেশ অভিমান করে সে মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, চলবে না ত' বাঁচলুম।

বলে সে চঞ্চল চরণে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। আমি উঠে তার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলেম তনু।

না, না, কোন কথা নয়। বলে সে মুখ ফিরিয়ে শুলো।

আমি এইবার অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করে বল্লেম, আমি চল্লেম। তোমার দাদা এলে বলো যে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্সনটা ড্রয়ারের ভেতরে আছে।

প্রায় দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তনিমা মুখ ফিরিয়ে ডাকলে, এই!

উত্তর না দিয়ে বেরিয়েই যাচ্ছিলেম, এমন সময় ঝাঁ করে উঠে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, যাও দিকিনি, কেমন করে যাবে?

হেসে বল্লেম, তোমার দৌড় যে ঐ পর্য্যন্ত সে আমি জানি।

সে তেমনি পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কোন কথা কইলে না।

জিজ্ঞাসা করলেম, কটা শুণলে?

ওপর দিক থেকে চোখ নামিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লে, কী কটা?

বল্লেম, কড়িকাঠ।

ফিক্ করে হেসে ফেল্লে। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলেম না। তাকে কোলে করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গায়ের ওপর চাদরটা তুলে দিলেম।

বল্লেম, একটী কথা না। চুপটী করে শুয়ে থাকবে। আগে সেরে ওঠো, তারপরে কী রকম সংসার করতে হবে ভাবা যাবে'খন।

এই আবার আমার এ কাহিনীর শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেচি। আমাকে এইবার তনিমার শেষ কথা বলতে হবে। তনিমার শেষ-কথা তার মৃত্যু। মৃত্যু যে কত ভয়াবহ ও ভীষণ তা তনিমার মৃত্যু-কাতর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পেরেছিলেম। শুধু যে মানুষের দেহটাই মৃত্যুতে বিনষ্ট হয়ে গেলো বলে নয়, তার সমস্ত আশা আকাঙ্খার চির সমাধি হলো বলেও বটে। তোমরা আমাকে নাস্তিক বলবে, বলো ক্ষতি নেই, কিন্তু কেমন করে আস্তিকের মত বলবো, তনিমার জীবনের আশা-আকাঙ্খা শেষ হয়নি, তা চির-সার্থক হয়ে উঠেচে, অন্য কোনো জগতে, অন্য কোনো জীবনে!

যখনই তনিমাকে দেখেছি, তখনই মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেচি তার চোখ দুটো রাঙা। এর কারণ আমি কোন দিন জিজ্ঞাসা করিনি। দুষ্টু মেয়েকে শান্ত করতে যেমন জোর করে কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দেয়, ঠিক তেমনি ভাবে সে দিন যখন তনিমাকে শুইয়ে দিয়ে এলেম, তখন সে আর কোন কথা কয় নি, বেশ শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালকের মতই চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিলো। হয়ত' পরে ঘুমিয়েও পড়েছিলো, সে খবর আমি আর রাখবার প্রয়োজন মনে করিনি।

নবকিশোর আর আমাতে এক ঘরেই শুতেম। সেদিন দু'জনে মিলে নানা গল্পগুজব করে প্রায় রাত দুটোর সময় ঘুমোবার উদ্যোগ করেচি, এমন সময় একটা করুণ চীৎকার-ধ্বনি সমস্ত বাড়ীটাকে প্রায় কাঁপিয়ে দিলে। শব্দ ছুটে এলো তনিমার ঘর থেকে। আমাদের ধারণা হলো, চোর এসেচে। দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে তনিমার ঘরে ছুটে এলেম। তনিমার বাবা ও ছোট ভাইটা পর্য্যন্ত না এসে পারেনি, সে চীৎকার এত করুণ।

চীৎকারটা একবার মাত্র হয়েছিলো, আর একটী বারো নয়। তনিমাকে দেখলেম শুয়ে আছে—স্থির, অচঞ্চল। তার হাত দুটো দুই চোখে চাপা। আমাদের সকলেই কেমন একটু ভীত হয়ে পড়েছিলেম। ব্যাপারটা মনে হলো যেন রহস্যময়।

নবকিশোর ডাকলে, তনু!

কোনো সাড়া এলো না।

তনিমার বাবা এগিয়ে এলেন। বিছানার ওপরে বসে ডাকলেন, তনু, কী হয়েচে মা!

কোথায়, কে উত্তর দেবে! তনিমা ঠিক তেমনটি হয়েই শুয়ে রইলো। তনিমার বাবা তনিমার মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকলেন, তনু মা, কোনো কষ্ট হচ্ছে?

কোনো উত্তর এবারেও এলো না। আমরা
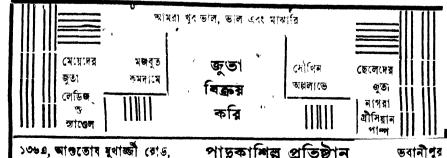
কলেই বড় ভীত হয়ে উঠলেম। সে যে বেঁচে াছে এ অবশ্য বেশ বোঝা গেল। কিন্তু অমন াবে সে শুয়েই বা কেন, আর কোনো উত্তরই দিচ্ছেনা কেন? কিসের যন্ত্রণায় তনু ৎকার করে উঠেছিলো সেটা জানবার জন্যে ামরা ক্রমে ক্রমে বড় উৎসুক হয়ে উঠলেম।

আমরা সকলেই কী করব ভাবচি, এমন ময় সামান্য একটু শব্দ হলো ওঃ।

শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনো পরিবর্ত্তন লো না, কেবল গলার ঐ স্বরটুকু।

তনিমার বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ী হয়েচে মা? কোথায় অসুখ করেচে?

তনিমা হাত দুটো দুপাশে নামিয়ে রেখে ্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে, আঃ।

আমি কাছে এগিয়ে প্রশ্ন করলেম, কী য়েছে তনু? কোথায় যন্ত্রণা হচ্চে? আস্তে ত্তর দিলে, চোখে।

নবকিশোর বল্লে, চোখে কী হচ্চে?

তনিমা উত্তর দিলে, ভয়ানক কী রকম যন্ত্রণা হচ্চে। তখন কী রকম চিড়িং করে উঠেছিলো তাই চেঁচিয়ে উঠেছিলুম।

ডাক্তার এলো, পরীক্ষা করলে, ওষুধ দিলে, কিন্তু যন্ত্রণার কোনো উপশম হলো না। নবকিশোর ও আমি সে রাত সেই ঘরেতেই কাটিয়ে দিলেম।

সকাল হলো, অন্য ডাক্তার এলো, চোখে নীল চশমা আঁটা হলো, ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হলো, কিন্তু ফলের কোনো তারতম্য দেখা গেলো না। ক্রমে যন্ত্রণা বেড়ে যেতেই লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তনিমার সকরুণ চীৎকার! আমার চোখে জল আসে, মুছে ফেলি, কী আর করব? অতি অসহায়; আমরা অতি অসহায়! বিজ্ঞানের কোনো ক্ষমতা নেই, অতি তুচ্ছ সে! মানুষের যন্ত্রণার উপশম করতে পারে না, পারে না সে মৃত্যুর ওপরে হুকুম চালাতে। কল্‌কাতার যত বড় বড় ডাক্তার সকলেই এলো কিন্তু কেউই রোগের নাম পর্য্যন্ত বলতে পারলে না, চিকিৎসাও অতএব আন্দাজে ঢিল মারার মতই হলো। চিকিৎসার নামেও মেয়েটাকে যা অত্যাচার করা হলো, তাও খুব কম নয়।

রাত দুপুর। তনিমার চোখে ওষুধ দিয়ে দিচ্ছিলুম রবারের ড্রপার দিয়ে। সে ওষুধটা জোর করে আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে মেজেতে ফেলে দিয়ে আমার হাতটা চোখের ওপরে চেপে ধরে রইলো। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেম, ও কী করলে তনু? অসুখটা সারাতে হবেত'? এ রকম ছেলেমানুষী করলে চলে কখন?

তনিমা বিশেষ কোনো উত্তর দিলে না। কেবল বল্লে, তোমার হাতটা একটু জোর করে চেপে রাখ না, আমি তাতেই স্বস্তি পাব।

তাই চেপে রইলেম, ওর এতে যদি যন্ত্রণার লাঘব হয়, আমি কেন তাতে বাধা দিই। কিন্তু তবু কি যন্ত্রণা যায়, যত জোরে পারে আমার হাতটা মাঝে মাঝে নিজে ধরে চেপে রাখে, কিন্তু যন্ত্রণার আর লাঘব হয় না, দারুণ চীৎকার করে ওঠে।

একটু হয়ত যন্ত্রণা কম পড়েছিলো, জিজ্ঞাসা করলে, আমার আর বোধ হয় তোমাকে নিয়ে সংসার করা হলো না!

তার গলাটা মৃদু একটু কেঁপে ওঠল।

আমি আশ্বাসের স্বরে বল্লেম, ছিঃ, ওরকম ভাবতে নেই। তোমার এমন কী হয়েচে যে ওরকম ভাবচ।

আর কিছু বল্লে না, বোধহয় বুঝলে নিষ্প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ গেলো। আমার হাত দুটো চোখ থেকে তুলে নিয়ে বল্লে, তুমি অনেকক্ষণ জেগে আছো। তুমি এবারে যাও আর দাদাকে ডেগে দাও গে।

আমি বল্লেম, সে ঘুমুচ্চে ঘুমুক না, আমার কোনো কষ্ট হচ্চে না।

স্থির কণ্ঠে উত্তর এলো: আমার কি একটা কথাও রাখতে নেই!

বেশ। আর কোনো কথা না বলে নবকিশোরকে ডেকে দিয়ে শুয়ে পড়লেম।

দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়। একদিন হঠাৎ যন্ত্রণা কম পড়ল, এক রকম শ্বেত পদার্থে তার চোখ একেবারে বন্ধ হয়ে এলো। আমাদের একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল, আনন্দও যে কম হলো তা নয়। এ আনন্দ তনুর অসুখ সেরে যাচ্ছে বলে নয়; ওকে আর যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্চে না বলে। কিন্তু যখন ডাক্তার এলো, এবং পরীক্ষা করে যখন তিনি বল্লেন, তনিমার চোখ দুটো হয়ত পচে যাচ্চে, তখন আমরা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় চমকে ওঠলেম।

তনিমা স্থির হয়ে পড়ে থাকে, কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই, একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম। অমন যে দুটী লাল চোখ তা একেবারে হলদে। তা দেখলে মনে হয় তার শরীরে কোনো অসুখ নেই, কোনো জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, যেন সে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন।

আমরা সকলেই আপ্রাণ সেবা করে চলেচি। তনিমা কথা কয়, দিনের মধ্যে দুটো কী একটা। আমার সঙ্গে যদি কথা কয়, তাহলে সেই এক-ই কথা বলে, তোমার সঙ্গে সংসার করা হলো না, এইটে আমার জীবনে বড় দুঃখ রয়ে গেলো। আমি শেষে আর কোনো উত্তর দিতেম না, আর দেবার কোনো উত্তর ছিলোও না। কেবল যত পেরেচি তাকে হাসির গল্প করেচি, গল্প করেচি এমন সব জিনিষ যা তার মনকে প্রফুল্ল করে। কিন্তু ফল যে বিশেষ হতো না তা বেশ বুঝতে পারতেম।

একদিন দুপুরে তার ভয়ানক জ্বর হলো। হাই ফিভার। ডাক্তার এলো, চিরপ্রথানুযায়ী ওষুধ দিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনো মন্তব্য প্রকাশ করতে পারলেন না।

জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তনিমার যন্ত্রণাও বেড়ে যেতে লাগল। কেবলই আমাকে ধরে, আমার হাত দুটো খুব জোরে চেপে ধরে। বলে, মাথাটা জ্বলে যাচ্চে যেন ঠিক।

ক্যান বন্ধ করে তাল পাতার পাখায় খুব আস্তে আস্তে বাতাস করি? জিজ্ঞাসা করি, মাথার জ্বালাটা একটু কমেচে, তনু!

কোনো উত্তর দেয় না। কখন বা বলে, একটু।

বুঝতে পারি মাথার জ্বালা কমেনি, সে জ্বালা কমবার জ্বালা নয়। তবে আমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বলত, একটু কমেচে।

মাঝে মাঝে বড় ছটফট করতে থাকে। এত ছটফট করে আর এপাশ ওপাশ করে যে তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। অনবরত পাশ ফিরবে আর মাঝে মাঝে আমার হাতটা ধরে উঠতে চাইচে, বলচে, আমি বস্‌বো।

মিষ্টি কথা বলে তাকে আবার শুইয়ে দিচ্চি।

রাত প্রায় দুটো। তনিমা অনেক শান্ত হয়ে এলো। ভাবলেম, বুঝি বা তনিমার যন্ত্রণাটা কিছু কম পড়লো।

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থেকে ডাক্‌লে, বাবা!

কি মা! বলে বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন!

আমার মুখাগ্নি ওঁকেই করতে দিও। বলেই আমার হাতটা খুঁজে নিয়ে বুকের ওপরে চেপে ধরলে। হাত দুটোতে বেশ একটু চাপ দিয়ে আমার দিকে অনুমানে ফিরে বল্লে, ভাল ভাবে থেকো কিন্তু, আমার কথাটা রেখো। বিয়ে করো, তা নইলে তোমাকে দেখবে কে?

মৃদু একটু হাসলে। কি সুন্দর, অথচ কত ম্লান, করুণ সে হাসি।

চোখের জল মুছতে যাবো, তনু হঠাৎ চীৎকার করে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল। মুখটা মুহূর্ত্তের জন্যে বিকৃত করে স্থির হয়ে রইলো, তার চোখ দিয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়লো, অশ্রু নয়, দু ফোঁটা রক্ত।

* * * *

আমার গল্প-কথা শেষ হলো। তনিমার জীবনের পূর্ণচ্ছেদে আমার গল্পেরও পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। কিন্তু আমার কথা একটু বলবার আছে।

তনিমার মুখাগ্নি আমিই করেছিলেম। তার শেষ অনুরোধ আমাকে রাখতে হয়েছিল কেউ কোনো আপত্তি করে নি।

রাতের অন্ধকারে, নিঘুম চোখে ভাবি তনিমার কথা আর ভাবি আমার জীবন। এক দিন অতি অকস্মাৎ একটা বৈশাখী ঝড়ের মতো তনিমা আমার সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছিল, হাস্য-চঞ্চলা লীলাময়ী মূর্ত্তি। তেমনি ঝড়ের মতই সে চলে গেলো, কিন্তু সে দেখে যেতে পারলে না, যাকে সে পেছনে ফেলে এসেছে তাকে সে কত নিঃস্ব, কত দুর্ব্বল করে গেছে। তার জীবনে আজ কোনো আশা নেই, কোনো ভরসা নেই, ভবিষ্যত তার কাছে সেই কৈশোরের প্রথম জাগরণের মতই রঙ্গীন ও স্বপ্নময় নয়, একেবারে অন্ধকার। সে চাকরী করে। দুবেলা খায় আর ঘুমোয়। বিয়ে সে করেনি, করতে পারে না। মাঝে মাঝে হয়ত ভাবে, তনিমা মরে নি, তনিমাকে সে 'বিয়ে করেছিলো, হয়েছিলো তার দু'একটী ছেলেমেয়ে। কিন্তু এ স্বপ্ন বেশীক্ষণ থাকে না। সন্ধ্যায় ছাতের ওপরে পায়চারী করতে করতে আকাশের দিকে চেয়ে কতবার হয়ত ডাকে, তনু, তনু, তনু! এমনি করে তার দিন চলে। যা হতে পারত, অথচ হলো না, এর দুঃখ বড়ো বেশী। তনিমাকে সে প্রায় পেয়েছিলো, আর কিছুদিন হলে সে তাকে বিয়ে করে তার সংসারের সাধ মিটিয়ে দিতে পারত। মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি একটী ছেলে কিংবা একটী মেয়েও তার থাকত, তাহ'লেও জীবনটাকে বেশ দশজনের মত করেই কাটিয়ে দেওয়া যেতো, কিন্তু সে পথও চিররুদ্ধ! সমাপ্তির আনন্দ সে ভোগ করতে পারলে না। অসমাপ্তির ব্যথায় তার বুক ভরে আছে। তোমরা, যারা আমার এ কাহিনী পড়বে, একটু চোখের জল ফেলো, আমার জন্যে নয়; তনুর কথা স্মরণ করে। যদি পরলোকে থাকে, তাহ'লে এতে তার অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্তিলাভ করবে।

সমাপ্ত

চিঠি-পত্র

নিখিল-বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলন

খেয়ালী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

এই সপ্তাহের (২৩শে মাঘ তারিখের) খেয়ালীতে দেখা যায় নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের বিবরণী ও সমালোচনা শেষ হোল।

গতবারে সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানান হ'য়েছিল বিভিন্ন পক্ষের সমালোচনায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ যেন না থাকে। সম্পাদকের কর্ত্তব্যই তিনি ক'রেছিলেন এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে যে লোক বা লোকগুলি প্রেরিত হ'য়েছিল তাঁরা তাঁর ঐ উপদেশ অমান্য ক'রে নিরপেক্ষ সমালোচনার অজুহাতে বার বার একজন বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিকে—আজ যাঁকে সমগ্র বাঙ্গলার শত সহস্র শিক্ষার্থী গুরু বলে মান্য ও পূজা করে—অপমানিত করবার চেষ্টা করছে।

এবার ছদ্মনামী মহাশয় যে বিশিষ্ট গুণীকে লক্ষ্য ক'রে লিখেছেন "যাহারা অন্তঃসারশূন্য এবং সাধারণের অজ্ঞতার advantage লইয়া ঘরোয়ানার দোহাই দিয়া নিজেদের অপকর্ষ প্রচ্ছন্ন করিয়া উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিতে চান" তাঁরা ধরা পড়তে পারেন যদি open conference এ এই বিশিষ্ট ওস্তাদদের সেই রাগ সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা ও demonstration হয়। এ খুব ভাল কথা, এতে কারই কোন আপত্তি থাকবার কারণ নাই। এতে অনেক তথাকথিত গুণী এবং যাঁহাদের জন্য তিনি কলম ধ'রেছেন তাঁদের অনেকেই হয়ত ধরা পড়তে পারেন; কিন্তু যে প্রসঙ্গে তিনি এ কথা বলেছেন বা যা'কে উদ্দেশ ক'রে এটা লেখা হ'য়েছে তাঁর ভাল বই মন্দ হ'বে না, তাঁর "নিকষ পাষানেই" পরিচয় হয়ে যাবে বাওরা মহাশয়ের বোধ হয় জানা নাই যে, তিনি উত্তর ভারতের বহু নগরে বহু বড় বড় ওস্তাদের জলসায় এবং কলিকাতায় বহু গুণী ও রসজ্ঞ সমাজের সম্মুখে বহুবার তাঁর 'পারদর্শিতার প্রমাণ' দিয়ে এসেছেন। সাধারণে বহুবার সে প্রমাণ পেয়েছে বলেই আজ তাঁকে বাঙ্গলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে সম্মান ক'রে আসছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের গুণী সমাজে তাঁর শিক্ষা ও স্থান অকিঞ্চিৎকর ব'লে প্রমাণিত না হ'চ্ছে ততদিন শুধু কতকগুলি লজ্জাকর কটুক্তি বর্ষণ করলে তাঁদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না। এখানে স্বতই একটা প্রশ্ন মনে আসছে বাওরা মহাশয়ের মতে—যে লোকের ঠুমরী গায়ক ব'লে প্রসিদ্ধি সেই গুরুর কাছ থেকে তালিম নিয়ে যামিনী গাঙ্গুলী, রথীন চাটার্জ্জি, শৈলেন ব্যানার্জ্জি, সুধীর চক্রবর্ত্তী, জহরলাল, শান্তিলতা (খোকন) গীতশ্রী গীতা দাস ও আরতি দাস—এরা বারবার এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ভারি খেয়ালে প্রথম স্থান অধিকার করে কেমন ক'রে এবং প্রত্যহ open conference এ সমস্ত ওস্তাদগুণীর সম্মুখে demonstration দিয়ে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে কেমন ক'রে?

এরা কি "এরি হাবি ননদীয়া" হাল্কা ঠুমরী গান গেয়ে বছরের পর বছর প্রথম হয়? না ভারতের আর কোন ঘরোয়ানা ওস্তাদের ছাত্র এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না? না এদের গান না শুনেই এদের consolation হিসাবে প্রথম ক'রে দেওয়া হয়—? সে সব সম্মেলনে কি কোন ঘরোয়ানা ওস্তাদ গুণী উপস্থিত থাকেন না? ডাক্তার ভট্টাচার্য্য কি সেখানে প্রতি বৎসর একটা প্রহসনের অবতারণা করেন? আমরা ডাক্তার ভট্টাচার্য্যকে এই সমস্ত রহস্য ভেদ ক'রে দিতে অনুরোধ কচ্ছি।

বাওরা মহাশয়—সম্মেলনের কার্য্যাবলীর যে সব সমালোচনা ক'রেছেন তাতে আমাদের কোন আপত্তির কারণ দেখছি না;

তবে এটা সকলকেই স্বীকার করতেই হ'বে, ওরূপ বৃহৎ ব্যাপারে এক আধটু গোলযোগ না হ'য়ে পারে না। বাওরা মহাশয়ের ঘরোয়ানা সম্বন্ধে জ্ঞান ও ঐ সম্বন্ধে তাঁহার উচ্ছ্বাস সম্বন্ধে একটু ব'লে আমাদের বক্তব্য শেষ করব। সেটা যে খুবই উপভোগ্য হয়েছে তা আমরা স্বীকার না ক'রে পারি না। রাধিকা গোস্বামীর কোন শিষ্য (বাওরা মশায় যখন কোন নাম করেন নাই তখন আমরাও করব না) "এরি হারি ননদীয়া" কি এমনি কোন ঠুমরী গাইতে পারেন না কারণ তাতে গোঁসাইজীর ঘরোয়ানা জাত, কুল, মান বিলকুল নষ্ট হয়ে যাবে আবার তার উপর যদি তিনি অতি অন্যায় স্পর্দ্ধা ক'রে বলেন আমি উজির খাঁ, মহম্মদ আলির নিকট খেয়াল শিখেছি—তা হ'লে ত সর্ব্বনাশ। বোধহয় ঘরোয়ানা নষ্ট হওয়ার ভয়ে—তাঁরা তাঁদের কবরের মধ্যে শিউরে ন'ড়ে উঠবেন। এ সব মহাপাপের পরও তিনি যদি আবার ভাইয়া সাহেব গনপত রাও কি মৈজুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে ঠুমরী শেখার দাবী ক'রে তাঁর ঠুমরী গানের কদর চান তাহ'লে সে মহাপাপীর কি করা উচিত তা বাওরা মহাশয় অবিশ্যি বলে দেন নি, তবে পাঠকদের বিশেষ অনুরোধ করেছেন যেন কদাচ তাঁকে কদর না দেন। অতি উত্তম প্রস্তাব। এমন হাস্যকর যুক্তি কেউ কখনও শুনেছেন কি না 'খেয়ালীর' মারফত জানালে আমরা বাধিত হব। বাওরা মহাশয়ের মতে বোধহয় আবদুল করিম বা ফৈয়াজ খাঁ কোন ঘরোয়ানার দাবী করতে পারেন না কারণ তাঁরা কলিকাতায় একাধিক আসরে খেয়াল গানের পর ঠুমরী গেয়েছিলেন শুনেছি।

বাওরা মহাশয় ব'লেছেন "যাহার দ্বারা একটা ঘরোয়ানার যথোপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা হয়না তাঁহার দ্বারা বহু ঘরোয়ানার গৌরব অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত হ'য়েছে—একথা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ঘরোয়ানার অর্থ বিশিষ্ট তাৎপর্য্য মর্ম্ম অন্ততঃ যাঁহারা বিন্দুমাত্র বোঝেন তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।" ঘরোয়ানা ব'লতে বাওরা মশায় নিজে কি বোঝেন তা আমরা অনেক চেষ্টায়ও বোধগম্য করতে পারলাম না। তাঁর মতে কি প্রত্যেক গায়ককে Water tight compartment এ বদ্ধ থাকতে হবে? তাঁর মতে কেউ কখনও যেন কোন ধ্রুপদীর কাছে ধ্রুপদ শিখে খেয়াল বা ঠুমরী না শেখে। খেয়াল শিখে যেন ধ্রুপদ ও ঠুমরী না শেখে—তা তার ভগবৎদত্ত ক্ষমতাই থাকুক বা তার অপরিসীম যত্ন ও চেষ্টাই থাকুক। বাওরা মহাশয়ের পরামর্শ মত চল্‌লে বাঙ্গলার সঙ্গীত চর্চ্চা অচিরে চরম উৎকর্ষ লাভ করবে দেখা যাচ্ছে। বাওরা মহাশয়ের ও তাঁর সহকারিবৃন্দ এ সব অনধিকার চর্চ্চা না ক'রে কিছুদিন বাঙ্গলার বাহিরে গিয়ে এ সব সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা লাভ ক'রে এলে নিজেদের উপকার করতেন। তিনি ত এক জায়গায় নিজেই ব'লেছেন শুধু ওস্তাদদের আশপাশে ঘোরাঘুরি করলে ঘরোয়ানা সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান হয় না। আলোচ্য গায়কটি যদি সমস্ত জীবন অতিবাহিত ক'রেও ঐ জ্ঞান লাভ করতে না পেরে থাকেন তবে Conference এ আধ ঘণ্টা বা ১ ঘণ্টার আলোচনায় সমস্ত বাঙ্গালী কেমন করে ঘরোয়ানাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে তা ত আমরা অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারলাম না।

শেষ পর্য্যন্ত বাওরা মহাশয়—২ টি গল্পের অবতারণা ক'রেছেন যার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ। Conference এ প্রোঃ ধূর্জ্জটি বাবু বললেন একজন বিশিষ্ট গায়ক প্রদীপকি গাইবেন, সেই গায়ক যা গাইলেন তা শুনে অনেকের মনে সন্দেহ হ'ল; একজন সাহসে ভর ক'রে কিন্তু চুপে চুপে
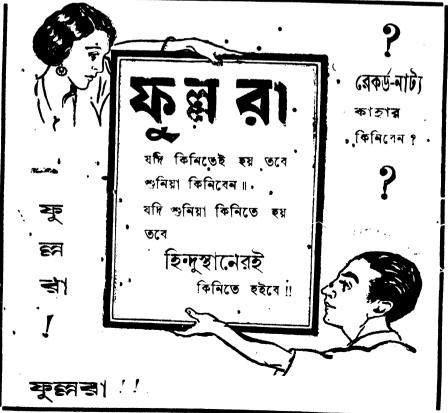
(কারণ প্রকাশ্য ভাবে জিজ্ঞাসা করা প্রমাণ নাই) পূর্জ্জটি বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি রাগ; তখন তিনি একটু হেসে (বাওরা মহাশয়ের মতে হাসার কারণ গায়কটির লজ্জা নিবারণ করার জন্য) বললেন "আলা উদ্দিন খাঁ সাহেব বললেন এটা বারোঁয়া"। জিজ্ঞাসা করি 'বাওরা' মহাশয় তখন ছিলেন কোথায়? তিনি ত সন্দেহ ভঞ্জন ক'রতে পারতেন, তিনি না পারলেও সেই গায়ককেও জিজ্ঞাসা করতে পারতেন তিনিই তাঁদের সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দিতেন। যিনি প্রকাশ্য Conferenceএ প্রদীপকি গাইতে ব'লেছেন তিনি বারোঁয়া ও প্রদীপকির পার্থক্যও দেখিয়ে দিতে পারতেন ব'লে আমাদের বিশ্বাস আছে। ব্যাপারটি নীরবেই বা পরিসমাপ্তি হ'তে দেওয়া হোল কেন? এতে বিশিষ্ট গায়কটির অজ্ঞতাই বা কোথায় প্রকাশ পেল তা ত আমরা বুঝতে অক্ষম। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব একজন বাঙ্গালী বড় গুণী তা আমরা স্বীকার করি কিন্তু তিনি এই verdict দিয়ে থাকলে তা আমরা মানতে প্রস্তুত নই কারণ ঐ প্রদীপকি রাগ গত ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদ All India Conferenceএ, গিরিজাবাবুর একজন ছাত্র (যামিনী গাঙ্গুলী) গান, তখন রাগের নাম উল্লেখ করবার প্রথা ছিল না। তখন কেউ কেউ রাগের নাম জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু ছাত্রটি রাগের নাম বলিতে অস্বীকার করে। তখন উপস্থিত গুণীমণ্ডলীকে রাগের নাম জিজ্ঞাসা করা হয় কিন্তু অনেকেই রাগ চিনতে না পারায় চুপ ক'রে ছিলেন। তারপর মহাজ্ঞানী ওস্তাদ হাফেজ আলি খাঁ সাহেব ঐ রাগের নাম করেন ও ছাত্রটি ও তার ওস্তাদের বহু তারিফ করেন। ৮ বৎসরের শিশু শান্তিলতার খেয়াল শুনে সঙ্গীতরত্ন নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব এত আশ্চর্য্য হ'য়েছিলেন যে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করেন ও জিজ্ঞাসা করেন কে এই ওস্তাদ যে এই ক্ষুদ্র বালিকাকে এমন ভারি খেয়াল বিশুদ্ধ ভাবে শেখাতে পেরেছেন। আশ্চর্য্য, গিরিজাশঙ্কর সেবার নিজে ঐ conferenceএ উপস্থিত হ'তে পারেন নাই কিন্তু তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতীয় সঙ্গীতে বাঙ্গালীর স্থান নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়ে এসেছিল। আমরা এ কথার সত্যতার জন্য ডাঃ ভট্টাচার্য্যকে refer কচ্ছি। তাঁর এ সব কথা স্মরণ থাকলে "খেয়ালী"র মারফত জানালে আমরা উপকৃত হব।

যদি এ ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খাঁ প্রদীপকি রাগকে বারোঁয়া বলে থাকেন তবে কি জন্য তিনি ব'লেছেন তা পাঠকবর্গ বিচার করবেন।

তারপর সেই বিশিষ্ট গায়কটি আর ১ খানি বাগেশ্রী গেয়েছিলেন এবং তা শুনে বাওরা মহাশয়ের কানে কানে প্রোঃ আলাউদ্দিন খাঁ বলেন গায়কটি পঞ্চম লয়ে গাইবার দরুণ রীতিবিরুদ্ধ হচ্ছে। বাওরা মহাশয়ের অবগতির জন্য আমরা জানাচ্ছি যদিও সাধারণতঃ বাগেশ্রীতে পঞ্চম লাগে না কিন্তু কোন কোন বিশিষ্ট ঘরোয়ানার কতকগুলি বিখ্যাত গান প্রচলিত আছে যাহাতে পঞ্চম লাগান হয়। ঐ গানগুলি চিরদিন ঐ ভাবে গাওয়া হচ্ছে। একই গান বিভিন্ন ঘরোয়ানায় বিভিন্ন রাগে ও বিভিন্ন লয়ে গীত হয় তা বাওয়া মহাশয় নিজেই স্বীকার ক'রেছেন (২৮ পৃঃ ২য় কলম, ৮ লাইন) এখানে কি বাওরা মহাশয় ব্যক্তিগত নিন্দাবাদের অবসর পেয়ে নিজের স্বীকার উক্তিবাদ ভুলে গেলেন?

লেখক বলেন "সম্মেলনে যদি ঐ সকল বিষয়ের মীমাংসা না হয় তাহা হইলে ভারতীয় সঙ্গীতের যথার্থ উন্নতি সাধিত হওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়" এ কথা খুব ঠিক কিন্তু এই সরল কথাটি বলার জন্য এত বিদ্বেষের বিষ ঢালবার কি প্রয়োজন ছিল?

বাওরা মহাশয় "খেয়ালী"র অনেকগুলি পৃষ্ঠা ধান ভানতে মহীপালের গীত গেয়ে শেষ পর্য্যন্ত অতি সংক্ষেপে নিজের বক্তব্যটুকু ব'লেছেন তা এই—"এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে রাগ রাগিণীর স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্র সাহায্যে ও গায়কীয় synthesis করিয়া standard নিরূপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং এই জন্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের ইহা করা উচিত যে কয়েকটি বিশিষ্ট রাগ নির্ব্বাচন করিয়া বিশিষ্ট গুণীদের সে বিষয়ে demonstration দ্বারা নিজ নিজ styleএর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে সুযোগ দেওয়া ও ঐ

সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট রাগ-রূপের আদর্শ প্রণয়ন করা। যখন কালস্রোতে সম্প্রদায় উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে—তখন যতদূর সম্ভব সময় থাকিতে সঙ্গীতের আদর্শ-সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা কি বাঞ্ছনীয় নহে?" খুব উচ্চাঙ্গের প্রস্তাব এবং আমরা ইহার সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু লেখক বোধহয় জানেন না' গত ৩০ ৪০ বছর থেকে বোম্বাইয়ের ভাতখণ্ডে মহাশয় এই উদ্দেশ্য নিয়েই জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং বরোদার দেশপ্রাণ গায়করা ও অন্যান্য বড় সামন্ত নরপতিদের সাহায্য লাভ ক'রেও এখনও বিশেষ কিছুই ক'রে উঠতে পারেন নাই। এ কাজে ভারতের সমস্ত বড় গুণীদের আন্তরিক সাহায্য দরকার,—কিন্তু তাঁরা কেউ ভাতখণ্ডেজির তাঁবেদার নন—এবং তাঁরা কেউ তাঁদের কষ্টার্জ্জিত বিদ্যা অত সহজে বিতরণ করতেও প্রস্তুত নন! লেখক যত সহজে কথাটি সিদ্ধ হ'বে বলে মনে করেন তা হ'বে ব'লে মনে হয় না। পশ্চিমা মুসলমান ওস্তাদের কাছে শিক্ষার্থী হ'য়ে দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা যাদের তিলমাত্র আছে তাঁরা জানেন তাদের কাছ থেকে জিনিষ আদায় করা কত কঠিন এবং এই জন্যই এ বিদ্যা আগে কখনও massএর মধ্যে প্রসার লাভ করে নাই—আর আজ যে কলিকাতা ও মফঃস্বলে এই সঙ্গীতের নব জাগরণের সাড়া পড়েছে—সেটা করা অক্লান্ত চেষ্টায় ও ঐকান্তিক যত্নের ফল তা আজ নূতন ক'রে কাউকে ব'লে দিতে হবে না। সেই চেষ্টাকে উৎসাহ দিয়ে বাড়িয়ে তোলাই সমীচীন।

বাওরা মহাশয় বাঙ্গলা দেশে আজকাল এমন একটি লোকও দেখতে পাচ্ছেন না যিনি তাঁকে ও অসংখ্য বাঙ্গালী শিক্ষার্থীকে সুরবর্ত্তিকা হাতে নিয়ে সুরভারতীর সাধনার আলোক দেখাবেন। আমরা বলি যদি কেউ চোখ বুজে ব'সে থাকে বা চোখে smoked goggles পরে আর কান দুটো ঠেসে plugging' করে রাখে তবে তারে সুরবর্ত্তিকা কেন সুরের X-Ray জ্বাললেও কিছুই দেখান যাবে না। আর তিনি আসরে ভাঙ্গা কাশী ছাড়া আর কি শোনবার আশা করেন?

শ্রীব্রজগোপাল সেন

শ্রীনির্ম্মলেন্দু পাঠক

বহরমপুর

১৭শে মাঘ, ১৩৪২

পতিতপাবন পতিতুণ্ডী

নতুন ছবি

"সুট মি সুটস" ছবিখানা হচ্ছে এডি ক্যাণ্টরের; এ খবর আমি গত সপ্তাহেই দিয়েছিলাম। এতে নামছে এডির সঙ্গে এথেল মারম্যান, স্যালি ইলার্স আরো অনেকে, আর আছে গোল্ড্উইন দলের সুন্দরী মেয়েরা। পরিচালনা করছেন নরম্যান টুর্গ। কিন্তু এর চেয়ে বড় খবর যেটা আছে, সেবার সেটা হচ্ছে "সুট দি সুটস" ছবিখানার নাম বদলান হয়েছে। এবং নাম হচ্ছে "ষ্ট্রাইক মি পিঙ্ক"।

ডিক্ পাওয়েলের নাম

চুপি চুপি একটা নাম বলে দি, কাজে লেগে যেতে পারে, মনে রেখে দিন। কে জানে কখন কোনটা কি কাজে লাগে। আর যারা ষ্টারদের কাছে চিঠি পাঠান তাদের তো কথাই নেই। ওদেশে কোন একটা কাজ কর্ম্মে কিম্বা উৎসবে যখন ডিক্ পাওয়েলকে নিমন্ত্রণ করা হয় তখন তাতে ডিক্ পাওয়েলের বদলে লেখা হয় রিচার্ড ইউইং পাওয়েল। আরো একটা কথা বলে দি কোন চুক্তিপত্রে সই করতে হলে ডিক্ পাওয়েল ওই নামেই সই করে।

ডিক পাওয়েল

ওয়েরা এঞ্জেলস

ওয়েরা এঞ্জেলস্ হাঙ্গেরীর সুন্দরী মেয়ে। চুম্বনে ওস্তাদ হয়ে সে এসেছে হলিউডে। পারে সে আরো—চারটে ভাষায় কথা তার মুখের ওপর দিনি মিনি খেলা করে। আরো চারটে ভাষাকেও সে চেনে। ভাষার লোফালুফি না চালালেও বুঝতে পারে কার লক্ষ্য কতখানি।

চমকে দিয়েছে সবারে। বলেছে সে চুমু খেয়ে আর চুমু দিয়ে সে বুঝতে পারে, কে কোন জাতের লোক। পালাবার জোটি নেই। চুমু খেয়েই বলে দেবে তুমি ইটালি থেকে, কি তুমি জার্ম্মানী থেকে আসচ কিম্বা আর কোন জায়গা থেকে তোমার আসা। লুকোতে কেউ পারবে না।

জিজ্ঞেস করায়, বেশ জোর করে বলে দিয়েছে যে, কোন ছুটো জাত এক রকমে চুমু খায় না, ওটা ওদের ভাষারই মত আলাদা।

হলিউডের লোকেরা আশা করে আছে যে এ অভিজ্ঞতা তার কেমন করে 'হোল সে কথা ওয়েরা কবে বলবে।

হাসি পায়। সে কথা কেউ কি আর বলে।

ক্যারলের নতুন আবিষ্কার

ওদেশের ষ্টারদের নতুন কিছু করা নাকি একটা ফ্যাসান। নতুন কিছু করা তাদের চাইই তা নয়ত ওদের নামের প্রচার তেমন করে হবে না। হয় নতুন কিছু খাবে, না হয় নতুন পরবে কিম্বা নুতন কিছু মাখবে। এমনিধারা হওয়া একটা কিছু চাইই চাই। সর্ব্বদাই মনে রাখে এমন কিছু 'একটা করব যা সকলের নজরে লাগবে।

তাই বলছি ক্যারল লম্বার্ডের কথা। ক্যারলও একটা নতুন জিনিষ আবিষ্কার করে ফেলেছে। সে জিনিষটা হচ্ছে এক রকম বার্নিশ। টেবিল, চেয়ার, দেরাজ বার্নিস করবার জন্যে নয়। তার নোখ বার্নিস করতে। লাল রঙের বার্নিশ চোখে লাগায়। যার জৌলুষ খোলে সবায়ের চোখের সামনেও ক্যামেরার ঈগল চোখের বাহিরে এবং ভিতরে।

আমি একটা কথা চুপি চুপি বলে দি ক্যারল ওই বার্নিশটি এখনও পেটেণ্ট করেন নি। আপনারা যদি কেউ চান আনিয়ে নিন না। ক্যারলের কাছে চাইলেই পাঠাবে এটা আমি জানি।

শূটিং বন্ধ হোল

দিন কতক আগে ম্যালিবুতে আগুন লেগেছিল এ খবর আমি দিয়েছিলাম আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সেদিন আগুন নিবে গেলে খবর পাওয়া গেছে লাওনেল এ্যাটউইল, চার্লস ফারেল এবং পরিচালক খেল ব্রাউন-এর বাড়ী একেবারে পুড়ে গেছে।

ঠিক সময়ে যদি সবাই আগুন নেবাবার চেষ্টা না করত তাহলে ম্যালিবুর ঘর-দোর, বন-জঙ্গল সব পুড়ে যেত।

সেদিন আগুন যে কত বেশী এবং ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা বোঝা যায় স্যর গে রেমণ্ডের কথায়। তিনি তো দশ বারটা হরিণকে বন থেকে বেরিয়ে এসে জল খেতে দেখেছিলেন। আর তা ছাড়া "রোজ অব দি র‍্যাঞ্চো" ছবি তোলা তার পরদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল শুধু ধোঁয়া আর ছাইয়ের জন্যে। ধোঁয়া আর ছাই এত উড়ে আসছিল যে ক্যামেরার হাতল ঘোরান একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

খুচরো খবর

ক্যারি গ্রাণ্ট ইউরোপে "দি কিউরিয়াস কোয়েষ্ট" ছবিতে নামছে।

* * *

ফ্রেড এ্যাসটায়ার নামছে 'ফলো দি ফ্লিট' ছবিতে।

* * *

'চার্জ্জ অব দি লাইট ব্রিগেড' ছবিতে দেখা যাবে এরোল ফ্লাইনকে।

* * *

মেরি পিক্‌ফোর্ড জেসি ল্যাস্কির সঙ্গে নামছে 'দি ফোর ষ্টার কিস' ছবিতে।

থাকলি

অধ্যাপক
শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী
বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, পি-আর-এস্

"কথাকলি" দক্ষিণ ভারতের লোক নৃত্য বা দেশী নৃত্য। ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত মার্গ নৃত্যই ইহার ভিত্তি। আর রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, কালিদাস, শ্রীহর্ষ, ক্ষেমীশ্বর, বৎসরাজ, বিশ্বনাথ, মাধব প্রভৃতি, সংস্কৃত-নাট্যকার কবিগণের দৃশ্যকাব্য, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণের শ্রব্য কাব্যগুলির বস্তুভাগ (ও অনেক সময়ে ভাষা, শ্লোক পর্য্যন্ত)—ইহার প্রধান উপজীব্য। এই নৃত্যের প্রধান পরিচালক বা নর্ত্তক মূকাভিনেতা; কিন্তু তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণ পাঠ্য, গীত ও বাদ্যের অবতারণা করিয়া থাকেন। পাঠ্য অংশে অবিমিশ্র সংস্কৃত শ্লোকের পদম্ সুরেলা আবৃত্তি ও বিশুদ্ধ মালয়ালম্ ভাষায় গদ্য সংলাপ প্রযোজিত হয়। গানের ছন্দে সংস্কৃত ও মালয়ালম্ ভাষায় মিশ্রিত প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ আবৃত্তি বা গীত ও বাদ্য—পরে উক্ত বাচিক অংশের আঙ্গিক অভিনয়ের সাহায্যে অভিব্যক্তি—আবার বাচিকাভিনয়—পুনরায় অঙ্গাভিনয়—এইরূপে কথাকলি নৃত্য চলিতে থাকে। এই অবস্থায় বাদ্যের তালে তালে পদক্ষেপ করার নাম "কলাপম্"। কথাকলি লোকনৃত্য হইলেও ইহার অঙ্গভূত গীতগুলি বিশুদ্ধ 'জাতি'মান্। অবিমিশ্র রাগরাগিণী ছাড়া লৌকিক আধুনিক সঙ্গীত কথাকলিতে অপাংক্তেয়।

'কথাকলি' শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় দুইটি শব্দ (১) 'কথা' (শেষ 'আকার'টি হ্রস্ব—'অ' ও 'আ'র মাঝামাঝি উচ্চারণ); ও (২) 'কলি' ('ল' টি 'ল' ও 'ড়' এর মাঝামাঝি-ভাবে উচ্চারিত হয়)। কথাকলি বলিতে বুঝায় মূকাভিনেতার আঙ্গিক অভিনয়

নিউ এম্পায়ারে "কথাকলি" নৃত্যের কৃষ্ণরূপী—কৃষ্ণণ

সাহায্যে কোন উপাখ্যানের বিবৃতি প্রদান (Story dance); ইংরাজী ভাষায় ইহাকে মূকাভিনয় (pantomime) বলা চলে।

কথাকলি অভিনয়ের জন্য যে বাঁধা রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন—এমন কোন নিয়ম নাই। বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, আটচালার তলায় বা খোলা মাঠেই সাধারণতঃ অভিনয় হইয়া থাকে। তবে দক্ষিণ মুখে অভিনয় নিষিদ্ধ। সূর্য্যাস্ত হইলেই বাদ্য আরম্ভ হয়। বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে নিম্নোক্ত যন্ত্র কয়টিই প্রধান:—(১) 'চেণ্ডা' ('চে' ও 'চ' এর মাঝামাঝি উচ্চারণ)—ছোট দুমুখো ঢাক (cylindrical)—এক মুখ উঁচু ও অন্যমুখ নীচু করিয়া গলায় ঝুলাইতে হয়—উপরের পিঠে কাঠি দিয়া বাজাইতে হয়—আওয়াজ অতি তীব্র। (২) 'মদ্দলম্' (মাদল?)—মৃদঙ্গের মত যন্ত্র—আঙ্গুলের উপরের পাবগুলিতে "অঙ্গুলিমুখত্র" (thimble) পড়িয়া বাজাইতে হয়। (৩) এক-জোড়া বড় করতাল ও (৪) প্রকাণ্ড পেটা ঘড়ি একটা। ইহা ছাড়া বীণা বাঁশী প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। সূর্য্যাস্তের সময় সন্ধ্যা আন্দাজ ৬টায় এই বাদ্য আরম্ভ হয়। ইহারই নাম "কলি" (কড়ি)। প্রায় প্রহর খানেক "কড়ি" চলিবার পর রাত্রি প্রায় নয়টা নাগাইদ রঙ্গস্থলে প্রদীপ জ্বালান হয়। একটি অতি বৃহদাকার ধাতব পিলসুজ তাহার উপর প্রকাণ্ড গোলাকৃতি প্রদীপ; উহাতে মশালের মত বড় বড় সলিতা তেলে ভিজাইয়া জ্বালিয়া দেওয়া হয়। মঞ্চের পুরোভাগে (stage-front) ঠিক মাঝখানে প্রদীপটা জ্বলে; ও ঐ একটি দীপালোকে সমগ্র মঞ্চ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহার পর মদ্দলম্ ও করতাল বাদ্য ('শুদ্ধমদ্দলম্')। তাহার পর 'তিরিশিলা' ('তিরিশিলা'=পর্দ্দা) উত্তোলন। মঞ্চের পুরোভাগে দুইপ্রান্তে দুইজন দাঁড়াইয়া একটি পর্দ্দা কিছু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরে। তাহার পিছনে ধীরে ধীরে নর্ত্তকগণের আবির্ভাব হয় (দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহারা সমুদ্রতরঙ্গের মধ্য হইতে ঢেউএর তালে তালে নাচিতে নাচিতে উঠিতেছেন)। ইহার পর একটি বা দুইটি নর্ত্তকীর আবির্ভাব, ও কন্যাকুমারী দেবী, গণেশ, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবীর আবাহন স্তোত্র-গীতি বাদ্য ও তদনুযায়ী নৃত্য। এই অংশটির নাম "তোট (টে)য়ম্" (সংস্কৃত দৃশ্য—কাব্যের "পূর্ব্বরঙ্গের" অনুরূপ)। [এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা উচিত যে, "কথা-কড়ি"তে স্ত্রীভূমিকাও পুরুষে গ্রহণ করেন। কথাকলি সম্প্রদায়ে অভিনেত্রীর স্থান মোটেই নাই।] ইহার পর প্রথম পাত্রের (character) প্রবেশ। ইনিই নাট্যের

সূচনা করিয়া দেন (সংস্কৃত রূপকের সূত্রধার-স্থানীয়)। এই সূচনা অংশটুকুর নাম "পুরপ্পাড়্" (টু)। এই প্রথম পাত্রটি শ্রীজয়দেব কবির গীতগোবিন্দ হইতে গানের ("মেলপদম্") অবতারণা করিয়া দিয়া নিক্রান্ত হ'ন। এই অংশটির নাম "মঞ্জুতরা" (তর)। এই গীতের সহিত যে সঙ্গত চলিতে থাকে, তাহা সত্যই অতি অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচায়ক।

ইহার পর প্রকৃত নৃত্যাভিনয় আরম্ভ। এই অভিনয়ের মধ্যে শৃঙ্গাররসের অভিব্যক্তিই প্রথম প্রদর্শনীয়। শৃঙ্গাররসের অপর নাম আদিরস। এই জন্যই বোধ হয় শৃঙ্গাররসের উদ্বোধন প্রথমে প্রয়োজন। অভিনয়ান্তে প্রায়ই অদ্ভুত বা শান্তরস বিরাজ করে। ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়—ইহাই সকল প্রকার কথাকলি নৃত্যের মূলিভূত আদর্শ। সর্ব্বশেষে "ভরতবাক্যম্" (নটগণের প্রার্থনা-স্তুতিগীতি)। ইহার পর রঙ্গপ্রদীপের সম্মুখে আবার একখানি বিকৃষ্ট বা চতুরস্র তিরিশিলা (পর্দ্দা) তুলিয়া ধরা হয়। ইহাই যবনিকা-পাতের কার্য্য করে। তিরিশিলা খানি বিচিত্রবর্ণের—ডোরাকাটা ও জরি বসান হইয়া থাকে।

কথাকলি নৃত্যের উৎপত্তির ইতিহাস অতি অস্পষ্ট। যতটুকু জানা যায় তাহাও নানারূপ পরস্পর বিরোধী উপাখ্যানের প্রভাবে লুপ্তপ্রায়। এই সকল আখ্যায়িকা অতি বিচিত্র। আমরা নিম্নে উহার একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

ভক্ত-কবি-দার্শনিক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসীম কৃপা ছিল। প্রভু নিত্য রাত্রিতে আবির্ভূত হইয়া ভক্ত-প্রবরকে নিজলীলারস আস্বাদন করাইতেন। এ সংবাদ কালিকটের জামোরিনের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি এদৃশ্য দর্শনের নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। বিল্বমঙ্গলের প্রার্থনায় প্রভু জামোরিনকে দর্শন দিতে স্বীকৃত হ'ন। প্রভুর লীলাদর্শনে বিহ্বল জামোরিন আত্মহারা হইয়া প্রভুকে আলিঙ্গনে উদ্যত হইলে প্রভু অন্তর্হিত হইলেন; কিন্তু প্রভুর মস্তকের একটি শিখি-পুচ্ছ জামোরিনের হস্তে রহিয়া গেল। ইহার পর জামোরিন একটি কৃষ্ণলীলাভিনয়-সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। উহাতে কৃষ্ণলীলা (কৃষ্ণাট্টম) প্রদর্শিত হইত। এই "কৃষ্ণাট্টম"-এর মূলভিত্তি শ্রীগীতগোবিন্দ, ও ইহাতে নাট্যশাস্ত্রোক্ত অভিনয় পদ্ধতির ধারা প্রচলিত। ভক্তিভাবের স্ফুরণই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ে প্রভুর শীর্ষচ্যুত শিখিপুচ্ছ সহ-যোগে এমন একটি "মুটি" (মুকুট) নির্ম্মিত হইয়াছিল, যাহা প্রত্যেক নটনর্ত্তকের মস্তকেই সমভাবে মানাইত। শ্রীরাধার বেশভূষা তৎকালীন দেশীয় রমণীগণের বেশানুযায়ী পরিকল্পিত হইয়াছিল—মায় তাঁহাদিগের ঘোমটাটি পর্য্যন্ত। আর ব্রাহ্মণ কন্যাগণের কেশবন্ধনের অনুকরণে শ্রীরাধা প্রভৃতি অভিনেত্রীগণের মস্তকের এক পার্শ্বে ঝুঁটি বাঁধা হইত।

এই অপূর্ব্ব কৃষ্ণলীলার সংবাদ পাইয়া কোটরকরের রাজা এই অপূর্ব্ব অলৌকিক 'মুটি' দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু অপহৃত হইবার ভয়ে জামোরিন্ উহা পাঠাইলেন না। রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কপ্পীলীঙগাট্টু বৈদিগাল (বৈদিক) নামক জনৈক কলাবিদ্ ব্রাহ্মণকে সংবাদ দিলেন। [এই কপ্পীলীঙগাট্টু-এর জন্ম বিবরণ অতি অদ্ভুত। ইঁহার পিতা একজন সাধক ছিলেন। তাঁহার এক পত্নী সজাতীয়া ব্রাহ্মণকন্যা ও অপরা শূদ্রজাতীয়া। তিনি নিজ তপোবলে দুই ভাগ চরুতে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণী ভার্য্যাকে এক ভাগ ও শূদ্রাভার্য্যাকে অপর ভাগ ভোজনের নিমিত্ত প্রদান করেন। কিন্তু সপত্নীদ্বয় কৌতূহলবশতঃ নিজ নিজ ভাগ অপরের ভাণ্ডের সহিত পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীর চরুতে ব্রহ্মণ্যতেজঃ নিহিত ছিল; আর শূদ্রার চরুতে ছিল শিল্পীর গুণ নিহিত। চরু বদলের ফলে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মিলেন শিল্পী কপ্পালীঙগাট্টু; আর শূদ্রার গর্ভে জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ সাধু-পুরুষের জন্ম হইল।] এই শিল্পী ব্রাহ্মণ-সন্তান সকল ব্যাপার শুনিয়া কুমারিকা অন্তরীপে যাইয়া কন্যা কুমারী দেবীর সাধনায় সমাধিমগ্ন হইলেন। সাধনার সপ্তম রাত্রিতে

দেবী স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে সমুদ্রতীরে গমন করিতে আদেশ দিলেন। যথাসময়ে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া তিনি সমুদ্রের জলে সত্ত্বরজস্তমোগুণ ভেদে তিনশ্রেণীর পাত্রের বিচিত্র নেপথ্য (অঙ্গরাগ, অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি) যথাক্রমে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইলেন। সমুদ্র-তরঙ্গবক্ষে পাত্রগণের প্রতিবিম্ব প্রথম দেখা গিয়াছিল বলিয়া রঙ্গমঞ্চের সম্মুখের পর্দাখানির নাম দেওয়া হইয়াছে তিরিশিলা (তরঙ্গ-পট বা তরঙ্গ-বস্ত্র)। আর এই পর্দার পিছন হইতে পাত্রগণ যেভাবে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠেন, তাহাতে ঠিক মনে হয় যেন তাঁহারা সমুদ্রের মধ্য হইতে ঢেউএর তালে তালে নাচিতে নাচিতে উঠিতেছেন।

কথাকলির (কথকড়ি) প্রথম অবস্থায় 'তোটয়ম্'-এ কেবল কন্যা কুমারী দেবীর আবাহন করা হইত। অংশু স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তকগণ (ভ্রুকুংস) এই আবাহন নৃত্য সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু ইদানীং ইহার মধ্যে গণেশ, কৃষ্ণ, সরস্বতী, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর স্তুতিও স্থান পাইয়া থাকে। ইহা কথাকলির প্রারম্ভে অবশ্য কর্ত্তব্য।

"তোটয়ম্"-এর পর 'পুরপ্পাড়'—পুরুষ কর্ত্তৃক প্রযোজ্য। ইহার দুইটি অঙ্গ (ক) নোটম্—"কলাসম" বিধি অনুসারে নর্ত্তকের চক্ষুর ক্রিয়া মাত্র ইহাতে প্রদর্শিত হয়; (খ) নীলপদম্—রামস্তুতি,—ইহাতে নেত্র, হস্ত, পদ ও সর্ব্বাঙ্গ সমতালে চালিত হয়। তাহার পর এই পুরুষবেশী নর্ত্তক জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে "মঞ্জুতর কুঞ্জতল-কেলিসদনে" ইত্যাদি গানের অবতারণা করিয়া দিয়া নিষ্ক্রান্ত হ'ন। এই গানের আদ্যক্ষর কয়টি লইয়া এই অংশের নাম হইয়াছে—"মঞ্জুতরা"। ইহাতে লতাকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ও বিহার সূচিত হয়; অতঃপর গায়ক ও বাদক নানাবিধ রাগ ও তালের মধ্য দিয়া নিজ নিজ শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই গীতিবাদ্য-বহুল সূচনাংশের নাম "মেলপদম্।"

ইহার পর প্রকৃত নৃত্যারম্ভ। নৃত্যগুলি দুই ভাগে বিভক্ত—একক নৃত্য (Solo) ও মিলিত বা রূপক-নৃত্য (dance-drama)। কয়েকটি একক নৃত্যের নাম, যথা—একলোচন (উত্তরা স্বয়ম্বর হইতে গৃহীত); মৃগনৃত্য—"গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্" ইত্যাদি (শকুন্তলা), বস্ত্রহরণ, প্রণয়কলহ (গীতগোবিন্দ), মন্নন ও মন্নথি—ধোপা ও ধোপানী (লবণাসুরবধ), বর (উদয়নপ্রবেশ), "কান্তং প্রতি কপোতিকা", মারুতি (কল্যাণসৌগন্ধিকা), দশমুখ রাবণ, তপোবনম্, দুঃশাসনবধম্ (মহাভারত) ইত্যাদি। কতকগুলি রূপক-নৃত্যের নাম, যথা— কিরাতার্জ্জুনীয়ম্, রাবণবিজয়ম্, হরিশ্চন্দ্রচরিতম্, রুক্মিণী স্বয়ম্বরম্ ইত্যাদি। এই সকল রূপকের আখ্যানাংশে অনেক নূতনত্ব আছে। সাধারণতঃ, এই গল্পগুলি যে আকারে মূল রামায়ণ মহাভারতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে ঈষৎ ইতরবিশেষ কথাকলির প্রত্যেক রূপকনৃত্যেই দৃষ্ট হয়। মহাকবি ভাসের রূপকগুলি যেমন রামায়ণ-মহাভারতের বস্তুভাগ অবলম্বনে রচিত হইলেও নানারূপ মৌলিকতায় পরিপূর্ণ, এই কেরল কলালয়ম্ কথাকলি সম্প্রদায়ের রূপক নৃত্যগুলিও সেইরূপ বহু বিষয়ে মৌলিকতার দাবী করিতে পারে। কথাকলির সাহিত্য বেশ উন্নত। উহার অধিকাংশ উপাদানই রামায়ণ, মহাভারত ও লৌকিক সংস্কৃত দৃশ্য বা শ্রব্য কাব্য হইতে গৃহীত। এই সকল উপজীব্য গ্রন্থের মধ্যে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটক (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী), ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ মহাকাব্য (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী), ক্ষেমীশ্বরের নৈষধানন্দ (নলদময়ন্তী) ও চণ্ডকৌশিক (হরিশ্চন্দ্র) নাটক (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী), বৎসরাজের রুক্মিণী হরণ ঈহামৃগ (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী), বিশ্বনাথের সৌগন্ধিকা-হরণ ব্যায়োগ (খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী), মাধবের সুভদ্রাহরণশ্রীগদিত (খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী) ইত্যাদি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথাকলি-সাহিত্যের ভাষা নবরসরুচিরা—উপমা, রূপক, শ্লেষ, স্বভাবোক্তি প্রভৃতি শব্দ ও অর্থালঙ্কারের আড়ম্বরে একটু অধিক ভারগ্রস্তা বলিয়াই মনে হয়। সঙ্গীতগুলিকে দাক্ষিণাত্যের বিশুদ্ধ রাগগুলি (নীলাম্বরী প্রভৃতি) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সন্ধ্যা সময়ের উপযোগী রাগসমূহের আলাপে নৃত্যারম্ভ হয়; ও ক্রমে রাত্রি যতই গভীর হইতে থাকে, ততই রসস্ফূর্ত্তির অনুকূলভাবে তত্তৎকালোপযোগী রাগের প্রয়োগ করা হয়। এইরূপে সর্ব্বরাত্রিব্যাপী নৃত্যাভিনয়ে বিশুদ্ধ "রাগমালা"র প্রবর্ত্তনে রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে অভিনয় সমাপ্তি ঘটে না। এইরূপ রাগমালার প্রচলন—এক মালাবার অঞ্চল ছাড়া ভারতের কুত্রাপি আর দেখা যায় না।

কথাকলি অভিনেতৃবর্গের অঙ্গসজ্জা—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—এই তিন গুণানুসারে পরিকল্পিত—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও "কেরল-কলালয়" সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীশঙ্করণ নম্বুদ্রি ও তাঁহার সহযোগিগণের অপরূপ নৃত্যকলা সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় বিশেষ সমালোচনার ইচ্ছা রহিল।

রাখী

শ্রীসমর মিত্র

পাহাড়ে ওদের বাড়ী···। গরু, ছাগল, মহিষ ওরা চরায়···সারাদিন। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে মাঠ···ছায়া ভরা। সন্ধ্যে হ'লে তারা নাচে মাদলের তালে তাল দিয়ে।

একটা বড় ফাঁকা যায়গা ঘিরে, তারা সবাই মিলে বসে গান গায়, মাঝখানে জ্বলে শুকনো কাঠের আগুন। সেই আলোর মাঝে তাদের উৎসব—কাল সুঠাম দেহের উপর, আলোর ছায়া প'ড়ে চমৎকার দেখায়। সে উৎসবে কেউ বাদ যায় না, মেয়েরাও নাচে—গান গায়।

এমনি করে ওদের দিন কাটে, দিনের পর দিন,—রাতের পর...রাত।

একঘেয়ে, একটানা সুর ছিঁড়ে গেল। আর এক পাহাড়ের দেশ থেকে এল, আর একদল সাঁওতাল।

রাত্রিতে, তাদের পূর্ণ অভ্যর্থনা হ'ল। তীব্র মদের গন্ধে, আর নাচ গানের শব্দে বনের গাছের প্রত্যেক পাতায় শিহরণ খেলে গেল,···অপূর্ব্ব ছন্দে উঠলো তারা দুলে···।

—'চন্দন'! এই দেশেরই ছেলে, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, যারা নতুন এসেছে। তাঁকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে। লম্বা, কোঁকড়ান চুল কান পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, আর মাথায় বাঁধা গাছের লতা, সামনে গোঁজা কি একটা রঙিন পাখীর পালক,—পিঠে তার তীর ধনুক।

চন্দন গান গাইতে আরম্ভ করলে। তার মত মিষ্টি গলা আর ছিল না। সবাই ওকে ভালবাসে—চেনে।

চন্দনের হঠাৎ চোখ পড়'ল রাখীর ওপর। রাখী নতুন এসেছে, চমৎকার নাচে।

রাখী অবাক হয়ে তার দিকে চেয়েছিল, চন্দন তা দেখে, মুখ ফিরিয়ে নিলে,···গান ধরলে। রাখী এগিয়ে এল তার দিকে, দুটো হাত ধরে বললে 'নাচবে?—আমার সঙ্গে?'—

চন্দন বিরক্তিতে, হাত ছাড়িয়ে বললে 'না আমি নাচব না' বলে সে চলে যাচ্ছিল সেখান থেকে। রাখী খপ্ করে তার হাত ধরে বললে, 'অতিথি আমরা ফেরাতে নেই,—এস'।

চন্দন রাজী হ'ল না। রাখী, দুই চোখে জল নিয়ে ফিরে গেল। সে ত জানতো না, রাখী কোন মেয়ের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে না, সে আপনার শীকার নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

*　　*　　*

রাখী ঝরণার তলে জল নিতে এসেছে, দেখলে চন্দন মুখ ধুচ্ছে।

রাখী তার জলের জায়গা নামিয়ে রেখে, পেছনে একটা ছোট পাথরের ওপর বসে প'ড়ল, আস্তে,···পা টিপে···।

চন্দন মুখ ফিরিয়ে দেখলে রাখী—।

বিরক্তিতে ওর সারা মুখটা ছেয়ে গেল। নিজের চুলগুলো গুছিয়ে রাখতে, রাখতে বললে. 'এখানে যে'—! রাখী মুচকি হাসি হেসে বললে, 'তোমাকে দেখব ব'লে'—। চন্দন কোন কথা না বলে, চলে যাচ্ছে দেখে, রাখী বললে 'তোমার নাম কী'? —'বলব না'—। —'কেন? নাম বলতে আর কী হয়েছে?' 'বেশ্ এবার বলছি, কিন্তু আর কোনদিন কিছু বলব না'—'চন্দন?'—'আঃ! খাসা নাম তোমার চন্দন,' রাখী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো—।

চন্দন দু, এক পা এগিয়ে এল। তাই দেখে রাখী দৌড়ে গেল ছোট্ট মেয়ের মত। হাসতে হাসতে বললে "চন্দন তুমি আমার নাম জানলে না?"

"দরকার নেই—পথ ছাড়—"

রাখী সরল হাসিতে উপ্‌ছে পড়ে বললে "না তুমি যেও না, তোমায় আমি যেতে দেব কেন—?"

চন্দন ঘুরে দাঁড়ালো। রাখী হঠাৎ তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল, বললে "আমার নাম জেনে রাখ"—

তার কথা শেষ হোল না, চন্দন তাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল···। আর রাখী—? দু'একটা বনফুল ছিঁড়ে মাথায় পরলে—পরক্ষণেই তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো।

সেইদিন সন্ধ্যায়। নাচ হচ্ছিল। রাখী চন্দনকে খুঁজলে, সেখানে তাকে পেলে না—চন্দন পাহাড়ে বসে গান গাইছিল। রাখী শুনলে তার গান; প্রতিটী পদ মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে রাখীর বুকে—; যেন পৃথিবীর সব ব্যথা নিংড়ে, যে বেদনা তারই তৈরী···। গান থামতেই চোখ মুছে রাখী খিল খিল করে, হেসে উঠলে।

চন্দন মনে মনে জ্বলে উঠলো। সে ভাবলে, তার কাছে রাখী বারে বারে কেন আসছে?

—কী করেছে ওর? যার জন্যে রাখী সব সময় চলে আসে, কেবল কথা বলবার জন্যে?

রাখী হেসে বললে "ওই বুঝি তোমার গানের সুর"—?

"হু—কেন—?"

"মোটেই হচ্ছে না—"।

"তাতে তোমার কী হল—? তোমাকে তা বলার জন্যে কে ডেকেছে—"?

"না ডাকলে কী আসতে নেই—"?

রাখী তার ডাগর চোখ তুলে ধরল, চন্দনের চোখে। চন্দন অতো বোঝে না, বললে, "না—তুমি এসনা আমার কাছে, তুমি এলে সারাদিন আমার কিছু কায হয় না, শীকার কর্ত্তে...। চন্দন দেখলে রাখী চলে যাচ্ছে।

রাখী এসে বসলো পাহাড়ের একটা কোণে, তার দুটি গাল বেয়ে নেমে এসেছে জলের ধারা।

রাখীকে চলে যেতে দেখে, চন্দন কেমন যেন কেমন হয়ে গেল। সে কিছু বুঝতে পারলে না—তার বুকের ভেতর কেমন করে উঠলো। সে ভাবলে, 'আর ও আসবে না ওর কাছে'।

• • •

চন্দনের দিন ব্যথায় ঘনিয়ে আসে। মনের অন্ধকার জমাট বেঁধে যায়—।

চন্দন ধরা দেয় রাখীর কাছে। কিন্তু রাখীর মনে হ'ল, ও যেন কেমন ধরা দিয়েও ধরা দেয় না;—কেমন যেন উদাসভাব ওর...। রাখী তার বুকে মুখ রেখে কত কথা বলে যায়—চন্দন বাধা দেয় না কিন্তু রাখী এক সময় দেখে ওর চোখে জল.—অকারণে···। সে বুঝে উঠতে পারে না কেন এ ব্যথা—?

সেদিন সারা পৃথিবীর বুক জুড়ে চাঁদের আলো। রাখী এল চন্দনের বুকের একান্তে—বনফুলের গয়না প'রে।

চন্দন বললে "আঃ—রাখী তুমি এত সুন্দর—"?

রাখী ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললে "সে শুধু তোমার জন্যেই—"

চন্দন যেন হঠাৎ চমকে উঠে বলে ফেললে "না—না তা হয় না"।

"কী হয় না চন্দন—" রাখীর ভীত স্বর।

"তোমায় বিয়ে করা—"

"কেন চন্দন—"? রাখী কাঁপছিল। চন্দনের বুকে মাথা রেখে বললে "বল"—।

চন্দন তার কপালের চুলগুলো সরিয়ে রাখতে রাখতে বললে "তোমাকে বিয়ে করার কথা সেদিন বাবা মাকে বল্লাম; কিন্তু বাবা কী বললেন জান রাখী—? তোমরা নাকি আমাদের চেয়েও নীচু ঘর—।

তাঁরা আমায় খুব বোঝালেন, খুব বকলেন,···"একি! রাখী···রাখী···।"

চন্দনের কাতর স্বরে ও তার দুচোখ ভরা জল নিয়ে বললে "চন্দন"— তার ঠোঁট কাঁপছিল, গলা বুজে আসছিল—।

"কী—কী—বলছ রাখী?"

"তবে আমায় বিদায় দাও—চন্দন"।

চন্দন মুহূর্ত্তে তাকে বুকে চেপে ধরলে, তার হাত দুটো নিয়ে অজস্র চুমায় ভরিয়ে দিলে। ব্যাকুল হয়ে বললে "শোন—বাবাকে বলে এলাম যে আমি তোমাকেই বিয়ে করব"—

রাখী আর কিছু না বলে চন্দনের কাছে সবটা ছেড়ে দিলে। এই ভাবে তারা অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলে। "রাখী"। চন্দন ডাক্‌লে।

"চন্দন"—। উত্তর দিলে।

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে হেসে ফেল্‌লে।

চন্দন কিন্তু বিয়ে কর্‌বার আগেই, রাখীদের চলে যেতে হল কুড়ি মাইল দূরে সহরের বুকে। রাখী একজন বড় লোকের কাছে চাকরী পেলে—তারই কাজ করছিল, তার আর কেউ নেই—বাবু একলা,—রাখী সুন্দরী। রাখীকে বনের হরিণী বলা যেতে পারে—। বাবু রাখীকে চায়,—রাখী তা বুঝতে পারে,—নিজেকে ধরা দেয় না,—দূর থেকে যত্ন করে। রাখী সুখেই থাকে, মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে যায় রাতে, সে যেন চন্দনের গানের সুর শুনতে পায়।— ব্যথায় তার বুক টন্‌টন্ করে ওঠে,—বাইরে আকাশের পানে তাকিয়ে ভাবে—"চন্দন এখন কী কর্চ্ছে সে কী ভুলে গেছে রাখীকে— ?" চন্দন হয়ত জেগে বসে ভাবছে তারই কথা—তারই মত। আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে—কিন্তু তার মুখে চন্দনের কথা,—বুকে চন্দনের সুর—স্মৃতির শেষ পরশ টুকুর মত জেগে থাকে।

এদিকে চন্দন 'রাখীহীন' পাহাড়ে একলা ঘুরে বেড়ায়। রাখী যে জায়গায় এসে ব'সত, সেই খানে এসে বসে। রাখীর কথা যেন শুনতে পায়,—তার বিশ্বাস রাখী আবার ফিরে আসবে তার কাছে। চন্দনের কিছু ভাল লাগে না,—যদিও সে রাখীর কাছে ধরা দেয় নি সম্পূর্ণ—কিন্তু রাখী ! হাঁ—সে চায় চন্দনকে,—নিষ্ঠুর ভাবে চায়—চায় তার সবটা—। রাখী তাকে প্রথমে পায়নি—শেষে ওকে পাগল করে দিয়েছিল।

চন্দনের আর ভাল লাগে না, সে ঠিক করলে সে যাবে রাখীর কাছে তাকে ফিরিয়ে আনবে এই পাহাড়ের কোলে। মাঠের মাঝে থাকবে তারা, সারাদিন—, আর সারাটী রাত তারা কাটিয়ে দেবে—পরস্পরের বুকে মুখ রেখে—।

শেষটায় রাখী চন্দনকে ভুল বুঝলো—। চন্দন এসে বল্‌লে "রাখী চল—ফিরে চল—"

"তা হয় না চন্দন—"। রাখী বল্‌লে।

"সেকি রাখী কেন হয় না— ?" চন্দন জানতে চাইলে।

"সে তুমি জান।" রাখী যেন পাথর হয়ে গেছে।

"না' রাখী তাতে কিছু হবেনা যাকে রাজী করিয়েছি আমি।" তুমি এস।

রাখী বল্‌লে "না তুমি যাও অন্য কাউকে বিয়ে করোগে।" এরপর চন্দন আর কিছু বল্‌লে না সে ফিরে এল পাহাড়ের কোলে। তার গানের সুর আরও করুণ হয়ে ফুটে উঠল ; গভীর রাত্রে কেউ যদি জেগে উঠে, চন্দনের গান শুনতে পায়—ভুল করে বসে, ভাবে কেউ বুঝি তার প্রিয়জনের বিরহে বড় কান্নাই কাঁদছে। শুধু একটা নিশ্বাস ফেলে, পাশ ফিরে সে শুয়ে প'ড়ে।

যার যায় শুধু সেই বসে থাকে গভীর রাতে তার প্রিয়ার ফিরে আসার অপেক্ষায় ; প্রিয়া তার আসেনা—হয়ত বা সে ভোগ করে। সহরের আনন্দ নিবিড় করে—। তার প্রিয়ার ব্যথা তাকে স্পর্শ করতে পারেনা।

চন্দনের রাখীহীন জীবন প্রদীপ নিভিয়ে আসে—স্বর্গের ফুল পূজায় লাগল না—সুন্দর হয়ে যে ফুল ফুটে উঠেছিল, তা নিষ্ঠুর—ঝড়ে ছিড়ে যায়, শুধু তা'র, ঝরা পাপড়ি কতদিন পাহাড়ের বুকে পড়ে থাকে।

খবর পেয়ে রাখী ছুটে আসে, তার ভুলের সংশোধন কর্ত্তে, তখন চন্দন নেই। বুক ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায়,—বাইরে সে পাথর হয়ে বসে রইল। মন বলছিল, 'প্রিয় তুমি দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি'—মুক্তার মত অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ল তার চোখ থেকে।

(ইংরাজী গল্পের ছায়াবলম্বনে)

কানন মাঝারে বনফুলে পেয়ে—

শ্রীসর্ব্বগ্রাসী দেবশর্ম্মা

ওরে বনফুল !
কা'র তরে তুই দাঁড়াস্ হেথায়
হ'য়ে আকুল ?
কেহ কী হেথায় বলেছে থাকিতে
নয়ন মেলিয়া নিশীথ যাপিতে,
আকাশের পানে ক্ষণেক চাহিতে
ব্যাকুল মনে ?
কাননের মাঝে নীরবে নিভৃতে
মধুপ সনে ?
বহিছে বায় !—
কানন মাঝারে বনফুলে পেয়ে
শুধাল তায়,
নীরব কবিটি হইয়া পাগল,
"নামায়ে তোমার আঁখিতে বাদল,
কেহ কী গিয়াছে ভাঙ্গিয়া আগল
মেঘের পানে ?"
কহিল না কথা মুগ্ধ করিল
কবিরে গানে !
বিস্ময় মানি'
কবি চেয়ে রয়—নাহি শুনা যায়
তাহার বাণী !
নীরবে আসিয়া বাতায়নে বসি',
হেরিল আকাশে নিরমল শশী,—
সরাইয়া দূরে ঘন কালো মসী
আঁধার হ'তে,
চোখের সুমুখে উঠিয়াছে ভাসি'
সেদিন রাতে।
ভাবিল কবি
ফুটে ওঠে মোর সুমুখে এ কোন্
মায়ার ছবি !
ইহারি আশায় ফুল ব'সে থাকে,
আনন হইতে গুণ্ঠন রাখে,
বায়ুর প্রলেপ অঙ্গেতে মাখে
কানন মাঝে !—
এতকাল পরে বুঝিয়াছে কবি
এখন সাঁঝে।

MAYA MUKHERJEE
KALI FILMS " KALPARINAYA "

[প]রিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

[গ্রা]ম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪
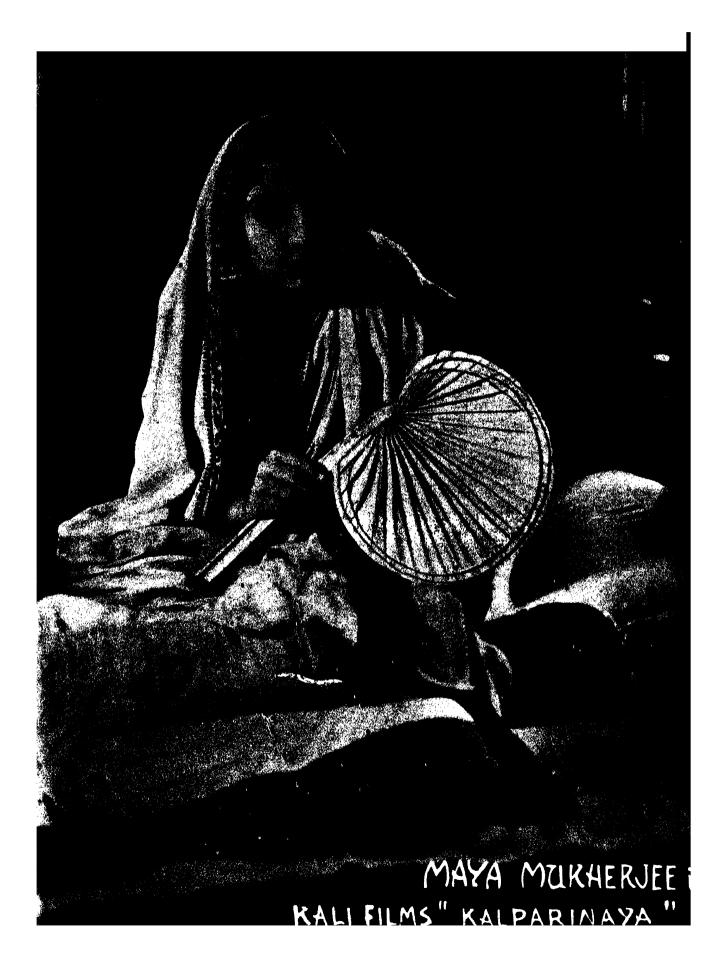
ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৪ই ফাল্গুন ১৩৪২—27th February, 1936. } ৯ম সংখ্যা

২২নং ওয়ার্ডে কংগ্রেসের মনোনয়ন

কলিকাতা কর্পোরেশনের আসন্ন নির্ব্বাচনো-[প]লক্ষে ২২নং ওয়ার্ড সম্পর্কে দক্ষিণ কলিকাতা [কং]গ্রেস বোর্ডের সিদ্ধান্ত আংশিকরূপে পরিবর্ত্তন [ক]রিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটীর নির্ব্বাচন-বোর্ডের [স]ভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র [র]ায় ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মল্লিককে কংগ্রেস মনোনীত [প্র]ার্থীরূপে বরণ করিয়াছেন।

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস বোর্ডে নবম বার্ষিকী [ভো]তি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়ায় বর্ত্তমান [ক]াউন্সিলারদ্বয় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত [উ]পেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসী মনোনয়নের ছাপ [হ]ইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহারা নয় বৎসরাধিককাল [কর্]পোরেশনে বিরাজ করিতেছেন সুতরাং তাঁহারা [এবা]রে মনোনয়নপ্রার্থী না হইলেই শোভন হইত। [যা]হা হউক, তাঁহারা অতীতে যে ভুল করিয়াছেন [ভ]বিষ্যতে তাঁহারা সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়া [নি]র্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন [ক]রিবেন না। কংগ্রেস মনোনীত নবীন প্রার্থীদ্বয়কে [বি]না বাধায় নির্ব্বাচিত হইবার সুযোগ দিয়া তাঁহারা [জ্যে]ষ্ঠজ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্যপালন করুন ইহাই আমরা [কা]মনা করি।

কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীদ্বয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র বংশ গৌরবে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও অমায়িকতায় ২২নং ওয়ার্ডের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিশেষ প্রিয়পাত্র। তাঁহার অর্থ-স্বাচ্ছল্য আছে, অবসর আছে, কর্ম্মস্পৃহা আছে। দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস নির্ব্বাচনী বোর্ডে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ন্যায় তরুণ উৎসাহী যুবককে প্রতিনিধিরূপে বরণ করিয়া লইতে ২২নং-এর নির্ব্বাচকমণ্ডলী যে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিবেন না, তাহা সুনিশ্চিত।

অপর মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মল্লিকও ভবানীপুরের যুবক সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত। অর্থ-নৈতিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত উদীয়মান বাগ্মী হিসাবে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ইতিমধ্যেই স্বীয় কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দুই বৎসরাধিককাল শিক্ষালয় পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীরূপে দক্ষিণ কলিকাতায় কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান এই তরুণ যুবকের মনোনয়নে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

২২নং ওয়ার্ডের করদাতাবৃন্দ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মনোনীত এই দুই নবীন উৎসাহী যুবককে প্রতিনিধিরূপে বরণ করিয়া কংগ্রেসের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখুন ও তারুণ্যের জয়যাত্রা সফল করুন—ইহাই আমাদের আন্তরিক নিবেদন।

-:০:-

দামোদর বন্যার প্রতিকার দাবী

—:০:—

বিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের আন্দোলন

দামোদরের দক্ষিণদিকের বাঁধ তুলিয়া দিবার জন্য বহুগ্রাম বৎসর বৎসর প্লাবিত ও বিধ্বস্ত হয়। তাই সম্প্রতি বিধ্বস্ত অঞ্চলের খণ্ডঘোষ, রায়না ও জামালপুর থানার প্রায় ২৫০ গ্রামের একলক্ষ নরনারীর পক্ষ হইতে দামোদর বন্যার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য ব্যাপকভাবে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, নিম্নে জনসভাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

২রা ফেব্রুয়ারী প্রথম সভা হয় রায়না থানার বোরো গ্রামের বাতানডাঙ্গা নামক প্রশস্ত ময়দানে। সভায় ৩৩ খানি বন্যা-পীড়িত গ্রামের প্রায় ৩ হাজার লোক উপস্থিত হয়। এতলোক হইয়াছিল যে গ্রামের মধ্যে সঙ্কুলান হয় নাই। ডাঃ যতীন্দ্রমোহন রায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুত দাশরথি তা, শ্রীযুত গৌরপদ হাজরা, যতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

৪ ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় সভা হয় আনগুনা গ্রামে। সভাপতি হন মুগুরা ইউনিয়নের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুহ। সভায় বহু গ্রামের নরনারী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত দাশরথি তা, বর্ত্তমান ইউনিয়নবোর্ড প্রেসিডেণ্ট ও জমিদার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র হাজরা প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী বোকরা হাটতলায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সামন্তের সভাপতিত্বে বিরাট সভায় শ্রীযুত দাশরথি তা, পাঁচুগোপাল গুহ, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় দেমুয়া গ্রামে জনসভা হয়। শ্রীযুত দক্ষরাজ ক'লে সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুত নিতাইচরণ ঘোষ সূর্য্যকুমার ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৫টার সময় পাষণ্ডা হাটতলায় মৌলভী জোবেদুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে বিরাট সভা হয়। পল্লীকবি শ্রীযুত হরিপদ সেন তাঁহার স্বরচিত 'বন্যার-গান' করেন। শ্রীযুত দাশরথি তা, ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবিকল হক ও নিতাইচরণ ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী গোতাল হাটতলায় জমিদার শ্রীযুত পশুপতি নাথ দে মহাশয়ের প্রবল চেষ্টায় বিরাটভাবে সভার অধিবেশন হয়। প্রসিদ্ধ কবি কবিকঙ্কনের জন্মভূমি দামুন্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ১৩ খানি গ্রামের অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ কোঙার প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী বড়বৈনান গ্রামে পণ্ডিত শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ বেদান্ত শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে বিরাট সভা হয়, শ্রীযুত দাশরথি তা, বনওয়ারী মণ্ডল, মুগ্ধকর মণ্ডল, বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী জামালপুর থানার সাহসনপুরে দামোদর সৈকতে শ্রীযুত প্রভাশ চন্দ্র সাহানার সভাপতিত্বে বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুত দাশরথি তা, নিতাইচরণ ঘোষ ও ধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে ক্লাব ময়দানে শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ মিত্রের সভাপতিত্বে সভা। সভাপতির অভিভাষণ বিশেষ তথ্যপূর্ণ ছিল। শ্রীযুত দাশরথি তা, ডাঃ নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা করেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী কামারগড়ে গ্রামে শ্রীযুত চণ্ডীচরণ দেব উপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিরাট সভা। সভাস্থল পত্র-পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। কলিকাতা বড়বাজার তৈলব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত বগলাকান্ত তা, শ্রীযুক্ত দাশরথি তা, শ্রীযুত ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ও শ্রীযুত

শ্রীএকলব্য

অলিম্পিক ও বিশ্বমৈত্রী

আগামী অলিম্পিক অনুষ্ঠানের তারিখ যতই এগিয়ে আসছে ততই জার্ম্মানীর ভেতর উৎসাহ বেড়ে চলেছে। জার্ম্মানীর প্রতি অধিবাসী যেন কি করে এই অনুষ্ঠান সাফল্যলাভ করবে তার চিন্তাতে বিভোর, সেই কাজে আত্মহারা। কারণ তারা বুঝেছে যে অলিম্পিকের ভেতর দিয়েই বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা হতে পারে। অলিম্পিকে খেলাধূলোর সমান এমন বোধ হয় কিছু নেই যা দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে এক নিবিড় বাঁধনে আটকান যায়, অলিম্পিকের মত এমন কিছু নেই যা জগতের বিভিন্ন স্থানের যুবকশক্তিকে এক অপূর্ব্ব উত্তেজনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

অলিম্পিকের এই মোহিনী শক্তি এমন যে গেল মহাযুদ্ধের পর যখন ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে প্রায় মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হবার উপক্রম তখন এই খেলা ধূলোই ঐ দু'জাতির মধ্যে কৃষ্টির আদান প্রদান রক্ষা করে চলেছিল।

মেয়েদের থাকবার জায়গা

অলিম্পিকে যে সব মেয়ে প্রতিযোগী যাবে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছে Reich Sports Field এ Comradeship House। এই বাড়ীতে অন্ততঃ ৪৫০জন প্রতিযোগীর স্থান করে দেওয়া যেতে পারে। বাড়ীটা অনেকদিনের পুরোণো, কিন্তু কেউ ওখানে না থাকার দরুণ ওটা ভুতের বাড়ীর মত পড়েছিল। এবার অলিম্পিক উপলক্ষ্যে ওটা ভাল করে মেরামত করা হয়েছে। অলিম্পিক হয়ে যাবার পর এ বাড়ীটায় স্বাস্থ্য পরিচর্চ্চা সংসদের ছাত্রেরা বাস করবে এবং তখন এর পরিচালক হবেন Baroness Wangenheim। Comrade House এ খাবার দাবার যোগাবে North German Llyod Line.

অলিম্পিক ষ্ট্যাডিয়াম

ষ্ট্যাডিয়াম প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন যারা দেখবে তারা সকলেই ষ্ট্যাডিয়ামের বিরাটত্ব বেশ অনুভব করতে পারবে। বিশাল এক ডিমের আকারে তৈরী হয়েছে এই খেলার জায়গা। পুরোপুরি লম্বায় এটা ৩৩৩ গজ আর চওড়া হচ্ছে ২৫১ গজ। বসবার সারির সবচেয়ে যেটা উঁচু তা মাটি থেকে ৫৬ ফুট উঁচু এবং খেলাধূলোর জায়গাটা মাটি কেটে আরও ৪০ ফুট নীচে তৈরী হয়েছে। খেলাধূলোর জায়গাটি সবচেয়ে উঁচু সারির বসবার আসন থেকে প্রায় ৯০ ফুট নীচে আর এর পরিমাপ হোল ২১২ গজ লম্বা এবং ১৩১ গজ চওড়া। খেলাধূলোর জায়গাটা এমন কৌশলে তৈরী হয়েছে যে কারোও খেলা দেখতে বিশেষ কষ্ট হবে না। যে সব চেয়ে কাছে বসবে তার কাছ থেকে মাঠের ওপর প্রতিযোগীর দূরত্ব মাত্র ১৮ গজ আর যে সব চেয়ে দূরে বসবে তাদের মধ্যে দূরত্ব হবে কিছু বেশী ২০০ গজ। বসবার আসনগুলো দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—ওপরের আর নীচের। ওপরে আছে ৩১ সারি বসবার জায়গা আর নীচে আছে ৪০ সারি বসবার জায়গা।

তৈরীর একটু আধটু যা বাকী আছে আশা করা যাচ্ছে মে মাসের ভেতরেই তা সব শেষ হয়ে যাবে।

কোলকাতায় হকি খেলা

এখানে যথা নিয়মে হকি খেলা চলছে। এবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার সম্ভাবনা কাষ্টমসেরই বেশী। কেননা তাদের এবার দুর্দ্ধর্ষ form. গেলো বছরের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান যদি এবার তৃতীয় হতে পারে, যা খেলছে তার অনুপাতে খুব ভাল স্থান পেয়েছে বলে আমাদের ধরে নিতে হবে। ওরা যেন খেলতে-হয়-খেলছি বা গড়িমসী চালে চলছে—ভাল করে খেলার চেষ্টা ওদের খেলোয়াড়দের একটুও নেই। আর বেশ ভাল খেলছে St. Joseph. রেঞ্জার্স দলের খেলা অনেক পড়ে গেছে। গেল সপ্তায় প্রথম ডিভিসন হকি খেলার ফলাফল নীচে দেওয়া হোল (মঙ্গলবার পর্য্যন্ত):—

নিতাইচরণ ঘোষ বন্যার প্রতিকারের উপকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সভাগুলিতে বন্যার প্রতিকারের জন্য জনসাধারণ প্রদত্ত স্কীমটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া বন্যা অঞ্চলে রাস্তার অস্তিত্ব না থাকায় জেলাবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডকে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করা হয় এবং জেলা বোর্ডের পরিকল্পিত স্কীমের ও বন্যা অঞ্চলের কোন ব্যবস্থা না করিয়া দামোদর ব্রীজ নির্ম্মাণের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। ইহা ছাড়া আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রত্যেক গ্রাম হইতে কেন্দ্রিয় সমিতির জন্য দুইজন করিয়া প্রতিনিধি লওয়া হইতেছে।

বুধবারের খেলা

মোহনবাগান—পুলিশ—০—০

ডালহৌসি—লিলুয়া—১—০

সেণ্ট জোসেফ—আর্মেনিয়ানস—১—০

বৃহস্পতিবারের খেলা

রেঞ্জার্স—ই, বি, আর—১—১

অ্যাভেরিয়ান্স—ভবানীপুর—০—০

বি, জি, প্রেস—মিঃ মেডিক্যাল্স—২—০

শুক্রবারের খেলা

সেণ্ট জোসেফ—পুলিশ—২—১

শনিবারের খেলা

ডিভন্স—লিলুয়া—১—১

ডালহৌসি—কাষ্টমস—৬—২

মোহনবাগান—কলিকাতা—১—১

সোমবারের খেলা

ডালহাউসী—বি, জি, প্রেস—১—০

ভবানীপুর—পুলিশ—২—১

সেণ্ট জোসেফ—ই, বি, আর—১—০

মঙ্গলবারের খেলা

ক্যালকাটা—রেঞ্জার্স—১—৫

মিঃ মেডিক্যালস—ডিভন্স—৫—০

* * *

আসছে সপ্তায় কোলকাতায় আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলা হবে। এই খেলার ফলাফল দেখে বার্লিন অলিম্পিকের জন্যে ভারতবর্ষের খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হবে। আন্তঃপ্রাদেশিক খেলায় বাংলার দল মনোনয়ন করার জন্যে কোলকাতায় অনেকগুলো 'ট্রায়াল' খেলা হয়ে গেছে সেই খেলাগুলির ওপর নির্ভর করে বাংলার পক্ষে খেলার জন্যে নিম্নলিখিত দল মনোনীত হয়েছে।

এলেন (পোর্ট কমিশনারস), পি, দাস (মোহনবাগান), সি, ট্যাপসেল (বি, এন, আর ক্যাপ্টেন), এস, চ্যাটার্জ্জি (মোহনবাগান), সৌকত আলী (কাষ্টমস) বা এল, সি, ট্যাপসেল (বি, এন, আর), গ্যাজিবার্ডি (বি, এন আর), এ, দেব (বি, জি, প্রেস), হেওয়ারসন (কাষ্টমস), আর, জে, কার (বার্ণস) বা এমেট (মিঃ মেডিক্যাল্স) সুলতান খাঁ (মোহনবাগান), নাজির (গ্রীয়ার)।

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল

আগামী ৪ঠা এপ্রিল বোম্বাই থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দল বিলাত রওনা হবে। বিলাতে ঐ দল কবে এবং কোথায় কোন ম্যাচ খেলবে তার তালিকা নীচে দেওয়া হোল :

মে

২, ৪, ৫—উষ্টারসায়ার

৬, ৭, ৮—অক্সফোর্ড বিঃ বিঃ

৯, ১১, ১২—সামারসেট

১৩, ১৪, ১৫—নর্দাম্পটনসায়ার

১৬, ১৮, ১৯—এম, সি, সি

২০, ২১, ২২—লিষ্টার সায়ার

২৩, ২৫, ২৬—মিডলসেক্স

২৭, ২৮, ২৯—এসেক্স

৩০, জুন ১, ২—কেমব্রীজ বিঃ বিঃ

জুন

৬, ৮, ৯—ইয়র্কসায়ার

১০, ১১—ডারহাম

১৩, ১৫, ১৬—নটিংহাম

১৭, ১৮, ১৯—মাইনর কাউন্টিস

২০, ২২, ২৩—সারে

২৭, ২৯, ৩০—প্রথম টেষ্ট, লর্ডস

জুলাই

৪, ৬, ৭—ল্যাঙ্কাসায়ার

৯, ১০, ১১—আয়র্লণ্ড

১৫, ১৬, ১৭—ল্যাঙ্কাসায়ার

১৮, ২০, ২১—ডার্ব্বিসায়ার

২৫, ২৭, ২৮—দ্বিতীয় টেষ্ট, ম্যাঞ্চেষ্টার

আগষ্ট

১, ৩, ৪—গ্ল্যামর্গান

৫, ৬, ৭—ওয়ারউইকসায়ার

৮, ১০, ১১—গ্লষ্টারসায়ার

১৫, ১৭, ১৮, ১৯—তৃতীয় টেষ্ট, ওভ্যাল

২২, ২৪, ২৫—হ্যামসায়ার

২৬, ২৭, ২৮—কেণ্ট

২৯, ৩১ সেপ্টেম্বর ১—সাসেক্স

সেপ্টেম্বর

২, ৩, ৪—নিখিল ইংলণ্ড একাদশ বা ফোকসটোন

৫, ৭—স্যার জুলিয়ানের একাদশ

৯, ১০, ১১—স্কারবোরা

১৪, ১৫—ভারতীয় জিমখানা

শ্রীদুর্ব্বাসা

রঙের খেলায় প্রাথমিক চাল ঃ—রঙের খেলায় প্রাথমিক চাল সাধারণতঃ দুই রকমের হতে পারে—একটি আক্রমণকারী চাল (Aggressive lead) এবং অপরটি প্রতীক্ষাকারী চাল (Waiting lead)। আক্রমণকারী চালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে ইহা অতি সত্বর পিট আহরণ করে কিন্তু প্রতিক্ষাকারী চালের স্বাতন্ত্র্য এইখানেই যে অপরের খেলার উপর নিজের পিট আসা নির্ভর করে। এখন আক্রমণকারী চাল দেবার সময় ক্রীড়ককে দুইটী বিষয় বিশেষ করে স্মরণ রাখ্‌তে হবে। প্রথম কথা এই যে হাতে অনেক তাস রঙ থাকার দরুণ রঙকর্ত্তা অতি অনায়াসে তাঁর চাল বন্ধ করে দিতে পারেন, সুতরাং তাঁর চাল এরূপ হওয়া উচিত যা'তে দুই একটি পিট যেতে না যেতে তিনি পিট পেয়ে যান, অর্থাৎ যাতে তাঁর হাতে অনারের পিট শীঘ্র বৰ্দ্ধিত হয়। আর দ্বিতীয় কথা এই যে রঙকর্ত্তা তাঁর বাজে তাস পাশাবার জন্য যদি কোন রঙের পিট তৈয়ারী করবার চেষ্টা করেন তা' হলে তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য সেই রঙের বড় তাসের পিট যতক্ষণ সম্ভব দেরী করে নেওয়াই উচিত। অতএব রঙের খেলায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ চাল দেওয়াই অভিপ্রেত।

আক্রমণকারী চাল (Aggressive lead) **:**—টেক্কা সাহেব সমেত যে কোন রঙে প্রাথমিক চাল দেওয়া যুক্তিযুক্ত। এই চালে দুই রকমের সুবিধা বর্ত্তমান। প্রথমতঃ এই চালের দরুণ প্রথম পিট আপনাদের সুনিশ্চিত; দ্বিতীয়তঃ রঙকর্ত্তার খেঁড়ীর (Dummy) হাতখানি পর্য্যবেক্ষণ করে কি ভাবে চাল চালন করা যাবে সে বিষয়ে চিন্তা করবার অবসর পাবেন এবং উপরন্তু আপনার খেঁড়ী এই চালে কি সঙ্কেত করেন (Signal) তা' জান্‌তে পারবেন। সুতরাং খেঁড়ীর সঙ্কেতানুযায়ী সেই রঙে যতগুলি পিট পাওয়া যায় সবগুলি টেনে নিতে পারেন অথবা অন্য কোন রঙে চলে যেতে পারেন। তবে যদি কোন রঙে শুধু টেক্কা সাহেব থাকে তো সেই রঙে না খেলাই ভাল, কিন্তু আবার যদি ডাক-বিশ্লেষণে জানা যায় যে আপনার খেঁড়ীর হাতে প্রবেশ করবার মত একটি তাস নিশ্চিত বর্ত্তমান তবে এই তাস দুই খানি খেলে নেওয়াই উচিত।
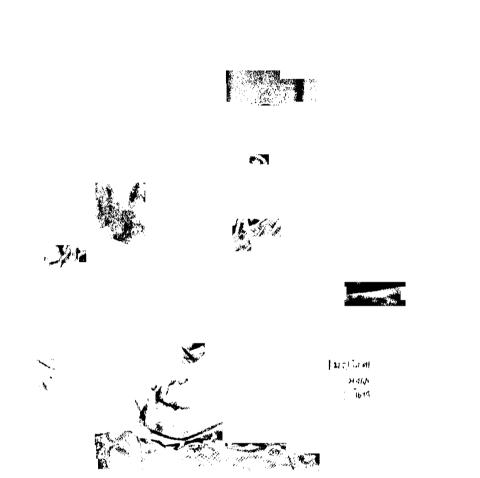
(২) আপনার হাতে যদি টেক্কা সাহেব সমেত কোন রঙ না থাকে, অথবা আপনার খেঁড়ীর কথিত রঙে উভয়ের সম্মিলিত হস্তে টেক্কা সাহেব না থাকে তবে সাহেব বিবি গোলাম বা বিবি, গোলাম দশ অথবা গোলাম দশ নয় ইত্যাদি ধরণের কোন ক্রমানুযায়ী অনার (Complete sequence) থেকে প্রাথমিক চাল দেওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

(৩) যদি আপনার হাতে রঙ ধরবার তাস থাকে এবং খেঁড়ীর হাতে পিট দেবার সম্ভাবনা থাকে তবে অত্যল্প তাস সমেত যে কোন রঙে প্রাথমিক চাল দেওয়া বিধেয়। কিন্তু যদি আপনার হাতে কোন রঙে সাহেব × থাকে তা' হলে অত্যল্প তাসওয়ালা রঙে না খেলাই ভাল।

(৪) আপনার হাতে মাত্র একখানি বড় তাসওয়ালা কোন রঙ থাক্‌লেও খেঁড়ীর কথিত রঙে প্রথমে চাল দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। কেননা উক্ত একক বড় তাসখানি পেড়ে খেলা হলে উহার মূল্য একেবারে নষ্ট হয় না মনে করুন খেঁড়ীর কথিত রঙে আপনি পেয়েছেন টেক্কা বিবি × বা সাহেব ×, তা' হ'লে উক্ত রঙের সর্ব্বোচ্চ তাসখানিই পেড়ে খেলা আপনার উচিত হবে। অবশ্য উক্ত রঙে যদি আপনার হাতে চারখানির বেশী তাস থাকে তা' হলে স্বতন্ত্র কথা। এই অবস্থায় কি চাল দেওয়া নিয়মসঙ্গত তা' ৬ষ্ঠ এবং ৭ম সংখ্যার খেয়ালীতে বিশদভাবে বলা হয়েছে।

প্রতীক্ষাকারী চাল (Waiting lead) :—যখন আপনার হাতে টেক্কা সাহেব বা ক্রমানুযায়ী অনার সমেত কোন রং না থাকে অর্থাৎ আপনার হাতে টেক্কা বিবি, টেক্কা গোলাম বা সাহেব গোলাম বা সাহেব বা বিবি প্রভৃতি ধরণের তাস থাকে তখন সে রঙে অপরের নিকট থেকে চাল এলেই আপনার পক্ষে সুবিধাজনক। কাজে কাজেই সাতা তিরি কিম্বা নয় আটা ছক্কা নিয়ে অত্যন্ত তাসওয়ালা রঙে চাল দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই অত্যল্প তাসওয়ালা রঙে যদি অনার থাকে তবে তা' সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। ইহা ব্যতীত এই অত্যল্প তাসওয়ালা রঙ যদি বিপক্ষদলের রঙ হয় তথাপি এই রঙে চাল দিলে আপনার কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হবে না। তবে এটুকু মনে রাখতে হবে যে যদি এক পক্ষের রঙ ডাকের পর তাঁর খেঁড়ী সেই রঙে সমর্থন না করে অন্য রঙে খেলতে চান এবং তাঁর উত্তরে ডাকদার আর একটি রঙ ডেকে খেলা করবার চেষ্টা করেন এবং অতঃপর সেই রঙে উভয় পক্ষ যদি থেমে যান তবে সে ক্ষেত্রে রঙ খেলে দেওয়া অতীব ফলপ্রসূ। আর যদি টেক্কা বা সাহেব সমেত তিন তাসওয়ালা রঙ আপনার হাতে থাকে তবে প্রথমে স্বল্প তাসওয়ালা রঙে খেলাই যুক্তিযুক্ত। এর ফলে ডাকদারের পক্ষে খেলা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

ক্রমানুযায়ী তাস থাকলেও হাতে সাহেব বিবি দশ বা বিবি গোলাম নয় কিম্বা গোলাম দশ আটা ইত্যাদি ধরণের তাস অনেক সময় ক্রমানুযায়ী তাসের মত (Complete Sequence) কার্য্যকরী। তজ্জন্য যে অবস্থায় ক্রমানুযায়ী তাস নিয়ে খেলা হয় সে অবস্থায় এই ধরণের তাস নিয়ে চাল দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ নয়।

যখন আক্রমণকারী চালের (Aggressive Lead) বা প্রতীক্ষাকারী চালের (Waiting Lead) উপযুক্ত কোন তাস হাতে না থাকে তবে সে ক্ষেত্রে শক্তির পর্য্যায়ানুযায়ী চতুর্থ সর্ব্বোচ্চ তাসখানি খেলাই বিধেয়। তবে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আপনার হাতে যদি রঙের পরিমাণ বেশী থাকে তা' হ'লে বহু তাসওয়ালা রঙে চাল দেওয়া সুফলদায়ক; কারণ ফলতঃ ডাকদারের রঙ এর দরুণ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার রঙ বৰ্দ্ধিত হবে।

উল্টাডাঙ্গা কার্ড-ক্লাব :—গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় ৯নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোডস্থ প্রাঙ্গনে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার লাহিড়ী, এম-এ, বি-এল, এডভোকেট মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির অকসন্ ব্রীজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন হয়। যথাসময়ে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে কল্যাণীয়া কুমারী রেণুবালা ধরের শ্রুতিমধুর কণ্ঠসঙ্গীতের সহিত সভার কার্য্য

আরম্ভ হয়। তা'রপর এই সমিতির সম্পাদক মুরলীবাবু পূর্ব্ববর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র এম্‌-এল, শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দে এম-এ, প্রভৃতি মহোদয়গণ ভাবগর্ভ বক্তৃতাদানে সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তৎপরে বিজয়ীদল "ব্রুক এণ্ড পার্টনার" এবং বিজিত দল "লিলি বি"কে যথাযোগ্য পুরিতোষিক বিতরণের পর সভাপতি মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় ব্রীজ বিষয়ক বক্তৃতায় উন্মুক্ত প্রাঙ্গনটিকে মুখরিত করে তোলেন। পরিশেষে শ্রীসতীশ গুপ্ত অদ্ভুত বাচবিদ্যায় উপস্থিত জনসাধারণকে চমৎকৃত করেন। তৎপরে জলযোগের সহিত এই সুমধুর অনুষ্ঠানটীর সমাধা হয়। বলা বাহুল্য যে সমিতির সুদক্ষ সম্পাদক শ্রীমুরলী মোহন দাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সুষ্ঠু পরিচালনার দ্বারাই এদের ব্রীজ প্রতিযোগিতাটী এবং বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানটী সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু সমূহ দুঃখের বিষয় এই যে এরা এখনও ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হন নাই। আমরা আশা করি শীঘ্রই এরা ব্রীজ এসোসিয়েশনে যোগদান করে এই এসোসিয়শনকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন।

স্যাটার্ণ ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশনঃ—বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবস মানিকতলায় ৺কালীনাথ মিত্র, সি, আই, ই মহাশয়ের বাগানে এই সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন হয়। ডেপুটী একাউণ্ট জেনারেল মিঃ এচ্‌ ডি, বোস সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সভাপতি যামিনীবাবু, সম্পাদক যতীশবাবু এবং অন্যতম সদস্য মনিলাল বাবু প্রভৃতি এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। স্যাটার্ণ ক্লাবের সুযোগ্য সম্পাদক দেবব্রত দত্ত মহাশয় যে বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী পাঠ ও আয়ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন তার মর্ম্ম জ্ঞাত হয়ে আমরা পরম প্রীতিলাভ করেছি। বাস্তবিক মাত্র দুই আনা মাসিক চাঁদার সাহায্যে এরূপ সুন্দরভাবে ক্লাব-পরিচালনা দেবব্রতবাবুর ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অপূর্ব্ব কর্ম্ম-শক্তির পরিচায়ক। সভাস্থল অতি মনোরম-ভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। এবং তদুপরি স্যাটার্ণ ক্লাব কলিকাতার বিভিন্ন প্রতি-যোগিতায় (এপোলো ক্লাবের ও লুনার এণ্ড ফুলস্‌ ক্লাব প্রভৃতি) জয়ী হয়ে সম্প্রতি যে কয়টি কাপ ও শীল্ড প্রাপ্ত হয়েছেন সেইগুলি সভাস্থলে রক্ষিত হয়েছিল। খাওয়া দাওয়া, আদর আপ্যায়ন, হরিদাসবাবুর কৃমিক-সঙ্গীত সেদিন সর্ব্বোতোভাবে সুন্দর হয়েছিল। দেবব্রতবাবু নিজে এবং তদীয় কর্ম্মকুশল সহকারী দেবেন্দ্রবিজয় বাবু, ধীরেনবাবু, পঙ্কজবাবু, সতীশবাবু, গৌরী বাবু, হরিদাসবাবু প্রভৃতির সুমিষ্ট ও সাদর অভ্যর্থনায় সকল অভ্যাগতই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। এই উৎসব সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য আমরা ক্লাবের সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবব্রত দত্ত মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোচ্য বর্ষের কার্য্যকরী সভ্যের নাম নিম্নে দেওয়া হল :—

সভাপতি :—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়।

অবৈতনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীদেবব্রত দত্ত।

অবৈতনিক সহঃ সম্পাদক :—শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় রায়।

সভ্যগণ :—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।
শ্রীগৌরীদাস মিত্র।
শ্রীপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীভবেশনাথ সেনগুপ্ত।
শ্রীহরিদাস ঘোষ।

(বিলাসী)

কালী ফিল্মস্

"কাল-পরিণয়" আস্‌চে মাসের প্রথম হপ্তাতেই মুক্তি পাবে 'উত্তরা'য়। নির্ব্বাক যুগে এই ছবি তুলেই গাঙ্গুলী মশাই কোম্পানীর থলে দিয়েছিলেন ভরিয়ে। এবার নিজের ষ্টুডিওতে নিজেই যখন তিনি সেই ছবিখানা সবাকে রূপ দিয়েছেন, তখন তাঁরও সিন্দুক নিশ্চয়ই ভরে উঠবে। আর ছবিখানা যে খুব ভাল হবে তা' আমরা দু' তিন শুটিং দেখেই বেশ বুঝতে পেরেছি।

* * *

এখানে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী তাঁর বহুদিনের চিত্রনাট্য "ফুল্লরা" তুলবেন। আর্টিষ্ট সংগ্রহ চল্‌ছে—শেষ হ'লেই মহলা বস্‌বে। "ফুল্লরা"র সদ্গতি এতদিন পরে হ'ল দেখে আমরা সুখী হলাম।

* * *

ঈষ্ট ইণ্ডিয়ার "পথের শেষে" শেষ কোরেই জ্যোতিষ মুখুয্যে এই প্রতিষ্ঠানে ফিরে আস্‌ছেন—একখানা ছবি তোলার ভার নিয়ে। যে ভাবেই হ'ক বাবুরাম ঘোষ রোডের মায়া মুখুয্যে মশাই ভুলতে পারেন নি—দেখছি।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

আস্‌চে বেস্পতিবার ৫ই মার্চ্চ, ঈদ্ উপলক্ষে গুল হামিদের "খায়বার পাশ" ভারতের বিভিন্ন দশ জায়গায় মুক্তি পাবে। আর কোলকাতায় 'প্যারাডাইজে' কালই দেখানো সুরু হবে।

দেবকী বসুর "সোনার-সংসারের" মহলা চল্‌ছে। তাড়াহুড়ো না কোরে অতি সতর্কতা নিয়ে কাজ কোরছেন দেবকী বাবু। চরিত্র নির্ব্বাচন ছবিখানার হ'য়েছে অভিনব। তারপর হাস্যরসিক তুলসী লাহিড়ী আর সুগায়িকা কমলা (ঝরিয়া) এতে যোগ দিয়ে আরও ভাল হ'য়েছে।

* * *

মিঃ স্পেণ্টা "লয়লা-মজনু" পারস্য-চিত্র এই প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে তুলবেন—এ খবর আগেই সবাইকে জানানো হ'য়েছে। আর এতে সুন্দরী, শিক্ষিতা শ্রীমতী ভাজিরী নায়িকা সাজছেন এও সবাই জানেন। সম্প্রতি ছবিখানার মহলা বসেছে—শীঘ্রই শুটিং সুরু হবে।

মা ও ছেলে—কোয়ালিটি পিকচার্স-এর "ব্যথার দানে" ইলা দাস।

কোয়ালিটী পিক্‌চার্স

এদের "ব্যথার দান" প্রায় আধাআধি শেষ হ'য়েছে। পরিচালক হেমগুপ্ত চিত্ররাজ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম কোরছেন। তাঁর এ সুপ্রচেষ্টা সুফল হবে—এ বিশ্বাস আমাদের হয়।

এই সঙ্গে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য তিনরীলের একখানা হাসির ছবি তোলবার তোড়জোড় কোরছেন—এমন কী মহলাও বসেছে। এতে নামছে লীনা মুখার্জ্জি, বিনয় মুখার্জ্জি আর নির্ম্মল বাঁড়ুয্যে।

ইণ্ডিয়া মুভীজ লিঃ

এই নামে একটি যৌথ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে। কর্ম্মকর্ত্তা হচ্ছেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। সিনেমা ও থিয়েটারের সঙ্গে তিনকড়িবাবু জড়িত আছেন বহুদিন ধরে—বুড়ো বয়সে তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'তে দেখলে আমাদের সুখের অন্ত থাক্‌বে না।

পপুলার পিকচার্স

এদের নব-উদ্যম প্রশংসনীয়। দ্বিতীয় ছবি "আবর্ত্তনে"-র কাজ শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে প্রায় শেষ হ'ল। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হ'লাম, নায়িকা কুমারী লীলা হালদার এই ছবিতে নাকি ভাল কাজ কোরছে। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় যারা নামছে তারাও বেশ মানিয়ে অভিনয় কোরছে। এদের মধ্যে প্রমোদ রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী, শরৎ চাটুয্যে, কৃষ্ণ মুখার্জ্জি, ক্ষেত্র ভট্চায, শেফালিকা (পুতুল) রেণুকা ঘোষ (এঃ) ও ডলি রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

সতু সেন ছবিখানার পরিচালক আর হেমন্ত গুপ্ত চিত্রনাট্যকার—এ খবর সবায়ের জানা আছে। ভি, ভি দাতে আর গফুর আলোক-চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজ কোর্‌ছেন।

দেবদত্ত ফিল্মস

এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" ও "ইন্দিরা"র চিত্র-স্বত্ব কিনেছেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়ার প্রচার-সম্পাদক সুধীরেন্দ্র সান্যাল এ কাজ সম্পাদন কোরেছেন। এদের প্রথম তেলেগু ছবির সঙ্গে সঙ্গেই উপরোক্ত গল্প দু'টির চিত্র-গ্রহণ সুরু হবে।

পপুলার পিকচার্স-এর "আবর্ত্তনে"-র একটি দৃশ্য

আর একটা খবর, এই প্রতিষ্ঠানের মালিক দেবদত্ত শীলের বড় ভাই এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ছবিতোলার জন্যে। সুসংবাদ!

শ্রীভারতলক্ষ্মী

চারু রায়ের পরিচালনায় এদের "বাঙ্গালী" শীঘ্রই শেষ হ'য়ে মুক্তির অপেক্ষায় থাক্‌বে।

মায়াপুরী ষ্টুডিও

চিত্রজগতে সুপরিচিত চানী দত্তের পরিচালনায় "মানিক-জোড়" বা "মামা ভাগ্নে"র শূটীং মায়াপুরী ষ্টুডিওতে আরম্ভ হ'য়েছে। পি, সাণ্ডেলের উপর আলোক-চিত্র গ্রহণের ভার পড়েছে। তার প্রধান সহকারী অজিত সেন চিত্র গ্রহণে যথেষ্ট সহায়তা কোরছেন। সুবল দাস রসায়নাগারের কাজ দেখছেন। ছবিখানি আশা-করা যায় আগামী ইষ্টারের ছুটীতে মুক্তি লাভ কোরবে।

ক্যালকাটা থিয়েটার্স

ক্যালকাটা থিয়েটার্সের পরিচালনায় "নাট্য-নিকেতন" নাট্য-জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এদের আগামী আকর্ষণ "কেদার রায়" শিল্পী সমাবেশে, নাটকীয় সৌন্দর্য্যে অভিনবরূপ নিয়ে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ কোরবে।

মিনার্ভা হস্তান্তরিত

আমরা খবর পেলাম যে, শীঘ্রই মিনার্ভা থিয়েটার হস্তান্তরিত হয়ে যাবে। ন্যাশন্যাল পিকচার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত হেমেন্দ্র কুমার মজুমদার এই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হ'য়েছেন। এই মর্ম্মে সম্প্রতি দলিলপত্র রেজেষ্ট্রী হ'য়ে গেছে। শ্রীযুত মজুমদার উদ্যোগী কর্ম্মঠ যুবক, তার হাতে মিনার্ভার আরো উন্নতি আমরা দেখব বলে আশা রাখছি।

২২ নং ওয়ার্ডের কংগ্রেসী মনোনয়নের ফলাফল

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেস-প্রার্থী মনোনয়নের জন্য দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির পক্ষে যে নির্ব্বাচন-বোর্ড গঠিত হইয়াছিল তাহাতে ২২নং ওয়ার্ডে অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, আশুতোষ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল অধ্যাপক শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও চাটার্ড একাউন্টান্ট শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উপস্থাপিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক্রমে নবম-বার্ষিকী নীতি ১০—২ সংখ্যক ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়ায় বর্ত্তমান কাউন্সিলারদ্বয় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরিভাবে পরিত্যক্ত হন।

তৎপরে যথাক্রমে নিম্নলিখিত ভাবে তিনটী বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়:—

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন সেনগুপ্ত —{ শ্রীঅক্ষয় সরকার
শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় —{ শ্রীঅক্ষয় সরকার
অধ্যাপক শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়

শ্রীসুকুমার রায় —{ শ্রীঅক্ষয় সরকার
শ্রীজ্ঞানদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভোট গ্রহণের ফলে

শ্রীযুক্ত অক্ষয় সরকার	৯
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র ঘোষ	৭
শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২
ও	
অধ্যাপক সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১

ভোট পান। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয় সরকার ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র ঘোষ অধিক সংখ্যক ভোট পাওয়ায় দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের পক্ষে প্রার্থীরূপে মনোনীত হন।

শ্রীঅক্ষয় সরকারের ও শ্রীদ্বিজেন্দ্র ঘোষের পক্ষে ভোট বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে:—

প্রার্থী	পক্ষে	বিপক্ষে	নিরপেক্ষ
সরকার	৯	০	৩
ঘোষ	৭	২	৩

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর এই মনোনয়ন আংশিকভাবে নাকচ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মল্লিককে মনোনীত করিয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয় সরকারের বিবৃতি

আসন্ন কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে ২২নং ওয়ার্ড হইতে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মল্লিক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক কংগ্রেস-নির্ব্বাচনপ্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছেন। এতদ্বারা আমি আমার বন্ধু ও পরিচিত কর্ম্মিগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন তাঁহাদের উভয়কে সমর্থন করেন।

এই প্রসঙ্গে আমি আমার দক্ষিণ কলিকাতার কংগ্রেস সহকর্ম্মিগণ ও বিভিন্ন দলের পরিচালকগণকে দক্ষিণ কলিকাতা জেলা নির্ব্বাচন বোর্ডে আমাকে সম্মিলিতভাবে সমর্থন করার জন্য আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের সম্মিলিত সমর্থনের জন্যই ২২নং ওয়ার্ড হইতে কংগ্রেস নির্ব্বাচন প্রার্থীদের মধ্যে আমি সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলাম। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও আমি দক্ষিণ কলিকাতার কংগ্রেস কর্ম্মীদের একটি বিশিষ্ট দলের সহিত জড়িত ছিলাম। তথাপি যে জেলা নির্ব্বাচন বোর্ডে কেহই আমার নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন নাই ইহাই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয়। সত্য কথা বলিতে কি আমি তাঁহাদের নিকট হইতে এইরূপ সহৃদয় সহযোগিতা লাভ করিব ইতিপূর্ব্বে ইহা ছিল আমার কল্পনাতীত। নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে তাই আর একবার আমি আমার দক্ষিণ কলিকাতার কংগ্রেস সহকর্ম্মীদের ধন্যবাদসহ এই অনুরোধ জানাই যে, আমাদের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মনোনীত কংগ্রেস তরফের নির্ব্বাচনপ্রার্থী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মল্লিকের নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব

যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সে বিষয়ে তাঁহারা যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

সহকর্ম্মীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীগৌর দে, শ্রীশৈলেন দাস, শ্রীজ্যোতিষ দত্ত, শ্রীহরনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযতীন মল্লিক, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার রায়, মিঃ পি, ব্যানার্জ্জি এম্-এল্-সি, ও শ্রীপরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের সহকর্ম্মীবৃন্দকে তাঁহাদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

বিবিধ

ভবানীপুর সবুজ সমিতি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শত বর্ষোৎসব উপলক্ষে ভবানীপুর সবুজ সমিতি গত রবিবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী একটী বিরাট শোভা-যাত্রা ও নগর সঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আলেয়া সংসদ, মিতালীসঙ্ঘ, কাঁসারীপাড়া যুবক সম্প্রদায় প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইয়াছিল।

বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে বেলুড় মঠে প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে সারাদিন ব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা এবং বেলা ৯ ঘটিকা হইতে হোম আরম্ভ হয়। অতঃপর বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বেদগান করেন।

বেলা ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত মঠ-বাড়ীতে পরিদর্শকদিগের বসিবার ঘরে উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীত এবং কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, হরেন শীল, কালীপদ পাঠক, সতীশ দত্ত (দানী বাবু), প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গায়ক এবং বাদকগণ ইহাতে যোগদান করেন।

সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মণ্ডপটিকে নানা-ভাবে সুসজ্জিত করিয়া তাহার মধ্যে ঠাকুরের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। এই মণ্ডপের সম্মুখে বেলা ১২টা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত ভবানীপুরের রত্নাকর সঙ্ঘ মাতৃমহিমা (চণ্ডী) কীর্ত্তন করেন।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী এই যুগাবতারের জন্মতিথি ও উৎসব উপলক্ষ্যে নানা ধর্ম্মের ও নানা বর্ণের সহস্র সহস্র নরনারী যোগদান করেন। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় মণ্ডপসম্মুখস্থ চন্দ্রাতপতলে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমে সভায় রামকৃষ্ণ মিশনের বর্ত্তমান সভাপতি স্বামী অখণ্ডানন্দের বাণী পঠিত হয়। অতঃপর স্বামী নির্ব্বেদানন্দ, ডাঃ কালিদাস পাল, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি রামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

সভায় কতকগুলি ইউরোপীয় এবং মার্কিন পুরুষ ও মহিলা যোগদান করিয়া-ছিলেন। এতদ্ভিন্ন বিচারপতি স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জ্জি, স্বামী প্রণবানন্দ, মিসেস হার্ডিঞ্জ, ডাঃ অধর দাস, ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পঞ্চানন বসু, ব্রজরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মল বসু, শ্রীমোহিত মৈত্র, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

আপনার নিজস্ব চা

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যদিও ভারতই জগতের অর্দ্ধেক অধিবাসীদের চা'র চাহিদা মিটাইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবাসীরা নিজেরা এখন পর্য্যন্ত চা'র যথার্থ আদর করিতে শিখেন নাই। আমাদের জানা থাকা উচিত যে সকলের সেরা, সুগন্ধযুক্ত চা আমাদের নিজের দেশে, আমাদের নিজেদের শ্রমে উৎপন্ন হয়। চা'র প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের বর্জ্জন করিতেই হইবে। আসুন, নিজেদের ব্যবহারের জন্য আমরা ভারতের চা ব্যবহার করি। এই সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, স্বাস্থ্যপ্রদ ও স্নিগ্ধকর পানীয় আমাদের জাতীয় পানীয় হউক। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে কয়েক পেয়ালা চা পান করি আসুন। গ্রীষ্মকালে চা শরীর শীতল করে। শীতকালে চা পান করিলে আরাম পাওয়া যায়। আজই পরীক্ষা করিয়া দেখুন। স্মরণ রাখিবেন ইহা আমাদেরই নিজস্ব চা এবং উহা উপভোগ করিবার অধিকার সর্ব্বপ্রথম আমাদের।

চা প্রস্তুত করার প্রণালী

১। ভারতীয় চা ব্যবহার করিবেন।
২। সম্ভব হইলে মাটীর পাত্র ব্যবহার করিবেন, প্রত্যেকের জন্য এক চামচ চা ও এক চামচ অতিরিক্ত দিবেন।
৩। জল যেন টগবগ করিয়া ফোটে।
৪। আগে চা দিয়া তাহার উপর ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিবেন।
৫। চা অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ভিজিতে দিবেন; তাহার পর চিনি ও দুগ্ধ দিয়া পান করিবেন।

কোটী কোটী লোক ভারতীয় চা পান করেন আপনিও করেন ত ?

I. K. 7

সেতুবন্ধ

= উপন্যাস =

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ-পৃথিবীতে প্রত্যেক নর-নারী এক একটি টাইপ। তাদের আচার ব্যবহারে, কথা বলবার অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে, জীবন যাত্রার বিচিত্র ধারায় এতটুকু ঐক্য মেলেনা। সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে সকলকে একই মানদণ্ডে বিচার করতে গেলে এসে পড়বে অসঙ্গতি, প্রকাশ হয়ে পড়বে অক্ষমতার পরিচয়, নতুন করে হবে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি।

মৃত্যুঞ্জয় এটা জানে এবং ভালো করে বোঝে। এ-বোধশক্তি সে খবরের কাগজের কিংবা কোন মাসিক পত্রিকার পাতা থেকে অর্জ্জন করেনি। কিংবা কোন জ্ঞানীব্যক্তির মুখনিঃসৃত বাণী থেকেও না। নারীর প্রেম, ভালবাসা, ঘৃণা এবং দাম্পত্য-জীবনের সুখ-দুঃখ এগুলো তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ফল।

গত যুদ্ধের পর যে-সমস্ত লোক কণ্ট্রাক-টারী করে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেছে তাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম নিঃসঙ্কোচে করা যেতে পারে।

কেমন করে সে অর্থ উপার্জ্জনের সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছিলো তার ইতিহাস আমাদের জানা নেই। তার বিত্তের পরিমাণ এতো দ্রুত বেড়ে চল্লো যে সকলে চিন্তা করবার কোন অবসরই পেলেনা। রুদ্ধবিস্ময়ে রইল তাকিয়ে।

মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন কর্ম্মময়। কাজটাকে সে জীবনে ভালো করেই বোঝে। এবং এর বিনিময়ে সে অর্থ পেলেই মহা তৃপ্ত।

নিজের জীবনটাকে সে এমনভাবে গ'ড়ে তুলেছে যে এর পারিপার্শ্বিকতায় বিলাসীর কোন নামগন্ধ নেই, নেই কোন অকারণ ঔৎসুক্য। কর্ম্মটাই তার বিলাস। এর বিভিন্ন প্রণালী তার অন্তরে জুগিয়ে এসে আনন্দের ভাণ্ডার।

আজকাল মৃত্যুঞ্জয়ের নাম সকলের মুখে মুখে। তার কর্ম্মপদ্ধতি এতো চমৎকার, তার বিচার-বুদ্ধি এতো তীক্ষ্ণ যে কাজের লোক মাত্রেই তার কাছে পরামর্শ নেবার জন্যে ছুটে আসে। ফুরসৎ নেই একথা কেউ বিশ্বাস করতে চায়না।

যুদ্ধ যখন বাঁধে মৃত্যুঞ্জয় তখন শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। পাশ করে বেরিয়ে আসবার পর একদিনও তাকে বসে থাকতে হয়নি। তারপর বরাত এমন ফিরে গেল যে নাইবার খাবার সময় সে করে উঠতে পারতোনা।

সকালে উঠেই মৃত্যুঞ্জয় আজকাল বাইরের ঘরে এসে বসে। নানারকম নক্সা নিয়ে মাথা ঘামায় এবং যেখানে সমস্যাটা কুটিল হয়ে দাঁড়ায় এক আধটা সিগারেটের ধোঁয়ার মাথাটা পরিষ্কার করে নেয়।

আজ সকাল থেকে মৃত্যুঞ্জয় চিত্রের একটা নকসা নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে দু'চারজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। তাঁদের একথা-সেকথা করে বিদায় করেছে। এতবড় একটা কনষ্ট্রাকসান ওয়ার্ক আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙালীর ভাগ্যে জোটেনি।

চুপি চুপি দিলীপ বাইরের ঘরে এসে ঢুকলো।

দিলীপ মৃত্যুঞ্জয়ের ছেলে। তার নীলোৎপল চক্ষুদুটিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে শানিত-বুদ্ধির তীক্ষ্ণ জ্যোতি। মুখে দুষ্টুমি বুদ্ধির স্পষ্ট অভিব্যক্তি। মাথার চুলগুলি ঈষৎ কোঁকড়ানো। লোহার মত শরীর, ইস্পাতের মত নমনীয় অথচ দৃঢ়। বয়স বছর সাতেক হবে।

—বাবা?

মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তার জাল টুটে গেল। বল্লে: শোন্ দুষ্টু এদিকে আয়। আবার কী মতলব নিয়ে এসেছিস বলতো? বলে দিলীপকে সস্নেহে কোলের মধ্যে টেনে নিলে।

—আমাকে একটা ঘোড়া কিনে দিওনা বাবা।

—ঘোড়া নিয়ে তুই কী করবি?

—চড়বো।

…চড়তে পারিস?

—হাঁ, খুব। কদ্দিন যে কাঠের ঘোড়াটায় চেপেচি। তুমি বুঝি দেখনি!

—আচ্ছা, আচ্ছা, তোকে একটা ছোট ঘোড়া কিনে দেবো।

—কবে দেবে বাবা, বলনা?

—শীঘ্রী।

—এখন একটা আনি দাওনা বাইসকোপ কিনবো।

—বাইসকোপ!

—সেই যে সামনের দিকে ছোট ছোট চুঙি পরায়, কাচের ভিতর দিয়ে একচোখ বুজে দেখে।

—ওঃ বলে মৃত্যুঞ্জয় ড্রয়ার থেকে একটা আনি বার করে দিলীপের হাতে দিয়ে বল্লে: এখন আর বিরক্ত করিসনে খোকা। দেখচিস না কাজ করচি।

দিলীপ বাবার কথার কোন জবাব দিলেনা। বাইসকোপ কেনবার আনন্দে সে অধীর হয়ে ঘর থেকে সে ছুটে পালিয়ে গেল।

একটা জিনিষ মৃত্যুঞ্জয়ের মতের বিরুদ্ধে ঘটেছিলো—বিবাহ। তখন সে ফাইনাল বি, ই, দিয়েছে। মায়ের কথাগুলি আজও সে ভুলতে পারেনি।

"বাবা, মৃত্যুঞ্জয় এইবার একটা বে'থা' কর, বাবা। বুড়ো মানুষ কদ্দিন আর বাঁচবো। সংসারী হয়েচিস দেখে তবু সুখে মরতে পারবো। পড়াশোনা তো শেষ হয়ে গেচে।

—পড়াশোনার কি শেষ আছে, মা। প্রয়োজনের ঘর তো একেবারে শূন্য। দুবেলা দুটো খেতেই পাইনা, এর ওপর বিয়ে করা কি চলে? বৌকে কী খেতে দেবো শুনি?

—কী যে কথা কস তার ঠিক নেই। কী আবার খেতে দেবো? যা জুটবে তাই খাবে।

—ভবিষ্যতের কষ্টের কথা তুমি মোটেই ভাবচোনা, মা

—ভগবান যা করেন তাই হবে। ভেবে চিন্তে ওসব জিনিষের কোনই কিনারা হয়না।

—তা বলে জেনে শুনে কষ্টকে সংসারের মধ্যে কেন টেনে আনি, মা। আর একটু সবুর কর। পয়সার মুখ একবার দেখতে আরম্ভ করলে আর না করবোনা।

—তদ্দিন কি আর বেঁচে থাকবো, মৃত্যুঞ্জয়!

—তুমি আমার উন্নতি দেখে যাবেনা তাও কি কখনো হয়। জোর করে যে তোমায় বাঁচিয়ে রাখবো, মা।

—পাগল ছেলের কথা শোনো। জোর করলেই কি আমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবি, মরাবাচা যে ভগবানের হাত। আমার একটা কথা রাখ, আর অমত করিসনে।"

—অনিচ্ছাসত্ত্বে মৃত্যুঞ্জয় তখন মার কথায় মত দিয়েছিল।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে মৃত্যুঞ্জয় চিত্রের নকসাটা পরীক্ষা করতে লাগলো। বিশলক্ষ টাকার কাজ, সামান্য একটু গোল্ল-মাল হয়ে গেলে সমস্ত জিনিষ পণ্ড হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাগান থেকে তরকারির ঝুড়িটা নিয়ে এসে রান্নাঘরের দাওয়ার কাছে রাখতে রাখতে শশীবাবু বল্লেন: শুনেছো তোমার ছেলের কীর্ত্তি?

মহেশ্বরী বিস্ময়ে বলে উঠলেন: কি হয়েচে?

ঘরদোরে দেশলাইয়ের খালি খোল রাখবার যো নেই।

—কেন?

—তোমার ছেলে সেগুলো দিয়ে রেলগাড়ী তৈরী করেচে। কোত্থেকে একটা ছুরি যোগাড় করে কুঞ্চিগুলো চিরে লাইন পেতেচে। ঘরে পিজবোর্ডের একটা বাক্স ছিলনা সেগুলোকে গোল গোল করে কেটে চাকা করেচে। আপনার মনে নানারকম শব্দ করে গাড়ী চালাচ্চে।

—দিনকের দিন ছেলেটা যেন কী রকম হয়ে যাচ্চে। সব সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক। খেতে বসে ভালো করে খায়না।

—তেঁতুল তলা দিয়ে হাঁটবার উপায় নেই। সকলকে হাত নেড়ে সাবধান করে দিচ্চে: হুশিয়ার, এখন লাইন টপ্‌কোনা। যে জোরে গাড়ী আসছে এক্ষণি গাড়ীর তলায় পড়ে গেলে ছাতু হয়ে যাবে। এত কথা কোত্থেকে ও শিখলে বলতো?

—মৃত্যুঞ্জয়ের মা একথার কোন জবাব দেননা। খেতে বসে যে-সব প্রশ্ন করে খোকা

তাঁকে উৎব্যস্ত করে তোলে সেগুলো তাঁর মনের মুকুরে ভেসে ওঠে :

"খোকা বলে : আকাশে যে চাঁদ ওঠে কোত্থেকে সে আলো পায় মা ?

—কী করে জানবো খোকা ? তোর মত তো আমি বই পড়তে জানিনে।

—তুমি সব জানো মা। আমায় বলচোনা। আমার চেয়ে তুমি কত বড়।

—ভগবান সব জিনিষ তৈরী করেচেন। তিনিই চাঁদের মধ্যে আলো দিয়েছেন।

—ও আলো তো একদিন ফুরিয়ে যেতে পারে।

—ও আলো ফুরোয় না, খোকা।

—মাঝে মাঝে আলো দেখতে পাওয়া যায় না কেন, মা ?

—তখন মেঘ এসে ঢেকে দেয় যে, খোকন।

—সে তো খানিকক্ষণের জন্যে। আবার যে আলো ফুটে বেরোয়।

—কী যে বলিস খোকা বুঝতে পারিনা।

—বাঃ তুমি সব ভুলে যাও মা। বাবার যখন বাতের অসুখটা বাড়ে তখন তুমি বাবাকে বল : আজ আমাবস্যে। রাতে ভাত খেয়োনা। আমাবস্যায় চাঁদ দেখা যায় না কেন ?

মহেশ্বরী একথার কোন জবাব খুঁজে পাননা। বলেন : খেয়েনে খোকা, আর দুষ্টুমি করিসনে। ভাত যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

মৃত্যুঞ্জয় খেতে খেতে বলে : ওদের বিষ্টু কি বলছিলো জাননা মা !

—কি ?

—চাঁদে একটা বুড়ি আছে। দুষ্টুমি করে চুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আলো বন্ধ করে দেয়, তাই আমাবস্যা হয়। বিষ্টু বড় বোকা। ও কিচ্ছু জানেনা মা, নয় ?"

মহেশ্বরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন : তুমি এখন থেকে খোকাকে একটু নজরে রেখো। ও বেশীদিন বোধ হয় বাঁচবেনা।

তোমার যেমন কথা। মরা বাঁচার কথা কোত্থেকে আসচে বলতো ? দেখে নিয়ো বড় হয়ে খোকা খুব বিদ্বান হবে বলে শশীবাবু চুপ করেন।

* * *

মৃত্যুঞ্জয় যেবার ২০ টাকা বৃত্তি পেয়ে সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো শশীবাবু তখন মৃত্যুশয্যায়।

মৃত্যুঞ্জয়ের মন অত্যন্ত খারাপ। সে পিতার শিয়রে বসে আছে। ভালো ভাবে পাশ করেছে এ খবরটা জানাবার জন্যে তার এতটুকুও আগ্রহ নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের মা সেই যে ঠাকুর ঘরে ঢুকেছেন এখনো বেরোননি।

শশীবাবু ক্ষণিকের জন্যে চোখ চাইলেন; বল্লেন : তোর পাশের খবর বেরিয়েছে, খোকা ?

হাঁ, বাবা। জলপানি পেয়ে পাস করেচি।

ছেলের সাফল্যের কথা শুনে শশীবাবুর পাণ্ডুর মুখ আনন্দে চকচকে করে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। বল্লেন : আর বেশীদিন বোধ হয় বাঁচবোনা। তোর উন্নতি দেখে যাবার আর সময় হয়ে উঠবেনা।

মৃত্যুঞ্জয়ের ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ কেঁপে উঠলো ; অমন কথা বলোনা, বাবা। তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

একবার তোর মাকে ডাক দিকি ; একটা কথা বলে যাই।

মনের কথা গোপন রেখেই শশীবাবুকে মরতে হলো। মহেশ্বরী স্বামীর পাশে এসে বসে বুঝতে পারলেন সব শেষ হয়ে গেছে।

উমেশবাবু করপোরেশনে চাকরি করেন, মোটা রকমেরই মাইনে পান। এর ওপর বাড়ীটুকু তাঁর নিজের। সেদিক দিয়ে তিনি বাচোয়া। সংসারে প্রাণী বলতে তিনটি ; তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী এবং ছুন্নি। একটা চাকর অবিশ্যি আছে, তাও তাকে মাইনে দিতে হয়না, ভাত কাপড়েই সন্তুষ্ট হয়ে আছে। সংসারের খরচপত্তর এত কম যে ব্যাঙ্কে টাকার অঙ্কটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

কলেজ খোলবার আগেই মহেশ্বরী মৃত্যুঞ্জয়কে সঙ্গে করে নিয়ে বৌবাজারে দাদার কাছে এসে উঠলেন, উমেশ বাবু তখন অফিস থেকে ফেরেননি।

দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ক্ষেমদা সিংগারের কলটা নিয়ে ছুন্নির জামা

তৈরী করছিল। এমন সময় দরজায় গাড়ী এসে থামলো।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখবার দরকার হলোনা। ছুন্নি মাকে এসে খবরটা দিয়ে তাক লাগিয়ে দিলে। বল্লে পিসিমা এসেছে।

মহেশ্বরী এসেছে শুনে ক্ষেমদা মনে মনে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে উঠলো। তবুও বাধ্য হয়ে হাতের কাজ তাকে ফেলে রেখে উঠে যেতে হলো। চোখের কোণে লোক দেখানো চোখের জল এনে সে মহেশ্বরীকে ঘরের মধ্যে এনে বসালে।

মহেশ্বরী বল্লেন: দাদা কখন আসবে বড বৌ?

ওর আসতে আজ একটু রাত হবে—ক্ষেমদা একটু থেমে বল্লে: গাড়ীর কাপড়টা ছেড়ে ফেল দিদি। মুখ হাত পা ধুয়ে কিছু মুখে দাও। একটু গঙ্গাজল নিয়ে আসি বলে ক্ষেমদা বেরিয়ে গেল।

এদিকে মৃত্যুঞ্জয়কে পেয়ে ছুন্নির আনন্দ আর ধরেনা। দোতলার একটি ঘরে দাদাকে নিয়ে গিয়ে আবোল তাবোল বকে চলেছে।

এমন অনেক ছেলে মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় যাদের বুদ্ধি একটু দেরীতে পাকে। আমাদের ছুন্নিরও তাই। তেরোয় পা দিয়েছে লোকজনের সঙ্গে একটু সমিয়া করে কথা বলতে হয় তা পর্য্যন্ত তার জানা নেই। মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে। কথা কইতে কইতে কেমন যেন সে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে এ নিয়ে ক্ষেমদা তাকে উঠতে বসতে বকে, কত রকম উপদেশ দেয়। কিন্তু ছুন্নি সে সব কথা কানেও ধরে না। এত বকুনি খেয়েও সে একদিনের জন্যে হাসি এবং কথাবার্ত্তা বন্ধ করেনা।

ছুন্নি বলে: তুমি বুঝি এখানে থাকবে দাদা?

মৃত্যুঞ্জয় বলে: হাঁ। এখান থেকেই পড়াশোনা করবো।

থাকোনা, আমাদের কত ঘর পড়ে রয়েছে। রাতে সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়বে তোমার কাছে এসে গল্প শুনবো। কেউ টের পাবেনা। বেশ হবে না?—বলে ছুন্নি হেসে উঠে।

আমি তো গল্প জানিনা।

জানিনা বল্লে তোমাকে ছাড়বো না, দাদা। বই পড়ে পড়ে তোমায় গল্প শোনাতে হবে।

আচ্ছা।

(ক্রমশঃ)

চেতনমিতি

শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ল্যাবরেটারী ইনচার্জ্জ, রাধা ফিল্ম কোম্পানী

(সপ্তম সংখ্যার শেষাংশ)

হার্টার ও ড্রিফিল্ডের সময় হইতে আলোকচিত্রণ দ্রব্যাদির উৎপাদনেই চেতনমিতির সমধিক প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের আলোকচিত্রণ ফলক উৎপাদকেরা হার্টার ও ড্রিফিল্ডের প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে উৎপন্ন ফলকাদির চেতনাঙ্ক নিরূপণ করিতেন। তাঁহারাই পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুগে নানাপ্রকার আলোকচেতন মণ্ডের অনুশীলনে ঐ প্রণালীর প্রয়োগ করিয়াছেন। বিকাশকের (developer) গবেষণাতেও এই প্রণালীর যথেষ্ট ব্যবহার হইয়াছে, এবং ইহাতে বিকাশন পদ্ধতির প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে Eastman Kodak Companyর আলোকচিত্রণ দ্রব্যাদির নির্ম্মাণশালায় একটী গবেষণাগার স্থাপিত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যাদির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত নানাবিধ সমস্যার সমাধানই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। গত চব্বিশ বৎসর যাবৎ আলোকচিত্রণ বিজ্ঞানে এই প্রতিষ্ঠানের দান অতুলনীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ প্রথম আরম্ভ হয়; এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়। চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত প্রথম নাটক (The Great Train Robbery) যদিও আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু, ব্যবসায়ক্ষেত্রে উহাই চলচ্চিত্র বিজ্ঞানের প্রথম অবদান। প্রথম প্রথম, অর্থাৎ প্রায় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলচ্চিত্র উৎপাদনকার্য্যে চেতনমিতির প্রয়োগ হয় নাই বলিলেই চলে। অথচ, ঐ সময় আলোকচিত্রণমণ্ডের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, এবং পরকলা (lens) ও অন্যান্য উপকরণের পরিকল্পনায়ও প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এক কথায় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের কারুশিল্পের দিকটা সত্য সত্যই উন্নতির অতি উচ্চ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় ঐ সময় হইতেই সবাক্‌চিত্র উৎপাদন আরম্ভ হয়। দুইটী বৃহৎ উৎপাদক সঙ্ঘ সবাক্‌চিত্র ঐ সময় প্রস্তুত করিতেছিল। তন্মধ্যে এক সঙ্ঘ ফনোগ্রাফ যন্ত্রের অনুকরণে মোমের চাকার উপর শব্দলেখন (record) সম্পন্ন করিত, এবং অপর সঙ্ঘের শব্দলেখন হইত ফিল্মের উপর ঋণাত্মক চিত্রেরই পার্শ্বে। শব্দ-তরঙ্গ মাইক্রোফোন নামক যন্ত্রের সাহায্যে একটী বৈদ্যুতিক দীপের তড়িৎসঞ্চার পথে প্রবাহের (current) তারতম্য ঘটাইয়া উক্ত দীপের উজ্জ্বলতায় বৈষম্য সৃষ্টি করিত। ঋণাত্মক চিত্রের পার্শ্বে প্রতিফলিত এইরূপ দোলায়মান দীপ শিখার চিত্রই শব্দলেখ।

ইহা সত্য সত্যই অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয় যে, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যখন ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রথম সবাকচিত্র বাহির হয় তখনও চেতনমিতি শাস্ত্রে চলচ্চিত্রের দিক দিয়া বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ এই যে প্রথম প্রথম মোমের চাকার উপর শব্দলেখন সম্পন্ন হইত উপরন্তু, বিকাশন, মুদ্রণ এবং অন্যান্য কার্য্যে শিল্পকারগণ (technician) অনুমানের উপর নির্ভর করাই অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিত। এই অনুমানপ্রিয়তা এই দেশের শিল্পকার দিগের ভিতর আজিও প্রবল। কারণ এই বৈজ্ঞানিক যুগেও এদেশে অনেক চিত্রনির্ম্মাণশালায় শিল্পকারগণকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে দেখা যায়।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে হলিউডে চলচ্চিত্র যন্ত্রবিদ্ সমিতির যে সম্মেলন হয়, উহাতে সবাক্‌চিত্র উৎপাদনের মূলতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটী মৌলিক গবেষণা সম্বলিত প্রবন্ধের বিচার হয়। তন্মধ্যে যান্ত্রিক বিকাশন (machine development) সম্বন্ধে একটী মৌলিক রচনার আলোচনার সময়ে বিকাশন নিয়ন্ত্রণে চেতনমিতির প্রয়োগ সম্বন্ধে নানা তর্ক উপস্থিত হয়। এই সম্মেলনের পর হইতেই চলচ্চিত্রে চেতনমিতির প্রয়োগের সূচনা। বিভিন্ন অবস্থায় বিকাশনের ব্যবস্থাপনে (control) হার্টার ও ড্রিফিল্ড প্রবর্ত্তিত চেতনমিতির প্রয়োগ সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য-তথ্য সংগৃহীত হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে
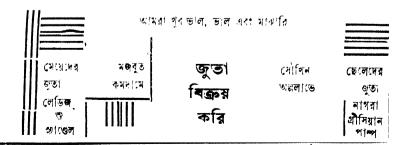
চলচ্চিত্র নির্ম্মানশালায় চেতনমিতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩০ সালের মধ্যেই ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক মুখরচিত্র নির্ম্মাণ-শালায় হার্টার ড্রিফিল্ড প্রণালীর প্রয়োগ আরম্ভ হয়।

ঋণাত্মক চিত্রের বিকাশনমাত্রা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ চিত্রে ব্যবহৃত ফিল্মের অনুরূপ এক টুকরা ফিল্মের চেতন-মিতির আলোক সংস্পর্শ করা হয়। পরে ইহা বিকাশনের সময় চিত্র কুণ্ডলীর সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে চিত্র এবং চেতনমিতির টুকরা একইভাবে বিকশিত হইতে পারে। বিকাশন প্রক্রিয়ার পরে উক্ত ফিল্ম টুকরা চিত্র হইতে খুলিয়া লওয়া হয়, এবং ইহার বিভিন্ন ঘনত্ব ঘনত্বমান যন্ত্রে নির্দ্ধারিত হয়। তৎপরে বিভিন্ন ক্রমের আলোক সংস্পর্শ ও ঘনত্ব বিন্দুপাত করিয়া ফিল্মের লক্ষণ-বক্র অঙ্কিত হয়। লক্ষণবক্র হইতে গামা পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়মানুসারে নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। উপরি-উক্ত উপায়ে বিকাশিত চিত্রের গামার হিসাব পাওয়া যায় মাত্র, অর্থাৎ চিত্র পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট গামায় বিকাশিত হইল কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জন্যই উপরিউক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রকৃত পক্ষে বিকাশনের পূর্ব্বে সময় নির্দ্দেশের নিমিত্ত একইভাবে আলোকস্পৃষ্ট কয়েকটী চেতনমিতির ফিল্ম টুকরা বিভিন্ন সময়ে বিকশিত করিয়া যথানিয়মে উহাদের গামা নিরূপণ করা হয়। তৎপরে বিভিন্ন সময় ও তদনুবর্ত্তী গামা বিন্দুপাত করিয়া একটী রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়। এই রেখাচিত্র হইতে যে কোন গামার উপযোগী বিকাশনের সময় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

হলিউডের বিভিন্ন প্রকরণাগারে যে যে গামায় ঋণাত্মক চিত্র বিকশিত হয় তাহাদের মধ্যমান (average) ০·৬৮। কোনও প্রকরণাগারে ০·৫৫ গামাতে চিত্র বিকাশন হয়। আবার কোথাও বা অধিকতর বৈসাদৃশ্যপূর্ণ (contrast) চিত্র প্রস্তুত হয় এবং গামামান ০·৮০এ রাখা হয়। ঋণাত্মক চিত্রের গামামানে এই প্রভেদ পরে ধনাত্মক বৈষম্যদ্বারা পুরিত হয়। বস্তুতঃ ঋণাত্মক গামা ও তদুপযোগী ধনাত্মক গামা এই উভয়ের সংযুক্ত প্রভাবেই চিত্রের শিল্পানুমোদিত গুণ নির্দ্ধারিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডের গামাসীমা বিভিন্ন। অবশ্য বিকাশকের প্রকারভেদে এই গামাসীমার কথঞ্চিৎ প্রভেদ হয় এবং সময়-গামা রেখা চিত্রের (time gamma curve) আকারেরও প্রভেদ হয়। ঋণাত্মক-মণ্ডের চেতনাঙ্ক সাধারণতঃ অধিক এবং উহার বৈষম্য (contrast) অপেক্ষাকৃত কম। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ঋণাত্মক মণ্ড অধুনাপ্রচলিত ঋণাত্মক বিকাশকে সাধারণতঃ ০·৬৫ গামাতে বিকশিত হয়। ধনাত্মক মণ্ডের চেতনবিশেষত্ব (sensitivity characteristic) সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। ইহার বৈষম্য সাধারণতঃ অধিক কিন্তু চেতনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম। ১·৮ হইতে ২·০০ গামার মধ্যে বিকশিত হইলেই ইহা প্রমাণ সীমার (normal range) মধ্যে থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সমস্ত প্রকরণাগারেই ঋণাত্মক চিত্র বিকাশনের নিমিত্ত সোহাগা-ঘটিত বিকাশকের ব্যবহার হয়। ইহার প্রচলনের পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রকরণাগারেই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশন সূত্রের ব্যবহার হইত। নিম্নলিখিত সূত্র আজকাল প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত, তবে যান্ত্রিক-বিকাশনের জন্য অপেক্ষাকৃত তীব্রতর বিকাশকের ব্যবহার হয়।

বিকাশন সূত্র

মিটল	—	১২০ গ্রেণ।
সোডিয়ম সালফাইট্‌	—	১৪ আউন্স।
হাইড্রো কুইনোন্‌	—	৩০০ গ্রেণ।
সোহাগা	—	১২০ গ্রেণ।
জল	—	১ গ্যালন।
বিকাশন-উত্তাপ	—	৬৫ ডিগ্রী ফাঃ।

উপরি-উক্ত বিকাশক সোহাগা-ঘটিত বিকাশক বলিয়া পরিচিত। যদিও সোহাগার নিজের কোনও বিকাশন-শক্তি নাই, সোডিয়ম কার্ব্বনেটের পরিবর্ত্তেই ইহার ব্যবহার। সোহাগা বিকাশকের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে ইহাতে সাধারণ বিকাশক অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ সোডিয়ম সালফাইট্‌ মিশ্রিত হয়। অত্যধিক পরিমাণ সোডিয়ম্‌ সালফাইটের গুণেই চিত্রের সুক্ষ্মকণা বজায় থাকে। মণ্ডের সিলভার ব্রোমাইড সালফাইটে দ্রবীভূত হয় এবং বিকাশিত চিত্রের উপর সুক্ষ্ম রৌপ্যকণা পরিন্যস্ত হইয়া এই সুক্ষ্মকণার সৃষ্টি করে। সোহাগা বিকাশকের বিভিন্ন উপাদান ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিলে অনুবর্ত্তী লক্ষণ-বক্রের আকারের বিশেষ কোনও প্রভেদ হয় না; কেবলমাত্র বিকম্পন বেগ পরিবর্ত্তিত হয়। ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত বিকাশকের সাহায্যে বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট অভীষ্ট গামা পাওয়া যাইতে পারে। হলিউডের বিভিন্ন প্রকরণাগারে বিভিন্ন সোহাগা ঘটিত বিকাশকে ৮।।০ হইতে ১২ মিনিটের মধ্যে ০·৬৮এর নিকটবর্ত্তী গামামান রক্ষিত হয়।

দৃশ্যপটে পরিক্ষিপ্ত চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে হইলে উহা আলোকচিত্রিত দৃশ্যের প্রতিরূপ হইলেই যথেষ্ট হইবে না। পরন্তু উহাতে শিল্পানুমোদিত একটী অতিরিক্ত গুণ থাকা দরকার, এবং এই উৎকর্ষই উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। সাধারণতঃ উজ্জ্বল চিত্র সকলের প্রিয়, এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ঋণাত্মক চিত্র ০·৬৫ গামাতে বিকশিত করিয়া মুদ্রিত ধনাত্মক চিত্র ১·৮০ হইতে ২·০০ গামাতে বিকশিত করিলে চিত্রের এই উৎকর্ষ পরিস্ফুটিত হয় এবং উহাতে এক চিত্তাকর্ষক ভাবের বিকাশ হয়। ফিল্মের উপর শব্দ লেখন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত বৈষম্যপূর্ণ চিত্র দৃশ্যপটে দেখা যাইত, এবং ধনাত্মক গামা এর নিম্নে কখনই রাখা হইত না। কিন্তু শব্দের আলোক চিত্রণের পর হইতে ঘটনাক্রমে ছায়াচিত্রের অনেক অবস্থান্তর ঘটিয়াছে; দৃশ্যপটে পরিক্ষিপ্ত চিত্রের বৈষম্য অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং অধিকতর কোমল চিত্র দেখা দিয়াছে। অবশ্য ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মণ্ডের প্রকার ভেদ ইহার অন্যতম কারণ; কিন্তু প্রধান কারণ হইয়াছে মৃদুনাভি পরকলা (soft focus lens) ও ব্যাপন চক্রের (diffusion disk) ব্যবহার। ফিল্মে চিত্রিত শব্দ লেখের পার্শ্বে এইরূপ বেঙ্গল চিত্র সন্তোষজনক হয় নাই। কারণ, সুস্পষ্ট শব্দলেখের সহিত এইরূপ চিত্র বেমানান দেখাইত। ইহার ফলে ব্যাপন চক্রের ব্যবহার অনেক কমিয়া যায়, এবং শব্দলেখের উপযোগী স্পষ্টতর এবং অধিকতর বৈষম্যপূর্ণ চিত্রের উপর উৎপাদকদিগের দৃষ্টি পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকল চিত্র নির্ম্মাণশালায় ধনাত্মক গামার সীমা ১·৮০ হইতে ২·০০ এর মধ্যে।

শব্দ লেখনেই চেতনমিতির প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, এবং মুখরচিত্র প্রস্তুত হইবার পর হইতেই এ শাস্ত্র যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এইচ এবং ডি বক্রের সরলাংশ নিম্নদিকে বর্দ্ধিত করিলে আলোক স্পর্শের অক্ষের সহিত যে কোণের উৎপত্তি হয়, সেই কোণের স্পর্শজ্যাকে গামা বলা হয়। ৪৫ ডিগ্রী কোণের স্পর্শজ্যা ১। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর কোণের স্পর্শজ্যা ১ হইতে অধিক এবং ন্যূনতর কোণের স্পর্শজ্যা ১ অপেক্ষা কম। ০·৬৫ গামা বলিলে সহজে বুঝা যায় যে এইচ এবং ডি রেখার সহিত আলোকস্পর্শ অক্ষের কোণের পরিমান ৪৫ ডিগ্রীর নিম্নে, এবং গামা ২·০০ এর নিকটবর্ত্তী হইলে উক্ত কোণের পরিমাণও ৪৫ ডিগ্রীর ঊর্দ্ধে হইবে। গামামান ১ এর সমান হইলে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট ঘনত্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে আলোকস্পর্শের পরিবর্ত্তন উহার

সমান হইবে, ১ এর কম গামা হইলে আলোকস্পর্শের পরিবর্ত্তন ঘনত্বপরিবর্ত্তন অপেক্ষা অধিক হইবে, এবং ১ এর অধিক গামা হইলে আলোকস্পর্শের পরিবর্ত্তন অনুবর্ত্তী ঘনত্বপরিবর্ত্তন অপেক্ষা কম হইবে। সুতরাং উপরি-উক্ত বিচার হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে গামামান ১ হইলে ঘনত্ব ও আলোক সংস্পর্শের অনুপাত ১ হইবে, এবং ঋণাত্মক শব্দ চিত্রের এই প্রকারই বিকাশনই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। এখন এই ঋণাত্মক চিত্র মুদ্রিত করিয়া যদি পুনরায় ১ গামামানে বিকশিত করা যায় তাহা হইলেই অবিকৃত শব্দতরঙ্গের পুনরুৎপাদন সম্ভব হয়। কিন্তু কেবলমাত্র শব্দচিত্র সম্পর্কেই উপরি-উক্ত ব্যবস্থা প্রযুজ্য হইতে পারে, কারণ ধনাত্মক শব্দলেখের সহিত একই ফিল্মে চিত্র মুদ্রিত থাকাতে উপরি-উক্ত বিকাশন-ব্যবস্থা চিত্রের পক্ষে যথেষ্ট হয় না। চিত্রের বাঞ্ছনীয় বৈষম্য বজায় রাখিতে হইলে ধনাত্মক গামা ১ অপেক্ষা অনেক বেশী রাখিতে হয়। ঋণাত্মক শব্দলেখের গামা ১ অপেক্ষা কম রাখিলে, ধনাত্মক চিত্রের গামা ১ অপেক্ষা অধিক রাখিতে পারা যায়, কারণ ঋণাত্মক ও ধনাত্মক গামার গুণফল ১ হইলেই বিজ্ঞানসম্মত শব্দলেখন সম্ভব হয়। ঋণাত্মক গামা ১ ধনাত্মক গামা ১ এর সহিত গুণ করিলে গুণফল ১ হয়। অতএব ঋণাত্মক-গামা ১ এর নিম্নে ০·৬৫এ রাখিলে ধনাত্মক গামার মান এতটা হওয়া দরকার যাহাতে গুণিত গামা ১ হয়। অর্থাৎ, ঋঃ গামা ০·৬৫ × ধঃ গামা "ক" = গুণিত গামা ১। সুতরাং ধঃ গামা "ক" = ১·৫৪। চিত্রের বৈষম্য ও অন্যান্য গুণ চিত্তাকর্ষক হইতে হইলে ধনাত্মক গামা ইহা অপেক্ষাও বাড়ান দরকার। শব্দলেখের ঋণাত্মক গামা আরও কমাইলে অথবা গুণিত গামা (overall gamma) আরও বাড়াইলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনকার্য্যে গুণিত গামা ১ এর উপরে রাখা হয় এবং শব্দলেখের ঋণাত্মক গামাও ০·৬৫ এর অনেক কম করা যায়। সাধারণতঃ শব্দলেখের ঋণাত্মক গামা ০·৫০, ধনাত্মক গামা ২·১৫ এবং গুণিত গামা (২·১৫×০·৫০) ১·০৭৫। চিত্রবিকাশনে ঋণাত্মক গামা ০·৬৫, ধনাত্মক গামা ২·১৫ এবং গুণিত গামা (২·১৫×০·৬৫) ১·৪। চিত্রের গুণিত গামা এত উর্দ্ধে রাখিবার কারণ এই যে পরিক্ষেপনে (projection) চিত্রের কতক পরিমাণে বৈষম্য হ্রাস হয়।

চলচ্চিত্র উৎপাদনকার্য্যে চেতনমিতির প্রয়োগ দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। আজিও এদেশে অনেকস্থানে শিল্পকারগণকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, ইহাতে যে কি কুফল ফলিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আজ প্রায় ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতার পরেও এদেশের কোনও একখানি চিত্র শিল্পানুমোদিত উৎকর্ষে বিদেশীয় চিত্রের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার (Academy of Motion Picture Art and Science) ভারতীয় উৎপাদকদিগের নিকট হলিউডে প্রদর্শনের জন্য একখানা ভারতীয় ফিল্ম চাহিয়াছেন। জাপান হইতেও তাঁহারা ঐরূপ ফিল্ম পাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এযাবৎ এখান হইতে কোন ফিল্ম পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। আজ বিজ্ঞানের জাগরণের দিনে বিজ্ঞানরচিত উপায়ে প্রস্তুত নিকৃষ্ট চিত্র বিজ্ঞানোন্মেষিত পাশ্চাত্য চক্ষুর নিকট ধরিতে কোন উৎপাদকই মনে মনে সাহস পাইতেছেন না। এইরূপ হীন অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন হইতেছে শিল্পকারদিগের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং সর্ব্বোপরি গবেষণার ব্যবস্থা। এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে Agfa Company কলিকাতার সেণ্ট্রাল এভিনিউতে ফিল্ম শিল্পবিভাগ সম্বন্ধে একটী গবেষণাকেন্দ্র খুলিতেছেন। বর্ত্তমান সময়োপযোগী চেতনমান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সজ্জা উক্ত প্রকরণাগারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আশা করা যাইতে পারে এই প্রতিষ্ঠান এদেশের চলচ্চিত্র উৎপাদন ব্যবসায়ের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে।

ঐশ্বর্য্য

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়

পিতার পরলোকান্তে ভোলানাথ চতুর্দ্দিক একেবারে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সেই অন্ধকারটা আরও নিবিড় নিশ্ছিদ্র হইয়া দেখা দিল তখন, যখন দিনু মল্লিক গোটা তিনচার মুলতুবি ডিক্রি জারীতে দিয়া স্থাবর অস্থাবর গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলেন। স্ত্রী সৌদামিনী কণ্ঠের বিষ সহস্র ধারায় উদ্গীরণ করিয়া কহিল—"পুরুষ মানুষ না তুমি? ঘেন্নাপিত্তি দেহে নাই নাকি? পাঁচ জনে দাঁত বার করে হাসছে, দেখতে পাওনা তুমি? আমি হলে গলায় দড়ি দিতাম আর না হয়ত সিঁদকাঠি নিয়ে পরের বাক্স ভেঙ্গে ঐ চামারের টাকা ফেলে দিতাম"। বলিয়া দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ভোলানাথ পাথরের মত হইয়া বসিয়া রহিল। এতটুকু হুঁ হাঁ পর্য্যন্ত করিল না।

সে দিন কতগুলি তৈজসপত্র ভোলানাথের ঘর হইতে টানিয়া আনিয়া ডিক্রির দায়ে নিলাম হইতেছিল। ভোলানাথ অদূরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ চক্ষে তাহাই দেখিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কহিল "আজ্ঞে, ও থালা তো দেবার যো নাই। আমার মা ঐ থালাতে ভাত খেতেন যে"। এই অসঙ্গত উক্তিতে সকলেই হাসিয়া উঠিল ভোলানাথ এই হাসি-ঠাট্টার ধার দিয়াও গেলনা। অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "খুড়ো মশাই ঐ পাথরের বগী থালা খানা আমায় দান করুন। আমার বিধবা মা ঐ থালাতে ভাত খেতেন।" বলিয়াই একটা উত্তরের অপেক্ষায় ঠিক দায়রার বিচারের খুনী আসামীর মত জজের রায় শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহার খুড়োর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মল্লিক কহিলেন, "বেশ তো! টাকাটা ফেলে দিয়ে সমস্তই ঘরে নিয়ে যাও। ওটা তোমার বিধবা মায়ের, এটা তোমার বুড়ো বাপের, এত কথার দরকার কি বাপু।" ওমেদ মোল্লার ডাক বেশী ছিল। সে পাথর খানা হাতে করিয়া উঠিয়া দাড়াইল। ভোলানাথ কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "শেষে মোছলমানই ভাত খাবে ঐ পাথরে!"

কে একজন কহিল, "আজ্ঞে না, ওমেদের পরিবার ঐ পাথরে হবিষ্যান্ন আহার কোরবে। মায়ের সখের জিনিষ ভাল জায়গাই পড়ল।" ভোলানাথের মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দুই হাতে চুলের মুঠো শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া দাওয়ায় উঠিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

সৌদামিনী আসিয়া প্রশ্ন করিয়া দাড়াইল "নিয়ে গেল ত! মায়ের ঐ শেষ চিহ্নটুকু!"

"ভোলানাথ কোন জবাবই করিলনা শুধু তাহার দুই রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সৌদামিনী অতি দুঃখে চেঁচাইয়া উঠিল। "বেশ"। ভোলানাথ ইহারও কোন প্রত্যুত্তর করিল না। শুধু একটা জঘন্য হিংস্র প্রবৃত্তির-ছাপ বারবার তাহার মুখের উপর প্রতিফলিত হইয়াই তন্মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। মা সরস্বতীর সঙ্গে তাহার কোন দিনই বনিবনাও হয় নাই। অতি শৈশবেই ভোলানাথ তাঁহাকে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করতঃ বিদায় করিয়াছিলেন। সুতরাং চাকরী বাকরী করিয়া একদিন এ অত্যাচারের জবাব দিবে, এ কথা সে কল্পনাও করিতে পারিলনা। যে বস্তু তাহার মাথায় ঢুকিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল, সে চিন্তা যেমন হীন তেমন জঘন্য। অতিবড় বর্ব্বরও ঐ পন্থা অবলম্বন করিতে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। তবে এজিনিষটা ভোলানাথের ধাতে শৈশবেই

বরদাস্ত হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং ভোলানাথকে বিশেষ কাহিল করিতে পারিলনা। ছেলেবেলায় সহপাঠীরা যখন টিফিনের ছুটীতে দোকান হইতে খাবার কিনিয়া খাইত, গরীব ভোলানাথের বুকখানা কান্নায় গলা পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিত। স্কুলের ধারে ছিল মা চণ্ডীর মন্দির। সেই মন্দির সংলগ্ন বাগানে ছিল ষষ্ঠির বটের গাছ। শনি মঙ্গলবারে কত যে মাথা কামান চুল, পোঁটলা বাঁধা ফুল, দুই চারিটা পয়সা ঐ বটবৃক্ষমূলে স্তূপাকার হইত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহাই ছিল ভোলানাথের মিঠাই খাইবার ধনভাণ্ডার। ছুটীর পর ছেলেরা যখন বাগানে ঢুকিয়া পেয়ারা, কাঁচা আমড়া ইত্যাদি ফল সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকিত, ভোলানাথ তখন অন্যের অলক্ষ্যে এই ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিত। আবার পাড়ার মেয়েদের দুইচার পয়সার চিনি ইত্যাদি মানত থাকিলেও সে সকল ভোলানাথ সংগ্রহ করিয়া আনিত এবং মা চণ্ডীকে ঐ দূর হইতেই সন্দেশটি প্রদর্শন করাইয়া গিলিয়া ফেলিত। কাঁচা বয়সের এই বিদ্যাই তাহার এই পরিণত বয়সের মাথার ভিতর নাড়া দিয়া ক্রমাগত তাহাকে ঠেলিতে লাগিল। ঠায় চার পাঁচ ঘণ্টা এক ভাবে কাটাইয়া, ভোলানাথ অকস্মাৎ স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, "চট্ করে ভাতে ভাত দুটো ফুটিয়ে দাও তো! আমি এই আটটার গাড়িতেই বেরুব।" সৌদামিনী মুহূর্ত্ত খানেক স্বামীর মুখের দিকে চোক চাহিয়া তাকাইয়া থাকিয়া কহিল "ও বিদ্যাতে চাকরী হয়না। মিথ্যে রেলের ভাড়াটাই শুধু ঘর থেকে যাবে" বলিয়াই চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিয়া গেল। ইহাতেও ভোলানাথ টলিল না। তাহার দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় মায় অস্থি মজ্জা মেদ এমন কি প্রতি শোণিত বিন্দু হইতে যেন সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"টাকা চাই, টাকা চাই—চাই টাকা"

[২]

বহু গবেষণা এবং বিস্তর চিন্তার ফলেই বোধকরি ভোলানাথ তাহার অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রটিকে স্থির করিয়াছিল। স্থানটি পশ্চিম বঙ্গ নয়, পূর্ব্ববঙ্গেও নয়, একেবারে উত্তর বঙ্গের রাজপুত জেলায়। এবং সেও আবার সহরের উপর নহে অজ পাড়া গ্রামেই, যেখানে মানুষ মানুষকে আজও সহানুভূতি করে; দুঃখের সমবেদনা জানায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার অলঙ্কার অবিশ্বাস আজও যেখানে মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে নাই; বাঙ্গলার সেই নিভৃত প্রদেশে।

এখানে পৌঁছিয়াই ভোলানাথ আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিলনা। অবিলম্বে গলায় কাছা ঝুলাইয়া দিল এবং ধূলা বালি মাখিয়া মাথাটাকে ডাব মত করিয়া ফেলিল। পিতৃদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের করুণ মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া অনেকেই নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সকল

বস্তু তাঁহারা এই পিতৃমাতৃভক্ত মহাপুরুষের থলিতে আনিয়া গুঁজিয়া দিতে লাগিল, তাহাতে এই ভদ্রলোকটীর এত চেষ্টার শোকটাকেও অনেক খানি ফিকা করিয়া দিল। চোখ-মুখে আনন্দ যেন উথলিয়া উঠিতে থাকে, ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, এমনই অবস্থা। এদিকে অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর মায়ামমতার পরিমানটীও বাড়িয়া গেল। 'হবিষ্যান্ন আর গলা দিয়া গলেনা এমনই অবস্থা। বিরক্ত হইয়া ভোলানাথ বাপ মাকে রেহাই দিলেন। তখন দেখা গেল পিতা মাতার উপর যে পরিমাণ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল মা শীতলার উপর তার চেয়ে চতুর্গুণ বেশী। মা পুর্ব্বে ছিলেন এক সাধুবাবার অস্থাবর সম্পত্তি। বাবা চড়া দাম পাইয়া এই দেড়পো ওজনের পিতলের মা ঠাকুরণকে ৮॥৵০ মুল্যে হস্তান্তর করেন। মা এতদিন গোপনে ভোলানাথের ঝোলাতে বাস করিতে ছিলেন এখন তেল সিন্দুর পড়িয়া মাথায় চড়িয়া বসিলেন। ভক্ত মাকে মাথায় করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। শ্রীমন্দির গঠনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতে লাগিলেন। ভক্তটি যেথানে শেষ আস্তানা ফেলিলেন, সে গ্রামে তো বটেই. ধারে কাছের বিশ পঁচিশ খানা গ্রামেও মায়ের অনুগ্রহ প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল। মাতৃপদাশ্রিত সাধু ভোলানাথ আর এক পাও নড়িলেন না। এখানেই স্থায়ী ভাবে ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া গেলেন। আর তাহার ফল হইল এই যে, ষোড়শোপচারে ভোগ, রীতিমত সদক্ষিণা পূজা এবং প্রণামীর ব্যবস্থায় পিতৃদায় পর্য্যন্ত হার মানিয়া গেল। গ্রামের জমিদার সাহা বাবুরা। সাধুর ছিল অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। জমিদারের একমাত্র পুত্রের হইল মায়ের অনুগ্রহ। এরপর জমিদার বাড়ীর লোকের ছুটাছুটীর আর অন্ত রহিল না। সাধুও তেমনি অনড়. কোনমতে গৃহীর আশ্রয়ে যাইতে তিনি স্বীকৃত নহেন। শেষ পর্য্যন্ত জমিদার জননী স্বয়ং আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। কহিলেন "বাবা আমার ঠাকুর বাড়ীতে তো স্থান হ'তে পারে।" বাবা নড়িয়া চড়িয়া অনেক ভাবিয়া কহিলেন 'আচ্ছা চল', আমি বলছি ছেলে তোর আমি বাঁচাবই, কিন্তু গ্রহ-শান্তি পরে করতে হবে।

ঠাকুর বাড়ীতে পা দিয়াই ভোলানাথ অবাক হইয়া গেল। জমিদার হিসাবে সাহারা প্রসিদ্ধ না হইলেও, তামাকের কারবারে ইহারা, লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর। বিগ্রহদের মণিমুক্তা খচিত মহার্ঘ অলঙ্কার ইত্যাদি দেখিয়া সাধুর বিস্ময়ে একেবারে তাক লাগিয়া গেল। এখানে বসিয়াই সাধুবাবা ঘটা করিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। সে কি পূজার ধুম। দেখিয়া দেখিয়া স্বয়ং বাবুকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইল "লোকটা যথার্থ সাধক ব্যক্তি. মায়ের উপর সাধুটীর অধিকার আছে।" কথাটীর সত্যতাও প্রমাণ হইয়া গেল। অতি অল্পদিনেই মা জমিদার পুত্রকে নিরাময় করিয়া দিলেন। তখন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভক্তি শ্রদ্ধায় বাবার চরণে লুটাইয়া পড়িল।

বাবা কিন্তু কোনরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। লোকে পীড়াপীড়ি করিলে কহিতেন "সবই ঐ মহামায়ার ইচ্ছে"। আমি তো চরণাশ্রিত ভৃত্য মাত্র। মেয়েরা পূর্ব্বেই ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বাবার এই উক্তি শুনিয়া জমিদার নিজেও গলিয়া জল হইয়া গেলেন। ইহার পর বাবাকে আর ছাড়িয়া দেওয়া হইল না। গ্রহশান্তি ইত্যাদির জন্য মাস তিনেকের মত, হাতে-পায়ে ধরিয়া রাজি করান হইল। সেদিন ঠাকুর বাবা নিরালয় বসিয়া ঠাকুর বাড়ীর পুরাতন খাতা পত্র ঘাটিতেছিলেন। অকস্মাৎ বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেলেন। দেখিলেন বিগ্রহদের অঙ্গে যে সমুদয় অলঙ্কার রহিয়াছে সে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ভোলানাথ নিজের চোখ দুটীকে পর্য্যাপ্ত বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মণি মাণিক্য খচিত অমূল্য অলঙ্কার রকম বিরকমের মোহর সোনা দানা কত কিই যে পুরুষানুক্রমে বিগ্রহদের নামে জমা হইয়া এই খাতা খানিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অদূরস্থিত ঐ সিন্দুক দুইটীর দিকে তাকাইয়া ভোলানাথের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হইয়া গেল এবং দুইকানের ভিতর দিয়া আগুন যেন

ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তারপর সে আর স্থির হইয়া বসিতে পারিলনা। উন্মাদ যেমন বন্ধ ঘরে আটক থাকিয়া ঘরময় উদ্দেশ্য-বিহীন ছুটাছুটি করিতে থাকে, এই সাধুটিও তেমনি করিয়া ক্ষিপ্তের মত পায়চারী করিতে লাগিল। একবার ভাবিতেও পারিলনা যে সয়তান তাহার চুলের মুঠো ধরিয়া কোথায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে।

পনরটী দিনও অতিবাহিত হইতে পারিল। আজ অতি প্রত্যুষে জমিদার বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সাধুবাবা নাই, সিন্দুকের অলঙ্কার ইত্যাদি কিছুই নাই, এমন কি দেব-মূর্ত্তিগুলি উলঙ্গ শ্রীহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

জমিদার পুলিশে খবর দিতে যাইতেছিলেন। মা আসিয়া হাত ধরিয়া কহিলেন, "নরেন, যে লোক যমের হাত থেকে আমার ছেলে কেড়ে এনে বুকে তুলে দিয়েছে তাকে আমি শাস্তি দিতে দেবনা।" নরেন্দ্র কহিল, "কিন্তু মা দেবতার উপর অত্যাচার :—"

মা ধীরে ধীরে পুত্রের মস্তকে হস্তার্পন করিয়া কহিলেন, "তুই দুঃখ করিস-নে-রে নরেন। দেবতার ধন কেউ ভোগ করতে পারেনা। ওঁদের জিনিষ ওঁরাই ফিরিয়ে নেবেন" বলিয়া খোকাকে পুত্রের কোলে দিয়া হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন।

৩

হৃদয়ের যত কিছু সার সম্পদ সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া যে ঐশ্বর্য্যকে মাথায় করিয়া ভোলানাথ ঘরে ফিরিয়া আসিল, সেই ধনরত্নই আজ তাহাকে আত্মীয় পরিজন এমন কি সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিলে তিলে দগ্ধ করিতে লাগিল। পুরাতন পাকা বাড়ীটা মেরামত করিয়া বসবাসের উপযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভোলানাথকে কোনমতেই বাস করিতে রাজি করান গেল না। ওপাশের সেই মেটে ঘরটার মাটীর মেঝেতেই পড়িয়া সে দিন কাটাইতে লাগিল। সেদিন ভোলানাথ একটুখানি বাহিরে গিয়াছিল। বড় মেয়ে ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"মা দেখ একবার বাবার বিছানার শ্রী। বলিয়া হাত দিয়া কহিল, "বর্ষাকালের মাটি, বিছানা মাদুর ভিজে যেন সপ সপ করছে?—রদ্দুরে দেব।" মা রান্নাঘরে যাইতেছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া নাক সিঁটকাইয়া কহিলেন, "ওর উপর থাকে কেমন করে!" বলিয়াই শয্যাটি কেবল সরাইয়াছে কিনা—ভোলানাথ অমনি মার মার শব্দে আসিয়া বিছানার উপর ধুপ করিয়া বসিয়া কহিল—বেরো ঘর থেকে নইলে কিন্তু খুন করব, তা বলে দিচ্ছি।

মেয়ে মেঝের দিকে তাকাইয়া কহিল,—"এ জায়গাটা খুড়ল আবার কে?"

ভোলানাথের মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। মা কহিল,—"ওমা সে আবার কি?" ভোলানাথ কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, "ওরে তোদের পায়ে পড়ছি যা তোরা এখান থেকে" বলিয়াই নিজের গলাটা সাঁড়াশীর মত দশ আঙ্গুলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"যাবি নে! আচ্ছা দেখ তোর মরা বাপের মুখ।" বলিয়াই এমন করিয়া চাপিয়া ধরিল যে চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসে এমনিই অবস্থা। ভয় পাইয়া মাতাপুত্রী সরিয়া গেল। ভোলানাথ চক্ষের নিমিষে খিল বন্ধ করিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিনে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত তাহাকে স্পর্শ করান গেল না।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিবার পর সৌদামিনী দেখিল স্বামীর ঘরে সেই গভীর রাত্রেও প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটা অব্যক্ত করুণ আর্ত্তনাদ, রহিয়া রহিয়া, অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে। সৌদামিনী পা টিপিয়া আসিয়া দেখিল, স্বামী প্রকাণ্ড কলসীর মত কি একটা বস্তু বুকে করিয়া কাঁদিতেছে। সৌদামিনী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল এখনও ঘুমাওনি যে। অকস্মাৎ মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুতিগোচর হইবামাত্র ভোলানাথ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সম্মুখের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল, 'কে'?

সৌদামিনী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া আকুল হইয়া কহিল, "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বল না কেন এমন করচ।" ভোলানাথ এতক্ষণে চিনিতে পারিল। কহিল "ঘুমাতে দেয় না যে" বলিয়াই নিতান্ত বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। সৌদামিনী কহিল,—"দোরটা খোল আমি বাতাস করছি, এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে।" মুহূর্ত্তে ভোলানাথের চক্ষের জল বাষ্প হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল। প্রদীপ্ত দুই চোখ দিয়া আগুন জ্বালাইয়া কহিল—"ঘরে আসবে", কোথায় কি আছে একবার খোঁজ নেওয়া চাই, না?" বলিয়াই ও-কোণস্থিত রামদা'খানা দেখাইয়া কহিল, ঐ দেখছিস কুটি কুটি করে কেটে ওই মধুমতীতে বিসর্জ্জন দিয়ে আসব তোকে!—হা-রা-ম………" বলিয়াই ফুঁ দিয়া আলো নিভাইয়া, চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সৌদামিনী আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

পরদিন হইতে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল সে ভোলানাথ আর নেই। সহজ ভাবেই সকলেরই সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল,—"সুরেন আসছে, জেলেদের বলে রাখ একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা তো চাই।" সৌদামিনী হাসিয়া কহিল, "জামাই তো লেখেন ঐ রকম; আবার শেষ পর্য্যন্ত ছুটীও পায় না। আসুক তো! তখন না হয় দেখা যাবে।" পাড়ার বন্ধুরা আসিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিল। যে একটু অশুভ মেঘ পূর্ব্বে দেখা দিয়াছিল, সেটুকু কাটিয়া গেল। সৌদামিনী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

পাঁচ সাত দিন বাদে, জামাতা তাহার এক বন্ধুসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বন্ধু আছেন অপরিচিত ভদ্রলোক, শুনিবামাত্র ভোলানাথ ঘরে ঢুকিয়া সেই যে লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিল, আর মুখ পর্য্যন্ত বাহির করিল না। জামাতা আসিয়া অনেক ডাকাডাকি ,অনুনয় বিনয় করিল। ভোলানাথ দরজা পর্য্যন্ত খুলিল না। লেপের ভিতর হইতে জবাব করিল,' "উঠবার যে শক্তি নেই আমার।"

সৌদামিনী আসিয়া কহিল, "ওগো! জামাইর সঙ্গে না হয় দেখা না করলে, কিন্তু ঐ একজন নূতন ভদ্রলোক এসেছে, ও লোকটী কি মনে করবে বলত!" ভোলানাথ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া কহিল—"ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এই বারটি আমায় বাঁচাও! বলিয়াই পাগলের মত অপলক চক্ষে চাহিয়া রহিল। সৌদামিনী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া নীরবে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল।

৪

ভোলানাথের বাড়ীর সম্মুখেই চাটুয্যেদের বিঘা পাঁচ ছয় জমী লইয়া প্রকাণ্ড একটা বাগান। এই বাগানেরই একান্তে, গড়াই নদীর তীরে, বহুকালের পুরাতন জীর্ণ একটা মন্দির। আজও কোনমতে সেটি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বোধকরি এই বাগানখানি একদিন এই মন্দির সংলগ্ন উদ্যানই ছিল। এখন কালক্রমে সে শিবলিঙ্গ দুভাগ হইয়া দুই কোণে পড়িয়া আছে। আর মন্দির সংলগ্ন উদ্যান, আজ নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া, হিংস্র জন্তুর আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সাপখোপের ভয়ে, মন্দিরে তো দূরের কথা, ইহার ত্রিসীমানায় কেহ কখন পা দেয় না। ভোলানাথ এই মন্দিরে আসিয়া আশ্রয় লইল। দিবারাত্রি, প্রায় সর্ব্বক্ষণ এইখানেই ভোলানাথের কাটিয়া যায়। সৌদামিনী অনেক কান্নাকাটি করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভোলানাথ কহিল, "আমাকে যদি বাঁচাতে চাও খবরদার চেঁচামেচি কোরো না।" সৌদামিনী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া ভয়ে একেবারে পাথর হইয়া গেল।

শ্রাবণের আকাশ। আজ সকাল হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। অপরাহ্নে সেই আকাশের চেহারা যেন এক নিমিষে একেবারে বদলাইয়া গেল। উন্মত্ত ঝড় জল ছুটিয়া আসিয়া, এমন করিয়া মাতামাতি আরম্ভ করিয়া দিল যে, সমস্ত পৃথিবীটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লণ্ডভণ্ড না করিয়া ইহারা আর শান্তি হইবে না। সন্ধ্যার অন্ধকার যত গাঢ় হইতে লাগিল উন্মত্ত প্রকৃতির দাপাদাপিও ততই বাড়িয়া উঠিল। আকাশ-ভরা বিদ্যুৎ নভমণ্ডলকে চিরিয়া চিরিয়া খান খান করিতে লাগিল। মড় মড় শব্দে ঘর পড়িল, চড় চড় করিয়া ডাল ভাঙ্গিতে লাগিল, গাছ পড়িতে লাগিল;—অদূরস্থিত শ্রাবণের ভরা গাঙ্গে, প্রলয় গর্জ্জনে আছড়াইয়া পড়িয়া, দুই কুলকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লণ্ডভণ্ড করিতে করিতে, নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। প্রকৃতির এত বড় তাণ্ডব নৃত্য বুঝি আর কখন কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই। এই দুর্য্যোগেও স্বামী ঐ জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। সৌদামিনী অচেতনের ন্যায় চোখ মেলিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতেছিল। পরাণ সর্দ্দার নৌকা সামলাইতে ঘাটে গিয়াছিল। সোজা পথে বাড়ীর উপর দিয়া ফিরিবার মুখে সৌদামিনীকে দেখিয়া কহিল, মাঠান্ দেখছ কি, আজ কিছু থাকবে না। এতকালের মন্দির সেও আজ যাবে। আধখানা বাগান একেবারে চড় চড় করতে লেগেছে। সে চলিয়া গেল। সৌদামিনী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াই, ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল—বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া,' পড়ি' মরি করিয়া, সে যখন মন্দিরের প্রায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ সমস্ত দিগ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সশব্দে বজ্রপাত হইল। এবং ঐ কোণের নারিকেল গাছটী সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারই আলোকে সৌদামিনী দেখিল কত কি মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কার, রাশি রাশি সুবর্ণ মুদ্রা চারিধারে ছড়ান রহিয়াছে—আর ইহারই ভিতর প্রকাণ্ড এক কলসী মাথায় করিয়া যক্ষের মত পাহারায় আছে তাহারই স্বামী। পলকের জন্য এই দৃশ্য সৌদামিনীর চোখে পড়িল। ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, শীগ্গির বেরিয়ে এসো।"

ভোলানাথ যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। কহিল, "যেতে ত চাই, ছাড়ে না যে।"

সৌদামিনী কলসীটাকে স্বামীর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া মন্দির মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া কহিল এইবার এস। ভোলানাথ ইতস্ততঃ করিতেছিল। সৌদামিনী স্বামীকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার সময় কহিল, "ও ঐশ্বর্য্য। ও বস্তু ভোগের নয়, ত্যাগের।" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঐ অতবড় মন্দিরটা যেন দুই বাহু বিস্তার করিয়া গড়াইয়ের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ভোলানাথ চঞ্চল হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেছিল। সৌদামিনী স্বামীকে জোর করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া কহিল "ছি ও দেখতে নাই।"

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

চার্লি ও পলেট

সেদিন ৫ই ফেব্রুয়ারী চার্লি চ্যাপলিনের ছবি নিউ ইয়র্কে মুক্তিলাভ করেছে। যে ছবি দেখবার জন্যে দু দুটো বছর ধরে সারা জগত উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে ছিলো সেই 'মডার্ণ টাইমস' এতদিন পরে লোকের চোখে ধরা দিয়েছে।

দলে দলে লোক আসছে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যবক্তার চার্লি চ্যাপলিনকে দেখতে; দেখে যাচ্ছে তার প্রিয়তমাকেও, অদ্ভুত সে।

ব্রডওয়ে লোক চলাচল বন্ধ করতে হয়েছে—এত ভিড়। তবু একশরও বেশী পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে শো হাউসের কাছে—পাচ্ছে না তারা আয়ত্বে আনতে।

শত শত মেয়ে—মিলের মেয়েই বেশী আসছে, ফিরতে হচ্ছে পুলিশের ধাক্কায়।

নিউ ইয়র্কের পথে পথে দল করে ভিড় জমেছে—লাঠির গুঁতোয় ভেঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে চারিদিকে, লোক এসেছে ইংল্যাণ্ড, ক্যানাডা, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা। আরো কত কত দেশ।

হলিউড থেকে এসেছে ইভিলিন লে, এডি ক্যান্টর, জিনজার রজার্স আর কত লর্ড লেডি এসেছে তার ইয়ত্তা নেই।

যাকে দেখতে—সে তার দুবছরের অক্লান্ত পরিশ্রম আর চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড-এর একটা বিরাট জিনিষ ফেলে প্রিয়তম পলেট গডার্ডকে নিয়ে জগতের কোন কোণে গিয়ে লুকিয়ে গেছে কেউ জানেনা।

জমকালো ছবি

নাচ আর গান। বড় বড় সেটের ওপর লুটিয়ে পড়বে অর্দ্ধনগ্ন তরুণীরা। তাদের নাচের তালে প্রেক্ষাগৃহের চোখের ওপর ফুটবে নানান ফুল। কামনার উৎস, কামনার ফোয়ারা—রাঙা রাঙা রাঙা করে ফেলবে। হোলির আবির উড়বে; ফুলের রেণু ঝড়বে প্রজাপতির পা থেকে,—মৌমাছির হুল থেকে। —চমকে দেবে সবারে, সতেজ আর সবেগ গতিতে। হাজারে হাজারে ছুটবে ছবি। কাতারে কাতারে মেয়ে নাচবে, পড়বে, উঠবে,—লুটবে, ফুটবে, চুমবে।

লাফান, ঝাঁপান আর ডিগবাজী খেতে ওস্তাদ তারা এমনি কত লোক। এরোপ্লেন আর প্যারাসুট, ট্রেণ আর ট্রাম, গাড়ী আর মোটর—ছুটছে তারা এপার হতে ওপার। তাদের নিয়ে চলেছে ছিনিমিনি খেলা।

হাসছে আর হাসাচ্ছে একজন। কে?—সে কে?—এডি, এডি, এডি ক্যান্টর।

স্যামুয়েল গোল্ডউইন দলের মেয়েরা চুমু খাচ্ছে—জড়িয়ে ধরে সুধা পান কচ্ছে এডি ক্যান্টরকে 'ষ্ট্রাইক এমি পিঙ্ক' ছবিতে। এ খবর ত আগেই দিয়েছি। নরম্যান টুর‍্যাগ হাঁপিয়ে পড়েছে যে। আহা কত কাজ করবে সে! তিন তিনটে ইউনিটে কাজ করছে একই ছবিতে। এমন তো হয়নি আর কখনও ওদেশে।

এখানে যদি নাচ চললো দেড়শো মেয়েকে নিয়ে—ওখানে তখন গাইলে গান এথেল মারম্যান—পেছনে তখন দেখবো যে মস্ত বড় পার্ক, ওই প্রকাণ্ড সেটের ওপর এডি আর জ্যাক লা রিউর খেলা—এড়িয়ে যদি যাও, দেখবে ওপাশে রেলগাড়ী চলেছে—ছবির রেলগাড়ী—এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিকে; কি ছুটেই তারা চলেছে। ছবির গতি যে ওদের হাতে।

আর চাও ষ্টাণ্ট। বুকের স্পন্দন বুঝি থেমে যাবে। তালে তালে তারা পড়বে আর উঠবে, ওই লাফান ঝাঁপানর সঙ্গে সঙ্গেই। এ গল্পও করেছি।

আহা বেচারা ওই সব করতে গিয়েই তো গেলো। শুধু পুরোণো নয় অভিনয় করত ও চমৎকার, মলো সে; ছবির মাঝামাঝি সময়ে। নাম তার স্যাম হার্ডি। আর এক জনও আঙুল উড়িয়েছে। দুর্ভাগ্য ওর; ওই ওপরের জ্যাক লা রিউর।

বিদায় ডেম্পসি!

জ্যাক ডেম্পসির নাম কে না জানে। শুধু চিত্রামোদীদের কাছে নয়, ক্রীড়া জগতেও। তাঁর নাম লোকেদের অনেকদিন মনে থাকবে। ডেম্পসিকে দেখা যেতো নির্ব্বাক যুগে। তখন তিনিও একজন ষ্টাণ্টের ওস্তাদ, ছবির হিরো। সে সবদিন ঘুচে গেলো, মুছে গেলো সবাকের দিন আসাতে।

তারপর হলেন ব্যবসাদার—আর নিলেন হলিউডে ছোটো খাটো চাকরী। এ ছাড়াও আর একটা কাজ ছিলো তা হচ্ছে ছোটো মুষ্টিযোদ্ধাদের শেখান; শেষের এটা ছিলো সখের। জানেন ত জ্যাক ডেম্পসি এক সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন।

সব ছেড়ে দিয়েছেন—হলিউডের চাকরী, লস এঞ্জেলসের ব্যবসা, বারবারা হোটেল—সব। এবার চললেন দেশে। এতদিন যে বাড়ী জ্যাক আর এসটিলি টেলরের হলিউডের কত অভ্যাগতের কাঁটা চামচের ঠুং ঠাং আওয়াজে মুখরিত হয়ে যেতো। সে বাড়ী খানা ডেম্পসি মিস টেলরকে দিয়ে দিয়েছে।

বন্ধুর দরাজ বুকের কথা হলিউডের অনেকদিন মনে থাকবে।

ফ্রেডি বারথোলোমিউ

অদ্ভুত বুদ্ধি নিয়ে জন্মেচে এই ফ্রেডি। ১১ বছরের ছেলে সে এরই মধ্যে তার বুদ্ধির

ফ্রেডি বারথোলোমিউ

তারিফ না করে থাকতে পারবে না কেউ।

মিস মিল্লিক্যান্ট মেরি বারথোলোমিউ হচ্ছে ফ্রেডির মাসী কি পিসি; আসলে তিনিই হচ্ছেন ফ্রেডির অভিভাবক।

সে যাক। সেদিন কোর্টেতে যখন জিগেস করলে 'ও কি দিব্যি গালার অর্থ জানে।' ফ্রেডি বলেছিলো 'হ্যাঁ'। এ্যাটর্নি বোধহয় তাতে সন্তুষ্ট হননি তাই বল্লেন 'জানো যে ছেলেরা মিথ্যে বলে তাদের কি হয়।'

ফ্রেডি উত্তর দিলে—বোধ হয় নরকে যায়।

হলিউডে ফুটবল

হলিউডে ফুটবল খেলা বেশ জমে উঠেছে। আজকাল ওরা খেলচে এমনি সখ করে নয়, পয়সা নিয়ে বা পয়সা দিয়ে। এর জন্যে আগে যত লোককে খেলতে দেখা যেতো তার চেয়ে ঢের বেশী লোককে আজকাল দেখা যায়। শুধু বড়রাই খেলে না, ছোটরাও খেলচে। রবিবার বিকেলে বড়দের খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে ছোটদের খেলা হয় আরম্ভ। এই ছোট একটা দলের ক্যাপ্টেন মিকে রুনে। মনে আছে যে ছেলেটি 'এ মিড্ সামার নাইটস্ ড্রিমে' খুব চমৎকার অভিনয় করে। পরিচালক ক্ল্যারেন্স ব্রাউন এর মস্ত বড় পৃষ্ঠপোষক। ক্লাবদের অর্থ দিতে এবং পরামর্শ দিতে তাঁর মত আর কেউ নেই। 'হাফ ব্যাক অব নোটার ডেম'এর ষ্টার নিক লুক্যাটস এই ছেলেদের খেলা শেখান।

খুচরো খবর

রবার্ট মণ্টোগোমারী পাইপ খেতে ভয়ানক ভালবাসে এবং সেইটেই তার প্রিয়।

* * *

জেমস কগনে আর প্যাট ও'ব্রায়েন এর সঙ্গে ষ্টেজে থাকতে ভয়ানক ভাব ছিলো।

* * *

ডন ব্রিগস আর জিন রোজার্স 'গ্র্যান্ড ম্যারিওয়েল' নামে একখানা সিরিয়াল ছবিতে কাজ কচ্ছে।

* * *

সাইমন সিমন ডুখান ছবি যা তার মনের মত নয়, তাতে নামল না।

* * *

মায় ওয়েষ্টের ছবি 'ব্লণ্ড লাইক লু' ছবিখানা নাবালকদের জন্যে নয়। বুঝতেই পাচ্ছেন কেন নয়?

রেণুকা ঘোষ ছবিতে এই প্রথম নামছেন। ইনি শিক্ষিতা ও ভদ্রবংশ-সম্ভূতা। বাংলা চিত্র-শিল্পের উন্নতির জন্যে যে ক'টি মেয়ে সাহস কোরে এ পথে নেমেছেন রেণুকা তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। পপুলার পিকচার্সের "আবর্ত্তনে" এঁকে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ ৯, রামময় রোড, কলিকাতা | টেলিফোন পার্ক ৩৩৪

ষষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২১শে ফাল্গুন, ১৩৪২, ৫ই মার্চ ১৯৩৬

কর্পোরেশন নির্ব্বাচন

জাতীয় সংহতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনরূপ ধারণা আছে, জাতির উন্নতি ও কল্যাণ সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন দরদ আছে, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, ভারতের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। অতএব রাজনৈতিক জীবনে নিজেকে দেশসেবক বলিয়া অভিহিত করিতে হইলে, প্রথমে হইতে হইবে কংগ্রেসের সেবক। স্বর্গীয় স্যার আশুতোষের ভাষা একটু ঘুরাইয়া বলিতে হয়—Congressman first, Congressman second, Congressman always ইহাই প্রত্যেক দেশ-সেবকের জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক।

আমরা দেখিয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, এবারের আসন্ন কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে কলিকাতার কয়েকজন দেশসেবক ও জনসেবক কংগ্রেসের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠাই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমেই উল্লেখ-যোগ্য আট নম্বর ওয়ার্ডে কবিরাজ সত্যব্রত সেনের কথা। জেলা কংগ্রেস কমিটী হইতে মনোনীত হইলেও কংগ্রেস ইলেক্শন বোর্ড তাঁহাকে মনোনীত করেন নাই। গত নির্ব্বাচনে তিনি তাঁহার ওয়ার্ড হইতে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক ১৪৭০ ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এরূপ জনপ্রিয় প্রতিনিধি যে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি কর্পোরেশনের চেয়ে কংগ্রেসকেই বড় মনে করেন। তিন নম্বর ওয়ার্ডে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষও এইরূপ অভিনন্দনযোগ্য। প্রথমে ইলেকশন বোর্ড শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরীকে মনোনীত করেন। কিন্তু নির্ব্বাচন বোর্ড পুনর্বিবেচনা করিয়া ইহাদের পরিবর্ত্তে ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত ও ডাঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষকে মনোনয়ন করিয়াছেন। সতীশবাবুর জনপ্রিয়তা, যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তি অবিসংবাদী। সেইজন্যই কংগ্রেস "প্রেষ্টিজ"কে কলঙ্কিত না করিয়া নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে নিজেকে এই-ভাবে অপসারিত করার জন্য তিনি সবিশেষ প্রশংসনীয়।

পুরাতন কংগ্রেসসেবীদের নিকট আমরা ইহাই আশা করিয়া থাকি। অতএব সমস্ত ওয়ার্ডেই এইরূপ আত্মত্যাগ দেখিতে পাইলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। ১২ নম্বর ওয়ার্ডেই পুরাতন কংগ্রেসকর্ম্মী এবং দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় কংগ্রেস মনোনয়ন না পাইয়া স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইয়াছেন। এইরূপ কার্য্য দেশের একশ্রেণীর কংগ্রেসকর্ম্মীর মনোভাবের কি ঘোর অধঃপতন হইয়াছে তাহাই সূচিত করে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষও এই শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ বিস্মিত হই নাই—ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তবে ভূপেনবাবুর এইরূপ পরিণতি একান্ত পীড়াদায়ক।

২২নং ওয়ার্ডে কংগ্রেসপ্রার্থী হইয়াছেন তরুণ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রের বিরাট পুরুষ স্বর্গীয় দেশবন্ধুর অন্যতম কার্য্যপদ্ধতিই ছিল বাহির হইতে ঘরের দিকে লোকের মুখ ফিরাইবার চেষ্টা এবং এরূপ কর্ম্মী পাইলে তিনি সাগ্রহে আবাহন করিয়া লইতেন। তদ্ভিন্ন কংগ্রেসের ধমনীতে তাজা রক্ত প্রবাহিত করা কংগ্রেসনেতৃবৃন্দের অন্যতম কর্ত্তব্য। সেইজন্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের মনোনয়ন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মল্লিকের পিতার চারিত্রিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদি লইয়া করদাতাদের মধ্যে যে আলোচনা উঠিয়াছে তাহার অতীব অশোভন। তাঁহার পিতা কিভাবে আচারাদি পালন করেন তাহা লইয়া পুত্রকে দায়ী বা বিদ্রূপ করা নিতান্ত অন্যায় ও কুরুচির পরিচায়ক। ঈশপের জল ঘোলার গল্পের ন্যায় ব্যাপার নেকড়ে বাঘের সমাজে চলিতে পারে কিন্তু মানুষের সমাজে তাহা অচল।

সৃষ্টি-রহস্য

(জীব-সৃষ্টির অতি নিম্নস্তরের কথা

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

বিশ্ব-সৃষ্টি অনন্ত বিস্ময়ে আবৃত, স্রষ্টা চির-রহস্যময়।

এই সৃষ্টির মধ্যে জীব-সৃজন সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ ও বিস্ময়জনক ব্যাপার। ইহার মূলে কী যে অস্ফুট রহস্য আবৃত—ইহা যে কী বিচিত্র যবনিকায় আচ্ছাদিত থাকিয়া যুগে যুগে অনুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণের অন্তরে গভীর হইতে গভীরতর প্রেরণার সৃষ্টি করিতেছে তাহা ভাবিলেও স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়! জীব-সৃষ্টির উৎপত্তির ও বিলয়-কাহিনী আঁধার যবনিকার অন্তরালে চিরদিন রহস্যে লুক্কায়িত। চিরদিনই ইহা বিস্ময়ের সহিত কৌতূহল প্রদান করিতেছে।

বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সৃষ্টি-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহা গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় গতানুগতিক মতামত ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিরণ্যগর্ভ হইতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল; বিশ্ব-সৃষ্টির পর জীব-সৃষ্টির প্রথম যুগে একটী ভাসমান সুবৃহৎ অর্ণবপোত হইতে পূর্ব্ব-রক্ষিত প্রত্যেক জাতীয় প্রাণী ছাড়িয়া দেওয়া হইল অথবা একটী সুন্দর নরাকৃতি জীব ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রই উদ্ভূত হইল—এরূপ সকলই হইতে পারে; কিন্তু এরূপভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলে যুক্তি-তর্ক বা বিজ্ঞানের কোন নীতিই স্থান পাইতে পারে না। বিবর্ত্তনবাদীদের নীতিতে বানর নর হইয়া উঠিলেও নরই যে পুনরায় বানরে রূপান্তরিত হইতেছে না বা হইবে না এরূপ কথাই বা কে বলিতে পারে? নব্য বিজ্ঞান শাস্ত্র ক্রমোন্নতির সংবাদ প্রদান করিতেছেন। হিন্দুর পৌরাণিক সংবাদে যে বেদ উদ্ধারকারী দশবিধ রূপধারী মৎস্য-কূর্ম্মাদি নারায়ণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে— তাহা কি? তাহাতে কি কোন রহস্যেরই কোনরূপ ইঙ্গিত নাই? আজ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে ঐ সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর পৌরাণিক আখ্যায়িকার * প্রসঙ্গ না তুলিয়া আমরা নব্য বিজ্ঞানের সাধারণ মতামত প্রকাশ করিতে এস্থলে প্রয়াস পাইব।

স্বতঃজননবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রতিকূল প্রতিবাদে অনুকূল মতাবলম্বিগণ সভ্যজগতে নিতান্তই উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। আকাশে বাতাসে রেণুতে রেণুতে যে-জীব-পরমাণু চির অদৃশ্যভাবে নিত্য বিরাজ করিতেছে— ক্লেদজ প্রাণীগণ অর্থাৎ যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া স্বতঃজননবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহারা সেই মানব দৃষ্টিতে অদৃশ্য প্রাণী-পরমাণুরই রূপান্তর মাত্র।

বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন বাদের কথা বলিতে গেলে বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া অনেক কিছুই বলা চলে। বিজ্ঞান যে এক-কোষযুক্ত প্রাণীর সংবাদ দিয়াছেন ইহারা অতি নিম্নস্তরের এবং চর্ম্ম চক্ষে প্রায়ই অদৃশ্য জীব। যাহারা ক্রমোন্নতি-বলে দৃশ্য তাহাদের দেহেও অবয়বাদির কোনরূপ চিহ্ন প্রকাশ নাই। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাদের জড়বৎ অবয়বাদিশূন্য অচল দেহে চৈতন্যেরও কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না সাধারণভাবে ইহাদের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে নিতান্ত প্রয়োজনহীন নিকৃষ্টও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

* এস্থলে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে পৌরাণিক আখ্যায়িকার উল্লেখ থাকিলেও হিন্দুদর্শনাদির ন্যায় উচ্চস্তরের মতামত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধ নহে

কৃত্রিম কংগ্রেস-কর্ম্মীর স্বরূপ

২২নং ওয়ার্ড

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্‌-এ, বি-এল্‌

কংগ্রেস কর্ম্মী

কর্পোরেশন সদস্যপদপ্রার্থী

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপরিলিখিত প্রচার-পত্র ২২নং ওয়ার্ডের করদাতাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। কংগ্রেসের অনুজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া "কংগ্রেস-কর্ম্মী" (?) ভূপেনবাবু কর্পোরেশন সদস্যপদপ্রার্থী হইয়াছেন। কবিরাজ সত্যব্রত সেন ও অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র ঘোষ যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন "কংগ্রেস-কর্ম্মী" ভূপিদা যে সেই মহানুভবতার পরিচয় দিতে পারিলেন না তাহা গভীর পরিতাপের বিষয়। কর্পোরেশনের মোহ-চক্র যে কংগ্রেস-কর্ম্মীরও কতদূর অধঃপতন ঘটাইতে পারে দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজাতশত্রু ভূপেনবাবু তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ভেক গ্রহণ করিলেই যেমন সন্ন্যাসী হওয়া যায় না "গান্ধীটুপি" ও "খদ্দর-ভূষণ"ও তদ্রূপ কাহাকেও অকৃত্রিম কংগ্রেস-কর্ম্মীরূপে পরিণত করিতে পারে না।

২২নং ওয়ার্ডের করদাতাগণ এই কৃত্রিম কংগ্রেস-কর্ম্মীর স্বরূপ বুঝিয়া তাঁহার আদর্শ-চ্যুতির যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতে ভুলিবেন না।

জড় ও জীব এই দুই পদার্থমাত্র সৃষ্টিতে বর্ত্তমান। বিজ্ঞান ঐ যে এক-কোষযুক্ত প্রাণীর সংবাদ প্রদান করিতেছেন উহারা জীব হইয়াও জড়বৎ। ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত দেহ। ইহাদের দেহে আহার্য্য নির্দ্দেশক কোন আকৃতি পর্য্যন্ত নাই; তথাপি ইহারা জন্ম গ্রহণ করে, জীবিত থাকে সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হয়? এই বিশাল বিশ্বের কোথাও এমন কোন স্থান নাই যে স্থলে কোনরূপ না কোনরূপ প্রাণী নাই। জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে সর্ব্বত্র প্রাণিসমূহ নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে কতক গুলি প্রাণী ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। কতকগুলি প্রথম স্তরেই পড়িয়া রহিয়াছে। কতকগুলি ক্রমোন্নতির স্তরে স্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ যে এক কোষযুক্ত প্রাণী—উহাদের দেহে আহার্য্য গ্রহণ নির্দ্দেশক কোন ইন্দ্রিয় না থাকায় উহারা সারা দেহ দ্বারা খাদ্যের সারভাগ শোষণ করিয়া লয়। এইরূপে এই প্রাণিগণ খাদ্যের সারভাগ শোষণান্তর ক্রমশঃ দেহ পুষ্ট করিয়া তাহা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি প্রাণীতে পরিণত হইয়া পড়ে। এইরূপে ইহাদের ক্রমবিভক্তিবলে 'বংশ-বৃদ্ধি হইতে থাকে। এবং এই বংশ-বৃদ্ধি ক্রমোন্নতির পথে চলিতে থাকে।

এখন বিবর্ত্তনবাদের কথা ধরিলে এই কথাও যে বলা যায় না তাহা নহে যে সৃষ্টির প্রথমে একটি জড় পদার্থে এমনি করিয়া কোন পদার্থের ঘর্ষণে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভাবে তাপ ও শৈত্যের সংযোগে জীবের জীবন সঞ্চার ঘটে নাই। এমনই করিয়া কোন পদার্থের ঘর্ষণে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জড় দেহে সহসা স্পন্দনের উদ্ভব হয় নাই। তাহা বহু যুগ যুগান্ত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বর্ষ হয়ত সেই ভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত থাকিয়া নানা রাসায়নিক ক্রিয়া সাধনের পর ক্রমোন্নত ও ক্রমবিস্তৃত হইতে হইতে রূপান্তরিত অসংখ্যে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান কোলাহলময় জীব জগতের সম্ভব করিয়াছে।

এই জীবনটি কি? ইহা কি শুধুই কতক গুলি স্পন্দনের সমষ্টি মাত্র? এই সম্পন্দনের তালে তালে স্পন্দিত হইয়াই কি বিশ্ব সৃষ্টি বিকশিত হইতেছে? হয়ত তাহা জড়ের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইতে চাহে! বিশ্ব সৃষ্টি অনন্ত রহস্যে আবৃত থাকিয়া অনন্ত কৌতূহল প্রদান করিতেছে॥

(বিলাসী)

"কৃষ্ণ-সুদামা"

প্রযোজক: রাধা ফিল্ম
গল্প: কৃষ্ণধন দে
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: ফণি বর্ম্মা
চিত্র-শিল্পী: বীরেন দে
শব্দযন্ত্রী: নৃপেন পাল
চরিত্র: কৃষ্ণ—অহীন্দ্র চৌধুরী, নারদ—মৃণাল ঘোষ, ইন্দ্র: তুলসী চক্রবর্ত্তী, রুক্মিণী—কাননবালা, সত্যভামা—বীণা, বালক কৃষ্ণ—পূর্ণিমা, সুশীলা—রাধারাণী, অপ্সরা—শান্তি গুপ্তা, শ্রেষ্ঠী—জানকী ভট্টাচার্য্য, শ্রেষ্ঠী পত্নী—গীতা।
প্রথম মুক্তি—রূপবাণী, ২৯শে ফেব্রুয়ারী '৪৮।

রাধা ফিল্মের নূতন পৌরাণিক ছবি "কৃষ্ণ-সুদামা" সম্প্রতি 'রূপবাণী'তে মুক্তি লাভ কোরেছে। প্রচার মহিমায় ছবিখানি মহিমান্বিত সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্ত্তমান বাংলার ছায়াছবির ষ্টাণ্ডার্ড অনুযায়ী বিচার কোরলে আমরা স্বীকার কোরতে বাধ্য যে ছবিখানির নিজস্ব সম্পদ বিশেষ কিছু নেই। 'রাধা'-র "শচী-দুলালের" মত, কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এরা সযত্নে সাজিয়েছেন। কিন্তু ঘটনার গতি ও তার ক্রমবিকাশের মধ্যে 'টেম্পো' যথাযথ সুরক্ষিত না হওয়ায় এবং দুর্ব্বল সংলাপের দোষে মূল আখ্যায়িকাটি একটী অখণ্ড নাটকাকারে ছবির পর্দ্দায় দানা বাঁধবার অবকাশ পায়নি। ছবির 'ট্রিটমেণ্ট' নিতান্তই মামুলী এবং পরিচালনার মধ্যেও আমরা প্রয়োগ-শিল্পীর কোন উল্লেখযোগ্য কলা-জ্ঞানের পরিচয় পেলাম না। কিন্তু বর্ত্তমান উন্নত রুচি দর্শকদের ভোলবার মত বিশেষ কোন উপাদান ছবিতে না থাকলেও মফঃস্বলের দর্শকদের কাছে "কৃষ্ণ-সুদামা"-র আদর হওয়াই সম্ভব। যাত্রা, কথকতা বা পাঁচালী— বাংলার নিজস্ব জিনিষ। সুতরাং 'টেকনিকের' নাম-গন্ধ না থাকলেও তাদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং সে কারণ এই শ্রেণীর অভিনয় বাঙ্গালী আজও ভালবাসে। এই দিক দিয়ে বিচার কোরলে হয় ত' "কৃষ্ণ-সুদামা" অনেককে খুশী কোরবে।

শিল্পীদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, মৃণাল ঘোষ বা শান্তি গুপ্তা—এঁদের কেউই অভিনয় নৈপুণ্যে আমাদের খুশী কোরতে পারেন নি। আর বীণার কথা না বলাই ভাল। অযথা নাচ-গানে নাটকের গতি ব্যাহত হয়েচে। নাচ গুলির পরিকল্পনায় সেই "বিদ্যা-সুন্দর" বা 'আবুহোসেনী' কোলকাতা ঢোলাকের ছাপ! গানে এক পূর্ণিমা ছাড়া কেউই আমাদের আনন্দ দিতে পারেন নি।

দৃশ্য-পটেও "দক্ষ-যজ্ঞের" সে জাঁকজমক নেই। কৃষ্ণের জন্মোৎসবের মিছিলটিও হুবহু "দক্ষ-যজ্ঞ"-এ সতীর স্বয়ম্বর সভা দৃশ্যের 'কারবন কপি'।

ছবির গল্পটিও একখানি ১২।১৩ রীল ফিল্মের উপযোগী নয়। গল্পটি পৌরাণিক হোলেও নিতান্তই সাধারণ এবং ছবির 'ট্রিটমেন্টে' কৌশলের অভাবে Thrill, Suspense বা Climax কোন জায়গাতেই ভালভাবে বিকাশ-লাভ করবার সুযোগ পায় নি। ফটোগ্রাফি অতিসাধারণ এবং Shot judgment-এ অনেক ত্রুটি নজরে পড়লো। ছবির depth এবং Composition-এ সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের কোন পরিচয় পেলাম না। শব্দ-যন্ত্রীর কাজও খুব উন্নত এবং নির্দোষ হয় নি। নদী পার হওয়ার সময় দূরত্ব অনুযায়ী পূর্ণিমার গানে স্বরের পার্থক্য যথাযথভাবে গৃহীত হয় নি। শেষ দুটি দৃশ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অন্যতমা মহিষী সত্যভামার সাক্ষাৎ মেলেনি এবং এটি বিশেষ খাপছাড়া বোলে মনে হোল।

দ্বারকায় কৃষ্ণের প্রাসাদের সম্মুখে তাঁর দ্বারপাল দুটির ছ্যাবলামী নিতান্তই অসহ্য। ছবিখানির সঙ্গে একটি 'কৌতুক-চিত্র' দেখানো হোয়েছে—"ঝিনঝিনিয়ার জের"। এটি কোন শ্রেণীর 'কৌতুক-চিত্র' জানিনা। কমিক ছবিতে 'Comic gags' সৃষ্টি না কোরতে পারলে লোক হাসানো সম্ভব নয়। 'ঝিনঝিনিয়া'-র ঘটনা-বিন্যাসের মাঝে 'gags'-এর কোন অবসর নেই। কুমার মিত্র ও অনাথ বসুর অতি নিম্ন শ্রেণীর ভাঁড়ামীতে ছবিখানি ভারাক্রান্ত হোয়ে উঠেচে।

চিত্র-গঠনে বাঁড়ুয্যে মশাই নূতন ব্রতী। তিনি করিৎকর্ম্মা লোক, তাঁর কাছ থেকে আমরা ভাল ছবি দেখ্‌তে চাই। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি ছায়া-ছবির উপযোগী সাবলীল গল্প, অভিজ্ঞ-পরিচালক এবং নিপুণ কর্ম্মীদের

নিয়ে কাজ কোরবেন। বাঁড়ুয্যে মশাই আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং 'রাধা'রও আমরা হিতকামী—সেইজন্য তাঁর কাছে নিঃসঙ্কোচে এই আবেদন পেশ কোরলুম। আশা করি পূরণ হবে।

খাইবার পাশ

ঈষ্ট ইণ্ডিয়ার নতুন উর্দ্দু ছবি। সীমান্ত প্রদেশের আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে একটা প্রেম-প্রতিহিংসার আলেখ্য এই "খাইবার পাশ"। ছবিখানা বেশ—বেশ এর দৃশ্য-সৌন্দর্য্য, বেশ এর আলোক-চিত্র, বেশ এর পরিচালনা, বেশ এর শব্দানুলেখন আর বেশ এর অভিনয়। গল্পের জোর যদি সেই পরিমাণে আর একটু জোরালো হ'ত তা' হ'লে আর একটা বেশ যোগ করায় আমাদের আপত্তি ছিল না।

গুল হামিদ একজন সুদর্শন সুঅভিনেতা বলেই এতদিন সবার কাছে পরিচিত ছিলেন কিন্তু পরিচালনায়ও তাঁর মাথা আছে—"খাইবার পাশ" দেখে সবাই তা' স্বীকার কোরেছে। ছবিখানার 'টেম্পো' অত্যন্ত দ্রুত, তার ফলে সবাইয়ের মনে আগাগোড়া একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

শৈলেন বসু ও নিগমের আলোক-চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজ সুন্দর—দোষ দেখাবার কিছু নেই।

অভিনয়ের ভেতর গুল হামিদ, মজাহার, পাহেলওয়ান চমৎকার। পূর্ণিমার গান আর অভিনয় ভাল। পেসেন্স কুপার মন্দ নয়। আঙুরির নাচখানা আনন্দদায়ক। ইন্দুবালা অচল। হাসেনদীন খুব হাসিয়েছেন।

মোট কথা, বাঙালী ও অবাঙালী সবাই এই ছবিখানা দেখে প্রচুর আনন্দ পাবেন—একথা আমরা জোর গলায় বলতে পারি।

নিউ থিয়েটার্স

নিউ'থিয়েটার্স ষ্টুডিওর মেয়েদের মধ্যে ছুটী নেওয়ার 'এপিডেমিক' লেগেছে। সবাই প্রায় অসুখে পড়ে ছুটী নিয়েছে—এমন কী উমা আর মলিনাও! নতুন মেয়ে খোঁজার জন্যে ষ্টুডিওর মাথাদের টনক নড়েছে। অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক খোঁজখবরের পর একজন মেয়ের সন্ধান এঁরা পেয়েছেন, কনট্রাক্টও হ'য়েছে তিন বছরের মত, আরও দু'বছর কোম্পানীর হাতে আছে—দরকার বুঝলে কাজে লাগাবেন। হাঁ, আসল কথা বলতে ভুলে গেছি। মেয়েটির নাম কমলেশকুমারী। পাঞ্জাবী বাপ আর ইংরেজনী মা—এই দু'য়ের ঔরসে কমলেশকুমারী রূপে ইংরেজ মহিলা আর কথাবার্ত্তায় বাপের ভাষায় ব্যুৎপন্না। পাশ্চাত্যে "কথাকলি" নাচ নেচে শ্রীমতী সেখানকার জনগণের প্রশংসা পেয়েছেন। নীতীন বসুর আগামী ছবিতে দ্বিতীয় স্ত্রী ভূমিকায় সে নামবে ঠিক হ'য়েছে। আর এই ছবির নায়িকার জন্যে কাজীসাহেব ও পলিশওয়ালা চারিদিকে চর পাঠিয়েছেন। নায়িকার সন্ধান মিললেই অবিলম্বে ছবির কাজ সুরু হবে।

* * *

প্রকাশ যে, "সোনার-সংসার" শেষ কোরেই দেবকী বসু আবার তার গৌরবময়

কর্ম্মস্থল নিউ থিয়েটার্সে ফিরে আসছেন "নিমাই সন্ন্যাস" তোলবার জন্যে। খবরটা সত্যি হ'লে আমরা বলি—সুস্বাগতম!

* * *

দিল্লীতে "ক্রোড়পতি" মুক্তি পেয়ে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা লাভ কোরেছে।

* * *

নীতীন বসুর হিন্দী "ভাগ্য-চক্র" বোম্বাইয়ে 'রেকর্ড' কোরেছে। উপর্য্যুপরি ছ'টি রবিবারে এর আনুমানিক বিক্রি চ' হাজার টাকার ওপর।

* * *

দেবিকারাণী নিউ থিয়েটার্সে ঢুকবে এই নিয়ে বাজারে খুব গুজব রটেছিল। গুজবটা যে একেবারে ভুঁয়ো এমন নয়। ব্যাপারটা প্রায় পাকাপাকি হ'য়ে উঠেছিল—এমন সময় বোঝা গেল, দেবিকারাণী যদি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন তা' হ'লে নানান কুটিলতার সৃষ্টি হ'তে পারে। সেজন্য শেষ মুহূর্ত্তে ধামা চাপা দেওয়া হ'ল।

* * *

পরিচালক প্রফুল্ল রায় পীড়িত হ'য়ে কোলকাতার কোন একটি হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করায় হিন্দী "দেনা-পাওনা" বা "পূজারিণ" ছবির কাজে যোগদান কোরতে পারছেন না। কিন্তু তাই বলে ছবির কাজ বন্ধ নেই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হ'লাম আমাদের বিশ্ববিনিন্দিত যতীন বাবু পরিচালকের ধড়াচুড়ো পরে "দেনা-পাওনা"র 'সেটে'-র ভেতর সেঁটে গেছেন। লোকে যাই বলুক, আমরা কিন্তু জোর কোরে বলি, নিউ থিয়েটার্সের 'বি ইউনিটের' সিংহাসনের অধীশ্বর সত্যই সাম্রাজ্য শাসনের দাবী কোরতে পারেন। তাই আমরা কখনও তাঁকে দেখি প্রোডাক্শন ম্যানেজার, কখনও ষ্টুডিও ম্যানেজার, কখনও আলোক-চিত্রশিল্পী আর কখনও বা দেখি পরিচালকরূপে। আর সুলেখক ও সু-সিনারিও-রচয়িতা ব'লে তাঁর যশঃ সৌরভ বকুলতলার ও টালিগঞ্জের মাঠে সমধিকভাবে পরিব্যাপ্ত!

* * *

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওর কর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে কিছু অদল বদল হবে। ষ্টুডিও-ম্যানেজার ছবি ঘোষাল কোনও জীবন-বীমা আপিসের মোটা মাইনে আর কমিশনের লোভে টালিগঞ্জের মায়া কাটিয়েছেন। ছবি ঘোষালের জায়গায় আমরা শুনলাম মিঃ পি, এন, রায় যোগ দিচ্ছেন। ইনি 'ইন্টারন্যাশন্যাল ফিল্ম ক্র্যাফ্ট' দলভুক্ত ছিলেন। তারপর সেই প্রতিষ্ঠানটি যখন বর্দ্ধিতাকারে টলিউড়ে এল—সেই সময় থেকেই মিঃ রায়ের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। আজ আবার সেই ষ্টুডিওটিই ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হ'চ্ছে আর মিঃ রায় পরিণত বয়সে তার সেই পুরণো কর্ম্মস্থলে ফিরে আসছেন—এটা খুব সুখের বিষয়।

এদিকে অমর মল্লিক ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা ছেড়ে পরিচালনার কাজে ব্রতী হ'চ্ছেন। তাঁর শূণ্য গদী দখল কোরবে কে?—এটাই মস্ত বড় সমস্যা! আমরা বলি

কালী ফিল্মস

সুকুমার দাশগুপ্তের হিন্দী "প্রফুল্লে"-র শূটিং বেশ চল্‌ছে। বাঙ্‌লা ছবিখানা যেমন লোকের মনে লেগেছিল হিন্দীতেও সেরকম

শূটিং দেখলেই লোকে তা' বুঝবে। "প্রফুল্লে" কে কৈ নাম্‌ছে নীচে তার পুরো লিষ্ট দেওয়া হ'ল।

যোগেশ—মনিলাল, রমেশ—জীওনকুমার, সুরেশ—বেণু, কাঙালী—সত্যনাথ, পীতাম্বর—নূর মহম্মদ, হাবুল—রমেশ ভাই, মদন—আবদুল আজিজ খাঁ, শিবনাথ—ইসরৎ, যাদব—মাষ্টার মহম্মদ, প্রফুল্ল—পার্ব্বতী, জ্ঞানদা—দেববালা (এন্-টি), জগমণি—সারা, উমা-সুন্দরী—রাজকুমারী।

* * *

"কাল-পরিণয়ের" সম্পাদনা চল্‌ছে। আস্‌চে মাসের গোড়ার দিকে ছবিখানা উত্তরায় মুক্তিলাভ কোরবে।

গুণময় বাড়ুয্যের "পরভৃতিকা" মহলায় খুব চল্‌ছে। জোর শূটিং দু'একদিনের ভেতরই আরম্ভ হবে।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাধুখাঁ

আসন্ন করপোরেশন নির্ব্বাচনে ১৩নং ওয়ার্ডে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাধুখাঁ কংগ্রেস প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছেন। করপোরেশনে নববিধান প্রবর্ত্তিত হইবার প্রারম্ভেই দেশবন্ধু কর্ত্তৃক মনোনীত কংগ্রেস সদস্যরূপে করপোরেশনের কাউন্সিলার পদে বিপিনবাবু বৃত হইয়াছিলেন। তদবধি কয়েক বৎসর যাবৎ দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সহিত বিপিনবাবু উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেসী উপদলদ্বয়ের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তিনি গত নির্ব্বাচনে অতি অল্পসংখ্যক ভোটে পরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদ্যোগী ও উৎসাহী ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া কংগ্রেস ইলেক্‌শান বোর্ড সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, জানবাজার পল্লীতে বিপিনবাবুর সমর্থকমণ্ডলী বিশেষ উদ্যমের সহিত নির্ব্বাচন-আয়োজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার মান্না প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় যুবকবৃন্দ বিপিনবাবুর সমর্থনে যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে বিপিনবাবুর জয়লাভ সুনিশ্চিত।

আমাদের উদ্যমী-বন্ধু শ্রীঅজিতনাথ লাহিড়ীকে ঐ আসনে বসালে কেমন হয়। আমরা আশা করি, তাঁর বন্ধু শ্রীযতীন্দ্র মিত্র তাঁকে যদি একটু সাহায্য করেন তা' হ'লে অজিতবাবুর অভীষ্ট পূরণ হয়।

* * *

আমাদের দীনেশ দা'র স্বপ্ন এতদিনে সফল হ'তে চল্‌ল। আস্‌চে ১৫ই মার্চ্চ তাঁর পরিচালনায় "বিজয়ার" শূটিং সুরু হবে। আমরা বিশেষ আনন্দিত হ'লাম যে মিঃ সরকার ভূমিকা-লিপির কিছু পরিবর্ত্তন কোরেছেন। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও ছন্না যথাক্রমে আগে নরেন ও বিলাসের চরিত্রে নামবেন বলে প্রকাশ পেয়েছিল। এখন এ দু'টো ভূমিকায় যথাক্রমে নাম্‌ছেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল। এ পরিবর্ত্তন বেশ ভালই হ'য়েছে। নলিনীর অবগুণ্ঠন এখনও মুক্ত হয় নি।

লাগ্‌বে মনে হয়। আর বন্ধুবর সুকুমারের চেষ্টা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়! একদিন

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

আস্‌চে ১৪ই মার্চ্চ 'শ্রী' চিত্রগৃহে এদের নবতম বাঙ্‌লা বাণী-চিত্র "পথের শেষে" মুক্তিলাভ কোরবে। অভিজ্ঞ পরিচালক জ্যোতিষ মুখুয্যের পরিচালনায় আমরা আশা

শ্রীযুক্ত সতীশ ঘোষের

মহানুভবতা

কংগ্রেসের প্রতি অপূর্ব্ব অনুরক্তি

কলিকাতা কর্পোরেশনের ৩নং ওয়ার্ডে বর্ত্তমান কাউন্সিলার অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস কর্পোরেশন ইলেকশন বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ পত্রখানি প্রচার করা হইয়াছে। নিম্নে পত্রখানি উদ্ধৃত করা হইল :—

"আপনার পত্র পাইয়াছি, পত্রখানির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন।

"অন্য লোক যাহাই ভাবুক, বর্ত্তমান অবস্থায় আপনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন উহা ঠিক ব্যবস্থাই হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

"আমি কর্পোরেশনে যে কাজ করিয়াছি তাহার জন্য আমি আমার কাউন্সিলার বন্ধু এবং জনসাধারণের নিকট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছি শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

"বর্ত্তমান সময় কংগ্রেসের মধ্যে একতা রাখিবার জন্য আপনি যে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানিবেন।"

গান :—শ্রীসুনীল কুমার দাশ গুপ্ত

দোল্ খেল্‌বি যদি আয়।
পিচ্‌কারীতে রং গুলে আজ ডাক্‌ছে শ্যামরায়।
বসন্ত আজ ফুল বনে
খেল্‌ছে হোলী বঁধু-সনে,
ফাগুণ-ধারা ঝুরছে পথে,—খেল্‌বি যদি আয়।
"খেল্‌বি কে আয়, খেল্‌বি কে আয়"
গাইছে রাঙ্গা বায়ে
পাগ্‌ল করা ঢেউয়ের নাচন্
দুল্‌ছে যমুনায়;
পলাশ, অশোক রং ধ'রেছে,
কালো কোকিল্ সুর ধ'রেছে,
আর কেন তোর এক্‌লা থাকা—
খেল্‌বি যদি আয়॥

করি, ছবিখানা সাধারণের কাছে সমাদরলাভ কোরবে।

* * *

পরিচালক কারদারের "বাগে সিপাহী"র শুটিং গেল বুধবার থেকে সুরু হ'য়েছে। গুল হামিদ, বিমলাকুমারী, পেসেন্স কুপার, মজাহার খাঁ, ইসাক্, পাহেলওয়ান, নন্দকিশোর, হাসেনদীন, সিকান্দার, কামরাণ, ললিতা প্রভৃতি শক্তিমান অভিনেতৃবৃন্দ এই ছবিতে নাম্‌ছে।

* * *

পরিচালক দেবকী বসুর "সোণার-সংসারে"র মহলা শেষ হ'য়েছে। শুটিং যে কোন মুহূর্ত্তেই আরম্ভ হ'তে পারে। ভদ্রবংশ-সম্ভূতা ছায়া দেবী এই ছবির নায়িকা সাজছেন। রূপে ও গুণে শ্রীমতী যে এই ছবিতে অভিনয় কোরে 'তারকা' শ্রেণীভুক্তা হবেন—এ বিশ্বাস আমাদের হয়।

মহানিশা ফিল্মস্

এদের "মহানিশা" রূপবাণীতে শিগ্‌গির দেখাবার ব্যবস্থা চল্‌ছে। এ প্রতিষ্ঠানের মালিক শিশির মল্লিক একজন করিৎকর্ম্মা লোক। তাঁর বিচক্ষণতায়, নরেশ মিত্তিরের কলা নৈপুণ্যে আর অভিনেতৃ-বর্গের সুঅভিনয়ে ছবিখানা যে ভাল হবে এ আশা আমাদের হয়। কিন্তু আমরা শঙ্কিত হ'য়ে পড়্‌ছি ছবিখানার আলোক-চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজ কেমন হবে? কারণ আগেও বড়ুয়া ষ্টুডিও থেকে যে ক'খানা ছবি উঠেছে তার এ দু'টো বিভাগ ছাড়া অন্য বিষয়-গুলো উৎরে গেছে। যদি সব দিক থেকে ছবিখানা ভাল হয়, তা' হ'লেই ভাল! নইলে আলোকশিল্পী অশোক সেনের সারা-

পপুলার পিক্‌চার্সে'র

নবতম অর্ঘ্য

আবর্ত্তন

—ভূমিকায়—

কুমারী শীলা হালদার

কুমারী মীরা সেনগুপ্তা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	আস্‌মানতারা
জীবন গাঙ্গুলী	শেফালিকা (পুতুল)
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়	রেণুকা ঘোষ
শরৎ চট্টোপাধ্যায়	গোপালীবালা
প্রফুল্ল দাস	আঙ্গুরবালা
প্রমোদরায় চৌধুরী (এঃ)	বেলারাণী
ধীরেন ঘোষ (এঃ)	বিণাপানি
ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য (এঃ)	উমাতারা
সুধীর দে (এঃ)	অন্নপূর্ণা
বিজয় মজুমদার	ইন্দিরা

শ্রীমতী ডলি রায়

—প্রভৃতি—

পরিচালকঃ সন্তু সেন

চিত্রনাট্যঃ হেমন্ত গুপ্ত

আলোকশিল্পী—ভি, ভি, দাভে শব্দযন্ত্রী—এ, গফুর

—শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে গৃহীত হইতেছে—

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে উত্তর কলিকাতার কোনও বিশিষ্ট চিত্রগৃহের রূপালী পর্দ্দায় রূপায়িত হইবে।

দিন, সারা-রাত্তির, সারা-ক্ষণ কাজ করা সারা-জীবনে বিফল হবে। আর শব্দযন্ত্রী শম্ভুসিংহ বেগতিক দেখলে দেশে তার ডালরুটি বাধা আছে—সেখানে পাড়ি মারবেন।

বিশ্বভারত ফিল্মস্

গেল সোমবার ধারাকোটের রাজা বাহাদুরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে এদের কর্তৃপক্ষ ট্যাংরা—হিউজেস রোডে এক উদ্যান-সম্মিলনীর আয়োজন করেন। বহু বিশিষ্ট অতিথিকে নাচ, গান ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। এদের প্রথম ছবি উঠবে "দেবী-ফুল্লরা"। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনা করি।

"চিত্রাঙ্গদা"

আসছে সপ্তায় ১১ই ১২ই ও ১৩ই মার্চ্চ এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে "চিত্রাঙ্গদা অভিনয় করবেন। এ ব্যাপারে সব ব্যবস্থা করার ভার পড়েছে নিরলস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের ওপর।

পপুলার পিক্‌চার্স

এঁদের "আবর্ত্তনের" শুটিং বেশ জোরে চলেছে। গেল মঙ্গলবার বিয়ের একটা দৃশ্য খুব জাঁকজমকের সঙ্গে তোলা হয়েছে। বরযাত্রীদের ভুরিভোজনের ব্যবস্থা হ'য়েছিল প্রচুর। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের জিদিবে বরযাত্রীরা খুব খুসী হ'য়েছে। আমাদের এক্তার-পপুলার ধীরুদা' পপুলারের ছবির বর সেজে শান্ত ছেলের মত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—বোধ হয় কনের সন্ধানে! যা'ক এ ত' তাঁর অভিনয়—আসল ব্যাপারটা কবে ঘটবে আর সেই ব্যাপারে আমরা যে বরযাত্রী সাজবার জন্যে এখন থেকেই মহলা দিচ্ছি।

* * *

এ হপ্তার রেণুকা ঘোষের যে আর্ট-প্লেট বেরিয়েছে তার পরিচয়-লিপিতে আমরা তাকে উচ্চশিক্ষিতা ও ভদ্রবংশসম্ভূতা বলে পরিচয় দিয়েছি। রেণুকা উচ্চশিক্ষিতা কিনা আমরা জানিনা—কিন্তু শেষোক্ত সম্মানের অধিকারিণী সে নয়।

হোলির গান

শ্রীললিত চক্রবর্ত্তী

যদি করিবে হেলা
কেন খেলিলে নিঠুর এই প্রণয় খেলা ॥
যদি ঝরাবে কুসুম, কেন দানিলে মধু,
রাখিয়া বুকের মাঝে জ্বালা বাড়ালে শুধু,
যদি ছিঁড়িবে ডোর—কেন গাঁথিলে মালা ॥
ওগো দানিয়া আলোক ফোটালে যে ফুল প্রাণে,
কেন আঁধার আনি ভরিলে বিষাদ গানে।
যদি হানিয়া ব্যথা প্রাণে ঘুচাবে আশা,
কেন আনিয়া মরুমায়া জাগালে তৃষা,
যদি শুকাবে নদী কেন ভাসালে ভেলা ॥

শ্রী

"তরুবালা" এখানে শেষ হপ্তা বলে বিজ্ঞাপিত হ'চ্ছে। ছবিখানা সাধারণের আদর পেয়েছে দেখে আমরা খুসী হ'লাম।

দেবদত্ত ফিল্মস্

এঁদের প্রথম বাঙলা ছবি হবে "অহল্যা"। জ্যোতিষ বাড়ুয্যে আর কৃষ্ণধন দে এখন চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনায় ব্যস্ত আছেন। পরে এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" ও "ইন্দিরা" তুলবেন।

রূপকথা

আসছে শনিবার থেকে এখানে ইউনিভার্সালের দু'খানা নামকরা ছবি দেখানো হবে; ছবি দু'খানা হচ্ছে "ইনভিজিবল্ ম্যান" আর "দি কাউন্টেস অফ মন্টি ক্রীষ্টো"। এর পরের শনিবার থেকে এখানে "বিদ্রোহী" ও "রাতকাণা" দেখানো হবে।

কলিকাতায় আয়ুষ্কাল

বাংলার রাজধানী কলিকাতা, ব্রিটীশ রাজত্বের দ্বিতীয় সহর হইলেও, ইহার রোগ-সংখ্যা, এমন কি মৃত্যুসংখ্যা, বিশেষতঃ শ্বাসরোগে, অন্যান্য প্রাদেশিক সহর হইতে অনেক বেশী।

পৃথিবীর বুকে সর্দ্দি-কাশি একটী সাধারণ রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমাবস্থায় এই সাধারণ সর্দ্দি কাশি নিবারণে সচেষ্ট না হইলে, দিনে দিনে এই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া ব্রঙ্কাইটিশ, নিউমোনিয়া, এমন কি, পরিশেষে মারাত্মক যক্ষ্মারোগে দাঁড়াইতে পারে। শীতের পর বসন্ত সমাগমে ঋতু পরিবর্ত্তনের ফলে, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই বায়ুনালী ও ফুসফুস প্রদাহের জন্য কাশিতে ভুগিতে থাকে।
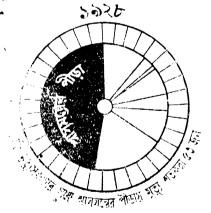
উপরের ১নং চিত্র হইতে দেখা যায়, ১৯২৮ সালে, কলিকাতা সহরের মোট মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় মৃত শতকরা ৫৩ জন। শিশুদের মধ্যেও মৃত্যুর হার কম নয়। এক সপ্তাহ হইতে এক মাস বয়স্ক শিশুর মোট মৃত্যু সংখ্যা ১০৩১-এর মধ্যে ১৪০টী শিশু ব্রঙ্কাইটিশ ও ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া

৮৬, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড

সাউণ্ড-ষ্টুডিও

আলানবাজার, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও পার্টনার : **শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রথম বাংলা **অহল্যা** নির্ম্মাল্য

কাহিনী : **শ্রীকৃষ্ণধন দে,** এম্, এ

প্রয়োগ শিল্পী ...	শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রধান আলোক-শিল্পী ...	শ্রীগীতা ঘোষ
আলোক-শিল্পী	মিঃ বি, ঘোষ	শব্দ যন্ত্রী	শ্রীঅমর ঘোষ
স্থির চিত্র-শিল্পী	শ্রীমনি গুহ	কাচ-শিল্পী	মিঃ এম্ বর্ম্মা (এম্-আর্-এ-এস্)
সুর-শিল্পী	শ্রীরামচন্দ্র পাল	ব্যবস্থাপক	শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	শ্রীভুবনেশ্বর কর	দৃশ্য-সজ্জাকর	শ্রীহরি পাল

পরবর্ত্তী **বঙ্কিমচন্দ্রের** আকর্ষণ

রজনী * ইন্দিরা

সহরের কলধ্বনি

ষষ্ঠ সপ্তাহ

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে
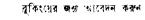
ফোন : ক্যাল ১১৭৯ **৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা** গ্রাম : ফিল্মাসাও

রোগে মারা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১ হইতে ২ মাস বয়স্ক ৫৫০টী শিশু, ২ মাস হইতে ৩ মাস বয়স্ক ১৪২টী শিশু এবং ৩ মাস হইতে ৬ মাস বয়স্ক ৪৪৩টী শিশু ব্রঙ্কাইটীশ, নিউমোনিয়া এবং অন্যান্য শ্বাসরোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে।

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, অতিবাহিত হইতেছে, কিন্তু কলিকাতা সহরে

শ্বাসরোগের উপশম হয় নাই। ১৯৩৪ সালে, ঐ পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা মৃত্যু-সংখ্যা ৫৯ জনে দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় রোগের উৎকটতার জন্য আমাদের বসিয়া থাকিলে চলিবে না। রচির "সিরোলিন" শ্বাস পীড়ায় প্রভূত উপকার করে বলিয়া, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছে।

গল্প ও রচনা প্রতিযোগিতা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও কালি-কিঙ্কর ছাত্র-সমিতি হইতে রচনা ও গল্প প্রতিযোগীতা দেওয়া হইতেছে।

গল্পটীর বিষয়:—সখের নেশা।

সখ করিয়া যাহারা দেশসেবা করিতে আসেন এবং তারপর যখন দুঃখ, বিপদ আসে তখন তাহারা কিরূপে তাহাদের কাজে পশ্চাৎপদ হন তার একটা সরস ছবি।

গল্পটী আট পাতার অধিক হইবে না।

রচনার বিষয়:—সাহিত্যে শরৎচন্দ্র।

রচনা বারো পাতার বেশী হইবে না।

যাহারা রচনা ও গল্পে প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদিগকে চতুর্থানি রৌপ্যপদক আর যাঁহারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদের বর্ত্তমান সুসাহিত্যিকদের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী দেওয়া হইবে।

গল্প এবং রচনা "সম্পাদক, কালিকিঙ্কর ছাত্র-সমিতি, বড়িশা, পোঃ ২৪ পরগণা" ঠিকানায় ২২শে মার্চ্চ ১৯৩৬, এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।

সমিতির বিচারই চরম।

শুভ-বিবাহ

গত ১৬ই ফাল্গুন শনিবার কাশীধাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত 'বাতায়ন' সম্পাদক শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষালের প্রথমা কন্যা অন্নপূর্ণার শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নব-দম্পতীর শান্তিময় দীর্ঘজীবন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

শ্রীসুবোধ রায় সাধারণ সম্পাদক, হুগলী জেলা সাহিত্য পরিষদ্ জানাইয়াছেন যে হুগলী জেলা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে আগামী ৮ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় চাতরা নন্দলাল ইনষ্টিটিউটে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিপূজার জন্য একটি সভা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সর্ব্ব-সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নবতম পুণ্য জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভবানীপুর রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সমিতি হইতে সকাল চা'টায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাক্ষাৎ পার্শ্বচর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজার নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা সংকীর্ত্তন সহ ভবানীপুরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া বাহির হইয়াছিল।

সংকীর্ত্তনের ভার লইয়াছিলেন ভবানীপুর সমাজ। এই শোভাযাত্রায় কাঁসারীপাড়া ক্লাব, শাকারীপাড়া ক্লাব, মিতালীসঙ্ঘ, কোহিনুর ক্লাব, রামকৃষ্ণ পাঠাগার প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যোগদান করিয়াছিলেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে এসে উমেশবাবু মহেশ্বরীকে দেখে বিশেষ কিছু বল্লেন না। জামাকাপড় ছেড়ে ছাতে গিয়ে উঠলেন।

খাবার সময় মহেশ্বরী দাদাকে বাতাস করছিলেন। বল্লেন : তোমার কাছেই উঠলুম দাদা। অন্য কোন আশ্রয় আমার নেই। তোমাকেই আমাদের ভার নিতে হবে। মৃতুন যাতে মানুষ হয় তার ব্যবস্থা তোমায় না করলে চলবে না।

উমেশবাবু বেশ একটু গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন : জানিস তো আমার আয়। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। পয়সা খরচ করা কি আমার দ্বারা সম্ভব হবে ?

কলেজের মাইনে পত্তরের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। খোকা এবার জলপাণি পেয়ে পাস করেচে দাদা, দুমুটো আমাদের খেতে দিও। তা হলেই হলো।

পয়সা খরচ করতে হবেনা শুনে উমেশবাবু আশ্বস্ত হলেন। বল্লেন : আচ্ছা, তাই থাক, দেখি মৃত্যুঞ্জয়ের জন্যে কি কদ্দূর করতে পারি।

* * *

মহেশ্বরী দাদার কাছে রয়ে গেলেন, নীচেকার দুখানা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় স্কটীসে আই-এস্-সি ক্লাসে ভর্ত্তি হয়ে গেল।

স্বামীর মৃত্যুর পর মহেশ্বরী কেমন যেন হয়ে গেছেন। সব কাজকর্ম্ম তিনি ঠিক মতন গুছিয়ে করতে পারেন না। এর ওপর কয়েকটি উপসর্গ এসে জুটেছে। চব্বিশ ঘণ্টাই পুজোআচ্ছা নিয়েই থাকেন। তেতলার ছাদের উপর কুঠরীটিকে তিনি দেবনিকেতন করে তুলেছেন। আজকাল তিনি যেন কেমন একটু বায়ুগ্রস্ত।

মৃত্যুঞ্জয় নিজের ঘরটিকে এরই মধ্যে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। নিয়মিত সময়ে সে কলেজ যায়।

মহেশ্বরী এ বাড়ীতে আসবার পরই চাকরটি'র চাকরি চলে গেল। দাদার অভিপ্রায় তিনি বুঝতে পারলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করলেন না। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম মায় বাসনমাজা পর্য্যন্ত তিনি মুখটি বুজে করে যান। মৃত্যুঞ্জয়কে তিনি যদি মানুষ করে তুলতে পারেন তার কাছে এ কষ্ট অকিঞ্চিৎকর।

প্রথম দু'বছর উমেশবাবুর সংসারে কোনরূপ অশান্তির ছায়া দেখা গেলনা। মৃত্যুঞ্জয় এবারও বৃত্তি পেয়ে পরীক্ষা পাশ করে শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হয়ে গেল। কলেজের এ্যাটাচ্‌ড্ হোষ্টেলে তাকে থাকতে হয়। রোববার রোববার মাকে সে দেখে যায়।

ছুন্নি বেশ বড় হয়েছে। আজকাল মা তাকে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে আসতে বারণ করে। তবুও সে সুবিধে পেলে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে, আগেকার মত কথা বলে উৎব্যস্ত করে তোলে, ভালো জিনিষ পেলে লুকিয়ে লুকিয়ে দিয়ে যায়।

বাইরে থেকে উমেশবাবুকে বোঝবার যো নেই, যেন গোবেচারী, কারুর কথায় তিনি বড় একটা থাকেন না। কিন্তু হঠাৎ যদি কোন কথা মনের মধ্যে আটকে যায় সেটাকে সহজে তাড়িয়ে দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। মহেশ্বরী সংসারের একপ্রান্তে এদ্দিন বেশ ছিলেন। হঠাৎ উমেশবাবু আবিষ্কার করলেন যে মহেশ্বরীর এখানে থাকাটা খতিয়ে দেখলে ষোল আনাই লোকসান। এর ওপর স্ত্রী তাঁকে উঠতে বসতে সতর্ক করে দিচ্ছে : খরচ পত্তর একটু বুঝে করো। এ টাকায় আমি আর সংসার চালাতে পারবোনা।

স্ত্রীর কথার উপর প্রতিবাদ করবার মত সাহস উমেশবাবুর নেই। এদ্দিন তিনি স্ত্রীর কড়া শাসনের ছায়ার নির্ব্বিঘ্নে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়ে গেছে বিদ্যা বুদ্ধিতে সব দিক থেকেই তিনি স্ত্রীর কাছে দাঁড়াতে পারেন না। তাই তিনি স্ত্রীর কথায় ওঠবোস করেন, অন্তর দিয়ে করেন শ্রদ্ধা। স্ত্রীর ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে তিনি এর আশু প্রতিবিধান করবার জন্যে কোমর বেঁধে লাগলেন।

একদিন সুযোগ মিল্লো।

সন্ধ্যার পর আফিস থেকে ফিরে এসে উমেশবাবু ছাতে হাওয়া খাচ্ছিলেন। মহেশ্বরী

[illegible]ক্র ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই উমেশবাবু অন্ধকারের মধ্যেই বলে উঠলেন : কে ?

—আমি, দাদা।

—কে, মহেশ্বরী ?

—হাঁ

—আমার কাছে একটু বস, দরকার আছে।

উমেশবাবু দরকারের কথাটা বলতেই মহেশ্বরী চট করে দাদার অন্তরের আসল খবরটা বুঝে নিলেন। দ্বিরুক্তি না করে দাদার পাশে এসে বসলেন।

—শুনেছিলাম শশী মরবার সময় কিছু টাকা রেখে গেচে।

—কৈ না, যা শুনেচো সব মিথ্যে।

—কিন্তু এদ্দিন তোদের চল্লো কী করে?

—সে তো তুমি আমার চেয়ে ভালই জান দাদা।

—এদিক ওদিকের খরচগুলো তুই কোত্থেকে পাস ?

—বাজে খরচ তো কিছুই নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের মাইনে দিতে হয় না। জলপানি যা পায়। তাই দিয়ে কোন রকমে চালিয়ে নিই।

উমেশবাবু বুঝতে পারলেন এদিক দিয়ে গেলে বিশেষ কোন সুবিধে হবেনা তাই তিনি অন্য একটি পন্থা আবিষ্কার করবার জন্য অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলেন। অনেক ভেবে চিন্তে বল্লেন : আফিসের খবর শুনেচিস ?

একটু শঙ্কিতচিত্তে মহেশ্বরী বল্লেন : কী হয়েছে, দাদা ?

—শালারা আর খেতে দেবেনা, শুকিয়ে মারবে।

—কোন বিপদ হয়নি, তো ?

—এর চেয়ে বিপদ হওয়া যে শতগুণে ভাল ছিল, মহেশ্বরী ! যা হোক কিছু নিষ্পত্তি হয়ে গেলে ভাবনা চিন্তের বালাই থাকতোনা। একে কুল্লে এই ক'টাকা তো মাইনে পাই, তার ওপর শুনচি আসচে মাস থেকে বেটারা মাইনে কাটবে। এতবড় সংসারটা যে কী করে চলবে ভেবে কূলকিনারা পাইনে।

—সবই বুঝি, দাদা। কিন্তু কী করবো বল ? আমার ঠেঙ্গে এমন পয়সা নেই যে তোমাকে এসময়ে সাহায্য করি।

—বলছিলুম কি নীচের ঘর দুখানা ভাড়া দিলে কেমন হয় ? যা দুপয়সা আসে তাই মঙ্গল। আবার ভাবচি তোরা কোথায় যাবি। তোদের তো ফেলতে পারবো না !

—আমি কী বলবো, দাদা ? যা ভাল হয় কর।

—ভাড়াটা দিই, কি বল ?

—বেশতো, তাই দাওনা। কিন্তু ওপরে তো বেশী ঘর নেই।

—তাই তো বিষম ভাবনায় পড়ে গেচি। তোরা থাকতে নীচেটা কি করে ভাড়া দিই ?

—তোমার কাছে থাকতে গেলে আমাকে ভাড়া দিতে হবে না কী ?

—কিন্তু উপায় কি? অন্য জায়গায় থাকতে গেলে মাসে মাসে যা হোক কিছু তোকে তো ভাড়া গুণতে হতো।

—আমার ওপর তোমার একটা কর্ত্তব্য তো আছে।

—পয়সার যেখানে টান ধরেচে সেখানে অতো খতিয়ে বিচার করবার সময় নেই।

—আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। মৃত্যুঞ্জয়ের ওপরও তো তোমার একটা—

—কি বলতে চাচ্ছিস, মহেশ্বরী বুঝেচি। বলছিলুম কি মৃত্যুঞ্জয়কে লেখাপড়া শিখিয়ে আর কাজ নেই। আমাদের আফিসে বরং কুড়ি টাকা মাইনের চাকরীতে ঢুকিয়ে দিই। যে-রকম চালাক ছেলে দু'পাঁচ বছরের মধ্যে বেশ গুছিয়ে নিতে পারবে। এ-সময়ৈ আর অমত করিসনে। ও চাকরীতে ঢুকলে তোরও কোন কষ্ট থাকবে না। কি বলিস, চেষ্টা দেখবো? বাজার যা পড়েচে কাউকে আর করে খেতে হবেনা।

—না দাদা, তা হয়না। এ সময় ওকে লেখাপড়া ছাড়িয়ে চাকরীতে দিতে পারবো না।

—বেশী লেখাপড়া শিখেই বা কী হবে, শুনি? ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কত লোক ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্চে, তার খোঁজ রাখিস?

—খোঁজ রেখে কী করবো দাদা। পাশ করার পর মৃত্যুঞ্জয়ের কিছু যদি না জোটে, বুঝবো সে ওর ভাগ্য—বলে মহেশ্বরী দাদার কাছ থেকে উঠে গেলেন।

—রবিবার দিন মৃত্যুঞ্জয় এলে মহেশ্বরী তাকে নিভৃতে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন: পাশ করতে তোর আর ক'বছর আছে, খোকা?

—হঠাৎ একথা কেন জিজ্ঞেস করচো, মা?

—এমনি।

—না মা, তুমি লুকোচ্চো। কী হয়েচে তোমায় বলতেই হবে।

—এ বাড়ীতে দাদা আমাদের আর থাকতে দিতে চায়না।

—বেশ তো, দেখেশুনে অন্য একটা বাড়ীতে উঠে গেলেই হবে।

—বাড়ী ভাড়া করা কি মুখের কথা রে, খোকা? পয়সা কোথায়?

—একটু হেসে মৃত্যুঞ্জয় বললে: ওজন্যে তুমি ভেবোনা, মা, তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্চি। জলপানির টাকা আমার একটিও খরচ হয়নি। কালই পোষ্ট-আফিস থেকে উঠিয়ে এনে তোমার হাতে দেবো।

—কিন্তু তোর খরচ কোত্থেকে চলবে, খোকা?

—এ দু'বচ্ছর আমি চালিয়ে নিতে পারবো।

(ক্রমশঃ)

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন
—পতিতুণ্ডী—

চার্লি চ্যাপ্লিন্ ও পলেট গডার্ড "মডার্ণ টাইমস" এর নায়ক নায়িকা।

কোলকাতায় ছবিখানা আসতে আর দেরী নেই। চার্লির ভক্ত সবাই— তাই সবাই দিন গুনছে।

ফ্রেডি আর চার্লি

হোটেলে খাওয়া চলেছে। এক টেবিলে ফ্রেডি বারথোলোমিউ আর তার পিশি মিলিসেন্ট—খাচ্ছে তারা মহা আনন্দেই। হঠাৎ ফ্রেডি আনন্দে চীৎকার করে উঠল ওঃ কি! সে আনন্দে তার চায়ের কাপ ফেলে একেবারে লাফিয়ে উঠেচে। ওধারে যে চার্লি চ্যাপলিন আর এইচ জি ওয়েলস বসে চা খাচ্ছে সে কথা ত কেউ জানত না। সবাই চমকে উঠল।

চার্লি চোখ তুলে তাকিয়ে রইল। এ ছেলেকে সে চেনে যে। অনেকদিন ধরে এর সঙ্গে কথা কইবার সাধ। আজ সেই ছেলেই সামনে।

চার্লি উঠল, টেবিল ছাড়লে—জোরে হেটে এসে পৌঁছল ফ্রেডির টেবিলের ধারে। তার মুখ দিয়ে প্রথম কথা বেরোল; "আমার নাম চার্লি চ্যাপলিন, চেন আমাকে?"—হাসলে চ্যাপলিন।—"তোমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা করবার ইচ্ছে ছিল। আজ দেখা হয়েছে ভালই হোল।...পারবে! পারবে তুমি আমাদের কাছে আসতে...আমাদের সঙ্গে যোগ দাও না।"

এরপর ফ্রেডি পারেনি—পারেনি কিছু বলতে; শুধু মুখের পানে তাকিয়ে বলেছিল, "হ্যাঁ স্যার, আপনার সঙ্গে একদিন দেখা করব।"

এইচ জি, ওয়েলসও খুব ভাল সুপারিশ দিয়ে গেছে ফ্রেডিকে। বলেছে, 'ফ্রেডি তুমি আমাদের গর্ব্ব—আজকের দিনে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে তুমিও একজন'।

এই এত বড় সুপারিশ! কটা ছেলের ভাগ্যে এমন সুপারিশ জোটে।

লোকে একদিন চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে জ্যাকি কুগানের নাম শুনেছিল; সে নাম আজও তারা ভোলেনি। এরপর হয়ত

লোকে চালির সঙ্গে ফ্রেডির নাম শুনবে। 'দি কিড' এর মত আর একটা নামও ছায়াছবির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে কিনা কে জানে!

সেক্সপীয়রের তিন বই

সেদিন তর্ক উঠেছিল আর ভাবনা হয়েছিল রোমিওকে নিয়ে—টুটল তা সেদিন, যেদিন খবর পেলুম রোমিও করবে লেসলি হাওয়ার্ড। চোখে এলো ঘুম—মনে এলো তৃপ্তি—উতল হিয়া মানল বাঁধন। কিন্তু এ কথা তো বলে দিয়েছি আগেই। আজ যা বলব তা আলাদা। কাদের নাকি দুঃখ ছিল সেক্সপীয়রের বই গুলোয় জুটেছে কেন ষ্টাণ্ট! আমি বলছি—হবেনা—তা হবে না। রুচির পরিচয় দেবে তারা। আর্টএর জন্যে আর্ট এ কথা মেনে সিনারিও গড়ে উঠেছে বড় বড় মাথা থেকে। ভয় খাবার বা ঘাবড়ে যাবার দরকার নেই। খোঁজ নিয়েছি আমি। এ নিছক আসল সঠিক খবর। ষ্টাণ্টের গন্ধও তার মধ্যে পাওয়া যাবে না। জানেন সেক্সপীয়রের একটা কথা পর্যান্ত বদলে অন্য কথা বসান হয় নি। প্রতীক্ষায় থাকুন! ভেবে লাভ কি?

রোমিও জুলিয়েট

তাই বলছি বসেছে মাথার পাশে মাথা, গুণে আর জ্ঞানে মূল্যবান। নামের তাদের জয়ঢাক বেজেছে হলিউডের ষ্টুডিওর অন্তর থেকে, প্রতিঝঙ্কার উঠেছে ছায়াজগতের পাহাড়ের গা থেকে—সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে—মাটির পা থেকে। পুড়ছে সেখানে পুড়ছে সিগারেট আর সিগার, রাতের পর রাত দিনের পর দিন; দেখা দেছে হলিউডের আকাশে রাঙা রাঙা ধুম্রায়মান রেখা।

লেসলি হাওয়ার্ড আর নর্মা শিয়ারার—নর্মা শিয়ারার আর লেসলি হাওয়ার্ড শব্দ উঠে মেট্রোর দরজায়; ধ্বনি প্রতিধ্বনি ওঠে সারা ছায়া-বিশ্বময়। স্ত্রী সে—প্রিয়তমা সে আরভিং থ্যালবার্গের। তাইতো সে কর্ত্তা—তাইতো তার অবদান।

আর একখানা

জানেন নিশ্চয়ই নাম। বলেছি তো আপনাদের সেই ছবি—যে ছবিতে এলিজাবেথ বার্গনার নামছে। রোজালিণ্ড নাম তার নিশ্চয়ই ভোলেন নি। যদি ভুলে থাকেন শুনুন; রোজালিণ্ড সেজে এলিজাবেথ বার্গনার নামছে। কী চমৎকার হবে বলুন ত। গার্কো, মার্লিনের খুব বিশেষ তলায় ওর নাম যাবে না—কী বলেন? ওর ছবি পরিচালনা করছেন ডাক্তার জিনার। হাঁপিয়ে উঠছেন নাকি বইখানার নাম শোনবার জন্যে। বইখানার নাম হচ্ছে 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট।' অনেকখানি তোলা হয়ে গেছে। খুব সম্ভব এইখানা তিনখানার মধ্যে প্রথম পর্দ্দার সফেদ শীতল বক্ষের প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন পাবে।

তারপর।

পরের খানা সেক্সপীয়রের অমর উপন্যাস। জগতে মঞ্চের দশখানা সুবিখ্যাত নাটকের নাম করতে গেলে এখানাও আসবে। নাম না করে আমরা থাকতে পারব না। আলেকজান্দার কোর্ডা চলেছেন তাকে পরিচালনা করতে। দশজন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের নাম করতে গেলে তাঁর নামও করতে হবে। জাতিতে তিনি ইহুদি। যাক সে কথা।

রবার্ট ডুনেকে নিয়ে ওই ছবি উঠবে। ছবির নাম হচ্ছে 'হ্যামলেট'।

এইবার আপনারা প্রতীক্ষায় থাকুন আর দিন গুনুন কবে এ ছবি আসবে। আমি বলে দিচ্ছি এখনও এ ছবি আসতে বেশ দেরী আছে।

খুচরো খবর

কারলফ নামটা হচ্ছে রাশিয়ান নাম।

* * *

"সাইর‍্যানো ডি বারজেরাক" ছবিখানা পরিচালনা করবেন আলেকজাণ্ডার কোর্ডা।

* * *

ব্যারোজন সুবিখ্যাত এবং লোকপ্রিয় অভিনেতা "সাইর‍্যানো ডি বারজেরাক" ছবিতে নামবে।

* * *

বরিস কারলফ হচ্ছে ইংলণ্ডের লোক।

* * *

বরিস কারলফের ভাই হচ্ছেন জষ্টিস ই, এম, প্র্যাট—বম্বে হাইকোর্টের বিচারক।

"জাগিয়ো না আমায় জাগিয়ো না"

(গল্প)

শ্রীমতী রমলা বিশ্বাস

দুর্বীপাকেরই অদৃষ্ট আমার—কেউ বা বলে 'ভবঘুরে', আবার কেউ বা 'পাগল' বলে আমায় সাদর-সম্ভাষণ জানায়, আর এক ধনী শিক্ষিত প্রতিবেশী, সুরেনবাবু তাঁর নাম, স্নেহ-ভালবাসা বোধ করি অঝোর ধারায় ঝরে পড়তো আমার ওপর, তাই তিনি আমার নাম রেখেছিলেন 'লোফার'।

তা না হয় তিনি রাখলেনই !

ভাল কোরেই জানতেন আমায় তিনি—আমার বড় ভাই আর তাঁর এক কাকার বন্ধুত্বও ছিল প্রগাঢ়।

আমার বড়দা এক মেমসাহেবকে বাঙলা শিখিয়ে মাসে ষাট্ টাকা মাইনে পেতেন—হয় তো বা এই কারণেই তাঁদের মধ্যে ছিল অন্তরঙ্গতা। ধূমকেতুর মত হঠাৎ এক জাপানী বণিক এসে আবির্ভাব হল তাঁদের বাড়ীতে—কিছুদিন বাদেই শোনা গেল তাঁদের হয়ে গেছে 'ল্যভ্ ম্যারেজ্'—তাঁরা চলে গেলেন জাপানে মধুচন্দ্র যাপন কোরতে; অবিশ্যি পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছিলেন যাবার সময় দু'শো টাকা।

দাদার চাকরি গেল—তার সঙ্গে শিথিল হয়ে গেল ওই ধনীর বন্ধুত্ব !

এই তো মানুষের জীবন !

লোকে বলে ভালবাসা নাকি একটা সেতু বিশেষ—তারই ওপর বান্ধব-বান্ধবী চলা-ফেরা করে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, সেতুর স্তম্ভগুলি একই উপাদানে তৈরী হওয়া উচিৎ—কোনোটি মাটীর, কোনোটি ইঁটের আর কোনোটি পাথরের গাঁথুনি হলে ধসে যাবার প্রতি মুহূর্ত্তে সম্ভাবনা।

মানুষের ভুলে যাওয়াই স্বভাব, এইটেই তার ধর্ম্ম—সব কিছু বিস্মৃতির গর্ভে প্রোথিত করে বলেই তার নাম মানুষ ! এই ভুল-চুক নিয়েই তো দুনিয়ায় সত্যিকারের কারবার—এতে যত আনন্দ, যত গন্ধ, যত গান, যত ছন্দ, তেমনি আবার ততই নিরানন্দ ও অরাজকতা বিরাজ করে। মানুষ কিন্তু আলো ছেড়ে চলে যায় অন্ধকারের অতল গর্ভে তার কাল ওড়না দিয়ে নিজেকে ঢেকে কবর দিতে।

এমনি ভাবেই দাদার বন্ধুত্ব ভেঙে যায় আর তার পরিবর্ত্তে আসে তার ছোট ভাইটির ওপর বরফের-মত-ঠাণ্ডা বিদ্রূপ-বাণী।

যাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না আমার—তবু আমারই মত এক নিঃস্ব বন্ধুর কথা শুনে, সুরেন বাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকায় গিয়ে উপস্থিত হলুম……চাকরির খোঁজে।

গরীবের আবার আশা !

সুরেন বাবু দূর হতে দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন—আয়ত দুটী নয়ন তাঁর দেখতে দেখতে জবার রঙ্ ধারণ কোরলো। একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, "আজ সকাল থেকেই অযাত্রার মুখ দেখলুম, না জানি দিনটা কি ভাবে কাটবে" পরক্ষণেই আবার চীল-চেঁচান চেঁচিয়ে চাকর ডেকে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। দয়া কোরে যদি তিনি নিজেই তাড়িয়ে দিতেন, তা হলেও না হয় এক সান্ত্বনা ছিল—গরীবের এই প্রাপ্য !

সান্ত্বনা !?

তাই ছিলুম আমি ভবঘুরে—লাঞ্ছিত হয়েও প্রতি দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াতুম।

এমনি কোরেই আমার সাতটি বছর এক-একটি কোরে কালের কোলে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে—রেখে গেছে তাদের পেছনে স্মৃতির শুষ্ক একটি মালা, আর নিয়ে গেছে এক মাত্র আশ্রয় আমার বড় ভাইটিকে !

একটা দু'য়ানি একদিন রাস্তায় পেয়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে গেছি কিছু খাবার কিনতে, এমনি সময়ে এক বৃহৎ মোটর গাড়ী আমার কাছে এসে সশব্দে দাঁড়াল। ভাবলুম একি নিয়তির পরিহাস ! বিশ্বাস আমার আদবেই হয় নি যে, কেউ মোটরে চড়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে। সাহস ভরে দেখলুম সেই মেমসাহেব যাকে আমার দাদা বাংলা শেখাতেন, সঙ্গে তাঁর স্বামী এবং আধ-ফুটন্ত গোলাপের মত সুন্দর চার পাঁচ বছরের একটি মেয়ে। তিনি আমায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বললেন, "ডিয়ার সি,
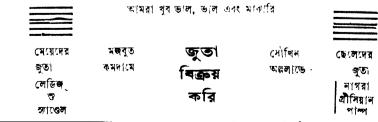
আমি তোমাকে খুঁজিয়াছি—আমার মেয়েকে পোড়াইতে হইবে ব্যাড়লা অড্ ইংরাজী বোল্।"

আনন্দে আমি অচল, তাকে ধন্যবাদ অবধি জানাতে ভুলে গিয়েছিলুম!

তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিলুম! মনের জানালাগুলো আজ উন্মুক্ত—মুক্ত বাতাসে প্রতি ধূলিকণাটি অবধি পরিস্কার হয়ে গেল!

কত বিনিদ্র এবং অর্দ্ধ-বিনিদ্র রজনী কাটাবার পর আজ আবার সুখনিদ্রার তৃপ্ত-জলে তলিয়ে গেলুম। সোণালী স্বপ্ন তার ফুরফুরে হাওয়ায় আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। তার রঙীন রাজত্বের এধার-ওধার ঘুরে চড়লুম এক ট্রেণে। আমি আর সাত-আট বছরের একটি মেয়ে, নামটির সন্ধান পরে পেলুম—'নীলিনা', এবং তার মা। হাতে ছিল আমার সিগারেট, সসম্ভ্রমে আমি লুকিয়ে ফেললুম। মেয়েটির মা আমায় বলে উঠলেন, "আমার সামনে লজ্জা কি, আমি তোমার মা, মার কাছে কিছু লুকাতে নেই।"

যেন কত কালের পরিচয়—কত কালের স্নেহ আজ মূর্ত্ত হয়ে দেখা দিয়েছে!

মাথা আমার নুয়ে পড়েছিল, তবে এ-কথা স্বীকার কোরবো মিথ্যার দায়ে দোষী হতে হবে যে আমি ধূমপান স্থগিত রেখেছিলুম!

মেয়েটিও আমাকে 'দাদা' বলে ডেকে তার প্রাণের যত কথা এক নিঃশ্বাসে উজাড় কোরে দিল।

কতক্ষণই বা আলাপ কিন্তু কত আপনার! দাদাটির সঙ্গে যেন আজ বছর তিনেক দেখা হয় নি, তাই সব কথা মনের কোণে জমা হয়ে গুমরে উঠছিল।

কিন্তু আমার সব চেয়ে এই বিষয়টি আশ্চর্য্য লাগছিল যে এর কোনো কথাটি অবান্তর নয়। কোনো শিক্ষিতা বৃদ্ধাকে এই বালিকার ছদ্মবেশে রাখাই যেন বিধি অলক্ষ্যে বসে আছেন তাঁর আনন্দ!

উচ্চ অভিনেতৃ হবার নীলিনার একমাত্র কামনা।

এ-কথায় সে-কথায় বলে উঠলো, "আচ্ছা প্রভাতদা, তোমার চণ্ডীদাস বইখানা কি রকম লাগলো?"

"আমি তো পড়িনি নীলিনা।"

"আমিই কি পড়েছি, চণ্ডীদাস বায়স্কোপের কথা বলছি।"

"আমি জীবনে একবারই সিনেমা দেখেছি, বইটির নাম 'অশ্রু ও বিচ্ছেদ'।"

নীলিনার ডাগর-ডাগর চোখ দু'টা থেকে বিস্ময় ঠিকরে পড়তে লাগলো! তার চোখের ভাষার অন্ত নেই—যেন একখানি কাব্য!

উচ্ছ্বাস আর চাপতে না পেরে আমি বলে উঠলুম, "নীলিনা, তুমি একখানি কবিতা!"

এতক্ষণে তার কোমল অধরের পেলব পাপড়ি দু'খানি কেঁপে উঠলো, বললে, "আমি আজ প্রথম শুনলুম যে, পৃথিবীতে একজন আছে সে চণ্ডীদাস দেখেনি।" একটু স্তব্ধ হয়ে বোধ হয় তার দুঃখ সামলে নিয়ে অভিমানের সুরে বলতে সুরু কোরলো,

"তা হলে আর তোমাকে উমাদির বিষয় কি বলবো—কি সুন্দর তাঁর পাট!"

পরক্ষণেই আবার বলে উঠলো, "আমার কি মনে হয় যেন প্রভাতদা?—আমার ইচ্ছে হয় আমি একজন ম—স্ত বড় উমাদির মত হয়ে উঠি। কিন্তু তাহলে উমাদির কাছে গিয়েই শিখতে হয়............আলাপই বা করিয়ে দেবে কে।"

যেন একটা চাপা দুঃখ সারাঙ্গীর মূর্চ্ছনার মত থেকে-থেকে ফেটে-ফেটে বেরুতে চেষ্টা কোরল!

তার ভক্তি দেখে সত্যই বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলুম!—এমনি ধারা ক'জন আছে যে একজন অপরিচিতাকে দিদির সিংহাসনে বসাতে পারে?

মা আর থাকতে পারলেন না, বলে উঠলেন, "তোর যত আদাড়ে সখ! ছেলেমানুষে কি থিয়েটার বায়স্কোপ নিয়ে মাতে।"

নীলিনার নীলিম চোখে দুষ্টু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। অজস্র হাসির ধারা ছুটিয়ে বললো, "মা তুমি সেকেলে লোক, এ-সব কিছুই বুঝবে না। তার চেয়ে একটা মালা নিয়ে ঠক্-ঠক্ কর। কিন্তু তুমি

প্রভাতদা এবার এলেই দেখো, তার পরে বলবে, "সত্যিই নীলিনা এমনটি আমি দেখি নি।" আমি তো আমার দাদুকে বলেচি উমাদির কোনো প্লে এলেই আমাকে.........

হঠাৎ গাড়ীর বেগ একেবারে মন্দীভূত হয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে চীৎকার আর কান্না শোনা গেল, "একি আমার সর্ব্বনাশ হল।"

এই কান্নার রোলে আমারও ঘুম ভেঙে গেল—বাস্তব জগতে ফিরে এলুম, কিন্তু মনটাকে যেন সেই ট্রেণের মধ্যে সেই নীলিনার পাশেই ছেড়ে এসেছি! আকাশও বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে—ঘরের মাঝখানে এক টুকরো সূর্য্যের আলো আমার সেই বোনটির প্রদীপ্ত হাসির মত ফেটে পড়েছে। পাশের বাড়ীর গ্রামোফোনের আওয়াজ ভেসে আসছে, "স্বপন যদি মধুর এমন, হোক সে মিছে কল্পনা, জাগিয়ো না আমায় জাগিয়ো না।"

অনেকের অনেক কথাই শুনেছি, মনের মাঝে কিছুই রেখাপাত করেনি কিন্তু আমার সেই ছোট স্নেহের বোন নীলিনার কথা কিছুতেই ঠেলতে পারবো না। তাই ভাবি, চণ্ডীদাস এবার যদি কখনো আসে তবে উমাদির অভিনবত্ব দেখবার জন্য আমাকে ছুটে যেতেই হবে! কিন্তু নীলিনা সাথে না থাকলে কি আনন্দ পাব, না বুঝতেই পারবো?
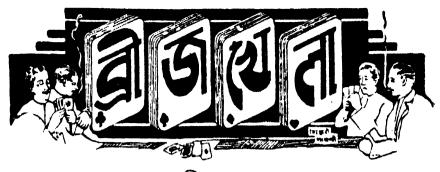
শ্রীদুর্ব্বাসা

ব্রীজ খেলায় সঙ্কেত ও তার তাৎপর্য্য :—গত সংখ্যার খেয়ালীতে "রঙের খেলায় প্রাথমিক চাল" নিবন্ধে সঙ্কেত (signal) কথাটির উল্লেখ করেছিলাম কিন্তু ঐ শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি সে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। সুতরাং এবার এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সঙ্কেত অর্থে পাঠকবর্গ যেন মনে করবেন না যে কোন প্রকার মুখভঙ্গী বা অন্য কোন প্রকার গোপনীয় ভাবের অভিব্যক্তির দ্বারা ক্রীড়ক তাঁর খেঁড়ীকে তাঁর হাতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলেন। অপর পক্ষে মাত্র কতিপয় তাস বিশেষের খেলার দ্বারা বা "না খেলার" দ্বারা কি তাস ক্রীড়কের হাতে আছে বা তাঁর হাতে নাই সঙ্কেত করা হয়ে থাকে। এই সঙ্কেতের দ্বারা নিম্নলিখিত পাঁচ রকম অবস্থার কথা জ্ঞাপন করা হয়।

(১) ক্রীড়ক যদি ছোট তাস দিয়ে পিট ধরেন তা' হ'লে বুঝতে হবে যে তাঁর হাতে তদপেক্ষা বড় তাস বর্ত্তমান। মনে করুন আপনি ইস্কাবনের আটা খেলেছেন, রঙ কর্ত্তার খেঁড়ী নয় দিয়েছেন আর আপনার খেঁড়ী বিবি দিয়ে পিট নিলেন। অর্থাৎ এই বিবি দিয়ে পিট নিয়ে আপনার খেঁড়ী আপনাকে বলে গেলেন যে, "বন্ধু, আমার হাতে সাহেবখানিও বর্ত্তমান।" কিন্তু তিনি যদি সাহেব দিয়ে পিট ধরতেন তা' হলে বুঝতে হত যে রঙকর্ত্তা বিবিখানি পেয়েছেন। এতদ্ব্যতীত ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ক্রমানুযায়ী বড় তাস হাতে নিয়ে (honours in sequence) প্রথম চাল দিতে হলে সর্ব্বোচ্চ তাসখানি খেলাই বিধেয় কিন্তু অন্যের খেলায় ক্রমানুযায়ী তাস থেকে নিম্নতম তাসখানি দেওয়াই উচিত। ধরুন কোন রঙে আপনি পেয়েছেন সাহেব বিবি গোলাম দশ নয়; এখন যদি এ রঙে পেড়ে খেলতে চান্ তবে আপনাকে দিতে হবে সাহেব, অপরপক্ষে অন্যের খেলায় সে ক্ষেত্রে নয় দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

(২) যে পিট আপনি পাবেন না সে পিটে

(ডামি।)

ইস্কাবন—টেক্কা, দশ, নয়।
হরতন—বিবি, চৌক্কা, তিরি।
রুহিতন—সাহেব, দশ, ছক্কা, চৌক্কা, তিরি।
চিড়িতন—নয়, সাতা।

আপনি খেল্‌লেন
ইস্কাবনের আটা

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, সাতা।
হরতন—সাহেব, আটা, চৌক্কা, দুরি।
রুহিতন—বিবি, সাতা, দুরি।
চিড়িতন—দশ, চৌক্কা, তিরি।

তাস দিতে হলে সাধারণতঃ ছোট তাস দেওয়াই নিয়ম সঙ্গত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তদ্রূপ না হয়ে যদি ক্রীড়ক কোন বড় তাস ফেলেন তবে বুঝতে হবে যে ক্রীড়কের এই চালে কোন অভিসন্ধি বর্ত্তমান যদ্দ্বারা তিনি খেঁড়ীকে কোন বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করছেন। এরূপ উচ্চতম-নিম্ন-তাস পাশানকে (high-low discard) ইংরাজিতে Echo বলা হয়ে থাকে। মনে করুন আপনি রুহিতনের সাহেব খেলেছেন, রঙকর্ত্তার খেঁড়ী

(ডামি।)

ইস্কাবন—সাহেব, আটা, পাঞ্জা।
হরতন—ছক্কা, চৌকা, তিরি।
রুহিতন—আটা, চৌকা, তিরি।
চিঁড়িতন—নয়, সাতা।

আপনি রুহিতনের সাহেব খেলেছেন।

ইস্কাবন— বিবি, দশ, নয়।
হরতন—সাহেব, সাতা, পাঞ্জা, দুরি
রুহিতন—বিবি, সাতা, দুরি।
চিঁড়িতন—দশ, আটা, পাঞ্জা।

যে কোন তাস দিয়েছেন, আপনার খেঁড়ী দিলেন সাতা; পুনরায় আপনি যখন রুহিতনের টেক্কা খেললেন আপনার খেঁড়ী দিলেন রুহিতনের দুরি। এ ক্ষেত্রে প্রথমে সাতা ফেলার পর দ্বিতীয় পিটে দুরি দেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, "বন্ধু, আমার হাতে রুহিতনের বড় তাস বর্ত্তমান তুমি আবার ঐ রঙ খেল।"

(৩) এ ক্ষেত্রে ক্রীড়ক বড় তাস দেবার পর সেই রঙে ছোট তাস দিয়ে ঘোষণা করেন, "বন্ধু, তুমি পুনরায় ঐ রঙে চাল দাও, আমি তুরূপ করে পিট নেব।" মনে করুন আপনি হরতনের সাহেব খেলেছেন আর আপনার খেঁড়ী সেই রঙের সাতা দিয়েছেন; অতঃপর

(ডামি।)

হরতন—বিবি, দশ, ×, ×।

আপনি খেলেছেন হরতনের সাহেব।

হরতন—সাতা.

আপনার টেক্কা খেলার বেলায় আপনার খেঁড়ী চক্কা দিলেন এবং পুনশ্চ সেই রঙে চাল দেওয়ায় আপনার খেঁড়ী তুরূপ করে পিট নিলেন। মোটের উপর (২) ও (৩) চালের অবস্থা প্রায় একরূপ কারণ প্রথমোক্তটি বড় তাসের দ্বারা পিট ধরবার ক্ষমতা প্রকাশ করছে, আর অন্যটি তুরূপ করবার ক্ষমতা জানিয়ে দিচ্ছে।

(৪) চতুর্থ নিয়মেও উচ্চতম নিম্ন তাস (high-low card) পাশিয়ে যাওয়া নিয়মানুমোদিত কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই পাশানর দ্বারা ক্রীড়ক বলেন, "বন্ধু, যে রঙে খেলা হচ্ছে সে রঙ না খেলে যে রঙ আমি পাশাচ্ছি সেই রঙে খেল আমি পিট ধরব।" এখন ধরুন আপনি চিঁড়িতনের সাহেব খেলেছেন আপনার খেঁড়ী তাতে ইস্কাবনের নয় ঘুশিয়ে দিলেন। এ ক্ষেত্রে ইস্কাবনের নয় পাশিয়ে তিনি বলতে চাইছেন, "বন্ধু, তুমি সত্বর ইস্কাবন খেল, আমি ঐ রঙে নিশ্চয় পিট ধরব।" তবে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শুধুই খেঁড়ীর পিটে ঐ অর্থ প্রকাশ লাভ করে তা' নয়, বিপক্ষ দলের পিটেও ঐ অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন ধরুন বিপক্ষদল ফেরাইএর খেলায় কোন রঙে পিট টানতে আরম্ভ করেছেন আপনার হাতে সেই রঙ না থাকায় ছয়ের চেয়ে বড় অন্য রঙের একখানি তাস আপনি পাশিয়েছেন। ঐরূপ পাশান দেখে আপনার খেঁড়ী বুঝে নিলেন যে তাঁর পিট পাবার পর তিনি উক্ত রঙে চাল দিতে আদিষ্ট হচ্ছেন।

* (৫) উচ্চতম-নিম্ন-তাস পাশিয়ে নিম্নতম তাস পাশান যেমন আবাহনমূলক, নিম্নতম

(ডামি।)

চিড়িতন—বিবি, গোলাম, ×, ×।

আপনি খেলেছেন চিড়ের সাহেব।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, নয়, ×।
চিড়িতন—নাই।

চন্দ্র ফিল্মসের

পরপারে

বিভিন্ন চরিত্রের রূপশিল্পী

শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী
শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
শ্রী নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
শ্রী ভূমেন রায়
শ্রী শৈলেন চৌধুরী
শ্রী সন্তোষ সিংহ
শ্রী অনুপম ঘটক

সত্বাধিকারী

ডি, এল্, রায়ের

পরপারে

* প্রথম অর্ঘ্য *
নব পরিকল্পনায় দেখা দিবে

পরপারে

শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা
শ্রীমতী বীণা
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা
শ্রীমতী নিঃভাননী

— পরিচালক —
জনপ্রিয় আলোকচিত্র শিল্পী
শ্রী যতীন দাস

সুরশিল্পী
শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চন্দ্র

তাস পাশিয়ে উচ্চতম নিয় তাস পাশান তদ্রূপ বিরতিমূলক। নিম্নতম তাস পাশিয়ে পরের পিটে তদপেক্ষা বড় তাস পাশানর দ্বারা ক্রীড়ক পুনশ্চ খেঁড়ীকে সেই রঙে খেলতে নিষেধ করেন। যেমন ধরুন, আপনি হরতনের সাহেব খেলেছেন, আপনার খেঁড়ী ছরি ফেলেছেন; তৎপরে আপনি যখন পুনরায় সেই রঙের টেক্কা খেললেন আপনার খেঁড়ী তখন সেই রঙের সাতা দিলেন। অতএব ফলতঃ আপনাকে বুঝতে হবে যে খেঁড়ী আপনাকে বলছেন অন্য কোন রঙে চলে যেতে, কেন না এই রঙে তাঁর বিশেষ সুবিধা হবে না। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে আমার এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করব। এই সঙ্কেতটি অধিকাংশ খেলোয়াড়ের অজ্ঞাত। এটি হচ্ছে রঙের সঙ্কেত, ইংরাজিতে Trump Echo বলা হয়ে থাকে। হাতে যখন মাত্র তিনখানি রঙ বর্ত্তমান এবং তন্মধ্যে দুইটী রঙ অকর্ম্মণ্য, অর্থাৎ যদি আপনার হাতে থাকে দশ তিরি ছরি বা গোলাম ছক্কা চৌকা তখন প্রথমে মধ্যবর্ত্তী তাসখানি ফেলে দিয়ে তৎপরে নিম্নতম তাসখানি ফেলাই বিধেয়। ইহার ফলে খেঁড়ী বুঝতে পারবেন যে আপনার হাতে সর্ব্বশুদ্ধ তিনখানি রঙ ছিল এবং

ইস্কাবন—দশ, চৌকা, তিরি।
হরতন—পাঞ্জা, চৌকা, তিরি।
রুহিতন—টেক্কা, ছক্কা, পাঞ্জা।
চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, আটা।

ইস্কাবন—নয়।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, দশ, ছক্কা।
রুহিতন—নয়, চৌকা, ছরি।
চিড়িতন—দশ, পাঞ্জা, তিরি, ছরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, পাঞ্জা, ছরি।
হরতন—আটা, সাতা, ছরি।
রুহিতন—সাহেব, দশ, আটা, তিরি
চিড়িতন—নয়, ছক্কা, চৌকা।

আপনি খেলেছেন হরতনের সাহেব, আপনার খেঁড়ী দিলেন ছরি; অতঃপর টেক্কা খেলার বেলায় সাতা দিয়ে তিনি জানালেন, "বন্ধু, পুনশ্চ এই রঙে চাল দিও না অন্য কোন রঙে চলে যাও, কারণ এ রঙে মোটেই আমার পিট নাই।" কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধরুন যদি তিনি এ সংবাদ দিতে না পারতেন তা' হ'লে বিপক্ষদল অনায়াসে খেলা করে নিয়ে যেতেন। অথচ এই সংবাদ দানের ফলে ক্রীড়ক রুহিতনে চলে যাওয়ায় বিপক্ষদলের 'গেম' একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

এইবার শেষ সঙ্কেতটির সম্বন্ধে কিছু বলে তুরুপ করবার নিমিত্ত এখনও একখানি রঙ হাতে বর্ত্তমান।

* উচ্চ তাস (High Card)—টেক্কা, সাহেব, বিবি; নিম্ন তাস (Low Card)—ছরি, তিরি, চৌকা, পাঞ্জা; উচ্চতম-নিম্ন তাস (High-low Card)—ছক্কা, সাতা, আটা, নয়; নিম্নতম-উচ্চ তাস (Low-high Card)—গোলাম, দশ

জীন হারলো

হলিউডের বিবাহিত জীবন স্থায়ী হয় না কেন?

= শামশের আজাদ =

আমেরিকার বিখ্যাত-মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ লুই, ই, বিস তাঁর বিজ্ঞান সম্মত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, ফিল্ম ষ্টারদের শান্তিময় বিবাহিত জীবন অসম্ভব কেন, সেই প্রবন্ধ অবলম্বনে নিম্নের প্রবন্ধ লেখা হ'ল।

গ্লোরিয়া সোয়ানসন

ছায়াচিত্রের 'ষ্টার'দের জীবনযাত্রার ধরণ বিশ্লেষণ করলে বেশ বুঝতে পারা যাবে যে, তারা খুবই বুদ্ধিমান, সামাজিক-রীতিনীতি বজায় রাখবার দিকে তাদের ঝোঁক পুরোদস্তর; অমায়িক ব্যবহার ও ভব্যতা যেন তাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কি রকম পোষাক পরতে হয়, কি পোষাক পরলে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক দেখায় সে আর্ট জ্ঞানটা ওদের একেবারে একচেটিয়া। আর সেই আর্ট জানা আছে ব'লেই সাধারণ মানুষের চেয়ে ওদের দৈহিক অবয়ব মানুষের সাধনার বস্তু। তবে মানুষের মনের কোণে সাধারণতঃ যে সব আশা-আকাঙ্খা ভীড় করে উঁকি মারে, ওদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় না। ওরাও চায় ভালবাসা, চায় একখানি সুখ-শান্তির নীড় রচনা করতে—এবং মানুষের পরম চাওয়া—একটী সন্তান এও তাদের আশা-আকাঙ্খার অন্যতম সামগ্রী, শ্রেষ্ঠতম কাম্য। আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়, যখন দেখা যায়—এরা ফিল্ম কলোনীতে বাসা বেঁধে একেবারে খাঁটি গৃহস্থের মত সংসার ধর্ম্ম পালন কর্চ্ছে। কিন্তু আবার এই ষ্টারদের বিবাহিত জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এই জীবনের পরমায়ু তাদের কত অল্প। এরা বিবাহিত-জীবন দীর্ঘস্থায়ী করতে ত পারেই না, বিবাহিত জীবনের যে স্বল্প পরমায়ু তাকেও সুখী করতে পারে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমতঃ জুন নাইটের কথা ধরা যেতে পারে। তাঁর দাম্পত্য-জীবনের অবসান হয় বিয়ের পাঁচদিন পরে, বিয়ের পাঁচদিন পরে স্বামী-ত্যাগ, এটা দাম্পত্য-জীবনের একটা রেকর্ড বলতে হবে। কিন্তু জুন এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে এক পক্ষের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে বিয়ের বাঁধন ছিঁড়বার জন্যে মামলা করে ঠিক এক মাসের মধ্যেই তিনি আবার আগের মত মুক্ত স্বাধীন জীবনে ফিরে গেলেন।

জিন হার্লোকেও রেকর্ড সৃষ্টিকারীদের দলে ফেলা যায়। তিনি অবশ্য তাড়াতাড়িতে জুনকে এঁটে উঠতে পারেন না, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা তাঁর অনেকগুলি। চার্লস ম্যাক গ্রু, পল বার্ণ ও হল রসন এই তিন-জনকে তিনি একে একে স্বামীত্বের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করেছেন। এখন গুজব তিনি উইলিয়ম পাওয়েলের জন্য নিজের বুকে প্রেমের সিংহাসন রচনা কর্চ্ছেন।

গ্লোরিয়া সোয়ানসন শেষ পর্য্যন্ত কত-জনকে যে স্বামীগিরির সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন তার একটা খতিয়ান করা দরকার।

ফিল্মরাজ্যের মহারাণী, আমেরিকার জন-প্রিয় অভিনেত্রী মেরী পিক্‌ফোর্ড ও ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্‌-এর বিবাহ বিচ্ছেদটা কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এদের দাম্পত্য-জীবন বেশ স্থায়ী হয়েছিল। এবং অকস্মাৎ তার শেষ পরিণতি যে এরূপ শোচনীয় হবে তা কেউ ধারণা করতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটে গেল।

অন্যান্য যে সব ষ্টার বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক-জনের নাম করতে গেলে প্রথমে মনে পড়ে ছোট ডগলাস ও জোয়ান ক্রফোর্ড, রিচার্ড ডিক্স ও উইনি, ফ্রেড কো, রুথ চ্যাটার্টন ও জর্জ ব্রেণ্ট, নিক ষ্টুয়ার্ট ও সু ক্যারল, আন হার্ডিঙ্গ ও হ্যারি ব্যানিস্টার, হুট গিবসন ও স্যালি আইলার্স; উইলিয়াম পাওয়েল ও ক্যারল লমবার্ড প্রভৃতির কথা। তবে এটা বিড়ম্বিত-জীবন ফিল্ম ষ্টারদের সম্পূর্ণ তালিকা নয়—তালিকা করতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থেও স্থান সঙ্কুলান হবে না।

কতগুলো ষ্টার বিবাহ বিচ্ছেদ করলো তার তালিকা দেওয়া আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য, ষ্টাররা অন্য মানুষের মত স্থায়ী বিবাহিত জীবনলাভ করে না কেন, তার আলোচনা করা। তারা পরস্পরকে

ভালবাসে, যখন ভালবাসার মধ্য দিয়ে তারা মিলিত হয় এবং সুখের নীড় রচনা করে, তখন তাদের মধ্যে এমন কি ব্যাপারের সৃষ্টি হয় যার ফলে তারা হয় অস্থির-চিত্ত এবং তাদের জীবন মনে হয় বিড়ম্বনা-পূর্ণ ? সত্যই কি তারা প্রেমের ব্যাপারে ভিন্নধর্ম্মী ?

মনস্তত্ব এই জটিল সমস্যার একটা সমাধান নাকি খুঁজে পেয়েছে। মানুষের মন নিয়ে যাঁরা বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে ফেলে যাচাই করেন তাঁরা জানেন, যে, যারা বছরের পর বছর মানুষের প্রেম-ভালবাসায় গল্পকে রূপালি পর্দ্দার বুকে রূপায়িত করে তোলেন, ভাবে ও ভাষায়, ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম ও ভালবাসার ব্যাপারে তাঁদের অবস্থা এত নিরাশা-জনক কেন ? তাঁদের মতে যে সকল ঘটনার সংমিশ্রণে মানব-মন গড়ে ওঠে, তাকে জানা কিছু কঠিন নয়।

প্রথমে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মিথ্যা অভিনয় ষ্টারদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য—এই-ই তাদের অবলম্বন। কাজেই মিথ্যার বা অভিনয়ের ভিত্তির উপর ষ্টারদের জীবন ওঠে গড়ে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ষ্টাররা যখন কাজের মধ্যে নিজেদেরকে একেবারে ডুবিয়ে রাখে তখন তারা হয়ে থাকে যেন অন্য জগতের মানুষ। নিজস্ব সত্ত্বা তাদের আদৌ থাকে না। একটা ছবিতে কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী হয়ত একটা দুষ্ট স্বার্থ-সর্ব্বস্ব মানুষের কবলে পতিত নির্দ্দোষ ও সরল মানুষের ভূমিকায় নামলো, এবং সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রী তার দ্বিতীয় ছবিতে নামলো হয়ত একটা খুব হিসেবী অর্থ-গৃধ্নু মানুষের কূট চরিত্র ফুটিয়ে তুলবার জন্যে। এবং তৃতীয় ছবিতে তাকে হয়ত নামতে হল ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী এক রহস্যময়ী নারীরূপে।

অনেকে মনে করেন, এই রকম বিভিন্ন ধরণের ভূমিকায় একই অভিনেতা অভিনয় করতে চায় না, বা তারা তা করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিক তার বিপরীত। তারা বার বার একই ধরণের ভূমিকা দিলে বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে।

তাদের এই মনোবৃত্তির কারণ খুঁজতে হলে আমাদের বেশীদূর যেতে হবে না। আমরা দেখি, মানুষ যতক্ষণ না কোন এক কাজের সঙ্গে নিজের মনকে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পারে ততদিন সে কাজে তার মনকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারে না। কিন্তু মানুষ অনেক সময় অবস্থা বিপর্য্যয়ে কোন কাজ হাতে নেয় এবং সেই অবাঞ্ছিত কাজ করতে করতে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে মানুষ অজ্ঞাতসারে সেই কাজকেই নিজের আকাঙ্ক্ষিত ধন মনে করে। এবং তাইই অবশেষে মানুষের সিদ্ধির সোপান হয়ে দাঁড়ায়।

অভিনয় ব্যাপারেও এই কথা খাটে। যে হবে প্রকৃত অভিনেতা, শৈশব থেকেই তার
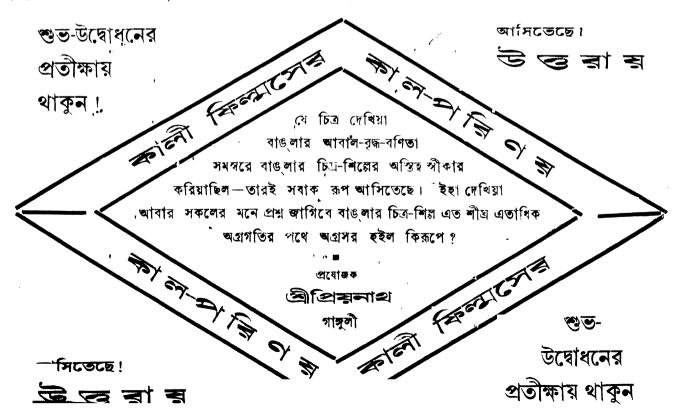
প্রতিভার স্ফুরণ হয়। ছয় সাত বৎসর বয়সেই শিশু তার ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল জীবনের প্রবেশ দ্বারে করাঘাত করে। এই সময় থেকে তাকে দেখা যায় যে, সে একেবারে অবিকলরূপে একটা মানুষের আচার ব্যবহার ও হাব-ভাবকে অনুকরণ কর্চ্ছে। তার পোষাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনের মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটে বেরোয়, যা তার অন্য সব সাধারণ খেলার সাথীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে না। ষোল বৎসর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিভা নাটমন্দিরে অথবা ছায়াচিত্রের পর্দ্দায় স্ফুরিত হবার জন্য ব্যাকুল হবে। এবং এই হবে তার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল জীবনের প্রথম যাত্রারম্ভ।

"একবার যে অভিনয় করে, অভিনয় করেই তার জীবন কাটে—" এই মূল্যবান কথাটা জনৈক চিত্রাভিনেতার মুখে শুনা গিয়েছিল। একথায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন তা সহজেই বুঝা যায়। অভিনয় জিনিষটা এমন এক বৃত্তি, যা অবলম্বন করলে মানুষ অন্য কোন বিষয়ে নিজেকে নিয়োগ করতে পারে না।

সেই জন্যই, এবং ষ্টারদের অশান্তিময় বিবাহিত জীবন আলোচনা করে আমরা দেখতে পাই, যে তারা ষ্টুডিয়োতে থাকা কালে আর বাইরের অনুভূতি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ থাকে না—এবং ষ্টুডিওর মধ্যে যে রকম ভাবে তাদের তৈরী করা হয়, তার বাইরেও তারা নিজেদেরকে ঠিক সেই রকম ভাবে সব সময় তৈরী হতে চেষ্টা করে। তার ফলে বাস্তব জীবনেও তারা অভিনয় ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

কাজের মধ্যে তারা সব সময় ভালবাসার অভিনয় করে। এবং নিজের পরিবারের উপর ভালবাসার সেই অভিনয়ের প্রভাব যথেষ্ট পড়ে। ভালবাসার ভান করে করে তাদের মনের অবস্থা এত শিথিল হয়ে গিয়েছে যে, তার ফলে মনের দৃঢ়তা তারা হারিয়ে বসেছে, মনের যে খাঁটি মমত্ববোধ ও স্নেহ-প্রীতি সেটা যে তাদের নিজস্ব, সেটা যে মিথ্যা নয়, সত্য, এ বোধ তাদের থাকে না।

অভিনয় আর অনুভূতি এক জিনিষ নয়। কাজেই হলিউডের ইতিহাস স্রষ্টাদের বিবাহিত জীবনের সমাপ্তি টানা-হেঁচড়ার মধ্যে হতে দেখলে তাতে খুবই আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। মনে করুন, আপনি কেবলই প্রেমের অভিনয় কর্চ্ছেন, প্রেমকে অনুভূতি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা না করে কেবলই ভান করে চলেছেন, এর ফল কি হবে? আপনি কখনও সত্যিকার ভাবে কাউকে ভালবাসতে পারবেন না। অন্যকে আপনি যে ভালবাসা দিবেন তা খাঁটী অন্তর দিয়ে ভালবাসা অথবা ষ্টুডিওর ভালবাসার প্রাণহীন অনুকরণ, তা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না।

ষ্টারদের মনোবৃত্তি অন্তপ্রর্বাহী। এটা বৈজ্ঞানিকদের মত। ষ্টারদের মনোবৃত্তির যে প্রবাহ তা বহির্মুখী ত নয়ই, বরং অন্তর্মুখী। এক কথায় এরা কল্পনা-বিলাসী। কখনও এদের দেখা যায় অতি উৎফুল্ল, কখনও হয়ত ক্ষণে ক্ষণে অতিরিক্ত বিমর্ষ, এ ধরণের মানুষ কিন্তু সব সময় বাস্তব জীবন থেকে থাকে বহু দূরে। অন্তপ্রর্বাহী মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ বহির্জগতের সঙ্গে কখনো নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। সে সব সময় নিজের চিন্তার সঙ্গে খেলা করে—নিজের মনের সাথে চলে তার আলাপ আলোচনা।

প্রত্যেক আর্টিষ্টের চরিত্রই ঠিক এই মনোবৃত্তি দিয়ে গড়া। তারা খামখেয়ালী, কমবেশী গম্ভীর এবং বাইরের জগতের সাথে

হ্যারল্ড লয়েড,

লাওনেল ব্যারীমুর

ফ্রেডরিক মার্চ

এরা সুখী পরিবারের অন্যতম

সম্পর্ক শূন্য বলে তাদের সাহচর্য্য মানুষের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

একথা মনে রাখা দরকার যে, ষ্টাররা নিজেদের একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করে ফেলে এবং তারা নিজেরাই দলবদ্ধ হয়ে থাকে বহির্জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে। এমন কি, তারা জগতের প্রাত্যহিক সংবাদ পর্য্যন্ত রাখে না, জগতের কোথায় কি ঘটলো তার খোঁজ নেবার জন্য মাথা ঘামায় না।

এই রকম দলবদ্ধ হয়ে বাস করার ফলে তারা নিজেদের 'ষ্টার' সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্য সকলেও পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু বিবাহের ফলে যা স্বাভাবিক, তাই ঘটে যায়। একই বৃত্তির মানুষ বলে দম্পতিদের মধ্যে মিলন স্থায়ী হয় না। সেই জন্য এর প্রতিকার করতে হলে পুরুষ ষ্টারকে এমন মহিলাকে বিয়ে করতে হবে যে কল্পনা-প্রিয় ত নয়ই, বরং পাচিকা ও মাতা-সাজতে যার থাকবে বিপুল আগ্রহ এবং সংসার খরচ থেকে যে দু'এক ডলার বাঁচাতে পারবে। মহিলা ষ্টারকেও তেমনি একজন কর্ম্মক্ষম, পরিশ্রমী ব্যবসায়ী মানুষকে বিয়ে করতে হবে।

তবে সমস্ত ষ্টারদেরই যে বিবাহিত জীবন এইরকম ক্ষণস্থায়ী একথা বলা চলেন'। কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে যাঁরা বিবাহ ক'রে সাধারণ মানুষের মতই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাচ্ছেন। লায়নেল ব্যারীমুর, ফ্রেডরিক মার্চ্চ ও হ্যারল্ড লয়েড পূর্ব্বোক্ত সুখী পরিবারের অন্যতম।

ষ্টারদের কাজ খুব আরামপ্রদ নয়। মানুষ যা নয় তাই হয়ে, যতক্ষণ না নিখুঁত ছবি তোলা হবে ততক্ষণ অভিনয় করা, এবং তীব্র আলো ও গরমের মধ্যে থেকে শব্দ রেকর্ড করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই রকম দুঃসাধ্য কাজ শেষ করে ষ্টাররা যখন ঘরে ফেরে তখন সামান্য উত্তেজনায় তারা ভীষণ রেগে যায়। ফলে কটুক্তি থেকে তাদের মধ্যে হয় কলহের সৃষ্টি। এবং সেই কলহ সাংসারিক জীবনের পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

ষ্টারদের মনোভাব পরিবর্ত্তনশীল। বিভিন্ন ভূমিকায়—অভিনয় করতে হয় ব'লে এই পরিবর্ত্তনশীলতা তার মনে স্থায়ী আসন দখল করে। কিন্তু, যখন গৃহস্থালীর ব্যাপারে কোন রকম অশান্তির উদ্ভব হয়, তখন ষ্টারদের এই পরিবর্ত্তনশীল মনোবৃত্তি তাদের কোন কাজে লাগে? দেখা গিয়েছে, কোন এক সামান্য কারণে দম্পতির মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে, কারণটা হয়ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তবুও ষ্টার-এর চঞ্চল মনোবৃত্তি তাকে পাগল করে তোলে। সে সব যুক্তি, সব বিচার বুদ্ধি ভুলে গিয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত তার জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে পথে বসিয়ে সরে পড়ে। এর ফলেই হলিউডের অসংখ্য বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার উদ্ভব।

পুরুষ ষ্টারগণ ছবির পর্দায় খাঁটি প্রেমিকের অভিনয় করলেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে তাঁর দ্বারা তা সম্ভব হয় না। এও তাদের অন্তঃপ্রবাহী মনোবৃত্তির জন্য। ভালবাসার বাস্তব ব্যাপারে তারা প্রেমিকার মন জয় করতে চায় না। কারণ সে প্রেরণা তাদের মধ্যে আসে না। তা ছাড়া পুরুষরা তাদের লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সমাদৃত হয়। অসংখ্য নারী তার সু-অভিনয়ের জন্য স্তুতিগান করে। প্রত্যহ সে অসংখ্য প্রশংসাসূচক চিঠিপত্র পায়। এ অবস্থায় সে ষ্টার যদি আত্মাভিমানী হয় তাতে কি আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কিছু থাকে?

আত্মাভিমানী ষ্টার খাঁটি প্রেমিক হতে পারে না। সে প্রেমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। বরং সে চায় নারীদের কাছ থেকে তোষামোদ। বিবাহিত হোক আর না হোক পুরুষ যদি খাঁটি প্রেমিক না হয় তবে সে নারীর হৃদয় জয় করতে কথনো সক্ষম হয় না।

ক্লদেৎ কল্‌বার্ট যে ছবিতে অভিনয় করে—সেই ছবিটিই উচ্চাঙ্গের—এই ব্যাপার দাঁড়িয়েছে আজকাল। সুনামের ওপর সুনাম, তারওপর সুনাম। আবার আসছে প্যারামাউন্টের আরেকটি বিখ্যাত চিত্র। "ব্রাইড্ কাম্‌স্ হোম্" এর নাম,

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

গ্রাম- ভ্যারিটি ফোন—পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৮শে ফাল্গুন ১৩৪২—12th. March, 1936. } ১১শ সংখ্যা

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

বিগত নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কয়েকজন বন্ধুবৎসল সামাজিক আমাদের লেখার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সধূমবাষ্প উক্তি প্রকাশ করেন। আর এতদ্ব্যতীত আমাদের সমালোচনা শেষ হইবার পরেও, সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে কয়েকজন স্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি লেখনীমুখে আমাদের সমালোচনার প্রতিবাদাদি জ্ঞাপন করেন। কেবল মাত্র করতালিতেই যাঁহারা আয়ত্তকর ও আয়ত্তদৃষ্টি —স্বরুচির পরিপোষক সিদ্ধান্তে অন্যথা দর্শনে যাঁহারা কেবল "হীন কটূক্তি" আবিষ্কার করিয়া থাকেন, উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ের লোকমর্য্যাদা অতিক্রমণকারী উচ্ছ্বাস পরিবেশনে যাঁহাদের চিত্তে অনুমাত্র শালীনতার ছায়াপাত হয় না—সেইরূপ ব্যক্তিবর্গের আলোচনার প্রতিবাদে লেখনী কলঙ্কিত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পক্ষপাতশূন্য নির্ব্যক্তিক সমালোচনার মুখে গুণ-দোষের আলোচনা প্রসঙ্গে গায়ক ও বাদকগণের সম্বন্ধে যাহা একান্ত ভাবে বলা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহারই আমরা অবতারণা করিয়াছি —আমাদের আলোচনায় তথাকথিত ভক্তহৃদয়ে যে বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেখা গিয়াছে—তাহা একান্তই স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য। ব্যক্তিবিশেষের তুষ্টি বিধানে বা দুঃখপ্রদানে লক্ষ্য না করিয়া মন্তব্য উপনিবদ্ধ করা হইয়াছিল কিন্তু অন্ধ স্তাবকতার মহিমায় ব্যাহত-দৃষ্টির যে নমুনা দেখা গিয়াছে—আলোচনার নামে যে ফেণিলোচ্ছল তারুণ্যের সন্ধান মিলিয়াছে তাহাতে দিগ্‌দর্শনের প্রয়াস অনুপেক্ষিত বলিয়াই মনে হয়। গুণ-দোষ বিচার প্রসঙ্গে যাঁহারা ব্যক্তি বিচার না করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বরূপ বুদ্ধিগোচর করিতে অসমর্থ---তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন আমরা তাঁহাদের জন্য সমালোচনা লিখি নাই---Classical সঙ্গীতের আভিজাত্য সম্বন্ধে যাঁহারা সচেতন—Classical সঙ্গীতের Conservatismএর অর্থ ও বৈশিষ্ট্য যে লঘুতর রূপান্তর-সহ নহে—ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম ও অনুভব করিবার শিক্ষা যাঁহারা সম্প্রদায় ক্রমে লাভ করিয়াছেন—সেই সকল সহৃদয়চিত্তে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে ভারতীয় সঙ্গীতের নিম্নাভিমুখী গতিরই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানে—আমরা যদি অনুমাত্র চিন্তা ও প্রশ্নের জাগরণে সমর্থ হইয়া থাকি —অন্ধ বিশ্বাস নিরাকরণ করিয়া—আমরা যদি কাহারো মনে সঙ্গীত, সঙ্গীতজ্ঞ ,ও তৎগোষ্ঠীর পূর্ব্বাপরধারা সংরক্ষণের পরিণতি ও পরিস্থিতির স্বরূপ সম্বন্ধে তত্ত্বান্বেষী সন্দেহের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে। এই সম্পর্কে যদি ব্যক্তিবিশেষের মনঃক্ষোভের কারণ হইয়া থাকি তাহা হইলে আমরা অনন্যোপায়। ৺রাধিকা গোস্বামীর কোন শিষ্য যদি 'এরি হারি ননদীয়া' গাহিয়াও পূর্ব্বাপরধারা সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য মাত্র এইটুকুই যে তিনি নিঃশঙ্কে তাহাই গাহিতে থাকুন

ও ঘরাণা বজায় রাখুন—তবে বুঝিবার ও বিচারের ভার কেবল তাঁহাদেরই উপর যাঁহারা সাধু সন্ধানী—শ্রোতা ও বোদ্ধা উভয়ই।

সঙ্ঘশক্তি ও নিয়মানুবর্ত্তিতা

যে কোনো সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের গোড়ার কথা নিয়মানুবর্ত্তিতা। নিয়মানুবর্ত্তিতাই শৃঙ্খলা ও শক্তির ভিত্তি। যুদ্ধারম্ভের মুহূর্ত্তে বা যুদ্ধের সময় যদি, সাধারণ সৈনিকগণ সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন বা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে যুদ্ধ অসম্ভব হইয়া উঠে। সামরিক জীবনে যেমনি, অসামরিক সাধারণ জীবনেও তেমনি নেতার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা, নেতার আদেশ সম্বন্ধে একান্ত নিয়মানুবর্ত্তিতা ভিন্ন কাজ চলেনা। ভুল হউক, আর ঠিক হউক নেতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতেই হইবে। সামরিক জীবনে ইহার ব্যতিক্রম হইলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অসামরিক নাগরিক জীবনে তাহা নাই বলিয়া অনেক সময়ে কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ও অনাচার দেখা দেয়। এবারে করপোরেশন নির্ব্বাচনে এইরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। যেখানেই জেলা কংগ্রেসকমিটী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্ব্বাচন বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত হ'ন নাই, সেখানেই জেলাকংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কেহ কেহ নিজে-দের প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাইয়া তাঁহাদের গোপনে সমর্থন ও সাহায্য করিতেছেন। অনেকস্থলে কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেও দাঁড়াইয়াছেন। ইহাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একরূপ বিদ্রোহ বলা যাইতে পারে। ইহা যেরূপ লজ্জাকর, সেইরূপ নিন্দনীয়। সাধারণ কাউন্সি-লারের পদের লোভে যদি পুরাতন কংগ্রেসসেবীরা কংগ্রেসদ্রোহী হইয়া উঠেন, তাহা হইলে অধিকতর লোভের ক্ষেত্রে তাঁহারা কি করিবেন তাহা ধারণাতীত। এই কংগ্রেস-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে এখন হইতেই অভিযান না করিলে ভবিষ্যতে ইহা সংক্রামক হইয়া দেশের ঐক্য ও সঙ্ঘনীতির বিশেষ ক্ষতি করিবে।

:o:-

শ্রীদুর্ব্বাসা

উচ্চ তাস সংগঠনঃ—বড় তাস খেলা হয়ে গেলে তার পরবর্ত্তী তাস বড় হয়ে পড়ে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কোন বড় তাসের উপর তদপেক্ষা বড় তাস দিয়ে পিট নিলে তন্নিম্ন তাসখানি বড় হয়ে যায়। মনে করুন 'দ' বিবি খেললেন, 'প' দিলেন

হরতন—টেক্কা, গোলাম, সাতা।

হরতন—সাহেব, আটা, পাঞ্জা।

হরতন—বিবি, নয়, ছক্কা।
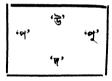
হরতন—দশ, চৌকা, বিবি, দুরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, ছক্কা, তিরি দুরি।

ইস্কাবন—সাহেব, সাতা,

ইস্কাবন—গোলাম, দশ, নয়।

ইস্কাবন—বিবি, আটা, চৌকা

সাহেব এবং 'উ' টেক্কা দিয়ে পিট নিলেন; সুতরাং 'পূ'র দুইখানি তাস গোলাম দশ আপনা আপনি বড় হয়ে গেল। এই নিমিত্ত এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছে যে কোন বড় তাস খেলা হলেই তাকে তদপেক্ষা বড় তাস দিয়ে ঢেকে দিতে হয়, কেন না ইহার ফলে নিজের বা খেঁড়ীর পরবর্ত্তী তাসগুলি বড় হয়ে যাবে। এখন 'দ'

হরতন—টেক্কা, বিবি, সাতা।

হরতন—সাহেব, নয়, পাঞ্জা।

হরতন—দশ, ।, তিরি।

হরতন—গোলাম, আটা, চৌক্কা, দুরি।

গোলাম খেলেছেন, 'প' সাহেব দিলেন, 'উ' মারলেন টেক্কা,—সুতরাং 'পূ' এর দশ তৎক্ষণাৎ বড় হয়ে গেল।

আবার ধরুন এক্ষেত্রে 'দ' দশ খেললেন, 'প' সাহেব দিলেন আর 'উ' টেক্কা দিলেন, তার ফলে 'পূ'র বিবি, নয় দুইখানি তাসই বড় হয়ে গেল। এখন পূর্ব্বোক্ত দুই ক্ষেত্রে 'প' যদি বড় তাস না মারতেন তা' হলে 'দ' সব কয়খানি পিট নিয়ে যেতেন। তবে ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যে ক্ষেত্রে উক্ত উপায়ে নিজের বা খেঁড়ীর কোন তাস বড় করতে পারা যায় না সে ক্ষেত্রে উচ্চতর তাস না ফেলাই বিধেয়। যেমন ধরুন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে 'উ' বিবি খেলেছেন; এখন যদি 'পূ' সাহেব মারেন তা' হলে বিশেষ ক্ষতি সংসাধিত হবে, কেননা 'উ'র বাকী তাস গুলি সববড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি 'পূ' গোড়ায় সাহেব না মারেন তা' হলে 'উ'কে একটি পিট ছেড়ে দিতেই হবে।

ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য যে যখন ক্রীড়কের হাতে দুইখানি বড় তাস বর্ত্তমান তখন প্রথমে বড় তাস না দিয়ে

শেষ অংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

সাহিত্য পরিচয়

নাগিনীঃ বিচিত্র রহস্য সিরিজঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিতঃ দাম বারো আনা।

"নাগিনী" একটী ডিটেকটিভ থ্রিলার—অর্থাৎ ঐরূপ পুস্তকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ইহাতে বর্ত্তমান। বাজারে ডিটেকটিভ উপন্যাস নামে অধুনা অনেক পুস্তকেরই প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু বলা বাহুল্য তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মনে বিরক্তি ও অপ্রসাদ সৃষ্টি করে। ঐ সকল পুস্তকের রচয়িতাগণ ঘটনার ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিতে অক্ষম হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের পুস্তকের ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। "নাগিনী" বইখানিতে যাহাতে পাঠকের মন আসল ঘটনার সূত্র হইতে বিক্ষিপ্ত না হয় সেই দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভাষা সরল ও সহজ গতিশীল, ঘটনা সমাবেশ অভিনব ও চমকপ্রদ। বইটী পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। স্থানে স্থানে রোমাঞ্চকর বিভীষিকার সমন্বয়ে এই বৈচিত্র্য-পূর্ণ কাহিনী পাঠকের মনে একটী সভয় উদ্বেগ সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীমতিলাল বসু।

(ডামি।)
ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, দশ, নয়।

ইস্কাবন—সাতা, ছুরি। | 'উ' 'প' 'পূ' 'দ' | ইস্কাবন—সাহেব, আটা, চৌকা, তিরি।

(ডামি।)
ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, সাতা, তিরি।

ইস্কাবন—দশ, ছক্কা, পাঞ্জা। | 'উ' 'প' 'পূ' 'দ' | ইস্কাবন—সাহেব, চৌকা, ছুরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, নয়, আটা।

ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, সাতা, তিরি।

ইস্কাবন—দশ, ছক্কা, পাঞ্জা। | 'উ' 'প' 'পূ' 'দ' | ইস্কাবন—সাহেব, চৌকা।

ইস্কাবন—টেক্কা, আটা, ছক্কা, ছুরি।

(১)
(ডামি।)
ইস্কাবন—বিবি, পাঞ্জা, চৌকা।

'উ' 'প' 'পূ' 'দ' | ইস্কাবন—সাহেব, তিরি, ছুরি।

ডামি ইস্কাবনের বিবি পেড়ে খেলেছেন, 'পূ' কি খেল্বেন?

(২)
(ডামি।)
চিড়িতন—গোলাম, দশ, পাঞ্জা।

উ প পূ দ | চিড়িতন—সাহেব, আটা, চৌকা।

ডামি খেল্লেন চিড়ের গোলাম, 'পূ' কি খেল্বেন?

(৩)
(ডামি।)
ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, দশ।

উ প পূ দ | ইস্কাবন—বিবি, ছক্কা, তিরি।

ডামি ইস্কাবনের গোলাম খেল্লেন, 'পূ' কি খেল্বেন?

(৪)
(ডামি।)
চিড়িতন—টেক্কা, দশ, নয়, আটা।

চিড়িতন—বিবি, পাঞ্জা, চৌকা। | উ প পূ দ

'দ' চিড়ের গোলাম খেলেছেন, 'প' কি খেল্বেন?

ব্রীজ খেলা

ব্রীজ খেলা-পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ অংশ

দ্বিতীয়বারে দেওয়াই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। মনে করুন 'উ' বিবি খেলেছেন এখন 'পূ' যদি সাহেব মারেন তথাপি তিনি একটি পিটও পাচ্ছেন না; কিন্তু যদি দ্বিতীয়বারে সাহেব মারেন তবে তিনি অতি অনায়াসেই একখানি পিট পেয়ে যাচ্ছেন। তবে যদি হাত নিম্নলিখিতরূপ হয় তা' হলে প্রথমবারেই বড় তাস দেওয়া কর্ত্তব্য। যেমন ধরুন 'উ'র বিবি খেলার উপর 'পূ' যদি সাহেব না মারেন তা হলেও বিশেষ সুবিধা হবে না। সেজন্য কোন রঙে দুইখানি তাস সমেত বড় তাস থাকলে প্রথমেই বড় তাস দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

নিম্নে কয়েকটি হাত দেওয়া হল কোন ক্ষেত্রে কি খেলা উচিত তা' প্রথমে বিবেচনা করে পরে উত্তর দেখে মিলিয়ে নেবেন।

উত্তর:—(১) ইস্কাবনের সাহেব। (২) চিড়িতনের চৌকা। (৩) ইস্কাবনের তিরি। (৪) চিড়িতনের চৌকা। (৫) রুহিতনের গোলাম। (৬) ইস্কাবনের সাহেব। (৭) হরতনের চৌকা। (৮) ইস্কাবনের ছুরি। (৯) ইস্কাবনের সাহেব। (১০) চিড়িতনের সাহেব। (১১) রুহিতনের তিরি। (১২) ইস্কাবনের ছুরি।

চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং ক্লাব:—এই সমিতির ব্রীজ প্রতিযোগিতার খেলা সুন্দররূপে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। আগামী ১৫ই মার্চ্চ রবিবার পারিতোষিক বিতরণী সভার আহ্বানকল্পে এঁরা পূর্ণ উদ্যমে পরিশ্রম করে চলেছেন। ভবিষ্যতে এঁদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বল্বার ইচ্ছা রহিল।
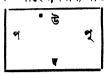
---

(৫) (ডামি।)

রুহিতন—সাহেব, বিবি, সাতা, পাঞ্জা, তিরি।

রুহিতন—গোলাম, নয়, আটা।

'দ' খেলেছেন রুহিতনের দশ, 'প' কি খেল্‌বেন ?

(৬) (ডামি।)

ইস্কাবন—টেক্কা, দশ, সাতা, ছক্কা।

ইস্কাবন—সাহেব, পাঞ্জা, তিরি

'দ' ইস্কাবনের গোলাম খেলেছেন ; 'প' কি খেল্‌বেন ?

(৭) (ডামি।)

ইস্কাবন—নয়, সাতা, ছক্কা।
হরতন—বিবি, গোলাম, আটা, চুরি।
রুহিতন—টেক্কা, সাতা।
চিড়িতন—গোলাম, আটা, সাতা, তিরি।

উ
প পূ
দ

ইস্কাবন—বিবি, চুরি।
হরতন—সাহেব, সাতা, চৌকা।
রুহিতন—বিবি, দশ, আটা, চুরি।
চিড়িতন—সাহেব, নয়, ছক্কা, পাঞ্জা।

ইস্কাবন রঙ, ডামি হরতনের বিবি খেলেছেন। 'পূ' কি দেবেন ?

(৮) (ডামি।)

ইস্কাবন—টেক্কা, সাতা।
হরর্তন—বিবি, পাঞ্জা, চৌকা।
রুহিতন—টেক্কা, দশ, আটা, পাঞ্জা, চুরি।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, ছক্কা।

ইস্কাবন—সাহেব, তিরি, চুরি।
হরতন—সাহেব, নয়, তিরি।
রুহিতন—বিবি, চৌকা, তিরি।
চিড়িতন—নয়, সাতা, পাঞ্জা, চুরি।

ইস্কাবন রঙ, 'দ' ইস্কাবনের বিবি খেলেছেন ; 'প' কি তাস দেবেন ?

(৯) (ডামি।)

ইস্কাবন—টেক্কা, সাতা।
হরতন—গোলাম, আটা, সাতা, চৌকা।
রুহিতন—সাহেব, বিবি, দশ, আটা।
চিঁড়িতন—টেক্কা, ছক্কা, পাঞ্জা।

বিবিধ
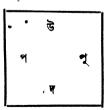
বালক সঙ্ঘ

জাষ্টিস্ চন্দ্র মাধব রোডস্থ বালক সঙ্ঘের আগামী ১৩ই মার্চ্চ শুক্রবার, ১৪ই মার্চ্চ শনিবার ও ১৫ই মার্চ্চ রবিবার মিলনী উৎসব হইবে। ব্যায়াম, সঙ্গীত সম্মেলন, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের মাধুর্য্য বর্দ্ধন করিবে।

বর্ত্তমান

গত ৮ই মার্চ্চ রবিবার ১ নং, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, সোশ্যাল সার্ভিস্ লীগ ভবনে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বর্ত্তমানে'র প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করেন।

শক্তি সঙ্ঘ

গত ৮ই মার্চ্চ রবিবার বেহালা স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে শক্তি সঙ্ঘের অষ্টম বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ক্যাপ্টেন এ, ই, কার ডি, সি, এম, এস, সভাপতির আসন গ্রহণ ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

সূচী শিল্প প্রতিযোগীতা

বহিরগাছি পল্লী মঙ্গল পাঠাগারের উদ্যোগে এ বৎসর একটি সূচি-শিল্প প্রতি-যোগীতার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই প্রতিযোগীতায় কেবলমাত্র মহিলারা যোগদান করিতে পারিবেন। কার্পেটের উপর সূচের কাজ হওয়া চাই। পিক্টোগ্রাফ দিয়া তোলা কোন কাজ লওয়া হইবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের জন্য ২ খানি সুদৃশ্য রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে চৈত্র, ১৩৪২। যাঁহারা

ইস্কাবন—সাহেব, চৌকা।
হরতন—দশ, নয়, ছক্কা, পাঞ্জা।
রুহিতন—গোলাম, সাতা, পাঞ্জা।
চিড়িতন—বিবি, দশ, নয়, আটা।

ইস্কাবন রঙ, 'দ' ইস্কাবনের বিবি, খেলেছেন; 'প' কি দেবেন?

(১০) (ডামি।)
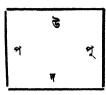
ইস্কাবন—গোলাম, দশ, চৌকা।
হরতন—টেক্কা, বিবি, দশ, ছক্কা।
রুহিতন—সাহেব, সাতা, ছক্কা।
চিড়িতন—বিবি, গোলাম, সাতা।

উ / প / পূ / দ

ইস্কাবন—আটা, পাঞ্জা, দুরি।
হরতন—সাহেব, চৌকা, তিরি।
রুহিতন—বিবি, গোলাম, দশ, নয়, আটা।
চিড়িতন—সাহেব, দুরি।

ফেরাই-এর খেলা, ডামি চিড়ের বিবি খেলেছেন; 'পূ' কি দেবেন?

(১১) (ডামি।)

ইস্কাবন—টেক্কা, দশ, পাঞ্জা, দুরি।
হরতন—সাহেব, গোলাম, সাতা, তিরি।
রুহিতন—গোলাম, দশ।
চিড়িতন—বিবি, আটা, পাঞ্জা।

উ / প / পূ / দ

ইস্কাবন—গোলাম, নয়, সাতা।
হরতন—পাঞ্জা, দুরি।
রুহিতন—বিবি, আটা, চৌকা, তিরি।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, সাতা, ছক্কা।

হরতন রঙ, ডামি রুহিতনের গোলাম খেলেছেন; 'পূ' কি তাস দেবেন?

(১২) (ডামি।)

ইস্কাবন—বিবি, গোলাম।
হরতন—গোলাম, আটা, পাঞ্জা।
রুহিতন—বিবি, সাতা, পাঞ্জা, চৌকা।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, আটা, ছক্কা।

ইস্কাবন—সাহেব, আটা, চৌকা, দুরি।
হরতন—বিবি, দশ, চৌকা।
রুহিতন—গোলাম, দশ, আটা।
চিড়িতন—টেক্কা, চৌকা, তিরি।

ফেরাই-এর খেলা, ডামি ইস্কাবনের বিবি খেললেন; 'পূ'-র কি দেওয়া উচিত?

তাঁহাদের শিল্প কাজগুলি ফেরৎ লইতে ইচ্ছুক তাঁহারা উপযুক্ত ডাকখরচ পাঠাইবেন অথবা কলিকাতা শাখা কার্য্যালয়ে সম্পাদকের নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারেন। যদি কোন বিশেষ আপত্তি না থাকে তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প কাজ দুইটী ফেরৎ দেওয়া হইবে না। শিল্প কাজগুলি ফ্রেমে বাঁধান হইলে ভাল হয়। কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ শাখা-কার্য্যালয় সম্পাদককে লিখিবেন। শিল্প কাজগুলি পাঠাইবার ঠিকানা:—সম্পাদক—পল্লী-মঙ্গল পাঠাগার, বহিরগাছি পোঃ, (নদীয়া), অথবা, শ্রীসার নাথ ভট্টাচার্য্য (সম্পাদক) পল্লী-মঙ্গল পাঠাগার (শাখা ৩৬-৪-৩ বেনিয়াটোলা লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট পোঃ কলিকাতা)

পারিতোষিক বিতরণী

গত ৭ই মার্চ্চ শনিবার ভবানীপুর সাধারণ পার্কে নির্ম্মিত একটী বিস্তৃত প্যাণ্ডালে গঙ্গাপ্রসাদ রোডস্থ কর্পোরেশন স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী-সভার কার্য্য কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জি, ব্যার-য়্যাট-ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অভিভাবক মণ্ডলী এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

এই শিক্ষায়তনের কিশোর ছাত্রবৃন্দ সুমিষ্ট সঙ্গীত ও চমৎকার আবৃত্তি দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য কতকগুলি রৌপ্য পদক ও অন্যান্য মূল্যবান পুরস্কার ও ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য বহু মূল্যবান ক্রীড়া সামগ্রী সফল-কাম ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

সভাপতি মহাশয় বিদ্যালয়ের কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এম, এ, বার-য়্যাট-ল বিদ্যালয় ও সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমণ্ডলীর পক্ষ হইতে সভাপতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কর্পোরেশন নির্ব্বাচন

মহান আদর্শও বিরাট কর্ম্ম প্রচেষ্টা

শরৎচন্দ্র বসুর আবেগপূর্ণ আবেদন

কলিকাতার নাগরিক বৃন্দ !

১২ বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ভোটদানের যোগ্যতার মাপকাঠি বিশেষ ভাবে খর্ব্ব করা হইয়াছে এবং একাধিক ভোটদান ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। কলিকাতা নগরীর পৌর-শাসন দায়িত্ব ব্যাপক ও তুল্যভাবে নগরের বাসিন্দা, সম্পত্তির মালিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অলোকসামান্য প্রতিভাই কলিকাতা কর্পোরেশনের সরকারী মনোবৃত্তিপ্রভাবান্বিত কর্পোরেশন গঠনতন্ত্রের জাতীয়তার ভিত্তিতে পুনর্গঠন সম্ভবপর করিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহান ব্যক্তিত্ব কর্পোরেশনে সেবা ও আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা আনিয়া দিয়াছে! বাঙ্গলার এই দুই মহান সন্তান যে মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাহা ভারতীয় জাতীয় মহাসভারই দান।

কলিকাতা নগরীর প্রথম মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেশবন্ধু দাশ কর্পোরেশনকে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে পৌরজন সেবার এক কর্ম্মপন্থা রচনা করেন। বার বৎসর পূর্ব্বে দেশবন্ধু দাশ যে গতিপথ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন এখনও তাহা পৌরজন সেবার বিস্তৃত ও মনোরমপন্থারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সেই পথ ধরিয়াই পৌরজন কল্যাণ রথ অগ্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। দেশবন্ধুর কর্ম্মপন্থা 'দরিদ্রনারায়ণ' সেবায়ই কর্ম্মপন্থা। তাঁহাদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, বিনাব্যয়ে চিকিৎসা, যথেষ্ট পরিমাণ জল সরবরাহ, বিশুদ্ধ দুগ্ধ, বিশুদ্ধ খাদ্য, বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু, সহরের সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা-ঘাট-জনস্বাস্থ্য-রক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষকে জনসাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতি অবহিত ও ঐ সকল পরিপূরণের প্রতি মনোযোগী থাকিবার ব্যবস্থাও তিনিই করিয়া গিয়াছেন। প্রাণহীন মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মপন্থার মধ্যে তিনি নবপ্রাণ ও নব চেতনার সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের নিরস কর্ত্তব্যকে তিনি দীনদরিদ্রের ও নির্য্যাতীত নিপীড়িতের সেবার গৌরবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়া গিয়াছেন।

কর্পোরেশনের কংগ্রেস পক্ষ চিরকাল ঐ মহান আদর্শেরই অনুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন। কংগ্রেস কর্পোরেশন দলের আমলে কলিকাতা নগরী শিক্ষা বিস্তার ও চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য সহায়তার দিকে অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। সহরের সর্ব্বত্র শত শত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারীগুলি

দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি

ও

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ

আমরা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলাম যে দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ ২২নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস-দ্রোহী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষকে আগামী কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে যথাসাধ্য সহায়তা করিতেছেন। একথা আজ কাহারও অজ্ঞাত নাই যে দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুপ্রেরনায় এবং সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের পক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্ত্তৃক এ বৎসরে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নের ভার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উপর অর্পণ করা হইয়াছে। অতএব ২২নং পল্লীর করদাতাগণ স্বভাবতঃই আশা করিয়াছিলেন যে দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মনোনীত কংগ্রেস পক্ষীয় প্রার্থীগণ ব্যতীত আর কাহাকেও সমর্থন করিতে পারেন না।

ইহা ব্যতীত দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির পক্ষে যাঁহারা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের সমর্থন করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে দুএকজন কর্পোরেশন কর্ম্মচারীও আছেন। কিন্তু কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনানুসারে কোন কর্পোরেশন কর্ম্মচারীর নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করা বেআইনী।

আশা করি আমাদের এই সংবাদ প্রকাশের পরে উক্ত কর্পোরেসন কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের বেআইনী কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। যদি উক্ত অন্যায় কার্য্যে তাঁহারা বিরত না হন তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বহু অপ্রিয় আলোচনা করিতে হইবে।

যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাইতেছে। পরিশ্রুত জল সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি ও সরবরাহ করা জলের গুণ বৃদ্ধির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইতেছে। তৎপর সহরের পয়ঃপ্রণালী সমস্যা—যাহা পুরাতন কর্পোরেশনের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে, তাহার যথোচিত সমাধান সম্ভবপর হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। স্বল্প ব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য এক ব্যাপক ও কার্য্যকর পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। সহরবাসীদের গৃহে ব্যবহারের জন্য স্বল্পমূল্যে যাহাতে বিদ্যুত শক্তি পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থাকল্পে জনমতকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলা হইতেছে। সহরের তরুণদের জন্য খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী ও প্রচার কার্য্যাদির দ্বারা স্বাস্থ্যনীতির প্রতি নাগরিকগণকে অধিকতর পরিমাণে অবহিত করা সম্ভবপর হইয়াছে। পূজা পর্ব্বাদির সময় নাগরিকগণের সুযোগ সুবিধার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে। সংক্রামক রোগাদি দেখা দিলে সংক্রামকতা প্রতিরোধ ও অপর যাহা কিছু করা দরকার ব্যাপকভাবে প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা তৎসমুদয়ই করা হইতেছে। রাস্তাঘাট ও ভ্রমণোদ্যানগুলি যথাযথভাবে রক্ষার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। ঐ দিক দিয়া জনসেবার যোগ্যতার মাপকাঠি যথাসম্ভব উচু রাখা হইতেছে—পরলোকগত মহান নেতার নাগরিক সেবা-আদর্শের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কংগ্রেস কর্পোরেশন পার্টি আরও অনেক কিছু করিয়াছেন—সে সকলের উল্লেখ এস্থলে সম্ভবপর নহে। নগরবাসীদের করভার বৃদ্ধি না করিয়াই কিন্তু উহাদের পক্ষে এতকিছু করা সম্ভবপর হইয়াছে। সরকারী ও বে-সরকারী অর্থনীতিবিশারদগণ মাঝে মাঝেই বলিয়াছেন বটে যে, কলিকাতার মত সমৃদ্ধিমুখীন নগরীর পৌর শাসন-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইলে করভার বৃদ্ধি ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কর্পোরেশনের কংগ্রেসী দল কিন্তু কর-বৃদ্ধির সমুদয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন এবং কোনরূপ অর্থসঙ্কটে জড়িত না করিয়াও কর্পোরেশনকে প্রগতির পথেই আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন। গত ১২ বৎসরকাল যাবত কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক সুনাম এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে যে, কর্পোরেশন কলিকাতা নগরীর শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সুবিধাজনক সর্ত্তে প্রকাশ্য বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

গুরুতর অর্থ সঙ্কটের সময়ে অর্থ সঙ্কটের চাপ সকল সম্প্রদায়ের উপরই যখন অল্পবিস্তর অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেই সময় কর্পোরেশন এই প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছে।
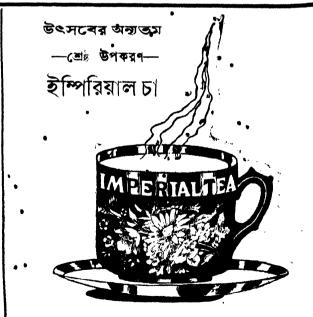
এই সকল কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়া জনহিতব্রতী সকল প্রতিষ্ঠানই কিঞ্চিদধিক গর্ব্বানুভব করিতে পারে। কংগ্রেস কর্পোরেশন পাটি অনেক কিছু করিয়াছে সত্য, কিন্তু করিবার আরও অনেক কিছু আছে, নাগরিক জন-সেবার যে মহান কর্ম্মপন্থা ১২ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস কর্পোরেশন পাটি রচনা করিয়াছিলেন তাহার অনেক কিছুই এখনো অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। কর্পোরেশনের অপর কোন দলই আপনাদের সমক্ষে অপেক্ষাকৃত ভাল কোন নাগরিক জনসেবার কর্ম্মপন্থা উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। উহারা অপরের কাজের সমালোচনা লইয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। ঐ সকল সমালোচনার বিশেষ কোন মূল্যও আছে বলিয়া কেহ মনে করে নাই, কর্পোরেশনের কংগ্রেস পাটি যোগ্য এবং যথাযথ সমালোচনায় মোটেই বিরক্তি বোধ করে না; বস্তুতঃ পক্ষে উপযুক্ত এবং সুসঙ্গত সমালোচনাই তাহারা চাহে এবং তাহারা মনে করে যে, পৌর জনসেবা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার পক্ষে উহার প্রয়োজন আছে।

কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ, আমাদের মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় জাতীয় মহাসভা—আমি আপনি, 'আমরা সকলেই স্বেচ্ছায় যাহার সেবাব্রত বরণ করিয়া' লইয়াছি, সেই মহা প্রতিষ্ঠানের নামে আমি আপনাদিগকে আগামী কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসপক্ষীয় প্রার্থীদিগকে ভোট দিতে অনুরোধ করিতেছি।

এই নগরীর নাগরিক অধিকার রক্ষায় অবহিত হইবার জন্য সমস্ত শক্তি সন্নিবেশিত করিবার জন্য আমি আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি—যাহারা আপনাদের শ্রদ্ধার পাত্র, কেবল মাত্র সেই সকল ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণকেই আপনারা আপনাদের প্রতিনিধিরূপে বরণ করিয়া কর্পো-

রেশনে প্রেরণ করুন। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে, আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে আপনাদিগকে কখনও অনুতাপ করিতে হইবে না, আপনাদিগকে এক্ষণে বিভেদ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। আপনারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, আপনাদের ভোটের দ্বারা, আপনারা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, আপনাদের ভোটের সাহায্যেই আপনারা বিভেদ অনৈক্যের অবসান ঘটাইতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দোষ, ত্রুটিহীন ও অধিকতর যোগ্যতা সহকারে কর্পোরেশনের কার্য্য পরিচালন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। কংগ্রেস প্রার্থীগণের বিপক্ষে প্রদত্ত প্রত্যেকটী ভোটই উপদলীয় চক্রান্তজালকে কর্পোরেশনে কায়েম করিবার পক্ষে প্রদত্ত ভোটরূপে গণ্য হইবে—কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত প্রত্যেকটি ভোটেই দেশবন্ধুর ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের মহানকর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপিত হইবে।

দেশবন্ধুর পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার এবং তাঁহার সুযোগ্য অনুবর্ত্তীগণের মহান আদর্শ ও বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমাদিগের সকল কার্য্যে উৎসাহ অনুপ্রেরণা আনিয়া দিক—কলিকাতার নাগরিকগণের সুখ সুবিধা বিধানকল্পে আমাদের সকল শক্তি নিয়োগে আমরা যেন তাঁহাদের মহান আদর্শের অনুপ্রেরণায় সফলকাম হইতে পারি।

আপনাদের চির সেবক

শরৎচন্দ্র বসু

চেয়ারম্যান, কংগ্রেস কর্পোরেশন

ইলেকশন বোর্ড

১০ মার্চ্চ ১৯৩৬

কর্পোরেশন নির্ব্বাচন

প্রভু না ভৃত্য?

শ্রীমল্লিনাথ

আগামী পক্ষকাল পরেই অর্থাৎ ২৬শে মার্চ্চ কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন দিবস ধার্য্য হইয়াছে। এবারকার নির্ব্বাচন গত কয় বারের নির্ব্বাচন অপেক্ষা অধিকতর উদ্দীপনা-ময় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। যতগুলি আসন নির্ব্বাচনে পূর্ণ করিতে হইবে তাহার প্রায় চারিগুণ প্রার্থী এবার মনোনয়ন পত্র দাখিল করায় প্রতি পল্লীতে পল্লীতে নির্ব্বাচন-প্রার্থী বিভিন্ন ব্যক্তির আত্ম-ঢক্কা নিনাদে পল্লীর গগন-পবন মুখরিত ও জনসাধারণের কর্ণ বধির হইবার উপক্রম। প্রত্যেক বিভিন্ন প্রার্থীর "পেটোয়া" ব্যক্তিগণ যে যাহার তরফের পক্ষে প্রচার কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছে। এবং এই "পেটোয়া" ব্যক্তি-গণের মধ্যে অনেকেই আবার কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী।

সম্প্রতি কংগ্রেস কর্পোরেশন ইলেকস্যন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নির্ব্বাচন ব্যাপারে এইরূপ প্রচার কার্য্য সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে এক পত্রাঘাত করিয়া জানাইয়াছেন যে কর্পোরেশনের কতিপয় কর্ম্মচারী কোন কোন প্রার্থীর স্বপক্ষে প্রচার কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন যাঁহাদের জানা আছে তাঁহারা জানেন যে এইরূপ কার্য্য অবৈধ। আমরা জানিনা শরৎচন্দ্রের পত্র সম্পর্কে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয় কোনরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন কি না তবে আমরা এ কথা চিন্তা করিতে স্বতঃই লজ্জিত হই যে যাঁহারা কয়েকদিন পরেই ঐ সকল কর্পোরেশন কর্ম্মচারীর মনিব হইবার আকাঙ্খা পোষণ করে তাঁহারা কিরূপে ঐ প্রকার ব্যক্তির সাহায্য প্রত্যাশী হন! কর্পোরেশন কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা নির্ব্বাচন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেন তাঁহারা আইনের চক্ষুতে অপরাধী। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার পর অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে কর্পোরেশনের ছোট বড় বহু বেতনভোগী এবারকার নির্ব্বাচনে কোন না কোন পক্ষে তদ্বারক করিয়া ফিরিতেছেন—বিশেষ করিয়া উত্তর কলিকাতার বহু কেন্দ্রে এই প্রকার অন্যায়, ঘৃণ্য, ও বে-আইনী কার্য্য বহু কাউন্সিলার পদাকাঙ্খী প্রার্থী কর্পোরেশন কর্ম্মচারী দ্বারা করাইতেছেন। আশা করি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পত্রে এই সকল অনাচারের বিষয় জ্ঞাত হইয়া কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয় এই সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। যে সমস্ত কর্পোরেশন কর্ম্মচারী নিষেধ অমান্য করিয়া এইরূপ অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন তাঁহাদের শাস্তি চাকুরী হইতে বরখাস্ত। যদি এই অনাচার অবিলম্বেই না বন্ধ হয় তাহা হইলে বারান্তরে যে সকল কর্পোরেশনের বেতনভোগী এইরূপ অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত তাঁহাদের নাম ধাম প্রকাশ করিয়া অপ্রিয় আলোচনা করিতে বাধ্য হইব।

ইহা ছাড়াও কর্পোরেশন নির্ব্বাচন ব্যাপারে আরও একটি বিসদৃশ ব্যবস্থা সাধারণের বিশেষ পীড়াদায়ক। কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে Returning Officer এবং Polling Officer গণ কর্পোরেশন কর্ম্মচারী-দিগের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যে দিক দিয়াই হউক না কেন ইহার অযৌক্তিকতা অতি সহজেই ধরা পড়ে। কর্পোরেশন কর্ম্মচারীদিগের মনিব কাউন্সিলারবৃন্দ। কিন্তু সেই কাউন্সিলারগণেরই নির্ব্বাচন ব্যাপারে তাঁহাদের কর্ম্মচারীবৃন্দ কর্ত্তৃত্ব করিবেন ইহা কোন-রূপেই শোভন ও যুক্তিযুক্ত নহে। অতি সত্বরও এই বিসদৃশ ব্যবস্থার অবসান করা উচিত এবং এই সম্পর্কে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাহিরের লোককে যেরূপ Revising Authority নিযুক্ত করা হইয়া থাকে তদ্রূপই নির্ব্বাচন ব্যাপারে কর্পোরেশনের সহিত নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে ঐ পদে নিযুক্ত করাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

(বিলাসী)

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

এই সপ্তাহে চিত্র-জগতের বিশেষ আকর্ষণ হবে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার "পথের শেষে"। ছবিখানি উত্তর কলিকাতার নবতম চিত্রগৃহ "শ্রী"তে শনিবার থেকে দেখানো হবে।

৺নিশিকান্ত বসু রায় রচিত "পথের শেষে" নাটকখানি বহুপূর্ব্বে বাঙলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ কোরেছিল। সেই জনপ্রিয় নাটকখানি অবলম্বন কোরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী এখানিকে সবাক-চিত্রাকারে গঠন কোরেছেন এবং এই ছবির পরিচালনা কোরেছেন—চিত্রজগতের যশস্বী প্রয়োগশিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ছবির গল্পাংশটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

একদিকে পিতৃ আজ্ঞা অন্যদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান—এই দোটানায় পড়ে পিতৃভক্ত একমাত্র পুত্র নলিনীর জীবন বিপন্ন হয়েছিল। ঘটনা বিপর্য্যয়ে বাধ্য হয়ে পুত্রকে পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন কোরতে হোয়েছিল। তারই সুযোগ নিয়ে স্বার্থপর আত্মীয়ের দল কীভাবে ষড়যন্ত্র কোরে একমাত্র বংশধরকে গৃহচ্যুত, সমাজ-চ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করবার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্রের আয়োজন কোরেছিল—তারই ধারাবাহিক কাহিনী "পথের শেষে" চিত্রে অতি নিপুণভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

ঘটনাধারা আগাগোড়া বৈচিত্র্যময়। এই সংসার রঙ্গমঞ্চে কত শ্রেণীর কত বিচিত্র জীব যে ঘোরাফেরা করে—তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন চিত্র দর্শকের অন্তরকে নানারসে আলোড়িত কোরে তুলবার মত উপকরণ এই চিত্রে যথেষ্ট আছে। তা' ছাড়া এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় বাংলার চিত্র ও মঞ্চ জগতের শ্রেষ্ঠতম তারকাদের একত্রে যোগাযোগ—বিশেষ লোভনীয় সন্দেহ নেই।

"পথের শেষে" চিত্রে আমরা ছায়া দেবী নাম্নী ভদ্রবংশের একজন সুশিক্ষিতা অভিনেত্রীর দর্শন পা'ব, ইনি অভিনয় এবং সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী বোলে প্রকাশ। আশা করা যায়, সামাজিক চিত্র হিসাবে "পথের শেষে" বাংলাদেশের চিত্র-রসিকদের দরবারে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ কোরবে। ছবিখানির আলোক-চিত্র গ্রহণ কোরেছেন জনপ্রিয় শিল্পী শৈলেন বসু এবং আশাকরি আমরা এতে তাঁর হাত যশের যথেষ্ট পরিচয় পাব।

* * *

এই সপ্তাহে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে তাঁদের আগামী বাংলা চিত্র "সোণার সংসার", প্রয়োগ-শিল্পী দেবকী বোসের পরিচালনায় তোলা হবে। প্রথম শুটিং সুরু হয়েচে একটি বস্তী-দৃশ্যে। এর জন্য শুনেছি ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বিস্তৃত প্রাঙ্গণের এক অংশে এক রিয়াট বস্তী গঠন করা হয়েচে।

কালী ফিল্মস্

আস্‌চে ৪ঠা এপ্রিল 'উত্তরা'-য় এদের বহু-বাঞ্ছিত "কাল-পরিণয়" মুক্তিলাভ কোরবে। যশস্বী প্রযোজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর স্বহস্তে প্রযোজিত ছবি। তার ওপর শিল্পী সমাবেশ ও গল্পের মাধুর্য্যে যে ছবিখানা সাধারণের উপভোগ্য হবে—একথা বলাই বাহুল্য।

নিউ থিয়েটার্স

'ভ্যারাইটীজ' কাগজের মারফৎ জানা গেল যে প্রমথেশ বড়ুয়া লাহোরের কোন একটি প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে বড়ুয়া ষ্টুডিওতে একখানা ছবি তুলবেন—নিউ থিয়েটার্সের সৌজন্যে।

এদিকে তাঁরাই আবার জানাচ্ছেন যে মিঃ বড়ুয়া নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন কোরে ঈষ্ট ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছেন ছবি তুলতে। খবর দু'টো তাঁদের বিশ্বস্ত বন্ধুর দেওয়া সেজন্য বিশ্বাস না কোরেও উপায় নেই। 'ভ্যারাইটীজে'-র এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তা' হ'লে মিঃ বড়ুয়ার পক্ষে এ কাজ আমরা সমর্থন করি না। এ সম্বন্ধে পাকা খবর পেলে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা কোরব। মিঃ বড়ুয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য জানাবেন কি?

—

চাঁদ উঠেছিল গগনে

শ্রীনীহার রঞ্জন গুপ্ত

ছোট বেলার খেলার সাথী!...
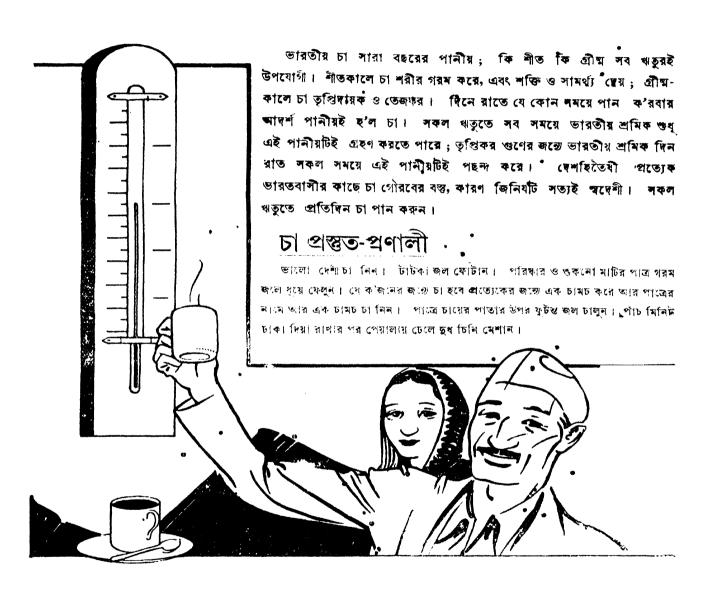
অমিয় ভাবলে যাই না হয় একবার দেখেই আসি! সেই সেদিনকার ছোট্ট মেয়ে তরুলতা মাথায় ঘোমটা টেনে আজ না জানি কতই না গিন্নী বান্নী গোছের হয়ে উঠেছে হয়ত!......

ব্যথার স্মৃতি মন্থন ক'রে এক টুক্‌রো হাসি ঠোঁটের কোণায় জেগে ওঠে। চোখ দুটো অকারণেই জলে ভরে আসতে চায়!......

মায়ের ত' ইচ্ছা ছিলই। নিজেরও যে ইচ্ছা ছিল না তাই বা কে জানে? আর তরুলতা! হয়ত বা তার মনের কোণায়ও ঐ রকমই একটা কিছু দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার মাঝে সলাজ বধূঁর প্রথম দৃষ্টিপাতের মতই ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠত!...অমিদা হবে স্বামী আর 'তরু' হবে তার বৌ!...

তরুলতার বিবাহের ঠিক্ বছর দুই বাদেই মা মারা যাওয়ার পর সেই যে সে ঘর বাড়ী বন্ধ করে অনির্দ্দিষ্ট ভবঘুরের মত আজ এখানে কাল সেখানে করে করে বেড়াচ্ছে তার কি আর কোনদিনও শেষ হবে না? ঘরে ফেরার কথা মনে হলেই কেন সেই সব অতীত দিনের টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতিগুলো মনের আনাচে কানাচে এসে উঁকি দিয়ে তাকে উন্মনা করে তোলে?...অথচ ডাক্তার ত' এক প্রকার বলেই দিয়েছে এরোগের একমাত্র ঔষধ শুধু complete rest!...'বিশ্রাম! একদিন নয় দু'দিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস...হয়ত বা বছরের পর বছর...ডাক্তারের কথায় ওর হাসিই পায়!...ভাবে 'বিশ্রাম'...কে জানে? এ জীবনে কোনদিনও সেটা সে পাবে কিনা! হয়ত বা এমনি ভাবেই ঘুরতে ঘুরতে একদিন পথের মাঝেই কোন গাছের তলায় কিংবা কোন রেলষ্টেশনে এই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে!...আর তাতেই বা এমন ক্ষতিটা কিসে?...কেইবা তার জন্য কাঁদবে?...

তরুলতার স্বামী বিপিনবাবু পলাশপুর থানার দারোগা। সংসারে তার আপনার বলতে এক পাগলী মা ও স্ত্রী তরুলতা!... বেলা তখন প্রায় আটটা কিংবা নটাই হবে অমিয়র গরুর গাড়ীটা এসে থানার ধারে মস্ত হিজল গাছটার নীচে থামল। গাড়ী হতে নেমে সে একজন কনেষ্টবলকে জিজ্ঞাসা করলে, 'দারোগা বাবু আছেন?'

—'আজ্ঞে বাবু না! কাল রাতে একটা খুনী কেসের তদ্বিরে বেরিয়ে গেছেন, এখনও ফেরেননি।

—'তুমি আমায় দারোগা বাবুর বাড়ীতে পৌছে দিতে পার?'

—'হাঁ বাবু ওইত' বাবুর বাড়ী দেখা যাচ্ছে!...চলুন না।'—

একটা মাঠের মাঝ দিয়ে সরু আঁকা-বাঁকা একটা পথ গেছে! ও এসে দারোগা বাবুর কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়াল! জায়গাটা নেহাৎ মন্দ হবে না বলেই বোধ হয়!... চারিপাশে ধূ ধূ করছে খোলা মাঠ!... মাঝখানে গোটা তিনেক টিনের ও একটা খড়ের ঘর আর চার পাশে কঞ্চির বেড়া দিয়ে
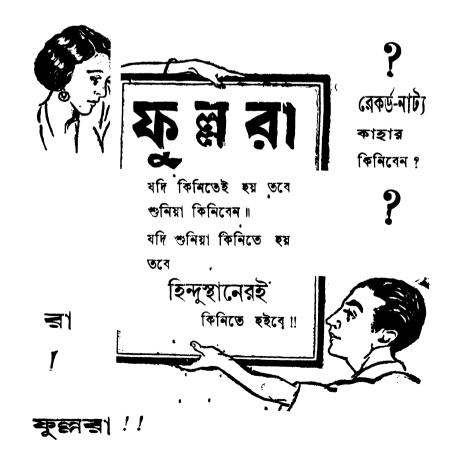
ঘেরা ! কনেষ্টবলটী তাকে পৌছে দিয়েই চলে গেল। ও বাইরের দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবতে লাগল এখন কি করা যায় ?…হুট্ করে তো আর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়া যায় না ! তরু ছাড়া যদি আর অন্য কেউই থাকে, তখন ! এমন সময় একজন দাসী মতন মেয়ে মানুষ বাড়ী হতে বেরিয়ে আসতেই অমিয় তাকে ডাকলে, 'ওগো শুনছো ?'…সে এগিয়ে এসে বললে, 'আমায় ডাকছেন বাবু ?'…

—'হাঁ, দেখ—বাড়ীর মধ্যে একটু খবর দিতে পার—ভাট্পাড়া হতে অমিয় এসেছেন।'

……বাইরের ঘরে ঢুক্তেই তরুলতা এসে পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।

—'কেমন আছ অমিদা ?'

—'ভাল, তুই কেমন আছিস তরু ?—'

—'মেয়ে মানুষের আবার থাকা না থাকা ?—'

অমিয় ডান হাতটা ওর মাথার উপরে রেখে হাসতে হাসতে বললে, 'বাঃ এর মধ্যেই যে বেশ গিন্নী-বান্নীদের মত কথা বলতে শিখে গেছিসরে, সত্যিই আমার বড্ড হাসি পাচ্ছে তরু !…সেই সে দিনকার সেই পুতুল খেলার তরু সেও কিনা আজ মাথায় ঘোমটা টেনে রীতিমত সংসারী হয়ে উঠল।' হাসতে হাসতে অমিয়র চোখের কোণে জল এসে গেল !

—'সত্যি অমিদা, তোমার উপরে আমার বড্ড রাগ হয়েছিল ; ভুলেও কি একটীবার এদিকে আসতে নেই অমিদা !…উঃ সেই কতদিন পরে বলত ?—' ওর চোখে জল, মুখে হাসি। ঘোমটা স্খলিত হয়ে এসে বাঁ পাশের কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়েছে। হাসতে হাসতে অমিয় বললে, 'হাঁরে' আজও তুই সেই ছেলে মানুষটীই আছিস তরু ?…'

……অমিদাকে পেয়ে যে ওর কি স্ফূর্ত্তি !…'তুমি হাত পাটা ধুয়ে নাও অমিদা !…চা খেয়েছো ?…খাওনি বোধ হয়, না ?…আর এত সকালে চা-ই বা কোথায় পাবে !…আমি চায়ের জল কাঠের উনুনেই চাপিয়ে দিচ্ছি…দেখনা এই হয়ে গেল বলে !…উঃ আর একটু বাদেই যা গরম পড়বে। তার চাইতে কুয়োর বেশ ঠাণ্ডা জল আছে স্নানটা সেরে নাও… ততক্ষণে চা'টা আমার হয়ে যাবখন।…' অ পঞ্চুর মা ! এ আমার দাদা হয়রে ! কুয়ো থেকে কয়েক বাল্তি জল তুলে দেনা মা !…দাওয়ার উপর একটা মোড়ায় বসে বসে অমিয় তরুর কার্য্যকুশলতা দেখতে লাগল। এই সেই তরু—আজ সে সংসারের একজন হয়ে দিব্যি একটা সংসারকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে !…এক সময় চায়ের জলটা নামিয়ে ও এসে দেখলে অমিয় তখনো চুপটী করে বসে বসে কি যেন ভাবছে !…

—'ওমা এখনও তুমি ঠায় বসে আছ অমিদা !…ওঠ, স্নানটা সেরে নাও !'…ঘর

হতে একটা গন্ধওলা তেলের শিশি তরু বের করে এনে দিল, 'এ কুন্তলীন তেল, উনিই মাখেন...মাথা নাকি বেশ ঠাণ্ডা থাকে। ...নাও নাও তাড়াতাড়ি মেখে স্নানটা সেরে এলত'। তরুর কথায় কেন যেন কেবল ওর হাসি পায়!...কুঁড়ের এক পাশে হোগলার বেড়া দিয়ে খানিকটা জায়গা স্নানের জন্যই আড়াল করে দেওয়া হয়েছে!...ও একবার ভাবলে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে যদি কোন ক্ষতি হয়; পরক্ষণেই আবার মনে হলো 'ক্ষতি হয় হোক্‌গে আজত' স্নান করি!...'

—'তুমি ঐ রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বসে চা খাও অমিদা...আর আমি ততক্ষণ রান্নাটা সেরে নি।...কিন্তু তোমার চেহারা একি হয়ে গেছে বলত অমিদা!...গলার কণ্ঠা বেরিয়ে গেছে।...চোখের কোলে কালি! ...দেহের বরণ মলিন, রুক্ষ!...প্রথমটাত' পঞ্চুর মার মুখে তোমার আসবার খবর পেয়ে ওখানে গিয়ে তোমায় দেখে ভাল করে চিনে উঠতেই পারিনি।'...আগের দিন বিকালের দিকে গরুর গাড়ীতে চেপে সারাটা রাত গাড়ীর ঝাঁকুনিতে 'অমিয় একটী বারের জন্যও চোখের পাতা দুটি এক করতে পারে নি। ঠাণ্ডা জলে স্নান করে অল্প ঝির ঝিরে হাওয়ায় অমিয়র চোখের কোলে ঘুম জড়িয়ে আসতে লাগল। ও তরুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমায় একটা বিছানা পেতে দে তরু...একটু ঘুমিয়ে নিই!...কাল সারাটা রাত জেগেই কেটেছে।' তরুদের শয়নঘরের পাশের ঘরটাতেই ক্যাম্প খাটটার উপর তরু একটা বিছানা পেতে দিল।...খোলা জানলাটা দিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু মাঠ আর মাঠ...মাঝে মাঝে দু' একটা বাবলা গাছ অসংখ্য হলুদ ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে!...মাঠের মাঝখান দিয়ে গাঁয়ের লোকের পায়ে-চলার পথটা সাপের মতই এঁকে বেঁকে না জানি কোথায় আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে!...থানার ধারের হিজল গাছটায় একটা হলুদ পাখী থেকে থেকে ডেকে উঠছিল 'বৌ কথা কও!' 'বৌ কথা কও!...'

২

'অমি দা' ওঠ! ওঠ!...ভাত হয়ে গেছে।' তরুর ডাকে অমিয়র ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। খেতে বসে ও দেখলে এর মধ্যেই তরু কত কি যে জোগাড় করে এনেছে। ডিমের ডালনা, মাছের পাতুরী, কামরাঙ্গার টক্‌...আরো কত কি!...খেতে খেতে অমিয় বললে, 'এর মধ্যে এত সব যোগাড় করলি কখন রে?...'

অমিয়র কথায় ও শুধু একটু হাসলে।

বিকেলের দিকে বিপিন তদন্ত শেষ করে ফিরে এল। তরুর মুখে অমিয়র কথা শুনে সেই অবস্থাতেই সে অমিয়ের ঘরে এসে ঢুকলো। ও তখন একটা ইংরাজী বই নিয়ে তার পাতাগুলি উল্টাচ্ছিল।—'এই যে নমস্কার।...তারপর ভালত!'

—'হাঁ একপ্রকার! আপনার তদন্ত শেষ হলো।'

—'আর বলেন কেন যত সব।...বিজপুরের কে এক হরদেব ঘোষালের বিধবা স্ত্রীকে তার ছোট ভাই পরশু রাত্রে খুন করে পালিয়েছে। আসামীকে পাওয়া যায় নি...লাশ পোষ্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে একজন কনেষ্টবলকে সেখানে পাহারায় রেখে চলে এলাম।...আপনি বসুন আমি একুনি এই ধড়াচূড়াগুলি ছেড়ে আসছি'!—'

অমিয় তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'না না আপনি আগে সুস্থ হয়ে নিন, তার পর সন্ধ্যাবেলায় ধীরে সুস্থে সব কথা হবে'খন।'

...আধ ঘণ্টা বাদে একটা পাইপ ধরাতে ধরাতে বিপিন এসে ঘরে ঢুকল, এটা আমার একটা 'এ্যারিষ্টোক্র্যাসী'...তা যাই বলেন... আপনার বোন গন্ধে নাকে আঁচল চাপা দেন'—বলে ও এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে অকারণেই মিটি মিটি হাসতে লাগলো।... একজন চৌকীদার এসে জানালে কে একজন একটা ডাকাতী কেস নিয়ে এসেছে এখুনি থানায় যেতে হবে। উঠতে উঠতে বিপিন বললে, 'এই দেখুন, আসতে না আসতে আবার শমন। হাড় মাংস একেবারে ছিঁড়ে খেলে। আর এ বেটাদেরও কি একটু স্বোয়াস্তি বলতে কিছু নেই, খালি ডাকাতি আর খুন, আর খুন আর ডাকাতি!...চল দেখি আবার কোথা হতে কে এল। সার্টটা গায়ে চাপাতে চাপাতে বিপিন বেরিয়ে গেল।

…আবার চোখ দুটো জ্বালা করছে!… সারা গা দিয়ে একটা উত্তাপ উঠছে!… জিভটা শুকিয়ে উঠছে…আজও বোধহয় আবার জ্বর এলো!

বৈকালের পড়ন্ত রোদ বাবলী গাছগুলির পাতায় পাতায় ঝিক্‌মিক্ করছে। এক কাপ চা হাতে ও একটা ডিসে কিছু হালুয়া নিয়ে তরু এসে ঘরে ঢুকল।…

—'অমি দা!'

—'কে? তরু!'—অমিয়র দুটো চোখই লাল টক্ টক্ করছে।

—'তোমার জন্য চা এনেছিলাম!'…

—'ও চা এনেছিস্…' তা ওইখানে রেখে দে!…'

—'ওকি তোমার চোখ দুটো অত লাল দেখাচ্ছে কেন অমি দা! জ্বর হয়নি ত'!—

একটুকরো বিকৃত হাসি হেসে অমিয় বললে, 'জ্বরই বোধহয় এল ভাই!—'

খাটের উপর এক পাশে বসতে বসতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তরু বললে, 'তাইত, জ্বর হয়ে পড়ল তোমার!—'

একটু হাঁপাতে হাঁপাতে অমিয় মলিন হাসিতে গালটা ভরিয়ে বললে. 'ও জ্বর কিছু নয় তরু! ও আমার রোজই হয়, নূতন কিছু বা ভয়ের কিছু নয়। রাত্রের দিকেই আবার কমে যাবে'খন।—তুই বরং এক কাজ কর। ঐ চা'টা কিছু দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে যা… একটু পরে খাবো খন।' অমিয়র তৈলহীন রুক্ষ লম্বা লম্বা চুলগুলি আঙুল দিয়ে 'চিরে দিতে দিতে তরু ডাকলে, 'অমি দা?'

—'কেন রে তরু?—'

—'এ রকম জ্বর তোমার কতদিন হতে হচ্ছে অমিদা!'

—'যেবার তোর বিয়ে হয়না! তারই বছরখানেক বাদ হতে!'

—'এতদিন চিকিৎসা করাওনি?—'

—'হ্যাঁ কত ডাক্তার দেখালাম। কত ওষুধ পত্র খেলাম, তা কিছুতেই কিছু হলো না রে—'

এমন সময় একটা কাসির বেগ আসায় অমিয়র মুখের কথা মুখেই আটকে গেল।

অসহ্য কাসির চাপে ওর সমগ্র শরীরটাই যেন মনে হচ্ছিল এক্ষুনি বুঝিবা ভেঙ্গে মুচড়ে গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে!…তরু অমিয়র পিঠে হাত বুলাতে লাগল!

তরুর চোখে জল দেখে অমিয় স্নেহমাখা কণ্ঠে শুধালে, কাঁদিস কেন তরু?

—'তোমার এমন অসুখ আর তুমি আমায় একটা খবর পর্য্যন্ত দাওনি অমিদা!… তুমি কি নিষ্ঠুর!—'

এক টুকরো মলিন হাসি হেসে অমিয় জবাব দিলে, 'তোকে খবর দিয়ে কি এমন হতো বলত। শুধু শুধু তোকে ব্যস্ত করাই হতো!…আর কিছু নয়!…তোর এমন সংসার!…তোর বিপিন!…

—'তুমি কি এখনও সেই ছেলেমানুষটাই আছ অমিদা!—'

৩

দারুণ বিশুচিকা রোগে যেদিন একসঙ্গে তরুর বিধবা মা ও তিনটী ভাই একই দিনে আড়াআড়ি চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই চিরতরে চক্ষু বুজল তখন বাড়ীর মধ্যে এমন একটী লোকও ছিল না যে সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা তরুলতাকে দুটো স্নেহের কথা বলে তার অতবড় দুঃখে এতটুকু সান্ত্বনা প্রকাশ করে। পাশের বাড়ী হতে অমিয়র মা এসে তরুকে আপনার বক্ষে তুলে নিলেন। সেই হতেই তরু অমিয়র মার হাতেই মানুষ হতে লাগল। তরুর নিতান্ত আপনার জন কেউ না থাকলেও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় যে দু'একজন ছিলেন না এমন কথা বলা যায় না। তবে সেধে কে পরের ঝকি বয়!…অতএব কেউই সেদিকে পা দিলেন না। অমিয়র মা ছেলেকে যখন কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না যে তরুকে

বিয়ে করলে সে ঠকবে না বরং মেয়েটা সুখী হবে তখন তিনি অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিপিনের হাতেই তুলে দিলেন।…তরু স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। মা বললেন, 'এবার তুই একটা বিয়ে কর অমিয় !'

অমিয় হেসে মার' কথার জবাব দিল, 'তেমন মেয়ে কৈ মা, যে বিয়ে করব।'

পুত্রের সংসারী হওয়া আর তাঁর দেখা হলো না। অতৃপ্ত বাসনা বুকে নিয়েই একদিন তিনি ওপারের উদ্দেশে পাড়ী জমালেন!…সেও আজ বছর দেড়েকের কথা!‥

…আকাশ ভরে জ্যোৎস্না উঠেছে। চাঁদের আলোর সামনের মাঠটা যেন চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে। সামনের বাড়ী হতে হিন্দুস্থানী কনেষ্টবলদের গানের আওয়াজ ভেসে আসছিল। জান্‌লার সামনে একটা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে অমিয় চোখ বুজে চুপ করে পড়েছিল। জ্বরটা বোধহয় এবার কমবে!

—'রাত্রে কি খাবে অমি দা!—'

—'আজ রাত্রে আর কিছু খাব না তরু! ক্ষিদেও তেমন নেই!…'

—'বেশ ক্ষিদে না থাকে এক বাটী গরম গরম দুধ না হয় খেওখন।'

—'বিপিন এল, তরু?'

—'হাঁ সন্ধ্যার একটু আগেই একবার এসেছিল, কিন্তু তক্ষুনি আবার বেরিয়ে গেছে।…'

—'রাত্রে ফিরবেত' ?'‥

—'তাও' বলতে পারি না!'

—'আচ্ছা এই যে মাঝে মাঝে বিপিন রাত্রে বাড়ী থাকে না, তা তোর একা একা ভয় করে না?—'

—'না ভয় কিসের! পঞ্চুর মা ত' বাইরেই শুয়ে থাকে! আর থানা এত কাছে…কত লোকজন!'

পরের দিন সকালে বিপিনের সাথে দেখা হতেই অমিয় শুধালে 'কাল কত রাত্রে ফিরলেন বিপিন বাবু?…'

—'সে অনেক রাত্রে!…আপনার বোনের মুখে শুনলাম আপনার নাকি খুব অসুখ। তা এ পলাশপুরের climate ত' খুব ভালই শুনেছি…কয়েকটা দিন থেকে যান্ না…'

'—তা হয় না বিপিনবাবু। আমার আজ বিকালেই যেতে হবে। আপনি যদি একটা গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করে রাখেন!'

—'আজই যাবেন?…তা কি করে হবে? আপনাকে একটা দিন ভাল করে যত্নও করতে পারলাম না। কলিমুদ্দীকে একটা ভাল খাসীর কথা বলে দিয়েছি! না না অমিদা তা হয় না। আপনাকে এত শীঘ্র ছেড়ে দেব না।'

'—দেখুন আমার এই বিশ্রী রোগ!'

অমিয়র কথায় হো হো করে হাসতে হাসতে বিপিন বললে, 'ধরুন যদি আমার নিজের কোন সন্তানেরই ওই রোগ থাকত' তবে কি তাকে ফেলতে পারতাম। ওসব ওজর ছাড়ুন। বলে সে হাসতে হাসতে কাজে বেরিয়ে গেল।

চায়ের কাপটা হাতে করে তরু এসে ঘরে ঢুকল 'এখন তুমি কেমন আছ অমিদা!'…

—'বেশ ভালই আছি ভাই!…আজই আমি এখান হতে যেতে চাই তরু!'…

—'আজই যাবে?…কেন তোমার কি এখানে কোন্ কষ্ট হচ্ছে অমি দা?'…

—'কষ্ট!…' অমিয় হেসে ফেললে 'এর চাইতে সুখের কিছু তোর অমিদা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারবে কি না সন্দেহ তরু!…

সারাটা দুপুর তরু অমিয়কে থাকবার জন্য কত সাধ্য সাধনাই না করলে, কিন্তু সে কোনমতেই থাকতে রাজী হলো না।

—'তবে নিতান্তই যখন থাকবে না; তখন আর কি বলব!…আমার এখানে যে তুমি একটা দিনের জন্যও এসেছো এতে যে আমি কত সুখী হয়েছি তা তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারব না!…তবে'…বাকীটা তার আর বলা হলো না। চোখের জলে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে এল।

—'দুঃখ করিস না ভাই! আবার আসব। তখন না হয় দু'চা'র দিন থাকা যাবে।'

—'এমন ভাগ্য কি আমার কোনদিন হবে?—'

বিকালের দিকে চা দিতে এসে তরু বললে, 'আমার বড় ইচ্ছা ছিল অমিদা

তোমার এই সময়ে ছুটো দিন তোমার সেবা করি!...'

—'তা বেশ; মরবার আগে খবর দেব। যাস্...'

—'কি যে সব অলুক্ষণে কথা বল অমিদা!'...তরু কেঁদে ফেললে।

—'আয় এইখানে আমার পাশে এসে বোস তরু!'...তরু এসে খাটের উপর অমিয়র পাশে বসলো। তরুর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে স্নিগ্ধকণ্ঠে অমিয় বললে, "হ্যারে তরু, বিপিন তোকে খুব ভালবাসে নারে!...'

ও লজ্জায় মুখটা নীচু করে ফেললে।

—'এর লজ্জার কি আছে রে!... বল না?...'

সহসা তরু অমিয়র কোলে মাথাটা গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। অমিয় প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছিল। কিন্তু, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলে। ধীরে ধীরে তরুর চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, অতীতকে ভুলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ভাই!... এমন কি অতীত সুখের স্মৃতিও বিষের মত ত্যাগ করা উচিত।...বিয়ের দিন মা কি কথা বলে দিয়েছিলেন তা মনে পড়ে ত! স্ত্রীর স্বামীই সব কিছু...তার বাইরে স্ত্রীলোকের আর আপনার বলতে কিছুই নেই!...'

কিন্তু সেদিন যাওয়া তার আর হলো না। সহসা অন্যান্য দিনের চাইতে একটু বেশী করেই জ্বরটা এল। তরুর মুখের দিকে তাকিয়ে অমিয় হাসতে হাসতে বললে, 'আজ আর বোধহয় যাওয়া হলো না ভাই!... গাড়োয়ানটাকে কাল সকালেই না হয় আসতে বলে দে।...'

পঞ্চুর মা গিয়ে গারোয়ানকে বলে এল, এখন আর বাবু যাবে নি গো...কাল ভোর ভোর নাগাৎ বেরুবেন।'

—'যে এজ্ঞে মাঠান্!...আমি ঐ গাছ তলাতেই গরু বেঁধে রাখছি, যখন আপনি বলবে তখুনিন আসব!...'

...সে রাত্রেও বিপিন এল না। চৌকীদারকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে একটা জরুরী কেসে আটকা পড়েছে, কাল সন্ধ্যে নাগাত ফিরবে।...

৪

রাত্রি তখন দশটা কি এগারটা হবে!... জ্বরের যন্ত্রনায় অমিয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে একবার এপাশ আবার ওপাশ করছিল। একবাটী গরম দুধ হাতে তরু এসে ঘরে ঢুকলো।...তার ঠাণ্ডা হাতটা অমিয়র রোগতপ্ত ললাটে রাখতেই অমিয় চোখ তুলে চাইলে।

—'কে?—'

—'আমি।—'

—'কে, তরু?...'

—'হাঁ।—'

—'খাওয়া হলো?—'

—'হয়েছে। একটু দুধ এনেছি এটা খেয়ে নাও অমিদা।—'

—'দুধ এখন থাক। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিতে পারিস ভাই।'

তরু উঠে গিয়ে বাইরে থেকে কুজো হতে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে নিয়ে এসে অমিয়র মুখের কাছে তুলে ধরল। 'এই নাও জল।'

উঠে বসে এক চুমুকে সমস্ত জলটা ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে একটা নিঃশ্বাস টেনে বললে, 'আঃ!'

তরু বসে বসে অমিয়র মাথায় হাত বুলাতে লাগলো!…কিছুক্ষণ পরে অমিয় বললে, 'এবার তুই ঘুমো তো তরু!…আর রাত জাগিস্‌নে।'…

—'যাবোখন।'…

—'হাঁরে বিপিন কি আজও রাত্রে আসতে পারবে না নাকি ?'…

—'না!…'

তারপর দুজনই কিছুক্ষণ চুপচাপ!… তরু ধীরে ধীরে ডাকলে,—'অমিদা!'

—'কিরে ?…'

—'এমন করে আর কতদিন চলবে অমিদা!…তুমি একটা বিয়ে করনা অমিদা!…'তরুর কথায় অমিয় হেসে ফেললে, 'আমার এই রোগে কে তার মেয়ের বিয়ে দেবে তরু! এ তোর নেহাৎ পাগলের মত কথা হলো!…

—'কিন্তু তোমার দেখার যে কেউ নেই গো।—'

—'কেন তুই আছিস…মালতী আছে!…

—'মালতী! মালতী কে অমিদা!…

—'গ্রামের জীতেনকে মনে আছে ?… মালতী তারই ছোট বোন। আহা মেয়েটা আমাকে সত্যিই বড্ড ভালবেসেছিল রে ?…'

—'তবে তাকেই বিয়ে কর না কেন ?…'

—'এই ত' মাস চার পাঁচ হলো তার বিয়ে হয়ে গেছে!…'

……ধীরে ধীরে কখন যে কথার মাঝে ঘুম এসে গেছে তা ও মোটেই টের পায়নি। সহসা ওর ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই চেয়ে দেখলে তরুও কখন না জানি ওরই পাশে ঘুমে ঢুলে পড়েছে!…তার বাঁ হাতটা ঘুমের ঘোরে ওরই গলার উপর এসে নেতিয়ে পড়েছে!… খোলা জানলাটা দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো গালের এক পাশ দিয়ে এসে যেন ঘুমিয়ে আছে!…চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল তখনও টলমল করছে!…বোধ হয় কাঁদছিল!…অমিয় ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তরুর হাতটা নিজের গলার উপর হতে নামিয়ে বালিশের উপর রাখলে। তারপর ধীরে ধীরে বিছানা হতে উঠে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল!… জ্বরে তখনও গা পুড়ে যাচ্ছে!…চাঁদের আলো উঠানটার উপর পড়ে যেন চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছে!…উঠানের একধারে একটা নিম গাছ নিশীথের হাওয়ায় দুলে দুলে উঠ্‌ছে।…ও পায়ে পায়ে এসে উঠানের উপর নামলে!…একবার বাইরের দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর দরজাটা টেনে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

গাড়োয়ানটা গরুর গাড়ীর ছৈয়ের মধ্যেই মাথা গুঁজে জড়সড় হয়ে অকাতরে ঘুমচ্ছিল। অমিয় এসে তাকে ঠেলতে লাগল, 'এই ওঠ!…

ধাক্কা খেয়ে গাড়োয়ানের ঘুমটা ছুটে গেল। সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বলল।

—এ্যাঁ!…কি বলছ!…'

—'এই, গাড়ী ছেড়ে দে…রাত আর নেই! এই বেলা না গেলে সকালের ট্রেন ধরা যাবে না!'…আসার সময় অমিয় স্যুটকেশটা নিয়ে এসেছিল। সেটা ধপ্ করে গাড়ীর এক কোণায় ফেলে দিয়ে সে গাড়ীর ভিতরে শুয়ে পড়ল। দারুণ উত্তেজনায় ও জ্বরে সমস্ত শরীরটা তখন তার কাঁপচে!…

…সেই মেঠো পুথটা বেয়ে চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে পড়া মাঠটাকে পিছনে ফেলে গরুর গাড়ী এগিয়ে চলতে লাগল!…

নীল আকাশের বুকে চাঁদটা ঢুলতে ঢুলতে অনেকটা হেলে পড়ছে!…ভোরের আর খুব বেশী দেরী নেই। মাঝে মাঝে দু'একটা রাত জাগা পাখী আকাশ পথে টি টি করে ডাকতে ডাকতে কে জানে কোথায় উড়ে চলেছে!…

হয়ত বা এতক্ষণে তরুর ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে। সে হয়ত ব্যগ্র ব্যাকুল পদে ঘরে ঘরে অমিয়কে খুজে বেড়াচ্ছে। গ্রামটাকে পিছনে ফেলে গরুর গাড়ীটা তখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে। সহসা পিছন দিকে চেয়ে অমিয়র চোখ দুটো জলে ভরে এল। আহা তরু, সুখে থাক ভাই। অভাগা অমিদাকে ভুলে যা।

—এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে গাড়ী হতে মুখ বের করে অমিয় দেখলে ঐ দূরে মাঠের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বিপিন বাড়ী ফিরছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল, খটা খট্ খট্ খট্…খট্!…

চিঠি-পত্র

নিখিলবঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলন

মাননীয় "খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

গত ৭ই ফাল্গুন তারিখের 'খেয়ালীতে' বৈজু বাওরার সমালোচনার উপর যে পত্রলেখক-যুগল 'খেয়ালী'র মারফত একখানি পত্র বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিলাম যে তাঁহারা শ্রীবৈজু বাওরা লিখিত প্রবন্ধের আলোচনা করিতে গিয়া নিজেদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈজু বাওরা লিখিয়াছিলেন "বাগেশ্রী"তে গায়কটী যেভাবে পঞ্চম লাগাইতেছেন তাহা রীতিবিরুদ্ধ। সমালোচক মহাশয় অর্থ করিলেন—যে কোনো মতে বাগেশ্রীতে পঞ্চম লাগে এবং কোনো মতে পঞ্চম লাগে না। এবং এমন মুরুব্বিয়ানা কোরে তিনি বলেছেন যেন পাঠকবর্গ কেহই একথা জানেন না। বাগেশ্রীতে পঞ্চম লাগাইতে হইলে **কিভাবে** লাগাইতে হয় এবং আলোচ্য গায়কটী কিরূপভাবে উহা লাগাইয়া রীতি বিরুদ্ধ ব্যাপার করিতেছিলেন এবং আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব কেনই বা উহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাই ছিল শ্রীবৈজু বাওরার কথা। "পঞ্চম লাগান" বা "পঞ্চম না লাগান" এবং "**কিভাবে** পঞ্চম লাগান"—এদুয়ের মধ্যে তফাত্ আকাশ-পাতাল। যিনি এটুকুও বুঝ্তে পারেন না, তিনিও আবার গান ও গায়ক সম্বন্ধে philosophy আওড়ান এবং আমাদেরও পড়িতে হয়। আর "প্রদীপ্কী" ও "বারোয়া" সম্বন্ধে বৈজু বাওরা আমাদের যে interesting বিবরণটী দিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমি একটু বলিতে চাই যে ব্যাপারটী আপনি যদি ধূর্জ্জটীবাবু ও খাঁ সাহেবকে মৌখিক জিজ্ঞাসা করিয়া একটা মোকাবিলার বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে মন্দ হয় না। আমিও সেই conferenceএ ছিলাম ও আলোচনাটী শুনিয়াছিলাম। প্রয়োজন হইলে আমিও কিছু নিবেদন করিতে পারি। (অবশ্য লেখায় নয়, সভায়)। আর আমার যতদূর স্মরণ আছে যে শ্রীযামিনী গাঙ্গুলী—Allahabadএ Student Competitor হিসাবে যে রংগটী গাহিয়াছিলেন তাহা 'পটদীপ্কী,' 'প্রদীপকী' নহে। পটদীপ্কী ও প্রদীপকীর মধ্যেও যে অনেক তফাৎ তাহাও কি লেখকমহাশয়দের জানা নাই? না শুধু সাফাই গাহিবার জন্যই—এই অন্যথাচরণ! আর তা ছাড়া শ্রীমান্ যামিনী গাঙ্গুলী এলাহাবাদে কি গাহিয়াছিলেন—বা না গাহিয়াছিলেন—সে কথার উত্থাপন করা তো সম্পূর্ণই অবান্তর ও অনাবশ্যক—কারণ শ্রীবৈজু বাওরা ঠাকুর ঘরে কেহ আছেন কিংবা নাই—সে সম্বন্ধে তো কোন প্রশ্ন করেন নি—সুতরাং এ চমক লাগিল কেন? ইহাতেই লেখকের identity সম্বন্ধে সন্দেহ উঠিতে পারে। "বুঝ সাধু যে জান সন্ধান!"

বিনীত

শ্রীঘনশ্যাম বটব্যাল

[নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সম্বন্ধে এই শেষ পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম। এই বাদানুবাদ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। সঃ খেঃ]

ক্যারল লোম্বার্ড

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

উপকারে মার্লিন

অভাব অভিযোগ যেমন আমাদের মধ্যে জড়িয়ে আছে তেমন ত ওদেরও। তাই সেদিন প্রপার্টি বয় যখন তার অভাবের অভিযোগ জানাচ্ছিলো তখন তার কথা শুনে ওরা অভিভূত হয়ে পড়েনি আর আমিও খবর পেয়ে চমকে যাইনি। কিন্তু চমকে গিয়েছিলাম আর একটা কথা শুনে। তার ওই অতটুকু অভাবের কথা শুনে একজন বড় অঙ্কের একখানা চেক দিয়েছে, তাই।

ডিজায়ার ছবি তোলা হচ্ছে। স্পট আর মডেলিং। কিলওয়াটের হুড়োহুড়ি। এপাশ থেকে, ওপাশ থেকে, সেপাশ থেকে আলোর রেখা টানা চলেছে। পাঁচটা ক্যামেরাম্যান, তিনটে ক্যামেরা। সেটের ওপর লোক গিস্‌ গিস্‌ করছে—বাড়তি লোক আর স্টুডিওর লোকে। এদের এড়িয়ে ওপাশে ডাইরেক্টরের তখনও বসে বসে বোঝান চলেছে একথা প্রপার্টি-বয় দুজনের জানা ছিল না কিম্বা জানা থাকলেও ওখানেই বসে আছে একথা খেয়াল ছিল না।

‘একজন জানাচ্ছিলো—“কি করি ভাই, টেক্সের দায়ে ত মারা পড়লুম। আর পারিনা।···অতটুকু বাড়ীর এত টেক্স।··· দেবও কোত্থেকে, আয় ত এই। খেতেই কুলোয় না তা আবার···।” মার্লিন চেয়ার ঠেলে উঠল। সে যে ডাইরেক্টরের কথা শুনতে পাচ্ছিল না। তার মন আর এক জায়গায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। শুনতে পাবে কী করে। মার্লিন মোটা অঙ্ক বসিয়ে একখানা চেকের ওপর নিজের নাম সই করলে, তারপর সেই প্রপার্টি-বয়টির কাছে গিয়ে হেসে বল্লে, রাখুন এটা, আমার মত কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন।

তারপর?—তারপর সে চেকখানা যে কাজে লাগিয়েছিল, এটা নিশ্চয়ই।

দুঃসময়ে মায় ওয়েষ্ট

দৌড়েছে! উঃ ভীষণ দৌড়। থামতে চায়না তারা। দৌড়ে গৃহাদি শেষ করে ফেলবে নাকি! পাহাড় নদী কিছু মানবে না তারা! সব ভেঙ্গে চুরমার ক’রে ফেলবে যে! আর যে দুটো জীবন ওর মধ্যে ধুঁকছে তাদের?

ও দুটো কী কুকুর, না বাঘের বাচ্চা! ছুটেছে তারা প্রাণপণে! থামতে ওরা চাবেনা! কারোর শাসন মানবে না। গাড়ীতে যারা বসে আছে একজন ভিক্টর ম্যাকল্যাগ্লেন অপরে মায় ওয়েষ্ট। নাম কি কিছু কম! দুইজনেই অভিনয়ের চরিত্রে অদ্ভুত! আর তাদের জীবন!

মায় এর জীবন বিপন্ন। ভিক্টর ম্যাগল্যাগ্লেন লাফিয়ে পড়ল। ধরলে চেপে

প্লেনের গাড়ী। যাক্ ক্ষতি করতে পারেনি কিছু! মায় দিলে ম্যাক্‌ল্যাগ্লেনকে ধন্যবাদ। বাড়ীতে আসতে বল্লে! আর কুকুর দুটো অতিথি সেবাপরায়ণার কাছে কোন আদরই পেলেনা। পাওয়া তাদের উচিত ছিল; ওযে মায় ওয়েষ্ট। ক্লস্তএইক লু ছবির জন্যে লেলুলয়েডের ফিতে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। ছবি শেষ করুতে পারলেই মায় বাঁচে। ও দুটো কুকুরের কথা মায় মনে রাখতে চায়না। ওতে মায়-এর ভয়ই হয়, আতঙ্ক আনে।

মিতব্যয়ী তারকা

মিতব্যয়ের দিক থেকে জান কিপারা ওর জুড়ী মেলা ভার। খরচপত্র সব হিসেবের মধ্যে। এতটুকু তার বাহিরে হবার জোটি পর্য্যন্ত নেই। ষ্টুডিওতে মিতব্যয়ী কারুকে তুলনা করতে গেলে জান কিপারার সঙ্গে তুলনা দেয়। জানেন না আপনারা! আমি বলছি ওর সবই অদ্ভুত। ওই একজন মাত্র তারকা হলিউডে আছে যে বাড়ী থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে থাবার নিয়ে আসে। হোটেলে পয়সা খরচ করে লাঞ্চ খাওয়া তার কুষ্ঠীতে লেখে না।

জান কিপারা যখন ষ্টুডিওতে আসে তখন সঙ্গে থাকে তিনটে কাগজের থলে। একটাতে থাকে ফল, একটাতে থাকে স্যাণ্ডউইচ আর একটাতে থাকে থার্ম্মো ফ্ল্যাস্ক্ ভর্ত্তি চা। তাতেই তার খাওয়া চলে।

ওর মতে মনের মত খাওয়া হয় না তা নয়—শান্তি পায় না, তৃপ্তি পায় না, বিশ্রাম পায় না। বাড়ীর থাবার খেয়ে যতটা তৃপ্তি পায় সে এতটা কিছুতেই পায় না। কাজেই তার সঙ্গে আসে ওই থলে।

প্রেম নাকি?

ডিক পাওয়েল এর হঠাৎ বাহিরে ঘুরতে যাবে বলছে ব্যাপার কি? সেও তো কম পয়সা চেনে না। সেদিন বলেছে সে আর ভাল লাগছে না দিন কতক বাইরে বেড়িয়ে আসি। ব্যাপার কি?—আমরা খবর পেয়েছি যে মেরি ব্রায়ান আর বাডি রোজার্স-এর সঙ্গে এক রকম বিয়ের ঠিক। এ বিয়ের সঙ্গে তার কি কিছু সম্বন্ধ আছে নাকি?

ক্লার্ক গেবল

সে এক সময় ছিল যখন মেরী ছিল ডিক-এর একমাত্র সহচরী আর হলিউডে সেই হচ্ছে ডিকের প্রথম পরিচিতা। সেদিন কত গুজবই রটেছিল। তারপর আজ। আজ তার বিয়ে। এ গুজব সত্যি মিথ্যে জানিনা। ডিক-এর মনে কোন একটা ব্যথা জেগে উঠেছে জানি। এ তারই জন্যে মনে হয়। সে যে ডিক-এর মনে এখনও দাগ দিয়ে রেখেছে একথাটা অনেকবারই তো টের পেয়েছি। তাই বলছি।

খুচরো খবর

হলিউডের যারা বাসিন্দা নয় এমন বৃটেনবাসী তাদের কর দিতে হয় তিন দফা; প্রথম ক্যালিফোরণিয়াতে দ্বিতীয় ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সকে আর তৃতীয় বৃটেনকে।

* * *

জর্জ্জ আর্লিস, চার্লস লাটন টেক্সের ভয়ে হলিউডে আর অভিনয় করবে না ঠিক করেছে।

* * *

জিন হারলোর লেখিকা হবার ভয়ানক সাধ।

* * *

ক্লার্ক গেব্‌ল্ জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়তে সুরু করেছেন।

সেতুবন্ধ

= উপন্যাস =

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যুঞ্জয় কলেজের কাছ বরাবর একটা দোতালা বাড়ীর নীচের একখানি ঘর অল্প টাকায় ঠিক করে মাকে সেখানে নিয়ে এলো।

বি, ই, পাশ করবার পরই মৃত্যুঞ্জয় একটা সাহেবী ফার্ম্মে অপ্রত্যাশিতভাবে দেড়শো টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে গেল। চাকরি সে নিলে বটে কিন্তু প্রাণপণে নিজের উন্নতি করবার চেষ্টার ত্রুটি করলেনা। বাইরে বাইরে প্রাইভেট কাজের যোগাড় করতে লাগলো।

মায়ের কথা এবার কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ঠেলতে পারলেনা।

ফাল্গুনের এক শুভলগ্নে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে মৃণালের বিবাহ হয়ে গেল। মৃণালের বাপ-মা কেউ নেই, লক্ষ্ণৌয়ে মেসোমশাইয়ের কাছে থেকে সে মানুষ হয়েছে। প্রিয়-বাবুর অবস্থা খুব ভালো। খাস্ গবর্ণমেণ্টের চাকরি, মাইনেও বেশ মোটা রকমের পান। যৌতুক হিসাবে তিনি মৃত্যুঞ্জয়কে পাঁচ হাজার টাকা নগদ এবং এর ওপর মৃণালকে তিনি হাজার তিনেক টাকার গয়নাও দিয়েছিলেন।

ছেলের বৌভাতে মহেশ্বরী বিশেষ কিছু করেননি। পাড়ার বাছা বাছা জন কতককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

বৌ দেখে সকলের মুখে সুখ্যাতি আর ধরেনা। বলে: বেশ বউ হয়েচে, মহেশ্বরী, তোমার নজর আছে, বলতে হবে। বৌয়ের যে শুধু রূপ আছে তা নয়, গুণও অনেক। এরকম নম্র ধীর প্রকৃতির মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। মুখের কথাটি যেন মুখেই মিলিয়ে রয়েচে।

মহেশ্বরী বল্লেন: এখন তোমরা পাঁচজনে আশীর্ব্বাদ কর যাতে মৃত্যুঞ্জয় আমার বেঁচে-বর্ত্তে ঘর-সংসার করতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় এদিন নিজেকে কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলো। মৃণালকে ঘরে আনবার পর থেকে তার কাজ করবার একাগ্রতা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এসেছে। তার অন্তরে প্রেমের যে ফল্গুধারা বরফে ঢাকা শীতের নির্ম্মম প্রকোপে জমাট বেঁধেছিলো মৃণালের প্রেমের অরুণ আলোকপাতে ধীরে ধীরে সেটি চটুল ভঙ্গিমায় নৃত্য ক'রে উঠলো প্রকাশ-বেদনায়। দেহের প্রতিটি 'রেখায় অব্যক্ত আনন্দ-শিহরণের অভিনব আয়োজন, একটি বিচিত্র অনুভূতি। মনে হয় যেন মৃণালের আবির্ভাবের জন্যে সে প্রতীক্ষা-প্রখর মুহূর্ত্ত গুণেছে। মৃণালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো তার কল্পনার ইন্দ্রজাল। যে পৃথিবী ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের চোখে সীমাবদ্ধ, যে মনের আয়তন ছিল সঙ্কীর্ণ, বাস্তবতার কঠিন নিগড়ে অবরুদ্ধ, সে হয়েছে আজ অসীম, ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী গেছে ঘুচে। যৌবন-নদীর উভয় কূল আর দৃষ্টিগোচর হয়না। প্রেমের উদ্দাম ফেনপুঞ্জ অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে ফেনায়িত হয়ে উভয় কূল প্লাবিত করে তুলেছে। মৃণালকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের খেলার অন্ত নেই। নিজের কাজের যথেষ্ট ক্ষতি

স্বীকার করে সে মৃণালকে সুখী করবার জন্যে নিত্য-নতুন পন্থা আবিষ্কার করতে লাগলো। সেদিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়োজিত করে রেখেছে।

এদিকে মহেশ্বরী বৌমাকে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম শেখান। মৃত্যুঞ্জয় একটু সুযোগ পেলেই মৃণালের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে। মৃণালও ঈষৎ ঘোমটার মধ্যে থেকে অতি মৃদুস্বরে উত্তর দেয়।

রাতে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুঞ্জয় এবং মৃণালের মধ্যে যে-সব কথাবার্ত্তা হয় সে-গুলো অধিকাংশই তাদের অপরিপক্ক মনের রঙীন উচ্ছ্বাস—ছেলেমানুষীর নামান্তর।

মৃত্যুঞ্জয় বলে: আমায় তুমি ভালবাসো, মৃণাল?

মৃণাল অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করে উত্তর দেয়: যাও, আমি জানিনা।

—বলবে না তুমি?

—না।

—তা হলে আমি পাশ ফিরে শুই? কী হবে সারারাত মিছিমিছি জেগে থেকে—বলে মৃত্যুঞ্জয় পাশ ফিরে শোয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের একটা হাত টেনে নিয়ে মৃণাল বলে: তোমাকে কিছুতেই আজ পাশ ফিরে শুতে দেবোনা। আমার দিকে ফিরে শোও, বলচি।

আঃ কী হচ্ছে, মৃণাল? সারাদিন খেটেখুটে এসে কোথায় একটু বিশ্রাম করবো, তা নয় কাণের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতে আরম্ভ করলে।

মৃণাল বুঝতে পারে, মৃত্যুঞ্জয় রাগ করেছে। বলে, ধন্যি তোমার রাগ বাবা। না বলেচি বলে মুখ গোঁজ করে পাশ ফিরে শোওয়া হলো। আচ্ছা বলচি বলে মৃত্যুঞ্জয়ের কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে যে-কয়টি কথা সে উচ্চারণ করে তাতে মৃত্যুঞ্জয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। সাগ্রহে মৃণালের হাতের আঙুলগুলি নাড়তে নাড়তে বলে: এদ্দিন তুমি কোথায় ছিলে বলতো, মৃণাল?

—তোমার যেমন কথার ছিরি! কোথায় আবার থাকবো? মেশোমশাইয়ের কাছেইতো ছিলুম।

—না, না, ও তোমার ভুল ধারণা মৃণাল। তুমি আমার অন্তরের মধ্যে ছিলে লুকিয়ে। আমার ইচ্ছায় তোমার বাইরের প্রকাশ। তোমার সাধ্য-সাধনা করে পেতে হয়নি।

—তুমে, কি যাতা বকচো, বলতো?

—একটা কথা বলবো, মৃণাল?

—বল।

—বিলেতে পড়তে যাওয়া যদি আমার ভাগ্যে ঘটে তুমি একা থাকতে পারবেতো? আমার জন্যে তোমার মন কেমন করবেনা?

—হুঁ—একটু থেমে মৃণাল বলে: আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই তো পারো। সব সময় তোমাকে দেখতে পাবো।

—অত পয়সা তো আমার নেই, মৃণাল।

—তা হলে বিদেশে গিয়ে তোমার কাজ নেই। তোমার যা আয় তাতেই আমাদের বেশ চলে যাবে।

—আমার উন্নতি তুমি চাওনা, এই না?

—তাই বুঝি বললুম?

—তবে?

—যেতে আমি তোমাকে বারণ করবো না, কিন্তু বেশীদিন সেখানে থেকোনা: পড়াশোনা শেষ হলেই চলে এসো, বলে মৃণাল মৃত্যুঞ্জয়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকায়।

বছর দেড়েক পরে এদের সংসারে এলো নবীন অতিথি—একটি অপরিচিত পান্থ।

মৃত্যুঞ্জয়ের ছেলে হয়েছে, মহেশ্বরীর আনন্দ রাখবার আর যায়গা নেই। মৃণালের মাতৃহৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। মৃত্যুঞ্জয়ও ছেলেটির দিকে চেয়ে চেয়ে কী এক উন্মাদনায় আত্মহারা হয়ে ওঠে! ছোট ছোট দুটি হাত মোমের মত নরম, মুখের গড়ন ওরই অনুরূপ। শুধু রংটি শিশু মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় ভাবে: এই জড়পিণ্ডবৎ শিশুটি ওরই অভিন্ন-ছবি। এমন কি প্রাণ ধারণোপযোগী জীবনীশক্তিটুকু পর্য্যন্ত শিশুটি মৃত্যুঞ্জয়ের কাছ থেকে সঞ্চয় করে নিয়ে এসেচে। আশ্চর্য্য এই সৃষ্টিরহস্য!
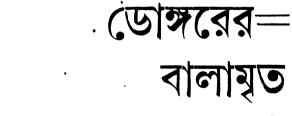
মহেশ্বরী নাতির নাম রাখলেন দিলীপ।

শ্রীএকলব্য

আন্তর্প্রাদেশিক হকি খেলা

আসছে আগষ্ট মাসে জার্ম্মানীতে অলিম্পিক খেলায় ভারতবর্ষ থেকে একটি শক্তিশালী হকি দল পাঠানোর জন্যে কোলকাতায় এই প্রতিযোগীতার সৃষ্টি হয়েছে—এ খবর আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে আগেই জানিয়েছি। অলিম্পিকে গেল দুবারই ভারতবর্ষীয় দল জগৎজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে—কাজেই এবার খুব চিন্তা বিবেচনা করে দল মনোনয়ন করতে হবে যাতে এবারও ভারতবর্ষ জয়ী হয়ে ফিরতে পারে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রাদেশিক দল ছাড়াও এবার অন্যান্য আরও কটা দল কোলকাতায় খেলতে এসেছে—যেমন, মানভাদার, ভূপাল, নিখিল ভারত রেলওয়েজ। এই খেলায় আজ পর্য্যন্ত অনেকগুলো খেলা শেষ হয়ে গেছে এবং প্রতিযোগীতা প্রায় শেষ হয়ে 'এল। আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা যে বাঙ্গলা দল এবার বেশ ভাল খেলছে। প্রথমে তারা খেলেছিল বিহার ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে। এই খেলায় তারা ৭ গোলে জিতেছে। অবশ্য এই খেলায় যে বাঙ্গালা দল অক্লেশেই জিততে পারবে তা সকলেরই জানা ছিল। তার পরের রাউণ্ডে বাঙ্গালা দল নিখিল ভারত রেলওয়েজ দলকে তিন গোলে হারিয়ে দিয়ে সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করেছে। রেলওয়ে দলে পৃথিবীর নামকরা অনেক বড় বড় খেলোয়াড় ছিল। কাজেই এই খেলায় বাঙ্গালা দল এত সহজে জয়ী হতে পারবে—এ অনেকে ভাবতে পারেনি। বাঙ্গালা দল এখন আন্তর্প্রাদেশিক প্রতিযোগীতায় সেমি ফাইনালে উঠেছে

অন্যান্য খেলার মধ্যে ভূপাল বনাম পাঞ্জাব খেলার ফল অভাবনীয় হয়েছে। এই খেলায় পাঞ্জাব দল ভাল খেলেও ভূপাল দলের কাছে এক গোলে হেরে গেছে। আজ পর্য্যন্ত এই খেলায় যা ফলাফল হয়েছে নীচে দেওয়া হল।

৪ঠা মার্চ্চ

বাঙ্গলা ৭ বিহার-উড়িষ্যা ০

৫ই মার্চ্চ

বোম্বাই ৩ যুক্তপ্রদেশ ২

পাঞ্জাব ০ ভূপাল ০

৬ই মার্চ্চ

বাঙ্গলা ৩ নিখিল ভারত রেলওয়ে ১

ভূপাল ১ পাঞ্জাব ০

মাদ্রাজ ২ মধ্যপ্রদেশ ১

৭ই মার্চ্চ

মাদ্রাজ ১ দিল্লী ১

বোম্বাই ১ ভূপাল ১

মানভাদার ২ সিন্ধু ১

৯ই মার্চ্চ

বোম্বাই ২ ভূপাল ১

দিল্লী ৪ মাদ্রাজ ৩

১০ই মার্চ্চ

বাঙ্গলা ৩ দিল্লী ০

মানভাদার ০ বোম্বাই ০

বুধবার ১১ই মার্চ্চ এই প্রতিযোগীতা শেষ হবার কথা। তবে মঙ্গলবার দিন

দিলীপ যখন বছর পাঁচেকের, মৃত্যুঞ্জয়ের ভাগ্যাকাশ উন্নতির উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। হঠাৎ সে একটা বড় গোছের কনস্ট্রাক্‌শ্যান ওয়ার্ক পেয়ে গেলো এবং কয়েক মাসের মধ্যে সে আশার অতিরিক্ত লাভ করে ফেল্লে।

(ক্রমশঃ)

মানভাদারও বোম্বাই-এর খেলা ড্র হওয়ায় বুধবার Final হবে কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা আছে। বাঙ্গলা Semi Final-এ দিল্লীকে হারিয়ে দিয়ে ফাইনালে উঠলো—আশা করা যায় বাঙ্গলা এবার Champion হবে।

* * *

আন্তর্প্রাদেশিক হকি খেলার সঙ্গে সঙ্গেই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক হকি প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠান গেল বুধবার হয়ে গেছে। এ বছর খেলাটি সমান-সমান অর্থাৎ ড্র হয়েছে—কোন দলের কোন গোল হয়নি। খেলা যতটা ভাল হবে আশা করা গেছল ততটা ভাল হয়নি। স্থানীয় দলের জয়ের বেশ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু ফরোয়ার্ডদের খারাপ খেলার দোষে শেষ পর্য্যন্ত কোন গোল হয়ে ওঠে নি।

এই বছর নিয়ে এ প্রতিযোগীতা চার বার হোল এবং চার বছরের ক্রমিক ফলাফল হয়েছে এই রকম :—

১৯৩৩—কলিকাতা ৩ পাঞ্জাব ১
১৯৩৪—পাঞ্জাব ৪ কলিকাতা ০
১৯৩৪—পাঞ্জাব ৫ কলিকাতা ০
১৯৩৬—কলিকাতা ০ পাঞ্জাব ০

ক্রিকেট খেলা

এ বছর কোলকাতায় একটি প্রতিযোগীতা-মূলক ক্রিকেট খেলার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কোলকাতায় ফুটবল, হকি, টেনিস ইত্যাদি সব রকম outdoor খেলাধুলোর প্রতিযোগীতামূলক খেলার ব্যবস্থা আছে কিন্তু হকি খেলায় এ রকম কিছু এতদিন ছিল না। ক্রিকেট অনুরাগী কুচবিহারের পরলোকগত মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের নামে এই প্রতিযোগীতা একটি কমিটির অধীনে এবং বেঙ্গল জিমখানার অনুমোদনে পরিচালিত হচ্ছে। এ বছর প্রথমবার এবং তার ওপর season শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রতিযোগীতা তেমন জমেনি। কেন না কোলকাতারই অনেক নামকরা টিম (যেমন, স্পোর্টিং ইউনিয়ন) এতে যোগ দেয় নি; আর এ ছাড়াও এই প্রতিযোগীতাটি ভারতীয় দলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ—অর্থাৎ অভারতীয় কোন দল এতে খেলতে পাবে না। এব্যারে যে কটি দল এতে যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে মোহনবাগান এবং মোহামেডান স্পোর্টিং শেষ পর্য্যন্ত finalএ উঠেছিল। ফাইনালে মোহামেডান দল মোহনবাগানকে এক ইনিংস এবং ৫৮ রাণে হারিয়ে দিয়েছে। ফাইনাল খেলার ফলাফল নীচে সংক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়া হোল :—

মোহামেডান স্পোর্টিং—২৩০ রান (গফুর ৯০ রান; আর, মুখার্জ্জি ৫৪ রানে ৩টি এবং এস, প্রামাণিক ৩৬ রাণে ৪টি উইকেট)

মোহনবাগান—প্রথম ইনিংস ৯৫ রান (ডি, দে ২৬ রাণ, গোষ্ঠ পাল ২০ রাণ; অবেদ আলি ৩৫ রানে ৪ উইকেট) দ্বিতীয় ইনিংস ৭৭ রান (জিতেন ঘোষ ৩২ রান; অবেদ আলি ২৬ রানে ৪ উইকেট এবং জোবেদি ২৩ রানে ৫ উইকেট)

খেয়ালী চিত্রপট—

শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা—ছায়ালোকের ছায়াকে চন্দ্র ফিল্মসের "পরপারে"র রূপালী জ্যোৎস্নাতে উজ্জ্বল কোরে তুলবেন।

পরিচালক

টেলিগ্রাম	ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ	টেলিফোন
'ভ্যারিটি'	৮, রামময় রোড্, কলিকাতা	পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৬ই চৈত্র, ১৩৪২, ১৯শে মার্চ ১৯৩৬

ময়ূরপুচ্ছে দাঁড়কাক

গায়ে পড়িয়া যে বন্ধুত্ব করিতে আসে তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখাই বুদ্ধিমানের নীতি। "করদাতা-বান্ধব-সঙ্ঘে"র প্রথম আবির্ভাব সময়ে আমরা ইহাকে সেই চক্ষেই দেখিয়াছিলাম। এতদিন এই করদাতা-বান্ধবগণ কোথায় ছিলেন? যেদিন দরিদ্র করদাতাদের উপেক্ষা করিয়া করপোরেশনে শ্রেণী-বিশেষের প্রভুত্ব ছিল, যেদিন সাহেবপাড়া ও বাঙ্গালীপাড়ায় ছিল আকাশ-পাতাল প্রভেদ, সেই দুঃখের দিনে এই বান্ধবগণ সোণার টোপর মাথায় দিয়া কোন্ বনে লুকাইয়া ছিলেন? আজ যখন কংগ্রেস নির্ভীক চেষ্টা ও সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মপ্রণালীর দ্বারা করপোরেশনে করদাতৃ-সাধারণের স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে, তখন অমনি ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার জন্য ইহাঁরা 'করদাতাদের চাঁদের লোভ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিতে বান্ধবের বেশে হাজির হইয়াছেন। ইহাঁরা নিজেদের ঢক্কানিনাদে নিজেরাই উৎফুল্ল। ঢাকের বাদ্য যে থামিলেই মিষ্ট লাগে, অভদ্র আনন্দের মোহে সেই সামান্য কথাটাও ইহাঁরা ভুলিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত লোককে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া এই তথাকথিত করদাতা-বান্ধবসঙ্ঘ যে এতদিন প্রচারকার্য্য চালাইতেছিল ইহাতে আমরা অবশেষে সময় থাকিতে যে ইহার স্বরূপমূর্ত্তি আচার্য্যদেবের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে ইহাই বিশেষ আনন্দের কথা। ইহার ঘৃণিত ও জঘন্য প্রচারকার্য্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন তাহা রবিবারের "আনন্দবাজারে" প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন "কংগ্রেস ও কংগ্রেসসেবীদের জঘন্য আক্রমণপূর্ণ লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র, পুস্তিকা ও সাপ্তাহিক পত্র বিনামূল্যে বিতরিত হইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি।" আচার্য্যদেব তো বিস্মিত হইতেই পারেন কারণ তাঁহার মত সরল লোক তো সকল সময়ে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাককে চিনিয়া উঠিতে পারেন না? এক হাত গলায় আর এক হাত পায়ে লাগাইয়া যে সকল ভণ্ড লোক-হিতৈষণার মুখোস পরিয়া জীবনে চলে, তাহাদের কার্য্যধারা এইরূপ। করদাতাদের উপকার নহে, কংগ্রেসের বিরোধিতা করাই এই সঙ্ঘের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বুঝিয়াই প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"এ সম্বন্ধে আমি ইহাও বলিতে বাধ্য যে, লীগের কর্ম্মকর্ত্তাগণ লীগের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী মনোনয়নকালে উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কংগ্রেসের লোক বলিয়াই যখন মনোনীত করেন নাই ও তাঁহাদের মনোনীত একুশজন প্রার্থীর মধ্যে উনিশজন প্রার্থী কংগ্রেসকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর গৃহীত হইয়াছে, তখন লীগের এই কার্য্যধারাকে আমি সমর্থন করি না।"

এতদিন যদি কাহারও মনে সামান্য সন্দেহও থাকে, আচার্য্যদেবের এই দুইখানি পত্র প্রকাশের পর তাহা নিঃসন্দেহে তিরোহিত হইবে। সরকারের ধামাধরা, জোহুকুম-পৃষ্ঠপোষিত সঙ্ঘ কোনও করদাতার নিকট হইতে সামান্যতম সাহায্যও যাহাতে না পায়, তাহা প্রত্যেকেরই দেখা কর্ত্তব্য। এ যুগে কংগ্রেস-দ্রোহিতা দেশ-দ্রোহিতারই নামান্তর। তাই আচার্য্যদেবের পত্রের শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা কলিকাতার নাগরিকবৃন্দকে সচেতন করিতে চাই :—

"**কংগ্রেস** দেশের শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। এবং সেজন্য জনসাধারণের নির্ব্বাচনাধিকার বলে নির্ব্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইবার দাবী কংগ্রেসেরই।

কংগ্রেসের আজীবন সেবকরূপে আমি কংগ্রেসকেই জয়যুক্ত দেখিতে চাই।"

দক্ষিণ কলিকাতা সেবক-সমিতির সহকারী সম্পাদকের বিবৃতি

দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বিশ্বাস শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকারের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, সেবক সমিতির কোনও কর্ম্মী, এমন কি ব্যক্তিগতভাবে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষের নির্ব্বাচনে সহায়তা করিতেছেন না।

শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র বিশ্বাসের এই বিবৃতির পর, আশা করি, কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রচারকবৃন্দ সেবক-সমিতির কল্পিত সহায়তার সংবাদ প্রচার করিয়া সাধারণের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে বিরত হইবেন।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার

সমীপেষু

প্রিয় অক্ষয় বাবু

দেখিলাম যে এই সপ্তাহের "খেয়ালী"তে সবিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে যেহেতু দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির ন্যায় প্রতিষ্ঠানের —যে প্রতিষ্ঠান বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট এত বেশী রকম ঋণী—কর্ত্তৃপক্ষ ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ যাহাতে কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হইতে পারেন সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যদিও তিনি কংগ্রেস মনোনয়ন পান নাই অর্থাৎ মিঃ এস, সি, বসু কর্ত্তৃক মনোনীত হন নাই। তাহাতে অনেকটা নিশ্চিত করিয়া একথাও বলা হইয়াছে যে, উক্ত সমিতির কয়েকজন সভ্য যাঁহারা করপোরেশনের কর্ম্মচারী, তাঁহারাও ধীরেনবাবুর পক্ষে খাটিতেছেন।

যাহা হউক, আমি আপনাকে বলিতে চাই যে "খেয়ালী"তে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইতিপূর্ব্বে কখনও কোনও নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করে নাই। কেন করে নাই সে কারণ সহজেই অনুমেয়; এবং বর্ত্তমানে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে, সমিতির কোনও কর্ম্মী এমন কি ব্যক্তিগতভাবেও, বিশেষ করিয়া ধীরেন বাবুর জন্য কাজ করিতেছেন না। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক এবং যেহেতু তাঁহার কোনো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শুধুই যে প্রতিষ্ঠানের সভ্য তাহা নয়, ইহার কার্য্য-পরিচালক সংসদের সদস্যও বটেন, সেইহেতু ধীরেনবাবু যদি কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীও হইতেন তথাপি সেবক সমিতির কর্ম্মীরা বর্ত্তমানে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার বিপরীত আচরণ করিতেন না।

ভবদীয়

অনিল চন্দ্র বিশ্বাস

বিবিধ

শালাবাবু

'স্বর্ণলতার' গদাধরচন্দ্রের পর ভাওয়ালের মধ্যমকুমারের শ্যালকপ্রবরই "শালাবাবু" নামে সুপরিচিত ছিলেন। এবার আর এক "শালাবাবুর" আবির্ভাব হইয়াছে। ইনি 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষের শ্যালক—দত্তজ। এই "শালাবাবু" কর্পোরেশনে সরাসরি দুই শত টাকা মাসিক বেতনের চাকরীতে বহাল হইয়াছেন। তিনি যখন তুষারকান্তির শালা, তখন 'অমৃত বাজারের' সমর্থনকারী কাউন্সিলাররা অবশ্য তাঁহাকে ভগিনীপতির সম্মানও দিতে পারেন। কিন্তু এই নিয়োগ লইয়া এত আন্দোলন কেন? তুষারকান্তি পুলিশ কমিশনারের "বার্ত্তা লইয়া" যখন স্বরাজ্যদলের কাছে যাইয়াও Nationalist news paperএর সম্পাদকরূপে আজও বিরাজ করিতেছেন, তখন যদি দোষ না হইয়া থাকে, তবে শ্যালকের প্রতি প্রীতিই কি দোষের? কথায় বলে:—

"রাস্তার অধম গলি,
কুটুম্বের অধম শালী;
গলার শোভা মালা
কুটুম্বের শোভা শালা।"

সুতরাং শালাবাবুর প্রতি প্রীতিই কি দোষের?

তবে কেবল শালার চাকরীই নহে। ইহাতে তুষারকান্তির আরও সুবিধা হইল। শুনিয়াছি, বীণার মামলার পর তুষারের পত্নী নাকি তাঁহাকে নলিনীর সঙ্গে মিশিতে বারণ করিয়াছিলেন। এবার তুষার বলিলেন—"উপকার ত তোমারই হইল। তাই চাকরী পাইল।" 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' আবার নলিনীর প্রশংসাকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। হইবে না-ই বা কেন?

'দৈনিক বসুমতী' লিখিয়াছেন:—

"সার্ভিস কমিটীর সভাপতি হইলেন শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার। তিনি যে তুষার বাবুর অকৃত্রিম বন্ধু তাহা একাধিক ঘটনায় জানা গিয়াছে। ভক্তবৎসল সরকার সাহেব তুষার বাবুকে আপ্যায়িত করিলে আগামী নির্ব্বাচনে 'আপন দলের প্রার্থীদের গুণকীর্ত্তন যে বিনা খরচায় সুচারুভাবে চলিবে ইহা বুঝিয়াই করদাতার এই অর্থের সদ্ব্যবহারের সমর্থন করিয়াছেন। কর্পোরেশনের ভিতরকার বহু কর্ম্মচারী এবং বাহিরের বহু প্রার্থী যে বিদ্যা ও গুণে দত্তজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিবারও প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই।"

দত্তজ অপেক্ষা অন্য যে কোন বিষয়ে অন্যান্য প্রার্থীরা বড় হইলেও—আর কেহই যখন 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদকের শালা নহেন, তখন তাঁহাদিগকে হার মানিতেই হইবে।

আমরা তুষারকান্তির প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা করি না। তাঁহার সুপারিষে যদি শালার একটা হিল্লা হয়, তবে মন্দ কি?

ন্যায়ের ফাঁকি

৩নং ওয়ার্ডের কংগ্রেসদ্রোহী কাউন্সিলার পদপ্রার্থী শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী যে পাকা লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি কংগ্রেসের মনোনয়ন "পেয়ে হারালেম" হইয়া এখন স্বতন্ত্র প্রার্থী হইয়াছেন। তিনি যখন লিখিতং করিয়াছিলেন, কংগ্রেসের মনোনয়ন না পাইলে আর নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন না, তখন সে প্রতিশ্রুতি কেন ভঙ্গ করিলেন, জিজ্ঞাসায়. উত্তরে তিনি নাকি বলিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছিলেন, তিনি মনোনয়ন না পাইলে আর নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন না; কিন্তু এমন কথা ত লিখেন নাই যে তাঁহার মনোনয়ন বাতিল হইলে আর প্রার্থী হইবেন না। চমৎকার! ইহাকেই বলে ন্যায়ের ফাঁকি। কিন্তু গল্প আছে—কলুর চোখ ঢাকা বলদের গলদেশে ঘণ্টা কেন বিলম্বিত এক পথিক তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কলু বলিয়াছিল—বলদটা ঘুরিতেছে কি না, তাহা দূর হইতেও সে ঘণ্টাধ্বনিতে বুঝিতে পারে। শুনিয়া পথিক মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বলদ যদি দাঁড়াইয়া মাথা নাড়ে, তাহা হইলেও ত ঘণ্টা বাজিবে।"—কলু তাহাতে জবাব দেয়—"বলদটা ন্যায় পড়ে নাই।" তেমনই রায় চৌধুরীর এই Interpretationএ লোক ভুলিবে না।

মন্ত্রী ও নিরন্ন

গত রবিবারের 'অমৃতবাজার পত্রিকার' অলঙ্কার—

এক দিকে বর্দ্ধমানে নিরন্নের হাহাকার;
আর এক দিকে বর্দ্ধমানজাত মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের ছবির বাহার।

কাল পরিণয়

নির্ব্বাকযুগে যে চিত্রখানি আপনাকে করিয়াছিল মুগ্ধ—সেইখানি সবাকে আরো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া আপনাকে করিবে চমৎকৃত। উৎকৃষ্ট পরিচালনায়, চিত্রশিল্পে, অভিনয়ে ও সঙ্গীতে কালী ফিল্মস্-এর "কাল পরিণয়" আপনার প্রাণে আনিবে শিহরণ। সত্যি, এ চিত্রটি হইবে সুন্দরতম। অভিনব ভূমিকা লিপি-তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, জীবন গাঙ্গুলী, জহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, মায়া মুখার্জ্জী, রাণীবালা, মাষ্টার সন্তু, দুনিয়াবালা প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর প্রযোজনায়

উত্তরায় আসিতেছে

আজ বর্দ্ধমানবাসীরা যদি জিজ্ঞাসা করে—

এই সার বিজয়প্রসাদ মন্ত্রী হইয়া মোট কত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন আর কত টাকা বর্দ্ধমানের নিরন্নদিগের জন্য ব্যয় করিয়াছেন তবে তাহার কি উত্তর পাওয়া যাইবে ?

ইষ্টারের ছুটীতে ই, বি, আর-এর ব্যবস্থা

সারা বৎসরের কর্ম্মক্লান্তির মধ্যে বাঙ্গালী কেরাণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ছুটীর দিকে চাহিয়া থাকে যখন বাহিরে গিয়া, নূতন দেশ ও দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের একঘেয়ে ভাব কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ছুটী হইলেই অত্যধিক খরচের জন্য সব সময় ইহাদের বাহিরে যাইবার সুবিধা হয় না। এবার ইষ্টারের ছুটীতে ই, বি, আর সেই সুবিধা দান করিয়াছেন। ১০৲ টাকায় তৃতীয় শ্রেণী ও ১৫৲ টাকায় মধ্যম শ্রেণীতে ই, বি, আর এর যে কোনো স্থানে যতবার ইচ্ছা যাতায়াত করিতে পারেন। ভ্রমণের আনন্দ ও জ্ঞান সঞ্চয়ের এই অপরূপ সুবিধা গ্রহণে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সবিশেষ উন্মুখ হইবেন—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

পরলোকে

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী জমিদার ভূপতিভূষণ রায় ইহলোকের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি শিয়ালদা ইম্পিরিয়াল ক্লাবের একজন বিশিষ্ট ক্রীকেট খেলোয়াড়, সোণার বাংলার নাট্য সমালোচক চিত্রসেন মহাশয়ের মাতুল, রেডিয়োর খ্যাতনাম্নী সম্ভ্রান্ত বংশীয় গায়িকা শ্রীমতী কমলা রায়ের স্বামী। এর একমাত্র শিশুকন্যা আছে, বৃদ্ধা মাতা জীবিতা, ভগবান এই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি দিউন !

৩নং ওয়াড

এবারকার কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস কর্পোরেশন ইলেকসান বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সহরের করদাতাগণকে কংগ্রেস প্রার্থীগণকে সমর্থন করিতে যে আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই কথাই তিনি অতিশয় দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণকে সমর্থন করিলে করদাতাগণের বিশ্বাস কোন মতেই অপাত্রে ন্যস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। শরৎচন্দ্রের উপর কলিকাতার জনসাধারণের অখণ্ড বিশ্বাস আছে ; সুতরাং এই কারণে আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণের জয়ের বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না। কংগ্রেস-বিরোধী তথা স্বদেশদ্রোহী প্রার্থীবর্গ এবং উহাদের তল্পিবাহকেরাও কংগ্রেস বিপক্ষে নিজেদের দুরবস্থা উপলব্ধি করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীগণের নামে অসভ্য অনোচিত এবং মিথ্যা কুৎসা রচনা করিয়া করদাতাগণের সম্মুখে অসত্যের মোহজাল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রলুব্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন নির্ব্বাচন

২২নং ওয়ার্ডের করদাতাগণের নিকট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের

আবেদন

বন্ধুগণ,

কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী নির্ব্বাচন আসন্নপ্রায়। আপনাদের ওয়ার্ড হইতে উক্ত নির্ব্বাচনে সদস্যপদপ্রার্থীরূপে দুইজন দাঁড়াইয়াছেন। আপনাদের সম্যক্ অবগতির জন্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে ইঁহারা সকলেই কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্য হিসাবে নির্ব্বাচনপ্রার্থীরূপে দাঁড়াইবার জন্য কংগ্রেস কর্পোরেশন ইলেকসন বোর্ডের মনোনয়নের আবেদন জানাইয়াছিলেন।

বহুদিন হইতে নাগরিক সাধারণ দাবী জানাইয়া আসিতেছিলেন যে কর্পোরেশনের প্রতি নির্ব্বাচনে নূতন নূতন ব্যক্তিকে সদস্য করিয়া পাঠান উচিৎ। এই দাবীর যৌক্তিকতা আমিও উপলব্ধি করি এবং আমি মনে করি পুরাতন কাউন্সিলারদের সঙ্গে যদি যথাযথ সংখ্যক নূতন লোককে কাউন্সিলার করিয়া পাঠান যায় তাহা হইলে কলিকাতা নগরীর নাগরিক সাধারণের স্বার্থ অধিকতর পরিমাণে সুরক্ষিত হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এবং নানাদিক্ দিয়া সমীচীন বিবেচনা করিয়া ইলেকশন বোর্ডের পরামর্শে ও সমর্থনে আমি **প্রফেসর প্রকাশচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে** আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যপদপ্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছি। বন্ধুগণ, আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া আপনারা আসন্ন মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যদ্বয়কে ভোট দিয়া দেশবন্ধুর স্মৃতিবেদীমূলে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করুন—কলিকাতা মহানগরীর নরনারীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে আমাদের সহায় হউন। ইতি—

ভবদীয় বিশ্বস্ত সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

তিন নং পল্লীতে ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত এবং ডাঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে সদস্যপদ-প্রার্থী। ডাক্তার সেনগুপ্ত এবং ডাক্তার ঘোষ ৩নং পল্লীর প্রায় সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং এইজন্য পল্লীবাসীর অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং বিশেষতঃ ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত তিন নম্বর পল্লীর দরিদ্র বান্ধব সমিতির অন্যতম কর্ণধার। আগামী নির্ব্বাচনে এঁদের সাফল্য যে সুনিশ্চিত এবং এই দুই জনসেবকের বিপক্ষে নিজেদের সাফল্যের কোন আশা ভরসা নাই বুঝিতে পারিয়া কংগ্রেস-বিরোধী কুচক্রী চক্র এঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিষোদ্গারণ আরম্ভ করিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে ইহাদের জঘন্য মিথ্যাপ্রচার কার্য্যের ভাষা এবং ভাব বিশেষ নিন্দনীয়। খুব বেশী দিনের কথা নহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় যখন স্বরাজ্যদল গঠন করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে মনোনীত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ডাঃ সেনগুপ্তের উপর দেশবন্ধুর কি অপরিসীম বিশ্বাস ছিল। করম্চাঁদ বনাম আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং যতীনবাবুর যে বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে তাহাতে তাঁহারা উভয়েই ডাঃ সেনগুপ্তের সত্যনিষ্ঠা এবং সততা সম্বন্ধে পঞ্চমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার পরও যে ডাঃ সেনগুপ্তের স্বপক্ষে আরও বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে তাহা আমরা মনে করি না। তিন নম্বর পল্লীতে নির্ব্বাচনে তিনি যে অবশ্যই জয়গৌরবে বিভূষিত হইবেন—তাহা না বলিলেও চলে।

কলব্য

আন্তপ্রাদেশিক হকি

আন্তপ্রাদেশিক হকি-প্রতিযোগীতা শেষ হয়ে গেল—বাঙ্গলা final খেলায় মানাভাদার দলকে এক গোলে হারিয়ে দিয়ে এ বছরকার মত champion হোল। এই খেলায় বাঙলা যে রকম খেলেছিলো তাতে তাদের আরো অনেক বেশী গোলে জেতা উচিত ছিল। কিন্তু ফরোয়ার্ডদের জন্যে অনেক সময়ে গোল হয়েও হয়নি। তবে দু'দলের রক্ষণভাগ আক্রমণভাগের চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বাঙ্গলার পক্ষে সেদিন গোলে এ্যালেন এমন সুন্দরভাবে অনেকগুলো বল ধরেছেন যা অন্য কোন গোলকীপার ধরতে পারতো কিনা সন্দেহ আছে! আর ব্যাকে পি ট্যাপসেলের তো কথাই নেই—সেদিন যারা ট্যাপসেলের খেলা দেখেছে তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে ট্যাপসেল কেন নিখিল ভারত দলের পক্ষে খেলবার জন্যে মনোনীত হয়ে বার্লিন অলিম্পিক-এ খেলবে। হাফ ব্যাক তিন জনের মধ্যে সেদিন সব চেয়ে ভাল খেলেছে গ্যালিবাডি ও শৈলেন চট্টোপাধ্যায়। আবার এই দুজনের মধ্যে

আমাদের মতে শৈলেশের খেলা ঢের ভাল হয়েছে। মানাভাদার দলের প্রায় সকলেই ভাল খেলেছে। এই বছর নিয়ে চার বার এই খেলা হোল। ক্রমিক নিয়মানুসারে কে কোন বছর champion হয়েছে তা নীচে দেওয়া হোল।

১৯২৮—যুক্তপ্রদেশ
১৯৩০—পাঞ্জাব
১৯৩২—নিখিল ভারত রেলওয়েজ
১৯৩৬—বাঙলা

* * *

আন্তপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগীতার ওপর নির্ভর করে গেল হপ্তায় বার্লিনগামী নিখিল ভারত অলিম্পিক হকি দল মনোনয়ন করা হয়েছে। বাঙলা থেকে নামে পাঁচ জন নিখিল ভারত দলে স্থান পেলেও ঐ পাঁচ জনের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নেই। যাক্, এর জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। বাঙ্গালী হকি এখনো ভাল করে খেলতে শেখেনি, তাই মনোনীত হয় নি—এটা খেলোয়াড় জনোচিত মনোভাব নিয়ে মেনে নেওয়াই ভাল।

মেয়েদের স্পোর্টস্

ছোট ছোট মেয়েদের জন্যে অনেকগুলো স্পোর্টসের প্রচলন আছে কিন্তু যে সব মেয়েদের একটু বয়েস বেড়ে গেছে তাদের জন্যে এ রকম কোন স্পোর্টসের প্রচলন ছিল না। এর অভাব দূর করার জন্যে সহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মিলে গেল সপ্তায় গড়ের মাঠে পার্কে একটি Inter Collegiate Girls Sports এর অনুষ্ঠান করেন। সেদিনকার উৎসবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মতে Inter Collegiate Girls' Sports সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

বাইটন কাপ প্রতিযোগীতা

হকি অনুরাগী লোকেরা শুনে খুব খুশী হবেন যে এবার বাইটন কাপ খেলায় অনেক ভাল ভাল টিম যোগদান করায় এই প্রতিযোগীতাটি বেশ প্রতিযোগীতামূলক হবে। আজ পর্য্যন্ত যে সব দল বাইটন কাপে খেলার জন্যে রাজী হয়েছে তাদের নাম নীচে দেওয়া গেল :—

১। ব্রাউনিং ক্লাব (স্পোর্ট রেঞ্জার) ২। ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশন ৩। ফরিদপুর লালে গ্রো ইউনিয়ন ৪। বি ওয়াই এসোসিয়েশন (লক্ষ্ণৌ) ৫। অলিম্পিক হকি ক্লাব (বিলাসপুর) ৬। দিল্লী ইয়ংস ৭। মণিপুর ষ্টেট হকি টিম ৮। এলাহাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট একাদশ ৯। এল ওয়াই এসোসিয়েশন (লক্ষ্ণৌ) ১০। কিরকি ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব ১১। ইয়ং এ্যাথলেটিক ক্লাব (রামপুর ষ্টেট) ১২। রাঁচি এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন ১৩। ষ্টার ক্লাব (বেরিলি ক্যান্ট) ১৪। মাদ্রাজ হকি এসোসিয়েশন ১৫। লোবলস ক্লাব (বেরিলি) ১৬। ঝান্সি হিরোজ ১৭। পিণ্ডি টাইগার্স ক্লাব ১৮। দিল্লী ওরিয়েন্টাল।

এ ছাড়াও বোম্বাই কাষ্টমস দলকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

শেষাংশ ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় দেখুন

"পথের শেষে"-র পরিচালক শ্রীজ্যোতিষ মুখার্জ্জি

পথের শেষে

প্রযোজক : বি, এল, খেমকা
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস
গল্প : ৺নিশিকান্ত বসু রায়
চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালনা } জ্যোতিষ মুখার্জ্জি
আলোকচিত্রশিল্পী : শৈলেন বসু
শব্দযন্ত্রী : জ্যোতিষ সিংহ
সুরশিল্পী : সন্তোষানন্দ দাস
চরিত্র : দুর্গাশঙ্কর---যোগেশ চৌধুরী, অনাদি---নরেশ মিত্র, নলিনী---জহর গাঙ্গুলী, যোগেশ---ভূমেন রায়, পারুল---জ্যোৎস্না গুপ্তা, রাধা---ছায়া দেবী, ললিতা---পদ্মাবতী, স্বর্ণদা---মনোরমা প্রভৃতি।
প্রথম মুক্তি : "শ্রী" ১৪ই মার্চ্চ '৩৬।

মঞ্চ-মালা এই "পথের-শেষে"। এর জয়গানে মঞ্চ-জগৎ একদিন মুখরিত হ'য়েছিল। পর্দ্দায় এর করুণ কাহিনী ভাবপ্রবণ বাঙালীর মন যে করুণরসে উপ্‌চে তুল্‌বে—যেদিন "পথের-শেষে" তোলা হবে শুনেছিলাম, সেদিনই আমরা বুঝেছিলাম।

একদিকে পিতৃ-আজ্ঞা—অন্যদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান! একদিকে ধর্ম্ম—অন্যদিকে অধর্ম্ম! পথের গোড়ায় যার মুখে আনন্দ ফুটেছিল—পথের মাঝে তার অভিনব পরিবর্ত্তন আর পথের শেষে তার মর্ম্মান্তিক পরিণামই এই গল্পের সারাংশ।

(বিলাসী)

পরিচালক জ্যোতিষ মুখুয্যে ছায়ারাজ্যে-বাস কোর্‌ছেন—বহুদিন ধরে। মনে প্রাণে তিনি কচি হ'লেও—ছায়াছবির কারখানায় প্রবীনত্বের গণ্ডী তিনি পেরিয়েছেন। সুতরাং তাঁর হাত থেকে ভাল ছবি জন্ম নেওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর "পথের-শেষে" শ্রেষ্ঠ বাঙ্‌লা ছবির সঙ্গে একাসনে স্থান না পেলেও পরিচালনা ব্যাপারে কাহিনীটিকে তিনি যতদূর শক্তি সরলভাবে সকলকে বল্‌বার চেষ্টা কোরেছেন। আর একটা দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি কাজ কোরেছেন সেটা হ'চ্ছে, সাধারণের মনের যোগাযোগ এই ছবিতে তিনি খাটিয়েছেন। তবে মুখুয্যে মশাই ললিতার দৃশ্যগুলোর ভেতর অতর্বেশী বেহায়াপনার অবতারণা না করালেই ভাল হ'ত। আর একটা ব্যাপার চোখে বড় লাগে, সাধারণ বারনারীর ঘর থেকে রিভল-ভারের আমদানী! এ ছাড়া ছোটখাটো দোষত্রুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়! যা' হ'ক মুখুয্যে মশায়ের অভিজ্ঞতা একদিন হয়ত' শ্রেষ্ঠ আসনের দাবীতে তাঁকে অধিষ্ঠিত কোর্‌বে। সে সুদিনের অপেক্ষায় আমরা রইলাম।

ছবিখানার আলোকচিত্রের ভেতর কোনও ভেল্কিবাজী নেই সত্য; কিন্তু ছবির আলোছায়া সব জায়গায় বেশ সোজা ও স্বচ্ছ হ'য়েছে। তবে একথাও আমরা বল্‌তে বাধ্য হ'চ্ছি—যারা শৈলেন বসুর "খায়বার পাশ" দেখেনি তারা ছবিখানার আলোকচিত্র ভাল বল্‌বে; "খাইবার-পাশে"র চিত্রশিল্পীর এ কাজে আরও কৃতিত্ব দেখানো উচিৎ ছিল।

শব্দযন্ত্র দু' জায়গায় অভিনেতৃদের স্বর যথাযথভাবে ধরতে না পারলেও জ্যোতিষ সিংহ মোটের উপর ভাল কাজই কোরেছেন।

অভিনয়ে নায়ক জহর আগের চেয়ে অনেক উন্নত অভিনয় কোরেছে। নায়িকা জ্যোৎস্নার রূপের অনুযায়ী গুণের প্রকাশ ততটা পায়নি। ভাবপ্রকাশে শ্রীমতী চির-দিনই নিরেশ। এ ছবিতেও সেই ভাব-প্রকাশের অভাব তার অভিনয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। ছায়া শুন্‌লাম ভদ্রঘরের মেয়ে—ছবিতে নামা তার এই প্রথম। তার গানের গলা ভাল—অভিনয়ে মাঝে মাঝে জড়তা দেখা গেলেও ভবিষ্যতে ইনি সে

চিত্রালীর গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি নিবেদন

প্রেসের কয়েকজন কম্পোজিটার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ফাল্গুনের "চিত্রালী" প্রকাশে অযথা বিলম্ব হইয়া গেল। আগামী সোমবারের মধ্যে 'চিত্রালী' বাহির হইবে। অতঃপর যথাসময়ে 'চিত্রালী' প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—চিত্রালী

ভাল অভিনয় কোরবেন তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। নরেশ মিত্তিরের অনাদি চরিত্রোপযোগী হ'য়েছে। সন্তোষ সিংহের গোবিন্দ ও শরৎ সুরের শ্যামাও তাই। জয়নারায়ণের মিবারণ চলনসই। যোগেশ চৌধুরীর দুর্গাশঙ্কর আরও উন্নত হওয়া উচিৎ ছিল। ভূমেনের যোগেশ বড় বেশী মঞ্চ-ঘেষা হয়েছে। মঞ্চে তার এই অভিনয় লোকের হয় ত' ভাল লাগ্‌বে। রঞ্জিত রায়ের নিধুখুড়ো হাসিয়েছে আমাদের খুব। মনোরমার সুখদা মোটের ওপর চলনসই বলা যেতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বিশ্রী হ'য়েছে পদ্মর অভিনয়। Vulgarityর একটা সীমা আছে—পদ্মর অভিনয়ে তাও অতিক্রম কোরেছে। আমাদের দেশের প্রডিউসার

খেলার মাঠে

একাদশ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ফুটবল খেলা

কোলকাতায় হকি খেলা শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই। এখন থেকেই ফুটবলের জন্যে ময়দানে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। গেল সোমবার ১৬ই মার্চ্চ আই, এফ, এর Clearance Certificate নেবার শেষ দিন ছিল। এবার প্রায় প্রত্যেক ক্লাব থেকেই পুরোনো খেলোয়াড় চলে গেছে, নতুন খেলোয়াড় এসেছে। এই Clearance Certificate এর ফলে বিভিন্ন ক্লাবের লাভ লোকসানের খতিয়ান আমরা আগামী সংখ্যায় করব।

কোলকাতার হকি লিগ

গেল শনিবার দিন আন্তপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগীতা শেষ হয়ে যাওয়ায় এই সোমবার থেকে আবার যথারীতি লিগ খেলা আরম্ভ হয়েছে। দুদিনের খেলার ফলাফল নীচে দেওয়া হোল :—

সোমবার

কাষ্টমস ৪ মিলিটারী মেডিক্যালস ২

রেঞ্জারস ০ আর্ম্মেনিয়ানস ০

মঙ্গলবার

মেডিক্যাল কিঃ ২ ক্যালকাটা ১

আর ডাইরেক্টারদের ছবিতে কোনও Sexy-ভাব দেখাতে গেলেই অমনি মনে উদয় হয় পদ্মর কথা। কিন্তু আমরা বলি, পদ্মর ঐ চেহারার ভেতর Sex কোথায়? যতগুলো ছবিতে পদ্ম নেমেছে তার ভেতর ন্যাকামি আর বেহায়াপনা সব জিনিষকে হার মানিয়েছে। তাই ছায়াছবির কর্ত্তাদের আমাদের অনুরোধ তাঁরা পদ্মকে এবার ছায়াছবির দরবার থেকে ছুটী দিন। আর পদ্ম, তুমিও মার্জ্জিত অভিনয় কোরতে যতদিন না শেখ, ততদিন ও-মুখ আর পর্দ্দায় দেখিও না। ছোট ভূমিকার মধ্যে প্রফুল্ল মুখুযোর ইন্‌সপেক্‌টার ভাল। ধীরেন দাসের গান প্রাণে একটা সাড়া দেয়। অন্যান্য চরিত্র অনুল্লেখযোগ্য।

"পথের-শেষে-র" সম্পাদনা এখনও দরকার। সম্পাদক ফিল্মের ওপর কাঁচির ব্যবহার একটু কোরলে গল্পের গতি আরও প্রাঞ্জল হ'তে পারে। ছবিখানার সুর-সংযোজনা চলনসই। নেপথ্য-সঙ্গীতের বালাই নেই। সাজসজ্জা ও সেটের প্রশংসা করা যায়।

মোটের ওপর আজকালকার বাঙলা-ছবির বাজারে ছবিখানা যে সাধারণের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ কোরবে এ-কথা বলাই বাহুল্য।

নিউ থিয়েটার্স

বাজারে গুজব রটেছিল প্রমথেশ বড়ুয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া যোগ দিচ্ছেন। 'ভ্যারাইটীজ' মারফৎ বড়ুয়া এ সংবাদের প্রতিবাদ কোরেছেন।

* * *

হিন্দী "দেনা-পাওনা"-র কেবল গাজন-দৃশ্য তোলা বাকী। পরিচালক প্রফুল্ল রায় হাঁসপাতাল থেকে ফিরে আবার "দেনা-পাওনা"-র সেটে ঢুকেছেন। এই ছবি শেষ কোরে প্রফুল্ল রায় নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় এক মাসের জন্যে অবস্থান কোরবেন।

কালী ফিল্মস

জ্যোতিষ মুখুয্যের ঈষ্ট ইণ্ডিয়ার সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ায় তিনি এই প্রতিষ্ঠানে আবার ফিরে এসেছেন। মুখুয্যে মশাই গাঙ্গুলী মশায়ের প্রিয়তম শিষ্য। তিনি আবার এই প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসায় সকলেই খুসী হ'য়েছে। শোনা যাচ্ছে, এ প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে এবার "রাজমোহনের স্ত্রী" হবে তাঁর প্রথম ছবি।

* * *

সুশীল মজুমদার একখানা ছোট ভক্তি-মূলক ছবি এই প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে তুলছেন। নাম "বসন্ত পূর্ণিমা" ছবিখানা "কাল-পরিণয়ে"র সঙ্গে দেখাবার কথা আছে। গাঙ্গুলী মশাই ঠিক কোরেছেন এবার থেকে জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী তিন চার রীলে তুলে পার্শ্ব-চিত্র হিসেবে দেখাবেন। এ মতলবটা মন্দ নয়। কারণ পৌরাণিক বা ধর্ম্মমূলক কাহিনীর বাজার আজকাল মন্দা।

রাধা ফিল্ম

বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষের" সম্পূর্ণ চরিত্র-লিপি এখনও বণ্টিত হয় নি। কাননবালা ও শান্তি গুপ্তা সূর্য্যমুখী ও কমলমনির ভূমিকায় নাম্‌বেন বলে প্রকাশ। ফণি বর্ম্মা ছবিখানার পরিচালক।

* * *

এরা উর্দ্দূতে "কণ্ঠহার" তোলা ঠিক কোরেছেন। মহলা চলছে। কাননবালা নাকি নায়িকা সাজবেন। আর দু'টো বিশিষ্ট চরিত্রে নামবেন ইন্দিরা দেবী ও এ, কাবুলি।

কোয়ালিটী পিক্‌চার্স

"ব্যথার দানে"-র শূটিং শেষ হ'য়েছে। আস্‌চে ৩রা এপ্রিল ছবিখানা 'চিত্রা'য় মুক্তি পাবে। হেম গুপ্ত এ ছবির পরিচালক। আমরা দেখেছি, তিনি বেশ যত্ন নিয়ে ছবিখানা পরিচালনা কোরেছেন—সেজন্যে ছবিখানা ভাল হবে বলে আমরা আশা করি।

* * *

এদেরই তিন রীলের হাসির ছবি "জোয়ার-ভাঁটা" ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় তোলা হ'চ্ছে। চরিত্রে কারা নাম্‌বেন আগেই জানানো হ'য়েছে—নতুন যোগ হ'য়েছে জিতেন গোস্বামীর নাম।

ডি-জি টকীজ

বাঙ্‌লা ফিল্মশিল্পের 'পায়োনিয়র' ধীরেন গাঙ্গুলী আবার স্বাধীনভাবে ছবি তোলার মানসে উপরোক্ত নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন কোরেছেন। "ডি-জি"-র দুর্দ্দমনীয় শক্তি, নবীন উৎসাহ চিত্ররাজ্যে তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে আসীন রেখেছে। 'ডি-জি'-র প্রথম দু'খানা ছবি "দ্বীপান্তর" ও "কালাপানি" যথাক্রমে বাঙ্‌লা ও হিন্দীতে তোলা হবে কালী ফিল্মসে। আমরা 'ডি-জি'র এই নব যাত্রাপথে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কোর্‌ছি।

শিল্পীর মৃত্যু

শোকে আমাদের মন ভরে উঠেছে। পপুলার পিক্‌চার্সের "আবর্ত্তন" ছবির নায়ক শ্রীপ্রমোদ রায়চৌধুরী গেল বেস্পতিবার সকাল ৪টায় বসন্তরোগে ইহলোক ত্যাগ কোরেছেন। ইনি বরিশালের জমিদার ক্রোড়পতি শ্রীরমণী মোহন রায়চৌধুরীর

একমাত্র পুত্র। "আবর্ত্তন" ছবিতে এঁর অংশ প্রায় তিনভাগ তোলা হ'য়েছিল। তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যামিনী মিত্তির, নতু সেন, হেমন্ত গুপ্ত, শোভা ঘোষ, সুধীর গুহ ও আরও অনেকে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা এঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন কোর্‌ছি।

রূপবাণী

এখানে রাধার "কৃষ্ণ-সুদামা" তৃতীয় হপ্তায় পড়্‌ল শনিবার থেকে। ধর্ম্মপ্রবণ বাঙালীর মনের খোরাক "কৃষ্ণ-সুদামা" যোগাবে—তাই ভীড় হ'চ্ছেও বেশ। এর সঙ্গে "ঝিন্‌ঝিনিয়ার জেরে"-র জের চলছে ভাল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

এরা বীরেন্দ্র ভদ্রের "জীবন-বীমা" নামে একখানা কৌতুক-নাট্য চিত্রে রূপান্তরিত কোর্‌ছেন। ছবিখানার পরিচালনা কোর্‌ছেন তুলসী লাহিড়ী এবং একটি মুখ্যাংশেও নামবেন তিনি।

*　　*　　*

দেবকী বসুর বস্তির দৃশ্য এখনও শেষ হয় নি। দেবকীবাবু এখন 'বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় রত্ন' নিয়ে ব্যস্ত। প্রায় দু' শ' প্রতিযোগীর ভেতর ছ'টি রত্নকে দেবকীবাবু অতি সাবধানের সঙ্গে বেছে নিয়েছেন।

*　　*　　*

ক্যাপ্‌টেন ফ্রাঙ্কলিন ও থেম্‌কা উত্তর ভারত পরিভ্রমণ কোরে ফিরেছেন। এখানেই এদের ছবির কেন্দ্রস্থল হবে। হলিউডের টেক্‌নিসিয়ানরা হলিউড থেকে রওনা হ'য়েছেন। তাদের অভ্যর্থনার জন্যে ফ্রাঙ্কলিন আস্‌চে হপ্তায় কলোম্ব যাত্রা কোরবেন।

রীতেন এণ্ড কোং

কোল্‌কাতার চিত্র-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রীতেন এণ্ড কোম্পানীর কার্য্যাবলী সত্যই প্রশংসনীয়। সম্প্রতি এরা পপুলার পিক্‌চার্সের "আবর্ত্তন" ও দেবদত্ত ফিল্মসের "অহল্যা" সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ কোরেছেন। আমরা এদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নিউ এম্পায়ারে "চিত্রাঙ্গদা"

সশিষ্য ও শিষ্যা রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" ১১ই মার্চ্চ দেখলাম। সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর এই নৃত্য-গীতমুখর "চিত্রাঙ্গদা"। এর নাচে, গানে ও অভিনয়ে রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের স্মরণ করাচ্ছিল—এ কেবল রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। সবাইয়ের গান, নাচ, অভিনয়ই আমাদের মুগ্ধ কোরেছিল—কিন্তু তার মধ্যে শ্রীমতী নন্দিতা সত্যই চমৎকার। এই বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথকে আবার আমরা মঞ্চের ওপর দেখতে পাব তা কল্পনাও কোর্‌তে পারিনি—সে সুযোগ আমাদের হরেন ঘোষ দিয়ে সত্যই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কোরেছেন।

সেতুবন্ধ

= উপন্যাস =

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুস্থান পার্কের দক্ষিণ দিকে যে চার তালা বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে তার মালিক মৃত্যুঞ্জয় মিত্র। বাড়ীর সামনে একটা প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড, মাঝখান দিয়ে লাল কাঁকর-দেওয়া একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। একদিকে নানা রকম ফুলের গাছ, মাঝে মাঝে বিরামকুঞ্জ, অপর দিকে টেনিস কোর্ট। অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় জীবনে কোনদিন টেনিস খেলতে জানেনা। তার বন্ধুবান্ধব এসে খেলে এতেই সে খুসী। রাস্তা দিয়ে মোটর এসে গাড়ীবারান্দার নীচে থামে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রকাণ্ড হলঘর, সমস্তটাই মোজেক করা। মাঝখানে গোটা দুই বড় সেক্রেট্যারিয়েট টেবিল, আশপাশে অসংখ্য কুসন-চেয়ার এবং সোফা। ঘরে ঢুকেই সামনে প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিং দেখা যায়। ইনিই শশিশেখর মিত্র, মৃত্যুঞ্জয়ের পিতা।

হলের পাশের ঘরেই মৃত্যুঞ্জয়ের অাফিস। বাইরে থেকে এতো কাজ আসতে আরম্ভ করেছে যে সে বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। সম্প্রতি গণ্ডিয়ায় ব্রিজের কনস্ট্রাকশান ওয়ার্কটা পেয়ে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের নাইবার খাইবার সময় নেই। দু'জন ইঞ্জিনিয়ার লোকজন সঙ্গে করে কাজ করবার জন্য কর্মস্থলে চলে গেছে। কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে। গেল সপ্তাহে মৃত্যুঞ্জয় গণ্ডিয়াতে সুপারভিসন করবার জন্যে গিয়াছিল। আজ সকালে সে ফিরেছে।

হলের অপর পার্শ্বের ঘরে দিলীপ পড়ে। চার তালায় মহেশ্বরী থাকেন। বাড়ীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই—সম্পূর্ণ আলাদা। নিজের পুজোআচ্ছা নিয়েই তাঁর সময় কেটে যায়। তবুও তিনি সকাল বেলায় দোতালায় নাবেন, রান্নার যাবতীয় তরকারী নিজে কোটেন এবং কি কি রান্না হবে বৌমাকে বলে দেন। ইচ্ছে করেই তিনি ঠাকুর রাখতে দেননি। তাঁর ধারণা যে-বাড়ীতে সংসার ঠাকুর-চাকরদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় সেখানে পয়সার আদ্য-শ্রাদ্ধ তো হয়ই, উপরন্তু লক্ষ্মীও আস্তে আস্তে সরতে থাকেন। এর উপর অজস্র পয়সা খরচ করেও বাড়ীর কারুর স্বাস্থ্য ভাল থাকেনা। এগুলো মেয়েদের জিনিষ। পুরুষ মানুষ দিয়ে কি রান্না চলে?

রান্নাবান্না চুকে গেলে মহেশ্বরী নিজের জন্যে যোগনো করে ভাতে ভাত চড়িয়ে দেন। কারুর হাতে তিনি খাননা।

দুপুর বেলায় কাজকর্ম্ম শেষ হয়ে গেলে মহেশ্বরী নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করেন। মাঝে মাঝে দিলীপ ঠাকুরমার কাছে গিয়ে আবোলতাবোল বকে উৎব্যস্ত করে তোলে।

এত কাজকর্ম্ম স্বত্তেও মৃত্যুঞ্জয় মাকে একদিনের জন্যে এতটুকু অযত্ন করেনি। মায়ের প্রতি ছেলেবেলাকার অগাধ বিশ্বাস, অচলা ভক্তি এখনো তার সমভাবে আছে। মায়ের সুখস্বাচ্ছন্দের উপর তার দৃষ্টি সজাগ।

মৃত্যুঞ্জয় বাড়ীতে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে মায়ের কাছে আগে আসে। মায়ের কাছে বসে কাজকর্ম্মের হিসাব নিকাস দাখিল করে। মহেশ্বরী ছেলের গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে কাজকর্ম্মের কথা রুদ্ধ বিস্ময়ে শোনেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আজকাল গল্প-গুজব করবার এতটুকু অবকাশ মৃত্যুঞ্জয়ের নেই। সে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজকর্ম্ম নিয়েই মেতে আছে। যে-মৃত্যুঞ্জয়কে বিবাহের পর মৃণাল বছর দেড়েক পর্য্যন্ত একান্ত আপনার করে পেয়েছিল, আজ মৃত্যুঞ্জয়কে অতি নিকটে পেয়েও তাকে একটি মুহূর্ত্তের জন্যে কথা বলবার কোন সুযোগ পাচ্ছেনা দেখে মৃণালের অবচেতন মন সহসা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। মৃণাল ভাবে: কি আশ্চর্য্য! ওঁকে একটা কথাও বলবার যো নেই। খালি কাজ—কাজ—কাজ। কাজটাই এখন দেখছি ওঁর একমাত্র চিন্তা। এরকম নিঃসঙ্গ অবস্থায় কী করে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে! কোন কথা শোনবারও ফুরসুৎ নেই।

জামাকাপড় ছেড়ে মৃত্যুঞ্জয় বেরিয়ে যাচ্ছিলো। মৃণাল বল্লে: এখন কোথাও বেরুচ্ছো, না কী? আজ চিত্রায় চণ্ডীদাস দেখানো হচ্ছে, দেখতে যাবে? চলনা, কদ্দিন যে বাইস্কোপে যাইনি তার ঠিক নেই।

—আজ কী করে যাই বলতো। কত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েচি সে তো তুমি নিজেই জানো।

—দু'ঘণ্টার জন্যে বাইসকোপে গেলে তোমার কোন ক্ষতি হবেনা। চলনা, একটা কথা আমার রাখো।

—লাভ-লোকসান বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই,মৃণাল।

—মায়া এসেছিল। ওকে যে আজ কথা দিয়েচি। ও, ওর দাদা, বৌদি সকলেই আজ দেখতে যাবে।

—বেশতো যাওনা, ওদের সঙ্গে। ঘরের গাড়ীও তো রয়েচে। অসুবিধে তো কিছু নেই।

—আর তুমি?

—আর একদিন গেলেই হবে। সেদিন কিন্তু তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবো। আজ সাতটার সময় একটা জরুরী এন্‌গেজমেণ্ট আছে।

—তা হয় না। মায়াকে আজ কথা দিয়েচি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

—তুমিই যাওনা, তা হলেই হবে। আমি না গেলে ওরা কিছু মনে করবে না।

—বাঃ, বেশ কথা বল্‌লে। তুমি থাকবে বাইরে বাইরে আর আমি ওদের সঙ্গে আমোদ করতে যাবো তাও কি কখনো হয়? না যাও ওদের বলে পাঠাই আমার যাওয়া হবেনা। থামাকা ওদের আটকে রাখি কেন?

—হাতের কাজ ফেলে আজ কি করে যাই বলতো, মৃণাল?

—তোমার একই কথা আমার আর শুনতে ভালো লাগেনা। তুমি কি আমার একটুও মুখ চাইবেনা? আমার সাধ আহ্লাদ বলে কি কিছু নেই? তোমার কাজের পায়ে নমস্কার। এক আধদিন মানুষ এদিক ওদিক তো বেরোয়।

—তোমার কোন সাধটা মেটাইনি, শুনি?

—ওকে সাধ পূরণ বলেনা। ওটা আমাকে এড়িয়ে চলার একটা ছল। লক্ষ্মীটি, আমার একটা কথা রাখো, সঙ্গে চলো। আগে তো তুমি এমন ছিলেনা। আমার মুখের সামান্য একটা কথার জন্যে কি সাধ্যি-সাধনাই না করতে।

—আমায় ক্ষমা কর, মৃণাল। আজ আমি কিছুতেই যেতে পারবোনা।

—বেশ তুমি তোমার কাজ নিয়েই থাকো। আর যদি কোন দিন তোমাকে কোন কথা বলি—কথাটা শেষ হবার আগেই মৃণাল ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত নটার পর মহেশ্বরী ওপর থেকে বড় একটা নামেনা। রাত এগারোটায় মহেশ্বরীকে মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরে আসতে দেখে

সে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে বল্লে : কিছু বলবে মা ?

হাঁ বাবা, তোর সঙ্গে একটু দরকার আছে।

আমাকে তুমি ডেকে পাঠালেই পারতে। নীচে আসবার কোন দরকার ছিলনা।

—কী হয়েছে তাতে। তোর কাছে এলে আমার মানের কোন লাঘব হবেনা।

—মান-সম্ভ্রমের কথা আমি ভাবতেই পারি না যে, মা। কষ্ট করে আসবার কোন প্রয়োজন ছিলনা।

—বাবা, মৃতুন, এবার দিন কতক আমি তীর্থে বেরুবো।

—সে কী করে হবে, মা। তুমি গেলে যে সংসার অচল হয়ে যাবে। এখন তোমায় আমি যেতে দিতে পারবোনা।

—সংসার অচল হবার কোন ভয় নেই, খোকা। বৌমাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছি।

—কিন্তু তোমায় ছেড়ে তো আমি থাকতে পারবোনা।

—শোন ছেলের কথা। মা কি কারুর চিরকাল থাকে রে। এ-বয়সে যদি তীর্থধর্ম্ম করতে না বেরুই তবে আর কবে করবো।

—থাকেনা সত্যি, তবুও যদ্দিন তুমি আছো, সেইটেই আমার পরম লাভ, মা। কত পুন্যির জোরে তোমাকে যে পেয়েছি।

—আর আমাকে আটকে রাখিসনে' মৃত্যুঞ্জয়। মন বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেচে।

বেশ, তাই যাও মা, কিন্তু তোমার সঙ্গে যেতে পারবোনা। কাজটা হাতে নিয়ে যে কি অতান্তরে পড়েচি তার ঠিক নেই।

—আমার সঙ্গে যাবার জন্যে তোকে ব্যস্ত হতে হবেনা। তার ব্যবস্থা আমি করেচি। রায়েদের গিন্নিকে আসতে লিখেচি। আসচে বুধবার রওনা হবো।

—আমার আর বলবার কিছু নেই, মা।

—কিন্তু মনের মধ্যে একটা ধোঁকা নিয়ে যেতে হচ্চে।

মৃত্যুঞ্জয় একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বল্লে : কী হয়েচে, মা, আমায় বল। তার ব্যবস্থা আমি এক্ষুনিই করচি। মনে কোন অশান্তি নিয়ে গেলে যে কোথাও একদণ্ড শান্তি পাবেনা।

—বৌমার দূর সম্পর্কের এক কাকা তাঁর মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় আসচেন অসুখের চিকিৎসার জন্যে। আমাদের বাড়ীতেই উঠবেন, লিখেচেন।

—সে তো আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা, মা। আমার বাড়ীতে যদি পাঁচ জনের পায়ের ধূলো পড়ে এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে।

—কিন্তু তিনি না কি বিলেত গিয়েছিলেন সে তো তুই জানিস।

—ওর মুখেই শুনেছিলুম, তাতে কী হয়েছে ?

—ওদের কোন জাতিধর্ম্ম আছেরে। ওরা যে ম্লেচ্ছ, কোন আচার-বিচার মানেন না। এখানে এসে উঠলে সমস্ত বাড়ীটা অপবিত্র হয়ে যাবে। ঘরে যে-সব দেব-দেবী আছেন তাঁরাও রুষ্ট হয়ে উঠবেন।

—ওকথা যে বলচো, মা, কাজের খাতিরে কত সাহেব আমার বাড়ীতে আসে সে তো তুমি স্বচক্ষেই দেখেচো, মা।

—তা হোক। তোরা নীচে যা করিস তার জন্যে তোকে কোনদিন কিছু বলিনি। কিন্তু ওঁরা এসে থাকলে ঘরদোর সব দেখবেনই। তখন তো তুই তাঁদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবিনে।

—খুব পারবো মা। চারতলায় একদম চাবি লাগিয়ে দেবো। তারপর যদি কোন অত্যাচার দেখি এখান থেকে তাঁদের চলে যেতে বলতে তখন এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করবোনা। সেটুকু শিক্ষা আমি তোমার কাছে পেয়েচি।

—চাবি দিস কোন আপত্তি নেই। দেখিস বাবা, ঠাকুরেরা যেন আমার অভুক্ত থাকেননা।

—না, না, মা, সে ভয় তুমি করোনা পুরুত মশাইকে কাল ডেকে পাঠালেই হবে। তারপর যা ভালো হয় সে তুমিই করে', মা।

(ক্রমশঃ)

চন্দ্র ফিল্মসের

ডি, এল্, রায়ের

পরপারে

প্রথম অর্ঘ্য

নব পরিকল্পনায় দেখা দিবে

পরপারে

বিভিন্ন চরিত্রের রূপশিল্পী

শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

শ্রী নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

শ্রী ভূমেন রায়

শ্রী শৈলেন চৌধুরী

শ্রী সন্তোষ সিংহ

শ্রী অনুপম ঘটক

শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা

শ্রীমতী বীণা

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা

শ্রীমতী নিভাননী

=পরিচালক=

জনপ্রিয় আলোকচিত্র শিল্পী

শ্রী যতীন দাস

সুরশিল্পী

শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দে

সত্ত্বাধিকারী
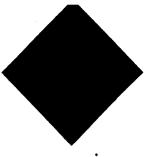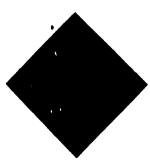
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চন্দ্র

কাল ও আজ

=মজাহার খাঁ=

অনুবাদিকা : কমলা চ্যাটার্জি

*

লিখতে বলেছি ; কিন্তু কি লিখব, লেখা আমার অভ্যাস নেই—লেখক আমি নই। তবু আমাকে লিখতে হবে। আর এমন করে লিখতে হবে যা সকলের ভাল লাগবে। ও কাজটা যে বড় শক্ত, তাও আবার নিজের জীবনের কথা লেখা। কত ভাবব, কেমন করে গুছিয়ে লিখব এই ভাবতেই সময় যায়। এতে কী আর 'সাহিত্য' করা চলে, না আমরা পারি ? আর আমার জীবনে লোকের ঔৎসুক্য আনবার মত কী বা আছে যা আমি বলতে পারি ? আমি যা—তা হচ্ছে অভিনেতা —উগ্র উৎকট চরিত্রের ; যাকে আপনারা বলতে পারেন 'ভিলেন'।

গোড়ার কথা—সেই ছোট বয়সের কথা আমার মনে নেই, আর যা আছে তা জানাবার মত এমন কিছু নয়। জন্মাই আমি ১৯০৫ সালে ; লেখা পড়া শিখি ইন্দোরে। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে ধার এষ্টেটের পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাজে লেগে যাই। বাবা চাইলেন আইন পড়াতে। পড়লুম, অনিচ্ছায় পড়ার ফল যা হয় তাই হোল। রাজ্যের লজ্জা সারা গায়ে মেখে বোম্বায়ের মাটিতে পা দিলুম।

বোম্বাইতে আমি সম্পূর্ণরূপে বিদেশী। কি করব কিছুই ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছি না। কত কষ্টই সে সময়ে সহ্য করেছি। হঠাৎ একদিন স্বর্গীয় বি, পি, মিশ্রর সঙ্গে দেখা। ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। আলাপ হবার পরই তিনি 'ফেটাল গারল্যাণ্ড' ছবিতে আমাকে নামান। সেই সময় থেকেই আমার ভিলেনের অংশে নামা। এই মিশ্রই আমার গুরু—আমাকে ভিলেনের অংশে নামতে বলে গিয়েছেন। আজও তাই আমি মেনে যাচ্ছি।

'ফেটাল গারল্যাণ্ড' আমার প্রথম ছবি। উঃ! সেদিন কী আমোদ যেদিন রূপোলী পর্দায় আমি আমার ছায়াকে দেখি। বিস্ময়ের বিমুগ্ধতায় আনন্দের আতিশয্যে আমি কথা কইতে পারিনি অনেকক্ষণ। মনে আছে, মিশ্র আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিল 'তুমি খুব শীঘ্রী নাম কিনবে।' আজ গুরু আমার বেঁচে নেই—তাঁর শেষ নিশ্বাস কবে পড়েছে বলতে পারব না। তবু সবাক ছবির যুগে এই আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত ষ্টুডিওতে যখন কাজের অবসরে বসি তখন কখনো কখনো তাঁর কথা আমার মনে হয়, চোখে জল আসে। ভেসে ওঠে শব্দ-মুখর অবিন্যস্ত সেট, চারিদিকে ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া সূর্য্যের আলো আর তারি মাঝে মিশ্র আমায় উপদেশ দিচ্ছেন। দ্বিতীয় ছবি 'দি লেডি অব দি লেক' পরিচালক ছিলেন মিঃ চৌধুরী আর সঙ্গে নেমেছিল আর্ম্মেলাইন। নির্ব্বাক যুগে যেসব ছবি পয়সা দিয়েছিল তার মধ্যে এটাও ছিল একখানা। 'এভেঞ্জিং এনজেল' ছবিতে হিরো এবং ভিলেন রূপে আরভিন কুমারের অংশে নামি। 'বিজয় কুমার'এ আর্ম্মেলাইনের সঙ্গে, 'জুয়েল অব রাজপুতানা'য় সুলোচনা এবং ডি, বিলিমোরিয়ার সঙ্গে, 'ভ্যানিশিং হোপ'এ ই বিলিমোরিয়া ও আর্ম্মেলাইনের সঙ্গে, 'সিন্দাবাদ দি সেলর'এ জামশেদজি ও সুশীলার সঙ্গে, 'সিনেমা গার্ল' ছবিতে আর্ম্মেলাইন ও পৃথ্বীরাজের সঙ্গে, 'দি চ্যালেঞ্জ'এ আর্ম্মেলাইন ও ই বিলিমোরিয়ার সঙ্গে, আর 'সেণ্টেড্ ডেভিল' ছবিতে মিশ্রর সঙ্গে নামি ;

[মি]শ্র এতে নিজে ভিলেন সাজেন। তারপর [বাগদাদ]-এ বাগদাদ', 'আলিবাবা এণ্ড ফর্টি [থি]ভস্.' 'গুলসান আরব' ছবিতে নামি; [এস]ব ছবি পরিচালনা করেন বি, পি, মিশ্র।

পরিচালক মিশ্র ছাড়া পরিচালক চৌধুরীর [কা]ছেও আমি কম ঋণী নই। তিনিও [আ]মাকে অনেকগুলো ছবিতে নামান। [পা]ঞ্জাব মেল,' 'লেডি অব দি লেক,' [হি]ন্দার ইণ্ডিয়া,' 'হীর রঞ্ঝা' (Heer [R]anjha) ছবিতে নামি। এসব ছবিতেই [আ]মি ভিলেন রূপে নামি।

এ ছাড়াও আমি অন্যান্য যেসব মূক [ছ]বিতে নামি তা মিঃ কে, আমান পরি[চা]লনা করেন। সা, জি, আগা বি, এ, এল, [এ]ল, বির 'ভিলেজ গার্ল' এবং 'ফ্লাইং প্রিন্স্' [মি]ঃ ভবনানীর পরিচালিত ছবি, এতে নামি। [এ]র পরের ছবি আমার হচ্ছে—'মিডনাইট [মে]য়ার', 'পূরণ ভকত', 'ওয়েডিং নাইট', [কা]হিনী', 'মাহি ওয়াল', 'রেড সিগন্যাল।' 'বাচ্চা সাক্কার' পর 'রাজ তিলক' ছবিতে নামি।

আমার বাকহীন ছবিতে নামা শেষ হোল—এলো সবাকের দিন। পর্দায় কথা কইলুম প্রথম ইম্পিরিয়ালের 'নুরজাহান' ছবিতে। দুটো ভাষার ছবি—সেটা ইংরিজি আর উর্দ্দু। আমি সাজি সম্রাট আকবর। হলিউড ফেরতা পরিচালক এজরা মিরেরও সেটা প্রথম ছবি। তারপর সাগরের ছবি 'বীর অভিমন্যু'তে নামা। এইবার পাড়ি জমালুম ক'লকাতায়। নিউ থিয়েটার্সের নতুন ছবি 'মুবে কা সিতারা' ছবিতে নামি। সে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার ডাক এলো, যোগ দিলাম।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার হয়ে আমার প্রথম ছবি হচ্ছে—'কিং ফর এ ডে'। 'নলদময়ন্তী'র পর 'আওরাৎ কা পিয়ার' ছবিতে নামি। 'পূজারী কী লেড়কী'—'ইহুদী কা লেড়কীর' অনুকরণ ছবি আমি খানিকটা অভিনয় করি; তারপর কি জানি কেন কর্ত্তারা উদাসীন হয়ে পড়লেন, ছবি আর শেষ হোল না।

আখতার নাওয়াজ তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়ায় আসে। তাঁর ছবি আরম্ভ হয়; আমিই প্রধান অংশে নামি। এ ছবি শেষ হবার আগেই মিঃ এ, আর, করদারএর ছবি 'সুলতানা' আরম্ভ হোলো। ভিলেনের ওপর গল্প গড়ে উঠেছে। আমিই সেই ভিলেন সাজি। এরপর ডি-জির ডিটেক্‌টিভ ছবি 'নাইট বার্ড' ছবিতে নামি। কতরকমই মেক-আপ এতে করি। ছ-ঘণ্টা লাগত শুধু মেক-আপ সারতে।

মিঃ মধু বোসের লেখা এবং পরিচালনায় 'সেলিমা'—ইষ্ট ইণ্ডিয়ার ক্লাসিক ছবি; এতে আমি নামি। সত্যিকার রসস্রষ্টার সৃষ্টি আছে মধু বোস-এর দৃষ্টিতে। কোনটা কি ভাবে করতে হবে তা তিনি জানেন।

কারাওয়ালার ছবি 'ষ্টেপ মাদার' হচ্ছে 'সেলিমা'র পরের ছবি। তারপরে 'বিদ্রোহী' ডি-জির পরিচালনা। এতে অভিনয় করবার সময় জয়পুরের দিন কটা আজও আমার মনে আছে। কী আমোদেই কেটেছিল। কখনও ভুলতে পারব না।

লোকে জিজ্ঞেস করে আমি কী ভালবাসি—ভালবাসি আমি ঘোড়ায় চড়তে, পোলো খেলতে, বন্দুক ছুঁড়তে, সাঁতার কাটতে, নৌকো চালাতে, মোটর চালাতে, মোটর সাইকেল চালাতে, গান করতে—আরো কত বলব। আমার অবসরে আমি বসে বসে হারমোনিয়ম বাজাই। হয়েছে একটু মুস্কিল। 'মার্ডারার' ছবিতে 'দিল্লী হাওড়া' এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে গাড়ীর চলন্ত অবস্থায় লাফিয়ে পড়ি—তাতে আঘাত লাগে—এখনও মাঝে মাঝে শরীরে আভ্যন্তরীণ একটা কষ্ট অনুভব করি।

আজকাল ডাক্তারের অস্ত্রোপচারে অনেকটা ভাল আছি। আমায় যারা ভালবাসে তাদের আরো আনন্দ দিতে পারব এ আশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। বন্ধুরা আশীর্বাদ ক'রো।

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

শিরলী টেম্পল্

কড়া পাহারায়

পুলিশ! পুলিশ! চারিদিকে পুলিশ! কড়া পাহারায় ঘিরে রেখেছে ওই ছোট মেয়েটাকে যত সব বন্দুকধারী। একবার যদি শুটিংএ বেরোবে, সঙ্গে যাবে ছ গাড়ী লোকজন আর বন্দুক।

ব্যাপারটা আর একদিন বলেছি আজও বলছি, শার্লি টেম্পলকে চুরি নেবে ঠিক করেছে ছেলেচোরেরা! শুধু করেনি চিঠিও দিয়েছে—চেয়েছে অনেক টাকা, আর তা যদি নির্দ্দিষ্ট তাদের বলে দেওয়া ডেরায় পৌঁছে না। হয়, তাহলে তারা শার্লিকে চুরি তো এমন কি প্রাণেও মেরে ফেলবে।

এই এতবড় কথায় কার না ভয় তাই ওর পেছনে এত কড়া পাহারা। অ রক্ষে এই যে ওদেশে এত ছেলেচোর যে চোর এমন কি বুড়ো চোর থাকা সত্ত্বে একজন ষ্টারও আজ পর্য্যন্ত চুরি যায়নি চোরেরা শুধু ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় কি ভয় খেয়ে চলে যায়। আসলে নিজেদের চোরের হাতে ফেলবার সুবিধে দেয় না। রাত্তির যতই উৎসবের হোক—বসন্তের কামুক বাত আর উলঙ্গ জ্যোছনা ষ্টারকে যতই রোমাণ্টি করে তুলুক—কোনো ষ্টারই একা কোনো দিনই বেরোয় না। দেহ তাদের চাই-ই।

ষ্টারদের সোফাররাও কম ওস্তাদ তাদের বেশীর ভাগ লোকই খুব ভাল ব ছুঁড়তে জানে। কে জানে ওই চোরেরা সোফারদের ভয়ে আরো, কাছে আ কিনা। চোরেরা চিঠি দিয়ে আনন্দ ষ্টাররা পড়ে আর ছেঁড়া কাগজের মিশিয়ে দেয় এই হচ্ছে রোজকার ইতিহাস

নাবিক মেয়ে

গার্বোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেলো সে! এইতো ছিলো! চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব। এই এতটা পথ এলো সব, কারোর নজরে পড়ল না যে সে নেই। এ পথ তো আর স্থল পথ নয়, জলপথ। খুঁজে না পাওয়া যাওয়া মানেই হচ্ছে জলের তলে যাওয়া। এই দশ মাইল পথ সবাই জাহাজে করে এলো আর কেউ খোঁজ রাখলে না যে গার্বো কোথায় গেলো। তাইতো খোঁজ খোঁজ রব!

ডাইরেক্টর তাঁর আর্টিষ্ট হারিয়েছেন—তাঁর যে মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়! দলবল নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন ক্যাটালিনা দ্বীপের উদ্দেশ্যে। শুটিং সেখানে সারতে হবে। বাহিরে ভাল প্রাকৃতিক দৃশ্য তুলতে হলে ওদের ওই রকম একটা দ্বীপেই যেতে হয় যে। সেই যাওয়ায় এই বিপত্তি।

গার্বো চিত্রাকাশের ধ্রুবতারা—চলচ্চিত্র জগতের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী—তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যাও, যে যেখানে আছো তার খোঁজে বেড়িয়ে পড়! কাতারে কাতারে লোক দলে দলে বোটে বেরিয়ে পড়ল গার্বোর খোঁজে। পেলো তারা। গার্বো নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে একা আসছে বোট চালিয়ে। সে যে ভাল নৌকো চালাতে পারে তাই তার এ সখ। লোক যখন গেলো তার কাছে, বলে দিলে এখন সে ফিরবে না—নৌকো চালাবে। শুটিং সেদিন বন্ধ করতে হয়েছিল অনেকক্ষণ। এবং সেই ডাইরেক্টর বোধ হয় মাথায় হাত দিয়ে ভেবেছিল—'গার্বো বুঝি আর ফিরল না, সুদুর সুইডেনের পথে পাড়ি জমালো।'

জীন হারলোর চেনা লোক

ওদেশের ষ্টুডিওর মধ্যে সাধারণ লোক একেবারেই ঢুকতে পায়না তবু যারা চেনা পরিচয়ের জোরে ঢোকে, তারা ডাইরেক্টরের বিনা অনুমতিতে সে ছবির শুটিং দেখতে পায় না। সেদিন এই নিয়ে খুব চমৎকার একটা ব্যাপার ওদের ওখানে ঘটেছিল। জিন হারলোর শুটিং চলেছে। ঢুকল এসে ডরিস ডিউক ক্রমওয়েল। ডরিস ক্রমওয়েল

জিন্ হারলো

আর সাধারণ মেয়ে নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী মেয়েদের মধ্যে সেও একজন। বিরাট সিগারেটের ফ্যাক্টরী,—বছরে তা থেকে দেয় লক্ষ লক্ষ টাকা। তা হলে কি হয়। ষ্টুডিওর দরজায় ও খাতির নেই।

মেট্রো গোল্ড্‌ইন মায়ার ষ্টুডিওতে ঢুকেছিলেন স্বামীকে নিয়ে ডরিস ক্রমওয়েল, অবশ্য চেনা ছিল বলেই। সারা ষ্টুডিও ঘুরে ঢুকলেন এসে সেটের ভেতরে। একজন সহকারী পরিচালক এগিয়ে এলেন—বল্লেন: আপনি কি বাহিরের লেখাটা পড়েন নি। বাহিরে লেখা ছিল, 'সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।' তাঁরা বাহিরে চলে আসছিলেন, জিন হারলো হাত ধরে টেনে এনে বসিয়ে তাঁদের মান রক্ষা করলেন সেদিনকার মত।

উৎসাহী তারকা

রেজিন্যাল্ড ডেনি শুধু অভিনয় করেই ক্ষান্ত নয়। অভিনয় করা ছাড়া বাহিরের কাজেও সে বেশ উৎসাহী। সারাদিন ষ্টুডিওতে কাজ করার পর সে এসে বসে তার কারখানায়। সেখানে দেখাশোনা চলে তার ছোট এরোপ্লেনগুলোর। সেটা এরোপ্লেনের কারখানা কিনা। ছোট ছোট এরোপ্লেন হয় সেখানে তৈরী। তাই থেকে রেজিন্যাল্ড ডেনির ব্যাঙ্কের খাতার অঙ্ক বাড়ে দিনের পর দিন।

এই সব প্লেনএ থাকে ছ ঘোড়ার শক্তি। আর ঘণ্টায় ৬০ মাইল পারে জোরে দৌড়োতে। গ্যাসোলিন যতক্ষণ না ফুরিয়ে যায় ততক্ষণ প্লেনটি থাকে আকাশে তারপর ডেঙ্গায় নামে।

প্লেনগুলো কি করে চালাতে হয় তার জন্যে রেজিন্যাল্ড ডেনি ক্লাস করেছে; আর সেই ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছে লেসলি হাওয়ার্ড, রবার্ট মণ্টোগোমারী আর চেষ্টার মরিস।

খুচরো খবর

মীরণা লয়ের পরের ছবি 'পেটিকোট ফিভার।'

* * *

'ইনভিটেশন টু হ্যাপিনেস' ছবিখানার নাম বদলে রাখা হয়েছে 'আই লভ্‌ড্‌ এ সোলজার।'

* * *

পল রবসন্ নামবে 'সঙ অব ফ্রিডম' ছবিতে।

* * *

ফ্রাঞ্চট টোন সপ্তাহে অন্ততঃ পনেরো-খানা বই পড়ে, তার মধ্যে দশখানা থাকে নাটক আর পাঁচখানা থাকে উপন্যাস।

* * *

রবার্ট টেলর যেমন পারে পিয়ানো বাজাতে তেমনি পারে সেলো বাজাতে।

কংগ্রেস মনোনীত ও সমর্থিত প্রার্থিগণের

তালিকা

এবারকার নির্ব্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে ৩৮ জন কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনীত এবং তিনজন কংগ্রেস কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছেন। এই ৪১ জনের মধ্যে (১) ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (বর্ত্তমান সদস্য এবং কংগ্রেস মনোনীত)—২৩নং ওয়ার্ড, (২) কুমার বিশ্বনাথ রায় ও (৩) নিতাই পাল (উভয়েই বর্ত্তমান সদস্য এবং কংগ্রেস মনোনীত)—৩১নং ওয়ার্ড, (৪) স্যার হরিশঙ্কর পাল (বর্ত্তমান সদস্য এবং কংগ্রেস সমর্থিত)—২নং ওয়ার্ড এবং (৫) সুশীল সেন (বর্ত্তমান সদস্য ও কংগ্রেস সমর্থিত)—১২নং ওয়ার্ড (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন)।

বিভিন্ন ওয়ার্ডের অবশিষ্ট কংগ্রেস-পক্ষীয় প্রার্থিগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১নং ওয়ার্ড

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

(২) রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ত্তমান সদস্য)।

৩নং ওয়ার্ড

(১) ডাঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

(২) ডাঃ শশিকুমার সেনগুপ্ত।

৪নং ওয়ার্ড

(১) জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী (বর্ত্তমান সদস্যা)।

(২) ডাঃ নারায়ণচন্দ্র ঘোষ

৫নং ওয়ার্ড

(১) মোহনলাল মজুর (বর্ত্তমান সদস্য)।

(২) কবিরাজ শিবনাথ সেন।

৬নং ওয়ার্ড

(১) গোষ্ঠবিহারী শেঠ।

(২) মদনমোহন বর্ম্মণ (বর্ত্তমান সদস্য)।

৭নং ওয়ার্ড

(১) দেবজীবন ব্যানার্জ্জী (বর্ত্তমান সদস্য)।

(২) হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার।

(৩) দুর্গাপ্রসাদ খৈতান।

৮নং ওয়ার্ড

(১) প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা।

(২) ডাঃ জে, এম, দাশ গুপ্ত।

৯নং ওয়ার্ড

(১) দেবনারায়ণ দে।

(২) যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (বর্ত্তমান সদস্য)।

১০নং ওয়ার্ড

(১) ইন্দ্রভূষণ বীদ (বর্ত্তমান সদস্য)।

১১নং ওয়ার্ড

(১) রাজকুমার বসু।

১৩নং ওয়ার্ড

(১) বিপিন বিহারী সাধু খাঁ

১৪নং ওয়ার্ড

(১) বিজয় সিং নাহার।

১৮নং ওয়ার্ড

(১) সনৎকুমার রায় চৌধুরী (বর্ত্তমান সদস্য)।

১৯নং ওয়ার্ড

(১) ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য।

২০নং ওয়ার্ড

(১) ডাঃ কে, এস, রায় (বর্ত্তমান সদস্য)।

২১নং ওয়ার্ড

(১) ডাঃ এস, সি, ঘোষ (বর্ত্তমান সদস্য)

২২নং ওয়ার্ড

(১) দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

(২) প্রকাশচন্দ্র মল্লিক।

২২এ নং ওয়ার্ড

(১) ধরণীকুমার বসু।

২৪নং ওয়ার্ড

(১) শিশিরকুমার ব্যানার্জ্জি।

২৫নং ওয়ার্ড

(১) অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি (বর্ত্তমান সদস্য)।

২৭নং ওয়ার্ড

(১) এন, সি, সেন

২৮নং ওয়ার্ড

(১) মহম্মদ হাসান

২৯নং ওয়ার্ড

(১) ভূতনাথ কোলে (কংগ্রেস সমর্থিত)।

৩০নং ওয়ার্ড

(১) ধীরেন্দ্রকুমার মজুমদার।

(২) পুলিন বিহারী সাউ (বর্ত্তমান সদস্য)।

৩২নং ওয়ার্ড

(১) মৃগেন্দ্রকুমার মজুমদার (বর্ত্তমান সদস্য)।

(২) ডাঃ বি, বি, গোস্বামী

(স্বাঃ) শরৎচন্দ্র বসু,
সভাপতি,

(স্বাঃ) সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
সম্পাদক,

কংগ্রেস কর্পোরেশন ইলেকশন বোর্ড

(গল্প)

শ্রীবিনয় দত্ত

লীলা মেয়েটির নাম দিয়াছে মায়া। আমি কিন্তু ফুলকে বলিলাম—ফুল, তোর মেয়ের নাম বদলে রাখ। মায়া নাম ভাল নয়, ওর নাম সবিতা রাখলেই বেশ হবে—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মৃদু হাসিয়া ফুল উত্তর দিল—'মায়া' নাম এখন আর বদলানো চলবে না মামাবাবু, ও-নাম লীলার দেওয়া।

লীলার নাম উঠিতেই পূর্ব্বের কথা আসিয়া পড়িল, আমি একটু গম্ভীর হইয়া গেলাম।

ফুল কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—মামাবাবু, মামীমা কেমন হয়েছেন।

নির্ব্বিবাদে উত্তর দিলাম—বেশ ভালো। এই 'বেশ ভালো' কথাটির মধ্যে যে ইতিহাস রহিয়াছে তাহা আমি ছাড়া আর কে বুঝিবে?

ফুলও আমার মুখের দিকে চাহিয়া অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়া গেল।

পাশের ছোট মেয়েটি যে এতক্ষণ 'মা, 'মা' করিয়া হাত দু'টি আর পা দু'খানি নাচাইতেছিল তাহাও এখন বন্ধ হইয়াছে।

আমার কিন্তু এই মৌনতা ভালো লাগিতেছিল না, পকেট হইতে মেয়েটির জন্য কয়েকটা লজেঞ্জ বাহির করিয়া ফুলের হাতে দিলাম, বলিলাম—ফুল, উঠি আজকে, কালকে যদি পারি সন্ধ্যার দিকে একবার আসব।

—আর একটু বসে যাও মামাবাবু, মার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও—

—দিদির সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা করি, তুই এলি, তাই আফিসের পর তোকে দেখতে এলাম।

—মামাবাবু, কিছু মনে করো না, তোমার জামা-কাপড় এত ময়লা কেন?

—কে সাফ ক'রে দেবে ফুল?

—কেন, মামীমা!

—ও তো ছেলে মানুষ, ও আর কত করবে!

—কিই বা করে, মানুষ তো তোমরা দু'টি, এক রান্না-খাওয়া ছাড়া আর কি কাজ আছে?

বলিয়াই ফুল বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, সে হয়ত আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই ভাবিতেছিল।

আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া জুতা পরিতেছিলাম, ফুলও উঠিয়া আসিল, বলিল—এঃ, জুতোয় কালি দাও না ক'মাস ধ'রে? হাসিয়া বলিলাম—কালি নিয়ে আর কি হবে ফুল! একভাবে দিনগুলো কেটে গেলেই হ'ল!

—বিয়ের একবছর না পেরোতেই এত নিরাশ হ'য়ে পড়লে মামাবাবু?

—আশা যাদের চ'লে যায়, নিরাশ না হ'য়ে তাদের উপায় কি মা?

বলিতে বলিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পড়িলাম, ফুলও বলিল—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, যেও না।

—আজকে নয়, পারিতো কালকে একবার আসব।

—পারি তো' নয়, আসতেই হবে...

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আভাকে বলিলাম—আভা, ফুল এসেছে—ওর মেয়েটি দেখতে কি সুন্দর!

তা' তো হবেই, যেমন মা তেমনি তো মেয়ে হ'য়েই থাকে। হাঁা, ভাল কথা, আমার মা চিঠি লিখেছেন এবার পুজোয় বাড়ী যেতে হবে। ঠাকুরমার শরীর ভালো না, কখন তিনি মরেন তার তো ঠিক নেই, আমাদের একবার তিনি দেখতে চান—

—আর কিছু তোমার বলবার আছে?

কথাগুলো শুনেই নাও না—অত বিরক্ত হ'চ্ছ কেন?

—কোথায় বিরক্ত হ'চ্ছি?

—দাদা শীগ্‌গিরই এখানে আসবেন, ও'র একটা কাজের সুবিধে ক'রে দিতে হবে—তিন,চার মাস বেকার বসে আছেন, বুঝতে তো পারছ বেকার কি করে ছেলেরা বসে থাকে!

—তোমার দিকের আর কোন সংবাদ নেই তো, আজ!

—দেখ, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না, যার সঙ্গে পার তার সঙ্গে ও-রকম করো গে—আমি ও-সব ভাল বাসিনে, যখনই কাজের কথা বলব তখনই ফাজ্‌লামি!

—আচ্ছা এখন থেকে আর ফাজলামি করব না। —ভাল কথা, আমার খোঁজে কেউ এসেছিল?

—কে তার খোঁজ রাখে? —হাঁা, কোথায় কি 'লেখা' দেবেন ব'লে কথা দিয়েছিলেন, তার জন্য এক ভদ্রলোক এসেছিলেন—কি 'লেখাই লেখেন' যার জন্যে লোকগুলো ছাপার জন্যে ছুটে আসে—

আভার সকল কথাই উড়াইয়া দিতে পারি কিন্তু লেখা সম্বন্ধে ওর যখন ঠাট্টা

চলে, তখন তাহা সহ্য করা কষ্টকর হইয়া ওঠে। কিন্তু তাহা হইলেও মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিয়া নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আজও তাহাই করিতে হইল—শুধু বলিলাম—দেখ আভা, আমি লিখতে পারি বা না পারি —তা নিয়ে রোজ রোজ ও-ভাবে ঠাট্টা ক'রো না।

—আচ্ছা, বেশ করব না, করব না, করব না,—তুমিও আমার কাজের কথায় ফোঁড় কেটো না।......

—আর একটু ঝোল দেব?

—দাও, যদি বেশী থাকে। ঝোল বাটি হইতে ঢালিতে ঢালিতে আভা বলিতে লাগিল আমার চুড়ি দু'টোর কি করলে, আজও গড়ান শেষ হয় নি, না কি?

—রবিবার নিয়ে আসবো।

—আভা একথা শুনিয়া একটু মনে আনন্দ পাইয়াছে, তাই পাতের ধারে বসিয়া বলিল—দেখ আমার বহুদিনের সাধ একটু পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি, এবার পুজোর ছুটিতে নিয়ে যাবে!

—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

—এর মধ্যে ভেবে দেখবার আর কি আছে! হ্যাঁ, আর একটা কথা তোমায় অনেক দিন বল্ব বল্ব ভাবছি, মনে কিছু তো করবে না?

—না, তোমার কোন কথাতেই মনে কিছু করিনে আভা!

—তোমার কবিতা কেউ পয়সা দিয়ে তো ছাপে না, আর কবিতার বই, ছাপালেও বিক্রি হয় না কিন্তু সেদিন যে কার কথা বলেছিলে—এক ভদ্র লোক তোমার কবিতা-গুলো তাঁর নামে ছেপে তোমায় বেশ কিছু টাকা দেবেন, তা নাও না!

—তারপর সে টাকা নিয়ে কি করব?

—কি আর করবে, সোনার দাম দিন দিন যখন বাড়ছে, তখন ৪।৫শ' টাকার গয়না করে রাখলে সময় অসময় কাজে লাগত।

—কি গয়না করতে চাও?

—আর দু'ছড়া হার।

বেশ, তাই করো! কবিতাগুলো বিক্রি করেই ফেলব!......

কবিতাগুলি বিক্রয় করিবার কথা বলিয়া অন্তরে যে বেদনা আমি অনুভব করিলাম, তাহা এক অন্তর্য্যামি ছাড়া আর কে বুঝিবেন?

ভাবিলাম—নারী! তুমি তোমার সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য কত সাধনাই না কর, কত দুঃখ-কষ্ট করিয়াও তুমি তোমার দেহ বিক্রয় করিতে পার না বা কর না এবং করিবার প্রবৃত্তিও হয় না, কিন্তু এই লেখার মূল্য তুমি বুঝিলে না! হয়ত গভীর চিন্তা করিয়া লেখক খুব সুন্দর লেখা লিখিল এবং অন্ন-বস্ত্রের জন্য তাহাকে অন্যের কাছে অন্য নামে বিকাইতে হইল—ইহা হয়ত সহ্য করা যাইতে পারে কিন্তু ইহা হইতে দুঃখের আর কি থাকিতে পারে যে কেবল তোমার সুখের জন্য তাহা বিকাইতে হইবে!

অনেক দুঃখে হাসি পায়, তাই আভার এই সুমহান প্রস্তাব সমর্থন করিলাম আর হাসিলাম; সেই হাসির পিছনে রহিয়া গেল দুঃখের পাহাড়। আবার ইহাও ভাবিলাম—আভার কি দোষ?

সেদিন আভা রান্নার উনুন ধরাইতে পারিতেছিল না, দেখিলাম আমার টেবিল হইতে কয়েকখানা লেখা কাগজ লইয়া গিয়া উনুন ধরানোর কাজ শেষ করিয়াছে।

বৈকালে এক কাগজে একটি লেখা দিতে গিয়া দেখি লেখাটির প্রথমের বারোখানি পাতা নাই—রাগ হইল। আভাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল—কে জানে কি হ'য়েছে, তবে সকাল বেলা কয়েকখানা বাজে লেখা কাগজ টেবেল থেকে নিয়ে উনুন ধরিয়েছিলাম।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—বেশ করেছ।

আভা হন্-হন্ করিয়া সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি সামনের দরজাটা জোরে বন্ধ করিয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া আমার এই দাম্পত্য-জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

রাগ হইতে লাগিল লীলার উপর। আজ যদি সে আমার ঘরে আসিত, তাহা হইলে আমার জীবনটা এমনি দুঃখময় হইত না!—হয়ত জীবনে বড় হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতাম।...সেইদিন ফুলকে পরিষ্কার করিয়া সমস্ত কথা লিখিলাম—শেষের দিকে এইটুকুও লিখিতে বাধা বোধ করিলাম না—

...ফুল, লীলাই আমার এই সমস্ত দুঃখের কারণ নয় কি? হয়ত জীবনটা ঘুরিয়া যাইত, যদি লীলা আমার ঘরে আসিত। অর্থাভাব লীলা অনুভব করিলেও স্বামী-সুখ হইতে এতটুকু বঞ্চিত হইত না। আমিও উপযুক্ত স্ত্রীরূপে লীলাকে পাইতাম—সুখী হইতাম। যাক্ এর জন্য কাউকেই দোষ দিচ্ছি না ফুল, দোষ দিচ্ছি আমার ভাগ্যের। কয়েক দিন পরে ফুলের নিকট হইতে আমার পত্রের উত্তর আসিল। সে আমাকে অনেক প্রবোধই দিয়াছে এবং এই পত্রের মধ্যে আভার নামে আর একখানি উপদেশ-পূর্ণ পত্র দেখিলাম—তাহা লিখিয়াছে লীলা।

তারপর কয়েক দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিলাম—আভা যেন একটু আমার সেবা-সম্বন্ধে সতর্ক হইয়াছে। ভোর বেলা উঠিয়া দেখি—দাঁত-মাজিবার পাউডার ও ব্রাস এবং পাশে এক বালতি জল সাজাইয়া রাখিয়াছে—তাহা ছাড়া কাপড়-গামছা-সাবান বেশ সুন্দরভাবে বাথরুমে রাখিয়া দিয়া আসিয়াছে।

সেদিন রবিবার সকালে পুরোনো বইয়ের দোকান হইতে একখানি অমুল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, যদিও বইখানির অনেক স্থলই ছেঁড়া অবস্থায় ছিল।

দুপুর বেলা একটু ঘুমাইয়াছিলাম—ঘুম হইতে উঠিয়া আভাকে বলিলাম—টুথ পাউডার আর ব্রাসখানা দাও তো আভা মুখটা আটা আটা লাগছে, একটু ধুয়ে ফেলি।

আভা মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই ছেঁড়া বই-খানার একখানা পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে কিছু পাউডার আনিয়া আমার হাতে দিল—আমি পাউডার হাতে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। এমন সময় নীলার দাদা রমেশ আসিয়া হাজির, তাহার সামনে আভাকে আর অপ্রস্তুত করিলাম না। শুধু বলিলাম—এ কাগজখানা রেখে দাও আভা, এখানা কাজের কাগজ।

রমেন বলিল—ওটা কিসের কাগজ বিকাশবাবু? আমি উত্তর দিলাম—ওটা 'Languages of the World Before the Birth of Christ'—এ-বই আজ-কাল আমাদের দেশে পাওয়া যায় না।

—ছিঁড়লেন কেন?

—ওটা ছেঁড়া ছিল।

—এটা আমি নিয়ে যেতে পারি? আমি পড়ব আর নীলাকেও পড়তে দেব—

—হাঁ, নিয়ে যেতে পারেন।

ইহার পরে সংবাদ পাইয়াছিলাম—রমেন নীলাকে পড়াইবার উদ্দেশ্যেই সেই বইখানা লইয়া যায় নাই—আভা যে এই দুষ্প্রাপ্য বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া আমাকে দাঁত-মাজিবার পাউডার দিয়াছিল, ইহাই জানাই-বার জন্ম তাহার বেশী আগ্রহ ছিল।

তাই আবার ভাবিলাম—আভা বেচারীর কি অপরাধ!

—এই বুঝি তোমার কালকে আসা মামাবাবু?

—কি করি ফুল, সময় কোথায়—কাজের চাপে মরবারও একটু সময় পাইনে।···

—মামাবাবু, আসচে মাসের প্রথমেই নীলার বিয়ে'—এই কলকাতায় ব'লেই বিয়ে হবে, বুঝলে?

—বুঝলাম, তা এখন কি করতে হবে?

—এখন কিছু করতে হবে না, তবে বিয়ের সময় তোমাকে একটু কাজ কর্ম্ম ক'রে দিতে হবে...তখন কোন ওজর-আপত্তি চলবে না।

—কোথায় সম্বন্ধ হল রে ফুল?

—খুলনায়, ছেলেটির অবস্থা ভাল—নিজে ল' পাশ ক'রে কেবল প্র্যাকটিস্ করতে বসেছে।

—নাম জান?

—সুধাময় চৌধুরী।

—ওঃ, ওর সঙ্গে তো আমি একই কলেজে পড়েছি!

—কেমন ছেলে মামাবাবু?

—খুব ভাল ছেলে—ও-রকম ছেলে খুব কম মেলে।

ইহার পর সুধাময়ের গুণ গাহিয়া তাহাকে স্বর্গে তুলিয়া দিলাম, বলিলাম—নীলা যে অমন ছেলের হাতে পড়বে তাতে সত্যই সে সুখী হবে আর আমরাও দেখে তৃপ্তি পাব···

ফুলও তাহার অন্তরঙ্গ বান্ধবীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখিয়া আনন্দ বোধ করিল কিন্তু আমি যে কত বড় মিথ্যা কথা বলিলাম তাহা কেবল আমি জানি, আর জানেন সুধাময়ের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই।

ভাবিলাম—আজ আমার এই বিবাহ-জীবনে অশান্তির মূল কারণ হইয়াছে নীলা—সেই নীলাকে দুঃখে না ফেলিলে নীলা আমার অবস্থার কথা বুঝিতে পারিবে না।

সুধাময়ের চরিত্রের কথা এইবার অন্ততঃ একটু না বলিলে আমার গল্প অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে—নামও যেমন সুধা তেমনি সে বিশেষ ভক্তও সেই সুধার। এই সুধা পান করিয়া যখন সে টাল সামলাইতে পারে না তখন রাস্তার পার্শে ড্রেণে পড়িয়া গেলেও রক্ষা নাই—তবে পুলিশের লাঠির খোঁচা খাইয়া খাইয়া বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া পড়িয়া থাকিয়া রক্ষা পায়। সে যে সুধার কেবল ভক্ত তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সুধার ভক্ত হইলে যে সমস্ত উপসর্গ থাকা উচিত সুধাময়ের মধ্যে তাহার সবগুলিই আছে—কোনটারই অভাব নাই।—সুধাময়ের সম্বন্ধে বলিতে গেলে আরও অনেক কথাই বলিতে হয়।···

ফুল বলিতে লাগিল—মামাবাবু, তোমার সঙ্গে যে লীলার বিয়ে হ'ল না তার জন্য কিন্তু লীলা দায়ী নয়—তাকে কোন দোষ দিও না।

—না, তাকে দোষ দেব কেন ফুল, ওসব কথা রেখে তোর মেয়েকে নিয়ে আয়, একটু আদর করি।

ফুল পাশের ঘর হইতে তাহার কোলের মেয়েটিকে লইয়া উপস্থিত হইল। আমি মেয়েটিকে কোলে লইয়া বলিতে লাগিলাম—সবু, সবি, সবিতা—কি, এই দাদাকে বিয়ে করবি ?—

মেয়েটি 'হিঃ হিঃ' করিয়া হাসিয়া উঠিল, ফুল বলিল—মায়ার ইচ্ছে হয়েছে, তোমার সঙ্গে বিয়েতে বসে।

এমনি সময় দিদি আসিয়া বলিয়া উঠিলেন—না মা তোর আর ঘটকালি ক'রে কাজ নেই—এক লীলার ঘটকালি ক'রে তো অনর্থ ঘটিয়েছিস···

এ-কথায় হয়ত অন্য অনেক কথা আসিয়া পড়িবে বুঝিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

দিদি বলিলেন মাঝে মাঝে আসিস ভাই, তুই দূর সম্পর্কের ভাই হ'লেও তোকে নিজের মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও বেশী দেখি। অন্য সবাই অপরাধ ক'রতে পারে, আমি তো কোন কিছুর মধ্যে নেই তা তো মানিস।

—হ্যাঁ, দিদি, তোমার কোন দোষ নেই। দোষ সত্যই যাদের তাদেরই বা আমার বল্‌বার কি আছে!···

এই কয়দিন ধরিয়া কেবল ভাবিতেছি—আমি ভাল কাজ করি নাই। লীলার সঙ্গে সুধাময়ের বিবাহ না-হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। আবার ইহাও অনেকবার মনে আসিতে লাগিল—কেন আমি লীলার জন্য অত ভাবিতেছি ?—তাহার বিবাহ-জীবন সুখের হইবে না, তাহাতে আমার কি আসিয়া যায় ? যে লীলা আমার জীবন শুধু ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়াছে, তাহার জীবনকে সুখময় করিব কেন ?—সে যেমনটি আমাকে শিক্ষা দিয়াছে, আমিও তাহাকে তেমনটি শিক্ষা দিব। তাহার উপর আমার চরিত্র লইয়া সকলে যেদিন আলোচনা করিল সেদিন আমাকে যে তাহারা নরকে নামাইয়া দিয়াছিল তাহাতে দুঃখ ছিল না কিন্তু লীলাও যে সে কথায় কি করিয়া সায় দিল, তাহা ভাবিতে পারি না। তাই ভাবিলাম—আজ সুধাময়ের সঙ্গে লীলার বিবাহ হইলে লীলা উপযুক্ত শাস্তি পাইবে।···

বাহিরে গাড়ি থামিবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আভা আসিয়া বলিল—ফুল আর লীলা না ফিলা এসেছে—যাও তোমাকে গাড়িতে ডাকছে।

পরণে আমার একখানা মুসলমানী লুঙি, হাতে একটা ফাউণ্টেন পেন, চোখে চশমা। কাঁধে একখানা গামছা, গায়ে একটা গেঞ্জি—এই অবস্থায় বাহির হইয়া গেলাম।

ফুল বলিল—মামাবাবু, তোমার সঙ্গে বিশেষ কাজ আছে, এই অবস্থায় চল, মা ডাকছেন। কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়িতে পড়িলাম। আমি এক পাশে, অন্য পাশে লীলা আর মাঝখানে মেয়েটি কোলে লইয়া ফুল বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে মেয়েটির গাল দু'টি লীলা টিপিয়া দিতেছিল, আমিও তাহার দেখাদেখি তদ্রূপ করিতে লাগিলাম।

—মামাবাবু, লীলার সঙ্গে সুধাময়ের যে বিয়ে হবে তা'তে তুমি কি ক'রে মত দিলে ?

—কেন, কি দোষ হয়েছে ?

—দোষ আর কি হবে, দেখ মামাবাবু তোমরা যে এমনি ক'রে প্রতিশোধ নিতে পার, এ কথা আমি ভাবতে পারিনে, অন্ততঃ তোমার সম্বন্ধে। যে মাতাল, যে লম্পট, লোকে দেখা তো দূরে থাক, যার নাম নিতে ঘৃণা বোধ করে, তার সম্বন্ধে যে নির্বিবাদে এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে গেলে, তাতে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি।

আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না, লীলা এইবার বাহিরের দিকে চাহিয়াই বলিতে লাগিল—ফুল, বিকাশবাবু যখন আমারই উপর অমনি ক'রেই প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছেন, তখন তাই হোক্—আমি এ বিয়ে করব। রেখার যে পত্র পেয়েছি তা এই ছিঁড়ে ফেলে দিলাম—বিকাশবাবু যখন এতে মত দিয়েছেন, তখন যদি দুঃখ পেতে হয় তাহ'লেও আমি সেই দুঃখ বরণ ক'রে নেব, কিন্তু—লীলার গলা ভারী হইয়া উঠিল।

আমি একটু শান্ত ভাবেই ফুলকে বলিলাম—ফুল, রেখা কে ? আর সে কি লিখেছে ?

—সে ওর এক বন্ধু, একই কলেজে পড়ত, সম্পর্কে রেখা সুধাময়ের বৌদি হয়, তুমি যে সমস্ত কথা লিখেছ তার সবই উল্টো·········লীলা যেন এ বিয়ের মত না দেয়—এ অনুরোধও জানিয়েছে।

—ফুল এ বিয়ে ভেঙে দাও, আমি একটি ভাল ছেলে দেখে দেব লীলার জন্যে—

লীলা বলিয়া উঠিল,—আর ভাল ছেলেতে আমার কাজ নাই। আপনাকে আমি অনুরোধ করছি বিকাশবাবু, আমার সম্বন্ধে আপনার কোন কথা এখন বলবার প্রয়োজন দেখি না·········

লীলা এই বিবাহ-শাস্তি বরণ করিয়া লইয়াছে। বিবাহের দিন আমি উপস্থিত ছিলাম, ইহার মধ্যে লীলার সঙ্গে আমার নির্জ্জনে একবার দেখা হইয়া গেল, দেখা হইতেই কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া লীলা বলিল—আপনার সাধ মিটেছে তো বিকাশ বাবু?

তারপর সে আমাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল। আমি বলিলাম—এ কথা বলছ কেন লীলা?

—আমি অন্য কিছু মনে ক'রে একথা বলছি না। আমি আজ এ-দুঃখ তোমার হয়েই বরণ ক'রে নিলাম। তোমার বিবাহটি ও জীবন সুখের হয় নাই, তা' জানি এবং তার চিহ্ন স্বরূপ আমিও বিবাহ-দুঃখ যেচে নিয়েচি······ ···দুঃখের মধ্যে আমাদের মিলন হবে চিন্তায়—সেই মিলনই সত্যকারের বিবাহ·········বিদায়। আশীর্ব্বাদ কর, যেন পর জন্মে তোমার সেবা করবার অধিকার পাই।·········

মুখ ফুটিয়া কথা বাহির হইল না—আমার অন্তর বাহির তখন মূক হইয়া গিয়াছে।

সেদিন লীলা ফুলের মেয়েটিকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল, আর ডাকিতেছিল—সবিতা, সবিতারাণী, সবি, সবু—ও সবু, তোমার মায়া নাম ভাল না, সবিতাই ঠিক মানাবে—আমিও তাই বলি। আমি ঘরে প্রবেশ করিতেই লীলা বলিল—বিকাশ বাবু, আপানার দেওয়া নামই ওর রেখে দিলাম।

এই নাম নিয়ে সকলের সঙ্গে আমার কত তর্ক। আজ আমাকেই পরাজয় মানতে হ'ল—ওই দেখুন, আমার এক বন্ধু একটা কার্ড লিখেছে।—যে মায়াকে আদর্শ ক'রে ওর নাম দিয়েছিলাম, তার পতন হয়েছে, তাই আপনার সবিতা নামই ঠিক রইল। আপনার যে আদর্শ ক'রে ওর নাম দিয়েছিলেন, তাই-ই অক্ষয় হবে,—তার মতোই ও বড় হবে·········

বলিতে বলিতে ছোট খুকিটিকে লইয়া ঠোঁটে, মাথায়, গালে—সর্ব্বত্র লীলা চুম্বন দিতে লাগিল, তারপর কি জানি ভাবিয়া উঠিয়া গেল। আমি আস্তে সবিতাকে একবার তুলিয়া দুই হাত দিয়া বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিলাম। সবিতার গায়ের গন্ধের সঙ্গে লীলারও স্পর্শ যেন অনুভব করিতে লাগিলাম। যে এত দূরে ছিল, সে আজ কত কাছে!·········

ফুল আসিয়া ডাকিল—মামাবাবু, কি করছ?

—তোর মেয়েকে আদর দিচ্ছি ফুল।

—মামাবাবু, তোমার দেওয়া নামই রাখা গেলো, লীলার মায়ার মৃত্যু হয়েছে—

—মৃত্যু?

—হ্যাঁ, মৃত্যু বইকি! রমণীর আদর্শ বা লক্ষ্য থেকে তাকে প'ড়ে যেতে দেখলেই মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা যায় মামাবাবু!

—যাঃ, পাগলামী রাখ ফুল।

—পাগলামী নয়, ওর নাম সবিতাই রাখা হ'ল—লীলাকে ডাকব? সেও তাই বলেছে—

—না, মা, আর ডেকে কাজ নাই, একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রে উঠব—লীলার বর কেমন হয়েছে রে ফুল?

—যতটা রেখার পত্রে শোনা গিয়েছিল মামাবাবু তার চেয়েও খারাপ।

—খারাপ?

—হ্যাঁ, মামাবাবু, কিন্তু লীলা তার জন্য এতটুকু দুঃখিত নয়। বলে—পুরুষ হ'য়ে বিকাশ বাবু যদি অতটা স্ত্রী-সুখ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে সহ্য করতে পারেন, তবে আমি স্ত্রী হ'য়ে স্বামী-সুখ হ'তে তার চেয়ে বেশী সহ্য করতে সক্ষম হব না কেন?—একথার তুমি কি উত্তর দেবে মামাবাবু?

—কিছু না।

—তা আমরাও জানি।

খেয়ালী
চিত্রপট

যে সব অভিনেতা কিছুদিন হ'লো পরিচালক সেজেছেন —ধীরাজ ভট্টাচার্য্য তাঁদের ভেতর নবতম। এঁর "জোয়ার ভাঁটা" চিত্রটি চিত্রায় আগতপ্রায়। ওপরে ঐ চিত্রটির অভিনেতা আর অভিনেত্রী—বিনয় আর লীনা মুখার্জ্জী।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৩ই চৈত্র ১৩৪২—26th. March, 1936. } ১৩শ সংখ্যা

সুভাষচন্দ্র ও সরকার

জননীর কোলে প্রবাসী সন্তানের প্রত্যাগমন সাধারণতঃই একান্ত আনন্দের বিষয়। এই সাধারণ আনন্দ আবার অসাধারণত্ব লাভ করে যখন এই সন্তান হ'ন জননীর মুখোজ্জ্বলকারী। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র আজ শুধুই বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান নহেন, তিনি আজ সারা ভারতের অন্যতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তাই বহুদিন পরে তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাগমনের সংবাদে দেশবাসীর অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গত রবিবারের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সংবাদে সেই আনন্দের উপর যেন বিষাদের একটা ছায়াপাত হইয়াছে। উক্ত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, ভিয়েনাস্থ বৃটিশ কন্সাল সুভাষচন্দ্রকে জানাইয়াছেন যে. তিনি মার্চ্চের শেষে দেশে ফিরিবেন, সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট উক্ত বৃটিশ কন্সাল মারফত তাঁহাকে জানাইতেছেন যে, তিনি যদি দেশে ফিরেন তাহা হইলে ভারতে পদার্পণের পর তাঁহার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার নাও থাকিতে পারে।

বাস্তবিক, এই সংবাদ যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছে। গত দুই বৎসর যাবত বাঙ্গলার কংগ্রেসী কলহের অবসানকল্পে সেই সুদূর হইতে তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আর কাহারও দ্বারা হইত না। সেই চেষ্টা আজ সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। আজ যদি তিনি নিজে আসিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব ও আদর্শ দ্বারা বাঙ্গলা কংগ্রেসকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে এই বহুদিনের ধূমায়িত অগ্নির উপর যে শান্তিবারি বর্ষিত হইবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তদুপরি দেশের এই সন্ধিক্ষণে তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ভারতীয় কংগ্রেস তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। এই সময়ে দেশ যদি তাহা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে দেশের একান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। সারা দেশের লোকের যাঁহার উপর আস্থা ও বিশ্বাস আছে, অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ন্যায় যাঁহার জীবন ও কার্য্য একান্ত প্রকাশ্যভাবে সারা জগতের নিকট সুগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের এই অনাস্থা কি সত্যই পরিতাপের বিষয় নহে? দেশে ফিরিলে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা হরণ করা সম্বন্ধে সরকারকে তীব্র নিন্দা করিয়া পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাব পাশ হইয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মিঃ হ্যালেটের ও স্যার নৃপেন্দ্র নাথের উক্তির বিশ্লেষণ আমরা অন্যত্র করিয়াছি। পণ্ডিত জওয়াহরলাল মুক্তিলাভ করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্য যথারীতি টিকিয়া আছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকেও সে অবসর দিলে বৃটিশ সাম্রাজ্য যথারীতি টিকিয়া থাকিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

—শ্রীনটশেখর—
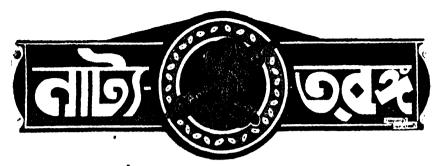
গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-উৎসব

বাঙলার নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-বার্ষিকী-শ্রাদ্ধ বছরে বছরে অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে। কিন্তু প্রতি বছরেই গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে কতকগুলো লোক বেশ ছেলেখেলা ক'রে আস্‌ছেন। এ বিষয়ে আমরা শুধু মন্তব্য প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত থাক্‌বো না, কারণ আমরা যুক্তি দিতে প্রস্তুত।

প্রথমেই আমরা ব'লতে চাই যে—গিরিশ-স্মৃতি সভায় দীনেশ সেন-কে সভাপতি-রূপে বরণ ক'রে উদ্যোক্তারা মস্ত বড় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। দীনেশ সেন বক্তৃতা দেবার আর্ট এই বৃদ্ধ বয়সেও আয়ত্ত ক'রতে পারেন নি; তার ওপর তাঁর কথা বল্‌বার ভঙ্গী ও মাতৃভাষার উচ্চারণ অত্যন্ত পীড়াদায়ক; (শিশির বাবুর "রীতিমত নাটকে"র ভাষায় এ হ'চ্চে বৈদিক বাঙলা।) তিনি সেই দিন আমাদের উক্তি বিশেষভাবে প্রমাণিত ক'রেছেন তিনি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে ব'লতে উঠে 'ধান ভানতে শিবের গীত' সুরু ক'রে দিলেন। কোথায় গেলেন গিরিশ, তিনি কেবল কৃষ্ণকমল গোস্বামীর প্রেম ও ভক্তির কথা নিয়ে মেতে উঠলেন। শেষে অনেক আবোল তাবোল বক্‌বার পর গোস্বামী ও গিরিশের মাঝে সেতুবন্ধন ক'রলেন এই ব'লে যে, সে সময় ইংরেজী জানা সকলেই নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রেম ও ভক্তি বর্ত্তমান ছিল। আহা! কী সভাপতির অভিভাষণ রে! (মরি গদগদ হ'য়ে। এই দীনেশ-ই কি সেই দীনেশ যাঁ'র মহাপ্রশস্তি লিখেছিলেন স্বর্গত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—

"বিশ্ববিদ্যালয়-গাভী,
দীনেশ এঁটুলি।"—

তিনিই যদি ইনি হন, তা' হ'লে 'তো ব'লতেই হ'বে ইনি আর 'এঁটুলি' নন—এখন "ভ্যাম্‌পায়ার"।)

সভাপতির এই বিকট অভিভাষণের আগে স্বামী সম্বুদ্ধ চৈতন্য মঙ্গলাচরণ ক'রে হ্রস্বদীর্ঘ-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলেন। গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোকটি তিনি প'ড়লেন—

"...............................

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"

(স্বামীজী ব'ললেন—মা সু-উ-উ-উ-উ-চ, বোধহয় স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল—সুচ ফুটিয়ে মুক্তি-মার্গের সন্ধান এনে দেবেন।)

তারপর "গিরিশ সংঘে"র বকেয়া সম্পাদক ভূতনাথ অ্যাংলিসাইজড্ 'বিকৃতস্বরে প্রস্তাব ক'রলেন যে এমন একটা ফাণ্ড রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা গ'ড়ে তুলুন, যা' থেকে বুড়ো বয়সে নট-নটীদের পেন্‌সন্ দেওয়া যেতে পারে। প্রস্তাব উত্তম, কিন্তু কার্য্যে চিরদিনই যে অষ্টরম্ভা হ'বে—তা' আগে থেকেই আমরা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রছি।

তারপর ডা: পঞ্চানন নিয়োগী ও 'নগেন্দ্র' প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মামুলি ধরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ক'রে নিরস্ত হন।

এর পর উঠলেন অশোকনাথ শাস্ত্রী। তিনি তাঁর বক্তৃতায় গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী অভিজ্ঞতা এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার মিলনের উদ্যম সম্বন্ধে আলোচনায় কিছু নতুন তথ্যের সূচনা ক'রেছিলেন। (অতি উত্তম! কিন্তু তিনি দেখছি যত্রতত্র বক্তৃতা ক'রে বেশ পেশাদারী বক্তা হ'য়ে উঠ্‌ছেন।—তিনি কি জানেন না—"দর্দ্দুরা যত্র বক্তার-স্তত্র মৌনং হি শোভনম্‌"?)

* * *

শাস্ত্রী ম'শায়ের বক্তৃতার পর আশ্চর্য্যময়ীর "রাখাল মিলি ঘন করতালি"—কীর্ত্তনটি সুগীত হ'য়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই গানে এন্‌কোর প'ড়লো, আশ্চর্য্যময়ীও এই স্মৃতিসভায় আবার গাইতে সুরু ক'রলেন।

(আশ্চর্য্যময়ীর পক্ষে এ-ব্যাপারটা বিসদৃশ নয়, কারণ বুড়োবয়সে মঞ্চে এন্‌কোর না পেয়ে এই স্মৃতিসভাতেই সুযোগ পেয়ে খেদটা মিটিয়ে নিতে পারেন; কিন্তু যাঁরা এন্‌কোর দেনে-ওয়ালা তাঁরা রসজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের যে রকম পরিচয় দিলেন—তা' তাঁরা বুঝতে না পারুন, আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি।)

সাহিত্যের দালাল নলিনী পণ্ডিতের জামাই-বাবাজী যোগেশ মিশ্র স্বনামধন্য 'শ্বশুরের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে অনুনাসিক স্বরে একটি ড্রামাটিক বক্তৃতা ক'রলেন। মাথা-মুণ্ড নাই থাক্—তিনি হাততালি পেয়েছিলেন প্রচুর,—আশার অতিরিক্ত হাততালি সইতে না পেরে তিনি হতাশ্বাসে ব'সে প'ড়লেন। (কেন,—শ্বশুর ম'শায় যে হাততালি খেয়েও দমেন না, তাঁর আদর্শ কি তখন ঠেকাতে পারলে না?—তা' যাই হোক, নিরুৎসাহ হ'য়ে মুক্তকচ্ছ হ'বার কোনো কারণ নেই। যোগেশ মিশ্রের শ্রীশ্বশুর ক্ষেত্রটি একটি সাহিত্যের বেনাবন; তিনিও যে এই বেনাবনের একটি নতুন "কলম", সে বিষয়ে সন্দেহ ক'রবার কি আছে! অতএব মাভৈঃ, আস্‌ছে-বারে

(দেখে নেবার পালা। ভালো ক'রে আজ থেকেই মুখস্থ ক'র্‌লে—তখন আর পরে দমে যেতে হ'বে না।)

এই ব্যক্তিটির পর মনোরঞ্জনবাবু উচ্চারিত বেশ ভালো কথাই ব'লেন। বছর বছর মামুলি প্রথায় গিরিশ চন্দ্রের স্তুতিগানে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করাও হয় না, আর বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের কোন উপায় উদ্ভাবন ত এ প্রথায় হতেই পারে না। এর চেয়ে বরং নাট্যসাহিত্যের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মিলে যদি একটা symposium করেন, ও অশোক শাস্ত্রী মশাই এবার আলোচনায় যে থেই ধরিয়ে দিয়েছেন সেই সূত্র ধরে যদি বিচারমূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ন, তবেই সত্যিকার কিছু কাজ হ'তে পারে—ইহাই ছিল মনোরঞ্জনবাবুর বক্তব্যের সারাংশ। আমরাও এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

এ সভায় শিশিরবাবু গিরিশবাবু সম্বন্ধে তাঁর কত উচ্চ ধারণা তা'র পরিচয় দিতে গিয়ে স্বরচিত নতুন নাটকের কয়েক পৃষ্ঠা তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গীতে প'ড়েছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য—গিরিশবাবুর মত প্রতিভাবান নাট্যকার-নট এক যুগে একজনের বেশী জন্মায় না। নটেরা সমাজের প্রকৃত হরিজন—তাঁরাই যথার্থ পতিত; গিরিশচন্দ্র এঁদের একটা উপায় করে দিয়ে অপূর্ব্ব সহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু একথার প্রতিবাদে ব'লেছিলেন—নটেদের হরিজন শ্রেণীতে ফেলতে তিনি রাজী নন। কারণ, রঙ্গমঞ্চের নটেরাই প্রকৃত শিক্ষাদাতা। এর পর গিরিশ-দৌহিত্র শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বসুর 'বুদ্ধদেব' হইতে আবৃত্তি সুখশ্রাব্য হ'য়েছিল। নাট্যপরিষদের বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গানখানিও মন্দ হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য সঙ্গীত ও বক্তৃতা অনুল্লেখযোগ্য। এমন কি আশ্চর্য্যময়ীর শেষ দু'খানি বৈষ্ণব পদাবলী কীর্ত্তনও ভাল জমে নাই। রাত্রি দশটায় সভা ভঙ্গ হয়।

বিভীষিকাময় বিপ্লবী নেতা

—:০:—

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে মিঃ হ্যালেটের উক্তি

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি ভারত সরকারের সাবধান বাণী প্রসঙ্গে যে স্থগিত প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল সেই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে হোম সেক্রেটারী মিঃ হ্যালেট মহাত্মাজির ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী স্বনামধন্য কৃষ্ণদাসের পত্রের উল্লেখ করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এসোসিয়েটেড প্রেসের বিবরণী হইতে আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

WHO IS MR. A?

Finally Mr. Hallett recalled the letter of Mr. Krishna Das which the Law Member had read out textually on a previous occasion. That letter had remained unchallenged. In it there was a reference to one Mr. A and Mr. B. Mr. Hallett now disclosed to the house that Mr. A. meant Mr. Subhas Chandra Bose. He did not disclose the identity of Mr. B. The letter showed that the Yugantar party of revolutionaries were supporters of Mr. Subhas Chandra Bose and this party was responsible for the Chittagong Armoury raid, Pahartali outrage and other crimes. Mr. Bose was head of that party.

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সিমলা অধিবেশনে সংশোধিত ফৌজদারী আইন সম্পর্কে বিতর্ক প্রসঙ্গে আইন সচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কৃষ্ণদাসের যে পত্রের উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাতে বর্ণিত **Mr. A** নাকি বাংলার জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। মিঃ হ্যালেট আরো বলিয়াছেন যে কৃষ্ণদাসজির পত্রে প্রকাশ সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী যুগান্তর দলের নেতা। মিঃ হ্যালেটের মতে উক্ত যুগান্তর দলই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পাহাড়তলী আক্রমণ ও অন্যান্য সন্ত্রাসমূলক কার্য্যাবলীর জন্য দায়ী।

পাগল হইয়া হেথা হোথা ফিরি

কামের গন্ধে মম

"কস্তুরী মৃগ সম"

—কৃষ্ণদাসের খেদোক্তি

ফরওয়ার্ডের বিজ্ঞাপন

গত ২১শে সেপ্টেম্বর "ফরওয়ার্ডে" প্রকাশিত উপরিস্থ বিজ্ঞাপনের উত্তরে কৃষ্ণদাসজীর পার্শ্বস্থ আবেদনখানি প্রেরিত হয়।

মহাত্মাজির শিষ্য বলিয়া প্রখ্যাত কৃষ্ণদাসজির পত্রখানি লইয়া আইন সচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও হোম সেক্রেটারী মিঃ হ্যালেট এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছেন। উক্ত পত্রের উল্লিখিত অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে বাহিরের কোনরূপ সমর্থক সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হয় নাই। একমাত্র উক্ত ব্যক্তির (কৃষ্ণদাস) বাক্যকেই ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস নিজেকে গান্ধিজীর শিষ্য এবং অহিংসপন্থী বলিয়া চিরদিন আত্ম-পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। তিনি কিরূপে হিংসাপন্থীর দলের ভিতরকার খবর রাখিলেন তাহা বাস্তবিকই কি বিস্ময়কর নহে? তদ্ভিন্ন বাংলার সহিত তিনি বহুদিন হইতে সংশ্রব ছিন্ন করিয়াছেন। বাংলার রাজনৈতিক দলের শতকরা নব্বই জন তাঁহার বাঙ্গালী নাম জানে না। এহেন ব্যক্তি বাংলার এক বিশেষ সমস্যার সংবাদ কিরূপে জানিল এবং তাহা কতদূর সত্য তাহা জিজ্ঞাস্য। তদুপরি কৃষ্ণদাসের পদ ও পদবী এমন কি গুরুত্বপূর্ণ যে যাহার একটা পত্রের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার ভারতের নির্ব্বাসিত সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার বিরুদ্ধে এরূপ একটি গুরু অভিযোগ আরোপ করিতে পারেন। এই ব্যক্তির বিদ্যা, বুদ্ধি ও মতি-গতির পরিচয় আমরা যদিও ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি তবুও আর একবার জনসাধারণের সমক্ষে তাঁহার সেই অপরূপ কৃতিত্বের সাক্ষ্যটি উপস্থাপিত করিতেছি।

Dear Sir,

With reference to your advertisement in the "Forward" dated September 21, 1935, I would invite you to correspond with a living subject of the following description, if political opinion does not stand in the way of your entertaining the proposal.

Birthplace — Chandpur (Dt. Tipperah), E. Bengal

42, bachelor

Antecedents — Has been a close follower of Gandhiji for the last 15 years with personal relations with him.

Present occupation — Holding the position of

"শ্রীকৃষ্ণদাস সিংহ রায় (গুজরাটী অনুসরণে কৃষ্ণদাসজী) ৪২ বৎসর কৌমার্য্য-ব্রত পালন করিয়া বর্ত্তমানে মদনের শরবিদ্ধ হইয়া পাত্রীর সন্ধানে চতুর্দ্দিকে আবেদন পত্র প্রেরণ করিতেছেন। অনুরূপ একটি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উপরে আমরা তাহার অনুলিপি প্রকাশ করিলাম।

গত ২১শে সেপ্টেম্বরের 'ফরওয়ার্ডে' জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার গ্রাজুয়েট কন্যার

paid office Secretary of the All-India Congress Committee, Swaraj Bhavan, Allahabad.

Parentage – Son of late Radha Madhav Sinha Ray, who was a lawyer at Chandpur

Family – Mother still living. Three younger brothers, all married and living in joint family.

Name – The subject is known to public as Krishnadas. The family surname of Sinha Ray is not generally used by him or his friends.

Address – For correspondence, he may be addressed as
Krishnadas
Swaraj Bhavan,
Allahabad.

কলির কৃষ্ণদাস

"উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী ক'রেছি সার,
কিশোরী-ভজন কিশোরী-পূজন
কিশোরী গলার হার।"
বৃন্দাবন-বিহারীর এই লীলা স্মরি'
শ্রীকৃষ্ণদাসের প্রাণ উঠিল গুমরি'।
সংবাদপত্রের বুকে "পাত্র চাই" খুঁজে
বদ্ধ দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরে চক্ষু বুজে।
চল্লিশ হইয়া পার চাল্‌শে দুই চোখে
নতুবা দেখিতে পেত—কেন বল লোকে
আদরের কন্যা দিবে তুলে হাতে তার,
তিন ছোট ভাই পূর্ব্বে বিবাহিত যার!
নিজের উপাধি ত্যজি' সাজিল যে সন্ত
বৈষ্ণব নামের ভেকে করে নব ঢঙ!
বাঙ্গালী হইয়া যেই সাজে অ-বাঙ্গালী
হইল স্বজন-দ্রোহী নামের কাঙ্গালী!

* * *

সুকঠোর আকুমার ব্রহ্মচর্য্যতলে
দেখ সবে কামনার দীপ কিবা জ্বলে!
শত উপদেশ-স্বর্ণ হ'ল ধূলিমুঠি
বৃথা হ'লো নিত্য কাচা মহাত্মা-লেঙ্গুটি!

* * *

বৈষ্ণবীর মালপোয়া খাইতে খাইতে
কেন এই ব্যক্তিটির কাঁচা মাংসে লোভ?
অহিংসার পথে সদা যাইতে যাইতে
কেমনে এ জানে কার হিংসাসাথে যোগ?
অপরূপ চীজ্‌ ইনি—স্বদেশী টিক্‌টিকি
সত্যমিথ্যাকল্পনার রচি' মায়াজাল
অপরের ক্ষতি করি'—আনন্দেতে টিকি
নাড়িয়া জানায় নিজ বাহাদুরী চাল।
এই দেশদ্রোহী মুখে অহিংসার বাণী
যেন কুম্ভীরের চক্ষে সাঁতারের পানি।

পাত্রের অনুসন্ধানে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে কন্যার পিতা যে সকল আবেদনপত্র পাইয়াছিলেন, কৃষ্ণদাসজীর আবেদন-পত্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

পত্রটির প্রতিলিপি হইতে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন, কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতার বিবাহের পর মদনের আহ্বানে সাড়া দিতে তিনি কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ১৫ বৎসর মহাত্মাজীর পার্শ্বচর হইয়া থাকিয়া ও সবরমতী আশ্রমে অবিবাহিত জীবনের মন্ত্র-সিদ্ধ হইয়াও প্রৌঢ়ত্বের অবসানে কৃষ্ণদাসজীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে সবরমতী আশ্রমের দীক্ষার ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইতেছে।"

যে লোক বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে এবং এতদিন একজন বিশিষ্ট অসহযোগী হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যার পাণিপ্রার্থী হইবার এরূপ দরখাস্ত প্রেরণ করিতে পারেন তাঁহার মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াই কি স্বাভাবিক নহে?

সংশয়াকুল স্যার নৃপেন্দ্রনাথ

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি ভারত সরকারের সাবধানবাণী জ্ঞাপন প্রসঙ্গে উড়িষ্যার প্রতিনিধি পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাসের স্থগিত প্রস্তাবের আলোচনা কালে স্বরাষ্ট্র বিভাগের খাস-মুন্সী, স্বয়ং স্বরাষ্ট্র সচিব এবং আইন-সচিব তিনজনই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সুভাষচন্দ্র বাঙলার বিভীষিকাময় বিপ্লবী নেতা—অতএব সুভাষচন্দ্রকে দেশে ফিরিতে দিয়া গভর্ণমেণ্ট নিজেদের বিপন্ন করিবার মূঢ়তা প্রকাশ করিতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে আইন-সচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতা 'অমৃতবাজার' ও 'আনন্দবাজারে' বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'অমৃতবাজারে'র বিবরণীতে প্রকাশ যে,

Sir Nripendra, in his introductory explanation cleared his position, saying that he took his stand neither to impeach Sj. Bose's freedom nor to prove his terrorist guilt. All that the Law Member was concerned with was to explain the executive action in preventing Sj. Bose from moving freely in India. The burden of Sir Nripen's speech was to show that the terrorist conspiracy was still alive in Bengal and Sj. Bose's return to the country would give an incentive to the terrorist activities.

'আনন্দবাজারে'র বিবরণীতে প্রকাশ যে,

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাসের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় এক বক্তৃতা করেন। তাহার উত্তর দিতে উঠিয়া আইন সচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলেন,—মোটামুটিভাবে যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া হোম সেক্রেটারী মিঃ হ্যালেট অদ্য বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলার একদল বিপ্লববাদী সুভাষবাবুর সমর্থক এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সুভাষবাবু নিজেও একজন বিপ্লববাদী, সেই সাক্ষ্য-প্রমাণ-সম্পর্কে মিঃ দত্ত একটি কথাও বলেন নাই। আমি মনে করি যে, এমন সব প্রমাণ আছে, যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, সুভাষবাবুও একজন বিপ্লববাদী।

'আনন্দবাজারে'-র বিবরণী পাঠ করিলে মনে হয় যে, স্যার নৃপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত (চাকরীগতও হইতে পারে) অভিমত যে, সুভাষচন্দ্র একজন বিপ্লববাদী। আর অমৃতবাজারে'-র বিবরণী বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ শ্যাম ও কুল উভয়ই রক্ষা করিয়াছেন অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের সহিত সুভাষচন্দ্রের সংশ্রব সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত অভিমত প্রকাশ না করিয়া সরকারী-নীতির সমর্থন করিয়াছেন। স্যার নৃপেন্দ্রনাথের বিস্তৃত বক্তৃতা পাইলে আমরা বারান্তরে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

এই প্রসঙ্গে 'সংশয়াকুল স্যার নৃপেন্দ্রনাথকে আমরা একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহা কি সত্য নহে যে সুভাষচন্দ্র প্রবাসে যাইবার প্রাক্কালে বাঙলার তদানীন্তন এ্যাড্ভোকেট্-জেনারল স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সুভাষচন্দ্রের প্রবাসে যাইবার ও চিকিৎসার ব্যয়ভারের দায়িত্ব বহুলাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন—অবশ্য তদানীন্তন লাট স্যার ষ্ট্যান্লী জ্যাক্সনের সম্মতিক্রমে? তখন যদি সুভাষচন্দ্রকে সত্যই তিনি বিপ্লববাদী বলিয়া মনে করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে কোন্ যুক্তিবলে বাঙলার এ্যাড্ভোকেট্ জেনারল হইয়াও স্যার নৃপেন্দ্রনাথ বাঙলার বিভীষিকাময় বিপ্লববাদী নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন!

বিবিধ

কবিরাজ নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, গৌরীপুরের (মৈমনসিংহ) যশস্বী বহুদর্শী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্-এ কাব্যসাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, দর্শনাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ৩২-১ মাণিকতলা স্পারে তাঁহার চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়াছেন। কাব্যে, দর্শনে ও আয়ুর্ব্বেদে কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ পাণ্ডিত্য-খ্যাতি আছে। তিনি সংস্কৃতের এম্ এ, ও ছাত্রজীবনে প্রত্যেক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদকাদি লাভ করিয়াছেন। স্বর্গত প্রাণাচার্য্য কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও স্বনামধন্য প্রবীণ কবিরাজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কতীর্থ মহোদয় ইঁহার আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মৈমনসিংহের সুবিখ্যাত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভূস্বামী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইনি প্রথমে গৌরীপুরেই চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করেন। গৌরীপুরে ইঁহার নিজস্ব "ভৈষজ্য উদ্যান" একটি দর্শনীয় বস্তু। সম্প্রতি ইঁহার বহু বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে ইনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। যাঁহারা আয়ু-

...দের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা কবিরাজ মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিলে উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বিনামা-রহস্য!

সে দিন হৃষীকেশ পার্কে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে সভা হয়, তাহাতে হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর চাকরীয়া শ্রীনলিনাক্ষ সান্ন্যাল কংগ্রেসের ছাড় লইয়া যে দল কর্পোরেশনে প্রবেশ করিয়াছেন—তাঁহাদের নিন্দাকীর্ত্তন করিতে করিতে সহসা একপাটি চটি জুতা দেখাইয়া বলিয়া উঠেন—কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উহা ছুড়িয়াছে! যেন ম্যাজিক। কথা বলিয়াই তিনি সযত্নে চটি পাটিটি পকেটস্থ করেন। যে "অমৃত বাজার পত্রিকা" তাঁহার প্রভু (হিন্দুস্থানে) নলিনীর বন্ধু সেই পত্রেই একজন লিখিয়াছেন—সেটা election tactics; চটিপাটি সান্ন্যাল সভাপতির চরণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই বিনামা রহস্যের সমাধান কে করিবে? বিধানী দলের ব্রেণ কিরণশঙ্কর কি এই ব্যাপারে কোনরূপ আলোকপাত করিতে পারেন না?" তবে চটিপাটি যদি সভাপতিরই হয়, তবে কি তাঁহাকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না? সান্ন্যাল যখন অগ্নিশর্ম্মা স্বরাজী হইবার পরও মন্ত্রীর মাতামহালয়ে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, তখনও কি কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চটি ছুড়িবে? গল্পে আছে, মুচী একটা মামলায় দারোগাকে এক জোড়া জুতা উপহার দিয়া বলিয়াছিল—"হুজুর, পান খেতে এই জোড়া দিলাম।" আমাদের সভা-সমিতিতে কি শেষে সেইরূপ ব্যাপার ঘটিতে লাগিল? আমরা আশা করি, এই চটিপাটি নলিনীর "রঞ্জনীতে" গ্লাসকেসে শোভা পাইবে।

নির্ব্বাচনে কর্ম্মচারী

শুনিলাম, কলিকাতা কর্পোরেশনের সুচতুর চীফ এক্জিকিউটিভ আফিসার এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, কর্পোরেশনের কোন চাকর যেন কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে কোন পক্ষে কাজ না করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি rulesএ নাই? যদি থাকে, তবে আবার "to guild refined gold" হিসাবে এই ইস্তাহার জারি করা কেন? তাহা না করিয়া অপরাধী চাকরদের গলাধাক্কা দেওয়াই কি সঙ্গত ছিল না? তিনি কি জানেন না, কে বা কাহারা এই-রূপ কাজ করিতেছে? সহযোগী "আনন্দ বাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন, লাইসেন্স আফিসার শ্রীশৈলেন্দ্র ঘোষালের ভ্রাতা (ইনি কি এখন আর কর্পোরেশনে চাকরীয়া নহেন?) সে দিন সভায় গোল করিয়া-ছিলেন। আশা করি তাহা শৈলেন্দ্র বাবুর সম্মতিক্রমে নহে। নির্ব্বাচনের পরে আমরা অপরাধী কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিব! আজ এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। কর্পোরেশনের যে সব officer ঠিকাদারদের দালালী করেন—ঠিকাদারদের মোটরে নিত্য ভ্রমণেও পরিতৃপ্ত না হইয়া ঠিকাদার-তনয়ের সঙ্গে সস্ত্রীক র'াচিতে পাড়ি জমান, তাঁহারাও কি above suspicion? গিরিশিরে আদিত্যকিরণ-পাত যত স্বাভাবিকই কেন হউক না—কর্পোরেশনের আফিসে তাহা শোভা পায় না। যদি প্রমাণ হয়, কর্পোরেশনের কোন কর্ম্মচারী ঠিকাদারের দোস্ত—তবে কি সেই ঠিকাদারের নাম কর্পোরেশনের তালিকা হইতে বর্জ্জন করা ও সেই কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করাই রোগের উপযুক্ত ঔষধ হইবে না?

কর্পোরেশন ও হিন্দুস্থান

এবার দেখিতেছি, যাঁহারা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন—

(১) নলিনাক্ষ

(২) বঙ্কিমচন্দ্র

(৩) শচীন্দ্রপ্রসাদ

নলিনাক্ষ বাবু যে হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর চাকরীয়া তাহা আমরা অবগত আছি। বঙ্কিমবাবুও কি তাহাই? আর শচীন্দ্রপ্রসাদের কথা আর না-ই বলিলাম।

যদি এই ত্র্যহস্পর্শের সহিত হিন্দুস্থানের সম্পর্ক থাকে, তবে কি ইহা great minds think alike, না—his master's voice? আমরা আশা করি, কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক বা যিনি এখনও হিন্দুস্থানের ডিরেক্টারী ছাড়েন নাই সেই কুমার নরেন্দ্র-নাথ লাহা এ বিষয়ে আমাদিগের সংশয় দূর করিবেন। এই হিন্দুস্থানেই 'অমৃতবাজার পত্রিকার' জাতীয়তাবাদী সম্পাদক—কলি-কাতার পুলিশ কমিশনারের অবধ্য দূতরূপে গিয়াছিলেন। এখন কি সত্য সত্যই এমন সন্দেহের কোন কারণ আছে যে, হিন্দুস্থানের মন্ত্রণাগৃহ হইতে তাহার কর্ম্মচারীসঙ্ঘ কংগ্রেস-দ্রোহিতা করিতে বাহির হইতেছে? বিধান বাবু এ বিষয়ে কি বলেন?

আর দেশের লোকই বা এ বিষয়ে নির্দ্ধারণের কি করিতেছেন?

অদ্যকার ২২নং ওয়ার্ডের নির্ব্বাচনে

আদর্শচ্যুত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

তাঁহার কংগ্রেসদ্রোহিতার যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করুন।

ইনি কে ?

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা—যে রাত্রিতে

"মিথ্যা সরম সঙ্কোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মত
পদতলে"

সেই রাত্রির কথায় মদনকে বলিয়াছিল—যখন

"আপনারে আর বার মনে পড়ে গেল,
ছুটিয়া পলায়ে এনু নব প্রভাতের
শেফালি-বিকীর্ণ-তৃণ বনস্থলী দিয়ে,
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মত।"

আজ কোন সাংবাদিক cheap midday fareএ বঞ্চিত হইয়া "শেফালি-বিকীর্ণ" পথে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছেন এবং কেইবা কমলবঁধুর সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের পথে দেখা দিয়া আসিয়াছেন ? আবার শুনিতেছি, কেহ কেহ বর্গভীমার মন্দির সান্নিধ্য হইতে সান্ত্বনা-বাক্য শুনিতেছেন :—

"Weep no more ladies, weep no more,
Men were deceivers ever".

কর্পোরেশনের ইলেকশন চুকিয়া গেলে আমরা এবিষয়ের রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিব।

'ছন্দা'র ছন্দ-পতন

'ছন্দার' তৃতীয় সংখ্যায় আমাদের হেমেনদা অশোক শাস্ত্রী মশাইয়ের 'কথাকলি' সমালোচনার পাল্টা জবাব দিয়েছেন। "তাঁর বিশ্বাস, কলকাতার "খাঁটি যাত্রার আসরে" কথাকলির উপরে অবিচার হ'ত না। এটা যদি তিনি একবার পরীক্ষা করে দেখেন, তাহ'লে তাঁর ওরকম বিশ্বাস আর থাকবে না। কলকাতার যাত্রার আসরে যে বহু মুদ্রাভক্তের সমাগম হয় আমি তা' জানি। কারণ বাল্যকালে কোন যাত্রার আসরে আমার জামার জেব থেকে একটা মুদ্রা অন্তর্হিত হয়েছিল।"

বাল্যকালে তাঁর জামার জেবে যে অন্ততঃ একদিনের জন্য একটাও মুদ্রা বর্ত্তমান ছিল—এ খবর পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হয়েচি কারণ এই প্রৌঢ় বয়সে তাঁর সংস্পর্শে এসে মুদ্রা-ভক্তেরা বারবারই বিফল মনোরথ হয়েচে বলে শোনা গিয়েচে।

তন্ত্রের পঞ্চমকারের অন্যতম ম-কার যে "মুদ্রা" তাহার ভক্ত হ'লে নাট্যশাস্ত্রের মুদ্রার প্রসাদ লাভ করা যে কঠিন হ'বে ইহা "এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী" কিরূপে ভুলে গেলেন তা ভেবেই আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

গত বৃহস্পতিবার ১৯শে মার্চ সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় ভবানীপুর "নর্দান পার্কে" রামকৃষ্ণদেবের শততম জন্মোৎসব আরম্ভ হয়। মাননীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় এই উৎসবের পৌরহিত্য করেন। সুগায়ক শ্রীযুত বিনয় গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক একটী উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শতবার্ষিকী কমিটীর সভাপতি ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের অনুরোধে মাননীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় একটী সুন্দর ও সময়োচিত বক্তৃতা দ্বারা উৎসবের উদ্বোধন করেন। তৎপরে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় সন্তান শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ, শ্রীযুত কিরণ দত্ত, স্বামী গুণাতীতানন্দ এবং ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় বক্তৃতা দেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মহৎ ভাবধারা ও আদর্শ সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। উদ্বোধন সভায় শেষে কয়েকজন বিশিষ্ট গায়ক ও গায়িকা সুমধুর গীত দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন।

দ্বিতীয় দিবস শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ৩০ টায় বেনেটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতি শারীরিক শক্তি ও কৌশল প্রদর্শন করেন। শনিবার হাওড়া সমাজ কর্ত্তৃক "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এবং রবিবার ভবানীপুর সমাজ কর্ত্তৃক "চণ্ডিদাস" অভিনয় হয়।

আগামী রবিবার ২৯শে মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে দরিদ্র নারায়ণের সেবা হ'বে।

এই উৎসবে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, শ্রীদ্বিজেন্দ্র-চন্দ্র ঘোষ, শ্রীপ্রকাশ মল্লিক, রায় বাহাদুর পি, সি, বসু, মিঃ পি, এন, ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে বহু বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে কবিরাজ সত্যব্রত সেন ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ আসন্ন অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহারা কংগ্রেস-আদর্শের প্রতি যে অসামান্য অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা যে সগৌরবে সমর্থিত ও নির্ব্বাচিত হইবেন তাহা সুনিশ্চিত। আমরা তাঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

নূতন সাপ্তাহিক—

সুসাহিত্যিক শ্রীহেমন্তকুমার গুপ্তের সম্পাদনায় "সাহানা" ও 21st. "Century" নামে বাঙলা ও ইংরাজী দুইখানা সাপ্তাহিক শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে। হেমন্তবাবু একজন উৎসাহী যুবক। তাঁহার সম্পাদনায় এই সাপ্তাহিক দুইখানি যে অনতিবিলম্বেই সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিবে—একথা বলাই বাহুল্য।

শিশিরকুমার ইন্‌ষ্টিটিউট

আগামী শনিবার ৪ঠা প্রেপ্রিল ৫॥ ঘটিকায় শিশিরকুমার ইন্‌ষ্টিটিউটের ষোড়শ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুরস্কার বিতরণী সভা হইবে। সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথ রায়চৌধুরী

সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং লেডি প্রতিমা মিত্র পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

ইলাসট্রেটেড নিউজ

কলিকাতা, ৭নং মুরলীধর সেন লেন হইতে প্রকাশিত—এই নামে আমরা একখানি সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা পাইয়াছি। ইহার ভিতর খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদ বিষয় লইয়া মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে। সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচ্ছদ গৌরবে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি সত্যই পঠনীয়। কিন্তু Make-up আর সাজসজ্জার দিকে ইহাঁদের ভবিষ্যতে নজর রাখিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন

আগামী ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। মাননীয় স্যার হরিশঙ্কর পাল মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা এই মহাসম্মেলনের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

পুনর্লাভ

বাঙ্গালা দেশের মেয়ে, ধনীর আদরের দুলালী যে বয়সে পূর্ণিমার চন্দ্রের মত, ভাদ্রের নদীর মত, বসন্তের ফুল কাননের মত শোভা পাইবার কথা, রূপ লাবণ্যের গৌরবে স্ফীতা হইবার কথা, সেই বয়সে রেণুকে দেখিলে শুধু পিতা-মাতারই নয়, সকলেরই দুঃখ হয়।

অসুখটা যে কি, তাহা সঠিক নির্ণীত হইল না। একটা বেদনা দেহে তাহার লাগিয়াই আছে। বাত হইতে পারে, অস্ত্রের পীড়া জনিত বেদনাও হইতে পারে, নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সেবার হাইকোর্টের পূজাবকাশে, বোস্ দম্পতি একমাত্র কন্যাকে লইয়া ইউরোপ যাত্রা করিলেন। সমুদ্রের হাওয়ায়, মনোহারিত্বে এবং বৈচিত্র্যে, রেণুর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা গেল বটে, কিন্তু তাহার অবসান হইল না।

অবশেষে সুইজারল্যাণ্ড! যেন বাঙ্গলা দেশের তারকেশ্বর! তারকনাথের অনুগ্রহ হইলে মুমূর্ষু রোগীও যেমন স্বপ্নাবেশে ঔষধ পাইয়া নিরাময় হইয়া যায়, রেণুরও তাহাই হইল। এক বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করিয়াই বলিলেন ডিস্‌মেনোরিয়া!

বিশ্বাস করা কঠিন বটে, কিন্তু রোগ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ প্রয়োগকরা মাত্র রেণুর অর্দ্ধেক অসুখ তখনই সারিয়া গেল। ছোটখাট কোম্পানীর তৈয়ারী ঔষধে উচ্চ শিক্ষিত বোস্ সাহেবের আদৌ আস্থা ছিল না কিন্তু বিশাল ল্যাবরেটারীতে আবিষ্কৃত রুচির "সেরিডন্" অসাধ্য সাধন করিয়া তাঁহাকে বিস্মিত করিয়া দিল।

রেণু আজকাল সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছে, আজ সে ষোড়শী তরুণী। রূপের আভায়, শোভায়, দিব্য বিভায় আজ বোস্ দম্পতীর গৃহ সমুজ্জ্বল।

(শ্রীবিজয় রত্ন মজুমদার)

(বিলাসী)

ডাকু-কা-শিকার

ন্যাশনাল থিয়েটার্সের প্রথম উর্দ্দু ছবি এখানা 'ভারতলক্ষ্মী টকীজে' দেখানো হ'চ্ছে। ডাকুর টিকিট-প্রাপ্ত এক ব্যক্তির ওপর অত্যাচার কোরে সেখানা হরণ করবার জন্যে একদল বদমায়েস তার স্ত্রী-কন্যার ওপর অত্যাচার প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনা এবং পরে একটি সহৃদয় যুবকের প্রচেষ্টায় তাঁদের রক্ষা—একেই কেন্দ্রীভূত কোরে এর গল্প গড়ে উঠেছে। গল্পটি সম্পূর্ণ চিত্রোপযোগী এবং ঘটনাবলী সত্যই শরীরে রোমাঞ্চ আনে। বুলচন্দানির পরিচালনার ভেতর সব জায়গায় না হ'লেও কয়েক জায়গায় বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভূতির আলোকচিত্র ও গফুরের শব্দযন্ত্রের কাজ প্রশংসনীয়। অভিনেতৃবর্গের ভেতর নিম্বলকর, গামা, সারা, বিলায়াতু, এইচ কৈলাশ, রাধা, ধুমি খাঁ ভাল অভিনয় কোরেছে। প্রোঃ ডুরুলে সম্প্রদায়ের নাচ বেশ চিত্তাকর্ষক। ছবিখানার সাজসজ্জা, সেট ও সম্পাদনা ভাল।

প্রমথ বাঁড়ুয্যের প্রথম প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হ'য়েছে দেখে আমরা সত্যই খুশী হ'য়েছি। এঁর উদ্যম এ প্রতিষ্ঠানকে অদূর ভবিষ্যতে গৌরবের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত কোরবে—এরূপ আশার আলো

"ডার্বি-কা-শিকার" আমাদের গত শনিবার দেখিয়েছে।

ওয়ান্ ফেটাল নাইট্

বেঙ্গল টকীজেরও এখানা প্রথম উর্দ্দু ছবি—'প্যারাডাইজে' দেখানো হ'চ্ছে। "ডার্বি-কা-শিকারে"-র মত রোমাঞ্চ-প্রিয়দের মনে এ ছবিখানাও যথেষ্ট রোমাঞ্চ আনবে। মধু বোসের পরিচালনায় ছবিখানা তোলা হ'য়েছে। সেজন্য যে ভাল ছবি হবে এ আশা করাও অন্যায় নয়। ছবিখানা ভালও হ'য়েছে। কিন্তু মধু বোসের মত পরিচালক যে শেষ অবধি আজে বাজে নাচগান দিয়ে বোম্বাই ছবির মত স্থানে স্থানে সুলভ প্যাঁচের অবতারণা কোরবেন—এ তাঁর মত কলারসিক পরিচালকের কাছ থেকে আমরা আশা করিনি। ছবিখানার আলোক-চিত্রে আলোছায়াপাতের সামঞ্জস্য সত্যই মনোহারী। গফুরের শব্দযন্ত্রের কাজ ভাল। অভিনয় কোরেছেন সবচেয়ে ভাল ধীরাজ ভট্টাচার্য্য। এমন ভাল অভিনয় সে কোরতে পারে আমরা কল্পনাতে আনতে পারি নি—আমরা কেন, যেই ছবিখানা দেখবে সেই একথা বলবে। ধীরাজ! সত্যই তোমার অভিনয় সুন্দর, অতি সুন্দর। জেরিনার অভিনয় উচ্চাঙ্গের হ'য়েছে। মোটকথা এই ছবিতে নায়ক সিকেন্দার ছাড়া কারও অভিনয় নিন্দের নয়। ছবিখানার গান ভালো। সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট যথোপযুক্ত। সম্পাদকের কাঁচিও ঠিক ব্যবহার হ'য়েছে।

কালী ফিল্মস্

গাঙ্গুলী মশাইয়ের প্রযোজনায় "কাল-পরিণয়" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। এপ্রিলে ছবিখানা 'উত্তরা'-য় মুক্তি পাবে। ছবিখানা সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত, আর মনে হয় আমাদের সে আশা পূর্ণ হবে।

* * *

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী এখন "ফুল্লরা"র কাজ স্থগিত রেখে "অন্নপূর্ণার মন্দিরে"-র দ্বার উদ্ঘাটনের আনুষঙ্গিক কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

* * *

গত সংখ্যায় আমরা জানিয়েছিলাম যে এদের "বসন্ত পূর্ণিমা" ছোট ভক্তি-মূলক ছবির পরিচালক সুশীল মজুমদার। সত্বাধিকারী প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী এ সংবাদের প্রতিবাদ কোরেছেন। আমরা জানতে পারি কি এ ছবির পরিচালক কে?

চন্দ্র ফিল্মস্

এদের "পরপারে"র কাজ দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে। অর্দ্ধেকের ওপর কাজ শেষ হ'য়েছে। যতীন দাস যেরূপ সতর্ক হ'য়ে কাজ কোরছেন আর যে রকম পরিশ্রম কোরছেন তাতে মনে হয় আলোক চিত্রশিল্পীর কাজে যে খ্যাতি তিনি অর্জ্জন কোরেছেন পরিচালকরূপেও একখানা ছবিতেই সেই গৌরবে তিনি ভূষিত হবেন। ভায়া প্রবোধও ক্যামেরার কাজে দাদার মত নাম পাবার জন্যে বেশ একটু উতলা হ'য়ে উঠেছে। আর শান্তিপ্রিয় শান্তিময় শাস্তছেলের মত সব কাজেরই কাজী হ'য়ে রয়েছে। আমাদের যতদূর বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ-শিল্পী-সমন্বয়ে এই "পরপারে" ১৯৩৬ সালের একখানা শ্রেষ্ঠ ছবি বলে পরিগণিত হ'লেও হ'তে পারে।

প্রাইমা ফিল্মস্

'স্ক্রীন কর্পোরেশন'ও 'রূপবাণীর' তত্ত্বাবধানে 'প্রাইমা ফিল্মস্' নামে একটি চিত্র-পরিবেশনার প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে—এ খবর আগেই সকলকে জানানো হ'য়েছে। 'রূপবাণী' বিল্ডিংসে এই নব-গঠিত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় তৈরী হবে ঠিক হ'য়েছে। নিউ থিয়েটার্সের "বিজয়া" থেকে কয়েকখানা ছবি পরিবেশনা ও প্রদর্শনের জন্য এরা দীর্ঘকালের চুক্তিবদ্ধ হ'য়েছেন। এ ছাড়া দেবদত্তের "রজনী" পরিবেশনার ভার এঁরা পেয়েছেন। এঁদের ছবিগুলো 'চিত্রা' কিংবা 'রূপবাণী'তে প্রথম মুক্তি পাবে।

কোয়ালিটী পিকচার্স

কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন যে, "ব্যথার দান"-এর শেষ দৃশ্যে অভিনয় কোরতে কোরতে শ্রীমতী ইলা দাস হঠাৎ উঁচু জায়গা থেকে পড়ে মূর্চ্ছিতা হয়। দু' ঘণ্টা পরে সে অভিনয় করবার জন্যে প্রস্তুত হয় এবং এই দৃশ্যটি নায়িকার অবসাদের ভাব থাকায় ইলা ভাল অভিনয় কোরেছে।

শ্রী

এখানে "পথের শেষে"-র তৃতীয় হপ্তা পড়্‌ল। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর মনে এই মর্ম্মন্তুদ কাহিনীটি যে যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি কোরবে এ কথা আমরা আগেই বুঝেছিলাম।
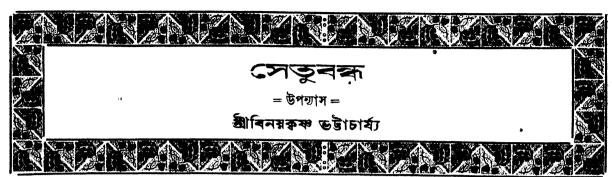
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বুধবার সকাল থেকেই বাড়ীটি যেন স্বপ্নপুরীর ন্যায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয় কাজ করতে করতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। সংসারের কাজকর্ম্মে মৃণালের মন বসছেনা। চাকরদের মুখে রা নেই। মহেশ্বরীর উপস্থিতিটা তাদের যে কতখানি আরাধনার বস্তু, কতখানি মঙ্গলময়, আজ তা তারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারায় তাদের দুঃখের অবধি রইলোনা। দিলীপও বাড়ীর লোকজনদের হাবভাব লক্ষ্য করে চুপ করে আছে। মহেশ্বরীরও দুঃখ কম নয়। সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে মন সরচে না। তবুও তাঁকে যেতেই হবে।

সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আজ কারুর সেদিকে হুস নেই। মহেশ্বরী যাবার আগে ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন। বাইরে মোটর অপেক্ষা করছে।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে মহেশ্বরী দোতালায় নেমে এলেন। মৃণালকে বল্লেন: যাবার সময় মৃত্যুঞ্জয় কোথায় গেল, বৌমা? তাকেতো দেখতে পাচ্ছিনা।

মৃণাল বল্লে: উনি বাইরে নেমে গেছেন। ডেকে পাঠাবো?

—হাঁ, আমার আর সময় নেই।

—যাতো দিলু, তোর বাবাকে একবার ডেকে নিয়ে আয়তো—বলে মৃণাল আপন মনে কাপড়ের খোঁট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

মৃত্যুঞ্জয় আসতেই মহেশ্বরী বল্লেন: তা হলে আসি, মৃত্যুঞ্জয়। আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। দেরী করলে আজ রাতের গাড়ী হয়তো পাওয়া যাবেনা।

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ থেকে কোন কথা বেরুলোনা। সে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মৃত্যুঞ্জয়ের চিবুক স্পর্শ করতে গিয়ে মুখের পানে চাইতেই মহেশ্বরী বল্লেন: যাবার সময় চোখের জল ফেলতে নেই, মৃত্যুঞ্জয়। সারা রাস্তায় এতটুকু স্বস্তি পাবোনা। পরে মৃণালকে লক্ষ্য করে বল্লেন: দেখো বৌমা, এদ্দিন ধরে যে— সংসারকে আমি মাথায় করে রেখেছিলুম তার মর্য্যাদা তুমি অক্ষুণ্ণ রেখো। আর এই চাবির থোলোটা নাও, এর মধ্যে সিন্দুকের চাবিটাও রইলো। সংসারের যাবতীয় নালিস-মকদ্দমা, অভাব-অভিযোগ এখন থেকে তোমাকেই শুনতে হবে বৌমা বলে মহেশ্বরী আঁচল থেকে চাবির থোলোটা মৃণালের হাতে তুলে দিলেন।

দূর থেকে আশীর্ব্বাদ কর মা যাতে তোমার উপদেশটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি বলে মৃণাল মহেশ্বরীর পায়ের ধুলো নিলে।

বাপ-মার দেখাদেখি দিলীপ ঠাকুমাকে প্রণাম করতেই মহেশ্বরী তাকে সস্নেহে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লেন: বেঁচে থাকো, দাদু। হাজার বছর তোর পেরমাই হোক।

রায়-গিন্নিকে দেখতে পাচ্ছিনা। তিনি আবার কোথায় গেলেন মৃত্যুঞ্জয়, বলে মহেশ্বরী নীচে নামতে লাগলেন।

তিনি গাড়ীর মধ্যেই আছেন মা, বলে মৃত্যুঞ্জয় মায়ের পিছু পিছু চললো। পুনরায় বল্লে: আমায়তো কিছু আশীর্বাদ করে গেলেনা, মা।

তোর যা কিছু ভালমন্দ ঠাকুরের কাছে নিবেদন করে গেলুম, খোকা।

গাড়ীতে উঠতেই দিলীপ ঠাকুরমার সঙ্গে যাবার জন্তে বায়না ধরলে। মহেশ্বরী বল্লেন: খোকা, আমার সঙ্গে আয়। দিলুকে ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসবি। এটুকু পথও আমার সঙ্গে চলুক।

কোন কথা না বলে মৃত্যুঞ্জয় গাড়ীর মধ্যে গিয়ে উঠলো। গাড়ী ছেড়ে দিলে।

বাড়ীর লোকজনেরা শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মহেশ্বরী আজ মুক্ত, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তিনি নামিয়ে দিয়েছেন। কোন বন্ধনই তাঁর নেই। কিন্তু তবুও তাঁর মন দুর্য্যোগের ঘনান্ধকার রাত্রির মত ভয়াবহ চঞ্চলতায় আবর্ত্তিত। আশঙ্কা তার সহস্র বাহু মেলে ধরেছে।

গাড়ীর মধ্যে দিলীপ কথা বলবার জন্তে পাগল হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যে যে চিন্তার ধারা তাকে প্রকাশ-বেদনায় অস্থির করে তুলেছে তা সে বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ করলে: আমাকে ছেড়ে তুমি বেশীদিন থেকোনা, ঠাকুমা।

—না মাণিক তোমাকে ছেড়ে আমি বেশীদিন থাকবো না, যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো।

—আমাকে তুমি আলাদা করে চিঠি দিও।

—কেনরে ?

—তা না হলে তোমাকে আমি চিঠি দেবোনা।

—তুই চিঠি লিখিতে পারিস, দিলু ?

—বাঃ, পারিনা, বুঝি। কত চিঠি আমি লিখেচি। সেই যে তোমাকে একখানা দেখিয়েছিলুম। তুমি বড্ড ভুলে যাও, ঠাকুমা।

—বুড়ো হয়ে গেচি, সব কথা কি মনে থাকে, মাণিক। এইবার মনে পড়েচে।

—আমার জন্তে কি নিয়ে আসবে।

—কত খেলনা, আরো কত কি জিনিষ।

—বাবার জন্তে কিছু এনোনা, ঠাকুমা। বড্ড দুষ্টু হয়েচে। আমার সঙ্গে একটুও কথা কয়না।

দিলীপের কথা শুনে মৃত্যুঞ্জয় একটু হাসলে।

কোনরূপ প্রতিবাদ করে রসভঙ্গ করতে ইচ্ছে হলোনা।

—সেদিনকার গল্পটা তো তুমি শেষ করে গেলেনা, ঠাকুমা, দেখো, তোমার মাথা ধরবে।

মহেশ্বরী একটু হেসে বল্লে: অসুখ করলে যে মরে যাবোরে।

দূর, তা কেন। অসুখ করলে বুঝি আবার মরে। ওষুধ খেলেই ভালো হয়ে যাবে।

—যেখানে যাচ্চি সেখানে যদি ওষুধ না পাওয়া যায়।

—চিঠি দিয়ো, বাবার কাছে পয়সা নিয়ে ওষুধ কিনে পাঠিয়ে দেবো।

প্লাটফরমে পৌঁছিয়ে মৃত্যুঞ্জয় পাঞ্জাব মেলের সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ গাড়ীখানি খুঁজে বার করলে। মিস্ত্রি গিন্নীকে উঠতে বললে। দিলীপ গাড়ীর মধ্যে গিয়ে বসলো।

গাড়ী ছাড়তে আর মিনিট খানেক দেরী এমন সময় মৃত্যুঞ্জয় দিলীপকে নামিয়ে নিয়ে কোলে করে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো।

মহেশ্বরী জানলার কাছে সরে এলেন। আঁচল থেকে দুটো টাকা বার করে বল্লেন: এইটে তোর কাছে রেখেদে, দিলু। মদনকে বলিস দোকান থেকে একটা মোটর গাড়ী কিনে দেবে।

দিলীপ হাতের চেটোয় টাকা দু'টোকে চেপে ধরলে। গার্ডের হুইসিল পড়তেই গাড়ী ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করেছে।

দিলীপ চীৎকার স্বরে বল্লে: খুব শিগ্‌গির এসো ঠাকুমা। না এলে তোমার কাছে চলে যাবো।

মহেশ্বরী জানলায় মুখ বার করেই ছিলেন। বল্লেন: আসবো, দাদু।

বাবা, ঠাকুমা বুঝি আর আসবেনা? বলনা, কথা কইচোনা যে?

মৃত্যুঞ্জয় অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিলে: আসবে। তোকে ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারবেনা, দেখিস।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্ব্বাসা

যুগ্ম প্রতিযোগিতা (Pairs Contest):—কলিকাতায় এবার যুগ্ম প্রতিযোগিতা (Pairs Contest) আরম্ভ হয়েছে। ব্রীজের উন্নতিকল্পে 'ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনে'র সম্পাদক যতীশবাবুর এবং উক্ত এসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত গোলক মল্লিক মহাশয়ের সমবেত চেষ্টায় এই খেলা কলিকাতায় প্রথম আরম্ভ হল। সাধারণের মধ্যে এ খেলার প্রচলনের জন্য যতীশবাবু ও গোলকবাবু কলিকাতার ১৬ জন শ্রেষ্ঠ ব্রীজ ক্রীড়ককে তাঁদের খেঁড়ী সমেত এ খেলায় যোগদান করবার জন্য অনুরোধ করেছেন; এবং এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত সকল ক্লাবকেই খেলা দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন। এঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, কলিকাতায় বহুল প্রচলিত সিঙ্গল্‌স টুর্ণামেণ্টের পরিবর্ত্তে এই যুগ্ম প্রতিযোগিতা ব্রীজ সাধারণে প্রবেশ লাভ করুক। সিঙ্গল্‌স খেলায় খেলার কায়দা এবং কৌশলের অপেক্ষা সাধারণতঃ ভাগ্যই অধিক কার্য্যকরী হয়ে থাকে। কিন্তু এ খেলায় ক্রীড়া কৌশল এবং সুনিয়ন্ত্রিত ডাকেরই প্রাধান্য। সিঙ্গল্‌স খেলায় ভাল হাত তুলতে পারলেই জয়লাভের আশা পনের আনা, কিন্তু এ প্রতিযোগিতায় ভাল ডাক দিতে এবং তৎসহ ভাল খেলতে না পারলে জয়লাভের কোন আশাই নাই। কারণ সকল প্রতিযোগীই একই প্রকার তাস নিয়ে খেলবেন। কাজে কাজেই শ্রেষ্ঠতম বা যোগ্যতমেরই সাফল্যের ষোল আনা সম্ভাবনা। এ খেলার বিশেষত্ব কি এবং সাধারণ প্রচলিত সিঙ্গল্‌স খেলার সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় তা' পরে জানাচ্ছি।

যতীশবাবু ও গোলকবাবু কলিকাতার যে ১৬ জন বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য আবাহন করেছেন তাঁদের নাম নিম্নে দিলাম।

(১) শ্রীযুক্ত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়।
(২) শ্রীযুক্ত নীতীশ মিত্র।
(৩) শ্রীযুক্ত রতন দত্ত।
(৪) শ্রীযুক্ত বিমান মিত্র।
(৫) শ্রীযুক্ত গণেশ ভট্টাচার্য্য।
(৬) শ্রীযুক্ত টি, সেনগুপ্ত।
(৭) শ্রীযুক্ত পরীক্ষিৎ চক্রবর্ত্তী।
(৮) শ্রীযুক্ত মহীতোষ সরকার।
(৯) শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু।
(১০) শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
(১১) শ্রীযুক্ত ভবেশ সেনগুপ্ত।
(১২) শ্রীযুক্ত নরেন শীল।
(১৩) শ্রীযুক্ত শচীভূষণ রায়।
(১৪) শ্রীযুক্ত গগন বিশ্বাস।
(১৫) শ্রীযুক্ত নীলমণি সরকার।
(১৬) শ্রীযুক্ত কে, এন্, চট্টোপাধ্যায়।

১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ই মার্চ্চ তারিখে এই খেলা হয়ে গেছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪টা ডিল্ করে খেলা হয়েছে। খেলার স্থান ২২নং বৃন্দাবন বোস লেনস্থ 'লুনার এণ্ড ফুলস্ কম্বাইণ্ড' ক্লাবে। এই ষোল জন খেলোয়াড়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—যথা উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব-

পশ্চিম। প্রথমোক্ত আটজন হচ্ছেন উত্তর-দক্ষিণ এবং দ্বিতীয়োক্ত আটজন হচ্ছেন পূর্ব্ব-পশ্চিম। এবার খেলার বিশেষ বিবরণ সমেত কিরূপে যোগ্যতমের নির্ব্বাচন হতে পারে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিব।

৮টী ঘরে ৮জন উত্তর-দক্ষিণ এবং তাঁদের প্রতিপক্ষ ৮জন পূর্ব্ব-পশ্চিম খেলতে বসেছেন। প্রত্যেক ঘরে তাস-বণ্টন ও খেলা হল। প্রথম ঘরে যে তাস খেলা হল তা' হল, প্রথম নং ডিল্, দ্বিতীয় ঘরে দ্বিতীয় নং ডিল্ ইত্যাদি। খেলা শেষ হতেই প্রত্যেকটি তাস অন্য ঘরে চলে গেল। যিনি তাস অন্য ঘরে নিয়ে যাবেন তাঁকে কেবল এই কথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, যে সংখ্যক ঘরে তাস খেলা হল তার ঠিক নীচের সংখ্যার ঘরে যেন সেই তাসটি যায়। নীচে একটি তালিকা দিলাম; এই নিয়মে তাস দিলে বণ্টনকারীর পক্ষে সুবিধা হবে এবং এক তাসও ভ্রমবশতঃ দুই ঘরে যাবে না।

ঘরের নং	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ডিল্ নং	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬
	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫
	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪
	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩
	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১

কিরূপে পয়েণ্ট গণনা করতে হয় সে সম্বন্ধে আগামী বারে বল্‌বার ইচ্ছা রইল; এবং এ খেলার ফলাফলও ভবিষ্যতে জানতে পারবেন।

ব্রীজের জন্ম ও ইতিহাস:—

ব্রীজ, ব্রীজ আর ব্রীজ, আজকাল সর্ব্বত্রই ব্রীজ খেলা হয়ে থাকে কিন্তু খুব কম লোকই বোধ করি ব্রীজের জন্ম এবং ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত আছেন। এখানকার কথা ছেড়েই দিন, প্রথমে ব্রীজ খেলার প্রবর্ত্তন কোথায় হয় এবং 'ব্রীজ' এই নাম জন্মগ্রহণ করল কিরূপে সে সম্বন্ধে ইংলণ্ডেই বহুবার বাক্-বিতণ্ডা হয়ে গেছে। জানা গেছে যে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেষ্টারে একদল গ্রীক্ এই ধরণের এক রকম খেলা খেল্‌তেন এবং তদানীন্তন, এমন কি তৎপূর্ব্বেও কনস্-টান্টিনোপলে এই খেলার প্রচলন ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ব্রীজখেলা প্রকৃতপক্ষে প্রথমে ইংলণ্ডে প্রবেশলাভ করে এবং তার ছয় বৎসর পরে ১৮৮৬ অব্দে "ব্রিটিশ, অর রাশিয়ান্ ব্রীজ" (British or Russian Bridge) শীর্ষক ব্রীজ বিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা ব্রীজ-সাধারণে দুর্ল্লভ, এবং এমন কি এখন এক ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ ব্যতীত অন্য কোথায়ও ইহা পাওয়া যায় কি না জানা নেই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্যারিসে ব্রীজ খেলার চলন ছিল না। এদিকে ইংলণ্ডে বিশ্ববিখ্যাত পোর্টল্যাণ্ড ক্লাবই জনসাধারণে এই খেলার প্রচার করেন। ১৮৯৪ অব্দে লর্ড ব্রুগ্‌হামের (Lord Brougham) দ্বারাই এই খেলা উক্ত ক্লাবে প্রবিষ্ট হয়। এই ত' গেল এর ইতিহাস।

'ব্রীজ' নামের জন্ম সম্বন্ধে একদল বলেন যে রাশিয়াতে "Biritch" নামে এই রকমের এক খেলা প্রচলিত ছিল,—যদিও এ ধরণের কোন বাক্যই রুশদেশীয় ভাষায় পাওয়া যায় না। অতঃপর ইংলণ্ডের ব্রীজ খেলার ভুবন-খ্যাত ক্রীড়াপরিচালক এবং ব্রীজ সাংবাদিক মিঃ ডালটন নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করে 'ব্রীজ' নামের জন্ম সম্বন্ধে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে লণ্ডনের ক্লাবগুলির বহুপূর্ব্বে লিসেষ্টারসায়ার প্রদেশে 'গ্রেট ডাল্‌বি'র সন্নিকটস্থ দুই প্রতিবেশী "রাশিয়ান হুইষ্ট" নামে এই খেলা খেল্‌তেন। প্রতি সন্ধ্যাতেই তাঁদের এই খেলা চল্‌ত, এবং যথাক্রমে একদিন অন্তর পরস্পর পরস্পরের আবাসে গিয়ে খেলে আস্‌তেন। একটি ভগ্নাবশেষ ভীতিপ্রদ সেতু বা 'ব্রীজের' (bridge) দ্বারা তাঁদের উভয়ের বাড়ী সংযুক্ত ছিল এবং উহাই ছিল তাঁদের একমাত্র পথ। সুতরাং প্রতিদিনই খেলার শেষে অতিথি গৃহাধিকারীকে অভিবাদন করে বলতেন, "Good night, it is your bridge, to-morrow." মিঃ ডালটন্ বলেন কালক্রমে এই রূপেই এই খেলার নাম হল ব্রীজ।

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

ক্যারল লমবার্ড আর জর্জ র‍্যাফ্ট "বোলেরো"তে। আবার একসঙ্গে তারা শিগ্‌গীরই নাববে।

অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে ছবি আসাও বন্ধ হয়েচে আগেই। আর এখন থেকে যেসব ছবিতে বৃটিশ জাতীয়তার গন্ধ আছে সেসব ছবি দেখাতে দেবে না—তা, ছবি আমিরিকার হোক কিম্বা জার্ম্মাণির হোক, কি আর কোথাকার হোক।

তাই বন্ধ হয়েছে 'লাইভ্‌স্ অব বেঙ্গল লান্সার'। ইটালির সরকারী দৃষ্টিতে যে সব ছবি পড়েছে তার মধ্যে এই খানাই হচ্ছে প্রথম ছবি। আরো যেগুলো সরকারী কোপদৃষ্টিতে পড়বে বলে মনে হয়, তা হচ্ছে 'ক্যাপ্‌টেন ব্লাড', 'ডেভিড কপারফিল্ড' এবং 'দি টেল অব টু সিটিস'।

আর 'মিউটিনি অন দি বাউন্টি' এছবি খানাতো এখনো ওখানে দেখায়নি খবর পেয়েছি, এটার কি করবে। হ্যাঁ, একটা কথা জানেন তো—ওসব ছবির কোন খানাই বৃটিশের তৈরী নয়।

পাশা খেলা চলবেনা

নিগ্রোদের যত শক্তি ঠিক তত কম বুদ্ধি। শিক্ষাও তাদের সেই পরিমাণ কম তাই তাদের কথায় কথায় রাগ আর কথায় কথায় চলে ছুরী ছোরা। তাই সে দিন ওয়ার্ণার ব্রাদার্স ষ্টুডিওর সেটের পাশে একখানা নোটিশ লটকানো দেখতে পাওয়া গেলো। তাতে লেখা ছিল: পাশা খেলা চ'লবেনা।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়! পরিচালক উইলিয়াম ডাইটাল সেদিন সেটের ভেতর ঢোকবার কতকগুলো হাতীর দাঁতের গুঁটীর নড়ানড়ি শুনতে পেলেন তাই নোটীশের উদ্ভব।

ছ'শ নিগ্রো আসছে তাঁর ছবিতে ভিড় ক'রতে। এখানে এই পাশা খেলা তাদের মাথায় না ঢুকে যায়। গণ্ডগোল হ'তে পারে ওতেকেই। এক পকেট থেকে যদি ওদের ঘুঁটি বেরোয়, অপর পকেট থেকে ছুরী বেরোয় তো ওদের পকেট থেকেই।

নাম বদলানো

তুমি পরিবর্ত্তনশীল! আমি পরিবর্ত্তনশীল! অণু পরমাণু সব পরিবর্ত্তনশীল! পৃথিবীই পরিবর্ত্তনশীল—তাইতো এই পরিবর্ত্তন। তাইকি ওরা বদলায়?—কিম্বা বদলানো ফ্যাশান! এ ওরাই জানে। সে যাক! নামের প্রচার কেমন ক'রে ক'রতে হয় ওরা জানে! সেইজন্যেই মার্লিন বদলেছে। তার ছবির নাম 'ইনভিটেশন টু হ্যাপিনেস' বদলে রাখা হ'য়েছে 'আই লভ্‌ড্ এ সোলজার'।

এই বদলের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে বক্স-আফিস। লভ হচ্ছে প্রেম, আর সোলজার হচ্ছে সৈনিক—ছুটো নামই বক্স-আফিসের টাকা বাড়াবার

বন্ধ হোল

ছবি দেখানো বন্ধ হোলো—ওরা আর দেখাতে দেবেনা। ওদের আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে এটা খুব চমৎকার ব্যাপার, তা বলতেই হবে। এতদিন কেন যে ওই-সব ছবি দেখানো বন্ধ করেনি সেইটাই আশ্চর্য্য! ইটালি যে বন্ধ করবে আমরা জানি, বন্ধ না করাটাও অন্যায় তাও জানি। বৃটিশের

কাল পরিণয়

নির্ব্বাকযুগে যে চিত্রখানি আপনাকে করিয়াছিল মুগ্ধ—সেইখানি সবাকে আরো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া আপনাকে করিবে চমৎকৃত। উৎকৃষ্ট পরিচালনায়, চিত্রশিল্পে, অভিনয়ে ও সঙ্গীতে কালী ফিল্মস্-এর "কাল পরিণয়" আপনার প্রাণে আনিবে শিহরণ। সত্যি, এ চিত্রটি হইবে সুন্দরতম। অভিনব ভূমিকা লিপি-তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, জীবন গাঙ্গুলী, অহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, মায়া মুখার্জ্জী, রাণীবালা, মাষ্টার সন্তু, ভুনিয়াবালা প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর প্রযোজনায়

উত্তরায় আসিতেছে

উপযুক্ত নাম। এমনি যে কজন লোক আসে তার চেয়ে ও দুটো কথা থাকলে যে লোক বেশী আসবে তা সত্যি এবং তা মানি। ও দুটো কথায় কাব্যের চেয়ে বোধ হয় মোহই আছে বেশী। আর তাছাড়া এ রকম নাম বদলে সহজে লোকের মনে দাগ দেওয়াতেও লোকের ঔৎসুক্য বাড়ায়।

তাই হয়ত মে ওয়েষ্টের ছবির নাম 'ক্লণ্ডাইক লু' নাম বদলে রাখা হয়েছে 'ক্লণ্ডাইক অ্যানি'। এখানে অপর কোন কারণ পাওয়া যায়না, একমাত্র মে যে অংশে নামছেন সে অংশের নাম লু নয়, অ্যানি।

লোকের নজর রাখবার জন্যেই হয়ত প্যারামাউন্ট ওই ছবি খানার নাম বদলে রাখলে 'ক্লণ্ড লাইক অ্যানি'। প্রচারকার্য্য কেমন করে চালাতে হয় ওরাই তো জানে।

দুজন

খবরটা বড় জবর। ফ্রেড্রিক মার্চ্চ আর ওয়ার্ণার বাক্সটার দুজনে এক ছবিতে নামবে। টোয়েন্টিইথ্ সেঞ্চুরি-ফক্স সত্যিই খুব কৌশলের পরিচয় দিয়েচেন। কারণ এমন দুজন লোকপ্রিয় ও যুবশক্তির আদর্শ পুরুষ এক ছবিতে নামান ওদের বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দেয়।

ছবিখানির নাম হচ্ছে 'উডেন ক্রসেস'। খবর পেয়েছি ওইটেই নাকি এ বছরের সাজসজ্জায় এবং লোক সম্ভারে এ বছরের সব চেয়ে দামী ছবি হবে। গত মহাযুদ্ধের দুজন ফরাসী কর্ম্মচারীর এডভেঞ্চার নিয়ে এই গল্প। হোয়ার্ড হক্স এই ছবি পরিচালনা ক'রবেন।

দুজন অভিনেতাই দিন দিন নাম কিনছেন। তাঁদের এ নামায় আরো খানিকটা নাম বাড়িয়ে দেবে। উপস্থিত ফ্রেড্রিক 'এ্যান্থনি এডভার্স' ছবিতে নামছে আর ওয়ার্ণার ছবি শেষ ক'রছে 'দি প্রিজনার অব সার্ক আইল্যাণ্ড'।

খুচরো খবর

মেরিয়ান মার্স নামছে 'নো মোর ইয়েসটারডে' ছবিতে।

* * *

হলিউড থেকে লণ্ডনে অভিনয় করতে এসেচে টুলিলো কারমিনাটি, এডমাণ্ড লো, এলিস হোয়াইট, মেরী ক্রিসন। এছাড়াও এডমাণ্ড গুয়েন এবং পল ক্যাভানাককেও দেখতে পাওয়া যাবে ব্রিটিশ ছবিতে। শেষের দুজন হচ্ছেন ব্রিটিশ আর ওপরের নামগুলো হচ্ছে আমেরিকান—এ আপনারা জানেনতো?

* * *

ভিভিয়েন লের নাম আপনারা জানেন? বছর খানেক তাঁকে কোনো ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়নি। শেষ ছবি খানা আলেকজান্দার কোর্ডা পরিচালনা ক'রেছিলেন এবং তাতে চুক্তি অনুসারে দিয়েছিলেন ভিভিয়েনকে ৫০,০০০ হাজার পাউণ্ড। এইবার তাঁকে দেখা যাবে নাকি 'হ্যামলেট' ছবিতে রবার্ট ডোনাটের সঙ্গে।

* * *

পল রবসন নামবে 'সং অব ফ্রিডম' ছবিতে।

* * *

রোমিও জুলিয়েট ছবিতে র‍্যামন নোভারো নামতে চায়না কেন?

কারণ হার্ব্বার্ট ব্রেননের পরিচালনার ছবিতে নামা সে পছন্দ করেনা!

নর্ম্মা শিয়ারারের সঙ্গে নামা, তাও নয়। গার্ব্বো, সাইমন সিমন তাদের সঙ্গেও নামতে চায়না।

* যেদিন ফুটল ফুল *

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

বিদ্যাসাগর কলেজের বাস্‌টা বঙ্কিম রায়ের বাড়ীর সাম্‌নে থাম্‌লে নন্দিতা নেমে পড়ল; হাতে একগোছা বই।

বড় আয়নাটার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বেণীতে লাল্ ফিতে বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে ফুল্লরা বল্‌লে:

—কে দিদি বুঝি, আজ দেরীতে এলে যে বড়?

"ক্লাস্ ছিল—" এই কথা ব'লে নন্দিতা আরামচেয়ারটার উপর ঝিমিয়ে প'ড়ল।

—এ দুল্‌টা ত আগে দেখিনি? কে দিল? প্রশান্ত বুঝি?—নন্দিতার মুখে দুষ্টুমির হাসি।

আরক্তিম গণ্ডে ফুল্লরা আস্তেই বলে:

—হাঁ, তা নইলে আর কেই বা দেবে?

ফুল্লরার মুখের উপর নন্দিতা হেসে বলে

—তোমার ভুল, দেবার লোক আছে বই কি!

উৎসুক চোখে ফুল্লরা চায়। বলে:

—কি বল্‌ছ দিদি—?

নন্দিতা কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে:—

—হঠাৎ এত সাজগোজ ক'রে কোন্ দিক্‌টা পাগল ক'রতে চ'লেছ?

—যাও! তুমি ভারি দুষ্টু!—

—হ্যাঁ, কিন্তু প্রশান্তর চেয়ে কম।

নন্দিতা আবার হাসে। বলে:

—সিনেমায় চলেছিস্ বুঝি? কা'র সঙ্গে?

—হ্যাঁ, গ্লোবে। তুমি ত যাবে না, জানি—

নন্দিতা প্রশ্ন করে:

—প্রশান্ত বাদ্ যায় নি ত! তা নইলে সবই মাটী!—

নন্দিতার কথা শেষ হয় না। পেছন'থেকে একটা ছোট্ট কীল পড়ে।

—দিনরাত তোমার একঘেয়ে ঠাট্টা!

ফুল্লরা গম্ভীর হোয়ে শুধায়,—প্রশান্ত কি আমার ইয়ে—?

নন্দিতা হো হো কোরে হেসে ওঠে, আর বলে:

—এবার মনের কথাই বেরিয়েছে! এ সুখবরটা তাকে দিতেই হবে। একটা পুরস্কারের লোভ রাখি।—

কথাটা চাপা দেবার বিপুল চেষ্টায় ফুল্লরা চেঁচিয়ে ওঠে—আসুক্ অনুপম দা, তোমার দুষ্টুমির শাস্তি হবে।—

অতি সহজ কণ্ঠেই নন্দিতার জবাব আসে।

—শাস্তির লোভটুকু আমার যথেষ্টই আছে। সেই জন্যেই বসে আছি।

ফুল্লরা অবাক্। বলে:

—তাই বুঝি সিনেমায় যাবার ইচ্ছে নেই?

—সে কি বলে দিতে হবে?

রাস্তায় গাড়ীর হর্ণের শব্দে ফুল্লরার চমক্ ভাঙ্গিল। ক্ষণিকের জন্য একবার আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া দুল্‌টা বেণীটা সাড়ীখানা গুছিয়ে নিল।

—চল্লুম্।

ব্যস্ত হোয়ে ফুল্লরা বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা।

পড়ার ঘরে নন্দিতা। প্রতিদিন কত আলো ও ছায়ার স্নিগ্ধ মিলন ঘ'টে এসেছে। দখিন্ হাওয়া সামনের জান্‌লার ফাঁক দিয়ে এসে নন্দিতার একরাশ কুঞ্চিতচুলে দোলা দিয়ে গেল। সাম্‌নের বাড়ীর নববধূটী নিশ্চয় এবার চোখে পড়বে। কিছুদিন হোল পরিচয় হোয়েছে! ছোট্ট সংসার। স্বামী ও স্ত্রী। প্রতি সন্ধ্যায় সে ছাতটা একবার কোরে বেড়িয়ে যায়। এবার বোধ হয় তার স্বামীর আস্‌বার সময় হোয়েছে। বধূহৃদয়ের শিশির-ভেজা উৎফুল্ল চিত্তটি নন্দিতার কুমারী জীবনের কাছে একটা হেঁয়ালীর আবরণে ঢাকা থাকে।

নন্দিতা সোজা হয়ে বসে। হাতের কাছে অসমাপ্ত বৈষ্ণব কবিতাবলী। মনটা যখন গুমোট হোয়ে থাকে নন্দিতা তখন এই বইটা নিয়ে বসে। কি জানি নন্দিতার কাছে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতি অধিক প্রিয় হোয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ নন্দিতার চমক ভেঙ্গে ঘরে ঢুকল অনুপম।

—কি পড়া হোচ্ছে?

—চণ্ডিদাস।

—ও, তোমার প্রিয়সাথী! অনুপম হাসে।

নরম হোয়ে নন্দিতা শুধায়—

—আজ এত দেরী কোরে?—কলেজে কাজ ছিল বুঝি?
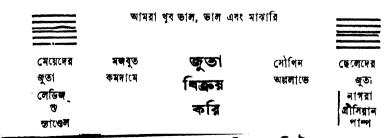
—হ্যাঁ, আর পারি না। কাজের চাপে ম'রে আছি। ইচ্ছে করে সব দূর কোরে কোথাও বেরিয়ে পড়ি।

—হঠাৎ এত বৈরাগ্য! এ গুণ ত তোমার ছিল না।

—এ আমার নয়—পরিনির্ব্বাণ মঠের।

নন্দিতা হেসে বলে:

—ও দলে আবার কবে থেকে ভিড়লে।

—কিছুদিন আগে থেকে। মন্দ লাগছে না।

তা জানি। নন্দিতা থামল।

—শোন, ইচ্ছে ছিল Plaza‌য় নূতন ফিল্মটা দেখে আসি। কিন্তু—এ অনুযোগের সুর নন্দিতার জানা। তবু ভাণ কোরে আস্তে শুধায়—

—কেন দেখে এলে না!

মাথা নেড়ে অনুপম জবাব দেয়:

—না গিয়ে ভালই করেছি। একলা অন্ধকার ঘরে চুপ কোরে বসে থাকা—সেই জন্যেই এখানে চলে এলুম।

নন্দিতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি ভাবছে।

এদিক্ ওদিক্ চেয়ে অনুপম বলে:

—আজ বাড়ী শুদ্ধ গেল কোথায়?

—Cinema‌য়।

অনুপম না ভেবেই বলে:

—তুমি গেলেও পারতে? বড্ড কুঁড়ে হোচ্ছ? চল একটু market-এ ঘুরে আসি।

প্রস্তাবটা নন্দিতার কাছে মন্দ লাগল না।

—রাত হোয়ে যাবে না?—কোমলস্বরে নন্দিতা বলে।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই অনুপম নিজেই লজ্জিত হয়। শুষ্কমুখে সামনের বইটা তুলে নিয়ে দু-তিনটা পাতায় চোখ বুলিয়ে আবার সেখানা রেখে দিল। বলে:

—হাওয়াটা হঠাৎ বন্ধ হোয়ে গেল।

নন্দিতার উত্তরের অপেক্ষা না কোরেই অনুপম বলে—

—পড়াটা থাক্ আজকে। চল ছাদে একটু গল্প করিগে।

—সেই ভাল।

ছাদে এসে অনুপম বিভোর হোয়ে যায়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—

—আঃ কি চাঁদিনী রাত!

—সত্যি, কি সুন্দর!

ছাদের ধারে ধারে হরেকরকমের গাছ টবে সাজান। আলো ও আঁধার যেখানে কোলাকুলি কোরে আছে তারই অন্তরালে দুজনে গিয়ে ব'সল।

অনুপম বলে:

—ছাতটা মস্ত বড়। ফুলের হাওয়া বেশ লাগছে।

ঠাট্টা কোরে নন্দিতা বলে:

—এবার নিশ্চয়ই কবিতার আবৃত্তি শুনতে হবে!

—এত বড় গুণী আমি নই।

অনুপম আকাশের দিকে তাকাল।

—কি এত ভাবছ? আস্তে নন্দিতা শুধায়।

—অনেক কিছু।

—খুলেই বল না।

উদাসকণ্ঠে অনুপম বলে:

—দুঃখ হোচ্ছে, একটা বড় ভুল কোরেছি।

—কিসের ভুল?

অনুপম বলে চলেছে—

—গান জানলে ইচ্ছে হোচ্ছিল প্রাণ খুলে গাই।

—আমরা কিছু মনে না ক'রলেও পাশের্বর বাড়ীর লোক পুলিসে খবর পাঠাবে।

বেশ জোরের সহিত অনুপম জবাব দেয়:—আমি ভয় করি না। এ আনন্দ ত ওরা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

কিছুক্ষণ যায়।

নন্দিতা—

আনত কাল চোখদুটী তুলে নন্দিতা বলে—কিছু বলছ?

চোখে চোখে দৃষ্টি প'ড়তেই অনুপমের অন্তরটা নাড়া দিয়ে উঠে।

—হ্যাঁ। অনুপম থমকে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—আমি কি বোকা!

—কেন?

—সামনে এত বড় গায়িকা, লক্ষীটী একটু গাওনা?

নীচে ফুল্লরার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। নন্দিতা চঞ্চল হোয়ে বললে—ওরা এসেছে। আমি এখনি আসছি—যেন পালিও না।

রাত্রি এগারটা। নন্দিতার খোঁজে ফুল্লরা পড়ার ঘরে ঢুকে বল্‌লে,—দিদি, আজ দু'জনে একসঙ্গেই শো'ব।

—কেন? অনেক কথা বুঝি জ'মে আছে?

তা, মিথ্যা নয়।

—ভাই, পরীক্ষাটা সাম্‌নে। সারা সন্ধ্যা ফাঁকি দিয়েছি।

ফুল্লরা বল্‌লে—যে দোষী তাকেই শাস্তি দিও। জ্যোৎস্নারাতে অনুপম'দার প্রেমটা বুঝি খুব উথলে উঠেছিল?

নন্দিতা হেসে জবাব দেয়—হাঁ। অনুপমদা গুণীলোক।—

কোন কথা না শুনে ফুল্লরা নন্দিতার হাত ধ'রে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

চাঁদের একরাশ আলো উন্মুক্ত জান্‌লা দিয়ে বিছানার একপাশটায় ছড়িয়ে প'ড়েছে। তারই এককোণে গুটী হোয়ে দুটি বোন এলিয়ে প'ড়ল। নন্দিতা শুধায়—আসল কথাটা খুলে বল্‌ত? প্রশান্ত এসেছিল?

একটু মলিন হেসে ফুল্লরা জবাব দেয়—আমি জানি না। সিনেমায় গিয়েছিলুম। কি সুন্দর গল্পটী, শুন্‌বে?

ধমক দিয়ে নন্দিতা বলে—চুপ। আবার ভণ্ডামী? আজ তবে এত সাজগোছ মাঠেই মা'রা গেল?

ফুল্লরার জবাব নেই।

নাড়া দিয়ে নন্দিতা বলে—তুই কাঁদছিস্? আসুক প্রশান্ত শাস্তি দোব।

অন্ধকার রাতে বিছানা ভিজিয়ে ফুল্লরা কাঁদে।

নন্দিতার হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিয়ে ফুল্লরা বলে—প'ড়ে প'ড়ে বাড়ীশুদ্ধ পাগল্ করেছিস্? আয়নায় একবার চেহারাখানা দেখেছিস্?

—সময় পাইনি। এ্যা, খুব দেখাচ্ছে, বুঝি?...

—হুঁ। অনুপমদা'কে জিজ্ঞেস্ করিস্।

—অজ্ঞতার ভাণ কোরে নন্দিতা বলে—

—ওর চোখ নেই। প্রশান্ত আসুক, জিজ্ঞাসা কোরব।

—ঠাট্টা রাখ্। খবর রেখেছিস—?

নন্দিতা কোন উৎসাহই দেখায় না। বইয়ের দিকে ঝুঁকে আছে। ফুল্লরা আবার বলে—

—মা বলছিলেন পরীক্ষার পরই তোমার একটা হেস্তনেস্ত হবে।

আর অনুপম দা'কে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

—মন্দই বা কি?

—এ তোমার নিশ্চয়ই মনের কথা নয়। আচ্ছা, অনুপমদা' যদি ইন্দ্রানীকে বিয়ে করে তুমি নিশ্চয়ই হিংসেয় ম'রে যাবে?

মাথা নেড়ে নন্দিতা বলে

—কিছু না। তবে তোমার অনুপমদা' অতখানি সাহস নিয়ে জন্মায় নি!

—অর্থাৎ, তোমা ভিন্ন গতি নেই!

নন্দিতা বেশ জোর দিয়ে বলে

—সে কথা ওকেই জিজ্ঞেস কোরো।

ফুল্লরা একটু অবাক হোয়ে থাকে।

—তুমি আমায় ডেকেছিলে?—

একরাশ কাগজের ভিতর থেকে বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ, একটা কথা আছে?......

—কার কথা?

—মেয়েদের বিষয়। নন্দিতার বিয়ে দিতে হবে কিছু ভেবেছ কি?

খুব গম্ভীর হোয়ে মনোরমা দেবী স্বামীকে বল্‌লেন। নিতান্ত ছেলেমানুষের মতই বঙ্কিমবাবু জবাব দিলেন—

—তা এত শীগ্‌গির। পাশটা করুক্—

—বড্ড ছেলেমানুষী হচ্ছে। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কি বর এসে হাজির হবে।

নিতান্ত নিরুপায়ভাবেই বঙ্কিমবাবু শুধোলেন—কি ক'রতে বল? কালই তবে ঘটক লাগাই?

—কথা শোন। ছেলে পেয়েছি। তাই বুদ্ধি নিতে এলুম।

অবাক হোয়ে বঙ্কিমবাবু প্রশ্ন করেন

—ছেলেটী কে?

—আমাদের অনুপম।

অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বঙ্কিমবাবু বল্‌লেন—বেশ। কবে দিতে চাও?

—সে ত' পরে ঠিক্ হবে। আগে দেনা-পাওনাটা মিটিয়ে নাও। জানই ত' এমন কিছু তোমার ভাই ত' রেখে যায় নি।

হঠাৎ বঙ্কিমবাবু ব'লে ব'সলেন—নন্দিতার মতটা নিয়েছ? ও যেন মনে না করে আমরা যার তার হাতে গছিয়ে দিচ্ছি। এ অনুযোগের কিন্তু আমাদের দুঃখ রাখবার আর জায়গা থাকবে না।

আখাস দিয়ে মনোরমা দেবী বলেন—সে ভাবনা আমার। মেয়েদের মতের উপর নির্ভর কোরে থাকলেই দেশশুদ্ধ মেয়েদের বিয়ে হোয়েছে!

বঙ্কিমবাবু ঘাড় নাড়লেন।

—কিন্তু শেষকালে কেলেঙ্কারী না হয়।

—না—গো—না। নন্দিতার কিছু অমত নেই।

—আচ্ছা, তবে কালই অনুপমদের বাড়ী যাব।

নন্দিতা-অনুপমের এই ব্যাপারটা আর চাপা প'ড়ে রইল না। হাওয়ার ন্যায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন কলেজের ফেরৎ রাস্তায় অনুপমকে ধরল বন্ধুর দল। হাসিমুখে দেবেন এগিয়ে এসে বলে

—Congratulations, ভাই। কাজের মতন কাজ কোরেছ।

অবনী বলে,—বউদি শুনছি marvellous!

অনুপমের মুখটা লজ্জায় লাল হোয়ে যাচ্ছিল।—সব মিথ্যে কথা! কে রটিয়েছে?··· এত শীগ্‌গির বিয়ে?

দেবেন চেঁচিয়ে বলে—

—মিছে কথা! কলেজ শুদ্ধ কেনা জানে?

পাশ থেকে মন্মথ বলে—চল, দলবেঁধে সব যাই বঙ্কিম রায়ের বাড়ীতে। বউদির হাতের রান্না মন্দ লাগবে না।

খাওয়ার কথা শুনে অবনী বেজায় খুসী।

হেসে বলে—অনুপম, be sports!··· একদিনমাত্র, বউদি নিশ্চয়ই খুসী হবেন।

অনুপম পড়ল মুস্কিলে। নন্দিতার সঙ্গে একটা engagement আছে; হাতে সময়ও ছিল না। হঠাৎ পথে এই বিপদ!

বিজন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। নন্দিতার পাড়ায় ওর বাড়ী। আস্তে বলে—

—আর এক সুন্দরী শ্যালিকা আছেন। অনুপম চেপে যাচ্ছে।

দেবেন চেঁচিয়ে বলে উঠল—তাই নাকি? আজ তোমায় ছাড়ছি না। চল কোথায় তুমি নিয়ে যাবে।

অবনী মুখ টিপে হাসে।

বন্ধুদের হাত থেকে কোন মতে নিস্তার পেয়ে অনুপমের যেতে বেশ দেরী হোয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাপড় জামা বদলিয়ে রাস্তায় পা দিয়েছে, পেছনে ডাক প'ড়ল

—কে অনুপম নাকি?

অনুপম থমকে দাঁড়াল। অনিচ্ছায় বিরস মুখে অনুপম ঘরে ফিরে এল। হর্ষবাবু বল্লেন

—বস। একটা কথা আছে।

গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নাবিয়ে বেশ সহজ কণ্ঠেই বল্লেন

—বিলাত যাওয়াই তবে স্থির করলে? কিন্তু তার আগে আমার ইচ্ছে—

হর্ষবাবু থামলেন।

উদগ্রীব মুখে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনুপম চঞ্চলতাটা কোনক্রমে দমন কোরে নিলে। পাশে মা বসে।

হর্ষবাবু বল্লেন

—আমি স্থির ক'রেছি তোমার বিয়ে দিয়ে তবে পাঠাব। সেই জন্যই পাত্রী দেখছিলুম।

অনুপমের বুকটা দুর দুর কোরে উঠে। তবু সে চুপ কোরেই থাকে। একটু জিরিয়ে হর্ষবাবু আবার বলেন

—সেদিন আমরা শিবনাথ দাশের মেয়ে দেখে এলুম। খাসা মেয়ে। তারপর ব'নেদী ঘর। নগদ গহনায় একেবারে মেয়েকে ভরিয়ে দেবে। শুনেছ গিন্নি?—

একটু থেমে বলেন—

—অনুপমের বিলাত যাবার খরচ পর্য্যন্ত দিতে রাজী।

নিভাননী দেবী সায় দিলেন।

—বীণার কথা ব'লছত? অনুপমের সঙ্গে বেশ মানাবে।

হর্ষবাবু ঘাড় নাড়লেন। গম্ভীর হোয়ে বল্লেন—সবই ত' শুনলে অনুপম? তোমার মত কি?···দেখ, একবার বন্ধুদের নিয়ে মেয়েকে দেখে এস।

অনুপম স্থাণুর মত চুপ ক'রে বসে রইল। দেহের শিরা উপশিরাগুলো যেন ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গেছে। কথা ব'লতে গিয়ে ঠোঁটটা একটু কেঁপে গেল। নিষ্প্রাণকণ্ঠে বলে—বাবা, বিয়েতে আমার এখন মত নেই।

বাধা দিয়ে হর্ষবাবু বলেন—আচ্ছা, হবে'খন—অনেক সময়।

বাইরের খোলা বাতাসে এসে অনুপম হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেল। সারা অন্তরটা কেঁদে ওঠে,—নন্দিতা! নন্দিতা!!

গভীর অন্ধকারে কলকাতা তখন ডুবে গেছে!

বৈচিত্র্যহীন, ছন্দহীন আবার সেই নন্দিতার একটানা জীবন। সকাল দশটা ও বিকাল পাঁচটা, কলেজে যাওয়া আসা; সে হাঁফিয়ে উঠে। কলেজশুদ্ধ নন্দিতার ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হোয়ে উঠেছে। তাকেই কেন্দ্র কোরে মেয়েদের ফিসফিস্ আলোচনা ও পরিহাস নন্দিতার অজানা নেই। অতি নিঃশব্দেই সে কলেজে যায় ও আসে। বাহির-জগতের সুখ দুঃখের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তার ছিল কিনা সন্দেহ।

তোর কি হোল বলত? একদিন অণিমা এসে শুধায়।

কিছু না।

আমায় লুকোস্ নি? কিছু কিছু খোঁজ রাখি।

হঠাৎ নন্দিতা গম্ভীর হোয়ে ওঠে। অণিমা আরও বলে

—তা ভাই দোষটা সব হর্ষবাবুর, ছোড়দা'ও সেই কথা বল্‌ছিলেন।

কোনও মতে কথাটাকে চাপা দিয়ে নন্দিতা পালিয়ে বাঁচে।

মাঝে অনুপম একদিন এসেছিল। ইচ্ছে ক'রেই নন্দিতা দেখা দেয় নি। কিন্তু ফেরবার পথে অনুপমের ছলছল চোখদুটী লুকিয়ে দেখে নিয়েছিল। প্রথমে, অভিমানে রুদ্ধ হোয়ে কিসের একটা অজ্ঞাত আনন্দে সে মগ্নছিল। আজ দেখল ভণ্ডামির মুখোস প'রে সইবার শক্তিটুকু তার উবে গেছে। মনের গভীর দুর্ব্বলতা তার শ্বাস রোধ ক'রে আন্‌ছিল। আবার সে বৈষ্ণব-কবিতা নিয়ে বসে।

—দিনরাত পড়া, চোখের মাথা খাচ্ছ। ফুল্লরা রাগ করে বলে।

ফুল্লরা এলে নন্দিতা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বইখানা মুড়ে সে উত্তর দেয়—

—এবার আর পাশ ক'রতে হ'চ্ছে না।

—তা হ'লে বাঁচি। মা দিচ্ছে আমায় দিনরাত বকুনী—শুনিয়ে শুনিয়ে বলে' নন্দিতা দিনরাত পড়ছে, আর আমি নাকি সারা সহর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি।

নন্দিতা হেসে বলে—কাকি'মা মিথ্যা বলে নি।

বাধা দিয়ে ফুল্লরা বলে—থাক্, আমি সাক্ষী রাখিনি। এদিকে খবর রেখেছ কিছু।

নন্দিতা অবাক্ হোয়ে চায়।

অতি আস্তেই ফুল্লরা বলে—অনুপমদার বড় অসুখ।

নন্দিতার কোমল বুকে কে যেন দশমন হাতুড়ী পিটল। বইয়ের দিক মুখ রেখে শুষ্ক কণ্ঠে বলে—

—কি অসুখ? এখন কেমন আছে, ফুল্লরা?—

—ডাক্তার বল্‌ছে টাইফয়েড্।

—কবে বাড়ল?

—পরশু থেকে। কাল যে প্রশান্তদা খবর দিয়ে গেল।

মুখখানা কাঁচুমাচু কোরে নন্দিতা প্রশ্ন করে—কিছু বলেছেন?

—কা'র কথা ব'লছ?···হ্যাঁ, একবার প্রশান্তদার হাত ধ'রে কেঁদে ব'লেছিলেন 'নন্দিতা যেন ক্ষমা করে'।

ফুল্লরার সব কথা শেষ হোল না। নন্দিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—চল্, আজ আমরা একবার দেখে আসি।

ফুল্লরা অবাক্ হোয়ে চায়।

—দেরী করিস্‌নি। নন্দিতা চেঁচিয়ে ওঠে।

—কি বল্‌ছ দিদি? মা যে বক্‌বেন।

অতি সহজকণ্ঠে নন্দিতা বলে—আচ্ছা, আমি একাই যাচ্ছি।

ফুল্লরা ভয় পেল।

—শোন, পাগ্‌লামী কোরো না। কাল প্রশান্তদার সঙ্গে যাওয়া যাবে।

অবসন্ন দেহে নন্দিতা আবার চেয়ারে ঝিমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে দেখে ফুল্লরা চ'লে গেছে।

নন্দিতা গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদতে বসল।

অনুপমের অসুখ প্রায় সেরে গেছে। শরীরটাকে সুস্থ ক'রতে সে শিলং পাহাড়ের দিকে বেরিয়ে পড়ল। একদিন খুব গম্ভীর-ভাবেই হর্ষবাবু বলে ফেললেন 'ছেলের জন্য মাথাটা কাটা গেল, কে জানত' শেষ পর্য্যন্ত অনুপম এসব বাঁদরামি ক'রবে। কথা দিয়েছিলুম শিবনাথকে—।'

সায় দিয়ে নিভাননী বলেন—সবইত বুঝছি, কিন্তু তার আগে তোমার ছেলে। নন্দিতাকে যদি বিয়ে করতেই চায় আমাদের বাধা দেওয়া উচিৎ নয়।

বিরক্তিতে হর্ষবাবুর মুখটা ভ'রে উঠল। কর্কশকণ্ঠে বল্‌লেন—বিষয়বুদ্ধি কি কিছু আছে? বঙ্কিম রায় ভারি চালাক্—একটা পয়সা খরচ করবার ইচ্ছে নেই।

—আমি শুনেছি নন্দিতার বাবা কিছু' রেখে গেছে।

—টাকা, সব মিথ্যে! থাক্‌লে. ওই জ্যাঠার হাতেই গেছে।

—সে যাই হোক্; নন্দিতা মেয়ে ত ভালই।

হর্ষবাবু ঘাড় নাড়লেন।

—সব দোষই তোমায়। সবই যদি জান্‌তে, আমায় আগে বলনি কেন?

—তখন তুমি নিশ্চয়ই অমত ক'রতে।

—আচ্ছা, তাহ'লে বঙ্কিম রায়ই জিতল' দেখছি। অনুপমকে জানিও।

চিন্তিতমুখে হর্ষবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

—ফুল্লরা কোথায় চ'লেছিস?

—কেন মা, পাশের বাড়ী; বিরাজদি' শ্বশুরবাটী থেকে এসেছেন।

—এখন থাক্। দিনরাত গল্প পছন্দ করি না। পড়াশুনো কি চুলোয় গেছে?

—মা, এখখুনি ফিরে' আসব।

—পরে হবে। হ্যাঁ, নন্দিতাকে সেকথা জিজ্ঞেস ক'রেছিলি?

—হুঁ।

মনোরমা দেবী প্রশ্ন ক'রলেন—কি বলে?

—শুনে চুপ্ কোরে রইল। বড্ড অভিমানী মেয়ে কি না!

—সেত বুঝলুম, কিন্তু খামখেয়ালার সময় আছে। কাল হর্ষবাবু এসেছিলেন, কর্ত্তার সঙ্গে সব ঠিক কোরে গেছেন। এর পরে নন্দিতা কোনো কেলেঙ্কারী ক'রে বস্‌লে আর মুখ ঢাক্‌বার উপায় থাক্‌বে না।

উৎফুল্লমুখে ফুল্লরা জিজ্ঞাসা করে—তাই নাকি? তুমিত আগে বলনি?

তারপরই সে নন্দিতার কাছে ছুটে যায়। —এবার ,দিদি, বিয়ের ফুল ফুটল'। বক্‌শিস্ দাও।

অজ্ঞতার ভাণ কো'রে নন্দিতা বলে—কি, চাস্, Firpo-র dinner. ফোন্ করি।

—Dinner-এর লোভ রাখি না। যা চাই দেবার সাহস নেই।

—অদেয় ত কিছু দেখছি না।

কানের কাছে মুখটা এনে ফুল্লরা বলে—তোমার অনুপমদাকে।

সহজকণ্ঠেই নন্দিতা জবাব দেয়—স্বচ্ছন্দে।

—আবার ভণ্ডামি! ফুল্লরা রেগে উঠে।—আসুক্ অনুপমদা—।

—কি কোরবে? আমি ত বিয়ে করছি না!

ফুল্লরা ঘাব্ড়িয়ে যায়। প্রশ্ন করে—মানে?

—খুব সহজ।

ফুল্লরা বলে—দাম বাড়িয়ে লাভ নেই। মা জান্‌তে চেয়েছেন।

নন্দিতা চুপ্।

যাবার সময় ফুল্লরা শুনিয়ে যায়—এ গর্ব্ব তোমার শীগ্‌গির ভাঙ্গবে। জেনে রেখো আমি ফুল্লরা, তোমার জিদ্ ভাঙ্গব।

প্রশান্ত বাড়ী ফিরছিল। হঠাৎ ফুল্লরার ডাকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। গম্ভীর হোয়ে বলে—কিছু হোল? এদিকে বিপদে প'ড়েছি যে!

সাহস দিয়ে প্রশান্ত বলে—ভয় নেই, অনেকখানি এগিয়ে এসেছি।—তবে

আবার কি বাধল। আমার কাজ তোমায় করতেই হবে।

চিন্তিত মুখে প্রশান্ত বলে—আচ্ছা। তা না হোলে বোধহয় কথা বন্ধ!

ফুল্লরা হেসে বলে—শুধু তাই নয়, ভীষণ ঝগড়া।

প্রশান্ত রাস্তায় পা দিয়েছে।

রাস্তায় যত ধুলো উড়িয়ে মোটরখানা প্রশান্তর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। হাত যোড় ক'রে প্রশান্ত বলে—আসুন্ দিদি, আপনার অপেক্ষাই ক'রছিলুম।

নন্দিতা গাড়ী থেকে নামল।

—ফুল্লরা এসেছে?

—না।

—তবে বোধহয় মায়াদিদির গাড়ীতেই আস্‌ছে। এ খবর ত নিশ্চয় রাখো।

—দুর্ভাগ্য, দিদি।

দুজনেই হাসে।

সাজান-গোছান বৃহৎ হলঘরটীতে ঢুকে নন্দিতা বলে—মাসিমা কোথায়? ও ভুলে গেছি, তিনি ত দেওঘর গেছেন।—দিদি, তুমি একটু বোস আমি আস্‌ছি।

টেবিলের উপরের এ্যাল্‌বামটা নন্দিতা তুলে নিল। পাতা ওল্‌টাতেই একটা ছবি চোখে পড়ল। প্রশান্ত, অনুপম, ফুল্লরা ও নন্দিতা। বহুদিনের সেই পুরাণ Diamond Harbour-এর ছবি। নন্দিতা বুজিয়ে রাখল। হঠাৎ পেছনে ফিরতেই চমকে গেল। বুকটা দুর্ দুর্ কোরে ওঠে। অনেকক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে শুষ্ককণ্ঠে অনুপমই বলে—তুমি এখানে? স্বপ্ন দেখছি না ত'?

নন্দিতার ঠোঁটটা শুধু কেঁপে ওঠে।

—প্রশান্ত ত এমন কিছু বলেনি।—তোমায় বিরক্ত করছি না ত?

—না—। নন্দিতার ঠোঁটে এসে থেমে গেল।

অনেক কষ্টে আস্তে শুধায়—কবে শিলং থেকে ফিরলেন?

—পরশু। এ যাত্রা মরা হোল না। তারপরই প্রশান্তর নেমতন্ন। জোর কোরে আনল।

হেসে নন্দিতা বলে—আমারও সেই দশা। সামনে পরীক্ষা।

—কেমন preparation হোল? একটা খাওয়া দাওয়ার লোভ রাখি।

মাথা নেড়ে নন্দিতা বলে—সে আশায় বালি।

—আচ্ছা দেখা যাবে।

নন্দিতা এদিক ওদিক চাইল; দরজাগুলো সবই বন্ধ। তবে কি প্রশান্তর সব কারসাজি?

—নন্দিতা—। অনুপমের সেই সুর!

নতমুখে নন্দিতা মাটীর দিকে চায়।

অনুপম বলে—সত্যি, দোষী আমি নই।

—আমি ত কোন নালিশ করি নি।

—সে জানি। তবে তোমায় একটা বড় দুঃখই দিয়েছি। নন্দিতার কাছে একটু স'রে আসে।

—কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা! আজ কি আনন্দই হোচ্ছে।

নন্দিতার মুখটা লাল হোয়ে ওঠে।

বেতসলতার মতন দেহটী অনুপম বুকে জড়িয়ে ধরে গভীর চুম্বন ক'রল।

বাইর থেকে প্রশান্ত হেঁকে ডাকে—তোমাদের ঝগড়া সব মিটল? আমরা আস্‌তে পারি?

শাঁখ বাজিয়ে ফুল্লরা হাসি মুখে ঢুকে পড়ল।

সাহিত্য-পরিচয়

বিস্মৃবিপ্লব—কবিতার বই। লেখক—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—আট আনা।

প্রারম্ভেই কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থের মর্ম্ম শুনিয়েছেন—

"প্রেয়সীর আলিঙ্গন হোতে আজ মুক্তি
নাও কবি,
ভুলে যাও প্রেম-নত নয়নের সজল মিনতি।
সুশীতল আরামের ফুলশয্যা তুলে,
দুরন্ত আঘাতে খুলে অবরুদ্ধ দ্বার
দাঁড়াও বাহিরে এসে;
নিরন্নের বিপন্নের মর্ম্মভেদী শোনো
হাহাকার।"

যুগের বেদনা কবির লেখনীতে মর্ম্মে মর্ম্মে ফুটে উঠেছে। নিষ্পেষিত, সর্ব্বহারাদের অন্তরের অশ্রু-পুষ্প দিয়ে সমবেদনার-সুতোয় কবি রচনা করেছেন তাঁর এই মালাখানি। অগনন নরদেবতা আজ তাদের অন্তরের শত অতৃপ্ত কামনা, ক্ষুধার করুণ কাকুতি এবং নিষ্ফল আক্ষেপ-জ্বালা নিয়ে কবির গানে এসে ধরা দিয়েছে। তারা সব লক্ষ্মীছাড়ার দল, নিঃসহায়, রিক্ততার বেদনা তাদের অবশ করে রেখেছে। তারা উপেক্ষিত; লাঞ্ছনার বেদনা গুমরে ওঠে তাদের মনে—এর জন্যে দায়ী তথাকথিত বর্ত্তমান কৃত্রিম সভ্যতা:—

"সভ্যতার নাগপাশে কাঁদে আজি শান্তি,
শুচি, সুখ,
কুটিলতা ফেরে গুপ্ত সুড়ঙ্গের অন্ধকার
দিয়ে;"

ক্ষেত্রবাবু আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নন এবং তাঁর লেখার মধ্যে যে একটা স্বাচ্ছন্দ সাবলীল ভাবগতি আছে তা তাঁর আলোচ্য বইটিতে তাঁর অন্যান্য বইএর মতই প্রকাশ পেয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা ক্ষেত্রবাবুর কাছ হতে এই ধরণের গান শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলুম।

বইখানির Get-up অতি সাধাসিধে কিন্তু সুরুচিসম্পন্ন। শচীনের প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি অতি সুন্দর এবং ভাবব্যঞ্জক।
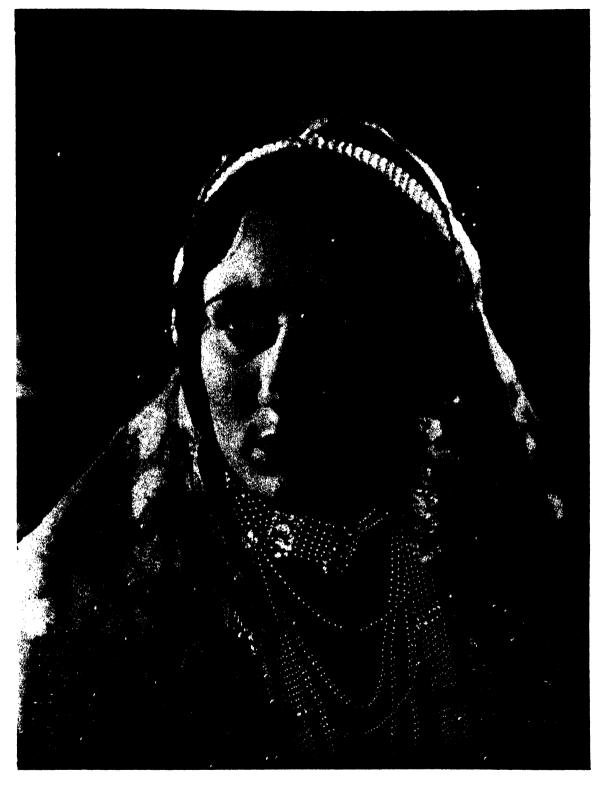
ন্যাশনাল থিয়েটার্সের উর্দ্দু ছবি
"জান্-বাজ-মাল্কা"-র নায়িকা
= শ্রীমতী আনোয়ারি =
অনেক ছবিতে অভিনয় কোরে
ইনি নাম কিনেছেন।

পরিচালক— ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা
প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা
গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২০শে চৈত্র ১৩৪২—2nd. April, 1936. } ১৪শ সংখ্যা

সার্থক মনোনয়ন

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বণিকবৃন্দ ও জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী মডারেটমণ্ডলীর সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের বিগত নির্ব্বাচনে অধিক সংখ্যক কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিপক্ষে যে সম্মিলিত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল তাহাকে ছিন্ন করিয়া কংগ্রেস যে সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিপক্ষদলের বিতর্ক-জালে বিভ্রান্ত না হইয়া কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ কংগ্রেসের প্রতি তাঁহাদের অটুট আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'আনন্দবাজার', 'এ্যাড্ভান্স' ও 'খেয়ালী' ভিন্ন কলিকাতার অন্যান্য সমস্ত সাময়িক পত্রই ক্লাইভ ষ্ট্রীট-সমর্থিত "করদাতৃসঙ্ঘ" নামধেয় সদ্যবিকশিত রহস্যময় প্রতিষ্ঠানের চক্রান্তে জাতীয়তার আদর্শ বিস্মৃত হইয়া কংগ্রেসদ্রোহিতা প্রচার করিয়া আদর্শচ্যুত হইয়াছিলেন। বাগবাজারের সহযোগী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিয়াও নিজ পল্লী ১নং ওয়ার্ডে করদাতৃসঙ্ঘের মনোনীত প্রার্থীদ্বয়কে জয়ী করাইতে পারেন নাই। সহযোগীর কংগ্রেসদ্রোহিতা সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং তাঁহার এই নবতম অপচেষ্টায় কেহই বিস্মিত হন নাই।

বিগত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস নির্ব্বাচনী-সংসদের মনোনীত প্রার্থিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ধরণীকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন, কবিরাজ শিবনাথ সেন, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধু খাঁ, ডাক্তার বি, বি, গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ কোলে ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের জয়লাভ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রীতিভাজন শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের ২২নং ওয়ার্ডে সর্ব্বোচ্চসংখ্যক ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচন তাঁহার জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। শিক্ষা, দীক্ষা ও বংশ-গৌরবে দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র কংগ্রেসপক্ষীয় দলের যে ভূষণ হইয়াছেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মডারেট্ রাজনীতিবৃন্দের আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়াও দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সেই সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর বাহিরে কংগ্রেসের বিশালতম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার এই কর্ম্মময় জীবনের প্রারম্ভে শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হিসাবে আমরা তাঁহার শুভ-কামনা করিতেছি এবং আশা করি, কংগ্রেসের আদর্শ বহন করিয়া তাঁহার কর্ম্মময় জীবন গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে। ২২এ সংখ্যক পল্লীতে হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত গাঁটছড়ায় আবদ্ধ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করিয়া শ্রীযুক্ত ধরণীকুমার কংগ্রেসদ্রোহীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছেন। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল প্রভৃতি

হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মচারীবৃন্দের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর অশেষ প্রতিপত্তিশালী পুরাতন কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শেঠকে পরাজিত করিয়া কবিরাজ শিবনাথ সেন জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। ডেপুটী কমিশনার মিঃ বি, এন ব্যানার্জ্জীর জামাতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পরাজয়ে আমরা বিস্মিত হই নাই। সশস্ত্র গুরখাপাহারায় সন্ত্রস্ত না হইয়াও ১৩নং পল্লীর অধিবাসীবৃন্দ শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধু খাঁকে নির্ব্বাচিত করিয়া কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। মজুমদার-ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কর্ত্তৃক মনোনীত বলিয়া বিজ্ঞাপিত স্বনামধন্য কাউন্সিলার শ্রীজিতেন্দ্রিয় নাথ বসু খালপারে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৮নং পল্লীতে শ্রীভূতনাথ কোলে শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালালের মৌরসী স্বত্বের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের কর্ম্মদক্ষতার গুণেই শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর পরাজয় হইয়াছে এবং শ্রীদেবনারায়ণ দে জয়যুক্ত হইয়াছেন।

উল্লিখিত বিজয়-বিবরণী হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেস-নির্ব্বাচনী সংসদের সভাপতি শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর মনোনয়ন সার্থক হইয়াছে। শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় কংগ্রেস প্রার্থিগণ যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহা আশাতীত।

বিগত নির্ব্বাচনে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় পরিচালিত উপদল প্রকাশ্যে দলগঠন না করিলেও দলপতি স্বয়ং মেঘের অন্তরাল হইতে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মন্ত্রী কিরণশঙ্করও অন্যান্য অনুচরবৃন্দকে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে কংগ্রেস-প্রার্থীদের বিরোধিতা করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তবে সুখের বিষয়, তাঁহাদের এই অপচেষ্টা বিফল হইয়াছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের "Congress Stalwart" এই অপ্রত্যাশিত সার্টিফিকেট ফেরি করিয়াও দারিদ্র্য-ভেকধারী আদর্শচ্যুত কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২নং ওয়ার্ডে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছেন। কংগ্রেসদ্রোহিতা করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আশা করি, তাহাতে ভবিষ্যতে অন্যান্য কংগ্রেসকর্ম্মী সতর্ক হইবেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনটবর চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান্ কাউন্সিলারবৃন্দ কংগ্রেস দলে যোগদান করিয়া কংগ্রেসের শক্তি বর্দ্ধন করিলে তাঁহারা যে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট অধিকতর প্রিয় হইবেন তাহা তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রী জে, সি, গুপ্ত, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী ও শ্রীহেমন্তকুমার বসু কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিয়া ও শ্রীপরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনয় বসু, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার রায় ও শ্রীকুঞ্জদা-রঞ্জন সেনগুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কংগ্রেসের জয়লাভে সহায়তা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিবিধ

শ্রীযুক্ত নিশীথ সেন সম্বর্দ্ধিত

২৭নং ওয়ার্ডের নব-নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেনকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য গত রবিবার অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ১নং ফার্ণ রোডস্থ ভবনে খগেনবাবু এক প্রীতি-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। ২৭নং ওয়ার্ডের কর্ম্মীবৃন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন সেনগুপ্ত ও শ্রীহরনাথ চক্রবর্ত্তী সেন মহাশয়ের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে শ্রীযুক্ত সেন কর্পোরেশনে উপদলীয় সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া কংগ্রেসের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, কাউন্সিলার সুশীল সেন, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ড্রেনেজ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীনলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুলদারঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রভাতকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীসুহর গাঙ্গুলী, শ্রীভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

খগেনবাবুর পুত্রগণ অভ্যাগতদিগকে ভুরিভোজে পরিতুষ্ট করেন।

সুদক্ষ প্রচার-কর্ত্তা

সুহৃদবর শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল মহাশয়কে আমরা চিত্র-শিল্পের একজন সুদক্ষ প্রচারক বলিয়া জানিতাম। প্রচার-কর্ত্তা হিসাবে তিনি একাধিক ফিল্ম-কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন এবং সর্ব্বত্রই সুনিয়ন্ত্রিত প্রচার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমানে ২২নং ওয়ার্ডের কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের

শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল

পক্ষে যে প্রচার-দক্ষতার পরিচয় সান্যাল মহাশয় দিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়।

এই বৎসর কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে সান্যাল মহাশয়ের প্রচার-কার্য্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার এই প্রচার-দক্ষতা আমাদিগকে বিশেষ উল্লসিত করিয়াছে এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ২২নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থী দ্বিজেন্দ্রচন্দ্রের সাফল্যের জন্য সান্যাল মহাশয়ের প্রচার-কার্য্য বহুলাংশে সহায়তা করিয়াছে।

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

গত রবিবার ২৯শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে ৯৭নং ল্যান্সডাউন রোডে দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ধরণীকুমার বসু, শ্রীনিতিন রায়, শ্রীপ্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ মিত্র, শ্রীঅনাথ দত্ত, শ্রীপ্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী ও শ্রীরমেশ গাঙ্গুলী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সেবাশ্রম দক্ষিণ কলিকাতার একটী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। আমরা ইহার উত্তরোত্তর সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব কামনা করি।

আশানন্দ-স্মৃতি-স্তম্ভ

আশানন্দ স্মৃতিস্তম্ভের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় জানাইতেছেন যে,

স্মৃতি-স্তম্ভ
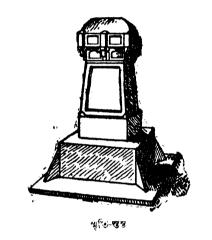
বিখ্যাত বঙ্গবীর ৺আশানন্দ মুখোপাধ্যায় ("ঢেকি") মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি দেশের সম্মুখে উজ্জ্বল করিবার জন্য তাঁহার ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে "আশানন্দ-স্মৃতি-স্তম্ভ" নামে সাধ্যমত মনোরম স্তম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। স্তম্ভটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলেও আর্থিক অনটন বশতঃ ইহার চারিদিকে রেলিং বা প্রাচীর ইত্যাদি এখনো দেওয়া যায় নাই। এই কার্য্য শীঘ্র সমাহিত না হইলে স্তম্ভটির ক্ষতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্য জনসাধারণের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের শ্রদ্ধার দান সাদরে গৃহীত হইবে এবং উক্ত শুভ-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ঠিকানায় সাহায্যাদি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, "আশানন্দ-স্মৃতি-স্তম্ভ সঙ্ঘের" কোষাধ্যক্ষ, আশানন্দ পল্লী, পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, ই, বি, রেলওয়ে।"

পরলোকে

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম মহাশয়ের ভ্রাতা অবসর-

প্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্ জজ শ্রীশচন্দ্র সোম তাঁহার বালিগঞ্জ এ্যাভিনুস্থিত ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। আমরা শোক-সন্তপ্ত সোম পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

রাইচাঁদ বড়াল

নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গীত পরিচালক শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়াল মহাশয় 'হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টসে'র সঙ্গীত পরিচালকের কার্য্য করিয়া থাকেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন। উপরন্তু বর্ত্তমানে তিনি মেগাফোন কোম্পানীতে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে যোগদান করিয়াছেন!

দক্ষিণ কলিকাতার ডেলিগেটদ্বয়

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের ডেলিগেট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেণী বিভাগ—

বাঙ্গলা

'খেয়ালী'র পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, কলিকাতা হাইকোর্টে 'খেয়ালী' মানহানির মামলার আপীল অগ্রাহ্য হইলে 'ন্যাশ্নাল নিউস্পেপার্স লিমিটেডে'র সেক্রেটারী ও 'খেয়ালী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় নয় মাস বিনাশ্রম দণ্ডাদেশ পালন করিবার উদ্দেশ্যে কারাবরণ করিয়াছেন।

হাইকোর্টের আপীলের প্রাথমিক শুনানী সমাপ্ত হইলে এবং কারাবরণ করিবার প্রাক্কালে যোগজীবনবাবুর পক্ষীয় উকিল শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের নিকট শ্রেণী বিভাগ

(শেষ অংশ পর কলমে দেখুন)

করিবার জন্য আবেদন করেন। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট্ রিপোর্টের জন্য ভবানীপুর থানার ইন্সপেক্টারকে তদন্ত করিতে আদেশ করেন। পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ রেজার সন্তোষজনক রিপোর্ট পাইয়াও পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট যোগজীবন বাবুকে কোনরূপ শ্রেণী বিভাগ করিতে অস্বীকার করেন।

ইতিমধ্যে যোগজীবন বাবুকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে দমদম স্পেশাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে যোগজীন বাবু বাঙ্লা সরকারের এ্যাডিশন্যাল চীফ্ সেক্রেটারীর নিকট শ্রেণী বিভাগের জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। বাঙ্লা সরকার আলিপুরের এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উক্ত আবেদন সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। প্রকাশ যে, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট তীব্র বিরোধিতা করিয়া যোগজীবন বাবুর আবেদন-পত্র অগ্রাহ্য করিতে বলেন কিন্তু এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া যোগজীবন বাবুকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া বাঙলা সরকারের নিকট সুপারিশ পত্র প্রেরণ করেন। বাঙ্লা সরকার এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সুপারিশ অনুমোদন করিয়া যোগজীবন বাবুকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিবার আদেশ দেন এবং বাঙলা সরকারের পক্ষ হইতে এই আদেশ দমদম জেলে প্রেরিত হইয়াছে।

সরকারী উকীলের পদ-প্রার্থী

বিদায়ী কংগ্রেসী ডেপুটী মেয়র

আলিপুরের প্রবীন গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় কৈলাশচন্দ্র বসু বাহাদুরের কার্য্যকাল গত ৩১শে মার্চ্চ সমাপ্ত হইয়াছে। রায় বাহাদুরের শূন্যপদে প্রায় চল্লিশজন প্রার্থী ২৪ পরগণা জেলা ও সেসন্ জজ মিঃ এলিসের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। গত বারুনির দিন মিঃ এলিসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সমস্ত প্রার্থী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই চল্লিশজন প্রার্থীর মধ্যে অন্যতম প্রার্থী হইতেছেন বিদায়ী কংগ্রেসী ডেপুটি-মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে সনৎবাবু বিগত নির্ব্বাচনে ১৮নং ওয়ার্ড হইতে পুনরায় কংগ্রেসী কাউন্সিলাররূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রকাশ যে, বাঙ্লার এ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ এ, কে, রায় সনৎবাবুর সরকারী উকিলের পদপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সনৎবাবুর ন্যায় যোগ্যব্যক্তির এই পদ প্রাপ্তি সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে তাহাতে কংগ্রেস পক্ষীয়দলের যে শক্তিক্ষয় হইবে তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

দরিদ্র নারায়ণ সেবা

গত রবিবার নর্দার্ণ পার্কে ভবানীপুর রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দরিদ্র নারায়ণ সেবা হয়। এই মহদানুষ্ঠানে রায় বাহাদুর পি, সি, বসু, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ও সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ দরিদ্র নারায়ণদের নিজেরা পরিতুষ্ট করান। সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ ও উদ্যোক্তা-মণ্ডলীর এই মহদনুষ্ঠানের আমরা প্রশংসা করি।

রূপ-তরঙ্গ

(ঝিলাসী)

ভ্যাডানের যুগে—নিব্বাক "কাল-পরিণয়ের" একটি দৃশ্য। দণ্ডায়মান উড়িয়া চাকরের ভূমিকায় বর্ত্তমানের বিখ্যাত পরিচালক আমাদের জ্যোতিস মুখুজ্জে মশাই। শিশু মনুর ভূমিকায় শ্রীমান্ দীপ্তি সান্যাল—বর্ত্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র; এবং নায়ক মণীন্দ্রের ভূমিকায়—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য। এই চিত্রে সুবিখ্যাতা সীতা দেবী নায়িকার ভূমিকায় নামিয়াছিলেন এবং বাংলা ছাড়িবার পূর্ব্বে উহাই ছিল তাঁহার শেষ ভূমিকা।

ছায়া দেবী

শুনে ভারী সুখী হ'য়েছিলাম—ছায়া দেবী হচ্ছেন ভদ্রঘরের আসল এবং যিনি নাকি সিনেমাতে যোগদান করে' এই শিল্পকে কৃতজ্ঞ ক'রেছেন। ব্যাপারটা, সত্যি বল্‌ছি, প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কারণ, 'ভদ্রঘর' এই কথাটা বিজ্ঞাপনেই ব্যবহার হ'তে দেখেছি বেশী। তা' ছাড়া ঘরের বাইরের মেয়েরাও নিজেদের নামের পেছনে দেবী, রায়, ঘোষ, বোস, মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যে, গুপ্ত, গুপ্তা, টাইটেল্ জুড়ে অচল আধুলির মত ঘসে মেজে বাজারে সচল হবার চেষ্টা কোরছে। শুধু তাই নয়, অন্ধকারে দোতালা বাসের কনডাক্টরকে 'মেকি' চালানোর মত তারাও কত লোকের মনে ধাঁধা লাগাচ্ছেন। রিজেণ্ট পার্ক-এর ষ্টুডিয়োয় তাই একদিন উপস্থিত হ'তে হ'লো।

ছায়া দেবী যেখানে অভিনয় করেন—সেখানে আশে পাশে কড়া পাহারা। যেন গার্ব্বোর গন্ধ পেলুম। যাক্, ধন্যবাদ সান্যাল মশাই, ভেতর থেকে সেলাম এলো।

দেখলুম সত্যি। তাই বিশ্বাস করলুম। ভাবলুম—ও কপালে সিনেমার 'কিলো' থেকে সিঁদুরই মামায় বেশী। আর, সিঁদুর আছে-ও।

তবে—কেন তিনি ক্যামেরার মোহে পোড়েছেন, কী কারণ—সে অনেক কথা। শুনে দুঃখিত হলাম—

সেই ছায়া দেবীই সেদিন নাকি রঙ্গমঞ্চেও নাব্‌তে স্বীকৃত হ'য়েছেন।

তাঁর ভাবীকালে সূর্য্যোদয়ের যে ছবি আমাদের চোখে ভেসে উঠেছিল—তা ডোবে বুঝি। তাঁর সুনামের যে দীপ-শিখা আমরা জ্বালিয়েছিলুম—তা অসময়ে নেবে বুঝি।

ছায়া দেবীর এই সঙ্কল্পের প্রশংসা আমরা কর্‌তে পারছি নে এবং এ সঙ্কল্পের কারণ যে কী তাও ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে। মনে হচ্ছে—তিনি চান রঙ্গমঞ্চ

ছায়া দেবী

ও সিনেমায় একসঙ্গে নাম কিন্‌তে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যতদূর আমরা জানি এতে ফল দাঁড়াবে ঠিক উল্টো। এতে সাধারণের সামনে নাবা তাঁর ঠিক হবে, কিন্তু নাম হবেনা। সিনেমা-কূল আর রঙ্গ-শ্যাম রাখ্‌তে গিয়ে এ কুল ওকুল—দু'কূলই তাঁকে দিতে হবে জলাঞ্জলি।

সিনেমা-অভিনয়ের সম্পূর্ণ ধারণা তাঁর এখনও হয়নি। এ তিনি নিজেও স্বীকার করবেন। সিনেমা-অভিনয় মঞ্চ-অভিনয় নয়। মঞ্চঅভিনয় ভাষার রাজত্ব, আর সিনেমায় ভাবের। এই সময়ে তাঁর রঙ্গালয়ে যোগদান যেন রেলের লাইনে লাল-বাতি। এগুলো 'কলিসন' হবার সম্ভাবনা!

এবং, এই যোগদানে তাঁকে যে মঞ্চের প্রভাবে হাবুডুবু খেতে হবে—এ স্বাভাবিক। কারণ, মঞ্চে তাঁকে অভিনয় করতে হবে বেশী। আর, অভিনয়ের মন তাঁর এখনও শিশু। ছোটকালে শিশু যে নামতা শেখে, সেটা সারা জীবন সে ভোলেনা!

ষ্টেজ আর সিনেমায় একসঙ্গে যে অভিনয় করা চলে না, তার কতো হাজার প্রমাণ দেবো! সিনেমা-শিল্পের যে রাজধানী তার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লিওনেল ব্যারিমুর, জন ব্যারিমুর,

জেনেট ম্যাকডোনাল্ড, মিরিয়াম হেপকিন্‌স্‌, বেটি ডেভিস্‌, বারবারা ষ্ট্যানউইক, ক্লার্ক গেবল্‌, অল জলসন আর জোন ব্লনডেল্‌—আরো কত চাই? থিয়েটারের নাম তাঁদের কম ছিলোনা। তবুও তাঁরা বলেন—'অসম্ভব' দু'টো একসঙ্গে কিছুতেই হয়না।' একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো—থিয়েটার আর সিনেমা এ'দুটোর ভেতর কোনটা বেশী ভালো? বেশীর ভাগই জবাব দিয়াছিলেন—সিনেমা। কেন? বেটি-ডেভিস বলেন—"ক'টা লোক থিয়েটারে যায় শুনি। লোক যায়তো বেশী সিনেমায়। তা ছাড়া সম্মান, সুনাম ও পয়সা—এ তিনটেও বেশী সিনেমায়।

এরপর যে কথাগুলো বল্‌ছি সে গুলো একটু রূঢ় শোনালেও সত্য। দূষিত আবহাওয়া আমাদের দেশে সিনেমার চেয়ে বেশী হ'চ্ছে থিয়েটারে।

রঙ্গমঞ্চের গণ্ডী অপরিসর, সঙ্কীর্ণ।

সিনেমার ষ্টুডিয়ো তার তুলনায় বিশাল আর বিস্তৃত। আত্মরক্ষার উপায় ঢের এখানে বেশী।

তাই, রঙ্গালয়ের আবহাওয়া সয় রঙ্গিনি-দের। রঙ্গিলার সইতে পারে, আবীরা-বালারও সইতে পারে, তাই বলে ছায়া দেবীরও কী সইবে? কে জানে সইতেও পারে। কারণ মঞ্চের হাঁড়িকাটে যখন মাথা গলিয়েছেন, তখন সইতে পারবেন বলেই হয়'ত বুঝেছেন।

নিউ থিয়েটার্স

গত হপ্তায় রাত্রে শিয়ালদহ ষ্টেশনে দেখলুম খুব ভীড়। কাতারে কাতারে লোক সবাই যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে কী দেখছে। ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢোকা মুস্কিল দেখে একজন লোক্‌কে জিজ্ঞেস কোর্‌লাম—"হ্যাঁ মশাই, এত ভীড় কিসের?" লোকটি জবাব দিল—ছবি তোলা হ'চ্ছে।" "ছবি তোলা হ'চ্ছে—কোন ছবি?" উত্তর এলো—"তা' মশাই জানিনে।" আমার আগ্রহটা বেড়ে গেল। এত ভীড়, কোন ছবি তোলা হ'চ্ছে জান্‌বার ইচ্ছে হোল। কোন রকমে কনুয়ের গুতো, পায়ের চাঁট খেয়ে খানিকটা এগিয়ে দেখলুম প্রমথেশ বড়ুয়া ছুটোছুটি কোর্‌ছেন—বুঝলাম "গৃহদাহ" তোলা হ'চ্ছে। আর এগুবার সাহস হ'ল না। দেখলুম ইতি-মধ্যেই আমার অবস্থা ভেজা ব্লটিংয়ের রূপ ধারণ কোরেছে। পরের দিন খবর পেলুম "গৃহদাহে"-র ষ্টেশনের একটা জনতা-দৃশ্য তোলা হ'চ্ছিল আর শুটিং চলেছিল রাত্তির চারটে পর্য্যন্ত।

"আবর্ত্তনে"-র নায়িকা কুমারী শীলা হালদার
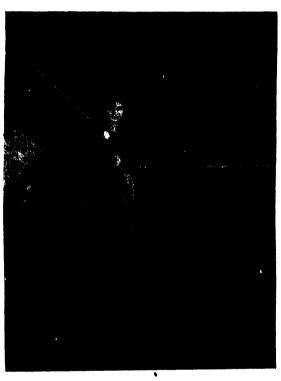
হিন্দি দেনা-পাওনা এন্‌টির নয়?

গেল রোববার হিন্দি "দেনা-পাওনা"-র শেষ শুটিং 'গাজন-দৃশ্য' তোলার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হ'য়েছে। প্রচার-সম্পাদকের প্রচার বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ যে, এখানি 'ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফিল্ম ক্র্যাফ্‌টের' ছবি। এ কোন 'ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফিল্ম ক্র্যাফট'? যাদের "চোর-কাঁটা" আর "চাষার মেয়ে" তারাই—না অন্য কেউ?

কালী ফিল্মস্‌

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। মজলিসী আড্ডা টিম তেতালায় চল্‌ছিল বছর খানেক। মুখুজ্যে, মুখুজ্যে আর মুখুজ্যে কোরে যারা ষ্টুডিয়োতে মুখে ফেনা তুলতো তাদের সবাইকে দুঃখ সাগরে ভাসিয়ে মাই ডিয়ার মুখুজ্যে বানপ্রস্থের পালা শেষ কোরে আবার গুরুদ্বারে উপস্থিত হ'য়েছেন। "রাজমোহনের স্ত্রী"র ঘোমটা উন্মোচন করবার ভার তাঁর ওপর পড়েছে। অবশ্য যাকে আমরা এতদিন "রাজ-মোহনের স্ত্রী" বলে জানতাম পর্দ্দায় তার নতুন নাম দেখব "বারি-বাহনী।"

গুণময় বাড়ুয্যে "পরভৃতিকা"র মহলা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। আনন্দ পরিষদের যশস্বী নট ও নাট্যকার লক্ষ্মী মিত্তির "পরভৃতিকার" মহলা পরিচালনার জন্যে এখানে যোগ দিয়েছেন আর একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় তাঁর চিত্রাবতরণও আশ্চর্য্যের নয়! গুণময়ের গুণে, আর লক্ষ্মীর কৃপায় "পরভৃতিকা" যে গাঙ্গুলী মশাইয়ের সিন্দুক ভরিয়ে তুলবে—এরূপ ধারণা করা বোধ হয় অসমীচীন নয়।

পরিণয়ে পরমাদ

বাজলো শঙ্খ, বাজলো সানাই—একটি যুবক আর যুবতীর যৌবন আর জীবনে হ'লো মিলন। কিন্তু, সবার অলক্ষ্যে কার অভিশাপের পড়লো নিঃশ্বাস!

ছায়া-শিল্পে সবাইকে সন্তুষ্ট করবার মত

গল্প কালী-ফিল্মস্‌এর "কাল পরিণয়ে" যে আছে—এ শেয়াল-শকুনও স্বীকার করবে।

নির্ব্বাক যুগে এই গল্প ম্যাডানের সিন্দুককে সোণায় ভরিয়েছিলো। তার আরেকটি কারণ ছিলো—পরিচালক শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী।

সবাকে "কাল পরিণয়ে"র নাকি হবে নব-জাগরণ! নতুন ভাব, নতুন রূপ নিয়ে।

এর প্রযোজনায় গাঙ্গুলীমশাই আর তাঁর সুযোগ্য সব সহকারী যে পরিশ্রম করেছেন তা আর কেউ না দেখলেও আমরা দেখেছি।

কলকাতার টং টং ট্রাম, বাস আর গাড়ি। এক কথায় কে সিনেমাকে করলো সামাজিক?

এ সব ক'টা প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে দু'টি শব্দে—কালী ফিল্মস্।

তাই তো বলি কালী ফিল্মস্-এর পরিশ্রমে আমাদের বিশ্বাস আছে। সম্মিলীত শক্তির কী ফল আমরা জানি।

আর, তাইতো আমরা আশা করছি, কালী ফিল্মস্-এর 'কাল-পরিণয়ে' নতুন একটা কিছু সবাই দেখতে পাবে। আমরা তাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছি শনিবার কবে হবে।

স্বদেশাভিমুখে সুভাষ

ভারত-গভর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধে যে সাবধান-বাণী প্রকাশ করিয়াছেন—তৎসত্ত্বেও তাঁহার এখন ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিৎ কিনা এই সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র তাঁহার সহকর্ম্মী কংগ্রেস-নেতৃবর্গের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন, জানা গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত সত্বেও য়ুরোপে অযথা সময়ক্ষেপ না করিয়া এবং তথায় নির্ব্বাসিত না থাকিয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে ডাকবাহী বিমানপোতযোগে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরামর্শ নেতৃবর্গ তাঁহাকে দিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র গত ২৭শে মার্চ্চ 'কণ্টিভার্ডে' জাহাজযোগে জেনোয়া হইতে স্বদেশাভিমুখে রওনা হইয়াছেন। পিতৃশ্রাদ্ধের পর সুভাষচন্দ্র যখন পুনরায় ইউরোপে গমন করেন, তখন 'ইটালিয়ান্' জাহাজে রিটার্ণ-টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন; অনুরূপ টিকিট দুই বৎসর বলবতী থাকে, তদনুযায়ী সেই 'ইটালিয়ান্' টিকিটের ব্যবহার করিয়া গত ২৭শে মার্চ্চ সুভাষচন্দ্র 'ইটালিয়ান্' জাহাজযোগে জেনোয়া হইতে ভারত অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

এবং তাঁদের পরিশ্রমে আমাদের বিশ্বাস আছে।

আপনাদের মনে পড়ে সেই দিনগুলো—যখন ধর্ম্মের স্রোতে, বাংলাদেশের ছায়াশিল্প অসাবস্থার বাণে ভেলার মত ভাসছিলো? সেই খালি খোল্-করতাল, আর কীর্ত্তন। তারপর আবার খানিকটা পৌরাণিকের ছোঁয়া।

সেই হাওয়া বদ্‌লালে কে? সেই 'বিমল হেমজিনি তনু অনুপম রে'—তাকে কে পরালে চাদর, পাঞ্জাবি আর পাম্প সু'। 'কোকিল কুজিত নব দুর্ব্বাদল' গ্রামের একঘেঁয়ে পথের পর কে প্রথম দেখায়

কারণ, আস্‌চে শনিবারই 'কাল-পরিণয়ে'র শুভ-উদ্বোধন কি না!

পপুলার পিক্‌চার্স

এদের "আবর্ত্তনে"-র চাকা ঘুরছে জোরে। যামিনী মিত্তির একজন করিৎকর্ম্মা লোক একথা নাট্য ও চিত্রজগতের কারও অজানা নেই। একটা জিনিষ আমাদের তাঁর সম্বন্ধে খুব ভা'ল লাগে—সেটা হ'চ্ছে, পয়সা দিয়েই খালাস না হ'য়ে খুঁটিনাটি সব বিষয়ই তিনি নিজে দেখে শুনে কাজ করেন। আর পরিচালক সতু সেনও মঞ্চজগতের মত চিত্রজগতেও তাঁর নামের প্রতিষ্ঠা কোরেছেন।

আর, হেমন্ত গুপ্ত তিনিও প্রচার-কার্য্যে ও প্রযোজনায় গুণীর মত এদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য কোরছেন। এদের সমবেত চেষ্টায় ও শিল্পিগণের শিল্প-নৈপুণ্যে "আবর্ত্তন" যে সাধারণের প্রিয় হবে—একথা বলাই বাহুল্য।

চন্দ্র ফিল্মস্

অবিশ্রান্ত ভাবে এদের কাজ চলছে। দিন নেই, রাত্তির নেই, খাওয়া দাওয়া, ঘরবাড়ী ছেড়ে এরা ছবি, ছবি আর ছবি তুলতেই ব্যস্ত। দুর্গাদাস, অহীন্দ্র, জ্যোৎস্না প্রভৃতি অসামান্য অভিনেতৃ সম্মেলনে আর যতীন দাস, প্রবোধ দাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে, জ্যোতিষ সিংহ প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত টেক্‌নিসিয়ানদের যোগাযোগে "পরপারে" যে '৩৮ সালের এক বিস্ময় চিত্র হবে—এ আশা অনেকেই কোরছেন, আমরাও করি।

কোয়ালিটী পিক্‌চার্স

এদের "ব্যাথার দান" চিত্রায় ব্যাথার ডালি নিয়ে আস্‌চে এ হপ্তায়ই আস্‌ছে। ছবিখানার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ খেটেছেন খুব—তাদের শ্রম সার্থক হ'তে দেখলেই আমরা খুসী হব।

রূপবাণী

শনিবার ৪ঠা এপ্রিল হইতে "কৃষ্ণ সুদামা" ষষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ কোরিল। ভিড় এখনও পূর্ব্ববৎ।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

চারু রায়ের চারু হস্তে তোলা "বাঙ্গালী" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। এই সঙ্গে ভূপেন বাঁড়ুয্যের—"বেজায় রগড়" হাসির ছবিও বেরুবে। এই ষ্টুডিও থেকে বহুদিন পরে আবার বাংলা ছবি মুক্ত হবে তাই আমরা মুক্তির দিন গুনছি।

দেবদত্ত ফিল্মস্

এদের "রজনী" ও "অহল্যা"র মহল বসেছে। এদিকে ছবি দু'খানা সেট তৈরী হ'চ্ছে।

স্ব-লগনে

প্রসাদ বসু

মাধবী-মঞ্জির-দিন এসেছে—
কাননে কোকিল তাই কুহরে,
নীরস— বৃন্তে ফুল ফুটেছে
মন্থরে মধুবাস বিহরে।
ভাবের সিন্ধু বুকে
লহরী জাগিছে সুখে
পলকে বহিছে বায়ু অনুকুল
আবেশ আনত আঁখির 'পরে।
এ সময় তুমি রবে নিকটে,
রবে মোর সব ঠাঁই ভরিয়া,
হে আমার মরমের ঋতুরাজ,
এস কাছে, আরও কাছে সরিয়া
ক্ষণিকের এই ক্ষণ,
এই রাঙা আভরণ
টুটিয়া যাইবে যে গো এখনি
নিঠুর নিদাঘ বায়ুর ডরে।

ন্যাশান্যাল থিয়েটার্স

এদের উর্দ্দু ছবি "জানবাজ-মাল্কা" প্রায় শেষ হ'য়ে এল। দাদা এবার একখানা বাঙ্লা তুলুন—হিন্দী, উর্দ্দুতে ত' হাত পাকালেন!

আদর্শ পিক্চার্স

বোম্বাইয়ের 'আদর্শ পিক্চার্স' যারা "ধুনে-ধর" ছবি তুলেছিলেন—তারা ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে এসেছেন ছবি তুলতে। শোনা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" এঁরা বাঙ্লা ও হিন্দীতে তুলবেন। মাড়োয়ারীদের এত বাঙ্লা-প্রীতি কেন?

ভারতী পিক্চার্স

'ছায়া' কর্ত্তৃপক্ষ ভারতী পিক্চার্স থেকে "শকুন্তলা" তুলবেন—এরূপ জানিয়েছিলেন। এখন শুনছি "শকুন্তলা"-র জন্য নিতে দেরী আছে। তার আগেই শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" এরা তুলবেন ঠিক কোরেছেন।

আন্তপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগীতা

আমরা আগেই লিখেছিলুম যে আন্ত-প্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগীতার শেষ খেলা দুটো বোম্বাইতে হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বোম্বাই এ দুটো খেলা অনুষ্ঠানের ভার নিতে অস্বীকার করায় দিল্লীতে খেলা হয়েছে। প্রথম খেলা হয়ে গেল উত্তর ভারতের সঙ্গে বোম্বাইয়ের। এই খেলায় বোম্বাই জয়ী হয়েছে। অর্থাৎ বোম্বাই পশ্চিম কেন্দ্র দিয়ে আন্তপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগীতার ফাইনালে উঠল।

আর একদিক অর্থাৎ পূর্ব্ব কেন্দ্র দিয়ে ফাইনালে উঠেছিল মাদ্রাজ। ফাইনাল খেলা বোম্বাই বনাম মাদ্রাজ এখন দিল্লীতে হচ্ছে। আমরা যতখানি খবর পেয়েছি তাতে দেখা যায় যে প্রথম ইনিংসে বোম্বাই করেছে ৩৮৪ রান (হিন্দেলকার ৫৪, কাত্রী ৮৩, বাপুরিয়া ৯০, ওয়াদকার ৬৪ রান, ও উটাপ্পা ৭০ রানে ৪ উইকেট) এবং মাদ্রাজ প্রথম ইনিংসে ২৬৮ রান (কৃষ্ণস্বামী ৭৭, গোপালন ৩৩ রান, কালাপেসী ? রানে ৫ উইকেট)। এর পরে বোম্বাই দ্বিতীয় ইনিংস খেলা আরম্ভ করে ৩ জন আউট হয়ে ৪৩ রান করেছে। ইংলণ্ডগামীদলের খেলোয়াড় বিজয় মার্চ্চেন্ট ১৯ রান করে নট আউট রয়েছেন।

এই খেলাটি শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল গেল সোমবার কিন্তু সোমবার দিন দিল্লীতে খুব বৃষ্টি হওয়ায় ঐ দিন খেলা বন্ধ ছিল। গেল বুধবার দিন বোধ হয় খেলাটি শেষ হয়েছে।

* * *

এই দুটো খেলায় বোম্বাই, উত্তর-ভারত

অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত সন্তো: [illegible] বসু

কর্পোরেশনে আসন্ন অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু অন্যতম পদপ্রার্থী—এই সংবাদ আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। নবগঠিত কর্পোরেশনে কংগ্রেস পক্ষীয় কাউন্সিলারবৃন্দের অধিকাংশই কর্পোরেশনে নবাগত অর্থাৎ কর্পোরেশন সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞ। তাঁহাদিগকে যথোপযুক্তভাবে পরিচালনা করিতে সন্তোষকুমার বসুর ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্পোরেশনে কংগ্রেস দলের নেতা হিসাবে উপস্থিতি একান্তভাবেই অপরিহার্য্য। কারারুদ্ধ মেয়র সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়র এবং সম্প্রতি মেয়র হিসাবে কর্পোরেশনে তিনি যে অসামান্য কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি যে উপযুক্তভাবে নেতার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন সে বিষয়ে নবনির্ব্বাচিত কাউন্সিলারবৃন্দ যে একমত হইবেন তাহা সুনিশ্চিত।

এবং মাদ্রাজের পক্ষে প্রত্যেক দলে দু'জন করে ইংলণ্ডগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় খেলেছেন উত্তর-ভারত দলে খেলেছিলেন আমির ইলাহি এবং বাকা জিলানী। এই দু'জনের মধ্যে আমির ইলাহি ভাল খেলা দেখিয়েছেন। মাদ্রাজের পক্ষে খেলেছেন রামস্বামী এবং গোপালন। ইংলণ্ডগামীদলে রামস্বামীর নির্ব্বাচন সম্পর্কে আমরা তাঁর দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম। রামস্বামী এই ম্যাচে যা খেলেছেন তাতে আমাদের সন্দেহ যে অমূলক নয় তা বেশ প্রমাণিত হয়েছে। বোম্বাইয়ের পক্ষে হিন্দেলকার এবং বিজয় মার্চেন্ট আছেন। এঁদের খেলা আমাদের নিরাশ করেনি।

ইংলণ্ড অভিমুখে সুটে বাঁড়ুয্যে

গেল রবিবার বাংলা থেকে মনোনীত ক্রিকেট খেলোয়াড় সুটে বাঁড়ুয্যে ভুপাল অভিমুখে রওনা হয়েছেন। ভুপালে দলের অন্যান্য

সুটে ব্যানার্জ্জী

খেলোয়াড়রা এসে জমায়েত হবেন এবং তাঁরা একসঙ্গে ৪ঠা এপ্রিল বোম্বাই থেকে জাহাজে উঠবেন।

বোম্বাইয়ে ক্রিকেট সংস্কার

বোম্বাইতে প্রতি বছর কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগীতা হয় এ সকলেই জানে। তাতে চারটি দল করা হয়—মুসলমান, হিন্দু, পার্শী এবং ইউরোপীয়ানদের নিয়ে। এ বছর যাতে আর একটা দল বাড়িয়ে এই প্রতিযোগীতাকে পাঁচটী দল নিয়ে করা যায় তার প্রচেষ্টা করা হচ্ছিল। উপরোক্ত চারটি সম্প্রদায় ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের একটা মিলিত দল করে কোয়াড্রাঙ্গুলারকে পেণ্টাঙ্গুলার করার প্রস্তাব এখনো আরও আলোচনা-সাপেক্ষ হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে।

ফ্রান্স ও অলিম্পিক

ফ্রান্স থেকে অলিম্পিকে কোন প্রতিযোগী এবার যাবে কিনা সন্দেহের বিষয়। রাজনৈতিক কারণে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মানীর ভয়ানক মন কষাকষি চলছে। এইজন্যে ফ্রান্সের অলিম্পিক কর্ত্তৃপক্ষ বলছেন যে যেহেতু খেলাধুলা স্বদেশের স্বার্থের পরে সে-জন্যে বর্ত্তমান অবস্থায় ফ্রান্সের পক্ষে

জার্ম্মানীতে অলিম্পিকে যোগ দেওয়া এক রকম অসম্ভব। তবে তাঁরা এও আশা করেন যে ইতিমধ্যে হয়তো অবস্থা ভালর দিকে যেতে পারে। তা হলে অবশ্য ফ্রান্সের পক্ষে অলিম্পিকে যোগ দেওয়া কষ্টকর হবে না।

কোলকাতার হকি লিগ

কোলকাতার হকি লিগ খেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। এ বছর বিভিন্ন দল যে রকম খেলছে তাতে আর সন্দেহ থাকে না যে এবার লিগ পাবে কাষ্টমস্। রেঞ্জারস গোড়ার দিকে খুব খারাপ খেলায় তাদের লিগ পাবার আশা প্রায় নির্ম্মূল হয়েছে। এখন তারা যে রকম সুন্দর খেলছে গোড়া থেকেই যদি অত ভাল খেলতো তা হলে ওরাই এবার লিগ পেত। সেণ্ট-জোসেফ আর ভবানীপুর অবশ্য খুব ভাল প্রথম দিকে খেলেছিলো, কিন্তু ইদানীং কয়েকটা ম্যাচে হেরে গিয়ে ওদের চ্যাম্পিয়ান হবার সব আশা-ভরসাই নষ্ট হয়েছে। গেলো হপ্তায় খেলাগুলোর ফলাফল নীচে দেওয়া গেল।

২৬-৩-৩৬ কাষ্টম্‌স ২—সেণ্ট জোসেফ ০
রেঞ্জার্স ৫—ড্যালহাউসী ১
২৭-৩-৩৬ রেঞ্জার্স ০—লিলুয়া ০
পুলিশ ০—মিঃ মেডিকেল্ ০
বি, জি, প্রেস ০—আর্ম্মেনিয়ান্‌স ০
২৮-৩-৩৬ সেণ্ট জোসেফ ২—মোহনবাগান ১
কাষ্টম্‌স ৫—লিলুয়া ০
ড্যাল্‌হাউসী ৪—ডিভন্স ১
ক্যালকাটা ৪—ভবানীপুর ২
৩০-৩-৩৬ রেঞ্জার্স ৪—মোহনবাগান ১
কাষ্টম্‌স ২—জেভেরিয়ান্‌স ১
বি, জি, প্রেস ২—লিলুয়া ০
৩১-৩-৩৬ ক্যালকাটা ২—ই, বি, আর ১
ড্যাল্‌হাউসী ০ আর্ম্মেনিয়ান্‌স ০
সেণ্ট জোসেফ ২—ডিভন্‌স ০

বাইটন কাপ খেলা

কোলকাতায় হকি লীগ খেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। এর পরে আসছে বাইটন কাপ প্রতিযোগীতা। বাইটনের যা তোড়জোড় হচ্ছে তাতে এবার বেশ এ প্রতিযোগীতা জমবে। কোলকাতার বাইরে থেকে অনেক ভাল ভাল দল এতে খেলতে আসবে বলে শোনা যাচ্ছে। সব চেয়ে বড় খবর হচ্ছে আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জের একটি দল এবার বাইটন কাপে খেলতে আসছে। আজ পর্য্যন্ত যে কয়টি দল এতে নাম দিয়েছে তার একটা তালিকা নিচে দিলাম।

১। ঝাঁসি হিরোজ
২। ভূপাল
৩। দিল্লী ইয়ংমেন্‌স
৪। ঢাকা স্পোর্টিং
৫। ব্রাউনিং ক্লাব (পোর্ট ব্লেয়ার)
৬। লালিগ্রো ইউনিয়ান (ফরিদপুর)
৭। বি, এন, আর
৮। টাউন ক্লাব (জামসেদপুর)
৯। কাষ্টমস
১০। ডালহৌসি

বোম্বাই কাষ্টমস দলের কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে তাঁরা কোলকাতার বাইটন কাপে খেলতে আসার আপ্রাণ চেষ্টা কচ্ছেন। সম্ভব হলে এঁরাও যোগদান করবেন বাইটনে। বম্বাইএর টেলিগ্রাফ দলের বাইটন কাপে যোগদানের কথাও আছে।

কোলকাতায় ফুটবল

কোলকাতার ফুটবলের মরশুম এসে পড়ল বলে। গেল রবিবার ব্যারাকপুরে মোহন বাগানের সঙ্গে ব্ল্যাকওয়াচের একটা এমনি খেলা হয়ে গেছে। ব্ল্যাকওয়াচ দু গোলে জিতেছে।

অপেক্ষা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী

আমি চেয়ে থাকি ওই পথ পানে
তুমি যাও যাহা দলি.
আমার বক্ষে জাগে শিহরণ
তুমি যবে যাও চলি॥
পুলক আসিয়া পলকে ফুরায়
নিমিষের দরশনে,
আমি চেয়ে থাকি ও পথের পরে
আর ভাবি আনমনে॥
মিশে যেতে চায় ধূলিকণা সনে
ও পথে আমার মন,
নয়ন চাহেনা হারাতে তোমার
চকিতের দরশন॥
শাস্তি সহসা ব্যথা হ'য়ে যায়
চঞ্চল করি মন,
আনত নীরব হ'য়ে চ'লে যায়
যবে ওই দুনয়ন॥
আশা ক'রে যায় কত কথা কানে
জেলে দিয়ে তার বাতি,
ম্লান হয়ে যায় ধীরে ধীরে ধীরে
আমি দেখি সারা রাতি॥

—:০:—

(বিলাসী)

ক্যালকাটা থিয়েটার্স

নাট্য-জগতে একটা বিস্ময় আনবার জন্যে ক্যালকাটা থিয়েটার্স উঠে পড়ে লেগেছে। মঞ্চ-শিল্পী, পট-শিল্পী, গীত-শিল্পী, নৃত্য-শিল্পী আর সবার ওপর শিশির-কুমার ছাড়া নাম-করা যতগুলি নাট্য-শিল্পী পেয়েছে নিজেদের আসরে এনে ভর্ত্তি করিয়েছে। "কেদার রায়ে" এদের সকলেই নিজেদের বিভাগের কাজে একটা নতুনত্ব আনবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। উদ্যোগ আয়োজন ভালই চলছে কিন্তু অভিনেত্রী সংগ্রহের এরা কী ব্যবস্থা কোরছেন? যে সকল অভিনেত্রী আপাততঃ এদের দলে রয়েছেন, তারা কেউই যে এই শক্তিমান অভিনেতা-দের বিপরীতে সমতালে পা ফেলে চলতে পারবেন না—এ কথা সুনিশ্চিত। এমন কী নব-সংগৃহীত ছায়া দেবী ও রেণুকা রায়ও নয়।

"শিবপ্রসাদে" যোগেশ ও অহীন্দ্র

"চরিত্রহীনের" শিবপ্রসাদের ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী অসুস্থ হওয়ায় অহীন্দ্র চৌধুরী দু'রাত্তির অভিনয় করেন। এই ভূমিকায় কে ভাল অভিনয় কোরলেন—এ প্রশ্ন সাধারণের মনে উদয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়! এবং সবাই প্রায় আঁচ কোরে রেখেছেন যে, অহীনবাবুই ভাল অভিনয় কোরেছেন। লোকের এ ধারণা যে একেবারে অমূলক একথা আমরা বলতে চাইনা। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা বলতে বাধ্য যে একমাত্র শেষ দৃশ্য ছাড়া অহীন-বাবু কোথাও যোগেশবাবুর অভিনয়কে ম্লান কোরতে পারেন নি। নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীও গত হপ্তায় এই ভূমিকায় নেমে-ছিলেন। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল।

গৃহদাহ

শরৎচন্দ্রের "গৃহ-দাহ" নব-নাট্যমন্দিরের আগামী আকর্ষণ। শিশিরবাবুর মনে মনে ইচ্ছে "রীতিমত নাটক"-এর পর রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ"-এর যোগসূত্র বাঁধবেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর এ শরৎ-প্রীতি কেন? যা হ'ক "গৃহদাহ" মনোনয়ন কোরে শিশির কুমার বুদ্ধিমানেরই কাজ কোরেছেন। কিন্তু সুরেশ ও মহিম সাজবে কে! এ বয়সে ও দু'টো ভূমিকায়ই শিশির কুমারকে মানাবে না। আর এদিকে অচলা আর মৃণাল সাজবে কে? মৃণাল রাণীকে দিয়ে তবুও কোনও রকমে চলতে পারে। কিন্তু অচলার ভূমিকায় দেখ্‌ব কা'কে! শেষ অবধি কঙ্কা বা প্রভাকে যেন ঐ ভূমিকায় আমাদের দেখ্‌তে না হয়।

রূপ-মহল

এঁরা এই শনিবার থেকে শচীন্দ্রনাথের "বাঙলার দুলাল" নামে তিন দৃশ্যের একখানা নাটক "আবুল হাসানে"-র সঙ্গে দেখাবার ব্যবস্থা কোরেছেন। এতে মূল ভূমিকায় দুর্গাদাস, ভূপেন চক্রবর্ত্তী ও রেণু (রূপ) নামছেন।

মিনার্ভা

"শিবশক্তি"-র পর "শিবার্জ্জুন" এদের আসর বেশ জমিয়ে রেখেছে। শিবের কৃপা এদের ওপর বেশ বেশী দেখা যাচ্ছে। এরপরে এদের এখানে নিশ্চয়ই "শিব-পার্ব্বতী" না হয় এমনি ধরণের নিশ্চয়ই কোনও নাটক আসবে। কর্ত্তৃপক্ষ কী বলেন?
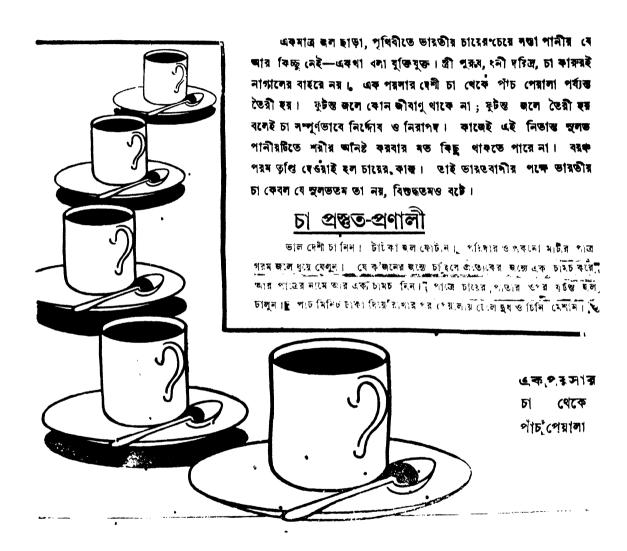
নাম-না-জানা

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

সকালবেলা একখানা চিঠি এসেছে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটি মেয়েদের হোষ্টেলে।

সকালবেলা চিঠিখানা নিয়ে সবাই নিজেদের মনের সাথে অনেক বোঝাপড়া করেছে, কিন্তু তবুও কেউ একটা কিনারা ক'রে উঠতে পারেনি যে রিণার মত এমনিতর অস্বাভাবিক গম্ভীরভাবাপন্না মেয়েটির কাছে এই চিঠিখানা কোথা হ'তে এল।

ভাগ্যিস্ প্রথমে চিঠিখানা গীতার হাতে পড়েছিল, তাইতো আমরা জানতে পারলেম। এমনিতর হয়ত সবাইকার আসে···

এমনি ক'রে সকলেই যে যার মতামত গড়ে তোলে···

আজ ক'দিন যাবৎ আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ ও থেকে থেকে মেঘের গুরুগম্ভীর ধ্বনি চতুর্দ্দিকের সমস্ত কোলাহলকে যেন নীরবতায় ঢেকে দিয়েছে। তাপদগ্ধ ধরণীর বুকে এই অবিরল বারিধারা রিণার মনকে উদাস, চঞ্চল ক'রে তোলে—কোন এক অননুভূত ব্যথায় তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

রিণা একা চুপচাপ জানালার ধারে বসে প্রকৃতি দেবীর এই খেলা দেখ্‌ছিল···

এদিকে গীতা, নীতা আর ললিতা ঠিক করলে যে তারা আজ রিণার ঘরে গিয়ে চিঠির সম্বন্ধে একটা সঠিক খবর জেনে আসবে। বৃষ্টির জন্য যখন কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায় না তখন বিকেল বেলাকার এই প্রস্তাবটি সকলেরই বেশ মনঃপূত হ'ল। ওদের ভেতরে কে গিয়ে এখন চিঠি চাইবে তা নিয়ে একটা সমস্যা উপস্থিত হয়। তখন গীতা বললে, 'বেশ তোরা না পারিস্, আমি গিয়েই চাইব। তোরা শুধু আমার সাথে থাকবি।'

গীতা রিণার ঘরে গিয়ে বললে, 'রিণা ভাই, সকালবেলা তোমার চিঠিটা কোথা হ'তে এল।'

রিণা হঠাৎ তার ধ্যান-ভঙ্গ ক'রে বললে, 'তোমরা কি বলছ?' গীতা আবার সাহসে ভর ক'র বললে, 'তোমার ঐ সকাল বেলাকার চিঠিটার সম্বন্ধে বলছিলাম।

রিণা বললে, 'ওঃ! তোমরা দেখতে চাও। তা তোমাদের দেখাবো বৈ কি! জীবনটা হচ্ছে একটা অভিজ্ঞতার সমষ্টি। জোরে জোরে চিঠিটা পড়, সবাই শুনুক, ওতে অনেক জ্ঞানের কথা আছে।'

ওরা ভাবেনি যে এত সহজে কাজ হাসিল করতে পারবে। যাহা হউক গীতা পড়তে সুরু করলে-

রিণা,

অনেকদিন পর আবার তোমায় লিখতে বসেছি। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সব কিছুরই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাথেও বোধ হয় বাহ্য জগতের একটা ব্যবধানের সেতু গড়ে উঠেছে।, কিন্তু আমি জানি,—বাইরের সেতুটা ত একটা মিথ্যে আবরণ, এর পর্দ্দা টেনে নিলেই বেরিয়ে পরবে আসল রূপটা। অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে যিনি বাস করেন, তার সাথে যে আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে, কাজেই সেখান থেকে আর আমাদের কেউ ব্যবধান করতে পারবে না।

আমাদের ব্যবধানটি যেমনি মধুর—আবার তেমনি বেদনাদায়ক। সুখের ভেতর থাকা চাই দুঃখের রেশ, নইলে তার ভেতর থাকবে না কোন বৈচিত্র্য। এই ব্যবধানই এনে দিলে আমাদের নিজেদের প্রকৃত সত্তার উপলব্ধি। ব্যবধানের ভেতর যে সৌন্দর্য্য তার রস কি সবাই উপভোগ করতে পারে?

প্রেমের ভেতর আছে কাঁটা, সুখের ভেতর যেমন দুঃখ। তাই প্রেম এত সুন্দর, এত মধুর,—নইলে প্রেমের মাধুর্য্য বোধ হয় কিছুই থাকত না। প্রেমই একমাত্র পথ যার সংস্পর্শে না এলে আমাদের মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতির পূর্ণতা আসে না। প্রেমের ভেতর যেমন কাঁটা, সুখের ভেতর যেমন দুঃখ, তেমনি মিলনের ভেতর চাই ব্যবধান। এই ব্যবধানই আমাদের জীবনকে বড় ক'রে তোলে—সম্পূর্ণ ক'রে তোলে।

তুমি হয়ত বলতে পার সুখ—ভোগ কো'রে—না ত্যাগ কোরে? আমরা মানুষ,—আমরা সবাই এই সুখ বা আনন্দের অন্বেষণেই ঘুরে মরছি এবং যাঁর যাঁর রুচি অনুযায়ী তা গ্রহণও করছি।

কেউ বা ত্যাগ কোরে—কেউ বা ভোগ কোরে!

কিন্তু ভোগের মধ্যে এসে পড়ে ক্লান্তি, আর অবসন্নতা, তাই মনে হয় এই ত্যাগের ভেতরেই যেন বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্য নিহিত রয়েছে।

মানুষ যখন প্রেম করে তখন সে তার প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝতে পারে না,—বুঝতে পারে সময়ের অতিপাতে। তেমনি আদর, আপ্যায়ন, আনন্দ, ভালবাসা যা কিছু আমরা পাই, তার মর্ম্মও আমরা ঠিক তখন তখনই উপলব্ধি করতে পারি না। পারি,—যখন আমরা নির্জ্জনে বসে মনের হিসেব নিকেশের খাতার পাতা উল্টে যেতে থাকি তখন। আনন্দের বন্যা আমাদের হৃদয় উপচে দেয় তখনই সবচেয়ে বেশী। এই বন্যার ঢেউ কার কাছ থেকে কতখানি জোরে এসে হৃদয়ে আঘাত করেছে—তার ওজন হয় তখনই।

আজ বহুদিন গত হয়েছে আমি তোমার দৃষ্টিপথ থেকে চলে এসেছি, তবুও হিসেব নিকেশের খাতা খুললে মনে হয় এই ত সেদিন। এর পর কত নবাগত অতিথি এসেছে এবং চলে গেছে, কিন্তু কোথাও তোমায় তাড়িয়ে দিয়ে ত আর কেউ সে স্থান দখল করতে পারে নি। তাই সময় সময় বিস্ময় এসে মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায়। সত্যি মনে হয়, নারীর প্রতি যার আসক্তি জন্মেনি তার কখনও জীবন পথে বড় হওয়া চলে না। তাই' ত প্রেম চাই—যে সত্যিকার প্রেমের খনি খুঁজে পেয়েছে, সে কি কখনও পুড়ে মরে আসক্তির অনলে? আসক্তির বহু উর্দ্ধে প্রেম।

সংসারটা আমার মোটেই ভাল লাগল না; তাই সংসার ছেড়ে আমায় এই নির্জ্জন লোকালয়হীন প্রান্তরে চলে আসতে হয়েছে। তুমি বলবে, একি ভীরুতা,—নয়ত বলবে, রিক্ত সন্ন্যাসের নিভৃত আয়োজন।

তার উত্তর,—ভীরু আমি মোটেই নই সে তুমি বেশ জান; আর সন্ন্যাসী হবার কথা তা কিন্তু আমি কল্পনায়ও কোনদিন আনতে পারিনি।

তাহ'লে তুমি বলবে, 'এ তবে তোমার কি খেয়াল?'

—খেয়াল ঠিক নয়। আমার ভাল লাগে না এই সংসারের 'যা নয় তাই হওয়ার' কদর্য্য পুনরাবৃত্তি। উঃ,—মনে ক'রতেও গা-টা শিউরে ওঠে।

—তুমি বলবে, এ যে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, নইলে সংসার চলবে কি করে, সমাজ গড়ে উঠবে কি করে?

—সংসার আর সমাজ গড়ে তুলবার জন্য ভগবান আর এক শ্রেণীর লোক তৈরী করেছেন। তার মধ্যে আমি নেই, আমায় ছাড়াও তাঁর সৃষ্টির ব্যাঘাত কিছুতেই ঘটবে না। আমি শুধু শিখেছি সৌন্দর্য্যটুকু গ্রহণ করতে, তার ভেতরে প্রবেশ ক'রে অনুশীলন ক'রবার প্রয়াস আমি কখনই করব না। অনুশীলন করবার চেষ্টা করলেই সুরের রেশ ছিন্ন হবে বলে আশঙ্কা হয়।

যদি বল, এরকম নিঃস্বার্থ প্রেমের দরকার কি? জগতকে দেবার মত আমাদের কিছুই কি নেই?

—হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু দানের জন্য আর মিলনের প্রয়োজন নেই। ব্যবধানই আমাদের সে দানের হবে সহায়ক এবং সম্পূর্ণও ক'রে তুলবে এই ব্যবধান। পূর্ব্বেই বলেছি প্রেমই আমাদের সম্পূর্ণতা এনে দেবে এবং এই সম্পূর্ণতার জন্যই আমরা সাধারণ স্তরের থেকে উঠে গেছি অনেকখানি উপরে। সেখানেই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত দান।

উত্তরটা একটু কবির মত হয়ে গেল কিন্তু আসলে আমি কবি-লেখক নই। ভাষায় রূপ দিতে পারি না বটে কিন্তু ভেতরটা আমার কবিতায় ভরা।

—তুমি বলবে এরকম কাব্যির বন্যা সব মানুষের ভেতরেইত ফল্গু নদীর মত বয়ে যাচ্ছে, তার খোঁজ কি কেউ রাখে ?

—সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করবার ক্ষমতা হয়ত সবার ভেতরেই কিয়ৎ পরিমাণে সুপ্ত থাকে ; কিন্তু আমার সুপ্ত উপলব্ধি বোধ হয় এখন জেগে উঠেছে—তফাৎ এইখানে।

হৈ চৈ এখন আর ভাল লাগে না, ভেতরকার নদীর জল হয়ে গেছে এখন শান্ত, স্তব্ধ। আশা নেই, আকাঙ্খা নেই, ভয় নেই, উদ্যম নেই। যে আনন্দের জন্য লোকের সন্ধানের সীমা নেই তার সন্ধান যে আমি পেয়েছি। সে যে আমার ভেতরেই ছিল—তোমার ভেতরেও আছে। তাইত আমরা জানতে পেরেছি। সবাইকার ভেতরেই এই আনন্দের খনি আছে, কিন্তু সে খনির সন্ধান ত সবাই পায় না। কাজেই তাঁরা ঘুরে ঘুরে মরে—যখনই তাঁরা পাবে এই খনির সন্ধান তখন তাদের আর বাইরের সঙ্গের প্রয়োজন হবে না।

তুমি বলবে, 'প্রবৃত্তির ক্ষুধা রোধ করা কি সহজ কথা ?

এ কথা বললে আমি তোমার কাছে হার মানছি। মনের ক্ষুধার সাধ আমার মিটে গেছে, এ কথা আমি জোর করেই বলতে পারি। তবে প্রবৃত্তিকে যদি আহার্য্য দেওয়া যায়, তাতে দোষ কি ? তাতে হয়ত সমাজ বাঁধা দেবে—না। তাইতো বেছে নিয়েছি এই নির্জ্জন লোকালয়হীন প্রান্তর। এখানে সমাজ নেই—আছে গাছ, পাথর আর মাটি। প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে দিতে চাই আমার এই পঞ্চভূতের দেহকে......

চিঠির কলেবরকে আর বাড়াতে চাই না আমার নিজের সম্বন্ধে বলে। এ কথাও আমি তোমায় কোনদিন বোঝাতে চেষ্টা করব না যে আমার জন্যই তুমি সৃষ্ট হয়েছিলে এই পৃথিবীতে এবং তোমার জন্য আমি ; বিশেষ করে বিশেষভাবে আমরা পরস্পরের জন্য সৃষ্ট হয়েছি।

তুমি বলতে পার, 'দেখা ত কত লোকের সঙ্গেই হয়, তবে তাদের কথা দাগ কাটে না কেন মনে ?'

তার উত্তর ; 'আমি তোমায় প্রথম দেখেছি, তুমিও আমায়। তাই এর সাড়া পৌচেছে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গিয়ে।'

এক কথায় শেষ করি,—যাঁকে ভালবাসা যায়, তাঁকে বিয়ে করা যায় না ; বিয়ের জন্য প্রয়োজন হয় সাধারণ স্তরের লোকের।

আজ আসি। ইতি।

নাম-না-জানা।

চিঠিখানা পড়া শেষ হ'লে পর সবাই নিঃশব্দে যে যার ঘরের দিকে চলে গেল।

সেতুবন্ধ

= উপন্যাস =

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তিন সপ্তাহের ওপর হবে মহেশ্বরী তীর্থ-পর্য্যটনে গিয়েছেন। প্রথম প্রথম মায়ের অভাবটা মৃত্যুঞ্জয় বেশ বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু সেটা দু'চার দিন। তারপর কাজের চাপে সে এতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো যে সংসারের কোন অসামঞ্জস্য, এমন কি মায়ের স্নেহকরস্পর্শের অভাব তার মনের কোণে ক্ষণিকের জন্যে এতটুকু রেখাপাত করলেনা। মৃণালের কষ্টের অন্ত নেই। শাশুড়ী থাকতে দু'দণ্ড কথা কয়ে সে বাঁচতো। এত বড় বাড়ীতে অসংখ্য দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও নির্জ্জন কারাবাসের ভীষণ স্মৃতি স্মরণ হওয়ায় তার দেহের প্রতিটি রেখা কঠিন হয়ে উঠলো। এদের সঙ্গে রাতদিন সে কী কথা কইবে? আত্মসম্মান-বোধ তার আছে। এর ওপর মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কওয়ার আশাও দুরাশা। তর্ক করে তাকে বুঝোতে যাওয়া আরো বিপজ্জনক। আজকাল মৃত্যুঞ্জয় কখন কী ভাবে চলে মৃণালের কাছে সেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহেশ্বরী তাকে কি অকূলবন্ধের মধ্যেই না ফেলে গেছেন।

সকাল বেলায় স্নান করে সেই যে মৃত্যুঞ্জয় মোটরে করে বেরিয়ে গেছে এখনো ফেরেনি। মৃণাল রান্নাঘরে বসে সমস্ত আনাজপাতিগুলিকে ধামার মধ্যে তুলে রাখছে।

ঝি এসে খবর দিলে: মা, পাঞ্জাব থেকে আপনার কে এক কাকা এসেচেন, সঙ্গে একটি মেয়েও আছে।

—বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেচিস, বুঝি?

—না, মা, বাইরের ঘরে বসে আছেন।

মৃণাল তাড়াতাড়ি নেমে এলো।

সাহেব পোষাকধারী যে বৃদ্ধটি ইজি-চেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন ইনিই তারাপ্রসন্ন ঘোষ। ইনি বিপত্নীক। বয়েস বোধ করি পঞ্চাশের কিছু ওপর হবে: কিন্তু দেহটিকে তিনি এমন তোয়াজে রেখেছেন যে তাঁর বয়েসের কথা শুনলে অনেকেই কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবেনা। কর্ম্মের খাতিরে তাঁকে খুব অল্প বয়সেই দেশ ছেড়ে বিদেশে বসবাস করতে হয়েছিলো। প্রথমে তিনি প্রফেসারি নিয়েই গিয়েছিলেন। বছর চার পাঁচ কাজ করবার পর বিশেষ গবেষণা করবার জন্যে তিনি বিলেতে যান। বিলেত থেকে ফিরে এসে পূজোয় সময় একবার তিনি দেশে আসেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিলেত যাওয়া সম্পর্কে গাঁয়ে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল। ভিতরে ভিতরে তাঁকে একঘরে করবার গোপন আয়োজন চলেছে তা প্রথমে তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি। অষ্টমির দিন রায়েদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে বুঝতে পারলেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রটা কত ভীষণ। অপমানিত হয়ে ফিরে এসে সেইদিনই রাতের গাড়ীতে তিনি গাঁ ছেড়ে যে চলে এলেন তারপর দেশে যাওয়ার নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনেননি। ইন্দ্রানীর বয়েস তখন চার বছর। গত বৎসর তিনি রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছেন। বছর চারেক হলো তিনি প্রিন্সিপলের পদে নিযুক্ত হয়েছেন। মাস তিনেক হবে রেনাল কলিকে তিনি ভারী কষ্ট পাচ্ছেন। অপারেশন ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কর্ম্মস্থলে তিনি অপারেশন করতে পারবেন। কিন্তু কেমন একটা তাঁর ধারণা জন্মেছে অপারেশন যদি একান্ত করতেই হয় কলিকাতায় এটা তিনি করাবেন। বিদেশে মৃত্যু অপেক্ষা স্বদেশে মৃত্যুর তিনি আজ-কাল বেশী পক্ষপাতী।

ইন্দ্রানী সামনের বড় অয়েল পেন্টিংটা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। পরণে তার বিলাতী পোষাক নেই সত্য। কিন্তু তার পোষাক-পরিচ্ছদে বিলেতী ছাঁবর স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। এর ওপর তারাপ্রসন্নবাবু ইন্দ্রানীকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে বাঙালীঘরের মেয়েদের এতখানি স্বাধীনতা হয়তো কেউ সমর্থন করবেনা। রূপ বলে যদি কোন জিনিষ থাকে তা তার সারা দেহটীকে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। কথা বলবার ভঙ্গিটি অপূর্ব্ব। কোথাও এতটুকু জড়তা নেই, ঝরণার মত সঙ্গীতমুখর। আপন স্বচ্ছ গতিতেই বেয়ে চলেছে।

রায়বাহাদুর খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মৃণাল ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করতেই

তিনি কাগজ থেকে মুখ তুলেই বললেন: কেমন আছিস, বেটি?

মৃণাল বল্লে: রাজাকাকা, এদ্দিন পরে মেয়ের কথা মনে পড়লো বুঝি?

—শোন মেয়ের কথা। কোন দিন আমাকে আসবার জন্যে লিখেছিলি? আসতে বল্লে যদি না আসতুম তখন তোর আদালতে যা দণ্ড হতো, মাথা পেতে নিতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করতুমনা।

—চিঠি না লিখলে আমার বাড়ীতে বুঝি আপনি আসতেন না? দূরে গেলে মানুষ আপনার জনকে এমনি করেই ভুলে যায়।

রায়বাহাদুর বুঝতে পারলেন মৃণালের অভিমান হয়েছে। মৃণালের একথার কোন জবাব তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তবুও বল্লেন: তোর কথা কি ভুলে থাকতে পারিরে, এ যে নাড়ীর টান। বুড়ো হয়েচি সবদিক আঁটঘাঁট বেঁধে কাজ করবার মত সে সামর্থ্য আর নেই। ভুল হয় তাই পদে পদে। এগুলো যদি তোরা মানিয়ে না নিস তা হ'লে আমিই বা যাই কোথা বল দিকি?

মৃণাল একথার কোন জবাব দিলনা। বলিল: চিঠিতে লিখেছিলেন অসুখের কথা। তারপর আর কোন খবর না পেয়ে ভেবে বাঁচিনে। কি হয়েচে কাকাবাবু?

—অসুখটা খুব কঠিন। এখন ডাক্তারের হাত-যশ আর ভগবানের দয়া।

ইন্দ্রানী এতক্ষণ ঘরের আসবাবপত্তর দেখছিল। এইবার মৃণালের কাছে এগিয়ে এসে প্রণাম করে বল্লে: মিত্তিরমশাই গেলেন কোথায় দিদি? আমাদের আসবার খবর পেয়ে বাড়ী থেকে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেলেন নাকী!

—উনি কাজ-পাগলা মানুষ। সেই যে সকালে চান্‌টান্ করে বেরিয়েচেন এখনো পর্য্যন্ত ফেরেননি।

—একটু বোকলেই পারো, তা'হলে ঠিক সময়েই আসেন। রাশ আলগা দিয়ে মিত্তির মশাইয়ের মাথা তুমিই খেয়েচ, দিদি।

—দিদি না হয় হাল ছেড়ে দিয়েচে, তুইই না হয় একবার চেষ্টা করে দেখন', যদি সোজা করতে পারিস।

—দুদিনের জন্য এসে কি চেষ্টা দেখবো বলতো, দিদি?

—আর না হয় বরাবরই থেকে যা না। আমার দিক থেকে কোন আপত্তি হবেনা। পুরুষ মানুষকে এখনও চিনলিনে। আগে একটা হোক তখন বুঝবি।

—আচ্ছা, গো আচ্ছা। তখন কিন্তু দেখিয়ে দেবো মেয়েদের শক্তি পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। হাঁ, দিদি, ঘরে তো এতো ছবি রয়েচে কই মিত্তির মশাইয়ের ছবি তো দেখতে পেলুমনা?

—তুই ওঁকে চিনিস নাকী?

—না।

—তবে?

তবুও ছবি দেখে একটা আন্দাজ করে নিতুম।

—ছবি দেখে আর কাজ নেই, ইন্দ্রানী। আসল লোকটি এলেই চিনিয়ে দেবোখ'ন।

পরে রায়বাহাদুরকে উদ্দেশ করে বল্লে: চলুন রাজাকাকা, ওপরে চলুন। জামা-কাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম করুন, ততক্ষণ আপনার জলখাবারের আয়োজন করি।

আর ইন্দ্রানী, তুইও আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

রায়বাহাদুর কোন কথা না বলে ইন্দ্রানীকে সঙ্গে নিয়ে মৃণালের পিছু পিছু ওপরে চল্লেন।

স্নান সেরে কাপড়-জামা ছেড়ে রায়-বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের ইজি-চেয়ারে এসে বসলেন। চাকরটি সকালের অর্দ্ধসমাপ্ত খবরের কাগজখানি এনে দিলে। একটা চুরুট ধরিয়ে তিনি পুনরায় কাগজ পড়ায় মন দিলেন।

এদিকে ইন্দ্রানী রান্নাঘরে এসে দিদির সঙ্গে গল্প করতে বসলো।

না দিদি, কুটনো আমিই কুটচি বলে ইন্দ্রানী একপ্রকার জোর করে দিদির হাত থেকে বঁটি কেড়ে নিতেই মৃণাল বলে উঠলো: থাক ইন্দ্রানী, তোকে আর গিন্নিপনা করতে হবেনা। আমিই সব করে নিচ্চি।

—গিন্নীপনা কী দেখলে দিদি। চুপ করে মানুষ বসে থাকতে পারে? বলে ইন্দ্রানী তরকারীর চুপড়িটা কাছে টেনে নিলে।

—আগে চাট্টি' খানি ময়দা মাখ, কাকাকে খানকতক লুচি করে দিই তারপর খানকতক আলু কুটে দে ভেজে দেবো। আমি ততক্ষণ চায়ের জলটা চাপিয়ে দিই বলে মৃণাল চায়ের কেৎলিটা উনুনে চাপিয়ে দিলে।

—ময়দা মাখতে মাখতে ইন্দ্রানী বল্লে: তোমার শাশুড়ী কোথায় গেলেন দিদি? তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছিনা!

—তীর্থধর্ম্ম করতে গেছেন।

—কবে ফিরবেন?

—তা কী করে বলবো।

—তোমার চিঠিতে জানতে পেরেচি তিনি সব সময়ই পুজোআচ্চা নিয়েই থাকেন। আচার বিচার খুব মেনে চলেন। আমার বাবা বিলেতে গিয়েছিলেন জেনেও আমাদের এখানে আসা নিয়ে কোন আপত্তি তোলেননি।

—আপত্তি? না। যেখানে নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা অল্প সে-সব জিনিষ নিয়ে তিনি বড় একটা মাথা ঘামানননা।

—আমাদের ব্যাভার-করা জিনিষ তিনি নিঃসঙ্কোচে ব্যাভার করবেন?

—তাঁর যে বন্দোবস্ত সব আলাদা, ইন্দ্রানী। আমাদের সঙ্গে ছোঁয়ানেপার কোন বালাই নেই। চার তোলায় তিনি সম্পূর্ণ আলাদাভাবেই থাকেন। তাঁর বিনা হুকুমে জিনিষপত্তর হাত দেওয়া কারুর অধিকার নেই।

—রান্নাবান্না?

—সে তিনি নিজে হাতেই করেন। বিধবা হবার পর কারুর হাতে তিনি খান না, এমনকি আমার হাতেও নয়। রান্না-বান্না চুকে গেলে উনুন নিকিয়ে দিই। তারপর নিজের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করে নেন। একটা বামুনঠাকুর পর্য্যন্ত রাখতে দেননি।

—কেন?

—পুরুষমানুষ দিয়ে রান্নার কাজ চলে না। ওগুলো মেয়েদের। তাদের হাতে রান্না না হলে পুরুষ মানুষের খেয়ে তৃপ্তি হয় না।

—হাঁ দিদি, মিত্তিরমশাই তোমায় ভালবাসেন?

—সেকথা তুই বরং ওঁকেই জিজ্ঞেস করিস। নিজে মুখে কী করে তা বলবো।

—চিঠিতে লিখেছিলে মিত্তিরমশাই তোমাকে মোটেই দেখেন না।

—ওমা, ওকথা তোকে আবার কবে লিখলুম। শুধু জানিয়েছিলুম উনি যে-রকম কাজপাগলা—দুদণ্ড বসে কথা কইবার ওঁর সময় নেই।

—রাতে তো কথা কইবার অনেক সময় পাও, দিদি।

—রাতে উনি কারুর নন। একবার বিছানায় শুলে আর হুঁস থাকে না।

—জাগিয়ে দিলেই পারো।

—যে খেটে আসেন, জাগাতে আর ইচ্ছে হয় না।

—তা হ'লে মিস্তিরমশাইয়ের সঙ্গে রীতিমত তোমার 'টাগ-অব-ওয়ার' চলচে দিদি।

—হাঁ, একরকম তাই।

লুচি এবং আলুভাজা তৈরী হয়ে গেলে মৃণাল চায়ের কাপে চা ঢেলে নিলে। পরে একটা রূপোর থালায় সেগুলোকে সাজিয়ে পাশে কয়েকটা মিষ্টি দিয়ে বল্লে: তুই একটু বোস ইন্দ্রানী, কাকাকে জলখাবারটা দিয়ে আসি বলে মৃণাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পড়াটা রেখে এগুলো খেয়ে নিন রাজাকাকা বলে একটা টুল টেনে এনে মৃণাল তার উপর খাবারের থালা এবং চায়ের কাপটা রাখলে।

রায়বাহাদুর কাগজটা সরিয়ে রেখে বল্লেন: এ কী করেচিস, বেটি! এ যে রাজসূয়ো যজ্ঞ দেখচি। এত জিনিষ কে খাবে বলতো?

ওগুলো আপনি খেয়ে নিন।

—তোর হাতের জিনিষ খেতে আমার খুব লোভ। কিন্তু ডাক্তারের যে বারণ।

—তবে যা পারেন তাই খান।

—ইন্দ্রানী তোর সঙ্গে বুঝি গল্প করচে?

—হাঁ।

—ও আমার গল্প করতে পেলে আর কিছু চায় না।

—ইন্দ্রানীর ব্যবস্থা করিগে, আপনি ততক্ষণ খান বলে মৃণাল কুঁজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে টুলটার ওপর রাখলে।

—আচ্ছা বলে রায়বাহাদুর খেতে বসলেন।

রান্নাঘরে এসে মৃণাল বল্লে: এইবার ইন্দ্রানী তুই নেয়ে নে। দোতলার সিঁড়ির পাশেই বাথ-রুম। নাওয়া হয়ে গেলে আমার ঘরের আলনা থেকে একখানা কাপড় নিয়ে পরিস।

ইন্দ্রানী কোন কথা না বলে কলঘরে গিয়ে ঢুকলো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরে একটু বিশ্রাম করছিলেন। রান্নাঘরে ইন্দ্রাণী খেতে বসেছে। দিলীপের আজ খেলা করতে মন বসছে না। ইন্দ্রানীর কোলে বসে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। স্বামীর আসার ঠিক না থাকায় মৃণাল রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে নিচ্ছে। দিলীপকে বিরক্ত করতে দেখে মৃণাল বল্লে: ও কী কচ্ছে খোকা? বাড়ীতে যে আসচে তাকে তুই দুদণ্ড সুস্থির থাকতে দিবিনে। যা, খেলা করগে যা।

এর জবাব দিলে ইন্দ্রানী। বল্লে ছেলেপিলেরা ওরকম একটু আধটু দুষ্টুমি করেই থাকে, দিদি। তুমি তোমার কাজ কর। অসুবিধে ভোগ করবো তো আমি? বলে দিলীপকে সস্নেহে কোলের মধ্যে টেনে এনে পুনশ্চ বল্লে: খোকন, তুমি বুঝি খুব দুষ্টু হয়েচ?

—না মাসিমা, দুষ্টু আমি মোটেই নই।

—আমাদের বাড়ী তুমি যাবে?

—তোমাদের বাড়ী কোথায়?

—অনেক দূর।

একটু চিন্তা করে খোকা বল্লে: যাবো।

—মার জন্যে তোমার মন কেমন করবে না?

—না, আমি যে বড় হয়েচি। তোমাদের বাড়ী রেলগাড়ী করে যেতে হয় বুঝি?

—হাঁ, মাণিক।
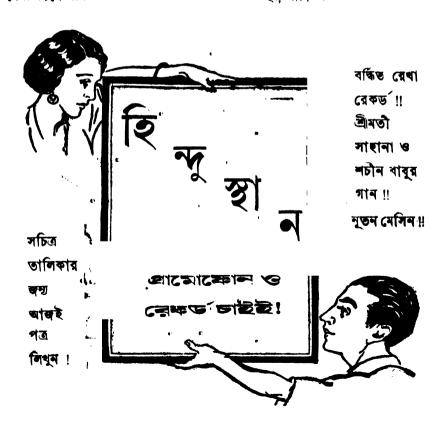
—আমাকে একটা ইঞ্জিন কিনে দিয়ো। মোটর গাড়ী আমার আছে। আমি মোটর চালাতে পারি, জানো মাসিমা?

—তোমায় ভালো একটা ইঞ্জিন কিনে দেবো। আমায় কিন্তু তোমার মোটরে একদিন বেড়িয়ে নিয়ে আসবে?

—সে যে ছোট গাড়ী; তোমার তো জায়গা হবে না, মাসীমা।

—মা, বাবু এসেচেন, চাকর রান্নাঘরে ঢুকে বল্লে: এবেলা উনি খাবেন না, কোথায় খেয়ে এসেচেন।

মৃণাল বল্লে: উনি কোথায় রে মদন?

নীচে।

বাবা এসেছে শুনে দিলীপ মাসীমার কোল থেকে উঠে নীচে নেমে এলো। বল্লে: মাসীমা এসেচে।

—কখন?

—সেই সকালে।

—তুই তাকে চিনিস?

—হুঁ। খুব ভাব হয়ে গেচে বাবা, মাসীমার সঙ্গে আমি চলে যাবো।

—কেন রে?

—তুমি আমার সঙ্গে কথাই কও না।

—একা সেখানে তুই থাকতে পারবি খোকন?

—ভালো না লাগলে আবার চলে আসবো, সকাল থেকে মোটরটা চলচে না, বাবা। বোধ হয় খারাপ হয়ে গেচে। ওটা আবার ঠিক করিগে বলে দিলীপ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্রানী খাওয়া সেরে মৃণালের সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলো। মৃণাল আলনায় কাপড় গুছিয়ে রাখচে।

মৃত্যুঞ্জয়কে ঘরে ঢুকতে দেখে মৃণাল ইন্দ্রানীর দিকে চেয়ে, হেসে কি ইসারা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটা প্রণাম করে ইন্দ্রানী বল্লে: সেই সকাল থেকে আপনার আশায় হাপিত্যেকা করে বসে আছি, এই আসেন এই আসেন করে ধৈর্য্যের বাঁধনও টুটে গেল, বলে ইন্দ্রানী উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভেঙে পড়লো: এই বুঝি আপনার আসার সময় হলো, মিত্তিরমশাই? আস্কারা দিয়ে দিদিই আপনার মাথাটি খেয়েচেন।

এই অপরিচিত মহিলাটির সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের চাক্ষুষ পরিচয় নেই। মৃণালের চিঠির মধ্যে সে জানতে পেরেছিলো ইন্দ্রানী সম্পর্কে তার বোন হয়। এর বেশী জানবার জন্তে সে কোনদিন অকারণ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি। কিন্তু আজ এই মেয়েটির নির্ভীক উক্তি শুনে সে বেশ একটু বিস্মিত হয়ে উঠলো। আজ পর্য্যন্ত এরকম ধরণের কথা কেউ তাকে শোনাতে সাহস করেনি। রীতিমত রেগে গিয়ে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু অন্তরের রাগকে সংহত করে নিয়ে সে বল্লে: আজ যে তোমরা এসে পড়বে তা জানতুম না, ইন্দ্রানী। তা হলে হয়তো সকাল সকাল ফিরতুম।

—না জানিয়ে এসে ভালোই করেচি, মিত্তিরমশাই। জানতে পারলে আজ হয়তো এ বাড়ীতে আর আসতেন না।

—তার মানে বাইরে বাইরে কাটাতুম নাকি?

—অসম্ভব নয়। সে আপনি পারেন।

—কিসে বুঝলে?

—সেটুকু বোঝবার বয়স আমার হয়েচে। নেহাত আনাড়ীর মত চোখ বুজে চলিনা। আজকাল মেজদিকে বুঝি আপনার আর ভালো লাগে না?

—ভালো লাগা না লাগার কথা কোত্থেকে আসচে, ইন্দ্রানী?

—আসচে বৈকি, মিত্তিরমশাই। তা না হলে আপনি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান।

—আমি কাজের মানুষ। একবার কাজ পেলে আমি কারুর নই তা জানো?

—ওরকম করে নিজেকে গোপন করতে চাইচেন কেন? কৈফিয়ৎ দাবী করে বিচার করতে বসিনি। সে ভয় আপনার নেই, মিত্তিরমশাই? নিঃসঙ্কোচে বলুনই না।

—কী বলবো?

—যা সত্যি।

—মিথ্যা কথা বলতে আজও আমি শিখিনি, ইন্দ্রানী!

—এ-বাড়ীতে আমাদের না ওঠাই ছিল ভালো।

—কেন?

—দিদির মুখে যে-রকম আচার-বিচারের বহর শুনলুম তারপর দুদণ্ড এখানে থাকতে প্রাণ যেন হাঁফিয়ে উঠচে।

—ওগুলো মেনে চলা কি অন্যায়।

—ন্যায়-অন্যায় বিচার করার সাহস আমার নেই। ভাবচি আপনাদের ক্ষতির পরিমাণটা।

—ক্ষতি?

—হাঁ। জানেন তো বাবা বিলেত যাবার পর আমরা একঘরে হয়ে আছি। সামনে কিছু না বলুন, আমরা চলে গেলে আমাদের ব্যাভার করা বাসন-কোসনগুলো ফেলে দেবেন এটা সুনিশ্চিত। আপনি রাজী হলেও মা কিছুতেই রাজী হবেন না।

মাকে চেননা তাই ওকথা বলচো, ইন্দ্রানী। ক্ষতি হয়তো হবে স্বীকার করি। কিন্তু তোমাদের মর্য্যাদা আগে। তার কাছে এ ক্ষতিটা কিছুই নয়।

—একটু বসুন, মিত্তিরমশাই, দিদির খাওয়া হলো কী না দেখে আসি বলে ইন্দ্রানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর তারাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা হয়ে গেল। উনি তখন বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে লোহার চেয়ারে বসে হাওয়া খাচ্ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বল্লে: কাজের ভিড়িকে এমন ব্যস্ত ছিলুম কাকাবাবু, যে আপনার সঙ্গে

দেখা করতে পারিনি। যখন ফিরলুম তখন আপনি ঘুমোচ্ছেন। ঘুম ভাঙাতে আর ইচ্ছে হোলোনা। আপনার কোন অসুবিধে হয়নি তো? বলে মৃত্যুঞ্জয় রায়বাহাদুরের পাশে বসলে।

দিব্বি আরামে আছি বাবাজী। কষ্টের আঁচ পর্য্যন্ত গায়ে লাগেনি। স্ত্রী গত হবার পর এরকম হোমলি কম্ফর্ট যে কতকাল ভোগ করিনি তা স্মরণ হয় না। কাজের মানুষকে আমি খুব পছন্দ করি।

অসুখের কথা চিঠিতে লিখেছিলেন, কী হয়েচে আপনার?

রেনাল কলিক। অপারেশন ছাড়া গত্যন্তর নেই। যখন অপারেশন করতেই হবে তখন স্বদেশে ফিরে এসে করাই ভালো, কি বল বাবাজী? মৃত্যু যদি একান্তই ঘটে নিশ্চিন্দি হয়ে তবু মরতে পারবো। একটা কথা তোমায় বলে রাখি এর ব্যবস্থা তোমার করতে হবে।

—বেশতো, বাড়ীতেই এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সকলেই দেখাশোনা করতে পারবে। কালই ডাক্তার ব্যানার্জ্জিকে কল দিচ্ছি।

—সে হলে তো খুবই ভাল হয়। ইন্দ্রানীর ইচ্ছে এখান থেকে সে এম, এ, পড়ে। সে ভারও তোমার ওপর রইলো। বিদেশে থেকে ছুট বলতেই তো দেখা শোনা করতে আসতে পারবোনা।

—আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তা করবো।

—চাকর এসে বল্লে: মা বল্লেন খাবার তৈরী হয়ে গেচে। উনি কি এখন খাবেন না একটু পরে খাবার দেবে।

রায়বাহাদুর বল্লেন: রাত করে কোন লাভ নেই, বাবাজী। ও জিনিষটা যত শীগ্রী শীগ্রী সারা যায় ততোই ভালো। তুমিও বসবে চলো।

আপনি খেতে বসুন আমি যাচ্ছি।

আচ্ছা বলে রায়বাহাদুর উঠে পড়লেন।

রাতে বিছানায় শুয়ে রায়বাহাদুর বল্লেন: এই বাড়ীতেই অপারেশনের ব্যবস্থা করলুম, মা। যা কিছু বন্দোবস্ত মৃত্যুঞ্জয়ই করবে। মস্ত একটা ভাবনা থেকে রেহাই পেলুম।

ইন্দ্রানী বল্লে: এ বাড়ীতে অপারেশন কিছুই হতে পারেনা, বাবা।

রায়বাহাদুর একটু বিস্মিত হয়ে বল্লেন: কেন মা, মৃত্যুঞ্জয়ের তো আপত্তি নেই।

আপত্তির কথা নয় বাবা। সে তুমি বুঝবেনা। এখানে অপারেশন আমি কিছুতেই হতে দেবোনা।

আমায় যে আবার ভাবনায় ফেল্‌লি মা।

আপনি চুপ করে থাকুন, জামাই-বাবুকে বলে মেডিকেল কলেজে এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মেয়েদের কথার প্রতিবাদ করবার সাহস রায়বাহাদুরের নেই। তাই তিনি

শ্রীদুর্ব্বাসা
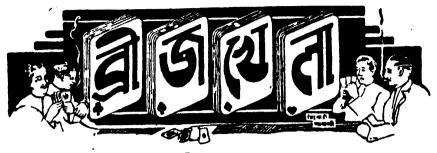
সমস্যার সমাধানঃ—বিগত ৮ম সংখ্যার খেয়ালীতে যে ব্রীজ সমস্যা প্রকাশিত হয়েছিল নিম্নে তার উত্তর দেওয়া গেল।

'পূ' যথাক্রমে ইস্কাবনের তিরি ও রুহিতনের পাঞ্জা দিয়ে গেলেন। এবারে 'দ' চিঁড়ের চৌকা খেলায় 'উ' পিট নিলেন এবং ইস্কাবনের

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, আটা, তিরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা।
চিড়িতন—টেক্কা, নয়, তিরি।

ইস্কাবন—দশ, নয়, পাঞ্জা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—বিবি, তিরি।
চিড়িতন—বিবি, আটা, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—বিবি, সাতা, ছক্কা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—সাহেব, পাঞ্জা।
চিড়িতন—দশ, সাতা, ছক্কা

ইস্কাবন—সাহেব, দুরি।
হরতন—সাতা।
রুহিতন—দশ, সাতা।
চিড়িতন—সাহেব, গোলাম, চৌকা।

হরতন রঙ, 'দ' খেলবেন। বিপক্ষদলের সকল বাধা সত্ত্বেও 'উ'এবং 'দ'কে সব কয়খানি পিট নিতে হবে।

সাতা খেললেন।

'প' চিঁড়ের পাঞ্জা দিলেন এবং 'উ' এবং
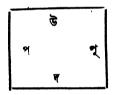
বল্লেনঃ যা ভালো হয় তাই কর মা। আর আমি ভাবতে পারিনা।

পরদিন সকাল বেলায় রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করে বল্লেনঃ মায়ের ইচ্ছে নয় এ-বাড়ীতে অপারেশন হয়। বাবাজী, তুমি মেডিকেল কলেজেই বন্দোবস্ত কর, কেমন?

বেশ তাই হবে কাকাবাবু, মৃত্যুঞ্জয় একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে বল্লেঃ ডাক্তার

গোলাম পেড়ে খেললেন। যদি 'পূ' ইস্কাবনের বিবি ফেলেন 'দ' সাহেব মেরে পিট নিয়ে রুহিতনের সাতা পেড়ে খেলবেন। অতঃপর 'উ' পিট নিয়ে চিঁড়ে খেললেন। এবারেও 'দ' পিট ধরে পুনশ্চ চিড়িতন খেলায় 'প'কে রুহিতন বা চিঁড়িতন পাশাতে হচ্ছে

ব্যানার্জ্জিকে একটা কল দেওয়া দরকার। ফোন করে দিই, কি বলেন?

দাও।

বেলা এগারোটা নাগাদ ডাক্তার ব্যানার্জ্জি এলেন। রায়বাহাদুরকে বেশ করে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্তর লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ঠাকুর ক্যাসেল্ ষ্ট্রীটের শ্রীজয়দেব শেঠ ও শ্রীবীরেন বসাক এ সমস্যাটির উত্তর দিয়েছেন। উপরি লিখিতভাবে খেলা চললে একটি পিটও নষ্ট হবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যেহেতু প্রথম হতেই 'দ' পক্ষের চাল পত্রানুরূপ অবস্থায় আসাই অসম্ভব। অতএব তাঁদের জিজ্ঞাস্যের সমাধান আপনা হতেই হয়ে গেল।

যুগ্ম প্রতিযোগিতা (Pairs Contest):—এই প্রতিযোগিতার পরিচালনা কিরূপভাবে করতে হয় তা' বিগত সপ্তাহে দেখিয়েছি। এবারে কিরূপভাবে প্রতি-যোগিতার 'ম্যাচ পয়েন্ট' দিতে হয় তা' আপনাদের জানাব। মনে করুন উভয়পক্ষ ভালনারেবল অবস্থায় একটা হাত বিভিন্ন আট ঘরে খেলা হয়েছে। খেলার শেষে সেই হাতটার বিভিন্ন ঘরে কিরূপ ফলাফল হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ প্রথমে লিখিত হবে। ধরুন প্রথম ঘরে চারটি ইস্কাবন ডাকা হয়েছিল এবং চারটির খেলা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঘরেও ঠিক তাই। চতুর্থ ঘরে চারটির ডাক হয়েছিল কিন্তু তিনটীর খেলা হয়েছে। পঞ্চম ঘরে তিনটীর ডাক হয়ে চারটীর খেলা হয়েছে। ষষ্ঠ ঘরে তিনটীর ডাক হয়ে তিনটীর খেলা হয়েছে। সপ্তম ঘরে পাঁচটীর ডাক হয়ে তিনটীর খেলা হয়েছে এবং অষ্টম ঘরে চারটির ডাক হয়ে ছয়টির খেলা হয়েছে। তা' হলে খেলার ফলাফল প্রথমে নিম্নলিখিতভাবে লিখিত হবে।

উত্তর-দক্ষিণ।	পূর্ব্ব-পশ্চিম।
১ম ঘর—+৬২০	(—) ৬২০
২য় ঘর—+৬২০	(—) ৬২০
৩য় ঘর—+৬২০	(—) ৬২০
৪র্থ ঘর—(—) ১০০	+১০০
৫ম ঘর—+১২০	(—)১২০
৬ষ্ঠ ঘর—+৯০	(—) ৯০
৭ম ঘর—(—) ২০০	(+) ২০০
৮ম ঘর—+৬৮০	(—) ৬৮০

একটি মুহূর্ত মাত্র!
তারপরই হয়তো রূপসী এই নারীর জীবন আর যৌবনে পড়বে
যবনিকা! বিপুল হাতে ঐ পুরুষ, ভীতিপ্রদ মৃত্যু তার চোখে!
রোমাঞ্চ আর শিহরণ, অভিনব ও অপূর্ব, অভিজ্ঞ পরিচালনা ও
অনবদ্য অভিনয়ে কালী ফিল্মস-এর "কাল-পরিণয়" বাংলাদেশের
ছায়া-শিল্পে সত্যিই হবে একটা নতুন কিছু। নতুন ভাব, নতুন রূপ,
নির্ভীক একটি সাফল্যের এ নব-জাগরণ। তার অগ্রিমপ্রমাণ এর ভূমিকা
—জীবন আর জহর গাঙ্গুলী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য,
শৈলেন চৌধুরী, শীতল পাল, মায়া, রাণী, মনোরমা আর ভুনিয়াবালা।
চিত্র শিল্পী: ননী সান্যাল। শব্দ-যন্ত্রী: মধু শীল। পটশিল্পী: পরেশ বসু।
সম্পাদক: সৈত্যনাথ বাড়ুয়ে ও ল্যাবরেটারী: কে, মুখার্জি।
স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর অভিজ্ঞ প্রযোজনায়!

যেখানে উত্তর-দক্ষিণ দল খেলা জিতেছেন সে ঘরে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী উক্ত খেলায় হেরে গেছেন, সুতরাং উত্তর-দক্ষিণের পক্ষে যে 'স্কোর' (score) যোগ হবে তাঁদের প্রতিপক্ষের ঘরে সে 'স্কোর' বিয়োগ হবে। সুতরাং উত্তর-দক্ষিণ দল যে স্থলে +৬২০ পেয়েছেন পূর্ব্ব-পশ্চিম দল সে স্থলে (—) ৬২০ পাবেন। এখন আটটা ঘরের ফলাফল আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে অষ্টম ঘরের উত্তর-দক্ষিণ দল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী 'স্কোর' করেছেন এবং সপ্তম ঘরের দল করেছেন সর্ব্বাপেক্ষা কম। কাজে কাজেই অষ্টম ঘরের দল পাবেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী 'ম্যাচ পয়েন্ট' এবং সপ্তম ঘরের দল পাবেন সর্ব্বাপেক্ষা কম। তারপরেই ভাল খেলেছেন তিনটী ঘর একসঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। ক্রম পর্য্যায়ে এই তিনটী ঘরের স্থান হচ্ছে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কারণ অষ্টম ঘর প্রথম স্থান লাভ করেছেন। যিনি প্রথম স্থান লাভ করবেন তিনি 'ম্যাচ পয়েন্ট' পাবেন ৭, দ্বিতীয় ৬, তৃতীয় ৫ ও চতুর্থ ৪। এই ভাবে পঞ্চম ৩, ষষ্ঠ ২, সপ্তম ১ ও অষ্টম ০ 'ম্যাচ পয়েন্ট' পাবেন। তা' হলে উপরি-লিখিত ফলাফলের উপর 'ম্যাচ পয়েন্ট' দিলে দেখা যাবে যে

		উত্তর-দক্ষিণ।
১ম ঘর	—	৫ পয়েন্ট।
২য় ঘর	—	৫ পয়েন্ট।
৩য় ঘর	—	৫ „
৪র্থ ঘর	—	১ „
৫ম ঘর	—	৩ „
ষষ্ঠ ঘর	—	২ „
৭ম ঘর	—	০ „
৮ম ঘর	—	৭ „
একুনে		২৮ „

তা' হলে দেখা গেল যে সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ ফল হয়েছে সপ্তম ঘরে। তার অর্থ হচ্ছে এই যে উক্ত ঘরের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিম দল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল খেলেছেন। সুতরাং উক্ত দলের মধ্যে তাঁরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তারপরে চতুর্থ ঘরের প্রতিপক্ষ, কেননা এ ঘরেও উত্তর-দক্ষিণ দল সুবিধা করতে পারেন নাই। সুতরাং এ ঘরের পূর্ব্ব-পশ্চিম দল দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন ষষ্ঠ ঘরের পূর্ব্ব-পশ্চিম দল। এবার দেখুন

		পূর্ব্ব-পশ্চিম।
১ম ঘর	—	২ পয়েন্ট।
২য় ঘর	—	২ „
৩য় ঘর	—	২ „
৪র্থ ঘর	—	৬ „
৫ম ঘর	—	৪ „
৬ষ্ঠ ঘর	—	৫ „
৭ম ঘর	—	৭ „
৮ম ঘর	—	০ „
একুনে		২৮ „

অষ্টম ঘরের পূর্ব্ব-পশ্চিম দল সর্ব্বাপেক্ষা কম পেলেন, কেননা তাঁদের প্রতিপক্ষ পেয়েছেন সব চেয়ে বেশী। এই ভাবে এই প্রতিযোগিতার 'ম্যাচ পয়েন্ট' (match point) গণনা করা হয়।

ঘোরাল ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব—এই সমিতির উদ্যোগে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও এঁদের tournament বেরিয়েছে। ৬ই এপ্রেল এই প্রতিযোগিতার নাম গ্রহণের শেষ দিন। এবার কিন্তু তিনটী প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে—অকসন্ সিঙ্গল্স, অকসন্ ডুপ্লিকেট ও কন্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট। এঁদের ঠিকানা—সেক্রেটারী, ঘোরাল ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব, ১৪।১ জয়নারায়ণ চন্দ্র লেন, কলিকাতা।' সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশন্, এসপ্ল্যানেড্ ইন্‌ষ্টিটুট্, এসপ্ল্যানেড্ ইষ্ট এই ঠিকানায়ও এই প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ পেতে পারেন।

চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং ক্লাব :—

বিগত ১৫ই মাঘ রবিবার এই ক্লাবের বার্ষিক সভা ও তদুপলক্ষে ব্রীজ প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণ হয়ে গেল। ডেপুটি মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা, ব্রীজ এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশ বসু, এ্যাড্‌ভান্স পত্রিকার শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক পরেশবাবু ক্লাবের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা লিপিবদ্ধ করে যে রিপোর্টটী পাঠ করেছিলেন তা' বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। গীত-বাদ্য, জলযোগ, আদর আপ্যায়ন প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানেরই বিন্দুমাত্র ক্রটী হয় নাই। ক্লাবের প্রত্যেকটি সভ্যের সুমিষ্ট ও সুমধুর ব্যবহারে অভ্যাগতবৃন্দ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। বাস্তবিকই এঁদের আতিথেয়তা অনুকরণীয়।

তবে মাত্র একটি কথা এঁদের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাতে চাই। ডেপুটী মেয়র সনৎবাবু এর পূর্ব্বে আরও দুই-একটি ব্রীজ সভায় সভাপতিত্ব করেছেন; কিন্তু প্রত্যেক সভাতেই তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্রীজ খেলোয়াড়গণকে উপহাসাস্পদ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কেন জানি না তাঁর এ ব্রীজ বিভীষিকা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্লাবেই তাঁকে সভাপতিত্ব করতে আবাহন করা হয়। আর তিনিও স্বেচ্ছায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং অতঃপর সভায় উপবেশন করে ব্রীজের নিন্দাবাদ করেন। ব্রীজ যদি তাঁর এতই অপ্রীতিকর তবে তিনি সভাপতিত্ব গ্রহণ না করলেই পারেন। আর ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষকেও বলি তাঁরা কি সভাপতিত্ব করবার লোক আর খুঁজে পান না।

ওপারের ছায়া

— শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি —

হ্যারল্ড লয়েড

ফ্রেড ষ্টোনের বদনাম

'লোকে কেন যে বদনাম রটায়!' এই কথাই উইলি রোজার্স বলে। এই লোকগুলোর সাক্ষাৎ আজো মিলল না। কত চেষ্টাই করছে উইলি।

বন্ধু তার ফ্রেড ষ্টোন। তার নামে বদনাম। সে নাকি দু'পয়সা করে নিচ্ছে উইলি রোজার্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে। এ তাদের নিছক হিংসে।

লোকে বলে ফ্রেড ষ্টোন বন্ধুত্বের জন্যে আয় করতে পেরেছে প্রায় একলাখ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। উইলি বলেছে ও মিথ্যে কথা।

তবে সে যে আয় ক'রতে পারত তা উইলির জানা। কারণ সে যে কিছু টাকার লোভ ত্যাগ ক'রতে পেরেছে, এটাতো উইলি জানে।

ফক্সের একখানা ছবিতে নাম্‌বার জন্যে যবে অনুরোধ এসে পৌঁছল সেদিন ফ্রেডের কাছেও একটা মোটা টাকার চেক এসেছিল, শুধু যদি সে উইলির মত করিয়ে দেয় তাই

এমনি আরও একটা চেক এসেছিল ন্যাশানাল রেডিও ব্রডকাষ্ট থেকে।

আরো এসেছিল। একখানা ম্যাগাজিন অপিস থেকে পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের চেক। আর সেই সঙ্গে যে চিঠিখানা এসেছিল তাতে লেখা ছিল: "মাসের পর মাস উইলির সম্বন্ধে লিখলে আমরা আরো বেশী দিতে পারি।' ফ্রেড কিছু লেখেনি।

তবু বলবে—বন্ধু'তে বন্ধুতে—টেবিলে, ট্রেণে, ট্রামে—উইলির জন্যেই ফ্রেড হচ্ছে বড় লোক।

হার্ব্বার্ট চটেছে

আজকাল হার্ব্বার্ট মার্শাল এ্যান হার্ডিং-এর ওপর একটু চটে আছে। হার্ব্বার্ট ভালবাসে না অমন রসিকতা, এ্যান কিনা তাই করল। অবশ্য দোষ এ্যানের ছিল না। এ্যান বিশ্বাস করেছিলো হার্ব্বার্টের কথায়। তাই ব্যাপারটা হোলো এমনধারা।

হার্ব্বার্ট বলত সে সব সিগারেট খায়না। এক রকম সিগারেট—ওই একই মার্কা সিগারেট ছাড়া দ্বিতীয় অন্য কোন মার্কা সিগারেট খায় না। শুধু খায়না নয় খেতে পারেই না। ওতে ওর অসুখ করবে। তাই ঠিক হোলো, হার্ব্বার্টের মনোমত মার্কা সিগারেট ওর দিনের দরকার অনুযায়ী দেওয়া হবে।

এ ওজর এ্যান বোঝেনি। তাই পরিচালক ষ্টিফেন রবার্টস এর সঙ্গে এক ডলারের বাজী ফেলে বসল। বল্লে—"হার্ব্বার্ট অন্য সিগারেট খেতেই পারে না। একটা টানেই বুঝে ফেলবে যে ও যে সিগারেট খায় এ সে সিগারেট নয়।" এলো নতুন সিগারেট—নতুন তার মার্কা। টানের পর টান দিয়ে হার্ব্বার্ট দিলো সিগারেট শেষ ক'রে। হার্ব্বার্ট তো আর জানত না যে লুকিয়ে এই কাণ্ড করা হয়েছে।

পরিচালক বল্লে—"আমার জিত। দাও টাকা।" পেলো টাকা। আর এ্যান জানলে হার্ব্বার্টের অভিমান। সেইতো বাজী ফেলে—ফেল্লে তাকে মুস্কিলে।

গেব্‌লের গাড়ী কেনা

একটা লোকের ভেজায় সাধ ক্লার্ক গেব্‌লকে একখানি মোটর গাড়ী বিক্রি করবে। লোকটা অবশ্য নতুন গাড়ী বিক্রী ক'রে বেড়ায় এবং সেটাই তার পেশা। তাহ'লে কি হয় এখানে গাড়ী বিক্রি করা বোধহয় তার হোল না। হয়েছে মুস্কিল

যখনি সে আসে ক্লার্ক গেবলের সঙ্গে দেখা করতে তখন হয় দেখা হয় না, না হয় ক্লার্ক গেবল বলে না নোব না।

তাই অনেক ভেবে সে এক মতলব খাটালে। রোজকার কাজ হোল তার রাত্রিতে মেট্রোর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। ক্লার্ক আসে গাড়ীতে চাপে চলে যায়। আর সে যায়। বসে থাকে চুপচাপ দিনের পর দিন; হর্ণ দেয় আর নিরাশ হয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে।

অবশেষে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোল। একদিন গেবল এলো তার গাড়ীর কাছে। গাড়ী তার পছন্দ হোল। তারপর?

তারপর রোজ রাত্রিতে দেখা যায় গেবল সেই ঝকঝকে গাড়ীখানায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মনের আনন্দে।

মার্লিনের গাড়ী

মার্লিনের গাড়ীখানা এত বড় যে ওরকম গাড়ী নাকি হলিউডেই নেই। লোক যদি গিয়ে বলল, তাকে বেশ খুঁজে দেখতে হয়, কোথায় রয়েছে। এত বড় সে গাড়ীখানা। একজন লোক বলে ফেলেছে সেটা নাকি একটা হাতীর মত।

যার গাড়ী এত বড় তার মালিক জানে না গাড়ী চালাতে। লোকে দেখে 'স্বপ্নের গাড়ীতে স্বর্গের পুরী।' গাড়ী চলে হু হু করে বাতাস কাঁপিয়ে। লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মালিক কোথায় বলে খুঁজেই পায় না।

তাই মার্লিন শিখছে গাড়ী চালাতে। "আই লভড্ এ সোলজার" ছবিতে মার্লিন চালাবে সেই গাড়ী। ষ্টিয়ারিং ধরে বসেছে সে এই প্রথম। তিন দিন ধরে শেখা চলেছে ষ্টিয়ারিং ধরা, গিয়ার বদলান, থামান, চালান এই সব।

গাড়ীখানা হচ্ছে ওবর্ণ গাড়ী। অবশ্য এটা যে একটা বিশেষ রকমের এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেচেন।

খুচরো খবর

মরবার আগে জন গিলবার্টকে মার্লিনের সঙ্গে খুব বেশী দেখা যেত।

* * *

এ্যানিটা লুজ নামছে "ব্রাইড্‌স্ আর লাইক দ্যাট" ছবিতে।

* * *

এ্যান সাদার্ণকে দেখা যাবে "হউ মে বি নেক্সট্" ছবিতে।

* * *

হলিউডে যাঁদের রান্নায় নাম আছে। এমন আছেন দশজন। অবশ্য সবাই ভিন্ন ভিন্ন রকমের রাঁধতে পারেন। তাঁদের নাম হচ্ছে—(ক) মিরিয়াম হপকিনস্, (খ) উইলিয়াম পাওয়েল, (গ) মিল্লিসেণ্ট বার-থোলোমিউ, (ঘ) মারলে ওবেরণ, (ঙ) মেরি পিকফোর্ড, (চ) এডি ক্যাণ্টারের স্ত্রী, (ছ) পলেট গডার্ড, (জ) জোয়েল ম্যাক্রি, (ঝ) জিন পার্কার, (ঞ) স্যামুয়েল গোল্ডউইন-এর স্ত্রী।

পপুলার পিকচার্স-এর "আবর্ত্তন" এলো ব'লে। ওপরে হচ্ছে একখানা বিয়ের বাড়ীর দৃশ্য।—এ সবাই বুঝ্তে পারে। কিন্তু, বরকে দেখতে পাচ্ছেন? ঐ যে মালা গলায় চুপ্চাপ্ বসে' ভদ্রলোকটি? কে বলুন তো! ভালো করে' দেখ্লে অনেকেই হয়তো চিন্তে পারবেন। বরটি আর কেউ নয়, সুপরিচিত সুঅভিনেতা ধীরেন ঘোষ।

নী

সংখ্যা

ব্যর্থ চেষ্টা

ılation III
:r powers
ɔf drawing
ıce."

চাকরীয়া
করিয়াছেন।
য়া ছিলেন
নকী করিয়া
রের চাকরী
কালে---৬০
অভিজ্ঞতায়
ত পারিলেন
প্রভৃতি
ার্জ্জন করা
বিকাশ হয় ?

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা
প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা
গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪
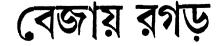
ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৭শে চৈত্র ১৩৪২—9th. April, 1936. } ১৫শ সংখ্যা

"আর কি সময় নাহি রসময় ?"

ব্যবস্থা পরিষদে সুভাষচন্দ্রকে এদেশে আসিতে নিষেধ করা সম্বন্ধীয় যে প্রস্তাবে ভারত সরকারকে বিপুল পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সরকার পক্ষে বক্তৃতা করিতে উঠিলে চারিদিকে বিদ্রূপ গুঞ্জন শুনা গিয়াছিল। তাহাতে লজ্জানুভব না করিয়া তিনি তখনও তাহার পরেও যে রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই কথা মনে পড়ে—রসিক তিন রকমের ---সুরসিক, অরসিক আর বদরসিক। তিনি কোন শ্রেণীর তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তিনি বলেন,—"I see I have become popular on that side of the House." তাহা যে কত সত্য তাহা তিনি সিভিল গার্ডের সময় হইতেই জানেন! তাহার পর--- সুভাষচন্দ্রকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে মামলা সোপর্দ্দ না করিয়া কেন ৩নং রেগুলেশনে আটক রাখা হয়,

সুভাষচন্দ্র বসু

তাহার উত্তরে তিনি রসিকতা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিলেন,--

"Because detention under Regulation III left the Government with greater powers to permit Sj. Bose of drawing a more liberal allowance."

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ চাকরীয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতাও চাকরীয়া ছিলেন এবং তিনি যৌবনে মুন্সেফী করিয়া বৃদ্ধ বয়সে আবার সরকারের চাকরী লইয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘ কালে---৬০ বৎসরেরও অধিক কালের অভিজ্ঞতায় তিনি কি এখনও বুঝিতে পারিলেন না---দেশসেবা, জনসেবা প্রভৃতি অনেক কাজে অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না, কিন্তু তাহাতে মানুষের মহত্ব বিকাশ হয়? তিনি কি বুঝিতে পারেন না——

"অর্থ নহে পরমার্থ?"

দেশসেবা বনাম আত্মসেবা

স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে বাঙ্গালীর কবিশ্রেষ্ঠ গাহিয়াছিলেন :—

"সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এ দেশে
সার্থক জনম আমার
তোমায় ভালবেসে।"

কবিগুরু কণ্ঠ দিয়া তখন দেশেরই মর্ম্মবাণী প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। স্বদেশী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বদেশসেবকগণ দেশসেবা করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। মাতৃভূমির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও ভালবাসা বশতঃ, মাতৃভূমির জন্য ত্যাগের অবসর লাভ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়া, দেশসেবার অধিকারই আত্মত্যাগের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মনে করিয়া তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে দেশের আহ্বানে সাড়া দিয়া কংগ্রেসের তথা দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সেদিনের কংগ্রেসসেবীর আদর্শ ছিল উচ্চ, ত্যাগ ও নিষ্কাম কর্ম্মে গরীয়ান্। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে একটা আদর্শচ্যুতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। কংগ্রেসের ক্ষেত্র আজকাল অনেকের পক্ষে ভাগ্যান্বেষণের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন কংগ্রেসের সেবা করিয়া নাম ও যশ, পদ ও পদবী কুড়াইয়া পরে তাহাই সরকারী ক্ষেত্রে আত্মোন্নতির সুবিধা হিসাবে ব্যবহার করা, আজিকার দিনে যেন বহু কংগ্রেস কর্ম্মীর একটা স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। এবং এই শোচনীয় পরিণতির ফলেই আজ নিষ্কলুষ দেশসেবার আবহাওয়া স্বার্থের আবিলতায় বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজিকার দিনে কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে একটা শৈথিল্য, একটা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব, একটা হতাশার সঞ্চার লক্ষ্য করা যাইতেছে।

আলীপুরের প্রবীণ সরকারী উকীল রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর অবসর গ্রহণে উদ্যত। এই শূন্য পদের জন্য প্রায় চল্লিশজন প্রার্থীর মধ্যে বিদায়ী কংগ্রেসী ডেপুটী মেয়র এবং এবারকার ১৮নং ওয়ার্ডের কংগ্রেসী কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী অন্যতম এ সংবাদ আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহেই দিয়াছি। নিদারুণ দুঃখের সহিত আমরা ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস-সেবীদের মনোভাব ও আদর্শের যে পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই সংবাদে বিশেষ করিয়া উদ্বুদ্ধ। কোন্ কারণে এতদিনকার কংগ্রেসসেবক ও দেশসেবক হইয়া সনৎবাবু আজ সরকারীপদপ্রার্থী তাহার উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, ইহা অভাবে হয় নাই, হইয়াছে স্বভাবে। রায়চৌধুরী মহাশয় অন্যতম বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীরূপে আজ জনসাধারণে সবিশেষ পরিচিত। এই পরিচয়ের সুবিধা তিনি সরকারী চাকুরীর ধাপ্ হিসাবে ব্যবহার করিবেন, ইহা ছিল আমাদের কল্পনার অতীত। সনৎবাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠে না। বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্মান প্রভৃতিতে তিনি সর্ব্বতোভাবে উক্ত পদের উপযুক্ত। কিন্তু তবু মনে হয়, সত্যই কি তাঁহার পক্ষে ইহার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল? ইহাতে কি কংগ্রেসের আদর্শ অবনমিত হইল না? কংগ্রেসসেবীদের আদর্শ নিষ্ঠা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে আঘাত লাগে, এরূপ কোনো কার্য্য তিনি করিতে পারেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহা ধারণা করিতেও পারি নাই।

যাহা হউক আমাদের বক্তব্য এই যে, দুই নৌকায় পা দিবার চেষ্টা করা তাঁহার ন্যায় সুধী ব্যক্তির কখনই কর্ত্তব্য নহে। সরকারী উকীলের চাকুরীর চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার উচিত ছিল কংগ্রেসী কাউন্সিলার পদে ইস্তফা দেওয়া। কংগ্রেস ও দেশের জনসাধারণ একান্ত বিশ্বাসে তাঁহার উপর যে ভার ন্যস্ত করিয়াছিল, আজ যদি তাহা তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বহ গুরুভার বলিয়াই মনে হয়, তাহা হইলে সোজাসুজি সে কথা বলিয়া সে ভার নামাইয়া রাখিয়া বিদায় লওয়াই তাঁহার পক্ষে শোভন ও সঙ্গত।

শ্রীদুর্ব্বাসা

একটি সমস্যা:—পাঠক বর্গের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত নিয়ে একটি সমস্যা দেওয়া হল। হরতন রঙ, 'দ' খেলবেন। প্রতিপক্ষের সকল বাধা সত্ত্বেও 'উ' এবং 'দ'র সম্মিলিত হস্তে সাতখানি পিট পাওয়া চাই।

ইস্কাবন—নাই।
হরতন—গোলাম, পাঞ্জা, চৌকা।
রুহিতন—বিবি।
চিড়িতন—বিবি, দশ, নয়, আটা।

ইস্কাবন—দশ।
হরতন—সাহেব, বিবি।
রুহিতন—দশ, আটা, তিরি
চিড়িতন—গোলাম, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—নয়, আটা।
হরতন—নয়, সাতা, ছক্কা, তিরি
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—সাতা, ছক্কা।

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি।
হরতন—টেক্কা, দশ, আটা।
রুহিতন—সাতা, ছক্কা।
চিড়িতন—টেক্কা।

নিস্কাশন কৌশল ও 'ফিনাস' (Finesse):—অনেক সময় এমন সব হাত আসে যে, আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় ডাক অনুযায়ী সে হাতে খেলা করা অসম্ভব। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সকল হাতে খেলা করে ফেলেন। বলা বাহুল্য যে, নিস্কাশন কৌশল কিম্বা 'ফিনাসের' সাহায্যে তাঁরা এই আপাত-অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তুলতে পারেন। তবে এই দুইটী কৌশল গ্রহণ করবার দুইটী বিভিন্ন ধারা আছে। যেমন ধরুন, বিপক্ষদল ডাক না দেওয়াতে নিজেরা ডেকে ডাক নিয়েছেন এবং অতঃপর খেলা আরম্ভ হলে দেখতে পেলেন যে সাদাসিদেভাবে খেললে খেলা হওয়া একেবারেই অসম্ভব, সে ক্ষেত্রে 'ফিনাস' নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর যে স্থলে বিপক্ষদলের ডাক দেওয়া সত্ত্বেও আপনারা ডাক নিয়েছেন সেই স্থলে নিস্কাশন কৌশলের (Squeeze Play) প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। কারণ সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই বিপক্ষদল আপনাকে কতকটা অনায়ের পিটের আভাস দিলেন এবং তাঁর খেঁড়ীর নীরবতা আপনাদের জানিয়ে দিল তাঁর হাতের অবস্থা। অতঃপর এই দুই বিষয়ের পর্য্যালোচনা করলে নিস্কাশন কৌশল প্রয়োগ করবার সুবিধা হবে। এ সম্বন্ধে নিম্নের হাতখানি দেখুন। 'ফিনাস' নেবার কতকগুলি নিয়ম আছে তা' পরে জানাব।
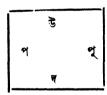
'পূ' তাস-বণ্টন করেছেন এবং 'পূ' ও 'প' ভাল্নারেবল। ডাক হয়েছিল নিম্নলিখিতরূপ

'পূ'	'দ'
একটি রুহিতন।	পাশ।
পাশ।	একটি হরতন।
পাশ।	দুইটি হরতন।
পাশ।	চারটি হরতন।
পাশ।	
'প'	'উ'
পাশ।	ডবল।
পাশ।	দুইটি চিঁড়িতন।
পাশ।	তিনটী হরতন।
পাশ।	পাশ।

'প' খেললেন রুহিতনের আটা। 'পূ' সাহেব মেরে পিট নিয়ে রুহিতনের টেক্কা

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, ছক্কা।
হরতন—বিবি, গোলাম, সাতা।
রুহিতন—বিবি, পাঞ্জা।
চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, সাতা, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—দশ, নয়, পাঞ্জা, চৌকা।
হরতন—সাহেব, নয়, আটা, তিরি।
রুহিতন—আটা, তিরি।
চিড়িতন—নয়, চৌকা, দুরি।

ইস্কাবন—সাহেব, আটা, তিরি, দুরি।
হরতন—চৌকা।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, দশ, চৌকা, দুরি।
চিড়িতন—বিবি, দশ, আটা।

ইস্কাবন—গোলাম, সাতা।
হরতন—টেক্কা, দশ, ছক্কা, পাঞ্জা, দুরি।
রুহিতন—গোলাম, নয়, সাতা, ছক্কা।
চিড়িতন—ছক্কা, তিরি

খেলে নিয়ে হরতনের চার খেল্লেন। 'দ' ছেড়ে দিলেন, আর 'দ' সাহেব দিয়ে পিট নিয়ে ইস্কাবন খেল্লেন। এবার 'দ'র ভাববার সময় এসেছে, কেন না ইস্কাবনের সাহেব যে 'পূ'র হাতে বর্ত্তমান এ খবর তিনি তাঁর ডাক থেকে টের পেয়েছেন, কাজে কাজেই তিনি দেখ্‌লেন যে একটি পিট কম পাচ্ছেন। সে জন্য এ ক্ষেত্রে তাঁর 'ফিনাস' নেওয়া বিধেয় নয়, নিস্কাশন কৌশল বিশেষভাবে প্রয়োগ্য। সুতরাং তাঁকে টেক্কা মারতে হল; তৎপরে তিনি হরতনের বিবি ও গোলাম খেললেন। 'দ' গোলামের উপর টেক্কা মেরে সব রঙ খেল্লেন এবং তাতে খেঁড়ীর ইস্কাবনের বিবি ও ছক্কা পাশিয়ে দিলেন। আর 'পূ'র পক্ষে পাশ দেওয়া এখন ভীষণ কষ্টকর, তিনি যে তাসই ফেলুন না কেন আপনার সেটাই সুবিধা করে দেবে।

ভেনাস্ ক্লাব :—আগামী ১৩ই এপ্রিল সোমবার, 'ভেনাস্ ক্লাব' কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্রীজ প্রতিযোগিতাগুলির নাম গ্রহণের শেষ দিবস। 'ভেনাস্ ক্লাব' যে কলিকাতার নামজাদা ব্রীজ ক্লাবগুলির অন্যতম তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এবং বিশেষ করে প্রতি বৎসরই এঁদের প্রতিযোগিতাগুলি যে সুষ্ঠু পরিচালনায় 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হয় তা' ব্রীজ-সাধারণ ভালভাবেই অবগত আছেন। আশা করি, অন্যান্য বারের মত এবারেও এঁদের পরিপূর্ণ উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ ফলপ্রসূ হবে। এঁদের ঠিকানা—মিঃ ডি, সি, দত্ত, 'ভেনাস্ ক্লাব', ১৮, গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা। এঁদের উদ্যোগে তিনটি প্রতিযোগিতা বেরুচ্ছে,—অকসন্ সিঙ্গল্‌স, অকসন্ ডবল্‌স, কণ্ট্রাক্ট ডবল্‌স।

সাউথ ক্যালকাটা ব্রীজ ক্লাব :—বিগত ২৯শে মার্চ্চ রবিবার, বেহালা পঞ্চাননতলায় এই সমিতির সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। যথারীতি সভার কার্য্য আরম্ভ হলে এ বৎসরের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কার্য্য-পরিচালকবৃন্দ মনোনীত হন।

সভাপতি :—শ্রীযুক্ত বেচারাম মুখোপাধ্যায়।

অবৈতনিক সম্পাদকদ্বয় :—

শ্রীযুক্ত সুশীল মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত জলি মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়।

সদস্যগণ :— „ অনিল পাঠক।

„ করালী চক্রবর্ত্তী।

„ ইন্দু চট্টোপাধ্যায়।

„ জিষ্ণু মণ্ডল।

„ রবি চট্টোপাধ্যায়।

„ যতীশ বসু (ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশন)।

কাল-পরিণয়—উত্তরা'য়

সগৌরবে চলিতেছে

(বিলাসী)

কাল-পরিণয়

কালী ফিল্মস্ চিত্র
প্রযোজক : শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী
গল্প : ৺রামলাল বন্দোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য : শ্রীআশুতোষ সান্যাল
আলোকচিত্রশিল্পী : শ্রীননী গোপাল সান্যাল
শব্দযন্ত্রী : শ্রীমধুসূদন শীল
শিল্প নির্দেশক : শ্রীপরেশ বসু
সম্পাদনা : শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিস্ফুটনাধ্যক্ষ : শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়
পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং

চরিত্র : তারক ঘোষ—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, মনীন্দ্র—শ্রীজহর গাঙ্গুলী, মন্টু—মাষ্টার বুলু, অন্নদা—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কমলাকান্ত—শ্রীশীতল পাল, জগদীশ—শ্রীশৈলেন চৌধুরী, কিশোরী—মায়া মুখার্জ্জি, মোক্ষদা—রাণীবালা, কালী ঝি—দুনিয়াবালা প্রভৃতি।

উদ্বোধন দিবস : উত্তরা, ৪ঠা এপ্রিল '৩৬

মনে আছে?—সেই একদিন সকালে উঠে দেখা গেলো কলকাতার সমস্ত রাস্তা পোষ্টার-এ ছেয়ে গেছে—

"মন্টু! তুমি পল্‌কা-সুতোয় ঘুঁড়ি উড়িয়ো না।"

অনেকদিন আগে সিনেমার নির্ব্বাক যুগে সেই ছিলো পাব্‌লিসিটি। 'ম্যাডানের, এই প্রচার-পত্রের কারণ, আমরা জানতুম, "কাল-পরিণয়"।

কিন্তু, অনেকে ভুলও বুঝেছিলো। বিশ্বকর্ম্মার পুজো তখন আগতপ্রায়। লোকে ভাবলে—বিশেষ কোন ঘুঁড়ির সুতোর এ বুঝি এক বিজ্ঞাপন!

সেই "কাল-পরিণয়" সবাকে আবার সোণা ফলাতে ফিরে' এসেছে। সারদা, মোক্ষদা, মনীন্দ্র, কিশোরী আর কালী এরা ইসারায় আর কথা কয় না। সেদিন শুনে' এসেছি কানে, কালী বলেছে কথা—"কী করো! দিদিবাবু দেখে ফেলবে যে!"

"কাল-পরিণয়"-এর গল্প আবার কী বল্‌তে হবে! সেই, মোক্ষদা বলে' একটি মেয়ে মনীন্দ্র বলে' একটি ছেলেকে ভালবাসতো। মনীন্দ্রের দাদামশায়েরও ইচ্ছে ছিলো তাদের বিয়ে হয়। কিন্তু, আরেকটি টুকটুকে মেয়ে—নাম তাঁর কিশোরী—মনীন্দ্রের মন আগের থেকেই অধিকার করে' বসেছিলো। বিয়ের শঙ্খ বাজলো বটে, তবে তাতে শুধু মিলন হ'লো মণি-কিশোরীর। সারদাকে ভুলেছে কে! সেই সারদা—যে হুইস্কির বুদ্‌বুদে পৃথিবীর লাল-নীল রঙ দেখতো। তার মন ছিলো হায়নার মত ধূর্ত্ত, নিষ্ঠুর। যে-যার মুখে চুমো খাচ্ছে তারই বুকে ছোরা বসাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'তো না। সেই সারদার সঙ্গেই একদিন বিয়ে হ'লো মোক্ষদার। কিন্তু, সুখ তাহার জীবনে উঁকি মারলো না। মণীন্দ্র পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো চাকরীর খোঁজে, আর সারদা মত্ত রইলো মদে আর কালী-ঝি'র প্রেমে। এ কথা দাদামশায়ের কানে পৌঁছুলো। তিনি সারদাকে তাঁর বিষয় থেকে বঞ্চিত করে' মোক্ষদাকে আর মণীন্দ্রকে সমান করে' ভাগ করে' দিলেন। এতে সারদা গেলো চটে'। মোক্ষদা হ'লো খুন। হত্যার অপরাধে মণীন্দ্র পড়লো ধরা—সে দেখা করতে এসেছিলো। কিন্তু বিচারে কালী-ঝি সব ফাঁস করে দিলে। মণি-কিশোরীর দ্বিতীয়বার আবার মিলন হ'লো।

সমালোচনা করতে গিয়ে "কাল-পরিণয়"-এর সবাক ও নির্ব্বাক সংস্করণে তুলনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু, আমরা তা' করবোনা। কারণ, তুলনা এখানে বাঞ্ছনীয় হবে না। শুধু এইটুকু বলবো—নির্ব্বাক "কাল-পরিণয়" সবাক "কাল-পরিণয়"-কে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। তা ছাড়া দর্শকদের আনন্দ দেবার উপাদান এতে যথেষ্ট বিদ্যমান। সে উপাদানের পরিমাণ নির্ব্বাকের চেয়ে সবাকে কিছু কম নয়। বেশ সহজ, সরল এর গতি। বসে দেখতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয় না। মাঝে মাঝে আগ্রহ জাগবার জিনিষও এতে আছে—স্থির, সুনির্ম্মল এক সরোবরে টুপ্ করে' এক ডুমুরের ডুবে পড়া যেন। কেঁপে কেঁপে জলে গোল হ'য়ে ঢেউ উঠলো। সেই ঢেউ-এর গতি চললো খানিকক্ষণ। তারপর, আবার শান্ত, সুন্দর।

হাসির খোরাকও এতে যথেষ্ট। রেষ্টুরেণ্ট-এর এক দৃশ্যে সিগ্রেট্-মুখে এক মহিলার সঙ্গে ক্ষুদে এক বামুনের আগমনে দর্শকদের সেই উল্লাসের হর্ষধ্বনি তার প্রমাণ। তা' ছাড়া 'হরি বোল শম্ভুত' আছেই।

ছবির গতিতে আগ্রহ জাগাবার জিনিষ আরো ছিলো। সে গুলো যে প্রকাশ পায়নি তার কারণ হচ্ছে কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যের প্রবর্ত্তন। কিম্বা, কোন দৃশ্যের অহেতুক একটু বেশী আয়ু। সম্পাদকের সাহায্যে এখনো সেই দুর্ব্বল গ্রন্থীগুলোকে শুদ্ধ করে' তোলা যায়—এই আমাদের বিশ্বাস। তা ছা'ড়া পরিচালকের বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় বেশ পাওয়া গেছে—এমন সব দৃশ্যেরও অভাব চিত্রে নেই। তার একটি প্রমাণ শ্রীমতী মায়া মুখার্জ্জীর কাজ অন্যের ওপর সেরে নেওয়া। আপনারা জানেন শ্রীমতীর রূপের ছটার পরিমাণে অভিনয়ের নিপুণতাটা একটু কম। আমরা দেখে সত্যিই ভারী

সুখী হ'লুম যে প্রযোজক মশাই অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকার এই সুন্দরী নারীকে ক্রমশঃ অভিনেত্রী করে তুলছেন।

ক্যামেরার কাজ মোটের ওপর মন্দ নয়। কিন্তু, ননী সান্যালের কাছ থেকে আমরা আরো উন্নত কাজ আশা করেছিলুম। তার কারণ, ননীবাবু আজ কম দিন হ'লো এ কাজ করছেন না। এতদিনে তাঁর একজন পাকা সুনিপুণ শিল্পী হওয়া উচিত ছিল। ভবিষ্যতে ননীবাবুর কাছ থেকে আমরা আরো উন্নত ও আধুনিক কাজ দেখতে চাই। ছবি তোলার আনুসঙ্গিক সে সমস্ত ধারায় তাঁর আরও দক্ষতা আমরা চাই।

শব্দযন্ত্রে মধুবাবুর কাজ মোটের ওপর ভালো। তবে মনে হচ্ছে নতুন মেশিনটা এখনও তাঁর সঙ্গে একটু আধটু গোলমাল করেছে।

সেটিং যেখানে যেটুকু প্রয়োজন—তার সদ্ব্যবহার হয়েছে।

নেপথ্য-সঙ্গীত খুব বেশী না থাকলেও জায়গায় জায়গায় সুরুচির পরিচয় পেয়ে সুখী হয়েছি। তা দ্বারা গানের সুরগুলোও সুন্দর, বিশেষ করে অনুপম ঘটকের গানটি হৃদয়গ্রাহী ও চমৎকার।

ল্যাবোরেটরীর কাজ তাড়াতাড়ি করা হয়েছে মনে হ'লো। এ ছাড়া বিশেষ নিন্দনীয় এ বিভাগে আর কিছুই নেই।

মোটামুটি দেখতে "কালপরিণয়"-এর অভিনয় বেশ ভালো। সারদার ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীকে চমৎকার মানিয়েছিলো। একটু দ্রুত যেখানে গতি সেখানেই তার আবৃত্তি হচ্ছিলো অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তারক ঘোষের মৃত্যুর দৃশ্যে একদিকে নিষ্ঠুরতা, নির্লজ্জতা অন্যদিকে অল্প একটু করুণার ছোঁয়া তার অভিনয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিলো। মনীন্দ্রের অংশে জহর গাঙ্গুলী মন্দ অভিনয় করে নি। তারক ঘোষ রূপে শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর অভিনয় এককথায় সুন্দর ও স্বাভাবিক। বিশেষ করে মৃত্যুর দৃশ্যে যখন বুকের বেদনা বড় বেশী, সেই যন্ত্রণা-কাতর মুখভঙ্গি অনবদ্য, এবং এ একমাত্র তিনকড়ি বাবুর কাছ থেকেই আশাকরা যেতে পারে। জগদীশের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী মাঝে মাঝে মঞ্চ-ঘেঁষা হ'লেও মোটেই মন্দ নয়। শীতল পালের কমলাকান্ত চরিত্রোপযোগী হয়েছে। শম্ভুর ভূমিকায় চানী দত্ত সবাইকে খুব হাসিয়েছে। অন্যান্য ভূমিকা স্বাভাবিক।

অভিনেত্রীদের ভেতর মোক্ষদার ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালা অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর অভিনয় করেছেন। কিশোরীর অংশে মায়ার কথা আগেই বলেছি। রাকীর পিসিমা চলনসই। এখন বাকী রইলো ভুনিয়াবালার কালী ঝি তা-ও আশাপ্রদ বৈ কি !

এখন আমরা বলতে পারি কালীফিল্ম্স-এর "কাল-পরিণয়" এর প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে—তিনটি, এর রূপ, এর গুণ, এর গান। রীল্-এর পর রীল্ দেখে দর্শকদের প্রাণে আনন্দ

যে উঠ্‌বে রিন্‌ঝিনিয়ে—এ আমরা জানি। সে রিণিঝিণি সাফল্যের সুরে নাচ্‌বে। তাই "উত্তরা"র সপ্তাহের পর সপ্তাহ হবে "কাল-পরিণয়"। অটল, অচঞ্চল হবে এর গতি।

যৌবন হ'লো জয়ী

কেয়া আর কোকিলকে সঙ্গী করে এসেছিলো বসন্ত। কিন্তু, তার বিরুদ্ধে আজ আমাদের নালিশ আছে। সে নাকি মুকুট-হীন এক রাণীর বাতায়নে আজ সাত দিন বয়নি। কে সে রাণী? দুঃখের কথা আর কি বলি, সে রাণী হচ্ছে ক্ষেত্রবালা। কোথায় সে বাতায়ন? আজ্ঞে, আনওয়ার শা' রোডে।

ক্ষেতুর নাকি মাথার মুকুট পড়েছে খসে। তার চুলে নাকি ফুলেল্ পড়েনি, তার চোখে নাকি জল। ধুলোয় লুটোয় নাকি তার জর্জ্জেট্ ওড়না, বার্ণিস্ স্যাণ্ডেল আর মলমল ঘাঘ্‌রা! কোথায় রাণী? আজ্ঞে, গোঁসা ঘরে।

বুক থেকে আজ আমাদেরই নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। হায়, এ রাণীকে সাধ্‌তেও রাজা আর আস্‌বে না।

তুমি বেশী দুঃখ ক'রো না ক্ষেতু। তোমাদের "ভাগ্যচক্রে"র বিজ্ঞাপন পড়েছো তো? সেই যে—'ভাগ্যের চাকা ঘোরে আর ঘোরে'—

তোমার কপালের ওপর থেকে চাকা এখন ঘুরেছে। 'বিজয়া'র নলিনী তোমার তো নেই-ই, তা ছাড়া, কিছু মনে ক'রোনা—ওখানে তোমার এখন থাকা যেন পদ্মের পাতায় জল—টলমল।

জিজ্ঞেস করছো—কার মাথায় তোমার মুকুট, কার পায়ে তোমার নূপুর, কার গায়ে তোমার ওড়্‌ণা?

বল্‌ছি শোনো। সেদিন সন্ধ্যেয় হৈ হৈ। হিন্দী "দেনা পাওনা"র সভায় যে বাঁদী সেদিন নাচ্‌তে এসেছিলো—সেই হয়েছে এখন বি ইউনিটের নমরু বেগম। তার ডাক নাম—লক্ষ্মী। তার পায়ে নাকি স্বাভাবিক আল্‌তা, তার নথ দেখে মুক্তো নাকি হিংসে করে। তার যৌবনে বারো মাস বান্ ডাকে। কানে কানে বল্‌ছি ক্ষেতু—তার যৌবনকে জামা দিয়ে নাকি ধরা যায় না। এত অস্থির, এত চঞ্চল।

আর বেশীক্ষণ দেখা হ'লো না জানো! হুট্ করে এক শেয়ালের ডাক বলে—হাটু, হাটু। বলি—কেন? না, আসে বাদশা, আসে বেগম।

ঘাড়টা নীচু করে' কায়দায় বলি—আদাব।

নতুন বেগম মুখে হাসে না। কিন্তু, তার সুরমা-চোখ দিয়ে হাসির ঝরে ফুলঝুরি!

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফিল্ম

কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে আমরা সেদিন উক্ত প্রতিষ্ঠানের "সোনার-সংসার" চিত্রের বস্তী দৃশ্যটি দেখে এসেছি। ষ্টুডিওর উত্তর দিকের প্রাঙ্গনের একধারে বিরাট এক বস্তী, এমন নিখুঁতভাবে তৈরী হয়েছে, যে দেখে মনে হয়—বহুকাল ধ'রে হয়ত' এখানে এমনি একটি জনবহুল বস্তীর অস্তিত্ব ছিল। দোকান ঘর, মুদীখানা, পশুশালা ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের, ভিন্ন ভিন্ন অবাসগৃহগুলি অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে তৈরী হয়েছে। পরিচালক দেবকী বাবুর নিখুঁৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বিরাট বস্তীটিকে রূপ দিয়েছেন—ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সুবিখ্যাত কারু-শিল্পী, শ্রীযুত বটু বাবু। আমরা তাঁর নৈপুণ্যের প্রশংসা করি।

বস্তীর এক কোনে সেদিন এক বৈষ্ণবীর নিত্যপূজার ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তন গানে মুখর হোয়ে উঠেছিল। মাথায় চুড়ো বাঁধা ও গেরুয়া কাপড় পরা বোষ্টুমিটিকে আপনারা সবাই চেনেন। ইনি সুবিখ্যাত গায়িকা—শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া)।

আর একদিকে দেখলুম, হাতে ওভার কোট ঝুলিয়ে একটি ফুটফুটে বেকার ছোকরা আর

একটি বেকার যুবতীর সঙ্গে বেশ নিরিবিলিতে ফিস্‌ফাস্ কোরছে।

আদতে এঁরা কিন্তু সত্যই বেকার ন'ন। ছোকরা বাবুটি—আমাদের জনপ্রিয় শিল্পী ধীরাজ ভট্টাচার্য্য। তন্বীটি—'বোম্বাই-ফেরৎ বাঙ্গালীর মেয়ে, মেনকা।

পরিচালক দেবকী বোস যে যত্ন দিয়ে ছবিখানি তুলেছেন, তা'তে মনে হয়—এখানি একখানি শ্রেষ্ঠ ছবি হ'বে।

"পথের শেষে"
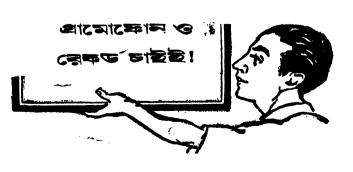
"শ্রী" ছবিঘরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার "পথের শেষে" এখনও বেশ জনতা আকর্ষণ কোরছে। এই শনিবার থেকে ছবিখানা পঞ্চম হপ্তায় পড়লো।

ডি-জি-টকীজ

চিত্ররাজ্যে 'ডি-জি'-র নিজের প্রতিষ্ঠান আবার গড়ে উঠ্‌তে দেখে সবাই হ'য়েছে বেশ খুসী। বহুদিন ধরে তিনি চিত্ররাজ্যে বাস কোরে এ শিল্পের উন্নতির জন্যে কী না কোরেছেন। তাঁর নিজের হাতে গড়া 'ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান' আজ নেই সত্যি; কিন্তু যতদিন ফিল্মশিল্পের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন 'বি-ডি-এফ'-এর কবর থেকে 'ডি-জি'-র নাম হবে ধ্বনিত। তাঁরই হাতে গড়া শিল্পীরা আজ বাঙলার কয়েকজন নাম করা পরিচালক—এটা তাঁর পক্ষে কম গৌরব নয়! তাঁর নতুন প্রতিষ্ঠানের নতুন ছবি 'দ্বীপান্তরে'-র মহলা চলছে। ধীরেন বাবু বললেন সেদিন—"পুরণো মুখ এতে আমি দেখাব না।" কথাটা খুব ভাল জহর-জ্যোৎস্না, অহীন-মনোরঞ্জন, কানন-রাণী দেখে দেখে লোকে হয়েছে অতিষ্ঠ। 'ডি-জি'-র নব-প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হ'ক এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছে।

কোয়ালিটি পিকচাস

এদের "ব্যাথার দান" কাল থেকে 'চিত্রা'য় সুরু হবে। নতুন পরিচালকের নতুন ছবি যদি চিত্রপ্রিয়দের আনন্দ দিতে পারে—তা' হ'লেই তাঁর নাম হবে।

এই সঙ্গে ধীরাজ ভট্চায্যের তোলা "জোয়ার-ভাঁটা" ছোট হাসির ছবিও দেখানো হবে। ধীরাজের এ ছবিখানার বিশেষত্ব সবাই প্রায় এ ছবিতে প্রথম ছায়ার আলোয় ধরা পড়েছে।

চন্দ্র ফিল্মস্

এদের "পরপারে"র শুটিং আধাআধি শেষ হ'য়েছে। যে ক'দিন শুটিং আমরা দেখেছি—তা'তে মনে হয়, যতীন দাস
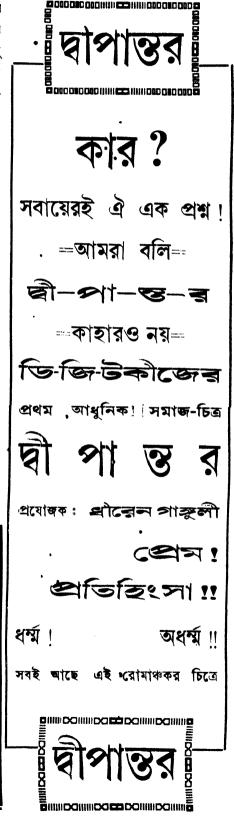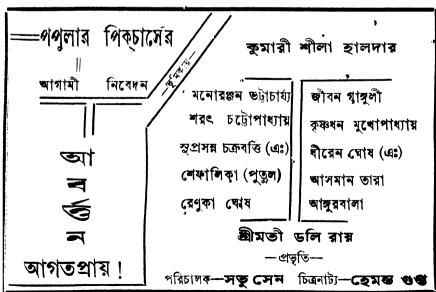
ক্যামেরার কাজে যেমন নাম কিনেছেন, পরিচালনাতেও তেমনি নাম কিনবেন। ছবিখানার সাফল্যের জন্য শিল্পীরা ত' আছেনই—তার ওপর প্রবোধ দাস, জ্যোতিষ সিংহ, সন্তোষ সিংহ, অয়স্কান্ত বক্সী, শান্তিময় বাঁড়ুয্যেও পরিচালকের সঙ্গে সমানভাবে কাজ কোরছেন। এদের সমবেত চেষ্টা অল্পদিনের মধ্যেই যে এদের শ্রম সার্থক কোরে তুলবে—এ ধারণা অস্বাভাবিক নয়!

কালী ফিল্মস্

এরা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের "হারানিধি" নাটকের স্বত্ব কিনেছে। ছবিখানা প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর নিজ পরিচালনায় তোলা হবে। পুজোর সময় যাতে ছবিখানা মুক্ত হয় তার চেষ্টা চলছে।

এদের "অন্নপূর্ণার মন্দিরে"-র শুটিং বেশ জোরে চলেছে। বৃদ্ধ তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ছবিখানার সাফল্যের জন্যে যে রকম খাটছেন—তা'তে মনে হয়, পরিচালনায় এবার হয়ত' তাঁর সুনাম হবে।

পপুলার পিক্‌চার্স

এদের "আবর্ত্তনে"-র শুটিং অবিশ্রান্তভাবে চলছে। ছবিখানার সাফল্যের জন্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা মালিক থেকে আরম্ভ কোরে কর্ম্মীবৃন্দ কোরছেন তা' সত্যই প্রশংসার্হ।

এই সঙ্গে ননী দাশগুপ্ত লিখিত "নারদের অ্যাট্‌ হোম" নামে একখানা হাসির ছবি এরা তোলার ব্যবস্থা কোরছেন। হেমন্ত গুপ্ত ছবিখানার পরিচালনা কোরবেন। হেমন্তবাবুর ওপর বিশ্বাস আমাদের আছে—সেজন্য মনে হয় ছবিখানা ভালই হবে।

ইটালী টকীজ

এখানে রাধা ফিল্মের রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-চিত্র "কণ্ঠহার" তৃতীয় হপ্তায় পড়্‌ল। ছবিখানা এ অঞ্চলে যে বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়েছে তার প্রমাণ—এখনও পর্য্যন্ত এ চিত্রগৃহে এই ছবি দেখবার জন্যে অসম্ভব জনসমাগম হ'চ্ছে।

শ্রীভারত লক্ষ্মী পিক্‌চার্স

"বাঙ্গালী" আর হাসির ছবি "বেজায় রগড়" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। অনেকদিন পরে এদের তোলা বাংলা ছবি আসছে তাই দর্শকরাও প্রতীক্ষায় রয়েছে।

রূপবাণী

"কৃষ্ণ-সুদামা" এখানে সাত হপ্তায় পড়্‌ল তবুও দর্শক বেশ হ'চ্ছে মনে হয়। ভক্তি-রস যে ভক্তিপ্রবন বাঙ্গালীদের হাসি কান্নায় মাতিয়ে তোলে—এ ধারণা নিতান্তই স্বাভাবিক।

শ্রীমতী ছায়া দেবী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া

মাননীয় "খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু—

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

গত সংখ্যার "খেয়ালী" পত্রিকায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়ার অভিনেত্রী, শ্রীমতী ছায়া দেবী সম্বন্ধে আপনারা যে সংবাদ পত্রস্থ করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট, উক্ত অভিনেত্রী কোন রঙ্গালয়ে যোগদান করেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সহিত তিনি যে কণ্ট্রাক্ট করিয়াছেন ঐ চুক্তির মর্ম্মানুযায়ী তিনি এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া অপর কোন স্থানে যোগদান করিবার এবং অভিনয়-কলা প্রদর্শন করিবার অধিকারিণী নহেন।

অতএব আশা করিতে পারি, আগামী সংখ্যার "খেয়ালী"-তে গত সংখ্যায় প্রকাশিত ভুল সংবাদের সংশোধনের সুব্যবস্থা করিবেন। নিবেদন ইতি।

বিনীত—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর পক্ষ হইতে

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

(পাব্‌লিসিটি ম্যানেজার)

[শ্রীমতী ছায়া দেবী সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর পক্ষ হইতে প্রচার সম্পাদক শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ উপরে প্রকাশিত হইল।

নাট্য-নিকেতনে 'কেদার রায়ের' অভিনয়ে যে ছায়া দেবী নাম্নী অভিনেত্রীর নাম বিজ্ঞাপিত হইতেছে তাঁহার সম্বন্ধে নাট্য-নিকেতনের কর্তৃপক্ষ কোন বিবৃতি পাঠাইলে আমরা তাহাও পত্রস্থ করিব।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও নাট্য-নিকেতনের কর্তৃপক্ষের বিবরণী পাইলে ছায়া দেবী নাম্নী অভিনেত্রী সম্বন্ধে জনসাধারণের সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান হইবে।

সঃ খেঃ]

বোম্বাইয়ে জননায়ক সুভাষচন্দ্র বন্দী

-:o:-

আর্থার রোড হাজতে নীত
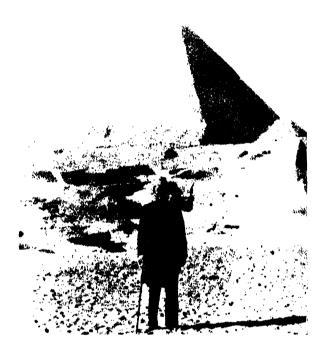
ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে কায়রোতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পিরামিডের সম্মুখে সুভাষচন্দ্র

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কুণ্ঠাহীন শঙ্কাহীন জাগ্রত পাবক
দেশজননীর প্রিয় সন্তান-সাধক
বিদেশের রাজভোগ তুচ্ছ তব কাছে;
এদেশের কারাগার—তবু তাহে আছে
দেশজননীর স্পর্শ, এদেশের মাটি
তব কাছে মাটি নয় স্বর্ণরেণু খাঁটি।
দেখুক নির্ব্বীর্য্য দেশ আদর্শ তোমার
আত্মত্যাগ আনন্দের মহা পারাবার
গাহন করিয়া তাহে হোক্ সবে পূত
ভীরু যেও সেও হোক্ তীব্রশক্তি যুত
সার্থক জনম তব পূর্ণ তব দান
বিশ্বেতে রাখিলে আজি বাঙ্গালীর মান।

প্রথম সংবাদ

বুধবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় বোম্বাই হইতে টেলিফোন যোগে খবর আসে যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করিবার পর ১৮১৮ সালের তিন আইন বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে আর্থার রোড ফাঁড়িতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ন্যাশান্যাল নিউজ্‌পেপার্সের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বুধবার প্রাতে ন্যাশানাল নিউজপেপার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহটাকে নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছিলেন:—

Subhas Bose
Care Mayor
Bombay.
National Newspapers' Respectful Homage.

বোম্বাইএর বাজার বন্ধ

বোম্বাই, ৮ই এপ্রিল

শ্রীযুত সুভাষ বসু গ্রেপ্তার হওয়ায় তুলা, সোনা, রূপা ও শস্যের বাজারে কোন কাজকর্ম্ম হয় নাই। এ, পি

পরবর্ত্তী সংবাদ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র ১০-২০ মিনিটের সময় জাহাজ হইতে অবতরণ করেন তৎক্ষণাৎ পুলিশের একজন ডেপুটী কমিশনার আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন এবং একটি মোটর সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে আলেকজেন্দ্রিয়া ডকে লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে মোটরযোগে তাঁহাকে আর্থার রোড পুলিশ ফাঁড়িতে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বসু যে জাহাজে আসিয়াছেন তাহা বেলা সকাল ৯টার সময় বন্দরে আসিয়া পৌছে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রকে দূর হইতে চেনা যাইতেছিল। ভোর হইতে বিপুল জনতা ডকে আসিয়া সমবেত হয় এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্রই জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দন করে। সুভাষচন্দ্র স্থির ভাবে অভিনন্দন গ্রহণ করেন। পুলিশ দল অবতরণ স্থানের নিকটে অপেক্ষা করিতেছিল কিন্তু শ্রীযুত বসু ১০-১৫ মিনিটের আগে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন নাই। এ, পি

বিবিধ

কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা

কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহার অকাল মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। এক বৎসরও হয় নাই তাঁহার পিতা রাজা হৃষীকেশ লাহা পরিণত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত ও তাঁহার দীক্ষায় দীক্ষিত কুমার সুরেন্দ্রনাথ পিতার শূন্য স্থান আমাদিগের ব্যবসায়িক ও সামাজিক জীবনে পূর্ণ করিবেন। তখন কে কল্পনা করিয়াছিল, তিনি এত অল্পদিনের মধ্যেই ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইবেন?

কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা

সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে লাহা পরিবারের ব্যবসায় যোগ দেন। তাঁহার কুলক্রমাগত ব্যবসাবুদ্ধি অনুশীলনে তীক্ষ্ণ হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল তিনিই কৃষ্ণদাস লাহা কোম্পানীর কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেন। কিছুদিন হইতে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহার মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। উভয়ে প্রথমে হৃষীকেশ অয়েল মিল প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে বঙ্গেশ্বরী কাপড়ের কলে আবশ্যক অর্থ সরবরাহের ভার গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথ ঐ কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

সুরেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালার বিশেষ ক্ষতি হইল।

আমরা তাঁহার পরিজনগণকে আমাদের সহানুভূতি নিবেদন করিতেছি।

কাউন্সিলার সম্বর্দ্ধিত

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের রাসবিহারি এভিন্যুস্থ "কুসুম-ভিলা" ভবনে ডাঃ সুবোধ কুমার সেন, ২৭নং ওয়ার্ডের নব-নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেনকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এক প্রীতি-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। সভায় কৌতুক, সঙ্গীত, বক্তৃতা বিশেষ শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, ডাঃ টি, এন্, মজুমদার, প্রফেসর জিতেন্দ্রচন্দ্র গুহ, মিহিরকুমার সেন, তারকচন্দ্র দাস, রায় সাহেব কালি সদয় ঘোষাল, সাইগল, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, পরিতোষ বন্দ্যো, হর্ষনাথ মুখো, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের জে, সি দাস, ব্যারিষ্টার এস. কে, গুপ্ত, নলিনীমোহন বন্দ্যো, রায় বাহাদুর টি, সি, রায়, এস, সি, সেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ সেন অভ্যাগতদের সান্ধ্য-ভোজের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

সেতুবন্ধ

= উপন্যাস =

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সম্প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের সংসারে আর একটি নোতুন লোকের আবির্ভাব হয়েছে। মৃণালের মাসতুতো ভাই অনুপম, ক্রিসমাসের সময় কলকাতায় বেড়াতে এলো।

সকাল বেলায় ইন্দ্রানী দিদির ঘরে ঢুকে কি একটা কথা বলতে যাবে, একজন অপরিচিত লোককে দেখেই চুপ করে গেল।

মৃণাল বল্লে: এক কাপ চা দেবো, ইন্দ্রানী?

—না থাক। এইতো চাকরটা এক কাপ চা দিয়ে এলো।

—আর এক কাপ না হয় খেলেই। 'তোর আবার চায়ে অরুচি' বলে এক কাপ চা ইন্দ্রানীর দিকে এগিয়ে দিলে। পরে অনুপমের দিকে চেয়ে বল্লে: একে তুই চিনিস অনুপম?

—কী করে চিনবো, দিদি? কাল রাতে তো সবে এসেচি।

—ইন্দ্রানী সম্পর্কে আমার বোন। পরে ইন্দ্রানীর দিকে ফিরে বল্লে: অনুপম আমার মাসতুতো ভাই। কলকাতায় বেড়াতে এসেচে। ওমা এখন তুই চায়ের কাপে হাত দিসনি। নে খেয়েনে, অনুপমের সামনে তোকে আর লজ্জা করতে হবেনা।

'এই খাই' বলে ইন্দ্রানী চায়ের কাপটা কাছে টেনে নিলে।

ততক্ষণ তুই অনুপমের সঙ্গে কথা ক ইন্দ্রানী, রান্নাঘরের ব্যবস্থা করিগে।

—আজ থাক দিদি। এখানে উনি তো এখন রইলেন, আর একদিন আলাপ করলেই চলবে। কলেজে ভর্ত্তি হবার আগে বইগুলো একবার নেড়েচেড়ে দেখি।

রেখে দে তোর পড়াশুনা। পাশ করে সবই হবে। মৃণাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের চারিদিকে নিস্তব্ধতা, শব্দ-তরঙ্গের উপর ক্ষীণ উচ্ছ্বাসটুকু পর্য্যন্ত নেই। এখনও পর্য্যন্ত ইন্দ্রানী চায়ের কাপে মুখ দিতে পারেনি। এর আগে সে কত নব-পরিচিত লোকের সঙ্গে সহজকণ্ঠে আলাপ করেছে, এতটুকুও দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু আজ অনুপমের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে কেন যে যত রাজ্যের সরম-সঙ্কোচ এসে তার কণ্ঠনালী রোধ করে দিলে বহু চেষ্টা করেও সে এর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে পারলেনা।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে অনুপম। বল্লে: চাটা কিন্তু জল হয়ে গেল।

কোন কথা না বলে ইন্দ্রানী এক নিশ্বাসে চায়ের কাপটা শেষ করে ফেল্লে।

—আপনি বুঝি পড়েন?

—এম, এ দেবার ইচ্ছে আছে।

—কি সাবজেক্ট নিয়েচেন?

—ফিলজফি। কিন্তু এতগুলো বইয়ের একটা পাতাও উল্টে দেখিনি।

—বই না পড়ায় কিছু আপনার এসে যাবেনা। এম-এ-তে আমারও ওই সাবজেক্ট ছিল। এখন কিছুদিন এখানে আমি আছি। আপনাকে মোটামুটি জিনিষগুলো দেখিয়ে দেবো'খন।

—অনুপমবাবু! কোলকাতায় এসেচেন আপনি বেড়াতে। কোথায় দু'দিন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াবেন তা নয়, খামাকা আমার পেছনে মিছামিছি সময় নষ্ট করতে বলিনা।

—চব্বিশ ঘণ্টা তো আর পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াবোনা। একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার যথেষ্ট সময় করতে পারবো।

—দরকার নেই। যা পারি নিজে নিজে দেখে নেবো।

—আমার অযাচিত সাহায্য আপনি চান না, এই তো?

—ঠিক তা নয়। আপনাকে বিরক্ত করতে রাজী নই।

—বিরক্ত হবো তো আমি, ওজন্যে আপনি কেন মাথা ঘামাচ্চেন, বলুন তো?

—ঠিক ও জিনিষটাও ভাবচি না।

—তবে?

—আর একদিন বরং আমি আমার মতামতটা আপনাকে জানাবো।

—বেশ তাই করবেন।

'দেখি দিদি আবার কোথায় গেলেন' বলে ইন্দ্রানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনুপম কিন্তু ইন্দ্রানীকে থাকবার জন্যে একটি বারও অনুরোধ জানালেনা। সে এমনি প্রকৃতির লোক যার হৃদয়ের নিভৃত-মণিকোঠায় আজ পর্য্যন্ত কোন নারী স্থান পায়নি। ইন্দ্রানীর যৌবনের রূপসম্ভার যে-কোন পুরুষের কাম্য। অথচ অনুপমের কাছে এর কোন দাম নেই। প্রেম-সম্পর্কিত

ব্যাপারে সে একেবারেই উদাসীন, যোগাসনে উপবিষ্ট যোগীর ন্যায় নির্ব্বিকার।

ইন্দ্রানীর অন্তর্দ্ধানে অনুপম টেবিলের উপর থেকে একটা বাংলা ম্যাগাজিন নিয়ে পড়তে লাগলো। কথা না বলা নিতান্ত অশোভন এই মনে করে অতি নীরস কয়েকটি প্রশ্ন সে ইন্দ্রানীকে করেছে। এর বেশী হয়তো কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহসই করতোনা।

রায় বাহাদুরের অপারেশন নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেছে। ক্রমশঃ তিনি আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলেচেন। ইন্দ্রানী প্রত্যহ পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে বাবাকে দেখতে যায়। আজও বেরোবার সময় মৃণালকে বল্লে: অনুপমবাবু কোথায় গেলেন, দিদি?

বোধ হয় নীচে আছে, দেখ দিকি।

বাইরের ঘরে ইন্দ্রানী অনুপমকে দেখতে পেলেনা। অনেক খোঁজাখুজির পর সে আবিষ্কার করলে বাগানের একটা লোহার চেয়ারে অনুপম চুপ করে বসে আছে।

একটু বেড়িয়ে আসি, চলুন, অনুপমবাবু?

—কোথায় যাবেন?

—উপস্থিত হাঁসপাতালে বাবাকে দেখতে। তারপর ওখান থেকে যেখানে হোক বেড়াতে গেলেই হবে। গাড়ী প্রস্তুত, আর দেরী করবেননা উঠুন।

অনুপম কোন কথা না বলে গাড়ীর মধ্যে এসে উঠলো। সারা রাস্তাটা সে অনুপমের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

ইন্দ্রানী বিছানার পাশে এসে বসতেই বাবা বল্লেন: একে তো চিনিনা, মা।

—উনি দিদির মাসতুতো ভাই। কোলকাতায় বেড়াতে এসেচেন।

—বেশ, বেশ, এই পাশেই বসো বলে রায়বাহাদুর হাতের সঙ্কেত করলেন।

খানিকক্ষণ কথা কইবার পরে সাড়ে ছটা নাগাদ ইন্দ্রানী বল্লে: আজ একটু সকাল সকাল উঠবো, বাবা।

—কেন মা?

—অনুপমবাবুকে সহরটা একটু দেখিয়ে শুনিয়ে আনবো।

—তুই কি সব পথঘাট চিনিস, মা?

পথ-ঘাট না জানায় বিশেষ কোন অসুবিধে হবেনা, বাবা। মোটরে যে যাচ্ছি।

—রাস্তায় যে রকম গাড়ীর ভীড় একটু সাবধানে যাস।

—আচ্ছা।

গাড়ীতে উঠে অনুপম বল্লে: সন্ধ্যার আগে ফিরবেন তো?

—লেকে পৌঁছুতেই তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

—ফিরতে তা'হলে রাত্তির বলুন?

—নটা তো নিশ্চয়।

—না, না, ততক্ষণ আজ বাইরে থাকা চলবেনা, দিদি ভয়ানক বকাবকি করবেন।

—বকুনির হাত থেকে রেহাই পাবার ভার আমার। আমার সঙ্গে একলা যেতে আপনার বুঝি ভয় করচে?

—না, ভয় আপনার জন্যে নয়।

—তবে চোর ডাকাতের? আমি ভরসা দিচ্চি আমি আপনার সঙ্গে থাকতে কেউ আপনাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেনা।

—মোটরে চড়লেই আমার কেমন যেন ভয় হয়। সব সময় মনে হয় ছিটকে পড়ে যাবো। এত জোরে গাড়ী ছুটে চলেছে যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

—ভয় কি আমি তো আপনাকে প্রায় আঁকড়ে ধরে আছি। নোঙর-বাঁধা নৌক কি বাণের জলে ভেসে যায়?

কিন্তু শিকল শক্ত না হলে ছিঁড়ে যেতেও তো পারে!

—'পরীক্ষা করে দেখুন না, ছিড়তে পারেন কিনা' বলে ইন্দ্রানী নিজের হাতটা প্রসারিত করে ধরলে।

—উঃ, ছাড়ুন, আপনার হাত কি শক্ত।

—গাড়ীটা এখানে থামলো কেন, ইন্দ্রানী?

—একটু দাঁড়ান আমি আসচি।

* * * *

—কী চমৎকার ফুল বলে অনুপম হাত বাড়ালে: এত বড় গোলাপ ফুল কোথায় পেলেন বলুন তো?

—চেষ্টা করলে কী না পাওয়া যায়।

—ভারী লোভ হচ্ছে, একটা নেবো?

—আপনার জন্যেই তো আনলুম।

—আমার জন্যে?

—হাঁ। আরো চান তো এনে দিতে পারি।

—এইতো যথেষ্ট। এত ফুল নিয়ে কী হবে।

—কী আবার হবে? ফুল নিয়ে আবার কি হয়? একটু পরে শুকিয়ে গেলে আপনার বাক্সের মধ্যে তুলে রেখে দেবেন।

—কেন?

—দেশে গিয়ে কোন দিন বাক্স খোলেন তো আপনার মনে পড়বে।

—এগুলো না থাকলে কি আপনার কথা মনে পড়তোনা?

—কি জানি, নাও তো পড়তে পারে। আপনি এখানে কদিন থাকবেন?

—'যদ্দিন আমাকে আপনি থাকতে বলবেন। এখনো একটানা ছুটি রয়েচে—' বলেই অনুপম কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

—তার মানে?

—আপনার ইচ্ছের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করচে।

—আপনি কী যে কথা কন নিজেই তা ভালো করে বোঝেন না।

—কী জানি, হয়তো আপনার কথাই

এইবার লেকের মধ্যে গাড়ী ঢুকলো। এইখানেই নাবি আসুন। লেকটা একটু ঘুরে বেড়াই।

কোন কথা না বলে অনুপম নেবে পড়লো।

অনুপমবাবু, আজকের চাঁদনি রাত কী-চমৎকার দেখেছেন। চলুন না একটু রো করি।

—আজ থাক, ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

—আমার সঙ্গে নৌক চড়তে বুঝি সাহস হচ্ছেনা?

—ঠিক তা নয়।

—ভয় নেই, অনুপমবাবু। ঠেলে ফেলে আপনাকে দেবোনা। আপনাকে একবার অভয় যখন দিয়েচি তখন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর যদি একান্তই ডুবি তো দুজনেই ডুববো।

—কটা বাজে বলুন তো?

—কেন? এর মধ্যে ফিরবেন নাকী? রাত যে মোটে সাড়ে সাতটা

হাঁ।

—চলুন। আপনার মত লোককে সঙ্গে করে নিয়ে বেরোনোও বিপদ।

আজ সকাল বেলায় রায়বাহাদুর কলেজ থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। সিড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে তিনি গাড়ীতে উঠে বল্লেন: এদ্দিন পরে মুক্ত বাতাসে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, মৃণাল।

ভালোয় ভালোয় সেরে উঠেচেন, এই যথেষ্ট রাজাকাকা, একটু থেমে মৃণাল বল্লে: ওখানে কি আপনার খুব কষ্ট হয়েচে?

অন্য কোন অসুবিধে বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি, মার যত্ন-আত্তিই আমাকে সব ভুলিয়ে রেখেছিলো বলে রায়বাহাদুর অন্য দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন: ডাক্তারবাবুও যা করেচেন তা সহজে ভুলতে পারবোনা, মৃণাল। কিন্তু দিনরাত বিছানায় আটকে পড়ে থাকাটা মস্ত বড় ঝঞ্ঝাট বলে মনে হতো।

—সত্যিই তো। এনিয়ে কোনদিন আপনি কাউকে কিছু বলেননি?

—বলিনি, মা, খুব বলেচি। ডাক্তার ব্যানার্জ্জিকে বলতে কসুর করিনি। এসব তুচ্ছ অসুবিধের কথা শোনবার ওদের সময় নেই। দরকারের গুরুত্বের ওপর ওরা ওদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে মা।

তা হলে ওঁরা আপনাকে খুব জব্দ করেছিলো, কেমন?

রায়বাহাদুর একথার কোন জবাব দিলেন না।

* * * *

কলেজ থেকে রায়বাহাদুর মাসখানেকের ওপর হবে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে এসেছেন।

অপারেশনের পরের যে দুর্ব্বলতা সেটা অনেক কমে এসেছে। সকালের দিকে তিনি বাগানে পায়চারি করেন, বিকালে ইন্দ্রানীকে নিয়ে মোটরে হাওয়া খেতে বেরোন।

একদিন দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্রাম করছিল। রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে নিজেই উঠে এলেন। বল্লেন: তোমার ব্রিজের কাজটা আর কদ্দিন লাগবে বাবাজী?

—মাস তিনেক তো বটেই।

—বাবাজী, আজ রাতের গাড়ীতেই রওনা হবো।

—এখনোতো আপনার শরীর বেশ সারেনি। এরই মধ্যে আপনি যেতে চাইচেন, কেন?

—ইচ্ছে থাকলেও আর থাকবার উপায় নেই। ছুটি ফুরিয়ে এসেচে, তিন দিন পরে কাজে জয়েন করতে হবে। ইন্দ্রানীকে তোমার কাছেই রেখে গেলুম। এইখান থেকেই ও এম-এ পড়বে। জানতো মা আমার সব-ই। হুট বলতে ওখান থেকে কলকাতায় আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবেনা।

—কিন্তু আমার দ্বারা ইন্দ্রানীর তত্ত্বাবধান করা কি—

—খুব। তুমি পারবেনা তো কে পারবে, বাবাজী।

* * * *

রায়বাহাদুর কর্ম্মস্থলে চলে গেছেন। ইন্দ্রানী মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে উপস্থিত রয়ে গেল।

দিন সাতেক পরে সকালের দিকে রায়বাহাদুরের চিঠি পেয়ে মৃত্যুঞ্জয় একটু

চিন্তিত হয়ে উঠলো। রায়বাহাদুর জানিয়েছেন ইন্দ্রানীর ওখানে থেকে পড়াশোনার একটু অসুবিধে হচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয় চেষ্টা-চরিত্রি করে কাছে পিঠে একটা বাড়ী যেন দেখে দেয়।

ইন্দ্রানীর কি অসুবিধে হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় এটা ভেবে ঠিক করতে পারছে না।

দুপুর রাত্তে খেতে বসে মৃত্যুঞ্জয় প্রশ্ন করে বসলো: এখানে তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে ইন্দ্রানী? ঠিক মত সব দেখাশোনা করতে পারছিনা বলে বাবাকে চিঠিতে জানিয়েচো, বুঝি?

এক রকম তাই-ই, মিত্তির মশাই। দিদির খোঁজ খবরই বড একটা আপনি রাখেন, এর ওপর আমার আবার খোঁজ খবর নেবেন, তা হ'লেই হয়েচে।

মৃত্যুঞ্জয় একটু ক্ষুব্ধ হলো। ধরা গলায় বলে: এখানে তুমি থাকতে চাও না, এই তো?

—হাঁ।

—তা হলে তোমার জন্যে একটা বাড়ী দেখি, ইন্দ্রানী?

—ওইটুকু হলেই যথেষ্ট হবে মিত্তির মশাই! তারপর নিজের পায়ে আমি দাঁড়াতে পারবো।

দিন পনেরো হতে চল্লো ইন্দ্রানী মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীর কাছ বরাবর একটা বাড়ীতে এসেছে। তার সংসার বলতে একটা বামুন ঠাকুর আর একটা ঝি।

আজকাল ইন্দ্রানী মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত কমিয়ে দিয়েছে। পোষ্ট-গ্রাজুয়েটে ভর্ত্তি হবার পর সে পড়াশোনায় মন দিলে। বি-এ-টা সে ফাঁকি দিয়ে কোন রকমে পাশ করেছিলো। এখন থেকে একটু একটু করে পড়াশোনা না করলে সে সব বইগুলো একবার করে শেষও করতে পারবে না।

অনুপমের সঙ্গে প্রথম দিন আলাপ করতে গিয়ে ইন্দ্রানী যে-সব কথাগুলো বলেছিলো আজ সুস্থ মনে বিচার করতে বসে তার ক্ষোভের সীমা রইলো না। ওরকম ধরণের উত্তর সে না দিলেও পারতো। এক কথায় অনুপমের প্রস্তাবে রাজী হলে কোন ক্ষতি ছিল না। পরীক্ষার দিক দিয়ে ক্ষতিয়ে দেখলে অনেক লাভ হতো, সুনিশ্চিত। নিজের দুর্ব্বলতার জন্যে সে বারংবার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় হেলান দিয়ে ইন্দ্রানী প্রিঙ্গিল-প্যাটিসনের "আইডিয়া অব্ গড্" বইখানা পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু একটা লাইনও পড়তে পারলে না। অনুপমকে কেন্দ্র করে তার মনের তলায় যে মন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল তার ক্রিয়ার তখন অভিনব আয়োজন চলেছে। এইরূপ একটি পুরুষকে সে মনে মনে কামনা করে। হোক না সে যত অপটু তাকে সে পড়ে-পিটে মানুষ করে নেবে। বইটা মুড়ে রেখে ইন্দ্রানী একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ঘুম এলোনা।

বিকালের দিকে দিদির বাড়ীতে এসে ইন্দ্রানী অনুপমকে বল্লে: আপনার কথায় রাজী হলুম। কবে থেকে পড়াতে যাবেন, অনুপমবাবু?

—বেশতো, আজই চলুন না। আপনার বাড়ীটাও দেখে আসা যাবে'খন। আজ আর কোথাও বেরুবোনা।

—চলুন। কাপড়-জামাটা ছেড়ে নিন। ওরকম ময়লা কাপড়-জামা পরে যাবেন নাকি?

—কোন ক্ষতি নেই। 'আমাকে বিদেশ-বিভুয়ে কেউ চেনে না।

আপনার খেয়ালেই অনুপম হেঁটে চলেছে। একটি নারী তার সঙ্গে হেঁটে চলেছে এটুকুও তার স্মরণ নেই। অনুপমের নির্লিপ্ততা ইন্দ্রানীর ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছে। এরকম আত্মভোলা লোক নিয়ে বেরোনোর চেয়ে একা বেরুনো ঢের ভাল। ইন্দ্রানী বল্লে: আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন, অনুপমবাবু?

(ক্রমশঃ)

চলচ্চিত্রে সম্পাদক

শ্রীসুবোধ মিত্র

হলিউড রেস্তোরাঁ থেকে দুজন লোককে বেরোতে দেখা গেলো, একজন লম্বা অপরে অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকৃতি। জীবনের পূর্ণতায় তারা সুখী। তৃপ্তি ও বিচারে খাওয়া এনেচে তাদের আনন্দ—তারই ছায়া তাদের চোখে মুখে। একজনের হাতে সিগারেট অপরের সিগার। দুজনে জ্বালাল।

চলল তারা এক পা—দু পা—তিন পা।

একটা আলোর পোষ্টের পাশ থেকে একজন মেয়ে বেরিয়ে এলো তাদের সামনে। সুন্দরী মেয়ে সে—ঝকমকে চেহারা—বাদামী অলকে মোহিনী মায়া, প্রচুর মাংসল বক্ষ, ক্ষীণ কটী, প্রশস্ত নিতম্ব। চাঁদির চাঁদের চিক্কণ নেই তার চোখে, নেই মায়ার মেদুরতা—আছে তড়িতের তলোয়ারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

সারা শরীরে তার ইথারের কম্পন।

শাণিত সায়কের তীব্র দৃষ্টি ছুঁড়ে মারলে। কষে একটি চড় বসিয়ে দিলে ওই খর্ব্বাকৃতি লোকটিকে। দাঁতে দাঁত দিয়ে বল্লে: 'আমি তোমায় ঘৃণা করি—ঘৃণা করি!' তারপর পথের অপর দিকে চলতে আরম্ভ করলে। আর সেই খর্ব্বাকৃতি লোকটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে মেয়েটির যাওয়া-পথের পানে তাকিয়ে গালে হাত বুলোতে লাগল।
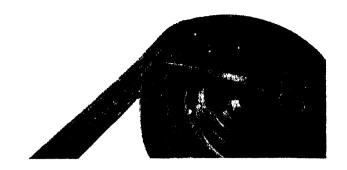
একটা দৃশ্য ঘটে গেলো। এ দৃশ্যে আর যাই থাক, একটা মজা হোল। একটা সুন্দরী মেয়ে এসে একটা বেঁটে লোকের গালে চড় মারল। একটু আমোদ, একটু আনন্দ আর অফুরন্ত উৎগ্রীবতা লোকের অন্তরে এনে দিল।

আনলনা একটু বেদনা, একটু অনুকম্পা!

পরের গল্প আমি শুনলুম। আমার চোখের সামনে ধরা দিলে একটা ট্র্যাজিক সিন। তা হচ্ছে এই:—

সুন্দরী নীলনয়না ষোড়শী আজ তিন বৎসর ধরে ছবিতে শুধু ভিড়ের মধ্যে মুখ দেখাচ্ছিল। এবং তার মত সকলের ভাগ্যে যা জোটে তাই তারও ভাগ্যে জুটে আসছিল। অর্থাৎ যতদিন কাজ চলত ততদিন খাওয়া চলত, তারপর—অনশন।

অবশেষে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোল। বড় একখানা ছবিতে একটি ভাল ছোট অংশ অভিনয় করতে পেলো। আয় তার বাড়ল। সপ্তাহে ত্রিশ ডলার। কম কি! খাওয়া এবং পরা দুইই চলতে পারে। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে অভিনয় করলো। পরিচালক সন্তুষ্ট হলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করলেন ছবি শেষ হলে প্রোডাক্শান-চিফের সঙ্গে তার সম্বন্ধে কথা বলবেন।

এর পর?

এরপর স্বর্গে যাবার সোনার সিঁড়ি তার চোখের ওপর ভাসতে লাগলো।

......কতদিন হোল খবর নেই। দিন যায়—পক্ষ যায়—মাস যায়, সেই এক কথা, সেই এক গল্প। উৎকণ্ঠার একঘেয়েমিতে জীবন অতিষ্ঠ। রোজই খবর আসে—সম্পাদনার কাজ চলেচে। কাল যাবে রসায়ণাগারে।—কিম্বা নতুন কিছু প্রয়োগ করবার জন্যে বিশেষ অভিজ্ঞদের কাছে ছবি পাঠান হয়েচে। কি কতকগুলো শব্দ যোজনা করা হবে—তাই নেওয়ার চেষ্টা চলেছে, এমনি কত কি। মেয়েটি শোনে আর তার বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনের পানে চেয়ে থাকে।

অবশেষে দিন এলো। খবর পেলেন ছবি মুক্তি পাবে। আনন্দে উৎফুল্ল—

বিয়োগান্ত ভূমিকায় জাসু পিট্‌স অতুলনীয়। কিন্তু লোকে তাঁকে হাস্যরসিকা বলে।

লাইট্ চুরি করা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মস্ত দোষ। ওয়ালেস বিয়ারী এই আলো চুরি কোরতে মস্ত ওস্তাদ।

গৌরবান্বিতা সে। আজ তার ছবি মুক্তি পাবে। সবাই দেখবে তার ছবি—দেখবে কতো ভাল অভিনয় করতে পারে, কত বড় অভিনয় শক্তি নিয়ে জন্মেছে সে। হলিউডে তারাদের মাঝে তার স্থান অনিবার্য্য, একথা লোকে স্বীকার করবে—করবে—করবে।

তাই এলো নতুন পোষাক—নতুন তার ডিজাইন—এসেন্স আর পমেডের গন্ধে ভরল অঙ্গ-খানি। একখানি মূল্যবান টিকিট এলো। হলিউডের তারাদের সঙ্গে তাকে বসতে হবে—সে যে ভাবী-তারা।

দুর্ভাগ্য! চোখের ওপর রঙমহলের আগল বন্ধ হয়ে গেলো। বসন্তের রঙীন প্রজাপতি গুলোর পাখা ঝরে গেছে—কুৎসিত বিষাক্ত কীটের অত্যাচারে ফুলগুলি গন্ধহীন, বর্ণহীন, মৃত। চোখের ওপর কে করালের কাল যবনিকা টেনে দিলে।

সে নেই—ছবিতে সে নেই। কোন অশান্ত অত্যাচারী দস্যু তাকে অত্যন্ত নির্ম্মম-ভাবে ছবি থেকে চুরী করে নিয়ে গেছে। কোথায় সে কেহ জানেনা, ভাবতে পারছে না।

তারপর ওই দৃশ্য, যে দৃশ্য—আপনারা ওপরে দেখেছেন।

সে ছবিতে নেই। প্রত্যেক জায়গায় যেখানে সে ছিল সেখানেই কাটা হয়েছে। এই কাটা যে তার খারাপ অভিনয় করার জন্যে হয়েছে তা নয়। ছবি লম্বা হয়ে যাওয়ার জন্যে সম্পাদক কাঁচি চালাতে বাধ্য হন। ছবিতে শুধু সে বাদ পড়েন নি, অমন আরো অনেককেই বাদ পড়তে হয়েছিল। তার রাগ তার স্বপ্ন ভগ্ন হোল। পরিচালক তাকে ভুলে গেলো, তাই। তাই, তাই এই প্রতিশোধ নেওয়া ওই লোকটির ওপর; যে তাকে কেটে বাদ দিয়েছে। পরিচালককে তাকে মনে রাখবার সুযোগ দেয়নি। ওই যে ওপরে একটা দৃশ্য ঘটে গেলো সেটার কারণ এই। এই আর যিনি গালে চড় খেলেন, তিনি হচ্ছেন সম্পাদক।

পরিচালকের জীবনে এসব নতুন নয়। ভারী কঠিন তাঁদের জীবন। তার চেয়ে কঠিন তাঁদের হৃদয়। চিত্র-সম্পাদনার কাজ মানুষকে শীঘ্র বিশ্ব নিন্দুক করে তোলে। কিছুই তাঁদের পছন্দ হয়না। সত্যিকার রসজ্ঞের দৃষ্টি যদি তার না থাকে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তিনি নিন্দুক হবেন, বিশ্বের নিন্দাভাজন হবেন। ষ্টুডিওর মধ্যে একমাত্র তিনিই আছেন যিনি দেখতে পান কেমন করে তারকারা দিনের পর দিন উঠচে—পড়চে—নিবচে।

জাসু পিটস্-এর নাম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। হলিউডে অমন ট্রাজেডিয়ানের জুড়ী মেলা শক্ত। প্রত্যেক চিত্রদক্ষই এই কথাই বলবে। কিন্তু লোকে তাকে কমেডিয়ান বলে জানে এবং যেদিন সেই হিসেবে লোকে তাকে দেখতে না পাবে সেই দিনই তার পতন।

'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট' ছবিতে তাকে হিরোর মায়ের অংশে নামান হয়েছিল। যখন সে ছবি পর্দায় দেখান হোল লোকে ছ্যা ছ্যা করলে—এই ভেবে আসন ছাড়লে যে জাসু পিটস-এর নিশ্চয়ই পতন হয়েছে, তা নয়ত এমন অভিনয় কিছুতেই করতে পারে না।

হুকুম এলো জাসু পিটসের সমস্ত অংশ-টুকু বাদ দিতে হবে এবং তার জায়গায় বসাতে হবে বেবিল মারসারের অভিনয়। জাসু পিটস যে খারাপ অভিনয় করেছিল তা নয়; লোকে তাকে ওভাবে দেখতে চায় না। এইটেই হচ্ছে সত্যি খবর এবং সম্পাদকের তা জানা চাই।

ঠিক ওমনি একটা ব্যাপার ঘটেছিল 'ওয়াকিং ডাউন ব্রডওয়ে' ছবিতে। লোকেরা কাঁদবার বদলে হাসলে, তাই হোল ছবি কাটতে।

ফিলিপস্ হলমস্ বলে একজন লোক 'হোয়াট প্রাইস হলিউড' ছবিতে কনস্ট্যান্স বেনেটের স্বামী সাজে। দুদিন সুটিং হবার পর তার হাত জখম হয়।

সম্পাদক জানালে তার ছবি ভাল হয়নি। সে ছবিতে নামল নিল হ্যামিল্টন। বেচারা ফিলিপস্ শুধু হাতই ভাঙ্গলে!

এই দিন কতক আগে ফিলিপস্‌কে অমনি আর একবার নিরাশ হতে হয়েছে। 'রকে-বাই' ছবিতে কন্সট্যান্স বেনেটের সঙ্গে নামে সে। ছবি শেষ হবার সময় সম্পাদক খবর পাঠালে আবার তুলতে হবে। আবার গোড়া থেকে তোলা আরম্ভ হোল। ফিলিপ্‌স্ হোমস্‌কে নিয়ে নয় জোয়েল ম্যাক্রিয়াকে নিয়ে। ফিলিপ্‌স্‌এর ছবি উঠল সম্পাদকের সেল্‌ফে।

তাই বলে সবাই নিরাশ হয়ে পড়েনা। এই আশায় থাকে যে, তাদের একটা দিন আসবেই যখন তারা নাম কিনতে পারবে।

যিনি রোনাল্ড কোলম্যানের ছবি 'ডেভিল টু পে' ছবি সম্পাদনা করেন তিনি বাদ দিয়েছিলেন কন্সট্যান্স কানিংসের সব ছবি
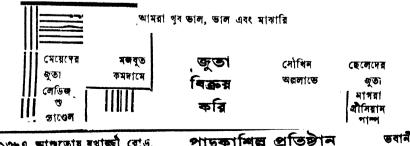
খানি এবং বাদ দিয়েছিলেন এই ভেবে যে আর একটি ভালো মেয়ের বুঝি পতন হোল। কন্সট্যান্স-এর জায়গায় অভিনয় করে লরেটা ইয়ং। আর কানিংস? সে মুসড়ে পড়েনি। সে অন্য ষ্টুডিওতে গিয়ে 'দি ক্রিমিন্যাল কোড' ছবিতে অভিনয় করে। তখন থেকেই তার নাম বেড়েছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের একটা ষ্টুডিও থেকে সে সপ্তাহে পায় পাঁচশ পাউণ্ড।

যখনই দুজন সম্পাদকে কথাবার্ত্তা হয় তখনই দেখতে পাওয়া যায় তারা ষ্টারদের নিয়ে কথাবার্ত্তা কইচে, আর সে কথার মূল ষ্টারদের পরস্পর পরস্পরের হিংসে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার হিংসে ওদের মধ্যে ভয়ানক। যখনই ষ্টারেরা ছবি দেখতে বসে, তাদের নজর থাকে অপরে তাকে ছাপিয়ে গেলো কিনা! সাধারণ দর্শকের চোখে তার চেয়ে বেশী অন্য জনে ধরা পড়ল কিনা।

মেয়ে ষ্টারদের তো কথাই নেই। তারা স্বশরীরে সম্পাদকের কাছে উপস্থিত হয় এবং প্রার্থনা করে, সেই অভিনেতার বা অভিনেত্রীর ছবি কেটে বাদ দিতে যাকে ছাপিয়ে গেছে। অংশ্য সবটা নয় সেখানে যেখানে তার অভিনয়ের চেয়ে ওই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভিনয় ভাল হয়েচে।

লাইট চুরি করা অভিনেতা অভিনেত্রীদের একটি মহা দোষ। ষ্টুডিও সেট ছবি তোলার উপযোগী করবার জন্যে দুরকম আলো ব্যবহার করা হয়। এক রকম থাকে—সমস্ত সেটটা আলো করে। আর একরকম—কোন বিশেষ জায়গায় আলো করে। এই আলো গুলো থাকে সাধারণতঃ সেটে চরিত্রের ওপর—আলো ছায়ার ভাগ করে। চরিত্রের প্রয়োজনীয়তার ওপর আলো দেওয়ার তারতম্য হয়। অর্থাৎ সে ছবিতে যিনি মুখ্য ও অপর লোক যিনি বা যারা গৌণ তাদের ওপর আলো ফেলার তারতম্য হয় এই জন্যে যে মুখ্য চরিত্রের চেয়ে অন্য চরিত্র লোকের চোখে বেশী ধরা না পড়ে। ওয়ালেস বীয়ারি এই আলো চুরী করতে মহাওস্তাদ—অবশ্য আজ কাল আর করেন না। তখন ক্যামেরাম্যান হয়ত বিয়ারীকে বললেন: আপনি ওখানে গিয়ে ওই জায়গায় দাঁড়াবেন। ছবি তোলা আরম্ভ হোল। ওয়ালি জানে সে দৃশ্যে কে বিশেষ নজরে থাকবে। ও তাড়াতাড়ি সেই বিশিষ্ট লোকটির জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। আর এমন করে দাঁড়াল কেউ ধরতে পারলেনা। শুধু পারে ওই লাইটম্যান গুলি! ওরা জানে কিনা কোন আলো কোথায় গিয়ে পড়চে।

সে যাক্। ওয়ালির জ্বালায় জ্বালাতন এক ছোকরা সম্পাদককে গিয়ে জানিয়েছিল যে ওয়ালির ছবি যেন ছবিতে দু'মিনিট থাকে। বেচারা সে! সেই হচ্ছে ছবির হিরো আর ওয়ালি তাকে এমন ক'রে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

ছবিতে আর একরকম অভিনেতা দেখতে পাওয়া যায়। এরা আবার অন্য রকম হিংসুটে তারা ছবিতে ষ্টারদের ছবি নষ্ট করতে ওস্তাদ। খুব বড় হয়ত একটা সিন হচ্ছে; সে ছবির ষ্টার হয়ত খুব ভাল অভিনয় করছে। আর একজন অভিনেতা সে নিজেকে লোকের নজরে আনবে বলে, হাতের ঘড়িটা দুবার ঘুরিয়ে দেখালে, কি গোঁপটা দুবার নাড়িয়ে নিয়ে কিম্বা কয়েকবার নিজের ভ্রূ নাচালে এতে ছবিতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। কিন্তু আজকাল ওসব চালাকি চলেনা। সম্পাদক যদি দেখলে এমনি করেছে কেউ, অমনি নতুন একরকম যন্ত্র তৈরী হয়েছে, তা দিয়ে তাকে একবারে ঝাপসা করে দেবে। লোকে বুঝতেই পারবেনা যে কে?

শুধু অভিনেতা অভিনেত্রীরাই সম্পাদককে বিপদে ফেলেন না আমাদের চলচ্চিত্র সমালোচকরাও ফেলেন। এই কথাই বলেছেন সেদিন বৃটিশ সম্পাদক থরোল্ড ডিকিন্সন। সে কেটেছে গ্লোরিয়া সোয়ানসনের 'পারফেক্ট আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং' ছবি।

ছবিখানা যত বড়, পয়সার অঙ্কও তাতে খরচ হয়েচে তত বড়, তাকেই সমালোচকেরা বললে কিছু হয়নি আর বললে: নাম করা ষ্টেজ অভিনেতা অভিনেত্রীরা ছবিতেও মঞ্চঘেষা অভিনয় করে। আরো বলেছে সাধারণ অবস্থাতেও আমরা ওই অবস্থায় পড়ি, তাই বলে কি আমরা অমন করি, যেমন করেছে ওই ছবিতে।

তাই ডিকিন্সন ছবিখানা কেটেছে এবং কেটে তাকে নতুন করে রূপ দিয়েছে।

ডিকিনসন বলেছে লণ্ডনে ওয়েষ্ট এণ্ড সিনেমাতে যখন ছবি দেখান হচ্ছিল আমি ছিলাম সেখানে সকলের পিছনে বসে। একজন অভিজ্ঞ লোক দর্শকদের মনের ইচ্ছা যেমন বুঝতে পারে, আমি তেমনি বুঝতে পেরেছিলাম।

সে ছবির একটা অংশ যখন দেখান হোল সকলে ঘাবড়ে গিয়েছিল, এমনি সে অংশটি। ছবি শেষ হওয়া মাত্র আমি ওপরে প্রোজেকসন্ ঘরে গিয়ে সেখানটা কেটে ফেলি এবং লোকে যেমন ভাবে চায় ঠিক তেমনি ভাবে উল্টে সাজিয়ে দি। এরপর যখন সে ছবি দেখান হয়েছিল খুব কম লোকই ধরতে পেরেছিল, এখানা সে ছবি।

সেন্সারও সম্পাদককে কম বিপদে ফেলেনা। একবার ডিকিনসনের হাতে কাটা একখানা ছবি সেন্সর ট্রেড শো'র চারদিন আগে বন্ধ করে দেয়। অনেক জোড়া, অনেক কাটার পর সে ছবি লোকে দেখতে পায়। অনেক প্রিয় জিনিষ কাটতে হয়েছিল এতে। ডিকিনসন বলে জীবনের বড় অশুভ মুহূর্ত্ত কাটে আমার যখন এই ছবি সেন্সরের জন্যে দেখান হয়। তারপর! শান্তির শুভ বার্ত্তা যখন শুনলুম তখন ছিলনা সেখানে কেউ—কানে ছিল টেলিফোন।

সোণালি প্রেম

শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বেকার জীবনের তিক্ততা ভালো করিয়া হজম করিতে না করিতেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বিহারের একটি সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ষ্টেটের সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের পদ লাভ করিয়া বসিলাম। বি-এল্‌ ডিগ্রীর কৌলীন্য রক্ষার একটা সুন্দর সুরাহা হইল। যাহাই হউক ভাবিয়া এই বাঙ্গালী-বিরল খোট্টা অঞ্চলের বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া কর্ম্ম-জীবনের অভিযান সুরু করিয়া দিয়াছি। বাংলা দেশের সহিত সম্পর্ক রাখার সুযোগ সুবিধা নিজের অবহেলার জন্যই বড় একটা ঘটিয়া উঠে নাই। পারিবারিক বন্ধন যাহাদের কাছে তুচ্ছ, তাহাদের কাছে ইহা বিশেষ দুঃখজনক নহে। সুতরাং দিন কাটিতেছিল ভালই।

সহসা এক আসন্ন শীতের সন্ধ্যায় অরুণার মরণাপন্ন অবস্থার সংবাদ পাইয়া কয়েক মাসের ছুটীতে দেশে গিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষ দেখা ঘটিয়া উঠে নাই। একটি মৃত-সন্তান প্রসব করিয়া অভিমানিনী সূতিকাগারেই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। মৃত্যুর পরেও কাহার প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করা নাকি মনুষ্য-চরিত্রসম্মত নহে। সুতরাং বিরহের এই প্রথম অনুভূতি কিছু দিনের জন্য আমাকে বেশ গভীরভাবেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শময় পৃথিবীর যৌবন-সুধার আস্বাদনের কাছে সে বৈশিষ্ট্যহীন বিরহ ক্রমে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইল। অরুণাকে ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেলাম। অবশ্য এই ব্যাপারে নিজের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করিবার কোন কিছু থাকিলেও, অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। বৈষয়িক-বুদ্ধি-সম্পন্ন পিতা নিজে দেখিয়া শুনিয়া যে গ্রাম্য-মেয়েটিকে তাঁহার ভাবী পুত্রবধূ হিসাবে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছিলেন, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষকালে তাহাকেই কিনা জীবন-সঙ্গিনীরূপে বরণ করিতে হইল। তাই এই নিরক্ষরা কালো মেয়েটিকে শুভদৃষ্টির পর হইতেই প্রীতির-চক্ষে দেখিতে পারি নাই। স্বামী হিসাবে এই যে প্রচ্ছন্ন অবহেলা, ধনীর কন্যা হইলেও অরুণার নারী-হৃদয়ে তাহা তীরের মত বিঁধিয়াছিল। তাই ভাবিতেছিলাম, মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও বুঝি অভিমানিনী তাহা ভুলিতে পারে নাই!

দাম্পত্য-প্রেমের পরিণতি যাহাই হউক, পত্নী-বিয়োগের পর মাতৃহীন সন্তানের পারিবারিক বন্ধন যদি এই বিশেষ অবস্থায় শিথিল হইয়া পড়িতে চাহে, তবে তাহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। ছুটীও দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং বিমাতার প্রভাবাধীন সংসার হইতে নিজেকে একদিন পরোক্ষে মুক্ত করিয়া পুনরায় কর্ম্মস্থলে ফিরিলাম।

চলিয়াছি ইণ্টার ক্লাশে। হু হু করিয়া ডেরাডুন এক্সপ্রেস ছুটিয়া চলিয়াছে। ধাবমান ট্রেনের বাধাহীন গতির সহিত তালে তালে দোলা খাইতে খাইতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, টের পাই নাই। অকস্মাৎ কাহার যেন শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। ট্রেন হাজারিবাগ পৌঁছিয়া বিরাট লৌহ-বক্ষ ভরিয়া নিঃশ্বাস লইতেছে। একে শীতকাল তায় গভীর রাত্রি; কুলী-মুটের হাঁকডাক নাই বলিলেই চলে। র‍্যাগে আপাদ-মস্তক মুড়িয়া পুনরায় সংক্ষিপ্ত শয়নের আয়োজন করিতেছি, এমনি সময়ে মাথার পাশ হইতে নারীকণ্ঠ-নির্গত পরিষ্কার বাংলা ভাষা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম: 'এই চা-ওয়ালা, এধার আও—'

পিছন ফিরিয়া চাহিলাম। ঠিক পাশেই দেয়াল ঘেঁষিয়া বসিয়া ২০।২২ বছরের একটি গৌরবর্ণা মেয়ে শিয়রের কাছে রক্ষিত আমার অতিপ্রিয় 'ডনজুয়ান'-খানি নির্বিচারে হস্তগত করিয়া পাতা উল্টাইতেছে। মেয়েটি কোন ষ্টেশনে উঠিয়া কোন সময়ে যে আমার সংস্পর্শের গণ্ডীর ভিতর নিজেকে নির্বিঘ্নে সমর্পণ করিয়া পরম আত্মীয়তা প্রদর্শনের সুযোগের সূত্রপাত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলাম।

'নিন, ধরুন—'

তরুণী এক পেয়ালা চা আমার দিকে আগাইয়া দিয়া নিজে এক পেয়ালা লইল।

দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মাণিব্যাগ বাহির করিয়াছি কি অপরিচিতা বিদ্যুদ্বেগে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বা হাত দিয়া আমার হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—'না-না, ও আপনাকে দিতে হবে না, আমিই এখন দিয়ে দিচ্ছি।'

মেয়েটির উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের দুই একটি মৃদুর ঢেউ আমার শিরায় শিরায় বহিয়া গেল। বুঝিলাম প্রতিবাদ বৃথা। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে চায়ের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলাম।

ট্রেণ চলিতেছে। কামরার চারিদিকে তির্য্যক্‌দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া লইয়া তরুণী বলিল, 'বারে, আপনিত বেশ লোক, এত করে জানালুম বোবা হ'য়ে থাকবার জন্য নাকি? গল্প-টল্প বলুন।'

আর না বলিয়া উপায় নাই। পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যই বা থাকে কোথায়? তরুণীর হাবভাব দেখিয়া ক্রমেই বিস্ময়াভূত হইতেছিলাম। দ্বিধা না করিয়া প্রশ্ন করিলাম।

'গল্পের উপকরণ ত আপনিই সাথে করে এনেছেন, দেখ্‌ছি। আপাততঃ রহস্যের একটা কিনারা হোক!'

তরুণী প্রশ্নটীর নিহীত অর্থ বুঝিবামাত্র তাহার দূরদৃষ্টিব্যঞ্জক বড় বড় চক্ষু দুটি মেলিয়া আমার পানে মুহূর্ত্তের জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল, পরে নিম্নস্বরে উত্তর দিল।

'হ্যাঁ, মেয়ে মানুষ হ'য়েও একা একা দেশ-ভ্রমণে যখন বেরিয়েছি, তখন অভিজ্ঞতাও কম হয়নি। সে সব কাহিনী শুনবার সময় হবে আপনার?'

'নিশ্চয়ই। পাথরগঞ্জ ষ্টেশনের এখনও যে ঢের দেরী! বলুন যাহোক সময় কাটবে ভালো।'

'আমিও এ যাত্রা কাশীতে জানি ব্রেক করবো স্থির করে রেখেছি। পুরণো সহর—বহুবার যাওয়া আসা করেছি, তবু জীবনের এই উদ্দেশ্যহীন অবস্থায় যার সাথে একবার দেখা না করে—'

বাধা দিয়া উৎসুক হৃদয়ে প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি কোথায়, কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন?' 'ওহো গোড়াতেই গলদ হ'য়ে গেছে দেখ্‌ছি! আচ্ছা, প্রথম থেকেই শুনুন: অবশ্য যা বল্‌ছি, তা খুব সংক্ষেপেই।

'মেয়ে হোষ্টেলে থেকে কল্‌কাতার কোনও কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়লুম। ইংরেজীতে ছিল অনার্স। তাই, সেক্সপীয়ার নিয়ে বে-কায়দায় পড়লে মাঝে মাঝে প্রোফেসারের বাড়ীতেও যাওয়া আসা করতে হ'ত। ক্রমে সে বাড়ীর প্রাইভেট টিউটর অমূল্য রায়ের সাথে হ'ল আমার পরিচয়—'বাধা দিয়া এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করিয়া বসিলাম:

'কোন অমূল্য রায়—এই আপনার ফরিদপুরের ওধারে যার বাড়ী?' সবে রিপন কলেজ থেকে দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে যে পাশ করেছে না?

তরুণী বিস্মিত হইয়া বলিল,

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন আপনার সাথে তাঁর জানাশুনা ছিল নাকি?'

'শুধু জানাশুনাই নয়, আমরা যে এক-সাথেই ও কলেজ থেকে পাশ করেছি। তারপর অমূল্য ঢুকলো পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেণ্টে আর আমি শেষটায় ওখানেই ল-ক্লাশে নাম লিখিয়ে বস্‌লুম। সেই থেকে একরকম ছাড়াছাড়ি। তবে কল্‌কাতায় যতদিন ছিলুম, মাঝে মাঝে দেখাশুনা হ'ত। কিন্তু এই কয়েক বছর ধরে' তার আর কোন খবরই নেই। কোথায় আছে সে আজকাল?'

তরুণী আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ অবনত শিরে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিল।

'অমূল্যবাবুর বন্ধুর কাছেই যে ঘটনাচক্রে তাঁর কথা বলতে হচ্ছে, এ আমার পরম তৃপ্তি। কিন্তু তিনি আজ সকলের নিন্দা-প্রশংসার বাইরে। এটুকুই যা দুঃখ! অমূল্যবাবু এই বছর খানেক হ'ল বসন্তরোগে মারা গেছেন।'

এ সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং খানিকক্ষণ মর্ম্মাহত হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার সহিত জড়িত কলেজ-জীবনের কত ঘটনাই না এক নিমেষে স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তার অভিনয় করিবার নিখুঁত বৈশিষ্টটুকুই আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই রহস্যপ্রিয় অমূল্য, যার ছাত্র-জীবনের অনেক কাহিনীই জানি; কিন্তু কই, এই মেয়েটীর সম্বন্ধে একটী কথাও ত সে কোনদিন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করে নাই? হয়ত নিতান্ত ব্যক্তিগত বলিয়াই—।

আর ভেবেই বা কি করবেন, বলুন? আপনি যখন তাঁর সহপাঠী, তখন এই স্মৃতি-জড়িত ঘটনার সবটুকুই নিঃসঙ্কোচে আজ আপনার কাছে খুলে' বলবো।...হাঁ, ক্রমে আপনার দার্শনিক বন্ধুটীর সাথে আমার পরিচয় হ'ল—ঘনিষ্ঠ হ'তে ঘনিষ্ঠতর। তিনি সেবার এম-এ দেবার জন্য তৈরী হ'চ্ছেন। বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র-সন্তান—পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহরে বসে' কষ্ট করে' লেখাপড়া শিখছেন। কিন্তু দোষ হ'ল এই (অবশ্য তাঁর কাছে নয়!) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিগত বাধা সত্ত্বেও যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মকে এড়াতে না পেরে আমাকে তিনি ভালোবেসে ফেল্লেন। সরল বিশ্বাসে আমিও তার প্রতিদান দিলুম। আর আধুনিক আবহাওয়ায় মানুষ হ'লেও অঞ্জলি সেনের মত মেয়ের ভালবাসা অত ঠুনকো নয়, বুঝলেন মশাই? অমন সুদর্শন, ভাব-গম্ভীর, উচ্চশিক্ষিত পুরুষও যে অপরের সান্নিধ্যে এলে নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, সে পরিচয় আমার জীবনে সৌভাগ্যক্রমে মাত্র ঐ একবারটী ঘটেছে। ভদ্রলোক পরীক্ষান্তে বাড়ী গিয়ে মাসখানেক পর লিখলেন এক লম্বা চিঠি। মাফ করবেন, তার বর্ণনা করতে আর আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। মানে, বাড়ী গিয়ে টের পেলেন তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ নাকি ঠিকঠাক—আত্মীয় স্বজনের অমতে যেতে পারেন না। বিশেষতঃ সমাজ যখন আমাদের এ মিলনকে কিছুতেই অনুমোদন করবে না, তখন যেন আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভুলতে চেষ্টা করি। অনর্থক বিদ্রোহ ক'রে লাভ নেই, ইত্যাদি।'

অঞ্জলি সহসা থামিয়া আমাকে আড়াল করিয়া অঞ্চলের সাহায্যে চক্ষু মার্জ্জনা করিবার ছলে আসন্ন অশ্রুর বন্যা প্রতিরোধ করিল।

এ কাহিনী আমার যেন কেমন অবিশ্বাস্য বলিয়াই বোধ হইতেছিল। কিন্তু তাহার এই আকস্মিক ভাব-প্রবণতা দেখিয়া সে ধারণা আর রহিল না, সহানুভূতির উদ্রেক হইল।

অঞ্জলি পুনরায় বলিয়া চলিল।

'চিঠিখানি এখনও আমার স্যুটকেশের মধ্যে রয়েছে। বছর কয়েক আগেকার লেখা; জানি, আমার সারা-জীবনের প্রথম ভালোবাসার মৃত্যুবার্ত্তা বহন করে, ওই জিনিষটিই প্রথম হাতে এসেছে; ওর প্রতিটি অক্ষর তখন এক দুঃসহ ঘৃণার বিষাক্ত মলিনতায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলেও কিছুদিন পর তা আমার কাছে অনুতাপের অশ্রু ধৌত হ'য়ে দেখা দেয়—ওর সাথে যে বিয়োগাত্মক করুণ স্মৃতি জড়িত, সে আমি শত চেষ্টা করেও ভুলতে পারছি নে। আর 'ডন জুয়ানে'র পৃষ্ঠায় বর্ণিত বায়রণের এই নির্ভীক উক্তিটুকুও যেন আমার মনের কথাই:

'Man's love is of man's life a thing apart, 't is woman's whole existence;......'বলিতে বলিতে সে নীচু হইয়া স্যুটকেশ হইতে চিঠিখানি বা'হির করিতে যাইতেছিল, কিন্তু আমি বাধা দিলাম, বলিলাম।

'না—না, ও আর কি দেখবো? বলুন, তারপর কি হ'ল।'

'এর পর প্রায় পাঁচ ছ'মাস অমূল্যবাবুর কোনও সংবাদ পাইনি। তবে জানতুম, কি একটা ইন্‌সিওরেন্স অফিসে চাকরী পাবার পর শ্যামবাজার অঞ্চলে বাসা করে, দেশ থেকে স্ত্রী, মা-বোনকে আনিয়েছেন। ইচ্ছে করেই ওঁর সংস্পর্শ থেকে নিজেকে তফাতে রাখতে চেয়েছিলুম, কিন্তু শেষটায় তা' আর হ'ল না। হঠাৎ একদিন তিনি আমাকে লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন দেখা করতে, কিন্তু যাই নি। কেন, নিজের কি হাত-পা নেই? একবার আসতেও দোষ? পরের দিনও আবার সেই অনুরোধ। তখন লোকটাকে প্রশ্ন করে জানলুম, তিনি নাকি মৃত্যু-শয্যায়।

অঞ্জলির অজ্ঞাতসারে তাহার উন্নত বুক মথিত করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

'শঙ্কাকুলচিত্তে গিয়ে দেখি, বসন্তের গুটিতে তাঁর সারা গা ছেয়ে গেছে, সহজে চিনবার জো নেই। রোগীকে নিয়ে চলছে যমে-মানুষে টানাটানি। অবশেষে রোগেরই হ'ল জয়। হপ্তাখানেক নিদারুণ যন্ত্রণা

ভোগ করার পর অমূল্যবাবু মারা গেলেন। পুত্রহীনা মায়, সন্ত-বিধবা তরুণী পত্নীর বুকফাটা কান্না—সে কি করুণ, সে কি মর্ম্মন্তুদ! শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার কিছু আগে কতটা অনুতপ্ত, কতটা মর্ম্মাহত হ'য়েই যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন! আমি মেয়েমানুষ, তাই না সর্ব্বান্তঃকরণে আজ তাঁকে ক্ষমা করতে পেরেছি! আর ভাবি, আমরা পরস্পর পরস্পরকে বন্ধুভাবে ভালোবেসেছিলুম। এ ক্ষেত্রে বন্ধুর অবর্ত্তমানে বাস্তবজগতে তার স্মৃতিটুকুরও কিই বা মূল্য? নিজের প্রতি আমি কঠিন হয়নি, নিজের সত্তাকে নূতন করে' অনুভব করছি বলেই আজ এমন কথা বলতে সাহস করছি।'

অঞ্জলি চুপ করিল। আর আমিও কলেজ-জীবনের বিস্মৃত প্রায় বন্ধুটীর এই নূতন পরিচয় লাভ করিয়া চিন্তাকুল মনে বসিয়া রহিলাম।

অনন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের জমাট বাঁধা অন্ধকারের পাহাড়-তীক্ষ্ণ-আলোকরশ্মি পাতে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে রুদ্ধশ্বাসে। ঘূর্ণায়মান লৌহ-চক্রের বিরাম-হীন ঘর্ঘরধ্বনি দিগ্বিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া সারা পৃথিবীময় যমযম করিতেছে! আর এই নিদ্রিত কামরার ভিতর শীতের প্রাবল্যে জড়সড় হইয়া বসিয়া আমরা দুটি বুভুক্ষু প্রাণী। শীতের তুহিনার্দ্র যবনিকা ভেদ করিয়া মুকুলিত বসন্তের নবরূপ কি কাহারও চক্ষে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে না? পরে মাথা তুলিয়া নিনিশেষ নয়নে অঞ্জলির পানে চাহিলাম। পর-পুরুষের সান্নিধ্য সম্বন্ধে সে যেন এতক্ষণ পর সহসা সচেতন হইয়া উঠিল। অপসৃত গাত্রাবরণ ঠিক করিয়া লইয়া সেই যে আনত হইয়া বসিয়া রহিল, আর মাথাটি তুলিতেছে না। বুঝিতে পারিলাম না, এক তরফা মূল্য-হীন-প্রেমের এই মৃত্যু-মহোৎসবময় তমসালীন নিরাশার গর্ভ হইতে সে কোন আশার আলোক আবিষ্কার করিয়াছে; অনুসন্ধিৎসু হইয়া শুধাইলাম; তারপর বর্ত্তমানে কোথায়, কি উদ্দেশ্যে চলেছেন?' অঞ্জলি যেন চেতনা ফিরিয়া পাইল। বলিল,

'হ্যাঁ, আপাততঃ সুরুচির ওখানে, এলাহাবাদে। কলকাতা আর ভালো লাগছে না। তাই, বেরিয়ে পড়্বো পড়্বো বলে' ভাবছিলুম, আর ঠিক সময়েই এল তার এক চিঠি। আস্ছে মাসে তার ছেলের মুখে ভাত দেওয়া হবে, আমি যেন অবিশ্যি অবিশ্যি একটু আগেই যাই। সুরুচি ছিল আমার সহপাঠিনী। এইত গতবার এলাহাবাদের এক আই-এম-এস্ ডাক্তারের সাথে তার বিয়ে হ'ল। অবশ্য বন্ধুটি আমার নিজেই স্বয়ম্বরা হয়েছে; আর তা বাপ-মার সম্মতিতেই। কাশীতে জার্নি ব্রেক করে মার সাথে একবার দেখা করা দরকার। আর ভাই-বোনও যখন নেই, তখন সংসারে বন্ধনই বা কোথায়? বাবা ব্যাঙ্কে যে টাকা গচ্ছিত রেখে গেছেন, তার অবশিষ্ট যা' আছে তা'তেই মার বাকী দিনগুলো বেশ সহজেই কেটে যাবে। এর পর আমি মুক্ত। বিনা চিন্তায়, বিনা দ্বিধায় দিব অকুল-সমুদ্রের ঢেউ-এ পাড়ি—মিথ্যা দুরাশার দ্বীপের সন্ধানে। কে জানে, কোথায় এ নাবিক-বিহীন তরণীর গতিপথের শেষ!'

অঞ্জলি ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

রাত্রির অবসানে কুয়াশাচ্ছন্ন প্রান্তর ভেদ করিয়া ট্রেণ তখন পামরগঞ্জ ষ্টেশনাভিমুখে আগাইয়া চলিয়াছে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কখন যে অঞ্জলির একখানি হাত নিজের হাতের মুঠির মধ্যে আনিয়া পরম আগ্রহভরে চাপিয়া ধরিয়াছি, তাহা নিজেই টের পাই নাই। চেতনা হইল, যখন সে হাসিয়া নিজের হাতখানি ছাড়াইয়া লইল।.........

ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলাম,

'আর মরীচিকার পেছনে কেন? অকুল সমুদ্রের দ্বীপের সন্ধান কি এখনও মেলেনি?' কোনও উত্তর নাই।

'দেবী, যদি মহাজন বাক্য—'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্-নীতির ভক্ত হন, তবে বোধ করি এ ভাগ্যহীনের আশা নিশ্চয়ই দুরাশা নয়?'

অঞ্জলি এবার হাসিয়া উঠিল। সলজ্জভাবে বলিল,

'আপনি ত বেশ উঁচুদরের আর্টিষ্ট দেখ্‌ছি!'

'কি রকম?'

'মেয়েমানুষের মন ভোলাতে ওস্তাদ, আর কি?'

'এ আপনার অতিশয়োক্তি? নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনে কোনও রমণী-রত্নের সাহার্য্য লাভই ঘটে উঠে নি, পর আবার শৃঙ্গার রসের সাধনা!'

'মশাই কি দেশ থেকে তরুণী-স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে আস্‌ছেন নাকি? এই বয়সেই এতটা বৈরাগ্য?'

'ও সব ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে। তবে দেবী প্রথম দর্শনের পর থেকেই বৈরাগ্যের ইতি-হাসটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে! অবশ্য, আমি স্বয়ং শ্রীবুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্য নই, খাঁটি মাটির মানুষ।'

'তাই বুঝি মেয়ে মানুষের রূপ দেখে' গলে গেছেন নয়?'

বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকার কথা এক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না। তবু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। আচ্ছা মেয়ের পাল্লায় পড়িয়াছি যা হোক! কয়েকটি সোনালী মুহূর্ত্ত আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া গড়াইয়া গেল। অঞ্জলি কি যেন ভাবিয়া লইয়া পুনরায় সহসা বলিল।

'আচ্ছা, চলুন আপনার ওখানে, দেশ-ভ্রমণে যখন বেরিয়েছি, তখন ওধারটা যা হয় একবার ঘুরেই যাই।'

ট্রেণ তখন ধীরে ধীরে পামরগঞ্জ ষ্টেশনে ঢুকিতেছে। * * * *

ষ্টেশন-এরিয়ার বাহিরে আসিতেই ষ্টেটের দারোয়ান মহাদেব সিং লম্বা সেলাম ঠুকিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। টমটম প্রস্তুত। পশ্বার্ত্তিনী অবগুণ্ঠনবতীর প্রতি একবার আড়নয়নে চাইবামাত্র কটাক্ষহত হইয়া বুঝিলাম বৃথা কাল বিলম্ব অনুচিত। সুতরাং আদেশ পাওয়া মাত্র মহাদেব সিং মালপত্রের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া "থৈনি' টিপিতে টিপিতে সহিসের পার্শ্বে গিয়া জাঁকিয়া বসিল। আমরাও গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

জন-বিরল গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরিয়া টমটম ছুটিতেছে। সস্মিত-মুখে অঞ্জলি আমার অতি নিকট সান্নিধ্যে সরিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল,

'দেশ-ভ্রমণের নক্সা আপাততঃ শিকেয় তোলা থাক, মশাইর সংসারের গোলক-ধাধায় ঢুকে' এবার পথ খুঁজে পেলে হয়!'

রহস্য এ ঠিক নয়।

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

নতুন মেয়ে

হলিউড আজ যাকে নিয়ে মেতে উঠেছে সে হচ্ছে রিটা—রাঙ্গা রাশিয়ার রাঙ্গা মেয়ে রিটা রাও। র‍্যামন নোভারোর দেশের রিটা রাও মুগ্ধ করেছে সবাইকে। এ্যানাকেও হয়ত ছাপাবে এই ওদের বিশ্বাস। হলিউডের সেটের অন্তর থেকে হাজার হাজার বাতির আলো খেয়ে যে ফুল আজ ফুটে উঠল, কাল যে শুকিয়ে যাবে না—কে তা বলতে পারে? আজকের মার্লিনকে কাল বার্লিন যেতে হতে পারে। কালকের এ্যানাকে আজকে বেনা-বনে বাসা বাধাতে পারে, ওই হলিউড; এওতো আমরা জানি। তাই রিটার মিতা হলিউড যদি না হয় আমরা চমকে যাব না। বলবো, বন্ধু সেলাম। তোমার দেশের কড়া চুরুটের মত তুমি আমাদের নেশা জমাতে পারলে না। ফিরে যাও, তোমার দেশ মেক্সিকোতে।

রিটা—সে পারে নাচতে, গাইতে, বাজাতে, অভিনয় করতে। ওর নামটাও যেমন মিষ্টি চেহারাটাও ঠিক তেমনি। নিউ ইয়র্কের প্যারাডাইস ক্লাব থেকে রিটাকে হলিউডে এনেছে স্যামুয়েল গোল্ডউইন। প্রত্যেক ষ্টুডিও থেকে আসছে ওর ডাক, যদি সে নামে সেখানে। ষ্টুডিওর সঙ্গে চুক্তি আগেই ওর হয়ে গেছে। তাহলে কি হয়, মেট্রো-গোল্ডউইন "ষ্ট্রাইক মি পিঙ্ক" ছবিতে ওকে নামাবে। জানেন তো "ষ্ট্রাইক মি পিঙ্ক" ছবিখানা হচ্ছে এডি ক্যাণ্টারের।

টিকিট বিক্রেতা

হলিউড জায়গাটা নতুনের জায়গা। নতুন কিছু করাটাই যেন ওদের ফ্যাসান। মাথায় একটা নতুন কিছু প্ল্যান নিয়ে আছেই। সম্প্রতি একটা ভারী চমৎকার ব্যাপার ঘটেছে। ওখানকার সিনেমা ম্যানেজাররা আজকাল ঠিক করেছে ষ্টারদের দিয়ে টিকিট বিক্রী করানো। এতে ছবির নাম যেমন ছড়িয়ে পড়ে তেমনি কুড়িয়ে আনে পয়সা। প্রচার কার্য্যে ওদের জুড়ী মেলা শক্ত।

ফিলিস ব্রুক্‌সকে সেদিন বক্স অফিসে টিকিট বিক্রী করতে বসান হয়েছিল। টিকিট বিক্রী করবে সে। কিন্তু বিপদ হোল ভয়ানক। লোকে এলো, টিকিট কিনলো কিন্তু বক্স-অফিসের কাউণ্টার ছাড়লে না। চাই তাদের সই। সই না নিয়ে তারা নড়বে না। ফলে ফিলিসের টিকিট বিক্রী

করা হোল না আর। লইই করে যেতে লাগলো।

জ্যাক লা রুর মুস্কিল

মুস্কিল হয়েছে জ্যাক লা রুপ! বেচারা মহা ফাঁপড়ে পড়েছে। কি বলবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। কেউ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিতে পারবে না, অথচ সবাই তাকে জিজ্ঞেস করচে আর উত্তর পাবার জন্যে উৎব্যস্ত করচে।

জ্যাক গিয়েছিল মোটরে বেড়াতে নিউ ইয়র্কে। ইতিমধ্যে জ্যাকের নাম কাগজ-ওয়ালারা দিলে জড়িয়ে ইলেনর পাওয়েলের সঙ্গে। ইলেনর পাওয়েল ছিল নাকি ওর দলের সাথী ও এক পথের যাত্রী।

আর মিস কনি সিম্পসনের হলো রাগ। কনি ভালবাসে জ্যাককে; সে তো চটে যাবেই।

তাই জ্যাক যখন ফিরল কনি ওর সঙ্গে কথা কয়নি। শুধু কথা বন্ধ নয় সে দেখা পর্য্যন্ত করে নি। জ্যাক এলো; কনির হাত ধরে কত কাঁদুনি গাইলে; বল্লে:—কতো, কতো কথা। কনি জ্যাকের হাত ধরে বল্লে—তোমার হাতের ওই আংটি, কে দিয়েছে ওটা। জ্যাক চুপ! পারেনি কিছু বলতে।

ডিকের পালান

সেদিন ভিড় জমেছিল নারিকেল গাছের তলায়, ঝোপের মধ্যে। কত লোক ছিল তাতে,—প্যাটরিসিয়া এলিস, ডিক ফোরান আরো কত কত লোক। বিরাট ককটেল পার্টি—সোডা, সস, আর স্যাম্পেন টেবিলে টেবিলে ছড়ান। আইসক্রিমে মুখ ঠাণ্ডা করছে এর, ওর, তার। মিহি আর মোটা আওয়াজ ভাসছে সিগারে আর সিগারেটের ধোঁয়ায়।

উৎসব, উৎসব আর উৎসব। উৎসবে পাগল করেছে তাদের, তাই বন্ধু ঠিক করলে সোডার বোতল খুলে জল ছিটাবে ডিকের গায়ে।

খুললে বোতল—ছাড়লে জল; লাগল না ডিকের গায়ে; ডিক,—সে নীচু হয়ে পালালে। আর চীৎকার উঠল আর একটি সেই ওপাশে বসে খাচ্ছিল কিনা!—কি? কি? কি ব্যাপার আগুন ধরল না সাপে কামড়াল—চেঁচায় কেন ও,—পাগল হোল নাকি! বন্ধ হোল অর্কেষ্ট্রা, টেবিলে, টেবিলে উল্টোলো বোতল! টেড লুইস হাতের দণ্ড ফেলে পড়ল লাফিয়ে বাজনার মঞ্চ থেকে।

তারপর!

থাম, থাম রব উঠল, ডিক বল্লে সবাইকে ব্যাপার কিছুই নয়। তবে সেদিন থামল। ভাঙা আসর আর জোড়া লাগেনি।

হলিউডের প্রজাপতি

যে প্রজাপতিটাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় হলিউডের সেটে—পার্কের মাঠে—রেঁস্তোরার টেবিলে, আরো কত কত জায়গায়, তাকেই দেখা যাচ্ছে জোন ব্লনডেল আর ডিক পাওয়েলের সঙ্গে ঘুরতে। জোনের ডাইভোর্সের যেদিন শেষ খবর পাওয়া যাবে ডিক আর জোন এ আইনের খাতায় নাম রেজেষ্ট্রী করে, এক শয্যায় শয়ন করব। তা যদি না হয় অর্থাৎ এই প্রেমের মিলন যদি না ঘটে—মালা যদি জোনের গলায় না দোলে, তা হলে হলিউড বুঝবে তাদের ধারণাটা ভুল হয়েছে। তারা বুঝবে না যে, ডিকের 'বিয়ে করবে না' এই চুক্তির জন্যে মদনের শর বিঁধল না।

আর একটা খবর বলে দি ডিক ফোরানের সঙ্গে পলা ষ্টোনকে সব সময়েই দেখা যাচ্ছে।

আর দেখা যাচ্ছে ফ্রেড কিটিংকে—প্যাট এলিসের হাত ধরে বেড়াচ্ছে সে।

* গজল *

"গুল্-তাজিয়া 'পরে"

রে মুসাফির! কাজ কী মিছে আখেজ ক'রে,
ভেসে যা দিল্ মিলায়ে--দিল্ বিলায়ে সবার 'পরে
যে ছিল তোর দ্বন্দ্ব-দুস্মন্,
ক'রে নে তায় দোস্ত-সুজন্,
আজকে দিনে দর্গাতে পাত্ প্রেম-দুলিচা সবার তরে।
ব'ল্ছে কবি "শোন্রে আসি,
ডাক্ছে আজ নবীর বাঁশী,
বে-হোশ্ যে আজ দেখ্বি রোশন্ গুল্-তাজিয়া 'পরে"।

খুচরো খবর

রুথ চ্যাটারটন এরোপ্লেন চালাতে ভালবাসে।

* * *

অ্যানা মে ওয়াং, এর দেশ চায়না; সেখানে গেলো সে এই প্রথম।

* * *

রুথ চ্যাটারটন আর ব্রায়ান আহেরিনের নাম লোকে একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করছে।

* * *

আর প্রেমের খবর হচ্ছে জিনি রেমণ্ড আর জেনেট ম্যাকডোনাল্ড।

* * *

সেদিন ঝিনুকের ভেতর থেকে একটা মুক্ত পেয়েছে জীন হারলো।

* * *

ফ্রেড ম্যাকমারে জানত না এতোদিন এরোপ্লেন চালাতে—সে এখন শিখল।

হাসাতে হ্যারল্ড লয়েড্ ওস্তাদ্—একথা সবাই জানে। তাই তার নতুন ছবি "মিল্‌কী ওয়ে" এ হপ্তায় কোল্‌কাতার চিত্রপ্রিয়দের হাসিয়ে খুন কোর্‌ছে। হ্যারল্ডের বাঁ পাশে যে বসে, সে হ'চ্ছে ডরোথী উইলসন আর ডান পাশে হেলেন ম্যাক।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১০ই বৈশাখ ১৩৪২—23rd. April, 1936. } ১৭শ সংখ্যা

কৌশল বনাম আধ্যাত্মিক নিরপেক্ষতা

অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর অনুরক্ত কর্ম্মীদলের মধ্যে যে অবসাদ ও নৈরাশ্যের উদয় হইয়াছে, তাহাতে ব্যথিত হইয়া শরৎচন্দ্রের ত্রুটী, বিচ্যুতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া গত সংখ্যায় যে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে প্রশ্নবাণের যে গুঞ্জরণ উত্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া আমরা পুনরায় উক্ত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ব্যক্তিগত ভাবে শরৎচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের সুযোগ থাকায়, অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দের অপেক্ষা তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার বহু সুবিধা আমরা পাইয়াছি। সেইজন্যই তাঁহার নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বৈধানিক ব্যূহ হইতে যে শর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ ব্যথা বোধ করিয়াছি। কিন্তু এতৎ প্রসঙ্গে ইহাও স্বীকার্য্য যে, কংগ্রেসের এই পরাজয় শরৎচন্দ্রের অবিবেচনার ফলেই সংঘটিত হইয়াছে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের অনুচর ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্তের মুখপত্র "নবশক্তি" অল্ডারম্যান-নির্ব্বাচন আলোচনা প্রসঙ্গে যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতেই কি ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বৈধানিক দলের অনুচরবৃন্দের মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হয় নাই? সহযোগী আক্ষেপ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস ইলেক্শান বোর্ড "যোগ্য ও জনপ্রিয়" সদস্যদের দাবী উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে আজ "পরাজয়ের গ্লানি" ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু বৈধানিক দলের অনুরাগী সদস্যদের মনোনয়ন ব্যাপারে, ক্যাপ্টেন দত্ত ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার রায় চৌধুরী নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে উডবার্ণ পার্কের মন্ত্রণাকেন্দ্রে কিরূপ যাতায়াত করিয়াছিলেন তাহা সাধারণে না জানিলেও কংগ্রেসের অন্তরঙ্গদের অগোচর নাই এবং অতীতের সাহচর্য্যের দুর্ব্বলতাবশে শরৎচন্দ্র বৈধানিক দলের অনুরাগী অধিক সংখ্যক সদস্যকেই মনোনীত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয় সিং নাহার, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী, ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায়, ডাঃ এস, সি, ঘোষ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী শাস্ত্র, কুমার বিশ্বনাথ রায়, শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল, ডাঃ জে, এম দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা প্রভৃতি সকলেই যে পূর্ব্বাপর বৈধানিক দলের অঙ্গীভূত ইহা কি ক্যাপ্টেন দত্ত অস্বীকার করিতে পারেন? শরৎচন্দ্রকে বিভ্রান্ত

করিয়া বৈধানিকদলের উপরিউল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়নের ছাপ প্রদান করাইতে ক্যাপ্টেন দত্ত কতটা দায়ী তাহা কি তিনি নিজে জানেন না? ২২এ ওয়ার্ডে নবনির্ব্বাচিত কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ধরণী কুমার বসু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত ব্যবসায় সম্পর্কে বহুভাবে বিজড়িত এবং সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব ব্যাপার এই যে শ্রীযুক্ত ধরণী কুমার বসুর অভিনন্দন-সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার। বৈধানিকদলের সদস্যবৃন্দের মনস্তুষ্টি করিতে গিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার অনুরক্ত অনুচরবৃন্দকে মনোনীত না করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। সরল-চিত্ত শরৎচন্দ্রকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য কৌশলী বিধানচন্দ্র ও নলিনীরঞ্জন যে দূতদের পাঠাইয়া ছিলেন তাঁহাদের দৌত্যকার্য্য যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

শ্রীযুক্ত জে সি গুপ্ত, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ ও কবিরাজ সত্যব্রত সেন অল্ড্যারম্যান নির্ব্বাচনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া সহযোগী "নবশক্তি" কৌতুক অনুভব করিলেও, শরৎচন্দ্র ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে বিধানীদলের অনুরক্তদের মধ্য হইতে অধিকসংখ্যক কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে সহায়তা করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর বিরুদ্ধ-বাদী সতীশচন্দ্র, জে সি গুপ্ত ও সত্যব্রতকে নিক্ষেপ করা রাজনৈতিক সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। এই কথা তীক্ষ্ণধী ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইল বলিয়া আমরা মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর অবিবেচনার ফলে কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে তাঁহার অনুচরবৃন্দ ভগ্নোৎসাহ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারই অবিবেচনার ফলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জনের সকল ষড়যন্ত্রের ভিত্তির উপর কর্পোরেশনে কংগ্রেস-বিরোধীদলের বিজয়-পতাকা প্রোথিত হইল। যে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিবার বাসনা তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই হাতে আত্মসমর্পণকে কি অদৃষ্টের পরিহাস বলিব না? রাজনীতিতে সরলতা ও আধ্যাত্মিক নিরপেক্ষতার পরিবর্ত্তে কৌশলই যে জয়ী হয়, এই শিক্ষা লাভ করিয়া শরৎচন্দ্র যদি ভবিষ্যতে তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থা পরিচালনা করেন, তাহা হইলে দেশেরও কল্যাণ হইবে এবং আমাদেরও আর এই বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে হইবে না।

-:o:-

বিবিধ

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ গত ১লা বৈশাখ হইতে পুনরায় তাঁহার পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্র "বসুমতী"তে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার সুসম্পাদনায় সহযোগী "বসুমতী" তাহার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইলে আমরা প্রীত হইব।

বালীগঞ্জ বিদ্যালয়

গত রবিবার অপরাহ্নে বালীগঞ্জ প্লেসে বালীগঞ্জ বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় ২৭নং ওয়ার্ডের নব নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেন বার-এ্যাট-ল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিসেস সেন পুরস্কার বিতরণ করেন। বিদ্যালয়ের বালিকাগণ সঙ্গীত, নৃত্য, ড্রিল, আবৃত্তি এবং 'ভক্তের ভগবান' নাটক অভিনয় করিয়া সমবেত ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ আনন্দ দান করে। সভায় সভাপতি—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিদ্যালয়ের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুত তারকচন্দ্র দাশ হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। পুরস্কার বিতরণের পর স্থানীয় যুবকগণ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনীত হইয়াছিল।—বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় সাহিত্যিক শ্রীযুত অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য, কেদারের ভূমিকায় মৌনী শাস্ত্রী এবং অবিনাশের ভূমিকায় ভানুদেব ভাদুড়ী অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। বালক বালিকাদের মধ্যে শ্রীমান্ সুধীর দাশ, বিদু, কুমারী অমলা ভট্টাচার্য্য, রেবা ভট্টাচার্য্য

বিশেষ সুন্দর অভিনয় ও আবৃত্তি করিয়াছিল। কুমারী আশা সরকার এবং রেখা রায়ের নৃত্য কৃতিত্বপূর্ণ হইয়াছিল।

হেমেনদা'র গোবর্দ্ধন ধারণ

"ছন্দা"র দেখা গেল যে, আমাদের হেমেনদা' শাস্ত্রযুদ্ধে পাত্তা না পেয়ে এবার অশোক শাস্ত্রী মশাইকে "শস্ত্রযুদ্ধে" আহ্বান কোরেছেন। শাস্ত্রীমশাইকে আমরা শাস্ত্রব্যবসায়ী, নিরীহ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বোলেই ত চিরদিন জানতুম। হঠাৎ তিনি শস্ত্রযোদ্ধা হোয়ে উঠলেন কবে থেকে? আমাদের এক রসিক বন্ধু অনেক গবেষণার পর স্থির কোরেছেন,—অশোক শাস্ত্রী ম'শাই একজন বৈদান্তিক—নিরাকারের ভক্ত। তাই বোধহয়, হেমেনদা' তাঁর পড়া "শাস্ত্র"কেও নিরাকার "শস্ত্র" বানিয়ে তুলেছেন। হেমেনদা' শাসিয়েছিলেন যে, একজন মালাবারী "শাস্ত্রী" (শৈশব থেকেই কথাকলি আবহের ভিতরেই যিনি মানুষ) অশোক শাস্ত্রী ম'শাইকে শস্ত্রযুদ্ধে ঘায়েল করতে রাজী হোয়েছেন। (হেমেনদা' নিজে বোধ হয় 'আস্পায়ার'!) শাসানর ধরণটা দেখে প্রথমটা একটু ভড়কে যাবার উপক্রমও আমাদের হোয়েছিল—এবার হেমেনদা' যে বিরাট "গোবর্দ্ধন" ধারণ কোরেছেন, তার চাপনে বুঝি বেচারি অশোক শাস্ত্রীর প্রাণটা বেঘোরে মারা যায়! কিন্তু হেমেনদা' যখন তাঁর "শস্ত্র"টি ছুড়লেন, তখন দেখা গেল, যাকে আমরা গোবর্দ্ধন বোলে আশঙ্কা করছিলুম, তা' আসলে গোবর্দ্ধনই নয়—শুধু একতাল গোবর মাত্র।

* * *

পরের সপ্তা'র "ছন্দা"র মালাবারের অধিবাসী ও ঢাকাপ্রবাসী শ্রীযুত গোবর্দ্ধন শাস্ত্রী মশাই অশোক শাস্ত্রীর প্রতিবাদ কোরেছেন। গোবর্দ্ধন শাস্ত্রীর শাস্ত্রজ্ঞানের বহরটা একবার শুনুন। তিনি স্বীকার কোরেছেন যে, "হস্তলক্ষণদীপিকা" বোলে নাচের যে সংস্কৃত পুঁথি আছে, তা' তিনি নিজে জীবনে কখনো পড়েন নি। তবে ছেলেবেলায় মায়ের কোলে ব'সে ব'সে নাচের মুদ্রার গোটা কুড়ি আন্দাজ "শোলোক" মুখস্থ কোরেছিলেন!!! (আহা! এমন না হোলে আর "আশৈশব" "কথাকলি আবহের ভিতর মানুষ" হওয়া যায়!) বড় হোয়েও তিনি আর তাঁর এই শৈশব-প্রতিভার কোন মাজা-ঘষা করেন নি। পাছে ঘষতে ঘষতে সূক্ষ্ম বুদ্ধিটুকু মিলিয়ে যায়। দ্বিতীয় কথা, তিনি শ্রীশঙ্করণ নম্বুতিরির নাচ কখনো দেখেন নি, তবু তাঁর অশোক শাস্ত্রীর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা চাই-ই চাই। (এ না হোলে আর "বিশেষজ্ঞ" কা'কে বলে?) খাঁটি কথাকলির মুদ্রাগুলি সব "হস্তলক্ষণদীপিকা" থেকে নেওয়া হোতেও পারে। কিন্তু শ্রীশঙ্করণ যে সম্প্রদায় (কেরলকলালয়ম্) গড়েছেন, তা' যে ঠিক খাঁটি কথাকলির ভাব পুরোপুরি বজায় রেখেছে, তা'র সন্ধান তিনি রেখেছেন কি? শ্রীশঙ্করণ তাঁর মুদ্রাগুলি হুবহু "হস্তলক্ষণদীপিকা" থেকে নিয়েছেন কি না—এ তত্ত্বটা তাঁর নাচ নিজের চোখে না দেখে বা তাঁ'র নিজের কাছ থেকে না জেনে শুনে নিয়ে গোবর্দ্ধন শাস্ত্রী এ প্রতিবাদ লিখতে সাহস করেন কি করে? অথবা এতে আশ্চর্য্য হ'বারই বা কি আছে? কারণ,—"rush in where angels fear to tread"—এর চেয়ে বড় সত্য কথা খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের কোন প্রতিনিধি শ্রীশঙ্করণের কাছে জিজ্ঞাসায় জেনেছেন যে, তিনি তাঁর নাচে কোন সংস্কৃত পুঁথিই হুবহু অনুসরণ করেন নি; বরং অনেক নূতনত্ব এনেছেন।

মালাবারী শাস্ত্রীর আর এক আফশোষ—উদয় শঙ্করকে নম্বুতিরির তুলনায় ছোট করা হয়েছে কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেশে একজনকে ছোট না কোরেও ত আর একজনকে বাড়ান চলে। শাস্ত্রী ম'শায়ের কি এ জ্ঞানটুকুও নেই যে, নাচের দর্শক যাঁরা (অবশ্য তিনি ও হেমেনদা' ছাড়া) তাঁরা কেউই শ্রীরামকৃষ্ণের মত ব্রহ্মজ্ঞানী নন। আর ঠিক এই নজীরেই ত "এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী"—হেমেনদা'কে কোনরকমে ছোট না কোরেও আমাদের আফিসের গোবরাকে তাঁর তুল্য বিজ্ঞ সমালোচক বলা চলে।

শাস্ত্রীজী বোলতে চেয়েছেন—সংস্কৃত ভাষার মত মুদ্রা-ভাষাও মৃত ভাষা। আজ কলকাতা সহরে ভাস-কালিদাসের সংস্কৃত নাটক অভিনয় হোলে যেমন failure হোতে বাধ্য, তেমনি এই সব পুরাণো মুদ্রাদোষদুষ্ট নাচও এযুগে এদেশে, অচল না হোয়ে পারে না। শাস্ত্রী ম'শাই এত শাস্ত্র পড়েন—আর এটুকু খবরও রাখেন না যে, এই কলকাতা সহরেই এমন একটি প্রতিষ্ঠান আছে, যা'র সকল কার্য্য কেবল সংস্কৃত ভাষার মারফতেই নির্ব্বাহ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম **"সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎ"**। পরিষদের সভ্যেরা খুব কম কোরে অন্ততঃ শ' তিনেক বার সংস্কৃত নাটকের অভিনয় এই কলকাতা'তেই কোরেছেন। তাদের একখানি নাটকের "শতরজনী" অভিনয়ও হোয়ে গেছে। আমরা বহুবার এই সব অভিনয় দেখেছি। সংস্কৃত ভাষা বুঝি না বটে, কিন্তু সংস্কৃত অভিনয় বুঝতে কোনবার একটুও বেগ পেতে হয় নি। আর এই সব অভিনয় যাঁরা করেন, তাঁরা সকলেই যে দিগগজ পণ্ডিত তাও নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে অসংস্কৃতজ্ঞ অভিনেতারাই অভিনয় ভাল করেন। আর দর্শকের মধ্যেও পণ্ডিতের ভিড় যে খুব বেশী হয়, তাও বলা যায় না। পাশ্চাত্যশিক্ষিত, কলারসিকগণের সমাবেশই এতে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। স্কুল কলেজের ছেলেদের আগ্রহও এতে খুব। আধুনিক সভ্যতা ও রুচিবিশিষ্টা মহিলাগণও সাগ্রহে

এসব অভিনয় দেখতে আসেন—এ আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি। তবে আর সংস্কৃত অভিনয়ের অবস্থা অচল বলি কি করে!

যাক্—আমাদের সব অশাস্ত্রীয় মতি-গতি। দুই শাস্ত্রীর শাস্ত্রযুদ্ধের ভেতর ঢোক্‌বার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে ওপর ওপর যতটা বুঝেছি তা'তে মনে হয় যে, অশোক শাস্ত্রী মশ্যাই এই সব বাজে-মার্কা তার্কিকদের সঙ্গে যেন আর তর্কযুদ্ধে না নামেন। তাঁর বাজারে একটু সুনাম আছে। রাম, হরি, যদু, মধুর সঙ্গে বাদানুবাদ করা একবার সুরু করলে তা' আর অক্ষুণ্ণ থাকবে না—এ তাঁকে আমরা আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি।

* * * *

হেমেনদা' আমাদের "বস্তুহীন চীৎকারে" বড় আতঙ্ক পেয়েছেন শুনলুম। যাক্,—এ তবু "মুদ্রাতঙ্ক"—জলাতঙ্ক নয়। এ রোগের চিকিৎসা কলৌলীতে হয় না, জানি। তবে গৌদল পাড়ায় হোলেও হোতে পারে।

পবিত্র দাশগুপ্ত

তরুণ-সঙ্গীতজ্ঞ
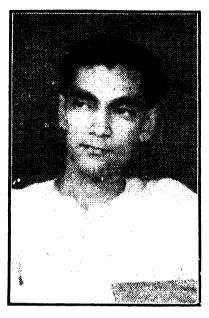
শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার দাশগুপ্ত (২৩) বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ ম্যারিস সঙ্গীত কলেজের এবং সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায়ের ছাত্র। গত ২২শে মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্তা বেলা হালদার মহাশয়ার পরিচালনায় বেতারে তাঁহার খেয়াল গান শুনিয়া আমরা সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি। মাত্র তিন বৎসর লাক্ষ্ণৌএ গিয়া পবিত্রবাবু উচ্চ সঙ্গীতে সবিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছেন। জানিতে পারিলাম পবিত্রবাবু কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবেন। আশা করি, বেতার কর্ত্তৃপক্ষ এই নবীন সঙ্গীতজ্ঞের গান মাঝে মাঝে শুনাইয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবেন।

ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘ

ভবানীপুর ব্যায়াম সংঘের ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভায় আগামী বর্ষের জন্য (বাংলা ১৩৪৩) উক্ত সংঘের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সভাপতি:—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র সেন।

পপুলার পিক্‌চার্সের

আগামী নিবেদন

ভূমিকায়ঃ

* কুমারী শীলা হালদার

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জীবন গাঙ্গুলী কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল দাস, সুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (এঃ), ধীরেন ঘোষ (এঃ), শেফালিকা (পুতুল) আসমানতারা, রেণুকা ঘোষ আঙ্গুর বালা, গোপালী বালা

* শ্রীমতী ডলি রায়

পরিচালক : সতু সেন চিত্রনাট্য : হেমন্ত গুপ্ত

সহ-সভাপতি :—শ্রীযুক্ত সাতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যুগ্ম-সম্পাদক :—শ্রীরণজিৎ কুমার বসু মল্লিক, কবিরাজ সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ :—শ্রীরবীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅঘোরচন্দ্র দাস, শ্রীশচীন্দ্রকুমার দাস, শ্রীঅমরকুমার ঘোষ, শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিশিরকুমার গুহ।

পাঠাগার অধ্যক্ষ :—শ্রীসত্যপ্রেম রায় চৌধুরী, ডাঃ সতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়।

প্রীতি সম্মেলন

শ্রীযুত হেমন্তকুমার গুপ্তের সম্পাদনায় এবং নিউজ পেপার পাবলিশিং সিণ্ডিকেটের পরিচালনায় আগামী সপ্তাহে "সাহানা" নামে একটি নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। তাহার শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে গতপূর্ব্ব মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় ৩নং সুতারকিন্ ষ্ট্রীটে (চিত্তরঞ্জন এভিনিউ) একটী প্রীতি সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীযুত সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সজনীকান্ত দাস, অবিনাশ ঘোষাল, বিশ্ববন্ধু রায়চৌধুরী, ডাঃ ধীরেন সেন, বাবুলাল চৌখানি, জ্যোতিষ ঘোষ, যামিনী মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সতু সেন, বিভুতি ভুষণ ব্যানার্জ্জি, হররংগাবিন্দ সেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত হেমন্ত গুপ্ত, শিশির হালদার, অমিয় দে, ললিত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নিমন্ত্রিতগণকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

এঁদের তামিল "দেবদাসে"র শুটিং সুরু হ'য়েছে।

* * *

শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন 'বিজয়ার' বরণ হ'বে। দীনেশদার অসাধারণ ধৈর্য্য সার্থক হো'ক এবং তাঁর যশঃ সৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হোক আমরা এই শুভ কামনা কর্চ্ছি। চরিত্র-লিপি বণ্টনের শেষ মীমাংসা হয়েছে বলে এখনও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করা যায় না। দুর্গাদাস, বিশ্বনাথ ও পাহাড়ীর ভাগ্য যথাক্রমে পরীক্ষিত হ'য়ে অবশেষে পাহাড়ীই নরেনের ভূমিকায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন। পাহাড়ী ও দুয়ার দ্বন্দ্বে দুয়া জয়লাভ করে বিলাসলাভ করেচেন। বি ইউনিটে খোঁটার জোর যখন আছে তখন A. D. C. দুয়া ভায়ার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তা' আমরা ভবিষ্যৎবাণী কর্চ্চি। ক্ষেত্রবালার গোঁসাঘরে অভিমান করা সার্থক হয়েচে—'নলিনী'র মণি-মালা তাঁর গলায় পড়েচে।

কালী ফিল্মস্

এই ষ্টুডিওতে গুণময় বাঁড়ুয্যের "পরভৃতিকা" মহলায় বসেছে। তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর "অন্নপূর্ণার মন্দির", জ্যোতিষ মুখুয্যের "ভোট-ভণ্ডুল", রহস্যময় পরিচালকের "বসন্ত-পূর্ণিমা", সুকুমার দাশগুপ্তের হিন্দী "প্রফুল্ল"র শুটিং চলেছে। আর "হারানিধি"র ভূমিকা-লিপি বণ্টন গাঙ্গুলি মশাই এদিকে নিজে কোরছেন।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

পরিচালক দেবকী বসু আর তাঁর কর্ম্মীরা এখন বস্তীর দৃশ্য তোলা নিয়েই ব্যস্ত।

...হপ্তায় আজুরি ও রঞ্জিত রায়ের রাস্তায় ...-নৃত্যের মনোহারী দৃশ্য তোলা হ'য়েছে। ...র দৃশ্যের ভেতর এরূপ আরও অনেক ব্যাপার সংগ্রথিত হওয়ার পর এই দৃশ্যটি শেষ হ'বে।

* * *

খবর পাওয়া গেল ফ্রাঙ্কলিন্-গ্রান্ভিল ...ল বোম্বাইয়ে মহামান্য লর্ড ও লেডী উইলিংডনের প্রত্যাবর্ত্তন ও নতুন বড়লাট বাহাদুরের আগমনের যে চিত্রগ্রহণ ক'রেছেন তা' খুব ভাল হ'য়েছে। এবার এরা 'ওয়াইল্ড লাইফ' যেখানে প্রথম তুলবেন—সে জায়গায় রওনা হবেন।

* * *

"বাগী সিপাহী"র রাণীর কক্ষের একটি মস্ত বড় দৃশ্য এখন তোলা হ'চ্ছে।

* * *

পারস্য-চিত্র "লয়লা-মজনু" স্পেন্টার পরিচালনায় প্রায় আধাআধি শেষ হ'য়েছে।

রাধা ফিল্মস্

ফণি বর্ম্মার পরিচালনায় এদের আগামী বাঙলার ছবি "বিষবৃক্ষে"-র শূটিং ১লা বোশেখ থেকে সুরু হ'য়েছে।

* * *

এদের হিন্দী "কণ্ঠহারে"র নাম হ'য়েছে "...নী কোন?" ছবিখানার পরিচালক জি, আর, শেঠী।

"শ্রী"

এখানে "পথের শেষে" ষষ্ঠ হপ্তায়ও দর্শক আকর্ষণ কোরছে খুব। অসচে শনিবার থেকে ছবিখানা সপ্তম হপ্তায় পড়্বে।

"উত্তরা"

এদিকে 'উত্তরা'-রও দর্শকের ভীড় দেখে মনে হয় "কাল-পরিণয়" এখানে ন, দশ হপ্তা বেশ চলবে।

পরপৃষ্ঠায় দেখুন

খোরপোষের দায়ে—
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার
আলিপুরের এজলাসে চাঞ্চল্যকর দরখাস্ত

গতকল্য বুধবার বেলা ১১৷৷০টার সময় আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসে স্বর্গীয় মহেন্দ্র সিংহের কন্যা টালিগঞ্জ থানার এলাকাধীন ৬নং কেয়াতলা লেনের অধিবাসিনী শ্রীমতী রাসমণি দেবীর পক্ষে উকীল শ্রীযুক্ত প্রকাশ ঘোষ ও হীরেন মিত্র কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে অবৈধ সহবাসজনিত বলিয়া বর্ণিত কন্যা মহামায়া দেবীর ভরণ পোষণের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা খোরপোষের দাবী করিয়া এক আবেদন পেশ করেন।

শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার

মিঃ এল, কে, সেন ২৯শে এপ্রিল তারিখে উক্ত আবেদন অনুযায়ী কারণ দর্শাইবার জন্য শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকারের উপর নোটীশ জারি করিয়াছেন। আদালতে কন্যাসহ রাসমণি দেবীর উপস্থিতিতে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

"খেয়ালীর" পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট এই মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসেই কবিরাজ অনাথনাথ রায়ের মামলা ও "খেয়ালী" মানহানি মামলার শুনানী হইয়াছিল। পাঠকবর্গের ইহাও স্মরণ থাকা স্বাভাবিক যে এই মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসেই "খেয়ালী" মানহানি মামলায় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রূপবাণী

শনিবার ২৫শে এপ্রিল থেকে মাত্র ৪ দিনের জন্য লরেল হার্ডির "ডেভিল ব্রাদার", তারপর তিন দিন দেখান হবে "স্মাইলিং থ্রু"। ২রা মে থেকে বহু আকাঙ্খিত অনুরূপা দেবীর "মহানিশা" এখানে মুক্ত হবে।

তোলা হ'চ্ছে। সিসটোফোন যন্ত্রে বাবাদাস চাটুয্যে শব্দগ্রহণ ও আলোক-চিত্রের কাজ কোরছেন পি, স্যাণ্ডেল—একে সাহায্য কোরছেন অজিত সেন আর নায়ক সাজছেন ফণি বিদ্যাবিনোদ।

শোনা যাচ্ছে এরপরে এরা হেমেন্দ্র কুমারের "ঝড়ের যাত্রী" তুলবেন।

তুলবেন—একথা আগে থেকেই বলছি—কারণ, কয়েকদিন শুটিং-এ হাজির থেকে সে অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় কোরেছি। "আবর্ত্তনে" যে সকল শিল্পীর সমাবেশ হ'য়েছে তার মধ্যে আমরা নতুনত্বের স্বাদ পাব, কুমারী লীলা হালদার ও জনপ্রিয় ধীরেন ঘোষের আবির্ভাবে। লীলা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিয়েও পর্দায় নামবার যে সৎসাহস দেখিয়েছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। এ ছাড়া ডলি রায়, মনোরঞ্জন, জীবন, পুতুল, আসমানতারা, শরৎ চাটুয্যে প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

নিউ থিয়েটার্সের বাঙলা ছবির পরিবেশনা
মিঃ বি, এন্, সরকারের বিবৃতি

নিউ থিয়েটার্সের বাঙলা ছবির পরিবেশনা সম্বন্ধে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, এন্, সরকার জানিয়েছেন :—

নিউ থিয়েটার্সের বাঙলা ছবির পরিবেশনা নিয়ে আমাদের চিত্র প্রদর্শনকারীদের মনে যে সংশয়াকুল জল্পনার সৃষ্টি হ'য়েছে বলে মনে হয়, সেই জল্পনা নিরাকরণের জন্তে নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে তাঁদের অবগতির জন্তে জানাচ্ছি—যদিও বর্ত্তমানে অরোরা ফিল্ম করপোরেশন নিউ থিয়েটার্সের বাঙলা ছবির একমাত্র পরিবেশক, প্রাইমা ফিল্মস্ লিঃ নিউ থিয়েটার্সের ষ্টুডিওতে প্রযোজিত ও নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড কর্ত্তৃক মুক্ত অন্যান্য কতকগুলো বাঙলা ছবির পরিবেশনা কোরবেন। অরোরা ফিল্মস্ ও প্রাইমা ফিল্মস্ যথাক্রমে "গৃহদাহ" ও "বিজয়া" সরবরাহ কোরবেন।

মিঃ বি, এন্, সরকার

চন্দ্র ফিল্মস্

এদের "পরপার"এর শুটিং প্রায় শেষ হয়েছে। ছবিখানা অবিলম্বেই 'চিত্রা'-য় দেখাবার জন্য যতীন দাস ছবিখানার সম্পাদনা করছেন। বাঙলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ-সম্মিলনে, যতীন দাসের সুবিজ্ঞ পরিচালনায়, প্রবোধ দাস ও জ্যোতিষ সিংহের আলোকচিত্র ও শব্দযন্ত্রে, অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গীত-লহরীতে যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে—এ ভবিষ্যদ্বাণী দিকে দিকে সবায়ের মুখেই ধ্বনিত হ'চ্ছে।

ডি-জি-টকীজ

এদের প্রথম ছবি "দ্বীপান্তর"এর শুটিং কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে নিয়মিত চলছে। ছবিখানার সাফল্যের জন্তে 'ডি-জি' আর তাঁর কর্ম্মীবৃন্দ দিনরাত যে অক্লান্ত পরিশ্রম কোরছেন, তা' সত্যই প্রণিধানযোগ্য। আমরা এঁদের সফলতা কামনা করি।

দেবদত্ত ফিল্মস্

এদের দ্বিতীয় ছবি অহল্যার চরিত্র নির্ব্বাচন হ'য়েছে এরূপ :—অহল্যা—রেণুবালা রায়, মায়া—ইলা, শচী—ছায়া, ইন্দ্র—অহীন্দ্র চৌধুরী, গৌতম—বীরেন বল, রঘু—মৃণাল ঘোষ, বিশ্বামিত্র—রবিরায়, সূর্য্য—জ্যোৎস্না মিত্র, অন্ধ চণ্ডাল—সত্যেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টস

পান্নালাল পাঠকের মালিকত্বে এই নামে একটি প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে। এদের প্রথম হাসির ছবি "রামকান্ত দালাল" মঞ্চ-নট রাধিকানন্দ মুখুয্যের পরিচালনায়

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

চারু রায় পরিচালিত এদের "বাঙ্গালী" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

পপুলার পিক্‌চার্স

এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ছবি "আবর্ত্তন" শীঘ্রই 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোরবে। "আবর্ত্তন" আধুনিক সমাজের চিত্তভেদী করুণ কাহিনী। আখ্যায়িকাটি আমরা জানি—এতে বাঙলা ও বাঙালীর মনের ব্যথা ফুটে উঠেছে পর্দার পর পর্দায়। মধু সেন ছবিখানির পরিচালনা কোরে যে মঞ্চের মত পর্দায়ও তার রসজ্ঞান ঘনীভূত কোরে

পরলোকে মণিলাল

কালী ফিল্মসের হিন্দী "প্রফুল্ল"-র নায়ক মণিলাল গত হপ্তায় পরলোক গমন কোরেছেন। এর আগে "ওয়ান্ ফেটাল নাইট"-এ অভিনয়ে ইনি সুনাম কেনেন। ব্যবহারিক জীবনে মণিলালের মত অমায়িক ও সচ্চরিত্র অভিনেতা বাঙলাদেশে খুব কম আছেন। আমরা এর শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস
অতীত ও ভবিষ্যৎ

শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার

লক্ষ্ণৌ চলিয়াছি—কংগ্রেসে যোগদান করিতে। বন্ধুদের সহিত গল্প করিতেছি বটে কিন্তু আমার মনের আকাশে শরতের শুভ্র বিচ্ছিন্ন লঘু মেঘের টুক্‌রার ন্যায় কল্পনার নানা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশ ঘোরা ফেরা করিতেছে। মনে হইতেছিল ১৯১৬ সালের পর লক্ষ্ণৌ-এ এই আবার কংগ্রেসের অধিবেশন। সেবারে বাঙ্গালী অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাকে একদিক হইতে Historic Session বলা যাইতে পারে, যেহেতু ৮ বৎসর পূর্ব্বে সুরাটে যে বিচ্ছেদ হইয়াছিল সেই বিচ্ছেদস্মৃতির উপর যবনিকাপাত করিয়া আবার নূতন করিয়া সর্ব্বদল-মিলনের সূত্র রচিত হইয়াছিল। আর এই আসন্ন শাসন সংস্কারের সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাহ্নে পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে এই অধিবেশনকেও ঐতিহাসিক অধিবেশন (Historic Session) বলিতে পারি—যেহেতু বর্ত্তমান কাল ও অবস্থাকে আমি জাতীয় জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ বলিয়াই মনে করি। আর সত্য কথা বলিতে কি, যৌবনের অদম্য শক্তিতে শক্তিমান, উদ্‌বুদ্ধ জাতীয়তার প্রতীক, নিজস্ব নির্ভীক চিন্তায় দীপ্যমান, এখন দুইজন ভারতবাসীই চোখে পড়ে—পণ্ডিত জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। ইঁহাদের মধ্যে একজন যখন কংগ্রেস সভাপতিত্ব করিতে যাইতেছেন, তখন অপর জন ভারতে ফিরিবামাত্র রাজরোষে পতিত ও বিনা বিচারে বন্দী—ইহাকে অদৃষ্টের পরিহাস ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন বন্দী সুভাষচন্দ্র এই লক্ষ্ণৌ সহরে বলরামপুর হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহাকে দেখিবার জন্য তখন লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম। তাহার পর এই……।

বাঙ্গলার দলাদলি সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাস্তবিক এই দলাদলি বাঙ্গলার যে কত ক্ষতি করিয়াছে এবং এই দলাদলি পরিহার না করিলে আমাদের

শিশু জওহরলাল (১৮৯০)

ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা যে সুদূর পরাহত তাহা বহুবারই উল্লেখ করিয়াছি। তবে, আমার ধারণা ছিল যে, এইরূপ দলাদলি বাঙ্গলারই নিজস্ব—বাঙ্গলার বাহিরে ইহার কোনো অস্তিত্ব নাই। লক্ষ্ণৌ-এ গিয়া আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির মধ্যে দলাদলি ও ঝগড়ার জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন কোথায় হইবে—তাহা বহুদিন ধরিয়াই অনির্দ্দিষ্ট ছিল এবং শেষে মালবীয় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মধ্যস্থতায় তাহা মিটমাট হইয়াছিল—একথা সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। লক্ষ্ণৌ পৌছিয়া দেখিলাম কংগ্রেসের আয়োজনে সেই ঝগড়ার চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান—মতিনগরের গঠন ও পারিপাট্য অসম্পূর্ণ। মতিনগর যাহা হইতে পারিত তাহা হয় নাই—শুধু দলাদলি ও আত্মকলহের জন্য।

প্রথমেই সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টিকটু ও বিস্ময়জনক যাহা দেখিলাম তাহা এই যে,—সেখানে প্রকৃত সেবাব্রতী নাই। বাঙ্গলায় volunteer বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সম্পূর্ণ অভাব। আজ নহে বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে—বিশেষ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে শিক্ষিত যুবক ও ছাত্রশ্রেণী, কি রাজনৈতিক কি অরাজনৈতিক সকল রকম অনুষ্ঠানেই—সেবাব্রতের ভার গ্রহণ করিয়া সুনামের সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন

করিয়াছে। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস ছাত্রদল সংস্পর্শ বিরহিত। দরোয়ানশ্রেণীর কতকগুলি লোককে সাময়িকভাবে অর্থ-বিনিময়ে volunteer-এর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই ভাড়াটিয়া অশিক্ষিত ভলান্টিয়ারের দল লাঠি হাতে চৌকীদারী করা ভিন্ন অপর কোনো কাজে লাগে নাই। তাহারা কিছুই জানে না। প্রথম প্রথম ইহা বুঝিতে না পারিয়া হয় তো তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি—"Publicity Office কিধার?" তাহারা তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে উত্তর দিয়াছে—"নেই জান্তা হুজুর।" যেখানকার ছাত্রদল রাজনীতি সম্বন্ধে "শতহস্তেন বাজিনাং"—এই নীতি অনুসরণ করে, যেখানে কংগ্রেসের ন্যায় অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়াটিয়া সেবাব্রতী সংগ্রহ করিতে হয়, সেখানকার লোকও বাঙ্গলার কথা উঠিলে তাচ্ছিল্যের সহিত নাসিকা কুঞ্চিত করে, ইহা সত্যই মর্ম্মান্তিক।

স্বেচ্ছাসেবিকাদের অবস্থাও অনুরূপ। শ্রীযুক্তা সুনীতি মিত্র, শ্রীযুক্তা নেহরু—ইঁহারা ও আর দুই-এক জন হয়তো আভিজাত্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সকলকে স্বেচ্ছাসেবিকা না বলিয়া কংগ্রেস পরিচারিকা বলিলেই বোধহয় ভাল হয়।

এই সকল দেখিয়া ভাবিতেছিলাম নানাদিকে বাঙ্গলা অপেক্ষা যাহারা পিছাইয়া আছে তাহারা বাঙ্গলার উপর আধিপত্য করে কিরূপে। কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ফলে এই আত্মগত প্রশ্নের উত্তরও পাইয়াছি। বাঙ্গলা আজ পিছাইয়া আছে, কারণ বাঙ্গলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নিখিল ভারতীয় ব্যাপারে তাঁহাদের যোগ্য আসন ও স্থান লইতেছেন না, সারা ভারতের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহারা এখন উদাসীন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে তাঁহাদের অনুপস্থিতিই তাহার প্রমাণ। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ জে, সি, গুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যদি যাইতেন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আলোচনায় যদি শরৎচন্দ্র যোগদান করিতেন তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ফলে হয়তো ব্যাপারটা এরূপভাবে ধামা

ক্রীড়ারত জওহরলাল (১৮৯১)

চাপা পড়িত না। নিজেদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক—নিখিল ভারতে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ইঁহাদের যে প্রতিষ্ঠা আছে সমবেত ভাবে কার্য্য ক্ষেত্রে তাহা যদি ব্যবহৃত না হয় তো ইঁহাদের ছাড়িয়া বাহিরের লোককে কি দোষ দিব! বাস্তবিক প্রস্তাবে কংগ্রেস হইতে শরৎচন্দ্রের অনুপস্থিতি আমাদের সকলেরই বড় বেশী বাজিয়াছে। শরৎচন্দ্রকে তাই সবিনয়ে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করা যদি তাঁহার অভীপ্সিত হয় তাহা হইলে এই Half-hearted ভাব পরিত্যাগ করিয়া তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে এই গুরুভার গ্রহণ করুন। সুভাষচন্দ্রের অভাবে বাঙ্গলার হৃত আসন পুনরাধিকারের দায়িত্ব তাঁহারই সমধিক—একথা বিস্মৃত হইলে তো তাঁহার চলিবে না।

এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনে বাঙ্গলার কোনো স্থানই ছিল না বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে দুইবার মাত্র লক্ষ্ণৌ-এ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছেন দুইজন বাঙ্গালী। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আর, প্রথম লক্ষ্ণৌএ ছিলেন বাঙ্গলার অন্যতম মনীষী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত। আর এবার?

বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। সেখানে শ্রীযুক্ত মাখমলাল সেন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে যখন Office Acceptance সম্বন্ধে আলোচনা হইল, তখন বাঙ্গালীর মধ্যে এক ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের বক্তৃতাই হৃদয়গ্রাহী ও উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। বাকী বাঙ্গালী প্রতিনিধিরা বোধ হয় বক্তৃতা না করিলেই ভাল ছিল। খোলা অধিবেশনে এক শ্রীযুক্ত ধীরেশ চক্রবর্ত্তী ভিন্ন আর কোনো বাঙ্গালীই বলিবার মত কিছুই বলিতে পারেন নাই। বক্তৃতার আসরে ইঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আজ মনে হয়—হায়, রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা না কম্বুকণ্ঠ সুরেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী? যে বক্তৃতা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর সুনাম ও

দুর্নাম দুই-ই ছিল—সেই ব্যাপারে যেন আজ শ্মশানের নীরবতা তাহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। বক্তৃতাতেও দেখিলাম অবাঙ্গালী—বিশেষ করিয়া মাদ্রাজী ও বোম্বাইয়ের সোশ্যালিষ্ট দলের যুবকসভ্য বেশ কৃতিত্ব প্রকাশ করিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, এই নূতন দলের মধ্যেও বাঙ্গলার স্থান কোথায়? নূতন চিন্তার ক্ষেত্রেও কি তাহার দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে? সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলার এই তথাকথিত সোশ্যালিষ্টদল বলিয়া একাধিক দলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেখানেও ঐক্য, সঙ্ঘশক্তি, চিন্তা ও ভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ—এ সমস্তেরই অভাব। বোম্বাই সোশ্যালিষ্টদলের মধ্যে এ সকল গুণই বর্ত্তমান—মাসানী, অচ্যুত পটবর্দ্ধন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য্য নরেন্দ্রদেব প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট সখ্য আছে—এঁরা পরস্পর পরস্পরের হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন না। সেই জন্যই এই দল কংগ্রেসের মধ্যে অন্যতম প্রধান দল হিসাবে ইতিমধ্যেই নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সমস্যা লইয়া আলোচনা কালে মিঃ সত্যমুর্ত্তি যে ভাবে এই ব্যাপারের টীকাভাষ্য করিলেন তাহাতে নিদারুণ দুঃখের সহিতই মনে হইল যে, এতদিন পরে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের প্রভেদ বুঝি লুপ্ত হইল। ১৯২০ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত যাহারা Left-wingers বলিয়া পরিচয় দিতেছিলেন মন্ত্রিত্ব মাকালের লোভে তাঁহারা আজ উদারনৈতিক তথা মডারেটদের সহিত একই মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শত শত যুবকের আত্মত্যাগ ও আত্মনিগ্রহ কি বৃথাই হইল! আজ কবি যতীন্দ্রনাথের কবিতার দুইটি লাইন মনে পড়িতেছে :—

"বোকা বোকা ছেলে চ'লে যায় জেলে, আমরা বাহিরে আছি

মাতা পুত্র (১৮৯৭)

দেখি যে দেশটা এল কি না এল স্বরাজের কাছাকাছি।"

লণ্ডনে জওহরলাল (১৯০৪)

এমনই অদৃষ্টের পরিহাস যে এতদিনকার প্রখ্যাত No-changer, মিঃ রাজাগোপালাচারি আজ তাঁহার কোট বদলাইয়াছেন (Turncoat)। সেদিন তিনি স্বরাজ্যদল গঠন করার জন্য দেশবন্ধুর প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই, আর আজ তিনিই দাঁড়াইয়াছেন মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে। মহাত্মা গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি পাকা ঘুঁটিও আজ এই সম্পর্কে কাঁচিতে বসিয়াছে। ধন্য রাজনীতি!

একজন লোককে দেখিলাম যিনি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, যিনি বোড়ের চালে কিস্তিমাৎ করিতে জানেন। তিনি আর কেহই নহেন—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই। মঞ্চের উপর তাঁহাকে কেহ কোন দিনই সম্মুখে দেখে নাই—নিজেকে যথাসম্ভব লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিয়া পিছন দিকেই বসিয়াছিলেন। কিন্তু সেইখান হইতেই এমনভাবে সূত্রধরের কাজ করিয়াছিলেন যে তাঁহার নির্দ্দেশেই ভোটের গতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছিল। অধিবেশনের প্রারম্ভে কমলা নেহরু স্মৃতি ভাণ্ডারে পাঁচ হাজার টাকা দানের ঘোষণা দ্বারা তিনি যে ভাবে সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার সূক্ষ্ম রাজনীতি ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিকাতার ১৯২৮° সালের কংগ্রেস যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সহস্র ত্রুটী চক্ষে পড়িবে। নিয়মনিষ্ঠা, সেবাব্রত, ছাত্রদলের সহিত কংগ্রেসের যোগাযোগ—এই সকল বিষয়ে কলিকাতার সেই কংগ্রেস স্মরণীয়। কিন্তু

মহাত্মা গান্ধী ইহাকেও Circus-show বলিয়া বিদ্রূপ করিতে ত্রুটী করেন নাই। অথচ মজার কথা এই যে, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে শেষ পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য একরাত্রি নাচের আসর বসাইতে হইয়াছিল। সবরমতীর ঋষি কিন্তু এ সম্বন্ধে নীরব।

কেম্ব্রিজে পঠদ্দশাকালীন পণ্ডিত জওহরলাল ও সতীর্থগণের ফটো। বাম দিক হইতে: দ্বিতীয়—শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত, চতুর্থ—ডা কিচলু এবং পঞ্চম স্বয়ং জওহরলাল।

বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের অবস্থা আজ প্রায় সমান। পাঞ্জাবও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সমস্যায় বাঙ্গলারই ন্যায় পীড়িত। অথচ সেখানকার প্রতিনিধি একমাত্র ডাঃ সত্যপাল। বাঙ্গলাও প্রাইমারি ভোটে চার পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল। অথচ বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের হাতে পঁচিশ ত্রিশটি ভোট—মাদ্রাজের হাতেও তাই। সেইজন্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বিষয়ে ভোটের সময় দেখা গেল বিহার ও মাদ্রাজ একত্র হইয়া আর সকলকে পরাজিত করিয়াছে।

দুর্ব্বল, আত্মবিশ্বাসহীন, উদাসীন ব্যক্তিদের রাজনীতি দূরের কথা, জীবনেও কোনো স্থান নাই। অন্যান্য প্রদেশের হস্তে বাঙ্গলার লাঞ্ছনা আজ সকলের চক্ষেই সুপ্রকট। ইহা লইয়া বিলাপ করিয়া লাভ নাই। আত্মকলহ ও উদাসীনতা পরিত্যাগ করিয়া নিখিল ভারতের ব্যাপারে পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করিবার অচিরাৎ চেষ্টা না করিলে বাঙ্গলার দুর্দ্দশা কল্পনাতীত। আজ পট্টভাই সীতারামাইয়ার মত লোকও বলে—"Bengal never speaks." এই ব্যাঙের লাথি খাইয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না?

সেই সিংহল বিজয়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত যে বাঙ্গলা সারা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, যাহার সাহিত্য আজ সারা পৃথিবীতে গৌরবের আসন লাভ করিয়াছে, যে দেশ এখনও দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় ও সুভাষচন্দ্রের মত ত্যাগী কর্ম্মবীরের জন্মদান করে—সে দেশ পিছাইয়া পড়িবার নহে। চাই আত্মচেতনা, চাই কর্ম্মপ্রেরণা, চাই সঙ্ঘবদ্ধতা। কারা প্রাচীরের অন্তরাল হইতে সুভাষচন্দ্রের বাণী শুনা যাইতেছে—"Congressmen unite." শুধু বাঙ্গালার সম্বন্ধেই কি এই আহ্বান ব্যর্থ হইবে?

প্রেমের দ্বন্দ্ব

শ্রীমতী রুচিরা দেবী

নববধূ সুচেতাকে ঘিরে ননদের দল বসেছিল। অশোক বার কয়েক সামনের বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেছে, এক আধবার বোনেদের ডাকবার ছল করে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এতেই তাকে নিয়ে হাস্য পরিহাস চলছিল। কিন্তু অস্ফুট-গুঞ্জন তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে রূপান্তরিত হল, যখন সে সরাসরি ঘরে ঢুকে সকলকে হুকুম করলো, এই তোমরা একটু সরো ত, ওকে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমার বন্ধুরা এসে সব ভীষণ ছ্যাবলামো করবে ঠিক করেছে, সে সম্বন্ধে—

মেয়েরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘর ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হল, কেউবা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, সকলেই বিয়ে করে রাঙাদা, কিন্তু বিয়ে হতে না হতে তোমার মত বউ-পাগলা কাউকে দেখিনি বাপু! আর একজন বললে, ফুলশয্যেটাও তর সইছে না দেখছি যে!

অশোক রাগ করলেও কিছু বলতে পারলে না, কিন্তু ঘোমটার আড়ালে বধূ সশঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। চারিধারের তীব্র কৌতূহলি দৃষ্টি তাকে কাঁটার মত বিঁধছে। অশোকের কথা বলা হল না, নীচে মেজ কাকার আহ্বানে সে তিন লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আর সুচেতাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু ততক্ষণে ছাতে মেয়েরা যেখানে কুটনো কুটছিলেন সেখানে রীতিমত আলোচনা ব'সে গেছে।

কনে খুড়ি আলু ছাড়াতে ছাড়াতে বলছিলেন যাই বল বাপু, এখন থেকে মেজদি ছেলেকে শাসন না করলে, বউ নিয়ে মাথায় তুলে নাচবে যে। মা খুড়ির সম্মান কি আর রাখবে?

সেজ জা তাঁর, আলগোছে মুখে দু'টো পান ফেলে দিয়ে দোক্তা বার করতে করতে বললেন, যা বলেছ নবো, বৌমাটির আমাদের লজ্জাসরম কিছু কম দেখছি। এখন থেকে না বললে—সেই বলে না

কাঁচায় না নুইলে বাঁশ
বাঁশ করবে টাঁশ টাঁশ!

পিসিদের মধ্যে কে বললেন ওরে উমা, তোরা বউকে শিখিয়ে দিস, ঘোমটা যেন একটু বেশি করে দেয়, চারধারে শ্বশুর ভাশুর গিস গিস করছে। উমা অশোকের খুড়তুত বোন, ঝঙ্কার তুলে বললে জানি না বাপু, রাঙাদা বলেছে একরাশ ঘোমটা দিয়ে তার বউ জংলি সাজবে না।

অশোকের মা কি কাজে যেন এসেছিলেন, শুনতে পেয়ে তীব্রস্বরে বললেন সাজবে না বৈকি, ওর কথাতেই চলতে হবে না কি? আস্পদ্দার সীমা ছাড়িয়ে গেছে দেখছি যে! আজ পর্য্যন্ত আমাদের নাকের ওপর ঘোমটা উঠলো না, আর বউ আমার মেম সাহেব হবেন!

জায়েরা সমস্বরে বললেন, হ্যাঁ মেজদির আমাদের লজ্জা বটে, ত্রিশ বছর একভাবে দেখছি, এখনো যেন ক'নেবৌটি!

সুষমা বললে ওগো, তোমাদের বউ কি বলে শোন, সকালে কলঘর থেকে মুখ ধুইয়ে আনছি বললুম আরেকটু ঘোমটা দাও বৌদি, চারধারে লোক রয়েছে, বললে আমি তা হ'লে প'ড়ে যাবো কিন্তু, চোখে না দেখলে চলবো কি করে! ন'পিসি ভালমানুষ বললেন আহা সত্যিই ত', এক দিনে কি অভ্যেস হয়? দু'পাচদিন যাক্ আর তোমাদেরও বলি বাপু, আজকাল ঘোমটা কেউ দেয় না।

বড় জ্যাঠাই গম্ভীর মুখে বললেন অমন কথা বোলো না ন ঠাকুরঝি, আমাদের শাশুড়ীরা যা করে এসেছিলেন আমরাও তাই করেছি, আমাদের বৌয়েরাও তাই করতে বাধ্য। সিংঘি বাড়ীর বৌয়েরা কখনো চাকরের সঙ্গে কথা কয় নি, ভাশুরের সামনে বেরোয় নি, এই বাড়ীর বউ হয়ে এ বাড়ীর মান ত রাখতে হবে।

সে ত' নিশ্চয়, আজকালকার কথা বোলো না ভাই, আজকালকার, বৌঝির বেহায়াপণা দেখে দেখে হাড় হদ্দ হয়ে গেছে। ব'লে মেজপিসি হাঁক দিলেন যেখানে গুটিকয়েক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ব'সে কুড়াইসুটি ছাড়াচ্ছিল, তাদের লক্ষ্য করে—হ্যাঁরা তোরা ছাড়াবি না পেটেই পুরবি সব? কান ধ'রে সব উঠিয়ে দোব বলছি।

আলোচনা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করলো

কার বৌ বিয়ের ছ মাস না যেতেই শাশুড়ীর সঙ্গে আলাদা হ'য়েছে, কে জায়েদের ননদদের গ্রাহ্য করে না, হট হট করে স্বামীর সঙ্গে থিয়েটার, সিনেমা দেখে বেড়ায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুচেতা বেচারি মুস্কিলে পড়লো সবচেয়ে বেশী। তার স্বামী আধুনিক, এ যুগের নূতনতম সভ্যতার ভক্ত। তার বন্ধু অসংখ্য, বান্ধবীর সংখ্যাও কম নয়। তারা সাবলীল গতিতে চলে ফিরে বেড়ায় সহজভাবে, ডুরে কাপড়ের স্তূপে আচ্ছাদিত কলের পুতুলের মত কারো ইঙ্গিতে ওঠে বসে না। অশোক সুচেতাকে তাই বলে ঘোমটা কমাও, চারতলার ছাতে চলো চাঁদের আলোয় বসি গিয়ে,—এ পাওয়া যেন সম্পূর্ণ হচ্ছে না। বধূ সভয়ে বলে, না না কেউ যদি ডাকেন শুনতে পাবো না—ঘরেই ব'লো না। অশোক রাগ করে বলে ওই জন্যেই ত তোমাকে ভাল লাগে না। ভালো লাগাবার মন্ত্র তুমি জানো না! আমি যখনি চাইবো, সব ফেলে সকলের শাসন না মেনে ছুটে আসবে—তাকেই বলে না প্রেম! এ কি বলবে ও রাগ করবে—ভালোবাসা এত ভয়ে ভয়ে হয় না। ওরা বললেই বা তুমি শুনবে কেন?

সুচেতা চুপ ক'রে থাকে সে ভেবে কিছুঠিক পায় না। চারদিকের এই নিঠুর আবেষ্টন—কাকে রেখে সে কাকে মানবে! স্বামীর কথা না শুনলে স্বামী রাগ করে, শ্বশুর শাশুড়ী ননদদের না মানলে তাঁরা চটে যান। পনেরো বছর বয়সের এমন কোনো অভিজ্ঞতা তার নেই যাতে সকলকেই সুখী করা যায়; সুচেতা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

স্বামীর আহ্বানে দ্বিপ্রহরে ঘরে গেলে শাশুড়ীর দল ছি ছি ক'রে ওঠেন। বলেন, সিংঘি বাড়ীর বউ দিনের বেলায় স্বামীর মুখ দেখবে কি? অকল্যাণ কোরোনা বৌমা আমাদের একটু মেনে চ'লো।

ওধারে স্বামী বলে, তুমি তবে ওঁদের নিয়েই থাকো আমি অন্য কোথাও চলে যাই। স্ত্রী যদি স্বামীর বাধ্য না হয়, সে স্ত্রীতে প্রয়োজন কি? অন্তরালে সুচেতার চোখ জলে ভ'রে ওঠে। বাঙালী ঘরের বধূজীবন কি এমনই বিড়ম্বনা!

গভীর রাতে মৃদু হাসির আওয়াজে শাশুড়ী ডেকে বলেন লজ্জাসরম কি কিছু নেই বৌমা! পাশের ঘরে আমরা রয়েছি এমন হাসবে যে শুনতে পাবো! আমরাও যে এককালে বউ ছিলুম! বধূ মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে শুভ্র বিছানায় ছড়িয়ে পড়ে, টেবিলে ধূপ জ্বলে, মৃদু সুগন্ধে ঘর ভরা। বাহু বন্ধনে বেঁধে স্বামী বলে, তোমার আমার মিলনের মাঝখানে কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে বলতে পারো? যেমন ক'রে তোমাকে চাই—পাই না কেন রাণী! নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরে ভীরু পাখীর মত বধূ বলে জানি না ত!

পূজার ছুটিতে সকলে দেশ ভ্রমণে বেরোলেন। সুচেতা আর অশোকও চললো। আগ্রায় যমুনাতটে তাজমহলের অপরূপ শোভা! সকালবেলা নির্জ্জনে সুচেতাকে পেয়ে চুপি চুপি অশোক বললে—চল দুজনে তাজমহলে গিয়ে আর একবার দেখে আসি, একলা তোমায় পাশে না পেলে এদেখা সার্থক হবে না। কুণ্ঠিত সুচেতা বললে মার অনুমতি নিয়ে আসি দাঁড়াও। শাশুড়ী শুনে বললেন কণাকে সঙ্গে নাও বৌমা, একলা যেন যেয়োনা। কণা অশোকের ছোট বোন। তাকে দেখেই অশোক জ্ব'লে উঠলো—তার সব প্ল্যান উল্টে গেল। কিছু বলতে পারলো না বটে, কিন্তু সুচেতাকে নিয়ে বেড়াবার আনন্দ সব চ'লে গেল। এর জন্যে সে কতখটা দায়ী করলো সুচেতাকে, ওর কেন মাকে বলা, চুপি চুপি চ'লে গেলেই ত হ'ত!

হোটেলের নির্জ্জন ছাত, সেখান থেকে দেখা যায় চাঁদের আলোয় শুভ্র তাজ, স্বপ্নের মত জেগে আছে। অশোক সুচেতাকে ডেকে নিয়ে ছাতে গিয়ে বললে, দেখ দেখ, এত মাধুর্য্য যে একলা ভোগ করা যায় না! আজকের দিন স্মরণীয় ক'রে রাখবার মত কিছু দাও আমায়। জ্যোৎস্নালোকে তরুণী প্রিয়ার দূর ব্যবধান কি ক'রে সহ্য করি? সুচেতা স্বামীর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে ব্যাকুলমুখে চুপি চুপি বললে—বাঃ আমার বুঝি ইচ্ছে যায় না তোমার কাছে আসি?

কিন্তু কি করবো, কণা যে সমস্তক্ষণ সঙ্গে থাকে। মুগ্ধ অশোক ছ'হাতে তার সুন্দর-মুখখ না তুলে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করেছে মাত্র—এমন সময় তীক্ষ্ণস্বরে সিঁড়ি থেকে কণা ডাকলে বৌদি শীগগির নেমে এসো, মা ডাকছেন।

স্বামীর বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সুচেতা ত্বরিতগতিতে নেমে গেল। অসম্পূর্ণ মিলনের স্মৃতি নিয়ে অশোক রইল দাঁড়িয়ে, মন তার তীব্র বিরক্তিতে ভরে গেল।

বিয়ের তৃতীয় বছর কেটে গেল তবুও সুচেতা স্বামীর সান্নিধ্য পূর্ণভাবে পেল না। অশোক ঝগড়া ক'রে রাগ ক'রে শেষে হাল ছেড়ে দিলে। বাড়ীতে আরো ছুটি তিনটি বধূর আগমন হল। তাদের তুলনায় সকলে এবার সুচেতাকে লজ্জাশীলা ব'লে আখ্যা দিলেন। কিন্তু ছুটি তৃষিত হৃদয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে গেল। তবু দিন যায়, বছর যায়, সুচেতার তিনটি ছেলে মেয়ে হয়েছে, তাদের নিয়ে সে এখন ব্যস্ত। দেহ কিছু স্থূল হ'য়েছে, অশোকের মানসী এখন বাবলা-মিণ্টু-বেণুর জননীতে রূপান্তরিত! প্রেমিক অশোক গাম্ভীর্য্যে পদমর্য্যাদায় স্থির ধীর। ছুটির দিন দ্বিপ্রহরে নীচে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় বসে, সুচেতা হয়ত তখন তার সঙ্গ কামনা করে, কিন্তু পায় না।

সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে বেশীরভাগই পাশা চলে, নয়ত সিনেমায় যায়—খাবার ঢাকা থাকে। সুচেতা জেগে শুয়ে থাকে ঘুম আসে না। পাশে তিনটি শিশু ঘুমে অচেতন, মৃদু নীল আলো জ্বলে। ওপাশে একানে খাটে অশোকের বিছানা, নেটের মশারী ফেলা। অশোক আসে টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে নিয়ে জল খায়, কোনদিন চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরায় তারপর শুতে যায়। সুচেতা আশা করে একটি মৃদু আহ্বানের, ছুটি অক্ষরের একটি ছোট নাম মিষ্টি ক'রে ডাকা মৃদুস্বরে, কিন্তু অশোক ক্লান্ত, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়, দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়! সুচেতা নীরবে পাশ ফিরে শোয় সমস্ত দিনের পর প্রিয়সঙ্গকামী মন হয়ত চায় একটু সোহাগ, ছুটি মিষ্টি বাণী, কিছুই না, হয়ত একটুক্ষণ জেগে গল্প করতে! আকাশে হয়ত চাঁদ ওঠে, জ্যোৎস্নালোকে ধরণী মন্দির, বহুদিন আগেকার মধুস্মৃতি মনে পড়ে আর মনে জাগে—

"আছি যেন সোণার খাঁচায়, একখানি
পোষমানা প্রাণ!
এও কি বুঝাতে হয়, প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান!"

সেতুবন্ধ

= উপন্যাস =

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

মিত্তির মশাই, আপনি এখনো, এখানে!

—কে ইন্দ্রানী? ওই চেয়ারটায় বস।

—বসতে ভয় হয়।

—কেন?

—ফাইল এবং কাগজপত্তরে ঘরটাকে তো কে: রেখেছেন স্তূপাকার। সামাজিক কোন বন্ধনই আপনি মানেন না। আপনি একটি অদ্ভুত জীব, যাকে—

—যাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও, ইন্দ্রানী।

—জানিনা যান, বলে চেয়ারটা টেনে ইন্দ্রানী বসলে: কথাটা একটু কটু শোনাবে তা হোক। খালি কাজ নিয়ে থাকলেই আপনার চলবে, মিত্তির মশাই?

—নিশ্চয়। তুমি কি বল?

—একটু অন্যমনস্ক হয়ে ইন্দ্রানী বল্লে: তা হবে।

—কথাটা বুঝি বিশ্বাস হচ্চে না?

—সহজ কণ্ঠে ইন্দ্রানী বল্লে: না, আপনি মস্ত একটা ভুল করচেন।

ব্যস্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বল্লে: কোনখানটা, ইন্দ্রানী?

—প্রত্যেক জিনিষটায়। এই দিদির কথাই ধরুন না।

—এ সম্বন্ধে মৃণাল তোমায় কিছু বলেচে নাকী?

—এতে বলাবলি কিছু নেই, মিত্তির মশাই। মধ্যস্থ হয়ে আপনাদের দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে আমার বাঁধে। আচ্ছা, আপনি দিদিকে ভালবাসেন?

—হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন কেন করচো, ইন্দ্রানী।

—বোধ হয় না। আজ আপনার বাড়ীতে একটা কাজ আর আপনি বেশ নিশ্চিন্তমনে এখানে বসে আছেন তো?

—সবই বুঝি ইন্দ্রানী। এই কাজটা শেষ হলেই—

—আপনার কাজ নিয়ে আপনি থাকুন। লোকে আপনার কণ্ঠে জয়মাল্য পরিয়ে দিক। কিন্তু আসল জিনিষটা আপনি কবে শিখবেন, বলুন তো?

—কোন কথাটা বলচো?

—সময়ে সময়ে আমার কি মনে হয় জানেন, মিত্তির মশাই? আপনাদের মত এই স্বামী আখ্যাধারী জীবগুলি অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য। অবশ্য, প্রত্যেক কেসটা স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্রভাবেই তাদের ব্যবস্থাপত্রের বন্দবস্ত করতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয় হো হো করে হেসে উঠলো। বল্লে: আমার জন্যে কি ব্যবস্থা করেচো, জিজ্ঞাস্ করতে পারি?

মিত্তির মশাই, এসব জিনিষগুলো আর কবে বুঝবেন, বলুন তো? দিদি আপনার এক কণা ভালবাসা পাবার জন্যে—

এতক্ষণ বেশ কথা কইছিলে, ইন্দ্রানী। একথাটা নেহাত ছেলেমানুষের মত শোনাচ্চে। উৎসবে মৃণাল আমার উপস্থিতি কামনা করে অস্বীকার করি না। ও বিষয়ে, আমার একটু কেন বেশই গাফেলি আছে। সুবিধে পেলেই গা ঢাকা দিই। কিন্তু মৃণালকে ভালবাসি কী না এ-সন্দেহ তোমার কোত্থেকে এলো, ইন্দ্রানী?

—লোকে তাই তো বলে।

—তারা বলবেই। কি দিয়ে তুমি তাদের মুখ ঠেকিয়ে রাখবে বল তো?

—দিদির মুখে শুনেচি, আপনি তাঁকে কী যত্নটাই না করতেন! পদ্মলার মুখ দেখা অবধি আপনি যে কী রকম হয়ে গেচেন। এখন দিদির সঙ্গে দুদণ্ড কথা কইবারও আপনার সময় নেই।

—এত বড় মিথ্যা অপবাদ তুমি কী করে দিলে বলতো?

—বিনা কারণে মানুষ মানুষকে অপবাদ দেয় না, মিত্তির মশাই।

—আপনাকে অনেক কথাই বললুম। কিছু মনে করবেন না যেন। যদি কোন দিন আমার সাহায্য দরকার মনে করেন, আমায় স্মরণ করবেন।

—কেন?

—দিদিকে সুখী করবার।

—আচ্ছা।

ইন্দ্রানী মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের উপর যে সমস্ত কথা বলে গেল সেগুলো যদি সাধারণের মধ্যে আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায় তা হলে অনেকের কাছে তার লজ্জার সীমা থাকবে না। এখন থেকে মৃত্যুঞ্জয় নিজেকে আমুল সংযোর করচে, সাধারণের রসনার খোরাক আর সে যোগাবে না। ইন্দ্রানীর উপর তার এতটুকু রাগ নেই। সে যা অসঙ্গতি দেখেছে তাই অকপটে জানিয়েছে।

মৃণালের সম্বন্ধে তার ভয়ের কোন কারণ নেই। মৃণাল সে-জাতের মেয়ে নয়, যারা কথার পিঠে কথা গেথে সাধারণের মনকে সরস করে তোলে। উৎসব-ব্যসনে যতই তার অনাসক্তি থাক, মনে-প্রাণে মৃণাল তাকে অশ্রদ্ধা করে না।

উৎসবে যোগদান করবার জন্যে মৃত্যুঞ্জয় তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা ছেড়ে নিলে।

সভায় আসতেই বিনোদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বল্লে: ব্যাপার কি হে, মৃত্যুঞ্জয়, তোমার টিকি যে মেলা ভার হয়েচে। বলি যোগটোগ কিছু সাধনা করচো না কী?

হাঁ, এক রকম তাই-ই।

পাশেই বিনোদের স্ত্রী মণিমালা একজনের সঙ্গে কথা কইছিল। মৃত্যুঞ্জয়কে দেখে সরে এসে বল্লে: আপনার সঙ্গে দেখা হবে এটা আশা করিনি। কেমন আছেন?

দেখা হওয়া কি আমার সঙ্গে এতই শক্ত।

আপনার মত একনিষ্ঠ সাধকের দর্শন পাওয়া কি সহজে মেলে।

ওঃ, একটু মুচকে হেসে মৃত্যুঞ্জয় বল্লে: এক্ষুণি আসচি, আপনি ততক্ষণ এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন। কৈ হে বিনোদ, তুমিও কি গা ঢাকা দিলে নাকী?

না হে না, ঠিকই আছি। গা ঢাকা দেবার মত কোন কাজ এখনও করিনি।

মৃত্যুঞ্জয় মৃণালকে খোঁজবার জন্যে এগিয়ে চল্লো। গানের মজলিস যেখানে হচ্ছিলো মৃত্যুঞ্জয় মৃণালকে সেখানে দেখতে পেলেনা।

আর একটু এগিয়ে আসতেই মৃণালের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা হয়ে গেল। মৃণাল মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তন্ময় হয়ে কথা কইছিল। মৃত্যুঞ্জয় মৃণালকে দেখেই বলে উঠলো: তুমি এখানে, মৃণাল? সারা বাড়ীটা যে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্চি।

বিস্ময়বিমূঢ়কণ্ঠে মৃণাল বল্লে: কতক্ষণ তুমি এখানে এসেচো?

এই তো আসচি। আমাকে তুমি এখানে আজ আশা করনি, কেমন?

মৃণাল এ কথার কোন জবাব দিলে না।

তোমাকে আজ কাপড় জামা পরে বেশ মানিয়েচে কিন্তু, কথা কয়টি বলে মৃত্যুঞ্জয় একটা উত্তরের আশায় মৃণালের দিকে চেয়ে রইল।

—তার মানে? শ্লেষ?

—সত্যি বলচি এর মধ্যে এতটুকু শ্লেষ নেই।

—আজকের এই উৎসব-বাসরে তোমার সঙ্গে আবার মিছামিছি কথা কাটাকাটি করতে প্রবৃত্তি হয় না। আর সে সামর্থও হয়তো আমার নেই। তুমি যে রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেচো, বাধ্য হয়ে দিন কতক মেসোমশাইয়ের কাছে লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে থাকবো। কালই যাবো; এখানে একদণ্ড আমার থাকতে ইচ্ছে নেই। প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেচে।

—বাড়াবাড়িটা কী দেখলে?

—সে তুমি বুঝবেনা।

—চলে যেতে চাও, কেন?

—ভয়ে।

—সত্যিই কি কাল চলে যাবে?

—হাঁ।

আর কোন কথা না বলে মৃত্যুঞ্জয় উৎসব-গৃহ থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে

মুক্তির গান

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
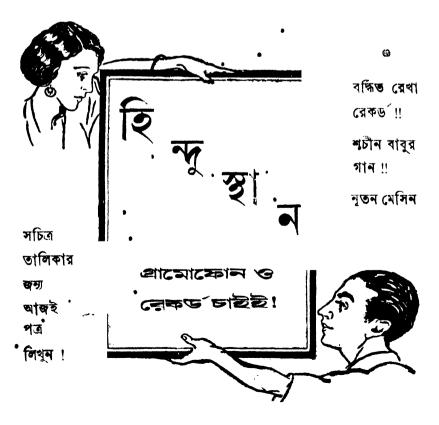
মহামানবের আহ্বানে আজ সাড়া দে নবীন যাত্রী।
লঙ্ঘন করি শুচি অশুচির গহন আঁধার রাত্রি।
আয়রে পতিত দলিত মানব আয় জগতের শূদ্র
সভ্যতা বুকে অধিকার তোর নহে কারো চেয়ে ক্ষুদ্র।
কিসের লাগিয়া রয়েছিস্ তোরা ভেদের কারায় বন্দী?
আভিজাত্যের ভেঙ্গে দে দম্ভ স্বার্থের অভিসন্ধি;
'হাড়ি মুচি ডোম মেথর, দোসাদ, নিষাদের নাই মুক্তি?'
মানিস্‌নে হেন অসার বচন স্বার্থপরের যুক্তি।
বংশানুক্রমে লাথি ঝাঁটা খাওয়া সহিবেনা আর বিশ্ব
একশ্রেণী নর শুধু হ'বে গুরু, তোরা হ'বি শুধু শিষ্য?
যুগে যুগে যারা করেছে দলন চরণ রাখিয়া বক্ষে
ভেবে দেখ কত অশ্রু-তটিনী বহেছে তোদের চক্ষে।
কত শম্বুক জীবন ত্যজিল কত শ্রীরামের হস্তে
তবুও চেতনা লভিলিনা তোরা রহিলি নমিত মস্তে!
শাস্ত্র-দোহাই দিয়া চিরদিন করেছে তোদের অন্ধ
পাছে ভাঙ্গে ভুল, করিয়াছে তাই শিক্ষার পথ বন্ধ।

পথে পথে কাঁদে দীন ভগবান জপিয়া মুক্তিমন্ত্র,
তবুও গলেনা নিঠুর জাতির পাষাণ হৃদয়তন্ত্র।
খাঁটি ব্রাহ্মণ হ'য়ে ওঠ্ তোরা উপবীত নহে কাম্য
আয় আয় সবে কোলাকুলি করি, প্রচার করিতে সাম্য।
মহামানবের বেজেছে বিষাণ, বন্ধন হবে মুক্ত
বাক্য ও মন এক হোক্ আজ শোন্‌রে বেদের সূক্ত।
যারা চিরদিন দেবমন্দির রেখেছে করিয়া রুদ্ধ
দেবতা সেথায় নাই কভু নাই, সে নহেক কভু শুদ্ধ;
লহরে আজিকে শ্রেষ্ঠসাধক একলব্যের দীক্ষা
দক্ষিণা শুধু দিস্‌নে দ্রোণেরে পূর্ণ করিয়া শিক্ষা।
মানবতা দলি যুগে যুগে যা'রা মেনে চলে হীন ধর্ম্ম
যাসনে কো আর বুঝিতে, তাদের শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম।
"সবার উপরে মানুষ সত্য", বাজিছে বিজয়ডঙ্কা
মাভৈঃ মাভৈঃ মন্ত্র উঠিছে কিসের আজিকে শঙ্কা।
সার্ব্বজনীন মন্দিরতলে আয়রে জাগায়ে হর্ষ—
মুক্তির পথে হের ঐ চলে নিখিল ভারতবর্ষ।

এলো। ইন্দ্রানীর কথা হঠাৎ তার মনে পড়্‌লো। সে বলেছিলো: বিপদে পড়লে আমার কথা স্মরণ করবেন, মিত্তিরমশাই। আমি আপনার পেছনেই আছি।

মদনকে দেখতে পেয়ে মৃত্যুঞ্জয় বল্লে: ছাদের আলোটা জ্বেলে দিয়ে একখানা মাদুর পেতে দিয়ে আয়তো, মদন।

যাই বাবু বলে মাদুর নিয়ে মদন ছাতে উঠলো।

মাদুর পাতা হতেই মৃত্যুঞ্জয় বল্লে: একটু দাঁড়া মদন। এই চিঠিখানা ইন্দ্রানীর হাতে দিয়ে একটা জবাব নিয়ে আসবি বলে মাদুরের উপর শুয়ে ইন্দ্রানীকে সে চিঠি লিখলো। মৃণালের সঙ্গে যা যা ঘটেছে তার মোটামুটি ব্যাপার সে লিখলে: বড় বিপদে পড়ে তোমার শরণাপন্ন হচ্চি, ইন্দ্রানী। কাল সকালে তোমার আশা চাই। সাক্ষাতে সমস্ত কথা বলবো।

মদন চিঠিখানি নিয়ে চলে গেল।

মৃত্যুঞ্জয়ের বিশ্লেষণকারী মনের বাঁধন শিথিল হয়ে গেছে। মৃণালের অপ্রত্যাশিত নির্ম্মম ব্যবহার তার অন্তরের প্রতি তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে, তাকে উৎব্যস্ত এবং ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছে। সে বুঝতে পারছেনা মৃণালের কাছে তার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের গুরুত্ব কতখানি।

ঘন্টা খানেক পরে মদন ইন্দ্রানীর কাছ থেকে চিঠির জবাব নিয়ে এলো।

ইন্দ্রানী লিখেছে: দিদির মনের যা অবস্থা তাঁকে আজ রাতে আর বিরক্ত করবেন না। কাল সকালে গিয়ে যা ভালো হয় তাই করবো। দিদি লক্ষ্ণৌয়ে যেতে চাইচে যাকনা। ঝগড়া হলে ওরকম ধরণের কথা অনেক হয়ে থাকে।

মৃণাল লক্ষ্ণৌয়ে চলে যাচ্ছে, এর আগে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে এ-চিন্তাটা মোটেই স্থান পায়নি। তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মৃণালের সঙ্গে তার বহুবার ঝগড়া হয়ে গেছে, রাগারাগির অন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু ব্যস ওই পর্য্যন্ত। দু'চার দিনের ব্যবধানে সমস্ত গোলযোগের অবসান হয়ে গেছে, মান-অভিমানের পালা পর্য্যবসিত হয়েছে

প্রেমের একনিষ্ঠতায়। কিন্তু আজ মৃণালের লক্ষ্যেয়ে চলে যাওয়াটা মৃত্যুঞ্জয় সহজভাবে নিতে পারছেনা। কোথায় যেন সে বিচ্ছেদের করুণ সুর শুনতে পাচ্ছে। মৃণালের অনুপস্থিতি বাড়ীর সুখস্মৃতি-বিজড়িত আবহাওয়াকে কত ভয়াবহ শোচনীয় করে তুলবে এ-দৃশ্যটা কল্পনার চোখে দেখে মৃত্যুঞ্জয় শিউরে উঠলো। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিচ্ছেদের একটা বিরাট ব্যবধান কেমন করে গড়ে উঠতে পারে মৃত্যুঞ্জয় এখনো পর্য্যন্ত তাহা বুঝতে পারছেনা।

রাতের গভীরতা কত তা সহজে অনুমান করা কঠিন। মাঝে মাঝে বহুদূর হতে ধ্যানমগ্ন নৈশ-গগণের বক্ষ বিদীর্ণ করে মোটর গাড়ী কর্কশ শব্দ করে ছুটে চলেছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতার দুর্লঙ্ঘনীয় প্রাচীর।

আশার একটা ক্ষীণ রশ্মি মৃত্যুঞ্জয়কে বিচলিত করে তুলেছে। বোঝবার ভুলে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, যে আবহাওয়াকে করে তুলেছে ভারাক্রান্ত তার অসহ্য গুমোটকে সে সরিয়ে দেবে। মৃণালের কাছে সে কৃত অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু ইন্দ্রানীর কথা স্মরণ হওয়ায় মৃত্যুঞ্জয় একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো। ইন্দ্রানী লিখেছিলো আজ যেন মৃত্যুঞ্জয় দিদিকে বিরক্ত না করে, কথার রুক্ষতায় তার ধৈর্য্যের বাঁধন আলগা করে না দেয়। ইন্দ্রানীর এ-উপদেশ-বাক্যের দাম আছে প্রচুর। তবুও মৃত্যুঞ্জয় মৃণালের কাছে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

দোতলায় নেমেই মৃত্যুঞ্জয় দেখতে পেলে মদন একটা ট্রাঙ্ক মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুঞ্জয় বল্লে: এত রাতে কোথায় এটাব নিয়ে যাচ্ছিস, মদন।

—মার হুকুম।

—যা আমার ঘরে চুপ করে বসে থাকগে, যা। কোন কাজ তোকে করতে হবে না।

—কিন্তু মা যে রাগ করবে বাবু?

—আমার কথাটা বুঝি তোর কানে যাচ্ছে না?

মদন বাবুর মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

মৃণালের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সে বলছে: দরজাটা খুলে দেতো, বিরাজী, মদন ট্রাঙ্কটা বোধহয় নিয়ে এসেচে। কে যেন দরজা ঠেললে না?

মৃত্যুঞ্জয় ঘরের মধ্যে ঢুকে বল্লে: আমি।

মৃত্যুঞ্জয়ের আবির্ভাবে মৃণাল বিস্মিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার রুদ্ধকণ্ঠস্বর বেপর্দায় বেজে উঠলো: আমায় আজ আর তুমি বিরক্ত করো না।

মৃত্যুঞ্জয় বল্লে: তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে, মৃণাল।

মৃণাল নিরুত্তর।

মৃত্যুঞ্জয় বুঝতে পারলে ঝির সামনে একটা অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা মৃণাল হয়তো পছন্দ করবেনা। তাই সে একটু চুপ করে থেকে বল্লে: বিরাজী, তুই এখান থেকে যা তো। সে মৃণালের দিকে চেয়ে রইলো।

দৃঢ়কণ্ঠে মৃণাল বল্লে: ওইখানেই থাক, বিরাজী, তোকে কোথাও যেতে হবেনা।

মৃণালের কথায় মৃত্যুঞ্জয় কোন প্রতিবাদ করলেনা। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে নিয়ে বল্লে: তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু কথা বলতে চাই। জানি তুমি খুব ক্লান্ত, তবুও কথাটা এতই দরকারী এই মুহূর্ত্তে না বলে থাকতে পারচি না।

তোমার সঙ্গে আমার দরকারী কথা কীই-বা থাকতে পারে, রাগে মৃণালের শরীরের রেখাগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো: এখন আর আমাকে জ্বালিও না। জিনিষপত্তর কখন গোছাবো, বলতো? কালই যে দিলুকে নিয়ে চলে যাচ্চি।

—কালই চলে যাচ্ছো একথা তো শুনিনি।

—এখন তো জানতে পারলে।

—বিরাজীকে এখানে থাকতে বলচো, কেন? ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াবে তার খেয়াল আছে? মান-সম্ভ্রমের ভয় কি তোমার একটুও নেই? কোনটে চাও? ঝির সামনে আমাকে অপমান করতে না—

মৃণাল মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে চাইতেই দেখতে পেলে তার চোখের পাতা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এসেছে। বল্লে: এখান থেকে এখন যাতো, বিরাজী।

ঝি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মৃত্যুঞ্জয় মৃণালের কাছে সরে এলো।

মৃণালকে এখন চেনা দুষ্কর। তার কথাবার্ত্তার বিচিত্র ধারা, তার পরিচিত চাউনির চটুল ভঙ্গিমা, এমন কি তার দেহের প্রতিটি রেখা মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে আজ সম্পূর্ণ

অপরিচিত, রহস্যের রঙীন জালে আবৃত। এ-মৃণাল সম্পূর্ণ আলাদা, দেহে ও মনে কোথাও পরিচিতির এতটুকু ছাপ নেই। কথা কইতে গেলে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। কুণ্ঠা এবং অতিরিক্ত লজ্জা কণ্ঠনালী রোধ করে। এ-মৃণাল সে-মৃণাল নয়, পরিচয়ের গভীরতায় যাকে সে আপনার করে পেয়েছিলো, যাকে সে দিনের পর দিন মনেপ্রাণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে এসেছে। মৃণাল যেন আজ নবাগত অতিথি, পরিচয়ের কোন লিপি না নিয়েই এসেছে। এমনি কি এদের মধ্যে ব্যবধানের পরিধি অলঙ্ঘনীয়।

কথা কইতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো। বল্লে: আমার একটা কথা রাখবে, মৃণাল।

মৃণাল কোন জবাব দিলে না।

আমাকে বলবার জন্যে আমায় সময় দাও। তোমার জন্যে আমি আমার জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

মৃণালের অট্টহাস্যে মৃত্যুঞ্জয়ের কথা মুখেই রয়ে গেল। তার রোষদৃপ্ত মুখে বিরক্তির স্পষ্ট আভাষ দেখতে পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের দেহের রক্ত হিমশীতল হয়ে গেল।

বেশ একটু বিরক্ত হয়ে মৃণাল বল্লে: ও ধরণের কথাগুলো আমাকে না শোনালেই নয়। এখানে আমার একদণ্ড থাকতে নেই। দিনকতক মেশোমশাইয়ের কাছে গিয়ে থাকবো এটুকু অদর্শনও কি তোমার সহ্য হবেনা? এর আগে এটা ভাবতে পারোনি?

মৃত্যুঞ্জয় চীৎকার করে বলে উঠলো: মৃণাল!

পদে পদে তুমি আমায় অপদস্ত করচো, পাঁচজনের কাছে মাথা হেঁট করচো। খালি কাজ—কাজ—কাজ—এ ছাড়া যেন তোমার আর কোন কথা নেই।

আমার কথা বিশ্বাস কর, মৃণাল। তোমাকে ইচ্ছে করে কোনদিন অপমান করিনি।

অপমান না করা আর কাকে বলে তা তো জানি না। আমার প্রতি অবিচারের তো অন্ত নেই। তুমিই কেবল বুঝতে পারো না, বাইরে সকলে এ কথা জানে। লোকে আমার স্বামীর দোষ দেখিয়ে তার বিচার করবে আমারই সামনে, আর আমি তা নির্ব্বিবাদে মাথা পেতে নেবো কেমন? তোমার এ-নির্লিপ্ততা আমার কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েচে।

তোমার প্রতি আমি উদাসীন, একথা কে বল্লে? সত্যিই আমি তোমায় আন্তরিক ভালবাসি!

তোমার এতটুকু দয়ামায়া নেই। তুমি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। কর্ম্মপ্রেরণা নিয়েই তুমি জন্মেচো। তোমাকে তো চিনতে আমার বাকী নেই। তোমার মত স্বার্থপর লোক একটিও দেখিনি।

কী বলচো, মৃণাল?

আজ দিলুর জন্মদিন সেটা তোমার খেয়াল নেই। অথচ সাতদিন আগে এ-সম্বন্ধ নিয়ে তোমাকে পাখী পড়া করে শিখিয়েচি। কাজে এমন ব্যস্ত যে, পাঁচজন অতিথি আজ বাড়ীতে আসচে এটা জেনেও তুমি পরম নিশ্চিন্তে তুমি তোমার কাজ নিয়েই রইলে। অবিচার করনি তুমি কী করে বললে বলতো? তোমার মত ইঞ্জিনিয়রদের মুখেই এসব কথা শোভা পায়।

জিনিষটা যে এতদূর গড়াবে তা বুঝতে পারিনি।

মৃণাল মৃত্যুঞ্জয়ের স্বীকারোক্তিটা বিচিত্র ভঙ্গী করে পুনরাবৃত্তি করলে। বল্লে: আমাদের বিয়ের প্রথম বছরের কথা তোমার স্মরণ আছে কীনা জানিনা। তখন আমাদের সাংসারিক স্বচ্ছলতা মোটেই ছিল না। নিজের অপরিমোচনীয় দৈন্যকে ঢাকবার জন্যে কী অমানুষিক পরিশ্রমই না করেচো। তোমার মনের বৃত্তিগুলির সহজধারা তখন বুঝতে পেরেছিলুম। পয়সার মুখ দেখবার পর থেকে তোমাকে চেনা দুষ্কর হয়ে উঠেচে। এখন সংসারে কোন কিছুরই অভাব নেই—চাকর-বাকোর, মোটর, এমনি কি বাড়ীতে একটা ফোন পর্য্যন্ত নিয়েচো। মুক্ত হস্তে খরচ করচো। খালি আমার কথাই তোমার মনে থাকে না। তুমি এখন যেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। সেদিনকার দুঃখে-ঘেরা নিরানন্দ দিনের কথা তোমার স্মরণ আছে? ভুলে গেচো? অসম্ভব নয়। সুখের দিনে দুঃখের কথা মানুষের মনে থাকে না। তখন সত্যিকার মানুষের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিলো। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ যে এরকম সর্ব্বনাশ ঘটাবে তা কি তখন ভাবতে পেরেছিলুম।

একটু চুপ কর, মৃণাল, আমায় আর দগ্ধো না!

সত্যি বলচি আমার আজ মাথার ঠিক নেই। খামাকা রাগ বাড়িয়ো না। আবার বিরক্ত করলে লক্ষ্মৌ থেকে কিছুতেই আমি তোমার কাছে আর আসবো না। এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া।

অবুঝ হয়োনা, মৃণাল, আমার অবস্থাটা অন্ততঃ একটু ভেবে দেখো।

ঘরের ভিতর থেকে চীৎকার করে মৃণাল বিরাজীকে ডাকলে। দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল এবং বিরাজী ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

ধীর পাদক্ষেপে এবং অবসন্ন দেহে মৃত্যুঞ্জয় কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরের ঘরে ঢুকে, চেয়ারে বসে টেবিলের উপর হাত রেখে তার উপর মাথাটা ন্যস্ত করলে। জ্ঞান হওয়ার পর জীবনে এই বোধ হয় প্রথম মৃত্যুঞ্জয়ের চোখদুটো পরাজয়ের তীব্র বেদনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে।

(ক্রমশঃ)

গাল্স্ ইন-এর মেয়েরা নাচে, আর রূপে মুগ্ধ করে সবার মন

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিত পাবন পতিতুণ্ডি
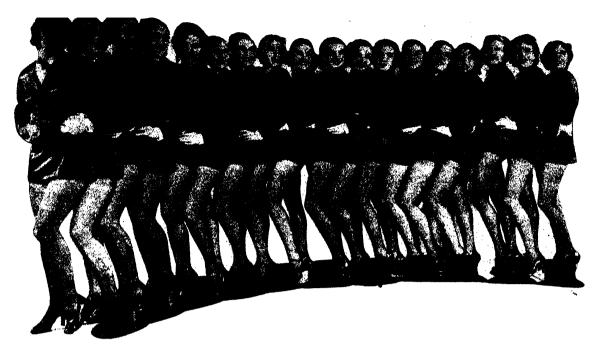
শার্লির পরের ছবি

শার্লি টেম্পলের পরের ছবি কি জানেন তো?—কি জানেন না?—আমি বলে দিচ্ছি,—'দি পুয়োর লিট্ল রিচ গার্ল'।

ভারী নাচ গানের বই সেখানা। এক শার্লিকেই গাইতে হবে আটখানা গান। আর শুধু গান নয়, তার সঙ্গে নাচতেও হবে। সেই নাচের তালে পা মিলোবে—শরীরের ঢেউয়ে দোলা খাবে এমন আছে চল্লিশজন,—যাদের আমরা সফেদ পর্দায় দেখবো; আর দেখবো শার্লির মত তাদেরও বয়স।

এ নাচ শার্লি টেম্পল একদিনে শেখেনি। যেদিন সুরের প্রথম ঝঙ্কার তার গলায় ঝণিয়ে উঠেছিলো, যেদিন নাচের প্রথম পদক্ষেপ, সাগরের তরঙ্গের সঙ্গে সমান তাল রেখে তার ছায়ারস পিপাসুদের হৃদয়ে কমল-কোরক ফোটাবার প্রচেষ্টা এনেছিলো, সে-দিনের কথা আমি আপনাদের জানিয়েছিলাম। তাই বলছি, সেদিন আর এদিন; ক'দিনই বা। শার্লি পারে না কি? তাই এটাও শিখে ফেল্লে।

আর তার চিঠি

চিঠি ওদের আসে সবারই। একখানা নয়, দুখানা নয়, দশখানা নয়—আসে শ'য়ে শ'য়ে—হাজারে হাজারে। তাই শার্লি টেম্পলেরও আসে হাজারে হাজারে। লোকে যে তাকে ভালবাসে বেশী।

সেদিন পর্য্যন্ত এসেছে কত হাজার চিঠি। সে চিঠির বুকে যা লেখা আছে তা ওই এক কথা;—'শার্লিকে দাও আরো নাচ আরো গান।' আমরা চাই আরো। আরো! আরো!

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স ষ্টুডিওর ঘরে তাই রয়েছে বস্তাবন্দী চিঠি। কত পড়বে শার্লি টেম্পল আর কত পড়বে ডেরিল জানুক।

যে ছবির জন্যে এ চিঠি আসছে তার নাম আগে করেছি; আবার করছি,—'দি পুয়োর লিটল রিচ গার্ল'।

এক কামড়ে পাঁচ হাজার

শুনুন একটি মজার ব্যাপার। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স ছবি তুলছে 'আণ্ডার টু ফ্ল্যাগস্', এ খবর অবশ্য আপনারা জানেন। সেদিন ওই ছবির জন্যে কুড়িটা উট ভাড়া করা হয়েছিলো। এবং তাদের জন্যে একটি বীমা কোম্পানীর সঙ্গে বীমাও করা হয়েছিলো।

সেই গল্পই করছি। ওদের বীমা কোম্পানীর সঙ্গে যে সর্ত্ত ছিলো সেইটেই মজার। তাতে লেখা ছিলো: উট যদি কাউকে কামড়ায় এবং কাজ করতে অক্ষম করে ফেলে তাহ'লে উক্ত দংশিত ব্যক্তি ওই বীমা কোম্পানীর কাছ থেকে হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাবেন। আরো আছে। যদি রোনাল্ড কোলম্যান, ভিক্টর ম্যাক্লাগেন কিম্বা সাইমন সিমনের ওপর ঐ উক্তরূপ কোপ প্রদর্শন করে—তা হলে তার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ বীমা কোম্পানীর দিতে হবে পাঁচ হাজার ডলার।

ফ্রাঙ্ক লয়েড হচ্ছেন এ ছবির পরিচালক। কে একজন গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলো, তাদের বেলা হাজার ডলার কেন? উত্তর দেন ফ্রাঙ্ক লয়েড—আর্টিষ্ট আর এক্সট্রাতে তফাৎ কিছু নেই—তাদের সত্যিকার দামে। শুধু কোম্পানীর পক্ষে ক্ষতি। এক্সট্রার বদলে এক্সট্রা আসবে; আর্টিষ্টের বদলে আর্টিষ্ট আনা অনেক খরচের ব্যাপার। আর এখানে একজন আর্টিষ্টের কোন কারণে একটু আটকে পড়তে হয় তাহলে তার জন্যে কোম্পানীর লোকসান হবে পাঁচ হাজার ডলার।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ সম্মান

সেদিন উৎসব-আপ্যায়নে এক হাজার দুশো পঞ্চাশ জন চিত্রজগতের সুপ্রসিদ্ধ লোকেদের সামনে এ বছরের কাকে কাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হোল তা ঘোষণা করা হয়েছে। লস্ এঞ্জেলস্-এর বিল্টমোর হোটেলে 'একাডেমী অব মোসান পিকচার আর্টস এণ্ড সায়েন্স'-এর এই উৎসব সম্পন্ন হয়।

ভাল অভিনয় করে যাঁরা লোককে তৃপ্তি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান পেলেন বেটী ডেভিস্ আর ভিক্টর ম্যাকলাগেন। ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের 'ডেঞ্জারাস' ছবিতে অদ্ভুত অভিনয়ের নাম উঠল মিস ডেভিসের, আর ম্যাকলাগেনের উঠল আর-কে-ওর 'দি ইনফরমার' ছবিতে।

আর ভাল ছবির জন্যে পুরস্কৃত হলেন আরভিং থ্যালবার্গ। মেট্রোর 'মিউটিনি অন দি বাউন্টি' ছবির উনিই হচ্ছেন কর্ম্মকর্ত্তা।

ভাল পরিচালনার জন্যে পুরস্কৃত হয়েছেন জন ফোর্ড; এবং 'দি ইনফরমার' ছবি তাঁরই পরিচালনায় ওঠা।

ভাল গল্পের জন্যে পুরস্কৃত হয়েছেন বেন হেক্ট আর চার্লস ম্যাক আর্থার। ওদের দুজনের লেখা গল্প হচ্ছে 'দি স্কাউণ্ড্রেল'।

খুচরো খবর

মেরী রোনাল্ড আবার ষ্টেজে নামছে।

চিঠি-পত্র

(১)

মাননীয় খেয়ালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৩ই এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটস্থ কুমার সিং হলে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনীর মহিলা শাখার যে অধিবেশন হয়, উহাতে শ্রোতারূপে যোগদান করার সুযোগ আমার হইয়াছিল। শ্রীমতী নীলিমা দেবী এই সভার সভানেত্রীত্ব করেন। কতিপয় মহিলা কয়েকটি সুচিন্তিত সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করার পর জনৈক ভদ্রলোক "নারীধর্ম্ম" শীর্ষক গদ্য ও পদ্য সম্বলিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আধুনিক বঙ্গমহিলাদের শুধু মন্দ দিক লইয়াই আলোচনা করেন ও এমন কি স্থানে স্থানে নারীসুলভ কোমল কণ্ঠের অনুকৃতি করিয়া মহিলাদের ব্যঙ্গ করিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাতে স্বভাবতই কতিপয় মহিলা মর্ম্মাহতা হয়েন ও সভানেত্রীকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেন নিমন্ত্রিতা মহিলাদের সম্মুখে এরূপ প্রবন্ধ পাঠ সমীচীন কি না। পুরুষ শ্রোতাদের মধ্য হইতেও একজন ভদ্রলোক সভানেত্রীকে ঐ একই প্রশ্ন করেন। কিন্তু অধিকাংশ তরুণ শ্রোতা—যাঁহারা এতক্ষণ মহিলাদের বিরুদ্ধে লিখিত উক্ত সরস প্রবন্ধটি সমস্ত অন্তর দিয়া উপভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা এই প্রশ্ন শুনিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিতে থাকেন। যাহা হউক সভানেত্রী প্রবন্ধ পাঠককে প্রবন্ধ শেষ করিতে অনুমতি দেন ও পরে বলেন যে লেখকের ভাষা আরও সংযত হওয়া উচিত ছিল। এই অপ্রিয় ঘটনাটি আর অগ্রসর হইবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না, কিন্তু সভানেত্রীর এই মত তরুণ শ্রোতাদের মনোমত না হওয়ায় তাঁহারা পুনরায় কোলাহল আরম্ভ করেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, কোলাহলকারীদের মধ্যে লাইব্রেরী পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় ভদ্রলোকও ছিলেন। এই সময়ে সহসা পুষ্পমাল্য-ভূষিত একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ লেখককে সমর্থন করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহাতে কতিপয় মহিলা পুনরায় তাঁহাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন ও পূর্ব্বোলিখিত ভদ্রলোক তাঁহাদের সমর্থন করেন। এই ঘটনার পর তরুণ শ্রোতাদের ধৈর্য্যরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং তাঁহারা সমস্ত ভদ্রতাজ্ঞান জলাঞ্জলি দিয়া একযোগে উক্ত সমর্থনকারী ভদ্রলোককে শুধু আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক সবলে আকর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে সভাস্থলের বাহিরে লইয়া যান ও শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে, তাঁহার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক গৃহ-বহিস্কৃত করিয়া দেন। ইহাকে যদি সাহিত্যানুশীলন বলিতে হয় তাহা হইলে গুণ্ডামির অনুশীলন বলিব কাহাকে?

---

* * *

যে ওয়েষ্টকে আজকাল খুব ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে দেখা যায় ভিক্টর ম্যাক্‌লাগেনের সঙ্গে।

* * *

একাডেমী অব মোশন পিক্‌চার আর্টস এণ্ড সায়েন্সের কাছ থেকে এইবার সম্মানিত হয়েছেন—ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ এবং এই সম্মানিত হলেন ছায়াচিত্রের ক্রমোন্নতির জন্যে।

এই কয় ছত্র শুধু এই উদ্দেশ্যেই লিখিলাম যাহাতে ভবিষ্যতে এইরূপ কোন সাহিত্য সভায় যোগদান করিবার পূর্ব্বে, মহিলারা ভালরূপে চিন্তা করিয়া যথা কর্ত্তব্য স্থির করেন।

ইতি,—
বিনীত,
প্রত্যক্ষ দর্শী।

(২)

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়,

আমার এই চিঠি আপনার পত্রিকায় স্থান দিলে আমি বাধিত হইব। গত বৎসর হইতে পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনীতে এক উপাধি পরীক্ষা হইতেছে, ইহাতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হন তাঁহারা "গীতশ্রী" উপাধি পান। গত বৎসর যাঁহারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সত্যই সঙ্গীতের অনুশীলন করেন। এ বৎসরও এ পরীক্ষা হইয়াছিল, এবং পরীক্ষার আগে দৈনিক পত্রিকায় ঢক্কা নিনাদিত হইয়াছিল যে, অমুক অমুক আসিতেছেন ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পরীক্ষার ফল ত কোন পত্রিকায় বাহির করা হয় নাই। কেন? কর্ত্তৃপক্ষ কি এ বিষয়ে উদাসীন? না পরীক্ষা হইয়াছিল Behind the Screen?

গত রবিবারে কাগজে দেখিলাম যে, একজন ছাত্রী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া কাগজে নাম জাহির করিয়াছেন। এ পরীক্ষাতে কি কেহ প্রথম হন নাই? না শুধু একজনই পরীক্ষার্থী ছিলেন! অবশ্য এই পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলার খবর নিশ্চয় সঙ্গীত সম্মিলনীর পক্ষ হইতে দেওয়া হয় নাই অথচ গত বৎসর পরীক্ষার ফল দৈনিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকায় যথারীতি প্রচার করা হইয়াছিল। আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ এ বৎসর পরীক্ষার খবর আমাদের জানাইবেন।

ইতি—
শ্রীকমল রায়
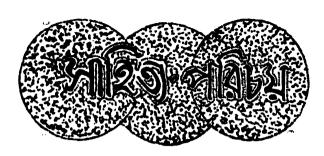
কংগ্রেস ও বাঙ্গালা—শতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস—শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রণীত। সংহতি কার্য্যালয়—৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য ১॥০ টাকা।

বর্ত্তমানে এদেশে অন্যান্য নানা উপাধির ন্যায় 'সাংবাদিক' উপাধিটিও সবিশেষ সস্তা ও সহজপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়েকমাস প্রুফ সংশোধন করিয়া, কয়েকদিন সংবাদ-পত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরে যিনি কাজ করিয়াছেন, তিনিই সাংবাদিক। কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে Journalist বলে, এবং যাহার বঙ্গানুবাদ হিসাবে 'সাংবাদিক' কথা চলিত হইয়াছে সেরূপ লোক এদেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বাঙ্গলায় 'সাংবাদিক' বলিতেই একটি লোকের কথা আমাদের মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে। তিনি আর কেহই নহেন—এই শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায় ও অভিজ্ঞতায়, স্মৃতিশক্তি ও সংগ্রহে—সাংবাদিক জগতে তাঁহার জোড়া মেলা ভার! অতএব এই পুস্তকখানি যেভাবে লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইত না।

এই পুস্তকখানি কংগ্রেসের ইতিহাস নহে। কংগ্রেসের বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হইয়াছে—কিন্তু ইহাতে গত একশত বৎসরের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ গত একশত বৎসরের কোন্ ভাবধারা পরিণতি লাভ করিয়া কংগ্রেসের জন্মদান করিল এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গলাই তাহাতে কিরূপে প্রাথমিক ও প্রধান শক্তি-সঞ্চার করিল, এই পুস্তকে

তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর চৈতন্যোদয়ে এই পুস্তক যথোচিত সাহায্য করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস এবং জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে এইরূপ পুস্তক প্রকাশ করিয়া হেমেন্দ্রবাবু দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইতিহাস হইলেও ইহা উপন্যাস অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক এবং ইহাতে বহু নূতন ও অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পুরাতন ও নবযুগের বিশিষ্ট বাঙ্গালী, ভারতীয় ও ভারতবন্ধু ইউরোপীয়দের প্রায় শতাধিক প্রতিকৃতি এই পুস্তকে আছে।

— শ্রীসুবোধ রায়

সচিত্র বর্ষবাণী (তৃতীয় বর্ষ, ১৩৪২)—সম্পাদিকা: জাহারআরা চৌধুরী। প্রকাশক: আলতাফ চৌধুরী। মূল্য পাঁচ সিকা। "বর্ষবাণী" গত দুই বৎসর "রূপরেখা" নামে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ঐ নামে বাজারে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার আবির্ভাবে ইহা এই বৎসরে নব নাম "বর্ষবাণী" গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের দেশে শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক যতগুলি শ্রেষ্ঠ বার্ষিক পত্র প্রকাশিত হয় "বর্ষবাণী" তাঁহাদের সমপর্য্যায়ে স্থানলাভ করিবে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, দিনেন্দ্রনাথ, কেদারনাথ, শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব, দীনেশ সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নজরুল, ইন্দিরা দেবী, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী দেবী প্রভৃতির সারগর্ভ রচনায় এই বার্ষিকীখানি সত্যই সমৃদ্ধ। তিন রঙা ও এক রঙা চিত্র নির্ব্বাচনেও সম্পাদিকার সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটের নিখুঁত পরিকল্পনা পুস্তকখানি পড়িবার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করে। অথচ মূল্য সে পরিমাণে অল্প বলিতেই হইবে।

—"বিপ্রদাস"

(বিলাসী)

রূপ-মহলে—"ব্রহ্মতেজ"

রাজা পরীক্ষিতকে তক্ষকের দংশন এই মূল ঘটনা, তার ওপর কলি-দ্বাপরের প্রতিযোগিতা, অশ্বত্থমার প্রতিশোধ ও কলি-সঙ্গিনীগণের এক মুনিপুত্রের মনোহরণের গাথা এই শাখা প্রশাখাকে ভিত্তি কোরে ভূপেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে "ব্রহ্মতেজ" নাটক রচনা কোরেছেন। আমাদের মনে হয়, এমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর যাত্রা-নাটক রঙ্গালয়ের আসরে অভিনীত না হ'য়ে যদি নট্ট কোম্পানী, ভাণ্ডারী বা গণেশ অপেরায় অভিনীত হ'ত তা' হ'লে যাত্রামোদীদের আসর হয়ত, মশ্‌গুল কোরতে পারত। আমরা আরও আশ্চর্য্য হচ্ছি, দুর্গাদাস বাঁড়ুয্যের মত রসজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি যে রঙ্গালয়ের নাট্য-পরিচালক, সেখানে এই নাটকখানি অভিনীত হবার 'পাশপোর্ট' পেল কেমন কোরে? তিনি এই নাটকে অভিনয় না কোরলেও লোকে যে তাঁরই রুচিজ্ঞানের নিন্দা কোরবে —এ কথা বলাই বাহুল্য।

আর অভিনয়ের কথা বলতে গেলে অভিনেতৃরা এই নাটক জমাবার জন্য আপ্রাণ চীৎকার কোরেছেন—সেই চীৎকার এই বদ্ধ ঘরে না হ'য়ে যদি কোনও খোলা মাঠে হ'ত তা' হ'লে দর্শকরা হয়ত' এতটা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত না। কারণ, সবায়ের মনে হয়ত' আশঙ্কা জেগেছিল থিয়েটার দেখ্‌তে এসে শেষে কী তাদের কাণের পাতলা পরদাটা ছিড়ে বাড়ী ফিরতে হবে? এদের মধ্যে তবুও গণেশ গোস্বামীর কলি, রেণুবালার বালক-কৃষ্ণ ভাল হ'য়েছে। আর অনুতের ভূমিকায় আশু বোস যে আমাদের খুব হাসিয়েছেন একথাও স্বীকার কোরতে হবে। ভূপেন চক্রবর্ত্তী অশ্বত্থমায় যে পরিমাণ চীৎকার কোরেছেন তা'তে তাঁর গলার সরু সরু শিরা উপশিরাগুলো এখনও সজীব আছে কিনা —তা'তে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তুলসী চক্রবর্ত্তীর ঋষি ও পশুপতি সামন্তের দ্বাপর চলনসই। যুগল দে'র জন্মেজয়, নরেন চক্রবর্ত্তীর তক্ষক, আমাদের মনে লাগে নি। বেদনা বালার রাণী ইরাবতীও তাই। কমলার নাচ-গান উপভোগ্য। অন্যান্য ভূমিকাগুলো অচল।

এই নাটকের জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল দৃশ্যপটের পরিকল্পনা কোরেছেন—সেগুলি অবশ্য আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

নব নাট্যমন্দির

শরৎচন্দ্রের "অচলা"র মহলা এখানে সুরু হ'য়েছে। কিন্তু যেরূপ চরিত্র বণ্টন হ'য়েছে তা' শুনে আমরা আশ্বস্ত হ'তে পারছি না। এবং চরিত্র-লিপি দেখে আমরা কেন, নাট্যামোদীরাও আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাক—দস্তুরমত ভড়কিয়ে যাবেন। এতে সাজছেন সুরেশ—শিশির ভাদুড়ী, অচলা—কঙ্কা, মহিম—শৈলেন চৌধুরী, মৃণাল—প্রভা।

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

[শ্রীমল্লিনাথ]

নির্ব্বাচনের শিক্ষা

কর্পোরেসনের গত সাধারণ নির্ব্বাচন এবং তাহার পরবর্ত্তী অলডারম্যান নির্ব্বাচনের ফলাফল আমাদের পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষণীয় বলিয়া আমরা মনে করি। এই-বারকার নির্ব্বাচন ব্যাপারে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত ইলেকসন বোর্ডের মনোনীত প্রার্থীরা প্রায় অক্লেশেই নির্ব্বাচন বৈতরণী পার হইতে পারিবেন। কিন্তু তাহা যে ঘটে নাই তাহা আমাদের লজ্জার বিষয় হইলেও অবশ্যই স্বীকার্য্য।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষীয় প্রার্থীদের কোন কোন কেন্দ্রে পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিতে বসিলে অনেক কারণই দৃশ্যমান হইবে। শরৎবাবুকে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে একেবারে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রায় নিয়ামক রূপেই বরণ করিয়াছিল। শরৎবাবু তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতা বলে কোন কোন ক্ষেত্রে কলিকাতার জিলা কংগ্রেসগুলির মনোনয়ন বাতিল করিয়া দিয়া নূতন অজ্ঞাত ও অখ্যাত প্রার্থীকে কংগ্রেসের ছাপ আঁটিয়া দিয়া নির্ব্বাচন-গোষ্ঠে যথেচ্ছ বিহার করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার অতি বড় ভ্রম হইয়াছিল। শরৎবাবু জানেন যে, বাংলার অন্যত্র যাহাই হউক, কলিকাতা সহরে জিলা কংগ্রেসের কর্ম্মীরাই জন-সাধারণের কাছে প্রিয়। তিনি যে কি উদ্দেশ্যে জিলা কংগ্রেসগুলির মনোনয়ন বাতিল করিয়া 'যদু' 'মধু' প্রভৃতি প্রার্থীগণের কপালে কংগ্রেস ছাপ আঁটিয়া দিয়াছিলেন তাহা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অবোধ্য। বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী মনোনয়ন ব্যাপারে তিনি যে কোন বিশেষ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাহাও তাঁহার মনোনয়ন-তালিকা দেখিলে উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অকারণে জিলা কংগ্রেসগুলির মনোনয়ন সমর্থন না করাতে জিলা কংগ্রেসের কর্ম্মিগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ এই জিলা কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মিগণই তাঁহার অন্তরীণ হইতে মুক্তির পর পরিপূর্ণ-ভাবেই তাঁহার অনুগমন করিয়া আসিয়াছেন। তাহার উপরেও আর একটি প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে যে, স্থানীয় কর্ম্মীরা যেমন সঠিকভাবে কোন প্রার্থীর নির্ব্বাচনের সাফল্য এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে বলিতে পারে তিনি তাহা নিজে কোনমতেই ধারণা করিতে পারেন না। এই কারণেই তাঁহার উচিত ছিল সকল ক্ষেত্রে না হইলেও অন্ততঃ বহুলাংশে জিলা কংগ্রেসের মনোনয়ন মানিয়া লওয়া। তাহা হইলে কংগ্রেসকে অনেক স্থলেই পরাজয়ের গ্লানি স্পর্শ করিত না। উত্তর কলিকাতায়—খালপারে এবং ৩নং পল্লীতে, মধ্য কলিকাতায় ১১নং পল্লীতে, দক্ষিণ কলিকাতায় ২২নং এবং ২৪নং পল্লীতে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় যে এই কারণেই ঘটিয়াছে, তাহা কি শরৎ বাবু এখন বুঝিতে পারিতেছেন? এই সূত্রে আমরা বিশেষ করিয়া ৩নং পল্লীর এবং ২৪নং পল্লীর উল্লেখ করি। ৩নং পল্লীতে তিনি প্রথমে যাঁহাদের ছাপ দিয়াছিলেন, জানি না কি কারণে দুই দিন পরে তাঁহাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়া তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই ব্যক্তিকে কংগ্রেস মনোনয়ন-ছাপ আঁটিয়া দিলেন। অথচ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষের ন্যায় নিষ্ঠাবান দলগত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁহার ছাপ দেওয়ায় যে খুবই উচিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনের পল্লীতে তিনি যদি তাঁহার প্রথম মনোনীত অধ্যাপক ঘোষকে শেষ পর্য্যন্ত রাখিতেন, তাহা হইলে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ে বিপক্ষদলের বিদ্রূপবাণ আজ তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত না। ১১নং ওয়ার্ডে শ্রীরাজকুমার বসুকে ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি বা মধ্য কলিকাতা জিলা কংগ্রেস কমিটি কোন প্রতিষ্ঠানই মনোনীত করে নাই এবং পল্লীতে তাঁহার পরিচয়ও বিশেষ কেহ জানে না। ইহা সত্ত্বেও কেন তিনি জিলা কংগ্রেস কমিটির মনোনীত শ্রীনটবর দত্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু ইহার ফলাফল হইয়াছে যে শ্রীনটবর দত্ত তাঁহার মনোনীত প্রার্থী অখ্যাত শ্রীরাজকুমার বসুকে পরাজিত করিয়া কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ২৪নং ওয়ার্ডে গত ১৯৩৩ সালের নির্ব্বাচনে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ

ক্যালকাটা থিয়েটার্স

শনি ও রবিবারের আসর ছাড়া আর অন্যদিনে অভিনয় করবার জন্যে এরা প্রমথ বিশীর "ঋনং কৃত্বা" প্রহসন মহলায় ফেলেছেন, শীঘ্রই শুভ-উদ্বোধন দিবস ঘোষিত হবে।

রূপ-মহল

এরা অমর ঘোষের "গঙ্গার্জ্জুন" অবিলম্বে মঞ্চস্থ করবার জন্যে জোর মহলা বসিয়েছেন। দুর্গাদাস প্রমুখ সকলেই এই নাটকে নামবেন প্রকাশ।

গতবারের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসন্তোষ কুমার বসু কর্তৃক অতি অল্প সংখ্যক ভোটে বহুকষ্টে পরাজিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি এবং দক্ষিণ কলিকাতা জিলা কংগ্রেস কমিটি গত নির্বাচনে ব্যক্ত কৃষ্ণবাবুর ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া কৃষ্ণবাবুকেই ২৪নং পল্লীতে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেন। কিন্তু তিনি জিলা কংগ্রেস কমিটির মনোনয়ন নাকচ করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের বিপক্ষে খাড়া করিয়াছিলেন; এবং এই অবিমৃষ্যকারিতার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। আর সন্তোষবাবুও বা কেন একজন 'ডামি' প্রার্থী খাড়া করিলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। যদি কোন কারণে তিনি কৃষ্ণবাবুকে সমর্থন করিতে অপরাগ হ'ন তাহা হইলে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে পরাজিত করিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা পূর্ব্বাহ্নেই সঞ্চয় করিয়া তিনি শরৎচন্দ্রের দরবারে তাঁহার প্রার্থীকে লইয়া অনুগ্রহা কাঙ্খী হইলেই সকল দিক রক্ষা হইত। তাঁহার এই অবিবেচনার জন্যই অলডারম্যান নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস পক্ষীয় প্রার্থী মনোনয়নের সময় তাঁহার নামে ঐরূপ প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। ২২ নং ওয়ার্ডে অন্যতম কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ের কারণ তাঁহার দুর্ব্বলতা। দক্ষিণ-কলিকাতা জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন, তিনি ব্যক্তিগত কারণে তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে এইরূপ দুর্ব্বলতার পরিচয় অতিশয় মারাত্মক।

উপরোক্ত ব্যক্তিগতভাবে আলোচিত কয়েকজনকে বাদ দিলেও দেখা যায় যে, প্রায় সর্ব্বত্র শরৎবাবু এমন সকল লোককে মনোনীত করিয়াছেন যাহারা কখনই পূর্ণভাবে কংগ্রেসকে সমর্থন করিতে পারেন না। দল-গঠন করিতে গেলে দয়া, মায়া বা নিরপেক্ষতার বালাই চলিবে না। বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ব্যক্তিকে সর্ব্বত্রই নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিয়া স্বীয় দলের ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে হইবে। শরৎবাবু ঐ কথা ভুলিয়া বিরুদ্ধ দলের মন পাইবার আশায় অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রায় তিনি নিজের বিরুদ্ধবাদীকে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি কি জানেন না যে, যাহাদিগকে তিনি স্বীয় অনুচরবর্গকে বঞ্চিত করিয়া কংগ্রেস-ছাপ দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই নলিনীপোষিত বৈধানিক দলভুক্ত? এক নং পল্লীতে রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাত নং পল্লীতে দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, আট নংএ ডাঃ জে, এম, দাসগুপ্ত, ১৪নং পল্লীতে বিজয় নাহার, ১৮ নম্বরে সনৎকুমার রায়চৌধুরী, ২১নং পল্লীতে ডাঃ সুবোধ ঘোষ, ২২এ পল্লীতে শ্রীধরণী কুমার বসু, ২৩নং পল্লীতে শ্রীফণী ব্রহ্ম, ২৫নং ওয়ার্ডে অমর মুখোপাধ্যায় কোন না কোন সূত্রে নলিনী, বিধান বা কিরণের সঙ্গে আবদ্ধ তাহা কি শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল? শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু নিশ্চয়ই এখন উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে আমরা যাহা বলিয়াছি—দলগত রাজনীতিতে (Party Politics) নিরপেক্ষতার স্থান নাই—তাহা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি যদি এই সকল বর্ণচোরা কংগ্রেসদ্রোহীগুলিকে মনোনয়ন না করিয়া দৃঢ়হস্তে বৈধানিক মোহচক্র নিশ্চিহ্ন করিতে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে অলডারম্যান নির্ব্বাচনে যে কংগ্রেস-পক্ষীয় প্রার্থীগণকে এইরূপ শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে হইত না তাহা বলাই বাহুল্য। ৮নং পল্লীতে নিষ্ঠাবান কংগ্রেসসেবী কবিরাজ শ্রীসত্যব্রত সেনকে মনোনীত না করিয়া বহুমুখী ডাঃ জে, এম, দাসগুপ্তকে মনোনয়ন করা তাঁহার পক্ষে যে কতদূর অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হইয়াছিল তাহা কি এখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই? ২২এ ওয়ার্ডে নির্ব্বাচিত কংগ্রেস প্রার্থী কুমার বসুকে সম্প্রতি এক সভায় সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল; উহার সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার। ইহা ব্যতীত ব্যবসায় সূত্রে বিধানচন্দ্র প্রভৃতির সহিত ধরণীকুমারের সম্বন্ধ বিদ্যমান। শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর মনোনীত যে ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনার সভায় শ্রীনলিনীরঞ্জন সভাপতিত্ব করিতে স্বীকৃত হয়, সেই ব্যক্তির টিকি কোথায় বাঁধা তাহা অনুমান কি কষ্টসাধ্য? শরৎবাবু এই সব বর্ণচোরাদিগকে যে শুভ উদ্দেশ্যে সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা যে ফলদায়ক হয় নাই তাহার পরিচয় অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন!

শুধু নির্ব্বাচন কেন, যে কোন রাজনৈতিক কাজ করিতে গেলেই অর্থের প্রয়োজন আছে। এবার কংগ্রেসের পক্ষে এত বড় একটি নির্ব্বাচন পরিচালনা করা হইল, কিন্তু ঐ জন্য যাহা কিছু ব্যয় করা হইয়াছে তাহা যে যাহার ব্যক্তিগত অর্থকোষ হইতেই করিয়াছেন—party fund বলিতে কোন কিছু এবার সৃষ্ট হয় নাই। ইলেকসন বোর্ডের পক্ষে যাহা কিছু ব্যয় হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বোর্ডের সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের নিজের অর্থ হইতেই করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই অত্যন্ত পরি-তাপের কথা যে এতবড় একটি নির্ব্বাচন পরিচালনা করিবার জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কোন party fundএর ব্যবস্থা করেন নাই।

এবারকার নির্ব্বাচনের ফলাফলে শরৎ-বাবু নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, বাস্তবের সহিত সম্পর্কবিহীন নিছক আদর্শবাদ কার্য্যক্ষেত্রে অচল। এবারকার নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে অগ্রসর হইতে গিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যে সকল বাধা বিপত্তি তিনি ভোগ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে কার্য্যক্ষেত্রে ঐ সকল চোরাবালির সন্ধান এবং স্থান তিনি পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন!

পপুলার পিক্‌চার্সের "আবর্ত্তন" চিত্রের একটি দৃশ্যে কুমারী লীলা হালদার নৌ-বিহারে রতা। ছবিখানার ভেতর সাধারণের মনকে চঞ্চল করবার বহু খোরাক আছে। আস্‌ছে শনিবার ৯ই মে ছবিখানা 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা
প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা
গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

খেয়ালী

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৭ই বৈশাখ ১৩৪২—30th. April, 1936. } ১৮শ সংখ্যা

সাংবাদিকের দায়িত্ব

পর্য্যায়ক্রমে গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া "খেয়ালী"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নানাস্থানে নানারূপ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। অনেকে আমাদের মন্তব্যে এরূপ বিস্ময় প্রকাশেও বিরত হন নাই যে, যেহেতু স্যার নৃপেন্দ্রনাথের পুত্র মিঃ বি, এন, সরকারের সহিত আমাদের পরিচালক সখ্যসূত্রে আবদ্ধ এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর তিনি আত্মীয় সেহেতু "খেয়ালী"তে তাঁহাদের কার্য্য কলাপের ঐরূপ সমালোচনাও অভিনব। এই সকল বিস্ময়ব্যাকুল শুভানুধ্যায়ীদের বিস্ময় অপনোদনের জন্য জানাইতেছি যে, আমাদের নিকট সাংবাদিকের দায়িত্ব অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সাংবাদিকের ধর্ম্ম ব্যক্তিগত সম্পর্কের বহু উর্দ্ধে বলিয়াই আমরা মনে করি। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সুভাষচন্দ্রের মত দেশবরেণ্য নেতার প্রতি স্যার নৃপেন্দ্রনাথের শ্লেষোক্তি সুরুচির পরিচায়ক হয় নাই, একথা বলিতে আমরা বাধ্য, না বলিলে বরং আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইত। এখানে তাঁহার পুত্রের সহিত আমাদের প্রীতির মাপ-কাঠিতে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। দেশের ও দশের দিক হইতে সাংবাদিকরূপে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে এবং সেই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার একান্ত প্রয়োজন।

অপরে যে যাহাই মনে করুক না, অন্ততঃ স্যার নৃপেন্দ্রনাথ নিজে ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কথিত বক্তব্যের (Public utterences) সমালোচনা জনসাধারণ চিরকাল করিয়াছে ও করিবে এবং তিনি ইহাও জানেন যে, ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই হউক না কেন জাতিগত বা বৃহত্তর জীবনে (Public Life) নিকটতম বন্ধু ও আত্মীয়ের সহিতও মতভেদ অনিবার্য্য। নতুবা, আজ তিনি যখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী তরফের নেতা, তখন আইন-জগতে তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সরকার-প্রতিপক্ষ দলের অন্যতম নেতা হইতেন না। আর শুধু আজ কেন, প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ "বন্দে মাতরম্" সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাঁহার তদানীন্তন জুনিয়ার উদীয়মান ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পুরাতন Servant-এর পৃষ্ঠা খুঁজিলেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে।

কেহ কেহ একথা ইঙ্গিত করিতেও ত্রুটী করেন নাই যে, যেহেতু শরৎবাবু ২২নং ওয়ার্ডে 'খেয়ালী'র পরিচালককে মনোনয়ন দান করেন নাই, সেই হেতুই

তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। একথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহার প্রমাণ—মনোনয়নের পর হইতে আরম্ভ করিয়া নির্ব্বাচনের পর পর্য্যন্ত 'খেয়ালী' কংগ্রেস তথা শরৎচন্দ্র বসুকে সর্ব্বথা সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। যদি শরৎবাবু ২২নং ওয়ার্ডের মনোনয়ন বাতিল করিয়া আর সব ওয়ার্ডে যথাযোগ্য লোককে মনোনীত করিতেন, অর্থাৎ যদি তাঁহার ভুলের জন্য অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের এরূপ শোচনীয় পরাজয় না ঘটিত তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যের সমালোচনার কোন প্রয়োজনই হইত না। ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিক জগতে আমরা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দেশের নেতা হিসাবে যে ভুল তিনি করিয়াছেন ভবিষ্যতে যাহাতে সে ভুল না হয় সেজন্য তাঁহার কার্য্যের প্রকাশ্য সমালোচনা করিবার দাবী আমরা রাখি।

২২নং ওয়ার্ডের মনোনয়ন সমর্থন করিতে গিয়া হরিশ পার্কে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছিলেন :—"আমি এই মনোনয়ন ব্যাপারে কারুর কথা শুনিনি—ভাইয়ের কথা শুনিনি, বোনের কথা শুনিনি, ভাগ্নের কথা শুনিনি। আপনারা বোধহয় জানেন, এই ওয়ার্ডে যিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী থেকে সর্ব্বোচ্চ ভোট পেয়েছিলেন তিনি আমার আত্মীয়: তবুও তাঁর মনোনয়ন আমি নাকচ ক'রে দিয়েছি।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা শরৎচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জীবনে তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের খাতিরে তাহার ক্রটী হইতে দেন না। অতএব তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরাও আমাদিগের সাংবাদিকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যকে কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা ব্যাহত হইতে দিই নাই—একথা আর কেহ না বুঝুক তিনি যে নিজে বুঝিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

:o:-

অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ

রায়—রুণী—বিশ্বাস আঁতাত

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর যোগ্য প্রত্যুত্তর

কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন সম্পর্কে গত ৯ই এপ্রিল তারিখে আমি যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলাম, উহার উত্তরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং মিঃ পি, সি, বিশ্বাস যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম!

আমার বিবৃতিতে আমি বলিয়াছিলাম যে, গত ৮ই এপ্রিল তারিখে জোড়াসাঁকো রাজবাটীতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার মিত্র প্রভৃতির উপস্থিতিতে যে সভা হইয়া গিয়াছে, ঐ সভায় কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান পদের জন্য কংগ্রেস পক্ষের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মিঃ এফ, রুণী, মিঃ বি, কে, বসু, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক ও হাজী মহম্মদ আকবরকে দাঁড় করাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতেই অল্ডারম্যান নির্ব্বাচন ব্যাপারে কর্পোরেশনে কংগ্রেসী-দলের পরাজয় ঘটিয়াছে। আমি ঐ প্রসঙ্গে ইহা জনসাধারণকেই ভাবিয়া দেখিতে, অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, কর্পোরেশনের কংগ্রেসী দলের পরাজয় ঘটাইবার জন্য কংগ্রেসী বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিয়াছে, এমন কতকগুলি লোক যে অপকৌশল অবলম্বন করিয়াছে, উহা বস্তুতঃই সম্মানজনক বা সমীচীন কি না।

ডাঃ রায় ও মিঃ বিশ্বাস আমার উক্তির একটা বর্ণেরও প্রতিবাদ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। কাজেই কলিকাতার নাগরিক সাধারণের উপরই আমি ডাঃ রায় ও মিঃ বিশ্বাসের বিবৃতির সারবত্তা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ন্যস্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

ডাঃ রায় ও মিঃ বিশ্বাস উভয়েই মূল প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছেন এবং আমার উপর দোষারোপ করিয়াছেন যে, ১৯৩০ সালে আমি (ডাঃ রায় সহযোগে)—ডাঃ রায়, মিঃ বিশ্বাস, মিঃ সরকার ও অপর কয়েকজন গত ৮ই এপ্রিল তারিখে অপর এক পক্ষের সহিত যেরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন—অনুরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভ্রান্তি-প্রণোদক—এবং আমি এই প্রসঙ্গে ইহা না বলিয়া পারিতেছি না যে, উঁহাদের নিশ্চয়ই স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিয়াছে।

১৯৩০ সালে কর্পোরেশনে কংগ্রেসী দলের নিশ্চিত সংখ্যাধিক্য ছিল—কাজেই কংগ্রেসী পক্ষের অল্ডারম্যান পদপ্রার্থিগণের নির্ব্বাচনের সুবিধার জন্য বা অপর কোন উদ্দেশ্যেই অপর কোন দলের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার কোন কারণই তখন দেখা দেয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটি হইয়াছিল এই যে, ঐ সময় একজন মনোনীত হিন্দু কাউন্সিলার ডাঃ, রায়ও আমার নিকট আসিয়া জানান যে, কর্পোরেশনে কংগ্রেসী দলের যখন নিশ্চিত সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে, তখন কংগ্রেসী দল অপরের প্রতি মহানুভবতা দেখাইতে পারে এবং তজ্জন্য বেসরকারী এবং কংগ্রেসী দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন, এমন দুইজন, অন্ততঃ একজন হিন্দু অল্ডারম্যান পদপ্রার্থীকে কংগ্রেসীদল অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন—তাহাতে কংগ্রেসীদলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইবে না। ঐ ভদ্রলোক যে কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন আমি এ স্থলে ঠিক তাহাই উল্লেখ করিলাম। যদি উক্ত ভদ্রলোকের কথার কোনক্রমে ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকি তাহা হইলে সেই ভদ্রলোক যেন তাহার প্রতিবাদ করেন।

উক্ত ভদ্রলোক যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা কংগ্রেসী দলের সভায় উপস্থাপিত করা হয় এবং ঐ প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়া সভায় একটী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পরে অবশ্য অল্ডারম্যান পদপ্রার্থী আরও নূতন লোক দাঁড়াইয়া পড়ায় কংগ্রেসী দলের, পূর্ব্বসিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আমি যথাযথ জানাইলাম। এবিষয়ে কাহারোও কিছু প্রতিবাদ করিবার থাকিলে আমি সানন্দে প্রতিবাদ আহ্বান করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা দৃষ্টে স্পষ্টই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, ১৯৩০ সালে কর্পোরেশনের কংগ্রেসী দলের শক্তি বা মর্য্যাদা খর্ব্ব করিবার মত কোন কিছুই করা হয় নাই।

১৯৩০ সালে কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান পদপ্রার্থী কংগ্রেস মনোনীতদিগের নির্ব্বাচনের জন্য সরকার মনোনীত সদস্যগণের বা শ্বেতাঙ্গ সদস্যগণের সহিত কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নাই। এ সম্পর্কে আমার সহিত বা কংগ্রেস পক্ষের অপর কাহারও সহিত শ্বেতাঙ্গ

দলের কাহারও কোনরূপ আলাপ-আলোচনার সুত্রপাত হয় নাই।

মনোনীত সদস্য দলের পক্ষ হইতে একজন মাত্র সদস্য পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উঁহার ঐ প্রস্তাব কংগ্রেসী দলের সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং কংগ্রেসী দল কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ঐ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে ঐ ভদ্রলোক, তাঁহার দলভুক্ত বন্ধুবান্ধবগণ যাহাতে কংগ্রেস-মনোনীতদের সমর্থন করেন, সেজন্য স্বভাবতঃই নিশ্চয়ই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে কংগ্রেসী দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য বা কংগ্রেসী কোন সদস্যকে কংগ্রেস দল ত্যাগে প্ররোচিত করিয়া কর্পোরেশনের কংগ্রেস বিরোধী দলের সহিত চুক্তিবদ্ধ করিবার জন্য কোনরূপ অপচেষ্টা হয় নাই। এই অবস্থা বিবেচনায় জনসাধারণই বিচার করিতে পারিবেন যে ১৯৩০ সালের ঐ পরিস্থিতির সহিত ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসের উক্ত "পরিস্থিতির কোন তুলনা চলে কি না। ডাঃ রায় অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বা কংগ্রেস কর্পোরেশন ইলেকশন বোর্ডে যোগদান করেন নাই, এজন্য ডাঃ রায়কে আমি কোন দোষ দিতেছি না; কিন্তু কংগ্রেসী দলের কার্য্যের সহিত কোন সংস্রব না রাখা ও যে সকল হিন্দু কাউন্সিলার নিজদিগকে কংগ্রেসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং এখনো দিতেছেন—তাঁহাদিগকে কংগ্রেস দলের পরাজয় ঘটাইবার মতলবে কংগ্রেস দল ত্যাগ করতঃ কর্পোরেশনের কংগ্রেস-বিরোধী দলের সহিত মৈত্রী প্রতিষ্ঠা বা চুক্তিবদ্ধ হইতে প্ররোচিত করা ঠিক এক কথা নহে।

অল্ডারম্যান পদের জন্য কংগ্রেসমনোনীত সদস্য ৫ জনের বা উহাদের কোন একজনের নির্ব্বাচনের জন্য আমি কখনও কোন মন্ত্রী বা কোন সরকারী সদস্যের সহায়তা লাভের অণুমাত্রও চেষ্টা করি নাই—যিনি পারেন, তাঁহাকে আমার এই ঘোষণারও প্রতিবাদ করিতে আহ্বান করিতেছি। মিঃ জে, সি, গুপ্ত ইতঃপূর্ব্বেই এতৎসম্পর্কে তাঁহার বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ইহা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত যে, কর্পোরেশনের হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় আমি অপর কয়েকজন নাগরিকের সহিত যোগদান করিয়াছিলাম; কিন্তু উহার সহিত অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনের অণুমাত্রও সম্পর্ক নাই।

ডাঃ রায় আমাকে "বিদ্রোহী" আখ্যা দান করিয়াছেন। ইহা খুবই সত্য কথা যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন করিতে পারি নাই। ১৯৩৪ সালে গিড্ডাপাহাড়ে রাজবন্দী হিসাবে অবস্থান করা কালে ডাঃ রায় আমার সহিত দেখা করিতে গেলে আমি তাঁহার নিকট স্পষ্ট করিয়া আমার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে ডাঃ রায় জানাইয়াছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে আমি আমার বিবেকানুসারে কাজ করিতে এবং ভোট দিতে পারিব—সে স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হইবে। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী অন্যরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে আমি পরিষদের সদস্য পদপ্রার্থীরূপে দাঁড়াইলে তাহার বিরুদ্ধতা করা হইবে না বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরিষদে আমার নির্ব্বাচনে অবিসংবাদিতভাবে সপ্রমাণ করে যে, সমগ্র দেশ আমার অভিমতেরই সমর্থক। ইহা সত্ত্বেও যদি আমি 'বিদ্রোহী' আখ্যারই উপযুক্ত হই, তাহা হইলে আমি ইহাই বলিব যে, আমার উক্ত বিদ্রোহ দেশের অধিকাংশ জনগণ কর্ত্তৃকই সমর্থিত। ডাঃ রায় নিশ্চয়ই দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী—আমি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে আমার মনোভাব সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া ধরা সত্ত্বেও আমাকে "বিদ্রোহী" স্বরূপ গণ্য করেন নাই।

কেবলমাত্র আমাকে "বিদ্রোহী" আখ্যায় ভূষিত করিয়াই ডাঃ রায় তুষ্ট হন নাই, পরিষদের কংগ্রেস জাতীয় দলের সদস্যগণের উপরও তিনি পার্লামেন্টি সদস্যদের সহিত সহযোগিতা না করায় দোষারোপও চাপাইয়া দিয়াছেন। তবে পরিষদের পার্লামেন্টী দলের সেক্রেটারী সত্যমূর্ত্তি জাতীয় দল সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে ডাঃ রায়ের অভিযোগের যোগ্য প্রত্যুত্তরই প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ সত্যমূর্ত্তি বলিয়াছেন—

"কংগ্রেসী দল ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, পরিষদের কংগ্রেসী পক্ষের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য মিঃ আণে পরিচালিত কংগ্রেস জাতীয় দলের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং সানন্দসহযোগিতাই বহুলাংশে দায়ী।"

ডাঃ রায় বলিয়াছেন যে, সময়ে সত্য আপনিই আত্মপ্রকাশ করিবে; কিন্তু আমার বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইল তাহাতে জনসাধারণ বেশ বুঝিতে পারিবেন—ডাঃ রায় এবং তাঁহার বন্ধুগণ কি চাল চালিয়াছেন এবং প্রকৃত সত্য কোথায় নিহিত আছে। এই সকল ব্যাপারে জনসাধারণ যে কঠোর সত্যের সম্মুখীন হইয়াছেন, কংগ্রেসের বর্ত্তমান ও অতীত ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলে না। উহা হইল এই যে, কংগ্রেসী বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিয়াও লোকে কর্পোরেশনে কংগ্রেস পক্ষীয়দের পরাজয় কামনা করিতে পারে বা পরাজয় ঘটাইবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারে। এই আচরণ যাহাদের দ্বারা সম্ভবপর, আমাদের মনোনীত প্রার্থিগণ সকলেই গোঁড়া কংগ্রেসী কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপন নিশ্চয়ই তাহাদের মুখে শোভা পায় না।

চিঠিপত্র

তালতলা সাহিত্য-সম্মিলনীতে মহিলা দিবস

শ্রীযুক্ত খেয়ালী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

সবিনয় নমস্কার নিবেদন

জানিতাম মিথ্যারও একটা সীমা আছে কিন্তু এক প্রত্যক্ষদর্শীর নাম ধাম জানিতে পারিয়াছি যিনি বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত কাগজে অসীম মিথ্যাবিবৃতিপূর্ণ চিঠি ইংরাজী বাংলায় পাঠাইতে সুরু করিয়াছেন, কোথাও ছাপা হইতেছে কোথাও ছাপা হইতেছে না। দেখিতেছি সম্প্রতি খেয়ালী সম্পাদকের মত দূরদর্শী লোকেরও চোখে ধূলা দিতে সমর্থ হইয়াছেন। তালতলা কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনী সম্বন্ধে গত সংখ্যায় যা লেখা হইয়াছে তা কতটা অসত্য একে একে দেখাইতেছি।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নাম না জানিবার লেখকের কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? "জনৈক ভদ্রলোক" না লিখিয়া নাম উল্লেখ করিলে কি তিনি বেশী প্রসিদ্ধ হইয়া যাইবেন এমন আশঙ্কা ছিল? "অত্যন্ত অন্যায়ভাবে" শুধু মন্দ দিক লইয়াই আলোচনা" তিনি করেন নাই—অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে ভালোমন্দ দুই দিকের আলোচনা করিয়া উপসংহার করেন, "নারী-সুলভ কোমল কণ্ঠের অনুকৃতি" তিনি করেন নাই, তাঁহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরই কবিসুলভ কোমল। "কতিপয় মহিলা" নয়, দুইটি কুমারী "সবিনয়ে" নয় রাগতভাবে প্রতিবাদ করেন। "অধিকাংশ তরুণ শ্রোতা" নয়, দুইজন বাদে বয়স নির্বিশেষে সমস্ত শ্রোতা "ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার" নয় নিয়মানুগ হইয়া "প্রবন্ধ চলুক" বলেন। এইখানে একটি নির্জ্জলা সত্য বাহির হইয়া গিয়াছে—"উক্ত সরস প্রবন্ধটি সমস্ত অন্তর দিয়া উপভোগ করা"র কথায়। প্রবন্ধটি সত্যই অত্যন্ত সরস হইয়াছিল, এবং শ্লেষে নয় হিউমারের মধ্য দিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবার উপদেশ ছিল। সুতরাং 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং' হইয়াছিল তাঁহাদেরই বেলায় যাঁহারা কিছু না বুঝিয়া প্রবন্ধ থামাইয়া দিবার জন্য জিদ্ ধরিয়াছিলেন (পরিপূর্ণ সভাগৃহে সবশুদ্ধ চারিজনমাত্র) এবং যাহারা আজো পর্য্যন্ত কাগজে প্রোপাগাণ্ডা করিয়া বেড়াইতেছেন।

জনৈক ভদ্রলোক—বৃদ্ধ ভদ্রলোক পূর্ব্বোল্লিখিত ভদ্রলোক সমর্থনকারী ভদ্রলোক এত "ভদ্রলোকের" ছড়াছড়ি এই ভদ্রলোকটির পত্রে যে কোন্ ভদ্রলোকের যে কি হইল বোঝা কঠিন। নীচের অংশের প্রতিবাদ করিবেন তালতলা লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষরা। আমরা শুধু বলিতে চাই শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর প্রবন্ধ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ষ্টাইলে সংযত হাস্যরসবহুল ও অনবদ্য হইয়াছিল এবং সভায় আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাহা উপভোগ করিয়া প্রকৃত রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বিনীত
শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক, তরুণ সাহিত্য বাসর

"খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সম্প্রতি এই সংখ্যায় "খেয়ালী"তে তালতলা মহিলা দিবস সংক্রান্ত একখানি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। পত্রখানিতে সুসাহিত্যিক শ্রীযুত প্রভাত কিরণ বসুকে অন্যায় এবং মিথ্যাভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ঘটনাটি সম্পূর্ণ বিকৃতরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাটি এই—সভায় প্রথমে মহিলারা প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে অনেকেই পুরুষদের বিশেষ রকম আক্রমণ করেন। প্রভাত কিরণ বসুর লেখা হাস্যরসবহুল—সেদিনকার প্রবন্ধটি হিউমারের ভিতর দিয়া আধুনিক নারী প্রগতির ভালো এবং মন্দ দিক এবং আমাদের প্রাচীন সমাজের ভালো এবং মন্দ দিক সরস ভাবে আলোচিত হয়েছিল। প্রথম থেকেই প্রবন্ধটি জমে গিয়েছিল—প্রবন্ধে যখন আধুনিক নারী প্রগতির মন্দ দিক আলোচিত হচ্ছিল তখন অকস্মাৎ দুজন মহিলা মাত্র শ্রীযুক্তা বীণা রায় এবং পুষ্প দে প্রতিবাদ করতে উঠে

আমাদের মনোনীত প্রার্থিগণকে জনসাধারণ বেশ ভাল করিয়াই জানে। কংগ্রেস প্রার্থীদের নামের পাশাপাশি সম্মিলিত কংগ্রেস বিরোধী দলের মনোনীত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করিলেই জনসাধারণ বুঝিতে পারিত কে কোন শ্রেণীর লোক।

অপরের কুৎসা কীর্ত্তন বা অপরের ঘাড়ে দোষ চাপান আমার স্বভাব নহে—তবে এ কথা সত্য যে, যাহাদিগকে আমি আমাদের সামাজিক এবং সাধারণ কর্ম্মজীবনকে কলঙ্কিত ও মসীলিপ্ত করিবার জন্য দায়ী বলিয়া মনে করি, আমি মুক্তিলাভের পর আর তাহাদের সহিত মিশিতে রাজী হই নাই। ইহাতে যদি ডাঃ রায় ও তাঁহার বন্ধুগণের ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কোনরূপ ত্রুটী স্বীকার করিব না এবং তাঁহারাও আমার নিকট হইতে তাহার আশা করিতে পারেন না।

আমি সহরের বাহিরে থাকায় এবং আমার শরীর সুস্থ না থাকায় এই বিবৃতি প্রকাশে বিলম্ব হইয়া গেল।

—শরৎচন্দ্র বসু
২৭।৪।৩৬

বলেন 'আমরা কি পুরুষদের অপমান শুনতে এখানে এসেছি'—এর উত্তরে প্রভাত কিরণ বসু সভাকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর প্রবন্ধে অপমানজনক কিছু আছে কিনা—শ্রীযুক্তা বীণা রায় বলেন নিশ্চয়ই আপনি আমাদের অপমান করেছেন। তখন অকস্মাৎ দুইজন যুবক উঠে গোলমাল আরম্ভ করেন—এবং প্রভাত কিরণ বসুকে বলেন আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। সমবেত শ্রোতা চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রভাত বাবুকে এই কথা বলায়—তাঁরা সমস্বরে অনুরোধ জানান প্রবন্ধ চলুক—এতে কোন অন্যায় দোষারোপ নেই। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী মহিলাদের পক্ষ হতে বলেন—'মহিলারা যখন পুরুষদের আক্রমণ করে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন তখন পুরুষরা যেমন নীরবে শুনেছেন তখন আমরাও এ প্রবন্ধ শুনতে বাধ্য।' সভানেত্রী উদ্ধত যুবক এবং মহিলাদ্বয়কে বসিয়ে দিয়ে প্রভাত-কিরণকে তাঁর প্রবন্ধ পুনরায় পাঠ করতে অনুরোধ জানান এবং বলেন প্রতিবাদ করবার থাকলে পরে করবেন। প্রভাত কিরণের প্রবন্ধ শেষ হয়। শেষের দিকে তিনি নারীর অনেক মঙ্গলের কথা বলেন। তাঁর লেখায় সরসতা এবং সমাজের উন্নতিমূলক মন্তব্য এবং অধঃপতিত সমাজের জন্য দুঃখ বিলাপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রবন্ধ পাঠ শেষে কেহই প্রতিবাদ করতে পারেন নাই—শেষকালে মাত্র দুজন মহিলা একটু ভাষার জন্যে প্রতিবাদ করেছিলেন। অধ্যাপক জয়গোপাল বাবু (যাঁকে আপনাদের পত্র লেখক জনৈক বৃদ্ধ বলে ব্যঙ্গোক্তি করেছেন) প্রগতির বিরুদ্ধে মহিলাদের অনেক যুক্তিযুক্ত ভাবে উপদেশ দেন এবং প্রভাত কিরণ বসুর প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভানেত্রীও প্রভাতকিরণ বসুকে সমর্থন করেন। জয়-গোপালবাবুর বক্তৃতাকালে সেই দুইজন যুবক পুনরায় গোলমাল আরম্ভ করেন; তখন গৃহস্বামী তাদের সভা হতে বহিস্কৃত করে দেন। তারাই একটি বিপক্ষ দল গঠন করে প্রতি কাগজে প্রভাত কিরণ বসুকে অন্যায়-ভাবে আক্রমণ করেছে। প্রতি কাগজেই এর প্রতিবাদ বার হয়েছে।

যাহোক ব্যাপারটি যথাযথ আপনাকে জানালুম—এতে একটুও অতিরঞ্জন নেই। আশা করি, অতঃপর আপনি এবিষয়ে সুবিচারই করবেন। "খেয়ালী"র মত সত্যবাদী এবং শক্তিশালী কাগজে আমার এই প্রতিবাদটী প্রকাশ করে নিরপেক্ষতার সম্মান রক্ষা করবেন ইহা আশা কি করতে পারি না? ইতি—

অন্য একটী প্রত্যক্ষদর্শী

[তালতলা সাহিত্য সম্মিলনীতে শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু মহাশয়ের "নারী ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা বর্ত্তমানে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। প্রভাতকিরণ বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ও বিভিন্ন পত্রলেখকের মতামত বিচার করিয়া ভবিষ্যতে আমাদের নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করিব।

তবে গত সংখ্যায় প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে প্রভাতকিরণ বাবুকে জনৈক ভদ্রলোক বলিয়া বর্ণনা করা যে শিষ্টাচার বহির্ভূত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ প্রভাতকিরণ বাবু কলিকাতা সাহিত্য সমাজে একজন সুপরিচিত ও শক্তিমান লেখক। সুতরাং তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভাণ যে স্বেচ্ছাকৃত তাহা অবশ্য স্বীকার্য।

পত্র লেখকগণ প্রভাতকিরণ বাবুর প্রবন্ধের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতার বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ সম্বলিত প্রবন্ধ পাঠাইলে তাঁহার প্রবন্ধের দোষগুণের সুবিচার করা হইবে।

সঃ খেঃ]

আম কাঁঠাল প্যাকবার সময় আসিয়াছে

-জামাই ষষ্ঠীও আসিতেছে-

সেই সঙ্গে আসিয়াছে

সেনোলা রেকর্ডে

সম্পূর্ণ অভিনব রঙ্গ-নাটকের সেট

প্রহারেণ ধনঞ্জয়

রচনা ও প্রযোজনা

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বি, এ

শিল্পী-পরিচয়

গঙ্গাধর—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
হরিবংশ—শ্রীমণি মজুমদার
মাধব—শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
পুণ্ডরীকাক্ষ—শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী
পচা—শ্রীআশুতোষ দে
ধনঞ্জয়—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
গিন্নি—শ্রীমতী নিভাননী
হরিদাসী—শ্রীমতী সরযুবালা
সুবাসিনী—শ্রীমতী গীতা
পুঁটুরাণী—শ্রীমতী ঊষাবতী
সুরবালা—শ্রীমতী প্রফুল্লবালা
হরিদাসী—শ্রীমতী মঞ্জুলিকা

রেখায় রেখায় হাসি, রেখায় রেখায় রসিকতা

৫ খানি সেনোলা সিলভার রেকর্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ১১৷০ মাত্র

সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাকট্‌স কোং

কলিকাতা

! আগতপ্রায় !

চিত্রজগতে

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের অভিনব ও

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান

বা—ঙ্গা—লা

বাঙ্গলার শ্যামল তৃণক্ষেত্রে নির্ঝরিণী কলতানে
তরুপত্রের মর্ম্মরধ্বনিতে যে বেদনা হাহা করে
অভ্রভেদী হর্ম্ম্যরাজীর প্রাচীর গাত্রে—
দীনের জীর্ণ কুটিরের মৃত্তিকা স্তুপে

বা—ঙ্গা—লী—র

যে চিরন্তন ব্যথা—যে শাশ্বত বেদনা—
প্রত্যাহত হইয়া—অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছে

বা—ঙ্গা—লী

বাণীচিত্রে শুনিবেন তাহারই করুণ প্রতিধ্বনি

পরিচালক : চারু রায়

কাহিনী : ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বা—ঙ্গা—লী

আগত প্রায় !

বিবিধ

অধ্যাপক অশোকনাথ

বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী এম্-এ. পি-আর-এস্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তদনুযায়ী তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অধ্যাপক অশোকনাথের এই পদলাভের জন্য তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

যতীশ বসু

ইণ্ডিয়ান্ ব্রীজ এসোসিয়েশনের বিদায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশ বসুর অবিরাম শ্রমশীলতা, অটুট অধ্যবসায় ও গঠনমূলক

শ্রীযুক্ত যতীশ বসু

শক্তির প্রাচুর্য্য অতুলনীয়। এর মুখে হাসি লেগেই আছে; ব্রীজ মহলের সবাইয়ের বন্ধু যতীশ বাবু; আর যতীশ বাবুর বন্ধু সবাই।

জ্ঞানদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

চার্টার্ড একাউণ্টান্ট শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত বৃহস্পতিবার ব্যারিষ্টার পরীক্ষা প্রদানের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। বৎসরাধিক পরে ব্যারিষ্টার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানদাবাবু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আমরা তাঁহার শুভকামনা করি।

জেনুইন ইনসিওরেন্স

বিগত ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাস হইতে, ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত জেনুইন ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের যে বর্ষ শেষ হইয়াছে, আমরা তাহার মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। এই কোম্পানী পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা এই বৎসর সকল দিকেই কৃতিত্ব প্রদর্শন ও সাফল্য অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন।

এই বৎসরে কোম্পানী ১৩২৮৭৫০্ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়া ৮০৮২৫০্ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। অবশিষ্ট গুলি অগ্রাহ্য হইয়াছে অথবা বিবেচনাধীন আছে। বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি—ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি নূতন কোম্পানীর পক্ষে এই পরিমাণ নূতন কার্য্য সংগ্রহ নিশ্চয়ই প্রশংসার কথা।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর প্রিমিয়ম বাবদ আয় হইয়াছে ২৪৯৫১॥৶০ আনা এবং সমস্ত খরচ খরচা বাদে ১৪৩১৫৸৶১১ পাই জীবনবীমা তহবিল করা হইয়াছে। এই বৎসর পর্য্যন্তও এই কোম্পানী কণ্ট্রোলার অব কারেন্সির নিকট জমা দিয়াছেন ৪৫০০০্ হাজার টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন ৪০০০্ টাকার।

জেনুইন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী মাত্র দেড় বৎসর যাবত বীমাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। এই দেড় বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণে সাফল্য অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আলোচ্যবর্ষে এই কোম্পানী ঢাকাতে একটী ব্রাঞ্চ অফিস খুলিয়াছেন।

তরুণ সম্প্রদায়

গত শনিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় ভবানীপুরের ২১নং রূপনারায়ণ নন্দন লেনে শ্রীযুত পান্নালাল দের সভাপতিত্বে তরুণ সম্প্রদায়ের সভ্যগণের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত বিনয়ভূষণ বসু নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উত্থাপন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এই সভায় স্বনামধন্য নেতা বসন্তকুমার বসু, স্যার দিনশা ওয়াচা, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও দুলালচাঁদ গোস্বামী ও মিসেস কমলা নেহেরুর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

সম্পাদকের যথারীতি রিপোর্ট পাঠের পর ১৯৩৬-৩৭ সালের নিম্নলিখিত কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি—শ্রীযুত সদাশিব মিত্র। সহঃ সভাপতি—কাউন্সিলার শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, কাউন্সিলার শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত অক্ষয় কুমার সরকার, কাউন্সিলার শ্রীযুত ধরণী কুমার বসু। যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীকাশীনাথ চাটুয্যে, শ্রীরাজ কুমার সেন। সহঃ সম্পাদক—শ্রীবিনয়ভূষণ বসু। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগোবর্দ্ধন সুর। সভ্যগণ—শ্রীসন্তোষ কুমার নন্দী, শ্রীকানাই লাল নন্দী, শ্রীকমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকনক বরণ মিত্র, শ্রীজয়দেব চাটুয্যে, শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅমিয় ভূষণ বসু।

ওয়েসাইড্ ক্লাব

ওয়েসাইড্ ক্লাবের পঞ্চম বার্ষিকী ও পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষ্যে গত ২৫শে এপ্রিল সন্ধ্যায় ১২নং মোহনলাল ষ্ট্রীটে কাউন্সিলার ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে এক উৎসবের আয়োজন হয়। গীত-বাদ্যাদি বহু আমোদ-প্রমোদের পর সভ্যগণ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের "রাজর্ষি" নাটক অভিনীত হয়।

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার ৯ই মে

পপুলার পিক্‌চার্সের

দ্বিতীয় চিত্রাঞ্জলি

আবর্ত্তন

একটি নারীর জীবনে যে কত ঝঞ্ঝা বাত্যা আসে, কত অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় তাহার জীবন-তরী যে কোন্ দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া কোথায় গিয়া যাত্রা শেষ করে, তাহার করুণ মর্ম্মস্পর্শী আলেখ্য।

ভূমিকায়ঃ

* কুমারী শীলা হালদার

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জীবন গাঙ্গুলী, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল দাস (হাজু), সুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (এঃ), ধীরেন ঘোষ (এঃ), শেফালিকা (পুতুল), আসমানতারা, রেণুকা ঘোষ আঙ্গুর বালা, গোপালী বালা

* শ্রীমতী ডলি রায়

"শ্রী" চিত্রগৃহে

পরিচালকঃ সতু সেন

আবর্ত্তন

চিত্রনাট্যঃ হেমন্ত গুপ্ত

"শ্রী" চিত্রগৃহে

কাফে ডি মনিকো

মেট্রো সিনেমা সংলগ্ন যে রেস্তরাঁটি—সেটির নাম "কাফে ডি মনিকো"। এই রেস্তরাঁটির মালিক শ্রীবিভূতি ভূষণ বিশ্বাস দেশী ও বিলাতী আদব কায়দা দোরস্ত প্রত্যেকেরই রুচি অনুযায়ী এই রেস্তরাঁর রুচি-পন্থা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায়, বিশুদ্ধ আহার্য্যে সর্বোপরি খরিদ্দারদের সঙ্গে সুমধুর ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যেই এই রেস্তরাঁটি সবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ধনী নির্ধনী সবাইয়েরই সামর্থ্য অনুযায়ী ইঁহারা খাদ্য মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—সুতরাং কলিকাতার ধনী নির্ধনী নির্ব্বিশেষে নিঃসঙ্কোচে বিদেশী রেস্তরাঁগুলির ভেজাল মালে উদরপূর্ত্তি না করিয়া এখানে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়ত' লাভবান্ হইবেন। আমরা এই রেস্তরাঁটির অত্যল্পকালের মধ্যে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মালিক শ্রীবিভূতি ভূষষ বিশ্বাস, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীধীরেন রায়চৌধুরী ও প্রচারক শ্রীঅজিত, সেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবানীপুর ইয়ং মেন্স এসোসিয়েসান

গত রবিবার ২৩শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় ভবানীপুরের ৫৮-১, কাঁসারীপাড়া রোডে, কাউনসিলার শ্রীযুক্ত ধরণীকুমার বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির দ্বিবিংশতি বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে।

যথারীতি উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পিরামিড, মুগুর ড্রিল, ডাম্বেল ড্রিল, তরোয়াল খেলা বেশ চমকপ্রদ হইয়াছিল। ব্রতচারী নৃত্য ও জঙ্গল নৃত্যও নেহাৎ মন্দ হয় নাই। খেলায় দর্শকবৃন্দ বেশ আকৃষ্ট হইয়াছিল। নবীন স্কাউট মাষ্টার শ্রীযুক্ত শচীন মুখার্জ্জির উদ্যম প্রশংসনীয় এবং তাঁহারই দক্ষতায় এই সমিতির কার্য্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র ঘোষ, ব্যায়ামবীর শ্রীদিগিন্দ্র দেব, শ্রীমন্মথ দাশগুপ্ত, মিঃ এ, পি, মল্লিক, মিঃ এস, এন, দত্ত, শ্রীচিত্তরঞ্জন মোদক, রায় সাহেব জ্ঞান ঘোষ, কাউন্সিলার জামালুদ্দিন আহম্মদ, শ্রীদুলালচন্দ্র নন্দন ও শ্রীনন্দদুলাল মুখুয্যে প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

কোন্নগর পাঠচক্র

কোন্নগর পাঠচক্রের উদ্যোগে গত শনি ও রবিবার কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শনিবার (২৫শে এপ্রিল) সন্ধ্যা ৭টায় চোরবাগানের সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্ত্তন সম্মিলনীর কালীকীর্ত্তন হয়। পরদিন রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভাধিবেশন হয়। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ উদ্বোধন করার পর স্থানীয় বিদ্যালয়, সৎসঙ্গ, কালী-কীর্ত্তন সমিতি, বীণাপাণি ক্লাব ও পাঠচক্র রামকৃষ্ণদেবের চিত্রপটে পুষ্পমালা দিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। শ্রীমান অবনীকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র যথাক্রমে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব" ও "শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্ম" শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধপাঠ করেন। স্বামী কৈলাসানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দের বক্তৃতা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে অতি সুন্দর ও সহজভাবে রামকৃষ্ণদেবের কয়েকটী বিশেষত্বের কথা বুঝাইয়া দেন এবং সাধারণ মানব-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রভাব সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় একঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা দেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমধুর সঙ্গীতে এবং তৎসহ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পাখোয়াজ সঙ্গত সকলে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

সভাশেষে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত কোন্নগর কালীকীর্ত্তন সমিতির কালীকীর্ত্তন সকলকে আনন্দদান করে।

আদর্শ সংসার

শরীর সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিলনা বলিয়া আগেকার দিনে সাধারণ ঔষধ ব্যবহৃত হইত, তাহাও আবার অনুমানের উপর। নির্ভর করিতে হইত দৈবের হাতে। আধুনিক বহু বিচক্ষণ ডাক্তার এই সব রোগ হইতে রোগী দিগকে নিরাময় করিবার জন্য, সুইজার-ল্যাণ্ডের রচি কোম্পানীর, 'সারিডন্' ট্যাবলেট্ ব্যবহার করিবার উপদেশ দিবার সময় এই ঔষধের অমূল্য গুণরাজির ব্যাখা করিয়া থাকেন। এই 'সারিডন্' ট্যাবলেট্ অসময়ে দরকারের জন্য প্রত্যেক ঘরে কিনিয়া রাখা দরকার। আমাদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত স্বাস্থ্যকর নিয়মাবলীর মত এই 'সারিডন্'কেও একটী আবশ্যকীয় দ্রব্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বাতজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, সর্দ্দিজ্বর, তীব্র মাথার যন্ত্রণা—এসব রোগে 'সারিডন্' ব্যবহার করিলে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়, সে কথা নিঃসন্দেহ ভাবে বলা যাইতে পারে। গরম দুধপান, বিছানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম, কোষ্ঠ পরিষ্কার প্রভৃতির প্রতি সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি রাখা দরকার।

গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য-সমাজ

গত বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি—রায় শ্রীযুত জলধর সেন বাহাদুর। সহঃ সভাপতি—ডাঃ নলিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত ব্রজমোহন দাশ। সম্পাদক—শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমিশনার, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী। সহঃ সম্পাদক—শ্রীযুত কান্তি ভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থগারাধ্যক্ষ—সুনীল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অপরাপর সভ্যগণ :—শরৎচন্দ্র বর্ম্মণ, শ্রীযুত বিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত ললিতমোহন মুখো-পাধ্যায়, শ্রীযুত নীরদবরণ রায়, শ্রীযুত জ্যোতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত মণিলাল আঢ্য।

সাহিত্য সেবিকা

অনুরূপা দেবীর

ম হা নি শা

বাণীচিত্রে

রূপবাণীতে

(শুভ উদ্বোধন ২রা মে)

পরিচালক—নরেশ মিত্র

আলোকশিল্পী—অশোক সেন

শব্দযন্ত্রী—এস. এন, সিং

সুরশিল্পী—অমর বসু

প্রযোজক—শিশির মল্লিক
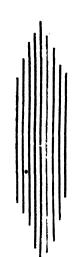
বিভিন্ন ভূমিকায়

নগেন্দ্রবালা

আসমানতারা

হরিসুন্দরী [ব্ল্যাকী]

চারু-বালা

রেণুকা

(মনোরা পিকচার্সের সৌজন্যে)

মিস্ এথেন হ্যাম্পডেন্

পদ্মাবতী

রাজলক্ষ্মী

পারুলবালা

গিরিবালা

আঙ্গুরবালা

বেলা

(পপুলার পিকচার্সের সৌজন্যে)

অমর বসু (এঃ)

নরেশ মিত্র

যোগেশ চৌধুরী

রবী রায়

মিঃ হ্যাম্পডেন্

ভুমেন রায়

জহর গাঙ্গুলী

ইন্দু মুখার্জ্জী

হীরালাল চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী

উষানাথ রায় চৌধুরী (এঃ)

বিল্বমঙ্গল দাস

বিজয় কার্ত্তিক দাস

বিনয় বসু

মণি মোহন চট্টোপাধ্যায়

(বিলাসী)

সীতার বিবাহ (উড়িয়া চিত্র)

নতুন কিছু কর, এই হ'চ্ছে গাঙ্গুলী মশায়ের আদি ও অকৃত্রিম 'মটো'। তারই ফলে. চিত্রজগতে তাঁর নতুন নতুন দানে চিত্রবিলাসীর মনে তিনি অতি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠ আছেন। চিত্রশিল্প প্রথম উড়িয়া ছবি "সীতার বিবাহ" তাঁর নবতম দান এবং এই ছবি প্রযোজনার ফলে তাঁর নাম চিত্র-শিল্পের ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে।

গেল কাল থেকে 'রূপকথা-'য় কালী ফিল্মসের এই নতুন উড়িয়া ছবি "সীতার বিবাহ দেখান হ'চ্ছে। ছবিখানা দেখে সত্যই আমরা আনন্দ পেয়েছি। এতদিন আমরা পোড়ো বাড়ীর পাশে, রাস্তাঘাটে এদের কাপড় টাঙিয়ে অভিনয়, রাস্তা অতিক্রম কোরে যাবার সময় মুহূর্ত্তের জন্যে দেখে মনে মনে হেসেছি।' অভিনয় জিনিষটার ওপরও এদের আধিপত্য আছে—একথা আগে আমাদের অজানা ছিল। "সীতার বিবাহে" মাখনলাল শর্ম্মার রাম, অদ্বৈতচন্দ্র মাহান্তীর লক্ষণ, শ্রীমতী প্রভার সীতা, বিশ্বামিত্র, জেলে-জেলেনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতৃ-বর্গের অভিনয় আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। গানগুলোর ভাষা সবজায়গায় আমরা বুঝতে না পারলেও সেগুলি সুর তান লয়ে যে সুমধুর হ'য়েছে—একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। ছবিখানার সংলাপ বেশ প্রাঞ্জল—দু' একটি কথা ছাড়া যেন মনে হয় বাঙলায় অভিনীত হ'চ্ছে। উড়েদের রাস্তায় ঝগড়ার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয় এদের ভাষা কী দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু ছবিতে কথাবার্ত্তা শুনে মনে হ'ল ঝগড়ার কথাবার্ত্তার জন্যে হয়ত' এদের নতুন অভিধান আছে।

ছবিখানার পরিচালনা মোটামুটি ভাল। আলোক-চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজ প্রশংসনীয়। সাজসজ্জা থিয়েটারী অনুকরণে পরিকল্পিত। সেট সাধাসিধের উপর ভাল। পরিস্ফুটনা-গারের কাজও ভাল।

কলিকাতাবাসী উড়িয়াদের এই ছবিখানা দেখবার সুবিধে দেবার জন্যে আমরা তাদের মনিবদের অনুরোধ করি, তাঁদের ঠাকুর চাকরদের তাঁরা যেন অন্ততঃ পক্ষেও এক-বেলার ছুটী মঞ্জুর করেন।

শ্রীমতী সাধনা বোস

আমরা শুনে' সুখী হ'লুম—কলকাতায় "মন্দির"-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের অভিনয় প্রথম দিনের চেয়ে হয়েছে অনেক ভালো। মহলার দ্রুত পরিশ্রমের পর প্রথম দিনের অভিনয় একটু খারাপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এই "মন্দির" নাটকের অপূর্ব্ব আকর্ষণ ছিলেন—শ্রীমতী সাধনা বোস, একথা আজ সবাইকে মনে করিয়ে না দিলেও চলবে। তাঁর নাচের আর কত প্রশংসা করবো! 'কাফ্‌পো'-র সিঁড়ি বেয়ে জলজ্বলে জর্জ্জেট্ তরতর নেবে আসে সাধনা বোস। পথের পথিক থমকে দাঁড়ায়। বলে—"জানো, ও কে?" জবাব আসে—"জানি। ও ভারতের নাচ-কোহিনুর।"

প্রথম দিনের পর তাঁর গানও নাকি হয়েছিলো প্রায় নাচের মতই নাম-করা। কানে আজও বাজে নাকি কারো সাধনার সেই গানের সুর। সে গান নাকি অনেককে টেনে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো রাণার দেশ রাজপুতনায়। যেখানে নীল আকাশের নীচে, সোনার মুকুট, লাল-শাড়ি, দিন কাটে তাঁরই বোন নীলিনার। নীলিনার মধু-গলা আজও যেন বহুদূর থেকে বাঁশীর মত ভেসে আসে। সাধনার গলায় সে ক'টা দিন বেজেছিলো নাকি নীলিনারই মধু-ছায়া।

আমরা শুনে' তাই হয়েছি সুখী।

নিউ থিয়েটার্স

কাজের প্রসারতার জন্যে নিউ থিয়েটার্স আর এক ইউনিটে কাজের ব্যবস্থা কোরছেন। চণ্ডী ঘোষ ও আনোয়ার সা ষ্টুডিওতে যেমনি কাজ চলছে—চলবে। এছাড়া এরা আপাততঃ ছ' মাসের জন্যে বড়ুয়া ষ্টুডিও ভাড়া নিয়েছেন এবং এখানে এদের তিন নম্বর ইউনিটের কাজ যথারীতি চলবে।

মহানিশা ফিল্মস্

এই শনিবার থেকে 'রূপবাণী'-তে এদের বহু আকাঙ্খিত "মহানিশা" মুক্তি পাবে। "মহানিশা"-র ট্রেলার দেখে আমরা ছবিখানার পরিচালনা ও অভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ আশ্বাম্বিত হ'য়েছি। কিন্তু ছবিখানার আলোক-চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজে সে আশা আমরা পোষণ কোরতে পারছি না। আমরা শুধু আশ্চর্য্য হ'চ্ছি শিশির মল্লিকের মত এমন একজন বহুদর্শী লোক কেমন কোরে বড়ুয়া ষ্টুডিওর যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর কোরে ছবি তুলতে সাহস পেলেন! যা' হ'ক ছবি সম্পূর্ণ না দেখে এর বেশী কোনও কথা আমরা আগে থেকে বলতে চাইনা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

এই ষ্টুডিওর মালিক মিঃ বি, এল, খেমকা কার্য্যব্যাপদেশে বোম্বাই, মাদ্রাজ ঘুরে এ হপ্তায়ই শেষে কোলকাতায় ফিরবেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নবম পরিচ্ছেদ।
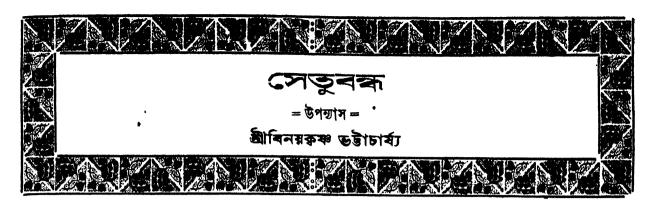
পরদিন সকাল বেলায় ইন্দ্রানী মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে এলো। রান্নাঘরের চৌকাটে দাঁড়িয়ে বল্লে: ভেতরে যাবো, দিদি?

—আয়না।

—এখনো যে বাসি কাপড় ছাড়িনি।

—নেকামো রাখ দিকি, একটু হেসে মৃণাল বল্লে: কোন্ দিন শুনবো যে তুই বায়ুগ্রস্ত হয়ে উঠেছিস।

—সে ভয় নেই। হাঁ দিদি, মিত্তির মশাইয়ের সঙ্গে কাল রাতে তোমার আবার কী হয়েছিলো? বলে ইন্দ্রানী মেঝের উপর বসলো।

—কী আবার হবে?

—কী যে হয়নি তাই বলো। মিত্তির-মশাই কাল রাতে আমায় জরুরী তলব পাঠিয়েছিলেন।

—ওমা এর মধ্যে তোকে এ-খবরটা জানানো হয়ে গেচে। ধন্যি লোক যা হোক। জেনে শুনে আমাকে আর জ্বালাস নি, ইন্দ্রানী।

—জানলুম আর কোথায়? যেটুকু জেনেচি সে তো এক তরফা, আর একটা দিক এখনো যে বাকী রয়েচে দিদি।

—আমার সঙ্গে তোর মিত্তিরমশাইয়ের কী হয়েচে না হয়েচে এটুকু জানবার জন্যে তোর এত আগ্রহ কিসের বলতো? একটু রেগে মৃণাল বল্লে: ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মত থাকবি। বুড়োটে কথা শুনলে গা যেন জ্বালা করে।

—জানলে তো কিছু ক্ষতি নেই দিদি। মিত্তিরমশাইকে বরং গুছিয়ে বলতে পারবো।

—তোকে দৈত্যগিরি করতে পাঠাবো ওঁর কাছে? এর চেয়ে যে ঢের সহজ সহজ পথ রয়েচে, ইন্দ্রানী। তোকে সাবধান করে দিচ্চি আমার কথায় তুই থাকিসনি।

কেন? মিত্তিরমশাইকে কেড়ে নেবো এই ভয় কচ্চো, বুঝি?

—বিশ্বাস নেই। আপনার জনই এই রকম করে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

ইন্দ্রানী আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মৃত্যুঞ্জয় দোতলার খোলা বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল। গত রাত্রিতে যে অশান্তির ঝড় মাথার উপর দিয়ে গেছে তার তীব্র অনুভূতি এখনও তার মন থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নি। সারা দেহে ও মনে বিচ্ছেদের বিদায় বাণী। ইন্দ্রানীর আসার প্রতীক্ষায় সে অধীর হয়ে উঠেছে।

মিত্তির মশাই আপনি এখানে? সারা বাড়ীটা আপনাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজচি। কি বিচ্ছিরি চেহারাই না আপনার হয়েচে। বিশ্বাস, না হয় আয়নাটায় একবার মুখ দেখে আসুন। সারা রাত বুঝি ঘুমোননি?

এই চেয়ারটায় বস, ইন্দ্রানী। এত দেরী হলো কেন? কোথায় বেরিয়েছিলে বুঝি?

না দিদির সঙ্গে কথা কইছিলুম।

মৃণালের কথা কাণে যেতেই মৃত্যুঞ্জয় কথাগুলো শোনবার জন্যে আগ্রহসহকারে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

ইন্দ্রানী চেয়ারে বসে মুখে হাসির রেখা টেনে মৃত্যুঞ্জয়ের আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে বল্লে: এমন কী হয়েচে, মিত্তির মশাই যে মুখ ভার করে বসে আছেন? আমার সামনে এরকম করে বসে থাকলে হঠাৎ যদি অপরিচিত কেউ দেখে ফেলে কী মনে করবে বলুনতো? মনে করবে—থাক আর বলবো না।

—সে ভয় নেই। এখানে কেউ আসবে না।

—স্বীকার করলুম আসবে না। তবুও কথাগুলো একটু আস্তে আস্তে বলুন। দেয়ালেরও কাণ আছে তাতো জানেন।

—জানি। কিন্তু চুপি চুপি কথা বলতে যে শিখিনি ইন্দ্রানী। আর তা ছাড়া, আজ মনের অবস্থা যেরকম—

ইন্দ্রানী মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নিরুদ্বেগকণ্ঠে বল্লে: এই মন নিয়েই তো আদান-প্রদান, যত কিছু অশান্তির সৃষ্টি। কালকের ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে অত বড় কোরে ভাববার কী আছে? এরকম অশান্তি যদি মনে পুষে রাখেন, যে আপনার সঙ্গে ঘর করবে তার প্রাণ যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, মন উঠবে বিতৃষ্ণার পাকে ঘুলিয়ে।

তুমি আমাকে আর ছুঁয়োনা, ইন্দ্রানী।

মনটাকে কিছুতেই প্রবোধ মানাতে পারচিনি। মৃণাল তোমাকে কী বলচে, বলতো?

যা শুনলুম আপনারই তো দোষ ষোল আনা, মিত্তিরমশাই।

—রাগ পড়ে গেচে।

—না, এখন ঘাটালে উলটো উৎপত্তি হবে।

—চেষ্টা করে দেখছিলে নাকী?

—আপনার বিবেচনা শক্তি কারুর চেয়ে কম নেই। একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন।

—বিবেচনা-শক্তি আমার আদৌ আছে কীনা সেইটেই এখন ঘোর সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েচে।

—সন্দেহের কথা আপাততঃ স্থগিত রাখুন, দিদি কি বলেচেন, জানেন?

না।

আপনি কর্ম্মপ্রেরণা নিয়ে জন্মেচেন। আপনার বুদ্ধি-বৃত্তি সেই জাতের—যার তীক্ষ্ণ ধারের কাছে দিদির সাধারণ বিচার-বুদ্ধি ম্লান হয়ে যায়। আপনার হৃদয় এতো উদার, তার পরিধি এতো প্রশস্ত যেখানে দিদি নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজের স্বাতন্ত্র্য যায় মিলিয়ে। একথা কি স্বীকার করেন, মিত্তিরমশাই?

মানতে রাজী নই, ইন্দ্রানী। চিরকাল কি আমি এরকম দুর্বোধ্য ছিলুম?

না, প্রথম জীবনে দিদি আপনার মনের অন্দরে পেয়েছিল সহজ প্রবেশাধিকার। তখন আপনার ভালবাসাটা ছিল অনাবিল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, মিত্তিরমশাই, একটা কথা? দিদিকে এখনো কি আপনি ভালবাসেন?

সত্যিই ভালবাসি।

মিথ্যে কথা। এক সময়ে হয়তো দিদিকে ভালবাসতেন। এখন সেই ধারণাটাই আপনার অন্তরের সমস্ত অনুভূতিগুলিকে অকর্ম্মণ্য করে দিয়েচে।

অধৈর্য্য হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বল্লে: আমাকে এরকম করে অপমান করার মানে কি বলতে পারো ইন্দ্রানী? কাল রাতে কী বলেছিল স্মরণ আছে?

হঁ্যা।

উপযাচক হয়ে সাহায্য চেয়েছিলুম তাই উচিত শিক্ষাই দিচো। ব্যাপারটা কচলে কচলে তেতো করে তুলচো যে।

আপনাকে শিক্ষা দেবো আমি? এ-ধৃষ্টতা কোত্থেকে আমার এলো বলুনতো? পরামর্শ চেয়েছিলেন, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বুঝেছি তাই জানিয়েছি। তবুও নিজের বুদ্ধি জাহির করে রাতে দিদির সঙ্গে কী কাণ্ডটাই না করেচেন।

কাজটা কি খুব অন্যায় হয়েচে?

একশোবার। সাতের মধ্যে অশান্তিটাকে আরো খুঁচিয়ে বাড়িয়েচেন। এখনও যদি আমার কথা শোনেন—

কী বলচো বল, ইন্দ্রানী। এখন থেকে তোমার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। এতটুকু দ্বিধাবোধ করবো না।

আপনাকে বিশ্বাস কী করে করি বলুন তো? আপনি বলেন এক, করেন আর এক। দিদির সঙ্গে ঝগড়া হলে আপনি আলাদা মানুষ হয়ে দাঁড়ান।

আর একবার না হয় বিশ্বাস করেই দেখো। তোমার দিদিকে লক্ষ্ণৌ থেকে শিগগির ফিরিয়ে আনবার ভার তোমার উপর রইলো, ইন্দ্রানী।

কথাটা নেহাত ছেলেমানুষের মত বললেন। গত কয়েক বছর ধরে যে-অশান্তিটা ধূইঁয়ে ধূইঁয়ে উঠেচে তাকে আপনি একদিনেই নষ্ট করতে চান নাকী? সময় লাগবে না? এক' বছর ধরে চৌদিকে আপনি অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেচেন।

আমার তো তা স্মরণ হয় না।

এরকম ভোতা স্মরণ-শক্তি নিয়ে কি কাজ করা চলে, মিত্তিরমশাই। দিদির আপনি কোন সাধই মেটাননি। আপনাকে পেয়েও পায়নি।

কিন্তু এ-দায় থেকে আমাকে উদ্ধার করতে হবে তোমায় ইন্দ্রানী।

পরের বোঝা ব'য়ে বেড়াবার মত স্বচ্ছল সময় আমার নেই, মিত্তির মশাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

সাতদিন হতে চল্লো দিলীপকে নিয়ে মৃণাল লক্ষ্ণৌয়ে চলে গেছে। মৃণাল নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের কাজ করবার একাগ্রতাও কমে এসেছে। মৃণালের উপস্থিতি এ্যাদ্দিন তাকে কাজ করবার অপরিসীম উৎসাহ অলক্ষিতে জুগিয়ে এসেছে এইটেই মৃত্যুঞ্জয় আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। মৃণাল নেই—চারিদিকে ব্যর্থতার তীব্র দাহন, প্রতি পদে অক্ষমতার সুস্পষ্ট পরিচয়, উৎসাহের উৎস শুকিয়ে গিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। দিলীপের অনুপস্থিতি তাকে কম পীড়া দিচ্ছে না, সময়ে অসময়ে খেলাধূলার ফাঁকে দিলীপ তাকে কি বিরক্তিটাই না করতো। এ-বিরক্তির মধ্যে সে দেখেছিল অনাবিল আনন্দের দিব্য ব্যঞ্জনা। আজ দিলীপ নেই। কে তাকে বিরক্ত করবে, কে তার মরুময় জীবনে একটু আনন্দবারি সেচন করবে? না মৃত্যুঞ্জয় এরকম নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে পারবে না। লোক পাঠিয়ে দিলীপকে অন্ততঃ নিয়ে আসবে। মৃণাল যখন জেদের বশে চলে গেছে, যদ্দিন না সে স্বেচ্ছায় ফিরে আসে কিছুতেই মৃত্যুঞ্জয় তাকে আসতে বলবে না।

—রাতে শুয়ে দিলীপ শুধোয়: বাবা, কবে আসবে, মা?

—কালকে।

—কাল আসবে, কাল আসবে বলে তুমি রোজ আমায় ভুলিয়ে রাখ, মা।

—দেখিস খোকন, কাল নিশ্চয় আসবেন।

—বাবা, তোমায় বুঝি চিঠি দিয়েচে? কই দেখি? আমার কথা কিছু লেখেনি?

—দুষ্টুমি করিস-নে খোকন, ঘুমো।

—চিঠিটা কোথায় রেখেচো, মা?

—হারিয়ে গেচে।

—কোথায় ফেলেচো, বলনা, খুঁজে দেখি।

—কোথায় খুঁজবি রে, সে কি আমি জানি।

—এখানে এসে পর্য্যন্ত তুমিতো কোথাও যাওনা, মা, চিঠি নিশ্চয় বাড়ীর মধ্যে আছে। তুমি বুঝি বাবাকে চিঠি লেখোনি?

মৃণাল একথার কোন জবাব খুঁজে পেলে না। অজানা আশঙ্কায় চুপ করে রইলো। এর পর দিলীপ তাকে কি প্রশ্ন করবে তা সে বুঝতে পারলে না।

—ওঃ, বুঝেচি বাবা তোমাকে চিঠিই দেয়নি।

—কেমন করে জানলি, খোকন?

—বাঃ, আমি যে রোজ ডাকপিওনকে জিজ্ঞেস করি। সে আমায় কখ্‌খনো মিছে কথা বলবেনা, বাবার চিঠি থাকলে নিশ্চয় সে আমাকে দিতো।

—তুই কি ইংরেজি পড়তে জানিস, খোকন? কোন সময় ডাকপিওন চিঠি দিয়ে গেচে সে অতো খেয়াল করিসনি?

—আমি তো বরং একটু একটু জানি। তুমিতো কিছুই জানোনা, মা। প্রথম যখন ইংরিজি পড়তে আরম্ভ করি তোমার কাছে পড়া জিজ্ঞেস করলেই বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতে—মনে নেই? খাম দেখলেই বুঝতে পারতুম।

—কী করে রে?

—খামের ওপর বাবার নাম যে ছাপা আছে। সেটুকু আমি যে জানি। কালকের দিনটা দেখবো, মা। বাবা যদি না আসে পরশু আমি নিশ্চয় চলে যাবো। এখানে আমার থাকতে ভালো লাগচেনা।

—পথ-ঘাট তুই কি সব চিনিস খোকন? কেমন করে যাবি বলতো?

—খুব চিনি মা। রেলে আসতে আসতে আমি যে সব দেখে এসেচি। আমি বুঝি একা যেতে পারিনা, মা? কেমন করে যাবো, শুনবে?

—বল দিকি, শুনি।

এখান থেকে একটা গাড়ী করে ইষ্টিসানে গিয়ে সেই যে বড় ঘরটা আছে সেখান থেকে একখানা টিকিট কিনবো। তারপর ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলে গাড়ীতে চেপে বসবো।

—তোকে যদি টিকিট না দেয়।

—তুমি কিছু জানোনা, মা, পয়সা দিলেই তারা টিকিট দেয়।

—গাড়ী ভুল হতেও তো পারে।

—বাঃ, জিজ্ঞেস করে চড়বোনা, বুঝি।

—বাবা যদি তোর সঙ্গে কথা না কয়।

—বাবার গলা জড়িয়ে বলবো: আমার কথা তুমি একদম ভুলে গেচো, বাবা। তোমাকে আমি নিতে এসেচি, মার কাছে যাবে, চলো।

মৃণালের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। রুদ্ধ আবেগে দিলীপকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লে: আর জ্বালাতন করিসনে, খোকন। রাত অনেক হয়ে গেচে, ঘুমো, বলে দিলীপের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

মানুষ যখন তার অতি প্রিয়জনকে চোখের আড়াল হতে দেখে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় সময় কাটানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে। নিকটে যাকে পায় তাকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে হাত বাড়ায়। মৃত্যুঞ্জয়েরও ঠিক সেই অবস্থা—এখন সে এমন একটি সঙ্গীর সাহচর্য্য কামনা করে যে তার ব্যথিত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেবে। ইন্দ্রানীই হচ্ছে তার নিমজ্জমান জীবনের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল।

সেদিন ইন্দ্রানী কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল মৃত্যুঞ্জয় মৃণালকে সবচেয়ে আঘাত করেছিলো কোন্ জায়গায়। সত্যিই তো কাজের ভিড়িকে মৃণালের দিকে তাকাবার এতটুকু অবসর ছিলনা।

ইন্দ্রানী প্রায় রোজই একবার মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে আসে। ইন্দ্রানীর কথা মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে এখন বেদবাক্য। এই সেদিন ইন্দ্রানীকে সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একটা "পনি" কিনে লক্ষ্ণৌয়ে দিলীপের কাছে পাঠিয়ে দিয়েচে—তার জন্মতিথির সস্নেহ উপহার বলে। ইন্দ্রানীর কথামত আজকাল সে যে-কোন সামাজিক উৎসবে যোগদান করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনা। মোটকথা, মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন-মরণ এখন ইন্দ্রানীর হাতে। নিজের স্বাতন্ত্র্য সে নষ্ট করে ফেলেছে। ইন্দ্রানী এখন তার ভালমন্দ সবই।

মৃত্যুঞ্জয় আগে কোন খেলাই জানতো না। এখন কাজ করবার একাগ্রতা শিথিল হয়ে আসায় সে খেলাধূলোয় মন দিলে। মাস তিনেকের মধ্যে সে ব্রিজ খেলায় এমন পাকা হয়ে উঠলো যে কেউ তাকে হারাতে পারে না।

—টেবিলের উপর ঝুঁকে, মাথায় হাত দিয়ে অত মন দিয়ে কী লিখচেন, মিত্তির মশাই? দিদিকে বুঝি চিঠি দিচ্ছেন?

—দূর তা কেন?

—তবে?

—সময় কাটতে চাইছিল না তাই কাগজের উপর হিজিবিজি কাটছিলুম।

—কদিন না আপনাকে বলেচি যে সময় পেলেই দিদিকে এক আধখানা চিঠি দেবেন।

—চেষ্টার ত্রুটি করি নি, ইন্দ্রানী। ও জিনিবটা আমার আসে না। কথা বলার উপর ট্যাক্স নেই তাই পার পেয়ে গেলে। যাকে ও কাজটা করতে হয় তার যে প্রাণটা হাঁফিয়ে ওঠে।

দিদিকে আজ একখানা চিঠি লিখুন, মিত্তির মশাই, আমি বাড়ী থেকে একবার চট্ করে ঘুরে আসি।

ইন্দ্রানীর কথার কোন জবাব না দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় চিঠি লিখতে বসলো। কিন্তু একটা লাইনও লিখতে পারলে না। কে যেন হাতের উপর একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। একখানা সাদা কাগজের উপর ফাউনটেন পেনের সরু নিবের মুখটা ছুইয়ে রেখে মৃত্যুঞ্জয় আকাশ পাতাল চিন্তা করছে।

প্রথমে কী বলে সম্ভাষণ জানাবে এইটুকু ভাবতেই মৃত্যুঞ্জয় ঘেমে নেয়ে উঠলো। কবে কোন্ যুগে দাম্পত্য-জীবনের প্রথম অধ্যায়ে সে মৃণালকে চিঠি লিখেছিল, তাও অতি কষ্টে। তাই আজ নতুন করে চিঠি লেখবার প্রেরণা সঞ্চয় করা তার পক্ষে দুসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইন্দ্রানীর আদেশ কী করে সে উপেক্ষা করবে? এক একটি করে কথা সে লেখে আবার সেটাকে কেটে দিয়ে আর একটি কথা বসাবার জন্তে সময় নেয়। যৌবনের প্রারম্ভে মৃণালের যে বালিকাসুলভ চপলতা, আনন্দপ্লুত চোখের মদির চাউনি সে দেখেছিল সেগুলোকে আর একবার কল্পনার চোখে ছবি আঁকবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। কিন্তু কাজের পেছনে দিনরাত ব্যয় করার ফলে স্মৃতির তীক্ষ্ণ ধার ভোঁতা হয়ে গেছে। না, মৃত্যুঞ্জয় অবাস্তর কল্পনার পেছনে আর বৃথা সময় নষ্ট করবে না। যা মনে আসছে তাই সে কলমের সাহায্যে রূপ দেবে।

মৃত্যুঞ্জয় আপন মনেই চিঠি লিখে যাচ্ছে এমন সময় ইন্দ্রানী ঘরে এসে ঢুকলো। পদধ্বনি কাণে যেতেই সে চেয়ে দেখলে ইন্দ্রানী তার সামনে দাঁড়িয়ে। ইন্দ্রানীর চোখের কোণে চাপা হাসির স্পষ্ট ছবি দেখতে পেয়ে সে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কোন রকমে তাড়াতাড়ি করে সে চিঠিটা শেষ করে নিয়ে এলো।

—এক কাপ চা দেবো মিত্তির মশাই? আপনাকে বড় ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে।

—দরকার নেই, ইন্দ্রানী। চিঠি লেখা আমার সামর্থের বাইরে বলে মৃত্যুঞ্জয় লেখা চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললে।

—ও কী করলেন? চিঠিটা ছিঁড়তে গেলেন কেন? আবার কষ্ট করে লিখুন, তা না হলে নিস্কৃতি পাবেন না।

—তোমার কথামত মৃণালকে না হয় ফিরিয়ে আনলুম। তারপর সংসারে যদি অশান্তি দেখা দেয় তখন তুমি কী দিয়ে ঠেকাবে বল তো?

—বাঃ, আপনিতো খুব মজার লোক দেখছি, মিত্তির মশাই। নিজের ক্ষমতা কতটুকু তাই-ই আপনি জানেন না। এ-লজ্জা আপনি কোথায় লুকিয়ে রাখবেন, বলুন তো?

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যার সমাধানঃ—বিগত ২৭শে চৈত্রের "খেয়ালী"তে ব্রীজ খেলার যে সমস্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল তার সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হল। হাবড়া রামকৃষ্ণপুর থেকে শ্রীবিমল কুমার বোস ও শ্রীজহরলাল পাল যে উত্তর পাঠিয়েছেন তা' যে বিসদৃশ নিম্নলিখিত সমাধান থেকেই তাঁরা তা বুঝতে পারবেন।

ইস্কাবন—নাই।
হরতন—গোলাম, পাঞ্জা, চৌকা।
রুহিতন—বিবি।
চিড়িতন—বিবি, দশ, নয়, আটা।

ইস্কাবন—দশ।
হরতন—সাহেব, বিবি।
রুহিতন—দশ, আটা, তিরি।
চিড়িতন—গোলাম, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—নয়, আটা।
হরতন—নয়, সাতা, ছক্কা, তিরি।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—সাতা, ছক্কা।

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি।
হরতন—টেক্কা, দশ, আটা।
রুহিতন—সাতা, ছক্কা।
চিড়িতন—টেক্কা।

হরতন রঙ, 'দ' খেলবেন। প্রতিপক্ষের সকল বাধা সত্ত্বেও 'উ' এবং 'দ'কে সাতখানি পিট পেতে হবে।

প্রথমে 'দ' চিঁড়ের টেক্কা খেলে পিট নিয়ে ইস্কাবনের সাহেব খেললেন। 'উ' রঙ তুরূপ করে পিট নিয়ে চিঁড়ের বিবিখানি খেললেন। 'দ' এ পিটে রুহিতনের ছক্কা পাশালেন। অতঃপর 'উ' রঙের পাঞ্জা খেললেন এবং 'দ' টেক্কা মেরে পিটখানি ধরলেন। তৎপরে 'দ' ইস্কাবনের বিবি পেড়ে খেলায় 'উ' রুহিতন পাশিয়ে গেলেন। এখন ইস্কাবনের বিবির উপর 'প' তুরূপ করুন আর নাই করুন 'দ' পক্ষের খেলা অবশ্যম্ভাবী।

ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনঃ—গত ১৫ই এপ্রিল বুধবার "এসপ্ল্যানেড ইনষ্টিটিউটে" ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের ১৯৩৫-৩৬ সনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির শেষ অধিবেশন হয়ে গিয়েছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। 'সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এসোসিয়েশনের নূতন নিয়মাবলী সংগঠন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন এই সভায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনেও তাঁদের দেখা মেলে নি। সমিতির সভ্য হবার জন্য এই সকল ব্যক্তির যাদৃশ উৎসাহ ও উদ্যম গত নয় মাস পূর্ব্বে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল, তাঁদের সেই উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টা এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে নির্ব্বাণপ্রায় হ'ল তা' সাধারণের বুদ্ধির অতীত। দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্রতী হবার পূর্ব্বে নিজেদের ক্ষমতা, অধ্যবসায় ও সময়ের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রেখেই কার্য্যে অবতরণ করা বিধেয়, নতুবা শুধু সমিতির সভ্য হ'য়ে নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ অনুভব করাই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না হওয়াই সমীচীন। নির্ব্বাচনের সময় নিজেদের শক্তি ও সময়ের অভাব জ্ঞাপন করে যোগ্যতর ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করলেই যে এসোসিয়েশনের প্রকৃত কল্যাণ সাধন হয়, ইহা কি এই সকল সভ্যবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে? জানি না আবার হয়তো তাঁরা আগামী নির্ব্বাচনের সময় বন্ধুদের অনুরোধে বা উপরোধে সভ্য হচ্ছি, এই অজুহাতে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদের প্রার্থী হবেন। ব্রীজ এসোসিয়েশনের জন্মমাত্র অল্পদিন হয়েছে বলেই আমাদের বক্তব্য এই যে, উপযুক্ত রক্ষকের তত্ত্বাবধান ব্যতীত ইহার জীবন ফলময় হতে পারে না। বৎসরের প্রথমে যে ঔদাসীন্য

পরিলক্ষিত হল ইহারই পুনরাবৃত্তি যদি ভবিষ্যতে হতে থাকে তা' হলে এসোসিয়েশনের জীবনকাল কতদিন সমূহ চিন্তার বিষয়। ব্যক্তি বিশেষের তৃপ্তিবিধান বা গৌরব রক্ষণ করতে গিয়ে যদি যথার্থ কর্ম্মী নির্ব্বাচন না করা হয়, তা' হলে ইষ্টফলের সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। সুতরাং উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগ সর্ব্বক্ষেত্রে একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করি আগামী নির্ব্বাচনের সময় সাধারণ সভ্যাবৃন্দ বিশেষভাবে এ কথা স্মরণ রাখবেন। যা' হোক সভায় নিয়মাবলী সংগঠনের পর আলোচ্য বর্ষের সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুকুমার বোসের অনুমোদনে এসোসিয়েশনের বিদায়ী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যতীশ বসুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এসোসিয়েশনের প্রারম্ভ থেকেই যে যতীশ বাবু ধীর মতিতে এসোসিয়েশনের কার্য্য যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে এসেছেন, তার যোগ্য প্রশংসা করে এসোসিয়েশন যতীশ বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা:—'ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনে'র সাধারণ সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন গত ২৬শে এপ্রিল না হয়ে, ১০ই মে রবিবার সাড়ে তিন ঘটিকায় ল্যান্সডাউন রোডে 'পদ্মপুকুর ইন্‌ষ্টিটিউটে' হবে বলে ধার্য্য হয়েছে।

তাসের জন্ম:—কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রীজের জন্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলেছিলুম, এবারে তাসের জন্ম সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। তাসের জন্ম কবে কোথায় হল ক'জনই বা জানেন, আর জানতে কারই বা আগ্রহ নেই? তাসের জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে। ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস নাকি খুব করুণভাবাপন্ন রাজা ছিলেন;—আর তাঁর মনে ছিল ব্যথার পাথার। সুতরাং তাঁর আনন্দবর্দ্ধনের জন্যেই নাকি জনৈক সৃষ্টিকর্ত্তা ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে খেলার তাস তৈরী করেন। তাঁর রাজ্যের প্রজাবর্গের মধ্য থেকে চার শ্রেণীর লোক নিয়ে চার রঙের তাস তৈরী হয়,—এক একটি রঙ এক এক শ্রেণীর প্রতীক। হৃদয় নিয়ে ধর্ম্মযাজকদের (clergymen) কারবার,—তাঁদের কাজ হচ্ছে কি করে জনসাধারণের হৃদয় উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। সুতরাং হরতন বা "heart" হচ্ছে এই ধর্ম্মযাজকদের প্রতীক। এই তাসগুলি ফরাসীদের আচার-ব্যবহার অনুযায়ী তৈরী হওয়ায় তদানীন্তন স্পেনবাসীরা হরতন রঙের তাসের চিহ্ন থেকে "heart"-এর পরিবর্ত্তে হাতলবিহীন সুরাধার (chalice) ব্যবহার করেন। তখনকার যুগে ফ্রান্সে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ বর্শা ব্যবহার করিতেন সুতরাং কতকগুলি তাসে বর্শার শীর্ষ অঙ্কিত থাকত। এই তাসগুলি উচ্চশ্রেণী ও সামরিক ব্যক্তিগণের মূর্ত্তি স্বরূপ। পরে অজ্ঞানতা-বশতঃ এ্যাংলো সেক্সনীয়েরা বর্শার শীর্ষ অঙ্কিত তাসগুলিকে "Spade" নামে অভিহিত করেন। নগরবাসী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী রূপ লাভ করে রুহিতনে বা "Diamond"-এ। ইহার সহিত হীরক বা কোন মূল্যবান প্রস্তরের কোনই সম্বন্ধ নাই। চতুষ্কোণ প্রস্তরের টালি দিয়ে তখনকার যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহ নির্ম্মিত হ'ত, সে জন্যেই কতকগুলি তাসের উপরিভাগে লোহিত বর্ণের চতুষ্কোণ অঙ্কিত থাকত! যে তাসগুলিকে আমরা চিড়ে বা "Club" নামে অভিহিত করি সেগুলি প্রথমে লবঙ্গের পাতা থেকে গৃহীত হয়েছিল। বলা বাহুল্য উহা কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর প্রতীক। স্পেনবাসীরা চিড়িতন তাসে ফরাসীদের লবঙ্গ পাতার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ-মুদ্গার দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীতে মূর্ত্তি দিয়ে চিড়িতন বা "Club" তৈরী করেছিলেন। এ জন্যেই এখনো আমরা এই রঙকে "Club"ই বলে থাকি।

অভিনয়

শ্রীসুধীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দু'ধারে রজনীগন্ধার ঝাড়, মাঝে একটা শ্বেতপাথরের বেদি, তারই নীচে শ্বেতপাথরের তৈরী একটা কৃত্রিম হ্রদ, তার ধারে ধারে গন্ধরাজের সারি, মাঝখানে একটা ঝরণা—নিরাবরণা গ্রীকপ্রতিমার গা বেয়ে বেয়ে উচ্ছল ধারায় ফেটে পড়ছে রূপের নৃত্যে; রসের উৎস-সন্ধানে দু'টি হংসমিথুন—অবশ্য এরাও কৃত্রিম, পাথরের তৈরী। মাঝে মাঝে শেলি এসে বসে এই বেদির ওপর, ছবি আঁকে, গান গায়, বই পড়ে: কখনো কখনো এই তরুণীর কোল ঘেসে একটি তরুণকেও দেখা যায়: সেও নাকি রূপ, রস, আর গন্ধের পূজারী।

সন্ধ্যা হোয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শেলি বাগানটার ভেতর পায়চারি ক'রছে, আশে পাশের ফুলগুলো থেকে কখনো দু'একটা তুলছেও, কখনো কখনো গুনগুনিয়ে গান গায়; দখিনের মৃদুল হাওয়া সুরের রেশ বয়ে আনে, চোখ বুজে সতু শোনে, প্রাণে চলে স্বপ্নের জাল বোনা।...শেলিএসে বসল বেদির পাশে, সতু চোখ মেলে চাইলে। পাঁতলা পাতলা ঠোঁট দুটোর পাশে ফিকে একটু দুষ্টুমির হাসি খেলে যায়, শেলি বলে,—ওকি! লোভীর মত তাকাচ্ছ যে? সতুও হাসে, হাতের রঙীন বইখানা দেখিয়ে লোভ দেখায়, শেলির কৌতুহল জাগে।

"কি বই?" অন্যমনস্কের মত সতু মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে, শেলি একটু এগিয়ে এসে বলে, ইস্! অগত্যা শেলি গম্ভীর হবার ভাণ করে, অন্যমনস্কের হাত থেকে বইখানা খসে পড়ে সবুজ ঘাসের উপর; নিস্পৃহের মত বসে থাকতে থাকতে কখন যে শেলি বইখানা তুলে নিয়েছে—অন্যমনস্কের অভিনেতা সতু যেন তা টেরই পায়নি। শেলি বইখানা সতুর কোলে ছুঁড়ে দিয়ে হি হি করে হেসে ওঠে।

" 'Don Juan' ছোঃ"

"মানে"

"মানে আবার কি, ওসব ছেলেবেলাতেই পড়েছি"

"বলুন দেখি দু' একটা লাইন!" সতুর চোখের দৃষ্টি বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে ওঠা-নামা করে, শেলি আবিষ্ট কণ্ঠে বলে যায়—

"A long, long kiss, a kiss of youth
and love,
And beauty all concentrating like
rays,
Into one focus, kindled from above,
Such kisses as belong to early days,
Where heart, and soul, and sense
in concert move,
And the blood's lava, and the
pulse ablaze,
Each kiss a heart-quake, for a
kiss's strength,
I think it must be reckoned by
its length."

"চমৎকার"।

শেলি হাসে। সতুর হাতের ভেতর শেলির হাতখানা একগোছা নরম ফুলের মত. চেয়ে চেয়ে সতু তাই দেখে. একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সতু। চোখে পলক পড়ে না, অমনি নিষ্পলকে আবার শেলির মুখের দিকে চায়: চোখের বোবা ভাষায় সতু যেন কি বলে। ফিক্ ক'রে একটু হেসে শেলি হাত ছাড়িয়ে নেয়, বলে—ছিঃ, প্রথম অঙ্কে এ সব বড্ড থার্ড ক্লাস্। সতু একটু থতমত খেয়ে বলে, অভিনয় করছ নাকি? শেলি কোন কথা কয়না, নীচের ঠোঁটটা দাঁতে চেপে শুধু হাসে। সতু চটে যায়, বলে, অর্থ! ঐসব রঙীন চিঠি, মন্দির-ছাউনি; সেদিনের সেই বিষাদের সুরমাখা গান, আজ্‌কের এ আবিষ্ট-উচ্ছল আবৃত্তি! কেন আমায় অমন ক'রে ডাক'? শেলি তেমনি হাসে, যেন ও সব কিছুকেই অভিনয় বলে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে আসে যেন সে সত্যিই অপ্রকৃতিস্থ।

অনেকদিন হোয়ে গেল সতু আর আসে নি। ক্ষণে অক্ষণে শেলির মনে পড়ে বায়রণের ঐ ভক্তটিকে, তার হাসি পায়, ভাবে—কি বোকা এই ছেলেগুলো।

বাইরে থেকে সরোজের গলা শোনা গেল; তাড়াতাড়ি শেলি ড্রেসিং টেবিলটার কাছে যেয়ে চেহারাটা একটু পরখ ক'রে দেখ্‌লে, ঘামে যেখানকার রং চটে গেছে সেখানে একটু ফিনিসিং টাচ্ দিয়ে নিলে। সরোজ সেই ঘরেই এসে উপস্থিত: তার ভাগ্য ভাল যে শেলির তখন make-up হোয়ে গেছে।

"কি, প্রসাধন হোল?"

"কেন বলুন ত?"

"এগ্‌জিবিসনে তোমায় নিয়ে যাব ভাবছিলাম"

"বেশ ত' মাকে বলুন"

"রোজ যেন আমিই বলি"

লিলুয়া চাকরটা এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। শেলি একটু বিস্মিত হোয়ে আবার সামলে নিল পরক্ষণেই: সরোজকে ব'ললে,—বসুন একটু, আমি আসছি। সরোজ কি যেন ব'লতে গেল কিন্তু তার পূর্ব্বেই সে ঘর থেকে চলে গেছে।

চিঠি লিখেছে সতু; মাত্র দু'লাইন, বায়োস্কোপে যাবার আমন্ত্রণ, সঙ্গে একখানা টিকিটও পাঠিয়েছে। শেলি ক্ষণেক ভাবলে, অদ্ভুত লোক ত', কি দরকার ছিল টিকিট পাঠানর! নিজে এসে······না, সেদিনের সে অপমান সে আজও ভুলতে পারে নি, বড় ভীরু, বড় লাজুক ঐ সতু।

সরোজ যেয়ে ব'ললে শেলির মায়ের কাছে, শেলিকে প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবে। মা ব'ল্‌লেন, আজ ত' হয়না বাবা, ওর সই নমিতা বায়োস্কোপের টিকিট্ পাঠিয়ে দিয়েছে, ওখানেই বুঝি ও যাবে, দেখ তোমরা।

সরোজ শেলির কাছে এসে নিরুৎসাহে ব'ললে, কি তাহ'লে বায়োস্কোপেই যাচ্ছ, first show? একটু হেসে শেলি ব'ললে, হ্যাঁ, যাচ্ছি, তা মুখ কালো ক'রছেন কেন? সরোজ কথা কয়না, বিষাদের ছায়া আরও ঘনীভূত হ'য়ে আসে; শেলি বলে, প্রদর্শনীতে যেয়ে একটা কিছু আমার পছন্দসই আমাকেই প্রেজেণ্ট্ দেবেন এই ত'! তা আপনার পছন্দর বাইরে কি আর আমার পছন্দ। সরোজ হেসে ফেলে বলে, এত দুষ্টু হোয়েছ শেলি······!

লিলুয়া চা আর খাবার দিয়ে চলে গেল; শেলি ব'ললে, নিন, বিচার পরে হবে।

"তা বেশ, তুমি একটা গান গাও, ঐ সুরটা মনে রেখে চলে যাব, এতদূর থেকে এলাম"

শেলি চোখ দু'টোকে নাচিয়ে বলে "সুর বেশী মনে রাখা ভাল নয়, ওতে বিপদ ঘটে"। সরোজ কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে, বিপদের কিছুই যে সে খুঁজে পায়না।

তাড়াতাড়ি তৈরী হোয়ে শেলি বেরিয়ে পড়ল, মনে মনে ভাবছে—কি বলবে সে সতুকে, সেই দুর্ব্ব্যবহারের পর থেকে অনেকগুলো চিঠিই ত' লিখেছে শেলি, কিন্তু কৈ উত্তর, ত' আসেনি! বোকা; ভেবেছে এও বুঝি অভিনয়। শেলির আজ আদর ক'রতে ইচ্ছে ক'রেছে; বড় ছেলেমানুষ সতু, অতশত বোঝে না: কবিতা লিখে কি ক'রে!

একি! এই সিট্ ত'! কিন্তু সতু কৈ!

Interval হোয়ে গেল তবু সতুর দেখা নেই, কি রকম মানুষ! এমন হ্যারাস্ করার অর্থ! প্রতিশোধ? না, কবির খেয়াল! শেলি আর অপেক্ষা ক'রতে পারলেনা, একটা ট্যাক্সী ডেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেল।

"কিরে এত শিগ্‌গির এলি যে?"

"শরীরটা ভাল লাগল না, তাই"—

ব্যস্ত হ'য়ে মা ব'ল্‌লেন, ঐ মাথাধরাটা বুঝি·········। "হ্যাঁ।"

"কিছু খাবিনে বুঝি, আচ্ছা ঘুমো: ওরে সন্ধ্যের পর সতু এসে একটা বই রেখে গেছে ওখানে।" "আচ্ছা"—শেলি দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতেই ঠক্ ক'রে একখানা চিঠি পড়ল পায়ের কাছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে শেলি পড়তে লাগল,—

গান দিয়ে অমন ক'রে তুমি কাকে ডাকছিলে। আকাশে জলছিল মিলনকালের লাল আলো,—সে আলোর রং লেগেছিল আমার মনে। তোমার আঙিনা থেকে ফিরে এলাম, রূপদেবতার দেউল তোমার তখন নিঃসঙ্গতায় ভরা,—সেখানে হয়ত কেউ ছিল না রক্তমাংসের শরীরী, ছিলে তুমি আর তোমার কল্পলোকের চিরসুন্দর দেবতা। গান দিয়ে তুমি তার অর্চনা ক'রছিলে, রূপ দিয়ে সাজাচ্ছিলে নৈবেদ্য; তার নাম কি জানিনে, অবুঝলোকে তাকেই বলে ভালবাসা আর কবিরা বলেন প্রেম।

রূপদেউলের পূজারিণী,—আমার অনাহূত আগমনের কথা হয়ত ক'রতে না, তাই চলে এলাম। যুগযুগান্তেও যে কথা পুরোন হয় না সে প্রেমের মন্ত্রে তুমি আমার অন্তরকে ভুলিয়ে দিলে; হোক্ সে অভিনয়, হোক্ সে অবান্তর, যুক্তি দিয়ে তা আমি যাচাই করিনে।...............

রূপ দিয়ে গন্ধ দিয়ে যার আরতী, অমন সর্বভোলা সঙ্গীতে যার অর্চনা,—জান, তুমিও জান, আমিও জানি—যে দেবতা ঐ গানের তালে চরণ ফেলে আসেন, যার আসাটাকে প্রাণ মন দিয়ে তুমি চাও, সে আর যেই হোক্, আমি নই।

............নারী আমি অনেক দেখেছি, কেউ আষাঢ়ের গুমটো মেঘ—মুখ ফুটে কথা বলে না, শুধু অবিশ্রান্ত বর্ষণ, তাদের চোখে জল দেখ্‌লে আমার চোখেও জল আসে। ঐ অশ্রুমুখীর মেঘমালার পাশে আর একজনাকে আমার মনে পড়ে যাকে লোকে বলে চপলা; সত্যিই সে বড় চঞ্চল,—ঐ টুকুই ওর বৈশিষ্ট্য। আলেয়ার মত শুধু চোখে ধাঁধা লাগায় না—হেঁয়ালীর মত মনেরও সে ধাঁধা।

চিঠিটা শেলি আবার পড়লে, কিছুই সে ঠিক ক'রতে পারলে না, শুধু একটা ক্ষোভ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়; বড় অন্যায়; বড় অবিচার সে ক'রেছে। অভিনয়ই সে ক'রে গেছে চিরদিন: সতুর মত কত কিশোর কত শিশুপ্রাণের প্রতি তাচ্ছিল্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সে চলে গেছে। নানা লোকের নানা রকমের মুখের ভীড় ঠেলে একটি বিবর্ণ কচি মুখ, সতুর সেই ভীরু চোখের দৃষ্টিই শেলির বেশী ক'রে মনে পড়ে। সেদিনের পর থেকে সে আসেনি সত্যি, কিন্তু সেদিন থেকেই ছায়ার মত মনের অলি-গলিতে সে ঘুরে বেড়ায়। সেদিনের সেই দুর্ব্ব্যবহারের কথা মনে পড়ে দুঃখ হয় শেলির, মনে মনে বলে, না, আর তাকে ফেরাবে না।

একটা চিঠি লিখে শুয়ে পড়ল।

সেই পুরোন দিনের হাজারো রকমের—স্মৃতি ঘেরা বেদি, তারই একপাশে বসে আছে শেলি। সতুও এসেছে, কিন্তু অকারণেই আজ সে বড় চঞ্চল, কোথায়ও সে স্থির হয়ে ব'সছে না। চোখে মুখে আনন্দের দীপ্ত, আলোর বন্যাপ্রবাহ। বাগানের ভেতর পায়চারি ক'রতে ক'রতে প্রায় হয়রান হোয়ে সতু এসে বসল বেদিটার ধারে। শেলি ব'ললে, কি অমন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আবার সেই অন্যমনস্কের অভিনয়! সতু কোন উত্তর দেয়না—শুধু শেলির দেওয়া রজনীগন্ধাগুলো আলগোছে ঘাসের উপর ফেলে দিলে। শেলি ভাবে—সেদিনের সেই কথাটা আজও মনে ক'রে রেখেছে সতু। শেলি হেসে ব'ললে,—অমন ক'রে ওগুলোকে ফেলে দিচ্ছ যে?

"ব্যাখ্যা জানিনে ফেলে দিলাম এই শুধু জানি।"

"এই-ই তোমার জীবনের প্রতিকৃতি। জীবনের সুধাপাত্রের সঞ্চিত সুধা অপব্যয়ের অন্যায়ে তুমি হারিয়ে ফেল, দেউলিয়া সেজে কতলোককে নিজের অদৃষ্টের সাথে জড়িয়ে মিছেমিছি দোষ দাও।" অন্যদিকে চেয়ে উদাস কণ্ঠে সতু বলে, অনেকের সম্বন্ধেই কথা কয়টা সত্যি, কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ শেলি: যাকে আজ "পাবার জন্যে মন আকুল কাল তাকে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ ক'রতেও বাধা পড়ে।

"অভিনয়ের মত লাগছে", শেলি হেসে ফেলে, সতু হাসে না—বলে,—অভিনয়ের প্রতিযোগীতাই যে এই জগৎ। কোন খোস্ খেয়ালী ওমরাওএর কাছ থেকে আমরা সব বায়না নিয়ে এসেছি। শেলি শ্রান্তভাবে বলে, সেদিনের সেই কথাটা কি তুমি ভুলতে পার না? সতু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; শেলি কোল ঘেঁসে বসে সতুর হাত দুটো কোলের উপর তুলে নিয়ে ব'ললে, সামান্য একটু ঠাট্টায় তুমি এত ব্যথা পেলে! ওকি মুখ ফিরিয়ে রইলে যে?

সতু শেলির মুখের দিকে চাইল, কি যেন একটু ভেবে অন্যমনস্কের মত ব'ললে, তুমি কি চাইছ?

দু'জনার মুখ মুখোমুখি—একের নিঃশ্বাস পড়ছে অপরের মুখে। শেলির চোখ বুঁজে আসে, বুকে জাগে কথার প্লাবন, আস্তে আস্তে শেলি বলে যায়, আমি চাই সত্যিকারের জীবন, সাধারণের মাঝখানে অতি সাধারণের মত জীবনের উষ্ণ অনুভূতি। একটু থেমে সে আবার বলে চলল, ওখান থেকেই আমরা পাব প্রেরণা; আমি রং দিয়ে ছবি আঁকব, তুমি কথা দিয়ে; আমি চিত্রশিল্পী তুমি হবে কথাশিল্পী। শেলি শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে।

......দু'খানা হাত মালার মত জড়িয়ে গেছে সতুর গলায়, শেলির মুখখানা নেমে এসেছে সতুর বুকের কাছে, চিবুকের নীচে। কান পেতে শুনচে শেলি সতুর হৃৎস্পন্দন। শেলি চোখ মেলে চাইল, আস্তে আস্তে সতুর মুখখানা নেমে আসছে শেলির ঠোঁটের কাছে, উষ্ণনিঃশ্বাস লাগছে শেলীর চোখে; শেলির চোখ বুঁজে আসে; হঠাৎ সতু নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত ক'রে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। ঐ হাসিতে একটু যেন বিদ্রূপ একটু যেন তাচ্ছিল্য ধরা পড়ে। দলিতা ফনিনীর মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শেলী, সতু ব'ললে,—কেমন হোল অভিনয়টা? কোন ক্লাস?

কি যেন ব'ললে শেলি, ঠিক্ বোঝা গেল না; শিস্ দিতে দিতে সতু ওখান থেকে বেরিয়ে এল...।

ডিওনী কুইনটুপ্লেট্স

সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ১৯৩৬,
'নিয়া' (NEA) সার্ভিস

ইভোনা ম্যারী সেসিলি এ্যানেটা এমেলি

বিশ্বের বিস্ময়

পাঁচ শিশু

শ্রীসুরথ রাও

সেদিনের প্রভাত হোল। বিছানা ছাড়লুম শহরের একখানি খবরের কাগজের আফিস থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে। তাতে চেয়েছিল দুশ-পঞ্চাশটা কথা আর একখানা ছবি।

তারপর!

প্রায় দু বছর পরে আবার আজকের প্রভাত হয়েছে। সেদিনকার সূর্য্যের সোনার রশ্মি আজকে দুনিয়ার লোকের চোখ ফিরিয়েছে। আজ তাদের চোখ ফিরেছে ড্যাফো হাঁসপাতালে, যেখানে পাঁচটা যমজ সন্তান একসঙ্গে বেড়ে উঠছে দিনের পর দিন। পাঁচ শিশু! সহজাত পঞ্চ কন্যা—নাম তাদের ইভোনা, ম্যারী, সেসিলি, এ্যানেটা, এমেলী।

হলিউড তাদের ডেকেছে। তৈরী করেছে ফিল্ম ষ্টার। তাই এমন ক'রে খবর পেয়েছে দুনিয়া। তাই চিঠি ছুটেছে লাখে লাখ! টেলিগ্রাম তারে কাঁপন লাগছে দিন রাত!

আজকের দিনে সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার বার্ণার্ড ফ্রিরিক্স্ বললে ছেলেরা গান গেয়েছে—প্রেস ঘড় ঘড় করে উঠল—সারা জগতের কাগজে তাদের ছবি বেরোল আর বেরোল একরাশ কথা।

আর সেদিন!

যেদিন হলিউডেরমাটী তারা ছোঁয়নি—বিশ্বের বড় বিস্ময় হয়ে উঠতে পারেনি, আমি বেরিয়েছিলাম ওদেরি বাড়ীর সন্ধানে একজন ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে।

সকালবেলা! কী বিশ্রীই রাস্তা সেটা। উত্তর অন্ট্যারিওতে অত খারাপ রাস্তা খুব কম আছে আর গেছেও লোকে খুব কম। গাড়ীর ঝাকানি আর ঝাকানির মধ্যে দিয়ে আমরা এগোলুম। অলিভার ডিয়নের বাড়ী ক্যালেণ্ডার থেকে দুমাইলের কিছু বেশী ও দশ মাইল হবে নর্থ বে থেকে। কিন্তু তাহলে কি হয়; ওঃ কি কাদা! এইটুকু পথ যেতে আমাদের লেগেছিল দেড় ঘণ্টারও ওপর। আর ওই রাস্তাকে এখন বাঁধিয়ে সমান করা হয়েছে। ডিয়নের বাড়ীতে রোজ প্রায় সাতহাজার দর্শক যায় এই পথ দিয়ে। তাই দেশের মালিক খরচ করেছেন পঁচাত্তর হাজার ডলার এই রাস্তাতে—যাওয়ার সুবিধে করতে। আজকের ওই রাস্তা হয়েচে ও প্রদেশের শ্রেষ্ঠ পথ।

ডিয়নের বাড়ীর ঠিকানা আমরা জানতুম না। কত লোক, কত বাড়ী, কত দোকান, কত আড়ৎ পার হয়ে গেলো, আমরা জিজ্ঞেস করতে করতে চলেছি, কেউ ঠিক বলতে পারে না। এ পথে লোকে যাওয়া

আসা করে কম। আমিও তো এ জেলাতেই জন্মেছি, বড় হয়েছি, আমার মনে হয় এ পথে এলাম আমিও প্রথম।

অবশেষে ঠিকানা মিললো।

ডিয়নের বাড়ী। উত্তর অন্ট্যারিওর অন্যান্য ফার্ম্মহাউসের মতনই একটা। ভেতরে ঢোক, দরজা দিয়ে পার হলেই পড়বে প্রকাণ্ড একখানা হলঘর;—তিনটে কাজে লাগে এ ঘর—খেতে, শুতে, রাঁধতে। বাড়ীর অর্দ্ধেকটা জায়গা বোধহয় এই ঘর খানাতেই। বাকী অর্দ্ধেকটায় দুখানা ঘর—একখানা শোবার অপরখানা গান বাজনার। মিউজিক ঘরের গৌরব—একটি পিয়ানো।

ডিয়নের স্ত্রী ছিলেন, তাঁর শোবার ঘরে পাঁচ শিশুকে নিয়ে। আমি ছেলে মেয়ে ভালবাসি তবু এদের প্রতি স্নেহের অনুভূতি জেগে ওঠার মত কিছু পাইনি। দেখে মনে হোল তাদের জন্মাবার যখন উচিত ছিল তার দু মাস আগেই বুঝি জন্মেছে। কি জানি, সত্যি বলতে কি, ওদের দেখাচ্ছিল ঠিক লোমহীন খরগোসের মত। ওরা যখন জন্মেছিল ডাক্তার ড্যাফো ওদের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল যাতে তাদের মা বাঁচে। সে যাক্! ড্যাফো বল্লেন: সেদিন ওদের দেখে আমার মনে হোল বুঝি ইঁদুর। ডাক্তার অ্যালান রয় ড্যাফোর ভাই ডাক্তার উইলিয়াম ড্যাফো বল্লেন: আর বলেন কেন, আমার তো মনে হোল বুঝি বেড়াল। খরগোস, ইঁদুর কিম্বা বেড়াল যাই হোক ওদের মধ্যে কোন চার্ম্ম ছিল না।

আমাদের দেখে ডিয়ন স্ত্রী হাসলেন। ইংরিজি জানেন না—কথা কইতে গেলে ফরাসী ভাষায় কথা ক'ন। সঙ্গে মিডওয়াইফ যিনি ছিলেন, তিনিই ইংরিজি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছিলেন। মায়ের প্রাণ! তিনি এই ভেবে হাসলেন বুঝি ওই ছেলে কটি ভয়ানক সুন্দর। আমরা অমন করে তাকিয়ে দেখছিলাম অনেকগুলো বলে—সে কথা তিনি বোঝেন নি।

বাপ বাইরে বেরিয়েছিলেন বাজার করতে। অনেক কষ্টে অনেক খোঁজার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হোল পথে। শরীরের বাঁধন আছে তার—পাতলা চেহারা—কাল চুল আর কাল চোখ—ক্যানাডিয়ান চাষা। তার বাজার আমাদের পেছনে বসবার আসনে রেখে গল্প আরম্ভ করে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'তোমার ছেলেদের সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়।'

সে বললে—'কি জানি,—তবে অতগুলো হবে আমি আশা করিনি।'

আমরা তাকে বাড়ীতে পৌছে দিলুম।

অলিভা ছেলেগুলোকে তুলে নিয়ে একটা বড় মাংসের ঝুড়িতে রাখলে; তারপর কোলে তুলে নিলে। আমি তিনখানা ছবি তুলে নিলাম। ছবি দেওয়াতে তার কোন আপত্তি ছিল না। সে ভেবেছিল এটা তারই ভাগ্য, তাই তার স্ত্রী একসঙ্গে পাঁচটী সন্তান প্রসব করেছে। সেই দুবছর আগের বাড়ীর সঙ্গে অলিভার আজকের বাড়ীর খুব বেশী বদল না হলেও কিছু হয়েছে। যে বারান্দাটি ছিল ঝড়ঝড়ে পুরোনো—যাকে সারাবার মত ক্ষমতা অলিভারের ছিলনা সেই বারান্দা এখন সারানো হয়েছে। তার ওপর বাড়ীখানা ছিল একজনের কাছে বাঁধা তাও ছাড়ান হয়েছে। সেদিন ছেলে মানুষ করবার মত ছিলনা একটিও পয়সা, আর আজ সে বোর্ড অব গার্ডিয়ানসের কাছ থেকে পাচ্ছে মাসে একশো ডলার।

আর ড্যাফো হাসপাতাল! একতলা বাড়ী সেটা। বারো খানা ঘর আছে। আধুনিকতায় চকচকে ঝরঝরে। দুজন কর্ম্মচারী আছে তারাই ডাক্তার ড্যাফোর পরিচালনায় শিশুদের মঙ্গল এবং সুখ-সুবিধা দেখে। তাছাড়া দুজন নার্স একজন রন্ধন করে আর একজন গৃহরক্ষক। দুজন রক্ষী আছে সর্ব্বদা পাহারা দেবার জন্যে।

মাদাম বেনজামিন ও মাদাম অ্যালেক্স লিগ্রস ছিলেন এই শিশুদের জন্মাবার সময়। তাঁরাও লাভবান হচ্ছেন এই ছেলেদের ছবি আর স্মারক কিছু বেচে। এই ছেলে জন্মাবার পর পাব্লিক ওয়েলফেয়ারের মিনিষ্টার অনারেবল্ ডেভিড ক্যারেল এবং বোর্ড অব 'গার্জ্জেন্‌স-এর কাছ থেকে হাসপাতালের opening উন্মোচন দিন দুজনে পঁচাত্তর ডলার করে পান।

আর এই পাঁচটি শিশু 'কান্ট্রি ডক্টার' ছবিতে নামার দরুণ পেয়েছে, পঞ্চাশ হাজার ডলার। টাকা অছির হাতে জমা আছে। আঠার বছর বয়সে ওরা যখন টাকা পাবে তখন ওই টাকা গিয়ে পৌঁছবে একলক্ষ ডলারে।

চারখানা ছবি তুলে নিয়ে আমি বাড়ী ফিরলাম। এক নম্বর,—শিশুরা মার কাছে শুয়ে আছে। দু নম্বর,—বাপের কোলে রয়েছে—মাংসের ঝুড়ী তাতে রয়েছে শিশুরা। তিন নম্বর—বাড়ীর ছবি। চার নম্বর—ডিয়ন, তার স্ত্রী ও মেয়েদের একসঙ্গে ছবি।

আজকে পৃথিবীতে যত বড় বিস্ময় এনেছে সেদিন অলিভার মনে তা আনেনি। আমার মনে আছে অলিভাকে বল্লুম—'তুমি যে পৃথিবীর রেকর্ড করেছ।' সে হাসলে, বল্লে—'তাতে কি, খাওয়াব কি করে?'

আরো একটা কথা মনে হয়। আমরা যখন প্রথম দিন ওই শিশুদের দেখতে যাই বিল ডামন ডে কে দেখেছিলুম ছেলেদের আলু ওজনকরা পাল্লাতে ওজন করতে।

আর আজকে—আজকে সেদিন নেই। এখন এই শিশু মেয়েদের সম্মান টোন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের 'দি কান্ট্রি ডক্টারের' ষ্টারদের সঙ্গে সমান। জীন হারলন্ট, রোচেল হাডসন, লিউইস ষ্টোন, রিচার্ড হাডসনের সঙ্গে পরিচয়—সমান সম্মান গ্রহণ করছে।

আজ তাদের নাম পড়ছে কাগজের প্রথম পাতায়। আজ তারাও হচ্ছে বিশ্বের স্নেহময়ী। আজ তাদের জন্যেও বেরোচ্ছে আড়াইশো কথা আর একখানা ছবি।

দুর্জ্জন-মুখ-চপেটিকা

হিড়িম্বাচার্য্য বিরচিতম্

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—,"
মাঝে মাঝে আওড়ায় অমৃতের পুত্র;
ছাপমারা চিতাবাঘ ঝোপে ঝোপে রঙ্গে,
দেখিতে কি নাহি পাও আজো ফেরে বঙ্গে?
নানা বেশে নানা ঢং আওড়ায় বুকনি,
মুখোশের পশ্চাতে কাক-চিল-শুকনি
সত্যের খোঁচা সহি' ফেরে ঝিছে হর্ষে
রক্ষিতা প্রসবিছে হের প্রতি বর্ষে
তবু মুখে কপ্ চায়-"কস্তে পুত্র—"
সূতিকা গৃহেতে পুনঃ ঘাঁটে মলমূত্র॥

পরপদলাঞ্ছিত-পথধূলি-বাসম্।
বক্র কুটীল মুখে মৃদু মৃদু হাসম্॥
পরধন লালসায় নিত্য প্রলুব্ধ,
সুবিধা সুযোগ খোঁজে লালসায় মুগ্ধ;
প্রেমিকের শিরোমণি পরকীয়াতত্ত্বে
পরনারী তনুখানি লোভনীয় মর্ত্ত্যে
মুখোশ খুলিয়া দাও হয়ে যাবে ক্রুদ্ধ
তা' নহিলে চেনা দায় খৃষ্ট কি বুদ্ধ।
তবু মুখে আওড়ায়—"কস্তে পুত্রঃ—"
হেন শয়তানী রূপ নাহি পাবে কুত্র।

ইহাদের তরে কোনো ইতিহাস তৈরী
হয়নিকো, ইতিহাস-বেত্তারা বৈরী;
শুধু লেখে এ কাহিনী দৈনিক-পত্রে—
কুৎসিত লীলাখেলা কালো কালো ছত্রে।
পল্লী-চরিত-বীমা কোরে রাখো ভাইরে
এদের কবলে যদি পড়—ত্রাণ নাইরে।
ঐ শোনো বন্দিনী লক্ষ্মীর ক্রন্দন—
ইহাদের কোষাগারে হেরি তাঁর বন্ধন;
ভুলিয়োনা ইহাদের শুনি সাধু-উক্তি
ভুল হ'লে কে দিবে গো লক্ষ্মীরে মুক্তি?

এই শয়তানী রূপ, আছে ভাই মূর্ত্ত
বিখ্যাত লম্পট, বিখ্যাত ধূর্ত্ত
বিখ্যাত এ রসিক লীলা করে বঙ্গে;
আমি কবি অখ্যাত লিখি তাই রঙ্গে;
ঘৃণিত জীবনী তা'র, ঘৃণ্য চরিত্র
লেখনী কলঙ্কেছি আঁকি তার চিত্র।
হেনলোক যদি হয় বলশালী অর্থে,
সমাজের বুকে বসি কিনা পারে ক'রতে?
সাবধান, সাবধান, হে বাঙ্গালী সাবধান,
অসাধ্য নাহি কিছু সব পারে শয়তান।

পুরুষের প্রেম

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

শোন সৌমিত্র :

—'তুমি এসেছ আমার খোঁজ ক'রতে! কিন্তু বন্ধু কেন এখানে এলে?

—'আমি এসেছি আশ্রয় খুঁজতে—শান্তির জন্য বেছে নিয়েছি এই নির্জ্জন স্থান। চতুর্দ্দিকে পাহাড়—আর সামনে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট স্রোতস্বিনী—কুল কুল স্বরে সে চলেছে কোন এক অজানার সন্ধানে, তা কে জানে? কুটীর বেঁধেছি লতাপাতা দিয়ে—বেশ লাগে আমার এ জায়গাটা।

—'তুমি বন্ধু! তাই এসেছ আমার খোঁজ ক'রতে! কেন আমি এখানে এসেছি, এই তোমার প্রশ্ন? কেন আসক্তির সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিয়ে চলে এলুম এই অসময়ে?

—'তুমি বলবে, All the love in the world is longing to speak—only it dare not because it is—shy! shy! shy!

—'ঠিক তা নয়! প্রেমের ভেতর গভীরতা না থাকলেই তা আপনাকে প্রকাশিত ক'রবার জন্য হয়ে পড়ে অত্যন্ত উন্মুখ। যেমন ধর—আজকালকার ছেলেরা তাদের সামান্য ভাবপ্রবণতাকে বা সাময়িক হৃদয়াবেগকে প্রেম বলে কল্পনা ক'রে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত করে—তারপর পরিচিত বা অর্দ্ধ পরিচিত তরুণীদলের কাছে প্রকাশ করে তাদের অনুকম্পা পেতে চায়—তাদের দলে আমি নই। আমার হাসি পায় তাদের বিনিয়ে বিনিয়ে বলবার ভঙ্গী দেখে—তাদের কল্পনার দৌড় দেখে—তাদের আলেয়ার পিছনে ছুটতে দেখে!'

সৌমিত্র শোন :

—'ব্যথা···ব্যথা···ব্যথায় ভরে আছে আমার মন, প্রাণ, আমার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। উঃ···এ যে কি ব্যথা, এ যে কি দাহ, এ যে কি জ্বালা—তা তোমায় আমি কি করে বোঝাব!

—'তুমি বন্ধু, তুমি এসেছ আমার ব্যথা উপশম ক'রতে। কিন্তু···না, না...তুমি পারবে না...কেউ—ই পারবে না। আত্মার বেদনা, অন্তরের ক্রন্দন—তু—মি—সেখানে যাবে কি ক'রে? তুমি তো সেখানে যেতে পারবে না!'

শোন শোন, তোমায় বলি—

—'তোমায় ব'লেই বলছি। জ্যোৎস্না তার ফিনিক্ ফুটিয়ে তুলছে—আকাশে, বাতাসে, আমার দেহের প্রতি শিরায়, উপশিরায়। নামটি তোমায় ব'লব না। নামে কি এসে যায়! ধর না তার নাম লিপি··· ,

—'হাঁ, লিপি এল আমার জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রতে। অভিনয় হ'ল সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত। এমনটি আর কা'র সাথে হয়ও নি—হবেও না।'

—'সৌমিত্র, শোন একটা কথা······ কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণের নায়কের একটা মস্ত বড় বাধা আছে...সে হয়ে উঠে তখন কল্পনাবিলাসী, আদর্শবাদী পুরুষ। সে চায় না তার নায়িকাটিকে···সে চায় গম্ভীর আত্মোপলব্ধিবোধ।

—'তার প্রাণ কেঁদে উঠে এই সমস্ত বিশ্বের দুঃখে—ইচ্ছে করে, তাদের কাছে গিয়ে তাদের দুঃখের লাঘব ক'রে আসি। কি ভাবে যে নিজেকে আত্মোৎসর্গ ক'রতে ইচ্ছে করে, তা তোমায় কি ক'রে বোঝাব, বন্ধু! তর্ক বা ব্যাখ্যা ক'রে একথা কেউ—কাউকে কোনদিন বোঝাতে পারেওনি—পারবেও না···নিছক অনুভূতির জিনিষ।

—'হাঁ, লিপি এল। আমার মন, প্রাণ সমস্ত হরণ ক'রে নিয়ে গেল। আর সাথে যা আমার ফিরিয়ে দিলে—নিজকে রিক্ত ক'রে দিলে······নিঃস্ব। করে দিলে—তা সর্ব্বকুলপ্লাবী। কাণায় কাণায় ভরে উঠল চতুর্দ্দিক।

—'সৌমিত্র, কে বলে মেয়েরা উপযাচিকা হয়ে আসে না? প্রতি অঙ্গ যে প্রতি অঙ্গের তরে কেঁদে ওঠে—না এসে কি পারে?

দু'ধার থেকেই আসবে, সমানে—একসাথে—একভাবে—তবেই তো হবে আত্মায় আত্মায় মিলন।

—'মেয়েরা যতক্ষণ শক্ত হয়ে থাকে—ততক্ষণ তার কাঠিন্যকে ভেদ করে কা'র সাধ্য? কিন্তু সংযমের বাঁধ ওদেরই ভাঙ্গে শীগগির—যখন ভাঙা সুরু করে, তখন সে ভাঙন আর শেষ না হ'লে থামে না। তাদের দুর্ব্বলতা এইখানেই। তারুণ্যকে শ্রদ্ধা করা তাদের রীতি।

—'তারা বিলিয়ে দিতে চায় মনো-মন্দিরের যত গোপন পূজার উপাচার আপনার ছন্দে গানে···

—'সৌমিত্র, লিপির সেই চলে যাওয়ার ছন্দটুকু এখনও আমার প্রাণে ঝড়ের সৃষ্টি করে—রিণি ঝিণি তাল তুলে দেয় আমার মনে। আগেই বলেছি—তখন ছিলুম আমি কল্পনাবিলাসী—কল্পনা নিয়েই বেশীর ভাগ সময় থাকতুম বিভোর। তখন আমার আদর্শ ছিল—স্বার্থ হ'তে যে প্রেমের সৃষ্টি—তা হচ্ছে প্রেমের বিকার সে প্রেমের বিকার বা কামনা যতদিন না দগ্ধ হয় ততদিন প্রেমের মাধুর্য্যও বিকশিত হয় না।

—'তাই আমি ছুটে পালিয়ে গেলুম তার দৃষ্টি হ'তে। আমার আসক্তির প্রধান উপলক্ষ্য যা ছিল—তা থেকে দূরে সরে যাওয়াই মনে হ'ল বাঞ্ছনীয়। তার দৃষ্টিপথ হ'তে চলে আসাতে মনে হ'ল, সে যা ব্যথা পেল—তার দ্বিগুণ ব্যথা পেলুম আমি। এ ব্যথার তুলনা হয় না, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না···সমস্ত বুক ভরা শুধু ব্যথা···ব্যথা···ব্যথা···কি করি, কোথায় যাই? কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারি না।'

এমনি সময় আমার ছোট বোন নীলার স্বামী নৃপেন চিঠি লিখলে হেঁয়ালি ক'রে, এই শোন—

হে চিঠি,

তোমার ভাবার্থ এতদিন পর পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে সমর্থ হলুম, তাই এই অপার আনন্দের তৃপ্তির কথা তোমায় জানাচ্ছি। হে সর্ব্বজন আকাঙ্খিত চিঠি, হে বিরহীর অবলম্বন, হে বিরহীর স্বর্ণ-সেতু, হে অপ্রকাশভাবের অনাবিল প্রকাশক, হে কর্কশ শীতঋতুর নবমেঘদূত (নয়ন বারিধারা বর্জ্জিত) তুমি যে অনুত্থাপিত কুমার প্রাণেও দম্পতীসুলভ বিরহের হা হুতাশ আনয়ন ক'রতে পেরেছ, সেজন্য তোমার শক্তির মহিমার কাছে মস্তক অবনত করছি ও তোমায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি।

ইতি বিনীত চিঠির সেবক।

সৌমিত্র, তুমি বল—বল আমায়, এ চিঠির জবাব আমি কি দেবো···

দুঃখ হয় ওর জন্যে—প্রেমের স্বাদ বড় দেরীতে পেয়েছে।

* * *

সৌমিত্র, তুমি শুনে যাও। আমার প্রথম প্রেম হচ্ছে আমার লজ্জা, সে প্রেমে ছিল গভীর হৃদয়াবেগ এবং এর সমাপ্তি হতো নিশীথের অশ্রুধারায়।

—'প্রেমের একটা মস্ত বড় দোষ হচ্ছে—আর কাউকে ভাল লাগে না—সুন্দর দেখাও যায় না। এর মত বিষম জ্বালাও সংসারে অতি অল্পই আছে। যখন মানুষ প্রেমাস্পদকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে ঘুরে ঘুরে শান্তির আশায় এধারে, ওধারে ঘুরে বেড়ায়, তখন কাউকে বড় একটা প্রীতির চোক্ষে দেখতে ইচ্ছে করে না···

—'আচ্ছা তুমি বল, সংসারে এর মত অভিশাপ আর কি আছে। যাক্ তারপরে এল সুচনা, তিনি লিখলেন,—

শ্রী,

তোমার সাথে আমার মনের মিল হবে কিনা জানি না—জানবার বিশেষ তাড়াও নেই। তুমি ভাবছ তোমাকে টলাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই, কিন্তু তোমার এ ধারণা ভুল। তুমি লিখছ এখন: ধর আমি যদি এখন পেছন থেকে এসে তোমার মুখের উপর আমার মুখ চেপে ধরি—কি ক'রতে পার তুমি? তাড়িয়ে দিতে পার কি?

থাক্ থাক্ তোমার ভয় নেই। আমি জোর ক'রে তোমার কিছু নেবো না।

শীগ্‌গিরই একবার এসো·········

সুচনা।

মুখের উপর মুখ চেপে ধরি······উঃ—···সহ্য ক'রতে পারলুম না। Vulgarity-র চূড়ান্ত।

আমার বিশ্রাম চাই সৌমিত্র, বিশ্রাম। এই নীরবতা আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি বোধই হবে আমার বিশ্রামের সহায়ক।

তুমি একেবারে ছেলে মানুষ, আমার খোঁজে চলে এলে এই নির্জ্জন শ্যামবনানীর প্রান্তরে। অন্তরের দুঃখ, আত্মার বেদনা—এর প্রতিশেধক হচ্ছে নির্জ্জনতা।

বিদায় চাইছি তোমার কাছে, আমায় মাপ ক'রো। আমার আশা, আকাঙ্খা সংসারের বাইরে। আমি সেখানে দেখি দুঃখের চরম শান্তিকে কল্পনার রঙীন স্বপ্নে!

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিত পাবন পতিতুণ্ডি

মেট্রোর উঠ্তি তারকা বেটি ফার্নেসকে এখানে আমরা দেখ্তে পাচ্ছি। টেনিস খেল্তে এ ভারী ভালোবাসে

হ্যারল্ড লয়েডের নতুন থ্রিল

চশমাধারী হ্যারল্ড লয়েড হাসির খোরাক জোগাতে ওস্তাদ। আজ সবাকের যুগে নাম একটু পড়ে গেছে বটে! নির্ব্বাক যুগে চার্লি চ্যাপলিনের ঠিক পরেই যদি কারোর নাম করা যায় তো সে হ্যারল্ড লয়েডের, আর কারোর নয়। আজকের দিনে হ্যারল্ড লয়েডের নাম কে না জানে! আর সেদিন যা পয়সা রোজগার করেছে, তারই দৌলতে ও আজকা'ল জমিদার। এ কথা যাক্! আর একদিন আলোচনা কর' যাবে।

হ্যারল্ড লয়েড!—সিনেমার কোন্ জিনিষটা তার অজানা বা অদেখা আছে। তবু তাকেও সেদিন চমকে দিয়েছে। সেই গল্পই করছি।

হ্যারল্ড তার ছবিতে দেখলে সে জাপানী ভাষায় কথা কইচে। তাই বলে মনে করবেন না যে সে ও ভাষাটা বলতে জানে। প্রাচ্যের ও ভাষাটা শেখা হ্যারল্ডের পক্ষে বড় সহজ নয়।

আসল ব্যাপারটা একজন জাপানী কথা কয়েছে এবং ছবিতে বুঝিয়েচে যেন হ্যারল্ডই কইছে।

'আই ডু' নামে একখানা হ্যারল্ড লয়েডের পুরোণো ছবি নিয়ে জাপানে, টোকিয়োতে জাপানি ভাষা ছবিতে বসান হয়েচে। অবশ্য ছবিখানা জাপানে দেখান হবে বলে। তারই একটা সিনের একটা কপি হ্যারল্ড লয়েডের কাছে পাঠিয়েছিল। পর্দ্দার ওপর ছবি দেখে হ্যারল্ড গেছে চমকে। সেতো ধারণাই করতে পাচ্ছে না এ ছবি তার কি না?—

ছবির বদলে নয় ভাষার বদলে।

আর জ্যাক পেনের

হ্যারল্ড লয়েডের কথা বলতে গিয়ে জ্যাক পেনের কথা মনে এলো।

কয়েক বৎসর আগে জ্যাক পেন সে "ইট উইংথ মিউজিক" বলে ছবি তৈরী করে। ছবি তোলাবার কিছুদিন পরেই জ্যাক ছুটী নিয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সাউথ ফ্রান্সে বেড়াতে যায়। সেখানেই একদিন ওখানকার একমাত্র সিনেমা হাউসে সে "ইট উইংথ মিউজিক" ছবিখানা দেখতে যায়।

ছবি আরম্ভ হোল! জ্যাক একটু আরাম করে বসবে বলে, গায়ের কোটটা চেয়ারের পেছন দিকে ঠিক ক'রে রাখতে লাগলো। কানে এলো ছবির ভাষা—এবং তা ফরাসী ভাষা। জ্যাক চমকে গেলো; পিছন ফিরে ঘুরে বসে দেখতে লাগলো। সে তো অবাক! ইংরিজি ভাষায় সে ছবি

ভুলিয়েচে আর ছবি কথা বলচে ফরাসী ভাষায়, এবং তা ফরাসী লোকের মত বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায়। জ্যাক ফরাসী ভাষা জানে না, আর শুধু জানে না নয় বোঝাও তার পক্ষে কষ্টকর। সে শুধু ভাবতে লাগলো, এ কেমন ক'রে সম্ভব হোল।

আমরা জানি ওই ছবির মুখে আট রকম ভাষা দেওয়া হয়েচে। তবে জ্যাক যে ওই আট রকম ভাষা শুনতে যায় নি নানান জায়গায় তা জানি।

শার্লির ছবি

শার্লি টেম্পলের যে পরিমাণে ছবি তোলা হচ্ছে এতে তার নামের মোহ লোকের মন থেকে মুছে যেতে পারে। তাই টোয়েন্টিএইথ সেঞ্চুরী ফক্স ঠিক করেছে ওর ছবি আর একটু কম তোলা হবে। এ বছরে ওর নামে ছিল চারখানা ছবি, তা থেকে একখানাকমান হয়েছে শার্লির "বেটলি টেকস্ দি এয়ার" ছবিখানা তোলা হবে না ঠিক হয়েছে। "ডিম্পলস্" ছবিখানার আশাও কম, সেখানাও বোধহয় এবছরে তোলা হোল না। ডিম্পলস্ ছবিখানা মার্কাদের গল্প জানেন তো?

যাই হোক "ক্যাপটেন জানুয়ারী" আর "পুয়োর লিট্‌ল রিচ গার্ল" ছবিখানা আমরা দেখতে পাব ও দুখানা এখন তোলা হচ্ছে।

আগনেস আয়ার্স আবার ফিরল

আপনাদের কার মনে আছে বলুন, আগনেস আয়ার্স-এর কথা?

আমি বলছি। রূপোলী পর্দায় সে ছিল এক জলজ্বলে তারকা। হলিউডের আকাশ থেকে তার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দুনিয়ায়। রসিকজন তা কুড়িয়ে নিয়েছিল, মাথায়, বুকে, চোখে।

সে রূপের বিভা ঝকমকিয়ে উঠেছিল "দি সেক" ছবিতে। তারপর দেখা যায় "ফরবিডন ফ্রুট-এ"। তারপর "টেন কমাণ্ডমেণ্টস"। তারপর "সান অব সেক" ছবিতে— রুডল্‌ফ ভ্যালান্টিনোর শেষ ছবি—অমর ছবি সেখানা।

এরপর!

—টকির প্রথম যুগ। বিদায় নিয়েছিল সে। গত পাঁচ ছ' বৎসর ধরে সে মেয়েকে আর কেউ পর্দার বুকে দেখতে পায়নি। ঘুরেছে সে নিউ ইয়র্ক থেকে অনেক জায়গায়। রাতের পর রাত অভিনয় করেছে সে ষ্টেজের ওপর।

এইবার ফিরে এসেছে।

রবার্ট টেলর আর জেনেট গেনরের ছবি "স্মল টাউন গার্ল" ছবিতে সে নামবে। আদর আপ্যায়নে পুরোণো বন্ধুরা আবার তাকে বুকে টেনে নিয়েছে।

মে ওয়েষ্ট—আরনেষ্ট লুবিশ

মে ওয়েষ্ট আর আরনেষ্ট লুবিশে একটু মনোমালিন্য হয়েচে। এ হওয়ার কারণ হচ্ছে ভিক্টর ম্যাকলাগ্লেনের পার্ট নিয়ে। মে জানান "ক্লনডাইক অ্যানি" তে ম্যাকলাগ্লেনের পার্ট তিনি ছোট করতে চান।

লুবিশ উত্তর দেন—তা সম্ভব নয়, কারণ; তাহলে ভিক্টর ম্যাকলাগ্লেন অভিনয় ক'রবেন না।

মে'র ম্যানেজার উত্তর দিলেন

মে'র ম্যানেজারই সব কথাবার্ত্তা চালান কিনা, তিনিই বলে পাঠালেন:—মিষ্টার লুবিশ আপনি এই সিনেমা লাইনে কদিনইবা আছেন, জিনিষটা বুঝুন ভাল করে।

লুবিশ শ্লেষের সঙ্গে তার উত্তর দিলেন—কথাটা ঠিকই।

মে যে আমার চেয়ে বড়।

খুচরো খবর

ডেরিল জানুকের পরিচালনায় "হোয়াট প্রাইজ গ্লোরি" ছবিতে নামবে ক্লার্ক গেবল আর ওয়ালেস বিয়ারি।

* * *

"কুইন অব সেবা" ছবিতে আর 'র‍্যামোনা' ছবিতে নামবে লরেটা ইয়ং।

* * *

'র‍্যামোনা' ছবিখানা হবে বহু রঞ্জিত চিত্র।

* * *

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্-এর 'মার্ক অব জোরো' ছবিখানা নতুন করে মুখে ভাষা দিয়ে তোলা হবে লরেন্স টিবেটকে নিয়ে।

* * *

জেনেট গেনরের পরের ছবি হচ্ছে 'ব্যাঙ্গো অন মাই নি।'

* * * *

বিখ্যাত নির্ব্বাক ছবি "ফোর ডেভিলস" আবার শব্দ দিয়ে তোলা হবে।
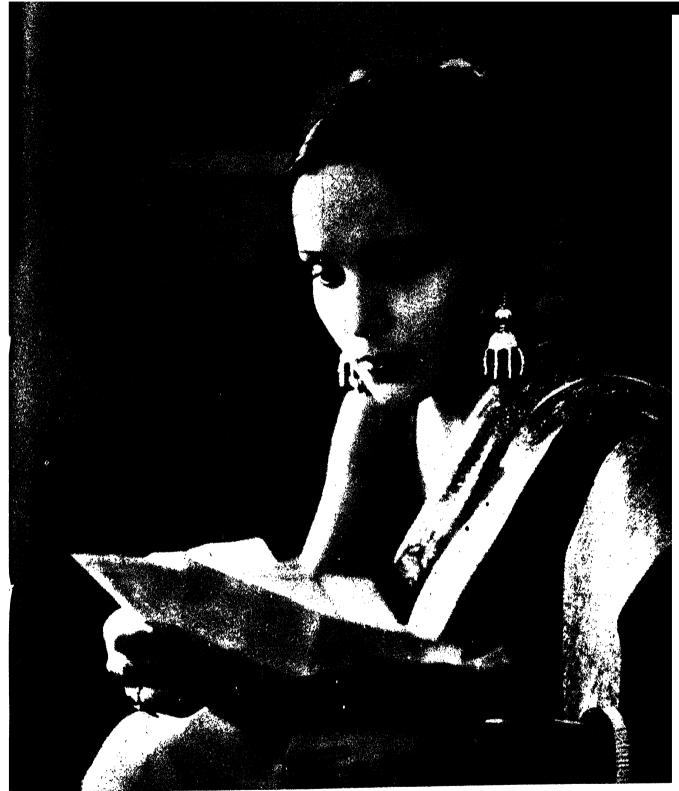
দেবীকারাণী

বংশ-গৌরবে, অভিজাত্যে শ্রীমতী অভিনেত্রী কুলরাণী। প্রাচ্য প্রতীচ্যের চিত্রপ্রিয়দের কাছে দেবীকারাণী সমধিক পরিচিতা। সম্প্র বোম্বে টকীজের "মিয়ান বিবি" ছবিতে অভিনয় কোরছে

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৪শে বৈশাখ ১৩৪২—7th. May, 1936. } ১৯শ সংখ্যা

আনুনাসিক ক্রন্দন

এবারে স্যার হরিশঙ্কর পাল "কোয়ালিশান" দলের সাহায্যে মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন—অর্থাৎ যে-আসনে দেশবন্ধু, যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র বসিয়াছিলেন সেই আসনে আজ বসিলেন বিলাতী ভাঁটিখানার জনৈক ভেণ্ডার। এই দুর্ঘটনাকে কি আখ্যা দিব—অদৃষ্টের পরিহাস না কলিকাতা নাগরিকজীবনের দুর্দ্দৈব!

ভাঁটিখানার ভেণ্ডারের কথায় হয়তো মাত্রাজ্ঞান আশা করা অন্যায় এবং তাঁহার সব কথা হয়তো কর্ত্তব্যের মধ্যে আনাও উচিত নহে। কিন্তু এখানে আমরা তাঁহাকে ব্যক্তি হিসাবে দেখিতেছি না, দেখিতেছি মেয়রের পদের অধিকারী হিসাবে। তাই নির্ব্বাচনান্তে তিনি যে প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার সমালোচনা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমেই তিনি দেশবন্ধুর বিরাট নামের আড়ালে নিজের স্বরূপ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি দেশবন্ধু-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এই make-up-show বেশীক্ষণ বজায় রাখা তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। কারণ পরক্ষণেই একটি উক্তিতে—এবং এইটাই তাঁহার মনের কথা—তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। কোয়ালিশান দলের মনোবৃত্তির শানাইয়ের পোঁ ধরিয়া তিনি বলিয়াছেন—করপোরেশনের কর্ত্তব্য যথাসম্ভব রাজনীতিকে পরিহার করিয়া চলা। সভ্যতার প্রারম্ভে ময়লা পরিষ্কার, জলনিষ্কাশন ও রাস্তামেরামত নাগরিক জীবনের হয়তো একমাত্র কার্য্য ছিল কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নাগরিক জীবনে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর সমস্যা ও মহত্তর আদর্শ দেখা দিয়াছে। সভ্য ও শিক্ষিত নাগরিক রাষ্ট্রেরও একটি বিশিষ্ট অংশ (an important unit of the state)। অতএব আজিকার দিনে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তদ্ভিন্ন স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সমস্যাগুলিও স্বাধীন ও পরাধীন সবদেশের নগরেই বিদ্যমান। কিন্তু পরাধীন ভারত ও লাঞ্ছিত বাঙ্গলার কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে, যাহা কোনও শিক্ষিত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি অবহেলা করিতে পারেন না। সেই সকল সমস্যাকে অবহেলা করিয়া স্বল্পতম বাধার পথ অনুসরণ করা কাপুরুষতা ও বর্ব্বরতার লক্ষণ—মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম নহে।

হেমন্তকুমার বসু ও "আনন্দবাজার পত্রিকা" স্যার হরিশঙ্করের নির্ব্বাচন এবং পরবর্ত্তী উক্তি প্রভৃতি লইয়া দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এইরূপ বিধবার নিস্ফল ক্রন্দনে বিশ্বাসী নহি। শোভাবাজার অঞ্চলে বিলাতী মদের ভাঁটিখানার ভেণ্ডারের প্রতিপত্তি থাকিলেও কলিকাতা নগরীতে ও তাহার উপকণ্ঠে যেখানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও সতীশরঞ্জন দাশ প্রমুখ ব্যক্তিরাও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই, সেখানে স্যার হরিশঙ্কর অপরাজেয়, ইহা আমরা মনে করি না। আসল

প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধতা ও সুপ্রযুক্ত বাধাদান। এবারকার পরাজয়ে যদি কংগ্রেস সেই শিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আনুনাসিক ক্রন্দনের আর প্রয়োজন হইবে না।

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস সদস্য না হইয়াও কংগ্রেসের বয়কট প্রস্তাব অনুসারে মেয়র-নির্ব্বাচন সভায় যোগ না দিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদও এই সম্পর্কে প্রশংসনীয় যেহেতু তিনি আত্মীয়তার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া কংগ্রেসের দাবীকেই বড় বলিয়া মানিয়াছেন। কিন্তু ৯নং ওয়ার্ডের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ দে বিরোধী-প্রস্তাব সত্ত্বেও নির্ব্বাচন সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেসদ্রোহীকে নয়ের পল্লীর অধিবাসীরা যেন না ভুলেন। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া এবারে যে শিক্ষালাভ করিলেন, আগামীবারে ইনিও যেন সেই শিক্ষা হইতে বঞ্চিত না হ'ন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস ইলেকশান বোর্ড আত্মীয়তার অজুহাতে শ্রীযুক্ত নিতাই পালকে সভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। আমরা এই দুর্ব্বলতার সমর্থন করি না। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আত্মীয়তার স্বার্থ ও সম্পর্কের বহু উর্দ্ধে। দ্বিতীয়তঃ, এতো খুড়ার বাড়ীতে বিবাহ-বাসর বা শ্রাদ্ধ-বাসর নহে যে, ভ্রাতুষ্পুত্রের উপস্থিতি অপরিহার্য্য!

যাহা হউক, পরাজয়ের গ্লানি কখনই স্থায়ী হয় না যদি সেই পরাজয় হইতে আমরা ভবিষ্যৎ জয়ের শিক্ষালাভ করি। অতএব এবার ঠেকিয়া শিখিয়া আগামীবারে সুকৌশল সঙ্ঘবদ্ধতার ফলে কংগ্রেস যদি করপোরেশনে এই সকল অবাঞ্ছিতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে পারেন তাহা হইলে কংগ্রেসের লজ্জানুভব করিবার মত কিছুই থাকিবে না।

:o:-

একলব্য

কোলকাতার হকি খেলা

কোলকাতার হকি খেলা গেল শনিবারেই শেষ হয়েছে। এ বছর প্রথম ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়ন হোল কাষ্টমস এবং নেমে গেলো ই, বি, আর ও লিলুয়া। এ বছরকার চ্যাম্পিয়ন হবার জন্যে কাষ্টমস এবং রেঞ্জার্সের মধ্যে শেষাবধি তুমুল প্রতিযোগীতা চলেছিল। এবং লিগ খেলার শেষে দেখা গেলো যে কাষ্টমস এবং রেঞ্জার্স-এর পয়েন্ট সংখ্যা সমান—প্রত্যেকরই ২৪ পয়েন্ট। সকলেই আশা করেছিল যে যখন দুই দলের পয়েন্ট সমান তখন আর একটা বেশী খেলে এদের মধ্যে কে চ্যাম্পিয়ন হবে তার মীমাংসা হবে। কিন্তু এবছর আন্তর্প্রাদেশিক হকি খেলার জন্যে অনেক সময় নষ্ট হওয়ায় হকি লিগ কর্তৃপক্ষ সময়াভাব হেতু স্থির করলেন যে অতিরিক্ত কোন খেলা না হয়ে হকি লিগ কর্তৃপক্ষের ৬নং ধারা অনুযায়ী কাষ্টমসের গোল সংখ্যা কিছু বেশী থাকায় কাষ্টমসকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হোক।

গেল বছরের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান এবার দ্বিতীয় ডিভিসনে নাম্‌তে নাম্‌তে বেঁচে গেছে।

দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে এবার প্রথম ডিভিসনে উঠলো গ্রীয়ার এবং পোর্ট কমিশনার্স এবং দ্বিতীয় থেকে নীচে যেতে হোল তালতলা এবং অরোরা। তৃতীয় ডিভিসন থেকে ওপরে উঠলো বি, এন, আর এবং ওয়াই, এম, সি, এ। তৃতীয় থেকে চতুর্থ ডিভিসনে নেবে গেলো রোনাল্ডসে হাট এবং দক্ষিণ কলিকাতা। চতুর্থ থেকে তৃতীয় ডিভিসনে উঠলো পাঞ্জাব স্পোর্টস এবং পার্শিশ কিম্বা সেন্ট টমাস স্কুল।

এবার চারটী ডিভিসন প্রতিযোগীতার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেঞ্জার্স, গ্রীয়ার, বি, এন, আর এবং পাঞ্জাব স্পোর্টস কোন খেলায় হারেনি। কম কৃতিত্বের কথা নয় নিশ্চয়ই।

*   *   *

হকি লিগ খেলার পর আরম্ভ হোল বাইটন কাপ এবং লক্ষ্মীবিলাস কাপ খেলা। এবার বাইটন কাপ বোম্বাই কাষ্টমস ফাইনালে কোলকাতার কাষ্টমসকে ২—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। এ বছর যে কটা দল বাংলার বাইরে থেকে বাইটন কাপ প্রতিযোগীতায় নাম দিয়েছিল তাদের মধ্যে নাম করা দল হচ্ছে—বোম্বাই কাষ্টমস, ভূপাল, ঝান্সি হিরোজ এবং বি, এন, আর রেজিমেন্ট। এবং এদের মধ্যে ঝান্সি হিরোজ এবং ভূপাল যে রকম ভাবে হেরেছে তা কেউ মনেও ভাবেনি। ভূপাল দল চতুর্থ রাউণ্ড খেলায় কোলকাতার রেঞ্জার্সকে ৪—১ গোলে হারিয়ে দেওয়ায় অনেকে আশা করেছিল যে ওরা বোম্বাই কাষ্টমসকে সহজেই হারিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু খেলার ফল অন্য রকম—বোম্বাই কাষ্টমস ভূপালকে ৬—১ গোলে হারিয়ে দিয়ে ফাইনালে উঠলো।

এদিকে ঝান্সি হিরোজ দল পুরো সপ্তায় প্রতিদিনই হয় লক্ষ্মীবিলাস কাপ নয় তো বাইটন কাপ খেলতে খেলতে শেষ পর্য্যন্ত একেইতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, তার ওপর সেমি ফাইনালে কোলকাতা কাষ্টমসের সঙ্গে প্রথম দিনের খেলার অন্যায় ভাবে ধ্যানচাঁদের গোল না দেওয়ায় আরো যেন দমে পড়েছিলো। তাই পরের দিন যখন আবার কোলকাতা কাষ্টমসের সঙ্গে খেলতে নামলো তখন ওরা খেলছিলো যেন একটি পরাজিত দল। ঝান্সীর এই উৎসাহ-হীন খেলার সুযোগ কাষ্টমস নিলে। কাষ্টমস একটা গোল কোনক্রমে ঝান্সিকে দিয়া ফাইনালে উঠলো। ঝান্সির ভাগ্য যদি একটু সুপ্রসন্ন থাকতো তবে যে ওরা এবার বাইটন কাপ পেত, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

*   *   *

লক্ষ্মীবিলাস কাপ অবিশ্যি ফাইনালে মোহনবাগানকে ৬—২ গোলে হারিয়ে দিয়ে ঝান্সি পেয়েছে। ফাইনালে গোড়ায় যেভাবে খেলা আরম্ভ হয়েছিলো তাতে ঝান্সির অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। মোহনবাগান প্রথমে গোল দেয় তারপরে ২খানা গোল দেয় ঝান্সি; এরপরে আবার মোহনবাগান গোল শোধ করে এবং এই সমান সমান অবস্থা খেলা শেষ হবার ৭।৮ মিনিট আগে পর্য্যন্তও ছিল এবং মোহনবাগান খেলছিলো খুব ভাল। কিন্তু শেষ কয়েক মিনিট ঝান্সি দলের বিশেষ ধ্যানচাঁদ এবং রূপসিং-এর খেলা যেন একেবারেই বদলে গেলো। তারা এত ভাল খেললে এই সময়টা যে পরপর ৪খানা গোল তারা মোহনবাগানকে দিলে। ধ্যানচাঁদ এবং রূপসিংএর খেলার Combination এদিন যারা দেখেছে তারা কোন দিন তা ভুলতে পারবে না।

এই খানেই এবছরকার মত হকি খেলার যবনিকা—এর পরে এদেশের সকল খেলার সেরা খেলা—ফুটবল।

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে গেলো শনিবার। তার আগে অবশ্য ভারতীয় দল একটা চ্যারিটি

ম্যাচ খেলেছিলো—"মিঃ ফ্রিম্যানের একাদশ-এর সঙ্গে। এই খেলা ড্র হিসেবে শেষ হয়েছে। খেলা হয়েছিলো প্রত্যেক দলে ১২ জন নিয়ে। এই খেলার গোড়ায় ভারতীয় দল ব্যাট করে ১০জনে আউট হয়ে ১৮৫ রান করে এবং তারপর "ফ্রিম্যানের একাদশ" ৪ জনে আউট হয়ে ১৭৪ রান করে।

এই খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষে উইকেট-কিপার, হিন্দেলকার খুব সুন্দর খেলা দেখিয়ে বিলেতে সকলের প্রশংসা পেয়েছেন।

সরকারীভাবে খেলা ভারতীয় দল শনিবার উষ্টারসায়ারের সঙ্গে আরম্ভ করেছে। এই খেলা সম্বন্ধে আজ (সোমবার) পর্য্যন্ত যা খবর আমরা পেয়েছি তাতে জানা যায় যে সি, কে, নাইডু; বিজয় মার্চেন্ট এবং পালিয়া ভাল খেলা দেখিয়েছেন। এসম্বন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা আগামী সংখ্যায় দেবো।

কোলকাতায় ফুটবল

বাইটন কাপ খেলা শেষ না হওয়ায় কোলকাতায় ফুটবল পুরো দমে আরম্ভ হতে পারছিলোনা। গেলো শনিবার এবছরকার মত কোলকাতায় হকির ওপর যবনিকা পড়ে যাওয়ায় সোমবার থেকে ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। গেলো সপ্তায় অবিশ্যি কয়েকটা ম্যাচ খেলা হয়েছে কিন্তু তার ওপর নির্ভর করে প্রতিযোগীদলগুলি সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া যায় না। তবে কাগজে-কলমে দেশী দলগুলোর মধ্যে মোহামেডান স্পোর্টিং এবং ইষ্ট বেঙ্গল খুবই শক্তিশালী এবং বিদেশী দলগুলির মধ্যে ক্যালকাটা এবং ব্ল্যাকওয়াচ। এবছর ইষ্টবেঙ্গল দলে মুসলমান খেলোয়াড়দের এতই প্রাচুর্য্য যে কেউ কেউ ওদের ঠাট্টা করে মোহামেডান স্পোর্টিং-এর অন্য একটা সংস্করণ বলতেও ছেড়ে দিচ্ছে না।

আগামী সপ্তা থেকে আমরা আরো বেশী করে কোলকাতার ফুটবল খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

(বিলাসী)

"মহানিশা"

কাহিনী—অনুরূপা দেবী। পরিচালক—নরেশ মিত্র। আলোকশিল্পী—অশোক সেন। শব্দযন্ত্রী—এস, এন, সিং। সুরশিল্পী—অমর বসু। প্রযোজক—শিশির মল্লিক।

ভূমিকা:—ডাক্তার—অমর বসু (এঃ), বেহারী—নরেশ মিত্র, রাধিকাপ্রসন্ন—যোগেশ চৌধুরী, মুরলীধর—রবি রায়, ব্রজরাজ—ভূমেন রায়, নির্ম্মল—জহর গাঙ্গুলী, ধীরা—চারুবালা, অপর্ণা—রেণুকা রায়, প্রিয়ম্বদা—পারুলবালা প্রভৃতি।

প্রথম মুক্তি—২রা মে, ১৯৩৬ "রূপ-বাণী"তে।

অনুরূপা দেবীর এই উপন্যাসখানা যেদিন নাট্যরূপ নিয়ে "রঙমহলে" আত্মপ্রকাশ করলে—নাট্যামোদীদের সেদিন খুব কম আনন্দ দেয়নি। কিন্তু, গত শনিবার যখন সে প্রকাশ পেলো সবাক-চিত্রে, চিত্রামোদীরা খুব যেন হাসি-মুখ নিয়ে ফিরে এলো না।

সত্যি, সবাক-চিত্রে "মহানিশা"র কোনো সার্থকতাই ফুটে' ওঠে নি।

এবং, এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী পরিচালক নরেশ মিত্র। নির্ব্বাক যুগে চিত্র-পরিচালক হিসেবে যে নাম ইনি অর্জ্জন করেছিলেন, সবাকে সে নামের হয়েছে জলাঞ্জলি।

মঞ্চের আব্‌হাওয়া চিত্রে অচল—অসম্ভব। সাহারায় যেমন অসম্ভব বর্ষা।

কিন্তু, নরেশবাবুর চল্‌তি-স্বাস্থ্য মঞ্চের হাওয়ায় সুস্থ। নাট্যজগতের পল্‌তা-পথ্য এঁর অম্বল রোগের অমোঘ রসায়ন। চিত্র-রাজ্যের আবহাওয়া তাই এঁর কিছুতেই সইবে না। পেট-রোগা মানুষের যেমন সয়না দার্জ্জিলিঙ।

তাই মঞ্চের হাবভাব আদব-কায়দা এঁর মাথায় অবিরত ঘুরে' বেড়াচ্ছে। ফিল্মের একটি ষ্টুডিয়ো এঁর কাছে ষ্টেজ্ ছাড়া যেন আর কিছু নয়। তিনি হয়তো ভাবেন—ভারী মজার এ জায়গা। 'ড্রপ-সিন' কিম্বা 'সিন সিফটিং'-এর কোনো হাঙ্গামা এতে নেই। একটা জায়গায় বসে', খানিকটা উজ্জ্বল আলোর নীচে চালাও ক্যামেরার হাতল।

সবাকচিত্রে "মহানিশা" তাই সবাক-চিত্র না হয়ে হয়েছে চিত্রে-মঞ্চ-নাটক। জায়গায় জায়গায় 'ড্রপ্' না ফেলে দেয়া হয়েছে 'ফেড-আউট্'। 'ড্রপ' না তুলে করা হয়েছে

'ফেড-ইন্'। একটা উপন্যাসকে চিত্রের ছাঁচে ঢাল্‌তে হ'লে কোন দৃশ্যএর প্রয়োজনীতা—কোন দৃশ্যের অপ্রয়োজনীতা কতখানি, বা কোন দৃশ্যের কতখানি আয়ু হওয়া উচিত, বা কী রকম ভাবে দর্শকের সামনে টেনে আনা দরকার—সে জ্ঞানের অল্পমাত্র পরিচয়ও নরেশবাবুর ভেতর আমরা পাই নি। তাই এ চিত্রখানা হয়েছে—শুধু দেখে যাও ছবি, আর শুনে যাও কথা। ভাগ্যিস্ অনুরূপা দেবীর গল্পে উপভোগ্য কয়েকটি ঘটনা ছিলো, তা না হ'লে আগ্রহ জাগাবার কোনো জিনিষই তো এতে থাক্‌তো না। দর্শক ক্যাবলা তার সঙ্গী হাবলাকে হয়তো বল্‌তো—'এই হাবলা, ঘুমোচ্ছিস্ নাকি? হাবলা হাই তুলে' হয়তো বল্‌তো—'দূর! তুই তো'—

অন্ধ মেয়ে ধীরার গল্প কার কাছে আজ অজানা? মৃতপ্রায় এক ধনীকে শেষ শান্তি দিতে নির্ম্মলের সঙ্গে তার বিয়ে, তার শোক, তার শাস্তি, স্বামীকে সুখী করবার তার অপূর্ব্ব পন্থা—সবাক-চিত্রের যে সম্পূর্ণ উপযোগী এ আমরা একশোবার মানি। আর, এও জানি যে এই গল্পই হচ্ছে নরেশবাবুর এ প্রচেষ্টার একমাত্র আকর্ষণ। অনুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে যে পরিচালকের সে-ও এই গল্পের climax খুঁজে নিতো তিনটি। প্রথম, মুরলীবাবুর মৃত্যু-দৃশ্য। দ্বিতীয়, নির্ম্মলের অ্যাক্‌সিডেন্ট। তৃতীয়—সব চেয়ে বড়—ধীরার সমুদ্রে ঝাঁপ।

কিন্তু, নরেশবাবু কী করেছেন শুনুন। প্রথমটি—একেবারে রঙমহলের রিভলভিং ষ্টেজ। দ্বিতীয়টি অ্যাক্‌সিডেণ্ট বলে মনেই হয় না। আর, তৃতীয়টি একেবারে হাস্যাস্পদ।

এই শেষ দৃশ্যে—'মহানিশা, মহানিশা'—অনুরূপা দেবীর সেই ঘোরতর বিবরণ। আর, এই সবাক চিত্রে? খানিকটা কালো আকাশ। হঠাৎ খানিকটা টিনের শব্দ। তারপর—কালো আকাশে বেশ খানিকটা চকের দাগ। এসব কী? না, বজ্র বিদ্যুৎ-ধারা অনেক আগেই ডেকের রেলিঙ ডিঙিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আগে নির্ম্মলের সঙ্গে শেষ-কথা বল্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। নির্ম্মল এলো। বল্‌লে 'তুমি এসব কী বলছো ধীরা?' ধীরা বল্‌লে কিছু কথা। তারপর নির্ম্মলই তাকে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিলে!

এ হেন অক্ষমতার পরিচয় পরিচালনায় অনেকদিন বোধহয় দেখা যায়নি। আর, এ দৃশ্যটি আমাদের ভুলতেও লাগবে অনেকদিন!

চিত্রটির আরম্ভ বাজে, মাঝখানটা মন্দ নয়, আবার শেষদিকটা সেরকমই বাজে। তা ছাড়া, বাঙলা ছবিতে অতো ইংরেজী ভাষার ব্যবহার পরিচালকের না করাই উচিত। দর্শকদের হাসাবার জন্য যে সমস্ত উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিলো—সে গুলোও অত্যন্ত বাজে, আর অত্যন্ত সস্তা।

এরকম উদাহরণ আর কত দেবো! বাজে দৃশ্যের বাহুল্যতাই বা এ চিত্রে কতো! রেঙ্গুন দেখতে দেখতে ঘুম আসে। গ্রামের চাষবাসের নানারকম দৃশ্যে যে কোনো লোকের ভালোরকম চাষা হবার উপায় এতে আছে। আর, শ্রাদ্ধ-কার্য্যের মন্ত্রও আপনি অনেকখানি এর থেকে শিখতে পাবেন!

সম্পাদনা যিনি করেছিলেন তাঁর কী হয়েছিলো জানতে ইচ্ছে করি। তাঁর আঙুলে হয়েছিলো ব্যথা; না কলকাতায় কাঁচি পাওয়া যাচ্ছিলো না? ছবির প্রায় অর্দ্ধেকটা কেটে অনেকটা উন্নতি সাধন তিনি ইচ্ছে করলেই তো করতে পারতেন। অবিশ্যি, সে শক্তি তাঁর আছে কিনা এও যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়!

ক্যামেরার কাজ অচল। ক্যামেরা-ম্যানের ছবি তোলার প্রাথমিক ধারাও জানা নেই। তাই অভিনেতৃদের মুখে কখনও ভূতের ছাপ পড়েছে, কখনও হ'য়েছে শ্বেতী। তাই অশোককে আমরা উপদেশ দিই—মানে মানে তিনি এ লাইন থেকে বিদায় নিলেই মঙ্গল।

শব্দযন্ত্রের কাজ মন্দ নয়। কণ্ঠস্বর সবার অপরিষ্কার না হলেও সবার সবসময়ে একরকম হয়নি।

এ দু' বিভাগের কাজ শিশিরবাবু করলেই আরো উন্নতধরণের করতে পারতেন। বড়ুয়া ষ্টুডিয়ো ছাড়া যে কোনো ষ্টুডিয়ো নির্ব্বাচনে এর চেয়ে ঢের বেশী উন্নত কাজ পাওয়া যেতো, আমাদের বিশ্বাস।

আবহাওয়া-সঙ্গীত এ চিত্রে নেই বললেই চলে। তবে যেখানে আছে—সেখানে শুধু একটা গীটার কিম্বা বেহালা বাজিয়ে কোন-রকমে কাজ সারা হয়েছে।

অভিনয়ও চিত্রটির, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, একেবারে নরেশবাবুর পরিচালনারই মত। একেবারে মঞ্চ-ঘেষা। ক্যামেরার সাম্‌নে অভিনয় করতে সবাই যেন ভুলেই গিছলেন। তাঁরা যেন ভেবে নিয়েছিলেন—এ 'রঙমহল'। সামনে কাতারে কাতারে সব লোক ব'সে—কারো হাতে অপেরা-গ্লাস। মুরলীবাবুর ভূমিকায় রবি রায়ের অভিনয় আমাদের
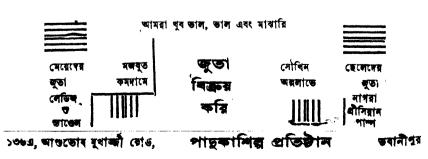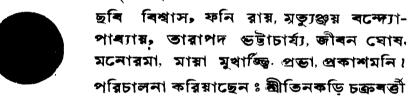
বেশ ভাল লেগেছে। নরেশবাবুর বেহারী আর উন্নত হওয়ার সুযোগ ছিল। মুরলী-বাবুর চঞ্চল, পরে সুশীল ছেলের ভূমিকায় নেবেছেন ভূমেন রায়। চিরকাল অতি-অভিনয় করেন বলে' যিনি বিখ্যাত। তবে এখানে ভালো মানিয়েছিলো বলেই হয়তো সবার একে মন্দ লাগবে না। যোগেশ চৌধুরী সিরিও-কমিক অংশে ভাল অভিনয় করেন। রাধিকাপ্রসন্নও তাই সবায়ের ভাল লাগবে।

অত্যন্ত 'সুশীল এবং সুবোধ বালক' নির্ম্মলের অংশে নেবেছিলো জহর। প্রথম দিকে এর অভিনয় হয়েছে প্রাণহীন—এক পুতুল। কথা বলার ভঙ্গী জহরের আগের চেয়ে একটু সহজতর হয়েছে, কিন্তু সেই কথাবলার ভাব তার চোখে একেবারেই খেলেনি। কৃষ্ণধনের কৃষ্ণধন ছ্যাবলামিতে ভরা। অন্যান্য সবাই অত্যন্ত বেশী মঞ্চ-অভিনয়ের জন্য অনুল্লেখযোগ্য।

মেয়ে ভূমিকাগুলোর ভেতর শ্রীমতী চারুবালার ছিলো সব চেয়ে কঠিন পাট। কারণ, সবাক "মহানিশা"য় ইনিই হচ্ছেন সেই চির-দুঃখী ধীরা। চির অন্ধের হাব ভাব চলাফেরায় এঁর অভিনয় চিত্রে অন্যান্য অভি-নেত্রীর তুলনায় যে ভালো এ স্বীকার করছি। তবে এর মুখ পর্দ্দার উপযোগী মোটেই মনে হ'লো না। এবং,'মেক-আপ'এর সাহায্যেও এর চেহারা যে আরো উন্নতি কেন করা হয় নি—তা একমাত্র নরেশবাবুই জানেন। রেণুকা রায়ের সম্বন্ধে সকলেরই বেশ ভালো ধারণা আছে। কিন্তু এর ভবিষ্যৎ যে কোন পথে তা' বলা শক্ত।

জনৈকা স্ত্রীলোকের ভূমিকায় শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, তাঁর সেই অদ্ভুত একরকমের অভিনয় করেছেন। পতিত পাবনীর অংশে শ্রীমতী হরিসুন্দরীও তাই। এদের দু'জনকে ছবি থেকে এখন ছুটি দিলে কীরকম হয়!

শ্রীমতী আসমানতারার সৌদামিনী একেবারে খাস্ মঞ্চের। অন্যান্য ভূমিকা অচল।

এসব সত্বেও "রূপবানী"তে শিশিরবাবুর "মহানিশা"র কিছুদিন চলা বিশেষ বিচিত্র নয়। তার কারণ—দু'টো। অনুরূপা দেবীর অন্ধ-ভক্তের সংখ্যা বাংলা দেশে খুব কম নয়। আর, চিত্রটির প্রচারকার্য্যে অল্পবিস্তর অভিনবত্বের ছোঁয়াও আছে। এবং, এদু'টো কারণেরই জোরে, মনে হয়, "মহানিশা"র বিদ্যুৎ কিছুদিন ধরে' "রূপবানী"তে চম্‌কাবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

এই ষ্টুডিওতে তিনটি বিভিন্ন ইউনিটে তিনখানা ছবির কাজ চলছে। করদারের উর্দ্দু ছবি "বাঘী-সিপাহী" আদ্ধেক শেষ হ'য়েছে। দেবকী বসু বস্তীর দৃশ্য প্রায় শেষ কোরে এনেছেন। স্পেণ্টার পারস্য-চিত্র "লয়লা মজনু" অনেকদূর এগিয়েছে।

* * *

ফ্রান্‌কলিন-গ্রান্‌ভিল দল নতুন বড়লাট বাহাদুরের আগমন ও পুরণো বড়লাট বাহাদুরের প্রত্যাবর্ত্তনের যে চিত্র গ্রহণ কোরেছিলেন গেল ২৯শে এপ্রিল বোম্বায়ের 'এক্‌সেল্‌সার থিয়েটারে', বোম্বায়ের বড়লাট বাহাদুর ও লেডী ব্রাবোর্ণের সমক্ষে তার আনুষঙ্গিক-প্রদর্শন হয়। মিঃ .বি, এল্ খেমকা, ক্যাপ্টেন ও মিসেস্ ফ্রাঙ্কলিনও এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন।

এই ইউনিট এখন 'পেরিকলারে' বোম্বায়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একটি

'পতি নহ তুমি পিতা'

রসিক যেজন জানে তার মন
রসিকতা কা'রে বলে
কুলমান ছাড়ি' দেয় সে যে পাড়ি
আদিরস-নদীজলে।
এই সাথে আর রূপচাঁদ যার
সহায় হয়েছে ভাই,
এ জগৎ মাঝে কভু তার কাছে,
কিছু অসাধ্য নাই।
যৌবন-রাতি নব নব সাথী
লইয়ে কাটানু হাসি'
রূপ ও রূপায় মিলে গিয়ে হায়
ছড়ালো জ্যোছনারাশি।
ভেবেছি কি তবে শেষে কি যে হ'বে
এর পরিণাম-ফল?
বেরসিকদল করি কোলাহল
ঘুলায়ে তুলিবে জল?
পতি হইবার নিতি বারে বার
সাধনা ক'রেছি ভাই,
হইবারে পিতা সত্যি, হে মিতা
মনে কোন সাধ নাই।
কর্ম্মে সবার আছে অধিকার
এই তো গীতার সার
পাব নববধূ খাব ফুলমধু
ফলের ধারিনা ধার।
এতদিন পরে বলে সবে মোরে
"পতি নহ তুমি পিতা",
এই অঘটন অশুভ রটন
হইতে বাঁচাও মিতা।

টপিক্যাল তুলে তারপর ধরমপুর ষ্টেট অভিমুখে যাত্রা কোরবেন।

খেমকা অভিনন্দিত

বোম্বে টকীজের রায় সাহেব চুনীলাল মিঃ বি, এল, খেমকাকে অভিনন্দিত

করবার জন্যে একটি 'ডিনার-পার্টির আয়োজন করেন। এই উপলক্ষ্যে স্যার রিচার্ড টেম্পল, ক্যাপ্টেন চোপরা আই-এম-এস, ক্যাপ্টেন ও মিসেস ফ্রানকলিন মিঃ ডব্লিউ, জে, ময়লান, মিঃ পল পেগী, মিঃ এজরা মির, মিঃ ও মিসেস্ কুইরিবেট প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

কালী ফিল্মস

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় এদের "অন্নপূর্ণার মন্দির" প্রায় শেষ হ'য়েছে। আসচে জুন মাসের প্রথমেই ছবিখানা দেখাবার চেষ্টা চল্‌ছে। "অন্নপূর্ণার মন্দিরে"র গল্পাংশ ছবির পক্ষে উপযোগী। এই গল্পটিকে আশা করি চক্কোত্তি মশাই ভালভাবে রূপ দিয়ে চিত্রামোদীদের কাছে নিজের গুণপনা জাহির কোরবেন। তবে চক্কোত্তি মশাইকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, এই ছবির জন্যে গতানুগতিক পন্থা না নিয়ে তিনি প্রায় সব কটিই নতুন মুখ পর্দ্দায় দেখাবেন। "অন্নপূর্ণার মন্দিরে"র চরিত্র-লিপি এই,—বিশু—ছবি বিশ্বাস, রামশঙ্কর—ফণি রায়, হরিশঙ্কর—মৃত্যুঞ্জয় বাড়ুয্যে, কালীপদ—বুলা, নরেন—তারাপদ ভট্টাচার্য্য, সান্যাল—শচীন চাটুয্যে, ডাক্তার—রামচন্দ্র মিত্র, সুধীর—জীবন ঘোষ, অন্নপূর্ণা—মনোরমা, জাহ্নবী—প্রভা, সতী—মায়া মুখুয্যে, সাবিত্রী—সাবিত্রী (পক্কী), ক্যাস্ত—প্রকাশমণি।

* * *

এর সঙ্গে জ্যোতিষ মুখুয্যের তোলা "ভোট-ভণ্ডুল" দেখানো হবে। এ ছবিখানার শুটিং শেষ হ'য়েছে। মুখুয্যে মশাই পাকা-রসিক তাঁর হাতে এই রস-চিত্র যে রসিকের মনে রস সঞ্চার কোরবে—এ ভরসা সবাই করে।

* * * *

সুকুমার দাশগুপ্তের হিন্দি "প্রফুল্লে"-র নাম হ'ল "আশিয়ানা।" বন্ধু সুকুমার পরিচালনা কাজে নতুন সত্য—কিন্তু তার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে অগাধ। তার আগ্রহ, তার চেষ্টা প্রথম ছবিতেই যে আমাদের দেশের তথাকথিত পরিচালকদের ওপরে স্থান দেবে—একথা আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারে। বন্ধুবরের বহুদিনের সাধনা সফল হবে—জয়যুক্ত হবে, নিশ্চয়ই হবে।

গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী" ফুল্লরা-"র মঙ্গল শুটিং নিয়েছেন। ছবিখানা অবশ্য কালী ফিল্মসের নয়—তিনকড়ি বাবুর নিজের।

কোয়ালিটী পিকচাস

এদের দ্বিতীয় ছবি শীঘ্রই সুরু করবার চেষ্টা চল্‌ছে। শরৎচন্দ্রের "চন্দ্রনাথ," অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্র" ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "দানের মর্য্যাদা"—এই তিনটি গল্পের একটি হয়ত' এঁরা তুলবেন। আর কোনও একটি বিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে কথা চল্‌ছে এবারকার ছবি তোলবার জন্যে।

চিত্র-ভারতী

মায়াপুরী ষ্টুডিওতে চানী দত্তের চিত্র-ভারতীর "মাণিক-জোড়" প্রায় আধাআধি শেষ হ'ল। এখানে "মাথুর" ও শৈলজা মুখুজ্যের "অনাথ আশ্রম" তোলার ব্যবস্থা চল্‌ছে।

চন্দ্র ফিল্মস

এদের "পরপারে" মুক্তি প্রতীক্ষায়। এ মাসের মধ্যেই চিত্রায় ছবিখানা দেখানো হবে। দুর্গাদাস, অহীন্দ্র ও জ্যোৎস্না প্রভৃতি, বাঙলার জনপ্রিয় অভিনেতৃ সম্মেলনে, যতীন দাস ও কৃষ্ণচন্দ্র দে'র পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছবিখানা যে অভিনব রূপ পরিগ্রহ কোরবে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

ডি-জি-টকীজ

সেদিন সন্ধ্যের সময় কালী ফিল্মসে গিয়ে শুন্‌লাম 'আজ সমস্ত রাত্তির শুটিং হবে "দ্বীপান্তরে"র। সত্যনাথ বললে, "চলুন একটু শুটিং দেখি।" তাই গুণময়বাবুকে নিয়ে 'সেটে'-র দিকে এগুলাম—কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা'। সেখানে দেখলাম, তখনও সেট্ তৈরি হ'চ্ছে—কেউ নেই। গুণময় বাবুকে জিজ্ঞেস কোরলাম ডি-জি কই? তিনি বললেন মেক্-আপ রুমে। কিন্তু সেখানে গিয়েও সমস্যায় পড়লাম ডি-জি'কে আর দেখতে পাই না—আশে পাশে অনেককেই দেখলাম কেউ বা কালা পাহাড় কেউ বা সাদা পাহাড় সেজে বসে রয়েছে। হরিশবাবুকে জিজ্ঞেস কোরলাম ডি-জি কই? তিনি বেশ সহজভাবেই উত্তর দিলেন—"আপনাদের পাশেই।" বললাম আপনিই মিঃ ডি-জি? তিনি একটু হেসে বললেন—"আমি সর্দ্দার।" বাস্তবিকই চমৎকার রূপ-সজ্জা কোরেছেন ইনি। এমন কী মনে হয় শুটিংয়ের ঐ সাজে যদি তিনি বাড়ী ফেরেন তা' হ'ল তাঁর অতি-আপনার-লোকের কাছেও বাড়ী ঢোকবার পাশপোর্টের জন্যে তাঁকে দস্তুরমত সাক্ষীসাবুদ জোগাড় কোরতে হবে।

পপুলার পিক্‌চাস

আসচে শনিবার 'শ্রী'-তে এদের দ্বিতীয় অর্ঘ্য "আবর্ত্তন" মুক্তিলাভ কোরবে। এই ছবিখানা যে চিত্রামোদীদের খুব আনন্দ দেবে—এ ধারণা আমাদের হয়। প্রথমতঃ এর গল্পটির ভেতর চিত্রোপযোগী মাল-মশলা লোকের মনে প্রতি মুহূর্ত্তেই নতুন নতুন ভাব-রসে আপ্লুত কোরবে। দ্বিতীয়তঃ এ ছবিতে যাঁরা অভিনয় কোরেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই চিত্ররাজ্যে নবাগত—বিশেষতঃ কুমারী শীলা হালদারের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় চিত্রবিলাসীদের কাছে মস্ত বড় আকর্ষণ। তারপর পরিচালনায় সতু সেন ও সম্পাদনায় চারু রায় যেন মাণিকজোড়। আমরা জানি এই ছবিখানার সাফল্যের জন্যে যামিনী মিত্তির চেষ্টার কসুর করেন নি। তাঁর এ শ্রম যে সার্থক হবে—এ আশা আমরা করি।

* * *

ইতিমধ্যেই এরা আবার শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিত মশাই" তোলার আনুষঙ্গিক কাজ সেরে ফেলেছেন। এতে মূল ভূমিকা দু'টি বৃন্দাবন আর কুসুমে যথাক্রমে নামছেন অমলেন্দু ঘোষাল ও শেফালিকা (পুতুল)।

বিবিধ

ভিয়ানা-যাত্রী প্রমথনাথ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কঠিন চক্ষু-রোগে আক্রান্ত হইয়া ভিয়ানা অস্ত্রোপচারের জন্য গত মঙ্গলবার বোম্বাই মেলে কলিকাতা ত্যাগ করেন। ষ্ট্রেচারে করিয়া নীত ডাঃ প্রমথনাথকে বিশেষ অসুস্থ বলিয়া বোধ হইল। অধ্যাপক জে, পি, নিয়োগী, অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ, শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার, ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সম্পাদক মিঃ ডি, কে, সান্যাল ও ডাঃ প্রমথনাথের বহু গুণমুগ্ধ ছাত্র ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ প্রমথনাথ নিরাময় হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন ভগবানের নিকট আমাদের এই আন্তরিক প্রার্থনা।

'তরুণ আলো'

গত রবিবার সন্ধ্যার সময় শঙ্কর ঘোষ লেনস্থ মেট্রোপলিটন (আদি) বিদ্যালয় ভবনে "তরুণ-আলো"র বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে সন ১৯৩৩ সালে মেট্রোপলিটন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কতিপয় বালকের চেষ্টায় "তরুণ-আলো" নামক একখানি হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হয়। তদবধি এই পত্রিকা যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যে সমস্ত ছাত্র ইহার উদ্যোগী ছিল তাহারা আগামী বৎসর বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিবে। তাহারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও যাহাতে পত্রিকাখানির প্রকাশ বন্ধ না হয় তাহার জন্য তাহারা ২য় শ্রেণীর ছাত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। শ্রীমান অজয় দাশগুপ্তের এবং শ্রীমান নির্ম্মল রায়ের যুগ্ম-সম্পাদনায় এই পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে। শ্রীযুত প্রভাত গাঙ্গুলী, চারু বসু, অনিল মুখার্জ্জি, হরিচরণ বিদ্যারত্ন, পাঁচুগোপাল সান্যাল, নৃপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন

গত শুক্রবার আশুতোষ হলে মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন সভায় বিশিষ্ট অতিথিরূপে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু শুভাগমন করেন। শরৎচন্দ্র বসুকে অভিনন্দিত করিয়া কবিরাজ অনাথনাথ রায় বলেন:—রাষ্ট্রনেতা শরৎচন্দ্র তাঁহার নিঃসঙ্গ বন্দী জীবনে ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ এই তন্ত্রেরই অঙ্গ। রাষ্ট্রনায়কের কর্ত্তব্য জাতীয় দুর্দ্দিনে তাহার পথ নির্দ্দেশ করা। তিনি আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিন যাহাতে দেশের ও দশের কল্যাণ হইবে। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, কবিরাজ শিবনাথ সেন ও মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত বসুকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার ত্যাগের ও দেশ সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, বন্ধুবর কবিরাজ অনাথনাথ রায় বলিয়াছেন যে, আমি তন্ত্র-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ইহা ঠিক নহে। আমি আমার বন্দী জীবনে তন্ত্রশাস্ত্রের কয়েকখানি পুস্তক মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছি সত্য বটে এবং আমি আমার কোন বন্ধুকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম এবং তাহা সংবাদ পত্রেও স্থান পাইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য রাজাপ্রজা সকলেরই চেষ্টা করা উচিৎ। আয়ুর্ব্বেদকে আমি শ্রদ্ধা করি। জ্ঞানে কখনও কবিরাজী ব্যতীত অন্যকোন ঔষধ আমি ব্যবহার করি নাই। কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায় ও তাঁহার মৃত্যুর পর কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির ঔষধ প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতাম। কংগ্রেসের আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বরাবরই সহানুভূতি আছে তবে কংগ্রেস নানা কাজে ব্যাপৃত। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবেত চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাহাদের আশা সাফল্যলাভ করিবে।

দেশে যদি নিজেদের গভর্ণমেণ্ট থাকিত তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের ষ্টেট ফ্যাকালটীর জন্য কোন কথাই বলিতে হইত না। কবিরাজ মহোদয়গণ এই বিষয়ে যতটা চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে হয়ত শীঘ্রই তাঁহাদের চেষ্টা সাফল্য লাভ করিবে।

ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘ

আগামী ২৬শে বৈশাখ, শনিবার (৯ই মে) ৪৬ নং কালিঘাট রোডে বৈকাল ছটার সময় ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘের ২য় বার্ষিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাধুখাঁ মহাশয় পৌরহিত্য করিবেন।

ডেণ্টাল কংগ্রেস

'ক্যালকাটা ডেন্টাল রিভিউ'-এর সম্পাদক ডাঃ আর, এন, ঘোষ আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে ভিয়েনায় 'ইন্টার ন্যাশন্যাল ডেন্টাল কংগ্রেসে'-র অধিবেশনে যোগদান করিবেন। আমরা যতদূর জানি মিঃ ঘোষ বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম হইতে মনোনীত একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ইন্টার ন্যাশন্যাল ফেডারেশনে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন। ১৯৩১ সালে প্যারিসের অধিবেশনে ইনি যোগদান করেন। জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে ইনি কলিকাতা হইতে রওনা হইবেন।

'স্মৃতি-সঙ্ঘ'

গত ৩রা মে রবিবার ২ ও ৪নং মাধব চাটার্জ্জির ষ্ট্রীটে 'স্মৃতি-সঙ্ঘের' উদ্যোগে ও

শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার সভাপতিত্বে একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ২২নং ওয়ার্ড হইতে যে দুইজন কাউন্সিলার নিযুক্ত হন তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিবার জন্যই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রথমে অর্কেষ্ট্রার পর সুগায়ক শ্রীসুনীল বসু তার সঙ্গীত দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করেন। তারপর শ্রীঅমিয় বসু ও কুমারী অনিমা রায়ের গান হয়। কুমারী সাধনা বসুর নৃত্যও উপভোগ্য হয়। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রেরও ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবশেষে সঙ্ঘের সভ্যগণ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। রাত্রি ১০॥০ ঘটিকার সময় উৎসব ভঙ্গ হয়।

রচনা ও গল্প প্রতিযোগিতার ফল

কালিকিঙ্কর ছাত্র সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিভুদান রায়চৌধুরী জানাইতেছেন—

রচনা ও গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল সাধারণকে জানাইতে আমাদের একটু বিলম্ব হইয়া গেল, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত। রচনা এবং গল্প উভয় প্রতিযোগিতার জন্যই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু গল্প মাত্র দুইখানি পাওয়ায়, তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্ব্বাচন করা আমাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হওয়ায় উহার পরীক্ষা এবৎসর স্থগিত রহিল।

রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন :—শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল মৈত্র, কলিকাতা। দ্বিতীয় স্থান :—শ্রীঅজিত কুমার দত্ত, ডাল্টনগঞ্জ।

"চিত্রালী" সম্পাদক শ্রীসুবোধ রায় আমাদের রচনাগুলি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন।

সকলকে পত্রদ্বারা তাদের ফলাফল জানানো অসম্ভব। যাহারা ডাক টিকেট পাঠাইয়াছেন তাহাদেরই কেবল বিশেষ পত্র দেওয়া হইল।

প্রথম ও দ্বিতীয় রচনা কোন সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইবে। উহা এক্ষণে ছাত্র সমিতির সম্পত্তি।

ব্রীজ খেলা

এসোসিয়েশনের আগামী নির্ব্বাচন :—ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের নির্ব্বাচন আসন্ন প্রায়। আগামী রবিবার নির্ব্বাচন দিবস। সুতরাং চতুর্দ্দিকে এখন থেকেই ধূমধাম আরম্ভ হয়েছে এবং নানা দিক দিয়ে নির্ব্বাচন প্রার্থীরা নিজ নিজ বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দিচ্ছেন। গত সংখ্যায় আমরা এই নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছিলাম, বর্ত্তমানেও দুই চারিটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। নির্ব্বাচন যে আজকাল ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুসীতে পরিণত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁরা প্রকৃত কর্ম্মী তাঁরা অনেক সময় নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামেন না কারণ তাঁরা বলেন, অবশ্য সবিনয়ে, যে "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে" লাভ কি। যোগ্যতার আদর যেখানে নাই সেখানে ভোট ভিক্ষা করে স্বীয় কৃতিত্বের প্রদর্শন কি হীনমতির পরিচায়ক নয়? এই তো গেল এক তরফের মনের কথা, আর এক দল আছেন যাঁরা এই সুযোগে তোড় যোড় করে নিজেদের যোগ্য প্রতিপন্ন করবার জন্য নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। কিন্তু মজা এই যে, যোগ্যতার পরিচয় নির্ব্বাচনের সময়েই শেষ হয়ে যায়। নির্ব্বাচনের পর যখন প্রকৃত শক্তির পরিচয় দেবার সময় আসে তখন তাঁদের নিজ নিজ বপুখানি নিয়ে নড়াচড়া করবার আর উৎসাহ থাকে না। ফলতঃ যে উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে উদ্দেশ্য চিরকালই 'যে তিমিরে সে তিমিরে'—একেবারেই অকর্ম্মণ্য থেকে যায়। গত বৎসরের নির্ব্বাচনের পর থেকেই আমরা উপলব্ধি করে আসছি যে এই নিষ্ঠুর সত্যতা আমাদের এতই ভয়ানক আঘাত করেছে যে এ সম্বন্ধে আলোচনা না করে পারা যায় না। গত মনোনয়নে আমরা সেক্রেটারীরূপে যাঁকে পেয়েছিলাম তিনি ও আর গুটি কয়েক সভ্য ব্যতীত অপর কাকেও যথার্থ উপযুক্ত মনে করতে আমরা অসমর্থ। আমাদের মনে হয় যে গত বৎসরের সেক্রেটারী মহাশয় যদি এ বৎসরেও স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন তা' হলে তাঁর অদম্য শক্তি ও উৎসাহ এই এসোসিয়েশনের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সেক্রেটারী মহাশয়ের সম্বন্ধে যা' বলা হয়েছে তার শতাংশের এক অংশও এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের সম্বন্ধে বলা চলে না। ইহাই পরম দুঃখের বিষয় যে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে যদি উক্ত পদের মর্য্যাদা পূর্ণরূপে রক্ষা করতে না পারা যায় তবে সে পদের মোহ কেন এত দুর্দ্দাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের সাহায্য ও আনুকূল্য লাভ করলে সেক্রেটারী মহাশয়ের পক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে ও সুচারুরূপে স্বকার্য্য সম্পাদন বড়ই সহজ হত। এবং এসোসিয়েশনের বহুবিধ কল্যাণ ও বহুমুখী উন্নতি আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারতাম্। আগামী নির্ব্বাচনে ভোটদাতারা এ বিষয়ে সচেতন হবেন কি? শুধু এসোসিয়েশনের দলসৃষ্টির পরিপোষকতা করবার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা যোগ্য কর্ম্মীবিহীন যে কোন প্রতিষ্ঠানের উপর লক্ষ্য করা যাক না কেন আমরা দেখতে পাব যে কয়েকটি দল আছে যে গুলি দ্বন্দ্ব ও স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির মোহে আবদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক কার্য্য বিস্মৃত হয়ে কেবল ধ্বংসমূলক প্রবাহের অবতারণা করেন। আমাদের ব্রীজ এসোসিয়েশনে এদলের প্রয়োজন নাই। এই এসোসিয়েশনের নিয়ম-কানুন আরও সুচারুরূপে গঠন করে যথা সম্ভব সেগুলির দোষ ত্রুটীর সংশোধন করে এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যে অক্ষুণ্ন রাখাই বিধেয়,—এখানে আমার দল জয়ী হল কি পরাজিত হল বা জয়ী হবে কি পরাজিত হবে এ প্রসঙ্গ অর্থহীন। আমাদের মনে হয় যে পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত যে সকল সভ্য কার্য্যে অবহেলা করে এসেছেন তাঁদের নির্ব্বাচিত না করে যোগ্য ব্যক্তিগণের মনোনয়ন সর্ব্বতোভাবে যুক্তি সঙ্গত। সাধারণ ভাবে আলোচনা করেই আমরা বলতে পারি যে হাওড়ার দিক থেকে 'হাওড়া সাণ্ডে ক্লাবের' কর্ম্মকর্তা শ্রীযুক্ত নন্দী মহাশয় ও কলিকাতার উত্তর দিক থেকে 'দম্ দম্ ক্লাবের' কুমার বিশ্বনাথ রায় মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করলে নির্ব্বাচনের ফল বোধ হয় শুভই হবে। আমরা ব্যক্তি বিশেষের নির্ব্বাচনের প্রতি অন্ধভাবে আকৃষ্ট নই, যোগ্য ও গুণবান্ যদি নির্ব্বাচিত হন তবেই এসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তর হবে এবং আমরাও সুখী হব।

সেতুবন্ধ

= উপন্যাস =

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রানী আজকাল মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে আসে। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু প্রত্যহ ইন্দ্রানীর আসার আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। সকালের দিকে বাগানে বসে লোহার বাজারের দর কি রকম ওঠানামা করছে সেই কাগজখানা মৃত্যুঞ্জয় দেখছিলো এমন সময় ইন্দ্রানীর বামুন ঠাকুর একখানা চিঠি নিয়ে এলো। ইন্দ্রানী কলেজের মেয়েদের সঙ্গে আজ রাতে হাজারিবাগে আউটিঙে যাবে তাই সে মৃত্যুঞ্জয়কে খবরটা জানিয়েছে।

চিঠির জবাব দেবেন বাবু?

না, তুই যা।

ক'দিন যখন ইন্দ্রানী এখানে আসেনি আজ নিশ্চয় সে আসবে এইটাই মৃত্যুঞ্জয় আশা করছিল। ইন্দ্রানী আসতে পারবে না জানতে পারায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাজের তালিকা সমস্ত এলোটপালোট হয়ে গেল। মেজাজ অত্যন্ত খারাপ থাকায় সমস্ত দিন সে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলে। ইদানিং কাজ করবার আগ্রহও তার নেই। কর্ম্মচারীদের উপর ভার দিয়ে সে হাল ছেড়ে বসে আছে। অফিস ঘরের অপরিমোচনীয় বিশৃঙ্খলা দেখে কান্না আসে। একদিকে কতকগুলো ফাইল টাই করা আছে। খাতাপত্তরগুলো এলোমেলোভাবে ছড়ানো, অপর কোণে স্তূপীকৃত জঞ্জাল। চাকরগুলো বাড়ীতে আছে নাম মাত্র। তারা কখন কী যে করে মৃত্যুঞ্জয়ের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে ইন্দ্রানী এসে চাকরগুলোকে দেখতে পেলে বকে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত জঞ্জাল সাফসুতরো করিয়ে নেয়। মৃত্যুঞ্জয় নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছে।

পড়বার ঘরে রাতের খাবারটা চাকর দিয়ে গেছে। খিদে না থাকায় নামমাত্র বসে মৃত্যুঞ্জয় উঠে পড়লো। এইবার সে মৃণালকে চিঠি লিখতে বসলো। কিন্তু একটা লাইনও লিখতে পারলে না। মাঝখান থেকে কতগুলো সাদা কাগজের আশ্রাদ্ধ হলো। চিঠি লেখার সঙ্কল্প ত্যাগ করে সে একখানা বই নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। দু'একপাতা পড়তেই তার বেদনাপ্লুত অশ্রান্ত মন নিঃসঙ্গতাবোধের সুতীব্র অনুভূতিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। বইখানা খাটের উপর রেখে নীচেয় নেমে এসে টেলিফোন গাইড্‌টা উল্টেপাল্টে দেখে জনকতক বিশিষ্ট বন্ধুকে সে ফোন করলে। কিন্তু সকলেই একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে তার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে। গায়ে একটা জামা চড়িয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

খানিকটা এধার ওধার ঘুরে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ী ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলে। ঘুম না আসায় পুনরায় সে বই নিয়ে বসলো।

পরদিন মৃত্যুঞ্জয় ইচ্ছে করেই সমস্ত এনগেজমেণ্ট প্রত্যাখ্যান করলে। শুধু রাতে একজন বন্ধুকে নেমতন্ন করলে। বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত অনেক কথাবার্ত্তা চললো। কিন্তু এতটুকু সে শান্তি পেলেনা।

তিনদিন পরের ঘটনা—

রাত বোধ করি এগারোটা। মৃত্যুঞ্জয় বাইরের ঘরের সোফায় শুয়ে নিজের অধঃপতনের কথা চিন্তা করচে। এমন সময় টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি উঠে রিসিভারটা কাণে দিতেই একটা চাপা মিহি স্বর শোনা গেল। এস্বর তার সুপরিচিত।

—কে, ইন্দ্রানী? কোত্থেকে ফোন করচো?

—বন্ধুর বাড়ী থেকে। এখানেই আজ থাকবো। ঘণ্টাখানেক হলো আমরা এসেচি।

—আমার কাছে এলেই পারতে? একা যে সময় কাটিতে চাচ্চে না। কেমন আছো?

—ভালোই। দিদিকে চিঠি দিয়েচেন?

—আমাকে আর লজ্জা দিও না।

—আপনার কোন ওজুহতই শুনতে চাই না, মিত্তিরমশাই। দিদিকে চিঠি না দিলে ও-বাড়ী আর মাড়াচ্ছি না।

—শুনচো, ইন্দ্রানী? হ্যালো, হ্যালো—

কোন জবাব না পেয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মৃত্যুঞ্জয় একটা জিনিষের আবিষ্কারের আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো।

ব্যাপারটা অসম্ভব, কিন্তু সত্যি। মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রানীকে ভালবাসে। ইন্দ্রানীর উপস্থিতি প্রত্যহ তাকে নব নব আশায় প্রবুদ্ধ করেছে। সে অধীর হয়ে ইন্দ্রানীর অপেক্ষা করেছে কিন্তু নিরাশ হয়নি। ইন্দ্রানীকে কেন্দ্র করে যে প্রেম তার অন্তরে সঞ্চিত হয়েছিল সেটা আনন্দের আতিশয্যে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়লো।

মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রানীকে ভালবাসে এ-কথা ভাবতেও কেমন যেন হাসি পায়। সে ভাবে: ইন্দ্রানী কি তাকে ভালবাসে? তার সঙ্গে যে-দিন ইন্দ্রানী শেষ দেখা করে যায় সে বলেছিল—মিত্তির মশাই, আপনি বেশ মজার লোক। আপনার নিজের ক্ষমতার ওজন আপনি নিজেই জানেন না, এটা ভারী লজ্জার কথা। এ-কথার অর্থ কি?

হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় চঞ্চল হয়ে উঠলো। সোফায় শুয়ে সে কল্পনায় দেখে ইন্দ্রানী তার রূপলস্কার নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে

দাঁড়িয়ে। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে স্নিগ্ধ পেলব আভা, শিরায় শিরায় পরিপূর্ণ সজীবতা, দেহে ও মনে নব নব আশার অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা। ইন্দ্রানীর খেয়ালী মনে যে রং ধরেছে তারই অব্যক্ত আনন্দে শিউরে-উঠা ঠোঁটের কোণে হাসির দিব্যব্যঞ্জনা।

কল্পনার শুভ-মিছিল মৃত্যুঞ্জয়কে উৎব্যস্ত করে তুলেছে। আনন্দের আতিশয্যে সে সারা রাত ঘুমুতে পারলে না। পরদিন সকাল বেলায়ও নিজের আনন্দমুখর মনের বলগাকে সংযত করা কঠিন হয়ে উঠল। মন প্রফুল্ল থাকায় আহারের প্রয়োজনাতিরিক্ততাকে সে মোটেই গ্রাহ্য করলে না।

কল্পনার চোখে ইন্দ্রানী সম্বন্ধে যে-দৃশ্যটি সে মনে মনে এঁকেছিল তারই মোহমিশ্রিত আনন্দে অধীর হয়ে মৃত্যুঞ্জয় চলাফেরা করছে। একদিন একটা ফুলের তোড়া ইন্দ্রানীকে সে পাঠিয়ে দিলে। এই উপঢৌকনের পেছনে যে বিশেষ বার্ত্তা গুপ্ত অবস্থায় রয়েছে এটা যদি ইন্দ্রানী বুঝতে না পারে এই চিন্তায় মৃত্যুঞ্জয় অস্থির হয়ে উঠল।

* * *

সরোজের ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রিত সভায় ইন্দ্রানীর সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা হয়ে গেল। ইন্দ্রানীও সেই সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিল। ইন্দ্রানীকে লোকজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মৃত্যুঞ্জয় আনন্দের প্রাবল্যে কিছুক্ষণের জন্য কোন কথা কইতে পারলেনা। একটু এগিয়ে এসে তবু সে বল্লে: এরকম করে আমাকে কষ্ট দেবার মানে কি, ইন্দ্রানী?

—কষ্টটাকে আপনি যদি জোর করে টেনে আনেন সে দোষ কি আমার, মিত্তির মশাই?

ইন্দ্রানীর এত রূপ এর আগে মৃত্যুঞ্জয়ের চোখে ধরা পড়েনি। তার দেহে অপর্য্যাপ্ত রূপমদিরায় মৃত্যুঞ্জয়ের চক্ষু দুটি গোলাপী নেশায় নেশাতুর হয়ে উঠলো। ইন্দ্রানীর উজ্জ্বল চক্ষুতারকায় ভালবাসার স্পষ্ট আভাষ সে দেখতে পাচ্ছে।

খাবার ডাক পড়তেই ইন্দ্রানীকে পাশে বসে খাবার জন্যে মৃত্যুঞ্জয় অনুরোধ জানালে। ইন্দ্রানী মৃত্যুঞ্জয়ের পাশের চেয়ারটায় বসে খাচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয় তার অবচেতন মনের আনন্দধারাকে কিছুতেই রোধ করতে পারছেনা।

সন্দেশটা একটু ভেঙ্গে মুখে দিতে দিতে ইন্দ্রানী বল্লে: আজ সকালে দিদির একখানা চিঠি পেয়েছি, মিত্তির মশাই।

—মৃণাল তোমাকে চিঠি দিয়েচে?

—হাঁ। এতে তো আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

—না, আশ্চর্য্য আমি হইনি। ভাবচি আমাকে সে চিঠি না দিয়ে কী করে আছে।

—আপনি দিদিকে চিঠি দিয়েছিলেন নাকী?

—না।

—তবে কামাকা অনুযোগ করলে চলবে কেন, মিত্তির মশাই?

—যাক, ওকথার আলোচনা করে কোন লাভ নেই। তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে, ইন্দ্রানী। আমার গাড়ীতেই তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবো 'খন।

একটু হেসে ইন্দ্রানী বল্লে: আচ্ছা।

মোটরে উঠে ইন্দ্রানী বল্লে: আপনার দরকারটা কি শুনতে পাই, মিত্তির মশাই।

—বাইরে যে ব্রিজের কাজটা হচ্ছিল কি রকম লোকসান হয়ে গেচে, শুনেচো?

—কই না।

—এক রকম সর্ব্বনাশ হতে হতে বেঁচে গেচি। ব্রিজের খানিকটা পড়ে গিয়েছিল তাই রক্ষে। সমস্তটা গেলে আমায় আর খুঁজে পেতেন', ইন্দ্রানী।

—এখানিং কাজকর্ম্ম দেখাশোনায় যেরকম গা এলিয়ে দিয়েছিলেন এরকম একটা কিছু হবে তা আগেই বুঝতে পেরেছিলুম।

—তাই বলছিলুম, ইন্দ্রানী, একদিকে ব্যবসায় ক্ষতি অপর দিকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটানো আমার আর সহ্য হয়না। তুমি আমার ভার নেবে?

এ-প্রশ্নের জবাব ইন্দ্রানী হঠাৎ দিতে পারলেনা। যৌবনের মুকুলিত প্রভাতে হৃদয় যখন প্রেমের কলগুঞ্জনে, অব্যক্ত আনন্দ শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে ঠিক সেই সন্ধিস্থলে ইন্দ্রানীর নিবেদিত প্রেম

উপেক্ষিত হয়েছিল। সে ব্যথিত হয়ে গুমরে-ওঠা বিরহ-বেদনা মনের কোণে নীরবে গোপন করে রেখেছিল। তর্ক বা প্রতিবাদ করতে কোথায় যেন বেঁধেছিল। বুঝেছিল পুরুষজাতটাই আসলে হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চনার প্রতীক। চলতি পথে এদের সঙ্গে হয় অকস্মাৎ সাক্ষাৎ, দুদিনের আনাগোনায় এরা নারীকে ভুলিয়ে রাখে নানা কৌশলের অপূর্ব্ব মোহে। তারপর হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ। হাজার মাথা কুটলেও কোন সন্ধানই পাওয়া যায়না। কাজেই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রস্তাবে ইন্দ্রানী কী করবে কিছুই সে বুঝতে পারলেনা। তবুও সে মুখ খুললে: আপনার মত লোকের ভার নেবার মত ক্ষমতা আমার নেই, মিত্তির মশাই। সে জন্যে তো অপর লোক আছে। দেহের উপরকার আবরণের চাকচিক্যটাই যা দেখেছেন, ভিতরে যে একদম শূন্য।

—আমাকে আর ঘুরিয়োনা, ইন্দ্রানী। তোমার অন্তরের বাণী যে আমি জানি।

—থাক, মিত্তির মশাই, এখানেই ওসব কথার যবনিকা টেনে দিন। বাড়ীর দরজার কাছে তো গাড়ী এসে থামলো। বাইরের ঘরে একটু বসবেন না আপনাকে আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে?

—চল একটু বসি।

চেয়ারে বসে মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রানীর দিকে চেয়ে আছে। ইন্দ্রানী জানলার কাছে এগিয়ে এসে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চেয়ে বল্লে: আকাশের প্রত্যেকটি তারাকে কেন্দ্র করে একটা ছোট-খাটো উপন্যাস রচনা করা চলে। উপন্যাসের আখ্যানবস্তু আপনার-আমার সম্বন্ধ-স্থাপনের মত অসম্ভব, কল্পনার রঙীন জালে পরিবেষ্টিত।

—না, ইন্দ্রানী, তা নয়, তোমাকে পাওয়ার কল্পনা হয়তো আমার কাছে আশাতীত দুরাশা।

—অন্য কথা যদি কিছু থাকে, তাই বলুন, মিত্তির মশাই। এসব কথা শুনতে আমার আর ভাল লাগেনা। দিদির সম্বন্ধে না হয় দু'একটা বলুন, শুনি?

'মৃণালের কথা এখন যাক' বলে মৃত্যুঞ্জয় চেয়ার ছেড়ে ইন্দ্রানীর কাছে উঠে যেতেই ইন্দ্রানী তাড়াতাড়ি জানলার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো।

—রাত তো এখন বেশী হয়নি, চলনা, ইন্দ্রানী, রাতের শো'য়ে বায়োসকোপ দেখে আসি। যাবে?

—না।

—কেন?

—খেয়ালী লোকের সঙ্গে আমি বড় একটা কোথাও যাই না বলে ইন্দ্রানী ইজিচেয়ারে বসে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

দুরাশার উত্তেজনায় মৃত্যুঞ্জয় কখন যে ইজিচেয়ারের হাতোলটায় বসেছে তা তার স্মরণ নেই। পরমুহূর্ত্তে দেখা গেল ইন্দ্রানী মৃত্যুঞ্জয়ের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ। ক্ষণিকের আত্মসমর্পণে অধীর হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়ের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ইন্দ্রানী বল্লে: এই পর্য্যন্তই থাক, মিত্তিরমশাই। এর বেশী কিছু আর আশা করবেন না।

—ইন্দ্রানী, তোমায় আমি ভালবাসি।

—আপনার আজ কি হয়েচে বলুনতো? যা তা বলতে আরম্ভ করেচেন।

—তোমার মনের কথাটা আমায় বল।

—এ-কদিন নির্জ্জনে একা একা সময় কাটিয়েছেন বলে আপনার মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ঠেকচে। প্রিয়জনের সঙ্গ আপনার একান্ত প্রয়োজন, এটা অস্বীকার করি না।' তাই বলে আমি যে আপনাকে ভালবাসি এ-তথ্য আপনি কী করে আবিষ্কার করলেন, বলুনতো? আসলে ভালবাসা বলে কোন পদার্থ আপনার নেই। ওটা আপনার অন্তরের দুরারোগ্য দুর্ব্বলতা।

—তোমায় ভালবাসি কী না প্রমাণ চাও, ইন্দ্রানী?

—দরকার নেই, তার চেয়ে দিদিকে আপনি ফিরিয়ে আনুন। সমস্ত অশান্তির এইখানেই অবসান হয়ে যাক।

—না, ইন্দ্রানী, তা হয় না। মৃণালের উপস্থিতিটা আমি আর মোটেই কামনা করি না। রূপ আছে স্বীকার করি, যার মোহে উচ্ছ্বসিত হয়ে একদিন কল্পনার জাল বুনতে চেয়েছিলুম। কিন্তু তুমিই আমার চোখ খুলে দিয়েচো। এখন তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চাই। আমার অন্তরের গোপন ব্যথা অনুভব করবার ক্ষমতা তোমার আছে। তোমার সঙ্গ-কামনা আমার স্বপ্নাতীত স্বপ্ন। এদ্দিন এটাও তোমার চোখে পড়ে নি ইন্দ্রানী? দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার সান্নিধ্যে নিরুপদ্রবে সময় কাটিয়েচি, একদিনের জন্যে অশান্তির এতটুকু ছায়া আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

—আমিই যে আপনার অশান্তির কারণ হব না, তাই-বা আপনি কেমন করে জানলেন?

—অস্বীকার করচি না। নর এবং নারীর সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা, কত রোমাঞ্চকর কাহিনী রুদ্ধ আবেগে শুনেচি। সব নারীই সকল পুরুষের পক্ষে সমান মঙ্গলময়ী নয়। এ-ক্ষেত্রে গ্রহের শুভাশুভের প্রতিক্রিয়ার কথাই এসে পড়চে। পুরুষদের বেলায় ওই একই কথার পুনরাবৃত্তি। মৃণালের অপর্য্যাপ্ত রূপের প্রতি আমার আকর্ষণ আছে প্রচুর। কিন্তু তোমাকে যে আমি চিনি ইন্দ্রানী। ওদিক দিয়ে ভুল হবার কোন উপায় নেই।

—একটু চুপ করুন, মিত্তিরমশাই। মাথাটা বড় ধরেচে।

—একটু টিপে দেবো, ইন্দ্রানী?

—না, না, মিত্তির মশাই, দরকার নেই। ও রকম আমার মাঝে মাঝে হয়। একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি। এ-দুনিয়ার হাটে প্রকৃত প্রেম এতো দুর্লভ বলে কল্পনা-বিলাসী মানুষ নারীকে ছলনার মোহে বন্দী করতে চায়। তাই আমার সম্বন্ধে আপনার কথাগুলো প্রলাপের উক্তির মত শোনাচ্ছে। আপনি আমাকে প্রকৃত ভালবাসেন কীনা তার সত্যাসত্য বিচার করে কোন লাভ নেই। আমার মুখের কথা যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনার প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে প্রত্যাখ্যান করবো।

বাইরে কার পদশব্দ কাণে পৌঁছতেই উভয়ে চুপ করে গেল।

ব্যস্ত হয়ে মদন ঘরে ঢুকে বল্লে: 'একখানা টেলিগ্রাম এসেচে বাবু' বলে কাপড়ের খোঁটে-বাঁধা হলদে খামখানি মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলে।

খামখানি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মৃত্যুঞ্জয় বল্লে: আমি যে এখানে এসেচি, তুই কেমন করে জানলি, মদন?

—আপনি যে যে জায়গায় যান আমার সব জানা আছে। সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষে এখানে এসে আপনাকে পেলুম!

টেলিগ্রামখানি পড়তে পড়তে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ সহসা ভয়ে এবং হতাশায় এতটুকু হয়ে গেল।

ইন্দ্রানী মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের এ ভাবান্তর লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে: কিছু খারাপ খবর নয় তো, মিত্তির মশাই? হঠাৎ ওরকম চমকে উঠলেন কেন?

মৃত্যুঞ্জয় বল্লে: যা সন্দেহ করেচো, তাই। দিলু ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পেয়েচে। আমাকে টেলি পাবা মাত্র যেতে লিখেচে।

—কোন দিক দিয়ে যে কখন বিপদ আসে তা কেউ বলতে পারে না। কটা বাজে বলুন তো, মিত্তির মশাই?

হাত ঘড়িটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বলে: সাড়ে আটটা।

—একটু দাঁড়ান, টাইম টেবিলটা নিয়ে আসি বলে ইন্দ্রানী কক্ষান্তরে গেল।

—দেখ মদন, চট করে আমার স্যুটকেশটা গুছিয়ে ফেলগে যা। এক্ষুনি আমি যাচ্ছি।

—আচ্ছা বলে মদন বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্রানী পুনরায় ঘরে ঢুকে টাইম-টেবিলের একটা পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বল্লে: নটা ছত্রিশে একটা মিক্সড্ একপ্রেস আছে। ওই গাড়ীটা আপনি পেতে পারেন।

—আমার সঙ্গে যাবে ইন্দ্রানী? বিপদের কথা শুনলে আমার হাত-পা আসে না। চল না?

—না মিত্তির মশাই, আমার যাওয়া হতে পারেনা। আপনি একাই যান। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই দিলু যেন এ-যাত্রায় ভালোয় ভালোয় সেরে ওঠে।

মৃত্যুবিলাসী—ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। শ্রীজয়ন্ত উপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য বারো আনা। কলিকাতা, ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

"মৃত্যুবিলাসী" বইখানা পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। বহুদিন বাংলাভাষায় এরূপ চিত্তাকর্ষক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রকাশিত হয় নাই। বইখানিতে এমন নিপুণভাবে ঘটনা সমাবেশ করা হইয়াছে যে গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে পাঠকের মনে কোন খুঁত বোধ হয় না। লেখক শ্রীজয়ন্ত উপাধ্যায়ের সঙ্গে "খেয়ালী"র পাঠকদের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে। ব্যঙ্গ রচনায় তাঁহার হাত পাকা বলিয়াই আমরা এতদিন জানিতাম, কিন্তু ওই বইখানা পড়িয়া তাঁহার কল্পনাশক্তি এবং রহস্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। সবচেয়ে বড় রহস্য কিন্তু এই যে, ছদ্মবেশী গোয়েন্দার মত লেখকও ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। জয়ন্তবাবুর প্রকৃত পরিচয় তাঁহার বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবে এটুকু বলা চলে যে তিনি সংবাদপত্রসেবী হিসাবে সুপরিচিত। বোধহয় সেই কারণেই তাঁহার বইয়ে অস্বাভাবিকতার বাহুল্য নাই।

"মৃত্যুবিলাসী"-র গল্পাংশের চম্বুক এই :—এক পাকা জালিয়াত বহু চেক জাল করিয়া অনেক টাকা মারিয়াছিল। পুলিশ চৌদ্দ বৎসর চেষ্টা করিয়া তাহাকে ধরিতে পারে নাই—সে অবশেষে ধরা পড়িল রবি দত্ত নামে এক তরুণ গোয়েন্দার হাতে। একটা খুনের দায়ে তাহার ফাঁসী হইল। ফাঁসীর দিন হইতেই কে বা কাহারা রবিকে খুন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। শুধু রবি নয়, যে-সব লোকে প্রসাদের গ্রেপ্তারে ও বিচারে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহারা সকলেই এই রহস্যময় মৃত্যুবিলাসীদের প্রতিহিংসার কবলে পড়িয়া গেল। যেদিন একজন বিখ্যাত ব্যাঙ্কারের অন্তর্ধান হইল, সেই দিন হইতে ব্যাপার চরমে উঠিল। তাহার নিঃসম্পর্কীয়া তরুণী উত্তরাধিকারিণী ললিতা সেন পড়িয়া গেল এই রক্তপিপাসু অজ্ঞাত ব্যক্তিদের রোষ-দৃষ্টিতে। ফলে তাহার বহু দুর্য্যোগ সহিতে হইল। গোয়েন্দা রবি তাহার প্রেমে পড়িয়াও তাহার কিনারা করিতে পারিল না। গল্পের বাকী অংশটুকু এখানে আর দিলাম না, কারণ তাহাতে বইখানির পাঠকের ঔৎসুক্য নষ্ট হতে পারে। "পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না" বলিলে বইখানির চিত্তগ্রাহিতার যথাযথ বিবরণ দেওয়া হয় না। চরিত্র অঙ্কনের নৈপুণ্যে এবং ঘটনাবলীর স্বাভাবিকতায় বইখানি খুব উপভোগ্য হইয়াছে। আর একটা কথা, কলিকাতা এবং সহরের আশেপাশের সুপরিচিত স্থানের মধ্যে ঘটনাগুলি ঘটাতে সেগুলি সিনেমার ছবির মত মনের মধ্যে দাগ কাটিয়া বসিয়া যায়। পাঠকদের নিকটে বইখানির খুব সমাদর হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, মিষ্ট্রি টকী (Mystery talkie) হিসাবে বইখানার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। বাংলা সবাকচিত্রে গোয়েন্দা উপন্যাস একরূপ নাই বলিলেই চলে। এ ধরণের বই একটু যোগ্যতার সঙ্গে সবাকচিত্রে রূপান্তরিত হইলে তাহা খুব জনপ্রিয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই বেশ মনোরম। শেষ কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে কয়েকটী মারাত্মক ছাপার ভুল লক্ষ্য করিলাম, যত্ন করিয়া প্রুফ সংশোধন করিলে পাঠকের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করা চলিত।

শ্রীমল্লিনাথ

—তুমি চল, ইন্দ্রানী, এতখানি একা যেতে পারবোনা।

—এ সময় আর ছেলেমানষী করবেন না, মিত্তির মশাই। এইখানেই সকল দুঃখের যেন অবসান হয়। বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনে আপনাদের যাত্রাপথ সুগম হয়ে উঠুক।—ইন্দ্রানী আর কোন কথা বলতে পারলেনা। চোখের কোণে উদ্গত অশ্রুকে গোপন করবার জন্যে সে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

—তা হলে আমি আর দেরী করবোনা।

—যান। পৌছিয়েই একখানা টেলিগ্রাম করবেন। ভুলবেন না যেন? খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সুস্থির থাকতে পারবোনা।

—আচ্ছা।

(ক্রমশঃ)

(গল্প)

শ্রীহর প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সেদিন শুনলুম হঠাৎ সুধীরের স্ত্রী মারা গেছে—কলেরায়। বছর চারেকের একটি ও একটি বছর খানেকের ছেলে, সুতরাং সংসার ছেড়ে সুধীর যে হিমালয়ে গিয়ে যোগাভ্যাস আরম্ভ ক'রে দেবে, একথা সহজে বিশ্বাস করা অসম্ভব। কিন্তু সেদিন আখড়ায় বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়েই এক তুমুল তর্ক হ'য়ে গেল। বন্ধু ব'ল্লে—ছেলেবেলায় সেই পাঠশালা থেকে ওকে দেখে আসছি, পণ্ডিত-ম'শার ওর ভাবভঙ্গী দেখে ওর নামই রেখেছিলেন সিদ্ধার্থ; আর ওর বিয়ের ইতিহাসটাও ত' তুই জানিস্—বিয়ের দিনই ও সেই পালিয়ে গেল মাসীর বাড়ী, তারপর ওর বাপ কত ক'রে ধ'রে এনে তবে বিয়ে দেয়। যা'ই হোক বন্ধুর সঙ্গে ঠিক একমত না হ'লেও—সাময়িক একটা আঘাত ছাড়া বৌ মরে সুধীর যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো আর ও যে কোনদিনই বিয়ে আর ক'রবে না, এ আমি দিন-রাত্তির চন্দ্র-সূর্য্যির মতই বিশ্বাস ক'রতুম।

ইস্কুল থেকেই সুধীরের সঙ্গে আমাদের একরকম ছাড়াছাড়ি। ইউনিভার্সিটির প্রথম যে দেউড়িটা আমরা দু'-দু'বারেও পার হ'তে পারলুম না—সুধীর শুধু প্রথমবারেই নয়, একেবারে কুড়ি টাকা জলপানি নিয়ে সেটা পার হ'য়ে গেল। বি এ, পাশ ক'রবার সময়ও জলপানি এবং এম-এ-তে নাকি সোনার মেডেল পেয়েছিল ব'লে শুনেছিলাম। ওর মামা গভর্ণমেণ্ট অফিসে আট-শ' টাকা মাইনের চাক্‌রে, তা'ই ভাগনে এম-এ পাশ ক'রতেই সেখানে তা'কে ঢুকিয়ে নিলেন ষাট্ টাকা মাইনেয়। বছর দু'য়েকের মধ্যেই ও আফিসের কি একটা এগ্‌জামিন পাশ ক'রে ফেল্‌লে—তা'ই গত বছর থেকে দু'শো কুড়ি টাকা মাইনেয় বহাল হ'য়েছে—এখন ও সুপারেন্‌টেণ্ডেণ্ট্। এতে আমরা একটুও আশ্চর্য্য হইনি, কারণ ও জজ্ ম্যাজিষ্টর হ'বে ব'লেই ছেলে বেলা থেকে আমরা জানতুম।

যখন ইস্কুলে প'ড়তো কা'রো সঙ্গে ও বেশী কথা ব'লতো না—একমাত্র লেখাপড়ার কথা ছাড়া। ফোর্থ, থার্ড ক্লাশে উঠে টিফিনের সময় আমরা যখন রেষ্টরেণ্টে ব'সে চা' চপ্, কাট্লেট্ ওড়াচ্ছি—ও তখন নির্জ্জন ক্লাসের এক কোণে ব'সে পেঁপে, কলা ও দু'টো মিষ্টি খা'চ্চে। সুধীরের বাপ ছিলেন একজন সেকেলে গোঁড়া বামুন। ওর মাথায় টিকির বহর দেখে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ হেড্-মাষ্টার হরিহর বাবু কত রগড়ই না ক'রতেন—ও কিন্তু একটি কথারও উত্তর দিতনা। কুড়ি টাকা জলপানি নিয়ে ও যখন ইস্কুল থেকে বেরিয়ে গেল তখনও পিছনে সেই টিকিই ওর ঝুলছে।

আর একটা জিনিষ ওর আমাদের কাছে ভারি আশ্চর্য্য ঠেক্তো—সেকেণ্ড ক্লাশ, ফার্ষ্ট ক্লাশে প'ড়বার সময় ইস্কুল লাইব্রেরী থেকে আমরা যখন দু'তিন দিন অন্তর একখানা ক'রে নভেল নিচ্চি, ও তখন নিচ্চে—ভ্রমণ বৃত্তান্ত, মহাপুরুষদের জীবন-চরিত, Smiles এর essay, নয় ঐরকম ধরণের কিছু একটা। থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখ্তে ওকে আমরা কোন দিনই দেখিনি, এমন কি অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে যেখানে কিছু আলোচনা হ'ত, ও সেখানে থাক্লে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে প'ড়তো। আমাদের ইস্কুল ম্যাগাজিনে 'কো-এজুকেশন'-এর বিরুদ্ধে ও এমন এক তীব্র প্রবন্ধ লেখে যে, ক'লকাতার যত ইস্কুল ম্যাগাজিন আছে প্রায় সমস্তগুলিই একবাক্যে তা'র প্রতিবাদ করে। এখনও সুধীর লেখা একেবারে ছাড়েনি, অবিনাশের দৌলতে তা' জান্বার সুযোগ আমাদের মাঝে মাঝে ঘটে। 'মাসিক-বসুমতী' নতুন বেরুলেই, আথড়া ঘরে সেখানা এনে আমাদের না দেখালে অবিনাশের কিছুতেই তৃপ্তি হ'ত না; আমরাও 'বসুমতী' এলে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিতুম। তখন 'বসুমতী'-তে হেমেন মজুমদারের "স্নান-অবদানে" প্রভৃতি বিখ্যাত ভিজে-কাপড়ের ছবিগুলো বেরুচ্চে। এই ছবি দেখবার জন্যে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে প'ড়তো "সতীধর্ম্ম—শ্রীসুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ", "অন্তঃপুর ও অবরোধ" কোনও বারে বা "গীতা ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ" ইত্যাদি।

সুধীর কোনদিন দলে মিশতনা, বিশেষতঃ দাবা-তাসের আড্ডা বা যাত্রা-থিয়েটারের আখড়াকে ও ঘৃণার চোখেই দেখত; সুতরাং ছেলেবেলায় একই ইস্কুলে লেখাপড়া এবং একই পাড়ায় বাস সত্ত্বেও তা'র সঙ্গে আমাদের একটা সুদূর ব্যবধান ছিল—সে আমাদের আবহাওয়ার অনেক দূর দিয়ে

চ'লতো। কখনো দেখা হ'লে, পরস্পরের অতি-সংক্ষিপ্ত কুশল প্রশ্ন ছাড়া কোন কথাই আমাদের হ'ত না। এক কথায়, আমরা তা'কে বেশ একটু সম্ভ্রম ক'রেই চ'লতুম। এই হ'ল সুধীরের জীবন-ধারার এবং আমাদের সঙ্গে তা'র সম্বন্ধের ইতিহাস। হাঁ, একটা কথা ব'লতে ভুলে গেছি—অবিনাশ এসে সেদিন আমাদের ব'লুলে, শুনেছিস, বৌ মরার পর, সুধীর নিয়মিত 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি'-তে যেতে আরম্ভ ক'রছে।

* * *

প্রায় বছর খানেক কেটে গেছে—সুধীরের ভবিষ্যৎ-জীবন ধারার জল্পনা কল্পনায় আমাদের আখড়া-ঘর প্রতি সন্ধ্যায় আর মুখর হ'য়ে উঠেনা—ও আলোচনা কবে বন্ধ হ'য়ে গেছে। এখন কোনও দিকে চাইবার বা ভাববার একটুও অবসর আমাদের নেই; আসছে শনিবার দিন বাগবাজারে বোসেদের বাড়ী আমাদের 'প্লে' আছে গিরীশ বাবুর 'বলিদান'। গত শনিবারে তা'র একদফা ফুল-রিহার্সেল হ'য়ে গেছে। মাঝে আর ক'টা দিনই বা—এর মধ্যে বরানগরের সখির দলের ব্যবস্থাটাও আবার ঠিক ক'রে ফেল্‌তে হ'বে। বাড়ীতে শুধু দু'বেলা দু'টো খাওয়া, তারপর আমরা ক'জন এখন সারা দিন-রাত্তির, আসন্ন 'প্লে'-র উদ্যোগ-আয়োজনে মুহূর্ত্ত-নিরবকাশ।

—সেদিন সন্ধ্যায় আখ্‌ড়া-ঘর একরকম খালি ব'ল্‌লেই চলে—শুধু তিনটি প্রাণী, আমি, রমেশ আর চুনি। আমাদের মত ব'নেদী আড্ডাধারী ছাড়া কে বেরোবে অত বৃষ্টিতে—মুষলধারে বৃষ্টি, মেঘের কক্কড় ধ্বনি, রাস্তার ওপর দিয়ে জলের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। চুনি হঠাৎ উঠে প'ড়ে ঘরের এককোণে যে হ্যারিকেনটা জ্বলছিল তার আলোটা দিলে বাড়িয়ে, তারপর পকেট থেকে চাবি বা'র ক'রে আলমারী খুলে দু'টো বোতল আর গোটা তিনেক গ্লাস বা'র ক'রলে। আমরা তা'র দিকে চেয়ে আছি, সে ব'ল্‌লে—"ভয় নেই বৃষ্টিতে কেউ আর আজ এদিক মাড়াচ্চে না।" তা'রপর সশব্দে বোতল দু'টোর কর্ক্ খুলে পাশাপাশি তিনটে গ্লাসে সমান সমান অংশে ঢক্ ঢক্ ক'রে রক্তিম তরল পদার্থটা ঢেলে ফেল্‌লে। আমরা চুপ ক'রে আছি দেখে, আমাদের দু'জনের দিকে একবার আড়্-চোখে চেয়ে দু'হাতে দু'টি গ্লাস তুলে নাটকীয় সুরে-"বিবিজান্ ...." ভাঁজতে ভাঁজতে আমাদের একেবারে মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ধ'রলে। এই দুর্য্যোগে কে বাইরে বেরিয়ে সোডা আনতে যাবে, সুতরাং মুচ্‌কী হেসে চুনির হাত থেকে গ্লাস দু'টো নিয়ে আমরা নিমেষের মধ্যে তা'র সদ্ব্যবহার ক'রলুম, —চুনিও। একেবারে নির্জ্জলা—গলা থেকে বুক অব্‌ধি যেন জ্বলে গেল।

পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দ আর থেকে থেকে মেঘের গর্জ্জন ও অন্ধকার আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ছোটাছুটি। রমেশ পকেট থেকে 'গোল্ড্-ফ্লেকের' প্যাকেটটা বা'র ক'রে সামনে রাখ্‌লে; নিস্তরঙ্গ বাতাস—তিনটে সিগ্রেটের নিশ্চল ধোঁয়া, ঘরের চা'রপাশের দেওয়ালের মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে যে ধূম্রান্ধকার সৃষ্টি কোরলে তা'তে আমাদের চোখের সামনের সমস্ত যেন ক্রমেই ঝাপসা হ'য়ে আসছে ব'লে ম'নে হ'তে লাগলো। হঠাৎ রৌদ্র-ঝলকিত শানিত তরোয়ালের মত খানিকটা বিদ্যুৎ খোলা দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকে ঘরটাকে অসহ্য-আলোক চকিত ক'রে নিমেষে মিলিয়ে গেল—সব অন্ধকার, সঙ্গে সঙ্গে অতি ভীষণ একটা শব্দ; খুব কাছেই প'ড়লো বোধ হয়। তীব্র আর্ত্তনাদ ক'রে চুনি আমায় জড়িয়ে ধ'রলে—তা'র হাতের জ্বলন্ত সিগ্রেটের ছ্যাঁচকায় আমি লাফিয়ে

উঠলাম। তা'রপর দু'জনে মিলে সেই ঘরের মধ্যে নৃত্য সুরু ক'রে দিয়েছি, এমন সময় রমেশ উঠে আমাদের দু'জনের হাত ধ'রে এমন এক ঝাঁকানি দিলে যে আমরা ব'সে প'ড়লাম। রমেশ অটল, অনড়; তা'র অনেক দিনের অভ্যেস. আমাদের প্রায় ডবল সে টানতে পারতো।

কতক্ষণ কেটে গেছে.—প্রকৃতির সে তাণ্ডব নৃত্য কখন গেছে থেমে। রাস্তার ওপাশের দোতলা বাড়ীটার নীল-পর্দ্দা দেওয়া জানালার মধ্য দিয়ে আলো দেখা যা'চ্চে।—বাঃ! বেশ মিষ্টি গলা ত', নিশ্চয়ই কোন মেয়ে গান গাচ্চে। কল-কণ্ঠে হাসির একটা রোল উঠলো—বাবা! এ মেয়ে গলা না হ'য়ে যায় কোথায়! ঘরটায় বোধহয় মেয়েদের গানের ম'জলিস চ'লেছে।

ফস্ ক'রে চুনি আমার ঘাড়টা ধ'রে ঐ বাড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দিতেই, দেখি—নীল-পর্দ্দাটা সরিয়ে একটি মেয়ে জান্‌লার ধারে এসে দাঁড়ালো। রাস্তার আলো গিয়ে তা'র মুখে প'ড়েছে—আঠার উনিশ বছর বয়েস হ'বে, ধব ধব ক'রছে রঙ, চাঁদের মত মুখ। "উঁ—হু-হু হু-হু" ক'রে আমি লাফিয়ে উঠতেই, রমেশ হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধ'রে ব'ল্লে—"এই শালা চুপ কর।"

জানালার একটা কবাট্ খুলে বাইরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে চুনি ব'ললে—"খুব গুঁড়ি গুঁড়ি বিষ্টি প'ড়ছে—এইবার চল যাওয়া যাক।"

বড়-রাস্তার মোড়ে আসতেই লাল-সিং আমাদের দেখতে পেয়ে তা'র ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে আমাদের সাম্‌নে এনে ব'ললে—"আইয়ে বাবু।"

ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠতেই, ট্যা'ক্সি ছেড়ে দিলে। কিছু ব'লবার দরকার ছিল না—লাল-সিং অনেকদিনের লোক, সে আমাদের জা'ন্‌তো।

—রামবাগানে নেমে গলির মধ্যে যখন

যৌবন

শ্রীআদিত্য নাথ মুখোপাধ্যায়

গোলাপ যখনও ফোটেনিকো ভাল
ছড়ায়নি তার বাস,
ভ্রমরা তখনও লভিতে পবন
আসে নিকো তার পাশ।
সুপ্ত ছিল যে কুসুম-কোরক
অনাগত মাঝে সুখে,
মলয় হর্ষ, ঝঞ্ঝা বেদনা,
লাগেনি তাহার বুকে।
বরষের পর বরষ কাটিল,
দিনের উপর দিন
কুসুম কলিকা মুকলিত হ'ল,
মন হ'ল উদাসীন।
ভ্রমরার মধু গুঞ্জন-ধ্বনি
মধুর লাগিল কাণে
চুম্বন তার নূতন পিপাসা
জাগাল নূতন প্রাণে।
যৌবন ভার বহিতে নারিলা,
ক্ষুদ্র পরাণখানি
জনম তাহার সার্থক হ'ল,
প্রাণ ভ'রে প্রেম দানি।

আমরা ঢুকছি, গলির মুখেই প্রকাণ্ড আর্শি-দেওয়া পান-বিড়ির দোকানের ঘড়িটায় একবার ঢং ক'রে উঠলো। রমেশ ঘড়ির দিকে চেয়ে ব'ললে—"রাত সাড়ে এগারোটা বাজলো।"

গলির প্রথম বেঁকটা পার হ'য়েই, বাড়ীটায় ঢোক্‌বার দরজায় দেখি প্রতীক্ষমানা চার-পাঁচ-জন তখনও দাঁড়িয়ে আছে! পকেট থেকে টর্চ্চটা বা'র ক'রে তা'দের মুখে ফেলে দেখছি, এমন সময় একজন ব'লে উঠলো—"পারুলকে খুঁজছেন ত'—সে ওপরে।" দেখি আবার কে এসে আস্তানা গেড়েচে।

ট'লতে ট'লতে তিনজন অপরিসর প্রায়ান্ধকার সেই প্রবেশ-পথ দিয়ে ভেতরে ঢুক্‌ছি—চুনি ছিল আগিয়ে, হঠাৎ তা'র সঙ্গে একজনের ধাক্কা লাগতেই আমরা দাঁড়িয়ে প'ড়লাম।—হুর্‌রে! ব'লে চেঁচিয়ে উঠে, টর্চ্চের বোতামটা টিপে তা'র মুখে আলো ফেলতেই দেখি—গগ্‌লস চোখে এক ভদ্রলোক থ'মকে দাঁড়িয়ে প'ড়েছে। মুখটা যেন বড্ড চেনা চেনা মনে হ'চ্ছিল, আলোটা আরও ভালো ক'রে তা'র মুখে ফেলতেই যেন নেশার ঘোরেও যেন চমকে উঠলাম, জড়িত কণ্ঠে ব'লে উঠলাম—"কে?—সুধীর!—তুই!!"

"হ্যাঁ—" ব'লে আমাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে সে বেরিয়ে গেল।

শ্রীপতিত পাবন পতিতুণ্ডি

হলিউডে মরার নিয়ম

হলিউডে মরারও নাকি একটা নিয়ম আছে—একটা মিল আছে।

ওখানেও একজন মরলে নাকি—মরে তিন জন। তাই এই তিন জনের মরার খবর পেয়ে আমি চমকে উঠিনি। হলিউড হলপ করে তিন জনের মৃত্যুর নাম নিয়ে মরণের চাকা ঘুরছে অহরহ।

জ্যাকও সেদিন মরেছে! ও সেই জ্যাক—যে নামে 'বিগ প্যারেডে'।

সুন্দরী, ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে—আদরের রীণি, রীণি এ্যাডোরি, সেও সেদিন কোন অদৃশ্য ছায়া লোকে পাড়ি জমিয়েছে। বেচারা অনেককাল ধরে ভুগেছিলো টিউবার কিউলোসিসে।

সুন্দরী রীণির নাম লোকে সহজে ভুলতে পারবে না। নির্ব্বাকযুগে সেও ছিল রীণি। ছবিতে অভিনয়ে সেও পেয়েছিল নামের কহিনুর—যশের মুকুট—প্রীতির অশ্রু।

কালডেন সেও মারা পড়েছে। নামের পাহাড়ে উঠেছিলো চূড়োতে। তারালোকের বেতারবার্ত্তা তার ঘরেও টক্ টক্ করত। তারপর একদিন পতন হোল। গলার হীরের হার ছিড়ল, পায়ের জুতো হোল লাল। তারালোকের সোনার রেণু রঙ বদ্‌লালো। পায়ের রেণু মাথায় উঠলো। ধূলোই হোল বুঝি শয্যা! ধূলোই হোল আহার আর নাকি নিশ্বাসের খোরাক। তাই পারলেনা থাকতে। বিদায় নিলে।

আর জন গিলবার্ট—প্রেমের অবতার সে। গার্ব্বোকে রহস্যের খাসমহলে প্রবেশ করিয়েছে নাকি সে। মৃত্যু হল তারও। একের মরণে আনলে তিনজনের মৃত্যু। ওই তিনের চাকাটায় আর একবার ঘোরা শেষ হোল।

শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অনেক সময় অনেক রকম মতদ্বৈতের কারণ উদ্ভব হয়। কিন্তু চার্লী চ্যাপ্‌লিনের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। এঁর নবতম অবদান "মডার্ণ টাইমস" এঁর গৌরবে আরও গরিমাময় কোরেছে। চার্লীর শিল্পী-জীবনই ধন্য!

ও পারের ছায়া

সৌভাগ্যের রাণী পিক্‌ফোর্ড

রূপ গুণ আর অর্থ একসঙ্গে পাওয়া মানুষের মহাভাগ্যের কথা। কিন্তু তা পেয়েছে মেরী পিকফোর্ড।

মেরী পিকফোর্ডই হচ্ছে প্রথম স্ত্রীলোক, যে হতে পেরেছে একাধারে প্রডিউসার, পরিচালক, ষ্টার আর সিনারিও লেখক।

মেরী পিকফোর্ড আর জেসি এল ল্যাস্কি সম্প্রতি নতুন নামে কোম্পানীতে ছবি আরম্ভ করবে। সে চিত্রের গোড়ায় লেখা থাকবে পিকফোর্ড-ল্যাস্কি প্রোডাকশন্। ওই চিত্রের ট্রেড মার্কের নমুনা বাহিরে থেকে চাওয়া হয়েছে। যার পছন্দ হবে তাকে পাঁচশ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু ও কথা যাক।

মেরী পিকফোর্ডের ডাইভোর্সের কথা এইবার শেষ হয়ে এলো। অর্থাৎ আজও পর্য্যন্ত যারা ডগলাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্কে নিয়ে মজলিসে আর মদের টেবিলে কান্নার সুরে কথা বলছিলেন তাঁদের কথা এইবার শেষ হোল।

ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস আর মেরী পিকফোর্ডে পুনরায় মিলন সংঘটিত হবার কোন আশা নেই।

কারণ চার্লস বাডিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মেরীর বাড়ীতে—মেরীর সঙ্গে পথে—মেরীর সঙ্গে মাঠে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে—মেরীর সঙ্গে সিনেমায়—মেরীর সঙ্গে কারে।

কাজেই আর কী চাও।

মেরীর শুভাকাঙ্খী বন্ধুরা বলছে চার্লসের সঙ্গে তার বিয়ে হবেই!

চার্লস বাডি রোজাজের সঙ্গে মেরীর বিয়ে হোক্ বা না হোক, মেরীর জীবনে সুখ আসুক, শান্তি আসুক,—এ হলিউডের সবাই চায়। আমরাও চাই।

খুচরো খবর

ক্লার্ক গেবল আর জোয়ান ক্রফোর্ড একসঙ্গে নাবছে "এ লেডি কাম্‌স টু টাউন" ছবিতে!

* * *

"ব্রড্‌ওয়ে মেলোডি ১৯৩৬" ছবিতে ফ্রান্‌সেস্ ল্যাঙ্‌ফোর্ডকে সুপ্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা কোল পোর্টার আবিষ্কার করেন।

বাবা নহি আমি বলে দাও তুমি !

নলিনী রঞ্জনের আবেদন

১৬ই আলিপুরে মামলা আরম্ভ	জজ কোর্টে আবেদন	৭ই হাইকোর্টে রুলের শুনানী

স্বয়ং আদালতে হাজির হইবার আদেশ

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র ও স্বর্গীয় অধ্যাপক প্রমথ সরকারের পত্নী শ্রীমতী বীণা সরকারের [illegible] শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে খোরপোষের দাবী করিয়া এক উড়িয়া মালীর কন্যা শ্রীমতী রাসমণি দেবী আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার গত ২৮শে এপ্রিল তারিখ আলিপুরের দ্বিতীয় সাব জজ মিঃ কে. বি, সেনের এজলাসে টালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত কয়াতলা লেনের মহেন্দ্র নাথ সর্দ্দারের কন্যা রাসমণি দেবী ও তাহার ত্রয়োদশী কন্যা মহামায়া দেবীর বিরুদ্ধে এক দেওয়ানী মামলা দায়ের করিয়া মহামায়া তাহার অবৈধ কন্যা নহে এবং সে তাহার ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাধ্য নহে, ইহা ঘোষণার জন্য প্রার্থনা জানায়।

এই দেওয়ানী মামলার বিচার সাপেক্ষে রাসমণির আনীত মামলা স্থগিত রাখিবার জন্য পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের নিকট নলিনীর পক্ষের কৌশুলী মিঃ নিশীথ সেন আবেদন পেশ করেন।

উভয় পক্ষের বিতর্ক শুনিবার পর ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, বিবাদীপক্ষের কৌশুলীর সওয়াল তাঁহার মনে কোনরূপ রেখাপাত করিতে পারে নাই। তদনুসারে তিনি বাদীর প্রার্থনানুযায়ী মামলার বিচার স্থগিত রাখিতে অসম্মত হন এবং নলিনী সরকারকে ৪ঠা মে তারিখের মধ্যে তাঁহার লিখিত জবানবন্দী দাখিলের আদেশ দেন।

শ্রীযুত সরকার সোমবার এই সম্পর্কে আদালতে একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আগামী ১৬ই মে মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য করিয়াছেন এবং ঐ দিবস শ্রীযুত সরকারকে সশরীরে আদালতে হাজির হইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ১৬ই মে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার লিখিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তিনি কখনও রাসমণি দেবীর সহিত অবৈধ সহবাস করেন নাই এবং মহামায়া তাঁহার ঔরসজাত কন্যা নহে। অতএব কোন প্রকার ভরণপোষণের জন্য তিনি আইনতঃ বাধ্য নহেন।

রাসমণি দেবী তাহার দরখাস্তে যে সমস্ত অভিযোগ করিয়াছে তাহা একেবারে ভিত্তিহীন এবং বিদ্বেষপ্রসূত মিথ্যা। চক্রান্তকারী লোকের প্ররোচনায় সময় সময়

মেট্রোর "দি গ্রেট্ জিগ্‌ফিল্ডে" মীরণা লয় উইলিয়াম পাওয়েলের স্ত্রী সাজবে। এই নিয়ে পর্দ্দায় সে চারবার পাওয়েলের স্ত্রী সাজল।

আজি আলোকের সাথে

শ্রীকপিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আজি আলোকের সাথে
কে যেন বহিয়া আনি' দিল ব্যথা সকরুণ বেদনাতে।
তরুণ আকাশে রক্তিম আভা যে ছবি এঁকেছে আজ,
চির-ব্যথা সম রহিল তা আঁকা এ মোর বুকের মাঝ;
নিশার স্বপণ মরিচীকা সম মিলাইয়া গেল লাজে
দানিল আঘাত—হিয়াতে আজিকে ব্যথার বেদন বাজে।
নীল আকাশের ওই আলো রাণী লাল হ'ল কার রাগে,
জীবনের মাঝে জাগিবে না প্রেম সে নিবিড় অনুরাগে;
সে ভালবাসার হতাশ বেদনা ভরি' গেল এই প্রাতে,
আজি আলোকের সাথে।
কে তুমি নিঠুর এনে দিলে আজি বজ্র বারতা হেন,
বিস্ময় লাগে অন্তর মাঝে আমি কি হয়েছি যেন!

নিশার কোলেতে পূর্ণিমা রাণী যবে ঢেলেছিল আলো
সে মোরে বুকেতে জড়াইয়া ধরে বলেছিল—বাসি ভাল।
সে ভালবাসায় কপটতা কভু ছিল না একটুখানি,
আজি এ ঊষার বারতা মাঝারে তাই বিস্ময় মানি;
হেন কথা কভু বলিতে কি তার বাজিবেনা হৃদি মাঝে,
রিক্তারে সে কি রিক্ত করিবে এই জীবনের সাঝে।
জীবন যাহার শেষ হ'তেছিল তাহারে বাঁচায়ে আনি,
অমর প্রেমের পূর্ণাভিষেকে করেছিল সে যে রাণী
তার এ বারতা বজ্রের রূপে আঘাত হানিল মাথে
আজি আলোকের সাথে।

তাঁহার (শ্রীযুত সরকারের) নিকট ভয় প্রদর্শন করিয়া টাকা আদায় করিবার ক্রমাগত যে সমস্ত চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে বর্ত্তমান মামলা তাহারই পরিণতি।

হাইকোর্ট হইতে রুল জারি

সোমবার শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের দরখাস্ত ক্রমে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ এম, সি, ঘোষ চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রাসমণি দেবীর উপর এই মর্ম্মে রুল জারি করিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত সরকারের বিরুদ্ধে আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসে খোরপোষের দাবীতে যে মামলা চলিতেছে, তাহা রাসমণি ও তাহার কন্যার বিরুদ্ধে শ্রীযুত সরকারের আনীত দেওয়ানী মামলার বিচার নিস্পত্তি পর্য্যন্ত কেন স্থগিত থাকিবে না, তাহার কারণ দেখাইতে হইবে।

মাননীয় বিচারপতি বৃহস্পতিবারের মধ্যে কারণ দর্শাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু রুলের শুনানী পর্য্যন্ত খোরপোষের মামলা স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মিঃ এন, কে, বসু; মিঃ এস, সি, তালুকদার; মিঃ বি, কে, দে ও শ্রীযুত রমেন্দ্রচন্দ্র রায় শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে রাসমণি দেবী যে দরখাস্ত করিয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে শ্রীযুত সরকারের রাজনৈতিক শক্রদের দরখাস্ত। ঐ মামলা চলিতে দিলে মাস তিনেক ধরিয়া চলিবে এবং তাহাতে শ্রীযুত সরকারের ক্ষতি হইবে। বার্লিনে যে আন্তর্জ্জাতিক মিউনিসিপ্যাল সম্মেলন হইবে, ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ উহাতে যোগদানের জন্য এবং অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত সরকার আগামী সপ্তাহে বিলাত যাত্রা করিতে চাহেন; কিন্তু তিনি যাহাতে বিলাত যাইতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহার শক্রয়া এই মামলা রুজু করিয়াছেন। ৯ই মে তারিখে বোম্বাই হইতে যে জাহাজ ছাড়িবে, ঐ জাহাজে বিলাত যাত্রার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই টিকেট কিনিয়াছেন।

খোরপোষের মামলা রুজু হইবার পর শ্রীযুত সরকার আলীপুরের দ্বিতীয় সাবজজের এজলাসে এক দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়া এই ঘোষণা করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন যে, শ্রীযুত সরকার রাসমণি দেবীর কন্যা মহামায়ার পিতা নহেন; সুতরাং তিনি তাহার খোরপোষ দিতে বাধ্য নহেন তিনি এই দেওয়ানী মামলার শুনানী যথাসম্ভব সত্বর শেষ করিতে প্রস্তুত, এবং এতৎকল্পে মাননীয় বিচারপতি যতটাকা কোর্টে দাখিল করিতে আদেশ করেন, শ্রীযুত সরকার তত টাকা কোর্টে দাখিল করিতে প্রস্তুত আছেন।

মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার

প্রগতি
না
অধোগতি ?

গোল্ড ফ্লেকের
ফাঁদে
ফাঁকে ?

গৃহহারা, শান্তিহারা, সর্ব্বহারা নারীর নিরাশাময় ভবিষ্যৎ

নিন্দিত পুরাতনকে বর্জ্জন করে অতি-উগ্র অপরীক্ষিত নূতনকে বরণ করে নিয়ে অতি-আধুনিক নারী আজ অতি-লজ্জা থেকে অতি বাচালতায়, অতি-নম্রতা থেকে অতি-মদমত্তায় নিজের সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে শুধু তার অকল্যাণ নয় দেশের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের অশুভ সূচনা করেছে কিনা চালতলা পাব্লিক লাইব্রেরী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের মহিলা দিবসে এই চিন্তনীয় গভীর সমস্যার উদ্ভব করে শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয় অতি-আধুনিকা ও তাঁদের শুভানুধ্যায়ী মহলে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছেন তার যুক্তিপূর্ণ বিচার প্রয়োজন বোধে আমরা নিম্নে নারী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করলুম।

ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বিক্ষোভ পরিহার করে যাঁরা এ প্রবন্ধের সমালোচনা পাঠাবেন আমরা তা সাদরে প্রকাশ করবো।

আমাদের নিজস্ব মন্তব্য পরিশেষে প্রকাশিত হবে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

মহিলাসভায় পুরুষের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় কিনা এসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে। গত বৎসর এই সাহিত্য সম্মিলনী মহিলা-শাখার অধিবেশনে নিমন্ত্রিত পুরুষদের দেখে কয়েকজন বিসদৃশভাবে কটাক্ষপাত করেছিলেন। অভিযোগকারীদের মধ্যে পুরুষও ছিল নারীও ছিল। পুরুষের বলবার কি অধিকার ছিল জানিনা, কিন্তু নারীর অভিযোগে আমাদের ক্ষুব্ধ হবার কারণ ছিল। মহিলাসভায় যে সব পুরুষ যোগদান করেন, নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁরা সহানুভূতিসম্পন্ন, জাতিগঠনে নারীর দেহমনের উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অস্বীকার করেন না। হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন এবং অন্তরের প্রেরণা প্রকাশ করতে যাঁরা আসেন, কটুকথা ব'লে অবজ্ঞা ক'রে তাঁদের দূরে সরিয়ে দেওয়া সহজ হতে পারে, কিন্তু ভদ্রতাসম্মতও নয় লাভজনকও নয় সে আচরণ।

পুরুষকে অবিশ্বাস নারীর মজ্জাগত, স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তার উপকার করবার মূলে একটা না একটা স্বার্থগন্ধী উদ্দেশ্য আরোপ করাও নারীর স্বভাবের মধ্যেই, কিন্তু নারী স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করেনা যে তার বেশী ক্ষতি করে তার নিজের জাত।

বাপের বাড়ী ও শ্বশুরবাড়ীতে কুটুম্ব ও প্রতিবেশীমহলে নারীর লজ্জা ও চরিত্র নিয়ে আলোচনায় এবং নারীর দুর্গতির কারণ হ'তে নারীর যত উৎসাহ, পুরুষের তত নেই। তীক্ষ্ণ তীব্র বিদ্রূপে, অপমানে, অত্যাচারে, জর্জ্জরিত ক'রে কুৎসায় গগনপবন মুখরিত ক'রে গৃহহারা শান্তিহারা করেছে নারীকে নারীই বারংবার। পুরুষকে নারীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে, সংসারযাত্রায় অনায়াসে সর্ব্বহারা করতে নারীই কি বেশী সাহায্য করেনি? বিবাহ বাসরে নারীকে পণ্য সামগ্রীতে পরিণত ক'রে, গৃহধর্ম্মে নারীকে দাসীর চেয়েও হেয় ক'রে, জনসেবার কর্ম্মক্ষেত্রে নারীকে প্রবঞ্চিত উপহাসিত ক'রে, বিধবার নিঃসঙ্গ জীবনকে দুঃখ ও বিঘ্নবহুল ক'রে নারীর সমস্যা নারীই কি জটিলতর করেনি? স্ত্রীস্বাধীনতার যুগে পুরুষের চেয়ে নারীই কি অধিকতর ব্যাপক-ভাবে প্রগতিকে অধোগতি প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়নি? অন্তঃপুরের ইতিহাস যাঁরাই নিগূঢ়ভাবে অবগত আছেন তাঁরাই জানেন নারীর চিন্তাধারার অনুসরণে পুরুষ কাজ ক'রে নারীর উন্নতির পথে বাধাসঞ্চার করেছে, মূর্খতা, অজ্ঞতা, প্রগলভতা, লজ্জা-হীনতায় নারীই নারীর নামে দুরপনেয় কলঙ্কলেপন করেছে। নারীর বিদ্যাবিস্তার, কলাশিক্ষা, অর্থ-উপার্জ্জন, প্রতিভা-প্রতিষ্ঠায় পুরুষ যত সাহায্য করেছে নারী তত নয়। প্রসাধনে, বেশবিন্যাস ও অঙ্গশোভায়, রূপবর্দ্ধনে, খেলায়, ব্যায়ামে, স্বচ্ছন্দভ্রমণে, স্বাস্থ্যরক্ষায়, শুশ্রূষায় নারীকে পুরুষ যত সুযোগ দিয়েছে নারী তত নয়। নারী দিয়েছে অপবাদ, দিয়েছে ঈর্ষা, দিয়েছে কুৎসাপঙ্কিল অনুৎসাহ।

বাংলাদেশে সচরাচর তিন শ্রেণীর মেয়ে আছে। এক বড়লোক আর এক মধ্যবিত্ত, শেষ হল গরীব।

কোন্ কোন্ মেয়ে কি ভাবে মানুষ হয় দেখা যাক্।

সাধারণতঃ বড়লোকের মেয়ে বেলাতে ঘুম থেকে ওঠে। নিজে কাপড় কাচবার বালাই নেই, কাপড় ছেড়ে ফেলে দেয়, ঝি কাচে। তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ হয়, স্নো, পাউডার মুখে ঘষা হয়, অবিন্যস্ত চুলটাকে ফাঁপিয়ে কানদুটো ঢাকা হয়, বালিশের তলা থেকে হারটা বা'র করে নিয়ে পরা হয়, পরা হয় কানের ঝুমকো দুটো। কেউ কেউ বা চোখে

সুর্মা লাগায়। তারপর স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে বিলিতি ধরণের 'হলে' চায়ের টেবিলে গিয়ে চা-টোষ্ট খেতে খেতে ন্যাকান্যাকা কথা আর গল্প, দিশিধরণ হলে পিঁড়েতে বসে চা মিষ্টি খেতে খেতে ভাইবোনদের সঙ্গে আব্দারের সুরে ঝগড়া, আর হেরে গেলে— মা দ্যাখোনা! সকাল থেকে কাজ কর্ম্মের নামটি নেই, একটু গান, একটু পড়া, একটু হয়ত গাড়ীটা নিয়ে বেরোন, একটু সখের সেলাই, খোসগল্প। স্নান করার বেলা হলে ঝাড়া আধঘণ্টা ফরসা হবার চেষ্টা, তারপর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন এলিয়ে গড়িয়ে খাওয়া এবং দীর্ঘ দিবানিদ্রা, বিকেলে আবার সাজসজ্জা করে হয় মোটর ট্রিপ, নয় বাড়ীতে একবার এঘর একবার ওঘর। আর যেতে আসতে আয়নার সামনেটা হয়ে যাওয়া। রাত্রে ইলেকট্রিকের সুইস টিপে সোফায় কিংবা বিছানায় এলিয়ে পড়া—খাওয়া আর শোয়া দিন যেন যায় না। বাপকে বলে বাপি কি পাপা কি ড্যাডি। বাবার বন্ধু এল ত হৈ হৈ, কৃত্রিম সুর—কৃত্রিম হাসি, গরীব আত্মীয় এল ত—ও কে হয় মা? চিনি না ত? এইসব মেয়ে সংসারধর্ম্মের কিছুই শিখল না, শুধু জানল আপনার দেহকে —আপনার মনকে। বড় ঘরে বিয়ে হল ত' দিনরাত তিনতলায় পাখার তলায় ব'সে থাকা, স্বর্গের পাখীর মত একতলার মাটিতে পা পড়বে না, শ্বশুরকে এক কাপ চা কিম্বা স্বামীকে একদিন মাংসর কোর্ম্মা ক'রে দিল ত—ধন্যি ধন্যি—'বৌমা কত কাজ করে'! রং এর দোষে গরীব-ঘরে পড়ল ত নাক তুলেই থাকে—বাসন আমি সাত জন্মে মাজি নি, রান্নাকরা আমার দ্বারা পোষাবে না, কলাইকরা বাটিতে চা আমাদের চাকররাও খায় না, ঝগড়া খিটিমিটি, অশান্তি। এদের ছেলেরা হবে অমানুষ, স্বার্থসর্ব্বস্ব। বড়লোকেই রইল ত' ঝিয়ের কোল থেকে চাকরের কোল, চাকরের কোল থেকে মোটরকার, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলই না। কোনরকমে হোঁচট খেয়ে লেখাপড়া শেষ ক'রে বিলেতও হয়ত গেল, মুরুব্বির জোরে কাজও হয়ত পেলে, কিন্তু ইউরোপীয় কিম্বা ইহুদী বান্ধবী আর শেরী কিম্বা শ্যাম্পেন গোল্ড ফ্লেকের ফাঁকে ফাঁকে চাইই।

আজকালকার মধ্যবিত্ত মেয়েরা প্রথম থেকেই লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পায়, যদি ছেলে পছন্দ করে আর সস্তায় বিয়ে হয়। কেউ শেখে গান, কেউ যন্ত্রসঙ্গীত, কেউ এস্রাজ, কেউ যোগাড় করে সাঁতারের মেডেল। সাইকেল, হাইজাম্প, ভারতীয় নৃত্যে সমস্ত দেহমন হয়ে ওঠে চঞ্চল। যথেষ্ট হৃদস্পন্দনের মধ্যে সহশিক্ষা সাঙ্গ করে হয়ে পড়ে সবজান্তা, অনগ্রসরতার ভাব যায় কেটে। ধুয়া ধরে বিয়ে করব না; কিন্তু আজ বিয়ে হলে আর কাল-এর জন্যে অপেক্ষা করে না। পছন্দ ক'রে বিয়ে করতে

হলে এমন লোককে পছন্দ ক'রে বসে, যার সঙ্গে বিয়েতে অনেক বাধা, অসবর্ণ-পরিণয় ভিন্ন গতি নেই, অনেক সময় বাংলা দেশের কোন ছেলেই পছন্দ হয় না, হয় সিলোনীস্, হয় সিন্ধী, এবং হিন্দুর চেয়ে অহিন্দুর প্রতিই বেশী অনুরাগ দেখা যায়, যদিচ অহিন্দু প্রেমের খাতিরেও তার জাতিধর্ম্ম ত্যাগ করে হিন্দুত্ব গ্রহণ করে না। রূপ-ম' মনোনয়ন ক'রে যার সঙ্গে বিবাহ দেয়, পনেরো আনা তিনপাই Caseএ তাকে সম্পূর্ণভাবে অভিলষিত মনে হয় না। কারণ এই সব মেয়েরা পর্দানশীন মেয়েদের চেয়ে জগতটা অনেক বেশী দেখেছে, পুরুষের পৌরুষ এবং গুণ অনেক বেশী উপলব্ধি করেছে। তার কল্পনা অনেক বেশী অগ্রসর, তাদের রুচি অনেক পরিবর্ত্তিত। তারা চায় এমন পুরুষ যার যৌবনে রবীন্দ্রনাথের মতন রূপ, উদয়শঙ্করের অঙ্গ-ভঙ্গিমা, দিলীপ রায়ের গানের গলা, গোষ্ঠ পালের মতন ক্ষিপ্রতা, শিশির ভাদুড়ীর মত ভাব-প্রকাশ, বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা, হৃষীকেশ লাহার ঐশ্বর্য্য। বলে বটে—"খড়ের কুটিরখানি গাছের তলায়—ধন নয় মান নয় কিছু ভালোবাসা, করেছিনু আশা, আমায় ঘিরি আমায় চুমি কেবল তুমি কেবল তুমি—" কিন্তু আলোকোজ্জ্বল করতালি মুখর এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চের মোহ কিছুতেই তারা ত্যাগ করতে পারে না। স্বামীটি যদি খবরের কাগজও না পড়ে, রিকশভাড়াও না দিতে পারে, মার্চ্চেন্ট অফিস থেকে ছাতা বগলে সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফেরে—তবে ত জীবন দুর্বিসহ। এদের ছেলেরাও সাধারণ ভাবে সুখে দুঃখে মানুষ হয়, ডাক্তার, উকীল ইঞ্জিনিয়ার হয়, কিন্তু তাদের আদর্শ হল রোমান্স, লভ এ্যাট্ ফার্ষ্ট সাইড, ছাত্রছাত্রী-সম্মিলন, জলসা হৈ-হৈ।

তারপর গরীব ঘরের মেয়ে। মুড়ীচ্চাক্ ছোলাচ্চাক খেয়ে ইস্কুলে যায়, চার পয়সা মাইনে দিয়ে নীচু কেলাসে পড়ে, বিঁড়ে খোঁপা বেঁধে দিদিরা নমস্কার—মে-এ-এ-ম্ নমস্কার করে—সারাদিন বন্দী থাকে বইত না, বড় কেলাসে ওঠবার আগেই পড়া বন্ধ হয়ে যায়—উদয়াস্ত খাটুনী সুরু হয় মায়ের সঙ্গে। মার খেয়ে, বকুনী খেয়ে বড় হতে হতে এক-দিন হঠাৎ বিয়ে হয়ে যায়, জিরেন পায় শুধু বিয়ের কটা দিন, আবার অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্চে, সে খবরের জন্যে কোন কৌতূহল নেই, স্বামীরা সারাদিন ম্যাট্ ম্যাট্ কি ফ্যাট্ ফ্যাট্ করে, শাশুড়ী বলে, 'ছোটনোকের মেয়ে', দেওর বলে, 'হতচ্ছাড়ীকে নাথি মারব'—মনে গভীর ক্ষত উৎপাদন করে না, সবই গা-সহা। একপাল ছেলে মেয়েতে ঘর ভ'রে যায়। সারাদিন ধরে ছুটোপাটি, মারামারি, গালা-গালি, রাত্তিরেও পরিত্রাহি চ্যাচাবে, একটু যদি ঘুমোবার জো আছে, ধড়াধ্বড় এটাকে চড় ওটাকে পাথাপেটা, আর মর্ মর্ মর্!—

তাদের ছেলেদের লেখাপড়া হয় না, বিড়ি ফুঁকে ছাতার দোকানে কাজ করে, বায়স্কোপের চার-আনার টিকিট ছ-আনায় বেচে—আর বলে "মাইরি শালা, আর শালা তোর দিব্যি শালা, মাইরি কোন্ শালা মুখ খারাপ করে।"

বিচিত্র ভঙ্গীতে ঠমকে ঠমকে যারা পথে যায়, বাসে চড়ে, পৃথিবীতে পুরুষ বলে একটা জীব আছে একথা ভুলে যায়—কালীঘাটের আদিগঙ্গার কাদাগোলা জলে যারা হাঁসের মতন স্নান সেরে পাঁপরভাজা আর আলুনী খেতে বসে—দার্জ্জিলিং-এর মাউন্ট এভারেষ্ট হোটেলের বাতায়নে সাহেবী পোষাক পরা চালিরাৎ সঙ্গীর সঙ্গে কলহাস্যে গল্প করতে করতে কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য্য উপভোগ করে, সকলেই উপরোক্ত তিনশ্রেণীর একটা না একটাতে গিয়ে পড়বে এবং তাদের পরিণাম আমরা দেখলাম।

নারী যতক্ষণ না সেই আদর্শ শিক্ষা ও স্বাধীনতার উজ্জ্বল আবহাওয়া পাচ্ছে, যাতে নিজে সে পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠছে এবং ভবিষ্যৎ বংশধারাকে সমৃদ্ধ করে তুলছে ততক্ষণ দেশের কল্যাণ নেই। যে শিক্ষায় নারী নিজে এমন মানুষ হলনা যাতে সে সকলকে সুখী করতে পারল, বহুজনের উন্নতিবিধান করতে পারল, দেশকে দিতে পারল সুসন্তান, সে শিক্ষা কি শিক্ষা? অকালকুষ্মাণ্ডয় দেশ গেছে ভ'রে, অবিনয়ী উদ্ধত চরিত্রহীনের অত্যাচারে সমাজের শান্তি ও সম্পদ্ হয়েছে বিপন্ন, এ দোষ কার? দেশের মায়েদের?

পুত্র-যশ ও জলদানের দ্বারা মানুষের পুত্রলক্ষণ বোঝা যায়, শিক্ষিতা সর্ব্বগুণ-সম্পন্না জননীর প্রকৃত পরিচয় তার সন্তান সৌভাগ্যে। সে দায়িত্ব বর্ত্তমান কালে কতদূর পালিত হচ্ছে বিবেচ্য।

সাবেক ও আধুনিক কোন্ শিক্ষাকে বলব আদর্শ? ছুটীর সময় আহ্নিক সেরে তিনটের সময় খাওয়া সেই কি ধর্ম্ম? ভগবান ব'লে যে একটা কেউ আছে সেটা দিনান্তে একবারও মনে করবার চেষ্টা না করাটাই বা কি ধর্ম্ম? ছুঁচিবাইগ্রস্তের দুহাতি গামছা প'রে গোবরজলছড়া দিয়ে গোময়গন্ধে পানীয় জল অবধি বিকৃত করাই বা কি রুচি? বিগতযৌবনে নানা কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য নিয়ে তরুণী সেজে বাবুর্চ্চির হাতের রান্না মুর্গীর ঠ্যাং খাওয়াই বা কি রুচি? পাণ্ডার ব্যগ্রবাহুবেষ্টনে বহুপুরুষের পীড়নে দেবদর্শনই বা কেমন? থিয়েটারে বায়স্কোপের অন্ধকারে অনেক লোকের হাঁটু ঠেলে যাওয়া এবং তাদেরও সেইভাবে যেতে দেওয়া মেয়েদের পক্ষে তাই কি শোভন? নারীজাগরণ সকলেই প্রার্থনা করি, কামনা করি, কারণ সে ছাড়া জাতির মুক্তি নেই একথা অবিসম্বাদিত সত্য। কিন্তু নিন্দিত পুরাতনকে বর্জ্জন করতে হবে ব'লে অতি উগ্র অপরিক্ষিত নূতনকে বরণ ক'রে নিয়ে নারী যদি আজ অতি-লজ্জা থেকে অতি-বাচালতায়, অতি-নম্রতা থেকে অতি মদমত্ততায়, অতিপ্রাচীনতা থেকে অতি-আধুনিকতায় নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে, তাহলে শুধু তার অকল্যাণ নয়—দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় তার অশুভসূচনা দেখা দিয়েছে।

অবিশ্বাস ও অসম্ভ্রম বিদূরিত হয়ে পুরুষের শ্রদ্ধাবিগলিত গৃহপ্রাঙ্গণে হারোনো শ্রী ও মহিমা ফিরিয়ে আনতে—নারীকে নিতে হবে নূতন ও পুরাতনের যা কিছু ভালো—নির্ব্বিচারে নয়, বিচারসহ যুক্তিতে—এবং যেখানেই বাধবে বিরোধ কিছু ত্যাগে, কিছু করুণায়, কিছু তেজে নারীকে পণ ক'রে নিতে হবে সুগম, যাতে অতীত ও বর্ত্তমান নিরাশাময় নিরন্ধ্র তমসাচ্ছন্ন হলেও ভাবী কালের পূর্ব্বতোরণে জাগে আশার দীপরশ্মি এবং দূরশ্রুত গান কাছে চলে আসে—

মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।

শেফালি-কুঞ্জে

এখন হইতে কত না যতনে
দিয়ে রূপ রস মধু,
শরৎকালেতে ফুটায়ে তুলিও
তব শেফালিকা-বধূ,
ধৈরয ধ'রি সুকোমল স্নেহে
পরশ দানিয়া তারে,
কচি ফুল কলি পরুষ-পরশ
সহিতে কভু সে পারে?
ফুল-মালঞ্চে পাকা মালী যেই
ল'য়ো তার উপদেশ,
কুঞ্জে তোমার শেফালি তাহ'লে
ফুটিয়া উঠিবে বেশ।

আজি এইক্ষণে ভাবি মনে মনে
অতুল-দাদার কথা,
তাঁর হৃদয়ের অকথিত বাণী
গভীর মরমব্যথা।
মদনের বাণে তাঁর দলবল
ক্রমে হ'ল ছারখার
পুরাণো তো গেল— নতুন না এলে
দেখিবে কে তাঁরে আর?
নিজের কথাই পঁচিশ কাহন
ভাবিছ আজিকে ভাই,
দাদার কি হ'বে সে কথা তোমার
ভাবিতে সময় নাই!
সন্ধ্যা সবে তো এরি মাঝে এতো
এখনো রাত্রি বাকী
আটঘাট বেঁধে না চলিলে শেষে
পড়িবে বিষম ফাঁকী!
জানি বীর তুমি ভাবিছ বোধহয়—
"তোয়াক্কা কে রাখে কার?
শেষকালে নয় খেয়া কড়ি দিয়ে
ডুবে হ'ব নদী পার।

[শ্রীমতী শেফালির সহিত 'অমৃতবাজার পত্রিকার' বিজ্ঞাপন-বিভাগের শ্রীমনোজ বসুর শুভ বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত। বিজ্ঞাপন-বিভাগের অধিপতি শ্রীঅতুলানন্দ দত্তের প্রতি কটাক্ষ থাকায় জন্য কবিতাটী মুদ্রিত করিতে কেহ সাহসী হন নাই। তবে অতুলবাবুর ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া কোন গুপ্তচর আমাদের দপ্তরে কবিতাটী পাঠাইয়া দিয়াছেন। সঃ খেঃ]
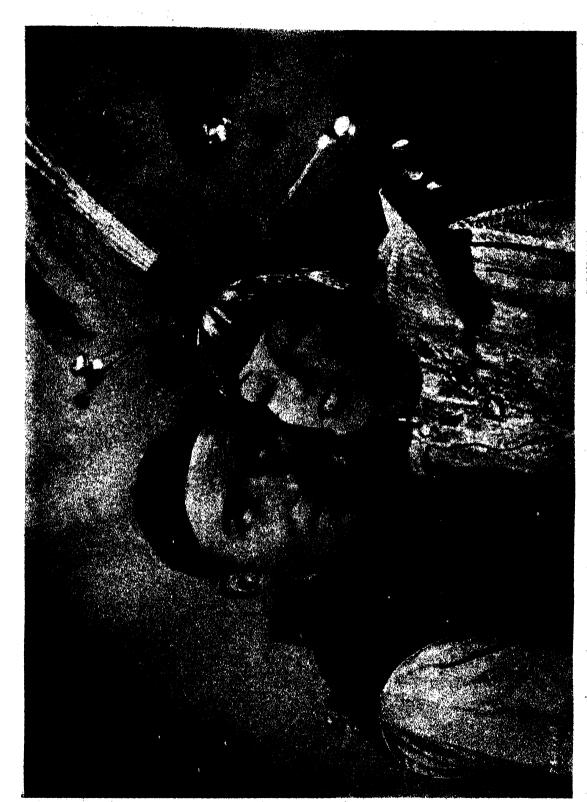
মেট্রোয় চল্‌ছে প্যারামাউন্টের সঙ্গীত-মুখর-চিত্র "এনিথিং গোজ"। বিঙ্‌ ক্রস্‌বি আর এথেল মারম্যান এতে সুন্দর অভিনয় কোরেছে।

পরিচালক — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা
প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা
গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৩১শে বৈশাখ ১৩৪৩—14th. May, 1936. } ২০শ সংখ্যা

কর্পোরেশনের শিল্পাগার

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের মুক্তির পর আমরা যখন "খেয়ালী"র পৃষ্ঠায় তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি, তখন এই ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তিনি করপোরেশনে তাঁহার যে প্রারব্ধ কার্য্য অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন নবোদ্যমে সেই কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করুন এবং ইহাও বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার দ্বারা এই কার্য্য যেরূপ সুসম্পন্ন হইবে, অন্য কাহারও দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। গত শনিবার শ্রীযুক্ত নিয়োগীর তত্ত্বাবধানে করপোরেশনের এই শিল্পাগারের (Commercial Museum) উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে।

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ"—এই কথাই আমরা জানি কিন্তু কি ভাবে বাণিজ্য করিতে হয় অথবা বর্ত্তমানে বাণিজ্য করিতে হইলে কিসের বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের শিল্পবাণিজ্য সংক্রান্ত কোন্ বস্তু কোথায় ও কত সস্তায় পাওয়া যায় এবং তাহা অধিক মূল্যে কোথায় বিক্রীত হইতে পারে এই সকল তথ্য জানা না থাকিলে এই প্রতিযোগিতার বাজারে বাণিজ্যে লাভ করার আশা দুরাশা মাত্র। করপোরেশন শিল্পাগারে এই সকল বস্তু ও তৎ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। শুধুই যে সহরের বা সহরের নিকটবর্ত্তী লোকেরাই ইহাতে উপকৃত হইবে তাহা নহে, মফঃস্বলের অধিবাসীরাও যাহাতে এই শিল্পাগারের সাহায্য পায় তজ্জন্য পত্র-বিভাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিভাগ পত্রদ্বারা মফঃস্বলবাসীদের প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিবেন।

প্রত্যেক স্বাধীন দেশে বাণিজ্যিক উন্নতির মূলে আছে এই শিল্পাগারের সাহায্য। আনন্দের বিষয় কলিকাতা করপোরেশন এমন একজন লোকের উপর এই শিল্পাগার পরিচালনার ভার দিয়াছেন যিনি দেশবিদেশের বাণিজ্যিক উন্নতি ও অবনতির ইতিহাসে সম্যক অভিজ্ঞ। অতএব আমরা আশা করি, দেশবাসী করপোরেশনের এই শিল্পাগারের সম্পূর্ণ সুবিধা ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিবেন।

দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়

গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় যে সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিয়াছিল এবং আজিও নানা বাধা বিপত্তির সংঘাত সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া আছে, উহাদের মধ্যে দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয় অন্যতম। স্বাদেশিকতার ভাবের আতিশয্যে ঐ সময়ে সারা বাঙ্গলাদেশে অনেকগুলিই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু কালের অমোঘ বিধানে এবং জনসাধারণের ঔদাসীন্যের ফলে তাহাদের অধিকাংশই প্রায় লুপ্ত। কিন্তু দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয় আজিও সগৌরবে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

গত ৯ই মে শনিবার জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এই প্রতিষ্ঠানের শুভার্থী কংগ্রেসকর্ম্মীবৃন্দের এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বিদ্যালয়টিকে কি উপায়ে দেশের ও দশের পক্ষে অধিকতর কার্য্যকরী করা যায় তাহার আলোচনা হইয়াছিল। দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয় বর্ত্তমানের ন্যায় জাতীয়তামূলক শিক্ষা বিতরণ ছাড়াও আরও বহু কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে ইহা সভার আলোচনায় বেশ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়টীকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে চাই প্রচুর অর্থানুকূল্য। দেশবন্ধুর কর্ম্মক্ষেত্রে দক্ষিণ কলিকাতায় দেশবন্ধু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কোন জনহিতকর কর্ম্মধারা যে অর্থাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে তাহা আমরা মনে করি না। জাতীয় আদর্শে আস্থাবান দেশবাসী কলিকাতার এই একমাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ের রক্ষা-কল্পে অকুণ্ঠ অর্থসাহায্য করিয়া দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন।

:o:-

প্রগতির প্রতি ভেংচী

শ্রীশান্তিরাম উপাধ্যায়

[গত সংখ্যা খেয়ালীতে শ্রীযুক্ত প্রভাত কিরণ বসু মহাশয়ের নারী-প্রগতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ (মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার) প্রকাশিত করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই সম্বন্ধে আলোচনা আহ্বান করিয়াছিলাম। আনন্দের বিষয় বাঙ্গলার একজন শক্তিশালী তরুণ-লেখক এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। জাতীয় জীবনের প্রগতির সহিত নারী-প্রগতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। সেই জন্য এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ আলোচনার ফলে যাহাতে সত্য পথের একটা দিশা মিলে, সেই আশায় আমরা এই আলোচনাটি সাদরে পত্রস্থ করিলাম।]

১৯শ সংখ্যা 'খেয়ালী'তে শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধটি প'ড়ে বিস্মিত হলাম যে, এরই জন্যে এত রাগ, দ্বেষ, কলহ-কোলাহল হ'য়ে গেছে। যাঁরা এই প্রবন্ধ-পাঠ শুনে রুষ্ট হ'য়েছিলেন তাঁরা অনায়াসেই একে তুচ্ছ ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকতে পারতেন; তাতে নারীর অগ্রগতিতে কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটতো না। প্রভাতবাবুর লেখাটি একটি সাময়িক উত্তেজনার স্ফূর্ত্তি মাত্র, ওর কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। কারণ ও লেখায় নারীর মনের কোন বিশ্লেষণ নেই, কেবল তার বাহিরের অঙ্গভঙ্গীর প্রতি কটুকটাক্ষ আছে। ও লেখায় কোন গাম্ভীর্য্য নেই, গভীরতা নেই,—ওর ভাব অতি পুরাতন, ভাষা অতি তরল। এ যেন খেলায় হেরে গিয়ে শিশুর ভেংচী কাটা। পুরুষের অমর্ষণ ও মনের দুর্ব্বলতাকে মহিলা-সম্মেলনের সমক্ষে এমনভাবে প্রকাশিত না করাই বোধহয় সমীচীন ছিল।

সমাজ-বিপ্লবের দিনে সহসা একটা মত প্রকাশ করা অবিবেকের কাজ। কারণ, ভবিষ্যতের পক্ষে কোন্‌টি ঠিক কল্যাণ তা আমরা জানিনে। আর নারী-প্রগতির সঙ্গে—তাহার দেহের দুর্গতি (?) যাই হোক্ না কেন,—তার মনের গতি কোন্ পরিণতির দিকে ছুটেছে, এ কথা পুরুষ বলতে পারে না, বিশেষতঃ বাঙ্গালী পুরুষ। বাংলায় পুরুষ নারীর মনের সঙ্গে সুপরিচিত নয়। চমকাবেন না! সত্যি কথা। মানুষের মন চেনা যায় সখ্যের ভেতর দিয়ে, অর্থাৎ বন্ধু-ভাবে সে যখন সম্পূর্ণ ধরা দেয়। নারীকে চিনতে হ'লে তাকে পেতে হবে সঙ্গি-ভাবে, মাতৃভাবে নয়, স্ত্রী-ভাবে নয়, দুহিতা-ভাবে নয়। বাংলার ক'টা পুরুষ ক'টা নারীর সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশবার সুযোগ পায়? প্রভাতবাবু যেমন ধারা হাটে-মাঠে, ঘাটে-বাটে, আপিসে আদালতে, বাসে-রেলে পুরুষের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পান, তেম্নিধারা কি নারীর সঙ্গে মিশেছেন? পুরুষের দৌড় ত নিজের গৃহটি পর্য্যন্ত। সেখানে তার মহীয়সী মাতাকে সে শ্রদ্ধায় অবনত হ'য়ে দেখে,—তাঁর মাতৃ-ভাবটুকুই দেখে। ঐ মায়েরই জায়ারূপ তার দৃষ্টির অগোচরে। সে তার নিজের কন্যাকে দেখে স্নেহের চক্ষে; কন্যার সম্পূর্ণ মনের পরিচয় পায় না। এমন কি নিজের স্ত্রী-মনেরও সম্পূর্ণ পরিধিতে সে পৌঁছিতে পারে না। বাংলার বউ লজ্জায় সঙ্কোচে, সম্ভ্রমে, অভিমানে, স্বামীর কাছেও নিজের অনেক-খানি সত্তা গোপন ক'রে রাখে। তাই না এত প্রগতির দিনেও স্ত্রী স্বামীর কাছে ঠিক পরিপূর্ণ আদর যত্ন পায় না।

যাক্—বলছিলাম যে, বাংলার পুরুষের নারী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সত্যকার জ্ঞান নেই। ছাপানো বই প'ড়ে আর নিজের পরিবার হ'তে যে অভিজ্ঞতা,—তাই শুধু সম্বল ক'রে সমগ্র নারী-জাতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা চলে না। নারীর পরিণাম কি হবে না হবে, তা নিয়ে পুরুষের এত মাথা-ব্যথা কেন? নারীদের মধ্যেও অনেকেই শিক্ষা লাভ করেছে, তারাই এখন ও কথাটা বলুক না। কারো যদি ব্যক্তিগত জীবনে কোন নালিশ থাকে ত স্পষ্ট সেই কথাই নিজের বন্ধুবান্ধবের (বান্ধবীরও) কাছে বল্লেই হয়। সভা-সমিতিতে ও নিয়ে বাহাদুরী করতে যাওয়া কেন?

অনেকের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস নেই,

অথচ কার্নিভ্যালে কাঠের ঘোড়ায় চড়ে বেশ আনন্দ পায়। তাদের হঠাৎ যদি আসল ঘোড়ায় চাপিয়ে দেওয়া যায় ত অবস্থা হবে জন গিল্‌পিনের মতো। বাংলার পুরুষ এতদিন নারীজাতটাকে কাঠের ঘোড়া ভেবে বেশ ক'রে বাগিয়ে তার ঘাড়ে চড়ে দিব্যি আরাম উপভোগ করছিলো। এখন হঠাৎ ঘোড়াটা যখন জীবন্ত হয়ে পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে, তখন পুরুষ বলছে, 'সামাল সামাল, —ওরে, আমি যে ছাই আছাড় খেলাম, থামাও না একে কেউ!'

প্রভাতবাবুর প্রবন্ধের ভাষার উচ্ছ্বাস যেন বর্ষার দিনে কলকাতার রাস্তায় হঠাৎ জলজমার মতো। পথের ছিদ্রপথে প্রচুর জল নিঃসরণ হয় না। তাই বান ডাকে। মনের সঙ্কীর্ণতায় নারীপ্রগতির সবটা হজম হয় নি বলেই সহসা বচনের বন্যা জেগেছিলো।

নারীজাতি-ই নারীর অধঃপতনের একমাত্র কারণ, আর পুরুষ কেবলি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে, একথা বোধহয় ঐতিহাসিক সত্য নয়। অথচ এইরূপ একটা নির্জ্জলা মিথ্যে কথার খুঁটির ওপরে এ প্রবন্ধ খাড়া করা হয়েছে। এর হেতু বোধহয় প্রভাত-বাবুর 'পেসিমিজম্'। নারীর যে নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক চিত্র প্রবন্ধে আঁকা হ'য়েছে সেইটিই কি বাংলার নারী সম্বন্ধে প্রভাতবাবুর চরম কথা, 'ফাইন্যাল ভার্ডিক্ট'? তাঁর মনের কোনে কি এই প্রগতিশীলাদের একটি মেয়েও বেশ একটি রমণীয় সুন্দর প্রসন্ন চরিত্রের ছাপ দিয়ে যায় নি? তবে তাঁর দুর্ভাগ্য!

প্রবন্ধটি নিছক গালাগালি, ওতে কিছুমাত্র কাজের কথা নেই। লেখক দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখছেন, অথচ আলো যে কি তাও দেখেন নি, কিসে যে আলো জ্বলবে তার ব্যবস্থাও করেন নি। বলবেন হয়ত, ও সব সমাজ-বৈজ্ঞানিকের কাজ, সাহিত্যিকের কাজ নয়। কেবল বুকনি দিয়ে মনের ঝাল-ঝাড়াও সাহিত্যিকের ধর্ম্ম নয়। আদর্শ শিক্ষা কি, কোন্ পথে প্রগতিকে মোড় ফেরাতে হবে,—এসব বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা থাকলেও পাঠক খুসী হতো। প্রভাতবাবু তাঁর নিজের গৃহের কন্যা অথবা ভগিনী প্রভৃতির জন্যে কি আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, এবং বর্ত্তমান যুগের প্রগতির সঙ্গে তাঁদের মনের গতির কি প্রভেদ, তার কিঞ্চিৎ আভাষ দিলেও পারতেন। একটা পথের ইঙ্গিত অন্ততঃ পাওয়া যেতো। দুটো 'অতি'-র মাঝখানে যে কি আছে সেটা না জানলে চলবে কেন? ইতিহাসের মাঝখানটা ফাঁক থাকতে পারে না।

প্রগতির ধারা অতি-প্রাচীনতা থেকে অতি-আধুনিকতায় হঠাৎ লাফ নয়, একটি ক্রম রেখে বেশ ধীরে ধীরে এসেছে। পুরুষ নারীর উর্ব্বশী রূপ অনুসন্ধান করেছিল তাই নারী এসেছে এই স্বচ্ছন্দগতি লাস্যময়ী নৃত্যপরা মায়াবিনী মূর্ত্তিতে। এখন অস্বীকার করলে চলবে কেন?

লেখক নারীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখিয়েছেন, প্রত্যেক মেয়েই অপদার্থ, অলস, বিলাসিনী, সমাজ-বিধ্বংশ-কারিণী, বথাটে-পুত্র-প্রসব-কারিণী। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বাংলার পুরুষগুলোকেও কি এমিধারা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না? আর তারাই কি সব আদর্শ জীবন যাপন করছে? এদেশে যেমন দেবা তেমি দেবী। এতে আর ঝগড়া কেন? আসল গলদ প্রগতিতে নেই, আছে অন্যখানে। ঘরের একটা দরজা বন্ধ থাকলে সে ঘরে হাওয়া খেলে না, যে হাওয়া প্রবেশ করে, তাও হ'য়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর। পশ্চিমের প্রগতির হাওয়া এদেশে ঢুকেছে; কিন্তু পরাধীনতার প্রবল প্রাচীরে আমাদের সমাজ-মনের একটা দিক সম্পূর্ণ রুদ্ধ,—তাই সব ভালো এখানে বিষিয়ে ওঠে, তাই প্রকৃত শিক্ষা নেই, শিল্পকলা নেই, জাতিগঠন নেই। তাই ছেলেরাও এখানে দুঃশীল, দুঃশিক্ষিত, অপটু, অসমর্থ, ক্লীব; মেয়েরাও তাই উন্মার্গ-গামিনী। ভাল হবে কোত্থেকে? প্রভাতবাবু একটি বেশ ভালো মেয়ের বর্ণনা দয়া ক'রে দেবেন কি?

মেয়েরা বর্ত্তমানে যেভাবে সারাদিন কাটায়, তাছাড়া অন্য কি ভাবে দিন যাপন করা যেতে পারে এরও একটা খসড়া লেখকের দেওয়া উচিত ছিল। মেয়েদের জীবন-লীলার ক্ষেত্র কি, কতদূর তার প্রসার, এ সবের কোথাও কোন আলোচনা নেই,—

লেখক দিব্যি এসব এড়িয়ে গেছেন,—অথচ ভৎর্সনার পঞ্চমুখ। বর্ত্তমান বাংলার একজন তথাকথিত বড় চাক্‌রে, বা উকীল বা কেরাণী অথবা সাহিত্যিকের জীবনধারার রুটীন যদি আলোচনা করি ত দেশের পক্ষে তাও বিশেষ আশাপ্রদ নয়। এখানের পুরুষ যদি কর্ম্মঠ হ'ত তা হলে আর দেশের এ দুর্দ্দশা হত না। পুরুষের কাজের মধ্যে ত' দেখতে পাই, গার্ডেন পার্টি, বিলিয়ার্ড খেলা, চায়ের মজলিস, সবুজ সঙ্ঘ—রসচক্র, মধুচক্র, ক্লাবের আড্ডা, বারোয়ারী তলায় নারী-চর্চ্চা, ফুটবল-চর্চ্চা, সিনেমা,—আর ফাঁকে ফাঁকে কাউন্সিল, কংগ্রেস, য়ুনিয়ন্ বোর্ড, আবিসিনিয়া, জাপান আর এম্-সি-সি-র স্বপ্ন।

একথা প্রভাতবাবু ভুলে যাচ্ছেন কেন যে, যুগধর্ম্মকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। নারীপ্রগতিতে বাইরের জীবনে অনেক বিশৃঙ্খলা এসেছে স্বীকার করি, কিন্তু এও স্বীকার করতে হবে যে নারীমনের অনেক উন্নতি-সাধনও ঘটেছে। প্রাচীন নারীর মনোজীবনের চেয়ে আধুনিক নারীর মনোজীবন অনেক প্রশস্ত, ব্যাপক, উদার ও শক্তিমান্। বিজ্ঞজন প্রত্যেক যুগেই নূতনকে সতর্কতা-বাণী আউড়েছেন, আবার যুগান্তরে সেই নূতনই হয়েছে পুরাতন 'অতীত—অতএব গৌরবময় আদর্শ। ভবিষ্যতে আবার অতি-অতি-অতি-আধুনিক যেদিন আরও প্রবল তাণ্ডব নৃত্য করবে, সেদিন এই আজকের অতি-আধুনিক নারীই হবে মহত্বের আদর্শ। ঐতিহাসিক তখন গবেষণা ক'রে বলবে, বিংশ-শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধেই বাংলায় ছিল সত্যযুগ।

খেলার মাঠে

একলব্য

রসিদ—মহামেডান স্পোর্টিং

খেলার মাঠ আবার সরগরম হ'য়েছে। ক্রীড়ামোদীদের প্রাণে এসেছে পুলক সঞ্চার। বিকেল হ'লেই সব ভুলে ট্রামে বাসে লোক বাদুড়ের মত ঝুলতে ঝুলতে খেলা দেখবার জন্যে মাঠে হাজির হয়। আফিসের বাবুদের চারটে থেকে কলমের গতি আসে নিভে—কখন গিয়ে গো-ও-ও কোর্‌বেন এই হয় তখন থেকে তাদের ধ্যান। কিন্তু এ বছর যত উৎসাহ নিয়ে লোকে খেলা দেখবার জন্যে সাজগোজ কোর্‌ছিল—কয়েকটা খেলা দেখার পর সে উৎসাহ তাদের অনেকটা নিভে গেছে। ভাল খেলা এবার কোন দলেরই কাছ থেকে এখনও পর্য্যন্ত দেখা যাই নি। গত বছরের লিগ্-বিজয়ী মহমেডান দলের সে ক্ষিপ্রতা যেন আর নেই। এর কারণ আর কিছুই নয়, তাদের দলের রহমৎ ও মহিয়ুদ্দিনের অভাব। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, অন্যান্য ভারতীয় দল থেকে তাদের বিশেষত্ব-সুযোগ তারা নষ্ট করে নেই। ইষ্ট বেঙ্গলের অবস্থাও এবার খুব সুবিধে জনক মনে হ'চ্ছে না। নূর মহম্মদের অভাব এরা খুব অনুভব কোর্‌ছেন। তবে শেষ অবধি একাগ্রতার ফলে এরা লিগে উঁচু স্থানেই থাক্‌বে আশা করা যায়। মোহন-বাগান যদি এখন থেকেই সাবধান না হয় তা' হ'লে তাদের অবস্থা এ বছরের হকি লিগের মত হওয়া আশ্চর্য্য নয়! এখন মোহনবাগানের অবস্থা দেখে মনে হয় ১৯১১ সালের নাম ভাঙিয়ে তারা খাচ্ছে। আর দুঃখ হয়, যে মোহনবাগানের নামে গেল বছর পর্য্যন্ত গ্যালারীতে লোকের জায়গা দেওয়া যেত না, ভাল ভাল খেলায় সেই মোহনবাগানের খেলায় আজ হাতে লোক গোনা যায়। মোহনবাগান যদি লোকের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে পেতে চায় তা' হ'লে Selection Committee-র বিশেষ সতর্ক হ'য়ে ভবিষ্যতে খেলোয়াড় নির্ব্বাচন কোর্‌তে হবে আর খেলোয়াড়গণেরও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মত একাগ্রতা, একনিষ্ঠভাব ও অনুপ্রেরণার আদর্শ নিয়ে খেলতে হবে। কালীঘাট লীগের

সুনীল চাটার্জ্জি—মোহন বাগান

গোড়ার দু' একটা খেলায় হারলেও উপরি উপরি ঈষ্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগানকে পরাজিত কোরে ভবিষ্যৎ-যাত্রার পথে আশার আলোক দেখিয়েছে। এরিয়ান্স যত খারাপ খেলোয়াড় নিয়ে যত খারাপই খেলুক, শেষ অবধি তারা লিগের মাঝামাঝি স্থান পাবে আশা করা যায়। ই, বি, আরের অবস্থা বিশেষ ভাল হলেও খুব খারাপ নয়। যে কটা ম্যাচ আজ পর্য্যন্ত এরা খেলেছে তাতে এদের খেলা দেখে একেবারে হতাশ হবার কারণ নেই। ই, বি, আরের পক্ষে সামাদ এবং মোহনবাগানের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় মোনা দত্ত বেশ ভালই খেলছে। টিম গুলোর মধ্যে ক্যালকাটা ও কাষ্টমস যথাস্থানে স্থান পাবে মনে হয়। ...য় ডিভিশন থেকে উন্নীত পুলিশ ব্লাক ওয়াচের সঙ্গে ড্র করে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তবে শেষ-রক্ষা এরা কোরতে পারবে বলে মনে হয় না। ড্যালহাউসীর অবস্থাও এবার পুলিশের মত নৈরাশ্যজনক। গোরাদল ব্লাক-ওয়াচ এবার লিগ বিজয়ী হবে—এ আশা অনেকেরই আছে। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে খেলায় এদের ফল দেখে অনেকেই সন্দিহান হ'য়ে পড়েছে। নতুন দল এ্যাটাচ্‌ড সেক্‌শন এখন কিছু আহা মরি না খেললেও লীগে খুব নীচে স্থান পাবে না মনে হয়।

এ হপ্তার খেলার ফলাফল

বৃহস্পতিবার

এটাচ্‌ড সেক্‌শন—কালীঘাট	৩—১
ঈষ্টবেঙ্গল—ক্যালকাটা	১—১

শুক্রবার

মোহনবাগান—কাষ্টম্‌স	১—১
পুলিশ—ঈ, বি, আর	০—৩
ব্লাক ওয়াচ—এরিয়ান্স	২—০

শনিবার

মোহনবাগান—ক্যালকাটা	১—০
কালীঘাট—ঈষ্ট বেঙ্গল	২—১
মহামেডান—ড্যালহাউসী	২—০
এটাচড সেক্‌শন—পুলিশ	৩—৩

সোমবার

কালীঘাট—মোহনবাগান	২—০
মহামেডান—ঈষ্ট বেঙ্গল	২—০
পুলিশ—ব্ল্যাক ওয়াচ	৩—৩

মঙ্গলবার

এরিয়ান্স—ক্যালকাটা	১—১
ঈষ্ট বেঙ্গল—ঈ, বি, আর	০—০

বার্লিনে আফগান হকি টিম

আফগান হকি টিম এ বছর বার্লিন অলিম্পিকে হকি প্রতিযোগিতায় যোগদান কোরেছে। গেল ওয়েষ্টার্ণ এশিয়াটিক অলিম্পিকে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে সকলেই খেলবেন। গত ৭ই মে য়ুরোপ যাত্রার প্রাক্কালে ফ্রন্টিয়ার মেলে এরা লাহোর ত্যাগ কোরেছেন।

ভারতীয় দলের বিপর্য্যয়

গত ১১ই মে'র লণ্ডনের খবর যে, ভারতীয়দল সামারসেটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাত্র ২২৮ রাণ কোরেছে। তাহারা 'ফ'লো অন' করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল দু' উইকেটে ১২৩ রাণ করার পর খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়।

(বিলাসী)

ব্লাড-ফিউড্

সীমান্ত প্রদেশের পটভূমিকে কেন্দ্রীভূত কোরে নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ এই ছবিখানা তুলেছেন। এখানি গেল শনিবার থেকে 'নিউ সিনেমা'-য় দেখানো হচ্ছে। কাহিনীটির ভেতর অনেক উত্তেজনা ও অনুপ্রেরণার টুকরো টুকরো দৃশ্য আছে সত্য; কিন্তু সেগুলো অসম্বদ্ধভাবে থাকায় সর্ব্বত্রই রস-সঞ্চারে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। পরিচালনাকার্য্যে প্রফুল্ল রায়ের আমরা কোনও প্রশংসা কোরতে পারলাম না। কৃষ্ণগোপালের আলোক-চিত্র সর্ব্বত্রই বেশ কোমল কিন্তু যথাযথ আলোছায়ার সামঞ্জস্য না থাকায় আলোকচিত্র বিশেষ প্রশংসনীয় হয় নি। শব্দযন্ত্রের কাজে অতুল চাটুয্যের প্রশংসা করা যায়। সম্পাদনা মোটের ওপর মন্দ নয়। অভিনয়ে নিউ থিয়েটার্সের অভিনেতৃরা—জগদীশ শেঠী, মলিনা, পৃথ্বিরাজ ভাল অভিনয় কোরেছেন। কমলার নায়িকা, হীরালালের নায়ক ও লমুর অভিনয় বিশেষ আশাপ্রদ নয়। ছবিখানার সঙ্গীত ও নৃত্য বেশ তৃপ্তিপ্রদ। দৃশ্য ও সাজসজ্জা ভাল।

আবর্ত্তন

আমাদের বাঙলা চিত্র-সমালোচক বিশেষভাবে পীড়িত হ'য়ে পড়ায় এ হপ্তায় "আবর্ত্তনে"-র সমালোচনা আমরা পত্রস্থ কোরতে পারলাম না। আগামী হপ্তায় এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হবে।

মিঞা-বিবি

গেল শনিবার থেকে চৌরঙ্গীতে "প্যারাডাইজে" দেবিকারাণীর নবতম ছায়া-ছবি "মিঞা-বিবি" দেখানো হচ্ছে। ছবিখানা দেখে যে আমরা খুব খুসী হয়েছি একথা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করি।

দেবিকারাণী তাঁর আগের ছবি চুটী "কর্ম্ম" বা "জাওয়ানী কি হাওয়া"-য় যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন এ ছবিতে তার চেয়ে অনেক বেশী ভাল অভিনয় কোরে আমাদের আনন্দিত কোরেছেন। ছবিখানার গল্পটি কিছু অসম্ভব হলেও খুব চিত্তাকর্ষক। এক অতি চালাক স্বামী, তার স্ত্রীর কাছে মিথ্যে কথা বলে স্থানান্তরে যাওয়ায় তার স্ত্রী সে কথা জানতে পারে এবং সেই মিথ্যে কথা বলার জন্মে তাকে শিক্ষা দিতে মনস্থ করে। এই শিক্ষা দেবার ব্যাপারকে কেন্দ্র কোরে জমে উঠেছে "মিঞা-বিবি"র গল্পাংশ।

ছবির পরিচালনা মোটের ওপর ভাল। ক্যামেরার এবং শব্দ-যন্ত্রের কাজ আমরা খুব তারিফ করছি। সম্পাদকের কাঁচি বেশ বুদ্ধি খরচ করেই চালানো হয়েছে।

ছবিখানাতে দেবিকারাণী ছাড়া আর আর প্রধান ভূমিকাগুলোতে বেশ প্রশংসনীয় অভিনয় কোরেছেন—নাজামুল হোসেন, জে, সি, কাশ্যপ ও এইচ, মানি।

ছবিখানা কোলকাতায় চিত্রামোদীদের বেশ কিছুদিন আনন্দ দিতে পারবে বলে মনে হয়।

মমতা

"মিঞা-বিবি"-র সঙ্গে এই নামে ছোট একখানি ছবিও দেখানো হচ্ছে। একে পুরা একখানা ছবি ঠিক বলা চলে না—কোন একখানা বড় ছবির গোড়া বা শেষ হিসেবে দেখানো চলতে পারে। "মমতা" হচ্ছে মাতৃস্নেহের একটি করুণ আলেখ্য। নিজের সন্তানের জন্মে, জননী যে নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না এই ছবিতে দেবিকারাণী অতি সুন্দরভাবে তাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

নিউ থিয়েটার্স

গেল হপ্তায় চণ্ডী ঘোষ রোড ষ্টুডিওর পেছনে, "বিজয়া"-র নরেনের সঙ্গে চাষীদের যে দৃশ্য আছে, তা' তোলা হ'য়েছে। ছবিখানা অল্পদিনের মধ্যেই শেষ করার জন্মে শুটিং চলেছে জোরভাবে।

* *

এদিকে নীতীন বসু তার আগামী ছবির মহলা জোরভাবে চালিয়েছেন। এ মাসের শেষাশেষি ছবিখানার শুটিং সুরু হবে আশা করা যায়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানলাম যে, এই ছবিখানিতে নীতীনবাবু গতানুগতিক টেক্‌নিককে দূরে ফেলে সম্পূর্ণ নতুন টেক্‌নিকে তুলবেন। নিউ থিয়েটার্স যে আমাদের সিনেমাশিল্পকে প্রগতির পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এ কথা অবিসম্বাদিত। এবার নীতীনবাবু ও নিউ থিয়েটার্স-কর্ম্মীদের নব-আয়োজন সার্থক হ'ক—এই আমাদের একমাত্র কামনা।

কালী ফিল্মস

এদের "অন্নপূর্ণার মন্দির" আসছে ৬ই জুন 'উত্তরা'-য় মুক্তি পাবে। তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় তোলা এ ছবিখানা রসিকজনচিত্তে যে আনন্দদান কোরবে এ বিশ্বাস আমরা করি। আমরা এ ছবিতে প্রায় সবগুলো ভূমিকাতেই নতুন মুখ দেখতে পাব—চিত্রামোদীদের কাছে এ একটা মস্ত বড় আকর্ষণ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম

এই প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারী মিঃ বি-এল খেমকা বোম্বাই থেকে বায়ু-পথে মাদ্রাজ পৌচেছিলেন এবং মাদ্রাজের বিশিষ্ট ফিল্ম-ব্যবসায়ীদের দ্বারা এক বিরাট সভায় সম্বদ্ধিত হোয়েছিলেন। সভাপতি (মাদ্রাজের মেয়র) মহাশয়ের অভিভাষণ এবং ফিল্ম-ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত খেমকা বিশেষ সম্মানিত বোধ করেন এবং যথাযোগ্য প্রত্যুত্তরে তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

* * *

এই প্রতিষ্ঠানের তামিল চিত্র "ভক্ত কুচেলা" এবং তেলেগু চিত্র "ধ্রুব" ও "অনুসূয়া" মাদ্রদেশের বিভিন্ন নগরে মুক্তিলাভ কোরে বিশেষ জনসমাদর লাভ কোরেছে। সম্প্রতি ... সুবিখ্যাত পরিচালক পুলেয়া সাহেবের

পরিচালনায় "সতী সুলোচনা" নামে একখানি তেলেগু চিত্র গঠন কোরছেন।

* * *

পরিচালক দেবকী বসু ধীরে ধীরে বস্তীর মধ্যেকার, স্বর্গধামের ভেতরকার দৃশ্যগুলোর চিত্র গ্রহণ কোরছেন। শীঘ্রই ইনি বহির্দৃশ্য তোলার জন্য বাহিরে যাবেন বোলে শুনচি।

অপর ইউনিটে যথাযথ উর্দ্দু 'বাগী-সিপাহী'র চিত্রগ্রহণ চলচে।

ডি-জি-টকীজ্

ডি, জি-র 'দ্বীপান্তরে'র কাজ খুব জোরের সঙ্গে চলেছে। এই অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁদের সাতটি দৃশ্যের শূটিং শেষ হ'য়ে গেছে। এই উৎসাহ উদ্দীপনার মূলে যে বিপুল অভিজ্ঞতা লক্ষিত আছে, তারি সহযোগীতায় যে চিত্রখানি আমরা পাব, আশা করি তা' ভালই হবে। মণি কুণ্ডু ব্যবস্থাপনায় ডি, জি-কে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সাহায্য কোরছেন। আমরা আশা করি, ডি,জি-র এ নব-প্রচেষ্টাকে সকলে সাদরে বরণ কোরবে।

চন্দ্র ফিল্মস

যতীন দাস বিশেষভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় এদের "পরপারে-"র সম্পাদনা-কাজ স্থগিত রয়েছে। ছবিখানার এ মাসেই মুক্তি পাবার কথা—সেইজন্যে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। আমরা আশা করি যতীনবাবু শীঘ্রই নিরাময় হ'য়ে যা'তে এই মাসের মধ্যেই ছবিখানা মুক্তি পায় তার ব্যবস্থা কোরতে পারবেন। আমরা এ ছবিখানার ওপর ভাল ধারণা পোষণ করি।

চিত্র-ভারতী

চানী দত্তের পরিচালনায় এদের হাসির ছবি "মাণিকজোড়ে"র শূটিং প্রায় শেষ হ'য়ে এল। এতে চানী দত্ত, শান্তনীল গোস্বামী, মনী ভট্চায, পদ্মাবতী আরও কয়েকটা নতুন মেয়ে অভিনয় কোরছে।

দেবদত্ত ফিল্মস

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস "রজনী" জ্যোতিষ বাড়ুয্যের পরিচালনায় দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে। গীতা ঘোষ, বি, ঘোষ, সমর ঘোষ, এম্, বর্ম্মা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে এবং অন্ধমেয়ে রজনীর ভূমিকায় চারুবালা ভাল কাজ কোরছেন—এ খবর কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

এই প্রতিষ্ঠানে ভোলানাথ আঢ্য সম্পাদকরূপে যোগদান কোরেছেন।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস

এদের "রামকান্ত দালালে"-র শূটিং প্রায় শেষ হ'য়ে এল। এতে ফনি বিদ্যাবিনোদ ও সুরমা মূল ভূমিকায় নামছে। শোনা যাচ্ছে, এরপর এরা হেমেন্দ্রকুমারের "ঝড়ের যাত্রী" তুলবেন।

ভাগলপুরে পূর্ণিমা সম্মেলন

বিগত ৬ই মে বুধবার ভাগলপুরে বারোয়ারী সমিতির প্রাঙ্গনে পঞ্চবার্ষিক পূর্ণিমা সম্মেলনের এক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবসে সহরের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ উৎসব প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসের প্রযোজনায় নবমবর্ষীয়া বালিকা সুজাতা মিত্রের সঙ্গীত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

ভাগলপুরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

বিগত ৮ই মে ভাগলপুরে সি, এম, এস হলে স্থানীয় কমিসনার রায় চারু চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ কর্ত্তৃক 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব হইয়া গিয়াছে। সহরের যে সমস্ত সুসাহিত্যিক-গণ উক্ত দিবসে তথায় উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মাখন লাল চৌধুরী, ডাক্তার দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দিতেশচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কবিবর সম্বন্ধে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠে সকলকে মুগ্ধ করেন।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ শুক্রবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পঞ্চ-সপ্ততিতম জন্মপূর্ত্তি উপলক্ষে চুঁচুড়া বাণীচক্র একটি উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। পুষ্পের প্রাচুর্য্যে, অনাড়ম্বর সুরুচিসঙ্গত সজ্জোপকরণে, ধূপের সৌরভে উৎসব গৃহে একটি শান্ত ও শুচিস্মিত পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার আঢ্যের ঐক্যতান বাদনের পর সভার উদ্বোধন হয়। কবিগুরুর প্রতিকৃতিকে মাল্য ভূষিত করার পর সভা হইতে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রণাম ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপক এক তার প্রেরিত হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার আঢ্য একটি স্বরচিত প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ পাল বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের জীবনের যে দিক লোকালোচনের অন্তরালে আছে—সেই দুশ্চর তপস্যার দিকের কথা রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা ঘটনা হইতে সবিস্তারে বর্ণনা করেন। সাধারণতঃ লোকে রবীন্দ্রনাথকে ভোগী বিলাসী, ধনী ও গর্ব্বিত অভিজাত শ্রেণীর একজন বলিয়াই জানে। কিন্তু এই সাধারণ ভ্রান্ত ধারণার অন্তরালে যে অনলস কর্ম্মী, নিদারুণ অধ্যবসায়ী, ত্যাগী, সহজ বৈরাগী ও সুমার্জ্জিত ভব্য বিনয়ী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন, তাঁহার পরিচয় কয়জন জানেন। শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় রবীন্দ্রনাথের এই দিককার জীবনকাহিনী সকলের সমক্ষে

সবিস্তারে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরেন। অতঃপর জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদর আপ্যায়নে অতিথিবর্গ সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

রেকর্ড সমালোচনা

বাংলা দেশে ইদানীং কয়েকটী এমন উৎসব হইয়া গিয়াছে যাহার সার্থকতা শুধু বাংলা দেশে নয়, সমগ্র জগতে আছে। উদাহরণ স্বরূপ রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর কথা বলা যাইতে পারে। য়ুরোপে এই ধরণের উৎসবের স্মৃতি রেকর্ডে অমর করিয়া রাখা হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশে সেনোলা অগ্রবর্ত্তী হইয়া রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে একখানি ইংরাজী রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। স্বনামধন্য ডাঃ কালিদাস নাগ এই রেকর্ডে বাঙালীর পক্ষ হইতে, বাংলা দেশের পক্ষ হইতে, বিশ্ববাসীর নিকটে রামকৃষ্ণের অমর বাণীকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা রেকর্ড করিবার সময় ইংরাজি রেকর্ডিং এক্সপার্ট সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, I wish there were more records like this in India." সকলের চেয়ে প্রশংসার যোগ্য যে এই রেকর্ডখানির বিক্রয়-লব্ধ অর্থের অংশ রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী ফাণ্ডে দেওয়া হইবে'।

শোক সংবাদ

গত ৯ই মে ৯নং টাউনসেণ্ড রোড নিবাসী শ্রীনরসিংহ প্রসাদ মিত্র প্রায় আশী বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি রাজা রাজ বল্লভের একমাত্র কন্যা-বংশসম্ভূত শ্যামবাজারের মিত্র বংশের সন্তান ও কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেয়ারম্যান রায় গোপাল লাল মিত্র বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পৌত্র ছিলেন।

প্রায় ৩০ বৎসর সম্মানের সহিত সিমলায় চাকরী করিবার পর, তিনি ১৯০৬ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহার মাতামহ ভবানীপুর নিবাসী গৌর মোহন ঘোষ মহাশয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও বাটীর অংশ পাইয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন, পরে ১৯১২ সালে তাঁহার বিশেষ কার্য্য-কুশলতার জন্য তাঁহাকে ভারত সরকারের আয় ব্যয় বিভাগে পুনঃ প্রবিষ্ট করা হয়, এবং ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত তথায় কার্য্য করেন।

ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘ

গত ৯ই মে শনিবার অপরাহ্নে ৪৬নং কালিঘাট রোডে ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘের দ্বিতীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনী বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করিয়াছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীবিপিন বিহারী সাধুখাঁ। সভার প্রারম্ভে সঙ্ঘের গত-বর্ষের যে কার্য্য-বিবরণী পঠিত হয় তাহাতে সঙ্ঘের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করিতেছে বলিয়া জানা যায়। নিম্নে ঐ কার্য্যবিবরণীর প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত হইল।

"১৩৪৩ সালে ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘ তাহার দশম বৎসরে পদার্পণ করিল। সঙ্ঘ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহার সভ্য সংখ্যা ছিল মোট ২৫ জন মাত্র এবং এই বৎসরে ৭০ জন সভ্য হইয়াছেন। আশা করা যায়, এই স্থানের ভদ্রমহোদয়গণ তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে এই সঙ্ঘে প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ দিবেন। সঙ্ঘ দরিদ্র, সভ্যগণও নিঃসম্বল, আমাদের কিছু নাই। আছে শুধু পরস্পরের ভিতর অকৃত্রিম ভালবাসা এবং গুরুজনদিগের প্রতি আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা। দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার দাবী তাঁহাদের করুণা ও স্নেহ হইতে একদিনের তরেও বঞ্চিত হইবে না।

এই কিছুদিন পূর্ব্বেও ব্যায়াম করিলে পাড়া প্রতিবেশীর নিকট হইতে—এমন কি পিতামাতার নিকট হইতেও "গুণ্ডা" আখ্যা পাওয়া যাইত। এখন সে ভাব কাটিয়া গিয়াছে। বুঝিয়াছেন, শক্তি ভিন্ন অনেক কিছুর হাত হইতে মুক্তি নাই। শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে ব্যায়ামের প্রয়োজন। সঙ্ঘের সভ্যগণ ব্যায়াম কৌশলের জন্য যথাসাধ্যানুযায়ী আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সঙ্ঘের সভ্যগণ ব্যায়াম চর্চ্চা ব্যতীতও বাহিরের নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত থাকেন। জাতিনির্ব্বিশেষে মানবের রোগ সেবা এবং অন্তিমকালের সৎকার করিতে এই সঙ্ঘের সভ্যগণ ভবানীপুর অঞ্চলে চিরপ্রসিদ্ধ।

মানসিক উন্নতিকল্পে এই ব্যায়াম সঙ্ঘের সহিত একটী পাঠাগার সংশ্লিষ্ট আছে। ইহার সভ্য সংখ্যা ৪০ জন মাত্র। ইহাতে ৯০০ শত বাংলা এবং ১০০ শতখানি ইংরাজি পুস্তক আছে। ইহা ব্যতীত বহু মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখা হয়।

সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য শ্রীশিশির কুমার গুহ ১৩৪২ সালে এলাহাবাদ মিউজিক কন্‌ফারেন্সে ধ্রুপদে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটি কাপ পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহাতে সঙ্ঘ গৌরবান্বিত।"

সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠান দর্শকবৃন্দ এবং উপস্থিত ভদ্র-মহোদয়গণের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল।

সভায় বহু গণ্যমান্য ভদ্রব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কাউন্সিলার শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, শ্রীসত্যব্রত সেন এবং কাউন্সিলার শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

আমরা সঙ্ঘের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

আগামী বর্ষের জন্য সঙ্ঘের নিম্নলিখিত কার্য্য-পরিচালক সংসদ গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র সেন। সহঃ সভাপতি—শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

এ, বি, এল, শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল, ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় এম বি, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীরণজিৎ বসু মল্লিক, কবিরাজ সুধীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এল, এ, এম, এস। পাঠাগারাধ্যক্ষ—শ্রীসত্যপ্রেম রায় চৌধুরী, ডাঃ সতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী এম, বি। সহঃ পাঠাগারাধ্যক্ষ—শ্রীকৃষ্ণ মোহন দাস, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীরণজিৎ কুমার বসু মল্লিক। হিসাব পরীক্ষক—শ্রীঅজিত কুমার রায় এম, এ, বি, এল। কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ—শ্রীরবীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅঘোরচন্দ্র দাস, শ্রীশচীন্দ্র কুমার দাস, শ্রীঅমর কুমার ঘোষ, শ্রীশিশির কুমার গুহ, শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিক্ষক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সহঃ শিক্ষক :—চুণীলাল সেন, শ্রীকানাই লাল নন্দী। ড্রিল মাষ্টার—শ্রীফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

সহজ পথ

দীর্ঘ জীবন পথে নীরোগ স্বাস্থ্যের অনেকখানি দাম আছে। অনেক সময় আমরা মুস্কিলে পড়ে যাই, সহজ পথটা না চিন্তে পেরে। বছরের ছয়টা ঋতুর সঙ্গে যে বাংলার স্বাস্থ্যের নিকট সম্বন্ধ আছে, তা আমরা স্বাস্থ্যবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট দেখলেই বুঝতে পারি। ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা সর্দ্দি কাশি প্রভৃতি রোগ, এক এক ঋতুতে বিশেষভাবে দেখা যায়, কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ঋতু বা সময় নাই। নাক দিয়া জলপড়া, সর্দ্দি কাশি, হাঁচি, মাথার যন্ত্রণা, জ্বর, সাধারণতঃ এই সব লক্ষণগুলি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রথমে দেখা যায়। প্রথমে রোগ সামান্য অবস্থায় পরিলক্ষিত হলেও পরে ভীষণ কষ্টদায়ক হয়। এমন কি, পরে ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া রোগে দাঁড়াইতে পারে। অসুখের পর রোগী ভীষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, হৃদরোগগ্রস্থ লোকেরা এই রোগেই মারা পড়ে। বহু বৎসর যাবৎ চিকিৎসক মণ্ডলী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে, রচি ল্যাবরেটরীতে "সারিডন" আবিষ্কার করেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ প্রতিকারের ও আরোগ্যের জন্য পৃথিবীর সকল দেশের চিকিৎসকই এর ব্যবস্থা দিচ্ছেন। তাঁরা স্বীকার করেন, "সারিডন্" ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ ও ফলপ্রদ ঔষধ। এমন কি হৃদ্‌যন্ত্রের বেদনায়ও নিরাপদে 'সারিডনে'র ব্যবস্থা দিতে তাঁরা দ্বিধা করেন না।

বি, ওয়াই, এম, এ,—কালীঘাট

গত শনিবার ৯ই মে ২৩নং রাসবিহারী এভিনিউস্থ 'মধু মহলে' কালীঘাট, বি, ওয়াই, এম, এর অষ্টম বার্ষিক-সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। মিঃ এস, সি, মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত বৎসরের হিসাব গৃহীত হইবার পর নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ ১৯৩৬-৩৭ সালের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সভাপতি—মাননীয় মিঃ বি, কে, বসু। সহ সভাপতিগণ—মেসার্স জে, সি, মুখার্জ্জি, ডি, এল, দত্ত, পি, ব্যানার্জ্জি, এস, এন, মুখার্জ্জি, এস, সি, মিত্র, বি, এন, রায়চৌধুরী এবং পি, মুখার্জ্জি। সাধারণ সম্পাদক—মিঃ সি, বি, চ্যাটার্জ্জি। কোষাধ্যক্ষ—মিঃ পি, চ্যাটার্জ্জি। বিভাগীয় সম্পাদকগণ—মিঃ বি, ভট্টাচার্য্য (ফুটবল), মিঃ এন, কে, সেন (ক্রিকেট), মিঃ এ, রায়চৌধুরী (সাহিত্য), মিঃ এস, সি, বসু (হকি), মিঃ পি, দাসগুপ্ত (গ্রাউণ্ড)। ফুটবল ক্যাপ্টেন—মিঃ বি, মুখার্জ্জি। ফুটবল ভাইস ক্যাপ্টেন—মিঃ এম, দাস। কার্য্যকরী সমিতি—মিঃ বি, চ্যাটার্জ্জি, মিঃ এস, সরকার এবং মিঃ এম, কে, সাহা।

সাহায্য রজনী

অদ্য সন্ধ্যা ৭॥০টায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের স্মৃতি-রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাম্যমান পাঠাগারের সাহায্যকল্পে নাট্যনিকেতনে "কর্ণার্জ্জুন" ও মানময়ী গার্লস স্কুলে"র বিশেষ অভিনয় হইবে। ইহাতে নূতন ভূমিকায় পরশুরাম—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, দুর্য্যোধন—অহীন্দ্র চৌধুরী, কর্ণ—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এতদ্ভিন্ন শকুনি—নরেশ মিত্র, অর্জ্জুন—রবি রায়, দুঃশাসন—ভূমেন রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "মানময়ী গার্লস্ স্কুলে" মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের দামোদর ও জহর গাঙ্গুলীর মানস শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এই সদানুষ্ঠানে সাহায্য করা সকলেরই বিশেষ কর্ত্তব্য।

ইন্সিওর্যান্স হেরাল্ড (বিশেষ সংখ্যা)

আমরা সদ্য প্রকাশিত (এপ্রিল ১৯৩৬) "ইন্সিওর্যান্স হেরাল্ড" পত্রিকার Office Eqiupment Number পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। এই সংখ্যায় লেখকগণ—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীতারা দাস দত্ত, মিঃ এম, পি মেনন, মিঃ এ, সি, মিত্র, মিঃ ডি, সি, দাস প্রভৃতি। ইহারা জীবন বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সুনিপুণভাবে লেখনী পরিচালনা করিয়া এই সংখ্যার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। জীবন বীমা বিষয়ে বিভিন্ন ভাবধারা এবং কর্ম্মপদ্ধতির সহিত আমাদের এইরূপ সহজেই পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য আমরা পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটার শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। "ইন্সিওর্যান্স হেরাল্ড" পত্রিকা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে থাকুক ইহাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।
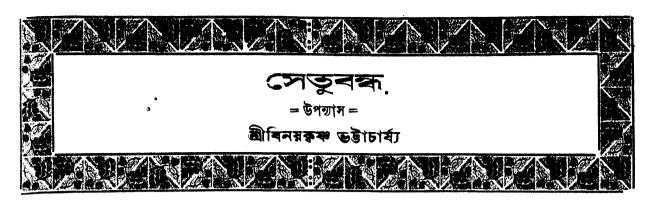
পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মোটরে করে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ী ফিরে এলো। তাড়াতাড়ি জামা কাপড় ছেড়ে সুটকেসটা মদনকে গাড়ীতে পৌঁছে দিতে বলে সে গাড়ীতে এসে উঠলো।

—কবে ফিরবেন বাবু ?

—কিছু ঠিক নেই রে মদন, যত শীঘ্রী পারি ফিরবো। বাড়ী থেকে তুই উধাও হয়ে বেরিয়ে গিয়ে গল্প করতে যাসনে যেন। ঘরে কত দামী জিনিস আছে, জানিস নে, যায় না যেন।

—না বাবু, কোথাও যাবোনা।

ট্রেনে উঠে মৃত্যুঞ্জয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

দিলীপের অমঙ্গল আশঙ্কায় সারা রাত মৃত্যুঞ্জয় চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত ফেলতে পারেনি। কত অশুভ চিন্তা তার মনকে চঞ্চল করে তুলেছে। অবসাদগ্রস্ত শরীরে ক্ষণিকের একটু তন্দ্রার আমেজ আসে সে ধড়মড় করে উঠে বসে। ভাবে লক্ষ্ণৌ বুঝি পেরিয়ে গেল। জানলার ধারে উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে সূচিভেদ্য অন্ধকারে মাইল পোষ্টের রিডিং পড়বার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে পুনরায় সে আপনার জায়গায় এসে বসে। বুঝতে পারে এতো শীঘ্রী লক্ষ্ণৌ পৌছান যায়না। হাত ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখে রাত দুটো।

নানারকম চিন্তা করতে করতে ভোরের দিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুমিয়ে পড়লো।

—বাবা ?

চোখ চেয়ে মৃত্যুঞ্জয় দেখলে দিলু বিছানায় শুয়ে আছে। বল্লে: আয় কাছে আয় খোকা।

—না যাবোনা।

—কেন ?

—এদ্দিন তুমি আসোনি কেন ? আমায় তুমি ভুলে গেচো। তোমার কাছে আমি কক্ষোনো যাবোনা।

—তুই তো আমার কাছে চলে যেতে পারতিস ?

—কার সঙ্গে যাবো। টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলে ? অমনি বুঝি আবার গাড়ীতে যাওয়া যায়। মা আমাকে কিছু খেতে দেয় না বাবা। অসুখে খেলে কী হয় বাবা ?

—অসুখ বাড়ে।

—সন্দেশ খেতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্চে। তুমি আমায় লুকিয়ে এনে দিয়োনা বাবা। মা জানতে পারবেনা।

—দেবো। আমার কাছে তা হলে তুই আসবি।

—আসবো।

মৃত্যুঞ্জয় দিলীপের গায়ে হাত দিতে যেতেই কে যেন তাকে সজোরে ধাক্কা মারলে। তন্দ্রা ভেঙ্গে যেতেই সে বুঝতে পারলে যে, সে স্বপ্ন দেখছিল। সামনে চেকার টিকিট দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মৃত্যুঞ্জয় জামার পকেট থেকে টিকিটটা দেখালে।

সকাল হয়ে গেছে। ডি হিরি-অন-সোনে

গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবী মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের অবগুণ্ঠন থেকে মুক্তি পেয়ে উষার নবীন আলোয় নিজের বিকশিত রূপ সকলের কাছে উন্মোচিত করে ধরেছে। পূর্ব্বাকাশে নবোদিত সূর্য্যের বাল রশ্মির লোহিত ছটার অপূর্ব্ব সমাবেশ। মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ বিস্ময়ে পৃথিবীর এই অপর্য্যাপ্ত রূপরাশির দিকে চেয়ে রইলো।

সন্ধ্যার সময় মৃত্যুঞ্জয় লক্ষ্ণৌয়ে এসে পৌঁছুল। আধ ঘণ্টা পরে প্রিয়বাবুর বাড়ীতে ঢুকে সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের অন্তঃকরণ অজানা আশঙ্কায় মোচড় দিয়ে উঠলো। এমন কি কারুর কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। বাড়ীটি যেন রূপকথার স্বপ্নপুরীর ন্যায় নিস্তব্ধ, নিঝুম।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে মৃত্যুঞ্জয়ের পা যেন আর এগুতে চাইছে না। চারিদিকে অমঙ্গলের সুস্পষ্ট চিহ্ন সে দেখতে পাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে উপরে উঠে বারান্দার সামনে মৃণালকে দেখতে পেয়ে সাহসে ভর দিয়ে বল্লে: দিলু কেমন আছে, মৃণাল? কোন ঘরে আছে?

আঙ্গুল দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে মৃণাল বল্লে: তোমাকে ওরা এখন ঘরে যেতে দেবে না।

—কারা?

—ডাক্তারেরা। দুজন ডাক্তার ঘরের মধ্যে আছেন।

—থাকলেই বা। তা বলে ঘরে ঢুকতে পাব না কেন?

—অপারেশনের পর এখনো যে ভাল রকম জ্ঞান হয় নি। আমাকে পর্য্যন্ত ঘরে ঢুকতে দেয় নি। খালি মেশমশাই আছেন। কখন তুমি টেলিগ্রাম পেয়েছিলে?

—কাল রাত সাড়ে আটটায়। হঠাৎ একথা জিজ্ঞাস করচো কেন?

—থেকে থেকে মনে হচ্ছিল টেলিগ্রাম পেয়েও তুমি বোধহয় আসবে না।

—দিলুর অসুখ, আর আমি থাকবো চুপ করে? তুমি পাগল হয়ে গেচো মৃণাল, ঘোড়া থেকে কী করে ও পড়লো বলতো?

—অসাবধানেই পড়ে গেচে। বিপদ তো আর জানান দিয়ে আসে না।

—হাত-পা ভেঙ্গে যায়নি তো?

—না। ডাক্তারেরা সন্দেহ করচেন গলার হাড়টা বোধহয় ভেঙ্গে গেচে। ও রকম করচো কেন? বিপদের কোন আশঙ্কা আছে নাকী?

—না, না, ভয়ের কোন কারণ নেই, মৃণাল।

—জামা কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত-পা ধুয়ে মুখে কিছু দেবে চলো।

—থাক্, এত তাড়াতাড়ি কোন দরকার নেই।

—পাশের ঘরটায় একটু বসিগে চল। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই।

—তাই চলো।

সহসা পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দ হতেই মৃণাল ব্যস্ত হয়ে বল্লে: এইবার বোধহয় ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। চল দিলু কেমন আছে খবরটা নিইগে বলে মৃণাল ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই মৃত্যুঞ্জয়ও মৃণালের পিছু পিছু বেরিয়ে এলো।

বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই প্রিয়বাবুর সঙ্গে ডাক্তারের কথাবার্ত্তা মৃণালের কানে গেল।

—জ্ঞান হবার পর ছেলে যখন সুস্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে তখন আর কোন ভয়ের কারণ নেই, প্রিয়বাবু।

—আপনি থাকতে আমার কিসের ভয়।

মৃণাল এগিয়ে এসে মেশোমশাইকে বল্লে: এখন দিলুকে একবার দেখতে পাবো না?

একথার জবাব দিলেন ডাক্তারবাবু। বল্লেন: ভয় কি মা, ছেলে আপনার ভালোই
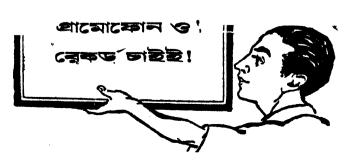
আছে। এখন একটু ঘুমিয়েচে, এ সময় কোন রকম গোলমাল না করাই ভালো। একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন।

পরে প্রিয়বাবুকে বল্লেন:. রাতে যদি দরকার বোধ করেন, এই পাশেই তো রয়েচি, একবার খবর পাঠাবেন।

—আচ্ছা।

মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারবাবুকে বাইরে এগিয়ে দিতে এসে সিড়ির মাঝ বরাবর মৃদুকণ্ঠে বল্লে: খোকা আমার বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বল্লেন: আপনার ছেলের কী হয়েচে যে বাঁচবেনা? ওরকম মাইনর অপারেশন আমাদের হামাসাই করতে হয়। আপনার অতো নার্ভাস হলে কি চলে বলিয়া ডাক্তারবাবু সিড়ি ভাঙতে লাগলেন।

মৃত্যুঞ্জয় উপরে উঠে আসতেই প্রিয়বাবু বল্লেন: তুমি কখন এলে মৃত্যুঞ্জয়? বিপদের হিড়িকে তোমাকে দেখেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি তো?

সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছেচি। রাস্তায় কোন রকম অসুবিধে হয় নি।

—খাওয়া দাওয়া কিছু হয় নি বোধ হয়?

—আজ্ঞে, খিদে নেই।

—কাল কখন ট্রেনে চড়েচো তার ঠিক নেই। ট্রেনে চাপলে মানুষের ভাল করে খাওয়াই হয় না। যাও মৃণাল, মৃত্যুঞ্জয়ের খাবার ব্যবস্থা করে দাওগে যাও। দিলুর জন্যে আর কোন ভাবনা নেই।

—অত ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই। একটু পরে খাবোওখন।

—তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, মৃত্যুঞ্জয়। সারাদিন যে তোমার পেটে কিছু পড়েনি।

বলে দালানে ইজি চেয়ারের উপর শুয়ে ঠাকুরকে তামাক দিতে বল্লেন। মৃণাল মৃত্যুঞ্জয়ের খাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে নীচে নেমে এলো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মৃত্যুঞ্জয় উপরে উঠে এলো। প্রিয়বাবুকে বল্লে: রাত অনেক হয়েচে, এইবার আপনি কিছু খেয়ে নিন।

—এই যাই। চ' মৃণাল আমার সঙ্গে তুই খাবি চ'। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকে না। সেই সকাল থেকে দাঁতে কুটোটি পর্য্যন্ত তো কাটিসনি বলে একপ্রকার জোর করে মৃণালকে তিনি টেনে নিয়ে গেলেন।

সেদিনকার রাতের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় সিগরেট খাচ্ছে। পৃথিবীর গতি-চাঞ্চল্য বোঝা যায় না, অন্ধকারের ভয়াবহ অবগুণ্ঠনে অবলুপ্ত। উন্মুক্ত আকাশ প্রাঙ্গনে তারকাপুঞ্জের স্তিমিত আলো মাটির প্রদীপের মত মিটমিট করে জ্বলছে।

মৃত্যুঞ্জয় চিন্তা করে: প্রেমের প্রকৃত রূপ কিরূপ? এর কি কোন ক্ষয় আছে? ও মৃণালকে ভালবাসে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধাও করে। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে ওদের মধ্যে কিছুদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়েছে। রাগারাগি হলে এরকম হয়েই থাকে। আসলে মৃণাল মৃত্যুঞ্জয়েরই। এই কয়েক ঘণ্টা আগে ইন্দ্রানীর এককণা ভালবাসা পাবার জন্যে ও কি সাধ্যসাধনাই না করেছিল। একথা এখন মনে করতেও যেন তার হাসি পায়। এই অভিনয়ের পেছনে কতখানি আন্তরিকতা ছিল তা সে স্পষ্ট করে বলতে পারে না। অবাস্তর কথাবার্ত্তায় এবং কল্পনার জালে ইন্দ্রানীকে ও মোহিত করতে চেয়েছিল। এখন ও বুঝতে পেরেছে নারীর ভালবাসা বা তথাকথিত প্রেমনিবেদন আসলে এটা একটা ফাঁদ বা চোরাবালি। কখন কী ভাবে মানুষ

এর খপ্পরে এসে পড়ে তা হঠাৎ বোঝা যায় না।

মৃত্যুঞ্জয় আর চিন্তা করতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে সিগারেটের টুকরাটা জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে সে বিছানায় এসে বসলো। চাইনীজ টাইপের ল্যাম্পের স্নিগ্ধ আলোরশ্মি নানা কারুকার্য্যখচিত আবরণ ভেদ করে ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিছানার উপর হাত-পা বেশ আরাম করে ছড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে। এখানে যতকিছু অসুবিধে তার থাক না কেন বাড়ীর একটা সুখস্বাচ্ছন্দ্য সে অনুভব করছে। তৃপ্তিতে তার সারা দেহ স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে।

বিছানায় শুয়ে মৃত্যুঞ্জয় জানলার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে এমন সময় দরজায় খুট করে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ও প্রশ্ন করলে : কে ?

কোন জবাব না পেয়ে দরজার কাছে এগিয়ে এসে বল্লে : মৃণাল না কি ? বাইরে বেরিয়ে এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে পুনরায় বিছানায় এসে শুলো।

মৃণালের আসার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে সময় কাটানো মৃত্যুঞ্জয়ের অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে ভাবে : মৃণালের কাছে ও নিজেই যাবে। এ-বাড়ীর সমস্ত ঘরদোর তার নখদর্পণে। আবার চিন্তা করে দরকার নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে তা হলে লজ্জার সীমা থাকবে না। মৃত্যুঞ্জয় পাশ ফিরে শুলো।

হঠাৎ কার কোমল করস্পর্শে মৃত্যুঞ্জয় চমকে উঠে চেয়ে দেখলে মৃণাল তার সামনে দাঁড়িয়ে। বল্লে : ওরকম করে দাঁড়িয়ে থেকো না, মৃণাল। আমার পাশে এসে বসো।

মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে বসে মৃণাল বল্লে : দিলুর জন্যে তোমার মন কেমন করতো না ?

—করতো।

—তা হলে কি করে তুমি এ-ক'মাস চুপ করে ছিলে বলতো ? একখানা চিঠি লিখেও তো খোঁজখবর করতে পারতে।

—ও কথা বলে আমায় আর লজ্জা দিয়ো না, মৃণাল।

—হ্যাঁগা, ওখানে তোমার কেমন করে দিন কাটতো বলতো ? কাজ নিয়েই পড়ে থাকতে বোধহয় ?

—সময় কি আর কাটতে চাইতো, মৃণাল। কাজ করবার শক্তি নষ্ট হয়ে-গিয়েছিলো। তোমার আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলুম।

—যাও, কী যে বল তার ঠিক নেই।

—সত্যি বলচি, এর মধ্যে একতিলও মিথ্যে নেই। তুমি চলে আসবার পর এতটুকু কাজও করতে পারিনি।

—আমাকে যেতে বল্লেই পারতে। তা হলে তোমার কোন ক্ষতি হতোনা। ভাগ্যিস দিলুর এমন একটা বিপদ হলো তাইতো তোমায় ফিরিয়ে পেলুম।

এমন সময় পাশের ঘর থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েই মৃণাল এবং মৃত্যুঞ্জয় উভয়েই চুপ করে গেল।

নিশ্চয় এ-কান্না দিলুর বলে মৃণাল ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মৃত্যুঞ্জয়ও ওর পিছু পিছু এলো।

উভয়ে ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতে যাবে এমন সময় নার্স বেরিয়ে এসে বল্লে : একটু পরে আপনাদের ডাকবো। এখন আসবেননা বলে ওদের মুখের উপর দরজা ভেজিয়ে দিলে।

পুনরায় অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কে যেন অসহায় কণ্ঠে ডাকলে : মা।

মৃণাল মৃত্যুঞ্জয়কে বলে : দিলু ডাকচেনা ?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—মা, মা, মা কোথায় ?

—ওই শোন আবার দিলু ডাকচে।

মৃণাল আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেনা। বিব্রত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। মৃত্যুঞ্জয়ও মৃণালের পদানুসরণ করলে। দিলুর কাছে এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃণাল বল্লে : এই যে বাবা, আমি রয়েচি। ভয় কি ?

—বাবা এসেচে, মা ?

—এই তো আমি রয়েচি খোকন বলে মৃত্যুঞ্জয় দিলুর বিছানার উপর এসে বসলো। মৃণাল আর কোন কথা বলতে পারলেনা। তার দুই চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

সমাপ্ত

আলো-অন্ধকার

শ্রীসমর মিত্র

(১)

সব কাজ কি আর পারা যায়? গল্পের প্লট তৈরী, কলেজের পড়া, খেলার মাঠে, সিনেমা আরও খুচরা কাজ—কত কি।

লেখায় ঝোক বেশী, লেখেও মাঝে মাঝে মাসিক পত্রে।

নীতিশ, তার পড়ার ঘরে বসে ভাবে নতুন প্লটের সন্ধান। অনেক হাতড়ে হয়ত বা প্লট পেলে, কিন্তু, নায়ক-নায়িকার নাম ঠিক কর্ত্তে অনেকক্ষণ লাগে, শুধু তাই নয়, কোন কোন দিন হয়ত, নিজে পেরে ওঠে না, তখন সুনন্দাই তা ঠিক করে দেয়। ছোটবোন হ'লে আর কি হবে? ওর চেয়ে বুদ্ধিতে কম যায় না, বরং বেশীই।

সেদিন নীতিশ খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা, ঘুমের আমেজের সঙ্গে নতুন প্লটের সন্ধান করছিল, এমন সময় সুনন্দা এসে ঘরে ঢুকলো।

সুনন্দার চুলখোলা, কাপড়টার আঁচল কোমরে জড়ান।

সুনন্দা বললে "কাল যে দোল"

নীতিশ জবাব দিলে "তা কি হবে?" যেন কিছু জানে না।

এতখানি অবহেলা কোন মেয়েই সহ্য কর্ত্তে পারে না। গম্ভীর হয়ে সুনন্দা বললে "বেশ। যেন কিছু জানেন না, বাবাকে বলতে যাচ্ছি যে তুমি আমায় কোথাও নিয়ে যেতে পার্ব্বে না; ড্রাইভার ছুটী নিয়েছে। তাই তোমার বলা হচ্ছিল"।

নীতিশ বল্লে, "কোথায় যেতে হবে শুনি?"

সুনন্দা ফিক্ করে হাসলো, বললে—"বাঃ! বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে আসতে হবে না, প্রত্যেক বছর বুঝি তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে?"—

দোলের দিনটা ওদের খুব আমোদে কাটে, সুনন্দার আর নীতিশের বন্ধুরা রাত্রিতে আসে, খুব খাওয়ান হয়, আর দিনে দোল খেলার আমোদে ডুবে যায়।

নীতিশ বল্লে "তুই যা, আমি ঘণ্টা দুই বাদে যাব—একটা গল্পের প্লট মনে আসছে কিনা—"।

সুনন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নীতিশের মোটেই গল্পের প্লট মনে পড়েনি, তবে ও ভাবতে লাগল, কড়িকাঠ গোনা প্রায় শেষ হ'য়ে এল, আবার গুনতে সুরু কর্লে, এমনি করে অনেক্ষণ কেটে গেল।

(২)

সুনন্দা এসে ঘরে ঢুকলো, "আঃ! দাদা চল—ওঠ—"।

'—যা, তুই কাপড় পরে আয়—"।

সুনন্দা চটপট একখানা সিল্কের কাপড় প'রে এল।

দুজনে গিয়ে বসল একটা Fiat গাড়ীতে। প্রথমে তারা এল রেবাদের বাড়ী। লঘুভঙ্গীতে সুনন্দা নেমে গেল। নীতিশও পেছনে এল।

ড্রইংরুমে ব'সে রেবা কি একটা সেলাই করছিল, সুনন্দা পেছন থেকে চোখ টিপে ধ'রল; রেবা কি করে যেন বুঝতে পারলে যে সুনন্দাই এসেছে তা'কে ডাকতে।

তিনজনে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। প্রথমে মনীষা, লীনার বাড়ী গেল। প্রচুর রং ওরা মাখলে, সারাদিন যেন ওরা দোল খেলে কাটাতে চায়।

এবার তারা বাড়ী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। নীতিশ এতক্ষণ বিশেষ কোন কথা বলেনি, কিন্তু যখন শুনলে, মনীষা বল্ছে—"করুণাদি'র বাড়ী যাওয়া হয়নি,—গেলে হয়।" তখন সে প্রতিবাদ কর্ত্তে যাচ্ছিল, সুনন্দা লাফিয়ে উঠে বল্ল, "সত্যি, কি যে ভুল হয় আমাদের"—নীতিশের দিকে ফিরে বল্লে "দাদা লক্ষীটী চল না আর একটু—।"

নীতিশ গাড়ীর বেগ একটু বাড়ালো; ওদের কতকগুলো কথা হাওয়ায় ভেসে এল, ও তা শুনতে পেলে।

মনীষা বল্লে "উঃ! করুণাদি'র মত ভাল মেয়ে আর হয় না।"

লীনা তা'র সঙ্গে সুর মেলালে "নিশ্চয়ই, সেবারে ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ্ পাবে কেউ ভাবতে পারে নি"—"কিন্তু আমার ভাই, ওর জন্যে দুঃখ হয়—" সুনন্দা বল্লে।

"কেন?"

মনীষা বল্লে—"কারণ সেদিন ওর বাবা

মারা গেলেন, এখন কি করে যে ওর চলে, তা ওই জানে"।

মনীষা বল্‌লে—"কেন দু'জায়গায় গান শেখায়—আর স্কলারশিপের টাকা পায়"।

ক্যাঁচ করে ব্রেক্ করে গাড়ী এসে থামলো টাউনসেণ্ড রোডের একটা ছোট্ট বাড়ীর সাম্‌নে।

লীনা নেমে কড়া নাড়তেই, বেরিয়ে এল একটি ১৮।১৯ বছরের মেয়ে। এই করুণা,—নীতিশ চেয়ে দেখলো।

করুণা জানালো তার স্নান হয়ে গেছে; ও তাই অল্প ফাগ মাথায় দিলে।

করুণা বল্লে "চল্ ভেতরে বস্‌বি চল্"।

সুনন্দা নীতিশের দিকে ফিরে বল্‌লে 'না ভাই, আজ যাই, দাদা আবার রাগ কর্ব্বে'।

করুণা নীতিশকে চিন্‌'ত না, মোটে ক'মাস হ'ল, এদের সঙ্গে স্কুলে ভাব হ'য়েছিল।

করুণা বল্‌লে 'দাদা' তোমার এতক্ষণ ঘুমুচ্ছেন, বাড়ী গিয়ে দেখবি।"

এবার করুণা বাদে সকলে হেসে উঠলো। নীতিশও কথাগুলো গিলছিল।

লীনা বল্‌লে "গাড়ীতে যিনি বসে আছেন, উনি সুনন্দার দাদা।"

করুণা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো না, একটু কুণ্ঠিত হ'ল মাত্র।

করুণা এগিয়ে এসে নমস্কার করে বল্‌লে, 'দেখুন আপনাকে ড্রাইভার ভাবা অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা কর্ব্বেন—বলে মৃদু হাস্‌তে লাগ'ল।

নীতিশ মুগ্ধ হয়ে ওদের কথা শুন্‌ছিল, বললে "সব দোষ ক্ষমা কর্ত্তে পারি, যদি সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী যান, কেমন যাবেন ত?"

করুণা বললে "কিন্তু আমার আর দোষ কতটুকু বলুন? যে ড্রাইভ করে, তা'কে ত' ড্রাইভার ছাড়া কিছু বলা যায় না;—হ'তে পারেন তিনি সুনন্দা'র দাদা"। বলে রীতিমত হেসে উঠলো। তা'র হাসির সঙ্গে সকলে যোগ দিল।

নীতিশ কিছু বললে না, আর বলবার ছিলই বা কী? করুণার মিষ্টি,—অথচ অসঙ্কোচ ব্যবহারে ও মুগ্ধ।

সবাই বাড়ী ফিরে এল। সুনন্দা ও নীতিশ সবাইকে আসতে বললে সন্ধ্যের সময়। এইদিন সুনন্দাদের বাড়ীতে উৎসব হ'য়ে থাকে, আরও একটা কারণ, এটা সুনন্দা'র জন্মদিন।

(৩)

সেই দিন সন্ধ্যায়।

সুনন্দা'র হল্‌ঘরে লোক আর ধরে না; বেশীরভাগ সুনন্দার বন্ধু। নীতিশেরও বাদ যায়নি তবে সংখ্যায় অনেক কম।

বাবাঃ! মেয়েদের কী হাসির ধুম। হাত হ'তে খসে পড়া কতকগুলা কাঁচের প্লেটের শব্দ বুঝি অত মিষ্টি হয় না,...সাসির বুকে ভাইব্রেসন্—তার সঙ্গে চুড়ীর টুং, টাং শব্দ।

ঘরটা যেন স্যাম্পেনের ফোয়ারা; আইস্ প্যাক্ গ্লাসের শব্দ, একটা নেশা আনে।

আজকালকার ছেলেরাও হ'যেছে তেমনি, কী যে মেয়েলী প্যাটার্ণে হাসে? ওদের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে হাস্‌ছে। সবার যেন ধার করা হাসি, নিজেদের হাসি ওরা যেন ভুলে গেছে।

নীতিশ ওদের সঙ্গে সুর মেলাতে পারে নি; ও মোটেই ফিকে হাসি হাস্‌তে পারে না। একটা কাউচে বসে, করুণার সঙ্গে গল্প করছিল।

করুণা বল্‌ছি'ল 'আপনি বড় ছোট গল্প লেখেন। "সব জিনিষ বড় করে লেখার মত ক্ষমতা, নেই বলে বোধ হয়"—নীতিশ বল্‌লে একথা।

করুণা গম্ভীর হয়ে বল্‌লে "ছোট-গল্প লেখা আমার খুব ভাল লাগে"—

"আমাকেও তৃপ্তি দেয়; কতক জিনিষ আছে যা অপ্রকাশ রাখাই ভাল। প্রকাশ করে যেন বেশী সুখ পাই না"—নীতিশ বলে চল্‌ছিল, করুণা বাধা দিয়ে বললে "হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন—কিন্তু...—"বাধা পড়'ল ওর কথা শেষ হবার আগে, মেয়েলী গলার তীক্ষ্ণ হাসি ওর কথা গুলিয়ে দিলে; বিরক্তি হ'য়ে বল্‌লে:—"আঃ! কী যে হাসে, চলুন আপনাদের টেনিস্ লনে বসে গল্প করি, যাবেন?"—

—"চলো"—নীতিশ বলে ফেল্‌লে।

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, নীতিশদেরই লন্,—ওরা এসে বস'ল। পূর্ণিমার চাঁদ...সারা লন্‌টা আলোয় মুড়ে দিয়েছে। কি কথা যে ওরা বলবে ভেবে পায় না।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। দুজনে দুজনকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিল, ওরা হাস্‌লো। নীতিশের মুখে মেয়েলী হাসি ছিল কী? তা কেউ দেখতে পেল না।

"তুমি একলা থাক?" নীতিশের দিক থেকে কথা এল ভেসে।

"দু'জন যখন নেই তখন একলাই—"

"মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আস্‌লে পার"—এবার করুণা কাছে সরে এসে বস্‌লো, বল্‌লে, "তুমি সুখী হও? আমি এলে?"

নীতিশ চকিত হ'য়ে, উঠ্‌লো, ছোট করে, অস্পষ্ট ভাষায় বললে 'হুঁ'—।

করুণার অত ছোট উত্তর বোধ হয় পচ্ছন্দ হল না, সে চুপ করে বসে রই'ল। নীতিশ ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো, বেশীক্ষণ চুপ্ করে থাকবার মত ধৈর্য্য রইল না, ডাক্‌লে —"রুণু"—

—"কি বলো"—গাঢ় সুর, গলার স্বরে মাদকতা।

নীতিশ হাত ধরে, বল্লে,—"কাছে সরে এস"। ও সরে বস'ল।

নীতিশ ও'র হাত ছেড়ে দিলে, দুহাতে তা'র মুখ তুলে ধরে ঠোঁটের ওপর পর পর দুটী চুমু খেলে।

ভয়ে আনন্দে ওর' দুজনেই চোখ বুজ্‌লো. পরস্পরকে অনুভব করছিল ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে। নরম ঠোঁটের স্পর্শ,—তাদের শরীরের প্রত্যেক স্নায়ু অবশ হয়ে গেছ্‌ল,— মুখ সরিয়ে নিতে পারছিল না কেউ-ই।

করুণা বড্ড কাঁপছিল—তাই, নীতিশ মুখ তুলে নিতেই,—সে নীতিশের বুকের কাছে নিজেকে রাখলে। নীতিশ দুহাতে বুকের ভেতর চেপে ধরলো।

"দাদা,—দাদা,—আঃ! ওঠোনা ছাই"— সুনন্দা পাশে দাঁড়িয়ে নীতিশকে ডাক্‌ছিল।

নীতিশ ধড়্‌মড়্ করে উঠে বসলো বললে, 'অ্যাঁ—কী হয়েছে?—খাবার দিয়েছে?' করুণাকে ও খুঁজলো—।

সুনন্দা এবার হেসে উঠলো, বললে, "যাও, যাও—খেলতে যাও—বেলা হ'য়েছে, আর আলবার সময়, মনে করে কালকের জন্তে, ইন্‌ভিটেসন্ কার্ডগুলো এনো,—যেন ভুলে যেও না,—বা রাস্তায় ঘুমিয়ে প'ড় না"...।

মাথা চুলকে নীতিশ বললে—"হাঁা যাই" উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ও ভাবলে "ওঃ কাল হোল?—কিন্তু—করুণা,—রুমু?"
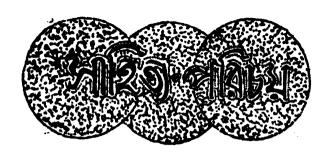
বুলবুল:—তৃতীয়বর্ষ, বৈশাখ, মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ ও বেগম শামসুন নাহার সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা। ২৩ ক্রেমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

মুসলিম সাহিত্যিক সমাজের মুখপত্র 'বুলবুল' দুবছর ত্রৈমাসিক আকারে বের হবার পর বর্ত্তমানে বৈশাখ সংখ্যা থেকে সচিত্র মাসিক আকারে বের হচ্ছে। বৈশাখ সংখ্যা পড়ে আমরা খুব খুসী হয়েছি। মুসলিম সাহিত্যিকরা কয়েক বছরের সাধনায় কতখানি ব্যুৎপত্তিলাভ করেছেন, বাঙলা সাহিত্যে কতখানি এগিয়ে গিয়েছেন আইডিয়ার দিক দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যাবে যে কোন এক সংখ্যা বুলবুল পড়লে। এদেশে হিন্দু মুসলমান মিলন যদি কখনো সম্ভব হয় তা হবে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। মনে হয় বুলবুলের মতো কাগজ হবে এই মিলনের অগ্রদুত।

এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের ডি. এচ. লরেন্স স্বলিখিত প্রবন্ধ। এই শ্রেণীর লেখা বাজার চলতি মাসিকপত্রে কমই দেখা যায়। তুর্কী বীরাঙ্গনা খালেদা খনেম—যিনি কিছুদিন আগে কলকাতা এসেছিলেন—সাহিত্যিক হিসেবেও বেশ নাম করেছেন। তার সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'মার্ণানন্দিনী'র অনুবাদ বেশ ভাল লাগল। মিঃ মোদাব্বেরর ছোট গল্প মিসেস লজ সায়্যাল ও মনীষী খোদা বখ্‌শের উর্দ্দু সাহিত্যের ধারা উল্লেখযোগ্য লেখা। শেষোক্ত লেখাটি পড়ে উর্দ্দু সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা গেল। লীলাময় রায়, শরৎচন্দ্র, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, শামসুন নাহার এদের প্রবন্ধ এবং নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল এঁদের কবিতা বৈশাখের বুলবুলের মর্য্যাদা বাড়িয়েছে।

মোট কথা বুলবুল পড়ে আমরা আশান্বিত হয়েছি। এর মারফত হিন্দু মুসলমান যদি অকপটচিত্তে বাণী বিনিময় করতে পারেন দেশের অনেক সমস্যাই সমাধান হয়ে যেতে পারে। প্রগতিপন্থী প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবককে আমরা বুলবুল পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। বুলবুলের ছাপা কাগজ বেশ—প্রচ্ছদপট ও তিনরঙা ছবি মন্দ নয়।

ওপারের ছায়া

পতিতপাবন

গারট্রুড মাইকেল প্যারামাউন্টের মেয়ে—শরীরকে সুন্দর রাখতে রোজ সাঁতার কাটে। সাঁতার কাটবার তার নিজের জায়গা আছে।

ছাতা ও তলোয়ারে

তলোয়ার চেয়ে ছাতা ভাল সেদিন ওরা বুঝেছে। আমি ছবির কথাই বলচি। এই ত ছায়াছবিতে ওই ভোঁতা তলোয়ারেও যে বিপদ কত তার ইয়ত্তা নেই।

তাই গল্প করচি; 'দি গে অ্যাডভেঞ্চার' ছবি সেই কথাই প্রমাণ করেছে। মণ্টি ব্যাঙ্কস ছবিখানা পরিচালনা করচেন; অবশ্য গ্রসভেনরের হয়েই।

ব্যারি জোনস এই ছবিতে নামছেও। যুদ্ধ ছিল গে মিড্‌লটোন-এর সঙ্গে। যুদ্ধ ঠিক নয় মারামারি। জোনস-এর হাতে ছিল ছাতা আর মিডলটোন-এর হাতে ছিল তলোয়ার। শুনলে হাসি পায় বটে কিন্তু ঠিক হাসির ব্যাপার নয়।

নোয়া স্যুইনবার্ণের ওপর ভার পড়েছিল এই ঝগড়া থামাবার। নোয়া তাই এসে দাঁড়ালে মাঝখানে ঝগড়া থামাতে। বেচারা স্যুইনবার্ণের পায়ে এসে পড়ল তলোয়ার। প্যাণ্টের ভেতর গেলো তলোয়ার ঢুকে।

প্যাণ্টটা গেলো ফেঁড়ে অনেকখানি। বন্ধ হোল সে তলোয়ার-খেলা। তাকে পাঠান হোল প্রপার্টিস রুমে। ভোঁতা হয়ে এলো তলোয়ার; আর এলো নতুন পোষাক তবে সেদিন স্যুটিং হোল।

সবচেয়ে ছোট সেট

দিনের পর দিন যত ছায়াছবির উন্নতি হচ্ছে তত তৈরী হচ্ছে বড় বড় সেট আর তৈরী হওয়ার খরচের বড় বড় অঙ্ক।

আজকালের এমনি দিনে সবচেয়ে ছোট সেটে কাজ করেচে হার্ব্বার্ট মার্শাল আর গারট্রুড মাইকেল-এ। এত ছোট সেটে আর জগতে কেউ কাজ করেছে কিনা জানিনা।

জায়গাটা হচ্ছে রেল গাড়ীর বারান্দার একটি কোণ। আর এই জায়গাটির মাপ হচ্ছে দেড় স্কোয়ার ফুট। টেলিফোন বুথের চেয়েও বোধ হয় ছোট।

ছবিখানি পরিচালনা করচেন রবার্ট ফ্লোরে। আর ছবিখানির নাম হচ্ছে 'রি ইউনিয়ন'। ছবিখানি যখন তোলা হয়; পরিচালককে তখন দাঁড়াতে হয়েছিল পেছনে একটা মইয়ের ওপর।

ফোটানো বরফ

খবরটা অনেকদিন আগেই দেওয়া উচিত ছিল; দিতে পারিনি তাই আজ দিচ্ছি।

পিকফোর্ড-ল্যাস্কির ছবির জন্যে হলিউড ষ্টুডিওতে প্যারির বিখ্যাত প্যালে ডি গ্লেস জায়গাটার নকল জায়গা তৈরী করান হয়েছিল। জানেন তো ছবিখানার নাম হচ্ছে 'ওয়ান রুইনি আফটার নুন'।

পাঁচ হাজার বর্গ ফুট জায়গায় এই

নকল বরফ ঢালা হয়েছিল। ফ্র্যান্সিস ডিওর আর আইডা লুপিনো এই বরফের ওপর স্কেটিং করবেন বলে; অবশ্য ছবির জন্যেই।

সাধারণ বরফের দৃশ্য তুলতে গেলে যে ভাবে বরফ তৈরী করা হয়, সেভাবে করা হয়নি। কারণ তাতে বরফের ওপর স্কেটের ঘড় ঘড় আওয়াজে ছবির অন্যান্য প্রয়োজনীয় আওয়াজের ক্ষতি হবে তাই এই রকম বরফ ঢালা। এই জিনিষ তৈরী হয়েছিল হাইপো সালফেট ও আরও বিশ রকম জিনিষ মিশিয়ে গুলিয়ে। এবং ফোটান তরল পদার্থটি শুটিং করার বারো ঘণ্টা আগে ওই পাঁচ হাজার বর্গ ফুটের ওপর এক ইঞ্চি পুরু করে ঢেলে দেওয়া হয়েছিলো। শুনেচি এই জিনিষটি বারো ঘণ্টা পরে জমে যাবার পর এর ওপর স্কেট করলে শব্দ হয়না।

বাড়ী যাওয়া

চেভ্ শুড হচ্ছেন মেট্রোর নৃত্য-পরিচালক। আজ পর্য্যন্ত হাজারের ওপরে মেয়ে তাঁর নজরের মধ্যে দিয়ে গেচে। তিনি ওদেশের গড়ে একশ পঁচিশ জন মেয়েদের মধ্যে কে কি ভাবে বাড়ী যায়, তাই দেখিয়েচেন।

তিনি বলিলেন—

১। চল্লিশ জন যায় নিজের গাড়ীতে।

২। কুড়ি জন যায় অন্য মেয়ের গাড়ীতে চড়ে।

৩। চব্বিশ জন যায় তার ছেলে বন্ধুর সঙ্গে।

৪। পঁচিশ জন যায় ট্যাক্সি কিম্বা বাসে চড়ে।

৫। আট জন, যারা ষ্টুডিওর কাছে থাকে তারা হেঁটে যায়।

৬। একজন মেয়ে; যাকে বাপ এসে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়।

৭। বাকী মেয়েরা বাইসাইক্লে চড়ে বাড়ী যায়।

যাতনা—অচেনা বন্ধুর হঠাৎ আবির্ভাবে সঙ্গের সাথী হয়ে।

প্রেম কি

গ্রেগুা ফ্যারেল সুন্দরী চতুরানী অভিনেত্রী। নামও তার খুব। হলিউডে অনেক নাম করা কুমাররা তাকে ভালবাসে। তবু আজও পর্য্যন্ত হৃদয় তাঁর খালি—কোন কুমারই স্থান পাননি।

সম্প্রতি গ্রেগুা তার বাড়ী সব বদল করছে।—তৈরী হচ্ছে সাঁতারের জন্যে মস্ত বড় চৌবাচ্চা—আর তেমনি তক তকে সাজান টেনিস কোর্ট।

মনে হয় গ্রেগুা ক্যালিফোর্নিয়াতেই সুদৃঢ় ভাবে বাসা বাঁধল। আর ওখানকার বন্ধু-বান্ধব নিয়েই আনন্দে কাটাবে। আর যা সন্দেহ হয় তা রোমান্সের—সত্যি মিথ্যে জানি না!

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যার জের:—বিগত ১৪শ সংখ্যার "খেয়ালী"তে ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে কালিকাপুরের শ্রীফণীন্দ্র-মোহন গুহ ঠাকুরতা আমাদের শ্রীদুর্ব্বাসাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। উক্ত সমস্যাটি এবং তাঁর প্রশ্নের যথাসাধ্য নির্ভুল উত্তর নিয়ে প্রদত্ত হল।

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, আটা, তিরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা।
চিড়িতন—টেক্কা, নয়, তিরি।

ইস্কাবন—দশ, নয়, পাঞ্জা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—বিবি, তিরি।
চিড়িতন—বিবি, আটা, পাঞ্জা

ইস্কাবন—বিবি, সাতা, ছক্কা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—সাহেব, পাঞ্জা।
চিড়িতন—দশ, সাতা, ছক্কা।

ইস্কাবন—সাহেব, ছরি।
হরতন—সাতা।
রুহিতন—দশ, সাতা।
চিড়িতন—সাহেব, গোলাম, চৌকা।

হরতন রঙ, 'দ' খেলবেন। বিপক্ষদলের সকল বাধা সত্ত্বেও 'উ' এবং 'দ'কে সব কয়খানি পিট নিতে হবে।

আমাদের উত্তর ছিল 'দ' প্রথমে রঙের সাতা খেলায় 'প' চিঁড়ের পাঞ্জা দিলেন এবং 'উ' ও 'পূ' যথাক্রমে ইস্কাবনের তিরি ও রুহিতনের পাঞ্জা দিয়ে গেলেন। এ ক্ষেত্রে ফণীন্দ্রবাবু প্রশ্ন করেছেন যে 'দ' রঙের সাতা খেললে 'প' যদি শ্রীদুর্ব্বাসার নির্দেশ অনুযায়ী চিড়ের পাঞ্জা না দিয়ে রুহিতনের তিরি দেন ও 'পূ' 'উ'এর অনুরূপ রঙ পাশান, তা' হলে বিপক্ষদলের বাধা সত্ত্বেও 'উ' আর 'দ' কিরূপে সব কয়খানি পিট পেতে পারেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরও অন্যভাবে উক্ত সমস্যাটির সমাধান নিয়ে দেওয়া হল।

অতএব 'দ'র রঙের সাতার উপর 'প' রুহিতনের তিরি দিলেন, 'উ' ইস্কাবনের তিরি পাশালেন এবং 'পূ' ফণীন্দ্রবাবুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী 'উ' অনুরূপ রঙ অর্থাৎ ইস্কাবনের ছক্কা পাশিয়ে গেলেন। পিট নিয়ে 'দ' রুহিতনের সাতা খেললেন। এখন 'প', 'উ' ও 'পূ' যথাক্রমে রুহিতনের বিবি, রুহিতনের টেক্কা ও রুহিতনের পাঞ্জা দিয়ে গেলেন। অতঃপর 'উ' ইস্কাবনের আটা পেড়ে খেললেন, 'পূ' ইস্কাবনের সাতা, 'দ' ইস্কাবনের সাহেব ও 'প' ইস্কাবনের পাঞ্জা দিলেন। পিট নিয়ে 'দ' ইস্কাবনের ছরি পেড়ে খেললেন। এ ক্ষেত্রে 'প' ইস্কাবনের নয়, 'উ' ইস্কাবনের টেক্কা ও 'পূ' ইস্কাবনের বিবি দিলেন। তারপর 'উ' ইস্কাবনের গোলাম খেলায় 'পূ' বাধ্য হয়ে চিড়ের ছক্কা দিলেন এবং 'দ' ও 'প' যথাক্রমে রুহিতনের দশ ও ইস্কাবনের দশ দিয়ে গেলেন। অতঃপর 'উ' চিড়েতনের তিরি খেললেন; এবার 'পূ' চিড়ের সাতা, 'দ' চিড়ের সাহেব ও 'প' চিড়ের পাঞ্জা দিলেন। অবশেষে 'দ'র চিড়ের গোলামের উপর 'প' দিলেন চিড়ের বিবি কিম্বা আটা, 'উ' দিলেন চিড়ের টেক্কা কিম্বা নয় এবং 'পূ' দিলেন চিড়ের দশ। সুতরাং 'প' চিড়ের বিবি বা আটা যাই দিন না কেন 'দ' পক্ষ সব কয়খানি পিটই পাচ্ছেন। আবার পঞ্চম পিটে ইস্কাবনের গোলামের খেলায় 'পূ' যদি চিড়ের ছক্কা না পাশিয়ে রুহিতনের সাহেবও পাশাতেন তবে 'দ' রুহিতনের দশের পিট নিয়ে যেতেন। অতএব এই স্থলে ফণীন্দ্রবাবুর সকল প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করবার পরও যদি এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে ফণীন্দ্রবাবুর বা আর কারও কোন কিছু বলবার থাকে আমাদের জানালে আমরা সে বিষয়ে সমালোচনা করতে প্রস্তুত।

শিবপুরের শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় ও কালিকাপুরের শ্রীফণীন্দ্রমোহন গুহ ঠাকুরতা, বি-এ, বিগত ১৫শ সংখ্যার "খেয়ালী"তে প্রকাশিত ব্রীজ-সমস্যার নির্ভুল উত্তর যথা সময়ে পাঠিয়েছিলেন। পত্রগুলি বিলম্বে শ্রীদুর্ব্বাসার হস্তগত হওয়ায় অযথাভাবে প্রাপ্তি স্বীকারে দেরী হল।

আর একটি হাত:—প্রত্যেক প্রতিযোগিতায়ই এমন এক একটি খেলা আসে যখন ক্রীড়কের পক্ষে খেলা করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এই খেলা হওয়া না হওয়ার উপর স্বপক্ষের জয় পরাজয় নির্ভর করে।

অভিসার

শ্রীরামেন্দ্র কুমার দেশমুখ্য

সুপ্তিমগ্না নিখিল পৃথ্বী ; তৃতীয়ার ক্ষীণচাঁদ,
দগ্ধশাখার পুষ্প কোরক ; বহি' অপূর্ণসাধ—
ধরেছে শিরে—
মরণের তাজ, রূঢ় ব্যর্থতা, বিধাতার শাপটারে।
মুক্ত করিয়া দ্বার,
নামিয়াছিলাম আঁকা বাঁকা পথে। ধরায় অন্ধকার ;—
আকাশে হোথায় চিরদীপালির চলেছে মহোৎসব।
বাতাসে ভেসেছে নিত্যকালের ঝিল্লীর টানারব।
অতনুর অভিসার—
হাস্নাহেনার কুঞ্জবিতানে চলিয়াছে অনিবার।
সরু বাতায়ন পথে,
স্তিমিত দীপের শিথায় অদূরে, নিদহারা আঁখিপাতে,
ভাসিয়া উঠেছে প্রতীক্ষমানা প্রিয়ার আমার ছায়া,
আঁচল জড়ানো মরালগ্রীবাটী ; জাগরণ মসী মায়া,
উপচি' পড়েছে চোথে
আগমন মোর জানায়েছি তা'রে প্রেমভীরু দুরুবুকে।
ধীরে সে এসেছে পাশে—
গতিমন্থর, চোথে আশঙ্কা, রুধি' শঙ্কিতশ্বাসে।
—তারপর উভ-অন্তর-বীণা-তন্ত্রী উঠেছে রণি ;
একক সুরেতে যে সুর শুনেনি বিশ্বের কোন প্রাণী।
আজিও তেমনি শুব্ধ পৃথিবী ; বাতাসে ফুলের বাস.
চলিয়াছে ভেসে, গন্ধমন্দির করিতেছে নিঃশ্বাস।
তেমনি দীপালি-জ্বালা,
চামেলী হাস্নু তেমনি বয়েছে রাত জাগিবার পালা।
কিন্তু কোথায় হায়
প্রতীক্ষমানা প্রাণপ্রিয়তমা, প্রাণ মোর যারে চায়।
বিরহ যাহার চিত্তে ঢেলেছে অগ্নিদহন জ্বালা।
যে নদীর লাগি সাগর ধরেছে বেদনা-ফেনার মালা।
মাটী এই বসুধার,
মন্থরপাদ-নাড়ী স্পন্দন শুনিবেনা তার আর।
যাত্রী কি অসীমের
উদ্বেল তার করিয়াছে হিয়া অভিসার সুদূরের ?
মোর পানে চাহি' তাঁ'র আঁখি প্রেম করিবেনা নিবেদন।
আঁখির নীলায় আর ভাসিবেনা আনন্দঘন মন।

এই সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে ব্রীজ খেলায় ক্রীড়কের কতখানি ব্যুৎপত্তি তার প্রকাশ পায়। কয়েকদিন পূর্ব্বে এইরূপ একটি খেলা হয়েছিল 'ভেনাস ক্লাবে'। নিম্নে একপক্ষের সম্পূর্ণ হাত তুলে দেওয়া হল আর কিরূপ ডাক চলেছিল তা'ও দেওয়া হল, এখন এই দুই হাত দেখে বলুন আপনি কি ভাবে খেলবেন। প্রথমে খেলা হয়েছে ইস্কাবনের দশ। শেষে বিপক্ষদলের হাতও দেওয়া হল, তবে প্রথমে বিপক্ষদলের হাত না দেখেই বলুন তো আপনি কি ভাবে খেলবেন ? তারপর তার হাত দেখে সমাধান করতে পারেন। পরে আমাদের উত্তর ছাপা হবে।

উত্তর।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, আটা, ×, ×।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, দশ, নয়।
চিড়িতন—টেক্কা, ×, ×।

দক্ষিণ।

ইস্কাবন—×, ×।
হরতন—টেক্কা, গোলাম, দশ, ×, ×।
রুহিতন—×।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, নয়, সাত, ×।

ডাক হয়েছে এইরূপ—

'দ'।	'প'।
একটি হরতন।	পাশ।
দুইটি চিড়িতন।	পাশ।
দুইটি ফেরাই।	পাশ!
চারটি চিড়িতন।	পাশ।
পাঁচটি চিড়িতন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।

	'পূ'।
একটি ইস্কাবন।	পাশ।
দুইটি রুহিতন।	পাশ।
তিনটি চিড়িতন।	পাশ।
চারটি ফেরাই।	পাশ।
পাশ।	ডবল!
রি-ডবল!	পাশ।

বিপক্ষদলের হাত

পশ্চিম।

ইস্কাবন—দশ, ×।
হরতন—সাহেব, বিবি, নয়, ×, ×, ×, ×।
রুহিতন—×, ×, ×, ×।
চিড়িতন—নাই।

পূর্ব্ব।

ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, নয়, ×।

হরতন—×।

রুহিতন—সাহেব, ×, ×।

চিড়িতন—গোলাম, দশ, আটা, ×, ×।

অনেকস্থলেই এই ধরণের খেলা হয়ে থাকে; পাঠকবর্গ যদি সেই হাতগুলি আমাদের কাছে পাঠান তা' হলে আমরা সাদরে তা' পত্রস্থ করব।

ল্যান্সডাউন ক্লাব :—আগামী ১৬ই মে থেকে ল্যান্সডাউন ক্লাবের ব্রীজ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। অন্যান্য বারের মত এবারেও সিঙ্গলিকেট অকসন, সিঙ্গলিকেট কণ্ট্রাক্ট, ডুপ্লিকেট অকসন ও ডুপ্লিকেট কণ্ট্রাক্ট এই চার বিভাগেই প্রতিযোগিতা চলবে, অধিকন্তু এদের উদ্যোগে Pair Contest-এরও ব্যবস্থা হয়েছে। Pair Contest-এর সকল ভার ন্যস্ত হয়েছে 'ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনে'র কর্ণধার সুপরিচালক শ্রীযুক্ত যতীশ বসুর উপর। বলা বাহুল্য যে, এই অভিনব প্রতিযোগিতার প্রচলন প্রত্যেক ক্রীড়কের পক্ষেই সুবিধাজনক, কেননা শুধু এই প্রতিযোগিতায়েই সকল দল সকল দলের সহিত খেলবার সুযোগ পান।

খোড়াল ফ্রেণ্ডস :—এদের অকসন্ ডুপ্লিকেটের ফাইন্যাল খেলা শেষ হয়েছে। কারা জয়ী হয়েছেন সে খবর এখনও আমাদের কাছে পৌছোয় নি।

'সুভাষ দিবস'এ রবীন্দ্রনাথ

দেশ-জোড়া দুঃখের দুঃসহ বেদনা

বাঙ্গলার হাজার হাজার নরনারী বিনাবিচারে বন্দীশালায়

(আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য বিশেষভাবে প্রদত্ত)

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ১০ই মে 'সুভাষ দিবস'এ আনন্দবাজার পত্রিকার মারফৎ দেশবাসীর নিকট নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন :—

অনেক দুঃখ অনেক নামে রূপে সমস্ত দেশ জুড়ে জমে উঠেছে। সে দুঃখ দরিদ্রের দুঃখ, অক্ষমের দুঃখ, তার মধ্যে কেবলি আছে শোচনীয়তা। এমন কিছু নেই যা আজকের দিনে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সমস্যার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে।

জটিল অর্থনৈতিক কারণে অন্য দেশে অর্দ্ধাশন একটা অনভ্যস্ত বড়ো সংখ্যায় পৌঁচিবামাত্র বহু ক্ষমতাশীল চিন্তাশীল হৃদয়বান মানুষের দিন ও রাত্রিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেচে। কর্ম্ম অভাবে অন্ন অভাব অনিবার্য্য হবেই, এ কথা সে সব দেশে নিঃশব্দে স্বীকৃত হয় নি। সে দেশের মানুষ পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকবার অধিকারী, উপবাসের কৃশ-মূর্ত্তি দেখা দেবামাত্র এ কথাটা গর্জ্জিত হয়ে উঠেচে সেখানে সে দেশে মানুষের মূল্য আছে।

আমাদের দেশে অর্দ্ধাশন অনশন দেশেকালে পরিব্যপ্ত। তার বেদনা ঘরে ঘরে। কিন্তু ক্রন্দনধ্বনি ঘরের বাইরে পৌঁছবার মতো কণ্ঠ দেশের নেই। আমাদেরও যে বাঁচতে হবে এমন দাবী নেই মানব সমাজের কাছে। পিপাসার জল নেই, অন্ন নেই, আরোগ্যের ব্যবস্থা নেই। মরে যাচ্ছি দ্রুতবেগে, বেঁচে থাকচি আধমরা হয়ে, এর প্রতিকার তো নেই-ই, যথেষ্ট পরিমাণে পরিতাপ নেই মানবের মনে।

সাংঘাতিক রোগের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হয়ে চলল চারদিকে। নূতন ও পুরাতন মূর্ত্তিতে মারী জীর্ণ করচে সমস্ত দেশের অস্থিমজ্জা, মনকে করচে নিচেষ্ট, আশা ভরসা মিলিয়ে দিচ্চে ধুলোয়। এর উপরে নিরক্ষরতায় মূর্খতায় এখানে মানুষের মূল্য এসে ঠেকেচে শূন্যে। জগতে এর উদ্বেগ অতি ক্ষীণ, এর নালিশের কোনো জায়গা নেই।

এই সঙ্গেই এই বাঙ্গলা দেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বন্দীশালায়। বিচারের দাবী করচিই, সেই দাবীর পিছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, কিন্তু তার জোর নেই। বিনা বিচারে যারা দণ্ডভোগ করচে অপরিমিত কাল ধরে, তাদের মধ্যে দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো করে আছে, দেশের অসম্মান। বিচারের অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান। তার থেকে আমরা বঞ্চিত। কেননা আমরা বিশ্বের গোচর নই, আমাদের মূল্য নেই। এই দেশব্যাপী অভিসম্পাতের আক্রমণ হতে যদি কোন দিন নিজেদের রক্ষা করতে পারি তাহ'লেই আমাদের প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হবে দেশে বিদেশে।

সেদিনের পূর্ব্বে ব্যর্থ বিলাপ ঘোষণা করবার জন্যে সম্পাদকের আমন্ত্রণ স্বীকার করবার উৎসাহ আমার নাই। ইতি ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৩ সাল।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(বিলাসী)

কোলকাতার থিয়েটার
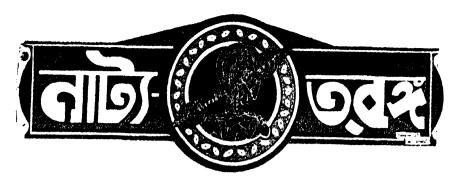
আমাদের রঙ্গালয়গুলির অবস্থার কোন আশু পরিবর্ত্তনের আভাষ এখন পাচ্ছিনা। নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার জন্যে সকলেই তোড়জোড় কচ্ছেন কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই আবার থিয়েটার মালিকদের মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে দেখা যায় যে এর পরের উপায় কি। নিত্য নতুন নাটক তাঁরা খুলে চলেছেন তবু দর্শক আর আকর্ষণ করা যাচ্ছেনা। বাড়ীর দরজায় House Full টানিয়ে রাখলে সাধারণ পথচারী পথিকের হয়তো তাই বিশ্বাস হতে পারে, কিন্তু সত্যি যারা ভেতরের খবর কিছু রাখে তারা জানে, যে ভেতরে চলেছে কি করুণ আর্ত্তনাদ। এই অবস্থার প্রতীকার করার জন্যে অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেক উপায়ও সুপারিশ করা হয়েছে কিন্তু আমাদের থিয়েটারের কর্ত্তারা সে বিষয়ে মন দেবার সময় করে উঠতে পারেন নি। যাক এ কথা; তবে আজ যা সহরের থিয়েটারগুলোর অবস্থা এ রকম আর দিনকতক এইভাবেই চললে এদের নিশ্চয়ই লালবাতী জ্বালতে হবে।

নব নাট্যমন্দির

এদের প্রাচীর পত্র অনেকদিন আগেই "অচলা"র শীঘ্রী আগমন ঘোষণা করে মৌনতা অবলম্বন কোরেছে। কবে যে "অচলা" সচলা হয়ে পাদপ্রদীপের সামনে নিজেকে জাহির করবেন তা বেশ গবেষণার বিষয়। এ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলছেন যে নিউ-থিয়েটার্সের আসছে ছবি "গৃহদাহ" যে সময় "চিত্রা"য় দেখানো হবে সেই সময় এরা "অচলা"কে মহলা গৃহের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন। শ্রীমতী "অচলা এখনও মহলা গৃহে বন্দী।

মিনার্ভা

এ হপ্তায় এদের খবর আগামী ১৩ই তারিখে "দস্যু"-র উদ্বোধন। এবং আরো একটি সুখবর যে সু-বিখ্যাত মঞ্চ-শিল্পী শ্রীপরেশ বসুর এখানে পুনরায় যোগদান। "দস্যু"র প্রযোজনা করেছেন শ্রীকালিপ্রসাদ ঘোষ। 'মিনার্ভা'র "দস্যু" ঐ অঞ্চলের ধনীদের ভাণ্ডার লুট করে 'মিনার্ভা'র সিন্দুক ভরাবে কি না তা আমরা যথা সময়েই "দস্যু"র সম্মুখীন হয়ে তার বল পরীক্ষা করে দেখবো।

রঙমহল

এদের "চরিত্রহীন" নাটক এখনও বেশ চলছে। এরপরে এরা শ্রীসুধীন্দ্র রাহার "সর্ব্বহারা" মঞ্চস্থ করবেন বলে প্রাচীরপত্র মারফৎ ঘোষণা করেছেন। "চরিত্রহীন" হলে "সর্ব্বহারা" হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়!

রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী সমস্যা

আজকাল কোলকাতার রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী সমস্যা বিশেষ প্রবল রূপ ধরেছে। অভিনয়-অভিজ্ঞ মেয়ে পাওয়া যায় তো ভাল চেহারা পাওয়া যায় না, ভাল চেহারা পাওয়া যায় তো অভিনয় করতে পারে এমন মেয়ে দেখা যায় না। এই জন্যে আজও দেখা যায় যে সেকালের সেই বস্তা পচা মাল যাদের চেহারা এবং বয়েসের বিচারে নায়িকার ঠাকুমার ভূমিকায় অভিনয় করা উচিত তাদের করতে হচ্ছে নায়িকার অংশ। কেন না তা না হলে যে উপায় নেই, উপযুক্ত নটীর এমনি অভাব আজ বাংলার রঙ্গমঞ্চে। এ সম্বন্ধে আমরা সবিস্তারে পরে আলোচনা করবো।

চরণ ও বরণ

শ্রীফণি মুখোপাধ্যায়

চরণ ও বরণ।
তুমি আমায় দিচ্ছ চরণ
(ওগো,) আমার চরণ ভাল।
তুমি আমায় দিচ্ছ বরণ
(ওগো,) হোক না বরণ কাল॥
তোমার চরণ, তোমার বরণ,
তোমার দেওয়া জীবন-মরণ;
তোমার দেওয়া জ্ঞান ও করম
হয় যেন মোর আলো।
ওগো, এমনি ক'রে করাও মোরে
যখন যাহা ভালো॥
আমি আমার আপন হ'তে
চাইনে কভু নিজে।
তুমি আমায় আপন কর
অশ্রুজলে ভিজে॥
সান্ত্বনা মোর ঐখানে আজ,—
যে যা বলে নাই কোন লাজ,
তুমি যদি গাঁথ গো হার
অরূপ মনসিজে।
রূপ-গরবী তাহার কাছে
হার মানিবে নিজে।
নিঠুর তোমার লীলাতে আজ
শান্তি পথহারা।
তাই বলি গো, দাও হে ভেঙে
মোহ, ভ্রান্তি কারা॥
উড়ুক তোমার বিজয় নিশান,
দাও হে আমায়—জ্ঞান-গরীয়ান,
চাই গো আমি মুক্ত বিমান
(যেন) অন্ত-বিহীন ধরা।
চাইগো আমি তোমার বিভব
আকুল পাগল পারা॥
রুদ্ধ আমার হৃদয় আগার,
—সেথায় কেন আলো?
প্রদীপ আমার জ্বেলেছে আজ
রুদ্ধ-দুয়ার খোলো॥
দয়াল, তোমার কৃপণতা—
আমার বুকে জাগায় ব্যথা,
তাই বলি এ নিঠুরতা
এবার দূরে ফ্যালো।
দুয়ার খুলে, আপন ভুলে
বিলাই তোমার আলো॥

অ্যানিয়া ট্যারাণ্ডা
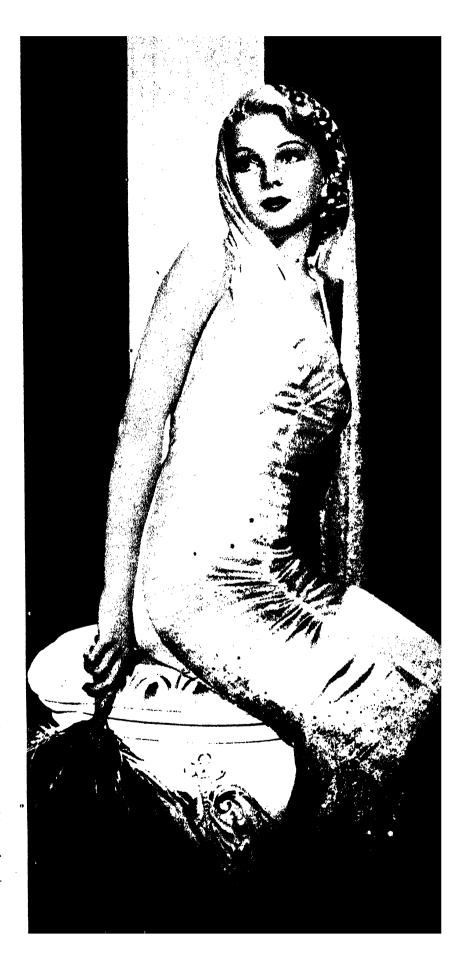
কত শত মেয়ে, কত সুন্দর চেহারা, কতবার কত ষ্টুডিয়োয় কত না ঘুরে বেড়িয়েছে। তারই ভেতর হঠাৎ একদিন এ মেয়েটি স্যাম গোল্ডউইনের চোখে গেলো পড়ে'। পড়বার মত চেহারা সন্দেহ নেই। এই অ্যানিয়া নেবেছে এডি ক্যান্টরের সঙ্গে "ষ্ট্রাইক মি পিঙ্ক"এ। চিত্রখানি আসচে চিত্রায়

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'রেট্রি' | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ ৯, রামময় রোড্, কলিকাতা | টেলিফোন পার্ক ৩২৪

[illegible], [illegible]শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩, [illegible]শে মে ১৯৩৬

"সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা"

—বিধান রায় ও প্রফুল্ল ঘোষের দ্বৈত উচ্ছ্বাস

আসন্ন প্রাদেশিক শাসন সংস্কারের প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভে সম্প্রসারিত ভোটাধিকার সম্বন্ধে যে নিয়মাবলী রচিত হইয়াছে তাহা সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। আসন্ন শাসন সংস্কারের মধ্যে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে জনসাধারণের ভোটাধিকার বিস্তৃতভাবে ন্যস্ত হইয়াছে। এই সম্প্রসারিত ভোটাধিকারকে উপযুক্তভাবে নিয়োজিত করিতে পারিলে জনমতের রাজনৈতিক দায়িত্বজ্ঞান অধিকতর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। সুতরাং নব নিয়ম অনুসারে যাঁহারা ভোটাধিকার পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে ভোটারতালিকাভুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে হইলে জনপ্রিয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ ও সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

অনুরূপ সহযোগিতার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া মিঃ নারিমান প্রমুখ বোম্বাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ণধারবৃন্দ বোম্বাই সরকারের স্বরাষ্ট্র সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং স্বরাষ্ট্র সম্পাদকও কংগ্রেসী নেতৃবর্গের সহিত যথোচিত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নবসংস্কৃত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আসন্ন নির্ব্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি ইতিমধ্যেই বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে বাংলা দেশের কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে অদ্যাবধিও উদাসীন আছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির গঠন সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ ও আবেদন নিবেদনের পালা এখনও শেষ হয় নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কোন্ দল প্রাধান্যলাভ করিবেন তাহা এখনও সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বিগত কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ইলেক্‌শন বোর্ডের সভাপতির অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনার ফলস্বরূপ মজুমদারদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছেন। সভাপতির অবিবেচনার ফলে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বাংলার রাজনীতি-গগন হইতে অপসৃত হইয়া কেহবা হাইকোর্টের কেহবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ-কক্ষে বিশ্রামলাভ করিতেছেন। ব্যক্তিত্বপূর্ণ নেতার অভাবে কর্পোরেশনে কংগ্রেসীদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুচতুর ও কৌশলী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সুবিন্যস্ত ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ হইয়া মেরুদণ্ডহীন পৌত্তলিক নেতা শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী কোয়ালিসান-মনোনীত মেয়রের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। তৎপরে বিভিন্ন কমিটি গঠনে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত কংগ্রেস মিউনিসিপাল এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একমন একপ্রাণ হইয়া যে মিলনের জয়গান করিয়াছেন তাহাতেই কর্পোরেশনে কংগ্রেসীদলের অপমৃত্যু হইয়াছে। কর্পোরেশনে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র আশীষপূত কংগ্রেসী দলের এই অপমৃত্যুর অন্তরালে শ্রীগৌরাঙ্গ-ছায়াশ্রিত শক্তিশালী কংগ্রেসকর্ম্মীবৃন্দ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। যে শরৎচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া উক্ত কর্ম্মীবৃন্দ ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন সেই শরৎচন্দ্র ক্রমবর্দ্ধমান গ্রীকের স্তূপের

মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন। উড্‌বার্ণ পার্কের বদ্ধ প্রকোষ্ঠের অনতিদূরে মজুমদারী দলের নৈরাশ্যের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হইতেছে ও বৈধানিক দলের জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কারান্তরালে সংক্রামিত আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন শরৎচন্দ্রের নিকট জয় পরাজয় সমান হইতে পারে কিন্তু রাজনীতিতে "Nothing succeeds like success". বৈধানিক দলের এই বিজয়ে আকৃষ্ট হইয়া বাংলা কংগ্রেসের খাদি মণ্ডলের কর্ম্মীবৃন্দ বৈধানিক দলের সহিত প্রেমডোরে আবদ্ধ হইয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের শূন্যপদে ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থানলাভের আশায় ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ শুধু নিজেই মজুমদার-দল হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন নাই; অধিকন্তু কুমিল্লা হইতে ডাক্তার নৃপেন্দ্রনাথ বসুকে আনাইয়া ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সভাপতির পদত্যাগ করিতে বাধ্য করাইয়াছেন। দুষ্ট লোকে বলে অভয়াশ্রমের কর্ম্মীবৃন্দ বৈধানিক দলের প্রেমে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহারা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একঘরে করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সম্মিলিত রায়-অভয়াশ্রম উপদল বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে জয়লাভ করিলে আমরা বিস্মিত হইব না। এই দলগত প্রাধান্যের মীমাংসা হইবার পর বিজয়লক্ষ্মী যে উপদলের গলে মাল্যদান করিবেন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাঁহারাই বাংলায় আসন্ন কাউন্সিল নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব পরিচালনা করিবেন। দলগত প্রাধান্যলাভের ঘাতপ্রতিঘাতের পরিসমাপ্তি কোথায় তাহা আজ কে বলিবে?

স্বাগতম্

ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক নির্ব্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। মনোনীত হবার নিমিত্ত যে সকল অনুষ্ঠান ও আয়োজন চল্‌ছিল তারও নির্ব্বাণ হয়েছে। যারা জয়যুক্ত হলেন তাঁদের আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি। কলিকাতার মেয়র সভাপতি, নাড়াজোলের মাননীয় কুমার বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মিত্র ও এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি অক্লান্ত-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত যামিনী কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সম্পাদকীয় আসনে আমরা আশানুরূপ ব্যক্তিকে লাভ করেছি,—বিগত বৎসরে যিনি সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমে এসোসিয়েশনের সমূহ কল্যাণ সম্পাদনে আপনাকে ব্রতী করেছিলেন আমাদের বন্ধুবর সেই শ্রীযুক্ত যতীশ বসুর পুনর্নিয়োগে আমরা অতীব তৃপ্তিলাভ করেছি। এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদকরূপে আমরা লাভ করেছি সুবিখ্যাত ব্রীজ-ক্রীড়ক শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ব্রীজের আসরে মণিবাবুর পরিচয় অনাবশ্যক; বিভিন্ন সমিতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এসোসিয়েশনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অন্তরালে যিনি নিজের সময়—এমন কি জীবন উৎসর্গ করেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না সেই নিরভিমান নীরব কর্ম্মীর নির্ব্বাচনে যে আমাদের ন্যায় সকলে আনন্দ অনুভব করবেন তাহা সুনিশ্চিত। তবে সমূহ দুঃখের বিষয় এই যে এ হেন একনিষ্ঠ কর্ম্মীর নির্ব্বাচনের সময়েও ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাই যে প্রাণ স্পন্দনের একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ তাহা আমরা অস্বীকার করি না; তথাপি দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই দুর্ব্বল বা হীনমতির পরিচায়ক তাহা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আজকাল আবার একটি ধুয়া উঠেছে যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী-নির্ব্বাচনের কালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূঢ়ভাবে প্রকাশিত হওয়া চাই। সুযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক্ ইহা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে একজন প্রতিযোগীর সহিত অপর প্রতিযোগীর গুণগত বৈষম্য সুপ্রচুর, সে ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া অযোগ্য প্রতিযোগীর শালীনতা হীনতারই পরিচয় দিয়া থাকে। আমরা যে এ হেন বিষম প্রতিযোগিতার কেবল মৌখিক নিন্দাবাদ করছি তা নয়,—আমাদের এই উক্তি তথ্য-নিপুণমতির অবিদিত নহে।

অযোগ্য প্রতিযোগিগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে দল ভাঙিয়ে যে দল পাকাবার চেষ্টা করেন সে চেষ্টার মূলে যে প্রবৃত্তি তাহার স্বরূপ অঙ্কন করবার মত ভাষা আমাদের নেই। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে আত্মতুষ্টি সম্পাদন যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তা হলে উহা কোনমতে উপেক্ষনীয় হতে পারে কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় না। "আমার যোগ্যতা নেই কিন্তু অপরে যোগ্য হলেও তার সম্মান কিরূপে করা যায়!—" অতএব ছলে বলে কৌশলে কয়েকজন অনুগত ও জনকয়েক সরলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বাক্‌জাল মোহে মুগ্ধ করে স্বীয় দল প্রতিষ্ঠা করবার যে প্রয়াস ইহার পরিণতি কোথায়? আমরা এ সম্বন্ধে এখন আর আলোচনা করতে ইচ্ছুক নই তবে উপসংহারে বক্তব্য এই যে এ সংগ্রামে অবতীর্ণ না হ'লে মণিবাবু ভালই করতেন। মণিবাবু কি জানেন না যে মেকী ধরা পড়লে তার পরিণাম কি! তিনি যখন আসরে অবতীর্ণ হয়ে দেখলেন যে তাঁর বিরুদ্ধেও কোমর বেঁধে একজন অবতীর্ণ হয়েছেন তখন তিনি প্রত্যাহার করতে পারতেন। আমরা অবশ্য এরূপ শঙ্কা করছি না যে তাঁর পরাজয় ঘটলে ব্যাপারটী তাঁর সম্মানের হানিজনক হত; তবে এটুকু আমাদের বিশ্বাস যে প্রত্যেক মানুষেরই নিজের শক্তি সম্বন্ধে গর্ব্ব নয়, অহঙ্কার নয় কিন্তু চৈতন্য থাকা উচিত। মণিবাবুর নিকটে কি আমরা সেটুকু আশা করতে পারি না? শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে শান্তনুনন্দনের ন্যায় তাঁর অদম্য কর্ম্মক্ষমতা কোন রসিক ব্যক্তি না উপলব্ধি করেছেন? তবে আজ নিজেকে সহকারী সম্পাদকপদে প্রতিষ্ঠিত দেখতে তাঁর এ মোহ কেন? সসম্মানে বিনা বাধায় যদি তিনি নির্ব্বাচিত হতেন তা হলে বুঝা যেত যে এসোসিয়েশন গুণগ্রাহিতার মর্ম্ম বুঝে, কিন্তু যে স্থলে তাঁর মত কর্ম্মীর বিরুদ্ধে অপর কেহ দাঁড়াবার সাহস পায় সে হেন নির্ব্বাচন তাঁর উপেক্ষা করা কি উচিত ছিল না? তিনি ব্রাহ্মণ! তার স্মরণ রাখা উচিত ছিল,—তিনি দরিদ্র হতে পারেন কিন্তু প্রার্থী নহেন।

শ্রীদুর্ব্বাসা

একটি সমস্যা :—পাঠকবর্গের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত নিয়ে আর একটি সমস্যা দেওয়া গেল।

ইস্কাবন—দুরি।
হরতন—পাঞ্জা।
রুহিতন—সাতা, দুরি।
চিড়িতন—সাহেব, ছক্কা, তিরি।

ইস্কাবন—সাহেব, ছক্কা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—ছক্কা, পাঞ্জা।
চিড়িতন—বিবি, নয়, চৌকা।

ইস্কাবন—বিবি, নয়, সাতা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—সাহেব, চৌকা।
চিড়িতন—দশ, দুরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, চৌকা।
হরতন—সাতা।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—টেক্কা, গোলাম, পাঞ্জা।

হরতন রঙ, 'দ' খেলবেন। সকল বাধা সত্ত্বেও 'উ' এবং 'দ'কে ছয়খানি পিট ধরতে হবে।

ব্রীজ এসোসিয়েশনের মনোনয়ন ঃ—বিগত ১০ই মে রবিবার সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় সুবিখ্যাত ব্রীজ-ক্রীড়ক ও পরিচালক শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভবানীপুরের 'সদানন্দকর ইনষ্টিটিউটে' ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়ে গেল। যথাবিহিত কার্য্যাদি আরম্ভের পর বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্য পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হয়েছেন—

সভাপতি :—কলিকাতার মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল, কে, টি। সহঃ সভাপতি :—নাড়াজোলের কুমার বাহাদুর। শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বিমান কুমার মিত্র।

অবৈতনিক সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু। অবৈতনিক সহঃ-সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন। অবৈতনিক হিসাব-পরীক্ষক :—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

সভ্যগণ :—ল্যান্সডাউন ক্লাব। ক্রকফোর্ডস ক্লাব। থেটা বেটা ক্লাব। লুনার এণ্ড ফুলস কমবাইণ্ড ক্লাব। ভেনাস ক্লাব। স্যাটার্ণ ক্লাব। শান্তি ইনষ্টিটিউট্।

থেটা বেটা ক্লাবের সম্মিলন :—১৭ই মে রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় থেটা বেটা ক্লাবের প্রাঙ্গণে ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সভাপতি কলিকাতার মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল, কে, টি মহাশয়ের সম্মানার্থে থেটা বেটা ক্লাব একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। উক্ত সম্মেলনে ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের নব নির্ব্বাচিত কার্য্য-পরিচালকবৃন্দের সকলেই নিমন্ত্রিত হন। আমরা ক্লাবের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচী রায়কে এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্পাদকের দু'খানি চিঠি :—ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশ বসু ব্রীজ সাধারণেরর অবগতির নিমিত্ত 'শ্রীদুর্ব্বাসাকে' দু'খানি চিঠি পাঠিয়েছেন, সেগুলি নিয়ে প্রকাশিত হল।

6 Esplanade East,
11th May 1936.

In persuance of the resolutions passed in the General Meeting of the Indian Bridge Association, held on the 10th May 1936, to devise ways and means for the efficient management of tournaments, I request the Bridge-loving public and the organisers of different tournaments in general.

All suggestions may please be communicated to me on or before the 15th of June 1936.

(Sd/-) Jotish Bose.
Hony. Secy. Indian Bridge Association.

ব্রীজ প্রতিযোগিতাগুলির সুপরিচালনার উপায় ও নিয়ম-কানুন স্থির করবার জন্য ব্রীজ সাধারণের প্রতি সম্পাদকের এই আহ্বানের প্রত্যুত্তর আশা করি পাওয়া যাবে। যা' হোক যাঁরা প্রতিযোতিগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার কামনা করেন এবং প্রতিযোগিতা পরিচালনার সুবিধার্থে নিয়ম-কানুন পাঠিয়ে ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশন তথা আপামর

নলিনী ও রাসমণি

মিলন ও বিচ্ছেদের করুণ-কাহিনী

বস্ত্র প্রেরণ, যৌন-সংশ্রব, অন্তঃসত্বা ও কন্যা প্রসব

রাসমণি বণাম নলিনীরঞ্জন সরকারের মামলার ফরিয়াদী রাসমণি দেবী, আলীপুরের পুলিশ কোর্টে প্রকাশ্য আদালতে শ্রীযুক্ত নলিনী সরকারকে সনাক্ত করিয়া জবানবন্দী প্রসঙ্গে বলে যে:—তাহার বাড়ী হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর জমীতেই অবস্থিত ছিল। নলিনী সরকার প্রায়ই তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া জল এবং তাম্বুলাদি চাহিয়া খাইত। সরকার প্রায়ই তাহার পিতাকে বলিত যে, কেন সে এক চাষার সহিত এত সুন্দরী কন্যার বিবাহ দিয়াছে। ঐ সময় সাক্ষীকে সরকার স্বামী গৃহে যাইতে বারণ করে। সময় সময় নলিনী সরকার তাহাকে ও তাহার পিতাকে সামান্য অর্থাদি প্রদান করিত। এক সময় বিবাদী তাহাদের পরিবারের সকলকেই কাপড় উপহার দিয়াছিল তবে তাহার কাপড়খানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল।

ঐ সময় তাহার পিতামাতা তাহার অসুস্থ ভগ্নীর স্বাস্থ্যের নিমিত্ত বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে গমন করে। তখন সাক্ষী, তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী ও একটী বালক ভৃত্য বাড়ীতে ছিল। রাত্রিতে ঐ অঞ্চলেরই জনৈকা বৃদ্ধা রমণী তাহাদের বাড়ীতে থাকিত। সাক্ষী বলিতে পারে না যে, উক্ত বৃদ্ধা রমণী বর্ত্তমানে বাঁচিয়া আছে কিনা?

প্রথম যৌন-সংশ্রব

তাহার পিতামাতার অনুপস্থিতির সুযোগে 'সরকার মশায়' অধিকতরভাবে তাহার সহিত মেলামেশা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার সহিতই সাক্ষীর প্রথম যৌন সংশ্রব হয়। প্রায় একপক্ষ কাল পরে তাহার পিতা একাকী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নলিনী সরকারের সহিত এইভাবে অবৈধ প্রণয় প্রায় দুই বৎসর কাল চলিয়াছিল। তাহার পিতা অসময়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সরকার মহাশয় তাহাকে অর্থ আনয়নের নিমিত্ত আফিসে কিম্বা খাবার আনয়নের নিমিত্ত দোকানে প্রেরণ করিয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইত।

অন্তঃসত্বা ও কন্যা প্রসব

নলিনী সরকারের সহিত প্রথম পরিচয়ের প্রায় বৎসর খানেক পরে সে অন্তঃসত্বা হয় এবং এক আশ্বিন মাসে এক কন্যা সন্তান প্রসব করে। বালিকার নাম মহামায়া।

বালিকার জন্মের পর প্রথম ছয়মাস ক[illegible] নলিনী সরকার সাক্ষীর গৃহে যায় নাই [illegible] ইহার পর তিনি প্রায়ই তাহার সহি[illegible] সাক্ষাৎ করিতেন।

বালিকার জন্মের পর নলিনী সরকা[illegible] দুইজন বাবু ও এক দারোয়ানের মারফ[illegible] আতুড় ঘরের খরচা ও জন্ম রেজিষ্টারীর ব[illegible] নির্ব্বাহার্থ ১০০৲ শত টাকা প্রেরণ করেন। বি[illegible] ইহার পর ছয় মাস পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বে[illegible] তিনি কোনপ্রকার আর্থিক সাহায্য ক[illegible] নাই।

তুমি মোরে দিয়ে গেছ ডাব

শ্রীকপিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি মোরে দিয়ে গেছ ডাক
আমি নির্ব্বাক
শুনি নাই কাণে—তুমি ফিরে গেছ;
চলে গেছ দূরে—বহুদূরে,
তোমার অন্তর বাণী
কেন মোরে জাগালোনা ক্ষনিকের তরে?
তাই ভাবি—ভাবি মনে মনে
যে গেছে তাহারি আজি ফিরাব কেমনে?
যে মেঘ ঘনায়ে আসে আঁধারি আকাশ
তোমা বিনা সেই পাশ
কেমনে কাটাব' আমি?
পথ নাই—কোন অবকাশ
নাহি সে দিবস যামী।
ব্যথা জাগে অন্তরের মাঝে
জীবনের কাজে বা অকাজে;
হ'য়ে আনমনা
খেয়ালের মাঝে মোর মেটেনা কামনা।
ছিল যেই আশা
ধূলায় লুটায় আজি; নাই যে গো তব ভালবা[illegible]
স্মৃতির মন্দির মোর হ'য়েছে উজাড়
শূন্য এ ভাণ্ডার
আগুলিয়া রাখি কিবা ফল?
হয়েছে যে জীবন বিকল
বন্ধুর পথের খোঁজে
নিতি ছুটি যেতে চায় সে কোন সুদূরে
তুমি শুধু ডেকে নিও
ডেকো মোরে তব সুরপুরে।

আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে তাঁদের নিয়ম-কানুনগুলি এসোসিয়েশনের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠিয়ে দেন।

প্রাপ্তি স্বীকার:—বেঙ্গল ব্রীজ এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মল্লিক মহাশয় ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের বিদায়ী সভাপতি মহাশয়ের নিকট এসোসিয়েশনের জন্য দুই শত টাকার একখানি চেক্ দান করেছেন। আমরা জানি যে, বেঙ্গল ব্রীজ এসোসিয়েশনের বরুণ কম বেশী ১১৫৲ টাকা তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। কোন হিসাবেই চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়লেও এত স্বল্প সময়ে ১১৫৲ টাকা ২০০৲ টাকায় পরিণত হয় না; তাঁর এই দানের জন্য তিনি ব্রীজ মহলের সকলেরই ধন্যবাদার্হ। তাঁর এই মহানুভবতা অনুসৃত হলে ব্রীজ এসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ জীবন স্বচ্ছ হয়ে যাবে। সম্পাদকের চিঠিখানি নিয়ে দেওয়া হল।

11th. May 1936.

I am glad to announce that Mr. Gopal Chandra Mullick, the ex-secretary of the Bengal Bride Association has kindly handed over a cheque for Rs 200/-to the President of the Indian Brigde Association. The amount represents the balance of the B. B. A's fund which was deposited with Mr. Mullick.

(Sd/-) Jotish Bose,
Hony. Secy., Indian Bridge
Association.

"অমৃতবাজার পত্রিকা" ও "খেয়ালী"

"খেয়ালী"র গতপূর্ব্ব সংখ্যায় 'অমৃতবাজার পত্রিকার' বিজ্ঞাপন বিভাগের শ্রীমান্ মনোজ বসুর বিবাহোপলক্ষে "শেফালী-কুঞ্জ" শীর্ষক কবিতার উত্তরে "ভ্রমর-গুঞ্জে" শীর্ষক যে কবিতাটী অমৃতবাজার পত্রিকার" সিটি আপিস হইতে প্রেরিত হইয়াছে তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। "বিজ্ঞাপনের বিরস ক্ষেত্রে" যে এইরূপ রসবোধ জাগ্রত হইয়াছে তাহাতে প্রীত হইয়া "খেয়ালী"র সুকবি যে কবিতাটী লিখিয়াছেন আমরা তাহাও প্রকাশ করিলাম।

—সঃ খেঃ

ভ্রমর গুঞ্জে

শ্রীপ্রফুল্লানন্দ দত্ত

অজানা সে কবি খেয়ালের বশে
লিখেছে খেয়ালী বুলি।
অপরূপ তার ভাষার চাতুরী—
মনোহর ভাবগুলি॥

ভ্রমরের মত উড়ে ফুলে ফুলে
যে বেড়ায় মধু খেয়ে,
সারাটা দুনিয়া উজাড় করে যে,
হেসে নেচে গান গেয়ে॥

অক্ষয় যার রসভাণ্ডার
নিতি-নব যার মতি
সে কিসে বুঝিল এতদিন পরে
এই পরিণয়-রীতি॥

"ফুল মালঞ্চে" মালি সে মালিনী
বুঝিতে বাকি কি আর
"শেফালি কুঞ্জ" সুরু না করিতে
প্রমাণ হয়েছে তার॥

শরৎ-শেফালি ফুটে শরতেই
পুরাতন কথা এতো
নূতন কিছুতো বলেনি এখানে
হীরামালিনীর মত॥

নাহি যাঁর ক্ষয় সবই রয় সয়
আই ঢাই প্রেমে প্রাণ
নিরসে সরস প্রেমের পরশ
পথে তরী বেয়ে যান॥

তিনি বলেছেন, "ধৈরজ ধর"
থামহে সবুর কর
এখন শরৎ ছয় মাস বাকি
ততদিন জ্বলে মর॥

নিজের বেলায় বেশ আঁটিসাঁটি
অপরকে উপদেশ
গায়ে নামাবলি মনে রসকেলি
সাজটি হয়েছে বেশ॥

অপরের কথা মরম, বেদনা
আর অকথিত বাণী
কেমনে বুঝিলে কিসে বা জানিলে
সুচতুর চূড়ামণি॥

অথবা এখন ভাল লাগে নাকো
ঘুরে চ'রে বুঝে খাওয়া
নয়না হয়ত নিত্য নতুন

বিজ্ঞাপনের বিরস ক্ষেত্রে

শ্রীঅব্যয়কুমার সরকার

বিনয় মোলাম বহুৎ সেলাম
সাবাস্ হে দাদা মোর
তোমারো আঁখিতে লাগে দেখি শেষে
কাব্য-মোহের ঘোর।

ছুঁড়েছিনু টুপি শূন্যের পানে
ভাবি নাই কোন দিক্
সহসা দেখি যে সেই টুপি তুমি
মাথায় পরেছ ঠিক।

বিজ্ঞাপনের বিরস ক্ষেত্রে
রস-মালঞ্চ-কার
মানিয়েছে ভাল এ তব নূতন
বেশ যে চমৎকার!

ক্ষয় নাহি যার কিবা ভয় তার
নাইকো ভাবনা, আহা!
তুমিই কী কম তুলনাবিহীন!
ভেবে কী দেখেছ তাহা?

গভীররাত্রে বাসের গাত্রে
প্রায় হয় পিঠোপিঠি
কথা নাহি কয়ে শুধু থাক চেয়ে
মুখে হাসি মিটিমিটি।

দাদার পন্থা ধরে ছোট ভাই
এই তো সকলে জানে
এতদিন পরে শুধাও কেন গো
আমার ঘোরার মানে?

গেল বয়ে দিন হৃদয়ের বীণ
হ'য়ে আসে সুরহারা.
সে তারের সুরে মরিবে কী ঝুরে
তোমার বিরহধারা?

চক্ষুলজ্জা দূরে রেখে দাদা
ঝাঁপাও জীবনজলে
ভয় নাই, ভাই তুলিবে সদাই
ডুবিলে অতল-তলে।

হয় কাঁচা কলি নয় পাকা ঝিঙ্গে
যদি মিলে ভাল ফুল
এক ফুলে আসে একশো ভ্রমর
কেন? বলিছি কি ভুল?
তাই কি গো কবি নিজের বেদনা
অপরের ঘাড়ে দাও
ভাব কি অপরে বুঝিতে পারে না

ষ্টেজ প্লে ও ফটো-প্লের পার্থক্য কী?

"খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আজকাল প্রায়ই দেখতে পাই যখনই কোন নাটক চিত্র-নাটকে রূপান্তরিত হয় আপনারা অভিমত দেন অমুক নাটক "মঞ্চঘেষা" বা "Stagy"। এই "মঞ্চঘেষা" কথাটীর অর্থ কি? Photoplay-এর সহিত Theatrical performance-এর পার্থক্য কোথায়? Photoplay কি হওয়া উচিত ও কিরূপ হইলে "মঞ্চঘেষা" হয় তাহা যদি বিশদভাবে আপনার কাগজে লেখেন বিশেষ উপকৃত হইব। নির্ব্বাক যুগের কথা যেন এই প্রসঙ্গে তুলিবেন না। সেই যুগে "মঞ্চঘেষা" কথাটীর অর্থ কতকটা বুঝতুম। কিন্তু এই সবাক ও three dimension-এর যুগে Theatrical performance-এর সহিত Photoplay-এর কি পার্থক্য থাকা উচিত তাই জানাইবেন।

আপনি উপরোক্ত দুইটি বিষয়েই একজন বিশেষজ্ঞ। আপনার কাছ থেকে উত্তরও নিখুঁৎ হ'বে তাই একটু কষ্ট দিলাম। নমস্কার ইতি—

আপনাদের শ্রীশ্যামানন্দ বসু
C/o M/s Aurora Film Corporation
125, Dharamtolla St., Calcutta.
৬ই মে ১৯৩৬।

[আমরা পাঠকবর্গকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য আহত কোরৃছি। সঃ সেঃ]

একলব্য

ভারতীয় দল নর্দাম্পটের সঙ্গে খেলাটি শেষ করে এখন এম-সি-সির সঙ্গে খেলেছে। এম-সি-সি প্রথমে ব্যাট করে ৩৮২ রাণ করেছে—এর মধ্যে হিউম্যান একাই একশোর বেশী রাণ করেছে। বোলারদের মধ্যে বাঙ্গালী খেলোয়াড় সুটে বাঁড়ুজ্যে বেশ ভাল বল দিয়েছেন। বাঁড়ুজ্যে ৭০ রাণ দিয়ে ৩টী উইকেট পেয়েছেন। নিশার ৬৫ রাণ দিয়ে এবং জাহাঙ্গীর খাঁ ৮১ রাণে ২টী করে উইকেট পেয়েছেন। ভারতীয় দল এরপরে ব্যাট করে সকলে আউট হয়ে মাত্র ১৮৫ রাণ করে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়েছে। মার্চ্চেণ্ট ফিল্ড করার সময়ে অ'ঙুলে আঘাত পাওয়ায় ব্যাট করেন নি এবং মহম্মদ হোসেন ব্যাট করার সময় আঘাত পেয়ে অবসর গ্রহণ করেন।

কোলকাতার ফুটবল লিগ খেলা

কোলকাতার ফুটবল লিগের প্রথম ডিভিসনে যে কটা দল এবার খেলছে তাদের সব কটা সম্বন্ধে আমাদের মতামত গেল সংখ্যাতেই বেরিয়েছে, শুধু বাকী পড়েছিল কালিঘাট সম্বন্ধে। কালিঘাট সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে এদের এবার দল যা হয়েছে তাতে লিগ খেলায় শেষ পর্য্যন্ত এরা মাঝামাঝি স্থান অধিকার করবে। এরা এবার তিনজন ভাল খেলোয়াড় হারিয়েছে—বেনীপ্রসাদ, প্রেমলাল এবং সাহাবু। এদের জায়গায় কর্ত্তৃপক্ষ খোঁজখবর করে শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে নয়—এমন কি ব্রহ্ম থেকেও খেলোয়াড় আমদানী করেছে কিন্তু তা সত্বেও এরা যে লিগে ভাল স্থান পাবে, এ রকম ভরসা করতে পারছি না।

* * *

দ্বিতীয় ডিভিসন দলগুলির মধ্যে "প্রোমোশন" পাবার জন্যে বিশেষ প্রতিযোগীতা চলছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ভবানীপুরের মধ্যে। ভবানীপুর ক্লাব এর আগে অনেকবারই দ্বিতীয় ডিভিসন খেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি ওদের, প্রথম কোন দিনই হতে পারে নি। এবার দ্বিতীয় ডিভিসন খেলাতে আজ পর্য্যন্ত ওরা যেমন খেলছে তাতে ওদের অবস্থা খুব ভাল বলেই মনে হচ্ছে। তবে গেলো সোমবার টাউন ক্লাবের সঙ্গে খেলায় ওদের হেরে যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নি। এখন থেকে ভবানীপুর ক্লাবকে আরো ভাল করে খেলতে হবে যদি তাদের ইচ্ছে থাকে আসছে বছর প্রথম ডিভিসনে খেলবার।

* * *

কোলকাতার ফুটবল খেলায় "রেফ্রীং" ইদানীং অনেক উন্নতিলাভ করলেও নিন্দা ত্রুটির ওপরে ওঠে নি। ইষ্ট বেঙ্গল বনাম ব্ল্যাকওয়াচ খেলায় গেল মঙ্গলবার ইষ্ট বেঙ্গল ব্ল্যাকওয়াচকে প্রথম যে গোল দেয় তা একেবারেই-অফ-সাইডে গোল হয়েছিল, কিন্তু রেফরী তা কেন দেখতে পেলেন না তা সাধারণের একেবারেই অবোধ্য। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করবো।

গেল হপ্তার প্রথম ডিভিসন খেলার ফলাফল নীচে দেওয়া হোল।

(বিলাসী)

আবর্ত্তন

চিত্র নির্ম্মাতা—পপুলার পিকচার্স
প্রযোজক—শ্রীযামিনী মিত্র
কাহিনী—৺নিশিকান্ত বসু রায়
পরিচালক—শ্রীসতু সেন
চিত্র-শিল্পী—মিঃ ভি-ভি-দাতে
শব্দযন্ত্রী—মিঃ গফুর
সুর-সংযোজক—সুর-সজ্ব
চিত্র-নাট্য—শ্রীহেমন্ত গুপ্ত
সম্পাদক—শ্রীচারু রায়

চরিত্র: বেণী—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মল—সুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, শরৎ—শ্রীধীরেন ঘোষ, পল্টু—শ্রীজীবন গাঙ্গুলী, জগন্নাথ—শ্রীপ্রফুল্ল দাস, বিজন—শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়, হারাধন—শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, বিজলী—কুমারী শীলা হালদার, সাহারা—শেফালিকা (পুতুল), বিজনের স্ত্রী—রেণুকা ঘোষ প্রভৃতি।

চিত্র-সরবরাহকারী—রীতেন এণ্ড কোং।

প্রথম মুক্তি—"শ্রী" শনিবার, ৯ই মে '৩৬।

"আবর্ত্তন" ভাল ছবি কী খারাপ ছবি এই নিয়ে উঠেছে মনের ভেতর তর্ক। বন্ধু-বান্ধব যারা দেখেছে সবাই বল্‌ছে 'খুব ভাল—ভীষণ চল্‌বে।' কিন্তু সমালোচকের মাপকাঠিতে 'খুব ভাল' বলতে আমার মন সরছে না। আমি বললাম "আবর্ত্তন"কে আমি চল্‌তি ছবির পর্য্যায়ে ফেল্‌তে পারি—আর ভীষণ চল্‌বে কী না চল্‌বে সে দর্শকদের রুচির ওপর নির্ভর করে এবং সে রুচির খোরাক "আবর্ত্তনে" তারা হয়ত' পাবে—তাই বলে দর্শকদের রুচি-মাফিক-ছবিকেই এই প্রগতির দিনে 'খুব ভাল' বল্‌তে আমার মন সরছে না। আমার মন্তব্য সবায়ের যেন মনঃপুত হ'ল না। সবাই বল্লে, আচ্ছা দেখা যাবে লোকে কী বলে। আমি বল্লাম লোকের মতের সঙ্গে আমার মিল না থাক্‌তেও পারে।' তারা চুপ কোরল।

"আবর্ত্তনে"-র গল্প আমার কাছে মন্দ লাগে নি। কিন্তু চিত্রনাট্য সেই পরিমানে হ'য়েছে কম-জোরালো। বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকার পর নির্ম্মল দেশে ফিরে দেখ্‌ল তার সম্পত্তির মালিক তার বাবার বন্ধু দেবীদাস বাবুর কন্যা বিজলী। বিজলীর এক প্রতিবেশী অভিভাবক তার এই অগাধ সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্যে শরৎ নামে তার দূর-সম্পর্কীয় দুশ্চরিত্র ভাগ্নের সঙ্গে তার বিয়ে দেবার মতলব আটলেন। এদিকে বিজলী-নির্ম্মলের মধ্যে প্রেমের রশ্মি দেখা দিল। নির্ম্মল-বিজলী-প্রণয়ে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে চক্রীরা চক্রজাল বিস্তার কোরল। তার ফলে সন্ন্যাসীর আবির্ভাব, মোটর দুর্ঘটনা, গুণ্ডা কর্ত্তৃক বিজলী অপহরণ, বিজলীকে সাহারা নাম্নী এক পতিতার গৃহে আবদ্ধ রাখা—সেখান থেকে সাহারার সঙ্গে চক্রান্ত কোরে শরতের বিজলী উদ্ধার এবং শরৎ-বিজলীর বিবাহ সভায় প্রতারিতা সাহারা ও পল্টু গুণ্ডার চক্রান্ত ফাঁস—পরে নির্ম্মল-বিজলীর মিলন, এই হ'চ্ছে গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। এই ঘটনাগুলোর ভেতর অনেক উত্তেজনা সৃষ্টির বস্তু ছিল; কিন্তু গল্প কী কোরে বলতে হয় তা' চিত্রনাট্যকার এখনও ধাতস্থ কোরতে পারে নি; সেইজন্যে গোড়ার দিকে গল্পের গতি চলেছে প্যাসেঞ্জারের মত আর শেষের দিকে তুফান মেলের মত। তা' ছাড়া চিত্রনাট্যকার গল্পের ভেতর যাই ঘটনা থাক্‌না কেন—সেগুলো সঙ্গতি রেখে পরের ঠিকভাবে বিন্যস্ত কোরতে পারেন নি।

"আবর্ত্তনে"র পরিচালনার ভেতর আহা মরি কিছু না থাক্‌লেও পরিচালক নির্ব্বুদ্ধিতার প'রিচয় দেন নি। এবং একটা জিনিষে সতু সেনের আমরা প্রশংসা ক'রি যে তিনি অহেতুক মজ্‌লিসী আড্ডা ও গুণ্ডার আড্ডার দৃশ্য না দেখিয়ে সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ ও-সব দৃশ্যগুলোয় cheap stunt এর সাহায্যে দর্শক ভোলাবার অনেক অনেক বস্তু ছিল।

মোট কথা ভাল 'সিনারিও' ও ভাল গল্প পেলে পরিচালনায় সতু সেন হয় ত'

বৃহস্পতিবার

মোহনবাগান—ব্ল্যাকওয়াচ	০—০
ইষ্ট বেঙ্গল—কাষ্টমস	০—০

শুক্রবার

ই, বি, আর—এ্যাটাচড সেকসন	২—০
মোহামেডান—পুলিশ	৩—১

শনিবার

ব্ল্যাকওয়াচ—ক্যালকাটা	২—০
কাষ্টমস—কালিঘাট	৪—০

সোমবার

মোহনবাগান—ই, বি, আর	১—০
ড্যালহৌসি—পুলিশ	০—০
এরিয়ান্স—এ্যাটাচড সেকসন	১—০

মঙ্গলবার

ইষ্ট বেঙ্গল—ব্ল্যাকওয়াচ	২—১
ক্যালকাটা—কাষ্টমস	৫—২
পুলিশ—কালিঘাট	২—১

ভবিষ্যতে নাম কোর্‌তে পারেন।

"আবর্ত্তনে"র আলোক-চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজ খুব উচ্চাঙ্গের না হ'লেও চলনসই বলা যায়।

"আবর্ত্তনে"র নেপথ্য-সঙ্গীত ও সুর সংযোজনার মধ্যে সুর-সভ্যের কোনও কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নি। ছবিখানার সম্পাদনা ভাল। তবে মনে হ'ল সম্পাদক মশাই কয়েক জায়গায় অতি নির্দ্দয়ভাবে কাঁচি চালিয়েছেন যার ফলে ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষিত হয় নি। সম্পাদক মশাইয়ের ছবিখানা ছোট করবার ইচ্ছে থাকলে প্রথমভাগে বিজলীর ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি দৃশ্য অনায়াসে উড়িয়ে অন্য দৃশ্যের মধ্যকার সঙ্গতি রাখতে পারতেন। এ বিষয়ে সম্পাদকের আর একটু মাথা খাটালেই ভাল হ'ত।

"আবর্ত্তনে"-র অভিনয়ের কথা লিখতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে পল্টু গুণ্ডার ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয়। এত সুন্দর স্বাভাবিক প্রাণবন্ত অভিনয় বহুদিন আমরা দেখি নি। তাঁর কথাবার্ত্তা, চালচলন, হাবভাব এখনও মনের ভিতর ভেসে উঠছে। এরপরে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণধনের অভিনয়। ধীরেন ঘোষের শরৎ খুব ভাল হয় নি—তার কারণ ঘোষমশাই ক্যামেরার ঈগল চোখ দু'টোর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে কাজ কোরতে পারেন নি। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের বেণী সবাইকে খুশী কোরবে। সুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রথমেই দুঃসাহ কোরে নায়ক না সাজলেই পারতেন। ভবিষ্যতে নায়ক সাজতে হ'লে তাঁকে অনেক সাধ্য সাধনা কোর্‌তে হবে—তা' হলে হয়ত' কৃতকার্য্য হবেন। শরৎ চাটুয্যের পরদায় অভিনয় দুরাশামাত্র। তাঁর পরদায়ও সেই মঞ্চের কসরৎ চক্ষুপীড়াদায়ক। প্রফুল্ল দাসের জগন্নাথ মন্দ নয়। কুমারী লীলা হালদারের নায়িকা আশানুরূপ হয় নি। প্রথমতঃ তিনি ঐ চরিত্রে অভিনয় কোরেছেন কাঠের পুতুলের মত দ্বিতীয়তঃ নায়িকা সাজার মত তার দৈহিক সৌন্দর্য্য নয়। পুতুলের সাহারা মঞ্চ-ঘেষা হ'য়েছে। রেণুকার ভূমিকা চলনসই। কুমারী মীরা সেনগুপ্তের বিজলীর বোন ভাল। অন্যান্য পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রগুলো অনুল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে, শতকরা নিরেনব্বই খানা বাঙলা ছবি যে দোষগুণ নিয়ে সাধারণের সামনে উপস্থিত হয় "আবর্ত্তন" সেই দোষগুণ নিয়ে পরদার ওপর ভেসে উঠেছে। সেইজন্যে মনে হয়, সব ছবির মত এখানও 'শ্রী'-তে বহুদিন ধরে চলবার সৌভাগ্যলাভ কোরবে।

নিউ থিয়েটার্স

নীতীন বসুর পরবর্ত্তী হিন্দী ও বাঙলা ছবির মহলা শেষ হ'য়েছে। আশা করা যায়, আসছে হপ্তা থেকে যথারীতি শুটিং চল্‌বে। আমরা শুনলাম, চন্দ্রাবতী দু' ভাষারই নায়িকা সাজছেন। আর বাঙলাতে দুর্গাদাস, ইন্দু মুখুয্যে ও হিন্দীতে সাইগাল, কমলেশ-কুমারী প্রভৃতি আছেন। এই ছবির গল্পে এমন একটা অভিনবত্ব ফোটানো হবে যা' ইতিপূর্ব্বে কোনও ভারতীয় ছবিতে দেখা যায় নি—এমন রিপোর্ট আমাদের কর্ণগত হ'য়েছে। নিউ থিয়েটার্স ও নীতীন বাবু সংযোগে আবার একটা নতুন কিছু যে আমরা দেখব—এ আশা কোরছি।

নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

এদের "বিজয়া-"র শুটিং আর এগুচ্ছে না। কারণ, পরিচালক দীনেশ দাশ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। দীনেশ বাবুর ওপর বিধি দেখছি বৈরী—এতদিন পরে শুটিং আরম্ভ হ'ল তা'তেও আবার ব্যগড়া। যা' হ'ক শীগ্‌গির তিনি নিরাময় হ'য়ে কাজ আরম্ভ করুন, এই আমাদের কামনা।

ইস্টার্ন ন্যাশন্যাল ফিল্ম ক্র্যাফ্ট

এদের "পূজারিণ" লাহোরে মুক্ত হ'য়ে খুব সমাদর লাভ কোরেছে। খবরে জানা গেল ছবিখানা সেখানে ভালই চল্‌বে।

কালী ফিল্মস

এদের "অন্নপূর্ণার মন্দির" আসছে মাসের প্রথমেই 'উত্তরা-'য় মুক্তিলাভ কোর্‌বে। গুজব যে ছবিখানা খুব ভাল হ'য়েছে। হবারই কথা, নিরুপমা দেবীর "অন্নপূর্ণার মন্দির"কে কেনা দেখেছে তার ওপর কালী ফিল্মসের কর্ম্মিগণের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হবার নয়।

* * * *

জ্যোতিষ মুখুয্যের "ভোট-ভণ্ডুল" শেষ হ'য়েছে। এবার তিনি হিন্দীতে তুল্‌ছেন কালী ফিল্মসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবি "তরুণী"। হিন্দীতেও ছবিখানা যে সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট কোরবে—একথা আমরা আগেই বলেছিলাম।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

দেবকী বসুর "সোনার-সংসারে" স্বর্গের দৃশ্য এখন তোলা হ'চ্ছে। এ দৃশ্যে কার্ত্তিক রায়, সত্য মুখার্জ্জি, নবদ্বীপ হালদার হাসান দীন, বিনয় গোস্বামী, নির্ম্মল বাড়ুয্যে, ভূমেন রায় প্রভৃতি অভিনয় কোর্‌ছেন।

* * *

কারদারের উর্দ্দু ছবি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

* * *

স্পেনটার পারশ্য-চিত্র "লয়লা-মজনু" শেষের দিকে এগুচ্ছে।

* * *

গেল রবিবার ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর এই ষ্টুডিও পরিদর্শন কোর্‌তে যান এবং পারশ্য-চিত্র "লায়লা-মজনু-"র শুটিং দেখেন। তারপর এই প্রতিষ্ঠানের প্রচার-সম্পাদক সুধীরেন্দ্র সান্যাল মিঃ মুরকে "বাঘী-সিপাহী" ও "সোনার-সংসারে"র বস্তীর দৃশ্য দেখানোর পর স্বত্বাধিকারী খেমকার সঙ্গে চা-পান কোরে ইনি বিদায় নেন।

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টস

এদের "রামকান্ত দালালে-"র শুটিং আর একদিন হ'লেই শেষ হবে। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের খবর দিয়েছেন যে, এই ছবির নায়ক-নায়িকা সুরমা ও ফণি বিদ্যাবিনোদ, আলোক চিত্র-শিল্পী পি, সাণ্ডেল ও তার সহকারী অজিত সেন ভাল কাজ কোরেছেন।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

এদের "বাঙ্গালী" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

ইটালী টকীজ

নিউ থিয়েটার্সের সর্ব্বজন-প্রশংসিত "ভাগ্য-চক্র" এই শনিবার থেকে এখানে দ্বিতীয় হপ্তায় পড়্‌বে। প্রথম হপ্তায় যে রকম ভীড় দেখা গেছে তা'তে মনে হয় ছবিখানা এখানে অনেকদিন চল্‌বে।

রঙমহল

এদের দু'টি শিল্পী সহসা অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় এঁদের সুধীন রাহার নতুন ধরণের পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক "সর্ব্বহারা"র উদ্বোধন হবে ৩০শে মে। প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন সতু সেন, সঙ্গীত ও সুরের জাল বুনেছেন কাজী নজরুল ইসলাম ও নৃত্য-পরিকল্পনার ভার নিয়েছেন ব্রজবল্লভ পাল। শোনা গেল, কর্ত্তৃপক্ষ এই নতুন ধরণের নাটকখানিকে সুষ্ঠু কোরতে কোনই ত্রুটি রাখছেন না।

শোক-সংবাদ

প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী গত শুক্রবার বেলা ২।৪৫ মিনিটের সময় হৃদযন্ত্রের ক্রীড়া বন্ধ হওয়ায় তাঁর বনহুগলীর বাটীতে পরলোকগামী হ'য়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫৫ বৎসর হ'য়েছিল।

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় লালমোহন গোস্বামী মহাশয় পাকুড় ষ্টেটে চাকুরী কোরতেন। চিত্তরঞ্জন গোস্বামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কিছুদিন পাকুড় ষ্টেটে এবং পরে কিছুদিন ই, আই, রেলওয়েতে চাকুরী করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি খুব রসিক ছিলেন এবং ব্যঙ্গ-কৌতুক দ্বারা সকলকে খুব হাসাতে পারতেন। ২৫ বৎসর বয়সের সময় তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন এবং হাস্য-কৌতুকাভিনয়কে তিনি জীবনের উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে তাঁহার ব্যঙ্গ-কৌতুকাভিনয়ে পরিতৃপ্ত কোরে গিয়েছেন।

তিনি কয়েকখানা চিত্রে অভিনয় কোরেছেন তার মধ্যে 'বরের বাজার'(নির্ব্বাক), 'খোকাবাবু' (নির্ব্বাক), 'সরলা' (নির্ব্বাক), 'বিদ্রোহী' (সবাক), 'শুভ ব্রাহ্মস্পর্শ' (সবাক) এবং হিন্দী 'সীতা' (সবাক) উল্লেখযোগ্য। দুই একবার তিনি রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় কোরেছেন। মেক্‌আপ'-এর সাহায্য না নিয়ে তিনি ৫২ রকমের হাসি দেখাতে পারতেন। যে সমস্ত ব্যঙ্গ-কৌতুক তিনি দেখাতেন তার মধ্যে বিগ কজকোর্ট, হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা, ন'কড়ির নাট্য বিকাশ, বলবান জামাতা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যুতে বাঙ্গলা দেশের একজন বিশিষ্ট হাস্য-রসিকের অভাব হ'ল।

মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, বিধবা স্ত্রী, ৪টী পুত্র (সুললিত, সৌরীন্দ্র, আদিত্যমোহন, সরোজমোহন), ২টী অবিবাহিতা কন্যা, ৪টী ভ্রাতা রেখে গিয়েছেন। কাশীপুর শ্মশানঘাটে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের এই দারুণ শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন কোর্‌ছি এবং ভগবানের নিকট তাঁর স্বর্গগত আত্মার কল্যাণ কামনা কোর্‌ছি।

স্বদেশের স্বাদেশিকতা

সহরে এলেই বা কি, আর ইংরাজী লেখাপড়া শিখ্‌লেই বা কি, বাঙ্গালী তার গ্রাম্য স্বভাব সহজে ছাড়তে পারে না। "If you are not with me, you must be against me"—এই গ্রাম্য দলাদলির ভাব তার মনে বাসা বেঁধে আছে। তাই মহা-মহাসমালোচকদের বেলায়ও দেখা যায় যে, তাঁদের সঙ্গে আর কারুর মতে না মিল্‌লেই তাঁরা অমনি গূঢ় কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন।

স্বদেশের মধু বসুরও সেই অবস্থা হ'য়েছে। যেহেতু বিলাসীর সঙ্গে তাঁর মত মেলেনি অমনি তিনি নিজের নামের সার্থকতা ভুলে বিষোদ্গার ক'রতে লেগে গেছেন।

বার বার কালী ফিল্মের কথা উল্লেখ করে তিনি খোঁচা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু তুলনা জিনিষটা মোটেই মুখরোচক নয় একথা মধু বাবুর মত পণ্ডিতকেও কি স্মরণ করিয়ে দিতে হ'বে। কালী ফিল্মের শব্দ-যন্ত্রী মধু শীলের শব্দ নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠত্ব কি মধুবাবুও স্বীকার করেন না? তিনি আমাদের যে ঢিলটা অন্যায়ভাবে মারতে চেষ্টা ক'রেছেন সেইটি ঘুরে গিয়ে পাটকেল হ'য়ে তার গায়েও লাগ্‌তে পারে সেটা তিনি বোধ হয় ভুলে গেছেন। অর্থাৎ বার বার কালী ফিল্মকে টেনে তাঁর খাটো করার চেষ্টার মধ্যেও কোনো গূঢ় কারণ আছে নাকি?

শুভ-বিবাহ

'চিত্রপঞ্জী' সম্পাদক শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত শনিবার প্রজাপতি-সভার সভ্যপদে ভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার দাম্পত্য জীবন সুখময় হউক।

হীরার কণ্ঠি

শ্রীবসন্ত কুমার আঢ্য

"যারা দিন আনে দিন খায়" তাদের মাঝখানে তার মত সুন্দরীর জন্মানোর মধ্যে যেন ভাগ্যবিধাতার বিদ্রূপ ছিল। জীবনের উচ্চাশা সফল করবার মত সম্পদ, সম্ভাবনা যখন নেই তখন একমাত্র আশা, সম্ভ্রান্ত ধনী কোন লোককে বিয়ে করা। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তাকে বিয়ে করতে হোল গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের এক কেরানীকে।

পোষাক তার সাদাসিদে, কারণ আড়ম্বরের মত আর্থিক স্বচ্ছলতা স্বামীর নেই। সমাজের উচ্চস্তর থেকে এ যেন তার পতন, এমনি একটা দুঃখ সব সময়ে তার মনে কাঁটার মত বিঁধতো। যে সব মেয়ে রূপের সম্ভার নিয়ে জন্মায়, বিধাতার দেওয়া ঐ একটিমাত্র সম্পদের জোরেই তারা জীবনের স্বপ্ন সফল করবার কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকে। তাই, রূপের প্রসাদে, ধনীর গৃহিনী, কন্যা এমনি সব সৌভাগ্যবতীদের দলভুক্ত হতে না পারলে তাদের মন বিক্ষোভের আগুণে নিয়ত পুড়তে থাকে।

নিজের গৃহস্থালীর অনাড়ম্বর পারিপার্শ্বিকতার মাঝে ধনীর উপভোগ্য স্বাচ্ছল্য, বিলাসিতার অভাবে মেয়েটির মনে অসন্তোষের আগুণ সব সময়ে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলতে থাকে। এমন কি ধনীগৃহের ছোট খাটো সুখ সুবিধার অভাবটাকে পর্য্যন্ত সে খুব বড় করে দেখতো। অথচ কল্পনায় সব সময়েই তার জাগতো, ব্রোঞ্জের বাতিদানে জ্বালানো বাতির উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল বড় দালান, মেঝেতে পাতা এমন পুরু কার্পেট যার উপর পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত হয়না, দেওয়াল পর্য্যন্ত প্রাচ্যের দামী রেশমী কাপড়ে ঢাকা, হুকুমে হাজির তকমা আঁটা চাকরের দল দালানের বাইরে বড় আরাম কেদারায় অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় উপবিষ্ট ; তাছাড়া বেলা পাঁচটায় অভ্যাগত বিশিষ্ট সাহিত্যিক মণ্ডলী, যাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রত্যেক ধনীর ঘরণীর জীবনের অন্যতম স্বপ্ন, তাঁদের সাদর অভ্যর্থনার জন্যে নির্দ্দিষ্ট সুসজ্জিত, নির্জ্জন কক্ষ তার মানস চক্ষের সামনে সব সময়ে ভেসে বেড়াতো। তিন দিনের ব্যবহৃত কাপড়ে ঢাকা টেবিলে, সাদাসিদে আহারে পরিতৃপ্ত স্বামীর সামনাসামনি বসে মেয়েটির মন ভেসে যেতো লক্ষ্মীর বরপুত্রদের খাবার ঘরে, যার দেওয়াল বর্ণসম্পদে অতুলনীয়, কারুশিল্পে মনোহর ভেলভেটের পর্দ্দায় মোড়া নাম না জানা খাবারে ভর্ত্তি, সুপরিবেশিত, ঝকঝকে রূপোর থালার সামনে উপবিষ্ট তরুণীর দল ; মাঝে মাঝে আলগোছে তারা মুখে দিচ্ছে গোলাপ-গন্ধী মাছ, কিম্বা গৃহপালিত চাতকের পুচ্ছ নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে কত বীরত্বের কাহিনী শুনছে ; তাদের মুখে সেই রহস্যময় হাসি যার তলায় বয়ে চলেছে ব্যথার ফল্গু।

মরু জীবনে অভ্যস্ত আরব দেশের নাবিক যেমন জলের বুক থেকে বালির বুকে খেজুরের ছায়ায় শীতল পর্ণ কুটীরে ফেরবার জন্যে নিয়ত কামনা করে, তেমনি তার মনও প্রসাধন সামগ্রী, অলঙ্কারের অভাবে নিয়ত হাহাকার করতো। অভ্যাগতদের তুষ্ট করবে, তার সৌভাগ্যে আর পাঁচজন ঈর্ষ্যান্বিত হবে, রূপের পূজারীরা স্তব স্তুতির ডালা নিয়ে পেছু পেছু ফিরবে, এ তার জীবনের চরম সুখ!

তার ছিল এক ধনী সহপাঠিনী বান্ধবী ; নিজের পক্ষে দুর্লভ, এমন কত জিনিষের অধিকারিনী সে। একবার তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে, বাড়ী ফিরে মেয়েটিকে হতাশা দুঃখ, বেদনায় অশ্রুজলে নৈশ উপাধান সিক্ত করতে হয়েছিল বলে, আজকাল সে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে না।

একদিন বৈকালে স্বামী, হাতে একখানা বড় খাম আর মুখে হাসি নিয়ে বাড়ী ফিরলো। বল্লে "দেখো, তোমার জন্যে একটা কিছু এনেছি।" তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়ে মেয়েটি একখানা কার্ড বের করলে ; তাতে ছাপা রয়েছে "১৮ই জানুয়ারী সোমবার আপিসের কর্ত্তা আর ম্যাদাম জর্জ্জেস র‍্যামপোনো, লোয়াজেল দম্পতীকে তাঁদের গৃহে সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।"

স্বামী আশা করেছিল নিমন্ত্রণ পেয়ে বৌ খুব খুশী হবে। তার বদলে বিরক্তির ভঙ্গিতে, রাগের সঙ্গে মেশানো হতাশ কণ্ঠে মেয়েটি বল্লে "এ নিয়ে আমার হবে কি?"

"কিন্তু মণি, তুমি খুশী হবে মনে করে, অনেক চেষ্টায় এ কার্ড আমি জোগাড় করেছি। কোথাও তো বড় একটা যাওনা, তা চলনা একটা মজলিসে যাওয়া যাক। সবাই চেষ্টা করছে নেমন্তন্ন পাবার, আর

আপিসের আমাদের মত কেরাণীদের বড় একটা কেউ এ নেমতন্ন পায়না। গবর্ণমেণ্টের মত মুরুব্বী উপর ওয়ালার দল সেখানে জমায়েৎ হবে।"

চরম ঘৃণার দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চেয়ে অধীর হয়ে মেয়েটি বলে উঠলো "তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবার মত আমার কি আছে ?"

পুরুষের পক্ষে যা স্বাভাবিক, এদিকটাতো বেচারী ভেবে দেখেনি ; এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলে। কাচুমাচু করে বল্লে "কিন্তু-কেন, যে পোষাকে থিয়েটারে যাও। আমার চোখে, ও পোষাকে তোমাকে তো বেশ লাগে।" হঠাৎ বৌয়ের চোখে জল দেখে হতভম্ব, বিব্রত হয়ে বেচারী থেমে গেল। চোখ থেকে গাল বেয়ে, বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

খুব নরম গলায় স্বামী বল্লে "কেন, কি হয়েছে মণি ?"

জোর করে মনকে শান্ত করে, চোখ মুছে মেয়েটি বল্লে "হয়নি কিছু। অত বড় মজলিসে যাবার মত পোষাক, গয়না কিছু নেই, তাই যাবো না। বন্ধুদের ভেতর যার বৌকে সাজাবার ক্ষমতা আছে, তাকেই দিয়ে দাও গে কার্ডখানা।"

হতাশ হয়ে স্বামী বল্লে "আচ্ছা, কত হলে তোমার নাচের মজলিসে যাবার মত পোষাক হবে ? মাঝারি গোছের, যা পরে সব জায়গায় যাওয়া চলবে, কত পড়বে কিনতে ?" কত দামের পোষাক তার, মিতব্যয়ী স্বামীটির কাছ থেকে চাইলে আৎকে উঠবে না তার একটা হিসেব মনে মনে করে, একটু ইতঃস্তত করে বল্লে "তা ঠিক বলতে পারিনে, তবে শ'চারেক ফ্রাঙ্ক হলে এক রকম গুছিয়ে নিতে পারবো।"

বন্ধুদের সঙ্গে রবিবারে, নান্‌তের এক জঙ্গলে পাখী শিকার করতে যাবার মত একটা বন্দুক কেনবার জন্যে, স্বামী ঐ টাকাটা জমিয়েছিল, তাই একটু মনঃক্ষুন্ন হোল। তবু বল্লে "বেশ, তাই দোব, তবে পোষাক যেন বেশ ভাল হয়।"

মজলিসের তারিখ এগিয়ে এলো ; তবু মেয়েটি দুঃখ, চিন্তা, অস্বস্তিতে মলিন। পোষাক তো হয়েছে। তবে আবার কি ? একদিন বৈকালে মঁসিয়ে লোয়াজেল্ বল্লে "কদিন ধরে দেখছি মুখ ভার। আবার হোল কি ?"

ম্যাদাম লোয়েজেল্ জবাব দিলে "পোষাক তো হোল, কিন্তু গয়না পরবো কি ? কি বেমানানই দেখাবে। তার চেয়ে দরকার নেই বাপু গিয়ে।"

"তা তুমি ফুল দিয়ে তো সাজতে পারো। দশ ফ্রাঙ্ক হলেই গোটা দু'তিন বড় গোলাপ হবে, আর ফুল তো আজকাল খুব চলতি।" মেয়েটির মন কিন্তু এ কথায় সায় দিলে না। বল্লে "কত গয়না পরে বড় লোকের বাড়ীর সব আসবে, তার মাঝখানে ফুলে আমাকে যা মানাবে !"

"কিন্তু তুমি তো আচ্ছা বোকা ! তোমার বন্ধু ম্যাদাম ফরেস্‌তিয়ের দু' একখানা জড়োয়া গয়না একবার চেয়ে নিলেই তো পারো। তোমার সঙ্গে তো খুব জানা শুনো, বেশ হয় না বলতে পারবেন না।"

মেয়েটি আনন্দে চিৎকার করে উঠলো "ঠিক বলেছে তো ! আমার কিন্তু কথাটা মনে হয়নি।"

পরদিনই ম্যাদাম লোয়াজেল্ বন্ধুর কাছে গিয়ে বিপদের কথাটা জানালে। পাশের ঘর থেকে বড় একটা গয়নার বাক্সো এনে, খুলে দিয়ে ম্যাদাম ফরেস্‌তিয়ে বল্লেন "আপনার যা খুশী বেছে নিন।"

বাক্সোটায় ছিল বালা, মুক্তোর মালা, সোণা, জড়োয়ার অনেক দামী গয়না। মাদাম লোয়াজেল্ দু'-একখানা পরে আরসীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সেগুলো পরবে কিনা মনস্থির করতে না পেরে বলে ফেল্লে "আর কোন গয়না নেই ?"

বন্ধু জবাব দিলেন "হ্যাঁ আছে বৈকি। এগুলো দেখুন, যদি এর ভেতর থেকে কিছু পছন্দ হয়।" হঠাৎ কালো মখমলের কৌটা খুলে বের করলেন এক ছড়া হার ; ম্যাদাম লোয়াজেল্ এর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ঝলমলিয়ে উঠলো হীরের দ্যুতি। অপূর্ব সেই হীরের কণ্ঠি গলায় পরবার অদম্য আগ্রহে ম্যাদাম লোয়াজেল্‌এর বুক দুলতে

…গেলো ! কম্পিত হাতে হীরের কণ্ঠি গলায় তুলে নিয়ে সাদাসিধে পোষাকের উপর গলায় পরলে। আরসীর বুকে নিজের যে ছায়াপাত হোল তাতে বিস্মিত, মূক পাথরের মূর্ত্তির মত ম্যাদাম লোয়াজেল্ বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পাছে অমূল্য এই হীরক হার ম্যাদাম ফরেস্তিয়ে দিতে রাজী না হন সেই সঙ্কোচে ইতঃস্তত করে বল্লে "আপনি এই হার ছড়াটি যদি দেন !"

"আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে নেবেন বৈকি। এতে আর আপত্তি কি ?"

আশাতিরিক্ত উৎফুল্ল হয়ে আবেগের সঙ্গে বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে, অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে হার ছড়া নিয়ে ম্যাদাম লোয়াজেল্ বাড়ী ফিরলো।

নাচের মজলিসে ম্যাদাম লোয়াজেল্ সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মুখে আনন্দের দীপ্তি, তার উপর দেহ সৌষ্ঠব, বেশ অলঙ্কারের পারিপাট্যে ম্যাদাম লোয়াজেল্ হোল সবাইকার আলোচনার বিষয়। এমন কি সমাগত বিশিষ্ট কয়েকটি ভদ্রলোক তার সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে জানবার চেষ্টা করতে লাগলেন "উনি কে ?"

উচ্চপদস্থ কয়েকটি কর্ম্মচারী তাকে নাচের সঙ্গিনী করবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন। মঁসিয়ে লোয়াজেল্এর খোদ মনিব র‍্যাম্‌পোলো পর্য্যন্ত তার সমর্থন করলেন। নিজের সাফল্য জয়ের নেশায় মাতাল হয়ে মেয়েটি আপনার মনে নাচতে লাগলো। চারধার থেকে প্রশংসার মৃদু গুঞ্জনের ফুরফুরে বাতাসে, মেয়েটির মন ভেসে গেল সুখের মেঘলোকে। এর চেয়ে বড় কামনার জিনিষ মেয়েদের আর কি থাকতে পারে ? ভোর চারটেয় নাচের মজলিস শেষ হোল।

মাঝ রাতেই নাচের মজলিস থেকে সরে ছোট ঘরে গিয়ে, মসিয়ে লোয়াজেল্ শ্রান্ত হয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিল। তারই মত দু'চার জন ভদ্রলোক-পত্নীদেরও প্রতীক্ষায় সেই ঘরে ঠাঁই নিয়েছিলেন।

সাদাসিধে শালখানা বৌয়ের গায়ে চড়িয়ে দিয়ে কেরাণী যুবকটি যাবার জন্যে তৈরী হোল। নাচের পোষাকের সঙ্গে বেমানান শালখানা, রূপে পরাজিত অথচ বহুমূল্য হার পরিহিত মেয়েদের সামনে থেকে আড়াল করবার জন্যে, ম্যাদাম লোয়াজেল্ খুব সন্তর্পণে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো।

স্বামী বল্লে "দাঁড়াও, একখানা গাড়ী ডাকি, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

স্বামীর কথায় কান না দিয়ে, মেয়েটি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেবে, অন্য মেয়েদের নজর এড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল। চলতি গাড়ী ভাড়া করবার দু'চার বার বৃথা চেষ্টা করে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে অগত্যা তারা—সীন নদীর দিকে হাঁটতে লাগলো। জাহাজ ঘাটের কাছে দু'চারখানা ছ্যাকরা গাড়ী, রাত-চড়া শিকারী পাখীর মত ঘুরতে ফিরতে

দেখা গেল। দিনের অনাহারের ক্ষুধা তাদের ভেতর দিয়ে, বহুদিনের কবরস্থ মৃতদেহের কঙ্কালের মত আত্ম প্রকাশ করছিল। এমনি একখানা গাড়ী শেষ পর্য্যন্ত লোয়াজেল্ দম্পতীকে রু গু মারতরে তাদের ছোট বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিয়ে, ছোঁ মেরে ভাড়াটা তুলে নিয়ে, নতুন শিকারের খোঁজে অন্ধকারের বুকে মিশে গেল। দুঃখিত মনে, শ্লথ পদে মেয়েটি ঢুকলো, নিজের বাড়ীর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে। তার জীবনের মধুরতম রাত্রি, অন্ধকারের বুকে বিদ্যুৎরেখার মত ক্ষণিক আলোক পাত করে, অলীক স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। মঁসিয়ে লোয়াজেল্ এখন ভাবছিল, কাল বেলা দশটায় তাকে বসতে হবে আপিসের টুলে।

নিজের রূপের অপূর্ব্ব বিকাশ শেষবার দেখবার জন্যে ম্যাদাম লোয়াজেল্ গিয়ে দাঁড়ালো আরসীর সামনে; তখুনি শোনা গেল তার বিস্মিত কণ্ঠস্বর "হীরের হার কোথায় গেল?"

অতর্কিতে এই চিৎকার, তীরের মত অর্দ্ধ জাগ্রত স্বামীর কানে গিয়ে বিঁধলো।

"কি বল্লে?"

নিজের ভীত, চকিত দৃষ্টি স্বামীর বিস্মিত দৃষ্টির উপর নিবদ্ধ করে মেয়েটি বল্লে "ম্যাদাম ফরেস্তিয়ের হীরের হার হারিয়ে ফেলেছি।"

বিছানা ছেড়ে উঠে স্বামী বল্লে "হারালে?—কি করে? এতো সম্ভব নয়!"

তাড়াতাড়ি দুজনে পোষাকের ভাঁজ, আঙরাখা, পকেট সব হাঁতড়াতে লাগলো, কিন্তু হার পাওয়া গেল না।

"নাচের মজলিস থেকে যখন বেরিয়েছিলে তখনো গলায় ছিল তো।"

"হ্যাঁ, বারান্দায় পর্য্যন্ত গলায় হাত দিয়ে দেখেছি, তখনো ছিল।"

"কিন্তু পথে পড়লে তো শব্দ পেতুম। তাহলে নিশ্চয় গাড়ীতে রয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, খুব সম্ভব; গাড়ীর নম্বর দেখেছিলে কি।"

"না; তুমিও বোধ হয় দেখ নি।"

"না!"

পাথরের অনড় মুর্ত্তির মত; খানিকক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইলো। শেষে স্বামী তাড়াতাড়ি পোষাক বদলে নিয়ে বল্লে "যে পথটুকু হেঁটেছি, খুঁজে দেখিগে, যদি সেখানে কোথাও পড়ে থাকে।" সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি বসে পড়লো একখানা কেদারায়। যে বিপদের কালো মেঘ হঠাৎ কোথা থেকে এসে তাদের জীবনের আকাশ আঁধার করে ফেল্লে, তারই পানে ভীত চোখে চেয়ে মেয়েটি চুপ করে বসে রইল। এমন কি উঠে নাচের জমকালো পোষাটা পর্য্যন্ত ছাড়বার ক্ষমতা বা ইচ্ছা পর্য্যন্ত রইলো না।

ভোর সাতটায় স্বামী ফিরলো; হারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। খবরটা পুলিশের কর্ত্তাকে জানিয়ে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা আর পুরস্কার ঘোষণা করে, যত ছ্যাকরা গাড়ীর আড্ডা ঘুরে, হতাশ, অবসন্ন হয়ে সে বাড়ী ফিরলো। সারাদিন মেয়েটির কাটলো, থমথমে বাড়ীর আবহাওয়ায়, নিশ্চল অবস্থায়। বৈকালে রুক্ষ, মলিন মুর্ত্তি নিয়ে স্বামী বাড়ী ফিরলো; তখনো হারের কোন খবর নেই।

"তোমার বন্ধুকে লিখে দাও, হারের টিপকল ভেঙ্গে গেছে, সারিয়ে দিতে দু' চারদিন দেরী হবে; এর মধ্যে যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়।"

হপ্তাখানেক যখন কাটলো, তখন দুজনের মন হতাশায় অবসন্ন হয়ে পড়লো। এই সাতদিনে স্বামীর বয়েস যেন পাঁচ বছর বেড়ে গেছে। শেষকালে সে বল্লে "দেখা যাক্ খুঁজে-পেতে যদি না মেলে, তাহলে কিনে দিতে হবে।"

খালি কৌটোটা ছিল বাড়ীতে। তার ভেতর যে দোকানের ছাপ ছিল, সেখানে তারা গেল। খাতাপত্তর উল্টে দোকানদার বল্লে যে হার সে বেচেনি; শুধু কৌটোটা ম্যাদাম তার কাছ থেকে কিনেছিলেন।

তখন থেকে ম্যাদাম ফরেস্তিয়ের হারের মত হারের খোঁজে, তারা সহরের যত গয়নার দোকানে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। হতাশায় মন, ক্লান্তিতে দেহ ভেঙ্গে পড়বার মত হোল। শেষকালে প্যালে রয়্যালের ছোট্ট একটা দোকানে, অনেকটা হারাণো হারের মত হার একগাছা মিললো। কম্পিত বুকে, শুষ্ককণ্ঠে তারা দাম কত পড়বে, জানতে চাইলে। দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক, তবে ছত্রিশ হাজার পেলেই দিতে পারে, আর ফেব্রুয়ারীর ভেতর যদি ফেরৎ

দেয় তাহলে ছ' হাজার ফ্রাঙ্ক বাদ দিয়ে চৌত্রিশ হাজারে কিনে নেবে, কথা দিলে। পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে মসিয়ে লোয়াজেল্ পেয়েছিল আঠারো হাজার ফ্রাঙ্ক; বাকীটা ধার-দোর করে কোন রকমে জোগাড় করলে। কারো কাছ থেকে হাজার, কারো কাছ থেকে পাচশো এমনি করে হ্যাণ্ডনোট কেটে, মহাজনদের উঁচু হারে সুদ দিয়ে, নিজের সুনাম, ভবিষ্যৎ সব পথের ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে, সর্ব্বস্বান্ত মসিয়ে লোয়াজেল, একদিন দোকানের খাতাঞ্চির টেবিলে ছত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক রাখলে।

হার ফেরৎ পেয়ে ম্যাদাম ফরেস্তিয়ে খালি ভারী গলায় বল্লেন "হার ছড়া তাড়াতাড়ি ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল; যদি আমার দরকার পড়তো?" ম্যাদাম লোয়াজেল্ যা ভয় করেছিল, ম্যাদাম ফরেস্তিয়ে আর কৌটো খুলে দেখলেন না। ঠিক আগেকার হারের মত হার তো পাওয়া যায় নি; দেখলে কি ভাবতেন, হয়তো তাকে চোর বলে ঠাওরাতেন।

প্রকৃত দারিদ্র্য যে কি জিনিষ, এইবার মেয়েটি তার স্বাদ পেলে। প্রকৃত সহ-ধর্ম্মিণীর মত স্বামীর দুঃখ, ঋণের ভার বহন করবার জন্যে সাহসে বুক বেঁধে দাঁড়ালো। ভারী ঋণের বোঝা নামাবার জন্যে তাদের চেষ্টার অন্ত রইলো না। একটি মাত্র দাসীকে জবাব দিয়ে, আগেকার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে সস্তায় অন্য বাড়ীর ছাদের তলায় নীচু কুঠরী ভাড়া নিলে। রান্নাবাড়া, বাড়ীর সমস্ত কাজের ভার সে নিজের হাতে তুলে নিলে; ময়লা কাপড় নিজে কেচে ঘরে শুকিয়ে নিতে লাগলো। বাড়ীর যত আবর্জ্জনা নিজে রাস্তায় ফেলে দিয়ে, ফেরবার সময় জল নিয়ে আসতো। বালতি ভরা জল তুলতে গিয়ে, কতবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তাকে দম নিতে হোত। নিজে মুদির দোকানে, বাজারে, কসাইখানায় গিয়ে দরদস্তুর করে জিনিষ পত্র কিনে, সামান্য আয়ের যতটা সম্ভব বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলো। বরফের মত সাদা নরম হাত দুখানা তার লাল টকটকে আর কর্ক্কশ হয়ে উঠলো। প্রত্যেক মাসে কতক ধার তার মেটাতে, আবার নতুন দেনা কিছু কিছু করতে বাধ্য হোত। আফিসের কাজের পর স্বামী বৈকালে যে সময়টুকু পেতো, সেই সময়টুকু বইয়ের দোকানে কাজ করে আর পাতা পেছু পাঁচ সেণ্ট করে পাবার জন্যে প্রায়

সারারাত বই নকল করার কাজে ব্যস্ত থাকতো। এমনি কঠোর পরিশ্রমে দশ বছর কাটলো।

ম্যাদাম লোয়াজেল্-এর শরীরে পূর্ব্ব লাবণ্যের চিহ্নমাত্র নেই। সামান্য গরীবের ঘরের গৃহিণীর মত দেহ তখন তার দোহারা, সবল। মাথা উস্কোখুস্কো, পরণে খাটো ঘাগড়া, হাত দুখানা লাল; দরজায় দাঁড়িয়ে গলাবাজী করে খোসগল্প করতে তখন দরিদ্র-পল্লীতেও তার জুড়ী মেলা দায়।

তবু দুপুরে স্বামী যখন আফিসে, তখন নিস্তব্ধ বাড়ীর খোলা জানলার ধারে বসে বসে, তার মনে পড়ে সেই নাচের মজলিসের কথা; যেদিন তার রূপ, পোষাক, অলঙ্কারের পারিপাট্যে অভিজাত সমাজেরও চমক লেগেছিল। হীরের হার না হারালে আজ সমাজের কোন স্তরে তার স্থান হোত, কে জানে? আকস্মিক বিপদে ভরা, পরিবর্ত্তন-শীল মানুষের জীবন সত্যিই বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি। কত সহজে মানুষের জীবন ভাঙে, গড়ে!

হপ্তায় দু'দিনের পরিশ্রম থেকে দেহ, আর চিন্তায় ভারাক্রান্ত মনকে হালকা করবার জন্যে, একদিন রবিবার ম্যাদাম লোয়াজেল্ চলেছিল সাজে লিজের ছায়াশীতল পথের ধার ধরে। হঠাৎ দেখলে সম্ভ্রান্ত একজন মহিলা একটি ছেলের হাত ধরে সেই দিকেই আসছেন। মহিলাটি ম্যাদাম ফরেস্তিয়ে ছাড়া আর কেউ নন। আজও তাঁর রূপ তেমনি সমলিন, দেহ তাঁর যৌবনের লাবণ্যে ভরা। ম্যাদাম লোয়াজেল্ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, মন তার চঞ্চল হয়ে উঠলো। পূর্ব্ব পরিচিতার সঙ্গে সে কথা বলবে। নিশ্চয় হীরার হার যখন দেওয়া হয়ে গেছে এখন সব কথা খুলে বলতে আজ আর বাধাটা কি? মনস্থির করে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে ম্যাদাম লোয়াজেল বল্লে "শুভদিন জেন্।" ম্যাদাম ফরেস্তিয়ে একটু অবাক হয়ে লোয়াজেলের পানে চেয়ে ভাবলেন, সমাজের নীচু স্তরের এই মেয়ে মানুষটা তাঁকে পরিচিতের মত সম্বোধন করে কেন?

"দেখ—হাঁ ম্যাদাম—আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন—"

"না, আমি মাতিলদ্য লোয়াজেল।"

"আহা বেচারী মাতিলদ্য! আপনাকে যে আর চেনবার উপায় নেই।"

"হাঁ, আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পর অনেক দুঃখ, কষ্ট পেয়েছি আর সে সবের মূল আপনি।"

"আমি? কি করে?"

"মনে পড়ে, মন্ত্রীর বাড়ী নাচে যাবার জন্যে যে হীরের হার আপনি আমায় ধার দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তারপর?"

"হার আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম।"

"হারিয়ে ফেলেছিলেন? কিন্তু হার তো আপনি আমাকে ফেরৎ দিয়েছিলেন।"

তা দিয়েছিলুম। কিন্তু সে আপনার হার নয়। যা আপনার হাতে দিয়েছিলুম তা অন্য একগাছা। সেটা আমাকে কিনে দিতে হয়েছিল আর দশ বছর ধরে তারই ধার শোধ করতে গিয়ে যে কঠোর পরিশ্রম, দুঃখ সইতে হয়েছে তারই ছাপ রয়ে গেছে দেহে, মনে। আপনি বোধ হয় জানেন আমাদের এমন বিশেষ কিছু ছিলনা, যা দিয়ে ও রকম হার কিনে দিতে পারি। তা যাক্, ঋণ শোধ করতে পেরেছি এই আমাদের পরম সান্ত্বনা, সুখ।"

"তাহলে আমাকে দিয়েছিলেন, নতুন এক গাছা কিনে?"

"হ্যাঁ, তা বোধ হয় আপনি ধরতে পারেননি। অনেক খুঁজে পেতে, অনেক দাম দিয়ে, তবে অনেকটা আপনার হারের মত হার এক গাছা মিলেছিল।" ম্যাদাম লোয়াজেল্ এর মুখে একটা আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠলো।

বন্ধুর দুঃখে ম্যাদাম ফরেস্তিয়ের মন গলে গেল। তার রুক্ষ কঠিন হাত খান নিজের কোমল সুগোল হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। কণ্ঠস্বর সজল, কোমল হয়ে উঠলো বল্লেন "আহা, বেচারী মাতিলদ্য! কিন্তু আমার সেটা ছিল ঝুটো হীরের! তার দাম পাঁচ শো ফ্রাঙ্কের বেশী ছিলনা।"

* মোপাসাঁ থেকে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর "মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলা" প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও সমর্থন

"সমাজের উপকারের জন্যই দরদী কবি প্রভাতকিরণ এই ভয়ঙ্কর চিত্র এঁকেছেন"—

শ্রীমতী প্রতিমা রায়

"এই প্রবন্ধটীতে সেই নারীদের বিরুদ্ধে সত্যই নিন্দাবাদ করা হইয়াছে"—

শ্রীভবেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

"প্রভাতবাবু যা বলেছেন তা অত্যন্ত খাঁটি এবং সত্য কথা।" প্রবন্ধটি বিক্ষোভের কারণ নয়—

শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
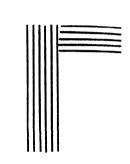
"সন্তানের বুকে চিরপরাধীনা অয়ি নিখিলের নারী
কত দুর্ব্বলা ভাবো তুমি একবার
কস্তুরীর তুমি ক্লান্ত-হৃদয়ে স্নিগ্ধ-পিপাসা বারি
এইটুকু শুধু আছে তব অধিকার।"—

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

নারীধর্ম্মে প্রভাতকিরণ

শ্রীপ্রতিমা রায়

সম্প্রতি নানা পত্রিকা মারফৎ দেখতে পাচ্ছি যে, তালতলা কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত জনপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ 'নারীধর্ম্ম' নিয়ে অনেকে খুব আলোচনায় মেতে উঠেছেন। একপক্ষ প্রভাতবাবুকে সমর্থন করেছেন, ও আর একপক্ষ (যদিও মুষ্টিমেয়) তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। নানা যুক্তি-তর্ক-সমস্যা সমাধান এসে ভীড় ক'রে অকারণে প্রবন্ধের আসল রূপটিকে পালটে দিচ্ছে।—

প্রভাতবাবুর কথা অতি সহজ, সরল কোন বৃথা আড়ম্বর নেই। নারীধর্ম্ম আজ প্রগতির (!) ঠেলায় কতদূর পালিত হচ্ছে তার কি পরিণাম হচ্ছে—তারই মন্দ দিকের সরস একটি আলোচনা। এতে এতো ক্ষেপে

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবন্ধের সমালোচনা

শ্রীভবেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সমস্যাটী নূতন না হইলেও, বর্ত্তমান নারী-জাগরণের দিনে এই জাতীয় আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধটীর সমালোচনা আহ্বান করিয়াছেন।

নারী বলিতে আজ পর্য্যন্ত যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের বুঝি। এই প্রবন্ধটীতে সেই নারীদের বিরুদ্ধে সত্যই নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। নারীদের বিরুদ্ধে প্রভাত বাবুর প্রথম অভিযোগ—গত বৎসর এই সমিতিতে পুরুষ দেখিয়া "কয়েকজন" বিসদৃশ কটাক্ষপাত করেন। এ ব্যাপারটা রুচিগত ও অভ্যাস-গত। এদেশে নারীরা বহুদিন ধরিয়া পুরুষের সংসর্গ-বর্জ্জিত। পুরুষ হইতে দূরে থাকার অভ্যাসটা স্ত্রী হইয়া, সমগ্র সমাজের শুভা-শুভের আলোচনা হয় এমন সভায়ও, বর্জ্জন

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

নারীধর্ম্ম

শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর 'নারীধর্ম্ম' শীর্ষ প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে দেখলুম এবং এই প্রসঙ্গে আমার যা মনে হ'চ্ছে তা কিছু ব'লতে ইচ্ছে করি।

প্রভাতবাবু যা' ব'লেছেন তা অত্য খাঁটি এবং সত্যি কথা। নারীর শত্রু নারীই, একটু ভেবে দেখলেই একথা নার নিজেও অস্বীকার ক'রতে পারবেন না এবং তাঁদের আরও স্বীকার ক'রতে হবে এ প্রবন্ধটি শুধু বিক্ষোভ সৃষ্টি করবা উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হয় নি, যা'তে এ চিরন্তনী সমস্যার মূলোচ্ছেদ ক'রতে নারী জাতি সচেষ্ট হ'ন তাই এর উদ্দেশ্য। প্রব হয়তো গায়ে লাগবার মতো অনে জিনিসই আছে, কিন্তু সেটা তো ব্যক্তিগ নয়, সেটা সমষ্টির উদ্দেশ্য। এটা ব্যক্তিগত

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

নারীধর্ম্মে প্রভাতকিরণ

শ্রীপ্রতিমা রায়

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

ওদের কি আছে বুঝতে পাচ্ছি না! কিন্তু সমালোচক ধুরন্ধরদের চুলচেরা বিচারে অসলে তার যে খেই হারিয়ে যাচ্ছে!

গত সংখ্যার খেয়ালীতে 'শ্রীশান্তিরাম উপাধ্যায়' নামে জনৈক শক্তিশালী তরুণ লেখক বিরুদ্ধভাবে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—সাহিত্যিক মহলে জোর গলায় কিছু বলবার অধিকারিণী নই—তবুও এই শক্তিশালী সমালোচকটীর কয়েকটী যুক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করবো!

সমালোচকের আক্রোশ—প্রভাতবাবু নারী না হয়ে কেন নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করতে গেলেন? যেহেতু বাংলার পুরুষের নারী সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতামত দেবার জ্ঞান নেই—বাতুলের প্রলাপ!

শরৎচন্দ্র নারী চরিত্র-চিত্রনে দক্ষ—নারীমনের psychology, তাঁর লেখনীতে পরিস্ফুট—কেমন করে? শরৎচন্দ্র বাঙালী, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী (এবং পুরুষ)। বাংলা সাহিত্যে শুধু নারীই কি নারীর মন বিশ্লেষণ অধিকারিনী?—প্রভাতকিরণ বাবু তাঁর প্রবন্ধে এঁকেছেন, আধুনিক নারীমন কি রকম মন্দ দিকে ছুটে চলেছে—যে নারীর রূপ শুধু বান্ধবী নয়—সহধর্ম্মিনী নয়—মাতৃরূপে যার বিকাশ—সেই নারীর মন আজ কুশিক্ষায়—বিলাসে, মত্ততায়, অহঙ্কারে, বাচালতায়—কেমন করে ধ্বংসের পথে ছুটে চলেছে শিক্ষার আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ কেমন করে আজ নারীসমাজ হতে অন্তর্হিত হচ্ছে—তারই এক সুন্দর সাবধান বাণী তিনি নারীসমাজকে শুনিয়েছেন—একে সাময়িক উত্তেজনা—ভেংচি কাটা ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করা উপাধ্যায় প্রভৃথ

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবন্ধের সমালোচনা

শ্রীভবেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

করা হয়ত কোন নারীর পক্ষে অসম্ভব। একথাটা প্রভাতবাবুর মত লোকের বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না বুঝিয়া চটিয়াছেন। এবং সেই চটার ফলে এমন একটী প্রবন্ধ প্রকাশও করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ—নারীর পরম শত্রু নারী নিজে। ইহা অস্বাভাবিক নহে। আমাদের দেশে প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় নারীর সহিত নারীর ঘনিষ্ঠতাই সমধিক। এইজন্য দ্বন্দ্বও তত বেশী। নহিলে যে সময়টীতে নারীর সহিত পুরুষদের বেশী ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে, ঠিক সেই সময়টীতেই পুরুষরা নারীর বিরুদ্ধে আলোচনা করিতে গেল কেন? অন্যপক্ষে, যখন জাগরণ আরম্ভ হয় তখন সমগ্র শরীর একসঙ্গে চঞ্চল হইয়া উঠিলেও সকল অঙ্গ তৎক্ষণাৎ সে জাগরণকে স্বীকার করিয়া লয় না। কোন সমাজের জাগরণের বেলায়ও সমাজের সমস্ত অংশ একসঙ্গে সেই জাগরণকে স্বীকার করিয়া আসন্ন রূঢ়তাকে বরণ করিতে চাহে না। তাই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল প্রকারের আন্দোলনের প্রধান শত্রু হয় সেই দেশের লোক—মঙ্গল যাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। আমাদের দেশে নারীরা যদি নারীদের দ্বারা পীড়িত হয়—নারী প্রগতি যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে পুরুষদের টীপ্পনী কাটীয়া কি লাভ হইবে। সত্য বটে পুরুষরা নারীর সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু একথাও ত' মিথ্যা নহে যে পুরুষই একদিন নারীকে Beast of Burden হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে এবং সেই নিপীড়িত নারীদের যে কিঞ্চিৎ ভাল ব্যবহার দিয়াছে শুধু প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। অন্য পক্ষে পুরুষ নারীকে যতটুকু

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

নারীধর্ম্ম

শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

ভাবে গ্রহণ ক'রতে গেলে বিশেষ বুদ্ধির পরিচায়ক হবে না।

নারী শুধু নারীর শত্রু কেন, জগতের প্রায় সব দুষ্কর্ম্মের মূলেই নারী আছে। এর সাক্ষী ইতিহাস, এর সাক্ষী প্যারী সহরের সেই প্রসিদ্ধ পুলিশ কমিশনার, যিনি দুষ্কর্ম্মের রিপোর্ট পেয়েই মন্তব্য দিতেন, Cherchez la femme, "মূলে কে নারী জড়িত আছে খোঁজ নাও;" এর সাক্ষী নারী নিজে, যাদের মধ্যে একজন বিদুষী ব'লেছেন "I must accept here as in all relations between the sexes, the validity of the man's plea that rings—yea, and will continue to ring—through the centuries: the Woman Tempted Me."

বাইরে তো এই। ঘরেও শাশুড়ী-বধূ, বধূ-ননদিনী, সতীনে-সতীনে, দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কেউ ব'লবেন, সব ক্ষেত্রেই কি তাই? কিন্তু তা'র উত্তর Exception proves the rule; যখনই ব্যতিক্রম আছে তখনই সাধারণ নিয়মটা প্রমাণ হ'য়ে যাচ্ছে না?

অতি-আধুনিকারা ও তাঁদের শুভানুধ্যায়ীরা (?) কেন চঞ্চল হ'য়েছেন বোঝা যাচ্ছে না। সাধারণ নিয়মটা মানতেই হবে; এবং নারী যদি সত্যিই জেগে থাকেন তো তাঁরা এই নিয়মটাকে এমনভাবে উল্টে দেবেন যা'তে এখনকার ব্যতিক্রমটাই নিয়ম হ'য়ে দাঁড়ায়। সভায় পঠিত প্রবন্ধ কেবল যুক্তিতর্কের দ্বারাই খণ্ডিত করা যায়, প্রতিবাদ তো শুধুই মৌখিক আপত্তি নয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা নাকি ব'লচেন যে কথার সুরে আপত্তি

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

নারীধর্ম্মে প্রভাতকিরণ

শ্রীপ্রতিমা রায়

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

সমালোচকদেরই সাজে—কিন্তু এই নারী রূপের আজ প্রকাশ পাচ্ছে ক্রমেই ব্যাপকভাবে—আমাদের সামাজিক জীবনে—তার যথেষ্ট উদাহরণ তো প্রতিদিনই সংবাদ পত্রের মারফৎ আমরা পাচ্ছি—এ কথা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে? সমাজের উপকারের জন্যেই দরদী কবি প্রভাতকিরণ এই ভয়ঙ্কর চিত্র একেছেন তিনি সত্য কথাই বলেছেন—যদিচ অপ্রিয়! এটা সাময়িক উত্তেজনার স্ফূর্ত্তি হতে পারে—হয়ত এর কোন 'স্থায়ী' সাহিত্যিক মূল্যও না থাকতে পারে—কিন্তু সামাজিক জীবনের এটা একটা মস্ত বড় সমস্যা—সুতরাং 'শিশুর ভেংচিকাটা' 'অতি তরল বলে মুরুব্বি চালে উপেক্ষা করা চলে না। চললে বোধ হয় শক্তিশালী সমালোচক পুরুষ হয়ে নারীর পক্ষে ওকালতি করতে আসতেন না!—(যেহেতু সমালোচক মহাশয় পুরুষ ব'লে প্রভাতবাবুকে নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখায় ব্যঙ্গ ক'রেছেন)।

সমালোচক প্রবর আরও দোষ ধ'রেছেন প্রভাতবাবুর প্রবন্ধে—যে, 'কোনও সমাধানই তিনি করেন নি'—'প্রবন্ধটি নিছক গালাগালি' 'কেবল বুকনি দিয়ে মনের ঝাল ঝাড়া'—ইত্যাদি—ইত্যাদি!

আমরা সবিনয়ে শান্তিরাম বাবুকে অনুরোধ জানাই—শান্ত মস্তিষ্কে তিনি প্রভাতবাবুর প্রবন্ধটি আর একবার পড়ুন!

প্রভাতবাবুর মূল বক্তব্য হচ্ছে—আজকের অধঃপতিত সমাজের নারী প্রগতি মন্দ দিকে এগিয়ে চলেছে—আলেয়ার আলোর পানে ছুটে চ'লেছে—তাই সমাজে ব্যাভিচার আজ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। পুরুষ ও নারী দুইই হ'য়ে পড়েছে বিলাসের দাস—প্রকৃত

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবন্ধের সমালোচনা

শ্রীভবেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

অধিকার দিয়াছে তাহা নারীর জন্য নহে,—তাহার নিজের সুবিধা ও তৃপ্তির জন্য—আপনার স্বার্থরক্ষার জন্য। পুরুষ বুঝিল—নারীকে কর্ম্মঠ হইবার, বিদুষী ও বুদ্ধিমতী হইবার, আর্থিক স্বাধীনতার সুযোগ দিলে তাহারই মঙ্গল—পরিশ্রমের লাঘব, অন্তরের তৃপ্তি ও স্বোপার্জ্জন উপভোগের সুবিধা হইবে। তবেই ত পুরুষ বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে নারীকে একটু সামান্য স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে!

তৃতীয় অভিযোগ—এদেশে নাকি সচরাচর তিন শ্রেণীর মেয়ে দেখা যায়। কিন্তু অন্য দেশেও এই তিন শ্রেণীর মেয়ে আছে;—ইহা কোন দেশেই ধনতন্ত্রের নিয়ম হিসাবে বর্জ্জন করিতে পারিবে না।

বলা হইয়াছে—বড় লোকের মেয়েরা অলস, বিলাসী, পরনির্ভরশীল অকর্ম্মণ্য। ইহাতে মেয়েদের দোষ কি? পুরুষ পিতাই ধনী এবং তিনি চান বা ভালবাসেন যে তাঁর কন্যা ওইভাবের হোক। বড়লোকের ছেলেরাও ত উহাপেক্ষা অধিক দোষে দোষী অতএব দোষটী ধনের ও ধনী পিতার। সে জন্য মেয়েদের দোষ দিলে একতরফা ও অন্যায় বিচার হইবে না কি?

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা আনন্দের। কোন জাতীর জীবন আছে কিনা তাহা অনেক পরিমাণে সমাজের এই কাজগুলির উপর নির্ভর করে। আবার লেখকই অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিয়াছেন যে, সস্তায় বিবাহ দেওয়ার জন্য মেয়েদের ওই সুযোগগুলি পাওয়ান হয়। ইহার মধ্যেও পুরুষ পিতার ও পুরুষ স্বামীর পরিপূর্ণ ইচ্ছা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহারই

শেষাংশ ২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

নারীধর্ম্ম

শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

করবার মত কিছু ছিলো। রোগ প্রবল হ'লে ওষুধ সাধারণতঃ তেতো হ'য়েই থাকে; নিরোগ শরীরে ওষুধের প্রয়োজন কি?

এ-রোগের প্রতিকার শিক্ষার একটা মহান্ আদর্শ খাড়া করা। সে শিক্ষার উপাদান স্কুলকলেজের পাঠ্য বইয়ে নেই, আছে নারীর মনে, নারীর বিচারবুদ্ধিতে, নারীর দায়িত্ববোধে। দেশের ভবিষ্যৎ তো নারীরই হাতে, যে নারীর সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম সুসন্তানের জননী হওয়া সেই নারীর হাতে। দেশের ভবিষ্যৎ যারা, তা'দের যথার্থ মানুষ তৈরী করার ভার দেশের মায়েদের হাতে। প্রভাতবাবু যে তিনটি শ্রেণীর কথা ব'লেচেন তারা সত্যিই আছে; কিন্তু মায়েদের তা'দের থেকে তফাৎ হ'তে হবে, চিন্তা ক'রতে শিখতে হবে,—"নিতে হবে নূতন ও পুরাতনের যা কিছু ভালো—নির্ব্বিচারে নয়, বিচারসহ যুক্তিতে—এবং যেখানেই বাধবে বিরোধ, কিছু ত্যাগে, কিছু করুণায়, কিছু তেজে নারীকে পথ ক'রে নিতে হবে সুগম।" সাবেক বা আধুনিক ধরণের কোনোটারই চরমপন্থী হওয়া ঠিক নয়; ধীরভাবে বিচার ক'রে প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পথ ঠিক ক'রে নিতে হবে।

সমাজ ও জাতির কাছে যে ঋণে আমরা ঋণী, তা' কি পুরুষ কি নারী কখনো পূর্ণভাবে শোধ ক'রতে পারে না। আংশিক ভাবে যেটুকু পারে সে সম্বন্ধে নারীজাতির আদর্শের কথা একজন মহিলারই মুখ থেকে তুলে দিই—

Let the young women...learn as a new great faith that the sons and daughters they bear are not their children and the children of

শেষাংশ ২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

তোর কি মা সাজে বিলাসিনী বেশ

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

নারি! আজ চাহ পুরুষের সাথে সাম্যের অধিকার
ধরণীতে তাহা সম্ভব কভু নয়,
চির-দুর্জ্জয় অনাদি নিয়মে চলিয়াছে অনিবার
পুরুষের কাছে প্রকৃতির পরাজয়।
পুরুষ স্বচ্ছ, পুরুষ শান্ত, পুরুষ বিশ্বপিতা,
ত্রিবিধ গুণের উৎস প্রকৃতি রাণী
চির-চঞ্চলা মায়াবিনী নামে ধরণীতে পরিচিতা
সৃজনের বুকে চির শাশ্বত বাণী।
বিকার বিহীন পরম পুরুষ ত্রিগুণে দলিয়া পায়
দ্রষ্টা স্বরূপে বিরাজিত চিরদিন
বিশ্ব মোহিনী প্রকৃতি তাঁহারে নিয়ত ভুলাতে চায়
বিবিধ ছন্দে বাজায়ে প্রেমের বীণ্ ॥
প্রলোভনে কভু টলে নাকো তাঁর কঠিন কঠোর হিয়া
ক্ষণিক বিলাসে ভুলে যায় তব স্মৃতি
কুসুমের মত কোমল তোমার মর্ম্মে বিশ্বপ্রিয়া
ভাবতন্ত্রীতে উঠে বিরহের গীতি ॥
সৃজনের বুকে চিরপরাধীনা অয়ি নিখিলের নারী
কত দুর্ব্বলা ভাবো তুমি একবার
কর্ম্মীর তুমি ক্লান্ত-হৃদয়ে স্নিগ্ধ-পিপাসা বারি
এইটুকু শুধু আছে তব অধিকার।
"ঈক্ষণ" রূপে নিদ্রিতা ছিলে ব্রহ্মের হৃদি-মাঝে
সহসা জাগিলে সৃজনের কম্পনে,
রূপে রসে গানে বিরাজিতা তুমি আজো নব নব সাজে
নিখিলের প্রতি পরমাণু স্পন্দনে ॥

প্রেম দয়া মায়া প্রীতি করুণায় তুমি যে মূর্ত্তিমতী
রসের আধার তুমি গো জগন্মাতা
তেজের মূর্ত্তি পুরুষের সদা শৌর্য্যে বীর্য্যে মতি
বিশ্ব লীলায় মূর্ত্ত তাহারা ধাতা ॥
তাই মা জননী থামাও তোমার অলীক উন্মাদনা
মরীচিকাময় মিথ্যা প্রগতি পথে
আত্মধর্ম্ম কর মা পালন করি তব বন্দনা
ডুবিয়োনা আর বিলাসের পাপ স্রোতে ॥
জীবন যুদ্ধে পুরুষ যখন আসিবে ক্লান্ত দেহে
তুমি তা'রে দিয়ো প্রেম সুশীতল ছায়া
বক্ষে ধরিয়ো সন্তানে তব বিপুল গভীর স্নেহে
জগজ্জননী তুমি যে গো মহামায়া।
নরের বক্ষে কর্ম্ম-প্রেরণা প্রদানিয়া নিশিদিন
মত্ত করগো জীবনের সংগ্রামে
মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রে করিয়া চিত্ত ভাবনাহীন
ছায়াসম তা'র রহিয়া নিয়ত বামে ॥
তোর কি মা সাজে বিলাসিনী বেশ দুর্ভিক্ষের দেশে?
যেথা নিতি জ্বলে শ্মশানের চিতানল
যেথা কোটি কোটি নরনারী কাঁদে দীন ভিখারীর বেশে
পথে পথে ফেলি বেদনা অশ্রুজল ॥
পাশ্চাত্যের প্রলোভনে আর মুগ্ধা হয়োনা নারি,
সংযমশীলা মূরতি ধর মা আজ
ভারতের মৃত সন্তান বুকে প্রদানি পিযূষ বারি
দাও মা পরায়ে মরণ বিজয়ী সাজ।

নারীধর্ম্মে প্রভাতকিরণ

শ্রীপ্রতিমা রায়

মনুষ্যত্ব যাচ্ছে হারিয়ে! নারীর আদর্শ হ'য়েছে ক্ষুণ্ণ—মাতৃত্বের গৌরব যাচ্ছে লুপ্ত হ'চ্ছে। প্রভাতকিরণ বাবু প্রগতির বিরুদ্ধে নন—তিনি জানেন—তিনি মানেন যে জাতীয় জীবনের প্রগতির সহিত নারী-প্রগতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। তাই তিনি প্রাচীন কালের শিক্ষাতে ক্ষোভ প্রকাশ ক'রেছেন; আবার আধুনিক কুশিক্ষাকেও ব্যঙ্গ ক'রেছেন:—

"সাবেক ও আধুনিক" কোন শিক্ষাকে ব'লব আদর্শ? ভুটোর সময় আহ্নিক সেরে—তিনটের সময় খাওয়া, সেই কি ধর্ম্ম? ভগবান বলে যে একটা কেউ আছে সেটা দিনান্তে একবারও মনে করবার চেষ্টা না করাটাই বা কি ধর্ম্ম? ছুঁচিবাই গ্রস্তের দুহাত গামছা পরে গোবরজল ছড়া দিয়ে গোময়-গন্ধে পানীয় জল অবধি বিকৃত করাই বা কি রুচি? বিগত যৌবনে নানা কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য নিয়ে তরুণী সেজে বাবুচ্চির

হাতের রান্না মুর্গীর ঠ্যাং খাওয়াই বা কি রুচির পাওয়ার ব্যগ্রবাহুবেষ্টনে বহুপুরুষের পীড়নে দেবদর্শনই বা কেমন? থিয়েটারে বায়োস্কোপে অন্ধকারে অনেক লোকের হাঁটু ঠেলে যাওয়া, তাদেরও সেই ভাবে যেতে দেওয়া মেয়েদের পক্ষে তাই কি শোভন?—

পরিশেষে দরদী প্রভাতকিরণ অল্প কথায় দেখিয়েছেন—

"নারীকে নিতে হবে নূতন ও পুরাতনের যা কিছু ভালো,—নির্ব্বিচারে নয়, বিচারসহ যুক্তিতে—এবং যেখানেই বাধবে বিরোধ, কিছু ত্যাগে, কিছু করুণায়, কিছু তেজে নারীকে পথ ক'রে নিতে হবে সুগম—"

প্রভাতকিরণ প্রকৃতই নারীসমাজের হিতকামী বন্ধু—ইতিপূর্ব্বে তিনি নারী প্রগতিকে উৎসাহ দিয়ে, আরও বহু কবিতা লিখে প্রকাশ ক'রেছেন—নারীধর্ম্মে তিনি যা বলেছেন তা শ্লেষ নয়—তা আমাদের উপকারের জন্যে—সুতরাং আমরা যেন তাঁকে ভুল না বুঝি! নারীসমাজ সত্যই প্রভাতবাবুর কাছে ঋণী—তাঁর এই অনবদ্য প্রবন্ধের—সত্যিকার 'মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলা'কে সসম্ভ্রম আহ্বান জানাবার জন্যে। আমরা তাঁকে এর জন্যে অভিনন্দিত করছি।

প্রবন্ধের সমালোচনা

শ্রীভবেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

অজ্ঞাতসারে নিজেদের সুবিধা ও মানসিক বিলাসের জন্য নারীদের মঙ্গলের একটী দিক খুলিয়া দিয়াছেন। অন্য দিকে বর পছন্দ না হওয়ার কথাতে পুরুষদের অক্ষমতার কথাই ওঠে। যখন পনের আনা তিন পাই কেসে মেয়েদের বর পছন্দ হয় না তখন ইহাও সত্য যে পনের আনা তিন পাই বরেরা সত্যই পুরুষ হওয়ার অযোগ্য। নারীর মন জয় করিবার জন্য পুরুষের যে বীর্য্যবত্তা, বুদ্ধিবত্তা এক কথায় যে উজ্জ্বল শক্তিমান পৌরুষের প্রয়োজন তাহা অধিকাংশ পুরুষের নাই। পুরুষের ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে।

প্রভাতবাবু গান শেখা, ভারতীয় নৃত্য, হাইজাম্প, সাতারের কথা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন—যেন সেগুলি গুরুতর পাপের কাজ। কিন্তু ওই কাজগুলি বাদ দিয়া আনন্দ করিবার সম্বল কি শুধু বাটনা বাটীয়া, ভাত রাঁধিয়া, পতি পদসেবা করিয়া, সন্তান প্রসব করিয়া বা নিতান্ত পঙ্কে পবিত্র সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া জুটিবে?

গরীব মেয়েদের সম্বন্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা অভিযোগ না হইয়া মর্ম্মন্তুদ সত্যকথা হইয়াছে। পুরুষদের সৃষ্ট বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রাধীন সমাজের ক্রীতদাসী ভিন্ন ইহারা ত আর কিছু নহে। নারী হিসাবে ইহারাই কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ। এদেশের একটী প্রয়োজনীয় বৃহত্তম অঙ্গকে পুরুষরা যে স্বেচ্ছায় পঙ্গু করিয়াছে তাহার ফলভোগ পুরুষরা নিজেই করিতেছে। কিন্তু তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কি নারীরা করিবে, না করিবে এই স্বার্থপর পুরুষরা?

"নিন্দিত পুরাতনকে বর্জ্জন ক'রতে হবে বলে' অতি উগ্র অপরিক্ষিত নূতনকে বরণ" করিতেছে বলিয়া প্রভাতবাবুর আশঙ্কা হইয়াছে। কিন্তু নারীদের মঙ্গলের জন্য অতি নূতনকে পরীক্ষা করিবার দায়িত্ব কি প্রভাতবাবুর দলের লোকেরা লইবেন?

সমগ্র প্রবন্ধটীতে নারীস্বাতন্ত্র্য বিরোধী সুকৌশলী পুরুষ চিত্তের একটী স্পষ্ট ছাপ লাগিয়া আছে। প্রবন্ধটীকে বিশ্লেষণ করিয়া খুটী নাটী সমালোচনা করিতে গেলে লেখা অনেক বড় হইবে সেই জন্য ক্ষান্ত দিতে হইল।

একটা ব্যাপার আমরা দেখিনা যে নারীর সর্ব্ববিধ দৈন্যের জন্য আমরা পুরুষরা দায়ী এবং আমরাই আমাদের দেশের নারীদের চেয়ে অনেক অধিক অন্যায়কারী দুর্ব্বৃত্তি সম্পন্ন। অথচ নারী জাগরণ দেখিলে আমরাই চিৎকার করি অধিক—নারীদের স্বজাতি শত্রু অপেক্ষাও। নারীদের বিরুদ্ধে আমরা এই জাতীয় প্রাবন্ধিক আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করি এবং ইহা দ্বারা নারীরা যে ব্যথা পাইয়াছেন তাহাতে পুরুষ হিসাবে আমরা লজ্জা অনুভব করি।

নারীধর্ম্ম

শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

their husbanbs only, but the sons and daughters of our country—the interitors of all the fine tradition of our race. Let us spread the new romance of Love's responsibility to Life; let us honour ideals of self-dedication to our husbands, understanding their dependence upon us, to our homes, to our sons and our daughters, to our race, its great ones and their deeds; our moral obligations to all children even before they are born.

এইটুকু মনে রাখলেই পুরুষ-নারীর বিরোধের কারণ থাক্‌বে না।

ওপারের ছায়া

শ্রীপাততপাবন পতিতুণ্ডি

ব্লাঞ্চে সিওয়েল এর নাম। মেট্রোর ছবির এ মেয়ে-সম্পাদক

গার্ব্বো ফিরবে—

জন গিলবার্ট যখন মরল,—কত লোক কত কথাই বললে। গ্রেটার চোখে জল, গ্রেটার বুকে ব্যথা, গ্রেটা পড়ছে মুষড়ে—আর তো ফিরবে না ছায়ালোকে। পর্দার ওপর আর তার ছায়া নতুন করে কেউ দেখতে পাবে না।

কিন্তু যে যাই বলুক; আসল কথা জানে এবং জানত আর একদল লোক; তারা হচ্ছে মেট্রো গোল্ড্‌ইন মায়ার ষ্টুডিওর কর্ম্মসচিব। এই কর্ম্মসচিবগণের পরামর্শে চলছে মেট্রো ষ্টুডিও। হলিউডের তারারা তাদের হাতের পুতুল। বাজীকরের হাতের ছোট বল—তাদের নিয়ে লুকোলুকি খেলা চলেছে দিনরাত।

তাই তারা বলে দিয়েছেন গার্ব্বোর পরের ছবি 'কাউন্টেস ওয়ালিউস্কা'। এই খানাই পরের ছবি বলে অন্ততঃ ঠিক আছে। এবং তার তোড়জোড়ও চলেছে।

কথার মানুষ

কথার মানুষ ছিল উইলি রোজার্স। মরণকালেও তার কথার খেলাপ হয়নি। সেদিনের কথা, ঠিক যেদিন অ্যালান ক্যান প্লেনে দুর্ঘটনা ঘটে, তার আগের দিন। আহা কে জানত তার জীবনের দীপ এত শীঘ্র নিবে যাবে।

ঠিক সেই আগের দিনের কথা। উইলি এলো প্রডিউসার উইনফিল্ড সিহান-এর কাছে। বল্লে তাকে, তাদের জন্যে দুটো ঘোড়া পাঠাবে হিডন ভ্যালিতে। উইনফিল্ড যেন ভাড়া না করে।

তারপর দিন উইলির প্লেন আকাশ থেকে পড়ল মাথা ঠুকে মাটীতে। প্লেনের কলের সঙ্গে উইলির বুকের কলও ভেঙ্গে চুরে চুরমার হয়ে গেল।

কতদিন গেল; উইনফিল্ড ফিরল তার কনে জেরিটজাকে নিয়ে। ইউরোপে হনিমুন সেরে। খবর পেলে মিসেস রোজার্স তাদের জন্য দুটো ঘোড়া পাঠিয়েচে। উইনফিল্ড আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে টেলিফোন করলে মিসেস রোজার্সকে।

মিসেস রোজার্স বল্লে—"উইলির খাতায় ঘোড়া পাঠাবার কথা লেখা ছিল। আরো লিখে রেখেছিল যদি উইলি কোন কারণে কোথায় চলে যায় মিসেস উইলি যেন তা পাঠায়।"

কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল উইলির এমনি।

কাজ আগে

প্রেমের চেয়ে কাজ বড় একথা জানে ক্লদেৎ কলবার্ট। কাজ পেলে ও চায়না কিছু—না খাওয়া, না শোওয়া, না স্বামীর-সঙ্গ লাভ। তাইতো ও এতদিন বিয়ে করেনি। নরম্যান ফষ্টারের সঙ্গে প্রেম গোপনে। অতি সন্তর্পণে পুষে রেখেছিল। আর শেষ পর্য্যন্ত বিয়েও করেনি তাকে। সেও কাজের জন্যেই।

গিয়ে করেছে জোয়েল প্রেলম্যানকে। সবে যেদিন প্রেলম্যানের সঙ্গে গিয়েছে হনিমুন করতে, অমনি খবর এলো—হলিউডে ফিরে আসতে হবে। ক্লদেৎও তাই চায়। কাজ যে ওর প্রাণ। ও বলে,—সংসার নিয়ে যারা মেতে থাকতে চায় তারা সংসারই করুক পর্দায় নেবে চমক লাগাবার দরকার কি?

ক্লদেৎ থোক এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে তবে 'আণ্ডার টু ফ্ল্যাগস' ছবিতে নামবে বলে চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করলে। আর সাইমন সিমন—যার জন্তে পার্টটা ঠিক ছিল, সে হোল বাদ।

হনিমুন ছেড়ে ক্লদেৎ ছুটেছিল ইয়ুমাতে। সেই নিয়ে ক্লদেৎ-এর যাওয়া হয়েছিলো চ্যার। বিয়ে হয়েছিলো ওইখেনেই তারপর আবার গিয়েছিলো স্যুটিং করতে। তারপর ফিরেছে—আবার নতুন করে হনিমুন করছে।

ভুল হওয়া

বিপদে যে লোকের মাথার ঠিক থাকে না সে কথা আমরা জানি, কনিও জানত। তবু কনি ভুল করলে।

হলিউডে খবর এলো বাপ রিচার্ড বেনেট ভয়ানক পীড়িত। কনি বেনেট তো অস্থির হয়ে উঠলো। বাপের অসুখ—সে কি থাকতে পারে। জোয়ান বেনেটকে নিয়ে কনি উঠলো গিয়ে এরোপ্লেনে।

প্লেন চলেচে হু হু করে। পার হয়ে গেল কত রাস্তা, কত গ্রাম। হঠাৎ পাহাড়ের মাথার ওপর এসে কনির মনে হোল তাইতো সে যে তার মনিব্যাগ আনেনি। তাদের কাছে একটা সেণ্ট পর্য্যন্ত নেই। তারপর!

তারপর তারা অবশ্য ফেরেনি।

চুরি

চোর নানান রকমের থাকে কিন্তু আমেরিকার মত চোর বোধহয় জগতে আর কোথাও দেখা যায়না। ওয়ালটার ওয়াগনার তখন 'পাম স্প্রিংস' ছবি তুলছিল। বাহিরে একটা খোঁয়াড় তৈরী করতে, ওয়ালটার হলিউড থেকে চল্লিশ মাইল দূরে স্যুটিং-এর একটা জায়গা ঠিক করলে।

তারপর একদিন লোকজন নিয়ে গিয়ে সেখানে একটা সেট খাড়া করে চলে এলো।

পরদিন সকালে সবাই সেখানে যখন উপস্থিত হোল, দেখলে সেখানে কোন সেটের বদলে বিরাট মাঠ পড়ে ধূ ধূ করছে।

খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেলো। কে চুরি করলে এই নিয়ে ভাবনা।

খোঁজ পাওয়া গেলো এইটুকু যে আগের দিন রাত্রে তিনজন সেট ভেঙ্গে চুরি করে গাড়ীতে নিয়ে গেছে। একজন নাকি বন্দুক নিয়ে সমুদ্রে পাহারা দিয়েছিল আর অপর দুইজন সেট খুলে গাড়ী বোঝাই করেছিল।

নিউ থিয়েটার্স ভারতের গৌরব

প্রিয় বিশ্ববাবু,

জানেন ত আমি সেবার এই জঙ্গলা ছবি তোলবার পাগলামি মাথায় নিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট করেছিলাম; অনেক প্রযোজক ও ধনীর শরণাপন্নও হয়েছিলাম—কিন্তু কোনওরূপ আশাপ্রদ ফল পাই নি—আজ এই সুদীর্ঘ তিন বছর পরে আমার কল্পনা খানিকটা সত্য হতে চলেছে; 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মে'র সত্ত্বাধিকারী মিঃ বি, এল, খেম্‌কা ফ্রানক্‌লিন-গ্রানভিল প্রোডাকশনের একমাত্র ভারতীয় পরিচালকরূপে আমার স্বপ্ন কতকটা সত্যে পরিণত করতে চলেছেন; খুবই আনন্দের কথা বটে।

যাক্, আমি এখন যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম সেই কথাই বলি—বছর তিনেক আগে, সেই সময় আমার জঙ্গলা ছবি তোলার স্বপ্ন সত্য হবার বিশেষ কোনও লক্ষণ না দেখে বড়ই আশাভঙ্গ হয়ে পড়ি এবং চিত্রজগত থেকে তখনকার মত কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করি। কিন্তু চুপ করে ত আর বসে থাকা যায় না, তাই এই ক'বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে প্রায় ভারত প্রদক্ষিণটা শেষ করে এলাম। এতদিন চিত্রজগতের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম—তাই যেখানেই গিয়েছি সেখানেই সম্ভবমত চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তাহাদের কার্য্যকলাপও দেখবার অবকাশ করে নিয়েছিলাম। সেখান থেকে যে সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছি সেটুকু বলতে আজ নিজেকে খুব গর্ব্বিত মনে হচ্ছে।

বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ বাংলা দেশের বহু পূর্ব্বেই চিত্রজগতের আসরে নেমেছেন; কিন্তু আজ যা দেখে ও বুঝে এলাম—বাংলা অন্যান্য প্রদেশকে অনেকখানি পিছনে রেখেই এগিয়ে চলেছে; তবে বাংলা বলতে গেলেই

খুচরো খবর

চার্লি চ্যাপলিনের প্রথম অভিনয় করার সুযোগ আসে ষ্টেজের ওপর। তাই সিডনির সেদিন অসুখ হওয়ায় তার বদলে তাকে নামতে হয়েছিল।

* * *

'দি গুড আর্থ' ছবিখানায় প্রত্যেক দিন দুঘণ্টা অন্তর পল মুনির পোষাক বদলাতে হবে। আর এতে পল মুনি সাজছে একজন চীনে ভদ্রলোক।

* * *

লাওনেল যেমন মরণের হাত থেকে বেঁচেছে এমন বোধহয় হলিউডের খুব কম লোকই বাঁচে। ছেলে বয়সে টেক্সাসের পথে বেড়াবার সময় বদমাইস লোকেরা গুলি ছুড়তে আরম্ভ করে। গুলি এসে লাগে লাওনেলের পাশের লোকের তাতেই সে মরে যায়।

আমাদের সুযোগ্য কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের প্রতিষ্ঠান 'নিউ থিয়েটার্সে'র' কথাই বলতে হয়। আজ মাত্র পাঁচ কি ছয় বছর এই প্রতিষ্ঠানটীর সৃষ্টি; কিন্তু সবাইকে পিছনে ফেলে সে যে ভাবে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে তাতে মিঃ সরকার এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা কেহই শতমুখে স্বীকার না কোরে থাকতে পারে না। কিন্তু ওদের দেশের ছবির সবটাই যেন ধার করা—(অবশ্য দুই একটা exception আছে)—পরস্ব জিনিষ। নাটকীয় জ্ঞান এত কম, যা কল্পনা করা যায় না; এবং সে বোধশক্তি ফোটাবারও বিশেষ চেষ্টা নেই—গতানুগতিক ভাবেই কাজ চলেছে। অবশ্য ওরা বলবে mass-appeal, Box-office value; কিন্তু আজ আমাদের হিন্দী "দেবদাস" ও "ভাগ্যচক্র" সে চাকা ত ঘুরিয়ে দিয়েছে।

এক দল লোক আমাদের দেশে আছেন—যাঁরা বিশেষ সিনেমার পক্ষপাতী নন; যা দুই একখানা দেখেন তাও বিদেশী; দেশী ছবির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করে থাকেন। কিন্তু আজ সে দলেরও কেউ কেউ 'নিউ থিয়েটার্সে'র ছবির বিজ্ঞাপন দেখলেই মন্তব্য প্রকাশ করেন "এতদিন বাদে আর একখানি দেশী ছবি দেখতে হবে" ইত্যাদি। সেবার যখন আমি একদল অবাঙ্গালী সিভিলিয়ান মহলে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম—হাস্য-কৌতুকের ভিতরে কতকটা এরূপ একটী ঘটনা ঘটেছিল—এই দলের অনেকগুলি ভদ্রলোক ভারতীয় ছবি বিদ্বেষী; কথা প্রসঙ্গে ভারতীয় সিনেমার কথা আসতেই একজন বলে উঠলেন "Tuh—don't talk of Indian pictures." একজন জেলা-জজ প্রতিবাদ-স্বরূপ বললেন "But there can be some exception, of course"—একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন "who is that lucky exception"? জেলা জজ মহাশয় উত্তরে বললেন "New Theatres Pictures of Bengal". ইণ্ডিয়া মেট্রোলজিক্যাল আফিসের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী বলে উঠলেন "Really they have brought down revolution in the Indian cinema line." তখন সব প্রথমের ভদ্রলোকটী একটু হেসে বললেন "That may be possible—Revolution may have a claim originality from Bengal—যাই হ'ক, প্রথমে তাঁরা আমাকে বাঙ্গালী বলে বুঝতে পারেন নি; যখন বুঝলেন ও শুনলেন যে আমিও চিত্রজগতের একজন; তখন আমার প্রতি নানাবিধ প্রশ্নবাণ বর্ষণ হতে সুরু হ'ল। সবার উপরে যখন তাঁরা শুনলেন যে 'নিউ থিয়েটার্সে'র অনেকের সঙ্গে আমি পরিচিত এবং মিঃ বি, এন, সরকারের সঙ্গে দুই একবার আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছে—ব্যস্—আর যাবি কোথা—আমি যেন হয়ে গেলাম সেখানকার centre of attraction. যতটা জানি নীতীন বসু, অমর মল্লিক, মুকুল বসু, রাইচাঁদ বড়াল, প্রমথেশ বড়ুয়া, উমা, পাহাড়ী, সাইগাল, দুর্গাদাস প্রভৃতি সকলেরই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলতে হল। সেদিনকার মজলিসে প্রধান বক্তা হলাম আমি—অবশ্য পুরস্কার স্বরূপ আমার জন্য এক Special Dishও এসেছিল—

এই ত গেল রুচিজ্ঞান সম্পন্ন দর্শকদের কথা। যে mass কেবল লাঠি তলোয়ার খেলা এবং আজগুবি রকম "বাহাদুরকা খেল" দেখতে Booking Officeএর সামনে দাঙ্গার সৃষ্টি করে ফেলে তারাও আজ "নিউ থিয়েটার্সে'র বই কবে থেকে সুরু হচ্ছে" এই প্রশ্নবাণে ছবিঘরের ম্যানেজার-দিগকে বিব্রত করে ফেলছে—এও কী কম আনন্দের কথা! যে হাওয়া বইতে সুরু করেছে, আশা করা যায় ধীরে ধীরে তথা-কথিত বোম্বাই ছবির আদর কমে আসবে।

ওখানকার চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও অনেকেই অন্তরে একটা ক্ষীণ আশা পোষণ করেন যে তাঁরা একদিন না একদিন 'নিউ থিয়েটার্সে'র দলে ঢুকে কাজ করবার সৌভাগ্য লাভ করবেন—কেননা তাঁদের এই ধারণা যে, আজকাল চিত্রজগতে যশের সহিত পরিচিত হতে হলে ঐটীই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান। এই সমস্ত ঘটনা দেখে বেশ বুঝতে পাচ্ছেন যে আজ আমাদের চিত্রশিল্প বাংলার বাহিরে সকলের চোখে কিরূপ স্থান পেয়েছে। আজ 'নিউ থিয়েটার্সে'র নামে প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্ব্বে বুক অনেকটা উঁচু হয়ে উঠে। তাই প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কাম্য যে তাদের চিত্রশিল্পকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করে অর্জ্জিত সুনাম বজায় রেখে এগিয়ে চলুক—আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মনে একটু সান্ত্বনা পাবেন যে অন্ততঃ একটী ব্যবসায় ক্ষেত্রেও আজ বাঙ্গালীর স্থান অনেক উঁচে।*

শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পি ৮৪, হালদারপাড়া রোড
কালীঘাট, কলিকাতা।

* 'ভ্যারাইটীজ' সম্পাদক শ্রীবিধাবসু রায়-চৌধুরীকে লিখিত।

কোন ছবিতে দুর্গাদাস বাড়ুয্যে নাম্‌ছে শুন্‌লে চিত্রপ্রিয়রা সেই ছবি দেখবার জন্যে হ'য়ে ওঠে পাগল। তাই চন্দ্র ফিল্মসের "পরপারে"-র মুক্তির দিন গুন্‌ছে তারা। কারণ, দুর্গাদাস এতে নেমেছেন নায়কের ভূমিকায়।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩—28th. May, 1936. } ২২শ সংখ্যা

মাণিকজোড়—মন্ত্রী ও মেম্বার

অভাব, অভিযোগ এবং হাহাকারে দেশ ছাইয়া গেল, সংবাদপত্রে নানা আলোচনা ও আন্দোলন হইতে লাগিল। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের টনক কি সহজে নড়ে? অবশেষে বর্দ্ধমান জেলার পল্লীস্থ নিরন্ন লোক দলে দলে—নারী, বৃদ্ধ ও শিশু সন্তানাদি সহ—যখন আদালতে, ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে জড় হইতে লাগিল, তখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের মত একটা লক্ষণ যেন ওদিক হইতে দেখা গেল। এবং ক্রমে এতদিনে কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করিলেন যে কোথাও বা অন্নকষ্ট (scarcity) কোথাও বা দুর্ভিক্ষ (famine) হইয়াছে! (জটিল ন্যায়শাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে এই সূক্ষ্ম ভেদবিভাগ বুঝিতে পারিবেন না!)

ইহার ফলে মন্ত্রী বিজয় প্রসাদ উঠিয়া পড়িয়া সফর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! দরিদ্র কৃষকদের প্রতি এতটা দরদ? ইহা আসন্ন নির্ব্বাচনের পূর্ব্বাহ্নে রাজনৈতিক তদ্বির নহে তো? মেম্বার বিজয়ও পিছাইয়া হটিবার লোক নহেন! অর্থাৎ মন্ত্রী বিজয় ও মেম্বার বিজয়—উভয়েই উঠিয়া পড়িয়া সফর ও বক্তৃতা করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। মেম্বার বিজয়ের কথা কিছু বলিতে চাহি না কারণ Tour শেষ করিতে করিতে বোধহয় তাঁর Term'ও শেষ হইয়া যাইবে! আমরা শুধু মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। তেজস্বী মন্ত্রী কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের পদত্যাগের ধাক্কায় হোঁচটে পড়িয়া তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে! কলিকাতা হাইকোর্টের Briefless Lawyer আজ বৎসরে ৬৪ হাজার টাকা ঘরে লইয়া যাইতেছেন। এই কয় বৎসরে যে পরিমাণ অর্থ তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা বোধহয় মন্ত্রিত্বলাভের পূর্ব্বে তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। সেই টাকা হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি কতটুকু সাহায্য বর্দ্ধমানজেলার প্রজাদের—তাঁহারই জমিদারীর প্রজাদের—করিয়াছেন? একবার "আনন্দবাজারে" পড়িয়াছিলাম সফরের সময় তাঁহার ক্যাম্পে এক সন্ধ্যায় যে দরিদ্রের দল সমবেত হইয়াছিল তাঁহাদের মাথা পিছু এক আনা করিয়া দিয়া তিনি একুনে ১৩৲ টাকা কয়েক আনা দান করিয়াছিলেন। এই দমকা দানের ধাক্কা তিনি কি আজ পর্য্যন্ত সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই? না, তিনি মনে করেন যে, সুরেন্দ্রনাথের অক্ষয়কীর্ত্তি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনকে সংশোধিত, সঙ্কুচিত ও আদর্শভ্রষ্ট করিয়া যে মাহাত্ম্য তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট, তদপেক্ষা অধিক গৌরব অর্জ্জন করা এ জীবনে আর তাঁহার প্রয়োজন নাই!

নলিনী ও রাসমণি

খোরপোষের মামলায় অভিনব অধ্যায়

মিঃ বরদা পাইনের আচরণ

মিঃ এল, কে, সেনের তীব্র মন্তব্য

রাসমণিকে জেরা করার জের

গত সোমবার আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে রাসমণি দেবী কর্ত্তৃক আনীত খোরপোষ মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে, রাসমণির জেরার সময় আদালতে একটী চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট ও শ্রীযুত সরকারের পক্ষের এডভোকেট মিঃ বি, পি, পাইনের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। ফলে মিঃ পাইন মামলার সংস্রব ত্যাগ করিয়া আদালত হইতে চলিয়া যান।

মামলার শুনানী উঠিলে মিঃ পাইন রাসমণিকে জেরা করেন। তাহার সলিসিটরের চিঠির মারফতে মিঃ বি, এম, চ্যাটার্জ্জি ও অন্যান্যেরা শ্রীযুত সরকারের নিকট হইতে ৫০০০০ টাকা দাবী করিয়াছিলেন বলিয়া সে গত শুনানীর দিন বলিয়াছিল কি না এই প্রশ্নের উত্তরে রাসমণি বলে যে, সে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিল যে, সে তাহার কন্যার বিবাহের জন্য টাকা এবং নিজের ভরণপোষণের জন্য ৩০ টাকা মাসোহারা চায়। তাঁহারা তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত ৫০০০০ টাকা পাইলে সে যাহা চায় তাহার সমস্তই সঙ্কুলান হইবে।

প্রঃ—গত শুনানীর দিনে তুমি কি বলিয়াছিলে যে, মিঃ বি, এম, চ্যাটার্জ্জি ও অন্যান্যেরা তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে উক্ত টাকা ভাগ করিয়া লইতে চান?

উঃ—না, আমি ঐরূপ কথা বলি নাই।

প্রঃ—গত শুনানীর দিন তোমার জেরা শেষ হইলে পর তুমি কাহাকেও তোমার সলিসিটরের চিঠির অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলে কি?

উঃ—না।

প্রঃ—গত শুনানীর দিনের জেরার পর ঐ চিঠিতে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছিলে কি?

উঃ—আপনার প্রশ্ন বুঝিতে পারিলাম না।

প্রঃ—গত শুনানীর দিন তোমার জেরা শেষ হইলে পর তুমি কি উক্ত পত্রে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিয়াছিলে?

উঃ—পত্রখানি আমার নিকট নাই। উহার বিষয় আমার কি ভাবিবার আছে? ভাবনা টাবনা কি আমি কিছুই জানি না।

মিঃ পাইন—গত শুনানীর দিন বাদীপক্ষ উক্ত পত্রের একখানি নকল তাহাদের নিকট আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মিঃ ঘোষ—আমি কখনও উহা বলি নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, সলিসিটর মেসার্স এইচ, এন, দত্তের পত্রের একখানি নকল আমার নিকট আছে।

প্রঃ—গত শুনানীর দিনের জেরার পর তুমি তোমার সলিসিটারের চিঠিতে লিখিত বিষয় তোমাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য তোমার উকীলকে বলিয়াছিলে কি?

উঃ—সলিসিটরের চিঠি দিবার দুই তিন দিন পর আমি আমার সলিসিটরের নিকট হইতে একখানি চিঠির নকল পাইয়াছিলাম।

প্রঃ—তাহা হইলে তুমি কেন বলিলে যে, উক্ত পত্রের নকল তোমার নিকট ছিল না বলিয়া তুমি উহার বিষয় ভাবিতে পার নাই?

ম্যাজিষ্ট্রেট—উক্ত পত্রের নকল তোমার নিকট আছে কি?

উঃ—না, আমি ইতিপূর্ব্বেই আমার উকিলের নিকট উহা দিয়াছি। আমি আমার উকিলের হস্তে সর্ব্বসমেত তিনখানা উকিলের চিঠি দিয়াছি।

মিঃ পাইন—তুমি কি তোমার উকিলের উক্ত চিঠিতে লিখিত বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলে?

রাসমণি—নিরুত্তর।

মিঃ পাইন—(ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি)—সাক্ষী যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দেয় তাহা হইলে আমি নিরুপায়।

মিঃ ঘোষ—সাক্ষী ইতিপূর্ব্বেই "না" বলিয়া উত্তর দিয়াছে। এই মামলায় জয়লাভ করিবার আশা নাই দেখিয়াই মিঃ পাইন নিজেকে নিরুপায় মনে করিতেছেন।

মিঃ পাইন—এই আদালতের প্রত্যেকেই নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয়।

প্রঃ—তুমি কি তোমার দরখাস্তে এই উল্লেখ করিয়াছিলে যে, ১৯২৩ সালের ...ের মাসে মহামায়ার জন্মের পর শ্রীযুত ...কার তোমার বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করেন ... তোমার ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা ... করিয়াই তোমাকে ত্যাগ করেন। ... কি সত্য ?

উঃ—(কিছু সময় পর) মহামায়ার জন্মের ... তিনি ১০০ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। ...নি বহুদিন পর পর ৬।৭ মাস অন্তর ...দিতেন।

মিঃ পাইন—(ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) সাক্ষী ...দি এইরূপ ব্যবহার করে তাহা হইলে আমি ... প্রকারে মামলা চালাইব। আমি তাহাকে ... প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি সে সেই প্রশ্নের ...ত্তর দিতেছে না।

মিঃ ঘোষ—আপনি তাহাকে জটিল ...ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অনুগ্রহ-...র্বক আপনার জটিল কথা ভাঙ্গিয়া সরল ...ভাবে তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

মিঃ পাইন—(ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) ...হার এই এক গুঁয়েমি স্বভাব আপনিই ...রাইতে পারেন, আপনি তাহাকে আমার ...শ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করিতে পারেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ পাইন, আপনি যদি ...হাকে আপনার প্রশ্ন বুঝাইতে না পারেন ...বে তাহা আমার দোষ নয়।

মিঃ পাইন—আপনি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট সাংসারিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির এই ...ভাবে আমি আপনার নিকট আমার পক্ষ ...ইতে সাক্ষীকে প্রশ্ন করিবার জন্য অনুরোধ ...নাইতেছি। আমি সরল বাঙ্গলায় প্রশ্ন ...রিতেছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট—প্রকৃতপক্ষে হয়তো তাহার ...ঝিতে কষ্ট হইতেছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ...হাকে বুঝাইয়া বলুন।

মিঃ পাইন—তুমি বাঙ্গলা জান ?

উঃ—হাঁ।

ম্যাজিষ্ট্রেট—সে কি বলে নাই যে, সে উড়িয়া ?

মিঃ পাইন—আদালতে প্রথম জবানবন্দী দিবার সময় তাহার ভাষায় সে উড়িয়া বলিয়া কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল কি ?

মিঃ পাইন—(সাক্ষীর প্রতি) তোমার দরখাস্তের নবম প্যারায় তুমি কি এই কথা বলিয়াছ যে, মহামায়ার জন্মের পর শ্রীযুত সরকার তোমার বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করেন এবং ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা না করিয়াই তোমাকে ত্যাগ করেন ? ইহা কি সত্য ?

রাসমণি—নিরুত্তর।

মিঃ পাইনের আদালত ত্যাগ

ম্যাজিষ্ট্রেট—সে বুঝিতে পারে না এরূপ প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা আপনার উচিত নহে। সে আপনার প্রশ্ন বুঝিতে না পারিলে তার জন্য আপনি আমাকে দোষ দিতে পারেন না।

মিঃ পাইন—(ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) জেরার জন্য আমাকে কতক সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত। আপনি সাক্ষীর প্রতি যে প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রতি সেইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। আমাকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য।

মিঃ পাইন—(সাক্ষীর প্রতি) তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই এখানে আসিয়াছ। আমার প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি আজ কাল এবং প্রয়োজন হইলে আগামী পরশুও তোমাকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিব।

ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ পাইন, আমি আপনাকে এরূপ করিতে দিতে পারিব না। আমি আপনাকে চীৎকার করিতে দিতে পারিব না। সে আপনার প্রশ্ন বুঝিতে না পারিলে তার জন্য আপনি আমার উপর দোষারোপ করিতে পারেন না। আপনার এইরূপ আচরণ করা উচিত নহে।

মিঃ পাইন—আমি অত্যন্ত সঙ্গত আচরণ করিয়াছি। আমি প্রতিবাদ করিয়া পুনরায় বলিতেছি যে, আমার আচরণ সঙ্গত হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আমি আপনাকে এইরূপ আচরণ করিতে দিব না।

মিঃ পাইন—তাহা হইলে আমি এই মামলা চালাইতে পারিব না। আদালতে প্রথম জবানবন্দী দিবার সময় সে (রাসমণি) সমস্ত প্রশ্ন ঠিক ভাবে বুঝিয়াছিল কিন্তু জেরার সময় বুঝিতে পারিতেছে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আপনি যেরূপ আচরণ করিতেছেন...

মিঃ পাইন—আমার আচরণ সম্পূর্ণ শিষ্টাচার সম্মত হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আপনি যদি এইরূপ ব্যবহার করেন তাহা হইলে আমি আপনার বিরুদ্ধে মামলা আনিব।

মিঃ পাইন—আপনি যদি আমি আদালত অবমাননার অপরাধে অপরাধী বলিয়া মনে করেন তবে যেন আমাকে রেহাই না দেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আমি আপনাকে এইরূপ আচরণ করিতে নিষেধ করিতেছি। আমি আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।

মিঃ পাইন—কী আমাকে সতর্ক করিতেছেন ?

ম্যাজিষ্ট্রেট—হাঁ আপনাকেই সতর্ক করিতেছি।

মিঃ পাইন—তাহা হইলে আমি এই মামলার সংস্রব ত্যাগ করিতেছি।

অতঃপর মিঃ পাইন আদালত ত্যাগ করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, ভাদুড়ীকে জেরা করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

উত্তরে মিঃ ভাদুড়ী বলেন যে, তিনি শুধু মিঃ পাইনকে সাহায্য করিবার নির্দ্দেশ পাইয়াছেন। এমতাবস্থায় তাহাকে তাহার

মঞ্চাভিনয় ও সবাক্-চিত্রাভিনয়ের পার্থক্য কী ?

সান্যাল
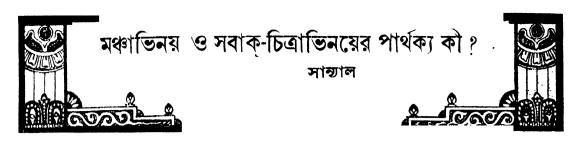
গত সংখ্যার "খেয়ালী"-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ বসু সবাক চিত্রাভিনয় এবং মঞ্চাভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য কী—জানিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার অবগতির জন্য লিখিতেছি :—

১। মঞ্চাভিনয় এবং সবাক চিত্রাভিনয়—উভয় স্থলেই অভিনয়-কলা প্রদর্শনের ক্ষেত্র বিভিন্ন। সুতরাং উহার পদ্ধতি বা টেকনিক্‌ও বিভিন্ন। মঞ্চ-নাটক সংলাপ-প্রধান। বর্ত্তমান টকীর যুগে, চিত্র-নাটকে সংলাপ বা গীত-বাদ্যাদি সংযোগ করিবার সুযোগ থাকিলে মূলতঃ সংলাপ বা dialogueই উহার প্রমাণ নহে। সবাক-চিত্রে সংলাপ বা dialogue-এর ব্যবহার হওয়া উচিত, চিত্রাকারে রূপান্তরিত গল্পটিকে পরিস্ফুটনের সুযোগ দিবার জন্য। কিন্তু মঞ্চ-নাটকের মেরুদণ্ডই হইতেছে সংলাপ বা dialogue. তাহা ভিন্ন স্বাভাবিকতাই ফিল্ম অভিনয়ের মেরুদণ্ড। পাদপ্রদীপের আলোতেও সকল ব্যাপারে যথাসম্ভব স্বাভাবিকতা সাধনের চেষ্টা হয় বটে কিন্তু তবুও সে সবের মধ্যে অল্প-বিস্তর কৃত্রিমতা থাকিয়া যায়। দর্শকের কাছ হইতে অভিনেতার দূরত্ব হেতু তাহাকে একটু গলা চড়াইয়াই কথা বলিতে হয় এবং সময়ে সময়ে অতিরিক্ত রকম অঙ্গ-ভঙ্গীও করিতে হয়, যাহা সর্ব্বাংশে স্বাভাবিক নহে। কিন্তু ফিল্ম-অভিনয়ে এটুকু কৃত্রিমতারও স্থান নাই। ছবির পর্দ্দায় যাহা কিছু প্রতিফলিত হইবে তাহা হওয়া চাই স্বভাবত যেমনটি হয় ঠিক তাহারই প্রতিলিপি। নতুবা কামেরার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি এই কৃত্রিমতাকে বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়া সমগ্র অভিনয়টিকে হাস্যকর করিয়া তুলিবে। চিত্রাভিনয়ে এই স্বাভাবিকত্বের ব্যতিক্রম ঘটিলে উহাকে আমরা "মঞ্চ-ঘেঁষা বা "stagy" বলিয়া থাকি।

২। ষ্টেজের উপর অভিনেতারা যেভাবে চলাফেরা করেন, হাত পা নাড়েন বা রঙ্গ-

মক্কেলের নিকট হইতে নূতন করিয়া নির্দ্দেশ লইতে হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের মন্তব্য

ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার আদেশে বলেন,—অদ্য পুনরায় আবেদনকারিণী রাসমণির জেরা আরম্ভ হয়। কিছু সময় জেরা হওয়ার পর আদালতে একটা ঘটনা ঘটে। বিবাদী পক্ষের এডভোকেট মিঃ পাইন আবেদন-কারিণীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আবেদনকারিণী কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দেয়। অন্যান্য প্রশ্ন বুঝিতে তাহার কিছু কষ্ট হইতেছিল। কতকগুলি প্রশ্ন অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ছিল. যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল নিম্নে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

প্রঃ—গত শুনানীর দিনের জেরার পর তুমি কি উক্ত চিঠির বিষয় ভাবিয়া দেখিয়াছিলে ?

উঃ—আমি আপনার প্রশ্ন বুঝিতে পারিতেছিনা।

পুনর্ব্বার প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করা হয় এবং আবেদনকারিণী বলে, "চিঠিখানি আমার নিকট নাই উহার বিষয় আমি কি ভাবিব ভাবনা-টাবনা কি আমি কিছুই জানি না।"

"জেরার সময় মিঃ পাইন সব সময়ই ম্যাজিষ্ট্রেট যেন তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না, এইরূপ ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর দোষারোপ করিতেছিলেন। একবার তিনি বাস্তবিকই সাক্ষীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর প্রতি যেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন তাঁহার প্রতি সেইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন না। আমি তাঁহাকে ইহা বলি যে, আবেদনকারিণীর ন্যায় কোন নীচকুলোদ্ভবা ও অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক যদি তাঁহার প্রশ্ন বুঝিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহা আদালতের দোষ নহে। মিঃ পাইন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠেন ও অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকেন। ইহাতে একটা কুৎসিত ব্যাপারের সূচনা হয়। আমি তাঁহাকে আদালতের বিরুদ্ধে এরূপ হীন মন্তব্য প্রকাশ করিতে কিংবা এরূপ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ আচরণ করিতে নিষেধ করি। তাহাতে কোন ফল হয় না। তাঁহাকে শেষবারের মতো সতর্ক করিয়া দিবার প্রয়োজন হয় এবং তাঁহাকে ঐরূপ ভাবে সতর্ক করিয়া দিলাম। ইহাতে তিনি উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলেন 'আমি মামলার সংশ্রব ত্যাগ করিলাম' এবং এই বলিয়া তিনি আদালত ত্যাগ করেন।"

মঙ্গলবারে পুনরায় শুনানী উঠিবে।

মিঃ প্রকাশ ঘোষ এবং তৎসহ মেসার্স জে, বসু ও এস, সি, সেনগুপ্ত রাসমণির পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিঃ বি, পি পাইন এবং তৎসহ মিঃ এ, কে, ভাদুড়ী, এ, চক্রবর্ত্তী, ডি, এন, ব্যানার্জ্জি, এইচ, ডি মুখার্জ্জি ও এস, ব্যানার্জ্জি শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকারের পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মঞ্চ পরিক্রমণ করিতে করিতে কথা বলেন. স্বাভাবিক জীবনে মানুষ তাহা করে না। তাই ছবির পর্দ্দায় অঙ্গ-সঞ্চালনের এই বাড়াবাড়ি অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হয়। চিত্র-নাটকে মূলতঃ ক্যামেরার নির্দ্দেশ মানিয়া অভিনয় করিতে হয়। ক্যামেরার বিশেষ ধর্ম্ম অনুযায়ী drastic time limitation এবং space limitation-এর মধ্যে, স্বাভাবিকতা বজায় রাখিয়া ভাবাভিব্যক্তি এবং কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সংলাপের সাহায্যে অভিনয়-কলা প্রদর্শন করিতে হয়।

৩। ষ্টেজে পাঁচ-ছয় ঘণ্টাকাল যাহা মূলতঃ সংলাপ এবং নৃত্য-গীতাদি সংযোগে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনাদির দ্বারা সম্পন্ন করা হয়—তাহাই চিত্র-নাটকাভিনয়ে, মাত্র দুই ঘণ্টা-কাল মধ্যে, ছবির পর ছবি সাজাইয়া, ভাবাভিব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও কেবল মাত্র Effective dialogues-এর সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হয়। চিত্র-নাটকে, যেখানে একটি মাত্র কথা বলিলেই যথেষ্ট সেখানে বড় বড় বক্তৃতার স্থান নাই।

৪। ফিল্ম অভিনয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখের ভাব প্রকাশ করিতে হয় চোখের ভিতর দিয়া কেননা অত্যধিক মুখ-ভঙ্গী, ক্যামেরার দৃষ্টিতে অত্যন্ত কদর্য্য দেখায়। ষ্টেজ-অভিনয়ে দেহের মুখের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এমনিধারা কড়া নিয়ম নাই। এই দুটি বিষয়ে মঞ্চ-শিল্পী চিত্রাভিনেতা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীন। তাহা ছাড়া পাদপ্রদীপের আলোকে, চোখের ভাষা ভালরকম স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। কিন্তু ছবির পর্দ্দায় যন্ত্রের গুণানুযায়ী, মুখের বা চোখের যে কোন অভিব্যক্তিকে যতখানি ইচ্ছা বড় করিয়া, শোভন করিয়া প্রদর্শন করা চলে।

৫। মঞ্চ-নাটকে বহু চরিত্রের সমাবেশ করা চলে কিন্তু চিত্র-নাটকে তাহা করিলে উহার মাধুর্য্য নষ্ট হয়। "A plethora of characters is apt to be bewildering" (Talbot) একটি মাত্র চরিত্রের সাহায্যেও ছায়া-চিত্রে রস-সৃষ্টি করা যায়। Oliver Hardyর এক রীলের "টেলিফোন বিভ্রাট" এই শ্রেণীর উপভোগ্য কৌতুক-চিত্র।

৬। মঞ্চ নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই narration-এর সাহায্যে কার্য্য সমাধা করিতে হয়। চিত্র-নাটকে, যন্ত্রের কৌশলে, narration এর সঙ্গে সঙ্গে উহা পর্দ্দার গায়ে প্রতিফলিত করিয়া 'action' আকারে দেখানো হয়। মঞ্চে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। নায়ক তাহার পরিণত বয়সে, বাল্য-কালের কোন বিশেষ ঘটনার বর্ণনাকালে—উপযুক্ত shot-এর সাহায্যে সেই সময়কার impression পর্দ্দার গায়ে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করিতে পারে। গান গাহিবার সময়ও, কথায় সূত্র ধরিয়া, যথাযোগ্য insert দিয়া narrationকে সংক্ষিপ্ত বা হৃদয়গ্রাহী করা চলে। মঞ্চ-নাটকে, কেবল মাত্র
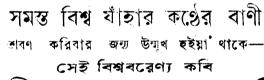
সাথী

শ্রীমতী কনকপ্রভা দেবী

ওগো, চির-জনমের চির-সাথী,
আমি তোমারি লাগিয়া যুগে যুগে ওগো,
সুরের মালিকা গাঁথি—
ওগো সাথী, চির-জীবনের, চির-জনমের,
চির-সাথী।

কভু আঁধার সাগর পারে লয়ে চল,
কভু ডুবাও আলোক ধারে,
মম জানা-অজানার মিলন মেশায়
মিশে যাও একাকারে—
আমি তোমারি লাগিয়া রাখিয়াছি মালা
নব নব সুরে গাঁথি—
ওগো সাথী, চির-জীবনের, চির-জনমের—
মম সাথী॥

—আদাব্—

শ্রীসুনীল কুমার দাশগুপ্ত

বক্ষে তোমার যে ব্যথা বয়, কবি,
জানি, ওগো, জানি আমি সবি।
দেখেছিলে প্রথম যেদিন
হাস্না-ফোটা-বাগে,
শুনেছিলে গানটী সেদিন
ভরা-অনুরাগে,
আজ কে তুমি সুর হারিয়ে
আঁক্‌ছো স্বপন্-ছবি।
"ঢালো, সাকী, ঢালো সুরা,
নেশায় মাতুক্ চিত্ত-সারা,
লওগো 'আদাব্' দিন দুনিয়া"
গাইছে ইরাণ-কবি॥

narration ছাড়া, বর্ণিত বিষয়ের পুনঃ প্রদর্শনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।

৭। চিত্রাভিনয়ে অভিনেতারা যন্ত্রের দাস। ক্যামেরার whims না মানিয়া রক্ষা নাই। রঙ্গমঞ্চে একটি দৃশ্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অভিনীত বিষয়ের continuity of thought ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই। চিত্রাভিনয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে এক একটি 'শট্' পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়। এদিক দিয়া মঞ্চে অভিনয় করা অপেক্ষা, স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখিয়া, চিত্রে অভিনয় করা দুরূহ ব্যাপার।

৮। ছায়া এবং কায়া—উভয়ের যে dimension গত পার্থক্য, third dimension বাদ দিলে, উহার কৃত্রিমতা পর্দ্দার গায়ে সহজেই ধরা পড়ে। মঞ্চে তাহা ঘটিবার উপায় নাই। তাই চিত্রাভিনয় মূলতঃ mechanical display ছাড়া আর কিছুই নহে তথাপি এই mechanical performance-এর সুযোগ এই যে ইহাতে সর্ব্বদা অভিনয়ের standard সমান থাকে। কিন্তু মঞ্চে তাহা কদাপি রক্ষিত হইবার উপায় নাই।

৯। উভয় শ্রেণীর অভিনয় ধারার মূল পার্থক্যগুলি নজরে রাখিয়া, প্রয়োজন অনুযায়ী মঞ্চ-নাটক ও চিত্র-নাটক বিভিন্ন পদ্ধতিতে রচনা করিতে হয়। একটি মাত্র প্রবন্ধে উভয় শ্রেণীর রচনা পদ্ধতির বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নহে। আমি উভয় শ্রেণীর অভিনয়ের কয়েকটি মূল পার্থক্য দেখাইয়া দিলাম মাত্র। "খেয়ালী"র পত্র লেখক মহাশয় ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে দুইখানি বাঙলা গ্রন্থের দুইটি অধ্যায় পড়িয়া দেখিতে পারেন। নিম্নে বর্ণিত পুস্তকের দুইটি অধ্যায়ে তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয়টি অধিকতর নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্থানাভাবে বা সময়াভাবে আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে পারিলাম না। পুস্তক দুইটি আমি পত্র-লেখক মহাশয়কে কয়েকদিনের জন্য পড়িতে দিতেও প্রস্তুত আছি।

(ক) শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অভিনয়-শিক্ষা" পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠায়, "শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর" লিখিত "ফিল্ম-অভিনয়" শীর্ষক রচনা।

(খ) শ্রীনরেন দেব প্রণীত "সিনেমা" নামক গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় "চলচ্চিত্রে অভিনয় প্রণালী"-নামক অধ্যায়।

ইহা ছাড়া নিম্নের কয়েকটি পুস্তকেও জিজ্ঞাসিত বিষয়টি অতি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে:

(ক) Screen Technique
by Frederick Talbot

(খ) Screen Acting
By Inez and Helen Klumph

(গ) Modern Theatres and Cinemas , By P. M. Sland

(ঘ) Photoplay Writing
By William Lord Wright
(Falk Publishing ; New York)

(ঙ) Photo Play Ideas
by Universal Scenario Co.
Hollywood.

(চ) The Art of Moving Picture
by V. Lindsay

(ছ) Practical Hints on Acting for the Cinema by Agnes Platt.

উপরের বইগুলি Newman and Co., M. L. Shaw এবং Photographic Stores and Agency Co Ltd. ও বোম্বে Taraporewalla and Sons এর দোকানে পাইবেন। উভয় শ্রেণীর অভিনয় ধারা এবং রচনা পদ্ধতির সম্পূর্ণ আলোচনা সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে, মাত্র একটি প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। আমার বিশ্বাস, পত্র-লেখক মহাশয় এই গ্রন্থগুলি যত্ন করিয়া পড়িলে অনেক বিষয় শিখিতে ও জানিতে পারিবেন।

Third Demension সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোন কিছুর আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। কারণ বর্ত্তমান সিনেমা-টেকনিক দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাহা অতি Modern, কাল তাহা Badly antiquated. তথাপি মঞ্চাভিনয় ও চিত্রাভিনয়ের মধ্যে স্থূল পার্থক্যগুলির আলোচনায়, Third Dimension, Futurism বা Cubism ইত্যাদির যোগাযোগ সন্ধান না করিলেও চলিবে।

কালী ফিল্মসের
আগামী শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর অমর-লেখনী প্রসূত

অন্নপূর্ণার মন্দির

পরিচালক: শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
আলোকচিত্র-শিল্পী: সুরেশ দাস
শব্দযন্ত্রী: জগদীশ বসু
দৃশ্য-সজ্জাকর: পরেশ বসু
শ্রেষ্ঠাংশে: ছবি বিশ্বাস, ফনি রায়, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জ্জি, বুলা, তারাপদ ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র মিত্র, জীবেন ঘোষ, মনোরমা, প্রভা, মায়া মুখার্জ্জি, সাবিত্রী, (পপ্পা) প্রকাশমনি প্রভৃতি অনেকে।

এইসঙ্গে শ্রীবীরেন ভদ্রের হাসির নক্সা

ভোট-ভণ্ডুল

পরিচালক: শ্রীজ্যোতিষ মুখার্জ্জী

শুভ-উদ্বোধন

উত্তরা

শনিবার—৬ই জুন '৩৬

বিবিধ

শিশিরকুমার ইনষ্টিট্যুট

আগামী ৪ঠা জুন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় রঙমহলে এরা যে একটি সাহায্য রজনীর সুন্দর আয়োজন করেছেন তার বিস্তারিত অনুষ্ঠানলিপি আমাদের হস্তগত হয়েছে। জানাতে আনন্দ বোধ করছি যে, এদের অনুষ্ঠানলিপির পরিচ্ছন্নতা আমাদের চমৎকৃত করেছে।

বর্ত্তমানে সাহায্য রজনীর নামে প্রায়ই যে সব জলসা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়; তার অনেক ক্ষেত্রেই (অবশ্য সব ক্ষেত্রে নয়) দেখা যায় যে—দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য উদ্যোক্তাগণ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এমন প্রবলবেগে শিল্পী সংগ্রহ করেছেন—যাতে এক মিনিট করে সময় দিলেও তাঁদের সকলকে গাওয়াতে প্রায় ঘণ্টা চারেক লাগে। রসোপলব্ধি চুলোয় যাক, সুস্থচিত্তে বসে দেখাই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। গান-বাজনা, নাচ, ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি মিলে এমন একটা হৃদয় বিদারক অবস্থার উদ্ভব হয় যে আনন্দ উপভোগের নামে অর্থব্যয় ব্যাপারটা তখন রীতিমত শারিরীক একটা ক্ষতির মত মনে হয়। এত কথা বললাম এই জন্যে যে শিশিরকুমার ইনষ্টিট্যুটের আয়োজিত আমোদ প্রমোদের তালিকা এ সবের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নীচে এঁদের এবারকার অনুষ্ঠানলিপি দিলাম। এর থেকেই বুঝতে পারবেন যে এদের শিল্পী-নির্ব্বাচনে কতখানি দক্ষতা এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির প্রভাব আছে।

নৃত্য—সুবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মণিবর্দ্ধন—তাঁর পরিকল্পিত প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য, বালিনৃত্য এবং মণিপুরী নৃত্যকলা প্রদর্শন করবেন।—

নৃত্য-শিল্পী মণিবর্দ্ধন

অর্কেষ্ট্রা—মণিবর্দ্ধনের সঙ্গে। নিয়ন্ত্রণ করবেন সুরেন্দ্রলাল দাশ।

সঙ্গীত—গীতশ্রী রেণুকণা মোদক, কুমারী আরতি দাস, পাহাড়ী সান্যাল ও মিঃ সাইগল।

যন্ত্রসঙ্গীত—তিমির বরণ ও অমিয়কান্ত (ভোম্বল) (যথাক্রমে স্বরোদ এবং সেতার)

(পাহাড়ী, সাইগল আর তিমিরবরণকে পাওয়া গেছে নিউথিয়েটার্সের সহৃদয় অনুমতিতে)।

তারপরে ইনষ্টিটুটের সভ্যেরা অভিনয় করেন অনিল ভট্টাচার্য্য ও বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের আধুনিকতম ব্যঙ্গ নাট্য—

—"অতি আধুনিক"—

এঁদের প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই আমাদের উপস্থিত থাকবার সুযোগ হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখেছি যে সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁদের অভিনয়-কুশলতা অসাধারণ।

এমন একটি সুন্দর সন্ধ্যা যাপনের সুযোগ আশা করি অনেকেই ছাড়বেন না।

কিশোর সঙ্ঘ

গত ২৬শে মে মঙ্গলবার কলিকাতার মেয়রের সভাপতিত্বে কেশব সেন ষ্ট্রীটস্থ "রাধা ভবনে" কিশোর সঙ্ঘে"-র বাৎসরিক মিলন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এই সঙ্ঘের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

তরুণ সম্প্রদায়

গত ২৪শে মে রবিবার কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের গৃহে তরুণ সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু ডি পি-পি, বি-এ, (ক্যাণ্টব) বার-এ্যাট ল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কাউন্সিলার ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কাউন্সিলার স্বর্ণকুমার বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তরুণ সম্প্রদায়ের সভ্যগণ কর্ত্তৃক ব্যায়াম-ক্রীড়া বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বিমল ব্যানার্জ্জীর 'ব্যালান্সি' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসুর আন্তরিক ও প্রশংসনীয় চেষ্টার ফলে ভবানীপুরে তরুণ সম্প্রদায়টি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হইতেছে।

শোক সংবাদ

বিগত ১৩ই মে বুধবার বেলা দুইটা পনর মিনিটের সময় কলিকাতা সার্ভে অফিসের একজন অবসর-প্রাপ্ত বিশিষ্ট উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুত সুরপদ রায়চৌধুরী তাঁহার বড়িশা বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৪ বৎসর ছিল।

সুরপদ বাবু জীবিতকালে বহুজনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সেও যেরূপ পেশীবহুল শরীর ছিল যৌবনেও অনেকের ওরূপ দেখা যায় না। তিনি বড়িশা 'কালিকিঙ্কর ছাত্র সমিতি'র একজন বিশিষ্ট সভ্য ও উৎসাহদাতা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও একটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

শ্রীযুক্ত গুণেন মুখোপাধ্যায়

বাসন্তী কটন মিলের সেক্রেটারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আলীপুরের অন্যতম অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

উজ্জ্বলকুমার মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ

গত ১০ই মে রবিবার তারিখে উক্ত কাপের ফাইনাল খেলা পুলিশ কোর্ট টেনিস ক্লাব গ্রাউণ্ডে হইয়াছিল। সুবৃহৎ মনোরম রৌপ্য কাপটি স্পেনের ভাইস-কনসাল শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস ঘোষ মহাশয় তাঁহার একমাত্র আদরের পুত্র উজ্জ্বলকুমার ঘোষের স্মৃতি-রক্ষার্থে পুলিশ কোর্ট টেনিশ ক্লাবকে দান করেন। সৌম্য দর্শন উজ্জ্বলকুমার নিজে একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন এবং খেলা-ধূলা ও ক্লাব পরিচালনায় তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। সর্ব্বজনপ্রিয়, সরল ও উদার উজ্জ্বলকুমার মহামান্য কাকিণা রাজার প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন। ফাইনাল খেলার দিন পুলিশ কোর্ট গ্রাউণ্ডটী সুসজ্জিত হইয়া মনোরম দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। মিঃ ডি, কে, দাস, কিশোরীমোহন সাহাকে ৬-১, ৬-২ তে পরাজিত করেন। ফাইনালে জয়ী হন। হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি অনারেবল এস, কে, ঘোষ আই-সি-এস সভাপতি হইয়াছিলেন ও অনারেবল এস, কে, সিংহ মহাশয়ের পত্নী প্রাইজ বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতায় চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল্ এস, কে, সিংহ মহাশয়, ডেপুটী কমিশনার ই হড্সন্ প্রভৃতি ভাল ভাল টেনিস খেলোয়াড় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

খেলার মাঠে

শ্রীএকলব্য

ইংলণ্ডে ভারতীয় দল

গেল হপ্তায় এম-সি-সির সঙ্গে খেলায় ভারতীয় দল ১০ উইকেটে পরাজিত হয়েছে। এই খেলায় প্রথমে ব্যাট করে এম-সি-সি দল ৩৮২ রাণ করে। এম-সি-সির পক্ষে ভাল খেলেছেন জে এইচ হিউম্যান ১১৫ রাণ, হেনড্রেন ৮৮ রাণ, আর ওয়াট ৬৫ রাণ, জি ও এলেন ৫৪ রাণ। ভারতীয় দলের পক্ষে ভাল বল দিয়েছেন সুটে বাঁড়ুয্যে ৭০ রাণে ৩ উইকেট, নিশার ৬৫ রাণে ২ উইকেট, জাহাঙ্গীর খাঁ ৮১ রাণে ২ উইকেটে, আমির ইলাহি ৪২ রাণে ২ উইকেট। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে করেছিল মাত্র ১৮৫ রাণ—ভাল খেলেছেন মুস্তাফ আলি ৪৭, এল অমরনাথ ৩৬ জাহাঙ্গীর খাঁ ৩০ (আউট হন নি) এবং সি কে নাইডু ২৪ রাণ। এম-সি-সির পক্ষে ভাল বল দিয়েছেন—সিমস্ ৬৪ রাণে ৩ উইকেট এবং এলেন ৩৪ রাণে ২ উইকেট। সুতরাং ভারতীয় দলের রাণ সংখ্যা তাদের চেয়ে ১৫০ রাণের বেশী কম হওয়ায় এম-সি-সি ভারতীয় দলকে "ফলো-অন" করতে বাধ্য করান। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে করতে পেরেছিলো মাত্র ২৩০ রান। ভাল রাণ করেন জাহাঙ্গীর খাঁ ৮০, সুটে বাঁড়ুয্যে ৪৭ (আউট হন নি)। ভারতীয় দলের দুই ইনিংসের মোট রাণের সংখ্যার চেয়ে এম-সি-সির রাণ কম ছিল ৩৩। এম-সি-সি দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে কেউ আউট না হয়ে ৩৬ রাণ করায় ভারতীয় দল ১০ উইকেটে পরাজিত হয়।

এই খেলায় এই রকম দারুণ পরাজয়ের কারণ ভারতীয় তরফে দুইজন ভাল খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি। প্রথমতঃ এম-সি-সির ব্যাট করার সময়ে মার্চেণ্ট ফিল্ড করতে গিয়ে ভয়ানক আঘাত পান। এই জন্যে ভারতীয় দলের দু ইনিংসের একবারও তিনি ব্যাট করতে পারেন নি। ভারতীয় দলের মধ্যে এবার যাঁরা বরাবর ভাল ব্যাট করেছেন মার্চেণ্ট তাঁদের মধ্যে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাটস্ম্যান। তাঁর অনুপস্থিতিই সব চেয়ে বেশী ভারতীয় দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিখ্যাত বিলাতী ক্রিকেট খেলোয়াড় মিঃ ডি আর জার্ডিন এই কথা সেদিন বলেছেন। তারপর এস, এম হুসেনের কথা। তিনি প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে গিয়ে আঘাত পেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে আর খেলতে পারেন নি। এই নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে জাহাঙ্গীর খাঁ এবং বাঙ্গলার সুটে বাঁড়ুয্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল করে খেলে ভারতীয় দলকে ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচান।

* *

এম-সি-সির সঙ্গে খেলার পর ভারতীয় দল লিষ্টারশায়ারের সঙ্গে খেলতে যান। খেলা মাত্র একদিন হবার খুব বেশী বৃষ্টি হওয়ায় খেলা বন্ধ হয়ে যায় এবং ম্যাচটিকে ড্র হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

* * *

তারপরে ভারতীয় দলের খেলা মিডল্‌সেক্সের সঙ্গে। এ খেলাতেও ভারতীয় দল পরাজিত হয়েছে—৪ উইকেটে। ভারতীয় দল প্রথমে ব্যাট করে সকলে মাত্র ১১০ রাণ করতে পেরেছিলেন। বিপক্ষদলের প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যা ১৭৩। তারপর ভারতীয় দল দ্বিতীয়বার ব্যাট করে রাণ তোলেন ১৫৮। দ্বিতীয় বারের ভারতীয় দলের খেলায় দলের নাম-করা বড় বড় ব্যাটস্ম্যানেরা প্রায় সকলেই কিছু খেলতে পারেন নি। কেবল মুস্তাক আলী এবং সুটে বাঁড়ুয্যে যা একটু কিছু করতে পেরেছেন। মুস্তাক করেছেন ৪৩ এবং বাঁড়ুয্যে ২৭ রান (আউট হন নি)। মিডলসেক্স দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ জন আউট হয়ে ৯৬ রাণ করার পর খেলা শেষ হয়। এই খেলাতে মিডল্‌সেক্সের প্রথম বারের খেলায় বাঁড়ুয্যে তিনটি উইকেট পান। এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৩ রাণ দিয়ে তিনি ২টী উইকেট পেয়েছিলেন। বিলাতী দলের প্রথম ইনিংস খেলায় ভারতীয়দের তরফে সব চেয়ে ভাল বল করেছেন—তরুণ পাঞ্জাবী খেলোয়াড় এল, অমরনাথ। তিনি ২৯ রাণ দিয়ে ৬টী উইকেট পান। তাঁর বোলিং বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় এই রকম :—

১৩·৫ ওভার,
৫ মেডেন,
২৯ রাণ,
৬ উইকেট।

আজ পর্য্যন্ত বিলেতে খেলায় ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা বল দিয়েছেন সব চেয়ে ভাল বোলিং গড়পড়তা হয়েছে অমরনাথের এই বল দেওয়া। এবার বিলাতে খেলতে গিয়ে অমরনাথ ব্যাট করার চেয়ে বল দিচ্ছেন ভাল।

কোলকাতার ফুটবল

গেল হপ্তার উল্লেখযোগ্য খেলাগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে মোহনবাগান বনাম ইষ্ট বেঙ্গল। এই খেলা দেখে আসার পর আমাদের মনে চিন্তা হয়েছিল যে মোহন-

বাগান তাদের পুরোনো নাম ভাঙ্গিয়ে আর কতদিন চালাতে পারবে। এই কিছুদিন আগেও যে মোহনবাগানের খেলা দেখার জন্যে মাঠে এক ইঞ্চিও জায়গা পাওয়া যেত না—তা সে খেলা যত বাজে দলের সঙ্গেই হোক না কেন—আর আজ মোহনবাগানের খেলা দেখার কথা উঠলে যেন শরীর অসুস্থ মনে হয়! মোহনবাগানের খেলা দেখতে মাঠে বড় জোর জন পঞ্চাশেক হাজির—একথা বললে কিছুদিন আগে এমন কি গেল বছরেও যে বলতো তাকে লোকে রাঁচির টিকিট কিনে দেবার জন্যে চাঁদা তুলতে উদ্যত হোত, আজ তাই হয়েছে একেবারে নির্মম সত্য। পুলিশ বনাম মোহনবাগান খেলায় কজন লোক গেছল একবার মনে করুন তো?

কিন্তু এমন কেন হয়? মোহনবাগানে খেলতে রাজী এমন খেলোয়াড় পাওয়া যায় না কি আজকাল? যাঁরা ইদানীং ক্লাবের উন্নতির জন্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে এসেছেন, যাঁরা হকি খেলা শেষ হবার আগেই বেরিয়ে যেতেন কোলকাতার বাইরে খেলোয়াড় অনুসন্ধান করতে তাঁরা কি এই কথাই আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন?

আজকের মোহনবাগানে যারা বড় খেলোয়াড় বলে পরিচিত তাঁদের সত্যিই 'বড়' খেলোয়াড় বলে পরিচয় দেওয়া চলে কি না তা ক্লাবের কর্ত্তাদের একবার বেশ ভাল করে ভেবে দেখা বিশেষ দরকার। এই 'বড়' খেলোয়াড়রা তাঁদের মিথ্যা গুমরে এমনই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকেন যে মাঠে খেলতে নেমে তাঁরা শুধু দর্শকদের হাসির উদ্রেক করেন—আর কিছু নয়। আর পুরোনো দিনের কথা যাদের মনে পড়ে যায় অনুকম্পাও বোধ হয় তারা অনুভব করে একটু—সেদিন আর আজ! এই সব 'বড়' খেলোয়াড়রা মাঠে খেলতে নেমে ক্লাবের ওপর, বোধ হয় দর্শকদের ওপরও খানিকটা—দয়া করে যেন একটু নড়াচড়া করেন। কেউ বল পাশ করে দিলে যদি তাঁরা দেখতে পান যে দু হাত ছুটে গিয়ে বল ধরতে হবে, আর তাঁদের দ্বারা কিছু হয় না। এই রকম অমার্জ্জনীয় শৈথিল্যের পরিচয় এরা কি ইচ্ছে করেই দেন, না তাঁদের জীবনে অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত? অবিশ্যি আমরা বিশ্বাস করিনে যে তাঁরা ইচ্ছে করে এমন গাফিলতী করেন।

ক্লাব কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে একটু মনোযোগ আকৃষ্ট হলে আমরা খুসী হব। ইষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় সেই শোচনীয় পরাজয়ে মোহনবাগান সম্বন্ধে আমাদের মনে যে কথাগুলি আঘাত করেছিলো—আমরা এখানে সেই কথাই মাত্র লিপিবদ্ধ করলাম।

• • •

গেল হপ্তার খেলাগুলির ফলাফল নীচে দেওয়া হোল :—

বুধবার

মোহনবাগান—এ্যাটাচড সেকসন	১—০
মোহামেডান—ই, বি, আর	০—০
এরিয়ান্স—ডালহাউসী	২—০

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স
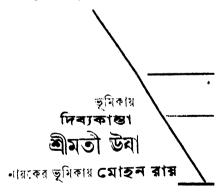
প্রমথেশ বড়ুয়ার "গৃহদাহ" মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। সংস্কৃত 'চিত্রা'য় "গৃহদাহে"-র আগুনের ফুল্‌কি দেখাবার জন্যে লোকদের ছোটাবে শিগ্‌গির। বড়ুয়ার তোলা ছবি সবাই দেখ্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তাই 'চিত্রা'-য় লোকে ছবি দেখ্‌তে এলেই শোনা যায়—"হ্যাঁ, মশাই আপনাদের "গৃহদাহ" কবে আস্‌চে?"

* * *

বড়ুয়া এখন শ্রীসুকুমার দাশগুপ্তের "পরজন্ম" ছবি তুলছেন হিন্দীতে লাহোরের কোনও 'ইউনিটে'-র হ'য়ে এ খবর আমরা আগেই দিছ্‌লাম। সম্প্রতি ছবিখানার শুটিং সুরু হয়েছে আর শোনা যাচ্ছে এখানা হিন্দী ও বাঙ্‌লা দু' সংস্করণেই তোলা হবে। বন্ধু সুকুমারের গল্প-লেখার মুনশিয়ানায়, বড়ুয়ার পরিচালনার কৃতিত্বে আর নিউ থিয়েটার্সের শিল্পিগণের সমবেত চেষ্টায় ছবিখানা যে বাঙ্‌লা চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ-পথে আলোর সন্ধান দেবে—একথা বলাই বাহুল্য।

* * *

শোনা যাচ্ছে নীতীন বসু নাকি তার ছবির নাম আপাততঃ রেখেছেন "দিদি"। কুলি মজুর সংক্রান্ত ব্যাপারটি গত হপ্তা থেকে বাসন্তী কটন মিলে তোলা হ'চ্ছে।

নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

নিউ থিয়েটার্সের বি ইউনিট ষ্টুডিওতে এদের "বিজয়া"-র শুটিং খুব জোর চলেছে।

কালী ফিল্মস্

আস্‌চে ৬ই 'উত্তরা'য় কালী ফিল্মসের নতুন ছবি "অন্নপূর্ণার মন্দির" মুক্তিলাভ কোরবে। এর গল্প, এর শিল্পীরা ছবিখানার অভিনবত্ব; তাই মনে হয় "অন্নপূর্ণার মন্দির" এখানে বহুদিন চলবে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

মিঃ স্পেণ্টার পরিচালনায় এদের পারস্য সবাক্-চিত্র "লয়লা-মজনু" প্রায় শেষ হ'য়ে এল। এতে কারা নামছেন তা' নীচে দেওয়া হ'ল।

লয়লা—শ্রীমতী ভাজিরি, মজনু—স্পেণ্টা, রাজপুত্র—শিরাজী, লয়লার বাবা—আবেদ, সাধু—এম, এরিয়ান্, লয়লার মা—মিসেস্ মার্কার, মজনুর বাবা—মহম্মদ হোসেন।

এই পারস্য ছবির কতকাংশ দেখে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' সম্পাদক মিঃ আর্থার মূর এই ছবির প্রযোজক ও পরিচালককে বিশেষ প্রশংসা করেন।

চন্দ্র ফিল্মস্

এদের "পরপারে" 'চিত্রা'য় মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। যতীন দাসের পরিচালনায়, কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গীত পরিচালনায়, প্রবোধ দাসের আলোক-চিত্রে, জ্যোতিষ সিংহের শব্দ-গ্রহণে সর্বোপরি বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে ছবিখানা যে সবায়ের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে—একথা বলাই বাহুল্য।

পপুলার পিক্‌চার্স

যামিনী মিত্তির পুরী থেকে ফিরে এসেই "পণ্ডিত মশাই" তোলা সুরু কোরবেন।

"উত্তরা"

এখানে আস্‌চে হপ্তা থেকে টারজনের নতুন ছবি "নিউ এ্যাড্‌ভেঞ্চার্স অফ টারজন" দেখানো হবে। টারজন-ভক্তরা এই ছবিখানা দেখে খুসী হবেন এ কথা বলা যায়।

শ্রীমতী সাধনা বসু

হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়াতে শ্রীমতী বসু বাড়ী থেকে তাই বেরুতে পাচ্ছেন না। ফারপোর আয়নার মত আবহাওয়ায় তাঁর নীল জর্জ্জেট্ তাই নেচে আর বেড়ায় না। বাজনা বাজে, কিন্তু, কোনো বিশেষ টেবিলের নীচে, কোনো চেনা হাই-হিল্ পা,—তার তাল ফেলা গেছে থেমে।

আমরা খুবই আশা করছি—শ্রীমতী বসু খুব শীগগিরই তাঁর পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। আবার সেই আয়নার মত আবহাওয়ায় উড়বে তাঁর শাড়ী; বাজবে বাজনা, আর নাচবে—সেই হাই-হিল্ চেনা পা।

ডি-জি-টকীজ

এদের প্রথম ছবি "দ্বীপান্তরে"র শুটিং জোর চলেছে। কয়েকদিন আগে 'শ্রী' চিত্র-গৃহে এদের ছবির মঞ্চের একটি দৃশ্য খুব জাকজমকের সঙ্গে শেষ হ'য়েছে। এই ছবিতে দশ বছরের ছেলে মাষ্টার রূপলাল বাদলের ভূমিকায়। সুন্দরী উষা ও সুন্দর মোহন খুব ভাল অভিনয় কোরছেন। পরিচালক ডি-জি ও ব্যবস্থাপক মণিকুণ্ডের অদম্য প্রচেষ্টা সফলকাম হ'ক, এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

বৃহস্পতিবার

ক্যালকাটা—কালীঘাট	০—০
কাষ্টমস্—পুলিশ	৩—১

শুক্রবার

মোহামেডান—ব্ল্যাকওয়াচ	৭—১

শনিবার

ডালহাউসী—ক্যালকাটা	১—০
কাষ্টমস্—এ্যাটাচড সেকসন	১—০
ইষ্টবেঙ্গল—মোহনবাগান	৪—০

সোমবার

মোহনবাগান—পুলিশ	১—০
মোহামেডান—ক্যালকাটা	৩—০
ই, বি, আর—কাষ্টমস্	১—০
এরিয়ান্স—কালীঘাট	১—১

মঙ্গলবার

ডালহাউসী—কাষ্টমস্	১—১
ব্ল্যাকওয়াচ—এ্যাটাচড সেকসন	৩—২

চলা-পথের মাঝে

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

চ……১টা বাজল, আর চলতে পারচি না, সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহটা একটু বিশ্রামের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেচে,…… এক ঝলক শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া আমায় কাঁপিয়ে দিলে……রাত্রির গভীরতা বেড়েই চলল,……জন-মানব-শূন্য পথে নিশাচরের মত ঘুরচি, পাশ দিয়ে একটা মোটর চলে গেল, দেখি এক তরুণী পাশের তরুণটীর বুকে মাথা রেখে কত কি বলে চলেচে…… হয়তো তাদের জীবনের বিচিত্র স্বপ্ন! একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মাঝ হতে বেরিয়ে এল…… মাথাটা ঝিম ঝিম করচে; দুহাত দিয়ে চেপে চললুম, ……এ চলার পথের শেষ কোথায়?

আমারই এই দেহ! অথচ আজ যেন সব বিদ্রোহ সুরু করেচে, কোন কথাই আর শুনবে না……চার দিন অনাহারী—শরীরটা আর বইতে পারচি না, তবু টলতে টলতে এগুতে হোল, সামনের কল থেকে খানিকটা জল খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করলুম,……

আর পারচি না, ঠাণ্ডার আধিপত্য যেন বেড়েই চলেচে……

একটা বারেণ্ডার কোণে খবরের কাগজ পেতে শুয়ে পড়লুম……ভগবান! আমায় যদি এই পৃথিবীতে জন্মই দিলে, তবে মানুষের নাম দিয়ে এত বড় অভিশাপ আমার মাথায় তুলে দিলে কেন? আজ যদি তুমি পশুত্বের মাঝে সৃষ্টি করতে, তা হলে হয়তো এই হীন স্বার্থপরতার পাপ হতে মুক্তি পেতাম।

আবার আমরা এই মনুষ্যত্বের গর্ব্ব করি… আমারই মত দিনের পর দিন কেউ উপোষ দিচ্চে, আর কেউ বা সস্তায় খবরের কাগজে বেকার সমস্যার সমাধান করছেন……এখন তাই ভাবি, এই সব আশার কুহকে না পড়লে হয়তো দুমুটো অন্নের সংস্থান হোত…… এই তো আমার বি, এ পাশ করার গৌরব। পাশ করে ভাবলুম একটা চাকরী বাকরি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো……সবই ভোঁয়া……তার চেয়ে মুর্খ হয়ে থাকলে, আজ এতো সঙ্কোচ আসতো না……যা করে হোক দুমুটো খেতে তো পেতুম। শিক্ষার গর্ব্ব নিয়ে পশুর চেয়ে অধমভাবে বাঁচতে হোত না……এই তো শিক্ষা! এক একবার ভাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলি এই হীন শিক্ষার মোহ মুছে ফেলে…সকলের সামনে তার মুখোস খুলে কদর্য্য নগ্ন দাসত্বের মূর্ত্তি তুলে ধরো, ডিগ্রীর মোহে আর যেন কেউ না ভোলে!…

* * *

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, চেয়ে দেখি এক ঝলক রৌদ্র আমার গায়ের উপর এসে পড়েচে……যেন সন্তান হারা মা, ফিরে পাওয়া সন্তানের উপর তাঁর স্নেহ বুলিয়ে দিচ্ছেন…ভারি আরাম লাগছিল, কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলুম না, উঠতে হোল…দু'চার পা যেতে না যেতেই মাথাটা ঘুরে উঠল…ফুটপাতের ধারে বসে পড়লুম।…সামনে দিয়ে একটা ছোট মেয়ে, খাবার কিনে আনন্দে নাচতে নাচতে চলেছিল,…ওই খাবারের গন্ধ আমায় যেন পাগল করে তুললে। একবার হয়তো মনের মাঝে একটু দ্বিধা এল……আমি উন্মত্তের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম……

মেয়েটীর আর্ত্তস্বরে অনেক লোক জমে গেল। তারা আমায় আচ্ছা করে মার দিয়ে বললে, ব্যাটা বদমাস ফের যদি বিট্‌লেমো করেচো তো শ্রীঘর পাঠিয়ে দেবো…হাঃ হাঃ করে হেঁসে উঠলুম। সকলে সভয়ে সরে গিয়ে বললে, ব্যাটা পাগোল…...আবার চলতে সুরু করলুম,……অপেক্ষাকৃত একটু নির্জ্জন যায়গায় বসে ডাইরীখানা খুলে ধরলুম।

* * *

আজ খুবই খাওয়া হয়েছে।……আসতে আসতে দেখি একটা ডাষ্ট-বিনে সামনের বাড়ী থেকে এঁটো লুচি তরকারি, ভাঙ্গা খুরি আর কলাপাতা ডাঁই করে ফেলচে… …গোটা কতক কুকুর উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল,…তাদের তাড়িয়ে বেশ করে খেয়ে নিলুম। এই খাওয়ার আস্বাদ যেন ভুলেই গিচলুম…কুকুর গুলোর দিকে চেয়ে দেখি, ওরা আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে…মনে মনে বললুম, বন্ধু তোমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েচি বলে, একেবারে হতাশ করবো না…ওরা যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল…

আনন্দে গাইতে গাইতে আশ্রয়ের সন্ধানে চলেচি। শীতের প্রকোপটা আজ একটু কম, দখিনের ফুর ফুরে হাওয়া যেন বসন্তের আগমন বার্ত্তা জানিয়ে আমার মনের মাঝে এক অতীত স্বপ্নের শীহরণ এনে বিচিত্র রঙ্গে রঙ্গিয়ে তুললে……সেই অতীতের সুখ-স্মৃতি এখন আমার এই চলার পথের একমাত্র পাথেয়!……

পাশ দিয়ে কত তরুণ তরুণী অবাধে বেয়ে চলেছিল, তাদের সেই শাড়ীর খস খস শব্দ আর সেন্টের তীব্র গন্ধ আমায় বিহ্বল করে দিল,…………এক খানা মোটর উল্কা গতিতে আমার উপর এসে পড়ল।……ক্ষণিকের জন্য একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলুম……

ওঃ……মাগো!

জ্ঞান হয়ে দেখি এক অপূর্ব্ব তরুণীর ব্যাকুল আঁখি আমার পর ন্যস্ত হয়ে রয়েচে।......আমায় চাইতে দেখে, সে ঝুঁকে পরে জিজ্ঞাসা করলে,......কিছু খাবেন... একটা দুর্ব্বলতা আমায় আচ্ছন্ন করে ফেললে, চুপ করে রইলুম......খানিক বাদে এক যুবকের স্বর কানে এল।......জ্ঞান হয়েচে নীতা?

হাঁ, এইমাত্তর চেয়েছিলেন......ডক্টর রায়কে কি ফোন করেচ।

সকালেই করেচি···এসে পড়লেন বলে।

আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম এ কোথায় রয়েচি, কিন্তু সবই যেন এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছে......কিছুই মনে করতে পারলুম না।

ডক্টর রায় এসে বললেন, আর কোন ভয়ের কারণ নেই, তবে খুবই দুর্ব্বল, একটা ইন্‌জেকসন দিয়ে যাচ্ছি, কি রকম থাকেন বিকেলে খবর দেবেন......হাঁ! আর দেখবেন পেসেণ্টকে এখন যেন কোন রকমে ডিসটার্ব করা না হয়।

খানিক পরে বেশ সুস্থ বোধ করলুম...... তরুণীর দিকে চেয়ে বললুম, কিছুতো বুঝতে পারচি না। আমি আপনাদের এখানে কি করে এলুম...কিন্তু তখনই সেই এক্‌সিডেণ্ট-এর কথা মনে পড়ে গেল···ওঃ!

সে তখন বলে চলেচে···সেদিন ওঁকে সরিয়ে দিয়ে ড্রাইভ করতে লাগলুম, ফাঁকা রাস্তা হু হু করে চলেচি, হঠাৎ আপনি সামনে পড়লেন...এত নার্ভাস হয়ে গেলুম যে কি করব কিছু ঠিক করতে পারলুম না,.....আপনার সেই অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেছিলুম......উঃ! সেই থেকে কি করে যে সময় কেটেচে তা ভগবানই জানেন।

বললুম—হসপিটালে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, তা'হলে মিছি মিছি এই কষ্টটা ভোগ করতে হোত না।

কি যে বলেন তার ঠিক নেই, আমার জন্তেই তো আপনার এই অবস্থা...একটু থেমে, আমার দিকে চেয়ে বললে, একটা অন্যায় করে ফেলেচি, আপনার ডাইরীখানা না বলে পড়েচি......আচ্ছা আপনি এই রকম কষ্ট করেন কেন......মা কি বোন থাকলে এরকম করে বেড়াতে পারতেন না··· আমরা কিন্তু আপনাকে আর যেতে দেব না।

এমন সময় সেই যুবকটী···মোহিত বাবু ·· ঘরের মধ্যে এসে বললেন, নিশ্চয়!···আমরা যেতে দিলে তো যাবেন, আর আমাদের পর ভাবচেন কেন। মনে করুন এ আপনার এক বোনের বাড়ী।

বললুম···বোনের স্নেহ কি রকম তা জানি না, তবে আপনাদের কাছ থেকে যা পেলুম তা জীবনেও ভুলব না।......

মনে মনে বললুম, ভগবান তোমার এ খেলা বোঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে, কোথা থেকে কাকে এনে যে তুমি মেলাও তা একমাত্র তুমিই জান।......

• • •

এখন আরোগ্যের পথে অনেকটা এগিয়ে চলেছি, দিন গুলো অনিতা ও মোহিত বাবুর সঙ্গে গল্প গুজব করে বেশ কেটে যাচ্ছিল... বিকালে চা খেয়ে কোন কোন দিন অনিতার সঙ্গে বেড়াতে বার হতুম, ও' যেন হীম গিরির তুষার শিখরের কুয়াসা-বৃত এক ঝলক সূর্য্যের কিরণ···স্বপ্নের আবরণ দিয়ে কে যেন ওকে গড়ে তুলেচে, তাই এখনও ওর চোখে স্বপ্নের রেশ লেগে' রয়েচে···যেন এ পৃথিবীর কোন কিছুই ওকে স্পর্শ করতে পারে না......

কিন্তু ওর সংস্পর্শ···আমায় মাতাল করে তুললে। একটা বিশ্বগ্রাসি যৌবনের ক্ষুধা আমার মাঝে লেলিহান শিখা বিস্তার করে বসল,··· ··এক এক সময় মনে হয় ওর ওই বাইরের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দেখি' এই বিশ্বের নরের কি কৌতুহল নারীর মাঝে লুকান আছে···আবার ভয় হয় পাছে এই স্নেহ ভালবাসা হারাই···না না···ওর ওই সরল বিশ্বাসের মাঝে আমার অন্তরের এই তীব্র আঘাত দিতে পারব না......ও যে বড় নরম, আমার এ আঘাতে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে......নিঝুম রাত্রের কালো আবরণ আমায় গ্রাস করে ফেললে...

না! আমায় এই স্নেহ নীড় ছেড়ে চলে যেতে হবে।···নিজের উপর আর বিশ্বাস রাখতে পারচি না......অনিতার সামনে শয়তানের মনোবৃত্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারব না। আজই যেতে হবে। এর পর যদি আবার আমায় দুর্ব্বলতা আচ্ছন্ন করে···তখন কি আর যাওয়া হবে।

আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়ালুম...... ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে সুরু হয়েচে··· ওদের জানলার দিকে চেয়ে বললুম, বোন! দেবতার ফুঁল দিয়ে কি শয়তানের পূজো হয়......তাই আজ তোমাদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে চলার পথের সাথী হতে চলেচি......বিদায় দিদি! বিদায়···তোমার এই হতভাগ্য অধম ভাইটীকে ক্ষমা কোরো।

পুব দিকে ঊষার আলোক সবে ফুটে উঠেচে।......শিশির ভেজা পাতার দুফোঁটা জল আমার পর পড়ল, যেন আঁধার রাণীর বিদায় বেলায় ঝরে পড়া দু'ফোঁটা অশ্রু!

মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার

—প্রতিবাদ ও সমর্থন—

বিগত দুই সংখ্যার "খেয়ালী"তে প্রকাশিত "মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার" এবং তাহার উত্তরস্বরূপ "প্রগতির প্রতি ভেংচী" প্রবন্ধ পড়িয়া বুঝিলাম, শ্রীযুক্ত প্রভাত কিরণ বসু এবং শ্রীযুক্ত শান্তিরাম উপাধ্যায় উভয়েই ভেংচীকর্ত্তনশিল্পে পটীয়ান, এবং এই সাহিত্যিক ভেংচী-প্রতিযোগিতার উপলক্ষ্য মোহিনী রমণীজাতি। পাঠকেরা জানেন মোহিনী রমণীকে উপলক্ষ করিয়াই সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব এবং দেবাসুরের অমৃতভক্ষণ-ঘটিত কোন্দল বাঁধিয়াছিল। এই উভয় ব্যাপারের ফলের কথা মনে করিয়া বসু-উপাধ্যায় দ্বন্দ্বের ফলাফল লইয়া যাঁহারা মানসিক অস্বস্তি ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হউন যে এটা সত্যযুগ নয়, যে তর্কের ফলে কাহারো ভুঁড়ি ফাঁসিবে। আর আলোচনা যখন নারীজাতি লইয়া, তখন ইহা অবিসম্বাদীভাবে সত্য যে, আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তর্ক করিয়া এবং তর্ক শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবে। সুতরাং হে রসিক পাঠক, আসুন আমরাও তর্কে প্রবৃত্ত হই। এ তর্কের ফলে "খেয়ালী"-চক্রের রস-চিক্কণ আইবুড়োদের নারীলাভ হইবে কিনা জানিনা—কারণ, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"—তবে আমাদের এবং তাঁহাদের পারস্পরিক আনন্দবিধান হইবে, একথা নিশ্চয়।

প্রথমে ধরা যাক্ শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধের কথা। প্রভাত-কিরণের দীপ্তিচ্ছটা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার মেঘাবৃত

"কত কেরামৎ জানো রে—"

* শ্রীজয়ন্ত উপাধ্যায়

বলিয়া মনে হইল। আমাদের গ্রামের হারুখুড়ো বড় ডাকসাঁইটে সমালোচক ছিলেন। গ্রামে এমন কিছু ঘটিতে পারিত না যাহা তাঁহার সমালোচনার কশাঘাত-ব্যথিত হইত না। একবার একটী ছেলে

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিল, গ্রামশুদ্ধ লোক ছেলেটীর প্রশংসায় শত মুখ। শুধু হারুখুড়ো মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "হুঁ, ভারী তো! তবু তো কুড়ি টাকা পায় নি!" আমাদের প্রভাত বাবুও ওই "কুড়ি টাকা পায়নি" দলের ক্রিটিক্ বনিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে আদর্শ ও কর্ম্মের মধ্যে এক চুলের ব্যবধানও ধরা পড়ে, এবং এই ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁহার কাছে অসহনীয় বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের মেয়ে জাতির

প্রগতির মধ্যে বহু খুঁত আছে, বহু অসম্পূর্ণতা আছে, বহু বহু ত্রুটি আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু জীবনে শিক্ষা ও স্বাধীনতার সূর্য্যালোক আমদানী করিবার জন্য মেয়েজাতিটাই কি অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছে, তাহা প্রভাতবাবুর সন্ধানী চক্ষুর দৃষ্টি এড়াইল কেমন করিয়া? একশত বৎসর আগেও প্রভাতকিরণ বাবু এবং বর্ত্তমান লেখকের পূর্ব্বপুরুষেরা বাঁশে চাপিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া সদ্য বিধবাদের আগুনে পোড়াইয়া মারিতেন, সে কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? আমরা পুরুষজাতি নারী জাতিকে কবে কতটুকু স্বাধীনতা দিয়াছি? কবেই বা তাহাদিগকে নিতান্ত নাবালকদের মত দায় ছাড়া অপর কিছু বলিয়া মনে করিয়াছি?

বর্ত্তমানে মেয়েরা পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা স্বাধীনতা পাইয়াছে, সে-কথা সত্য। এবং এ-স্বাধীনতার যেটুকু প্রভাতবাবু দেখিয়াছেন, তাহা যে তাঁহার পছন্দসই নয়, তাহা তাঁহার সরস শ্লেষ-রচনায় প্রকাশ। কিন্তু যে স্বাধীনতাটুকু আমরা নারীকে দিয়াছি, তাহা আসলে কতটুকু, এবং সেই ক্ষুদ্রাংশটুকুই বা আমরা কেন দিয়াছি, সে কথা তো ভাবিয়া দেখা হয় নাই। আসল কথা হইতেছে এই যে, নারীদের প্রগতির অনেকখানিই হইতেছে আমাদের ডিক্‌টেশনে, আমাদেরই অবিশ্রাম চেষ্টার ফলে। আমরা চাই আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের আরামটাকে গাঢ়তর করিয়া উপভোগ করিতে, স্ত্রী-কন্যাকে

সাজাইয়া-গুজাইয়া, স্মার্ট করিয়া, তাহাদের কোমল মুখে কায়দাদুরস্ত ইংরাজী কথার কলম লাগাইয়া দশজনের কাছে বাহবা পাইতে। আমরাই চাই বিলাত ফেরত বড়লোকের ছেলেকে জামাই করিবার আশায় মেয়েকে দিয়া "স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে বিলিতি ধরণের "হলে" (হলটা কি মেয়ের নিজের তৈরি, না তার বাপের তৈরি?) চায়ের টেবিলে গিয়ে চা-টোষ্ট খেতে খেতে ন্যাকা ন্যাকা কথা আর গল্প" বলাইতে। নহিলে মেয়ের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য থাকিত জীবন ভোর ন্যাকামো করিয়া চলিতে?

"মধ্যবিত্ত" ঘরের মেয়েরা বাঙ্গালী ছেলেদের পছন্দ করেনা, সিংহল বা সিন্ধুদেশবাসী যুবকের প্রতি আসক্ত হয় এবং "হিন্দুর চেয়ে অহিন্দুর প্রতিই বেশী অনুরাগ" দেখায়—ইত্যাদি কথার অবতারণা করিয়া প্রভাতবাবু অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উক্ত ব্যাপার লইয়া অনেকখানি শ্লেষ করিতেও ছাড়েন নাই। প্রভাতবাবুর কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তিনি কবিলোক, মানসিক উত্তেজনার মুহূর্ত্তে নব নব কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উপরোক্ত উদাহরণটীও তাঁহার এই ফেনিলোচ্ছল কল্পনাশক্তিরই পরিচয়। যদি কোন মহিলা প্রভাতবাবুর এই একান্ত কাল্পনিক সত্যলেশমাত্রহীন অভিযোগে বিচলিত হন, তাহা হইলে তিনি এই কথা ভাবিয়া দুঃখ দূর করুন যে, কল্পনার আতিশয্যে প্রভাতবাবুর সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, তাই তিনি মেয়েদের উপরে তাঁহার হিন্দুত্বের আক্রোশ ঝাড়িয়াছেন। প্রভাতবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, মেয়েরা বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর ছেলেকে কি দেখিয়া পছন্দ করিবে?

"এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।"

চায়ের দোকান যাহাদের পার্লামেণ্ট, মার্চ্চেণ্ট অফিস যাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র, গুষ্টিশুদ্ধের সেবা-তদ্বিরের জন্য যাহারা "দাসী" আনিতে চায়, তাহাদিগকে কে চায়? বাপের কন্যাদায়, নিজের অন্নদায়, এ নহিলে অজীর্ণ-ক্লান্ত কাপুরুষ তাম্বুলবিলাসী অপদার্থদের "অভিলাষ" করিবে কে? ত্রিশ মুদ্রা আয় করিয়াও যাহাদের বাটা ভরিয়া প্রত্যহ পান খাইবার সঙ্গতি হয়, বায়োস্কোপে গিয়া অভিনেত্রীর অঙ্গ-সৌষ্ঠব-সুধা চক্ষু ভরিয়া পান করিবার পয়সা জোটে, কিন্তু স্ত্রীকে, মাকে, বোন্‌কে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে, একখানা পছন্দসই বই বা সাড়ী কিনিয়া দিতে বা তাহারা রোগে পড়িলে চিকিৎসা করাইতে ধর্ম্মে বাধে, সেই স্বার্থসর্ব্বস্ব অসভ্যদের সাদা চোখে পছন্দ করিবে কোন কাণ্ডজ্ঞানহীনা? অহিন্দুর সমাজে চলিবার ফিরিবার বেশী স্বাধীনতা আছে, আর আছে খানিকটা আর্থিক স্বাধীনতা। অহিন্দুকে অভিলাষ করিলেও বা কি অন্যায়? বরঞ্চ এই সব অপদার্থ অকালকুষ্মাণ্ডদিগকে যাহারা প্রাণ দিয়া সেবা করে, মন দিয়া স্নেহ করে, যাহারা তিলে তিলে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া যৌবনের মধ্যাহ্ন দিনে সুখলেশহীন পৃথিবী হইতে বিদায় লয়, তাহাদের ধৈর্য্য, তাহাদের সংযম, তাহাদের নিষ্ঠার প্রশংসা করাই উচিত। "নারী নিজে মানুষ হ'ল না"—হায় প্রভাতবাবু, নারীর জীবনের ভার যাদের উপরে, যাহারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নারীর অন্নবস্ত্রের কর্ত্তা হইয়া তাহাদিগকে ক্রীতদাসী করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই বা কতটুকু মানুষ হইয়াছে?

কিসের এত অহঙ্কার, দম্ভ নাহি সাজে!
বরং থাকো মৌন হ'য়ে সসঙ্কোচ লাজে!

কল্পনাপ্রবণা কিশোরীরা মনে মনে তিলোত্তম আদর্শপুরুষকে প্রার্থনা করে, ইহার মধ্যেও প্রভাতবাবু একটা হতাশ হইবার মত মস্‌লার সন্ধান পাইয়াছেন। ইহাকেই বলে শাঁখের করাত! প্রভাতবাবু "গডাচরচন্দ্রের" মত "ডুড-"ও খাবেন, "টম্বাক্‌-"ও খাবেন। রোমান্স আদর্শ নয় কাহার? কলেজে-পড়া ভবিষ্যজ্জীবনের কেরাণী কোন্ ছেলেটী না মেসে বসিয়া খাতায় পদ্য লেখে—"কে আমারে করেছে পাগল? শূন্যে কেন চাই আঁখি মেলে—যেন কোন্ উর্ব্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে!" প্রভাতবাবু নিজেই কবি, ভবিষ্য-গৃহিনীর উদ্দেশ্যে যে সব প্রশস্তি রচনা

করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু মাসিক পত্রিকাদির শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। দেখা যায়, এ রোগ তাঁহারও আছে—খুড়ি, ছিল। থাকিয়া থাকিলে লজ্জার কিছুই নাই। আমারও ছিল, শান্তিরামবাবুরও ছিল কিম্বা আছে, পৃথিবীশুদ্ধ সকলেরই সকল যুগে আছে।

প্রভাতকিরণবাবু আশা করি রাগ করিবেন না। প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়া বা কোন "গভীর সমস্যার উদ্ভব" করিবার উদ্দেশ্য লইয়া লিখিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি চাহিয়াছিলেন "স্মার্ট" হইতে, চোথা চোথা বাক্য-বিন্যাসে মুগ্ধ শ্রোতার আনন্দিত করতালি কুড়াইতে। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়ের প্রবলতা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার মধ্যে বহু অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয় কথার অবতারণা করা হইয়াছে। এমন করিয়া চিমটি কাটিয়া চটাইবার প্রয়োজন তাঁহার মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখকের হওয়া উচিত হয় নাই।

প্রভাতকিরণবাবু আধুনিক মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া যে-ভেংচী কাটিয়াছেন, আমার অপরিচিত জ্ঞাতি শান্তিরাম উপাধ্যায় মহাশয় প্রভাতবাবুকে সেই ভেংচী সুদশুদ্ধ ফিরাইয়া দিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। সাহিত্যের বাজারে ভেংচী কাটার মত এমন উপাদেয় জিনিষ আর কিছুই নাই—অবশ্য, 'চক্র' বা 'বাসর'-বিশেষে বসিয়া চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্যের সৎকার করা ছাড়া। পেয়ের কথা বাদ দিলাম, কারণ সাহিত্যিকদের সে পয়সা কোথায়? যাহা হউক, জবাবটা বেশ মুখের মতই হইয়াছে। লেথক একটা কথা, বেশ বলিয়াছেন—"কারো যদি ব্যক্তিগত জীবনে কোন নালিশ থাকে ত' স্পষ্ট সেই কথাই নিজের বন্ধুবান্ধবের (বান্ধবীরও) কাছে বল্লেই হয়। সভাসমিতিতে ও নিয়ে বাহাদুরী করতে যাওয়া কেন?"

শান্তিরাম বাবুর একটা কথা আমি কিছুতেই মানিতে পারি না—তিনি আমার স্বগোত্র জ্ঞাতি হইলেও নয়। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, "নারীর পরিণাম কি হ'বে না হ'বে তা নিয়ে পুরুষের এত মাথাব্যথা কেন? নারীদের মধ্যেত অনেকেই শিক্ষা-লাভ করেছে, তারাই এখন ও কথাটা বলুক না!" ভ্যালা হাঙ্গাম, নারীর পরিণাম সম্বন্ধে আমরা বলিব না তো কে বলিবে? শিক্ষা দিতেছি আমরা, স্বাধীনতাও দিতেছি আমরা—আমাদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়া। নারী—অন্ততঃ আমাদের দেশে—বিদ্রোহ করে নাই; তাহাদের অন্নবস্ত্র, জীবন-যৌবন—কাজেই তনুমনপ্রাণ—আমাদের অধিকারে। আমরা এই নারীর পরিণাম-নির্দ্দেশ করিব না তো কে করিবে। শান্তিরাম বাবুর বয়স অল্প, তা না হইলে নারীর মুখ দিয়া হদিস্ চান? আমি যখন আপিস হইতে ফিরি, তখন আমারই ইচ্ছানুসারে আমার গৃহিণীকে কাছে আসিয়া পাথার বাতাস করিতে হয়, জলখাবারের থালা গুছাইয়া সারাদিনের শ্রমক্লান্ত মুখে মিষ্ট হাসি টানিয়া মিষ্টতর কথা বলিতে হয়। তাঁহার আপন ইচ্ছায় চলিবার স্বাধীনতা ও ট্যাক্‌খরচের জোগাড় থাকিলে আমার এ মধুর আরামটুকু কি একদিনও টিকিবে?

আমাদের দেশে এখনো পর্য্যন্ত যেটুকু নারীপ্রগতি হইয়াছে, তাহা কি সত্যই অনেকখানি? আমার তো মনে হয়, এ প্রগতি অতি সামান্য। সত্যকারের স্বাধীনতা এই প্রগতির মধ্যে নাই, তাই প্রভাত বাবু যে-উচ্ছৃঙ্খলতার কল্পনায় বুদ্ধি-শুদ্ধি গুলাইয়া বসিয়াছেন, সে উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগও নাই। নিজের জীবিকা-সমস্যার সমাধান নিজে না করিয়া লইতে পারিলে স্বাধীনতা কোথায়? আমাদের ভাত-কাপড়ের দাসী "মহিয়সী মোহিনী মহিলা" যতই না কেন আমাদের মুগ্ধ চোখের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়া স্যাণ্ডাল্ গুঞ্জরিয়া আকুল অঞ্চলে উদ্দাম চঞ্চলা হইয়া ট্রামে-বাসে ভ্রমণ করুন, আমরা জানি, তাঁহার পায়ে বাঁধা আছে আমাদেরই অন্দরমহলের শিকল, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে সেই জেনানায়ই আসিতে হইবে। পুরুষের সামাজিক ও আর্থিক স্বাধীনতা আছে, পুরুষ মেয়েদের চেয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা করে অনেক বেশী; মেয়েদের যেদিন আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা হইবে, সে'দিন তাহাদের শিক্ষা-

দীক্ষার ধারা তাহারাই স্থির করিয়া লইবে। সেদিন প্রভাতবাবুর রোষ হইবে নিষ্ফল, আমার পরামর্শ হইবে অবাঞ্ছিত, শান্তিরাম বাবুর উৎসাহদান হইবে অতি প্রত্যাশিত সাধারণ ব্যাপার। নারীর সেদিন যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে কোন বাধা থাকিবে না, নিজের খুসীমত সে উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে। আমাদের পক্ষে সেই ভয়ঙ্কর দিনে আমরা আর প্রত্যহ সযত্ন-রক্ষিত মাছের কালিয়া পাইব না; হয়ত আফিস হইতে ফিরিয়া দেখিব, গিন্নী ময়দানে গিয়াছেন খেলা দেখিতে, আমাকে কিছুই না বলিয়া। সেদিন সন্ধ্যার তর্জ্জন করিয়া তাহাকে শাসন করিতেও পারিব না, হাতখরচের টাকা কাটিয়া সহবৎ শিক্ষা দিতেও পারিব না। কিন্তু আমার স্বাধীনা গৃহিনীই কি সেদিন আগের মত আরামে থাকিতে পারিবেন? সেদিন ট্রামে উঠিলে কেউ বেঞ্চি ছাড়িয়া দিয়া বসিতে বলিবে না, ফুটপাথে বিনম্র পুরুষের ভীড় পথ ছাড়িয়া দিয়াও দাঁড়াইবে না, স্ত্রীলোক বলিয়া কেহ খাতির করিবে না।

তবে একটা ভরসার কথা আছে—নারীর সেদিন আসিতে বহুদিন লাগিবে, অন্ততঃ আমরা থাকিতে তো নয়। পরমুখাপেক্ষিনী নারীকে আমরা মোহিনী করিয়া অন্তঃপুরে দেবী করিয়া রাখিয়াছি—সেই দেবী করিয়াই রাখিব। লাঠি মারিয়া আমাদের পিঠ ভাঙিবার জন্য স্বাধীনা জেনানা করিয়া দিব না।

নারী ধর্ম্মের পক্ষে নারীর কথা

*** শ্রীনীলিমা মিত্র**

কয়েক সপ্তাহ আগে সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত যে প্রবন্ধটি নিয়ে আপত্তি (?) উঠেছিল এবং এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি সংবাদপত্রে তার বিরুদ্ধে যে আলোচনা বেরিয়েছিল আমাদের চোখে তা পড়েছে। তারপর ১৯শ সংখ্যা 'খেয়ালী'তে মূল প্রবন্ধটি পড়েছি এবং দেখেছি সম্পাদক মহাশয় সেই সম্বন্ধে খোলাখুলি সমালোচনার জন্যে সকলকে আহ্বান করেছেন।

গত ২০শ সংখ্যা 'খেয়ালী'তে নজর পড়্‌ল "প্রগতির প্রতি ভেংচী" নামে কে এক আধুনিক শক্তিশালী (?) লেখক তার জবাব দিয়েছেন কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম এইজন্যে—যে প্রবন্ধটির জন্যে সভায় মহিলাদের এত বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছিল, কাগজে কাগজে ছদ্মনামে (ভেবেছিলাম কোন মহিলারই) যে চিঠি চাপাটি চল্‌ল, যখন সেই প্রবন্ধ বেরোলো সম্পাদকের আহ্বানসত্বেও তার জবাব কোন মহিলা না দিয়ে দিলেন একজন পুরুষ—লজ্জার কথা বটে! এ যেন গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল!

কোনো মহিলার কি উচিৎ ছিল না নিন্দিত প্রবন্ধটির বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো প্রগতি শুধু অধোগতিই নয় উচ্চগতিও বটে। সে যাই হোক আধুনিক লেখকটি তাঁর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ (যেহেতু প্রভাতবাবুর ভাষা তাঁর তুলনায় তরল, লেখক উপমা দিয়েছেন যেন বর্ষার দিনের কলকাতার রাস্তার জল!) প্রবন্ধটিতে বলেছেন প্রভাতবাবু পথে ঘাটে যে রকম পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেন ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নাকি সেইরকম নারীদের সঙ্গ পাননি তাই এমন সব কথা লিখতে পেরেছেন, কিন্তু আমি জানি, খুব ভালো রকমই জানি প্রভাতবাবু দেশে বিদেশে যত গ্রাম্য এবং শিক্ষিতা মহিলাদের জানবার সুযোগ পেয়েছেন, আধুনিক লেখকটি তা পেয়েছেন কি না সন্দেহ। তিনি প্রভাতবাবুর দুর্ভাগ্য বলতে পারেন না। দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের এবং এই অত্যাধুনিক প্রগতিযুগের।

মনের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে তিনি আসেননি সেদিনের সভায় শুধু সস্তায় নাম কেনবার মোহে! নারীর স্বাধীনতার নামে যে স্বেচ্ছাচার আজ বন্যাজলের মত অবাধে আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে তারি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল সেদিন। আধুনিক সাহিত্যের নামে যে বিষাক্ত আবহাওয়া বাণীর কমলবনে দস্যুর মত প্রবেশাধিকার পেতে চায় তাকে আমরা যেমন মনেপ্রাণে ঘৃণা করি তেমন ঘৃণা করি এই নারীর চটুলতাকে! বাসে ট্রামে সিনেমায় যে নারীকে দেখি পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে বাচালতা করতে, গৃহধর্ম্ম পালনে সে সক্ষম কি না সেইটাই আজ প্রশ্ন উঠেছে।

কয়েক বছর ধ'রে সাহিত্য নাম নিয়ে যে উপন্যাস, গল্প, কবিতা বেরোচ্ছে তাতে দেখি যে নারীর চিত্র সেই কি প্রগতি যুগের নারীর আদর্শ! খালি পুরুষকে প্রলোভিত করা ছাড়া আর কি নারীর ধর্ম্ম নেই কর্ম্ম নেই? লীলাকটাক্ষে, স্পর্শে এবং দৈহিক আকর্ষণে পুরুষকে জয় করার চেয়ে আজ নারীর প্রয়োজন রয়েছে গৃহে এবং সমগ্র বাহির জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে। নারী শুধু পুরুষের লালসার ইন্ধন জোগাতে সৃষ্টি হয়নি, তার কামনাকে বাড়িয়ে তুলতেও নয় বরং তার সমস্ত কামনাকে জয় করে নিজেকে দাঁড়াতে হবে বিশ্বের কাছে মাথা তুলে—দৃঢ় সুন্দর ভঙ্গিতে।

কিন্তু কি দেখছি, এই বাংলার পথে ঘাটে নারীর বিলাসিনী মূর্ত্তি, শোভনতা, শালীনতা, দৃঢ়তা চোখে পড়েনা—খালি প্রসাধনের বাহুল্যতা আর বেহায়াপনার চূড়ান্ত অভিনয়।

আমার সঙ্কীর্ণতা (?) আমার ভগিনীরা ক্ষমা করবেন—আমি মানতে রাজি নই এই আধুনিক শিক্ষার পরাকাষ্ঠাকে। অনেক অনেক পরিবারে এর জন্যে যে কলঙ্ক, যে অনুতাপের সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে তার জন্যে দায়ী করি প্রগতি যুগের ছেলেমেয়েকে এবং ততোধিক তাদের অভিভাবকদের যারা অন্ধের মত ফলাফল না জেনেই অবাধে এগিয়ে চলে স্রোতের তৃণের মত আপন খেয়ালে।

পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতা সে দেশে কি সুখের সৃষ্টি করেছে জানিনা কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার নামে যে ঢেউ এসেছে সে যে সুখের নয়, কল্যাণের নয় তার হাজার পরিচয় পেয়েছি এবং পাচ্ছি। আগেকার অশিক্ষিতা নারীদের অন্ধ সংস্কার তখনকার দিনে সমাজে এবং পুরুষদের মনে বিক্ষোভ এনেছিল কিন্তু তারো চেয়ে অকল্যাণ এনেছে এই অনুকরণের বাহুল্যতা এই আধুনিক আবহাওয়া। প্রকাশ্য সিনেমায় তাই দেখি ভদ্রকুমারীর, ভদ্র মহিলার অভিনয়! ভে.ব পাইনা এ অর্থ উপার্জ্জনের পথা না নাম কেনবার সখ! যদি সত্যই অর্থের জন্যে নারীকে এই পথ বেছে নিতে হয় তবে এর চেয়ে অবনতি নারীর কি হতে পারে? আমরা জানি—ভালোরকমই জানি সিনেমায় কিম্বা রঙ্গমঞ্চে ভদ্রনারীর সম্মান ব্যাহত হয়। অসম্মানকর অসুন্দর পথে নারীর চলা কিছুতেই শোভনীয় নয় প্রার্থনীয়ও নয়।

আমাদের বর্জ্জন করতে হবে এই সব সাহিত্যের নামে অশ্লীল অকথ্য পুস্তকগুলিকে আর তার লেখকদেরও। চিন্তার কোনো খোরাক নাই, সরসতার বালাই নাই, আছে খালি নারীর প্রতি নরের দৈহিক ক্ষুধার পরিচয়, আর তার বিশ্লেষণ! যেন এ ছাড়া নারীর আর কোনো প্রয়োজন নাই, কোনো কার্য্য নাই, খালি পুরুষের লোলুপতা বাড়িয়ে তুলতে এবং তাতে নিজেকে আহুতি দিতেই নারীর জন্ম হয়েছে। এর চেয়ে অসম্মানজনক, এর চেয়ে ঘৃণিততম নারীর বিরুদ্ধে আর কিছুই নাই।

আমাদের কন্যাদের বাঁচাতে হবে এই সব দূষিত হাওয়া থেকে, এই সব আধুনিক প্রগতির হাত থেকে এবং ছেলেদেরও শিক্ষা দিতে হবে মেয়েদের প্রতি সহজ সুন্দর ভাব পোষণ করতে।

সহশিক্ষার যে প্রশ্ন দেশ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের মনে জাগছে সে প্রশ্ন আজ আমাদের মনেও জাগা উচিৎ।

আজ বাংলার মেয়েদের সৌন্দর্য্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, খালি পুঁথির বিদ্যা নিয়ে নারীধর্ম্ম পালন হয় না, সন্তানও পালন হয় না। আমাদের কন্যাদের শিক্ষা দিতে হবে প্রথমতঃ গৃহধর্ম্ম পালনে সুন্দর সংস্কারহীন অকলঙ্ক জীবন যাপনে তারপর বাহিরের জনতায় দাঁড়াবার মর্য্যাদাপূর্ণ আত্মবোধ, গাম্ভীর্য্য-শালীনতা। জনাকীর্ণ রাজপথে চলা কিম্বা সিনেমায় নীচে গিয়ে বসাই নারীর চরম স্বাধীনতা নয়, তাকে সহশিক্ষা পেতে হবে এইভাবে। পুরুষের সাহচর্য্য মানে প্রেম করা নয়, মোহসৃষ্টি করা নয়, সহজ সরল চলায় তাকে প্রমাণ করতে হবে নারী ও পুরুষ যেমন বিধাতার সৃষ্টি তেমনি পাশাপাশি থাকবার অধিকারও তিনি দিয়েছেন সুন্দর পবিত্রভাবে।

আমার বক্তব্য এই প্রভাতবাবু সরস করে সেদিন সভায় যা ব'লেছিলেন তা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, আমাদের তা ভাবতে হবে নির্জ্জনে এককভাবে গৃহে আত্মীয়াদের কাছে, এবং সভায় সমিতিতে সর্ব্বমহিলা সমক্ষে এই প্রশ্ন তুলতে হবে আমাদের কন্যাদের আমরা যে আধুনিকতার স্রোতে ছেড়ে দিয়েছি তার শুভাশুভ কি? তর্কে কোনো সমস্যারই কখনো সমাধান হয় না। আমাদের চিন্তা করতে হবে পারিপার্শ্বিক কত দুর্ঘটনার, বিচার করতে হবে স্কুল কলেজে পথে ছেড়ে দিয়ে. আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে চাই কিন্তু পরিণাম এর যে মধুর হয় না অধিকাংশ অভিভাবিকা-মহিলাই তা স্বীকার করবেন। মুখে করবার যদি সাহস নাও থাকে মনে মনে জানি আমাকে তাঁরা সমর্থন করবেন।

অনেকদিন ধরে অনেক বিখ্যাত এবং অখ্যাত পরিবারে দেখে আসছি এই আধুনিকতার সুনি হাওয়ায় অনেকে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন, অনেক লজ্জাস্কর কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে তবু মনে দ্বিধা জেগেছে এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার। নূতনত্বের মোহে যারা অন্ধ

তারা এর অমঙ্গলের দিক দেখেনি, গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করে তারা চলতে যায় কিন্তু পরিণামে তারাই ঠকে বেশী। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ কি খাদ্য খাদকের? আধুনিক যুগের মেয়েরা এই প্রমাণই কি বেশী করছে না? কল্পায় তাদের ম'রে যাওয়া উচিৎ এই গ্লানিকর সত্যতা প্রমাণ করার দরুণ।

গৃহ কোণে সংসার সর্ব্বস্ব মেয়ে যারা অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে থাকতে চায়, অন্ধ সংস্কারের দারুণ মনোভাবে নিজেরাও মরে পুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজনের মনেও রেখাপাত ক'রে যায়—সমাজের দেশের তারাও যেমন অকল্যাণ ডেকে আনছে আর এরাও ততোধিক এই সভ্য যুগের অতি বাচাল মেয়েগুলি।

পুরুষের সাহায্য না নিয়েই যারা বড় হ'তে চায় তাদের আমি সমর্থন করি না। যারা শুধু পুরুষকেই দোষী ক'রে নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে নিজে অচেতন থেকে গৃহে নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় সেই সব মূঢ় মেয়েগুলি নিজেকেই ফাঁকি দেয় এবং সর্ব্বজগতে বিধাতার দরবারেও ফাঁকি পড়ে নিঃসন্দেহ।

মহিমময়ী মনস্বিনী আমরা হ'তে চাই না কিন্তু সুগৃহিনী সুজননী হ'তে চাই। কন্যা ভগিনীর সহজ সেবায় পিতাকে ভ্রাতাকে সুখী করতে চাই, গৃহে চাই মধুর শান্তি। যাহা নারীর পক্ষে সম্মানজনক কল্যাণকর তাহাই বেছে নিতে চাই। আত্মচেতনায় নারী জাগরূক হোক, অসুন্দর সর্ব্বনাশের পথে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী; ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম দুয়ের সমন্বয়ে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে নারী রচে তুলুক সুন্দর সুখনীড় এবং বাহিরের মালিন্যকে জয় ক'রে সেখানেও গ'ড়ে তুলুক পুরুষের মনে নারীর প্রতি সহজ মমত্ববোধ সম্ভ্রম আর বিশ্বাস।

ভেংচী কোন্ তরফের ?

* শ্রীজ্যোৎস্না নাথ চন্দ

বাঙ্‌লা-দেশের বাক্‌-বাহুল্যের অপবাদ অনেককাল হইতেই আছে জানি কিন্তু তবুও এ কথা বলিতে কিছুমাত্র বাধিতেছে না যে তার্কিক হিসাবে বাঙালীর লজিক অখণ্ডনীয় নয়। "খেয়ালী" সম্পাদকের মনের ঔদার্য্য আছে এ কথা আমি অনেকবার অনেক কিছুতে লক্ষ্য করিয়াছি এবং সেইজন্যই সবিনয়ে এমনতরো একটা ধারণাকে বোরখা চাপাইয়া না রাখিয়া কালি এবং কলমের সাহায্যে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি। হঠাৎ এ কথাটা কিসে মনে হইল জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তবে বলি শুনুন, শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু তালতলা সাহিত্য-সম্মিলনীতে যে প্রবন্ধটা পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সম্পর্কে নানা-পত্রিকায় নানা মতামত নানা লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সুখের কথা। যে দেশে শতকরা ছয়জন লোক লিখিতে পড়িতে পারে, যে দেশে "হা অন্ন", "হা অন্ন" করিয়াই লোকের পরমায়ু প্রতি পলে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে, যে দেশে সমাজের লম্পটকুল প্রতিনিয়ত আস্কারা পাইয়া সমাজপতির বেশে চড়িয়া বেড়াইতেছে, যে দেশে "পতির নিকট পত্নীর প্রেম-পত্রের" ফরমূলা উচিত-দামের দশগুণ বৃদ্ধি মূল্যে বিকাইতেছে সে দেশের পক্ষে এমন সচেতন-ভাব বিস্ময়ের বস্তু সন্দেহ নাই। "খেয়ালী"র মারফৎ "একজন শক্তিশালী তরুণ-লেখক" এই আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন দেখিয়া খুবই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তরুণীদের ব্যাপারে, নারী ধর্ম্মের আলোচনায় তরুণেরা যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতেছেন ইহা খুবই আশাপ্রদ। সেইজন্যই শ্রীশান্তিরাম উপাধ্যায়ের প্রভাতবাবুর প্রবন্ধ পাঠে যে, মানসিক অশান্তি আসিয়াছে সে সম্পর্কে দুই চারিটী কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছি। "যাঁরা এই প্রবন্ধ-পাঠ শুনে রুষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা অনায়াসেই একে তুচ্ছ করে চুপচাপ্ বসে থাক্‌তে পারতেন": শান্তিরাম বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত। তবে যাঁহাদের চুপ্-চাপ্ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত ছিল তাঁহারা যে চুপচাপ্ থাকিতে পারেন নাই ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে প্রভাতকিরণবাবুর প্রবন্ধটী কাহারো কাহারো আঁতে ঘা দিয়াছে এবং তাঁহারা প্রভাতবাবুর অপ্রিয় সত্য-ভাষণকে হজম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা "সাময়িক উত্তেজনার স্ফূর্ত্তি মাত্র" তাহা

পরপারে
: পরিচালক :
যতীন দাস
: সুর-শিল্পী :
কৃষ্ণ চন্দ্র দে
: আলোক চিত্র-শিল্পী :
প্রবোধ দাস
: সহকারী :
অ জ য় ক র
: শব্দযন্ত্রী :
জ্যোতিষ সিংহ
: সহকারী :
মিঃ ই লি য়া স
স্বত্বাধিকারী : ধীরেন্দ্র নাথ চন্দ্র
দু র্গা দা স
প্রমুখাৎ
অহীন্দ্র নির্ম্মলেন্দু
মনোরঞ্জন শৈলেন
ভূমেন অনুপম
সন্তোষ সিংহ কৃষ্ণধন মুখো
আশু বোস সন্তোষ দাস
অয়স্কান্ত তিলা মহম্মদ
জ্যোৎস্না বীণা
নিভা নগেন্দ্রবালা
প্রভৃতি নাট্যকলাকুশলীগণের
সংযোজনায়
চন্দ্র ফিল্মসের
প্রথম নৈবেদ্য
পরপারে
চিত্রায় মুক্তি প্রতীক্ষায়

এতটা উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে কিনা এ সম্পর্কে সাইকো-এনালিষ্টরাই ভালো বলিতে পারিবেন : আমরা করিমদ্দি ও রহিমদ্দিদেরই সওয়াল করি মাত্র, কিন্তু সাহিত্যিকদের কাঠ-গড়ায় পাই কম। প্রভাতবাবুর ভাবের অগভীরতা, ভাষার তারল্য, "পুরুষের অমর্ষণ" ইত্যাদি বিষয়ে শান্তিরামবাবু বহু-বিধ অভি-যোগ আনয়ন করিয়াছেন। এই বাক্-যুদ্ধে আমি একটা কুরুক্ষেত্র সংঘটন করাইব এমন ধারণা লইয়া আমি লেখনী ধারণ করি নাই ; সত্য নিরূপণের আকাঙ্খাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। শান্তিরামবাবুর কলমে চাতুর্য্য আছে : তিনি বলিতেছেন "এ যেন খেলায় হেরে গিয়ে শিশুর ভেংচী কাটা।" শুনিতে বেশ লাগে কিন্তু শান্তিরামবাবু কোন্ খেলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বুঝিলাম না। প্রভাতকিরণবাবু কোন্ খেলা খেলিতে গেলেন ও কোন্ খেলায় হারিয়া গিয়া এমনতরো অশোভন ভেংচী কাটিলেন ? তরুণরা তরুণীদের সহিত যে খেলা খেলিতে গিয়া "মনের দুর্ব্বলতাকে" চাপিয়া রাখিতে পারেনা সে খেলা খেলিবার বয়স যে প্রভাতকিরণ বাবুর অনেককাল গিয়াছে সে সম্পর্কে আমি হলপ করিয়া জবানবন্দী দিতে পারি। "তরুণ" শান্তিরামবাবু এই সব খেলার উল্লেখ করিতে গিয়া বোধ করি আপন অন্তর-লোকেরই প্রচ্ছন্ন বাণীকে প্রকাশ করিয়াছেন : প্রভাত কিরণবাবুর প্রবন্ধের অযৌক্তিকতাকে সুষ্ঠুরূপে সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। আমি প্রবন্ধটী যথেষ্ট যত্ন সহকারে পড়িয়াছি ; সে প্রবন্ধে নারী তাহার দেহকে কোন্ চোখে দেখিতেছে সে সম্পর্কে subtle ইঙ্গিত আছে কিন্তু "দেহের দুর্গতি"র কোন উল্লেখ নাই। প্রভাতকিরণবাবুর ভাষা কিছুটা crisp এবং সেই জন্যই কিয়ৎ পরিমাণে নির্ম্মম। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অশোভনতাকে প্রশ্রয় দেন নাই : নারী-ধর্ম্মের স্বরূপ কি হইতে চলিয়াছে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"বাঙলার বউ লজ্জায়, সঙ্কোচে, সম্ভ্রমে, অভিমানে স্বামীর কাছেও নিজের অনেকখানি সত্ত্বা গোপন করে রাখে। তাই না এত প্রগতির দিনেও স্ত্রী স্বামীর কাছে ঠিক পরিপূর্ণ আদর-যত্ন পায় না"। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, শান্তিরাম বাবুর এই অভিনব আবিষ্কার কলম্বাস্‌কেও হার মানাইয়াছে। ওগো "বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ" কুল, তোমরা শান্তিরামবাবুর কাণে কবে এই বাণী গুঞ্জরণ করিলে ? বড়ই সুখী হইলাম, প্রীতিলাভ করিলাম যে বাঙালী স্ত্রীরা স্বামীদের নিকট হইতে "পরিপূর্ণ" আদর-যত্ন পায়না। যে আদর তাঁহারা স্বামীদের নিকট হইতে পান্ না, সে আদর কি তাঁহারা তাঁহাদের "দাদাদের" বা "কাকাদের" বা "cousin-দের" নিকট হইতে "পরিপূর্ণ"-ভাবে পান ? আজ শান্তিরামবাবু আমাদের কি বাণী শুনাইলেন ? মা বসুমতী, তুমি দ্বিধা হও ! বাঙলার স্বামী-সমাজ, সাবধান ! সাবধান !! কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ হয় ? প্রমাণ হয় যে প্রভাতকিরণবাবুর ডায়োগনিসিস্‌ই ঠিক, নির্ভুল যদিও নির্ম্মম। এ কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি, বিশেষতঃ আমরা যাহাদের কাছে মাসে পাঁচ-দশটা ঘর-ছাড়া মেয়েমানুষের জীবনেতিহাস আসিয়া পৌঁছায়, যে নারী-ধর্ম্মের প্রাচীন-আদর্শের দেয়ালে বহুবিধ ফুলশর বিদ্ধ হইতেছে এবং সমাজের প্রতি অঙ্গে বিকৃতি ফুটিয়া উঠিতেছে। এই সব নানা কথা বিবেচনায় শান্তিরামবাবুর মন্তব্য "প্রবন্ধটী নিছক গালাগালি, ওতে কিছুমাত্র কাজের কথা নেই" বড়ই খেলো, লঘু শোনায়। প্রভাতবাবু বহু দুঃখেই বোধ করি দুই চারিটা কটু-কাটব্য করিয়াছেন। হাইকোর্টের divorce proceedings, পুলিশ কোর্টের রেকর্ড ইত্যাদি দেখিলে মনে কিছুমাত্র আশা আসেনা, idealism তো দূরের কথা। কিন্তু শুনিয়া সুখী হইলাম যে শান্তিরামবাবু

কোন কোন প্রগতিশীলার "রমণীয়", "সুন্দর" "প্রসন্ন" চরিত্রের ছাপ লাভ করিয়াছেন। আমরাও "ছাপ" পাইতে চেষ্টা করি কিন্তু পাই কোথায় ? প্রভাতকিরণবাবু আরো একটু সহানুভূতি ঢালিয়া প্রবন্ধটী লিখিতে পারিলে আমি খুবই সুখী হইতাম : তিনি conventional তরুণ নহেন। তাঁহার প্রবন্ধটী উচ্ছ্বাস-দোষ-দুষ্টও বটে—শান্তিরামবাবু ইহা ঠিকই বলিয়াছেন। আইনে mens rea বলিয়া একটা কথা আছে : প্রভাত-কিরণবাবুর mens rea বোধ হয় ভালোই এবং সেইজন্যই তিনি ক্ষমার্হ। আমি নবীন-পন্থীও নহি, প্রাচীন-পন্থীও নহি। ভালোকে ভালো এবং খারাপকে খারাপ বলিবার অধিকারটুকুন্ হইতে ভরসা আছে শান্তিরামবাবু তথা "খেয়ালী" সম্পাদক বঞ্চিত করিবেন না। ফরাসীরা বলে nes pa ? আমিও তাই বলিয়া শেষ করি !

নারী কোন পথে ?

শ্রীকল্যাণী সেনগুপ্তা

শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর প্রবন্ধ "মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার" আমাকে তৃপ্তিদান করেছে। তিনি এই প্রবন্ধে নারীজাতির অবনতির অতি অনবদ্য চিত্র এঁকেছেন। আমার মনে হচ্ছে এই চিত্রটি নারীর চোখে আঙুল দিয়ে তাদের অবনতি স্পষ্ট করে দেখাবার পক্ষে যথেষ্ট। নারী জাতি আজ এতই অতল জলে ডুব দিয়েছে যে পৃথিবীর কিছুই আর তাদের দৃষ্টিপথে আসছে না। তারা কল্পনা সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ভাবছেন তাদের কল্পিত-রাজ্য পাতাল পুরীতে ঢুকে নারীর ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য নরজগতে প্রতীয়মান করবে। যা হোক তাদের মোহ একদিন ঘুচবে, যে দিন পাতাল পুরীর সন্ধান আর মিলবে না—তাদের কল্পনার নেশা যাবে ছুটে এবং

দেখতে পাবে যে বৃথাই তারা অথই জলে ডুবেছে। প্রভাত বাবুর প্রবন্ধে একটী জায়গায় আমার একটু প্রতিবাদ করবার আছে তাহা এই—

প্রথম কথা হচ্ছে—নারীজাতি পুরুষকে বিশ্বাস করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এর জন্য কিন্তু নারী দায়ী নয়—দায়ী হচ্ছে পুরুষ—যে তাদের এদেশের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে জীবন পণ করে লেগেছে। আধুনিক শিক্ষার এম্‌নি গুণ যে নারীকে তার কোমল বৃত্তি ভুলতে সাহায্য করে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে পুরুষের মতো সব বিষয়ে অংশ মত দাবী করতে প্রলোভিত করছে। এখন অবস্থাটা এম্‌নি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পুরুষ যদি তাদের বলে—তোমাদের দাবী অন্যায়ভাবে হচ্ছে অথবা তোমরা মরীচিকার পেছনে ছুটছ—তোমাদের প্রকৃত দাবীটুকু হারাতে বসেছ—অমনি তাদের সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং তারা মনে করে পুরুষ তাদের ঠকাতে চেষ্টা করছে। এইভাবে নারীর মনে সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এর জন্য দায়ী পুরুষ। পুরুষই তাদের আধুনিকভাবে গড়তে গিয়ে ক্রমশঃ গড়ে তুলেছে অবিশ্বাসের প্রসার ক্ষেত্র, এখন বুঝাতে গেলেও আর বুঝতে চায় না—আর তারা বুঝতে পারবে না—কারণ তারা নাকি সর্ব্বদাই অন্তর্মুখী, তাদের মানসিক ক্ষমতা থাকলেও মনীষার স্ফুরণ তাদের ভেতর কখনও দেখা যায় না।

লীলাময়

এক অঙ্ক নাটিকা

শ্রীপ্রভাত কুমার দেব সরকার

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কলেজ রেষ্টুরেণ্ট, সময়—ক্লাসের অবসর বেলা ২৷৷০।

[ঘরটার এক কোণে গুটিকয়েক ছাত্র জটলা ক'রে আছে। সিগ্রেটের ধোঁয়ায় ঘরের আবহাওয়া ঘোলাটে,—খালি আধ-খালি চায়ের পেয়ালা সামনে—কোনটা আবার এ্যাশট্রের মত ব্যবহার করা হ'চ্ছে—যদিও সামনেই এ্যাশট্রে আছে!···সমর, জ্যোতি, সুনীতি, পেলব, কটুকণ্ঠ প্রভৃতি উৎসুক হয়ে বারবার পথের দিকে চাইচে,—"গাধাটা ক্লাস কামাই করবে দেখচি! —আরে মদ্দানি সব তাতে!!" বলতে বলতে লীলাময় প্রবেশ করল।]

সকলে সমস্বরে—তারপরে?

লীলাময় (বুক পকেটে হাত দিতে দিতে)—তারপর আর কি, এ শর্ম্মা থাকলে যা' হয়! (বলে' পকেট থেকে সেলুলয়েডের মাথার কাঁটা বার করে' দেখাল)।

সকলে—দিলে!—দুপুর রোদ্দুরে!—পথের মাঝে!!!

পেলব—তোর সঙ্গে তা' হ'লে আগে থেকে চেনা?

জ্যোতি—গোপন প্রেম, বাহাদুরী নিতে প্রকাশ কর্‌লি সবার কাছে।

সমর—বিশ্বাস হ'চ্ছে নারে!

সুনীতি—প্রেম কী অত ছ্যাব্‌লা?—দুপুরে ফুল ফোটে না—নীতি বিগর্হিত।

লীলাময়—ফোটে, ফোটাতে জানতে হয়—সূর্য্যমুখী তার প্রমাণ।······গোপন, ছ্যাবলা, চেনা ও সব বাজে—আসলে সব এক। প্রেমে আলো আঁধার নেই—অন্দরমহল সদর বাটী নেই, ও সব বানান কথা···কেবল ঝোপ বুঝে কোপ দিতে জানা চাই।—

সুনীতি—(কথার মাঝখানে) কিন্তু কাঁটা দেওয়ার মানে?

লীলাময়—বাজে কথায় মাথা ভার করেচিস্ বইতো নয়!—গাধা এটা বুঝিস না, অবিন্যস্ত চুলকে বিন্যস্ত করতে কাঁটার প্রয়োজন—খোঁপাটা বাহার, কাঁটাটা তার আহার—

পেলব—মানে, ও জানাতে চায়, আমার বাহারের আহার তোমায় দিতে কোন আপত্তি নেই, এমনি তর আপনার তুমি।

লীলাময়—ঠিক তাই, কাঁটা ওরা যা'কে দিতে পারে প্রাণটাও—

সমর—অবাক করলি! অদ্ভুত ব্যাখ্যা তোর প্রেমনীতির।

সুনীতি—কিন্তু তা' হ'লেও—।

লীলাময়—এতে 'কিন্তু'ও নেই, 'তাহলে'ও নেই, কামিনীরঞ্জন বাবু মিথ্যে বলেন না—
"মাথার কাঁটা চুলের ফিতে শাড়ীর আঁচলে,
ট্রামে বাসে, বালীগঞ্জ আর লেক অঞ্চলে—
তার পর কিরে? মনে আসচে না!

পেলব—"প্রেমের বাহন বেড়ায় ঘুরে। তাদের খোঁচালে—তার পর থাইসিস্ না কী!

সমর—"ধরে প্রেমের থাইসিসে···ঢুকে পোকা হৃদয় যন্ত্রেতে—এমন কথা মনেও থাকে না ছাই!

জ্যোতি—"তখন ব্যাধির নিদান খুঁজতে হ'বে বিয়ের মন্ত্রতে।"

সুনীতি—যত সব ছ্যাবলামি!—হেঁড়ে গলা আর তেড়ে বার করিসনি, থাম।

লীলা—আসল কথা তো এখন শুনিস নি—

সকলে—কী???

লীলাময়—ও ফুটপাতে যখন ছাতাটী আড়াল ক'রে চল্‌ছিল, ভাবলুম বেজায় নিরীহ, তবে ব্যস্! পাশ দিয়ে হন্‌হন্ করে

চলে গেলুম—ফিক করে' হাসি কানে এল—পাকা! ফিরতেই মুখোমুখী দেখা।—বললে, 'নীভাননী হোটেলটা' কোথায় জানেন? একটু খেলাবার জন্যে বলুম, সে তো এখানে নয়—বড় দূর. অনেক অলিগলি, বল্লে, না শুনেছিলুম এখানেই কাছাকাছি—

পেলব—লক্ষণ তো সব ফলচে—

লীলাময়—ফলবে না? শম্মার চেহারাটা! ···ওরা চেহারা ছাড়া প্রেমে পড়বার মত কোন জিনিষই পুরুষের মধ্যে খুঁজে পায় না।···শুধু কাঠামটা ভাল হ'লেই—তা' চানাচুর ফিরিওলা হোক, আর রিক্সা বাহক-ই হোক—

সুনীতি—বাজে কথা! গুণগ্রাহী ওরা না' হ'লে পুরুষের উচ্ছ্বাসে ধরাটা ধাপার মাঠ হ'য়ে যেত।

লীলাময়—থাক ঢের হয়েচে!—পরের মুখে-খাওয়া ঝাল আর ঝাড়িস নি।······ তারপর বল্লুম, ওঃ নিভাননী! আমি মনে করি নির্ম্মলা—। বললে, না আমারই ভুল, নির্ম্মলাই। পথ বলে দিলুম,—ছাড়ে না; বললে, চলুন না একটু দয়া করে' এগিয়ে দেবেন—দেখচি আবার গোটাকতক ছেলে পিছু নিয়েচে।·· ···কোথায় নির্ম্মলা কোথায় নিভাননী!—সদানন্দের গলিতে পা দিতেই মাথা থেকে কাঁটা খুলে—

সুনীতি—অমন কেউ করে না—মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, ভালবাসার উপহার পুরুষরাই দেয়, মেয়েরা নয়

লীলাময়—ফের সেই, ময়না বুলি!' ক'টা experience আছে তোর?

কটুকণ্ঠ—সত্যিইতো এ সবে practical অভিজ্ঞতার দরকার করে, ড্রিমি philosophyতে কিছু বোঝা যায় না—মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, experimental psychologyতে কিছু ধরা যায় না বা atomic theoryতে ফেলে কেটে কুটে ভাগ করা যায় না।

লীলাময়—তারপর বল্লুম, পুনর্মিলন হ'বে কোথায়? লেকে? বললে, না, সেখানে ডেঁপো ছোকরার বড্ড ভিড়—সা'নগর পার্কের দক্ষিণের কুঞ্জবনে। তথাস্তু, এলুম চলে।

পেলব—হি-হি ডেঁপো! ওদের অনাশক্তিতেই আসক্তির গন্ধ পাওয়া যায়—হি-হি ডেঁপো—সুন্দর!

[ক্লাসের ঘণ্টা বাজিল]

সকলে—চল, চল, আর নয় ঘণ্টা পড়ল।

(ক্রমশঃ)

পপুলার পিক্‌চার্সের

আবর্ত্তন

পরিচালক: সতু সেন

চিত্র-সম্পাদক: চারু রায়

তৎসহ সঙ্গীত মুখর চিত্র

কুহু — কেকা

পরিচালক: চারু রায়

জনাকীর্ণ

শনিবার

চতুর্থ সপ্তাহ

৩০শে মে হইতে

শ্রীদুর্ব্বাসা

চারটি হাতে বিভিন্ন ডাকঃ— হাতবিশেষে কি ডাক দেওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত নির্ভুলভাবে তার উত্তর দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ পক্ষে ডাক দেওয়া সম্বন্ধে ব্রীজখেলায় কোন সম্পূর্ণ সরল নিয়ম অদ্যাবধি লিপিবদ্ধ হয় নাই। খেলবার সময়ে খুব অল্প হাতই পাওয়া যায়, যেখানে কেবল মাত্র একটি উপায়েই ডাক চলতে পারে। এই জন্যই ইংলণ্ড-আমেরিকার সংবাদ পত্র প্রভৃতিতে প্রকাশের জন্য প্রতিযোগিতা থেকে যে সকল হাত সংগ্রহ করা হয় তা' নিয়ে ব্রীজ-লেখক ও সমালোচকদের মধ্যে বহুবিধ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ খেলার সময় সুবিখ্যাত ব্রীজকুশলীগণ যেরূপ ডাক দেন অনেক ব্রীজসমালোচকদের তা' মনঃপূত হয় না। আমরাও এখানকার অনেক প্রতিযোগিতার খেলা আলোচনা করে দেখেছি যে অধিকাংশ সময়েই প্রতিযোগীদের ডাক আমাদের আশানুরূপ হয় না। তবে এর থেকেই যদি বলা হয় যে এদেশের ও ও-দেশের ব্রীজনিপুণ ব্যক্তিগণের ডাক প্রমাদসঙ্কুল তবে তাঁদের প্রতি সমূহ অন্যায় করা হবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটি সমস্যা ওপারের কোন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার উত্তরে ব্রীজক্রীড়কেরা তার এত রকম সমাধান করেছিলেন যে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ, অধিকাংশ উত্তরদাতার পক্ষেই যে কিছু একটা যুক্তি কিংবা কিছু একটা উদ্দেশ্য ছিল ন'—তা' নয় এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই সুবিখ্যাত ব্রীজ-খেলোয়াড়। এই ঘটনাটি থেকেই বেশ বোঝা যায় যে তাসের টেবিলে বসে ডাক দেওয়া কত জটিলতার সৃষ্টি করে।' উক্ত সমস্যাটি, তার বহুবিধ উত্তর এবং আলোচনা নিয়ে প্রদত্ত হল।

ইস্কাবন—নয়, ছক্কা, চৌকা, দুরি।
হরতন—তিরি।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, সাতা, তিরি
চিড়িতন—দশ, চৌকা, দুরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, দশ, সাতা
হরতন-গোলাম, দশ, নয়, ছক্কা, পাঞ্জা।
রুহিতন—গোলাম, নয়, পাঞ্জা, দুরি
চিড়িতন—নাই।
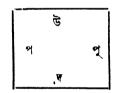
ইস্কাবন—সাহেব, পাঞ্জা।
হরতন—সাহেব, বিবি, আটা, দুরি
রুহিতন—দশ, চৌকা।
চিড়িতন—টেক্কা, গোলাম, নয়, আটা, ছক্কা।

ইস্কাবন—বিবি, আটা, তিরি।
হরতন—টেক্কা, সাতা, চৌকা।
রুহিতন—আটা, ছক্কা।
চিড়িতন -সাহেব, বিবি, সাতা, পাঞ্জা, তিরি

কোন পক্ষেই কিছু নেই, 'দ' তাস বণ্টন করেছেন। চার হাতের কিরূপ ডাক হওয়া উচিত বলতে হবে। *

যদিও সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিপ্রসূত ডাক কোন্টি এ নিয়ে মতদ্বৈধ ঘটতে পারে, কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে এই চার হাতে ডাক দেওয়া কষ্টজনক বলে মোটেই মনে হয় না। অবশ্য এই চার হাতে সুবিখ্যাত ব্রীজ-ক্রীড়কেরা তাঁদের সমাধানে সর্ব্বসমেত একশত-রূপ পন্থায় ডাক দিতে চেয়েছিলেন।

প্রথমেই ডাককারীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছেন। ১২৪ জন ক্রীড়ক 'দ'র হাতে প্রথমেই পাশ দেন এবং বাকি ৫১ জন 'দ'র হাতে একটি চিড়িতন ডাক দেন। আমাদের মতে 'দ'র পক্ষে পাশ দিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত, কেননা 'দ'র হাতে মাত্র দুইখানি অনারের পিট আছে এবং উপরন্তু সকল রঙের মধ্যে তাঁর রঙই নিম্নতম।

এখন পূর্ব্বোক্ত ১২৪ জনের মধ্যে দুইজন ব্যতীত সকলেই 'প'র হাতে পাশ দিয়ে গেলেন। তন্মধ্যে একজন 'প'র পক্ষে একটি হরতনে প্রাথমিক ডাক দিলেন, আর একজন একটি ইস্কাবনে প্রাথমিক ডাক দিলেন। আমাদের মতানুযায়ী শেষোক্ত ডাক দুইটী অসঙ্গত,—এ ডাক দুইটিকে আধা-ভূয়ো ডাক (Semi-Psychic Bid) বলা যেতে পারে।

অতঃপর 'উ'র পক্ষে ১১ জন একটি রুহিতনে ডাক দিলেন। আবার একজন উত্তরদাতা এস্থলে দুইটি রুহিতনেও ডাক দিয়েছিলেন। এই ডাকটিও আধা-ভূয়ো ডাকের পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে; যখন 'পূ'র হাত সবিশেষ শক্তিসম্পন্ন তখন ঐরূপ ডাক অবশ্য চলতে পারে। এ ক্ষেত্রে যদি ডাক দিতেই হয় তবে সর্ব্ববাদী-সম্মত মত হচ্ছে একটি রুহিতনে না ডেকে একটি ফেরাইএ ডাক দেওয়া। এই ফেরাইএ ডাক দেবার পর যদি বিপক্ষদল ডবল দেন,

তা' হলে দুইটা রুহিতনে পালিয়ে যাবার উপায় বর্ত্তমান। যা' হোক এরূপ সমাধান অনাবশ্যক যেহেতু কাগজে কলমে সমস্যার মধ্যে ভুয়ো ডাকের কোন স্থান নাই। সুতরাং এ স্থলে উক্ত আলোচনা অপ্রয়োজন।

এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১১০ জন প্রথম তিন হাতে পাশ দিয়ে গেলেন। অতঃপর এরা তিনটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। ৪৫ জন ডাককারী 'পূ'র পক্ষে পাশ দিয়ে হাতটিকে নষ্ট করালেন, ৬১ জন একটি চিড়িতনে ডাক দিলেন, আর ৪ জন উত্তরদাতা এ স্থলে একটি হরতনে ডাক দিলেন। সমস্যার বিচারকদের মতে 'পূ'র পক্ষে একটি চিড়িতনে ডাক দেওয়াই বিধেয়। যা' হোক এতাবৎকাল অধিকাংশ প্রতিযোগীই এই সমস্যার বিচারকদের সঙ্গে একমত হলেন।

অতঃপর অধিকাংশ প্রতিযোগীর সহিত বিচারকদের মতবিভেদ দৃষ্ট হয়। যে ৬১ জন 'পূ'র হয়ে একটি চিড়িতনে ডাক দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে ৩৭ জনের মতে 'দ'র দ্বিতীয়বারও পাশ দেওয়া উচিত। বিচারকগণের মতানুযায়ী ১৮ জন প্রতিযোগী 'দ'র দ্বিতীয় ডাকে একটি ফেরাইএ ডাক দেন। ৬ জন মত প্রকাশ করেছেন যে দ্বিতীয় ডাক এলে 'দ'র পক্ষে ডবল দেওয়াই উচিত। এ ক্ষেত্রে বিচারকগণ একটি ফেরাইএ ডাক দেবার পক্ষপাতী, কেন না বিপক্ষদলের বাধা প্রদানে এ ডাকই বিশেষ সমুপযুক্ত,—প্রতিরোধে এর মূল্য অনেকখানি।

যে ৩৭ জন 'দ'র দ্বিতীয় ডাকে পাশ দিয়ে গেছেন, তন্মধ্যে ১৭ জন 'প'র দ্বিতীয় ডাকে একটি ইস্কাবন ডাক দেন, ১৯ জন একটি হরতনে 'take out bid' দেন, এবং একজন উত্তরদাতা একটি ফেরাইএ ভীতিপ্রদ ডাক দেন। আমাদের মতে এ ক্ষেত্রে একটি হরতনে ডাক দেওয়াই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। পরে উক্ত ৩৭ জনের ডাক নানাবিধ পথ গ্রহণ করে অবশেষে নিম্নলিখিতরূপ রঙ করতে সমর্থ হয়েছিল। তন্মধ্যে ১৮ জনের মতে 'প' চারটি হরতনে ডেকে নিয়ে রঙ করলেন, ৪ জনের মতে 'প'র চারটি হরতন রঙে বিপক্ষদল ডবল দিয়ে ছেড়ে দেন, আর ১০ জনের মতে 'পূ' চারটি হরতন ডেকে নিয়ে রঙ করলেন। যেহেতু চার হাতই দেখা যাচ্ছে, কে আগে খেল্‌বেন কে পরে খেল্‌বেন এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। অবশিষ্ট মাত্র চয়জন উত্তরদাতা এ ক্ষেত্রে সুযুক্তিপূর্ণ উত্তরদানে অসমর্থ হন।

অতঃপর 'দ'র দ্বিতীয় ডাকে যে ১৮ জন একটি ফেরাইএ ডাক দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে ১২ জন 'প' বা 'পূ'র পক্ষে চারটি হরতনে রঙ করলেন।

—

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

বড়লোকের বিপদ

বিঙ্ক্রসবীকে যদি কেউ মিলিয়নেয়ার বলে, তাহলে সে যে ভুল করেছে, একথা কেউ বলবে না। তার বাড়ী, তার গাড়ী, তার ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা অঙ্ক দেখে ওদেশের লোকেরা তাকে ওই বলেই জানে।

আর মেয়েরা। তাদের তো কথাই নেই। বিঙকে ভালোবাসে না এমন কোন মেয়ে আছে কিনা সন্দেহ।

সেই বিঙ্‌এর হয়েছিল একদিন মুস্কিল। কিছুতেই সে তার চেক ভাঙ্গাতে পারেনি। চেষ্টা করেছিল অনেকবার—একবার, দুবার, তিনবার কিছুতেই সে কৃতকার্য্য হ'ল না।

বিঙ্‌এর সেদিন টাকার দরকার। ষ্টুডিও থেকে যাবে ব্রডকাষ্ট অপিসে—গাইতে হবে সেদিন সেখানে। বিঙ একখানা চেক লিখে তার সেক্রেটারির হাতে পাঠিয়ে দিলে ভাঙ্গাতে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কও তখন বন্ধ হয়েছে। কাজেই ফিরতে হোল। বিঙ্ বল্লে—যাও ষ্টুডিওর কেশিয়ারের কাছে, দেখ, তার কাছে যদি ভাঙ্গানি পাও। সেবারেও ফিরতে হোল। কেশিয়ার তখন চলে গিয়েছে। মেয়েটি,—বিঙের সেক্রেটারি একটি মেয়ে কিনা,—সে একবার শেষ চেষ্টা করবে ভেবে ছুটলো ষ্টুডিওর অপর পারে রেষ্টুরেণ্টে, তারপর গেলো কাপড়ের দোকানে। কিন্তু কোথাও মিললো না।

বিঙ্ ক্রসবি খালি পকেটেই ষ্টুডিও ছাড়ল।

যার একটা অটোগ্রাফের দাম পাঁচ পাউণ্ড থেকে দশ পাউণ্ড তার চেক ফেরে!—উত্তর মিললো। সেক্রেটারির বুক থেকে অনেকক্ষণ আগেকার অস্বস্তির একটা বদ্ধ নিশ্বাস বেরিয়ে গেলো। আয়ত দৃষ্টিতে দেখলে চেকের তলায় যে নাম সই রয়েছে তাতো বিঙ্ ক্রসবির নয় আর কিছু। ক্রসবি আছে কিন্তু বিঙ্ নেই। ছবিতে যে আসল নাম উড়িয়ে দিয়ে নকল একটা বিঙ্ বসানো হয়েছে সে খবর তো সবাই জানেনা। তাই হয়েছে মুস্কিল। চেকে বিঙ ক্রসবির সই ছিল আসল নামেই।

আন্নাস´ আর রোজাস´

খবরটা আপনারা সবাই জানেন না আমারও দেওয়া হয়নি। কত রকমের গুজব

রটে। গুজব নিয়েই ওরা আছে। আর গুজব না রটালে, ওদের রোজ রোজ নতুন খবর জুটবে কি করে। একটা কিছু ওদের চাইই, তা নয়ত ষ্টারদের সমস্ত চার্‌ম্‌ নষ্ট হয়ে যাবে। মনে আছে নিশ্চয়ই, কিছুদিন আগে গুজব রটেছিল লিউ আয়ার্স আর জিনজার রোজার্স চার্চ্চে গিয়ে হাতে হাত দিয়ে মন্ত্র পড়বে।

পরে একদিন শুনলুম জিনজার রোজার্স গেছে রেণোতে বেড়াতে, লিউ আয়ার্সের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই।

এই সেদিন জিনজার রোজার্স বলেছে ও খবরটা একেবারেই বাজে। আমাদের মধ্যে ওরকম কোন ভাব একেবারেই জেগে ওঠেনি। তাই ভাবি ওরা কি রকম ভুয়ো জিনিষ নিয়ে মাতামাতি করে।

পা মচকান

ওখানের ব্যাপারই এই রকম! কারোর কোন কিছু হোল তো অমনি অনেকের ঘটতে থাকবে তাই। ধরুন, আজ শুনলেন অমুকের গলায় ব্যথা হয়েছে—ব্যস আর যায় কোথা! কাল শুনবেন আর একজনের, পরশু শুনবেন আর একজনের, চতুর্থ দিন শুনবেন নবম ও দশম ব্যক্তির ওই গলার ব্যথার খবর। তারপর একদিন তার একটি প্রকাণ্ড লিষ্ট বেরোবে।

প্যাট্রিসিয়া এলিস ১৯৩৫ সালের আর একজন উদীয়মানা অভিনেত্রী। নামের হাট্টই ওকে আকাশের অনেকখানি ওপরে তুলে নিয়ে গেছে। সেই প্যাট্রিসিয়া এলিসের ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এর ছবিতে কাজ করবার সময় পা মচকে গিয়েছিল, আমি খবর পেয়েছিলাম, দিই নি।

তারপর খবর এলো অল জলসনের পা মচকে গেছে।

তারপর এসেছে বেট ডেভিস-এর নাম। সেও ভয়ানকভাবে পা "মচকে ফেলেছে, দি পেট্রিফায়েড" ছবিতে কাজ করতে করতে। এই পর্য্যন্ত শুনে রাখুন। এরপর একটা লিষ্ট আপনাদের দেব।

"গার্ডেন অব আল্লা"

অবশেষে সেদিন ঠিক হোল। মার্লের বদলে এলো মার্লিন। আর এলো র‍্যামন নোভারো। র‍্যামনই হবে "গার্ডেন অব আল্লা" ছবির হিরো আর নায়িকা মার্লিন ডিয়েট্রিক।

কত গুজবই রটেছিল এই র‍্যামন সম্বন্ধে। যাক এইবার নিষ্পত্তি হোল। ষ্টেজে নামা কিম্বা ছবি পরিচালনা করা দুটোই এখন স্থগিত রইলো।

আর মার্লে! তার হয়েছে রাগ। কার না হয় রাগ? "গার্ডেন অব আল্লা" ছবিতে তারই তো নায়িকা হয়ে নামবার কথা ছিল।

মার্লে ওবেরণ

তার নাম পর্য্যন্ত চারিদিকে রটে গেলো। আর এখন কোম্পানী তার বদলে আনলে মার্লিন ডিয়েট্রিকে।

তাই মার্লে ওবেরণ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের দাবী দিয়ে সেলজ্‌নিক পিকচার্স কোম্পানীর নামে নালিশ করেছে। আদায় করছে এই বলে; "গার্ডেন অব আল্লা" ছবির নামের প্রচারে তার নাম দেওয়া হয়েছিল; আজ তার নাম বাদ দেওয়াতে, সম্মানের হানি হয়েছে।

নতুন ছবি

জিন ক্লেয়ার লুইনের 'ডড্‌স ওয়ার্থ' বইখানি মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার ষ্টুডিও নিয়েছেন। এখানাকে ছায়াছবিতে রূপান্তর করার সব ঠিক হয়ে গেছে। ওয়াল্টার হাস্টন হিরো আর নায়িকার অংশে নামবে রুথ চ্যাটারটন।

এরল ফ্লিন

এরল ফ্লিনের নাম আপনারা আজকাল খুব শুনতে পান। শুনতে পান তার কারণ সে 'ক্যাপটেন ব্লাড' ছবিতে ভাল অভিনয় করেছে বলে। সেই এরল ফ্লিন-এর পুরোণো চুক্তিপত্র আর তাতে বসানো হয়েচে পাওনার একটি বড় রকমের অঙ্ক।

আরো একটি খবর আছে। ওদেশের ষ্টারদের নামের সঙ্গে সঙ্গে পয়সা যেমন বাড়ে, তেমনি আরোও একটা জিনিষ বাড়ে, তা হচ্ছে ফ্যান মেল। আজ প্রথম দিনে যদি হয় পাঁচখানা কাল একটু নাম হলে পাবে পাঁচশখানা। ঠিক এমনি হয়েচে এরল ফ্লিনের। সে আগে পেত সপ্তাহে পাঁচখানা এখন পায় পাঁচশখানা।

সেদিন এরল ফ্লিন বলেছে তার ফ্যান মেলের মধ্যে চব্বিশখানা আসে বিয়ের অনুরোধ নিয়ে। আহা! তারা তো জানে না যে গভীর রাতে তন্বী-তরুণী-বধূ লিলি ড্যামিটার গলা জড়িয়ে এরল বলে; "বৌ কথা কও, বৌ কথা কও"।

খুচরো খবর

জেনেট ম্যাকডোনাল্ড আর ক্লার্ক গেবল নামবে 'উডি' ছবিতে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন ভ্যানডাইক।

* * *

এডি ক্যান্টরের ছবির নাম হচ্ছে 'পনি বয়'।

* * *

ছায়াচিত্রে অভিনয় করার জন্তে জ্যাকি সপ্তাহে আয় করেছে এক হাজার পাঁচশ থেকে এক হাজার ছ'শ পাউণ্ড। সত্যি কথা বলতে কি! 'দি কিড্' ছবির পর নাম করার মত ছবি আর জ্যাকির কিছু নেই।

কুমারী শীলা হালদার — —
পপুলার পিক্‌চার্সের "আবর্ত্তনে" নায়িকা সেজে ইনি সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, ভদ্রঘরের যে ক'টি মেয়ে আজ অবধি সিনেমায় নেমেছেন শীলা তাদের মধ্যে একজন।
"আবর্ত্তন" 'শ্রী'তে এখন চল্‌ছে।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩—4th. June, 1936. } ২৩শ সংখ্যা

দিন আগত ঐ......

অন্ধ্র, কেরালা ও তামিল নাড়ু—এই তিনটি কংগ্রেস কমিটী লইয়া মাদ্রাজ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গঠিত। এই তিনটী কংগ্রেস কমিটী হইতেই আগামী সংস্কৃত শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক এসেম্‌ব্লীর প্রার্থী নির্ব্বাচনকল্পে বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে। অর্থাৎ কংগ্রেসের তরফ হইতে যোগ্য প্রার্থী যাহাতে নির্ব্বাচিত হয়, সে সম্বন্ধে এখন হইতেই আয়োজন ও তোড়জোড় চলিতেছে। বোম্বাইয়ে মিঃ নরীম্যান এবং বিহারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইতিপূর্ব্বেই এই বিষয়ে উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলার কংগ্রেসীমহলে এই সম্বন্ধে যেন শ্মশানের নীরবতা বিরাজ করিতেছে। এইরূপ নিশ্চেষ্টতার কারণ কি তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সম্মিলিত দল-গঠন সম্ভব নাও হয় তথাপি বাঙ্গলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

যে কোনও কাজের সাফল্যের প্রথম সোপান শৃঙ্খলা। সুচিন্তিত কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিয়া যথা নিয়মে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে তবে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, বিশেষতঃ কাজ যেখানে দশজনকে লইয়া। পূর্ব্বাহ্নে অবহিত না হইয়া শেষ মুহূর্ত্তে ছুটাছুটি করিলে যে "ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্ট" হইতে হয়—গত কলিকাতা করপোরেশান নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের অসাফল্যই তাহার প্রমাণ। যথেষ্ট সময় লইয়া যদি ধীর স্থিরচিত্তে বিবেচনা ও পরামর্শ করিয়া করপোরেশান-প্রার্থী নির্ব্বাচন করা হইত তাহা হইলে কংগ্রেস নিশ্চয়ই জয়লাভ করিত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এত তাড়াতাড়ি হইয়াছিল যে ধীর স্থিরচিত্তে বিবেচনা বা পরামর্শ করিবার মত সময় হাতে ছিল না। মনোনয়ন পত্র দাখিল করিবার দিন শেষ মুহূর্ত্তেও প্রার্থী খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। এইরূপ বিশৃঙ্খল হঠকারিতার শোচনীয় পরিণাম আজ সকলেরই সুবিদিত। এই পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি আমরা চাহি না। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, পরাজয়ের গ্লানি কখনই স্থায়ী হইতে পারে না যদি আমরা সেই পরাজয় হইতে যে শিক্ষালাভ করি তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎ জয়ের সূত্র রচনা করিতে পারি। তাই বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ী সদস্যদের প্রতি একান্ত অনুরোধ তাঁহারা যেন বৃথা আদর্শের আকাশকুসুম রচনা করিয়া অথবা নানা পরিকল্পনা করিয়া আলস্যে কাল হরণ না করেন। দোষে গুণে জড়িত মানুষদের লইয়া মাটির পৃথিবীর বুকে রাজনীতির যে রথ চলিয়াছে সেই রথে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে হইলে স্বপ্নের রাজ্য ত্যাগ করিয়া এই ধূলিমলিন পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতে হইবে এবং বাস্তবতাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। নির্ব্বাচন আসন্ন, অতএব বাঙ্গলা ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে যাহাতে যোগ্যতম লোকদেরই প্রেরণ করিতে পারে এখন হইতেই বাঙ্গলার কংগ্রেসকে সে বিষয়ে সচেষ্ট ও যত্নবান হইতে অনুরোধ করি।

৬	১	০ =	৮ বার
৫	২	০ =	১৯ বার
৫	১	১ =	৪২ বার
৪	০	০ =	৮০ বার
৪	২	১ =	২৮৩ বার
৩	৩	১ =	২০৮ বার
৩	২	২ =	৩৪০ বার

মোট ১০০০ বার

শ্রীদুর্ব্বাসা

হাতের ও রঙের বিভাগ—
জনৈক পাঠকবন্ধু Hand Pattern আর Suit Patter সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন এবং তিনি প্রশ্ন করে পাঠিয়েছেন যে, উহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি না। তাঁর এবং অন্যান্য পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে নিম্ন-লিখিত নিবন্ধটি দেওয়া হল।

Hand Pattern হচ্ছে হাতের বিভাগ এবং Suit Pattern হচ্ছে রঙের বিভাগ। মনে করুন আপনার হাতে ছয়খানি ইস্কাবন, চারখানি হরতন, দুইখানি রুহিতন, আর একখানি চিড়িতন এসেছে তা হলে এ ক্ষেত্রে আপনার হাতের বিভাগ হচ্ছে ৬—৪—২—১। আবার ধরুন, আপনার হাতে ছয়খানি ইস্কাবন এসেছে, আর বাকি তিন জনের হাতে ৪ খানি, ২ খানি ও ১ খানি এই ভাবে গেছে তা, হ'লে আপনাদের হাতে ইস্কাবন রঙের বিভাগ হচ্ছে ৬—৪—২—১। এইবার বোঝা গেল হাতের বিভাগ ও রঙের বিভাগ কা'কে বলা হয়। কিন্তু যখনই আমাদের প্রবন্ধে রঙের বিভাগ সম্বন্ধে বলা হবে তখনই বুঝতে হবে যে সেটি Trump suit সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। অতঃপর এই দুই বিভাগের মধ্যে কি সম্বন্ধ সেই বিষয়ে আলোচনা করব। সাধারণতঃ দেখা যায় যে হাতের বিভাগ যে ধরণের হয় রঙের বিভাগও সেই ধরণের হয়। যেমন ধরুন যদি আপনার হাতের বিভাগ হয় ৬—৪—২—১ তা' হলে আপনি যে রঙে খেল্‌বেন সে রঙের বিভাগও হবে ৬—৪—২—১—এ অবশ্য ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত ব্রীজ ক্রীড়কের অভিমত; তিনি এ নিয়ে একটি তুমুল তর্ক বাধিয়ে তুলেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে যদি আপনার হাতের বিভাগ হয় ৬—৪—২—১, আর আপনি ইস্কাবন রঙ করেন, তবে আশা করা যায় যে কোন খেলোয়াড় ইস্কাবনে রঙে চার তাস পেয়েছেন; আর যেহেতু একজন আপনার খেঁড়ী আর দুইজন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই হেতু বিপক্ষদলের কোন একজনের হাতেই চার তাস ইস্কাবন যাওয়া সম্ভবপর। বস্তুতঃ সকল ক্ষেত্রেই যে রঙের বিভাগ এরূপ হয় তা নয়, তবে ৫ বারের মধ্যে ২ বারের অধিক উক্ত নিয়ম খাটে। এই ratioটি নিছক কল্পনা প্রসূত নয়,—উল্লিখিত তর্কের ফলে তাঁরা ৮৫৭১ বার তাস-বণ্টন করে দেখেন যে তার মধ্যে ৩৩৪০ বার এই ধরণের তাস প্রত্যেক খেলোয়াড়ই পেয়েছিলেন। সেই থেকেই পাঁচের দুই ratio চলে আসছে। অতঃপর অধিকাংশ সময় বিপক্ষদল যে রঙে চারখানি তাস পান, সে বিষয়েও যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। ১০০০ বার তাস বণ্টনের ফলে উক্ত ঘটনাটিও প্রমাণিত হয়েছে। সেই তালিকাটি নিম্নে লিখিত হল। অবশ্য মনে রাখবেন যে আপনার হাতে ছয়খানি রঙ এসেছে, আর বাকি সাতখানি কি ভাবে পড়েছে নিম্নের তালিকা থেকে দেখুন।

তবে জেনে রাখা উচিত যে হাতে অন্য রঙে পিট ধরবার তাস থাক্‌লেই ছয়খানি তাস নিয়ে রঙ করলে কোন ফল হয়, নচেৎ অধিকাংশ সময়ে খেসারৎ দিতে হবে।

ভেনাস ক্লাব ও ব্রীজ এসোসিয়েশন্‌:—সম্প্রতি ভেনাস ক্লাবের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদের হস্তগত হয়েছে। এ বিষয়ে সবিশেষ জান্‌বার জন্য ভেনাস ক্লাবের পক্ষ থেকে, এবং ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সম্পাদকের ও উক্ত প্রতিযোগিতার ক্রীড়কদের নিকট থেকে পত্র আহ্বান করছি। আমাদের মনে হয় ভেনাস্‌ ক্লাবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে অভিযোগ ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত অধিকাংশ ক্লাবের বিরুদ্ধেই খাটে। যাই হোক্‌ শীঘ্রই এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বল্‌বার ইচ্ছা রইল। সম্পূর্ণ পত্রখানি নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

লুনার এণ্ড স্ক্রুলস কমবাইণ্ড ক্লাব।
২২, বৃন্দাবন বসুর লেন।
২৫শে মে ১৯৩৬।

মাননীয়,
খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু, (ব্রীজ-বিভাগ)।

মহাশয়,

ভেনাস্‌ ক্লাব ইণ্ডিয়ান্‌ ব্রীজ এসোসিয়েশনের সহিত সদস্যভুক্ত নয় এমন সমস্ত

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

জিন্ হার্লো আর ডিক্ পাওয়েল রেডিয়োতে গান গাইছিলো—এমন সময়ে এই ছবি।

সই ভিখিরী

ভিখিরী ! ভিখিরী দেখেছি অনেক রকম। চায় তারা পয়সা, কাপড়, খাবার কিন্তু সইয়ের ভিখিরী কখন দেখিনি। কোন লোক এসে খাতা খুলে ধরে বল্লে :—'একটা সই দিন',—এমন মেলে ; মেলে না ভিক্ষে করে পয়সা' নিয়ে তারপর বলা একটা অটোগ্রাফ দিনতো। সেদিন সে খবরও পেয়েছি। হলিউড যেন আজব দেশ, সবটাই যেন আজগুবি মাটির সোণার কমল ওখানে তারায় গিয়ে পাপড়ী মেলেছে। ওদের ষ্টুডিওটাই স্বর্গরাজ্য—মায়ারাজ্য—স্বপ্নরাজ্য। কল্পনা দিয়ে মুড়ে রেখেছে অর্দ্ধেকটা। গাছের ফলটা হলদে হয়ে পেকে উঠলে, ওরা বলে—'ওরে সোনা ! সোনা ফলেচে। সারা দুনিয়ার লোক বিস্ময়ে ওদের পানে চেয়ে বলে—'সত্যি সোনা ?—দেখেচ ? সোনা—সোনা—সোনা।'

সে কথা যাক্।

রবার্ট টেলর সেদিন পথে বেরিয়েছে বেড়াতে। মনের আনন্দেই বেড়াচ্ছিলো বেভার্লি হিল্‌স-এর পথে পায়ে পায়ে। একটি ভিখিরী এলো, বল্লে : পয়সা দাওনা বাবা।

টেলর মুখের দিকে তাকালে। জিজ্ঞেস করলে, পয়সা ?—পকেট থেকে পয়সা বার করে দিলে তাকে। আর ভিখিরী ?—সে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলে—আপনার নাম রবার্ট টেলর ? রবার্ট উত্তর দিলে :—হ্যাঁ। ভিখিরী ছেঁড়া জামার ভেতরকার পকেটে হাত দিয়ে শত ভাজ করা এক টুকরো কাগজ বার করে বল্লে : একটা অটোগ্রাফ দিন তো।

দলকে তাঁহাদের প্রতিযোগিতায় খেলতে অনুমতি দিয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার পত্রিকায় লেখা যদি উচিত বিবেচনা করেন তাহা হইলে দয়া করিয়া লিখিবেন কি ? কারণ, ইহা ইণ্ডিয়ান্ ব্রীজ এসোসিয়েশনের নিয়মানুমোদিত নহে। ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মহাশয়ই বা ইহার কি প্রতিকার করিয়াছেন। আর, এই ভাবে যদি এসোসিয়েশনে অসদস্যভুক্ত দল লইয়া সদস্যভুক্ত দলের প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে এবং ইণ্ডিয়ান্ ব্রীজ এসোসিয়েশনের যদি তাহার কোনও প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে I. B. Aকে মানিবে কে ? এবং তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজনই বা কি ? আমাদের বিবেচনায় কোন সদস্যভুক্ত দলের এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান না করাই উচিত। ইহাই বোধ হয় ওই সমস্ত ক্লাবের শ্রেষ্ঠ মৌন প্রতিবাদ। এই বিষয়ে আপনার মতামত প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব।

ইতি,—

ভবদীয়,

(স্বাঃ) শ্রীগোলোকবিহারী মল্লিক।

মেগাফোন রেকর্ডে

৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের

প্রযোজক—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে :—দুর্গাদাস, শৈলেন চৌধুরী, শ্রীমতী কাননবালা
কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্তা (এ্যামেচার)

৬খানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ নাটক

মূল্য ১৩৷৷০

জুন মাসের অন্যান্য চমৎকার রেকর্ডগুলি নিকটস্থ
গ্রামোফোন ব্যবসায়ীর দোকানে শ্রবণ করুন।

পূর্ব্ব প্রকাশিত অভিনব কৌতুক নাটকের সেট

"ভোট-ভণ্ডুল"

প্রযোজক ও রচয়িতা—**বীরেন ভদ্র**

"ভণ্ডরাম" ইহার চিত্ররূপ দেখিলেই
রেকর্ড সেট কিনিতে
হইবে।

:সেনোলা:

রেকর্ড

জুন মাসের নূতন রেকর্ডে

শ্রবণ করুন

সেই গান

যে গান গাহিয়া নিখিলবঙ্গ প্রতিযোগিতায়

শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

সর্ব্ব-প্রথমের সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন

"কত যুগ ধরি বঁধুয়া আমার"

Q. S. 76

তৎসঙ্গে শ্রবণ করুন

Q. S. 77 { সোণার বরণ কন্যা সে যে — শ্রীমতী রেণুবালা ও
এই তো আমি যাই গো বধূ — মিঃ মণি রায়

Q. S. 78 { মীরার বঁধুয়া শ্যামসুন্দর — শ্রীযুত সুখেন্দু গোস্বামী
রাধিকার অন্তরে কি যে হলো

Q. S. 79 { গগণে জাগিল মহাকাল — শ্রীযুত ধীরেন ঘটক
আমার জীবন লয়ে প্রভু — "

Q. S. 80 { অন্ধকার অন্ধকার — কুমারী বাসন্তী দাশগুপ্তা
নীলাকাশের বুকের মাঝে

শ্রবণ করুন

ওস্তাদ কুদরৎউল্লা খাঁ সাহেবের

স্বর—প্রকাশ বীণ—Q. S. 81

আজই আপনার রেকর্ড-বিক্রেতার নিকট শ্রবণ করুন

সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ কো

কলিকাতা

টেলর অবাক হয়ে আপনার পকেট থেকে ফাউণ্টেন পেন বার করে সেই কাগজের ওপর দিলে সই করে।

ভিখিরীটি বল্লে: ধন্যবাদ। ডাইম (ছ পেন্স) বাজাতে বাজাতে চলে গেলো। টেলর কি ভেবেছিল জানিনা। আমার মনে হয়েছিলো, ওদেশের ভিখিরীরাও সিনেমা দেখে।

সিলভিয়ার শেষ হোল

সিলভিয়া সিডনির অজস্রলে জমকালো যৌবনের জোয়ার জয়মাল্য পরিয়েছে হলিউডের গলায়। কোন জগতের জ্যোতিঃ বৃষ্টি ওর সারা গায়ে। সেই জাজ্জল্যমান রেখায় রেখায় আকর্ষিত হচ্চে বিশ্বের সিনেমা

জগৎ। সিলভিয়া সিডনি তাদের বরণীয়া।

বার্ণাড কার্ফের এ ভালো লাগে না তাই, এ বিবাদ, এই বিচ্ছেদ। সিলভিয়া ভাবে তার কাজটাই বড়। কার্ফ বলে: ও রূপ দেখানো কাজের নেশা ছাড়তে হবে। সিলভিয়া তা পারবে না, পারবে না কিছুতেই পারবে না।

বার্ণাড হচ্ছে নিউ ইয়র্কের একজন বই প্রকাশক। কাজেই সহধর্ম্মিনীকে—সহধর্ম্মিনীর মত পাবার ইচ্ছা এবং সময় তার যত প্রবল এবং প্রশস্ত হোক, ফিল্ম অভিনেত্রীর পক্ষে ততটা নিজেকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই এই ছাড়াছাড়ি।

মারলিন ডিয়েটরিশ

সিলভিয়া ছায়াচিত্রের কাজে বাধা পেতে চায়না। এর জন্যে ও সব ছাড়তে প্রস্তুত।

সেদিন কোর্টে সিলভিয়া ঐ কথাটা ঠিক সোজাসুজি স্বীকার করেনি। ও বলেছে: কার্ফ ফিল্মের কাজ করা লোকদের ঠিক বুঝতে পারে না; মিছেমিছি কাজ নিয়ে ঝগড়া করে। এসব ভাল লাগে না। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল।

ছায়াচিত্রের যশ গৌরবের সঙ্গে সাংসারিক জীবনের সাবলীল স্বাচ্ছন্দে সুখে মেলা খুব দুরূহ। তাই কার্ফে সিলভিয়াতে সে সুখ জেগে উঠল না।

হলিউড জিতল, যেমন স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদ মামলায় জিতে আসে, ছায়ায় নামা নেশাখোরের গলায় দোলায় জয়ের হীরের হার।

এডমণ্ড লো

প্রেমে বিঘ্ন

আরলিন জাজ-এর এবার বোধ হয় স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হোল। বড় সুখের জীবন ছিল ওদের। স্বামী ওর হচ্ছে চিত্র পরিচালক ওয়েস্লী রাগেলস্।

ওরা ওদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলবে না! এই বিচ্ছেদের কথা কারুকে বলতেও নারাজ। ওরা স্বীকার করেচে যে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েচে। তবে বিচ্ছেদ মামলা আনবে কিনা তা ভাবেনি।

এমন দিন ছিল যেদিন হলিউডের লোকেরা ওদের খুব সুখী স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নাম করত। কোথা থেকে যে এ ফাটল দেখা দিলো!

ফ্রেডারিক মার্চ

বাহিরে থেকে মনে হয় ওদের এ সম্বন্ধ চিরদিনের মত ঘুচে গেলো। শুনেছি ছোট ছেলেটি আরলিনের কাছেই থাকবে। এরিক পামারের নাম কে না শুনেচে। উফার নাম আজ অত বড় হয়েচে কার জন্যে?

সে ওই এরিক পামারের জন্যেই। জগতের শ্রেষ্ঠ ষ্টুডিও গুলোর নাম করতে গেলে লোকে জার্ম্মানির উফার নাম বলে গোড়ার দিকে। কেন বলে?—আজ বলার উপযুক্ত কে করে তুলেছে?—সে ওই এরিক পামার।

মার্লিন ডিয়েট্রিক, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, আজ তার নামে কাতারে

কান্তারে লোক ছোটে সিনেমা হাউসের পানে। ওই মার্লিনকে ছায়া জগতের পূজারীদের সামনে কে প্রথম অবগুণ্ঠন খোলালো—কে বলে দিলো : চেয়ে দেখো, কলা কুশলী মার্লিন— অভিনয় পটিয়সী মার্লিন—চিত্র রূপসী মার্লিন।

আর এমিল জেনিংস্—জগতের অন্যতম অভিনেতা, যার তুলনা খুঁজতে সারা দুনিয়া খুঁজে বেড়াতে হয়; সেই এমিল জেনিংস "ব্লু এঞ্জেলে" নেমেছিল কার জন্যে সেও ওই এরিক পামার প্রডিউসার ছিল বলে।

সেই এরিক পামারের তত্ত্বাবধানে ডেনহামে ছবি উঠবে 'আই সার্ভ' গল্প লিখেচে এ ই ডব্লিউ মিসনস্। রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে প্রেমের ঘটনাবলী নিয়ে গল্প। ছবিখানি পরিচালনা করবে পরিচালক উইলিযাম কে হাওয়ার্ড।

উইলিয়াম কে হাওয়ার্ড এসেচে হলিউড থেকে। সঙ্গে এসেচে চীনে ক্যামেরা ম্যান জেমস ওয়াংহো! গুণের আধার সে! তার তোলা ছবি আপনাদের মনে আছে?—মনে করুন "তো ভিভা ভিলা" ছবির কথা, কেমন চমৎকার ফটোগ্রাফি। সেই আলো ছায়া—সেই রেখায় রেখায় মিশে যাওয়া অনন্ত আকাশ—মেঘ মেঘ আর মেঘ। সেই অস্পষ্ট আলোর আর ছায়া ভিভার চোখে মুখে—ঘোড়ায় পায়ে পায়ে।

আর ফ্লোরা রবসন আর লরেন্স অলিভার ওই ছবির নায়ক নায়িকা, ষ্টেজের ধূলো তারা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে রূপোলী পর্দ্দার বুকে দাঁড়িয়ে বিশ্বের ছায়াচিত্র রস পিপাসুদের প্রথম অভিবাদন জানাবে।

আজকের দুনিয়া তাকিয়ে আছে এরিকের এই দুটি শিল্পী-অবদানের পানে।

কে জানে আর একটা মার্লিন কি আর একটা কিছু তৈরী হবে কি না।

খুচরো খবর—

ক্লার্ক গেবলের প্রথম ছবিতে নামা সৈনিক হয়ে।

* * *

"মেরী অব স্কটল্যাণ্ড" ছবিতে নামচে ফ্রেডারিক মার্চ।

* * *

"দি ব্যাড ওম্যান ছবিতে এডমণ্ড লোর সঙ্গে নামচে ডলরেস্ ডেল রিও।

শ্রীএকলব্য

কোলকাতার ফুটবল খেলা

লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হ'ল। মহামেডান স্পোর্টিং একটিও না হেরে প্রথমার্দ্ধে প্রথম স্থান অধিকার কোরেছে। গত শনিবার মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের ফিরতি খেলা ছিল। লোকের ধারণা ছিল, মোহনবাগানকে মুস্‌লিম টিমটি অতি সহজেই পরাস্ত কোরবে। কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেল ভাগ্যদেবী যদি তাদের অশেষভাবে সাহায্য না কোরতেন তা হ'লে পরাজয় ছিল তাদের অবশ্যম্ভাবী। মোহনবাগান খেলার শেষের দু' মিনিট আগে এক গোলে হেরেছে বটে, কিন্তু মুস্‌লিম টিমকে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে "মরা মোহনবাগান লাথ্‌ টিক"। মোহনবাগান অনবরত গোলে শুট্‌ কোরেও গোল দিতে পারে নি—এমন কী বিদি বিভনায় 'পেনালটি'-তে পর্যন্ত তারা গোল দিতে পারে নি। সে যাই হ'ক, মহামেডান স্পোর্টিং এবারও নিশ্চয়ই দিগ্বিজয়ী না হ'লেও লীগ-বিজয়ী হবে।—যদি সত্যি তাই হয়, ভারতবাসীর তার চেয়ে আনন্দের আর কী হ'তে পারে! মহামেডান স্পোর্টিং, মোহন-বাগান, ইষ্ট বেঙ্গল যেই লীগ-বিজয়ী হবে আমাদের কাছে তা' সমান।

প্রথমার্দ্ধ লীগ খেলা শেষ হবার পর প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসন দলগুলির লিগে কার কি রকম অবস্থা তার টেবল্‌ নীচে দেওয়া হ'ল।

প্রথম ডিভিসন লীগ

	খেলা	জয়	ড্র	পরাঃ	গোল স্বঃ	গোল বিঃ	পঃ
মহমেডান	১১	৯	২	০	২৭	৩	২০
ব্ল্যাকওয়াচ	১১	৭	২	২	২৬	১৫	১৬
ই, বি. আর	১১	৫	৩	৩	১২	৬	১৩
ইষ্টবেঙ্গল	১০	৪	৩	৩	১৫	৭	১১
ক্যালকাটা	১১	৪	৩	৪	১৬	১১	১১
মোহনবাগান	১০	৪	৩	৩	৫	৮	১১
এরিয়ান্স	১০	৪	৩	৩	৮	১১	১১
ডালহৌসী	[illegible]	[illegible]	২	৪	৬	১১	১০
কাষ্টমস	১১	৩	৪	৩	১৬	১৪	১০
কালীঘাট	১১	২	১	৬	৮	২০	৭
পুলিশ	১১	১	২	৮	৮	২১	৪
এটাচড সেক্‌শন	১১	২	০	৯	৮	২৪	৪

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	গোল স্বঃ	গোল বিঃ	পঃ
ভবানীপুর	১০	৭	২	১	১৪	৪	১৬
রেঞ্জার্স	১১	৬	১	৪	১৫	৯	১৩
টাউন ক্লাব	৯	৬	১	২	১০	৩	১৩
কুমারটুলী	১১	৩	৬				১২
হাওড়া ইউঃ	১১	৫					
স্পোর্টিং ইউঃ	১০	৩	৬	১	১১	১০	১২
অরোরা	১১	৪	৩	৩	১২	১২	১১
জর্জ টেলিগ্রাফ	৯	৩	৪	২	১০	৬	১০
নেপিয়ার	১১	৩	৪	৪	১০	১০	১০
বৌবাজার	১০	২	৪	৪	৫	৮	৮
ডিভিন্স 'বি'	১১	২	১	৮	৮	১৬	৫
ইটালী স্পোর্টিং	১১	০	২	৯	৪	২৩	২

কে ক'খানা গোল দিয়েছে

প্রথমার্দ্ধ লিগ খেলায় প্রথম ডিভিসন দলগুলির খেলোয়াড়দের মধ্যে কে ক'খানা গোল দিয়েছে তা এখানে দেওয়া হ'ল।

রসিদ (বড়) (মহমেডান স্পোর্টিং)	১১
ক্যাস (এটাচড সেক্সন)	
সিম্যান (কাষ্টমস)	
সামাদ (ই, বি, আর)	
লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্ট বেঙ্গল)	
পার্ক (ব্ল্যাকওয়াচ)	
নিউম্যান (পুলিশ)	
বারোস (ক্যালকাটা)	
উইলকিন্সন (ব্ল্যাকওয়াচ)	
রহিম (মহমেডান স্পোর্টিং)	
ডিয়ারি (ব্ল্যাকওয়াচ)	
ব্ল্যাক (ব্ল্যাকওয়াচ)	
এস দত্ত (ই, বি, আর)	
কোকোনাটো (ক্যালকাটা)	
পাগসলি (কালীঘাট)	
সেলিম (মহমেডান স্পোর্টিং)	
জ্যাক (ব্ল্যাকওয়াচ)	
নোবল (ক্যালকাটা)	
কে, ভট্টাচার্য্য (কাষ্টমস)	
কে, প্রসাদ (ইষ্টবেঙ্গল)	
এ, রায়চৌধুরী (মোহনবাগান)	
ফোর্ড (ডালহৌসী)	
রসিদ (ছোট) (মহমেডান)	
মুর্গেশ (ইষ্ট বেঙ্গল)	
এস রায় (এরিয়ান্স)	
নূর মহম্মদ (মহমেডান স্পোর্টিং)	
ডব্লিউ সার্প (এরিয়ান্স)	
মহম্মদ হোসেন (মহমেডান স্পোর্টিং)	

গত সপ্তাহের খেলাগুলির ফলাফল নীচে দেওয়া হোল :—

বুধবার

ডালহাউসী—ইষ্টবেঙ্গল	১—০
ই, বি আর—এরিয়ান্স	২—০
ক্যালকাটা—এ্যাটাচড সেক্‌শন	৬—০

বৃহস্পতিবার

ব্ল্যাকওয়াচ—কালীঘাট	৫—০
কাষ্টমস্‌—মোহামেডান	০—০

শুক্রবার

ক্যালকাটা—ই, বি, আর	২—০
এরিয়ান্স—কাষ্টমস	১—০
ডালহাউসী—এ্যাটাচড সেকসন	২—১
ইষ্টবেঙ্গল—পুলিশ	৩—০

শনিবার

মোহামেডান—মোহন বাগান	১—০

সোমবার

মোহন বাগান—এ্যাটাচড সেকসন	২—১
এরিয়ান্স—পুলিশ	১—০
কাষ্টমস্—কালীঘাট	১—১

মঙ্গলবার

ক্যালকাটা—ইষ্টবেঙ্গল	৪—১
ব্ল্যাকওয়াচ—ই, বি, আর	২—১

ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতের সম্মিলিত ক্রিকেট খেলোয়াড়রা লণ্ডনে "ইসেক্স"-এর কাছেও সাত উইকেটে হেরে গেল। এতাবধি তারা আটটি ম্যাচ খেলেছে তার মধ্যে পাঁচটাতে, হেরেছে—তিনটি হ'য়েছে ড্র। ১৯৩২ সালে যখন এই ভারতীয় দল বিলেতে প্রথম খেলতে যায়, তখন তাদের যাত্রা গৌরবময় ছিল। সে বছর তারা ন'টি খেলার পর দশম খেলায় "হ্যাম্পসায়ারের" কাছে প্রথম পরাজয় স্বীকার করে। তার আগে "ব্রুকহিথ" ও "মার্টিনিয়াস এগারো"-র কাছে প্রাক্টিশ ম্যাচে তারা জয়ী হয়। তারপর "অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি"-কে হারিয়ে "সাসেক্স" "গ্লামর্গান" "এম-সি-সি"-র স'ঙ্গে ড্র করে। আর এ বছরকার তাদের খেলার ফল এই—

উরসেস্টার—৩ উইকেটে পরাজয়
অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি—সমান
সামারসেট্—৯ উইকেটে পরাজয়
নরদাম্টস্—সমান
এম-সি-সি—১০ উইকেটে পরাজয়
লিসটারসায়ার—সমান
মিড্লসেক্স—৪ উইকেটে পরাজয়
এসেক্স—৭ " "

এই পরাজয় সংবাদ আজ সুদূর থেকে আমাদের কানে পৌছিয়ে আমাদের মনকে কেবল ব্যথাই দিচ্ছে। কিন্তু ও-দেশের সমালোচকমণ্ডলী কাগজে-পত্রে, মাঠে-ঘাটে, থিয়েটারে-সিনেমাহলে, ক্লাবে ভারতীয়দের খেলার তারিফ কোরে তাদের উচ্চ প্রশংসায় ভূষিত কোরছেন। বিশেষতঃ অমরনাথের ও এস্, ব্যানার্জির ব্যাটিং ও বোলিং তাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ অবধি ভারতীয় দল পাঁচটি 'সেঞ্চুরি' কোরেছে তার মধ্যে অমরনাথের ভাগে তিনটি এবং দু'টি "ইসেক্স"-এর বিরুদ্ধে—দু' ইনিংসে দু'টি। বাকী দুটির অংশীদার মার্চেন্ট ও বাকা জিলানী। প্রাচ্যের বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর এই আখ্যানবাণী এ পরাজয়ের ভেতরও আমাদের আলোর সন্ধান দিচ্ছে।

ভারতীয় দল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনে ১৬১ রাণ করে; কেম্ব্রিজের হয় ২১৭ রাণ। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয়রা কেউ আউট না হ'য়ে ৩ রাণ করার পর খেলা শেষ।

অলিম্পিক যাত্রী ভারতীয় হকি দল

যাক, আশার কথা—প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হয়েছে। আগামী ৪ঠা জুন ভারতীয় হকি দল বার্লিন অভিমুখে অলিম্পিকে আমাদের আগেকার খ্যাতি বজায় রাখতে যাত্রা করবে। বাংলা এবার দিয়েছে অন্য সবায়ের চেয়ে বেশীটাকা—সাত হাজার সাতশো পঞ্চাশ। এতে আশ্চর্য্য হবারই বা কি আছে—বাংলা তো বরাবরই বেশী টাকা দিয়ে আসছে। ১৯২৮ সালে ২০,০০০৲, ১৯৩২ সালে ১৫,০০০৲।

এবার নিখিল ভারতীয় দলে বাংলা থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছে পাঁচ জন খেলোয়াড়। অন্য যে কোন একটা প্রদেশ থেকে নির্ব্বাচিত খেলো-

সাহিত্য পরিচয়

গোয়াজ্জিন—বি-আম্মা লতীফুন্নেসা সংখ্যা; খাদেমুল এনছান সমিতি কর্ত্তৃক ১২০, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক: সৈয়দ আবদুর রব। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৸০, প্রতি সংখ্যা ৶১০।
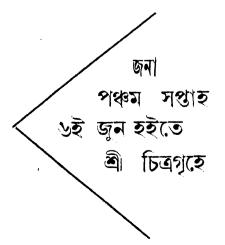
খাদেমুল এনছান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আবদুর রব সাহেবের পরলোকগতা জননীর স্মরণার্থে এই বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যায় ঐ মহিয়সী মহিলার জীবনবৃত্তান্ত লইয়া বহু ব্যক্তি তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইহাতে অন্যান্য বিভাগীয় লেখাগুলিও প্রকাশিত আছে। শ্রীদিলীপকুমার রায়ের "দেশিকী ফ্যাসাদ." মিঃ আবদুল কাদেরের "সুর-শিল্প" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকার উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করি।

...য়াড়ের সংখ্যার চেয়ে বেশী। এই দেখে অন্যান্য প্রদেশের প্রাদেশিকতা বিষে জর্জ্জরিত কেউ কেউ বাংলাকে কোণ-ঠাসা করার জন্যে সুর ধরেছিলেন যে প্রত্যেক প্রদেশকে নির্ব্বাচিত প্রতি খেলোয়াড় পিছু ১৫০০৲ টাকা করে দিতে হবে। বাংলা থেকে যদিও পাচ জন নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন—একজন—আর কার, যেতে পারবেন না। তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট ব্যক্তিদের প্রস্তাবানুসারে বাংলাকে অত টাকা না দিলেও চলতো। তাঁরা এখন কি বলেন?

(বিলাসী)

লাহোর থেকে খবর

লাহোর থেকে খবর এসেছে জবর। হিন্দী "দেনা-পাওনা" সেখানে নাকি সুনামের পরেছে সোনালী মুকুট। এ সুনামের জন্য দায়ী যে শুধু চকচকে চঞ্চল চোখ চন্দ্রা—তা নয়। সুকণ্ঠ মিঃ সাইগল—একলা তিনিও নন। অভিজ্ঞ পরিচালনা কিম্বা সুতীক্ষ্ণ প্রযোজনা—এও সাফল্যের একমাত্র কারণ নয়।

এর অসীম গুণের একটি গুণ হচ্ছে—রঙীন আব্‌হাওয়া সঙ্গীত

আমাদের মিহিরদা'র ভাই তিমিরবরণ উদয়শঙ্করের নৃত্যশিল্পে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে' বিখ্যাত। তারপর সিনেমা তাঁর যন্ত্রের অভিনব ঝঙ্কার শুনলে হিন্দী "দেবদাস"এ। তূর্য্যের হ'লো ধ্বনি। আকাশের বাতাস হ'লো চঞ্চল। সারা ভারতের সিনেমা-সাধারণ জান্‌লে—নেপথ্য-গানে এসেছে আসল এক গুণী।

জীবনের প্রতি চলার পথে যে সুর, যে ঝঙ্কার থাকে মানুষের অগোচরের অন্তরালে—তার প্রতিরূপ, তার প্রতিসুর যে চিনতে পারে—যে সবাইকে চেনাতে পারে—সেই হচ্ছে যান্ত্রিকজগতে গুণীর মত গুণী। আমাদের তিমিরবরণ যে তাঁদের ভেতর অন্যতম একজন—হিন্দী "দেনাপাওনা"র সোনার মত সুনাম তার প্রমাণ।

আমরা খুবই আশা করছি—"বিজয়া"র বুকের যে অপরূপ বেদনা বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী লেখনীর সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, পর্দ্দায় তারই প্রতিরূপ গড়্‌তে তিমিরবরণের অভিনব ঝঙ্কারও যথেষ্ট সাহায্য করবে।

গুণী গাবে গান। সে গানের সঙ্গত তার হবে বিজয়ার হাসা, বিজয়ার কাঁদা, বিজয়ার কথা বলা। তার হাসি, তার কান্না, তার কথা বলায় মুহূর্ত্তে মুর্চ্ছনা জাগাবে তিমিরবরণের রঙীন—রেশমী সুরের রেশ।

নিউ থিয়েটার্স

বালন্তী কটন মিলে কুলি-মজুর সংক্রান্ত ব্যাপারটি গেল হপ্তা পর্য্যন্ত তোলা হ'য়েছে। নীতীন বসুর এই ছবির বিষয় আমরা যতই শুন্‌ছি ততই আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছি। আর চরিত্র নির্ব্বাচনেও ছবিখানার নতুনত্ব আছে শুনলাম, এতে দু'ভাষারই নায়ক সাজ্‌ছেন সাইগল, নায়িকা বাঙলা ও হিন্দীতে যথাক্রমে চন্দ্রাবতী ও কমলেশকুমারী। আর 'ভিলেন' দুর্গাদাস ও পৃথ্বিরাজ যথাক্রমে বাঙলা ও হিন্দীতে। আসছে হপ্তায় এ সম্বন্ধে সাধারণকে বিশদভাবে খবর দেবার চেষ্টা আমরা কোরব।

* * *

আমরা যে খবর দিয়েছিলাম তা' সত্যিই সত্য হ'ল। আমাদের অমায়িক বন্ধু অজিত নাথ লাহিড়ী 'চিত্রা' থেকে ১নং ষ্টুডিওতে স্থানান্তরিত হ'য়েছেন। তিনি পি, এন্, রায় ও ছবি ঘোষালের সহকারীরূপে কাজ কোরবেন। আমরা অজিতবাবুর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। এদিকে অধুনা-লুপ্ত "রওণক মহলে-"র সহকারী ম্যানেজার কৃষ্ণ ঘোষ 'চিত্রা'র অজিতবাবুর স্থানে নিয়োজিত হ'য়েছেন।

ইনি হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস। চিত্ররাজ্যে আগমন এঁর নতুন। "অন্নপূর্ণার মন্দির"-এ ইনি নামছেন বিশ্বেশ্বরের ভূমিকায়।

নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

'বি ইউনিট'-এ এদের "বিজয়া"র শুটিং আবার সুরু হ'য়েছে। পরিচালক দীনেশ দাস বিশেষভাবে অসুস্থ। তিনি সুস্থ হ'লে 'বিজয়ার' কাজ আরো দ্রুতভাবে চলবে।' তাঁর অচির আরোগ্য আমরা কামনা করছি।

কালী ফিল্মস্

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী পরিচালিত এদের "অন্নপূর্ণার মন্দির" এই শনিবার থেকে 'উত্তরায়' মুক্তিলাভ কোরবে। গল্পের অভিনয়ে, শিল্পিগণের নতুনত্বে ও কালী ফিল্মসের প্রচেষ্টায় ছবিখানা যে বাঙ্লার ছেলে মেয়ে সবাইকে আনন্দ দেবে—একথা জোর গলায় বলা যায়।

*　*　*

এই সঙ্গে হাসির রাজা মুখুয্যে মশাইয়ের "ভোট-ভণ্ডুল" দেখানো হবে। এ ছবির খবর চিত্রবিলাসী যারা তারা সবাই রাখেন—আমরা শুধু জানি, "ভোট-ভণ্ডুল" দেখে লোকে এমন হাস্‌বে যে—দুর্ব্বল-চিত্ত লোকের হার্টফেল্ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়!

পরিচালক সুকুমারের হিন্দী ছবি "আশিয়ানা" প্রায় শেষ হ'ল। এরপরও বন্ধুবর আমাদের আর একখানা হিন্দী ছবি তুলবেন। তার ওপর আমাদের অগাধ ভালবাসা, সেজন্যে তার যত উন্নতি দেখ্‌ব—ততই আমরা উল্লসিত হব।

*　*　*

সুশীল মজুমদার চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মুক্তি-স্নান" তুলবেন—এখবর আমরা পূর্ব্বেই জানিয়েছিলাম। শুনছি তিনি এখন চরিত্র-নির্ব্বাচন নিয়ে ব্যস্ত আছেন। হয়ত' কুমারী শীলা হালদার নায়িকার ভূমিকায় নাম্‌তে পারেন।

*　*　*

জ্যোতিষ মুখুজ্যের হিন্দী "তরুণী"-র চরিত্র নির্ব্বাচন শেষ হ'য়েছে। ছবিখানা মহলায় পড়েছে। ছবিখানা তোলা শেষ হ'লে বাঙ্লার বাইরেও যে মাইডিয়ার মুখুজ্যে মশাইয়ের নাম ছড়িয়ে পড়্‌বে তার আভাষ আমরা কিছু কিছু পেইছি।

ফুল্লরা

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী তাঁর নিজের মানসকন্যা "ফুল্লরা"কে কোলে নিয়ে রাধার কুঞ্জ থেকে কালীর কমলে বহুদিন ঘোরা ফেরা কোরে নিজেই শেষে "ফুল্লরা"-কে রূপ দেবেন—

"অন্নপূর্ণার মন্দিরে" ঘোড়ায় চড়ে চরিত্রহীন বেপরোয়া এক জমিদারের ছেলে—এ চরিত্রে রূপ দিয়েছেন তারাকুমার ভট্টাচার্য।

এখবর যথাসময়ে আমরা সবাইকে দিচ্ছ্‌লাম। সম্প্রতি ছবিখানা মহলায় পড়েছে। এতে মূল-ভূমিকায় নামছেন, ফুল্লরা—শিশুবালা, কালকেতু—অহীন্দ্র চৌধুরী, ভাঁড়ুদত্ত—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রাজপুত্র—শরৎ চাটুয্যে। এতদিন পরে "ফুল্লরা"-র যে একটা গতি হ'ল—এ দেখে সত্যিই আমরা খুসী হ'য়েছি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

দেবকী বসুর "সোনার সংসারে"-র নায়ক রমেশের পল্লীগ্রামের বাড়ীর দৃশ্য অল্প সেটে তোলা হ'চ্ছে। এই দৃশ্য থেকে নাটকের আনুষঙ্গিক সঙ্গতি সুরু হবে—যারই ওপর সমস্ত নাটকখানি ভিত্তি কোরে গড়ে উঠবে। এই দৃশ্যে বাঙলাতে জীবন গাঙ্গুলী ও ছায়া দেবী ও হিন্দীতে গুল হামিদ ও রামপিয়ারী বিশিষ্ট চরিত্র চিত্রণ কোরবে। আর প্রকাশ যে, এই দৃশ্যের দৃশ্য-সজ্জা হ'বে অভিনব এবং তার রূপদাতা হ'চ্ছেন বটু সেন।

* * *

"সোনার সংসারে" তুলসী লাহিড়ী পণ্ডিতজী ও পূর্ণিমা একটি গানের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে নিয়োজিত হ'য়েছে।

* *

কারদারের উর্দ্দু ছবি "বাঘে সিপাহী"-র রাজ-প্রাসাদের দৃশ্য গেল হপ্তায় তোলা শেষ হ'য়েছে।

লয়লার মৃত্যু-দৃশ্য তোলার সঙ্গে সঙ্গে পারশ্য-চিত্রে "লয়লা-মজনু" শেষ হ'য়েছে। পরিচালক স্পেণ্টা এখন ছবিখানার সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

পায়োনিয়ার ফিল্মস

এখানে প্রফুল্ল ঘোষ অনুরূপা দেবীর "মা" হিন্দিতে তুলছেন। ঘোষ মশাই পূর্ব্বেই এ ছবিখানা বাঙলায় তুলেছিলেন, কিন্তু বিশেষ সুবিধে কোরতে পারেন নি। হিন্দীতে এই গল্পটি যদি ভালভাবে তোলা যায় তা' হ'লে কোম্পানীর নাম ও পয়সা দু'ই হবার সম্ভাবনা আছে। তা' ছাড়া এতে জাল মার্চ্চেণ্ট অরবিন্দ ও অজিত দু'টি ভূমিকায় নামছেন আর জুবেদা সাজছেন মা। এটা এ ছবির একটা মস্ত আকর্ষণ।

ডি-জি-টকীজ

গেল হপ্তায় ডি জি তাঁর "দ্বীপান্তরে"র শুটিংয়ে কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিও দিন-রাত মুখর কোরে রেখেছিলেন। নতুন সব শিল্পীদের নিয়ে বৃদ্ধবয়সে ডি-জি যে অমানুষিক পরিশ্রম কোরছেন তা' দেখে মনে হয় যেন তার ভেতর তারুণ্যের সেই রক্ত আবার শিরায় শিরায় বইছে। উচ্চ-শিক্ষিত মনোহর মোহন রায় নায়কের ভূমিকায় ও তারই উপযুক্ত নায়িকা প্রিয়দর্শনা ঊষা দেবী—চিত্রজগতে নবাগতা হ'লেও এরা নাকি অভিনব অভিনয় কোরছেন—এ ছাড়া নবাগতা মেয়েটি—নীলিমা বাঁড়ুয্যেও 'ডি-জি'-র মান রক্ষা করেছেন এরূপ কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন। আর এদের সবায়ের ওপর ডি-জি আছেন। আর একটি ছোট ছেলে রূপলাল নাকী "দ্বীপান্তরে" তার নামের মতই সুন্দর অভিনয় করেছে। ডি-জি-র এই নব-যাত্রার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হ'ক—এই আমাদের একমাত্র কামনা। "দ্বীপান্তরে"র সম্পূর্ণ চরিত্র-লিপি নীচে দেওয়া হ'ল।

মমতা—ঊষা দেবী, রুবি—করুণা বসু, মালতী—নীলিমা বাঁড়ুয্যে, নর্ত্তকী—রেণুকা

রাণী, লতিকা—রাণী চৌধুরী (বোম্বে)-ভামিনী—বীনাপাণি, মিসেস্ রায়, অমিতা দেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া—আরতি দেবী, শচীমাতা—পারুল বালা, লোবেন—মোহন রায়, হোটেলের সরদার—দীরেন গাঙ্গুলী, বাদল—মাঃ রূপলাল, রূপেন মিত্তির—হরিশ বাঁড়ুয্যে, ম্যানেজার—পুলিন বসাক (ঃ), সুকুল—নৃপতি চাটুয্যে, কেবলরাম—অসিত বাঁড়ুয্যে, বালক-কৃষ্ণ—ভট্চাজ (ঃ), নিমাই—সুধীর ঘোষ, মিঃ রায়—বিভূতি গাঙ্গুলী, বিচারপতি—হরেন মুখুয্যে (ঃ), ইন্সপেক্টার—চন্দ্রশেখর ভট্চায, মাঝি—মাঃ মণ্টু, পরিব্রাজক—নিমাই চক্রবর্ত্তী, বায়োস্কোপের দর্শক—নেপোলিয়ান কুণ্ডু।

চন্দ্র ফিল্মস্

আস্‌চে ১৩ই এদের প্রথম ছবি "পরপারে" 'চিত্রা'-য় মুক্ত হবে বলে প্রকাশ। ছবিখানা বাজারে বেরুবার আগেই চিত্ররাজ্যে এনেছে এক নব উম্মেষণা। কারণ, এতে প্রধান অপ্রধান ভূমিকায় যারা অভিনয় কোরেছেন সকলেই চিত্রপ্রিয়দের প্রিয়-অভিনেতা; যতীন দাস যিনি বাঙ্গলার সিনেমা শিল্পের শৈশব থেকে এর সেবা কোরে আস্‌ছেন, তিনি এই ছবির পরিচালক; আর কৃষ্ণচন্দ্র দে, প্রবোধ দাস, জ্যোতিষ সিংহ প্রভৃতির সঙ্গীত-পরিচালনা, আলোক-চিত্র ও শব্দযন্ত্রের গুণপনার কথা কে না জানে! তার ওপর ধনীর দুলাল ধীরেন্দ্রনাথ চন্দ্র এই ছবির সাফল্যের জন্মে অকাতরে অর্থব্যয় কোরেছেন। এত যত্ন নিয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যে ছবি তোলান হ'য়েছে—সেখানা যে সব দিক থেকে সাফল্য মণ্ডিত হবে—এ ধারণা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

এদের "বাঙ্গালী" ও হাসির ছবি "বেজায় রগড়" কোল্‌কাতার কোনও শ্রেষ্ঠ ছবিঘরে শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে।

শুভ-পরিণয়

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার যশোহর নিবাসী স্বর্গীয় বিপিন বিহারী দাঁ মহাশয়ের মধ্যম পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সিতিকণ্ঠ দাঁর সহিত কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বিদের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী দীপ্তির শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা নব দম্পতীর শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বগুড়ায় স্মৃতিসভা

বগুড়া জেলা মুসলিম ছাত্র সমিতির উদ্যোগে গত ২২শে মে শুক্রবার বগুড়া টমসন হল গৃহে এক মহতী স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ঐ সভায় পরলোকগত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ওয়াজেদ আলী খাঁ পানি, ডাঃ এম এ আনসারী, মার্মাডিউক পিক্‌থল (সুনামখ্যাত সাংবাদিক) ডাঃ লুৎফর রহমন এবং খাঁ বাহাদুর, ইমাদুদ্দিন আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। বগুড়ার তরুণ মুসলিম কর্ম্মী মিঃ এ ওয়াসেথ বি, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেনোলা রেকর্ড

সেনোলা আর এক বিষয়ে সকলের অপেক্ষা বাহাদুরী লইয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত গ্রামোফোন সেটে কোন কোম্পানীই ভদ্রঘরের মহিলাদিগের দ্বারা অভিনয়ের আয়োজন করিতে পারেন নাই। সেনোলার মাথুর সেটে তাহা সম্ভব হইয়াছে। মাথুর পালাটি রচনা করিয়াছেন যশস্বী সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রযোজনা করিয়াছেন শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সেন বি-এ, এল-এল-বি। তিনখানি রেকর্ডে এরূপ নিখুঁত প্রযোজনা সচরাচর দেখা যায় না। এই গীত-প্রধান কীর্ত্তন-পালায় সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে—সুনির্ব্বাচিত কীর্ত্তন-গুলি। কীর্ত্তনগুলিতে সুর-সংযোজনা করিয়াছেন স্বনামধন্য সুর-শিল্পী শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য। সুরের প্রাণময়ত্বে এবং গায়িকা-দিগের মধুর কণ্ঠস্বরে গানগুলি সত্যই মধুর হইতে মধুরতর হইয়াছে। রাধিকার ভূমিকায় শ্রীমতী বীণা চৌধুরি যে অভিনয়-নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের নিকট হইতেও বেশী আশা করা যায় না।

"বিজয়া"

বয়েজ ওন লাইব্রেরী ও ইয়ং মেন্‌স ইন্‌ষ্টিটিউট্-এর সভ্যেরা গেল ২৩শে মে শনিবার University Instituteএ তাদের সপ্তবিংশতি বার্ষিকী উপলক্ষ্যে "বিজয়া" অভিনয় করেছিল।

মোটের উপর অভিনয় ভালই হয়েছে। পরেশের ভূমিকাটী বড়ই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। বিলাসবিহারী স্থানে স্থানে অতি অভিনয় করলেও তার অবশিষ্টাংশে ভাল। রাসবিহারির অভিনয় বেশ ভালই হয়েছে। বিজয়ার ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাকে চমৎকার মানিয়েছিল ও তার অভিনয়ও ভাল; নরেনের ভূমিকা যথেষ্ট সংযত হলেও দর্শকগণের মনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়নি। এই অংশটির প্রাণ-খোলা হাসি ও অকুণ্ঠিত হাব ভাব অভিনেতার অতি সংযত অভিনয়ের সঙ্গে যেন মোটেই খাপ খায়নি। দয়াল, কালীপদ, ও কানাইসিংএর ভূমিকা চলন সই। অন্যান্য ছোট ছোট ভূমিকা গুলির মধ্যে ব্রাহ্ম ভদ্রলোকগণ দর্শক সাধারণকে যথেষ্ট হাসাতে পেরেছিল। বিজয়া-নরেনের বিবাহ দৃশ্যটী বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

শ্রীসরযু ঘোষ

(১)

টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া সুবিমল কতকগুলি কি নোট দেখিতেছিল, পিছন হইতে তুষার আসিয়া সুবিমলের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল—এবার কিন্তু গরমের ছুটিতে নৈনীতালে বেড়াতে যেতে হবে; সেবার দার্জ্জিলিং গিয়ে কি আমোদটাই না হ'য়েছিল!—বলিয়া থামিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া একটু অভিমান ভরা সুরে পুনরায় তুষার কহিল—"কি উত্তর দিচ্ছ না যে?" সুবিমল কাগজ পড়িতে পড়িতেই পিছনদিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া তুষারকে সামনের দিকে টানিয়া আনিয়া নিজের চেয়ারের পাশটিতে বসাইয়া তাহার নিমিলিত চোখদুটির উপর নিজের ঠোঁট দুখানি রাখিল; তুষার তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—"যাও, কি যে করো! আমি যা জিজ্ঞাসা করলাম, তার উত্তর নেই!"—বলিয়া উঠিতে গেল, কিন্তু সুবিমল ছাড়িল না, তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া কহিল—"কেন রাগ করছ তুষার! তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি আমি কোন দিন কথা কয়েছি?"

"তাহ'লেও তো মানুষে একটা কথা বলে?"

"এতো তোমায় জানান আছে, তোমার যখন ইচ্ছা হ'য়েছে তুষার, তখন সে কাজ নিশ্চয়ই হবে। তুমি কি জাননা তুষার! তুমি আমার জ্বালাভরা জীবনে স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছ?"

"কি যে বকো তুমি, তার ঠিক নেই! কি যে তোমার জ্বালা তাও এ পর্য্যন্ত আমি জান্‌তে পারলাম না!!"

তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া সুবিমল কহিল—"বলতে ত সব কথা তোমায় ইচ্ছে করে রাণী! বল্লে পরে অনেকটা বুকের বোঝা নেমেও যায়,—কিন্তু, তা এখন বলা হবে না তুষার! তোমার ওই তুষারের মতন সাদা বুকে কালো রংএর ছোপ ধরাতে চাই না রাণী! তার চেয়ে আমার যখন সব শেষ হ'য়ে আসবে, সেই শেষের দিনে, তোমার কাছে সব গ্লানি ব'লে যাব। তবে তুমি এটুকু জেনে রেখ, তোমায় আমি ভালবাসি—অপরিমিত।"

দুইজনেই খানিক স্তব্ধভাবে থাকিয়া, ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া তুষার কহিল—"বেশ! তোমার ভালবাসা পেয়েই আমার জীবন ধন্য হোক্, আর সব জিনিষ আঁধারেই চাপা থাক্"—বলিয়া উঠিয়া পড়িল। সুবিমল একটুখানি চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল "রাগ কর না, রাণী—! ব্যবস্থা ক'রগে তুমি, কলেজ বন্ধ হ'লেই, রওনা হওয়া যাবে।

(২)

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুবিমল রায় গ্রীষ্মের ছুটিতে নৈনীতালে বেড়াইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার পত্নী তুষারকণা। একদিন বৈকালে চা খাইতে খাইতে তুষারের অত শুভ্র মুখখানির দিকে চাহিয়া সুবিমল ভাবিতেছিলেন—বাপ মা নামটা রেখেছিলেন ঠিক—এমন সময়ে তাঁহার বন্ধু অমরনাথ ও তাঁহার পত্নী আসিয়া কহিলেন, চলুন বেড়াতে যাওয়া যাক্। তাঁহারা দুই বন্ধুতেই সপরিবারে নৈনীতালে বেড়াইতে আসিয়াছেন। সুখের বিষয় নিঃসন্তান তুষারকণার কোন ঝঞ্ঝাট নাই, কিন্তু অমরনাথের পত্নী ৩।৪টি সন্তানের জননী হইয়া বড়ই বিব্রত। সকল সময়ে তিনি ইহাদের সহিত বেড়ানতে যোগ দিতে পারেন না। আজ একটু সকাল সকাল সারিয়া লইয়া ছেলেগুলিকে চাকরের জিম্মায় রাখিয়া স্বামীর সহিত বন্ধুগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তুষার সুবিমলকে কহিল, "ওঠ, তৈরী হ'য়ে নেও" বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। সুবিমল মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না তুষার! আজ তোমরা যাও, আজ আর আমার ভাল লাগছেনা বেড়াতে"। তুষার মুখ বাঁকাইয়া বলিল "তা কি হয়! তুমি না গেলে কি হয়!"

"কেন হবে না! লক্ষীটি যাও।"

"না, তুমি না গেলে আমার—"

"থামলে কেন? 'ভাল লাগেনা' এই তো ব'লতে চাও? আচ্ছা, আজ অমর আমার হ'য়ে—"

তুষার রাগিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল—"থামুন, মশায়! আপনাকে আর টিপ্পনি কাটতে হবে না। থাকুন এই গুদমে, ওই কাগজ পত্রের মধ্যে মুখ গুজে প'ড়ে, আমার ব'য়ে গেছে আপনাকে সাধ্‌তে। যতই এই পুরুষ জাতটাকে আদর দেওয়া যায়, ততই মাথায় উঠে বসেন!" অমরনাথের পত্নী ডালি হাসিয়া কহিল—"বটেই তো! ওঁদেরকে রাখতে হয় আমাদের আসবাব পত্রের সামিল, তার বেশী ওঁদেরকে উঠতে দিতে নেই," তাহ'লেই ওঁরা মনে করেন যে 'ওঁদের না হ'লে মেয়ে জাতটার আর গতি নেই। যাক্—তুই ভাই শিগ্‌গীর তৈরী হ'য়ে নে, ওঁর আর তৈরী হ'তে কতটুকু লাগবে? জানিস তো আমার আবার পিছনে টান আছে—ভেবেছিলাম একটু সকাল সকাল বেড়াতে বেরোবো, তা সুবিমলবাবু সব ভেস্তে দিচ্ছেন। চলুন না, সুবিমল বাবু! কী ঘরের কোনায় ব'সে থাকবেন?"

"কাল আপনাদের সঙ্গে যোগ দেব, আজকের মত ছ'ড়ান দিন। আপনার বন্ধুর হাত থেকে যখন কতকগুলো গাল খেয়ে ছাড়ান

পেয়েছি, তখন আর জড়াবেন না, মিসেস্ সেন !"

এমন সময়ে তুষার বেড়াইতে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়া ডাকিল—"চল্ চল্ ডালি ! ওঁর সঙ্গে আর ব'কতে হবে না,—উনি থাকুন এই বইএর কীট হ'য়ে।" তিন জনে বাহির হইয়া গেল।

(৩)

"একি ! নমিতা ! !"

"এ কি ! তুষার ! !"

"ডালি ! আজ তুই অমরবাবুকে নিয়ে বেড়িয়ে আয় ভাই, আমি আজ আর যাব না। আমার এই বহুদিনের-অদেখা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে, তার সঙ্গে একটু গল্প করব—কিছু মনে করিস নে ভাই!—আয় তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হ'চ্ছেন আমার বন্ধু নমিতা—'মিস্' কি 'মিসেস'—এখনও সেটা ঠিক জানতে পারি নি,—কাজেই এই পর্য্যন্ত পরিচয়—আর নমি ! ইনি হ'চ্ছেন আমার স্বামীর বন্ধু 'মিঃ সেন'।"

নমস্কার প্রতিনমস্কার জানানর পর, ডালি হাসিয়া কহিল—"তুষার ! প্রিয়তমা বন্ধুকে পেয়ে আজকের বিকেল তোর খুব মিষ্টিভাবেই কাটুক।" তুষার হাসিয়া কহিল—"হাঁ ভাই, খুব ছোটবেলাকার বন্ধু।" অমরনাথ কহিলেন "আপনার সঙ্গে তাহ'লে ফিরে এসে এইখানেই মিট্ করব ?" "হাঁ, অমর বাবু !"

তুষার দুইহাতে নমিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"নমি ! তুই এখানে কবে এলি ?"

নমিতা হাসিয়া কহিল—"তুই যে একেবারে আত্মহারা হলি ! চল, বাড়ীর ভেতর ঢোক্, সব বলছি।" দুইজনে কম্পাউণ্ড পার হইয়া সামনের বারাণ্ডায় উঠতেই হলের ভিতর হইতে বছর আষ্টেকের একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া 'মা' বলিয়া নমিতাকে জড়াইয়া ধরিল। তুষার কহিল—"নমি ! তোর মেয়ে ?—দেখি দেখি"—টানিয়া নিজের কাছে লইয়া আসিয়া অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিল। অনাস্বাদিত মাতৃহৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা তার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। সে মেয়েটিকে চুম্বন দিয়া ছাইয়া ফেলিল—খানিক পরে বলিল,—"নমি, কি নাম রেখেছিস মেয়ের ?" নমিতা যেন সে কথা না শুনিতে পাইয়াই বলিল—"চল, তুষার, ঘরে চল, বসিগে।" নমিতা আগে আগে, পিছনে তুষার মেয়েটির হাত ধরিয়া ড্রইং-রুমে ঢুকিয়া, দুইখানা চেয়ার লইয়া দুজনে বসিয়া পড়িল। তুষার অনর্গল নানা কথা কহিতে লাগিল, নমিতা স্থিরভাবে বসিয়া দু'একটি কথায় বন্ধুকে তৃপ্ত করিতে লাগিল।

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ সামের দিকে নজর পড়ায় তুষার কহিল "বারে ! কি সুন্দর ছবিখানা ! কার ছবি ? বেবির—তোর মেয়ের ? বাঃ, কি চৎকার !" বলিয়া উঠিয়া ছবির দিকে আগাইয়া গেল। মেয়েটি এতক্ষণ তার কোলের ভিতর থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, এখন ছাড়া পাইয়া ছুটিয়া পলাইল। তুষার অল্পক্ষণ পরে অন্য একখানা ছবি দেখিয়া বলিল—"কে ইনি ?" নমিতা আস্তে আস্তে উত্তর দিল—"বাবা।" তুষার ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারাঘর ছবি দেখিতে লাগিল।

"সুন্দর ছবিগুলি নমি ! কোন্ শিল্পীর এ সব আইডিয়া ? বাঃ কি চমৎকার এ ছবিখানা ! দূরে প্রিয়তমকে দেখে ছুটে যাচ্ছে, তার আবেগ উদ্বেল প্রাণটানিয়ে—! এখানা কি ? একটি মেয়ে ব'সে—ছোট্ট শিশু একটি কোলে, মেয়েটির মুখে একটি বেদনার ছাপ প'ড়েছে ; কিন্তু সেই ব্যথাভরা চোখে কেমন একটা স্নেহপ্রেম ঝ'রে প'ড়ছে দেখেছিস ? কার এ সব আইডিয়া নমি ? কে ইনি শিল্পী ? নামত নেই !—বল্না।"

"শুনে কি হবে তুষার ?"

"বাঃ কে ইনি শুন্বো না ? যাঁর তুলীর আঁকে হৃদয়ের এমন স্নিগ্ধ মনোরম জিনিষগুলি এমন সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠেছে, কে তিনি, তা জানতে ইচ্ছে করে না ? তোর স্বামী ? তিনি কি আর্টিষ্ট ?" একটু মৃদু হাসির সহিত নমিতা কহিল—"না, ভাই, না।"

"তবে ? কে বল্না নমি।"

"একান্তই শুনবি ?"

"হাঁ, হাঁ, বল্ বাপু, তোর মত অত ধৈর্য্য আমার নেই।" ছোট্ট ক'রে নমিতা বলিল—"আমি।"

তুষার সবিস্ময়ে কহিল—"তুই ! তুই এত বড় আর্টিষ্ট ! তোর সেই ছোট বেলাকার

প্রিয় জিনিষটি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল—জীবনে ! !"

"শুধু এইটুকু কেন তুষার ! ছোট বেলাকার আইডিয়া জীবনে অনেক কিছুই ফুটে উঠেছে আমার—" বলিয়া নমিতা একটু ছোট নিশ্বাস ফেলিল। তুষারের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবিগুলি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসায় সুইচ টিপিয়া দিয়া তুষার কক্ষটি আলোকিত করিয়া দিল, এমন সময়ে ডালি ও অমরনাথ ঘরে ঢুকিয়া কহিল "চলুন এবার মিসেস্ রায় ! বাড়ী ফেরা যাক ? আপনার বন্ধুর সঙ্গে অদ্ভুত আলাপ খুব আনন্দদায়ক হ'য়েছে নিশ্চয়ই ?"

"হাঁ, মিঃ সেন। আসুন, আপনারাও সে আনন্দে যোগদান করুন।"

নমিতা উঠিয়া স্নিগ্ধ হাঁসির সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তুষার কহিল —"দেখ ডালি ! ইনি আমার শুধু বন্ধু ব'লে পরিচয় দিলে ঠিক হবে না। দেওয়ালের গায়ে তাকিয়ে দেখ—কত বড় শিল্পী ইনি ! এর তুলির টানে, কত বিরহীর বিরহব্যথা—মিলন আশে কত-প্রেমিকার প্রেমের উচ্ছ্বাস—প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন আনন্দ কি সুন্দর ফুটে উঠেছে দেখ ! !" তুষার ডালিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইতে লাগিল। এমন সময়ে নমিতার উপদেশ মত 'বয়' আসিয়া জানাইল—'চা দেওয়া হইয়াছে।'

নমিতা তুষারের কাছে গিয়া তুষার ও ডালির হাত ধরিয়া, অমরনাথকে আহ্বান করিয়া বলিল—"আসুন, গরীবের বাড়ীতে একটু চা খেয়ে যান। আয়, তুষার।"

খাইবার ঘরে ঢুকিয়া তুষার আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "ওরে বাবা ! এযে একেবারে বিরাট ভোজের আয়োজন ক'রে ফেলেছিস্ ! আচ্ছা ; তুই ড্রইং রুমে ব'সে ব'সে কখন এ সব ফরমাস করলি ?" অমরনাথ ও ডালি একসঙ্গে কহিয়া উঠিল "এ অসময়ে কষ্ট ক'রে এত আয়োজন কেন ক'রেছেন আপনি !" নমিতা স্নিগ্ধ হাসির সহিত কহিল "এটুকু আর বেশী কি এমন মিষ্টার সেন ? ব'সে পড়ুন।" "আপনি ও বসুন" চারিজনেই বসিয়া পড়িল। খাইতে খাইতে তুষার কহিল "আচ্ছা নমি ! বাঙ্গলোর বাহির দিকটা বা ড্রইং রুম দেখে তোর বাবাকে মনে হয় তিনি সম্পূর্ণ সাহেবী কায়দায় থাকতেন, কিন্তু খাওয়ার ঘর বা খাওয়ার আয়োজন দেখে মনে হয় তিনি পুরো বাঙ্গালী" নমিতা বলিল—"সত্যিই ভাই, তিনি বাহিরে সাহেব, কিন্তু অন্তরে পুরো বাঙ্গালী ছিলেন। বিশেষতঃ খাওয়ার সম্বন্ধে তিনি ব'লতেন 'বাঙ্গালী আমরা—বাঙ্গলা দেশের জল হাওয়ায় শরীর পুষ্ট আমাদের—বাঙ্গলা খাদ্য না হ'লে কি প্রাণ বাঁচে আমাদের।' তিনি রুটি, বিস্কিট এ সব জিনিষ মোটেই পছন্দ করতেন না। কাজেই আমাদের বাড়ীতে ওসব দিয়ে অতিথি সৎকারের পাট নেই।"

"আচ্ছা, তিনি যদি এত ভালবাসতেন বাঙ্গলা দেশকে—তবে সে দেশ ত্যাগ ক'রে এই পাহাড় ঘেরা দেশে এসে বাস করছিলেন কেন নমি ?"

নমিতা তাড়াতাড়ি বলিল—"সে অনেক কথা—আর একদিন বলবো"—বলিয়া কথার ধারাটা ঘুরাইয়া লইল।

নানা কথা ও হাসি গল্পের ভিতর দিয়া খাওয়া শেষ হইল। তুষার হাসিয়া কহিল —"নিজের পেটটি তো ঠাণ্ডা হ'ল, দেখিগে মিঃ রায় এখন কি কচ্ছেন।"

নমিতা হাসিয়া কহিল—"তিনি এতক্ষণ তোর অদর্শনে চারিদিক অন্ধকার দেখছেন। কিম্বা—" তুষার ভ্রূভঙ্গিতে হাসিয়া কহিল "আচ্ছা আর তোমাকে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে হবে না।"

বিদায় সম্ভাষণের পর যাইবার সময়ে তুষার কহিল "কাল আবার আসছি তোমার বিরক্ত করতে—মিষ্টার রায়কে নিয়ে তোমার ষ্টুডিও দেখাতে।" হাসিয়া নমিতা কহিল "পাগলামি করিসনে, সকলকে নিয়ে ! মিষ্টার রায়কে নিয়ে কখন আসবি বলতো ?" "তা বলতে পারছি নে ভাই ! সে বই-এর কীটকে যখন সুবিধে পাব, তখনই টেনে নিয়ে আসব।"

(৪)

প্রত্যুষেই নমিতার বাঙ্গলোর সামনে তুষার ও সুবিমল আসিয়া উপস্থিত হইল। গেটের ভিতর ঢুকিতেই দরোয়ান উঠিয়া সেলাম করিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই বারাণ্ডা হইতে বেবী তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া নিকটে আসিতে তুষার হাস্যোজ্জ্বল মুখে চুমা খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা কই বেবী ?" স্নিগ্ধ মিষ্টস্বরে বেবী বলিল—"মা তো এখন পুজোর ঘরে, মাসিমা।"

"চলত আমাকে সেখানে নিয়ে"।

"সেখানে তো এখন মা কাউকে যেতে দেবেন না।"

"তা হোক, আমায় যেতে দেবে" বলিয়া বেবীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল, পশ্চাতে সুবিমল। ঘরের সামনে আসিয়া সুবিমলকে

একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তুষার বলিল—"এস, এস। পূজারতার পূজা ভঙ্গ করা যাক" বলিয়া দ্বার বিলম্বিত পর্দ্দাখানি সরাইতেই তুষার বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহারই স্বামীর একখানি প্রকাণ্ড অয়েল-পেন্টিং-এর সম্মুখে ধ্যানস্থা নমিতা। কাঁপিতে কাঁপিতে সুবিমল নিকটস্থ একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল, আর তুষার দরজায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শব্দে নমিতার ধ্যান ভাঙ্গিল, মুখ ফিরাতেই সামনে তুষার এবং দরজার নিকটেই সুবিমলকে দেখিতে পাইয়া চমকিয়া বলিয়া উঠিল—"তুমি! তুমি এসেছ—আজ আটটি বৎসর পরে, তুষারের সঙ্গে!! তুমি তুষারের স্বামী!!! ও: ভগবান!" তুষার স্বামীর অতীত জীবনের অমুক্ত কথাগুলি মুহূর্ত্ত মধ্যে অনুমান করিয়া লইয়া শুব্ধ জমাট-ভাবে ভাবিতেছিল। নমিতা ধীরে ধীরে তুষারের নিকটে আসিয়া বলিয়া পড়িয়া বলিল—"তুষার, ভাই বন্ধু! কাল জিজ্ঞাসা করেছিলে, বাবা নৈনীতালে কেন এলেন? আজ তবে বলি, আমার নিবিড় ব্যথার কথা, আমার গ্লানির কথা। স্বেচ্ছাচারিণী বলে ঘৃণা করতে ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু আর কিছু ভেব না আমার বন্ধু।"

"হুগলী থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর যখন বাবা আমাকে কলেজে ভর্ত্তি করে দিলেন, সেই সময়ে আমি মাসিমার বাড়ীতে থেকে পড়তাম। ইনি তখন নতুন প্রফেসর হ'য়েছেন, মাসীমাদের সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই প্রায়ই সে বাড়ীতে আসতেন—আমার সঙ্গেও আলাপ হ'ল। কিছুদিন পরে ইনি হুগলী কলেজের প্রফেসর হ'য়ে চ'লে গেলেন।

"আমি আই-এ ফেল ক'রে বাড়ী এলাম, এসে শুনলাম তোর বাবা কিছুদিন আগে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়ে অন্য কোথায় বদলি হ'য়ে গেছেন—কাজেই তোর সঙ্গে আর দেখা হল না। বাবা আবার আমাকে ভর্ত্তি করে দিতে চাইলেন, আমি আর পড়তে রাজী হ'লাম না। তখন ইনি সেখানকার প্রফেসর। আমার সঙ্গে আগের থেকে আলাপ থাকায়, আমাদের বাড়ী যাতায়াত করতে লাগলেন। আমাদের সেই আলাপ ক্রমে নিবিড় ভালবাসায় পরিণত হ'ল। জানিস তুই, আমার মা ছিলেন না—তোরা যখন ওখানে ছিলি, তখন কতদিন তোর মার কাছ থেকে মায়ের আদর নিয়ে এসেছি—। যাক্। বিয়ে আমি করব না, বাবাকে বলেছিলাম, তাঁর স্নেহের কোলেই চিরদিন থাকব।—তবু বাবার ইচ্ছে—'যদি এর সঙ্গেই বিয়ে হয়—।' কিন্তু আমার তা মত ছিল না—আমার মত ছিল—যার সঙ্গে প্রাণের "মিল হবে, তাঁর সঙ্গে ভালবাসা হবে,—কিন্তু তাতে আবার বিবাহের বন্ধন কেন?—

"তারপর—বেবী আমার কোলে আসার সম্ভাবনা জানতে পেয়ে, বাবা লোকলজ্জা ও গ্লানিতে চিরদিনের মত বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে আমাকে নিয়ে এই সুদূর পাহাড় ঘেরা দেশে এসে বাস করতে লাগলেন। এই কটা বচ্ছর—বারা আমার, আমারই জন্যে দারুণ মনঃপীড়া ভোগ ক'রে শেষে ঐ পাহাড়ের কোলে চিরশান্তি লাভ ক'রেছেন।" বলিতে বলিতে নমিতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল তাহার কণ্ঠও রুদ্ধ হইল। খানিক পরে ক্ষুব্ধস্বরে নমিতা বলিল—"তুষার! উতল করেছে আমায় বেবীর কথা ভেবে। যখন চোখের সামনে ভবিষ্যৎ ভেসে উঠল তখন সমস্ত "আইডিয়া" ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আজ বেবীর সমাজে স্থান নেই। উঃ!" নমিতার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—খানিক পরে তুষার নমিতার হাতখানি ধরিয়া কহিল—"দিদি ওঠ, বাড়ী চল!" বিষাদের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া, একবার তুষারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল —"'দিদি' নয়, বল্ 'বন্ধু', বল্ 'নমি'—আর পারিস যদি, অভাগা সন্তান আমার—তোরই স্বামীর—পারিসতো তাকে নিয়ে সমাজে স্থান দিস—বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তুষার ধীরে ধীরে তাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিল—চোখে তার ফোঁটার পর ফোঁটা জল।

প্রত্যাখ্যান

শ্রীশিশির কুমার সরকার

(১)

আঁকন ফুলের কড়িহার সই
গলেতে আমার না-দিও।
(শুধু) গলেতে আমার না-দিও
তটিনীর জল মহা আনন্দে দু'কূল উছলি' ছাপিবে
আকাশের ভালে সিঁদুরের রেখা রাজিবে
কবরী তোমার শিথিল করিয়া
মূরতি আমার আঁকিও।
আঁকন ফুলের কড়িহার বৃথা
গলেতে আমার না-দিও।

(২)

আঁকন ফুলের কড়ি হার সখি
এমনি প্রভাতে গাঁথিও।
অজানা বাদলে ভাবিও।
ফাগুনের বানে কচি পাতা যবে জাগিবে
আবিরের খুনে ধরণী যে দিন রাঙিবে
সেদিন আমারে ভাবিও—
সখি ভাবিও।
দরদী তোমার দড়াহার সই,
গলেতে আজিকে না-দিও।

(৩)

কাঁকন পরিও আঁকনের সই
স্বর্ণবলয় খুলি,
(তব) স্বর্ণবলয় খুলি।
কুসুমের হারে কিবা প্রয়োজন?
থাকে যদি মনে পূজা-আয়োজন
মুছে যায় যাক আঁখির কাজল
অশ্রুদীপে হ'ক সে উজল
চুমে যায় যাক তোমারি নিটোল
পদপদ্মের ধূলি।

সে-ধূলির জয়-রাজটীকা মোর
ভালেতে আঁকিও তুলি।
কাঁকন পরিও আঁকনের সই
স্বর্ণবলয় খুলি।

(৪)

মদির নয়নে বসন্ত যবে হাসিবে
সেদিনও আমারে এমনি কি ভালবাসিবে?
কচি পাতা মাঝে থাকিয়া থাকিয়া
পথ-তরু 'পরে ডাকিবে পাপিয়া
সেদিনও কি তুমি আমার লাগিয়া
অশ্রু নীরবে মুছিবে?
বসন্ত যবে হাসিবে।

(৫)

সেদিন প্রভাত আলোকে
কেশের গুচ্ছ-পুচ্ছ নাচায়ে
ঢাকিবে আঁখির পলকে।
সেদিন প্রথম আলোকে।
বিহগবিহগী নাচিবে কুলায়
তুমি কি সেদিন লুটিবে ধূলায়?—
আঁখির জলেতে কাজল মুছিবে
ভিজাবে তোমার অলকে?
সেদিন প্রভাতে আলোকে।

(৬)

আঁকনের ফুল তুলিওগো সই
মালাটি তেমনি গাঁথিও।
(শুধু) গলেতে আমার না-দিও।
এমনি শীতল ছায়াবীথিতল,
অদূরে নাচিবে তটিনীর জল
এমনি দিনেতে এমনি করিয়া
কথাটি আমার ভাবিও—
সই ভাবিও,
দরদী তোমার দড়াহার বৃথা
গলেতে আমার না-দিও।

লীলাময়

এক অঙ্ক নাটিকা

শ্রীপ্রভাত কুমার দেব সরকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—লেকের পার—উত্তরে পামবেষ্টিত কুঞ্জবন, সময়—কনে-দেখা বেলা।

[বরুণা বসে আছে আর বার বার উৎসুক হ'য়ে এদিক ওদিক চাইচে। হাত দশেক দূর থেকে লীলাময়কে দেখ্‌তে পাওয়া গেল]

বরুণা (একটু রাগের ভাণ করে')—বেশত! ঠিক একঘণ্টা পরে, চলে যেতেও পারি না—ব্যস্ তা' হ'লে কাল থেকেই কথা বন্ধ হোক আর কি! উনি বাস্‌লেন ভাল, টাল সাম্‌লাব আমি—এর মধ্যে পাঁচ ছ' জন কটাক্ষে অশ্লীল কবিতা আউড়ে গেচে।

লীলাময়—অ্যা, চটো কেন? অভিসারের ফ্যাসাদ অনেক।—যেই আসব বলে' বেরিয়েচি সেজে গুজে, দেখা সুনীতির সঙ্গে। বল্‌লে, চল্ এক সঙ্গে যাই। মিথ্যে কথা বল্‌তে হ'লো—ফের বাড়ী ঢুকে পড়লুম্। জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে' দেখি, তখন রাস্তায় পায়চাড়ি ক'রচে। ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে—তা'তেই—। আচ্ছা পট্টি দিয়েচি সকলকে—সা' নগর পার্কের নাম ক'রেচি।

বরুণা—কেন মিথ্যে ভোগাও ওদের?—বেচারা সব!

লীলাময়—ভোগাবনা? গাধাগুলো কল্পনায় মারা পড়বার যোগাড় হ'লো।—আমার চেহারাটা আর মুখের তোড় দেখে' ভাবে, প্রেমটা আমি খোলামকুচির মত নাড়াচাড়া করি। কিন্তু আস্‌লে যে আমি কী, তা' তো তোমার জান্‌তে বাকী নেই। ওরা ভাবে আমার ভাবের ফোয়ারা ছোটে মেয়েদের দেখ্‌লে, ভাব কিন্তু আমি জানি, মেয়েদের দেখ্‌লে ভাব আমার ভোঁতা হ'য়ে যায়।—বাপ্‌রে আমি বোবা বনে যাই।—গাধাগুলোকে বেগার না খাটালে, তোমার অবস্থা কী হ'তো বলতো?

বরুণা—কেন আমার আবার কী হ'তে' যাবে?

লীলাময়—কথাটা বুঝতে পারলে না—তোমার প্রেমের হাটে এসে ওরা হল্লা করতো—সেখানে তোমার মেছুনী ছাড়া আর কিছু হ'বার উপায় নেই।

বরুণা—কিন্তু ওদের কাছে আমার নাম করবারই বা দরকার কী?

লীলাময়—তা' না হ'লে আমার গুণটা যে ফেঁসে যায়—তোমায় ভালবেসে সবার কাছে গর্ব্ব করবার মত কোন প্রমাণই থাকে না যে! সাকারের ভক্ত ওরা—যে দিন জানবে আমি ওদেরই মত নিরাকার নিয়ে মাতামাতি করি, সেদিন দেবে.........দলে ভিড়িয়ে।—পুরুষ হ'য়ে পরাজয় মানবো কেন? বানান প্রেমের গল্প ওই সব কল্পনায় প্রেম পাগল হা করে' গেলে—বেশ মজা লাগে!

বরুণা—তুমি কী আমাদের বাজারের আলু পেলে নাকি, সবার কাছে দর বলে' বেড়াও।

লীলাময়—তা' ছাড়া যে উপায় নেই, ইতর সাধারণ আলুর দামটাই জানে, ফাগুনের পটলের দাম জানে না—তোমাদের তাই ওদের কাছে আলু বানিয়েচি।—তাতুকনা একটু, বাইরে আগুন নিয়ে খেলা করুক, তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

বরুণা—ছেলেদের মধ্যে অমন বানান গল্পের চলন আছে না কি?

লীলাময়—নাঃ, তুমি দেখ্‌চি ভয়ঙ্কর সরল! চলন না-থাকলে, প্রেমের গল্প লেখক প্রেমানন্দদের বেঙ ছাতার মত জন্ম হ'বে কেন?—মাসিক ও সাপ্তাহিকে যত প্রেমের গল্প বেরোয়, সব গুলোই তো বানান অভিজ্ঞতায় লেখা।—সন্ধ্যে বেলায় এলবার্ট কেটে, তোলা সিল্কের জামাটা গায়ে দিয়ে, জুতোয় ব্লেকো মাখিয়ে, আধ পয়সার সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে পাশ দিয়ে যখন হন হন্ ক'রে চলে যায়, বুঝতে পারনা তখন ওদের মতলবটা কী? শিকারের আশে ওরা বুড়ো বাপ্‌কে বাজারে পাঠিয়ে ছাদে উঠে শাড়ীর আঁচল খুঁজে বেড়ায়।

বরুণা—স্বজাতির নিন্দে করা পাপ—যত খারাপ হোকনা কেন তারা!

লীলাময়—সাধে করি! ন্যাকার অবতার সব।—এদিকে আমার অবস্থা সঙ্গিন—প্রেমের গল্প শোনবার জন্যে গরীব কেরাণী বাপের ট্রামের পয়সা পকেট থেকে সরিয়ে যখন তখন চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে যায়—

বরুণা—বল্‌লেই পার আমি ও সবের কিছু জানিনা।

লীলাময়—কিন্তু এটা ভোল কেন, আমরা পুরুষ—তিল সত্যকে মিথ্যে দিয়ে তাল করতে আমাদের বাধেনা—সবার চক্ষে—বিস্ময়ের বস্তু হ'তে লোভ আমাদের বেশী।—তোমরা যেটাকে বাড়াবাড়ি মনে কর, আমরা সেটাকে তাড়াতাড়ি জাহির করতে উঠে পড়ে লাগি।

বরুণা—কিন্তু এ মিথ্যে তো একদিন ধরা পড়বেই—তখন কেন আর—

লীলাময়—মিথ্যে একদিন ধরা পড়বে, তা জানি। কিন্তু সত্য যে তুমি, সেটা

যাহা ছিল এতদিন পুস্তকের
পৃষ্ঠায় আবদ্ধ—আবাল-
বৃদ্ধবণিতা যাহার
কাহিনী পড়িয়া সুখ-দুঃখে কখনও বা
হাসি কখনও বা কান্নায় মশগুল হইয়াছে
ছায়াপটে তারই আলেখ্য নব-ভাবে, নব-রূপে জীবন্ত-মূর্ত্তি
পরিগ্রহ করিয়াছে। কল্পনার রঙীন জাল যাহা এতদিন বাসা
বাঁধিয়াছিল মনের অন্তরে—ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহা চক্ষের সম্মুখে।

কালী ফিল্মসের আগামী শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর অমর-লেখনী প্রসূত

অন্নপূর্ণার মন্দির

অন্নপূর্ণার মন্দির

পরিচালক: শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী চিত্র-শিল্পী: শ্রীসুরেশ দাস
শব্দযন্ত্রী: শ্রীজগদীশ বসু দৃশ্য-সজ্জাকর: শ্রীপরেশ বসু

শ্রেষ্ঠাংশে: ছবি বিশ্বাস, ফণি রায়, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জ্জি, বুলা, তারাপদ ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র মিত্র, জীবেন ঘোষ, মনোরমা, প্রভা, মায়া মুখার্জ্জি, সাবিত্রী (পক্ষী), প্রকাশমণি প্রভৃতি।

কালী ফিল্মস্

এই সঙ্গে মন-মাতানো শ্রীবীরেন ভদ্রের হাসির নক্সা
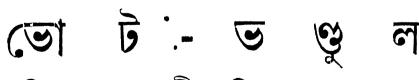
পরিচালক: শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

শুভ-উদ্বোধন ═ উত্তরা ═ শনিবার, ৬ই জুন

থেকে তো আর ফাঁক পড়বো না।......... অবিবাহিত অবস্থায় যে কটা দিন প্রেমিক বলে' চলে যেতে পারি, সে ক'টা দিনই ভাল—। পথে ঘাটে প্রেম সম্বন্ধে যখন গল্প উঠবে, আমার মতামতটাই ধর্ত্তব্যের মধ্যে হ'বে—আমি হ'ব প্রেমের তুলাদণ্ড।

বরুণা—ছাই, ওরা থাকলে জানিয়ে দিতুম, প্রেমসম্বন্ধে কত অজ্ঞ তুমি।—একটুতেই কথা বন্ধ করে দাও।

লীলাময়—সেই ভয়েই তো তোমায় তাদের কাছে বার করি না।...আর ভুলে যাও কেন, ভালবাসায় মান-অভিমান না থাকলে ওটা বাসি হয়ে যায়—ঝালিয়ে নিতে ওটার দরকার আছে।

বরুণা—না, তোমার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই,...কিন্তু কোনদিন ওরা একটা ফ্যাসাদ না বাধিয়ে ফেলে!

লীলাময়—সেই আশাই ক'রছি সর্ব্বক্ষণ। লাভও হ'বে তা'তে ওদের—কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কী সম্বন্ধ বুঝবে তখন,...যাক্ বাজে কথায় সময় নষ্ট! আস্‌বার সময় ভেবেছিলুম্, তোমার জন্যে হা পিত্তেস্ হ'য়ে বসে থাকতে হ'বে...একঘণ্টা দেরি তোমার হওয়া উচিত ছিল—ঘোর কলিকে উল্টে দিলে...এখন তো অভিসারে বেরোয় পুরুষ!

বরুণা—ঘুরিয়ে কথা বলবার ঘোরপ্যাঁচ তোমার জানা আছে...এতে অভিসারের স্বাদ পেলে কোথায়?

লীলাময়—না, তোমার অভিসারের কথা বল্‌চিনে...অভিসারে বেরিয়েছিলুম্ আমি—রাধার মত, পথে আট্‌কালো জমিদারের লোক...ঘটলো অঘটন...বল্‌চি, অঘটনটা আমার না-ঘটে, ঘটা উচিত ছিল তোমার—বৈষ্ণব প্রেমের লীলা খেলা হতো,—ইঃ, কী রকম লোক জমেচে দেখ—কাকে যেন মারচে—[কথার মাঝখানে একটা হৈ চৈ-এর শব্দ শোনা গেল, হল্লার সঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো :—'মার শালাকে!...পিঠে জুতোর ছাপ দে!...মা বলা নারে!...শালা!' দূর থেকে অবোধ্য হল্লার শব্দ আর ভিড় ছাড়া কিছু বোঝা যায় না। সান্ধ্য-ভ্রমণ-বিলাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যে যেখানে ছিল, সব সেখানে। লীলাময় আর বরুণা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়ল]

লীলাময়—আরে, মিষ্টার বাসু! কর কী, কর কী—ভদ্র সন্তান যে! [মার বন্ধ হ'য়ে গেল]

মিঃ বাসু—দেখ দিকি ভাই, বলা নেই, কওয়া নেই—'তোমারই লাগিয়া—', এদের জ্বালায় মেয়েদের নিয়ে সন্ধ্যে বেলায় বেরোবার জো নেই...দেখবি তো দেখ—পিছু নেওয়া কেন?—আরে এটা জানিস্ না, ভদ্রমহিলার সঙ্গে রক্ষী একজন থাকেই! (হাসিয়া) অসভ্য চাষা সব!—আদ্দিকালের কাপালিকের মত মন্ত্র আউড়ে ভাবে, পিছটান পড়ল আর কি! [এতোক্ষণে সুনীতির মাথাটা ঠেলে উপরে উঠেচে]

নীলাময়—আরে, সুনীতি! তোমার এ দুর্গতি কেন? ভদ্রনামে কালী দিয়ে এখন দাঁড়িয়ে আছিস্…পালা!

মিঃ বাসু—আপনার বন্ধু? sorry, জানা ছিল না [ভিড় সরাইয়া দিয়া]—যাক্ যা' হবার হ'য়ে গিয়েচে। (কেতকীর দিকে ফিরে) তোমার কী মত, ভদ্রলোককে কাল চায়ের নেমন্তন্ন করি?

নীলাময়—থাক্. এই শিক্ষাই ওর যথেষ্ট! জুতো মেরে গরু দান করলে বেচারা বোধ হয়, আত্মহত্যা করবে। বরং কপালটা একটু কেটে দিতে পারতে—প্রেম-দিগ্বিজয়ে জয়টিকা মানাত ভাল—বলতে পারতো:—

প্রেম-যুদ্ধে জয়ী মোর মত কেবা?
ললাটে মোর রচা জয়টিকা,—পৃষ্ঠ
মোর উপানৎ অঙ্কিত আলিম্পনে,—
তবু পালাই নাই ছাড়ি রণভূম।
অকাতরে সহিয়াছি কীল-চড়
বিদ্রূপ-হাসি হ'তে শত্রুর গণ।

মিঃ বাসু—বেহায়াকে লজ্জা দিতে পার।

বরুণা ও কেতকী—ছিঃ, তোমরা যেন কী! সামান্য একটা ভুল নিয়ে খবরের কাগজের সম্পাদক হ'য়ে ওঠলে যে!

মিঃ বাসু—(হাসিয়া) সত্যি! আচ্ছা, চলুন ভাই (কেতকীর দিকে ফিরে), এস আর এক চক্কর দেওয়া যাক, [মিঃ বাসু ও কেতকী আগাইয়া গেল]

নীলাময়—(বরুণাকে) তুমিও ওদের সঙ্গে এগিয়ে যাও। এর সঙ্গে একটু গোপন কথা আছে—এখনি সেরে মিলবো'খন।

বরুণা—(চলতে চলতে হেসে) কিন্তু ভদ্রলোককে আর লজ্জা দিওনা যেন।

[সুনীতি এবং নীলাময় একটু আড়ালের দিকে চলতে লাগল]

নীলাময়—তোর এই কাজ? সব কটার চেয়ে তোকেই original বলে' জানতুম।

সুনীতি—কী করবো বল, experience-এর আশায়!

নীলাময়—আমিষ অভিজ্ঞতা! কেন, নিরামিষ তো সত্যি ছিল।

সুনীতি—কিন্তু তুই যে বলিস্, কটাক্ষ আর পিছটান-মন্ত্র এ সব ব্যাপারে ব্রহ্মাস্ত্র।

নীলাময়—এখন দেখলি তো—ব্রহ্মাস্ত্রের আঁচটা লাগে কোথায়—লক্ষ্য ছেড়ে, যে লক্ষ্য করে তাকেই—

সুনীতি—সত্যি, এমন শিক্ষা আমার দরকার ছিল,—experience আমি আর এক দিক থেকে পেলুম, প্রেমে অভিজ্ঞতা বলে' কিছু নেই—ওটাকে পাওয়া যায় হঠাৎ। অভিজ্ঞতার ঠাস্ বুনানি ওকে আটকাতে পারে না।…তোর কাছে একটা অনুরোধ আছে—বল, রাখবি?

নীলাময়—বল, রাখবো।

সুনীতি—আজকের এ ব্যাপার ওরা কেউ যেন জানতে না পারে! লক্ষ্মীটী, সত্যি কর রাখবি?

মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার

প্রতিবাদ ও সমর্থন

প্রভাত প্রসঙ্গে নারী

শ্রীহিমাংশু ভূষণ চক্রবর্ত্তী

১৯শ সংখ্যা "খেয়ালীতে" শ্রদ্ধেয় প্রভাত-কিরণ বসুর 'নারী প্রগতি' সম্পর্কিত একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবার সুযোগ লাভ হইল। প্রথমেই বলা প্রয়োজন প্রবন্ধটী কোনো ব্যক্তি-গত উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত হয় নাই: কেননা, লেখক অবিবেচক নহেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কোনো কোনো পাঠক ও শ্রোতা কেন যে ইহার অপব্যাখ্যা ও কদর্থ গ্রহণ করিলেন বুঝিলাম না। যাহা হউক, মোটের উপর তাঁহারা ইহা ভালো করেন নাই। প্রবন্ধের প্রকৃত বিচার না করিয়া, লেখক বস্তুতঃ কি বলিতে যাইতেছেন তাহা না দেখিয়া এবং কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কথাগুলি বলা হই-তেছে, না বিচার করিয়া হটকারীর মত মন্তব্য প্রকাশ করাতে সমস্যা যে বাড়ে বৈ কমে না এ সত্য কি তাঁহারা অবগত নহেন? আমি এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রভাত-কিরণের বিরুদ্ধে দুইচারিটী গালিগালাজ বর্ষণ করিয়া নারীর নিকট মিথ্যা 'বাহবা' লইবার আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিরাম প্রমুখ সুযোগ্য সমালোচকেরা প্রবন্ধটী ধীর চিত্তে আর একবার পড়িয়া দেখিবেন ইহাই প্রার্থনা

এখন দেখা যাউক,—প্রভাতকিরণ কি বলিয়াছেন। প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন: "পুরুষের প্রতি অবিশ্বাস নারীর মজ্জাগত।" কথাটা মিথ্যা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা আদৌ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পুরুষেরা নারীর প্রতি মাঝে মাঝে এমন বিশ্বাসঘাতক হয়েন যে নারীর অবিশ্বাস আসা তখন অস্বাভাবিক নহে। কাজেই নিজের ত্রুটী ঢাকিয়া সমষ্টিগতভাবে নারীর উপর পুরুষের প্রতি অবিশ্বাসের দোষারোপ করা প্রভাত কিরণের পক্ষে সুসঙ্গত হয় নাই। তবে এও বলি: ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে প্রতারিত হইয়া যদি কোনো মহিলা সমস্ত পুরুষ সম্প্রদায়কেই অবিশ্বাসের চক্ষে দেখেন তবে অচিরেই যে তাঁহারা বিচারবুদ্ধি-হীনতার অপরাধে অপরাধী হইবেন তাহা নিঃসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে।

প্রভাতকিরণ বলিয়াছেন: "বাপের বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ীতে, কুটুম্ব ও প্রতিবেশী মহলে নারীর লজ্জা ও চরিত্র নিয়ে আলোচনায় এবং নারীর দুর্গতির কারণ হ'তে নারীর যত উৎসাহ পুরুষের তত নেই।" কথাগুলি কটু হইলেও অবিসংবাদিত সত্য। কলিকাতা বা কোনো নগরবাসিনী প্রগতিশীলা ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতে পারিলেও পল্লীবাসিনী মহিলারা যে শতমুখে ইহা স্বীকার করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি! অতএব লেখক তাঁহার এ মন্তব্য দ্বারা অপরাধী প্রতিপন্ন হইতে পারেন না।

রচয়িতা তাঁহার প্রবন্ধের ২য় অনুচ্ছেদের

লীলাময়—(হেসে) সত্যি—সত্যি—সত্যি, হলো এবার; কিন্তু আর যেন না হয়!

সুনীতি—এই নাক মলচি, কান মলচি।

[বরুণা, কেতকী ও মিঃ বাসু ঘুরিয়া আসিয়া পড়িল।]

মিঃ বাসু—ওকি, মাষ্টারী আরম্ভ হ'য়ে গেচে যে! [সুনীতির বেগে প্রস্থান]

বরুণা—ফের তুমি ওঁকে নিয়ে পড়েছিলে! নিজে খুব সাধু নয়!—চালুনী ছুঁচের বিচার করে!—দেব বলে'—

[মিঃ বাসু ও কেতকী আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল]

লীলাময়—বল, আমার গৌরব আছে,—তোমার বরং—

বরুণা—আমার কী? তুমিই তো—চিঠিগুলো এখন আছে—

লীলাময়—একি! মিঃ বাসু ভাগলো কোথায়? চল আমরাও এগিয়ে যাই—রাত হ'য়ে এলো, বাড়ী গিয়ে গৌরব-অগৌরবের বোঝাপড়া করা যাবে।

বরুণা—(অনিচ্ছায়) চল

(ক্রমশঃ)

সপ্তদশ পংক্তিতে "বিবাহ বাসরে নারীকে পণ্য সামগ্রীতে পরিণত ক'রে, গৃহধর্ম্মে নারীকে দাসীর চেয়েও হেয় ক'রে, জনসেবার কর্ম্মক্ষেত্রে নারীকে প্রবঞ্চিত ও উপহাসিত ক'রে, বিধবার নিঃসঙ্গ জীবনকে দুঃখও দিগ্ধবহুল ক'রে, নারীর সমস্যা নারীই কি জটীলতর করেনি ?" বলিয়া যে অকাট্য উক্তি করিয়াছেন —তাহা অতিশয়োক্তি সন্দেহ নাই। কেননা, এগুলির ভিতর নারী অপেক্ষা পুরুষের অপরাধই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। বিবাহের বাজারে নারীকে পণ্যসামগ্রীতে পরিণত করিতে পুরুষ যতটা মজবুত, নারী তত নহে। নারীর অনুপ্রেরণা বা উত্তেজনা সেগুলির ভিতর থাকিলেও পুরুষ ইচ্ছা করিলেই তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন। পুরুষের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া নারী যদি কোনো ক্ষেত্রে প্রগল্‌ভতা হয়ই, তবে সেজন্য নারী অপেক্ষা পুরুষই কি সমধিক দায়ী নহেন ?…সুতরাংই প্রভাতকিরণের এ মন্তব্যের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। তবে তিনি "নারীর বিদ্যাবিস্তার, কলা শিক্ষা, অর্থোপার্জ্জন ও প্রতিভা প্রতিষ্ঠায় পুরুষ যত সাহায্য করে নারী তত নয়" বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি : এবং ইহা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়াই আর কোনো যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলাম না।

"প্রসাধন, বেশ, বিন্যাস, অঙ্গশোভায়, সম্বন্ধনে, খেলায়……নারীকে পুরুষ যত সুযোগ দিয়েছে নারী তত নয়" বলিয়া প্রভাতকিরণ যে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন ইহাতেও তিনি ভ্রান্ত নহেন এবং প্রত্যেক তরুণী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন আলোচনা করিলেই এ সত্য অবধারণ করা চলে। সেটা তাহা স্ত্রৈণস্বভাব বশতঃই হউক, আর যে কারণেই হউক প্রত্যেক পঁচিশ টাকার কেরাণীই যে তাহার তরুণী পত্নীর সন্তোষবিধান করিতে মাসে গড়পড়তা অন্ততঃ পাঁচটী টাকাও খরচ না করেন এমন নহে। জিজ্ঞাসা করি : বধূর জন্য তাহাদের শাশুড়ী অথবা ননদ জায়েরা কয় কপর্দ্দক খরচ করিয়া থাকেন ?

অতঃপর লেখক ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই যে তিন শ্রেণীর বাঙ্গালী নারীর দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি যে সফল হইয়াছেন ইহা নিঃসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী নারীর এমন সুন্দর এমন নিখুঁত চিত্র বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগতভাবে না দেখিয়া সমস্ত জিনিষ এবং আলোচনাটাকেই সমষ্টিগত ভাবে ধরুন : বলুন তো লেখক বাঙ্গালী নারীর দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকা প্রস্তুত করিতে গিয়া যে সব কথাগুলি বলিয়াছেন তাহাতে অন্যায় বা অতিশয়োক্তি আছে কি না। যদি পক্ষপাতিত্ব করিয়া বলেন, তবে বুঝিব চিত্রে বর্ণিত কোনো দুর্ব্বলতা অথবা Frailty হইতে আপনিও মুক্ত নহেন। প্রভাত কিরণ নারী-চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া ধনী ও মধ্যবিত্তঘরের দুলালীদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন উহা অপ্রিয় সত্য সন্দেহ নাই, কাজেই আদরের ভগিনীরা আমার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন খুব, কিন্তু না ক্ষেপিয়া ভবিষ্যতের জন্য একটু সাবধান হইলেই শোভন হইত না কি ? আমি জিজ্ঞাসা করি : লেখক গরীবের ঘরের 'পোড়ামুখীদের' সম্বন্ধে যে মন্তব্য বা মত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে তাহাদের অন্যান্য ভগিনীদের মত আঁচ লাগিতেছে না কেন ? সুতরাং আমাকে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের আচরণ অপেক্ষা দরিদ্র পিতা-মাতার কন্যাসন্তানের আচরণ অশোভনীয় নহে ?………

এখন 'প্রগতি' কথাটা নিয়া একটু আলোচনা করা যাউক। প্রগতি কি ? প্রগতি হইতেছে গিয়া Advancement—অর্থাৎ আগাইয়া চলা।

কিন্তু আগাইয়া যে চলিব তাহার একটা গন্তব্য স্থান থাকিবে তো ? গন্তব্য স্থানই যদি না রহিল তবে পথিক পৌঁছাইবে কোথায় ? তৃষ্ণার্ত্ত মরু যাত্রীর মত ক্লান্ত হইয়া পথের মাঝখানেই সে পড়িয়া মরিবে না কি ?

আমাদের দেশের বর্ত্তমান নারী প্রগতির অবস্থাও ঠিক্ তাই। নির্দ্দিষ্ট কোনো গন্তব্য ঠিক্ না করিয়াই আজ তাঁহারা দিশেহারা হইয়া ছুটিয়াছেন। অকূল সমুদ্রে পড়িয়া মানুষ যেমন তৃণ আশ্রয় করিয়াও ভাসিতে চাহে, এ যুগের প্রগতিশীলারাও ঠিক তেমনি ভাবেই যে কোনো দ্রব্য আঁকড়াইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে চাহেন। বিচার করিবার স্পৃহা বা সময় তাহাদের নাই। কিন্তু যাহা হইবার নহে তাহাকে হওয়াইবার যে ব্যর্থ কল্পনা তাহা কল্পনাই রহিয়া যায়—বাস্তব পারেনা কোনোদিনই সেখানে ঘেঁসিয়া আসিতে।

অতএবই 'প্রগতি' বলিতে তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন প্রকৃত প্রগতি তাহা নহে। প্রকৃত প্রগতি সেখানে, যেখানে মানুষ অন্যকে অনুকরণ না করিয়া, নিজের ধর্ম্ম ও সমাজবদ্ধ থাকিয়া আত্মোন্নতি করিয়া থাকে। আমার সাগরপারের অভিজ্ঞতা হইতে যতটা জানি তাহাতে ওদেশের মেয়েরা যাহাদের বাঙ্গালী নারীরা সদাসর্ব্বদা অনুকরণ করিতে ব্যস্ত, আদৌ এ দেশীয় প্রগতিশীলাদের (?) ন্যায় লজ্জাহীনা নহেন। বক্ষবস্ত্র অনাবৃত করিয়া কয়েকটী অতি বাচাল মেয়ের মত তাহারা কখনই 'আমাদের ন্যায় 'পথে, ঘাটে, ট্রামে, বাসে' পরপুরুষের কণ্ঠলগ্ন হয়েন না : সুতরাং ওদেশের reference দিয়া যদি কেহ লজ্জাহীনতার অভ্যাস করিয়া থাকেন তবে তাহারা যে বিষম একটা ভুল করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ! সাধারণতঃই, ওদেশীয় নারী সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটা কদর্য্য ধারণার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। ইউয়্যামেরিকার মহিলারা লজ্জাহীন হইলেও বর্ত্তমান বাঙ্গালী নারীদের ন্যায় নির্লজ্জ নহেন। তাহাদের সেই লজ্জাহীনতার ভিতরেও যথেষ্ট control

রহিয়াছে দেখিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "ভারতীয় নারী" শীর্ষক পুস্তক ও Ruth Grey লিখিত "Women of the World" বইখানা প্রত্যেককেই পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আশ্চর্য্য! ভারতীয়, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার নারীরা কিনা আজ নিঃসংশয়েই ল্যাটীন প্রবচনের সারবত্তা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন—"Corruptio optimi pessima"!

অতএবই শ্রদ্ধেয় প্রভাতকিরণ 'প্রগতি' সম্বন্ধে তাঁহার যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। যাহারা ইহা লইয়া অকারণে তাহাকে নিন্দাবাদ করিয়াছেন তাহারা পক্ষপাত দুষ্ট সন্দেহ নাই—যেহেতু প্রভাতকিরণ কখনই বলেন নাই এ যুগের শিক্ষা দীক্ষাই কেবল খারাপ আর গত যুগেরটা কেবলই ভাল ছিল।

পরিশেষে লেখক সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহার লেখায় যুক্তি থাকিলেও উহা যে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছে তাহা অসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে। এতখানি উত্তেজনা লইয়া কাহাকেও বিচার করিতে যাওয়া নিছক একটা পাগলামীরই নামান্তর মাত্র; কাজেই প্রবন্ধের ভিতর অগ্নিধারা ভাষা প্রয়োগ করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। নারীকে বিচার করিতে হইলে তাহার বহিরাবরণটাই যথেষ্ট নহে; কেননা যে নারী তাহার রূপে রাজার ঐশ্বর্য্যকে লুণ্ঠন করিতে পারে সে কী করিয়া বিত্তহীন আশ্রয় দাতার কাছে নিজেকে লুটাইয়া দেয়? যে কল্যাণ-হস্তের বরণভঙ্গীমা বিশ্বের মন হরণ করিতে পারে, সে কী করিয়া প্রিয়তমের গৃহধূলিতে সমাবৃত থাকে? যে কণ্ঠের মোহন-সঙ্গীতে সমস্ত পৃথিবী বশীভূত হয়, কেন সে পরিচয়-হীনের মন্দিরে থাকিয়াই সন্তোষ লাভ করে? তাই বলি, নারীর এই যে ছদ্মরূপ ইহা তাঁহাকে বিচার করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

নারী-ধর্ম্ম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র।

"তোর কি মা সাজে বিলাসিনী বেশ
দুর্ভিক্ষের দেশে;
যেথা নিতি জ্বলে শ্মশানের চিতানল
যেথা কোটি কোটি নরনারী কাঁদে
দীন-ভিখারীর বেশে
পথে পথে ফেলি বেদনা অশ্রুজল।"

বিমলচন্দ্র ঘোষ।

গত তিন সপ্তাহ যাবৎ 'খেয়ালী' মারফতে "নারী ধর্ম্ম" নিয়ে দু'দলের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলেছে, তা'তে আমাদের মনে হয় প্রভাত-কিরণ বসু মহাশয় যাহা লিখেছেন তাহা চির সত্য। আর নারী সাহিত্য সম্মিলনে নিমন্ত্রিত পুরুষদের দেখে, নারীদেরই বিসদৃশ কটাক্ষপাত করা, এটাও নারীদের পক্ষে অন্যায় নয় কি? আজ যদি নারীরাই তাদের মীমাংসা মিটাতে পারত, তবে কেন সে সভায় পুরুষদের আহ্বান করা হয়? আর আহ্বান করেই বা তাদের কেন অপমান করা হয়?

আজকাল পুরুষদের অপমান করতে পার-লেই নারীরা ভাবেন, "খুবই কাজ করেছি।" কিন্তু বিচার ক'রে দেখতে গেলে দেখা যায়, পুরুষরাই তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী; এবং জব্দ করাটুকু হচ্ছে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠার মারা। তাই প্রভাতবাবু লিখেছেন, "নারীই নারীর সর্ব্বনাশের মূল।" আর সেই প্রসঙ্গে তিনিই আজিকার কয়েকটী ব্যাপারও দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রভাতবাবু সত্যিই নারীদের শুভা-কাঙ্ক্ষী। তাই তিনি যখন তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেছেন, নারী চলেছে আজ উন্মাদনা, উচ্ছৃ-ঙ্খলতা, বাচালতা এবং বিলাসের পথে, তখন তাঁর অন্তরে পেয়েছে ব্যথা, লেগেছে নিজের দেশের নারীর, নারীত্বে, মাতৃত্বের অবমাননার দারুণ শেলাঘাত। তাদের এইরূপ পরিনতিতে দেশের এবং দশের ভবিষ্যত অন্ধকারময় ভেবেই শুনিয়ে দিয়েছেন সাবধানতার বাণী। এই কথাটা মহিলা সম্প্রদায় একটু ভেবে দেখবেন কি?

প্রভাতবাবুর প্রবন্ধের বিরুদ্ধবাদী সম্প্রতি পত্রিকা মারফতে দু'জনকে দেখতে পেলুম। এবং তাঁরা নারীপক্ষ টেনে নিয়ে পুরুষদের অনেক গালাগালিও দিয়ে যাচ্ছেন, যথা:—ক্লীবত্ব, স্বার্থপর, বিলাসী ইত্যাদি! কিন্তু এর সূক্ষ্ম বিচার করে দেখতে গেলে প্রবন্ধের আকার অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়, তাই মোটামুটি কয়েকটী বিষয়ের প্রতিবাদের সাহায্য নিতে হল। শান্তিরামবাবুর সমা-লোচনার প্রতিবাদ শ্রীযুক্তা প্রতিমা রায়—ই করেছেন; তবে আমরা শান্তিরাম বাবুর একটী কথার প্রতিবাদ না করে থাকতে পার-লুম না। "ক্লীবত্ব"—অধিকাংশ পুরুষদের মধ্যেই নাকি এসে গেছে "ক্লীবত্ব"। এই কথাটী শান্তিরামবাবু তাঁর দার্শনিক মতে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে শুধু, এই কথাটিই জিজ্ঞেস করতে চাই যে—আমা-দের দেশে অধিকাংশ পুরুষ "ক্লীব" হলেও—"আমাদের দেশের" অধিকাংশ মেয়েদের পক্ষে অনুপযুক্ত কি না, শান্তিরামবাবু এই কথাটি একটু ভেবে দেখেছেন কি?

আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আর আমার সেরূপ প্রতিবাদ করবার শক্তি সামর্থও নেই, তথাপি চোখ দু'টোতে যা' দেখি এবং কানে যা শুনি তারই কতকটা অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটি সদুত্তর দিতে চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় প্রতিবাদকারী শ্রীভবেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ভবেশ বাবু লিখেছেন প্রভাত বাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ "নারীর পরম শত্রু নারী নিজে"। এই কথাটির বিশ্লেষণ তিনি যেরূপভাবে করেছেন তাতে মনে হয় প্রভাত বাবুর সরল কথাটীর ভাবার্থ বুঝে উঠতে পারেন নি, তাই তাঁর অর্থ বুঝেছেন উল্টো, লিখেছেনও তদ্রূপ। এটা খুবই সত্যি কথা যে—নিজের দোষ বা গুণ কেউ কখনও

...ক্ষে উপলব্ধি করতে পারে না। সেই জায়-
...য় পুরুষ বা নারী বলে কোন কথা নেই,
পুরুষরাই পরস্পরের সাহায্য ক'রে এবং বিচার
ক'রে তা'র সমাধান করে। এই জায়গায়
...ন "নারী" নিয়েই কথা উঠেছে তখন
পুরুষের প্রয়োজন পড়েছে মীমাংসা করে
দেবে, কারণ "নারী" জানেনা সে সব দোষ
...গুলোকে সংশোধন করে তাকে তুলতে
...করে। তার পরিবর্ত্তে তা'রা গড়ে
তোলে উগ্র গরল, যা'র জ্বালায় জ্বলে মরে
তাদেরই স্বজাতি। ভবেশবাবু আরও লিখে-
ছেন আমাদের দেশের নারীরা যদি নারীদের
দ্বারাই পীড়িত হয়—নারী প্রগতি যদি বাধা
প্রাপ্ত হয়, তবে পুরুষদের টিপ্পনী কাটিয়া কি
লাভ হইবে। এই কথার উত্তর এই যে:—
...দের উদ্দেশ্য একই পথে যাওয়া তাদের মধ্যে
যদি কেহ কখনও নিজের কাছেই নিজে প্রতা-
রিত হয়ে—বিপথে চালিত হয় তখন কি
তার শুভাকাঙ্ক্ষী সাথিটীর কর্ত্তব্য নয় যে
তাকে ফিরিয়ে আনা? আমরা জানি, এই
রীতি। কিন্তু ভবেশবাবুর কথায় প্রতীয়মান
হয় ঝড়ের "নৌকাডুবীর মত" নিজের নৌকা-
খানা ঠিক আছে, আর অপরের খানা ডুবে
গেলো দেখে হাততালি দেওয়া। তিনিই আবার
লিখেছেন "স্বার্থপর পুরুষ,"—আমাদের মনে
হয় ঐ কথাটী কেবল ভবেশবাবুর মত
মনুষ্যের মুখেই শোভা পায়। আবার এই
সব কথাগুলো বোধহয় ভবেশবাবুর নিজের
লেখনিতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি
বলেছেন........."নারীর সহিত নারীর
ঘনিষ্ঠতাই সমধিক," এজন্য দ্বন্দ্বও তত বেশী।
...হিলে যে সময়টিতে নারীর সহিত পুরুষদের
ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা হইতেছে, ঠিক সেই
সময়টিতেই পুরুষরা নারীর বিরুদ্ধে আলো-
চনা করিতে গেল কেন? নারীসমাজের
অন্তর্দ্বন্দ্বই, পুরুষের এই আলোচনায়—
অনধিকার প্রবেশের কারণ (!)

তারপর তিনি লিখেছেন, পুরুষই নারীকে একদিন "Beast of Burden" হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং পরে যেটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছে শুধু প্রায়শ্চিত্তের হিসাবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় তখনকার যুগে পুরুষ ও নারীর মনের ভাব এবং স্বভাবও ছিল ঐ ধরণের। তা' না হলে মানুষ (অর্থাৎ যার মধ্যে আছে মনুষ্যত্ব) সে কি ক'রে অপরের উপর অমানুষিকতা প্রয়োগ কর্ত্তে পারে, এবং অপরেও তা কিরূপে সহ্য করতে পারে? পরে নারী যখন পে'ল "নারীত্ব," "মাতৃত্ব," এবং তার হৃদয় ভরে উঠলো সন্তান-বাৎসল্য রসে, তখন তার সন্তানগণ পেল দীক্ষা মাতৃপূজা মন্ত্রে। তাই সেই মাতৃরূপা নারীকে আরও জাগিয়ে তুলবার জন্য দেখিয়ে দিলে প্রগতির সুগম পথ। সে আহ্বান আনেনি নারী। আকস্মিক আলোর তীব্রতরে নারী হারিয়ে ফেল্ল তার পথ। তাই প্রভাতবাবু দিলেন তাদের সাবধান করে। সেদিন কথায় কথায় একজন অর্দ্ধ-শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন বাস্তবিক আজকাল মেয়েদের মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে মাতৃত্বের ভাব—তারা শিখেছে শুধু নিজের সুখভোগের দিকটা এবং বিলাসিতা,—ভুলে গিয়েছে সন্তান প্রতিপালন এবং তাকে মানুষ করে গড়ে তোল', এইত গেল একজন অর্দ্ধশিক্ষিতা মহিলারই কথা, যার কাছ থেকে আমরা তথাকথিত উচ্চ শিক্ষার 'Theorising Tendency'র কল্পনাও কর্ত্তে পারিনা।

তাই প্রভাতবাবু দেখিয়েছেন তিনটী নারী চরিত্র তিন প্রকারের, এবং তাদের সন্তানগণও যে কি প্রকারের হয় সেটাই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এতে যে তিনি কি অন্যায় করেছেন তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারছি না। আর সেই ব্যাপার-টাকে আরও জটিল করে তুলেছে যত সব উরুমস্তিক সমালোচকের দল।

ইচ্ছে ছিল আরও কিছু লিখবার। তবে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আমরা চাই নারীকে আদর্শ মাতৃরূপে, যাতে ভবিষ্যতে দেশের এবং দশের মুখ উজ্জ্বল হয়। মায়েদের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা! আর সংসার-ধর্ম্মের স্রষ্টা যে নারী, তারই নিদর্শন স্বরূপ একজন ইংরাজ সাহিত্যিক মিঃ থেইয়ার লিখেছেন:—

"The mother makes the home. There is no real home without a good mother. She is its sun and children like planets, revolve around her. No matter how good, and true the father is, the mother gives the moulding character to home.

নারী প্রগতি

শ্রীগণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নানান পত্রিকায় এই বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনা হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজের মতটাকে যুক্তিতর্ক দ্বারা সঠিক প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, ফলে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং তা' হওয়া অনিবার্য্য ও উচিৎ। এটা শুধু আমাদের দেশেরই সমস্যা নয় উপরন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত পাশ্চাত্য দেশেও ইহা লইয়া হৈচৈ ও গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। সমস্যা যে সমাধান হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু যেখানে সমস্যা সেইখানেই সমাধান এবং যেখানে সমাধান সেইখানেই সমস্যা!

বর্ত্তমানে প্রভাতবাবুর "নারী ধর্ম্ম" শীর্ষক রচনাটি লইয়া "খেয়ালী"র পাতায় বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। প্রভাতবাবু ভুল করিয়া শুধু মন্দের দিকটাই দেখাইয়া সতর্কবাণী নিক্ষেপ করিয়াছেন মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া। আসলে আরও একটু স্পষ্ট করিয়া সরল ভাষায় যুগপৎ উৎসাহ ও প্রশংসাবাণী শোনান উচিৎ

ছিল এবং তা'তে যাঁহারা মনক্ষুণ্ণ হইয়াছেন (কি স্ত্রী কি পুরুষ) তাঁহারা হয়ত হইতেন না।

যুগধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সব ধর্ম্মেতেই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তনের ছোঁয়াচ অবশ্য স্বীকার্য্য। নারী ধর্ম্মও তন্মধ্যে একটি। নারী ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ নারী-মনোবিজ্ঞান জানিতে হইবে। শান্তিরামবাবু ঠিকই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালিদের চোখে (শুধু বাঙ্গালিই নয়) মাতৃরূপের পাশে ভার্য্যারূপটি চোখে পড়ে না। কিন্তু একটু ভুল আছে। চোখে ঠিকই পড়ে; তবে মায়ের সেই ভার্য্যারূপটির মন বিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখি না। আমরা হইতেছি গোঁড়া আদর্শবাদী ও ধর্ম্মভীরু তাই মায়ের ভার্য্যারূপটি চোখে পড়িলেও অন্যায় ভাবিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মায়ের রূপের দিকেই জোর করিয়া নিবদ্ধ রাখি। মায়ের ভার্য্যারূপটি মনের অবচেতন অবস্থাতে সমাধিস্থ হইয়া থাকে। বন্ধুভাবে না মিশিলে মেয়েদের মন জানা যায় না;—ইহা খুবই সত্য কথা। কথায় বলে,—নারীমন চেনা বড় দায়। যে দেশের অধিকাংশ লোকেরা অশিক্ষিত ও যাহাদের সমাজ সেই অনুপাতে তৈরী সে দেশের লোকেদের মেয়েদের মনের সঙ্গে পরিচিত থাকা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা উপন্যাসাকারে বা গল্পাকারে মেয়েদের মন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা দু' পাঁচজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশের কাছে সে দান খুবই কম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হৃদয়ঙ্গম করিবার শিক্ষা না থাকিলে কাহারও মনের কথা জানা যায় না। জানিতে হইলে চাই—দূরদৃষ্টি, বুদ্ধি ও সহানুভূতি।

মেয়েদের প্রগতি লইয়া পুরুষদের মাথা ঘামাইবার যথেষ্টই প্রয়োজন আছে, এ কথাটা মেয়েরাও স্বীকার করিতে বাধ্য। যে মেয়েদের সম্মিলনে পুরুষদের প্রবেশাধিকার নাই এমন সম্মিলনী পুরুষদের সাহচর্য্য কামনা করিয়া থাকে ও পরোক্ষভাবে পুরুষদের সাহায্যও পাইয়া থাকে। পুরুষ কর্ম্মঠ, শক্তিশালী ও মেধাবী সুতরাং পুরুষের সাহায্য ব্যতীত মেয়েদের প্রগতির পথ বন্ধুর, এমন কি অচল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

—মেয়েদের গান বাজনা, কলেজে পড়ান (?) দৌড় ঝাঁপ প্রভৃতি শেখান মানেই বিবাহের পথ সুগম করিয়া দেওয়া,—প্রভাত বাবুর এই উক্তিটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, অনেকাংশে অপ্রিয় সত্য। বিবাহের পথ সুগম করিবার জন্যই যদি মেয়েরা যুগপৎ শরীর ও মনের উৎকর্ষতার প্রতি নজর রাখিয়া দৌড় ঝাঁপ দেয় ও গান বাজনা শেখে সে ত ভালই, কিন্তু অনেকে যে করেন না সেইটাই আক্ষেপের বিষয়। ইহা দোষই হউক আর গুণই হউক মেয়েদের অপেক্ষা পুরুষদের বেশী প্রাপ্য, যেহেতু আজকাল ছেলেরা গান-বাজনা না-জানা মেয়েদের সহজে বিবাহ করিতে রাজী হন না; এমন কি ভাবী-পত্নী নাচিয়ে না হইলে অনেক সময় ছেলেরা এইটুকুর জন্য বিবাহে আপত্তি জানান। ছেলেরা মেয়েদের এই সব বিষয়ে সার্টিফিকেট দেখিতে চান বলিয়াই অভিভাবকেরা মেয়েদের প্রাইজ জোগার করাইতে বাধ্য করিয়া থাকেন।

আসলে মেয়েদের জন্ম কর্ম্মক্লান্ত পুরুষের সেবা শুশ্রূষা করা, প্রেমের শীতল পরশে অবসন্ন মনে আনন্দ দেওয়া। পুরুষ করিবে কর্ম্ম; বন্ধুর পথের সে যাত্রী,—কঠিন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। মৃত্যুর সাথে বাধিবে সংগ্রাম। পিছনে থাকিবে নারী। পুরুষের প্রাণে সে জোগাইবে উৎসাহ, প্রেরণা ও শক্তি।

নারীর প্রগতিও ঠিক তাই। সম-অধিকার চাই আর পুরুষদের সমতালে কদম মিলাইয়া চলিব বলিয়া চীৎকার করা একটা মস্তবড় ব্যর্থতা। নারীকে চিরকাল পুরুষের পিছনে থাকিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে (যতটা পুরুষের ন্যায়তঃ প্রাপ্য) নতুবা তাহার নিজেরই সমূহ ক্ষতি— পদে পদে অক্ষমতা ধরা পড়িবে, অপমানিত হইবে।

নারীর শত্রুতা সাধন যে নারী করিয়া থাকেন তাহাও পুরুষের শিক্ষার গলদ থাকার জন্যই। খাশুড়ী-বধূ, বধূ-ননদিনী ও সতীনে সতীনে যে ঝগড়া তা'তে স্পষ্টই মনে হয় এজন্য মেয়েরাই দোষী বা দায়ী; কিন্তু তাহা নয়, একটু তলাইয়া দেখিলে বোঝা যায় ইহার মূলে আছে পুরুষের অক্ষমতা ও অসংযমতা। তাই নারী ধর্ম্মের কথা কিছু বলিতে হইলে পুরুষকেই পক্ষান্তরে বলিতে হয়—তার ভুল, ত্রুটী, সংশোধন ও সমস্যার কথা এবং তজ্জন্য পুরুষেরই অবহিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু তজ্জন্য মেয়েদের যে কিছুই করিবার নাই বলিয়া তাঁহারা নিষ্কর্ম্মা ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন তাহা হইতে পারে না। পুরুষদের সহযোগাতায় তাঁহাদের আন্তরিক উৎসাহ ও চেষ্টা থাকা উচিৎ।

নারী ধর্ম্মের আদর্শ মাতৃরূপেই পারিস্ফুট ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, কিন্তু নারীর অপরাপর রূপগুলিতে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, কারণ ইহারাই মাতৃরূপ বিকাশের পথে প্রধান সহায়ক। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় মেয়েরা এই বিষয়ে তেমন মনোযোগ দেন না। অতি আধুনিকাদের মধ্যে অনেকেরই বাচালতা যে একটু বেশী মাত্রায় উঠিয়াছে, ইহা প্রভাতবাবুর মত আমরাও স্বীকার করি। ইহাতে পুরুষদের কিছু মাত্র দোষ নাই। দুটো ইংরাজী নভেল পড়িয়া মেমসাহেবদের আদব কায়দা দেখিয়া, মেয়েদের দুটো সভা সমিতিতে যোগদান করিয়া ও দু'চার জন মেয়েদের কৃতিত্বের কথা শুনিয়া তাঁহারা বুঝিয়া লন মেয়েদের আত্মচেতনা জাগিয়াছে পরিপাক করিবার অক্ষমতা ও মনের ক্লৈব্যতা হেতু পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মনোভাব প্রকাশ পায় আত্ম-অহঙ্কারে। পুরুষ তার

প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই পুরুষের প্রতি ফুটিয়া উঠে অবহেলাভাব—যেন don't care.

ছেলেদের মত অনেক মেয়েরাও নাকি অবিবাহিতা হইয়া থাকিতে চাহেন, অভিভাবকদের অর্থাভাবের জন্য নয়, একটা খামখেয়ালী ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবার জন্য—যেন ছেলেদের বিরুদ্ধে মেয়েদের অভিযান। এটা মেয়েদের একটা নিছক বাচালতা। ছেলেরা যে ক্ষেত্রবিশেষে বিবাহ করিতে চাহেন না, তার অনেক কারণ বিদ্যমান। কিন্তু মেয়েদের সে সবের কারণ কি? একটা কারণ যাহা সচরাচর দেখা যায়, উপার্জ্জনশীল পাত্রের পাত্রী হইবার উপযুক্ত রূপ বা গুণের অভাব। নতুবা, অহেতুক পণপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিবার একটা অকার্য্যকরী অস্ত্র প্রয়োগ। বিবাহ না করিয়া পণ-প্রথা রহিত করা যায় না; বিবাহ করিয়া মা সাজিয়া ছেলের বিবাহে সে চেষ্টা করিলে ভাল হয়। প্রভাতবাবুর কথাতেও বলি,—নারী প্রগতি পথে যখন আসিবে বাধা তখন কিছু ত্যাগে, কিছু করুণায়, কিছু তেজে নারীকে পথ করিয়া লইতে হইবে সুগম।

শান্তিরামবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা দিনের আলোর মত সত্য,— পরাধীনতার পাপ হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে এ দেশের নারী প্রগতি কেন, কোন প্রগতিকেই সুপথে চালনা করা এক দুরূহ ব্যাপার। সমস্যা সেদিন আপনা হইতেই খানিকটা সমাধান হইয়া যাইবে যেদিন এ দেশের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষমতা আসিবে। পরিশেষে বলিতে চাইবে ভবেশবাবুর মত আমরা অত হতভাগ্য নই যে প্রভাতবাবুর প্রবন্ধ পাঠে কোমল হৃদয়া নারীরা যে ব্যথা পাইয়াছেন, আমরা পুরুষ হিসাবে তজ্জন্য লজ্জায় মাথা নোয়াইয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিয়া পাইব না।

প্রভাত-প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

শ্রীকিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত।

শ্রীযুক্ত প্রভাত কিরণ বসু মহাশয়ের 'নারীধর্ম্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটী এবং তাহার প্রতিবাদ ও সমর্থন সাগ্রহে পাঠ করিয়া দেখিলাম। আজকাল এই নারী জাগরণের দিনে প্রভাতবাবু এইরূপ একটি যথার্থ আলোচনার উপযুক্ত সমস্যার উত্থাপন করিয়া সত্যই তাঁহার স্বভাবসুলভ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, আমাদের মতো ক্ষুদ্রজনেরা বসু মহাশয়ের 'নারী ধর্ম্মের' উদার অভিমত গুলিকে কিছুতেই আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। প্রভাতবাবু প্রবন্ধটি লিখিয়া নারীসমাজের প্রতি যে অহেতুক অনুকম্পা দেখাইয়াছেন তাহার আড়ালে তাঁহার এমন একটি বিশেষ বক্তব্য ও মনোবৃত্তির পরিচয় আছে যাহা কোন সমঝদার পাঠকেরই দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবে না বস্তুতঃ এই প্রবন্ধটিতে নারীদের অযথা দোষী করা হইয়াছে।

কোনও বছরে কোনও সমিতিতে পুরুষের উপস্থিতি দেখিয়া কোন কোন মহিলা যদি সত্যই বিব্রত হন বা কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন তবে সেটা যে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ তাহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এবিষয়ে শ্রীভবেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গত সংখ্যায় 'খেয়ালী' মারফৎ যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব সত্য। ব্যাপার সত্যই রুচিগত ও অভ্যাসগত। শতাব্দীর অন্তরালবর্ত্তিনী অধিবাসিনী ঘরের বাহিরে আসিয়াই অত্যন্ত হঠাৎ এবং অত্যন্ত সাধারণভাবে যে কোনও পুরুষের সহিত মেলামেশা বা বাক্যালাপ করিতে পারিবেন তাহা আশা করা মোটেই সাধারণ নয় এবং ঐরূপ অদ্ভুত আশা করিয়া অপদস্থ হইতে হইলে সেজন্য ক্ষোভের কোনও কারণ থাকিতে পারেনা। বিশেষতঃ আমাদের সমাজের এতোদিনকার আবহাওয়ার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সমিতিতে উক্ত মহিলাদের আচরণ বিশেষ দৃষ্টিকটু বলিয়া মনে হয় না।

ইহার পর প্রভাতবাবু নারীচরিত্রের বিবিধ দোষ-ত্রুটী দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এদিক দিয়া তিনি যে আংশিকভাবে সফলতা লাভ করিয়াছেন একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা মোটেই 'নূতন কিছু' নহে। নারীর আদিম প্রবৃত্তির সহিত প্রভাতবাবুর বর্ণিত দোষ-ত্রুটী বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। এরকম নারী-চরিত্র সব জায়গায় সবক্ষেত্রে সবসময়েই অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নারীর সেই পৌরাণিক দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া পুরাতন নিন্দাবাদের কোনও সার্থকতা দেখা যাইতেছে না।

প্রভাতবাবু অনুযোগ করিয়াছেন নানাদিক দিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য পুরুষ নারীকে যতটা সাহায্য করিয়াছে নারী পুরুষকে তাহার একাংশও নয়। কথাটা সত্য হইতে পারে। কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে পুরুষের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবার মতো উপযুক্ত শক্তি ও সামর্থ্য নারীর আছে কি-না। পুরুষ নিজেই এযাবৎ নারীকে অবহেলা করিয়া 'অবলা' বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিয়াছে। দুর্ব্বল বৃক্ষ-লতার সহিত তুলনা করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লিখিয়াছে এবং দুর্ব্বলা, অসহায়া নারীর প্রতি সমবেদনায় গলিয়া গিয়া দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করিয়াছে! সুতরাং এক্ষণে সেই 'অবলা' নারীর সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য গ্রহণ করিয়াই তাহাকে তুষ্ট থাকিতে হইবে। নারীকে একাধারে স্বামীকে সুখী করা, সন্তান লালন এবং গৃহ-শ্রী সম্পাদন এই তিন কাজই সুযোগ্যভাবে সম্পাদন করিতে হয়। পুরুষও এককালে তাহার নিকট ইহার বেশী আশা করিত না, করিতে পারিত না। উপরিউক্ত তিনটি কাজ ছাড়া নারীর আর যাহা কিছু করিবার আছে তাহা রীতিমতো 'সেকেণ্ডারী।' অবশ্য নারী যদি এই 'সেকেণ্ডারী' কর্ত্তব্যের মাঝেও পুরুষকে সাহায্য করিতে পারে তবে সেটা যে সৌভাগ্যের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

তারপর প্রভাতবাবু এদেশের মেয়েদের তিনটি শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা দিয়াছেন। এবিষয়েও আমি ভবেশবাবুর যুক্তিকেই

সমর্থন করি। কাজেই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি না করিলেও চলিবে।

এমন একদিনও ছিলো যখন নারী সর্ব্বদা রুদ্ধ-অন্তঃপুরে বন্দিনী হইয়া সব-কিছুর জন্যই পুরুষের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত, পুরুষের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নিঃশেষে নিজেকে উৎসর্গ করিত। তাহাদের বাঁচিয়া থাকা এবং বাঁচিবার সার্থকতা তাহারা তখন পুরুষের পদতলে নিজেদের নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার মাঝেই খুঁজিয়া বেড়াইত। ইহার পর এদেশের পুরুষ অন্য দেশের নারীদের দিকে চাহিয়া নিজেদের ভুল বোধ হয় বুঝিতে পারিল। বুঝিল, নারীকে আর অধিককাল অন্তঃপুরে বন্দিনী করিয়া রাখা উচিত হইতেছে না, ঘরের বাহিরে তাহাদিগেরও আত্মপ্রতিষ্ঠার সমুদয় সুযোগও সুবিধা দিতে হইবে। তাই পুরুষই প্রথম দরদ করিয়া ঘরের বন্দিনী নারীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে টানিয়া আনিল এবং নারীকে যথার্থ নারী হইবার সুযোগ প্রদান করিল। নারীও আজ তাই সে সুযোগের যতটুকু পারে সদ্ব্যবহার করিতেছে। যে পুরুষ ও নারী আপাততঃ প্রভাতবাবুকে সমর্থন করিতেছেন তাঁহাদের অন্ততঃ এটুকু মনে রাখা উচিত যে পুরুষই প্রথম প্রগতির পথে নারীকে টানিয়া আনিয়াছে এবং সেইজন্য আধুনিক নারীদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এক্ষণে লম্বা লম্বা বুলি আওড়াইলেই চলিবে না! বর্ত্তমান নারী-প্রগতিতে তাঁহারা যদি সত্যই 'অধোগতি' বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন তাহা হইলেও তাঁহাদের সর্ব্বদাই ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পুরুষ ও নারীর বর্ত্তমান বিষদৃশ (প্রভাতবাবুও তাঁহার দলের লোকদের মতে) অবস্থার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী।

অন্দরের বাহিরের বিরাট জগতে এতো-কাল প্রধানতঃ পুরুষের আধিপত্য ছিলো কিন্তু আজ নারীও সেখানে আসিয়া নিজের গুণে বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করিয়া কোন কোন স্থলে বিজয়িনীও হইতেছে। এসব দেখিয়া প্রভাত বাবু যদি ক্ষুব্ধ হইয়া নিন্দাবাদ করেন তবে তাহা পুরুষের দুর্ব্বলতারই একটি উদাহরণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এবং একথাও সহজে প্রতীয়মান হইবে যে পুরুষ নিজের স্বার্থ ও তৃপ্তির জন্যই শুধু নারীকে বাহিরের অধিকার দিয়াছিলো, (নারীকে নারীর অধিকার লাভ করিবার জন্য নহে। অন্ততঃ এধরণের অধিকার লাভের জন্য নহে।) সে স্বার্থ ও বাসনা চরিতার্থ হইতেছে না বলিয়া তাহারা ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ প্রভাতবাবু এদেশের নারীর গান শেখা, ভারতীয় নৃত্য, হাইজাম্প, সাঁতার প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত যুক্তির সার্থকতা এবং সত্যতাই অত্যন্ত সহজে উপলব্ধি করা যায়।

পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে ঘর-বাহিরে কর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করিবে ইহা সকলেই চাহে। এবং ইহাও সত্য যে নারীকে সাহায্য করিবার মতো পুরুষের যতখানি শক্তি ও সামর্থ্য আছে, পুরুষের জন্য নারীর ততটা নাই। নারী যদি পুরুষকে পুরুষের সমানই সাহায্য করিতে পারে তবে পুরুষের প্রখর পৌরুষের মূল্য কি? সহযোগীতার সমুদয় প্রশংসার অধিকাংশইতো তাহা হইলে নারীরই প্রাপ্য। পুরুষ যদি নারী অপেক্ষা 'বেশী কিছু' না করিল তবে তাহার সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর প্রভেদ কোথায়? পুরুষ এতোকাল নারীর যে দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাকে বন্দিনী, পশ্চাৎপদ করিয়া রাখিয়া ছিলো, এক্ষণে এই নারী-জাগরণের দিনেও সে সেই অতি-পুরাতন দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াই নারীকে, নারীর অভিজানকে ম্লান করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

নারীর আদর্শ ও নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেকেই অনেক রকমের বক্তৃতা করিয়াছেন। এবং যাঁহারা সেইসব বক্তৃতা দিতে সাহসী হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেই যে প্রভাতবাবু ও তাঁহার সমর্থন-কারীদের চেয়ে 'বক্তৃতা-প্রতিভায়' নিকৃষ্ট ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারিতেছিনা।

বনবিহারী বাবু এবং প্রতিমা দেবীকে (যদিও তিনি নিজেই নারী) আমরা আরেকটু ভাল করিয়া নারী-চরিত্র 'ষ্টাডি' (study) করিতে অনুরোধ করি। নারী-চরিত্র চিরকাল দুজ্ঞেয় একথা অনেকেই অনেকক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এসম্বন্ধে ফস্ করিয়া একটা কিছু ধারণা করিয়া বলা উচিত নহে। একসে-পশানের (Exception) কথা এস্থলে নিশ্চয়ই উঠিবে না এবং এই শব্দটির সম্বন্ধে কিছু বলাও আপাততঃ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। একসেপশানের দোহাই দিলে চলিবে না, একথা ঠিক যে নারীর মনের গতি যে কোন সময় অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

কাজে কাজেই যাঁহারা নারী-প্রগতির কথা চিন্তা করিয়া অযথা শঙ্কিত হইতেছেন আমরা তাঁহাদের বলি—'মা ভৈঃ!' প্রথম জাগরণের সাময়িক উত্তেজনা ও অশান্ত উদ্দীপনা নারীর ভবিষ্যৎ গৌরবময় কার্য্য ও জীবনপ্রবাহকে কোনমতে ম্লান করিতে পারিবে না ইহাই আমাদের অন্তরিক বিশ্বাস। নারীর ভালোমন্দ চিনিয়া লইবার অনন্য সাধারণ শক্তি নারী অচিরেই লাভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে নারী-প্রগতির প্রকৃত আবহাওয়া উপলব্ধি করিবার সময় এখনও আসে নাই। যখন আসিবে তখন আমাদের মতো প্রভাতবাবু ও তাঁহার সমর্থকেরাও দেখিবেন যে, নারী সত্যই ব্যক্তিত্বে প্রখর, স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মে কঠোর হইয়া পুরুষের পাশেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

[শ্রীযুক্ত প্রভাত কিরণ বসুর নারী প্রগতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ (মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার) লইয়া আলোচনায় নানা স্থান হইতে অনেকে সাগ্রহে যেরূপ যোগদান করিয়াছেন তাহাতে 'খেয়ালী'র জনপ্রিয়তাই সূচিত করে। আমাদের হাতে যে কয়টী প্রবন্ধ আছে আগামী সংখ্যায় সেগুলি মুদ্রিত হইবে। তৎসঙ্গে আমাদের সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত করিয়া আমরা এই বাদানুবাদ পরিসমাপ্ত করিব। অতঃপর এ সম্বন্ধে আর কোন লেখা প্রকাশিত হইবে না।]

(সঃ খেঃ)

গ রী কুপার = এ্যান্ ং

পি ার ইব্‌বেট্‌সন্'-এ সুন্দর অভিনয় রছেন

বি যেন 'স্বপন' দেখা হ'চ্ছে

পরিচালক

টেলিগ্রাম ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ টেলিফোন

[illegible] ৬, রামময় রোড, কলিকাতা পার্ক ৩২৪

শনিবার, [illegible]শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩, জুন ১৯৩৬

ভেদ ও ভাঙ্গনের পূর্ব্বাভাষ

গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে কর্পোরেশন ইলেকসন বোর্ডের এক সভা আহুত হইয়াছিল এবং সেই সভায় কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের সম্পাদকদ্বয়কে আহ্বান করা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্র কুমার মজুমদার ইলেকসন বোর্ড সমীপে বহু অভিযোগ-পূর্ণ এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাও প্রকাশ যে, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনে বৈধানিক-ভাবাপন্ন সদস্য অধিক হওয়ায় তাঁহারা সেনগুপ্তপন্থী কাউন্সিলারদিগের মতামত উপেক্ষা করিয়া চলিতেছেন। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের নেতা এবং সম্পাদকদ্বয়—শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বৈধানিক-ভাবাপন্ন ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। পাঠকবর্গের ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারকে মেয়র পদে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ হেন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সন্মিলিত হইয়া বিধানী-দলের সহিত যে গুপ্ত যোগাযোগের সৃষ্টি করেন নাই তাহা কে বলিতে পারে। এই ত্রিমূর্ত্তির বিরুদ্ধে সেনগুপ্তপন্থী মুষ্টিমেয় কাউন্সিলারবৃন্দ এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে কোন বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বেই তাঁহারা নলিনী-বিধান-কিরণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এক স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং সেনগুপ্তপন্থী কাউন্সিলারদিগকে কোনই আমল দেন না।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বহুবার বহুভাবে যে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া যে সমস্ত বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন ও বাণী প্রচার করিয়াছিলেন আজ সে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী বাষ্পমণ্ডলীতে পরিণত হইয়াছে। বৈধানিকদলের গুপ্তচর হিসাবে বহু কাউন্সিলার তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া মনোনয়নের ছাপ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমানে তাঁহাকেই কদলী প্রদর্শন করিয়াছেন। যে চরিত্র-হীনকে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য শরৎচন্দ্র বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন ভাগ্যচক্রের ক্রুর পরিহাসে সেই চরিত্রহীনের বিজয়-পতাকা কর্পোরেশনে আজ শরৎচন্দ্রের পরাজয় ঘোষণা করিতেছে। ইলেকসন বোর্ডের বিগত অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণী আমাদের গোচরীভূত না হইলেও, ইহা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে উক্ত অধিবেশনে সেনগুপ্তপন্থী কাউন্সিলারবৃন্দের অভাব অভিযোগের বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। অবিলম্বে যদি শরৎচন্দ্র দৃঢ়তার সহিত নেতৃত্বের দণ্ড গ্রহণ না করেন তাহা হইলে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের দ্বিধাবিভক্ত হইবার আশু সম্ভাবনা। পদানত ও পরাভূত সেনগুপ্তপন্থী কাউন্সিলারবৃন্দ আর কতদিন বৈধানিক দলের তল্পিদাররূপে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনে বিরাজ করিতে পারেন?

আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্র মজুমদারের পত্র পাঠের অবসর শরৎচন্দ্র পাইয়াছেন এবং ইহাও বিচিত্র নহে যে এতদিন পরে হয়তো শরৎচন্দ্র তাঁহার অবিবেচনার ফলস্বরূপ যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ক্রমবর্দ্ধমান ছায়া নিরীক্ষণ করিয়া নিজেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। শরৎচন্দ্র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ ও কবিরাজ সত্যব্রত সেনের ন্যায় দলগত নেতৃ ও কর্ম্মীবৃন্দকে বাণপ্রস্থে প্রেরণ করিয়া চরিত্রহীন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা অপ্রতিহত করিয়া তুলিয়াছেন। ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের অভিনব পদত্যাগপত্র পাঠ করিবার অবসর কি শরৎচন্দ্র পাইয়াছেন? যদি সে অবসর তিনি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে ইহা কি ক্ষণিকের তরে তাঁহার মনে উদয় হয় নাই যে দাশগুপ্তের এই পত্রাঘাত সত্যব্রত সেনের মনোনয়ন পত্র নাকচ করার প্রকৃতির প্রতিশোধরূপে তাঁহারই উপর বর্ষিত হইয়াছে। এই বহুরূপী ডাক্তারবাবুটির স্বরূপ এখন শরৎচন্দ্রের নিকট হয়তো পূর্ণভাবেই প্রতিভাত হইয়াছে।

যদি ব্যারিষ্টারী করিয়া অর্থোপার্জ্জন শরৎচন্দ্রের জীবনের একমাত্র কাম্য বলিয়া গণ্য হইত তাহা

হইলে আমরা উপরি-লিখিত বহু প্রসঙ্গের অবতারণা করিতাম না। যদি পূর্ণভাবে এখন রাজনীতিতে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে "ক্ষণিকের দেখা দিয়া" বাংলা কংগ্রেসের বিবদমান দলের চক্রান্তের মধ্যে নিজের বিরাট ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দেওয়া সমীচিন নয়। তাঁহাকে কদলী প্রদর্শন করিয়া তাঁহারই মনোনীত কাউন্সিলারবৃন্দ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব "Colleague" চরিত্র-হীন ব্যক্তি বিশেষের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বিগত কর্পোরেসন নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে মনোনয়ন ব্যাপারে তাঁহার অবিবেচনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া শরৎচন্দ্র যদি তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতি রচনা করেন তাহা হইলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ হইতে পারে।

খদ্দর-ভূষিত লাট

আইন-কানুন, নানা বন্ধনের নাগপাশ তো আমাদের আছেই কিন্তু এই বন্ধনের মাঝেও যে স্বাধীনচেতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকই শ্লাঘার বিষয়?, কয়জনের বাক্যে ও কার্য্যে এই অভীপ্সার পরিচয় পাই—"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির্র স্বাদ"। তাহার কারণ ভয়ের সংস্কারে, আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বার্থ চিন্তায়, দাস-মানুষের মন সাধারণতঃ এমন অসাড় হইয়া যায় যে, এই সকল চিন্তা তাহার একান্তে ভাবিতেও বোধ হয় ভয় হয়। এই মনুষ্যত্ব-বিধ্বংসী ভয় হইতে, এই স্বার্থপ্রণোদিত জড়ত্ব হইতে মুক্তি দান করিবার জন্যই কংগ্রেসের আদর্শ স্বরাজের আদর্শ, সেইজন্যই কংগ্রেস মনে করেন Good Government is no substitute for Self-Government.

তবু এই চিত্ত-অসাড়কারী system-এর মধ্যেও যে স্বাধীনচেতা মানুষের জন্ম হয় ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি প্রমাণিত করে। বর্ত্তমানে মধ্যপ্রদেশের অস্থায়ী গভর্ণর মাননীয় মিঃ ই, রাঘবেন্দ্র রাও এইরূপ স্বাধীনচেতা মানুষ।

মিঃ রাঘবেন্দ্রের শক্তি ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় অবশ্য আমরা বহুদিন হইতেই পাইতেছি। দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্যদল গঠন করেন তখন তিনি ছিলেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাজ্যদলের অন্যতম নেতা; এবং সেই সময়কার মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যেরূপ deadlockএর সৃষ্টি হইয়াছিল সেরূপ ভারতে আর কোথাও হয় নাই!

মধ্য প্রদেশের অস্থায়ী লাট মাননীয় মিঃ রাঘবেন্দ্র রাওয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী "খেয়ালী"র অন্যতম পরিচালকের নিকট যে আলোকচিত্র পাঠাইয়াছেন তাহার প্রতিলিপি।

পদগ্রহণ কর্ত্তব্য কি না সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কিন্তু পদের ভারে নিজে ভারাক্রান্ত ও অভিভূত না হইয়া আপনার মনুষ্যত্ব ও শক্তিতে যত বড় পদই হউক না কেন তাহাকে মর্য্যাদা দান করার শক্তি মানুষের মধ্যে আছে। খদ্দর-শোভিত গান্ধী-টুপী পরিহিত গভর্ণর রাঘবেন্দ্র রাও তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। ভারতের চাকরী-জগতে ইঁহার অনন্যসাধারণ আদর্শ দেশের সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মনুষ্যত্বের পথের দিশা দান করুক ইহাই কামনা করি।

চিরদিন এমন যাইবে না। একদিন হয়তো পদগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে। তখন আমরা চাই আদর্শে উদ্বুদ্ধ, তেজে দীপ্ত, সত্যে অনুপ্রাণিত এইরূপ আত্মসচেতন মানুষ। তাই আজ মিঃ রাঘবেন্দ্র রাওকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি আজিকার এক রাঘবেন্দ্র রাও ভবিষ্যত-ভারতে বহু রাঘবেন্দ্র রাও গড়িয়া তুলুক।

❋ সাহিত্যে আধুনিকতা ❋

শ্রীমোহজিৎ মুখোপাধ্যায়

'রসের বাজারে আজকাল কাঁকরের আমদানী সুরু হয়েছে'—সাহিত্য জগতে ঢুকেছে আজ দলাদলি। রূপ ও রসকে গৌণ ক'রে এখন আরম্ভ হয়েছে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা নিয়ে মারামারী—শরীরতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব নিয়ে রেষারেষি। প্রগতির যুগে পুরান পন্থিরা তীব্রভাবে আলোচনা করছে নূতনের যৌন ক্ষুধার স্ফূর্ত্তের বিকাশকে আর্ট বলে চালানো, আর নতুন পন্থিরা বলছে প্রকৃত আর্ট হচ্ছে এই।

এর মধ্যে কাদের কথা ঠিক তা' বলা দুরূহ। কারণ সহজ, সরল পন্থা ছেড়ে তারা করছে গালাগালি। তাই সত্য জিনিষটা ঢাকা পড়ছে গলাবাজির ফাঁকে। সাহিত্যের আদি উৎপত্তি হচ্ছে সমাজ। সাহিত্য সমাজকে সৃষ্টি করেনা, সমাজ সাহিত্যকে সৃষ্টি করে। এ কথা অতি সহজে বোঝা যায়, যদি একটা কথা শুধু মনে রাখা যায় যে, জীবনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষ চায় আনন্দ—সহজ, সত্যের ভেতর দিয়ে আনন্দ। সাহিত্য তাই রূপ ও রস দিয়ে সৃষ্টি; আধুনিক যুগের ঘটেছে পরিবর্ত্তন—তাই সাহিত্যেরও ঘটেছে আধুনিকতা। সাহিত্যে আধুনিকতা বলতে এখন বোঝায় না যে কয়েকজন আধুনিকতা প্রকাশ করে নিজেকে প্রকাশ করছে—এখন বোঝায় সমাজের অন্তর চাচ্ছে এই রকম আনন্দ ও রসের সৃষ্টি। লোকেরা এইরূপ রস গ্রহণ করছে, কিন্তু তাদের মধ্যে, মাঝে মাঝে বাধা দিচ্ছে 'সংস্কার বা রীতি'।

এই সংস্কার বা রীতির কারণ হচ্ছে খুব স্পষ্ট। অতি পুরাকাল থেকে জ্ঞান চর্চ্চা ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া। নিয়ম, সূত্র যে-সমুদয় ছিল তারা সেগুলির অর্থ ব্যাখ্যা না ক'রে লোকদের পালন করিয়ে নিত, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে। লোকেরা অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে নিজেকে সাজাত নানা রকম আইনের দ্বারা—যৌন প্রক্রিয়া বিষয়ে নানা রকম সূত্রের দ্বারা। এই ধারাটাকে তারা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল, অনেক যুগ ধরে, অনেক দিন পর্য্যন্ত এমন কি ইংরাজ জাতির আগমন পর্যন্ত। এই আইনগুলিই তাই ভারতবর্ষের সর্ব্বস্ব, তার বিরুদ্ধাচরণ করলে লাগে দ্বন্দ, মারামারি।

আধুনিক যুগ, 'অর্থ ও প্রয়োজনীয়তার' যুগ। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন লোকের মনে চিন্তার ধারা এসে পৌচেছে, কোন বস্তুর কি ধর্ম্ম এবং কোন বস্তুর ধর্ম্মকে বাদ দিলে হয় স্বভাব জাত স্ফূর্ত্তের পরিপূর্ণতা নষ্ট। এই যুগে তাই মানুষ গড়ে উঠেছে অন্যরকম। যৌন ক্ষুধার স্ফূরন ও তার পারিপার্শ্বিক বৃত্তিকে তাই আজকাল দেখতে চায় না লোকে একটা ভীষণতর সীমার মধ্য দিয়ে, কারণ তাহলে জীবনের প্রগতিতে এটাই হয়ে উঠে মুখ্য। তাই সাহিত্যও আজকাল যৌন ক্ষুধার বর্ণনাতে গোঁড়ামি বা বাঁধাবাঁধি হারিয়েছে।

আধুনিক সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যার যতটুকু সত্ত্বা বা প্রভাব তাকে ঠিক ততটুকু ভাবেই দেখা। যৌন ক্ষুধা, যৌন ক্ষুধাতেই সম্পূর্ণ। এটা দেহের একটা বৃত্তি—জীব মাত্রেই এই ক্ষুধার বশবর্ত্তী। কিন্তু এই যৌন ক্ষুধাকে নানা ভাবে উচ্চ করে বলা, সত্যের অপলাপ, ও নিজেকে, অন্যকে প্রত্যবায় করা।

আধুনিক সাহিত্য তাই বিভিন্ন। আধুনিক সাহিত্য দিতে চায় সত্যের ভিতর দিয়ে আনন্দ, বাস্তব ও প্রকৃতের মধ্যে রূপ ও কল্পনা। এর গতি সহজ ও সরল। জোর বা বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে এর স্বতঃস্ফূর্ত্ত গুণগুলি তাই নষ্ট হয় না—তাই আর্টও এখানে মুক্ত ও সত্য। তাই আধুনিক সাহিত্যে হৃদয়ে অনুভূতি হয় সমধিক। লোকে বৃত্তির সহজ বিকাশে সহজে তা' গ্রহণ করতে পারে। মনের স্বচ্ছন্দ গতির মত সাহিত্যের গতি হয় স্বচ্ছন্দ, খাঁজ না থেকে।

আধুনিক সাহিত্যের আর একটা বিশেষ গুণ, যা পুরাণ 'পন্থিরা বরাবর বিদ্বেষের চোখে দেখেন তা' এই যে এতে উপদেশের বা দর্শন শাস্ত্রের কোন গুঢ় তত্ত্ব থাকে না। সাহিত্য রূপ ও রস নিয়ে সৃষ্টি তাতে অকারণ একটা Idealism বা দার্শনিকতা দেখান নিতান্ত অশোভন। উদ্দেশ্যমূলক আর্টএর মূল্য অকিঞ্চিৎ কারণ তাতে আসল আনন্দ ও সুন্দরের মর্য্যাদা থাকে না। সেটা তখন হয়ে দাঁড়ায় ঠিক Advice to son, পুত্রকে উপদেশ দেওয়ার মত, এবং সেইজন্য তা'র প্রেরণাও হয় খুব কম। 'Art for Arts' Sake,' 'সুন্দরের সীমানা সুন্দরেই' তাকে 'হওয়া উচিৎ' এরূপভাবে পরিত্যাগ না করলে, তার মুখ্য উদ্দেশ্য নষ্ট হয় এবং 'আর্ট' তখন হয় 'Secondary' বা 'গৌণ'। আধুণিকতম সাহিত্যে তাই কেবল এই সৌন্দর্য্যের স্ফূরণের মুখ্য ও প্রধান উদ্দেশ্য এবং আর্ট তাই বিকৃত না হয়ে হয়েছে সরল ও সুন্দর।

সর্ব্বশেষে একথা আধুনিক সাহিত্য বার বার করে মনে করিয়ে দেয় যে, প্রত্যেক জিনিষকে তার স্বভাবগত ধারা অনুসারে গ্রহণ করা উচিত। কী হওয়া উচিৎ ছিল বা বাধ্যতামূলক নিয়মের পদক্ষেপ অনুসারে হওয়া উচিৎ, এ কথা আধুনিক সাহিত্য বার-বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সহজ, সরলভাবে দেখলে সাহিত্যের কোনও অশ্লীলতার দোষ নজরে পড়বে না। পুরান-পন্থিরা কিন্তু এ কথা ভুলে যান যে নগ্নকে

(বিলাসী)

সর্ব্বহারা
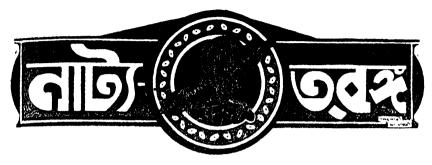
সুধীন্দ্র রাহার নতুন নাটক "সর্ব্বহারা" মিত্রের 'রঙমহলে'-র আগের নাম বজায় রেখেছে। পুরো পাঁচ ঘণ্টা নাটকখানা আমাদের মনে সব সময়ই নতুন নতুন ভাবের যোগান প্রদানে মশগুল রেখেছে। নাট্য-কারের ঘটনা সংস্থাপনা একটু আজগুবি রকমের হ'লেও—নাটকখানি ঘটনাবহুল এবং পর পর গ্রথিত হ'য়ে যথেষ্ট রসসৃষ্টি কোরেছে। গ্রন্থকারের নাটক রচনা বা সংলাপের সংগ্রন্থনে যত না কৃতিত্ব থাক—তাঁর বহুমুখী কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, শেষ অবধি কোথায় নাটকের পরিণতি তা' তিনি কাউকে বুঝবার সুযোগ দেন নি। মোট কথা Suspense—যা' নাটক রচনার Technique-এর মেরুদণ্ড তা' তিনি অতি সংযতভাবে শেষ অবধি বজায় রেখেছেন। কিন্তু "সর্ব্বহারা" নাটকের নামকরণে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে। আমাদের মতে এর নাম "সর্ব্বহারা" না হ'য়ে "সর্ব্বপ্রাপ্ত" হ'লেই ভাল হ'ত। নাটকখানার নাম শুনে মনে হয়, দারুণ Tragedy হবে। কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেল দারুণ Comedy।

আর একটি জিনিস এই নাটকাভিনয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছে, সেটি হ'চ্ছে সকলের সুন্দর অভিনয়। অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হয়, প্রত্যেক নট-নটিই যেন নিজ নিজ চরিত্রের সাফল্যের জন্যে দরদ ঢেলে অভিনয় কোরেছেন। এর মধ্যে জীবন-গাঙ্গুলীর বেমো, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের রাজা ভাস্কর দেব, কৃষ্ণধন মুখুজ্যের দৌলৎরাম অনবদ্য, অভিনব। বোকা বেমোর ভূমিকায় জীবন রূপসজ্জা ও অদ্ভুত অভিনয়ে আমাদের বিস্ময়াভিভূত কোরেছেন। সিরিও-কমিক ভূমিকায় মনোরঞ্জন অতুলনীয়—তাই রাজার চরিত্রটিও হ'য়েছে মন-মাতানো। কৃষ্ণধনের মাঁড়োয়ারী দৌলৎরাম দেখে তাঁর কথাবার্ত্তা চালচলনে কেউ তাঁকে বাঙালী বলে ধরতে পারবে না—একথা হলপ কোরে বলা যায়। মোট কথা, এই তিনটি চরিত্র সৃষ্টিতে এই তিনজনের খ্যাতির মাথায় তিনটি সোণালি পালক যোগ হ'ল। তা' ছাড়া রতীন বাঁড়ুয্যের মন্মথ, যোগেশ চৌধুরীর লক্ষ্মীপ্রসাদ, গগন চাটুয্যের সৎকার সমিতির সেক্রেটারী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের ডাক্তার—আমাদের খুব ভাল লেগেছে। প্রভাত সিংহের শ্যামল ও বিজয় কার্ত্তিক দাসের রাঘব মন্দ না হ'লেও আরও উন্নত হ'লে আর সরায়ের সঙ্গে পা' ফেলে চল্‌তে পারতেন।

মেয়েদের মধ্যে শেফালিকার বেজী হ'য়েছে চমৎকার। কথাবার্ত্তায় হাবভাবে তিনি চরিত্রের যে রূপ দিয়েছেন, তা' সার্থক হ'য়েছে। আসমানতারার সৌরভী ও সুহাসিনীর ডাক্তারের স্ত্রী সবাই খুসী কোর্‌তে পারবে। ফুলের ভূমিকায় ছোট মেয়েটি অতি সুন্দর। পদ্মাবতীর কোহিনুরে আরও উন্নতি করা দরকার। মোট কথা অভিনয়ের দিক থেকে এই নাটকখানি সত্যই খুব উত্‌রে গেছে।

প্রযোজনার দিক থেকে নাটকখানার সুসঙ্গতি পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠালাভ কোরেছে। কেবল এক জায়গায় আমাদের একটু বিসদৃশ ঠেক্‌ল—সেটি জীবন ও আসমানের দ্বৈত-সঙ্গীত। দ্বৈত-সঙ্গীতেও আমাদের ততটা আপত্তি নেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৌরভীর ঢঙটা আমাদের মনঃপূত হয় নি। সতু সেন একজন কলারসিক প্রযোজক তাঁকে এ বিষয়ে

না বলে সাধারণভাবে গ্রহণ করলে তার মধ্যে থাকে শুধু সত্য কিন্তু থাকে না কোন অশ্লীলতা, কিন্তু তার স্বভাবগত গুণকে মিথ্যার আড় দিয়ে ঢাকাতে গেলেই হয় বিসদৃশ এবং যখন সহজ গুণ তার প্রকাশ হয়ে পড়ে তখনি মনে হয় বুঝি বা সেটা অশ্লীলতা।

চিন্তা কোরে দেখবার জন্যে আমরা অনুরোধ করি।

নাটকখানির গানগুলোর মধ্যে সুরের গোলমাল কানে বাজে। কাজী নজরুল যেখানে গানের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যে নিয়োজিত হ'য়েছেন—সেখানে এ দোষ আমরা আশা করতে পারি না। তবে মনে হয়, যাঁরা গান গেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যাঁরা বাজনা বাজিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঠিক নেই—সেজন্যেই প্রথম প্রথম এমনি অসুবিধা হ'চ্ছে। নাচের ভেতর বেশ নূতন ঢঙ আছে। এজন্যে ব্রজবল্লভ পাল পশংসার যোগ্য। "সর্ব্বহারা"র সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট যথোপযুক্ত হ'য়েছে।

মোট কথা, "সর্ব্বহারা" একখানা দেখবার মত নাটকাভিনয় হ'য়েছে এবং মনে হয়, 'রঙমহলে'র পূর্ব্ববর্ত্তী সব নাটকের মত একখানাও সেরূপ জীবনী শক্তি লাভ কোরবে।

দস্যু

'মিনার্ভা'র "দস্যু" এসেছে অনেকদিন কিন্তু ভয়ে তার সঙ্গে এতদিন সাক্ষাৎ করতে পারি নি। "দস্যু"র নাট্যকার হ'চ্ছেন আশুতোষ সান্যাল। "দস্যু"কে তিনি পরিচিত ক'রেছেন এই ভাবে: বিলাসী প্রমোদোন্মত্ত রাজা—তারই জন্যে রাজ্যে এল অশান্তি। সেনাপতি ও রাজশ্যালক দু' জনেরই এই সুযোগে দৃষ্টি পড়ল সিংহাসনের ওপর। রাজশ্যালকের অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রতাপ দেশময় জ্বালে প্রতিহিংসার আগুন। রাণীর তিরস্কারে রাজার ঘুম ভাঙলো। তিনি ছুটলেন প্রতাপকে শাস্তি দিতে—দস্যু স্বেচ্ছায় নিজেকে ধরা দিলে আর তারই ফলে রাজশ্যালক পুণ্ডরীকের চক্রান্ত হ'ল ফাঁস। নাটকখানা রচনায় মাঝে মাঝে Grip আছে সত্য কিন্তু ঘটনা বিন্যাসে ও সংলাপ-কথনে নাট্যকারের কাঁচা হাতের ছাপ ফুটে উঠেছে স্পষ্ট। তবে 'মিনার্ভা'র মত জায়গায় এরূপ ধরণের নাটকেরই চাহিদা বেশী—সেজন্যেই বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষ এ নাটকখানিকে মঞ্চস্থ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

অভিনয়ে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য রঞ্জিত রায়—তাঁর অভিনয়ে আমরা মুগ্ধ হ'য়েছি। তাঁর ভূমিকাটি এর চেয়ে ভাল অভিনয় কেউ কোরতে পারেন বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। এ ছাড়া কারও অভিনয় উল্লেখযোগ্য নয়। শরৎ চাটুয্যের প্রতাপ উচ্চ চীৎকারে গগন পবন মুখরিত হ'য়েছে। বঙ্কিম দত্তের রাজা ও জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্ডরীক বিশেষত্বহীন। লাইটের কাঞ্চন মন্দ লাগলনা। কিন্তু সরযূবালার মাধবী ভাল হয়নি। অন্যান্য স্ত্রী ও পুরুষ ভূমিকাগুলো আলোচনার বাইরে।

প্রযোজনায় কালীপ্রসাদ ঘোষের প্রত্যেক দৃশ্যের অভিনয়ে আবহাওয়া সৃষ্টিতে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। দস্যু প্রতাপের বাসস্থানে

খোরপোষের মামলা

নলিনীরঞ্জন সরকারের আবেদন নামঞ্জুর

মিঃ পাইনের আচরণ ✲ ভিত্তিহীন অভিযোগ

মিঃ রঞ্জিত গুপ্তের যুক্তিপূর্ণ রায়

আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এল, কে, সেনের এজলাসে নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে শ্রীমতি রাসমণি দেবী খোরপোষের যে মামলা রুজু করিয়াছে, সেই মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তর করার আবেদন সহকারী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর গুপ্ত না-মঞ্জুর করিয়াছেন।

গত ২৫শে মে তারিখে বিবাদী পক্ষের এডভোকেট শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন পাইন আদালতে বাদিনীকে জেরা করার সময় বিচারক ও শ্রীযুত পাইনের মধ্যে বাদ-বিতর্ক হইয়াছিল। তাহার ফলে শ্রীযুত পাইন মামলা পরিচালনার দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া আদালত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরদিন মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তরিত করার জন্য উচ্চ আদালতে আবেদন করার উদ্দেশ্যে শুনানী স্থগিত রাখার জন্য বিবাদী পক্ষ হইতে একখানি আবেদন করা হইয়াছিল। আবেদনে বলা হইয়াছিল যে, বিবাদী পক্ষ শ্রীযুত সেনের নিকট নিরপেক্ষ ও সুবিচার পাইবে না বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে তৎপরে সহকারী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর, গুপ্তের এজলাসে মামলা স্থানান্তরের আবেদন করা হয়।

আবেদন না-মঞ্জুর করিয়া শ্রীযুত গুপ্ত তাঁহার রায় লিখিয়াছেন—"আবেদনকারী সুবিচার ও নিরপেক্ষ বিচার পাইবে না—এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ না থাকিলে মামলা স্থানান্তরের আবেদন করা উচিত নহে। আবেদনকারীর পক্ষে আশঙ্কা করার যে সঙ্গত কারণ আছে তাহাও প্রমাণ করা প্রয়োজন।"

"বর্ত্তমান মামলায় আবেদনকারী নিম্ন আদালতের বিরুদ্ধে ৪টি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। সে বলিতেছে,—(১) আইনানুসারে উত্থাপনের অযোগ্য প্রশ্ন সাক্ষীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বিচারক অনুমতি দিয়াছেন (২) আবেদনকারীর পক্ষে সুবিধাজনক ও আইনানুসারে উত্থাপনের যোগ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেওয়া হয় নাই (৩) জেরার সময় প্রশ্নের উত্তর না দিয়াও অন্য ভাবে বাদিনী 'একরোখা' আচরণের নিদর্শন প্রদান করিলেও ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাইতে বিচারক আবেনকারীর এডভোকেটকে সাহায্য করেন নাই এবং (৪) ২৫শে মে তারিখের ঘটনায় বোঝা যায় যে, বিচারক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মনোভাব পোষণ করিতেছেন। তিনি আবেদনকারীর এডভোকেটের সহিত সুসঙ্গত ব্যবহার করেন নাই।

"প্রথম দুইটি অভিযোগ আমি একত্র বিবেচনা করিব। বিশেষ কোনও সাক্ষ্য গ্রহণের অযোগ্য কিনা তৎসম্বন্ধে সাধারণতঃ মতভেদ থাকিবে। ঐ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করার অধিকার বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর ন্যস্ত আছে। এই অভিযোগের পোষকতায় আবেদনকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, বিচারক নিয়মিত ভাবে ও স্বভাবতঃই উত্থাপনের অযোগ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং আবেদনকারীর প্রতিকূলে মনোভাব পোষণের জন্যই তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারী যে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি আমি বিবেচনা করিয়াছি। আবেদনকারীর এডভোকেট সাক্ষ্য আইনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহাই ঠিক এবং বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যাখ্যা ভুল—এরূপ যুক্তি আমি স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু উহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ভুল হইয়াছে ধরিয়া লইলেও তিনি যে (আবেদনকারীর) প্রতিকূল মনোভাব লইয়া ঐরূপ করিয়াছেন, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। কেন না, তিনি ৪১ পাতা সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমার নিকট প্রেরিত রিপোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার প্রত্যেকটি

নর্ত্তকীর তাণ্ডব-নৃত্য পরিকল্পনাও প্রশংসার্হ। তা' ছাড়া প্রযোজনার ভেতর কোনও নতুনত্ব নেই।

নাচ, গান ও সাজসজ্জা "দস্যু"র মান রেখেছে। কিন্তু দৃশ্যপটের জাঁকজমক 'মিনার্ভা'র আগেকার নাটকগুলোর তুলনায় নেই বল্‌লেই হয়। পটলবাবু এদিকে আর একটু মাথা ঘামালে মন্দ হ'ত না।

অভিযোগ আলোচনা করিয়াছেন। আমি মনে করি যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমস্ত যুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনার পর তিনি তাঁহার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আইনের ব্যাখ্যায় তিনি ভুল করিয়া থাকিলে এবং ঐরূপ ভুল ব্যাখ্যার উপর তিনি রায় দিলে আপীল আদালত—যদি এই মামলার আপীল হয়—নিশ্চয়ই ঐরূপ ভুলের সংশোধন করিবেন।

"প্রশ্ন উত্থাপন বা অগ্রাহ্য করার প্রসঙ্গে আবেদনকারী বিচারকের বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ করিয়াছে। অভিযোগ করা হইয়াছে যে, একটি প্রশ্নে রাসমণি যে উত্তর দিয়াছিল বিচারক তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই। স্বেচ্ছাক্রমেই বিচারক উহা লিপিবদ্ধ করেন নাই—ইহাই আবেদনকারী ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, বাদিনী ঐরূপ কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই, পরবর্ত্তী শুনানীর দিনে আবেদনকারীর এড্‌ভোকেট ঐ বিষয়ে তাঁহার (বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের) দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। বাদিনী পূর্ব্বদিন ঐ প্রশ্নের কোন উত্তর দিয়াছিল একথা অস্বীকার করে। এবিষয়ে বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমি মনে করি যে, তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক।

কিন্তু বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিতে ভুলিয়া গেলেও মনে রাখা উচিত যে, তিনি মানুষ, মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভুল হইতে পারে। কোন ভুল হইয়া থাকিলে পরবর্ত্তী শুনানীর দিনে তাহা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে আমি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেকটি উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবেদনকারীরই ভুল হইয়াছে।

বাদিনী অশিক্ষিতা

প্রশ্নের উত্তর দিতে বাদিনীর অনিচ্ছা ও অসম্মতি সম্বন্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে। স্মরণ রাখা উচিত যে, বাদিনী অশিক্ষিতা ও নীচ বংশজাতা। তাহার পক্ষে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অসুবিধা হওয়াই স্বাভাবিক। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটও সেই কথা বলিয়াছেন।

বাদিনী রাসমণির পক্ষ হইতে কয়েকটি প্রশ্ন উদ্ধৃত করিয়া যে এফিডেফিট দাখিল করিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে,—অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান সাক্ষীগণও ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হতবুদ্ধি হইত। প্রশ্নগুলি সহজবোধ্য করিতে আবেদনকারীর এডভোকেটও চেষ্টা করেন নাই।

বাদিনীর পক্ষে সহজবোধ্যভাবে প্রশ্নগুলি উত্থাপনের নির্দ্দেশ দিয়া বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট সঙ্গত কাজই করিয়াছিলেন; ঐরূপ নির্দ্দেশ প্রদানের দ্বারা তিনি যে কোন

ক্ষেত্রে আবেদনকারীর প্রতিকূলে মনোভাব পোষণের পরিচয় দিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণ অনুরূপ অসুবিধাগ্রস্ত হইলে বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট যে অনুরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করিবেন—সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

২৪শে মে আদালতে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাই আমি অতঃপর আলোচনা করিব। ঐ দিনই তাঁহার আদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করার প্রয়োজন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের ঐ বিবরণে প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে—ইহা আমি বিশ্বাস করি। এখানে আমি উহার পুনরুক্তি করিব না—কেন না, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আবেদনকারীর এডভোকেটের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল.—ইহাও দুঃখের কথা। উদারতার পরিচয় দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ অসুস্থতার জন্য অথবা সমস্ত দিন বাদিনীর জেরা করায় ক্লান্ত হইয়া এডভোকেটের ঐরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। উহার যে কোন কারণে এডভোকেটের ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটিয়াছিল—আমিও তাহাই মনে করিব।

যে কারণেই উহা ঘটিয়া থাকুক না কেন—এডভোকেটকে সতর্ক করিয়া দেওয়া এবং বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনয়নের সম্ভাবনা স্মরণ করাইয়া দেওয়া ব্যতীত বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন উপায় ছিল না। কেন না, উহা না করিলে আদালতের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিত না। অনুরূপ অবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেট যে আর কি করিতে পারিতেন—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। বিচারকের নিকট হইতে যেটুকু ভদ্র ব্যবহার ও সুবিবেচনা পাইতে আইনজীবীদিগের অধিকার আছে—এই এডভোকেট পুনরায় এই মামলায় আবেদনকারীর পক্ষ সমর্থন করে একই বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে যে সেটুকু ভদ্র ব্যবহার পাইবেন—তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

"আবেদনকারী সুবিচার পাইবে না—এরূপ আশঙ্কা করার কোন সঙ্গত কারণ নাই বলিয়াই আমি মনে করি। প্রত্যুত পক্ষে মামলার নথিতে দেখা যায় যে, বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। মামলার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন না হইলে আদালতে উপস্থিত থাকার দায়িত্ব হইতে আবেদনকারীকে নিস্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। সমনের মামলায় যে ভাবে শুনানী হয়, বর্ত্তমান শুনানীও সেইভাবে চলা উচিত। তথাপি, বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করিতে ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি দিয়াছেন। এই সমস্ত

(বিলাসী)

জীবন নাটক

দেবকী বসুর "লাইফ ইজ এ ষ্টেজ" বা "জীবন নাটক" ছবি আমাদের অপরিমেয় আনন্দ দিয়েছে। ছবিখানা এখানে মুক্ত হবার আগে বাইরের সব কাগজ-পত্রের আলোচনা পড়ে ছবিখানা দেখবার কোনও আগ্রহ আমাদের ছিল না। কিন্তু এখন দেখছি, ছবিখানা না দেখলে দেবকী বসু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অন্য রকম থাকৃত। আমাদের এখন মনে হচ্ছে, ছবিখানা আগে বোম্বাইয়ে মুক্ত না হয়ে এখানে দেখালে দেবকী বসুর ওপর ধারণা সবায়ের ভাল থাকৃত। দেবকীবাবু ভুল কোরেছেন, যেখানে লোকে "তুফান মেল," "হাণ্টারওয়ালি"র মত মস্তকহীন ছবি দেখবার জন্যে হপ্তার পর হপ্তা সিনেমা হল মশগুল কোরে রাখে, সেখানে "জীবন নাটকে"র মত সূক্ষ্ম মনঃস্তত্ত্ব সম্পন্ন ছবির স্থান নেই, একথা সহজেই অনুমেয়।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটি নারীর অভিযান। সুখ-শান্তির জন্যে সে মঞ্চে অভিনয় কোরে বুঝল—অভিনীত নাটকের সঙ্গে তার জীবন নাটকের হুবহু মিল আছে। সে মঞ্চ ত্যাগ কোরল—শান্তি ফিরে পেল। এই হ'চ্ছে নাটকের মূল কথা। পরিচালনায় দেবকী বসুর অসামান্য প্রতিভা ফুটে উঠেছে। কেবল দু'টো বিষয় তার দৃষ্টি এড়িয়েছে—প্রথম, ছবিখানার গতির সামঞ্জস্যতা আর দ্বিতীয়, নির্ম্মল বাঁড়ুয্যে ও লাভজীর ঐ ভাঁড়ামি এর ভেতর না আনলেই ভাল হ'ত। শব্দযন্ত্রী ও আলোক-চিত্রশিল্পীর কাজ চমৎকার—অতি চমৎকার। আর ফ্রান্জ ও হরিশ বালির আবহাওয়া-সঙ্গীত অশ্রুতপূর্ব্ব—অনবদ্য—অভিনব। সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, পরিস্ফুটনাগারের কাজ সম্বন্ধে অভিযোগ করবার কিছু নেই।

এবার অভিনয়ের কথা। নায়িকার ভূমিকায় দুর্গা খোটের অভিনয় দেখে মনে হ'ল ভারতে এখনও তিনি অপ্রতিদ্বন্দিনী। এরপরেই মারুতি রাওয়ের অভিনয় ও গান উল্লেখযোগ্য।' রামপিয়ারী তাঁর সুনাম অনুযায়ী অভিনয় কোরেছেন। মুবারক ও জয়রাজের অভিনয়ও চরিত্রোপযোগী হ'য়েছে। নির্ম্মল বাঁড়ুযো, ও লাভজির এই ছবিতে অভিনয় 'এক ভাড় দুধে এক ফোটা গরুর চোনা' হ'য়েছে। অন্যান্য আর সবাই ভাল অভিনয় কোরেছেন। আমরা আশা করি ছবিখানা 'প্যারাডাইজে'-র সুনাম আরও বাড়িয়ে দেবে।

নিউ থিয়েটার্স

নীতীন বসু আর হেমচন্দ্র তাঁদের ছবির জন্যে বাইরে গেছেন দু' একটি সুদর্শনা মেয়ের সন্ধানে। ছবি যা'তে সবদিক থেকে ভাল হয়, তার জন্যে এদের দু'জনেরই চেষ্টার অন্ত নেই।

নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্ম্স্

এদের "বিজয়া" নিউ থিয়েটার্সের দু' নম্বর ষ্টুডিওতে সমাপ্তির দিকে এগুচ্ছে। যতীন মিত্তিরের নিজ তত্ত্বাবধানে, দীনেশরঞ্জনের পরিচালনায় ছবিখানা যে বেশ উৎরে যাবে—একথা এখন থেকেই ভাবা বোধ হয় অন্যায় নয়। তা' ছাড়া চকচকে চোখ চন্দ্রা, থরথরে পা' ক্ষেতু, অমর মল্লিক ও পাহাড়ী সবাই আছেন। তিমির বরণের সঙ্গীত-পরিচালনা যে একটা নতুন কিছু হবে—আর তা'তে প্রাণসঞ্চার কোরবেন কৃষ্ণচন্দ্র ও সাইগাল—এ কথা কে না জানে!

রামণিক্ প্রোডাক্শন

নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর ষ্টুডিওতে এদের অতি-আধুনিক সমাজ-চিত্র "মায়া" প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় দ্রুতগতিতে তোলা হ'চ্ছে। এই ছবিতে আঙুরির নাচ ও গান হ'বে এক অভিনব সম্পদ। রাইচাঁদ বড়ালের

ব্যাপারে বোঝা যায় যে, বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট আবেদনকারীর প্রতিকূলে কোন মনোভাব পোষণ করিতেছেন না। ২৫শে মে আদালতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মামলা স্থানান্তরের আবেদন করা হয় নাই, ইহাও উল্লেখযোগ্য। অথচ, স্থানান্তরের অনুকূলে যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ২৫শে মের পূর্ব্বে মামলা শুনানীর সময় তাহার কোন কোন ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

ইহাতে বুঝা যায়, মামলার সুবিচার না পাইবার কোন আশঙ্কা পূর্ব্বে আবেদন-কারীর ছিল না; ২৫শে মে আদালতে "বাদ বিতর্ক" হওয়ার ফলেই এই আবেদন দাখিল করা হইয়াছে।

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে, বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এল, কে, সেন অভিজ্ঞ বিচারক; আদালতে তিনি সর্ব্বদাই নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন। ভবিষ্যতে এই এবং অন্যান্য মামলায়ও তিনি যে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন—তৎসম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

আবেদন নামঞ্জুর ও রুল বাতিল করা হইল।

সঙ্গীত-পরিচালনা, প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনা, বিমল রায়ের আলোকচিত্র "মায়া"-র এক বিচিত্র মায়াজালের রচনা কোর্‌বে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

কালী ফিল্মস্‌

আসচে শনিবার থেকে 'উত্তরা'-য় কালী ফিল্মসের বহু-আকাঙ্খিত, নিরুপমা দেবীর সর্বজন-প্রশংসিত "অন্নপূর্ণার মন্দির" দেখানো সুরু হবে। ছবিখানার কিয়দংশ দেখে আমরা ছবিখানার সাফল্য সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিত হ'য়েছি। এর সঙ্গে মজলিশী মুখুজ্যের মজলিসী ছবি "ভোট-ভণ্ডুল" সকলকে খুশী কোর্‌বে—একথা বলাই বাহুল্য।

* * *

পরিচালক সুশীল মজুমদারের "মুক্তি-স্নান" সুরু হবে আস্‌চে মাসের গোড়া থেকে। এতে লীলা হালদার ও 'এভার-পপুলার' ধীরু ঘোষ দু'টো বিশিষ্ট চরিত্রে নাম্‌ছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

বটু বাবুকে ধন্যবাদ! সেদিন সান্যাল মশাই রমেশের পাড়াগাঁয়ের যে সেট্‌ দেখালেন তা' সত্যাই সুন্দর। বাড়ী একেবারে আস্ত ইঁট দিয়ে গাঁথা হ'য়েছে—সেখানে গোয়াল ঢেঁকি ঘর, পায়রার খোপ মোট কথা পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে যা' যা' থাকে তার সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে; আর যেখানে এ বাড়ীর ভিত খোঁড়া হ'য়েছে তার আশে পাশের আবহাওয়ায় পাড়াগাঁয়ের সুন্দরভাব ফুটে উঠেছে। এখান থেকেই নাটকে উপক্রমণিকা। এই বাড়ীতে ডাকাত পড়ে নায়ক রমেশের "সোনার-সংসার" ছিন্ন ভিন্ন কোরে দেবে। আমরা এই দৃশ্যের পরিকল্পনার জন্যে ছবি দেখার আগেই আমাদের শুভেচ্ছা পরিকল্পকে জানাচ্ছি। আমরা শুনলাম, এই দৃশ্যটি ভালভাবে তোল্‌বার জন্যে চিত্রশিল্পী শৈলেন বসু ও শব্দযন্ত্রী নিগম পরিচালকের সঙ্গে বিশেষ যুক্তি পরামর্শ কোর্‌ছেন।

পরিচালক কারদারের "বাঘে সিপাহী" ও স্পেনটার পারস্য-চিত্র "লয়লা-মজনু" প্রায় শেষ হ'য়ে এল। ছবি দু'খানা সম্বন্ধে আমরা উচ্চ আশা পোষণ করি।

রাধা ফিল্ম

এদের "বিষবৃক্ষে"-র শুটিং সুরু হ'য়েছে। ফণি বর্ম্মা ছবিখানা পরিচালনা কোর্‌ছেন।

* * *

পরিচালক তড়িৎ বসু এতদিন পরে যে একটা সুযোগ পেলেন, তা'তে আমরা বিশেষ আনন্দিত হ'য়েছি। নরেশ সেনগুপ্তের "অভয়ের বিয়ে" দেবার জন্যে তিনি আপাততঃ মেয়ে খুঁজছেন—তাঁর এ ঘট্‌কালি সার্থক হক।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস্‌

এদের "রামকান্ত দালাল" প্রায় শেষ হ'য়ে এল। এর পরের ছবি "দিক্‌-ভুল" তোলার আয়োজন চলছে। "ঝড়ের যাত্রী" হবে এদের তিন নম্বর ছবি।

ডি-জি টকীজ

"দ্বীপান্তর" প্রায় শেষ হ'য়ে এল। ডি-জি আর তার সুযোগ্য সহকারীদ্বয় হরিশ বাঁড়ুয্যে ও শিবনাথ মুখুয্যে; ব্যবস্থাপক মণি কুণ্ডু তার সহকারী বিজয় বাঁড়ুয্যে; সঙ্গীত পরিচালক সত্যানন্দ দাস তার সহকারী শচীন রায়; নৃত্য-পরিচালক বোলেন দত্ত ও সম্পাদক বিনয় বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি এই ছবিখানা যা'তে চিত্ররাজ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি কোর্‌তে পারে তার জন্যে যে পরিশ্রম কোর্‌ছেন তা' সত্যাই অপূর্ব্ব! এদের সমবেত শক্তি জয়যুক্ত হ'ক এই আমাদের শুভেচ্ছা।

দেবদত্ত ফিল্মস্‌

গেল হপ্তায় বারাকপুরে আমরা দেবদত্ত ফিল্মসে গিছ্‌লাম। আফিসে গিয়ে দেখি কেউ নেই—সবারেরই চেয়ার খালি। ভাবলাম হয়ত' এতটা পথ তেল পুড়িয়ে আসাই আমাদের বৃথা হ'ল। ভাবছি চলে যাব, এমন সময় এক ভদ্রলোক আমাদের জিজ্ঞেস কোর্‌লেন "আপনাদের কাকে চাই?" আমি বল্‌লাম জ্যোতিষ বাবুকে। তিনি বল্‌লেন—"জ্যোতিষবাবু শুটিংএ—আপনারা আসুন না।" ষ্টুডিওর ভেতর ঢুকে দেখি সবাই ব্যস্ত। জ্যোতিষবাবু আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি আমাদের বস্‌বার ব্যবস্থা কোরে দিলেন। দেখলাম মস্ত বড় সেটে "রজনী"র শুটিং চল্‌ছে আর গীতা ঘোষ আলোর মালায় তাকে সুন্দরভাবে ভূষিত কোরেছেন। রবি রায় লবঙ্গ লতিকেকে (রেণুকা রায়) নিয়ে রঙ্গরস কোরছিলেন সেই দৃশ্যে। আশা করি, আমাদের গমনে তার কিছু ব্যাঘাত ঘটে নি।

প্লাজায় বাঙলা ছবি

চিত্রামোদীরা শুনে সুখী হবেন 'প্লাজা' প্রত্যেক রোববার সকালে এক এক খানা বাঙলা ছবি দেখানোর ব্যবস্থা কোরেছেন। গেল রোববার তারা "ভাগ্যচক্র" দেখিয়েছেন। আমরা শুন্‌লাম, ঐ দিন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের বহুলোক এই ছবি দেখবার জন্য 'প্লাজা'-য় জমায়েৎ হ'য়েছিলেন। আস্‌চে রোববার এখানে "চণ্ডীদাস" দেখানোর ব্যবস্থা হ'য়েছে। এদের নব-প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করুক, এই আমাদের একান্ত ইচ্ছে।

ভ্রম সংশোধন

গেল হপ্তার 'খেয়ালী"তে 'চিত্রার' নব নিযুক্ত সহকারী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষের নাম ভুলক্রমে কৃষ্ণ ঘোষ বলে বেড়িয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ৩নং শিবনারায়ণ দাস লেন থেকে শ্রীযুক্ত জ্যোতিন্দ্রমোহন ঘোষের সংশোধনী পত্রের জন্যে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিবিধ

অধ্যাপক গৌরীনাথ

পরমপ্রীতিভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয়ের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' বৃত্তিলাভে আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। একই পরিবারে দুই ভ্রাতা অশোকনাথ ও গৌরীনাথের অনুরূপ সম্মানলাভ তাঁহাদের বংশধারার বৈশিষ্ট্যকে শুধু অক্ষুণ্ণ রাখে নাই, অধিকতর মহিমামণ্ডিত করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদ

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের বিগত অধিবেশনে কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদ্ অন্যতম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আগামী সংখ্যায় আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট

গত ৪ঠা জুন সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় রঙমহলে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় ও নায়গড়াধিপতির সানুগ্রহ উপস্থিতিতে 'শিশির কুমার ইনষ্টিটিউটে'র উদ্যোগে একটী সাহায্য রজনীর অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে যে বিরাট ও রুচিপূর্ণ নৃত্য-গীতের জলসা ও সু-অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল তার জন্য ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

নিউ থিয়েটার্সের জনপ্রিয় সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীযুক্ত তিমির বরণ, শ্রীযুক্ত সাইগাল ও শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল, সঙ্গীত-সম্মিলনীর পরীক্ষোত্তীর্ণা কুমারী গীতা দাস গীতশ্রী, কুমারী রেণুকণা মোদক গীতশ্রী, কুমারী আরতি দাস ও বিশিষ্ট গুণী এনায়েৎ খাঁ ও শ্রীমান্ ভোম্বল এই বিচিত্র অনুষ্ঠানে স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করে দর্শকবৃন্দকে আশানুযায়ী তৃপ্তি দেন। ভারতবিশ্রুত সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনাধীনে এই বিচিত্রা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত মণি বর্দ্ধন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাসের অর্কেষ্ট্রা সহযোগে তাঁর পরিকল্পিত শিব-নৃত্য (হিন্দু) বৃহন্নলা-নৃত্য (বালী) ও গান্ধর্ব্ব নৃত্য (মণিপুরী) প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত মনি বর্দ্ধনের বৃহন্নলা নৃত্য পরিকল্পনা আমাদের চমৎকৃত করেছে এবং মনে হয় সঙ্গীতের আরও বেশী সহযোগিতা পেলে নৃত্য-নাট্য অধিক প্রস্ফুট হ'ত।

সেদিনের অনুষ্ঠানে আমাদের সবচেয়ে যা ভাল লেগেছে আর যা আমরা অনেকদিন মনে করে রাখব তা হ'চ্ছে 'শিশির কুমার ইনষ্টিটিউটে'র সভ্যগণ কর্ত্তৃক এঁদের সভ্যদ্বয় শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের লেখা নাটক "অতি আধুনিক" অভিনয়। এই অভিনয়ে পরিচালক মহাশয় ও শিল্পীগণ দ্বিতীয় দৃশ্যে (একটা রিহার্সাল দৃশ্যে) যে অভিনয় নৈপুণ্যের ও সংযমের পরিচয় দেখিয়েছেন তা সত্যই অনুকরণীয়। যদিও নাটকে স্থানে স্থানে রঙমহলে অভিনীত "কাজরী" ও নব নাট্যমন্দিরে অভিনীত "রীতিমত নাটকে"র ছাপ অল্প-বিস্তরভাবে এই নাট্য-প্রযোজনায় এসে পড়েছে তবু আমরা বলব এইরূপ নাট্যাভিনয় শুধু সৌখীনসম্প্রদায়ের নয়, যে কোন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শ্লাঘার বস্তু হ'ত।

খেলার মাঠে

সি, বি

গত ১লা জুন থেকে আই, এফ, এর পরিচালিত ফুটবল লীগের 'এ' ডিভিসন এবং 'বি' ডিভিসন লীগের রিটার্ণ খেলাগুলি সুরু হয়েছে। এবার লীগের গোড়া থেকেই এক রকম বৃষ্টি সুরু হয়েছে। সেই জন্য রিটার্ণ খেলাগুলির ফল এবং প্রথম খেলাগুলির ফল অধিকাংশ খেলার এক হবে বলেই মনে হয়। বৃষ্টি যে খেলাগুলির ফলের উপর প্রভাব বিস্তার করছে তা ক্যালকাটা বনাম ইষ্ট বেঙ্গলের খেলা থেকেই বিচার করা যেতে পারে। ইষ্ট বেঙ্গলের—ক্যালকাটার হারা কিছুতেই উচিৎ নয়। কিন্তু বৃষ্টির জন্য মাঠের অবস্থা খারাপ হওয়ার দরুণ ইষ্ট বেঙ্গল ক্যালকাটার কাছে ৪-১ গোলে হেরে গেছে। তবে এই রকম ফলের জন্য যে শুধু মাঠই দায়ী তা নয়। ইষ্ট বেঙ্গল খেলোয়াড়দেরও কতকাংশে দায়ী করা যেতে পারে। এই দিনে ইষ্ট বেঙ্গলের পক্ষে দুটি জুনিয়র খেলোয়াড় খেলেছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে আকতার হোসেন এবং পরেশ মুখার্জ্জী। তারপরেই মোহনবাগান বনাম এরিয়ান্স এবং কালীঘাট বনাম ই, বি, রেলএর খেলাগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। 'মোহনবাগান এবং এরিয়ান্স' খেলাটির বিশেষত্ব হচ্ছে যে 'এরিয়ান্স' ক্লাব সম্পূর্ণ শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও মোহনবাগান ৩ ০ গোলে জিতেছে! তার উপর আবার মোহনবাগানে দুটি নূতন খেলোয়াড় খেলেছিলেন। এখন অবধি এবৎসরে এইটাই মোহনবাগানের সব চেয়ে বড় জয়। কালীঘাট বনাম ই, বি, আর খেলাটির বিশেষত্ব হচ্ছে যে কালীঘাট প্রথম হাফেই ই, বি, আরকে তিনখানি গোল দেয়। আবার ই, বি, আর পাঁচ মিনিটের ভিতর দুখানি গোল শোধ দেয়। এই গোলগুলির জন্য কালীঘাটের 'ওড়িয়া' এবং ই, বি, আর এর সামাদ দায়ী। গত শুক্রবার ৫ই জুন ইষ্ট বেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং খেলাটি চ্যারিটী-ম্যাচ হয়েছিল। 'বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েসনের' সাহায্যের জন্য এই খেলাটি হয়েছিল। যদিও এবছর চ্যারিটী ম্যাচের সংখ্যা খুব বেশী হয়েছে তাহলেও আশানুরূপ জনসমাগম হয়েছিল। ইষ্ট বেঙ্গল ভাল খেলেও এক গোলে হেরে গেছে। মহমেডান স্পোর্টিংএর রহিম্ এই গোলটি দিয়াছিলেন। গত শনিবার মোহনবাগান বনাম ডালহাউসির লীগের প্রথম খেলায় মোহনবাগান এক গোলে হেরে গেছে। এই হারের জন্য দায়ী মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন সতু চৌধুরী এবং নূতন খেলোয়াড় নিশীথ মুখার্জ্জী। মোহনবাগানের এই পরাজয়ে সভ্যেরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছেন। গত সোমবার কালীঘাট দশজনে খুব ভাল খেলেও মহামেডান স্পোর্টিং-এর কাছে এক গোলে হেরে গেছে। কালীঘাট গোলরক্ষক সুবোধ ব্যানার্জ্জী দুটি পেনাল্টি কিক্ আটকাইয়াছেন।

অন্নপূর্ণার মন্দির

প্রভাতকিরণ বসুর "মহিয়সী মহিমা মোহিনী

নারী যতক্ষণ না নিজেকে ভাল করে বুঝে চলবার চেষ্টা করবে ততক্ষণ তার পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে বিলম্ব হবে; এবং তার বংশধারাও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে না, দেশের অকল্যাণও বেড়ে যাবে।

—শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে, বাহিরে ভগিনীরূপে—বৃহত্তর জগতের সম্মুখে বঙ্গমহিলারূপে নবদীপ্তিতে প্রকাশিত হোক এই বাঙলার নারী সমাজ! সার্থক হোক প্রভাতকিরণের বন্দনা গান—"মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার"।

—শ্রীদীপ্তি দেবী

"গতি" "অগ্র" হইলে দোষ নাই, "উগ্র" হইলে বা "অধো" হইলেই দোষ।

—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মল্লিক

অন্যায়কে অন্যায় বলে স্বীকারের সৎসাহস যাদের নেই, অপ্রীতিকর সত্যের আলোচনা শোনবার সহিষ্ণুতা যাদের নেই তারা বাদে বাঙ্গলাদেশের বিপুল জনসাধারণ আজ স্বীকার করবে প্রভাতকিরণ বাবুর প্রবন্ধটি জনমতেরই প্রতিধ্বনি।

—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র নারীর প্রতি আবেদনে ও নারীর একক চেষ্টায় নারী-সমস্যার সমাধান হইবে না।

—আমাদের কথা

ভুলপথে নারী-প্রগতির ধারা

শ্রীহেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাননীয় 'খেয়ালী' সম্পাদক মহাশয়—

আজ কিছুদিন যাবৎ আপনার পত্রে তালতলা সাহিত্য সম্মিলনীর মহিলা অধিবেশন সভায় পঠিত শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর "নারীধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হয়ে গেছে দেখলুম, এবং এখনও যে চলছে তাহাও দেখতে পারছি। যে প্রবন্ধের উপর নির্ভর করে এত ঝগড়া এত তর্ক-বিতর্ক চলছে, তাহার সমালোচনায় আমি স্পষ্ট করে কয়েকটি যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে চাই। আশা করি জনসাধারণের অবগতির জন্য আপনি আমার এই পত্রখানি আপনার কাগজে স্থান দেবেন।

তালতলা সাহিত্য সম্মিলনীর মহিলা অধিবেশন সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম এবং মহিলাদের প্রবন্ধ পাঠের পর প্রভাতকিরণ বাবুর "নারী ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধটিও মনোযোগ সহকারে শুনেছিলুম এবং সভার আবহাওয়ার দিকেও আমার যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। দেখেছিলাম দুই একটি তরুণ তরুণী বাদে সাহিত্য সভার সমুদায় পুরুষ ও মহিলা-দর্শক বিনা প্রতিবাদে প্রবন্ধটিকে সমর্থন করে নিলেন। উক্ত সভার জনসমষ্টির প্রবন্ধ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখে বুঝতে পেরেছিলুম প্রভাতবাবুর প্রবন্ধের যথেষ্ট মূল্য আছে। আজ আবার 'খেয়ালী' মারফত "নারীধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধটি নিজের কাছে পেয়ে এ সম্বন্ধে বিশেষ করে ভাববার অবকাশ পেয়েছি এবং তাহার ফলে দেখাতে চেষ্টা করব প্রবন্ধের সার অংশটুকু।

(শেষাংশ ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রগতি ও

শ্রীদীপ্তি দেবী

তালতলা ক'লকাতা সাহিত্য সম্মিলনের মহিলা দিবসে পঠিত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর প্রবন্ধ লইয়া 'খেয়ালি'তে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রবন্ধের মূলে অনেক সত্য তথ্য রহিয়াছে। 'নারী ধর্ম্ম' শুধু মহিলা সভাতেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই 'মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলা' রূপে 'খেয়ালি'তেও তুমুল আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছে—প্রতিবাদ অপেক্ষা সমর্থনই দেখিতেছি বেশী। প্রতিবাদের মূলেও অনেক সমর্থনই রহিয়াছে, কিন্তু যেহেতু মহিলা না হইয়া প্রভাতকিরণ মহিলার দোষ ত্রুটি ধরিয়াছেন, যেহেতু এটা বাংলা দেশ, পরাধীন জাতি, অকর্ম্মণ্য পুরুষ এখানকার অধিবাসী—অতএব নাকে সরিসার তৈল প্রদান করিয়া নিদ্রা যাও—স্তব 'গান গাহিয়া নারীর মন হরণ কর—ন্যাকা ন্যাকা অসার বাক্য সংযোজনায় আপনার সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ করিয়া সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্ধারণ কর এবং সকলের বড় কথা হইতেছে কি হইবে এসব ঝঞ্ঝাটে—গড্ডলিকা প্রবাহে অঙ্গ ভাসাইয়া দাও—প্রতিবাদকারীদের যুক্তি হইতেছে এই সব। উপাধ্যায় যুগল ভেংচী কর্ত্তনকল্পে যে দুইটি প্রবন্ধে প্রভাতকিরণের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং নিজেদের রস (?) নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তা অতি অসার—'এ যেন 'ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার'!

(শেষাংশ ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহিলার" প্রতিবাদ ও সমর্থনের পরিসমাপ্তি

"নারী-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি চিঠি

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মল্লিক

শ্রদ্ধেয় 'খেয়ালী' সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয় !

তালতলা সাহিত্য সম্মিলনীর মহিলা-শাখার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয় "নারী-ধর্ম্ম" নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে কিছু আমি বলিতে ইচ্ছা করি। যদিও গোড়াতেই জানাইতেছি যে আমি, লেখক, সমালোচক, সাহিত্যিক বা কবি নই।

(১) এরূপ প্রবন্ধ ওরূপ সভায় পাঠ করা আদৌ সমীচীন হয় নাই, কেননা সাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা উহাতে নাই।

(২) "মহিলা সভায় যে সকল পুরুষ উপস্থিত থাকেন, তাঁরা নারীর আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন"—প্রভাতবাবুর এই উক্তি আমি মোটেই সমর্থন করি না।

(৩) "পুরুষকে অবিশ্বাস নারীর মজ্জাগত"—প্রভাতবাবুর এই ধারণার মূল কোথায় পাইলেন? যদি কোন জাতি বা দেশের মেয়েদের কথা বলিতে হয়, তবে বাঙ্গলা দেশের ও বাঙ্গালি মেয়েরাই পুরুষকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে। এবং বিশ্বাস করে বলিয়াই পরাধীন বাঙ্গালির সব গিয়া যে টুকু সুখের লেশ আছে, তাহা তাহারা তাদের "গৃহ" হইতেই পায়। এইটুক যেদিন যাইবে, সেদিন বাঙ্গালির দুঃখের মাত্রা চতুঃগুণ বর্দ্ধিত হইবে। আর তা ছাড়া, আমরা কি এটা দেখিতে পাই না যে যেখানে অবিশ্বাস সেখানে দুর্গতি।

(শেষাংশ ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

চায়ের পেয়ালায় তুফান

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

কুক্ষনে কি শুভক্ষনে জানিনা শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয় বাঁশীটিকে ঘুরিয়ে ধরে লাঠি বানাতে গেছলেন। কবিতায় তাঁর মিষ্টিহাত, মিঠে মিঠে গল্প লেখেন, তাইতেই তাঁর খ্যাতি এবং তার জন্যেই তাঁর রচনার প্রতি প্রীতি আমাদের। সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা সহসা তাঁকে এতই ব্যথিত করে তুললো যে কাব্য হতে তিনি সাবধান-বাণী শোনালেন নারীকে, যেহেতু তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন "নারীজাগরণ ছাড়া জাতির মুক্তি নেই।" হিতকথা বলতে গিয়ে দিকে দিকে আচমকা এমন চাঞ্চল্য এলো যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া হয়েছিল!

তিনি মহিলা সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে প্রবন্ধ পড়েছেন "নারী ধর্ম্ম"—নারীর কল্যানের জন্যেই। জাতীয় জীবনের মহা উত্থান এবং পতনের দিনে নারী-স্বাধীনতার যুগে এই শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রয়োজন বুঝেই 'নারীর অমঙ্গলের দিক—নারীর ধ্বংশের পথ সরল করে তিনি একে দেখিয়ে দিলেন—এ পথ মরীচিকা!—

প্রথমেই তিনি বলেছেন, "মহিলা সভায় যে সব পুরুষ যোগদান করেন, নারীর আশা আকাঙ্খার প্রতি তাঁরা সহানুভূতি-সম্পন্ন, জাতিগঠনে নারীর দেহমনের উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অস্বীকার করেন না।" নারী যে নারীর বেশী শত্রু পুরুষের চেয়ে—প্রতিবাদকারীরা একথার সত্যতা অস্বীকার করতে পারেন নি। অস্বীকার করতে পারেননি

(শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আমাদের কথা

শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর প্রবন্ধ লইয়া গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া "খেয়ালী"তে নানা বাদ প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু সারা বাঙলার নয়, বাঙ্গলা হইতে বহুদূর নিউ দিল্লীর প্রবাসী বাঙ্গালীও এই বাদানুবাদে যোগদান করিয়াছেন। ইহা একদিকে যেমন "খেয়ালী"র জনপ্রিয়তা সূচিত করে তেমনি অন্যদিকে শিক্ষিত সাধারণের মন কিরূপ সজাগ হইয়াছে, সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহারা যে দিন দিন সচেতন হইতেছেন—ইহাও প্রমাণিত হয়। যাহা হউক, যাঁহারা এই বাদানুবাদে যোগদান করিয়া নারীধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনাকে প্রাণবান ও সচল করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

বাদানুবাদে যাঁহারা যোগদান করেন সাধারণতঃ তাঁহাদের মনে কিঞ্চিৎ উত্তাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই উত্তাপ প্রণোদিত মনোবৃত্তির ছায়া প্রত্যেকের ভাষায় কিছু না কিছু রেখাপাত করিয়াছে। এমন কি স্বয়ং অনিলবাবু প্রভাতবাবুর প্রতিপক্ষদের ভাষায় ও ভাবের অভিব্যক্তির ভঙ্গীতে যে দোষ ত্রুটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নিজের প্রবন্ধেও যে সেই দোষ ত্রুটী বর্ত্তমান তাহা বোধহয় লক্ষ্যই করেন নাই। এ যেন, যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইবার চেষ্টা তাহার মধ্যেই ভূত প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছে! ফলে, নারী-ধর্ম্মের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রে প্রভাত ধর্ম্মের আলোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অর্থাৎ, শেষ পর্য্যন্ত প্রভাতকিরণ হারিলেন কি জিতিলেন এই লইয়াই উভয়

(শেষাংশ ২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভুলপথে নারী-প্রগতির ধারা

= শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় =

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

'খেয়ালী'তে সমালোচনা যা হচ্ছে তাতে দেখতে পাই ন্যায্য কথার চেয়ে পত্র-প্রেরকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবই বেশী।

নারী যতক্ষণ না নিজেকে ভাল করে বুঝে চলবার চেষ্টা করবে ততক্ষণ তার পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে বিলম্ব হবে, এবং তার বংশধারাও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে না, দেশের অকল্যাণও বেড়ে যাবে।

প্রভাতবাবুর সঙ্গে আমরাও নারী জাগরণ প্রার্থনা করি, কামনা করি, কারণ সত্যই তাহা ছাড়া জাতির মুক্তি নাই, তাই নারীকে সরিয়ে ফেলতে হবে বর্ত্তমান নারী প্রগতির ভুল পথের জমাট অন্ধকার, গড়ে নিতে হবে তাকে দেশের কল্যাণে মুক্তির আহ্বানে মহিয়সী শক্তি। গৃহের অন্তরাল থেকে অঙ্গুলি হেলনে পুরুষকে দেখিয়ে দিতে হবে তার জয়যাত্রার পথ, তাকে সাহস দিয়ে কতক তেজে কতক নম্রতায় পুরুষের সাথে থেকে তাকে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করে, করে নিতে হবে সংসারের শান্তিময় পথ প্রশস্ত, তাকেই ত বলি নারীর ধর্ম্ম।

প্রভাতবাবু বলেছেন "পুরুষের শ্রদ্ধা বিগলিত গৃহ প্রাঙ্গনে হারান শ্রী ও মহিমা ফিরিয়ে আনতে—নারীকে নিতে হবে নূতন ও পুরাতনের যা কিছু ভালো"। এটা ত খুবই সত্য ও সরল কথা, অতীত যুগের সতী-সাবিত্রীর চরিত্র দিয়ে আজিকার আধুনিক নারী জগতের ভালর অংশটুকু গ্রহণ করে সুসন্তানের জননী হয়ে স্বামীকে সৎপথের সন্ধান দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে দেশের আবহাওয়াকে কল্যাণকর করে। এ কথা ত ভোলবার নয়—

"আঁধারে দেশকে পথ দেখাবে গো
তোমারি ভগ্নচুড়ী।"

নারী-প্রগতি ও প্রভাতকিরণ

= শ্রীদীপ্তি দেবী =

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রভাতকিরণ কি বলিয়াছেন এবং যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য কিনা তাহা না বলিয়া নিজের কথাতেই পঞ্চমুখ! প্রভাত কিরণ তাঁহার প্রবন্ধে কখনও বলেন নাই আজকাল কার পুরুষরা আদর্শ! তাহাদেরও যে কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছেনা, তাহারাও যে প্রকৃত পক্ষে সমাজের কোন উপকারে আসিতেছে না—তাহারা যে প্রকৃত মানুষ হইতেছেনা—ইহা লইয়া তিনি যথেষ্ট আক্ষেপ করিয়াছেন। যে তিন শ্রেণীর নারী চরিত্রের প্রতি তিনি কটাক্ষ করিয়াছেন সেই তিন সম শ্রেণীর পুরুষের চরিত্র লইয়াও তিনি শ্লেষ করিতে ছাড়েন নাই। উভয়েই প্রভাত বাবুর নিরপেক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "বড়লোকই রইল তো ঝিয়ের কোল থেকে চাকরের কোল, চাকরের কোল থেকে মোটর কার—নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলনা। কোন রকমে হোঁচট্ খেয়ে লেখা পড়া শেষ করে গেল, মুরুব্বির জোরে কাজও হয়ত পেলে, কিন্তু ইউরোপীয় কিম্বা ইহুদি বান্ধবী আর শেরী কিংবা স্যাম্পেন গোল্ড ফ্লেকের ফাঁকে ফাঁকে চাই-ই।"

মধ্যবিত্ত ছেলেরা "সাধারণ ভাবে সুখে দুঃখে মানুষ হয়, ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার হয়। কিন্তু তাদের আদর্শ হল রোমান্স; 'লভ ইন্ ফাষ্ট সাইট', ছাত্র-ছাত্রী সম্মিলন, জলসা হৈ হৈ।" তারপর গরীব—"তাদের ছেলেদের লেখা পড়া হয়না, বিড়ি ফুঁকে ছাতার দোকানে কাজ করে। বায়স্কোপের চার আনার টিকিট ছয় আনায় বেচে।" আধুনিক সমাজের কি পুরুষ কি নারীর—উন্নতি যে হইয়াছে সে কথা প্রভাত কিরণ অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু এই উন্নত-ধারার সহিত অবনতি এবং ঘোর অবনতিও যে সমাজের মধ্যে দুষ্টব্রনের মত কত অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার জন্য—আমাদের আর একদিকে যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহারই ভীষণ পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া চিন্তাশীল প্রভাতকিরণ এই প্রবন্ধে নির্ম্মম কষাঘাত চালাইয়াছেন। অনেকে ইহার জন্য ব্যথা পাইয়াছেন—অনেক কঠোর কথায় অনেকে তাহার জন্য প্রভাত কিরণকে নিন্দাবাদ করিয়াছেন কিন্তু একটু গভীর ভাবে ভাবিলেই তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন যে ইহা প্রভাত কিরণের ব্যক্তিগত আক্রোশ নয় যে ইহা "নিজের বন্ধু বান্ধবের (বান্ধবীরাও) কাছে বল্লেই হয়"—ইহা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক প্রব্লেম এবং ইহা সত্যই সমাজের উপকারার্থে রচিত। উপাধ্যায় যুগল পাতার পর পাতা ভরিয়া—নারীর পক্ষে সাফাই গাহিবার জন্য ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়াছেন। এরূপ না করিয়া তাঁহারা যদি নারী প্রগতির আদর্শের দিক লইয়া আলোচনা করিতেন তাহা হইলে প্রভাত কিরণের এই প্রবন্ধের পর নারী সমাজের কিছু উপকার করা হইত এবং তাহাদের সমর্থনকল্পে—আমরাই পুনরায় কলম ধরিতাম। তাহা না করিয়া হিন্দুনারী-সমাজকে জয়ন্ত উপাধ্যায় চরম উপদেশ দিলেন—"অসভ্যদের সাদা চোখে পছন্দ করিবে কোন্ কাণ্ডজ্ঞান হীনা? অহিন্দু সমাজে চলিবার ফিরিবার বেশী স্বাধীনতা আছে, আর আছে খানিকটা আর্থিক স্বাধীনতা। অহিন্দুকে অভিলাষ করিলেও বা কি অন্যায়?" হিন্দু নারী—সেবা যাহাদের আদর্শ, মা-বাপ, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী, দেবর, পুত্র, কন্যা পরিপূর্ণ বাঙ্গালীর তথা হিন্দু পরিবারের আদর্শ সংসারের যে সুখ যে শান্তি,—উপাধ্যায়ের মতে হইল তাহা সঙ্কীর্ণতা। দেহের বিলাসে—টয়লেটের শ্রাদ্ধ—রুজ-লিপষ্টিক, হাত কাটা জামা,

ফাঁপানো চুল—জাপানী সিল্ক-বস্ত্র এবং স্যাণ্ডেল কিম্বা হাই-হিল জুতা, মুখে কায়দা দুরস্ত ইংরাজী বুলি, লেকে ডুব দেওয়া, অসবর্ণ বিবাহ, অহিন্দু প্রেমিক ইহাই কি উপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কেবল উদারতা? তাঁহার এ উদার মত তাঁহারই গৃহে সীমাবদ্ধ থাকুক্। এগুলি কাগজে-কলমে প্রকাশ করিলেই কেমন বিসদৃশ ঠেকে (হইতে পারে ইহা আমাদের সঙ্কীর্ণতা)।

পরিশেষে আমার বক্তব্য প্রভাত কিরণের 'মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলা' প্রকৃতই অনবদ্য প্রবন্ধ হইয়াছে, আমরা তাঁহার কবি দৃষ্টিকে প্রশংসা করি! বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী মায়েদের হাতে এবং সেই মাতৃজাতিই হইতেছে—"বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ।" তাহারা চৌরঙ্গীর ফিরিঙ্গী মেম নয়। গৃহের অঙ্গনে স্ত্রীরূপে—মাতৃরূপে বাহিরে ভগিনীরূপে—বৃহত্তর জগতের সম্মুখে বঙ্গমহিলারূপে নবদীপ্তিতে প্রকাশিত হোক্ এই বাঙলার নারী সমাজ! সার্থক হোক্ প্রভাত কিরণের—বন্দনা গান——'মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।'

"নারী-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি চিঠি

= শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মল্লিক =

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

(৪) "বাপের বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ীর কুটুম্ব ও প্রতিবেশিনীরা নারীর লজ্জা ও চরিত্র আলোচনায় ও নারীর দুর্গতির কারণ হতে নারীর যত উৎসাহ পুরুষের তত নাই"—প্রভাতবাবুর এই উক্তিতে কতকটা সত্য আছে বটে, কিন্তু দায়ী দুজনেই পুরুষ ও স্ত্রী সমানভাবে।

"বিবাহে নারীকে বাধা করিতে, বিধবার দুর্দ্দশা বাড়াইতে, জনসেবার কর্ম্মক্ষেত্রে নারীকে প্রবঞ্চিত ও উৎসাহিত করতে প্রগতিকে অধোগতিতে পরিণত করতে নারীর উন্নতির পথে বাধা দিতে"—পুরুষ ও নারী দুজনেই সমভাবেই দায়ী, তবে ক্ষেত্র বিশেষে বেশী ও কম। ইহার প্রতিকার করা খুবই দরকার এবং ইহা আমাদের সমাজের কলঙ্ক কিন্তু শুধু নারীকে দোষ দিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না।

(৫) "নারীর বিদ্যা বিস্তার, কলাশিক্ষা, অর্থোপার্জ্জন, প্রসাধন, বেশ-বিন্যাস রূপ-বর্দ্ধনে, খেলায়, ব্যায়ামে, স্বচ্ছন্দ ভ্রমণে, স্বাস্থ্য রক্ষায়, শুশ্রূষায় নারীকে পুরুষ বেশী সুযোগ দিয়াছে"—ইহা সত্য কথা এবং আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পুরুষ ও নারী যেভাবে জড়িত (ভগবানের বিধানে) তাহাতে ইহা ছাড়া অন্য কি সম্ভব হইতে পারে?

(৬) "নারী দিয়াছে শুধু অপবাদ, ঈর্ষা ও কুৎসাপঙ্কিল অনুৎসাহ"—প্রভাতবাবুর এরূপ কটুক্তির মানে হয় না। ইহা এত ভ্রমাত্মক ও বিদ্বেষমূলক, যে ইহার প্রতিবাদ দরকার করে না।

(৭) বাংলা দেশের মেয়েদের প্রভাত বাবু তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন:—

(ক) "বড় লোকের মেয়ে"—"বেলাতে ঘুম থেকে উঠা, কাপড় নিজে না কাচা, বালিসের তলা হইতে হার লইয়া গলায় দিয়া প্রসাধন করা, চায়ের টেবিলে চা খাওয়া, আধঘণ্টা ধরিয়া স্নান, অনেক রকম তরকারি দিয়া খাওয়া, দিবানিদ্রা, বিকেলে সাজসজ্জা, তারপর হয় মোটরে বেড়ান না হয় এ-ঘর ও-ঘর করা, সোফায় এলিয়ে পড়া, দাদার বন্ধু এলে কৃত্রিম সুরে কথা, গরীব আত্মীয়কে চিনিতে না পারা, একটা মাংসের কোর্ম্মা রেঁধে বাহাদুরি নেওয়া, ছেলেদের ঝি চাকরের কাছে ছেড়ে দেওয়া, তারপর বিলাত পাঠান, মুরুব্বী ধোরে চাকরী, পরে স্যাম্পেন গোল্ড ফ্লেক ইত্যাদি"—প্রভাত বাবুর বড়লোকের মেয়েদের সম্বন্ধে এই ধারণা কি করে হল? আমার ত মনে হয় এরূপ বাড়ী খুব কম। হাতের আঙ্গুলে গোনা যায় এরূপ ২।৪টি আছে বটে এবং সেই হিসেবে প্রভাতবাবুর উক্তি আংশিক ঠিক হলেও, আমি নিজে অনেক বড়লোকের বাড়ীর মেয়েদের জানি যাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ উক্তি নিছক মিথ্যা। আসল কথা হচ্ছে এই, বাঙ্গালি হিন্দুকে প্রথম হিন্দু হইতে হইবে। ধর্ম্ম যেখানে নাই, সেখানে যথেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করবেই, কি বড় লোকের, কি গরীবের ঘরে। আমাদের সমাজের যাহারা উন্নতি চান, তাহাদের প্রথমেই এই জিনিষটা বোঝা উচিত। কি

পুরুষ, কি স্ত্রী, প্রত্যেককেই মানুষ হইতে হইবে। মানুষ না হইয়া লাফাইলেই অন্য পশুবাচ্য হইতে হইবে।

(খ) "মধ্যবিত্তমেয়েদের সম্বন্ধে প্রভাত বাবু লিখিয়াছেন যে তারা লেখাপড়া করে, সস্তায় বিয়ের জন্য। গান, যন্ত্রবাদ্য, সাঁতার, সাইকেল, হাইজাম্প ও নৃত্য নিয়ে বেহমন চঞ্চল করে। ধুয়া ধরে বিয়ে করব না, কিন্তু আজ বিয়ে হলে, কালকের জন্য অপেক্ষা করে না। পছন্দ নিজেরা করে এবং এমন লোককে, যে যার সঙ্গে বিয়েতে অনেক বাধা —অসবর্ণ, সিলোনিস, সিন্ধি ও অহিন্দু বেশী পছন্দ"। এরূপ উক্তি হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি ঘরের মেয়ের সম্বন্ধে উনি কোথা হইতে পেলেন ?

নিছক কল্পনা লইয়া, কবির বড়াই করিয়া এরূপ লেখা ঠিক হয় নাই। হিন্দু মধ্যবিত্ত মেয়েরা লেখাপড়া প্রভৃতি শিখলেও, সৎ, স্বাস্থ্যবান, সুরূপ, হিন্দু বাঙ্গালী প্রেমিক স্বামীই তাহারা চায়। হয়ত কোন অহিন্দু ও অধার্ম্মিক ঘরের কাণ্ড দেখিয়া প্রভাত-বাবুর মাথা বিগড়াইয়াছে।

(গ) গরীব ঘরের মেয়েদের সম্বন্ধে যা লিখিয়াছেন তাহা অনেকটা সত্য। দুঃখ, কষ্ট অনেক তাহাদের সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তার মধ্যেও যদি সৎ স্বামী পায়, তা হলে সুখে দুঃখে তারা একপ্রকার কাটিয়ে দেয়। আর তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা ভাল দিতে হইলে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক হওয়া দরকার।

(৮) প্রভাতবাবু ওটী ঠিকই বলিয়াছেন যে "সেই শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা, যাহা নারীকে মানুষ করিয়া তোলে এবং নারীত্বের মহিমা বজায় রাখায়। এবং পরে তাঁহারাই সুসন্তানের জননী হইয়া দেশের ও দশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারেন। নারীকে নিতে হবে বিবেকের সহিত সুবিচার করিয়া পুরাতনের ও নূতনের যাহা ভাল।

(৯) উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে মেয়েদের স্বাধীনভাবে বেড়ানোয় দোষ হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে বেড়ান ও মেলা-মেশার সম্বন্ধে মারহাট্টি মেয়েদের মতন যদি তারা চলে, তাহা হইলে সুশোভন হয়। আমি মহারাষ্ট্র দেশে গিয়া দেখিয়াছি তাঁহারা কিরূপ কার্য্যকুশল। মারহাট্টি মেয়েরা সংসারের সকল কাজ করেন, পুত্রকন্যাও লালন পালন করেন, উপরন্তু দরকার হইলে বাহিরের কাজও সুশৃঙ্খলার সহিত করিয়া থাকেন। বিনা দ্বিধায়, আড়ম্বরহীন সজ্জায়, স্বচ্ছন্দগতিতে তাঁহারা এমনভাবে চলা ফেরা করেন যে দেখিলে আপনা হইতেই পুরুষ বা নারী উভয়ের মনে কুভাব না জাগিয়া সম্ভ্রম আসে।

(১০) মেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে এটা ঠিক যে আগেকার মতন একবারে মূর্খ থাকিলে চলিবে না। তবে যে সকলকেই উপাধিধারী হইতে হইবে এমন কিছু কথা নেই। হয়ত, কতক মেয়েদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা ও অর্থকরী শিক্ষার দরকার আছে।

(১১) শুধু বাসে বা ট্রামে চড়িলে বা রাস্তায় হাঁটিয়া চলিলে যে কোন দোষ হয় তাহা আমার মনে হয় না, তবে অনুরূপ সাজসজ্জা হওয়া দরকার। মোটরে চড়ার পোষাক ও বাসে ট্রামে চড়ার পোষাক এক হওয়া উচিত নয়। এবং চলা ফেরা সম্বন্ধেও সেইরূপ সতর্কশীলতা থাকা দরকার।

(১২) আর দেশের ও বাঙ্গালির বিশেষতঃ তাদের অন্দরের ক্ষতি যদি কেউ করে থাকে ত কতগুলি ছাগ-সাহিত্য ও সেই সকলের রচয়িতা ছাগ-সাহিত্যিক এবং আপত্তিকর সিনেমার ছবি। অবশ্য ভাল সাহিত্য, ভাল থিয়েটার ও সিনেমা দোষের নয়।

"গতি" "অগ্র" হইলে দোষ নাই, "উগ্র হইলে বা "অধো" হইলেই দোষ।

চায়ের পেয়ালায় তুফান

= অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য =

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তাঁর বর্ণিত তিন শ্রেণীর মেয়েরই প্রাদুর্ভাব, এবং ঐ ঐ টাইপের মেয়েদের কার্য্যকলাপ হুবহু ঐ ঐ ধরণেরই। খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কথা যে সত্য এটা কেহই অস্বীকার করতে না পেরেও কয়েকজন (যদিও সমর্থকদের তুলনায় সংখ্যায় কম) মূল প্রবন্ধটি গালা-গালি দেবার অনুপাতে সাজিয়ে নিয়ে 'নরম গরম বোলচাল' দিয়ে খুব একহাত নেওয়া হচ্ছে মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। সস্তা হাততালি পাবার লোভও এঁদের ষোল আনা। বলতে গেলে এঁরা সকলেই আবার নিজেদের অজ্ঞাতসারে প্রভাতবাবুকেই ভীষণ সমর্থন করেছেন। আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা দেখুন :—

প্রথমে এলেন শ্রীশান্তিরাম উপাধ্যায়— "যিনি নাকি শক্তিশালী তরুণ লেখক।" কিন্তু এ নাম অশ্রুতপূর্ব্ব। প্রাতঃস্মরণীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পর আর কোন উপাধ্যায় সাহিত্য ক্ষেত্রে আসর জমাতে পারেন নি, শ্রীশান্তিরাম ও শ্রীকান্ত উপাধ্যায় আবির্ভূত

হয়েই একদিন প্রভাতে হয়ত প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন। তবে ছদ্মনামের অন্তরালে যদি কোন লেখক আত্মগোপন করে থাকেন সেটাও সাহসের অভাবই বলতে হবে—বাদ প্রতিবাদের সময় পর্দা শোভা পায়না। প্রভাতকিরণের প্রবন্ধে অযৌক্তিকতা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি অনেক গাল-ভরা বাজে কথার পর যেখানে কাজের কথা এনেছেন সেখানে বলছেন—"লেখক নারীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেখিয়েছেন, প্রত্যেক মেয়েই অপদার্থ, অলস, বিলাসিনী সমাজ-বিধ্বংশকারিনী, বকাটেপুত্র প্রসবকারিনী। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাংলার পুরুষগুলোকেও কি এমনি ধারা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না? আর তারাই কি সব আদর্শ জীবন যাপন করছে? এদেশে যেমন দেবা তেম্‌নি দেবী।

পশ্চিমের প্রগতির হাওয়া এদেশে ঢুকেছে। কিন্তু পরাধীনতার প্রবল প্রাচীরে আমাদের সমাজ-মনের একটা দিক্ সম্পূর্ণ রুদ্ধ—তাই সব ভালো এখানে বিষিয়ে ওঠে, তাই প্রকৃত শিক্ষা নেই, জাতি গঠন নেই। তাই ছেলেরাও এখানে দুঃশিক্ষিত, অপটু, অসমর্থ, ক্লীব; মেয়েরাও তাই উন্মার্গগামিনী।"

পাঠক এবার প্রভাতবাবুর প্রবন্ধে দেখুন:— "অকালকুষ্মণ্ডেয় দেশ গেছে ভ'রে, অবিনয়ী, উদ্ধত, চরিত্রহীনের অত্যাচারে সমাজের শান্তি ও সম্পদ্ হয়েছে বিপন্ন, এ দোষ কার? দেশের মেয়েদের।" সুতরাং শান্তিরাম বাবু প্রভাতবাবুকে প্রতিবাদ করে তাঁকেই সায় দিয়ে গেলেন এবং শেষ কথা বলে গেলেন—"নারী প্রগতিতে বাইরের জীবনে অনেক বিশৃঙ্খলা এসেছে স্বীকার করি।" স্বীকার যখন করেছেন তখন আমাদের কোন ক্ষোভ নেই। তারপর এলেন—শ্রীভবেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রভাত বাবুর অভিযোগ "বিলদৃশ কটাক্ষপাত" সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "এ ব্যাপারটা রুচিগত ও অভ্যাসগত।" প্রভাত বাবুর বক্তব্য "নারীর পরম শত্রু নারী নিজে" সম্বন্ধে—"ইহা অস্বাভাবিক নহে।" "তিন শ্রেণীর মেয়ে" সম্বন্ধে "অন্যদেশেও তিন শ্রেণীর মেয়ে আছে।" "বড় লোকের মেয়েদের" সম্বন্ধে "ইহাতে মেয়েদের দোষ কি?" মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধে—ইহাও সত্য যে পনের আনা তিনপাই বরেরা সত্যই পুরুষ হওয়ার অযোগ্য" এবং গরীবদের সম্বন্ধে "অভিযোগ না হইয়া মর্ম্মন্তুদ সত্যকথা হইয়াছে।" মোটকথা সবই তাঁর "সত্যকথা!"

তারপরে এলেন শ্রীজয়ন্ত উপাধ্যায় হারে-রে-রে-রে-রে করতে করতে সুর ভেজে "কত কেরামৎ জানো রে"—বাস্ থমকে গেছেন। আমরা শেষ করে দিই—

কত কেরামৎ জানো রে বন্ধু
কত কেরামৎ জানো!
শিবের গীত যে ধরেছো ভায়া
ধানটি যখন ভানো!

ছদ্মনামে ছদ্মনামে ধুল পরিমান! ইনি নাকি আগের উপাধ্যায়ের জ্ঞাতি! মাস্তুতো ভাই নয় তো? তিনি সুরু করেছেন "ভারতবর্ষের মেয়েজাতির প্রগতির মধ্যে বহু খুঁত আছে, বহু অসম্পূর্ণতা আছে, বহু বহু ত্রুটি আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?" বড় লোকের মেয়ের সম্বন্ধে লিখেছেন—"আমরা চাই......মেয়েকে দিয়ে স্যাণ্ডেল না গলিয়ে ......চায়ের টেবিলে গিয়ে...... ন্যাকা ন্যাকা কথা আর গল্প বলাইতে। নহিলে মেয়ের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য থাকিত জীবন ভোর ন্যাকামো করিয়া চলিতে?" এখানে লেখককে একটু ছড়া কেটে শোনাই—"ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, বারোটাকা দিয়ে তেরটাকা লয়।"

মধ্যবিত্ত মেয়েদের অহিন্দু অনুরাগের প্রতিবাদ করেই আবার বলছেন—"অহিন্দুকে অভিলাষ করিলেও বা কি অন্যায়?" এবং অহিন্দু সমাজে চলিবার ফিরিবার বেশী স্বাধীনতা আছে, আর আছে খানিকটা আর্থিক স্বাধীনতা।" "আমাদের ভাতকাপড়ের দাসী "মহিয়সী মোহিনী মহিলা" যতই না কেন আমাদের মুগ্ধ চোখে লুব্ধ দৃষ্টির সাম্‌নে দিয়া স্যাণ্ডাল গুঞ্জরিয়া অতুল অঞ্চলে উদ্দাম চঞ্চলা হইয়া ট্রামে বাসে ভ্রমণ করুন—"পাঠক লক্ষ করুন প্রভাতকিরণবাবু এতটা কড়া কথা বলেন নি। তাঁর লেখায় সংযম ছিল।

শ্রীকল্যানী সেনগুপ্তা সব সমর্থন করে প্রভাতবাবুর পুরুষের প্রতি নারীর বিশ্বাস হারানোর প্রতিবাদ করেছেন—"নারীজাতি পুরুষকে বিশ্বাস করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এর জন্যে কিন্তু নারী দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে পুরুষ"। মোটকথা সকলেই প্রভাত বাবুর সব কথার সত্যতা স্বীকার করেছেন; করে দেখাতে গেছেন কেন এমন হচ্ছে—কারণটা কি? কিন্তু কারণগুলো জানাবার আমন্ত্রন জানানো হয়নি। প্রভাতবাবু যা বলেছেন তারমধ্যে অসত্য কিছু আছে কিনা এইটাই আমাদের আলোচ্য। অসত্য যে কিছু নেই তা প্রতিপক্ষের আলোচনাতেই প্রকাশ।

এইবার প্রতিবাদকারাদের অযৌক্তিকতা কিছুটা দেখাই (পরিপূর্ণ ভাবে দেখাতে গেলে আমার প্রবন্ধের আকারের কথা স্মরণ

করে ক্ষান্ত দিলুম)। শ্রীশান্তিরাম অশান্ত সুরে অভিযোগ এনেছেন—"সমাজ বিপ্লবের দিনে সহসা একটা মত প্রকাশ করা অবিবেচকের কাজ।" ও, বিপ্লবের সময় চুপচাপ থেকে শান্তির সময় চ্যাঁচাতে হবে এই শ্রীযুক্ত শান্তিরামের মত! আগুন যখন ধরলো, তখন কিছু বলোনা, সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক্ তারপর সাবধানবাণী উচ্চারণ কোর! তোফা! তাঁর মত তাঁরই থাকুক।

উপমাগুলিও খাসা!

জীবন্ত ঘোড়ার ছোটার উপমা তিনি দিয়েছেন, দুরন্ত ঘোড়ার ক্ষেপে যাওয়ার উপমা দেননি। প্রভাতবাবুর প্রবন্ধের ভাষা "কলকাতার রাস্তায় হঠাৎ জলজমার মতো"। উপাধ্যায় মশায়ের ভাষা যে ধাপার মাঠ ধীরে ধীরে ভরাট হওয়ার 'মতো!' সেখানে তো সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নেই, সমস্তটাই তাঁর কাছে যা 'সার,' অন্যের কাছে তাই অসার—জঞ্জালে ভর্ত্তি।

"প্রগতির ধারা অতি প্রাচীনতা থেকে অতি আধুনিকতায়" ক্রম রেখে আসে নি, হঠাৎই এসেছে এবং তার কারণ কোলকাতা শহরে পল্লীগ্রামের হঠাৎ আবির্ভাব!

পত্রলেখক প্রভাতবাবুকে একটি বেশ ভালো মেয়ের বর্ণনা দয়া করে দিতে বলেছেন এবং প্রগতিশীলাদের একটি মেয়েও তাঁর মনে রমণীয় প্রসন্ন চরিত্রের ছাপ দিয়ে যায় নি কি—এই প্রশ্ন করেছেন। নিজের পরিবারের বাইরে মেয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপই হয় নি, এমন সন্দেহও তিনি করেছেন। কবি চরিত্রে এমন অঘটন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু গুটিকয়েক ভালো মেয়ে দেখাও অসম্ভব নয়, তাই বলেই দুর্গত নারী প্রগতির সমালোচনা করতে পারবেন না এমনই বা কি? গুটি কয়েক মোটা মাইনের চাকুরে দেশে আছে বলেই বিপুল সংখ্যা লোকের বেকার সমস্যার আলোচনা চলতে পারবে না? দেশবন্ধুকে যে দেখেছে সে স্বীকার করবে সমস্ত দেশটাই দেশবন্ধুতে ভরা? এ বড় অদ্ভুত প্রশ্ন!

হিউমারের মধ্য দিয়ে যে সমস্যা প্রভাতবাবু আমাদের সামনে ধরেছেন তা যেমনি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তাঁর দরদী মনের পরিচয়জ্ঞাপক। গভীরভাবে এ তথ্যটাকে ভেবেছেন বলে অভিজ্ঞতা-লব্ধ facts and figures তাঁর করতলগত বলে কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে কারুর অপ্রীতিভাজন হওয়ার ভয় না রেখে ঠিক জায়গায় ঠিক কথাই (right words in right place) তিনি উচ্চারণ করেছেন তেজের সঙ্গে—অস্পষ্টতার লেশমাত্র না রেখে; যে সব কথা দীর্ঘদিন ধরে অশান্তক্ষুব্ধ জনগণের মধ্যে (পুরুষ ও নারী) অন্তরালে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিলো তিনি তাই-ই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে দিলেন দিকে দিকে। একটা বৃহৎ জায়গায় আড়ম্বরের সহিত এই যে মূল্যবান বক্তৃতা, সহানুভূতিসম্পন্ন কবির মুখে এই যে তীক্ষ্ণ তীব্র সাবধান বানী এর প্রয়োজনীয়তা যদি আমরা অস্বীকার করি তবে সেটা ভাবের ঘরেই চুরি করা হবে। প্রবন্ধটিতে কি নেই তা নিয়ে আক্ষেপ করে ফল নেই, যা আছে তাই বহু জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। এতে পাক-প্রণালী ও টোট্‌কার কথা নেই; অতএব এ প্রবন্ধ অবহেলার যোগ্য এই মনে করে ঈর্ষাকাতর সংখ্যালঘিষ্ঠ দল মনে সান্ত্বনা পেতে পারেন, কিন্তু সমাজের কল্যাণকামী নারী ও পুরুষ মাত্রই সচেতন হয়ে চিন্তা করতে সুরু করবেন, দেশের ছেলেরা বিপুল সংখ্যায় অমানুষ হচ্ছে তার কারণ মাতৃজাতি শিক্ষায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে না এবং নিন্দিত প্রগতির মন্দদিকের বন্যাস্রোত বন্ধ করতে হলে সাবেক ও আধুনিকের যা কিছু ভালো আহার, বিহার, পরিচ্ছদ, শিক্ষা ইত্যাদিতে তারই প্রবর্ত্তন করলে কুসংস্কার এবং দুর্ব্বুদ্ধির বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া হবে—সমস্ত দেশের বিপদ ঘুচে গিয়ে উন্নতির ভাগীরথীর স্বচ্ছতা তখন প্রকাশ পাবে দুই তীরের জনাকীর্ণ ভূখণ্ড শস্যশান্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

কথাটি পুরাতন; কিন্তু কিছু নূতনত্ব না থাকলে প্রতিবাদকারীদের এত উষ্মা কেন? "যুগধর্ম্মকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না" একথা প্রভাতবাবু অস্বীকার করেছেন প্রবন্ধে এমন পরিচয় নেই; তিনি কেবল যুগধর্ম্মের অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তিনি অকৃতকার্য্য হলেও ক্ষতি নেই। বাসে ট্রামে পথে ঘাটে নারীশিক্ষা পরিষদগুলিতে ও দেশে-বিদেশে গৃহস্থালিতে তাঁর ছোট প্রবন্ধটি তুমুল আন্দোলন জাগিয়েছে—তার প্রমাণ আমরা প্রতিদিনই পাচ্ছি। প্রভাত বাবুর প্রতি স্তুতিবাদ ও গালিবর্ষণ অশ্রান্ত ভাবেই চলুক, কিন্তু সভায় তাঁর সমর্থনকারী অসংখ্য লোকের সমর্থনে এই প্রমাণ হয়ে গেছে যে তিনি যা বলেছেন তা জনমত (public opinion)।

শ্রীমতী প্রতিমা রায়, শ্রীমতী নীলিমা মিত্র, শ্রীমতী কল্যানী সেনগুপ্তা মহিলাদের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন—শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরকম প্রবন্ধের প্রয়োজন আছে—বর্ত্তমানকালের আবহাওয়ায়। শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ চন্দ ও শ্রীযুক্ত বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝিয়েছেন প্রভাতবাবুর কথাগুলি যুগোপযোগী ও মূল্যবান। সূর্য্যকে দেখতে গেলে প্রদীপের প্রয়োজন হয়না, মুদ্রিত প্রবন্ধ চোখের সামনে রেখে যে কোন নিরপেক্ষ লোক মত প্রকাশ করবে—"নারীধর্ম্মে" অযৌক্তিকতা কিছুই নেই। একটি প্রবন্ধ নিয়ে এত হৈ চৈ বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে সম্প্রতি কমই হয়েছে। অথচ কেন যে হলো, তার কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, স্বার্থলেশহীন নির্ভীক সমালোচনা নিজেই আন্দোলন সৃষ্টি করে সামাজিক বিপ্লবের গতি রোধ করতে পারে, বহুল প্রচারিত "খেয়ালী"র

মারফৎ অসংখ্য ঘরে কবি প্রভাতকিরণের সতর্কবাণী আজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—"অবিশ্বাস ও অসম্ভ্রম বিদূরিত হয়ে পুরুষের শ্রদ্ধা বিগলিত গৃহ-প্রাঙ্গনে হারানো শ্রী ও মহিমা ফিরিয়ে আনতে নারীকে নিতে হবে নূতন ও পুরাতনের যা কিছু ভালো—নির্বিচারে নয় বিচার সহ যুক্তিতে!"

সংযমে ও সরলতায়, সহানুভূতি ও সমালোচনায়—প্রবন্ধটি এককথায় চমৎকার। অন্যায়কে অন্যায় বলে স্বীকার করবার সৎসাহস যাদের নেই, অপ্রীতিকর সত্যের আলোচনা শোনবার সহিষ্ণুতা যাঁদের নেই তাঁরা বাদে বাংলাদেশের বিপুল জনসাধারণ আজ স্বীকার করবে প্রভাতকিরণবাবুর প্রবন্ধটি জনমতেরই প্রতিধ্বনি। আজকের দিনের নারীর শিক্ষা দীক্ষা আচার বিচার সংযতির পরে যদি শোভন সুন্দর হয়ে ওঠে, তবে আগামী কালের নর-নারীর ভবিষ্যৎ জীবনধারা শান্ত এবং আনন্দ-বহুল হয়ে উঠবে। নইলে দিনের পর দিন এগিয়ে যাবে প্রলয় রাত্রির অস্বস্তির অভিমুখে। অমূল্য উপদেশ উপেক্ষিত হলে প্রভাতকিরণের ব্যক্তিগত কোন ক্ষতিই হবে না, যাদের দুঃখে তাঁর রচনায় অশ্রু বিগলিত অকরুণ কথা উচ্চারিত হয়েছে—তাঁরাই যদি তাঁকে ভুল বোঝে তো বুঝুক ভুল, এই তাঁর শেষ কথা।

"একদা হেরিবে সবে—
সত্য,—প্রভাত কিরণের মত
আপনি প্রকাশ হবে।"

আমাদের কথা

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

পক্ষ সমধিক মাথা ঘামাইয়াছেন। এমন কি অনিলবাবু পর্য্যন্ত সকলের বক্তব্যের উপসংহার (summing up) করিয়া বলিলেন যে, প্রভাত বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। "King can do no wrong"—এই মনোবৃত্তি ছাড়িয়া অনিলবাবু যদি আর একটু সাদা মনে নারী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে অধিকতর আনন্দিত হইতাম। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অপূর্ণ ও দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ। অতএব তাহার বক্তব্যের মধ্যে সামান্য দোষ ত্রুটি থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রভাতবাবুর প্রবন্ধের বিরুদ্ধে যদি কেহ দুচারিটী সত্য কথা বলিয়া থাকেন তাহা হইলেই প্রভাতবাবুর মাহাত্ম্য বা প্রভাত-প্রবন্ধের গুরুত্ব কমে না। আসল কথা, প্রভাতবাবু তাঁহার নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা দ্বারা সমাজের যে গুরু সমস্যার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন এজন্য সকলেই আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তদুপরি তিনি যে নারীর একান্ত কল্যাণকামীর মনোবৃত্তি লইয়াই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। যাঁহারা তাঁহার প্রসঙ্গের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি। তবে প্রভাত বাবুর প্রবন্ধ যে কতকটা একদেশদর্শী হইয়াছে—হয়তো স্থানকাল পাত্রের পরিবেশের ফলে—তাহাতে সন্দেহ নাই। "নারী-প্রগতি" অর্থে যদি অতি আধুনিকদের নিত্য-নূতন রূপ লইবার যে চেষ্টা তাহাই যদি তিনি মনে করিয়া থাকেন এবং বাঙ্গলার নারী বলিতে যদি তিনি কলিকাতার নারীকেই বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে, তাঁহার প্রবন্ধ একাদেশদর্শী হয় নাই। কিন্তু প্রগতির আর একটা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আছে এবং কলিকাতার বাহিরেও যে বাঙ্গালীর একটা বিরাট জগৎ আছে—যেখানে নাগরিক সভ্যতা ও শিক্ষা আছে অথচ লেক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতির বালাই নাই—প্রভাতবাবুর প্রবন্ধে সে দিকের কোনো কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না। আজকালকার ছেলেরাও যে উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে তাহা প্রভাতবাবু স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহার দায়িত্বও সম্পূর্ণ মেয়েদের উপর দিয়াছেন—এই খানেই তাঁহার উক্তি তথ্য বিরুদ্ধ হইয়াছে। এই ব্যাপারে পুরুষদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে। পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবলমাত্র নারীর প্রতি আবেদনে ও নারীর একক চেষ্টায় নারী সমস্যার সমাধান হইবে না। কোনো সামাজিক সমস্যার আলোচনা করিতে গেলে সমস্যার স্ব-মুখী ও বিপরীতমুখী স্রোতের (currents and cross-currents) আলোচনাও বাঞ্ছনীয়। মাতা, ভগিনী, ও জায়ার কথা পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামীর কথার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একদিকের কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়া অপরদিকের কথা আলোচনা করিলে রায় একতরফা হইতে বাধ্য। অতএব প্রভাত-প্রবন্ধের প্রতি-পক্ষদের দুইটি অভিযোগ—(১) আলোচনাটি এক তরফা হইয়াছে—(২) নারীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত sweeping generalisation হইয়াছে—এই দুইটি অভিযোগের মধ্যেই কিছু সত্য আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনিলবাবু ইহা স্বীকার করিলে প্রভাত-মাহাত্ম্য নিশ্চয় ক্ষুন্ন হইত না। প্রভাতবাবুর সমর্থকদের মধ্যে যে দুই একজন একান্ত দুর্ব্বল সমর্থক আছেন—যেমন, বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—এ কথা অনিলবাবু স্বীকার না করিলেও প্রভাতবাবু নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। "নারীর অধিকতর শত্রু নারী"—প্রভাতবাবুর এই উক্তিকে বনবিহারীবাবু সমর্থন করিলেন এই বলিয়া যে জগতে যতকিছু কুকার্য্য হইয়াছে তাহার গোড়াতেই নারী এবং তাহার authority হিসাবে প্যারিসের পুরুষ পুলিশ কমিশনারের উক্তি উদ্ধৃত করিলেন। সভ্যশিক্ষিত সমাজ যে প্যারিসের পুলিশ কোর্ট নহে—একথা বোধ হয় বনবিহারী বাবুর ধারণায় আসে না। বাস্তবিক এ যুগের কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যে এরূপ একটা অদ্ভুত

(শেষাংশ ২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

যে নারীরে শ্রদ্ধা করি, যে নারীরে ভালবাসি

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার
অভিন্নহৃদয়েষু—

কাঁবাবন্দনায় মোর তুমি কি ভেবেছ বন্ধু
দেশে দেশান্তরে

আমি প্রেম ক'রে ফিরি ? বিমুগ্ধ হৃদয় নিয়ে
চলি রঙ্গ ক'রে ?

কোনো তরুতলচ্ছায়ে, কোনো নির্ঝরিনীতটে,
কোনো কুঞ্জবনে,

তরুণী তন্বীরা যত আমারে ঘিরিয়া বসে
মৃদু গুঞ্জরণে ?

সূর্য্য অস্তে চ'লে যায়, শুক্ল রাত্রি ফুটে ওঠে
শালবীথিপরে,

প্রীতিউচ্ছলিত বাণী গীতিকাব্যে তুলি গেঁথে
অরণ্যমর্ম্মরে ?

'আরো বলো, আরো বলো', আরো যে শুনিতে চাই
আরো বলো কথা !'

কলস্বনে অনুরোধ, আঁখিপদ্মে সুকরুণ
কত চঞ্চলতা ?

বিদায়-মুহূর্ত্ত আসে, ছলোছলো দুনয়নে
অশ্রু সুগভীর ?

বিচ্ছেদবেদনাক্রান্ত শূন্য তীর প'ড়ে থাকে
বন্যতটিনীর ?

উপলব্যথিতগতি স্রোতোচ্ছ্বাসে শোনা যায়
ক্রন্দনের বাণী ?

সেই স্বপ্ন দেখে তুমি, কত কি কল্পনা করো !
জানি বন্ধু জানি।

হে সখা, রেখোনা ক্ষোভ, এ যুগের আধুনিকা
বরাঙ্গনা যত

স্মরণের যোগ্য মনে করেনা ক' কবিদের
পূর্ব্বেকার মত !

ট্রামে, বাসে, পথে, ঘাটে, গিরিডিতে, আগ্রায়,
নীলসিন্ধুতীরে,

জলাপাহাড়ের পথে ত্রিকূটে কি হেদুয়ায়
দেখেও না ফিরে।

শুনিলে মোঁদের নাম রোমাঞ্চিত হয় নাকো
আনন্দ-আবেশে !

কবিদের অসম্মান হায়, এ দেশের মত
আছে কোন্ দেশে ?

কোনোদিন শুনি নাই পড়িয়া আমার লেখা
কোনো উষাকালে,

পূর্ব্ববাতায়নে বসি কোনো নারী ডুবিয়াছে
ঘনচিন্তাজালে।

সোণালী ও রাঙা মেঘ রৌদ্রে হইয়াছে লীন,
নিদ্রিত নগরী

ধীরে উঠিয়াছে জেগে, জনারণ্য তুলিয়াছে
কলকণ্ঠ ধ্বনি !

বহুদূর বনচ্ছায়া— মর্ম্মর, কাকলী তার,
তারি প্রতিচ্ছবি,

কিছু প্রেম কিছু প্রীতি গীতিমাল্যে গেঁথে তুলি !
অর্থহীন সবি।

'পুরুষ' তাহারে কহি, রমণীর রূপশোভা
বাঁধিবেনা যারে,

দলিয়া চলিয়া যেতে পারে ললনার লোভ
সত্য অহঙ্কারে ;

উচ্ছ্বসিত যৌবনের উদ্দাম গতিরে করে
সংযত সহজে,

মোহে নয়, আত্মজয়ে— চলেছে জীবন যার
দেবত্বের খোঁজে ;

জানে যে, রূপের জ্যোতিঃ, আজ যা উঠিল ফুটে
ম্লান হবে কালে,

আদরের মদিরতা, সোহাগ, আগামী দিনে
যাবে অন্তরালে !

শুধু একখানি বুকে একদিন দেবে ধরা
এক শুভক্ষণে,

শুধু একখানি মালা দোলাইবে কণ্ঠে এক
জীবনে মরণে,

শুধু এক হৃদয়ের প্রেম নিয়ে রবে ভোর,
কভু পথ ভুলে—

দূর হ'তে দূরান্তরে ছুটে ছুটে চলিবে না
নদী-কূলে-কূলে।

আমাদের এ জীবন, সেই পুরুষের নয়,
দিন হ'তে দিনে

ভাঙা হাটে হাটে ঘুরি' বেলাশেষে চেয়ে দেখি
কি আনিনু কিনে,—

কাহারো খোঁপার গন্ধ, কাহারো শাড়ীর পাড়,
মাথার কাঁটাটি,

কিছু হাসি, কিছু লিপি, কিছু কথা, কিছু গান,
সেবা পরিপাটি ;

হাজারো স্মৃতির চিহ্ন ভরিয়া রয়েছে মন,
তবু ব্যথাভরে

যে নারী করিল কবি, তারেই আহত করি
অকরুণ করে !

যে নারীরে শ্রদ্ধা করি, যে নারীরে ভালোবাসি,
তারি ত্রুটিকণা

তোমরা ভুলিতে পারো আমি কবি সুনির্ম্মম
কভু ভুলিব না।

বিধাতার শ্রেষ্ঠদান, নিখিলের স্বপ্নজাল,—
রমণীয় নারী,

মহিমা চেয়েছি তার, চাই শুভ্র যশ থাক্
অকলঙ্ক তারি !

বিলাসের স্রোতে তারে ভাসিয়া চলিতে দিলে,
হতভাগ্য দেশে

যতটুকু সুখশান্তি এখনো রয়েছে, বন্ধু,
মিলাবে নিমেষে !

তোমরা চলিয়া যাও, দিগন্ত মুখরি' তোল
স্তবগানে তার !

দেশের দুঃখের বাণী আমার লেখনীমুখে
তুলিবে ঝঙ্কার।

যে নারীরে শ্রদ্ধা করি, যে নারীরে ভালবাসি,
আজি ঝঞ্ঝাহত

তীক্ষ্ণবাক্যবাণে তারে প্রণাম, ভীষ্মের পায়ে
অর্জ্জুনের মত।

দুর্গতিহারিণীরূপে দুর্গার মুরতি ধরো
বরাভয় দানে,
রণচণ্ডী বেশে তব নৃত্যপরা দীপ্তি, আজ
ভূমিকম্প আনে!
ভরিয়া সমস্ত দেশ হে নারী, রহস্যময়ী
অপূর্ব্ব গৌরবে
আপন আসনে বসো, আমি ধন্য হব, দেবী
তুমি ধন্য হবে!"

একথা বলিয়া বন্ধু, ঘা দিয়া ফিরেছি নারী
হৃদয়-তন্ত্রীতে;
এক সুপ্রভাতে জানি উচ্ছ্বসিত হব তারি
বিজয়-সঙ্গীতে।
আজ রূঢ় সত্য কথা, দিকে দিকে দৃশ্য হেরি
হয়েছি অস্থির!
প্রশংসা পাবনা বন্ধু, লাঞ্ছনার নাম লব
নারী-বিদ্বেষীর!

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

আমাদের কথা

(২৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

উক্তি করিতে পারেন ইহা আমাদের ধারণাতীত! প্রভাতবাবুর প্রবন্ধে নারীদের সম্বন্ধে কোথাও এতটুকু অসম্মান সূচিত হয় নাই। কিন্তু বনবিহারীবাবুর এই উক্তি নারী-জাতির প্রতি একান্ত অসম্মানজনক। আর কেহ এরূপ মাত্রাহীনতার পরিচয় দেন নাই বলিয়াই বনবিহারীবাবুর কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম।

প্রভাত-প্রতিপক্ষ অনেকেই বলিয়াছেন যে প্রভাতবাবু কোনো constructive scheme দেন নাই। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য যে তাঁহারাও তো কিছু দেন নাই। প্রভাতবাবুর ভুল দেখাইতে গিয়া তাঁহারাও সে ভুল করিলেন কেন।

পরিশেষে প্রভাতবাবুর প্রবন্ধে সামান্য যে অপূর্ণতার উল্লেখ করিলাম আশা করি সে জন্য তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। এই সকল সামাজিক সমস্যার আলোচনায় ও বাদানুবাদে যদি তিনি Sir Roger De Coverleyর কথা স্মরণ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মনের ক্ষোভ দূরে যাইবে এবং তিনিও আমাদের সহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিবেন—"much may be said on both sides"

খেঃ সঃ *

[প্রভাত-প্রবন্ধের বাদ প্রতিবাদের উপর এইখানেই যবনিকা পাত হইল। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা হইবে না।]

লীলাময়

এক অঙ্ক-নাটিকা

শ্রীপ্রভাত কুমার দেব সরকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সেই চায়ের দোকান, সময়—সেই।

[ঘরটার আবহাওয়া সেই। লীলাময়, সমর, পেলব, জ্যোতি ও সুনীতি, সকলের পশ্চাতে—সুনীতির আসন—তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর।]

পেলব—আচ্ছা গুল মারলি!—গেলি তো খুব!

জ্যোতি—বাজে বাজে পাঁচ প্যাকেট সিগ্রেট পুড়ল।

কটুকণ্ঠ—আমি জানতুম, বিশ মণ তেলও পুড়বেনা, রাধাও নাচবে না।

সমর—ওটা ঐরকম, Engagementএর জ্ঞান নেই আবার love ক'রে বেড়ায়!

লীলা—ভো. বন্ধুগণ! চটো কেন, হেতুটা অবধান কর—তারপর যা' ইচ্ছে তাই বোলো।

—কলেজ থেকে ফিরে দেখি, বাড়ীতে স্বয়ং 'নির্ম্মলা হোটেল'। জিগোস করলুম, বাবা-মা যদি থাকতেন—তাঁরা কী মনে করতেন? বললে, আমি জানি আপনি ছাড়া এখানে কেউ থাকেন না,—আর চাকর বাকর? ওদের লজ্জা করলে প্রেম লজ্জা পেয়ে মাঠে মারা যাবে। একেবারে ঘুঘু!! সাবধান তোরা, মেয়েরা যা'কে ভালবাসে তার নাড়ী-নক্ষত্রের খোঁজ নেয়—সি-আই-ডির বাড়া!! —চা পানান্তে বললুম্, চলুন সা'নগর পার্কে। বলে, না, ভিড়ের মধ্যে কেন? এইতো বেশ আছি! তারপর যা' ঘোটলো, সে এক লজ্জার ব্যাপার! আমার ত্রিশঙ্কুরের মত অবস্থা! রাত তখন আটটা হ'বে, বলে, চলুন লেকে যাই, নেশা তখন আমার বেশ জমে উঠেচে—গেলুম সেখানে, দক্ষিণে সেই অন্ধকার যায়গাটা—তোদের মনে নেই?—আরম্ভ করলে, "তোমায় ভালবাসি,—তোমায় না-পেলে কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মঘাতী হবো,—তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল?"—বিনিয়ে বিনিয়ে এক কথা একশ'বার—প্যান্-প্যানানি ঘ্যানঘ্যানানি!—আমি যত বলি, ছি, বন্ধুদের কথা দিয়ে কথা না রাখা ভাল দেখায় না! ও তত বলে, কেন হয় না? ছ্যাবল্লা সব, রাস্তায় মেয়ে দেখলে হাঁ ক'রে থাকে।—

পেলব—তুই কী বল্লি? ভয়ে চুপ করে' ছিলি?

নীলাময়—কেন, আমার ভরটা কী?—গায়ে পড়ে প্রেম তো আমি করিনি! যা শোনান শুনিয়েচ।

সকলে (সুনীতি ছাড়া)—কী বললি ???

নীলাময়—বললুম, ছেলেদের আর দোষ কী? তারা সুন্দরের মর্য্যাদা দিতে জানে,—তারা চেয়ে না-দেখলে, তোমাদের সাজ-গোজের কোন মানে হয় না। কথাটা বুঝতে পারলেনা। জিগ্যেস্ করলে, কেন মানে হয় না? বললুম, তোমরা যখন টিকটিকির লেজের মত কেশকে ফাঁপিয়ে তুলে, তোলা মেড়ো-প্যাটার্ণ টাপ ঝুমকো কানে গুজে, লাল শালুর পীন পর্য্যন্ত খোলা বডিস্ পরে', বড় জোর সাড়ে তিনটাকার বাসন্তী মিলের 'ক্যামেলিয়া' সাড়ী পরে, হিল-তোলা জুতো পায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরোও, তখন ছেলেদের কী বুঝতে বাকী থাকে, তোমরা তাদের মক্ষিকার মত আহ্বান কর?—ফুলের দিকে ভ্রমর ফিরে না চাইলে, তার ফোটা যে ব্যর্থ হয়! তোমাদের চলার ধরণ, পোষাকের পারিপাট্য হাঁক দিয়ে বলে, হে ছোকরা পথিকগণ! আমাদের পানে ফিরিয়া চাও—নইলে বৃথা এলবই!

পেলব—Hear! Hear!!

জ্যোতি—হাতে হাত দে মাইরি!

কটু ও সমর—যেমন কুকুর! মিট্‌মিটে শয়তান!!

নীলাময়—ছেলেদের কোলের কাছে টানতে ওদের ছলা-কলার অন্ত নেই,—এদিকে মুখে বাহাদুরী কম নয়! 'নির্ম্মলা হোটেলের' ব্যাপারেই বুঝতে পারিস্—একেবারে বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া!

পেলব—ওদের হ্যাংলামিতে হাসি পায়—অবলার বোল ফুটেচে!

জ্যোতি—প্রয়োগ তার যেখানে সেখানে--

সমর—যথা, কবিতা-উপন্যাস লেখায় ওদের চেষ্টা।

নীলাময়—আঃ, তোরা দেখচি আমায় আর কিছু বলতে দিবিনে।—তারপর চুপচাপ থাকার পর, 'নির্ম্মলা হোটেল' বললে, এমন রাত্রি—আমরা দু'জনে একলা—কবিতা লিখতে ইচ্ছে করচে। পালাই পালাই করে' উঠলো প্রাণ!

পেলব—শেষ পর্য্যন্ত গান গাইলে নিশ্চই।

নীলাময়—কতকটা ন্যাকামির কান্না! ঐ যে, "আমারি লাগিয়া স'য়েচ কত ব্যথা—" ব্যথা আমার, না তোমার?—ব্যথার ঠেলায় একেবারে বাড়ী ধাওয়া—ছি, ছি, ছি!

কটুকণ্ঠ—সুনীতি তোর প্রেমনীতি blunt কেন আজ?—মেয়েদের সম্বন্ধে এতো অভদ্র অভিযোগ!

নীলাময়—ও আর কী বলবে! কাল যা' Experience হ'য়েছে—নিজের কানে সব শুনেচে যে! মেয়েদের সম্বন্ধে ওর ধারণা নিশ্চয়ই বদলে গেচে—কিহে, বলনা—

সুনীতি—হু,—

সমর—কী Experience রে সুনীতি?

[সুনীতি নীরব,—তাকে নিয়ে খুব খানিকটা তাড়াহুড়ো,। ইতি মধ্যে ক্লাসের ঘন্টা বেজে উঠলো]

পেলব—বলনা ভাই কী করে' পাকড়ালি,—কী বলে প্রথমে আলাপ করলি,—উপহার-টার কিছু? দেখি তোর পকেট।

নীলাময়—থাক্, ও পরে বলবে,—Principalএর অর্থনীতি—এখন প্রেমনীতি জলাঞ্জলি দিয়ে গা-তোলা দাও—

কটুকণ্ঠ—যা' বলেচিস্!—কেবল ওঁর ক্লাস ছাড়া ফাঁকি দেবার উপায় নেই—কেন—কি বৃত্তান্ত'র ঠেলায় অস্থির! ভুলে যান ওঁরাও যুবক ছিলেন এক দিন।

নীলাময়—এই যা! আজত কথায়-কথায় জানাতে ভুলে গেচি :—আজ সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় 'নির্ম্মলা হোটেল' আমার ভবনে পুনঃ পদার্পন করবেন—চিজটাকে দেখতে চাস্ তো, যাস্ সব।

সকলে—তা' আর বলতে!—নিশ্চয়ই যাব—মজা করা যাবে।

(ক্রমশঃ)

চিরন্তনী

শ্রীসমর মিত্র

সকলে ভাবলে বৃষ্টি হবে না, বৃষ্টি ত হলই, তা ছাড়া, এত ঝড়, জল, বুঝি ক'লকাতার লোকেরা বিশেষ ক'রে বয়স্থেরা কখনও দেখেনি। যদিও বছরের একদিন না একদিন এরকম বৃষ্টিই হ'য়েই থাকে।

ঝড়ের দোলার সাথে শীলা একটা ঘরে নাচ অভ্যেস করছিল। স্কুলের যে কোন উৎসবে, বিশেষ করে বাৎসরিক 'প্রাইজ্‌ ডে'-তে, ওকে ষ্টেজে নাম্‌তে হয়। এবারেও দেখাতে হবে, তাই সে খুব ব্যস্ত। ঘরের বড় দুখানা আয়নাতে তার দেহের সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছল। যৌবন-উচ্ছ্বসিত দেহের ভঙ্গিমা কেমন হয় তাই সে দেখ্‌ছিল।

যৌবন শুধু তার দেহে নয়, মনে। চেয়ে থাকার মত রং তার না থাক্‌লেও ফর্সা বলা যেতে পারে। পাতলা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, সামনের দিকে দু' একটা চুল কেটে দিয়ে অসাবধানতার সৌন্দর্য্য, অর্থাৎ 'কেয়ার-লেস বিউটী' তৈরী করা হয়েছে। নাচের 'পোস্‌' দেবার সময় চোখের উপর পড়বো পড়বো করে ভ্রূর কাছেই থেকেই যায়।

সাড়ী পরবার ধরনই ওর আলাদা, সামনে খানিকটা কোঁচার মত ঝুঁকে গেছে (অবশ্য কাছা নেই) বাঁদিক দিয়ে উঠে, ডানদিক থেকে আল্‌তো ক'রে নেমে গেছে।

রেকর্ড থেকে গান তুলতে, প্রথম যে রকম কষ্ট হয়, সেই রকম, ওর চলা,—কথা কওয়া শান্ত,—খুব লঘু, ভেতর থেকে যেন একটা মিষ্ট, মধুর কণ্ঠ ভেসে আস্‌ছে।

শীলা বারবার এক লাইন গাইছিল,— "ঝরা পাতা ঝরা পাতা আমি গো তোমার—"

ঝরা পাতার অভাবে, নিজের বসনখানি নাচের উপকরণ যোগাচ্ছিল। অবিশ্যি এতে তার বসন যে সুসংযত ছিল, এমন কথা সাহস করে বলা যায় না।

ঠিক পাশের ঘরে বসেছিল শিলার বাবা। সমস্ত সার্শী-দরজা বন্ধ করে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন।

এমনি সময় ঘরে এল দুজন তরুণ—ভেজা মূর্ত্তি; একজনের গায় একটা জার্সি, আর একটা কাল প্যাণ্ট—চেহারাটা মন্দ নয়। দিব্যি ছিমছাম্‌ গড়ন; ছেলেটীর নাম 'সুন্দর'।

জীবন আর সুন্দর, একসঙ্গে ফোর্থ ইয়ারে প'ড়ে। জীবন শিলার ভাই।

তারা ঘরে আসতেই মোহনবাবু বল্‌লেন, "কি হে—কারা জিত্‌'ল।"

আজ মেডিক্যাল কলেজ হেরে গেছে বাবা" জীবন বল্‌লে।

'বেশ—বেশ—সুন্দর কখানা 'স্কোর' করেছে?" জীবন উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌লে "ও আজ যা খেলেছে, দুটো স্কোর একাই করেছে।"

"যাও যাও সব কাপড় জামা ছেড়ে ফেল"। একটু পরে বল্‌লেন—"আমি আজ আর যেতে পারলাম না।"

ওদের গলার স্বর শুনেই শীলা ছুটে এল,—তার নাচ অভ্যেস ছেড়ে দিয়ে।

"এই শেলী যা বেয়ারাকে ডেকে দে," জীবন বল্‌লে একথা।

"আঃ! দাদার এসেই ফরমাজ"; সারা মুখে তার বিরক্তি আল্‌তো করে ছুঁয়ে গেছে।

ঝড় তখন থেমে গেছে, ওরা স্নান সেরে এল, চা খেতে খেতে খেলার গল্প করছিল।

শীলা ঘরে এসে বললে,—সুন্দরদা তোমার খেলার বাহাদুরী রাখ।"

"কেন? কি কর্ত্তে হবে?"—সুন্দর বললে একথা। "একটা গান শিখিয়ে দাও"—শীলা বল্লে।

সুন্দর গায় ভাল, গলাও খুব মিষ্টি, সে প্রায়ই শীলাকে গান শেখায়।

সুন্দর উঠে এসে অর্গ্যানের কাছে বস্‌'ল। সুন্দর গান শিখিয়ে বাড়ী ফিরল তখন বৃষ্টি থেমে গেছে।

(২)

সারা দুপুর ধরে সময় আর কাটে না। সময় আর কাট্‌বে কি করে? সময়কে কাটাতে হবে নিজে। প্রত্যেক সেকেণ্ডের কাছে নিজেকে হবে ধর্ত্তে। শীলা ভাবে ড্রইংরুমে বসে।

দুষ্টু ছেলের হাত দিয়ে ছেঁড়া একটুকরো তুলোর মত মেঘ এসে দাঁড়ায়, জানলা দিয়ে সোজা তা দেখা যায়; চারপাশে তার ভাদ্রের উজ্জ্বল রোদে ভরা নীল আকাশ। চিলগুলো উড়ছে—ওই তাদের কাজ, প্রত্যেকে তারা ডানা মেলে দিয়েছে সময়ের আকাশে; তাই ওদের স্বচ্ছন্দ সাবলীল লঘু গতি।

শীলার হাত আল্‌তো ক'রে নেমে এসেছে কোলের ওপর, শান্ত ছেলের টেবিলে

ঝুঁকে বই পড়ার মত। তা'র একটা আঙ্গুল বইয়ের ভেতর গিয়ে পেজমার্ক হয়েছে।

তা বলে, বইয়ের ভেতর কী আমরা দেখতে পাচ্ছি? মোটেই নয়, বইটা খুললেই আমরা তা দেখে নেব। কিন্তু বইটা বোধ হয় এখন আর খুলবে না। ঠোঁটের ঠিক্ নীচে, চিবুকের একটু ওপরে, ক্লান্তি স্পষ্ট চুমা খাচ্ছে,—তাইতে ও মত্ত, ও ডুবে আছে, তাতে।

আজ স্কুলের ছুটী। শীলা ভাবলে মানুষ কেন যে ছুটীর সৃষ্টি করেছে। ছুটী ত মনে কর্লে'ই পাওয়া যায়। ঢাক, ঢোল বাজিয়ে 'এই তোমাদের ছুটী দিলাম"—এ না বল্‌লে কি আর চল্‌তো না? আজ ছুটী যদি না থাক্‌তো, ত এতক্ষণ স্কুলের টিফিন হয়েছে,—মীনা, ইরা, সুহাস, এরা সব ওকে জ্বালাতন কর্চ্ছে। নয়ত শোভি সুন্দরদা'র নাম দিয়ে ওকে লজ্জা দেবার চেষ্টা কর্চ্ছে; আর প্র'তিভা তাই উপভোগ করছে।

রাস্তা দিয়ে একটা 'মোটর কার' জোরে চলে গেল; ধুলো উড়্‌লো;—সে আরামসে চোখ বুজিয়ে, মট্‌কা মেরে প'ড়ে থাকার মত শুয়েছিল;—কার সাড়া পেয়েই ঝট্ ক'রে উঠে পড়্‌লো;—পেছনের পর্দ্দা নড়ে উঠলো, দুতিন রকম রং খেলে গেল। কথা এল ভেসে, '.ভতরে আ'স'বা?' শীলা চম্‌কে গেল, 'সুন্দরদার গলার স্বর না?' "হ্যাঁ—নিশ্চই চলে আস্‌তে পারো"—এইবার ও নিজেকে ডুবিয়ে দিলে সময়ে'র কাছে। গল্প বল্‌ছিল………।

শীলাদের স্কুলের 'প্রাইজ্ ডে'-তে, এবার সুন্দর যাবে কি-না, এই নিয়ে তর্ক। সুন্দর বল্‌ছিল, মেয়েদের গান নাকি ওর ভাল লাগে না। শীলাও তর্ক তুল্‌লে "বাঃ! তাই বলে, তুমি গিয়ে গাইবে নাকি—?"

"গাইলেই বা দোষ কি," সুন্দর বল্‌লে "তুমি নাহয় ভাল গাইতে পার, তাই বলে মেয়েদের স্নাব করা উচিৎ নয়—মোটেই,—" শীলা বল্‌লে।

সুন্দর অস্পষ্ট হাস্‌লে, বল্‌লে "আমি একথা বলিনি যে মেয়েরা গান গাইতে জানেনা, বল্‌ছি গলা ভাল নয়।"

চুল হতে অজ্ঞাতে জল ঝরে পড়ার মত, শীলার হাত থেকে কখন বই পড়ে গেছে, তা ও জানতেই পারেনি। জান্‌লা দিয়ে অল্প হাওয়া আস্‌ছিল; একগাছা ছোট চুল দুল্‌ছিল, ফুর্ত্তিবাজ কচি ছেলের মত।

কানে দুল্‌ছিল, একটা বড় রূপার ঝুম্‌কা। চুমা খেতে চেয়ে, বাধা পেয়েছে—এমনি হয়ে কাঁধের অল্প ওপরে এসে থেমেছে। বিরক্তিতে শীলা মাথা নাড়াচ্ছিল,—ঝুম্‌কা যেন চুমা খাবার লোভ সামলাতে পারেনা; শীলা ঘাড় কাৎ ক'রে বল্‌লে "আচ্ছা সুন্দরদা, তুমি ত অনেকবার আমাদের নাচ দেখেছ?" "হুঁ! কেন?" সুন্দর বল্‌লে। "বল ত আমাদের মধ্যে কে সুন্দর নাচে—?"

সুন্দর এবার একটু মুস্কিলে পড়েছে। ও অনেক মেয়ের নাচ দেখেছে, আর শীলা'রও দেখেছে অনেকবার। সে ভাবলে সত্যি কথা বল্‌তে হলে, বল্‌তে হয় তোমায় চমৎকার মানায়, কিন্তু নাচের আর্ট ভাল বোঝনা—আর শুধু তাই নয়, বল্‌তে হয় আরও, প্রতিমা ভাল করে চর্চ্চা করেছে, স্কুলের সকলকে সে শেখাতে পারে।"

কিন্তু সুন্দর কী তা বল্‌তে পার্ব্বে? পারলেই যেন ভাল হয়। ও বলে ফেল্‌লে—তোমাদের মধ্যে প্রতিমাই ভাল জানে, তবে আর একটু 'স্লিম্ ফিগার' হ'লে ওকে চমৎকার মানাতো।"

সুন্দর প্রতিমাকে চেনে। তার সঙ্গে প্রথম আলাপ এই বাড়ীতে। এখন সুন্দর মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী যায়। সুন্দর প্রতিমার কথা ভাবতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লে। বললে, "ওঃ! সেদিন স্কুলে, প্রতিমা ষ্টেজে নেমে একলা তোমাদের মান রেখেছিল।"

শীলা দেখলে ভুরের চিলগুলো নীচে নেমে আসছে, অবাধ লীলা ভঙ্গিতে। পড়ে যাওয়া বইটা ও অনেকক্ষণ কুড়িয়ে নিয়েছে। মনে মনে সে 'হাফ্ হলিডে'র ছুটি অনুভব কর্ত্তে লাগলো। কতকটা ভয়,—কতকটা আনন্দ মেশানো,—আর তার একটানা লাগ্‌ছেনা। ওদিকে বিকেল হয়ে গেছে, সন্ধ্যা প্রায় হয়। ক্লান্ত পাখীরা বাসায় নামবার জন্যে ব্যস্ত;—শীলার মনে তারা গভীর হ'য়ে উঠেছে ফুটে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

“ডিজায়ার” চিত্রে গ্যারীকুপার মার্লিন ডিয়েট্রিশ, শাখট কলিকাতা

ও পারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

জুয়ানিটা কুইগলে

জুয়ানিটা কুইগলের নামটা বোধ হয় সকলের জানা নেই। আর না থাকাও আশ্চর্য্য নয়। ওকে আসলে লোকে চেনে বেবি জেন বলেই। জুনিটার বয়স মোটে চার বছর, এর মধ্যেই ওর নাম বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এইতো সেদিন ও ‘রিফ র‍্যাফ’ ছবিতে নেমেছিলো। এইবার নামছে ‘লাভস লেবার লষ্ট’ ছবিতে। এ বইখানায় ওর পার্ট ছিলনা। জেনের জন্যেই পরে লেখা হয়েচে নাচ গানের পার্ট। জেন নামবে ফ্রান্সেস ল্যাঙফোর্ডের সঙ্গে।

ফ্রান্সেস ল্যাঙফোর্ডেরও নাম বড় কম নয়। রেডিও এবং ষ্টেজে ওর নামতো আছেই, স্ক্রীণে ওর নাম কে না জানে?

“লাভস লেবার লষ্ট” ছবিখানায় নামা নিয়ে হবে ন’বার অভিনয় করা আর জুয়ানিটা হচ্ছে সত্যিসত্যিই হলিউডের মেয়ে। ও জন্মেছে হলিউডেই। ছবিতেও নামছে কত ছোট বয়স থেকে। দু বছর বয়স থেকেই পারে নাচতে এবং পিয়ানো বাজাতে। ওরা বলে: জুয়ানিটাই নাকি সব চেয়ে ছোট চুক্তিবদ্ধা অভিনেত্রী।

ফ্রান্সেসকে পাওয়া গেলনা

এই সেদিন জানা গেলো অভিনেতা অভিনেত্রী’রা কেন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নামতে চায়না।

এ ব্যাপারটা ভারী মজার। এ্যালজেবরা! স্রেফ এ্যালজেবরা নিয়ে এই বিভ্রাট!

ক্যালিফোর্নিয়ায় আইন আছে, যে সব ছেলে-মেয়েরা ছায়াছবিতে নামবে তাদেরকে প্রত্যেক দিনে কিছু না কিছু সময় পড়াতেই হবে। যেদিক দিয়েই হোক খানিকটা লেখাপড়া ওদের শেখাতেই হবে।

‘টু মেনি পেরেণ্টস’ ছবিতে স্ত্রী ভূমিকায় শ্রেষ্ঠাংশে নেমেছে ফ্রান্সেস ফারমার। আর এই ছবিখানায় আছে প্রায় একশোটা ছেলেমেয়ে।

ঠিক প্রথম দিনেই তেরো বছরের ছেলে জর্জ্জ আরনেষ্ট আবিস্কার করলে যে ফ্রান্সেস হচ্ছে ওয়াশিংটন ইয়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। ব্যস্ আর যায় কোথা! জর্জ্জ সুটিংএর অবসরের সময় এ্যালজেবরা নিয়ে এসে হাজির করল। ফ্রান্সেস পড়ল মুস্কিলে। কোন রকমে, অন্য কায আছে বলে সরে পড়ল।

এরপর যখনই ক্যামেরার হাতল থামত, অবসরের আরাম নিতে লোকে হাঁপ ছেড়ে বসত, এ্যালজেবরার খোলা পাতা ফ্রান্সেস্-এর চোখের সামনে জেগে উঠত, ফ্রান্সেস বসতে পারত না; কোথায় যে সে চলে যেতো কেউ তার খোঁজ পেতনা।

ক্যারল করেছে জয়

আনন্দ! আনন্দ! উৎসব!

ওর সোনালী চুলে! ওর মদির চোখে! ওর রাঙা ঠোঁটে যে মোহ আছে, ওর জাগ্রত যৌবনে! ওর মধুর কথায়! ওর চঞ্চল চলায় যে আকর্ষণ আছে তাকেও ডুবিয়েছে অতল তলায় ওর বিনীত ব্যবহার।

ভালবাসেনা কে?—সবাই ভালবাসে; ছুতোররা, ইলেক্‌ট্রীকের লোকেরা, প্রপার্টির ছেলেরা, ক্যামেরাম্যানরা আর ডাইরেক্টর, কে নয়?

আপনি যান প্যারামাউন্ট ষ্টুডিওতে বেড়াতে, দেখবেন ঠিক চারটের সময় প্রপার্টির একটি ছেলে বালতী হাতে করে সেটের ওপর আসচে। হ্যাঁ একটা কথা বলে রাখি, ক্যারোল লম্বার্ড নামছে' "দি প্রিন্সেস কামস এ্যাক্রস" ছবিতে।

তারপর। ওই যে বালতী দেখচেন, ওতে আছে ঠাণ্ডা পানীয়। ওই সরবত বিলান হয় যারা যারা ওই সেটে কায করচে সবাইকে।

এমনি ব্যবহার ক্যারলের। ভদ্রতায় ক্যারল লম্বার্ডের তুলনা মেলে কম। সরবত খাওয়ানো শুধু ওর এই ছবিতেই নয়। সব ছবিতেই বন্ধুত্বের খাতিরে ও সকলকে কিছু না কিছু খাওয়ায়।

সই

১৯২১ সাল। সুন্দরী যুবতী হেলেন হোমস-এর ছবি উঠছে সেটের উপরে। সবাই ব্যস্ত নিজেদের কায নিয়ে। ওদিকে দেখা গেলো একটি ছেলে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এদের কায দেখছে।

সে সট নেওয়া হয়ে গেলো। ছেলেটি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলো সেটের ওপরে। হেলেন হোমসকে বল্লে: দয়া করে একখানা অটোগ্রাফ দেবেন? হেলেন হোমস ওই ছেলেটির মুখের দিকে তাকালে, তারপর অত্যন্ত ভদ্রভাবে তার কাগজে অটোগ্রাফ দিয়ে দিলে।

১৯৩৬ সাল। এডি সাদারল্যাণ্ড প্যারামাউন্ট-এর সেটের ওপর তার নতুন ছবি 'পপি'-তে ডব্লিউ সি ফিল্ডসকে পরিচালনা করছে। সে দিন ভোলা হয়ে গেল। ওধারে এক্‌স্ট্রাদের ভিড়ের মধ্যে থেকে যে মোহিনী মূর্ত্তি এগিয়ে এলো—তার সোনার চুলে পাক ধরেছে এধারে, ওধারে, ওখানে। সেই মহিলাটি এলো

ক্যারল লোম্বার্ড

একবারে পরিচালকের সামনে; বল্লেঃ আমায় একখানা অটোগ্রাফ দেবেন?

সাদারল্যাণ্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এযে তার পরিচিত মুখ! কোথায় কোথায় যেন দেখেচে সে!

মনে পড়েছে সাদারল্যাণ্ডের। ওর চোক চক্ চক্ করে উঠল। হেলেন হোমস-এর খাতাখানা টেনে নিয়ে লিখলে—আমায় এই চলার পথে তুমি প্রথম পথ দেখিয়েছ; তোমায় ধন্যবাদ।

খুচরো খবর

জোয়ান ক্র্যাফোর্ডের কোনদিন সেক্রেটারি ছিলনা আর আজও নেই।

* * *

ক্র্যাফোর্ড চিঠি পায় অনেক। সবগুলোর উত্তর দেয় বড় বড় অক্ষরে।

* * *

স্পেন্সার ট্র্যাসি আগে ষ্টেজে নামত। ওর প্রথম নামা হচ্ছে নিউইয়র্কে।

* * *

ফ্রেডরিক মার্চের স্ত্রীর নাম হচ্ছে ফ্লোরেন্স এল্‌ড্রিজ। "মেরী অফ স্কটল্যাণ্ড" ছবিতে নামছে।

ইলা দাস ও চারুবালা

বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-কন্যা "রজনী" সবাক-চিত্র রূপে তোলা হ'চ্ছে দেবদত্ত ফিল্মস্-এ। ওপরের মেয়ে দু'টির আগেরটি নাম্‌ছেন চাঁপার ভূমিকায় আর অন্ধ-মেয়ে রজনী হ'চ্ছেন পাশেরটি। জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যে ছবিখানা তুলছেন।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা
প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা
গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ৪ঠা আষাঢ় ১৩৪৩—18th. June, 1936. } ২৫শ সংখ্যা

বাঙ্গলা ও আসন্ন নির্ব্বাচন

সম্প্রতি উনাওয়ে যে যুক্ত প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ সংস্কৃত শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা পরিষদের আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের ভোট দিবার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মিঃ রফী আহ্‌মেদ কিদ্‌ওয়াইকে সভাপতি ও মিঃ কেশবদাস মালবীয়কে সম্পাদক করিয়া যুক্ত প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী কমিটী গঠিত হইয়াছে। অতএব আগামী নির্ব্বাচনের জন্য যুক্ত প্রদেশে উদ্যোগ পর্ব্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ে মিঃ নরীম্যান বিহারে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইতিপূর্ব্বে এই সম্পর্কে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। শুধু বাঙ্গলাতেই এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত শ্মশানের নীরবতা বিরাজ করিতেছে।

অন্যান্য প্রদেশের নিকট হইতে একটা অন্যায় অবহেলা বাঙ্গলার যেন আজ নিত্য-প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস-কনক-জয়ন্তী উপলক্ষে যে ইতিহাস রচিত হইল তাহাতে বাঙ্গলার স্থান নাই বলিলেই চলে। অথচ বাঙ্গলাই কংগ্রেসের জন্মদাতা! ইহাকে অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া উড়াইয়া দিলে বা ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসের সহিত ললাটে করাঘাত করিলেই কি বাঙ্গলার নষ্ট শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে?

এই আনুনাসিক ক্রন্দনে, এই নপুংসকোচিত ব্যর্থ হতাশ্বাসে লাভ কি? বাঙ্গলার এই হতাদরের জন্য যদি কেহ দায়ী থাকে তো ইহার তথাকথিত নেতারা। নিজেরা গৃহবিবাদে স্বার্থকলহে দ্বিধাবিভক্ত ও হতবল তো তাহারা হইয়াছেন-ই, তদুপরি যাঁহারা এখন নেতৃস্থানীয় হইয়া আছেন তাঁহারাও কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ। সেই জন্যই আজ বাঙ্গলার এই দুরবস্থা। উদাহরণ স্বরূপ এই আসন্ন নির্ব্বাচনের কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের সমস্ত প্রদেশই এই নির্ব্বাচনের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, একদিন যে "Benighted Province" বলিয়া রাজনৈতিক আখ্যা পাইয়াছিল সেই মাদ্রাজও আজ এই নির্ব্বাচনে বাঙ্গলার অগ্রণী—ইহা কি কম লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। অতএব দেশের কল্যাণকামী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট আমাদের একান্ত আবেদন যে, এই কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইলে, ভারতের রাজনৈতিক জগতে বাঙ্গলার হৃত আসন পুনরাধিকার করিতে হইলে তাঁহারা যেন কালবিলম্ব না করেন; আলস্য, আরাম ও দলগতচিন্তা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা যেন অবিলম্বে বাঙ্গলার জনসাধারণকে কংগ্রেসের পতাকাতলে আহ্বান করিয়া নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হ'ন।

গত মঙ্গলবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি বার্ষিকী সভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাকে আসন্ন নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে বাঙ্‌লার পক্ষ হইতে জনসাধারণের নিকট প্রথম আবেদন বলা যাইতে পারে। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মতবাদ আমরা পূর্ণভাবে

সমর্থন করি। বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্‌লার পক্ষে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ যে আত্মঘাতী হইবে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি মন্ত্রীত্বগ্রহণ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মতবাদ সমর্থন করেন কিনা তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। আর লক্ষ্নৌ কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী সে প্রসঙ্গ এখন অবান্তর বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সমস্যার সমাধানের পূর্ব্বে আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের যোগদান ও জয়লাভের প্রচেষ্টায় বাঙ্‌লার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের আশু আত্মনিয়োগ করা উচিৎ। আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের বিজয়ী হইতে হইলে কংগ্রেসের ইতিমধ্যে প্রচারকার্য্য ও দল সংগঠন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্‌লায় এখনও পর্য্যন্ত এবিষয়ে কোন আবেদন ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয় নাই। দেশবন্ধুর স্মৃতি বার্ষিকীতে শরৎচন্দ্রের সারগর্ভ বক্তৃতা কী শুধু বাক্যঝঙ্কারেই পরিণত হইবে?

শৃঙ্খলার অনুশাসন

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সেনগুপ্তপন্থী ও রায়-পন্থী কাউন্সিলারগণের মধ্যে যে ভেদ ও ভাঙ্গনের পূর্ব্বাভাষ আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা যে এত শীঘ্রই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পরিণত হইবে তাহা আমরা ভাবি নাই। শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ডাঃ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাধুখাঁ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, মিঃ জামান প্রভৃতি দ্বাদশজন কাউন্সিলার কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের তদানীন্তন অস্থায়ী কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারের অভিযোগ করিয়া ইলেকশন বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের নিকট 'রেকুইজিশান্' পত্র প্রেরণ করেন। কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদের মারফতে উক্ত পত্র ইলেক্শন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নিকট প্রেরিত হয়। তৎপরে উক্ত পত্র আলোচনা করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে ইলেকশন বোর্ডের একটি জরুরি সভা আহুত হয়। উক্ত সভায় তদানীন্তন অস্থায়ী সম্পাদকদ্বয়ও আহুত হন। প্রকাশ যে, শরৎচন্দ্রের নির্দ্দেশানুযায়ী কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের একটি জরুরী অধিবেশন আহুত হয় এবং সেই অধিবেশনে স্থায়ী কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাচনের অনুজ্ঞা প্রেরিত হয়। সেই নির্দ্দেশানুযায়ী কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনে নিম্নলিখিত কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

লীডার—শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী (রায়-পন্থী)
" নিশীথ চন্দ্র সেন (সেনগুপ্ত-পন্থী)
(একের অনুপস্থিতিতে অন্যে লীডারের কার্য্য করিবেন।)
ডেপুটি লীডার—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর (নিরপেক্ষ)
সম্পাদকদ্বয়—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়-পন্থী)
" ইন্দ্রভূষণ বিদ্ (সেনগুপ্ত-পন্থী)
হুইপ্—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাধুখাঁ (নিরপেক্ষ)
" দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (")
" নরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় (")
কুমার বিশ্বনাথ রায় (রায়-পন্থী)

বিদায়ী অস্থায়ী সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে উপদলগত সঙ্কীর্ণতার যে অভিযোগ আরোপিত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাদিগের উভয়কেই সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারিত করিলে ভালই হইত। যাহা হউক, তাঁহাদের মধ্যে একজনের অপসারণ যে মন্দের ভাল হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আশা করি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদ্ সম্পাদক রূপে স্বীয় কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিবেন। 'হুইপ্' দিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাধুখাঁ তাঁহার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিলে আমরা বিশেষ প্রীত হইব। নবাগত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দলগত শৃঙ্খলতা পূর্ণভাবে বরণ করিয়া লইয়া ভবিষ্যতের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের পথ যে সুগম করিবেন তাহা আশা করা দুরাশা নহে। প্রীতিভাজন বন্ধুবর কুমার বিশ্বনাথ রায়ের বৈধানিক বন্ধন শিথিল হইলে আমরা সুখী হইব।

এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেস কাউন্সিলারবৃন্দের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা দূর করিবার মানসে এখন হইতে প্রতি সপ্তাহে মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সভা আহুত হইবে এবং সেই সভায় এসোসিয়েশন যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন তাহাই দলগত নির্দ্দেশ বলিয়া ঘোষিত হইবে এবং যাহাতে প্রত্যেক কাউন্সিলার উক্ত নির্দ্দেশ পালন করেন সেজন্য এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। এই ভাবে কার্য্য করিলে যে কংগ্রেস কাউন্সিলারদের মধ্যে দলগত শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে, তাহা সুনিশ্চিত। এসোসিয়েশনের সভ্যদের মধ্যে দলগত শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে 'হুইপ'দিগের দায়িত্বই অধিকতর। আশা করি অভিজ্ঞ 'হুইপ্' শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাধুখাঁ স্বীয় কর্ম্মদক্ষতার গুণে কংগ্রেস কাউন্সিলারদের মধ্যে দলগত নিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন।

(বিলাসী)

"অন্নপূর্ণার মন্দির" (কালী ফিল্মস্)

প্রযোজক : শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ; কথা ও কাহিনী : নিরুপমা দেবী ; চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক : তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ; সহঃ-পরিচালক : শ্রীকৃষ্ণ সরকার ; চিত্র-শিল্পী : সুরেশ দাস ; সহকারী : বিভূতি লাহা ; শব্দযন্ত্রী : জগদীশ বসু ; সুরশিল্পী : ধীরেন লাহিড়ী ; সহকারী : সমর বসু ও কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় ; রসায়নাগারাধ্যক্ষ : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ; সহকারী : শৈলেন ঘোষাল, গোপাল গাঙ্গুলী, ননী চাটার্জ্জি ও ধীরেন দাস ; শিল্প-নির্দ্দেশক : পরেশ বসু, সম্পাদক : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; সহকারী : সন্তোষ গাঙ্গুলী ; ধারা-রক্ষী : রমণী ঘোষ।

ভূমিকা

বিশ্বেশ্বর-ছবি বিশ্বাস ; রামশঙ্কর—ফণী রায়, হরিশঙ্কর—মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ—বুলা ; নরু—তারাপদ ভট্টাচার্য্য, সান্ন্যাল—শচীন চট্টোপাধ্যায় ; ডাক্তার—রামচন্দ্র মিত্র ; সুধীর—জীবন বসু, নকুল—শম্ভু রায়চৌধুরী (এঃ) ; অন্নপূর্ণা—মনোরমা ; জাহ্নবী—প্রভা ; সতী—মায়া মুখার্জ্জি ; সাবিত্রী—সাবিত্রী (পাঁচী), ক্ষেন্তু—প্রকাশমণি।

চিত্র-পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং (কলিকাতা) "উত্তরা"য় গত ১৩ই জুন শনিবার প্রথম উদ্বোধন।

"অন্নপূর্ণার মন্দির"-এর গল্প আবার বলা আমাদের বাহুল্য মনে হচ্ছে। তবুও, হয়তো ভালো মনে নেই, হয়তো বা অনেক কালের আগের পড়া—তাই, ছোট্ট্র মধ্যে আবার বলছি। এতে নায়িকা হচ্ছে ষোড়শী এক সুন্দরী—সতী। গরীব বাবা আর মা, নাটুকে দাদা, এক বোন, আর ছোট্ট এক ভাই। দুঃখে কাটে দিন। তার বিয়ে হবে সতী জানতো—গ্রামের বড়লোক বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে। কিন্তু, বিধির খেয়াল হ'লো কি জানি, সে বললে—না। তাই বলে সমাজ বসে থাকবার নয়। বিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দিতেই হ'লো এক বৃদ্ধের সঙ্গে। ভাঙ্গা বাঁধে জোয়ারের বাণ মানবে কেন! সাতদিন পর সতী তাই ফিরে এলো। হাতে শাখা নেই, সিঁথের সিঁদুর নেই, কাপড়ে পাড় নেই—এই যা... দারিদ্র্য এ দিকে চরম সীমায় উপস্থিত। বিয়ের জন্য বাড়ি বাঁধা ছিলো, মহাজন এলো দখল করতে। মান আর থাকে না। জমিদারের ছেলে নরেন, সতীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে বায়না দিতে চেয়েছিলো অনেকগুলো টাকা মরিয়া হ'য়ে সতী তাই গ্রহণ করলে। কিন্তু, বিধির ভুল ততদিনে ভেঙেছে। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে বিয়ে করলে সতীর বোন সাবিত্রীকে। মহাজন টাকা নিয়ে খুসী মনে ফিরে গেলো। মনে পাপ নিয়ে সতী তখন সংসারে আর থাকতে চাইলে না। তাই, হাতে বিষ, চোখে কিসের আলো, সতী চলে মরণের অভিসারে!......

পরিচালনায় পরিচালক তিনকড়িবাবু মঞ্চ-নাটকের যে মুকুট তাঁর মাথায়—তার প্রভাব পর্দ্দায় গোপন রাখতে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। মুকুটটিকে উড়নী দিয়ে আরো তাঁকে ঢাকতে হবে। সিনেমার সুন্দর দেবতাকে এখনও তাঁর ডাকতে হবে।

গল্পটিকে সিনেমার উপযোগী করতে চিত্রনাট্যকার অনেক অদল বদল করেছেন সত্য। মূল উপন্যাসে আছে তিনটে মৃত্যু। প্রথমটি সতীর স্বামীর, দ্বিতীয়টি সতীর বাবার, তৃতীয়টি সতীর নিজের। শোকের ওজন কম করতে তিনকড়িবাবু দ্বিতীয়টি বাদ দিয়েছেন। এই আচরণ তাঁর প্রশংসাজনক। তারপর মূল উপন্যাসে আছে—প্রথমে সতীর আত্মহত্যা, তারপর সাবিত্রীর বিয়ে। মৃত্যুর আগে বিশ্বেশ্বরকে সে বড় একটা চিঠি লিখে যায়। তাতেই থাকে তার মনের কথা। তারই অনুরোধে বিশ্বেশ্বর সাবিত্রীর বিয়ের জন্য এগিয়ে যায়। তবে, নিজের সঙ্গে নয়, পাত্র ছিল আরেকজন। কিন্তু, বিয়ের বাসরে বরকর্ত্তার সঙ্গে তার পণ নিয়ে লাগে গোলমাল। বরকর্ত্তা বর নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, ওদিকে বিয়ের লগ্ন বয়ে যায়। উপায় না দেখে, বিশ্বেশ্বর বরের আসনে নিজেই ব'সে পড়ে। তারপর অন্নপূর্ণার মন্দিরের বড় করে' প্রতিষ্ঠা, সাবিত্রীর সন্তান আগমন, ইত্যাদি। কিন্তু, তিনকড়িবাবু এ সব কেটে ছোট করেছেন। জমিদারের ছেলে নরেনের কাছ থেকে সতীর অর্থ গ্রহণের কারণটাকে তিনি বেশ বড় করেছেন। প্রথমে সে টাকা কিছুতেই নিতে চায় নি। নরেনকে গালাগালি করে' সে ফিরে আসে। এসে দেখলে—মহাজন বাড়ি দখল করতে প্রস্তুত। মা কেঁদেকেটে কত মিনতি করছেন! এ অপমান থেকে বাঁচাতে সে ফের ছুটে' যায়। নরেনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসে। কিন্তু, এসে দেখে—বিশ্বেশ্বর আর অন্নপূর্ণা ইতিমধ্যেই সে বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করেছে। কেন?—না, সাবিত্রী তখন যে বিশুর বউ!... আত্মহত্যার আগে প্রদীপের শিখায় সতী নরেনের দেয়া নোটগুলোকে যে পুড়িয়ে ফেললে—সেটা তিনকড়িবাবুর সৃষ্টি। নিরুপমা দেবী সতীকে দিয়ে সে নোটগুলোকে চিঠির সঙ্গে বিশ্বেশ্বরকে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বেশ্বরই সেগুলো ফেরৎ দিয়েছিলো নরেনকে।

এই অদলবদলটা ভালোর দিকে সন্দেহ নেই। উপযুক্ত বিশ্লেষণে এতে চিত্রের চিত্রত্ব হয়তো

ফুটে উঠতো বেশী। কিন্তু, দুঃখের বিষয় শেষ পর্য্যন্ত সেটা ঘটে' আর ওঠেনি। শেষের দিকটা এত ছোট করাতে, বইয়ের অন্নপূর্ণার মন্দির গঠনের যে বিশেষ বিশালতা—সেটা, মনে হয়, একটু বাদ পড়েছে।

চিত্রটির অভিনয় ভালো বৈ কি! এ বিভাগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রামশঙ্করের অংশে শ্রীফণী রায়ের অদ্ভুত চরিত্রাভিনয়। সাংসারিক দারিদ্র্যের অতি শুষ্ক আবহাওয়ায় মানুষের প্রকৃতি কোন রূপে যে রূপসী—তার হুবহু চিত্র ইনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অংশে এর কাজ শুধু মনে রাখবার মত নয়, মনে থাকার মত। বিশ্বেশ্বর বা বিশুর ভূমিকায় চিত্ররাজ্যে নবাগত শ্রীছবি বিশ্বাস তাঁর প্রথম অভিনয়ের তুলনায় মোটেও খারাপ করেন নি। কিন্তু, ভবিষ্যতে কথা বলার ভঙ্গীতে মঞ্চের ছায়া যাতে না পড়ে—তার দিকে ছবিবাবুর যথেষ্ট নজর রাখতে হবে। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্যও এ রাজ্যে প্রায় নতুন। এর অভিনয় তেমন প্রাণস্পর্শী হয়নি। ডাক্তারের ভূমিকায় শ্রীরামচন্দ্র মিত্র স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে একে এর চেয়ে বড় ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে। পুরুষদের অভিনয়ে এ ছাড়া অন্যান্য অংশ মঞ্চের অত্যাধিক আবহাওয়ায় অনুল্লেখযোগ্য।

স্ত্রী-ভূমিকায় একটি নবাগতার চমৎকার সাফল্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ইনি হচ্ছেন—সাবিত্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী সাবিত্রী। ক্যামেরার চোখে এর চেহারা ভালো, গলা ভারি মিষ্টি, চালচলন অভিনয়ও ভারী সরল, ভারী স্বাভাবিক। অদূর-ভবিষ্যতে এর সোনালী সুনাম আমরা আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি। সতীর অংশে শ্রীমতী মায়া মুখার্জ্জীকে মানিয়েছিলো সধবার সিঁথিতে সিঁদুরের মত। অভিনয়ে আগের চেয়ে ইনি উন্নত হয়েছেন সন্দেহ নেই। অপরূপ রূপ প্রতিমায় মনে হ'লো প্রাণের কিছু প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর মুখে ছোটো ছোটো কথা দিয়ে কালে একে একজন অভিনেত্রী করে' তোলা যায় না কী?......জাহ্নবীর সকরুণ ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা চিত্রাভিনয় থেকে মঞ্চাভিনয়ই করেছেন বেশী। কিন্তু, একেবারে হতাশ-জনক অভিনয় করেছেন অন্নপূর্ণার মত প্রয়োজনীয় ভূমিকায় শ্রীমতী মনোরমা। এর বাচনভঙ্গী, এর হাবভাব, এর চলাফেরা—কোনটাই দর্শকের প্রাণস্পর্শ করতে সক্ষম হয় নি। উন্নত না হ'তে পারলে ভবিষ্যতে পর্দায় এঁকে না দেখতে পেলে সুখী হ'ব।

শ্রীসুরেশ দাসের ফটোগ্রাফী বেশ ভালোই বলতে হবে। বিশেষ করে' মেঘলা আকাশ, আর বহির্দৃশ্যগুলো।

শব্দযন্ত্রে শ্রীজগদীশ বসুর কাজ ভালোই বলতে হবে।

আবহাওয়া সঙ্গীতে শ্রীনীরেন লাহিড়ী নিজের বিশেষত্ব কিছুই দেখাতে সক্ষম হন নি।

সম্পাদনায় ইচ্ছে করলেই বৈদ্যনাথ বাবু চিত্রখানায় আবশ্যকীয় গতির বৃদ্ধি করতে পারতেন।

আর তা'ছাড়া, পরেশবাবুর শিল্প-নির্দ্দেশনা রসায়নাগারের কাজ, দৃশ্য-সংস্থাপন, সাজ-সজ্জা ইত্যাদি সবই ভালো।

সমালোচনায় শেষে এটুকু স্বীকার করতে অবিশ্যি আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই—যে—গত সাড়ে পাঁচ মাসে যতগুলো ছবি কোল্‌কাতায় তৈরি হয়েছে, তার ভেতর "অন্নপূর্ণার মন্দির" সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। এর রূপ, এর গুণ সাধারণে চিনবেই। চির-পরিচিত বাঙলা গৃহের চির-দুঃখী এক মেয়ে, যার জীবন—যার যৌবন শুধু চোখের জলেই কাটলো তার কাহিনী, তার সকরুণ সুর "উত্তরা"য় সপ্তাহের পর সপ্তাহ সবার বুকে গভীর একটা দাগ রেখে যাবেই।

ভোট ভণ্ডুল (কালী ফিল্মস্)

প্রযোজক : প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী।

কথা ও কাহিনী : বীরেন ভদ্র।

পরিচালক : জ্যোতিষ মুখার্জ্জী।

চিত্র-শিল্পী : সুরেশ দাস।

শব্দযন্ত্রী : জগদীশ বসু।

চরিত্র : গঙ্গারাম—সন্তোষ দাস, হারুকেশব শৈলেন চৌধুরী, ছিদাম মুদী—উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবহরি—দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক—মনোমোহন ঘোষ, মনোহরা—ফুল্লনলিনী, মাতঙ্গিনী—নীরদাসুন্দরী প্রভৃতি।

চিত্র পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং (কলিকাতা)

প্রথম মুক্তি : 'উত্তরা', শনিবার, ১৩ই জুন ১৯৩৬।

"অন্নপূর্ণার মন্দিরের"-র সঙ্গে এই হাসির ছবিখানা দেখানো হ'চ্ছে। ছবির গল্প ও পরিচালনার গুণে ছবিখানা সবাইকে হাসিয়েছে খুব। মজলিস জমাতে মজলিসী মুখুয্যে ওস্তাদ, তাই "ভোট-ভণ্ডুল" মজলিসটিও তার হাতে পড়ে বেশ জমে উঠেছে। ছবিখানার আলোক-চিত্র, শব্দ-স্থিরীকরণ, সুর-সংযোজনা সম্বন্ধে অভিযোগ করবার কিছু নেই।

অভিনীত চরিত্রগুলি মেগাফোনে যাঁরা রেকর্ডে অভিনয় কোরেছেন তাঁরাই নেমেছেন। এদের মধ্যে উমাপদ বাঁড়ুয্যে, দেবীদাস বাঁড়ুয্যে, সন্তোষ দাস, শৈলেন চৌধুরী, মনোমোহন ঘোষ, নীরদাসুন্দরী, ফুল্লনলিনী প্রভৃতি সবাই সুঅভিনয় কোরেছেন।

মোটের ওপর "ভোট-ভণ্ডুল" দেখে সবাই যে খুব আনন্দ পাবেন—এ নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

কালী ফিল্মস্

সুকুমার দাশগুপ্তের ''আশিয়ানা" প্রায় সমাপ্তির পথে এসেছে। শোনা যাচ্ছে, এই ছবি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের লেখা আর একটা হিন্দি গল্প এখানে তোলার মনস্থ কোরেছেন। নবীন পরিচালকদের মধ্যে সুকুমারের ওপর আমাদের আস্থা খুব বেশী—সেজন্যে তিনি নতুন কিছু কোরছেন শুনলে আমাদের মন আপনা থেকেই উল্লসিত হ'য়ে ওঠে।

* * *

জ্যোতিষ মুখুয্যের "মডার্ণ লেডী" বা হিন্দী "তরুণী"-র মহলা খুব চলছে—শুটিং দু' এক দিনের মধ্যেই সুরু হবে।

* * *

নরেশ মিত্তির এখানে "সরলা" তুলবেন এ খবর বহুদিন আগেই আমরা জানিয়েছি। সম্প্রতি ছবিখানা মহলায় পড়েছে--আসচে মাসের গোড়া থেকেই শুটিং আরম্ভ হবে। এতে মূল কয়েকটা ভূমিকায় বোধ হয় নামছেন এরা : নীলকমল—নরেশ মিত্র, শশীভূষণ—অহীন্দ্র চৌধুরী, গদাধর—তুলসী লাহিড়ী, সরলা—মায়া মুখার্জ্জি, প্রমদা—রাণীবালা, শ্যামা—শিশুবালা। ছবিখানা নির্ব্বাকযুগে তুলে গাঙ্গুলী মশাই বেশ সুনাম পেয়েছিলেন। সবাক্-চিত্রে তিনি নিজেই এ ছবিখানা তুললে আমাদের মনে হয় ভালই হ'ত। কারণ, পরিচালক হিসেবে নরেশ মিত্তিরের কোনও প্রতিভার পরিচয় আমরা এ অবধি পাই নি—আর তাঁর ওপর আমাদের সামান্য যা'ও আস্থা ছিল, "মহানিশা" দেখে তাও নষ্ট হ'য়েছে। গাঙ্গুলী মশাই কী বলেন?

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

এ হপ্তায় "সোনার-সংসারে" রমেশের পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে মাঝরাত্তিরে ডাকাতির একটা উত্তেজক দৃশ্য তোলার কথা আছে।

* * *

পরিচালক কারদারের "বাঘে-সিপাহী"-র শুটিং দ্রুতগতিতে চলেছে। এই ছবিতে বিব্বলাকুমারী ও গুল হামিদ নায়ক-নায়িকা সেজে খুব নাকি ভাল অভিনয় কোরছেন। আর কারদার ছবিখানা ভাল করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা কোরছেন।

ফ্রান্‌কলিন্ প্রান্‌ভিল

মহামান্য ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার সৌজন্যে এ হপ্তা থেকে এদের প্রথম বস্ত্র-চিত্র "ফিল-নিশিন" আরম্ভ হ'য়েছে। ত্রিবাঙ্কুরের সরকার এই দলকে যথাসাধ্য সাহায্য কোরতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমন কী এখানকার প্রসিদ্ধ শিকারী মিঃ এস্. সি, এইচ্ রবিনসনও "চন্দ্রশেখর" নামে একজন অভিনেতাকে দিয়ে সাহায্য কোরেছেন।

ডি-জি-টকীজ

"দ্বীপান্তরে"-র শূটিং-এ গত হপ্তা কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিও মশ্‌গুল ছিল। নাচ, গান, বাজনা, হুড়োহুড়ি, লুটপাটি, ছেলে, মেয়ে মদ, মাংস সবই ছিল এ হোটেল দৃশ্যে। আর ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে, রুবি (করুণা বসু), হোটেল-সর্দ্দার (ডি-জি), আর 'বয়' (কালুবাবু)। সুন্দর নাকি এরা সব অভিনয় কোরেছেন। যাঁরা সেটে ছিল তাঁরা সবাই নাকি এই দৃশ্য খুব উপভোগ কোরেছে।

"কুহু-কেকা"

পপুলার পিক্‌চার্সের সঙ্গীত-মুখর "কুহু-কেকা"য় যে ছোট মেয়েটি হাব-ভাবে ছবিখানাকে সজীব কোরে তুলেছিল—সে মেয়েটি অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ সেনের কন্যা। পাশ্চাত্যে শিরলী টেম্পলের মত ছোট মেয়েরা অভিনয় কোরে আজ বিশ্ব-জোড়া নাম পেয়েছে। এই মেয়েটিও যদি আর কিছুদিন অভিনয় করে তা' হ'লে বাঙ্গলার শিরলী টেম্পল্ হওয়াও এর আশ্চর্য্য নয়।

কসমোপলিটান পিক্‌চার্স

এরা আপাততঃ তিলজলার এভারগ্রীণ পিক্‌চার্স ষ্টুডিওতে একখানা হিন্দি ছবি তুলবেন। মহলা শেষ হ'য়েছে—ছবিখানার শূটিং সুরু হবে আসচে হপ্তা থেকে।

আসচে শনিবার থেকে এই চিত্রগৃহে ফ্রেডি বারথোলোমিউ অভিনীত চিত্ত-চমকপ্রদ "প্রোফেশন্তাল সোল্‌জার" দেখানো হবে। ছবিখানা দেখে সবাই যে খুব আনন্দ পাবেন—একথা নিঃসঙ্কোচে আমরা বলতে পারি।

———

খোরপোষের মামলা

সরকারের আবেদন

আন্তরিক নয়—কৌশল-সঞ্জাত

শ্রীমতী রাসমণি দেবী তাঁহার কন্যা মহামায়ার খোরাক পোষাকের জন্য মাসিক ৫০ টাকা হিসাবে দাবী করিয়া নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে আলিপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এল, কে, সেনের আদালতে একটি খোরাক পোষাকের মামলা উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীমতী রাসমণির উক্তিতে প্রকাশ, উক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার কন্যা শ্রীমতী মহামায়ার পিতা। উক্ত মামলা স্থানান্তরিত করিবার জন্য উক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার কানলিফ ও বিচারপতি মিষ্টার হেণ্ডারসন গত সোমবারে উক্ত আবেদনের বিচার শেষ করিয়াছেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি বলিয়াছেন, "আবেদনটি অগ্রাহ্য করা হইল। আমার অভিমত এই যে, উহা আন্তরিক নয়—কৌশল সঞ্জাত।"

উক্ত আবেদনের শুনানীর কার্য্য আরম্ভ করিয়া শ্রীযুত বি, সি, চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাঁহার মক্কেল বিশেষ প্রসিদ্ধ নাগরিক। তাঁহার বিরুদ্ধে শ্রীমতী রাসমণি দেবী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছেন যে, নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার কন্যার পিতা এবং তিনি তাহার জন্য খোরাক পোষাক চাহেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা করিয়াছেন তাহার ফলে তাঁহার মক্কেলের মনে গুরু অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। সে জন্য তিনি মামলাটি স্থানান্তরিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার মক্কেলের বিরুদ্ধে 'শুনাকথার' প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ফরিয়াদী শ্রীমতী রাসমণিকে জেরা করিবার সুযোগ প্রদান করেন নাই। আবেদনকারীর য়্যাডভোকেট গত ২৫শে মে যে অবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত পরিত্যাগ করেন, তাহা বর্ণিত-আবেদনপত্র ব্যারিষ্টার উপস্থিত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ হইতে জানা যায়, তিনি ইতিপূর্ব্বেই ঐ মামলা সম্বন্ধে অভিমত গঠন করিয়াছেন। যে ম্যাজিষ্ট্রেট ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণ সম্বন্ধে অভিমত গঠন করিয়াছেন এবং মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে উক্ত নারীকে যে ভাবে জেরা করা উচিত সেই ভাবে তাহাকে জেরা করিবার সুবিধা যে ম্যাজিষ্ট্রেট আবেদন-কারীর পক্ষের য়্যাডভোকেটকে প্রদান করেন নাই, সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহার মক্কেলকে পুনরায় প্রেরণ না করিবার জন্য ব্যারিষ্টার প্রার্থনা করেন।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, তাঁহার মক্কেল নূতনভাবে বিচার প্রার্থনা করেন। এই আদালত যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণ সম্বন্ধে সেইরূপ অভিমত গ্রহণ করিবেন সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহার মক্কেল আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ লাভের প্রার্থনা করেন।

বিচারপতি মিষ্টার কানলিফ বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত এডভোকেটের কথান্তর হওয়ায় উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন-কারী সুবিচার পাইবেন না এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি মামলাটি স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। আইনের প্রতি নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি মামলা স্থানান্তরিত করিতে অভিলাষী হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কথান্তর উপস্থিত করিতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারপতি একবারও এরূপ বলেন যে, পুলিস আদালতের এ ভদ্রলোকের আইনের প্রতি নিষ্ঠা নাই। হাইকোর্টের বিচারপতি বলেন, আপীল আদালত এই নীতি গ্রহণ করিতে পারেন না। হাইকোর্টের বিচারপতি মনে করেন য়্যাডভোকেট পরিবর্ত্তন করা আসামীর উচিত।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় বলেন, য়্যাডভোকেট আদালত পরিত্যাগ করিয়াছেন এই অ[illegible] তিনি মামলাটি স্থানান্তরিত করিবার প্র[illegible] করেন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার কৈফিয়তে যাহা বলিয়াছেন সেই জন্য তিনি মামলাটি স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। উহা হইতে ইহা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, ম্যাজিষ্ট্রেটদের জন্য হাইকোর্ট যে বিধান বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সেই বিধান-অনুসারে কার্য্য করিতে অভিলাষী নন।

ব্যারিষ্টার আরও বলেন, মামলাটি স্থানান্তরিত করিবার জন্য অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আবেদন করা হইয়াছিল। উকিল ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে কলহ মনে করিয়া তিনি ঐ আবেদন ডিসমিস করিয়াছেন, ব্যারিষ্টার যে সকল বিষয় জানাইতেছেন, ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সকল বিষয় বিবেচনা করেন নাই।

হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার কানলিফ ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্তির উল্লেখ করেন। শ্রীযুত পাইন সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন, এরূপ অসঙ্গত ব্যবহার আমি কচিৎ দেখিয়াছি। ম্যাজিষ্ট্রেট আরও বলিয়াছেন, "ইহা অত্যন্ত আপত্তিকর। আদালতের অনুমতি লইয়া আদালত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি বিনানুমতিতে আদালত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করি নাই" হাইকোর্টের বিচারপতি বলিয়াছেন, শ্রীযুত সেন অভিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট, অপর পক্ষের কোনও দোষ থাকিতে পারে।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ঐ ব্যবহার অন্য দৃষ্টিতে দেখা যায়।

উক্ত আবেদন সরাসরি ভাবে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

———

দেব দত্ত ফিল্ম্‌সের প্রথম বাঙ্গালা অর্ঘ্য
রজনী
বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা
প্রধান ভূমিকায়
শ্রীমতী চারু বালা
শ্রীমতী রেনুকা রায়
শ্রীমতী ইলা দাস
অহীন্দ্র চৌধুরী
রবি রায়
মৃণাল ঘোষ
অমিয় গোস্বামী
প্রভৃতি
রূপবাণী-তে আগত প্রায়
প্রয়োগ-শিল্পী : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোক-চিত্র-শিল্পী : গীতা ঘোষ :: শব্দ-যন্ত্রী : সমর ঘোষ

সি, বি

লীগের খেলাগুলি শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই। এবার প্রায় সব খেলাগুলিই বৃষ্টির মধ্যে না হলেও কাদা মাঠে খেলা হচ্ছে। অন্যান্য বৎসরে হঠাৎ কোন কোন দিন ফুটবল লীগের খেলাগুলি কাদা মাঠে এবং বৃষ্টির মাঝে হয়েছে। কিন্তু এবারে মাঠের অবস্থা হঠাৎ এক এক দিন ভাল পাওয়া যাচ্ছে। এর জন্যে যে অনেক খেলার বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে তা স্বীকার করতেই হবে। কলিকাতায় যে তিনটি ঘেরা মাঠ আছে তার মধ্যে কেবল ক্যালকাটা মাঠেই জলকাদায় খেলা চলে। বিশেষ করে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল মাঠটির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এই দুইটি ক্লাবের পৃথক মতের জন্য একত্রে কোন কাজ আজ অবধি সুশৃঙ্খলায় হতে দেখা যায় নি। বোধহয় সেই জন্যই মাঠটির এই দুরবস্থা। এই দুইটি ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষদের সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করা উচিৎ যাতে করে এদের মাঠটির অবস্থা একটু ভাল হয়। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিকারে যে অর্দ্ধেকটি আছে সেটির অবস্থা তবু মন্দের ভাল। কিন্তু মোহনবাগান অধিকৃত বাকি অর্দ্ধেক মাঠের অবস্থা একেবারে অচল। বিশেষ করে মোহনবাগান ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় খেলোয়াড়রা ভাল খেলতে না পারলে কর্ত্তৃপক্ষরা খেলোয়াড়দের উপর দোষারোপ করেন। যেদিন মোহনবাগান ক্লাব নিজ মাঠে খেলে হেরে যায় সেদিনই ঐ ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষেরা মাঠের চরম অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করেন। মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করান উচিৎ। কারণ মোহনবাগান ক্লাব যা করে তাই ভাল—সেদিন চলে গেছে। ১৯১১ সালের অর্জ্জিত গৌরবে এখন ভাটার টান ধরেছে।

মহামেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্সের খেলাটি গত বুধবার মোহনবাগান মাঠে হয়েছিল। দুইটি টিমই যথাসম্ভব শক্তিশালী ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরিয়ান্স ক্লাব বেশ ভাল খেলেও ৪—১ গোলে হেরে গেছে। এরিয়ান্স ক্লাবের প্রায় সকলেই খালি পায়ে খেলেছিলেন। সেই জন্যই তাদের অত বেশী গোলে হারতে হয়েছে। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের পক্ষে রহিম তিনখানি এবং সাবু একখানি গোল দেন। এরিয়ান্সের সার্প প্রায় মিনিট পাঁচেক বাকী থাকতে একখানি গোল শোধ দেন। এরিয়ান্সের 'গোলকিপার' ভট্টাচার্য্যের অন্ততঃ দুইখানি গোল বাঁচান খুব উচিৎ ছিল। গত শুক্রবার ক্যালকাটা মাঠে কাষ্টমস্ এবং মহামেডান স্পোর্টিংয়ের রিটার্ণ খেলাটি হয়েছিল। এবারেও কাষ্টমস্ খুব ভাল খেলে 'ড্র' করেছে। এই খেলাটির ফল হয়েছে ১—১। রহিম এবং ডিফোলটস্ যথাক্রমে মহামেডান স্পোর্টিং এবং কাষ্টমসের পক্ষে গোল দেন। এ খেলাটির ভিতর মোহন বাগানের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় কে, ভট্টাচার্য্য সব চেয়ে ভাল খেলেছিলেন। তিনি এত খেটে খেলেছিলেন যে মাঠের প্রায় সব জায়গাই তাঁকে দেখা গিয়াছিল এবং আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে তিনি বুট পায়ে খেলেছিলেন। কাষ্টমসের গোলটি তাঁর চেষ্টাতেই হয়েছিল। কাষ্টমস এত ভাল খেলেছিল যে সেদিন মহমেডান স্পোর্টিং হেরে গেলে কেহ বিস্মিত হ'ত না। মহমেডানের ওসমান, রহিম এবং নুরমহম্মদ ভাল খেলেছিল। কাষ্টমসের দু'একটি নামকরা খেলোয়াড় যদি আর একটু মনোযোগ সহকারে খেলতেন তাহলে হয়ত কাষ্টমসের জেতা সম্ভব হত। গত শনিবার ক্যালকাটা এবং মোহনবাগানের রিটার্ণ গেমটি শেষোক্ত মাঠে হ'য়ে গিয়েছে। এই দুইটি ক্লাব পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই কারণে এই খেলার দিনে অত্যধিক বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মাঠে বেশ ভীড় হয়েছিল। যদিও সকলেই ধারণা করেছিলেন যে মোহনবাগান খুব বেশী গোল সংখ্যায় হারবে কিন্তু খেলার শেষে তাঁদের সে ধারণার জন্য লজ্জিত হতে হয়েছিল নিজেদের কাছে। এই খেলাটিতে মোহন বাগান অপ্রত্যাশিতভাবে ভাল খেলেছিলেন। মোহনবাগানের খেলা যে এত উচ্চ ধরণের হবে তা সেদিন কেহ আশা করেনি। সেদিন মোহনবাগানের অন্ততঃ দুটি গোলে জেতা উচিত ছিল। সন্তু চৌধুরী এবং নন্দু দুটি অব্যর্থ গোল মিস্ কোরেছিলেন। ক্যালকাটার আর্মষ্টং, বারোজ এবং কোকোনাটো বেশ ভাল খেলেছিলেন। মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের ভিতর কে, দত্ত, মন্মথ দত্ত, বিমল মুখার্জ্জী সব চেয়ে ভাল খেলেছিলেন। এই ম্যাচে কে, ব্যানার্জ্জী সেণ্টার হাফ খেলেছিলেন। তাঁর খেলা খুব উচ্চস্তরের না হলেও একেবারে অচল নয়। সকলের পায়েই বুট দেখা গিয়েছিল কেবল সুশীল চ্যাটার্জ্জী দ্বিতীয় হাফে খালি পায়ে খেলেছিলেন। গত সোমবার মোহনবাগান মাঠে মোহন বাগান এবং কালীঘাটের খেলাটি হয়েছিল। প্রথমার্দ্ধে মোহনবাগান ভাল খেলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে কালীঘাট মোহনবাগানকে

একেবারে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। এই খেলায় কালীঘাট ২—১ গোলে জিতেছে। টিমেই বেশ অদল বদল দেখা গেল। কালীঘাট টিমের ব্যাকে জোহানিস নামে একটি নূতন খেলোয়াড়কে দেখা গেল। রাইট ইনটিও একটি নূতন প্লেয়ার। ব্যাকে জোহা'নস খুব ভাল খেলেছেন। ইনিও রেঙ্গুন থেকে এসেছেন। এর সাহায্যে কালীঘাট ক্লাব যথেষ্ট শক্তিশালী হবে। মোহনবাগান ক্লাব আবার হঠাৎ কালি এবং বড়খোকাকে নাবিয়েছিলেন। এদের ভিনের মধ্যে কালি দেব একেবারে অচল। তাঁর ইচ্ছা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফুটবল খেলবেন। এই খেলাতে কে, ব্যানার্জ্জীকে কেন সেণ্টার হাফে খেলান হল না বুঝতে পারা গেল না। মোহনবাগানের আর কতদিন experiment চলবে।

বুধবার

মহামেডান—এরিয়ান্স	৪—১
ই, বি, আর—ড্যালহাউসী	২—১
ব্ল্যাক ওয়াচ—কাষ্টমস	২—০

বৃহস্পতিবার

কালীঘাট—এ্যাটাচড সেকসন	৩—০

শুক্রবার

কাষ্টমস—মহামেডান	১—১
ই, বি, আর—পুলিশ	২—০
ব্ল্যাকওয়াচ—এরিয়ান্স	২—০

শনিবার

মোহনবাগান—ক্যালকাটা	০—০
কালীঘাট—ঈষ্টবেঙ্গল	১—১
মহামেডান—ড্যালহাউসী	২—০

সোমবার

কালীঘাট—মোহনবাগান	২—১
এরিয়ান্স—ঈষ্টবেঙ্গল	১—০
পুলিশ—এ্যাটাচড সেকসন	৩—০
ড্যালহাউসী—কাষ্টমস	১—১

মঙ্গলবার

ঈষ্টবেঙ্গল—ই, বি, আর	০—০
ক্যালকাটা—এরিয়ান্স	০—০

চ্যারিটি ম্যাচ

গত রবিবার চুঁচড়াতে মোহনবাগান এবং কালীঘাট টিমে একটি চ্যারিটি ম্যাচ খেলা হয়। মোহনবাগান কালীঘাটকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে।

চাইনিজ টীম

গত বৎসর চাইনিজ টিম কলিকাতায় খেলতে আসবে বলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি আই, এফ, এ, শীল্ডের ফিকশ্চারে চাইনিজ টিমের নাম দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শেষ অবধি এই খবর গুজবে পরিণত হয়। কিন্তু এবার আর হয়ত ক্রীড়ামোদীদের হতাশ হতে হবে না। কারণ চাইনিজ টিমের ম্যানেজার মিঃ চেক্ ওয়া কলিকাতায় পৌছেছেন। ইনি যদি আই, এফ, এর সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করতে পারেন তা হলে আগামী ২রা জুলাই এই টিম্ কলিকাতায় পৌছবে। এরা ৪ঠা এবং ৬ই জুলাই দুটি ম্যাচ খেলবেন ঠিক হয়েছে। তবে কাদের সঙ্গে খেলবেন তা এখন জানা যায় নি। সেটা ঠিক হবে আই, এফ, এর সঙ্গে অন্যান্য সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি হলে।

ক্রিকেট

ভারতীয় দল গত ১০ই জুন সাণ্ডারল্যাণ্ড 'ডারহাম' কাউণ্টির সহিত দু'দিনের খেলা সুরু করে। বৃষ্টির জন্য খেলা আধ ঘণ্টা দেরীতে সুরু হয়। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ১৭৪ রাণ করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ২০৩ রাণ কোরে ডিক্লেয়ার করেন। ডারহাম প্রথম ইনিংসে ১৭৩ রাণ করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেটে ২০৩ রাণ কোরে ডিক্লেয়ার করেন। এতে ডারহাম দলের পাঁচ উইকেটে জয় হ'য়েছে। ভারতীয় দলের এই পরাজয় অতীব শোচনীয় বিষয়। 'ডারহাম' দ্বিতীয় শ্রেণীর কাউণ্টি-দিগের ভিতরও নিম্নস্তরের। সেই কারণে ভারতীয় দলের এই পরাজয় অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। এই খেলায় দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াজীর আলি 'নট্ আউট' থেকে ১৩৯ রাণ করেন।

ভারতীয় দলের উপর্য্যুপরি এই রকম ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ক্ষুব্ধ হ'য়ে বম্বে ক্রিকেট এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য অনেক সমালোচক এই দলের ক্যাপ্টেনের উপর দোষারোপ কোরছেন। তাঁদের মতে ভিজিয়ানা-গ্রামের মহারাজকুমার যথাযথভাবে ক্যাপ্টেনশি কোরতে পারছেন না। সি, কে, নাইডু কিংবা ওয়াজির আলি ক্যাপ্টেন হলে ভারতীয় দল এই অসম্মানের গ্লানি থেকে নিস্তার পাবে। কিন্তু আমাদের মতে এখন ক্যাপ্টেন পরিবর্ত্তন করা কোন রকমেই যুক্তিযুক্ত হবে না। তার পর এখন ক্যাপ্টেন পরিবর্ত্তন কোরলে মহারাজকুমারের যে অসম্মান হবে তা ভারতবর্ষের অসম্মান এবং ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল্ বোর্ডকে সমস্ত জগতের কাছে হেয় হতে হবে। ভারতীয় দলের পরাজয় আবহাওয়া এবং দুর্ভাগ্যের জন্যই হ'চ্ছে বলে মনে

দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়চৌধুরী

অসীম বীরত্ব, দুর্দ্দমনীয় সাহস, অবারিত প্রেম, অকুণ্ঠ প্রতিভা, অপূর্ব্ব ত্যাগ ও সীমাহীন দানের মহিমা নিয়ে যে মহাপুরুষ বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন—দেশসেবা ছিল যাঁর ধর্ম্ম, জীবনের কাম্য—যিনি দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু অকাতরে বিলিয়ে দিলেন, সেই যুগ-মানব, বিশ্বপ্রেমিক, স্বাধীনতার অগ্রদূত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্দেশ্যে আজ আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ কচ্ছি।

আজ আমার মনে পড়ে তাঁর মেছুয়াবাজারে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্ব্বাচনে প্রতিবাদপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা আর ফরিদপুর সম্মিলনে আবেগময়ী অভিভাষণ; মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও মৌলানা মহম্মদ আলীর মুক্তির প্রস্তাবে শ্বেতাঙ্গ সমিতির তীব্র কটাক্ষের নির্ভীক প্রতিবাদ আর ও'ডোর্ন সাহেবের হীন ইঙ্গিতের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর ও ১৯২৪ সালে শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তারে প্রতিবাদ সভায় অগ্নিময়ী মূর্ত্তি। মনে পড়ে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার বিপুল উদ্যমে ধর্ম্ম-যুদ্ধ অভিযান স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড্ডীন করার বিপুল প্রয়াস ও স্বদেশ-প্রাণ বীরেন্দ্রগণের আত্মদানের ধ্বংসলীলার বীরত্বপূর্ণ কাহিনী আর রণ-তরঙ্গ বিলাসী প্রমত্ত যুবকগণের প্রতি তাঁর উদ্দীপ্ত তেজপূর্ণ উৎসাহ বাণী।

সাহিত্য ও কাব্য

যাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাকিরণ সম্পাতে মনোবৃত্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য প্রতিভাত—সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিরন্তন-কল্পনা-বিলাসী অভিনব বৈচিত্র্যময় তেজোদীপ্ত মহাপুরুষ আর এই মর্ত্ত্যধরতে নেই—তবুও সেই বৈষ্ণবকুল চূড়ামণির হৃদয়োচ্ছ্বাস উন্মুক্ত বৈষ্ণব-স্তব গানের সকরুণ ভক্তি উচ্ছ্বাসে বাঙ্গলার গগনে-পবনে চিরপুলক ঝঙ্কার সঞ্চালিত, নারী প্রগতি নারী লাঞ্ছনার যুগে সেই সুপবিত্র গাথায় সঞ্জীবনী মন্ত্র লাঞ্ছিত বাঙ্গালী নারীর সম্মান রক্ষায় অনুপ্রাণিত, জাতীয় শক্তি উদ্দীপনের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র কাব্যে কথায় সমাহিত। তিনি ভক্তগণকে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ "উপহারে" লিখেছেন—

"মঙ্গী; কামনা শত লহ তুমি লহ,"

আবার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর আঁধার কক্ষে শেষ সীমার নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রতিক্ষায় কালাতিপাত করার ন্যায় দেশবন্ধুও যেন এই জন বহুল মহারণ্য হতে বিদায়ের সুযোগ খুঁজছিলেন। তাই "জাগরণে" জানালেন—

"………শেষ কর গান—
আমার জীবন ভরা বিশ্বের আহ্বান।"

আবার গাহিলেন—

"……কাণ্ডারী আমার
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।"

সর্ব্বস্ব দান করে বললেন—

"আমার যা আছে তাই লয়ে যাও সব
তার বেশী বৃথা আশা মিছে কলরব।"

আবার মরুময়ী অতৃপ্ত তৃষায় প্রাণের গানে ভাষা দিলেন—

"কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে চাই
অভিশপ্ত হৃদি মোর—গাহিতে পারিনা তাই।"

পরক্ষণেই সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে "তাপসী" রূপে গাহিলেন—

"সঁপেছি চরণে যত পুষ্প হাসি গান—
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া।"

গীতা বলেন—

"অনাশ্রিতঃকর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি য স
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরামগ্ন র্ণ চাক্রিয়ঃ"

দেশবন্ধুও যে কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করে স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করে গেছেন—তাঁকেও আজ আমরা পবিত্র "সন্ন্যাসী" আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হব না।

নাগরিক জীবন

দেশবন্ধু "কলিকাতা করপোরেশন পরিচালনায় যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন—সবার মনেই এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে

হয়। ক্যাপ্টেন বদলাইলেই যে দলের জয় হবে তার কোন স্থিরতা নেই। বাঙ্গলা এবং মাদ্রাজের ক্রিকেট এসোসিয়েশন এই মত পোষণ কোরে ভিজির নিকট তার কোরেছেন।

সি, এস, নাইডু

সি, এস, নাইডু এয়ার মেলে লণ্ডন পৌছেছেন।

ভারতীয় দলের 'নটলের' সঙ্গে যে খেলার কথা ছিল তাহা বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হ'য়েছে।

হকি

ভারতীয় হকি দল ১৬ই জুন দিল্লীতে সমবেত হ'য়েছেন। ১৭ই জুন তারিখে ঝাঁসি, ১৮ই তারিখে ভূপাল, ২১শে তারিখে মাদ্রাজ, ২৩শে তারিখে বাঙ্গালোর এবং ২৫শে তারিখে পুনায় খেলে ২৬শে জুন তারিখে বম্বে পৌছবেন।

মিঃ পি, গুপ্ত

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েসনের গত সভায় সভাপতি মিঃ ল্যাগডেন মিঃ গুপ্তকে ভারতীয় হকি টীমের সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ কোরেছেন। মিঃ গুপ্ত ঐ সভায় যাবার সম্মতি জানিয়েছেন এবং সম্ভবতঃ ২২শে জুন তারিখে কলিকাতা থেকে যাত্রা কোরবেন।

উঠেছিলো যে—একদিন এই প্রতিষ্ঠান বিরাট আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। তাঁর অন্তর্ধানে আজ এই মহানগরী, স্বায়ত্বশাসিত বিরাট পৌর প্রতিষ্ঠান "কলিকাতা করপোরেশন" ; দেশবন্ধুর সে আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়ে দলগত ও জাতিগত সঙ্কীর্ণতার আবর্ত্তনে নিমজ্জমান। সে শ্মশান-মরুতে আজ রাশীকৃত প্রেতের তাণ্ডব লীলা। কি দারুণ অদৃষ্টের পরিহাস! কি করুণ এ কাহিনী!!

এই বিরাট পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন রাশীকৃত পুষ্প-মাল্যে নয়—তাঁর নির্দেশিত কর্ম্ম সম্পাদনে। সেই অভাবনীয় কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন বিরাট মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তির শূন্যস্থান পূর্ণ করা আমাদের মতো ক্ষুদ্র কর্মীর পক্ষে সম্ভবপর না হলেও সেনাপতির পরিত্যাক্ত পতাকাবাহী সেনা হিসাবে তাঁর নির্দ্দেশিত পথে আমরা চলার অধিকারী।

তিনি যে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন সে যজ্ঞের হোমধূমের মাঝে আজো আমরা জাতীয় মিলনের আভাষ পাই। তাঁর পুরাতনের স্বপ্নেরা যেথে তমসাচ্ছন্ন দিনের পরপারে যবনিকার অন্তরালে—সে চরণ-চিহ্ন কাল অবগুণ্ঠনে ঢেকে রাখতে পারেনি—সেটা কোটী সূর্য্য-কিরণ ভাতিতে দীপ্তিময়ী হয়ে উঠেচে। সে গৌরবের স্মৃতি-জয়-যাত্রার গান—আমাদের জীবন যাত্রার যাত্রা গান হয়ে উঠুক্। *

* ['দেশবন্ধু দিবসে' শ্মশানে স্মৃতি মন্দির প্রাঙ্গনে পঠিত]

বিবিধ

কবিরাজ সত্যব্রত সেন

ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের পদত্যাগের জন্য কলুটোলার কেন্দ্রে যে উপ-নির্ব্বাচন আসন্ন তাহাতে আমাদের জনপ্রিয় বন্ধুবর কবিরাজ সত্যব্রত সেন কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন। কবিরাজ সত্যব্রতের জয়লাভ সুনিশ্চিত। তবে আমরা আশা করি, তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাউন্সিলাররূপে নির্ব্বাচিত হইবেন। কারণ কলুটোলার দুর্ভেদ্য কেন্দ্রে বর্ত্তমানে সত্যব্রতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বাতুলতা মাত্র।

হরিষে বিষাদ

গত সপ্তাহেই আমরা সংবাদ দিয়াছিলাম যে আমাদের সোদরপ্রতিম বন্ধুবর অধ্যাপক গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। গত শনিবার অপরাহ্নে তাঁহার পত্নী সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ হৃদ্‌রোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ সুনীল চন্দ্র বসুর আগমনের পূর্ব্বেই গৌরীনাথের মহিয়সী সহধর্ম্মিণী অকালেই পরলোক গমন করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য-পরিবারের সুখ-নীড়ে এই আকস্মিক শোকচ্ছায়াপাতে আমরাও মুহ্যমান।

ম্যালেরিয়া রোগের সংক্রামকতা

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া রোগ এত ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে এই রোগে মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও কিন্তু দেশের এত দুরবস্থা ছিল না। তখন দেশে এমন স্থানও ছিল যেখানে লোকে ম্যালেরিয়ার নামগন্ধও জানিতনা। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহারা বলেন যে, এনোফিলিস নামে এক প্রকার মশা আছে, ইহারাই ম্যালেরিয়ার বিষ এক দেহ হইতে অন্য দেহে ছড়াইয়া থাকে। সত্য বটে, এনোফিলিস ম্যালেরিয়া বিষ বাহকের কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয় ইহাই ম্যালেরিয়ার সংক্রামকতায় একমাত্র সহায়ক নহে। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগ্রামগুলিতে, বিশেষতঃ ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ঢাকা প্রভৃতি জেলায়, সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত মশা দেখা যায়। পূর্ব্বে অবশ্য আরও কম সময়ের জন্য মশা দেখা যাইত; কারণ তখন এখনকার মত এত ব্যাপকভাবে পাটের চাষ হইত না। এই কয়মাস ব্যতীত বৎসরের বাকী কয়টী মাসে মশা একেবারেই দেখা যায় না। কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি হইলেই মশা মরিয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়।

বিশেষজ্ঞগণের মতে বর্ষাকালেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইয়া থাকে। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি যে অনেক সুস্থকায় লোক ফাল্গুন মাসেও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়; আর এই আক্রমণও এত ব্যাপক যে বাড়ী পিছু দুই চারি জন করিয়া ভুগিয়া থাকে। আমার মনে হয় যে আবহাওয়ার দোষেই এই আক্রমণ হইয়া থাকে। যে গ্রামে ঝোপ জঙ্গল, ডোবা নালা পচা পুকুর বেশী, সেই গ্রামেই ম্যালেরিয়া অধিক। এই ধারণা অনেকাংশে সত্য বটে, কিন্তু এমন দেখা গিয়াছে যে এই সমস্ত অপরিস্কৃত এবং অসংস্কৃত স্থানগুলিকে পরিস্কৃত করার পরেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তাই এই সংক্রামকতার ব্যাপারকে বড়ই রহস্যজনক বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আমাদিগকে যথাসাধ্য পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করিতে হইবে, এবং তদুপরি এমন জিনিষও গ্রহণ করিতে হইবে যাহা ভুক্ত-দ্রব্যাদি সহজে হজম করাইয়া দিয়া, দেহের রক্তকণিকা বৃদ্ধি করতঃ নূতন বল ও নূতন উদ্দীপনা শক্তি আনয়ন করিবে, এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়াইয়া দিবে। এই প্রকার অমোঘ ঔষধ হইতেছে রচি কোম্পানীর রচিটোন। নিয়মিতভাবে ম্যালেরিয়ার পর সেবন করিলে যে ইহা প্রাণে নব আশা ও প্রেরণা জাগাইয়া দিবে, তাহা অবধারিত।

বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষে সাহায্য

বর্দ্ধমান 'বিচিত্রা' টকি হাউসের প্রোঃ শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, 'নিউথিয়েটার্স' লিমিটেডে'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ বি, এন, সরকারের ও 'ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিঃ'এর বদান্যতায় গত ৩১০ই জুন বুধবার তারিখে "চণ্ডীদাস ও মানময়ী গার্লস্ স্কুল" এবং ইংরাজি কমিক্ "সুটিং অফ্ ড্যান দি ডাক" ফিল্ম সাহায্য রজনীতে দেখাইয়া ৩৫০৲ টাকা বর্দ্ধমান রিলিফ্ কমিটীকে প্রদান করিয়াছেন। রিলিফ্ কমিটী উপরোক্ত সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণকে ও কোম্পানীদিগকে তাহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য সংসদ

বিগত ১৪ই জুন রবিবার সন্ধ্যায় ২৯।১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতায় সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশনে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর। সহ-সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মজুমদার। সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চৌধুরী। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য—শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মতিলাল সেনগুপ্ত. শ্রীযুক্ত মণিলাল সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নিতীশ দত্ত চৌধুরী।

উপরোক্ত কার্য্যনির্ব্বাহকগণ যথাযথভাবে নির্ব্বাচিত হওয়ার পর সাহিত্য-সংসদের নির্ব্বাচিত সহ-সম্পাদক, সুসাহিত্যিক ও তরুণ অর্থনীতিবিদ্ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চৌধুরী সংসদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বিবৃতি পাঠ করেন। উক্ত বিবৃতিতে যাহা শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলিয়াছেন, তাহা মোটের উপর এই কয়েকটি কারণেই উল্লেখযোগ্য—(১) সংসদের তরফ হইতে বাংলার সহর-পল্লী নির্ব্বিশেষে সকল সাহিত্যিকের সহিত সহযোগিতা করা এবং ভাবের আদান প্রদান করা (২) নবীন চিন্তাশীল সাহিত্যিকগণ যাহাতে আত্মচেষ্টায় ও এই সংসদের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতায় জ্ঞান চর্চ্চার পথ প্রশস্ত করিয়া যোগ্যতম হইতে পারেন তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া, (৩) জ্ঞান চর্চ্চার ক্ষেত্রে এই সংসদের মধ্যে নারী পুরুষের অধিকারগত পার্থক্য দূর করা ও (৪) কল্পনাবিলাসী বাঙ্গালীর জীবনে যাহাতে সাহিত্য চর্চ্চার মধ্যে অর্থনীতি চর্চ্চার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চৌধুরী তাহার অর্থনৈতিক ভাবধারার বর্ণনা দিয়া দৃঢ়ভাবে বলেন যে বাঙ্গালীর জীবনে অর্থশাস্ত্রের যোগ-সূত্র প্রায় ছিন্ন হইয়া যাওয়ার মধ্যেই। এই অবস্থায় বাঙ্গালীর কল্পনা বিলাসিতার সুযোগে অভারতীয় ও অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছেন। ফলে বাংলার কৃষক হইতে জমিদার, মহাজন, বণিক, উকীল, শিক্ষক প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীই দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় পৌছিয়াছে। বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড পাটের মূল্য বেরোমিটারী তালে অবাঙ্গালী ও অভারতীয়-গণ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাংলার আর্থিক বিধাতা সাজিয়াছেন। এই ভাবে বাঙ্গালীর আর্থিক অধঃপতনের পথ পরিষ্কার হইতেছে। অতঃপর শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন যে মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইলে, অনাহারে মরিতে বসিলে, সাহিত্য বা যে কোনও জ্ঞান চর্চ্চার পথ রুদ্ধ হইতে বাধ্য।

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর বিবৃতির পর পরবর্ত্তী অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সাহিত্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রচুর জলযোগের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

চক্রতীর্থ

গত ১৪ই জুন রবিবার দক্ষিণ কলিকাতার তরুণ সাহিত্যিকগণের সহযোগীতায় ১১নং চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথে "চক্রতীর্থে"র শুভ-উদ্বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে সভায় কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, করুণাময় বসু, প্রফুল্ল সরকার ও তরুণ সাহিত্যিক বিমল মিত্র, দিলীপ গুপ্ত, রবীন্দ্রকুমার বসু, অমূল্য কুমার সিংহ, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যনাথ মজুমদার, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ফনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ তাঁহার স্বরচিত একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও একটি কবিতা পাঠ করিয়া সভ্যগণকে আনন্দ দান করেন। তাঁহার রচনা দুইটি মৌলিকত্ব ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য সভ্যগণের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। পরে সাহিত্য বিষয়ে পরস্পরের আলাপ আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়। প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকার সময় উপরোক্ত ঠিকানায় 'চক্রতীর্থে'র নিয়মিত অধিবেশন হইবে।

অন্নপূর্ণার মন্দির

সারদেশ্বরী আশ্রম
নিবেদন

[শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত নিবেদনটি প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। আশ্রমের পক্ষ হইতে এই "নিবেদন" জানাইয়াছেন শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্র কুমার মিত্র (বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্ট), শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ভাইস্ চান্সেলর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত-তীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত (ভাইচ্ প্রেসিডেন্ট একজিকিউটিভ কাউন্সিল আসাম) প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এই নিবেদনে দেশবাসী যথোচিত সাড়া দিলে আমরা আনন্দিত হইব।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবী মাতাজীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তির বলে ১৩০১ সালে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের উদ্দেশ্য :—(১) হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজ অনুযায়ী স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার, (২) সদংশজাতা দুঃস্থা বালিকা এবং বিধবাদিগকে আশ্রয় দান, এবং (৩) নারীদিগকে আদর্শ জীবন-যাত্রার পথে সহায়তা করা। সেই সঙ্গে গৃহকর্ম্ম ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার জন্য শিক্ষা দানেরও সুব্যবস্থা থাকায় প্রতিষ্ঠানটী অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বর্ত্তমানে আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা প্রায় ৫০; ইহাদের অধিকাংশের যাবতীয় ব্যয়ভার আশ্রম সাধারণের দানলব্ধ অর্থ হইতে বহন করেন। আশ্রম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ৩০০; শিক্ষা অবশ্য অবৈতনিক।

আশ্রম-পরিচালক-মণ্ডলীতে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি আর-এস, পি-এইচ-ডি, আই-ই-এস, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এম-এল-সি, স্যার হরিশঙ্কর পাল, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন, প্রভৃতি মহানুভব এবং বিচক্ষণ ভদ্রমহোদয়গণ এবং শ্রীযুক্তা ননীবালা দেবী (লেডী ব্রহ্মচারী), শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দে (মিষ্টার পি, সি, দে ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন জজ মহাশয়ের পত্নী), শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী, সাংখ্যতীর্থা, বি-এ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিতা মহিলাগণ আছেন। শ্রীশ্রীমাতাজী এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ("মাতৃসঙ্ঘ" নামে) একদল একনিষ্ঠ নারী-কর্ম্মী গঠন করিয়াছেন, যাঁহারা কোনও প্রকার অর্থের প্রত্যাশা না রাখিয়া এই মহান্ ব্রতে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমাতাজীর এই দুরূহ কার্য্য চালাইবার যোগ্যতাও তাঁহাদের আছে। শিক্ষাদান এবং আভ্যন্তরীণ কার্য্য পরিচালনার ভার উপযুক্ত মহিলাদিগের উপর ন্যস্ত। আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বৎসর উপযুক্ত পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আশ্রমের বার্ষিক বিবরণীর সহিত ঐ হিসাবও সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীমাতাজীর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং দেশবাসীর সহৃদয়তায় কলিকাতায় ২৬ নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে আশ্রমের নিজস্ব জমিতে ১৩৩১ সালে একটী ত্রিতল ভবন এবং মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ছাত্রী-সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। আশ্রমের কাজের পরিধিও বিস্তৃত হইতেছে। সেজন্য আশ্রম ও বিদ্যালয় উভয়ত্র স্থানের অভাব। স্থানাভাব এবং অর্থাভাব হেতু প্রতি বৎসর অনেক দুঃস্থা বালিকা এবং বিধবাকে গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না! সুতরাং আশ্রম-ভবনের আয়তন বৃদ্ধি করা অবিলম্বে প্রয়োজন। সৌভাগ্যবশতঃ আশ্রম-ভবনের সংলগ্ন একখণ্ড জমি আছে, উহা এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। জমির মূল্য এবং তদুপরি গৃহনির্ম্মাণাদি বাবদ অন্যূন ৩০০০০্ টাকার প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত যাহাতে প্রতিষ্ঠানটী সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং ইহার কর্ম্মক্ষেত্র দিন দিন প্রসারলাভ করে তজ্জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন

সমাজের হিতৈষী, স্ত্রী-শিক্ষায় অনুরাগী এবং আমাদের দুঃস্থা মাতা ও ভগিনীগণের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন সহৃদয় নরনারীর প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ নিবেদন,—যিনি যাহা পারেন আশ্রমের সাহায্যে তাহা দান করুন। তাঁহাদের এই সহৃদয়তা দেশবাসী, তথা নিখিল জগতের কল্যাণকামী ভবিষ্য-যুগের নরনারীগণ অবশ্যই সকৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে স্মরণ রাখিবেন। দান সামান্য হইলেও সাদরে গৃহীত এবং যথারীতি স্বীকৃত হইবে। অর্থ পাঠাইবার ঠিকানা :—(১) শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী, আশ্রম-সম্পাদিকা, ২৬ নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা, অথবা (২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সলিসিটার, ৬ নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লীলাময়

এক অঙ্ক-নাটিকা

শ্রীপ্রভাত কুমার দেব সরকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—লীলাময়ের বস্‌বার ঘর ; সময়—৬-১৫।
[লীলা আর বরুণা পাশাপাশি বসে' আছে]

লীলাময়—আজ এখানে আমার প্রিয় বন্ধুগণের শুভানুগমন হ'বে।—বোধকরি, তারা তোমায় বাজিয়ে নেবে। তাদের সাম্‌নে তোমার ব্যবহারের জড়তা যেন প্রকাশ না পায়।

বরুণা—তাদের সাম্‌নে আমি থাক্‌তে পারবোনা।—শুনেচি—

লীলাময়—পারতেই হবে, নইলে তারা ভাব্‌বে, আমি নেহাৎ আনাড়ির সঙ্গে প্রেম করে'চি।

বরুণা—আমি বরং আনাড়ি হ'ব, কিন্তু হাটের হাঁড়ি হ'তে পারবো না,—বিশেষ ক'রে তোমার সুনীতিবন্ধুদের কাছে।

লীলাময়—নাঃ, তুমি দেখচি, ছেলেদের খেলাতে জান না!

বরুণা—প্রেমসাগরে দোল-খেলা অভ্যেস্ আমার নয়।

লীলাময়—নয় তো জানি-ই, নইলে আমার মত এক জন বেচারাকে—

বরুণা—তোমায় গেঁথায় আর যাই কৌশল থাক্‌না কেন, দোল ফেলে যে নয়, একি তুমি স্বীকার করনা? তোমায় পেয়েচি আমি হঠাৎ, কোন ছলের সহায়তা নেইনি।

লীলাময়—সে তো জানি, কিন্তু ওদের সঙ্গে একটু মজা করতে হ'বে। ওদের বলেচি, তুমি 'নির্ম্মলা হোটেল' টোপ ফেলেছিলে, আমায় গেঁথার বদলে গেঁথে গেচো নিজে,—তোমার লেজা-মুড়োর অধিকার তো পেয়েইচি—উপরন্তু তোমার মাথার কাঁটার—

বরুণা—মাথার কাঁটা! সে আবার কী?

লীলাময়—জাননা, তোমাদের মাথার কাঁটা—প্রেমের বাহন—দূতীর কাম করে,—বন্ধুদের ধারণা তো তাই—Experimental Truth.

বরুণা—কই, তোমায় তো একটাও মাথার কাঁটা দেইনি।

লীলাময়—দাওনি, তা জানি, কিন্তু বাজারে ত' ও বস্তুর অভাব নেই! কিনে এনে দেখিয়েচি, ওরাও তাই বিশ্বাস ক'রেচে।

বরুণা—এত জিনিষ থাক্‌তে, ওটার এত চলন হলো কবে থেকে?

লীলাময়—যেদিন থেকে তোমারা স্কুল-কলেজ যাওয়া আরম্ভ করলে। আজকাল আবার এলো খোঁপায় সিল্কের ফিতের প্রচলন হ'য়েচে—চিন-জাপানের পোয়াবার-তের!

বরুণা—বেশ মজা তো!!

লীলাময়—মজা না-থাক্‌লে তোমায় বলি!

এক ফালি চাঁদ

শ্রীমণীন্দ্র নাথ বসু

নদীতীরে সম্মুখেতে মোর—
জেগেছিলো এক ফালি চাঁদ—
ঘন কুয়াশায় ঢাকা—বিবর্ণ আকাশে
সন্ধ্যার লগনে।..........
সৃষ্টি হতে অবলুপ্ত—
মানুষের হাতে-গড়া বিষাক্ত পৃথিবী;
আলোকের উৎস হ'তে
নির্ব্বাসিত মূঢ় ওই মানবের দল।............
মুগ্ধ হয়ে দেখি—
এক ফালি তৃতীয়ার চাঁদ—
বিশাল বারিধি-বুকে—
সৃষ্টি করে মোহময় নন্দন-কানন।
সহসা চাহিয়া দেখি—
যৌবনের তলহীন অন্ধকার হ'তে
প্রথমা প্রেয়সী মোর আসিয়া দাঁড়ান পাশে
চঞ্চল চরণে।..................
মুহূর্ত্তে তাহারে ঘেরি—
কত-স্মৃতি উঠিল জাগিয়া
দিক্‌চক্রবালে।
দূরে কেন? কাছে এসো!
ভুজবন্ধনে নিঙাড়িয়া দাও—
সৌন্দর্য্যের সুধা অশান্ত হৃদয়ে।
মিটাইয়া দাও উগ্রতম যৌবনের ক্ষুধা
কোমল পরশে।
প্রিয়া বাঁধিল না বাহুপাশে—
খসিল না মোহের বাঁধন
উতলা হইয়া উঠি।
বাহুদুটী কামনায় হইয়া চঞ্চল
তাহারে টানিল কাছে।
কোথায়—কে? কোথা মোর প্রথমা প্রেয়সী?
কেহ কোথা নাই।.........
মুহূর্ত্তে ডুবিল স্মৃতি, কালের সায়রে—
এক ফালি তৃতীয়ার চাঁদ নাহি আর সম্মুখেতে
ডুবে গেছে—নিবিড় আঁধারে।.........

ওরা এলে একটু বাচালতা প্রকাশ করবে,—দেখাবে, তুমি বিশ্ব-প্রেম করতে পার,—লীলা ক্ষণিকের—

বরুণা—কিন্তু পারবো কী? হাসি পাবে যে!

লীলাময়—চাপ্‌তে হ'বে। দেখবে, কেমন অভিনয় করে' ওরা!...ওরা আস্‌বার সঙ্গে সঙ্গে পাশের দরজা দিয়ে ওঘরে উঠে যাব।—তুমি এই সোফায় পা' তুলে দিয়ে পশ্চিমের বটতলার 'on Love' উপন্যাস খানা খুব মন দিয়ে পড়বে।—ওরা এলেই বইখানা যা'তে ওদের নজরে পড়ে, সুমুখের টেবিলে রাখবে...তারপর সময়মত নিজপরিকল্পনায় বুঝ্‌লে—

বরুণা—এতো বই থাক্‌তে 'On Love'এ—এতো আবশ্যক?

লীলাময়—ওরা প্রেমিক, তোমার হাতে 'On Love' দেখলে ভাববে,—তুমি in Love.

বরুণা—যদি তোমার কথা জিগ্যেস করে?

লীলাময়—বলবে, বরুণা নাম্নী একটী মেয়ের সঙ্গে বালিগঞ্জে গেচে,...কথাটা খুব তাচ্ছিল্যভরে—বুঝ্‌লে?

বরুণা (মুচকি হেসে)—আমি পারবোনা বাপু! বরং দুজনে পালাই চলো।

লীলাময়—তাকি হয়! এবার পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রলে ভাব্‌বে, আমি সত্যি পটিবাজ।...এর পর এমন একজনকে প্রেমের মুরুব্বি পাকড়াবে যে, ওদের যেটুকু বাকী আছে সেটুকু নিঙড়ে বার করে' নেবে।

[ওপরে উঠবার সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ হলো—এবং একটু অস্ফুট গুঞ্জন]

লীলাময়—ওই ওরা আস্‌চে—চললুম—যা' বলে'চি ভুলনা— [প্রস্থান]

[এদিকে বরুণা যেমন বলেছিল, তেমনি রইল,—লীলাময়ের কোন কথাই পালন করে'নি। ওদের পায়ের শব্দ যত কাছে আসচে, নিজেকে শক্ত করবার তত চেষ্টা চলচে নিজের মধ্যে]

[পেলব, জ্যোতি, সমর কটুকণ্ঠ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। সামনের সোফায় বরুণাকে দেখে' বেরিয়ে যাবার চেষ্টা কর'ল]

বরুণা—(উঠে) আসুন—আসুন,

[কেউ কোন কথা না বলে' আভিভূতের মত যে যেখানে পায়লে বসে পড়্‌'ল]

পেলব (মনে মনে)—আরম্ভ করি কী করে'?

বটুকণ্ঠ (মনে মনে)—এতো বাবা, পথের-গায়ে-পড়া মেয়ে নয়!

জ্যোতি (মনে মনে)—চমৎকার'! খাসা-নাক চোখ! বনের চঞ্চল হরিণ!

সমর (মনে মনে)—যত ভাগ্য এই লীলা-টাই ক'রে এসেচে দেখচি!—সেরা চিজ! আমাদের ভাগ্য একেবারে ভোঁতা! হায়-হায়!

[মিনিট তিন সব চুপচাপ]

পেলব (মাথা চুলকোতে চুলকোতে উড়িয়ে)—লী-লা-ময় কো-কো থায়?

বরুণা (স্মিত হাস্যে)—বোধহয় নিচের ঘরে—ডেকে দেব?

সমর—না না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হ'বেনা,—চাকরটাকে বরং—

জ্যোতি—(মনে মনে) উঠনা বাবা! নয়ন ভরে একটু দেখে নিই—সজীব-স্বাদ—আঃ!

[মিনিট দুই আবার চুপচাপ]

বরুণা (আগ্রহের ভাণ করে')—আপনারা বুঝি লীলা বাবুর বন্ধু?

পেলব (মোলায়েম করে')—আজ্ঞে হুঁ, —এক সঙ্গে পড়ি···আমার ইংরেজী অনার্স আছে···Romeo-Juliet পড়েচেন...Jessica Lorenzo···Bassanio—Portio···Shakespeare-এর অমর সৃষ্টি.. খাসা পড়বেন···

জ্যোতি—আমার দর্শন অনার···কোঁৎ... হেগেন কী বলেন, জানেন?

বটুকণ্ঠ—আমার অর্থনীতি···দেখ্‌চেন বেকার সমস্যা কেমন বেড়ে চলেচে···Industrialisation না-হ'লে এর সমাধান দুরূহ—,

সমর (ঢোক গিলে)—আজ্ঞে আমার সংস্কৃত···শকুন্তলা নাটক পড়েচেন···কালিদাস অমর হ'য়ে গেছেন···পড়বেন।

[বরুণা অবাক—জোর করে' হাসি চেপে আছে]

[আবার চুপচাপ, কেউ কড়িকাঠে, কেউ সোফার পায়ায়, কেউ ফ্যানের ব্লেড কেউ পায়ের নখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' আছে]

বরুণা (উঠে পড়ে)—আচ্ছা আপনারা বসুন, চায়ের ব্যবস্থা করে আসি—লীলাবাবুকেও পাঠিয়ে দেই—

[পাশের ঘরে প্রস্থান

[পাশের ঘরে লীলাময় বসে বসে ভাব্‌ছে,—বরুণা ঘরে ঢুকলো]

লীলাময়—দেখ্‌লে চিজগুলো কে? আমার প্ল্যানটা ফাঁসিয়ে দিলে—তুমি ভারি আনাড়ি—

বরুণা—বড় গো-বেচারা সব—করুণা হয়।

লীলাময়—হুঁ,—গো-বেচারা! মুখ খুল্‌লে বুঝ্‌তে পারতে, হরবোলা কীনা?

বরুণা—কেন বেশ ভদ্র তো!

লীলাময়—ভদ্র না ছাই—আমি ভেবেছিলুম, মাঠে-ঘাটের অভ্যাসটা এখানে চালাবে।

বরুণা—চস্তোর তা° কী কেউ করে?

লীলাময়—বিশ্বাস না-হয়, দরজাটায় কান দিয়ে শোন—ওরা কী বলাবলি করচে।

[বরুণা দরজায় কান দিয়ে দাঁড়াল]

[এঘরে এদের মধ্যে ফিস্‌-ফিস্‌ করে' আলোচনা চলচে]

পেলব—ফসকে গেল—তোদের জন্যেই তো! আরে আপন গুন প্রকাশ পরে করলে চলতো না! হাঙলা সব!!

জ্যোতি—বাজে ব'কিস্‌ কেন, তুই তো আগেই! আহা! হাতের বাইরে!

পেলব—(গর্ব্বভরে)—তোদের সঙ্গে কী কথা ক'য়েচে?···আমার সঙ্গেই কথা ক'য়েচে···

বটু—সবার সঙ্গে···তোর নাম ধরে ত বলে'নি কিছু···আর তোর ঐ চেহারা দেখলে কী কারো কথা কইবার প্রবৃত্তি থাকে?··· বাজে কপচাস্‌নি···জ্যোতি বরং বলতে পারে···

সমর—প্রথমে কথাটা পাড়লে কে শুনি? মেয়েদের সঙ্গে কথা কইবার Moral Courage নেই, আবার ফুটানি···মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে শেখ আগে...গ্রাম্য সব!

[ও ঘরে] লীলাময়—শুনলে তো! নাও এবার আমার বানান গানটা গেয়ে শুনিয়ে দাও দিকি,···অরগানটাও দেখচি দোরের পাশে আছে···নাও আরম্ভ কর—

[বরুণা আরম্ভ করল] [এ ঘরে, টেবিল চেয়ার বই তাল দিয়ে উঠলো]

প্রেম বলে আজ যে বন্ধুরে
তোমরা সবাই জানো,
মাথার কাঁটা, চুলের ফিতের
স্বত্ব যাহার মানো,—
প্রাণের মাঝে থাকে সে যে
বাহিরে নয় জানি
গোপন রতন দেয় যাহারে
সবার আপন মানি
সেই তো জানে মর্ম্ম তাহার,
তোমরা কি তা জানো?
(ইথে) আইন কানুন নাইকো কিছু
মিছেই ঘোরা পিছু পিছু!
ভালবাসা হঠাৎ কিছু
(যেন) যোয়ার জলের টানও
বাইরে বৃথাই মাতামাতি
প্রেম যে মৌন সাধন-সাথী
প্রীতির দীপারতি জেলে
হৃদয়ে তার আনো।

[গান থামার পর বস্‌বার ঘরের দ্বারের কাছে বরুণার হাত ধরে লীলাময়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল—ঘরের ভিতরকার অধিবাসীগণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে হতভম্ব,—বরুণার মুখ লজ্জায় উজ্জ্বল]

লীলা—বন্ধুগণ, প্রেমপাগল ভাইরা আমার! আমার প্রথম দিনের শ্রীমতী জ্যোৎস্না', দ্বিতীয় দিনের অনুরাধা, আর শেষ দিনের 'নির্ম্মলা-হোটেল' স্বয়ং তোমাদের

সম্মুখে উপস্থিত...এঁর প্রেম করার অলৌকিক Knack-এর কথা তোমাদের অজানা নেই... (বলে' বরুণার লজ্জানত মুখের দিকে চেয়ে) এখন প্রেম সম্বন্ধে তোমাদের যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, জেনে নিতে পার...এই উপযুক্ত সময়

[পেলব আসন ছেড়ে উঠে কিছু না-ব'লে হাতের আংটী খুলে বরুণার হাতে পরিয়ে দিলে]

পেলব—প্রেম সম্বন্ধে এতোদিন পর্য্যন্ত যে বানান অভিজ্ঞতা পোষণ করতুম, আজ তার মৃত্যু হোক......তুমি যথার্থ প্রেমিকা তোমার কাছে আশীর্ব্বাদ মাগি।

লীলা—ধীরে বন্ধু, ধীরে ; আমার আর একটু বক্তব্য আছে—তোমাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত একে—এখন তোমরা যা' খুশী নাম দিতে পার,—যখন তখন যা'তা নাম দিয়ে এসেছি।—পুঁজি আমার ছিল এক, কিন্তু তোমাদের চমৎকৃত করতে একের ডাইনে শূন্যে বসাতে কোন দ্বিধা করিনি।

কটুকণ্ঠ—(বাধা দিয়ে দু'হাতে বরুণা এবং লীলাময়ের করমর্দ্দন করে') শূন্য আজ মুছে ফেল—একমেবাদ্বিতীয়ং...শূন্য দিয়ে আর আমাদের শূন্য-মন পূর্ণ করতে হ'বে না।

জ্যোতি—আমাদের এতোদিন ধাপ্পা দেওয়ারও শাস্তি আছে...আমরা তোমার নামে would-be বৌদির কাছে নালিশ জানাচ্চি...রায় আমাদের ঠিক করা আছে (বলে' দু'জনের হাত ধরে টেনে এনে সোফায় পাশাপাশি বসিয়ে দিল)।

লীলাময়—(উঠে পড়ে) অভদ্র, গাড়োয়ান সব !!

সমর—ভদ্রতা শিক্ষা তো কোন দিন পাইনি...মেয়েদের সঙ্গে গাড়োয়ানি ইয়ারকির কৌশল শিখিয়ে এসেচ...তার প্রথম পরীক্ষা হ'য়ে যাক তোমার উপর দিয়ে...বৌদি কী বলেন ? (বলে' জোর করে' লীলাময়কে বরুণার পাশে বসিয়ে দি'ল)

লীলাময়—(হেসে) কই সুনীতিকে দেখচি নে ত ?

পেলব—তোমার শিষ্যত্বের প্রথম পুরস্কার পেয়েচে,...এতক্ষণ বোধকরি, তার সঙ্গে জমিয়ে তুলেচে। [বরুণা মুচকি হাসল]

ঝরণা—আচ্ছা, আপনারা বসুন, দেখি, চাকরটা এখন চায়ের সরঞ্জাম আনচে না কেন ?

যবনিকা
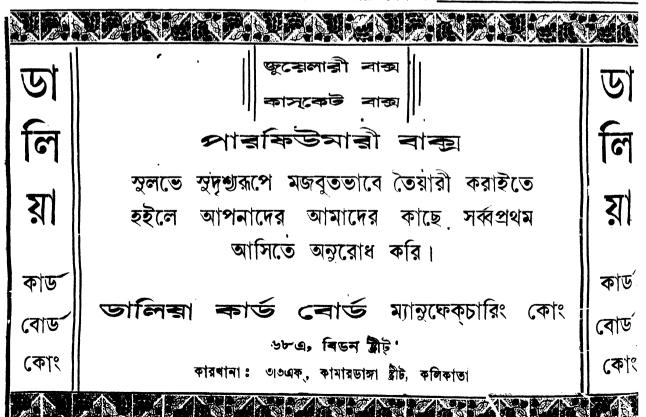
চিরন্তনী

শ্রীসমর মিত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুন্দর তখনও বলে চলেছে,—"তবে দেহের ভঙ্গীতে যদি কাকেও মানায় সে তোমাকেই। সমস্ত শরীরে যেন একখানি হাড়ও নেই; আচ্ছা কী করে করো অত সুন্দর?"

কোন জবাব আসে না অপর দিক থেকে। শীলা সুন্দরের দিকে চাইল—যেন হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেছে ফুলদান, এমনি অপ্রস্তুতের মত মুখ। হাসলে, বললে—"কী বলছিলে সুন্দর ভঙ্গিমা?"—

বাধা দিয়ে সুন্দর বললে, "নিশ্চই, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই"—।

শীলা আর কিছু বললে না। ঘর ভরে নেমে এল স্তূপীকৃত সন্ধ্যা। প্রত্যেক বিন্দুটী অন্ধকার হ'য়ে উঠল। ঘরের কোণ থেকে একচাপ অন্ধকার তেড়ে আসছে; জানলা দিয়ে খানিকটা নরম আলো এসে পড়েছে শীলার গালে। ও'কে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এতটা সময় কাটিয়ে ও রীতিমত হাঁফিয়ে উঠেছে। শীলা কাউচে মাথা হেলিয়ে দিয়েছে।

শুধু যে শীলা একলা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে তাই নয়, প্রতিটি মিনিট যারা ওর সঙ্গে খেলা করছিল, তারাও যেন হঠাৎ ঝিমিয়ে এসেছে। অবশ মুহূর্ত্তগুলো আর মোটেই ভাল লাগছিল না; সুন্দর উঠবো উঠবো করছিল; সে ভাবলে, "শেষটা ওকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে।" আবার মনে হল, "কিছু না বললেই হত ভাল, কিন্তু সত্যিই ত প্রতিমা……"; জঘন্য অবাস্তবকে ও ছেটে ফেল্লে; সুন্দর বললে,—"শীলা চল বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি,—যাবে?"

শিলা মাথাটা একটু নাড়িয়ে বললে, 'তুমি যাও'—।

"কেন? তুমি যাবে না"? সুন্দর প্রশ্ন করলে।

"—না"—শীলা বল্লে।

"কেন"?—

"ভাল লাগছে না—তাই—" একটু হাসলে।

"আমি কিন্তু বলতে পারি, আসল কারণ কী হয়েছে"।

"কি শুনি"? শীলার চোখে তীব্র দৃষ্টি।

সুন্দর বললে, 'দুঃখ হ'য়েছে'—

"কিসের—?" না বোঝবার মত মুখ; মনে মনে হয়ত বুঝতে পেরেছে।

"সত্যি কথা বলেছি তাই—"

"মোটেই তার জন্যে নয়," অল্প আগুনের আঁচ মেশানো তার গলার স্বরে।

"হ্যাঁ—তাই-ই—" অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে এল সুন্দরের মুখ থেকে।

"বেশ, তবে তাই-ই,—হ্যাঁ—তাই,—তোমার কী তাতে? কি বলছিলে? দুঃখ? নিশ্চয়ই হয়েছে"—অকারণে ও ফেটে পড়'ল। আগুন জ্বলছে, ধূ ধূ করে, তাইতে ও সবাইকে দেখতে পাচ্ছে। শীলার মনে হল ও যেন আগুনের শিখা, দেবে পুড়িয়ে, যে তার সামনে পড়বে। কতকটা শান্ত হয়ে এল, আগুন এল নিবিয়ে।

বললে, সুন্দরদা, দোহাই তোমার, যাও এখান থেকে; আমায় একটু একলা থাকতে দাও দয়া করে—"। বলে কাউচে মুখ লুকাল।

স্তব্ধ সুন্দর। সুন্দরের মনে হল, যেন ও'র অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে। আগুনের শত শত জ্বালাময়ী শিখা তাকে পোড়াবার চেষ্টা কর্চ্ছে। সংসার বলে যে কিছু আছে এই মাত্র সে ভুলে গেল। সে ভুলে গেল জগৎ, ভুলে গেল ঘরের কোণের অন্ধকার, বাইরের ঘনায়মান সন্ধ্যা, আর ভুলে গেল শীলাকে—। শীলার কথাগুলো যেন একখানা ছুরী, যার হাতলটা চুনী পান্নার তৈরী।

কে জানতো এই ছুরীতে তার হাত যাবে কেটে? সে রক্তাক্ত হাতে লাল, নীল পাথরগুলো দেখতে লাগ'লো।

সুন্দর খানিকটা নড়ে উঠে ফিরিয়ে আনলে তা'র জীবন। মনে হল পরীক্ষা

তার শেষ হয়ে গেছে। শীলার মাথায় একটি হাত দিয়ে বল্‌লে, "শীলা, তোমার শরীর কি আজ ভাল নেই"? শীলা নিস্তব্ধ। তেমনি ভাবে পড়ে রইল। তা'র মনে হল, সমুদ্রে ছোট একখানা নৌকাতে বেড়াতে বেরিয়েছে ছলাৎ করে খানিকটা জল নৌকা'র ভেতরে উঠে পড়'ল। সে ভয় পেয়ে আঁচল করে জল ফেলে দিতে গেল, আবার একটু জল উঠলো; সে ভীষণ ভয় পেলে; নিশ্চই সব দেবতা পরামর্শ করেছে তাকে ডুবিয়ে দেবার। শীলা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো; মনে হল ও পাগল হ'য়ে গেছে; আবার খানিকটা জল উঠলো,—শিলা যেন লাফ দিয়ে জলে পড়লো। এবার তা'র মরবার ভয় রইল না। ও, ত মরেই গেছে।

সুন্দর বল্‌লে, "আমি যাচ্ছি"—উত্তর না পেয়ে আবার বল্‌লে, "আলোটা কি জেলে দিয়ে যাব?"—

শীলা এবার তা'র মুখ তুল্‌লে, বল্‌লে, তুমি যেওনা, দাদা আসবে এক্ষুণি—হ্যাঁ আলোটা জেলেই দাও"—।

উজ্জ্বল আলোকে তার ম্লান মুখটী সুন্দর দেখতে পেলে। দেখলে শীলার পাতলা ঠোঁট দুটীতে তখনও সন্ধ্যার আঁধারের মত জমাট-বাঁধা বেদনা। সুন্দর বেরিয়ে যাবার আগে বলে গেল, "আর তোমায় কোনদিন বিরক্ত করতে আসবো না"—। শীলার মনে হল, 'আলো না জাল্‌লেই ভালো হোত।'

অভিমান আর ভাঙ্গেনা। শীলা ভাবে, সুন্দর আগে কথা বল্‌বে, অপর পক্ষ এইরকম একটা ধারণা নিয়ে বসে থাকে।

দুজনে কথা বলার অবসর হয়ত পায় অনেক; কিন্তু কেউ অপরকে ডাক্‌তে সাহস করে না। দুজনের অন্তরের মাঝে গড়ে ওঠে প্রাচীর। তারা পরস্পরকে চিন্‌তে চায় না।

শীলা মনে ভাবে "সুন্দরদার সঙ্গে কথা কওয়া আর এমন কী লোভনীয়?—" ওদিকে সুন্দরভাবে,—"শীলা যদি সত্যিই আমায় না চায়, আমি কী কর্ত্তে পারি?"

আজ শীলা'র স্কুলের প্রাইজ-ডে। শীলা, অনন্তর কাছে একটা কার্ড দিয়েছিল। মনে মনে সে ঠিক্ জান্‌তো, সুন্দরদা, নিশ্চই পাবে, প্রতিমার নাচ দেখতে নিশ্চই যাবে"। লাল রংএর একখানা স্কার্ট শাড়ী প'রে শীলা বসেছিল,—কাণের ঝুম্‌কটা সে বদলে নিয়েছিল।

"আমার কী না গেলেই নয় রে"—অনন্ত বল্‌লে। 'না দাদা তোমার যেতেই হ'বে; আমি এত কষ্ট করে প্র্যাক্‌টিস্ করলাম" শীলা কাঁদ্‌বার মত করে বল্‌লে।

"তবেই ত মুস্কিলে ফেল্‌লি" নিরুপায়ের স্বর।

"কেন তোমার কী বিশেষ কাজ আছে দাদা?"—

"হ্যাঁরে, তা নয়ত কী আমি যেতে চাইছিনা; আচ্ছা এক কাজ করলে হয়না?"—অনন্ত বল্‌লে "কী"—? শীলা মনে মনে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। "সুন্দর ত এখুনি আসবে, ও'কে নিয়ে তুই চলে যা, আর আমাকে রসা রোডে নামিয়ে দে; যত তাড়াতাড়ি পারি, আমি কাজ সেরে, স্কুলে যাচ্ছি, কী বল?"

"বেশ—তাই কর—কী আর বল্‌বো"—তার স্বরে যেন কান্না ফুটে উঠেছিল।

"রাগ করলি নাকি,—বল্‌ছি ত যাব"—

"তা হলে চল সময় আর বেশী নেই—"

"আমার একটু দেরী হ'য়ে গেল ভাই, কিছু মনে করিস্‌না'—বলে সুন্দর ঘরে ঢুক্‌লো।

"চল্, চল্ আর ভণিতা কর্ত্তে হবে না" বলে অনন্ত ওঠে দাঁড়ালো। শীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিকটা পরে ঘুরে এসে বল্‌লে 'দাদা গাড়ী এসেছে চল'—।

ওরা সকলে নীচে নেমে এল। গাড়ীর কাছে এল 'আরে—ভেতরে আয়না, বাইরে বস্‌ছিস্ কেন?' অনন্ত বল্‌লে—।

দরজাটা বন্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে সুন্দর বল্‌লে 'যাক, ঠিক্ আছে—শীলার সঙ্গে চোখা-চোখী হতেই, শীলা চোখ ফিরিয়ে নিলে।

রসা রোডের কাছে অনন্ত নেমে গেল। খানিকটা বাদে স্কুলের সামনে গাড়ী এসে থাম্‌তে শীলা নেমে চলে গেল, সুন্দরকে কোন কথাই না বলে। সুন্দর ভাবল যে, সে ফিরে যায়; মুহূর্ত্তে প্রতিমাকে আস্‌তে দেখতে পেলে। দুজনে, দুজনকে নমস্কার করলে।

"আসুন"—

"চলুন—" সুন্দর এগিয়ে চল্ল।

সামনের একটা সীট্ দেখিয়ে প্রতিমা বললে, "ওইখানে বসুন"—

—"একটা প্রোগ্রাম দিন'ত" সুন্দর বললে। একটা প্রোগ্রাম সুন্দরের হাতে দিয়ে বললে 'চুপ করে বসে দেখুন, পরে শুনবো কী রকম হল; আচ্ছা চললুম।— বলে চলে গেল গ্রীনরুমের দিকে।

প্লে চলতে লাগল। শীলার নাচ হল সকলের চাইতে চমৎকার। প্রতিমাও ভাল নাচ্‌লো। অনন্ত আস্‌তে পারেনি, বোধ হয় কাজে আট্‌কে গেছে। যাই হোক সুন্দরের চোখের সামনে ভাসছে শীলা। শীলা তার সঙ্গে কথা বল্‌বে না। তবে কী এক গাড়ীতে ওদের একলা যেতে হবে?

প্লে, নাচ, গান সব শেষ হল। সুন্দর চলে যাবে কিনা ভাবছিল, শীলা এসে হাজির হল; হাতে তার এক গাদা ফুল। একবার এদিক ওদিক চাইলে, বোধ হয় অনন্তকে খুঁজলো; ঠোঁটের কোণে বিরক্তি উঠলো ফুটে। সুন্দর এগিয়ে এল বললে "অনন্ত আসেনি, বাড়ী যাবে ত?"

শীলা কোন কথা না বলে গেটের কাছে এগিয়ে গেল।

বোকার মত দাঁড়িয়ে না থেকে সুন্দর ওর পেছন পেছন চল্‌লো।

শীলার গাড়ী এগিয়ে এল, গাড়ী বারান্দার তলায়। শীলা গাড়ীতে উঠলো কিন্তু দরজা বন্ধ করলে না, যেন কার আশার অপেক্ষা কর্ত্তে লাগল।

সুন্দর দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, শীলা বললে 'আসুন'—।

অল্প ইতস্তত করে সুন্দর গাড়ীতে উঠে বস্‌লো। এক কোণে বসে রইল চুপ করে; জোরে জোরে তা'র নিঃশ্বাস পড়ল। সুন্দর ভাবলে একথা কী না বললে আর চল্‌তো না। ও বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে দ্রুতমান গাড়ীর ছায়া পড়ছে, ফেলে আসা বাড়ীর বুকে। একটা একটা করে গ্যাস পার হচ্ছে, আর সুন্দরের মনে হ'চ্ছে, 'এই সুযোগে হয়ত শীলা তার মুখের দিকে চেয়ে, খুব্ একচোট্ হেসে নিচ্ছে।'

কত বড় ভুল্ যে সে করছে, তা এল একবারও তার মনে।

'দাদা এল না—বাড়ী গিয়ে খুব ঝগড়া কর্ব্ব' শীলা কেমন সহজ সুরে বলে ফেল্‌লে।

সুন্দর তার মুখ ভেতরে আনলে। কী বলবে? কী বলতে পারে সে?—শীলার অভিমান কী তবে মুছে গেছে? শীলাকে সুন্দর বুঝতে পারেনা, অথচ শীলার অভিমান, ত'ার কথা তার হাসি গান কেমন যেন ভীষণ ভাল লাগে।

'কথার উত্তর দিচ্ছেন না যে"—শীলার মুখ দেখা গেল না।

"কী বলব বল"? শেষের কথা শীলা শুনতে পেলেনা "ড্রাইভার একটু লেকের দিকে চলত"—শীলা বললে "লেকের দিকে"—বিস্মিত সুন্দর।

"হ্যাঁ—রাত ত বেশী হয়নি, বড় মাথা ধরেছে"—

শীলা গাড়ীর কুসানের ওপর ক্লান্ত মাথা রেখে বল্‌লে, "কেমন লাগ'ল"

"ভাল"—সুন্দর দেখলে গাড়ী ল্যান্সডাউন এক্সটেনসনের মাঝে ছুটে যাচ্ছে। গাড়ীতে সে আর তার প্রিয় বান্ধবী। এই সময়কে সে ব্যর্থ হ'তে দেবে না কিছুতেই। সেদিনের মান অভিমান ফেলবে মিটিয়ে। মনে ভয় হল শীলা যদি তাকে ক্ষমা না করে? তা হলে ও কী কর্ত্তে পারে! আবার মনে হল শীলা তাকে ক্ষমা করেছে, নয় ত, সহজ সুরে তার সঙ্গে কখনই কথা বল্'ত না।

"শীলা"—সুন্দর কাছে সরে এল।

"বল"—শীলার মাথা যেখানে ছিল সেই খানেই রইল—

"সেদিনের কথা কী তুমি আজও ভুলতে পারনি"—

"না"—

"ভুলতে চেষ্টাও করনি?" ওর হাত সুন্দর ধরলে; "যদি বলি না চেষ্টা করিনি"—শীলা হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলে। বললে "হাত কী চেষ্টা করে"—? "না,—না আমার দেওয়া ব্যথা তুমি ভুলে যাও. শীলা"—শীলার হাত দৃঢ় করে ধরে রইল।

"আমি কিছুতেই তা ভুলতে পার্ব্বনা"—এবার শীলা বিচলিত হ'য়েছে মনে হল।

"কেন শীলা?"

"তোমার দেওয়া ব্যথা কী আমি ভুলতে পারি?" বলে শীলা আস্তে আস্তে সুন্দরের কাঁধে মাথাটা রাখলে।

লেকের অপর পার দিয়ে একটা ট্রেন চিরন্তন শব্দ করতে করতে ছুটে গেল।

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যার সমাধানঃ—বিগত ২১শ সংখ্যার 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত সমস্যাটীর সমাধান নিয়ে প্রদত্ত হল।

ইস্কাবন—দুরি।
হরতন—পাঞ্জা।
রুহিতন—সাতা, দুরি।
চিড়িতন—সাহেব, ছক্কা, তিরি।

ইস্কাবন—সাহেব, ছক্কা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—ছক্কা, পাঞ্জা।
চিড়িতন—বিবি, নয়, চৌকা।

ইস্কাবন—বিবি, নয়, সাতা
হরতন—নাই।
রুহিতন—সাহেব, চৌকা।
চিড়িতন—দশ, দুরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, চৌকা।
হরতন—সাতা।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—টেক্কা, গোলাম, পাঞ্জা।

হরতন রঙ, 'দ' খেলবেন। সকল বাধা সত্ত্বেও 'উ' এবং 'দ'কে ছয়খানি পিট ধরতে হবে

'দ' প্রথমে ইস্কাবনের টেক্কা খেলে পিট নিয়ে ইস্কাবনের চৌকা পেড়ে খেললেন। এবার 'উ' হরতনের পাঞ্জা দিয়ে তুরূপ করে পিট নিয়ে রুহিতনের সাতা খেললেন। 'উ' রুহিতনের সাহেব দিলেন, 'দ' তুরূপ করলেন। অতঃপর 'দ' চিড়িতনের পাঞ্জা খেলবেন এবং 'উ' সাহেব দিয়ে পিট ধরে রুহিতনের দুরি খেলবেন। এ পিটে 'দ' ইস্কাবনের গোলাম পালিয়ে যাবেন, আর 'প' রুহিতনে পিট ধরতে বাধ্য হবেন। এখন 'প'র হাতে চিড়িতন ছাড়া আর কিছুই নাই সুতরাং তিনি চিড়িতনের যাই পেড়ে খেলুন না কেন বাকি দুইখানি পিট 'দ'-পক্ষের হয়ে যাচ্ছেই। সুতরাং 'উ' এবং 'দ' ছয়খানি পিট পেতে সমর্থ হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা উচিত যে পর পর তিন বার চিড়িতন খেলা হলে সমস্যার সমাধান হবে না, কেননা তা'তে 'পূ' রুহিতন পালিয়ে যাবেন এবং 'প' ইস্কাবনের সাহেব পেড়ে খেলবেন।

শিবপুরের শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজারের শ্রীশৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শালিখার গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে শ্রীননীগোপাল হাজরা, শ্রীলালবিহারী বসু ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমস্যাটির নির্ভুল সমাধান আমাদের নিকটে পাঠিয়েছেন।

ভেনাস ক্লাবের একটি হাতঃ—২০শ সংখ্যার 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত ভেনাস্ ক্লাবের প্রতিযোগিতার খেলা থেকে সংগৃহীত সমস্যাটির সমাধান নিয়ে দেওয়া হল। অনেক সময় সাধারণ খেলায় বা প্রতিযোগিতায় অদ্ভুত অদ্ভুত হাত এসে থাকে পাঠকবর্গ যদি সে হাতগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন তবে আমরা তা' সাদরে পত্রস্থ করব।

চিড়িতন রঙ; 'প' খেলেছেন ইস্কাবনের দশ। 'উ' এবং 'দ'কে সর্ব্বসমেত এগারোখানি পিট নিতে হবে।

'প' খেলেছেন ইস্কাবনের দশ; 'উ' ইস্কাবনের টেক্কা দিয়ে পিট ধরলেন, আর

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, আটা, ×, ×।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, দশ, নয়।
চিড়িতন—টেক্কা, ×, ×।

ইস্কাবন—দশ, ×।
হরতন—সাহেব, বিবি নয়, ×, ×, ×, ×।
রুহিতন—×, ×, ×, ×।
চিড়িতন—নাই

ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, নয়, ×
হরতন—×।
রুহিতন—সাহেব, ×, ×।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, আটা, ×, ×।

ইস্কাবন—×, ×।
হরতন—টেক্কা, গোলাম, দশ, ×, ×।
রুহিতন—×।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, নয়, সাতা, ×।

'পূ' এবং 'দ' ইস্কাবনের ছোট তাস দিয়ে গেলেন। এবার 'উ' রুহিতনের টেক্কা খেললেন 'পূ' 'দ' ও 'প' রুহিতনের ছোট তাস দিয়ে গেলেন। তৃতীয় বারে 'উ' রুহিতনের বিবি ফেল্লেন। এ ক্ষেত্রে 'পূ' বিবির উপর রুহিতনের সাহেব মারতে পারেন অথবা ছোট তাসও দিতে পারেন। 'পূ'র পক্ষে এখন রুহিতনের সাহেব দেওয়াই সঙ্গত হবে; 'পূ' যদি তাই দেন তবে 'দ' ছোট রঙ দিয়ে তুরুপ করবেন, অন্যথা ইস্কাবনের ছোট তাস পাশিয়ে যাবেন। চতুর্থ পিটে 'দ' হরতনের ছোট তাস পেড়ে খেলায় 'প' ও 'পূ'ও উক্ত রঙের ছোট তাস দিয়ে গেলেন, আর এ দিকে 'উ' তুরুপ মেরে পিটখানি নিলেন। অতঃপর 'উ' রুহিতনের গোলাম খেল্লেন; 'পূ' ও 'প' এ ক্ষেত্রে ছোট রুহিতন দিলেন এবং 'দ' ইস্কাবন পাশিয়ে গেলেন। ষষ্ঠ পিটে 'উ' রুহিতনের দশ ফেল্লেন, 'পূ' রঙ মার্লেন; 'পূ' যে রঙ মারবেন 'দ' তদপেক্ষা বড় রঙ মেরে পিট ধর্বেন। তৎপরে 'দ' একখানি ছোট হরতন দিতে 'প' হরতনের নয় ফেললেন, 'উ' রঙের টেক্কা দিয়ে তুরুপ করলেন, 'পূ' ইস্কাবন পাশিয়ে গেলেন। এখন হাতের অবস্থা হ'ল নিম্নলিখিতরূপ।

অতঃপর 'উ' রুহিতনের নয় খেল্লে 'পূ' চিড়ের দশ গোলাম বা ছোট তাস দিয়ে তুরুপ করলেন। ছোট রঙ মার্লে 'দ' ও ছোট রঙ মারবেন বা 'পূ' যদি রঙের দশ মারেন তবে 'দ' রঙের বিবি দিয়ে পিট ধরবেন। নবম পিটে 'দ' হরতনের গোলাম খেল্বেন; এ স্থলে 'প' হরতনের সাহেব মারলেন, 'উ' রঙ মারতে 'পূ'ও তুরুপ করে প্রথম পিট ধরলেন।

এখন 'পূ' যদি ছোট চিড়িতন খেলেন তা' হলে 'দ' দুইখানি চিড়িতন ও হরতনের টেক্কা নিয়ে তিনখানি পিট পাচ্ছেন। যদি 'পূ' ইস্কাবনের সাহেব খেলেন তবে 'দ' রঙের সাতা তুরুপ করে পিট ধরে যথাক্রমে চিড়িতনের সাহেব ও হরতনের টেক্কা খেল্বেন। এখানে 'পূ' যদি তুরুপ করেন তবে তিনি 'উ'কে ইস্কাবনের বিবির পিট দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে এমতাবস্থায় 'পূ' যাই খেলুন না কেন 'উ' পক্ষের এগারোখানি পিট অবশ্যম্ভাবী।

শিবপুরের শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় এ সমস্যাটির সমাধানও বেশ চমৎকারভাবে লিখেছেন। চতুর্থ পিটের বেলায় গোবর্দ্ধন বাবু লিখছেন যে 'দ' পিট নিয়ে ছোট একটি চিড়িতন খেলবেন আর 'পূ' টেক্কা দিয়ে পিট নিয়েই বুঝতে পারবেন যে সব রঙই 'পূ'র হাতে বর্ত্তমান। কিন্তু চিড়িতন খেলে 'উ' যদি রঙের টেক্কা দিয়ে পিট ধরেন তবে তাঁদের পক্ষে এগারো-খানি পিট-ধরা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যথা 'উ'র হাতের রঙগুলি দিয়ে তুরুপ করালেই সরলভাবে পাঁচটি চিড়িতনের খেলা হয়।

শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়:—শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচিতি লেখার চেয়ে সময়ের মধুর অপব্যবহারের আর কোন পন্থাই বোধ হয় নাই। কলিকাতার ব্রীজ আসরের কেই বা তাঁকে না চেনেন, ব্রীজ

শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রীড়কদের মধ্যে এমন কেই বা আছেন যে তাঁর নাম না শুনেছেন। আমাদের যামিনীদা'র নিরভিমান মধুর ব্যবহার, অবিশ্রান্ত নিঃস্বার্থ পরিশ্রম আর তরুণোপম উদ্যমের সংবাদ কে না রাখেন। দল-সংগঠনে ইনি অদ্বিতীয়; বাঙলাদেশে যেখানে কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে ফুটবল—ক্রিকেট পর্য্যন্ত কোথাও দলাদলির অভাব পরিলক্ষিত

ইস্কাবন—বিবি, আটা, ×, ×।
হরতন—নাই।
রুহিতন—নয়।
চিড়িতন—×।

ইস্কাবন—×।
হরতন—সাহেব, বিবি, ×, ×, ×।

ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, ×, ×

হরতন—টেক্কা, গোলাম, দশ,।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, সাতা।

চিত্র-তারকাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ভবিষ্যৎ বাণী

চিত্ররথ সেন

মায় ওয়েষ্ট

রোমেনর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি।, তাঁর গণনা মিথ্যে হয় না এমনিই ওদেশের ষ্টারদের ধারণা। মেরী বোল্যাণ্ড সিলভিয়া সিডিনি, ভার্জ্জিনিয়া ব্রুশ, আরলিন জাজ এবং আরো অনেকে আছে, যাঁরা তাঁর বন্ধু এবং তাঁর কথা অভ্রান্ত বলে ভাবে।

রোমেনের কথার সত্যতা সেদিন প্রমাণিত হয়েছে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে। গ্রাউচ মাইকেলের অমন সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়ার কথা সকলে না জানলেও অনেকে জানত। তাই ওদের ধারণা হয়েছে এমন অভ্রান্ত। রোমেনের কথা আজকাল কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারে না।

সেই রোমেন সেদিন ওদেশের কয়েকজন ষ্টারের সম্বন্ধে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ভবিষ্যৎ বাণী করে একটা ফিরিস্তি দিয়েছে।

ক্লদেৎ কলবার্ট

১৯৩৬ সালের অ্যাকাডেমি অব মোশন

বিং ক্রসবি

পিকচার আর্টস এণ্ড সায়েন্সের পুরস্কার পাবার যোগ্য ব্যক্তিগণের নামের অনেক

জোয়ান ক্র্যাফোর্ড

উর্দ্ধে তার নাম থাকবে। খুব সম্ভব ক্লদেৎ কলবার্ট পাবে এবং তা একটি লঘু কমেডি অংশে অভিনয় করার দরুণ।

চার্লস লাটন

তার বর্ত্তমান চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই চার্লস ইংলণ্ডে ফিরে যাবে। এখন থেকে নামবে ষ্টেজে। এবং ক্বচিৎ কদাচিৎ সে নামবে স্ক্রীণে।

মার্লিন ডিয়েট্রিক

মার্লিনের ইউরোপ যাওয়া মিথ্যে হবে, দুঃখ দেবে; কোন সুবিধে হবে না। আগামী "ডিসায়ার" ছবির লোকানুরাগ ও যশোগান আবার তাকে হলিউডে ক্ষিপ্র গতিতে ফিরিয়ে আনবে। আবার ১৯৩৭ সালে গ্যারি কুপারের সঙ্গে তার দ্বিতীয় ছবি তৈরী হবে। আর হলিউডেই হবে তার অভিনয়ের চিরস্থিতি।

হয় না সে স্থলে এরূপ দল সংগঠনকারী কর্ম্মিৎকর্ম্মা ব্যক্তির উপস্থিতি যে কত ভাগ্যের কথা তার সন্দেহ নাই। কলিকাতা তথা সমগ্র ভারতের ব্রীজ খেলার সর্ব্বাঙ্গীন্ উন্নতি-কল্পে ইনি এর যথেষ্ট সময় ও শ্রম কাজে লাগিয়েছেন নানা উপায়ে। আজ যে ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের অধীনে বহু প্রদেশের ক্লাবই সদস্যভুক্ত হয়েছেন তাঁর মূলেও এর দান কম নয়। ইনি ছিলেন ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গল ব্রীজ এসোসিয়েশনের প্রথম কর্ম্মাধ্যক্ষ ও এই এসোসিয়েশন সংগঠনে অন্যতম উদ্যোক্তা ও তৎপরে সহ-সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি। বর্ত্তমানবর্ষে ইনি ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের অন্যতম সহসভাপতিরূপে মনোনীত হয়েছেন।

মার্লিন ডিয়েট্রিক

জোয়ান ক্র্যাকোর্ড

১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে তার নানা দিক থেকে বিপদ আসবে এবং তা ক্রমশঃ বেড়ে উঠবে। বছরের শেষের দিকে দেখা দেবে সুখ; আর সুখেই বছর শেষ হবে। বাহির জীবন ছায়াচিত্র কার্য্যে বাধাপ্রাপ্ত হবে; জোয়ানের নজর পড়বে বেশী ঘরের পানে—সংসারের পানে—স্বামীর পানে। স্বামী ফ্র্যাঞ্চট টোনকে নিয়েই ও থাকবে মহাসুখে। তাহোক এতে ওর চিত্রামোদীর দল একটুকুও কমবে না।

মায় ওয়েষ্ট

মায়-এর বিয়ে খুব আসন্ন হয়ে আসবে। আর বিয়ে আসন্ন তা বলি কেন? খুব সম্ভব বিয়ে হয়ে যাবে। আর তা যদি না হয়, এই বিয়ের ব্যাপার যে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত গড়াবে তা বলে দিতে পারি।

ভার্জিনিয়া ব্রুশ

ক্যারল লম্বার্ড

প্রেমে আনবে অতৃপ্তি। ওকে করবে অসুখী। ক্যারল বিয়ের ভাবনা মাথা থেকে ঘুচিয়ে দেবে। এবং এই পতিত প্রেমের পরিনতি ওকে অনেক, অনেক কাল ধরে কুমারী করে রেখে দেবে।

ক্যারল লম্বার্ড

গার্টুড মাইকেল

১৯৩৬ সালে ওর সবচেয়ে উন্নতি দেখা দেবে। এ বছরের শেষে ও যে ছবিতে নামবে সেই ছবি ওর মাথায় যশের জয়মুকুট

গ্লাডিস সোয়ার্থাউট

পরাবে। নামের সূর্য্য উঠবে দেশে দেশে। হলিউডের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের সিংহাসনের পাশে ওর সিংহাসন তৈরী হবে। এইবার

জিন হারলো

ঠিক করে নেবে গার্টুড, ও কি চায়! বিয়ে না বাহিরের কায!

জিন হারলো

জিন খুবসম্ভব ইউরোপ যাবে এবং সেখানে একখানা ছবি করবে।

ডব্লিউ সি ফিল্ডস

ফিল্ডস-এর স্বাস্থ্য অনেক উন্নতি লাভ করবে। তবু তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আগের চেয়ে এখন আরো বেশী যত্ন নেওয়া দরকার।

বিঙ্ ক্রসবি

বিঙের জীবনে বিপদের সম্ভাবনা। ভীষণ আঘাত পেতে পারে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে পারে, তবে সে দুটো থেকেই অতি অল্পের জন্যেই বেঁচে যাবে। বিঙের এই বিপদের আশঙ্কা আছে কোন বাষ্পযান থেকে।

ক্লদেৎ কলবার্ট

ফ্রেড ম্যাকমারে

ফ্রেডের দিকে নজর রাখো। ১৯৩৬ সালে ওর বরাত খুব ভালো; একেবারে বরপুত্রের মত। হলিউড মনে করে ফ্রেড আজ পর্য্যন্ত যা নাম পেয়েছে তা নেহাৎ বরাত ক্রমেই পেয়েছে। ১৯৩৭ সালে ফ্রেডের নাম এত উঁচে উঠে যাবে—ওর চিত্রামোদীদল এত বেড়ে যাবে যে প্রডুউসাররা ওকে নিয়ে বেশ ভাবতে স্বরু করবে।

আইডা লুপিনো

আইডা এর মধ্যেই প্রেমে পড়েছে এবং তা খুব গোপনে রেখেছে। এটা ঠিক যে আইডাকে বিয়ে করতে হবে। ১৯৩৬ সালে ওর বিয়ে হবেই।

ভার্জ্জিনিয়া ব্রুশ

যে কারণেই হোক ভার্জ্জিনিয়া ব্রুশ ছায়াচিত্র জগত থেকে কিছুকালের জন্যে বিদায় নেবে। প্রেম, বিয়ে কি অন্য কোন কারবার যা ওকে টেনে নিয়ে যাবে। ওকে যে বিদায় নিতে হবে তা ধ্রুব সত্য।

জর্জ্জ বার্ণস এবং গ্রেসি এ্যালেন

১৯৩৬ সালে ওরা ওদের তৃতীয় সন্তান লাভ করবে। এ সন্তান হবে মেয়ে। ওরা দেশ ভ্রমণে বেরোবে; খুব সম্ভব সারা পৃথিবী ঘুরবে।

গ্লাডিস সোয়ার্থাউট

গ্লাডিসএর ছবি 'রোস অব দি র‍্যাণ্ডো' যে নাম কিনবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর পরের ছবি 'গিভ আস দিস্ নাইট' জান কিপারার সঙ্গে আরো নাম কিনবে। এ ছবির যশ এত ছড়িয়ে পড়বে যে সারা দুনিয়ার লোক—গ্লাডিসএর নাম জানতে পারবে।

জীবন-বন্ধন-মাঝে

শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী

অবরুদ্ধ জীবনের স্বপন নিচয়
বিকশিত করি' আজি দেখাও জগতে,
মুক্তি কামী ওগো তুমি নাহি কোনো ভয়
বসুধার বক্ষ শুধু তোমা সুধা দিতে।

পাষাণ প্রাকার মাঝে বারিধি কল্লোল,
উচ্ছ্বসিত জীবনের ভাবধারা নিয়ে;
শোনেছ কী তুমি কভু হ'য়ে উতরোল?
আবাহণ শত কণ্ঠে দিশাহারা হ'য়ে?

দেখেছো কী বিজলীর তীক্ষ্ণ হাসি রেখা—
প্রলয়-আঁধার-মাখা—বিভীষিকা—রাতে?
সে তো শুধু পথ-ভ্রান্ত পথিকের দেখা—
দূরে রাখি' স্নেহ-নীড় নিঠুর আঘাতে।

লক্ষ্য শুধু সীমাহীন আকাশের পানে,
বন্দী-মানব নাচে জগতের গানে।

[গত ১৯শ সংখ্যা খেয়ালীতে 'শেফালি কুঞ্জে' কবিতা বাহির হয়। তদুত্তরে শ্রীপ্রতুলানন্দ দত্ত 'ভ্রমর গুঞ্জে' কবিতা লেখেন প্রত্যুত্তর সহ এই কবিতা ২১শ সংখ্যা খেয়ালীতে মুদ্রিত হয়। অতঃপর পত্রিকার বাগবাজার আপিস হইতে বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞের নিকা হইতে যে বাণী পাওয়া গিয়াছে তৎসহ শিক্ষানবীশের প্রশ্ন মুদ্রিত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিলাম। খেঃ সঃ]

বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞের বাণী

অমৃতের সাথে খেয়ালের কথা
মনে হয় যেন শুধু বাতুলতা।

(বউবাজারের বিশেষ বন্ধু)

অক্ষয়-অব্যয় অতুল-প্রতুল
লিখিয়াছ দুয়ে ছন্দ,
কেন মিছামিছি কর চেঁচামেচী
বাড়াইছ শুধু দ্বন্দ্ব।

ভাগিনেয় ধীর মতি করি স্থির
প্রবেশে জীবনকুঞ্জে,
অবুঝ ধারণা অক্ষয় কল্পনা
কেমনে ভ্রমর গুঞ্জে!

"ঘুরে চ'রে খাওয়া" "ফুল খুঁজে লওয়া"
আর "জ্বলে পুড়ে ম'রা"।
এ স'বের পথে আছ এক সাথে
কেন দিলে শুধু ধ'রা।

বিজ্ঞাপন-রস যদি হে বিরস
কেমনে খেয়াল চলে
অকথিত বাণী প্রাণ দিয়ে শুনি
প'ড়ো না গভীর জলে।

সরম করোনা মরম বেদনা
হয়ে থাকে যদি আশ
প্রকাশিয়ে বল টুপি ছুঁড়ে ফেল
ছাড় হে রাতের ঘাস।

বাজাইয়ে বীণ দেখে শুভদিন
উভয়ে উভয় তরে,
লেগে যাও বীর হ'য়োনা অস্থির
প্রবেশ বাসর-ঘরে।

কিন্তু উপদেশ আছো দু'য়ে বেশ
প'রোনা গলায় ফাঁস,
যে জন প'রেছে সে জন মজেছে
সাধিয়া লয়োনা বাঁশ।

শিক্ষানবীশের প্রশ্ন

(রাণী মুদিনী গলির প্রেতাত্মা)

বউ-বাজারের বউ-বিলাসী গো
একি কথা তব মুখে?
বউ-ব্যাজারীর হতাশার শ্বাস
কেন আজি তব বুকে?

জ্ঞানে-অজ্ঞানে সে কি গো দিয়াছে
পাকা ধানে তব মই?
বাঁশ-সাথে তার তুলনা করিলে
—অবাক্ হইয়া রই!

বাসর-ঘরেতে প্রবেশ করিতে
একমুখে উপদেশ!
আবার বলিছ বিবাহ সে বাঁশ!
লীলাটি দেখালে বেশ!

জ্ঞানের সাগর রসের নাগর
মাতুল-মিত্র মোর
কোন কারণেতে হ'য়েছে কি কড়া
মামীর শাসন-ডোর?

রূপের বেসাতি করিতে বসিলে,—
বিরস বিজ্ঞাপন,
যেমন বিবাহ তেমনি মন্ত্র,—
এই মোর নিবেদন।

বিজ্ঞাপনেতে রূপা-রস আছে
রূপ কি সেথায় পাবে?
টাকা-আনা-পাই হিসাবের ঝাঝে
রূপ যে শুকায়ে যাবে!

অতুল-প্রতুল সকাশে আমার
এই ছিল আবেদন।
ইথে কেন রোষ? না লইও দোষ,
লহ প্রীতি-নিবেদন।

চকোলেটের মত মিষ্টি এই
মার্লিন ডিয়েট্রিশ্‌।
প্যারামাউন্টের "ডিজায়ার"
ছবির দর্শকদের মুগ্ধ কোরে-
ছেন ইনি রূপে ও গুণে।
[illegible]

পরিচালক

টেলিগ্রাম ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ টেলিফোন

স্ট্রাইকী ৯, রামময় রোড, কলিকাতা পার্ক ৩৩৪

[illegible] সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ই আষাঢ় ১৩৪৩, ২৫শে জুন ১৯৩৬

সনাতনীর ভূমিকায় ডাঃ নলিনীরঞ্জন

সহযোগী "অমৃতবাজার পত্রিকায়" প্রকাশ যে, গত শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতার এলবার্ট হলে বঙ্গদেশীয় সনাতনী সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নসীপুরের রাজাবাহাদুরের সভাপতির আসন গ্রহণ করার কথা ছিল কিন্তু তিনি অনুপস্থিত থাকায় সভায় তাঁহার অভিভাষণ পঠিত হয়। কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম, ডি, র অভিভাষণ।

একবার এক শ্রদ্ধেয় স্বদেশীযুগের বিশিষ্ট কর্ম্মীকে তাঁর হঠাৎ সনাতনী-প্রীতির কথা জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম সেটা তাঁর রক্ষা-কবচ মাত্র—এটা ধারণে নাকি বন্ধুবর সরকারের কোপদৃষ্টি থেকে রক্ষা পেয়েছেন বা পাবার আশা রাখেন। সনাতনী মুখোস নিয়ে আজ যখন ডাঃ নলিনীরঞ্জন বাঙ্লা দেশে তথা পুণ্যভারতভূমে ত্রাণকর্ত্তারূপে অবতীর্ণ, তখন আমরা তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির ও বিচক্ষণ ভবিষ্যৎদৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারি না। তাই সর্ব্বপ্রথম তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়েছে জাগণদেবতা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও তাহার সুযোগ্য অধিনায়ক জওহরলালের বিরুদ্ধে। সনাতনী সভার বা তার নেতা বা উপনেতার কোন গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি নেই কিন্তু তা বলে সন্ত্রাসবাদে ভীতি ত অমূলক নয়—যতই তার বাস্তবে অস্তিত্ব না থাবুক। জওহরলালের সাম্য-বাদের আদর্শ কিন্তু ক'রে দরিদ্র-নারায়ণে বিশ্বাসী ধনী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র সনাতনী নেতা ডাঃ নলিনারঞ্জনকে অবিচলিত রাখতে পারে! শোষণনীতি অতি পুরাতন ও সনাতনী—বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সমাজগঠন তার উপযুক্ত পরিপোষক। কংগ্রেসের ভবিষ্যগঠনে আয়-নির্দ্ধারণের যে কড়াকড়ি নিয়ম, নিরন্ন ও নিরস্ত্র নরনারীর মধ্যে দেশের সম্পদ-বণ্টনের যে দরদী বন্দোবস্ত আছে তা যে সত্যই আমর্জ্জনীয়! আজকের দিনে গবর্ণমেণ্টকে আয়ের উপর মোটা হারে সুপার-ট্যাক্স দিয়েও যে পরিমাণ অর্থ সমাগম হয় তার ভোগস্বত্ব উপভোগ ক'রে পুরুষানুক্রমে ধনী সম্প্রদায় এখনও নির্বিবচারে শোষণনীতি অনুসরণ করতে পারে। আয়াসভরা জীবন, জীবন-ভরা নিশ্চয়তা—ধনীর, তাহার পুত্রের ও পৌত্রের —এ যে সনাতনী সমাজের, ধর্ম্মের ও ভাবধারার দান, তাই যে কোন ভাগ্যবান তা মাথা পেতে গ্রহণ করবে। তাই কমলার বরপুত্র ডাঃ নলিনীরঞ্জন তার ব্যতিক্রম হ'তে পারেন না। কিন্তু ভোগের ক্রোড়ে লালিত পালিত ধনীসমাজে সুপরিচিত "প্রিন্স" জওহর সত্যই সবার বিস্ময়। ভারতের জনসাধারণের জীবন-প্রণালীর সাথে নিজের জীবন-প্রণালী ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়ে দেবার আকুলতা জওহরলালকে দিয়েছে সবার অন্তরের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। জওহরলাল যে কত বড় বিস্ময়, তার পরিচয় শুধু এইখানে শেষ নয়। কাশ্মীরী-ব্রাহ্মণকুলদ্ভোব একমাত্র আর্য্যরক্তের উত্তরাধিকারী ভারতের জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে ধর্ম্মের বাধা অতিক্রম করেছেন বলে ভারত নেতারূপে দেশ তাঁকে পেয়ে ধন্য। দেশাত্ম-বোধ ও জাতীয়তার পুরিপুষ্টির মধ্যে ধর্ম্মের সার্থকতা কিন্তু তা'বলে অনড় ও অচল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অনুশাসন মানবের ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ ও [illegible]

মানুষের ভগবৎবিশ্বাস আত্মবিশ্বাসের নামান্তর মাত্র। আত্ম-অবিশ্বাসী ভগবানে বিশ্বাস করে ভীকতাকে গোপন করার জন্য।

তাই জওহরলালের ভগবৎ-বিশ্বাসের অভাব ব'লে ডাঃ নলিনীরঞ্জনের দলীয় যে সনাতনী নেতারা ধূয়া তুলেছেন তাতে সত্যের চেয়ে দ্বেষ বেশী প্রকাশ পায়। জাতির নেতা জাতিকে হিন্দু, মোসলেম বা খৃষ্টানভাবে না দেখে ভারতবাসীরূপে দেখতে চায়। ধর্ম্মের বিরোধ বা গ্লানি যেন কোন দিন জাতীয় কংগ্রেসের পুণ্য আসর কলঙ্কিত না করে। ভারতের যে বাণী জাতীয়তাবলে মুখর হয়ে উঠবে, তাকে সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। জাতীয়তার ভিত্তি যে ধর্ম্মের উপর, তা সাম্প্রদায়িক নয়; অনুদার নীতি অনুসরণ ক'রে মানুষ যে শুধু ভ্রান্ত হয় তা নয়, অনর্থক কেবলমাত্র মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জাতির উপাস্য নেতাদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে সবার কাছে হাস্যাস্পদ হয়, কারণ আজকের সবাই সনাতনীর রূপ জানে।

এই সম্মেলনে নসীপুরের রাজা বাহাদুরের সুচিন্তিত অভিভাষণ কিন্তু প্রণিধানযোগ্য। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ নলিনীরঞ্জনের অভিভাষণের পর এইরূপ অভিভাষণ পঠিত হ'বে আশা করা যায় না। রাজা বাহাদুর সত্যই ব'লেছেন যে সনাতনীকে নীতি (?) পরিবর্ত্তন ক'রে নূতন ভাবধারার সঙ্গে বোঝা পড়া করতে হবে। দেশও তাই বলে কিন্তু আমরা জানি ডাঃ নলিনীরঞ্জন তা বলতে পারেন না। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব! এই জন্যই তাঁর সময়োপযুক্ত সনাতনী অভিযান।

মহারাজা ও মন্ত্রী

বর্দ্ধমানে আর একজোড়া মাণিকজোড়ের উদ্ভব হইয়াছে—মহারাজা ও মন্ত্রী। স্বীয় জমিদারী পরিচালনায় অক্ষম হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহতাব্ তাঁহার বিশাল সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ে নিক্ষেপ করিয়া নিজে যথেচ্ছ বিচরণে ব্যাপৃত হইয়াছেন। বিলাত প্রবাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া বাঙ্‌লায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বর্দ্ধমানে বেকার হইলেও কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার পুত্র উদয়চাঁদকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন। আসন্ন-নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে মহারাজ বিজয় ও মন্ত্রী বিজয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মিতালীর সৃষ্টি হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজা মণিলাল সিংহ রায় মহারাজ-তনয়ের পক্ষে তদ্বির আরম্ভ করিয়াছেন এবং বিনিময়ে মহারাজ স্বয়ং মন্ত্রী বিজয়ের সহায়তায় সমর্থক-মণ্ডলীর নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে উক্ত পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

The Palace,
Burdwan
4th. June, 1936.

Dear......

I do not know if you are aware that my eldest son Maharaj-Kumar Udoy Chand Mahtab is standing for election to the Bengal Legislative Assembly under the new constitution. The constituency which he has chosen is the Rural Burdwan Sadar. The Hon'ble Sir Bijoy Prasad Singh Ray, Minister for Local Self-Government, Bengal, now representing this constituency, who at my request, has agreed to stand from the Land-holders' constituency of the Burdwan Division so as not to contest the seat with the Maharaj-Kumar.

I, on my part, promised to support Sir Bijoy Prasad's candidature from the Land-holders' constituency. He whilst rendering service to the province as a Minister has always tried to uphold the cause and interests of the landholding community of Bengal, as you know, and as such he deserves full confidence and suffrage of the landholders. I hope, therefore that you will support him in getting himself elected through the landholders' constituency of the Burdwan Division for which I shall be grateful.

Yours sincerely,
(Sd/-) B. C. Mahtab, Burdwan.

"রতনে রতন মিলে" শীর্ষক প্রবন্ধে সহযোগী "বসুমতী" মহারাজ-মন্ত্রী আঁতাতের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, সদর বর্দ্ধমান কেন্দ্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মন্ত্রী বিজয় বর্দ্ধমান জমিদার-কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন এবং মহারাজকুমার মন্ত্রী বিজয়প্রসাদের বর্ত্তমান কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। এবং উভয়ে পরস্পরকে সহায়তা করিবেন।

বর্দ্ধমান জিলা কংগ্রেস কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, মহারাজকুমারই হউন বা মন্ত্রী বিজয়-প্রসাদই হউন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাঁহাদের বিরোধিতা করা হইবে। বর্দ্ধমান জমিদার-কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্রের কোন পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। সহজে মন্ত্রিত্বের মায়া পরিত্যাগ করা পীড়াদায়ক হইলেও মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ অতি সত্বরই বুঝিতে পারিবেন যে, মহারাজার সহিত প্রেমডোরে আবদ্ধ হইয়াও নব-সংস্কৃত শাসনতন্ত্রের মন্ত্রীমণ্ডলীতে তাঁহার স্থান সংকুলান হইবে না।

জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান!

শ্রীকমলাকান্ত বসু

শুক্তির গর্ভে মুক্তা যেমন আত্মগোপন করিয়া থাকে, অঙ্কুরের অভ্যন্তরে পুষ্প যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, রেণুকণার অন্তঃস্থলে ফল্গুধারা যেমন প্রবাহিত থাকে, সেইরূপ "সাহিত্য" শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যে সাহিত্যের আদর্শ ওতপ্রোত রহিয়াছে। সাহিত্য শব্দের দ্বিবিধ অর্থোপলব্ধি হয়,—(১) যাহা হিতের সহিত বর্ত্তমান তাহা স-হিত, তদ্ভাব "সাহিত্য." অথবা (২) সহিত (সঙ্গ) তদ্ভাব "সাহিত্য"। কিন্তু অর্থ দুই প্রকার প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা একই বস্তুর দুইদিক—পরস্পর এরূপ অঙ্গাঙ্গি-ভাবে সংযুক্ত যে একের উপর অন্যের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। সাহিত্য যে-হিতের প্রতীক সে-হিত কাহার হিত? ইহা যে সঙ্গভাবের সংঘটক তাহা কাহার সঙ্গ? উত্তর,—নিখিল বিশ্বের, জগতের মহামানবের! হিতের সহিত অ-হিতের কোনদিন কোন সম্বন্ধ নাই; দৃষ্টান্তস্বরূপ বায়স ও পিকের চিরকাল অসদ্ভাব উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিত বা শুভ দ্বারা মিলন সংস্থাপিত হয়, যেখানে হিত বিদ্যমান সেখানে মিলন নিঃসংশয়ে বর্ত্তমান। মণিমাল্য প্রণয়ন করিতে হইলে যেরূপ সূত্র ও মণি উভয়েরই প্রয়োজন, তদ্রূপ নিখিল বিশ্ব মানব-জাতির মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে হিত এবং সঙ্গভাব নিতান্ত আবশ্যক। অতএব হিত বই মিলন অসম্ভব, মিলন-হীন হিত আকাশকুসুমবৎ অলীক। সাহিত্যের আদর্শ—চরম ও পরম উদ্দেশ্য—মানবমণ্ডলীর হিতপূর্ণ মহা সম্মেলন সংগঠন।

আন্তরিক পরিতাপের কথা, আমরা সাহিত্যকে কল্পনার পর্য্যায়ে আকর্ষণ করিয়া তাহার মর্য্যাদাহানি করিয়া, বিপুল পুলক অনুভব করি! সাহিত্যিক কবি ঠিক কল্পনা-প্রিয় নহেন, তাঁহারা আদর্শবাদী। তাঁহারা চাহেন তাঁহাদের সমস্ত চিত্তরঞ্জনাকে তাঁহাদের জীবনে সুন্দর সুরঞ্জিত করিয়া বাস্তবে পরিণত করিতে। তাহারা চর্ম্মচক্ষু দিয়া বহির্জ্জগৎকে যতদূর দেখেন, তদপেক্ষা তাঁহাদের অন্তশ্চক্ষু দিয়া আরও অনেক বেশী অন্তর ও বাহিরকে পর্য্যবেক্ষণ করেন। শূন্যের উপরিভাগে শূন্যের—মহা-শূন্যের অবস্থান অসম্ভব নহে, কিন্তু অম্বরচুম্বী কল্পনাসৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার দৃঢ়ভিত্তির প্রয়োজন। যে-সাহিত্য আমাদিগকে শুদ্ধ কল্পলোকে রামধনু আর ছায়াপথের রূপ-বৈচিত্র্যে বিভোর করিয়াই নিঃশেষ,—তাহা তো আদর্শ সাহিত্যের স্বর্ণসিংহাসনের দাবী করিতে পারে না! সাহিত্যের মহান্ উদার আদর্শ বিশ্বমানবকে 'মানবত্ব' দীক্ষা দেওয়া তাহাদের প্রত্যেককে আকাশের ন্যায় সম্পূর্ণ সিন্ধুর মত গভীরহৃদয় ও পৃথ্বীর তুল্য অনন্ত-বিভবসম্পন্ন করিয়া তোলা! সাহিত্য কোন স্থান কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, সাহিত্য সর্ব্বযুগের—সাহিত্য সমগ্র জগতের। সাহিত্যের গতিপথ এই ধূলাধরিত্রীর মধ্যে ও তাহা লঙ্ঘন করিয়া আরও বহুদূর—অনেকদূর!

জগতের যে কোন জাতি উন্নতিশীলতা বা সুসভ্যতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার ভিত্তি-মূলে আছে সাহিত্য। সাহিত্য আমাদের জীবনবিকাশের এক দিব্য পথপ্রদর্শক। আদর্শসাহিত্য আমাদিগকে জানাইয়া দিবে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য। সেই অপূর্ব্ব কারুর কি অদ্ভুত সৃষ্টিবৈচিত্র্য,—সেই সৃষ্টিবৈচিত্র্যে আবার কি সুন্দর অঙ্গ এই মানব! তিনি তো আমাদিগকে পশুপর্য্যায়-ভুক্ত করেন নাই, তাহাদের মত আমাদিগকে তো মূক মূর্খ করিয়া প্রেরণ করেন নাই। তাই বুঝি আদর্শসাহিত্য স্বরলহরীতে তান তুলিয়া বিশ্বমানবকে শিক্ষা দেয়,—

> "সবার উপরে মানুষ সত্য,
> তাহার উপরে নাই!"

সুতরাং সাহিত্যের আদর্শ আমাদিগকে পশুপ্রকৃতি হইতে পর্ব্বতপ্রমাণ তুঙ্গস্তরে রক্ষিত করিয়া মহামনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর করা! এই অগ্রগমন-ই তো উন্নতি, জাতির সভ্যতার পরিস্ফুট ইঙ্গিত।

সাহিত্য বিশ্বমানবের হৃদয়ের চিরন্তন অভিব্যক্তি। হৃদয়ের বিশ্লেষণে পাওয়া যায় দুইটি অনুভূতি,—সুখ ও দুঃখ। হৃদয়ের সমস্ত চিত্তবৃত্তি ঐ দুই বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে। যখন সংসারের গুরু-ভারে আমরা বজ্রপ্রপীড়িতের যন্ত্রণা অনুভব করি, যখন অন্ধের মত ভ্রান্তপথে চলিতে চলিতে আমরা শেষে সঙ্কটসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যে আসিয়া পৌছি, যখন অশেষ প্রণয়ভাজন কোন অভিন্নহৃদয় দয়িতের বিয়োগ ব্যথা বা বিরহতাপে আমাদের

> "হিয়ার ভিতরে লুটায়ে লুটায়ে
> কাতর পরাণ কাঁদে,"

তখন আদর্শ সাহিত্য কি অলৌকিকী মোহিনী সান্ত্বনা আমাদের অন্তরের অন্তঃ-পুরে অজস্র বর্ষণ করে! রোগে শোকে কি দিব্যশান্তির সুসংবাদ বহন করিয়া আনে! তাই কি ফরাসী দার্শনিক সাহিত্যিক মন্টেস্কী (১৬৮৯—১৭৫৫) বলিয়াছেন,—"The love of study is in us almost the only eternal passion"! সাহিত্যের আদর্শ কত সুন্দর

আদর্শসাহিত্য আমাদিগকে দুঃখক্লেশের কশাঘাত হইতে অপার্থিব অতীন্দ্রিয় আনন্দ সুখের অধিকারী করে। আদর্শসাহিত্য আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়,—"আনন্দাৎ হ্যি এব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"! আনন্দ হইতে যখন আমাদের উৎপত্তি,—আনন্দেই মানবের জীবন, আনন্দের ভিতর দিয়াই জীবনের সম্যক বিকাশ, প্রতিভার ক্রমোন্মেষ,—তখন কেন আমরা নশ্বর দুর্ব্বহ দুর্দ্দশার নাগপাশের জটিলতা পরিচ্ছিন্ন করিয়া সেই ভূমানন্দের স্বপ্ন প্রার্থনা করিব না? কিন্তু এ আনন্দ কিসের আনন্দ? মিলনের আনন্দ, পরস্পর হিতসাধনের আনন্দ! সুর-সমন্বয়ে মাধুর্য্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, তৃপ্তি আছে, তাহা বলিয়া ছন্দোভঙ্গে শৃঙ্খলাভঙ্গনে কলহরোলে আনন্দের ছায়াটুকুও নাই! এ বিশ্ব সেই বিশ্বদেবের নৈসর্গিক দিব্য তন্ত্রী-উদ্ভূত সহস্র সুরের সামঞ্জস্য—যেন ঘনীভূত সুর-লোক! আদর্শসাহিত্য আমাদিগকে জানাইয়াছে, ও যুগে যুগে তাহাই জানাইবে,—

> "From harmony, from heavenly harmony
> The universal frame began;
> From harmony to harmony
> Thro' all the compass of the notes it ran,
> The diapason closing full in man."

জ্ঞানবিজ্ঞ বৈজ্ঞানিককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, প্রকৃতির এই বিধিশৃঙ্খলার কোথাও এতটুকু সুরবৈষম্য ঘটিবার যো নাই। তবে কেন আমরা 'diapason' হইয়া সেই স্বর-সংযোগ ব্যর্থ করিব? আমি বই তুমি থাকিতে পার না, তুমি ভিন্ন আমার অস্তিত্ব কোথা? সুতরাং সাহিত্যের আদর্শ আত্মীয়তা সংস্থাপন—"বসুধৈব কুটুম্বকম্" নীতিপ্রচার করা। সমস্ত হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, চিত্তের জটিলতা, জীবনের কলুষকল্মষ নিরসন করিয়া আমাদিগকে দেবোপম গঠন করা সাহিত্যের আদর্শ। যে সাহিত্য তাহা করিতে অসমর্থ তাহা আদর্শসাহিত্য কোন ক্রমেই নহে।

সাহিত্যের আদর্শ আরও মহান্—ইহার উদ্দেশ্য আরও ঊর্দ্ধপথে। অশ্রুজলে নির্ম্মলতার একটা সন্ধান আছে, গঙ্গাগর্ভে পবিত্রতার একটা ইঙ্গিত আছে, প্রদীপ্ত সূর্য্যে প্রতিভার একটা আভাস আছে, আকাশকুসুমে একটা আশাবৈচিত্র্য আছে, সৌরভে একটা দেব-ভোগ্যের আস্বাদ আছে, স্বপ্ন কুহকে একটা পুলকস্পন্দন আছে, সাহিত্যে তেমনি একটা বিরাট মহাপুরুষের শান্তিবার্ত্তা আছে! সাহিত্য আমাদিগকে সীমার মাঝে লীলা দেখায় যাহাতে আমরা সীমার মাঝে অসীমকে ধ্যান করিয়া অসীম হইতে পারি, সাহিত্য রূপের মধ্যে অরূপকে মায়া-পটে প্রতিফলিত করিয়া আমাদের নয়ন-গোচর করে যাহাতে আমরা রূপের তলে অরূপের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি, সাহিত্য বাস্তবকে কল্পনার অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া আমাদিগকে সেই বিরাট্ শিল্পীর সৃষ্টিলীলার নিগূঢ় তত্ত্বের মাঝে আত্মহারা হইতে শিক্ষা দেয়! সমস্ত মান-অভিমান স্বার্থ-আত্মম্ভরিতা বিসর্জ্জন দিয়া, প্রেমমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া, এক সাম্যের সাম্রাজ্যের অধিবাসী করিতে চাহে এই সাহিত্য। সাহিত্য সেই দিব্যালোক যাহাতে চিত্তজড়তা অপসারিত হয়, সাহিত্য সেই জ্ঞানগুরু যাহার কাছে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয়, সাহিত্য সেই স্পর্শমণি যাহার যাদুস্পর্শে অন্তরের অন্তরতম ভাবনারাজি স্বর্ণরূপ লাভ করে!

সাহিত্যের আদর্শ একটা ক্ষণিক কল্পনা-প্রবাহে আমাদের চিত্ততল প্লাবিত করা নহে, সাহিত্যের আদর্শ একটা কুৎসিৎ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি নহে, সাহিত্যের আদর্শ একটা বিলাসসম্ভোগের উদ্বোধন করা নহে। কল্পনায় উচ্ছ্বাস থাকিতে পারে, বীভৎসতায় সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, লীলালালসায় সুখ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের আদর্শ হইতে পারে না। আদর্শ সাহিত্যের দরবারে পবিত্র পারমিতার দাবী আছে, বিশ্বস্রষ্টার কারুকলার সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্যের মর্য্যাদা আছে, প্রকৃতির সমস্ত সুবিশৃঙ্খলা অনুবর্ত্তনের তৃপ্তির আভাস আছে। আদর্শ-সাহিত্য আমাদিগকে জানাইবে,—

> "জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
> জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান!"

অয়স্কান্তমণি যেরূপ লৌহকে টানে, তদ্রূপ সমস্ত মানবকে এক সৌভ্রাত্র—সহানুভূতি বন্ধে আকর্ষণ করা সাহিত্যের অনন্ত ধ্রুব আদর্শ।

বাউল *

শ্রীসুনীল কুমার দাশ গুপ্ত

গান গেয়ে যায়, কোন্ সে পাগল
বাজিয়ে প্রাণের একতারা,
গলে তার নামের মালা,
চোখে তার প্রেমের ধারা।
চায়না ক্ষেপা পিছন্-পথে,
এগিয়ে চলে নৃত্য-রথে,
যায় নেচে সে হেলে দুলে
হ'য়ে আপন্-হারা।
ভালে তার চাঁদের থালা,
গলে তার তারার মালা,
সুখী, দুখী আয় ছুটে আয়
ভেঙ্গে মায়ার কারা;
আজ পাপী তাপী উদ্ধারিতে
এলো ন'দের গোরা।

---

* চন্দননগর মিউজিক কম্পিটিসনে শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল কর্তৃক গীত।

দেবদত্ত ফিল্মসের
প্রথম পৌরাণিক
— অবদান —
অহল্যা
পরিচালক :
জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায়
ডি, জি, টকীজের
প্রথম সামাজিক বাণী-চিত্র
দ্বীপান্তর
: পরিচালক :
শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী
: শ্রেষ্ঠাংশে :
ঊষা, মোহন রায়
ডি-জি, রূপলাল
—মুক্তি প্রতীক্ষায়—
শ্রী
একমাত্র পরিবেশক
রীতেন এণ্ড কোং
৬৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্
কলিকাতা
গ্রাম : ফিল্মাসার্ভ
ফোন : ক্যাল ১১৩৯

(ঝিলাসী)

কালী ফিল্মস্

ছোট একখানা পৌরাণিক ছবি "বসন্ত-পূর্ণিমা" কিছুদিন আগে কিছু তোলার পর বন্ধ ছিল। এবার সেখানা বেশ জোরভাবেই তোলা হচ্ছে।

* * *

হিন্দী ছবি "আশিয়ানা" শেষ হ'য়েও হচ্ছে না। বন্ধুবর সুকুমারের দুর্ভাগ্য মণিলালের মত একজন হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ অভিনেতাকে হঠাৎ তিনি হারালেন। তার জন্যে তাঁর কাজের বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল। তারপর জীবন গাঙ্গুলীও নাকি অসুস্থ হয়েছেন, তাই তাঁর কাজও এগুচ্ছে না আর। সুকুমার যেদিনে ছবি আরম্ভ কোরেছিলেন, সেদিনটা পাঁজিতে নিশ্চয়ই ভাল দিন ছিল না। কারণ ঐ দিনে 'বি ইউনিটে' গুণের আঁধার গুণময়ের ছবিও আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু তাঁর ছবির খবর তারপর প্রকাশ করার সুযোগ এ অবধি আমাদের হয় নি। তবে শুনছি এবার নাকি একটা হেস্ত-নেস্ত না কোরে ভেরেণ্ডা আর তিনি কিছুতেই ভাজবেন না। শুটিং তাঁর এবার দু'এক দিনের মধ্যেই সুরু হবে আর গতি হবে নাকি রেলের গাড়ীর মত। সুকুমারের "আশিয়ানা" আর গুণময়ের "পরভৃতিকা"-র জন্যে এই উৎসাহী দুই পরিচালক যদি শান্তি স্বস্ত্যয়ণ করেন, তা' হ'লে এদের ফাঁড়া কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে—কী বলেন আপনারা ?

* * *

নরেশ মিত্তিরের "সরলা" পরিচালনা নিয়ে আমরা গেল সংখ্যায় যে মন্তব্য পেশ কোরেছিলাম তারই প্রতিধ্বনি কোরে আমাদের কয়েকটি পাঠক আমাদের চিঠি দিয়েছেন। তাঁদের চিঠিগুলো এখানে প্রকাশ না কোরে তাঁদের আর্জ্জি আমরা গাঙ্গুলী মশাইকে জানাব। তিনি যদি ভাল বোঝেন নিজেই ছবিখানা পরিচালনা কোরবেন—আর যদি ইচ্ছা হয়, নরেশ মিত্তির কেন রাম শ্যাম যাকে ভাল বোঝেন তিনি এভার ন্যস্ত কোরতে পারেন।

রা৺া ফিল্মস

৺ণি বর্ম্মার পরিচালনায় "বিষ-বৃক্ষে"র শু৺ অনেকটা এগিয়েছে। এদিকে তড়িৎ বসু "অভয়ের বিয়ে"র ঘট্কালি নিয়ে বিশেষ ব্য৺ হয়ে উঠেছেন। 'টি-বি'-র ওপর আমাদের আস্থা আছে, সেজন্য আমরা ভাবছি রাধার কুঞ্জে এবার "অভয়ের বিয়ে" জমবে ভাল।

চন্দ্র ফিল্মস্

সবায়ের আগ্রহ "পরপারে" আস্বে ক৺। কিন্তু "পরপারে" যে মরীচিকার খেলা খেলছে। আসি আসি কোরে আসিতে না পা৺র—এমনি ভাবেই সে এতদিন চলেছে। কিন্তু সে মুক্ত হবে নিশ্চয়ই, আস্‌চে ৪ঠা জুলাই। আমরা আগ্রহে প্রতীক্ষা কোর্‌ছি সেদিনের।

ডি-জি-টকীজ

"দীপান্তরের" জাহাজ দেখলুম রাস্তায় রাস্তায় ভাস্‌ছে। ছবিখানা আর মাসের মাঝামাঝি "শ্রী"-তে দেখানো হবে। ছবি-খানা ভাল হবে একথা কানাঘুষো হ'চ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে, উপরের সিট থেকে নীচের সিট্ সবায়েরই খোরাক এতে মিল্‌বে। যদি তাই হয়, তা' হ'লে ডি-জি-র দুঃসাহসকে শত্রু-মিত্র সবাই বরণ কোরে নেবে। কারণ, সবাই এই ছবিতে নবাগত।

এই সঙ্গে "শ্যামসুন্দর" নামে একখানা ছোট ছবি দেখানোরও তোড়জোড় চালছে।

"যৌন-কথা"

৺হিত যুবক-যুবতীর অনেক গোপনীয় কথা—৺ সকলের নিকট বলা যায় না—তাহাই নানারূপ ৺ এবং বুঝান হইল। আপনার জানা চাই-ই!! ৺।৵৹ আনা, ডাক টিকিটে অগ্রিম দেয়। ভিঃ পিঃ ৺ই। ঠিকানা—পবিত্র রায় চৌধুরী, চৌধুরী ৺ার, ঢাকা।

সি, বি

এ বৎসর 'এ' ডিভিসন এবং 'বি' ডিভিসন লীগ ক্লাবগুলোর ভেতর সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন স্থান কোন টীমগুলি অধিকার কোরবে তা এখন থেকেই বেশ ধারণা করা যাচ্ছে। যদিও এখন দলগুলোর প্রায় পাঁচ ছয়টি করে খেলা বাকি আছে তা'হলেও সর্ব্বনিম্ন এবং সর্ব্বোচ্চ দলগুলোর স্থান পরিবর্ত্তন হবে না বলেই মনে হয়। মহমেডান স্পোর্টিং 'এ' ডিভিসন লীগে ৩২ পয়েণ্ট কোরে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে সৈনিক টিম ব্ল্যাকওয়াচ্। এদের আজ অবধি ২৭ পয়েণ্ট হয়েছে। এখন আর ব্ল্যাকওয়াচ 'কোনরকমেই মহমেডান স্পোর্টিং-এর সমান' পয়েণ্ট করতে পারবে না। ক্যালকাটার সঙ্গে খেলার আগে অবধি অনেকের ধারণা ছিল যে হয়ত ব্ল্যাকওয়াচ এবং মহমেডান স্পোর্টিং-এর সমান পয়েণ্ট হতে পারে। কিন্তু ব্ল্যাকওয়াচ মোহনবাগানের সঙ্গে 'ড্র' করায় এবং ক্যালকাটার কাছে হেরে যাওয়ায় সে আশা একেবারে চলে গেছে। এখন ব্ল্যাকওয়াচ পাঁচ পয়েণ্ট পিছিয়ে পড়েছে। বাংলা দেশ ছেড়ে যাবার আগে যে গৌরব অর্জ্জন করবার আশা ব্ল্যাকওয়াচ করেছিল সে আশা আর কার্য্যে পরিণত হল না। রসিদ্ আহত হওয়ায় মহমেডান স্পোর্টিং টিমের খেলোয়াড়েরা একটু মনমরা হয়ে গেছেন এবং টিমটিও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে রহমৎ এসে শীঘ্রই এই দলে আবার যোগদান করবেন। যদিও রহমৎ কাগজে কলমে এবছর ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবে যোগদান কোরেছেন তাহলেও তিনি নাকি নূতনের আশা ত্যাগ করে পুরাতনকে আবার আঁকড়ে ধরবেন। রহমৎ যোগদান কোরলে রসিদের অভাব অনেকাংশে পূরণ হবে। 'এ' ডিভিসনে নীচের দিকে তিনটি টিম রয়েছে। এদের মধ্যে এটাচড সেক্‌সন্-এর সবচেয়ে কম পয়েণ্ট হলেও তারা মিলিটারী টিম বলে নামবে না।

সম্মথ দত্ত কোল্‌কাতার এ বছরের শ্রেষ্ঠ 'ব্যাক'।

'বি' ডিভিসনে এবার ভবানীপুর ক্লাব প্রথম হবে বলেই মনে হয়। ভবানীপুর ক্লাব প্রতিষ্ঠা হবার পর 'এ' ডিভিসনে উন্নীত হবার এরকম আশাপ্রদ সম্ভাবনা পূর্ব্বে কখন হয় নি। আজ অবধি ভবানীপুর ক্লাবের ২৯ পয়েণ্ট হয়েছে। ভবানীপুর ক্লাবের পরেই আছে হাওড়া ইউনিয়ন, টাউন ক্লাব এবং রেঞ্জার্স ক্লাব। গত সোমবার টাউন ক্লাব ভবানীপুরের কাছে ১—০ হেরে যাওয়ায় ৬ পয়েণ্ট পিছিয়ে পড়েছে। হাওড়া ইউনিয়ন এবং রেঞ্জার্সের গেম সংখ্যা ভবানীপুরের সমান হলে এবং

এঁরা খেলাগুলি জিততে পারলে ভবানীপুরের চেয়ে যথাক্রমে চার এবং পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে থাকবে। ভবানীপুর বাকী ম্যাচগুলি জিতবে বলেই মনে হয় এবং জেতা তাঁদের উচিৎ। দ্বিতীয় ডিভিসনে জর্জ্জ টেলিগ্রাফ ইনষ্টিটুট্ এবছর যে রকমভাবে খেলা আরম্ভ করেছিল তাতে অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে তাঁরা নিশ্চয়ই 'এ' ডিভিসনে উন্নীত হবে আস্‌ছে বছরে। কিন্তু তাঁরা গোটাকতক খেলায় জেতবার পর বাকী খেলাগুলিতে হারতে সুরু করেছে। এই হার এক প্রকার ইচ্ছাকৃত বলা চলে। কারণ জুনিয়রদের ভিতর নামকরা গোলকিপার মন্মথ দাস থাকা সত্ত্বেও তাঁরা একটি নূতন গোলকিপারকে খেলাচ্ছে। যা'হক কর্ত্তৃপক্ষ যা করছেন তা আমাদের হয়ত বোধগম্য হবে না, তবে তাঁরা পরে অনুতপ্ত না হলেই আমরা আনন্দিত হব। 'বি' ডিভিসনে নীচের দিকে আছে এনটালি স্পোর্টিং এবং বউবাজার ক্লাব। এদের মধ্যে প্রথমোক্তটি দ্বিতীয় ডিভিসনে নবাগত। এখন অবধি বউবাজারের হয়েছে ৯ এবং ইনটালির হয়েছে ৭। তবে বউবাজার ইনটালির কাছে হেরে যাওয়ায় তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। শেষ অবধি দুটি টিমের সমান পয়েন্টও হতে পারে।

গেল সপ্তাহের খেলাগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে মোহনবাগান মাঠে দুইটি দুর্ঘটনা। গত ১৬ই জুন ইষ্ট বেঙ্গল এবং ই, বি, রেলওয়ের রিটার্ণ খেলাটি হয়। কোন গোল না হওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। খেলা আরম্ভ হবার পাঁচ মিনিটের ভিতর সামাদ গোল দেবার জন্য সকলকে কাটিয়ে গোলের দিকে অগ্রসর হন। এমন সময় ইষ্ট বেঙ্গল গোলকিপার পদ্ম ব্যানার্জ্জী বলটি আটকাবার জন্যে সামাদের পায়ের কাছে অগ্রসর হন। এতে পদ্ম ব্যানার্জ্জীর মাথার সঙ্গে লেগে সামাদের ডান পায়ের 'সিন্ বোন্' ভেঙ্গে যায়। তাঁকে এম্বুলেন্সে কোরে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঠিক তার পরের দিনই মোহনবাগান মাঠে মোহামেডান স্পোর্টিং এবং এটাচড সেক্সনের খেলায় আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। এই খেলায় মহমেডান ৪—০ গোলে জয়লাভ করেন। খেলা আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই রসিদ বল নিয়ে অগ্রসর হলে বিপক্ষদলের ব্যাক মার্টিন্ বল মারতে গিয়ে রসিদের পায়ে মারেন। এতে রসিদের পায়ের সিন্‌বোন ভেঙ্গে যায় এবং তখুনি হাঁসপাতালে পাঠানো হয়। সামাদ এবং রসিদ দুজনেই 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' হাঁসপাতালে আছেন। তাঁদের সম্পূর্ণ আরোগ্য হ'তে এখনও প্রায় মাসখানেক সময় লাগবে মনে হয়। সামাদ খেলতে পারলেও রসিদ হয়ত ভবিষ্যতে আর খেলতে পারবেন না। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে চাইনীজ টিমের বিপক্ষে এই দুইটি বিখ্যাত কৌশলী খেলোয়াড় খেলতে পারবেন না।

রসিদ

মোহামেডান স্পোর্টিং এবং পুলিশের খেলায় প্রথমোক্ত দলে প্রথম হাফে অখিল আমেদ এবং দ্বিতীয় হাফে নুর মহম্মদ সেণ্টার ফরওয়ার্ড খেলেন। একা রসিদের অভাবে যে টিমটি কত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে তা' সেদিন বেশ বোঝা গেল। সেদিনের খেলায় পুলিশ জিতলে দর্শকেরা কেউই বিস্মিত হ'ত না। যা'হক কোনক্রমে 'ড্র' হ'য়েছে। গেল শনিবার মোহনবাগান ড্যালহাউসির সঙ্গে জিতে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। এই খেলাতে ড্যালহাউসির এস, ব্রাউটন এবং মোহনবাগানের বিমল মুখার্জ্জী, মন্ম চৌধুরী এবং মন্মথ দত্ত ভাল খেলেছিলেন। গেল সোমবার মোহনবাগান ই, বি, আরের নিকট একগোলে জিতেছে। এই খেলায় সতু চৌধুরীর সেণ্টারে কানি দেব হেড কোরে যে গোলটি দিয়েছিলেন তা বাস্তবিকই দর্শনীয়, কিন্তু কানি দেবের খেলায় ঐ গোলটি ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। দুইদলেই অনেক গোল দেবার সুযোগ পেয়েছিল।

গত সপ্তাহের খেলার ফলাফল :—

বুধবার

কালীঘাট—ড্যালহাউসী	৩—১
মহামেডান—এ্যাটাচড সেক্‌সন	৪—০

বৃহস্পতিবার

মোহনবাগান—ব্ল্যাকওয়াচ	১—১
ঈষ্টবেঙ্গল—কাষ্টমস্	২—০

শুক্রবার

ই-বি-আর—এ্যাটাচড সেক্‌সন	৪—২
পুলিশ—মহামেডান	০—০

শনিবার

মোহনবাগান—ড্যালহাউসী	২—০
ক্যালকাটা—ব্ল্যাকওয়াচ	২—০
ঈষ্টবেঙ্গল—এরিয়ান্স	২—১

সোমবার

মোহনবাগান—ঈ-বি-আর	১—০
এরিয়ান্স—এ্যাটাচড সেক্‌সন	৪—৩

মঙ্গলবার

ব্ল্যাকওয়াচ—ঈষ্টবেঙ্গল	২—১
পুলিশ—কালীঘাট	১—১
ক্যালকাটা—কাষ্টম্‌স	০—০

আই, এফ, এ, শীল্ড

এ বৎসর আই, এফ, এ, শীল্ড প্রতিযোগিতামূলক হবে বলেই মনে হয়।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল বিখ্যাত মিলিটারী দলগুলো এবৎসর যোগদান কোরেছে। এবৎসর অনেক নূতন সিভিল টিমও বাইরে থেকে আসছে। তবে তারা কে কতদূর কি কোরবে তা এখন ঠিক কোরে বলা যায় না। সর্বসমেত এবার ৪৩টি টীম নাম দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক খেলা

প্রতি বৎসর লীগ খেলা শেষ হলে ভারতীয় বনাম ইউরোপীয়ান একটী আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা হয়। কিন্তু এবৎসর লীগ খেলা শেষ হবার আগেই ২৭শে জুন শনিবার এই খেলাটি হবে। কারণ যদিও ৩১ জুলাই এই খেলাটি হবার কথা ছিল কিন্তু ঐ দিনে "চায়না বনাম ইণ্ডিয়া" খেলা ঠিক হওয়ায় ঐ খেলাটি আগে হবার ঠিক হয়েছে। গত সোমবার আই, এফ, এর একটি জরুরী সভায় উভপক্ষেরই টিম নির্ব্বাচন হয়ে গেছে। ইউরোপীয়ান দলের নির্ব্বাচনে বিশেষ কিছু বলবার না থাকলেও ভারতীয় দল পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে বলেই মনে হয়। মোহনবাগানের যেন কাকেও না নিলে

ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন জেলে মজুমদার

নয় এইরূপে কে, দত্তকে নেওয়া হয়েছে। যদিও সকলকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, তাহলেও মোহনবাগানের বিমল মুখার্জ্জী হাফব্যাকে এবং সন্মথ দত্তের ব্যাকে স্থান পাওয়া খুব উচিৎ ছিল। মজিদের জায়গায় কে ভট্টাচার্য্যর (কাষ্টমস্) স্থান পেলে ভাল হত। দুলাল কি করে রাইট আউটে স্থান পেলেন বোঝা গেল না। এবৎসর তিনি নিজ ক্লাবেই স্থান পাচ্ছেন না। নিম্নে নির্ব্বাচিত টিম দেওয়া হল।

ইণ্ডিয়ানস্

গোল—কে, দত্ত (মোহনবাগান)

ব্যাক—এস, মজুমদার (এরিয়ান্স) ক্যাপ্টেন এবং জুম্মা খাঁ (মহমেডান)

হাফব্যাক্—অখিল আমেদ, নুর মহম্মদ মাসুম (মহমেডান)

ফরওয়ার্ড—দুলাল (ইষ্টবেঙ্গল), রহিম (মহমেডান), লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্টবেঙ্গল) মজিদ (ইষ্টবেঙ্গল) এবং আব্বাস্ (মহমেডান)

রিজার্ভ—ওসমান্ (মহমেডান), বিমল মুখার্জ্জী (মোহনবাগান), এ রায়চৌধুরী (মোহনবাগান), পি, দাস (ইষ্টবেঙ্গল), সাবু (মহমেডান) এবং এস, রায় (বড়) এরিয়ান্স।

কৌমু

ইউরোপীয়ানস

গোল—ডেভিস (ড্যালহাউসি)

ব্যাক—জি, কার্ভে (ই, বি, আর) এবং ফ্লেমিং (ড্যালহাউসি)

হাফ ব্যাক—এম স্মিথ (কাষ্টমস্), গেষ্ট (ব্ল্যাকওয়াচ) এবং টার্ণবুল (ক্যালকাটা)

ফরওয়ার্ড—হাণ্টার (ব্ল্যাকওয়াচ), জে, মিলস (পুলিশ), ক্যান (এটাচড্ লেন্সন) ম্যাকু (ব্ল্যাকওয়াচ) এবং বারোস্ (ক্যালকাটা)।

রিজার্ভ—আর্মষ্ট্রং এবং টমসন্ (ক্যালকাটা), হারনেল্ (ব্ল্যাকওয়াচ) সি, ব্রাউটন (ড্যালহাউসি) এবং উইলকিসন্ (ব্ল্যাকওয়াচ)

চাইনিজ টীম

আই, এফ, এর সঙ্গে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হওয়ায় আগামী ৪ঠা এবং ৬ই জুলাই চাইনিজ টীম দুটি ম্যাচ খেলবে।

ক্রিকেট

ভারতীয় দল নটিংহামসায়ারের সঙ্গে গত ১৬ই জুন খেলা শেষ করেন। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে সকলে আউট হ'য়ে ১২৪ রাণ করেন। নটিংহাম ২ উইকেটে ১৫৪ রাণ করবার পর সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যাওয়ায় খেলাটি 'ড্র' হ'য়েছে।

ভারতীয় দলের প্রথম জয়

গত ১৭ই জুন মাইনর কাউণ্টিদিগের সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলা হয়। এই খেলায় সি, এস, নাইডু প্রথম যোগদান করেন। এতদিনে ভারতীয় দলের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হল। মাইনর কাউণ্টি প্রথম ইনিংসে ২৮৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে সকলে আউট হ'য়ে ৪২ রাণ করেন। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসেই ৪০২ রাণ কোরে এক ইনিংস এবং ৭৪ রাণে জয়লাভ করেন। এই খেলায় মুস্তাক আলীর ১৩৫ রাণ এবং মার্চেণ্টের ৯৫ রাণ উল্লেখযোগ্য

ভারতীয় দলের সহিত 'সারের' খেলা আরম্ভ হ'য়েছে। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে সকলে আউট হ'য়ে ২২৬ রাণ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ১১৭ রাণ করেন। 'সারে' প্রথম ইনিংসে ৪৫২ রাণ করেন। সারের পক্ষে গ্রাস্থাম ১০৫, ফিসলক ৯৮ এবং পার্কার ৭৭ রাণ করেন। খেলাটি এখনও শেষ হয় নাই।

অমরনাথ

অমরনাথকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলে একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছে। প্রায় তিন হপ্তা পূর্ব্ব থেকে এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। অমরনাথ ভারতীয় দলের পক্ষে অপরিহার্য্য বলে গর্ব্ব অনুভব কোরে ঐ দলের ক্যাপ্টেন ভিজি'কে কিছুদিন যাবৎ অবমাননা কোরে আস্‌ছেন। মাইনর কাউণ্টিদিগের সঙ্গে খেলবার সময় অমরনাথকে চার ঘণ্টা 'প্যাড্' পরিয়ে বসিয়ে রাখা হয় বলে তিনি দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন এবং উত্তেজিত হ'য়ে ক্যাপ্টেন এবং ম্যানেজারের উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন। অমরনাথের এরূপ আচরণে বিরক্ত হ'য়ে ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন মহারাজকুমার, ম্যানেজার ক্যাপ্টেন ব্রিটেন-জোন্স এবং আরও দু'একজন সভ্য মিলিত হ'য়ে দীর্ঘকাল আলোচনা হবার পর দলের ক্যাপ্টেন অমরনাথকে ভারতবর্ষে ফিরে আসতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এই আদেশ দেওয়ার পর অমরনাথ সারারাত্রি কেঁদে অতিবাহিত করেন এবং দোষ স্বীকার কোরে এবারের মত ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন এবং ম্যানেজার সে আদেশ প্রত্যাহার না করায় অমরনাথ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা কোরেছেন। অনেকের মতে ম্যানেজার এবং ক্যাপ্টেন অমরনাথের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ কোরে দেশে পাঠিয়ে না দিলেই সুবিবেচনার কাজ কোরতেন। আমাদের মতে অমরনাথের অপরাধ যত গুরুতরই হক তিনি যখন ক্ষমা চেয়েছেন তাঁকে দলের সঙ্গে রেখে 'টেষ্ট ম্যাচে' না খেলালেই যথেষ্ট শাস্তি হ'ত।

গান

কমলা মুখোপাধ্যায়

ওরে আমার মন
এই পৃথিবীর নিয়ম পথে চল্‌বি কতক্ষণ।
সুখের আলো জ্বাললো যারা
আঁধার ঘরে কোথায় তারা—
বেদন-গীতি করচে মুখর আমার এ-জীবন!

হাসির পরে কান্না জাগে এই কী জীবন-নীতি,
আলোর পাশে ছায়া থাকে এই কী ধরার রীতি।

দুঃখ তবে হোক্ গো মধুর
সুখ-ছায়া থাকুক সুদূর ;
প্রাণের মাঝে চলুক শুধুই ঝড়ের আলোড়ন!

———

মিঃ পি, গুপ্ত

অলিম্পিক হকি টীমের এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার মিঃ পি, গুপ্ত ও মিসেস গুপ্ত গত সোমবার রাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জার যোগে জামসেদপুর যাত্রা কোরেছেন। মিঃ গুপ্ত ২৪শে জুন বোম্বাই যাত্রা কোরে ২৭শে জুন ভারতীয় অলিম্পিক টিমের সঙ্গে ভারতবর্ষ ত্যাগ কোরবেন।

অলিম্পিকের পথে ভারতীয় হকি টীম

গেল ২১শে জুন মাদ্রাজ ইণ্ডিয়ান দলের সঙ্গে খেলে ভারতীয় অলিম্পিক দল ৫-১ গোলে জয়লাভ করেন। ধ্যানচাঁদ ৩টি এবং রূপসিং ও এমেট একটি কোরে গোল দেন।

মাদ্রাজ হকি এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ সুব্বারায়ণ বার্লিন গামী এই হকিদলের মঙ্গল কামনা কোরে বলেন যে ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে যে কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হ'য়েছে এই দলের মধ্যে যেন সেরূপ না হয়।

টিমের ম্যানেজার প্রফেসর জগন্নাথ এর উত্তরে বলেন যে, ভারতীয় হকি দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় ভারতের গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখবেন এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

চিত্র-জগতে মিঃ টমাসের আবির্ভাবের সূচনা

শ্রীকুমুদেশ সেন

বৃটিশ মন্ত্রী সভার বিশিষ্ট শ্রমিক সভ্য মিঃ জে, এইচ, টমাস বাজেট ট্রাইবুনালের অভিমত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রী সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হয়ত তাঁহার অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টারী নেতা ও উপনেতাদের উত্থান ও পতনের ইতিহাসে এইরূপ কলঙ্কময় ঘটনার ইতিপূর্ব্বে উদ্ভব হইয়াছিল কি না তাহা ইতিহাসবেত্তারাও সঠিক ভাবে বলিতে পারেন না। বৃটীশ পার্লামেণ্টে এই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে মিঃ জাস্টিস্ পোর্টার ও অন্যান্য বিচারপতিগণকে লইয়া যে ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছিল তাহার ফলাফল প্রকাশের পর ইংলণ্ডের রাজনৈতিক কর্ম্মকেন্দ্র হইতে বিদায় গ্রহণ করাই মিঃ টমাসের পক্ষে একমাত্র পন্থা ছিল। ২৫ বৎসরের কর্ম্মময় জীবনের কলঙ্কময় পরিণতির পর মিঃ টমাসের ভাগ্যে চিত্র-জগৎ হইতে সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়ের সূচনা দেখা যাইতেছে।

লণ্ডন এবং হলিউডের প্রসিদ্ধ ফিল্ম এজেণ্ট ফার্ম David A Badu Ltd এর ইংরাজ পার্টনার মিঃ ডি, এন, ওয়াট্‌লী নিম্নলিখিত মর্ম্মে মিঃ টমাসকে এই টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন "আমরা কি আপনার পুস্তকের চিত্ররূপ গ্রহণের স্বত্ব পাইবার অধিকারী হইতে পারি? আমরা হলিউডের সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ফিল্ম এজেণ্ট।"

মিঃ টমাস সম্প্রতি ওয়েষ্টওয়ার্ড হো, নর্থডেভনে হুইটসানের ছুটী উপভোগ করিতেছেন এবং টেলিগ্রামটী তথায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

মিঃ ওয়াটলী "সানডে রেফ্‌রী"র এক প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন "আমরা মিঃ টমাসকে তাঁহার নিজের জীবনী-ভূমিকায় নামিতে অনুরোধ করিব। মিঃ টমাস-এর ব্যক্তিত্ব আমাদের নিকট অসাধারণ মনে হয়।" Will Rogers-এর সহিত Mr. Thomas এর বহুবিধ সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং উভয় ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজেদের চরিত্রগত মাধুর্য্য, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং কঠিন পরিশ্রমে কর্ম্মজীবনে এত সাফল্য লাভ করিয়াছেন। Will Rogers-এর মতন মিঃ টমাসেরও গল্প বলিবার ক্ষমতা অপূর্ব্ব। আমি এখনও সুনিশ্চিত হই নাই যে, মিঃ টমাস ইংলণ্ডে অথবা হলিউডে কোথায় প্রথম তাঁহার চিত্র-জগতের জীবনী আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তবে তাঁহার সাধারণ ব্যক্তিত্বে তিনি যে শীঘ্রই পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হইবেন তাহা আমি বলিতে পারি।" জুনিয়ার ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস "সানডে রেফ্‌রী"র এক প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন "রাজনীতিক এবং আইন ব্যবসায়ীগণ জন্মগতই অভিনেতা। তাঁহাদের কার্য্যই যে এই। ইঁহাদের মহতী সভাতে দর্শকের মনের উপর রেখাপাত করিতে হয় এবং মিঃ টমাস্ এই কার্য্যে শিশু নহেন। ইনি নাটকীয় প্রভাবের কলায় বিশেষ পারদর্শী।"

"সানডে রেফারী" জানিতে পারিয়াছেন যে মিঃ টমাস এই বিষয় বিবেচনা করিতেছেন এবং এখনও কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

বিগত পঁচিশ বৎসর কাল ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগনে জ্যোতির্ম্ময় ভাস্বররূপে বিরাজ করিয়া সহসা রাহুগ্রস্ত হইয়া মিঃ টমাসের যে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল এবং চিত্র-জগতের আকস্মিক আহ্বানে মিঃ টমাসের ভবিষ্যৎ জীবন যে নব ও নাটকীয়রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা লইয়া সাংবাদিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য, উত্তেজনা ও জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে।

বিবিধ

চক্রতীর্থ

চক্রতীর্থের দ্বিতীয় অধিবেশন গত ২১শে জুন ১৯৩৬ রবিবার দিন হইয়া গিয়াছে। এই সাহিত্য সভার বিশেষত্ব: এখানে কোনো সভাপতি নাই, চিন্তাশীল তরুণ সাহিত্যিকগণের মধ্যে যাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পরস্পরের রচনার মনস্তত্ব ও সাহিত্যের রসবিচার করিতে পারেন সেজন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ বিশেষ সতর্কতা ও সংযমের সহিত সভার তর্কপ্রণালী, বাদ প্রতিবাদ ও বিচার পদ্ধতির নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহাতে ভবিষ্যত সভ্যগণের মধ্যে দলাদলি বা আত্মকলহ না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, সেজন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের তরুণ সমালোচক হীরালাল দাশগুপ্ত ও তরুণ সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নির্ম্মলেন্দু রায়, রবীন্দ্র কুমার বসু, করুণাময় বসু, প্রফুল্ল সরকার, এবং চক্রতীর্থের যুগ্ম সম্পাদক সুসাহিত্যিক বিমল মিত্র ও কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ভবিষ্যতে সভ্যগণের মধ্যে যদি কাহারো কোনো দার্শনিক প্রবন্ধ, সামাজিক সমস্যার জটীল মনস্তত্ব-পূর্ণ রচনা অথবা অর্থনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সভায় পঠিত হয় তখন ঐ সকল বিষয়ের বিচার ও রায়ের জন্য যাঁহার ঐ ঐ বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইবে। চক্রতীর্থের কার্য্যনির্ব্বাহকগণের নাম হীরালাল দাশ গুপ্ত, করুণাময় বসু, বিশ্ববন্ধু রায় চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু রায়, অনুপমকৃষ্ণ বসু, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ গুপ্ত, অমূল্য সিংহ এবং রবীন্দ্রকুমার বসু। এই সকল সভ্য-

দুর্জ্জনমুখ চপেটিকা

তরুণীর রূপ-গহ্বরে

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

হায়গো বন্ধু অত নিঃশ্বাস ফেলিয়োনা চাহি অম্বরে
ভয় হয় পাছে ফুসফুস যায় চুপ্‌সিয়া
পথে ঘাটে মাঠে বিহ্বল হয়ে তরুণীর রূপ-গহ্বরে
মরিও না Lake Tragedyর মত ডুব দিয়া।
আধা ইংরাজী আধা বাংলায় মিশ্রিত তব বুক্‌নীতে
বাংলার মাটী ঘেন্নায় হ'ল প্রেতশীলা
বাঙ্গালী জাতির শ্রাদ্ধাধিকারী তোমাদের মত শুক্‌নীতে
ধ্বংসের পথে চালাও নিত্য কোন লীলা ?

পেশীহীন ঐ ন্যাকা ন্যাকা দেহ কঙ্কালসার অঙ্গেতে
বলিহারী যাই পোষাকের নানা ঢং দেখে
বক্তৃতা আর চালবাজী নিয়ে নিষ্প্রাণ এই বঙ্গেতে
মিছে সয়তানী ঢেকে রাখো নানা রঙ মেখে
জুল্‌পী এবং বাবরী শোভিত ও বদনে যদি এক ঘুসি
শ্রমিক কিম্বা স্বাধিনতাকামী দেয় মিঠে—
ধুলায় পঙ্কে গড়াগড়ি দেবে দেখিবে সকলে খড়ভুসি
ঘুণ-ধরা মেরুদণ্ডের তেজ নাই পিঠে।

তোমাদের এই দুর্দ্দশা দেখে মরিছে প্রগতি-দীক্ষিতা
Laboratoryর সুলভ গরল পান কোরে
প্রবঞ্চনার যন্ত্রণা সহি' প্রণয়ের সুখ বঞ্চিতা
পৌরুষহারা হায়গো পুরুষ অন্ধরে।
কাঁদেগো সমাজ নেহারি সমুখে মৃত্যুর ঘন অন্ধকার
বিকট অট্ট হাসিছে রুদ্র হুঙ্কারি'
নবজীবনের পূর্ব্বাশা পথে হ'ল কিহে চির বন্ধ দ্বার
ধ্বংস-কৃপাণ ঝন ঝন্ উঠে ঝঙ্কারি'।

শবাকার দেহ তবু ওআননে কোথা হতে পাও হাস্য গো
কোথা হ'তে পাও বৃহন্নলার ভঙ্গিমা
ক্লৈব্য কালিমা কুষ্ঠের মত ঢাকিয়াছে তব আস্য গো
কোথায় হারালে নব জীবনের রক্তিমা—
হায়গো বন্ধু অত নিঃশ্বাস ফেলিয়োনা চাহি অম্বরে—
আকাশের মরু বালুকায় হ'বে চোখ কানা
যক্ষার বিষ প্রবেশিতে পারে ফুটা ফুস ফুস গহ্বরে
ঝাঝরা যে হ'বে স্বপ্ন-বিলাসী মনখানা।

গণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিঃস্বার্থ নিষ্ঠায় "চক্রতীর্থের" দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু একটি ছোট গল্প পাঠ করেন। গল্পটীতে নারীর মনস্তত্ত্বের একটি দিক্ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে এবং রবীন্দ্রবাবুর গল্পটী লইয়া সভ্যগণের মধ্যে রীতিমত বিচার ও আলোচনা হয়। তৎপরে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ তাঁহার একটি ব্যঙ্গ কবিতায় "কটু-কর্কশ-ক্রুর-রসাত্মক" ভাষার অদ্ভুত প্রয়োগ কৌশল দেখাইয়া উপস্থিত সভ্যগণকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করেন। সন্ধ্যা ৬॥০টা হইতে রাত্রি ৯॥০টা পর্য্যন্ত সাহিত্য আলোচনার পরে পরস্পরকে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

কোহিনুর রেকর্ড

নব নির্ম্মিত 'কোহিনুর রেকর্ড' কোম্পানীর হিন্দী ও উর্দ্দু রেকর্ডগুলি আমরা শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ইতিমধ্যে বাঙলা গান ও নাটকের রেকর্ড তোলার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন।

ছাত্রীর কৃতিত্ব

কুমারী মল্লিকা সেন গুপ্তা এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। সঙ্গীতেও এঁর নিপুণতা যথেষ্ট। ইনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের কনিষ্ঠা কন্যা ও চুঁচড়ার জেলা ও দায়রা জজ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের কনিষ্ঠা ভগিনী।

অল্ বেঙ্গল কমার্শিয়াল ষ্টোরস

গত ২১শে জুন রবিবার ২১০১ রাসবিহারী এভিনিউএ (বালীগঞ্জ) অল্ বেঙ্গল কমার্শিয়াল ষ্টোরস-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মাননীয় জাষ্টিস স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

বাঙ্গালী রক্ষণ সমিতি (The Bengal Economic Advancement Leauge) এর অনুপ্রেরণায় এই "ষ্টোরস" এর প্রতিষ্ঠা। আশা করি ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই পৃষ্ঠপোষকতা পাইবে।

সাহিত্য সংসদ

বিগত ২১শে জুন রবিবার সন্ধ্যায় ওরিয়েণ্ট্যাল আর্টস সোসাইটি হলে সাহিত্য সংসদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভেই সমবেত সদস্যগণ বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ণধার পরলোকগত ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুতে তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করেন। সমবেত সদস্যগণের কেহ কেহ গোর্কির সাহিত্য জীবনের পর্য্যালোচনা করেন। অতঃপর সদস্যগণ দুই মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া গোর্কির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সভার শেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং 'ওরিয়েণ্টাল আর্টস্ সোসাইটীর' হল সভার অধিবেশন-স্থান হিসাবে ব্যবহার করিতে দেওয়ায় সাহিত্য-সংসদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির তরফ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কে সংসদের সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক চিঠি দেন।

তরী ও তুফান

সুশীল রায়

দিগবারণেরা শুঁড় দিয়েই জল ছেটাক্, আর আকাশটাই ফুটো হ'য়ে গিয়ে থাক্, বলার কথা হ'চ্ছে—বৃষ্টি হ'চ্ছলো। আর মীয়োনো নিতান্ত নিরীহের মতো এর দাপট নয়, এর মূর্ত্তি উগ্রচণ্ড,—প্রচণ্ড! দুর্দ্দান্ত বাতাসের ধাক্কায় ঘরের জানলা যেই খুলে যাচ্ছে অমনি ঝাপ্টা দিয়ে জল ঢুকে প'ড়ছে ঘরে, মেঝে উঠছে ভিজে পলকে।

প্রবীর তোষকের কোণ মুড়ে নিয়ে ব'ললো—ছিট্‌কিনিটা দিয়ে নিয়েই না হয় তোরা—

বড়েমি রেখে নিজে উঠেই দাওনা বাপু! মানস বিকৃত গলায় ব'ললো এবং হাতের নিভন্ত বিড়িটা বাঁচিয়ে তোলার জন্য জোরে জোরে টানতে লাগলো।

এক কথার ভেতর খানিকটা জায়গা উঠলো ভেসে। অবশেষে প্রবীর উঠে জানলা বন্ধ ক'রে জল রুখলো।

যাক্, এই তো গেলো! কিন্তু কথাটা হচ্ছে ভজহরিকে নিয়ে! স্থবির মুখ ক'রে নিতান্ত অপরাধীর মতো সে ও-কোণে ব'সে সবার কথার তাল সামলাচ্ছে! এতগুলি প্রশ্ন আর তাড়াহুড়া বাইরের বৃষ্টির মতো ওর মনে এনেছে প্লাবন। তবু ভজহরি ব'লেই—

রাকেশের দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মানস ব'ললো—সত্যি ভজহরি, ওটা সেরে এসো চট্ ক'রে! দেরি ক'রে নিজেই ঠকবে! বিকেলের দিকে তোমায় নিয়ে যাবো সব সেট্‌লড্; ওরা রেডি হ'য়ে ব'সে থাকবে! আর বেল্লিক সেজে, ভাল্লুকের মতো একগোছা মিশকালো চুল নিয়ে যাওয়াটা কি—

রাকেশ ব'ললো—হাত বাড়িয়ে কি চাইছিস্?—

দেশলাইটা এগিয়ে দে। ওর বিড়ি ম'রে গেছে, আবার দম দিয়ে নিতে চায়। দাঁত দিয়ে বিড়ি কামড়ে কাঠি বের করতে করতে ফের ব'ললো—রেন কোটটা চড়িয়ে ভালো চাওতো বেরোও এখনো!—নইলে সব কিন্তু ম্যাসাকার! কি বলো হে তোমরা?

প্রবীর ওদিকের চৌকী থেকেই চিৎকার ক'রে সায় দিয়ে উঠ্‌লো—আলবাৎ!

মহেশবাবু প্রবীরের পাশে ব'সে ছিলেন। উঠে এসে ভজহরির পিঠে হাত বুলিয়ে ব'ললেন—যাও ভাই! আমাদের অপদস্থ ক'রোনা! ওঠো লক্ষীটি!

প্রবীর দেয়ালের দিকে চেয়ে হাসি ঢাকলো। মানস গম্ভীর থাকতে পারে। রাকেশ ব'ললো—মহেশবাবুর কথা শোনো ভজহরি, উনি বড়ো ঠেকেছেন! ভদ্রলোককে অপ্রস্তুত ক'রোনা! বৃষ্টি হ'লো তো বয়ে গেল! গরজে সব হয় দাদা! চাকরি পাবার আশায় নর্দ্দমা থেকে কে-একজন কাদা তুলে খেয়েছিলো,—পড়োনি অমৃতবাজারে? যাক্, ওঠো! মির্জ্জাপুরের সেলুনে গিয়ে কেতাদুরস্ত ক'রে চুলটা ছেঁটে আপ-টু-ডেট্ হয়ে এসো! বাবা—যে-সে নয়!—বেথুনে থার্ড ইয়ার! সে নিজে যাই হউক না কেন, এতদিনের সাহচর্য্যে তার দিল্ এখন নর্দ্দমায় পাঁকে নয়, নর্দ্দমার বাঁকে! মানে সে ঠিক উল্‌টে গেছে,—পঙ্কিল আবর্জ্জনা চোখে দেখেনা, দেখে—পঙ্কজের কমনীয়তা, চায় সুগন্ধ! আর তুমি কিনা তারি ইয়ে হ'তে চ'লেছো! কি বলো হে? দাওতো এগিয়ে রেনকোটটা!

ট্রাঙ্কের ওপর থেকে ভাঁজকরা তারি ওয়াটার প্রুফটা প্রবীর ছুঁড়ে দিলো ভজহরির গায়ে। ও একটু মুচকে হেসে উঠে দাঁড়ালো: সত্যি যেতে হবে?

—আরে আবার সত্যি! যেতে হবে! ঘাড় কামিয়ো চার আনা, ছ আনা। সব খুলে ব'লো, কি জন্যে এক হাঁটু জল ভেঙ্গে ভিজতে ভিজতে আসা, ঠিক বানিয়ে দেবে! শিগ্‌গির ক'রে এসো! আমরাও এদিকে তৈরি হই!

রাকেশ মহেশবাবুর গা টিপে প্রায় হেসে ফেলেছিলো আরকি! মানস মুখ গম্ভীর করে ব'ললো—শিগ্‌গির এসো! আবার কি চাও? রবারের নাগ্রা? আরে ন্যোঃ! কেডস্ এই জলে হাঁটা সুবিধে! এগোও!

ভজহরি সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে প্রায় রাস্তায়! এতক্ষণের দম আট্‌কানো একটা উচ্ছ্বাস বেলুনের মতো হঠাৎ ফেঁসে গেলো ঘরের ভেতর! ভজহরি কাপড় উঠিয়ে তখন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের হমাজল ডিঙোচ্ছে।

বাইরের দুরন্ত বাতাসের মতো ওদের অফুরন্ত উচ্ছ্বাস! ভজহরিকে ওরা সেই কবে থেকে হাপু নাচাচ্ছে! ওরা বলে—রাস্কেলটা কী ষ্টুপিড! ভজহরি সব। 'বাঁদরটা কেমন গাধা'র মতো ও সব। তাই হাসচে ওরা এতো! আশু মুখাজ্জির মতো লম্বা গোঁফ কামড়ে ধ'রে অদম্য উচ্ছ্বাসের হাত থেকে মহেশবাবু নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। প্রবীর রীতিমতো গড়াগড়ি দিচ্ছে বিছানার ওপর। মানস গম্ভীর থাকতে পারে। রাকেশ প্রবীরকে সহানুভূতি দেখাতে গিয়েছে ও-বিছানায়।

—এ ঠিক্ (প্রবীরের দম আটকে যাচ্ছিলো, থেমে নিয়ে) এ ঠিক মহেশদার জন্যে। বলিহারি দাদা আপনাকে!—এ গ্রেট্ অ্যাক্টার! উঃ হুহুহু—প্রবীর তীব্রভাবে হাঁসিয় রেশ টেনে গেলো।

রাকেশ উঠে ব'স্লো, চোখছুটি যেন হৃৎপিণ্ড।

এত হাসি শুনে ও-ঘর থেকে নগেন ছুটে এলো: আরে, তোদের হ'লো কি রে? কি? ভজাকে পাঠিয়েছিস্? বাহাদুরি আছে বটে, হ্যাঁ! খুব কাজের লোক কিন্তু! তোরা একটা ক'রে এজেন্সি নিয়ে নে! খুব কেস্ দিতে পারবি। খানিকটা হো-হো করে চেঁচিয়ে সে-ও যোগ দিলো হাসিতে, হঠাৎ আবার সে-হাসি গেল নিভে। ওর হাসির ধরণটাই অমনি! সবেতেই যোগ দেয়, কিন্তু ক্ষণিক—বিদ্যুতের মতো! সবার মন রক্ষা করাই ওর ব্যবসা কিনা!

নগেন চোখের কালো ফ্রেম-এর চশমাটা খুলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে কাঁচ মুছলো! ও-ঘর থেকে এ-ঘরে আসতে ঝাপটার জলের গুঁড়ো উড়ে এসে প'ড়েছে তার কাঁচে!

কিন্তু ওরা হাসছেই!

প্রবীর থেমে ব'ললো—এ বিপদ থেকে এখন উদ্ধারের ব্যবস্থা! কি করা যায়? এসেই তো তেড়ে-মেরে ধ'রবে—চলো। কি মহেশবাবু, বাৎলান্! আর, এই বৃষ্টি যাবোই বা কোথায়?

—ডারহামের খেলা আছে। এল্‌ফিন্‌-ষ্টোনে কি বলে হে ওর নামটা—সাইন্ অব্ দি ক্রশ। ঠিক হয়ে যাবে। মহেশ-বাবু বাৎলালেন নিমেষে।

কিন্তু প্রবীর ব'লছে—যাওয়ার জায়গার তো অভাব নেই! কিন্তু বৃষ্টি যে!

—এ আর কতক্ষণ? বাজলো কটা? ওরে বাপবা—দুই? রোববারটাই স্রেফ মাটি! নো তাশ, নো পাশা! মহেশবাবুর ভাবনা গড়িয়ে গেলো অন্যদিকে।

নগেন বুক বাজিয়ে উঠলো: হায় হায়! ঠিক হ'য়ে যাবে আমি ভার নিচ্ছি। চলো রেস্তরাঁ'য় বসি। একটু জল ধ'রলেই বেচু চাটার্জি পাড়ি দিয়ে কর্ণোয়ালিশএ ট্রা'ম নেবো। কিন্তু প্রবীর; আজ বৃষ্টিতে সব পণ্ড হ'লো, আসচে রবিবারে এনি হাও তোমার মেডিক্যাল—

মানস মুখে শব্দ করলো—হু'—ম্! নগেন, বেশ 'আছো ভাই! একথা সেকথা থেকে একদম আলাপাতায়!

নগেন প্রচণ্ড ভাবে হেসে উঠে কথা-টাকে জল ক'রে দিলো। মানসের দিকে চেয়ে ব'ললো, আর তুমি তো ওয়ার্ড দিয়েইছো! নেক্স্ট্ ইনক্রিমেন্টএ!

মানস চিৎকার ক'রে নগেনের পিঠ চাপড়ে ব'ললো—বহুৎ আচ্ছা!

প্রতিদানে নগেন মানসের কাঁধে ঝাঁকি দিয়েই উঠে দাঁড়ালো: রেডি হয়ে নাও! ইউ রাকেশ, রাখো ফিল্ম্-ফান্, ঝট্‌পট্

তৈরি হ'য়ে নাও! নিমেষে নগেন উবে গেলো কর্পূরের মতো।

মহেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। শরৎচন্দ্রের মহেশ লাঙলের ফলার আঘাতে শেষ মুহূর্তে যেমন চার পা যতদূর সম্ভব প্রসারিত করেছিলো, মহেশবাবু তেমনি ক'রে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে হাড়ের জড়তা অপসারিত করলেন। এ ঘণ্টা তাঁর নয়! এটা টু-সিটেড রুম, থাকে প্রবীর আর ভজহরি। উনি তৈরি হ'য়ে নিতে নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। রাকেশ, মানস ওরাও গেলো ক্রমে ক্রমে।

বরাত ভালো। বৃষ্টি ঝুঁকে পড়েছে। আকাশের হৃৎপিণ্ডটা টাইম্‌পিস্ ঘড়ির মতো ধুঁকছে শুধু, আর তাইতে যেটুকু ইলসেগুড়ি!

রাকেশ চীৎকার ক'রে জানালো; প্রবীর, বৃষ্টি কিন্তু ফুরিয়ে এসেচে, পাট-করা কাপড় ভাঙতে পারিস্!

প্রবীর জানলা খুলে হাত বাড়িয়ে অনুভব করছে বৃষ্টি কতটা!

আপনারা আমাকে ভুল বুঝতে পারেন! ভাবতে পারেন, প্রবীর রাকেশ মহেশদা ইত্যাদির মতন হয়ত আমিও এদেরি একজন! যদি তা ভাবেন, তবে আমি বড়ই ব্যথিত হব। কারণ কোনো বন্ধুর প্রতি অমন কুৎসিৎ প্রহসন করার মতো প্রবৃত্তি আমার নয়!

এইটুকু মাত্র কথা বলতে না বলতেই দেখি ওদের সাজ গোজ শেষ হ'য়ে গেছে।

ওরা সিঁড়ি ধ'রে নামতে সুরু ক'রে দিয়েছে। মহেশবাবু কেরাণী কোটটা গায়ে চড়িয়ে পাঁচ ধাপ আগে এগিয়ে গেছেন। প্রবীর নামছে ধীরে-ধীরে, নগেন এসে পেছন থেকে দৌড়ে, রাকেশ এবং মানসকে পেরিয়ে প্রবীরের কাঁধ সে ধ'রে ফেললো।

নীচে চ'লে এসেছে যখন, তখন আকাশ শুকনো খট্‌খটে। পথের জল সাপের মতো গর্ত্তে ঢোকেনি তখনও।

প্রবীরের কাঁধ নগেন ধ'রেই আছে, বললো—অ সচে রবিবার দিন কিন্তু মেডিক্যাল এক্‌জামিনেশনটা সেরে ফেলবো, জানলে? শুভস্য শীঘ্রম্!

তা না হয় হ'লো। কিন্তু ভজহরিকে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে সেলুনে পাঠানোই আসল কথা। সেই আসল কথা আস্‌লো কোথা থেকে—তার উৎস কোথায়—এবার তাই ব'লবো। ইতিমধ্যে রাস্তায় হ'তে থাক্, ওরা আসুক ফিরে।

ভজহরি এইবার বি-এ পাশ ক'রেছে, এইবার মানে খৃঃ অঃ ১৯৩৩এ। ছেলেটি আমার বয়সিই হবে, আর সহাধ্যায়ী! সহাধ্যায়ী, কিন্তু এক কলেজে, একই সেকশনে অধ্যয়ন না করলেও সহাধ্যায়ী—সমপাঠী—হওয়া চলে বই কি! এক বছরে পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে বলছি আর কি!—সে সায়ান্স, আর্টস্ কিংবা হোম কমার্স! তাই শ্রীমান ভজহরি ভাদুড়ি আমার সমপাঠী! বয়সে কচি (কিন্তু ডেপো চাল-চলনে)। বুদ্ধির দিক দিয়েও কচি অর্থে কাঁচা! সে-সব আমরা ক্রমশঃই টের পাবো। সেই ভজহরি কিন্তু একটা মেয়ের আকর্ষণে জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম ধাওয়া করলো সেলুন-এ! আজ বিশ বছর যে চুল ছাঁটাই করছে রাস্তার ধারের নাপিতের কাছ থেকে! আর তার ওপরে নাকি ঘাড় কামাবে, প্রবীর সাজেস্‌শন দিয়েছে।

ভজহরি বি-এ পাশ ক'রেছে—যেমন হাজারে-হাজারে ছেলে বছরে-বছরে করে! এবং যেমন হাজারে-হাজারে ছেলে বছরে-বছরে করেনা, সে করেছে অহঙ্কার! সে-ই অহঙ্কারই এমন কেলেঙ্কারীর সূত্রপাত টেনে এনেছে!—ক্রমে ক্রমেই আমরা দেখবো আশা করি! স্পেসিফিজ্‌ম্ এর কোনো প্রয়োজন নাই, শেষ-বেশ ভালোও তো হ'য়ে যেতে পারে।

যখন পরীক্ষার ফলাফল টাঙিয়ে দিলো ভজহরি তখন এখানে অর্থে কলকাতা'য় ছিলোনা। ফরিদপুরে থাকেন কাকা, থাকতো সে; সেখানে সে বেড়াতে গিয়েছিলো। সেই তার দেশ, বাবা মা গত হয়েছেন, কাকাই পড়াচ্ছেন, তিনিই তার সব। আদর আব্দার খুড়িমারাই মেন।

বুড়ি পিসিমা আছেন সেইখানেই, তাঁর কাছেও আব্দার খাটে যথেষ্ট। এক দাদা

থাকেন ভাগলপুরে—ইস্কুল মাষ্টারি নিয়ে আছেন। নিকট আত্মীয় আত্মীয়ার এইখানেই ইতি।

হ্যাঁ, তখন ভজহরি ছিলো দেশে—ফরিদপুরে। খবর জেনেই প্রবীর চিঠি লিখে দেয় সাফল্যের শুভ সংবাদ দিয়ে—এটুকু করার জন্য প্রবীরকে ইঙ্গিত দেওয়াই ছিলো। শুভ সংবাদ পেলো সে। কাকা-কাকীমা ইত্যাদি সকলে খুব আনন্দ করলেন। পিসিমার চোখে এলো জল, শুভদিনে তিনি শুভাশীর্ব্বাদ করলেন শুভাশ্রু দিয়ে; ভজু পাশ করলি, কত আনন্দের কিন্তু—

পিসিমা দুঃখ প্রকাশ করলেন তাঁর ভাই ও ভাজ এটা দেখে যেতে পারলেন না স্মরণে।

কাকা জিজ্ঞেস করলেন; এখন করবি কি?

ভজহরি প্রত্যুত্তরে দেয়ালের বালি খুঁটতে খুঁটতে মাথা নিচু ক'রে সবিনয়ে ব'ললো—আপনি বলেন!

শেষ-বেশ ঠিক হ'লো—ভজহরি চাকরীরই চেষ্টা করুক! ওর কাকার প্র্যাক্‌টিস্-এ মন্দা পড়েছে, Bar ছারখারে যাচ্ছে—ক্রমে নাকি তাস পাশার আড্ডা হ'য়ে উঠছে! এম-এ পড়ানোর খরচ জোটানো আর সম্ভব হ'বে না নাকি তাঁর, আর ল' প'ড়লেও তো তাঁরি মতো দুর্গতি! তার চেয়ে গরীবের ছেলে শাক-ভাত জোটানোর মতো কিছু একটা জুটিয়ে নিক, তাই যথেষ্ট, আর বেশী প'ড়ে গুচ্ছের টাকার শ্রাদ্ধ ক'রেও নাকি লাভ নাই। তিনি জানেন, ভজহরির পড়ার যথেষ্ট ইচ্ছে, কিন্তু তাঁর অক্ষমতার জন্য ভজহরি যেন মনে দুঃখ না পায়। এমনি সব বুঝিয়ে সুজিয়ে তিনি কোর্টে বেরুলেন। ভজহরি এই ফুরসতে একটু লাফিয়ে নিলো খুড়িমাদের নিয়ে। কি ছোটখুড়ি, খুব যে ব'লেছিলে পাশ করতে পারবো না! এখন সন্দেশ আনাও! ছোট কাকাকে লেখো, রাজবাড়ী থেকে যেন পাঠান্ —এ-এস-এম্, নগদ পয়সা তো লাগবে না—না কিনতে, না পাঠাতে! ভেণ্ডারকে ব'ললেই কিছু দিয়ে যাবে! লিখে দাও ঝট্‌পট্!

ছোটখুড়ি বয়সে ভজহরির ছোটো, তাই ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা চলে। তিনি ওপর পাটির দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট আস্তে ক'রে কামড়ে, চোখ বড়ো ক'রে শাসন করলেন—তোমার না কাকা। তারপর হেসেই কথাটার কাঠিন্য ক'রে দিলেন মাখনের মতো মোলায়েম।

—আমি এতো কী, যে তিনি আমার কাকা ব'লেই হয়ে নেবেন না! আমি এতো কি হোমরা চোমরা? ভজহরি হাসে!

ছোটখুড়ি মুখ গোমড়া ক'রে ভাণ করেন অতিরিক্ত চ'টেছেন। কিন্তু তুলোর পাঁজের মতো হাল্কা হ'য়ে যায় যেমনি হাসি চাপতে গিয়ে তাঁর ঠোঁট আচম্‌কা ওঠে কম্পন দিয়ে!

ভজহরি বলে,—থাক, যথেষ্ট রেগে ফেলেছো! ছোটকার কাছে রাগার জন্যে ইকে কিছু রাখো!

ন্তুখুড়িমা এসে প'ড়লেন ; কি পয়োটা এখনো হ'লো না, মণি ? তজু পাশ ক'রে বুঝি খুব—কাজের তাড়ান, পিসিমার ডাকে তখনই আবার ছু'ট চ'লে যান।

মণি ব'ললো —'দিদি ব'কবেন বাপু ! আর কথা বলছি না, যাও তোমার কাজ করোগে।

—আমার আবার কাজ ! তবু ভজহরি উঠলো। বাড়ী থেকে বের হ'লো সহরময় রাষ্ট্র করতে এই শুভ সংবাদটি। দুঃসংবাদের মতো আপনা আপনি শিগগির প্রকাশিত হয় না নাকি সুসংবাদ তাই ভজহরি বেরোলো।

আজ ভজহরির সব কিছু ভালো লাগছে। যে ঈশান স্কুলের দালান ছিলো তার চক্ষের শূল, কারণ সে পাশ করেছে জিলা-স্কুল থেকে, সেটাও তার কাছে ভালো লাগছে আজ, চমৎকার লাগছে। সে কথা আজ সর্ব্বপ্রথম সে প্রকাশ করলো তারকের কাছে। সেই স্কুলের সমুখের সবুজ মাঠে ব'সে তাদের অনেক কথা হ'লো।

যখন সে বাড়ী ফিরলো বেলা আন্দাজ দেড়টা হ'বে। সবই তার ভালো লাগছে, লাগছে না চান্ আর খাওয়া ! রীতিমতো সে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

তারপর কিছুদিন সেখানে থেকে সে কলকাতায় আবার রওনা হয়। কাকা ব'লেছেন মেস্-এ থেকেই চেষ্টা করুক চাকরীর, যে কটা দিন লাগে কষ্টে-ছিষ্টে সংচটা তিনি চালাবেন। পথে, রাজবাড়ীতে ছোটকাকার সঙ্গে দেখা করে সে কলকাতায় চলে এলো।

মেস্-এ পা দিতেই সকলে হৈ-চৈ ক'রে উঠলো। কলতলায় দাঁড়িয়ে প্রবীর ডেন্টি-ফ্রাইসের একমুখ ফেনার ভেতর ব্রাস ঘোরা-চ্ছিলো, স্যুটকেশ হাতে ভজহরিকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো, কি যেন ব'লতে গিয়ে থুৎনি বেয়ে সারা গা বেয়ে গেলো সাবান। তার জন্যেও সবাই খানিকটা হেসে নিলো। ভজহরি কোনো কথা বলেনি, শুধু একটু মাত্র হেসে সোজা সিড়ি দিয়ে হাটু ভেঙে ভেঙে উঠে গেলে ওপরে। সেই ঘরে যে ঘর থেকে সে কেডস্ পরে বৃষ্টিতে বেড়িয়ে প'ড়েছে !

গল্পের সুরু ব'লতে গেলে এইখান থেকেই। আর আমার এ-গল্পটি ভজহরিকে কেন্দ্র ক'রেই ঘুরবে—তার ঘুরবার পন্থা সার্কুলারই হোক্ কিম্বা হোক ইলিপটি-ক্যাল্ ! সে যাই হোক্, ভজহরিই আমার গল্পের সূর্য্য। আর সেই থেকে গল্পটা হ'য়ে উঠলো পৃথিবী। আমার গল্প এখন থেকে ঘুরবে। মধ্য-পথে আরো গ্রহ-নক্ষত্র কিম্বা অদ্ভুত কোনো আকর্ষণী দ্রব্যের অন্তরায় পড়ে, পড়ুক ! আসুক বিদ্যুৎ চাঁদের মতো উজ্জল দীপ্তি নিয়ে আর আসুক না কেন কোনো কুটিলতা রাহুর মতো তাকে গ্রাস করতে। রাহু বলে যে কেউ নেই, সব ভুয়ো—ছায়ার মতো মিথ্যে তা ভজহরির জানা আছে। ভজহরি ভয় করেনা, ছায়া সে ভালোই বাসে, প্রাখর্য্যার হাত থেকে কে রক্ষা করে ? ভজহরি জানে সব।

স্কুইবএর টিউবটা চ্যাপ্টা ক'রেই ভজহরি ব'সে প'ড়েছে প্রবীরের চৌকীর ওপর। জুতোর ছিল্‌টা চৌকীর কোণে বাধিয়ে জুতার ফিতে খুলছে। প্রবীর কাপড়ের খুট দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে উঠে এলো ওপরে। চীৎকার ক'রেই প্রায় ঢুকে পড়লো ঘরে : পাশ করলি, দেশ থেকে ফিরলি, আনলি কি, বল্ ! আরে শ্রেফ মাটি ক'রেছিস্ ! ওঠ তো ওঠ ! আরে, দেখেছো—আমার ডেণ্টাল ক্রীমটা—

ভজহরি প্রায় চ'মকে উঠলো : কিরে ? কি হ'লো কি ? আহা কিছু মনে করিসনা, ভাই।

—মনে আর কি করবো. বল্ ! কিন্তু মনে যে পড়বে, ভাই ! গরীবের জিনিষ ব'লে প্রবীর টিপে-টিপে সেটাকে আবার ফুলো করার চেষ্টা করছে !

ভজহরি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ব'ললো—নে, মাথা আঁচড়া ; আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। একপায়ে জুতো প'রেই সে চট্‌ফট্ করতে লাগলো।

প্রবীর হাসলো : থাক্, অপ্রতিভ আর হ'তে হবেনা। পাশ করলি তো, এখন এর কমপেন্সেশন শুদ্ধ্ কিছু খাইয়ে দে।

ভজহরির অপ্রতিভতা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, হেসে ব'ললো,—সকাল বেলা আর কি খাবি ? মুখ ধোবার আগেই তো এরি ফেনা খেয়ে নিলি।

প্রবীর ছোট্ট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত দেখছিলো, মুখ টিপে একটু হাসলো। মনে মনে ব'লতে লাগলো : তুমি হচ্ছো বোকা মানুষ, অমন চ্যাটাং কথা ব'লোনা, আমার কপালে জুটলো ফেনা ; ভগবান এমনো করতে পারেন বই কি—তোমার বরাতে জুটবে নিছক ফ্যান্ !

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্ব্বাসা

খেলায় ঔদার্য্যের অভাব? :—বোড়াল ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবের পুরস্কার বিতরণী সভায় ব্রীজ এসোসিয়েশনের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় কলিকাতার ব্রীজ ক্রীড়কদের মধ্যে খেলায় যথোচিত ক্রীড়কসুলভ ঔদার্য্যের অভাব এই অভিযোগ নিয়ে যে প্রবন্ধটী পাঠ করেন, তাতে প্রথমতঃ সভায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সুরু হয় এবং পরিশেষে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়; অতঃপর তিনি উক্ত প্রবন্ধটী শ্রীদুর্ব্বাসার নিকটে পাঠিয়ে দেন এই উদ্দেশ্যে যে প্রবন্ধটী পাঠ করে পাঠকবর্গ যথাকর্ত্তব্য স্থির করে নেবেন। আজ কিছুদিন থেকে যে কলিকাতার ব্রীজ মহলে 'এইরূপ, গণ্ডগোল চলে আসছে এবং এর থেকেই প্রায় প্রত্যেক প্রতিযোগিতায়ই কোন না কোনরূপ গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ক্লাবে ক্লাবে তা' নিয়ে অসন্তোষ ও মনোমালিন্যের সূচনা হচ্ছে এ আমরা জানি বিগত কয়েক মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধটী যে সময়োচিত হয়েছে তা'তে সন্দেহ নাই তবে পাঠকেরা একে কিরূপভাবে গ্রহণ করবেন বলা অসম্ভব। যা' হোক নিয়ে তাঁর প্রবন্ধটি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা গেল।

"সম্মান আহরণই খেলার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়" :—বর্ত্তমান প্রগতির যুগে মানুষের ক্রমবিকাশমান ভাবের পর্য্যালোচনা করলে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে আচারে ব্যবহারে সে যত অগ্রসর হচ্ছে মানুষিক উন্মেষ তার সহিত ঠিক সমান তালে পা ফেলে চল্‌তে পারছে না। মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা মনের যে পরিচয় পাই তাতে কুণ্ঠিত হবার কিছু না থাকলেও আশান্বিত হবার ভরসাও নাই তা অতীব নিষ্ঠুর সত্য। সাহিত্য বা রাজনীতি আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র নয়, সে বিষয়ে আলোচনা করলে উহা আমাদের অজ্ঞতারই পরিচয় হবে; এ জন্য আমাদের যে ক্ষেত্রের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান তদ্‌বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। যে কোন খেলাই যে মানুষের তৃপ্তি বিধানের অঙ্গস্বরূপ তাহা প্রায় অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত। কর্ম্মক্লান্ত জীবনে বিভিন্নভাবে সামান্য আনন্দ উপভোগ করবার, যে গূঢ় অভিলাষ স্বতঃই বর্ত্তমান তা'হাই নানা ক্রীড়াকলাপের মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। রসোপলব্ধি বা আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কারণ এই আনন্দ থেকেই জীবের সরল স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। নানাবিধ কর্ম্মভারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে মানুষ যখন আনন্দসূত্রকে হারিয়ে ফেলে তখনই তার স্বাভাবিক রসানুভব লিপ্সাই তাকে বিভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতির উদ্ভাবনে বা আবিষ্কারে প্রযোজিত করে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা যে সকল খেলাধুলার মধ্যে আবদ্ধ থাকি তার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই ইহা দৃষ্ট হয় যে আমরা খেলার মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েই উহাতে প্রবৃত্ত হই। ব্রীজ খেলতে বসেছি ব্রীজ ক্রীড়ার কলাকৌশল প্রদর্শনে আমার চিত্ত অবহিত থাকবে ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু খেলতে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত যদি আনন্দানুভব থেকে বঞ্চিত হলাম তা' হলে সে খেলার সার্থকতা কোথায়? আজকাল সাধারণতঃ ইহাই দৃষ্ট হয় যে খেলার উক্ত মূল উদ্দেশ্য সতত স্মরণ রেখে উহাতে যোগদান করেন এরূপ ক্রীড়কের সংখ্যা বেশ ক'মেই আসছে। খেলাও সমাপ্ত হল আর হাস্যমুখে যে যার গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন এরূপ তৃপ্তিদায়ক চিত্র কখন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। নানাবিধ ছলকপটতা গ্রহণ করে "যেন তেন প্রকারেণ" প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করবার দুর্দ্দমনীয় প্রয়াসের মূলে যে মনোবৃত্তি লুক্কায়িত থাকে তা' যাঁরা স্বয়ং উপলব্ধি করেছেন বা করতে পারেন তাঁদের পক্ষে খেলার মূল উদ্দেশ্য বুঝে ওঠা কঠিনতর। আমরা অবশ্য ইহা বলি না যে সম্মানলাভের নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টা করা অনুচিত; কিন্তু তবু ইহও স্মরণ রাখা বিধেয় যে সম্মান আহরণই এ খেলার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

আজকাল ক্লাবে ক্লাবে বিভিন্ন দলের মধ্যে যে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা' বড়ই অপমানজনক। জয়লাভ করবার জন্য গোপনে নানা প্রকার সঙ্কেতের রীতি এবং খেলায় প্রকৃত কৃতিত্ব না প্রদর্শন করে অপরের স্তুতি অর্জ্জন করবার হেয় পন্থা বাস্তবিক কুফল-প্রসূ। যে সব স্থলে কোন পক্ষীয় মানসিক উদারতার ফলে বহুবিধ গণ্ডগোল থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায় সেখানেও রস সৃষ্টিতে বা রস বোধের হানিকর এই ব্যবস্থার যে কিরূপ কুরুচি সঙ্গত তা' অনুভব মাত্র বেদ্য। খেলায় এক পক্ষের জয় ও অপর পক্ষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী কিন্তু এইসকল জয় পরাজয়ের সহিত নিজেকে আত্মবুদ্ধির সংশ্লিষ্ট করা যে অবিবেচনার কার্য্য তাতে সন্দেহ নাই। উপায়কে ফল বলে যারা ভুল করেন তাঁদের আমরা অপরাধী বলে বিবেচনা করি। ফললাভ করতে হলে উপায়ের প্রয়োজন আছে আমরা স্বীকার করি কিন্তু উপায় যে ফল এরূপ বিবেচনা করলে উহা শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচায়ক হবে না। যে স্থলে খেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ লাভ সে স্থলে উপায় মাত্র নিয়ে আলোচনা করলে বুদ্ধিমানদের মন্দ বুদ্ধির প্রকাশ পাবে। খেলতে বসে কপটতার আশ্রয় করে জয় পরাজয় লাভ করা যখন খেলার উদ্দেশ্য নয় তখন নানাবিধ কপটতার আশ্রয় নিয়ে জয়লাভ বা পরাজয় নিবারণ যুক্তিসিদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু মানুষ এই সাধারণ কথাটিও ভুলে যায়, খেলে আনন্দ পাচ্ছি কি না এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকে না। জয় পরাজয়ের মোহে কলুষিত বুদ্ধি হয়ে এই নীচ প্রচেষ্টার উদ্ভাবন ও অনুবর্ত্তন বাস্তবিক বিশেষ দুঃখের কারণ নয় কি? খেলতে বসে যেখানে এক পক্ষের জয় ও অপর পক্ষের পরাজয় সুনিশ্চিত তখন তার জন্য বৃথা উদ্বেগের প্রয়োজন কোথায়? ব্রীজের আসরে এ কথা আমাদের প্রায়ই মনে হয় পাঁচজনে খেলতে বসেছি, খেলার ফলস্বরূপ আনন্দলাভ করব, কিন্তু খেলার সময় শুধু বাদানুবাদ নয় তদ্ব্যতীত স্বপক্ষ বিজয়ের অনুকূলে যে সকল চাতুরীর প্রয়োগ হয় তার ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা-বাদ না করে থাকতে পারা যায় না। খেলতে বসে মন ছোট করার অর্থ কি? আনন্দ চাই নিকৃষ্টমতির পরিচয় দিই কেন! পাঁচজনে খেলতে বসে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসাদ অপনোদন করতে চাই, বৃথা বাদানু-বাদ থেকে আরম্ভ করে গোপনে অভিসন্ধি পূর্ণ করতে চাই কেন? আমরা এই যে কটা কথা বললাম তা' আমরা বর্ত্তমানে বহু আসরে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি এবং তার জন্য দুঃখ অনুভব করেছি বলেই বাধ্য হয়ে এই কথা বলি। পাঁচজনে মিলে মিশে খেলতে বসেও যদি অন্তরে গূঢ় নীচ বৃত্তির আভাস পাওয়া যায় তা' হলে এ দলাদলির পরিণতি কোথায়?

আর একটি সমস্যা:—ইহা সুখের আনন্দের বিষয় যে ব্রীজ-ক্রীড়কদের ও পাঠকবর্গের নিকট আমাদের সমস্যাগুলি সবিশেষ সমাদৃত হয়েছে এবং বহু পাঠক-বন্ধু আমাদের অনুরোধ করেছেন যে এইরূপ সমস্যা আমরা যেন মাঝে মাঝে প্রকাশ করি তা'তে তাঁদের খেলা শেখবার ও সময় কাটাবার বেশ সুবিধা হয়। আমরা আমা-দের পাঠকবর্গকে জানাচ্ছি যে তাঁদের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত এই ধরণের ব্রীজ-সমস্যা যথারীতি প্রকাশিত হবে এবং নির্ভুল সমাধানের দরুণ ভবিষ্যতে কোনবার আমরা পাঠকবর্গকে পুরস্কার দেবার ইচ্ছা করি। বাঙ্গলার বাহিরের অনেক পাঠকের উত্তরে জানাচ্ছি যে সমস্যা প্রকাশিত হবার পর পনেরো দিনের মধ্যে আমাদের নিকটে উত্তর পাঠাইলেই চলবে, বিশেষ তাড়া-তাড়ি করবার প্রয়োজন নাই। একটি নিয়ে সমস্যা প্রকাশ করা গেল।

ইস্কাবন—নয়, তিরি।
হরতন—গোলাম, নয়।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—বিবি, নয় ছক্কা।

ইস্কাবন—নাই।
হরতন—দশ, সাতা।
রুহিতন—সাহেব, ছক্কা।
চিড়িতন—টেক্কা, দশ, আটা।

ইস্কাবন—বিবি, আটা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—বিবি, আটা, পাঞ্জা।
চিড়িতন—সাতা, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—সাহেব, সাতা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা, সাতা, চৌকা।
চিড়িতন—সাহেব, গোলাম।

ফেরাই-এর খেলা, 'দ' খেলবেন। বিপক্ষদল যতই বাধা দিক্‌না কেন 'উ' এবং 'দ'র সম্মিলিত হস্তে পাঁচখানি পিট পাওয়া চাই।

ভুলের ফসল

শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায়

থমকিয়া দাঁড়ান এক শীতের সন্ধ্যায় দাদার ঘরে চা' দিতে এসে কাননের সাথে মুখোমুখী হলো বনিতার। সেদিন বনিতা সলজ্জ নয়নে কাননকে দূর থেকে দেখে নিয়েছিল। অচেনা, অজানা, অপরিচিত যুবকের সাথে নিঃসঙ্কোচে আলাপ ক'রবার মত সাহস পাচ্ছিল না—অথচ ওর সঙ্গে ভাব ক'রবার জন্ম বনিতার প্রবল আকাঙ্খা জেগেছিল। ভাগ্যিস ওর দাদা শ্যামল সেদিন প্রথম পর্বটা অমনি করে জমিয়ে দিয়েছিল।

প্রথম আলাপে ওদের ভেতর যে জড়তা ছিল, পরে তা' অনুভূতির আবেশে সতেজ হয়েছে। ওরা বেশী কথা বলে না সত্যি কিন্তু যেটুকু বলে তা ওদের মনের কোণে গভীর করে দাগ কেটে দেয়......যা তারা দিনের দুটো কথা নিয়ে সারা রাঁত জেগে জেগে চির সবুজের স্বপ্নমায়া রচনা ক'রে নিতে পারে। বনিতার বয়েস ঠিক সেই কোঠায় সেখানে তরুণের সাহচর্য্য পেলে ও বর্ত্তে যায়। কাননেরও যৌবনের প্রথম উন্মেষ...তরুণীর হাতছানি দিয়ে আহ্বানকে উপেক্ষা করবার আগ্রহ থাকে না—বরং যৌবনের জোয়ারে নিজেকে একটু ভাসিয়ে দিতে সাধ জাগে?

পাঁচজন সাধারণের মতই শ্যামলের সাথে কাননের সামান্য সাধাসিধে বন্ধুত্ব...ক্রমে বনিতাকে ভর করে সেই বন্ধুত্ব হয়ে উঠলো জমকালো।

শ্যামলদের বাসায় আজকাল রোজই বিকালে কাননের আসা চাই! এদিকে ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই বনিতার বুকে দারুণ এক অস্বস্তির বোঝা চেপে বসে! কাননকে পেলে বনিতা সব কিছু যেন ভুলে যায়...অকারণে একটু গম্ভীর হতে চায় কিন্তু যৌবনের চপলতায় সেই গাম্ভীর্য্য হাসির উচ্ছাসে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে খসে পড়ে! কাননকে ওর বেশ লাগে—তার প্রতিটী কথা ব'লবার ভঙ্গী ইস্তক চা খাওয়ার ধরণটুকু বনিতা এক নিঃশ্বাসে বলে দিতে পারে?

শনিবার। কাননের সাথে বনিতার ম্যাটিনীতে গ্লোবে একটা ছবি দেখ্‌বার কথা ছিল। ইউনিভারসিটি থেকে সরাসর শ্যামলদের বাসায় যেয়ে বনিতার ঘরে ঢুকেই কানন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: একি তুমি এখনও প্রস্তুত হওনি যে?

বনিতা তখন চুপ করে বসে আছে জানালার পাশে—হাতে তার একটা ইংরেজী নভেল...বইটে কাননই সেদিন ভুলে রেখে দিয়ে গিয়েছিল। বনিতার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে কানন বেশ একটু বিচলিত হয়ে উঠলো—বুঝতে পারলো ওর ভেতর কিসের জন্ম যুদ্ধ চ'লছে। এগিয়ে গিয়ে কানন আবার প্রশ্ন করলে: তোমার কি কোন অসুখ করেছে নিতা?

—না।

—তবে?

এই বলে কানন সপ্রশ্নদৃষ্টিতে বনিতার দিক্ চেয়ে রইলো।

কপট ক্রোধে ভ্রূ কুচকে বনিতা বলে চললো: একটা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাকে অন্ধকারের গহ্বরে ফেলে দেওয়ার মধ্যে কতখানি পৌরুষ আছে শুনি? কি দরকার ছিল আমার জীবনের সুষমাগুলি ধুলিসাৎ ক'রে দিয়ে তাতে ব্যর্থতা আনবার?

কানন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিল। বাইরের ধারালো রোদের মতো এদের নীরবতা রুক্ষ ও অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল। মনে হ'লো এদের মনের চারধারে যেন ফাটাল ধরেছে!

কানন একটু মুচকি হাসলে—ভাবটা এই যে এ আবার কোন পাগলামী!—জানিনা তোমার সম্মানের কতটা ব্যাহাত হয়েছে। জীবনকে উপভোগ ক'রব অথচ তার দায় দেব না এ তুমি কি ব'লছ নিতা?

সহনশীলা নারীজাতিরও নিষ্কলুষ প্রেম প্রত্যাখানের বেদনা যে বুকে অসহনীয় হয়ে ওঠে কানন বাবু?—এই বলে বনিতা ডুকরে কেঁদে উঠলো।

—বুঝলাম নিতা, এতদিন ফাঁকা কথার পর আমাদের সখ্যের ইমারৎ তৈরী হয়েছিল তাই একটু হাল্‌কা নিঃশ্বাসেই তা খসে

পড়েছে বসেছে ? দুঃখু হয় মানুষ ভুল বুঝে কত বড়ো একটা অন্যায় করে বসে যাক্‌গো তোমার এই অহেতুক ক্ষোভের কি কারণ ঘটলো ?

ঈর্ষাতিশয্যে বনিতার চোখ মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। হাতের বইখানা কাননের দিক ছুড়ে দিয়ে বনিতা ঘর থেকে গেল বেরিয়ে… বইখানা খুলতেই একখানা সবুজ রংএর কাগজ কানন দেখতে পেলো।

* * *

দুর্ঘটনা যেমন অকস্মাৎ ঘটে তার কাপনটা তেমন সহসা অপসৃত হয় না ?

হাজারীবাগে কানন নূতন প্রফেসার হয়ে এসেছে। বন্ধন বিহীন এই উদাস জীবন অনেকটা তার সয়ে গেছে ! তার জীবনটা রিক্ত করে দিয়ে বনিতা আপন খেয়াল বশে কি কাণ্ডটাই না করলো। কয়েক বছর আগে পর্যান্ত কাননের জীবনে কত রঙিণ আশা ছিল…আজ সব যেন চূর্ণ ! চূর্ণিত হয়ে গেছে ? এদিকে বনিতা গেছে সম্পূর্ণ বদলে। তার মনে যতটা ভাঙ্গন ধরেছে…স্বাস্থ্যের হয়েছে তার চেয়েও অধোগতি। এর হয়ত একটা কারণ আছে এবং কারণটা হচ্ছে কাননের পর ওর বিমুখতা। কাননেরই পর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যার গলায় পরাল ও বরমালা তার দীর্ঘায়ু হয়ত কামনা করেনি তাই ওর স্বামীর ঘটল মৃত্যু, যাতে করে ওর এল বৈকল্য……

তিন বছর পরের কথা। কানন তখন ক'লকাতার বাড়ীতে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে এসেছে। অনেকদিন পরে পুরাতন বন্ধু শ্যামলের খবর জানবার জন্য ওর মনটা ক্ষেপে ওঠে—কিন্তু সৌহৃদ্যের আত্ম অবচেতন অন্তরের বিমূঢ়তা এবং বিক্ষোভের চাপে ম্লান হয়ে পড়ে।

যাবার দিন……

আষাঢ়ের স্যাঁৎসেতে সন্ধ্যায় কানন তার টেবিলের পাশে বসে বইগুলো ঠিক করে নিচ্ছিল…হঠাৎ পায়ের শব্দে পিছন ফিরে দেখতে পেলো ঘরে ঢুকছে বনিতা। সঙ্কোচ ও দ্বিধায় সে এতটুকু হয়ে গেল ? এতদিন আত্মগোপনের পর এ আবার কোন খেলা ?

বনিতা বেশ সহজভাবে কাননের দিক্ এগিয়ে এসে তার হাত থেকে বইটে টেনে নিয়ে বললো : দিন আমিই গুছিয়ে দিচ্ছি।

— তোমাদের বাড়ীতে একদিন এই বইটে ছুড়ে দিয়েছিলে আমার দিক—আজ আমার হাত থেকে আবার তুমিই নিয়ে নিলে ছিনিয়ে…কিন্তু আজ আকস্মিক আগমনের মানে ?

—সব সময় সব কিছুর মানে হয় না কাননবাবু, সেদিন রুচির চিঠিটে আপনার এই বইটের ভেতর থাকার বোধ হয় কোন সঙ্গত মানে ছিল না ? রুচি সে আপনারই বোন্ তাই বা কে জানতো আর চিঠিটে সে আমার দাদার উদ্দেশেই লেখা তাই কি জান্‌তাম ?

—কি বললে নিতা ? সেই চিঠিটে রুচি শ্যামলকে লিখেছিল ? অথচ আমি তার কাছ থেকে কত চেষ্টা করেও এ কথাটা জানতে পারিনি !

—জানলে কি করতেন শুনি ?—

তা হলে রুচিকে হয়ত সারাজীবন এতটা বেদনা সইতে হোতনা—জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সঙ্গে এইভাবে তিলে তিলে নিজের সত্ত্বাকে বিলিয়ে দেওয়া থেকে হয়ত রেহাই পেত। অন্তঃসারশূণ্য প্রেমের এই পরিণতি থেকে নিশ্চয়ই মুক্তি দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম আমি। যাক্— তোমার দাদা ?—শ্যামলের খবর কি ?— এই বলে কানন সুইচ্‌টি টিপে দিলে।—

বিজলী বাতি থেকে এক ঝলক রোদ আঁধার ঘরে ঠিকরে পড়লো !

বনিতা একমনে হাতের বইটার পাতা উল্টাচ্ছিল :— আজ বছর খানেক হবে দাদা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিয়েছে কাননবাবু…কতখানি বেদনার চাপে মানুষ নিজের প্রাণ বলি দিতে পারে একবার ভাবুন দেখি ! অথচ সেদিন আমার আত্মাভিমানের অহমিকায় এমন বদর্য্য কাণ্ডটা ঘটলে হয়ত এতগুলো জীবনে এমন ক'রে দীনতা আসতো না—এই বলে বনিতা চুপ করে গেল।

প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু খবরের সাথে অতীতের স্মৃতি মনে জাগ্রত হওয়ায় কাননের সমস্ত

দেহ মন এক অব্যক্ত ব্যথায় ব্যথিয়ে উঠলো।

সজল চোখে বনিতা বললো: আমিই সব কিছুর জন্য দায়ী কানন বাবু। কত বড়ো একটা ভুল করে আমাদের উভয় সংসারের পর একটা কদর্য্য বিমর্ষতা ও প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবলীলা বইয়ে দিয়েছি... আজ নিজের মৃত্যু দিয়েও এ-ভুল চাপা পড়বে না—

জানতাম, একদিন নিজেই তুমি তোমার ভুল বুঝবে—তাই সেদিন তোমার উপেক্ষাকে প্রথম প্রেমের মালাদানের মতই বরণ করে নিয়েছিলাম...যাকগে আজ রাত ৯টার গাড়ীতে হাজারীবাগ যাচ্ছি...এই বলে কানন তার হাত ঘড়ির দিক চাইলে।

বনিতার সমস্ত অন্তর দুর্বিসহ বলে মনে হচ্ছিল। তার চাই এখন অবলম্বন...চাই নির্ভর করবার মতো পুরুষের সান্নিধ্য। আজ বনিতা নিজেকে খুলে দিয়ে কাননের শেষ কথা শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বনিতা বলে যেতে লাগলো: জীবনে একটা ভুল করে যতটা ক্ষতি-গ্রস্থ হয়েছি তাই ঢের—আর এই ভাবে জীবন দুটো নষ্ট করতে কিছুতেই দেব না।

—আমাদের জীবনের নৃত্য-পাগল-ছন্দময় গতিকে তুমিই তো স্বেচ্ছায় রুধে রেখেছ নিতা?

—তুমি আমাকে আর আঘাত দিওনা কানন...জাননা কতখানি ব্যথার-সমুদ্র বুকে নিয়ে দারুণ বিক্ষোভের সহিত কাটাচ্ছি। আমি দোষ করেছি—আমাকে শাস্তি দাও। এই বলে বনিতা কাননের বুকে মুখ লুকালো।

কানন প্রথমে আশ্চর্য্য, পরে লজ্জিত ও অধীর হয়ে উঠলো: এ কি পাগলামী তোমার নিতা। তুমি আমার একজন বন্ধু। বন্ধুত্ব সে হীরের মত কিংবা তার চেয়েও দুর্লভ সামগ্রী এবং পরস্পরের সহযোগিতার দাম যে কত বেশী তা আমি খুব জানি। এবং জানি বলেই তোমার অসীম উদাসীনতাকে এতদিন বন্ধুত্বের অভিমান বলে তৃপ্তি না পেলেও স্বস্তি পেয়ে এসেছি।

তুমি কি এই বন্ধুত্বকেই সব চেয়ে বড়ো আসন দাও? এই বলে বনিতা কাননের মুখের দিক চাইলে।

হ্যা নিতা, আমাদের এই বন্ধুত্বের ভিত্তি হবে পারস্পরিক সাহায্য; নীরব প্রশ্নহীন আত্মত্যাগ এবং এরই ফলে আমরা সারা জীবন বন্ধুই থাকব।

এই বলে কানন বনিতার হাতটা একটু চাপা দিল মাত্র।

সেদিন আসিবে কবে! *

শ্রীরবীন্দ্র নাথ মিত্র

চাই প্রাণ।

যেথা আছে দ্বেষ, ঈর্ষা গরিমা—
আত্মগর্ব্বে নাহি যা'র সীমা,
হিংসা বৃত্তি, কুটনীতিজাল
ঘিরিয়া রয়েছে নিরন্তর—
চাহিনা সেরূপ গরলতাময়
উগ্র-মানব অন্তর।

চাহিনা অম্বরে আঁধার—
বিরাজিছে যেথা শত বিভীষিকা
প্রতি পদে বারে বার।
সেথা নাহি তমোনাশী—
স্বচ্ছ কিরণ রাশি,
লুক্কায়িত ধ্বংসকারী
মৃত্যু করাল ছায়া,—
ভীত মৌন প্রকৃতি
স্তব্ধ ধরণী কায়া।

চাহিনা ধনী অথবা নির্ধন,
ত্যাগী কিংবা ভোগী অতি সুধীজন,
চাহি বুক ভরা দয়া-মায়া-স্নেহ,
পর দুঃখে উঠে কাঁদিয়া—
ক্ষুধার অন্ন বিলায় ক্ষুধিতে
হাসি মুখে নিজে সাধিয়া।

হায়,—সেদিন আসিবে কবে!
সেদিন হাসিবে নবীন পুলকে
তরুণ ভারত যবে।
ভাই, ভাই, বলি' প্রতি কণ্ঠরোলে
উঠিবে ধ্বনিয়া সাম্য গান
ঘুচিবে কালিমা, জাতি ভেদা ভেদ
নাচিবে বিশ্ব, নাচিবে প্রাণ।

---

* (শিলচর কংগ্রেস কনক জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত ও পঠিত)
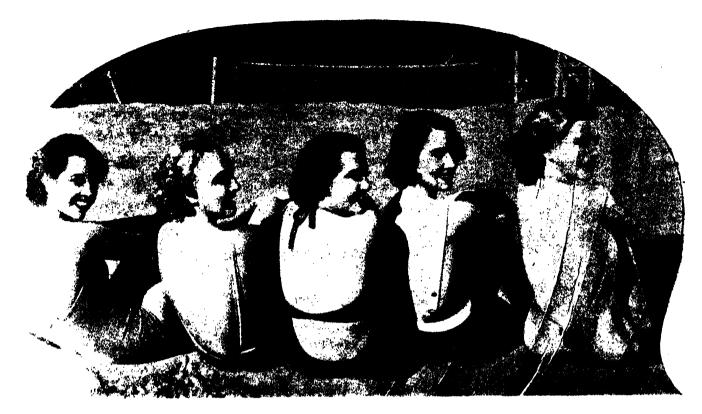
"কিছু মনে করবেন না"—পেছন ফিরে বলে মেয়ে কয়টা,—আর আপনারাও তাতে খুব খুসী। কারণ আপনারাও এঁদের খুবই পছন্দ করেন। এরা হচ্ছে প্যারামাউণ্টের মেয়ে,—নাম হচ্ছে—শিলভিন্, এন ইভার্স্, উইলমা ফ্রেন্সিস্, আইরিণ ব্যানেট, লুইস মল।

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

গিলবার্ট আর রুডলফ্

জন গিলবার্ট একদিক দিয়ে রুডলফ ভ্যালেণ্টিনোকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেম করেছে দুজনেই। প্রেমিক হিসেবে দুজনেই অতুলনীয়। মেয়েরা ভালবাসতো দুজনকেই। তবু তাদের মধ্যে তফাৎ আছে।

এইতো সেদিন ভার্জ্জিনিয়া ব্রুশ-এর সঙ্গে জন গিলবার্টের ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো। সেদিন ভার্জ্জিনিয়া স্বীকার করেছিলো যে সে এখনও জন গিলবার্টকে ভালবাসে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ভালবাসবেও।

গ্রেটা গার্ব্বো যেদিন ঠিক করলে "কুইন ক্রিশ্চিয়ানা" ছবিতে নামবে সেদিন চেয়েছিলো জন গিলবার্টকে তার নায়ক হিসেবে। এবং তা সে পেয়েও ছিলো। গিলবার্টকে মরবার কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও মার্লিনের সঙ্গে দেখা যেত। এই প্রেমিক পুরুষের সঙ্গই ছিল এমনি মধুর।

ষ্টুডিওর মেয়েরা জন গিলবার্টকে ভালবাসত, তার স্তুতিগান করত কিন্তু গিলবার্ট পারেনি কোন মেয়েকেই বেশীদিন ধরে ভালবাসতে।

আর ভ্যালেণ্টিনোর ছিল মেয়ে-চিত্রামোদীর দল। অত ভালবাসা মেয়ে-চিত্রামোদীদের কাছ থেকে আর কেউ পায়নি। তার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই মেয়েদের দল বেড়েই চলেছিলো দিনের পর দিন।

এই সঙ্গেই আর একটা কথা বলে দিই। জন গিলবার্টের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় তাঁর আগেকার দুই স্ত্রী লিট্রিস জয় আর ভার্জ্জিনিয়া ব্রুশ এসেছিল। দুজনের কাছেই আছে গিলবার্টের একটি করে মেয়ে। মিস জয় আর মিস ব্রুশ।

গিলবার্টের শেষ ইচ্ছানুসারে, তাঁর পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জমিদারীর বেশীরভাগ পেয়েছে মিস ব্রুশ।

ষ্টার না দেবতা

জগতে কত রকমেরই লোক থাকে। ষ্টারেরা ওদের কাছে যেন অমূল্য সম্পদ। শুধু একবার কোন ষ্টারকে দেখবে, কি দুটো কথা কইতে তার জন্যে কত রকম জোচ্চুরী, ভণ্ডামী যে ওরা করে তার ইয়ত্তা নেই। কোন কোন লোকের কাছে ওরা যেন দেবদেবীর সামিল।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে বল্লে কে অমুক দোকান?—আমি যে ওয়েষ্ট।—কে যে ওয়েষ্ট? অমুক যে ওয়েষ্ট?—অমুক ছবিতে নেমেছ?—বেশ অভিনয় হয়েছে।—একদিন আপনার বাড়ীতে যেতে

চাই, আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত গোটাকয়েক কথা আছে।—হ্যাঁ আমায় একটা সই দিতে হবে।

আরে, জিনিষ কিনবার জন্যে সে ফোন করলে আর তার সঙ্গে এই সব বাজে বিরক্ত করা কথা। নাম-করা ষ্টারদের টেলিফোন করা এমনি মুস্কিল।

অদ্ভুত! অদ্ভুত! সবটাই অদ্ভুত!

ছবি পেল

গত বছরে একজন যুবা পাদ্রী ক্লার্ক গেবল-এর কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন:—প্রিয় ক্লার্ক গেবল, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই; তোমার আত্মার মুক্তি কামনায় আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এ ভগবানের আহ্বান তুমি উপেক্ষা কোরো না।

পাদ্রী মহাশয়ের বড় উদ্দেশ্য ছিল। ভগবানের আহ্বান শুনিয়ে গেবলের সঙ্গে দেখা করবার মতলব ছিল। ব্যর্থ হোল। গেবল পাদ্রী মহাশয়ের কাছে ভগবানের আহ্বান শুনতে রাজী হননি। কাজেই পাদ্রীর সব আশা নির্ম্মূল হয়েছিলো।

আর।

একটি মেয়ে। মেয়েরা সত্যিই আলাদা রকমের।

ফ্যানি নিউ ব্ল্যাট-এর বেজায় সখ সে গেবলের সই করা ছবি একখানা তার ছোট রেস্তোরাঁর দেয়ালে ঝোলাবে। ওতে নাকি তার খদ্দের আসবে অনেক, অনেক! কাজেই সে একদিন হলিউডে এসে উপস্থিত হোল।

ষ্টুডিওর দরজা বন্ধ।

বরাত! নেহাৎ বরাত জোরেই এক মাংসওলার সঙ্গে তার হোল দেখা। মাংসওলা তার পরিচিত লোক। তার দোকানে দিত মাংস। ষ্টুডিওর ভেতরে ছিল। সেই ফ্যানিকে নিয়ে গেলো ষ্টুডিওর ভেতরে। গেবল তার কথা শুনে দিলে ছবির ওপর সই করে।

তারপর। ফ্যানির খদ্দেররা আসে দোকানে। তারা খেতে বসে, চেয়ে দেখে তাদেরই মাথার ওপরে গেবলের ছবি—তাদের পানে চেয়ে হাসচে। ফ্যানির হৃদয় তৃপ্তিতে, আনন্দে, গৌরবে ফুলে ফুলে ওঠে।

দামী ফিল্ম

ওদেশের মিউনিসিপ্যালিটি এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শুধো বৃটিশের ছবি "ডেথ অন দি রোড" ছবিখানা খুব কাযে লাগাচ্ছেন। ওরা বলেন এ ছবিখানা দেশের পক্ষে খুব মঙ্গলকর।

ছবিখানা আসলে প্রচারকার্য্য চালাচ্ছে।

ম্যানচেষ্টার পুলিশের প্রধান কর্ত্তা চেষ্টটিটা সিনেমা হাউসকে এই ছবি এক সপ্তাহ করে দেখাবার জন্যে বাধ্য করেছেন।

ঠিক ওই রকম গ্লাসগোর পুলিশের প্রধান কর্ত্তাও সিসিটো হুকুম জারী করেচেন। উনি বলেন অবিবেচকের মত জোরে চালালে তার ফলাফল কত ভীষণ হয়, তারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত এই ছবিতে দেখান হয়েচে।

ম্যাক্লেশ ফিল্মেরও পুলিশের প্রধান-কর্ত্তা এই ছবি দেখে এত মুগ্ধ হন যে চারটে শো তিনি শনিবার শনিবার ঠিক করেন, যাতে স্কুলের ছেলেরা অমনি দেখতে পায়।

সাউথ'র ওপরে সিনেমা ঠিক করেছে এই ছবি দেখাতে।

খুচরো খবর:—

ফ্রাঞ্চোট টোন সপ্তাহে দশখানা নাটক ও পাঁচখানা উপন্যাস পড়ে।

* * *

রবার্ট টেলর যেমন পারে পিয়ানো বাজাতে তেমনি পারে সোলো বাজাতে।

* * *

হলিউডে যারা ভাল ঘোড়ায় চড়ে, সিসিলিয়া পার্কার তাদের মধ্যে একজন।

* * *

ক্লার্ক গেবল তার প্রথম ছবিতে ঘোড়ায় চড়ে। তার আগে ও কখনো ঘোড়ায় চড়ে নি।

* * *

জেনেট গেনর তার প্রথম ছবিতে হাওয়াইয়ান গান গায়।

বড় বৌদি

শ্রীসুশীল কুমার দত্ত

কৈশোরে মা-বাপ হারানোর পর হইতে বিমল আশা করিতেছিল একটি মনোমত বৌদি পাওয়ার, যিনি আহারের ব্যবস্থার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিবেন এবং দাদা অমলবাবুর রুক্ষ মেজাজকে সম্পূর্ণরূপে না হোক, অন্ততঃ আংশিকভাবে শান্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু যে রকম অজ-পাড়াগায়ের নিরক্ষর মেয়ের সহিত অমলবাবুর বিবাহ হইতে দেখিল তাহাতেই সে ভীত হইয়া পড়িল।

তাহার বৌদি দিন করিয়া আসিলেন। বিমল তাঁহার তাচ্ছিল্য লক্ষ্য করিয়া আশা নিরাশার মধ্য দিয়া বড় ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল। এইরূপে মাস আট দশ কাটিয়া যাওয়ার পর,—ক্রমে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিলে,—একদিন তাঁহাকে নিরিবিলিতে পাইয়া বলিয়া বসিল যে, সে তাহার বৌদির এতটা উপেক্ষা মিশ্রিত গাম্ভীর্য্য মোটেই আশা করে নাই।

উত্তরে বৌদিদি সজোরে মাথা নাড়িয়া, এক গলা ঘোমটার ভিতর হইতে কহিলেন, "ওঁর চেয়ে তো তুমি মোটে ছ'বছরের ছোট! মুখের কাপড় খুলে কি তোমার সঙ্গে কথা কওয়া যায় নাকি? তোমার দাদা কি মনে করবেন তাহ'লে?" বলিয়াই তিনি সেখান হইতে সবেগে সরিয়া পড়িলেন।

বিমল অপার বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। ভাবিয়া পাইল না,—এই ঘোমটা খোলার কথা আসিল কোথা হইতে এবং আসেই বা কেন? কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে বুঝিল যে তাহার আশা ভরসা একেবারে ডুবিয়াছে, এবং আরও অনেক কিছু বুঝিল কিন্তু মুখে এ বিষয়ে আর কাহাকেও কিছু বলিল না। বলিবেই বা কাহাকে?

বিমলের কথাটা বৌদি বেশীক্ষণ পেটে রাখিতে পারিলেন না; অমলবাবুর নিকট গিয়া উদ্গার করিয়া দিলেন। বলিলেন তোমার ভাই আজ আমায় কি বলছিল জান? বলছিল—ওর সঙ্গে মুখ তুলে আমি কেন কথা কইনা—কেন দূরে দূরে থাকি, কাছে যাই না—এই সব! আজ বলেছে বলেছে; এর পর আর কোনদিন বললে আমি কিন্তু বরদাস্ত করতে পারব না তা আগে থাকতে বলে রাখছি। অত আব্দার কিসের? ছিঃ—।

অমলবাবু একটু বয়সে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "আহা চট কেন, বুঝছ না—পেটে খেলে পিঠে সইতে হয়। ওর যে অনেকগুলি টাকা প্রতিমাসে আমাদের বাক্সে ঢুকছে! তা তার জন্তেও কি একটু সইবে না?"

"অনেকগুলো মানে? কতগুলো গো? চাকরীর একটা পয়সাও তো কই দেয় না। এই বাড়ীর অংশের কথা বলছ?" বিমল চাকরীর এক পয়সা পর্য্যন্ত দেয় নাই এই কথাটি সত্য। মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বাড়ীর খাদ্য তাহার তেমন রুচিকর হয় নাই বলিয়া কোনদিনই খাইয়া পেট ভরে নাই। সে বাড়ীতে আহারে বসিত খুবই কম। কখনো-কখনো বসিলে কতক খাইত কতক ছড়াইয়া উঠিয়া যাইত এবং পথে ঘাটে মনোমত খাবার কিনিয়া খাইত। বাকী পয়সা খরচ করিত কাপড় জামায়। ইহা তাহার এমন বদ অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল যে, অমলবাবুর হাজার গালিগালাজেও সে ইহা না করিয়া পারিত না। সমস্তই সে নত মস্তকে সহ্য করিত।

"না বাড়ীর কথা নয়, অন্য টাকার কথা বলছি," বলিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিলেন, "বাপ গেলে যে ত্রিশ টাকা সুদ পাই সে কার টাকার? ওর মায়ের! মাকে হারিয়ে ও যখন মুষড়ে পড়ল তখন ওর বাক্স থেকে বার ক'রে নিয়েছিলুম। দেখো, একথা কখনো যেন প্রকাশ না পায়! এ টাকার কথা ও একেবারেই জানেনা, জানলে মহা মুস্কিল হবে! ঝি চাকরদের কাছেও আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।"

"কিন্তু মাইনের টাকাও তো ওর কম নয়! তার এক পয়সাও তো দেয় না।"

"নাই বা দিলে। তার অর্দ্ধেক তো আমারই কাজে লাগছে। দেখতে পাওনা ও' কেমন ক্ষ্যাপার মত আগোছাল। প্রায় প্রত্যেক মাসেই পাঁচ সাতখানা জামা কাপড় কেনে, দুটো তিনটে পরে বাকীগুলো এখানে ওখানে পড়ে থাকে। আমি সরিয়ে রেখে দিই, দু'তিনমাস পরে সেগুলো বের করে পরি।"

"ও টের পায় না?"

"আরে রামঃ!" একথা ঠিক। বিমল মনে করিত এ কাজ ঝি চাকরদের। তাদের গহ্বরে কিছু ঢুকিলে বাহির করা শক্ত জানিয়াই সে কাউকে ধরিয়া কখনো টানাটানি করে নাই। যদিই বা করিয়া থাকে ত' এটা কোথায় গেল—ওটা কোথায় ছিল, এই পর্য্যন্ত।

"বেশ, বেশ বর। ওর মা তোমার কত শাস্তি দিত আর তুমি যদি এইটুকুই না করলে তো পুরুষ মানুষ কিসে? বেশ কর তুমি।" একথা তাঁহার স্বামীর মুখ হইতে ফুলশয্যার রাত্রে শোনা; কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা। খুব সম্ভব স্ত্রীর নিকট প্রাপ্য কিছু পাইবার জন্যই বলিয়াছিলেন নচেৎ এমন মিথ্যা তাঁহার মুখ হইতেও বাহির হওয়া একটা আশ্চর্য্যের বিষয়। কেননা, বিমলের মা তাঁহাকে সতীনপুত্রের মত দেখিতেন না। বিমলও তাঁহাকে বৈমাত্র ভাই বলিয়া কোনদিন মনে

করে নাই। তবু কেন যে তিনি ভ্রাতৃবিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে স্থির করিয়া কিছু বলা যায় না। খুব সম্ভব, তিনি দুই তিনবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া বিমলের বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত বিদ্যার্জ্জনটা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। কিম্বা এমনো হইতে পারে, স্ত্রীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখিবার স্ত্রৈণের অত্যুগ্র আনন্দটাই ইহার অন্যতম কারণ। কারণ যাহাই হোক, তাঁহার এই বিদ্বেষটা ক্রমে দাঁড়াইয়াছিল প্রকৃতিগত একটা স্বভাবে;—অনেকটা নেশার মত। এই স্বভাব কিন্তু বৌদিদির চরিত্রে বিবাহের সময় ছিল না। ফুলশয্যার রাত্রের ওই মিথ্যা কথায় তিনি অমলবাবুর উপর স্নেহে, করুণায় একদিকে যেমন গলিয়া গিয়াছিলেন, বিপরীত দিকে মনে মনে ঠিক ততখানিই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিলেন সংশাশুড়ীর অভাবে বিমলের বিরুদ্ধে। এতদ্ব্যতীত, বিমলকে তাড়াইয়া তাহার স্থলে নিজের ছোট ভাইটিকে গ্রামের ম্যালেরিয়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া কাছে আনিয়া এই সহরের সুখকর আব-হাওয়ার মধ্যে রাখিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার ইচ্ছাটা তাঁহার মনের গোপন কোণে বাসা বাঁধিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কেননা, সে স্থানটায় বড় অন্ধকার;—দৃষ্টি চালানো দায়।

অমলবাবু এবার বীরত্বের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আরও কি ইচ্ছে আছে জান? ইচ্ছে আছে ওর বিয়ে দিয়ে একটা মোটা রকম কিছু হাতিয়ে নিয়ে বৌ সমেত তাড়াব। চাকরির টাকা না পাওয়ার জন্য একটা খিচিমিচি তো বাধিয়েই রেখেছি, এরপর তাড়াতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।"

স্বামীর কথা শুনিয়া আনন্দে স্ত্রীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাসিয়া কি বলিতে গিয়ে নিকটেই পদশব্দ শ্রুত হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বাহির হইয়া গেলেন

এমন দিনে পাশের দু'তলা বাড়ীতে ভাড়া আসিলেন অরুণবাবুরা। সংসারে তিনি তাঁর ছোট ভাই তরুণ, বার-তের বছরের একটা মেয়ে করুণাময়ী ও তার মা। সুতরাং সংসার তাঁদের ছোট। উপরের অংশেই কুলাইয়া গেল বলিয়া নীচের ঘরগুলি ভাড়া দিলেন। ভাড়াটে বিজয়, তরুণ বিমলের প্রায় সমবয়সী। অতঃপর অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এই তিনজনের মেলা-মেশার বড় ঘটা পড়িয়া গেল। এবং তরুণের সহিত বিমলের ঘনিষ্ঠতা শীঘ্রই 'তুমি'তে আসিয়া দাঁড়াইল ও তাহা যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল তখন সে শুনিল যে, অরুণবাবু হাঁসপাতালে। উভয়েরই অফিসে বাহির হইবার বেলা হইতেছিল তবু বিমল জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না। বলিল, "এরই মধ্যে তোমার দাদার এমন কি অসুখ করল যে তুমি তাঁকে একেবারে হাঁসপাতাল পাঠালে? অসুখটা কি? কবে গেলেন? আমি যে পরশু সকালে এখানে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি!"

তরুণ হাসিয়া বলিল, একটা দিনে একটা সহর পাতালে তলিয়ে যেতে পারে, তার তুলনায় বাড়ী থেকে যেয়ে হাঁসপাতালে থাকাটায় আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। অতএব এ প্রশ্ন তোমার অগ্রাহ্য। ক্ষণেক থামিয়া সে বলিল, দাদার অসুখ তেমন মারাত্মক কিছু নয়। হাটুর কাছের মাংসটা তার খোস পাঁচড়ায় কিভাবে কেজানে পচে যেতে বসেছিল। তাই ওইখানকার খানিকটা মাংস কেটে বাদ দিতে হবে ব'লে গেছেন। তাছাড়া আমি ত তাঁকে পাঠাইনি তিনি নিজের ইচ্ছেয় গেলেন। বললেন, "আমাদের মত মধ্যবিত্তের ঘরে রুগীর ব্যবস্থা কত আর ভাল হতে পারে, ভাই? যত ভালই হোক না কেন, হাঁসপাতালের মত কোন রকমেই হতে পারে না।" গিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ তাঁর সেকথা সত্যি। তুমি বুঝি হাস-পাতালে যাওনি কখনো?

হ্যাঁ গিয়েছি। তবে ভেতরে যাইনি কখনো দরকার পড়ে নি বলে।"

"ওঃ, তাই ওকথা বলছিলে, নইলে বলতে না। যেয়ো, যেয়ে দেখো কি সুন্দর ওখানকার ব্যবস্থা। সব কিছু যেন কলে হয়ে যাচ্ছে। বৈকালের দিকে একবার যেয়োনা। বৌদি প্রত্যেক দিন যান, আমিও মাঝে মাঝে অফিস থেকে ওখানে আসি। যেয়ো একবার;—দাদা দেখলে খুব খুশী হবেন।"

অফিসের বড় বাবুর গম্ভীর মুখ মনে করিয়া বিমল সহসা কিছু বলিতে পারিল না। ক্ষণকাল ভাবিয়া সে কহিল, "আচ্ছা, সেই সময় একবার চেষ্টা ক'রে দেখব'খন। কিন্তু বিশেষ কিছু আশা করতে পারছি না। এদিকে সময় হয়ে এল—আর না, এখন আসি।"

(২)

হলঘরের শেষ দিকটায় তিন চারটী বিছানার পরে অরুণবাবু একটায় হাটুতে ব্যাণ্ডেজ লইয়া শুইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বিছানার পাশে দুইটী টুলও রহিয়াছে।

ঠিক সময়ে দেখা গেল, সেই টুল দুটীতে করুণাময়ী ও তাহার মা উপবিষ্টা, তরুণ অনুপস্থিত, বিমল আসিল। খালি হাতে নয়, কিছু ফলমূল লইয়া। তাহাকে দেখিয়া অরুণবাবু সহাস্যে কহিলেন, "একি! বিমল যে? আজতো ছুটীর বার নয়, অফিস থেকে ছুটী নিয়ে আমায় দেখতে এসেছ?"

বিমল হাসিয়া কহিল, "না বড়দা। আপনাকে দেখতে আসার মত অসুখ আপনার হয় নি—এ আমি জানি। একথা জেনেও এসেছি আপনি হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন কিন্তু তার আগেই আমি আমার উত্তর দিয়ে রাখি।" বলিয়া সে মুগ্ধচোখে একবার

করুণার মায়ের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল. আমি নিজে আসি নি, বড় বৌদি আমায় টেনে এনেছেন।"

বড় বৌদি করুণাময়ীকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিলে সে তাহা করিল। তিনি তাহাকে নিজের টুলে বসাইয়া দিয়া সঙ্কোচ-বশতঃ দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং অরুণবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইলে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না।"

করুণাময়ী-পরিত্যক্ত টুলে বিমল বসিতে যাইতেছিল কিন্তু বসা আর তাহার হইল না; সে বলিয়া উঠিল, "যাক্, আজ আমার মস্ত বড় একটা ভুল ভেঙে গেল দেখছি। আমার ধারণা ছিল যে, যে যাকে যত বেশীভাবে সেও তাকে না ভেবে পারে না। এখন দেখছি, হ্যা তা পারে। বাড়ীর সুমুখের 'রক্'এ ব'সে তরুণের সঙ্গে গল্প করবার সময় এক-একদিন বড় বৌদিকে আপনাদের ছাদের সিঁড়িতে দেখে ভেবেছি—মা সকলের চিরদিন থাকে না, তা গেছে কিন্তু সেই রকমের স্নেহ কি পেতে পারি না কোনো দিনই? উনি তরুণকে যেমন স্নেহ করেন শুনেছি, তেমনভাবে আমাকেই বা দেখবেন না কেন? জগতে সকলেই কি রক্তের সম্পর্ক নিয়ে আসে, না রক্তের সম্বন্ধটাই সকলের বড়? পুরুষ তার নিজের ইচ্ছায় নারীকে শ্রদ্ধা করে না। প্রকৃত শ্রদ্ধেয় নারীকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারে না তাই করে। নইলে ওঁর মত বিজয়ের বৌও আমার কাছ থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি কেড়ে নিতে পারেনি কেন? শ্রদ্ধা আদায় করবার ক্ষমতা তার নেই কিংবা তার মধ্যে শ্রদ্ধা করবার কিছু নেই বলেই তো? সেই জন্যেই বলেছিলাম, উনি আমায় টেনে এনেছেন। ওর সঙ্গে আলাপ করবার এমন একটা সুযোগ পেয়ে হারাই কি করে? তাই এক ঘণ্টার ছুটী পেয়েও ছুটে এসেছি।"

"বাঃ, সুন্দর!" শুনিয়া বিমল পাংশু মুখে কহিল, "কি সুন্দর বড়দা? আপনি আমায় বিদ্রূপ করছেন! ছাদ থেকে নামবার সময় আমার মুখের দিকে অনেকবার তাকিয়ে দেখা সত্বেও বড় বৌদির ওই অস্বীকারটা আমার বুকে কি জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে যদি জানতেন তাহলে—" তাহাকে থামাইয়া অরুণবাবু, "না-না বিমল," বলিতে বলিতে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া সহাস্যে রায় দিলেন, "আমি সুন্দর বলেছি তোমার মনকে আর তোমার বক্তব্য বিষয়কে, তোমাকে বিদ্রূপ করতে নয়। তোমাকে বিদ্রূপ করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, কোনকালে হবেও না। তোমার মনকে বুঝতে আমার বাকী নেই।"

পাশ দিয়া একটী নার্স চলিয়া যাইতে যাইতে থামিয়া পড়িয়া বিমলের কথা শুনিতেছিল এবং এখন অরুণবাবুর রায় শুনিয়া হাসিমুখে তাকাইয়াছিল। বড় বৌদির দিকে তাকাইতে গিয়া তাহার মুখে চোখ পড়িতেই বিমলের দৃষ্টি রুক্ষ হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়াই নার্সটী লজ্জিত হইয়া সেখান হইতে

সরিয়া গিয়া অদূরে একটী রুগীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলে সে সহাস্যে কহিল, "কি ক'রে বুঝলেন বড়দা ?"

"তোমার মনখোলা কথায়।"

"পাব তো ?"

বিমলের কথাগুলি বড় বৌদির কি যে ভাল লাগিয়েছিল তাহা বলিবার নয়। সেই-জন্য বিমলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছিল। এবং কিছু বলিবার জন্য তিনি ভিতরে ভিতরে উন্মুখ হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। অরুণবাবু কিছু বলিবার পূর্ব্বে হাসিমুখে কহিলেন, "পাবে। এত বেশী পাবে যে, সেই পাওয়ার ভারে ক্লান্ত হয়ে শেষে যেন কাঁদতে না হয়।" বলিয়া তিনি নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন।

বিমল তাঁহার সেই হাসি দেখিয়া একে-বারে ধন্য হইয়া গেল। পায়ের কাছে সশব্দে প্রণাম করিয়া কহিল, "কাঁদি তা'তে ক্ষতি নেই বড়বৌদি, জানি আমার সে কান্না আপনার পরকালের খাতায় খরচ হয়ে থাকবে। তবে আপনার বিষয়ে অন্যায়ভাবে অন্যায় কিছু ভেবে যেন কখনো না কাঁদি এইটুকুই আজ আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। কেন-না, সত্যিই যদি আমি আপনার স্নেহ পাই তাহলে নিজে কাঁদলেও আপনাকেই কাঁদানো হবে। আপনাকে অন্যায়ভাবে কাঁদানোর পাপ আমার সইলেও দুঃখ সইবে না। বলিয়া সে ফলমূলের ঠোঙাটী করুণাময়ীর হাতে দিল।

অরুণবাবু স্নেহমুগ্ধ চোখে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। এখন ঠোঙার দিকে দৃষ্টি পড়িলে তিনি হাসিমুখে কহিলেন, "বৌদির স্তুতি ত অনেক করলে কিন্তু এই ফলমুল আনার উত্তর কি? এ গুলিও বোধহয় এতলোকের সুমুখে তুমি তোমার বৌদিদিকেই খাওয়াবে বলে এনেছ,—না ?"

অরুণবাবুর এই প্রশ্নে নিকটস্থ সকলের সপ্রশ্ন দৃষ্টি বিমলের মুখের উপর পড়িল। সে তাহা দেখিল কিন্তু এতটুকু দমিল না, স্বভাবসুলভ হাসিমুখে বলিল, "ও দুটো আপনার জন্যেই এনেছি—বটে—কিন্তু তা উপলক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্দেশ্য আমার অন্য"—মুহূর্ত্তকাল থামিয়া বলিল, "আপনি যদি অভয় দেন ত বলি, নইলে বলব না।"

"সম্পূর্ণ অভয় দিচ্ছি তুমি বল।"

বিমল ছেলেমানুষের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "সেই উদ্দেশ্যটা আর কিছু নয়, আপনাকে ঘুষ দিয়ে সন্তুষ্ট করে বৌদির সঙ্গে আলাপ করা।" বলিয়াই সে বিজয়গর্ব্বে হাসিয়া সজোরে বসিতে গিয়া সশব্দে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। নিকটস্থ সকলের সশব্দ হাসিতে সেই স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

নিকটেই ছিলেন বড়বৌদি ও সেই নার্স টি কোন এক সময় সরিয়া আসিয়া-ছিল। বড়বৌদি তাহাকে থামাইয়া দিয়া বিমলকে নিজে তুলিলেন। ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তরুণ কোন এক ফাঁকে আসিয়া বিমলের পিছন হইতে টুলটী সরাইয়া লইয়াছে এবং তাহাতে সে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। বিমলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বড়বৌদি তরুণের উপর মার-মুখী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তোমার কি আক্কেল ঠাকুরপো! ছোট্‌ঠাকুরপোর মাথাটা যদি ফেটে যেত ?"

তরুণ কিছুমাত্র হাল্‌কা না হইয়া গম্ভীর-ভাবেই বলিল, তাহলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম বৌদি। আর কিছু না হোক, আপনার হাতের সেবাটা তো দিনকতক ভোগ করা যেত। তারপর মরলেও কোনো আফশোষ থাকত না।"

"হ্যাঁ, করতাম ভাল করে। বয়ে গেছে আমার তোমার সেবা করতে।" বলিয়া বড়বৌদি বিমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "খুব লেগেছে ছোটঠাকুরপো? লাগে নি। যাক্ আজ তোমার একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কেটে গেল।"

"তা স্বীকার করি। কিন্তু এ কথা বলতে আমি ভুলব না যে, যার মুখ দেখে আজ আমার ঘুম ভেঙেছে তার মুখ দেখেই রোজ যেন ভাঙে। এমনটি না ঘটলে ত আর এই স্পর্শটুকু পাওয়া যেত না, যা মা হারানোর পর থেকে আজও আমি পাই নি।

বড়বৌদি কি বলিতে গেলেন কিন্তু বলিতে পারলেন না। ছটা বাজিতে শুনিয়াই বিমল বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল, "দেরী হয়ে গেল ব'লে অফিসে আজ হয়ত বড়বাবুর কাছে বকুনি খেতে হবে। কিন্তু তাতেও আমার লোকসান নেই, বরং লাভ আমার ষোল আনাই।"

সঙ্গে সঙ্গে বড়বৌদিও শুনাইয়া দিলেন, "এত শ্রদ্ধা—স্নেহ আমি কোথায় রাখব ছোট ঠাকুরপো? রাখতে যাতে পারি সে চেষ্টা অবশ্য আমি খুবই করব; আরও করব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যে ওর আগে তোমার কোলেই মাথা রেখে যেন মরতে পাই।"

বিমল খুশীতে উজ্জল হইয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল। এমন হাসি মায়ের মৃত্যুর পর তাহার মুখে দেখা যায় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী বীণা

চন্দ্র ফিল্মস্-এর "পরপারে" চিত্রে এ মেয়েটি শান্তার ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন। ছবিখানা শিগ্‌গির আস্‌ছে চিত্রায়।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৮ই আষাঢ় ১৩৪৩—2nd. July, 1936. ২৭শ সংখ্যা

কংগ্রেস ও আসন্ন নির্ব্বাচন

সংস্কৃত শাসনতন্ত্রে আসন্ন নির্ব্বাচন সম্পর্কে বাঙ্গলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ঔদাসীন্য সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি কয়েক সপ্তাহ আলোচনা করিয়া আমরা বলিয়াছিলাম—“দিন আগত ঐ” কিন্তু বাঙ্গলা আজিও নিদ্রায় অচেতন। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দকেও তৎপর হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমাদের সেই আলোচনা ও অনুরোধ কার্য্যকরী হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার নানা স্থান হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হইতেছে।

নদীয়া হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র দাস নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন। সংস্কৃত শাসনতন্ত্রকে অচল করিতে হইলে এইরূপ নির্ভীক ও স্বার্থহীন অনন্যমনা কংগ্রেসসেবীরই একান্ত প্রয়োজন।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে জামালপুর (ময়মনসিংহ) হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন। এই সংবাদে আমরা সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। দেশপ্রেম, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণ প্রভৃতি আদর্শের দিক হইতে জ্ঞানাঞ্জন বাবুর যোগ্যতার পরিচয় দেশবাসীকে নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা নাই; কিন্তু এক দিক দিয়া তাঁহার যে বিশিষ্ট ও অনন্যসাধারণ যোগ্যতা আছে তাহা এই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বোধ হয় অবান্তর হইবে না। দেশের শিল্প-তথ্য সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি বাঙ্গলায় বিরল এবং এই জ্ঞান বাজেট আলোচনায় কিরূপ প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। পরলোকগত গোখলে মহোদয় এবং পরবর্ত্তীকালে অধুনা পরলোকগত ওয়াচা মহোদয় এই বিষয়ে সম্যক পারদর্শী হওয়ার ফলে অতিশয় ধুরন্ধর রাজস্ব সচিবদের সেকালে কিরূপ পর্য্যুদস্ত করিতেন তাহা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ আছে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী তথ্য ও হিসাব (facts and figures) সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ায় সেই শক্তিমান পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পদাঙ্কানুসরণের যোগ্য ব্যক্তি। বাজেটের আলোচনা অত্যন্ত নীরস। অতি অল্প লোকই ইহার মর্ম্ম বুঝেন এবং একটু আধটু বুঝিলেও অনেকেই এই নীরস বাগবিতণ্ডায় যোগদান করিতে চান না। অথচ রাষ্ট্রতন্ত্রের ধমনীতে বাজেটই প্রাণবাহী শোণিত, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব এই একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য ব্যাপারে শ্রীযুক্ত নিয়োগী হইবেন যোগ্যতম প্রতিনিধি এবং আশা করি সেই হিসাবে তিনি দেশের লোকের সর্ব্ববাদীসম্মত ও অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিবেন।

এই তিনটি জেলার ন্যায় বাঙ্গলার অন্যান্য জেলা হইতেও যাহাতে অভিজ্ঞ ও সত্যকার কংগ্রেসসেবীগণ নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হ'ন আশা করি সেই বিষয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ও বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সচেতন হইবেন। সংস্কৃত শাসনতন্ত্রকে অচল করিতে হইলে এসেম্ব্লীতে শক্তিশালী কংগ্রেস

শ্রীমল্লিনাথ

গ্রহণ না বর্জ্জন ?

গত ১৬ই জুন দেশবন্ধু স্মৃতি দিবসের সভায় বাঙলার নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বর্ত্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে যে একদল মন্ত্রীত্বকামীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে পরলোকগত দেশবন্ধু যে যে সর্ত্তে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন তাহা পুরণ হইয়াছে কিনা। শ্রীযুক্ত বসু স্বয়ং সেইখানে প্রশ্নগুলি একের পর আরেকটা অবতারণা করিয়া আলোচনা করেন এবং দেখাইয়া দেন যে দেশবন্ধুর সর্ত্তগুলির কোনটিই পুরণ হয় নাই সুতরাং তাঁহার মতে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ত্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমস্যাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে তাহা চিন্তা করিলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা চলিতে পারে না। বাঙ্গলার নেতার মন্ত্রীত্বগ্রহণ-বিরোধী এতদ্বিধ উক্তিতে শঙ্কিত ও বিচলিত হইয়া মন্ত্রীত্বলোলুপ মদ্রবীর সত্যমূর্ত্তি শরৎচন্দ্রকে কটাক্ষ করিয়া একটী বক্তৃতায় বলেন যে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর স্মৃতির অবমাননা করিয়াছেন—:যেহেতু তিনি (ত্রিকালজ্ঞ সত্যমূর্ত্তি) মনে করেন যে দেশবন্ধু আজ জীবিত থাকিলে মন্ত্রীত্বগ্রহণ সমর্থন করিতেন। সত্যমূর্ত্তি নানা অসত্য এবং অর্দ্ধসত্যের জাল রচনা করিয়া শরৎচন্দ্রের স্পষ্ট উক্তিকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু শরৎচন্দ্রের সহিত বহুদিন পূর্ব্বে বিনিমিত তাঁহার পত্রগুলি শরৎচন্দ্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়া সত্যমূর্ত্তির মুখোস উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। সত্যমূর্ত্তির লালসালোলুপ দৃষ্টি যে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই মন্ত্রীত্বগদীর পানেই নিবদ্ধ তাহা ঐ পত্রগুলি একবার পাঠ করিলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কংগ্রেস এতদিন যে উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে; বহু দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহাস্যমুখে সহ্য করিয়াছে—আগামী শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলে কংগ্রেসের যে সুনিশ্চিত অপমৃত্যু ঘটিবে তাহাতে আর দ্বিমত নাই। কংগ্রেস আপনার ত্যাগ ও সেবার দ্বারা জনসাধারণের নিকট যে সম্মান-জনক আসন অর্জ্জন করিয়াছেন বর্ত্তমান অবস্থায় মন্ত্রীত্বগ্রহণ করিলে তাহা সে হারাইবে—কেননা মন্ত্রীত্ব স্বীকার করিয়া লইলে কংগ্রেস দল এবং লয়ালিষ্ট বা মডারেট (moderate) দলের মধ্যে কোন পার্থক্যই বিরাজমান থাকিবেনা। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীত্ব কেন যে আমাদের দেশের শ্রেণী বিশেষের রাজনীতিকগণের নিকট এত লোভনীয় হইয়া উঠিল তাহাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। আগামী শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়ার কথা আছে তাহা তলাইয়া দেখিলে যে সবই ভুয়া এবং মেকী বলিয়াই ধরা যাইবে তাহাতো বহুবার বহুভাবে দেশের সত্যসত্যই মঙ্গল-কামী নেতৃবর্গ আমাদের চক্ষুতে অঙ্গুলী দিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংস্কৃত শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নে কূটকৌশলী বৃটিশ মন্ত্রীবর্গ যে কতখানি বুজরুকীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই সম্যক পরিস্ফুট হইবে। ইণ্ডিয়া বিল আলোচনা কালে ইহা ঘোষণা করা হয় যে ইংলণ্ডে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের উপর যতখানি আদেশ বা ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধা পান ভারতবর্ষে আগামী শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় মন্ত্রীদিগকে ঠিক ততখানি ক্ষমতাই দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ ভারতবর্ষে যেমন পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগ প্রয়োজন মত ইচ্ছা করিলে যে কোনও নথী-পত্র বা সংবাদ মন্ত্রীদিগকে না দিতে পারেন—ইংলণ্ডের পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগও তেমনি ইচ্ছা করিলে প্রয়োজনমত ইংরাজ মন্ত্রীর নিকটও যে কোন নথীপত্র বা সংবাদ গোপন রাখিতে পারেন। এই সম্বন্ধে মতামতের জন্য "এডভান্স" পত্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘের প্রধানতম (Editor-in-chief) ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক রাষ্ট্রীয়-আইন-বিশেষজ্ঞ আর্থার বেরিডেল কিথের সহিত পত্রালাপ করেন। ডাঃ সেন এবং অধ্যাপক কিথের পত্রদ্বয় গত সপ্তাহে কলিকাতার সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। অধ্যাপক কিথ ডাঃ সেনের পত্রোত্তরে জানাইয়াছেন যে ইংলণ্ডের আইন সমূহের মধ্যে মন্ত্রীগণের ক্ষমতা খর্ব্বকারী এমন কোন বিধি নাই যে যাহার দ্বারা পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগ উহাদের অনুসন্ধান বৃত্তান্ত বা কোনও নথীপত্র মন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোপন রাখিতে পারে। এই সম্পর্কে ভারতবাসীকে যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা একেবারেই মিথ্যা।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতেই বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে আসন্ন শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় মন্ত্রীদিগের অবস্থা এবং ক্ষমতা কি ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অধ্যাপক বেরিডেল কিথ আরও

বলিয়াছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ "on principle" ভারতীয় মন্ত্রীদিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইহাই যদি ভারতীয় মন্ত্রীদিগের ক্ষমতার স্বরূপ হয় তবে কিসের আশায় কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবে ?

বাঙ্গলা ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সমস্যা

নিখিল ভারতীয় রাজনীতিক পটভূমিতে যেমন সত্যমূর্ত্তি-প্রমুখ সুবিধাবাদী সম্প্রদায় মন্ত্রীত্ব-লোভে খোলাখুলি আন্দোলন পরিকরিতেছেন বাঙ্গলায় তদ্রূপ কোন খোলাখুলি আন্দোলন মন্ত্রীত্বলোভী নেতৃবর্গের পরিচালিত না হইলেও ইহা কাহারও আজ অজ্ঞাত নয় যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীকিরণশঙ্কর রায় এবং শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ বাঙ্গলার কংগ্রেসী উপদল মন্ত্রীত্ব গ্রহণের স্বপক্ষে গোপনে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। বাঙ্গলার কংগ্রেসী কলহের বিচারে বাবু রাজেন্দ্রপ্রাসাদের রায় অনুসারে বাঙ্গলার কয়েকটা জেলায় শীঘ্রই কংগ্রেসের উপনির্ব্বাচন হইলে খুব সম্ভবতঃ কিরণশঙ্করের উপদল বাঙ্গলার কংগ্রেসে প্রাধান্যলাভ করিবে। তাহা হইলে খুবই সম্ভব যে বাঙ্গলার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ মন্ত্রীত্ব গ্রহণের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিবেন এবং তদনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবেন।

যদি বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উপরোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবে মন্ত্রীত্ব-বিরোধী নেতৃবর্গ কি করিবেন তাহাই এখন বিবেচ্য। এই প্রদেশে মন্ত্রীত্ব-বিরোধী নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় বলিতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এবং কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ মহাশয়কেই বুঝায়। শুনা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত বসু এবং কুমার দেবেন্দ্রলাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় কংগ্রেস স্যাশনালিষ্ট দল পুনর্জ্জীবিত করিয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিপক্ষে লোকমত গঠনে আত্মনিয়োগ করিবেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমরা ঐ উদ্দেশ্যে কোনও রূপ কার্য্যের আভাষ পাই নাই। যদি কংগ্রেস স্যাশনালিটি দল পুনর্জ্জীবিত করিয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিপক্ষে আন্দোলন পরিচালনা করাই সিদ্ধান্ত হয় তবে আমাদের মনে হয় এখন হইতেই সেই উদ্দেশ্য বেশ সুচিন্তিত কর্ম্মধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত। দল গঠন করিয়া কোন আন্দোলন পরিচালনা করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন এখন হইতে বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া তাহা সাধন করা দরকার। দল গঠন করিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন অর্থের—অর্থাৎ Party Fund এর ব্যবস্থা। পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং একদল নিঃস্বার্থব্রতী কর্ম্মী সংগ্রহ করিয়া এখন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র, কুমার দেবেন্দ্রলাল এবং শ্রীসুরেশ মজুমদারের মন্ত্রীত্ব-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করা সর্ব্বদাই বিধেয়।

পঞ্চফুলের মধুলোভী মক্ষিকার দল

ভুষির ফানুস্ ভ্রমর-গুঞ্জে

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্ন্যাল

বাঙলা দেশের একজন অতি প্রাচীন প্রয়োগ-শিল্পী—মাঝে মাঝে বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেন। বন্ধুটির দর্শন পেলে সকাল বেলাটা কাটে ভাল।

সেদিন, সবে মাত্র চায়ের পেয়ালাটি শেষ কোরে, অভ্যাস দোষে গড়গড়ার নলটি নিয়ে বসেচি, সামনে খোলা খবরের কাগজ। মাঝে মাঝে পাতা উল্টানো চলচে! ইতি-মধ্যে সেই পরিচিত মোটারের হর্ণ টি বেজে উঠলো।

বন্ধুটি সিগনাল দিয়ে, মরিস্-মাইনার থেকে গাত্র উৎপাটন কোরলেন।

সেই কোনে-বোতাম, ঝোলা-পাঞ্জাবীর এক পাশ দিয়ে—দুটি পার্কারের তীর-ওয়ালা ক্লিপ মাথা উঁচিয়ে আছে। কাঁচা পাকা চুল—পাকাই বেশী। সেদিন দেখলুম কলপ পড়ে নি। বিনা কলপে, এই লোকটির চুলের শোভা আমার ভালোই লাগে।

তবু সে কেন ?··· ······যাক্ সে কথা।

পরম সমাদরে চেয়ার দেখিয়ে দিলুম। কিন্তু যে তোড়ে তিনি বক্তব্যের প্রথম ভূমিকাটি সুরু কোরলেন—সেটি ঠিক চেয়ারে বসে বলবার মত নয়। সামনের বারো ফিট্ জায়গা প্রদক্ষিণ কোরে, হাত-পা সমানে চলচে। টকীর স্পিড ছাড়িয়ে মুখে খই ফুটচে—গায়ে ফোস্কা পড়বার ভয়ে, অতি সন্তর্পণে পিছিয়ে আছি!

বন্ধু-মহলে আজ-কাল যা' নিয়ে বাক্যালাপ বা আলাপ-আলোচনা—তারই একটি নতুন ভূমিকা!

অর্থাৎ বন্ধুবরের অদৃষ্টে কোন প্রডিউসারেরই একখানি ছবির বেশী টেঁকে না!

আমি বল্লুম, "কিন্তু ভাই, তোমার-ও ত' হাঁড়িতে 'কখনও কালি পড়ে না!"—বন্ধু জবাব দিলে না। আমি আবার সুরু করলাম্—নাই বা টিকলো। নিত্য-নতুন খরিদ্দারই ভাল।

"পুরোনো মধু কোবরেজদের কাজে লাগে। কিন্তু মধু-মক্ষিকাদের পক্ষে নতুনই মঙ্গল।"

শুধু হাসি-ভরা চাউনির মাঝে সেই মর্ম্মভেদী কটাক্ষ! এবারও জবাব কিছু এলোনা। সুতরাং বোঝা গেল, পরিহাসটি কাজে লাগলো না।

আমি আবার সুরু করলুম:

"ভূষি মালের কারবারী যারা, তোমাদের এক থাবাতেই তার পনের আনা ভুষি-নিকেষ!—মাল আর কিছু বাকী থাকে না। 'সেকেণ্ড চান্স' আসে কোথা থেকে বল!"

কথাটি হয় ত' এবার বন্ধুটির মনের মত হোল! জবাবে বল্লেন:

"কিন্তু ভাই, মালের যে শুধু বারো আনাই ভুষি—তা' ত' নয়, মাথাতেও সে ভুষি! শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাখে না সে!"

হায় বন্ধু! জবাব যা মুখে এলো, ভাষায় প্রকাশ কোরতে পারলেম না।

যে মাথা নিয়ে, তোমরা নিত্য-নতুন ভুষির ফানুস গোড়ছ, একটা পল্কা হাওয়াও যে সয়না ভাই!

ভুষি থেকে যে শুধু ছাতুই জন্মাছে—লাড্ডু আর দানা বাঁধে না!

সেই লাড্ডু বাঁধা চাই বন্ধু! কাঁচা ভুষির কারবারী নইলে বাচে কই! বিশ্বাস জন্মাবে কোত্থেকে!

তারপর, বন্ধুবরের বিরাট কর্ম্ম-বহুল জীবনী নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করা গেল। কিন্তু কোথাও বড় একটা একটি হজম-যোগ্য লাড্ডুরও সন্ধ্যান মিললো না।

বন্ধুবর কাগজওয়ালাদের বিচারের বিরুদ্ধে খানিকটা উদ্গার কোরলেন;

আমি বল্লুম: এও ভুল। মানুষ, সে যত বড়ই মহা-মানুষ হোক, তার হাতে গড়া জিনিষ মাত্রেই সমালোচনার অঙ্গীভূত। ভালো হোক বা মন্দই হোক—কালের কষ্ঠি-পাথরে তার দর একদিন যাচাই হবেই!

ভুঁই ফোড়দের বাদ দিয়ে, দেশের যারা সত্যিকারের গুনী নির্ভরযোগ্য সমালোচক—তাঁদের বিচারের ফল অবহেলার যোগ্য নয়। সমালোচকের সুক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে, যদি তোমার নিজের জিনিষটাই. নিরপেক্ষভাবে বিচার কোরতে—দোষ গুণের Percentage আপনি বেরিয়ে পড়তো!

যারা পুতুল গড়ে, তা'দের হাতেও ত' সব মুর্ত্তিগুলো একরকম রূপ পায় না। খেয়ালী বিধাতার সৃষ্টি-লীলাতেও দেখি সেই একই বিচিত্র বিধান! মানুষ ত' কোন ছার।

পরপারে

ঃ পরিচালক ঃ

যতীন দাস

ঃ সুর-শিল্পী ঃ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

ঃ আলোক চিত্র-শিল্পী ঃ

প্রবোধ দাস

ঃ সহকারী ঃ

অজয় কর

ঃ শব্দ-যন্ত্রী ঃ

জ্যোতিষ সিংহ

ঃ সহকারী ঃ

মিঃ ইলিয়াস

ঃ স্বত্বাধিকারী ঃ

ধীরেন্দ্র নাথ চন্দ্র

দুর্গাদাস

অহীন্দ্র — নির্ম্মলেন্দু
মনোরঞ্জন — শৈলেন
ভূমেন — অনুপম
সন্তোষ সিংহ — কৃষ্ণধন মুখো
আশু বোস — সন্তোষ দাস
অয়স্কান্ত — তিলা মহম্মদ
জ্যোৎস্না — বীণা
নিভা — নগেন্দ্রবালা

এবং

কুমারী সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা

ও

শ্রীমান রমেশ চন্দ্র খাণ্ডেলওয়ালা

দুইটী সন্তরণপটু বালক বালিকার ভূমিকায়

প্রভৃতি নাট্যকলাকুশলীগণের সংযোজনায়

চন্দ্র ফিল্মসের প্রথম নৈবেদ্য

পরপারে

৪ঠা জুলাই শনিবার **চিত্রায়** শুভ উদ্বোধন

তবু যে, শিল্পীও স্রষ্টা হ'বার আশা রাখে, তাকে কত দিক দেখে শুনে, কত ভেবে চিন্তে কাজ কোরতে হয়।

বন্ধুকে বল্লুম; ভাই, আজ তুমি য'ার কারবারী—সেই ব্যবসায় চুল পাকিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছ; তোমায় বুদ্ধি বা সদ্‌-পরামর্শ দিতে পারি—এত বড় ধৃষ্টতা আমার নেই। শুদ্ধ একটিমাত্র বন্ধুভাবে Suggestion দেবার ছিল—

নিত্য নতুন ফুলের মধু সংগ্রহে হয়ত' একটা সাময়িক উত্তেজনা থাকতে পারে। কিন্তু সে নানা ফুলের মধু পরিপাকে ও পরিবেশনে যথেষ্ট বিপদ আছে। সুতরাং এক ফুলে stick করাই ভাল। বিশ্বাস জমাবার পক্ষে এমন নিরাপদ পন্থা আর দ্বিতীয় নেই।

ভাল হোক বা মন্দই হোক—তবু তার দোষ গুণ বুঝে, শুধরে নেবার চ'ঞ্চ পাওয়া যায়। বাঙলার Migratory Birdদের মরণের সময় আসন্ন হ'য়ে এসেচে। পঞ্চ ফুলের মধু-লোভী এই শ্রেণীর মক্ষিকার দল—শুধু ভাড় কাৎ কোরেই তৃপ্ত নন—তার' বৃষোৎসর্গ, সপিণ্ডকরণ কোরে ছেড়ে দেন। "অতএব, বন্ধু—'দোহন' করবার পূর্ব্বে তোমার আশ্রয়টি ঠিক রেখো এবং মধু-ভাণ্ডটির প্রতিও দৃষ্টি রেখো। যেন একটি মাত্র চুমুকেই ভাড় খালি না হয়।"

দেখলুম কী জানি কেন, এবার বন্ধু আমার হাসিমুখের 'tip' টুকু নিলেন।

* * *

মরিস্-মাইনার বেরিয়ে গেল। শুধু তার উৎসাহ-ভরা চোখের দীপ্তিটুকু জানিয়ে দিয়ে গেল—

হয়ত' এখনও সময় আছে এবং পারলে হয়ত' সেই পারবে!

সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায়—অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, গড়গড়ায় ধোঁয়া ছাড়তে লাগলুম।

সি, খি

কোলকাতার ফুটবল লিগ

এ বছরের ফুটবল লীগের খেলাগুলি প্রায় শেষ হয়ে এল। আসছে শুক্রবার ৩রা জুলাই নিয়ম-মত লীগের খেলাগুলি শেষ হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু গেল শনিবার সব খেলাগুলি বন্ধ থাকায় ঐ দিনের খেলা-গুলি ৭ই জুলাই মঙ্গলবার হবে। সেইজন্যে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা বুধবার ৮ই জুলাই থেকে আরম্ভ হবে। ধার্য্যদিনের এই যে অদল-বদল তার কারণ হচ্ছে 'চাইনীজ টীম'। প্রত্যেক বছরেই ভারতীয়দল এবং ইউরোপীয়ান দলের আন্তর্জ্জাতিক খেলাটি লীগের খেলাগুলি শেষ হবার পরে হয়। কিন্তু ৪ঠা জুলাই 'ইণ্ডিয়া বনাম চায়না' খেলাটির বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়ায় ঐ খেলাটি ২৭শে জুন করতে হয়েছে। এ বৎসরের এই আন্তর্জ্জাতিক খেলাটি খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক হলেও আশানুরূপ লোকের ভীড় হয় নি। তার কারণ প্রধানতঃ ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচন অনেকের অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয়তঃ এবছর 'চ্যারিটি' খেলার একটু আধিক্য হয়েছে। গত হকির মরসুম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ দিন অন্তর একটা করে লেগে রয়েছে। সুতরাং দর্শকদের এখন চ্যারিটী করার চেয়ে চ্যারিটি পেলে ভাল হয়! তার পরে আগামী ৪ঠা এবং ৬ই জুলাই সকলেরই কিছু খরচার ব্যবস্থা আগে থেকেই করতে তো হচ্ছে!

শনিবার দিন ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় খেলাটি আরম্ভ হবার পর দেখা গেল যে দুটি দলই সমান শক্তিশালী। ভারতীয় দল প্রথমে গোল দেন। দুলাল রাইট-আউট থেকে সেণ্টার করায় লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথম গোল দেন। প্রায় চার মিনিট বাদেই ইউরোপীয়ান দলের মিলস্ গোলটি শোধ দেন। কিছুক্ষণ বাদেই লক্ষ্মীনারায়ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটি গোল করেন। ডেভিসের মত বিখ্যাত গোল রক্ষককে এর আগে কোন খেলোয়াড়ই এমনভাবে গোল দিতে সক্ষম হননি। ম্যাকু দ্বিতীয় গোলটিও পরিশোধ করে দেন। তার পর মিলস্ ভারতীয় দলকে আর একটি গোল দেওয়ায় ইউরোপীয়ান দল এগিয়ে থাকেন। খেলা শেষ হবার প্রায় দশ সেকেণ্ড আগে নূর মহম্মদ একটি ফাউল সট করে একেবারে গোলের সামনে বল ফেলে দেন। এতে মজিদ হেড দিয়ে গোল করায় খেলাটি 'ড' হয়। বিজয়ী দল কারা ঠিক না হওয়ায় পনের মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলান হয়। কিন্তু ঐ সময়ের ভেতরও কোন গোল না হওয়ায় খেলাটি 'ড্র' হয়। খেলা শেষ হবার পর দু' দলের ক্যাপ্টেন 'টস্' করেন এবং ভারতীয় দল টসে জয়লাভ করলে বিজয়ী হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং ইউরোপীয়ান দল বিজিতদের পুরস্কার লাভ করেন। ভারতীয় দলের ভিতর গোলে কে, দত্ত, ব্যাকে জুম্মা খাঁ, হাফ ব্যাকে নূর মহম্মদ এবং ফরওয়ার্ডে দুলাল ভাল খেলেন। দু' দলের মধ্যে নূরমহম্মদের খেলাই সেদিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবছরে এত ভাল খেলা তিনি কোনদিন খেলেননি এবং

ভবিষ্যতে খেলিবেন কিনা সন্দেহ। তিনি না থাকলে হয়ত ভারতীয় দলকে পরাজিত হতে হত। ফরওয়ার্ডদের গোল দিতেও তিনি যেমন সাহায্য করেছিলেন গোল রক্ষা করতেও তিনি তেমনি সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় দলের ভেতর রহিম সেদিন সবচেয়ে খারাপ খেলেছিলেন। তাঁর খেলা দেখে মনে হল যে তিনি ইচ্ছা করে খেলছেন না। এর কারণ হয়ত তাঁর ক্লাবের কর্ত্তাদের আদেশ। কে, দত্ত অনেকগুলি অব্যর্থ গোল বাঁচিয়েছিলেন। ইউরোপীয়ান দলের মধ্যে গেষ্টের নাম সকলের আগে করা উচিৎ। তিনি বেশ খেলেছিলেন। তাছাড়া টার্ণবুল্, বারোজ, মিলস এবং ক্যাসের খেলা উপভোগ্য হয়েছিল।

গত সপ্তাহে যতগুলি 'এ' ডিভিশন লীগ খেলা হয় তার মধ্যে ব্ল্যাকওয়াচ এবং মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলাটিই সবচেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। লীগের প্রথম খেলায় প্রথমোক্ত টিমটি শেষোক্ত টিমটির কাছে ৭-১ গোলে হেরেছিল। কিন্তু রিটার্ণ ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিং ব্ল্যাকওয়াচের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেছে। মহামেডান স্পোর্টিং-এর এবছরে এই প্রথম পরাজয়। এদের এই পরাজয় এই ক্লাবের সমর্থকদের অত্যন্ত মর্ম্মাহত করেছে। মহামেডান স্পোর্টিং এর খেলোয়াড়েরাও এই রকম বিস্ময়কর পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে মহামেডান স্পোর্টিং তাঁহাদের সাধারণ উদ্দীপনাপূর্ণ খেলা খেলতে থাকেন এবং কিছু সময়ের ভেতরেই একখানি গোল দেন। বিশ্রামের পর ব্ল্যাকওয়াচ ভীষণভাবে আক্রমণ করতে আরম্ভ করেন। হাণ্টার একটি কর্ণার কিক করলে গেষ্ট হেড করে গোলটি পরিশোধ করেন। এতে মহামেডান দল বেশ একটু দমে যায়। এর প্রায় দু'মিনিট পরে ইনস্ একটি সুন্দর সট করে আর একটি গোল করেন। তার পর নূরমহম্মদ গোলে একটি সুন্দর সট করেন কিন্তু তা পোষ্টে লেগে ফিরে আসে। শেষের দিকে মহামেডান স্পোর্টিং একটি পেনাল্টি কিক পায়। কিন্তু নূর মহম্মদ সেই সময় আহত হওয়ায় জুম্মা খাঁ সট করেন এবং বারে লেগে বল ফিরে আসে। মহামেডান দলের নূর মহম্মদ, ওসমান, রহিম এবং জুম্মা ভাল খেলেন। ব্ল্যাকওয়াচ দলের এণ্ডারসন গেষ্ট, ম্যাক্ এবং এমসলি প্রশংসনীয় খেলা খেলেন। মহামেডানের এই পরাজয়ে লীগের শেষের দিকটা আবার বেশ জমে উঠেছে। ব্ল্যাকওয়াচের ২০টা খেলে হয়েছে ৩১ পয়েণ্ট। মহামেডানের ২০টা খেলে হয়েছে ৩৪ পয়েণ্ট। দুই দলেরই এখন দুটি করে খেলা বাকী। ব্ল্যাকওয়াচ দুটি খেলায় চার পয়েণ্ট পাবে বলেই মনে হয়।

যুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রার্থী

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে সংস্কৃত শাসনতন্ত্রের আসন্ন নির্ব্বাচনে দক্ষিণ কলিকাতা অমুসলমান কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রার্থী হইবেন।

কিন্তু মহামেডান দলকে এখন ক্যালকাটা এবং মোহনবাগানের সঙ্গে খেলতে হবে। এই দুটি খেলায় যদি এরা অন্ততঃ দুটি পয়েণ্ট না পান তাহলে হয়ত লীগ বিজয়ী দল নির্দ্ধারণ করবার জন্যে এই দুই দলে আর একটি খেলা হতে পারে।

গত সপ্তাহের আর একটি খেলাও বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এই খেলাটি দুটি কারণে দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। প্রথম কারণ মহামেডান স্পোর্টিংএর কাছে ই, বি, আরের এই প্রথম পরাজয় এবং দ্বিতীয় কারণ মহামেডান স্পোর্টিংএর সাফির অন্যায়ভাবে চার্জ্জ করে ই, বি, আরের স্পিকের হাঁটু ভেঙ্গে দেওয়া। স্পিককে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। এখন তিনি ভাল আছেন বলে জানা গেছে। তিন বৎসর আগে ই, বি, আর 'এ' ডিভিসনে উন্নীত হয়েই মহামেডান দলকে আই, এফ, এ শীল্ডে হারিয়ে দেয়। মহামেডানের সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ এতদিনে নেওয়া হ'ল। ই, বি, আর দল সেদিন মোটেই খেলতে পারে নি। ফরওয়ার্ডে মনা দত্ত এবং স্পিক ভাল খেলেছিলেন। তরু সেনগুপ্ত গোল দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। ব্যাকে জি, কার্ভে অন্যদিনের চেয়ে যেন একটু নিকৃষ্ট খেললেন। যাই হক, এই দুর্ঘটনাটি নিয়ে এবছরে মোহনবাগান মাঠে তিনটি দুর্ঘটনা হল।

ইষ্টবেঙ্গল ভাল খেলেও ব্ল্যাকওয়াচের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেছে। কালীঘাট খুব ভাল খেলে ক্যালকাটার কাছে ২-০ গোলে জিতেছে কালীঘাট ক্লাবের পাগসলে সবচেয়ে ভাল খেলেছিল। পাগসলের প্রথম গোলটি সত্যই উপভোগ্য হয়েছিল। আর্ম্মষ্ট্রংএর মত নাম করা গোলরক্ষকও পাগসলের সটটি আটকাবার কোন সুযোগই পান নি। দ্বিতীয় গোলটিও পাগসলের জন্যেই জোসেফ দিতে পেরেছিল। পাগসলে গেল শুক্রবার রেঙ্গুন ফিরে গেছেন। ইনি চলে যাওয়ায় কালীঘাট ক্লাব বেশ একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। তবে তিনি হয়ত শীল্ডের খেলার আগে আবার আসতে পারেন। গত সোমবার বৃষ্টিতে খেলে এবং খুব দুর্ব্বল টীম নিয়েও মোহনবাগান পুলিশের কাছে ১—০ গোলে জিতেছে। মোহনবাগানের আরও দুটি গোল দেওয়া উচিত ছিল। এখন অবধি

পুলিশই আবার এ বছরে 'বি' ডিভিসনে নেমে যাবে ব'লে মনে হয়। পুলিশের ১৩ পয়েণ্ট হয়েছে ২১টি ম্যাচ খেলে। আর ডালহাউসির ১৩ পয়েণ্ট হয়েছে ১৯টি ম্যাচ খেলে। সুতরাং পুলিশেরই নেমে যাবার সম্ভাবনা বেশী।

'বি' ডিভিসনে ভবানীপুর ক্লাবের এ বছরে 'এ' ডিভিসনে উন্নীত হবার আশা কার্য্যে পরিণত হবে বলেই মনে হয়। যদিও তাঁরা অপ্রত্যাশিতভাবে ইটালি স্পোর্টিং-এর কাছে হেরে গেছেন, তাহলেও হাওড়ার চেয়ে তাঁরা চার পয়েণ্ট এগিয়ে আছেন। তাঁদের আর কুমারটুলি এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে দুটি খেলা বাকি। এ দুটি খেলায় তাঁরা চার পয়েণ্ট পাবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে এরা যদি দুটি খেলায় হারেন এবং হাওড়া বাকি দুটি খেলাতেই জেতেন তাহলে হাওড়া এবং ভবানীপুর সমান পয়েণ্ট হতে পারে। তবে এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত না হবার সম্ভাবনাই বেশী। 'বি' ডিভিসন থেকে বৌবাজার বা এনটালি, কারা যে বিদায় নেবেন তা এখনও ঠিক বলা শক্ত। বৌবাজারের ২০টি ম্যাচ খেলে হয়েছে ১২ পয়েণ্ট এবং এনটালির ১৯টি ম্যাচ খেলে হয়েছে—৯ পয়েণ্ট। তবে এ বছরে 'এ' ডিভিসনে এবং 'বি' ডিভিসনে গত বছরের উন্নীত টীমগুলিই যথাস্থানে ফিরে যাবেন এই মত অনেকেই পোষণ করেন।

গত সপ্তাহের খেলার ফলাফল নিচে দেওয়া হ'ল।

বুধবার

এরিয়ান্স—ডালহাউসী	৩—০
মহামেডান স্পোর্টিং—ই, বি, আর	৪—১

বৃহস্পতিবার

কালীঘাট—কলিকাতা	২—০
পুলিশ—কাষ্টমস	

শুক্রবার

ব্লাকওয়াচ—মহমেডান স্পোর্টিং	২—১

শনিবার

ইণ্ডিয়ান—ইউরোপীয়ান	৩—৩

সোমবার

মোহনবাগান—পুলিশ	১—০
ই, বি, আর—কাষ্টমস	২—১
কালীঘাট—এরিয়ান্স	২—১

মঙ্গলবার

ক্যালকাটা—মহামেডান স্পোর্টিং	০—০
ব্লাকওয়াচ—এ্যাটাচড সেকসন	২—১

চাইনীজ টীম

চাইনীজ টীমের ম্যানেজার মিঃ চেকওয়া সব ব্যবস্থা ঠিক করে গত সোমবার এয়ার মেলে বার্ম্মা থেকে ফিরে এসেছেন। এরা যে দুদিন খেলবেন সেই দুদিনের জন্য আই, এফ, এ, নয় আনা, এক টাকা দুআনা এবং দুটাকা চার আনা প্রবেশের ফি স্থির করেছেন। এর মধ্যে দুটাকা চার আনার আসনগুলি আগে থেকে রিজার্ভ করার ব্যবস্থা ছিল। গত সোমবার আই, এফ, এ, আফিসে প্রায় দুঘণ্টার ভিতর শনিবারের রিজার্ভ আসনের সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। নয় আনা এবং এক টাকা দুআনার টিকিট খেলার দিন গেটে পাওয়া যাবে।

আসছে শনিবার চাইনীজের বিপক্ষে ইণ্ডিয়ার হয়ে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা খেলবেন।

গোল—এস ব্যানার্জ্জি (বেঙ্গল)

ব্যাক—এস, দত্ত (বেঙ্গল, ক্যাপ্টেন) এবং এস মজুমদার (বেঙ্গল)।

হাফব্যাক—বি, মুখার্জ্জি (বেঙ্গল), নুর মহম্মদ (ইউ, পি) এবং মাসুম (মাইশোর)।

ফরওয়ার্ড—সেলিম (বেঙ্গল), রহিম (মাদ্রাজ), আর, কার (বিহার), কে, ভট্টাচার্য্য (বেঙ্গল) এবং আব্বাস (বেঙ্গল)।

রিজার্ভ—ওসমান খাঁ (দিল্লী), জি, কাদে (বেঙ্গল), মির্জ্জা (দিল্লী), সাধু (মাইশোর), এন, ঘোষ (বেঙ্গল), লক্ষ্মীনারায়ণ (মাইশোর) দুলাল (বেঙ্গল), মজিদ (ইউ, পি) এবং বেণীপ্রসাদ্ (ইউ, পি)

সোমবার ৬ই জুলাই 'চায়না'র বিরুদ্ধে 'সিভিল এবং মিলিটারি' দলের হয়ে যাঁরা খেলবেন তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হল।

গোল—আর্ম্মষ্ট্রং (ক্যালকাটা)

ব্যাক্—জুম্মা খাঁ (মহামেডান) এবং বাদে (ই, বি, আর)

হাফব্যাক—টেলর (ক্যালকাটা) গেষ্ট (ব্ল্যাকওয়াচ) এবং টার্ণবুল (ক্যালকাটা)

ফরওয়ার্ড—সেলিম (মহামেডান), রহিম (মহামেডান), ক্যাস্ (এটাচড লেস্কন), ম্যাকু (ব্ল্যাকওয়াচ) উইল্কিনস্ (ব্ল্যাকওয়াচ)

রিজার্ভ—ওসমান (মহামেডান), ম্যাগোয়ার (কাষ্টমস্) হারসেল্ (ব্ল্যাকওয়াচ) অখিল আমেদ (মহামেডান), বারোজ (ক্যালকাটা), লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্টবেঙ্গল) এবং পি, ব্রাউটন্ (ড্যালহাউসি)

"ইণ্ডিয়া"র টীম নির্ব্বাচনে কারও বিশেষ কিছু সমালোচনা করার নেই বলেই মনে হয়, তবে কাদের জায়গায় নন্দ চৌধুরীকে দিলে আরো ভাল হত, কেন না, কাদ এবছর কি রকম খেলছেন তা কেউ জানে না। সকলের নামের মাঝে কাদের নামটা যেন একটু খাপ্ছাড়া শোনালো। এই জায়গায় একটি খাঁটি ভারতবাসী হলেই সব দিক দিয়ে ভাল হত। 'সিভিল এবং মিলিটারী'র টিম্ মোটামুটি ভালই হয়েছে। তবে ক্যালকাটা ক্লাবের 'টমলন'-এর নাম টীমে থাকলে অনেকেই সুখী হতেন।

ক্রিকেট

ভারতীয় দল লায়েন্স সঙ্গে যে ম্যাচটি খেলেন তা 'ড্র' হয়েছে। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ২২৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৪২১ রাণ করে ডিক্লেয়ার করেন। লায়েন্স প্রথম ইনিংসে ৪৫২ রাণ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেটে ৫২ রাণ করলে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় খেলাটি 'ড্র' হয়েছে।

টেষ্ট ম্যাচ

১৯৩২ সালের ২৩.শ, ২৫শে এবং ২৬শে জুন ভারতীয় দল ইংলণ্ডের সহিত প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলেন। এই টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ২৫৯ রাণ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭৫ রাণ করেন। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ১৮৯ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৭ রাণ করেন। খেলার শেষে ইংলণ্ড ১৫৮ রাণে জয়লাভ করেন। জার্ডিন তখন ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন ছিলেন। খেলার শেষে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি আশা করেন যে অন্যান্য সকলেই ঐ প্রথম টেষ্ট ম্যাচ অন্তরের সহিত উপভোগ করিয়াছেন। ১৯৩২ সালের প্রথম টেষ্টে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গুলি খেলিয়াছিলেন।

• ইণ্ডিয়া—সি, কে, নাইডু (ক্যাপ্টেন), জে, এচ, ল্যাডলে; জে, নাওমল; ওয়াজীর আলি; এস, এচ, কোলা; নাজির আলি; পি, ই, পালিয়া; লাল সিং; জাহাঙ্গীর খাঁ; অমর সিং; এবং এস, এম, নিসার।

• ইংলণ্ড—ডি, আর, জার্ডিন (ক্যাপ্টেন) সাটক্লিফ, হোমস্, উলে, হ্যামণ্ড, পেণ্টার, আমিস্, রবিনস্, ব্রাউন, ভোস এবং বাওয়েস।

চার বছর বাদে গত শনিবার ২৭শে জুন আবার টেষ্ট খেলা আরম্ভ হইয়াছে। দুই পক্ষেই ১৯৩২ সালের টীমের অনেকেই আছেন। ভারতীয় দলের এবারেও জয়ের আশা খুব কম। তাহার উপর আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক দিনেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে খেলা আরম্ভ হইতেছে। ভারতীয় দলকে এবার অনেক বাধা বিপত্তির ভিতর খেলিতে হইতেছে। সেই সব কারণে পরিণাম স্থির করিয়া আগে বলা যায় না।

ভারতীয় দল—ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজকুমার (ক্যাপ্টেন), সি, কে, নাইডু; সি, এস, নাইডু; মার্চ্চেণ্ট; মস্তাক আলি, হিণ্ডেলকার, নিসার, অমর সিং, জাহাঙ্গীর খাঁ, ওয়াজীর আলি, পালিয়া এবং এস, ব্যানার্জ্জী (দ্বাদশ ব্যক্তি)

ইংলণ্ড দল—এ্যালেন (ক্যাপ্টেন), ওয়াট, রবিনস্, টার্ণবুল, লেল্যাণ্ড, ভেরিটি, মিচেল, ডাকওয়ার্থ, গিম্বলেণ্ট, ল্যাংরিজ, হার্ডষ্টাফ (দ্বাদশ ব্যক্তি)

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংশে ১৪৭ রাণ করেন। ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ১৩৪ রাণ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল সাত উইকেটে ৮০ রাণ করায় দ্বিতীয় দিনের (সোমবার) খেলা শেষ হয়।

অমরনাথ

অমরনাথকে ভারতে পাঠান সম্বন্ধে নানা মতের উদ্ভব হলেও শেষ অবধি ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন এবং ম্যানেজারের আচরণই পদস্থ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়েছে। লাহোর 'ক্রিসেণ্ট ক্লাব' অমরনাথ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলে একটি অভিনন্দন তাকে দেবার আয়োজন করছেন। লাহোরের অন্যান্য ক্লাব তাতে যোগদান করবে না বলেই মনে হয়।

হকি

গত ২৭শে জুন রাণপুরা জাহাজে ভারতীয় হকি টীম্ বোম্বাই ত্যাগ করেছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভারতীয় হকি টীমের হইয়া অলিম্পিয়াতে যোগদান করিবার জন্য বার্লিন অভিমুখে যাইতেছেন।

১। পি ফারনানডিস্ (সিন্ধু)
২। গুরুচরণ সিং (পাঞ্জাব)
৩। প্রোঃ জগন্নাথ, ম্যানেজার („)
৪। মোহম্মদ জাফর („)
৫। রূপ সিং (ঝাঁসি)
৬। ধ্যানচাঁদ, ক্যাপ্টেন („)
৭। আর, জে, এ্যালেন (বেঙ্গল)
৮। জে, গ্যালিবার্দ্দি („)
৯। সি, ট্যাপসেল („)
১০। মিকি („)
১১। এল, সি, এমেট („)
১২। পি, গুপ্ত, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার (বেঙ্গল)
১৩। সাহাবুদ্দিন (মানভাদার)
১৪। এন, মাসুদ („)
১৫। মহম্মদ হোসেন (মানভাদার)
১৬। আসান খাঁ (ভূপাল)
১৭। বি, এন, নির্ম্মল (বোম্বাই)
১৮। জে, ফিলিপ্স („)
১৯। ই, জে, জি, কুলেন (মাদ্রাজ)

১৯২৮ সালে আমষ্টারডামে 'ভারত' হকি খেলায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জ্জন করে। ১৯৩২ সালে ভারতীয় হকি টীম লস্ এঞ্জেলসে সেই পূর্ব্বার্জ্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে। ১৯৩৬ সালেও সেই যশ বজায় থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

পূর্ব্ব রেকর্ড—১৯২৮ সালের অলিম্পিক গেম্ (আমষ্টারডাম)

ইণ্ডিয়া—৬—অষ্ট্রিয়া—০
ইণ্ডিয়া—৯—বেলজিয়াম—০
ইণ্ডিয়া—৫—ডেনমার্ক—০
ইণ্ডিয়া—৬—সুইজারল্যাণ্ড—০
ইণ্ডিয়া—৮—হল্যাণ্ড—০

১৯৩২ সালের অলিম্পিক গেম্ (লস্ এঞ্জেলস্)

ইণ্ডিয়া—১১—জাপান—১
ইণ্ডিয়া—২৪—ইউ, এস, এ—০

সাহিত্য পরিচয়

নূতন বই—শ্রীব্রজমোহন দত্ত ও শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

সুন্দর চিত্রাবলী এবং ছড়ার সাহায্যে সুকুমারমতি শিশুদের বর্ণ শিক্ষার উপযোগী করিয়া এই বইখানা রচিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের সহজ সরল মিষ্টি ছড়া, পদ্য এবং চিত্ত-বিনোদনকারী ছবিগুলি শিশুদের মনরাজ্যে এক নূতন আনন্দের সৃষ্টি করিয়া বর্ণ পরিচয় বোধে তাহাদের মাতাইয়া তুলিবে ইহা স্বীকার করিতে আমরা এতটুকুও কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না। সাধারণতঃ পাঠ্য-পুস্তক অত্যন্ত নীরস হয় এবং ছাত্রদের কাছে ভয়াবহ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে; সেদিক হইতে "নূতন বই" নূতনত্বেরই পরিচয় দিয়াছে।

'—নূতন ভূষণ পরি নববধূ যায়
রূপার নূপুর তার রাঙা দুটিপায়।'

লেখকগণ উ-কার শিখাইতে এই সরস দুটি লাইনের সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ প্রতিটি বর্ণের সরস পরিচয় আছে পুস্তকখানিতে। আমরা 'নূতন বই-এর বহুল প্রচার কামনা করি। Get up অতি সুন্দর।

—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

১৯৩২ সালের ভারতীয় হকি টীমের কে কত গোল দিয়াছেন তাহার তালিকা:—

ধ্যানচাঁদ—১৩৩ গোল, রূপ সিং—৯৪ গোল, গুরুজিৎ সিং—৫৫ গোল, আর জে, কার—২৯ গোল, জাফর—১৮ গোল, পিনিগার—৫ গোল, মাসুদ—৩ গোল এবং সুলিভান—১ গোল।

(বিলাসী)

প্রদ্যোতকুমার অভিনন্দিত

গেল শুক্রবার বিকেলে 'উত্তরা' চিত্রগৃহে মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরকে কে, সি, এস, আই, রাজসম্মানে ভূষিত হওয়ায় এক্জিবিটার্স সিণ্ডিকেটের কর্ত্তৃপক্ষ অভিনন্দিত করেন। এই উৎসবে সাংবাদিক ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ওয়াল্ট ডিজনির "থ্রি লিটল পিগস" ও পরে পপুলার পিকচার্সের নতুন হাসির ছবি "সুখী সংসদ" (Happy Club) দেখানোর পর প্রচুর জলযোগের পর সভা ভঙ্গ হয়।

"সুখী সংসদ"

পপুলার পিক্‌চার্সের নতুন হাসির ছবি "হ্যাপি ক্লাব" বা "সুখী সংসদ"-এ তুলসী লাহিড়ী গল্প-রচয়িতা, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। গল্পের বাঁধুনি যদি একটু জোর হ'ত তা'হলে ছবিখানা আরও বেশী জমে ওঠবার সুযোগ পেত। এদিকে অভিনয়ের ভেতর তুলসী লাহিড়ী, প্রফুল্ল দাস ও প্রভাত সিংহ মন্দ অভিনয় করেন নি। পরিচালনা, শব্দস্থিরীকরণ, আলোক-চিত্রের কাজ ভাল বলা চলে। ছবিখানা গেল শনিবার থেকে 'শ্রী' ও 'পূর্ণ থিয়েটারে' দেখানো হচ্ছে।

মধু বোস প্রোডাক্‌শন

মধু বোস ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে "আলিবাবা" তুলবেন। সি, এ, পিতে যাঁরা "আলিবাবা" অভিনয় কোরে অভিনয় ধারার মধ্যে একটা আলোড়ন এনেছিলেন তাঁরাই অভিনয় কোরবেন এতে—আর তার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—মধু বোসের পত্নী, সাধনা বোসের চিত্রাবতরণ।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন

এদের "রামকান্ত" শেষ হয়েছে। এতে নেমেছেন ফনি বিদ্যাবিনোদ, রাধিকানন্দ মুখার্জ্জি, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরমা এবং উষা। পাঠক মশায় এর পরে "দ্বিকভুল" তোলার জন্যে তোড়জোড় কচ্ছেন।

কালী ফিল্মস

"অন্নপূর্ণার মন্দির"-এ পূজারীর ভিড় দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। গাঙ্গুলী মশায় নতুন নতুন মুখ পর্দ্দার ওপর দেখিয়ে সাধারণ লোকের সমর্থন যে পেয়েছেন তার প্রমান হচ্ছে "উত্তরায়" ক্রম-বর্দ্ধমান ভিড়। "অন্নপূর্ণার মন্দির" এখন বেশ কিছুদিন চললো। গেল হপ্তায় ছবির গল্প-লেখিকা শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী এসেছিলেন ছবি দেখতে; তিনি ছবি দেখে খুব খুশী হয়েছেন।

* * *

এই হপ্তার মধ্যেই শোনা যাচ্ছে যে গুণময় বাঁড়ুযোর "পরভৃতিকা"র কাজ আরম্ভ হবে। "পরভৃতিকা"র জন্যে গোড়ায় যে চরিত্র-নির্ব্বাচন হয়েছিল তার কিছু অদল-বদল কোরে এখন দাঁড়িয়েছে এই রকম :—সুবীমু—ভানু বাঁড়ুযো, উদয়—শৈলেন চৌধুরী, ভানুমতী—প্রভা, ভবানী—মনোরমা, অমিয়া—মায়া মুখার্জ্জি, প্রতিভা—সাবিত্রী। কৃষ্ণার ভূমিকায় কে দেখা দেবেন তা এখনো সঠিকভাবে স্থির হয় নি।

সুশীল মজুমদার তাঁর "মুক্তি-স্নানের" আনুষঙ্গিক কাজ প্রায় সব শেষ কোরে এখন মহলা আরম্ভ করার বন্দোবস্ত করছেন। "মুক্তি-স্নান"-এ আপনারা জীবন গাঙ্গুলী, চামী দত্ত, শীলা হালদার, সাবিত্রী প্রভৃতিকে দেখতে পাবেন।

* * *

বন্ধুবর সুকুমারের "আশিয়ানা" প্রায় শেষ হয়ে এল। এর পরে তার আরেকখানা হিন্দী ছবি তোলার কথা আছে। ঐ ছবিটার নাম আপাততঃ ঠিক হয়েছে "আই এ্যাম নট ফর সেল"।

ডি-জি-টকীজ

গেল হপ্তায় আমরা খবর দিয়েছিলুম "দ্বীপান্তরে"র সঙ্গে একটা ছোট ছবি, "শ্যামসুন্দর", দেখাবার আয়োজন হচ্ছে। "শ্যামসুন্দর" পরিচালনা কোরবেন শ্রীহেম গুপ্ত। তাঁর প্রচেষ্টা এবার সার্থক হোক।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

দেবকী বসু "সোণার সংসার"-এর নায়কের পল্লীগৃহের দিকে এখন মনোযোগ দিয়েছেন। ভারী মধুর এক দৃশ্যে নায়িকাকে দেখা যাচ্ছে তার বিয়ের প্রথম বাৎসরিক উৎসবের মিলন রজনীতে স্বামীকে তার কাছে এগিয়ে নিতে। দেবকী বাবু নাকি এই মিলন দৃশ্যে কতগুলো নতুন সুন্দর ভাবের ছোঁয়াচ দিয়েছেন। ছবির কাজ বেশ ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে।

চন্দ্র ফিল্মস

এদের "পরপারে" সবায়ের আগ্রহ মেটাবার জন্যে আসছে শনিবার ৪ঠা জুলাই "চিত্রার" রূপোলি পর্দ্দায় ঝলসিয়ে উঠবে। যতীন দাসের সুনিপুণ পরিচালনা, খোকা ভায়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ক্যামেরার কাজ আর জ্যোৎস্না গুপ্ত, বীনা, দুর্গাদাস, অহীন, নির্ম্মলেন্দু প্রভৃতি প্রথিতযশা শিল্পীদের প্রাণ-মন অভিভূতকারী অভিনয়ের গুণে "পরপারে" যে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে সে আশা আমরা রাখি।

বিবিধ

চক্রতীর্থ

চক্রতীর্থের তৃতীয় অধিবেশন গত ১৪ই আষাঢ় রবিবার সন্ধ্যা ৬৷৹টার সময় ১১নং চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোডস্থ ভবনে হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা ঐ দিন সভায় বহু তরুণ সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে 'বিচিত্রা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। সুসাহিত্যিক প্রফুল্ল সরকার ঐদিন সভায় রুশিয়ার জগদ্বিখ্যাত লেখক পুস্কিনের "কুইন অফ দি স্পেডস্" নামক গল্পটির "ইস্কাবনের বিবি" নামে একটি বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন। তরুণ সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার একটি ছোট গল্প পাঠ করেন; গল্পটির মধ্যে অতি সাধারণ বাঙ্গালী সংসারের একটি চিত্র অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে। কবি করুণাময় বসুর একটি কবিতা পাঠের কথা ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বিশেষ ব্যক্তিগত কাজের জন্য উহা আনিতে পারেন নাই। তৎপরে শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি নাটিকা (সিনারিও) পাঠ করেন; তৎপরে শক্তিশালী সমালোচক হীরালাল দাসগুপ্ত, নিধিরাজ হালদার, সুসাহিত্যিক বিমল মিত্র, জয়েশচন্দ্র লাহিড়ী, অনুপমকৃষ্ণ বসু, রবীন্দ্রকুমার বসু, অমূল্য সিংহ, সত্যনাথ মজুমদার, নির্ম্মলেন্দু রায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভ্যগণের মধ্যে সভায় পঠিত বিষয়গুলির মনস্তত্ত্ব ও রীতি লইয়া রীতিমত আলাপ আলোচনা হয়। সুকবি বিমলচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদক) বলেন "অদ্যকার সভায় কেবল মাত্র গদ্য পাঠ হইল, কিন্তু বিষয়গুলির মৌলিকত্বে ও লেখকগণের ভাষা ও চরিত্র সৃষ্টি কৌশলে আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম কারণং "গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি"—গদ্য রচনা হইতেছে সাহিত্যিক ও চিন্তাশীলগণের শক্তি পরীক্ষার কষ্টি পাথর এবং আশা করি চক্রতীর্থের সভ্যগণ একনিষ্ঠ সাহিত্য চর্চ্চার দ্বারা বঙ্গসংস্কৃতির সহায় হইবেন।"

স্থান পরিবর্ত্তন

সুপ্রসিদ্ধ প্রচার-শিল্পী শ্রীঅখিল নিয়োগী অভয় গুহ রোড হইতে ৭৮নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীটে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁরা সকাল বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে চান—ঐ ঠিকানায় গেলেই ভালো হয়—এছাড়া দুপুর বেলা তাঁকে রাধা ফিল্মে এবং সন্ধ্যে বেলায় 'রূপবাণী'তে পাওয়া যাইবে।

প্রীতিভোজ

কাউন্‌সিলার কুমার বিশ্বনাথ রায় বিনা বাধায় কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার প্রভৃতি অন্যান্য প্রার্থীরা নির্ব্বাচনের প্রাকালে স্ব স্ব নাম প্রত্যাহার করেন। আমরা বিশ্বনাথ বাবুকে প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

গত শনিবার রাত্রে কুমার বিশ্বনাথ রায়ের ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থিত ভবনে এক প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হয়। কাশীপুরের বিশিষ্ট কর্ম্মীবৃন্দ ও বিশ্বনাথবাবুর অন্যান্য বহু বন্ধু আমন্ত্রিত হন এবং বিশ্বনাথবাবু তাঁহাদের সকলকে ভূরিভোজে পরিতুষ্ট করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, কাউন্‌সিলার নিতাই পাল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

শুভ বিবাহ

গত বুধবার সুভাষচন্দ্রের তৃতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী অমিতা বসুর সহিত যশোহরের ভূতপূর্ব্ব স্বরাজী এম, এল, সি স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র শ্রীমান্ হরিদাস মিত্রের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নবপরিণীতা দম্পতীর শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সাহায্য রজনী

আগামী কল্য শুক্রবার ৩রা জুলাই খিদিরপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাহায্য কল্পে স্থানীয় চিত্রগৃহ 'ছায়ালোক'এ কালী ফিল্মসের 'বিদ্রোহ' ও 'মণিকাঞ্চন' প্রদর্শিত হইবে। আশা করি সহৃদয় জনসাধারণ এই মহৎ উদ্দেশ্যে সাহায্য করিবেন।

মিঃ বি, সেন

মিঃ বি, সেন চিত্র জগতে বিশেষ সুপরিচিত; ইনি সম্প্রতি মহীশূর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মিঃ সেন ইউরোপ হইতে ফিরিবার কয়েক দিবস পরেই London Film Productions Ltd এর অধিনায়কত্বে মিঃ রবার্ট ফ্লেহার্টীর ফিল্ম "Elephant Boy"এর যে শুটিং মহীশূরে হইয়াছে তাহার ফটোগ্রাফী বিভাগে কার্য্যে এতদিন ব্যাপৃত ছিলেন। এই ছবির সমাপনা কার্য্যের তত্বারক করিবার জন্য মিঃ সেনের ইউরোপে যাওয়া সম্ভবপর এবং শোনা যায় যে, এই ছবির উর্দ্দু পরিভাষা করিবারও সমস্ত ভারও ইঁহার উপর ন্যস্ত হইতে পারে। Mr. Zoltan Korda এখনও মহীশূরে অবস্থান করিতেছেন এবং তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে London Film Productions Ltd. তাহাদের Denhamএ নব প্রতিষ্ঠিত Technicolour Laboratoryর কার্য্যে মিঃ সেনের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন।

আমাদের প্রতিনিধির সহিত আলোচনাকালীন মিঃ সেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এই কোম্পানীর কর্ত্তৃবৃন্দের ব্যবহারের প্রশংসা করেন। ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা সত্যই অত্যন্ত গৌরব এবং সম্মানের বিষয় হইবে যদি London Films মিঃ সেনের কার্য্যের সহায়তা গ্রহণ করেন। মিঃ সেন সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ Belgium বিশ্ববিদ্যালয়ে Film Technology শিক্ষা করেন এবং তৎপর ইউরোপের কয়েকটি প্রসিদ্ধ Studioতে কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেন এবং খ্যাতি অর্জ্জন করেন। আমরা আন্তরিক ভাবে মিঃ সেনের এই নূতন উদ্যমের সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি ভারতীয় চিত্রশিল্প তাঁহার অভিজ্ঞতায় দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে।

শ্রীসুশীল কুমার দত্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

অপরিচয়ের বাঁধ ছুটা করিবার পর শ্রদ্ধায় বড় বৌদিকে প্লাবিত করিয়া স্নেহ গ্রাস করিতে বিমলের বেশী সময় লাগিল না। সে অরুণবাবুর সংসারের সহিত নিজেকে খুব মিলাইয়া ফেলিল এবং বড় বৌদি যখন তাহাকে নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ করিয়া কাছে বসিয়া খাওয়াইতে সুরু করিলেন তখন সে যেন স্বর্গে বাস করিতে লাগিল। পরিতৃপ্তির আনন্দে তাহার স্বাস্থ্য ফিরিতে সুরু করিল।

সেদিন হাঁসপাতালে গিয়া একথা-সেকথার পর বড় বৌদি মনের কথাটা বলিলেন। কহিলেন, "একটা সাধ আমার রাখবে? আমার বড় ইচ্ছে যে করুণার সঙ্গে বিমলের বিয়ে দিয়ে বিমলকে নিজের কাছে রাখি।"

অরুণবাবু কহিলেন, "কিন্তু 'ও' রাজী হবে কি?"

করুণা পাশের টুলে বসিয়াছিল, সেখান হইতে সরিয়া গেল।

"হ্যাঁ, হবে বলেই মনে হয়। এই ক'দিন ধরে নিমন্ত্রণ করে কাছে বসিয়ে খাইয়ে অনেক রকম কথা কয়ে জানতে পেরেছি ও কেবল-মাত্র একটু যত্নের কাঙাল। প্রথম নিমন্ত্রণের দিনে খেয়ে উঠে বলেছিল, "বড় বৌদি, মা গেছেন প্রায় আট বছর আগে। এই গত আট বৎসরের মধ্যে খেয়ে এমন তৃপ্তি একদিনও পাইনি। তাই এখন কেবল মা'কেই মনে পড়ছে। আপনি বোধ হয় আর জন্মে আমার মা ছিলেন। সত্যি বলছি বড় বৌদি, বাড়ীতে থাকতে আমার একদণ্ডও ইচ্ছে হয় না, মনে হয় আপনার কাছে প্রাঙ্কণটি পড়ে থাকি।" এতেই মনে হয় ও অমত কিছু করবেনা।

"তা যদি বোঝো তাহলে দেখনা চেষ্টা করে। ওর স্বাস্থ্য আর চরিত্র যে খুবই লোভনীয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই তা' ছাড়া, মাস গেলে চল্লিশ টাকা উপায়ও করে! যদি হয় খুবই ভাল হবে।"

পরদিন সকালেই বিমলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারে বসাইয়া বড় বৌদি কথাটা পাড়িলেন, বলিলেন, "আমার একটা বড় সাধ হয়েছে ছোট ঠাকুরপো। আমার সেই সাধে তুমি যেন বাজ ফেলো না। করুণাকে বিয়ে করতে তোমার কি কোনো আপত্তি আছে?"

বিমল মুখের অন্ন গিলিয়া লইয়া কহিল, "এইটিই কি আপনার সাধ নাকি?" বড় বৌদি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলে সে বড় বিপন্ন হইয়া কহিল, "তাহলে আমাকে বড় বিপদে ফেললেন দেখছি। বলিয়া" ক্ষণকাল ভাবিয়া লইয়া কহিল, "এ যাত্রা আমাকে ক্ষমা করুন। বিয়ে করা আমার দ্বারা হবে না।"

"আচ্ছা বেশ। হাত থামালে কেন, খাও।" বিমল খাইতে সুরু করিলে বড় বৌদি খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, "কারণ কি তা' শুনতে পাইনে? করুণাকে পছন্দ হয় না বুঝি?"

এইবার বিমল নিঃশব্দে হাসিল, হাসিয়া বলিল, "ওটা হল আপনার গর্ব্বের কথা। মনে মনে ঠিক জানেন যে অমন মেয়ে শতকরা একটাও দেখতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। না, কারণ তা নয়। কারণ আমার একটি নয়, অনেক। প্রথমতঃ আমার চাকরী পাকা হতে এখনো দু'তিন মাস বাকী; দ্বিতীয়তঃ বিয়ে করে করুণাকে নিয়ে গিয়ে আমি রাখবো কোথায়? আমার ওই দাদা আর নিরক্ষর বৌদির কাছে করুণার মত মেয়েকে নিয়ে গিয়ে রাখা যায় না, রাখতে আমি পারব না। আর তৃতীয় কারণ এই যে, আমার মাথা গোঁজবার ঠাঁই এই আপনার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও নেই—আমি দেখতে পাইনে।"

বড়বৌদি অদম্য আনন্দাবেগ কোন রকমে চাপিয়া কহিলেন, "আমি বিদ্ধ পাই।"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বিমল বলিল, "পান! কোথায়?"

"কেন—আমার কাছেই।" বলিয়া বড়বৌদি আর চাপিতে না পারিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন এবং পরদিন দুপুরে এই বিবাহের কথাটা পাকা করিয়া লইতে বিমলদের বাড়ী গেলেন। তখন বিমলদের বাড়ীতে ঝি-চাকর ব্যতীত আর কেহ ছিল না, অমলবাবু স্ত্রীকে কোথায় কি দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। কলতলায় দাসী রামী বাসন মাজিতেছিল। সে বড়বৌদিকে চিনিত, তাই তাঁহাকে দেখিয়াই দ্রুতপদে কাছে আসিয়া কহিল, ছোটবাবু তো বাড়ী নেই, অফিসে গেছেন—সেই সন্ধ্যের সময় ফিরবেন। বড়বাবুও গিন্নীমাকে নিয়ে কোথায় গেছেন। আমরা ছাড়া মানে, আমি আর সত্য ছাড়া বাড়ীতে এখন কেউ নেই।"

সত্য যে এ বাটীর চাকর তাহা বড় বৌদি জানিতেন। তিনি কহিলেন, "আমি ছোটবাবুকেই খুঁজতে এসেছি এ তোমায় কে বললে?"

রামী লজ্জিত হইয়া পড়িল। কহিল, "না-না, তা নয়, আপনি ছোটবাবুকে ভাল-বাসেন কিনা তাই মনে করেছিলুম বুঝি তাঁকেই খুঁজছেন।"

বড়বৌদি হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই বা তোমায় কে বললে?"

"কেন—ছোটবাবু নিজেই তো যখন-তখন বলেন। সে কথা শুনতে কি কারও আর বাকী আছে নাকি?"

"তাহলে ছোটবাবুর বৌদিও শুনেছেন?" রামী মাথা কাত করিয়া জানাইলে বড়-

বৌদি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনে কি বললেন তিনি ?" তাহাকে ইতস্তত: করিতে দেখিয়া তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমার কাছে বলতে তোমার আপত্তি কি ? একথা নিয়ে তোমার গিন্নীমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসব—তেমন মেয়ে আমি নই।"

রামী সাহস পাইয়াও নির্ভীক হইতে পারিল না। সে সভয়ে কহিল, "মা, তাই আপনি হোন্ এই কামনা করি। কিন্তু আর আপনি এ বাড়ীতে যেন আসবেন না! তাহলে আপনার মুখের ওপরেই নাহক্ দশ কথা শুনিয়ে দেবে। বড় বাবুকে যে কি দিয়ে বশ করেছেন তা তিনিই জানেন, কিন্তু তাও বলি বাপু অতটা ভাল নয়।—ছোটবাবুর সঙ্গে আপনার নাকি চরিত্র দোষ ঘটেছে—গিন্নিমা বলেন! আমরা কিন্তু চুপি চুপি বলাবলি করি এ কোন প্রকারেই হতেই পারে না। আপনার মত মানুষ—তাও কি কখনো হয় ?"

শুনিয়া রাগে, দুঃখে, নিজের উপর অসীম ঘৃণায় বড় বৌদির মুখ একেবারে কালীবর্ণ হইয়া গেল। তবু বহু চেষ্টায় মুখে হাসি ফুটাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হয় না কেন মেয়ে ? এমন যে হয় না সে তো নয়, হতেও তো পারে ?"

"ছি: ছি:, অমন কথা মুখে আনবেন না। শুনলেও আমাদের পাপ হয়।" বলিয়া রামী সত্যসত্যই যেন এইমাত্র পাপী হইয়া তাহা মোচনার্থে চোখ বুজিয়া কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া অদৃশ্য দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া কহিল, "আমরা কি আর মানুষ চিনি না—না জানি না ? ছোটবাবু আপনাকেই মা বলে জেনেছে, এ কি আর আমাদের কারো জানতে বাকী আছে ? সত্যকে আমি প্রায়ই একথা বলি।"

"আচ্ছা, সে না হয় মানলুম তোমরা আমাকে খারাপ মনে কর না, কিন্তু বলতে পার তোমাদের গিন্নিমার এমন ধারণা হল কেমন করে ?"

"তা আমরা কি করে বলব বলুন," বলিয়া মৌন হইয়া অকস্মাৎ কিছু একটা আবিষ্কার করার মত মুখভাব করিয়া রামী কহিল, "আমার মনে হয়, ছোটবাবু একবার ওঁকে বলেছিলেন না, উনি কেন দূরে দূরে থাকেন, কথা বলেন না, সেই থেকে বোধ হয় ঠিক করে নিয়েছেন ছোটবাবুর স্বভাব নাকি ভাল নয়। আমরা কেউ কিন্তু ছোটবাবুকে ওকথা বলতে শুনিনি, গিন্নীমা বলেন।" এখানে বলা বোধ হয় বাহুল্য নয় যে, নিজের সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য কিনা জানি না, বৌদি বিমলের সেকথা সগর্ব্বে ঝি চাকর ও বামুন ঠাকুরের কাছে বলিয়াছিলেন এবং বিমলও বৌদির মনের পরিচয় দিবার জন্য একদিন কথায় কথায় উদাহরণ স্বরূপ সেকথা বড় বৌদির নিকট বলিয়াছিল। তাই বড়বৌদির কাছে রামীর বক্তব্যটা অস্পষ্ট রহিল না। এমন সময় একটা চলন্ত গাড়ীর শব্দ নিকটবর্ত্তী হইয়া সদর দরজায় থামিয়া গেলে রামী ছুটিয়া গিয়া দেখিয়া আসিয়া সত্রাসে কহিল, "বড় বাবু আর গিন্নীমা এসে পড়েছেন !"

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বড়বৌদির বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সম্মুখের এই খিড়কীর দরজা দিয়া পলাইয়া যাওয়াই এখন রামীর একান্ত বাঞ্ছনীয়। সুতরাং তিনি হাসিমুখে কহিলেন, "বেশ, আমি এদিক দিয়েই পালাচ্ছি কিন্তু মনে রেখো এখানে আমার আসার কথা তুমি আমি ছাড়া আর কারো কাণে যেন না যায়।" বলিয়া তিনি সেই পথেই চোরের মত পলাইয়া গেলেন। এমনি করিয়া বিবাহের কথাটা পাকা হইতে গিয়া কাঁচা অবস্থাতেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল।

দিন কয়েক পরে এক সকালে বিমলের ঘুম ভাঙিতেই স্মরণ হইল যে, অরুণবাবু আরোগ্যের পথে বটে কিন্তু এখনো তিনি হাসপাতালে, গতকল্য সে ভরসা দেওয়ায় তরুণও অফিসের কাজে মফঃস্বলে চলিয়া গিয়াছে, এখন পুরুষ বলিতে কেহই তাহার বড়বৌদির নিকট নাই। অতএব এখনি খোঁজখবর লইতে তাহার যাওয়া একবার দরকার মনে করিয়া শয্যা ত্যাগ করিতেই করুণা আসিয়া হাজির। সে বলিল, "মা আপনাকে এখুনি একবার যাবার জন্যে বললেন।"

"তুমি বলছ না তো ?"

করুণাময়ী সলজ্জভাবে মুখ নত করিয়া ঘুরাইয়া লইল তাহা দেখিয়া বিমল হাসিল, হাসিয়া কহিল। "চল যাচ্ছি।"

করুণা সহ বিমল বাহিরে আসিতেই একেবারে বৌদির সম্মুখে পড়িয়া গেল। বৌদি যেন দেখিতেই পান নাই এমনিভাবে চলিয়া গেলে বিমল যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। করুণাকে লইয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, উপরের ঘরে আসিয়া দেখিল তাহার বড়বৌদি বড় বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া বুঝিল তাহার আগমন তিনি টের পান নাই। সে তাঁহার মুখের উপর ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া দৃঢ়-

স্বরে কহিল, "কে আপনার কি অনিষ্ট করেছে বলুনত, এছাড়া আর কিছু শুনতে চাইনে।"

বড়বৌদি এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন। যে বিবাহিত যুবা তরুণ ও বিমলের সমবয়সী সে যে কোন প্রকারে চরিত্রহীন ও মদ্যপ হইতে পারে এ ধারণা তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাই বিজয় প্রায়ই মধ্যরাত্রে বাড়ী ফিরিলেও তিনি তাহা সন্দেহের চক্ষে দেখেন নাই, যেমন শুনিয়াছিলেন—বাঙালীর অফিসে অমন রাত হয়—তেমনই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন প্রায় মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে কান্নার সুর অনুসরণ করিয়া নীচে গিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, বিজয় ভাল নয়, মদ্যপ। মাতাল হইয়া সে স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে প্রহার করিতেছে। পরদিন দেখেন, বিজয়ের ভাগ্যহীনা বউটী অন্যান্য দিনাপেক্ষা স্পষ্টস্বরে গতকল্যকার ক্রন্দনদোষে শাশুড়ীর নিকট প্রহার খাইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া এবং—'আমার ছেলে আজই না হয় ভাগ্যদোষে সব হারিয়ে চাকরি করতে ঢুকেছে, নইলে সে যা' তা' লোকের জামাই নয়। তলা বাড়ী! মোটরগাড়ী!' ইত্যাদি বিজয়ের মায়ের বহুবার কথিত কথা মনে করিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শ্বশুরের অপ্রত্যাশিত অর্থ পাইয়া বিজয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। আজ সে অর্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু সেই উচ্ছৃঙ্খলতার জের মেটে নাই। এমন উচ্ছৃঙ্খল মানুষ লইয়া এক বাড়ীতে বাস করার অনেক বিপদ আছে জানিয়া সেই সময় দু'চার দিন অন্তর দুই-তিন বার এবাড়ী ত্যাগ করিবার কথা বিমলের অগোচরে বিজয়দের বলিয়াছিলেন এবং উত্তরে বাড়ী দেখা হইতেছে শুনিয়া বড়বৌদি মনে মনে খুশী হইয়াছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই। উপরন্তু, গতকল্য বিমল যখন অফিসে এবং তরুণ যখন চলিয়া গিয়াছিল তখন বিজয়ের মা সেই কথা লইয়া গায়ে পড়িয়া একটা বাকযুদ্ধ বাধায় এবং সেই ঝগড়ার গায়ে-পড়া ভাবটা সম্যকরূপে সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি দুই একটা কথার উত্তর করিয়াছিলেন। সেই উত্তরের প্রত্যুত্তরে বিজয় তার মায়ের সহিত মিলিত হইয়া যে সকল অপমানকর কথা বিমলকে জড়াইয়া বলিয়াছে তাহা শুনিলে তাঁর এই দেবরটি যে কতখানি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এবং কি বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে তাহা তিনি এই ক'দিনেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। আরও বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহার এই ছোট ঠাকুরপোটীর প্রকৃতি ঠাকুরপোর মত নয়, তাহাপেক্ষা অনেক বেশী উগ্র। সুতরাং তিনি নিজেকে সকল দিক দিয়া সংবরণ করিয়া লইয়া, করুণাময়ীকে চায়ের জল চাপাইতে বলিয়া সেখান হইতে সরাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আজ আমার একটা কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে ছোট ঠাকুরপো, তুমি পারবে কিনা বল। 'না' বললে চলবে না, তোমাকে পারতেই হবে।"

"আপনার কাজের ভার নিতে আমি সকল সময়েই রাজী, না পারলেও তা আমাকে পারতেই হবে—এ আপনার অজানা নয়। কিন্তু কাজের ভার নেবার আগে, যে আপনার অনিষ্ট করেছে তার নামটা কি তা শুনতে পাইনে?"

"কি বাজে কথা বলছ তুমি? আমার এমন দেওরটী থাকতে কার কাঁধে ক'টা মাথা আছে যে আমাকে কিছু বলবে বা অসম্মান করবে?"

বিমল সন্দিগ্ধভাবে তাকাইয়া কহিল, "কি বলছেন! কেউ কিছু বলেনি আপনাকে?" তাহার সন্দেহটা সত্য বলিয়া মনে হইল।

"না, কেউ কিছু বলেনি। তুমি যদি কিছু শুনে থাক তাহলে তা মিথ্যে বলেই জেনো। মিথ্যেকে সত্যি মনে ক'রে কোনো কিছু ক'রে বসার মত পাগলামি আর জগতে নেই। তাতে অনর্থ বাধে যত, অনিষ্টও হয় তত। তুমি যেন কোনো কিছু বাধিয়ে বোসো না। শোন যা বলছিলাম—বিজয়দের এ বাড়ী ছেড়ে দিতে বলেছি কবে—, কিন্তু ওঠবার নাম গন্ধও—"

বিমল বলিল, "আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে বড়বৌদি। মনে হচ্ছে যেন—"

বড়বৌদি পারিয়া উঠিতেছেন না দেখিয়া একেবারে আসল জায়গায় আঘাত করিলেন। বাধা দিয়া রাগ দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার মনে হওয়াটাই বড় হ'ল, আর আমার মুখের কথাটা কিছু নয়—সত্যি ব'লে মেনে নিতে পারলে না। আমার ওপর তোমার শ্রদ্ধা এমনিই,—না—ছোটঠাকুরপো?"

"না, তা বলিনি বড়বৌদি, আমি তা বলিনি। এখানে এলেই আপনার যে মূর্ত্তিটা চোখের সুমুখে পেয়ে দেখে নিয়েছি, তা' আমি মিথ্যে বলে মনে করতে পারছি না। হাজার হোক নিজের চোখে দেখছি ত, পরের চোখে ত নয়।"

বড়বৌদি এইবার ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "থাম ছোটঠাকুরপো, আমাকে আর জালিও না। তোমার জালায় এবার আমার দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে হবে দেখছি! যা বলছিলাম শোন,"—বিমল শান্ত-সুবোধ বালকের মত বসিয়া পড়িলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বিজয়ের মায়ের ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারটা বড় বেশী। কখন কি ছুঁয়ে ফেলব আর ওঁকে হয়ত সেই জন্তে যখন-তখন স্নান করতে হবে, খাওয়ার সময় ছুঁয়ে ফেললে হয়ত ওঁকে উপবাসে কাটাতে হবে তাই আমাকে সারাক্ষণটি শশব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। তাই বলছিলাম কি, তুমি কোনো—"

বিমল জলিয়া উঠিল, বাধা দিয়া বলিল, "কেন? আপনাকে শশব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে কেন? ওঁর না পোষায় উনি অন্ত বাড়ীতে যেতে পারেন!"

"বাবারে বাবাঃ। কি পাপই আমি করেছি। পাপের ভোগ আর সইতে পারি নে। তোমাকে ডেকে পাঠানোই আমার ঝকমারি হয়েছে ছোটঠাকুরপো; তুমি বাড়ী যাও। আমার কাজ আর তোমার করতে হবে না।" বলিয়া বড়বৌদি উঠিবার উপক্রম করিতেই বিমল জুড়াইয়া একেবারে জল হইয়া গেল। সে অনুতপ্ত-কণ্ঠে কহিল, "না বড়বৌদি, আর আপনাকে বাধা দেব না। আপনি এইবার বলতে সুরু করে দেখুন—আমি আর একটা কথাও কইব না।"

"আমাকে তুমি কথা দিচ্ছ তাহলে?"

"হ্যাঁ" বলিয়া বিমল হাসিল।

"হাসি নয়, শোন। আমাকে জড়িয়ে কোনো রকম চেঁচামেচি মোটেই আমি ভালবাসি নে। নইলে তোমাকে বললেই ওদের মত দু'দশটা ভাড়াটেকে ভয় দেখিয়েই হোক কিম্বা শাসন ক'রেই হোক তাড়াতে যে নিশ্চয় পার এ আমি জানি। কিন্তু তার মত দুঃখ তার মত অপমান আর আমার নেই। এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোনো রকম ঝগড়াঝাটি হবে না বা চেঁচামেচি হবে না অথচ বিনা আপত্তিতে ওরা ঘর ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। তাই বলছিলাম কি—একবার উকিল বাড়ী যাও, যেয়ে জেনে এসো কি রকম কি করতে হবে আর খরচ হবে কত। কেমন পারবে তো?"

বিমল তার মাথা অনেকখানি হেলাইয়া জানাইল যে, ইহার মধ্যে না পারার মত কিছু নাই। জানাইয়া সে যাইবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

এখুনি যাচ্ছ নাকি? তবে দাঁড়াও। এখনো মুখ ধোয়া হয়নি তা টের পেয়েছি। হালুয়া খানিকটা আছে, যাও করুণার বোধ হয় এতক্ষণে চা করা হয়েছে, আমি এখুনি তা নিয়ে আসছি, পালিও না যেন। বলিতে বলিতে বড়বৌদি দ্রুতপদে তাহা আনিতে গেলেন।

(৪)

উকিল বাড়ী হইতে বিমল যখন ফিরিল তখন তাহার অফিসে বাহির হইবার সময় উত্তীর্ণ হইতেছিল। উপরে উঠিয়া আসিতেই সিঁড়ির মুখে বড়বৌদির সহিত দেখা হইলে সে সংক্ষেপে কহিল, "না বড় বৌদি, হল না, ওদিক দিয়ে হবার কোন উপায়ও নেই। ভাড়াটে যদি ভাড়া দেয় তাহলে আইনের সাহায্য নিয়েত—তাকে তাড়ানো বড় শক্ত ব্যাপার। অন্ততপক্ষে ছ'টি মাস সময় লাগবে!"

বড়বৌদি . হতাশ হইয়া পড়িলেন, অসহায়ভাবে, কহিলেন, "ছ'মাস! তাহলে কি হবে ছোট ঠাকুরপো?"

"আবার মজা এমনি, আপনিও যে এবাড়ী ছেড়ে অন্ত কোথাও চলে যাবেন তারও উপায় নেই। ওদের তুলে দিয়ে তবে আপনি যেতে পাবেন।"

"সর্বনাশ! এখন কি করা যায় তাহলে? আমি যে ভেবে ভেবে শুকিয়ে মরে যাব ছোট ঠাকুরপো?"

"আমার বুদ্ধিত আপনি নেবেন না, আমি আর কি করব বলুন। তবে একথা ঠিক যে, আমি যদি নিজের ইচ্ছেমত কাজ করতে পাই তাহলে ওরা এখানে তিন দিনের বেশী থাকতে পারবে না। একটু আধটু চেঁচামেচি তাতে অবস্থা হবেই কিন্তু তা'তে আমাদের ক্ষতিটা কি শুনি?"

"না, না ছোট ঠাকুরপো। খবরদার ওরকম কোনো কাজ করতে যেয়ো না। তাহলে লোকে কি বলবে বলত? তারপরও কি তুমি আমায় বেঁচে থাকতে বল নাকি?"

বিমল কেমন যেন মনমরা হইয়া কহিল, "যা ভাল মনে করেন করুন। আমার অফিসের বেলা হয়ে গেল, আমি এখন যাই।" বলিয়া সে নামিয়া গেল।

মুখে নিস্পৃহতা দেখাইলেও সে তার বড়বৌদির অসহায় ভাবটাকে মন হইতে তুলিয়া ফেলিতে পারিল না; কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করিতে লাগিল। সিঁড়ি নামা শেষ হইলে দেখিতে পাইল বিজয়ের বিকশিত যৌবনা সুন্দরী কিশোরী স্ত্রী চপলা চুপ করিয়া বিনা কাজে অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। সে সাড়াশব্দ করিয়া পাশ দিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া সদর দরজার নিকট গেল কিন্তু অপর পক্ষ নির্ব্বিকার। তাহার কেমন যেন বিস্ময় বোধ হইল। এই বিস্ময় কৌতূহলের বশীভূত হইয়া চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে পাশ ফিরিয়া তাকাইতেই চপলার সহিত তাহার চোখা-চোখি হইয়া গেল। অমনি চপলার পাতলা ঠোঁটে খেলিয়া গেল বিজলীর মত এক টুকরা

দেব দত্ত ফিল্ম্‌সের প্রথম বাঙ্গালা অর্ঘ্য

রজনী

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা

প্রধান ভূমিকায়

শ্রীমতী চারু বালা
শ্রীমতী রেনুকা রায়
শ্রীমতী ইলা দাস

অহীন্দ্র চৌধুরী
রবি রায়
মৃণাল ঘোষ
অমিয় গোস্বামী
প্রভৃতি

'রূপবাণী'তে আগতপ্রায়

প্রয়োগ-শিল্পী : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক-চিত্র-শিল্পী : গীতা ঘোষ :: শব্দ-যন্ত্রী : সমর ঘোষ

পরবর্ত্তী
আকর্ষণ

নাম-ভূমিকায়
রেণুকা রায়

হাসি। তাহার এই হাসি উপরে বড়ওয়ালা বড়বৌদির দৃষ্টি এড়াইল না, বিমলেরও না।

চপলার এই হাসি বিমলের মাথায় আনিয়া দিল মনের কাঁটা তুলিয়া ফেলিবার একটী অব্যর্থ কৌশল। ইহাকে হস্তগত করিতে পারিলে বিনা হাঙ্গামায় ইহাদের তাড়াইতে বেশী বিলম্ব হইবে না, উপরন্তু তাহার বড়বৌদি খুব খুশী হইবেন। একবার মনে হইল ইহার মত নারীকে হাত করিয়া এমন একটা জটিল কাজ করাইয়া লওয়ার মত কাপুরুষতা আর নাই, বরং বিজয়কে কোথাও ডাকিয়া লইয়া গিয়া মামলা-মকদ্দমার ভয় দেখাইবে এবং তাহাতে যদি কার্য্যোদ্ধার না হয় তবে প্রহার দিয়া বাধ্য করিলেই চলিবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িয়া গেল—বিজয় তাহা হইলে বাটীতে আসিয়াই দাপাদাপি শুরু করিবে, হয়ত বা বড়বৌদিকে অপমানকর কিছু বলিয়া বসিবে এবং সে তাহা শুনিয়া নিজেকে সংবরণ করিতে পারিবে না—একটা মস্ত হৈ-চৈ বাধিয়া যাইবে। অধিকন্তু তাহার বড়বৌদি তাহাতে আনন্দিত হইবেন না, কষ্ট পাইবেন। অতএব ইহাকে হস্তগত করিতে পারিলেই সর্ব্বদিক দিয়াই সুবিধা।

বিমল তাহাই করিল। পরদিন সকালে বেশ সাড়াশব্দ করিয়া সম্মুখের 'রক্'-এ জাকিয়া বসিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই চপলাকে ভিজা কাপড় লইয়া ছাদে উঠিতে দেখিল। চোখোচোখি হইবামাত্র বিমল তার তরুণ গোঁফের কোন বাঁকাইয়া একটী বেশ মিষ্টি—মধুর হাসি হাসিল এবং সেই হাসি দেখিয়া চপলাও ফিক্ করিয়া হাসিল, হাসিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিল। উভয়ে মনে করিল তাহাদের এই লুকোচুরি গোপনে সমাধা হইয়াছে; অতএব উদ্দেশ্যপথে কোনোদিক দিয়া বাধা আসিবার সম্ভাবনা নাই।

বাধা অবশ্য কোনোদিক হইতে আসিল না।—চপলা অতি অল্পক্ষণের মধ্যে নীচের রান্নাঘরের জানালায় আসিয়া ইসারায় ইঙ্গিত কি সব বুঝাইতে চেষ্টা করিল যাহার উত্তরে সে একখানা চিঠি লিখিয়া জানাইতে ইঙ্গিত করিল। কিন্তু দেখিয়া ফেলিলেন একজন,—তিনি বড়বৌদি। ঘরে না আসিয়া অকারণে বিমলের অস্বাভাবিক সাড়াশব্দ শুনিয়া এবং চপলাকে সেই সময় ছাদের সিঁড়ির দিকে যাইতে দেখিয়া হাসপাতালের কথা হইতে গতকল্যকার দৃশ্য পর্য্যন্ত তাঁহার মনে পড়িল এবং সন্দেহ করিয়াই উপরের জানালা হইতে তিনি ইহাদের লুকোচুরি দেখিয়া লইলেন। এই দেখার ফলে বিমলের অভিনয়টা সত্য ও অকপট আন্তরিকতাটা ছদ্ম-বরণাচ্ছাদিত একটা লাম্পট্যে রূপান্তরিত হইয়া তীরের বিষাক্ত ফলার মত তাঁহার মনের একাংশে বিঁধিয়া গেল এবং তন্মুহূর্ত্তে সমস্ত মনকে একেবারে বিষাক্ত করিয়া ফেলিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

তন্বী ও তুফান

সুশীল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চুল আঁচড়ানো শেষ হ'লে কালো, রোগা, বাচ্চা চাকরটাকে ডেকে ব'ললো; কই চা আনতে গেলিনা? পয়সা নিয়ে যা! আর, ঐ যে গ্লাস, ওটা নে। ধুয়ে নিস্ কিন্তু, বুঝলি?

ভজহরি ব'ললো—ওটা ধু'য়েই আনিস হবে,—আমারো হবে। আজ গ্লাস কিনে আনবো বিকেলে। কি, পয়সা দিতে হবে?

—না, বিনা পয়সায় আসবে। দুনিয়া-টা'ই চ'লছে মাগনা, তা-

—খুব যে! যা তুই, নিয়ে আয়। প্রবীর, তোকে দিয়ে দেবো অখন পয়সা!

প্রবীর কেরাসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলের ওপর ঝুকে ফিল্ম্ ফান্এর পাতা ওল্টাচ্ছে, ব'ললো—দিলে দিস, না দিলে জোরজার করবো না ঠিকই!

ভজহরি খালাস হয়েছে!—হাজত থেকে নয়, ঘুমসো কোট সার্ট আর গেঞ্জিটা থেকে! পিঠ চুলকাচ্ছে পাখার ডাট দিয়ে; উঃ ঢাকা মেসএ জায়গা পাওয়া যায় না! কী গরম নিশ্বাস সবার! তাইতে আবার হাফ বয়েলড হ'য়ে উঠেছি। সমস্ত গা গেছে হেজে, সাদা হবে দ্যাখ!

—আরেকটু থাকলে ভেজে উঠতিস হয়ত। নামটা ভজা থেকে একদম হ'য়ে যেতো ভাজা। ব'লে প্রবীর ভজহরির মুখের দিকে তাকালো; কেমন কিনা?

উদাসীর মতো ভজহরি উত্তর দিলো—হুঁ! হ্যাঁ, তোর লাইমজুস্ আছে? দে না, একটু নেয়েনি! প্রবীর টেবিল ছেড়ে ব'সে প'ড়েছে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে ব'ললো—আছে বই কি, দিচ্ছি! কিন্তু আগের থেকেই ব'লে রাখছি ভাই—সাবান নেই। সেটি আর চেয়ো না, নিতান্ত দুঃখিত এমন কি লজ্জিত হবো তাহলে!

কুলুঙ্গি থেকে বাচ্চা শিশিটা নামিয়ে দিলো। শিশি হাতে নিয়ে ভজহরি একবার চুল টেনে টেনে অনুভব করলো, ব'ললো—নাঃ, বেজায় আঠা হ'য়েছে, সাবান লাগবেই। আগে ওটা আনিয়ে নি! ভজহরি উঠে বাইরে গেলো।

প্রবীর চা খেয়ে নিয়েছে। ভজহরি অনুপস্থিত থাকায় তার খাওয়া হ'লো না, বাকীটুকু প্রবীরই দিলো সাবড়ে।

নেয়ে ধুয়ে ফিটফাট। শুধু চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু! মাইকেল যে লিখেছেন 'ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি', তেমন ওর নয়। তা আর কারো হোক্,—ছায়ার, কায়ার, কিংবা বিদ্যুৎদের। চা নেই? ওর সর্ব্বাঙ্গ রি-রি ক'রে উঠলো, প্রবীরকে হাসতে দেখে ভজহরি উঠলো আরো তেতে: সব সময় ইয়ার্কি! কাণ্ডজ্ঞান থাকলে আর এমন করতিস্ না! যাই খেয়ে আসি গিয়ে!

সেই ঘামের গন্ধ-ওলা গেঞ্জিটাই গায়ে চড়িয়ে ভজহরি চ'ললো। প্রবীর রীতিমতো মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, তবু ব'ললো—আসার সময় আমার জন্যে আর এক কাপ আনিস্, ভাই। পেলাস দেবো?

ভজহরি ভয়ানক রেগেছে। কোনো কথা না ব'লে গোঁ গোঁ ক'রে নেমে গেলো।

বোকার নাকি রাগও বেশি, প্রবীর সেই কথা স্মরণ ক'রে মনে মনে হাসচে।

জানিল, রাকেশ দেখেছে যে ভজহরি ফরিদপুর থেকে এলো, মহেশ বাবুও,—তা বাদে আরো অনেকেই—কিন্তু আরো অনেককে দিয়ে আমাদের দরকার নেই! কিছুক্ষণ বাদে ভজার সঙ্গে দেখা করার জন্যে সকলে এলো, দেখলো শুধু একা প্রবীর! দেখা না পেয়ে খবরের কাগজের খেলার পাতা চেয়ে নিয়ে বুলাতে লাগলো চোখ। নগেন এখন এখানে নেই, ফিল্ড ক্রিকেট্ করতে শিলং গেছে।

কিন্তু ভজহরি ফিরে এলো একটু বাদে, তখন এরা বেশি কিছু বলেনি। ততটা আলাপ নেই কিনা! শুধু মৌখিক আলাপ, তা আছে। তাই ওরা শুভ সংবাদটা পেয়ে যে খুব সুখী হ'য়েছে সেইটে জানালো এবং আরো জানালো এম-এ যদি না পড়েন, চাকরির চেষ্টা করাই উচিত।

ভজহরি সবিনয়ে নিবেদন করলো, চাকরীই করবো ঠিক করেছি! ব'লে একটু হাসলো ঠোঁট বাঁকিয়ে। প্রবীর জিজ্ঞেস ক'রলো—আমার চা আন্‌লি না?

—আসচে। পয়সা দে আগে! হাসতে হাসতেই হাত বাড়িয়ে উঠে এলো প্রবীরের চৌকিটায়! প্রবীর যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেছে; পয়সা? পয়সা কিসের? তুই দিয়েছিস্ তোর চায়ের পয়সা?

—আমি সেটা খেয়েছি? দেবো যে! ভজহরি হেসেই জবাব দিলো।

—আর আমি খেয়েছি এটা? একেবারেই গণ্ডমুর্খ—

ভজহরি একটু আঘাত পেলো। কিন্তু সেটুকু গোপন ক'রে ব'ললো—এখনো মুর্খ? সামলা এটে তো এবার—

প্রবীর একটু হাসলো, ব'ললো—ডিগ্রি পেলেই কি সে বিদ্বান?

ভজহরি ঘাড় নাড়লো,—না, তা কি?

তুই জীবনে পেলিনা, পাবিনা।—তাই বুঝি ভাবিস্, ওর কোনো ভ্যালু নেই? ইউনিভারসিটি এমনি দেয় না ভাই, বাজিয়ে নিয়ে তবে—হু হু, ভাবো বুঝি—জানো না তো কত ধানে কত চাল!

প্রবীর হেসে উঠলো; এই তো বিদ্যে! ধানের তেল! এবার ধান গাছের তথতা দিয়ে একটা আলমারী গড়িয়ে নাও!

ভজহরি জীব কেটে ব'ললো—ও ধরেনা প্লিজ অভ টাং।

রেস্তরার বাচ্চাটা এক কাপ চা এনে হাজির। প্রবীর লাফিয়ে উঠলো; খাওয়াচ্ছিস্? তা ভালো! আরে, এই ছোড়া পয়সা নিয়ে যা!

ভজহরি উঠে বাধা দিলো—যাক্ পয়সা দিতে হবে না। (বাচ্চাটাকে) যা রে তুই! প্রবীর হাসলো।

সে সকালটা কেটে গেল এমনি ক'রেই! তারপর চান্-খাওয়া সেরে সর্ব্বলে চ'ললো অফিসে। ঠাকুরকে এ-ঘরে ভাত দিয়ে যেতে ব'লে ভজহরি অনেকক্ষণ হ'লো নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে!

অফিস যাওয়ার সময় প্রবীর ওর মাথায় ঝাকানি দিয়ে ডাকলো, ভজা, দরজাটা দিয়ে ঘুমো! লাল দু'টো চোখ খুলে ভজহরি ব'ললো—উঃ, ছ! আবার প'ড়লো ঘুমিয়ে।

দরজা টেনে দিয়ে প্রবীর নেমে গেলো।

সমস্ত বাড়ীটা খাঁ-খাঁ ক'রে উঠলো। গিস্গিসে দালান, এখন তা-তে মোটে ক'টি বা প্রাণী! কিন্তু ভজহরি তা জানে না। অকাতরে ঘুম যাচ্ছে ও। চোরে কিছু চুরি করলে ঠাকুর চাকরকে সন্দেহ করা ছাড়া ওর আর বলার কিছুই থাকবে না! জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে ঘরটাকে ভরপুর ক'রে দিয়েছে, সেই ঝাজে ভজহরি উঠেছে ঘামিয়ে, কিন্তু তা দেখার লোক নেই, দেখে সে, যার নেশা আছে দেখাতে। দালানের প্রাচীরে কালো কাকগুলো ব'সে গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে শুধু ডাকে,—কর্কশভাবে। কিন্তু ভজহরির ঘুম ভাঙে না।

টাইমপিসটা ধুকে ধুকেও অনেকটা এগিয়ে গেছে। কলে জল এলো, তবু ওর ঘুম ভাঙলোনা। দেহের, চোখের সমস্ত জড়তা উজাড় ক'রে ও ঘুমিয়ে নেবে আজ। রাত্রের পাথেয়টুকু হয়ত নিঃশেষ হ'য়ে গেলো ওর।

ঝিয়েদের ঝাঝালো গলা আর বাসনের থনথনানিতে পল্লী মুখরিত হ'য়ে উঠলো। পাউরুটিওলা বিষম চেঁচাচ্ছে, কুড়মুড় ভাজা আরো। ওদের মনে ওরা যত পারে চেঁচাক, তবু ভজহরি ঘুমোবে। ওর ভাতে মাছি পড়ুক, ওর খাওয়া দিয়ে দরকার নেই! ঠাকুরটার আক্কেলের বলিহারি, একটু ঢেকে যেতে পারেনি!—উল্লুক! হয়ত এখনি গালাগাল করবে ঘুম থেকে উঠে। ঠাকুর ব'লবে হয়ত; ডাকলাম, উঠে ব'সলেন। কি ক'রে জানবো বাবু আবার তখনি ঘুমিয়ে প'ড়বেন। কড়মড় বুলি কিছু বুঝবে, কিছু বুঝবে না; চোখ দুটো ঠাকুরের দাঁতের মতো রাঙা ক'রে কিছুক্ষণ হয়ত চেয়ে থাকবে।

ঝি ঘরে বাসন নিতে এসে চমকে উঠলো: এ কি গা! ওগো, ও ঠাকুর! একি গো? চেঁচাতে চেঁচাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। আবার এলো ফিরে: রাধা বলো, পথের ভিখিরিকে দিলে বাছা খেয়ে বাঁচতো, আহা হা! ক্যাঙালের ত অভাব নেই! ওগো ও বাবু, তুমি উঠবে নি?

আর সইলো না। চোখ খুলে ভজহরি লাফিয়ে উঠলো: অ্যাঁ, কি হলো?

ঝি সব শোনালো। ভজহরি এমন বিশেষ কিছু দূরে ব'সে নেই, আর কানে কম শোনে ব'লে কোনো দুর্ণামও নেই তার; ঝি অত না চ্যাচালেও বেশ শোনা যেতো! কিন্তু এই চেঁচানোতেই কানের পর্দা এত জোরে কেঁপে উঠছে যে শব্দগুলো যেন গায়ে গায়ে লেগে হ'য়ে উঠছে অস্পষ্ট! সবিশেষ শুনে ভজহরি চোখ র'গড়ে ব'ললে যাক্ গে! বাজলো কটা? উঃ, খুব ঘুম দেওয়া গেলো যা হোক্।

ওরা সেদিনকার মতো ছুটি পেয়ে ফিরে এসেছে। দু-টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। প্রবীর ঢুকলো ঘরে। কিন্তু তখন ভজহরি বেরিয়ে গেছে। আকাশ তখন গোঙরাচ্ছে। বৃষ্টি নামবে হয়ত। নামুক; ভজহরি তার

আগে রেস্তঁরা থেকে ফিরে আসবে। প্রবীরের চিন্তিত হওয়া দরকার নেই।

প্রবীর চাকরটাকে ডেকে জিগ্‌গেস করলে—বাবু গেলো কোথায় রে? কখন উঠলো?

বেচারা একটু ভেবে নিলে, ব'ললো—এই তো গেলেন, উঠলেনও এই! খান নি তো!

—খান নি? সে কি রে? বাইরে জুতোর শব্দ শুনে প্রবীর তাকালো।

ভজহরি এসেছে: উঃ, 'কি ঘুমটাই দিলাম! এইমাত্র! এইমাত্র উঠছি, এই ঘণ্টাখানেক। খাওয়া দাওয়া ভুলে—উঃ!

প্রবীর বোতাম খুলতে খুলতে সংক্ষেপে ব'ললো—শুনেছি।

ভজহরি ব'ললো—ছারুর দোকান থেকে একটু অমলেট আর চা খেয়ে এলাম। ক্ষিদেয় পেটে রেগুলার উনুন্ জ্বলছিলো! ভজহরির ঠোঁটদুটো তখন তেল-তেলে, চকচক করছে। চৌকির উপর বসে পড়লো।

মাথার ওপর দিয়ে জামাটা বের ক'রে দিয়ে প্রবীর ব'ললো—মুখে বেশ লেগে আছে, আর ব'লতে হবে না,—শ্রবণে সিকি ভোজনও হয় না, বুঝলি? খাওয়াতে শেখ; পাশ করলি খাওয়া-দাওয়া!

ভজহরি একটু রসিকতার সুরে ব'ললো—একটা চাকরি জুটিয়ে দে, ঠিক খাওয়াবো!

—তার-চে, আমি রোজগার করছি তাই দিয়ে খাওয়া! প্রবীর তিরস্কারের গলায় ব'ললো: তোকে জোগাড় করে দেবো, আর চাকরি ক'রে তুই আমায় খাওয়াবি! ন্যাকামী ইয়ের সঙ্গে করিস্!

ভজহরি চোখ টিপে ব'ললো—জোগাড়ে যেন তো আর বেগ পেতে হবেনা! পাশটা—

প্রবীর ঘুরে দাঁড়ালো: ঢের-ঢের ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে! হাজার হাজার এম-এ! আশায় চিঁড়ে ভিজাও, স্বপ্নে হীরে কাটো! চাকরির বাজার জানোনা তো!

ভজহরি তবু জোর ক'রে বলে—রেখেদে! আলবাৎ হবে। দুদিন যুৎতে দে!

ভজহরি ভাবে, তার কাকার কাছ থেকে যত সোজায় টাকা আসে, তেমনি সোজাতেই ওর রোজগারের টাকার বাণ্ডিল এসে হাজির হবে। গুণতে যদি না পারে, দাঁড়ি পাল্লায় মেপে সিন্ধুকে তুলে রাখবে। কত স্বপ্ন দেখে: প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই তিনটে পার্কার পেন্ কিনবে। একটা কাকার, একটা দাদার, আরেকটা তার নিজের। ওঃ, ছোটকা! তার জন্যেও একটা,—তবে এই চারটে। চার কুড়িং • আশি। খুড়িমাদের দেওয়া যাবে মুর্শিদাবাদী জঙ্গলা শাড়ী, আর বৌদির একটা,—তা আর কতোই বা! তিন পঁচিশম্—হ'য়ে যাবে। কাকার মেয়েদেরো সিল্কেরই ফ্রক। ওঃ, নিজের একটা রিষ্টোয়াচ! তারপর মাস থেকে ধীরে ধীরে যাকে যা দেওয়া যায়। নিজেকেও একটু গুছিয়ে নিতে হবে। আর তেমন যদিই হয়—একটা অষ্টিন কিংবা ভক্সল, সে সব পরে ভাববে। আগে এই গুলো তো হ'য়ে যাক্! কাকাকে আর এই বয়সে প্র্যাক্‌টিস্ করতে দেবে না। কাকার ছেলেদের এই হেয়ারে ভর্ত্তি করিয়ে দেবে, বরেন ম্যাট্রিক্‌টা পাশ করলেই প্রেসিডেন্সি। কত কথা আকাশ পাতাল যে ভাবে ও, যার নেই কোনো মানে, নেই কোনো অর্থ! এ যেন বুদ্বুদের ওপর চিরস্থায়ী বাসা বাঁধা, এ যেন আলেয়ার আলোয় উৎসব প্রাঙ্গন আলোকিত ক'রে রাখা!

ভজহরি জোর দিয়ে ব'লেছে—হ'য়ে যাবে। সেই থেকে প্রবীর যে মুচকে মুচকে হাসচে, তা যেন আর থামেনা! বিস্কুট কামড়াচ্ছে—তবু হাসি।

ভজহরি জিগ্‌গেস করলো—কি, হাসছিস্ যে!

—একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো!

—কি কথা বলবি না? বল্‌ই না; এত কি গোপন!

—গোপন না, এ একটা স্বপন,—মানে অবিশ্বাস্য, হাস্যস্পদ!

—সেটা কি?

প্রবীর আর এগোলোনা, ব'ললো—শুনিস্ আর একদিন। আপনিই টের পাবি। শুনতেও হবে না কারো কাছ থেকে।

—সে আবার কি?

—সে?—এই যে মানস, এসো ভাই। এই যে আমাদের বি-এ।

—তোমাদের বিয়ে?

—তোমারো। ভজহরি আমার রুম-মেট ব'লে শুধু আমারি গর্ব্ব নয়।

—ও। বি-এ। তাও ভালো, আমি ভাবলাম, কারো বিয়ে বুঝি। একটা ফলার জুটলো ভেবে হঠাৎ ক্ষিধে পেয়ে উঠেছিলো। মানস দু'বার দুজনার মুখের দিকে চেয়ে হাসলো।

প্রবীর ভজহরির দিকে চোখ ফেরালো; বি-এ পর্য্যন্তই যখন এসেচে, এবার ওটা হ'তেই বা ক্ষতি কি? কি বলিস্ ভজা? লাগিয়ে দে ভাই, আমরা একটু খেয়ে বাঁচি।

—খেয়ে তো বেঁচে আছিসই, এবার বেচে খাস।

—বেঁচে খাবো? মানে?

—মানে, বিয়ে হবেই—তোরা বেঁচে থাক—খাবি।

—বিয়ে হবে? প্রবীর লাফিয়ে উঠলো; কবে ভাই?

ভজহরি কুঁকড়ে গেলো; সুবিধা মতো পাত্রী জুটলে।

রাত্রের কালো পর্দা এসেই এ অধ্যায়ের সম্মুখে ড্রপসিন টেনে দিলো।

ভেতর ভেতর ভীষণ টানা হ্যাচড়া, চাপা কণ্ঠস্বর, নীরব ব্যস্ততা। কারণ, পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু হাঙ্গামা আছে তো! আমরা সেই পটে এসে পড়লাম।

সমস্ত ষ্টেজটাকে অন্ধকার ক'রে রাখা হ'য়েছে, শুধু রঙ বেরঙের আলোর বদলানি ও ঝলসানি, এই। মুখের ওপর শুধু ফোকাস্ করা। আবির্ভাব হবে এ দৃশ্যে সবারি—যাদের নিয়ে আমাদের দরকার। দপ ক'রে যখন ফুটলাইট জ'লে উঠবে, পেছনের আবহাওয়ার স্বরূপ দেখতে পাবো আমরা। এ দৃশ্যের এই হ'লো ভূমিকা—খুব সংক্ষেপে ব'লতে গেলে।

ভজহরির বিয়ে ঠিকঠাক। ও ক্ষেপে উঠেছে, এই খানেই হোক্। এমন সুবিধে আর কেউ দেবে না। মহেশবাবু ঘটকালী করছেন, তাই তাঁর ওপর অসাধারণ শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা তার চেয়েও বেশী।

ভজহরির চাকরি করার আর দরকার নেই। অগাধ টাকা মিলবে, লোকটার অজস্র টাকা, কনট্রাক্টারি ব্যবসা,—জমিয়েছে প্রচুর। একটি মাত্র মেয়ে, ছেলে-পুলে আর নেই। সব নাকি জামাই-র নামে উইল ক'রে দিয়ে জীবনের শেষ কটা দিন ছোবানীকে সুখী দেখে চোখ বুজতে চায়। জামাই চায় গ্রাজুয়েট এবং সৎব্রাহ্মণ। ভজহরির সঙ্গে বেশ মিলেছে, ও ব্রাহ্মণের সেরা; ভাদুড়ি বামুন, কম নয়, হ্যাঁ! একনোমিক্স আর হিস্‌ট্রি নিয়ে পাশ করাও কম কথা নয়। আর, এর ওপর যদি অনার্স থাকতো, তবেই সোনায় সোহাগা। যাই হোক, অনার্স নেয়নি ব'লে ভজহরির দুঃখ নেই। কিছুতেই আজকাল ওর মালিন্য প্রকাশ পায় না—সদা প্রসন্ন! মর্ত্ত্য থেকে হঠাৎ কোন সুদূরের স্বর্গদেশে সে যেন ছিট্‌কে প'ড়েছে! মহেশবাবু সাহায্য ক'রেছেন, ক'রছেন। ভজহরি নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানায়।

ভজহরি ঘুমিয়ে, জেগে, সব সময় স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে সত্যি সত্যি ও হীরে ঘাঁটে আজকাল। প্রবীর সেদিন ঠাট্টা ক'রে-ছিলো। এর শোধ তুলবে ভজহরি নিজেই, প্রবীর যেন আশি টাকা মাইনে পেয়ে অহঙ্কার করতে না আসে! ভজহরির দুয়ারে গিয়ে এর পর না তাকে বেশি টাকার চাকরির জন্যে দাঁড়াতে হয়।

মহেশবাবু ব'ললেন—তোমার তো তাহ'লে ভাই, একটা ফোটো তোলা দরকার আজই। ওঁরা চেয়েছেন!

—ফটো দিয়ে কি দরকার? চলুন না, আমি সশরীরে যেতে রাজি আছি। (একটু হেসে) আচ্ছা, সত্যি, বলুন না—কে দেখতে চায়? ছায়া?—না, ওর বাবা?

মহেশবাবু ঠোঁট উল্‌টে বললেন—কি ক'রে বলি, বলো ভাই! ওরা যদি গোপন রাখতে চায়, রাখুক! কিন্তু আমি অনুমান করছি (একটু হেসে) বুঝলে কি না ভায়া, হুঁ-হু (একটু ভুরু টেনে) ওই ছায়াই! আপ্-টু-ডেট মেয়ে বর দেখে বিয়ে করতে চায়! আর বলো কেন! কিন্তু মেয়ে তুমি ভাই দেখতে পাবে না। এমন রূপ, আঃ চমৎকার! কী রঙ! ফটো তুলতে গেলে হয়ত প্লেটই ঝলসে যাবে। নামটা ছায়া না হ'য়ে ছবি হ'লে বেশ মানাতো। নাম পরিবর্ত্তনের দিক দিয়ে, রূপের দিক দিয়ে। হ্যাঁ, আর দেরি নয় ভাই—আজই। টাকার আটখানা, সিঙলে-ফিঙলে না-হয় এই কাছাকাছি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ওপরেই একটা আছে, যেখান থেকে হোক তুলে নিয়ে এসো। যাচ্ছো? ওঃ, আচ্ছা বেশ,—খেয়ে দেয়েই যেয়ো। ছুটির দিন, তোমায় আমরাও সাজিয়ে দিতে পারবো। কি বলো হে রাকেশ, তুমি কি বলো মানস, প্রবীর তো কথাই ব'লবে না।

ওরা জানালো—মহেশবাবু যা ব'লছেন সবারি তা শিরোধার্য্য। এতে আর বলাবলির কি আছে? প্রবীর বহুকষ্টে গম্ভীর হ'য়ে আছে—মানসের ছোঁয়াচ পেয়েছে হয়ত!

ভজহরি হাসলো: তাই হবে।

মহেশবাবু ব'ললেন—গোঁফটা অমনিই রাখতে চাও? তা, ইচ্ছে হ'লে থাক, কিন্তু আমার মনে হয়—ত্যার্চা ক'রে দু-পাশ ছেঁটে নিলে হয়ত তোমার মুখের কাটিং-এর সঙ্গে দিব্যি মানাবে। এই, এমনি করে আর কি! ব'লে উঠে গিয়ে দু-আঙুল বুলিয়ে সমঝিয়ে দিলেন; এমনি আর কি! কি হে, কেমন! ঠিক না?

ওদের উত্তর দেওয়ার অবসর না দিয়ে ভজহরি ব'ললো, তা—তা, আপনারা বুঝুন!

আয়না দিয়ে দেখে আর কতটুকু বোঝা যায় বলুন ! তবে, ডাকবো নাপতেটাকে !

—নাপিত দিয়ে কি হবে ? ব্যাটাকে বোঝাতেই লাগবে আধঘণ্টা ! আমরা আছি কি করতে ? রাকেশ বাধা দিয়ে উঠলো ; এসো, আমার কাছে। কেমন ক'রে ব'ললেন মহেশবাবু ? এমনি ? রাকেশ ঠিক তেমনি ক'রে ছটো আঙুল বুলালো।

মহেশবাবু সায় দিলেন : হ্যাঁ।

ডান হাতে ক্ষুর ধ'রে বাঁ-তেলোয় উল্টে-পাল্টে শান দিতে দিতে রাকেশ এগিয়ে এলো। ভজহরি দিব্যি ঘাড়টা চেয়ারের সঙ্গে বাধিয়ে মাথা তুলে ঠায় ব'সে প্রতীক্ষা ক'রছে।

হাতে জল নিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে জ্বালা ধরিয়ে তারপর ক্ষুর টানলো রাকেশ।

মানস অতি কষ্টে নিজেকে গোপন রেখে উঠে গেলো। রাকেশের হাত কেঁপে যে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘ'টে যায় নি, এই যথেষ্ট ! প্রবীর কি করবে. চুপ ক'রে ব'সে রইলো। মহেশবাবু কাছে গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কোন্‌খান দিয়ে ক্ষুরের এ পোঁচটা গেলে চমৎকার হবে।

যাক, সমাধা ! ভজহরি আর্শি দিয়ে দেখতে চায় একটু। মহেশবাবু চটে উঠলেন : এত বড়ো অবিশ্বাস ? তবে নিজে যা হয় করো ভাই, আমরা পাল গুটোলাম।

হঠাৎ এমন হবে ভজহরি প্রত্যাশা করে নি। ব'ললো—না, না,—তবে, আমি ব'লছিলাম কি—

মহেশবাবুর রাগ যেন কিছুতেই পড়ে না ; কি আর ব'লবো ভাই ? তুমি যে এমন ক'রে অপমান করবে আশা করি নি।

—অপমান সত্যি আমি করি নি মহেশদা আপনাকে, আপনাকে সত্যি অপমান করি নি। ভজহরির গলার স্বর প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠলো ; তবে আর দেখবো না। গোঁফে হাত দিয়েই ও যেন সব বুঝতে পারলো : বাঃ, এই তো ঠিক আছে। আর দেখা লাগবে না। খেয়ে দেয়েই যাবো, কি বলেন ?

মহেশবাবু তবে একটু শান্ত হ'য়েছেন, ব'ললেন—যেয়ো !

—আপনি যাবেন কিন্তু আমার সঙ্গে। মহেশদা, আপনার যেতে হবে। বুঝলেন ?

গোঁফের আড়ালে একটু হেসে নিয়ে মহেশদা ব'ললেন,—কারো রিকোয়েস্ট আমি হেলা করি না, এই হচ্ছে আমার মস্ত বড়ো উইকনেস। যেতে বলছো, যাবো।

রাকেশ ভজহরির হয়ে বললো—ও বড়ো দুঃখিত হবে মহেশদা, আপনি যান। শুধু রিকোয়েস্টের খাতিরে নয়, আমাদের ইন্টারেস্টের খাতিরেও। বিয়েতে এক পেট—

মহেশবাবু খাতে ফিরে এসেছেন : তা যাবো ! আর, যে কাজে আমি একবার হাত

বলুন ত কে এ মেয়েটী ?—নিশ্চয়ই বলবেন—মার্লিন ! আসলে কিন্তু নাম হচ্ছে এর—ইছা মিরাণ্ডা—ইটালিয়ান ফিল্ম অভিনেত্রী !

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

মেরী কুইন অব স্কটল্যাণ্ড

অনেক খোঁজাখুঁজি চলেছিল অনেক কাল ধরে। "মেরী অব স্কটল্যাণ্ড" ছবিতে স্কটল্যাণ্ডের মেরী কুইন সাজবে কে ? কত বাদানুবাদ, কত ঝগড়া, একে নাও, ওকে নাও, তাকে নাও। পছন্দ তো আর সবায়ের এক নয়।

দি, সেটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি ছাড়ি না, এই হচ্ছে আমার বদভ্যাস ! আর, বিয়ে ব্যাপার !—শেষ পর্য্যন্ত থাকবোই ! কিন্তু ভজহরি মাঝে মাঝে একটা ব্যথা দেয় কি না !

প্রবীর বেজায় হাসচে।

নানা মুনির নানা মত। চরিত্র চাই ঠিক ঐতিহাসিক চরিত্রের মত। তা সে মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক। আবার কেউ বলে : চেহারার কি দরকার ? ঐতিহাসিক চরিত্রের মত ঠিক চেহারা নাই বা হোল ; তাতে কি আসে যায়। আমরা দেখব আর্টিষ্ট চরিত্রটি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে

মহেশবাবু গম্ভীর হ'য়ে ব'ললেন—ঠাট্টা না প্রবীর ! এ সব সিরিয়াস্ জিনিষ অমন হেসে উড়িয়ে দিয়োনা।

প্রবীরের হাসি আরো প্রবল হ'য়ে উঠলো।

ভজহরি এখন অনেকটা আশ্বস্ত।

(ক্রমশঃ)

পারে কিনা। অভিনয়ের চরিত্রের ঠিক স্পিরিটটা রাখতে পারবে কিনা ? এই তো সেদিন ওয়াল্টার হাষ্টন যেমন করেছিলেন রোহ্ডস্ ছবিতে। ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে চেহারা তো একেবারেই খাপ খায়নি।

রেডিও পিক্চার্স কিন্তু এ বিষয়ে একটু বিশেষ নজর দেন। তাঁরা কীর্টির চেহারার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর বেশ মিল দেখেছেন ; তাই ক্যাথারিণ হেপবার্ণ হোল মেরী কুইন অব স্কটল্যাণ্ড।

সত্যিই কি কীর্টি ?

ক্যাথারিণ হেপবার্ণের চেহারা আমরা জানি। আরো জানি এ ছবিতে তার চেহারার অনেক বদল হবে। তবু, তবু সেই

ষোল শ খ্রীষ্টাব্দের স্কটের রাণীর কথা ভাবতে গেলে আমাদের চোখের ওপর ভেসে ওঠে সোনালী চুল, ভাস্করের খোদাই করা সুন্দর মুখ, চিবুক, বাদামী ও নীলে আয়ত চোখ, শিল্পীর তুলির দুটী রেখায় ভ্রূযুগল আর লম্বা এবং পাতলা শরীর।

কি কীর্তি! সত্যিই কি তুমি তাই!

সে যাক!

ক্যাথারিণ হেপবার্ণ অভিনয় করচে। এ ছবির অভিনয় যে ভালই হবে এ আমরা জানি

ষ্ট্রীট গার্ল

লিলি পন্স্‌এর পরের ছবি ঠিক হয়ে গেচে। রেডিও পিকচার্সের প্রথম ছবি এখানা; এখানাই হবে পন্স্‌এর দ্বিতীয় ছবি।

শুনে একটু চমকে গেলেন না?

'ষ্ট্রীট গার্ল' ছবিখানা মনে আছে? ওইখানাই হচ্ছে রেডিওর প্রথম সঙ্গীত মুখর ছবি। এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের নবতম অবদান।

ছবির নায়িকা সেজেছিল বেটি কম্পসন। স্বীকার করি সবাইকে সে চমকে দিয়েছিল, সবাই তাকে তারিফ করেছিল, তবু একথা বলতে পারি লিলির গলা ভাল এবং তা বেটি কম্পসনের চেয়ে অনেক ভাল।

'ষ্ট্রীট গার্ল' গল্পটা হচ্ছে;—পাঁচজন ছেলে,—তারা দল বেঁধে বাজনা বাজাত—আর এক মেয়ে এসে জুটল তাদের মধ্যে—তারপর মেয়েটিই হোল প্রধান—সেই বাজনার দল চালাতে লাগল—সহরে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ল—সবায়ের মুখেই তাদের নাম।...

এই হচ্ছে গল্প।

মিস পন্স্‌এর প্রথম ছবি 'আই ড্রিম টু মাচ।' তার দ্বিতীয় ছবি হবে 'ষ্ট্রীট গার্ল'। এ ছবিতে ওর চিত্রামোদীর দল বেড়ে যাবে সেইই তো মনে হয়।

আমার র‍্যামোনা

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের আর একখানা ছবি দেশে দেশে সাড়া পড়িয়ে দিয়েছিল। সে ছবির নাম 'র‍্যামোনা'। ডলরেস্ ডেল রিও আর ওয়ার্ণার বাক্সটারের সে ছবি, সুন্দর অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ স্থানে তাদের বসিয়ে ছিল দুজনকে। কে ভুলবে সে গান। দেশে দেশে, মাঠে ঘাটে, বাটে বাটে সে গান সবায়ের মুখে। আজও তো কেউ ভোলে নি।

হেনরি কিঙ্ অনেক ছবি পরিচালনা করেছেন। এই সেদিন 'কুইন টু প্রেট্স্'—সেই সহজাত পাঁচ মেয়ের ছবি 'দি কান্ট্রি ডক্টার' পরিচালনা করেচেন। এইবার টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের হয়ে 'র‍্যামোনা' ছবি পরিচালনা করবেন। ছবিখানি হবে রঙে রঙে বোনা—নীল, লাল, হলদে আরো কত রঙ।

অভিনেতা অভিনেত্রী এখনও ঠিক হয় নি, তবে খুব খরচ করে যে এ ছবি তোলা হবে তা জানি।

পঞ্চাশ হাজার পরে

'দি ট্রেল অব দি লোনসাম পাইন' ছবিতে রঙের ছোপ লেগেচে সারা গায়ে; কত রকমের রঙ।

কিন্তু এই যে রঙ লাগলো একি আর একদিনের। আজ কুড়ি বছরের ওপর হোল বড় সচল ছবিতে রঙ দেওয়া হয়েচে; তবে তো অমন রঙের খেলা খেলতে পেরেচে 'দি ট্রেল অব দি লোনসাম পাইন' ছবিতে। ওয়ানগারের রঙের ছোপ লাগান সার্থক হয়েচে।

আর রঙ?—ছবিতে রঙ?

সেই প্রথম প্রভাতে! মানুষের ইতিহাস গড়বার প্রথম দিনে রঙের যে সুর, যে সৌন্দর্য্য, যে সত্য মানুষের চোখে ধরা দিলে তাই রূপায়িত হোল আর একদিন প্রভাতে। সারা দুনিয়ার কুড় মানব অভিবাদন করে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্লে: তুমি আর্ট।

ওরা বলে: ছবির বুকে, মুখে শিল্পীর তুলির প্রথম রঙের রেখাপাত হয়েচে সেই পঞ্চাশ বছর আগে। আর তারই প্রথম প্রকাশ হচ্ছে নাকি স্পেনের এ্যালামভিরার গুহায়। ছবিখানি আছে ওই পর্ব্বতের গুহায় আঁকা। হিসেব করে দেখা গেচে ওখানা পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার আঁকা আর প্যালিওলিথিক যুগের।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে প্রথম সচল ছবি সাধারণকে দেখান হয়। তখন চিত্র রঞ্জিত করা হয়েছিল হাতে এবং তা বোধহয় শ তিনেক ফিট।

খুচরো খবর

মেট্রোর ষ্টুডিওতে রেভারেণ্ড ফাদার জন ডনেল ছবিতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে টেকনিক্যাল এডভাইসার।

* * *

মে ওয়েষ্ট এ ছবিতে কাষ করার জন্য শুধু মাইনে পান না, ছবির লাভের অংশও কিছু পান।

* * *

গ্রেটা গার্বোর পরের ছবি 'ক্যামিলি'।

* * *

রবার্ট টেলর হবে 'ক্যামিলি' ছবির হিরো।

* * *

জীন আর্থার আগে ফটোগ্রাফারের মডেল হিসেবে কায করতো।

আশুতোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

আজ আমরা যাঁহার জন্মদিনে যাঁহার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে সমবেত হইয়াছি, তিনি বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষে এত সুপরিচিত যে, তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা বলা আমি বাহুল্য মনে করি। কারণ, প্রদীপ জ্বালিয়া কাহাকেও সূর্য্য দেখাইতে হয় না; সূর্য্য আপনার কিরণে আপনি সপ্রকাশ।

আপনাদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ এবং সেই জন্ম দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ আপনাদের কাজের উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে। আপনারা যদি জীবনে আশুতোষের জীবনের শিক্ষা সার্থক করেন, তবে আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির পথ সুগম হইবে এবং কোন শক্তি আমাদের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। আশুতোষের শক্তির উৎস কোথায়? চরিত্রের বল ও আন্তরিকতাই তাঁহার শক্তির উৎস। তিনি আপনার সুখ তুচ্ছ করিয়া বাঙ্গালীকে উন্নতির পথে তাহার জয়যাত্রার পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন। আত্মসুখলাভের চেষ্টা পশুও করে—তাহা মানুষের একমাত্র কাম্য হইলে তাহা মনুষ্যত্ববিকাশের অন্তরায় হয়।

দুর্ব্বল দেহভার বহন করিয়া বিলাসে ও আলস্যে জীবন যাপন করা, চলচ্চিত্রে ও রঙ্গালয়ে যাইয়া যাহা দেখি তাহারই আলোচনা করা, গড়ের মাঠে ফুটবল ম্যাচে উত্তেজনায় চীৎকার করিয়া উদ্যম ও উৎসাহ ক্ষয় করা আমাদিগকে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় করিয়া দেয় না।

আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে—উচ্চতর ও মহত্তর কার্য্যের ভার আমাদের আছে। আজ বাঙ্গালার নবযুগের মহাকবি মধুসূদন দত্তের মৃত্যুদিন। বহুবর্ষ পূর্ব্বে যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের দ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অবনত অবস্থা উপলব্ধি করিয়াও আশার আলোক দেখিয়া বলিয়াছিলেন :—

"আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নিগুণ হইলেও রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলেই সেই কথা মনে করিয়া, জগতিতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু?"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ আশুতোষে সার্থক হইয়াছিল। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি ভবিষ্যতে তাহার গৌরবের দীপ্তি চারিদিকে ব্যাপ্ত দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে দেখিয়াছিলেন—আশাহীন হন নাই, অন্যায় সহ্য করেন নাই, অনাচারের নিকট মস্তক নত করেন নাই। আশুতোষের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এ বিষয়ে একমত যে, তিনি আশুতোষই ছিলেন। তাঁহার দ্বার যেমন অবারিত ছিল, তাঁহার স্নেহ তেমনই প্রচুর ছিল; তিনি বাঙ্গলার হিন্দুর প্রাচীন সামাজিকতার আদর্শ সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন; তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন। কিন্তু অনাচার তিনি কখন সহ্য করিতেন না। যে বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া—নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যেও সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়কেই তাঁহার প্রচারমঞ্চ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—চাই স্বাধীনতা।

তিনি জানিতেন, পরবশ্যতায় দুঃখ। তাই যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের আশার সম্বল তরুণদিগকে পরবশ্যতার শিক্ষায় প্রভাবিত করা না হয়, তাহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় যে তিনি অকাতরে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার কারণ, তিনি বিশ্বাস করিতেন, সুশিক্ষায় মনুষ্যত্বের উন্মেষ হয় এবং মনুষ্যত্বই মানুষকে মুক্তির মোক্ষদ্বার দেখাইয়া দেয়। জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান যে শক্তিতে মানুষকে শক্তিশালী করে, সে শক্তিকে কেহই পরাভূত করিতে পারে না। তাই ডিস্‌রেলী বলিয়াছেন—It had been discovered that the best way to secure implicit obedience was to commence tyranny in the nursery. আশুতোষ তাঁহার দেশের তরুণদিগকে সেই অনাচার হইতে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। তাই লর্ড লিটন যখন কতকগুলি সর্ত্তে—সরকারের নীতির সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহাকে ভাইসচান্সেলারী গ্রহণ করিতে বলেন, তখন তিনি সে প্রস্তাব ঘৃণা সহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি লর্ড লিটনের পত্র পাইয়া লিখিয়াছিলেন :—

"You have one before you who can speak and act fearlessly according to his convictions...... It may not be impossible for you to secure the service of a subservient Vice-chancellor, prepared always to carry out the mandates of your Government and to act as a spy on the Senate. He may enjoy the confidence of your Government, but will certainly not

শ্রীদুর্ব্বাসা

ডাকের পর ডাক দেওয়া বা ডাকের পর 'ডবল' দিয়ে খেঁড়ীর কাছ থেকে ডাক আদায় করবার যে সব নিয়ম বা পদ্ধতি আছে তা মেনে চলা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তবে হাতের বিভাগ ভাল হলে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় বলে মনে হয় না, কেন না হাতের বিভাগের উপর Hon. tricks কমে বা বেড়ে যায়। এমন কি হাতের বিভাগ ভাল হলে অতি অল্প Hon. tricks-এ 'গেম' বা স্লাম করা যায় সেইজন্ত খেলোয়াড়দের Hon. tricks ও হাতের বিভাগ পাশাপাশি রেখে ধীরভাবে বিচার করে তবে তাদের কর্ত্তব্য পথ বেছে নেওয়া বিধেয় আর এই বিচারশক্তি যার যত বেশী খেলায় উৎকর্ষতা দেখাবার ক্ষমতা তার তত অধিক। এইবার নিয়ে একটী হাত দেওয়া গেল যা' থেকে পাঠকবর্গ অনায়াসে হাতের বিভাগ ভাল হলে কি হয় বুঝতে পারবেন। হাতটী এইরূপ

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, ৯, ৬, ২
হরতন—১০, ৭, ৬, ৪
রুহিতন—
চিড়িতন—৭, ৬, ৩, ২

ইস্কাবন—৭, ৫, ৪
হরতন—সাহেব, বিবি, ৯, ৮, ৭
রুহিতন—টেক্কা, ৭, ৩, ২
চিড়িতন—৮

ইস্কাবন—টেক্কা
হরতন—টেক্কা, গোলাম, ২
রুহিতন—বিবি, ৫, ৪
চিড়িতন—বিবি, গোলাম, ১০, ৯,৫,৪

ইস্কাবন—গোলাম, ১০, ৮, ৩
হরতন—৫
রুহিতন—সাহেব, গোলাম, ১০, ৯,৮, ৬
চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব

উত্তর পক্ষ তাস্‌ নারেবল 'পূ' তাস দিয়েছিল আর ডাক হয়েছিল এইরূপ

পূ	দ	প	উ
এক চিঃ	এক রুহি	এক হর	পাশ
দুই হরঃ	তিন রুহি	তিন হর	পাশ
চার হর	পাশ	পাশ	পাশ

'প' চারিটী হরতনের খেলা করে নিয়ে গেল অথচ তাস দেবার পর দেখা গেল যে 'দ'-র চারিটী ইস্কাবন' এই যে দ 'গেমটী' নষ্ট করলো এটী নিজের হাতের বিভাগ না জানার দরুন নয় কি? যদি তিনি হাতের বিভাগ ভাল করে দেখতেন তাহলে অনায়াসে 'ডবল' দিয়ে খেড়ীর কাছ থেকে ডাক নিতেন। আর এই ডবল দেবার প্রথম কারণ হচ্ছে যে, তার হাত অনুযায়ী চারখানি Hon. tricks এ "গেম" আছে তন্মধ্যে তিনি নিজে ধরছেন তিনখানি, চাই মাত্র একখানি তার খেড়ীর কাছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে যদি তার খেড়ীর হাতে একেবারে কিছুই না থাকে তাহলেও তার নিজের রুহিতন রঙে পালিয়ে যাবার পথ আছে এবং যাতে করে তার বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না অথচ বিপক্ষ-দলের 'গেম' যাওয়া হাত নষ্ট হয়ে যাবে।

নিম্নে সাধারণের অবগতির জন্তে হাতের বিভাগ অনুযায়ী কত Hon. tricks থাকলে 'গেম' হয় তার টেবিল দিয়ে আজকে এই প্রবন্ধ শেষ করলাম।

হাতের বিভাগ

৬+৪+৩+০=৪খানি Hon. Tricks
৬+৪+২+১=৪
৬+৩+৩+১=৪॥০
৬+৫+১+১=৩॥০
৬+৫+২+০=৩॥০

---

enjoy the confidence of the Senate and the public of Bengal."

এই উক্তির আন্তরিক ভাব আজ আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আশুতোষ—বাঙ্গলার আশুতোষ—বাঙ্গালীর, আশুতোষ আজ আর আমাদের মধ্যে নাই; কিন্তু তাঁহার অমর বাণী আজ এই মরলোকে ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হউক—"Speak and act fearlessly according to your convictions."—যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে নির্ভয়ে তাহা বলিবে ও তদনুসারে কাজ করিবে।

আজ তাঁহার জন্মদিনে আমি আপনাদিগকে সেই কথাই বলিতেছি—যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবেন, নির্ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিবেন, নির্ভয়ে তদনুসারে কাজ করিবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

গত সোমবার স্যার আশুতোষের জন্মতিথি উপলক্ষে [illegible]

নদীর ধারে

শ্রীরবীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

একলা ব'সে নদীর ধারে
    গাইতেছিলেম গান ;—
বাজ্‌ছিল সে কোথায় দূরে,
বাঁশের বাঁশী করুণ সুরে ;
    নদী ছুটে চল্‌তেছিল।
    কণ্ঠে কলতান।
একলা ব'সে নদীর ধারে
    গাইতেছিলেম গান ॥

গান গেয়ে সে চ'লতেছিলেম
    আমি আপন মনে,—
আকাশ মাঝে রাতের তারা,
চেয়ে ছিল নিমেষ-হারা ;
    বাতাস খেলা ক'রতেছিল
    ঝাউ গাছেরি সনে।
গান গেয়ে সে চ'লতেছিলেম
    আমি আপন মনে ॥

শুক্লা একাদশীর শশী
    ছিল গগনভালে,
কোন্ এক পিয়া-হারা পাখী,
ডাক্‌ছিল সে থাকি থাকি ;
    তন্দ্রাহারা, পিয়ার লাগি
    বসি নীপের ডালে।
শুক্লা একাদশীর শশী
    ছিল গগন ভালে ॥

হঠাৎ দেখি তীরে এসে
    লাগল সে কার তরী,—
কণ্ঠে তাহার ফুলের মালা,
রূপটী শত মাণিক-জ্বালা,
    গানের সুরে এল সে কোন্
    স্বপন দেশের পরী !
হঠাৎ দেখি তীরে এসে
    লাগল সে কার তরী ॥

কার সে তরী কোথায় যে ঘর
    কিছুই জানি না যে—
রইনু শুধুই দৃষ্টি হেনে,
কণ্ঠ আমার গেল থেমে ;
কতই কথা জাগল আমার
    মনের ভাঁজে ভাঁজে।
কার সে তরী কোথায় যে ঘর
    কিছুই জানি না যে ॥

ভাবনু মনে শুধাই তারে
    আস্‌ছ কোথা হ'তে—?
কোন্ দেশে সে তোমার বাড়ী,
কোথায় বা সে দিচ্ছ পাড়ি ;
    গভীর রাতে এমন ক'রে
    নদীর পথে পথে।
ভাবনু ম'নে সুধাই তারে
    আস্‌ছ কোথা হ'তে ॥

হ'ল না মোর কিছুই বলা
    উঠ্‌ল দুলে তরী,
দাঁড় টেনে সে গেল চ'লে,
দেখনু শুধুই নয়ন মেলে ;
দাঁড়ের ভাষা শুন্‌নু শুধু
    দুটী শ্রবণ ভরি।
হ'লনা মোর কিছুই বলা
    উঠল দুলে তরী ॥

আবার যখন গাইব ভেবে
    গাইতে গেলাম গান—
কণ্ঠ আমার এল বুজে,
কারণ নাহি পেলেম খুঁজে ;
    ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল নয়ন
    দৃষ্টি হ'ল ম্লান।
আবার যখন গাইব ভেবে
    গাইতে গেলেম গান ॥

	Hon.	Tricks
৫+৫+২+১=৪	Hon.	Tricks
৫+৪+২+২=৪॥০	"	"
৫+৪+৪+০=৪॥০	"	"
৫+৪+৩+১=৪	"	"
৪+৪+৪+১=৪॥০	"	"
৪+৪+৩+২=৫	"	"
৪+৩+৩+৩=৫॥০	"	"
৭+৪+১+১=৩॥০	"	"
৭+৫+১+০=৩	"	"
৭+৬+০+০=২॥০	"	"

একটী প্রশ্ন—নিম্নের হাতটী কি ভাবে ডাকবেন ও খেলবেন। প তাস দিয়েছেন।

ইস্কাবন—৯, ৮, ৫, ৩
হরতন—৯, ৩, ২
রুহিতন—৭, ৩
চিড়িতন—সাহেব, ১০, ৮, ৩

ইস্কাবন—টেক্কা, ৭, ৬
হরতন—টেক্কা, ৮, ৭
রুহিতন—গোলাম, ১০, ৮, ৪
চিড়িতন—টেক্কা, ৯, ৭

ইস্কাবন—১০, ৪
হরতন—সাহেব, গোলাম, ১
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, ৬
চিড়িতন—বিবি, গোলাম, ৫, ৩, ২

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, গোলাম, ২
হরতন—বিবি, ১০, ৬, ৪
রুহিতন—সাহেব, ৯, ৩, ২
চিড়িতন—৪
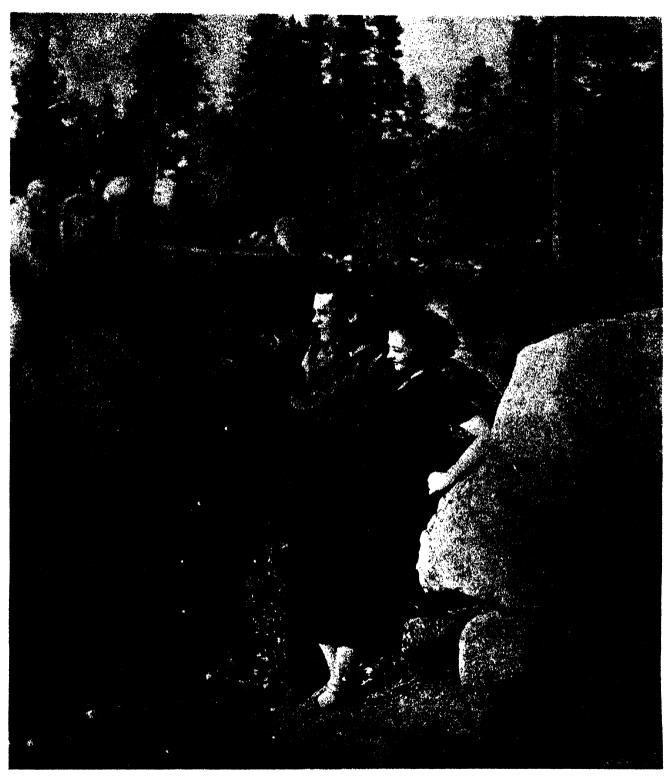
আগাগোড়া স্বাভাবিক রঙে তোলা প্যারামাউণ্টের "দি ট্রেল অফ দি লোনসাম পাইন" ছবিতে হেনরী ফোণ্ডা আর সিলভিয়া সিডনী নাকি ভারী সুন্দর অভিনয় কোরেছে। আসছে কাল থেকে মেট্রোয় দেখানো হবে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম	ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ	টেলিফোন
[illegible]	৯, রামময় রোড, কলিকাতা	পার্ক ৩২৪

[illegible] শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে আষাঢ় ১৩৪৩, ৯ই জুলাই ১৯৩৬

মিলনের পথে ?

উডবার্ণ পার্ক ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বার্ত্তা-বাহকের মুখে প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনার্থ দায়িত্বপূর্ণ দূতবৃন্দ আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেস কাউন্সিলারবৃন্দের মধ্যেও সম্মিলিত কংগ্রেসদল গঠনের চেষ্টা হইতেছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইলে আসন্ন সংস্কৃত শাসনতন্ত্রের নির্ব্বাচনে একটা অখণ্ড কংগ্রেসী দলই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

শুনা যাইতেছে যে, উক্ত মিলন প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে। এই মিলন সম্পর্কে নাকি প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত এই যে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে ডাঃ রায়ের দল-পরিহার করিবেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নাকি স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে নলিনীরঞ্জনের পরিহার সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্কল্প স্থির ও সুনিশ্চিত সুতরাং ডাঃ রায়ের দলকে শরৎচন্দ্রের নেতৃত্ব বরণ করিয়া লইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জনকে পরিহার করিতে হইবে। আরও প্রকাশ যে ডাঃ রায়ের দল এই সর্ত্তে সম্মত হইয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে একটী উভয় পক্ষের অনুমোদিত ফরমূলা রচিত হইলে আসন্ন প্রাদেশিক এ্যাসেমব্লির নির্ব্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেস ইলেকসন বোর্ড গঠিত হইবে।

উপরি-বর্ণিত সর্ত্তে যদি শরৎচন্দ্র ও ডাঃ রায়ের মিলন হয় তাহা হইলে আমরা সুখী হইব নিশ্চয়ই—তবে এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা চাই। শরৎ বসু-সত্যমূর্ত্তি পত্রবিনিময়ে ও দেশবন্ধু স্মৃতিবার্ষিকী সভায় শরৎচন্দ্র মন্ত্রিত্ব বর্জ্জন সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এতই সুস্পষ্ট যে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের উদয় হইতে পারে না এবং অপর পক্ষে ডাঃ রায় মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শরৎচন্দ্রের অভিমত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—একেবারে বিপরীত-মুখী। এই দুই বিভিন্ন মতবাদের সামঞ্জস্য-সাধন কি প্রকারে হইতে পারে তাহা বর্ত্তমানে আমাদের বুদ্ধির অগম্য। হয় শরৎচন্দ্রকে আর না হয় বিধান-চন্দ্রকে তাঁহাদের অধুনা-ব্যক্ত অভিমতকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা মন্ত্রিত্ব বর্জ্জনের পক্ষে সুতরাং বিধানচন্দ্র যদি তাঁহার পূর্ব্বমত পরিহার করিয়া মন্ত্রিত্ব-বর্জ্জনের মতবাদ সমর্থন করেন তাহা হইলে যে শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মন্ত্রিত্ব-বিরোধীদলের শক্তি-বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি সম্মিলিত দল গঠনের পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র ও বিধান-চন্দ্র এই বিষয়ে গভীরভাবে আলাপ আলোচনা করিবেন—কারণ যেখানে মূলগত আদর্শে মতানৈক্য বর্ত্তমান, সেখানে মিলন কখনই স্থায়ী হইতে পারে না।

আর শরৎচন্দ্রকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে বিগত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের সময় তিনি যে ভুল করিয়াছিলেন ভবিষ্যতে যেন তাহার পুনরাবৃত্তি না হয়। মূলগত আদর্শের পার্থক্য থাকিলে আমরা মৌখিক মিলনের পক্ষপাতী নহি। যাহা হউক বাংলার কংগ্রেসী মহলে, উডবার্ণ পার্কের মন্ত্রণা গৃহে ও ওয়েলিংটনের বদ্ধ দুর্গে ঘটনাবলীর যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে এসম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোন সঠিক ভবিষ্যৎবাণী

নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির

গত ২৮শে জুন রবিবার শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের উদ্যোগে চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরের দ্বি-ষষ্টিতম প্রতিষ্ঠা-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ইউরোপের পাঠাগার সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতির বক্তব্যের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি আলোকচিত্র সহযোগে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতে দশম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত "মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাদি একান্ত শিক্ষাপ্রদ ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বিপিন সাধুখাঁ

কাউন্সিলায় বিপিন বিহারী সাধুখাঁর নির্ব্বাচনের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া যিনি কলিকাতা হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা করিয়াছিলেন তিনি তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে বিপিন বাবু স্বীয় পল্লীবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করুন ইহাই আমাদের শুভেচ্ছা।

স্বর্ণকুমারী দেবীর তৈলচিত্র

গত সপ্তাহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে স্বর্গতা স্বর্ণকুমারী দেবীর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত ছিলেন ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যিক ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে ছোট গল্পের (short stories) প্রচলনে যে তিনিই অগ্রণী ছিলেন, একথা কেহ বলেন নাই। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁহাকে Pioneer বলা চলে কারণ রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই তিনি একাধিক ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ

বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত যে সরকারের টনক নড়িয়াছে এবং তাঁহারা এই দুরবস্থায় সামান্য সাহায্য করিতেও চেষ্টা করিতেছেন, ইহা মন্দের ভাল। বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলিও কাজ করিতেছে এবং চাঁদা তুলিতেছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ভীষণতার তুলনায় সরকারী ও বে-সরকারী উভয়বিধ সাহায্যই অপ্রতুল। কিছুদিন পূর্ব্বে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ দেশের জনসাধারণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন। আশা করি, ইঁহাদের আবেদন ব্যর্থ হইবে না।

গোড়ায় গলদ

বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতার কথা আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে মনে হয়—এ রোগের গোড়া কোথায়? রুগ্ন রোগক্লিষ্ট মাতার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হওয়ার পরই শিশু যে আবেষ্টন ও আবহাওয়ার মধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহাতে নবজাত শিশুর শরীরে পুষ্টির প্রচুর অভাব ঘটে। এই অভাবের জন্য বাহিরের সহস্র সহস্র রোগবীজাণু ঐ দুর্ব্বল দেহের মধ্যে সহজে প্রবেশলাভ করে এবং সময়মত আত্মপ্রকাশ করিয়া শিশুকে মৃত্যুর দ্বারে লইয়া যায়।

রোগ নিপীড়িত বাঙ্গালী জাতিকে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে হইলে প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় জিনিষ এই স্বাস্থ্য সম্পদ। বর্ষাকালে প্রতি ঘরে বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার প্রাবল্যহেতু রোগীরা রক্তহীন, অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

বহু বৎসর গবেষণার ফলে "রচিটোনের" আবিষ্কার হইয়াছে। "রচিটোন" ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণকে দমন তো করেই, অধিকন্তু মাতাকে সবল করে, ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনর্গঠন করে, শুন্যদুগ্ধ বৃদ্ধি করিয়া শিশুর প্রচুর আহার যোগায় এবং দেহে নব জীবনীশক্তি আনিয়া দেয়। রচিটোনের উপাদানগুলির অদ্ভুত ক্রিয়াশক্তিতে নূতন রক্তকণার সৃষ্টি হয়, স্নায়ুমণ্ডলী পুষ্ট ও সতেজ হয়। অদ্ভুত ও চমকপ্রদ অথচ দ্রুত কার্য্যকারিতা হিসাবে রচিটোনের সমকক্ষ টনিক আর নাই।

সাহিত্যে অশ্লীলতা

গত ৫ই জুন রবিবার 'চক্রতীর্থের' চতুর্থ অধিবেশনে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ "কবি ও কাব্য" সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় একটি সুচিন্তিত গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ বহু বিখ্যাত আধুনিক তরুণ সাহিত্যিকগণের সমুখে পাঠ করেন। কবি ও কাব্যের সম্বন্ধ, জীবনের উপর কাব্যের প্রভাব, কবিতার function এবং কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন type প্রসঙ্গে বিমলবাবু আলোচনা করিতে করিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতার উপর ওজস্বিনী ভাষায় তীব্র নিন্দা করেন। তৎপরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের শক্তিশালী সমালোচক হীরালাল দাশগুপ্ত বিমলবাবুর প্রবন্ধটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলেন, বিমলবাবুর "কবি ও কাব্য" প্রবন্ধটি Shellyর Defence of Poetryর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বিমলবাবুর critical utterances গুলি খুব Subtle না হইলেও Shellyর লেখার

মত অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ। "It is a first class poem written in Prose". হীরালাল বাবু সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে বলেন যে "কবি বিমল ঘোষ আধুনিক সাহিত্যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছেন সে অভিযোগ তাঁর নিজের প্রতিও খাটে, তাঁহার "নারী ও প্রেম", কবিতাটির প্রতি-ছত্র তথাকথিত Vulgarity পূর্ণ। কিন্তু আমি মনে করি 'There is nothing decent or indecent but thinking makes it so' বিশ্ব সংসারে কোনো বস্তু বা কার্য্য decent বা indecent নয়। শ্লীলতা বা অশ্লীলতা, ভাল বা মন্দের বীজ মানুষের অন্তরে নিহিত। বিষয় বস্তুতে কিছুই আসিয়া যায় না। It is not the matter that always matters but the manner of putting the thing." Sexকে Electricityর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। Electrician ব্যতীত অপরে উহা লইয়া নাঁটা ঘাঁটি করিতে গেলেই বিপদ ঘটে। যাহা হউক বিমল বাবুর প্রবন্ধটির মধ্যে তাঁহার স্বরচিত উদ্ধৃত কবিতাটি আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। ছন্দে গতিতে ভাবে ভাষায় বৈচিত্র্যে কবিতাটি অনবদ্য—অপরূপ। তৎপরে শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায়ের সভায় পঠিত "সামান্য একটি শাড়ী লইয়া" নামক গল্পটি অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল। এই তরুণ লেখকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়—ঐ দিন সভায় সুসাহিত্যিক বিমল মিত্র, জয়েশচন্দ্র লাহিড়ী, অমূল্যকুমার সিংহ, কবি করুণাময় বসু, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রকুমার বসু, অনুপমকৃষ্ণ বসু, সত্যনাথ, মজুমদার ও অন্যান্য বহু সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

বিলাসী

পরপারে

প্রযোজক : চন্দ্র ফিল্মস
গল্প : ৺ডি, এল, রায়
পরিচালনা : সতীন দাস
চিত্র-শিল্পী : প্রবোধ দাস
শব্দযন্ত্রী : জ্যোতিষ সিংহ
চিত্র-সম্পাদক : ধরমবীর ও বৈজনাথ
সুরশিল্পী : কৃষ্ণচন্দ্র দে
ভূমিকা-লিপি : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—মহিম, অহীন্দ্র চৌধুরী বিশ্বেশ্বর, নিৰ্ম্মলেন্দু লাহিড়ী—পার্ব্বতী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য—দয়াল, ভূমেন রায়—প্রদ্যোৎ, শৈলেন চৌধুরী—কালী, অনুপম ঘটক—ভবানী ; জোৎস্না গুপ্তা—সরযূ, সীণা—শান্তা, নিভাননী—হিরণ্ময়ী, নগেন্দ্রবালা—করুণাময়ী ইত্যাদি।
প্রথম মুক্তি : "চিত্রা", ৪ঠা জুলাই, ১৯৩৬।

• অনেক বাধা বিপত্তি পার হয়ে শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রফিল্মের প্রথম প্রচেষ্টা "পরপারে" গেল শনিবার চিত্রায় মুক্তি পেয়েছে। আগেই অনেকবার আমরা বলে রেখেছিলাম যে "পরপারে" মুক্তি পেলে কোলকাতার চিত্রামোদীরা একখানা ভাল ছবি দেখতে পাবে—আমাদের সে ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্যি হয়েছে—এ কথা অপক্ষপাত লোকমাত্রেই স্বীকার করবে। চন্দ্র ফিল্মের প্রথম ছবি দেখে আমরা এদের পরের ছবির আশায় রইলুম।

স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলালের মূল "পরপারে"-র পর্দ্দার ওপরে যে ছায়া পড়েছে—তাতে অবিশ্যি অনেক পার্থক্য ঘটেছে কিন্তু পরিচালক যা করেছেন তা যে ছবির উৎকর্ষতার দিক থেকেই করেছেন এ অবিশ্যিই স্বীকার্য্য। পরিচালক বিরাট মূল গল্পটিকে যে রকম সুন্দরভাবে সংক্ষেপ করেছেন, তা সত্যি ই প্রশংসনীয়। গল্পের নায়ক মহিম, দেবচরিত্র সুপুরুষ কিন্তু দরিদ্র। প্রভূত বিত্তশালী জমিদার বিশ্বেশ্বরের একমাত্র ওয়ারিশান সুন্দরী ষোড়শী সরযূকে বিয়ে করে সে রাতারাতি বড়লোক হোল আর সঙ্গে সঙ্গে ধনীর চরিত্রের আনুষঙ্গিক যা কিছু তাও গেল তার

সীণা

বরাতে জুটে। চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপা, যৌবন আর বসন্তের বান্ধব—এই তিনের সংঘাতে মহিম হারালো তার দেবোপম চরিত্র—ক্রমশঃ নেমে দাঁড়ালো সমাজের এমন এক স্তরে যেখানে মানুষ মানুষকে দেখলে নাকই কোঁচকায়—হেসে কথা বলে না। সেই মহিম কেমন করে আবার তার লুপ্ত-সত্তা ফিরে পেয়েছিল—"পরপারে"-র গল্প হচ্ছে তারই বেদনা-মধুর আলেখ্য।

ছবির ওপর গল্পের ক্রম-পরিণতি যেভাবে দেখানো হয়েছে তা আসল নাটকের সঙ্গে অনেক জায়গায় অমিল থাকলেও বেশ সাবলীল ভাবেই চলে গেছে মনে হয়। তবে

একটা কথা এখানে বলতে হবে যে গোড়ার দিকে গল্পের গতি অতি মন্থর হয়েছে। গোড়ার দিকের টেনিস খেলা আর শান্তার ঘরে অশান্ত উপদ্রব কাঁচি দিয়ে একটু কমিয়ে দিলে মনে হয় এ দোষ শুধরে যাবে। ছবির শেষের দিকটা একেবারে চমৎকার। গতি এই অংশে বেশ দ্রুত—ঘটনা সমাবেশও চমকপ্রদ। বিশেষ করে ছবির পরিণতির দৃশ্যগুলো সম্বন্ধে কোনও প্রশংসাই বেশী হবে না।

অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে একটা জিনিষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছবিতে আমরা দেখেছি কোন একটি চরিত্রকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। অবিশ্যি তাই বলে যে এতে বিভিন্ন চরিত্রগুলোর সম্যক বিকাশের ক্ষতি হয়েছে তা নয়; চরিত্রগুলোর বিকাশ লাভ করতে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই সুযোগ প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভি-নেতৃবর্গের মধ্যে দুর্গাদাস তাঁর স্বভাব-সংযত অভিনয় করে তাঁর পূর্ব্ব-সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন; তাঁর শেষ দিকটা গোড়ার দিককে ছাপিয়ে উঠেছে। অহীনবাবু বিশ্বেশ্বরের

জ্যোৎস্না

ভূমিকায় এক নিখুঁত "দাদামশায়ে"র ছবি এঁকেছেন। তবে তাঁর বাচনভঙ্গীতে রঙ্গমঞ্চের সামান্য ছোঁয়াচও না থাকলে আমরা আরো খুশী হতুম। সরযূর অংশে জ্যোৎস্নার অভিনয় হয়েছে অতি সুন্দর। শ্রীমতীর রূপও শ্রীমতীর সাফল্যের অনেক সহায় হয়েছে। শান্তার রূপে বীণাকে দেখলাম সে তার আধোআধো বুলি ছেড়ে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেছে। বীণার অভিনেত্রী-জীবনে কি সাফল্যের রেখা দেখা যাচ্ছে? অন্যান্য ভূমিকাগুলির ভেতর নিভাননী এবং শৈলেন চৌধুরী আমাদের খুশী করতে পেরেছে। নিভাননীর উন্মাদিনী রূপে দৃশ্যটি মনে রাখবার মতো। নির্ম্মলেন্দু আর মনোরঞ্জনের অভিনয় চলনসই বলা যেতে পারে। অনুপম ঘটকের অভিনয় বা গান কিছুই আমাদের ভালো লাগে নি।

খোকা দাসের ক্যামেরার কাজ গোড়ার দিকে জায়গায় জায়গায় কিছু hard হলেও বেশ সুন্দর। খোকার কতগুলো 'শট' ভারী suggestive, বিশেষ করে ঝড়োরাতের শটের সৌন্দর্য্য ভাষার বাহিরে—অন্ততঃ দেশী কোন ছবিতে তো এ রকম আমরা দেখিনি।

শব্দযন্ত্রীর কাজ আমাদের খুশী করতে পারে নি ; তবে শুনেছি দায়ী তার জন্তে যন্ত্রী নয়,—যন্ত্র।

সুর-সংযোজনা যা হয়েছে তা আমাদের মনে হয় বেষ্ট বাবুর মত গুণীর যশ খর্ব্ব না করলেও—প্রশংসা মোটেই পাবে না। আবহাওয়া সঙ্গীত আরো বেশী ব্যবহার কেন করা হয়নি তা আমরা বুঝতে অক্ষম। অনুপম ঘটকের গান গাওয়া ভাল হয় নি।

পোষাক-পরিচ্ছদ বা সেট সম্বন্ধে কোন ত্রুটী আমাদের চোখে পড়েনি। পরিচালক যে এদিকে বেশ কড়া নজর রেখেছিলেন তা বুঝতে দেরী হয় না। বহির্দৃশ্য প্রশংসনীয়।

মোটের ওপর, বাংলা ছবির মধ্যে বোধ হয়—'বোধ হয়' কেন, নিশ্চয়ই—সব চেয়ে বেশী-টাকা খরচ করে চন্দ্র ফিল্মস যে ছবি তুলেছেন তা চিত্রামোদী সাধারণের সকল শ্রেণীর কাছেই সমান উপভোগ্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ডি-জি টকিজ

এদের "দ্বীপান্তর" তোলা শেষ হয়েছে। খুব সম্ভব, জুলাই মাস শেষ হবার আগেই "দ্বীপান্তর" "শ্রী" চিত্র গৃহে মুক্তি পাবে।

• তুলসীদের ধর্ম্ম মূলক ছবি "শ্যামসুন্দর"-এর কাজ শ্রীহেম গুপ্তের পরিচালনায় এবং ডি-জির তত্ত্বাবধানে বেশ এগুচ্ছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

পরিচালক মিঃ কার্দ্দারের অসুস্থতার জন্তে "বাঘী-সিপাহী"র কাজ ক'দিন বন্ধ ছিল। এ হপ্তায় আবার যথারীতি কাজ সুরু হয়েছে। এখন রাজার "দরবার" দৃশ্য তোলা হচ্ছে।

* * *

দেবকী বসুর "সোনার সংসার"-এর নায়কের বাড়ীর দৃশ্য তোলা শেষ হয়েছে। দেবকী বাবু শীঘ্রই কোলকাতার বাইরে—অবিশ্যি খুব কাছাকাছি জায়গাতেই—বহির্দৃশ্য তোলার জন্তে যাবেন।

ইরাণী ছবি "লাইলা-মজনু" সিমলা পাহাড়ে ইরান সরকারের প্রতিনিধিকে দেখাবার জন্তে পাঠানো হবে। খেমকা বাবু খুব চেষ্টা করছেন যাতে ছবিখানা পারস্য দেশে পারস্য রাজের আদেশে তাঁকে দেখানো হয় এবং তা ছাড়াও ছবিখানা পারস্য রাজধানী তেহারানে বিশিষ্ট নাগরিক এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে দেখাবার আয়োজন হচ্ছে।

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন

শুনেছি এ হপ্তায় এদের "রামকান্ত"র কাজ শেষ হয়ে যাবে। "দিকভুল"-এর তোড়জোড় ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। পরিচালনার ভার কার ওপর পান্নাবাবু দেবেন এখনো ঠিক করে উঠতে পারেন নি। "দিকভুল"এ ক্যামেরার কাজ করবেন পি, স্যাণ্ডেল এবং তাঁর সহকারী হচ্ছেন চিত্র জগতের তরুণ-কর্ম্মী অজিত সেন।

দেবদত্ত ফিল্মস

এদের জমকালো তেলেগু ছবি "সতী সুলোচনা" মাদ্রাজের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তি অপেক্ষা করছে। সম্ভবতঃ ১১ই জুলাই শনিবার এই শুভকাজ সম্পন্ন হবে।

* * *

বঙ্কিম চন্দ্রের অমর কীর্ত্তি "রজনী"র চিত্র-গ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন একসঙ্গে লবঙ্গলতা এবং অমরনাথ ও রজনীর একটি বিশেষ ভাবপূর্ণ দৃশ্য তোলা হচ্ছে। বিশিষ্ট কর্ম্মীদের সাহচর্য্যে জ্যোতিষবাবুর তোলা এই ছবি যে বাংলার চিত্রজগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে—এ আশা আমরা করতে পারি।

কালী ফিল্মস

গেল শনিবার কোলকাতায় যে "চীন বনাম ভারতবর্ষ" আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলা হয়ে গেছে এরা তার ছবি তুলেছেন। যে হাজার হাজার লোক সেদিন খেলার মাঠে ঢুকে খেলা দেখার সুযোগ পায় নি, তারা নিশ্চয়ই "উত্তরা" এবং "শ্রী"তে গিয়ে ঐ খেলা দেখে আসবে।

গেল রবিবার সন্ধ্যের সময় "ভারতবর্ষ" এবং "চীন" দলের খেলোয়াড়রা "উত্তরায়" ঐ ছবি দেখতে এসেছিলেন। দু দলের খেলোয়াড়রা পৌঁছলে পর বিশাল জনতা বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁদের অভ্যর্থনা করে এবং চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষ অভ্যাগতদের সম্বর্দ্ধনায় কোন ত্রুটী করেন নি। ছবি দেখানোর মধ্যে বিশ্রামের সময় দর্শকদের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে দুপক্ষের খেলোয়াড়রা 'উত্তরা'র ভেতরে দোতালার ষ্টেজ-বক্সে দাঁড়ান এবং ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন সম্মথ দত্ত চীন দলকে অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে দর্শকদের আনন্দধ্বনি করতে অনুরোধ করেন। চৈনিক দলের নায়ক লি-উই-টংও তার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেন।

দুদলেরই খেলোয়াড়রা এই ছবি দেখে বিশেষ খুশী হয়েছেন।

খেলার মাঠে

সি, খি

চাইনিজ টিম

বহু আকাঙ্খিত চাইনিজ অলিম্পিক্ টিম গেল ২রা জুলাই বার্ম্মা থেকে কোলকাতায় পৌঁছায়। পূর্ব্ব বন্দোবস্তমত গেল শনিবার ক্যালকাটা মাঠে 'চায়না' বনাম 'ইণ্ডিয়া'র খেলাটি হয়। এই খেলাটি দেখবার জন্যে ক্যালকাটা মাঠে যে রকম জনসমাগম হয়েছিল সেরূপ জনসমাগম আগে কখন হয়নি। প্রায় তিন দিন আগেই দু'টাকা চার আনার রিজার্ভ আসন সমস্ত বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। এত ভিড় হয়েছিল যে শেষ পর্য্যন্ত সাধারণঃ যেগুলি

সম্মথ দত্ত

ন'আনার আসন সেগুলিও দু'টাকা চার আনার রিজার্ভ আসন করে বিক্রী করতে হয়েছিল।

যত লোক মাঠের ভেতরে ঢুকতে পেরেছিল তার চারগুণ লোক র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে খেলা দেখেছে।

খেলা ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় চাইনিজ দলের ক্যাপ্টেন "লি ওয়াটং" তাঁহার দল নিয়ে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মাঠে উপস্থিত হন। তারপরেই "ইণ্ডিয়া" দলের ক্যাপ্টেন সম্মথ দত্তের সঙ্গে ঐ দলকে মাঠে নামতে দেখা যায়। যথাসময়ে খেলা আরম্ভ হল। প্রথমে চাইনিজ দল অবিশ্যি ভারতীয় দলকে চেপে রাখে। তারপর ক্রমে ক্রমে দুই দলই সমান শক্তিশালী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। চাইনিজদের খেলায় অনেকগুলি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা গেল। তাদের "হেড" করার কৌশল খুব ভাল; দ্বিতীয়তঃ খুব লম্বা পাশ করে খেলা তাদের অভ্যেস। আর পাশগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে যে প্রত্যেক পাশগুলি নিজের দলের লোকের কাছে নির্ভুলভাবে পৌঁছায়।

চাইনিজ দলের প্রথম দিনের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা যেন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলতে পারছে না। এই দলের ক্যাপ্টেন 'লি ওয়াটং' দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। সেদিন 'ইণ্ডিয়ার' গোল-রক্ষক এস, ব্যানার্জ্জীকে চীনা ক্যাপ্টেনের সট রুখতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তবে 'ইণ্ডিয়া' দলের খেলোয়াড়দের চাতুর্য্য এবং ওদের পাশগুলির জন্যে চাইনিজ দল বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সেদিন একেবারে বৃষ্টি না হওয়ায় মাঠের অবস্থা খুব ভাল ছিল এবং কাজেই 'ইণ্ডিয়া' দলের খুবই সুবিধে হয়েছিল। চাইনীজ দলের যে বেশ একটু অসুবিধা হচ্ছিল তা স্পষ্টই বোধ হল। খেলাটি পুরো এক ঘণ্টা হয়। ২৯ মিনিট খেলা হবার পর চাইনীজ দলের 'শেন কাম্ শান্' একটা গোল করেন। বিশ্রামের পর পাঁচ মিনিট খেলা হবার মধ্যেই নূর মহম্মদ পেনালটিতে গোলটি পরিশোধ করেন।

তারপর দুই দলই গোল দিবার অনেক সুযোগ পেলেও আর গোল না হওয়ায় খেলাটি ১-১ গোলে 'ড্র' হয়। 'ইণ্ডিয়া' দলের পক্ষে সন্মথ দত্ত, নুর মহম্মদ এবং কে, ভট্টাচার্য্যের খেলা একেবারে ছবির মত সুন্দর হয়েছিল। আর সন্মথ দত্ত বাস্তবিক ক্যাপ্টেনের যোগ্য খেলা সেদিন খেলেছিলেন। সেদিনকার কি টিম 'ইণ্ডিয়ার' পক্ষে নেমেছিল তা আমরা গেল হপ্তাতেই জানিয়েছি। আর এখানে চাইনিজ দলের খেলোয়াড়দের নাম দেবার কোন আবশ্যকতা আমরা বোধ করি না।

* * *

গেল শনিবার চাইনিজদলের খেলা দেখে যারা সন্তুষ্ট হতে পারে নি, তারা গেল সোমবার—চাইনিজদলের সঙ্গে সম্মিলিত সিভিল এবং মিলিটারী দলের খেলা দেখে চাইনিজদলের খেলা সম্বন্ধে উঁচু ধারণা করতে পেরেছেন। সম্ভবতঃ ভিজে মাঠের দরুণ চাইনিজদল ঐদিন অত সুন্দর খেলতে পেরেছিল। শনিবার যারা অনেক কষ্ট স্বীকার করেও মাঠে ঢুকতে পারে নি তারা সোমবার অনায়াসেই খেলা দেখেছে। চাইনিজদলে চারজন নতুন খেলোয়াড় খেলার জন্যেও ওদের খেলা খুব উঁচুদরের হয়েছিল। চাইনিজদলের রক্ষণ-ভাগের চেয়ে আক্রমণ-ভাগ অধিকতর শক্তিশালী বলেই মনে হল। ক্যাপ্টেন 'লী' উইটংয়ের পায়ে বল পড়লেই সকলে গোল হবার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিলেন। ইনি ২৫-৩০ গজ দূর থেকে সট করে অনায়াসেই গোল দিতে পারেন। তা ছাড়া তাঁর বল কাটাবার ক্ষমতাও সত্যি অদ্ভুত। কোলকাতায় এই রকম সেণ্টার-ফরওয়ার্ড আগে খুব কমই দেখা গেছে। এই দলের ক্যাপ্টেনের পর গোলকিপার—'প্যান কা পিনের' নাম উল্লেখযোগ্য। সত্যিই তিনি যে সব বল আটকিয়েছেন তা ধারণা করা যায় না। সিভিল এবং মিলিটারী দলের 'আর্মষ্ট্রং, কার্ভে এবং ক্যাশ ভাল খেলেছিলেন। আর্মষ্ট্রং-এর গোল-রক্ষা দর্শনীয় হয়েছিল। খেলা আরম্ভ হবার দুমিনিটের ভেতর চাইনীজদলের ক্যাপ্টেন 'লী' একটি সুন্দর গোল দেন। ১৫ মিনিট পরে ক্যাশ বহু কষ্টে গোলটি পরিশোধ করেন। বিশ্রামের, চার মিনিট পূর্ব্বে 'লী' আর একটি গোল করেন। আর কোন গোল না হওয়ায় 'চায়না' ২-১ গোলে জয়ী হয়।

* * *

সোমবার দিন রাত্রেই চাইনিজ টিম বার্লিনের পথে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেছেন। বোম্বাইয়ে একটি ম্যাচ বুধবার খেলে বৃহস্পতিবার দিন তাঁরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করবেন।

কোলকাতা ফুটবল লীগ

শেষ অবধি মহামেডান স্পোর্টিং দলই এ-বছর ফুটবল লীগ-জয়ের গৌরব অর্জ্জন করেছে। এ বছর নিয়ে মহামেডানদল পর পর তিন বছর লীগ পেল। উপর্য্যুপরি তিন বার লীগ বিজয়ের গৌরব একমাত্র 'ডারহাম' সৈনিকদলই করতে পারে। মহামেডান দল-এ বছর ২২টি ম্যাচ খেলে ৩৬ পয়েণ্ট পেয়েছে। ব্লাকওয়াচ দলের পয়েণ্ট এদের চেয়ে দু' পয়েণ্ট কম।

গেল বৃহস্পতিবার মোহন বাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং-এর রিটার্ণ খেলাটি হয়ে গেছে। এই খেলাটির ফলের ওপর মহামেডান দলের লীগ বিজয় নির্ভর করছিল। কারণ এই খেলাটিতে মহমেডান দল হারলে এবং ব্লাকওয়াচ কালীঘাটের সঙ্গে খেলায় জিতলে এই দুদলের সমান পয়েণ্ট হতে পারতো। যাহোক বৃহস্পতিবার খেলা শেষ হবার পর দেখা গেল ব্লাকওয়াচ—কালীঘাটের খেলা ড্র হয়েছে। রিটার্ণ গেমে মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে ড্র' করে মোহনবাগান সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। তার উপর আবার মোহন-বাগান ১০ জনে খেলেছিলেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে খেলা আরম্ভ হবার দু' মিনিটের ভেতর জুম্মা খাঁর সঙ্গে ধাক্কা লেগে বেণী প্রসাদের ডান হাতের 'কনুইয়ের' হাড় সরে যায়। বেণীপ্রসাদকে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হয়। মোহন-বাগান দলে কে দত্ত, এস দত্ত, বি মুখার্জ্জী এবং এ রায় চৌধুরীর খেলা প্রশংসনীয় হয়েছিল। মহামেডান দলে ওসমান, জুম্মা খাঁ, নুর মহম্মদ এবং আব্বাস্ ভাল খেলেছিলেন! সিভিল টিম-গুলির ভেতর পুলিশ সকলের নীচের স্থান অধিকার করায় আসছে বৎসরে 'বি' ডিভিসন লীগে খেলবে।

ক্রিকেট

প্রথম টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটেছে। ভারতীয় দল ৯ উইকেটে হেরে গেছে। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ১৪৭ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৩ রাণ করেন। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ১৩৪ রাণ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ১০৮ রাণ করেন।

* * *

এ্যাল্ডারসটে ভারতীয় দলের সঙ্গে আর্ম্মিদলের যে খেলাটি হবার কথা ছিল সেটা বৃষ্টির জন্যে পরিত্যক্ত হয়েছে।

* * *

অমরনাথ দেশে ফিরলে 'লাহোর ক্রিসেণ্ট ক্লাব' তাঁকে অভ্যর্থনা করবে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছিল, ঐ ক্লাবের সভাপতি তার প্রতিবাদ করেছেন।

ভারতীয় দলের সঙ্গে ল্যাঙ্কাশায়ারের ক্রিকেট ম্যাচ আরম্ভ হয়েছে। ল্যাঙ্কাশায়ার দল প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৪৩৫ রাণ করে ডিক্লেয়ার করেন। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৯৫ রাণ করার পর বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

রুদ্ধ যৌবন খুলেছে দুয়ার অন্ধকারে !

প্রিজ্‌ম ও টেষ্ট টিউবের ফাঁকে ! খুন্তি ছেড়ে টেলিস্কোপ !

"অন্ধকারে ও টেবিলে কাজ করছে একটি নারী
টেলিস্কোপের স্ক্রু ঘোরাতে
বাজছে তাহার হাতের চুড়ি।"

শ্রীপ্রভা দে, সরস্বতী (মোরাদাবাদ)

ইউনিভারসিটি সায়ান্স কলেজের ডার্ক রুম। প্রশস্ত ঘরটির ভেতরে সর্ব্বসমেত সাতটি টেব্‌ল—বিভিন্ন এক্‌সপেরিমেণ্টের জন্য। সবগুলিই আলো সম্পর্কিত—কোনটা প্রিজ্‌ম এবং স্পেক্‌ট্রস্‌কোপ্‌ নিয়ে, কোনটা লেন্স্‌ এবং মাইক্রোস্‌কোপ্‌ নিয়ে, কোনটা জিসের প্রকাণ্ড ক্যামেরা নিয়ে।

…………অন্ধকার।

দরজাগুলো বন্ধ, উপরন্তু কালো পর্দ্দা ঝুলচে। জানালা আছে—তবে, সেগুলো কখনও খোলা হয় না। সিলিংয়ের কাছে গোটাকয়েক ইলেট্রিক ভেন্টিলেটার। পাশের ঘরেই প্রফেসার-ইন্‌-চার্জ্জ (মিঃ ঘোষ) সম্প্রতি বিশেষ একটা রিসার্চ-ওয়ার্ক নিয়ে ক'দিন থেকে খুব ব্যস্ত। দুই ঘরের মাঝখানে কালো পুরু পর্দ্দা ঝুলচে।

মিঃ ঘোষের চেহারায় একটা বেপরোয়া ভাব, হাস্যোদ্দীপক। ঘোষের মতো মোটা, বেঁটে কালো। উপরন্তু সামনের কটি দাঁত নেই। এক কথায় অপরূপ। তাঁর রিসার্চ ছাত্রমহলে একটা কৌতূহল সৃষ্টি করেচে। তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি পারা থেকে সোণা তৈরী করবেন। এই আর একদিনই তিনি একটি ছেলেকে বলছিলেন, দেশে আর গরীব থাকবে না দেখো!

ঘোষের বিদ্যের দৌড় ফিজিক্সের "ঘোড়ার গল্প" পর্য্যন্ত। শুধু মাত্র "আশুদাদার" কৃপা দৃষ্টিতে পড়ে প্রফেসারীটা পেয়েছিলেন। রিসার্চ করার অপবাদ এই ছ'মাস আগেও কেউ তাঁকে দিতে পারত না। অধুনা রমন সাহেব খামাখো নোবেল প্রাইজটা নিয়ে এলো—তাই তাঁর আক্ষেপের অন্ত নেই। তাই তিনি খাদা নুন খেয়ে সম্প্রতি লেগে গেছেন কাজে।

বিজ্ঞানে সম্প্রতি এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে জিনিষ মাত্রেই এ্যাটমের সমষ্টি। এই এ্যাটম্‌ ভাঙলে দুটো জিনিষ পাওয়া যায়—একটি নিউক্লিয়াস্‌, অন্যটি ইলেক্‌ট্রন্‌। ইলেক্ট্রনের সংখ্যার বিভিন্নতার জন্যই প্রতি জিনিষের বিভিন্নতা। পারা নিয়ে তার ইলেক্ট্রন-সংখ্যা সোনার সমান করতে পারলেই লাখোপতি! ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল—এবং এও প্রমাণিত হয়ে গেছে সর্ব্বস্থানেই এটা সম্ভব নয়। আরও অনেক কঠিন তথ্য আছে এর ভেতরে। তবে মিঃ ঘোষ বেপরোয়া—সোনা তিনি না বানিয়ে ছাড়চেন না। যাক্‌—আমাদের গল্প সুরু করা হউক।

সেই যে বেলা এগারটা থেকে প্রকাশ তার এ্যাপারিটাস নিয়ে বসেছে এখনও সেট্‌ হল না। ক্লাসের মধ্যে সে একজন ভালো ছেলে, প্রাক্‌টিক্যালে হাত চমৎকার। আজ যে কী হয়েছে………

হ'য়ে এসেচে, হ'য়ে এসেচে, আর একটু—হয়তো লেন্সটিকে আর একটু বাঁ পাশে সরাতে হবে—এক ইঞ্চির বিশ হাজার ভাগের এক ভাগ—দপ্‌ করে বার্ণারটি গেল নিভে। দেশ্‌লাই—দেশ্‌লাই—ব্যায়ারা—

এই তো ঘণ্টাখানেক আগেই দেশলাইটা ছিল টেব্‌লের ওপরে। গেল কোথায়? এতক্ষণ অপরিসীম চেষ্টা করে যদি-বা খানিকটা অগ্রসর হওয়া গেল—খানিকটা কেন অনেকটা—চেষ্টা আর কৃতকার্য্যতার অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে—আলোটা গেল নিভে। নতুন কিছু নয়, বহুদিন পূর্ব্বে ফ্রেনেল্‌ সাহেব এই এক্‌সপেরিমেণ্ট করে প্রমাণিত করেছিলেন আলো আর কিছু নয় কতগুলো উর্ম্মিমালা। প্রকাশের অনুসন্ধিৎসু মন এরই নেশায় এতক্ষণ ভরপুর হয়েছিল। সে ভাবলে, গ্যাস তো বন্ধ হ'য়ে যায়নি? বার্ণারের পাইপের কাছে মুখ এনে দেখলে, না, ঠিকই আসছে। ছুটল প্রকাশ ঐ কোণের টেবলটার দিকে, যেখানে আর একটি বার্ণার জলছে।

—দেশলাই এনেছেন—দেশলাই—আমার দেশলাই—

প্রকাশ জানে ঐ টেবলে কাজ করছে প্রতিমা সেন—পরিপূর্ণ একটি মেয়ে। আরও জানে, এঘরে আর কেউ নেই।

…হ্যাঁ, প্রতিমাও জানে, প্রকাশ একটি অন্ধ নাবালক নয়। চাইকি, দু'জনে মিলে এই অন্ধকারে একথানা ডুয়েট্ গাইতে পারে গুণ গুণ করে!

—এনেছেন দেশলাই?

প্রকাশের স্বরে খানিকটা বিরক্তি খানিকটা আমোদ।

গরমে প্রতিমার ছোট্ট ওভ্যাল্-সেইপড মুখটি ঘেমে উঠেছে। বার্ণারের অস্পষ্ট আলোতে প্রকাশ যেন নতুন করে আজ প্রতিমাকে দেখল। একটা লজ্জামিশ্রিত সঙ্কোচ, হয়তো তারই মতো একটু আমুদে কৌতূহল, এই বিশ্বব্যাপী অন্ধকারে, এই অবিমিশ্র একাকীত্বে…

—আনিনি তো।

প্রতিমার পাৎলা ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

—এইটে নিন না।

আবার কাঁপল।

তারপরই আঙুলে—আঙুলে কোলাকুলি, ছোঁয়াছুঁয়ি।

প্রকাশ একটু বিশেষভাবে আত্মসচেতন ব্যক্তি। কতিপয় অন্যান্য ছেলের মতো প্রতিমার সান্নিধ্য অথবা বন্ধুত্ব পাবার জন্য সে কোনদিন ব্যস্ত নয়। প্রায় এক বছর একসাথে তারা পড়ছে, অবশ্য পাশাপাশি বসবার সুযোগ পায়নি! এর ভেতরে তারা কথা বলেছে মাত্র দুদিন। প্রকাশের পর্বতপ্রমাণ ইন্‌ডিফারেন্স প্রতিমাকে মাঝে মাঝে সচেতন করে তোলে। আর, বলতে গেলে, খুব সত্যি কথা, মেয়েরা তাকেই পছন্দ করে, যে তাদেরকে আমলের মধ্যেই আনে না।

তবে আজ, কি-জানি-কেন, প্রকাশের মনে হ'ল, এই নির্জ্জীব অন্ধকার উৎসারিত হয়ে উঠছে উষ্ণ নিঃশ্বাসে আর জটিল রহস্যে। প্রতিমার অশরীরী আত্মাকে সে যেন অন্ধকারে আবিষ্কার করে ফেলল, গন্ধ পেল ওর গায়ের।

ঘন্টাখানেক কাজ করেই প্রকাশ প্রতিমার কাছে এসেই বলে ফেললে, আসুন একটু গল্প করা যাক। কাজ আর কাজ, নিউটন্ আর ফ্রেনেল, ব্র্যাগ আর উইলসন, …ভাল্লাগে না…

প্রতিমা তো একেবারে অবাক্। ছেলেটার মতলব কি?

—আলোটা জেলে দি?

আপত্তিতে প্রকাশ উগ্র হয়ে উঠল,—না, না, খবরদার আলো জালবেন না। মিঃ ঘোষ এসেই ভাববেন আমরা আলো জেলে শুধু গল্প করছি।

—আর অন্ধকার যে…

—হ্যাঁ, তা না তো কি! লাইটের কাজ আলোতে হয় না। তিনি ভাববেন আমরা কাজের সাথে কাজের কথাই বলছি।

—বড্ড গরম।

—বড্ড শীত।

তারপরই দুজনে হাসির স্রোতে গড়িয়ে পড়ে।

হাসি থামলে প্রকাশ হঠাৎ বললে, জানেন এই অন্ধকারে আপনাকে আমি খুন করতে পারি।

—খুন করবেন! কাকে?

—আপনাকে।

—আমার আছে কি? এইতো দু'হাতে দু'গাছা চুড়ি…কাণে দুলও নেই একজোড়া…

—আপনি বোকা। সায়ান্স ছেড়ে আর্টস নিলেই পারতেন।

—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বোকা সাজতে হয় যে।

সামনের টুলটা টেনে নিয়ে প্রকাশ বসে পড়ল। বলল,—যাবেন আজ বালীগঞ্জে? আমাদের নতুন বাড়ী হচ্ছে…

—না।

—কারণ?

—যে হেতু, আর কোন জায়গায় ওরূপ একটি বাড়ী হচ্ছে না।

—মানে?

—মানে খুব সোজা। একজনের ঐশ্বর্য্য আর একজনের অভাব। থিওরি অব ইকুইলিব্রিয়াম!

—তা হ'লে আপনি এত সুন্দরী বলে আর কোন মেয়ে সেই অনুপাতে কুৎসিত?

—হওয়া উচিত। না হলে আমি যাবো কোথায়?…তা বলে আপনি ওরকম করে তাকাবেন না…

—বনের ফুলের জন্ম বৃথা।

—ভুল ধারণা। যে কোন ঐশ্বর্য্য মালিকের একার। আমার রূপ আমার নিজের। আপনার বাড়ী আপনার। অন্যকে ডেকে আনা দুর্ব্বলতা অথবা অহঙ্কার।

—তবে আপনি চিরদিন আপনারই থাকবেন?

—আপনি ভারী ফাজিল তো!

পর্দার ওপারে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শোনা গেল মিঃ ঘোষ আপনা-আপনি বলছেন, রট্…রট্—

প্রকাশ আর প্রতিমা একসাথে চমকে উঠল। প্রতিমা বললে, উনি শুনতে পেয়েছেন আমাদের কথা…ছি, ছি,—কী আপনি বলুন তো?

বারান্দা ঘুরে প্রকাশ এসে দাঁড়াল মিঃ ঘোষের জানালার কাছে। কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে পেল মিঃ ঘোষ অবিশ্রান্ত খেটে চলেছেন তাঁর উড-বি-বিশ্ববিখ্যাত এক্‌সপেরিমেন্ট নিয়ে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে তাঁর উদ্‌গ্রীব অথচ মৃদু ফিস্‌ফিসানি। সমস্ত চেতনা তাঁর কেন্দ্রীভূত হয়েছে কাজে। বিশাল এ্যাপারেটাস্, খাটছে ছ' হাজার ভোল্ট, জলছে গোটাকয়েক ডায়োড,

ট্রায়োড—ঝুলছে হাজারো কালেকশন wire। আর মাঝখানে একটি হার্ড-গ্লাস টেষ্ট-টিউব—মার্কারি ভর্ত্তি।

মিঃ ঘোষ চুরুট মুখে এদিক ওদিক পায়চারী করছেন। হঠাৎ প্রকাশের দিকে তাঁর নজর পড়ল। ডাকলেন,—এদিকে এসো—

মন্থর গতিতে, শঙ্কিত মনে, প্রকাশ এগিয়ে এল। তখন প্রকাশের সেই অদ্ভুত চেহারা দেখলে সবারই মনে হত সে কারো গরু চুরি করেছে!

—ডাকলেন আমায়?

—হ্যাঁ। তারপর চুরুট-মুখে পায়চারী করতে করতে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন,—এটা সায়ান্স কলেজ, পাঠাগার—কিন্তু...

প্রকাশ একবার দম্ নিয়ে দ্বিতীয়টা টানবার চেষ্টা করলে। ওদিকে, ডার্ক রুমে, প্রতিমা সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে দাঁড়িয়ে আছে।—

—কিন্তু প্রকাশ, এ-রকমভাবে আর কিছুদিন...

প্রকাশ এই বার হয়তো এক গ্লাস জল খেতে চাইবে!

মিঃ ঘোষের গলার স্বর সপ্তমে চড়েছে,—আর কিছুদিন, আর কিছুদিন এইভাবে যদি আমি খাটতে পারি,—বুঝলে প্রকাশ—(একটু হেসে নিয়ে) তবে, এই সায়ান্স কলেজকেই আমি একটি গোল্ড ম্যানুফ্যাক্‌চারীং সেণ্টার করে তুলব!

প্রকাশ ভাবলে, তা'হলে, আমি আপনার কাছ থেকে এক ভরি সোনা কিনে প্রতিমাকে একটা আংটি গড়িয়ে দেব!

যা হ'ক, এর পরদিন থেকে প্রকাশ প্রতিমার কাছে বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠল। কাজে অকাজে, রাস্তার পাশে, লাইব্রেরীতে, করিডরে দাঁড়িয়ে, তারা সবসময়ে কোকিলের ডাক শুনতে পেত।

আবার সেই ডার্ক রুম্।

সাধারণতঃ ব্যাচ বাই ব্যাচ এক-এক ডিপার্টমেণ্টে প্র্যাক্টিক্যাল্ করে। প্রতিমা আর প্রকাশ ছিল একই ব্যাচে। আরও একটি ছেলে ছিল, অনিল—সেদিন সে আসেনি। ঠিক তার পরের দিনই সে এসেছিল, এবং তারপর থেকে সে ভীষণ রেগুলার হয়ে উঠেছে। মাসের ভেতর পনরদিন কামাই করা তার একটা ধাতুগত ব্যাপার ছিল। সম্প্রতি ধাতু বদলেছে।

আর একটা দোষ ছিল তার—কবিতা লিখত।

অনিল ঘরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে প্রতিমা আর প্রকাশের কথাবার্ত্তাগুলো জানিয়ে রাখি।

ঠোঁট কুঁচকে প্রতিমা বললে, আজকাল আপনি তো দেখছি বেশ পপুলার হয়ে উঠলেন।

আড় চোখে চেয়ে প্রকাশ না বলে পারল না,—সে-টা আপনারই কল্যাণে।

—কী রকম?

—জানি নে। তবে আপনার সাথে আলাপ হবার পূর্ব্বে আমাকে কেউ পছন্দই করত না।

—বলেন কি!

টেবল-ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে প্রকাশ বললে,—কিন্তু আপনার তো অনেক বন্ধু—রথীন, প্রেমেন্দ্র—আপনি তো চির-পপুলার!

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে প্রতিমা বললে,—বড় বিশ্রী শোনালো আপনার মতো ছেলের মুখে!

বোকামীটা হৃদয়ঙ্গম করে প্রকাশ খানিকটা খুব জোর হেসে ফেললে। প্রতিমা বল্লে: যাই বলেন বড্ডবেশী ফরওয়ার্ড ওরা—একদিন রথীনবাবু কী বললেন শুনবেন—প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ যথেষ্ট অধীর হয়ে উঠল কথাটি শোনবার জন্য। তবে, সে না বলে ছাড়ল না,—আমিও যদি কিছু-একটা আজ বলি—

—না, ওসব কথা বললে নালিশ করে দেব!

—আর আমিই যদি চেঁচিয়ে উঠি—প্রতিমা সেন আমাকে জড়িয়ে ধরে অন্ধকারে—

হাসতে হাসতে প্রতিমা প্রকাশের বুকেরই ওপর গড়িয়ে পড়ে আর কি! বললে, কেউ তা বিশ্বাস করবে?

—করবে না? আপনাদের মতো সিংহীনি মেয়েরা—যারা খুন্তি ছেড়ে টেলিস্কোপ ধরল...

—আর আপনাদের মতো ছেলেরা—যারা শুধু মেয়েদের আঁচলের তলায় দাঁড়িয়ে বিশ্বপ্রেমিক হয়ে উঠল···

এমন সময় অনিল গম্ভীরমুখে প্রবেশ করল। তার মুখ দেখে মনে হল ক'লকাতার এক্ষুনিই একটা প্রলয় ঘট্‌বে! অথবা মনে হলো, রবি ঠাকুরের দুধালো গাইটা হারিয়ে গেছে!······কোনদিকে না চেয়ে সে নিজের টেবলে কাজ সুরু করে দিলে। ফস্ করে বার্ণারটা জ্বাললে, খটাং করে চেয়ারটা টেনে নিলে।

প্রকাশ আর প্রতিমাও নিজ-নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। অবশ্য প্রকাশ মনে মনে আজ কদিন থেকেই অনিলের ওপর একটা বিজাতীয় ক্রোধ পোষণ করছে। শেষকালে কি অনিলের সাথে একটা ডুয়েল লড়তে হবে প্রতিমার ব্যাপার নিয়ে?

যন্ত্রপাতি সাজিয়ে গুছিয়ে অনিল খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে গেল। আশ্চর্য্য নয় একটুও, সেই অন্ধকারে, বার্ণারের ক্ষীণ আলোতে অনিল পুরো দু'ঘণ্টা কসরৎ করে একখানা কবিতা লিখে ফেললে।—

অন্ধকারে ও টেবিলে কাজ করছে
একটি নারী
টেলিস্কোপের স্ক্রু ঘোরাতে
বাজছে তাহার হাতের চুড়ি।
আচ্ছা,—অন্ধকারে ওকি কোন
করছে না সন্দেহ
আমরা দু'টি পুরুষ ছেলে
বসেই আছি শীতল-দেহ।
হঠাৎ যদি পাখা মেলে······

প্রকাশ এসে বললে, তোমার তো কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। যাবার সময় নীচে বেয়ারাকে এক কাপ চা দিয়ে যেতে বল।

প্রকাশের মুখের দিকে খানিকটা বোকার মতো চেয়ে অনিল বললে,—এক কাপে কী হবে? দু'কাপ।

—ও ইয়েস্—তুমি খাবে?

—তবে তিন কাপ।

—তিন কাপ কেন?

অনিল বেজায় চটে' উঠল। দানীবাবুর মতো ষ্টেজ কাঁপানো গলায় বললে,—কেন, কেন, কেন! জানো না উনি রোজ তিনটের সময় চা খান? তারপরই শিশির ভাদুড়ীর স্রোতের-মুখে-ভাসিয়ে-দেওয়া সুরে, টেনে টেনে, বলতে লাগল,—তিনটে বাজতে আর মাত্র,—মাত্র—সতের সেকেণ্ড বা—কী

—প্রতিমা তো একেবারে পাথরের মতো জড়ো সড়ো। শুধু তার কানদুটো বকের গলার মতো খাড়া হয়ে রইল।

প্রকাশ অনিলের রিষ্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে বললে, তোমার ঘড়ি ফাষ্ট চলছে।

কেন?

—যে হেতু উনি তিনটের সময় চা খান না।···ওকি? খাতায় লিখছ কি?

ছোট্ট করে অনিল বললে, কবিতা।

অনিলের পিঠ চাপড়ে প্রকাশ বললে,—ব্রেভো অনিল, তুমিই আমাদের দেশের পোয়েট ফিউচারেট!···না হলে, এই ডার্করুমে, লাইটের ল্যাবোরেটরীতে বসে···নিতান্ত করুণ এবং উদাস সুরে অনিল বললে,—কী করব···এ রকম সাইকোলজিক্যাল আবহাওয়াতে···ওপাশে···

—চুপ। শুনতে পাবে—

হঠাৎ প্রতিমার দিকে মুখ ফিরিয়ে অনিল কবিতাটি সুর করে পড়তে লাগল। তারপর বললে,—আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আমি বাজী রাখতে পারি আপনি কিছুতেই শুনতে পাচ্ছেন না!

এমন সময় বারান্দায় আকাশ বিদীর্ণ চীৎকার শোনা গেল। দ্রুত অসংযত পায়ে, বিরাট বপু কাঁপিয়ে, মিঃ ঘোষ চীৎকার করে করে অগ্রসর হচ্ছেন,—গোল্ড, গোল্ড এ্যাটলাষ্ট।

বারান্দায় এসে প্রকাশ, প্রতিমা এবং অনিল মিঃ ঘোষের চেহারা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। হাঁড়ির মতো মুখটি ঘামে ভিজে উঠেছে, চোখ দুটো অসম্ভব লাল, কাছাটা অর্দ্ধেক খুলে গেছে, এক পায়ে জুতো নেই। টেষ্ট-টিউবটি হাতে করে তিনি ক্যামিক্যাল ল্যাবোরেটরীর দিকে ছুটছেন আর বলছেন, —গোল্ড—গোল্ড—গোল্ড এ্যাটলাষ্ট।

কলেজের সমস্ত ছেলে মেয়ে, প্রফেসার বেয়ারা, দারওয়ান—ডেমনেষ্ট্রেটর জড়ো হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। মিঃ ঘোষ কাঁপতে কাঁপতে টেষ্ট-টিউবটি মিঃ রায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—দেখুন শীগগীর—শীগগীর—

মিঃ রায় হচ্ছেন কেমিক্যাল এ্যাসিষ্টেন্ট।

—প্রতিটি অপমৃতমান মুহূর্ত্ত মিঃ ঘোষের কাণে ড্রামের মতো বাজতে লাগল। প্রতি লোমশীর্ষে অধৈর্য্যের উত্তাল বারতা। প্রতি অণুতে আবিষ্কারের তা-থৈ নৃত্য।—আর, আর দেরী নয়; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার আর এক মিনিট পরেই সগৌরবে ঘোষিত হবে। উপস্থিত সকলই একটা চমকে ওঠবার চমৎকারিত্বে দুলতে লাগল।

—গান—

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যেওনা যেওনা তুমি এই অবেলায়।
আঁধার ঘনায়ে আসে বনবীথিকায়॥
শ্রাবণ আকাশ ছেয়ে
বাদল আসিছে ধেয়ে
কাননে কদম-কেয়া ফুল মুরছায়॥
নিশিথে বাদল হবে হেন নিশি কেবা কবে
প্রিয় জনে ব্যথা দিয়ে দূরে চলে যায়॥
এ ঘোর শাঙন্ সাঁঝে
বল প্রিয় কোন্ লাজে
তোমারে পথের মাঝে দিব গো বিদায়॥
আজিকে বাদল রাতে
শেষ দেখা তব সাথে
ওগো তাই প্রাণ কাঁদে মনো-বেদনায়॥

সত্যি, মার্কারীটা খাঁটি সোনার রঙে রাঙিয়ে উঠেছে।

শেষ পর্য্যন্ত মিঃ রায় বললেন, আমি বড় দুঃখিত মিঃ ঘোষ। আপনি আমার গালে একটা চড় মারুন!—এটা গোল্ডের গ-ও হয়নি।

এ্যা···তবে, তবে—ও মাই গোল্ড—

মিঃ রায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ফ্যানের রেগুলেটার জোরে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। মিঃ রায়কে সুস্থ করবার নিতান্ত ভদ্র অভিপ্রায়ে একটা বেয়ারা একগ্লাস জল এনে তাঁর মাথায় ঢেলে দিলে।

অনিল পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে দেখল প্রকাশ আর প্রতিমা কখন যেন সরে পড়েছে। তখনই সে উদ্দাম গতিতে ছুটল ডার্ক-রুমের দিকে।

মানুষ

বিমল চন্দ্র ঘোষ

(১)

তোমায় পা'ব কোন্ অতলে ?
অথৈ অতল নয়নজলে,
সেই বেদনা বাজছে নিতি বুকে গো !
বিপুল আঁধার দেউলমাঝে
মন সরেনা ধরার কাজে
বাঁধন-জ্বালা জ্বলছে গভীর দুখে গো।
এমন কোরে ক'দিন বল বাঁচবো আর ?
বইতে হ'বে দারুণ বোঝা লাঞ্ছনার ॥

(২)

একলা পথিক ঝড়ের রাতি
কাঁপছে ভীরু জীবন-বাতি
বাতাস যেন উদাস গীতি গাহেরে,
বজ্র হাঁকে আকাশ চিরে
মেঘলা দানব জগত ঘিরে
রুক্ষ জটা উড়িয়ে নভে নাচেরে।
কোন্ কাননে তোমার দেখা মিলবে গো।
মরুর বুকে সোনার ফসল ফলবে গো ॥

(৩)

ধরার বুকে মানুষ কোথা ?
বুঝবে আমার গোপন ব্যথা
প্রাণের সাড়া কোথাও যে আজ নাহিরে !
হাজার লোকের হাজার বাণী
সত্য বলে কোন্‌টা মানি ?
বিস্ময়ে তাই অবাক হ'য়ে চাহিরে।
নিত্য প্রতি পদক্ষেপে বুঝছি আজ
কোন্ বেদনা বাজছে, বুকে কিসের লাজ ?

(৪)

হায় জগতের তত্ত্বজ্ঞানী,
হায় গো উদাস গুহার ধ্যানী,
তোমরা সবাই মত্ত কিসের লাগিয়া ?
মানব-মনের অতল তলে
যে জন নিতি ক্ষুধায় জ্বলে
তা'র পানে কি দেখছ কভু চাহিয়া ?
অন্ধ আঁখির এ ভ্রম কবে ছুটবে রে !
কোন আঘাতে সকল বাঁধন টুটবে রে।

(৫)

কোথায় তুমি সত্য মানুষ
চারদিকে যে হাওয়ার ফানুস,
হাল্কাদেহে ভর করে ঐ চলেছে
নাচ্‌বে নাকি রুদ্রনাটে
যে যায় নিতি বাঁধন কাটে
দেখছ নাকি ধরায় মানুষ মরেছে।
হাঁফিয়ে ওঠে চিত্ত আকুল ক্রন্দনে
তামস পথে নিত্য ভীতির স্পন্দনে ॥

(৬)

ভ্যাপসা ঘরে গন্ধ উঠে
ঝাঁঝরা স্তালের পাঁজর ফুটে
স্যাঁতসেতে ঐ উঠ্‌ছে মেঝে ঘামিয়া
ঘুল ঘুলি দে বাতাস আসে
বক্ষ ফাটে দারুণ শ্বাসে
মহাপ্রাণী ভুখায় উঠে কাঁপিয়া।
এরেই যদি জীবন বল হায়রে নর
তা'র চেয়ে আর কিমাশ্চর্য্য অতঃপর ?

(৭)

পুঞ্জীভূত নিষেধরাশি
গলায় যেন টানছে ফাঁসী
মুক্তি হাওয়া কোথায় পা'ব জগতে ?
কোন অতলে তলিয়ে গিয়ে
সত্য সুধা মাণিক নিয়ে
উঠবো ফুটে ধুলায় মলিন মরতে।
শাসন বাঁধন নয়গো কভু মুক্তি নয়
চলছে যা আজ দিগ্বিদিকে বিশ্বময়।

(৮)

তোমার কাণের পাষাণ দ্বারে
দিচ্ছি আঘাত হাজার বারে
হায়রে সেথা শব্দ কোনো পশেনা
দারুণ ব্যথায় রক্ত ঝরে
মিথ্যা পরাণ কেঁদেই মরে
জমাট দ্বারে একটি পাথর খসেনা।
খুলবে না হায় খুলবে নাকি রুদ্ধদ্বার
নামবে না'কি দারুণ বোঝা লাঞ্ছনার ?

চিত্রলেখা

হীরালাল দাশগুপ্ত

চিত্রলেখা হে মোর চিত্রলেখা !
সন্ধ্যা বেলার করুণ গানের মত,
বেদনভারে মন যে অবনত
তুষার হ'ল বুকের অশ্রুরাশি ;
স্মৃতির বীণা সে কোন্ মূর্চ্ছনাতে
সে কোন্ সুরে বাজবে গহীন রাতে
মর্ম্মছেঁড়া বিদায় বেলার বাঁশী।

চিত্রলেখা, হে মোর চিত্রলেখা ?
নৈশ তারার মৌন গুঞ্জরণে
বাজবে কিগো তোমার বিধুর মনে
আকাশ-ছাওয়া আর্ত্ত মনের ভাষা।
হারিয়ে গেল যে মন নিরুদ্দেশে
নিবিড় দুখে সর্ব্বহারার বেশে
তা'র বুকে যে নেইকো কোনোই আশা ?

চিত্রলেখা হে মোর চিত্রলেখা !
হলুধ্বনি শাখের আওয়াজ দূরে
আসছে ভেসে গভীর করুণ সুরে
তোমার আমার আজ যে বিদায়-পালা,
আর্ত্ত এ মোর বুকের গোপন পুঁজি
উদাস চোখে আকাশ পানে খুঁজি
তারায় গাঁথা ব্যর্থ প্রেমের মালা।

চিত্রলেখা হে মোর চিত্রলেখা !
সেই সে মালার গন্ধ চিরন্তনী
আমার বুকে ছুঁইয়ে পরশমণি
মনকে আমার করলে নিখাদ সোনা।
বিদায় মাগি পথিক আপন-ভোলা
দুলিয়ে প্রাণে তোমার প্রেমের দোলা
অসীম পথে কোরবো আনাগোনা।

বড় বৌদি

কুমার দত্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

চপলা পত্র অবশ্য তখনি দেয় নাই ; তবে, বিমলের অভিনয়টা সত্যকারের রূপ কিনা যাচাই করিয়া মিথ্যা বলিয়া ধরিতে না পারিয়া যখন ধৈর্য্য ধরা তাহার পক্ষে দায় হইয়া উঠিয়াছিল তখন সুযোগ পাইয়া সে তাহা হাতছাড়া করিতে পারে নাই।—গত পরশু সন্ধ্যাকালে বিমল বড়বৌদির খোঁজখবর লইয়া যখন বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল সেই সময় সে তাড়াতাড়ি পত্র শেষ করিয়া কালি না শুকাইতেই অন্যের অলক্ষ্যে সদর দরজার নিকট তাহার গায়ে ছুড়িয়া দিয়াছিল এবং বিমল তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইয়া পড়িয়া, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাস্তার মোড়ে অপেক্ষায় থাকিয়া বিজয়ের সহিত দেখা করিয়া পত্র তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়া পরদিনেই ঘর ছাড়িয়া দিবার কথা বলিয়াছিল। বলিয়াই শাসাইয়া দিয়াছিল, সে তাহার স্ত্রীকে এখানে যেন মারধর না করে এবং তাহার বড়বৌদির কানে যেন এই চিঠির কথা কোনরকমে না যায়! শাসাইয়া, তাহার কথামত কাজ না করিলে পত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। দেখিয়া শুনিয়া বিজয় সভয়ে সম্মতি দিলেও সে নির্ভয় হইতে পারে নাই। তাই আজ অফিস হইতে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়াই বড়বৌদির তত্ত্বতল্লাস লইতে গিয়া বিজয়রা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে দেখিয়াই আনন্দে, গর্ব্বে তাহার বুকটা যেন ফুলিয়া উঠিল। গর্ব্বিত হাস্যে মুখখানাকে উজ্জ্বল করিয়া যেখানে বড়বৌদি করুণাকে খাইতে দিয়া নিকটেই বসিয়াছিলেন সেখানে গেল। বড়বৌদি তাহাকে দেখিয়া গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া লইয়া জড়সড় হইয়া বসিলেন, বসিয়া মৌন হইয়া রহিলেন।

দেখিয়া বিমলের মাথায় যেন গোটা আকাশটা ভাঙিয়া পড়িল! চপলার সহিত চাতুরি চালানোর সূচনা হইতেই বড়বৌদির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যটা অমীমাংসিত জটিল সমস্যালব্ধ মনোকষ্ট মনে করিয়া বিজয়রা চলিয়া গেলে তাহাদের তাড়ানোর কৌশল উদ্ঘাটন করিয়া চমকাইয়া দিবার আনন্দের পরিমাণ মনে মনে আঁকিয়া এ পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য প্রণালীর কথা বলে নাই। কিন্তু এখনো তাঁহার সেই গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কোন অসুখ করেছে বড়বৌদি?" উত্তর না পাইয়া সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বিজয়রা কি বাকী ভাড়া না মিটিয়ে পালিয়ে গেছে? তারা কোন কিছু বলে গেছে কি?"

বড়বৌদি মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—না। বস্তুতঃ ইহা সত্য। বিজয়রা যাইবার সময় কোনদিক দিয়া অশস্ত্রোচিত বা অন্যায় ব্যবহার দেখাইয়া যায় নাই।

"এটাও না ওটাও না! তবে কি এখন এখানে এসে আমি কিছু অন্যায় করেছি? কি জন্যে আপনার মুখ এত ভারি হয়ে উঠেছে বুঝতে পারছি না, জানতে পাইনে?"

বড়বৌদি ইহার উত্তর দিলেন। তবে তখনি নয়, কিছুক্ষণ পরে। বলিলেন, "হ বলছি দাঁড়াও।" বলিয়া তিনি বসিয়াই রহিলেন। করুণার খাওয়া শেষ হইলে তাহাকে শোয়াইয়া আসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে কহিলেন, এখানে আসা তোমার ভাল দেখায় না। আমি মেয়ে মানুষ আর তুমি পুরুষ। পুরুষ বলতে বাড়ীতে আর কেউ নেই। তোমার আমার মনে যা-ই থাক না কেন, লোকচক্ষুর দিকে নজর আমায় রাখতেই হবে। তুমি এ বাড়ীতে আসা আজ থেকেই বন্ধ কর।

বিমল অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া গেল। উষ্মার সহিত সে বলিয়া উঠিল, "লোকচক্ষুটা কে শুনি? এ বিষয়ে বড়দা'র সঙ্গে কি যুক্তি করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ হয়েছে। যদি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করতে তাহলে বলতাম লোকচক্ষুটা লোক-চক্ষুই। কিন্তু এখন তা আর আমি বলব না। লোকচক্ষুটা আমি নিজেই, বলবার কিছু আছে?" তাঁহার কথার শেষের দিকে বেশ ঝাঁঝ ফুটিয়া উঠিল।

বিমল অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বেশ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কি বলিতে গেল বটে, কিন্তু বলিল না, সে কান্না চাপিতে চাপিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

চার পাঁচ দিনের মধ্যে তরুণ আসিল। বিমলের শয়নকক্ষের যে জানলা বড়বৌদির বাড়ীর দিকে, তার ধারে বসিয়া সে তরুণের কথা গিলিল, তাহার আর বড়বৌদির নিকট যাওয়া ভাল দেখায় কিনা ভাবিল। অবশেষে সব ভাবনা পিছনে ফেলিয়া একদিন সকালে তরুণের বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

বড়বৌদি ঘর পরিষ্কার করিতেছিলেন এবং তরুণ সেই ঘরে একটা বই পড়িতেছিল। বিমল সটান সেই ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার দোষটা কি তা আমি আজও ভেবে পাইনি বড়বৌদি। বিজয়দের কেউ মিথ্যে ক'রে আমার নামে কিছু বলে গেছে কিনা জানতে পারি কি? যদি কিছু বলে গিয়ে থাকে আর সেই বলার জন্যে যদি আপনি এত কঠিন হয়ে থাকেন তাহলে তা মিথ্যে প্রমাণ করবার মত জিনিষ আমার কাছে আছে। দেখতে চাইলে এখুনি বাড়ী

থেকে তা এনে আমি আপনাকে দেখাতে পারি।"

বড়বৌদি কাজ বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, তা পার না। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি যে, নিজের বৌদি ঘরে ফেলে বাইরে পরের বৌদির সঙ্গে মিশতে আমার পেছনে একটা প্রশ্ন থেকে যায়।"

"সে প্রশ্নের উত্তর আমি কি আপনাকে বলিনি? আমার স্পষ্ট মনে পড়ে—আমি তা আপনাকে অনেকবার বলেছি।"

"হ্যাঁ, বলাও সত্যি শোনাও সত্যি। কিন্তু এ দু'য়ের মাঝখানে একটা জিনিষ থেকে সব কিছুই গোলমাল করে দিয়েছে। তা আর কিছু নয়—মিথ্যে!

"অর্থাৎ আমি মিথ্যে কথা বলে আমি আপনাকে—" বিমলের কথা শেষ হইতে পাইল না।

বড়বৌদি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ তাই।"

"আপনি রেগে উঠেছেন তা' বেশ বুঝতে পারছি। বুঝেও আমি চলে যাচ্ছি না; কারণ আপনাকে ছাড়া বেঁচে থাকতে আমি পারব না। আমার মনে হয় কোনো একটা কিছু আপনার মনকে বিষাক্ত করে দিয়েছে। খুলে বললে—" বলিতে বলিতে বিমলের কথা ভারি হইয়া আসিল, তবু শেষ হইতে পাইল না।

বড়বৌদি দীপ্তস্বরে বলিলেন, "না—মন আমার বিষাক্ত হয়নি।" বলিয়া ভেঙচাইয়া কহিলেন, "আপনার মনকে বিষাক্ত করে দিয়েছে—খুলে বললে এখুনি তা অমৃতাক্ত হয়ে যাবে!" বলিয়া তিনি দ্রুত পদে পাশের ঘরে গিয়া তরুণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো! ওকে চলে যেতে বলত। এখনো ওঘর আমার পরিষ্কার করা হয় নি।"

এঘর হইতে তরুণ কহিল, "আমি পারব না।"

"পারবে না কেন? তুমি আস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা ঘরে আনবে আর পরিষ্কার করব কিনা আমি? কেন কি জন্যে?"

এবার তরুণ আর উত্তর দিল না। তাহার উত্তরের পরিবর্ত্তে বিমল নিজেকে আর সংবরণ করিতে না পারিয়া, সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পাশের কক্ষ-দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি জ্ঞানত কোনো দোষে দোষী নই—একথা আপনি যদি অমত না করেন তাহলে আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলতে পারি।

বড় বৌদি সশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। বিমল সেই রুদ্ধদ্বারের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া খানিকক্ষণ খুব কাঁদিল। তারপর সে অশ্রুজড়িত স্বরে বলিল, "আমি আমার মায়ের যে ফটোটাকে বিছানা থেকে উঠেই প্রণাম করতাম, আপনার সঙ্গ পাওয়ার পর থেকে সেই ফটোর দিকে একটীবারের জন্যও তাকাইনি। এ বোধ হয় তাঁরই অভিশাপ। আপনি যদি সত্যিই খুসী হন তাহলে আমি আর আসবনা।" বলিয়া দুঃখপূর্ণ বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে চৌকাঠের উপর প্রণাম করিয়া কহিল, "চৌকাঠে আপনার পায়ের অনেক ধুলো লেগে আছে বড় বৌদি, তাই আমি মাথায় নিয়ে চললুম। বেঁচে থাকতে বোধ হয় আমি পারব না কিন্তু চেষ্টা করব। আর বেঁচে যতদিন থাকব ততদিন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করব যে, পরজন্মে আপনাকে যেন আপনভাবে পাই।" বলিয়া বিমল সজল চোখে নতমুখে ধীরে ধীরে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। তারপর সে নিজের ঘরে গিয়ে শয্যার উপর খানিকক্ষণ বড় বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিবার পর মুখ তুলিতেই মায়ের ফটোর দিকে চোখ পড়িবামাত্র ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। উন্মাদের মত ফটোর নিকটে গিয়া বলিল, "কেন—কেন তুই আমাকে অভিশাপ দিলি? ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আমার ওপর অভিসম্পাত করতে তোর লজ্জা হল না?" তবু তাহার রাগ পড়িল না, সে ফটোর উপর সজোরে এক চড় বসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফটোর কাঁচ ঝন্ ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হয় তাহার মনোভাব এই যে, বড় বৌদির নিজের কোন দোষ বা ভুল-চুক নাই—ওই ফটোখানাই নিজের প্রাপ্য না পাইয়া তাহার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিয়া এমনটী ঘটাইয়াছে। যে তাহার এত বড় শত্রু তাহাকে ধ্বংস করাই যুক্তিসঙ্গত।

এ বাড়ীতে করুণার আসার খবরটা বৌদি যথাসময়ে স্বামীর কানে তুলিয়া রাত কাটাইয়া গিয়াছে বলিয়া যথেষ্ট আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু অমলবাবু অত বড় মিথ্যাটা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই—ইহা তাঁহার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তবু তিনি কেন যে স্ত্রীর আশঙ্কাটাকে অসম্ভবের কোঠায় ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। আমরা জানি, সেখানে বৌদির কোন যুক্তিতর্ক খাটে নাই এবং তিনি এ বিষয়ে বিমলকে কিছু বলেন নাই। ইহাতে বৌদি মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া বাহিরে খুশীর অভিনয় করিয়া তাঁহার একজোড়া চক্ষুকে দশজোড়ার কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই চেষ্টার ফলে, উপর্য্যুপরি কয়দিন বিমলকে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে সকল সময়েই ঘরে বসিয়া থাকিতে এবং আজ এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অকারণে দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া, পাশের বাড়ীতে যাতায়াত লইয়া নিশ্চয় কিছু হইয়াছে মনে করিয়া বিমলের ঘরের জানালায় গিয়া ব্যাপার কি দেখিতেছিলেন। তাহাকে নতমুখে বাটী ফিরিতে দেখিয়াই তিনি

স্বামীর নিকট গিয়া আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনার কথা বলিয়া করুণার সেই আসার কথার পুনঃপুনঃ জের টানিয়া একটা বেশ মুখ-রোচক কদর্থের সৃষ্টি করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন এবং অমলবাবু হাঁ করিয়া তাহা গিলিতেছিলেন, এমন সময় কাঁচ ভাঙ্গার শব্দে চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও কিসের শব্দ ?"

"তবে আর সেই থেকে তোমায় বলছি কি ? ও যদি মদ খেয়ে মাতাল না হয়ে থাকে তো আমায় কুকুর বলে ডে'ক।" বলিয়া বৌদি সুর বদলাইয়া কহিলেন, "আমি পরের মেয়ে আজ আছি কাল নেই। আমায় রাখলে থাকব না রাখলে চলে যাব। মিছিমিছি তোমার ভায়ের নামে মিথ্যে করে বলে কি আমার আরও দুটো হাত-পা বেরুবে না সুখ-শান্তি বাড়বে ? ও আমার সতীত্ব নষ্ট করবে সে ভয় আমি করিনে—তার আগেই বিষ খেয়ে মরতে পারব। কিন্তু অমন একজন মন্দ-স্বভাবের মাতালকে নিয়ে এক বাড়ীতে বাস্ করলে লোকে কি বলবে বলত ? তখন লোকের মুখ আমি কি দিয়ে ঢাকব ?" বলিতে বলিতে যেন সেই ভবিষ্যতের দুর্ভাবনাতেই তাহার চোখে জল আসিয়া গেল।

অমলবাবুর যেন আর একবার, চমক ভাঙ্গিল। বলিলেন, "বলচি ! মদ খেয়েছে ?" বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। উত্তরে বৌদি চোখ মুছিতেই লাগিলেন, মুখে কিছুই বলিলেন না।"

স্ত্রীর চোখে জল ! ইহা দেখিয়া অনেকে অনেক কিছু করিয়াছে। অমলবাবু আর নিজেকে সংবরণ করিতে না পারিয়া বীরোচিত পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন।

অবরুদ্ধ মুখে বিশৃঙ্খল বেশে বিমল তখনো ভাঙ্গা কাঁচের রাজ্যমধ্যে এমন উদভ্রান্তের মত দাঁড়াইয়াছিল যে, সহসা তাহা দেখিলে দুঃশীলতার চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। অমলবাবুর সেই ভ্রম হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর সমস্ত কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মনে হওয়ামাত্র ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। কাছে কিছু না পাইয়া একটা টুল লইয়া ওধার হইতে তাড়া করিয়া আসিলেন, "মদ খেয়ে মাতলামি করবার আর যায়গা পাওনি শুয়োর কোথাকার,—বেরোও ! (অর্থাৎ বাহির হইয়া যাও !) আভিঃ নিকালো হিঁয়াসে—নিকাল যাও।" বলিতে বলিতে দরজার দিকটায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়া সাধ্যমত আরও অনেক তেজঃপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

"বেরোও" কথাটা বিমলকে হতচকিত করিয়া বড় বেশী আঘাত করিল। সে আজ তাহার দাদার রুক্ষ ব্যবহারের একটা স্পষ্ট অর্থ দেখিতে পাইয়া নির্ব্বোধের মত ভাবিল, পিতা যে পত্নীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বৎসর না ঘুরিতেই ফটো বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারই একমাত্র পুত্রকে এই বাটীর অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন—ইহা কি সম্ভব ? ভাবিয়া সে কি বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে পারিল না। তাহার ঠোঁট দুইটী কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল। একটা অতি বড় নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে যেমন ছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল।

বাটী হইতে বাহির হইয়া সে নানা ন্যায় অন্যায়ের, পাপ-পুণ্যের, সুখ-দুঃখের কথা দিয়া নিজের মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তারপর বাটীর পথে পা বাড়াইলেই মন তাহার হাহাকার করিয়া উঠিতে লাগিল বলিয়া বাটী আর সে ফিরিল না, পথে পথেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন করিয়া পাঁচ ছয় দিন কাটিলে এক দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে উদভ্রান্তের মত গাড়ী বহুল রাজপথ অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া ঢলিয়া পড়িতেই গাড়ীতে ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িল। অমনি হৈহৈ-গেল-গেল শব্দে পথের লোক ভীড় করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তারপর কেহ মাথায় জল দিতে লাগিল, কেহ বরফ আনিতে ছুটিল, কেহ বা হাঁসপাতালে খবর দিবার জন্য ফোন্ ধরিল।

ইহার পর বিমলকে দেখা গেল একেবারে হাসপাতালে—যে হলঘরের ভিতরের দিকে অরুণবাবু আজও হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ লইয়া শুইয়া রহিয়াছেন তার প্রবেশ পথের পাশেই শায়িতাবস্থায়। তাহার মাথায় ও বুকে ব্যাণ্ডেজ !

৬

ডাক্তার সাহেব নার্সকে ডাকিয়া বিমলকে দেখাইয়া গাড়ীতে ধাক্কা লাগা সংক্রান্ত অনেক কথা বলিলেন। বলিয়া তিনি আরও বলিলেন যে, ইহার জ্ঞান ফিরিবে খুব সম্ভব সেই সন্ধ্যার সময়। সেই সময় সে যেন বিশেষভাবে ইহার দিকে দৃষ্টি রাখে। এ সেই নার্স যে সেদিন বিমলকে মেঝে হইতে তুলিতে গিয়া বড়বৌদির নিকট হইতে বাধা পাইয়া মাঝপথে থামিয়া পড়িয়াছিল এবং বিমলের কথাগুলি যাহার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল।

আসন্ন সন্ধ্যায় খাবারের কৌটা হাতে করুণাময়ীকে সঙ্গে লইয়া বড়বৌদি ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন। পাশেই একটা রুগীর শিয়রে মুখ চেনা নার্সকে সজল চোখে বসিয়া সযত্ন পরিচর্য্যায় অস্বাভাবিকভাবে নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়া নিকটে আসিলেন। বিমলকে দেখিলেন। দেখিয়া তিনি স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, সহসা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণ একভাবে কাটিলে বলিলেন, "কি ক'রে এর এমন হ'ল ?"

নার্স নতমুখে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "মোটরের তলায় পড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু তা পারেন নি। মাডগার্ডে ধাক্কা লেগে

ছিটকে পড়েছিলেন।" তাহার একথা ডাক্তার সাহেব কথিত অনুমানমাত্র। অনুমান হইলেও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধে নাই। কেন না সেদিনকার সেই ব্যাপারের সহিত আজিকার এই ঘটনায় কোথায় যেন যোগ আছে, সে বুঝিয়াছিল।

বিমলের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর শুনিবার পর হইতে বড়বৌদির মনে এই আশঙ্কাই মাঝে মাঝে হইতেছিল এবং সেই সঙ্গে মনের বিষ নামিতে সুরু করিয়াছিল। এখন তাঁহার অনুতাপের আর অন্ত রহিল না। তিনি ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "কতখানি ক'রে কেটেছে? বাঁচবে তো?"

"তা আমি দেখিনি, এই প্রথম ব্যাণ্ডেজ। তবে ডাক্তার সাহেব যেভাবে যা বলে গেলেন তাতে গুরুতর কিছু হয়েছে বলেই মনে হ'ল।"

"এ্যাঁ! বলেন কি!" বলিয়া বড়বৌদি বিছানার ধারে বসিয়া পড়িলেন। তারপর হাত পায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি নিজের গর্হিত আচরণের কথা বলিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার এত বড় পাপের ভার একটু কমাইয়া লইতে হইবে।

শুনিতে শুনিতে নার্স মনে মনে রুষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার ধৈর্য চ্যুতি ঘটিলে সে রাগতভাবে বলিল, "যে এর এত বড় বিশ্বাসকে, এর শ্রদ্ধার মত শ্রদ্ধাকে সন্দেহের চোখে দেখতে পারে, জগতে তার করতে কিছুই আটকায় না। যা নেবার যোগ্যতা নেই তা নিতে যাওয়াই মস্ত বড় বিড়ম্বনা,—তা কি আপনি তখন জানতেন না?"

"না। না নিয়ে ফিরিয়ে দিলেও এমনটি যে ঘটত না বা এর চেয়ে বেশী কিছু ঘটত না তারই বা ঠিক কি ছিল?" বলিতে গিয়া বড়বৌদিও কথার মধ্যে ক্রোধ মিশাইয়া ফেলিলেন।

নার্স দৃঢ়স্বরে বলিয়া ফেলিল, না—হ'ত না। তা' হ'তে আমি দিতাম না।"

নার্সের রাগের কারণ বড় বৌদির চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। তিনি তাহা দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলেন, বলিলেন, "সত্যিই ভাই, এমন মানুষকে ভাল না বেসে যত্ন না ক'রে থাকা যায় না।" বলিয়া তিনি খপ্‌ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "এই বারের মত আমায় ক্ষমা ক'রে একে আমার হাতে ফিরিয়ে দাও ভাই, আর কখনো তোমায় আমি ফিরিয়ে দিতে বলব না। মন আমার অনুতাপে পুড়ে এখন খাঁটি সোনা হয়ে গেছে, তাতে সন্দেহের মরচে আর কখনো ধরবে না, ধরলেও আজকের কথা মনে ক'রে আমি তা ঝেড়ে ফেলে দেব। কেবলমাত্র এইবারের মত একে ফিরিয়ে দাও ভাই,—" বলিতে বলিতে ক্রন্দনের আবেগে কণ্ঠ তাঁহার রুদ্ধ হইয়া গেল এবং চোখ হইতে অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নার্স মুখ তুলিয়া কি বলিতে গেল, তরুণকে রুদ্রমূর্ত্তিতে অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সভয়ে মৌন হইয়া রহিল। বড়বৌদি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তরুণকে দেখিলেন, মনে মনে বুঝিলেন যে অন্যান্য দিনের মত সে অফিস হইতেই আসিয়াছে কিন্তু কিছু বলিলেন না, মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

তরুণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "বৌদি! তোমার মান-অপমান জ্ঞানটাও কি তুমি হারিয়ে ফেলেছ? মান না থাক, অপমান জ্ঞানটাও কি তোমার নেই?"

বড়বৌদি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না নেই। যার বড়বৌদি হ'তে পারলে আমার সে জ্ঞান থাকা সাজত তাকেই যে আমি এখন হারাতে বসেছি ঠাকুরপো, তা থাকবে কি ক'রে?"

"আমি বুঝি কেউ নই? আমারও মান অপমান বলে কিছু নেই বুঝি?"

"থাকবে না কেন ঠাকুরপো, থাকবে বৈকি। কিন্তু তা নিজের কাছে। আমার কাজের মধ্যে যে মান অপমান ধরতে আসে তাকে তার নিজেরটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমার মধ্যে তা জাগিয়ে দিয়ে বেশী করে পাওয়ার আশা তার বৃথা।"

তরুণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে আর কোনো কথা বলিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। বোধহয় বুঝিল যে, সে না জানিয়া তার বৌদির কত ভয়ানক ব্যথার জায়গায় আঘাত করিয়াছে।

বিমলের দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। তাহার জ্ঞান ফিরিয়াছিল নার্সের রাগতোক্তির সময়। সে চাহিয়া দেখিতেছিল কিন্তু সহসা কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না। এইবার বুঝিল, বুঝিয়া সে আর চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিল না। "একটা নার্স কি না আমার বড়বৌদিকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে! এত বড় ওর স্পর্দ্ধা!" বলিতে বলিতে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া নার্সকে মারিতে গেল কিন্তু মারিতে পারিল না, পড়িয়া গেল! পড়িয়া গিয়াও ক্ষান্ত হইল না। আবার উঠিতে চেষ্টা করিয়া সে বড় দুঃখের সহিত বলিল, "কি বলব বড়বৌদি, আজ নিয়ে বোধহয় পাঁচ ছ'দিন হ'ল আমার পেটে কিছু নেই; নইলে—।" বলা তাহার শেষ হইতে পাইল না। বড়বৌদি তাহাকে ধরিবার জন্য সরিয়া আসিতেছিলেন। সে আবার অজ্ঞান হইয়া তাঁহার কোলের কাছে ঘুরিয়া পড়িল।

বড়বৌদি বিমলের মাথা কোলে লইয়া বসিতেই সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার বুকের ব্যাণ্ডেজ ভিজাইয়া বড় বেশী রক্ত বাহির হইতেছে! দেখিবামাত্র তাঁহার মর্ম্মযাতনা যে কি প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা তাঁর বিকৃত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। তারপর তিনি সজল চোখে কি ব্যথাকাতর কণ্ঠেই না কহিলেন, "এ কি করলে ছোটঠাকুরপো! আমাকে কি এমনি করেই শাস্তি দিতে হয়? দয়া-মায়া কি তোমারও আজ একটুও থাকতে নেই!" এতগুলি কথা বলা সত্বেও তাঁহার পক্ষেও আর সজ্ঞানে থাকা সম্ভব হইল না। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অন্তরের গভীরতম তলদেশে অকস্মাৎ অত্যধিক আঘাত পাওয়ার ফলে, কেবলমাত্র মূর্চ্ছা নয়, মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়; সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৃত্যু কাহারও হয় নাই। এবং প্রায় বৎসর খানেক পরে জানা গিয়াছিল, বড়বৌদি সত্যসত্যই করুণার সহিত বিমলের বিবাহ দিয়া বিমলকে নিজের নিকট রাখিয়াছেন।

মিরনালয়

রবার্ট মণ্টোগোমারী

এ সপ্তাহের মেট্রোর ছবি—"পেটিকোট ফিভার"-এ মিরনালয় ও মণ্টোগোমারী অতি চমৎকার অভিনয় করেছেন।

ও পারের

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

দর্শক ও জিনি

কেউ কেউ বলে পর্দার অভিনেতাই বল আর ষ্টেজের অভিনেতাই বল, দুজনের কারোরই সাধারণ লোকের সঙ্গে বেশী দেখা শোনা করা উচিত নয়; এতে নাকি তাদের চারম নষ্ট হয়ে যায়। লোকের অন্তরের কল্পলোকে সেই অভিনেতা সেই রহস্যাবৃত মনের সৃষ্টির সৌরভে রূপান্বিত হতে থাকে স্বর্গের সুষমা নিয়ে, নরকের নিকষতা নিয়ে। তাদের ধ্যান ভঙ্গ করে দেওয়া অভিনেতা-জীবনে উচিত নয়। এতে সস্তার সৌজন্য গড়ে উঠতে পারে, কল্পনার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। অভিনয় ভাল লাগে, দর্শক বলে; বেশ অভিনয় করেছে কিন্তু তাদের অন্তরের অন্তরালে সুতো বাঁধা বেলুন ওড়ে না, ফেনাম্বিত বুদ্বুদের মাথায় মাথায় সাতটা রঙ লুকোচুরি খেলেনা।

কিন্তু সে যাক্। জিনি রেমণ্ড বলে, ও নাকি সাধারণ লোকের সঙ্গে দেখা শুনা করে ফল ভালই পেয়েছে। আজকাল ওর তো বেশ ভালই লাগে সবায়ের সঙ্গে মিশে আমোদে আহ্লাদে কাটাতে। আর জিনি, যতদিন ছবির কাজে থাকে শুধু ততদিন, আর অন্য সময়ে সে তো সকলের সঙ্গে মিশে ষ্টেজে অভিনয় করে সময় কাটায়।

জিনিকে কেউ জিজ্ঞেস কল্লে জিনি বলে, দেখো কোন বিক্রেতা যেমন কোন জিনিষ বিক্রী করতে গেলে জানতে পারে কোন্ জিনিষের চাহিদা কেমন, কোনটা কাদের লাগে ভাল এবং কে কি চায়। আমিও ঠিক তেমনি জানতে পারি। তাইতো আমি অমনি করে সকলের সঙ্গে মিশি। কত দূরে দূরে যাই, কত রকম লোকের সঙ্গে মিশি, তাদের কত কথা জানতে পারি। এই যে লোকের মনের খবর। এই যে লোকের সঙ্গে মেশা এর আসল জায়গাই তো হচ্ছে ষ্টেজ। ও ষ্টেজে না গেলে অভিনয় শিখবে কি সে?

রিচার্ড বারথোলোমেস

রিচার্ড বারথোলোমেসের নাম আজকাল একটু কমে গিয়েছে। কিন্তু একদিন চলচ্চিত্রে খুব নাম করা অভিনেতা অভিনেত্রীর কথা বলতে গেলে রিচার্ডের কথা অনেক আগেই বলে ফেলত। আমি নির্ব্বাক যুগের কথাই বলছি, তখন কে না তার অভিনয় দেখেছে। কে ভুলবে সে অভিনয়। সবাক ছবির যুগে রিচার্ডকে একটু পেছিয়ে দিয়েছে। এই দিন কতক আগে রিচার্ড বারথোলোমেসকে আপনারা কিন্তু দেখেছেন। সেখানা হচ্ছে গার্ব্বোর ছবি 'অ্যানা কারেনিনা'।

রিচার্ডের এখনকার ঝোক হচ্ছে ষ্টেজের দিকে। রিচার্ড বলে; সেই অনেকদিন আগে সেই ছোট বয়সে আমি ষ্টেজে পার্ট পেতুম না। দিনের পর দিন যেতুম আর আসতুম। রোজই শুনতুম পাবে। পাবে! পাবে হে ছোকরা অত ব্যস্ত কেন! রিচার্ড রইলো ষ্টেজ আঁকড়ে। পার্ট পেলও একদিন ছোট্ট একটুকু পার্ট। এমনিই রিচার্ডের ধৈর্য্য। তারপর রিচাড এসেছিল স্ক্রীনে।

এখন রিচার্ড বারথোলোমেসের নাম ষ্টেজে খুব। আর সত্যিই সে ষ্টেজকে জয় করতে পেরেছে।

নার্ভাস! নার্ভাস! বল কি হে ওটাতো একটা রোগ!—আমার তো মনে হয় যত আমি দর্শকের সামনে দাঁড়াই তত আমার অভিনয় শেখা হয়। হলিউডের চেয়ে ঢের

বেশী টেক আমার অভিনয়ে আত্মপ্রত্যয় আনে, রিচার্ড বলে।

রবার্ট টেলর

রবার্ট টেলর-এর নাম যেমন করে যত সহজে ছড়িয়ে পড়েছে এমন বোধ হয় খুব কম লোকের ভাগ্যে জোটে।

এই তো সেদিন। কত দিনই বা আগে। রবার্টের ছিল কলেজে অভিনয়। সে অভিনয় অদ্ভুত, অপরূপ। রবার্ট নিজেই টের পেলে না কি করে ও অত ভাল অভিনয় করলে। অভিনয় শেষ হয়ে গেল, রবার্ট পথে বেরোল।

তারপর?

তারপর কে এক অচেনা অজানা লোক রবার্টের হাত ধরে বল্লে 'যাবে হলিউডে'?—হলিউড?—রবার্টের চোখে কিসের আলো। ... ...

আর একটা দুঃখের প্রভাত হোল। ছবির লোকের ভিড়ে রবার্ট। তারপর ১৯৩৬ সাল। 'ট্যাপ্টি ট্যাপ-ট্যাপ'—এলিনর পাওয়েল এর সঙ্গে রবার্ট টেলর।

সারা জগত বিস্ময়ে, আনন্দে 'তাকাল। তাদের অন্তরের অভিবাদন পৌছল হলিউডে—ষ্টুডিওর অন্তরালে।

ধন্য হোল রবার্ট টেলর। ধন্য হোল এলিনর পাওয়েল, ধন্য হোল 'ব্রডওয়ে মেলডি অব ১৯৩৬'। এই ছবিই রবার্টের চতুর্থ (feature length) পূর্ণাঙ্গ ছবি।

এর আগে ও নেমেছে 'সোলাইটি ডক্টর' 'টাইম কোয়ার লেডি', 'মার্ডার ইন দি ফ্লিট' ছবিতে। এরও আগে ওকে দেখা গেছে 'ক্রাইম ডাজন্ট পে, "বেরিড লুট" এই সব ছবিতে; তবে খুব ছোট অংশে।

সেদিন নেমেছে 'স্মল টাউন গার্ল' ছবিতে জেনেট গেনরের সঙ্গে—আপনারা দেখেছেন। এইবার নামবে গ্রেটা গার্বোর, সঙ্গে 'ক্যামেলি' ছবিতে। গার্বোর সঙ্গে রবার্ট নামলে ও যে আর এক ধাপ উন্নতির সোপানে উঠে যাবে তা বলতে পারি।

জিন আর্থার

স্কুল যেদিন ছাড়ল দারিদ্র্যতা সেদিন জিন আর্থারকে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ধরা দেছে। জানি সেটা খুব খারাপ দিন! জিনের চোখে জল, জঠরে ক্ষুধার জ্বালা, অন্তরে অভাবের তাড়না। পয়সা, পয়সা আর পয়সা। তবু, তবু একটা কথা চুপি চুপি বলি, সেদিনটা না এলে জিনকে বোধহয় এমন করে রূপোলী পর্দার বেষ্টনী কামনা সৃষ্টি করতে হোত না। জিন আর্থার এলো ফটোগ্রাফারের কাছে। তার মডেল হোল, সেইখানেই একদিন দেখা এক আর্টিষ্টের মডেলের সঙ্গে। সেই বল্লে: এসো না চলচ্চিত্রে; একবার চেষ্টা করে দেখো না; কতদূর কি হয়! জিন আর্থারের ছবি উঠল নামও গেল।

আজ পর্য্যন্ত জিন আর্থারের কত ছবিই উঠেছে। কিন্তু ছবির যে প্রথম পথ দেখিয়েছিল তার নাম সবাই জানে না।—সে৽ হচ্ছে নর্ম্মা শিয়ারার।

ওপারে

প্রসাদ বসু

এপারে ডুবেছে দিনের সূর্য্য,
নেমেছে আঁধার ধরণী,
ওপারের ঘাটে সুমধুর নাটে
ভাসিল কি রাঙা তরণী?
বিদায় গোধূলি পূরবীর সুরে
কি যেন বলিছে দূরের বধূরে
চলেনা চরণ, হারাইয়া যায়
আকাশের চেনা সরণী।
আঁধার-ওড়না আবরণে ওই
চ'লেছে নীরবে কাহারা?
আলোকের কণা ঝলিছে যেথায়
চেনে কি সে-পথ তাহারা?
বারেক সেথানে মনে হয় যাই,
দেখে আসি তারে, আমি যারে চাই,
কি খেলা খেলিছে একেলা বসিয়া
ঘরছাড়া মোর ঘরণী।

খুচরো খবর

টবি উইঙ্ক খুব ভাল গল্‌ফ খেলে। এক এক দিনে ৩৬ বার গর্ত্তে বল ফেলে।

* * *

ল্যারি ক্র্যাব দিনে পাঁচবার পেট ভরে খায়। এতেই নাকি ওর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

* * *

হার্ব্বার্ট মার্শাল লণ্ডনের প্রত্যেক দৈনিক খবরের কাগজ পায়।

* * *

হলিউডে রডলা রোক খুব নাম করা গণৎকার।

* * *

জিনি রেমণ্ডের ভাই রবার্ট মারলো।

তরী ও তুফান

শ্রীসুশীল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শেষ পর্য্যন্ত ও আর আর্শিতে মুখ দেখে নি। ফটো তোলা হ'য়ে গেলে মহেশবাবু ওর গোঁফটুকু সবই কামিয়ে নিতে বলায় রাকেশই কামিয়ে দিয়েছে।
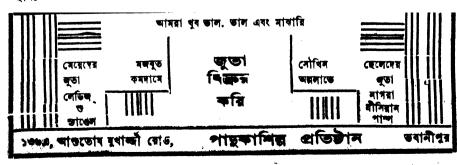
ফটো তোলার সময় ফটোগ্রাফার একটু হেসেছিলো। ভজহরি ভেবেছে, মহেশবাবু এত সব বাজে কথা শুনেই হয়ত তার হাসি পেয়েছিলো।

ভজহরির গলায় বড়ো শাদা পুঁতির মালা পরিয়েছিলেন ওরা। ব'লেছিলেন, ফটোতে দেখো ঠিক বেলফুলের মতো দেখাবে। ছায়া নাকি বেলফুলের বড় ভক্ত! চুল কপালের দিকে টেনে নামিয়ে সিঁথি করিয়েছিলেন, ওল্টানো চুল ছায়ার নাকি দু'চক্ষের বিষ! গলায় একটি রুমাল বাঁধা,—এও নাকি ছায়ারই পছন্দসই!

মহেশবাবুর কোনো কথায় প্রতিবাদ করার সাহস ভজহরির আর নেই।

ফটো তুলে এসে গলার পুঁতির মালা খুলে রাখলো। মহেশবাবু কোনো আপত্তি করেন নি। ভজহরি একটু হেসে প্রশ্ন করলে—মহেশদা চুলটা এখন তুলে দি? অভ্যেস নেই কিনা এমনি করে সিঁথি করা, কপালটা কেমন চুলকাচ্ছে।

মহেশবাবু আগে থেকেই রাজী ছিলেন, ব'ললেন, যে জন্যে করা তাতো হ'লোই, এখন আবার আমার আপত্তি কি, বলো! আপত্তি কি আমার জন্যে করি, ভাই! তোমাদেরি মঙ্গলের জন্যে। দাদা ব'লে যখন ডেকে ফেলেছো, সে মর্য্যাদা তো রাখতে হবেই।

কিন্তু সেই গোঁফটুকু রাকেশ চুল ওল্টানোর আগেই ক্ষুর দিয়ে মুছে দিয়েছে। কারণ, তাদের অলক্ষ্যে ভজহরি একবার যদি দেখে ফেলে, তবেই কেলেঙ্কারী আর কি!

ভজহরি হাসলো: তা ঠিক ব'লেছেন। সত্যি মহেশ দা, আপনাকে আমি দাদার মতোই শ্রদ্ধা করি, শুধু ডাকে দাদা নন।

মহেশদাকে সেলিয়ে দিয়ে ওরা বেশ বসে আছে সবাই! আজকাল ওরা শুধু হাসে! গাঁথুনির গোড়া পত্তন এদের মাথা দিয়েই বেরিয়েছে, আর ওরা দেখলো—মহেশবাবুকেও পাওয়া গেলো, ওর বিপিন ভঞ্জর সঙ্গে নাকি সেই স্কুলীযুগেরভাব আজ পর্য্যন্ত তেমনি আটো আছে, অতি ব্যবহার করা আদরের বইয়ের মতন মলাট আজ অবধি ঢিলে হ'য়ে যায় নি! আর এই বিপিন ভঞ্জই তো মাথুর কনট্র্যাক্টারের, ইংরাজিতে যাকে বলে, প্রাইভেট সেক্রেটারী! তাই সেইদিন থেকে ওরা মহেশবাবুকে ব'লে ক'য়ে পেছনের পট সাজিয়েছে—ফুট-লাইট দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলেই আমরা দেখতে পাবো। আর, ফোকাস-করা আলোর যদি অস্পষ্ট দেখে নিতে পারা যায়, সেটা হিসাবের খাতার জমার দিকেই যোগ হবে।

'শুধু ডাকে দাদা নন' ব'লে বিজয়ী বীরের মতো গর্ব্বিত চাহনি মেলে ছিলো ভজহরি! ওরা সবাই ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিলো। প্রবীর ব'ললো—তোমার গলার ভয়েস্-এও রীতিমতো গভীরতা প্রকাশ পেলো, ওই ডাকটায়ো।

মানসেরও সেই মত, শব্দ করলো,—হু-উ!

রাকেশ হাতের সিগারেট দেখিয়ে, ব'ললো, এটা টেনে নিয়ে মত প্রকাশ করবো।—ততক্ষণ তোমরা এগোতে থাকো। মানস যা ব'লবে, ধরে নাও, আমারও সেই

মত। আঃ, চেষ্টারফিল্ড দিব্যি সিগারেট হে! বেঁচে থাকো ভাই ভজহরি, মাঝে মাঝে এমনি খাইয়ো!—তোমার কুশল কামনা করবো। হাতের সিগারেট থেকে নীলে ধোঁয়া শাদা হ'য়ে পাকিয়ে পাকিয়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, রাকেশ টান দিলো।

চিরুণী দিয়ে চাপবাঁধা একরাশ কুচকুচে চুল ভজহরি টেনে টেনে উপরের দিকে ওঠাচ্ছে। বহুদিন চুল কাটায়নি ও। সেই টেষ্ট পরীক্ষার পরই কাটিয়েছিলো, সেপ হ'য়ে গেলো অনেক দিনের কথা। চুলের ভারে চিতাবাঘ-রঙা লিকপিকে চিরুণী লিকপিক করে।

—আজ তোমাকে কিন্তু চমৎকার মানিয়েছিলো, ভাই।—যদি দেখতে। অত বড় আর্শি নেই তো। যাক্, ফটোটা আসুক, দেখো। একা একা যে সবই আগুন লাগিয়ে তুললে, আমায় দাও! মহেশবাবু করুণ ক'রে হাসলেন।

রাকেশ ব'ললো—কই ভজা, ওঁকে তো দাও না!

পৃথিবী দু'ফাঁক হ'য়ে গেলে ভজহরি তলিয়ে যেতে রাজি ছিলো, মহেশদা চেয়েছেন আর তা কিনা ও দিতে পারলো না! যে মহেশদা তার জন্যে প্রাণপাত করছেন! উঃ, কী ভীষণ অকৃতজ্ঞতা! ভজহরি ভয়ানক চঞ্চল হ'য়ে উঠলো, ব'ললো—এক দৌড়ে নিয়ে আসি, অ্যাঁ? আধ-আচড়ান চুল নিয়েই সে ছুট দেয় আর কি!

মহেশবাবু মুখ বিকৃতি করলেন;—সিগারেট? ও খাইনে! মানস, পকেটে এক টুকরো বিড়ি থাকে তো বের করো! এই বাজার, গান্ধীজির এত হা-হুতাস, অনশন!—সেই বাজারে চেষ্টার!

মানস পকেট হাতড়ে মহেশবাবুকে দিলো যা হোক!

ভজহরির লজ্জা দ্বিগুণিত হ'য়ে উঠলো যেন, উচিত নয়, কি বলেন? ওই রাকেশটার পাল্লায় পড়ে এই মুস্কিল! আর কিনছিনা কখনো, প্রাণ গেলেও না! সত্যি মহেশদা দেশের অবস্থা প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে না পারলে এ আক্কেল আসে না! কিন্তু আপনাকে আমি বরাবর—

—থাক্, হয়েছে! ওটুকু শেষ ক'রে নাও! কাঁকড়ার ঠ্যাঙের মতো কিলবিল করছে কপালের ওপর, ওটুকু সেরে নাও! মহেশবাবুই ওকে থামিয়ে দিলেন!

ভজহরি মুখ কাঁচুমুচু ক'রে আয়নার সুমুখে দাঁড়ালো।

মহেশবাবু বিড়িটা জালিয়ে গোঁফের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে টানতে লাগলেন। ভজহরির চুল আচড়ানো শেষ হয়েছে। মহেশবাবু ওকে ডাকলেন; ওহে এদিকে এসো। প্রবীরের সঙ্গে তো চিরদিনই আছো। আমরা তোমার কামরার অতিথি, আমাদের এখন উপেক্ষা করা কি ভালো দেখায়? কি বলো হে তোমরা? তোমরাও তো আমারি মতন রবাহূত।

ভজহরি লজ্জায় প্রায় মিশিয়ে গেলো; হাত দু'টো ক'চলে, ঘাড়টা কেমন ক'রে যেন নিচু ক'রে ব'ললো—কি যে বলেন আপনি মহেশদা! আসবেন না, বাঃ! এ ঘরটাকে আপনার নিজ বাটীর মতোই ধ'রে নিন না! তারপর ভজহরি কাছে এলো, ব'ললো—কপালকুণ্ডলা দেখবেন? নিউ থিয়েটার্সের টকি? চলুন না এক সঙ্গে যাওয়া যাক্!

মহেশবাবুর কাছে বায়োস্কোপ জিনিষটা দু'চক্ষের বিষ, ব'ললেন—আচ্ছা ভজা, সেদিন গান্ধীজি উপোস করলেন, সুভাষ বোস যক্ষ্মায় ভিনিস্, সেনগুপ্ত রাচিতে ইয়ে, আর তুমি কিনা বাজে এমনি ক'রে—

ভজহরি চট্ ক'রে দোষটা সামলে নিয়ে গেলো, ব'ললো—মানস বলছিলো ও-বেলা, তাই! সত্যি বলছি আমার কিন্তু মোটে ইচ্ছে নেই!

মানস লাফিয়ে উঠলো—আমি? ও-বেলা?

ভজহরি—তুমি না? তবে রাকেশ, তুমিও না বোধ'য়! তবে কে যেন ব'ললো! হয়ত ভুল হয়েছে আমার। সত্যি, বায়োস্কোপটা দেখা—

মানসের পিঠে হাত বুলিয়ে ফের ব'ললো—কিছু মনে করিস্না, ভাই! ভুল হয়েছে। উঃ হুঃ, পাগল! মানস গম্ভীর হ'য়ে বসলো।

মহেশবাবুর ডাকে ভজহরি তাঁর কাছে উঠে গেলো, তিনি ব'ললেন—তোমার কোটের পেছনে বুঝলে ভজহরি (আকাশ পাতাল অনেক যেন তিনি চিন্তা ক'রে নিলেন) তোমার কোটের পেছনে হয়ত খুব গভীর একটা রহস্য আছে।

ও চৌকী থেকে একটা আওয়াজ এলো, —গভীর! যা ব'লেছেন—গভীর!

মহেশবাবু চোখ পাকিয়ে উঠলেন; প্রবীর, থামো। সব তাতে তোমার আমি হয়ে দেখছি। সিরিয়স্ জিনিষ নিয়ে ফাজলামো নয়। ভজহরিকে লুকিয়ে বাঁ-চোখটা টিপলেন, প্রবীর মাননের মতো গম্ভীর হ'য়ে ব'ললো।

ভজহরির মুখ দিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ বেরিয়ে এলো; গভীর!

কথাটা ব'লেই ওর মনে হ'লো ও যেন চারিদিক হারিয়ে ফেলেছে, মহেশবাবুর মুখের দিকে তাকালো। যে চাহনি আজ পর্য্যন্ত আর কেউ দেখেনি, দেখে থাকলেও প্রকাশ করতে পারেনি, ভজহরি তেমনি ক'রে তাকালো।

মহেশবাবু ওকে মার্জ্জনা করলেন। একটু থেমে উত্তর দিলেন, ব'ললেন—নিশ্চয় গভীর! কিসে গভীর না তুমিই বলো! বিপিন সেদিন তোমায় দেখে গেলো। সেই তো সব। মাথুর সম্পূর্ণ ভার ওর হাতেই সপে দিয়েছে—এই বিয়ের কথা বলছি। তবে, এ ফটো চাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে তুমিই বলো। ভয়ানক গভীর হে ছোকরা, ভয়ানক গভীর।

ভজহরি ফ্যাল ফ্যাল করে ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। মহেশবাবু আরো কিছু ভেবে নিলেন, ব'ললেন—হয়ত হবে, ছায়াই চেয়েছে। কিন্তু এ চাওয়ার কারণ কি? মহা সমস্যা!

প্রবীর ব'ললো—কি আর সমস্যা! টেবিল সাজাবে, ফটোটা চাই—ব্যস্।

—অত সোজা না হে। সত্যি কথা ব'লবে ভজা? আচ্ছা, তুমি হেঁদোয় গিস্লে (একটু ভেবে নিয়ে) পশু বেলা আন্দাজ দশটা—এমন সময়?

—আমি? নাঃ! পশু তো যাইনি, সত্যি বলছি। গিয়েছিলাম এই (একটু ভেবে) তশু দিনের আগের দিন, আর গেলো-কাল। আর, সে তো বিকেলের দিকে, তিনটে-চারটের সময়।

মহেশবাবুর কৌশল খেটেছে, সকলে চেঁচিয়ে হেসে উঠলো।

—তুমি তবে যাও মাঝে মাঝে, কেমন? দেখেছো তো তাকে?

ভজহরি নম্র গলায় ব'ললো—মোটরের নম্বর রাকেশ ব'লেছে ৩২০৫৭, আমি তো তা খুঁজেই পেলামনা, কিন্তু—ওদের আর মোটর নেই? আছে? তবে হয়তো দেখেছি! ভজহরি মাথা নিচু ক'রে তোষক সেলাই করা সুতো ধ'রে টানতে লাগলো।

—কেমন ক'রে চিনলি রে? প্রবীর চীৎকার ক'রে উঠলো: ওরে, এই ভজা! চিনলি কি ক'রে। ভজহরি উত্তর দিলো—মানস সেদিন ব'লে দিয়েছিলো কেমন দেখতে! তা আর পারবো না চিনতে।

—দাঁড়িয়ে ছিলি কোথায়? মানস গাম্ভীর্য্য ভুলে হেসে উঠলো।

ভজহরি অতিমাত্রায় সরল (বাইরের লোকে বলে বোকা), ব'ললো—ঐ গির্জ্জাটার মোড়ে! কেন, তখন দিয়ে যায়না ওদের মোটর? তবে?

—যাক্, তবে কাজের মত কাজ ক'রেছিস্ ব'লতে হবে। প্রবীর নিজের চৌকী ছেড়ে এসে এটার ভিড় বাধিয়ে ব'ললো—তবে খাইয়ে দে। কেমন শাড়ি প'রেছিলো বল্ তো! আচ্ছা, থাক্—তোর পছন্দ হ'য়েছে কি না সেইটি আগে বল্।

ভজহরি কথা বলেনা।

মহেশবাবু অনেকক্ষণ বাদে মুখ খুললেন: কি হে, পছন্দ হয়েছে তো!

—পছন্দ? হু, কেন হবেনা!

—তা হ'লেই হ'লো। আমার এতো শ্রম তবে সার্থক! তুমি বেঁকে ব'ললেই গিয়েছিলাম আর কি। যদি ব'লতে, পছন্দ হয়নি! উঃ, কী বিপদে পড়তে হতো, বলো দেখি তোমরা! যাক্, বেচেছি। আচ্ছা, আমি যা ব'লেছি ঠিক কিনা বলো! বা রঙ্, ঠিক প্রেট ঝলসে যায় কিনা! সত্যি, বিশ্বেস করো তোমরা! কিহে ভজা, তাই

নয় ? মহেশবাবু ভজহরির গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিলেন।

ভজহরি ব'লে উঠলো—হ্যাঁ রে, সত্যি! মানস, জেনে-শুনে ইয়ার্কি হ'চ্ছে, না ?

মানস ব'ললো—রঙটা ঠিক মনে করতে পারছিনা, ভালো ক'রে দেখিনি। মুখের কাটিং য',—উঃ মারভেলাস্! রঙও নিশ্চয়ি দারুণ-ফর্সা, নইলে—লাল-সিল্কের শাড়ী ছিলো পরণে, ঘুঝলি রাকেশ, আঃ কী চমৎকার যে দেখাচ্ছিলো! ঠিক যেন গনগনে আগুনের মত লকলকে শিখা!

প্রবীর জিগ্গেস করলো—তাপটা কেমন ? আঁচ ?

—তাও নিশ্চয়ি হাজার-দেড়েক সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি, নইলে অতদূর থেকে ভজহরিকে এমন ক'রে গলিয়ে দিলো!

—পোড়ালো বল্! কিরে ভজা পুড়লি না গল্‌লি ? প্রবীর হাসে।

ভজহরি মহেশবাবুর মুখের দিকে তাকালো।

মহেশবাবু মোলায়েম সুরে ব'ললেন—বলো, লজ্জা কি ? বলো, গ'ললামও না, আমি পুড়লামও না। কিসে ? নিতান্ত সোজা কথা—প্রেমে। তাই না ? কি বলো হে, ভজা!

ভজা বলে—হু।

—আচ্ছা তুমি তো দেখলে, সে তোমায় দেখেনি তো ? মহেশবাবু জিগ্গেস করলেন।

—কি জানি! এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল তো! হয়ত দেখেনি। চেয়েছিলোও বোধ হয় একবার আমার দিকে।

—কি-রকম ভাবে ?

—কেন এমনি সোজাসুজি!

—সো জা সু জি ? মহেশবাবু হঠাৎ চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন।

ভজহরি সে চিন্তায় বাধা দিলো—কি জানি মহেশদা, ঠিক মনে হ'চ্ছেনা। হয়ত আড়-চোখেই। কেন বলুন তো ?

—কেন ? (মহেশবাবু মাথা নাড়লেন একটু) কেন ? সাধারণ ভাবে চাইবে, সেই না! অমন তাকালো, তোমাকে তার ভালো লাগলো কি না!

প্রবীর মহেশদার ভুলটা ভেঙে দিলো—না মহেশবাবু, ভুল করছেন আপনি। ওই আড়-চোখে চাওয়ার মধ্যেই মার। ঠিক আছে রে ভজা, কিচ্ছু ভাবিস্ না তুই!

ভজহরির নৌকাটা তুফানে প'ড়ে টলোমল করছিলো মাতালের মতো, ফিরে এলো তাতে সম্বিত, ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন!

—তবে তো আজ আমাদের আমোদের দিন হে। ভজা, কি কপালকুণ্ডলা দেখাবে বলছিলে না ? চলো যাই। রেখে দাও তোমার সেনগুপ্ত-বোস। মহেশবাবু লাফিয়ে উঠলেন।

ভজহরি হাসলো—সত্যি কিন্তু, ফুর্ত্তির সময় অতশত ধরা যায়না, কি বলেন মহেশদা ? চলুন ?

মানস ইত্যাদি সবাই প্রায় লাফিয়ে উঠলো—চলো!

রেলওয়ে গার্ডএর আলোর রঙ বদলানোর মতো নিমেষে ওরা রঙ ব'দলে নিলো নিজেদের, অনতিবিলম্বে ওরা দলবেঁধে হুড়মুড় ক'রে নেমে এলো আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ওপর।

চিত্রা, হ্যা, চিত্রাতেই।

কপালকুণ্ডলার শেষ দৃশ্যের মতো ভজহরির সমস্ত চিন্তা ফুল হ'য়ে ফুটে ওঠে আজকাল।

কিউটিকুরা-স্নু-কৌটো ও সাবড়ে দিয়েছে এই অল্প ক'দিনের মধ্যেই! সমস্ত ঘাড়-গর্দ্দানে যখন ও পাফ চালায়, চারিদিক ধোয়ায় যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে! কিন্তু সর্ব্ব সমক্ষে ব্যবহার করার যে লজ্জা, সেটুকু আজ অবধি, ওর মজ্জায় আগের মতোই গ্রথিত ; তাই, যখন সকলে বাইরে থাকে কিংবা থাকে এদিকে-ওদিকে ও সেই সুযোগে স্নু-পৌচ সেরে নেয়। গ্লিসারিন এক বাক্স কিনেছে। প্রবীর একদিন ব'লেছিলো ; না সাবান নেই ; ভজহরিকে ঠাট্টা ক'রেছিলো, আজ কোন-মুখে আবার তার কাছে চাইতে আসে সাবান ? লাইম-জুস্ অঢেল ঢেলে যেতে পারে ভজহরি, প্রবীর তো কেনা বাদই দিয়েছে! তা না দিসুক, আর ক'দিনই বা! মহেশদা ব'লেছেন, শ্রাবণের শেষাশেষিই সব বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবে, আর মাঝামাঝি যদি ক'রে উঠতে পারেন তবে তো কথাই নাই! হেস্ত-নেস্ত একটা কিছু এর মধ্যে তিনি নাকি করবেনই! ভজহরি আর মেস্এর ফ্যান্-ঢালা ডাল খাবে না, হু, সেটুকু যেন জেনে রাখে ওরা!

ভজহরির সব চিন্তা ফুল হ'য়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু কি ফুল তাহা কিন্তু ভজহরি চিনে উঠতে পারেনি এখনো। ঘরে ঢুকেই প্রবীর নাক সিঁট্‌কালো ; উঃ কিসের একটা তীব্র গন্ধ রে ? ওঃ, পাউডার ! তুই মাখছিস্ বুঝি ? কি পাউডার ? পার্ল ?

ভজহরি হাসলো ; রামচন্দ্রো বলো ! সে আবার একটা পাউডার নাকি ! এ কিউটি।

—ওঃ পার্ল বুঝি বিউটি ফোটাতে পারে না ! তা বেশ। বড়ো দেখে একটা আর্শি কেন, তা না হ'লে এমনি রোজ রোজ কাণে থাকবে।

ভজহরি তৎক্ষণাৎ কাণে হাত দিলো ; যাঃ ! সত্যি লেগে আছে ? গেছে ?

প্রবীরও ভজহরির কাণ সামান্য রগড়ে ব'ললো হ্যাঁ গেছে।

তারপর একটু হেসে প্রবীর ব'ললো— মেখে কী হবে ? কিছু হবেনা !

—পাগল নাকি ? ভজহরি আৎকে উঠলো যেন ; আমার খুড়তুতো বোনের এই মেখে মুখের ছুলি স্রেফ মিলিয়ে গেলো ; আর রঙটা যা হ'লো—উঃ ! নইলে হয়ত অমন বরই জুটত না।

এখানে এটুকু গোপনে ব'লে রাখা উচিত ভজহরি কিউটিকুরা কোম্পানীর এজেন্ট নয়, না বা তা লেখক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্ব্বাসা

ল্যান্সডাউন ক্লাবের পারিতোষিক বিতরণ—বিগত ১লা জুলাই বুধবার ভবানীপুর পদ্মপুকুর ইন্‌স্টিটিউশনে ল্যান্সডাউন ক্লাব কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্রীজ প্রতিযোগিতাগুলির পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন হয়। নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতে সম্মত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিত হওয়াতে ব্রীজ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যতীশ বসু সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করেন। অক্‌শন্ সিঙ্গলস্, অক্‌শন্ ডুপ্লিকেট, কন্ট্রাক্ট সিঙ্গলস্ ও কন্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট—এই চার বিভাগে এদের প্রতিযোগিতা ঘোষিত হয়েছিল। এই চার বিভাগে যথাক্রমে স্টার্লিং ক্লাব, হাবড়া সান্‌ডে ক্লাবকে পরাজিত করে। ল্যান্সডাউন ক্লাব, হাওড়া সান্ ডে ক্লাবকে পরাজিত করে। থেটা বেটা ক্লাব ক্রকফোর্ডস ক্লাবকে পরাজিত করে ও স্টার্লিং ক্লাব ল্যান্সডাউন ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয়মাল্য অর্জ্জন করেন। অকসন সিঙ্গলসএ স্টার্লিং ক্লাবের হয়ে শ্রীজিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগিরিন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, অক্‌শন্ ডুপ্লিকেটে ল্যান্সডাউন ক্লাবের হয়ে শ্রীকালধন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরৎ সাহা, শ্রীসুশীল সিংহ ও সুকুমার বাবু, কন্ট্রাক্ট সিঙ্গলসে থেটা বেটা ক্লাবের হয়ে শ্রীবিমান মিত্র ও শ্রীসুবিমল মিত্র এবং কন্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেটে স্টার্লিং ক্লাবের হয়ে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভবেশ নাথ সেনগুপ্ত, শ্রীসনৎকুমার বিশ্বাস ও শ্রীদেবব্রত দত্ত খুব কৃতিত্বের সহিত খেলে

ব্রীজ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যতীশ বসু। এবারে ল্যান্সডাউন ক্লাবের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করেন।

স্ব স্ব প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। আমরা এদের সাফল্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। যা' হোক সাড়ে সাত ঘটিকায় সভার কার্য্য আরম্ভ হলে যথাসময়ে পুরস্কার বিতরিত হবার পর ভদ্রমহোদয়গণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ব্রীজ এসোসিয়েশনের এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্রীজ খেলায় অভব্যতা ও ক্রীড়ক সুলভ ঔদার্য্যের অভাবজনিত হীনতা লক্ষ্য করে

মণিবাবু বিগত কয়েকমাস যাবৎ ব্রীজ মহলের আপামর সাধারণকে সতর্কীকরণে যথার্থ সবিশেষ চেষ্টান্বিত হয়েছেন। তাঁর যুক্তির সারবনিতা লক্ষ্য করে আমরা উক্ত প্রবন্ধটি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম।

" ব্রীজখেলায় শিষ্টাচার :—

"গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা সহরে ব্রীজখেলা বিশেষ প্রসারলাভ করিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে এই খেলার আদর সমধিক। খেলাকে আশ্রয় করিয়া ইহার মধ্য দিয়া নানাবিধ উন্নতির চেষ্টা সে দেশের প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার বলিলেই চলে। আমাদের দেশে যদিও এই খেলা খুব বেশীদিন আসে নাই, তথাপি অতি অল্পকালের মধ্যেই ইহার আদর যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহা বিশেষ আনন্দের। আমার মনে হয় Indoor game বলিতে যে সকল খেলা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে সেগুলির মধ্যে ব্রীজ খেলার আসন অতি উচ্চে। ব্রীজখেলা যে শুধু মধুর আকর্ষণের বস্তু তাহা নহে, ইহার মধ্যে শিখিবার ও জানিবার অনেক কিছুই বর্ত্তমান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয় বস্তু এই যে, ব্রীজখেলার আদর ও আকর্ষণ যখন দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেছে এবং কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন নাগরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন এই খেলার প্রচলন ক্রম-বর্দ্ধমান, তখন এই খেলার ভিতর দিয়া সামাজিক রীতি-নীতির উৎকর্ষ সাধনের সুপ্রচেষ্টার প্রতি কিরূপে অবহিত হওয়া যায়। চিত্ত-বিনোদন সকল খেলার মূল উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু ব্রীজখেলার অন্য উদ্দেশ্যও বর্ত্তমান। এই খেলার মূলে চমৎকার science বর্ত্তমান এবং ভালরূপে এই খেলা খেলিতে গেলে এ বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনা সাপেক্ষ। সুতরাং অন্যান্য সাধারণ Indoor game-এর মধ্যে ব্রীজখেলা অন্তর্ভুক্ত করিলে আমাদের যে ভ্রম হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের বিকাশ মাত্র নাই; কিন্তু ইহা তো গেল স্বতন্ত্র কথা, এতদ্ব্যতীত এই ক্রীড়া-বিষয়ক আরও কিছু প্রণিধান আবশ্যক। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই খেলা যে ভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে এই খেলায় অবশ্যই এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যজ্জন্য ইহার আকর্ষণ এত বেশী। এই খেলার প্রসাদে কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, কত বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির সহিত যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার। এইরূপে সকল দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে ব্রীজখেলা বর্ত্তমানে কলিকাতার নাগরিক জীবনের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠানে এই খেলার বিশেষ ব্যবস্থা আছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত যাহাদের নিবিড়তর পরিচয় ঘটিয়াছে তাহারা অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যাহারা সাধারণতঃ ব্রীজখেলা খেলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই খেলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাঁচজনে যেখানে মেলা মেশা করেন, সেখানে আচার-ব্যবহারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেতন হওয়া নিতান্ত আকাঙ্খিত, সে স্থলে ব্রীজের আসরে ঘুরিয়া বেড়াইলে অধিকাংশ সময় যে সকল দৃশ্য দৃষ্টি-পথে আবির্ভূত হয় তাহাতে চিত্তে শান্তি ও আশার পরিবর্ত্তে বরং দুঃখ ও নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে। মনোবৃত্তির উৎকর্ষ যেথানে দেখিতে পাওয়া যায় না, চিত্ত-বিনোদন করিতে আসিয়া যেখানে কেবল শুধু কলহ ও নানাবিধ নিন্দিত মনোবৃত্তির প্রকাশ পায়, সে স্থলে ব্রীজখেলার আদর্শ যে ক্ষুণ্ণ তাহা সর্ব্বসুধীজন-বেদ্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে বর্ত্তমানে যাঁহারা ব্রীজ-খেলা খেলেন তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে এত বেশী আলাপ-পরিচয়ের সুবিধা পেয়ে থাকেন তার সীমা নাই, কিন্তু এই সুযোগ ও

'আমি গাহি উন্মাদের গান'

শ্রীবিভুদান রায়চৌধুরী

আমি গাহি কণ্ঠভরা উন্মাদের গান ;
আমার সঙ্গীত ছন্দে নাচিতেছে প্রলয়ের
রুদ্র-ভগবান

দক্ষিণ করেতে তার বাজিছে ডম্বরু,
বামহস্তে শোভে তার ভীষণ বিষাণ—
হুঙ্কারিতে হইয়ে উন্মুখ।

আমি গাহি শতাব্দীর নব-যুগ গান,
যে গান কণ্ঠ বিদারিয়া আসি ধরিত্রীর
নাচায় পরাণ

অপূর্ব্ব উল্লাস ভরে। যে গান
তন্দ্রামগ্নে আনি' দেয় অমৃত সন্ধান
আর বিশ্বমানবেরে সুখ।

আমি গাহি শুধু সেই গান,—
যে গান অন্ধতা হোতে এনে দেয়
আলোর সন্ধান ;

মর্ত্ত হোতে দূর-দূর পথে
যে গান তুলিয়া লয় অমৃতের রথে
মরণের ক্রোড় হোতে কাড়ি।

আমি গাহি নিত্য সেই গান,—
যে গান ঝঙ্কারি লোকে অসৎ-এরে
নাহি দেয় স্থান

এ বিশ্বের অধিবাসী সবে—
যে গান সৎ-এর পথে শুধু লয় টানি
অসৎ-এর পঙ্কিলতা ঝাড়ি।

সুবিধার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার মত যাহাদের অভিলাষ নাই তাঁহাদের এ খেলায় যোগদান না করাই কর্ত্তব্য। সমাজ সংগঠনের দিক্ দিয়া এই খেলার উপযোগীতা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে একই স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাবেশে যখন পরিচয় গাঢ় হইতে গাঢ়তর

হইবার সুযোগ পায় তখন তাহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার না করিয়া অপব্যবহার করা যাহাদের বুদ্ধিতে আসে তাহাদের কোন প্রকারে সমর্থন করা যায় না। এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা তো সাধারণ কথা, বিশেষ ভাবে বলিতে গেলে আমি দুই-একটি উদাহরণ উপস্থাপিত করিতেছি। খেলিতে বসিয়া খেলায় ভুলের জন্য আমি আমার খেঁড়ীর সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু তখন উভয়ে ভাবিয়া দেখিলাম না যে আমাদের এই বাদানুবাদের দ্বারা অপর-পক্ষীয় দলের অসুবিধা হইয়া থাকে। আরও বক্তব্য এই যে পূর্ব্বোক্ত বাদানুবাদ যেরূপ নীতি-বিরুদ্ধ উহার অনুরূপ তাদৃশ্য অনপেক্ষিত। জয়লাভেচ্ছা আমার যেরূপ, আমার খেঁড়ীরও সেইরূপ,—আমি যেরূপ আমার সাধ্যমত ভাল খেলিবার চেষ্টা করিতেছি আমার খেড়ীও প্রাণপণে তদ্রূপ চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং এরূপ প্রকাশ্য সভাস্থলে খেঁড়ীর খেলায় দোষারোপণ বা খেলার বিষয় অজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে নিন্দনীয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রীজ খেলায় সংযম-শিক্ষা হওয়া উচিত,—বলিতে গেলে প্রথমতঃ উহা একটি খেলা—খেলায় জয়-পরাজয়ের উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ বা বিষাদের প্রকাশ আদৌ সুশোভন নহে। তদ্ব্যতীত খেলায় ফলাফলের প্রতি উদাসীন হইয়া ধীর বুদ্ধিতে খেলিতে যাওয়া কি সকলেরই কর্ত্তব্য নহে? খেলিতে বসিয়াছি এত অধৈর্য্য হইব কেন! বুদ্ধির পরিচয় দিতে হইবে ইহা সত্য,—বুদ্ধির পরিচয় দিতে গেলে ভ্রমও হইবে ইহাও অপরিহার্য্য সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া প্রতি ভ্রম-বিভ্রমেই ধৈর্য্যচ্যুতি কখনই সমাদৃত হইতে পারে না। আমার মনে হয় ব্রীজ খেলার ভিতর দিয়া নানাবিধ উপায়ে সংযম-শিক্ষা গড়িয়া উঠিতে পারে, অবশ্য সে বিষয়ে প্রণিধান আবশ্যক। খেলার সৌকর্য্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের ধারা যখন শোভন-সুন্দর হইয়া উঠে তখন ব্রীজ খেলাকে সামান্য খেলার পর্য্যায়ভুক্ত করিলে চলিবে না। এই ব্রীজ খেলার মধ্যে শুধু science আছে বলিয়াই গরিমা এ কথা আমি মানি না,—ইহাতে যেমন science আছে ততোধিক artও বর্ত্তমান এবং তদ্ব্যতীত ইহার আর একটি দিকও আছে যাহা হইল জাতীয় জীবনকে সংযত করিয়া তোলা। আমরা যদি আমাদের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হই এবং যদি মনে করি যে খেলায় জয়লাভ করিতে পারিলেই আমাদের সুনাম অব্যাহত থাকিবে তাহা হইলে ইহার মত ভ্রান্তি আর নাই। মহৎ আদর্শকে যে আসনে বসান উচিত তদপেক্ষা নিম্নতর আসনে আমরা বসাইতেছি সে দোষ আমাদের,—সে দোষ প্রত্যেক ব্রীজ খেলোয়াড়ের পরিহার করিয়া চলা কি সম্ভব নহে?"

সাউথ ক্যালকাটা ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন

গত ৩০শে জুন মঙ্গলবার 'সাউথ ক্যালকাটা ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন' ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে, "মহানিশা" ও "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বাবু শচীপতি মুখোপাধ্যায়। এই অভিনয়ের অনুষ্ঠানে শ্রীশৈলেন ঘোষ ও শ্রীশৈলেন ভট্টাচার্য্য (গদাইবাবু) সাহায্য করিয়া ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অভিনয় বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। 'মহানিশা'র "ধীরা", "নির্ম্মল", "বেহারী" ও "অপর্ণার" অংশগুলি সুন্দর হইয়াছিল। ইরাবতীর বক্ষে বোটের উপর, 'মহানিশা'র দৃশ্যটীতে "নির্ম্মলের" ভূমিকায় শ্রীসমর মিত্র ও অন্ধ মেয়ে "ধীরার" ভূমিকায় শ্রীপ্রভাতকুমার সরকার চরিত্র দুইটী প্রস্ফুটিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছেন। "বেহারীর" ভূমিকায় শ্রীঅবনীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিয়াছিলেন। ছোট ছোট চরিত্রগুলি অতি মনোরম হইয়াছিল,

"স্বর-সাধনা"—পণ্ডিত কেশব গণেশ ঢেকণে প্রণীত। মূল্য ॥৹ আট আনা।

পণ্ডিতজী সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াই সঙ্গীতমহলে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছেন। ইঁহার রচিত "স্বর-সাধনা" প্রথম শিক্ষার্থিদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। স্বল্প পরিশ্রমে কয়েকটা গান মুখস্থ করিয়া গাহিতে পারিলেই সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যায় না এবং তাহাতে সুর ও লয়ের কোন জ্ঞানই হয় না। সঙ্গীতের প্রথম সোপানই হইতেছে স্বর-সাধনা; তাই পণ্ডিতজীর প্রণীত এই পুস্তকটী আমরা সঙ্গীত শিক্ষার্থীগণের নিকট অনুমোদন করিতেছি। এই পুস্তকের পাঠগুলি প্রথমে সহজ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে কঠিনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সাতটি স্বরের বহুবিধ Pormutation Combination (সুর ভরোয়ানা) দেখাইয়া পণ্ডিতজী স্বর সাধনার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে এই পুস্তকের পাঠগুলি ধৈর্য্য ধরিয়া অভ্যাস করিলে সুর ও লয় সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান হইবে। প্রত্যেক স্বর বিস্তারেই একটী বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া ছাত্রগণের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা কঠিন হইবে না। পুস্তকটীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে পণ্ডিতজী তাঁহার নিজের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছেন এবং আমাদের মনে হয় এই পাঠগুলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বাধীন হইলে যে কেহ খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী বিশেষ দক্ষতার সহিত গাহিতে পারিবে। আমরা "স্বর-সাধনা"র বহুল প্রচার কামনা করি।

ভবিষ্যতে ক্লাব-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের উপর অনেক আশা রাখেন, তন্মধ্যে, "আত্মারামনাথ" "ধতীশ্বর" "ছোটখুড়ী" "সৌদামিনী" "কেষ্টধনের" নাম উল্লেখযোগ্য। গানের মধ্যে মাষ্টার "ভৃত্যের" গানটী চমৎকার। হরপ্রসাদ মিত্রের "ব্রজরাজ" এক কথায় "বাজে"। মণোসুন্দরীর জানা উচিত ছিল যে তিনি অভিনয় করিতেছেন। "ধীরা" চারখানি ও "নির্ম্মল" দুইখানি মেডেল পান।

সময়ের স্বল্পতাহেতু 'মানময়ী'র প্রথম অঙ্ক ও শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটী অভিনীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রভাত সরকারের "নীহারিকা", সমর মিত্রের "মানস" ও অবনী প্রসাদের "রাজু" উল্লেখযোগ্য। অমর বসুর "দামোদর" ছ্যাবলামীতে ভরা।

—শ্রীসুধীর সরকার

দেবদত্ত ফিল্মসের প্রথম বাংলা ছবি "রজনী" শীঘ্রই মুক্তি পাবে। ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে চারুবালা আর অমিয় গোস্বামী—যথাক্রমে রজনী ও শচীন্দ্রের ভূমিকায়।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ, ৯, রামময় রোড্, কলিকাতা — টেলিফোন পার্ক ৩২৪

...শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩১শে আষাঢ় ১৩৪৩, ১৬ই জুলাই ১৯৩৬

মিলন-মন্ত্রণা-গুঞ্জনে মুখরিত উডবার্ণ পার্ক

কলিকাতা কর্পোরেশনে ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে মিলন প্রচেষ্টার যে অভিনয় চলিতেছে গত সংখ্যায় আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। সহযোগী "বসুমতী" তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া মৌখিক মিলনের যে অসারত্ব প্রমাণ করিয়াছেন আমরাও তাহার সহিত এক মত।

সম্প্রতি কাউন্সিলার শ্রীবিপিনবিহারী সাধুখাঁর বাটীতে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের সভ্য-বৃন্দের এক সভা হয়। তাহাতে নলিনীরঞ্জন-সহ বৈধানিক দলের সহিত মিলন-প্রস্তাব আলোচিত হয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত ধরণী কুমার বসু, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কাউন্সিলার-বৃন্দ এবং ঐ প্রস্তাবের বিপক্ষে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীবিপিন বিহারী সাধুখাঁ, কুমার বিশ্বনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমৃগেন্দ্রকুমার মজুমদার, শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ও শ্রীভূতনাথ কোলে প্রভৃতি কাউন্সিলার-বৃন্দ ভোট দেন। শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন, শ্রীসুশীল সেন ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু নিরপেক্ষ ছিলেন। ভোটাধিক্যে মিলন-প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়া ইউরোপীয় ও মনোনীত সদস্যদিগের সহিত একযোগে কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের সহিত মিলন যে কাম্য নহে তাহা সনৎ-রাজেন প্রমুখ বৈধানিক-ভাবাপন্ন কাউন্সিলার ব্যতীত অপর কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় নহে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক ঘরোয়া অধিবেশনে ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তকে শান্তি-দূত-রূপে বরণ করা হইয়াছে। তদনুযায়ী গত রবিবার মধ্যাহ্নে ১নং উডবার্ণ পার্কে শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সমীপে মিলন-ফর্ম্মুলার খসড়া উত্থাপন করেন। উক্ত আলাপ-আলোচনার পর মিলন-ফর্ম্মুলা কি রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা এখনও অজ্ঞাত হইলেও ইহা আংশিকভাবে প্রকাশ যে, উভয় পক্ষই স্ব স্ব দাবী বহুলাংশে প্রত্যাহার করিয়া অর্দ্ধপথে উপনীত হইয়াছেন। রণক্লান্ত উপদলদ্বয় স্ব স্ব দলগত নিষ্ঠা ভুলিয়া গিয়া যে সাময়িক মিলন-ফর্ম্মুলা রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা যে কতক্ষণ স্থায়ী হইবে তাহাই বিবেচ্য। যেখানে আদর্শের ঐক্য নাই, কর্ম্মীদিগের মধ্যে সৌহার্দ্য নাই সেখানে শুধু মিলনের রামধনুর ল্যাজে রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া মিলন-সৌধ রচনা করার প্রচেষ্টা বাতুলতারই পরিচায়ক।

যেখানে আদর্শগত মতভেদ আছে সেখানে দলসৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ সমস্যা বাঙ্গলার কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মীমাংসা না হইলে বাংলার কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের মধ্যে আন্তরিক মিলন কিরূপে সম্ভবপর হয় তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আসন্ন নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ন্যায় বহুলপ্রচারিত সংবাদ-পত্রের সহায়তার সদ্ব্যবহার করিবার মানসে এই মিলন-প্রস্তাব বৈধানিক দলের একটি কৌশল মাত্র। বিগত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে অনুরূপ মিলনের ধূয়া তুলিয়া শরৎচন্দ্রকে ধোঁকা দিয়া বহু বৈধানিকভাবাপন্ন কাউন্সিলার নির্ব্বাচন-বৈতরণী পার হইয়াছিলেন। এই সমস্ত কাল-সর্প কাউন্সিলারের স্বরূপ কয়েক মাসের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

গত শনিবার এলবার্ট হলের জনসভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ সম্বন্ধে যে তেজস্বী বক্তৃতা

করিয়াছেন তাহার পরেও মন্ত্রিত্ব-প্রয়াসী উপদলের দূতীবৃন্দ কোন্ ভরসায় শরৎচন্দ্রের নিকট মিলন-প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন তাহা আমাদের বোধের অগম্য। মিলন-মন্ত্রণা-গুঞ্জনে মুখরিত উডবার্ণ পার্কে যে মিলন-কর্ম্মূলা রচিত হইতেছে সেই মিলন-প্রক্রিয়ায় শরৎচন্দ্র যদি তাঁহার আদর্শ ও দলগত নিষ্ঠা বিসর্জ্জন দেন তাহা হইলে তাঁহার নেতৃত্বে-বিশ্বাসী কর্ম্মীবৃন্দ কোনদিনও তাঁহার এই দৌর্ব্বল্যকে ক্ষমা করিতে পারিবে না।

নলিনীরঞ্জনের বাসনা

জুলাইয়ের 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে' গেজেট-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয় একটি জবর খবর দিয়াছেন। এই সময়োচিত সংবাদ দানের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিলাতযাত্রার সংবাদপ্রকাশ উপলক্ষে তিনি পরিশেষে ইহাও জানাইয়াছেন যে, মিঃ সরকার পূর্ব্ব ময়মনসিংহ হিন্দু নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তরফ হইতে আগামী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন। তিনি আরও বলেন যে, মিঃ সরকার জানাইয়াছেন যে, 'বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বার অফ্ কমার্সের' পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবার বাসনা তাঁর নাই।

সম্ভবতঃ জেনেভা প্যারিস্ প্রভৃতি স্থান হইতে নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া আনিয়া অমিত-বিক্রমে সরকার মহাশয় নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন। তখন তাঁহার এতদিনের পৃষ্ঠপোষক ডাঃ রায়ের দল কি করিবেন?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত ডাঃ রায়ের দলের যে মিলনী-সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে তাহার প্রধান সর্ত্তই এই যে ডাঃ রায়ের দল নলিনীবাবুর সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে কি আমরা বুঝিব যে নির্ব্বাচনক্ষেত্রে কংগ্রেস-প্রতিপক্ষ খাড়া করিয়া ডাঃ রায়ের দল নলিনীবাবুর বিপক্ষতাচরণ করিবেন? এ সম্বন্ধে ডাঃ রায় একটা সুস্পষ্ট জবাব দিবেন কি?

প্রবা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ওগো পরদেশী বন্ধু আমার,
আমার মায়ের ছেলে!
দূর দুর্গম বিজন প্রবাসে
কি মধু-গন্ধ পেলে?
অনাত্মীয়েরে আপনার ক'রে,
বিদেশে বাঁধিলে বাসা,
জানিলে পরের কায়দাকানুন
শিখিলে পরের ভাষা,
তবু ভোল নাই, জননীর কথা,
জন্মভূমির ছবি,—
অভিনন্দন দিল আজি তাই,
তোমার দেশের কবি।

আজি পুরাতন হস্তিনাপুরে
'ইন্দ্রপ্রস্থ'-তলে,
দেশবিদেশের প্রবাসী বাঙালী
মিলিয়াছ দলে দলে,
"পুরাণা কিল্লা" ভেঙে প'ড়ে যায়
নূতন পথের পরে,
আজি দিবাকর ধরা নাহি দেয়
"যন্তর-মন্তরে"
পৃথ্বীরাজের ভগ্ন-প্রসাদ,
রিজিয়ার রাজধানী,
ঢেকেছে ধরণীধূলিলুণ্ঠিত
অবগুণ্ঠন টানি।

রাজা ও রাজ্য কত এলো গেল
কালের ঝঞ্ঝাবেগে,
কুতুবমিনার অতীত দিনের
সাক্ষী রয়েছে জেগে!
"নিউ ডেল্লী"র নবীন হর্ম্ম্য
আলো-ঝলমল্ দূরে,
অ্যাসফাল্টাম্' চিক্কণ পথ
গেছে 'অ্যাবেন্যু' ঘুরে;

ফতেপুরী হ'তে চাঁদনীচকের
প্রতি বিপণির পাশে,
দেখ ত বন্ধু, পুরাণো দিনের
গন্ধ কি ফিরে আসে?

কাশ্মিরী গেট পার হ'য়ে যাও
লাহোরি গেটের পথে,
নেমে চ'লে যাও দেওয়ানীখাসে,
দেওয়ানী-আম হ'তে,
দেখো মর্ম্মর-ঝরোকার ফাঁকে
নীল যমুনার ছায়া,
নয়নে কি জাগে বিগত দিনের
কাব্যমধুর মায়া?

শীতের রুক্ষ ধূলিধূসরিত
হিম কম্পিত সাঁঝে,
বিদেশী বন্ধু, কি কথা তোমার
জাগে মর্ম্মের মাঝে?
জাগে কি তোমার দেশের কাহিনী?
কালো দীঘি-জলরাশি?
গাঙের পাথার, ভীরু জ্যোৎস্নার
ক্লান্ত মলিন হাসি?
"ফিরে এসো" ব'লে মনের কোণে কি
কাঁদে নাম-নাহি-জানা?
থাক্ থাক্ সখা, বলিতে সে কথা,
জানি জানি আছে মানা!

'চায়ের আসরে' বলিতে যে হবে
'মন নাহি চায় যেতে,
ম্যালেরিয়াভরা 'রেচেড' সে গাঁয়ে
'ডার্টি' সে সহরেতে!'
জানি কলিকাতা প্রচারিত আজ
প্রবাসী সমাজময়
'ধূম্রমলিন বিশ্রীটাউন',
'বাস যোগ্যই নয়!'
তবু এ নগরী জ্ঞানে বিজ্ঞানে
কৃষ্টির গৌরবে

নিত্যনূতন অগ্রগতির
পথে উন্নত হবে!
তবু সভ্যতা, মার্জ্জিত রুচি,
শিল্প, কাব্য, গীতি,
বাংলা দেশের প্রধান সহরে
উচ্ছ্বসিত যে নীতি।
ভুলিতে চেয়েছ, তবু ভোল নাই,
চোখে জাগে তার ছবি,
সেথা হ'তে দিল অভিনন্দন
তোমার দেশের কবি।

কাব্য-কথিকা-কাহিনীর মালা
রচি তোমাদেরি লাগি,
পত্রিকা মুখে পাঠায়ে করি যে
সুখ দুঃখেরি ভাগী।
যদি ভুলে যাও আপন ভাষায়
'রাষ্ট্রভাষা'র চাপে,
যদি করো ঘৃণা জন্মভূমিরে,
ফিরিব মনস্তাপে।
ঘর হ'তে দূরে, দেশ হ'তে দূরে—
হে বন্ধু, কথা শোনো,
মনে ক'রে রেখো, নিজের দেশের
কাজ করো নাই কোনো।
ফিরিবে যেদিন, লইবে জননী
তুলে তোমাদের বুকে,
ক্যালকাটা মেল্ নির্ভরতায়
ধরিয়ো হাস্যমুখে।

নীলসিন্ধুর এ পারে ওপারে
গিরি বনভূমি কোলে,
আমার মায়ের সন্তানগণ
কতদূর গেছে চ'লে।
তাহাদেরি কেহ, আজি কর যাগ
দিয়া কবিতার 'হবি'
স্বস্তি বাচন সমুচ্চারণ
করে তোমাদের কবি॥

নিউ দিল্লীর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে প্রেরিত ও পঠিত।

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

[কলেজ ষ্ট্রীটের একাংশ—সুবোধ চ্যাটার্জ্জি ও বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ]

বিশ্ব। হ্যাঁ ভাই, এইটে কি কলেজ ষ্ট্রীট?

সুবো। [পিছন দিকে ফিরিয়া] ওঃ! হ্যাঁ এইটেই কলেজ ষ্ট্রীট। আপনি কত নম্বর বাড়ীতে যাবেন?

বিশ্ব। আমি কোনও বাড়ীতে যাবো না ভাই, কলেজ ষ্ট্রীটটাকেই আমার দরকার—(হেঁট হইয়া রাস্তার ধূলা কুড়াইয়া উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধিতে লাগিলেন)

সুবো। ও কি কচ্চেন? রাস্তার ধূলো কুড়িয়ে চাদরে বাঁধচেন কেন?

বিশ্ব। বাড়ী গিয়ে ব্রাহ্মণীর কপালে মাখিয়ে দেবো।

সুবো। ব্রাহ্মণীর কপালে মাখিয়ে দেবেন? কেন, তাঁর হয়েছে কি?

বিশ্ব। বায়ু রোগ!

সুবো। বায়ু রোগ?

বিশ্ব। বুঝতে পাল্লে না বুঝি? ঐ তোমরা যাকে "প্রেম রোগ" বলো, তাই!

সুবো। সে কি! আপনার ব্রাহ্মণী প্রেমে পোড়েচেন নাকি?

বিশ্ব। ভয়ঙ্কর! একটা বাইশ-তেইশ বছরের ছেলের সঙ্গে—

সুবো। এ্যাঁ, বলেন কি? আর আপনি স্বামী হোয়ে—

বিশ্ব। তাই বরদাস্ত কচ্চি—এই বোলবে ত? তা, নিজে কিছু প্রেমিক কি না—প্রেমিক পুরুষদের কাজই ত ঐ, কি বলো?

সুবো। যাক্—হয়ত আপনাদের পারিবারিক কোনও জটিল প্রেমের কাহিনী—তা শোনবার আগ্রহ থাকা কারু উচিত নয়, কিন্তু ধূলো কুড়োচ্ছিলেন কেন? "ধূলো পড়া" দিয়ে প্রেমাসুরকে তাড়াবেন নাকি?

বিশ্ব। বেশ বলেছ ভাই—ধূলো পড়া দিয়ে। কিন্তু এ ধূলো ত আর "পড়তে" হবে না—এ পড়াই আছে! কলেজ ষ্ট্রীটের ধূলো—বড় জাগ্রত কি না!

সুবো। জাগ্রত!

বিশ্ব। জাগ্রত বলে জাগ্রত। যে ধূলো গায়ে মেখে, ছেলে মায়ের মুখ ভুলে যায়…… [স্বর গাঢ় হইয়া আসিল]

সুবো। দেখুন,—আপনাকে হয়ত ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। "প্রেম রোগ" বল্লেন—আবার "মায়ের মুখ" বোলচেন………

বিশ্ব। রোগে কি আর এক রকমের ভাই—নানারকমের আছে ত!

সুবো। তা থাক্—কিন্তু কলেজ ষ্ট্রীটের ধূলো বোলতে, আপনি কি বোলতে চাচ্চেন, বুঝতে পেরেচি। সে ধূলো গায়ে মেখে, ছেলে মায়ের মুখ ত ভোলেনি—বরং মায়ের মুখ তার মনে পড়েচে—মায়ের মুখ সে দেখতে পেয়েচে!

বিশ্ব। ভাই তুমি বুদ্ধিমান বটে। কিন্তু বুদ্ধিমানেরও—ত ভুল হয়। সে ত তাদের মায়ের মুখ নয় ভাই, সে তাদের নিজেদেরই লোভ আর লালসা ভরা বিকৃত মুখের চেহারা একটু ভাল করে দেখলেই চিনতে পার্ব্বে। আচ্ছা, বেলা হলো, এখন যাই—

[প্রস্থানোদ্যত]

সুবো। শুনুন,—আপনি কে?

বিশ্ব। বড় শক্ত প্রশ্ন করেচ ভাই—কিন্তু থাক্। তুমিও যে, আমিও তাই—ব্রাহ্মণ।

সুবো। আমি ত ব্রাহ্মণ নই।

বিশ্ব। ব্রাহ্মণ সন্তান ত?

সুবো। তাও নই—আমার বাবা এটর্ণী

বিশ্ব। তবে?

সুবো। ব্রাহ্মণের পৌত্তুর চৌত্তুর হোলেও হোতে পারি।

বিশ্ব। না ভাই, তুমিও ব্রাহ্মণ—সত্যি কথা বল্‌বার সাহস আছে।

সুবো। আমি যে কাল মোটে বিলেত থেকে ফেরত এসেছি ঠাকুর।

বিশ্ব। [হাসিয়া] তবে ত দাদা তুমি ব্রাহ্মণের শিরোমণি—একেবারে রাজসংস্করণ। আমি যে বটতলার, সেই বটতলার!

সুবো। নমস্কার।

বিশ্ব। বটতলার বামুনের কাছে মাথা নোয়ালে?

সুবো। বট যে অক্ষয় বট, ঠাকুর—প্রণাম!

বিশ্ব। জয়স্তু। আবার হয়ত দেখা হবে—

সুবো। আবার দেখা হবে? পরিচয় ত দিলেন না?

বিশ্ব। কিছু দরকার নেই। দেখা হবার দরকার হোলে, এমনই হবে। এস ভাই—[সুবোধ চলিয়া গেল]

বেশ জ্যান্ত ছেলে! একটু মেঘাচ্ছন্ন—তা বেলা হোলে মেঘ কেটে যাবে।

(বিশ্বম্ভর অন্যমনস্কভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—বিপরীতদিক্ হইতে এক কেরাণী ভদ্রলোক দ্রুতবেগে আসিতেছিলেন, তাঁহার সহিত ধাক্কা লাগিয়া ভদ্রলোকটীর হস্তস্থিত টিফিন-বাক্স মাটীতে পড়িয়া গেল)

ভদ্রলোক। (সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ঘড়ি দেখিলেন) দুত্তোর ছাই—আর পাঁচ মিনিট আছে! নাঃ এখন "বাসে" গেলেও আর "লেট" বাঁচবে না! গ্যালো—এই বাঙ্গালী গেরস্তঘরের বৌগুলো একটু অতিরিক্তমাত্রায় পতিব্রতা হোয়েই সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল।

বন্ধুম, আজ বেলা হোয়ে গেছে—আজ আর খাবার তোয়ের করে দিতে হবে না—কিন্তু তা কি শুন্‌বে? এখন ঠ্যালা সাম্‌লাও!

বিশ্ব। (ভদ্রলোকটীর টিফিন বাক্স উঠাইয়া) এই নাও বাপু, তোমার খাবারের বাক্স। বাক্স পড়েচে বটে, কিন্তু পতিব্রতার হাতের তৈরী খাবার পড়ে নি—বাক্সতেই আছে!

ভদ্রলোক। (বাক্স লইয়া) ওঃ ঠাকুর মশাই—প্রণাম। কিছু মনে কর্ব্বেন না—তাড়াতাড়ি "লেট" বাঁচাতে গিয়ে গায়ের ওপর পড়েচি। কেরাণীগিরি বড় ঝক্‌মারি, ঠাকুরমশাই, বড় ঝক্‌মারী! যাই একখানা "লেট রিপোর্ট" করে দিই গে। রোজ রোজ কাঁহাতক্ই বা কি বলে রিপোর্ট করি! সে দিনত "বৌ মরেচে" বলে রিপোর্ট করেচি—যাই, আজ "বাপ মরেচে" বলে একখানা ঝেড়ে দিই গে! ওরে বাবা, সে যে আবার কাচা গলায় দিয়ে আফিস যেতে হবে। যাক্, উপায় যখন নেই, তখন কাচা কাচাই সই! সায়েবের মুখ ঝাম্‌টার চেয়ে ত ভাল!

বিশ্ব। বাপ-মা মরার ঐ একটা ফ্যাসাদ বটে! বৌকেও ত মারা হোয়ে গেছে শুনচি—এইবার নিদেন একটা ভাই টাই হোলে হয় না?

ভদ্র। ওইটী বোল্‌বেন না ঠাকুর-মশাই—সব পারি, ওইটেই কেমন একটা Weakness! মা-মরা ভাই, বৌটারও আবার ছেলে পিলে হয় নি—মানুষ করেচে!

বিশ্ব। (ভদ্রলোকটীর কাঁধে সহসা হাত দিয়া, কম্পিত কণ্ঠে) পার্ব্বে না, না? বাপ-মা, বৌ মার্ত্তে পারো, মা-মরা ভাই-টেকে মিছামিছি মার্ত্তেও বুক কাঁপে, না? এমনিই বটে! তবে এক কাজ করো—আর দেরী কোরো না—আফিসেই যাও, দেরী হয়, হবে।

ভদ্র। (বিশ্বম্ভরের পরিবর্ত্তন দেখিয়া) এ কি, আপনি ওমন কচ্চেন কেন?

বিশ্ব। (আরও করুণ কণ্ঠে) যাও ভাই, দেরি হোয়ে যাচ্চে—

ভদ্র। তাই যাই, কি বলেন? আপনি যখন বোল্‌চেন—সত্যি কথার মার নেই—প্রণাম!

(ভদ্রলোক দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন)

বিশ্ব। যাও ভাই, তোমার মঙ্গল হোক্!

(স্যুট সার্ট পরিয়া বসুদেব বাক্‌চী ও একটী সুটকেস্ হাতে লইয়া মাধব দাসের প্রবেশ)

বিশ্ব। তুমি ত আমাদের বসুদেব?

বসু। হ্যাঁ পণ্ডিত মশাই,—আপনার সুমুখে এই পোষাকে ভারি লজ্জা কোচ্চে। তারপর, আপনি যে—কোল্‌কাতা আস্‌বেন—রেলগাড়ীতে চড়ে' এটা ঠিক্ ধারণা কোর্ত্তে পাচ্চি নে!

বিশ্ব। কি কর্ব্বো বাবা—ব্রাহ্মণীর কথা ঠেল্‌তে পাল্লাম না—আর কতকটা নিজের গরজও বটে!

বসু। কেন, বিশেষ কি কিছু দরকার ছিল?

লেকরোডে মিলন বৈঠক

প্রকাশ যে, অদ্য বৃহস্পতিবার সুপ্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার লেক রোডস্থ ভবনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সাহিত্যিকের সরস আতিথেয়তায় রাজনৈতিক উত্তাপ প্রশমিত হইলে সুসংবাদ বটে।

বসু। পণ্ডিত মশাই না? হ্যাঁ, তাই ত—

(সসম্ভ্রমে বিশ্বম্ভরকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম)

মাধ। নাও গো, এত বেলায় আবার কে-এক পণ্ডিত মশাই জুটলেন! (বসুদেব উঠিতেই মাধবদাস ও প্রণাম করিল)

বসু। কি রে, তুই কেমন করে চিন্‌লি?

মাধ। ও কি আর চিনিয়ে দিতে হয় বাবু? গো-ব্রাহ্মণ দেখলেই আমি আপনিই চিন্‌তে পারি!

বসু। (ঈষৎ নিম্নস্বরে) ওরে ব্যাটা চাষার-পো—এ তোর "গো-ব্রাহ্মণ" নয়—আসল ব্রাহ্মণ! যা, আর একবার পায়ের ধুলো নে—

মাধ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—একেবারে বাস্তু—আসল খোয়ে গোগরো! আমি তেনাদেরই ত "গোব্রাহ্মণ" বলি। বাবাঠাকুর, পায়ে রাখবেন গো।

(পুনরায় বিশ্বম্ভরকে প্রণাম)

বিশ্ব। দরকার বৈ কি বাবা। সেই হতভাগাটা এখানে এম-এ পড়চে কি না। গ্রীষ্মের ছুটী কলেজ এখন বন্ধ—তবু বাড়ীও গেল না—প্রায় একমাস হোলো, কোন খবরও দিলে না। ব্রাহ্মণী বল্লেন—"এমন ত কখনো হয় না—তার জন্মতিথি পুজো আসচে, যাও, কেমন আছে দেখে, সঙ্গে কোরে নিয়ে এসো গে………"

বসু। তাই যাচ্চেন বুঝি, বিশুকাকার বাসায়?

বিশ্ব। না বাবা, সেইখান থেকেই ফিরচি—সে ত এলো না!

বসু। এলো না! আপনি নিতে এলেন, তার মায়ের আদেশ—তবুও এলো না!

বিশ্ব। না বাবা, এলো না!

বসু। বলেন কি পণ্ডিত মশাই! আমি যে আপনাদের ঘরের অনেক কথাই জানি—

বিশ্ব। থাক্ বসুদেব—সে কথা থাক্! তুমি যা বোলতে চাচ্ছো—তা বুঝতে পেরেচি। কিন্তু রাস্তা ঘাটে দাঁড়িয়ে সেকথা বোল্তে নেই—এ কলিযুগে কে-ই বা তা বিশ্বাস কোর্বে? কালধর্ম্মের আঘাত সহ্য কোর্ত্তেই হবে।

বসু। বিশুকাকা কেন এলেন না, কিছু কারণ জান্তে পাল্লেন কি?

বিশ্ব। বল্লে—"বিশেষ কাজ—যাবার হোলে যেতুম—কিছুদিন পরে যাবো!" অথচ, আর সাতদিন পরেই তার জন্মতিথি পূজো!

মাধ। ছ্যাস্তোর লেখা পড়ার নিকুচি করেচে! আমরা বাবু দুজনে লেখা পড়া না শিখে বেশ আমোদে আছি!

বিশ্ব। [বসুদেবের প্রতি] তা বাবা, তুমি এখন কি কোচ্চো? এতক্ষণ কেবল নিজের কথাই কচ্ছিলাম! স্বদেশ হিতৈষী-টিতৈষী হয়েছ না কি?

বসু। আজ্ঞে, তা আর হোতে পাল্লুম কৈ। তা হোলে কি আর ঐ ব্যাটাকে বাহন কোরে, পায়ে হেটে টং টং কোরে ঘুরে বেড়াই! জানেনই ত, আপনার কাছে দুচার পাতা ব্যাকরণ আর দু এক পাতা কাব্য পড়েই ইস্তফা দিই। তারপর আর পড়া শুনো ভাল লাগলো না। এখন ম্যাজিক ট্যাজিক যাহোক্ কিছু করে দিন গুজরান্ করি।

বিশ্ব। বিয়ে থা করেচ?

বসু। আজ্ঞে, না।

মাধ। এইটি কিন্তু বাবু তুমি অ-মন্দ বল্চো! না, বাবাঠাকুর, বাবু বিয়ে করেচেন বৈ কি—আমিই যে ওর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার।

বসু। ছ্যাখ ব্যাটা চাষার পো, পণ্ডিতমশায়ের কাছে—বেল্লিকপনা করিস্ নে, বল্‌চি।

মাধ। এ আর বেল্লিকপনা কি বাবু—সোজা সত্যি কথা। বাবাঠাকুর, আপনি ত অনেক শাস্তর পড়েচেন। আপনি ত জানেন্—ভোজ ঘরে বাবুরা বিয়ে কর্ব্বার আগে বলে কিনা—"বিয়ে কর্ব্বার আর আমার ইচ্ছে ছিল না—তবে কিনা সংসারে কাজকর্ম্ম করে, কোলের কাছে ভাত-জল ছ্যায়, দায়ে-অদায়ে রোগে-ভোগে ছ্যাখে শোনে যত্ন আত্তি করে—তাই আবার বিয়ে করা—নইলে তোমরা যা ভাবচো—তা মোটেই নয়।" তা বাবু, আমি যখন খুঁটিয়ে আপনার সংসারে ঐ সব কাজই করি, তখন আমিই বা আপনার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার না হবো কেন? ধম্ম কথা ত কইতে হবে? শুধু রেঁধে ভাতটা দিই না বটে, তা আজ কালকার দিনে কোন্ পরিবার আর রেঁধে ভাত দিচ্ছে বলো?

বসু। নাঃ—ব্যাটা, ভারি ফাজিল হোয়েচে দেখচি!

বিশ্ব। [মাধবের প্রতি] তোমার নামটি কি বাপু?

মাধ। আজ্ঞে—আমার বাবা নাম রেখেছিলেন "মাধব দাস", বাবু নাম রেখেছেন "মেধো", আর আমি নিজে নিজের নাম রেখেচি "মাধবী"!

বসু। "মাধবী"! ঈস্, ব্যাটা আবার সৌখীন!

মাধ। হাঁ গো হাঁ! নিজেদের বেলায় "সজনী", "বিজনী", "রমনী" হোতে দোষ নেই, আর আমার বেলায় "মাধবী" হোতেই দোষ! তার ওপর, বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার—একটা ইজ্জত আছে ত?

বিশ্ব। বসুদেব, তোমার লোকটী ত বেশ মিষ্টি দেখচি হে—একেবারে হুবহু সহুরে।

মাধ। বাবাঠাকুর, দণ্ডবৎ কচ্চি গো—পায়ে রাখবেন।

বিশ্ব। তাহোলে চলুন বসুদেব—গঙ্গা স্নান কোরে একেবারে গাড়ীতে গিয়ে উঠিগে।

বসু। আজই যাবেন?

বিশ্ব। হাঁ বাবা, জানোই ত সব—বুঝতেই ত পাচ্চ?

বসু। আজ্ঞে হাঁ, সেইজন্যেই ত বাবার পায়ের ধূলো দিতে বোল্‌তে সাহস কচ্চিনে—আমাদের সব অনাচারের কাণ্ড।

মাধ। তা নিয়ে চলুন না বাবু, পণ্ডিত মশাইকে। আমি বেশ শুদ্ধ-সাদ্ধা হোয়ে "দেবলা দেবী" ঘৃত দিয়ে "বঙ্গেবর্গী" ময়দা মেখে ওর জন্যে লুচি বানিয়ে দেবো এখন।

বসু। ফের ডেঁপোমি করে। [বিশ্বম্ভরের প্রতি] তা পণ্ডিত মশাই আপনি ভাবেন না, মাকে বোলবেন আমি যেমন কোরে হোক্, যত শীগ্রী পারি, বিশুকাকে তাঁর পায়ে পৌঁছে দেবো।

বিশ্ব। তুমি ভরসা কচ্চো ভাল, কিন্তু তুমি বুঝতে পাচ্চো না, বসুদেব, সে কতবড় প্রলোভনের আকর্ষণে আজ তার মায়ের মিনতি অগ্রাহ্য করেচে। আমার সঙ্গে সে কোনদিনই মুখ তুলে কথা কইতে পারে না, আজও পাল্লেনা কিন্তু তার অপরাধী অন্তর আমার কাছে সত্যগোপন কোর্ত্তে পারে নি। আমার নিশ্চয় মনে হচ্চে বাবা, সে কোনও রমনীয় মোহে আবদ্ধ। এক একবার ইচ্ছে

রেণীপার্কে বসু-রায় সাক্ষাৎকার

গত মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর আমন্ত্রনে গোস্বামী মহাশয়ের রেণীপার্কের ভবনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রকাশ যে, বাংলার কংগ্রেসী মিলন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হইবার পর গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সম্মানিত অতিথিদ্বয়কে ভূরি ভোজে পরিতৃপ্ত করেন।

হচ্ছিল, দেখে যাই—মহামায়ার কোন্ বিভূতি দিয়ে তার মোহের বন্ধন সৃষ্টি—যার মোহিনী মায়ায় আজন্ম প্রতিপালিত বক্ষের ধন তার মায়ের মুখ ভুলে যেতে পারে। বসুদেব, মহামায়া জননী হোলে রক্ষা করেন, রমণী হোলেও নিস্তার আছে কিন্তু মোহিনী হোলে নিষ্কৃতি নেই বাবা, নিষ্কৃতি নেই। আমরা পারলাম না, তাঁর কৃপা না হোলে, তুমিও পার্ব্বে না।

বসু। পণ্ডিত মশাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ম্যাজিক দেখিয়ে থাই, আমারও মোহিনীবিদ্যে টিদ্যে কিছু জানা আছে। যাকে বোলবেন—যেমন করেই হোক্, গুড়োকে নিয়ে যাবোই।

বিশ্ব। [অন্যমনে] ব্রাহ্মনীর আশাভঙ্গের কাতরমুখ মনে পড়লো—আমিও কতকটা আত্মহারা—কথা কাটাকাটি কোর্ত্তে আর সাহস কল্লুম না। কি জানি, বাইশবৎসরের সংযমসিদ্ধ অন্তর আকুমার সত্যভাষী রসনাপথে কোন্ অভিশাপবাণী প্রেরণ কোরে তার অকল্যাণ—না, না—মাতৃদেবীর গচ্ছিত ধন—ব্রাহ্মণীর অঞ্চলের নিধি—অকল্যাণ—অকল্যাণ—না—না—নারায়ণ—নারায়ণ——

[স্খলিত পদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

বসু। মাধব, তুই বাড়ী যা—আমি পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে বিশুকার ঠিকানাটা জেনে এখুনি আসচি…………

[বসুদেবের প্রস্থান]

মাধ। উঃ "নারায়ণ", "নারায়ণ" বলে ডাকলে, আর সর্ব্বশরীর যেন শিউরে উঠলো !

[বিশ্বম্ভর যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, মাধব বারবার সেখানে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে লাগিল] * (ক্রমশঃ)

* লেখক কোয়েটার ভুমিকম্পে স্ত্রীপুত্র-কন্যা বিসর্জন দিয়া কোনরকমে নিজের প্রাণটুকু লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। মানসিক বিক্ষোভ দূর করিবার জন্য সেই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, এই নাটকখানি তিনি লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। এই নাটকে সেই ঘটনার কিঞ্চিৎ আভাসও আছে। খেঃ সঃ।

বিলাসী

কালি ফিল্মস

সুকুমারের সামনে বাধা-বিপত্তির আর অন্ত নেই। এই সেদিন মনিলালের হঠাৎ মৃত্যুর জন্যে ছবি তোলার কাজে নানা গোলমাল হয়ে গেলো ; এখন আবার শুনছি, কুমারের নাকি ভারী অসুখ—ষ্টুডিয়োও আসতে পারে নি ক'দিন। একটা মাত্র সেট হয়ে গেলেই ছবি শেষ হয়, কিন্তু উপায় নেই। জীবনকুমার ষ্টুডিওতে এলেই "আশিয়ানা" শেষ হবে।

* * *

মুখুজ্জ্যে মশাই কোলকাতার বাইরের কাজ শেষ করে সহরে ফিরেছেন। টলিউডের ধারে এখন খুব ঝম ঝম ঝুমুরের আওয়াজ আর হিন্দুস্থানী "তরুণী"-দের মিষ্টি গলার গান বেশ শোনা যাচ্ছে। কর্ম্মিৎকর্ম্মা লোক মুখুজ্জে মশাই—"মডার্ণ লেডীর" মহলা প্রায় শেষ হয়ে এল।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

"সোনার সংসার"এর ট্রেনদৃশ্য গুলো সহরের অনতিদূরে এক পল্লী ষ্টেশনে এখন তোলা হচ্ছে। ষ্টেশনের কাছাকাছি যায়গায় একটা ফ্যাক্টরী-দৃশ্য তোলা হবে।

* * *

এদের পারস্য-ছবি "লাইলা মজনু" পারস্য দেশে মুক্তির ব্যবস্থা করা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজের প্রয়োজনে মিঃ থেমকা ছবির পরিচালক মিঃ স্পেণ্টা এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়ার পক্ষে মিঃ জালানকে পারস্য দেশে পাঠাবার ঠিক করেছেন।

* * *

"বাগী সিপাহী"র জমকালো দরবার সেট তৈরী হয়েছে—শীঘ্রী ক্যামেরায় তাকে ধরা হবে।

ডি-জি টকিজ

এদের "দ্বীপান্তর" আসছে শনিবার ১৮ই জুলাই "শ্রী"তে মুক্তিলাভ কোরবে। ডি-জির পরিচালনা আর উষারাণী-প্রমুখ গুণী শিল্পীদের সমন্বয়ে তোলা 'দ্বীপান্তর'র যে সাধারণকে খুশী কোরবে তা আমরা বলতে পারি।

রাধা ফিল্মস

শ্রীযুক্ত হরিভঞ্জ সম্প্রতি এই চিত্র-প্রতিষ্ঠানে পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন এবং হিন্দি "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি তিনি এই বই খানার চিত্রনাট্য নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

"নীহারিকা"র ভূমিকায় দেখা যাবে শ্রীমতী কানন বালাকে।

* * *

পরিচালক ফণিবর্ম্মার কর্ম্মকুশলতায় "বিষ-বৃক্ষের" কাজ দ্রুত বেগে অগ্রসর হচ্ছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরচিত দু'একটি গান বাদে চিত্রের অন্যান্য গানগুলি রচনা করেছেন অখিল নিয়োগী।

* * *

'অভয়ের বিয়ে'-র আনুষঙ্গিক কাজ নিয়ে পরিচালক শ্রীযুক্ত তড়িৎ বসু যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাতে মনে হয়—যে কোনো প্রথম শ্রেণীর ঘটকও তাঁর কাছে হার মানবে।

(অবশিষ্টাংশ ১৩ পৃষ্ঠায়)

বিবিধ

বেঙ্গল ইমিউনিটি

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাংলা দেশ ভারতের কয়েকটি প্রদেশের তুলনায় এখনও হয়ত পেছনে পড়ে আছে, কিন্তু হাওয়া যে এদেশের ফিরেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে যে সব ব্যবসায়ে ও উৎপাদন-শিল্পে সাধারণ বণিক বুদ্ধির বেশী কিছু প্রয়োজন হয় সেখানে বাংলা দেশ প্রথম থেকেই অপ্রতিদ্বন্দী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাধারণতঃ জৈব বিজ্ঞান মূলক ঔষধ প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানের কথা ধরা যেতে পারে। ব্যবসা বুদ্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সংযোগের ফলে বাংলা দেশের ঔষধ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ভারতে অদ্বিতীয়। জৈব বিজ্ঞানমূলক ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণায় ও সে ঔষধ উৎপাদন করার ব্যবসায়ে বাংলায় 'বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী' ভারতের মধ্যে অগ্রণী। ১৮ বৎসর আগে এদেশের চিকিৎসকদের সেরা ভ্যাক্সিন প্রভৃতি জৈব বিজ্ঞানমূলক ঔষধের জন্য সম্পূর্ণভাবে বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হত। গত মহাযুদ্ধের সময় বিদেশী মাল আমদানীর অসুবিধা হওয়ায় নিজেদের অসহায় অবস্থা গভীরভাবে উপলব্ধি করে এখানকার চিকিৎসা-জগতের শীর্ষ-স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি জৈব বিজ্ঞানমূলক ঔষধ এ দেশেই প্রস্তুত করার জন্য এই 'বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী' গঠন করেন। স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বি সি রায়, পরলোকগত ডাঃ পি নন্দী প্রভৃতি সে কোম্পানীর ডিরেক্টারদের বোর্ডে ছিলেন। এই শিশু প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু নানা কারণে তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ক্যাপ্টেন এন এন দত্ত সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে যখন এই কোম্পানীর ভার গ্রহণ করেন তখন প্রতিষ্ঠানটির খসেমিরে অবস্থা বললেই হয়। সেই মুমূর্ষু প্রতিষ্ঠানটিতে প্রাণ সঞ্চার করে যিনি তাকে বর্ত্তমান সমৃদ্ধি ও সাফল্যের স্তরে নিয়ে এসেছেন তাঁর অসাধারণ পরিচালনা শক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। বেঙ্গল ইমিউনিটির প্রস্তুত ঔষধ বর্ত্তমানে বিদেশী উচ্চশ্রেণীর যে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে শুধু যে সমকক্ষতা দাবী করতে পারে তা নয়, অনেক বিষয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিচালিত কোপেন হাগেনের ষ্টেট সিরাম ইনষ্টিউটের মত আন্তর্জ্জাতিক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানও স্বীকার করেছে। বহুমূত্রের ঔষধ ইনসুলিন এতদিন সূচিমুখেই প্রয়োগ ছিল। বহুদিন ধরে এই ঔষধটি শুধু সেবন করিয়েই যাতে ফল পাওয়া যায় তেমন ভাবে প্রস্তুত করবার চেষ্টা নানা দেশে হয়েছে। বেঙ্গল ইমিউনিটি প্রথম এ চেষ্টায় সফলতা লাভ করেছে। বেঙ্গল ইমিউনিটির ও রালিন বা ফস্ফোটানেষ্টে অফ ইনসুলিন বিলাতের লণ্ডন হাসপাতালেও ব্যবহৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। বেঙ্গল ইমিউনিটির ঔষধের বাজার এখন ভারতের বাইরে ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাঁদের গবেষণাগার বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় আধুনিক উন্নত সকল প্রকার যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সাহায্যে সেখানে নিত্য নানা নূতন দিকে রোগ ও ঔষধ নিয়ে পরীক্ষা চলেছে। বরানগরে বিশাল এলাকার মধ্যে তাদের গবেষনাগারের বিভিন্ন বিভাগ ও বিরাট পশুশালা সত্যই দর্শনীয় বস্তু।

ঔষধের যে উৎকর্ষ কোম্পানী বরাবর বজায় রেখে এসেছেন তাঁদের ব্যবসায়ের অসাধারণ সাফল্যের তাই মূল ভিত্তি। পৃথিবী ব্যাপি অর্থ নৈতিক দুর্দ্দশার ভেতরেও ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ পর্য্যন্ত বেঙ্গল ইমিউনিটি শতকরা ১৫৲ টাকা লভ্যাংশ দিয়েছেন, তারপর ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দিয়েছেন শতকরা ২০৲ টাকা।

গত ১০ই জুলাই এই কোম্পানী অষ্টাদশ বৎসরে পদার্পণ করেছে। প্রতিষ্ঠা-দিবস বার্ষিকী উপলক্ষেও বরানগরের পরীক্ষাগার ভবনে যে অনুষ্ঠান হয় বহু গণ্য মান্য লোকের উপস্থিতিতে তা স্বার্থক হয়েছে। নিমন্ত্রিতদের পরীক্ষাগারের বিভিন্ন বিভাগ দেখিয়ে প্রচুর জলযোগ ও সঙ্গীতের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

বাংলার এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই কামনীয়।

কবিরাজ সত্যব্রত সেন

বিগত উপনির্ব্বাচনে কলুটোলা কেন্দ্র হইতে কবিরাজ সত্যব্রত সেন কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউনসিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সদাইদাকে আমাদের প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

চক্রতীর্থ

চক্রতীর্থের পঞ্চম অধিবেশন গত ১২ই জুলাই রবিবার ১১নং চক্রবেড়িয়া রোড সাউথে হইয়া গিয়াছে। ঐদিন সভায় বহু শক্তিশালী তরুণ সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে সুসাহিত্যিক বিমল মিত্র, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচক হীরালাল দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল সরকার, অনুপমকৃষ্ণ বসু, রবীন্দ্রকুমার বসু, রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যনাথ মজুমদার, উমাপদ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্ম্মলেন্দু রায়, জয়েশচন্দ্র লাহিড়ী, ক্ষীরোদবরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

তরুণ প্রবন্ধ লেখক অমূল্যকুমার সিংহ এম, এ, "সভ্যতার গতি ও প্রকৃতি" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত দার্শনিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ ঐ প্রবন্ধটির সমালোচনা করিয়া ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র ও আর্য্য

সংস্কৃতির উপর একটি সরস গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দেন। বিমল মিত্র ও হীরালাল দাশগুপ্ত প্রবন্ধটির উচ্চ প্রশংসা করেন। তৎপরে কবি করুণাময় বসু তাঁহার একটি স্বরচিত "ভাঙ্গা-সেতু" শীর্ষক সুন্দর mystic কবিতা আবৃত্তি করিয়া শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করেন।

রাজবন্দী শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য্য

রাজবন্দী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি তাঁহার অন্তরীণাবাস খুলনা মুলঘর হইতে কলিকাতায় আইন পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি জেলে অবস্থানকালে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং শুনা যায় যে তিনি বেশ ভালই আছেন।

সাহিত্য-সংসদ

গত রবিবার ১২ই জুলাই সমবায় ম্যান্সনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ অরিয়েন্টাল আর্ট গৃহে উক্ত সংসদের প্রাথমিক সভা হইয়া গিয়াছে। রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযতীন ভট্টাচার্য্য ("আনন্দবাজা"র-পত্রিকার বাণিজ্য-সম্পাদক) এবং শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

মিস বেলা সরকার

শ্রীমতী বেলা সরকার যুক্ত-প্রদেশের আগামী কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর সুকুমার শিল্প ও সঙ্গীত বিভাগে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এই প্রদর্শনী লক্ষ্ণৌএ হইবে।

মিস বেলা সরকার

ইনি ইতিপূর্ব্বে নিখিলবঙ্গ ও নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

এই ভারতীয় কোম্পানী খুব বেশীদিনের নহে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বিগত ২৩ বৎসরে যে ধীর অথচ স্থির পদক্ষেপে ইহারা উন্নতির পথে চলিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। ১৯৩৫ সালে তাঁহারা ৮৩,৫৩,২৫০৲ টাকা এবং ৫০০ পাউণ্ডের কাজ করিয়াছেন। হিসাব হইতে দেখা যায় যে, আলোচ্যবর্ষে জীবনবীমার ফণ্ড টাকা ৫৩,৩৬,১৪৬৮১ পাই হইতে টাকা ৬২,৯১,৯৩৭৮৴৬ পাই হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন টাকা ১,২৮,৮০৩।৵১০ পাই রিজার্ভ ফণ্ড ও টাকা ১,০৪,৩৯০৲ স্পেশ্যাল ইনভেষ্টমেণ্ট রিজার্ভ ফণ্ডও আছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

রূপ-তরঙ্গ

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

"পরপারে"

চন্দ্র ফিল্মসের "পরপারে" যে চিত্রামোদী সাধারণের সমাদর পেয়েছে তা আজ কাকেও বলে দিতে হবে না। সব দিকেই প্রায় নিখুঁত এই ছবি যে বাঙ্গালীকে সন্তুষ্ট কোরতে পারবে সেতো আমরা আগেই বলেছি। দেশী ছবিতে সাধারণতঃ যে সব দোষ-ত্রুটি থাকে তার অনেকগুলোই এ ছবিতে নেই; বিশেষ কোরে আমাদের দেশে তোলা ছবিতে ল্যাবোরেটারীর কাজ প্রায় খারাপ হয় কিন্তু "পরপারে"তে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওর কর্ম্মী শ্রীকুলদারঞ্জন রায় যে সুন্দর ল্যাবোরেটারির কাজ কোরেছেন তার জন্যে তিনি ধন্যবাদ পেতে পারেন।

* * *

ছায়াছবিতে ছোট ছোট অংশে যারা নামে সাধারণতঃ সমালোচনার সময় তাদের নামে "ভাল" কিম্বা "ভাল নয়" বলেই কাজ শেষ করা হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ছোট ছোট চরিত্রে এক এক সময় এমন সুন্দর টাইপ-চরিত্রোপযোগী অভিনয় দেখা যায় যে ঐটুকু লিখেই শেষ করা যায় না। "পরপারে"-তে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের উকিল শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু "এ্যাডভোকেট-জেনারেল"এর অংশে যে সুন্দর অভিনয় কোরেছেন তা সত্যিই তারিফ করার মত।

"কান্টি গাল"

ডি-জির পরিচালনায় তোলা ছবি "কান্ট্রি গার্ল" যাদের জন্যে তৈরী তারা যে এ ছবি দেখে বেশ খুশী হোয়েছে তা বলাই বাহুল্য। "কান্ট্রি গার্লে" এদের এতো আকর্ষণের কারণ হচ্ছে তাদের মনের মত নানা চোখ-ধাঁধানো "খেল"। এই "খেল" যারা দেখিয়েছে তাদের মধ্যে শ্রীসুধীরকুমার সরকারের নামও উল্লেখযোগ্য। সুধীরবাবুর অতি দ্রুত মোটর চালানো এ ছবিতে বেশ একটি চাঞ্চল্য এনে দেয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

আই-এফ-এ শিল্ড খেলা

দৈনিক দলের খেলা শেষ হয়ে গেলো বটে—লিগ তো আগেই শেষ হোয়েছে—কিন্তু কোলকাতার ময়দান এখনো ফুটবলে সরগরম। আই-এফ-এ শিল্ড খেলা আরম্ভ হয়েছে গেল বুধবার থেকে। এবার আই-এফ-এ শিল্ডে খেলার জন্যে বাংলার প্রায় প্রতি জেলা থেকে এবং বাংলার বাইরে থেকে অনেক সিভিল টিম নাম দিয়েছে—এইটেই এবারের শিল্ড খেলার বিশেষত্ব। যারা নাম দিয়েছে তাদের কার কি-রকম ক্ষমতা আমাদের অজানা থাকলেও এ কথা বুঝতে বিশেষ দেরী হয় না যে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কোলকাতার তৃতীয় ডিভিসন লিগ খেলারও অনুপযুক্ত। অবিশ্যি honourable exception যে নেই তা নয়। কোলকাতার মাঠে আই-এফ-এ শিল্ডে খেলার যে একটা অদম্য মোহ আছে তার ফলেই অনেকে আসে কোলকাতায় খেলতে; কিন্তু কারোর কারোর অবস্থা কি হয় তা একবার ইষ্টবেঙ্গল—ভিক্টোরিয়া (ঢাকা) এবং ডালহৌসি—এম-এস-ক্লাব (বনগাঁ) খেলা দুটোর ফলের দিকে নজর দিলে বেশ বোঝা যাবে। আমরা ফলাফলের দিকে আঙুল দেখিয়ে এদের নিরুৎসাহ কোরতে চাই না, কিন্তু একটা কথা আবার না বলেও পারি না। কোলকাতায় এসে একেবারে আই-এফ-এ শিল্ড জয় করার চেষ্টা না কোরে এরা তো ছোট ছোট খেলাগুলোতে নাম দিয়ে ভাগ্য এবং শক্তি দুইই পরীক্ষা কোরতে পারে! আমাদের মনে হয় এইটেই এদের উচিত। তারপরে আরো দেখা যায় যে, এমন দু-একটা দল আছে যারা দেশী দলগুলির সঙ্গে খেলায় চমৎকার খেলে থাকে, কিন্তু বুট-পরা কারোর সঙ্গে খেলা পড়লে শোচনীয়-ভাবে হেরে যেতে হয়। এর তাজা দৃষ্টান্ত খুলনা ইউনিয়ন স্পোর্টিং—সিক্সথ ফিল্ড ব্রিগেডের খেলা। খুলনা দলের খেলোয়াড়রা বেশ ভাল খেলে কিন্তু বুটের ভয়ে দশহাত তফাতে সরে যায়। এদের হয় সাহস করে বুটের সামনে এগিয়ে গিয়ে খেলা উচিত, আর নয় তো, আই-এফ-এ শিল্ড বা যেখানে কোন বুটপরা দলের যোগ দেওয়া সম্ভাবনা আছে সেখানে না যাওয়া। কেন না, ভাল খেলেও অকারণে অনবরত হেরে গেলে সুনাম-হানির যথেষ্টই সম্ভাবনা। আশা করি খুলনা দলের কর্তারা আমাদের কথা বন্ধুভাবেই নেবেন।

এ-বছর আই-এফ-এ শিল্ড খেলায় আর একটা বিশেষত্ব যে প্রায় নামকরা সব সৈন্য-দলই খেলবে। বিশেষ কটা দল ছাড়া অপর অনেকগুলোই আমাদের অপরিচিত, কাজেই ওদের সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই এখন না করা ভাল।

লিগ খেলার সময়ে অনেক ভাল ভাল খেলার ফলাফল রেফরীর অবিচারের জন্যে উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মজার কথা হচ্ছে যে কোলকাতায় বেশ ভাল পরিচালকের অভাব নেই। শিল্ড খেলার সময় যাতে বাজে রেফরীকে দিয়ে কোন ভাল খেলা না পরিচালিত হয় সেদিকে আই-এফ-এ এবং রেফরীজ এসোসিয়েসনের কর্তাদের সতর্ক থাকা দরকার। এই দু-বছর আগেও মাত্র রেফরীর খামখেয়ালী মেজাজের জন্যে শিল্ড-ফাইনাল খেলা পণ্ড হয়েছিল। পুনরায় সেই দুরবস্থার সৃষ্টি যেন না হয়—ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ খুবই আশা করে।

গেলো ১৪ই জুলাই মঙ্গলবার পর্যন্ত শিল্ড-খেলার ফলাফল :—

প্রথম রাউণ্ড

খুলনা টাউন—সিটি এথলেটিক	৩—০
ডালহাউসী—এম-এস ক্লাব	৭—০
হাওড়া ইউনিয়ন—নেপিয়র	২—০
ই বি রেলওয়ে—পুলিশ	৩—২
ইষ্টবেঙ্গল—ভিক্টোরিয়া স্পোঃ	৯—০
কালীঘাট—স্পোর্টিং ইউনিয়ন	১—০
ইউনিয়ন স্পোঃ (খুলনা)—হুগলী	২—০
জামসেদপুর—দানাপুর	২—১
ফরিদপুর—কুমিল্লা	১—০

এরিয়াঙ্গ—মুঙ্গের	২—১
কাষ্টমস্—মাড়োয়াড়ী	১—০
ভবানীপুর—কুমারটুলী	১—০
ঢাকা টাউন—জর্জ্জ টেলি	৩—২

দ্বিতীয় রাউণ্ড

৬নং ফিল্ড ব্রিঃ—ইউনিয়ন স্পোঃ (খুলনা)	৪—০
ব্ল্যাকওয়াচ—ওয়ারী এ সি	২—০
পি. ডব্লিউ ডল—বিসেট ইনষ্ট	৪—০
সি. এস, সি—নরফোক	১—০
৫২নং এল আই—টাউন ক্লাব (কমিঃ)	৬—০

ফুটবল খেলা ও বাঙ্গালী

এ বছর কোলকাতার প্রথম ডিভিসন বল লিগ খেলায় বাঙ্গালী দল বলতে ছিল—মোহনবাগান, এরিয়াঙ্গ, ইষ্টবেঙ্গল, কালীঘাট। মোহামেডান দলকে আমরা বাঙ্গালী বলতে পারি না; কেন না, সত্যি কথা বলতে ঐ দল সারা ভারতবর্ষের খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী। ওদের বরং নিখিল ভারত মুসলিম দল বলা যেতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে যে, কিছুদিন আগেও উপরোক্ত, চারটি দলে খেলোয়াড়রা সকলেই বাঙ্গালী ছিল। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে যে মোহনবাগান এবং এরিয়াঙ্গকে বাদ দিলে অপর দুটী দল অবাঙ্গালী খেলোয়াড়েই ভর্ত্তি। এত অবাঙ্গালী খেলোয়াড়ের আমদানীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কারোর প্রথম ডিভিসনে জীবন রক্ষে করার উপায়, আর কারোর বা লিগ বিজয় করার অসম্ভব প্রচেষ্টা। অবাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে হয়তো প্রথম ডিভিসনে আয়ু রক্ষে করা যায়, কিন্তু অপর উদ্দেশ্যের পিছনে যারা ছুটে চলেছে তাদের সে আশা কোন দিনই সফল হবে বলে মনে হয় না। এ-কথা নিশ্চয়ই সকলে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অবাঙ্গালী খেলোয়াড় আমদানীর মোহ যে ঘুচছে না কেন সেটা দুজ্ঞের্য় রহস্য। অবিশ্যি বিশেষ প্রয়োজন হলে দু-একজন অবাঙ্গালীকে খেলতে দেওয়া উচিত স্বীকার করি, কিন্তু মাঠে কোন বাঙ্গালী টিম নামলে যদি দেখা যায় তার এগারো জনের মধ্যে আট কি ন'জনই অবাঙ্গালী, তা হলে একান্ত দুঃখের কথা নয় কি? এ কথা বোঝা উচিত যে এতে বাঙ্গালী ছেলের ফুটবল খেলার ক্ষতি হয়। এরিয়াঙ্গের স্বর্গত দুখীরাম বাবু এই জন্যে হাজার বিপদে পড়লেও কখনও অবাঙ্গালীকে দলে না নিয়ে বাঙ্গালী ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে দলের নাম বজায় রেখে গেছেন। বাঙ্গালী ছেলেরা খেলা শেখার যদি ভাল সুযোগ না পায় আর এমনিভাবে অবাঙ্গালী খেলোয়াড়ের আমদানী যদি অপ্রতিহত গতিতেই চলে—তবে কিছুদিন বাদে ফুটবল খেলায় বাঙ্গালীর যে সুনাম আছে তা লোপ পেতে বাধ্য। কালীঘাট এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের কর্ত্তারা এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখবেন কি?

ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রীকেট দলের দ্বিতীয় বিজয়

ভারতীয় ক্রীকেট দল এতদিন পরে আবার একটা খেলায় জিততে পেরেছে।

আয়র্ল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায় ভারতীয় দল ১০ উইকেটে স্থানীয় দলকে হারিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় দলের পক্ষে বিজয় মর্চেন্ট দ্বিতীয় ইনিংসে সুন্দরভাবে বেশ ধীর হয়ে খেলে ৭১ রাণ করে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট ছিলেন।

তৃতীয় রাউণ্ডে মোহনবাগান

গেল কাল বুধবার দ্বিতীয় রাউণ্ড খেলায় মোহনবাগান এরিয়ান্স দলকে ২—০ গোলে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে উঠেছে।

ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘ

আসছে শনিবার ১৮ই জুলাই এই সঙ্ঘের খেলার মাঠে এই সঙ্ঘের পরিচালিত "নীরোদ মেমোরিয়াল লীগের" পুরস্কার বিতরণ সভার অনুষ্ঠান হবে। লীগে যে-যে দল খেলেছিল তাদের সকলকার মধ্যে বাছাই করা দুটী দলে একটি Exhibition খেলাও হবে। সাধারনের উপস্থিতি এঁরা কামনা করেন।

সম্পাদকের আপিসে

(ছোট গল্প)

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র

পত্রিকার বৎসর শেষ হইয়াছে। সেইজন্য সম্পাদক মহাশয় নূতন বৎসরকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পত্রিকার মলাটে কার আঁকা ছবি দেওয়া যাইবে, কাহার নিকট হইতে লেখা চাওয়া যায়, কাহার নিকট বৎসরের চাঁদা বাকী পড়িয়াছে, পত্রিকার সাইজটা একটু পরিবর্ত্তন করিলে কিরূপ হয় আরও কত কি কাজ। চারিদিকে খাতা পত্র, ছবি কাগজ ইত্যাদি ছড়ানো রহিয়াছে। এমন সময় চোখের সামনে একখানি কাগজ কে যেন আগাইয়া দিল। মুখ না তুলিয়াই তরুণ সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞের মত বলিলেন—লেখা বুঝি?.........

অন্য দিন নিয়ে আসবেন, আজ আমি বড় ব্যস্ত; দেখবার সময় নেই।

—একটী ছোট্ট কবিতা; বেশী সময় লাগবে না; মিনতিভরা নারীকণ্ঠের কথাগুলি সম্পাদক মহাশয়কে চকিত করিয়া তুলিল!

মুখ তুলিয়া সম্পাদক মহাশয় দেখিলেন; চোখে সোণার ফ্রেমের চশমা পরিহিতা, এলোখোপা করা এক সুন্দরী তরুণী; হাতে একটী ছোট কবিতা।—মাপ করবেন; আমি বুঝতে পারিনি। কি কবিতা দেখি!

তরুণী কবিতাটি আগাইয়া দিল।—"আমি যারে ভালবাসি" ইহাই ছিল কবিতাটির নাম। প্রতিটি লাইনে প্রেমের হা হুতাশের উচ্ছ্বাস। কবিতাটি পাঠ করিয়া হাসিয়া সম্পাদক মহাশয় বলিলেন কবিতাটি ছাপা হবে।

—ধন্যবাদ।

তৎপূর্ব্বদিনকার পত্রিকায় ঐ সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"আমাদের দেশের লেখক লেখিকাদের প্রেমের কবিতা ও গল্পগুলি থার্ড ডিভিসনে পাশ করা ছেলের মত, "থার্ডক্লাশ" ঠিকা গাড়ীর ঘোড়ার মত, রাস্তার ধারের আবর্জ্জনা পূর্ণ ডাষ্টবিনের মত, দুর্গন্ধ-ময় অন্ধকার গলির মত; সেইজন্য আমরা সে সকল গল্প কবিতা ছাপার অক্ষরে বাহির হইতে না দিয়া লেখকদের নিকটই ফেরৎ পাঠাইয়া দিব—"

—কখন ছাপা হবে? ধীর কণ্ঠে তরুণী জিজ্ঞাসা করে!

—শীঘ্রই যাতে ছাপা হয়, তার চেষ্টা ক'রবো।

ঠিক এমনি সময় হাতে একখানা কাগজ লইয়া একজন সুবেশধারী তরুণ সম্পাদকের আপিসে প্রবেশ করিল।

প্রথমে সম্পাদককে একটি ছোট্ট নমস্কার করিয়া তরুণীর দিকে ফিরিয়া বলিল—কি নীলিমা, কি লেখা দিতে এসেছো দেখি।

তরুণী কবিতা লেখা কাগজটি টেবিল হইতে তুলিয়া তরুণের হাতে দিল। তরুণ কবিতাটি পাঠ শেষ করিয়া তরুণীর পানে চাহিয়া হাসিল; তারপর সম্পাদক মহাশয়ের পানে ফিরিয়া বলিল আমার কবিতাটি একটু দেখুন ত'। কবিতাটির নাম—"সে মোরে বাসেকি ভালো?" সম্পাদক হতভম্ব। দুই তরুণ ও তরুণী লেখার মধ্য দিয়া একে অপরকে জানাইয়া দিতে চাহিয়াছে—আমি তোমায় ভালবাসি। কবিতার উপাদান দুইটি সম্পাদক মহাশয়ের চোখের সামনে।

—ছাপবো।

তরুণ ও তরুণী মৃদু হাসিয়া সম্পাদককে নমস্কার করিল।

—চলুন অজিত দা।

—চলো!

* * *

পত্রিকার পাশাপাশি দুইটি লেখা ছাপা হইয়াছিল। তাহার একমাস পরে সম্পাদক মহাশয় বিবাহের দুইখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন—একখানি নীলিমার নিকট হইতে; অপরখানি অজিতের নিকট হইতে।

অজিত ও নীলিমার নবীন জীবন, সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহে সুখময় হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ

শ্রীগণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলা দেশ ছাড়িয়ে সুদূর উত্তর পশ্চিমে,......হাঁ মরুভূমিই বটে, তবু সে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জায়গা; চিরদিন এরই বুকে নির্ম্মিত হয়ে এসেছে ভারতের রাজধানী, এমন কি, আজও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

দিল্লী......

সুরমাকে নিয়ে সমীর বিকেলবেলা ট্রেণ থেকে নামলো। ট্রেণের ঝাঁকানি খেয়ে সুরমার সুন্দর মুখখানিতে শুষ্ক মলিনতা নেমে এসেছে।

সমীর ষ্টেশনটাকে এক পলকে ঘুরে দেখে নিলে। না, কুলির কোনই দরকার নেই। মাত্র একটা সুটকেশ আর একটা বেডিং, তা' সে অনায়াসেই পুরুষত্বের খাতিরে নিয়ে যেতে পারবে। নাঃ, এ দেখছি আমাদের দেশের মত পুরুষেরা দুর্ব্বল নয়। মেয়েরা ভীতু নয়,—সহজ গতি, সন্দিগ্ধহীন স্বাধীনতা।

—'এখানে আবার এতটা ঘোমটা কিসের?' মুখ বেঁকিয়ে সমীর চাপা গলায় বেজে উঠলো, 'গাড়ীতে সমস্তক্ষণ আমায় জালিয়েছ, সেটা ছিল নয় আমারই অসুবিধে, কিন্তু এখানে কি শেষকালে হোঁচট খেয়ে নিজের অসুবিধেটাই দেখাতে চাও এত লোকের মাঝে? ঘরের বউ যদি, তবে বাইরে আসবার কি দরকার ছিল?'

সুরমা সমীরকে অনুসরণ করে চললো। মুখে কথাটি নেই।

ষ্টেশনের বাইরে বেরিয়ে সুরমাকে নিয়ে সমীর একটা টাঙার উপর এসে বসলো।

—'কাঁহা বাবু?'

'—সিধা আগ্রা হোটেল।'

টাঙা ছুটে চলেছে।—'দেখো যেন পড়ে যেও না, বেশ শক্ত ক'রে ধ'রে থেক, বুঝলে? ঘরের বউ বাইরেত কখনও বেরোওনি, এসব জানবে কি।...ঘোমটা, খালি ঘোমটা;—মুখখানা ছাপিয়ে ফেলবে দেখছি।...জঞ্জাল... যত সব সৃষ্টি।'

টু-সিটেড একখানা কামরাই নিতে হল। সুরমার মাথায় টক্‌টকে লাল সিঁদুর। সে সিঁদুরের সম্মানের জন্যই সমীর পরস্পরের সম্বন্ধটুকু ছলনায় বন্দী রাখলে একখানা কামরার ভেতর।

—'নাও আর দাঁড়িয়ে কেন, জবড় জঙ্গল গুলোকে পরিত্রাণ দিয়ে নিজেকে এবার একটু শান্তি করবার চেষ্টা করো।'

বলে সমীর মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলে সুরমার আনত দুটি চক্ষু, মাঝে সিঁদুরের একটি লাল টিপ। বেশ দেখিয়েছে!

সমীর কাছে সরে এসে মাথার কাপড়টা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিতেই দু'চোখের দুটি দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সমীরের মুখের উপর—স্থির, অশরীরী অসহায়ের করুণ প্রার্থনা। ঢল ঢল কচি মুখখানিতে ভেজা ভেজা ভয়—অনাগত কাতরতার প্রতীক্ষায় কম্পিত বিহ্বলতা।

—'বাড়ীর জন্যে বুঝি খুব মন কেমন করছে? সমীরের গলায় সহানুভূতির আভাষ, আদরের আভাষ।

কিছুক্ষণ একেবারে নিস্তব্ধ। ঘরের আবহাওয়া দূরের মায়ায় ঘনীভূত। সমীর ডাকলো, 'সুরমা—!'

সুরমার চোখ দুটি চকমকিয়ে উঠলো।

—'বাড়ী যাবে সুরমা?'

সুরমা কথা কইতে পারলে না। মুখের সৌন্দর্য্যে স্পন্দিত হয়ে উঠলো কান্নার সুর, পাতলা ঠোঁট দুটি কুঞ্চিত হয়ে কেঁপে উঠলো; নিজেকে সামলাতে পারলে না,—সমীরের বুকের ভেতর ব্যগ্র বাহুবেষ্টনে মুখখানিকে সে লুকিয়ে নিলে; এলিয়ে দিলে নিজেকে শুদ্ধ করে সমীরের হাতে।—কান্নার দমকে সমস্ত শরীরটা তার কাঁপছে। থেকে থেকে উথলে উঠছে।—শাড়ীর গন্ধ, সমস্ত উষ্ণতা, কম্পনতা সমীর অনুভব করলে দেহে মনে সুরমার ঘনীভূত সংস্পর্শে।

—'ছিঃ—কেঁদনা সুরমা! চল তোমাকে আমি রেখেই আসি।—যাবে?' সুরমা কাঁদতে লাগলো।

সন্ধ্যার আবছায়া একটু একটু ক'রে ঘরখানিকে তখন অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। সমীর আস্তে আস্তে সুরমার আবেষ্টনী হতে নিজেকে মুক্ত করে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

অদূরে যমুনা নদী—

শীতের ঝরঝর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। দূর বনানীর কোলে স্তরে স্তরে ধূসরতার মেঘ উঠছিল জমে।—কোথায় বাঙলা দেশ আর কোথায় সে!—শীতের হাওয়ায় বরফের শীতলতা, শ্যাম্পেনের মত নেশায় মাতোয়ারা;—আমেজ, রঙীন আমেজ তীব্র আমেজ—সমীর অভিভূত হয়ে পড়লো,—ডুবে গেল তন্ময়তার গভীর জলে; থৈ পায় না, গভীর হ'তে গভীরতর।—পাতালের দিকে সোঁ সোঁ করে নেমে যাচ্ছে। মাটিতে এসে পা ঠেকলো যখন, তখন নেশার সে উগ্রতা নেই,—আছে স্নিগ্ধতা, নেমে এসেছে স্নায়ুতে স্নায়ুতে স্বপ্নের মাদকতা—দূরে দূরে—বহুদূরে, ছেড়ে-চলে-আসার দেশে আত্মীয়তা-বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে আত্মহারা মুক্তি। পিছনে হাতছানি দিয়ে—ওই অতি পরিচিত মাটির দেবতা মুখ ফুটে ডাকে—ওরে ফিরে আয়, আপন ঘরে ফিরে আয়!—তুলসী মঞ্চ—

সন্ধ্যায় দীপ হাতে, ঘোমটার আবরণে বধূরা—যেন মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যা,—চোখে পবিত্রতার স্বপ্ন—সলাজ পদক্ষেপ : সুরমা, বাংলার বধূ সুরমা—ব্যক্তিত্ব নেই, গাম্ভীর্য্য নেই—অসহায়, হাঁ রীতিমত অসহায়—না না এ অসহ ; সুরমা সুন্দরী, রূপসী—তার রূপ সৌন্দর্য্য ভোগ করবে এক অমার্জ্জিত, গ্রাম্য—নিশ্চয়ই এই প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের আড়ালে ছিল এক দারুণ অবিচার।—ভালই করেছে সে ; ঈর্ষা, হাঁ ঈর্ষাই দিয়েছে তাকে প্রেরণা আর নারীর রূপের মোহই তাকে দিয়েছে শক্তি—তার গ্রাম্যবন্ধু, বাল্যবন্ধু নিতাইকে প্রবঞ্চনা করতে। সুরমাকে চুরী করেছে সে।—বেশ করেছে,—ওরই রূপের মায়ায় সে মুগ্ধ হয়ে আজ চরিত্রহীন সেজেছে ; তার সকল প্রতিভা, তার সকল আদর্শ আজ ওরই রূপের কারাগারে বন্দী হয়ে নির্জীব হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে।—পরস্ত্রী হরণ, নাঃ ঠিকই করেছে সে—এ পাপ নয়, এর প্রায়শ্চিত্ত নেই ; এ প্রতিশোধ, এ ন্যায়বিচার।—

—'বাবু, আপনাদের কিছু দরকার আছে কি ?' অন্ধকারে কখন 'বয়' এসে ওর চিন্তাস্রোতে ধাক্কা মারলে।

—না হতে পারে না, সুরমাকে সে যেতে দেবে না—শত অনুরোধ উপরোধেও না ;—অবলম্বনহীন হয়ে যাবে সে, এই দূর প্রবাসে কি আশায়, কার ভরসায় সে অহরহ নিজেকে সান্ত্বনা দেবে !—সমস্ত জীবন তার নষ্ট হয়ে যাবে, হয়েছে, অবলম্বন না থাকলে আরও হয়ে যাবে—রিক্ততায়, শূন্যতায় সে পাগল হয়ে যাবে—

—'বাবু আপনাদের কিছু দরকার আছে কি ?'—'বয়' এবার একটু বেশ জোরের সঙ্গেই বললে।—'এ্যা', সমীর চমকে উঠলো, ধীরে ধীরে জেগে উঠে বললে, 'না কিছু দরকার নেই।'

'বয়' চলে যাচ্ছিল ; সমীর ডাকলে,—'বয় !'

বয় ফিরে দাঁড়াল ; আদেশের প্রতীক্ষায় বাবুর মুখের পানে চাইল। সমীর কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলে সেই জানে, তারপর জ্রূ দুটো কুঁচকে বললে, 'আচ্ছা, তুমি এখন যাও ; দরকার পড়লে পরে ডেকে নেবো তখন।'

বয় চলে গেল। সমীর খানিকক্ষণের জন্য নিরুপায় হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল ; পরে একসময়ে শশব্যস্তে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো।°

অন্ধকার ঘর। কিছুই দেখা যায় না। দেশলাই জেলে সুইচ টিপে দেবামাত্র তীব্র আলোকে ঘরখানা দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। দেখলে, সুরমা নিথর হয়ে বেডিংটার ওপর বসে আছে। ভাবলে, হয়ত তারই মত অতীত ও অনাগতকে তলিয়ে দেখছে। কিছু বললে না। মনে মনে একটু হাসলে। তারপর বাক্স খুলে তোয়ালেটা আর সাবানটা বার করে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সমীর ঘরে ঢুকলো। তখনও সুরমা আনতমুখে বসে। কাছে সরে এসে সমীর ডাকলে, 'সুরমা'—' !

সুরমা আনত চক্ষু দুটি ওর দিকে তুলে ধরলো।

—'যাও আর বসে থেক না, উঠে হাত মুখ ধুয়ে এস। বাথরুমে গরম জল রাখা আছে। নাও বসে থেক না, ওঠ লক্ষ্মীটি !'

যা' কিছু নেবার,—নিয়ে সরমা চলে গেল।

—সত্যই একি তার অন্যায় ! কুলের বধূকে বার করে এনে সে কি পাপ কাজ করেছে ?—না পাপের অস্তিত্বকে সে স্বীকার করে না, প্রায়শ্চিত্তও মানে না। মানে সে মানুষের অন্তরের প্রয়োজনীয় দাবীকে, তার ন্যায্যপ্রাপ্য স্বাধীনতাকে, তার সুখ, দুঃখ ও আনন্দকে ; আর মানে সে অবিচার ও অনুশোচনাকে।—হাঁ সুরমাকে সে সুখে ও শান্তিতে রাখবে। সুরমা, সুরমা—সুন্দরী রূপসী, সুরমা যদি তার বুভুক্ষিত অন্তরের দাবীকে স্বীকার না করে, যদি তার প্রেমকে অপমানিত করে ?—সমীর উত্তেজিত হয়ে উঠলো। পায়চারী করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো, চোখের তারা দুটো অকস্মাৎ থেমে গেল—তাহলে সে রেখে আসবে ; যে দায়িত্ব নিয়ে সে সুরমাকে ঘরের বাইরে এনেছে, সেই দায়িত্ব নিয়েই আবার সে একদিন তাকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে।—

সাবানের সৌরভ ছুটিয়ে সুরমা এসে ঢুকলো ঘরে। যৌবনমদে অভিষিক্ত মত্ত নারীত্বের উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস ঠমকে ঠমকে চমকে উঠছে প্রতি অঙ্গের রেখায় রেখায়।.........অতিসুন্দর.........অপরূপ !

সমীর পশুত্বে মশগুল হয়ে অকস্মাৎ মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। ব্যাঘ্রের কপিশ চোখের হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে ও চেয়ে রইল লোলুপ দৃষ্টিতে......যৌবন-ফেনময়-রসাধারে—নারীর পুঞ্জীভূত অপ্রতিরুদ্ধ চঞ্চলতাকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে নিঃশেষে সে যেন ঝুরিয়ে ফেলে দিতে চায় তার বুভুক্ষিত দেহাভ্যন্তরে ;—সেই ভোগ হবে পরিপূর্ণ, থাকবে না তাতে কোন অপ্রাপ্তব্য সম্পূর্ণতা।

মনুষ্যত্বের পরিধি হতে সমস্ত চেতনা তার—আক্রোশে ভেঙে পড়লো পশুত্বের ঘন কালো অন্ধকার গুহায়। দিনের আলোর সবটুকু স্পষ্টতা ঘর হতে অপসারিত হল আকস্মিক উদ্দীপনায় ! জমাট আঁধারের বুক চিরে পিপাসিত অশরীরী আকাঙ্খা গুমরে উঠলো তীব্র মাদকতার উত্তেজনায়।..

শিরায় উপশিরায় ছুটে চলেছে—উষ্ণায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। রক্তের-উষ্ণ প্রস্রবন...... উচ্ছলে উঠছে, ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে—আকাঙ্খায় অস্থিপঞ্জরের ওপর।... উষ্ণতায় ঘরের আবহাওয়া থম থম করছে; প্রতিটি নিঃশ্বাসের আর্ত্তনাদ শোনবার জন্য উৎকীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে শীতের হাওয়া.........

মানুষের প্রাণের দাবীর ওজুহাতে—সমীরের সব-কিছু অক্ষমতা,, দুর্ব্বলতা ধরা পড়লো সুরমার কাছে। অজানিত আকস্মিক ব্যবহারে সুরমা বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে সমীরের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সে কাতর দৃষ্টির পিছনে ছিল নারীর অসহায়ত্ব, পুরুষের কাছে নারীর চিরন্তন শক্তিহীনতার করুণ অভিব্যক্তি।

সমীর দেখলে সে-দৃষ্টি অসহ্য, অনিবার্য্য। টিকতে পারলে না, ঘর ছেড়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

দিন দুই পরের কথা............

সেদিন বিকেল বেলা সমীর বারান্দার এক কোণে একটা ইজিচেয়ারের ওপর বসে ছিল। সুরমা যে কখন ওর পিছনটিতে এসে দাঁড়িয়েছে ও তা' টেরই পায় নি।

অনুতাপে ও অনুশোচনায় যে মানুষ ভেতরে ভেতরে এতখানি ক্ষয়ে যেতে পারে—তা সুরমা ভাবতেই পারে না। চোখ মুখ বসে গেছে। আগেকার মত—সে লাবণ্য নেই, সে চাঞ্চল্য নেই।

একখানা হাত সুরমা ধীরে ধীরে সমীরের কাঁধের ওপর রাখলে। সমীর চম্‌কে উঠলো, মুখ ফেরাতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'কে, সুরমা?' সুরমা নিজেকে তুলে ধরলো, 'হাঁ, আমি।' জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছেন?'

—'ভালই আছি সুরমা। কিন্তু আমার জন্যে ভেব না—আমি পাপী, আমায় ক্ষমা করো'—বলতে বলতে উদ্গত কান্নার দমকে ওর কণ্ঠ-পথ বুজে এল। দর দর করে ক' ফোঁটা চোখের জল ওর শীর্ণ গালের ওপর গড়িয়ে পড়লো।

এ কদিন হ'ল 'বয়' কেবল সুরমার জন্যই খাবার দিয়ে যায়। সুরমা জিজ্ঞেস করলে সমীর বলে, 'নীচে গিয়ে আমি খেয়ে আসি।'

কিন্তু এ গোপনতা চাপা রইল না। 'বয়ের' কাছ থেকে জানলে যে অসুস্থতার দরুণ বাবু দু'বেলা শুধু দু'বাটী দুধসাবু নীচের গিয়ে খেয়ে আসেন। কথাটা শুনে সুরমা অভিমানে গুমরে উঠেছিল,—কি দরকার ছিল তার কাছে গোপন করবার? কেন, তার কাছে বললে কি হত?

স্নান সেরে একদিন সুরমা ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। দেখলে, বিছানায় শুয়ে সমীর। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। অনর্গল প্রলাপ বকছে। এ সব দেখে শুনে ও রীতিমত ভড়কে গেল। কি করে কিছুই ঠাওর করতে পারে না। চুপি চুপি এসে সমীরের শিয়রের পাশে দাঁড়াল।

দারুণ মাথার যন্ত্রণায় সমীরের চোখ মুখ ক্ষণে ক্ষণে বিকৃত হয়ে উঠছে। শীতের প্রাবল্যে শরীরটা তার থর থর করে কাঁপছে। ......ধনীর পুত্র সে; আজ সে নিঃসহায়—রোগাক্রান্ত।—কে তার দেখা শোনার ভার নেবে? কে তাকে রক্ষা করবে......?

সুরমা আর ভাবতে পারলে না, মাথাটা ঘুলিয়ে উঠলো; ধপ করে ও বসে পড়লো সমীরের মাথার একপাশে। ভয়ে ও ব্যথায় সুন্দর মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

কানের কাছে মুখ রেখে সুরমা ডাকলে, 'শুনছেন!'

—'কে?' সমীর বললে, শরীর তার প্রবলভাবে কাঁপছে।

—'আমি সুরমা, মাথাটা একটু টিপে দেব—কি?' সমীর চোখ মেলে চাইল। আগুন ছুটছে তার দেহ থেকে।

বললে, 'না না সুরমা, তুমি আমায় ছুঁয়ো না! আমি পাপী, তুমি পবিত্র; তোমার ঘর আছে, সংসার আছে, স্বামী আছে—তুমি আমার কাছে এসো না সুরমা! তুমি এখনও নিষ্কলঙ্ক, তোমার স্বামী তোমায় নিশ্চয় গ্রহণ করবে। সে আমার বন্ধু, আমি তার বন্ধু—না না, আমি বিশ্বাসঘাতক,...... তবু, তবু তার পায়ে হাতে ধরে ক্ষমা চাইব, বলবো, তোর সুরমা পবিত্র, তাকে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিস ভাই; সে তোরই, থাকবে চিরকাল তোরই হয়ে......আঃ আঃ বড় কষ্ট,—সুরমা—সুরমা নিয়ে এসো ত আমার ফাউণ্টেন পেনটা,......আমি আজই লিখে দেবো, তোমায় এসে সে নিয়ে যাবে।...... না-না : আমার জন্যে ভেবনা—। এ আমার প্রায়শ্চিত্ত, লাজা—দারুণ লাজা পেতে দাও আমাকে......উঃ—মাগো, মা—আ......

বলতে বলতে সমীর হাঁপিয়ে উঠলো, ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়লো। বসে বসে সুরমা মাথা টিপে দেয়, হাত পা টিপে দেয়, পায়ের তলায় হাত বুলোয়।

বিকেলবেলা ডাক্তার এসে দেখে গেলেন :—

'—ভাল হয়ে উঠবে তো ডাক্তার বাবু?' সুরমার গলার স্বরে আর্দ্রতা।

—'কোন ভয় নেই মা, ভাল হয়ে উঠবে বৈকি। এ হচ্ছে মনোবিকার। স্বামীকে ভাল ভাবে সেবা শুশ্রূষা করো যা'তে মনে তাঁর কোন কষ্ট না থাকে।' ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

সুরমা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ভাবে, স্বামীকে ভালভাবে সেবা শুশ্রূষা করো যা'তে মনে তার কোন কষ্ট না থাকে।...... স্বামী—সুরমার স্বামী, সুরমা ভাবে। স্বীকারে-অস্বীকারে টানাটানি লাগে—সুরমা উদাস হয়ে যায়।

দুর্ব্বল শরীর নিয়ে সমীর সেরে উঠলো। সুরমা ঘুরে ফিরে সর্ব্বদা ওরই কাছটিতে

থাকতে চায়। সমীর তাতে নারাজ, কেমন যেন ভয় হয়, ওর হাত এড়াতে পারলে ও যেন নিস্কৃতি পায়।

সুরমা বলে, 'আপনি এখনও ভালভাবে সেরে ওঠেন নি।—ডাক্তার বলেছেন আমার সেবা করতে নইলে ফের আবার অসুখ করবে। আপনি যা'তে মনে কষ্ট না পান সেটা ত আমার করতে হবে।'

কথা শুনে সমীর হেসে ফেলে। কিন্তু কেন জানি সুরমার সহজ সরলতায় ও মুগ্ধ হয়ে যায়। সুরমা কেবলি ওরই কাছটিতে ওরই মুখের ওপর পলকহারা দৃষ্টি মেলে বসে থাকে। সমীর ভাবে, সুরমার সুপ্ত নারীত্বের মহিমা, আর ভাবে তার অতীতের সুখময় দিনগুলি। দুর্ব্বল স্নায়ুগুলো ব্যথায় টন্‌টন্ করে ওঠে যখন আঁকে ওরই অনাগত দিনের এক একটি লাঞ্ছনার ছবি! নাভি কাঁপিয়ে একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস সমীরের নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে।

বলে, 'সুরমা, ডাক্তার বাবু অজানায় ভুল করে তোমায় এসব কথা বলে উপদেশ দিয়েছেন। আমার আবার কষ্ট, আর তুমি করবে তার উপশম।' সমীর হেসে উঠলো, বললে, 'আচ্ছা, ওইখান থেকে আমার ফাউন্টেন্ পেনটা আর একখানা সাদা কাগজ নিয়ে এসো।

সুরমা উঠে নিয়ে এল।'

—'আমার কষ্ট দু'দিনের সুরমা, তারপর সব ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার কষ্টের কথা কি কোনদিন ভেবে দেখেছ?'

সুরমা শুনেও শোনে না, বলে, 'কাকে চিঠি লিখবেন?'

—'নিতাইকে, তোমার এখানে থাওয়া দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে, তাই তোমায় এসে নিয়ে যাবে।' বলে সমীর হাসির বেগ দমন করে বলে, 'কেমন রাজী আছ ত?' সুরমার হাব ভাব লক্ষ্য করে।

—'আপনি যাবেন না?' সুরমা শুধায়।

—'নাঃ, আমি আর ফিরবো না। দেশে আর এ মুখ দেখাবো না।' সমীর উদাস হ'য়ে যায়, তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবে।

—'তবে আমিও যাব না।'

সমীর চম্‌কে ওঠে, 'কেন, তুমি যাবে না কেন?'

—'আপনি কেন যাবেন না? আপনি না গেলে আমিও যাব না। একসঙ্গে এসেছি—একসঙ্গে যাবো।'

—'আমার কথা ছেড়ে দাও সুরমা। তুমি হিন্দু এয়ো স্ত্রী। স্বামী ছাড়া তোমার কে আছে? তোমাকে যে যেতেই হবে সুরমা।'

সমীর লিখতে লাগলো:

সুহৃদ্বরেষু—

প্রিয় নিতাই, জীবনে আমি মস্ত বড় ভুল করেছি। আমি বিশ্বাসঘাতক। আমাকে ক্ষমা করোনা। ক্ষমার যোগ্য আমি নই। সুরমা সতী; গঙ্গাজলের মতই সে পবিত্র, শত আবর্জ্জনাও তাকে মলিন করতে পারে না। তুমি এসো, তাকে নিয়ে যাও। আমি আর বাড়ী ফিরবো না। মাকে বলো আমি তাঁর পুত্র নই। পুত্রের পরিচয় দেবার মত স্পর্দ্ধা আমি নষ্ট করেছি, মসীলিপ্ত করেছি। গ্রহণ না করো দাবী নেই—বন্ধুত্বের খাতিরেই ভালবাসা জানালাম।

ইতি সমীর—

আগ্রা হোটেল, দিল্লী।

লেখার পর চিঠিটা পড়ে সমীর মনে মনে হাসলো। আজও মনে পড়ে সে কথা: তখন নিতাইয়ের বিয়ে হয়নি। কথাপ্রসঙ্গে একদিন ও বলে ফেলেছিল ঠাট্টা করে, 'ঘরে বউ এলে বন্ধুর কথা সকলেই ভুলে যায়। বন্ধুর বাড়ী ঢুকলে তখন গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকতে হয়।

—'কিরে নিতাই তাই না?'

নিতাই তাকে আন্তরিক ভালবাসতো। এমন ভালবাসা বুঝি জগতে কেউ পায় না। তাই নিতাই সগর্ব্বে বলেছিল, 'কিন্তু আমার বেলায় ঠিক তার উল্টো দেখবি।'

—'তার মানে?'

—'বুঝে নে।'

—'পোষাকি রাখবি?'

—'সে ক্ষমতা আমার আছে; আমাকে এতটা হেয় মনে করিসনি সমীর।—তবে সেটা শুধু তোর বেলাতেই।' বলে নিতাই হেসে ফেলেছিল।

ঠিক হয়েছেও তাই—সমীর মনে মনে বিচার করে দেখলে।—কিন্তু এর পরিণতির অনির্দ্দেশতায় সমীর শিউরে ওঠে,—সুরমাকে যদি স্বামী তার গ্রহণ না করে, তাহ'লে?—তা'হলে সমীর কি করবে?

—'আপনারও তো মা আছেন। মা ছাড়া জগতে কারো কিছু থাকতে পারে না, তবে কেন যাবেন না?—আপনিও আমার সঙ্গে চলুন!' সুরমার গলায় গাঢ় স্বর, চোখে করুণ মিনতি।

সুরমার এরূপ আকস্মিক উক্তিতে সমীর হেসে ফেললে, 'সুরমা তুমি একেবারে ছেলে মানুষ। তোমাকে মনের কথা বোঝান দায়। জানো আমি গেলে কি হবে?—লোকে আমায় ধরে মারবে, তারপর মুখে চুণ কালি লাগিয়ে গাঁ থেকে বার করে দেবে গলা ধাক্কা দিয়ে।'

আর কোন কথা নেই সুরমার মুখে। একেবারে চুপ। মুখটা কেমন যেন বিষণ্ণ। উৎসাহ নিরাশায় নিভে গেছে।

সমীরের কণ্ঠে কোমলতার আবেগ, 'যাও সুরমা, স্নান টান সেরে নাওগে! বেশীক্ষণ আমার কাছে থাকতে নেই। আমি একবার বাইরে যাচ্ছি। চিঠিটা ডাকে ফেলে এক্ষুণি আসছি।'

নিতাই এসেছে।

চিঠি পেয়েই সে এসেছে, কিন্তু মাত্র
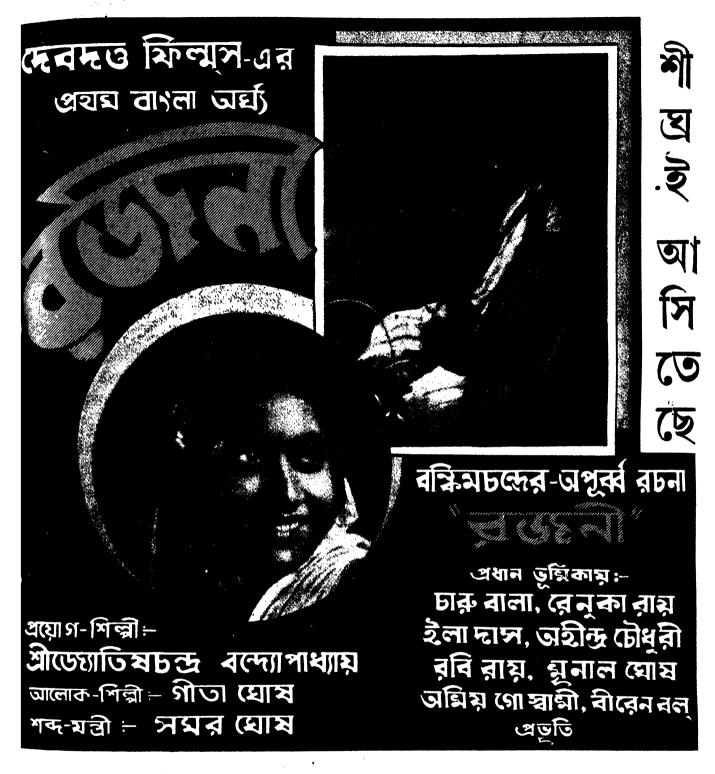
বিলম্ব করে নি। সমীর ট্রেণ ভাড়া দিতে গেছলো কিন্তু সে নেয় নি; রাগে বা ঘৃণায় নয়, বন্ধুত্বের খাতিরে। সমীর অবাক হয়ে ভাবে, নিতাই মানুষ নয় দেবতা—কি অটল বিশ্বাস, কি সন্দিগ্ধহীন অফুরন্ত ভালবাসা! ক্ষণে ক্ষণে বন্ধুত্বের অযোগ্যতায় সে যেন অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা অনুভব করে। মুখ দেখাতে পারে না। যথা-সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

কিন্তু এরকম আধা-আবরণে নিজেকে লুকাবার যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা—তা' আরও অস্বস্তিকর, লজ্জাকর। পরদিন সমীর সত্য-সত্যই একেবারে গা ঢাকা দিল।

টেবিলের ওপর ভাজ করা একটা চিঠি রাখা ছিল। নিতাই খুলে দেখলে, সমীরের হাতের লেখা।

লেখা রয়েছে: সেই অনুতাপ.........
ভাই নিতাই,

আমি চললাম। আমায় খুঁজোনা। আমি হীন, তোমার পায়ের ধুলার যোগ্য নই, ক্ষমার যোগ্য নই। আমি পাপী; তবু আজ মুহূর্ত্তের তরে সুখী হতে পেরেছি, চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পেয়েছি—এই ভেবে—যে তুমি সুরমাকে গ্রহণ করেছো। সুরমা সতী সাধ্বী আমার প্রণম্য। কলুষিত প্রাণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও।

ইতি সমীর।

চিঠিটা পড়ে নিতাই থ' হয়ে গেল। অমার্জ্জিত গ্রাম্য সে,—তাই বোধ হয় বন্ধুর কষ্টে মর্ম্মাহত হয়ে অশ্রুকণা উপচে পড়লো তার দু'টি চোখ বেয়ে।

———

কার্টুনের কারখানা হতে স্ক্রীনে

শ্রীচিত্ররথ সেন

আজকের জগতে খুব কম লোক মেলে যে ওয়াল্ট ডিজনের 'সিলি সিম্ফনি কার্টুন' ছবি ভালবাসে না। কেমন করে আঁকল, কেমন করে ছবি উঠল, কেমন করে পর্দায় অমন করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল এই নিয়ে কত কথা, কত প্রশ্ন। তার ওপর এটা রঙের যুগ, তার কথাও কম নয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ওঠে স্বদেশ থেকে, বিদেশ থেকে। কাগজওলাদের প্রাণ যায় উত্তর দিতে দিতে।

ওয়াল্ট ডিজনে

ডিজনের ছবি কেমন করে ওঠে সত্যিই এ আইডিয়া খুব কম লোকের আছে। কত সময়, কত কষ্ট, কত পরিশ্রম করে একখানা এক রীলের ছবি তৈরী হয়—একথা ভাবতেও সময় লাগে।

যাঁরা কখন কোন দিন ছবি তোলা দেখেছেন তাঁদের বলছি; তাঁরা যেমন করে মূর্ত্তি ছবি তোলা দেখেছেন ঠিক তেমনি ঐকান্তিকতা ও গুরুত্ব নিয়ে এ ছবি তোলা হয়। এবং তাতে যেমন অভিনেতারা অভিনয় করেন তেমনি এতে করে তুলির আঁকা ছবিগুলো।

ডিজনের ষ্টুডিওতে যদি আপনি যান, দেখতে পাবেন, কোন ছবি আরম্ভ হওয়ার আগে সেই ছবির গল্প নিয়ে আগে বৈঠক বসে,—আলোচনা চলে। কেমন করে তোলা হবে, কি ভাবে মিউজিক ভাবতে হবে, কোথায় কি ভাবে আঁকলে ছবি ভাল হতে পারে। তার মোটামুটি একটা ছক তৈরী করা হয়। জানেন তো কার্টুন ছবির মিউজিকটাই আসল, মিউজিকটাই তার প্রাণ।

তারপর সিনারিও লেখকদের কাছে গল্পটি পৌঁছায়। তাঁরা চিত্রনাট্য তৈরী করেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর দিয়ে। কয়েকজন মিলে চলে এ আলোচনা। গল্পটিকে প্রথমে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। তারপর এক একটি অংশকে কয়েকটি সমষ্টিগত দৃশ্যে পরিণত করা হয়। এক একটি দৃশ্যকে ভাগ করা হয় কতকগুলো খণ্ড-দৃশ্যে। তাদের সময় নেওয়া হয়। এক একটি খণ্ড দৃশ্যের সময় প্রকাশ করে দেয়, কত গুলো ছবি! সময়ের হিসেবে তৈরী হয় মিউজিক—সুর তান লয়। প্রত্যেক ছবি একটি ধাপ। মিউসিক ওঠে, নামে ঐ ধাপে পা দিয়ে; তাই আমরা প্রত্যেক ছবির অভিনয়ের সঙ্গে মিউজিকের দেখি অত মিল। এই অঙ্ক কষাটি হয় সিনারিও লেখকদের কাছে।

সিনারিও লেখকদের কাছ থেকে ছবি আসে আর্টিষ্টদের কাছে। আর্টিষ্ট আছে তিন রকমের। প্রথম দল অ্যানিমেটরস্ দ্বিতীয় দল "ইন বিটুইনার্স" আর তৃতীয় দল 'ইঙ্কাস' এ ছাড়া আরও একদল আছে যাদের কাজ হচ্ছে চিত্রনাট্যকারদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চিত্রপট আঁকা। এই সমস্ত চিত্রপট back ground এর কায করে।

অ্যানিমেটররা বলেন সাধারণত ছুটো সারিতে। প্রত্যেকের সামনে আছে এক একটি ডেস্ক। ডেস্কের ওপর একটি করে আলো। সেই আলোয় আলোকিত হচ্ছে শুধু শিল্পীর চিত্র। সিনারিও লেখকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী গল্পের আখ্যান ভাগ বজায় রেখে ছবির আকার দিয়ে যান একের পর একখানা করে, শেষ পর্যন্ত। এরপর ছবি পৌঁছায় 'ইন বিটুইনার' এর কাছে। এরা আঁকেন ছবির সূক্ষ্ম অংশগুলো। একটা ছবির সঙ্গে আর একটা ছবির কি তফাৎ এবং কোথায় তফাৎ এরাই একে দেন। এরাই ছবিকে ধাপে ধাপে চালিয়ে নিয়ে যান।

আর্টিষ্টরা খুব পাতলা এবং পরপৃষ্ঠা লেখা দেখা যায় এমন স্বচ্ছ আঁকবার কাগজ, প্রচুর আলোয় আলোকিত বোর্ডের ওপর রেখে ছবি আঁকেন। এরূপ আলোয় আলোকিত বোর্ড এবং ছবি আঁকবার জন্যে পাতলা চিত্রাঙ্কন-পত্র দরকার হয়, তার কারণ এতে ছবি আঁকবার সুবিধে হয়। কার্টুনের কোন একখানা ছবি আঁকতে গেলে তার আগের ছবিখানা দরকার হয়। চিত্রশিল্পী একখানা ছবির সঙ্গে পরের ছবির অঙ্কনের সামঞ্জস্য দেখতে পারেন এবং ওই ছবির পর্দায় প্রতিফলিত ছায়ার চলার গতি সাবলীল হয়। কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট ক্ষণের জন্যে চোখকে পীড়া দেয় না।

এরপর কাগজ আসে একদল মেয়ের হাতে। এসব মেয়েরা ঠিক শিল্পীর দলে পড়েন না। এরা শুধু ট্রেস করেন। অঙ্কিত ছবিখানা একখানা সেলুলয়েডের পাতার তলায় রেখে প্রকাশিত অংশগুলি সেই সেলুলয়েডের পাতায় কালী দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁদের কাছ থেকে যায় শিল্পীদের কাছে। এরা হচ্ছেন 'ইঙ্কার'। এই ইঙ্কাররাই সেই ট্রেস করা সেলুলয়েডের পাতায় ছবি কালী দিয়ে ভরান। সে ভরান সহজ নয়। কোথায় কি রঙে ভরবে, কেমন ধারা ভরবে এবং কত খানি ভরবে সেইটেই বিবেচ্য।

এই সব কার্টুন ছবির ফটোগ্রাফ নেওয়া আরো এক শক্ত ব্যাপার। এক একখানা ছবিই হচ্ছে কার্টুনের আর্টিষ্টদের এক একটি খণ্ড অ্যাকশন্। আঁকা ছবি সেলুলয়েডের পাতার ওপর পশ্চাৎ পটের ওপর মাপ করে বসান হয়। আগেই বলেছি এই সমস্ত দৃশ্য সিনারিও লেখকদের আদেশ অনুযায়ী আঁকা হয়। ছবি তোলা হয় ক্যামেরা ওপরে রেখে। ভারী বিশ্রী এবং অত্যন্ত একঘেয়ে এই সব ক্যামেরাম্যানদের কাজ। সাধারণ চলচ্চিত্র তুলতে গেলে মোটরে কিম্বা হাতে ঘোরান হয়। কিন্তু এ ছবি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আঁকা ছবি সরিয়ে সরিয়ে বেশ ঘড় ঘড় করে খানিকটা তুলে নেবে, তা চলে না। আমরা সিনেমায় যে সমস্ত ছবি দেখি তার এক একটা হাতল ঘোরায় ছবি ঘুরে যায় সাধারণত আটখানা। আর এই কার্টুন ছবিতে একবার ক্যামেরার হাতল ঘোরানোর ছবি ঘোরে একখানা অর্থাৎ একখানা করে ছবি ওঠে। আর হাতল ঘুরিয়ে অনেকগুলো ছবি এক সঙ্গে নেওয়া চলে না; প্রত্যেক ছবি আলাদা ভাবে তুলতে হয়। যে ক্যামেরায় আমাদের সিনেমার সাধারণ ছবি ওঠে এ ছবি তোলার জন্যে সে ক্যামেরা নয়। এ একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকারের। এদের ক্যামেরা ও তার যে সব জিনিষ ব্যবহার করেন তাতে ছবির ভিন্ন রঙের ভিন্ন ফল পান।

এই সমস্ত চিত্রের নেগেটিভ বহু রঞ্জিত চিত্রের নিয়ম অনুযায়ী রসায়নাগারে ছবির পসেটিভ তৈরী করা হয়। এবং ওই ছোট্ট ফিল্মের ছবি থেকেই দেখা যায় সব জায়গায় ঠিক রঙ ধরেচে কিনা!

রঞ্জিত চলচ্চিত্রের একটা বিরাট কষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে ছবির অস্পষ্ট অংশগুলি রং করা। এই সমস্ত অস্পষ্ট অংশ এবং ছবির ছায়ার অংশ ছবিতে এক হয়ে মিশে যায়। ছুটিকে আলাদা করে দেখানো অনেক কষ্ট, অনেক যত্ন, অনেক পরিশ্রমের ফল। 'সিলি সিমফনি' ছবিতে ওঁরা অনেক বাধা দূর করেছেন। একাগ্রতা, সূক্ষ্মতা, তৎপরতা এবং সতর্কতা দ্বারা এমন ভাবে আলোকচিত্র গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ছবি রঞ্জিত করেন যাতে উপরোক্ত দোষ এ ছবিতে পরিলক্ষিত হয় না। লাল এবং সবুজ রঙের ছায়া অংশের রঙ খুব স্পষ্টভাবে ধরা দেয়নই এমন কি নীল-হলুদের নানা রকম মেশা রঙ-ও এরা ছবিতে দেখান।

তন্বী ও তৃষ্ণা

শ্রীসুনীল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রবীর তবু বলে—তোর তো চুলি নেই, তবে মেখে কী লাভ?

ভজা একটু হেসে নেয়: বুঝিস্ না। ওর যা রঙ—পাশে দাঁড়ালে যে কালিয়ে উঠবো নইলে।

—তাই এই দিয়ে বুঝি রঙের চিকনাই আনবি, আর জ্বালিয়ে তুলবি তাকে? প্রবীর হাসে।

—এই যে মানস! প্রবীর প্রায় লাফিয়ে ওঠে: কিউটির বিউটি দেখে যাও, ভাই!

মানস বোঝে না কিছুই, বলে, মানে? মুখ গম্ভীর ক'রে ব'সে পড়ে ওদিকটায়!

—ভজহরি কিউটিকুরা ব্যবহার করছে। একটা গন্ধ পাচ্ছো না? একটা আমেজ? সত্যি কিন্তু মাদকতা আছে, মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে। প্রবীর চোখদুটো বুজে নেয়।

ভজহরি রুমাল দিয়ে তখনো মুখ রগড়াচ্ছে।

শেষের কথা এই 'সিলি সিম্‌ফনি' আজ যে এত নাম করেচে তার কারণ খুব ভাল গল্প, কি অত্যুৎকৃষ্ট সিনারিও কল্পনা এবং তার প্রয়োগ, কি নানান রঙে মাখা ছবি তা নয়, তার আর একটা কারণ মিউজিক যা আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি।

ছবির সঙ্গে মিউজিক অমন সঙ্গে সঙ্গে মিশে আছে বলে আমাদের কানে অমন করে তাল দেয়, তারিফ করে। আর চোখ! সে তো বাহিরে পর্দার ছবি দেখছে।

সবাকের যুগে পর্দার ছবি চোখ আর কান নিয়েই তো!

মানস বলে—হুঁ। গন্ধটা বিষাক্ত নয়, তো?—ঝিম ঝিম ক'রছে বলছো যে!

ভজহরি তৎক্ষণাৎ তেতে ওঠে: বিষাক্ত? তোমার সর্ব্বাঙ্গই তবে সিঁথিয়ে উঠেছে।

—আমার? মানস হো-হো ক'রে হেসে উঠলো: তোমার বলো! যদি বা না উঠে থাকে, ব্যস্ত হ'চ্ছো কেন, শিগগিরই উঠবে। 'কিউটিই' হ'য়ে উঠবে কেউটে!

ভজহরি এত কথার মানে জানে না, তাই সেও হেসে ওঠে হো-হো ক'রে। কিন্তু সে হাসি যে নিষ্প্রাণ, তা আওয়াজটাই ঘোষণা করছে।

একটু বাদে মানস জিজ্ঞেস করলো—কোথায় যাচ্ছো?

—বেড়াতে। এদিক, ওদিক। গা ছেড়ে দিয়ে ভজহরি উত্তর দিলো।

প্রবীর বলে—সবই ঠিক, কিন্তু ওই চুলটাই যেন বে-মানান! ছেঁটে নিস না কেন?

—সময় পাই? রীতিমতো ভারিক্কি চালে ভজহরি ব'ললো।

রাকেশও এলো।

মানস জিগগেস ক'রলো—মহেশবাবু আসেন নি? এত দেরি হচ্ছে আজ?

রাকেশ ব'ললো—নিচে। আসচেন। দাঁড়া, জামাটা ছেড়ে আসি। বলেই উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।—নগেনের আজ কাল দেখাই পাওয়া যায় না। বেজায় খাটছে। এক লাখ এই নভেম্বরেই পুরিয়ে দিতে হবে নাকি! খাটিয়ে আছে বটে!

প্রবীরের কথায় মানস সায় দেয়, আরো বলে—সিলভ থেকে কি-রকম মুটিয়ে এলো দেখেছিস? পনেরো ষোলো দিনে পাঁচ পাউণ্ড—বাপ্‌স্! এই যে মহেশ দা' আসুন।

ভজহরি সিল্কের শার্টের পাট ভাঙছিলো মায়া ক'রে। মহেশদা ঢুকে পড়লেন: কি হে তুমি চ'ললে কোথায়? এঃ হেঃ, দেখেছো! জামাটার পাট আজই ভাঙলে? পশু যে যেতে হবে, সব কথা দিয়ে এলাম আমি! তোমায় নিয়ে যাবো। ব্যস, কি গায়ে দিয়ে যাবে সেদিন? ওঃ, আছে আরো? তা-ও রক্ষে! আমার তো বুক কেঁপে উঠেছিলো, ছাখো হাত দিয়ে, এখনো কাঁপচে!

ভজহরি দেখে ব'ললে—সত্যি তো! আপনি বেজায় নার্ভাস, মহেশদা।

মহেশবাবু বিনিয়ে বিনিয়ে বললেন—নার্ভাস কি সাধে হই, দাদা। বুঝবে না! কত বড় একটা রেসপন্‌সিবিলিটি বলো তো! মেয়ে সেদিন নিজে বর দেখবে।

ভজহরি মুখ কাঁচুমাচু ক'রে ব'ললো—সত্যি নাকি মহেশ দা? ছায়া সেদিন নিজে দেখবে?

মানস, রাকেশ, প্রবীর সকলে প্রতিধ্বনি ক'রে উঠলো—নিজে দেখবে? ছায়া? আমরা যাবো তো সঙ্গে?

মহেশবাবু খুব তাড়াতাড়ি করছেন: যেয়ো, যেয়ো! বিপিন তো তাই ব'ললো—মেয়েই নিজে দেখবে। মাথুরও নাকি দেখতে চেয়েছে, rather চেয়েছেন। কি বলো ভজা?

ভজাও তাই বলে।

—আচ্ছা, তোমরা ব'সো, আমি জামাটা খুলে আসি। যেতে যেতে রোয়াক থেকে

চীৎকার ক'রে বললেন—ভজা, বেরিয়োনা, আসচি! তোমার ঘরে চা খাবো।

ওরা সবাই বলাবলি করছে চাপা গলায় ভজহরিকে শুনিয়ে শুনিয়ে: তবে হয়তো ফটো দেখেই, বুঝলি? পোজ্‌গুলো যা দিয়েছে, হাঁা, ক্রেডিট আছে!

ভজহরি ব'লে উঠলো—আমায় তো একবার দেখালি না।

—সে কথা মহেশদাকে বলো। ওর ওপর আমাদের কোনো হাত্‌ ছিলো না। তাগাদা লেগেছিলো, ষ্টুডিও থেকে ডাইরেক্‌ট্‌ চলে গেছে।

মানস গম্ভীর হ'য়ে ব'ললো—সত্যি কিন্তু, ওকে একবার দেখানো খুব উচিত ছিলো! ব'লে মানস প্রবীরের কানে কানে জিগগেস্‌ করলো—আছে কোথায় রে? তোর বাক্সে!

—হুঁ! প্রবীর ভজহরির দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে হাসলো।

ভজহরি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, কালো চাকরটাকে ডেকে ব'লে দিলো—দোকানের কেটলিতে ক'রেই কাপ পাঁচেক চা আনতে। আর তার সঙ্গে কাপ-ও। আর ইয়ে, টোষ্ট যদি হ'য়ে থাকে তবে তাও।

ঘরে ঢুকতেই কানে গেলো ফটোর কথা। ভজহরির মন যেন কেমন করে উঠলো! তবু তার সান্ত্বনা আছে প্রচুর! ফটো দেখেই তো ডাক প'ড়েছে তার! প্রথমটা কেমন করে দাঁড়িয়েছিলো, আঙুলটা থুঁৎনিতে দিয়ে; দ্বিতীয়টা কাৎ হ'য়ে মাথা ঘুরিয়ে; তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম—একে একে ভজহরি ভেবে নিলো। সত্যি হয়ত খুব ভালো হ'য়েছে। আর হয়তই বা কেন, নিশ্চয়ি। নইলে ছায়া শুধু শুধু ডেকে পাঠায় না, হুঁ, সে অত কাঁচা মেয়েই নয়।

কিন্তু সে ফটো যে প্রবীরের বাক্সে। সে ফটো যে দেখতে অতি বদ হ'য়েছে, পুঁতির মালা যে মোটেও বেলফুলের মতো হয় নি।

ভজহরি বাইরে গেলে ওরা ফটোর কথা নিয়েই খুব হাসাহাসি করছিলো, কিন্তু হঠাৎ আবার সে ঘরে ঢুকে পড়াতে তারা হাসি চাপার জন্যে মহেশবাবুর দোষ দিয়ে যা তা বলছে।—

ভজহরির কানে মহেশবাবুর দোষ মোটেই ভালো শোনায় না। সেই জন্যেই ও প্রতিবাদ করলো: এতে দোষ দেওয়া যায় না! দেরি করতে পারেন নি, ডাইরেক্ট দিয়ে এসেছেন।

ভজহরির ব'লতে হ'লোনা, ব'ললো ওরাই। প্রবীর কোনো রকমে হাসি চাপতে চেষ্টা করছে, রাকেশ একটু একটু হেসে ফেলছে, মানস গম্ভীর থাকতে পারে।

মহেশবাবু ব'ললেন—সত্যি আমার দোষ নেই, ভজহরি! নিতান্ত তাড়াতাড়ি লেগে গেল। ওদের demand দেখলাম বেজায়, তাই এলাম শিগগির ক'রে। যাক্‌, কপালে থাকে দেখো! ওরা ফিরিয়েও তো দিতে পারে! আর বিপিনটা আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলে;

সব গুলোই যে! দিলাম! তা, তুমি যাচ্ছো কোথায়? ওকি, পাউডার বুঝি? আরেকটু র'গড়ে নাও। শাদাটে হ'য়ে গেছে মুখ। যাত্রা পার্টির দুঃশলার মতো দেখাচ্ছে! পথে বেরুলে কেউ আবার তোমার গালা-গালি দিয়ে দিতে পারে বইকি। মুছেই নাও! আরে এযে সত্যি সত্যিই! আন্, এদিকে। খাবো ব'ললেই আজকাল খেতে পাওয়া যায় দেখছি যে! বাঃ! টোষ্ট, চা, এগ্রিথিং! ড্যাম গ্ল্যাড অ্যাম্বাই! তোমরাও হয়ত! কি হে মানস, কি বলো? ওঃ, রেখে দাও! শুধু বামুনদের পেটুক নাম মুছে গেছে, ভাই! তুমি বদ্যি ব'লে রেহাই পাচ্ছোনা! সব একাকার, সব পেটুক, সব যাবে মন্দিরে! এক পাতে খাবে পেসাদ। মহেশবাবু ফস্ ক'রে কিসে থেকে কিসে এসে পড়েন!

ভজহরি বলে— আলবৎ, এই তো চাই! সব এক জোট না হ'লে দেশ রক্ষা করা চলেনা! মানসেরা মুখ টিপে হাসে।

মহেশবাবু টোষ্ট কড়মড় ক'রে কামড়ে বলেন—ভজহরি জিনিষটাকে তলিয়ে দেখেছে বটে! আঃ, বেড়ে টোষ্ট তো হে! ছাক্কুর দোকানের, না?

মানস মুখ বুজে গম্ভীর হ'য়ে চিবোচ্ছে। রাকেশের সমস্ত জামা টোষ্টের গুঁড়োতে বোঝাই! প্রবীর আলতো ক'রে চায়ে ঠোঁট ছোঁয়ালো।

—এতো আদর! ন্যাঃ, কাজের মতোই কাজ করছি আমি। সৎ-পাত্রই জুটিয়েছি। সত্যি ভজহরি, তোমার ব্যবহার কখনো ভুলবোনা। আঃ, বেশ খাওয়ালে! বিপিনের সঙ্গে সেদিন তোমার কথা হয়েছিলো?

ভজহরি আশ্চর্য্য হ'য়ে ওঠে: কই, নাঃ! আমার দিকে তাকালেন না মোটে! আমি এখান থেকে তাঁকে আপনার ঘরে যেতে দেখলাম। বেঁটে মতো, ফর্সা—উনিই তো! হ্যাঁ, তবে আমি ঠিকই দেখেছি! কেন বলুন তো?

কাপ থেকে মুখ নামিয়ে মহেশবাবু ব'ললেন—না, এমনি জিগগেস করছি। ওর সঙ্গে তো এ বিষয়ে আমার আর কথা হয়নি!

ভজহরি মাথা নেড়ে বলে—না, আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি তাঁর! লোকটাকে দেখেই কিন্তু বেশ অমায়িক মনে হয়।

ভজহরির চোখেও ফুল ফুটছে। কিন্তু কি-ফুল ও চিনতে পারেনি আজো।

—সত্যি অমায়িক। রাকেশ না জেনেই সবজান্তার মতো জবাব দেয়।

মানস কথা বলেনা।

প্রবীর ফাজিলের চূড়ান্ত, বলে—মাইরি? সত্যি অমায়িক?

মহেশবাবু ভজহরির হ'য়ে হ'য়ে জবাব দেন: হ্যাঁ, সত্যি! ভজহরির গুণের তারিফ করতে হয় বটে! মুখ দেখে ও ঠিক লোক চিনেছে! আচ্ছা, ছায়া কেমন বল তো? মুখ তো দেখলে তার!

—তা আর কেমন? ভালোই!

—শুধু ভালোই? সেটা যেন কেমন-কেমন শোনায়। না ব'ললে নয় গোছের, ভদ্রতা গোছের। তার চেয়ে 'জানিনা' ব'ললেই এর চেয়ে হয়ত ভাল হ'তো! অমন উড়ো কথায় আমাদের তো মন ওঠেনা, ভাই! কি মানস, মুখ ভার ক'রে চা-ই খাবে? বলোনা, আমাদের কথাটা কি নিতান্তই অকেজো?

ঢোক গিলেই মানস চ'মকে ওঠার মতো ব'ললো—অকেজো? মহেশদার দেখছি মাথাটাই খারাপ হ'য়েছে! ওহে, ও ভজহরি, বলোই না খুলে! আমরা—

রাকেশ মানসের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলো—আমরা জানতে চাই, তোমার কেমন লেগেছে তাকে! প্রবীর ওর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ব'ললো—চুপ ক'রে রইলি যে!

ভজহরির আকাশ পাতাল সব তলিয়ে যাচ্ছে, এ টলমলীয়মানতা থেকে নিজেকে সামলে নিতে অনেকক্ষণ সময় লাগা দরকার, কিন্তু অল্প কয়েক মুহূর্ত্তেই ও তৈরি হ'য়ে নিলো, ব'ললো, দূর—থেকে সাগালাগি বলা যায় কি? কিন্তু এটুকু বলছি লাগবে ভালোই!

—লাগবে! ভবিষ্যতের কথাই চট-পট ব'লছো, আর বর্ত্তমানকেই দিচ্ছো উড়িয়ে? রাকেশ ভুরু কুঁচকে ব'ললো!

এর কী উত্তর দেবে ভজহরি? কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্ততঃ ওকে রাঁচি পাঠাও! ও মাথাটা ঠিক করিয়ে আসুক! না-হয় আপাততঃ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ওকে রেহাই দাও! এমন বিপদে ওকে আর ফেলোনা তোমরা!

উঃ, কি বরাত!

বুকপকেট এতখানি উঁচু,—কোম্পানীর প্রস্‌পেক্টাস্, প্রোপোজ্যাল-ফর্ম এ ঠাসা! চোখ মুখ লাল হৃৎপিণ্ডের মতো (বাঁদরটা যেন গাধার মতো—উপমায়), পায়ে রবারের নাগ্রা। বাঁ-হাতে ভাঁজ করা রেন-কোট, চুল উস্কো,—নগেন এলো,—হঠাৎ এলো—বিদ্যুতের মতো আচমকা!
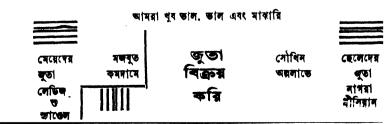
—আমিই যাব? খুব যে চা—বা! ঠাস্ ক'রে কোটটাকে চৌকীর ওপর ছুঁড়ে ফেললো। ব'ললো সেইখানেই, কাপড় টেনে হাঁটু অবধি ওঠালো: উঃ, কী গরম! রাত্তিরে গুড়গুড়ানিটুকুই আছে, বিন্দু জলের নেই প্রত্যাশা! পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুখের সমুখে খুব ঘোরাতে লাগলো।

নগেন এসে ভজহরিকে মহা সমস্যা থেকে বাঁচিয়েছে। ভজহরি ব'ললো—পাখা দেবো?

—ঐ আপ্যায়নটুকুই, এক বিন্দু চায়ের নেই প্রত্যাশা! কে খাওয়াচ্ছে? ভজহরি নিশ্চয়ি! কই হে, দাও পাখা!

পাখাটা এগিয়ে দিয়ে ব'ললো—খাবেন চা?

—তার মানে? খাবো বই কি! নগেন ক্রিমেস্তের বোতামগুলো খুলে দিয়ে খুব হাত চালাচ্ছে।

ভজহরি বেরিয়ে গেল এবং একটু বাদে ফিরে এসে ব'ললো—আসচে।

নগেন উঠে পড়লো: আসুক! আমি জামা ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে আসি ততক্ষণ! যাবার সময় আবার মুখ ফিরিয়ে ব'ললো—এক পয়সার চানাচুরের প্রত্যাশা ছিলোনা, সেই ভজহরি উঃ, কী চেঞ্জ!

ভজহরির বুক কাঁপছে, পুরানো কথাটা আবার না উঠে পড়ে। ও তবে কি জবাব দেবে তার? দিতে না পারলেও ওরা হয়ত হবে অসন্তুষ্ট। ওদের মনে ব্যথা দিয়ে ভজহরি তার নিজের ভবিষ্যতের মুখে কালী দিতে রাজি নয়! নগেন, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, ভাই। নইলে তোমার চা হয়ত জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।

কিন্তু চা তখনো আসেনি।

কাপগুলো ঠুং ঠাং ক'রে ওরা চৌকীর নিচে রেখে দিচ্ছে।

প্রবীর গলা খাঁখরালো। হয়ত কিছু ব'লবে। ভজহরির তখন মনের অবস্থা এমন অসহ্য রকমের দুর্দ্দশাগ্রস্ত, যা প্রকাশ করার মতো দুর্দ্দশা কোনো লেখক ভোগ করেন নি।

প্রবীর ব'ললো: নগেনের ডেলিভারিটা মার্ক করলে? এন্ট্রান্সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন চা বাগালো?

যাক্, তাও ভালো! ভজহরি অন্য রকম আশঙ্কা ক'রেছিলো!

সন্ধ্যা কিন্তু ঘনাচ্ছে। বেলা পোহালো ব'লে! কার যেন কালো ওড়না পৃথিবীর নগ্ন-বুকে লুটিয়ে আসচে—এ ওড়না ছায়ারই।

নগেন ফিরে এলো: টি রেডি? (চায়ে মুখ দিয়ে) I drink your fair future and good luck!

প্রবীর হাসলো: সত্যি কিন্তু, খেলাম আর ওকে আমাদের শুভেচ্ছা জানানোই হ'লো না। নগেনের চারিদিকে তাল ঠিক

আছে। সত্যি নগেনকে আমি admire করি।

নগেন মুচকে হেসে চায়ে টান দেয়: ব'লে—শুধু admire করলেই চলবে না। আমার এই একলাখ পুরিয়ে দেওয়ার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করো তো! জীবনটা চাই না, আর চাইলে দেবেই বা কেন?—চাই একটা জীবন-বীমা!

—উঃ, সীমা ছাড়িয়ে গেলে, ভাই! প্রশংসা করলাম, তুমি দাম বাবদও কিছু ধ'রে নিতে চাও যে! বেশ আমি withdraw করছি, অ্যাডমায়ার ফ্যাডমায়ার করি না, ভাই। রেহাই দাও।

হো-হো ক'রে নগেন হেসে ওঠে সহসা বিদ্যুতের মতো! কথাটা হ'য়ে আসে তরল।

ভজহরি এদের রঙ্গ দেখে মুখ টিপে হাসচে কেবল।

রাকেশ ব'লে ওঠে: খুব মজা, না? নগেনকে ব'লবো সব কথা? সেই তোমার হেঁয়োর? ও মহেশদা, রাখুন আপনার খবরের কাগোজ,—অন্ধকারে দেখছেন কী ক'রে?

ভজহরি উঠে দাঁড়ালো: আলো জেলে দেবো? অতি সন্তর্পণে করছে চলাফেরা, গায়ে জামাজুমি এঁটে রীতিমতো অখন্তি।

—নাঃ, এখন আলো জ্বালাতে হবে না। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলুক, শাঁখ উঠুক বেজে! থাক, জ্বালাতে হবে না। মহেশদা এখন পড়বে না। রাকেশ বাধা দিলো। আরো ব'ললো—মহেশ দা, ভুলে গেলেন—ছায়াকে ওর কেমন লাগলো। সেই কথাটা?

মহেশ দা ব'ললেন—হু। রাকেশের গা টিপে ব'ললেন আস্তে, থাক, বেচারি সাজলো-গুজলো, তোমরা ওকে বেরোতে দিলে না, ঘাড় ভেঙে খেলে, তার ওপর আর জ্বালিয়োনা! থাক। খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা-মুখ খুলে কাগজগুলো স্তূপ ক'রে পাশে রেখে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্ব্বাসা

তুরুপের মোহ:—ডাক শেষ হয়ে যাবার পর রঙকর্ত্তা যদি দেখেন যে তাঁর খেঁড়ীর হাতে কোন একটি রঙে একখানি তাস বর্ত্তমান কিম্বা একখানিও তাস নেই, এবং তুরূপ করবার মত হাতে কয়েকখানি রঙ বর্ত্তমান, তা' হলে অধিকাংশ সময় তুরূপের মোহ এসে এমন ধারা তাঁকে অভিভূত করে ফেলে যে, তাঁর আর অন্য কোন বিষয় বিচার করবার শক্তি থাকে না। ধীর বুদ্ধিতে বিবেচনা করে খেলায় যেখানে বিপক্ষদল তাঁদের খেল্‌বার ভাল রঙটির খেলা বন্ধ করে দেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁদের খেলার ধারাটিকে একেবারে পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হন; আর সেই সুযোগে ডাকদার তাঁর এবং খেড়ীর মিলিত হস্তে যে রঙটি দাঁড় করালে খেলা করা সুবিধাজনক, সেই রঙটি তৈরী করে নেবার পথ সুপ্রশস্ত করে তোলেন। নিম্নে এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল।

ইস্কাবন—গোলাম।
হরতন—গোলাম, আটা, ছক্কা, পাঞ্জা।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, আটা, ছক্কা, চৌকি, তিরি।
চিড়িতন—নয়, দুরি।

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, দশ, সাতা, ছক্কা।
হরতন—বিবি, দশ, চৌকা, তিরি।
রুহিতন—দুরি।
চিড়িতন—টেক্কা, পাঞ্জা, চৌকা।

ইস্কাবন—নয়, আটা, চৌকা, তিরি।
হরতন—নয়।
রুহিতন—দশ, নয়, পাঞ্জা।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, আটা, সাতা, ছক্কা

ইস্কাবন—টেক্কা, পাঞ্জা, দুরি।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, সাতা, দুরি।
রুহিতন—সাহেব, গোলাম, সাতা।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, তিরি।

অতি অল্প আয়াসে 'গেম' করে নিতে পারা যায় সে স্থলে অধিকাংশ সময় এই জন্যেই খেঁসারৎ দিতে হয়। বস্তুতঃপক্ষে একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলেই জানা যায় যে তুরূপ করে পিট নেওয়ার চেয়ে তুরূপের ভয় দেখিয়ে খেলা করা বিশেষ সহজসাধ্য। এই তুরূপের ভয়ে প্রথমতঃ

উভয় পক্ষ ভাল্‌নারেবল, আর ডাক হয়েছে নিম্নলিখিতরূপ। 'দ' ডেকেছেন একটি হরতন, 'প' একটি ইস্কাবন, 'উ' চারখানি হরতন এবং অবশেষে 'পূ' পাশ দিয়েছেন।

যখন খেলা শেষ হল তখন দেখা গেল যে 'পূ' ও 'প' চারখানি ইস্কাবনের

খেলা ছিল, কিন্তু 'উ'র চারখানি হরতনের ডাকের পর 'পূ'র পক্ষে ভাল্‌নারেবল অবস্থায় চারখানি ইস্কাবনে ডাক দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ।

যা হোক 'প' প্রথমে ইস্কাবনের সাহেব পেড়ে খেল্‌লেন, 'দ' টেক্কা দিয়ে সেই পিটখানি ধর্‌লেন। অতঃপর কি ভাবে খেলা উচিত তা' ভালরূপে বিবেচনা না করেই 'দ' তুরূপের মোহে পড়ে ইস্কাবন খেলে 'উ'কে দিয়ে তুরূপ করালেন এবং রঙ খেলে নিজের হাতে উঠে আর একখানি ইস্কাবন খেলে তুরূপ করালেন। তারপর শেষ রঙখানি খেলে নিজের হাতে পিট নিতে গিয়ে দেখলেন 'পূ' রঙে পাশ দিয়েছেন ফলতঃ বিপক্ষদলকে তিনি তিনখানি চিড়িতনে ও দুইখানি হরতনে পিট দিতে বাধ্য হলেন, অর্থাৎ ডাক মত চারটির খেলা কর্‌তে না পেরে দুইটী পিট কম পেলেন। এমতাবস্থায় রঙকর্ত্তা অনুযোগ কর্‌তে লাগলেন এই বলে যে, তাঁর হাতে রঙের বিভাগ অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি রঙের বিভাগ ৪-১ এই ধরণের না হয়ে ৩-২ এই ধরণের হত তথাপি তিনি একটি পিট কম পেতে বাধ্য হতেন। অন্যথা এই তুরূপের মোহ তাঁকে যদি না পেয়ে বস্‌ত তা' হলে তিনি অনায়াসে তাঁদের হাতের প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিতে পারতেন যে তুরূপের পরিবর্ত্তে রুহিতনে খেলাই যুক্তিসিদ্ধ, আর সেই অনুসারে খেলে খেলাও করে নিতে পারতেন।

এ খেলাটি খেল্‌তে হলে প্রথমে ইস্কাবনের টেক্কা দিয়ে পিট নিয়ে রঙের টেক্কাটি খেল্‌তে হবে। এই খেলায় 'পূ' যদি রঙ দেন তবে তো ডাক অনুযায়ী খেলা করা অত্যন্ত সহজ সাধ্য হয়ে গেল; এখন রঙের বিভাগ ৪-১ বা ৩-২ পড়ুক না কেন কোন মতে চারটির খেলা নষ্ট হয় না। তবে এরপর তৃতীয় পিটে 'দ' যদি রঙের সাহেব খেলেন তবেই গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তৃতীয় পিটে 'দ'র ছোট রঙ পেড়ে খেলার পর 'প' রঙের বিবি দিয়ে পিটখানি ধরুন আর নাই ধরুন খেলা নষ্ট কর্‌বার ক্ষমতা তার আর নেই।

ষ্টেটসম্যান ও ব্রীজ এসোসিয়েশন ঃ—বিগত ৫ই জুলাই রবিবারের ষ্টেট্‌স্ম্যানে "Jack of Spades"এর খেদোক্তি আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। সম্প্রতি বিলাতে ডুপ্লিকেট ব্রীজ খেলার সুপরিচালনার ও নিয়ম-কানুন গঠনের নিমিত্ত ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে বহু স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়েছে, কিন্তু ইহা সমূহ দুঃখের বিষয় যে একমাত্র কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশন ব্যতীত ভারতবর্ষে অদ্যাবধি এ ধরণের আর কোন সঙ্ঘ-সমিতি গঠিত হয় নাই। ব্রীজ খেলার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসো-

সিয়েশনের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ থেকে এরা এখনও কোনরূপ সাহায্য লাভে বঞ্চিত তার কারণ কোথায়। ডুপ্লিকেট ব্রীজ ও ব্রীজ এসোসিয়েশন প্রসঙ্গে "Jack of Spades" বলেন, "The position in India is that, with exception of the Indian Bridge Association (former the Bengal Bridge Association), which to some extent controls, Duplicate Bridge activities by the clubs affiliated to it, there are no union in any part of India." তিনি আরও বলেন, "The formation of regional unions on the lines of those in the United Kingdom is a matter worth of consideration by Bridge players in this country." আমরাও তাঁর সহিত গলা মিলিয়ে ঐ একই কথা বলি। আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে প্রতি প্রদেশেই স্বীয় প্রাদেশিক সমিতি গঠন করে এই এসোসিয়েশনে সদস্যভুক্ত হয়ে এসোসিয়েশনকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন। এ বিষয়ে আমরা ব্রীজ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মহাশয়েরও দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এ্যাডভান্সের প্রবন্ধাতঙ্ক:— রবিবার ৫ই জুলাই তারিখের এ্যাডভান্সে ব্রীজ প্রবন্ধ পড়ে মনে হয় যে, লেখক মহাশয়ের কলম বাজির বাহাদুরী আছে বটে। ট্যাক্ থেকে চারটি টেক্কা নিয়ে টেক্কা মারতে আসা কি ভাল? কেড়ে নিলে কাঁদতে হবে যে। সুতরাং যা' রয় সয় তাই নিয়ে থাকাই ভাল, —advice রবিবার দিনে না দিয়ে অন্য দিনে দিলেই ভালো হয়।

চিঠি-পত্র:—বেলুড় ওল্ড সঙ্গীত মন্দিরের পক্ষ থেকে শ্রীজহরলাল কোলের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দেওয়া হল। যে কোন দলকে ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হতে হলে ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সকল নিয়ম কানুন তাঁদের মেনে চল্‌তে হবে। এই নিয়মকানুনের মুদ্রিত পুস্তিকা এবং অন্যান্য যাবতীয় তথ্য ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের অবৈতনিক কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীশ বসুর নিকট থেকে পাবেন। তাঁর ঠিকানা, ৩নং এস্প্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা। সর্ব্বশুদ্ধ দেয় চাঁদা বাৎসরিক ২৲ দুই টাকা মাত্র; এতদ্ব্যতীত আর কিছুই দিতে হয় না।

—গান—

রচয়িতা—কুমারী সাবিত্রী দত্ত
সুরশিল্পী—সন্ধ্যারাণী ঘোষ
(বেহাগ মিশ্র)

কাল বোশেখীর ওই মাতনে মনের বাঁধন খোল্।
দেরে আমার বীণার তারে ঝড় তুফানের দোল্॥
উঠুক নেচে প্রলয়-নাচে আমার সুরের রেশ
গহন-গানের বেদন-বীণায় লাগবে আমার রেশ,
সবুজ মাঠের শ্যামলী মেয়ে আলুথালু বেশে
ছুটে বেড়ায় দুলিয়ে আঁচল বিবশ এলোকেশে,
পাগলী নদী চরণ ছুঁয়ে সবুজ ধানের ক্ষেতে
অসীম পানে যায় ছুটে ওই আপন তানে মেতে;
পাগল হাওয়া দিল ধরায় প্রবল ঝড়ের দোল
গানের সুরের রেশগুলি মোর তেমনি করে খোল্।

ভীষণ গরমে শুধু এদেশেই কি লোকেরা অস্থির হয়ে ওঠে! ঐ দেখুন প্যারামাউণ্টের কটি মেয়ে গরমের চাপে গায়ের কাপড়-চোপড় ফেলে সমুদ্রের ধারে কেবল সাঁতারের পোষাক পরেই একটু ঠাণ্ডা হচ্ছে।

ও পারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

ভুলের ফসল

হলিউডের মিলন, বিবাদ আর বিচ্ছেদের রোজকার ইতিহাস লিখতে গেলে বইয়ের আধখানা ভরবে শুধু এরই বিবরণ লিখতে।

বিবাদ-বিচ্ছেদের যুদ্ধ ওদের লেগেই আছে। জেমস্ কগ্‌নে যে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স ষ্টুডিওতে কায করত এ খবর আমরা জানি। তার সেদিন ঝগড়া লাগল ওয়ার্ণারের ষ্টুডিওর সঙ্গে, আর সব সম্বন্ধ চুকেও গেল। কেন? সেই খবরই বলচি :—

'জেমস্ কগ্‌নে ভাবে ষ্টুডিও তার প্রতি সুবিচার কর্চ্চে না। অন্যান্য ষ্টারের তুলনায় তার প্রতি ষ্টুডিও নজর রাখে না। জেমস মাইনে পায় এখন সপ্তাহে ন'শ পাউণ্ড। এ মাইনে ওর মনের মত নয়। বলে দি, সেই গোড়ার দিনে ও মাইনে পেত সপ্তাহে আশী পাউণ্ড। সে যাক।

জেমস একদিন সুবিধে পেলে।

একদিন ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের এক থিয়েটারের প্রাচীর পত্রে দেখা গেল—প্যাট ও'ব্রায়েনের নাম জেমস্ কগ্‌নের ওপরে রয়েচে। ব্যস্ আর কি! জেমস্ ছুটল কোর্টে। বিচার চাই। ওর চুক্তির একটা প্রতিজ্ঞা ষ্টুডিও ভেঙ্গে দিয়েছে।

এ ভুলের চারা নেই।

ষ্টুডিওর লোক ছুটল দলে দলে। এ যে তাদের মস্ত ভুল। দুজন লোক যাদের জন্যে এ ভুল হোল তাদের চাকরী গেল। যেখানে যত প্রাচীর পত্র ছিল, সব ছেঁড়া হোল। কিন্তু!

কিন্তু সবই হোল; কেবল বিচার হয়ে গিয়েছিল আগেই। জেমসেরই হোল জিত।

ক্লার্ক গেবল

মারলে ওবেরণ

ভিড়ে নামা মেয়েদের উন্নতি হওয়া এ খুব কম ঘটে। মারলে ওবেরণ ছিল ওই

ওয়ালেস বিয়ারী

ভিড়েরই মেয়ে। ছবিতে ভিড়ের দৃশ্যে নামবার জন্যেই ওকে ডাকা হোত।

কাফে-ডি-প্যারীতে মারলে নাচত। কিন্তু তাতে ওর তেমন রোজগার ছিল না। তাই নিজের খরচ চালাবার জন্যে যেত ভিড়ের দৃশ্যে নামতে।

জানেন তো মারলে ওবেরণ হচ্ছে ভারতেরই মেয়ে। ওর আসল নাম হচ্ছে এসটেল থম্পসন। ওদেশে গিয়ে ভারতে ফেরার টিকিট মারলে দশ পাউণ্ডে বেচে দেয়। কিন্তু তাতে কদিনই বা চলে। তাই এ সব কায নিয়ে ও নিজের খরচ চালাত।

মারলে নিজের রূপ এবং ব্যক্তিত্বের জন্যে

চার্লস্ লাটন

আজ এত বড় হতে পেয়েচে। প্রথম যে ছবিতে ও নায়িকার অংশে নামে তার নাম হচ্ছে 'মেন্ অব টু-মরো।' মারলের পরের ছবি হচ্ছে 'কোভেন্যাণ্ট উইথ ডেথ।'

হলিউডের হিরো

হার্কার্ট মার্শাল এখন ভারী ব্যস্ত।

ফ্রেড্ ম্যাকমোরে

আর তাই বা বলি কেন, হলিউডের সব হিরোরই এখন ভয়ানক কাজ।

আসল কথা হচ্ছে সুন্দরী অভিনেত্রীর তুলনায় সুন্দর অভিনেতা হলিউডে কম। ফ্রেড ম্যাকমারে বছরে দশখানা ছবিতে নেমেছেন। ক্লার্ক গেবলের ছবিও কম নয়। সেও গড়ান আগুণের মত হু হু করে বেড়ে চলেছে। হেনরি ফোণ্ডারকেও নামতে হচ্ছে অনেক গুলোয়। ডিক পাওয়েলেরও গুণতিতে কম নয়। বাস্তবিক প্রেমিকের পার্ট করবার মত লোক কেউ বসে নেই।

রে মিলাণ্ড যে এই সেদিন এসেচে তার বা কি কম? এরই মধ্যে পাঁচ খানা ছবিতে নামা হয়ে গেচে। গ্যারী কুপারের ছখানা ছবি ঠিক হয়ে আছে।

আর ওয়ালি বিয়ারী। ও প্রেমিকের দলে না পড়লেও ছবিতেও আমরা দেখচি না।

ওয়ালীর তিনখানা ছবি

ওয়ালী বিয়ারীর পরের তিনখানা ছবির নাম শুনতে পাওয়া গেচে। একখানা 'ওল্ড হাচ্'। একখানা পত্রিকা থেকে এই গল্পটি নেওয়া হয়েচে। গ্যারেট স্মিথ্-এর লেখা।

অপর খানা হচ্ছে 'বোনাস্ মানি।' গল্পটি লেখা হচ্ছে লিওনার্ড স্পিজ গ্যাল-এর।

আরো একখানা ছবির নাম শুনেচি। 'কো ভ্যাডিস্' ছবিতে নামবে ওয়ালী। সাজবে নেরো। মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার ষ্টুডিওর ছবি। আর এ ছবি যিনি নিবেদন করবেন তার নাম হচ্ছে আরভিং থ্যালবার্গ।

'নেরো'র ভূমিকায় ছায়াচিত্রে নেমেছে আজ পর্য্যন্ত দুজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, দুজনেই অভিনয় ক্ষমতায় অসীম ক্ষমতাবান। একজন এমিল জেনিংস অপরে চার্লস লাফটন্।

খুচরো খবর

রে রেন্নাহান হচ্ছেন একজন আলোক চিত্রকর, যার তোলা নাম করা রঙীন চিত্র

মার্লে ওবারণ

হচ্ছে 'বেকী সার্প', 'লা কুকারাচ্চা' এবং 'ট্রেল অব দি লোন্সাম পাইন।'

* * *

নোয়া বেরীর ছবি হচ্ছে 'নথিং ট্র্যাম্প'।

* * *

চার্লস লাফটন উপস্থিত যে ছবিতে নামছে তার নাম হচ্ছে 'রেম ব্রাণ্ডট'।

* * *

পরিচালনা করবে আলেকজান্দার কোর্ডা। ছবি তুলবেন জর্জেস্ পেরিনাল্।

* * *

'রেম ব্রাণ্ডট' হচ্ছে সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী।

"দি মুনস্ আণ্ডয়ার হোম" এ মার্গারেট সুলিভ্যান হেনরি ফোণ্ডাকে বলে:— বোঝনা?—কি?

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৭ই শ্রাবণ ১৩৪৩—23rd. July, 1936. } ৩০শ সংখ্যা

উদ্যোগ-পর্ব্ব

সহযোগী 'বসুমতী' আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"আগামী নির্ব্বাচন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য সমস্ত রাজনীতিক দলই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাদ্রাজ, গুজরাট, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে কংগ্রেসের কর্ত্তারাও প্রবলভাবে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন। বোম্বাই অঞ্চলে মডারেট দলও আপনাদের গুণপনা ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে বিশেষ কোন সাড়াশব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। এখানে মডারেটদিগের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে; কিন্তু কংগ্রেসও এ স্থানে প্রায় নির্ব্বাক।"

প্রকৃতপক্ষে বাংলার কংগ্রেসীদল আত্মকলহে বিব্রত হইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতি ও কর্ম্মকর্ত্তা গঠন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যে একটা হিসাব-নিকাশ না হইয়া গেলে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাচনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেছেন না।

সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সরস আতিথেয়তায় ও শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর মোলায়েম মধ্যস্থতায় শরৎ-বিধানের মিলনী-ফর্ম্মুলা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। শরৎচন্দ্র ও বিধানচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব দলের তালিকা-সম্বলিত যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে তাহাই উভয় পক্ষ মানিয়া লইবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তালিকা-সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র ও বিধানচন্দ্রের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য ঘটিলে শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

একপক্ষে যেমন কংগ্রেসী মিলনের আলাপ-আলোচনা চলিতেছে অপর পক্ষে জাতীয়তাবাদী অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত একযোগে কাজ করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। গত রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর আমন্ত্রণে তাঁহার উডবার্ণ পার্কের ভবনে কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ও ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি কংগ্রেসকর্ম্মীদের এক মিলিত বৈঠক বসিয়াছিল। উক্ত বৈঠকে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুর সুস্পষ্ট উক্তির আমরা প্রশংসা করি। আলোচনা প্রসঙ্গে নরেন্দ্রবাবু শরৎচন্দ্রকে জানান যে কংগ্রেসে দুই দলের মিলন হইবার পূর্ব্বে জাতীয়তাবাদী অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। আমরা নরেন্দ্রবাবুর এই উক্তি পূর্ণভাবে সমর্থন করি।

প্রকাশ যে অধুনা ডাঃ রায় সম্মিলিত কংগ্রেসী দল গঠনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এই সপ্তাহেই ডাঃ রায়ের দলের এক ঘরোয়া বৈঠক হইবে এবং সেই বৈঠকে মিলন-ফর্ম্মুলা আলোচিত হইবে। আমরা এই আলোচনার ফলাফলের জন্যে আগ্রহান্বিত রহিলাম।

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার

অমরনাথ

ভারতীয় বিখ্যাত ক্রিকেট্ খেলোয়াড় অমরনাথের বিরুদ্ধে কতকগুলি অশিষ্টাচারের অভিযোগ আনিয়া ভারতীয় দলের অধিনায়ক ও ম্যানেজার তাঁহাকে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তণ করিতে বাধ্য করেন। ভারতে ফিরিয়া অমরনাথ তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের যথাযোগ্য লিখিত উত্তর সহ ভূপালের নবাবের সহিত দেখা করেন। ভারতীয় ক্রিকেট্ কনট্রোল বোর্ডের সভাপতি এ বিষয় আলোচনার জন্য একটী বিশেষ সভা আহ্বান করেন। সভায় ইহা স্থির হয় যে, অমরনাথকে পুনরায় বিলাত পাঠান হইবে। অবশ্য বিলাতে তাঁহাকে অধিনায়ক ও ম্যানেজারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় দলের অধিনায়ক মহারাজ কুমার ও ম্যানেজার মেজর ব্রিটেন্ জোন্স এই সর্ত্ত মানিয়া লইতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার যাওয়া বন্ধ হয়। আমরা যতদূর জানি তাহাতে মনে হয় যে অধিনায়ক অপেক্ষা ম্যানেজারের আপত্তিই বেশী। অমরনাথের অভাবে ভারতীয় ক্রিকেট্ দল যে কত শক্তিহীন তাহা বুঝিয়াই ভারতবাসী তাঁহাকে পুনরায় পাঠাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলেন। অমরনাথও ভারতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ক্ষমাপ্রার্থীরূপে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। একজন শেতাঙ্গ ম্যানেজারের কাছে ভারতীয় সম্মানের কতটুকু দাম তাহা আমরা বুঝিনা বলিয়াই আজ আমাদের সব অনুরোধ ব্যর্থ হইল কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারই হইল ভারতীয় ক্রিকেট্ কনট্রোল বোর্ডের Dictator.

এ বছরের ভবানীপুর ক্লাবের ফুটবল টিম

ভবানীপুর ক্লাবের ফুটবল-ক্যাপ্টেন
শ্রীসরোজ মুখার্জ্জি

ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট খেলা

গত ১৫ই জুলাই ভারতীয় দলের সহিত ল্যাঙ্কাশায়ার দলের খেলা আরম্ভ হয়। এই খেলায় ভারতীয় দল ৮৪ রাণে জয়লাভ করে। এই জয়লাভের কারণ প্রধানতঃ দুইটী—প্রথম, মেজর নাইডুর অদ্ভুত বোলিং এবং দ্বিতীয়, মার্চ্চেণ্টের ব্যাটিং এই খেলায় অধিনায়ক মেজর নাইডু ৪৭ রান দিয়া ৭ জনকে

করেন। ভারতীয় দল যে আয়র্ল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাও কেবল নাইডুর অসাধারণ বোলিং সাফল্যের জন্য। তখন অবশ্য অনেকেই তাঁহার বোলিং সম্বন্ধে অনেক প্রকার মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ারের ভাগ্য-বিপর্য্যয় দেখিয়া সকলের সন্দেহই নিঃশেষ হইয়াছে। তাহার পর মার্চ্চেন্ট দুই ইনিংসেই যথাক্রমে ১৩৫ ও ৭৭ রান করিয়া নট আউট ছিলেন। তিনি যে কত বড় বিশ্বাসযোগ্য ব্যাটম্যান তা আমরা এই খেলার ফল দেখে বুঝিতে পারি কেননা তাঁহার এই একশত করার মধ্যে একটীও chance দেন নাই।

টেষ্ট খেলা

আগামী ২৫শে হইতে ম্যানচেষ্টারএ ভারতীয় দলের সহিত ইংলণ্ডের দ্বিতীয়

ভবানীপুর ক্লাবের মিঃ এন, গুহ

টেষ্ট ম্যাচ্ আরম্ভ হইবে। ভারতীয় Selection এখন বাহির হয় নাই। গুজব রটিয়াছিল যে মহারাজ কুমার এবার অধিনায়কত্ব করিবেন না। কিন্তু মেজর ব্রিকেটস্ জানাইতেছেন যে মহারাজ কুমার সেদিন এত বড় সম্মান ত্যাগ করিবেন না।

ভবানীপুর ক্লাবের মিঃ এ খালেক

ইংলণ্ডের পক্ষে খেলিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।
জি, ও, এলেন (ক্যাপ্টেন), আর ডবলিউ রবিনস্, হ্যামণ্ড, লেল্যাণ্ড, ভেরিটী, ফিস্‌লক, হার্ডষ্টাফ, ডাক্‌ওয়ার্থ, ফ্যাগ, নিমব্লেট ও গোভার।

আই, এফ, এ, শিল্ড

আই, এফ্, এ শিল্ডের দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা সব শেষ হইয়াছে। তৃতীয় রাউণ্ডের খেলা অর্দ্ধেকের উপর হইয়াছে। এ বৎসর মিলিটারী টিমের সংখ্যা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে খেলার Standard খুবই ভাল হইবে। কিন্তু খেলা দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। দ্বিতীয় রাউণ্ডের ২১টি খেলা খুব contested হইয়াছিল। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ভবানীপুর ও মহামেডান দলের খেলা। নিতান্তই ভাগ্যের দোষে ভবানীপুর ১ গোলে পরাজিত হয়। ইহাছাড়া গত বছরের শিল্ড বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক দলের সহিত ই, বি, আর এর খেলা খুব প্রতিযোগিতামূলক হইয়াছিল। যদিও ইষ্ট ইয়র্ক দল ৩—২ গোলে জয়ী হন কিন্তু ই, বি, আর দলের খেলা সত্যই অপূর্ব্ব হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ডিভিসন লিগ চ্যাম্পিয়ন

এতদিন বাদে ভবানীপুরের প্রচেষ্টা সফল হইল। অনেকদিন, প্রায় ১৩ বৎসর ধরে এরা অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন প্রথম ডিভিসনে ওঠার জন্যে, কিন্তু বিধির বিধানে শেষ পর্য্যন্ত সফল হন নাই। আজ তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে—এবার ভবানীপুর দ্বিতীয় ডিভিসনে প্রথম হইয়াছে। ১৯৩৭ সাল থেকে ভবানীপুর—প্রথম ডিভিসনে লিগ খেলিবে। শ্রীসব্যসাচী লিখিত ভবানীপুর ক্লাবের সংক্ষিপ্ত ক্রমোন্নতির পরিচয় নীচে প্রদত্ত হইল।

দ্বিতীয় ডিভিসন লিগ

১৯২৬ সাল—পুলিসের সঙ্গে একসঙ্গে দ্বিতীয় স্থান অধিকার।

১৯২৭ সাল—প্রথম ডিভিসন লিগে একটি টিম বাড়বার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং রেঞ্জার্স প্রথম ডিভিসনে গেকে যায়, ভবানীপুর তার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

১৯২৮ সাল—ভবানীপুর—দ্বিতীয় ডিভিসন লিগে প্রথম হলেও নানা কারণে 'প্রোমসন' পাই নি।

ভবানীপুর ক্লাবের ফুটবল ভাইস ক্যাপ্টেন শ্রীঅনিল বসু

১৯৩২ সাল—শেষ খেলায় কালিঘাটের কাছে হেরে যাওয়ায় দ্বিতীয় হোল।

১৯৩৩ সাল—এ বছরেও শেষ ম্যাচে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে হেরে যাওয়ায় প্রথম হতে পারে নি।

১৯৩৬ সাল—এবছর প্রথম ডিভিসনে উঠলো।

বিলাসী

দ্বীপান্তর

প্রযোজক : ডি-জি টকিজ
পরিচালক : ধীরেন গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপক : মণি কুণ্ডু
চিত্রশিল্পী : ননী সান্যাল
শব্দযন্ত্রী : মধু শীল, এম-এস-সি
চিত্র-পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং

ভূমিকা-লিপি : মোহন রায়—লোকেন, হরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়—রূপেন, মাষ্টার রূপলাল—বাদল, ধীরেন গাঙ্গুলী—সর্দ্দার, পুলিন বসাক—মেসের ম্যানেজার, ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি—ব্যারিষ্টার, উষা দেবী—মমতা, নীলিমা ব্যানার্জ্জি—মালতী, করুণা বসু—রুবি, কুসুমকুমারী—লোকেনের মা ; ইত্যাদি।

প্রথম মুক্তি : "শ্রী", ১৮ই জুলাই, ১৯৩৬।

ডি-জি টকিজের প্রথম অবদান "দ্বীপান্তর" দেখে যে যাই বলুক না কেন, আমাদের মতে একেবারেই অচল নয়। এই হিসেবে যে, ছবিটি এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রচেষ্টার ফল আর এতে নেমেছেন অনেকে, যাঁদের ছায়াছবিতে নামা এই প্রথম।

"দ্বীপান্তর"-এর গল্পাংশ হচ্ছে নায়ক লোকেনের জীবনকে কেন্দ্র কোরে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হোয়েছিল বটে, কিন্তু বাস্তব জীবন-সংগ্রামে নেমে সে দেখলে তার এতদিনের যা শিক্ষা হোয়েছে তা দিয়ে তার দৈনন্দিন অভাবের সামান্যও মিটবে না। অভাবের তাড়নায়, জীবনের হতাশায় সে আত্মহত্যা করার আয়োজন করেছিল, কিন্তু ভাগ্যচক্রের ফেরে মরা তার হয়ে উঠেনি ; সে একদল ডাকাতের পাল্লায় নিজেকে দেখতে পেলে। সর্দ্দার তাকে অবিরতই কেমন কোরে কষ্ট না কোরেই অর্থ উপার্জ্জন করা যায় তাই শেখাতে লাগলো ; আড্ডায় রূপোজীবিনী রুবির প্রেমও সে পেলে কিন্তু নিয়তির ক্রূর পরিহাসে তার কপালে কিছুই টিকলো না। শেষ পর্য্যন্ত নিরপরাধ লোকেন দ্বীপান্তরের পথে জাহাজে উঠলো—হাতে-পায়ে তার খুনী আসামীর লোহার শিকল।

পর্দ্দার ওপর এই গল্পের যে-রূপ প্রতিফলিত হয়েছে তা একান্তই সামঞ্জস্যহীন। এর জন্যে দায়ী অবিশ্যি চিত্র-নাট্যকার। চিত্র-নাট্য দুর্ব্বল হওয়ার জন্যে গল্পের রস কোথাও জমে উঠতে পারেনি এবং গতি কোথাও হয়েছে অতি দ্রুত, যেন ব্লু এক্সপ্রেস আর কোথাও বা এত মন্থর, যেন বোঝাই দেওয়া মালগাড়ী! চিত্রনাট্য যদি ভাল হতো তাহলে ছবির বারো আনা দোষই শুধরে যেত একথা সকলেই স্বীকার করবে।

পরিচালনায় ধীরেনবাবু আমাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। তিনি একজন নামী হাস্য-রসিক,—সেইজন্যে তাঁর ছবিতে আমরা আশা করেছিলাম আরো উন্নত এবং বেশী পরিমাণে হাসির খোরাক। এ বিষয়ে আমাদের তিনি হতাশ করেছেন। বয়-বাবুর্চ্চিকে দিয়ে তোতলা কথা বলিয়ে দর্শকদের হাসাবার চেষ্টা আজকের দিনে খুবই সস্তা বলে ধরা যেতে পারে। যুগপৎ রুবির এবং মমতার অন্তরের সংঘাত দেখাতে তিনি যে চেষ্টা করেছেন তাতে দর্শকের মনে কোন রেখাপাত করে না। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আর আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই।

ক্যামেরার কাজে ননী সান্যালের প্রশংসা আমরা করি। আমরা কেন, সান্যাল মশায়ের অতি বড় বন্ধুও তাঁর কাছে এতটা আশা করে নি। বিশেষ কৌশলের কিছু নেই, কিন্তু বেশ নরম আর স্বচ্ছ তাঁর কাজ।

শব্দযন্ত্রী মধুবাবুর কাজের প্রশংসা আমরা এতবার করেছি যে এবার কিছু না লিখলেও আশা করি তিনি আমাদের ভুল বুঝবেন না। শুধু বলে রাখি যে "দ্বীপান্তরে" পিন পড়ার মত সামান্য আওয়াজও দর্শকরা বেশ স্পষ্ট শুনতে পাবে এবং অবিকৃতভাবেই।

গানের সুর এবং আবহাওয়া সঙ্গীত অতি সাধারণ। সম্পাদনার কাজ বেশ যোগ্যতার সঙ্গে করা হয়নি। ছবিখানার অনেক উন্নতি হতে পারে, আর একটু বুদ্ধি খরচ কোরে কাঁচি চালালে। লোকেন আর বাদল যখন ঘোড়ার গাড়ীতে যাচ্ছে তখন তাদের কথাবার্ত্তা মোটেই শোনা যাইনি—সম্পাদক মশা'য়ের দৃষ্টি কি এদিকেএকটুও পড়েনি? রসায়নাগারের কাজ ভাল। আর ভাল হয়েছে দৃশ্যপট এবং সাজসজ্জা। দৃশ্যপটগুলোর বিশেষ প্রশংসা করা যেতে পারে।

লিগে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রথম ছিল।

ভবানীপুর 'ক্যালকাটা সকার লিগ' এবং 'বেঙ্গল সকার লিগ'ও পেয়েছে।

আই এফ এ শিল্ডে ১৯৩৫ সালে ৪র্থ রাউণ্ডে হেরে যায়। ট্রেডস্ কাপে ১৯২২ সালে রানার্স। ১৯২৯ সালে সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠেছিল।

ইয়ঙ্গার কাপে ১৯৩৩ সালে সেমি-ফাইনালে ডারহামের কাছে পরাজয়।

কুচবিহার কাপে ১৯২৩, ১৯২৭ এবং ১৯২৯ সালে জয়। ১৯৩১, ১৯৩২ সালে রানার্স।

এ ছাড়া ছোটখাটো আরো অনেক খেলায় এদের কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

ভবানীপুর ক্লাবের এই প্রশংসনীয় ক্রমোন্নতি জন্যে ফুটবল-সেক্রেটারী শ্রীশরৎ রায় এবং যথাক্রমে ক্যাপ্টেন ও ভাইস ক্যাপ্টেন শ্রীসরোজ মুখার্জ্জি এবং শ্রীঅনিল বসুর নাম সবায়ের প্রশংসায় দাবী করিতে পারেন। ভবানীপুর ক্লাবের প্রাণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মিত্রের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভবানীপুর ক্লাবের উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করুক—বাঙ্গালী মাত্রের শুভেচ্ছা।

এর পরে অভিনয়ের কথা। নায়ক লোকেনের অংশে রূপোলী রাজ্যে নবাগত মোহন রায়ের অভিনয় আশাপ্রদ। এদিকে থাকলে এঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সর্দ্দারের আড্ডার রূপোপজীবিনী রূপসী 'রুবির অংশে করুণা বসুও চিত্র জগতে নতুন পথিক। সেই হিসেবে ইনিও বেশ উতরে গেছেন; বাদলের ভূমিকায় মাষ্টার রূপলাল ভাল। পরিচালক স্বয়ং করেছেন ডাকাত সর্দ্দারের অংশ; মন্দ নয়, তাঁর চোখে-মুখে মনের ভাব প্রকাশ ভারী সুন্দর। নায়িকা মমতার ভূমিকায় উমারাণীর মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অভিনয় আমাদের খুশী করেছে। ছোট ছোট চরিত্রগুলোর মধ্যে ডাঃ হরেন মুখার্জ্জীর অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে। কুসুমকুমারীর 'লোকেনের মা' এবং পুলিন বসাকের "মেসের ম্যানেজার" একেবারেই অচল থিয়েটারী ঢংএর। মালতীর ভূমিকায় নীলিমা ব্যানার্জ্জী উল্লেখ যোগ্য। অন্যান্য ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।

মোটের ওপর সব দিক থেকে বিচার কোরলে "দ্বীপান্তরে" সাধারণে রসের সন্ধান পাবেন একথা বলা যায় এবং ছবিখানা "শ্রী"-তে চলবেও ভাল মনে হয়।

শ্যামসুন্দর

দ্বীপান্তরের সঙ্গে ছোট্ট তিনরীলের এই ছবিখানি দেখানো হচ্ছে। ছবিটির গল্পাংশ বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং হাস্যরসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং এতে দেখানো হয়েছে একজন ঠগ্ কেমন করে একজন ধার্ম্মিক কীর্ত্তনীয়ার সংস্পর্শে এসে তার স্বভাব বদলিয়ে সৎপথে ফিরে এল। গল্পটি মন্দ নয় তবে নিতান্ত সাধারণ পরিচালনার জন্যে ততটা জমে উঠেনি। ছবিটিতে অভিনয়ে কেউ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি তবে শেফালীর একক সঙ্গীতটা ভারি সুন্দর।

ক্যামেরা এবং শব্দযন্ত্রের কাজে কোন দোষ নেই এবং সাজসজ্জা ও দৃশ্য-সংস্থাপন যথোপযুক্ত হয়েছে।

নিউ থিয়েটার্স

"বিজয়া"-র কাজ বন্ধ রয়েছে—কারণ, চন্দ্রাবতী হ'য়েছেন অসুস্থ।

এদিকে পরিচালক নীতীন বসুরও জ্বর—সেজন্যে তাঁর ছবির কাজও আপাততঃ স্থগিত রয়েছে।

* * *

পরিচালক হেমচন্দ্র "অনাথ আশ্রমে"-র হিন্দী সংস্করণ তুলবেন আগে—পরে তোলা হবে এই গল্প বাঙ্লায়।

টালিগঞ্জে ভীষণ ডাকাতি ও নারী হরণ

টালিগঞ্জের যে অংশকে আমরা টলিউড বলে জানি ছায়া-লোকের সেই মায়া-পুরীতে সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি যেমনি হৃদয়-বিদারক, তেমনিই মর্ম্মস্পর্শী!

ভদ্রলোকটির নাম—রমেশ; ডাক্‌ফিল্ কোম্পানীর কেরাণী। সেদিন নাগ-পঞ্চমী উপলক্ষে অফিস বন্ধ ছিল। পাঁচ বছর আগে এই নাগ-পঞ্চমীর দিনেই বেচারী বিয়ে করেছিল। কিন্তু ছুটি থাকুক বা না-ই থাকুক, প্রতি বছরই সে এই দিনটিতে বাড়ী আসতো। জীবনের সেই শুভ দিনটি স্মরণে রাখতে—কেরাণী রমেশও বৎসরান্তে "ম্যারেজ

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার "সোনার সংসার"-এ নায়ক রমেশের বাড়ীতে ডাকাত পড়ার দৃশ্য। ছবিতে নায়ক রমেশ—জীবন গাঙ্গুলী এবং ডাকাত সর্দ্দার হচ্ছেন মণি ঘোষ।

স্যানিভারদারী" পালন করতে তার ক্ষুদ্র বাস-ভবনে ফিরে এল।

বাড়ীতে তার তিন বছরের ছেলে শ্যামল আর অষ্টাদশী সুন্দরী স্ত্রী—রমা।

স্বামী-স্ত্রীর মিলনে, মান অভিমানের মাঝ দিয়ে সন্ধ্যে কাটল। কিন্তু রাত্রি শেষের কিছু আগেই এক অঘটন ঘটে গেল।

শোবার ঘরে একদল ডাকাতের আচমকা আক্রমণ! ঘুমন্ত কুটীরে সকলে জেগে উঠলো। দলপতির আক্রমণে ও প্রবল প্রহারে রমেশ সজ্ঞাহীন। দলের আর একটী লোক রমার বাহু বন্ধন থেকে শ্যামলকে ছিনিয়ে নিলে এবং চথের নিমেষে আরও ক'জন রমার চেতনাশূন্য দেহকে কোলে তুলে নিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল!

যেন ভোজবাজীর মত, গভীর রাত্রে এই নিদারুণ অত্যাচারের ঘটনাগুলি,—পাড়া-পড়শী কেউ জানতে পারলো না!

নিয়তির এক ফুৎকারে রমেশের সোণার সংসার এক নিমেষে ভূমিসাৎ হয়ে গেল!

ইতিমধ্যে "টলিউড্ বার্ত্তাবহ" খবর দিয়ে গেল—

ব্যাপারটা নাকি ঘটেছিল সত্যিই, কিন্তু একটু অতিরঞ্জিত।

শুনলাম ঈষ্ট ইণ্ডিয়ায় এই ভেল্কীবাজী চলেছিল। ম্যাজিশিয়ান্ দেবকী বোস—সোণার সংসার ভেঙ্গে দিলেন!

রমা, রমেশ ও শ্যামল—আর কেউ নয়, আমাদের চির-পরিচিত সেই ছায়ালোকের বাসিন্দা—ছায়া দেবী, জীবন গাঙ্গুলী এবং সেই ছোট্ট মেয়েটি, নাম তার শ্যামপিয়ারী!

কালী ফিল্মস

প্রচার-পত্রে এদের আগামী ছবির নাম "Talkie of Talkies" দেখে অনেকেই স্থির করে উঠতে পাচ্ছেন না যে ছবিখানি সত্যি কি। আমরা শুনেছি যে "Talkie of Talkies" হচ্ছে নব নাট্যমন্দিরে অভিনীত "রীতিমত নাটকে"র চিত্ররূপ। শ্রীশিশির ভাদুড়ী এই ছবিখানি পরিচালনা করবেন এবং এতে নামছেন নাট্য-মন্দিরের নটনটীরাই। তবে শ্রীশিশির কুমারকে tackle করতে গাঙ্গুলী মশায়কে বিশেষ বেগ পেতে হবে নিশ্চয়ই,—কারণ অনেকেরই হয়তো মনে আছে যে নিউ থিয়াটার্সে "সীতা"র চলচ্চিত্র গ্রহণ কালে মিঃ সরকারকে অনেক সময় সারারাত্রি ষ্টুডিওতে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। শিশিরকুমারের মত costly Luxury গাঙ্গুলী মশায়ের ধাতে সইবে ত?

রাধা ফিল্মস

"বিষ-বৃক্ষে"র নগেন্দ্রের বাড়ীর একটী দৃশ্যের এখন কাজ চলছে। কুন্দনন্দিনীর নগেনের বাড়ী ছেড়ে হীরামালিনীর কাছে আশ্রয় নেওয়া, এবং তারাচরণের মৃত্যু-দৃশ্য প্রভৃতি অন্যান্য আরো কয়েকটা দৃশ্যও শেষ হয়েছে। মোট কথা ছবির কাজ বেশ স্থিরভাবেই এগুচ্ছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই মুক্তি পাবে।
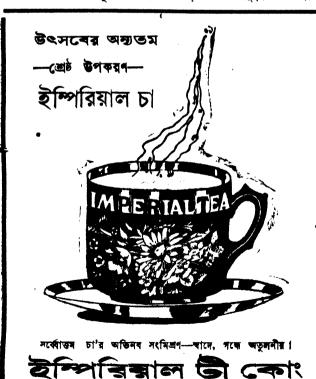
"খুনী কোন্?" বা হিন্দী "কণ্ঠহার"-এর একটা দৃশ্যের জন্তে সম্প্রতি এদের ষ্টুডিওতে প্রায় ৫০০ বাড়তির আমদানী হয়েছিল। এ ছবির কাজ বেশ ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

চিত্রা-রূপবাণীর ফুটবল খেলা

গেল শুক্রবার সকাল সাতটার সময় দেশবন্ধু পার্কে "চিত্রা" এবং "রূপবাণীর" মধ্যে ফুটবল খেলা হয়ে গেছে। "চিত্রা" ২-০ গোলে "রূপবাণী"কে হারিয়ে দিয়েছে। "চিত্রা" দলের খেলা বেশ ভালই হয়েছিল।

খেলার শেষে "চিত্রা"র দু'পক্ষের খেলোয়াড়দের জলযোগের বন্দোবস্ত হয়েছিল।

রীতেন এণ্ড কোং

সব জল্পনা কল্পনার অবসান হোল। এই প্রতিষ্ঠান চন্দ্র ফিল্মের "পরপারে"র পরিবেশন স্বত্ব পেয়েছেন। রীতেন এণ্ড কোং অনেক গুলো চিত্রগৃহে তাঁদের ছবি সরবরাহ করেন; কাজেই চন্দ্র ফিল্মের মালিক শ্রীযুক্ত চন্দ্র তাঁর ছবির যথোপযুক্ত পরিবেশন সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টস

এদের "রামকান্ত"র প্রায় বেশীর ভাগ অংশের কাজ শেষ হোয়েছে। শ্রীযুক্ত পাঠক এখন মিল অঞ্চলে এই ছবির একটি বিশেষ অংশ দৃশ্য তুলছেন। ছবির নায়িকা শ্রীমতী সুরমাকে আসছে হপ্তায় মন্দির দৃশ্যে একটি বিশেষ ভাবপূর্ণ দৃশ্য তুলসী বাড়ুজ্যের সঙ্গে তুলতে হবে।

ষ্ট ইণ্ডিয়া

ইরানী ছবির নায়িকা মিস ভাজিরি "লাইলা মজনু"র কাজ শেষ কোরে শীঘ্রী তাঁর স্বদেশে ফিরে যাবেন। অভিজাত ঘরের এই ইরাণী শিল্পী এদেশে এসে চারখানি ছবি তুলেছেন এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও মধুর স্বভাবের জন্তে তিনি এদেশ থেকে চলে গেলেও অনেকে তাঁকে মনে রাখবে।

* * *

"বাঘী সিপাহী"তে দরবার দৃশ্য এখনো তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই ছবির জন্তে পূর্ণিমার একটি নাচের দৃশ্যও নেওয়া হয়ে গেছে।

বিবিধ

বিপিন পাল রোড

দক্ষিণ কলিকাতার বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চার নম্বর ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে রসা রোডের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পরলোকগত বাগ্মী ও দেশ-সেবক বিপিনচন্দ্র পালের নামে নামকরণ করা হউক বলিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে। স্বদেশী যুগের তেজস্বী বক্তা ও দেশসেবকের স্মৃতি রক্ষার এই প্রচেষ্টা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

পরলোকে

প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ শিখরকুমার বসু পরিণত বয়সে দমদমার বাস ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার পুত্রত্রয় তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গত রবিবার দিন পাঁচ শতাধিক দরিদ্রনারায়ণের ভূরি ভোজের ব্যবস্থা করেন। পরলোকগত পুণ্যাত্মার স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

চক্রতীর্থ

চক্রতীর্থের ষষ্ঠ অধিবেশন বিগত ১৯শে জুলাই রবিবার ১১নং চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোডস্থ ভবনে হইয়া গিয়াছে। সুকবি প্রফুল্ল সরকার একটি কবিতা পাঠ করেন যাহাতে অতি আধুনিকতার সমস্ত দোষ ও গুণ বর্ত্তমান। তৎপরে শ্রীঅনুপমকৃষ্ণ বসু একটি অতি সুন্দর রস-রচনা পাঠ করেন যাহা প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীক্ষীরোদ চট্টোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ এবং শ্রীউমাপদ চট্টোপাধ্যায় একটি কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে সভ্যগণের মধ্যে নিয়মিত আলাপ আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়।

পথ

জয়েশচন্দ্র লাহিড়ী

কাঁসাই নদীর তীরে—উরগের মত এঁকে বেঁকে গেছে পল্লীর বুক চিরে সরু একখানা পথ। নব বধূর সিথির মত। সৃষ্টির প্রভাতি হতে চলা তার হয়েছে সুরু—মৌন ব্রতধারী পথ।

সাথীহীন, বন্ধুহীন পথ বিপুল ধৈর্য্য নিয়ে কোন অজানা বিরাটের তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছে।

বাক্‌হীন স্পন্দন-বিহীন পথ মহা নিদ্রার কোলে হেলিয়ে দিয়েছে তার সারহীন নিশ্চল সত্বাকে। এই নিদ্রাই তার গতি। এই গতিহীন গতিতেই তার জয়।

কবে কোন দিন, কার অভিশাপে পাষাণে রচেছিল তার শয্যা, তা আজিও হয়নি ঠিক।

তাপস পর্ব্বতের ধ্যান ভঙ্গ করে উন্মত্ত যৌবন-রসে উচ্ছল আবেগ নিয়ে একদিন সে এসেছিল।

স্তব্ধ পর্ব্বতের নির্দ্দয় মৌনতায় সে গিয়েছে থমকে।

পথের হৃৎপিণ্ড তার ধূলিকণা। কত দিনের কত স্মৃতি-বিজড়িত সুখ দুঃখ জমে আছে এই ধূলিকণায়।

ক্ষুদ্র তার প্রাণ, তুচ্ছ তার ধূলিকণা। তাই বুঝি হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির বেদনায় সে গুমরে গুমরে শিউরে ওঠে—কত তৃপ্তিহীন আকাঙ্খার আর্ত্তনাদ ভেসে বেড়ায় রেণুতে রেণুতে—কত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে সৃষ্টির কিনারায় যায় মিলিয়ে।

নীরব পথের আকুল বাসনা রুদ্ধ আবেগে কেঁদে কেঁদে ওঠে—কোন দুঃসহ বুকের ব্যথা সে বলতে চায়…পারেনা।

নির্ম্মম উপহাসের মত মুমূর্ষু এ পথের হৃৎপিণ্ড সবুজের স্বপ্ন দেখে—সবুজ সজীব গাছের ছায়া-বীথির হাওয়া মর্ম্মরিয়ে দোল খায়।

পাতায় পাতায় কেঁপে ওঠে তার ব্যথাতুর মর্ম্মের মূর্চ্ছিত কান্নার মূর্চ্ছনা।

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সুসজ্জিত কক্ষ—ভারতী এস্রাজ বাজাইয়া গাহিতেছিলেন]

"আমার এ সোণার গাছে ফলেছে সোণার ফল
এ নব-যৌবন রূপে-রসে ঢল ঢল !
ফলে ফুলে ভরা-শাখী,
পঞ্চমে গাহে পাখী,
তৃষিত চাতক বুকে চাহিছে ফটিক জল !
কোথা হে পিয়াসী বঁধু, কোথা তুমি চিতচোর,
নিশি জেগে আছি বসে, চোখেতে স্বপন-ঘোর—
এ স্বপন ভাঙিও না,
দূরে আর থাকিও না,
পথপানে চেয়ে চেয়ে আঁখি করে ছলছল !

[গীত শেষে ভারতী কক্ষবিলম্বিত দর্পণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং চূর্ণ কুন্তল-গুলি সুবিন্যস্ত করিতে করিতে]

ভারতী। নাঃ বাপু, আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের রূপ দেখে অবাক্ হোয়ে চেয়ে থাকি, তা কলেজের ছেলে-গুলোকে বোল্‌বো কি—তারা ত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ কোরে চেয়ে থাকবেই ! আচ্ছা, পুরুষরা যে চোখে লক্ষ্মী-সরস্বতী, দুর্গা-কালীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়, কেন তারা সেই চোখে আমাদের রূপ দেখে মাথা নোয়ায় না ? এ-কি যারা দেখে তাদের দোষ, না যাদের রূপ, তাদের দেখাবার দোষ ? কিন্তু সে যাই হোক্, আমি আর নিজের এ রূপ নিয়ে সাম্‌লাতে পাচ্ছিনে। এর একজন রক্ষকের দরকার হোয়েচে—যিনি এসে তাঁর মন্ত্রপূতঃ স্পর্শে অন্য ভক্ষকদের কাছ থেকে একে অস্পৃশ্য কোরে রাখবেন ! এবারকার Mailএ চিঠি পেয়েছি—তিনিত আর দুচার দিনের ভেতরেই এসে পড়বেন। তাই আসুন—তাই আসুন; আমি এ রূপের পসরা তাঁকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই ! আচ্ছা, মাষ্টার মশাই আজ দু'দিন হোলো আসেন নি—এমন অঘটন ত কখনো হয় না ! অসুখ বিসুখ কল্লে না কি ? আহা বেচারী, বড্ড shockটাই পাবেন ! স্পষ্ট করে খুলে বলাই এতদিন আমার উচিত ছিল—কিন্তু কেন জানিনা, বলি বলি করেও বোল্‌তে পাল্লাম না। আজও কি আসবেন না, না কি ? নাঃ একা একা আর ভাল লাগচে না—আর একটা গান গাই।

"(আমি) সঙ্গোপনে রাখ্‌নু কোরে পূজার আয়োজন,
বোধন-বাদ্য বেজে গেছে, ঘনিয়ে আসে ক্ষণ !
দুই চোখে দীপ রইলো জ্বালা
বাহুর ডোরে ফুলের মালা
হৃদয়ে নৈবেদ্য, অধর কর্ব্বে আবাহন !
সীমন্ত রাখিনু শূন্য
তুমি এসে কোরো পূর্ণ
সিন্দুরের বিন্দু দিয়ে—শ্রেষ্ঠ আভরণ—
কুমারী জীবন খানি
অঞ্জলি ভরিয়া আনি
চরণতলে কোর্ব্বো নিবেদন—
আমার প্রেমের পূজা হবে সমাপন !"

[বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ]

বিশ্বে। আমি 'এন্‌কোর' দিলে ত আর গাইবেন না ?

ভার। আপনি বুঝি চুরি কোরে গান শুনছিলেন ? যান্—আমি রাগ কল্লুম !

বিশ্বে। ও রাগ আমি এখুনি অনুরাগে পরিণত কর্ব্বার মন্তর জানি ! এই নিন্—গেজেট বেরিয়েচে, দেখুন। সেদিন বলেছিলাম, বিশ্বাস হয়নি, এখন হবে ত ?

ভার। দেখি, দেখি—(দেখিয়া আনন্দের গৌরবে) নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখতে বেশ ভাল লাগে, না মাষ্টার মশাই ?

বিশ্বে। হ্যাঁ, আর সেই "নিজের নাম" যদি আবার সকলের ওপরে থাকে, তাহোলে আরও বেশী কোরে ভাল লাগে ! যাক্, আপনার মুখের এই হাসিটুকু স্বচক্ষে প্রথম দেখ্‌বার লোভে, আমি যা-নয় তাই—অ-মানুষের কাজ করেচি !

ভার। কি—কি, কি কোরেচেন ?

বিশ্বে। আজ নয়—আর একদিন শুনবেন।

ভার। না, আর একদিন নয়, আজই, এখনই, আপনাকে বোল্‌তে হবে।

বিশ্বে। এত জোর কেন বলুন ত ?

ভার। না, আপনি বলুন।

বিশ্বে। আজ আনন্দের দিনে, শুনলে হয়ত ব্যথা পাবেন, তাই। আপনাকে আমাদের ঘরের কথা ত অনেক বলেচি। মা পাঠিয়েছিলেন দাদাকে, আমায় নিয়ে যাবার জন্যে—আমি যাইনি—

ভার। কেন গেলেন না ? ভাল করেন নি, মাষ্টার মশাই।

বিশ্বে। তা ত করি নি, কিন্তু এ "ভাল-না-করা" যে "কি না করা" তা আপনিও হয়ত ঠিক বুঝবেন না, সংসারের অন্য কেউও ঠিক বুঝতে পার্ব্বে না। তবুও যাইনি, যেতে পারি নি। আজ দু'দিন ঘরের বা'র হোতে পারি নি, আর্শীতে নিজের মুখ নিজে দেখতেও সাহস করি নি, কিন্তু আজ গেজেট বেরুবে

বলে, সব ভাবনা চিন্তা ঠেলে ফেলে বেরিয়ে পড়িচি—আপনার কাছে ছুটে এসিচি—

ভার। আপনি একটু বসুন, মাষ্টার মশাই—বাবা এখন বাড়ী নেই, মা'কে খবরটা দিয়ে আসি—[ভারতী সহসা চলিয়া গেলেন]

বিশ্বে। এ কি হৃদয়হীনতা? একটা সহানুভূতির কথাও মুখ দিয়ে বার হোলো না! ফাষ্ট হোয়েচে বোলে নিজের আনন্দেই বিভোর—ছুটলো মায়ের কাছে তাড়াতাড়ি খবর দিতে!

"হায়রে হৃদয়—
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে কত পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়!"

হয়ত, এতদিন আলেয়ার পিছনে পিছনেই ফিরচি!

[অত্যন্ত পরিপাটীভাবে সজ্জিত হইয়া "পূরবীরায়ের" বেশে বসুদেবের প্রবেশ]

পুরবী। নমস্কার। আপনিই বোধ হয় ভারতী দিদির মাষ্টার মশাই? তিনি বাড়ীর ভেতরে বোধ হয়? ভারতী দিদি first হোয়েচেন শুনে তাঁকে congratulate কোর্ত্তে এসেচি। আপনারও কথা ঢের শুনেচি—আপনাকেও এখানে expect করেছিলাম। ভারতী দিদি ত average merit এর ছিলেন, শুধু আপনার coaching-এর গুণেই না first হোতে পেরেচেন। দেখুন, আপনার সঙ্গে যখন দেখাই হোয়ে গ্যালো, তখন একটা অনুরোধ কর্ব্বো কিছু মনে কর্ব্বেন না। আমি আঁকটাতে বড় কাঁচা, যদি দয়া করে আমাকেও একটু শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে দ্যান্—তাহোলে বড় উপকার করা হয়···

বিশ্বে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ—বড্ড বেশী বাড়িয়ে বোল্‌লেন, তাইতে শুনতেও বেশ ভালই লাগলো। কিন্তু আমি এখানে পড়াই কিনা,—অবশ্য আর পড়াবো কিনা, অর্থাৎ এরা আমাকে আর রাখবেন কিনা, ঠিক জানিনে, তবে ভারতী দেবীর—মানে হোচ্চে ইয়ে না নিয়ে—অন্য কোনও মহিলা ছাত্রীকে—

পুর। কেন, "ভারতী দেবী" কি আপনার guardian না কি? বেশ, তিনিই আসুন,—এই যে ভারতী দিদি [ভারতীর প্রবেশ] My congratulations! আপনি আমাকে চিনতে পাচ্চেন না? তা চিন্‌বেনই বা কেমন কোরে! আমি আপনার এক class নীচে পড়্‌তাম যে! আমার নাম "পূরবী রায়"। আপনি খুব ভাল Motor এ কোরে school এ যেতেন কি না,—আর আপনি খুব সুন্দরী—যদিও অবশ্য আমার মতন এতটা নয়—তা যাই হোক্, সেইজন্যে সকলেই আমরা আপনাকে চিনি কিনা!

ভার। না,—আপনাকে ত আমি চিন্‌তে পাচ্চি নে—

পুর। কিচ্ছু দরকার নেই। আপনি আমাদের School-এর মাথা উঁচু কোরে দিয়েচেন—আপনাকে Congratulate কোর্ত্তে এসেচি—আর সেই সঙ্গে—হ্যাঁ ভাল কথা—আপনার মাষ্টার মশাইটীকেও দখল কোর্ত্তে এসেছি—যদি উনি আমাকে একটু Coach কোরে অমনি First কোরে দ্যান্! তা উনি বোল্‌চেন্—আপনার অনুমতি না পেলে—

ভার। আমার অনুমতি! উনি কর্ব্বেন মাষ্টারী, তাতে আমার অনুমতির দরকার? ওঁর যদি সময় থাকে, তাহোলে এমন সুন্দরী ছাত্রী ওঁর না ছাড়াই ত উচিত!

বিশ্বে। না—না, আপনি ত জানেন—সময় আমার. অল্প—না—না সময় আমার মোটেই নেই!

পুর। আছে বৈ কি মাষ্টার মশাই, মনে কোল্লেই, আছে। আচ্ছা, উপস্থিত ত আমার Card খানা রেখে চল্লুম—একটু ভেবে দেখবেন, যদি সময় কোর্ত্তে পারেন। [ভারতীর প্রতি] আপনার আর সময় নষ্ট কোর্ব্বো না—চল্লুম্—আজ আবার অনেক যায়গায় আমাকে Congratulate কোর্ত্তে যেতে হবে কি না। নইলে, আমি আবার খুব ভাল নাচতে পারি কি না—"আমরা নাচবো রাইবেঁশে" [ভঙ্গী সহকারে]—সেই ব্রতচারিণী Danceটা দেখিয়ে যেতে পার্ত্তাম্! আচ্ছা, আসি আজ—নমস্কার—নমস্কার!

[পূরবী ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

[ভারতী মুহূর্ত্তকাল সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন—এমন সময়ে নেপথ্য হইতে ভারতীর মা ডাকিলেন—"ভারতি"]

ভার। যাই মা—[ভারতী চলিয়া গেলেন]

বিশ্বে। বিশ্বম্ভর ভট্‌চায্যির ভাই, জাহ্নবী মায়ের সন্তান, কোল্‌কাতায় এসে শেষে কি মেয়েমানুষের আঁচলের রিং হোয়ে থাক্‌বো না কি! [পূরবীর দেওয়া Cardখানা নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন]

[ভারতী একহাতে খাবারের প্লেট, এক হাতে জলের গেলাস্ লইয়া প্রবেশ করিলেন]

ভার। মাষ্টার মশাই কি এখন থেকেই পূরবী রাগিণী সাধ্‌তে সুরু কোরে দিলেন না কি? কি—কথা কোচ্চেন্ না যে? রাগ হোলো না কি? না—না, রাগ কোরে আর কাজ নেই! মা তখন আহ্নিকে বসেছিলেন—আহ্নিক থেকে উঠে, আপনার জন্যে খাবার পাঠিয়ে দিলেন—বল্লেন, আজ মিষ্টিমুখ কোর্ত্তে হয়।

বিশ্বে। মিষ্টি মুখ—তা বেশ ত।

ভার। বেশ বোল্লেই ত আর মিষ্টি এগিয়ে গিয়ে মুখে পোড়বে না—একটু নড়তে চড়তে হবে ত?

[বিশ্বেশ্বর ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতে পাইলেন]

ভার। হাঁ কোরে তাকিয়ে রইলেন যে—ভাব লাগলো না কি? [বিশ্বেশ্বরের হাত

ধরিয়া টানিয়া] মিষ্টি কোলে করে বসে রইলেন্ ? আপনি ভারি বোকা—খান্—

বিশ্বে। এই যে খাই—[দুইজনে কাছাকাছি হইতেই বিশ্বেশ্বরের অধরোষ্ঠ ভারতীর অধর স্পর্শ করিল]

বন জ্যোৎস্না। [ঠিক এই সময়ে নেপথ্য হইতে] কি রে ভারতি, মাষ্টার মশাইকে মিষ্টিমুখ করালি ?

[ভারতী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—বিশ্বেশ্বর কুণ্ঠিতভাবে খাবারের পাত্র টানিয়া লইয়া খাইতে লাগিলেন—বনজ্যোৎস্না প্রবেশ করিলেন]

বন। তুমি ত বাবা, আমার সন্তানতুল্য—তোমার সামনে বেরুতে আর লজ্জা কি ? ভারতী ভাল কোরে পাশ কোরেচে শুনেছিলুম কিন্তু এত ভাল কোরে যে পাশ কোর্ব্বে, তা মনে করিনি। এ শুধু বাবা তোমারই চেষ্টায়—

[বিশ্বেশ্বর উঠিয়া আসিয়া বনজ্যোৎস্নাকে প্রণাম করিলেন এবং ভারতীও দেখাদেখি মা-কে প্রণাম করিয়া এক সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

বন। ভারতীর বুঝি এতক্ষণে প্রণাম কর্ব্বার কথা মনে পড়লো ? তা, দুজনেই একসঙ্গে প্রণাম কল্লে ! [ভারতী মায়ের দিকে একবার করুণ চোখে চাহিল মাত্র] তা কুরিচিস্ করিচিস্, আর [ভারতী মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন] [বিশ্বেশ্বরের প্রতি] তা বাবা, তুমি বড় ভাল মাষ্টার মশাই—আমি তোমাকে হাতছাড়া কোর্ব্বো না। ভারতী আছে—আমার আর চারটী ছেলে আছে—দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে আরও কোন্ না দুটী একটী হবে—তোমার পড়োর অভাব হবে না বাবা। তুমি এখানেই বরাবর মাষ্টারি কর্ব্বে। কি রে ভারতি, তুই ওমন মিইয়ে রইলি কেন বল্ ত ?

ভার। উনি এম-এ-পাশ কোল্লে কত বড়-বড় কাজ পাবেন্—চিরকালই কি আমাদের বাড়ী মাষ্টারি কর্ব্বার সময় পাবেন না ?

বন। তা পেলেনই বা বড় বড় কাজ—দিনে সময় না পান্, রাত্তিরে মাষ্টারি কর্ব্বেন ! কেমন, নয় বাবা ?

[ভারতী এই সময় চলিয়া যাইবার জন্যে উসখুস্ করিতে লাগিলেন—অদূরে দক্ষিণাবাবু প্রবেশ করিলেন]

দক্ষি। এই যে "বুনো" তুমি এখানে ! ওরে ভারতি, তোর মাকে শীগ্গী একটা প্রণাম কর্—তুই এবার Matric-এ-First হোয়েচিস্।

বন। দুয়ো-দুয়ো ! ওরে ভারতি, তোর বাবা হেরে গ্যাছে ! মনে কোরেছিলে, প্রথম খবরটা দিয়ে চোম্‌কে দেবে—তা ত হোলো না—মাষ্টার মশাই আমাদের প্রথম শুনিয়ে দিয়েছেন !

দক্ষি। মাষ্টার মশাই ? ওঃ, এই যে ! যাক্ এ হারে আনন্দ আছে। A right man in the right place ! এ খবর ওর ই ত প্রথম শোনানো দরকার—[ভীষণভাবে বিশ্বেশ্বরের করমর্দ্দন করিতে লাগিলেন]

বন। আহা, বাছার হাতটা যে ভেঙ্গে যাবে !

দক্ষি। কথনো ভাঙ্গবে না। এ তোমার পরিষ্কার jealousy ! আমার বেশ মনে পড়ে, তুমিও এককালে এই হাতুড়ী পেটা হাতের তারিফ কোর্ত্তে !

বন। হ্যাঁ-রে ভারতি, তোর বাবাকে প্রণাম কল্লিনে ?

[ভারতী প্রণাম করিতে যাইতেই, দক্ষিণাবাবু ভারতীকে বাধা দিয়া]

দক্ষি। ওকে ত এখনই double প্রণাম কোর্ত্তে হবে—তোমাকেও না প্রণাম কোর্ত্তে হয়—

বন। আমি কিন্তু এখন পার্ব্বো না—মাষ্টার মশাই রোয়েচেন—বড্ড লজ্জা কোর্ব্বে !

দক্ষি। আহা,—Feelings এর মুখে বাধা দাও কেন ? আমি হেরেও হারবো না। আমি এমন একটা first hand খবর দেবো যে, তোমরা সকলেই অবাক্ হোয়ে যাবে। মাষ্টার-মশাই, আপনি প্রস্তুত হোন্—

বিশ্বে। আমি প্রস্তুত হবো ?

দক্ষি। হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয়ই ! ভারতীর যে এই মাসের শেষেই বে'র ঠিক্ করে ফেল্লাম। আপনার দেশের বাড়ী নিশ্চয়ই ষ্টেশন্ থেকে বেশী দূর নয় ?

বিশ্বে। কিন্তু বিয়ে ত এখান থেকেই হবে...

দক্ষি। নিশ্চয়ই বে এখান থেকেই হবে—তবে তাঁদের অনেককে ত আনা চাই ? সেখানে যত আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, সব জড়ো কোর্ত্তে হবে ত ?

বন। এই তোমার খবর ?

দক্ষি। আহা, Feelings এর মুখে বাধা দাও কেন ? এখনও—climax এ আসে নি ! মাষ্টার মশাই, আপনাকেই সব আয়োজন কোর্ত্তে হবে—আমি ত একা মানুষ, ছেলেরা সব নাবালক—ভরসার মধ্যে উনি—ওই আমার একমাত্র wife !

বন। তুমি বাপু, আর যা ইংরিজি কোরে বোল্‌তে হয় বোলো—তা বোলে, "wife" বোলে, অমন মিষ্টি জিনিসটাকে মাটী করো না, তা বোলে দিচ্ছি।

দক্ষি। আচ্ছা-আচ্ছা। Now to come to the point—তোমরা বোধ হয় জানো না—সুবোধ এইমাত্র আমাকে "ফোন্" কচ্ছিলো—সে আজ তিন দিন হোলো এসে পৌঁছেচে—

বিশ্বে। সুবোধ ? কে সুবোধ ? তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ের সম্পর্ক কি ?

বন। সুবোধ এসে পৌঁছেচে ? এতক্ষণ বোল্‌তে হয় ?

দক্ষি। দুয়ো দুয়ো! ওরে ভারতি, তোর মা এবার হেরে গ্যাছে!

বন। না রে ভারতি, শুনিস্ নি। আমি কোনও দিন হারিনি—আজও হারবো না—

[সুবোধ চ্যাটার্জ্জির প্রবেশ]

এই যে বাবা, তোমার কথাই হোচ্ছিলো—চিরজীবি হোয়ে বেঁচে থাকো—[সুবোধ বনজ্যোৎস্নাকে প্রণাম করিলেন]

দক্ষি। হ্যাঁ-হে কতদিন পরে বিলেত থেকে এলে—এখনও প্রণাম টুপামের কায়দা-গুলো ঠিক্ মনে আছে ত দেখচি! কাপড়ও পরেচ দেখচি—কোমরে কসি-টসি কাউকে দিয়ে দিতে হয়, না, নিজে-নিজেই পারো? অনেকদিনের অনভ্যেস কিনা!

সুবো। কি যে বলেন, মিষ্টার মুখার্জ্জি—যা আজন্মকাল ধাতস্থ হোয়ে আছে, তা কি আর ত-চার বছরে ভোলা যায়।

বন। তা বাবা শুনচি—তিন দিন হোলো এখানে এসে পৌঁছেচ—

সুবো। এর আগে আর আস্বার সময় কোরে উঠতে পাল্লাম্ না। একটা বিশেষ জরুরি কাজ ছিল—এসেই কোল্কাতার বাইরে যেতে হোয়েছিলো—

দক্ষি। ভারি ভুল হোয়ে যাচ্চে—মাষ্টার মশাইয়ের নিশ্চয় অসুবিধে হোচ্চে। Let me introduce—সুবোধ, ইনি হোচ্চেন—শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর ভট্চায্যি—ভারতীর মাষ্টার মশাই। এরই মর্ম্মান্তিক চেষ্টায় ভারতী এবার first হোয়েচে। আর ইনি হোচ্চেন্—Mr. Subodh Chatterjee—আন্কোরা Bar-at-Law। এর বাপ প্রবোধবাবুর নাম নিশ্চয়ই শুনে থাক্বেন—খুব বড় এটর্নী। এই সুবোধের সঙ্গেই ভারতীর বে'র কথা একটু আগেই বোল্ছিলাম—ইনিই হোচ্চেন ভারতীর Would-be husband।

বিশ্বে। Husband? [ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন]

দক্ষি। কি হোলো? অমন্ কোরে বসে পোড়লেন যে?

বন। তোমার ওই ইংরিজি "husband" শুনে! অমন ভাল জিনিসটা কেন্ ইংরিজি কোরে মাটী কোল্লে—এতে কোনও ভাল মানুষের ছেলে স্থির থাক্তে পারে?

মুক্তি প্রতীক্ষায় থাকুন!

সুবো। [বিশ্বেশ্বরের প্রতি] আপনি Miss Mukherjeeকে পড়িয়েচেন—অসংখ্য ধন্যবাদ। বড় খুসী হলাম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

[বিশ্বেশ্বর শুষ্কমুখে নীরব রহিলেন]

দক্ষি। তাহোলে সুবোধ, তোমার বাবাকে বোলে এই মাসের মধ্যেই একটা formal পাকা দেখার আর সঙ্গে সঙ্গে বে'রও দিনস্থির কোরে ফ্যালা যাক্। কি বলো?

সুবো। হ্যাঁ বে'-টা যত শীগ্রী চুকে যায়, ততই ভাল। এখানকার Bar ত over-crowded—মনে কচ্চি পাটনায় গিয়ে practice আরম্ভ কোর্ব্বো। Miss Mukherjeeরও ত শীগ্রী Session আরম্ভ হবে—উনি একবারে পাটনাতে গিয়েই ভর্ত্তি হবেন।

বিশ্বে। ও, চলে গ্যাছেন! হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে তাঁর card। না—না, আর কোনও বাধা নেই—

[বিশ্বেশ্বর অন্য মনে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় চলিয়া গেলেন—ভারতী সহসা অগ্রসর হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে একখানি চেয়ারে বসিলেন]

দক্ষি। ওকি, মাষ্টার মশাই অমন্ abruptly চলে গেলেন যে?

বন। হাজার হোক্ মাষ্টার মশাই ত—ওঁর বুদ্ধি শুদ্ধি আছে—একটা ছুতো কোরে চলে গেলেন। দেখচো, ভারতী লজ্জায় কথা কইতে পাচ্চে না—কতদিন পরে দুটীতে এক সঙ্গে হবে—তোমার ও সব কথা এর পরে হবে—এখন চলো—

দক্ষি। হ্যাঁ-হ্যা, চলো। তবে ভাবে বোধ হোচ্চে—Thy necessity is greater than theirs! ওদের চেয়ে তোমার দরকারই বেশী!

[দক্ষিণাবাবু ও বনজ্যোৎস্না হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন]

সুবো। [ভারতীর কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া] তারপর ভারতী দেবি,

আপনাকে আজ এমন আনন্দের দিনে কেন যেন Out of tune দেখাচ্চে—কেন বলুন ত? শরীর ভাল আছে ত?

ভার। হাঁ, শরীর ভালই আছে।

সুবো। আপনার এদিক্‌কার চিঠিগুলো বেশী interesting হোয়ে উঠছিলো। মনে হোতো, আপনি যেন আমাকে সুমুখে রেখে মনের কথাগুলি বোলে যাচ্ছেন। ওকি, মুখ ঢাক্‌ছেন কেন? লজ্জা হোচ্চে বুঝি? আচ্ছা—আচ্ছা, আর চিঠির কথা বোল্‌বো না। কিন্তু আপনাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে—ইংরাজীতে যাকে বলে "bewitchingly beautiful!" আমি যখন বিলেত যাই, তখন আপনি typhoid থেকে সবে সেরে উঠচেন। কিন্তু প্রবাসে বসে আপনার সেই রোগশীর্ণ মুখের ছবি আমি কল্পনা কোর্ত্তেও ব্যথা পেতাম। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার এই মূর্ত্তিই চোখের সামনে যেন দেখতে পেতুম। মিথ্যে কথা বোলবো না—সে সব দেশে প্রলোভনও বড় কম নয়—কিন্তু আপনার এই দেবী দুর্লভ মূর্ত্তিই আমাকে সব প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা কোর্ত্তো। ওকি, আপনি কাঁদচেন নাকি?

[ভারতীর হাত দুইটী চক্ষু হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিলেন]

ভার। হাত ছেড়ে দিন—Mr Chatterjee!

সুবো। [হাত ছাড়িয়া দিয়া] যদি অনুমতি করেন—ঐ চোখের কোণে যেখানে মুক্তা বিন্দু টলটল কোচ্চে—ঐখানে—

[ভারতীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে লাগিলেন]

ভার। Mr Chatterjee!

সুবো। দু'দিন পরেই ত ঐখানে আমার সম্পূর্ণ অধিকার হবে—দু'দিন আগে বৈ ত নয়—তাতে দোষ কি?

ভার। দোষ আছে……

(চোখে মুখে অনন্ত দৃষ্টি লইয়া ভারতী ক্ষিপ্রপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

সুবো। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) আজ এই ঘরের ভেতর দু'টি নর-নারীকে অপ্রকৃতিস্থ দেখলাম—একটী মাষ্টার মশাই, আর একটি এই ভারতী। তাই কি? জানি না এ রহস্যময়ীর অন্তর কোন্ পথে আত্মপ্রকাশ কোর্বে!

(ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন)।

(ক্রমশঃ)

তন্বী ও তুফান

শ্রীসুশীল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভজহরি সারাদিন আলসের মতো ঘরে ব'সে থাকে—মাচায় যেমন কুমড়ো, উপমাটা মহেশদার। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, শুধু ব'সে ব'সে গাবানো! সর্ব্বাঙ্গের জড়তা ওর ভাঙেইনা! সকালে একবার নিচে যায়, মুখ ধুতে ও খেতে। রাত্রে আর একবার। তা ছাড়া আরো কোনো-কাজে নিচ পর্য্যন্ত দু-একবার যায় বটে! এ ছাড়া ও থাকে ঘরেই! শুয়ে, ব'সে কোনো রকমে সারাটা দিন দেয় কাটিয়ে! দুপুরে একটু ক'রে পাউডার মাখে, ঘুমোয়। তারপর বিকেলে যখন ওরা আফিস থেকে ফিরে আসে, এমনি ক'রে কেটে যায়। আজ সখ্ চাপলো, একটু বেড়িয়ে আসবে কাছে ভিতরে কোনো পার্ক-ফার্ক থেকে। সাজলো গুজলো, সব হ'লো মাটি! আর এতগুলো পয়সার হ'লো মাটি, হারুর দোকানে ধার জ'মেই উঠ্ছে! ভজহরির মন, সত্যি ব'লতে কি, ভালো লাগেনা। তার ওপর রাকেশ, পেছনে লাগতে পারলে ও যেন ব'র্তে যায়!—রাস্কেল কোথাকার! অন্ধকারের মধ্যে সব ভূতের মতো ব'সে গিসপিস করছে। ভজহরি উঠে গিয়ে সুইচ্ দিলো নিচের দিকে খট ক'রে টেনে। মুহূর্ত্তের মধ্যে এক চাপ কালো অন্ধকার বাইরে গিয়ে দাড়ালো, আর বাইরের অন্ধকারের ঘনতা তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে উঠ্লো। ভেতরটা শাদা—ফ্যানার মতো—শাখের মতো। আর্শির ছায়া দেয়ালে গোল হ'য়ে প'ড়ে টলমল করছে।

নগেন উঠে পড়লো: যাই! আটটায় যেতে হবে বাদুড়বাগান। এন্‌গেজমেণ্ট আছে।

মহেশবাবু নগেনকে ডেকে ব'ললেন—জানো নগেন, পশু'দিন যেতে হবে, মানে যাচ্ছি ঠিকঠাক ভজহরিকে নিয়ে মাথুরের ওখানে, ছায়া নাকি একে দেখতে চায়। মাথুরও হয়ত দেখবে বিপিন ব'লে-ছিলো।

নগেন উৎসাহিত হ'য়ে ওঠার ভাণ করলো—সত্যি? যাক্, তলে-তলে খুব কাজ ক'রে নিচ্ছেন কিন্তু! নগেন দেরি না ক'রে চ'লে গেলো।

—হ্যাঁ, ভজা! যাবে কিন্তু! মহেশবাবুও উঠে দাঁড়ালেন।

—তা যাবো বৈ কি! ভজহরিও দাঁড়ালো।

রাকেশ, মানস, প্রবীর ব'সে শুধু হাসা-হাসি করছে, ব'লছে—কিউটিকুরা, পাউডার, ছায়া, বিয়ে, ভজহরি, মহেশদা, নগেন তো, সেট্‌ল্‌ড্, একপেট খাওয়া, কি ফুর্ত্তি, যাঃ সত্যি, হাসছিস্ যে, হ্যাঁরে, বিশ্বাস কর্! ইত্যাদি ইত্যাদি!

মহেশদা চ'লে গেলেন।

ভজহরি জামা খুলে ফেললো।

মনসুন্-এর মত্ ব'দলে গেছে। আর ও না এসে থাকবেনা। জলস্থল, পাহাড়-পর্ব্বত, দেশ-গ্রাম, নদী-খালা ডিঙিয়ে একেবারে চ'লে এলো বাঙলায়, কলকাতায়!

আষাঢ়ের বাইশে আজ। ঋতুর বেশি ভাগ বিফলে গেলো কেটে, তাই সে আর দেরি করলোনা,—শেষরাত্তির থেকে শুরু হ'য়েছে বাদল! সকালে কি কেউ আর উঠতে চায় বিছানা ছেড়ে! খুব বরাত আজ রবিবার, আফিসের ঝঞ্ঝাট নেই। নইলে দুর্গতির ছিল একশেষ। ট্রাম বন্ধ, ঠনঠনে কালীবাড়ি পর্য্যন্ত তার দম। বাস্-এর দৌড়ও ঐ পর্য্যন্ত, আর এগোতে গেলে এঞ্জিনে জল ঢুকে ঠাণ্ডা! সার্কুলার রোড-এ কোনো-গতিকে বাস্ পাওয়া যায়! কলকাতা সহর জলের নিচে ডুব-সাঁতার দিচ্ছে।

পশু'দিন নগেন চোখমুখ রাঙা ক'রে ঘরে ফিরে ভারি দুঃখ ক'রেছিলো, ভজহরির কাছ থেকে পাখা চেয়ে নিয়ে খুব হাত চালালো! আজ র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে এসে ডাকছে কোমর বাঁকিয়ে—কিহে ভজহরি, কেমন ঠাণ্ডা! উঃ, আষাঢ় তো নয়—পউষ!

ভজহরি মশারি সরিয়ে মুখ বার করে শুয়ে শুয়েই ব'ললো—যা ব'লেছো!

প্রবীর মুখ ধুতে গেছে। আটটা বাজে, তবু চারিদিকে অন্ধকার। টিপটিপ ক'রে কাজরী গাথায় গান গাইছে বর্ষা সুন্দরী, শ্রোণীতে তার বিজলীর চন্দ্রহার, চরণে তার মৃদু-মঞ্জীর—বেজে চলে একটানা।

নগেন বাঁ-হাতে খানিকটা লালচে পাউডার নিয়ে এসে ব'ললো ভজার মশারিটা সরিয়ে: খাসা ঘুমোনো গেছে শেষ রাত্তিরের দিকটায়—ব'লে ডান হাতের আঙুল চালিয়ে দাঁত মাজতে লাগলো।

ভজহরির মন একটু খারাপ, তার কারণ আজ সেই 'পশু'। আজ তাকে যেতে হবে টালিগঞ্জ—ছায়াদের ওখানে। এই দুর্য্যোগ

আর দুর্ভোগ দিন বুঝেই এলো! দেবতার আক্কেল দেখে ভজহরি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছে।

রাস্তার দিকের বড় জানলাটার গরাদে গাল দু'টো বাধিয়ে নগেন লালচে থুতু ফেললো।

মন খারাপ নিয়েই ভজহরি মশারির ভেতর উঠে ব'ললো, চড় মেরে মেরে মারলো কয়েকটি মশা, যে-কটা গত কাল সমস্ত রাত্র তাকে জ্বালাতন ক'রেছে অসহ্য! তারপর চট্ ক'রে বেরিয়ে পড়লো বিছানা ছেড়ে। একটু গা মোড়ামুড়ি দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা বিড়ি নিলো, ধরালো। আর সেই পথের ধারের জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঢ় ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো।

নগেন একটু হেসে ব'ললো—আজ তোমার না যাওয়ার কথা, ইয়ে কি বলে, কি নাম যেন! আরে, এত জানাশোনা তবু ভুলে যাচ্ছি নামটা।

—মাথুর? ভাবী শ্বশুরের নাম সকালে উঠেই ভজহরি নিঃসঙ্কোচে ক'রে ফেললো।

নগেনের স্মৃতির দুয়ার যেন পলকে গেলো খুলে: Oh yes! হ্যাঁ, কিন্তু কী আশ্চর্য্য বলোতো! দিন বুঝে ঝড়-জল!

ভজহরিও সেই কথাই ভাবছে, ব'ললো—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

—কখন যাবার কথা? ও-বেলা? যাক্, তাও রক্ষে! ছ্যাখো বিকেলে থামে কিনা! আর ইয়ে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, ব'লবো পরে। আরে আমার সঙ্গে ওদের সব জানাশোনা যে! নামটাই ভালো ক'রে শুনিনি আগে, নইলে—রেখে দাও তোমার মহেশদা! এই এক নগেন মুখো-ই দিতো করে ঠিকঠাক ক'রে!

—কি কথা? এই জানাশোনা আছে এই তো? না, আরো কিছু? বলোই না ছাই এখনি। কি আর ক্ষতি, কেউ তো নেই এখন।

নগেন জিরিয়ে জিরিয়ে চলে: বলবো ব'লবো,—ব্যস্ত কেন? কেউ নেই কেমন? ঐ তো প্রবীর। কি হে, কেমন শীত আর বৃষ্টি?

প্রবীর তোয়ালে মুখে চেপে ঘাড় নাড়ে—হু। তোমাদের কি কথা হচ্ছিলো, হোক। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

—আরে রেখে দাও! কথা! কিচ্ছু না। নগেন মুখার্জ্জি প্রবীরকে চোখ টিপলো। প্রবীর ব্রাশ রাখতে রাখতে বলে—কিচ্ছুনা? (তারপর হেসে) আজ আমরা যাবো ভজহরির সঙ্গে টালিগঞ্জ। কি হে, তোমার engagement আছে, না যেতে পারবে সঙ্গে?

নগেন বলে—রেখে দাও তোমার এনগেজমেন্ট। এমন ছেড়ে কে কোথায় যায় হে?

প্রবীর হাসে।

নগেন জিগগেস করে—যাবো কটায়?

—এই, গোটা পাঁচেক। প্রবীর আর্শির সম্মুখে দাঁড়িয়ে দাঁত দেখে।

নগেন বলে—এমনি ধারা চুল নিয়ে কী বিশ্রী! কি বলো তুমি? ওহে প্রবীর, শুনছো?

—দাঁত আছে আর্শিতে, কানদুটো ঠিক তোমার মুখে। সব শুনছি। প্রবীর আয়না কাৎ, চিৎ ত্যাৰ্চা ক'রে দাঁতের এপিঠ ওপিঠ দেখার চেষ্টা করে।

—তবে ভজা, আজ সেরে নেওয়ার চেষ্টা করো!

ভজহরি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে,—বৃষ্টি থামুক, কেটে এলেই হ'লো চুল! আর, যাওয়া হয় কি-না হয় দেখি!

প্রবীর দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে উঠে: হয় কি-না-হয় মানে? প্রলয় হ'লেও যেতে হবে। মহেশদা কথা দিয়ে এসেছেন!

নগেন জানালায় মুখ দিয়ে খানিকটা চুরি ক'রে হেসে নেয়।

প্রবীর যা ব'লেছে, ভজহরির কিন্তু ইচ্ছা তাই! ত্রিভুবন অতলে তলিয়ে যাক্, সে-মুহূর্ত্তেও ও যেন ছায়ার ছায়াতে ফুরোয়, জীবনটা দেয় ভাসিয়ে!

দিনটা আজ কাটছে ভজহরিকে নিয়েই! হৈ-চৈ, আমোদ আহ্লাদ! সহস্র চিন্তা ভজহরির বুকে বিরাট আবর্ত্তের মতো পাক খাচ্ছে, পান্সির মতো ছর-ছর ক'রে জল কেটে ওর মনের আকাঙ্খা ছুটছে বহুদূর! ওর চিন্তার ফুল, ফুটছে, কি ফুল চিনতে পারেনি; ওর চোখেও ফুল ফুটছে, কি ফুল পারেনি জানতে!

দিন গড়িয়ে এলো বিকেলের দিকে—প্রায় দু-টো বেলায়। ভজহরিকে ওরা পাঠালো চুল কাটাতে। ভজহরির অন্তর্ধানের সাথে সাথে ওরা সেজে গুজে বেরিয়ে পড়লো, বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট পাড়ি দিয়ে কোথায় যেন যা ব।

তারপর—

ঠিক প্রবীরের সাজেস্শান-মাফিক ব'লে ক'য়ে বানিয়ে এসেছে মানিয়ে। তা নিয়ে নিচের বুড়ো দাড়ি-গোপপো ঠাট্টা-তামাসা করলো, তা করুক! ভজহরি সোজা উঠে এলো ওপরে।

মেস্-এর এ-তল্লাট খাঁ-খাঁ ক'রছে। ওর ঘরটাতেও তালা। দুটো তালা ঝুলছে, ওর-টা ও খুললো, দরজাও গেলো খুলে। ভেতরটা রাত্রের মতো অন্ধকার—গাঢ় ছায়া। জানলাগুলো টাইট ক'রে আঁটা।

মাঝে একটু দম নিয়ে বৃষ্টি আবার সুরু হ'য়েছে, এখনো চ'লেছে। ঘরে ঢুকে ভজহরি রেনকোটটা ধপ্ করে ফেললো মেঝের। ঘটাং ক'রে জানলা দুটো দিলো খুলে, এককোঁটা দুর্ব্বল আলো সহসা ঘরের মধ্যে পড়লো ছড়িয়ে। সেই আলোর ম্লানতায় ভজহরির মনের কুজ্ঝটিকা হ'য়ে উঠলো দ্বিগুণিত।

উঃ কী আশ্চার্য্য! এরা সব গেল কোথায়? ইর্‌রেস্‌পন্‌সিবিল্‌। কি যে করবে তার কোনো দিশেই ভজহরি ঠিক করতে পারলোনা। খানিকক্ষণ ভেজা কেডস্‌ পায়ে দিয়েই ঘুরে ঘুরে সমস্ত ঘর' ভেজালো। কিউটিকুরা বের ক'রে দিলো কাঁধে—কাঁধটা বেজায় চিন্‌ চিন ক'রে জ্বলছে! চৌকীতে শব্দ ক'রে ব'সে পড়লো, কেডস্‌ দুটো ছুঁড়ে পাঠালো বাইরে।

বেরুলো ঘর থেকে, চেঁচিয়ে ডাকলো চাকরকে, চাকর এলে তাকে জিগগেস করলো, জানিস, বাবুরা গেছে কোথায়?

সে জানেনা, সভয়ে ঘাড় নাড়লো।

—কেও ডাকতে এসেছিল? আমাকে না, ওদের। মোটর এসেছিলো একটা? কিছু জানোনা? তবে করো কি? গাজায় দম দাও? রাস্‌কেল্‌! যাঃ! ভজহরির সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করছে, বিদ্যুতের চাবুক খাচ্ছে যেন!

পাশের বাড়ীর বৌটা ঝিনুক দিয়ে বাটি বাজিয়ে বাজিয়ে খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছে,—ওরা আলো জ্বেলেছে ঘরে, ভজহরি জ্বালাবে? নাঃ, থাক্‌গে! বেলা পাঁচটা বাজেনি, এরি মধ্যে আলো? হোক্‌গে আঁধার, ও শুলো।

হাতদুটো মাথার নিচে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ও যে কত অভিসম্পাৎ করছে, তার নেই অন্ত! এ যেন মহাসমুদ্রের মতো নিরর্থক বুক চাপরানো, আছড়ে পড়া, দাঁত কিরিমিড়ি ক'রে ওঠা! ওরা আসুক, ভজহরি এর টিট তুলবে। মিথ্যেমিথ্যি এই বাদলায় তাকে ভিজিয়ে পাঠালো সেলুনএ, আবার ইয়ে!

সহসা ওর মত্‌ গেলো বদলে। ভাবলো, হয়তো ওরা তেতলায় ক্যারাম খেলছে! তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে পরলো। ঘরের দরজা কিছুক্ষণ না-হয় খোলা থাক্‌, ও এলো ব'লে।

সিঁড়ি থেকে খটাখট শব্দ শুনে ও চাঁদ পেয়ে গেলো হাতে, আকাশ ফুঁয়ে এসে ওকে যেন নমস্কার জানালো, ওর মাথা হ'য়ে উঠলো এত উঁচু।

বিরাট একটা ভিড় ঠেলে ও যেন দাঁড়ালো এসে ফাঁকায়, ঘরে 'ঢুকেই প্রশ্ন করলো: ওরা নেই? ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ভজহরির মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ভদ্রলোকটি জিগ্‌গেস করলেন—কারা? নগেন? না সে নেই।

—কোথায় গেছে জানেন?

—উহু! ব'লে যায়নি। একা একা ইনি টিপ করছেন হাতের।

—জানেন না?

—ভ্যালা যন্ত্রণা! আরে মশাই, বললাম জানিনা তবু বিশ্বেস হ'লোনা?

বেগতিক দেখে ভজহরি মাথা নিচু ক'রে নেমে এলো। দোপাটি গাছও যেন এখন ওর ওপর দিয়ে মাথা চাগায়?

ঘরে আরো খানিকটা ছায়া এসে গেছে। ঘরে ঢুকে ভজহরি আবার শুলো। অস্বস্তিতে ওর প্রাণ আইঢাই করছে। একা যাবে? বাসাও যে চেনে না ছাই। টালিগঞ্জ রেস-কোর্শ এর কাছে, তা সেখানে এমনধারা কতই বাড়ি আছে, থাক্‌গে। ও শুয়েই রইলো। ঘাড়ের নিচে হাত দেওয়ার চিনচিনানীটা আরো যেন বাড়ছে। বালিশ টেনে নিলো। চোখ বন্ধ ক'রে কত অদ্ভুত আমেজ উপভোগ করতে লাগলো,—চোখ খুললে যা একেবারে মিথ্যা—নিষ্ঠুর ভাবে মিথ্যা। ওর মন, ওর সর্ব্বাঙ্গ ক্রমশই বিষিয়ে উঠতে লাগলো। কি যেন ভেবে ভজহরি আবার উঠে ব'সলো।

সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় ক'রে নেমে এক দৌড়ে গিয়ে হাজির হ'লো হারুর দোকানে—ওরা গেছে কোথায় জানিস?

—কা'রা? বাবুরা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! কোথায় গেছে জানিস?

—এখানে চা খেলেন, তারপর কোথায় গেলেন জানি না তো! এদিক পানে যেতে দেখেছি মনে হ'চ্ছে!

—কে কে ছিলো?

—মহেশবাবু, মানসবাবু, প্রবীরবাবু, সবাই।

—সবাই! ভজহরি মুখ ভ্যাঙচালো: আর কে বল্‌না।

—রাকেশবাবু, নগেনবাবু (একটু ভেবে) হ্যাঁ, আর কেউ না।

—কখন গেছে? ভজহরি বিষম চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লো।

—সে কথ—ন। অনেকক্ষণ হ'লো তো!

—তবু, কটার সময়? একটা ঘড়ি কেন্—ব্যবসা মুফৎ চলেনা। হাড়ি চুষে পয়সা আদাই করবে, কারো সুখ-সুবিধে দেখবে না। কটায়, পাঁচটা?

হ্যাঁ, তা তো হবেই বাবু।

ভজহরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো। আবার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিগ্‌গেস করলো—এদিক গেছে? ঠিক জানিস?

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভজহরি ফিরলো মেস্-এ।

আর কোথায় যাওয়া সম্ভব! পাঁচটার সময় ওদিকে গেছে। নিশ্চয় বায়োস্কোপে। হয়ত রূপবাণীতে ব্লণ্ড মার্লিন ডিয়েট্রিকের 'ভেনাস' দেখতে। সেদিন যেমন তাড়া দিচ্ছিলো! ব'লছিলো—সাড়ে নটার টিপএই যাই চ! নিশ্চয় তাই। কপালকুণ্ডলা দেখে মেস্এ আর ফিরতেই চায় না! ভজহরি ঠিক করে ফেলেছে; ওর সঙ্গে আর চালাকী চ'লবে না, হ্যা! মিথ্যেমিথ্যি এ রকম অভদ্রতার মানে? ওদের কথা দিয়ে এসেছেন মহেশদা! নিশ্চয় প্রবীর রিং-লিডারী ক'রে মহেশদাকে ধ'রে বেঁধে সঙ্গে ক'রে সিনেমায় নিয়ে গেছে। বিপিন ভঞ্জ কি ভাববেন? ভজহরির ওপর বিশ্বেস ছায়ার আর রইলোনা! ভাবতে গেলে ভজহরির নিজেরি সর্ব্বাঙ্গ কামড়াতে ইচ্ছে ক'রে। উঃ, কী ভীষণ একটা বদনাম! ছায়া নিশ্চয় জামাজুমি এটে তৈরী হ'য়ে ব'সে ছিলো, সেকেণ্ডের কাঁটা টিকটিক ক'রে মিনিট, ঘণ্টা পেরিয়ে গেলো, হয়ত অবশেষে বিরক্ত হয়ে তীব্র প্রতীক্ষা শেষ ক'রে সমস্ত আবরণ ফেললো খুলে। এই খানে ভজহরির কল্পনা সহসা বিস্তার লাভ ক'রে, একটা ইংরাজী উপন্যাস লেখক এক জায়গায় নায়িকার কথা বলতে বলতে বলেছেন—She is full naked under her garments, সেদিন যেমন কল্পনায় চোখ দিয়ে ভজহরি সেই নগ্ন-নায়িকাকে দেখতে পেয়েছিলো, আজ তেমনি দেখলো ছায়াকে! মারভেলাস্ কিন্তু ছায়ার গড়ন, এক জায়গায় টোল নেই, সর্ব্বাঙ্গ কেমন চকচকে সাদা! ভজহরির চোখের দৃষ্টি স্তিমিত হ'য়ে এলো।

ভজহরি এবার উঠে ব'সলো। কিছুক্ষণ পরে উঠে গিয়ে আলো জ্বালালো; উঃ, কী তীব্র শুভ্রতা, বাল্বটা কত সি পি? উঃ, এত উগ্র! এতক্ষণের গাঢ় ছায়া ওর চোখে কালী লেপে গেছে তাই এ আলো তার কাছে এত মারাত্মক ঠেকে। আবার তখনি সুইচটা খট ক'রে ওপরে ঠেলে দিয়ে ব'সে পড়লো চৌকীর ওপর। আজ আসুক ওরা ভজহরি এর প্রতিশোধ তুলবে। একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন অপদস্ত! আর শুধু মেয়েকে কেন, তাকেও তো!—একজন ভদ্রলোকের ছেলেকেও!

ওদের আসতে এখনো অনেক দেরী, এতক্ষণ ভজহরি কি ক'রে কাটাবে ভেবে পেলোনা। কিছুক্ষণ ক্যারাম পিটলেও সময় কাটে বটে! কিন্তু নগেনের রুম-মেটটা যা চিজ!

ও তাই শুয়ে শুয়েই সময় কাটাবে ঠিক করলো (যেমন বরাবর ও ক'রে থাকে), আর যদি ঘুম আসে তবে তো চুকেই গেলো!

হ্যা, অনেকক্ষণ তো ধূম পান নিষেধ ক'রে রেখেছে! মনে পড়তেই একটা বিড়ি ধরালো।

উঠে গিয়ে রাস্তার ধারের জানলাটায় দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ে আর পথের যাত্রীদের যাতায়াত দেখে শুধু। প্যাচপেচে রাস্তা, দুয়েকটা মাত্র প্রাণী চ'লে-ফিরে বেড়ায়। গ্যাসের আলোয় কারুরই মুখ চেনা যায় না।

বিড়ির ধোঁয়া যখন তেতো হয়ে এলো এবং হাতে ঠেকলো আগুন তখন ফেললো। খাঁখারী দিয়ে গলা পরিস্কার ক'রে নিলো, থুতু ফেললো,—এতক্ষণে হ'ল তার বিড়ি খাওয়া শেষ! আবার কিছুক্ষণ ঘরময় করলো পায়চারী। কিছুই ভালো লাগে না। উঃ, কী ট্রেচারাস্ ওরা! এমন অভদ্র ওরা, তা জানলে কখনই—

সিঁড়িতে গমগম ক'রে আওয়াজ হ'লো। ভজহরি দৌড়ে গিয়ে দরজা দিলো খুলে। প্রবীরের গলার স্বর উঠছে সবার ওপরে; চল্না, ভজহরির আক্কেলের জবাবদিহি নি, আমাদের কী নাজেহালটাই করলো!

(ক্রমশঃ)

ঘূর্ণীচক্রে

ডলি মিত্র

(২)

ক্লান্তি, অসহ্য দুর্নিবার ক্লান্তি। মনটা মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলতে চায় আর পারিনা, আর ভাল লাগেনা—। কি যে ওর ভাল লাগেনা আর কি যে ও পারেনা তা বুঝতে গিয়ে, নিজেই ও হাঁফিয়ে উঠে, ভাবতে পারেনা। অলস, গরম দুপুরের হাওয়ায়, ওর মনে হয় দিনগুলা কী দীর্ঘ। ক্লান্ত হয়ে আসে ওর চোখের পাতা, কিন্তু ঘুমাতে পারে না, কী এক অজানা, অজ্ঞাত অসহনীয় অস্বস্তি ওকে জাগিয়ে রাখে—ঘুমাতে দ্যায়না। শিথিল হাতে রবি বাবুর কোন একটা বইয়ের পাতা উল্টে যায় —নরম বিছানা ওকে আর আরাম দিতে পারেনা—। সারাটা দিন কেমন করে কাটবে তাই ও ভাবে। সকলের মুখেই ও শোনে "আর ভাল লাগেনা", এই ভাল না লাগার কাহিনী শুনে শুনে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ও চায়—কিন্তু কি যে ও চায় তা আজও ওর মনের অগোচরে রয়ে গেছে—। কারোর কথা তাকে ভাবতে হয় না। ও শুধু জানে নিজেকে আর বোর্ডিং এর ছোট্ট একটা রুম—যাকে ওর মনে হয় নিজের দেহেরই একটা অংশ বলে—।

গরমের ছুটী। কতকগুলা কাজিল মেয়ে ছাতে বসে আমচুর খায়, নভেল পড়ে আর করে তার প্রচুর আলোচনা—। আর ভাল মেয়েরা? হ্যাঁ ভাল বলতে সাধারণতঃ যা বোঝা যায়—কয়েকটা লেটার পাওয়া, হয়ত য়ুনিভারসিটিতে ষ্ট্যাণ্ড' করা মেয়েরা ঘরে দরজা দিয়ে, আসছে পরীক্ষার জন্মে বোটানি কিংবা লজিক্ এর নোট মুখস্ত ক'রে ঠোঁটটা শুকিয়ে ফেলে, বার বার জিভের স্পর্শে তাদের সরস করে নিচ্ছে। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে পিঠটাকে কুঁজো করে য়ুনিভারসিটির দুটো 'ডিগ্রি' পাওয়াকেই ওরা হয়ত চরম রমণীয় বোধ করে। কিন্তু কিই বা হবে ঐ গুলা দিয়ে—? কি সার্থকতা পাবে? না হয় পাশই করল দুটা তিনটে—তারপর? সেই ত সংসার স্বামী-পুত্র-কন্যা? যা বাস্তব—নিছক সত্যি—কল্পনা নয়—স্বপন নয়—একেবারে চিরন্তনী! কিন্তু ও তো তা চায়না—কি চায় তা ভাবতে গেলেই নিজের কাছে নিজেই হয়ে উঠে রহস্যময়ী! মনের সঙ্গে খেলে খানিক লুকো চুরি। তারপর, হয়ত কোন দুষ্টু মেয়ে দমকা বাতাসের মত হঠাৎ ঘরে এসে পড়ায় ওর চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব মিটে যায়—।

জীবনের এই কটা বছরেই যেন ও নিজেকে সম্পূর্ণ চিনে ফেলেছে—। হয়ত ও এমন একটা কিছু করবে যা তাকে দেবে বিপুল আনন্দ—মনকে তার করে তুলবে পূর্ণ, ভরাট্—নিখাঁজ —পাওয়ার অসীম আনন্দে ওর মুহূর্ত্তগুলা ভরে উঠবে পুঞ্জীভূত রূপালি আলোয়—। কিন্তু সেটা কি,—বা—কবে? তা ও জানেনা।—বলতে পারেনা—ভাবতে গেলে কবির কথা মনে পড়ে—"ভুলে যাবে সর্ব্ব-গ্লানি বিপুল গৌরবে"—কিন্তু গ্লানি ভুলতে ও চায়না।—ও চায় ক্লান্তি ভুলতে যা তাকে করে রেখেছে জড়—নিস্পন্দ—অলস—। ওভাবে ছুটে গিয়ে যদি কোন উঁচু পাহাড়ে ও উঠতে পারত কিংবা দুবার স্কিপিং রোপ'টা ঘুরিয়ে ছোট্টবেলার মত লাফাতে পারত—। দরজাটা খুলে দিয়ে, হীরের আংটীর ঠিক্‌রে পড়া আলোর মত, ছোট্ট এক টুকরা মেয়ে হাসি, ঘরে ঢুকে পড়ে ওর গায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে—। একমুঠো ঠাণ্ডা নরম 'আইসক্রিম' জোর করে ওর মুখের মধ্যে পুরে দিতে দিতে বলে—"ওঠোনা মিনা দি—সারে চারটে বেজে গেছে আজও বুঝি মেট্রোতে যাওয়া হবে না—?" বরফ মাখা ঠাণ্ডা হাতটা একমুঠো কচি নরম কোমল ঘাসের ডগার মত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে ও বললে "তোরা যা না ভাই আমার ভাল লাগেনা—"

"বারে—একজন বড় কেউ না গেলে—?"

ছুটীতে অন্য সব টিচাররা বাড়ী গেছেন। বোর্ডাররও অধিকাংশ নেই। পরীক্ষার সুবিধার জন্মে কয়েকটী মাত্র, আর তারই মত গৃহহীন কয়েকটা মেয়ে মাত্র আছে। কাল, ওদের নিয়ে 'মেট্রো'য় যাবার কথা ছিল। ওরই জন্মে যাওয়া হয়নি, মাথা ধরেছিল। "নেহাৎ যেতে হবে—?" ঘড়ির পানে চেয়ে মৃণাল উঠে বসলে—বললে "তোরা তৈরী হয়ে নে জলদি—!"

হাসি ছুটে চলে গেল।.........

মিশমিশে কালো রাত্রি—জমাট বাঁধা অন্ধকার—কোলের কাছে কেউ আসলে চেনা যায়না। অসহ্য।—বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওর দারুণ বিশ্রি লাগে। ঘড়ির প্রতিটী শব্দ ও শুনছে—এই ত তার ঘুম—। ভাবছে, ও ভাবছে—সারা দিনরাত ও ভাবছে। কিন্তু কী ভাবনা ওর—? কী দীর্ঘ ওর ভাবনার সূত্র। রাতে বাধা দেবার কেউ নেই, খুশীতে ও উচ্ছল হ'য়ে উঠল, লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নিজেকে ও ছিনিয়ে আনলে। জানালা ওকে হাতছানি দ্যায়,—মৌন স্তব্ধ, নিকষ কালো রাত্রি—ও তাকাতে পারে না—আলোটা উজ্জ্বল করে দ্যায়—মন্ত্র মুগ্ধের মত আস্তে আচ্ছন্ন-ভাবে বাক্সটা খুলে অত্যন্ত সন্তর্পণে কয়েকটা কাপড়ের নীচে থেকে, ভাজ করা একটা খাম বের করলে—। চৌকাখাম—তার অল্প

সোনালি রং মলিন হয়ে এসেছে—কালের ব্যবধানে কুঁকড়ে গেছে তার দেহের অনেক অংশ। বহুদিন কাপড়ের নীচে থাকায় কেমন যেন একটা মেয়েলী গন্ধের আমেজ—। আস্তে আস্তে বাক্সের ডালা ও বন্ধ করে—কি যেন চুরি করতে যাচ্ছে এমনি ওর মুখের ভাব—। সাদা—শুক্‌নো! নিশ্বাস নিতেও যেন ও ভয় পায়—।

খুলবে—? হ্যাঁ। ও খামটা খুলবে। অনেক বার পড়েছে। তাতে কী—? পড়লেই বা—? তবু ও আবার পড়বে। কথাগুলো ভুলে গেছে—? নেই বা ভুললে—। না—না—ও পড়বে, না ভুললে কী পড়তে নেই—?

ও পড়ছে—এক লাইন—দু লাইন—তিন—না—ও আর পড়ে না, সমস্ত শরীর ওর অবশ শিথিল হয়ে আসছে—একটা রূপালি মুহূর্ত্ত—যাকে ও আপন করে নিতে চায়, অনুভব করতে চায়—। ওর কানে একটা অস্ফুট গুঞ্জন—। ও ভুলে যায়—পরে মন হতে নিঃশেষে মুছে যায়,—এটা বোর্ডিং—তারই একটা 'রুমে' একটা কালো রাত্রি নিকষ-জমাট্-বাঁধা অন্ধকার—। ও ভাবে—ঠিক ভাবেনা, ওর মনে হয়—এটা ওর বাল্যের ও কৈশোরের দ্বন্দ্বক্ষণ! বাবা, মা, ভাই সব একবার ওর কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে, সন্তর্পণে চিঠিটা লুকোতে চায় যেন এখুনি কেউ এসে পড়বে। নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে পেচকের বিশ্রী চীৎকারের মত ঘড়িটা দুটো শব্দ করে ওঠে। টং—! টং—!! অসাবধানে ভেঙ্গে যাওয়া কাঁচের টুক্‌রাগুলা কুড়াতে গিয়ে হঠাৎ খচ করে হাতে কাঁচ ফুটে—একটু লাল পদার্থ বেরিয়ে আসে—। চিঠিটা ঠিক রেখে ও আলোটা নিভিয়ে দ্যায়—বিছানায়—লুটিয়ে দ্যায়—দেহের প্রতিটী অঙ্গ শিথিল হয়ে আসে। বিপুল গাঢ় শীতল অন্ধকারে—ও আপনাকে ভুলে যায়—চিন্‌তে পারেনা—হারিয়ে ফেলে নিজেকে—।

গান

শ্রীলালিম পাল

ওগো পথিক ওগো পথিক ক্ষণিক সেথা দাঁড়িও তুমি
আকাশ যেথা ধরার মুখে গোপন প্রেমে যায় গো চুমি।
নিরালা বনের গোপন কথা,
জানিগো তোমায় জাগাবে ব্যথা
তবুও তুমি দাঁড়িও প্রিয় শ্যামল যেথা কানন ভূমি।

নিশুতি রাতে পূর্ণিমা চাঁদ উঠবে যখন আপনি হেসে
গন্ধে মাতাল বাতাস তখন আগল ভেঙে চলবে ভেসে,
স্বপন-রঙীন সেই আলোতে
মিলব আমি তোমার সাথে
হাতটি ধরে তখন তুমি যাত্রা কোরো নতুন দেশে।

(২)

উঃ—! বোর্ডিং এর ঘুম ভাঙ্গাবার 'বেলটা' কি নিষ্ঠুর, কর্কশ—কঠিন—! চোখ মুছতে মুছতে মৃণাল সামনের দালানে এসে দাঁড়ায়। মুক্ত—উজ্জ্বল স্বচ্ছ প্রভাত! কয়েকটী মেয়ে জুটল—। ভালো মেয়েরা আগেই উঠেছে। ঘণ্টার অপেক্ষা করে না—। হাসি ফ্রকের কোন্‌টা ধরে মুখ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল। মৃণাল মৃদু তিরস্কারের সুরে বললে "হাসি, আবার তুমি জামায় মুখ মুচছ—?"

হাসি অপ্রতিভ হল?—অকারণে যেমন ও খুসীতে উজ্জ্বল তেমতি মুহূর্ত্তে ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে পারে—। সস্নেহে কাছে টেনে এনে ও বলে—"ছিঃ—হাসি, তুমিত দুষ্টু নও—" ওর গুচ্ছে, গুচ্ছে মুখে এসে পড়া সোনালী চুলগুলা সরাতে লাগলো—। হাসি ওর পানে চেয়ে হেসে ফেল্লে—। চোখের কোনে জল, ঠোঁটের উপর দুষ্টু হাসি ও যেন মৃণালকে মুগ্ধ করে ফেলবে—। আঃ—কি মিষ্টি স্নিগ্ধ মেয়েটা—। তাকে নিজের ঘরে টেনে টেনে আন্‌লে—চিরুণীর আঘাতে ওর কোঁক্‌ড়া চুলগুলাকে গুচ্ছে, গুচ্ছে সাজিয়ে তুললেও,—দুপয়সা দামের ছোট্ট একটা "সেলুলয়েডের" পিন্ দিয়ে সামনের কয়েক গোছা চুলকে বেঁধে ফেল্‌লে—করকরে তোয়ালের স্পর্শে ওর কচি নরম সুন্দর মুখটাকে লালের আভায় দিলে রাঙ্গিয়ে। ওপাশ ফিরে কুমকুমের শিশিটা আনতে আনতে হাসি পালিয়েছে—। আঃ—কী দুষ্টু হয়েছে মেয়েটা—?

ও ঘরের সবটা গুছিয়ে ফেললে। যদিও ওকে শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিজেকে ধরা দিতে হয়েছে তবু বয়সের স্বল্পতায় ও ঠিক টিচারদের সঙ্গে মিশতে পারেনি—।

ওর ওপর সব ভার দিয়ে চলে গেছে সব। বোর্ডিং এর রুটীন্ বাঁধা জীবনে এসেছে কয়েকটী চঞ্চল মুহূর্ত্ত। সময়ের হিসাবে ওরা চায়না নিজেদের বদ্ধ রাখতে। 'লোকজন' বিরক্ত হলে ওরা না হয় কটা রূপালি ঝক্‌ঝকে টাকা ওদের Present. করবে—। হ্যাঁ—এই মুহূর্ত্তের জন্তে ওরা তা পারবে।

সকলকে নিয়ে মৃণাল ব্যায়ামাগারে গেল শরীর চর্চ্চা করতে। হলেই বা সম বয়সী, হলেই বা ক্লাসমেট্—আজ সবাইকে বড় ছোট নির্ব্বিচারে মানতে হবে মৃণালের গুরুত্ব। ওর ব্যায়াম পুষ্ট নিখুঁত দেহের' প্রতিটী পেশী সঞ্চালন, ওদের দিয়েছে মুগ্ধ করে। কিন্তু হাসিকে আর বুঝি রাখা যায়না, ও দেবে সব পাল্টে! ওর ভাল লাগেনা মেয়েদের এই ছেলেমীপনা—। হাসিকে নিয়ে মৃণালের দিনগুলা শব্দময়ী হয়ে উঠেছে। সারাদিন ওর দরকার মৃণালের ছোট্ট পরিচ্ছন্ন ঘরটায়।

বোর্ডিংএর টিচার এলেন ফিরে—আবার কে ঘেয়েমীর নিত্য স্রোত। ফাজিল মেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। হিষ্ট্রি বোটানির পাতার ধুলা ওদের বাধ্য হয়েই হল মুছতে। মৃণালের ঘরখানা না হলে ওদের পড়া হয় না। নাঃ—এবার ও পাগল হয়ে যাবে, ওর মন হয়েছে চঞ্চল, তায় ওর ঘরেই দাস্তগিরির প্রধান স্থান। ওরা দেবেনা ওকে পাশ করতে। মৃণাল জোর করে Sanskrit-এর খাতা খানা টেনে কোশ্চেন পেপারের অ্যান্সার করতে বসলে—। আঃ—কী বিকট কঠিন শব্দ গুলা, এই গুলাই সে পছন্দ করে নিয়ে ছিল নিজে—কিছুদিন আগে, কিছুতে যেন ও বিশ্বাস্ করতে পারছিলনা।......

গরম কেটে বর্ষা এল!

ছোট্ট দুষ্টু মেয়ে—অকারণে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলে। আকাশটার যেন অভিমান হয়েছে, হাস্‌বেনা মনে মনে করেছে প্রতিজ্ঞা। মৃণালের একটুও ভাল লাগেনা ও তো কবি নয়—। ঘোলাটে আকাশ! সূর্য্যকে হারিয়ে দিয়ে আপন আধিপত্য প্রকাশের চেষ্টা—ঝর্ ঝর্ জল। কলেজ যাবার রাস্তাটুকু কাদায় ভরা। জুতার হিল্‌টা ওকে বেশ পরিশ্রম করেই সাফ করতে হয়। বোর্ডিং এখন মুখরিত। নানা রকম মেয়ের ভীড়—ছোট বড়, কালো, ফরসা, লম্বা। হাসির দেখা পাওয়া যায়না। সকল মেয়ের সাথে সামনের সবুজ ঘাসেভরা মাঠে ফ্রকের সবটা ভিজিয়ে কোরাসে' "এস কর স্নান" গাইতে ব্যস্ত—! বকুনি ও কম পায়না সিষ্টারদের কাছে কিন্তু তবুও ওকে ওর আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারেনা কেউ। মৃণালের ঘর গুছানোই থাকে হাসির কল্যাণ হস্তের (?) স্পর্শে, এলোমেলো নয়—ওর দিনগুলা একরাশ বই খাতার মধ্যে হয়ে এসেছে সংক্ষিপ্ত! একাগ্র হয়ে পড়ার ফাঁকে কোনও একটা দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থ, অভিধান থেকে উদ্ধার করার মাঝে হঠাৎ মনে হয় হাসির কথা—মেয়েটা আসেনা কেন—? হাসিকে ও এত একান্তভাবে ভালবাসে তা হয়ত ও নিজে জানেনা। 'শব্দটা' পেয়ে আবার সামনের খোলা পাতায় দৃষ্টি পড়ে লাল নিল দাগী দেওয়ার পাশে লেখা 'ইম্‌পর্টেন্ট', কোনটার সংক্ষিপ্ত দুটী অক্ষর ভি, আই,—ওর হাসি পায়—সত্যই কী এরা জীবনের পথে চলার জন্যে 'ভেরী ইম্‌পর্টেন্ট'? না শুধুই য়ুনিভারসিটির কর্ত্তৃপক্ষকে সুখী করার একটা

কৌশল ? দুটো পাশ করে মেয়েরা যখন রান্নার বইয়ের পাতা খুলে স্বামী পুত্রের জন্য একটা ভাল তরকারী রাঁধার ব্যবস্থা করবে, কোথায় থাকবে ভট্টার Importance. কোথায় থাকবে Civic's-এর ষ্টেট্গভর্ণমেণ্ট'— ? স্বামী অফিসের সময়ে স্যুটের ক্রিজটার দিকে নজর রেখে নেক্টাইটা পরতে পরতে একবারও —ওদের মনে পড়বে লজিকের একটা ফ্যালাসি ? ঠোঁটের উপর হাসিটা ম্লান হয়ে এল। আবার খাতার পাতার মধ্যে ফেললো আপনাকে হারিয়ে— ।

বিকেল বেলা ! কলেজ হতে ফিরে হাতের বইয়ের গোছাটা টেবিলের ওপর ফেললে অশান্তভাবে। চেয়ারের গায়ে ঘামে-ভিজে ব্লাউজটা রাখলে খুলে—ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—ঠিক বললে না, মুখ থেকে বেরিয়ে এল "আঃ"—! ওর গৌর মুখটায় পথশ্রম-মাখা রক্তের ছাপ—। বহুদিন পর হাসি হঠাৎ ওর ঘরে ঢুকে পড়েছে—একটু হেসে মৃণাল বললে "কিরে"—ছোট্ট দুটো হাতে ওকে বেড়ে ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ও বললে "কি মজা ভাই জান মিনুদি, কাল আমরা সব বোটানিক্যাল যাব—।" ওর চোখের কোণ দিয়ে ঠিক্‌রে পড়ছে হঠাৎ-পাওয়া আনন্দের ছোট ছোট কণা। আবেশময় দুটি চোখের প্রশ্নভরা দৃষ্টি ওর কালো চোখের পানে রেখে মৃণাল বললে "মজা নেই তোর খালি পড়াশুনায়, না হাসিন্ —? হাসি সলজ্জ হেসে ওর দুষ্টু মুখটা দিলে মৃণালের কোলের উপর গুজে। মৃণাল হাসির মুখটি দুহাতে তুলে ধরে বললে "আমি কিন্তু যাবনা ভাই।"

"—বারে—তা বুঝি হয়—? সবাই যাবে আর তুমি থাকবে একাটি ?"

ক্ষতি কি ? তোদের মত ভুতের ভয় আমার নেই—

মাথাটা সজোরে নেড়ে হাসি ঘোরতর আপত্তি জানালে "না মিনাদি, তোমার যেতেই হবে ভাই"।

সাহিত্য-পরিচয়

বিপর্য্যয়—(পঞ্চাঙ্ক নাটক) 'রুডোলফ বেসিয়ারে'র ব্যারেট্‌স্ অফ্ দি উইম্‌পো ষ্ট্রীট নাটকের অনুবাদ। অনুবাদিকা—শ্রীগীতা দেবী।

প্রাপ্তিস্থান—৬১, ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা। মূল্য ॥০ আট আনা।

কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত নামের কথাচিত্রটি কলিকাতায় নানা ছায়াচিত্রগৃহে দেখানো হইয়াছিল। যাঁহারা এই চিত্রটি দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন কিরূপ দক্ষতার সহিত লেখিকা উক্ত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, এই নাটকখানিতে বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিং এবং মিস্ এলিজাবেথ ব্যারেট্ (পরে মিসেস্ ব্রাউনিং)—উভয়ের প্রথম যৌবনের প্রেমচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ভিক্টোরিয়া যুগের জীবন-যাত্রার—মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবনের—অপরূপ আলেখ্য ইহার মধ্যে আছে।

উপরি উক্ত কথাচিত্রটি এই নাটক অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত। অতএব এ খানি পাঠ করিলে কথাচিত্র অপেক্ষা অনেক অধিক সম্পদ পাওয়া যাইবে।

যাঁহারা কথাচিত্রটি এখনও দেখেন নাই, তাঁহাদের এই নাটকপাঠ চিত্রউপভোগে বিশেষ সাহায্য করিবে।

নাটকের নামকরণ সুন্দর। ভাষা ও ভাবপ্রকাশ অতি সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। ভবিষ্যতে লেখিকার নিকট আমরা আরও আশা রাখি।

"সত্যি বলছি হাসিন্ আমার অনেক পড়া আছে—আমায় বাদ দে লক্ষ্মীটি, না হলে ঠিক যেতাম"—সস্নেহে ওর কপালের চুলগুলা সরাতে সরাতে ও বললে—।

হাসির মুখের উপর ম্লানছায়া এল ঘনিয়ে ও চলে গেল। মৃণাল বাথরুমে ঢুকলো—। গায়ে জল ঢালতে ঢালতে ভাবলে নাঃ—অনেক কাজ—কাল যাওয়া হতেই পারেনা। বেচারা হাসি ক্ষুণ্ণ—কিন্তু কী-ই বা করবে ও ?

* * *

বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটা গাছের তলায় বসে ছোট একটা খাতায় মৃণাল কী যেন লিখছিল—দূরে মেয়েরা জটলা করছে। সিষ্টাররা বার বার তাদের সাবধানে চলা ফেরার কথা বলেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না—। হ্যা মৃণালকে আসতে হয়েছে—হাসির একান্ত অনুরোধ এড়াতে পারেনি ও, শুধুই না বেড়িয়ে কাজও কিছু করবে তাই ও এনেছে নোটখাতাটা। এক সময় খাতা হতে মুখ তুলতেই ও চমকে উঠল—একি কাকে দেখলে ও—?

অল্পদূরে দুটো ছেলে বাইকদুটো মাটিতে শুইয়ে ফেলে গল্প করছিল, একটি ছেলে ওর পানে ছিল চেয়ে—চোখে মিললো চোখ—মৃণাল মুখ ফেরালে।

"কি দেখছিস দেবী ? ছিঃ ও কি ভাবলো বলত ?

দেবীকুমার একটু অপ্রতিভ হল, বললে—"না ভাই আমার বহুদিন অদেখা একটি পরিচিতার মত লাগছে ওকে তাই—

ওর স্বরে কৈফিয়তের ভঙ্গি।

"তুই চিনিস ?"

"চেনাইত বোধ হচ্ছে" আরেকবার ওর চোখ গেল, নিজের অজান্তে মেয়েটির চোখে আবার চোখ মিলল। হঠাৎ দেবী বলে উঠল "না ঠিক সেই—সেই ভ্রুর তিলটি অবধি মিলে যায়—চেহারার একটু তারতম্য হলেই বা ?" কথাটা ওর একটু জোরেই উচ্চারিত হয়েছিল। মৃণাল চকিতে দেখে নিলে মেয়েরা এবং সিষ্টাররা বেশ দূরে। উঠে দাঁড়াতেই দেবীকুমার তড়াক্ করে কাছে এসে দাঁড়ালো, একটু থেমে বল্লে "মাফ করবেন, আপনি কী—মানে আমি বোধ হয় ভুল করছি না……।"

নতমুখে নোট খাতাটা নাড়তে নাড়তে বাধা দিয়ে ও বল্লে "হ্যাঁ আ'ম মৃণাল কিন্তু এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলেন বলুন ত ?"

"ডুব মারার দোষটা কী আমার একার মীনা ?" একটু হাসবার চেষ্টা করলে ও। "ও যাক্—আছ কেমন সব—? মাসিমা—?"

—"না তাঁরা কেউ নেই—আজ আমি একা"—মৃণালের গলাটা বুজে এল।

ওর সিঁথির পানে চেয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল দেবী, মৃণাল যেন বুঝতে পেরেই বললে—"হ্যাঁ কুমারীই আমি—বোডিংএ থাকি—আশুতোষে পড়ি, এখানে পড়াই—এবার আই, এ, দেব।"

দেবীকে চুপ করে থাকতে দেখে ও আবার বললে "আপনিও কই কিছু বল্লেন না আপনার কথা ?"

ও যেন আবার ফিরে পেয়েছে আপনাকে, ফিরে পেয়েছে পিতৃগৃহের ছোট্ট মেয়ের মত—তাই আবদারে হয়ে উঠেছে উচ্ছল…।

"বলবার মত কী-ই বা আছে ? এবারে এম্ এ দিয়েছি বর্ত্তমানে বেকার।" ও হাসলে—"কিন্তু তোমায় বোধ হয় ডাকতে আসছে—"

মৃণাল ভুলে গেছল যে ও বোর্ডিং-এর রুটীনে বাঁধা একঘেয়ে জীবনের অধিবাসিনী, একটু চমকে উঠে দেখলে হাসি আসছে ছুটে, একগোছা সোনালী চুল চোখে মুখে ছড়িয়ে—। যতদূর দৃষ্টি চলে ও তাকালে, কাউকে আর দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। হাসি এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে "মীনুদি এখানে একলাটী করছ কী—?"। ওর ছোট্ট মুখের গম্ভীর কথার ধরণ দেবীকে মুগ্ধ করল, ওকে আপনার কোলের কাছে টেনে, ছুটে আসার কারণে রক্তমাখা মুখটী দুহাতে তুলে ধরে বললে "তোমার মীনুদি একলা নেই ত—?"

অপরিচিতের কাছে ওর উচ্ছলতা মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কুচিত হল,—প্রশ্নভরা বিশাল দুটী চোখ মৃণালের মুখে তুলে বললে "কে ভাই ?" একগোছা কোমল নরম ফুলের মত স্নিগ্ধ সুন্দর মেয়েটীকে বুকের উপর তুলে নিয়ে দেবী বললে "তোমার বন্ধু—?"

মুহূর্ত্তের সঙ্কোচ গেল ভেঙে, হাসি হয়ে উঠল খুশীর ফোয়ারা—, হয়ত এত বড় একটী লোকের বন্ধুত্ব ওকে শুনিয়ে দিয়েছিল প্রচুর সৌভাগ্য-বাণী। দুহাতের কোমল আবেষ্টনে দেবীর গলা জড়িয়ে বললে "সত্যি—? তুমি বুঝি আগে মীনুদির বন্ধু ছিলে ?"

"ছিঃ—হাসি আপনি বলতে পারনা—?" মৃণালের তিরস্কার ভরা সম্বোধনে হাসি গেল কুকড়ে ও রোদের তাপে শুকিয়ে যাওয়া কোমল ফুলের পাপড়ির মতই।

"নাগো তুমি আপনি বলনা, তোমার মীনুদি কিছু জানে না—বন্ধুকে বুঝি কেউ আবার আপনি বলে—?"

দেবীর আশ্বাসে হাসি উৎফুল্ল হয়ে উঠল আগের মত, খুশীর আলো ঠিকরে পড়ে ওর কালো দুটী চোখের তারা থেকে,—সোনালী চুলের গোছা দুলিয়ে ও আগের কথার সূত্র ধরে বলে "তুমি বুঝি ওর বন্ধু ছিলে ?" মৃণালের পানে চাইলে, একটু দুষ্ট হাসি ওর চাপা ঠোঁটের ওপর উঠল ভেসে, বললে—"ছিলাম ত, তোমার দিদিটা ঝগড়া করেছিল,"—

"ছিঃ মীনুদি, বন্ধুর সাথে ঝগড়া করতে আছে বুঝি—?" এবার হাসির বকবার পালা—, ও সুযোগ ছাড়ল না—মুখের প্রতিটী কুঞ্চন, প্রবীনদেরও হার মানায়।

ওরা দুজনেই হেসে উঠল—

"ক্ষুদে শাসন-কর্ত্রীকে না মেনে তোমার উপায় নেই মীনা—" দেবী বল্লে।

অদূরে দেবীর সহচরটীকে লক্ষ্য করে মৃণাল মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বললে—"বেশ আক্কেল ত আপনার—এখনও সেই ভুলো-স্বভাব গেল না, বন্ধুটিকে একা রেখে দিব্যি নিশ্চিন্ত।"

অপ্রতিভ দেবী হাসির কপালে মৃদু ঠোঁট স্পর্শ করে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললে "জানই ত চিরকালের স্বভাব আমার কিন্তু—এই কী শেষ দেখা ?"

নতমুখে হাসির চুলে হাত চালাতে চালাতে মৃণাল বল্লে "আসবেন একদিন যদি সুবিধা হয়—" নোট খাতার এক টুক্‌রা স্লিপ কেটে ওর বোডিংএর নাম ঠিকানা দিলে ওর হাতে। নমস্কারের বিনিময় করে ওরা বিপরীত পথে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।……

মৃণাল ফিরে এল বহুদিনের পরিচিত বন্ধুকে দেখবার উৎকট আনন্দ নিয়ে। খাওয়া ওর আজ এগিয়ে যাচ্ছে, বেড়ানোর ক্লান্তি ওর মনেই ছিল না, নিজের ঘরে যেতে পারলে যেন ও বাঁচে। নিয়মের গণ্ডির বাইরে আপনাকে পাবে একান্তে দেখার অবসর, নিজের ঘরে, তাই ও ব্যস্ত। অবশেষে সেই ক্ষণ, সেই একান্ত প্রার্থিত মুহূর্ত্ত, এল ওর কাছে ঘনায়মান রাতের কোলের মাঝে ও

নিজের ঘরকে পেল কাছে। বিছানায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার সাথে সাথে হুড় হুড় করে চিন্তার রাশি ঢুকে পড়ল ওর মনের মধ্যে—ফুটো দিয়ে নৌকায় জল ঢোকার মত—যেন ওরাও এই মুহূর্ত্তের জন্যে ছিল অপেক্ষা কোরে। অন্ধকার ঘরের কোনে, ওর বিছানার চারিপাশে যেন দুষ্টু ছেলের মত লুকিয়েছিল, হঠাৎ ধরে ফেলার আনন্দ-টুকু উপভোগ করতে।

মৃণাল ফিরে এল ওর শৈশবের কোলে—। মা বাবার একটীমাত্র মেয়ে ত সে ছিল না তাই আদরের মাত্রাটা একটু কমই ছিল। দুটী ভাই—তাদের আদর যে বেশী হবে সেত জানাই ছিল, তাই কোনদিন ও তার জন্যে দুঃখ করেনি……। শুধু অহেতুক অবহেলা ওর বুকে বাজত কঠিন হয়ে—।

সেবার ওর ম্যাট্রিক দেওয়ার বছর, সকল চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ও আপনাকে পড়ার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে—সংসারের তুচ্ছ মান অভিমানে কান দেবার অবসর তার কমই। মাস দেড়েক আর বাকী আছে পরীক্ষার, এমনি এক-দিন সন্ধ্যাবেলা দাদা একটী অপরিচিত তরুণকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে হাজির। বললেন—"মীনু একে আজ খুব বাঁচিয়েছি। আমার গাড়ীর চাকার হাতে আজ প্রাণ দিতে বসেছিলেন, আর একটু হলেই। একে চা করে দে লক্ষ্মী বোনটী"। দাদার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত দেখে ওর হাসি পেল। নমস্কার করে ওঁকে বসতে বলে চায়ের জন্যে গেল। মা সব শুনে সহানুভূতি জানালেন—বাবা practical man বলে সবটুকু পরিচয় নিতে ছাড়লেন না—নাম দেবীকুমার, বিদেশের জমিদার-পুত্র. কলকাতায় পড়া-শোনা করেন, সে বছর বি-এস সি-র জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। দিনের পর দিন চায়ের নিমন্ত্রণ—মৃণালের পড়ার সাহায্য এবং সেই ঘনিষ্ঠতার ফলে ওদের মুকুলিত প্রাণের দৃঢ়-বন্ধন। ওদের পরীক্ষা হয়ে যাবার পর দেবীকুমারের আসা যাওয়াটা একটু ঘন নিবিড় হয়ে উঠল। বাবা বিরক্ত হলেন. দাদাকে ডেকে বল্লেন "এটা ভাল নয়।" দাদা নির্ব্বাক. কীই বা বলবেন—? অবশেষে বাবা নিজেই বল্লেন।

মীনাকে দেবী জানালে প্রাণের ভাষা লিপির সাহায্যে। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ তিনটী বৎসর—ওরা কেউ কারুর সামান্য এতটুকু খবরও পায়নি। অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল দেবী ওদের বাড়ীর পরিজনের কাছে। আজ ও একা—বাবা মা দাদারা কোন অজানা দেশে আপনাদের পরিচিত করতে চলে গেছেন ওকে নিঃসম্বল করে—। দিদিদের কাছে হয়ত গিয়ে দাঁড়ালে করুণায় পেত সাহায্য, আশ্রয়, তা ও করেনি। যে কলেজে ও পড়ত তারই 'প্রিন্সিপালের' কাছে সকল কথা বলে এবং সেই স্কুলে একটা কাজ পেয়ে আপনার পড়ার ব্যবস্থা করে নিলে। 'প্রিন্সিপাল' লোকটী ছিলেন ভাল, বোর্ডিং 'ফিজ'টা ওর excuse করলেন…।

……ভিজিটিং রুম বেশী বড় নয়—মাঝারী একটা ঘরে ছোট একটা টেবিল, খান-কয়েক চেয়ার, হাল্কা পটপটে দেয়ালের গায়ে কাঠের ব্র্যাকেট বুকে নিয়ে আছে ছোট একটা "টাইমপিস্"—ভিজিটারদের বাড়ী যাবার সময় টুকু স্মরণ করিয়ে দিতে দরদী বন্ধু—। তার নিচে কোন "বুক ষ্টল" থেকে পাওয়া রঙ্গীন ছবি দেওয়া একটা ক্যালেণ্ডার—।

হাসিকে নিয়ে মৃণাল সেই ঘরে এল। চেয়ারে বসে দেবীকুমার। মুখে আগ্রহ-প্রতীক্ষার ছাপ—। মাঝে অনেকদিন চলে গেছে সেদিনের পর—। মৃণালদের পরীক্ষা হয়ে গেছে। শীতটা যাই যাই করেও যেতে পারছে না যেন—! মাঝে মাঝে হিমেল হাওয়া ঘরে ঢুকে পড়ে ক্যালেণ্ডারকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে……।

"নমস্কার"—মৃণাল শুভ্র ছুটী হাত মৃদুভাবে কপালে ছোঁয়ালে ; দেবীকুমার একটু হেসে বললে "কেমন হল পরীক্ষা—?"

"লজিকটা একটু খারাপ হয়ে গেছে।"

অন্যগুলা ভালই—এই থেকে বুঝে নিয়ে দেবী বল্লে "এবার কী করবে—?"

"বি-এ পড়ব ভাবছি" চকিতে দেবীর পানে চেয়ে ও বললে—।

কিন্তু এবার তোমার সংসার করার বয়স এসেছে, পারনা কি এখন আমার সমর্থের উপর নির্ভর করতে—? অবশ্য পড়তে চাও পড়বে কিন্তু কাজটা ছাড়তে হবে।"

'কেন—? পরস্পরের উপার্জ্জন—সে ত সংসারের হিত ছাড়া নয়।" "বুঝেছি বেশ তাই হবে" দেবীকুমারকে একটু ক্ষুণ্ণ দেখালো। "তোমায় মাসখানেক ছুটি নিতে হবে" দেবী ওর কথার জের টানলে—

"কিন্তু আপনার বাড়ীর—মানে মার মত হবে ত ?" দেবীর বাবা নেই—।

"না হবার কারণ ত কই দেখছি না, আর নেই বা হল—ক্ষতি কী ?"

"না—না তা হয় না মায়ের মঙ্গল আশীষ ছাড়া আমাদের চলার পথ সুগম হয় কী ?"

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্কোচ দেখে দেবীর হাসি পেল "হায়রে—এরাই আবার চায় পুরুষের সাথে সমান অধিকার—কাদার মত জলে লড়াই করতে চায় অধিকারের কঠিন দাবী নিয়ে। আচ্ছা"—দেবীকুমার উঠল। হাসি ওকে আজ নিজের সম্বন্ধে উদাসীন দেখে বিস্মিত হল। তাড়াতাড়ি মৃণালের অনুকরণ করে নিজের ছুটি ছোট্ট হাত কপালে ছোঁয়ালে।

"ওহোঃ—তুমি এসেছ বন্ধু ভুলেই গেছলাম।" দেবী ওর রক্তভরা গালে মৃদু আঘাত করলে—। উচ্ছ্বসিত আনন্দে সোণালী চুলগুলা মুখ হতে সরিয়ে উজ্জ্বল চোখে হাসি চাইলে। বোর্ডিংএর ঘণ্টা পড়ল—হাসিকে ডেকে মৃণাল বললে "চল্"—অল্পক্ষণের জন্যে পাওয়া-বন্ধু ছেড়ে হাসি ক্ষুণ্ণ মনে মৃণালের কাছে এগিয়ে এল……।

বোর্ডিংএর নিয়মে বাঁধা জীবনের ধারায় অভ্যস্ত নিয়মিত মনের মাঝে এসেছে একটা বৈচিত্র্য ! মৃণালের মন হয়ে এসেছে অশান্ত, উদ্দাম চঞ্চল—।

কেন তা ও নিজেই বুঝতে পারেনা—। ভাল না লাগার এক ঘেয়েমীকে ত ওর মন হয়ে উঠেছে পূর্ণ ভরাট নির্খাজ—বুঝি এবার ভরে উঠবে একটি উজ্জ্বল সোণালী সার্থকতায়। দেবীকে বিদায় দেবার পরের রবিবার ফিরে এল বোর্ডিংএর বুকে উচ্ছ্বলতা নিয়ে। মৃণালের হাতে বেয়ারা এনে দিলে সাদা চৌকো একটা জিনিষ—সেটা নিয়ে মুহূর্ত্তের উজ্জ্বলতায় ছেয়ে গেল ওর মুখ—পরক্ষণেই বিবর্ণ হয়ে এল—আশঙ্কায় ভীরু-মন নিয়ে খামটা ছিড়ে ফেল্লে একটানে—একান্ত আগ্রহে চোখ ছুটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে রুদ্ধশ্বাসে, ও যেন প্রত্যেক অক্ষরটাকে গেলবার চেষ্টা করলে. আঃ—এত আনন্দ ? ও বুঝি এবার পাগল হয়ে যাবে, না—না—ও সইতে পারবে না এত আনন্দ, ও মরে যাবে, ছিঁড়ে যাবে ভেঙ্গে পড়বে টুকরা টুকরা হয়ে। "দেবীকুমারের মা রাজী" এই একটা লাইন—আঃ—এত সুখ ছিল জড়িয়ে এর বুকে। ও প্রায় দৌড়ে গেল হাসিকে খেলার মাঠে পেয়ে বুকে রেখে বল্লে "হাসিন এবার তোদের কাছ থেকে বিদায় নেবার দিন এল।" অসম্ভব রকম বিস্মিত হয়ে একপাল ছোট মেয়ে ওকে ঘিরে ফেল্লে—"ওকি ভাই কোথায় যাবে ?" "কেন ? কবে ?" নানা মেয়ের নানা প্রশ্নের ঝড়ে ওকে বিব্রত করে তুললে। ও বললে, ঠিক বললে না—মুখ থেকে যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে এল "আমার বিয়ে—।" বলতে বলতে ও মোটেই সলজ্জ হাসলেনা—গোলাপী হয়ে উঠল না ওর গাল—চোখের পাতায় নেই আবেশ। কবর থেকে যেন উঠে এল ওর কথাগুলা নির্জ্জীব প্রাণহীন—।

ওঃ—সকলে ওকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলে "সত্যি ?" ওদের হাত ছাড়িয়ে ও আস্তে আস্তে আপনার ঘরটীতে এল। ওর ঘরের প্রতিটি জিনিষ যেন ওকে ধরে রাখার জন্য এত মাধুর্য্য ভরা হয়ে উঠেছে—বোর্ডিং রুমে এত যে বৈচিত্র্যতা আছে, এত নতুনত্ব আছে তা আজ ও প্রথম উপলব্ধি করল। ছোট্ট বিছানার উপর ও ঝাপিয়ে পড়ল—দুহাতে বিছানাকে আলিঙ্গন করে বিদায় চেয়ে নিচ্ছিল—প্রতিটি জিনিষ আজ ওকে ভালবেসেছে, এক ঘেয়েমীর ধারা যেন হারিয়ে গেছে নতুনের মাঝে—এত আকর্ষণ ও আজ পেলে এখানে……। ও ভাবলে……এই ঘর, এই ওর বিছানা……আবার একজনের দেহভার নেবে এই ঘরে, আবার একজনের দৈনিক কাজের সাক্ষী থাকবে জমা, এ হবে আর একজনের প্রিয়, তাকে ভালবাসবে ওকে ভুলে যাবে, মনে রাখবেনা—একবারও ভাববেনা পর্য্যন্ত, নতুনের নেশায় ও থাকবে পূর্ণ……। বিদায় অভিশাপের কয়েকটা লাইন ওর মনে পড়ল।

"ওগো বনস্পতি, আশ্রিত-জনের বন্ধু
তোমায় করি নমস্কার
কত পান্থ, বসিবেক ছায়ায় তোমার
কত ছাত্র কতদিন, আমার মতন
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায় তলে, নীরব নির্জ্জন
তৃণাফলে, পতঙ্গের মৃদুগুঞ্জ স্বরে
করিবেক অধ্যয়ন……"

ও ভাবলে এই পুরাতনের বিদায়, নতুনের আহ্বান—এইত চিরন্তনী এই জগতে হয়ে আসছে যুগ যুগান্ত—সে চলে যাবে, ওর স্থান থাকবেনা অপূর্ণ, কেউ তার অভাব বোধ করবেনা—ঐ হাসিও হয়ত ভুলে যাবে নতুনের ডাকে ছুটে চলবে, উদ্দাম উত্তাল গতিতে……। না—না—ও ভাবতে পারেনা আর—ওর সহ্য হবেনা হাসির অন্তর হতে নিজের বিদায় —ও মরে যাবে ও বুঝি এবার কেঁদে ফেলবে হাসি—হাসি—না—না ও যাবেনা ঐ হাসিকে ছেড়ে—এই পরিচিত আবেষ্টনী।

হাতের মধ্যে ছোট্ট একটা জিনিষ মুড়মুড় করে ওর কথার প্রতিবাদ করলে—ও উঠে দাঁড়ালো—ভাবলে……সেই পাশ করে স্বামী, পুত্র, সংসার এতটা একঘেয়েমী ওর সহ্য হবে না নিজের মৃত্যু ও সহ্য করতে পারে, কিন্তু চিরন্তনীর অনন্ত জীবন ও সহ্য করতে পারবে না। তবে কী ও লিখবে কয়েক ছত্র? দেবীকুমারের আগ্রহপূর্ণ মুখটা যেন ফুটে উঠেছে তার লেখার পাশে, ও চিঠিটা আবার পড়লে……। আঃ কী করবে তবে ও—? ওকি শেষে পাগল হবে? নিজের জন্য ও জীবনে এত ভাবেনি বোধ হয়। কেন এল দেবীকুমার এতদিন বাদে? কেন এমন করে চঞ্চল করে তুললে? ভালোকে কেন ও ভালবাসলে? কেন—? কেন—? সহস্র কেনর চাপে বুঝি এবার মরে যাবে…… পাগল হয়ে যাবে…ঠিক ওকে এরা পাঠিয়ে দেবে রাঁচি। নাঃ—ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠল—নিজের এই অবস্থায় ওর চোখে জল আসছিল—আয়নার বুকে নিজের ছায়া দেখে ও চমকে উঠল—মানুষ কী কয়েক মুহূর্তে এত বদলে যেতে পারে? ও লিখবে……ও ঠিক করলে ও লিখবে দেবীকুমারকে……। চিরন্তনীকে …ও দেবেনা বাচতে। একজন……অন্ততঃ একজনও যদি হত্যা করে—এক ঘেয়েমীর গলা টিপে ও পাবে আনন্দ। সে আনন্দ থেকে ও নিজেকে বঞ্চিত করবে না, নিজেকে ও ভরিয়ে পূর্ণ করে তুলবে…ওর মুহূর্ত গুলিকে রূপালী সার্থকতায় তুলবে ভরিয়ে। কবির কথা মনে পড়ে…

"ভুলে যাবে সর্ব্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে…"

হ্যাঁ দেবীকুমারকে ফিরিয়ে দেওয়ার গ্লানি ও ভুলবে—ওর স্বাধীনতার গৌরবে—তার জন্য সব কিছু নিজের ও পারবে দিতে বিসর্জন। দেবকুমারকে ব্যথা দেবার গ্লানিকে ভুলতে ও অপেক্ষা করবে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত! ও পড়বে বি, এ, এম, এ…ও পরবে ললাটে গৌরবের জয়টীকা—গ্লানির কালিমায় নষ্ট হবে না তার ঔজ্জ্বল্য…।

শ্রীদুর্ব্বাসা

তুরূপের ভয় :—তুরূপের মোহে পড়ে কত ভাল খেলা নষ্ট হয়ে যায় সে সম্বন্ধে বিগত সপ্তাহে কিঞ্চিৎ বলেছি; তুরূপের ভয় দেখিয়ে কত খেলা করে নিয়ে যাওয়া যায় এবার তা' দেখাবার চেষ্টা করব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নলিখিত হাতগুলি উদ্ধৃত করা গেল।

ইস্কাবন—চৌকা, তিরি।
হরতন—গোলাম, চৌকা।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, চৌকা, দুরি।
চিড়িতন—টেক্কা, গোলাম, তিরি, দুরি।

ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, দশ।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, দশ।
রুহিতন—আটা, সাতা।
চিড়িতন—বিবি, আটা, সাতা, ছক্কা

ইস্কাবন—সাতা, দুরি।
হরতন—সাতা, পঞ্জা, দুরি।
রুহিতন—দশ, নয়, ছক্কা, পঞ্জা।
চিড়িতন—সাহেব, দশ, পঞ্জা, চৌকা।

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, নয়, আটা, ছক্কা, পঞ্জা।
হরতন—নয়, আটা, ছক্কা, তিরি।
রুহিতন—সাহেব, তিরি।
চিড়িতন—নয়।

ডাক হয়েছে নিম্নলিখিতরূপ—

'দ'	'প'
একটি ইস্কাবন।	পাশ।
দুইটি ইস্কাবন।	পাশ।
তিনটি ইস্কাবন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।
'উ'	'পূ'
দুইটি রুহিতন।	পাশ।
তিনটি চিড়িতন।	পাশ।
চারটি ইস্কাবন।	পাশ।

হরতনের সাহেব খেলার পর 'প' ইস্কাবনের বিবি খেলেছেন, 'দ' কি করবেন? এখন এই খেলা করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে ডাকদারের খেলার ধারার উপর নির্ভর করছে। ডাকদারের হাতে রঙের টেক্কা সাহেব থাকা সত্ত্বেও বিবির পিট তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে; আশ্চর্য্যজনক হলেও এ ক্ষেত্রে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন এই পিটখানি পাবার পর তিনি যে ভাবেই খেলুন না কেন এক হরতনের পিট ব্যতীত তাঁর আর একটিও পিট নাই। এ পিট নেবার পর 'প' যাই খেলুন না কেন সেই রঙে পিট করে নিয়ে ইস্কাবনের পিট কখানি নিয়ে তাঁর দেয় হরতন তাসগুলি খেঁড়ীর রুহিতনের পিটে ফেলে দিয়ে তাঁর ডাক অনুযায়ী খেলা করে নেবেন।

অতঃপর দেখা যাক্ যদি ডাকদার ইস্কাবনের বিবির পিটখানি ছেড়ে না দিয়ে টেক্কা বা সাহেব দিয়ে ধরেন, তা' হলে কি হয়। উপরোক্ত পিটখানি নেবার পর যদি তিনি রঙ খেলে যান তা হলেও বিপক্ষদলের রঙগুলি ধরতে পারছেন না আর উপরন্তু দেয় হরতনগুলি পাশাতে না পেরে বাধ্য হয়ে খেলারৎ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। আবার এদিকে যদি তিনি ঐ পিটখানি নেবার পর হরতন খেলেন তা' হলেও বিপক্ষ দল ঐ পিটখানি ধরেই রঙ খেলে দিচ্ছেন, তাতেও তিনি তাঁর দেয় হরতন পাশাতে পাচ্ছেন না। এখন খেলার ধারাটি যদি চিন্তা করা যায় তা' হলে বুঝ্তে পারবেন যে, যে কোন উপায়ে খেলা হোক্ না কেন বিপক্ষদলকে রঙের একটি পিট দিতেই হবে, সুতরাং সেই দেয় পিটটা কোন সময়ে দেওয়া উচিত তা' বিবেচনা সাপেক্ষ। তবে এ বিষয়ে সাধারণ নিয়ম এই যে ডামির হাতে রঙ থাক্‌তে থাক্‌তে বিপক্ষদলকে রঙের পিট দেওয়া বিধেয়, কেননা ডামির হাতে রঙ থাকার দরুণ বিপক্ষদল হরতন রঙে তাঁদের পিটগুলি টেনে নিতে পারবেন না। এমন কি যদি কোন ক্ষেত্রে বিপক্ষদল ইস্কাবন না খেলেন 'দ'-পক্ষের হাতে খেলা এলেই ছোট ইস্কাবন খেলে প্রথমে তাঁদের পিট দিয়ে দিতে হবে; অতঃপর পিট ধরে নিয়ে ডাক অনুযায়ী খেলা করতে হবে। নিম্নে আর একটি হাত দেওয়া গেল এবং তার যা ডাক হয়েছে তাও দেওয়া হল। এক্ষেত্রে ডামির চেয়ে বিপক্ষদলের রঙ কম না থাক্‌লেও রঙের ভয় দেখিয়ে কিরূপ খেলা করে নেওয়া যায় লক্ষ্য করুন।

'দ'	'প'	'উ'	'পূ'
একটি ইস্কাবন।	পাশ।	দুইটি চিড়িতন।	পাশ।
দুইটি ইস্কাবন।	পাশ।	তিনটি ইস্কাবন।	পাশ।
চারটি ইস্কাবন।	পাশ।	পাশ।	পাশ।

পিটখানি ছেড়ে দিলেন, কেন না, তিনি দেখলেন যে যদি রঙের বিভাগ ৪—২ হয় তাহলে রঙ মারলেই তিনি খেলা করতে

ইস্কাবন—সাহেব, দশ।
হরতন—আটা, পাঞ্জা, দুরি।
রুহিতন—বিবি, গোলাম, সাতা, চৌকা।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, গোলাম, তিরি।

ইস্কাবন—তিরি, দুরি।
হরতন—সাহেব, বিবি, নয়, ছক্কা, চৌকা।
রুহিতন—দশ, নয়, পাঞ্জা, দুরি।
চিড়িতন—নয়, আটা।

ইস্কাবন—আটা, সাতা, ছক্কা, পাঞ্জা।
হরতন—টেক্কা, গোলাম, দশ, তিরি।
রুহিতন—আটা, তিরি।
চিড়িতন—টেক্কা, ছক্কা, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, নয়, চৌকা।
হরতন—সাতা।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, ছক্কা।
চিড়িতন—দশ, সাতা, চৌকা, দুরি।

'প' হরতনের সাহেব পেড়ে খেলায় 'পূ' টেক্কা মেরে পিট নিয়ে হরতনের গোলাম খেল্‌লেন। ডাকদার ঐ পিটখানি তুরূপ করে নিয়ে দেখ্‌লেন যে যতক্ষণ না তিনি চিঁড়িতন রঙটি দাঁড় করিয়ে নিচ্ছেন ডাক অনুযায়ী তাঁর খেলা নাই। এখন তিনি এই পিটখানি ধরেই অনায়াসে রঙ খেলে নিতে পারতেন কিন্তু তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে বিপক্ষদলের হাতে রঙের বিভাগ ৩—৩ হলে খেলা করার বিশেষ কষ্ট নাই আর যদি ৪—২ বিভাগ হয়ে থাকে তা' হলে তাঁর পক্ষে খেলা করা একেবারে অসম্ভব। এ জন্য তুরূপের পিটখানি ধরেই তিনি খেল্‌লেন চিড়িতন, ডামি দিলেন সাহেব, আর 'পূ' টেক্কা দিয়ে পিটখানি নিলেন। পিট নেবার পর 'পূ' খেল্‌লেন হরতন, তাতে ডাকদার পারছেন না, অথচ ছেড়ে দিলে তাঁরা হরতন খেল্‌তেও পারচেন না, এবং এতদ্ব্যতীত অন্য পিটও পাচ্ছেন্ না। এখন কথা হচ্ছে এই যে যদি চিঁড়িতনের সাহেবের পিটখানি 'পূ' ছেড়ে দেন, তবে তারপর দ্বিতীয়বার চিঁড়িতন খেল্‌লেই 'পূ' টেক্কা মেরে পিট ধরে পুনরায় চিঁড়িতন খেলে খেঁড়ীকে দিয়ে তুরূপ করাবেন। অতএব এই মারাত্মক ভ্রম কেউ যেন না করে বসেন কারণ পক্ষান্তরে ডাকদার যদি চিঁড়িতনের সাহেবের পিট-খানি পেয়ে যান তা' হলেই তাঁর খেলা হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের পক্ষে সর্ব্বসমেত পিটগুলি এই,—একটি চিঁড়িতনে, পাঁচখানি রঙে আর চারখানি রুহিতনে; অতএব চিঁড়িতনের সাহেবের পিট পাওয়ার সঙ্গে

—"কে তুমি দরদী-বঁধু"—

শ্রীসুনীল কুমার দাশ গুপ্ত।

পথে যেতে যেতে সেদিন চকিতে—দেখিনু একটী মেয়ে,
আঁকা-বাঁকা তার কেশের গুচ্ছ আছে সারা পিঠ ছেয়ে।
দুই কাণে তার ঝুম্‌কোর দুল—হেলে দুলে করে খেলা,
সুন্দরী-তনু-বৃন্তে এ কীগো দোলন্‌-চাঁপার মেলা ?
কাজল্ পরা ও-জোড়া আঁখি হ'তে ঝ'রে যায় কালো বারি,
মোর অন্তরে লইলাম টানি' গোপন ব্যথাটি তারি।
অশ্রু-সিক্ত অঁচল তাহার লুটায় ধূলিতে দুঃখে,
দু'বাহু বাড়ায়ে অতি সযতনে বাঁধিনু তাহারে বুকে।
শুধাইল মোরে কিশোরী-বালিকা--"কে তুমি দরদী বঁধু" ?
নীরব ভাষায় দিনু তার মুখে চুম্বন-ভরা-মধু।
সেই দিন হ'তে বন্ধুরে মোর করিলাম মম রাণী,
করিলাম তারে মোর কবিতার সুখ-দুঃখের বাণী।

———

চলার পথে

কাজি আফছার উদ্দিন আহাম্মদ

.........। শুধু চল, এগিয়ে চল, দৃষ্টি তোমার শুধু সম্মুখে, পেছনে চাইবার পর্য্যন্ত অধিকার নেই, চল আর চল, এযে চলারই পথ, কেবল চলার চঞ্চলতাতেই যেতে থাকতে হবে। দৃষ্টি তোমার সম্মুখে, পেছনে নয়, শুধুই চলা। এ পথ যে অসীম, অনন্ত, এ পথের যে শেষ নেই! এসে চলে গেছে—ঐ দেখ ঐ দীনু চক্রবর্ত্তীর পোড় ভিটের পাশ দিয়ে, ঐ বটতলার সাকোর 'পর দিয়ে, ঐ 'ছোট্ট নদীটির পূব পাড় ধরে—এ যেন চলে গেছে দিগন্তের দিকে, ঐ যে যেখানে নীল আকাশটিতে পৃথিবীর ছোঁয়া লেগেচে। এ চলে গেছে বহুদূরে—এ যেন গিয়েচে ঐ পশ্চিম আকাশের শুক তারাটারও ঐ পিঠে; সে অনেক দূরের দেশে—কোথায়, তেপান্তরের মাঠের মাঝখান দিয়ে, বুড়ো বটের ছায়ার নীচ দিয়ে, সরষের ভূঁই বাঁয়ে ফেলে, বাবলার বন ডাইনে রেখে এ চলে গেচে, এঁকে বেঁকে ঠিক ছোট্ট নদীটির মত। কতদূর তা কেউ জানেনা, কোথায় গিয়ে এ থামবে তা' কেউ বলতে পারে না, এযে চলেচে আর চলেচে। কেউ বলতে পারেনা যে এ পথ কোথা থেকে বেরিয়েছে, মানুষ সব সময়েই দেখচে যে সে শুধু এই পথের মাঝখানে। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই পথের উপরেই, আরও উজানে, কত কাণ্ড হয়ে গিয়েচে। যে পথে রাম সীতার সন্ধানে বনে বনে ঘুরেছিলেন সে পথেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা চলেছিল, সে পথের 'পরেই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ চলেছিল; এ সেই পথ—

———

সঙ্গেই রঙ ধরে নিয়ে তিনি তাঁর খেলা করে নিলেন।

একটি হাত :—এইবার নিয়ে একটি হাত দেওয়া গেল, পাঠকেরা বলুন তো কি ভাবে খেলবেন ? হরতনের সাহেব খেলা হয়েছে।

ডাক হয়েছে নিম্নলিখিত রূপ,—

'দ'	'প'	'উ'	'পূ'
একটি ইস্কাবন।	দুইটি হরতন।	তিনটি রুহিতন।	তিনটি হরতন।
তিনটি ইস্কাবন।	চারটি হরতন।	চারটি ইস্কাবন।	পাশ।
পাশ।	পাঁচটি হরতন।	পাঁচটি ইস্কাবন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।		

ইস্কাবন—নয়, চৌকা, তিরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা সাহেব, গোলাম, আটা, ছক্কা, চৌকা।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, আটা, চৌকা।

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, দশ, আটা, পাঞ্জা, দুরি।
হরতন—গোলাম, দুরি।
রুহিতন—বিবি, তিরি, দুরি।
চিড়িতন—সাহেব, দুরি।

———

ওপরের ছবিতে হচ্ছে ফ্রাঙ্কট টোন আর গ্রেস মুর, দৃশ্যটি "দি কিং ষ্টেপস্ আউট" থেকে।

ও পারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

মা ও মাসী

একদিন খবর দিয়েছিলুম যে ফ্রেডি বারথোলোমিউর মা আর মাসীতে গণ্ডগোল বেঁধেচে। খবরটা প্রচার কার্য্য চালাবার জন্যে চমৎকার ও মুখরোচক করে তোলা ছিল না। খবরটা খবরই, গল্প নয়,—আসল এবং সত্যি। ফ্রেডির মা এবং মাসী দুইজনেই ফ্রেডিকে কাছে রেখে মানুষ করতে চান।

ফ্রেডির মা এসেছে আমেরিকাতে, 'লিটল লর্ড ফণ্টলরয়' ছবি মুক্তি পাবার পরই। ফ্রেডির মাসী মাইলিসেণ্ট বারথো-লোমিউ বলে; তার দাবীই বেশী, ওই তো ফ্রেডিকে মানুষ করেছে সেই ছোট বয়স থেকে।

আর ফ্রেডির মায়ের?—তিনি যে ফ্রেডির মা;—তাঁর হচ্ছে মায়ের দাবী।

এই এত গোলমাল যেখানে, ফ্রেডি সেখানে নির্ব্বিকার। কোনো কথায় নেই। একেবারে চুপচাপ। কারোর এ প্রশ্নে উত্তর দেয় না। ফ্রেডির কাষ দিনের দিন বেড়েই চলেচে। লোকে তাকে যতই দেখচে ততই ভালবাসচে। আজ পর্য্যন্ত ফ্রেডি যতগুলো ছবিতে নেমেচে সব কটাতেই ভাল অভিনয় করেচে। এই ভাল অভিনয় করে, লোকের কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়া ফ্রেডির শুধু ছবি থেকেই নয়, ওদেশের রেডিও থেকেও ও বর্ষণমুখর প্রশংসা পাচ্ছে।

মাইনেও ফ্রেডির কম নয়! এখন ষ্টুডিও থেকে সপ্তাহে পাচ্ছে দেড় হাজার ডলার এবং রেডিও থেকে ও যা পায়, তা ওই-রকমই একটা অঙ্ক।

দেখা যাক্ ফ্রেডির এই টাকা কার ঘরে ওঠে; মা না মাসীর!

ফ্রেডি বারথোলোমিউ

সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সে ছিল, আজও—এখনও সে আছে; এখন সে পথে তুমি, যুগ যুগ ধরে এই পথের ধারেই তোমার বংশধর। তবু এ ফুরোয় না, শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ তার যাত্রা সাঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে চলেচে, তবু তার পথ ফুরোয় না। এ পথ জীবন-পথ—এ পথ তো তোমার পরিচিত, তোমার আশে পাশের জিনিষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এ পথ যে অসীম, অনন্ত এ চলেচে অজানার অপরি-চিতের উদ্দেশ্যে, যে সুর একবার উঠেচে তা' আর থামবে না, এর আর বিরাম নেই, এ যে বীণার সুর চিরকাল বেজে চলেচে।

ক্যারল আর ক্লার্ক

বিয়ে বোধ হয় হোল ওদের। যতদূর

সম্ভব খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে ওদের ভালবাসা খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। আজকাল ক্যারল লম্বার্ড আর ক্লার্ক গেবলকে লোকে শুধু এক সঙ্গে বেড়াতে বা রেস্তোরাঁয় বসতে কিম্বা সার্কাস দেখতে দেখছে না, আরো দেখচে অনেক অনেক রকমে। এতদিন ধরে ক্যারলের প্রেমের কথা শোনা যেত 'বব রিসকিন'-এর সঙ্গে। জানেন তো বব হচ্ছেন একজন নাম করা চিত্রনাট্য লেখক।

ক্যারল লম্বার্ড

বব রিসকিনকে মেয়েরা ভালবাসে। কত দিন কত মেয়েকেই না তার সঙ্গে দেখা যায়। এইতো সেদিন রাতে কলোনি ক্লাবে হ্যারি রাসকিনের সঙ্গে ওর বেশ হাতাহাতি হয়ে গেল। সে দিন বব-এর সঙ্গে ছিল বারবারা ষ্ট্যানউইক। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি—হ্যারি রাসকিনও হচ্ছে আর একজন সিনারিও লেখক।

আর বেশী দেরীও নেই, আপনারা এইবার শুনতে পাবেন বব-এর নাম গ্রেণ্ডা ফ্যারেল-এর সঙ্গে।

ক্লার্ক গেবল এর বিবাহ বিচ্ছেদের মতলব সব ঠিক হয়ে গেছে আর হয়ত ছ' সাত মাস পরে আমরাও মামলার রায় শুনতে পাব, আরও যা শুনতে পাব তা আগেই বলেছি।

সত্যিকার ছবি

আমাদের দেশে যখন ছবি দেখতে যাই,

ক্লার্ক গেবল

তখন অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে জানলার পাশে গাছ। আরো দেখি সেটের ভেতর গাছ-পালা, যেমন মন্দিরের প্রাঙ্গনে কিম্বা বাড়ীর উঠোনে কি এই রকম কোন যায়গায় গাছ-পালা। আমরা দেখতে পাই গাছে প্রাণ নেই, নির্জ্জীব শুষ্ক। হয়ত বা মাঝে একবার কিছু সতেজতা টের পেলাম, আবার যে কে সেই। তার কারণ আর কিছুই নয়! গাছ কেটে নিয়ে এসে পোঁতা হোল আজ, কাজ চলল পরশু তরশু, এমন কি সাত দিন দশ দিন পর্য্যন্ত। গাছ তো শুকিয়ে যাবেই। ওরই মধ্যে কোন এক সময়ে যে গাছের জীবনের লক্ষণ পেলাম তা গাছটা পোঁতার পরই ছবিটা তোলা হয়েছে বলে। আর ওদের দেশে। নরমা শিয়ারার-এর ছবি উঠচে। স্বামী তার

মার্লিন ডিয়েট্রিশ

আরভিং থ্যালবার্গ। মেট্রোর প্রোডাকশান চিফ। ষ্টুডিওতে নরমার খাতির, নরমার প্রতিপত্তি অনেকের চেয়ে একটু বেশী বৈকি! দেখোনা নরমার নামের পাবলিসিটি।

নরমা শিয়ারের ছবি রোমিও জুলিয়েট, ওতে আছে বাড়ীর ব্যালকনির আর সার সংলগ্ন গাছ পালার দৃশ্য। রোমিও দাঁড়াবে নীচে বাগানে আর জুলিয়েট থাকবে ওপরে ওই ব্যালকনিতে।

বাগান! কিন্তু সে বাগানের কায তো একদিনে শেষ হয়ে যাবে না, তাই তার ব্যবস্থা অতুল এবং প্রচুর। ওই গাছ, ওই পাতা, ওই ফুল, ওই যে সবুজ তৃণ ওদের প্রত্যেককে বাঁচিয়ে রাখবার যতদূর সম্ভব কষ্ট করবার এবং যত্ন নেবার, ওঁরা তা নিয়েছেন। সমস্ত ষ্টেজের টেম্পারেচারকে বেঁধে ফেলেচেন। ছবি তোলার জন্যে গাছ বাঁচা এবং না বাঁচা সমস্ত যে হাতের মুঠোয়। আর নরমা সবাইকে আইসক্রিম খাওয়াচ্ছেন।

খুচরো খবর

ক্যারল লম্বার্ড পুরোণ, ছোট, সাদা ফোর্ড গাড়ী উপহার দিয়েছেন ক্লার্ক গেবলকে।

* * *

উইলসি রাগলস্ আর আয়রিন ডান্ একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে কিনা ভাবতে পারেনি। তাই আলাদা ভাবে বাহিরে বেড়িয়ে পড়েছে, নির্জ্জনে ব্যাপারটা সঠিক মিমাংসা করবার জন্যে।

* * *

জীন হারলো চুলে কলপ দিয়েছে।

* * *

মার্লিণ ডিয়েট্রিকের বাড়ীর দেয়ালে আছে শুধু সাদা আর কাল রঙ।

ফ্রেড ম্যাক্‌মারে আজ দুবছর ধরে হলিউডের ছবিতে নামচে, একদিনও ছুটী নেয়নি।
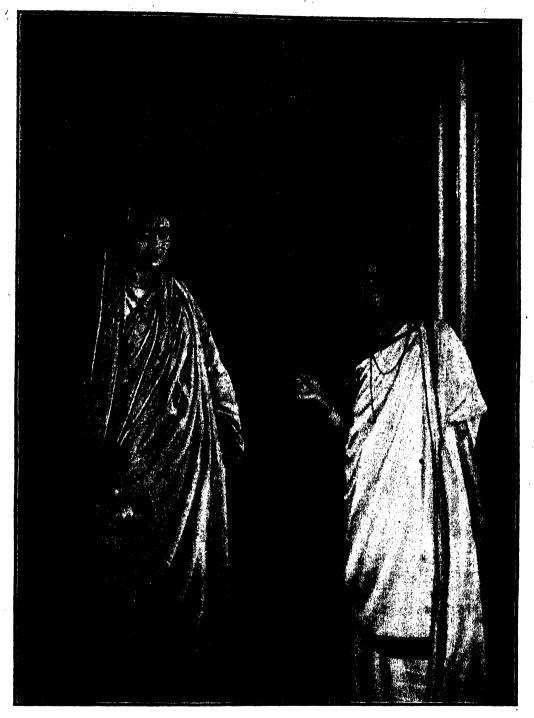
রবির খেয়ালী অর্ঘ্য
= বিষবৃক্ষ =.

সূর্য্যমুখী: এ বৈষ্ণবী কে—
তোকে জানতে হবে—
হীরা: আমি জানতে পারব ?

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] • [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
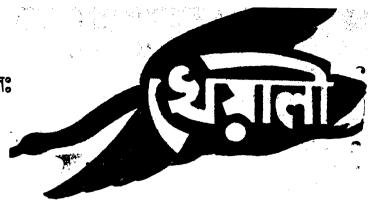
ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৪ই শ্রাবণ ১৩৪৩—30th. July, 1936. } ৩১শ সংখ্যা

মিলনের অভিনয়

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া উডবার্ণ পার্কে যে মিলন-বৈঠকের সূচনা ও আলোচনা হইতেছিল সে সম্বন্ধে বহু নূতন ও বিশিষ্ট সংবাদ আমরা দিয়াছি। গত সপ্তাহে শরৎচন্দ্রের আমন্ত্রণে অ-কংগ্রেসীদলের যে সভা হইয়াছিল সে সংবাদও আমরা দিয়াছি। প্রকাশ নব-নির্ব্বাচিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে সুভাষচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট উভয়দলের শতকরা ৫০ জনের 'ফরমূলা' লইয়া মিলিত দল গঠনের প্রস্তাব মজুমদারী দল করিয়াছেন এবং ইতিপূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল অপর পক্ষ নাকি ইহাতে রাজীও হইয়াছেন। কিন্তু গত শনিবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বৈধানিক দলের যে সভা হইয়াছিল সেই সভায় নাকি উভয়দলের সংখ্যানুপাতে নবগঠিত কার্য্যনির্ব্বাহকদল গঠন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এইরূপ বিপরীত বিধানে যদি মিলন-প্রচেষ্টা চলিতে থাকে তাহা হইলে মিলনের আশায় ব্যর্থ কালক্ষেপই হইবে; প্রকৃত মিলন চিরদিনই থাকিবে সুদূরপরাহত।

বাঙ্গলার কংগ্রেসী কলহের চিরন্তন অবসান ঘটিয়া যদি দেশে একটি সত্যকার সম্মিলিত দল গড়িয়া উঠে তাহা হইলে আমরা সবিশেষ আনন্দিত হইব। কিন্তু কোনরূপে জোড়াতালি-দেওয়া সাময়িক মিলনে আমরা বিশ্বাস করি না। রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিমান ও কর্ম্মক্ষমদল অপেক্ষাকৃত শক্তিহীনদলকে গ্রাস করিয়া অথবা পরাভূত করিয়া চলে—ইহাই নিয়ম। কোনরূপ 'কনশেসানের' লোভ দেখাইয়া কোন দলকে হাত করিলে সেই মিলন কখনই কার্য্য আমাদের মনে হয় শরৎবাবু যদি স্বীয় শক্তিবলে দলকে পরিচালনা করিয়া সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারেন তাহা হইলেই ভাল। নতুবা বৃথা মিলনের মোহে কৌশলীর হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা হইলে গত করপোরেশান নির্ব্বাচনে তিনি যে ভুল করিয়াছিলেন, এবারেও সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা।

শরৎবাবু যে ভাবে অ-কংগ্রেসী দলকে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সকল দল চিরদিনই শক্তিমান দলের মুখ চাহিয়া থাকে—তাহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। যখন যে দিকে সুবিধা পান তখন সেই দিকেই তাহারা ঢলিয়া পড়েন। এই সকল সুবিধাবাদী ব্যক্তিত্বহীন দলের উপর যত কম নির্ভর করা যায় ততই ভাল।

স্মৃতির অবমাননা ?

'**Common** sense' কথাটা এবং তাহার বাঙ্গলা তরজমা 'সাধারণ জ্ঞান' কথাটা খুবই প্রচলিত কিন্তু এই common sense কত uncommon এবং এই সাধারণ জ্ঞান কিরূপ অসাধারণ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু তাহা মাঝে মাঝে মনে হইলেও গত সপ্তাহে যতীন্দ্রমোহন স্মৃতিবাসরে ইহা অত্যন্ত রূঢ় বেদনার সহিত স্মরণ করিতে হইয়াছে।

সেদিন সকালে কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে যতীন্দ্রমোহন স্মৃতিমন্দিরের নিকট তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদনার্থ বহু লোকই সমবেত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দু'চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন এবং এই শ্রাদ্ধবাসরে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন মাড়াজোলের

বলিয়া পরিচিত ও হিন্দুসভার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বিজ্ঞাপিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চৌধুরী ইঁহাদের অন্যতম। শোনা যায় তিনি ডাঃ মুঞ্জেকে সঙ্গে লইয়া ইতিমধ্যে কাজ গুছাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

উক্ত সভায় শুধুই যে মাত্রাজ্ঞানহীনতার পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছিল তাহা নয়। সেদিন যে অভব্যতার নিদর্শনও সেই সভায় দেখিয়াছি তাহা এতদপেক্ষাও অপ্রত্যাশিত ও আপত্তিজনক। স্বয়ং সভাপতি হাভানা চুরুট খাইতে খাইতে স্মৃতিসভায় পৌরহিত্য করিলেন। অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাও বাদ যান নাই। জনৈক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে তবে অনেকের চেতনা হইল।

স্মৃতিসভা অর্থে স্মৃতিপূজা। অতএব পূজারীর শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্ত লইয়া স্মৃতিতীর্থে অর্ঘ্যদানই সমীচীন। সেই স্মৃতিসভায় যথেচ্ছ ধূমপান সত্যই পীড়াদায়ক। অন্য লোকের কথা যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র লাল খাঁর মত যোগ্য পিতার পুত্র ও দেশসেবকের নিকট হইতে এরূপ অভব্য মাত্রাজ্ঞান-হীনতা আমরা আশা করি নাই।

কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইলাম যে প্রায় সকল বক্তাই এই স্মৃতিসভাকে আসন্ন সংস্কৃতশাসনতন্ত্রের নির্ব্বাচন সভায় পরিণত করিয়াছিলেন। অধিকাংশ বক্তা ভুলিয়াও যতীন্দ্রমোহনের সম্বন্ধে একটি কথাও উল্লেখ করেন নাই; তাঁহাদের সমস্ত বক্তব্যই ছিল "কংগ্রেস এক হও, সঙ্ঘবদ্ধ হও" ইত্যাদি নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া।

কংগ্রেসের পক্ষে আসন্ন নির্ব্বাচন একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার স্বীকার করি, এ জন্য সভাসমিতির অনুষ্ঠানও বাঞ্ছনীয় কিন্তু তাহার স্থান ও কাল ভিন্ন। যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতিসভায় গিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে শুধুই যে মাত্রাজ্ঞানহীনতার পরিচয় দান করা হয় তাহাই নহে, ইহাতে যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতির অবমাননা করা হয় বলিয়া আমরা মনে করি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই নির্ব্বাচনের ধূয়া লইয়া এই অবসরে বহু অকংগ্রেসী রাজনৈতিক-নামগোত্রহীনব্যক্তি নিজের ঢাক পিটাইয়া লইতেছেন। কাত্যায়নী ষ্টোরসের সত্বাধিকারী

জগদ্ধাত্রীকুমার—জ্যোৎস্না

গত রবিবার ১০ই শ্রাবণ ২৬নং ল্যান্সডাউন রোড ভবনে মেসার্স অর ডিগ্ল্যাম্ কোম্পানীর অংশীদার স্বর্গত সলিসিটার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও উত্তরপাড়ার পরলোকগত রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রীমান্ জগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভবানীপুর ২৪নং পদ্মপুকুর রোডের পরলোকগত উকীল সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবীর শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। শ্রীমান অর ডিগল্যাম্-এর মিঃ ওয়াটারের আর্টিকেল্ড্ ক্লার্ক। তিনি ছাত্র-সমাজে বিশেষ পরিচিত ও সহরের বহু সমিতি, ক্লাব-এর সহিত সংশ্লিষ্ট, সাহিত্যেও তাঁহার বেশ হাত আছে। শ্রীমতীও সাহিত্যানুরাগিণী এবং সঙ্গীত-নিপুণা। এই উৎসবে সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে—

মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি মিঃ ডি, এন, মিত্র, বিচারপতি মিঃ এস্, এন গুহ, বিচারপতি মিঃ নাসিম আলি, স্যার ইউ, এন, ব্রহ্মচারী, স্যার হরিশঙ্কর পাল, নাটোরের মহারাজা, কাশিম বাজারের মহারাজা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, নরেন্দ্র কুমার বসু, মিঃ এস, এম, বসু, ডাঃ নলিনী সেনগুপ্ত, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, ম'থুরাম তুলারাম, অনারেবল সত্যেন্দ্র ঘোষ মৌলিক, কুমার সনৎ কুমার মুখার্জ্জি, মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, মিঃ নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি, মিঃ ডি, সি, ঘোষ, কমিশনার ডি, সি, ঘোষ, মিঃ এস, সি, মিত্র, বি, এন, সরকার, কমিশনার সুধাংশু মিত্র, শৈলপতি চ্যাটার্জ্জি, রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, কে, এন, মজুমদার, প্রোঃ মন্মথ বসু, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র মজুমদার, এস, কে, সেন, মিঃ এস, ব্যানার্জ্জি, ডাঃ বি, এন ব্যানার্জ্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

যাদুকর পি, সি, সরকার

তরুণ বাঙ্গালী যাদুকর (Magician) পি, সি, সরকার আজকাল বহু স্থানেই তাঁহার যাদুবিদ্যার পরিচয় দিয়া সুনাম অর্জ্জন

খেলার মাঠে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

অমরনাথ

বিখ্যাত খেলোয়াড় অমরনাথ যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তা দেখে আমরা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হয়েছি। ক্যাপ্টেন ও ম্যানেজার কি ভাবে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা আমরা এতদিন ঠিকভাবে বুঝতে পারিনি। ষড়যন্ত্রটা যে বিলাত যাবার আগে থেকেই হয়েছিল তা আমরা বিবৃতি থেকেই বুঝতে পাচ্ছি। কেন না, এডেন সহরেই কপূরতলার মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী তাঁহাকে জানান যে, ক্যাপ্টেন তাঁহাকে বিশেষ সুনজরে দেখেন

এ থেকে আমরা বেশ বুঝতেই পারি যে এখান থেকেই তাঁকে কি ভাবে জব্দ করা যায় তার পরামর্শ হয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেট্ কন্ট্রোল্ বোর্ড যে এ কথা জানতেন না এ বিশ্বাস আমরা করি না। জেনে শুনেই কেন যে তাঁরা এর একটা সুবন্দোবস্ত করে দেন নি তা আমরা ভেবে পাই না। তাছাড়া ব্যক্তিগত রাগ যখন ছিল তখন তাঁকেই বা ক্যাপ্টেন করা হ'ল কেন?

অমরনাথ

নাইডুর অমর সিংহের সঙ্গে ব্যক্তিগত মন-মালিন্য ছিল বলেই ত তাঁকে ক্যাপ্টেন করা হয় নি! উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যদি এই কারণের জন্য বাদ দিতে পারা যায় তবে মহারাজকুমারকেই বা কেন হ'ল না?

এ ছাড়া বিলাতে ক্যাপ্টেন সাহেব অমর-নাথকে নাইডুর সঙ্গে মিশতে বারণ করে-ছিলেন। অমরনাথ এর প্রকৃত কারণ না জেনে বন্ধুত্ব নষ্ট করতে রাজি হ'ন নি; এবার তাই জন্যে বোধ হয় অমরনাথকে জেল-খানার কয়েদির মত অসুখ শরীরেও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। Sportsman যে এত mean হ'তে পারে তা আমরা এর আগে জানতাম না। নাইডুর উপর তাঁর ঈর্ষা থাকতে পারে তা বলে একজন অসুস্থ লোকের উপর অত্যাচার করে নিজের রাগ মেটান নেহাৎ মূর্খতার পরিচয়। অযোগ্যের হাতে ক্ষমতা দিলেই যে তাহার অপব্যবহার হয় এ জেনেই যখন ক্রীকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভ্যরা ক্যাপ্টেন ও ম্যানেজার নির্ব্বাচন করেছেন তখন অমরনাথের এ লাঞ্ছনা ও অপমানের জন্য তাঁরাই সবচেয়ে বেশী দায়ী।

ইংলণ্ডে ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলা

ল্যাঙ্কাশায়ারএর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে ভারতীয় ক্রীকেট্ দল নাইডুর নেতৃত্বে পুনরায় ডার্ব্বিশায়ারএর সঙ্গে ড্র করে। নেতৃত্বের জন্য খেলার ফল কিরূপে দাঁড়ায় তা আমরা এ থেকে বুঝতে পারি। ভারতীয় দল এ পর্য্যন্ত যত খেলায় হেরেছে তার অনেকাংশে যে ক্যাপ্টেনই দায়ী তা আমরা জোর করে বলতে পারি। সেদিন ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে মার্চেন্ট নাইডুকেই ক্যাপ্টেন করবার জন্য মহারাজকুমারকে অনুরোধ করেছিলেন, যদিও সে অনুরোধ রক্ষা হয় নি। তাঁহারা নাকি শীঘ্রই ক্রিকেট্ কন্ট্রোল বোর্ডের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করিবেন।

গত শনিবার হ'তে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ

করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ব্রহ্মদেশ এবং উহার নিকটবর্ত্তী নানরাজ্য প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছেন এবং আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে খুব শীঘ্রই তিনি দড়ীর এবং জিম্বার নানারূপ খেলা দেখাইতে ইউরোপ পরিভ্রমণে বাহির হইবেন। তাঁহার এই নব প্রচেষ্টায় আমরা তাঁহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

আবার কিরণ!

গত সোমবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এক পত্রাঘাত করিয়া জানান যে, বর্ত্তমানে পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত হইলে কিরণশঙ্কর প্রভৃতি উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। তদনুযায়ী অদ্য বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছে। অদ্য ইহার শেষ মীমাংসা হইবে।

আরম্ভ হয়েছে। বাঙ্গলার একমাত্র খেলোয়াড় ব্যানার্জ্জি কেন যে এই খেলায় স্থান পেলেন না তা আমরা বুঝতে পারলাম না। বোধ-

নাইডু

হয় তিনিও অমরনাথের মত ক্যাপ্টেনের কোপদৃষ্টিতে পড়েছেন! ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ২০৩ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯০ (৫ উইকেট) এবং ইংলণ্ড দল ৫৭১ রান করেন। সময় না থাকাতে খেলাটী অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ভারতীয় দলের

মার্চ্চেণ্ট

মধ্যে মার্চ্চেণ্ট ও মুস্তাক আলি যথাক্রমে ১১৪ ও ১১২ করেন। ইংলণ্ড দলে একমাত্র হ্যামণ্ড শতাধিক রান করিতে সক্ষম হ'ন— তিনি ১৬৭ রান করেন। টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দল এই প্রথম এত রান করিতে সক্ষম হ'ন।

বার্লিন ভারতীয় হকি দল

এবার যখন বার্লিনগামী অলিম্পিক হকি দল নির্ব্বাচিত হয় তখন সেই নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আমরা মত প্রকাশ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, দলে এমন সব খেলোয়াড়রা স্থান পেয়েছে যাদের দলে স্থান পাবার মত কোন যোগ্যতাই নেই। এ-সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা এবং কটাক্ষ করে নিখিল ভারতীয় হকি ফেডারেশনের একজন কর্ত্তা ব্যক্তি খবরের কাগজে টিম নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

মুস্তাক

গেল হপ্তায় বার্লিনে ভারতীয় হকি দলের সঙ্গে একটি খেলায় জার্ম্মানীর একটি অতি সাধারণ দল ৪-১ গোলে সহজেই বিজয়ী হওয়ায় ওখানকার কর্ত্তাদের মাথায় টনক নড়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতির কাছে দারা বা পেনিগাংকে অবিলম্বেই জার্ম্মানীতে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ জানান। খবর পাওয়া গেছে যে দারাকে দু-একদিনের মধ্যেই বিমান যোগে জার্ম্মানী পাঠানো হবে।

বিলেতে ভারতীয় ক্রিকেট দলে যে কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হয়েছে এখানে অবিভি ধ্যানচাঁদ ক্যাপ্টেন থাকায় সেরকম কোন অবস্থার সৃষ্টি নাও হতে পারে কিন্তু চক্রীর চক্রান্তে নির্ব্বাচিত হয়ে যে-দল জার্ম্মানীতে অলিম্পিকে যোগ দিতে গেছে সেদল হয়তো হকি খেলায় ভারতের সম্মান হারাতে পারে।

সন্তরণে নূতন রেকর্ড

বিখ্যাত সন্তরণবীর প্রফুল্ল ঘোষ গেলো শুক্রবার (২৪শে জুলাই) সকাল ৭টা ১২ মিনিটের সময় হস্তবদ্ধ অবস্থায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে সন্তরণে প্রবৃত্ত হন। তিনি সোমবার (২৭শে জুলাই) সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে জলত্যাগ করেন। তিনি ৭১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট কাল হস্তবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ করে এলাবাহাদের বিখ্যাত সাঁতারু রবীন চাটার্জ্জির রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব

উক্ত ক্লাবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত খরোরা চ্যালেঞ্জ ও কেশব লাল মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ প্রতিযোগিতায় এবৎসর মোট ৩২টী টীম যোগদান করেছে। এই প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ কর্ত্তৃক অনুমোদিত। বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা এস, সি, আঢ্যি এণ্ড কোংর সত্বাধিকারী স্বর্গীয় কেশব লাল আঢ্যের স্মৃতির স্মরণার্থে উক্ত কেশব লাল মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ প্রতিবৎসর বিজিত ক্লাবকে দেওয়া হয়। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

আই-এফ-এ শিল্ড

আই-এফ-এ শিল্ডের খেলা সেমি-ফাইনাল ছাড়া সবই শেষ হয়েছে। যে কটা টিম সেমি-ফাইনালে উঠেছে তারা সব কয়টাই স্থানীয় টিম। এর মধ্যে একটি ইউরোপীয়, বাকী তিনটি ভারতীয়। ভারতীয় তিনটি দলের ভেতর মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং দুটী টিমই এর আগে সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠেছিল কিন্তু হাওড়ার পক্ষে এই প্রথম। তা ছাড়া গত বছরের শিল্ড-বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্কস্ টীমকে দ্বিতীয় ডিভিসনে হাওড়া যে এভাবে

গান

ভাটিয়ালী

শ্রীবংশী আশ

ভিন্ গেরামের বঁধুয়া যে মোর
এল আমার দেশ।
আঁখির তীরে খেয়া বেঁধে
আমার হয় যে বেলা শেষ।
তুফান উঠে মনের গাঙে,
উছলে পড়ে আঁখির কোণে ;
ভাসিয়ে দিয়ে পলক তরী
তোমায় খুঁজি দেশ বিদেশ।

হারাতে পারবে তা কেউ ভাবতেই পারেনি। তারা যে ফাইনালে যাবে না এ কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না। তিনটি ভারতীয় দলের মধ্যে একটাও কি এবার শীল্ড বিজয়ী হতে পারবে না ? যদি না পারে তবে ভবিষ্যতে এর চেয়ে সুন্দর সুযোগ মিলবে কি না সন্দেহ ? তবে খেলার ধরণ দেখে মনে হয়, হয়ত বা ক্যালকাটা টেণ্টেই শীল্ডটা থেকে যাবে।

গেল হপ্তায় আই, এফ, এ শিল্ড খেলাগুলির ফলাফল :—

তৃতীয় রাউণ্ড

ফিল্ড বিগেড	বনাম	ব্ল্যাকওয়াচ	৩—১
ক্যালকাটা	„	পি, ডব্লু উ ভলেণ্টিয়ার্স	১—০
ইষ্ট কেণ্ট	„	হ্যাম্পসায়ার	২—০
মোহনবাগান	„	কাষ্টমস	১—০
মহামেডান	„	লাইট্ ইনফেন্ট্রি	৩—২
ডারহামস	„	টাউন ক্লাব (খুলনা)	৭—০
হাওড়া	„	ডি, সি, এল, আই	১—০
ইষ্ট ইয়র্ক	„	ইষ্ট বেঙ্গল	১—০

চতুর্থ রাউণ্ড

ক্যালকাটা	বনাম	ফিল্ড ব্রিগেড	২—০
মোহনবাগান	„	ইষ্ট কেণ্ট	১—০
মহামেডান	„	ডারহাম্	২—১
হাওড়া	„	ইষ্ট ইয়র্ক	৩—১

বিলাসী

নিউ থিয়েটাস

প্রতিভার অন্তরালে

"বিজয়া"-র বিজয়-বার্ত্তা আজ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রতিধ্বনি আমরা কোর্‌ছি যে, "বিজয়া" হ'বে, খুব ভাল ছবি—আর তার চেয়ে নতুন খবর—এতে একটা নতুনত্ব দেখা যাবে। এর প্রথম দৃশ্যে তিনজনকে দেখা যাবে, শরৎ চাটুয্যে, যতীন মিত্তির আর দীনেশ দাশকে। শরৎ চাটুয্যে বল্‌ছেন—"আমি তোমাদের ম্যানুস্‌ক্রিপট দেখ্‌লুম—আমার "বিজয়া"-কে কি কোর্‌লে ?" যতীন মিত্তির উত্তর দিলেন—"আমাদের তো সবই প্রস্তুত আছে—এখন শুধু আপনার আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা কোর্‌ছি।" তারপর শরচ্চন্দ্র "বিজয়া" কে পরিচালনা কোর্‌ছেন জিজ্ঞাসা করায় মিত্তির মশাই উত্তর দেন দীনেশ দাশ। তা'তে শরৎবাবু বেশ উৎফুল্ল হ'য়ে বলেন—হ্যাঁ দীনেশকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। দীনেশের ওপর আমার "বিজয়া" কে দিয়ে বিশ্বাস কোর্‌তে পারি। তারপর নিউ থিয়েটার্স তাঁর সমস্ত ছবিই ভালভাবে রূপ দিয়েছেন প্রভৃতি আলাপ আলোচনার পর এই দৃশ্যটির যবনিকাপাত হবে এবং আসল ছবি সুরু হবে।

"চোরকাঁটা"র তাসের আড্ডায় ক্ষণেকের তরে যে নবীন উকীলটি চিত্রপটে উদ্ভাসিত হ'য়ে ক্ষণস্ফূর্ত্ত আত্মতৃপ্তিলাভ কোরেছিলেন আজ কয়েক বছরের মধ্যে তিনি কোলকাতার এক বিশিষ্ট চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। "চোরকাঁটা"-র যে প্রতিভা অবসর বিনোদনের রূপ পরিগ্রহ কোরেছিল আজ সেই প্রতিভা বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ-শিল্পীর মানস-কন্যাকে মুখর কোরে শরচ্চন্দ্রের স্নেহলাভ কোরেছে। ভবিষ্যতে মিত্র-প্রতিভা আরও পরিস্ফুট হ'লে আমরা খুসী হব।

* * *

নীতীন বসু সেরে উঠেছেন। তাঁর ছবির কাজ আবার আরম্ভ হ'য়েছে।

* * *

হেমচন্দ্রের "অনাথ আশ্রমের" আনুষঙ্গিক কাজ মিঃ সরকারের অসুস্থতার জন্যে আপাততঃ স্থগিত রয়েছে। মিঃ সরকার সুস্থ হলেই এই ছবির যথারীতি কাজ আরম্ভ হবে।

বি-ইউনিটের পঞ্চ-পাণ্ডব

আনোয়ারসা রোড ষ্টুডিওর বনবিটপীতলে মিত্তির মশাই পশুপতি-সুধা-মায়া-বংশী-কাত্তিককে নিয়ে তিনি যে পঞ্চপাণ্ডব তৈরী করেছেন তাঁরা মিত্তির মশাইয়ের উপযুক্ত শিষ্যরূপে বি-ইউনিটের কার্য্যাবলী সুপরিচালনার সহায়তা করেন।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

দেবকী বসু এখন ভেতরকার ট্রেণের দৃশ্য তুল্‌ছেন—এতে কথা আর শব্দ দুই-ই থাক্‌বে। এই রকম ছবি তুল্‌তে ক্যামেরাম্যানকে দস্তুরমত মাথায় কসরৎ কোর্‌তে হয়—কিন্তু শৈলেন বসু ধুরন্ধর চিত্রশিল্পী, তাই তাঁর এ রকম দৃশ্য তুল্‌তে বেগ পেতে হয় নি।

* * *

"বাঙ্গে সিপাহী" প্রায় শেষ হ'য়ে এল। আর "লয়লা মজনু" ইরাণে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

কালী ফিল্মস

"অন্নপূর্ণার মন্দিরে"র অনতিবিলম্বে "টকি অফ টকীজে"র মুক্তির জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ ব্যস্ত রয়েছেন। নব নাট্য-মন্দিরে অভিনীত "রীতিমত নাটক"ই যে "টকী অফ টকীজ" এ খবর সবাইকে আগেই আমরা জানিয়েছি। শিশিরকুমার স্বয়ং এই ছবি পরিচালনা কোরবেন আর এতে নাম্‌ছেন তিনি নিজে, অহীন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, জয়নারায়ণ মুখুয্যে, কঙ্কাবতী, রাণীবালা, সাবিত্রী প্রভৃতি। ছবিখানা মঞ্চের ন্যায় পর্দ্দায়ও যদি জনপ্রিয়তা লাভ করে তা' হলেই সকলে খুসী হবে।

* * *

কালী ফিল্মসের "মুক্তি স্নানে"র আনুষঙ্গিক কাজও ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। তবে "টকি অফ টকীজ", "পরভৃতিকা" ও "আশিয়ানা" শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এ ছবিখানার শুটিং সুরু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর কর্ম্মীবৃন্দ :— পরিচালক—সুশীল মজুমদার, চিত্রশিল্পী—সুরেশ দাস, শব্দযন্ত্রী—জগদীশ বসু, সঙ্গীত পরিচালক—নীরেন লাহিড়ী। বিভিন্ন ভূমিকায় নামবেন—ললিত মিত্র, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, কৃষ্ণধন মুখুয্যে, ধীরেন ঘোষ, শীলা হালদার, সাবিত্রী, প্রকাশমণি প্রভৃতি। নায়কের অংশে নির্ব্বাক "চোর কাঁটা"র নায়ক রাজীব রায়ের নামার সম্ভাবনা আছে।

রাধা ফিল্মস

"বিষ বৃক্ষে"র কাজ জোরে এগুচ্ছে। সম্প্রতি নগেন দত্তের বৈঠকখানার দৃশ্য তোলা হয়েছে। কাননবালা, জহর গাঙ্গুলী, শান্তি গুপ্তা, মীরা দত্ত প্রভৃতি এই ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অত্যুজ্জ্বল অভিনয় কোরছেন। আর হীরা মালিনীর ভূমিকায় নাম্‌ছেন প্রমীলা।

* * *

তড়িৎ বসুর সব চেয়ে ছোট বোনের মৃত্যুর জন্যে "অভয়ের বিয়ে"র চিত্রনাট্য তৈরীর কাজ কয়েকদিনের জন্যে বন্ধ রয়েছে।

"খুনী কোন্" বা হিন্দী "কর্ত্তার" প্রায় শেষ হয়ে এল। এই ছবিখানাতে হিন্দী-ওয়ালাদের খুসী করার অনেক মাল-মশলা আছে—সেজন্যে ছবিখানার সাফল্য অভাবিত নয়।

* * *

হিন্দীতে "মানময়ী গার্লস স্কুল" তোলা হবে। হরিভঞ্জ ছবিখানি কোরছেন। রাধার

প্রফুল্ল পিক্‌চার্স

এদের প্রথম হিন্দুস্থানী ছবি "মা" শেষ হয়েছে। ছবিখানার এখন সম্পাদনা চলছে। প্যারামাউন্ট ফিল্মসের হয়ে এর বাঙলা সংস্করণ তুলে প্রফুল্ল ঘোষ নাম পেয়েছিলেন। হিন্দী সংস্করণে জাল, জুবেদা, কানন প্রভৃতি শক্তিমতী অভিনেত্রী সম্মেলনে ছবিখানা যে সবাইয়ের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে—এ আশা হয়।

মিলনের

গত কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতার রাজনৈতিক মহলে বাঙ্গলার বিবদমান দুইটী কংগ্রেসী উপদলের মধ্যে মিলন সাধনের নিমিত্ত যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতে মজুমদারী উপদল কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি উপস্থাপিত হইয়াছিল :—(১) প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতিতে উভয় দল হইতেই সমান সংখ্যক সদস্য গ্রহণ এবং সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি করা, (২) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বর্জ্জন, এবং (৩) মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করা। তবে শেষ সর্ত্ত সম্বন্ধে স্থিরীকৃত হয় যে প্রথম দুই সর্ত্তে অপর পক্ষ রাজী হইলে এ সম্বন্ধে এখনই চরম সিদ্ধান্ত না করিয়া আগামী কংগ্রেস পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন মুলতুবী রাখা হইবে। ডাঃ রায়ের উপদল দ্বিতীয় সর্ত্তে এবং তৃতীয় প্রশ্নের মুলতুবী রাখার বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু মজুমদারীদল কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রথম সর্ত্তে তাঁহারা রাজী হ'ন নাই—অপরন্তু ডাঃ রায়ের উপদল চাহেন প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের দলগত সংখ্যার অনুপাতে কার্য্যকরী সমিতিতে সদস্য গৃহীত হইবে।

জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যের তোলা ছবিগুলোর সাফল্যের দাবী যিনি বহুলাংশে কোরতে পারেন তাঁরই হাতে "মানময়ী গার্লস স্কুল" বেশ জমে উঠবে—ভরসা করা যায়।

দেবদত্ত ফিল্মস

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বজন-আদৃত "রজনী" আসচে ৮ই আগষ্ট 'রূপবাণী'র রূপোলী পর্দ্দায় মুক্তি পাবে। "রজনীর" করুণ কাহিনী বাঙলার ছেলে মেয়ের প্রাণের কথা, তার ওপর ছবিখানাকে জয়যুক্ত করবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ খেটেছেন খুব—তাই মনে হয় ছবিখানাকে সাধারণে গ্রহণ কোরবে ভালভাবেই।

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টস

কোলকাতার কাছাকাছি এদের প্রথম ছবি "রামকান্তে"র বহিদৃশ্য তোলা শেষ হয়েছে। এই দৃশ্য তোলার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ নানা রকমের জন্তু জানোয়ার জমায়েৎ কোরেছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন যে, এই ছবিতে কোলকাতায় আগমন দৃশ্যে সুষমা ও তুলসী বাড়ুয্যের অভিনয় হয়েছে নাকি চমৎকার। এ ছবিতে একটা গীতি-মুখর ভূমিকায় বেতারের প্রভার চিত্রাবতরণ সত্যই আনন্দের সংবাদ।

বিয়ে

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী

ওঠো, ওঠো—

ব্যাপার কি ?

কাল বিলম্ব না করিয়া বন্ধু হাসিয়া কহিল, আমার যে বিয়ে···নিদ্রালস পরিত্যাগ করিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কহিলাম, আমার কি ? বন্ধু হো হো করিয়া হাসিয়া পিষ্ঠদেশে দু'চারটী মৃদু কষাঘাত করিয়া কহিল, সব কিছু কি আমার ? আমি তো উপলক্ষ মাত্র······।

চিরানুগত শরৎ দু' পেয়ালা চা হাজির করিল। গল্প পুরোমাত্রায় চলিল। সমাজ-ছাড়া সৃষ্টিছাড়া আরব্য উপন্যাসের মতো কতগুলো অদ্ভুত গল্প চলিতে লাগিল। কত অপরিচিতার দুর্ভেদ্যরহস্যপূর্ণ ঘনকৃষ্ণ অনিমেষ দৃষ্টি স্মৃতিপটে উঁকি মারিয়া নিমেষ মধ্যে বিদায় নিল। অচেনা দু' একজনার অনির্বচনীয় রাশীকৃত কথা স্মৃতি-বীণায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া হাসিতে হাসিতে বন্ধু কহিল, সে অপরিচিতার কুসুম কোমল হাতের এক পেয়ালা চা এমনিভাবে এসে হাজির হবে—আর দিব্যি থাকবে সবটুকু খেয়ে নেবার—সেদিন কি আমার হবে ?

সেদিনকার মতো অলস বৈঠক সাঙ্গ করিয়া বিদায়কালে বন্ধু কহিল, তোমার কিন্তু যেতে হবে।

* * *

আমরা জন সাত বরযাত্রী পুরুলিয়ার রেলযাত্রী। পথিমধ্যে সঙ্গীরা আমার কবিতা ও সাহিত্যের সমালোচনায় অলস রাত্রির অবসাদজড়িত শরীরমনের খোরাক জোগাড়ে ব্যস্ত। সমালোচকরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত—অধ্যাপক ও আইনজীবি। মাঝে মাঝে আমায় স্বীয় কবিতা আবৃত্তির অনুরোধ জানাইতেও ত্রুটি করিলেন না।

অক্ষমতা জানাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলাম, লজ্জার ভার বয়ে চলা সৌখিনতা নয়, তাতে অপর পক্ষের আনন্দ আছে—গৌরব নেই। এ লজ্জালব্ধ আনন্দে আমি ব্যাঘাত ঘটাবার মতো বে-রসিকও আমি নই।

* * *

পুরুলিয়া একটী ছোট্ট সহর। সুদূরবর্ত্তী মেঘ সদৃশ পাহাড়, অগণিত বৃক্ষশ্রেণী, রঙীন পথ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাসাদ ও পর্ণকুটীর—সৌন্দর্য্যের ডালি লইয়া চির-দণ্ডায়মান। কোথাওবা বিস্তৃত প্রান্তরে দু'একটী অশ্বত্থ গাছ প্রণয়বঞ্চিত সুন্দরীর মতো নিঃসঙ্গ দাড়াইয়া প্রেম-বিসর্জ্জনের বাদ্য শুনিতেছে। আবার কোথাও নামহারা বৃদ্ধ তরু দিনান্তে কর্ম্মক্লান্ত সুন্দরীর ন্যায় কাৎ হইয়া নিত্য নতুন পথিককে শীতল ছায়ে স্থান দিতেছে। অসংখ্য বিহঙ্গমকুলের কাকলি, সান্ধ্য সমীরণে বৃক্ষপত্রের অর্থহীন মর্ম্মরধ্বনি আর সাঁওতালীর অর্দ্ধ-নগ্ন সৌন্দর্য্য মনোমুগ্ধকর। সেখানকার "সাহেব বাঁধ" ও "মেম পার্ক" প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। কেবল বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে কত সহস্র লোক অকালে জীবনের শেষ সীমায় দিন গোনে। আমরা আতিথ্য স্বীকার কোরলাম—হাকিম মিঃ ঘোষালের গৃহে। গৃহে—তিনি বড় অমায়িক প্রকৃতির লোক। আদালতে—দারুণ তাঁহার কণ্ঠে কঠিন বিচারের বজ্রধ্বনী প্রচ্ছন্ন, বিচারক হিসাবে তাঁহার সুনাম যথেষ্ট। এক নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে তাঁহার সুগৃহিনীর কর্ম্মতৎপরতায় ও ভগিনী জাহ্নবী দেবীর সহযোগিতায় বন্ধুর বিবাহা-নুষ্ঠান যন্ত্র চালিতের ন্যায় নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কাহাকেও আতিথ্য ধর্ম্মের অবমান আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইতে হইল না।

* * *

বিদায় কালে ঘোষাল কন্যা-ত্রয়ের গান শোনবার অভিলাষ জানাইলাম। আবেদন মঞ্জুর হইলেও হাকিমগৃহে হুকুম কার্য্যকরী হইতে কিছু সময় লাগিল। লজ্জাজড়িত-কণ্ঠের গান তান ছাড়াইয়া প্রাণেই স্থান নিল। হাসি কান্নার ভিতরেই বিদায়ের পালা সাঙ্গ করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে

বাষ্পীয় শকট ধূম-উদগারণ করিতে করিতে পূর্ণ যৌবনা সুন্দরীর ন্যায় গর্ব্বভরে ছুটিতে লাগিল। সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বাতায়ন পাশে বসিয়া কত কি ভাবিলাম। আমার মনে পড়িল—মিঃ ঘোষালের ভাল-বাসার অত্যাচারের কথা, অধ্যাপক গাঙ্গুলীর অদ্ভুত ভালমানুষীর নিত্য নতুন লীলা, সর্ব্বোপরি মিঃ মুখার্জ্জির অযাচিত মেয়ের পরিহাস উক্তি—পরক্ষণেই দেখিলাম—সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় নীল সলিলা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রেম বিনিময়ে ক্লান্ত সুন্দরীর মতো মন্দ গতিতে চলিয়াছে, আর তাহার উপর জ্যোৎস্না কিরণ প্রতিভাত হইয়া এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অগণিত বৃক্ষ বিদ্যুৎবেগে দৃষ্টিপথে হাজির হইয়াই বিদায় নিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষুদ্বয় নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

* * *

পর দিন সকালে বন্ধু নব বিবাহিত পত্নী লইয়া হাওড়া ষ্টেশন হইতে বাড়ী ফিরিলেন। এ যাবত নব পরিণয়ের নিত্য নতুন লীলা কিছু ঘটেচে কিনা আমি জানিনা তবে আমি অনুগ্রহ-নিগ্রহের সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল হইতে মুক্তি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি।

———

শ্রীদুর্ব্বাসা

প্রাথমিক চালঃ—কণ্ট্রাক্ট খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে জয় ও পরাজয়ের ভাগ্য অনেকখানি নির্ভর করে প্রাথমিক চালের উপর, এমন কি সময় সময় ডাক দেওয়া ও প্রকৃত খেলার চেয়ে প্রাথমিক চালের তারতম্যে সমস্ত খেলাটির বিপর্য্যয় ঘটে যায়। হাতে সুবিধাজনক তাস না থাকলে সর্ব্বপ্রথমে কি তাস পেড়ে খেলা সুপ্রশস্ত তাও অনেকখানি নির্ভর করে বরাতের উপর। এমন ঘটে যে আপনার হাতে হয়তো প্রাথমিক-চাল-যোগ্য দুই-তিনখানি তাস আছে কিন্তু আপনি ভেবে পাচ্ছেন্ না কোনটি চাল দেবেন আগে, অথচ একটি বা অন্যটি পেড়ে খেলার উপর হয়তো হাজার পয়েণ্ট নির্ভর করছে। বিশেষতঃ ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতাগুলির খেলা বিশ্লেষণ করলে এ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায় বিপক্ষদলকে কণ্ট্রাক্ট খেলায় পরাজিত করতে হলে অনেক সময় সাধারণ নিয়মবিরুদ্ধ চালে বা অদ্ভুত চালে সুফল ফলে, কেন না এতদ্বারাই অধিকাংশ সময় খেড়ীর সামর্থ্য বা রঙকর্ত্তার দুর্ব্বলতা ধরা যায়। গেম বাঁচাবার জন্য রঙের খেলায় না হয় একক (singleton) বা দুই তাসওয়ালা রঙ থেকে প্রথম চাল দেওয়া চলে কিম্বা প্রথমে এক তাস রঙ খেলাও চলে, কিন্তু ফেরাইএর খেলায় বেলায় বহু-তাস ওয়ালা রঙের পরিবর্ত্তে অল্প তাসওয়ালা রঙে প্রথমে চাল দিলে কিম্বা ডাকের সময় খেঁড়ীর কথিত রঙের পরিবর্ত্তে নিজ রঙের চাল দিলে সময় সময় বিপক্ষদলের গেম নষ্ট হয় বটে, আবার উক্ত অনিয়ন্ত্রিত চালে ক্ষতিও হয় ভীষণ। যে কোন হাতের উপযুক্ত প্রাথমিক চালের কোনরূপ বাঁধা গৎ বা নিয়ম আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই ; তবে কোন রঙে ক্রমানুযায়ী তাসগুলির মধ্যে প্রথমে সর্ব্বোচ্চ তাসখানি খেলা সুযুক্তিসঙ্গত,—এই ধরণের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আমরা বলে যেতে পারি। কণ্ট্রাক্ট খেলায় এমন অনেক বিশেষ অবস্থা এসে পড়ে যে, তখন অন্ধের মত সাধারণ নিয়মে প্রাথমিক চাল দেওয়া সুফলদায়ক হয় না, সে ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করে তবেই নিয়মানুগ চাল দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ বিশেষ কারণ বর্ত্তমানে বিনা কালাপহরণে ক্ষেত্র অনুযায়ী সাধারণ নিয়মবিরুদ্ধ প্রাথমিক চালই বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে স্নামের ফেলায় বহু-তাসওয়ালা কোন রঙে পিট তৈরী করতে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে,—সে ক্ষেত্রে সাহেব, বিবি, গোলাম ধরণের অল্প-তাসওয়ালা রঙেই প্রথম চাল দেওয়া কারণসঙ্গত। যা হোক্, বলুন তো নিম্নলিখিত হাত নিয়ে 'প'র প্রাথমিক চাল কি হওয়া উচিত?

কোন পক্ষের কিছু নাই, 'দ'পক্ষ তাস্না-রেবল। 'দ'র তাস-বণ্টনের পর নিম্নলিখিতরূপ ডাক হয়েছে

ইস্কাবন—সাহেব, দশ, আটা, দুরি।
হরতন—সাহেব, গোলাম, আটা, সাতা।
রুহিতন—টেক্কা, তিরি।
চিড়িতন—নয়, সাতা, তিরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, তিরি।
হরতন—ছক্কা, দুরি।
রুহিতন—গোলাম, দশ, নয়, আ।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, আটা, পাঞ্জা, দুরি।

ইস্কাবন—গোলাম, নয়, ছক্কা, চৌকা।
হরতন—দশ, নয়, চৌকা।
রুহিতন—বিবি, সাতা, ছক্কা, পাঞ্জা।
চিড়িতন—দশ, চৌকা।

ইস্কাবন—বিবি, সাতা, পাঞ্জা।
হরতন—টেক্কা, বিবি, পাঞ্জা, তিরি
রুহিতন—সাহেব, চৌকা, দুরি।
চিড়িতন—টেক্কা, গোলাম, ছক্কা।

'দ'
একটি ফেরাই।
দুইটি ফেরাই।
পাশ।
'প'
দুইটি চিড়িতন।
পাশ।
পাশ।
'উ'
দুইটি ইস্কাবন।
তিনটি ফেরাই।

পূ
পাশ।
পাশ

পূর্ব্বোক্ত হাত নিয়ে কোন ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতায় একটি ঘরে 'প' চিড়িতন রঙে শক্তির পর্য্যায়ে চতুর্থ তাসখানি খেলায় অতি অনায়াসেই 'দ'-পক্ষ গেম করে ফেল্লেন। অথচ, অন্য ঘরে 'প' রুহিতনের গোলাম পেড়ে খেলায় ইস্কাপন রঙে খারাপ বিভাগের দরুণ (কেন না সাধারণতঃ 'দ'-পক্ষ ইস্কাবনে মাত্র একটি পিট লাভ করেন) 'উ-দ' পক্ষ সর্ব্বসমেত আটখানি পিট লাভে সমর্থ হলেন। 'প'র এই চাল সুচিন্তাপ্রসূত সন্দেহ নাই কারণ তিনি ডাক থেকেই জান্তে পেরেছেন যে বহু-তাসওয়ালা তাঁর চিড়িতন রঙ থেকে প্রাথমিক চাল দিলেও বিপক্ষ দল টেক্কা সাহেব দিয়ে সম্ভবতঃ দুইখানি পিট ধরতে পারেন, সুতরাং রুহিতনে চাল দিয়ে দেখলেই বা ক্ষতি কি? অকুসন ব্রীজ হলে খেলায় ক্রীড়ক বা তাঁর খেঁড়ীর কথিত রঙে চাল দিলেই নীতিসঙ্গত হত, কিন্তু কণ্ট্রাক্ট খেলায় বিশেষতঃ যখন 'গেম' অবধি ডাক উঠেছে তখন অন্য কোন একটি নিরাপদ চালের উপস্থিতিতে অকুসনের উক্ত নিয়ম একেবারেই অচল। অবশ্য রুহিতনে খেলে গেলেও প্রতিপক্ষ ঐ রঙে অন্ততঃ দুইবার খেলা বন্ধ করে দেবেন, কিন্তু তা' হলেও রঙকর্ত্তাকে যদি বেশী পিট না করিয়া দেয় তবে উক্তরূপ ক্রমানুযায়ী তাস থেকে সর্ব্বোচ্চ তাসটি পেড়ে খেলাই সুফলপ্রসূ।

ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতায় আর একটি হাত নিয়ে দেওয়া হল। 'প'র হাত নিম্নলিখিতরূপ:—

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, আটা, পাঞ্জা, তিরি।
হরতন—সাহেব, গোলাম, নয়, তিরি।
রুহিতন—আটা, ছক্কা।
চিঁড়িতন—নয়, দুরি।

'প' উপরোক্ত হাত নিয়ে প্রথমে ডাক দিয়েছেন একটি ইস্কাবন। অবশেষে তাঁর দক্ষিণস্থিত ক্রীড়ক 'দ' তিনটি ফেয়াইএ ডাক দিয়ে ডাক শেষ করেছেন। এখন 'প' কি চাল্‌বেন, তাঁর ইস্কাবন ডাকের উপর দুইবার ডাক ওঠা সত্ত্বেও তা'তে চাল দেবেন, না একতাস ছোট হরতন চাল্‌বেন, কিম্বা খেঁড়ীর হাতে পড়বার জন্য আন্দাজে কোন অল্প তাসওয়ালা রঙে চাল দেবেন? অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে তিনি ইস্কাবন রঙের চতুর্থ তাসখানি পেড়ে খেলায় অনায়াসে বিপক্ষদল গেম করলেন। এর পরিবর্ত্তে এস্থলে হরতন রঙের ছোট তাস পেড়েও খেলা চলে,—কেন না ইস্কাবনের উপর দুইবার যখন বিপক্ষদল ডাক দিয়েছেন, তখন তাঁদের হাতে ইস্কাবনে পিট আট্‌কাবার তাস নিশ্চিত বর্ত্তমান, অথচ হরতনে টেক্কা বিবি দুই তাস তাঁদের হাতে নাও থাক্‌তে পারে। সুতরাং খেঁড়ীর হাতে একখানি তাস আশা করে হরতনে চাল দেওয়া অকারণসম্ভূত নয়। বস্তুতঃ প্রতিযোগিতায় উক্ত খেলায় হরতন পেড়ে খেললে প্রতিপক্ষের গেম নষ্ট হত, কেন না সত্যই তাঁর খেঁড়ী হরতনের বিবিখানি পেয়েছিলেন। কণ্ট্রাক্ট খেলার ডাকের সময় যদি কোন রঙেই ডাক না হয়ে একেবারে ফেয়াইএ ডাক যায়, আর আপনার হাতে যদি প্রাথমিক চাল দেবার উপযুক্ত কোন তাস না থাকে, তা হলে খেঁড়ীর হাতে যাবার মত কোন তাস পেড়ে খেলাই যুক্তি সিদ্ধ। যদি না আপনার হাতে কয়েকখানি বেশ বড় তাস থাকে তবে অল্প তাসওয়ালা রঙ থেকেই আপনার প্রথম চাল দেওয়া উচিত। এই অল্প-তাসওয়ালা রঙে যদিই আপনার হাতে মাত্র দুই তিনখানি তাস থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই আপনার খেঁড়ীর হাতে সেই রঙে পিট-সংগঠনকারী তাস সমেত পাঁচখানি তাস থাকা সম্ভবপর, কেননা রঙকর্ত্তা বা তাঁর খেঁড়ী ফেয়াইএ ব্যতীত কোন রঙে ডাক দেন নাই এবং ডাক যোগ্য কোন রঙ যদি তাঁদের কারও বা উভয়েরই হাতে থাকত তবে নিশ্চয় তাঁরা কোন না কোন সময়ে স্ব স্ব রঙে ডাক দিয়ে পরস্পরে হাত মেলাবার চেষ্টা করতেন। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

সমস্যার সমাধান:—বিগত ২৬শ সংখ্যার 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত সমস্যাটির সমাধান নিয়ে প্রদত্ত হল। ফেয়াই এর খেলা, 'দ' খেল্‌বেন। বিপক্ষ দল যতই বাধা দিক না কেন সম্মিলিত হস্তে 'উ' এবং 'দ'কে পাঁচখানি পিট পেতে হবে।

ইস্কাবন—নয়, তিরি।
হরতন—গোলাম, নয়।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—বিবি, নয়, ছক্কা।

ইস্কাবন—নাই।
হরতন—দশ, সাতা।
রুহিতন—সাহেব, ছক্কা।
চিঁড়িতন—টেক্কা, দশ, আটা।

ইস্কাবন—বিবি, আটা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—বিবি, আটা, পাঞ্জা।
চিঁড়িতন—সাতা, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—সাহেব, সাতা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা, সাতা, চৌকা।
চিঁড়িতন—সাহেব, গোলাম।
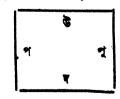
'দ' রুহিতনের সাত্তা খেল্‌বেন, 'প' সাহেব মারলেন এবং 'উ' ইস্কাবনের ছোট তাস পাশিয়ে গেলেন। 'প' তারপর চিড়িতনের টেক্কা পেড়ে খেললেন, 'দ' এ ক্ষেত্রে চিড়িতনের সাহেব দিয়ে গেলেন। যদি 'প' পুনরায় চিড়িতনের আটা খেলেন 'উ' বিবি দিয়ে পিট নিয়ে হরতনের গোলাম পেড়ে খেলবেন। এ পিটে 'পূ'কে যা হোক কিছু পাশ দিতে হবে। অন্যথা চিড়িতনের আটা না খেলে 'প' যদি রুহিতনের ছক্কা খেলেন 'উ' হরতনের নয় পাশ দিয়ে যাবেন। অতঃপর 'দ' রুহিতনের পিটখানি ধরে চিড়িতনের গোলাম চাল দিলেন। এ পিট খানি 'উ' চিড়িতনের বিবি দিয়ে নিয়ে হরতনের গোলাম পেড়ে খেললেন যাতে 'পূ' পাশ দিতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় পিটে যদি 'প' পুনরায় রুহিতন খেলেন 'উ' হরতনের নয় পাশাবেন এবং 'দ' পিটখানি গ্রহণ করবেন। এখন 'দ' চিড়িতনের সাহেব পেড়ে খেললেন। যদি 'প' টেক্কা দিয়ে পিটখানি নিয়ে নেন তো গেল, নচেৎ 'প' যদি পিটখানি ছেড়ে দেন 'দ' পুনরায় চিড়িতনের গোলাম খেলবেন। প্রথম পিটখানি নিয়ে যদি 'প' এক তাস ছোট চিড়িতন পেড়ে খেলেন, তবে 'দ' সাহেব দিয়ে পিটখানি ধরবেন এবং পরে রুহিতনের টেক্কা পেড়ে খেলবেন। 'উ' এবারে হরতনের নয় দিয়ে গেলেন। তৎপরে 'দ' চিড়িতনের গোলাম পেড়ে খেললেন।

যদি প্রথম বারেই 'প' রুহিতনের পিট খানি ছেড়ে দিয়ে যান' তবে 'উ' হরতনের নয় পাশ দিয়ে যাবেন। অতঃপর 'পূ' এক তাস রুহিতন খেলায় 'দ' পিটখানি ধরলেন। এখন পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা এসে গেল যেন 'প' প্রথম পিটখানি নিয়ে আবার রুহিতন পেড়ে খেলেছেন।

মহাজনটুলী, বর্দ্ধমান থেকে শ্রীসুবোধকৃষ্ণ সামন্ত ও শ্রীগৌরীপ্রসাদ আইচ, শিবপুরের শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং হাওড়ার বেলুড় ওল্ড সঙ্গীত মন্দিরের পক্ষ থেকে শ্রীজহরলাল কোলে আমাদের এই সমস্যাটীর উত্তর নির্ভুলভাবে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[বসুদেবের বাসাবাড়ী—"পূরবী"র বেশে সজ্জিত বসুদেবের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া মাধবদাস দেখিতেছিল]

বসু। কি রে ব্যাটা, হাঁ-কোরে তাকিয়ে দেখ্‌চিস কি?

মাধ। আজ্ঞে, দেখচি—গোঁফ গজালো কি না!

বসু। দূর, এরই মধ্যে গোঁফ গজাবে কি? এইত মোটে ঘণ্টা দু তিন্ হোলো কামিয়েচি!

মাধ। কি জানি বাবু, বর্ষাকাল—কিছু বলা যায় না ত? তার ওপর মেয়েমানুষেরা বলে "কলাগাছের বাড়"—চড় চড় কোরে বাড়ে! আচ্ছা বাবু, সন্দেহ টন্দেহ করে নি ত?

বসু। সন্দেহ কর্ব্বে? এই লালপাড় সাড়ী—এর মাহাত্ম্য কি কম ঠাউরেচিস্ নাকি? এই পরিয়ে যদি আজকালকার কলেজের ছোকরাদের কাছে তাদের Vice-Chancellorকেও সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে যাই, তাহোলেও তারা চিনতে পার্ব্বে না—উল্টে প্রেমে পোড়বে! আচ্ছা, তুই এক ছিলিম তামাক সাজ দিকি, আমি চট্ করে কাপড়টা ছেড়ে আসি।

মাধ। তামাক সাজাই আছে—কিন্তু আমি বলি কি বাবু, ও কাপড়-চোপড় আর দিন কতক ছেড়ে টেড়ে কাজ নেই। ঐ দিদিমণির পোষাক পোরেই দিন-কতক তামাক-টামাক খাও—কি জানি, কখন এসে পড়ে যদি?

বসু। এরই মধ্যে এসে পোড়বে কি? আসেও যদি, ত কালকের আগে নয়। তুই সব ঠিক-ঠাক কর—আমি আস্‌চি।

[বসুদেব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন]

মাধ। নাঃ, এ আবার এক ফ্যাসাদ হোলো—তক্কে তক্কে থাক্‌তে হবে—কি জানি কখন এসে-টেসে পড়ে! [গুড়গুড়ি ইত্যাদি যথাস্থানে রাখিতে লাগিল,—ইতি-মধ্যে দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ শোনা গেল] নাও গো, ঐ কে আবার কড়া নাড়ে! ফাঁক দিয়ে আগে দেখতে হবে সোজা। [দেখিয়া] একটা পাগোল-পাগোল ছোক্‌রা বটে! কি করি, দোর খুল্‌বো না কি?

বসু। [উপর হইতে জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া নিম্নস্বরে] এই মেদো, তুই যা বোল্‌লি, তাই হোলো। বিশুকা' এসেচে! ভারি মুস্কিল হোলো ত দেখচি—আমি যে পোষাক প্রায় খুলে ফেলিচি!

মাধ। [নিম্নস্বরে] ভাগিয়ে দোবো?

বসু। [নিম্নস্বরে] না, না, এসেছে যখন, হাতছাড়া কোরে কাজ নেই। তুই দোর খুলে বস,—মিনিট পাঁচেক আট্‌কে রাখ—আমি আসচি—

[পুনরায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল]

মাধ। কে মশাই—? দাঁড়ান—যাচ্ছি—! আচ্ছা, বাবুই শুধু সাজতে পারে, আর আমি পারি না? খুব পার্ব্বো! [চট্ করিয়া বসুদেবের চটি পরিয়া ও টেবিলের ড্রয়ার হইতে চস্‌মা বাহির করিয়া পরিয়া] ফতুয়া ত গায়েই আছে—এতেই হবে! [দরজা খুলিয়া দিলেই বিশেশ্বর প্রবেশ করিলেন]

মাধ। [ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের স্বরে] কাকে চান্ আপনি ?

বিশ্বে। পূরবী রায় কি এই বাড়ীতে থাকেন ?

মাধ। "পূরবী রায়"! ও,—বসুন। [মাধব গম্ভীরভাবে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিল]

"মেধো" ওরে "মেধো", বাবুর জন্যে একটা হুকো নিয়ে আয়—

বসু। [জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া] মেধোব্যাটা আবার কাকে "মেধো" বোলে ডাকে—!

বিশ্বে। থাক, তামাক আমি খাই নে। পূরবী রায় কি বাড়ীতে আছেন ?

মাধ। "খুকী"র কথা জিজ্ঞেস কোচ্চেন বুঝি ? "খুকী"কে আপনার কি দরকার ?

বিশ্বে। তিনি বুঝি আপনার কন্যা ? নমস্কার।

[মাধব গম্ভীরভাবে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিল]

তিনি একটু আগে আমার কাছে গিয়েছিলেন—তাঁর একজন private tutor এর দরকার ছিল, বোলছিলেন—

মাধ। আপনি বুঝি মাষ্টার ? কতদূর অবধি পোড়েচেন ? খুকীকে পড়াতে পার্বেন ত ? [বিশ্বেশ্বর চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিলেন] মাইনে কত নেবেন ? ভাল পড়াতে পারেন ত, দশটাকা অবধি দিতে পারি। [বিশ্বেশ্বর উঠিতে গেলেন, এমন সময় "পূরবী" সিড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন]

খুকি, এই বাবুটী বোলচেন—মাষ্টার। ছাখ দিকি একে দিয়ে চোলবে কি না ? ওরে মেধো, আমার লাঠি গাছটা, চাদরখানা দিবি চ'। খুকি, আমি এখনই আসচি —[মাধব চলিয়া গেল]

বসু। মাষ্টার মশাই যে! বসুন—বসুন! এত শীঘ্রী আপনাকে expect করি নি। আপনার ভারতী দেবী যে ছেড়ে দিলেন ?

বিশ্বে। তাঁর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক চুকে গ্যাছে!

বসু। সে কি। হঠাৎ এরই মধ্যে কি হোলো ?

বিশ্বে। তার বিয়ের সম্বন্ধ যে আগে থাকতেই স্থির ছিল, তা আমার জানা ছিল না।

মুক্তি প্রতীক্ষায় থাকুন !

বসু। জানা থাকলে কি কর্তেন ? আপনি কি যে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির থাকে, তাকে পড়ান না, নাকি ?

বিশ্বে। [সে কথায় কাণ না দিয়া ব্যথা বিবর্ণ-মুখে] উপযুক্ত হোয়েচে ! মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস কি অমনি যাবে ! [অতি কষ্টে হৃদয়-ভেদী আত্মদ্বন্দ্ব প্রাণপণে দমন করিয়া সহসা] হ্যাঁ, আপনি কি আজ থেকেই পোড়বেন ?

বসু। পড়ান্ ত পড়ি—কিন্তু আপনি কি আজ পড়াতে পার্বেন ?

বিশ্বে। পার্লে ভাল হোতো। একটা অবলম্বন,—খানিক অন্যমনস্ক—না থাক্—কাল্ তখন আসবো—

বসু। তা আজ প্রথম দিন, নাই বা পড়ালেন। বসুন্ না, একটু গল্প-সল্প করা যাক্—

বিশ্বে। না—চললুম্—

[উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় চলিয়া গেলেন]

বসু। কি করা যায় ? ব্যাপার স্বচ্ছ সুবিধে বোলে মনে হচ্চে না।

[হাসিতে হাসিতে মাধব প্রবেশ করিল]

মাধ। গুড়গুড়িটার বাবু জাত্ মেরে দিইচি। আপনি আর একটা কিনে আনবেন।

বসু। তুই ত ব্যাটা ভারি ওস্তাদ দেখচি! দিব্বি, কাঁকতালায় বাবাগিরি ফলিয়ে নিলি—?

মাধ। তা আপনিও যেমন খেলাঘরের মেয়ে, আমিও তেমনি খেলাঘরের বাবা! এত বড় বাড়ীখানাতে সোমত্ত মেয়েমানুষ একা-একা সব কথা কোইবেন্—পাছে আবার বেয়াড়া রকমের একটা কিছু মনে করে' বসে—তাই ভাবলুম্ আগে থাকতেই গোড়া বেঁধে রেখে দিই। হা-হা, কেমন "অ্যাক্টো" করিচি তা বলো ? [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] ওরে বাবা, আবার যে ফিরে আসে ? বাবু, হুসিয়ার গো! আমাকেও ফের গা ঢাকা দিতে হোলো!

[ত্রাস্তপদে মাধব চলিয়া গেল]

[বিশ্বেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ]

বিশ্বে। [চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া] না, আজ আর "মেসে" ফিরতে পার্ব্বো না—সেখানে আপনার 'জন' ত কেউ নেই। মা, মা, আজ তোমাকেই আমার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন!

[নিদারুণ মর্ম্মবেদনার চিহ্ন মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল]

বসু। মাষ্টার মশাই, কি পাগল হোলেন না কি ?

বিশে। পূরবি, তুমি যদি আমার বোন্ হোতে, তাহোলে আমার ব্যথা বুঝতে পার্ত্তে! আমি কি কোরেচি, জানো? বাপের মতন বড় ভাইকে অপমান কোরে তাড়িয়ে দিয়েচি! মা, মা—হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মা—সেই মায়ের আদেশ অকাতরে অগ্রাহ্য করিচি! কিসের জন্তে এ-সব করিচি জানো? [কাঠ হইয়া কল্পনায় যেন সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন]

বন্ধু। মাষ্টার মশাই, স্থির হোন্—আসুন, অন্য কথা বলি—

বিশে। স্থির হোতে পাচ্চি নে পূরবি! আমি আরও কি কোরেচি জানো? [অট্টহাস্ত করিয়া উঠিয়া] বাঃ, বাঃ, দাদার ভাই বটে। ভীষ্মের চেয়েও জিতেন্দ্রিয় যিনি—যার আমার মা যে ব্রহ্মচারিণীর ত তুলনা খুঁজে পাচ্চিনে—তাঁদের সন্তান হোয়ে কি করেচি জানো? আমি—হ্যাঁ আমি তোমারই মত এক কুমারীর—না, না, কুমারী ত নয়—পরস্ত্রী—হ্যাঁ-হ্যাঁ, পরস্ত্রী—পরস্ত্রীর মুখচুম্বন কোরেচি। তুষানল—তুষানল—আমার প্রায়শ্চিত্ত।

(মর্ম্ম বেদনার যাতনায় কণ্ঠরোধ করিতে উদ্যত হইলেন)

বন্ধু। (বিশেশ্বরকে বাধা দিতে গিয়া আত্মহারা হইয়া) বিশুকা—বিশুকা—

বিশে। এ্যা—এ্যা—, "বিশুকা বোলে কে ডাকে? তুমি, তুমি কি—পূরবী নও?

বন্ধু। [অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে] না!

বিশে। তবে—তবে? কে তুমি? একজন পরিচিত, একজন আত্মীয়—যে আমার মা'কে চেনে, যে আমার দাদাকে চেনে—যে আমাকে জানে—একজন—এমন একজনকে যে আমার আজ বড় প্রয়োজন! যে আজ আমার দেনা পাওনা ঠিক কোরে কোনে, আমায় ঠিকমত ঘৃণা কোর্ব্বে! কে তুমি—কে তুমি?

বন্ধু। "কে আমি" শুনলে সহ্য কোর্ত্তে পার্ব্বেন? তাতে যে আপনার লজ্জার গ্লানি—কলঙ্কের কালি, আরও বেড়ে উঠবে!

বিশে। তাই ত আমি চাই! এ লজ্জার গ্লানি, এ কলঙ্কের কালি যে একজন পরিচিতের গলা জড়িয়ে ধোয়ে, চোখের জলে ধুয়ে ফেলতে চাচ্ছি। যে আমার মা'কে জানে, যে আমার দাদাকে জানে, যে আমাকে জানে—সে আমাকে ধিক্কার দিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই বুঝবে, যে এতে আমার হাত ছিল না—এ আমার নিয়তি,—এ আমার নিদারুণ বিধিলিপি—তাকে এড়িয়ে চলা আমার সাধ্যাতীত। আমি পরিচিতের সেই ঘৃণার ভেতরকার ওইটুকু করুণাকণা নিয়ে আজ বাঁচতে চাই! বলো—বলো, তুমি কি পরিচিত, আমার এ দুর্দ্দিনের বন্ধু? আমি যে আর সহ্য কোর্ত্তে পাচ্চি না।

বন্ধু। বিশুকা, তুমি নরাধম হোলেও ভাগ্যবান্। আজ বুঝতে পাচ্চি,—তুমি অকৃতজ্ঞ সন্তান হোলেও তোমার সেই মমতাময়ী মায়ের আশীর্ব্বাদের আর অন্ত নেই। নইলে, যাদের মুখ চেয়ে এই ছলনার বেশ পোরে তোমার যে দুর্গতি চোখে দেখতে চেয়েছিলাম তা তোমার খুব বরাত জোর—ততটা আর দেখতে হোলো না! আমি পরিচিত, বন্ধু কিনা, জানতে চাচ্চো? এই বহু জনাকীর্ণ সংসারে বন্ধু আছে কিনা জানি না—তবে একদিন তোমার স্নেহময়ী মায়ের প্রসাদ এক সঙ্গে দুজনেই ভাগ কোরে পেয়েছিলাম! আমি বসুদেব।

বিশে। বসুদেব? বসুদেব কে?

বন্ধু। তোমারই মত ভাগ্যবান—আর তোমারই মত নরাধম—নইলে এখনও চিনতে পাচ্চো না কেন? [মাথার চুল ধীরে ধীরে খুলিয়া ফেলিয়া] চিনতে পাচ্চো—এখন মনে পড়ে?

বিশে। [চিনতে পারিয়া উচ্ছ্বসিত বেদনা তরল কণ্ঠে] বসু—বসু! বন্ধু—বন্ধু! হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক্, ঠিক্—নরাধম হোলেও ভাগ্যবান বটে! বসু, বন্ধু—আমায় রক্ষা করো—রক্ষা করো!

[মাধব প্রবেশ করিয়া কোচায় খুঁটে চোখ মুছিতেছিল]

(ক্রমশঃ)

'তোমার সুরে আমার গানে

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আমি যে গান বাঁধব বসে
নীরব বনছায়
তরুণ ঊষায় তুমি এসে
সুর দিয়ে যেও তায়।

সাগর পারে, বালুর চরে,
শিউলি ঝরা পথের পরে,
আমার গানের তরী যেন
সুরের স্রোতে ধায়।

যে বাণী মোর সঙ্গোপনে
মঞ্জরিয়া ওঠে,
তোমার সুরের আলোয় যেন
ফুল হয়ে তা' ফোটে।

তোমার সুরে আমার গানে
দোলন যেন জাগায় প্রাণে,
নিখিল যেন সেই গানেতে
নয়ন মেলে চায়।

তন্বী ও তুফান

শ্রীসুনীল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বারান্দার সুইচ টেনে দিয়ে ভজহরি দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠের ওপর। সিঁড়ির গহ্বর থেকে মাথা চাগিয়েই প্রবীর চেঁচিয়ে উঠ্লো: এই যে সশরীরে! কটায় ফিরলি, শুনি? কোন্-সেলুনে গিছ্লি? বল্! হাঁদা রাকরা কোথাকার!

সকলে উঠে এলো ওপরে।

রাকেশের চোখে তখনো 'সাইন অব দি ক্রস্এর' দৃশ্যগুলো ভাস্ছে, তার ওপর প্রবীরের এই উলটো চাপ, বেজায় হাসি পায় রাকেশের, তবু সে সামলে যায়। মানস গম্ভীর থাকতে পারে। মহেশদা যেন নিদারুণ মর্ম্মাহত হ'য়েছেন, মুখের এমনি ভাব দেখিয়ে রোয়াক ডিঙিয়ে ওধারে চ'লে গেলেন। নগেনের হাসি তো বিদ্যুতের মতো, ক্ষণিকের জন্যে আগমন,—সে আর বিশেষ মারাত্মক নয়।

সকলেই হুড়মুড় ক'রে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হৈ-চৈ আওয়াজ, অশ্রান্ত মুখরতার মেস্ হাউসের মরা তল্লাট হ'য়ে উঠলো জীয়ন্ত। কৌটা ভরা প্রাণ গিয়েছিলো চুরি, তার সন্ধান যেন পাওয়া গেলো, প্রাণ-পাত্র হ'লো উদ্ধার, অজ্ঞান রাক্ষসী দাঁত খিঁচিয়ে আচম্বিতে উঠলো যেন বেঁচে। খটাখট ক'রে চার পাঁচটা সুইচএ টান পড়লো, সমস্ত বাড়িটা নিমেষে হ'য়ে উঠলো দুধের মতো সাদা, খুকুমণির হাসির মতো স্নিগ্ধ!

—তারপর তুই এতক্ষণ কি করছিলি বল্তো! আমরা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্ প্রায় চ'ষে বেড়িয়ে খুঁজে খুঁজে তোর কোনো পাত্তাই পেলাম না! কতক্ষণ আর ওঁকে বসিয়ে রাখা যায়! ভদ্রলোক প্রায় তিনটের সময় মোটর এনে হাজির! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিপিন বাবু—তিনি নিজে। মাথুর নিজে পাঠিয়েছিলো।

প্রবীরের এ অভিনয় দেখে ওরা সবাই মনে মনে খুব খানিকটা সাবাস্ দিলো। মানস মাথা হেঁট ক'রে চৌকির ওপর ব'সে রইলো। রাকেশ চুরুটের ধোঁয়ায় ক্রমান্বয়ে ঘরটাকে বিষাক্ত ক'রে তুলছে।

প্রবীরের রাগ যেন পড়তে চায়না। টেনে ছিঁড়ে ফেলার মতো ক'রে গায়ের জামা খুলে ফেললো, ব্র্যাকেটে দিলো স'টকে: নাঃ, আর না, ভাই! আমাদের রেহাই দাও! খুব নাকানি চুবুনি হ'লো! যখন মাথুর বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলো—ভজহরি কোথায়? কী কঠিন ভাবে সে মোমেণ্টটা কাটলো, বলো তো হে তোমরা! জবাব দিতে গিয়ে মুখ দিয়ে কারু এক রত্তি কথা বেরোয় না! ভাগ্যিস্ মহেশদা ছিলেন! নাঃ! খুব পেয়েছি শিক্ষা, আর না। ব'লতে ব'লতেই হাঁটুর ওপর কাপড় টেনে তুলে ঠাস্ ক'রে ব'সে পড়লো চৌকীর ওপর।

রাকেশের দম আটকে আসছিলো, গলায় ধোঁয়া আটকে যে বিষম খায়নি তাও রক্ষে। মানস ব'ললো—যা হবার তা হ'য়ে গেছে, থামো ভাই! মিছিমিছি অনুশোচনায় দুঃখ বাড়বে বই কমবে না!

নগেন এতখানি হাসি বহন ক'রে এসে হাজির হ'লো: উঃ, যা খাওয়ালে! কি আপ্যায়িত! ঢেঁকুরে এখনো কাটলেটের গন্ধ পাচ্ছি।

নগেনের শুধু খাওয়ার গল্প! ও স্বপ্নে খায়, ও খায় মনে-মনে—প্রচুর, অঢেল!

—অমন খাওয়া আমার কণ্ঠা দিয়ে নামেনা ভাই! ওঝা ডাকিয়ে ভূতের মুখে ঝাটা খাইয়ে, গয়ায় গিয়ে তারই পিণ্ড দান! ছায়া কেমন ফিরে গেলো পর্দার আড়াল থেকেই! সেটাও কি আমাদের পক্ষে কম অপমানের কথা! এক ভজহরি নেই আর যেন দেশ মরুভূমি, শূন্য, ফাঁকা! আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে সমুখে এসে একবার অভ্যর্থনা পর্য্যন্ত করলেনা! যেটুকু করলো মাথুর নিজে! রেখে দাও তোমার খাওয়া! প্রবীর ধুকে গেলো।

রাকেশ যাবার বেলায় আদ্দেক দেখা 'ফিল্ম্-ফ্যান্টা' টেনে নিয়ে তারি পাতা ওল্টাচ্ছে! অতিরিক্ত মনোযোগীতায় সে ঝুঁকে প'ড়েছে গ্রেটার close-up ছবিটার ওপর। এমনি একটা পোজ আজ ও পেয়েছে 'সাইন অব দি ক্রস্' এ। সহসা উত্তেজিত হ'য়ে রাকেশ ব'লে উঠলো: গার্বোর poseটা দেখে যা, এই প্রবীর, এম্প্রেস্ ঠিক এমনি একটা দেয়নি আজ?

রাকেশ সমস্ত ফেঁকাস ক'রে দিল বুঝি! ওদের সবার মুখ নিমেষে উঠল কালিয়ে। প্রবীর চোখ দুটো বড় ক'রে কাছে এগিয়ে এলো, দেখলো। একটু থেমে সে কথাটা দিলো ঘুরিয়ে, ব'ললে—এম্প্রেস্-টকি হাউসের সমুখে টাঙানো ছবির কথা বলছিস্? হ্যাঁ, অনেকটা বটে। ড্রাইভারটা এতো স্পীডএ মোটর চালিয়ে গেলো, ভালো ক'রে দেখতেই পেলুম না! গ্র্যাণ্ড পোজ কিন্তু!

ফের নতুন ক'রে সবাই প্রবীরকে সাবাস দিলো।

সে যে কি ক'রে ফেলেছিলো, একটু হ'লে বুঝতে পেরে রাকেশের মুখ ম্লানিয়ে এসেছিলো—কিন্তু প্রবীরের উপস্থিত বুদ্ধিতে তার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

ভজহরি নিতান্ত অপরাধীর মতো, ধমক-খাওয়া বাচ্চা ছেলের মতো চুপটি ক'রে ব'সে রইলো। ও যে আজ কত বড় অপরাধ ক'রেছে তা ওদের থেকে ভজহরি নিজেই জানে আরো বেশী। পায়ে ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও হয়ত এ-অপরাধের মার্জ্জনা নেই। ভজহরি অনেকক্ষণ বাদে করুণ গলায় জিগ্গেস করলো—আবার যেতে ব'লেছেন নাকি, ভাই?

—আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু কথা হয়নি। মহেশদা জানেন সব। তাঁকেই জিগ্গেস ক'রো। আমরা আছি শুধু অপমানের ভাগটুকু নিতে। প্রবীরের সর্ব্বাঙ্গ যেন অপমানে বিষাক্ত হ'য়ে গেছে।

ভজহরি অতিরিক্ত মর্ম্মাহত অবস্থায় যেন নিতান্ত পঙ্গু, সর্ব্বাঙ্গ চেতনাহীন, নিঃসাড়। তির্য্যক্ ইস্পাতের ফলা সোজাসুজি ওর হৃৎপিণ্ড ভেদ ক'রে কে যেন বিঁধিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এ যন্ত্রণার কথা মুখ ফুটে বলা লোকের হদিস পর্য্যন্ত ও পায়না। যাতনার আওতায় ও কাতর। ছায়া আজ কত বড় আশা নিয়ে তৈরী ছিলো, আজ হ'তো ওদের দুজনার শুভদৃষ্টি। বাসরে আজ কে এক বোতল মদ ঢেলে দিয়ে গেলো? ফুলশয্যার বিছানা থেকে প্রিয়াকে আজ কে লুণ্ঠন ক'রে পালিয়ে গেলো। ভজহরির কান্না পায়। আজ ওর দু-চোখে ত্রিভুবন ঘোলাটে হ'য়ে এসেছে, আজকের অজস্র শুভ-মুহূর্ত্ত হ'য়ে গেলো ছায়ার মতো মিথ্যে, বার্দ্ধক্যের মতো অকর্ম্মণ্য। ভজহরির চিৎকার ক'রে, গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। নিজেকে সামলে নিয়ে ব'ললো—আবার একদিন ডাকেন নি, ভাই?

ভজহরির আর্দ্র গলা শুনে রাকেশ হেসে ফেলেছিলো আর কি! মানস গম্ভীর থাকতে পারে। নগেন চেঁচিয়ে হেসে উঠ্লো, কাপেকের ডাকে—বিদ্যুতের মতো! ব'ললো—দূর পাগলা! দুঃখ কিসের, ভাই? আমি আছি। ওরা resign দেয় দিক্। আমি আছি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে বলেছি তো?

প্রবীর দম ছাড়লো: কি-কথা ভাই? আমরা শুনতে পারিনা?

নগেন সংক্ষেপে জবাব দিলো,—না। সে কথা শুধু আমাতে ওতে।

ছায়ান্ধকারের মধ্যে ভজহরি বিদ্যুতের ঝিলিক দেখতে পেলো। হোক না সে আলো চোখ-ধাঁধানো! ভজহরি লিখেছে তার নোট খাতায়, আর জানে ব'লেই লিখেছে:

ক্ষণপ্রভা, আবার জ্বলো! হোক্না আলো চোখ- ধাধানি!
চপল তুমি, নিঠুর তুমি, তবু তুমিই আলোর রাণী।
ছায়ার কথাও ক্ষণিক চাবুক, পান্থ জনার দাও যে ফাঁকি,
তাই কি তুমি অলীক স্বপন? আলোর রাণী ব'লবোনা কি?

তাই ভজহরি আশ্বস্ত হ'লো।

কিন্তু তবুও মহেশদার সঙ্গে একটিবার দেখা করার জন্যে ওর মনে অশান্ত একটা তৃষ্ণা ক্ষণে-ক্ষণে লোলুপ হ'য়ে উঠছিলো। সে আকাঙ্খা বেশিক্ষণ ও মনে লালন করতে পারলোনা। তাই নগেনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে ও গেলো বেরিয়ে। বাইরে গিয়ে দরজা আস্তে ক'রে টেনে দিলো।

প্রবীর ব'লে উঠলো: উঃ, কী অসম্ভব বোকা!

এ-অধ্যায় নথী সংবাদ সম্বন্ধীয়।

ফাঁকায় পেয়ে ভজহরি নগেনকে ধ'রে ব'ললো—কথাটা কি ব'লতেই হবে! গেলো রবিবার থেকে ও সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে একটু নিরিবিলির, এত দিন বাদে ও খুঁজে পেলো একটু নিরালা। নগেনকে পেলো সে নিঃসঙ্গ রূপে। তাই সুযোগটুকুর অপব্যবহার করবেনা ব'লেই নগেনকে ধ'রে ব'ললো—কথাটা কি ব'লতেই হবে।

নগেন হেসে উঠে থামলো। তারপর কি যেন ভেবে মুচকে মুচকে হেসে ব'লতে শুরু করলো—সেদিন গিছ্লাম তো মাথুরের ওখানে, ফিরতি পথে মামার ওখান থেকেও ঘুরে এলাম, বিদ্যুতের সঙ্গে কথা হ'লো—

—বিদ্যুৎ কে?

—মামার মেয়ে। তার সঙ্গে কথা হ'লো

—কি কথা ভাই? ভজহরি চঞ্চল হ'য়ে পড়লো।

—এই দ্যাখো! বলতেই দাও! অত তাগিদে কি সব কথা গুছিয়েই ব'লতে পারবো!

—বেশ, তাহ'লে ধীরে ধীরেই বলো।

নগেন ব'ললো—ওই, মাথুরের সঙ্গে আমার মামার বহুদিন থেকে চেনাজানা। কাছাকাছিই তো বাড়ি, আর দু-পক্ষই অনেক দিনের বাসিন্দে! আমারো মুখ-চেনা কিছুকিছু! কিন্তু তোমার যে সম্বন্ধ হ'চ্ছে ওরি মেয়ের সাথে সে-কথা তো আগে জানতামই না! কে-না-কে ভেবে প্রথমে গা-ই করিনি! তারপর যেই একদিন নাম শুনলাম, ব্যস্! সত্যি, লোক খুব ভালো। অগাধ টাকা, টাকার আগুন! ফরাসের নিচে নোট বিছিয়ে ব'সে থাকে—প্রায় এমনি। মেয়েও বেশ শক্ত, সুষ্ঠু। লাবণ্য সারা গায়ে উপচে পড়ে! অতিরিক্ত লাজুক মেয়ে! আমাকে দেখলেই ফিক্ ক'রে হেসে মাথা হেঁট করে (এখানে ভজহরি একটা নিশ্বাস ফেললো)। তোমার সঙ্গে মানাবে কিন্তু চমৎকার! যাক্, সেদিন মামার ওখানেও গিছ্লাম। সব বললাম, শুনে সে কী ফুর্ত্তি সবার! বিদ্যুৎ তো লাফিয়ে উঠলো, ব'ললো—তোমার বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে, সোনাদা? বাঃ, তবে তো ভারি সুন্দর! বিয়ে কবে ঠিক হ'লো? ব'ললাম—দাঁড়া, বরের আসার কথা ছিলো আজ, আসেনি।

দেখাশুনা হোক্‌, আলুক্‌-খাক্‌, দিন দেখতে কতক্ষণ।

আরো বলে নগেন; বিদ্যুৎও পড়ে বেথুনে, ওরা এক সঙ্গেই পড়ে। যায় একি মোটরে। কাছে ডায়োসিশন থাকতে ছায়া বেথুনে ভর্তি হ'লো শুধু বিদ্যুতের জন্যে। মামার বন্ধু বেথুনে প্রফেসার তাই বিদ্যুৎকে সেখানে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চ'ললো ছায়া।—এতো বন্ধুত্ব ওদের। রোজ যাবে এক মোটরে। পড়াশুনা পর্য্যন্ত আলাদা-আলাদা করা চলেনা, এক জায়গায় ব'সে পড়া চাই। এই তো ব্যাপার!

নগেন ব'লে চলে: বিদ্যুৎ ব'ললো—ছায়া এ বিয়ের কথা শুনে খুব খুসি। কারণে অকারণে কেবল হাসে। কিন্তু তার কারণ যে কি তা বিদ্যুৎরা নাকি বুঝতে পারেনা! ওরা ঠাট্টা করলে ছায়া গা ঝাকানি দিয়ে ছুটে পালায়। ফিরে এসে নাকি বলে—বিয়ে তোদেরও হবে, স্ফুর্ত্তি হয় কিনা দেখা যাবে তখন।

নগেন থামেনা: ছায়া নাকি আজকাল বেজায় খাটছে—বি,এ পাশ করবেই! স্বামীর চেয়ে কোনো অংশে খাটো থাকতে চায়না—a good idea—কি বলো ভজহরি? ও চায় সাম্য।

ভজহরি থামের মতো নিশ্চল, প্রস্তর-মূর্ত্তির মতো অপলক, হিমালয়ের মতো স্তব্ধ। মুখ খুলে মাথা ঝাকি দিয়ে জানালো,—নিশ্চয়!

—আমিও তাই বলি। তুমি এ বছর আর ভর্ত্তি-টর্ত্তি হ'য়োনা। বিয়ে হলে আসছে বার থেকে একসঙ্গে প'ড়ো এম, এ। কি বলো?

ভজহরি তা-ই বলে।

নগেন একটু হাসলো। ভজহরি প্রশ্ন করলো—মামার বাড়ি থাকতে তুমি এমন মেসে থাকতে চাও কেন?

নগেন রীতিমতো স্বাভাবিক গলায় বলে—সম্পর্কটা তো নিকট না ভাই! মামের পিস্‌তুতো ভাই। আমায় রাখবে কেন? আর, বড়োলোক—বুঝলে না? যতটা অ্যালুফ থাকা যায়।

নগেনের রদ-মেট ভজহরির মাথা যোগাটী গাছের নিচে দিয়েছিলেন নামিয়ে, সে-মাথা নগেনই আবার তুলে দিলো অনেক উর্দ্ধে। ভজহরি আর কারো সাহায্য প্রার্থনা করে না। মহেশদাকে তাই ব'লে ও ছাড়বে না! বিপিন ভজ ওঁর হাতের লোক।—ওঁর কাছ থেকে কাজ পাওয়া যাবে অনেক। বিয়ের পর ভজহরি নগেনকে অনেক কিছু পুরস্কার দেবে। নগেন স্বপ্নেও যা ভাবতে পারে না, এমন অঢেল। নগেন আজ ওকে সুখী সংবাদ দিয়েছে। ভজহরি ভাবলো—এ সংবাদের মূল্য কত হ'তে পারে? ক-পরাদ্ধ পাউণ্ড? ডঙ্কা বাজিয়ে ভজহরি ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াবে নাকি? ব'ললো—মাইরি? তবে তোকে দিয়ে কাজ পাবো নিশ্চয়।

—কাজ? কি কাজ চাও বলো! নগেন হাসে: তা, যেটুকু আমার সামর্থ্য পাবে বইকি।

ঠিক? তবে আমার জন্য একটু খাটো, ভাই। ওরা কেবল ফাজলামো করবে। কাজের কাজ নেই, কেবল ইয়ার্কি!

নগেন ব'ললো—তা খাটবো। আর খাটা মানে তো কতটা এগোলো তার খবরা-খবর জানা, এই।

—হ্যাঁ তাই, তাই সই! ভজহরি যতটুকু পায় তাই যেন ওর এখন সম্পদ। একটু থেমে নিয়ে ভজহরি বলে—এই কথাটাই সেদিন ব'লতে চেয়েছিলি তো? এ-কথা আগে জানলে আরো কত সুবিধে হ'তো না?

*পাশ-করা সংবাদ পেয়ে মেস্-এ ফিরে এলে ওদের সম্বোধন যা ছিলো, এই বিবাহের হুজুগে সে-যুগ হ'য়ে গেছে পুরানো, তাই সম্বোধনও গেছে বিগড়ে।

নগেনকে আর ও কিছুতেই ছাড়বে না। পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু—ডে-লাইটএর পিছু একরাশ পোকার মতো। কিন্তু তার পরিণাম যে কি, তা তো ও জানে না। আলো দেখলেই পতঙ্গ তাতে দেয় প্রকাণ্ড একটা ঝাঁপ। ভজহরি নগেনের পিছু কিছুতেই ছাড়বে না। নগেন যেন একটা সম্মোহন শক্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আর, একটি সম্মোহনও কুসুমেষু প্রেরণ ক'রছেন, যার আঘাতে ছায়ার জন্য ও জর্জ্জরিত। ওর ডাক প'ড়েছে নিধুবনে, আর তার চেয়েও বেশি (হয়ত) ওকে হাতছানিতে ডাকছেন স্বয়ং কমলা। কোন আহ্বান কখন জরুরী ভজহরি সময়-সময় তাই বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু এটুকু জানে ডাক দু-তরফা।

নগেন যখন বেরিয়ে যায়, প্রবীরেরা যায় অফিসে—ভজহরি রাস্তার দিকের উন্মুক্ত জানলায় ব'সে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে। কিছুই ওর ভাল লাগে না। ওর প্রাণে ছায়ার মঞ্জীর নিত্য-নিয়ত অঙ্কুরিত হ'তে থাকে। একান্ত দুর্ভাবনায়, শীতল বর্ষার দিনেও তুনের মতো ও ওঠে ঘামিয়ে। ইলশে গুড়ির ছোট দানা-দানা ফোঁটার মতো ওর কপাল ওঠে ভিজে, কেয়াপাতায় জলবিন্দুর মতো দেখায়। তবু তার মনের ভেতরটা স্নিগ্ধ, কেতকীর মতো ছায়ার গন্ধে বিভোর। ও-চায় আরো উগ্রতা, আরো কাছে-আসা, আরো একান্ত-পাওয়া। ডুব-সাঁতার দিয়ে সেই গন্ধের মহাসমুদ্রে ও গা ঢাকা দেবে।—করবে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে উপভোগ, ক'রে নেবে ওর একচেটে। ওর সমস্ত মন থমথমে আকাশের মতো ভারি। এতবড়ো দুর্ভাবনার মধ্যেও ওর চোখের সম্মুখে জেগে ওঠে একটি নারীমূর্ত্তি, ব্রীড়ায় আকুঞ্চিত তার দেহ, পীনোন্নত দুটি স্তন, ঈষৎ কম্পিত অধর।

ভজহরি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। নিচে চেয়ে দেখলো সত্যি-সত্যি একটা মেয়ে,

একগাদা বই বুকে চেপে ধ'রে একা একা চ'লেছে। চমৎকার দেখতে কিন্তু। কিন্তু ছায়া এর চেয়েও সুশ্রী। আর কেউ ভজহরিকে আকর্ষণ করতে পারবে না, তাই ও চোখ ফেরালো, চাইলো ওপরে, দৃষ্টি সম্মুখের তেতলা ডিঙিয়ে আকাশ ছুঁলো। ভাবলো: ঐ মেঘের মতো কালো একরাশ চুল নিয়ে ছায়া কি ক'রে যে চলা ফেরা করে! আশ্চর্য্য! ফুলশয্যার বিছানার মতো পরিপাটি তার সর্ব্বাঙ্গ। চমৎকার!

—কিরে ভজা?

নিশি যেন ডাক দিলো! তাকিয়ে দেখলো কেউ নেই! গভীর রাত্রে এমন ডাক শুনতে ভজহরি চম্‌কে উঠ্‌তো! দিনেও নাকি বারোটার পর অপদেবতারা একবার বেরোয়। টাইপিস্‌টা টিকটিক ক'রে চলছে, ভজহরি তাকালো—না, বারোটা বাজেনিতো! গলার স্বর যে নগেনের তা অবধারিত! ভজহরি ব'সেই রইলো। বিড়িটা টানতে তার মনে ছিলো না, বিড়িরও জলতে মনে নেই! দেশলাই জ্বালালো, ধরালো।

নগেন ফিরে এলো,—কি রে ভজা? একা একা ব'সে ভাবছিস কি?

—এই এমনি! এর আগে ডাকলো কেরে?

—আমিই। কেন? চুপটি ক'রে ব'সে আছিস্ দেখে সাড়া দিয়ে গেলাম। এই তো ফিরছি। কেন?

—নাঃ, এমনি। কিন্তু—

—কিন্তু কি, বল্! নগেন হাসলো।

কিছুক্ষণ কি-যেন ভেবে নিলো ভজহরি; ব'লছিলাম: গিয়েছিলি তো? খবর কি? ভজহরি ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকালো নগেনের মুখে, সে চাহনি অতিরিক্তরূপেই তৃষিত ক্ষুধিত। এবং ওর মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া স্পষ্ট দেখা গেলো।

—ওঃ, সরি! দেখছো! একদম ভুল! একজনের বোনাসের তদ্বির করতে করতেই সাতটা থেকে এই এগারোটা বাজলো। আচ্ছা, ঠিক কাল। বেরোবার সময় মনে ক'রে দিস্! বুঝলি?

নগেনকে আজকাল সম্মুখে পেলে ও ছায়ার আদ্দেকটা পায়। তাই মনে-মনে অজস্র শুভেচ্ছা নগেনের সর্ব্বাঙ্গে ও স্যাপে। ভাবে, হয়ত ছায়া কিছু পেলো। তার মনের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ঢেলে দেয় নগেনের সর্ব্বদেহে।

ভজহরি উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে এসে নগেনের হাতটা মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো, ব'ললো—আইরি? ঠিক কাল? (সহসা গলার স্বর চড়িয়ে) সত্যি নগেন, তোর আসন কত উঁচুতে দেবো ভেবে পাইনা! তুই আমার যে কত উর্দ্ধে তুলেছিস্ যার থেকে আর উঁচু নেই! অক্ষমতার জন্যে ক্ষমা করিস্ ভাই! ব'লে সে চুপ ক'রে গেলো।

নগেনের বুকের মধ্যে সোডার বোতলের মতো একরাশ হাসি। হঠাৎ মুখ যদি খুলে যায় সে-হাসি রোধ করা নিতান্তই অসম্ভব হবে। হুইস্কির ফ্যানার মতো সে হাসি ফাঁপা। তার হাসি হোক্ না বিদ্যুতের মতো, কিন্তু এর ঝিলিকে বাজ উঠবে ডেকে, আকাশ হয়ত যাবে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে, টুকরো-টুকরো হ'য়ে। তবু এ উদ্দাম অট্টহাসি সে ঠোঁট বাঁকিয়ে ঈষৎ হেসেই দিলো বহুকষ্টে মিলিয়ে।

নগেনকে আজ পেয়ে ওর যে কত বড়ো আনন্দ এবং খুসি জেগেছে, যার মাদকতায় ভজহরি বিভ্রান্ত। মাঘের রাতে বৃষ্টিতে ভিজে এসে লেপ-মুড়ি দেওয়ার মতো আরামদায়ক, অনেকক্ষণ না-পাওয়ার পর চিরাভ্যস্তর এক-পেগ বিয়ার গেলার মতো চমৎকার, সুস্বাদু! ওর মনে হ'চ্ছে, ওর এ-বারতা ছায়ার কাছে সূচিত হোক্, ধ্বনিত হোক্, গুঞ্জিত হোক্।

—হাসচিস্? কেন, বলবিনা?

—কৈফিয়ৎ কি সবটারি দেওয়া যায়? বল্ তুইই! যদি আমি জিগ্‌গেস করি, তুই এত পাগলের মতো হ'য়েছিস্ কেন? জবাব দিতে কথা পাবি?

—হু। কেন পাবো না? ভজহরি গায়ে জোর দিয়ে ব'ললো।

নগেন হাসলো, একটু থেমে ব'ললো—আচ্ছা বল কিসের জন্য, স্রেফ কারণটা।

ভজহরি খিতিয়ে গেলো: কারণ? আচ্ছা ব'লবো এখন পরে। (নগেনের গায়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে) যা, বেলা হ'য়েছে, নেয়ে নে।

—তা যাচ্ছি। তোর ঘর, তুই যদি তাড়াস্, মোটেই থাকতে চাইনা। নগেন মনে-মনে হাসলো।

সহসা আকাশ যেন খ'সে পড়লো ভজহরির মাথায়, চোখ দুটো এতো বড় ক'রে প্রায় ও কুরিয়ে যাচ্ছিলো, ব'ললো—তাড়িয়ে কি যে, তুই বলিস, নগেন! তোরই ভালোর জন্যে ব'ললাম। তবে ব'স্ না!—আমারি তো তা'-তে ভালো রে!

দেয়ালের টিকটিকিটার দিকে চোখ রেখে নগেন এ হাসির ধাক্কাটাও সামলে নিলো। নগেন গিয়ে আবার ব'স্লো, মানে তাকে ব'সতে হ'লো,—ভজহরি কিছুতেই ছাড়লো না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নগেন ব'ললো—কারণ ব'ললিনা? অত সোজা না হে! সব কথাই যদি প্রকাশ করবার ভাষা থাকতো তবে লেখকরা আর চুলের মুঠি টেনে টেনে হয়রাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিফল হ'তোনা।

ভজহরি ভাবছিলো নগেন হয়ত তার ব্যবহারে দুঃখিত হ'য়েছে।

নগেনের কথায় মুখ তুলে ভজহরি ব'ললো—সত্যিই, ভেবে দেখলাম অসম্ভব! নেপোলিয়ান হয়ত এ কথাটা ভাবেন নি বুঝলি?

অন্তরালে

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত চৌধুরি বংশের রমেন, দার্জ্জিলিং বেড়াতে গিয়ে loveএ পড়ল। এ সব ব্যাপার না কি চাপা থাকেনা!

প্রবীণরা বল্লেন, আজ কালকার ছোঁড়াগুলোও যেমনি, ছুঁড়ি গুলোও তেমনি,—আমাদের কালে অত love ফাব ছিল না বাপু; বাপ মা যাকে ধরে দিত—তাকে নিয়েই মানিয়ে চলতো, তখন অত ডাকেরও বাহার ছিল না, ওগো হ্যাগো করে কাজ চালাতো, আর এখন darling যদি না বল, তাহলেই বলবে—idiot: ভদ্রতা জান না।

নবীনরা বল্লে Bravo! এই তো চাই, একেই বলে যুগধর্ম্ম!—তা না হলে বাপ-মা এক ছিচকাদুনে ঘাড়ে চাপাত. প্রেমকে তো ধামা চাপা দিয়ে—; তার নাকের সিকনি পোঁছাতে পোঁছাতে প্রাণ অস্থির করে তুলতো।

বন্ধুরা বল্লে, রমেনটার খুব good luck! আমরা তো Lakeএর চার ধার চষে ফেল্লুম, —আজ অবধি একটাও fianceeর পাত্তা পেলুম না, একেই বলে বরাত, আর আমাদের কেটো কপালে শুধুই Fiddle-de-dee! (ঘোড়ার ডিম)

পিসিমা ভাবলেন ছেলেটার মতি-গতি ফিরেচে এই যথেষ্ট;—একেই তো বিয়ে করবোনা বলেছিল, নিজে পছন্দ মত বিয়ে করছে,—ভালই! এতে আর বাধা-টাধা দিয়ে কাজ নেই শেষে আবার বিগড়োবে।

দুপুরে হিতৈষিরা এসে বল্লেন, হাঁ দিদি! শেষে একটা ঝিঙ্গি মেয়ের সঙ্গে ছেলেটার বিয়ে দিচ্ছিস, সে কি বাগ মানবে:—শেষে সংসারটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

পিসিমা বল্লেন, আর সংসারে কেই বা আছে ভাই! ওরা নিজেরটা যদি নিজেরা বুঝে নেয় সেতো ভালই—আর বনি বনাই বা কার সঙ্গে হবে,—তবে না ভাবনা ওই মেয়েটার জন্মে।

রমা এসে বল্লে, মা! তুমি এখনও গল্প কোরছ, বেলা যে গড়িয়ে পড়ল; আর কখন চান কোরবে?

ওমা! এখনও চান করিসনি?

হাঁ ভাই! আজ একটু ইচ্ছে করেই দেরী কোরলুম, একাদশী কিনা!

ওঃ! আচ্ছা, চল্লুম ভাই, বাড়ীতে সব কাজ-কর্ম্ম ফেলে এসেছি।

আঁধারের বুকে বেলা চলে পড়ল!

পিসিমা ডাকলেন। রমা…।

রমা এসে জিজ্ঞাসা করলে। ডাকছিলে মা?

হাঁ মা! ঠাকুরকে রান্নার জোগাড়টা করে দেত। উপোস করে আজ আর পারছিনি।

দিচ্ছি মা

ক্রমে কোলাহলও থেমে আসে,—আঁধার গভীর হয়!

* * * *

শ্রাবণী পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে পড়ল!

রমেন দেখতে পেয়েও মিছি মিছি খুঁজলে, শেষে—শ্রাবণী নিজেই ধরা দিলে!

দুজনে হাসতে হাসতে পাইনের গোড়ায় এসে বসল!

শ্রাবণী বল্লে। তার Hostelএর কথা—College friendরা তাকে কবে কি বলেছিল।

মার কথা মনে পড়াতে চোখ ছলছলিয়ে এল।

রমেন তাকে বুকে টেনে নিয়ে, কপালে ছোট্ট চুমুর রেখা দিল এঁকে।

শ্রাবণী লজ্জায় লাল হয়ে বল্লে: যাও! তুমি ভারী দুষ্টু।

খানিক রমেনের বুকে নেতিয়ে থেকে বল্লে—এবার ওঠা যাক্।

চল ম্যালটা ঘুরে যাই!

দুজনে ভবিষ্যতের কল্পনায় মেতে চলল!

নগেন হাসলো—তবে? আমার হাসির বাহারটাও ব্যক্ত করা imposible। আচ্ছা, এবার উঠি।

হ্যাঁ কিংবা না ভজহরি কিছুই ব'লতে সাহসী হচ্ছিলো না।

নগেন বুঝতে পারে, তাই আর কিছু না বলে রওনা হয়।

দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ভজহরি জিগ্গেস করলো—খেয়ে দেয়েই বেরুবি নাকি, ভাই?

—কেন?

—না, এমনি।

ভজহরি আর একটু নেশা ক'রে নেবে বলে ঝোলানো পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা বিড়ি নিলো, ধরালো। সেই জানলা, সেই ধোঁয়া, সেই চিন্তা, সব সেই। তারপর নেয়েখেয়ে লম্বা চৌকশ একটা ঘুম দেবে। তার পরমায়ুর পৃষ্ঠা থেকে একটা অক্ষর পড়বে খসে।

এমনি ক'রেই ত এতদিন কাটিয়ে এসেছে। সেই আগেকার কটা দিনের কথা এবার ব'লে নিতে হবে, তবেই জিনিষটা হ'য়ে আসবে সবেজরো।

——

শ্রাবণা বাড়ীর কাছাকাছি এসে বল্লে : আমাদের ওখানে চা খেয়ে তারপর Hotelএ ফিরো।

আজ থাক অন্য দিন আসবো!

শ্রাবণা রমেনের হাতে একটা ঝাকুনি দিয়ে বল্লে : আজ ছাড়লে তো যাবে!

আমাকে দিনে ডাকাতি কোরবে নাকি?

হাঁ কোরবোই তো!

শেষে রমেনকে বাধ্য হয়েই পেছু পেছু যেতে হল।

শ্রাবণার বাবা অজয় বাবু বল্লেন : এসো বাবা এসো! কদিন দেখতে পাইনি কেন, ভাল ছিলে তো?

আজ্ঞে হাঁ। কদিন একটু কাজ পড়েছিল তাই আসতে পারিনি।

আরম্ভ হোল Historyর আলোচনা—জাহাঙ্গীর রাজত্বে প্রজার কত সোনা ছিল। কোহিনুর কোথা হতে এসেছিল। Sepoy Mutiny কেন Stand করতে পারলে না।

রমেনের ভাল লাগে না,—তবু সায় দিতে হয়। আর এসব জেনে কি বা লাভ হবে।

শ্রাবণা চা নিয়ে এল।

চা খাওয়ার পর রমেন উঠে পড়ল।—করি-ডোরটা ঠেলে শ্রাবণার কাছে বিদায় জানালো।

শ্রাবণা জিজ্ঞাসা করলে। বাবাকে কবে বোলবে?

রমেন মাথা চুলকে বল্লে। কাল আসবো।

কখন আসবে?

বিকেলের দিকে!

রমেন রাস্তার ওপর এসে পড়ল।

* * *

রমেনকে অজয় বাবুর কাছে সব লজ্জা ঝেরে ফেলে পানি-প্রার্থি হয়ে দাঁড়াতে হল। দরজার পাশে শ্রাবণার ক্রেপ শাড়ীর এক টুকরা উঁকি দিলে।

মিলনোৎসব

বিমল চন্দ্র ঘোষ

তোমার নয়নে সখি মৌন মদির-ভাষা
কামধূয়া দেহলতা তন্বী,
নির্জ্জন বনপথে মোর বুকে ফুল শর
হানিয়া জ্বালালে কিগো বহ্নি?
জাগিল পুরুষ তা'র অজাগরী তৃষা লয়ে
যুব জনোচিত বীর বক্ষে,
উদগ্র কামনার লেলিহান হোমশিখা
জ্বলিল মাতাল দু'টি চক্ষে।
শ্রোনী ভারালস দেহ রহি রহি কম্পিত
বন্দিনী করি' ভূজ বন্ধে
আদিম নরের বুকে প্রথমানুরক্তির
আস্বাদ দিলে সে কি ছন্দে।
অধরামৃত পিয়ে লক্ষ রোমের কূপ
শিহরিল উছিয়া রক্ত,
আবেশে মুদিনু আঁখি নিমেষে ভুলালে প্রিয়া
স্বকীয়া বা পরকীয়া তত্ব।
দুহু দোঁহা পানে চাহি বিহ্বল অন্তরে,
শিথিল শিথিল নীবি-বন্ধ
আকুল করিল হিয়া আকুল আকুল সখি
মিলনের মোহ মোহ গন্ধ।
চিরদিন জানি সখি তোমার এ লালসার
তীব্র কামনাময়ী তীর্থে,
যৌবন জয়টীকা পরিয়া ললাটে নর
ছুটে আসে কী ব্যাকুল চিত্তে।
পুরুষ বাহুর মাঝে আত্ম সমর্পিয়া
কোথা গেল ভীরু অবগুণ্ঠন
দখিনা বাতাস আসি ও মুখের ওড়নাটি
বুঝি আজ কোরে গেল লুণ্ঠন।
হায়গো লাজুক নারী, রেশমী আঁচল দিয়ে
ঢেকে রাখা যায়না যে বহ্নি
নরের বিরাট ক্ষুধা দাউ দাউ জ্বলি উঠে
ইন্ধন নারীদেহ-তন্বী।
ওষ্ঠে ওষ্ঠে সেকি অসীম পরশ নেশা
বাহুর বাঁধনে সেকি স্ফুর্ত্তি
মর্ত্ত্যের কুহু-রাতে উদয় হ'ল কি আজ
জীবন্ত প্রণয়ের মূর্ত্তি
দ্বৈত লীলার মাঝে কত আধ-আধ ভাষা
সে ভাষার চোখে নামে তন্দ্রা
নাম ও রূপের মোহ বিস্মৃত হ'য়ে যাই
অলকা অতসী মায়া চন্দ্রা
সেদিনের উৎসবে তুমি আর আমি সখি
ভুলে গিয়েছিনু ঘর কন্না
দু'জনার মাঝখানে অবারিত ছিল শুধু
নগ্ন চাঁদের রূপ-বন্যা

———

অজয় বাবু ডাকলেন। শ্রাবণা!...

শ্রাবণা ধীরে ধীরে রমেনের পাসে এসে অজয়বাবুকে দু,জনে প্রনাম করলে।

অজয় বাবু আবেগে দুজনকেই বুকের মাঝে টেনে নিলেন।

বিয়ের দিনটিও স্থির হয়ে গেল।

রমেনের নাইবার খাইবার সময় নেই। এক শাড়ী কিনতেই অস্থির। পাড় পছন্দ হয় তো, রং হয় না—আর রং পছন্দ হয় তো, পাড় হয় না। শেষে পাঁচ সাতটা দোকান ঘুরে মনের মত মিললো।

এমনই সব খুটি-নাটি কাজের মধ্যে দিয়ে, বিয়ের দিনটা এসে পড়ল।

বাড়ীতে তেমন কোন মেয়ে নেই কাজেই বাসরের উপদ্রব ওদের সহ্য করতে হল না।—

নিজেরাই বাসর জাগিয়ে কল্পনার রঙিন স্রোতে ভেসে চললো!

শ্রাবণা বল্লে। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ...র্ণা বেয়ে যাবে, তার পাশে ছোট্ট একটী ...ড় থাকবে। তুমি যাবে শিকারে। সারা ...নের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে। ...মি দৌড়িয়ে গিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ...লে চুমুর পরশ বুলিয়ে দেব।

শ্রাবণা থামলে রমেন বল্লে, আর আমি ...থেকে সব ফুল উজার করে তুলে এনে ...মায় সাজাব। ঠিক যেন ফুলের রাণী। ...ম সবে ঝর্ণার পাশে ওই উঁচু-বেদিটায়। ...জের হাতে গাঁথা মালাটা, তোমায় গলায় ...য়ে দিয়ে; বেদি-মূলে ভক্ত-পূজারীর ... মুখ পানে চেয়ে বসে থাকবো,—যুগ ...ন্তর ধরে।

দুজনেই হেসে উঠল।

* * *

রমেন মেঘদূত খানা মেলে শ্রাবণার ...পেক্ষা করছিল, শ্রাবণা চুপি চুপি পিছন ...কে রমেনের চোখ দুটো চেপে ধরল।

রমেন শ্রাবণাকে বুকের মাঝে টেনে নিল।

লক্ষিটী! ছেড়ে দাও, এক্ষুনি বিন্দি এসে পড়বে।

দরজার বাইরে বিন্দির সাড়া পাওয়া গেল।

শ্রাবণা ব্যস্ত হয়ে বল্লে: ছুটি পায়ে পড়ি।—ছি, ছি, দেখে ফেল্লে তখন লজ্জার একশেষ।

দেখলে তো ভারী বয়ে গেল।

তোমার আর কি, শেষে আমাকেই কথা শুনতে হবে।

শ্রাবণা জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে।

বিন্দি এসে খাবারের প্লেট-টা টেবিলের ওপর রেখে গেল।

রমেন একটা সিঙ্গাড়া নিয়ে শ্রাবণাকে বল্লে: আগে তুমি খাও।

বড্ডো তোমার বিদঘুটে বায়না। মেয়ে-দের যখন তখন খেলে কি চলে?

আর আমরা বুঝি যখন তখন খাই, তাছাড়াও পিসিমাকে বলে দিচ্ছি আমায় পেটুক বলা হচ্ছে।

ওমা, তোমায় আবার পেটুক বল্লুম কখন্।

পিসিমা ডাকলেন, বৌমা—

শ্রাবণা তাড়াতাড়ি পিসিমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে,—ডাকছিলেন পিসিমা?

ছুব্যোয় কোকগুলো বেছে দাও তো মা, বুড়ো হয়ে পড়েছি এখন আর নজর চলেনা মা।

রমা হাঁপাতে হাঁপাতে, এসে বল্লে, উঃ! কি মেয়ে তুমি বৌদি, আমি সারা বাড়ী তোলপাড় করছি, আর তুমি কিনা এই ঠাকুর ঘরে বসে।

দাঁড়া ভাই। এই গুলো বেছে দিয়েই যাচ্ছি।

আমি তাহলে ঘরে রইলুম, পিগ্‌পিগ্‌ পিগ্‌পিগ্‌ এলো, জানলে।

আচ্ছা।

খানিক বাদে, শ্রাবণা এসে রমার পিঠে ছোট্ট একটা কিল দিয়ে বল্লে, কি রে কি করছিস্‌।

রমা এমব্রয়ডারী ফ্রেমটা এগিয়ে দিয়ে বল্লে: ঠিক করে দেখিয়ে দাওনা বৌদি, তখন থেকে কিছুতেই হচ্ছে না।

বাবা রে বাবা! কি যেন, সকাল হতে না হতেই সেলাই নিয়ে বসলেন। ভালও লাগে—কৈ দেখি।

রমা ফ্রেমটা এগিয়ে দিলে।

* * *

শ্রাবণার ভাবী-মাতৃত্বের সংবাদ চার ধারে ছড়িয়ে পড়ল।

রমেনও শুনতে পেলে।

শ্রাবণা এক অজানা পুলকে, শিউরে উঠল। পিসিমা শ্রাবণার ওপর চোখ রাখলেন পাছে কোন ভারী কাজ না করে।

শ্রাবণার চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগেনা। তবু থাকতে হয়, পিসিমার আদেশ।

শেষে তাদের মাঝে এক ক্ষুদ্র শিশু এসে পড়ল।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন। কি হোল রে?

ছাই বল্লে, মেয়ে!

রমা বল্লে,—শেষে একটা মেয়ে!

পিসিমা বল্লেন: মেয়ে বলে কি ফালনা, ওই যার কোল জুড়ে বেঁচে বর্ত্তে থাক।

* * *

শ্রাবণা মেয়েকে নিয়ে মহা ব্যস্ত।

রমেনকে বল্লে: তুমি খুকিকে তো একবারও নিলে না।

রমেন বল্লে: যে নরম ভয় হয়।

দেখছো! তোমায় ঠিক চিনতে পেরেছে, মেয়ের দিকে চেয়ে বল্লে, এই দুষ্টু এদিকে চা,—ওমা! কি দুষ্টু কিছুতেই চাইবেনা।

ঠিক তোমার মত!

ইস্‌ আমার মত। দেখনা তোমার মতই দুষ্টু হচ্ছে,—আচ্ছা! এর কি নাম রাখা যায় বলতো?

আমি বলে যাচ্ছি তুমি বেছে নাও!

বেশ! তুমি বল আমি বেছে নিচ্ছি।

শুভ্রা, জ্যোতি, বীথি, নীলা, রেণু, রেখা, ডলী……না: তোমার দেখছি একটাও পছন্দ হয় না।

পছন্দ হয়না তো কি করবো,

রমেনও ছাড়ে না।

শেষে স্থির হোল ফাল্গুনী, আর ওই ছোট্ট শিশুকে নিয়ে গড়ে তোলে ভবিষ্যতের বিরাট ভিত্তি।

* * *

অদৃশ্য কালের দণ্ড ধেয়ে আসে; তাই এখানকার সব দেনা পাওনা চুকিয়ে আঁধার লোকে পাড়ি দিতে হয়।

লোকে বলে শিশু স্বর্গের: সেই জন্যই বোধ হয় পৃথিবীর মানুষ তাকে ধরে রাখতে পারে না।

তাই ফাল্গুনীও একদিন ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়!

এই আঘাতে শ্রাবণা লুটিয়ে পড়ে।

কালের গতি বেয়ে যায়, মানুষের স্মৃতিও বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবে আসে,—সংসারে আবার শিশুর হাসি ভরে ওঠে।

বাস্তবের চাপে কল্পনার রঙিন-নেশাও কেটে আসে।

* * *

বরষের চাকা, তার শাশ্বত নীতিতে ঘুরতে থাকে!

বর্ত্তমান যায় অতীতে, ভবিষ্যত আসে বর্ত্তমানে, আর অতীত শোনায় তার ইতিবৃত্ত।

পিসিমা প্রিয় জনের উদ্দেশ্যে মহা-প্রস্থানের পথে পাড়ি জমালেন।

রমাও তার কুমারী জীবনের অবসান দিলে।

আর শ্রাবণা বধূত্বের কুণ্ঠা কাটিয়ে গৃহিনীর পদে অভিষিক্ত হল।

যৌবনে—জরা বীভৎস মূর্ত্তিতে দেখা দেয়! তখন মানুষ তার পিছন টানে থমকে দাঁড়ায়,—তাই সে স্রোতে আসে মন্থরতা!

শ্রাবণা রমেনকে বল্লে। হাঁ গা, এখনও বসে বসে তামাক খাচ্ছ, বাজার হাট আজ কি আর হবে না, বাড়ীতে যে কুটুম আসছে, সে কি হাওয়া খেয়ে থাকবে?

কুটুম আর কে? আসবে তো রমা।

হাঁ গো হাঁ, সে আমিও জানি।—এখন দয়া করে উঠবে না বসে থাকবে?

শ্রাবণা?

কি:, কি:, কি:?

আজ তোমায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে শ্রাবণা।

তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হোল নাকি?

মাথা আমার ঠিকই আছে শ্রাবণা,—তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন নিজেদের সত্তা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি, তাই বলছিলুম, সেই আগেকার মত গলা জড়িয়ে আমার পাশে বসনা—শ্রাবণা।—সত্যি লোভ হয়!

শ্রাবণা তীক্ষ্ণ স্বরে বল্লে: কি?—বুড়ো মিন্‌সে লজ্জা করেনা,—যতো বুড়ো হচ্ছে তত ঢং বাড়ছে। ছি, ছি!

স্তব্ধ রমেন আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে, গোলাপের ফুলও সৌরভের চেয়ে—তবে কি কাঁটাই সত্যি!

জীন হার্লোর আসছে ছবি "সুজী" থেকে ওপরের দৃশ্যটী—ছবিতে ক্যারী গ্র্যাণ্ট ও জীন হার্লো।

ও পারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

ছোট মোটর চালক

অবশেষে শার্লিও মোটর চালাতে সুরু করলে। ছোট মেয়ে, তা কি! হলিউডের মোটর-বিলে চলে কি করে? হলিউডের মেয়ে, দেশ বিদেশে তার নাম, সে মোটর চালিয়ে এসে ষ্টুডিওতে ঢুকবে না, তাও কি কখনো হয়! তাই শার্লি গাড়ী কিনেছে, গাড়ী চড়ছে, গাড়ী চালাচ্ছে।

শার্লির গাড়ী—ছোট্ট গাড়ী; এক সিলেণ্ডারের তার এঞ্জিন; খুব ছোট্ট সেটা। ইঞ্জিনটা হবে উঁচু মোটে তিরিশ ইঞ্চি আর প্রায় ছ' ফিট হবে লম্বা। সেই গাড়ীতে এক গ্যালন পেট্রল চালো, যাবে অনেক—অনেক দূর;—কোথায় যে কোন দেশে চলে যাবে, কে তার খোঁজ রাখবে!

ভাগ্যিস্, এই রকমে যে শার্লি টেম্পল এখন রূপকথার বইয়ের ওপরে এসে দাঁড়িয়েচে। ওর ওই ছোট্ট বুকের বাসনা, ওর ওই অরুণ আঁখির আশা বাস্তবের গায়ে রঙ ফলাচ্চে; স্বপ্নের সুষমা, কল্পলোকের কোমলতা সোণার কাটি সিকেয় তুলেচে। আর গাড়ীটাও তো পক্ষীরাজ ঘোড়া নয়।

শিরলি টেম্পল

সেটার গতির বেগ ওঠে ঘণ্টায় আট মাইল পর্য্যন্ত।

ভাঙ্গন

বিয়ের ভাঙ্গন বোধ হয় এইবার ওদের মধ্যেও দেখা দিল। ওদের আর মতে মিলচে না। জিন্জার রোজার্স বলে; এটাই আমার বেশ ভাল লাগে, লিউ আয়ার্স বলে ওটাই আমার ভাল লাগে না। এই নিয়েই যত অশান্তি, যত উপদ্রব এসে পড়চে ওদের মধ্যে। তাই ওরা এবার ঘর ছাড়ল। জিন্জার গেচে মায়ের কাছে আর লিউ আয়ার্স গেচে কুমারদের আস্তানায়। দেখা যাক, এতে যদি ওদের বিরহ জেগে ওঠে আবার তেমনি করে আগের মত ভালবাসতে পারে।

ওদের বিয়ে হয়েচে আজকে নয়। সেই অনেকদিন আগে; সে বিয়ে আজ বেশ পুরোণো হয়ে গেচে। তবু ছাড়াছাড়ি হোল। হলিউডের একটা সুখী পরিবারের ভাঙ্গন

দেখা দিল। এই ভাজনের কারণে আর যাই থাক, একটা কারণ বেশ বড় করে দেখা যায় তা হচ্ছে জিন্জার রোজার্সের নাম। জিন্জারের নামের গরিমা যদি এত প্রবল না হয়ে উঠত তাহলে এ ভাজন দেখা দিত কিনা তা বলা শক্ত। সত্যি কথা বলতে কি, জিন্জার যেভাবে দিন দিন উন্নতির সোপানে উঠচে সেভাবে লিউ আয়ার্স উঠতে পারেনি, পারবেও না।

ই জে কালসিপার হচ্ছে একজন অভিনেতা। জিন্জার রোজার্সের আগের স্বামী ছিল ওই; আর লিউ আয়ার্সের আগের স্ত্রী ছিল লোলা লেন।

লোলা লেন আজও বিয়ে করেনি।

ফ্রেডির আয় কমে গেল

যাই হোক আটাশ পাউণ্ড! তাই বা ছাড়ে কি করে?—তবু ছাড়তে হবে। গভর্ণমেণ্টের আইন; আইনের নিয়ম! ফ্রেডি

ফ্রেডি বারথোলোমিউ

দুঃখ করলে কি হবে?—ওকে যে মানতেই হবে।

১৯১৬ সালে ফ্রেডির বাপ অশ্বারোহী সৈনিক হিসাবে রয়াল ক্যানাডিয়ান ড্রাগুন্স্ দলে যোগ দেন। পশ্চিম সীমান্তে কাজ করবার সময় তাঁর পা যায় নষ্ট হয়ে; কাজেই তাঁর ছেলে এবং দুই মেয়ে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সাহায্য পায়। সে সাহায্যই হচ্ছে প্রত্যেকের বছরে আটাশ পাউণ্ড আয়।

ক্যানাডার গভর্ণমেণ্ট ভাবেন ফ্রেডির আয় অনেক; বছরে আটাশ পাউণ্ড কমে গেলে বিশেষ কিছু এসে যাবেনা। এখন ফ্রেডির আয় হচ্ছে বছরে প্রায় পনেরো হাজার পাউণ্ড। এ থেকে আটাশ পাউণ্ড কমে গেলে ফ্রেডির খুব বড় ক্ষতি হবেনা সত্যিই তবু ফ্রেডি বলে; ওটাই বা কেন যাবে!

ইমাইল কল

ইমাইল কল-এর নাম আপনারা শোনেন নি। ওর মাথা থেকেই প্রথম মিকি মাউস জন্ম নেয়। সজীব কার্টুনের আইডিয়া ওই প্রথম দেয়। ভদ্রলোকটি থাকেন ফ্রান্সে, বয়স তাঁর আশী বছর, এবং মাসে সাত ডলার মহৎ হৃদয়ের করুণার দানের মত অর্থ গ্রহণ করে অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন।

জ্যাক ওকে

আজ প্রায় আট বছর হয়ে গেল জ্যাক ওকে আছে প্যারামাউণ্ট ষ্টুডিওতে। কোন এক ষ্টুডিওতে ঢোকা এবং সেখানেই কাজ করে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যারা চায়, জ্যাকও ঠিক ওই দলের লোক। ওর ইচ্ছে নেই তবু

জ্যাক ওকে

ছাড়বে। এই আগষ্ট মাসেই ওর প্যারামাউণ্টের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছিন্ন হবে। তারপর, শুনচি টোয়েন্টিয়েথ ফক্সের কাগজে সই করবে।

অসার-আস্ফালন

পঞ্চানন দত্ত

ঘুড়ি কয় বালকেরে আকাশে উঠিয়া,
"কত উর্দ্ধে উঠিয়াছি দেখনা চাহিয়া,—
ধুলার জগৎ ত্যজি' স্বরগে উঠেছি
মূঢ় যতো শিশুগণে অবাক্ করেছি।"
শুনিয়া বালক কহে হাসিতে হাসিতে
"সুতার বিহনে তুমি পার কি উঠিতে?
তোমার জীবন আমি রেখেছি বাঁধিয়া
প্রাণ যাবে যদি দিই সুতাটি কাটিয়া,
মূর্খ তুমি তাই কর বৃথা আস্ফালন
আমার 'লাটায়ে' তব জীবন মরণ।"

———

খুচরো খবর

চিত্র-রাজ্যের একজন খুব পুরোণ লোক হচ্ছে কার্ল লেমিও—ইউনিভার্সাল ষ্টুডিও কর্তা।

* * *

বারবারা ষ্ট্যানউইক আগে ছিল মিশনারী

* * *

ডলরেস্ ডেলরিও নামবে ডগলাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ জুনিয়ার-এর সঙ্গে 'টু ইউ মা লাইফ' ছবিতে। প্রডিউসার হিসেবে ডগলাসের এই হচ্ছে দ্বিতীয় ছবি।

* * *

গেল প্যাটিক হচ্ছে আইরিশ মেয়ে চিঠি পায় বেশী স্পেন আর ইটালি থেকে।

* * *

রিচার্ড আরলেন ছায়াছবিতে কাজ করছে আজ ষোল বছর ধরে।

ফিরে আসা

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী

সমুদ্রের একঘেয়ে ছোট ছোট তরঙ্গগুলি এসে কূলের উপর সজোড়ে আছড়ে পড়ছে। জোর বাতাসের ঠেলা পেয়ে ছোট ছোট শাদা শাদা মেঘগুলি বিস্তৃত নীল আকাশে শাঁ শাঁ করে সরে যাচ্ছে। পাহাড়ের যে ঢালু ক্রমশঃ নীচু হয়ে হয়ে সমুদ্রের তীরে এসে মিশেছে তার উপর একখানি ছোট গ্রাম রোদ পোহাতে পোহাতে যেন ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

গ্রামে ঢোকবার মুখেই রাস্তার ধারে আমিনা বিবির একেলে সঙ্গিহীন বাড়ী। এটা একটা জেলের কুটীর,—মাটীর দেওয়াল, পাতার ছাউনি। দোরের সুমুখে ছোট একখানি সতরঞ্চীর মতো চারকোণা বাগান, তাতে কিছু কিছু শাক্-সব্জী দেওয়া আছে: রাস্তা ও বাগানের মাঝখানে বেড়া দেওয়া।

স্বামী গেছে মাছ ধরতে, আর কুটীরের সুমুখে আমিনা দেয়ালের গায়ে টাঙানো প্রকাণ্ড মাকড়শার জালের মতো একখানা মস্ত কটা রঙের জাল মেরামত করছে। বাগানে ঢোকবার পথের উপর একটা চোদ্দ বছরের মেয়ে চেটাই-এর উপর বসে পূর্ব্বে শতবার তালি দেওয়া কাপড় জামাগুলিতে আবার নূতন করে তালি লাগাচ্ছে। আর একটা মেয়ে (তার চেয়ে বছর খানেক ছোট) একটী ছোট্ট শিশুকে আদর করছে; শিশুটী এখনও কথা কইতে কি চোখমুখ নাড়তে শেখেনি। দুবছর ও তিন বছরের দুটী ছোট ছেলে মেয়ে মাটীর উপর মুখোমুখি বসে মুঠো-মুঠো ধূলো নিয়ে এ ওর গায়ে দিচ্ছে।

কারো মুখে কথা নেই। শুধু ছোট শিশুটী তার দিদির সমস্ত আদর ও ঘুম পাড়াবার চেষ্টা ব্যর্থ করে চিল-চঁচান-স্বরে অনবরতই চিৎকার করছে। একটা হুলো বিড়াল জানালার পীড়ির উপর বসে ঝিমুচ্ছে, আর এক ঝাঁক মৌমাছি দেয়ালের গোড়ায় বেগুনী রঙের কতকগুলি ফুলকে বেষ্টন করে গুণ গুণ করতে করতে মহা হৈ চৈ লাগিয়েছে।

পথের উপর যে মেয়েটী বসে সেলাই করছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে ডেকে উঠল—'মা'! আমিনা জিজ্ঞাসা করলে,—'কি রে?—কি হয়েছে?'

'আবার এয়েছে।'

সকাল থেকে বাড়ীর সবাই যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘটনাটা সামান্য বটে, কিন্তু তাতেই এই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একটা লোক সারা সকালটা বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—ভিখিরির মতো একটা বুড়ো লোক। বাড়ীর সকলে যখন কন্তাকে নৌকায় তুলে দিতে যায়, তখন এই লোকটার সঙ্গে তাদের প্রথম দেখা। বাড়ীর সুমুখে রাস্তার উপর সে বসেছিল। সমুদ্রতীর থেকে ফিরে আস্‌বার সময় তারা দেখলে সেই লোকটা ঠিক সেইখানে এক ভাবেই বসে আছে—এক দৃষ্টিতে বাড়ীর দিকে চেয়ে।

দেখলেই মনে হয় লোকটী রোগগ্রস্ত, আর ভারি কষ্টে পড়েছে। এক ঘণ্টার উপর সে সেখান থেকে নড়ল না; তারপর যখন বুঝলে যে বিনা কারণে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে লোকে তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করেছে, তখন উঠে পড়ল যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়, আর অতিকষ্টে পা টেনে টেনে চলে গেল।

কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই দেখা গেল আবার ফিরে এয়েছে ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে, অতি ধীর পদবিক্ষেপে; এবং আর একবার এসে রাস্তার উপর বসে পড়ল,—এবার কিন্তু বাড়ী থেকে একটু দূরে, যেন বাড়ীর লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করাই তার উদ্দেশ্য।

বাড়ীর সকলেই ভয় পেলে, বিশেষ আমিনা। আমিনা একটু ভীতুস্বভাবের মেয়ে মানুষ,—বড়ই দুর্ভাবনায় পড়ল, তার স্বামী পীর বক্স সন্ধ্যা না উত্তরোলে বাড়ী ফিরবে না।

তার স্বামীর নাম পীর বক্স; কিন্তু আমিনা তার সাবেক নাম আমিনা 'আলি' বজায় রেখেছে; এবং এই দম্পতিকে লোকে আলি বক্স বলে ডাকত। এর একটু ইতিহাস আছে, তাহা সংক্ষেপে এই:—আমিনার প্রথম সাদি হয়েছিল জের আলির ছেলে জবেদ আলির সঙ্গে। জবেদ করত জাহাজে মাল্লাগিরি। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে যেত বারোজা; সেখানে তার মাছের খেলোর কারবার ছিল।

বে'র পর দুবছরের ভিতর আমিনার একটা মেয়ে হল; আর একটী সন্তান হব-হব হ'য়েছে এমন সময়, জবেদ যে জাহাজে বারোজা যাচ্ছিল তা কোথায় উধাও হয়ে গেল, তার আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

জবেদের কোন খবরই মিললো না, নাবিক মাল্লারা কেউই ফিরল না,—সবাই মনে প্রাণে বুঝলে আরোহী-মাল্লা সবাইকে নিয়ে 'হীরে নূর' জাহাজ খানি সমুদ্রের অতল জলে শুয়ে চির-বিশ্রাম লাভ করছে।

আমিনা দশ বৎসর তার স্বামীর ফিরে আসার প্রত্যাশায় রইলো, আর অসীম কষ্টে মেয়ে দুটিকে লালন পালন করতে লাগল। সে ছিল যেমনই কার্য্যদক্ষ, তেমনই পরিশ্রমী; জবড় কাজের লোক দেখে সেই গ্রামের এক জেলে, পীর বক্স, তাকে নিকে করবার প্রস্তাব

করলে ; লোকটা বিপত্নীক, একটী ছোট ছেলে নিয়ে বড়ই ঝঞ্ঝাটে পড়েছিল,—সংসারে আর কেহ ছিল না। আমিনা তাকে নিকে করলে, আর তিন বছরের ভিতর তার আরও দুটী ছেলে মেয়ে হল।

বড়ই কষ্টে দিন চলত তাদের। মাংস দুধ তারা চোখে দেখতেও পেত না। ঝড় বাদলের সময় ব্যবসা যখন মন্দা চলত, মুদীর দোকানে তাদের ধার হত। যা হোক্, কোন রকমে ছেলেমেয়েগুলি বড় হতে লাগল। লোকে বলত,—'আলি বক্স বড়ই সরেস লোক। আমিনার তো অমুবুরি গতর, আর পীর বক্স—মাছ ধরায় ওর যুড়ি নেই।'

পথের উপরকার সেই মেয়েটী আবার বললে,—'বোধ হয় ও আমাদের চেনে। কন্তেপুর কি দরগাপুরের কোন লোক নয় তো ?'

মা সে কথার কাণও দিলে না। না—না, পাশওয়ালি গ্রামের কোন লোকই সে নয়, সে বেশ জানে।

লোকটা তাদের বাড়ীর দিকে স্থির-দৃষ্টি নিহিত রেখে একেবারে খুটীর মতো নিশ্চল হয়ে বসে রইল দেখে আমিনা ভারি চটে গেল ; ভয়ে মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়ল একখানা লাঙল নিয়ে।

"কি করছ গা ওখানে বসে ?' সে খুব চেঁচিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলে।

ভাঙা ভাঙা স্বরে জবাব এল,—'অ্যা,— এই একটু দম নিচ্ছি। তা—এতে তোমাদের কি ক্ষতি হচ্ছে ?'

"আমার বাড়ীর দিকে অমন করে বাজ-পাখীর মতো চাউনি দিচ্ছ কেন ?"

'আমি ত কারো কোন অনিষ্ট করি নি। রাস্তায় একটা লোক বসে থাকলে কার কি ক্ষতি ?'

এর আর কোন জবাব নেই দেখে আমিনা ঘরে ফিরে এল।

দিনটা আর কাটিতে চায় না। দুপুর বেলা লোকটা গা-ঢাকা দিলে। আবার পাঁচটার সময় এল। সন্ধ্যা বেলা থেকে তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার পর পীর বক্স বাড়ী ফিরল। সব শুনে বললে—'একটা চোর ছেঁচড় কি ঐ রকম কিছু হবে আর কি।'

নিশ্চিন্ত মনে পীর বক্স ঘুমুতে গেল ; আমিনার কিন্তু সমস্ত রাত ঘুম হলনা, আগন্তুকের চেহারা আর তার অদ্ভুত রকমের চাহনি তার সর্ব্বদাই মনে পড়তে লাগল।

ভোর থেকে প্রবল ঝড় সুরু হল। পীর বক্সের সেদিন মাছ ধরতে যাওয়া হল না। সে বাড়ীতেই রইল, আর বসে গেল আমিনার জাল মেরামত করতে।

বড় মেয়েটী দোকান থেকে কিছু জিনিষ-পত্তর আনতে গিছল। বেলা আন্দাজ ন'টা। ছুটতে ছুটতে বাড়ীর ভিতর এল, ভয়ে মুখখানা পাংশুবর্ণ ; হাঁপাতে হাঁপাতে চাপা গলায় বললে—'মা, মা, আবার এয়েছে।'

আমিনার দেহে যেন একটা কিসের কম্পন—কিসের শিহরণ উপস্থিত হল। স্বামীর দিকে চেয়ে বললে,—যাওনা একবার ওর কাছে। বাড়ীর আশে পাশে যাতে ওরকম করে না ঘুরে বেড়ায় তাই কর। লোকটা যে আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।'

পীর বক্স দীর্ঘাকৃতি পুরুষ,—রংটা তামার পয়সার মতো, মুখে লালচে দাড়ী, চোখ দুটো কটা, গর্দ্দান বেশ মোটা, তাতে সর্ব্বদাই একখান গরম কাপড় জড়ানো থাকে। ধীর শান্তভাবে চলতে চলতে লোকটীর সুমুখে এসে দাঁড়াল।

তাদের কথাবার্ত্তা হতে লাগল।

আমিনা আর তার ছেলেমেয়েরা বিলক্ষণ উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার সহিত দূর থেকে তাদের দেখ ছিল।

হঠাৎ সেই আগন্তুক দাঁড়িয়ে উঠল, এবং পীর বক্সের সঙ্গে বাড়ীর দিকেই আসতে লাগল।

আমিনা ভয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়বার উপক্রম করছিল, তার স্বামী তাকে ডেকে বললে—'একে দুটো ভাত আর একটু ঠাণ্ডা জল দাও। লোকটা তিন দিন অনাহারে আছে।'

তারা দুজনেই কুটীরের ভিতর এল, আমিনা ও তার ছেলেমেয়েরা পিছন পিছন ঢুকল।

লোকটা বসে ঘাড় হেঁট করে খেতে লাগল, সবাই হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইল। আমিনা নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে তার মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগল। তার দুটী বড় মেয়ে দোরে পিঠ-ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে—একজনের কোলে সেই ছোট শিশুটি—আগন্তুকের দিকে নির্নিমেষে নিবিষ্টদৃষ্টি। ছোট দুটী ছেলেমেয়ে উনুনের ছাইয়ের উপর বসে পোড়া চাটু নিয়ে যে খেলা করছিল তা ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আগন্তুকের দিকে।

পীর বক্স বসল সেখানে এসে, জিজ্ঞাসা করলে,—'তাহলে অনেক দূর থেকে আসছ?'

'চট্টল থেকে আসছি।'

'এই রকম হেঁটে হেঁটে?'

'হাঁ, এই রকম হেঁটে হেঁটেই। পয়সা না থাকলে আর উপায় কি?'

'কোথায় যাবে?'

'এই খানেই।'

'এখানে কারো সঙ্গে জানা শোনা আছে বোধহয়?'

'বোধহয় থাক্‌তে পারে।'

দুজনেই চুপ করলে। ক্ষুধার্ত্ত হলেও লোকটা খুব আস্তে আস্তে খাচ্ছিল; আর এক এক গ্রাস ভাত খাবার পর একটু করে জল চুমুক দিচ্ছিল। আর মুখ-মণ্ডল শ্রান্ত, শীর্ণ, কুঞ্চিত। দেখলেই বোধহয় বড় কষ্ট পেয়েছে।

পীর বক্স হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে,—'তোমার নামটা কি?'

মাথা না তুলেই লোকটা জবাব করলে,—'আমার নাম জবেদ আলি।'

আমিনার সর্ব্ব শরীর কেঁপে উঠল। আগন্তুককে ভাল করে দেখবার জন্য এক পা এগিয়ে তার সুমুখে এসে দাঁড়াল। তার হাত দুখানি অবসন্নতায় দুপাশে বিলম্বিত, তার মুখখানি বিস্ময়ে বিস্ফারিত। দুজনের কেউ কথা কইলে না।

পীর বক্স আবার জিজ্ঞাসা করলে,—'তোমার বাড়ী কি এখানে?'

সে বললে 'হাঁ, এখানে।'

এইবার সে আমিনার দিকে চাইলে। চোখে চোখে মিলন হল,—উভয়ের দৃষ্টি পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ—মিলিত, যেন আঠা দিয়ে জোড়া।

হঠাৎ আমিনা চেঁচিয়ে উঠল,—তার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত—কম্পিত—ভগ্ন—'তুমি—তুমি ?'

ধীরে ধীরে সে বললে,—'হাঁ, আমি।'

লোকটী একটুও বিচলিত হল না। যেমন খাচ্ছিল তেমনিই খেতে লাগল।

চাঞ্চল্য অপেক্ষা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পীর বক্স কম্পিতকণ্ঠে বললে,—'তুমি—তুমিই সেই জবের ?'

আগন্তুক সংক্ষেপে উত্তর করলে,—'হাঁ, আমিই সেই।'

দ্বিতীয় স্বামী জিজ্ঞাসা করলে,—'এতদিন কোথায় ছিলে ?'

'মনুভী দ্বীপে' আমাদের জাহাজখানা বারোগুর কাছ বরাবর গিয়ে প্রকাণ্ড ঝড় খেলে। পাল, হাল, মাস্তল সব ছিঁড়ে ভেঙে গেল। 'হীরে নূর' ছুটল বুনো মহিষের গোঁ নিয়ে। কিছুতেই ঠেকাতে পারা গেল না। শেষ এক বালির চড়ায় পড়ে ডুবে গেল। আমরা তিনজনে, সাঁতরাতে সাঁতরাতে ভাসতে ভাসতে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠলুম,—গোলাম, মালেক আর আমি। সেখানে পড়লুম বুনো অসভ্যদের হাতে। তারা বারটী বছর আটকে রাখলে। গোলাম, মালেক মারা গেল। কতদিন পরে সাহেব কোম্পানীর একখানা সওদাগরি জাহাজ সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা দয়া করে তুলে নিলে আমাকে তাদের জাহাজে,—নামিয়ে দিলে চট্টলে। সেখান থেকে আসছি।'

কাপড়ে মুখ ঢেকে আমিনা কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

পীর বক্স বলে উঠল—'এখন কি করা যায় ?'

জবের জিজ্ঞাসা করলে,—'তুমি কি একে নিকে করেছ ?'

পীর বক্স বললে—'হাঁ।'

তারা পরস্পরে মুখের দিকে চেয়ে রইল নীরবে। ছেলেমেয়েগুলিকে একে একে দেখে, জবের বড় দুটীর দিকে চেয়ে মাথা নাড়লে :—'এ দুটী আমার ?'

পীর বক্স বললে—'হাঁ, এ দুটী তোমার।'

জবের উঠে তাদের আদর করবার কোন ভাব দেখালে না ; শুধু বললে 'হা আল্লা। এত বড় হয়েছে !'

পীর বক্স আবার বললে,—'এখন কি করা যায় ?'

জবের হতবুদ্ধি হয়ে প্রথমতঃ উত্তর দেবার কিছু খুঁজে পেলে না। তারপর চেষ্টা করে মনটাকে ঠিক করলে।

'আমার কথা হচ্ছে—তুমি যা বলবে আমি তাই করব। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করতে চাইনি। এই বাড়ীটা নিয়েই একটু গোলমাল। আমার দুটী, তোমার তিনটী ছেলেমেয়ে ; যে যার ছেলে মেয়ে নেবে। তারপর তাদের মা,—ওর কি হবে ? তোমার, না আমার ? তুমি যা বলবে তাতেই আমি রাজী আছি। কিন্তু বাড়ীটা আমার নিজের,—পৈতৃক, আল্লার জন্মস্থান। তা ও জানে, তার দলীলপত্রও উকীলবাড়ীতে জিম্মা আছে।

কাপড়ে মুখ লুকিয়ে আমিনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। বড় দুটি মেয়ে এতক্ষণে কাছে এগিয়ে এসেছে, আর তাদের বাপকে ভাল করে দেখ্‌ছে—নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে।

জবেরের খাওয়া এতক্ষণে শেষ হল। এবার সে-ই প্রশ্ন করলে—"এখন কি করা যায় ?" পীর বক্সের মাথায় একটা মতলব জোগাল—"চল, মোল্লার কাছে যাওয়া যাক্‌,—সে একটা ঠিক করে দিক।"

জবের দাঁড়িয়ে উঠল, আমিনার দিকে একটু এগুতেই আমিনা তার পায়ের কাছে বসে পড়ে তার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরলে, আর কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল,—"খসম আমার খসম,—এতদিনে তুমি এলে ?" প্রথম যৌবনের সেই সব সুখের স্মৃতি এককালে তার মনে উদিত হয়ে তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেললে।

জবেরও আবেগভরে আদর করে আমিনার হাত ধরে তুললে। উঠানের কাছে যে দুটী ছেলে মেয়ে বসেছিল, তাদের মাকে কাঁদতে

সাহিত্য-পরিচয়

মোহনভোগ—শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত। মোহাম্মদী বুক এজেন্সি, ৯১, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ছেলেদের উপকথার বই। যাহাতে ছেলেপিলেরা পড়িয়া কিছুতেই অর্থ না বুঝিতে পারে, সেই জন্য লেখক বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ছয়-বেছয় উর্দ্দু বয়েৎ লাগাইয়া দিয়া বইখানির সুরৎ বাড়াইয়াছেন। লেখক প্রথম পৃষ্ঠাতেই জানাইয়াছেন, "রাজার দবদবায় 'দুষমনেরা কেউ কি মাথা তুলতে পারতো'।" এরূপ "দবদবায়"-মান রাজা সাহিত্যে থাকিলে হোসেন সাহেবের হাত-চুলকানিও হয়ত নিবৃত্ত থাকিত। উর্দ্দোপ্লুত ভাষায় বই লিখিয়া যশস্বী হওয়ার গরজ বর্ত্তমান মুসলিম লেখকদের কত বেশী, ইহা যাহার জানা নাই সে 'মোহনভোগ' পড়িয়া হয়তো এরূপ ধারণাই করিয়া বসিত যে, হোসেন সাহেব হয় ভালরকম বাংলা জানেন না, নয় ভালরকম উর্দ্দু জানেন না। তাই কোনরকমে অশ্বতরী ভাষায় কেচ্ছা লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে "তাজিম" করিয়া, এমন কি "কদম-বুছি" করিয়া "আরজ" করি, তিনি যেন অতঃপর বাংলা দেশবাসীর ভাষায় লিখিয়া উক্ত দেশের "বাল্‌বাচ্চা"দের "মকছুদ" পূর্ণ করেন। অবশ্য, আমাদের "শোকর-গোজারি"র কোন ফল ফলিবে কি না, তাহা নিতান্তই সন্দেহের বিষয়।

দেখে, তারাও এক সঙ্গে কান্না জুড়ে দিলে। সর্ব্ব কনিষ্ঠটি, জবেদের ছোট মেয়ের কোল থেকে আবার চিল-চেঁচান সুরু করলে।

পীর বক্স জবেদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। খানিকক্ষণ পরে বললে,—"এস, এটা যাহোক, একটা নিস্পত্তি করে ফেলা যাক্।"

জবেদ আমিনার কাছ থেকে সরে এল। বড় দুটী মেয়ের দিকে তার চোখ পড়ায় আমিনা বলে উঠল—"তোরা দুজন তোদের বাপকে গড় করবি নি?"

ভয়ে বিস্ময়ে হক্‌চকিয়ে তারা দুজন জবেদের কাছে গেল, চোখে এক ফোঁটা জল নেই। জবেদও তাদের দাঁড়ি ধরে চুমো খেলে। সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশুটি সেই অপরিচিত আগন্তুককে এত কাছে ঘেঁসে আস্‌তে দেখে এমন ভয়ানক চিল-চেঁচাতে লাগল যে বোধ হয় দম আটকে মারা যাবে।

দুই খসমে তখন পাশাপাশি বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়ল।

যাবার পথে একটা হোটেলের কাছে এসে পীর বক্স বললে,—"এক পেয়ালা চা খেয়ে গেলে হয় না?"

"আমার?—হলেও হয়, না হলেও হয়।" —জবেদ উত্তর করলে।

হোটেলের ভিতর ঢুকে পড়ে তারা একটা ঘরে গিয়ে বস্‌ল। অত সকালেও হোটেল ভোঁ ভ্যাঁ,—কেউ নেই।

"কোথা গা হামিদ চাচা,—একটু চা চাই যে। এই দেখ জবেদ ফিরে এসেছে। জবেদ—আমার স্ত্রীর খসম। জবেদকে মনে নেই? —সেই যে ডোবা "হীরে মুন" জাহাজের জবেদ।"

স্থূলকায় লোহিত-গণ্ড স্ফীতোদর হোটেল-ওয়ালা মহাশয় এক হাতে চা'র পেয়ালা আর এক হাতে সান্‌কি চামচ নিয়ে বেরিয়ে এল, আর নিতান্ত প্রশান্ত স্থিরভাবেই বললে—"ওঃ। ওঃ। তবে জবেদ আবার এলে?"

জবেদ বললে—"হাঁ এলুম।"

শ্রীনটশেখর

মণিবর্দ্ধন

গত ২৩শে জুলাই রবিবার, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে মণিবর্দ্ধন তাঁহার নৃত্যকলাকৌশল প্রদর্শন কোরেছেন। এই নৃত্যপ্রদর্শনীতে নৃত্যের চেয়ে যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীতেরই আধিক্য ছিল, যার ফলে অখণ্ডভাবে নৃত্যের রসস্ফূর্ত্তি লাভ করতে পারে নি। অনবরত একঘেয়ে ব্যাঞ্জো বাজনা ও বেসুরো বেতালা কণ্ঠের বিকৃত সঙ্গীত যে কতটা রসহানি করে, সে বিষয়ে বোধহয় পরিচালকবৃন্দের কোনরূপ খেয়ালই ছিল না। এ ছাড়াও ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল বিস্তর। প্রথমতঃ, নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণ ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের অনেকেই স্থানাভাবে ইনষ্টিটিউট-ভবন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আলোকসম্পাত করা হচ্ছিল অতি ক্ষীণভাবে। এর ফলে সামান্য দূর থেকেই নর্ত্তকের মুখভাব ও দৃষ্টির কোন কিছু বৈশিষ্ট্যই ধরা যাচ্ছিল না। তৃতীয়তঃ, মাঝের বিরামগুলি (interval) অতি দীর্ঘ হওয়ায় বড়ই বিরক্তিকর ঠেকছিল। চতুর্থতঃ, যিনি programmeএর itemগুলি announce করছিলেন, ও নৃত্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল অত্যন্ত নীরস—কাঠখোট্টা। এর ফলে প্রতিবারই তাঁর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে অসম্ভব রকম গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছিল। একটা সরস উৎসবের মাঝ থেকে এ সব রসবর্জ্জিত লোককে একেবারে বাদ দেওয়াই ভাল।

মণিবাবুর তিনটি মাত্র নাচ সে 'রাত্রে আমাদের দেখবার অবসর হোয়েছিল। প্রথমটি মণিপুরী "অসিনৃত্য"। মণিবাবুর নাচে পায়ের কাজ মন্দ নয়। কিন্তু নাচগুলিকে তিনি একটু ছেঁটে কেটে ছোট করলে আরও সুন্দর হোত। কারণ, এই সব নাচে একঘেয়ে ভাব অতি শীঘ্রই এসে পড়ে। অসিনৃত্যে একেবারে সাদা পোষাক ঠিক রসসৃষ্টির অনুকূল নয়। খানিকটা অংশ লাল হোলে বেশ মানাতো। দ্বিতীয় নাচটি "ঝড়ের রাতে"। এ নাচটি এত দ্রুত তালে নাচা হোয়েছিল যে, এর মধ্যে প্রকৃত নৃত্যের গতি কতটুকু তা' ধরা সম্ভব হয় নি'। নাচ যে তালে বা ছন্দে আরম্ভ হয়, বরাবর যদি সেই ছন্দ ও তাল বজায় থাকে, তবে নাচ কতটুকু অগ্রসর হোল, তা' ঠিক বোঝা যায় না। আর বিশেষ কোরে এই নাচটিতে উপযুক্ত আলোর অভাব হেতু মুখ-ভাবের বৈচিত্র্য কিছুই লক্ষ্য হচ্ছিল না। তৃতীয় নাচটি "বৃহন্নলা"নৃত্য—যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের নৃত্যের অনুকরণ। বৃহন্নলা নৃত্যটি একটি প্রাচীন পৌরাণিক নাচ। এর সঙ্গে আবার পিছনের পটভূমিকায় (background) যদি আধুনিক পোষাকপরা বাদকেরা আধুনিক বাজনা নিয়ে ব'সে থাকেন, তা' হোলে foregroundএর প্রাগৈতিহাসিক বৃহন্নলার সঙ্গে background এর অতি আধুনিক যন্ত্রসঙ্গীতের কতদূর অসামঞ্জস্য হয়, বলুন দেখি! বলি ও যবদ্বীপের বিচিত্র পোষাকের অনুকরণ এ নৃত্যে ভাল হয় নি। বাঁশের বাজনা (Gamelan Gambang) বা অন্যান্য প্রকার গ্যামেলন অর্কেষ্ট্রার অনুকরণও আশানুরূপ হয়নি। আর সবচেয়ে আমাদের কাছে বিসদৃশ ঠেকেছে যে,—বৃহন্নলা তাঁর প্রাচীন (classical) বলি নৃত্য নাচতে নাচতে হঠাৎ তার সঙ্গে সুমাত্রার আধুনিক লৌকিক নাচের (Pentjak' Minangkabau) কয়েকটি প্যাঁচ মিশিয়ে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ী তৈরী করলেন!!! ধ্রুপদ গাইতে গাইতে হঠাৎ গজলের তান ছাড়লে যেমন হয়, এও যে ব্যাপারটা সেইরকম হোল! মণিবাবুর মত একজন কৃতী নর্ত্তকের কাছ থেকে এরকম খিচুড়ী আমরা প্রত্যাশা করিনি'। আমরা বন্ধুভাবেই মণিবাবুকে একথাগুলি বললুম। আশা করি, তিনি এর অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করবেন না।

সেদিন বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দের মধ্যে শিল্পী-প্রবর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক অশোক শাস্ত্রী, প্রযোজক হরেন ঘোষ, প্রাচ্য-নর্ত্তক রাজেন্দ্রশঙ্কর, কবি প্রভাতকিরণ বসু প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য রসিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমরা শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।
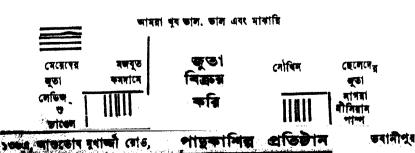
ফ্রান্‌সেস্‌ লেডারার ও আইডা লুপিনো

"ওয়ান্‌ আফ্‌টারনুন্‌" ছবিতে

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২১শে শ্রাবণ ১৩৪৩—6th. August, 1936. } ৩২শ সংখ্যা

ব্যক্তি না নীতি ?

রাজনৈতিক জগতে ঘটনার প্রবাহ খরতর। সেইজন্য এখানে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা গঠন করিতে হইলে তাহা স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হয়। বালির বাঁধের উপর যদি তাহা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে সমূলে উৎপাটিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না।

কিছুদিন হইতে উডবার্ণ পার্ক, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, সাহিত্যিক শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ—ইত্যাদি স্থানে মন্ত্রণা ও আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল বাঙ্গলার বিবদমান দুই দলের মধ্যে মিলন-কল্পে—এ সংবাদ আমরা পাঠকদের দিয়াছি। শোনা যাইতেছে এই মন্ত্রণাদির ফলে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে সম্পাদক বা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করিয়া একটি মিলিত দল গঠিত হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা এইরূপ জোড়াতালি মিলনে বিশ্বাস করি না এবং এখনও বলিতেছি যে, ইহা শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বা মতামতের কথা নহে, এইরূপ মিলনে দেশের সত্যকার কোনো স্থায়ী উন্নতি হইবে বলিয়াও আমরা মনে করি না। যাঁহারা এই মিলনে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারাও কি মনে করেন না যে, ইহা ভাবের ঘরে চুরি করা মাত্র? তাঁহারা কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, এই মিলন স্থায়ী হইবে ?

এই তথাকথিত মিলন কেন কার্য্যকরী হইতে পারে না, তাহার কারণও বলিতেছি। পরস্পরের স্বার্থ ভুলিয়া দেশকল্যাণের বৃহত্তর নীতিতে আস্থাবান হইয়া যখন দুই দলে মিলিত হয় তখনই সেই মিলন স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু নীতি ছাড়িয়া যখন ব্যক্তিকে লইয়া টানাটানি করা হয় অর্থাৎ কোন্ নীতি অনুসৃত হইবে তাহাই প্রধান বিবেচ্য না হইয়া কোন্ ব্যক্তি দলের কর্ণধার হইবেন, তাহাই বিবেচ্য হয় তখন সেখানে কি মিলন স্থায়ী হইতে পারে? এরূপ ক্ষেত্রে, মিলনের নামে পুনরায় দলগত মনোবৃত্তিকেই কি প্রশ্রয় দেওয়া হইল না ?

স্বার্থহীন দেশপ্রীতি ও মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর যদি স্থায়ী মিলন-সৌধ গঠিত হয় তাহা হইলে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইব কিন্তু মিলনের নামে ছদ্মবেশী দলগত মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া দেশের লোককে ভুলাইবার চেষ্টার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

বিলাসী

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

বোম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠাবান্ আলোক-চিত্রশিল্পী মিঃ কৃষ্ণগোপাল ('কে-জি' নামে বিশেষ পরিচিত) এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান কোরেছেন। এখন তিনি এই প্রতিষ্ঠানে ভোলা সালেম ফিল্মস্ লিঃ-এর "ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা" তামিল ছবি তুলছেন।

* * *

প্রবোধ দাস, যিনি ছবি তোলার কাজে নিজেকে সাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠিত কোরেছেন—তাঁর চুক্তিকাল শেষ হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কোরেছেন। তাঁর মত একজন গুণী শিল্পীর কদর সব জায়গাতেই হবে—এ আর বেশী কী!

* * *

"সোনার সংসারের" কাজ বেশ চল্‌ছে। খেম্‌কাবাবু আর গোস্বামী বাবু ঘর ছেড়ে ষ্টুডিওর ভেতরই বেশীক্ষণ কাটাচ্ছেন—কেননা, ছবিখানা নাকি শিগ্‌গিরই তাদের তুলে ফেল্‌তে হবে। গেল হপ্তায় শুশ্রূষাগারের একটা বেশ ভাল দৃশ্য এখানে তোলা হ'য়েছে।

কারদারের "বাম্বে সিপাহী"-র দরবারের একটা চমকপ্রদ দৃশ্য অন্য ইউনিটে তোলা হ'চ্ছে।

কালী ফিল্মস

"টকী অফ টকীজে"-র শূটিং এগিয়েছে অনেকটা। এতে অভিনয় কোরছেন—

দিগম্বর—শিশির ভাদুড়ী
সুহৃৎ—অহীন চৌধুরী
নাট্যকার—শৈলেন চৌধুরী
বীরেন—জয়নারায়ণ মুখো
ঐ পিতা—শীতল পাল
নবকৃষ্ণ—শান্তশীল গোস্বামী
স্বাগতা—কঙ্কাবতী
শান্তা—রাণীবালা
সান্ত্বনা—সাবিত্রী

দেবদত্ত ফিল্মস

আস্‌চে শনিবার থেকে 'রূপবাণী'-তে "রজনী" মুক্তিপাবে। "রজনী"-র মর্মস্পর্শী করুণ কাহিনী বাঙ্‌লার ছেলেমেয়ের মনে

যে ভিজিয়ে তুলবে—একথা আগে থেকেই অনুমান করা যায়। পরিচালনা, আলোক চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজ যদি ভাল হয়—তা' হ'লে ছবিখানায় আয়ুকাল যে বেশীদিন হবে একথা সত্য—অবশ্য যদি 'রূপবানী'র কর্তৃপক্ষ আগেকার সব ছবির মত এর আয়ু হ্রাস না করেন। তবে ভরসা ছবিখানার পরিবেশক প্রাইমা ফিল্মস্।

ভারতলক্ষ্মী পিক্চার্স

এদের বহু-প্রতীক্ষিত "বাঙ্গালী" অবশেষে সত্যই মুক্তি পেল। আস্‌চে ১৫ই আগষ্ট "বাঙ্গালী" মুক্তি পাবে 'উত্তরা'য়। ছবিখানা পরিচালনা কোরেছেন চারু রায়, ছবি তুলেছেন বিভূতি দাস—এ দু'জনেরই ওপর আমরা ভাল কাজের আস্থা রাখি। আর এ ছবিতে যাঁরা অভিনয় কোরেছেন—তাঁরাও যে কেউ আমাদের একেবারে নিরাশ কোর্‌বেন, এমন মনে হয় না।

রাধা ফিল্মস

নগেন্দ্রর বৈঠকখানায় দৃশ্য তোলার পর সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রর মিলন দৃশ্য তোলা হ'চ্ছে। শ্রীশের রসবহুল ভূমিকায় ভূমেন রায় আর দেবেন্দ্রের বন্ধু বগলায় অংশে তারক বাগচির অভিনয় ছবিখানার ভেতর রসসৃষ্টি কোর্‌বে।

"বিচিত্রা" (বর্দ্ধমান)

গেল শনিবার বর্দ্ধমান 'বিচিত্রা টকী হাউসে'-র চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে শেষ হ'য়েছে। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট নাগরিকগণ চা পার্টিতে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। এই দিন ১। "ডেভিল্‌স ব্রাদার" ২। "ওয়াইল্ড পিপল" ৩। "ভাগ্যচক্র" ৪। "একটি কথা" দেখানো হ'য়েছিল। এই দিনে দর্শকদের কর্তৃপক্ষ সকলকে এক একখানা কোরে সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার উপহার দেন।
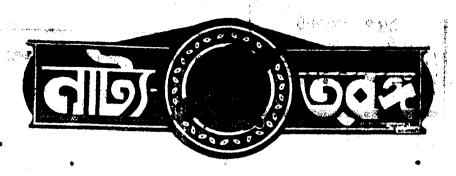
নাট্য নিকেতন

এই রঙ্গমঞ্চে "আলাদীনে"র আশ্চর্য্য প্রদীপ জ্বলে উঠেছে কাল সন্ধ্যে থেকে। "আলাদীনে"র বিশেষত্ব—এর প্রযোজনা কোরেছেন সুধীর গুহ, পরিচালনা কোরেছেন ভূমেন রায়, গীত-সংযোজনা কোরেছেন কাজী নজরুল,

আর নৃত্যের রূপ দিয়েছেন নীহারবালা। শুনছি কর্ত্তৃপক্ষ এই ছবিখানার প্রযোজনা ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয় কোরছেন। এতে বিভিন্ন ভূমিকায় নামছেন, জিন্—রবি রায়, আলাদীন—ভূমেন রায়, মনসুর—মণি ঘোষ, বাদশা—খগেন দাস, ফুলপরী—চারুবালা, সাজাদী—নিরুপমা, ফুলওয়ালী—দুর্গারাণী, লুৎফা—নীহারবালা।

রঙমহল

এখানে "নন্দরাণীর সংসার" পাতবার ব্যবস্থা চলছে—এ খবর সবাইয়ের প্রায় জানা আছে। যোগেশচন্দ্রের এই নাটকখানা একটি পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্রীভূত কোরে রচিত হ'য়েছে।

নব নাট্য-মন্দির

শিশিরকুমার এখন "টকী অফ টকীজ" নিয়ে যেতে রয়েছেন। সেজন্যে তাঁর "অচলা" সকস্থ কোরতে কিছু সময় লাগবে মনে হয়। যাই হ'ক তা'তে ক্ষতি নেই—তাঁর "রীতিমত নাটক" এখনও রীতিমত জমে রয়েছে।

একটা খবর পাওয়া গেল শ্রীমতী প্রভা নাকি এখান থেকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর এ মনোমালিন্যের কারণ আমরা সঠিক না জানলেও শুনতে পাচ্ছি—"টকী অফ টকীজে" স্বাগতার ভূমিকা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করাই তাঁর এ-রাগের কারণ।

মিনার্ভা

"বন্দী" এখানে আসর জমিয়ে রেখেছে। জয়নারায়ণ মুখুয্যে এদের দল হঠাৎ ছাড়লেন কেন? তিনি ত' অনেকদিন ধরেই মিনার্ভায়

বিবিধ

ক্রতীর্থ

চক্রতীর্থের ৮ম অধিবেশন বিগত ২রা গষ্ট ১১ নং চক্রবেড়িয়া রোড সাউথে হইয়া য়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র কুমার বসু উচ্ছৃঙ্খল" নামক একটি ছোট গল্প পাঠ রেন, যাহা উপস্থিত সভ্যগণের রীতিমত লোচ্য বিষয়রূপে পরিণত হয়, লেখক তাঁহার ল্পের নায়কের চরিত্রে অত্যন্ত জটীল মনস্তত্ত্বের রিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু

তাঁহার প্রতিভা-শক্তির অভাবে তিনি যাহা লিতে চাহিয়াছেন তাহা সম্যকরূপে পরিস্ফুট য় নাই। সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরে অল্পবয়সে তৃহারা পুত্রের জীবন মধুপায়ী পিতার স্নেহ শাসনের অভাবে যে কি ভাবে উচ্ছৃঙ্খল ইয়া উঠে তাহার চিত্রটি মোটামুটি মন্দ হয় নাই। গল্পটি সম্বন্ধে সুলেখক বিমল মিত্র বলেন, "গল্পটির স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাসের আধিক্য দোষ বাদ দিয়া লিখিলে লেখাটি সুন্দর হইত, কারণ সার্ব্বজনীন বিচার বুদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তিগত মান দণ্ডের সমীকরণ, গল্পে চরিত্র সৃষ্টির একটি অন্যতম অবশ্য করণীয় উপাদান।" শ্রীউমাপদ চট্টোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, প্রবন্ধটির মধ্যে অতিরিক্ত ইংরাজী সাহিত্যের Quotation থাকায় উহা সভ্যগণের ভাল লাগে নাই। তৎপরে শ্রীপ্রফুল্ল সরকার একটি অতি সুন্দর আধুনিক গদ্য কবিতা পাঠ করেন, কবিতাটি সম্বন্ধে

অভিনয় কোরছেন যোগ্যতার সঙ্গে—তবে াজ এ কি শুনি? কালীপ্রসাদবাবুর সঙ্গেই ার নাকি মনোমালিন্য হ'য়েছে। কী কারণ 'জনই কী আমাদের জানাবেন?

রূপ মহল

গেল শনিবার থেকে "রূপ মহলে"র দোর াবার খুলেছে। "নারী প্রগতি" এখানে লছে। "রূপ মহল"কে যদি বাঁচতে হয় তা' 'লে তাদের এখন থেকেই ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী সংগ্রহ কোরতে হবে।

কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ বলেন, "প্রফুল্ল বাবুর গদ্য কবিতায় Aesthetic emotion ও technical perfection অনবদ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, গদ্য কবিতা সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত হইলেও লেখাটি আমার খুব ভাল লাগিয়াছে।" পরিশেষে শ্রীযুক্ত হীরালাল দাশ গুপ্ত সভায় পঠিত বিষয় গুলির সমালোচনা করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

উদ্দীপনা ও শক্তিলাভ

মৃত্যুর আক্রমণ বার বার ব্যর্থ ক'রে দিয়ে, রক্ত আমাদের দেহকে সুরক্ষিত দুর্গের ন্যায় ঘিরে রাখে। তাই দেখতে পাই রক্তহীন দুর্ব্বল দেহ নিয়ে মৃত্যু দিন রাত করতে থাকে টানা হেঁচড়া। সে দেহকে রক্ষা করতে হ'লে দ্রুত রক্ত সঞ্চারের প্রয়োজন। প্রতিদিনের আহার্য্যকে জীর্ণ করে, তা থেকে রক্ত জমিয়ে নেওয়া ভগ্নদেহের পক্ষে অসম্ভব। তাই দেহকে তখন এমন জিনিষ গ্রহণ কর্ত্তে হয় যা আমাদের ক্ষুধাকে বাড়িয়ে দিয়ে, খাদ্য বস্তুকে হজম ক'রে দেয়, যাতে রক্তের উপাদান থাকে প্রচুর আর প্রত্যক্ষ, আর যা এই জীর্ণদেহে নূতন বল ও জীবনী শক্তি এনে মৃত্যু দূতকে হটিয়ে দেয়। সে রকম জিনিষ আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্য নয়, তা হ'চ্ছে একমাত্র "রচি" কোম্পানীর "রচিটোন"। এর অসীম কার্য্যকারিতার গুণে দেশ বিদেশে নরনারীরা বহুল পরিমাণে "রচিটোন" ব্যবহার করছেন। "রচিটোন" নূতন উদ্দীপনা ও শক্তি এনে দিয়ে, রোগজীর্ণ রোগীকে নূতন মানুষ তৈরী করে দেয়, এর আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় মানুষ পুনর্যৌবন লাভ করে।

সঙ্গীত সম্মিলনী

গত শনিবার ১লা আগষ্ট সন্ধ্যায় নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থিত সম্মিলনীর হলে সঙ্গীত সম্মিলনীর মাসিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গীতাদি ব্যতীত শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর উদাহরণ সহ "ছেলেদের গান ও ছড়া" বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। আগামী সংখ্যায় শ্রীযুক্তা চৌধুরাণীর প্রবন্ধটী 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত হইবে।

ডাঃ প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ডাঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চক্ষু রোগের চিকিৎসার্থ ভিয়েনায় গিয়াছেন। এ সংবাদ 'খেয়ালী'র পাঠকবর্গ অবগত আছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্রোপচারের পর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রমথ নাথ সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছেন এবং আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর ভিনিস হইতে তিনি ভারত অভিমুখে রওনা হইবেন।

শেষ সংবাদ

বাংলার কংগ্রেসী মিলন প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে। গত মঙ্গলবার রাত্রে মজুমদারী দলের শিবিরে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় সর্ত্ত-সম্বলিত যে আর একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা এরূপ অযৌক্তিক যে সেই পত্রাঘাতেই এতদিনের সযত্নগঠিত মিলনী-সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

প্রকাশ যে অতঃপর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বর্ত্তমান কর্ণধারবৃন্দ আর মিলনের কোন চেষ্টা করিবেন না। বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড সত্বরই গঠিত হইবে।

আশুতোষ কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস

বিগত ১৭ই জুলাই শুক্রবার আশুতোষ কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে।

এই সভায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ প্রথমে কলেজের আজ পর্য্যন্ত বিশ বৎসরের ক্রমোন্নতির কথা বলেন, এবং যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় সে দিকে কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি রাখিতে বলেন। তাহার পরে ডাঃ বি, এস্, গুহের একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর সভার কাজ শেষ হয়।

সভার কাজ শেষ হইলে আশুতোষ কলেজের ছাত্রগণের পরিচালনায় রবীন্দ্র নাথের "শেষরক্ষা" অভিনীত হয়।

সর্ব্বশেষে শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবীর একখানি সুললিত কণ্ঠ সঙ্গীতের পর ঐ দিনকার অনুষ্ঠানের যবনিকাপাত হয়।

রচনা প্রতিযোগিতা

ওয়েসাইড সাহিত্য শাখা সমিতি কর্ত্তৃক একটি রচনা প্রতিযোগিতা হইবে। রচনার বিষয় "একশত বৎসর পরে পৃথিবীর অবস্থা" কেবল মাত্র স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণ রচনা লিখিতে পারিবেন। কোন প্রকার প্রবেশ মূল্য লাগিবে না। রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক দিকে লিখিতে হইবে। রচনা সম্পাদকের নিকট ১০ই আশ্বিন ১৩৪৩, ইংরাজী ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সালের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। রচনার গুণানুসারে প্রথম তিনজনকে রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। অমর ভট্টাচার্য্য সম্পাদক, ১৮৯ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সরকার

বার্লিন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

গত ১লা আগষ্ট জার্ম্মান রাষ্ট্রনায়ক হের হিটলার বার্লিন অলিম্পিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

এইবার অলিম্পিকের ৫০ বছর পূর্ণ হ'ল। প্রত্যেক চার বৎসর অন্তর ইহার অধিবেশন হয়। ১৮৯৬ সালে পিরি কুবেরতাঁ এথেন্স সহরে ইহা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তার পর যথাক্রমে প্যারি, সেণ্টলুই, লণ্ডন ও ষ্টকহলমে অধিবেশন হবার পর মহাযুদ্ধের সময় বন্ধ থাকে। আবার পরে সাণ্ট ওয়ার্পে আরম্ভ হয়। তার পর প্যারি ও লস এঞ্জেলস। এবার বার্লিন এবং ১৯৪০ সালে টোকিওতে হ'বে বলেই স্থির হয়েছে।

এবার অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বার্লিন কমিটি বেশ একটা মনোহর পরিকল্পনার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটার নাম হচ্ছে অলিম্পিক টর্চ্চ রেস। অলিম্পিক খেলার জন্মভূমি গ্রীসের রাজধানী এথেন্স সহরের Sacred Grove নামে একটা উদ্যানে অলিম্পিক টর্চ্চ জ্বালা হয়েছিল। এই টর্চ্চটা জ্বালবারও একটা বিশেষত্ব ছিল। এথেন্স নগরের মেয়র একটা লেন্সের দ্বারা সূর্য্যরশ্মি দিয়ে টর্চ্চটা প্রথম জ্বালান। এথেন্স থেকে বার্লিন হচ্ছে তিন হাজার কিলোমিটার। একজন দৌড়-বিশারদ একটা মশাল নিয়ে এক কিলোমিটার দৌড়ান, সেখানে আর একজন অপেক্ষা করছিলেন এবং প্রথম ব্যক্তি সেখানে পৌঁছিলে তার মশাল হ'তে নিজের মশাল জ্বালিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি দৌড়ান। এজন্য তিন হাজার দৌড়াইবার লোক ও তিন হাজার মশালের ব্যবস্থা হয়েছিল। সমস্ত পথটা দৌড়াইতে ১২ দিন লেগেছিল। সাতটা দেশের ভেতর দিয়ে এই দৌড় হয়েছিল, যেমন—গ্রীস, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লেভিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, জেকো শ্লেভিয়া ও জার্ম্মান। যিনি সব শেষে

দৌড়িয়েছিলেন তিনি গত ১লা আগষ্ট অর্থাৎ অলিম্পিক আরম্ভ হবার দিন বার্লিন পৌঁছান। প্রথমে তাঁকে অলিম্পিক কমিটির সভ্যগণ অভ্যর্থনা করেন এবং জার্ম্মান নায়ক হের হিটলারের কাছে নিয়ে যান। তারপর শোভাযাত্রা করে বার্লিনের বিশিষ্ট রাস্তার মধ্যে দিয়ে অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মশালটী যাতে পূর্ণ একমাস (অর্থাৎ যতদিন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা চলিবে) প্রজ্জ্বলিত থাকে তারও ব্যবস্থা হয়েছে।

এ ছাড়া যে সব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে যোগ দেবার জন্যে প্রায়ই সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বার্লিনে এসেছেন। তবে স্পেন নিজেদের আভ্যন্তরবিপ্লবের জন্যই বোধহয় এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েও পরে নাম প্রত্যাহার করেন। এই সব ব্যক্তিদের থাকবার জন্য ১৬২টী কুটীর নির্ম্মাণ হয়েছে।

গত ক' বছর ধরে এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ও জাপান বেশীর ভাগ সম্মান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ বছরও তাঁরা নিজেদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বিশেষ ভাবে আগ্রহান্বিত। আমেরিকা এবার মোট ৩৮২ জন খেলোয়াড় পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় আছেন তার মধ্যে দু'জন বিশিষ্ট নিগ্রো একজনের নাম জেস্ ওয়েনস্ ও আর একজনের নাম উইলিয়ামস্ জেস্ ওয়েনস্, ক্রীড়াজগতের তিনটী রেকর্ড ভাঙ্গিয়াছেন।

(১) লং জাম্পে ২৬ ফুট ৮.০ ইঃ
(২) ২২০ গজ দৌড় ২০.৩ সেকেণ্ড
(৩) ২২০ „ হার্ডল ২০.৬ সেকেণ্ড

এবার তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হ'বে সুইজারল্যাণ্ডের হান্নিই বোধ হয়।

ব্রিটিশ প্রতিযোগীরাও এবার কম তোড় জোড় করে এসেছেন বলে মনে হয় না। হার্ডল রেসে এদের দলের অধিনায়ক ফিণ্ডলের সমকক্ষ পাওয়া ভার। তাছাড়া দৌড়ে উডারসন্ খুব নাম করা একজন। তিনি অনেক রেকর্ড করেছেন।

জাপান অবশ্য সন্তরণে খুব ভাল ফল দেখাবে বলে মনে হয়।

হকি খেলায় অবশ্য ভারতবর্ষই জয়ী হ'বে বলে আশা করি। তবে এদল যে এবার বিশেষ শক্তিশালী নয় তা আমরা আগের সংখ্যায় জানিয়েছি। জার্ম্মেণীই এদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'বে বলে মনে হয়। অবশ্য ভারতবর্ষ আগের চেয়ে খেলায় অনেক উন্নতি করতে পেরেছেন। এরা প্রাকটিশ ম্যাচে আমেরিকাকে ৯-১ গোলে পরাজিত করেছেন। জার্ম্মেণীর কাছে প্রথমবার হারলেও, পরের দু'বারই জিতেছে। এই প্রতিযোগিতাতে আফগান দলও বার্লিনে গিয়াছে।

ফুটবল খেলায় অবশ্য আমাদের স্বভাবতঃই চাইনিজ দলের দিকে লক্ষ্যটা বেশী। কেননা এ দলটি ভারতবর্ষে সেদিন মাত্র খেলে গেছে। তাহাদের খেলার standard আমরা দেখেছি এবং ফলাফল দেখলেই আমরা অনেকটা ও দেশের খেলার আন্দাজ করতে পারব বলিয়া মনে করি। চীনদল আগামী ৬ই আগষ্ট গ্রেট ব্রীটেন দলের সহিত খেলবে। আমরা যতদূর জানি তাতে ইতালির ফুটবল খেলাই সবচেয়ে ভাল এবং তাঁরাই বোধ হয় ফুটবল খেলায় জয়ী হবে বলে মনে হয়।

ভারতীয় একদল কুস্তীগিরও বার্লিনে গেছেন।

আই. এফ. এ. শিল্ড

লীগ বিজয়ী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আই. এফ. এ. শিল্ড ফাইনালে ক্যালকাটা ক্লাবকে অতিরিক্ত সময়ে ২—১ গোলে পরাজিত করিয়া শিল্ড বিজয়ী হইয়াছে।

সর্ব্বহারার দয়িত বন্ধু ম্যাক্সিম গোর্কি

শ্রীবিভূতি ভূষণ বাগচী

অল্পদিন হ'ল ম্যাক্সিম গোর্কি লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে জগতের এক সাহিত্যিক-দিকপালের যে পতন হয়েছে, একথা অস্বীকার কোরবার উপায় নেই। দেশকর্ম্মী ও সুসাহিত্যিক হিসেবে তিনি যে-কীর্ত্তি অর্জ্জন করে গেছেন তার স্থায়িত্ব অনন্তকালব্যাপী।

М Горький

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গোর্কী ভলগা নদীর তীরের নির্জনি নোভাগরড গ্রামে জন্মলাভ করেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন মিস্ত্রী, মাতা কৃষককুলসম্ভূতা হলেও বিবিধ গুণাবলীতে বিভূষিতা ছিলেন। গোর্কির দুর্ভাগ্য যে তিনি নিতান্ত নাবালক অবস্থায় মাতৃপিতৃহীন হ'ন। কৈশোর ও যৌবন তাঁর কেটে যায় বৈচিত্র্যের পর বৈচিত্র্যে। তারপর অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরে তাঁর দুর্দ্দম লেখনী চালিত করেছেন—সে লেখনীতে ফুটে উঠেছে দুঃখীর দুঃখ, অবনতদের বি'চিত্র জীবন, তাদের ক্ষণিক আনন্দের আভাষ আর লেখকের অনন্য-সাধারণ দেশপ্রেম।

গোর্কির সাহিত্য বুঝতে হ'লে তাঁর জীবনের গতি-প্রবাহের দিকে ভালভাবে আমাদের চেয়ে দেখতে হ'বে। পিতামাতার মৃত্যুর পর গোর্কির জীবন কাটে অনন্ত ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মাঝখানে। তবুও এ ভাগ্য-বিপর্য্যয় যে তাঁর স্বাভাবিক ভাবে হয়েছিল, তা নয়, কতকটা স্বেচ্ছাকৃত। নিতান্ত বালক অবস্থায় তিনি ঘর ছেড়ে চলে যান ভলগা ষ্টীমার সার্ভিসে কাজ কোর্‌তে। ষ্টীমারের পাচক বালকের স্বাভাবিক বুদ্ধি-বৃত্তি ও অধ্যয়নের নেশায় পরিচয় পেয়ে বিবিধ গ্রন্থাদি দিয়ে গোর্কিকে সাহায্য কোরতো। গোর্কির মুকুলিত প্রতিভা মুঞ্জরিত হবার সময় সেই।

অতুলনীয় প্রতিভা গোর্কির, প্রখর বুদ্ধি-বৃত্তি, কিন্তু চিত্তে ছিল তাঁর অবিশ্রান্ত অস্থিরতা। ষ্টীমারের কাজে তিনি পরিতৃপ্ত হ'তে পারলেন না। একাজ ছেড়ে দেবার পর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব্বে গোর্কি কার্য্য হ'তে কার্য্যান্তরে ঢুকেছেন, বিভিন্ন স্তরের লোকের সাথে সম্পূর্ণভাবে মিশে তাদের জীবনযাত্রা সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার ভার নিয়েছেন স্বাভাবিক ভাবে।

সম্ভবতঃ এই কারণেই গোর্কির-উপন্যাসে রাশিয়ার সমাজের নিম্নস্তরের ছবি প্রদীপ্ত ভাবে ফুটে উঠেছে। যথাসম্ভব সত্যকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর রচনার মধ্যে। তবুও তাঁর উপন্যাসগুলি রিয়ালিষ্টিক্ (বাস্তবতার) ডায়েরী নয়—কেননা উপন্যাস রচনায় তিনি বাস্তবের সাথে আদর্শবাদ বিজড়িত করেছেন। এই আদর্শবাদ তাঁর উগ্র বাস্তবতায় ঢাকা পড়ে আছে। কৃষক-কাহিনী লিখতে গিয়ে বিভীষিকার ভয়াল ছবি তিনি মনে আন্‌তে পারেন নি, টলষ্টয়ের আদর্শবাদী "মিষ্টিক্' পাত্রপাত্রী তাঁর গণ্ডীর বাইরে, আর উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকেরা যে সুচতুর প্রেমের ইন্দ্রজালের মাঝখানে তাঁদের নায়ক নায়িকাদের রেখে সাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছেন, সে পথের ধার দিয়েও গোর্কি চোলতে চেষ্টা করেন্‌নি। যে পথে তিনি এগিয়েছেন, সে পথ মনে হয় জীবনের দিমেলা বাস্তবতার নিষ্ঠুর নিদর্শন। যে আবহাওয়ার আওতায় তাঁর জীবনের শৈশব যৌবন অতিবাহিত হয়েছে, সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার আভাষ, সেই শ্রেণী, সেই দুঃখসংগ্রামের উল্লেখ তাঁর সাহিত্যে বহুবার আমরা পাই।

উপন্যাসের পটভূমিকায় গোর্কির পাত্র-পাত্রীর জীবন বিদ্যুৎপ্রভাসম হ'লেও নিষ্ফল। পৃথিবীর প্রচলিত পথ হ'তে তারা নির্মম ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কেবলমাত্র রচয়িতার অনুকম্পা পেয়েছে, তারা ধরার মানুষ বলে।

হতভাগ্যদের প্রতি এই ভাবের করুণা গোর্কি-সাহিত্যের মূলসূত্র। তাঁর লেখা হ'তে একটা সুন্দর গল্পের (Twenty Six Men and a Girl) আলোচনা করা যাক্। রুটীর 'বেকারীর' লোকদের নিয়ে এই গল্প। এখানে একটা কথা বলা ভাল, যে গোর্কি একসময় বেকারীতে কাজ করেছিলেন। সেখানে কালক্ষেপ কোরবার সময় তাঁর মানসিক অবস্থা এতদূর চঞ্চল, এতদূর সুতীব্র তিক্ততার সমাচ্ছন্ন হয়েছিল যে তিনি আত্মহত্যা ক'রে সে কাজ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। গল্পের সংক্ষিপ্ত ভাষণ এই—: বেকারীর লোকেরা যথাসম্ভব অপরিচ্ছন্ন ও বর্ব্বর, কতক তাদের মধ্যে রোগে ভুগে ভুগে মরণের ধারে এগিয়ে চলেছে। মতামত তাদের বিভিন্ন, জীবনযাত্রাও তাদের ততোধিক আশ্চর্য্যময়। তবে প্রচণ্ড ঐক্য তাদের ছিল জনৈক যুবতীর প্রতি "সেণ্টি-মেণ্টাল" ভালবাসায়। মেয়েটি প্রতিদিন এসে রুটীর সঙ্গে বেকারী কর্ম্মচারীদের প্রেমের অর্ঘ্যও গ্রহণ কোরতো। গল্পটীতে সমস্ত চিত্রটী এতদূর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে আমাদের বুঝতে বাধেনা এই হতভাগ্য-দের কাছে মেয়েটী কতখানি। তাদের প্রত্যেক দিন-যামিনীর আলোচনায় ছিল ঐ মেয়েটী। সে তাদের কাছে দেবী, পবিত্র-তার প্রতিমূর্ত্তি। আদর্শ রমণী যে কি তারা এই মেয়ে থেকেই প্রথম জানতে পারলো।

প্রতক্ষ্যভাবে এই বিষাদ-বিবরণী এগিয়ে চোলেছে নাটকীয় ভঙ্গিমায়। আকস্মিক ভাবে বাস্তবতার সংঘাতে হতভাগ্যদের ভাবের কুয়াসা অন্তর্হিত হয়ে যায়। তারা তখন বুঝতে পারে, তাদের "দেবী" কলঙ্কিতা নিতান্ত সধারণ "ভালগার" মেয়ে। যুবতীর অপরাধ সে জনৈক যুবককে বরণ করে' সংসারের পথে চোল্‌তে চেয়েছিল। লোক গুলো এই সময় তাদের পাশবিকতার চূড়ান্ত দেখাল—যতখানি কটূক্তি তাদের পক্ষে সম্ভব সবই তারা বর্ষণ কোরলো মেয়েটীর উপরে। সে কেন তাদের সবাইকে ছেড়ে অপর একজনের সঙ্গে প্রেম করে' তাদের পবিত্র প্রেমসম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে বিশ্বাস-ঘাতকতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখালো!

হায়—হতভাগ্যদের সর্ব্বহারা জীবন। এ সমস্ত সত্ত্বেও গোর্কি আশা ও আনন্দের সাহিত্যিক। চেখভ ও ডষ্টয়েভ্‌স্কীর মত দুঃখবাদের স্থান তাঁর সাহিত্যে নাই। সব চাইতে আশ্চর্য্য যে প্রথম জীবনে তিনি যেসব নিম্নস্তরের লোকচরিত্র তাঁর-উপন্যাস ও গল্পাবলীর সীমার মধ্যে এনেছেন, সে স্তরের বারবনিতা, দুঃখী, চোর চরিত্রহীন ভবঘুরে সবই আছে। সামাজিক ও জাগতিক আইন কানুন উপেক্ষা করে চলেছে তারা, যেন আপনারাই আপনাদের ভাগ্যবিধানের বিধাতা। দুঃখের জন্য মড়া-কান্না কাঁদে না, দার্শনিক তত্ত্ব এনে মনকে ভারী করে না অযথা। হীনচরিত্রের যারা, ভোড্‌কা খায়, গাছের বা ভাঙা ছাতের তলায় রাতের পর রাত কাটিয়ে দেয়, কামনা অভ্যুদয়ে মেয়েদের উপরে অত্যাচার করে' প্রবৃত্তি-চরিতার্থ করে আর অর্থাভাবে সঙ্গীদের হত্যা করেও তাদের অর্থ নিতে বাধে না। আর এক দিক দেখতে গেলে তারা আমাদের কাছে 'অতি-মানুষ'—তাদের গর্ব্ব, সাহস, স্বাধীনতা-প্রিয়তা অক্ষমে ঘৃণ্য উপেক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর মহিমায় তারা মহীয়ান।

ভাষার দিক দিয়ে গোর্কি অনেক সাহি-ত্যিককে পেছনে ফেলেছেন। এ ভাষা রোমান্স-রসসিক্ত বেতসলতার কম্পন, কিম্বা চন্দ্রালোক-বিরহীর উদাস কোমল গুঞ্জরণ নয়। ভাষা তাঁর দীপ্ত দিনের প্রদীপ্ত সূর্য্যের মত তেজস্বী, কালবৈশাখীর করাল ঝঞ্ঝার মত রচনায় সাহিত্যিক গতি তাঁর অবাধ, অপ্রতিহত। পার্ব্বত্য-নির্ঝরিণীর মত গোর্কি-সাহিত্যে স্বচ্ছ স্বকীয়তা বর্ত্তমান।

গোর্কি লোকান্তরিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান সাহিত্যের অতীত ও আজিকার যোগ সূত্র বিচ্ছিন্ন হ'বার আশঙ্কা হয়েছে। টলষ্টয়, চেখভ্‌ কবি ব্লক্‌প্রমুখ সাহিত্যিক মণ্ডলীকে তিনি যে শ্রদ্ধা সম্মানের অর্ঘ্য দিয়েছেন তাঁর পরবর্ত্তী লেখকরা বিগত সাহিত্যিকদের প্রতি সেই ভাবে সুবিচার কোরবেন কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেল।

ডায়েরীতে গোর্কি বলেছেন "টলষ্টয় ছিলেন—একধারে সুমহান সাহিত্য শিল্পী অন্যধারে যুগ-প্রসিদ্ধ ঋষি।" চেখভ্‌ সম্পর্কে বলেছেন "চেখভ্‌ আপন রচনার আলোচনায় বিনয়ের অবতার ছিলেন, সারাজীবন কেবলি নবীন সাহিত্যিকদের উৎসাহ যোগান দিয়ে গেছেন। চেখভ্‌ এর স্মৃতি মনে এলে আমি আবার আমার যৌবনের উৎসাহ উদ্দীপনা ফিরে পাই।" ব্লক এর কথায় বলেছেন—"কবি ব্লক হ'ল শ্রদ্ধা সম্মানে প্রদীপ্ত প্রতিমূর্ত্তি, চেহারায় তাঁর ফ্লোরেন্স্‌ এর রেনাসাস্‌ ফুটে উঠেছে।"

ঔপন্যাসিক হলেও গোর্কি রাশিয়ার রাজ-নৈতিক গগনে লেনিনের মতই উজ্জ্বল

জ্যোতিষ্ক। বিপ্লবের মতধারা কম কি তাঁর সাহিত্যে পূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়েছে। কর্ম্মীদলভুক্ত হয়ে তিনি বোলশেভিকদের অর্থসাহায্য করেছেন অক্লান্ত চেষ্টা করে। একমাত্র গোর্কির প্রচেষ্টাতেই 'Iskar' (স্ফুলিঙ্গ)—বোলসেভিকি মতবাদের মুখপত্র—সুদুর বিদেশ হ'তে কোটীপতি "সাভা মোরো সোভ" এর অর্থ সাহায্যে সম্পাদিত হয়ে রাশিয়ায় সুগোপনে সাধারণে বিতরিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। রাশিয়ার বৈপ্লবিক ইতিহাসে রক্তাক্ত দিবস বলে যেদিনের কথা উল্লিখিত হয়েছে, সে দিনের অভিযানের সঙ্গে গোর্কি জড়িত। শ্রমিকদের "উইন্টার্ প্রাসাদ" আক্রমণের আগের সন্ধ্যায় তিনি ও কয়েকজন প্রখ্যাতনামা কর্ম্মী শ্রমিকদের আবেদন নিয়ে মহামান্ত জারের মন্ত্রীসভায় গিয়ে জানান যে আবেদন অনুযায়ী অভিলাষ তাঁদের পূর্ণ হলে তাঁরা অনাবশ্যক রক্তপাত প্রয়োজনীয় মনে করেন না। ফল হোলোনা। আবেদন উপেক্ষাভরে পরিত্যক্ত হ'ল। পরদিনে হ'ল অবিশ্রান্ত রক্তপাত। কর্তৃপক্ষ গোর্কিকে বন্দী কোরলেন। ব্যাপারের পরে যখন সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হ'ল, গোর্কির সৎপ্রচেষ্টায় বিশ্ব বিক্ষুব্ধ হ'ল। দেশে, বিদেশে তাঁর মুক্তির জন্ত আন্দোলন চোললো। অবশেষে সরকার তাঁকে মুক্তি দিলেন।

এর অল্পদিন পরে মস্কো নগরীতে যে বিফল-বিদ্রোহের আয়োজন চলছিল তাতে গিয়ে তিনি শ্রমিকদের অস্ত্র যোগান দেবার সংকল্প করেন। সরকারের নেত্র এদিকে পোড়তেই তিনি রাশিয়া ছেড়ে চলে যান। আপন মতে বোলশেভিকদের গড়ে তুলবার জন্তে তিনি রাশিয়াতে ফিরে এসে এক বিদ্যালয় প্রচলন কোরলেন। এখানে গোর্কির মতের সাথে লেনিনের মতের মিল হ'ল না। লেনিনই অবশেষে জয়ী হলেন। মতভেদে যে বিরোধ, সে মনোমালিন্ত বেশী দিন স্থায়ী হ'লনা। অকপট স্বদেশকর্ম্মী, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক গোর্কির প্রভাব রাশিয়ায় তখন পরিস্ফুট। লেনিন তাঁকে অগ্রাহ্য কোরতে পারলেন না, বন্ধুত্বের বাঁধনে টেনে নিলেন। তবে এই দুই মনীষীর যে সংস্কৃতিগত ব্যবধান তা এই বান্ধবতার ছায়ায় ঘুচলোনা। বরং দেখতে পাই পৃথিবীব্যাপী মহাসমর সময়ে, রাশিয়ার প্রলয়ান্তকারী বিপ্লবকালে এই ব্যবধান আরও বেড়ে উঠেছে।

গোর্কি চেয়েছিলেন অতীতের যে সম্পদ, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে ও সুকুমার কলায় বিজড়িত হয়ে আছে তাকে বিনষ্ট না কোরে নবাগত সমৃদ্ধি দিয়ে পরিবর্দ্ধিত কোরতে। প্রতিপক্ষ তা চায় না, বিপ্লব-বহ্নির হোতা তারা, অতীতের যা কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নবীনকে তারা নবাসনে বসাবে। এই প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন—গোর্কির সাথে আমাদের সম্পূর্ণ মতের মিল হয়নি তবুও গোর্কি আমাদেরই একজন। আমাদের মত শ্রমিকদের আপনার করে নিতে পেরেছে, আন্দোলনে যোগ দিয়েছে আর সে নিজেও উদ্ভূত হয়েছে অবনত এই শ্রমিকশ্রেণী হ'তে। আমাদের কাছে ফিরে আসতে তাকে হবেই।"

সত্যই গোর্কি শেষে লেনিনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সে অধ্যায় গোর্কির জীবনে নব নব প্রেরণা দিয়েছে। বিগত সংস্কৃতির সাথে তিনি আজিকার ও অনাগত যুগের যোগসূত্রের সন্ধান পেলেন। সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের অতীত সমৃদ্ধি যে বোল্‌শেভিক বিপ্লববন্যায় প্লাবিত হয়ে যায়নি সে কেবলমাত্র গোর্কির আপ্রাণ প্রচেষ্টায়। একধারে তিনি যেমন ছিলেন অনন্যসাধারণ দেশকর্ম্মী, অন্যধারে ছিলেন রাশিয়ার সবচেয়ে লোকপ্রিয় সাহিত্যিক।

তাঁর রচিত উপন্যাস সকলের মধ্যে Mother, Three Men, Decadance ও বৃহত্তম উপন্যাস Life of Clim Samghin উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত প্রথম দুইখানি উপন্যাসে গোর্কি দেখিয়েছেন, মানুষ যত বড় শক্তিশালী ও চরিত্রবান হোক না কেন, একা তার পক্ষে সমাজের সংখ্যাতীত গ্লানির বিপক্ষে যুদ্ধ করে বিজয়ী হ'বার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁর Mother (মা) উপন্যাসের তুলনা বোধ করি জগতের সাহিত্যে নেই। গোর্কির দেশপ্রেমের শতদল রাগরঞ্জিত হয়ে এই উপন্যাসেই ফুটে উঠেছে। শেষ জীবনে তিনি "Life of Clim Samghin" নামে যে বিরাট উপন্যাস রচনা করেছেন সেখানি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বিপ্লবপূর্ব্ব রাশিয়ার ছবি তিনি যথাযথ ভাবে এই উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় চিত্রিত করেছেন। এর বর্ণনসমৃদ্ধি, অবাধ প্রবাহ, মুক্তপ্রেম-বৈচিত্র্য প্রভৃতির তুলনা রাশিয়ান সাহিত্যে বিরল।

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

র‍্যামোনা

'র‍্যামোনা' ছবি তোলার ভারী তোড়জোড় চলেছে। দলে দলে লোক চলেছে—ভারে ভারে জিনিষ চলেছে। থরে থরে সাজান জিনিষ—জিনিষ আর জিনিষ।

একশ সাইত্রিশ মাইল পার হয়ে এলো। ওই যে পাহাড়, ওর গায়ে গায়ে সবুজের মায়া, ওর পায়ের তলায় সবুজ কার্পেট—ওই বিস্তৃর্ণ সবুজ তৃণ ক্ষেত্র; ওই খানেই তো আসছে ওরা দলে দলে।

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের ছবি 'র‍্যামোনা' রূপ নেবে ওইখানেই। সারা গায়ে জ্বলবে আবীরের আলো। রঙ, আর রঙ। রঙে রঙে বোনা। ঝলমল করবে রূপে,—নীলে, লালে, সবুজে—আরো আরো কত রঙে। সূর্য্যের সাতটা শিউরান আলো ওর গায়ে এসে হবে জলছবি। ও হবে রঙীণ ছবি।

সব চললো

'র‍্যামোনা' ছবির জন্তে চলেছে বাড়ী, চলেছে গাড়ী, চলেছে খাবার। চলেছে হাজারে হাজারে লোক। চুয়াল্লিশ হাজার একার জমি—তার ওপর এসে পড়েছে যত রকম ছবির সাজ সরঞ্জামের জিনিষ, চলায়মান বাড়ী, বড় বড় সেট। দিন রাত শব্দ উঠছে খটা খট, খটা খট—থাকবার বাড়ী হচ্ছে, ছবির বাড়ী হচ্ছে।

টেনিস খেলো, সাঁতার কাটো, ঘোড়ায় চড়ো। মুক্ত ভূমি, অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিতে গা ভাসিয়ে যাও। আউটিং করেছ কোনদিন? দেখগে যাও! ফক্সের লোকেরা আউটিং করছে। মনে রেখো, ঝরণার গরম জলের কথা। পরিচালক হেনরি কিং বলেছে, ওখানেই ছ সপ্তাহ ধরে সুটিং করবে।

'র‍্যামোনা' ছবির নায়িকা লরেটা ইয়ং

লরেটার গাড়ী

লরেটা ইয়ং সাজছে এ ছবির নায়িকা। এসেছে ও সেখানে। বাড়ী এসেছে গাড়ীতে। ছু খানি ঘর তাতে। এক খানিতে বই পড়ে আর গল্প করে, অপর খানিতে শোয়। একটা ছোট্ট রান্নাঘর আর ফেণায়মান বুদ্বুদের বলের মধ্যে বসবার জন্তে একখানি বাথ-টাবওলা স্নানের ঘর। আর কি চাও? রেফরিজারেটর?—তাও আছে।

ভুল বোঝা

সেদিন লস এঞ্জেলসের এক দোকানে বেজায় ভিড়। গার্ব্বো নাকি এসেছে সেখানে। লোক জনের ছুটোছুটী, হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। দেখবেই গার্ব্বোকে। দেখবেই ওর রক্ত মাংসের শরীরখানাকে। কে কোথায় চেঁচিয়ে উঠেছে গার্ব্বো এসেছে, ওমনি কাতারে কাতারে লোক ছুটলো "গার্ব্বো গার্ব্বো" করতে করতে। কোথায় গ্রেটা গার্ব্বো! ক্যারোল লম্বার্ডের হোল মহাবিপদ। ও তাড়াতাড়ি ওর রঙীন চশমাটা খুলে ফেল্লে, চেঁচিয়ে উঠে বল্লে; আমি গার্ব্বো নই. জেন পিটার্স।

ভিড় ভাঙলো। এ ছায়াছবির কোন মেয়ে, এ কথা তারা না ভেবেই চলে গেল। ক্যারোল মুক্তি পেল।

ক্যারোল মিথ্যে বলেনি। ক্যারোল লম্বার্ড নামটা বল্লে হয়ত সহজে মুক্তি পেতনা, তবু যে নামটা বলেছিল তা ওর নিজের নামই। ক্যারোল লম্বার্ড নামটা ওর আসলে ছবির জন্তেই নেওয়া।

ফ্রেডির সখ

কিছুদিন আগে খবর পেয়েছিলুম শার্লি টেম্পল ভয়ানক ছবি তুলচে। ছবি তোলা তখন ছিল ওর ভয়ানক সখ। সেদিন খবর পেলুম ফ্রেডি বারথোলোমিউরও নাকি ছবি-তোলা-সখ নেশায় দাঁড়িয়েচে। ফ্রেডির এক চিত্রামোদী একটা ষোল মিলিমিটার ক্যামেরা পাঠিয়েচে, তাই দিয়ে আজকাল মুভী ছবি তুলচে। যে ছবি আমরা সিনেমায় গিয়ে দেখি তা হচ্চে পয়ত্রিশ মিলিমিটারে তোলা।

ফ্রেডির মতলব হচ্ছে নিজের পোষা জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ছবি তোলা। ওর পোষা কুকুরই সে ছবির প্রধান আর্টিষ্ট। পোষা খরগোস আর সাদা ইঁদুরটা নামবে বড় বড় অংশে।

মোটর সাইক্ল-এ খাবার

এমন একটা দিন—যেদিন রান্না হয়নি অথচ হলিউড ষ্টারটির ইচ্ছে বাড়ীতে খাওয়া সেরে নেবে। বাড়ীতে চাকর চাকরাণী পর্য্যন্ত নেই; তারাও হয়ত বেরিয়ে গেছে। ষ্টারটির নিজেরও রেধে নেবার ইচ্ছে নেই। সেদিন টেলিফোনে ওঁরা কাজ সারে। আর ফোনের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীতে খাবার এসে পৌঁছয়।

মারকো পোলিটি নামে হলিউডে এক হোটেল আছে। সেই হোটেলের আছে এক গাদা মোটর সাইক্ল আর একদল দুর্দ্ধর্ষ, দুঃসাহসিক মোটরবাইক চালক। এরা কিছু ভয় করে না। জল, ঝড়, রাস্তার লোকের ভিড় কোন দিকে এদের লক্ষ্য থাকেনা। খবর পেলেই এরা ছুটবে খাবার নিয়ে সেই লোকের বাড়ী।

ও হোটেলের কথা যাক। এই যে হোটেলটি গড়ে উঠেচে তার প্রথম কল্পনা জাগে মারলে ওবেরণের মাথায়। সেই প্ল্যানটি দেয় ওই হোটেলের মালিককে।

মারলে বলেছে: ক'লকাতায় থাকবার সময় ও নাকি এমন করেই খাবার পেত। আরো বলেছে যে, মোটে তিন শিলিং ন পেন্স, (প্রায় টাকা আড়াই) খরচ হোত

মারলে ওবারণ

ওদের দুজনের খেতে। তাতে থাকত সুপ, চিকেন, আর শাক-সবজী তো বটেই।

এ কথায় ওদেশের ওরা চমকে গেছে, ভাবছে এত সস্তা!

খুচরো খবর

স্পেনসার ট্রেসির চিঠি আসে বেশী সহযোগীদের কাছ থেকে।

পরিচালক ফ্রিট্জ ছিলেন একজন বিখ্যাত চিত্রকর।

* * *

সিলভিয়া সিডনির বাপ হচ্ছে রুমেনিয়ান আর তার মা হচ্ছেন রাশীয়ান।

* * *

'দি উইচ অব দি টিমবাকটু'—ছবিখানা লাওনেল ব্যারিমুরের ছবি। আজকাল নাম হয়েছে 'ডেভিল্‌স ডোল'। এতেই নামচে মরিণ ও'সুলিভ্যান এবং ফ্র্যাঙ্ক লটন; ছবি পরিচালনা কচ্ছের্ন টড ব্রাউনিং।

* * *

ক্লদেৎ কলবার্ট টেনিস খেলেনা। ওতে ওর শরীরের ওজন কমে যেতে পারে তাই।

ক্লদেৎ কল্‌বার্ট

ওম্যান্ প্রোপোজেস্

হেমেন মল্লিক

বেলা সাড়ে নটা।

নিভা সেনের স্নান, ব্রেক্‌ফাষ্ট, সাজসজ্জা সমস্তই শেষ হয়ে গ্যাছে। ডায়রী খুলে বসে অভ্যাস মত সমস্ত দিনের কাজের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে।

একটা ইংরেজী অরকেষ্ট্রার সুর গুন্ গুন্ করতে করতে কক্ষে প্রবেশ করল তার রুমমেট! কোনো জীবন বীমা কোম্পানীর অসামান্য প্রতিপত্তি-বিশিষ্টা নামু করা Lady Organiser হচ্ছেন এই—মিস ললিতা সাহা! গত তিন বৎসরের মধ্যে সে প্রায় তিন লাখ টাকার পলিসি বিক্রয় করেছে। নির্ভীক সারল্য ও বাধাহীন গতি এই দুটির জোরে সে প্রগতি-পন্থী আধুনিক মেয়ে-জগতের মধ্যে বেশ কিছু নাম করে নিয়েছে।

নিভা সেন মিশন স্কুলের টিচার। বি,এ দেবার পর থেকে,—আজ বছর খানেক হল তারা দুজনে Y. W. C. A-র এই সাত নম্বর কামরার বাসিন্দা হয়ে আছে। নিভা সেন ললিতার মত অতটা আধুনিক নয়, মানে সে সিগারেট খায় না, সাহেবী হোটেলে গিয়ে স্বল্প-পরিচিতের সঙ্গে ডিনার খেতেও পারে না! নারীর প্রকৃতিগত সঙ্কোচ ও বাল্য-বয়সের লজ্জাশীলতার হাত থেকে সে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি, আর সেই জন্যেই বোধ হয় নিভাকে আরো লোভনীয় এবং কাম্য মনে হয়। বছর একুশ বয়স হলে কি হয়, ওকে যে একবার দেখেছে (অনেকেই দেখেছে)—সেই বলেছে Protty little girl অর্থাৎ—রূপতত্ত্ববিদেরা নারীর অবয়বে যে বস্তুটির প্রশংসা সব চেয়ে বেশী করেন, নিভা সেনের সেই School-girl complexion টুকু সত্যের আনাই আছে! তার কারণ, স্কুলে সে ড্রিলের ক্লাস্ নেয়, মেয়েদের সঙ্গে নিজেও দৌড়াদৌড়ি করে এবং 'বারবেলে' ও শেখায়!

ইলাস্‌ট্রেটেড উইক্‌লির একটা পৃষ্ঠা খুলে ললিতা বল্লে—Body beautiful-এর একখানা বিজ্ঞাপন দেখেছো সেন? এদের কাছ থেকে একটা সেট আনালে কেমন হয়? সত্যি, ছবিটা দ্যাখো একবার? মেয়েটার বয়স কতো জানো? পঁয়তাল্লিশ! ঐ বুড়ো বয়সের ফিগার খানা দেখেছো একবার? পারফেক্‌ট্‌লি ফ্যাস্‌নিনেটিং! তুমিও আনাবে এক সেট্?

স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে নিভা বল্লে,—না ভাই, আমার অত টাকা নেই। নিভা মুখে যাই-ই বলুক মনে মনে সে নিশ্চয়ই জানতো যে তার ফিগারের এমন কোন বিকৃতি নেই যার জন্যে ঐ সব ফ্রেঞ্চ ট্রিট্‌মেন্ট সেট অত দাম দিয়ে আনতে হবে।

সে আবার বললে সকৌতুকে, তোমারই বা কিসের দরকার ও সবের, ললি? তুমি তো আজীবন অবিবাহিতা থাকবে, পুরুষের কোন সম্পর্কই রাখবেনা বলেছো?

—শরীরের ঐশ্বর্য্য বুঝি শুধু বিবাহের জন্যে, পুরুষের জন্যে? তুমি ভীষণ ব্যাক-ওয়ার্ড ভাই সেন। আমার শরীরকে আমি কান্তিমান করতে চাই পূর্ণরূপে বেঁচে থাকার জন্যে, জীবনকে আরও বেশী ভোগ করার জন্যে! বিয়ে করব না বলে কি সংসার ত্যাগ করে কৃচ্ছ্রসাধন করব বলেছি? ভালো কথা, সেন, মিঃ ঘোষের সংবাদ কি বলোতো? আজ কয়েকদিনই তুমি ও বিষয়ে আমাকে কিছু বলোনি? কৃপণের মত একা একা সমস্ত আনন্দ গ্রহণ করতে তোমার লজ্জা বোধ করা উচিত! বলো, further developments.

মিঃ ঘোষের কথায় নিভার মুখে যেন একখানি মেঘের ছায়া প্রতিফলিত হয়ে উঠলো। নিরানন্দ স্বরে সে বললে, কোন ডেভেলপ্‌মেন্টস্ নেই ললি, নতুন কিছু নেই বলবার! সত্যি! নিভার চৌকির পশ্চাতে এসে ললিতা বললে আমার দিকে চেয়ে বলোতো নিভা ও কথা সত্যি কি না? মিঃ ঘোষ অত স্মার্ট না হলে তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারতাম। তুমি কি বলতে চাও যে তোমাদের তারিখ পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে যায়নি এখনো? বছর খানেক হতে চলল, মিঃ ঘোষের মত ছেলে যে এখনো প্রোপোজ করেন নি এ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না!

ললিতার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিভা আহতস্বরে বললে—না ভাই, সত্যিই ও সব কিছু হয়নি আমাদের!

ভয়ানক বিস্মিত স্বরে ললিতা বললে—কি? তোমরা কি এখনো পরিণয়-প্রাসাদের পাঁচিলের বাইরে প্রবেশ পথ খুঁজে বেড়াচ্ছো? কি ব্যাপার বলোতো খুলে—কোনো অমিল হচ্ছে নাতো তোমাদের?

—ও সব কিছু না। মিঃ ঘোষ যেমন ছিলেন তেমনই আছেন, কোন পরিবর্ত্তন নেই।

—তবে!

—আবার তবে কি? আমি কি করতে পারি? আমাকে বলো প্রোপোজ করতে?

সজোরে মাথা নাড়িয়ে ললিতা বললে—'course, কেন নয়? এটা প্রগতির যুগ মনে থাকে যেন! Equal rights, Equal status, মেয়েরা কেন প্রোপোজ করবে না শুনি?

আপত্তির কারণ অনেক থাকা সত্ত্বেও ললিতার অতখানি তেজস্বীতার সম্মুখে সে কেবল বলতে পারলো:

—কি যে বলো তুমি ললি। মেয়েরা করবে বিবাহের প্রোপোজাল! পাগল বলবে যে?

—কে বলবে পাগল? মেয়েরা চাকরী করছে, কেউ পাগল বলে না? মেয়েরা উকিল ব্যারিষ্টার হচ্ছে কেউ পাগল বলে না? মেয়েরা ভোট দিচ্ছে, কাউন্সিলে যাচ্ছে কেউ পাগল বলে না? প্রোপোজ করলেই পাগল বলবে? সে দিন আর নেই নিভা সেন! আমার কথা শোনো। স্থান কালের সুযোগ উপস্থিত হলেই এবারে তুমি যোল্ডলি প্রোপোজ করবে, বুঝেছো?

—কিন্তু আমি কি করে প্রোপোজ করব শুনি? তুমি তো খুব লেকচার দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে। কি বলব আমি?

—কি আবার বলবে? ওরা কি বলে প্রোপোজ করবার সময়ে? বই-এ, কাগজে পড়োনি? বন্ধুদের কাছে শোনোনি? তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্টতার কি রকম footing হয়েছে তা তো আর আমার ঠিক জানা নেই?

মেয়েদের গানের ক্লাস নেবার সময়ে, সেলাই শেখাবার সময়ে, এমন কি কনডাক্ট্ রিপোর্ট লেখবার সময়েও নিভা ভেবে দেখেছে ললিতার তেজস্বী কথাগুলো। সত্যিই তো মেয়েরা যদি সমস্ত বিষয়েই আজ অদম্য ও শক্তিমতী, তবে ঐ একটী বিষয়েই বা তারা অসহায় থাকবে কেন? তাছাড়া, ব্যক্তিগত-ভাবে, মিঃ ঘোষ সম্ভবতঃ একটু দুর্ব্বল-মনোবৃত্তির লোক। কি জানি—ওঁর আবার সেই Inferiority complex নেই তো? 'একটা Graduate মেয়ে, স্বাধীন ভাবে মাসে শ'খানেক টাকা উপার্জ্জন করছে সে কি আমার স্ত্রী হতে রাজী হবে'—এই রকম চিন্তা করেই বোধ হয় তিনি আজ পর্য্যন্ত সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারেন নি প্রোপোজ করবার! তাছাড়া, বন্ধু বান্ধবেরাও যে ওকে ক্ষেপে ফেললে! একটা এস্পার ওস্পার না করে ওর নিজেরও কি নিষ্কৃতি আছে?—'বলো না ভাই নিভা কবে তোমাদের সেই হবে? ভয় নেই আমরা তোমার সে জীবনের কোনো ভাগ চাইবোনা। তুমি অত Reserve কেন বলোতো, বিবাহের চেয়ে বড় কিছুর সন্ধান পেলে নাকি তোমরা।'

এতখানি সহ্য করতে নিভা আর পারবে না। সে আজই এর একটা কিনারা করবেই। কি আর হবে? প্রথমটা বড় জোর মিঃ ঘোষ একটু অবাক হবেন, কিন্তু তারপর? কথাটা প্রথমে উত্থাপন করতেই যা বাধা, একবার কোনমতে, সুরু করলেই তো সমস্ত ঠিক হয়ে যাবেই, মায় তারিখ পর্য্যন্ত!

আসন্ন দিনের শুভ-সম্ভাবনার আবেশে নিভার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। সে চোখ দুটি বন্ধ করে চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিলে!

নিভা আর সুনীল ঘোষ এস্পায়ার রেঁস্তোরার একটা ক্যাবিনে বসে আছে। দুজনেই নীরব। প্লাজায় সিনেমা দেখার পর তারা প্রায়ই এখানে আসে। ওদের লিমন স্কোয়াশ্ খাওয়া খালি গ্লাস দুটো টেবিলে রয়েছে। ওদেরই মত চুপচাপ, গম্ভীর, কিন্তু অন্তরে ওদের মত পূর্ণ নয়।

সুনীল ভাবছে—আজ নিভার হল কি? যেন কিছু একটা ঘটেছে ওর। আমাকে বলতে ওর প্রাণ চাচ্ছে কিন্তু বলতে ও পারছে না। মুখটা গম্ভীর, থমথমে, ওকি কোন বিষয়ে আমার সহানুভূতি চায়, সান্ত্বনা? কিন্তু ও যে রকম গম্ভীর ও স্থির স্বভাবের মেয়ে ওকে নিজে থেকে কিছু বলাও মস্ত রিস্ক। ও জানে ভাল করেই যে, আর একটুও approachable and encouraging হলেই আমি ব্যাপারটার চূড়ান্ত করে দিই, তবু—ও কি আমাকে ভয় করে মনে মনে? যাই হোক্—আর বিলম্ব নয়, একটা কিনারা আজ করবই। সাইড্ অ্যাটাক্ করার মত সে সুরু করল, তোমার কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে নিভা, আমাকে বলতে বাধা আছে কি?

সঙ্গে সঙ্গে নিভার কাছে সরে বসে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো। সুনীলের এটা প্রথম ধাপ! আজ সে নিভাকে স্থায়ী ও নিশ্চিতভাবে জয় করবেই।

নিভা মনে মনে ভাবছে…গ্লাস দুটো নিয়ে গেলেই সে আজ কথাটা পাড়বে। কিন্তু প্রথমেই কি বলা যায়? মিঃ ঘোষ যে রকম সেন্টিমেন্টাল, উল্টো ভাববেন না তো?

ঘোষ মুখ উঁচু করে সোহাগ বিগলিত স্বরে বললে—my dream-girl!

মাত্র সেদিন অত বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার করার পর আজ এতখানি অবসাদ তোমাতে মানায় নাগো ডার্লিং নিভা! এই কয়েক ঘণ্টাতেই এত বিরহ?

—আমার মনে হয় তোমার কথা মত কাজ করে ভাল করিনি সাহাজাদি।

—তাতো এখন বলবেই! কাজটুকু উদ্ধার হয়ে গ্যাছে যে!

—না ললি, হাসি নয়! আমার প্রোপোজ করাটা শুধু যে হাস্যকর, তাই নয়, উপরন্তু Tresspass করা!

—বটে? Tresspassটা কিসের শুনি?

—নয়? পুরুষের অধিকারে Tresspass করা নয়? ওকে তো সুনীল সেন হতে হবে না, আমাকেই হতে হবে নিভা ঘোষ।

উত্তেজিতা ললিতা বারুদ-ক্যাটার মত উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো, কে বলেছে তোমাকে নিভা ঘোষ হতে হবে? দেশে একটা কোন রীতি চলে আসছে বলেই সেটা স্থায়ী সত্য বলে মেনে নিতে হবে নাকি? অনেক প্রথা বিধি ব্যবস্থা আছে যার পূর্ণ সংস্কার…………

—টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে ওঠায় নিভা ত্রস্তপদে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে, এক মিনিট

ললি, এই সময়ে সে ফোন করবে বলেছিলো···
আসছি···

এক মিনিটের পরিবর্ত্তে প্রায় দশ মিনিট পর নিভা কামরায় এসে ঢুক্‌লো।...তার সমস্ত মুখে চোখে একটা তীব্র বেদনা-বোধের রেখা সুস্পষ্ট

—কি হল আবার। অমন হেবেচেড্‌লি চেয়ে আছো কেন? নিভা!

নিভা যেন সেই ভাবেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল···

হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে ললিতা উঠে এসে বসল নিভার পাশে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর নিভার পৃষ্ঠে হাত রেখে অত্যন্ত শান্ত কোমল স্বরে ললিতা প্রশ্ন করলে; কি হয়েছে ভাই নিভা, অমন করছ কেন? কি বললে ঘোষ?

বালিসের ওপরেই মুখ ঘুরিয়ে নিভা জড়িত স্বরে বললে, শুনবে ঘোষ কি বললে এখন? বললে প্লাজায় আজ সুন্দর একটা ফিল্ম এসেছে—দুখানা টিকিট যেন রিজার্ভ করে রাখি আর সময় মত যেন আমি গিয়ে ওকে নিয়ে আসি, উনি ঘরেই থাকবেন!

—তার মানে! তুমি সিট্‌ বুক করবে? তুমি ওকে নিয়ে যাবে সিনেমা দেখাতে? ওর কি সে ক্ষমতা নেই?

—ক্ষমতার কথা তো হচ্ছে না। আমি যখন একবার ওর রাইট্‌স ইগনোর করেছি তখন বরাবরই আমাকে ঐ রোল নিয়ে চলতে হবে।

ললিতার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। কিছুক্ষণ চিন্তান্বিষ্ট থাকার পর সে বললে, তুমি মিছেই দুশ্চিন্তা করছ সেন, তোমার প্রোপোজ করায় উনি যে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন এটা তারই effect। এ ক্ষণেক স্থায়ী হতে পারে না। তুমি নিয়ে যাও ওকে সিনেমায়, দেখবে আজই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। যত নার্ভাস কোয়ার্‌ল্‌! সীট রিজার্ভ করেছো তো?

—না, আমি যাবনা সিনেমায়।

—তা কিছুতেই হয় না, Be a sport. দাঁড়াও, আমি বুক করে দিচ্ছি।

স্লিপারে পা চালিয়ে দিয়ে ললিতা হলের বার হয়ে গেল প্লাজায় ফোন করবার জন্য।

রাত্রি পৌনে একটা।

ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ-র সিড়ির পাশে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল।

সিল্কের স্কার্ফটা পিঠে জড়িয়ে ললিতা সিড়িতে নেমে পড়ল এবং এক হাতে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে অন্য হাতটা গাড়ীর ভিতরের দিকে চালিয়ে দিলে।

—Good night Banerjee!
—Good night darling!

হাসতে হাসতে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ললিতা সিড়ি দিয়ে হলে প্রবেশ করল। সাত নম্বর কামরার বাইরে থেকে আলো দেখেই সে জানতে পারলে যে নিভা ঘরেই আছে। ঘোষকে সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার ফলে ওদের ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে জানবার জন্য তার অদম্য কৌতূহল ছিল। কিন্তু কামরার ভিতরে এসে সে বিস্ময়াহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিভা সেন টেবিলে মাথা গুজে চুপ করে বসে আছে। বাইরের পোষাক সে তখনো বদলায়নি।

সন্তর্পণে নিভার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়ে ললিতা দেখলো সে গুমরে গুমরে কাঁদছে!

স্তব্ধ নির্ব্বাক ভাবে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার পর নিভার মাথার ওপর হাত রেখে ললিতা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললে, নিভা, কি হয়েছে তোমার? কাঁদছো কেন? ওঠো, কাপড় বদলাও আগে। শাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করার পর সিগারেট ধরিয়ে ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, এবার বলতো সেন তোমার কাহিনী। নিভা নিরুত্তর···

বহুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হবার পরে ললিতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে, কৈ, নিভা, আমি অপেক্ষা করছি তোমার সংবাদের জন্য। কোন আপত্তি থাকলে—

অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলে নিভা কতকটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, আপত্তি টাপত্তির কথা নয় ললি। কাল সকালেই আমি চিঠি লিখে দেবো Mr Ghoseকে যে, ওঁর মত লোকের স্ত্রী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এর একটা শেষ আমি করবই কাল সকালে। ওরকম মীন্‌, হ্যারোমাইণ্ডেড় লোককে যে এ্যাদ্দিন বন্ধুভাবে কি করে বরদাস্ত করে এসেছি বুঝতেই পারছি না। অথচ, আমি ঘোষের মধ্যে—, কেন তুমি আমাকে ওরকম পরামর্শ দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুললে ললি? তুমি তো জানো যে আমি তোমার ডুপ্লিকেট কপি নই—তোমার যুক্তি পরামর্শ নিয়ে আমার কখনো কোন উপকার হতে পারে? কি হল আজ জানো? ট্যাক্সির ভাড়া আমায় দিতে হয়েছে; ওঁকে মারকেট থেকে বাট্‌ন্‌-হোল কিনে দিতে হয়েছে, সিনেমায় ঢুকেই ওঁর চা-এর পিপাসা নিবারণ কর্ত্তে হয়েছে, ইণ্টারভ্যালে আইসক্রীম খাওয়াতে হয়েছে, সিনেমা থেকে বার হয়ে দয়ারাম জুয়েলারের ওখানে গিয়ে ওঁর পছন্দ করা এনগেজমেণ্টের আংটিটা দেখে রাখতে হয়েছে—যেন সেই আংটিটাই ওঁকে কিনে দিই, তারপর এম্প্যায়ার রেঁস্তোরার বিল—

তুমি একবারও জিজ্ঞাসা করতে পারলে না যে, এমন অদ্ভুত আচরণের অর্থ কি?—

অর্থ আবার কি? মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললেন—সুরু যখন অদ্ভুতভাবে, তখন বাকী সবটুকুও সেইভাবেই হওয়া উচিৎ! তুমি যাই-ই বলো ললি, কাল সকালে আমি এ ফার্সের ড্রপ ফেলবোই। টাকা খরচ করে ওঁকে খুশী করতে হয়েছে বলে আমার এতটুকু দুঃখ নেই, কিন্তু সেদিন থেকে আমার যে যন্ত্রণা, যে মানসিক অশান্তি ও অসম্মান ভোগ

করতে হয়েছে তা কেউ বুঝবে না। তুমি কি মনে করো একদিনও রাত্রে আমি ভালো করে ঘুমোতে পেরেছি এর মধ্যে? ওঁর শার্টিং-এর অর্ডার দিতে হবে, স্যুটের মাপ নেবার জন্য আমার দর্জিকে ওঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে—আচ্ছা তুমিই বলোতো ললি—এরকম হতে থাকলে আমি কি সুখী হতে পারবো কোন দিন?

সহসা দুই হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিতভাবে নিভা কেঁদে উঠলো!

বিব্রত ললিতা বলবার কিছু না পেয়ে নীরবেই সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে খেলা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে নিভাকে কিঞ্চিৎ সংযত ও আত্মসম্বৃত দেখে সে মৃদু হেসে বললে, শেষ পর্য্যন্ত তোমায় যদি স্বামীর পার্ট নিতেই হয় তাহলে, ঘর পরিষ্কার করা, রান্না বান্নার তদারক করা, সন্তান প্রসব করা—এ সমস্ত উনি করতে পারবেন তো?

অশ্রুভেজা মুখেই হেসে ফেলে নিভা বললে, হাসি নয় ললি, তোমার যুক্তি নিয়েই আমার এতখানি শিক্ষা হল?

সকাল সাড়ে সাতটা।

এক পৃষ্ঠার মধ্যেই নিভা তার বক্তব্যটা বেশ গুছিয়ে লিখতে পেরেছে। ললির ঘুম ভাঙলে ওকে একবার চিঠিটা পড়িয়ে বয়-এর হাতে সেটা পাঠিয়ে দিলেই চলবে। চিঠিটা সে আর একবার পড়ে দেখলো.........পুরুষের অধিকারে নারীর হস্তক্ষেপ করাটা সমীচীন নয় সত্য কিন্তু অবধারিত জানা সত্ত্বেও পুরুষ যখন কর্ত্তব্যে অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ করে তখন যে-কোন সহানুভূতি সম্পন্ন নারীই সাহায্য করতে চেষ্টা করে......আপনার ক্ষুণ্ণ হওয়া বা সামান্য একটু বিরক্ত হওয়া পর্য্যন্ত ভদ্রতার মধ্যেই কিন্তু ক্রমাগত ও ইচ্ছাকৃত-ভাবে আমাকে এমনভাবে হাস্যাস্পদ করা বা করতে প্রয়াস পাওয়াটা একান্তই ভদ্রতা বিরুদ্ধ........

এই রকম আরো কয়েক লাইন ছিলো। শেষের দিকে......পরিচিত হবার পূর্ব্বে আমি যেমন ছিলাম এখন থেকে আমি সেই অবস্থাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করছি—শুভাকাঙ্ক্ষী নিভা সেন।

চিঠিটা খামের মধ্যে রাখবার পরই দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গ্যালো। নিভা দরজা খুলে ধরতেই হোষ্টেলের বয় একটা চিঠি দিল তার হাতে।

ছোটো খাম, হাতের লেখা মিঃ ঘোষের। ক্ষিপ্র হস্তে চিঠিটা বার করে নিভা পড়ল:

"ডারলিং নিভা, জানি সন্ধ্যাবেলায় দেখা হবেই, তবু কোন কারণে এটা লিখতে হচ্ছে, আশা করি ক্ষমা করবে। মাজ্‌দার দোকানে কাল বৈকালে নতুন কনসাইনমেন্ট খোলা হয়েছে ক্যাডবারি চকোলেটের। ক্যাডবারির টাট্‌কা চকো শুনেছি অমৃতের মতন। পাঠাবে কয়েক পাউণ্ড? খুব খুশী হই তাহলে। এগারোটা পর্য্যন্ত আজ ঘরেই থাকবো। —ইওরস্ সুনীল।

রাগে ও ঘৃণায় নিভার হাত কম্পিত হল। অপরিসীম লজ্জা এবং অপমানে তার সমস্ত মুখখানি রক্তাক্ত হয়ে উঠ্‌লো।

গুড্‌মর্ণিং সেন, এত প্রত্যুষে কার লিপি এলো নিভা ডার্লিং? ললিতা আজ আটটা বাজবার আগেই উঠেছে। নিভা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, চুপ করো ললি, এই দেখো তোমার প্রত্যুষের লিপি।

সমস্তটা পড়ে ললি উচ্চৈঃস্বরে হাস্‌তে হাস্‌তে বিছানায় উঠে বসল।

—বাস্তবিক্—এ অসহ্য! কি করবে?

—কি আবার করব! ঐ আপদ চকোলেট নিয়ে আমি নিজে যাচ্ছি আর ভবিষ্যতে ওর সমস্ত চাওয়ার পথ ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আসছি! সিগারেট ধরাতে ধরাতে ললি মৃদুগুঞ্জনে সুর ধরল—"জয় যাত্রায় যাওগো..."

হ্যালো, কি সৌভাগ্য আমার! নিভা, ডার্লিং—তুমি? গুড মর্ণিং।

—মর্ণিং, আমি নিজেই এলাম আপনার চিঠির উত্তর দিতে!

—কৈ? আমার চকো কৈ? আনোনি বুঝি? এই যে এইখানে বসো। না, না ওখানে কেন? আমার এই চেয়ারটাতেই হবে, এসো।

অত্যন্ত কঠোরভাবে নিভা বললে —ধন্যবাদ, আমি এইখানেই বেশ বসেছি। তাছাড়া সময়ও আমার বেশী নেই। তাড়া-তাড়িতে আপনার চকোলেট কেনবার সময় করে উঠতে পারিনি, কিছু মনে করবেন না। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এম্পায়ার ক্যাবিনে বিবাহের প্রস্তাব তুলে আমি মূর্খতা করেছি মিঃ ঘোষ এবং তার জন্য যথেষ্ট লাঞ্ছনাও আমি পেয়েছি। আমার ধারণা ছিলো যে আমাদের এই বন্ধুভাব বা প্রীতি—এটা মিউচুয়াল, কিন্তু সমস্তটা স্পষ্ট বুঝতে পারার পর আপনার বন্ধুত্ব কিম্বা Love—কোনো কিছুর জন্যই আমার আর বিন্দুমাত্র কামনা নেই। ঝগড়া করতে আমি চাইনে, আমার দ্বারা যদি কোন ভাবে আপনার অসম্মান হয়ে থাকে তাহলে আমায় ক্ষমা করবেন—

—একি, নিভা—এ সব কি বলছ তুমি? আমাদের ব্যবস্থাটা কি তুমি ক্যান্সেল করছ নাকি? আমাদের বিয়ে, আমাদের প্ল্যান......

—হুঁ, সংক্ষেপে তাই-ই করছি। আপনার আচরণ সম্প্রতি আমার পক্ষে দুর্ব্বোধ্য ও অসহ্য হয়ে উঠেছে মিঃ ঘোষ। আমার সেদিনকার প্রোপোজাল আমি উইথড্র করছি। ব্যথা-হত মুখে সুনীল বললে, আমার এতদিনের স্বপ্ন, এতদিনের আশা, কল্পনা এমনি করে ধূলিসাৎ করে দেবে তুমি নিভা? কেন, কি হল তোমার? সত্যিই কি তোমার ভালবাসা এখন ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়েছে?

চোখ বন্ধ করে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিভা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, হ্যাঁ—

এখন থেকে আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে ভবিষ্যতে যে আপনি আমাকে অসুবিধায় ফেলবেন না এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি—বলে নিভা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

নিভার পা ছুটি কাঁপছে। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে, চেয়ারের হাতলছুটো ধরে সে নিজেকে শান্ত স্থির করবার চেষ্টায় চোখছুটি আবার বন্ধ করল।

সুনীলও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো। তার চোখের তারা ছুটো কোন লুক্কায়িত গোপন আনন্দে নৃত্য করছিল কি? নিভার দিকে একপদ অগ্রসর হয়ে সে বললে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিচ্ছু করবনা একদিন বলেছিলাম নিভা। কিন্তু একটা কথার উত্তর তুমি আমাকে দাও আজ। আমার প্রতি কোন প্রেম তোমার সত্যিই কি নেই এক বিন্দুও? অন্ততঃ সেদিনকার আগের দিন পর্য্যন্ত? বলো নিভা, আমার দিকে চাও?

সুনীল নিভার হাত ধরেছে।

জোর করে মাথা বেঁকিয়ে নিভা বললে, —আমি তো সমস্তই বলেছি একবার, আমায় যেতে দিন মিঃ ঘোষ, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সহসা হাসতে হাসতে সুনীল বললে, স্ত্রীলোকের প্রোপোজালের ফল তাহলে আমরা দেখলাম!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত মুখ তুলে নিভা বললে,—তার মানে?

কণ্ঠস্বরে স্বর্গীয় সোহাগ ঢেলে দিয়ে সুনীল বললে, মানে আর কিছুই নয় নিভা, এবার আমার পালা। আমি প্রস্তাব করছি, আজ থেকে এক মাসের মধ্যেই তুমি হবে আমার বউ আর আমি হবো তোমার—কি বলে?—'ওগো'! আমার প্রস্তাবের কোন প্রত্যাখ্যান বা এড়িয়ে যাওয়া নেই তাও বলে দিচ্ছি—সরে এলো!

নিভার সমস্ত ঘৃণা-বিতৃষ্ণা আবার কি প্রেমে পরিবর্ত্তিত হল? *

---

* চক্রতীর্থে পঠিত।

স্নেহ-হারা

শ্রীরমেন্দ্র নাথ বর্ম্মণ

১। এ অকুল স্রোত, এমন স্রোত যে কোথায় এগিয়ে নিয়ে এসেছে! যেখানে এসেছে সেখানে চতুর্দ্দিকেই স্রোত। যে স্থানে দাঁড়িয়ে যে বৃক্ষকে বেষ্টন করে পৃথিবীর আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল—সে অবলম্বনও আজ নিমজ্জিত এবং সে বৃক্ষও নাই। কাঁদো, কাঁদো.........কেঁদে দেখো সান্ত্বনা পাওয়া যায় কিনা। বোধ হয় কোন পুস্তকে, উপদেশে, ভাষায় এর সান্ত্বনা মিলিতে পারেনা। আছে শুধু নিজের মনের নিভৃত গুহায়। যখন কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে পৃথিবীর কাছে বিমুখ হয়ে নিজের মনের দিকে চাইবে তখন বোধহয় পেতে পারো।

২। মাঝে মাঝে মনটা বাত্যালোড়িত হয়ে এমন নুয়ে পড়ে যে এই আলোড়নের পেছনে তাঁর প্রচ্ছন্ন মঙ্গল রয়েছে এ কথাটাও তখন মন শুনতে চায়না। সে চায় সকল তুচ্ছ করে, সকল নিয়ম ভেঙ্গে চুরে পুরাতন অতীতকে নতুন করে গড়ে তুলতে। কিন্তু যখন সে অতীতকে আর পাবেনা—অতীত চলে যাবে বিস্মৃতির তলে—মাঝে মাঝে মনে পড়বে স্বপনের মত—তখন তার সেই পুরাতন স্মৃতি হবে নূতন এবং ক্ষীণ। এইত নিয়ম, এ নিয়ম লঙ্ঘন করে কার সাধ্য?

৩। মন ভেঙ্গে যায়—কালের নিষ্ঠুর অত্যাচারে মাঝে মাঝে সে ভেঙ্গে পড়ে—এ ভাঙ্গন রোধ করবার নয়। এ যেন সেই 'চেরিবডিস্' জল পানে রত—আর দূর থেকে সকল দ্রব্য আস্তে আস্তে ভেসে এসে চির ক্ষুধিতের গ্রাসে পতিত হচ্ছে। পৃথিবীর ধন, মান, অহঙ্কার, জীবন যৌবন সকলি এসে নিঃশেষে হজম হয়ে যাবে, আর জল ছেড়ে-দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যাবে স্মৃতিটুকু তার। এই ভেসে আসার সময়টুকুর মাঝেই যত সব আপন, পর গড়ে নেওয়া। আপনই বা কি—পরই বা কি। গড়াই বা কি—ভাঙ্গাই বা কি! এই অল্প সময়ের ক্ষুদ্র পথটুকুর জন্য আশে পাশে যারা যায় তারাই আপন, আর একটু যে এগিয়ে গেল—পড়ল সে আগে—ভাঙ্গল আপনত্ব।

৪। "কস্তে পিতা কা বা মাতা" সকলই ত ক্ষণিকের জন্য গড়া। তাঁরা শুধু এ পথটুকুর কতকটা বয়ে এগিয়ে দেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য একলার পথটুকুর চলার ধরণ টুকু শিখিয়ে দেওয়া। তার পরেই চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে কোথায় চলে যান কে জানে। তাঁরা শুধু কর্ত্তব্যের উপযোগী করে দেবার জন্য। তাঁহাদের তিরোধানের সাথে সাথে সঞ্চিত কর্ত্তব্যগুলি একটীর পর একটা ক'রে উপস্থিত হ'য়। তার পরেই সংসারের পতন উত্থান ও সুখ দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে প্রত্যেককেই অগ্রসর হতে হবে। এ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করাই তাঁদের স্মৃতি-তর্পণ।

৫। কর্ত্তব্য সম্পাদনেই তাঁহাদের স্নেহের প্রতিদান। এ কর্ত্তব্য শুধু নিজের স্বার্থ—কিন্তু পরোক্ষে এর ফল অনেক। স্বার্থটুকুই শুধু নিমিত্ত। পরোক্ষই মূল কারণ। কর্ত্তব্য সাধনে নিমিত্তও মূল—দুইই মানুষের সকল দুঃখ দুঃখ অপহরণ কোরে দেয় আনন্দ।—আনন্দ দেয় শোকে সান্ত্বনা। আর যে কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ সে দুঃখে সারা জীবন অতিবাহিত করবে। আর শুধু খুঁজবে

স্বপ্ন ?

শ্রীবসন্ত কুমার আঢ্য

তাকে কি ভালোই বাসতুম! কেন ভালবাসে? মানুষ কেন ভালবাসে? পৃথিবীতে একটি ছাড়া যেন মানুষ নেই, মন একজনকার চিন্তা ছাড়া জানে না, অন্তরের উৎস থেকে মুখে উৎসারিত হয় একটিমাত্র নাম; সেই নাম সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা হয় জপমালা! কথাগুলো ভাবলে আশ্চর্য্য না হয়ে পারি না।

আমাদের ভালবাসার কাহিনী আরম্ভ করছি। সে কাহিনী চির পুরাতন অথচ চির মধুর। সেই প্রথম দর্শনেই প্রেম। তার কোমল অন্তরের নিভৃত নীড়ে, তার বাহুর জগতে, তার স্নেহের সুশীতল ছায়ায় পুরো একটি বছর কাটলো। তার মোহন কথার জালে, তার কাছ থেকে পাওয়া সবকিছুর মোহময় বন্ধনে বন্দী হয়ে আমার জীবনের পুরো একটা বছর কেটে গেল। দীর্ঘকালের মধ্যে নিজের সত্বা তার মধ্যে এমন করে বিলুপ্ত হয়ে গেল যে দিন রাত্রি আমার কাছে সমান হয়ে উঠলো। মানুষের সুদীর্ঘ কালের আবাসস্থল এই পৃথিবীতে আমি জীবিত কি মৃত তার অনুভূতি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেললুম।

সান্ত্বনা। এবং সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়ে বাড়াবে আরও দুঃখ।

৬। আজ স্নেহ-হারা, বাঁধন-হারা হয়ে কাঁদছ—কেঁদে, কেঁদে যখন নিজের মনের দিকে চেয়ে কর্ত্তব্যের সন্ধান পাবে, তখন পাবে সান্ত্বনা—তখন আর কাঁদবেনা।

তারপর পৃথিবীর সব আকর্ষণ তুচ্ছ করে সে চলে গেল। কেমন করে? তা জানলুম না। তা আজও জানিনা। একদিন সন্ধ্যায় বর্ষাস্নাত হয়ে সে বাড়ী ফিরলো। বাইরে বৃষ্টির অবিরাম ঝর্‌ঝর্‌ গান শোনা যাচ্ছিল। পরদিন তার আরম্ভ হোল কাশি। এক সপ্তাহ এমনি চললো। তারপর সে শয্যা গ্রহণ করলে। কিসে যে কি হোল তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। তবে ডাক্তার এলো, ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে চলে গেল। ওষুধ এলো, তাকে খাওয়ানো হোল। দেখলুম হাতদুটো তার গরম, কপাল পুড়ে যাচ্ছে, চোখদুটো উজ্জ্বল কিন্তু সেখানে বিষাদের ছায়া। আমি কি কতকগুলো শুধোতে সে জবাব দিয়েছিল, কিন্তু তা আজ আমার মনে পড়ে না। সব—সব—সব আমি ভুলে গেছি। সে আমাকে চিরতরে ছেড়ে গেল; শেষক্ষণে তার সেই মৃদু, দুর্ব্বল দীর্ঘশ্বাস আজও আমি ভুলতে পারিনি। নার্স বলে উঠলো "ওঃ—" নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বুঝতে আমার একটুও দেরী হোল না।

আর কিছু—এ ছাড়া আর কিছু আমি জানলুম না। একজন পুরোহিত এসে বল্লে "তোমার রক্ষিতা?" আমার মনে হোল পুরোহিত তাকে অপমান করছে। সে যখন চলে গেছে তখন সে কথা জানবার অধিকার কারো নেই। আমি পুরোহিতকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বল্লুম। আর একজন এলেন। অন্তর তাঁর দয়া-মায়ায় ভরা। তিনি যখন আমাকে তার কথা শুধোলেন তখন আমার চোখ থেকে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

ওরা সবাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চাইলে। কি যে তারা আমাকে শুধিয়েছিল মনে পড়ে না; খালি মনে পড়ে একটা কফিন, আর তার মধ্যে তাকে ভরে হাতুড়ি মেরে পেরেক ঠোকার শব্দ। ওঃ—ভগবান!

তাকে গোর দেওয়া হোল; ওই গর্ত্তে তাকে গোর দেওয়া হোল। কত কে এলো—তার বান্ধবীরা। আমি ছুটে পালালুম খানিকটা ছুটে তারপর পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী এসে পৌছালুম। পরদিন আমি দেশ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়লুম।

সবে কাল আমি প্যারীতে ফিরেছি। বহুদিনের পর যখন আবার নিজের ঘর—আমাদের ঘর, আমাদের গৃহসজ্জা, মৃত্যু মানুষকে যে সম্পদের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়—সেই সব যখন আমার চোখে পড়লো তখন বিস্মৃত শোকের সাগর উথলে উঠলো। এমন অভিভূত হয়ে পড়লুম যে জানলা খুলে নীচে পাথর বাঁধান পথে লাফিয়ে পড়বার দুর্ণিবার একটা আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসলো। যে দেওয়াল, যে ছাদ একদিন তাকে আশ্রয় দিয়েছিল তার মাঝখানে থাকা আমার পক্ষে এমন অসহ

হয়ে উঠলো যে তার স্মৃতিবিজড়িত এই আবেষ্টনীর মাঝখান থেকে ছুটে বেড়িয়ে পড়বার জন্তে টুপীটা তুলে নিলুম। দালানে টাঙানো বড় আরসীখানার সামনে দিয়ে দরজার দিকে যাবার সময় আমার মনে পড়ে গেল, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখবার জন্যে, নিজের রূপের অম্লান ঔজ্জ্বল্য, অটুট স্বাস্থ্যের সজীবতা, আসতে যেতে দেখবার জন্যে সে আরসীখানা ওখানে টাঙিয়ে ছিল।

যে আরসীর বুক তার ছায়াপাতে কতবার ঝলমলিয়ে উঠেছে, তার সামনে এসে আমি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। এতবার—এতবার তার ছায়া পড়েছে ওই আরসীর বুকে যে মনে হোল আরসী তার প্রতিচ্ছবি নিজের বুকে ধরে রেখেছে। মসৃণ, গভীর, শূণ্য আরসীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কম্পিতপদে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার দৃষ্টির সামনে সব সময়ে যেমন তার মূর্ত্তি দেখি, আরসীর বুকেও তার প্রতিচ্ছবির সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে দেখলুম। সেই শূণ্যপ্রাণ আরসীর উপরও গভীর একটা ভালবাসা অনুভব করলুম। স্পর্শ করলুম—মৃত্যের নিথর শীতলতা আরসীর বুকে। ওঃ—স্মৃতি! দুঃখের জ্বালাময়ী, ভয়াবহ স্মৃতি-বিজড়িত আরসী আমাদের বুকে বেদনার সমুদ্র উত্তল করে তোলে। যারা স্মৃতি ভুলতে পারে, মনের পট থেকে বিগত জীবনের প্রেমের, স্নেহের সব ছবি নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারে তারাই সুখী। আমার বেদনার সাগর অপার, অকূল।

বেড়িয়ে পড়লুম। অজান্তে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখন যে গোর স্থানে এসে পড়েছি বুঝতে পারলুম না। তার ছোট গোর খুঁজে পেলুম। গোরের উপর শ্বেত পাথরের ক্রুশ চিহ্ন, তার গায়ে লেখা রয়েছে

"সে ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।"

ওইখানে মাটির কোলে সে আশ্রয় নিয়েছে। তার শিরীষকোমল তনুলতা কালের স্পর্শে বিকৃত হয়ে গেছে। কী ভয়ঙ্কর! মাটিতে কপাল রেখে কতক্ষণ উপুর হয়ে পড়ে কেঁদেছিলুম জানিনা। হঠাৎ চেয়ে দেখলুম পৃথিবীর বুকের উপর রাতের অন্ধকার যবনিকা নেমে আসছে। হতাশ প্রেমিকের কি এক উন্মত্ত বাসনা আমাকে পেয়ে বসলো। সেই রাত্রিতে শেষবার তার কবরের উপর পড়ে চোখের জলের সঙ্গে বুকের বোঝা হালকা করবার অদম্য আকাঙ্খা আমাকে অভিভূত করলে। কিন্তু আমি ধরা পড়ে যাবো, বিতাড়িত হবো। কি করে এই বিপদ কাটাই? কিন্তু বুদ্ধির ধূর্ত্ততা আমার কম ছিল না। তার গোরের উপর থেকে উঠে সশরীরে আত্মার আবাস ভূমিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। ঘুরে বেড়াচ্ছি তো বেড়াচ্ছিই। যে সহরে আমরা থাকি তার তুলনায় মৃত মানুষদের এই সহরটি কত ছোট! তবু ওখানকার অধি-

বাসীরা তাদের জীবন্ত প্রতিবেশীদের চেয়ে সংখ্যায় কত বেশী। আমাদের বংশধর, যারা একই সূর্য্যের আলো দেখে, একই ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা, একই ক্ষেতের আঙুর থেকে তৈরী মদ, আর রুটিতে ক্ষুধা নিবারণ করে তাদের বাঁচার জন্যে কত বড় বাড়ী, কত চওড়া রাস্তা, কত প্রশস্ত ঘরের দরকার হয়।

আর যে মৃত মানবাত্মাদের সোপান বেয়ে আমরা পৃথিবীতে নেমে এসেছি তাদের কতটুকুর প্রয়োজন আছে? পৃথিবী তাদের নিজের বুকে টেনে নিয়েছে, বিস্মৃতি তাদের ধরার বুক থেকে নিঃশেষে মুছে নিয়েছে।

পরিত্যক্ত গোরস্থানের শেষ প্রান্তে, যেখানে ক্রশ চিহ্ন গুলো কালের স্পর্শে আস্তে আস্তে ধ্বংশ প্রাপ্ত হচ্ছে, যে মৃত আত্মার আবাস ভূমিতে নবীন কোন অতিথি কাল আশ্রয় লাভ করবে সেখানে আমি হঠাৎ যেন দেখলুম সজীব জগত থেকে যে আত্মা বহুদিন পূর্ব্বে বিদায় নিয়েছে তারই রহস্যময় অস্তিত্ব। আছাটা গোলাপ কাঁটার ঝোঁপ, দীর্ঘ অন্ধকার ছায়াপাত করে দাঁড়িয়ে আছে এমন ঝাউবনে সেখানটা ভর্ত্তি। মানুষের দেহের সারে পুষ্ট, সুন্দর অথচ বিষাদ মাখা উদ্যান!

সেখানে আমি একা, সম্পূর্ণ একা! কাজেই হামাগুড়ি মেরে সবুজ একটা গাছের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। মোটা, বিষাদ গম্ভীর সেই গাছটার গুড়ি জড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলুম, যেমন করে জলমগ্ন ব্যক্তি ভাঙা জাহাজের তক্তা জড়িয়ে ধরে থাকে।

যখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এলো তখন আমি গুপ্তস্থান থেকে বেড়িয়ে ধীর, মৃদু, নিঃশব্দ পদক্ষেপে সেই অশরীরি আত্মার আবাস ভূমিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। অনেকক্ষণ ঘুরলুম কিন্তু তার আর দেখা পেলুম না। দুহাত বাড়িয়ে চলতে চলতে অন্ধকারে কত বার আমার হাত, পা, বুক এমনকি মাথা পর্য্যন্ত কবরে ঠুকে গেল কিন্তু তাকে দেখতে পেলুম না। অন্ধের মত হাঁতড়ে হাঁতড়ে গুড়ি মেরে যেতে গিয়ে কতবার কত পাথর, কত ক্রশ, কত লোহার রেলিঙ, কত ধাতু নির্ম্মিত কত বাসি ফুলের মালা স্পর্শ করলুম। কত অক্ষরের উপর হাত বুলিয়ে কত নাম পড়লুম। কী রাত্রি! কী ভয়াবহ, অস্বস্তিকর অথচ আকর্ষণে ভরা অন্ধকার রাত্রি! কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলুম না।

আকাশে চাঁদ পর্য্যন্ত নেই। কী ভয়ঙ্কর রাত! দুধারে গোর, মাঝখানে সরু পথ দিয়ে চলতে চলতে কতবার শিউরে উঠলুম। ডাইনে বামে, সামনে পেছুতে আমাকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য গোর। আমার দুর্ব্বল পা কাঁপতে লাগলো, চলতে না পেরে একটা গোরের উপর বসে পড়লুম। বুকের দুরু দুরু কাঁপনের শব্দ নিজের কানে বাজতে লাগলো। সে শব্দ ছাপিয়ে কানে এলো আরো" কি একটা শব্দ। কী? একটা বিশৃঙ্খল, নামহীন শব্দ! দুর্ভেদ্য অন্ধকার নিশিথে নিজের রগের দপ দপানি, না মৃত দেহের বীজে ভরা রহস্যময় পৃথিবীর বুকের শব্দ আমার কাণে এলো? চারদিকে ভীত, বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলুম। এভাবে কতক্ষণ কেটেছিল জানিনা। ভয়ে বিহ্বলতায় এমন অবশ হয়ে পড়লুম যে মনে হল চীৎকার করে উঠবো? মৃত্যুর শীতলতা অনুভব করতে প্রস্তুত হলুম।

হঠাৎ মনে হোল, যে পাথর খানায় আমি বসে আছি সেখানা কাঁপছে। সত্যিই কে যেন ভেতর থেকে পাথরখানা ঠেলছে এমনি ভাবে পাথরখানা নড়ছে। এক লাফে আমি কাছাকাছি আর একটা গোরের উপর গিয়ে পড়লুম। দেখলুম—সত্যিই দেখলুম, যে গোর এইমাত্র আমি ছেড়ে এসেছি তার পাথরখানা খাড়া উঠে পড়লো আর মাটির বুক ভেদ করে উঠে এলো কবরের অধিবাসী উলঙ্গ এক কঙ্কাল। ধনুকের মত বাঁকা পিঠ দিয়ে ওই এতক্ষণ পাথরখানা ঠেলছিল। অন্ধকার রাত, আমি স্পষ্ট দেখলুম ক্রশের গায়ে লেখা রয়েছে

"বাহান্ন বছর বয়েসে মৃত জ্যাক অলিভান্ত এখানে চিরবিশ্রাম লাভ করছেন। নিজের পরিজনকে ইনি ভালবাসতেন; এর অন্তর দয়ায় ভরা আর হৃদয় ছিল মহৎ। ঈশ্বরের করুণা ইনি লাভ করেছেন।"

মৃত আত্মা পাথরের গায়ে নিজের পার্থিব পরিচয় পড়ে দেখলে। তারপর পথ থেকে ছুঁচোলো, ছোট একখানা পাথর কুড়িয়ে

নিয়ে সাবধানে অক্ষরগুলো ঘষে তুলে ফেল্লে। চক্ষুহীন কোটর পাথরের উপর নিবদ্ধ করে কঙ্কাল খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বুড়া আঙুলের ডগা দিয়ে পাথরের গায়ে চকমকির আঁচড়ের মত উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে দিলে

"বাহান্ন বছর বয়েসে মৃত জ্যাক্ অলিভান্ত এখানে চিরবিশ্রাম লাভ করছেন। পিতার সম্পত্তি লাভের আগ্রহে নিয়ত নিষ্ঠুরতার আঘাতে ইনি তাঁকে অকাল মৃত্যুরমুখে ঠেলে দিয়েছেন। এর অত্যাচারের আঘাত এর স্ত্রী, পুত্রদের সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিবেশীদের ইনি প্রতারিত করেছেন। অপরের সম্পত্তির লোভে ইনি হীন চৌর্য্য বৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করতে পশ্চাদপদ হননি। ভগবানের করুণার পরিবর্ত্তে এর মাথায় বর্ষিত হয়েছে তাঁর অভিশাপ।"

দেখলুম লেখা শেষ করে কঙ্কাল চুপ করে দাঁড়িয়ে নিজের লেখা পড়ছে। এধার ওধার চেয়ে দেখলুম সব গোরের বুক জুড়ে বেড়িয়ে যত মৃত মানবাত্মা কবরের উপর আত্মীয়দের দেওয়া মিথ্যা পরিচয় মুছে তার জায়গায় জলন্ত অক্ষরে লিখে দিয়েছে তাদের সত্য পরিচয়। দেখলুম যত হিংস্র, খল, মিথ্যাবাদী শয়তান মিথ্যার মুখোসে সত্য পরিচয় গোপন করে লুকিয়েছিল কবরের অন্ধকার গহ্বরে। পৃথিবীর যত সদাশয় পিতা; সাধ্বী পত্নী, পিতৃভক্ত পুত্র, নিষ্পাপ কুমারী, সাধু সওদাগর নিজেদের বহুদিনের গুপ্ত অথচ নিদারুণ সত্য পরিচয়, যার গোপন রহস্য এতদিন গুণমুগ্ধ আত্মীয় পরিজনদের অজ্ঞাত ছিল, তা জলন্ত অক্ষরে রাতের অন্ধকার পটে ফুটিয়ে তুলেছে।

হঠাৎ মনে হোল সেও হয়ত তার কবরের উপর আমার অজ্ঞাত অথচ বিস্ময়কর কোন পরিচয় লিখে দিয়েছে। আধ-খোলা কফিন, মৃতদেহ, কঙ্কালের ভীড়ের মাঝখান দিয়ে আমি নির্ভয়ে ছুটলুম তার কবরের পানে। স্থির নিশ্চিন্ত ছিলুম যে তার দেখা পাবো। তার মুখখানা কফিনে দেওয়া চাদরে ঢাকা; তবু তাকে চিনতে আমার একটুও দেরী হোল না। যে পাথরের গায়ে একটু আগে পড়েছি

"সে ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে, পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে" দেখলুম এখন সেখানে জলন্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে

"প্রেমিককে প্রতারিত করবার জন্যে সে একদিন গোপন অভিসারে বেড়িয়ে বৃষ্টি ধারায় সিক্ত হয়ে বাড়ী ফেরে। তাতেই তার সর্দ্দি হয়, তার ফলে হয় মৃত্যু।"

শুনলুম, পরদিন সকালে তার কবরের উপর অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে পাওয়া যায়। *

* মোঁপাসা থেকে।

শ্রীদুর্ব্বাসা

প্রাথমিক চাল (২) ঃ—এ বিষয়ে গত সপ্তাহে কিঞ্চিৎ বলেছি, এ সপ্তাহে আরও দুটো উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে আরও বিশদ-ভাবে আলোচনা করতে চাই। আবার দেখুন, নিম্নলিখিতরূপ হাত নিয়ে 'প' তাঁর স্বল্প-তাসওয়ালা রঙ রুহিতনে প্রাথমিক চাল দেওয়ায় বিপক্ষদল দুইটি ফেরাইএ ডাক দিয়ে দুইখানি পিটে কেমন পরাজিত হলেন।

ইস্কাবন—গোলাম, নয়, পাঞ্জা।
হরতন—বিবি, ছক্কা, তিরি।
রুহিতন—গোলাম, চৌকা, তিরি।
চিড়িতন—টেক্কা, দশ, সাত্তা, চৌকা।

ইস্কাবন—টেক্কা, দশ, সাত্তা, চৌকা।
হরতন—সাহেব, গোলাম, পাঞ্জা, দুরি।
রুহিতন—আটা, সাত্তা।
চিড়িতন—আটা, ছক্কা, তিরি।

ইস্কাবন—আটা, ছক্কা, দুরি।
হরতন—আটা, সাত্তা, চৌকা
রুহিতন—সাহেব, বিবি, দশ, ছক্কা, পাঞ্জা
চিড়িতন—সাহেব, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, তিরি।
হরতন—টেক্কা, দশ, নয়।
রুহিতন—টেক্কা, নয়, দুরি।
চিড়িতন—বিবি, গোলাম, নয়, দুরি।"

"উ—দ" পক্ষ রবারের গেমে ৩০ পয়েণ্টের উপর করেছেন। 'দ' তাস বণ্টন করে একটি ফেরাইএ ডাক দেওয়ায় আর সকলে পাশ দিলেন এবং 'উ' দুইটি ফেরাই বলে ডাকটিকে বাড়িয়ে দিলেন। এইবার খেলবার পালা।

'প' ভেবে দেখলেন যে তাঁর খেঁড়ী যদি গৌণ রঙে (minor suit) কয়েকখানি পিট না ধরতে পারেন, তা' হলে প্রতিপক্ষের গেমে বাধা প্রদান একেবারেই অসম্ভব এবং উপরন্তু ইস্কাবনে হরতনে নিজে না খেলে তাঁর কাছে খেলা এলেই তবে ঐ দুই রঙে চাল দেওয়া তাঁর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। সুতরাং অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি রুহিতনের আটা পেড়ে খেললেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই চালটি অবশ্য সুফলদায়ক হয়েছিল, কিন্তু 'প' দেখেছিলেন যে রুহিতনে তাঁর হাত একেবারেই দুর্ব্বল এবং তদ্ব্যতীত এক ফেরাই ছাড়া রুহিতনে বা অন্যান্য রঙে কেউই ডাক দিতে ভরসা করেন নাই, অতএব ঐ রঙে তাঁর খেঁড়ীর হাতে কিছু থাকা সম্ভবপর। সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প-তাসওয়ালা রঙে প্রাথমিক চাল দেওয়ার দরুণ এ ক্ষেত্রে বিপক্ষদল তাঁদের ডাক অপেক্ষা দুইখানি পিট কম পেলেন। রুহিতনে চারখানি, চিড়িতনে একখানি,

ইস্কাবনে একখানি এবং হরতনে একখানি, মোট এই সাতখানি পিট 'উ—দ' পক্ষ প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। অন্ত কোন রঙে প্রাথমিক চাল দিলে 'দ' তাঁর চিড়িতনের পিটগুলি গঠন করে নিয়ে দ্বিতীয় বার অবধি রুহিতনের টেক্কা আটক রেখে গেম করে নিয়ে যেতে পারতেন। বহু-তাসওয়ালা রঙের চেয়ে স্বল্প-তাসওয়ালা রঙে প্রাথমিক চাল দিলে কত সময় খেলা রক্ষা করা যায় তা' নিম্নলিখিত কোন ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতায় হাত থেকেই স্পষ্ট দৃষ্ট হবে।

অন্ত টেবিলে এই হাত নিয়ে একটি ইস্কাবন ডাকের পর চারিটি হরতনে রঙ করে খেলা

চল্ছিল, ফলে একখানি পিটে রঙকর্ত্তা পরাজয় লাভ করেন।

ইস্কাবন—দশ, আটা, সাতা, ছক্কা।
হরতন—দশ, পাঞ্জা, তিরি, দুরি।
রুহিতন—নয়, আটা, ছক্কা, পাঞ্জা।
চিড়িতন—আটা।

প	উ / দ	পূ
ইস্কাবন—বিবি, পাঞ্জা, তিরি। হরতন—গোলাম, নয়, সাতা। রুহিতন—টেক্কা, বিবি, সাতা, তিরি। চিড়িতন—বিবি, গোলাম, নয়।		ইস্কাবন—নয়, চৌকা। হরতন—আটা, ছক্কা। রুহিতন—দশ, চৌকা। চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, দশ, সাতা, ছক্কা, পাঞ্জা, তিরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, দুরি।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, চৌকা।
রুহিতন—সাহেব, গোলাম, দুরি।
চিড়িতন—চৌকা, দুরি।

'পূর্ব্ব-পশ্চিম' দল গেম করেছেন 'দ' তাস-বণ্টন করে দুইটি ফেরাইএ ডাক দেবার পর সকলেই পাশ দিয়েছেন।

'প' প্রথমে চিড়িতনের বিবি পেড়ে খেলায় 'পূ' যথাক্রমে চিড়িতনে সাতখানি পিট গ্রহণ করে রুহিতনের চৌকা পেড়ে খেল্লেন। ফলত: 'দ'-পক্ষ মাত্র হরতনের এবং ইস্কাবনের টেক্কা দুইটির পিট পেলেন। অন্যথা 'প' যদি রুহিতনে প্রাথমিক চাল দিতেন তবে ছয়খানি পিটের পরিবর্ত্তে বিপক্ষ দল মাত্র একখানি পিটে পরাজয় লাভ করতেন। সে ক্ষেত্রে তাঁরা ইস্কাবনে দুইখানি, হরতনে চারখানি এবং রুহিতনে একখানি, মোট এই সাতখানি পিট পেতেন। আবার উক্ত প্রতিযোগিতার

ইহা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত এবং নিয়ম-বিরুদ্ধ চালগুলি ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ বিশেষ ডাকের পরেই খাটে, নচেৎ নয়। সাধারণ খেলায় ঐ রূপ নিয়ম-বিরুদ্ধ চালে সমূহ ক্ষতি অপেক্ষা লাভের আশা নাই। খেটের উপর প্রাথমিক চাল দেবার পূর্ব্বে বিশেষ করে চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান হওয়াই প্রয়োজন।

'একটি প্রশ্নের' সমাধান:—

২৭শ সংখ্যায় "খেয়ালী"তে প্রকাশিত একটি প্রশ্নের সমাধান নিয়ে প্রবৃত্ত হল। বলুন তো নিম্নের হাতটি কি ভাবে ডাকা উচিত আর খেল্বেনই বা কি ভাবে? 'প' তাস বণ্টন করেছেন।

নিম্নলিখিত ভাবে ডাক হওয়াই বাঞ্ছনীয়:—

'প'	'উ'	'পূ'	'দ'
একটি ফেরাই।	পাশ	তিনটি ফেরাই।	পাশ।
পাশ।	পাশ।		

উপরোক্ত ভাবে ডাক চল্লে নিম্নলিখিত রূপে খেলাই বিধেয়। প্রথমে 'উ' চিড়িতনের ছক্কা পেড়ে খেল্লেন। 'পূ' দিলেন চিড়িতনের দুরি, 'দ' দিলেন চিড়িতনের চৌকা 'প' চিড়িতনের নয় দিয়ে পিট ধরে চিড়িতনের

ইস্কাবন—নয়, আটা, পাঞ্জা, তিরি।
হরতন—নয়, তিরি, দুরি।
রুহিতন—সাতা, পাঞ্জা।
চিড়িতন—সাহেব, দশ, আটা, ছক্কা।

প	উ / দ	পূ
ইস্কাবন—টেক্কা, সাতা, ছক্কা। হরতন—টেক্কা, আটা, সাতা। রুহিতন—গোলাম, দশ, আটা, চৌকা। চিড়িতন—টেক্কা, নয়, সাতা।		ইস্কাবন—দশ, চৌকা। হরতন—সাহেব, গোলাম, পাঞ্জা। রুহিতন—টেক্কা, বিবি, ছক্কা। চিড়িতন—বিবি, গোলাম, পাঞ্জা, তিরি, দুরি।

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, গোলাম, দুরি
হরতন—বিবি, দশ, ছক্কা, চৌকা।
রুহিতন—সাহেব, নয়, তিরি, দুরি।
চিড়িতন—চৌকা।

টেক্কা খেলায় 'উ' দিলেন চিঁড়িতনের আটা, 'পূ' চিঁড়িতনের তিরি এবং 'দ' রুহিতনের দুরি। অতঃপর 'প' পুনরায় চিঁড়িতনের সাতা খেললেন। 'উ' এবার চিঁড়িতনের সাহেব দিয়ে পিট তুললেন, আর 'পূ' এবং 'দ' যথাক্রমে চিঁড়িতনের পাঞ্জা এবং হরতনের চৌকা দিয়ে গেলেন। তৎপরে 'উ' খেললেন ইস্কাবনের নয়, 'পূ' দিলেন ইস্কাবনের দশ, 'দ' ইস্কাবনের গোলাম এবং 'প' ইস্কাবনের ছক্কা। পিটখানি নিয়ে 'দ' ইস্কাবনের দুরি খেলায় 'উ' ইস্কাবনের আটা দিয়ে পিট ধরলেন এবং 'প' এবং 'পূ' যথাক্রমে ইস্কাবনের সাতা এবং চৌকা দিয়ে গেলেন। পুনরায় 'উ' ইস্কাবনের পাঞ্জা খেললেন। এ ক্ষেত্রে 'পূ' রুহিতনের ছক্কা ও 'দ' ইস্কাবনের সাহেব দিলেন এবং 'প' টেক্কা মেরে পিটখানি নিয়ে নিলেন। এবার 'প' রুহিতনের চৌকা পেড়ে খেললেন, 'উ' দিলেন রুহিতনের পাঞ্জা, 'পূ' দিলেন রুহিতনের টেক্কা এবং 'দ' দিলেন রুহিতনের তিরি। অতঃপর 'পূ' চিঁড়িতনের গোলাম বিবি খেলে নিয়ে পর পর দুইখানি পিট আদায় করে নিলেন। এ দুই পিটে 'দ' রুহিতনের নয় ও হরতনের ছক্কা, 'প' রুহিতনের আটা ও হরতনের আটা এবং 'উ' চিঁড়িতনের দশ ও রুহিতনের সাতা পাশ দিয়ে গেলেন। তারপর 'পূ' খেললেন হরতনের পাঞ্জা; 'দ', 'প', 'উ' এ পিটে যথাক্রমে হরতনের দশ, হরতনের টেক্কা এবং হরতনের তিরি দিয়ে গেলেন। পিট ধরে 'প' হরতনের সাতা খেলায় 'উ' এবং 'দ' হরতনের নয় এবং বিবি দিলেন আর 'পূ' হরতনের সাহেব দিয়ে পিট ধরলেন। অবশেষে 'পূ' হরতনের গোলাম খেলে পিট ধরেই তিনটি ফেরাইএর খেলা করে ফেলে শেষ পিটখানি প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দিলেন।

আর একটী সমাধান :—আমাদের প্রবন্ধের অনেক চিন্তাশীল পাঠক শিবপুরের শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত হাতটি নিম্নলিখিতরূপে খেলতে ইচ্ছা করেন। আমাদের মতে উক্ত হাত নিয়ে কি ভাবে ডাক দেওয়া এবং খেলা যুক্তিযুক্ত উপরে বলা হলেও গোবর্দ্ধন বাবুর সমালোচনাটিও প্রণিধানযোগ্য বলে নিয়ে উদ্ধৃত করা হল। তার মতে 'প' তাস বণ্টন করে একটি ফেরাইএর ডাক দিবেন। 'উ'র হাত ততো ভাল নয়, সুতরাং তিনি পাশ দিবেন। এখন 'পূ' দুইটি চিঁড়িতন ডাক দিয়ে নিজের হাতের শক্তি খেঁড়ীকে জানাবেন। 'দ' কিন্তু দুইটি ইস্কাবনের ডাক দিতে পারেন; এখন 'প' তার ওপর দুইটি ফেরাইএ ডেকে নেবেন। 'উ' এবার তিনটি ইস্কাবন ডাকতে পারেন যদিও তিনটির খেলা তাঁদের হয় না। 'পূ'র হাত নেহাৎ মন্দ নয়, তিনি তিনটি ফেরাইএর ডাক দেবেন; অতঃপর 'দ', 'প' আর 'উ' সকলেই পাশ দেবেন।

'উ' প্রথমে ইস্কাবনের তিরি খেলবেন (কেননা, 'পূ' দুইটি চিঁড়িতনে ডাক দিয়েছিলেন) এবং 'প' টেক্কা দিয়ে পিট ধরবেন। এখন 'প' ছোট চিঁড়িতন খেলবেন। প্রথমে 'উ'র পক্ষে ছোট তাস দেওয়াই সম্ভবপর, সুতরাং বিবি দিয়ে পিট ধরে চিঁড়িতনের দুরি খেলে দেবেন। এ ক্ষেত্রে 'দ' ইস্কাবন পাশাতে পারেন না, তাঁর পক্ষে রুহিতনের দুরি পাশানই ভাল। অতএব 'প' টেক্কা দিয়ে পিট নিয়ে পুনরায় চিঁড়িতন খেলে দেবেন। অতঃপর 'উ' চিঁড়িতনের সাহেব দিয়ে পিটখানি নিয়ে আর একখানি ইস্কাবন খেলে দেবেন এবং 'দ' ইস্কাবনের বিবিতে পিট ধরে পর পর আরও দুইটি ইস্কাবন খেলবেন, আর 'প' একখানি ছোট রুহিতন এবং 'প' রুহিতনের বিবি আর ছক্কা পাশিয়ে যাবেন। ইস্কাবনের শেষ পিটখানি 'উ' ধরবেন। এখন হাতের অবস্থা এমন মজার হবে যে 'উ' যাই খেলুন না কেন বাকি সব কয়টি পিটই 'প' এবং 'পূ' পেয়ে যাবেন; কারণ 'দ'র পক্ষে দুইখানি তাস পাশান ভয়ানক কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে আপনা আপনিই তিনি নিষ্পেশিত (squeezed) হয়ে যাবেন। ইস্কাবন খেলে নেবার পর হাতের অবস্থা হবে নিম্নলিখিতরূপ,—

'উ' খেলবেন রুহিতন, 'পূ' টেক্কা দিয়ে পিট ধরবেন এবং চিঁড়িতনের গোলাম এবং পাঞ্জা খেলে নেবেন। এখন 'দ'র পক্ষে পাশান মুস্কিল হয়, যদি রুহিতনের সাহেব রাখেন তা'হলে তাঁকে হরতনের দুইখানি তাস পাশাতে হয়, তখন 'পূ' ও 'প' হরতনের তিনটি পিট পেয়ে যান; আবার যদি 'দ' রুহিতনের সাহেব আর একখানি

ইস্কাবন—নাই।
হরতন—নয়, তিরি, দুরি।
রুহিতন—সাতা, পাঞ্জা।
চিঁড়িতন—দশ।

ইস্কাবন—নাই।
হরতন—টেক্কা, আটা, সাতা।
রুহিতন—গোলাম, দশ, আটা।
চিঁড়িতন—নাই।

ইস্কাবন—নাই।
হরতন—সাহেব, গোলাম, পাঞ্জা।
রুহিতন—টেক্কা।
চিঁড়িতন—গোলাম, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—নাই।
হরতন—বিবি, দশ, ছক্কা, চৌকা
রুহিতন—সাহেব, নয়।
চিঁড়িতন—নাই।

হরতন পাশান তা'হলে 'প' রুহিতনের গোলামের পিট পেয়ে যান। অতএব সকল বাধা সত্বেও 'প' ও 'পূ'র সম্মিলিত হস্তে তিনটি ফেরাইএর খেলা হয়ে যায়। এই তুলনামূলক সমাধানটি উদ্ধৃত করেও আমরা বলি যে 'পূ'র পক্ষে এ ক্ষেত্রে দুইটি চিড়িতনে ডাক দেওয়ার চেয়ে ফেরাইএ ডাক দেওয়াই নীতি-সঙ্গত এবং 'উ'র পক্ষেও তিনটি ইস্কাবনের ডাক অযুক্তিযুক্ত।

শান্তি ইন্‌ষ্টিটুট্—ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনে সদস্যভুক্ত সমিতি শান্তি ইন্‌ষ্টিটুটের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে কলিকাতায় দুইটি অক্‌সন্ ব্রীজ প্রতিযোগিতা বের হচ্ছে, একটি সিঙ্গলিকেট প্রতিযোগিতা, অপরটি ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতা। নাম গ্রহণের শেষ দিন হচ্ছে বুধবার ১২ই আগষ্ট এবং এদের ঠিকানা,—সেক্রেটারী, শান্তি ইন্‌ষ্টিটুট্, ২৬, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট (দ্বিতল)। প্রতিবারেই এদের প্রতিযোগিতা বেশ সুষ্ঠুরূপেই পরিচালিত হয়ে থাকে, এজন্য আশা করি ব্রীজ ক্রীড়ক মাত্রেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন।

চিঠি-পত্র—বিগত ১১ই আষাঢ় তারিখের "খেয়ালী"তে প্রকাশিত ব্রীজ-সমস্যার সমাধানটি প্রেসে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই শালিখার গোবর্দ্ধন সঙ্গীত এবং সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীলালবিহারী বসু এবং শ্রীননীগোপাল হাজরা কর্ত্তৃক লিখিত একখানি পত্র এবং তার সহিত উক্ত সমস্যার নির্ভুল সমাধান ও পরিষ্কার সমালোচনা আমাদের হস্তগত হয়, এ কারণেই প্রাপ্তি-স্বীকারে অযথা বিলম্ব হল।

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর).

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

[জাহ্নবী তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছিলেন—বিশ্বম্ভর প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন—জাহ্নবী প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই বিশ্বম্ভরকে দেখিতে পাইলেন]

জাহ্ন। এই যে তুমি এসেছ…[বিশ্বম্ভরের হাত হইতে লাঠি ও ছাতা লইয়া রাখিলেন এবং তাঁহাকে একখানি মোড়ায় বসাইয়া পাখায় বাতাস করিতে করিতে] তোমাকে কিছুই বোল্‌তে হবে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমাকে পাঠিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম, তোমাকে পাঠানো ঠিক হোলো না—সে আসবে না!

বিশ্ব। [অন্য মনে] গঙ্গার শীতলজলে অবগাহন করেও শরীর স্নিগ্ধ হোলো না! কেমন কোরেই বা হবে? জাহ্নবী বারির লহরে-লহরে আমি যে এক মৃৎকুটীরবাসিনী অশ্রুমুখী জাহ্নবীকেই দেখতে পাচ্ছিলাম! হায় রে মানুষের মন!

জাহ্ন। ও-সব কি বোল্‌চো? এখন একটু ঠাণ্ডা হও দেখি—এস আমি পা ধুইয়ে দিই—

[পাখা রাখিয়া, বিশ্বম্ভরের পা দুইটী ধোয়াইয়া দিয়া আলুলায়িত কুন্তলে মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন]

বিশ্ব। বোল্‌তে পারো জাহ্নবী, এই শূন্য বুক কেমন কোরে পূর্ণ হয়? এক ফোঁটা ছোঁড়ার এত প্রতাপ একদণ্ডে এমন কোরে বুকখানা খালি কোরে দিয়েচে? [সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া] হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ শূন্য বুক পূর্ণ কোত্তে পারো একমাত্র তুমি! হোয়েচে হোয়েচে! জাহ্নবী, আমি আজ আত্মহত্যা কর্ব্বো—আমাদের এতদিনকার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের আজ উদ্‌যাপন কোর্ব্বো!

[জাহ্নবী অন্তরে-অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন]

বিশ্ব। [উত্তরীয় প্রান্তের গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে] মনে করেছিলাম, এই ধুলোর দোষ! কিন্তু এ ধুলো তার গায়ে মাখিয়ে দিতে উদ্যোগী হোয়েছিল কে? আমিই হোয়েছিলুম—আমিই কালধর্ম্মের মোহে অন্ধ হোয়ে মোহকরী পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত কোর্ত্তে, তাকে বিলাসিনী রাজধানীর অন্ধকূপে নিক্ষেপ কোরেছিলুম! এখন সে যদি বিলাসী হয়, অকৃতজ্ঞ হয়, মাতৃদ্রোহী হয় ত' সে কার দোষ? [ধূলা ফেলিয়া দিলেন] যা, যা, তুই রসাতলের জিনিষ, রসাতলে যা!

জাহ্ন। ওগো দেখচি তুমি আজ আত্মহারা—আমার মিনতি স্থির হও—

বিশ্ব। না জাহ্নবী, আমি স্থির হোতে পাচ্চি নে। কি প্রয়োজন ছিল, আমাদের বংশ পরম্পরাগত ব্রাহ্মণ্য ধারায় মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ কোর্ত্তে? আমি দারিদ্র্যকে বরণ কোরে নিয়েছিলুম, কেন তাকেও ছেলেবেলা থেকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত কোল্লাম না? কেন, উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হোয়ে—দেশ ও দশের দুঃখদূর হবে বলে, বিজাতীয় বিদ্যা-শিক্ষার জন্যে তাকে কলেজে পাঠালুম? তখন ত বুঝতে পারি নি, কি মূল্যে এই বিদ্যালাভ করে "বড়" হোতে নয়, মানুষ হোতে হয়, অর্থ উপার্জ্জন কোত্তে হয়? এই "বড়" হওয়ার পেছনে যে কি অধঃ-পতনের পথ খোলা রয়েচে, তা তুমি বুঝতে পার্ব্বে না, জাহ্নবী কল্পনাও কোর্ত্তে পার্ব্বে না!

জাহ্ন। ওগো তা আমার পেয়েও কাজ নেই—তুমি ফিরে এসেচ—সেই আমার ঢের!

বিশ্ব। আমি যেমনটি গিয়েছিলুম, তেমনটি আর ফিরলুম কই জাহ্নবী? কাল-ধর্ম্মের সঙ্গে লড়াই কোর্ত্তে হোলে অনেক শক্তির প্রয়োজন। তুমি তাকে তুচ্ছ কোরে, তোমার সনাতন ধর্ম্মবুদ্ধি নিয়ে যদি মাথা উঁচু কোরে থাকতে চাও, তবে আজ যে আঘাতের জ্বালায় আত্মহারা হোয়েচি, এমনি আঘাতেই চিরদিন প্রতিমুহূর্ত্তে সহ্য কোর্ত্তে হবে। আর তা যদি সহ্য কোর্ত্তে না চাও, তবে তার সঙ্গে সমান হোয়ে কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াতে হবে। সে যেমন ছোট, যেমন নীচ, যেমন ধর্ম্মবিশ্বাসহীন, যেমন অকৃতজ্ঞ, যেমন বিলাসী, যেমন স্বার্থপর ঠিক কাঁটায়-কাঁটায়, অক্ষরে-অক্ষরে তেমনটি হোতে হবে। আমি আমার প্রিয়তম বক্ষের ধনকে যখন এমনি ছোটই কোর্ত্তে চেয়েচি তখন আমাকেও—হ্যাঁ-হ্যাঁ আমাকেও, তেমনি ছোটই হোতে হবে। নইলে, এরপর, সে যদি—কোনও দিন ফিরে আসে, তাহোলে আমরা ত তখন আর তার সঙ্গে তেমন কোরে মিলতে পার্ব্বোনা? তাই ত, আমিও তেমনি ছোট হোয়ে, তারই মত বিলাসী হোয়ে, তার জন্যে অপেক্ষা কোরে থাকতে চাই—তাই ত ব্রত ভঙ্গের সংকল্প আজ মনের মধ্যে জেগে উঠেছে! তুমি সহধর্ম্মিনী—সহায় হও, যুগ ধর্ম্ম পালন কোরে সাধারণ মানুষের মত এস আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করি। এ ব্রত ভঙ্গ নয়—এ আমাদের আত্মহত্যা—কিন্তু তবুও আজ তার প্রয়োজন হয়েচে—প্রয়োজন হয়েচে—

জাহ্ন। ওগো, তুমি আজ এ সব কি বোলচো। তুমি কি ভুলে গেলে—এ যে আমার শাশুড়ীর অন্তিম শয্যার সুমুখে শপথ করে ব্রত নেওয়া! তিনি যে এক বছরের বিশুকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে গেছলেন! পাছে গর্ভের সন্তানে বেশী স্নেহ জন্মায়, পাছে বিশুর অযত্ন হয়, তাই যে আমি "বড় দুখ" কোরে এই ব্রত নিয়েছিলুম। তখন আমার পোনের বচ্ছর বয়েস, এই নির্ব্বান্ধব পুরীর মধ্যে কেবল তুমি আর আমি—আমার একার কি সাধ্য ছিল, সেই কঠিন ব্রতের মান রাখি, যদি না বিশুকে তুমি আমারও চেয়ে, মায়েরও চেয়ে, বেশী ভালবাসবে? ওগো এতকাল পরে, অভিমান কোরে, তোমারই দেওয়া বিধি, তুমিই নষ্ট কোরে, সেই হতভাগার ফেরবার পথ জন্মের মত বন্ধ কোরে দিও না। সে এ ব্রতভঙ্গের অভিশাপ সহ্য কোর্ত্তে পার্ব্বে না—তার অকল্যাণ হবে—আমি "মা" হোয়ে তা দেখতে পার্ব্বো না—তার কাছে মুখ দেখাতে পার্ব্বো না!

বিশ্ব। অকল্যাণ—অকল্যাণ—না, না, অকল্যাণ হবে না। তাকে যদি ফিরে পেতে চাও, এই তার কল্যাণের পথ—এই পথ ধোরেই এবার থেকে চোলতে হবে। কিন্তু,—না-না আর "কিন্তু" নয়। একদিন ছিল বটে, নারায়ণ এ গৃহের কর্ত্তা ছিলেন—আমার স্বর্গগত পিতামাতা ছিলেন তাঁর সেবাইত—আর আমি ছিলাম, তাঁদের দাসানুদাস। আর আজ—আজ যে পথ ধোরে চোলতে এগিয়েছি—এ পথের আমি কর্ত্তা—হ্যাঁ-হ্যাঁ—আমি কর্ত্তা, আমি কর্ত্তা। এ কর্ত্তার চোখে নারায়ণ—সে ত একটা পাথরের নুড়ী—নির্জ্জীব, নিশ্চল, প্রাণহীন! তবু—তবু, ভাবতে হোল—ভাবতে হোল—হ্যাঁ, ঠিক হোয়েচে—ঠিক হোয়েচে—সেই পাথরের নুড়ী যে চোখ বের কোরে আমার কীর্ত্তি দেখে হাসবে—তা হোতে দোবো না। তাকে গ্রামের বাইরে সেই বটগাছের তলায় বিসর্জ্জন দিয়ে এসে আমি আজ নিষ্কণ্টক হবো—পুরোপুরি কর্ত্তা হোয়ে বসবো। এই বেলা—এই বেলা—সন্ধ্যের অন্ধকার আছে—চুপি চুপি—এই বেলা—

[গৃহের অভ্যন্তরে যাইতে উদ্যত হইলেন]

জাহ্ন। [পথরোধ করিয়া] ওরে হতভাগা সন্তান, স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে কি সৃষ্টিছাড়া অবস্থাতেই তোর এই হতভাগিনী 'মা'-কে আজ দাঁড় করিয়ে দিলি—

বিশ্ব। না-না, পথ ছাড়ো। এইবার সকল অকল্যাণের জড় মার্ব্বো—নারায়ণ, আত্মরক্ষা করো—

[সরু লালপাড় শাড়ী, হাতে লোহার কঙ্কণ, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা পরিয়া কালিন্দীর প্রবেশ]

কালি। কি গো কত্তামশাই, কোথায় যাচ্ছো—
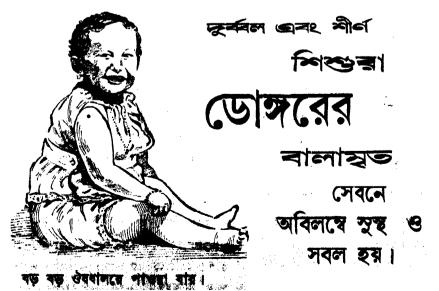
বিশ্ব। [তীব্র দৃষ্টি করিয়া] তুই কে ?

কালি। আমি কালিন্দী !

বিশ্ব। যমের বোন্ ?

কালি। যমের দোয়ারের কাঁটা ! কত্তামি কোত্তে গিয়ে ও পথে আর পা বাড়িও না—যাও ঘরে যাও। দাঁড়িয়ে দেখচো কি ? তোমায় নারায়ণ পাঠিয়েচেন—[আদেশের কণ্ঠে] যাও—ঘরে যাও—

[বিশ্বম্ভর নির্ব্বাক্ বিমূঢ়ের ন্যায় চাহিতে চাহিতে গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন]

জাহ্ন। [অগ্রসর হইয়া কালিন্দীর হাত ধরিয়া] তুমি কে বাছা ? যেই হও, তুমি আজ আমার স্বামীকে, সন্তানকে, আমাকে রক্ষা কোল্লে !

কালি। আমি তোমারই মত স্বামী সোহাগিনী, দিদি ! আমার স্বামী ভূমিকম্পে চাপা পড়েন কিনা। লোকে বলে—তিনি মারা গেছেন—আমার কিন্তু সে কথা বিশ্বাস হয় না। হ্যাঁ-গা, মেয়েমানুষের বিয়ে হোলে, স্বামী কি মারা যায়—যায় না। আমি তাইতে ত আজও লালপাড় কাপড় পরি, নোয়া পরি, সিঁদুর পরি, লোকের আনাচ-কানাচ থেকে মাছের আঁস কুড়িয়ে নিয়ে দাঁতে কেটে ফেলে দিই !

জাহ্ন। মা, তোর কথা শুনে গায়ে যে কাঁটা দিয়ে উঠচে মা !

কালি। তুমি আমায় "মা" বোলো না। তুমি আমার দিদি—আমি তোমার ছোট বোন, কেমন ?

[জাহ্নবী কালিন্দীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন]

কালি। হ্যাঁ, যে কথা বোল্‌ছিলাম, শোনো না। রাত্তিরকাল, সর্ব্বাঙ্গে তাঁর আদর মেখে, তাঁর হাতে মাথা রেখে, বুকের কাছটিতে শুয়ে, সবে ঘুমিয়েচি—এমন সময় হুড়মুড় কোরে কোথা দিয়ে কি হোয়ে গ্যালো। তিনি আমাকে ঠেলেঠুলে বার কোরে দিলেন—কিন্তু নিজে বেরুতে পাল্লেন না। হ্যাঁ দিদি, সেই আদর যে এখনো আমার সর্ব্বাঙ্গে লেগে রোয়েচে। রোগ হোলো না, ভোগ্ হোলো না—এই ছিলেন—এই কথা কোচ্ছিলেন—তিনি কি মোর্ত্তে পারেন, তিনি মরেন নি। এই যে একটু গাছের তলায় শুয়ে, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—তিনিই ত কানে-কানে বলে দিলেন তোমাদের বাড়ী আস্‌তে, তোমাদের ক্যাপা কত্তাটিকে সাম্‌লাতে—তাই না এলুম ! এমনি কত কথাই তিনি আমায় বোলে দ্যান্। আমি যে সধবা, একথা কেউ বিশ্বাস কোর্ত্তে চায় না—তিনি বোলে দিয়েচেন—তোমরা নাকি

—ঠিক বিশ্বাস কোর্বে। হ্যাঁ দিদি, তিনি যে আমার সঙ্গে সঙ্গেই রোয়েচেন—আমি সধবা নয় ত কি—আমি যে তা ছাড়া আর কিছুই ভাব্‌তে পারি নে—

জাহ্ন। তা ছাড়া আর কিছুই তোমার ভাব্‌তে হবে না বোন্—তুমি সধবা বৈ কি। তোমার এয়োৎ ত ফুরোয় নি। তোমার বিচার ত লোকের সঙ্গে মিলিয়ে হবে না ভাই, তুমি যে সতী!

কালি। হ্যাঁ-হ্যাঁ দিদি, "সতী" বোল্‌তে মনে পড়ে গ্যালো। তারপর তাঁকে তারা জালিয়ে দিলে কি না? আমিও ঝাঁপিয়ে গিয়ে সেই আগুনে পোড়লাম—কিন্তু তারা আমায় টেনে তুল্লে—তুলে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলে। জ্ঞান হোলে একদিন চোখে পোড়লো—আমার সিঁথের সিঁদুর মুছে গ্যাচে। অমনি মাথা কুটে কুটে রক্ত বার কোরে, সেই রক্ত দিয়ে সিঁদুর পোর্‌লুম—

জাহ্ন। [কালিন্দীকে বুকে টানিয়া লইয়া] আমি তোর দিদি নই, তুই-ই ভাই, আমার দিদি!

[গোপাল ছুটিয়া প্রবেশ করিল]

গোপা। "কই সই, কই চিন্তামণি,
বলো, কোথা গেল?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী
দেখ-দেখ, এসেছি শ্মশানে,
সে ত নাই লো এখানে,
পর্ব্বত গুহায়, নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কত দিন!"

ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এলে কি হবে? কেমন খুঁজে-খুঁজে এসে ধরিচি! খুঁজে পাওয়াই ত আমার কাজ—কেমন কোরে ফাঁকি দেবে বলো?

জাহ্ন। এ আবার কে দিদি? তোমার যেন চেনা মনে হোচ্ছে—

কালি। ও একটা বদ্ধ পাগল! ক'দিন থেকে আমার সঙ্গ নিয়েচে। কোন্ নাকি জমিদারের ছেলে—থিয়েটার আর বায়স্কোপ দেখে দেখে মাথা খারাপ হোয়ে গ্যাচে। মজা কোর্বো, দেখবে? কি রে পাগলা, এবার থিয়েটারে কিসের পালা গাইবি?

গোপা। "রাজা ভরত"। তাই ত তোমায় বোল্‌ছিলুম—তুমি যে ঘুমিয়ে পোড়্‌লে!

কালি। আচ্ছা, এইবার বল্—শুন্‌চি।

গোপা। আমি সাজবো "হরিণ শিশু," আর তুমি সাজবে "রাজা ভরত," কেমন? তুমি খুব Pathetic কি না!

কালি। "হরিণ শিশু" সাজবি কি রে?

গোপা। রাজা ভরতের গপ্প জানো না? সেই যে রাজা বনে বসে তপ কোচ্ছিলেন—কোথা থেকে একটা হরিণের ছানা তাঁর কোলে ছুটে এলো। রাজা তপ জপ ভুলে তাকে নিয়েই মত্ত। তারপর একদিন হরিণ ছানা কোথায় চলে গ্যালো। রাজার ত আহার নিদ্রা তপ জপ বন্ধ—কেবল "হরিণ" "হরিণ" কোরে খুঁজে বেড়ান্। ধ্যানে বস্‌তে যান, হরিণের মুখ মনে পড়ে। মোর্‌তে বোসেচেন, তখনও "হরিণ" "হরিণ" কোচ্চেন। গপ্পটা ত শুন্‌লে—এইবার রিহার্স্যাল্ আরম্ভ হবে। রাজা ভরতের acting খুব চমৎকার, আমার সব part মুখস্থই আছে—তোমায় আমি শিখিয়ে দোবো। এই শোনোই না—

"নারায়ণ, একি ঘোর মায়ার বন্ধন—
কোথায় উদ্ভব এর, কোথা এর লয়,
কিবা তত্ত্ব বুঝিতে না পারি—
ঘনাইয়া আসিছে আধার,
মৃত্যু আসে প্রসারিয়া কর,
তবু, তবু কেন ভুলিতে না পারি
সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গায়ে-পড়া,
সর্ব্ব দুঃখহরা স্পর্শ কোমল মধুর!
আয় ফিরে আয়, ক্ষুধিত বক্ষের মাঝে
অকৃতজ্ঞ, অকরুণ, ওরে মৃগশিশু!
আয় রে চপল, ভুলিব রে সব্ব চপলতা,

গান

(তিলেক কামোদ)

শ্রীপ্রভাতসমীর রায়

চোখে তোমার পাইনা দেখা
ঘুমিয়ে থাক বুকের তলে
দিই না সাড়া তোমার ডাকে
শুনি গো তায় পলে পলে।
ভোরের আলোয় তোমার ছবি
নিত্য আঁকে সোনার রবি
বেলা শেষে জাগে বনে
সবুজ-শোভা ফুলে ফলে।
দিন ফুরাল আজকে সাঁঝে
তোমার প্রেমের বাঁশী বাজে
হাঁসির মাঝে পাইনা তোমায়
পাব-কি তাই চোখের জলে।

———

ক্ষমিব রে সর্ব্ব অপরাধ,
শুধু তুই ফিরে আয়, আয় ফিরে আয়!
ইষ্ট চিন্তা, যাগযজ্ঞ, তপ জপহোম—
সব দিছি বিসর্জ্জন, তোর মুখ চাহি,
চাহি না অক্ষয় স্বর্গ, চাই শুধু তোরে;
তুই আয়, শুধু ফিরে আয়—
ব্যাকুল-কম্পিত-ব্যগ্র এই বাহু ডোরে
তুই শুধু দে রে ধরা—
আয়, আয় ফিরে আয়—আয় ফিরে আয়!

[বিশ্বম্ভর ইতিপূর্ব্বে প্রবেশ করিয়া ভাব বিহ্বল দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিলেন—এখন আলুথালু ভাবে অগ্রসর হইয়া, গোপালের হাত দুইটি ধরিয়া]

বিশ্ব। [অশ্রু গদ গদ কণ্ঠে] তুই কে ভাই? বল্, বল্, আর একবার বল্—

"আয় ফিরে আয়, আয় ফিরে আয়!"

গোপা। [মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পুনরাবৃত্তি করিল]

"আয়, আয় ফিরে আয়, আয় ফিরে আয়!"

[প্রথম অঙ্কের যবনিকা]

(ক্রমশঃ)

কমুরে ও ক্যারল লম্বার্ড দু'জনে সোনা নিয়ে খেলা কোরছে। "দি প্রিন্সেস্ কাম্স এক্রশ" ছবিতে এ দৃশ্যটি আপনারা দেখ্তে পাবেন।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা
প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা
গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪
সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

{ বৃহস্পতিবার, ২৮শে শ্রাবণ ১৩৪৩—13th. August, 1936. } ৩৩শ সংখ্যা

১৬ই আগষ্ট

গত সংখ্যা "খেয়ালী"র শেষ সংবাদে আমরা জানাইয়াছিলাম বাঙ্গালার কংগ্রেসের দুই বিবদমান দলের বহুকল্পিত ও বহুঘোষিত মিলন-সৌধ বোধ হয় ধূলিসাৎ হইল। আমাদের সে ঘোষণা সত্যে পরিণত হইয়াছে। এরূপ যে ঘটিবে সে অনুমান আমরা পূর্ব্বাহ্নেই করিয়াছিলাম এবং "খেয়ালী"তে লিখিয়াছিলাম। এবং আমরা মনে করি যাহা হইল তাহা ভালই হইল। এইরূপ সাময়িক স্বার্থমুখী মিলন শুধুই যে অবাঞ্ছিত তাহাই নহে, এরূপ মিলন ঘটিলেও তাহা কখনই স্থায়ী হইত না।

আগামী ১৬ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচন-সভায় নূতন বৎসরের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে। আমরা সংবাদ পাইলাম যে আগামী বি, পি, সি, সির কার্য্যপরিষদে শক্তি ও দলবিভাগ অনেকটা সমান সমানভাবেই হইয়াছে। অর্থাৎ ক্যাপ্টেন দত্তের নেতৃত্বাধীনে কুমিল্লাদলে ছয়জন এবং ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বাধীনে অভয় আশ্রম দলের আটজন এই পরিষদে থাকিবেন এবং এই দুই সম্মিলিত দলের ১৪ জন যে পক্ষে থাকিবেন সেই পক্ষই হইবেন সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান ও বি, পি, সি, সির ভাগ্যবিধাতা। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরও সংবাদ পাইলাম যে, ডাঃ রায়ের দল ইতিমধ্যেই শুধু যে ইঁহাদের সহিত দুস্তিয়ালী করিয়াছেন তাহাই নয়, সেই দুস্তিয়ালী সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছে। অর্থাৎ এই দুই দল সম্মিলিতভাবে ডাঃ রায়ের দলকে সমর্থন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় সভাপতি ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ সম্পাদক হইবেন ইহাও একরূপ স্থির হইয়াছে। অবশ্য আর একটা গুজবও হাওয়ায় ভাসিতেছে যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্বয়ং হইবেন সভাপতি এবং ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ হইবেন সম্পাদক। অবশ্য, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বি, পি, সি, সি,র সভাপতিরূপে পুনরায় রাজনীতির আসরে দেখা দিবেন, এরূপ কোন বাসনা তিনি নিজে এখনও জানান নাই।

যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার কংগ্রেসী গ্রহ-মণ্ডলের শনি শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের চক্রান্তই জয়ী হইল। অবশ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর এই আসন্ন পরাজয়ের সম্ভাবনায় আমরা দুঃখিত কিন্তু এরূপ পরাজয় অনিবার্য্য। মিলনের নামে সকলের সঙ্গে মিলিত হইবার সুবিধা লইয়া অপর পক্ষ যে জাল ফেলিয়া নিজেদের ডাঙ্গায় রুই কাৎলা তুলিবার মতলবমাত্র করিয়াছিল প্রকৃত মিলন তাহাদের কাম্য ছিল না—একথা শরৎবাবুর বহুপূর্ব্বেই বুঝা উচিত ছিল। বাগ্মিতার জ্ঞান হারাইয়া ত্রীকের কাকে কাকে সক্রিয় রাজনীতির (Active Politics) চর্চ্চা করিতে গেলে এই ভ্রান্তি ও পরাজয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন।

গত ২৭শে জুলাই সংস্কৃত শাসনতন্ত্রের আসন্ন নির্ব্বাচন চালাইবার জন্ত বঙ্গীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তা আছেন এবং যাঁহাদের মেয়াদ ১৬ই তারিখে শেষ হইবে তাঁহাদের কর্ত্তৃকই এই পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে এই পুরাতন দলের মত ও ধারণা নূতন দলের—শুধুই নূতন দলের কেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর—মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কিরূপে ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে বাঙ্গলার নির্ব্বাচন নিয়ন্ত্রণ করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য, বি, পি, সি, সির নূতন দল ২৭শে জুলাই তারিখে গঠিত পার্লামেন্টারী বোর্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করিতে পারেন। কিন্তু তাহা যদি না করেন তাহা হইলে ২৭শে জুলাই তারিখে গঠিত পার্লামেন্টারী বোর্ডের অবস্থাটা কিরূপ হইবে তাহাই বিবেচ্য। আমাদের মনে হয় ইঁহারা দুইটি পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। (১) ২৭শে জুলাইয়ে গঠিত পার্লামেন্টারী বোর্ড পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেস জাতীয় দলের মত একটা স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসাবে ধরিয়া নির্ব্বাচন নিয়ন্ত্রিত করা (২) পার্লামেন্টারী বোর্ড ও বি, পি, সি, সির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের "না-গ্রহণ না-বর্জ্জন" নীতির বিরোধিতা করিয়া নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে বাঙ্গলার জনমতকে সুপ্রতিষ্ঠ করা। কিন্তু শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া ওয়ার্কিং কমিটীর বিরোধিতা করার সাহস ও শক্তি তাঁহাদের আছে কি?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নাকি তাঁহার হাইকোর্টের কোনো কোনো সহকর্ম্মীকে বলিয়াছেন যে, হাইকোর্ট বন্ধ হইলে তিনি নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন এবং প্রচারকার্য্য করিবার জন্য সারা বাঙ্গলা পরিভ্রমণ করিবেন। সংবাদটি সত্য হইলে ভালই। কিন্তু এই সঙ্গে শরৎবাবুকে আমরা এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যদি তিন মাস তিনি সারা বাঙ্গলায় "ঝটিকা-সফর" (Whirlwind Tour) করিয়া বেড়াইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে, নতুবা নহে। রাজনীতিতে সক্রিয় অভিযানই (Aggressiveness) জয়লাভ করে। এখানে নৈষ্কর্ম্যের স্থান নাই। বিগত করপোরেশান নির্ব্বাচনে তিনি ফতোয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, নিজে কার্য্যক্ষেত্রে নিয়মবদ্ধকার্য্য প্রণালী অনুসরণ করিয়া অবতীর্ণ হন নাই। এবারে সারা বাঙ্গলা—কলিকাতা অপেক্ষা অনেক ব্যাপকক্ষেত্র পূর্ব্বপন্থা অনুসরণ করিলে তাঁহার এবারের ব্যর্থতা হইবে অধিকতর সুপ্রকট ও মর্ম্মন্তুদ।

গ্রীন এমেচার্সের প্রথম অবদান

গত ২৭শে জুলাই রঙমহলে গ্রীন এমেচার্স একনাম নিয়ে সুপরিচিত শিশির-কুমার ইনষ্টিটিউট তাঁদের গুণগ্রাহী দর্শক-বৃন্দকে অভিবাদন জানান। এই উপলক্ষে দুখানি ছোট নাটিকা যথাক্রমে "কালের মন্দিরা বাজে" ও "অতি আধুনিক" অভিনীত হয়। উভয় নাটকের যুগ্ম নাট্যকার শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং প্রযোজক ও সহঃ প্রযোজক নাট্যকারদ্বয়। অভিনয়ের পূর্ব্বে শ্রীমান্ জলি দত্ত তাঁর "সাপুড়ে নৃত্যে" দর্শকবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেন।

"কালের মন্দিরা বাজে" এঁদের নবতম অবদান। একটা ছোট ঘটনা অবলম্বনে চারিটি স্ত্রীপুরুষের জীবনে একরাত্রির নাটকীয় উপদানে এই একাঙ্কিকা পরিপুষ্ট। অশোক ও তমসা স্বামীস্ত্রী আর স্বামীস্ত্রী সুপ্রিয় ও আলো। আবার অশোক ও আলো বাল্য প্রণয়ী আর সুপ্রিয় ও তমসা তাই। এ হেন মণি-কাঞ্চন সংযোগ খুব অল্পই বাস্তবে ঘটে যদিও তার সম্ভাব্য সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ করি না। তবে সুপ্রিয় ও তমসা নিজেদের মধ্যে বিবাহিত জীবনের রীতি প্রণালী ও সততা সম্বন্ধে বোঝাপড়া করে নিয়েছেন কিন্তু সে বিষয়ে অশোক ও আলো সৌভাগ্যের দাবী করতে পারেন। তাই অশোকের একান্ত আগ্রহে আলো ও তার স্বামীর অশোকদের বাড়ীতে অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণের ফলে তমসার মনে যে ঝড়ের সূত্রপাত হয় তা প্রথম শান্ত হয় যখন তমসা জানে যে আলোর স্বামী সুপ্রিয়ই তারই বাল্য-প্রণয়ী। তারপর ঘটনাচক্রে অশোক সে সত্য জেনে ফেলে। সুপ্রিয় সাংসারিক সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে আলোকে সেই রাত্রে নিঃসাড়ে অশোকদের বাড়ী থেকে পালিয়ে বড় বিপ্লবের হাত থেকে নিজেদের ও তমসা-অশোককে রক্ষা করে। ঘটনায় অতিরঞ্জন নেই সত্য কিন্তু নাটকীয় উপাদানে ঘটনাটী এত বেশী দুর্ব্বল যে তাতে করে নাটক গড়া যায় না। এই নাটিকার একটীমাত্র নাটকীয় উপাদান আমরা খুঁজে পাই—সুপ্রিয় আলোর অন্তর্দ্ধানে অশোক ও তমসার দাম্পত্যজীবনের পরিণতিতে। এর অভিনয় ও প্রয়োজনা শিশিরকুমার

টের পূর্ব নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। "অতি আধুনিক" অভিনয় সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে মত পোষণ করিয়াছি, এবারেও আমরা সেই কথার পুনরুক্তি করে বলি যে এর অভিনয় ও প্রযোজনা অতি উচ্চাঙ্গের।

শিশির কুমার ইনষ্টিট্যুট—প্রথম বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ১৯৩৬

শিশির কুমার ইনষ্টিট্যুটের উদ্যোগে আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইবে। নিম্নলিখিত বিভাগে প্রতিযোগিতা বিভিন্ন শাখায় উল্লিখিত হইল।

১। আধুনিক বাংলা গান (উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত চলিবেনা)

২। বাউল (ভাটিয়ালী ও গ্রাম্য সঙ্গীত চলিবে না)

৩। কীর্ত্তন (পদাবলী সঙ্গীত ভিন্ন চলিবে না)

বার বৎসর হইতে উর্দ্ধ বয়স যাঁহাদের তাঁহারা (ক) মহিলা (খ) পুরুষ শাখায় সিনিয়ার সেক্‌সনে প্রতিযোগিতা করিবেন। বার বৎসরের নিম্নে জুনিয়ার সেক্‌সনে (ক) বালিকা ও (খ) বালক শাখায় প্রতিযোগিতা হইবে। প্রবেশিকা মূল্য লাগিবে না। যাঁহারা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে চান, তাঁহারা সবিশেষ বিবরণ ইনষ্টিট্যুটের বিভাগীয় সম্পাদক মিহির গঙ্গোপাধ্যায় ৭১।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট অথবা সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় ২১, বাগবাজার ষ্ট্রীট, ইহাদের কাছে পাইবেন।

সঙ্গীত সম্মিলনী

কলিকাতায় অন্যতম সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সঙ্গীত সম্মিলনী' বর্ত্তমানে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিগণিত। উপযুক্ত পরিচালনার জন্য সঙ্গীত সম্মিলনী অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং শিক্ষাদানের উৎকর্ষতার জন্য শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী জন

শ্রীঅরবিন্দ

(তত্ত্বজিজ্ঞাসু)

আগামী ১৫ই আগষ্ট হ'চ্ছে শ্রীঅরবিন্দের পঞ্চষষ্ঠিতম জন্মদিবস। এই দিন মহাযোগী পণ্ডিচারী আশ্রমে আশ্রমবাসী ও অন্যান্য দর্শন-প্রার্থীদের দর্শন দেন। ভারতের সব প্রদেশ থেকেই দর্শন-প্রার্থী সমবেত হয়; ইউরোপ আমেরিকা থেকেও কেউ কেউ আসেন। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রচার নেই, তবুও বৎসরের তিনটি দর্শন-দিনে এত লোকসমাগম হয় যে, আশ্চর্য্য লাগে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, তিনি কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন না, তবুও শুধু তাঁকে দর্শনের জন্যে বহু লোকের আগ্রহ।

অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন যে তিনি কথা বলেন না কেন? গত দশ বছর যাবৎ তিনি কা'রও সঙ্গে কোন রকম কথা বলেন নি। আশ্রমবাসীদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় হয় চিঠিপত্রে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, তাঁর যোগ কথায় বুঝিয়ে দেবার জিনিষ নয়—উপলব্ধি করার জিনিষ। এ উপলব্ধির আগ্রহ যাঁদের আছে তাঁরাই শ্রীঅরবিন্দের লেখাগুলি পড়লেই পথের নিশানা পাবেন।

শ্রীঅরবিন্দ

তবে শুধু পড়লেই ত সম্যক উপলব্ধি হয় না, তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যাঁরা আসতে চান তাঁরাই দেশ-দেশান্তর থেকে সুদূর পণ্ডিচারীতে উপস্থিত হন।

ভারতবর্ষ যোগী-সন্ন্যাসীর দেশ। এ দেশে এত যোগী, সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর আবির্ভাব হ'য়েছে যে, আধুনিক অনেক লোকের ধারণা যে, যোগেই ভারতের ঐহিক অধঃপতন হয়েছে। কথাটা একেবারে মিছে নয়, কারণ আত্মমুমুক্ষু যাঁরা তাঁদের ভিতর অনেকেই বাহিরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি। কাজেই জনসাধারণের মধ্যে একটা ভাসা-ভাসা ধারণা হয়েছে যে, যোগী হ'তে হ'লে বা ঈশ্বরোপলব্ধি করতে হ'লে জগতের সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা চলে না। যোগীকে একটা নিজের জগৎ সৃষ্টি

সাধারণের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিদায়

গত শুক্রবার ৭ই আগষ্ট, বেলা ১টার সময় প্রেসিডেন্সী কলেজ বেকার ল্যাবরেটরীতে জনপ্রিয় প্রিয়দর্শন তরুণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, পি-আর-এস্ মহাশয়ের বিদায় অভিনন্দন প্রদান উপলক্ষে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের আর্টস্ ও সায়েন্স বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক অশোকনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই উপলক্ষেই এই বিদায় সম্বর্দ্ধনা।

ক'রে আত্মানন্দ উপলব্ধি করতে হয়। জগতটা একটা শয়তানের খেলা মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দের "আর্য্যের" লেখাগুলি পড়লেই বোঝা যায় তিনি বিশেষ ভাবে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে আমাদের দেশের এ মনোভাব দূর করতে চেয়েছেন। এ জগৎটাও ভগবানের রাজ্যের বাহিরে নয়। অতি ক্ষুদ্র অণু থেকে অতিমানস-জীবন পর্য্যন্ত সমস্তই ভগবানের মধ্যেই র'য়েছে। তবে আমাদের জগৎ এত অপূর্ণ, এত দ্বন্দ-কোলাহল-পূর্ণ এই জন্তে যে, এখানে এখনও সচ্চিদানন্দের পূর্ণ বিকাশ হয় নি। মানুষ তার মনের উচ্চাংশ দিয়ে কিংবা তার আত্মার গভীর স্তরে সচ্চিদানন্দকে অনুভব করেছে, কিন্তু স্থূলে সচ্চিদানন্দের বিকাশের সুযোগ দেয় নি। এ সুযোগ মানুষকেই দিতে হবে; মানুষকেই হতে হবে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সচ্চিদানন্দের আধার। সচ্চিদানন্দের লীলা হবে শুধু অন্তরে নয়, বাইরেও, বহিঃপ্রকৃতিতে, মানুষের সকল সৃষ্টিতে।

সে সচ্চিদানন্দ কেমন? তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দ—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। তাঁর লীলা অবাধ, তা'তে দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের লেশ নেই, অসামঞ্জস্য একটুও নেই। মানুষ কি সেই ছন্দে যোগ দিতে পারবে? মানুষ ক্ষণিকের জন্তে হয়ত সে ছন্দের আভাষ পায়, কিন্তু পরক্ষণেই স্বার্থের আবর্ত্ত তা'কে টেনে নিয়ে যায় অন্ধকারের ঘূর্ণিতে। মানুষের সভ্যতার প্রারম্ভ হ'তেই এই আবর্ত্ত থেকে উদ্ধার পাবার জন্তে একটা আকুল প্রচেষ্টা চ'লেছে। সময় সময় মানুষ হা'ল ছেড়ে দেয়, ভাবে আবর্ত্তটাই সত্য—ওর বাইরে বুঝি চিরশান্ত আনন্দ-সমুদ্র নেই। কিন্তু আবার তা'র কবি, শিল্পী, দ্রষ্টা কল্পনা ক'রে অরূপের দেয় রূপ। ক্ষণিকের জন্তে সে রূপ ঝিলিক দেয়—আবার সব কালো, সব অন্ধকার।

মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু সচ্চিদানন্দের নিশানা পেয়েছে। যোগী যাঁরা তাঁরা এই আনন্দ-সমুদ্রে ডুব দিয়েছেন। কিন্তু এখনও চিরসুন্দরের বিজয়-রথ দেখা যায় নি। জগতে অবিশ্রান্ত তাঁর কাজ চ'লছে মানুষকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে পূর্ণ করার জন্তে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে মানুষ আংশিক ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে কিন্তু তা'কে হতে হবে ভগবানের মত ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী। তা' হ'তে হলে মানুষের পেতে হবে ভগবানের প্রকৃতি। নিম্ন প্রকৃতির খেলায় মেতে থাকলে, বা একে একমাত্র খেলা ব'লে মানলে চলবে না। খণ্ড-চেতনা নিয়ে তৃপ্ত থাকলে চলবে না, পেতে হবে ভূমার চেতনা—এবং সেই চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে সকল জ্ঞানে, চিন্তায়, অনুভূতিতে, কর্ম্মে।

বৃহত্তর সত্তার কাছে ঐকান্তিক ভাবে আত্ম-সমর্পণ ছাড়া মানুষের পক্ষে এ রূপান্তর সম্ভব নয়। এই আত্মসমর্পণ যোগের কথাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বিশেষ ভাবে বলেছেন এবং অর্জ্জুনকে বলেছেন যোগী হ'তে। এই গীতোক্ত যোগের মূর্ত্তিমান রূপই হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ।

অরবিন্দ-প্রণাম

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

যে আকাশে স্বচ্ছ শান্ত নিষ্ক্রিয় উদার অবকাশ
নিরঞ্জন তব আত্মা হে মহর্ষি রুধিয়া নিঃশ্বাস
সেথায় সমাধি মগ্ন বিরাটের সাধনা মন্দিরে;
যেথা নিত্য মহাকাল ওম্ মন্ত্র জপিছে গম্ভীরে
মহাব্যোম্ সূত্রে গাঁথা জ্যোতিষ্কের দীপ্ত জপমালা
ঘুরাইয়া রাত্রিদিন, যেথা নাই কামনার জ্বালা
জরাধর্ম্মী জীবনের ভয়ত্রস্ত হৃদয়-কম্পন,
যেথা নাই ব্যাধিতের, বিলাসীর কাতর ক্রন্দন,
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কূটদ্বন্দ, জীব-ধ্বংসী অস্ত্রের ঝঞ্ঝণা।
বিষাক্ত মারণ বাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ জীবের যন্ত্রণা।
বীভৎস কুৎসিত এই সভ্যতার পদধূলি হ'তে
জ্যোতির্লোক যাত্রী ওগো, গতি তব মহাপ্রাণরথে,
হে সত্য-সন্ধানী ঋষি যোগারূঢ় তোমার সাধনা—
কোন্ সত্য নির্দ্দেশিবে সপ্তলোক করি' পরিক্রমা—
জ্ঞানাগ্নির হোমানলে ভস্মকরি মিথ্যার জঞ্জাল?
আমি এক ক্ষুদ্র কবি অজ্ঞতায় মগ্ন চিরকাল
লভি নাই আজো দেব সত্যের সন্ধান, রাত্রিদিন
আত্মগত প্রশ্ন জাগে মর্ত্ত্যভূমে ওরে বিত্তহীন
কেন তোর জন্ম হ'ল অজ্ঞতার তমো অন্ধকূপে
তৃপ্তি ও বিশ্রাম লুব্ধ অবসন্ন কামনার স্তূপে?
শুধুই কি লক্ষ্য হ'বে জীবন ও সুবর্ণের তৃষা—
কল্পনায় সৃষ্টি করি' প্রেমভোরা জ্যোৎস্নাময়ী নিশা?
তা নয়, তা নয় গুরু আরো কিছু রয়েছে লুকায়ে
ধরিবার শক্তি নাই স্বর্ণমৃগ যেতেছে পলায়ে
নিকটে? অথবা দূরে? মনে? কিম্বা গহন কাননে?
যে বিরাট কর্ম্মশক্তি অতন্দ্রিত স্রষ্টার ভুবনে
কোথায় সে কতদূরে? সে কি আজ হ'ল মরীচিকা?
মামুক্ষর সত্যদ্রষ্টা, লেহি লেহি সন্দেহের শিখা
অন্তরে করিছে নিত্য ভীতির সঞ্চার। হায় আমি
ক্রমশুষ্ক জীবনের মরুরাজ্যে সত্যপথকামী
কম্পিত ছন্দের সুরে মাগিতেছি অভয় তোমার
তুমি কি চূর্ণিতে পার আজি মোর দুর্ভেদ্য প্রাকার।
জীবনের তমো কারাগারে? অযুক্ত এ সত্তা মোর
সংস্কার-নির্ম্মোক তলে অতৃপ্তির ব্যথায় বিভোর
সছিদ্র তরণী সম রহস্যের অসীম সাগরে
অজ্ঞতার লোনাজলে ধীরে ধীরে তরী যায় ভরে
জানায় অমর্ত্ত্যে তাই অন্তিম প্রার্থনা। মগ্নপ্রায়
জীবন-তরণী মোর অতর্কিতে যদি ডুবে যায়,
ক্ষতি কারো নাহি হবে, লক্ষ প্রাণ-বুদ্বুদের মাঝে
একটী বুদ্বুদসম যেথা চিরবিস্মৃতি বিরাজে
হয়তো লভিবে সেথা অনন্ত বিরাম। তুমি ঋষি
শুনিয়াছি লোকমুখে রহিয়াছ মহাযোগে মিশি'
যাত্রা করি ধ্যানমার্গে সাধনার নির্ব্বিকল্প লোকে
প্রজ্ঞার লেখনী দিয়া জ্যোতির্ম্ময় আত্মার আলোকে
উদ্ঘাটিছ নিত্য নব রহস্যের সুদুর্গম দ্বার।
ঋষি-সন্তানের দলে পুণ্যময়ী দেশমাতৃকার
তুমি এক শ্রেষ্ঠ রত্ন: ভারতের দারুণ দুর্দ্দিনে
অকম্পিত চলিয়াছ সনাতন সত্যপথ চিনে
হে উদ্গাতা অখণ্ড মানব। গাহে তব জয়গান
দাবাগ্নি-বেষ্টিত ঘন মহারণ্যে আত্মঘাতী প্রাণ;
সে প্রাণ আমার প্রাণ, সে আমার ক্ষুদ্র অহমিকা
অসম্পূর্ণ জীবলীলা মর্ম্মে জ্বালি শ্রদ্ধাদীপ শিখা
চাহি তব আশীর্ব্বাদ: চিত্ত-অরবিন্দে মোর
আশা দাও অরবিন্দ যেন সর্ব্ব বন্ধনের ডোর
মুক্ত হোক্, জাগি মর্ম্মে সর্ব্বগত আত্মাবিশ্বাস
ধরাবক্ষে ধন্য হোক্ অনিবার্য্য মৃত্যু-অভিযান।

[আগামী ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্ম দিন। এই উপলক্ষ্যে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য স্বরূপ এই সংখ্যায় 'খেয়ালী'তে একটি প্রবন্ধ ও একটি কবিতা প্রকাশিত হইল। সঃ খেঃ]
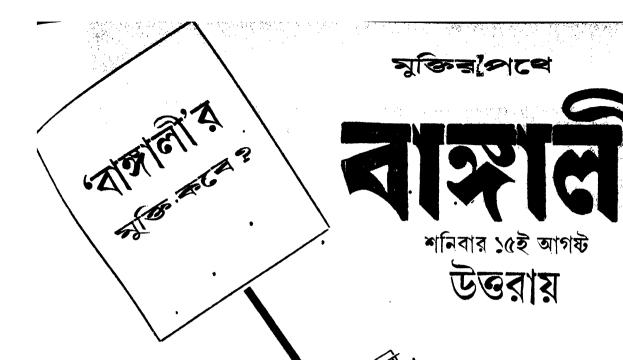
বিলাসী

রজনী

প্রযোজক :—দেবদত্ত ফিল্মস্

পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার } জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-শিল্পী : গীতা ঘোষ ও বি ঘোষ

শব্দ যন্ত্রী :—সমর ঘোষ

ব্যবস্থাপক : পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চিত্র-পরিবেশক : প্রাইমা ফিল্মস লিঃ

ভূমিকা লিপি : রবি রায়—রামসদয়, অমিয় গোস্বামী —শচীন, অহীন্দ্র চৌধুরী—হীরালাল, মৃণাল ঘোষ—অমরনাথ, নীরেন বল—গোপাল, তারক বাগচী—ভৃত্য, চারুবালা—রজনী, রেণুকা রায়—লবঙ্গলতা, ইলাদাস—চাঁপা, ছায়া দেবী—ঝি, ইত্যাদি।

প্রথম মুক্তি :—রূপবাণী, ৮ই জুলাই, শনিবার ১৯৩৬।

দেবদত্ত ফিল্মসের প্রথম বাঙ্‌লা অর্ঘ্য "রজনী" আমাদের আশানুরূপ হয় নি। যে ষ্টুডিও মূল্যবান যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিবেষ্টিত সেখান থেকে যদি এমন ছবি বেরোয় তা' হ'লে আমাদের আপশোষ করা অন্যায় নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর দান 'রজনী'র গল্পাংশ যে কত করুণ ও মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে তৈরি তা' বোধ হয় কাউকে আর স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। অন্ধ রজনী যখন শচীন্দ্রের স্পর্শ ও কণ্ঠস্বরকে সাথী করেই জীবন কাটাবে স্থির করে এগিয়ে চল্‌ছিল তখন সে বাধা পেলে গোপালের সাথে তার বিয়ের কথা শুনে। চোখের জলে মনকে ভিজিয়ে নিয়েও যখন সে এ বিপদ এড়াবার উপায় ঠিক্ করতে পারলে না, তখন তার সামনে এল চাঁপা—গোপালের স্ত্রী তারই পরামর্শে একদিন সে গাঁজাখোর হীরালালের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। হীরালালের দুরভিসন্ধির হাত থেকে উদ্ধার পেতে না পেতে তাকে এক জেলের কবলে পড়তে হ'ল। এই বিপন্ন অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করলেন্ অমরনাথ। রজনীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে অমরনাথই তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু লবঙ্গলতার কাছে রজনীর মনের অবস্থা জান্‌তে পেরে অমরনাথ নিজেই শচীন্দ্রের হাতে রজনীকে দিয়ে চিরবিদায় নিলেন।

এই এমন একটি করুণ রসাত্মক গল্পকে এমন ভাবে জবাই কোর্‌তে দেখলে বাঙালীর মন সত্যই ব্যথা পায়। জানিনা স্বর্গ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মানস-কন্যা "রজনী"র এ লাঞ্ছনা দেখতে পাচ্ছেন কিনা—যদি দেখতে পান তা' হ'লে তাঁর আত্মা যে গুম্‌রে গুম্‌রে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে না তাই বা কে বল্‌তে পারে।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যে আমাদের একেবারে নিরাশ করেছেন। চিত্রনাট্য কাকে বলে তা' বোধ হয় বাঁড়ুয্যে মশাই এখনও ধাতস্থ কোর্‌তে পারেন নি ; সে জন্যেই এখানা চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত না হয়ে মঞ্চনাট্যে পর্য্যবসিত হয়েছে। বাঁড়ুয্যে মশাই ত' অনেকদিন ধরেই ফিল্ম ফিতের ওপর অনেক নক্সা কুঁদলেন—এবার ও লাইন্‌টা ছেড়ে মঞ্চ-নাটক রচনা করার দিকে হাত মক্স করুন না কেন! বাঙ্‌লার রঙ্গালয়ে নাটকের অভাব বড় বেশী—চেষ্টা চরিত্তির কোর্‌লে এদিকে তাঁর কপাল খোলে কিনা দেখতে আপত্তি কী!

পরিচালনার কাজেও জ্যোতিষবাবু যে চিরদিনই অপদার্থ তার দামী একখানা নমুনা আবার পাওয়া গেল। সিনেমার ভেতর 'গতি' বলে যে একটা পদার্থ আছে—একথাটা তিনি এখনও বুঝে উঠতে পারলেন না। গতি যেমন মানুষের জীবনের সার্থকতাকে ব্যক্ত করে—সিনেমাতেও গতি ছবিকে কোরে তোলে প্রাণবন্ত। স্বাস্থ্যবতী যুবতীদের অর্দ্ধনগ্ন-স্বাস্থ্য লোককে দেখিয়ে 'সেক্স-এপীল' করাই ছবির মেরুদণ্ড নয়—আর আজকার দর্শকদের 'রিলিফ' দেবার জন্যে ওরূপ নিচু-শ্রেণীর ভাঁড়ের অবতারণাও অচল—একথা বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মগজে প্রবেশ না কোর্‌লেও সাধারণ দর্শকরাও যে বেশ বোঝেন তা' জানিয়ে দেয় সিনেমা-হাউসের দর্শকরা। জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যের পরিচালনার বিষয় আমাদের অনেক কথাই বল্‌বার ছিল—কিন্তু পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, সে জন্যে এখানেই থাম্‌তে হ'ল।

ক্যামেরার কাজ গীতা ঘোষ ভালই করেন বলে জানতুম। কিন্তু এ ছবিতে আমরা বিশেষ কিছু বুঝতে পেলাম না। তবে রসায়নাগারের কাজের দোষেই তাঁর প্রতিভা যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা আমরা জোর করে বল্‌তে পারি।

শব্দযন্ত্রী সমর ঘোষ এমন সব ভাল ভাল যন্ত্রপাতি পেয়েও যে এমন কাজ কোর্‌বেন, তা' আমরা বুঝে উঠতে পারি নি। প্রথম দৃশ্যে রামসদয় ও লবঙ্গলতার কথাবার্ত্তা এমন হ'য়েছে যে কেউ শুন্‌তেই পাইনি।

ছবিখানার সঙ্গীতের ভেতর কোনও বিশেষত্ব নেই। সেটু ভাল বল্‌তে আমাদের আপত্তি নেই।

এবার অভিনয়ের কথা। শচীন্দ্রের ভূমিকায় অমিয় গোস্বামী একেবারে অচল। তাঁর চেহারাই তাঁর উন্নতির প্রধান অন্তরায়। অহীন্দ্র চৌধুরীর হীরালাল মন্দ হয়নি। তবে একটু overacting হয়ে গেছে। মৃণাল ঘোষ একজন সুগায়ক। তাঁর পক্ষে

খুচরো খবর

সাহায্য রজনী

আগামী শুক্রবার ২১শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় খিদিরপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নব নাট্যমন্দির সম্প্রদায় কর্ত্তৃক 'রীতিমত নাটক' ও 'শেষ রক্ষা' অভিনীত হইবে। শিশিরকুমার, বিশ্বনাথ ও কঙ্কাবতী যথাক্রমে দিগম্বর, সুহৃদ ও স্বাগতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব

গত রবিবার কাশীপুরে রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র রায়ের বাটী নাড়াইল হাউসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। সেই উৎসবে শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মিত্র ঠাকুরের কীর্ত্তন ও প্রোঃ জ্ঞান গোস্বামীর গীতাবলী সবাইকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অলকেন্দ্রনাথ মিত্র, অমলেন্দ্রনাথ মিত্র, বনবিহারী রায়, অরুণকুমার রায়, মিঃ এম্. এন্ ভট্টাচার্য্য, শোভাবাজারের কমলচন্দ্র বসু, দার্জ্জিলিংয়ের মিঃ এ, এস্. ঘোষাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় অতিথিগণকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন।

এত বড় একটা চরিত্র ফুটিয়ে তোলার আশা করাই বৃথা। ভূমিকাটি ছোট হ'লেও রবি রায় তার মর্য্যাদা রেখেছেন। নায়িকা রঞ্জনীর ভূমিকায় চারুবালার অভিনয় প্রাণহীন মঞ্চ-ঘেঁষা। আমাদের পরিচালকরা কোন অন্ধ মেয়ের দরকার হ'লেই শ্রীমতীর স্মরণাপন্ন হন। কেন? খুশী করেছে লবঙ্গলতার ভূমিকায় রেণুকা রায়। তাঁর সহজ ও স্বচ্ছন্দ অভিনয় সত্যই অতিসুন্দর হয়েছে। ভবিষ্যতে ভাল পরিচালকের হাতে তাঁর উন্নতির সম্ভাবনা আছে মনে হয়। চাঁপার ভূমিকায় ইলা দাস চলনসই। ছায়া দেবী নামে যে মেয়েটি 'ঝি'-এর ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন। পরিচালক নানাভাবে তাঁর স্বাস্থ্য দেখিয়ে লোকের মনে আনন্দ দিতে চেষ্টা কোরেছেন। হ্যাঁ, স্বাস্থ্যবতী তিনি—এর বেশী তাঁর সম্বন্ধে বল্‌বার কিছু নেই।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সরকার

আই-এফ-এ-শিল্ড

শীল্ড প্রতিযোগিতার শেষ সম্মান কাহার ভাগ্যে আসে এই নিয়ে গত সপ্তাহ সারা-সহরময় যে উন্মাদনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল তার অবসান হয়েছে। ফাইনালে ক্যালকাটা ও মহামেডান দলের খেলা দুই দিন অমীমাংসিত থাকিয়া তৃতীয় দিনের অতিরিক্ত-সময়ে মহামেডান দলই জয়ী হয়। তারা ক্যালকাটা দলকে ২—১ গোলে হারিয়ে দিয়ে এবারকার খেলার সমস্ত গৌরবই পেয়েছেন।

২৫ বৎসর পরে কোন ভারতীয় দল যে আবার শীল্ড পেয়েছে এ যেমন একদিকে আনন্দের ও গৌরবের কথা তেমনি অপরদিকে ভারতীয় ক্রীড়াযোদ্ধিদের পক্ষে উন্নতির সোপান স্বরূপ। ১৯১১ সালে মোহনবাগান দল কেবল শীল্ডই পেয়েছিল; কিন্তু মুসলমান দল এবার শীল্ড ও লীগ্ দুইই নিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এখানকার ফুটবল খেলার ইতিহাসে এই কৃতিত্ব মাত্র তিনটী দলই অর্জ্জন করতে পেরেছে। ১৯০১ সালে রয়েল আইরিস্, ১৯০৮-৯ সালে গর্ডন হাই-লণ্ডারস্ ও ১৯২২-৩ সালে ক্যালকাটা দল।

পরাজিত হ'লেও ক্যালকাটা দলের গৌরব অনুভব করবার যথেষ্ট কারণ ছিল। লীগে তারা খেলায় যে form দেখাতে পেরেছিল তারচেয়ে শিল্ডের খেলায় যে কত বেশী উন্নতি করতে পেরেছিল তা বাস্তবিকই দেখবার ও শেখ্‌বার বিষয়। তাছাড়া তারা যে তিনদিন ধরে দুদ্ধর্ষ মুসলমান দলের সঙ্গে এভাবে লড়তে পেরেছেন তা কেবল তাদের গোলকিপার আর্ম্মষ্ট্রং-এর জন্যে।

মুক্তি প্রতীক্ষায় থাকুন!

মহামেডান দল লীগ্ ও শীল্ড নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। তারা এবার বোম্বাই-এর 'রোভার্স' খেলতে যাচ্ছেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় দলের ক্রীকেট্ খেলা

ভারতীয় দল বার্মিংহামে ওয়ারউইক-সায়ারের সঙ্গে ড্র করে। এই খেলায়

ভারতীয় দলে একজন নতুন খেলোয়াড় নামান হয়—ইনি দিলওয়ার হোসেন। দিলওয়ার প্রথম খেলায় নিজেই শতাধিক্ রান করেন। তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় তা আমরা জানি। কোলকাতায় এম্, সি, সির বিরুদ্ধে তিনি যে খেলা দেখিয়েছিলেন তা আমাদের আজও মনে আছে। ১৫ই আগষ্ট যে টেষ্ট খেলা আরম্ভ হ'বে তাতে বোধহয় তিনি স্থান পাবেন।

১৯৩২ সালেও ওয়ার উইকের সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলা ড্র হয়েছিল। মেজর নাইডু সেবার ১৬২ রান করেছিলেন।

এবারকার খেলায় ওয়ারউইক দল ১ম ইনিংসে ১০১ রান করে। আমীর ইলাহী ৪৮ রানে ৫টী ও জাহাঙ্গীর খাঁ ৪১ রানে ৩টী উইকেট পান। ভারতীয় দল ১ম ইনিংসে ২৪৯ করে। মায়ার মাত্র ১৮ রান দিয়ে ৪টী উইকেট পেয়েছেন। ওয়ারউইক্ দল ২য় ইনিংসে ২১৯ (৩ উইকেট) রান করে ডিক্লেয়ার করেন। ভারতীয় দল ২য় ইনিংসে ৫৪ (৩ উইকেট) রান করে। সময়াভাবে খেলাটী ড্র হয়।

বার্লিনে ভারতীয় হকি দল

বার্লিন অলিম্পিক খেলায় ভারতীয় হকি দল হাঙ্গেরী দলকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে। রূপসিং ৩টী ও জাফর ১টী গোল দিয়েছেন। হাঙ্গেরীয়ান দলের গোলকী-পারের ভাল খেলার জন্যেই বেশী গোল হতে পারেনি। ভারতীয় দলে ব্যাকে ট্যাপসেল্ খুব সুন্দর খেলেছিলেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভারতীয় দল আমেরিকা দলকেও ৭—০ পরাজিত করেছেন। এই খেলায় ধ্যানচাঁদ ২টী, রূপসিং ২টী, জাফর ২টী ও কুলেন ১টী গোল দেন।

তৃতীয় রাউণ্ডে ভারতীয় হকিদল জাপানকে ৯ গোলে পরাজিত কোরে সেমি ফাইনালে উঠলো।

এদিকে জার্ম্মানী আফগান দল্‌কে ৪—১ গোলে পরাজিত করতে পেরেছে। জার্ম্মানী দল এবার খুব শক্তিশালী। এদের সঙ্গে ভারতীয় দলের প্রবল প্রতিযোগিতা হ'বে।

অলিম্প্রিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

গ্রেট ব্রিটেন দল চীন দলকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ফুটবল খেলায় ২-০ গোলে হারিয়েছে। চীন দলের খেলা মাত্র সেদিন কলকাতায় হয়ে গেছে। তারা যে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না তা আমরা জানতুম। অবশ্য গ্রেট ব্রিটেন দলও এই খেলার পর পোলাণ্ড দলের সঙ্গে খেলে ৫-৪ গোলে পরাজিত হয়ে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকে চীন দলের মতই বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে।

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ভারতীর কক্ষ।

[মিসেস্ কেকা সেন টেবিল-হারমোনিয়ম বাজাইয়া গাহিতেছিলেন—ভারতী কিছু দূরে বসিয়াছিলেন]

"(আজি) শাওন ঘন গগন ঘিরে মুখর হোয়ে ঝরে গো—
ধ্বনির পরে প্রতিধ্বনি কানাকানি করে গো!
কদম্বেরি শাখায়-শাখায় শিহরণ ঐ জাগে গো,
শিখীর পাখা কোন্ দরদীর সোহাগ পরশ মাগে গো—
জন্মান্তরের হারিয়ে যাওয়া
চোখের পরে চোখের চাওয়া
স্মৃতির তীরে আবার ফিরে ভাসে চোখের পরে গো!
বর্ষাসজল গোধূলী আজ আকুল কাহার তরে গো!"

কেকা। তোমার বাজ্‌নাটি ত বেশ—ভারি মিঠে আওয়াজ—!

ভার। আপনার পছন্দ হোয়ে থাকে ত, ওটাকে আপনার ওখানে পাঠিয়ে দেবো, এখন। আমার আর ওটায় তেমন দরকার নেই।

[বনজ্যোৎস্নার প্রবেশ]

কেকা। ভারতি, ইনিই বুঝি তোমার মা?

বন। হ্যাঁ ভাই, আমিই ভারতীর মা।

কেকা। নমস্কার! আমার নাম বোধহয় ভারতীর কাছে শুনে থাকবেন—মিসেস্ কেকা সেন। ভারতী আমাদের স্কুল থেকেই পাশ কোরেচে।

বন। আমাকে আবার "নমস্কার" কেন ভাই! আমরা বোধ হয় দুজনেই এক বয়েসী।

[সহজ আত্মীয়তার ভাবে পাশে বসিলেন]

কেকা। হ্যাঁ, আপনার কাছে আমার একটু দরকার ছিল। শুন্‌চি, এই অল্প বয়েসে আপনারা নাকি ভারতীর "বে" দিতে যাচ্চেন। এই child-marriage সম্বন্ধে discourage কর্ব্বার জন্যেই আপনার কাছে আমার আসা। এ "বে" আপনি বন্ধ কোরে দিন্। বিশেষ ভারতীর যে এই বে-তে খুব মত আছে, তাও মনে হোচ্ছে না। "বে" যে কি বস্তু, ওর এখন বোঝবার বয়সই হয় নি—হয় ত, ও "আপন" ভুলে, সেই বর নামক জীবটিকে ভালবেসেই ফেল্‌বে! ও ত এখন দুধের শিশু বৈ ত নয়?

বন। বিয়ে কোর্ত্তে ওর খুব ইচ্ছে আছে ভাই! আমার মেয়ে বিয়ে কোর্ত্তে চাইবে না—এ কি হোতে পারে? আর বয়েস? তা, ওর মত বয়সেই ত আমি ওকে কোলে পেয়েছিলুম!

কেকা। Horrible! বলেন কি?

বন। তোমার ছেলে পিলে কি ভাই?

কেকা। ও সব হাঙ্গামা নেই। আমার ছেলে-পিলে হবে না।

বন। হবে না? তা কি কখনও বলা যায়—ও ত ভগবানের হাত!

কেকা। কে বোল্লে—ভগবানের হাত?

বন। বা রে, কে আবার বোল্‌বে? এ-ত সকলেই জানে। আমি পাঁচ ছেলের মা, আমি আর জানি নে?

কেকা। পাঁচ ছেলের মা! কিন্তু আপনার শরীর ত দেখ্‌চি বেশ আছে?

বন। আমি যে "বুনো"! উনি আমায় ঐ নামধোরে দিনের বেলায় ডাকেন কি না? রাত্তিরে কিন্তু ভাই, ছেলেপিলেরা সব ঘুমুলে "বনজ্যোৎস্না" বোলে ডাকেন—এমনি মিষ্টি লাগে! তা ভাই, তোমার ছেলে পিলে নেই, ভারি কষ্ট ত?

কেকা। কষ্ট কিসের? বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে আছি—

বন। মেয়ে মানুষের ছেলে পিলে নইলে কি মানায়? ঝঞ্ঝাট পোয়াতেই ত মজা—নইলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কেমন চারিদিকে সব কল্‌কল্ কোরে বেড়ায়—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়! দেখবেন আমার ছেলেদের? বেশ লাগবে, এখন! [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] ওরে, ও খোকনরা, এ দিকে সব আয় ত?

[গৌর, নিতাই, বলাই ও কানাই প্রবেশ করিল]

বন। ভারতীর পর, এই চারিটিই ছেলে। আর একটি মেয়ে হোলে বেশ হয়, নয় ভাই? ভারতীর বিয়ে হোলে শ্বশুরবাড়ী চোলে যাবে, একটি মেয়ে নইলে কি চলে? ওরে খোকনরা, ইনি তোমাদের দিদির "গুরুমা"—এঁকে প্রণাম করো।

কেকা। "গুরুমা"! How I hate that word! "গুরুমা" নয়, শিক্ষয়িত্রী।

গৌর। সেই শোলক্ বোলে-বোলে প্রণাম—সেই রকম ত মা?

বন। আচ্ছা, বেশ ত,—তাই কর্।

গৌর। "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

বাবা ত এখানে নেই মা, কাকে আগে প্রণাম কর্ব্বো?

নিতাই। দাদা ভারি বোকা! বাবা এখানে নেই ত, মা-কেই আগে প্রণাম করো না? মা-কে প্রণাম কল্লেই, বাবাকেও প্রণাম করা হয়, নয় মা?

বন। দাদাকে "বোকা" বোলতে নেই রে হাবা? আচ্ছা, আচ্ছা, আমাকেই প্রণাম কর্—

[গৌর বনজ্যোৎস্নাকে প্রণাম করিয়া পরে কেকা সেনকে প্রণাম করিল]

নিতাই। "ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা রোচতে মে ন লক্ষ্মণ।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

[পূর্ব্ববৎ প্রণাম]

বলাই। "নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
অবারিত মাঠ গগন ললাট জীবন জুড়ালে তুমি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলা গেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা•মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
"মা" বলিতে প্রাণ করে আনচান্ চোখে আসে জল ভরে।"

[পূর্ব্ববৎ প্রণাম]

কানাই। "জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে।
বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতি ভারতি দেবী নমস্তে॥"

[পূর্ব্ববৎ প্রণাম]

বন। [মাতৃত্বের গৌরবে] আমার মানিক্ সব! আচ্ছা, এখন খেল' গে!

[ছেলেরা লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল—বনজ্যোৎস্না চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন]

ওরা ওই শোলক্ বোলে বোলে রোজ আমাদের প্রণাম করে—আমিই ওদের শিখিয়েছি!

কেকা। [অজ্ঞাতসারে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া] এখন আর কোনও কাজের কথা হওয়া অসম্ভব। তবে ভারতীর বে'র কথাটা যা বোলছিলুম, সেটা বেশ কোরে ভেবে দেখবেন, আর too late না হোয়ে গিয়ে থাকে ত বন্ধ কোরে দেবেন। আচ্ছা, আজ তাহোলে আসি—নমস্কার!

[ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—বনজ্যোৎস্না কেকার অনুগমন করিলেন]

ভার। ছেলেখেলা কোর্ত্তে কোর্ত্তে কোথা দিয়ে কি হোয়ে গেল! আজ দু'দিন অনবরত মনের সঙ্গে যুদ্ধ কোরেও মনকে বোঝাতে পাল্লাম না। সে কিছুতেই আর আমাকে "কুমারী" বোলে মান্তে দিচ্ছে না। সেই স্পর্শটুকুকেই সে স্বামীত্বের অধিকার দিয়ে নিজেকে পবিত্র রাখতে চায়—আর কোনও দিকে চাইতে দিচ্ছে না! সুবোধবাবুকেই এতদিন ত আমি মনে প্রাণে বরণ কোরে নিয়েছিলুম—তবে মুহূর্ত্তে—পূরবী এসে পড়াতেই—আমি সে দিন অমন জ্ঞানহারা হলুম কেন? এখন এই উচ্ছিষ্ঠ দেহ তাঁকে ছাড়া আর ত কাউকে দিয়ে সোয়াস্তি পাবো না? আর মন? সে-ও কি উচ্ছিষ্ঠ হয় নি? নইলে, সে দিন সুবোধবাবুর হাত থেকে আমায় রক্ষা কোল্লে কে? এখন উপায়? আর ত লুকিয়ে রাখা চলে না…

[বনজ্যোৎস্নার পুনঃ প্রবেশ]

বন। হ্যাঁ রে ভারতী তুই আজ ক'দিন ধোরে মন-মরা হোয়ে রোয়েচিস্ কেন বল্ ত? তোর হোয়েচে কি? তোর গুরুমা যা বোল্লেন তাই না কি? বিয়ে কোর্ত্তে ইচ্ছে নেই?

[ভারতী মুখ তুলিয়া শুধু মায়ের দিকে চাহিলেন মাত্র]

বন। অমন কোরে তাকাচ্চিস্ কেন? কি হোয়েচে, বল্ না?

ভার। মা—

বন। "মা"—বোলে থাম্লি কেন? কি হোয়েচে বল্? ও কি, কাঁদচিস্ যে? [বুকের কাছে টানিয়া লইলেন] ছিঃ মা, আমাকে বোল্‌বি নে? কেন কাঁদচিস্ বল্ ত?

ভার। [অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে] মা, এ বিয়ে আমি কোর্ত্তে পার্ব্বো না!

বন। কেন বল দেখি, পাগলি? সুবোধের সঙ্গে ঝগড়া কোরেচিস্ বুঝি?

ভার। না মা, ঝগড়া করিনি।

বন। তবে বিয়ে কোর্ব্বি নে কেন? আজ তিন বছর ধোরে কথা দেওয়া রোয়েচে। আর তোদেরও ত দুটীতে কত ভাব? ছি, মা, ছেলে মানুষী কোর্ত্তে আছে?

ভার। না মা, এ বিয়ে আমার কর্ব্বার যো নেই। আমার বিয়ে আগেই হোয়ে গ্যাছে।

বন। "আগেই হোয়ে গ্যাছে!" তুই সত্যি পাগল হোলি নাকি?

ভার। মা, সে ভারি লজ্জার কথা—তবু তোমাকেই প্রথম বোলতে হবে। তুমি নইলে হয়ত সে কথা কেউ বুঝবে না। [একটু থামিয়া] মাষ্টার মশাই, তাঁর মুখ দিয়ে আমার কুমারীত্ব মুছে নিয়েচেন…

বন। [নির্ব্বাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে] বুঝতে পেরেচি। কিন্তু তুই জ্ঞান হারালি কেন?

[ভারতী মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন]

বন। [ভারতীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে] ভারতি! জানিনা তুই কেন জ্ঞান হারিয়েছিলি—সে কথা এখন জেনেও লাভ নেই। কিন্তু তুই যে এ কথা লুকিয়ে সুবোধকে বিয়ে কোর্ত্তে যাস্ নি—এতেই তোর পরিচয় পাচ্চি। তুই সত্যিই আমার মেয়ে বটে! সত্যিই মা, এ বিয়ে আর হোতে পারে না!

[ভারতী আরও নিবিড়ভাবে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

এখন ভাবচি কি উপায় করা যায়। তিনি ত গ্যাছেন, সুবোধের বাবার কাছে বিয়ের কথাবার্ত্তা কইতে। ঐ যে উনি আসচেন! ভারতি, তুই এইখানে থাক্, আমি আসচি—

[বনজ্যোৎস্না চলিয়া গেলেন]

ভার। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] মায়ের মন খুব সহজেই আমার অবস্থাটা বুঝে নিয়েচে। এখন আমার অর্দ্ধেক ভাবনার শেষ হোলো। কিন্তু সুবোধবাবু? তাঁদের হাত থেকে কি এত সহজে নিষ্কৃতি পাবো?

[বনজ্যোৎস্না ও দক্ষিণাবাবু প্রবেশ করিতেই ভারতী অন্যদিক দিয়া চলিয়া গেলেন]

দক্ষি। তবু ভাল। আমি বলি কি-না-কি ? ও একটা ছেলে মানুষী কোরে ফেলেচে। ওতেই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে না কি ? তুমিও ত আচ্ছা পাগল দেখচি !

বন। তুমি বলো কি গো ? এটা বুঝি বড় তুচ্ছ কথা হোলো ? মেয়ে মানুষের কাছে এ যে জীবন-মরণের কথা। ওর ভেতরে মেয়ে মানুষের কতখানি দেওয়া নেওয়ার কথা লুকানো থাকে তা পুরুষ মানুষ তোমরা বুঝবে কি ? তোমরা ত উড়িয়ে দিতে চাইবেই।

দক্ষি। চাইবোই ত ! বয়সকালে, বিয়ের আগে, আমরাও অমন কত—

বন। [উত্তেজিত কণ্ঠে] কথখন নয় ! আর তাও যদি—তোমার, আর তোমার মেয়ের কথা এক নয় জেনো।

দক্ষি। কেন নয় শুনি ? হ্যাঁ অবিশ্যি, যদি গুরুতর কিছু ঘোটতো—তাহোলে অবিশ্যি—

বন। আরও গুরুতর কিছু ঘটে নি—এই তোমার আমার ভাগ্যি ! মেয়ের কি দোষ ? আমাদেরই দোষ—অমন সোমত্ত মেয়েকে, অমন একটা সোমত্ত ছেলের কাছে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তি ছিলাম ! তা বাপু, তোমাদের এর চেয়ে গুরুতর যে কি, তা তোমরাই জানো—এ মেয়ে মানুষের ধর্ম্ম নিয়ে কথা। আমি বেঁচে থাকতে, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হোতে দিতে পার্ব্বো না—তা তোমায় বোলে দিচ্চি !

দক্ষি। কিন্তু কেলেঙ্কারীটা কতদূর গড়াবে—সেটা কি ভেবে দেখ্‌চো ?

বন। কেলেঙ্কারী যাই হোক্, মেয়ে যে না লুকিয়ে তার বংশের মান রেখেচে, ধর্ম্মের পথ খোলা রেখেচে, এই ঢের। আমি মা হোয়ে তাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ না কোরে থাকতে পারিনি !

দক্ষি। সুবোধ, সুবোধের এটর্ণী বাপ কি অমনি চুপ কোরে থাকবে ভেবেচো ? তখন, who is to bell the cat ? সে সব—তাল সাম্‌লাবে কে ?

বন। সাম্‌লাবে তুমি, সাম্‌লাবো আমি, আর সাম্‌লাবে তোমার মেয়ে—আবার কে ?

দক্ষি। বুনো, তোমার এ মূর্ত্তি ত এর আগে আর কোনও দিন দেখি নি ?

বন। আমি যে বুনো—আমি যে মা ! দেখো, কথা কাটাকাটি কোরে আর লাভ নেই। তুমি যাই বলো—আমি কিছুতেই ধর্ম্ম খুইয়ে মেয়েকে সুবোধের সঙ্গে বিয়ে দিতে পার্ব্বো না। তুমি বরং সুবোধকে ইসারায় একটু বোলে দিয়ে ভারতীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। ভারতীই সুবোধের সঙ্গে আগে বোঝাপড়া করুক, তারপর আমরা আছি।

দক্ষি। সুবোধের এখনি আসবার কথা আছে বটে—সেও একবার ভারতীর সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে চাচ্ছিলো। কিন্তু বিয়ের যে ২৫শে দিন স্থির হোয়ে গ্যালো। শুধু পাকা দেখার দিনটা পরে ঠিক্ কোরে জানাবেন বোল্লেন, প্রবোধবাবু দু-এক দিনের জন্যে মফঃস্বলে যাচ্ছেন—ফিরে এলেই—

বন। বোলেছি ত এ বিয়ে হবে না। যেমন কোরেই হোক্, বন্ধ কোর্ত্তে হবে।

দক্ষি। তুমি ত বোলে খালাস ! তারপর ? সুবোধকে না হয় সংক্ষেপে ব্যাপারটা বোলে দিচ্চি ইংরিজি কোরে—কিন্তু তুমি যে রকম বুঝতে চাচ্চো, সকলে যদি সেরকম না বুঝতে চায়, তখন ? তখন sensible man হোয়ে, আমি তাঁদের কথায় না বোলবো কেমন কোরে ? তখন কিন্তু আমায় দুষো না—তা বোলে দিচ্চি—

বন। আচ্ছা—সে পরের কথা, পরে হবে। এখন যা বোল্লে তাই ত করো—

দক্ষি। বেশ—[দক্ষিণাবাবু চলিয়া গেলেন]

বন। ভারতী, একবার এদিকে আয় ত মা ?

[ভারতী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন]

সুবোধ হয়ত এখনই আসবে। আসে যদি, তাকে তোর মনের কথা সব খুলে বলিস্। কিছু লুকোস নি—লজ্জা করিস্ নে—এ লজ্জার সময় নয়। কেমন, পার্ব্বি ত ?

ভার। পার্ব্বো মা।

বন। যদি সুবোধ না বুঝতে চায় ?

ভার। তাহোলেও মা, আমার ত অন্য উপায় নেই।

বন। সব কথা বেশ কোরে ভেবে দেখেছিস্ ত ? মাষ্টার মশাইরা খুব গরীব, জানিস্ ত ?

ভার। জানি মা।

বন। আর ধর, যদি তাদের দিক্ থেকে কোনও আপত্তি ওঠে ? সে-ও ত ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ কোরে ফেলেচে, কিন্তু সে ত জেনে গ্যাছে, সুবোধের সঙ্গে তোর অনেকদিনের পরিচয়। সংসারে সব কথা সবাই ত সহজে বিশ্বাস করে না মা ?

ভার। তাহোলেও মা, আমার অন্য পথ নেই। তাঁর সঙ্গে আর যদি আমার দেখাও না হয়, তিনি যদি আমাকে গ্রহণ কোর্ত্তে না চান্—তাহোলেও আমাকে তাঁরই জন্যে অপেক্ষা কোরে থাকতে হবে।

বন। এই ত আমার মেয়ের মত কথা, মা। দেখ্‌চি, তুই অনেক ভেবেচিস্—আর আমার কিছুই তোকে বলবার দরকার নেই। ওই যে সুবোধ আসচে। তোর এখন এখানে একলা থাকাই দরকার—আমি যাচ্ছি।

[বনজ্যোৎস্না চলিয়া গেলেন]

ভার। মা, আজ যেমন তোমাকে চিনলুম—তেমন আর কোনদিনই চিনতে পারি নি !

[সুবোধের প্রবেশ]

সুবো। [হাসিতে হাসিতে] আপনি ত আচ্ছা পাগল—মিছিমিছি একটা মনগড়া গোলযোগ বাধিয়ে মনখারাপ কোরে বসে আছেন? সেইজন্যে, সে-দিন অমনি কোরে পালিয়ে গেলেন বুঝি? আমি না কতই আকাশ-পাতাল ভাবচি!

তার। আপনিও ভাবচেন—আমিও ভেবেচি, Mr. Chatterjee, কিন্তু এ ত মিছিমিছি নয়!

সুবো। মিছিমিছি নয়? আপনি বলেন কি! বিলেত-টিলেতের কথা ছেড়ে দিলেও, আমাদের দেশেও এই ultra-modern যুগে, ও-সব অতি তুচ্ছ ব্যাপার—কেউ mind করে না, কোল্লেও চলে না। ও-সব একটা সাময়িক উত্তেজনা—বড় জোর বোল্‌তে পারেন "temporary insansity—ব্যস্! আমি ত Mr. Mukherjeeর কাছে শুনে—মনে-মনে হেসেই বাঁচি নে! আমরা হচ্চি বিলেত-ফেরত লোক্—ও-সব আমাদের চের গা-সওয়া আছে—আমিত গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি নি। আপনিও আর ঐ Silly জিনিস্‌টা নিয়ে মাথা খারাপ কোর্বেন না—আসুন, আমরা যেমন ছিলুম তেমনি হই।

তার। তা আর হয় না Mr. Chatterjee! আপনি দুঃখিত হবেন না—আমি এ ক'দিন অনেক দিক্ দিয়ে ভাববার চেষ্টা করচি—তা আর হবার নয়।

সুবো। তাহোলে আপনিও দুঃখিত হবেন না, Miss Mukherjee, আমাকেও বাধ্য হোয়ে বোল্‌তে হোচ্চে—আপনি এতদিন আমার সঙ্গে প্রতারণা কোচ্ছিলেন—মন আপনার অনেক দিন থেকেই আর এক জায়গায় বাঁধা পোড়েছিল?

তার। বিশ্বাস কর্বেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি সত্যিই বোল্‌চি সে-দিনকার সেই পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মন আমার, আপনার জন্যেই তোলা ছিল। অন্ততঃ আমি নিজে তাই বোলেই জানতুম্।

সুবো। বেশ, তাহোলে ত আর কথাই নেই। মনই ত আসল—মন নিয়েই ত কথা?

তার। তা ঠিক্ বোল্‌তে পারি নে। দেহের ভেতরই যখন মনের বাস, তখন দেহ উচ্ছিষ্ট হোলে, মনকে উচ্ছিষ্ট না কোরে ছাড়ে না। অন্ততঃ আমার কাছে এই জিনিসটা আজ আশ্চর্য্য রকম ধরা পোড়ে গ্যাছে—আমি নিজেই অবাক হোয়ে গেছি।

সুবো। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন—আপনার মন Unconsciosly আগে থাক্‌তেই কাজ কচ্ছিলো—আপনি টের পেয়েও টের্ পান্ নি।

তার। যা আমার জানা ছিল না, তার খবর আপনাকে কেমন কোরে দেবো বলুন্। তবে এইটুকু ঠিক্ জান্‌বেন, আপনি সেদিন আর একটু আগে এসে পৌঁছুলে আপনার জন্যে তুলে রাখা দেহ ও মন—দুইই আপনাকে দিয়ে নিস্কৃতি পেতুম্।

সুবো। তবে সেই ব্যাপারটাকে আপনি এত বড় কোরে দেখচেন কেন? আমি যদি বলি—মন আপনার উচ্ছিষ্ট হয় নি?

তার। দেখুন ত এ তর্কের জিনিস নয়। এক্‌টা জিনিস হয়ত সকলের দেহ-মনের ওপর সমান কাজ করে না। যেটা অনেকেই হয়ত তুচ্ছ বোলে উড়িয়ে দিতে পার্ত্তো—আমি সেটা পার্‌লুম না। আমার দেহ-মন হয়ত আলাদা উপাদানে তৈরী। হয়ত নারীর এই-ই চিরকালিনী চিন্তধারা—হয়ত তার দেহ পুরুষের প্রথম স্পর্শকেই স্বামিত্বের-সতীত্বের পরমাশ্রয় বোলে আঁক্‌ড়ে ধরে। কেউ সেটা নানাকারণে জীবনে স্বীকার কোর্ত্তে পারে না, কেউ পারে। আমার মন আমাকে সেইটে স্বীকার না করিয়ে আমাকে মুক্তি দিলে না। কিন্তু কি কোর্ব্বো বলুন—উপায় যখন নেই, তখন এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

সুবো। লাভ আপনার না পারে কিন্তু আমার আছে। আপনি হয়ত বুঝতে পাচ্ছেন না আমার জীবনটা আপনি কতখানি নষ্ট কোরে দিতে বোসেচেন। আপনার এত বক্তৃতা সত্ত্বেও আমার এখনও ধারণা, আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা কোচ্ছিলেন। আপনার চিঠিগুলোর address থাক্‌তো আমার নামে বটে, কিন্তু তার নায়ক ছিল আর একজন, নইলে কিছুতেই সে-গুলো অতটা realistic হোতে পার্ত্তো না। আপনি আমার যে আশার মূলে এতদিন ধোরে রস যুগিয়ে এসেছেন আমি এক মুহূর্ত্তের একটা তুচ্ছ কারণে সেটা উপেক্ষা কোর্ত্তে পার্ব্বো না—ততটা মহত্ব বা কবিত্ব আমার নেই। আপনি শুনচি অনেক ভেবেচেন—আমাকেও একবার ভেবে দেখতে হবে।

তার। দেখুন, আমাকে অপমান কর্ব্বার আপনার কতকটা অধিকার আছে—তার কারণ আপনার প্রতি আমার পূর্ব্বের ব্যবহার। নইলে, বারবার আপনার মুখে "প্রতারণা" কথাটা হয়ত ঠিক এমনিভাবে দাঁড়িয়ে শুনতুম্ না। কিন্তু আমার আর বলবার কিছুই নেই—শুধু এইটুকু জেনে রাখবেন—আমি সম্পূর্ণ অসহায়। যদি কখনো এইটুকু বুঝতে পারেন, তখন হয়ত আবার আপনার হারাণো মহত্ব ফিরে আসবে।

(ক্রমশঃ)

তন্বী ও তুফান

শ্রীসুশীল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অবশেষে ফুটলাইট জ্ব'ললো।

সেই আকস্মিক আলোর আবির্ভাবে সহসা যেটুকু ব্যাখ্যা গেলো, তা' গুছিয়ে ব'লতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায় :

ভজহরি যে অহঙ্কারী সেটুকু ব'লে নিয়েছি আগেই—আর এখন বলছি সে আলসেও। প্রবীর বলে—বিশেষণহীন ; মানস বলে সব ; রাকেশ বলে—আমার বলবার কথা নেই ; মহেশদা হাসেন ; আর নগেন বলে—ইনসিওর করো। নানাজন তাকে নানা কথা বলে, তার কারণ তার স্বভাব বিশ্রী আর সে বোকা,—অসম্ভব বোকা।

বি-এ পাশ ক'রে সে ভাবলো অনেক মহৎ একটা কিছু ক'রেছে, ইকনোমিক্স্এ তার দখল কার্ল মার্কস্, মার্শ্যাল, সেলিগম্যান ইত্যাদিরই মতো ; ছিস্‌্ ট্রিতে নিষেন পক্ষে খুব ছোটোর মধ্যে ধ'রতে গেলে বঙ্কু দরকার। তার 'মেরিট জাজ' করবার লোকের হদিস নাকি সে পায় না, এ উক্তির একটা ইতিহাস আছে। বালিগঞ্জ রেল ষ্টেশনের কাছে নাকি একটা নতুন ইস্কুল খোলা হ'য়েছে। একদা ভজহরি সেখানে যায় খুব ছোটো একটা কাজের জন্যে—মানে ওই স্কুলের টিচার হবে ব'লে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনেকটা অন্যায় হ'য়ে গেছে (হয় তো তাঁরা পস্তিয়েছেনও পরে) তাঁরা ভজহরিকে একটা চান্স দিলেন না। না দিন্, ভজহরিও চাকরির তোয়াক্কা করে না। সেইদিন ফিরে এসেই প্রবীরকে সে কথাটা বলে ; প্রবীর বলে একে ওকে-তাকে, কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যায়, ফলে—

এবং আরো অনেক কারণে ব্যাপারটা গুরুতরের দিকে গড়িয়ে চলে।

সমস্ত দুপুর ঘরে প'ড়ে প'ড়ে বিড়ি টানে, ঘুমোয়। প্রবীরদের হাজার অনুপ্রেরণায় সে একটা চাকরীর সন্ধান করে না। তার কাকা তাকে পাঠিয়েছেন, পয়সা খরচ করে মেস্-এ রেখেছেন আর সে কিনা দিনগুলোকে এমনি ভাবে উড়িয়ে দিচ্ছে! কারো তা সইলো না। তারা ষড়যন্ত্র সুরু করলো।—তাকে কর্ম্মঠ ক'রে তুলতে হবে, তা-কে ঘর থেকে পথে বের ক'রে ঘোরাবে। চাকরীর বাজার মন্দা হ'তে পারে কিন্তু পয়সার বাজার আজো চড়া। কলকাতা সহরে পথে ঘাটে তা ছড়ানো র'য়েছে,—কুড়িয়ে নাও, জোর জার করো। ক্যানভাস্ করো ; ন্যান্স-ডাইন্-এ এক ভদ্রলোক বের করেছেন Ant-Destroyer ব'লে কি একটা, হাই-কমিশন,—তাই নিয়ে লেগে যাও। নগেন বলে—ইন্‌সিয়োর্-এর কাজ করো, আজই এজেন্ট করে দিচ্ছি। মানস গম্ভীর হ'য়ে বলে—কিছু করো না ভাই, খুব ঘুমোও আর স্বপ্ন দ্যাখো।—বিরাট প্রাসাদ চারিদিকে ফুল-বাগিচা, সুরার পাত্র আর, আর বুঝলে ভজহরি টুকটুকে ফুরফুরে একটি সাকী, তুমি ওমর, অমর হয়ে বাঁচবার ওই এক চমৎকার ফন্দি। আরাম আছে, আমোদ আছে, সম্পূর্ণ সম্ভোগ—তারপর অফুরন্ত যশ। যশো-লিপ্সা তো তোমার পুরোদস্তুর! তাই করো, বুঝলে ভজহরি?

ষড়যন্ত্র তাদের সুরু হয়ে গেছে।

মানস আরো ব'ললো, আর যে কথাটা ব'লবে বলে সে ওকে ওমর বানিয়ে তুললো নিষেধে তাই বললো—মেয়ে বিয়ে করতে রাজি? অঢেল টাকা। আর যেখুনে থার্ড ইয়ার, ঠিক তোমার সাকি হওয়ার যোগ্য। কি হে প্রবীর, তোমরা যে সা-ই করছো না!

ভজহরির যেন একটু শীত করে উঠলো।

প্রবীর বললো—দূর, মেথর বিয়ে করবে কি? তার ওপর মেয়ের বাপের খাঁকতি ত্যাখো না, বামুনের ছেলে চাই, গ্রাজুয়েট চাই। আরে বাবা, না হয় তোর টাকা আছে, মেয়েটাও না হয় অসম্ভব সুন্দরী, স্বীকার করি কিন্তু কে এমন তাকে বিয়ে করতে যাবে? কি বলো, ভজহরি?

ভজহরি একটু গা মোড়ামুড়ি দিলো, কত ছেলে যাবে, ভাই।

প্রবীরের কায়দা খেটেছে, সে মনে মনে একটু হাসলো।

তারপর তারা একেবারে চুপ ক'রে গেলো। আর এ কথা তারা তুলছে না দেখে ভজহরি একটা বিড়ি ধরালো। বিড়ির ধোঁয়ায় তার বিশৃঙ্খল দাঁতগুলো তার ঠোঁটের মতোই অবাস্থ্য রকমে কালো হ'য়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ বাদে ভজহরি আর না ব'লে পারলো না—টাকা কে পাবে? শ্বশুরের টাকা?

কথাটা যেন অতিশয় সোজা হিসাবের এমনি ভাবে মানস ব'ললো—কে আবার পাবে, ন্যায্য প্রাপ্য যার—জামাই। বিলেত যেতে চাও পাঠাবে, হায়ার-এডুকেশন নিতে, অথবা কোনো টেকনিক্যাল·········এ

কথার মাঝেই ভজহরি ব'লে ফেললে,—আলবৎ, আমি রাজি আছি।

—রাজি আছো? (গোপনীয় কথার মতো ক'রে) তবে মহেশদাকে ধরো। লোকটার হাত আছে। বিপিন ভজের সাথে ওর ভাব আছে—আর সেই তো সব। ওই মেয়ের বাপের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী।

ভজহরি হাই তুললো। ওর বুকটা বোধ'য় ঢিব্ ঢিব্ ক'রছে।

বেথুনে থার্ড ইয়ার। আচ্ছা, নামটা কি? ভজহরি জিজ্ঞেস করবে?

মানস ব'ললো—নাম? নাম? ছায়া সাউ বোধ'য়। আগে তো নাম ছিলো ছোবানি তারপর ব'ললে এসে ছায়ায় দাঁড়িয়েছে। মেথরের বুদ্ধি আর কতো হবে'খলো, অমন চমৎকার মেয়ে, ছবি নাম দে, না ছায়া! ভোঃ! ছবি ব'ললে ছোবানির সঙ্গে বেশ মিল থাকতো—ছোবানিটা আটপৌরে আর ছবিটা পোষাকী। তাই না? আরে, টাকায় তারে বুদ্ধি চ্যাপ্টা হ'য়ে যায় নইলে,—বাদ দে ওদের কথা। তা, তুই রাজি হ'য়ে গেলি? অবশেষে মেথর? যাক্, কীর্ত্তি রেখে যাবি। কাগজে ছবি দিয়ে নাম বেরুবে, তা তোর কাকা রাজি হবেন?

—নিশ্চয়। আর না হ'লেই বা কি? অতটাকা পেলে তাঁকে দিয়ে আমার দরকার? সেই আবুল ফজলের আমলের কাকা—না বোঝে স্বরাজের কথা, না বোঝে কো-এডুকেশনের উপকারিতা, না বোঝে বিধবা বিবাহ সমাজের হিত কতটা! তাঁকে দিয়ে কী হবে! আর দাদা, তাকে ঠিক হলে নিয়ে নেবো। দাদা তো আমার ফ্রেণ্ড রে। আর দাদাটা বোকা আছে, ঠিক হ'য়ে যাবে। কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে।

পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী দুঃখের অথবা হাসির কথা হ'চ্ছে—বোকারাও ভাবে নিজেরা খুবই চালাক। যাই হোক্ তবে এইখান থেকেই গল্পের সুরু। যদিও বলা আরম্ভ হ'য়েছে আগে থেকেই কিন্তু সে সব মাঝের কথা।

তারপর।

অর্থাৎ সমস্ত ঠিকঠাক হ'য়ে যাবার পর।

ঠিক হ'য়েছে ভজহরির বিয়ে হবে ছায়ার সঙ্গে—বিদ্যুতের সখীর সঙ্গে। যে বিদ্যুৎ নগেনের মামাতো বোন।

মহেশদা বললেন—তবে ভজহরি, মাসেই এই তরা ভাদ্দর মাস। এর আগেই শেষ ক'রে নে'য়া যাক্।

ভজহরিকে কে যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে গেলো। তাকে সে চেনে না কিন্তু নাম শুনেছে। দেখেনি কিন্তু হয়তো দেখবে বোধ'য় সে ছায়া—অশরীরী।

অন্ধ চামচিকের মতো সে ছট্‌ফটিয়ে কি যেন ঢুড়ে বেড়ায় আর হয়তো একটি নিষ্ঠুর আঘাতের আকর্ষণ তার পাখায় মাখানো।

শ্রাবণ ফুরিয়ে আসচে। একটি পাহাড়িয়া নদীর মতো কুলকুল তান, রেখা একে যাওয়া রাঙা মাটিকে।

ভজহরি লাফিয়ে উঠলো—কাকার মত? Week-end কেটে পরশুদিনই তবে যাবো। আপনি দিন দেখুন না দাদাকে একটা তার ক'রে দি। আসুক না, আপনাদের সামেই সব ব'লবো। ২৭এ দিন আছে—ঐ দিনেই......

প্রবীর উপুড় হ'য়ে শুয়ে প'ড়লো। ভজহরি-ছবি তার গায়ে।

নগেন একটা অপদেবতা নাকি! মন্দিরের বেদীর ওপর সে অপবিত্রতা ছড়িয়ে বেড়ায়। হঠাৎ এ দুঃসংবাদ তাকে আনতে কে ব'ললো? ননসেন্স! ইডিয়ট্!! ভজহরির ভালো লাগে না।

তবু নগেন বলে,—জানি না ভাই ওদের কি কন্দি! Dr. Roy যাচ্ছে রোজ শুনলাম। ক্যাম্বেল থেকে বেরিয়ে সে এই কাজেই করছে। Female disease specialist নাকি! কিন্তু এ কি বাবা—এ চিকিৎসা করতে কে ব'ললে তাঁকে! প্রেমে-পড়া মেয়ের আবার কোনো tonic তিনি যোগাচ্ছেন কি না! জানি না! নগেন গালে হাত দিয়ে ব'সে প'ড়লো।

মহেশদা চোখদু'টো এত্তো বড়ো ক'রে মুখ সামান্য হাঁ ক'রে ব'সে রইলেন। প্রবীর মশারীর ভেতর থেকে গলা বার ক'রে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো।

জানলা দিয়ে ঝিলিমিলি এক টুকরো রোদ্দুর মেঝেতে এসে প'ড়েছে। ভজহরি সেইটুকুর পানে চেয়ে সমস্ত বিশ্ব আঁধার দ্যাখে।

একটা ফিরিওলা হাঁক দিলো—অসত্য!

ভজহরি কাঁদবে? তাকে ভগবান মেয়ে ক'রে জন্মদিলেন না কেন? কাঁদতে মানা থাকতো না। অসহ্য!

ভজহরি নগেনকে ব'লে উঠ্‌লো—এক লাখ্ নগেন। জয়েণ্ট লাইফ্! যদি তুমি বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারো। কে সে রায়—রাস্কেল! ডিস্‌পেন্সারী দিতে পারে না? টাকা নেই? বেশ আমি দেবো।

নগেন চেঁচিয়ে হেসে উঠলো বিদ্যুতের মতো আচম্‌কা: অস্থির হ'য়ো না ভজহরি। তোমার সঙ্গেই বিয়ে হবে, নিশ্চয়। কিন্তু এক লাখে ছাড়ছিনা, আরো বেশি। Legally তুমিই তার সর্ব্বে সর্ব্বা হবে, illegally সে আর যাকে ইচ্ছে বরণ করুক। আর ইয়ে তো জানো, ওর বাবার স্থির প্রতিজ্ঞা, বামুনের ছেলে চাই। Dr. Ray তো কায়স্থ।

—নগেন সামলে কথা ব'লো। মহেশদা যেন রেগে গেলেন: একজন ভদ্রলোকের মেয়ে সম্বন্ধে অমন অশ্লীল মন্তব্য করা তোমার যে কতটা অন্যায়, তা তুমি বুঝবে না। একটা আশি বছরের অথর্ব্ব বুড়োর life insure করানোতেও অত অন্যায় হয় না, মিথ্যা Medical report দেখিয়ে যদি তা-ই করো তুমি। ছায়াকে আমি চিনি, আর ও অমিয় রায়ের বাপ-ঠাকুর্দ্দার ঠিকুজি কুষ্ঠি জানতেও বাকি নেই। ছায়া পতিগতপ্রাণা—হরিণীর ন্যায় কালিদাসের উপমায়; আর অমিয় শার্দ্দূলের ন্যায় পত্নীগত জীবন—সেক্সপিয়রের কথায়। যার সঙ্গে নির্ব্বন্ধ—নির্ব্বন্ধ মানো তো, ছায়া মানে,—ছায়া তাকে সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বান্তকরণ উপুড় ক'রে নিজে নিঃস্ব হ'য়ে

ন করবেই—আমি জানি। আর অমিয়,—
ছেলেটা মেয়ে-বেশী বীকার করি কিন্তু মাথুরের
ড়াপাহারায় সে এ-মেয়ের পাঁচফুট তফাৎ
য়ে হাঁটে। বাজে কথা কাকে শোনাও।
য়া হাইকোর্ট নয় আর ভজহরিও বাঙাল
য়।

প্রবীর হেসে উঠলো—তবে বাঙাল কে
হেশদা?

—তুমি। বাঙাল ব'ললে যে চটে সেই
ঙাল। গায়ে ছাপ দেয়া থাকে না।
ভজহরিকে) উড়ো খবরে উড়তে শুরু
রো না। আমি আছি—এই মহেশ
শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমি দেখে
বো দুনিয়া—দেখে যাবো তোমাদের
কত্রিত জীবন যাপন।

নগেন যেন বিশেষ লজ্জিত হ'য়ে প'ড়েছে।
াই তার মাথা নিচু। আজ ভজহরি এখন
থিবীতে পা রাখতে নিজেকে হেয় জ্ঞান
রছে। তাই সে দৃঢ় হ'য়ে ব'সেছে।

কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে নগেন ব'ললো—
দ্রলোক মানে? মাথুর ভদ্রলোক নাকি!
ালা মেথর!

ভজহরি নগেনকে খুন করতে পারে—
বে ভদ্রলোক কে? তুমি? অমন ভাবে
পমান ক'রো না আমার সামনে,—তাঁর
য়ের সঙ্গে আমার বিয়ে, তিনি আমার
করকম বাবা ব'ললেই হয়।

মহেশদা অনেকক্ষণ ধ'রে গম্ভীর হ'য়ে
াছেন কিন্তু এবারে তিনি হেসে ফেললেন।
াকেশটা কেমন যেন মেয়েলি সুরে বিনিয়ে
নিয়ে হাসলো। প্রবীর মশারীর ভেতর
থ নিয়েছে। মানস গম্ভীর থাকতে পারে।
গেন ছুটে পালালো।

যাই হোক বিয়ে হবেই নাকি।

ভজহরি যাক্। কাকার মত নিয়ে
াসুক।

শুক্রবার দিনই ও যাবে। ভাইং-এ
ার্জেণ্ট দিয়ে এলো।

ভজহরির এ'কটা দীর্ঘ দিন হহু ক'রে
কেটে যায় না।

কাকা ব'ললেন,—কদ্দূর এগোলি?
সে দিন পত্রিকা-য় দেখলাম বেরিলি চিনির
কলে দু'জন কেরাণী চেয়েছে। ম্যাপ্লাই
ক'রেছিস্? আর ইয়ে, রোজ অমৃতবাজার
ঘাটিস্ তো?' ষ্টেনোগ্রাফার-এর অসম্ভব
চাহিদা বেড়েছে দেখলুম,—তুই ও-সব একটু
প্র্যাকটিস্ ক'রলেও পারিস্। যদ্দিন না
কিছু হয় কিছু নিয়ে এন্‌গেজড্‌ থাকা চাই
তো!

ভজহরির কিন্তু ও-সব কথায় আদপেও
মন আকৃষ্ট হয় না। অসহায় দুর্ব্বল একটি
উক্তির প্রচেষ্টা জিভের ডগা পর্য্যন্ত এসে
আবার মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। কাকার
সুমুখে সে যে কারণে এসে দাঁড়িয়েছে তারি
একটা আস্ফালন আঁকুপাঁকু ক'রে শিশু হস্তের
মতো জননীর বক্ষে কী যেন খুঁজে মরে—ক্ষুধায়
নয়, অভ্যাসে। তথাপি ভজহরি কিছুই খুঁজে
পায় না। এ তার কম দুঃখ!

কাকা গড়গড়ার নল না নামিয়ে দিয়ে
ব'ললেন—এতে তোর লজ্জার কী আছে?
চেষ্টা কর, চাকরি পাবিই।

কিন্তু তিনি জানেন না, ভজহরির সে
কারণে একবিন্দু লজ্জা নেই। তার লজ্জা,
আর লজ্জাই বা এ কে বলে কী ক'রে, দ্বিধা
তার অন্য কারণে। সে নাকের মধ্যে
আঙুলটা চালিয়ে দিয়ে চুলকে নিলো। ঠোঁট
একটু চুষে নিলো, দাঁত দিয়ে কামড়ালো।
তথাপি সেই অনুচ্চারিত কয়েকটি পদের
যোজনা করবার সামর্থ্য খুঁজে পেলো না।

ওদিকে আকাশে এলো এলোকেশী মেঘ।
নিবিড় হ'য়ে দেওদার গাছের মাথায় ওপর
দিয়ে এগিয়ে প'ড়লো ছায়া, ঘন হ'য়ে এলো
অন্ধকার। এ স্বপ্ন নয়, সত্য। ভজহরি
জানলা দিয়ে দূরের পানে চেয়ে দেখলো—
বাদল দিনের খোকাপনা। দিবস্ত গাছের

মাথা হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে নড়ে উঠলো—
ঝিরঝিরিয়ে কথা ক'য়ে উঠলো তাদের পত্র-
সম্পত্তি। মনের ভাব সমস্তই ভজহরির
নিজস্ব। কিন্তু কোন তৃতীয় ব্যক্তি এসে এ
মহাশূন্যতার হাত হ'তে ভজহরিকে উদ্ধার
ক'রে নিয়ে যেতে পারে না। এ মহা
নিঃসঙ্গতার উপর নিষ্ঠুর উপহাস করবার
আর কি কেউ নেই।

কাকা আছেন; তিনি ব'ললেন—কী
আরম্ভ হ'য়েছে, সেই গেল শনিবার থেকে!
শনির বৃষ্টি আর শনির দৃষ্টি! যা, হাত-মুখ
ধুয়ে নে!

ভজহরি ভাবলো—বলবার সময় তো উৎরে
যায়নি! সে আজ সারাদিন আছে, কালও
সারাদিন আছে, রাত্রের ট্রেনে পাড়ি দেবে!
তাই ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লো।

ছোটখুড়ি যেন আঁৎকে উঠ্‌লেন, তাঁর
সন্তান হয়নি ব'লে যেন শৈশবত্ব এখনো
অন্তর্ধান করেনি, খুকির মতো হাততালি দিয়ে
উঠ্‌লেন: এই যে, হঠাৎ! এরোপ্লেন
দেখলে খুকিরা যেমন হাততালি দিয়ে
আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ওঠে তেমনি
ক'রে: চেহারা যে ফিরেছে দেখছি!

—পিসিমা কই? খুড়িমা? বয়েনরা?
ছোট্‌কা এখানে বুঝি? নইলে তোমার মুখে
হাসিটা একটু বেশি-বেশি দেখছি!

মণি আধো মুখ-ভেঙচে মুখখানা যেন
কেমন ক'রে ঘুরিয়ে নিলো। সে-মুখের ওপর
যে-ছায়া ভজহরি দেখতে পেয়েছে তা লজ্জা,
আনন্দ, উৎসাহ এবং নির্লজ্জতার সংমিশ্রণের
একটি মাত্র অর্দ্ধোচ্ছ্বাসিত আভাস মাত্র! এই
হ'চ্ছে স্ত্রীলোকের রূপ, এই কারণেই পুরুষকে
তারা করে নিবিড় আকর্ষণ! ভজহরির মনে
এলো ছায়ার কথা, মাথুরের একক দুহিতা,
বেথুনে থার্ড ইয়ার, খুড়ি summer-এর পরে
যার ফোর্থ ইয়ার হ'য়েছে। পৃথিবীর মধ্যে
সবচেয়ে দ্রুতগামী কী? Aeroplane?
Rocket? Bullet? কিছু না, মানুষের

মানসিক চিন্তাধারা। তাই ভজহরি টালিগঞ্জে পৌঁছে গেছে। রেস্-কোর্স-এর পাশের বাড়িটায়। ট্রামে গিয়েছিলো একদিন, ট্রাম লাইনের মাথার ওপর দিয়ে রেলগাড়ি ঝকঝক যায় গজগজ ক'রতে ক'রতে, ট্রামের আভিজাত্য উপেক্ষা ক'রে। তারপর ডাইনে উঁচু উঁচু অনিবিড় জঙ্গল ফাঁকে-ফাঁকে মন্দিরের চূড়া, ঐ মন্দিরে নাকি ম্যাডান কোম্পানী কপালকুণ্ডলার বিয়ে দ্যায় নবকুমারের হাতে। বাঁয়ে নবাবের বাড়ি, জীর্ণ শীর্ণ তথাপি মূর্ত্ত-ইতিহাস। পাশা বাড়িটার বৈঠকখানায় একটা মোটা বনাতের পর্দা ঝুলছে অন্তঃপুরকে আড়াল দিয়ে, তার ইজ্জত বজায় রেখে। ভজহরি এই বাড়ি দেখে এসেছে একদিন একা গিয়ে। আলবৎ এইটে, না হয়েই যায় না। নগেন ব'লে দিয়েছে—বিধবার মতো শুভ্র নিঃসঙ্গ একটা বাড়ি। এইটেই। ভজহরির মন ভেতরটা ছুই-ছুই করছে,—অন্তঃপুরের ভেতরটা, অন্দরটা।

পিসিমা এসে প'ড়েছেন—ও কিরে? কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু ক'রে কি পাতাল খুঁজছিস্? এলি কখন! হঠাৎ!

সত্যি তো! ভজহরির হুস্ই ছিলো না। মাটির পানে চেয়ে এতক্ষণ সে অনেক ভেবে ফেলেছে। মাথা তুলেই ব'ললো—এই যে পিসিমা, এই তো আসচি। বিশেষ জরুরি কাজ আছে নিশ্চয়ি।

—তা বুঝেছি। নইলে ভজা আসবে ফরিদপুরে!

ভজহরি হাসলো মুচকে মুচকে, ব'ললো—না পিসিমা। ফরিদপুরে জন্ম, তা ছাড়া যাবো কোথায়? আর এলাম……অনেক কাজ!

Busy after nothing ব'লে একটা কথা আছে হয়তো ভজহরির তাই। আরো দেখা যায় যারা অজস্র পরিশ্রম করে তাদের অবকাশও অজস্র। কোনো কিছু করবার জন্যে সময়ের তাদের অভাব নেই—সমস্তই ছিম্-ছাম্ পরিপাটি।

পিসিমা ব'ললেন—যুগ্যি ছেলে হয়েছিস্, কাজ থাকবে না! তা নে, ও খোক্‌রাটা ছাড়্ তো। এক্‌টা চটের মতো মোটা কোট গায়ে দিয়ে রাতদিন থাকিস্ কি ক'রে? দেখলে আমারি যেন দম আটকে আসে। ও ছোটো বৌ, মণি…

ছোট বৌ ছুটে এলো। সমস্ত দেহ দুলে ওঠে, তরঙ্গায়িত হ'য়ে ওঠে গতির থমকে। পরণে একটি অতি সূক্ষ্ম খাদি তারি অজস্র ছিদ্র দিয়ে গোলাপি সেমিজের আভাস পরিস্ফুট। মুখে সানন্দ সৌজন্য—সেই তার অভিজাত।

—ভজা এসেচে দেখেচো?

—আপনি দেখেচেন তো? আমার কাছে পুরোনো হ'য়ে গেছে। সেই কতক্ষণ কচি খোকাটির মতো বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে, দেখিনি কি? তারপর আমার সঙ্গেই তো প্রথম দেখা। কেমন মজা? ভয়ে একটু খানি মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলে? ব'লে মণি খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠে।

ভজহরি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে পিসিমাকে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লো: ও কি পিসিমা, তোমার পা যে আর নেই! ক'রেছ কি?

—জলে জলে ঘুরি, হবে এ আর আশ্চর্য্য কি?

—না, না অমন ভাবে হেলা ক'রো না। treatment কি বলে ওষুধ-পত্তর খাও!

পিসিমা কথাটাকে ঘুরিয়ে দিলেন—তুই বাপু জামা খোল্! আমার না হয় শুধু পায়ে হ'য়েছে, যাবে তোর সর্ব্বাঙ্গে না হয়?

অবশেষে ভজহরি কোট খুললো।

বৃষ্টিতে বাড়ির উঠোন প্রায় এক হাঁটু হ'য়ে আছে। মণি একটা গামছা শক্ত ক'রে কাপড়ের ওপর দিয়েই প'রে নিয়েছে। তার অনেক কাজ। ও-দিকে ততকগুলো কাপড় বারান্দার ওপর জড়ো করা। পাখিটাকে খাবার দিতে হবে। সেই কতক্ষণ থেকে ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে। নিজের নাওয়া আছে। ননদের রান্না আজ নাকি সে-ই করবে। পিছ উঠান দিয়ে সে কি চমৎকার ক'রে হেঁটে যায়। ভজহরির দেখতে ভালো লাগে।

—বলি ও ছোটো খুড়ি, পা পিছলিয়ে চিৎ-পটাং হ'য়ো না যেন! বৃষ্টি কিন্তু তবে ছেড়ে যাবে। আছাড় খেলে নাকি ছাড়ে!

হাত দিয়ে শরীর balance ক'রতে করতে মণি হাটছে, কাজ করছে: হ্যাঁ, এ অপদেবতা আবার ছাড়বে! কাল রাত্তিরে যেই একটা তারা দেখতে পেয়েছি, অমনি তারা বাঁধলাম, ঐ তো উঠানে গাছা উপুড় ক'রে রেখেছি পরশু থেকে! কই ছাড়ছে!

ভজহরি তটস্থ হ'য়ে উঠলো……আরে রে রে রে রে রে থাক্। খুব সামলে নিয়েছ কিন্তু। মাথা গুড়ো হ'য়ে যেতো ইটে বেঁধে!

অকস্মাৎ এ খুকিত্ব থেকে মণি বার্দ্ধক্যে এসে যায় যেন: বুড়ো খুড়িদের মুখপানে তো চাইবে না খেটে খেটে হায়রাণ! একটা বিয়ে করবে তবে না।

ভজহরি একটু ন'ড়ে ব'সলো: বিয়ে করবোই তো। জানলে, ছোট খুড়ি, সেই মত নিতেই আমি এসেছি।

হাতের ঝাটা থামিয়ে মণি বলে: কিসের মত?

—বিয়ের। কাকার মত আছে কিনা সেইটুকু।

—কাকে বিয়ে। ওই হালদারদের বাসন্তীকে? কিছুতেই কারো মত নেই বাপু। ধিঙ্গি মাগাটা, ধেই ধেই নৃত্য। যতই কেন না (একটু এদিক-ওদিক চেয়ে, গলা নামিয়ে) জানতে তো বাকি নেই! কি হ'য়েছে জানো?

ভজহরি কাণ দুটো গাধার মতো প্রায় খাড়া ক'রে তুললো—কি ছোটো খুড়ি?

—না, কিছু না।

—বলোই না!

শ্রীদুর্ব্বাসা

৩০শ সংখ্যার "একটি হাত" :— বিগত ৩০শ সংখ্যার 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত 'একটি হাতের' সমাধান নিয়ে প্রবৃত্ত হল। 'উ' পক্ষের হাত নিম্নলিখিতরূপ।

আর, নিম্নলিখিতরূপ ডাক হবার পর হরতনের সাহেব খেলা হয়েছে, বলুন তো আপনারা কি ভাবে খেল্‌বেন ?

'দ'	'প'
একটি ইস্কাবন।	হরতন।
তিনটি ইস্কাবন।	চারটি হরতন।
পাশ।	পাঁচটি হরতন।
পাশ।	পাশ।

ইস্কাবন—নয়, চৌকা, তিরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, আটা, ছক্কা, চৌকা।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, আটা, চৌকা।

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, দশ, আটা, পাঞ্জা, দুরি।
হরতন—গোলাম, দুরি।
রুহিতন—বিবি, তিরি, দুরি।
চিড়িতন—সাহেব, দুরি।

'উ'	'পূ'
তিনটি রুহিতন।	তিনটি হরতন।
চারটি ইস্কাবন।	পাশ।
পাঁচটি ইস্কাবন।	পাশ।

"প" হরতনের সাহেব পেড়ে খেলায় ডাকদার ঐ পিটখানি Dummyর হাতের ছোট রং তুরূপ করে নিয়ে দেখলেন যে যদি রঙের বিভাগ ২-২ হয় তা'হলে তার পক্ষে খেলা করার বিশেষ কষ্ট নাই আর যদি ৩-১ হয় তা হলে খেলা করা একেবারে অসম্ভব। এজন্য তুরূপের পিটখানি ধরেই তিনি Dummyর হাত থেকে একখানি ছোট রঙ খেললেন, আর "পূ" যা দিলেন তার উপরের তাসখানি দিয়ে ছেড়ে দিলেন "প" দিকে। এখন 'প' এই পিটটী নিয়ে যা খেলবেন তাতে করে তার খেলা করার কোন বাধা নেই।

Finesse :—সাধারণতঃ যখন কোন রঙ-এর টেক্কা সাহেব সমেত পাঁচখানি থাকে আর Dummyর হাতে গোলাম সমেত তিনখানি থাকে তখন প্রথমে টেক্কা খেলে নিয়ে তারপর Dummyর হাতে প্রবেশ করে সেখান থেকে গোলাম পেড়ে খেলা উচিত, এবং বিবি যদি দক্ষিণ হাতে থাকে তবে finesse খাটিবে নতুবা হবে না। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যখন ডাকদার ও Dummyর হাত মিলিয়ে ৮ খানা হয় তখন বাকি ৫ খানি রঙের বিভাগ কিভাবে থাকে তা নিয়ে দেওয়া হল। প্রতি ১০০০ বারের মধ্যে ৫ খানি এক হাতে ২০ বার। বিবি সমেত চারখানি ১১৩ বার শুধু বিবি ২৮ বার। বিবি সমেত তিনখানি ২০৩ বার আর বিবি সমেত দুইখানি ১৩৬ বার।

শান্তি ইনষ্টিটিউট :—আগামী রবিবার ব্রীজ এসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু মহোদয় শান্তি ইনষ্টিটিউট টুর্ণামেণ্টের উদ্বোধন করিবেন।

—ওই কে-না-কে তার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্‌ গিস্‌গিস্‌, আবার কি ?

—এই ? এতো আজকাল ঘরে ঘরে। আশ্চর্য্য কি। তোমার ইতিহাস কি বলে ? ব'লেই ভজহরি কথাটাকে ঘুরিয়ে দিলো—ও তোয়ালেটা বুঝি তোমার ? তোয়ালে না বালিস ঢাকনা ?

—যা বলো। ঝোল, ঝাল, অম্বল।

—আবার শীত কালে কম্বল। নিজের অনুপ্রাসে ভজহরি নিজেই হেসে উঠ্‌লো : দেখলে কেমন কথায় কথায় মিল্‌ ?

ছোট খুড়ি হাসে কেবল।

আবার গমক দিয়ে বাদল এলো। ভজহরির বিয়ের কথাটা বলাই হ'য়ে উঠ্‌লো না। প্রায় ষ্টেশনের কাছ পর্য্যন্ত এসে গাড়ি ডি-রেল হবার মতো তার গন্তব্য স্থানে যেন আর পৌঁছনো হ'লো না।

তাই ওর মনটা দুঃখে টন-টন করে।

(ক্রমশঃ)

ছেলেদের গান ও ছড়া

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

সভানেত্রী মহোদয়া ও সমবেত ভগ্নীগণ,

আমার আজকের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে "ছেলেদের গান ও ছড়া।" তার মধ্যে প্রথমটির কতক নমুনা আপনাদের শোনাবার ব্যবস্থা করেছি; কিন্তু দ্বিতীয়টি নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। কারণ যতদূর বুঝছি কর্ত্রীপক্ষের উদ্দেশ্য শুধু বাংলা দেশের ছেলেদের গান ও ছড়া সম্বন্ধে গবেষণা করা নয়; সেগুলিকে ইস্কুলে ও ঘরে ঘরে প্রচলিত করা।

এখন ছেলেদের নানারকম গান ত ঘরে বাইরে গাওয়া হয়েই থাকে; সে বিষয়ে এমন কিছু নতুন আমি আপনাদের দেখাতে বা শোনাতে পারব কিনা সন্দেহ। কিন্তু ছড়া যে বয়সে কাজে লাগে, সে বয়সকে প্রাক-ইস্কুল বা B. S. অব্দ বলা যেতে পারে। আর ঘরে ঘরে যাঁরা সেগুলি ব্যবহার করেন (বা "করতেন" বলা উচিত হয়ত) তাঁরা কোন ইস্কুলে সেগুলি শেখেন নি, বা শিখতে আসবেন না; তার সুরের কোন স্বরলিপিও এ পর্য্যন্ত হয় নি। অন্যান্য অনেক সাবেকী জিনিষের মত ছড়া বলে' ছেলেদের ঘুম পাড়ানো, ভুলানো বা খেলানো উঠে গেছে কিনা বলতে পারিনে, কারণ দুঃখের বিষয় আমার নিজের এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই। সম্ভবতঃ সহরে ছেলেরা আয়ার মুখে "নিনি বাবা নিনি, মাখন রুটি চিনি" শুনতেই বেশী অভ্যস্ত। আমাদের হিন্দুস্থানী ছড়া সংগ্রহকে আমি মোটেই অবহেলার চক্ষে দেখিনে; কিন্তু এখানে আপাততঃ বাঙ্গলা ছড়া নিয়েই আমাদের কারবার।

বাঙ্গলা ছড়া সম্বন্ধে যাঁরা একত্রে জ্ঞান ও আনন্দলাভ করতে চান, তাঁদের আমি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের "লোকসাহিত্য" বইয়ের অন্তর্গত "ছেলে-ভুলানো ছড়া" নামক প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি। অন্য অনেক বিষয়ের মত এ বিষয়েও তিনি বোধহয় আমাদের প্রথম পথপ্রদর্শক ও শিক্ষা-গুরু। তিনি বলেন—"এই সকল ছড়ার মধ্যে একটা চিরত্ব আছে। * * * এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন, এবং সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইলেও নূতন। ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছুই নাই।"

আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন—"আটঘাট বাঁধা রীতিমতো সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই সমস্ত গৃহচারিণী অকৃত-বেশ অসংস্কৃতা ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়—যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা।"

আমারও হয়েছে সেই দশা। সভা সমিতির আধুনিকতার সুরের সঙ্গে এই নিতান্ত ঘরাও সেকেলে ছড়ার সুরের কোন মিল নেই; এবং ভয় হয় পাছে এ আবহাওয়ায় সেগুলির সহজ সৌন্দর্য্য ফোটাতে না পারি। তবু যখন ছড়া আমার contractএর মধ্যে আছে, তখন যাঁরা এ বিষয় আমার চেয়েও অনভিজ্ঞ, তাঁদের দু'চারটি নমুনা দেখাচ্ছি—বা শোনাচ্ছি বল্লে হয়ত বেশী ঠিক হয়। ইংরিজীতে "chamber music" বলে' একটা জিনিষ আছে, কিন্তু এই ছড়াগুলি যথার্থই bed chamber music, তাও বহু শ্রোতার জন্য নয়—একটি কি দুটি শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থে মধুরস্বরে অর্থহীন গুঞ্জন মাত্র। সে সুর এবং সে শ্রোতা দুটিকেই মনশ্চক্ষের সামনে রেখে তবে আপনাদের এগুলি শুনতে হবে। আমাদের সবচেয়ে চলতি ঘুম পাড়ানো ছড়া শোনেন নি এমন কেউ কি এখানে আছেন?

(ক) ঘুমপাড়ানী মাসি পিসি, আমাদের বাড়ী যেয়ো।
সেয নেই, মাদুর নেই, খোকার চোখে শুয়ো॥

বলা বাহুল্য এখানে 'সেয' মানে শয্যা; যদি নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য তাঁরা না আসেনত এরই পাঠান্তরে লোভ দেখানো আছে—

"বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো"

এরই জুড়ি ছড়ায় "যেয়ো" বদলে "এস" ও "শুয়ো"র বদলে "বস" বলে। আর একটি

(খ) খোকা ঘুমলো, পাড়া জুড়লো, বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে॥

(এর সুর একই। বেশীর ভাগ সুরই এই রকম, কারণ এক ঘেয়ে সুরে ঘুম শীঘ্র আসে)

এতে বর্গীদের হাঙ্গামার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত থাকায় রচনার সময়ের নির্দ্দেশও কতক পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু শুধু ঘুম পাড়াবার জন্য নয়, জাগ্রত ও দুরন্ত খোকাবাবুর মনস্তুষ্টির জন্যও নানা প্রকার গান মুখে মুখে বাঁধা হত। যথা দোলা দেবার সময়:—

(ক) দোল দোল দোলানি, হাতে দেব খেলানি,
খেলতে খেলতে এল বান, নিয়ে গেল চালার ধান।

কিংবা (খ) দোল দোল দোলানি।
রাঙ্গা মাথায় চিরুণী॥
বর আসবে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি॥

এই বরের কথায় ও বিয়ের কথায় বোধহয় আদ্ধেক ছড়া ভরা। এ বিষয়, আর একটি চলিত ছড়া হচ্ছে "আজ দুর্গার অধিবাস" (পাঠ ৩২ পৃঃ "লোক-সাহিত্য")। মেয়ে বিয়ের ঘটনাটি ঘরগত-প্রাণ বাঙ্গালীর সুখদুঃখের সহিত এমনি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত যে, উঠতে বসতে তার কথাই মনে পড়ে। বিশেষতঃ তখন সর্দ্দা আইনের ভয় ছিল না আর পণ প্রথা রহিত করবার চেষ্টাও হয় নি। আর একটি খুব চলতি ছড়া ("লোক সাহিত্যে"র ২৮পৃঃ পাঠ):—

আয় আয় চাঁদা মামা টী দিয়ে যা!
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা!
মাছ কুটলে মুড়ো দোব,
ধান ভানলে কুড়ো দেব,
কালো গরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা!

এই ছড়াটি শুনলেই আমাদের একমাত্র লালপেড়ে শাড়ীপরা বাঙ্গালী ঘরের বধূর কোলে একটি চাঁদমুখো খোকা এবং আকাশে চাঁদা মামার হাসি মুখের চিরন্তন ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এই কয়টি নমুনা থেকেই বোধহয় আমার শ্রোতারা বুঝতে পারবেন যে, বড় জোর দুধে দাঁত পড়বার আগে পর্য্যন্ত ছড়া ব্যবহার করা চলে, তারপরে নয়; বিশেষতঃ আজকালকার ছেলেরা জন্মাবধি যে চালাক হয়। তার পরবর্ত্তী বয়সের জন্য পরবর্ত্তীকালে ছড়া লেখা হয়েছে বটে, তবে জানিনে তাদের সেই স্বাভাবিক চিরন্তন গুণ আছে কিনা। এইত গেল ছড়ার পালা।

ছেলেদের গানের কথা আর একটু সরল করে এক্ষেত্রে বলা চলে। কারণ আমরা সকলেই তার সঙ্গে অল্প বিস্তর পরিচিত। আমাদের জীবনে ৩০ বৎসর খুব দীর্ঘ সময় বলে মনে হয় না। কিন্তু তার মধ্যেই বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে ছেলেদের গানের বেশী প্রচলন হয়েছে। তার আগে ছেলেদের বইয়ের মতই ছেলেদের গান বলে আলাদা করে বিশেষ কিছু রচনা করা হত কিনা সন্দেহ। কচি বেলা ঐ ছড়ার দ্বারাই কাজ চলতো। আর তারপরে বড়দের মুখে যা কিছু গান শুনতে পেত, তাই নকল করেই শিশুদের গীত-সুধার পিপাসা মেটাতে হত,—আর সময়ে সময়ে তার জন্য বকুনিও খেতে হত। আমাদের বাড়ীরই একটি ইঁচড়ে পাকা ছেলের কথা জানি, যে তার ঠাকুরদাদা রচিত "শয়ন ভিজিল নয়ন জলে, ওলো সজনী" গানটি গেয়ে খুব বিপদে পড়েছিল। আমি নিজেও অতি ছেলে বেলায় পরের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে "প্রেমের কথা আর বোলোনা" গেয়ে তাদের অনুরোধ রক্ষা করেছি মনে করলে এখনো ঈষৎ লজ্জা বোধ হয়, যদিও সে অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্ব কথা। তৎকালীন নাটকীয় গানের একটি লাইন "এনে দে এনে দে বিষ, আর যে সো পারিনে" গেয়ে বেড়ানও আমাদের সেকালে অভ্যাস ছিল, তা দুঃখের সঙ্গে এতকাল পরে স্বীকার করছি। তার আরম্ভটা ছিল "সজনি লো বল" ইত্যাদি। এটাকে ঠিক বালস্বভাবোচিত গান বলা যায় না। কিন্তু এর বদলে যে সব গোবদা ও গোমদা-তত্ত্ব কথার গান ছেলেদের মুখে কখনো কখনো তখন শোনা যেত তাই কি খুব শোভনীয়? যথা "তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাকি বল?" কিম্বা "দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন।" সুখের বিষয় এখন আমরা একটা শোভন মধ্য পথ অবলম্বন করেছি। বড়দের গান যে কটি বিষয়ে রচিত হতে প্রায়শঃ দেখা যায়,—যথা প্রেম, বৈরাগ্য, প্রকৃতি, ধর্ম্ম, স্বদেশ ও হাস্যরস—তার মধ্যে প্রথম দুটি ছাড়া সবই ছোটদের মুখে শোভা পায়;—অবশ্য সুর ও কথা সহজ ও হাল্কা হলে। শিশু-সঙ্গীত সমুদ্র মন্থন ক'রে আমি সেই রকম গুটি কয়েক গান বেছে আজ শিশুদের মুখেই আপনাদের শোনাব,—দেখুন আপনাদের কেমন লাগে।

এখানেও পূজনীয় কবিবরের অফুরন্ত গীত ভাণ্ডারই আমার প্রধান সহায় সম্বল, কারণ ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। কিন্তু অন্য দু'একটি খ্যাতনামা গীতকারের নমুনাও দেবার চেষ্টা করেছি; যথা অতুলপ্রসাদ সেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রথমেই ভগবানের নাম করে আরম্ভ করা যাক্। কারণ তাতে ছোট বড় সকলেরই মুখ শুদ্ধি হয়:—

(১) তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে—

এ গানটি বোধ হয় অনেকের কাছেই পরিচিত এবং ছেলেদের বিশেষ উপযোগী। তৃতীয় শ্লোকটি অপেক্ষাকৃত ভারি বলে বাদ দিয়েছি। তারপরে একটি শরৎকালের গান শোনাব। এটি কবিবরের নাটক "শারদ-উৎসব" থেকে নেওয়া। এবং তাতে ছেলেদের উপযোগী আরো অনেক গান আছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে তাঁর শান্তিনিকেতন ইস্কুলে তিনি বিশেষ বিশেষ ঋতু উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এই রকম অনুষ্ঠান ছেলেদের সৌন্দর্য্যবোধ উদ্রেক করবার খুব সহায়তা করে বলে অনেকের বিশ্বাস।

(২) আজ ধানের ক্ষেতে—

এর পরে যে গানটি দেব, সেটিও শরৎকালের, যদিও "বর্ষা মঙ্গল" উপলক্ষ্যে কবিবরের সুন্দর সুন্দর গানেরও অন্ত নেই; কিন্তু এবার তার কোন নমুনা দিতে পারলুম না বলে দুঃখিত। তবে শরতেরও আসবার বেশী দেরী নেই, তাই এ গানগুলিকে তাঁর আগমনী স্বরূপে দেখা যেতে পারে।

(৩) শরৎ তোমার অরুণ আলোর—

এতক্ষণ কেবল পূজনীয় রবীন্দ্রনাথেরই গান শুনিয়েছি।

এবার আমার জীবন্ত গ্রামোফোনে কবি অতুলপ্রসাদের একটা গান দিচ্ছি, সেটি "বাতাসের গান", ও কিছুকাল আগে খুব চলিত ছিল। তবে নতুনের মধ্যে সেই সঙ্গে একটি পুচকে Pavlova আপনার খেয়াল মত নাচবে। (তার অশিক্ষিত পটুত্ব দেখে আপনারা খুসী হবেন নিশ্চয়, এবং তাতে বাতাসের হাল্কা ভাবও পাবেন।)

(৪) মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে।

এবার আমাদের আর একজন খ্যাতনামা কবির একটি হাসির গান দেব। দ্বিজেন্দ্রলাল যে হাসির গানের রাজা, এ কথা কে না জানেন।

(৫) দুনিয়া কি মজাদার রঙীণ।

এর পরে আর কোন গান জমবে না, গানের পালা শেষ করে দেবার সময়ও হয়ে এসেছে।

যাঁরা শুধু চক্ষুকর্ণের ক্ষণিক তৃপ্তিতে সন্তুষ্ট না থেকে, এ বিষয়ে আর একটু আলোচনা এবং অনুসন্ধান করতে চান, তাদের কোন্ বই বা পত্রিকার দ্বারা সাহায্য হ'তে পারে, উপসংহারে সংক্ষেপে তারই উল্লেখ করছি:—

ছড়া সম্বন্ধে (১) উল্লিখিত "ছেলে ভুলানো ছড়া" ছাড়া "সংহতি" পত্রিকায় ১৩৪২ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় এবং "প্রদীপ" পত্রিকায় ১৩৪৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় লেখা শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দে'র "গ্রাম্য ছড়া" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (২) "বঙ্গলক্ষ্মী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়ের লেখা "আগডুম বাগডুম" ছড়াটির বেশ একটি ব্যাখ্যা পড়েছিলুম, কিন্তু দুঃখের বিষয় সন তারিখ মনে করতে পারছিনে, খোঁজ করেও পাইনি। এইটিই একমাত্র সুরে-বলানো ছড়া মনে পড়ছে যা' ছেলেদের খেলার সঙ্গে গাওয়া চলতে পারে (৩) যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "খুকুমণির ছড়া"র অনেক রকমের প্রচলিত ও স্বরচিত ছড়া আছে। (৪) সুকুমার রায় চৌধুরীর "আবোল তাবোল" বইয়ে ছেলেদের আমোদ দেবার মত ছড়া জাতীয় অনেক মজার কবিতা আছে। অবশ্য এস্থলে সেই পুরাকালের পুরোদস্তুর গ্রাম্য শিশুসুলভ ছড়ার রূপকে কিছু বাড়িয়ে ও বদলিয়ে কল্পনা করে নিতে হবে।

গান সম্বন্ধে পরিশেষে বক্তব্য এই যে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য স্বরলিপির বই থেকে ছেলেদের গানের একটা সুন্দর চয়নিকা করা যেতে পারে। তা ছাড়া **ছেলেদের গানের** বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি বইয়ের ফর্দ্দ নীচে দেওয়া গেল।

(১) সঙ্গীত-মুকুল—প্রকাশক, রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়; প্রাপ্তিস্থান, ব্রাহ্মবালিকা

শিক্ষালয়। গানের সুর অনেক স্থলে দেওয়া আছে, কিন্তু স্বরলিপি নেই।

(২) প্রিয়-সঙ্গীত—প্রিয়ম্বদা নাগ প্রণীত। কয়েকটি গানের স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে।

(৩) হাসি ও খেলা—যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। দু'একটি গান আছে কিন্তু স্বরলিপি নেই।

(৪) আজব বই—সুবিনয় রায় চৌধুরী প্রণীত। এতে দু'টি গানের স্বরলিপি দেওয়া আছে। এ বইটি সম্প্রতি লেখা হলেও শুনতে পাই খুব জনপ্রিয় হয়েছে।

(৫) শুভা—সুখলতা রাও প্রণীত। এটি কবিতায় ছোট নাটিকা। ৩।৪টি গানের স্বরলিপি আছে।

পুরণো "সন্দেশ" পত্রিকায় কয়েকটি খেলার গানের স্বরলিপি বেরিয়েছিল। এই ছড়া ও গানের ফর্দে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের ছাড়া অন্য বইগুলির নামের জন্য আমি শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে আরও জানিয়েছেন যে ৺উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, ৺সুকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীমতী সুখলতা রাওয়ের গানগুলি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। এ ছাড়া কবি অতুল প্রসাদের "কয়েকটি গান" এবং "মালিকা" নামক বই আছে জানি। তা'তে ছেলেদের উপযুক্ত গান কিছু থাকতে পারে।

আর আমার নিজের জানার মধ্যে ৺কামিনী রায়ের "গুঞ্জন" নামক বইয়ে ছেলেদের গান আছে বলতে পারি; কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে যদিও বা গানের কথা ও সুরের নাম পাওয়া যায় ত স্বরলিপি খুব কম বইয়ে দেওয়া থাকে।

রজনীকান্ত সেনের রচিত "পান্তোয়া ও চানাবড়া" সম্বলিত একটা গান আছে যা ছেলেদের পক্ষে খুব উপাদেয় হবার কথা; কিন্তু তার সব কথাগুলি মনে নেই, আর তাঁর স্বরলিপির বই আছে কিনা তাও জানিনে। বইয়ের দোকানে খোঁজ কোরে দেখতে পারেন। মজার গান আরো দু'একজন রচনা করেছেন, যার নমুনা আজকাল হয়ত রেডিওতে পাওয়া যায়, যদিও ছেলেদের ক্ষেত্রে বাছাই দরকার হতে পারে। মান্যবর গুরুসদয় দত্ত মহাশয় "ব্রতচারী"দের জন্য নানা রকম ছেলেদের গান রচনা করেছেন যা তাঁর "ব্রতচারী সখায়" পাওয়া যায়। স্বরলিপি দেওয়া না থাকলেও নাচ শেখাবার শিক্ষক তিনি সরবরাহ করেন জানি। যাঁদের হাতে ইস্কুল আছে, এই সুযোগে তাঁদের অনুরোধ করি সেখানে ব্রতচারীর খেলা ও গান চালিয়ে দেখতে; কারণ যতদূর জানি তাতে মেয়েদের শরীর মন দুইয়েরই উন্নতি হবার সম্ভাবনা। তিনি বাঙ্গালী জাতির উন্নতিকল্পেই এই পন্থা উদ্ভাবন করেছেন সুতরাং আমাদের শিক্ষয়িত্রী-দের এতে উৎসাহ এবং সহানুভূতি দেখানো উচিত বলে মনে করি।

একটি ব্যক্তিগত স্মৃতির উল্লেখ করে এবার শেষ করি। বহু বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অধুনালুপ্ত "সঙ্গীত প্রকাশিকা" পত্রিকায় ছেলেদের গানের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। তার উত্তরে তিনটি রচয়িতা গান পাঠান, তার মধ্যে ছদ্মনামে আমিও ছিলুম একজন। ছেলেদের বইয়ের খ্যাতনামা লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার "দেশ দেশ দেশ" বলে বেশ সরল একটা গান পাঠিয়েছিলেন, সেটা ছোট ছেলেদের প্রীতির ভাব জাগাবার বেশ উপযোগী। "সঙ্গীত প্রকাশিকা" এখন দুর্লভ তবে যদি কেউ দেখতে চান ত আমি গানগুলি দেখাতে পারি। গান ৩টি ৮ম ভাগে ১৩১৫ সালে (১৯০৮) বেরিয়েছিল।

আর কেন, এতক্ষণে ছড়া কেটে বলবার বিলক্ষণ সময় হয়েছে:—

আমার কথাটি ফুরলো,
নটে গাছটি মুড়লো।
কেনরে নটে মুড়োস্ কেন?
তোর গরুতে খায় কেন?
কেনরে গরু খাস্ কেন?
তোর রাখাল চরায় না কেন?
কেনরে রাখাল চরাস্‌নে কেন?
তোর বউ ভাত দেয় না কেন?
কেনরে বউ ভাত দিস্‌নে কেন?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না?
কেনরে কলাগাছ পাত ফেলিস্ না?
বৃষ্টি কেন হয় না?
কেনরে বৃষ্টি হস্ না?
ব্যাঙে কেন ডাকে না?
কেনরে ব্যাঙ ডাকিস্ না?
সাপে কেন খায়?
কেনরে সাপ খাস্?
খাবার ধন খাবনি?
গুড় গুড়িয়ে যাবনি? *

* গত ১লা আগষ্ট শনিবার সঙ্গীত সম্মিলনীর সভাধিবেশনে পঠিত।
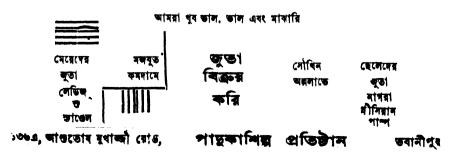
বৃটিশের ছবি 'নাইট উইদাউট আরমার' চিত্রের পরিচালক আলেকজেণ্ডার কোর্ডা।

ও পারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

আইরিশ ম্যান

আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেদের একটা নাম আছে যে তারা সব কাযেই তৎপর। শুধু এটা সুনাম নয়! লোকের কোন তুলনা করতে গেলেও ওরা ওই আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর মত বলে তুলনা করে ফেলে।

সেই আয়ার্ল্যাণ্ডের ছেলে হচ্ছে প্যাট ও'ব্রায়েন। সময় নষ্ট করতে ও চায়না, ভালও বাসে না। আর কোন কাযের তাড়া থাকলে তো কথাই নেই। সে সেদিন ফিরলো তার নিজের সাজবার ঘরে। ভয়ানক তার তাড়াতাড়ি। পোষাক শীঘ্র তার বদলে নিতে হবে। মুখের উপর মুছে যাওয়া রঙটাকে আর একবার ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ঘরের দরজা বন্ধ!

কী করে? চাবি! চাবি!

চাবি যে সেক্রেটারি নিয়ে কোথায় গেছে। প্যাট ও'ব্রায়েন কী করতে পারে?—সামনেই একখানা কাঠচেলা করার ছোট্ট কুড়ুল ঝুলছিল। ও'ব্রায়েন সেখানা টেনে নিলো। কুড়ুলের ঘায়ে দরজাটি ভেঙে ফেলে। তারপর ঘরে প্রবেশ করে 'মেক-আপ' সেরে সেটে চলে গেল।

ফ্রান্সেস ম্যারিয়ন

ফ্রান্সেস ম্যারিয়ন-এর নাম আছে। ফ্রান্সেস হচ্ছে মেট্রো গোল্ড্‌উইন মায়ারের সহ প্রডিউসার। কিন্তু এই তার পরিচয় নয়। এর চেয়ে ঢের বড় পরিচয় আছে। ফ্রান্সেস-এর মত সিনারিও লেখক খুব কম আছে। ফ্রান্সেস চিত্রনাট্য লেখে, পর্দায় তা ছবিতে রূপান্তরিত হয়। সে ছবিকে লোকে বাহবা দেয়। সে সব ছবি যেমন :—'এ্যানা ক্রাইষ্টি', 'দি রোড সঙ', 'দি সি-ব্যাট', 'মিন এণ্ড বিল', 'দি বিগ হাউস', 'দি চ্যাম্প', 'ডিনার এ্যাট এইট', আর এখন লিখেছে গার্বোর ছবি 'ক্যামিলি'। ওপরের ছবি গুলোর নাম শুনে নিশ্চয়ই আপনার মনে হচ্ছে সে কত বড় সিনারিও লেখক।

মার্লিনের ছবি

আলেকজান্দার কোর্ডা এনেছে ফ্রান্সেস ম্যারিয়নকে ইংলণ্ডে। কোর্ডা হচ্ছে জু। জিলিপীর প্যাঁচের মত তার বুদ্ধি। সেই বুদ্ধির প'াকে পা দিয়েই ফ্রান্সেস এসেছে তার কোর্ডার কাছে।

ওর নতুন চিত্রনাট্য হচ্ছে 'নাইট উইদাউট আরমার'। আলেকজান্দার কোর্ডা সে ছবি পরিচালনা করবে। মার্লিন ডিয়েট্রিক আর রবার্ট ডোনাট নামবে নায়ক নায়িকা হয়ে।

এ ছবি যে হবে বৃটিশ ছবি সে কথা আমাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবেনা। চিত্রনাট্য যে খুব ভাল হবে তার সম্বন্ধেও আমরা সন্দেহ মোচন করতে পারি।

মার্লিন ডিয়েট্রিক

ফ্রান্সেস লেখে সত্যিকার সিনারিও। এমন চিত্রনাট্য লেখে যে, পরিচালক অন্ধের মত অনুসরণ করে গেলে পরিচালকের ছবির কোন খানটায় ফাঁক দেখা যাবেনা, ত্রুটী বা বিচ্যুতি ধরা দেবেনা।

'নাইট উইদাউট আরমার' ছবিখানা ভাল ছবি হবে, আরো এই জন্যে আশা করা যায় যে এইখানা মার্লিনের প্রথম বৃটিশ-ছবি। এর আগে মার্লিন ইংলণ্ডে এসে ছবিতে নামেনি। এ ছবিতে বৃটিশের চেষ্টার অন্ত থাকবেনা। 'ডিজায়ার'-এর মত ছবিকেও ওদের দাবাতে হবে। এমনি কোর্ডার পণ।

রবার্ট ডোনাট

জ্যাক্ বুকানন

জ্যাক্ বুকানন আমেরিকা থেকে এসেছে ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডে ওর ছবি হচ্ছে 'দিস উইল মেক ইউ হুইস্‌ল্'। ছবিখানা হচ্ছে হার্ব্বার্ট উইল কক্সের প্রোডাকশান। পরিচালনা কর্চ্ছেনও হার্ব্বার্ট নিজে।

আরলিস্

আরলিসের পরের ছবি হবে 'আণ্ডার দি রেড রোজ'। জর্জ্জ আরলিস্ সাজবে কার্ডিন্যাল রিচেলিউ।

এরাও

কানার্ড ভিড এবং রেমণ্ড ম্যাসি এই ছবিতে নামবে। তবে কোন কোন অংশে তারা নামবে এখনও তা ঠিক হয়নি। মেয়েদের মধ্যে বড় ভূমিকায় কে নামবে তা এখন পর্য্যন্ত স্থির হয়নি। যে কটা নাম আমরা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে ক্যারোল লম্বার্ড, মার্গারেট সুলাভ্যান কিম্বা ডলরেস কষ্টেলো।

মনে হয় ডলরেসকেই এ ছবিতে পাওয়া যাবে। অপর দুজন এখন হলিউডে ভয়ানক ব্যস্ত।

সুন্দরী ডলরেস কষ্টেলো ব্যারীমুর এই সেদিন পর্য্যস্ত ছিল জন ব্যারীমুর-এর স্ত্রী। 'লিটল লর্ড ফণ্টলরয়' ছবিতে মায়ের অংশে নেমেছে।

মার্লিনের প্রেম

রুডলফ্ ভ্যালেনটিনো মারা যাবার পর অনেকদিন ধরে অনেক মেয়ে চোখের জল ফেলেচে। ভ্যালেন্টিনোকে ভুলতে তাদের বেশ সময় লেগেছিল। তেমনি ভালো বাসচে আজো অনেকে জন গিলবার্টকে।

নিঃশব্দ, নির্জ্জন ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ওপর অনেক গুলো জন গিলবার্টের ছবি সাজান; সেই ছবির সামনে বাতি জলছে। মার্লিনের প্রেমের এই নীরব প্রতিদান।

কে বলতে পারে যে তাদের এই প্রেম আগামী কালে চরম পথে উঠত কিনা, তারা বিবাহ করত কিনা।

গিলবার্টকে স্ত্রী পরিত্যাগ করতে হোত। তাতে ওর মধ্যে এমন একটা চারম ছিল

জেনেট ম্যাকডোনাল্ড

যে সমস্ত সম্বন্ধ চুকে যাওয়ার পরও সেই মেয়ে ওকে ভুলতে পারত না। তাই ভার্জ্জিনিয়া ব্রুস, লিটিল জন আলো ওকে ভুলতে পারেনি—আজও ওকে ভালবাসে।

এলিন আর ক্র্যাফোর্ডের ছবি

'ব্রডওয়ে মেলডি অব ১৯৩৭' তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছে। আবার সেই ট্যাপ্পিং, ট্যাপ, ট্যাপ—সেই তের নম্বর প্রিয় ষ্টার—সেই এলিনর পাওয়েল এই ছবিতে নামবে।

এই 'ব্রডওয়ে মেলডি'কে নতুন করে নতুন

নেলসন এডি

রূপ দেবার জন্যে আরো অনেক মেয়ে এ ছবিতে নামবে যাদের আমরা দেখেছিলাম 'ব্রডওয়ে মেলডি অব ১৯৩৬' ছবিতে।

'গরজাস্ হসি'তে আছে জোয়ান ক্র্যাফোর্ড

আর রবার্ট টেলর। ছবিখানা তোলা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

এলিনর পাওয়েল-এর আর একখানা ছবি হচ্ছে 'বর্ণ টু লাভ।'

জোয়ান ক্র্যাফোর্ড নামবে ক্লার্ক গেবলের সঙ্গে 'স্যারাটোগা' ছবিতে। 'নো হিরো' এবং 'দি গ্রেট ক্যানাডিয়ান' নামে দুটো বই ওর নামে নির্দ্ধারিত হয়ে আছে।

উইলিয়াম পাওয়েল আর মির্ণালয়

'দি থিন ম্যান' ছবিখানাকে নিয়ে অনেক দিন ধরে অনেক কথা চলে আসছিল। সেটা মিটেছে। ছবি খানার নাম হয়েছে 'আফটার দি থিন ম্যান'। এতে নামছে উইলিয়াম পাওয়েল আর মির্ণালয়।

ওরা আরো একখানা ছবিতে নামছে সে ছবির নাম 'প্রিজনার অব জেণ্ডা'। এ নামের ছবি আমরা নীরব ছবির যুগেও দেখেছিলাম।

নরমার ছবি

জেন অষ্টেনের উপন্যাস এতদিন পর্দ্দায় ছবিতে রূপান্তর হয়নি। এই প্রথম ওর বই 'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস'কে ছবি তোলার জন্যে নেওয়া হোল। 'মেরী এ্যান-টয়নেট' সাজবে নরমা শিয়ারার। চার্লস লাটনও নামবে এই ছবিতে।

রোজ মেরীর পরের ছবি যে 'মে টাইম' এবং তাতে নামবে জেনেট ম্যাকডোনাল্ড আর নেলসন এডি একথা কিন্তু আমরা জানি।

ওয়ালেস বিয়ারীর পরের ছবির নাম হচ্ছে 'দি ফাউণ্ডি'।

খুচরো খবর

ক্যালিফোর্ণিয়ার সান্তা বারবারার কাছে সমুদ্রের ধারের বাড়ীর মালিক দুজন রোনাল্ড কলম্যান, হার্ব্বার্ট মার্শাল।

যৌবন বৃন্তে ফুট্‌লো যেদিন ফুল

আশা দেবী

মিসেস্ গাঙ্গুলী বৈকালিক প্রসাধনে নিরতা। হাতকাটা ব্লাউজের উপর লালপেড়ে সাড়ীখানা অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে পেঁচিয়ে নিয়েছে। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। হাতে দু'খানা চুড়ী। গলায় একগাছি হালফ্যাসানের সরু হার। বুকের কাছে আঁটা একটা ব্রোচ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার খোঁপাটা ঠিক বসিয়ে দিচ্ছে এমন সময় সিড়ির কাছে বিজনের গলার শব্দ শোনা গেল। বিজন ঘরে ঢুকে ডাকল

—সিপ্রা!

খোপাটা দু'হাতে চেপে ধরে বিজনের দিকে ফিরে সিপ্রা বলল

—কেন?

—আমার সুট্, টাই আর নাইটকেপটা?···

—এই নাও, সিপ্রা গিয়ে সুট্ এনে দিলে।

বিজন তাড়াতাড়ি সুট পরে নীচে নেমে গেল। নীচে মটর প্রস্তুত ছিল। বিজন উঠতেই হর্ণ বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

সিপ্রা রূপসজ্জা শেষ করে রিষ্টওয়াচটার দিকে তাকালো, ছয়টা বাজে। আজ মিসেস্ মুখার্জ্জির বাসায় tea party, না গেলে হয়তো আশা রাগ কোরবে। সিপ্রা সেণ্ডেল খুলে Lady shoe পায়ে দিয়ে চাকরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।···

বাঁধানো লাল রাস্তার উপর মোটরখানা রেখে বিজন অন্ধকার অপরিসর এক গলি বেয়ে একখানা ছোট বাসায় গিয়ে উঠলো। অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘর। আলোবাতাস পৌঁছতে পারেনা। হঠাৎ কেউ আসলে হয়তো দম বন্ধ হয়ে যাবে।···

বিছানার এক পাশে রোগিনী একগাছি শীর্ণ লতার মতো পড়ে আছে। মাথার কাছে মিসেস ছায়া দেবী। পাশকরা Midwife. ভদ্রঘরের মেয়ে। সুন্দরী। দুধে আলতা মিশানো গায়ের রঙ। কলেজে পড়বার সময় এক ক্রিশ্চান্ যুবকের প্রেমে পড়ে যায়, তারপর ওদের Love marriage হয়। অল্পকয়দিন হয় ছায়াদেবী Municipalityতে চাকরী পেয়েছে। কয়েকটা case ভালো করে বেশ নাম করে উঠেছে।···

বিজন এসে ছায়াকে জিজ্ঞাসা করল

—Pain কতোক্ষণ ধরে?···

—সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। শরীর বড় Week, গরম দুধ দিয়েছি।

—হ্যাঁ—তাই খেতে দিন। আমি বাইরে আছি।

* * *

অতি ক্ষীণ আর্ত্তনাদ। জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম। দেহের সমস্ত রক্ত দিয়ে গঠন পুষ্টি

ফ্রেডারিক মার্চ্চ নিউ ইয়র্কের ষ্টেজে ফিরে আসবে কিনা ভাবচে।

* * *

হাঙ্গেরীর খুব বড় এবং ধনী মদের ব্যবসায়ীর মেয়ে হচ্ছে ষ্টেফিডোনা।

* * *

গ্রেটা গার্ব্বোর সঙ্গে মার্কস ব্রাদার্স এর যে নামবার কথা ছিল সেটা একেবারে বাজে কথা।

* * *

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের ছবি 'সিং বেবী সিং' ছবিতে নামচে এ্যাডলফ মেঞ্জু এবং এলাইস ফেয়ি। শুনেছি এ ছবির গল্পের মধ্যে জন ব্যারিমুর আর এলেন ব্যারির সুবিখ্যাত প্রেমের অনেকটা ইতিহাস আভাসে পাওয়া যাবে।

পরিণতি দিয়েছে যে সন্তানকে—এতটুকু একটা মাংসপিণ্ড—সে আজ দিপ্ত মুক্তির আলোর জন্তে বিদ্রোহী।—নির্ম্মম—নিষ্করুণ। হয়তো কোনো দানবীয় শক্তি তাকে পেয়ে বসেছে।—তাই সে মরিয়া। রুদ্ধ অন্ধকারে দীর্ঘ—সুদীর্ঘ দশটা মাস কাটিতেছে। এ্যাদ্দিন হয়তো তার দৃষ্টিশক্তি ছিল না। আজ দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সঙ্গে সে আলো-আঁধারের তারতম্য বুঝেছে। তাই আজ এই রূপরসগন্ধ পরিপূর্ণা বিচিত্রা ধরণীর স্নেহ সরল পরশের জন্য চঞ্চল।

বিজন বাইরে উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে। প্রসূতির আর্ত্তনাদ তাঁর প্রাণে করুণ হয়ে বাজছিল। সে তার সম্পর্কে কেউ নয়। তবু তার এত উৎকণ্ঠা। কেন? গরীব তারা। এ সম্বন্ধ তাঁর কাছে সব চেয়ে বড়ো। দীন-দুঃখীদের কাছ থেকে ভিজিটের টাকাটা পর্য্যন্ত নিতে চায়না। বিনি পয়সায় তাদের ঔষধ দেয়।

—ডাক্তার বাবু, Safe delivery.

ছায়াদেবীর মুখে মৃদু হাসির রঙ। বিজনের অন্তরটাও দুলে উঠ্‌ল এক অজানা পুলকে।

পাশে একজন প্রৌঢ়া মাথায় উপর আধখানা ঘোমটা টেনে দর্শনীর টাকা হাতে দাঁড়িয়েছিল। ছায়াদেবী বললে—এই আপনার ভিজিটের টাকাটা…

—Sorry মিসেস ছায়াদেবী।

প্রৌঢ়ার দিকে ফিরে বললে—মা, টাকাটা রেখে দিন। দরকার হবে। আমি Dispensaryতে গিয়ে ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু যত্ন নেবেন। প্রৌঢ়া নীরবে কৃতজ্ঞতা জানাল। ধীর গলায় বললে —ভগবান তোমার মঙ্গল করুণ।

ছায়াদেবীর দিকে ফিরে বিজন বললে

—আপনিও আমার গাড়ীতে চলুননা।

ছায়াদেবী কোনো আপত্তি না কোরে গাড়ীতে উঠে বসল। গাড়ী start দিলে।

* * *

অনেক রাত হয়েছে। সিপ্রা ডল্‌টিকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। বালিশের উপর একরাশ চুল এলোমেলো কোরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়তো বা তার খামখেয়ালিতায়।

বিজন কি মনে করে বিছানার পাশে আলগোছে বসে সিপ্রার মুখের পানে চেয়ে রইল। সে যেন ধীরে ধীরে কেমন ভাব-বিহ্বল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। সুইচটা অফ না কোরেই সিপ্রা শুয়েছিল। আলো পড়েছে তার মুখে। এই তার পত্নী! অনুপমা! সুন্দরী! এতোরূপ এ্যাদ্দিন কোথায় লুকিয়ে ছিল। চোখদুটো যেন আধফোটা কুসুম। কেমন কমনীয় মুখশ্রী। যেন পটে আঁকা একখানা ছবি। তার নরম একখানা হাত পুতুলটার উপর। বিজনের ইচ্ছা হচ্ছিল এ সুপ্তির মাঝে ও দুটো লাল গাল অজস্র চুমায় আরো রাঙিয়ে তোলে। বিজন তার তৃষিত ঠোঁটের সঙ্গে সিপ্রার ঠোঁটের মিলন ঘটাচ্ছিল এমন সময় সিপ্রা চমকে উঠল।

—চুরি কোরে প্রেম করতে শিখলে কার কাছে ?

—তোমার কাছে।

—কী দুষ্টু।

—দুষ্টু আমি নয়—তোমার রূপ। সত্যি সিপ্রা তোমার ও রূপ আমার···

—কবিত্ব রাখ। ভাত খেয়েছ ?

—না।

—বা-রে বারোটা যে বাজে! এতোক্ষণ না খেয়ে রয়েছ ? ঠাকুর কোথায় ?

—খাক্ ও ঘুমিয়েছে।

—আচ্ছা আমি দিচ্ছি। তুমি এসো।

সিপ্রা ভাত বাড়তে নীচে নেমে গেল।

খেয়ে দেয়ে বিজন শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার চোখে ঘুম আসছিল না। প্রসূতির ম্লান মূর্ত্তিখানা তার চোখের সামনে ভাসছিল। উৎকট অসহনীয় যন্ত্রণায় তার জীবনের উপর হয়তো বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল—মৃত্যুকামনা কোরেছে কিন্তু তবু—তবু হয়তো এখন সে সীমাহীন আনন্দে আত্মহারা—সমস্ত বেদনা ভুলে গিয়ে ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়েছে। শিশুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করে এক নূতন জীবন—তার মাতৃত্বের সূচনা, ধরা আজ স্বর্গে পরিণত। সৃষ্টির আনন্দ যেন সমস্ত প্রকৃতির, আলো বাতাস এ দেববিনিন্দিত শিশুর মুখে চুমো এঁকে গিয়েছে। ভোরের কাকলীতে হয়েছে তার অভিনন্দন। ভাগ্যবতী প্রসূতি।

কিন্তু সিপ্রা এ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিতা। সে যে চায়না। নারীর মন, চায়না বলাও কঠিন। এখন সে প্রজাপতির মতো চঞ্চলা! সে চায় তার যৌবনকে বেঁধে রাখতে। তার এ সৌন্দর্য্য চির-অম্লান—তার স্বচ্ছন্দগতি চির অব্যাহত থাকুক! কিন্তু তা কি হয় ? হোলে ফুল ঝড়ে পড়তনা—জরামৃত্যু পৃথিবীতে থাকত না। প্রকৃতির বিধান। এ বিধান উল্টে দেওয়ার শক্তি মানুষের নেই। এমনি সব এলোমেলো চিন্তা কোরতে কোরতে বিজন ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

সিপ্রা আজকাল ভারী ব্যস্ত। তার আর ফুরসুৎ নেই। সে আর তার বান্ধবী আশা মুখার্জ্জী মিলে দিচ্ছে 'নটীর পূজা'র মহলা। সরস্বতী পূজোর সময় তাদের এ অভিনয় হবে। তাদের প্রগতি-সঙ্ঘের সভ্যাদের সবাই সমান উৎসুক। কারু এতটুকু গাফিলি বা অবহেলা নেই। তাদের অভিনয় নৈপুণ্যে সবাই যেন মুগ্ধ হয় তজ্জন্য তারা সচেষ্ট—সক্রীয়। সিপ্রা সকালে উঠে মিসেস মুখার্জ্জির বাসায় গেল। মিসেস মুখার্জ্জি চায়ের পেয়ালায় চুমুক লাগিয়েছে মাত্র এমন সময় সিপ্রা গিয়ে উপস্থিত হোল।

—আরে সিপ্রা যে!—

—হ্যাঁ, আমি।

—এতো সকালে—ওদের যে আজ বৈকেলে আসতে বলে দিয়েছি।

—Rehearsal ও বেলায় না হয় হবে। আমি এমনি এসেছি।

—বেশতো—বেণু!

—যাই মা।

তোর মাসীমার জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আয়।

—চা যে আমি খেয়ে এসেছি ভাই।

—আর এক কাপ খেলে দোষ হবে না।

বেণু চা আর টোষ্ট নিয়ে এলো। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সিপ্রা বললে :

—তোমার একটা গান শোনাবে বেণু ?

মন্দ কি। বেণু তোমার মাসীমাকে রবী ঠাকুরের সে গানটা শোনাও।

—সুন্দর মরি মরি—ঋতু উৎসবের গানটী ?

হ্যাঁ।

গান

শ্রীবংশী আশ

মোর নয়নের কাজল হ'য়ে
ওগো আমার সুরের সাথী।
নিঝুম রাতে একলা ঘরে
জ্বালিয়ে তোমার রূপের বাতি।
সজল করুণ আঁখির ধারায়,
ধোয়াব তোমার নিঠুর হিয়ায় ;
ছন্দ হারা ভাষার গানে
গাইব তোমার সুরের গীতি।

বেণু পাশের ঘরে গিয়ে অর্গেন নিয়ে গাইতে লাগল—

ওহে সুন্দর মরি মরি।
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি॥
তব ফাল্গুন যেন আসে
আজি মোর পরাণের পাশে
দেয় সুধারসে ধীরে ধীরে
মম অঞ্জলি ভরি ভরি॥

* * *

গান শেষ হোলে অর্গেনের ডালা বন্ধ করে বেণু সিপ্রার কাছে এসে চপল চোখ দুটো নাচিয়ে বললে—

—গান কেমন লাগল মাসীমা?

—সুন্দর!

—ঠিক বলছেন?

—ঠিক নয়তো কী?

সিপ্রা আদর কোরে, বেণুর গালটা টিপে দিলে। একটা ছায়া-ভরা ব্যথা যেন বাজল ওর বুকে। বেণু। কেমন সুন্দর মেয়েটি! আশা আর সিপ্রা বসে বসে অনেক কথাই সেদিন বললো।

অভিনয়ের দিন।

গার্লস্কুলের মিস্ট্রেস্ Miss সুলেখা দেবী প্রভৃতি সহরের বিশিষ্টা ভদ্রমহিলাগণ নিমন্ত্রিতা হয়েছিলেন। অনেক ভদ্রলোকের নিকট complimentary card issue করা হয়েছিল।

অভিনয় শেষ হোল। তাদের আপ্রাণ চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের সবাই এক বাক্যে তাদের সুঅভিনয়ের জন্য অজস্র সুখ্যাতি করতে লাগল।

পরদিন সায়াহ্নে সিপ্রা তন্ময়া হয়ে তার পুতুলটিকে সাজাচ্ছিল। তার সঙ্গে কতোরাজ্যের কথা জুড়ে দিয়েছে। বিজন পা টিপে টিপে এসে পিছনে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সিপ্রা ডলটিকে বলছিল।

—খুকী ভালো মেয়ে—দুষ্টুমি করে না। পাজামা পরে। কৈ! গায়ে জামা দাওনি যে? আমি যাই তাহোলে—ওকি মুখ ভার করলে কেন?—এক্ষুণি আসব। পেছন ফিরতেই বিজনকে দেখল।

বিজন হাসিমুখে বলল।

—সিপ্রা! তোমার পুতুলটি বুঝি খুব ভালো।

—হ্যাঁ—ভালো বৈকি! কেমন শান্ত! কারু সঙ্গে ঝগড়া করে না। আর তোমার বেণু—? বাপো! সারাদিন কী দুরন্তপনা!

—কিন্তু বেণু কেমন মিষ্টি গায়! কেমন সুন্দর নাচে। ওর বাদল নৃত্যই তো তোমাদের অভিনয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কোরেছে। তা ছাড়া ওর গানগুলো হয়েছে নাটকের প্রধান আকর্ষণ।

হঠাৎ সিপ্রার মুখে পড়ল একটা মলিন ছায়া। তার পুতুলটিও যদি সজীব হোত তাহলে সেও তো আজ এমনি ভালো গাইতে পারতো। সিপ্রা যেন একটু আহতা হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। বিজন দেখলে

সেখানে একখানা কাগজ পড়ে রয়েছে। কাগজে অভিনয়ের সমালোচনা বা'র হয়েছে। বিজন পড়ল।

স্থানীয় প্রগতি সঙ্ঘের মহিলাদের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা" নাটিকা খানি সুঅভিনীত হয়ে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। কুমারী বেণু দেবীর বাদল-নৃত্য এবং স্বভাব মধুর কণ্ঠের গানগুলি সঙ্গীত-শিল্পের উৎকর্ষতার প্রমান দিয়েছে। অভিনয়ের মধ্যে শ্রীমতীর ভূমিকায় নন্দিতা দেবীর অভিনয় হয়েছে এক কথায় সুন্দর প্রাণস্পর্শী, অন্যান্য ভূমিকাও মন্দ নয়। সব চেয়ে উদ্যোগিনী পরিচালিকা শ্রীযুক্তা সিপ্রা দেবীর নৃত্য পরিকল্পনা এবং গানের সুর যোজনা উল্লেখযোগ্য। নাটকের সু-পরিচালনার জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে।

বিজন কাগজখানা টেবিলের উপর রেখে ভাবতে লাগল। হয়তো সিপ্রাও চায় বেণুর মতো একটা ফুটফুটে মেয়ে। তার বুকে হয়তো একটা ব্যথা অনুক্ষণ বাজে—পুতুলকে এখন সে সজীব দেখতে চায়।

* * *

ঋতুবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে একটি বছর কেটে গেছে। সিপ্রার একটী কন্যা সন্তান হয়েছে। বিজন সারাদিন রোগী দেখে, Laboratoryতে কাজ করে। যে অবসরটুকু পায় সে সময় মেয়েটিকে নিয়ে কাটায়। মেয়েটিও সুন্দরী হয়েছে। যেন সিপ্রার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু শিশুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুজনের মধ্যে যেন, শত সমুদ্রের ব্যবধান এসে পড়েছে। সিপ্রা অভিমানে আর বিজনের সঙ্গে তেমন কথা বলে না। উঃ! কী সর্ব্বনাশটা করেছে! এ্যাদ্দিন সে কেমন স্বচ্ছন্দে কাটিয়েছে! আর এখন যেন দিন দিন এক বাঁধনে জড়িয়ে পড়ছে। না—তা হতে দেবেনা—কিছুতেই না! মেয়ের কাছ থেকে সে দূরে থাকে। মেয়েটা সমস্ত-ক্ষণ দাইএর কাছে থাকে।

ভরা যুবতী সে, তার কোলে শিশু শোভা পায় না। শিশুর মা হতে সে পারে না। ওঃ ভগবান তাকে কেন এ অভিশাপ দিলেন। অসহনীয় ক্ষোভে রোষে সিপ্রা মেয়ের দিকে তাকায় না। তাদের সঙ্ঘের সভ্যাদের সঙ্গে সে আর আগেকার মতো মেলামেশা করতে পারে না। একটা সঙ্কোচের জড়িমা তাকে বাধা দেয়। তাদের উচ্চ হাসি আমোদ-প্রমোদ তাকে যেন উপহাস করে। ওদের কৌতুক তার কাছে বিদ্রূপ বলে মনে হয়। তার সমস্ত রাগ পড়ল স্বামীর উপর। বিজন তার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করল। মর্ম্মাহত হোল সরলা শিশুর প্রতি তার অবজ্ঞা দেখে।

* * *

দেখতে দেখতে আরও কয়েকটী বছর কেটে গেল। সিপ্রার মেয়েটি এখন বড় হয়েছে। বিজন তাকে উৎপলা বলে ডাকে মেয়ের মুখের আধ-আধ অস্ফুট বাণী তার প্রাণে আনন্দলহরী ছুটায়।

সেদিন বিজন কোথায় গিয়েছিল। দাইও ছিল না। পলা উঠে কান্না জুড়ে দিয়েছে সিপ্রা উঠে একবার চারিদিকে চাইলে। কেউ নেই। ধীরে ধীরে পা টিপি টিপি করে গিয়ে পলাকে তার বুকে তুলে নিলে। পলার কান্না বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সিপ্রা তার বুকের ভিতর যেন একটা আলোড়ন উপলব্ধি করল সেখানে যেন বহুদিনের সঞ্চিত কান্নার বাঁধ ভেঙে গিয়েছে।

ফুলের মতো কেমন সুন্দর সুকুমার শিশু গভীর তৃপ্তিতে সিপ্রার সমস্ত দেহ মন ছাইয়ে গেল। বিজন ওপরে এসে এ দৃশ্য দেখে দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল! একি! চির অনাদৃত শিশু পলা তার মায়ের কোলে দরজা থেকে বিজন ডাকলে—

—সিপ্রা!

সিপ্রা পলাকে বুকের আরো কাছে টেনে নিলে। শিশু মায়ের বুকে মুখ লুকালো যেন কুঁড়ির ভিতর ফুলের পাঁপড়ি লুকানো।

'বাঙালী'র বিয়ে—
চারি চক্ষের মিলন লক্ষ্য—
ধীরাজ আর মীরা

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা
প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা
গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪
সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৪ঠা ভাদ্র ১৩৪৩—20th. August, 1936. } ৩৪শ সংখ্যা

মিলন

বাঙ্গলার কংগ্রেস-পরিস্থিতি নাটকীয় দ্রুততার সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—শেষ মুহূর্ত্তে দুইদলের মধ্যে বিরোধের অবসানে বহুবাঞ্ছিত মিলন ঘটিয়াছে। এই মিলন অক্ষয় হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপ হইতে যে মিলনসূত্র পাঠাইয়াছিলেন—অর্থাৎ সমসংখ্যক উভয় দলকে লইয়া একটি মিলিত-দল গঠন—সেই সূত্র হইতেই যে মিলন-রাখী রচিত হইল, ইহাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইহা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি বাঙ্গলার কংগ্রেস-কর্ম্মীদের অখণ্ড বিশ্বাসই সূচিত করে; আর শুধু সুভাষচন্দ্র বসু কেন—বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিই ইহা তাঁহাদের সশ্রদ্ধ বিশ্বাসের জ্ঞাপক। কারণ, এই মিলন সম্ভব হইয়াছে প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত শরৎ বসু মহাশয়ের একনিষ্ঠ মিলনকামী চেষ্টার ফলে এবং বাঙ্গলার কংগ্রেস তাঁহার এই একনিষ্ঠ চেষ্টা ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা দান করিয়াছেন তাঁহাকে সর্ব্ববাদীসম্মতি-ক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া।

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু অস্থায়ী সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় সম্পাদক—বি, পি, সি, সির কার্য্য-পরিচালকমণ্ডলী ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠুতরভাবে গঠিত হইতে পারিত না। শরৎবাবুর মত ত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী, আন্তরিক স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতা বর্ত্তমান বাঙ্গলায় বিরল। আশা করি তিনি এখন হইতে একান্ত-মনে মুহ্যমান বাঙ্গলাকে কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার ব্রতে আত্মনিয়োগ করিবেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সমস্যাকে কেন্দ্রীয় সমস্যা করিয়া যে এই মিলন-সৌধ রচিত হইয়াছে ইহাতে আমরা আনন্দিত এবং ওয়ার্কিং কমিটী তথা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীকে সাম্প্র-দায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন ও পূর্ব্ব প্রস্তাব নাকচ করিতে অনুরোধ করিয়া এবং নাকচ না করিলে বি, পি, সি, সির নির্দ্দেশই চরম ও সর্ব্বথা পালনীয় বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী যে সাহসিক স্পষ্ট-বাদিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু বর্ত্তমান বি পি সি সিতে ডাঃ রায়ের দলই প্রবল। ওয়ার্কিং কমিটী ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নাকচ করিতে সম্মত না হন তাহা হইলেও কি তাঁহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বিরুদ্ধে বি, পি, সি, সির সিদ্ধান্ত পালন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন? ইহাই হইবে এই মিলন-সৌধের ভিত্তির দৃঢ়তার পরীক্ষা। আমরা একান্তমনে আশা করি বি, পি, সি, সি এই চরম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবেন।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সরকার

ভারতীয় দলের কৃতিত্ব

অলিম্পিক হকি ফাইন্যালে ভারতীয় দল জার্ম্মাণীকে ৮—১ গোলে হারিয়ে তৃতীয়বার 'চাম্পিয়নশিপ' লাভ করেছে। আমরা ভেবেছিলাম যে জার্ম্মান দলের সঙ্গে এদের খুব বেশী রকম প্রতিযোগিতা হ'বে। কিন্তু খেলার ফল্ দেখে মনে হ'ল যে প্রতিযোগিতা ত' দূরের কথা নেহাৎ ছেলে খেলাই হয়েছে।

এই খেলার ভেতর সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে খেলায়—সুপরিচালনার অভাব। ভারতীয় দলের ২টী গোল তিনি অযথা অগ্রাহ্য করেন। তাছাড়া অফ্ সাইড থেকেই জার্ম্মানী দলের ওয়েস গোল করে। অলিম্পিক খেলায় ভারতীয় দলকে কোন দল একটাও গোল দিতে পারেনি। সেজন্যেই বোধহয় পরিচালক ১টী গোল অন্যায় ভাবে দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রদের মান বাঁচিয়ে রাখলেন। অলিম্পিকেও এত সঙ্কীর্ণতা—লজ্জার বিষয়।

ভারতীয় দলের ৮টী গোলের ভেতর ধ্যানচাঁদ ৪টী, দারা ২টী, জাফর ১টী ও ট্যাপসেল ১টী গোল দেন। ধ্যানচাঁদ ও দারার সহোযোগিতা, জাফর ও রূপসিং এর দ্রুতগতি, ট্যাপসেল ও এলেনের ধীর ও স্থির ভাবে আত্মরক্ষাই ভারতীয় দলকে জয়ী করেছে।

ভারতীয় দলের পূর্ব্ব ফলাফল:—

১ম রাউণ্ড ভারতীয় দল-হাঙ্গেরী			৪—০
২য়	„	„ -আমেরিকা	৭—০
তৃয়	„	„ -জাপান	৯—০
সেমিফাইন্যাল	„	-ফ্রান্স	১০—০

একজিবিশন্ খেলা

গত শুক্রবার মোহনবাগান মাঠে রামকৃষ্ণ শত বার্ষিকি উৎসবের সাহায্যের জন্য মোহনবাগান দল ও মহাম্যাডান দলের একটী ম্যাচ্ হয়েছিল। এই খেলায় মোহনবাগান দল ২—০ গোলে জিতেছে। নন্দ রায়চৌধুরী ও হাবুল ভট্টাচার্য্য দলের ছুটী প্রয়োজনীয় গোল দেন। হাবুল যদিও এবার কাষ্টমস্ এর হয়েই ফুটবল খেলেছেন। কিন্তু এই খেলায় তিনি তাঁর নিজের টীমের হয়েই খেলেন। মহামেডান দলের ফুলটীম খেলেনি।

খেলায় ভীড় খুবই কম হয়েছিল। সেজন্যে টিকিট বিক্রি বেশী হয়নি।

ভবানীপুর কাব

দ্বিতীয় ডিভিসনের লীগ বিজয়ী ভবানীপুর দল এবার সিমলায় 'ডুরাণ্ড' প্রতিযোগিতায় খেলতে যাচ্ছে।

মহামেডান স্পোর্টিং

গত সোমবার মহামেডান দল 'রোভার্স' খেলবার জন্য বোম্বাই যাত্রা করেছে।

কুচবিহার কাপ

গেল বছরের মত এবারও কুচবিহার কাপের ফাইনাল খেলায় একই ফল হয়েছে। মোহনবাগান এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবছর এই কাপের ফাইনালে খেলে এবং মোহনবাগান এক গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়ে কুচবিহার কাপ বিজয়ী হয়েছে।

গ্রিফিথ শিল্ড

এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় মোহনবাগান ২—১ গোলে কোলকাতার গোরাদল এ্যাটাচড্ সেক্সনকে হারিয়ে গ্রিফিথ শিল্ড বিজয়ী হয়েছে।

লেডী হার্ডিঞ্জ শিল্ড

লেডী হার্ডিঞ্জ শিল্ড খেলার ফাইনালে ২-০ গোলে ইষ্ট বেঙ্গলকে হারিয়ে মোহনবাগান গেল বছরের মত এবারও ঐ শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। বিজয়ী পক্ষে কার্ত্তিদেব এবং দলের ক্যাপ্টেন সতু চৌধুরী গোল দেন। সতু চৌধুরী যে গোল দিয়েছিলেন তা সত্যি দেখবার মত ভারী সুন্দর হয়েছিল।

ট্রেড্স কাপ

রেঞ্জার্স ক্লাব মেসারার্স দলকে দু গোলে হারিয়ে এবার ট্রেডস্ কাপ পেয়েছে। প্রয়োজনীয় গোল দু'টী আর্ল দেন। খেলার শেষে সন্তোষের মহারাজা পুরস্কার বিতরণ করেন।

রাজা শিল্ড

এবারকার শীল্ড বিজয়ী মহামেডান দল ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাবকে ফাইনালে ১ গোলে পরাজিত করে রাজা শিল্ড পেয়েছে।

বার্লিন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

বার্লিন অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতা যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই বিভিন্ন রাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হ'চ্ছেন। আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলেট ওয়েন্স (যার কথা আমরা আগের সংখ্যায় বলেছিলাম) তিন তিনটি প্রতিযোগিতায় নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন দেশের কোন এ্যাথলেটই এরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তিনি যে তিনটি রেকর্ড স্থাপন করেছেন তা নিচে দেওয়া হ'ল:—

লং জাম্প—৮·০৬ মিটার (২৫ফুট ১০·২৫ই)

২০০ মিটার দৌড়—২০·৭ সেকেণ্ড

১০০ মিটার দৌড়—১০·১ „

...নচাদ · জাফর · রূপসিং · ট্যাপসেল · এলেন

...মেয়েদের প্রতিযোগিতায় খুবই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। জার্মানীর মেয়েরা যেভাবে ...কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন তাতে মনে হয় তাঁরাই বোধ হয় মহিলা প্রতিযোগিতায় টীম প্রাইজ পাবেন। নিম্নে কয়েকটি result দেওয়া হ'ল।

মহিলাদের ডিসকাস ছোঁড়া

মা...নারমেয়ার (জার্মানী) ৪৭·৬৩ মিটার (নূতন রেকর্ড)

৮০০ মিটার দৌড়

উডরফ (আমেরিকা) ১মিঃ ৫২·৯ ১০ সেঃ।

মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়

হেলেন ষ্টিফেন্স (আমেরিকা) সময় ১১·... সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)

পোলভল্ট

মেডোস (আমেরিকা) ৪·৩৫ মিটার (নূতন রেকর্ড)

৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ

...টনক (গ্রেটব্রিটেন) ৪ঘণ্টা ৩০মিঃ ৪১·... (নূতন রেকর্ড)

১৫০০ মিটার দৌড়

লাভ...ক (নিউজিল্যাণ্ড) সময় ৩মিঃ ৪৭·৮ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)

৪০০ মিটার দৌড়

উইলিয়ামস্ (আমেরিকা) ৪৬·৫ সেকেণ্ড

৫০০০ মিটার দৌড়

হোকার্ট (ফিন্ল্যাণ্ড) ১৪মিঃ ২২ ২ ১০ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)

ম্যারাথন দৌড়

কিটীসন্ (জাপান) ২-২৯—১৯·২ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)

মেয়েদের হাইজাম্প

জাক্ (হাঙ্গারী) ১·৬০ মিটার

৪০০ মিটার রিলে দৌড় (মেয়েদের)

আমেরিকা—৪৬·৯ সেকেণ্ড

৪৪০ মিটার রিলে দৌড়

আমেরিকা—৩৯·৮ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)

১৬০০ মিটার রিলে দৌড়

ব্রিটীশ ৩ মিঃ ৯ সেকেণ্ড

ভারোত্তলন (ফেদার ওয়েট)

টেরল (আমেরিকা) ৩১২·৫ কিলোগ্রাম

ভারোত্তলন (লাইট ওয়েট)

মেসবাহ (মিশর) ৩৪২·৫ কিলোগ্রাম

১১০ মিটার হার্ডল

টাউনস্ (আমেরিকা)

৪০০ মিটার হার্ডল

হার্ডিন (আমেরিকা)

দশ হাজার মিটার দৌড়

স্থালমিনেন (ফিন্ল্যাণ্ড) ৩০ মিঃ ১৫·৪ সেঃ

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

১০০ মিটার 'ব্যাক ষ্ট্রোক'

কিফার (আমেরিকা) ১ মিঃ ৫ ৯।১০ সেঃ (নূতন রেকর্ড)

২০০ মিটার 'ব্রেষ্টষ্ট্রোক'

হেহাটা (জাপান) ৩ মিঃ ১৯।১০ সেকেণ্ড (নূতন রেকর্ড)

১০০ মিটার 'ফ্রি ষ্টাইল'

জিক্ (হাঙ্গারী) ৫৭—৬ সেকেণ্ড

৪০০ মিটার 'ফ্রি ষ্টাইল'

মেডিকা (আমেরিকা) ৪ মিঃ ৪৪॥০ সেঃ (নূতন রেকর্ড)

৮০০ মিটার রিলে

জাপান ৮ মিঃ ৫১ ১/২ সেঃ (নূতন রেকর্ড)

মহিলাদের ১০০ মিটার 'ফ্রি ষ্টাইল'

ম্যাষ্টেন ব্রয়েক ১ মিঃ ৫·৯ সেঃ (নূতন রেকর্ড)

মহিলাদের ৩০০ মিটার 'ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক'

ফ্যাক্ হাটা (জাপানি) ৩ মিঃ ৩.১/১৬ সেঃ

মহিলাদের ১০০ মিটার 'ব্যাক্ ষ্ট্রোক'

ফ্রেন লিস্মেক (হল্যাণ্ড) ১ মিঃ ১৮·৯ সেঃ

মহিলাদের ডাইভিং

ফেস্ টিং (আমেরিকা)

ওয়াটার পোলো

প্রথম রাউণ্ড

হাঙ্গারী—মাল্টা	১২—০
আমেরিকা—উরুগুয়ে	২—১

শুভ বিবাহ

গত ২২শে শ্রাবণ আমাদের বন্ধুবর শ্রীসুধাংশু-বিকাশ রায় চৌধুরীর সহিত শ্রীমতী বিনীতা গুহের শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত পূর্ব্ব রবিবার সুধাংশুবাবুর বাটীতে একটী প্রীতিভোজেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেখানে বহু বিশিষ্টব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সুধাংশুবাবুর বিবাহে তাঁহার বন্ধুদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপক—"বাতায়ন—বন্ধুদের মর্ম্মবাণী" নামে—একটি পুস্তিকা পাইয়াছি। ইহার মুখপত্রে আছে বাতায়ন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের মর্ম্মবাণী—"বিয়ের বাইরে যে মেয়েকে পাওয়া যায় তাকে নিয়ে সংসার পাতা যায় না।" অবিনাশবাবু যেরূপ নিপুণতার সহিত এই 'মর্ম্মবাণী'কে ফুটাইয়াছেন তাহাতে মনে হয় ইহা তাঁহার মর্ম্মের কথা অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অবশ্য বন্ধুদের জানানো ভাল, কিন্তু এইরূপ অভিজ্ঞতা জানাইবার স্থান ও কাল কি বিবাহের আসর? নিজের 'মর্ম্মবাণীর' প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে তিনি লিখিয়াছেন :—

"......আমার বহুদিনের পাওয়া স্ত্রী আমার বহু দুর্ভোগের সম্ভাবনাকে ঘটাবার অবকাশ দেননি, অথচ এ দুর্ভোগের যে কোনো একটাই আমার সমস্ত সত্তাকে পাঁকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারত।" পাঁকের সঙ্গে মিশিবার সম্ভাবনা তাঁহার যেমন হইয়াছিল তেমনি সকলেরই হইবে এ অনুমান ঠিক বন্ধুপ্রীতির লক্ষণ বলিয়া মনে করি না। পরিশেষে তিনি লিখিতেছেন—

"এ কথাটা কখন আমার ভুলোনা, যে মেয়ে ধরা দেবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, তার সবটাই কাঁচারং,—একটু জল লাগসেই উঠে যায়।" এইরূপ উক্তি কোন্ শ্রেণীর রুচির পরিচয় দান করে তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন।

* * *

গত ২৬শে শ্রাবণ, রূপবাণী ও রাধা ফিল্মের প্রচার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীর শুভ বিবাহ বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য গুপ্তের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শেফালিকার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহোপলক্ষে গত শুক্রবার শ্রীযুক্ত নিয়োগীর বাসভবন ৭৮নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীটে এক প্রীতি-ভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগ দিয়াছিলেন।

ফ্রান্স—জাপান	৮—০
অষ্ট্রিয়া—সুইজারল্যাণ্ড	৯—০
জার্ম্মাণী—জেকোশ্লোভিয়া	৩—১
ব্রিটীশ—যুগোশ্লেভিয়া	৪—৩
সুইডেন—আইসল্যাণ্ড	১১—০

দ্বিতীয় রাউণ্ড

বেলজিয়াম—ব্রিটীশ	৩—১
হাঙ্গারী—হল্যাণ্ড	৮—০
ফ্রান্স—অষ্ট্রিয়া	৪—২
জার্ম্মানী—সুইডেন	৪—১

ফুটবল প্রতিযোগিতা

অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার ইতালি দল অষ্ট্রিয়া কে অতিরিক্ত সময়ে ২—১ গোলে হারিয়ে 'চ্যাম্পিয়ানশিপ' লাভ করেছেন। ইতালি যে জয়ী হ'বে তা আমরা আগেই বলেছিলাম।

এসপ্ল্যানেড ইনষ্টিটিউট

গত রবিবার ১৫ই আগষ্ট অপরাহ্ন ২॥০ ঘটিকায় ৩ নং এসপ্ল্যানেড ইষ্ট ভবনে ফ্যাক্টরী একাউণ্টস আফিসের সুযোগ্য ডেপুটী কণ্ট্রোলার মিঃ মহম্মদ সোয়াবের সভাপতিত্বে ইনষ্টিটিউটের দশম বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সম্পাদক যতীশ বাবুর যথারীতি বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি—মিঃ মহম্মদ সোয়াব, এম এ, এল এল বি, এ, সি, ডবলিউ, এ (লণ্ডন)।

সহসভাপতি—মিঃ এ পি ব্যানার্জ্জী বি এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীশ বসু বি এ।

সহসম্পাদক—শ্রীযুক্ত সিতাংশু মিত্র এম এ।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত নীলকান্ত চ্যাটার্জ্জী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, শ্রীযুক্ত ফটিক চন্দ্র ঘোষ।

ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদে শ্রীযুক্ত যতীশ বাবুর ও শ্রীযুক্ত সিতাংশু বাবুর সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপর্য্যুপরি সাতবার নির্ব্বাচন তাঁদের জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের যোগ্যতার কথা আমরা বিশেষভাবে জানি। এসপ্ল্যানেড ইনষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ তাঁহাদিগকে উপর্য্যুপরি নির্ব্বাচিত করিয়া যে কেবল গুণীর প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে নিজেদেরও গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

সন্ধ্যায় সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক ৺অমৃতলালের
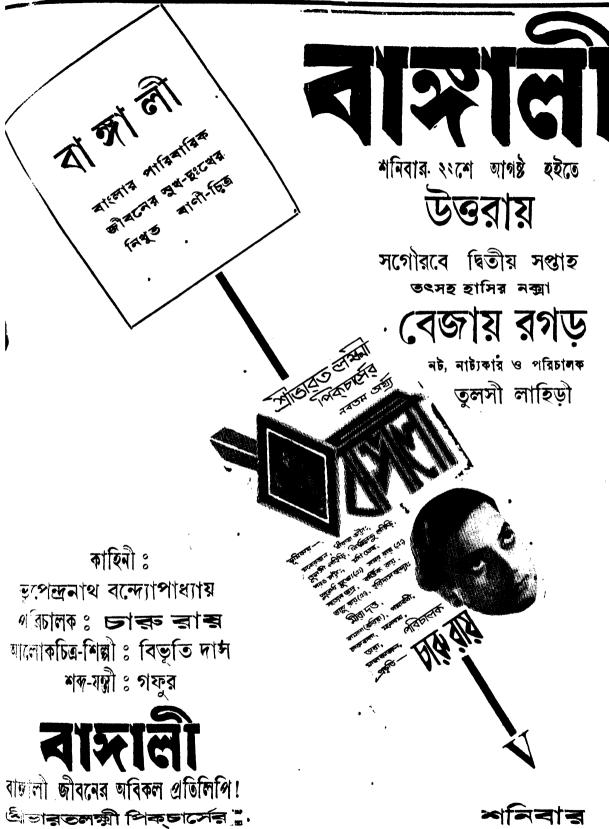
শনিবার
২২শে আগষ্ট হইতে দ্বিতীয় সপ্তাহ

"কলসী উৎসর্গ" অভিনীত হয়। অভিনয় সভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় সত্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। "মধু খুড়োর" অংশে আশুবাবু যেরূপ নিখুঁতভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা অনেক প্রথিতযশা আর্টিষ্টের পক্ষেও প্রশংসাজনক। "হাবার" অংশে শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য্যের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, "হলধর হালদারের" পার্টও চমৎকার ফুটাইয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ফটিক বাবু, সচ্চিদানন্দ বাবু, সুধীর বাবু এবং শিব বাবুও নিজ নিজ অংশে যোগ্যতার পরিচয় প্রদান কর্ত্তে পেরেছিলেন। আর সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত মণি বর্দ্ধণের শিবের তাণ্ডব ও ইন্দ্রনৃত্য। ইনষ্টিটিউটের অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মণি বাবু স্বেচ্ছায় তাঁহার ষ্টাফের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিয়া রূপে রসে নৃত্যে ঝঙ্কারে ইহাকে পূর্ণকমন্দির করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরিশেষে জলযোগের পর সভার কার্য্য শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে সফল করিবার সকল কৃতিত্ব সম্পাদক যতীশ বাবুর। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক-সংবাদ

গত ১২ই আগষ্ট সকাল ১১টার সময় বেলিয়াটির জমিদার রায় বাহাদুর হরেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী তাঁহার নব-নির্ম্মিত ১০৬/২, গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রামের বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও অনেক প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ১৯২৩-২৪ সালে সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক ইনি রায় বাহাদুর উপাধিলাভে সম্মানিত হন। ইনি হাটখোলার একজন পুরাতন বাসিন্দা ছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি একমাত্র ৬৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী ও বহু পৌত্র পৌত্রী ও আত্মীয়স্বজনকে রাখিয়া যান। নিমতলা শ্মশানঘাটে ইঁহার শবদেহের সহিত বহু বিশিষ্ট নাগরিক অনুসরণ করেন। আমরা ইঁহার আত্মীয়স্বজনকে এই দারুণ দুঃসময়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

রায় বাহাদুর হরেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সুবো। প্রার্থনা কর্ব্বেন, তাই যেন আসে। কিন্তু সে-টা যতদিন না আসে, আমাকেও একবার আমার এটর্ণী-বাপ—আত্মীয়বন্ধু স্বজন—আমার social position—যাদের যাদের সঙ্গে সংসারে দেনা-পাওনা কোর্ত্তে হয়—তাদের সঙ্গে একটা হিসেব-নিকেশ কোর্ত্তে হবে। আপনি আপনার দিকের কথা ভেবেচেন—আমাকেও আমার দিক্‌টা ভাবতে দিন। কিন্তু এও বোলে রাখচি—ইতিমধ্যে—আপনিও আর একবার ভেবে রাখবেন, যদিই গ্রহের ফেরে আপনাকে আমার পত্নীত্ব স্বীকার কোর্ত্তে হয়, তাহোলে তখন আপনার তরল মনের গতি আবার বদ্‌লাতে পারে কি না?

ভার। Mr. Chatterjee, বোলেছি ত, আমার বলবার আর কিছুই নেই।

সুবো। বেশ, আমার উত্তর পরে পাবেন—[প্রস্থানোদ্যত]

ভার। নমস্কার।

সুবো। ওঃ! নমস্কার। [সুবোধ চলিয়া গেলেন]

[ভারতী অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিশ্বম্ভরের বসতবাটীর অভ্যন্তর—কালিন্দী একা দাওয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া গাহিতেছিলেন]

"ননদিনি বোল্ গে যা তুই নগরে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক-সাগরে!
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল,
ব্রজকুল সব হোক্ প্রতিকুল,
আমি যে স'পেছি গো কুল অকুলকাণ্ডারীর করে!

কাজ কি বাস্, কাজ কি বসে,
কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সে থাকে যার হৃদয়বাসে, সে কি বাসে বাস করে?

কালি। প্রেম যে কি বস্তু, ওই মেয়েটিই তা জেনেছিল! আর আমি? এক সন্নিসী বোলেছিল—"বাছা, এক ক্ষুদ্র মানুষ-স্বামীকে নিয়ে দিন কাটালি, যদি জগৎ-স্বামী কৃষ্ণকে ভ'জতিস, তাহোলে তোর সকল জ্বালা ঘুচে যেতো!" একে সন্নিসী, মেয়েমানুষ নয়, মেয়েমানুষের স্বামীর মর্ম্ম কি বুঝবে? জগতের লোকের যিনি স্বামী, তাঁকে নিয়ে জগৎশুদ্ধ লোকের সতীনগিরির জ্বালা আমার সহ্য হবে না। পুরুষ মানুষ জগৎ-স্বামীকে ভালবাসুক—মেয়ে মানুষ তা পার্ব্বে কেন? আমার স্বামী, কেবল আমার—আর কারুর নয়—আমি তাঁকে নিয়েই ডুবে আছি। অনেক দিন হোয়ে গেল, তাঁকে চোখে দেখতে পাই নি। তিনি আমার ভেতরেই রোয়েচেন—তবুও একবার চোখের দেখা দেখতে সাধ হয়।

"তুমি অন্তরে আছ, বাহিরে এস গো,
রূপের পসরা নিয়ে,
দোঁহে হেরিব দোঁহারে হৃদয় দুয়ারে,
চারি চোখে চেয়ে চেয়ে।
রূপ দেখে মোর বুক ভরেনি, চোখে যে পলক ছিল
আর নিদারুণ বিধি মোরে দুঃখ দিতে লজ্জা যে নিরমিল—
এবার পিয়াসা মিটাবো, তোমারে হেরিব, লজ্জার মাথা খেয়ে,
তুমি নয়নের মণি, নয়নে রাখিব, আঁখির কপাট দিয়ে।"

[গোপালের প্রবেশ]

গোপা। এই যে তুমি আবার বেশ গাইতে পারো দেখচি। তবে আর ভাবনা কি—রাজা ভরতের মুখে দুখানা গান জুড়ে দিলেই পালা জ'মে যাবে! আচ্ছা, তুমি আমায় একটা সৎযুক্তি দাও দেখি? ক'দিন ধোরে ভাবছি—ঠিক্ কোর্ত্তে পাচ্ছি নে—ভেবে ভেবে রাত্তিরে ঘুম হয় না। কোন্‌টা হোই বলো দেখি—বেশ ভাল কোরে acting কোরে "লব্ধ প্রতিষ্ঠ অভিনেতা" হোই, না, বায়স্কোপের Director হোয়ে সবাক্ ছবি Produce কোরে সকলকে অবাক্ কোরে দিই? ও হরি, তুমি আমার কথাই শুনচো না—তা বোলবে কি? আচ্ছা, তুমি কি শুনতে ভালোবাসো? খালি প্রেম! তা আমি এখন এত প্রেম পাই কোথা বলো? নাটক কোরে কোরে, যা একটু শিখিচি! আচ্ছা, তোমাকে আমার "মা" বোলে ডাক্‌তে ইচ্ছে করে না কেন, বলো দেখি? বামুন

বৃদ্ধের ছেলেখেলা

বার্দ্ধক্যকে আমাদের শাস্ত্র দ্বিতীয় শৈশব বলিয়াছে। কথাটা যে মিথ্যা নয় তাহা শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর কীর্ত্তি-কলাপ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। রাজনীতি ক্ষেত্রে মতভেদ, ভুলভ্রান্তি, গোলযোগ ঘটিয়াই থাকে কিন্তু তাহা সংশোধনের শক্তি হারাইয়া প্রতিপদেই যদি পরাজিত শিশুর মত "আড়ি" দেওয়া হয় তাহা হইলে ব্যাপারটা কি হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায় না?

আচারী মহাশয় অবশ্য একজন প্রবীণ ও প্রাচীন কংগ্রেস সেবী। তদুপরি তিনি মহাত্মা গান্ধীর বৈবাহিক। অতএব তাঁহার পদত্যাগ পত্রের হুমকীতে কংগ্রেস-জগতে সাড়া পড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাপারটা যেন Sublime হইতে Ridiculousএ পৌছাইতেছে।

শ্রীযুক্ত রাজনও পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। ব্যাপারটা এখনও তদন্ত ও বিবেচনাসাপেক্ষ। সেজন্য এ সম্বন্ধে আমাদের সুবিবেচিত মন্তব্য আমরা পরে জানাইব।

ঠাকুরুণকে "মা" বোলে ডাকি, প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়। তোমায় কিন্তু তা নয়। তোমার চেহারায় "মা" নেই বাপু, তা যাই বলো!

কালি। থাকবে কোথা থেকে? আমার স্বামী, আমায় ত "মা" হবার অধিকার দেন্ নি? আমি যে রাধা! রাধাকে কেউ কি "মা রাধা" বোলে ডাকে?

গোপা। তবেই ত তোমার কাছে থাকা মুস্কিল হোলো দেখচি।

কালি। মুস্কিল কিসের? আমার কাছে থাকতে সাধ হয় যদি, আমাকে রাধা ভাবেই ভজ না? কত বোষ্টমে যে "রাধারাণী" বোলে পাগল হয়—সে ত আর মন্দ নয়?

গোপা। আমি ত আর বোষ্টম নই—আমি যে গোপাল চৌধুরী।

কালি। ঐ নাম আমার স্বামীরও ছিল! দিদি যখন তোকে ঐ নাম ধোরে ডাকে, শুনতে এমন ভাল লাগে!

গোপা। ও বাবা, তাহোলে যে আরও মুস্কিলে ফেল্লে! না বাবা, এখানে থিয়েটার বায়স্কোপ নেই—কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছিল—ও কথা শুনে আজই পথ দেখতে হোচ্চে!

[জাহ্নবীর প্রবেশ]

জাহ্ন। গোপাল, এখানে আছিস্?

গোপা। না বাপু, একদিকে রাধা, আর একদিকে যশোদা—এই টানায় পোড়ে শেষকালে "ব্রজের গোপাল" হোয়ে উঠলুম দেখচি!

জাহ্ন। রাধা—যশোদা, কি বোলচিস্ রে গোপাল?

গোপা। এই ইনিই বোলচেন—উনি নাকি রাধা! আর তুমি ত সাক্ষাৎ যশোদা-ময়ী—পরের ছেলের ঝক্কি লয়ে-লয়েই গেলে—

[সুরে] "আকুল বেণী, ধাইল রাণী,
ঘন শ্বাস বহে তাহে।
ননী লয়ে করে, স্তনে ক্ষীর ঝ'রে
অনিমিখ পথ চাহে॥"

হ্যাঁ হ্যাঁ—"হারানিধি" থেকে একবারে parallel passage!

জাহ্ন। হারানিধি—হারানিধি! পথ চেয়ে চেয়ে ত আমারও দিন যাচ্ছে! আমার "হারানিধি" কি ফিরবে না? আজ তার জন্মতিথি পুজো। পুজোর যোগাড় ত সব কোরে দিয়ে এলাম। তিনি পুজোয় বোস্লেন—এখনই পুজোয় মগ্ন হোয়ে গিয়ে সব জ্বালা ভুলে যাবেন! অন্যবার তাকে কোলের কাছটিতে নিয়ে পুজোর কাছে বোসে থাকতাম। বাইশ বছরের মধ্যে একটিবারও বাদ পড়েনি। এই-ই প্রথম বাদ পড়লো। আজ ত আর পুজোর কাছে বোসে থাকতে পাল্লাম না। গোপাল আয়, আজ তুই-ই আমার কাছে বোস্!

কালি। "গোপাল"—ঐ যা, নাম করে ফেল্লুম! তা ও ছোঁড়া কাছে বোস্লে কি আর তোমার বুক ভ'রবে? তোমার যে রাক্কুসে ক্ষিধে!

জাহ্ন। আর তোমার বুঝি ভাই ব্রহ্মার মন্দাগ্নি?

কালি। না ভাই, আমার ক্ষিধে-তেষ্টা সব মরে গ্যাছে।

জাহ্ন। মিছে কথা। দেহ থাকতে কি ক্ষিধে মরে?

কালি। তোমার ত মরেছে?

জাহ্ন। মরে নি—ঘুম পাড়িয়ে রেখেচি।

কালি। এমন ঘুম-পাড়ানি ওষুধ পেলে কোথা, দিদি?

জাহ্ন। তুইও যেখান থেকে পেয়েছিস্ আমিও সেইখান থেকে—স্বামীর কাছে।

গোপা। নাবাপু, তোমাদের দুই সতীনের ঝগড়ায় আমার প্রাণটা কিন্তু হাঁপিয়ে উঠচে! হেঁয়ালী ছাড়ো—কথা ধরো।

জাহ্ন। হ্যাঁ রে গোপাল, তোকে পেয়েও বুকে জোর পাচ্ছি নে কেন বোলতে পারিস্?

গোপা। আমি যে তোমার "সাজা গোপাল", মা,—সত্যি গোপাল হোলে, পেতে।

কালি। ছোঁড়া থিয়েটার কোরে কথা শিখেচে খুব।

জাহ্ন। সত্যি বাবা, তোর কথাগুলি ভারি মিষ্টি। ভাগ্যি এসেছিলি।

গোপা। থিয়েটার ত কোচ্ছোনা—এসে আর কি কোচ্চি বলো?

জাহ্ন। এই যে ভুলিয়ে রেখেচিস্। কিন্তু আজ যে আর কিছুতেই চেপে রাখতে পাচ্ছি নে। ফি বছর এমন দিনে সে যে সারাদিন আমার কাছে কাছে ঘুরতো; পায়েস রেঁধে আমি যে নিজের হাতে তাকে খাইয়ে দিতুম। তার লজ্জা কোর্ত্তো—বলতো "বুড়ো ধাড়ী হোলুম্—এখনো খাইয়ে দেওয়া কেন?" আমি বলতুম্—"ওরে, ছেলে কি কখনো মায়ের কাছে বুড়ো-ধাড়ী হয়—তোকে যে আজও আমি এক বছরের সেই শিশু বোলেই জানি!" আজ কেমন করে সে এইসব ভুলে রয়েছে? আমার মতন তারও মন কি সত্যিই এমনি ছট্‌ফট্ কোচ্ছে না? কচ্চে বৈ কি—সে যে আমা বৈ আর জানে না!

কালি। জানে গো জানে—খুব জানে! যে বয়েসের যা,—তাকে রাধায় পেয়েছে!

গোপা। ঐ গো, আবার রাধা!

জাহ্ন। তা হোক্—তবুও সে আমার কাছে আসবার জন্যে ছট্‌ফট্ কচ্চে। আমি যে বুঝতে পাচ্চি।

গোপা। ছট্‌ফট্ কর্ত্তেই হবে মা ঠাকরুণ। যশোদাময়ীর ক্ষীরসর-নবনীর লোভও কম নয়, রাইকিশোরীর পায়ে ধরার লোভও কম নয়। আমার কাছে বাবা, ও দুইই এক—আমি দুধও খেতে ভালবাসি, তামাকও খেতে ভালবাসি—'সরলার' গদাধর চন্দ্র যা বলেছিল। তবে উনি যা বোল্লেন—"যে বয়সের যা," আমাদের মত বয়েসে—রাধার নামটাই কাণে মিষ্টি লাগে!

[সুরে ও ভঙ্গী সহকারে]
"রাধা বই আর নাইকো আমার
রাধা বোলে বাজাই বাঁশী
মনের সাধে সঙ্গে যোগী
মেখেছি গায় ভস্মরাশি।
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে
রাধা নামটি বেড়াই সেধে
যে মুখে বলে রাধা, তারে বড় ভালবাসি।"

[হাতে তাল দিয়া] আহা—হা—হাঃ। বেঁচে থাক্ "চৈতন্যলীলা"—রাধানাম এবার গুলে খাবো!

বিশ্ব। [নেপথ্য হইতে] বিশ্বেশ্বর—বিশ্বেশ্বর—

[সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন]

জাহ্ন। এ কি? বিশুকে ডাকচেন্ যে?

[আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য হাতে লইয়া বিশ্বম্ভরের প্রবেশ]

বিশ্ব। বিশ্বেশ্বর— বিশু— !

জাহ্ন। [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কাছে গিয়া] তুমি কি জ্ঞান হারালে?

বিশ্ব। জ্ঞান হারাবো কেন? আজ যে তার জন্মতিথি—তাকে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো না?

জাহ্ন। আশীর্ব্বাদ কর্ব্বে বৈ কি। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করো।

বিশ্ব। মনে মনে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো? তুমি কি ভুলে গেলে—এই প্রসাদী অর্ঘ্য তার কপালে ছুঁইয়ে দোবো না? সে যে এই আমার কাছে ছিল, কোথায় গেল? দেখলুম—বড্ড রোগা হোয়ে গেছে—ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিলো—

[জাহ্নবী আর সামলাইতে পারিলেন না—অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

বিশ্ব। ওঃ! সে এখানে নেই, না? আনতে গিয়েছিলাম—আসে নি, না? কিন্তু এই যে—না, তুমি কাঁদচো—তাই বা কেমন কোরে হবে? ভ্রম, ভ্রম—আমারই ভ্রম—

[চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া]

কিন্তু এই—মন্ত্রঃপূত আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য—এ'ত আমি ফেলতে পার্ব্বো না? ফেললে, তার অকল্যাণ হবে। তবে—তবে—? গোপাল, গোপাল, তুইই তার প্রতিনিধি—এগিয়ে আয়—

গোপা। দোহাই বাবাঠাকুর—আমি পার্ব্বোনা—আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌বে!

কালি। [উঠিয়া আসিয়া জাহ্নবীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া]

ও অর্ঘ্য এঁকেই দাও—এরই ভেতর সে বেঁচে আছে!

বিশ্ব। [একবার কালিন্দীর, একবার জাহ্নবীর মুখের দিকে চাহিয়া] তাই দিই, কেমন? এরই ভেতর সে এসে লুকিয়েচে!

জাহ্ন। গোপাল, আমার হাত ধর!

[গোপাল জাহ্নবীর হাত ধরিল]

[বিশ্বম্ভর জাহ্নবীর মাথায় অর্ঘ্য রাখিলেন]

—জাহ্নবী বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিলেন—

—গোপাল অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল—

জাহ্ন। গোপাল, প্রণাম কর বাবা।

গোপা। [অন্যমনস্কভাবে] কাকে প্রণাম কর্ব্বো?

বিশ্ব। কালিন্দীকে!

—গোপাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কালিন্দীকে প্রণাম করিল—কালিন্দী স্থির হইয়া রহিল—

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[বসুদেবের বাসাবাটী—বিশ্বেশ্বর ইজি চেয়ারে শুইয়াছিল—মাধব প্রবেশ করিল]

বিশ্বে। কে? মাধব?

মাধ। হ্যাঁ গো, খুড়োঠাকুর।

বিশ্বে। বসুদেব কোথায়?

মাধব। আপনি ঘুমুচ্চেন দেখে, কোথায় বেরিয়েচেন।

বিশ্বে। আমি ত ঘুমুই নি—জেগেই আছি। আচ্ছা মাধব, আমি কি ক'দিন ভারি অসুস্থ হোয়ে পড়েছিলাম?

মাধ। তা পড়েছিলেন বৈ কি।

বিশ্বে। তোমাদের ভারি জ্বালাতন করেচি, না?

মাধ। তা একটু কোরেচেন বৈ কি। এই অল্পবয়সে ওমন কুঁঠকীকণ্ঠী ঠেলে ভালবাসে! [কেবল অঘোরে "ভারুতি," "ভারুতি" কোরেচেন!

বিশ্বে। তাই ত, ভারি অন্যায় হোয়ে গ্যাচে।

মাধ। আমি বলি কি খুড়োঠাকুর—ওই খুড়ীঠাকরুণটীকে বিয়ে কোরে ফেলুন—নইলে এ যাত্রা রক্ষে পাওয়া দায় হবে—তা কিন্তু বাপু বোলে দিচ্চি!

বিশ্বে। ছিঃ, মাধব! ও কথা বোলতে নেই।

মাধ। বলি কি আর সাধে ঠাকুর—তোমাদের যে চাবার গোঁ নেই! বল্লে হয়ত বিশ্বেস কর্ব্বে না—এই মাধবদাসও একদিন ছেলেবেলায় "হারাণি," "হারাণি" কোরে এক ছুঁড়ির জন্যে খেপিয়েছিল! তা ছুঁড়ী কি না আমার চোখের সামনে স্বচ্ছন্দে আর একজনের গলায় মালা দিলে! সেইথেকে "দুত্তোর" বোলে আর বিয়েই কল্লুম্ না। তারপর অনেকদিন পরে এই বাবুর সঙ্গে দেখা—এখন জোড়া কাত্তিকে দিব্বি বাজা হোয়ে ঘরকন্না ক'চ্চ!

[বসুদেবের প্রবেশ]

বসু। কি খুড়ো, মেদোকে নিয়েই পালা আরম্ভ কোরে দিয়েচ নাকি?

মাধ। আচ্ছা বাবু, "মেদো" কি এতই ফ্যালনা? সে-দিন কেমন "খুকী-খুকী" কোরে অ্যাক্টো করেছিলুম!

বসু। খুড়ো, ব্যাটা একহাত নিলে হে! কিন্তু আমিও কেমন এই ঢ্যাঙ্গা চেহারায় "পূরবী রায়" সেজে খুড়োকে হকচকিয়ে দিয়েছিলাম তা বল্!

মাধ। আজ কালকার ছেলে, মেয়েমানুষ সাজবে তা আর বেশী কি বাবু? একখানা

শাড়ী জড়ালেই হোলো—আর ত সব মেয়েমানুষের মতন! এখন বরং ব্যাটাছেলে হোয়ে আমার মতন পুরুষ সাজাই শক্ত! নয় গো খুড়োঠাকুর?

বসু। আচ্ছা, তুই এখন যা দিকি—একছিলিম্ তামাক নিয়ে আয়।

মাধ। তা এক ছিলিম্ কেন, দশছিলিম্ আনচি—

[মাধবের প্রস্থান]

বিশে। বসু, সেদিন "পূরবী" সেজে এখানে টেনে নিয়ে এসে সত্যিই তুমি আমাকে রক্ষা করেছিলে—নইলে সে-দিন আমি সবই কোর্ত্তে পার্ত্তুম—আত্মহত্যাও অসম্ভব হোতো না।

বসু। খুড়ো, তুমি পাগল হয়েছিলে। একটা এককোঁটা খেলোয়াড় মেয়ের জন্তে আত্মহত্যা?

বিশে। খেলোয়াড় মেয়ে! তুমি কি বলছো বসু?

বসু। খেলোয়াড় নয়? তোমাকে নিয়ে একটু খেলা কল্লেন বৈ ত নয়? তাঁর বহুদিনের প্রণয়ী—যাঁর সঙ্গে তাঁর বহুদিনের প্রেমালাপ—তিনি কার্য্যগতিকে বহুদিন অনুপস্থিত—lecture attend কর্ত্তে পাচ্ছিলেন না। তুমি অতি উত্তম বালক—উভয়েরই অজ্ঞাতসারে proxy চোলছিলো—সে দিন কেবল যা একটু উভয়েই বে-এক্তার হোয়ে পড়েছিলে।

বিশে। বসু,—বসু, তিনি একজন ভদ্রমহিলা—তাঁর সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার ইঙ্গিত—আমি কিছুতেই সহ্য কোর্ত্তে পার্ব্বো না। তুমি আমাকে যা বোলতে চাও বলো; আমি অপরাধী কিন্তু তাঁর পক্ষে হয়ত সেটা তাঁর মুহূর্ত্তের ভুল—ভুলের ত মার্জ্জনা আছে?

বসু। ভুল? ভুল হোলে প্রতিবাদ কর্ত্তো না? নীরবে সহ্য কর্ত্তো? [মাধব গুড়গুড়ি রাখিয়া চলিয়া গেল]

বিশে। প্রতিবাদ,—না, প্রতিবাদ করেন নি বটে! না—না—হয়ত আমারই বোঝবার ভুল—

বসু। তুমি বুঝতে পাচ্চোনা বিশুকা—ও সব আজ কালকার হাওয়া। তোমার বাইরেটা নবীন বটে, কিন্তু ভেতরে তুমি একেবারে সেকেলে—হাজার হোক্ গোঁড়া বামুন পণ্ডিতের বংশ ত! ও সব ওঁদের কাছে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা—নিছক মৃগয়া!

বিশে। বসু, যে জাতির মধ্যে আমার "মা" রয়েছেন সেই স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে আমি কখনই সম্ভ্রমহারা—বিশ্বাস-হারা হোতে পার্ব্বো না। তুমি মিছে তর্ক কর্চ্ছো—আমি তাঁকে পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি—কিন্তু তাঁর প্রতি আমি কখনই শ্রদ্ধাহীন হোতে পার্ব্বো না। তুমি কেবল এইটুকু কেড়ে নিওনা—তা হোলে আমি বাঁচবো কেমন করে?

বসু। বেশ, যাতে বাঁচো, তাই করো। মায়ের কাছে ফিরে চলো।

বিশে। যাবো বৈ কি। এখন সেই মায়ের কোলই ত আমার পরম আশ্রয়। তিনি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্বেন—সকল গ্লানি মুছে দেবেন—তা জানি—কিন্তু আমাকেও ত তাঁর কোলে গিয়ে ওঠবার জন্তে প্রস্তুত হোয়ে যেতে হবে। আমারও ত প্রায়শ্চিত্ত চাই। হয়ত ভারতীদেবী আমায় ক্ষমা করেচেন কিন্তু যিনি তাঁর স্বা—মী হবেন সেই সুবোধবাবু—তাঁর কাছে আমাকে ক্ষমা ভিক্ষা কোর্ত্তেই হবে—নইলে আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না। তুমি বোলবে—আমি পাগল হোয়েচি—হয়ত তাই। তিনি আমাকে তিরস্কার কর্ব্বেন—তা করুন্—কিন্তু আমার অপরাধের বোঝা হাল্কা হবে।

বসু। তিনি তিরস্কারও কর্ব্বেন না, পুরস্কারও কর্ব্বেন না। শুধু ভাববেন—তুমি তাঁকে ঠাট্টা কোর্ত্তে এসেচ। আর তোমার ভারতীদেবী শুনলে মনে কর্ব্বেন, তুমি অতি হীন কাপুরুষ—যা সুবোধবাবু হয়ত কোনওদিন জানতে পার্ত্তেন না—তাই জানিয়ে দিতে গিয়েছ!

[মাধবের প্রবেশ]

মাধব। একটা বাবু আপনাদের খুঁজচেন নিয়ে আসবো?

বসু। বাবু? আচ্ছা এই খানেই পাঠিয়ে দে।

[মাধবের প্রস্থান]

বসু। বাবু কে হে?

[সুবোধের প্রবেশ]

সুবো। [বিশেশ্বরকে লক্ষ করিয়া] নমস্কার—মাষ্টার মশাই। বস্‌চি বস্‌চি—ব্যস্ত হবেন না। গিয়েছিলুম আপনার বাসায় সন্ধান কোরে। সেখানে গিয়ে শুনলুম—আপনি এইখানে আছেন। তাই আসচি—আর কি! আপনার সঙ্গে এক মিনিট একটু privately কথা কইতে চাই।

[বসুদেব ইঙ্গিত পাইয়া উঠিয়া গেলেন]

আপনাকে কিছু বোলতে হবে না। আমি সব শুনেচি। আপনাকে কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হোতে হবে না। That's quite an accident—অন্ততঃ এই ভাবেই আমি নিয়েচি।

(ক্রমশঃ)

বিলাসী

বাঙ্গালী

…জক : শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

…ও কাহিনী : ভূপেন বাঁড়ুয্যে

…চালক : চারু রায়

…শব্দযন্ত্রশিল্পী : চার্লস ক্রীড

…শিল্পী : বিভূতি দাস

…শিল্পী : এ, গফুর

…শিল্পী : তুলসী লাহিড়ী

…দক : শ্যামদাস ও স্বকুমার

চিত্র-পরিবেশক : এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটার্স

ভূমিকা লিপি : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য—দীনদাস, … লাহিড়ী—সুখদাস, তুলসী লাহিড়ী—…, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য—নিশীথ, শরৎ চাটুয্যে —… সুবোধ মুখার্জ্জি (এঃ)—বিধু, মণি ঘোষ—… বন্দ্যো—যাদব, সমর রায় (এঃ)—মাধব, … এঃ)—কেষ্ট, কার্ত্তিক রায়—সুবোধ, অনিল …লালত, মনোরমা—বড়গিন্নী, পদ্মাবতী—ছোট-গিন্নী, মীরা দত্ত—পদ্মরাণী, চারুবালা—ফ্লোরা, …

প্র… মুক্তি : "উত্তরা" শনিবার, ১৫ই আগষ্ট,

"বাঙ্গালী" দেখে আমাদের কি মনে হয়েছে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমাদের জবাব হচ্ছে, ভালোই লাগলো। বাঙলা দেশের ছায়াছবির রাজ্যে এমন কতগুলো লোক চরে বেড়ায় যাদের নাম কোন ছবির শিল্পী-পরিচয়ের ভেতর নজরে পড়লে আমাদের মনে হয় যে ছবিখানি না দেখতে যাওয়াই ভালো। এমনিই একজন লোক হচ্ছেন শ্রীভারতলক্ষ্মীর নতুন ছবি "বাঙালী"র পরিচালক। শিল্পী শ্রীচারু রায়ের পরিচালনায় তোলা কোন ছবি মনে হলেই, মনে হয় দেখতে পাবো, সে ছবিতে মানুষ আছে, কিন্তু যেন প্রাণ নেই,—আছে কতগুলো নাক-চোখ-ভ্রু আঁকা কাঠের পুতুলের এধার-ওধার করে যেন স্প্রীংএর জোরে নড়াচড়া; তারা আধো-আধো বুলি বলে, টেনেটেনে মিহি সুরে কথা কয়! কিন্তু না, এ-ছবিখানি দেখে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে চারু রায়ের দোষ অনেক শুধরেছে।

"বাঙালী"র কাহিনী একটু বলে রাখি : দুই ভাই, সুখদাস আর দীনদাস। এ-যেন একেবারে মানে করে নাম রাখা—সুখদাসের দিন চলে বেশ সুখে আর দীনদাস, তার অপরূপ লাঙটী 'রত্ন'কে নিয়ে কোনরকমে কাটায় জীবন। দীনদাসের একটি মেয়ে পদ্মরাণী, যেন সত্যিই দীঘির কালোজলে টাটকা-ফোটা নীল পদ্ম! দীনদাসের সংসারে একটি নতুন মানুষের পরিচয় হয়—সে হচ্ছে ব্যারিষ্টার-তনয় নিশীথ। সে পড়াতে আসে পদ্মকে, কিন্তু পড়াবে সে কি, সে নিজেই ততক্ষণ পদ্মর ঐ টানা-টানা জোড়া-চোখের মধ্যে দিয়ে পড়তে চেষ্টা করে পদ্মর মনে কি লেখা!

সুখদাসের এক মামাশ্বশুর, নাম তার রামলোচন—বয়েস তার কত, কেউ তা বলতে পারে না—সংসারিক অবস্থার বিপাকে পড়ে ভাগ্নেজামাইয়ের কাঁধে এখন একেবারে কায়েমীভাবে ভর করার চেষ্টায় ব্যস্ত। এ-বিষয়ে সহায় তার সুখদাসের স্ত্রী,—তার ভাগ্নী, আর নাতি কিরণ। রামলোচনের আকাঙ্খা শুধু জামাইয়ের আশ্রয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোতেই মেটেনি—তার বড় সাধ আবার নতুন করে সংসার পাতায়। সুখদাসের স্ত্রী নিজের বড় জায়ের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে, মামা রামলোচনকে বিয়ো-কল্পনার ফানুসে উড়িয়ে রাতারাতি একেবারে আবুহোসেন গড়ে নিয়ে, পদ্মর মাকে লোভ দেখিয়ে পদ্মর সাথে রামলোচনের বিয়ের কথা পাড়ে। পদ্মর মা একেবারে রাজী ন'ন বটে, কিন্তু উপায় নেই, বাঙালীর বয়স্থা আইবুড়ো মেয়ে! কি আর করেন, 'না'ও বলেন না। কিন্তু দরিদ্র দীনদাস দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিপীড়িত হলেও, মনুষ্যত্ব তাঁর চরিত্রে কিছু ছিল। তিনি এই বিয়ের প্রস্তাবে বাধা দেন। কিন্তু পদ্মর অপোগণ্ড সাতটি ভাই কিরণের বোনা কূপোর জালে রামলোচনের কাঁদে ধরা পড়েছে। তারা বাপের অমতেই 'ঘাটের মড়া' রামলোচনের সাথে বোনের গাঁটছড়া বেঁধে দিতে যায়, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হোল না, সেই বিষম মুহূর্ত্তে তাদের উদ্ধার করলে নিশীথ।

এই হোল মোটামুটি "বাঙালীর" গল্প; এর পরেও, একে টেনে দীনদাসের মৃত্যু পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভূপেন বাঁড়ুজ্যে যে-শ্রেণীর নাট্যকার তাতে তাঁর লেখায় মার্জ্জিত রসের সন্ধান আমরা করি নে। এবং এই জন্যে পর্দায় "বাঙালীর" যে-রূপ ফুটে উঠেছে, তাতে অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় অধ্যায় যে দেখা যাবে তাতে আমরা বিস্মিত হইনি। কিন্তু পরিচালকের উচিৎ ছিল ঐ সব বিশ্রী অবান্তর অংশগুলো বাদ দিয়ে ছবির উপযোগী করে আখ্যানভাগটি গড়ে পিটে নেওয়া। নগরের পথে একদল নরনারী বিপন্ন-আর্ত্তের জন্যে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে—একজন দয়ালু লোক ওদের ভিক্ষের ঝুলিতে দিলে ৫০০৲ টাকার একখানি নোট। এমনও তো আরো কত লোকেই দিয়েছে! কিন্তু ভিক্ষা-ব্রতী নরনারীর যে দল ঐ চলে যাচ্ছে তাদের মাঝ থেকে একটী ষোড়শী নারী বেরিয়ে এল—মনে

হোল, সে লক্ষ্য করে চলেছে তাদের ঝুলিতে ঠিক-ঠিক কে কি দিচ্ছে—দাতাকে তার অযাচিত দানের বিষয়ে কথা কইতে। কিন্তু এরপরে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ জীবনে আর হয় নি। ছবিতে এই ঘটনা-সংস্থাপনের কি সার্থকতা, প্রয়োজনীয়তাই বা কি? মুল গল্পটিকে ছায়াছবিতে রূপ দেবার জন্যে যে সব side-issueর সৃষ্টি করা হয়েছে, মনে হয় তা বাহুল্য-দোষ দুষ্ট। সহরের নাগরী ক্লোরার ঘরে ভিন্ন ভিন্ন দলের কাণ্ড কারখানা, দীনদাসের বাড়ীতে ভিখারিণীকে নিয়ে মস্ত লম্বা ঘটনা, সুখদাসের বাড়ীতে রামলোচনের ভাঁড়ামি ইত্যাদি কিছু কম করে দিলে ছবির উন্নতি হোত—এ নিঃসংশয়ে বলা যায়। তবে পরিচালকের গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই ছবিতে এবং মনে হয় তিনি তাঁর ছবির অভিনেতৃ-সঙ্ঘের প্রত্যেকের কার কতদূর ক্ষমতা সে বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে তাদের ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়েছেন। এইক্ষেই চারুবাবুর "বাঙ্গালী" পরিচালনায় সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

শ্রীভারতলক্ষ্মীর চিত্র-শিল্পী বিভূতি দাস ক্যামেরার কাজে তাঁর পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। উপযুক্ত আলোক-সম্পাতের গুণে তাঁর ছবি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

শব্দ-যন্ত্রের কাজ আশানুরূপ হয় নি। মাঝে মাঝে সংলাপ অকারণে আস্তে বা জোরে হয়ে গেছে। তবে মোটের ওপর মন্দ নয়।

সম্পাদনা আরো একটু করলে ছবিখানির উন্নতি হ'তে পারে এ আগেই আমরা বলেছি। অপ্রয়োজনীয় অংশগুলোর ওপর কাঁচি চালালে ছবির grip আরো ভাল হবে।

অন্যান্য বিভাগের কাজ চলনসই।

অভিনয়ে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন দীনদাসের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য যে ধারায় অভিনয় এই ছবিতে করেছেন তাতে এক "দেবদাসে" তিনি এর চেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন বলা যেতে পারে। নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর কথা বলার ভঙ্গী ভাল, কিন্তু চোখ বা ভ্রূ বড় বেশী নাচে। রামলোচনের অংশে তুলসী লাহিড়ী বেশ ভাল উতরে গেছেন। ধীরাজ ভট্টাচার্য্য নিশীথ চরিত্রের অপমান করেন নি। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের কিরণ একেবারেই মক্ষ-ঘেষা। দীনদাসের সাতটী ছেলেকে দিয়ে সাতটী টাইপ ফুটোবার প্রচেষ্টায় পরিচালক সফল হয়েছেন, তবে তারই মধ্যে ভম্বু রায়ের "কেষ্ট" আমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছে।

স্ত্রী-ভূমিকাগুলোর মধ্যে বেশ সংযত অভিনয় করেছেন মনোরমা "বড়গিন্নী"র ভূমিকায়। পদ্মাবতীর ছোটগিন্নী চলনসই। মীরা দত্তকে পদ্মর বেশে একটু রোগা হলেই ভাল দেখাতো; তবে অভিনয় তিনি ভাল করেছেন। ক্লোরার বেশে চারুবালা আমাদের খুসী করতে পারেন নি। কমলা ঝরিয়ার গান দু'খানি শ্রুতিমধুর। বাঈজীর গলা নেই—ঢংও নেই; নাচটিও খুব সস্তা মনে হোল। লবঙ্গলতার ভূমিকায় তারা প্রাণহীন অভিনয় করেছেন। ছোটখাটো চরিত্রগুলো অচল নয়।

মোট কথা, "বাঙ্গালী" দোষে-গুণে দেখবার মত বেশ উপভোগ্য ছবি হয়েছে এবং আমরা আশা করি শ্রীভারতলক্ষ্মীর কর্ত্তৃপক্ষ "বাঙ্গালী"র সাফল্যে উৎসাহ পেয়ে আরো বেশী করে এখন থেকে বাংলা ছবি তুলবেন।

বেজায় রগড়

কাহিনী: ভূপেন বাঁড়ুয্যে
পরিচালক: তুলসী লাহিড়ী
চিত্র-শিল্পী: বিভূতি দাস
শব্দযন্ত্রী: এ, গফুর

ভূমিকা লিপি: তুলসী লাহিড়ী—মামা, কৃষ্ণধন মুখুজ্যে—পদ্মলোচন, সত্য মুখুজ্যে—বাঙ্গাল জমিদার, মাষ্টার সন্তু—জমিদারের ছেলে, হরিসুন্দরী—ঠানদি, উষাবতী—মামী, গিরিবালা—ঝি, রেণু—জমিদার পত্নী, ইত্যাদি।

প্রথম মুক্তি: "উত্তরা" শনিবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৬।

যেমন মামা, তেমনি ভাগে! পাড়াগাঁ থেকে মামা এসেছেন ভাগেকে সঙ্গে করে সহরে পুণ্যি সঞ্চয়ের আশায়। কিন্তু সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করতে করতে অবশেষে কি হয়ে দাঁড়ালো তা ছবিতে দেখে দর্শক-সাধারণ যে বেজায় রগড় পাবেন তা আমরা হলফ্ করে বলতে পারি।

ভাগের ভূমিকায় কৃষ্ণধন মুখুজ্যের অভিনয় দেখে আমরা খুসী হয়েছি। তুলসী লাহিড়ীর 'মামা'ও বেশ ভাল লাগলো। সত্য মুখুজ্যে পদ্মা-পারের ভাষায় কথা কওয়া বেশ দুরস্ত করে উঠতে পারেন নি, তবে অভিনয়ের ক্ষমতা তাঁর আছে। মেয়েদের মধ্যে বিশেষ ভাল অভিনয় কেউ না করলেও, কারুর অভিনয় একেবারে নিন্দে করে ফেলে দেবার মতও হয়নি।

ক্যামেরা এবং শব্দযন্ত্রের কাজ বেশ ভালই; উপযুক্ত সম্পাদনাও এ ছবিতে করা হয়েছে।

পর্দ্দার ওপর এ ছবিখানি না দেখলে বোঝা যাবেনা যে, এ ছবি কতখানি উপভোগ্য। সকলেই স্ফুর্ত্তি পাবে "বেজায় রগড়" দেখে—এ নিঃসন্দেহ।

কালী ফিল্মস্

"টকী অফ টকীজে"র শুটিং রীতিমত চলেছে। এর অংশ বণ্টনে আরেকটু নতুনত্ব হ'য়েছে। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে বিশ্বনাথের চুক্তি শেষ হওয়ায় ইনি এই নাটকে নায়ক বসন্তকুমারের ভূমিকায় নামছেন। শিশির, অহীন্দ্র, বিশ্বনাথ, কঙ্কা, রাণী প্রভৃতির সম্মিলনে ছবিখানা যে দিন দিন লোভনীয় হ'য়ে উঠছে—তা' সত্যি! তার ওপর গাঙ্গুলী মশাই নিজে ছবিখানার প্রযোজনা ব্যাপারে আপিস-পত্তর ছেড়ে ষ্টুডিওর ভেতরই সব সময় কাটাচ্ছেন। "রীতিমত নাটক" যে একখানা "রীতিমত ছবি" হবে তা' এদের ভাবগতিক দেখে ধারণা করা খুবই ন্যায়সঙ্গত।

"মরণ যে দিন আসবে কাছে"—

ডলি মিত্র

কুনোকুৎলিৎ ভীলদের মেয়ে রূপালি—। এত রূপ ওদের ঘরে মানায়না, কেউ যদি ওকে সাজিয়ে বলে, ও রাজার মেয়ে কেউ অবিশ্বাস করবেনা। সমস্ত বনটাই যেন ওর রূপের আলোতে উজ্জ্বল। একরাশ কালো কোঁকড়া চুলের মাঝে ওর ছোট্ট মুখটী গোলাপের মত সুন্দর। আর তার কালো দুটী চোখে দুষ্টুমী ভরা—। সকলেই তাকে ভালবাসে। পিতার সাথে ও শীকারে যায়—অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে খেলা করে—বিশ্রাম সে সহজে নেয় না। চঞ্চল মৃগশিশুর মত সারাদিন ওর ছুটাছুটির শেষ নাই। সবাই ওর সঙ্গ কামনা করে, কিন্তু ওর ভাল লাগে সবচেয়ে মজনুকে—। কালো, বলিষ্ঠ, দীর্ঘ দেহ, একমাথা ঝাকড়া চুল একটা লতা দিয়ে প্রায়ই বাঁধা থাকে। ওরা একসাথে বেড়ায়, খেলা করে। মজনু ওকে ফুল পেড়ে দেয়, ও মালা গাঁথে; নিজে পরে ও মজনুকে পরায়। সবাই—বিশেষ করে—শ্যামল ওদের হিংসা করে। শ্যামল পেতে চায় রূপালিকে একান্তকরে—। কিন্তু রূপালির ভালো লাগে এই কালো ডানপিটে কঠিন ছেলেটিকে। শ্যামল অবাক্ হয়ে দেখে, ওর সরু ডালে ওঠার কৌশল। ভাবে—কেমন করে ও সবদিক দিয়ে ওকে পরাস্ত করবে। সেদিন হঠাৎ কোন খেয়ালে রূপালি শ্যামলের প্রতি খুব সদয় হয়ে উঠল। খেলতে খেলতে শ্যামল মাঝে মাঝে বিজয়ী দৃষ্টিতে মজনুর পানে চাইছিল। সে দৃষ্টি মজনু সহ্য করতে পারলনা। ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে এসে বসলো দূরে—যেখানে পাহাড়ের বুক চিরে রূপালি ঝরণা ঝির্ ঝির্ করে অবিরত বয়ে চলেছে অশ্রান্ত, শান্ত সহিষ্ণুতায়, তার এক পাশে। কোন্ গাছ হতে ঝরে পড়া কয়েকটী বনফুল, তাই নিয়ে ও খেল্‌তে লাগল অন্যমনে।

খেলতে খেলতে হঠাৎ রূপালির দৃষ্টি পড়ল, মজনু নেই—বল্‌লে—"মজনু কইরে—?" শ্যামল হেসে বল্লে "হেরে যাচ্ছিল তাই পালিয়েছে"। রূপালি রেগে উঠে বল্লে "নাঃ—হেরে গিয়ে পালাবার ছেলে ও নয়—", ও ছুটে চলে গেল।

"মজনু"—

রূপালির ডাকে মজনু চম্‌কে উঠল—কথা বললেনা নতমুখে বসে রইল। তার পাশটিতে বসে, তার একটা হাত কোলের উপর টেনে নিয়ে রূপালি বললে "আমার উপর রাগ করেছিস্ মজনু?"

অভিমানাহত কণ্ঠে মজনু বল্লে "কিন্তু আমার রাগে তোর কী আসে যায় রূপো—"?

রূপালির কালো দুটো চোখ জলে ভরে উঠল, ডাকলে "মজনু"—

"না রূপো, তোর খেয়ালের দাস হতে পারবনা আমি—"

সজোরে মাথায় ঝাকানি দিয়ে রূপালি উঠে দাঁড়ালো। গোছা গোছা চুল দুলে উঠল। "এত অহঙ্কার ভাল নয় মজনু—।"

জোরে জোরে পা ফেলে রূপালি চলে গেল।

* * *

মেয়ের স্বভাব-বিরুদ্ধ করুণ মুখের পানে চেয়ে মা ব্যস্ত হয়ে উঠল, বল্লে "কি হয়েছে রে—?"

মায়ের পাশে বসে পড়ে রূপালি বল্লে "বড্ড যে ঘুম পেয়েছে মা—?"

সস্নেহে কাছে টেনে মুখের ওপর এসে-পড়া চুলগুলো সরাতে সরাতে মা বল্লে "বড্ড যে ঘুমিস্—ঘুমের দোষ কী—?"

মায়ের কোলের কাছে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলে ও বাড়ীতে রইল, খেল্‌তে গেল না। অনেক রাতে হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল—শুনলে বাঁশী বাজছে বড় মিষ্টিসুরে। এ সুর ওর চেনা। নাঃ—যত চেষ্টা করুক শ্যামল, পারবেনা ও মজনুর মত বাজাতে—। ওর মনে পড়ে গেল কয়েকদিন আগের কথা—মজনুর মত সরু ডালে উঠতে গিয়ে কেমন পড়ে গেছল শ্যামল। ও হেসে উঠল। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে ঘুমের জড়তার মধ্যেই মা বল্লে "ঘুমো রূপো—।"···

কয়েকদিন কেটে গেল।

শ্যামল এখন রূপালির সারাদিনের সাথী হয়ে উঠেছে। ওর জন্যে যত কিছু কঠিন দুঃসাহসিক কাজ করতে করতে শ্যামল ক্লান্ত হয়ে উঠেছে···যথাসাধ্য করেও ওকে সুখী করতে পারেনা···কিছুই ওর পছন্দ হয়না··· বলে "ছাই—ওর চেয়ে মজনু ভাল পারে—।"

মজনুর দিনগুলো দীর্ঘ হয়ে উঠেছে, সারাদিন উৎপাত করার সাথী নেই···নিছক শান্তিপূর্ণ দিন···। এই একঘেয়ে ভাব ওর ভাল লাগে না। ঝরণার ধারে বসে ভাবে সেদিনের কথা। আচ্ছা সে না হয় একটু অভিমানই করেছিল, কিন্তু রূপালি কেন বল্লে অহঙ্কার? সত্যই ও রূপালির কাছে অহঙ্কার করার স্পর্দ্ধা করেনা কোনদিন···।

রাখী পূর্ণিমা—!

প্রতি বছর এই দিনটায় মজনু সাজিয়ে দিত রূপালিকে ফুলের সাজে, আর দুজনে বেঁধে দিত ফুলের রাখী দুজনের হাতে।

এবার ও একলা···। রূপালিকে শ্যামল দিয়েছে সাজিয়ে। অনেক বার মজনু ভেবেছে, আজকে ও মিটিয়ে নেবে সব

ঝগড়া—কিন্তু কুণ্ঠা এসে বাধা দিয়েছে··· । উৎসবের মধ্যে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ও বাঁশী নিয়ে বসেছে রূপালি ঝরণার ধারে। চাঁদের আলোয় ও স্পষ্ট দেখলে রূপালি আর শ্যামল দুরে গাছের দোলনায়—শ্যামল খুসীতে উচ্ছল আর রূপালিকেও তার অসুখী মনে হলনা। মজনুর বুক ব্যথায় টন টন্ করে উঠল। বাঁশীর সুরে ও ছড়িয়ে দিলে ওর বুকের বেদনা··· ।

সত্যিই রূপালি হাসছিল—কিন্তু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—সে জোর করে টেনে-আনা হাসি—অকারণে বোকার মত হাসছিল রূপালি। কানে এল বাঁশীর ডাক্—ও পারলেনা সে ডাক্‌কে উপেক্ষা করতে—শ্যামলের হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল—একেবারে মজনুর পাশটিতে। নিজের 'রাখী'টা খুলে পরিয়ে দিলে ওর হাতে··· । একটানে সেটা খুলে ফেলে মজনু বল্লে "তোর শ্যামলের দেওয়া রাখী তোর হাতেই রাখ্— ।"

ঝর্ ঝর্ করে ওর চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল।

চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করে উঠল··· ।

ওর হাত দুটো টেনে নিয়ে মজনু বল্লে "তুই কাকে ভালবাসিস্ রূপালি ?" রূপালি শুধু চাইলে ওর দিকে পরিপূর্ণ চোখে।

মজনু বুঝলে সে দৃষ্টির ভাষা—বল্লে "আমায় ক্ষমা কর রূপা— ।" রূপালি হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে, সজোরে সব গয়না গুলো ছিঁড়তে লাগল, মজনু হেসে বল্লে—"ওকি হচ্ছেরে—?"

সবগুলা ছিঁড়ে ও ভাসিয়ে দিলে ঝরণার জলে। রূপালির হাত ধরে মজনু উঠে দাঁড়ালো—কোন গাছে ফুল ছিলনা প্রায়। দূরের ডাল থেকে ফুল পেড়ে ও সাজিয়ে দিলে রূপালিকে— ।

রূপালি নতুন করে ওর হাতে রাখী বেঁধে দিলে··· ।

আবার ওরা ফিরে এল ঝরণার ধারে··· ।

"বাঁশী বাজা না মজনু— ।"

"কী বাজাবো ? তোকে কতদিন পর পেলাম কাছে, কত কথা ছিল বলার—সব ভুলে গেলুম··· ।"

"যাক কথা—তুই বাজা— ।"

মজনু বাঁশী তুলে নিলে। রূপালি শুয়ে পড়ল ওর কোলে মাথা রেখে একটা মধুর অলস ভঙ্গীতে··· ।

খানিকটা বাজাবার পর, ওর হাত ছুঁয়ে মৃদু কণ্ঠে রূপালি—বল্লে থাক্।

বিস্মিত হয়ে মজনু বাঁশী নামালো, বল্লে—"কেন ?"

—বড্ড কাঁদাস্ তুই—

মজনু দেখলে সত্যই ওর চোখে জলের ধারা··· ।

তুইত বাজাতে বল্লি— । ওরা দুজনে হাতে হাত জড়িয়ে নিঃশব্দে বসে রইল··· ।

দিনের পর দিন কেটে গেল ওদের খেলায় হেলায়··· । দুটি তরুণ প্রাণ ধরা দিলে ভালবাসায়··· । ওরা বুঝলে, ওদের চলবেনা —কেউ যদি কাউকে ছেড়ে যায়··· । মা বল্লে রূপালির বিয়ের কথা— । বাবার গলা জড়িয়ে রূপালি বল্লে ও বিয়ে করবেনা মজনুকে ছাড়া··· ।

ওর বাবা সর্দার। মেয়ে ওর সুন্দর, ও চাইলে বেশী কড়ি··· । মজনুরা গরীব—পারলনা দিতে··· । শ্যামলের কড়ি ছিল—ও দেখলে এই সুযোগ--রূপালিকে চিরদিনের জন্যে জয় করার।

রূপালি শুনে কেঁদে জানালো··· । কান্না দেখে বাপের রাগ গিয়ে পড়ল দরিদ্র মজনুর পিতার উপর— । সর্দারের ভয়ে মজনুর বাবা ওকে রূপালির সাথে মিশতে মানা করে দিলে।

রূপালির বাবা টাকা চাইলে প্রাণ চাইলেনা। প্রথমে ভালভাবে, পরে ধমকে নিরস্ত করলে রূপালিকে— । সহর থেকে চাঁদীর গহনা এনে দিলে— । বাহিরের খুসীতে রূপালির মনের ক্ষত শুকালোনা··· ।

রূপালি খেলা, সাথী সব ছেড়ে দিয়েছে। ঘর থেকে বেরোয় না প্রায়— । মা ভাবে

সেদিন সন্ধ্যায় রূপালি যাচ্ছিল ঝরণায় গা ধুতে।

মজনু এসে দাঁড়ালো সামনে, ডাকলে—'রূপালি'—

"কেন মজনু ?" রূপালি দাঁড়ালো।

একটা কথায় সত্যি জবাব দিবি— ?"

"বল্"—

"তুই সুখী হবি এ বিয়েতে— ? পারবি ভালবাসতেই ওকে—" ?

"সব তো জানিস্ মজনু— ।"

"তবে চল্‌না রূপা, আমরা পালিয়ে যাই—"

"ছিঃ !—মজনু—"

"ছিঃ—কেন রূপা, তুই তো চাস্ না ওকে—তবে কেন আমরা মিলতে পারব না—?"

"না মজনু, ভাল আমি তোকে যতই বাসি, মা বাবার অমতে কাজ করবার সাহস আমার নাই. আর তা ছাড়া আমার বাবা এখানের সর্দার ; তাঁকে ছোট করতে পারব না—পথ ছাড় মজনু— ।"

"না ছাড়ব না—" অন্ধকারে দুইচোখ জ্বলে উঠলো। রূপালি ভয় পেলে, বল্‌লে "আমার দেরী হবে—ছাড় মজনু—" দৃঢ় করে' ওর হাতটা চেপে মজনু বল্‌লে—"হোক দেরী—আমি যেতে দেবো না—তোকে নিয়ে শ্যামল গর্ব্বের দৃষ্টিতে চাইবে, সে আমি সইব না।" রূপালি কাতর হয়ে উঠে সজল কণ্ঠে বল্‌লে—"কী হয়েছে আজ—? কেন এমন করছিস্ ?"

মজনু হাস্‌লে— । কালো, নিবিড় কালো, আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের তীব্র আলো ঝক্‌মক্ করে উঠল।

"কেন করছি—? বুঝ্‌বি না রূপালি—

বুঝলি না—কি জ্বালায় আজ কদিন জ্বলছি আমি। কিন্তু রূপালি, যে বাবা তোর পানে চাইলে না—তাঁর জন্যে এত ভাববি কেন—?"

"আমি যে মেয়েছেলে মজনু, বাবা পুরুষ।"

"তোক্—আমি তাঁর গর্ব্ব ভাঙবো, আমি পালাবো তোকে নিয়ে—দেখি কী করে আমার—"

বললে ও তাকে নিজের পানে টান্‌লে।

দৃপ্ততেজে জ্বলে উঠে রূপালি বল্‌লে—"এত নীচ তুই, অসহায় একলা পেয়ে আমায় অপমান করতে চাস্।" দুইচোখে অসহ্য আগুনের জ্বালা। মুহূর্ত্তে তার হাত ছেড়ে দিয়ে মজনু বল্‌লে—"অপমান—তোকে অপমান করছি রূপা—? রূপালি—না যা তুই—ভুল করেছিলুম—যা রূপালি—আর কখন তোকে বিরক্ত করবো না। জানি শ্যামল তোকে ভালবাসে—তোকে সুখী করবে, তুই সুখী হবি—হতভাগা নীচকে ভুলে যাবি, কিন্তু শুধু এইটুকু মনে করিস্—মজনু যত নীচই হোক—তোকে অপমান করার মতন স্পর্দ্ধা তার কখনও হয়নি—।" ওর স্বর বিকৃত হয়ে এলো, ও চলে গেল। আর রূপালি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো যতক্ষণ না অন্ধকারে ওর কালো মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল……।

মজনু ভুল বুঝলো—ভাবলে সত্যিই তাকে রূপালি চায় না—কেনই বা চাইবে—শ্যামল দরিদ্র নয়…। ওদের বিয়ের রাতে ও এলো না—কতকগুলো ফুলের গয়না পাঠিয়ে দিলে—রূপালির পরই ও যাকে ভালবাসত, সেই রাখুর হাতে। শ্যামল রূপালিকে জয় করে নিলে—। আর রূপালি নিজেকে ছেড়ে দিলে বাপের হাতের খেলার পুতুল করে'……।

মজনুর দিন কাটে ঝরণার ধারে বাঁশী বাজিয়ে। বড় বিমর্ষ হয়ে গেছে ও—সবাই দেখলে, ও আশ্চর্য্যরকম বদলে গেছে—তার যত ডানপিটেমী কোথায় যেন গেছে—। কয়েক মাস কেটে গেল। মজনুকে দেখে রাখুর বড় কষ্ট হলো। সে আর চুপ করে থাকতে পারলে না। মজনু ওকে রূপালির পরেই আসন দিয়েছিল মনে। রাখু মজনুকে খুব ভালবাস্‌তো। মজনু সেদিন কুটীরের সামনেটা কাঁটার ঝোপ দিয়ে বেড়া দিচ্ছিল—রাখু এসে ডাকল—"মজনু—"

"কী—?"

ওর পাশে বসে বললে—"তুই বড় বোকা, কেন ছাড়লি ওকে, তুই বল্ আমি ওর ঘরে আগুন লাগিয়ে রূপোকে নিয়ে আসি—"। মজনু হাস্‌লে—বল্‌লে "কী হবে তাতে—ও কী কোনদিন ওর স্বামীর হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারবে—?"

"তবে তুইও একটা বিয়ে করনা—রূপালি ছাড়া কী মেয়ে নেই—?" মজনু আবার হাসলে……। বড় করুণ সে হাসি—জমাট

বাঁধা কান্নাকে ভেঙে গড়া। বললে "বুঝবি না রাখু, সে বোঝাবার নয় —।"

রাখু নীরবে রইল।......

সমস্ত বনটায় সাড়া পড়ে গেছে যুদ্ধ হবে—অন্য জায়গা থেকে আসবে অন্য একদল ভীল। সবাই ব্যস্ত হলো অস্ত্রে শান্ দেবার জন্য। শুধু নির্ব্বিকার রইল মজনু। রাখু বললে "শান দিবি না— ?"

"আমি যে হেরেই গেছি অনেকদিন—কী হবে শান দিয়ে— ?"

তারপর ভীলরা এলো। দেখলে—কেমন করে এরা জানতে পেরেছে তাই প্রস্তুত। সারাদিন যুদ্ধ হলো—নিস্তব্ধ বন মুখরিত হয়ে উঠলো—চীৎকারে কান্নায় বন তোলপাড় হয়ে উঠলো—রক্তের নদী বইলো—দু'পক্ষের অনেকেই ম'লো—। সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ হয়ে এলো আবার—চারিদিকে মৃতদেহ, রক্তের চাপ—গাছপালা খণ্ড খণ্ড—শান্ত সমুদ্র যেন হঠাৎ ঝড়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সেদিন কোন পক্ষের জয় হলো না। শত্রুপক্ষ ভাবতে লাগলো অন্য উপায়। ক্রমে সন্ধ্যা মিশে গেল রাত্রির সঙ্গে—ঘরে ঘরে আত্মীয় বন্ধুর বিলাপের ধ্বনি থেমে গেল—শুধু পাতার শিরশির শব্দ আর ঝর্ণার উচ্ছল গতির কল্ কল্ ধ্বনি—বন পড়লো ঘুমিয়ে। মজনু বাঁশী বাজাচ্ছিল—বেহাগ নয়, হয়তো নামজাদা কোন সুরই নয়—তবু ও বাঁশীতে যা বাজছিল তা বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী—। সেত গান নয়, সুর নয়—মর্ম্মভেদী কান্না গুমরে গুমরে উঠছিলো বাঁশীর সুরে—। রূপালি ঠিক বলেছিল "মজনু বড় কাঁদায়।" হঠাৎ সব বনটা আলো হয়ে উঠলো—কিছুপরেই অনেকের মিলিত আর্ত্তকণ্ঠে মজনুর তন্ময়তা গেল ভেঙে—সে ছুটে এলো—দেখলে, সর্দ্দারের বাড়ীও আশেপাশের আরো অনেক ঘর পুড়ছে। পুড়েছেও অনেক। কত লোক ছুটছে ঝর্ণায় কলসী নিয়ে। সবাই চীৎকার করছে—"জল, বাঁচাও—।"

সর্দ্দার ছুটে এলো ওকে দেখতে পেয়ে। বললে—"আমার স্ত্রী—" মজনু হাসলো, ঝাপিয়ে পড়লো তার ভেতর। গাছের তলায় রূপালির মাকে নামিয়ে দিয়ে ও নিজের ঘরে যাচ্ছিল বৃদ্ধ পিতার জন্যে। শ্যামল ওকে ধরলে, মজনুকে জানতো ও, সে বনে তার মত কেউ ছিল না শক্তি ও সাহসে। বললে—"মজনু, রূপালি ঘরে ঘুমচ্ছে।"

"আর তুই তাই একা পালিয়েছিস —।" ঘৃণার হাসি ওর মুখে ফুটে উঠলো। বললে—"কিন্তু শ্যামল, ঘরে আমার বৃদ্ধ বাবা—" বলতে বলতে ওর চোখ পড়লো শ্যামলের ঘরের পানে—আগুনের লেলিহান শিখা হাহাকরে' নাচতে নাচতে তাকে গ্রাস করার জন্যে ছুটছে—। মজনু এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে গেল—রূপালিকে দুইহাতে করে বুকের কাছে তুলে' এনে দিলে শ্যামলের কাছে। দেখতে দেখতে বাড়ীটা আগুনে জলে উঠলো। সর্দ্দারের বাড়ীতে মজনুর গায়ে তাপ লেগেছিলো, বাবাকে আনতে দেহের অনেক অংশ ঝলসে গেল—বাইরে এনে তাঁকে শুয়ে দিতেই রাখুর মা ছুটে এলো—"বাবা আমার রাখু যে ঘরে—"। ওদিকের আগুন অনেকটা নিভে এসেছিলো জল ঢালায়। ভগ্ন অর্দ্ধ-ভগ্ন ভস্মীভূত ঘরগুলির পানে চেয়ে রূপালি ভাবছিলো—শ্যামলকে ও ভাল কোনদিনই বাসে নি, করুণা করতো,—কিন্তু আজকের ব্যবহারে তার প্রতি ওর মন ঘৃণায় ভরে গেছিল। রাখুর মার কথা কাণে যেতে ও একবার চাইলে ওদের ঘরের দিকে—সেটায় তখন ও বেশ আগুন—তারপর মজনুর ঝলসানো দেহের পানে চেয়ে ও উঠে এলো—ওর একটা হাত ধরে বললে—"আর তোকে যেতে দেবো না—"

"ছেলেমানুষী করিস্ না রূপা—"

"আমার উপর কী এমনি করে প্রতিশোধ নিবি মজনু—" কান্নায় ওর গলা বুজে এলো। মজনু বললে—"প্রতিশোধ—? না রূপা, কিন্তু আর দেরী করলে রাখুকে পাব না—ভয় নেই, ফিরে আসবো—।" ও বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেলো......।

গোলমালে রাখুর ঘুম ভেঙে যেতে আগেই ও পালিয়ে এসেছিলো, মাকে খুঁজতে সেখানে এসে দাঁড়ালো। মজনু তাকে খুঁজে পেলে না নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পা তার জড়িয়ে আসছে—এক জায়গায় বসে পড়ে বললে—"পারলাম না রাখু তোকে বাঁচাতে—কেমন করে শুধু মার কাছে ফিরবো—হোক্ এ জীবনের সমাপ্তি—যদি এমনি করেই হয়।" বাইরের থেকে মিলিত কণ্ঠে এলো—'রাখুকে পাওয়া গেছে।' মজনু উঠবার জন্য চেষ্টা করলে, পারলে না। তাকে বেরুতে না দেখে বন কাঁপিয়ে রূপালি চীৎকার করে উঠলো—"মজনু—মজনু—।" দূর থেকে কোথায় লেগে প্রতিধ্বনি ফিরে এলো—বাতাসে আকাশে ছড়িয়ে পড়লো ওর বুকফাটা চীৎকার—"মজনু—মজনু—।"

অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট হয়ে বাজলো সে ডাক্ মজনুর কানে। ও শুধু হাসলে......।

বাঙ্গালীর সার্কাস—শ্রীঅবনীন্দ্র কৃষ্ণ বসু প্রণীত—"পাবলিসিটি ষ্টুডিও" (৩৬৭নং অপার চিৎপুর রোড) হইতে শ্রীভুজঙ্গ শেখর সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত—প্রাপ্তিস্থান, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৩ সাল—১৭খানি হাফটোন ব্লক সহ—পৃঃ ৮৫—মূল্য ১।০

আজকাল একটা ধূয়া উঠিয়াছে যে, বাঙালী সব দিক্ দিয়াই ক্রমশঃ বড় পিছাইয়া পড়িয়েছে। কি বুদ্ধি পরিচালনায়, কি শারীরিক সামর্থ্যের প্রতিযোগিতায় বাঙালীর নাম আর ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসিগণের নামের উর্দ্ধে স্থান পাইতেছে না। কথাটা সর্বাংশে সত্য না হইলেও একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। স্বর্গত মহামতি গোখেল যে তীক্ষ্ণধী শক্তিমান্ বাঙালী জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'আজ বাঙলাদেশ যে ভাবে চিন্তা করে, কাল অবশিষ্ট ভারত সেই চিন্তাধারারই অনুবর্ত্তন করে'—সেই বাঙালী জাতিই আজিও বর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহার সে চিন্তাশক্তি ও দৈহিক বলের ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে—ইহা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কিন্তু বাঙালী কোনদিনই এরূপ শক্তিহীন ছিল না। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সুলিখিত ভূমিকায় বাঙালীর বাহুবলের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সে সবই প্রাচীন পরোক্ষ যুগের কথা। আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্ব্বেও বোসের সার্কাসের বিভিন্ন ক্রীড়ায় ক্রীড়কগণ নানারূপ অননুকরণীয়, বিস্ময়াবহ, রোমাঞ্চকর ক্রীড়ার মধ্য দিয়া যে দুর্জ্জয় সাহস, উদ্যম ও কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমাদিগের 'বুক দশহাত' হইয়া উঠে। সুশীলাসুন্দরী, মৃন্ময়ী, কুমুদিনী প্রভৃতি বঙ্গবীরাঙ্গনাগণের অসম-সাহসপূর্ণ ক্রীড়াকৌশল এখনও আমাদের চোখের উপর ভাসিতেছে। বীর পবনচাঁদ (ইনি বাঙালী), পান্নালাল বর্দ্ধন, ফণীন্দ্র নাথ, বীরেন্দ্র নাথ, হীরেন্দ্র নাথ, কৃষ্ণলাল বসাক, ভূতনাথ বসু, বেনী মাধব ঘোষ, যাদুকর গণপতি প্রভৃতি ক্রীড়কগণের নাম বাঙালীর সার্কাসের ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য। আর একজন মহাশক্তিমান্ খেলোয়াড়ের নাম না করিলে এ তালিকা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। তিনি স্বর্গত "ভীম ভবানী" বা কলির ভীম। এই সব খেলোয়াড়ই এককালে বোসের সার্কাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বোসের সার্কাস ছিল বাঙালীর একটি অতি নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান—বিশেষ গর্ব্বের জিনিষ। স্বর্গত কবিবর মনোমোহন বসুর পুত্র স্বর্গত প্রিয়নাথ বসু (প্রোফেসার বোস্) কিরূপে অতি সামান্য অবস্থার ভিতর দিয়া এই প্রশংসনীয় প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন,—উত্তরকালে কিরূপে তাঁহার ও তাঁহার অগ্রজ স্বর্গত মতিলাল বসুর সহযোগিতায় এই বোসের সার্কাস জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়াছিল,—আবার কিরূপেই বা বিধির বিপাকে গৃহবিবাদে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির শোচনীয় অকাল মৃত্যু ঘটিল,—তাহার ধারা-বাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থে অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। বোসের সার্কাস ছাড়াও বাঙালীর সার্কাসের প্রথম সূচনা (নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামশালা) হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যতগুলি বাঙালীর সার্কাসের আবির্ভাব হইয়াছে, সে সকলেরই উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে আছে। বলা বাহুল্য, বোসের সার্কাসই এ সকলের শীর্ষ-স্থানীয় ছিল। বোসের সার্কাসের পরেই সুনামধন্য ব্যায়ামবীর কৃষ্ণলাল বসাকের হিপোড্রোম সার্কাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থমধ্যে যে সতর খানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক খানিরই ব্লক অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পট ও তাহার উপর যে আবরণ খানি দেওয়া হইয়াছে—এ দুইটির ভিতরেই একজন নিপুণ শিল্পীর হস্তস্পর্শের আভাস পাওয়া যায়।

আজ আর বাঙালীর সার্কাস বলিতে কিছু নাই। শুধু বাঙালীর সার্কাস কেন, প্রকৃত সার্কাস বলিতে যাহা বুঝায়, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় তাহা আর আসিতেছে না। সার্কাসের পরিবর্ত্তে কার্ণিভাল ও সিনেমা অর্থাভাবে ক্ষীণ দেহ, হীনপ্রাণ বাঙালীর অর্থ, স্বাস্থ্য ও নীতিজ্ঞান লুটিয়া লইতেছে। শুনিতে পাই, এক একটা ফিল্ম তুলিতে বড় বড় বাঙালী পৃষ্ঠপোষকগণ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। অথচ তাহা বিশ্বের দরবারে পরিবেশনেরও যোগ্য হয় না। আর বোসের সার্কাসের মত একটা শক্তির উৎসস্বরূপ জাতীয় প্রতিষ্ঠান মাত্র কয়েক সহস্র মুদ্রার অভাবে লোপ প্রাপ্ত হইল, ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের কথা আর কি থাকিতে পারে?

বাঙলার ধনী ব্যবসায়োদ্যমী কর্ম্মিবৃন্দ বাঙালীর সার্কাস পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী

হইবেন কি? এ পুস্তক খানিতে তাঁহারা উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাইবেন।

পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই, ছবি—সবই সুন্দর। কেবল বিবরণ বড় সংক্ষিপ্ত। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণের প্রত্যাশায় রহিলাম। আশাকরি, দ্বিতীয় সংস্করণে এ আশা পূর্ণ হইবে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

শ্রীদুর্ব্বাসা

সাময়িক ব্রীজ সংবাদ

জলপাইগুড়ি ব্রীজ টুর্ণামেণ্ট :—'অমৃত বাজার পত্রিকা'তে প্রকাশ যে, জলপাইগুড়িতে একটী সর্ব্ব বঙ্গীয় ব্রীজ প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইতেছে এবং শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় (টুর্ণামেণ্ট কমিটির সম্পাদক, সেণ্ট্রাল রোড, জলপাইগুড়ি) এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য বাংলার সকল ক্লাবকে আহ্বান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পত্রিকার খবরদাতা জানাইয়াছেন যে, তিনি মণীন্দ্রবাবুর নোটীশখানি আমাদের ব্রীজ এসোসিয়েসনের সম্পাদক, মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম যে সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞাপন আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই। তবে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠ করিয়া মণীন্দ্রবাবুকে এ সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ জানাইবার জন্য লিখিয়াছেন। মণীন্দ্র বাবুর জবাব পাইলে সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে যথা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এরূপ প্রতিযোগিতা প্রচলনের আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুরাগী। যদি মণীন্দ্র বাবু নিজে একবার কালকাতায় আসিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত এবং ব্রীজ জগতের অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন তবে এ বিষয়ে তিনি অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারিবেন। আমরা কামনা করি তাঁহার পরিচালিত প্রতিযোগিতা বাস্তবিকই "সর্ব্ববঙ্গীয় প্রতিযোগিতা"র পরিণত হউক। এ বিষয়ে তিনিই প্রথম উদ্যোগী।

হাওড়া সান্‌ডে ক্লাব :—অনেকদিন পরে এ প্রতিযোগিতা শেষ সোপানে পদার্পণ করিল। Lansdown Club এর সাফল্যে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত যামিনীবাবু যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত তাহার Clubটীকে গঠিত করিতেছেন তাহাতে অনেক প্রতিযোগিতাতেই এই Club জয়যুক্ত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

বিপিনবিহারী উপেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউট :—এদের পরিচালিত প্রতিযোগিতাটিও অনেকদিন পরে শেষ হইতে চলিল। ফ্যাইন্যালের সোপানে আরোহণ করিয়াছেন North Club ও Understood Force Club। আমরা এই দুই ক্লাবকে অভিনন্দন করিতেছি।

South India Club :—এদের প্রতিযোগিতা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। ইহারা associationএর অন্তর্ভুক্ত হইয়া এ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিতেছেন। এজন্য ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই Club কলিকাতার একটি পুরাতন এবং বিখ্যাত Club। আশা করি এদের পরিচালনায় প্রতিযোগিতাটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। South India Clubকে association এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা association এর সম্পাদক মহাশয়কে অভিনন্দন করিতেছি।

Venus Club :—এদের ফ্যাইন্যাল খেলা শেষ হয়েছে অনেকদিন আগে। কিন্তু এখনও পুরস্কার বিতরণের কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। এ সম্বন্ধে ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ কি

বন্দোবস্ত করিতেছেন তাহা এখনও সাধারণের অপরিজ্ঞাত। Association এর সম্পাদক মহাশয় কি বলেন? আর Venus Club ত association সদস্য।

রাজবাটী ক্লাব:—এদের প্রতিযোগিতাও প্রতি বৎসর এই সময়ে আরম্ভ হইয়া মহালয়ার দিন শেষ হইত। গত বৎসরে নাকি বিশেষ কারণে উক্ত প্রতিযোগিতা November ও December মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসরও কি তাই হইবে? রাজবাটীর Club এর সম্পাদক নির্ম্মলবাবু কি বলেন?

খেটা খেটা ক্লাব:—এদের নিখিল ভারত প্রতিযোগিতা এ বৎসরও যথা সময়ে সুরু হইবে। কিন্তু এখন হইতে তাহার আয়োজন করিলে ভাল হয় নাকি? আমরা এ সম্বন্ধে অক্লান্ত কর্ম্মী শচীবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

Calcutta North Club:—এদের প্রতিযোগিতা বেশ ভালভাবেই চলিতেছে। তবে তিন টাকা দর্শনী লইয়া এরা চায়ের যা বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাতে প্রতিযোগী-সাধারণ সকলেই দুঃখিত। আমরা এ সম্বন্ধে মিঃ রায় ও মিঃ দত্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দর্শনীর অনুপাতে অন্ততঃ জলযোগের ব্যবস্থাটাও ঠিকমত হইলেই ঠিক হয় না কি?

Bombay Club:—এরা প্রতিযোগিতা বন্ধ করিলেন কেন? এদের মত সুপ্রতিষ্ঠিত ক্লাব যদি প্রতিযোগিতা পরিচালনে অপারগ হন তবে তাহা অতীব দুঃখের বিষয়। আশা করি, বোম্বে ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষবৃন্দ এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

South Calcutta Club:—এদের প্রতিযোগিতা ভালভাবেই চলিতেছে। প্রতিযোগীবৃন্দ এদের সুমধুর ব্যবহারে ও আতিথেয়তায় বিমুগ্ধ হইতেছেন।

এপেলো ক্লাব:—শুনিতেছি এরাও শীঘ্রই প্রতিযোগিতা বাহির করিবেন। এবং এ সম্বন্ধে association সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে August ও September মাসে অন্যান্য দুইটি প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে বলিয়া (Santi Institute, South India Club) সম্পাদক মহাশয় এপেলো ক্লাবকে January মাসে প্রতিযোগিতা পরিচালনের অনুমতি দিয়াছেন।

Calcutta Sunday Club:—এরাও প্রতিযোগিতা চালাইতেছেন, এবং ভালভাবেই চালাইতেছেন। এদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশবাবুর প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতাটি ভালভাবেই চলিবে মনে হয়। তবে এই দারুণ গরমে পাখার বন্দোবস্ত না থাকায় প্রতিযোগীগণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

Grand Coup:—প্রায়ই পাঠকদের মধ্যে অনেকেই লিখে পাঠান যে, বড়

রঙএর উপর ছোট রঙ পাশান যায় কি না? তাদের অবগতির জন্যে একটী Grand Coup হাতে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে তারা অনায়াসে বড় রঙের উপর ছোট রঙ পাশাতে পারেন।

ইস্কাবন—সাতা।
হরতন—গোলাম, দশ।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—সাতা, চৌকা, দুরি।

ইস্কাবন—নাই।
হরতন—সাহেব।
রুহিতন—টেক্কা, দশ, আটা, তিরি।
চিড়িতন—সাতা।

ইস্কাবন—সাহেব, নয়।
হরতন—তিরি।
রুহিতন—চৌকা, দুরি
চিড়িতন—আটা।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, ছক্কা।
হরতন—পাঞ্জা।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—টেক্কা, গোলাম।

ইস্কাবন রঙ, 'দ'কে এই ছয়খানি পিটের মধ্যে পাঁচখানি নিতে হবে। 'দ' এর খেলা। তিনি চিড়িতনের টেক্কা খেলে নিয়ে হরতনের পাঞ্জা খেললেন। এখন 'প' পিটটি নিয়ে রুহিতনের টেক্কা খেলায় 'দ' 'উ'র হাতে দিয়ে তুরূপ করে নিজের হাত থেকে রঙের ছয় পাশিয়ে দিলেন। এবং এইরূপ করায় দরুণ 'দ' বাকী সব কয়টী পিট নিতে পেরে-ছিলেন অন্যথা তিনি কোনমতে নিতে পারতেন না। আর এইরূপ খেলার প্রণালীকে Grand Coup বলা হয়।
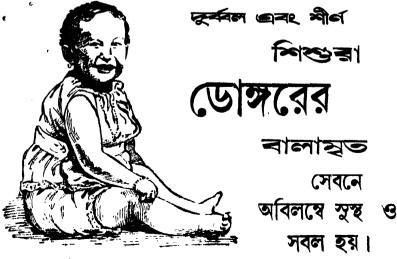
দূরে ও কাছে

শ্রীরবীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

তোমার থেকে থাকি যখন দূরে
কতই কথা আমার মনের বনে—
কমল হ'য়ে ফুটে ওঠে রাশি!
কাছে গেলে বিশ্ব গিয়ে ভুলে
অবাক হ'য়ে দেখি ও মুখ খানি;

কল্প-রঙে রাঙিয়ে যে সব
কথার মালা গাঁথি—
হেথায় দূরে ব'সে;
কাছে গেলে সকল ভুলে,
বিকাই পরাণ চরণ মূলে;
আপন উচ্ছ্বাসে।

হেথায় ব'সে কতই ছন্দে গানে
সাজাই মনের ডালা
একলা নিরজনে,
কাছে গিয়ে তাদের যখন খুঁজি;
দেখি শুধু নেই কিছু মোর পুঁজি
নিবেদিতে তোমার শ্রীচরণে।

থাক্‌লে কাছে এইটা শুধুই ভাবি
কোন্‌টা বলি—
কোন্‌টা আগে বলি,
এমনি ক'রে হয়না: কিছুই বলা,
কণ্ঠে তুমি দোলাও বাহুর মালা;
আমি দেখি নয়ন মেলি।

অবাক হ'য়ে চেয়ে মুখের পানে
রাত্রি যে যায়, ভোরের তারা জাগে,
থাকি চেয়ে, শুধুই থাকি চেয়ে,
বোলতে কিছু জুয়ায় নাক ভাষা,
চোখে লাগে তোমায় দেখার নেশা,
আমার নয়ন ছেয়ে।

আবার যখন আসি হেথায় দূরে
আমার কুটীর মাঝে,
ওগো সাথী! ওগো ও মোর সাথী!
দেখি তখন চেয়ে ম'নের পানে,
ভরে আছে না'নান গন্ধে গানে
খুঁজে তখন পাইনি পান্তি পাতি।

বোল্‌তে গিয়ে যেসব কথা
হয়নি তোমার বলা,
আজকে হেথায় দূরে,—
দেখি মনের পাতায় লেখা,
কতই প্রেমের রঙিণ রেখা
আমার হৃদয় জুড়ে।

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

বিদায় বন্ধু!

এই ষ্টুডিওগুলো নিয়েই একটা জগৎ। যেখানে আছে ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, সুখদুঃখ আর সুরের মর্মস্পর্শী ঝঙ্কার।

কবে কে জানত, আর্ণেষ্ট লুবিশ—অত বড় প্রতিভা, প্যারামাউণ্ট ষ্টুডিওর অত গুলো প্রতিভার ওপরের প্রতিভা, অতখানি শক্তি আর সম্মানের আসন ছেড়ে ছায়ালোক-বাসীর আদর-আপ্যায়ন খোসামোদ আর আলোচনার দূরে গিয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু সে গেলো ; এ খবর আমরা জানি।

আর কার্ল লেমল্

ইউনিভার্সাল মানেই কার্ল লেমল্ ; কার্ল লেমল্ মানেই ইউনিভার্সাল। সেই সেই ইউনিভার্সাল সহরে—ইউনিভার্সাল ষ্টুডিওতে আজকাল কার্ল লেমল্ এর পদচিহ্ন পড়ছেনা।

ইউনিভার্সাল সহর—ইতিহাসে তার বড় নাম। কতদিন ধরে কত কত লোক এসেছে বেড়াতে এই সহরে।

সহরটা চিতোর কিম্বা বারাণসী।

এই সহরের মুকুট যার মাথায় ছিল সে হচ্ছে কার্ল লেমল্।

তার মাথার মুকুট, তার মাথার তাজ আজ অপরের মাথায়। রাজদণ্ড আজ অপরের হাতে। উনষষ্ঠি বৎসরের বৃদ্ধ আজ বিদায় নিলে। ছোট নেপোলিয়ানের পতন হোল। পঁচিশ বৎসর পর ছায়ালোকের প্রবীন-যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলে।

কত লোকের চোখের জলে রুমাল ভিজল। তারা বল্লে: প্রিয়তম বন্ধু, বিদায়।

আর্ণেষ্ট লুবিশ

ইউনিভার্সালের যুগান্তর

ইউনিভার্সালের চলার পথ বদলালো।

নতুন লোকের হাতে হয়ত আরো আধুনিক হবে, স্বর্গে যাবার ছায়াপথ খুঁজে বার করবে।

তবু তাদের ছবি, তাদের অপরাজেয় অবদান—"দি হাঞ্চ ব্যাক অব নোটরডেম", "ফ্যাণ্টম অব দি অপেরা", "ফুলিশ ওয়াইভস", "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট", "ওনলি ইয়েসটারডে", "লিটন ম্যান হোয়াট নাউ", "ড্রাকুলা", "ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন" কেউ কোন দিন ভুলতে পারবে না।

তাই ইউনিভার্সালের রোমাঞ্চকর, লোমহর্ষক ছবি শ্রেষ্ঠত্ব এবং উৎকৃষ্টতার গুণে নাম পেয়েছে সকলের চেয়ে বেশী।

এরা!

নামের জগতে প্রথম পরিচয় পেয়েছে ইউনিভার্সালের অন্দর থেকে এরাই। এই লন চ্যানি, এরি ভন ষ্ট্রোহেম, লিউ আয়াস, এডওয়ার্ড আরণল্ড, মার্গারেট সুলাভ্যান, আইরিন ডুনে, জন্ বোলস্, বরিস্ কারলফ, বেলা লুগোসি এবং অন্যান্য আরো আরো অনেকে। এমন দিন ছিল যেদিন ষ্টুডিওর সঙ্গে এদের অনেকের বাঁধা ধরা কোন চুক্তিই ছিলনা। এরা পাট পেয়েছে, অভিনয় কোরেছে ; সে অভিনয়ে জগৎ তুষ্ট হয়েছে, যশের মালা তাদের গলায় দুলিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু, যে প্রথম পরিচয় এদের আমাদের কাছে করালে তার নাম হচ্ছে কার্ল লেমন্।

ফ্রান্সেস্ ড্রেকের বিয়ে

ফ্রান্সেস্ ড্রেক ভারী ব্যস্ত। ওর বিয়ে হয়নি তবু লোকে ওর বাড়ীতে আসচে, ওকে চিঠি দিচ্ছে আনন্দ করে, আশীর্ব্বাদ করে।

একি বিপদ! বিয়ে ওর হয়নি, তবু লোকে বলবে ওর বিয়ে হোল জেসি এল ল্যাস্কির সঙ্গে। কত বড় মিথ্যে কথা বলুন তো। ফ্রান্সেস্ যে বিয়ে করেনি সেই কথাই প্রমাণ করতে ওর এত ছুটোছুটী।

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম। কয়েক সপ্তাহ আগে কে এক নাচিয়ে মেয়ে ফ্রান্সেস ডোনা ড্রেক-এর সঙ্গে জেসি এল ল্যাস্কির বিয়ে হয়। তারই ফলে এই গুজব।

কাজেই আপনাদের কেউ যদি ওই ভুল গুজবটা শুনে থাকেন তাহলে এখন জানুন সেটা ভুল।

ফ্রান্সেস হচ্ছে ব্যালেট নাচিয়ে। ছায়া-ছবির সঙ্গেও তার কোন সম্বন্ধ নেই।

স্বামীর প্রেম-বন্ধন ভয় ফ্রান্সেস-এর আর রইল না। দূর হোক তার শুভ আশীর্ব্বাদ, কামনার অখণ্ড প্রীতি।

ম্যাক্স ইভান্স-এর মহাবিপদ

ম্যাক্স ইভান্সএর সঙ্গে মেলোড্রামার মিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ মেলোড্রামাতেই ম্যাক্স ইভান্সকে দেখতে পাওয়া যায়।

সেই ম্যাক্স ইভান্সের জীবনে নাটকের মত একটা সত্যিকার দৃশ্য সম্প্রতি ঘটে গেল। বদমাইসের বন্দুক ওর বুকের সামনে দাঁড়াল আর ত্রিশ ডলার নিয়ে উধাও হোল। বেভার্লি পাহাড়ে ষ্টারদের বসতি স্থানে এমন দুঃসাহসিক রাহাজানি এক রকম অসম্ভব; কারণ গায়ে গায়ে বাড়ীগুলি পাহারায় আছে—দিনে এবং রাতেও।

কতদিন, কত রকমে ভয় দেখানোর কথা আমরা শুনেছি। ষ্টারকে চুরী করে নিয়ে যাবার ভয় দেখানো ওখানে রোজকার খবর। কিন্তু বেভার্লি হিলে এমন ডাকাতির কথা শোনা যায়না।

তার ভাই টম্ আর অভিনেতা রাসেল হার্ডি ডাকাতি হয়ে যাবার পর এসেছিল দেখা করতে।

একটা কথা প্রায়ই শুনি যে, মেট্রো-গোলড্উইন মায়ারের সঙ্গে ম্যাক্সের যে চুক্তি আছে সেটা নাকি ওর পছন্দ হয়না। পছন্দ হয়না এই কারণে যে পার্ট ওকে দেওয়া হয় তা ওর মনের মত নয়। সেগুলো খুব কম জরুরী পার্ট। "লাভার্স কারেজিয়াস" বলে একখানা ছবিতে ও কয়েক বছর আগে অভিনয় করে। সে ছবির পার্ট ছিল ওর মনের মত। ও বলে, 'মনের মত পার্ট পাইতো ওই রকম পার্ট। ও ছবিতে ওর সঙ্গে নামে রবার্ট মণ্টো-গোমারী।

ম্যাক্স এখনও ভালবাসে টম গ্যালেরীকে। টম হচ্ছে ক্রীড়ালোকের লোক।

বিচক্ষণশালিনী মার্লিন

রূপমতী মাতা! ছায়া জগতের গরিয়সী কলাকুশলা মার্লিন ডিয়েট্রিক। মেয়ের গর্কের মা! আদরের মা!

সে মেয়ে। ছোট্ট মেয়ে মেরী, ছায়া-জগতের মার্লিনের মেয়ে মেরী, তার মায়ের সব অভিনয়, সব ছবি দেখতে পায়না, কারণ ভবিষ্যতে তার নৈতিক চরিত্র দূষিত হতে পারে এই তার মায়ের অভিমত।

মার্লিন চায়না দুনিয়াবাসীর মনের অঙ্গনে রঙীণ তুলি টানতে—কামনার যে রূপ শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্যে পর্দ্দার বুকে ফুটিয়ে তোলে, তা তার এই ছোট্ট মেয়ে মেরী, দেখুক

মেরী দেখেছে তার মার অভিনয় শুধু দুখানা ছবিতে, এক 'সাংহাই এক্সপ্রেস', দুই 'ডিজায়ার'।

বিয়ের কথা মিথ্যে

রবার্ট টেলর নাম করেছে অল্পদিন। তবু অল্পদিনেই ও যে সুনাম পেয়েছে তা অনেকের ভাগ্যে জোটে না।

ও কথা যাক!

কথাটা তাহলে নেহাৎ বাজে। রবার্ট তো একেবারেই অস্বীকার করলে। লোকে কত রকমই যে গুজব রটায়। রবার্ট বল্লে: বিয়ের কথা, বাজে কথা। ও রকম কোন কথাই আমাদের হয়নি।

তবে স্বীকার করেছে, প্রেমটা ওদের মিথ্যে নয় অর্থাৎ বারবারা ষ্ট্যানউইককে ও প্রাণের মত ভালবাসে।

মার্লিন ডিয়েট্রিক

আমার কথা, ওদের বিয়ে হবে এবং তা খুব শীঘ্রী।

খুচরো খবর

১। জোয়ান ক্র্যাফোর্ড রোজ তার বাড়ীর পুকুরে সাঁতার কাটে। ওটাই তার প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়াম।

* * *

২। বার্লিনে প্রথম মার্লিন ষ্টেজে অভিনয় করতে নামে ম্যাক্স বেন হারড্‌ট্‌-এর সঙ্গে।

* * *

৩। জোয়ান ক্র্যাফোর্ড রোজ সকালে লেটের ওপরে গরম কোকো খায়।

* * *

৪। ক্লেয়ার ট্রিভর এর 'ষ্ট্যাণ্ড ইন' হচ্ছে গ্যালা লিস্। মেয়েটি রাশিয়ার রাজকুমারী।

* * *

৫। ছবিতে নামবার আগে মির্ণালয় ছিল ভাস্কর।

মিলন-বাসরে

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়চৌধুরী

আমার কথাটি
হারায়ে ফেলেছি
তোমার বালুচরে
তোমার প্রেমের
ছাদ্‌নাতলায়
তোমার খেলাঘরে

তোমার কালো ডাগর চোখে
তোমার চির কল্প লোকে
তোমার মিলন
বিরহ দোলায়
চির জনম তরে।

সারাটি রজনী
কাটান্ন বিফলে
তোমার আঙিনায়
জাগিয়ে শিয়রে
বধুহে তোমার
রূপের জোছোনায়,

তাইতো আমার খুটিনাটি
এ বিদায়ের শেষ কথাটি
হয়নি কওয়া
মিলন-বাসরে
মনের মতো করে॥

তরী ও তুফান

শ্রীসুশীল রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে-ঈশান স্কুলে সে জীবনে অধ্যেতা-রূপে অধ্যুষিত হয়নি তারি শ্যামল প্রাঙ্গনে সে আজ বান্ধব-সম্মিলিত হ'য়ে আলোচনার, সমালোচনার এবং গান্ধীবাদের প্রধান বাগ্মিরূপে অধ্যাসিত হ'য়ে সবার মুখ উজ্জ্বল ক'রে তুলছে। সমালোচনার প্রতি স্তরে স্তরে তার নতুন প্রেরণা কোথা হ'তে যেন এসে যায়, রোমাঞ্চময় স্পষ্টবাদিতা! অনলস মুখরতা। ঝর্ণার মতো ঝর ঝরানীর অফুরন্ত বাণীর পসরা নিয়ে, আজ ভজহরি ভাদুড়ি কোমরে কাপড় বেঁধে উগ্রচণ্ডা হ'য়ে উঠেছে। অবলীল ভঙ্গীতে, ভাবে, ছন্দে, কথায় আজ ভজহরি উলঙ্গ।

তার বন্ধুরা কেও হাসে, কারণ না-হেসে তারা পারে না। এই ভজহরির কথা তাদের মনে প'ড়ে যায়। সেই অতীত দিনের একত্রীকৃত কতকগুলো ঘটনার ছোটো খাটো গাছপালা হঠাৎ বৃহৎ হ'য়ে ওঠে। যে ভজহরি ক্লাশে হাঁদার মতো ব'সে থাকতো, প্রচণ্ড গম্ভীরতার আওতায় যে বাস করতো! আজ সে-ই কি না চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। তাদের মনে পড়ে ডাংগুলি খেলতে গিয়ে সামান্ত একটু আঘাতেই ভ্যাং ক'রে কেঁদে দিয়েছিল এই ভজহরি। তারপর ইস্কুলে মাষ্টার মশাই বেরিয়ে গেলে তাঁর চেয়ারে গিয়ে বসবার জন্যে ফাইন্ হ'য়েছিলো এই ভজহরির। আর, হাফ্ইয়ার্লি এগ্-জামিনেশন্এ অঙ্কে গোল্লা পেয়েও এর অহঙ্কার; তাদের মনে পড়ে বাচ্চা কতকগুলো ছেলেকে এর পেছুনে লেলিয়ে দিয়ে কী রঙ্গটাই হ'তো একে নিয়ে। পণ্ডিতমশায় সপ্তাহে অন্ততঃ চারদিন জুলপি ধ'রে টেনে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এই ভজহরিকে।—কিন্তু সে-সব পড়া-না-করবার জন্যে তত নয়, যতটা নির্ব্বুদ্ধিতার কারণে। সেই জন্যেই তাদের হাসি পায়। ঈশান স্কুলে পাড়ার যারা প'ড়তো তারা তা'কে ডাকতো Zilla school-এর A ডবল S ব'লে। পঁচিশটাকা খরচা ক'রে America থেকে F. O. O. L. ডিগ্রিটা অচিরেই আনিয়ে নেবার জন্যে বন্ধুরা তাকে অনুরোধ করতো—না হয় তারাও কিছু চাঁদা দিতে পারে। Matriculation পাশ করবার পর তার বন্ধুরা তাকে চিঠি লিখতো, তার খামের ওপর লিখে দিতো Vajohori Vaduri M. A. (Trick) তথাপি ভজার সগর্ব্ব স্মারবক্ষ সামান্য আধ ইঞ্চি সঙ্কুচিত হয়নি।

তার বন্ধুরা তাকে গল্প বলতো, সমস্ত সত্য ঘটনা, তারা নাকি নিজে চক্ষে দেখেচে: দীনেশ যখন প্রথম হাজারিবাগ যায়, একটা আশ্চর্য্যরকম ট্রেন্-য়্যাক্সিডেণ্ট দেখেছে। ব্যাপারটা হচ্ছে: দুপুর, এই একটা নাগাদ সে ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালে, ওদিক থেকে বম্বে মেইল হৈ হৈ ক'রে ছুটে আসচে আর, আর এদিক থেকে তুফান মেইল। লাইন ক্রশ করবার জন্যে একটা লোক যেই নেবেছে প্লাটফর্ম থেকে, উঃ অসম্ভব কাণ্ড, গায়ে কাঁটা দ্যায়। লোকটার গলা থেকে একেবারে দু'আধখানা। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, সেই অবস্থায়ই সেই লোকটা চীৎকার ক'রে বলছে—আমার মাথা, আমার মাথা, আমার মাথা কই! আর একজন বলে: এ তো গেল তুফান মেইলে, আর বম্বেটায় আর একজনের ওপাশে, সে বোধ'য় আরো আশ্চর্য্য,—কোমড় থেকে কেটে বেরিয়ে গেলো তবু কি ছুট্ ট্রেনের পেছন পেছন, আমার পা দিয়ে যাও, আমার পা দিয়ে যাও। কারণ তার lower part চাকার সঙ্গে বেঁধে ছিলো। পা পেলো না লোকটা সারারাত ব'সে ব'সে কাঁদলো।

গল্প শুনে ভজহরি ফ্যাল-ফ্যাল করে সবার মুখের পানে চায়। কিন্তু তাকে অবশেষে ব'লতে হয়—কি আশ্চর্য্য!

বন্ধুরা দম আটকিয়ে থাকে। কারণ সে-আবহাওয়ায় হাসতে গেলেই বিপদ। সেই ভজহরি কিনা আজ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে!

ভজহরি বলে—সবাই যাবে মন্দিরে। কেন, দেবতা কি তাদের নয়? তারা কি দেবতার নয়? চণ্ডাল হ'য়েছে আর তার জাত গেছে। জাত কি, Can you illustrate it? গান্ধী বলেন,—হরিজন হরির জীব।

মাখন বলে: গান্ধীর জীব।

ভজহরি ব'লে ওঠে: একই কথা। মহৎ ব্যক্তি আর ভগবান সমান কথা। There's no God where none's noble. পড়ো নি?

তারা পড়ে নি। কারণ ভজহরি আজো বই ছাপেনি। ভজহরির প্রতিটা উক্তি যেদিন রবীন্দ্রের মতো হ'য়ে উঠবে, শুধু মাত্র সেই দিনই—এ-সব তার বন্ধুরা প'ড়বে।

কিন্তু এ কথার মধ্যে থেকে ভজহরি কোন্ পথে যেতে চায় বন্ধুরা বোঝে না। তারক কেবল শোনে, কোনো প্রতিবাদ করবার তার প্রবৃত্তি হয় না। বন্ধুদের মধ্যে যে-বন্ধুটা বোকা তাকে নিয়ে রঙ্গ করবার দিন আর নেই। এখন বোকাকে চালাক করবার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ভুঁই চাঁপার মতো জেগে উঠেছে, যৌবনের বারিধারায়। তাই তারক চুপ করে থাকে!

ভজহরি পকেট থেকে একটা বিড়ি বা'র করলো, তার গলা শুকিয়ে এসেছে। ধরালো, উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অফুরন্ত হাওয়ায় ধোয়া মুহূর্তের মধ্যে আকাশের বুকে আত্মগোপন করে।

এ-সময়টুকু সান্ধ্য বাতাসে ব'সে অন্য কারো সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে সময় অতিবাহিত হ'লে, তাকে সময়ের অসদ্ব্যবহার ব'লে ধরা যেতো না। কিন্তু এ নেহাৎই ভজহরি। তাই মাখন লাফিয়ে উঠ্‌লো: যাই।

ধীরে ধীরে সকলে হৈ-চৈ ক'রে স'রে পড়বার চেষ্টা শুরু ক'রে দে'য়াতে ভজহরির কান্না পেলো। এদেরকে পর্য্যন্ত সে ব'লতে পারলো না!

নদীর থেকে যে-পথটা সোজা সহরে এসে ঢুকেছে, তারা যখন সবাই সেই রাস্তায় পা দিয়েছে—ভজহরির আর একবার কান্না পেলো। লাল সুর্কির রাস্তা, অতি চমৎকার! ধূলা উড়িয়ে মটোর গাড়ি হুহু করে ছুটে যায়, আর সেই লাল ধূলো মটোরের পেছুন-পেছুন ছোটে। ডে-লাইট্-এর পেছনে এক লাল পতঙ্গের মতো। রাস্তার দু'ধারে গাছ, অশ্বত্থ, পাইকর, দু-একটা দেওদার। দূর থেকে নদীর পানে চাইলে মনে হয় কী বিরাট একটা টানেল্ যেন! এমন চমৎকারভাবে গাছগুলো ডালপালা জুড়ে নিয়েছে। কিন্তু ভজহরির এ-সব ভালো লাগেনা। বর্ষার জলে ভিজে পথটা আজ যেন কেমন মোলায়েম হ'য়ে আছে। তবু ভজহরির ভালো লাগে না।

সে-ও পথে উঠে এলো। 'বন্ধু-কুটীর' এর বাঁকে দাঁড়িয়ে পুরানো ভক্তটার শরীরের ভর দিয়ে ভজহরি দাঁড়িয়ে প'লো। এই খানে তারকের বাড়ি। মাখন থাকে কলেজ-এর পেছনে, দীনেশ বাজারের দিকটায়।

—ওরা সব্বাই চ'লে গেলো? ভজহরি প্রশ্ন করলো তারককে।

তারক বললো, হ্যাঁ, গেলো তো। আবার ওদের নাকি অনেক কাজ আছে।

ভজহরি বললো খুব অন্তরঙ্গভাবে—তোর তো কাজ নেই। চল একটু ঘুরে আসি। মেয়েদের যাত্রা হ'লো নাকি এখানে?

কিন্তু তারক সে-প্রশ্নের জবাব দিলো না, বললো—চল্। কদ্দূর যাবি?

—চল্। এই অলিপুর-কালিপুর ঘুরে···

তারা চ'ললো।

আবার নদীর রাস্তা। মেয়েদের ইস্কুলটা নিস্তেজ হ'য়ে একাকী পড়ে র'য়েছে। ভজহরি সেই দিকে একটু তাকালো। অশ্বত্থ গাছের ডালগুলো যেন ইস্কুলটাকে ঝেপে ধ'রেছে। অতি ছোটো পাঠশালা প্যাটার্নের বিদ্যাপীঠ। ওই শ্যাওলা-পড়া একতলা ভাঙা বাড়িটা থেকেই মেয়েরা লেখাপড়ার থেকে বেশি ঢঙ্ শিখে বেড়িয়ে আসচে। সেই কলকাতার গেজেটে তাদের নাম উঠে। ডায়োসেশন্, ব্রাহ্মো, ভিক্টোরিয়ার পাশা-পাশি এরো নাম। স্যোঃ। ভজহরি থুথু ফেললো।

তারক বললো—দাঁড়া সিগ্রেট কিনি। স্নো ভ্যু না বম্বে স্পেশ্যাল?

ভজহরি বললো—কেন্ য'-তা। পাল-মাল, পাসিংশো একটা হ'লেই হ'লো।

না, তারক বিড়ি কিনবে। তার কারণ সে গান্ধীকে বেশি পছন্দ করে না। আর স্বাদেশিকতার বেশি আড়ম্বর দেখায় না। মিলের সার্ট মিলের ধুতি ব্যস্।

একটা ছোটো সাঁকো। তার নিচ দিয়ে একটা ঝিল এঁকে-বেঁকে বেরিয়ে গেছে। তার ওপর শাদা শাদা নালফুল চ্যাটালো পাতার সঙ্গে নীরবে কথা কয়। সারাদিন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আপনারি ভুয়োর পানে, বিমুগ্ধ নয়নে। পথটা ঢালু হ'য়েই কোমর ভেঙে বাঁ দিকে ছুটে গেছে। বাঁকের সমুখেই মস্ত সিঁড়িওলা শাদা বাড়িটায় ভজহরি যাবে। বাড়ীর সমুখে খানিকটা অসমতল সবুজ মাঠ, উঁচু নিচু ঢেউ-খেলানো।

ভজহরি দাঁড়ালো।

—তবে তারক, আমি চলি।

—কোথায়?

—এই এখানে একটু যাবো।

তারক দ্বিরুক্তি না ক'রে মুখ ঘুরিয়ে সাঁকোয় উঠে ও-দিকে নেমে গেলো। ভজহরির অভদ্রতায় সে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হ'য়েছে।'

ইজি চেয়ারে ব'সে শরীরের উপরার্দ্ধ খবরের কাগজে ঢেকে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা কিম্বা সাবিত্রীরাণীর শ্লীলতা-হানির ঘটনা পড়ছিলেন। ঘটনা দুইটি বলবার কারণ আর কিছু নয়। পত্রিকা জগতে এমন একটি যুগ এসে যায় যখন তাদের সেই যুগ মাফিক চ'লতে হবেই, একটি কিছু সংবাদ নিয়ে মুখর হ'য়ে তারা পত্রিকার পাতা ভ'রে দেবার যাদু জানে। আর পাঠকরাও জানে মনোনিবেশ ক'রে প'ড়তে—বিশেষতঃ পরের ঘটনা অনুরূপ অন্ত কিছু। আর, এ পাঠক যখন ভজহরির জানা লোক আর সমবয়সী।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হ'তেই কাগজ হাত থেকে খ'সে গেল: আরে, অকস্মাৎ Surprising check! কি মনে ক'রে? তোমার বিয়ে করবে?

ভজহরি আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়।

—জানি, জানি! শুনেছি সব। কি এক মেথরকে নাকি নিয়ে প'ড়েছো।

ভজহরির চোখ দু'টো বড়ো হ'য়ে ওঠে।

—থাকি তো কলকাতা সহরেই! শুনিও সব। মেথরানীটা তোমাদের মেস্এই থাটে নাকি?

ভজহরি বেতের চেয়ারটায় হাঁদার মতো মুখ ক'রে ব'সে প'ড়লো।

—কি, ব্যাপারটা কি বলো তো। কানাঘুষা কিছু কিছু শুনছিলাম বটে।

ভজহরি ইনিয়ে-বিনিয়ে ঢোক গিলে এদিক-ওদিক চেয়ে হেসে কুটি কুটি হ'য়ে সমস্ত প্রায় খুলে ব'লেছে, ভদ্রলোকটি ব'ললেন: Heaven, হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি আবার শুনলাম, রোজ 'প্রভাতে ও-মুখ' দেখতে দেখতে তুমি নাকি মেথরানী-টাকেই ভালোবেসে ফেলেছো! আর দোষই বা কি 'যার যাতে মজে মন' বইত আর কিছু নয়। তা' তুমি তা'লে তো অনেক টাকা পাচ্ছো! কাঁকাকে ব'লেছ?

না, ব'লবো আজ।

—ব'লে ফ্যালো, ব'লে ফ্যালো। কিন্তু আমি এখানে তোমাকে কে ব'ললে?

—ছোট খুড়ি।

—হ্যাঁ, মণির কাছে গিসলাম কাল সন্ধ্যের সময়।

হ্যাঁ, ভদ্রলোকটির পরিচয়। ইনি হচ্ছেন ভজহরির ছোটখুড়ির দাদা। ভজহরির সঙ্গে কলকাতার কলেজে কিছুদিন প'ড়ে পাশের বাড়ীর মেয়েটাকে নিয়ে direct কাশ্মীর চ'লে যান্। একটী পুত্র সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রতি ঢাকায় ফিরেছেন। আসচে অঘ্রাণে তাঁদের বিয়ে হবে। এটি আবার তাঁরই বন্ধুর বাড়ী। সুগঠিত চেহারা, টানা দুটো চোখ, মেয়েরা তাই তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়, আর নিচে না তাকিয়েই ঝাপ দ্যায়। নাম দিয়ে দরকার নেই কারণ ইনি আর অধিক কাজে লাগবেন না আমাদের—ধরুন—না হয় এর নাম রমনীমোহন। হালদার বাড়ীর মেয়েটা নাকি এর সঙ্গেই ফিস্‌ফিস গিসগিস ক'রতে সুরু ক'রেছে। আর এইটেই হচ্ছে ছোটখুড়ি কথিত হালদার বাড়ী।

ভজহরি সটান্ ভেতরে চ'লে গেলো। ও ঘরে ঢুকেই দেখে বাসন্তী নিচের দিকে সেমিজটা টেনে ধ'রে বুকের ঘামাচি গালছে। ভজহরিকে দেখেই লজ্জা পাবার চেয়ে তার বেশী হাসি পেলো। খিলখিল ক'রে হেসে গুড়োগুড়ো হ'য়ে যায় যেন।

লাফিয়ে উঠে ভজহরির কাছে চ'লে এলো, স্বৈরিণী প্যাটার্ণের একটু হেলে দুলে হাসি দিয়ে ব'ললো—অমন ভাবে চোরের মতো ঘরে ঢুকতে হয়! ভাখো তো আমি কেমন লজ্জা পেলাম!

কেমন লজ্জা সে পেয়েছে তা ভজহরি না দেও আর সকলে বুঝতে পারবে।

ভজহরি কাঁধে একটা ঝাকানি দিয়ে লো, আছিস কেমন?

—ভালোই! প্রতি বাক্‌ভঙ্গির সঙ্গে তার আত সূক্ষ্ম নিখুঁৎ একটি চণ্ড নোট বুকে টুকে নেবার মতো দামী: তুমি আছো কেমন? মেথর বিয়ে করছো নাকি?

ভজহরি হেসে ফেললো; ফরিদপুরময় এক সাড়া। আরে, সে কি মেথর? বেথুনে পড়ে ফোর্থ ইয়ারে। মস্ত বড়লোকের মেয়ে। পলাশীর যুদ্ধের সময় তাদের পূর্ব্ব পুরুষরা হয়তো মেথরের কাজ করেছে।

—ও রাধে, আমি আবার শুনলাম···

তোর মুণ্ডু, ব'লে ভজহরি দু'হাত দিয়ে তার মাথাটা ধ'রে একটু ঝাকি দিলো। বাসন্তীর মুখের ওপর একটা করুণ ছায়া। মেয়েমানুষের স্বভাব ও বর্ষা ঋতুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সেদিন ভজহরি খুঁজে পেয়েছিলো। সে কিছুক্ষণ অবিচলিতভাবে, বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

বাসন্তী আঁচলটাকে ঘন করে গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে নিলো। বাইরে একটা পাপিয়া কেঁদে উঠলো মগডালে।

ভজহরি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। অকস্মাৎ তার জামার আস্তিন ধ'রে বাসন্তী টেনে ধ'রলো; একটু দাঁড়াও না।

ভজহরি দাঁড়ালো: কেন?

সমস্ত কথা বাসন্তী হারিয়ে ফেললো, চারিদিক থেকে কুড়িয়ে কাড়িয়ে যেটুকু পেলো তাই গুছিয়ে নিয়ে সে ব'ললো; কথা আছে। ভয় কি? মা রাধছে, দাদা গেছে বাজারে আর তো কেউ নেই বাসায়। ভয় কি?

এত অভয় বাণী শুনে সত্যিই ভজহরির ভয় হ'লো। যদি কেও পাছে···

—তুমি আমাকে একেবারে ভুলে যাবে তো? বাসন্তী এখন ব'লতে পারছে; তবে অমন করে তুমি একদিন আমার প্রলোভন ভাখালে কেন? আমার কাছ থেকে তুমি সমস্ত আদায় করে নিলে আর আজ······

আশ্চর্য্য বাসন্তী কাঁদতে জানে? তার প্রথম রূপ দেখে কখনই বুঝতে পারিনি প্রগলভা, স্বেচ্ছাচার এ মেয়েটির চোখে জল আসবে।

ভজহরির মাথায় প্রকাণ্ড একটা আকাশ ভেঙ্গে প'ড়লো। সে বাসন্তীর চোখের পানে চাইতে পারলো না। আবার বেরিয়ে যাবার দুর্ব্বল, অসহায়, কাতর একটা প্রচেষ্টা করলো।

বাসন্তী ব'ললো; এই সংবাদটা দিতে এসেছিলে তো? আচ্ছা যাও। হ্যাঁ শোনো।

ভজহরি এবার ব'লতে পারলো; যে মেয়ের নামে সহরে ঢি ঢি পড়ে আমি তাকে উপেক্ষা করি।

—অ্যাঁ! পাড়ায় ঢি ঢি, সহরে? অসম্ভব! মিথ্যা। বাসন্তী নিমেষে রাক্ষসীর মতো উগ্র হ'য়ে উঠলো; বদনাম আর কোন পুরুষে জানো? যার পুরুষত্ব নেই, যে দুর্ব্বল। আচ্ছা যাও।

ভজহরি গেলো না; তোমার বাবার বন্ধুর সঙ্গে। যিনি বাইরে ব'সে আছেন। তাঁর সঙ্গে, ওই চরিত্রহীন জানোয়ারটার সঙ্গে।

—জানোয়ার? (বাসন্তীর স্বর নেমে এসেছে) উনি জানোয়ার হ'লেন কি কারণে? কারণ মেয়েটাকে নিয়ে কাশ্মীর গিয়েছিলেন, সবাই জেনেছে। তার তুমি? তুমি কাশ্মীর যাওনি, ফরিদপুরেই ছিলে, এই তফাৎ, আমায় চরিত্রহীনা সাজিয়ে তুমি সাধু ব'সে গেলে। এই জগৎ! ছি ছি।

এত কথার জন্যে ভজহরি প্রস্তুত ছিলো না। আর সে জীবনে কল্পনায়ও ভাবেনি সেই নীরীহ শান্ত হেসে-আটখানা হওয়া বাসন্তী এমন কথা গুছিয়ে ব'লতে জানে। সে শুধু জানতো বাসন্তী জানে শুধু গা ঢেলে দিয়ে ভাব করতে। কিন্তু সে-সব তার উল্টে গেলো। সে মনে মনে ভাবলো বাসন্তীকে বিয়ে না করলে কেন সে তাকে······

বাসন্তীর চোখের আগুন স্তিমিত হয়ে এসেছে।

ভজহরি ঘর থেকে আবার বেরিয়ে যেতে চাইলো।

বাসন্তী তাকে ডেকে বলে ফেললো; একটা চুমু খেয়ে যাও! একটা করুণ আব্দারী সুর।'

ভজহরি অনড় দাঁড়িয়ে রইলো; যতকিছু অপ্রত্যাশিত আজ সে বাসন্তীর কাছে তার সবই পাচ্ছে।

—খাবে না?

ভজহরির মাথা নাড়বারো শক্তি অবলুপ্ত হ'য়ে গেছে যেন।

বিদ্যুল্লতার মতো কোমল উজ্জল দুটি বাহু দিয়ে ভজহরির কাঁধ জড়িয়ে ধ'রলো; শেষ চুম্বন! খাবে না?

—না। ভজহরি ব'লে ফেললো।

আবার প্রেতিনী হানা দিয়ে প'ড়লো বাসন্তীর মধ্যে; না? একদিন দিন ছিলো, কাতর অনুনয়েও তোমার অনেকদিন বিকলে কাটিয়ে দিতে হয়েছে। আজ দেখে নিচ্ছিলাম। বেশ, যাও।

—তুমি ইস্কুল যাবে না?

বাসন্তী নির্ব্বাক। কেবল তার অতি লঘু গোলাপী অধরোষ্ঠে ক্রোধের উপেক্ষিত, হওয়ার একটা সকাতর ইঙ্গিত। তার চোখে জল এলো।

ভজহরি বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু বলবার কথা খুঁজে পেলো না, না বা ঘর থেকে বাইরে যাবার সামর্থ্য। সে দাঁড়িয়ে রইলো। ওদিকের রান্নাঘর থেকে হ্যাঁক্‌হ্যাঁকানী একটা আওয়াজ আসচে।

ভজহরি ডাকলো বাসন্তি!

বাসন্তী কাঁদচে।

—আচ্ছা', বলবে কি টি টি প'ড়েছে।

দু'তিনবার ঢোক গিলে বাসন্তী ব'ললো।—

ভজহরি তোতলাদের মতো 'প'এ' বেধে গেলো যেন। অনেক ভেবে চিন্তে সে মরীয়া হয়ে ব'লে ফেললো—ওই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে গোপনীয় কী কথা তোমার থাকতে পারে? শুনলাম রাতদিন······

—সব গোপনীয় বুঝি তোমার সঙ্গে? বলো না ওসব কথা। হিংসেয় ম'রে যাচ্ছো তো? ব'লেছি আমার দরকার ছিলো। সহর জেনেছে, আমার তাতে trash। ব'লে আঁচলটা চোখের কোণায় তুলে নিলো বাসন্তী।

ভজহরির মনে দুঃখ হ'লো। অন্ধদেবতা সকলের ওপর সমান আশির্ব্বাদ ঢেলে থাকেন; মুর্খ, জ্ঞানী, চিন্তাশীল, নির্ব্বিকার সব্বাই-ই অন্ধ বালকের কঠোর পূজারী। এ-দৃশ্য দেখে যদি কেউ ভেবে থাকেন, ভজহরির হঠাৎ এ দশা হ'লো কী ক'রে, যে বিনা ত্রিসংসারের একটা ক্রীড়নক! যদি কেও ভেবে থাকেন; তিনি ভুল ক'রেছেন। তিনি যেন নিজেকে অসীম বুদ্ধিমান বিবেচনা ক'রে আর এমন ঘটনা তার জীবনে কেন ঘটলো না ভেবে কুণ্ঠিত হ'য়ে না পড়েন। তিনি যেন বিশেষ দুঃখিত না হ'ন। হঠাৎ একদিন এ-দিন এসে যেতে পারে বই কি!

ভজহরির মনে দুঃখ হ'লো। তথাপি তার দুঃখের কোনো কারণ নেই। হাতের ধুলো বালি নিক্ষেপ ক'রে সে মুঠো ভরে মুক্তো কুড়িয়ে নেবে। আজ বাসন্তি—পড়ে তো ছাওলা পড়া একটা ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাশে, সে কিনা বরাই দেখাতে এসেছে! ভজহরি দুঃখ ভুললো।

ভজহরি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। বাসন্তি ব'ললো—হ্যাঁ;

—হ্যাঁ কি বলো! আমার কাজ আছে, মিছে দেরী করিয়ে দিয়ো না কিন্তু! ভালো হবে না! ভজহরি রুখে দাঁড়ালো।

—মন্দটাই বা কী হবে শুনি! কেলেঙ্কারী রটাবে! বাসন্তী হালদার তার তোয়াক্কা করে না। যে পুরুষ নিজের বলিহারী জাহির করে কেলেঙ্কারী ডুবিয়ে, তার দে'য়া অপযশে কী যায় আসে? বাসন্তী উগ্রচণ্ডা।

সমস্ত রাত্রির অনিদ্র ট্রেন্ ভ্রমণে ভজহরির শরীরটা অসুস্থ। কোনো-রকমে সে এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। অনেক কষ্টে এবার সে বাধাহীন বেরিয়ে এলো চৌকাঠের বাইরে। পেছন থেকে একটা করুণ কণ্ঠস্বর তার কাণে আঘাত করলো: তবু তুমি আমায় ভুলে যেয়ো না যেন, বুঝলে?

তার নিজের অজান্তেই গতি লঘু হ'য়ে এলো, পেছনে চেয়ে দেখলো দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

বাইরের ভদ্রলোকটি এখনো ধোঁয়া ছাড়ছেন। ভজহরির ইচ্ছে হ'লো সে একটু বসে। সামান্য একটু আলাপ করবার আকাঙ্খা তার মনে এলো।

ভজহরি মাথা নিচু ক'রে কী যেন ভাবছে।

ক্রমশঃ

ক্যারোল লম্বার্ড এখন অভিনয় কোর্‌ছে ইউনিভার্‌সেলের "মাই ম্যান্ গুড্‌ফ্রে" ছবিতে। ওপরের ছবিতে তন্ময়তার মহিমায় তাকে কোরে তুলেছে মূর্ত্ত।

পরিচালক
টেলিগ্রাম ‘স্ব [illegible]রিটি’ | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ ৯, রামময় রোড, কলিকাতা | টেলিফোন পার্ক ৩২৪
সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ই ভাদ্র ১৩৪৩, ২৭শে আগষ্ট ১৯৩৬

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা আলোচনার পর কংগ্রেসের নির্ব্বাচন প্রচার-পত্র (Election Manifesto) গ্রহণ করিয়াছেন। নির্ব্বাচন প্রচার-পত্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেস যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অবশ্য কতকটা আশাপ্রদ। নির্ব্বাচন ইস্তাহারের ঐ অংশে বলা হইয়াছে যে, “নূতন শাসন-তন্ত্র অগ্রাহ্য করাতেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। নূতন শাসন তন্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেস উদাসীন নয়, নিরপেক্ষও নয়। তীব্র ভাষায় কংগ্রেস বাঁটোয়ারার নিন্দাবাদ করিতেছে এবং উহার অবসান কামনা করিতেছে”। কংগ্রেসের ১৯৩৪ সালের “না-গ্রহণ, না-বর্জ্জন” নীতিকে একান্ত সঙ্গতভাবে বিদায় দিয়া যে মনোভাব ব্যক্ত করিলেন তাহা বাঙ্গলা সানন্দে বরণ করিয়া লইত যদি ইহার শেষাংশ আরোও একটু স্পষ্ট হইত। ইহার শেষাংশে বলা হইয়াছে যে ‘‘বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে উদ্ভূত এক-তরফা আন্দোলন ফলপ্রসূ হইবে না, বরং সুপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়মূল করিবে” ; আন্দোলন ছাড়া কি করিয়া যে এই বিষাক্ত বাঁটোয়ারার উচ্ছেদ সম্ভব তাহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। অবশ্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন যে “কংগ্রেস বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার স্বাধীনতা কখন খর্ব্ব করে নাই”। তাহাই যদি সত্য হয় তবে বাঙ্গলায় সভ্যরা যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা হইল কেন? আইন সভাতে যদি কখনও বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ভোট দিবার প্রশ্ন আসে তখনই বা কংগ্রেসী সদস্যরা কি পন্থা অবলম্বন করিবেন? এই সকল সমস্যার সমাধানের কোন উপায়ই আমরা প্রচার-পত্রে দেখিতে পাইলাম না।

বাঙ্গলা কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয় “কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী” এই সংবাদটুকু পাঠ করিয়াই অহেতুকভাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন না তুলিলেও চলিবে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শরৎবাবুর ন্যায় স্পষ্টবাদী নেতার নিকট হইতে এইরূপ গোঁজামিল ইস্তাহার আমরা আশা করি নাই। আসন্ন নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে হিন্দু ভোটারদিগের নিকট বাঙ্গলা কংগ্রেসের অধীশ্বর শরৎবাবু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বাঙ্গলা কংগ্রেসের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিবেন, না কংগ্রেসী বড়কর্ত্তাদিগের গোঁজামিলের প্রতিধ্বনি করিবেন তাহা তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেই হইবে।

সহযোগী “বসুমতী”-এই প্রসঙ্গে শরৎবাবুর নিকট আবেদন করিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে প্রশ্ন করিতেছেন যে—“বাঙ্গলার কংগ্রেসী কর্ত্তারা কি করিবেন তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গলার লোক উৎসুক হইয়া আছে। শরৎবাবু তাঁহার বিরল-প্রাপ্ত অবসরকালে একবার এদিকে কৃপাদৃষ্টিপাত করিবার সময় পাইবেন কি?”

স্নেহপ্রবণ শরৎবাবু যখন বাংলার কংগ্রেসের অধিনায়কত্বের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন তখন স্ত্রীকের মায়া পরিহার করিয়া ও পারিবারিক দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গলায় কংগ্রেসী কার্য্য-পদ্ধতি সাকল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন, ইহাই আমরা কামনা করি।

বিগত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের ন্যায় নেতৃস্থানীয় সভ্যবৃন্দ অনুপস্থিত

থাকিয়া যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

সহযোগী "ফরোয়ার্ডের" উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা শরৎবাবুকে বলি যে—"দেশবন্ধুর রাজমুকুট বর্ত্তমানে তাঁহারই মস্তকে ন্যস্ত। তিনি যেন শৈথিল্য-বশে সেই মুকুটের অসম্মান না করেন।" "Petty Disputes and Squabbles"এর অবসানকল্পে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমানে তাঁহার দায়িত্ব কত গুরুতর তাহা বোধ হয় আর তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না।

সেন্সারের অপকীর্ত্তি

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের কনক-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ইউ-নিভারসিটী ইন্‌সটিটিউটে আহূত বিরাট সভায় দাঁড়াইয়া ৺অমৃতলাল বসু তাঁহার অনুপম রসসিক্ত ভাষায় বাঙ্‌লা নাটকের এবং নাট্য-প্রযোজনার অন্তরায় আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের সবচেয়ে মুস্কিল এই যে, আমাদের নাটক সংশোধন ও কাট ছাঁট করবার ভার আছে পুলিশের জমাদারের হাতে। তাঁরা ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে যা' খাড়া করে দেবেন, সেই নাটকই রঙ্গমঞ্চে চল্‌বে এবং তাই ছাপতে হবে।"

অবশ্য চলচ্চিত্রের অনুমোদন (Censor) ব্যাপারটি রসরাজ-কথিত নাটক-সংশোধন-ব্যবস্থার মত শোচনীয় নহে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার ফল ঐরূপ শোচনীয়ই দাঁড়ায়। বেঙ্গল সেন্সার বোর্ড নামে যে সরকারী ও বেসরকারী সদস্য মিলিয়া একটি চলচ্চিত্র-পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে বহু শিক্ষিত লোকও আছেন, কিন্তু তথাপি, তাঁহারা মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করিয়া বসেন যাহা অভাবিত এবং অর্থহীন বলিয়াই মনে হয়। সম্প্রতি ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। 'উত্তরা' চিত্রগৃহে অধুনা-প্রদর্শিত বাণী-চিত্র "বাঙ্গালী" সম্বন্ধেই আমরা বলিতেছি। এই চিত্রখানির প্রারম্ভে উপক্রমণিকা স্বরূপ ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত "বঙ্গ আমার জননী আমার" সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রোতাগণ তন্ময় হইয়া শ্রবণ করিতেছেন এমন সময় একান্ত ব্যথা ও বিস্ময়ের সহিত দেখা গেল যে গানখানি অসম্পূর্ণভাবেই শেষ হইল। সংবাদ লইয়া জানা গেল, বঙ্গীয় সেন্সার বোর্ড নিম্নলিখিত লাইনগুলি বাদ দিয়া দিয়াছেন

> "যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
> ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
> কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
> ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
> আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
> মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

এতদিন পরে সেন্সার বোর্ডের এইরূপ কার্য্য একান্ত অযৌক্তিক ও বিস্ময়কর। এই গানখানি সভায়, সমিতিতে, শোভাযাত্রায় পথে পথে, সারা বাঙ্‌লার রঙ্গমঞ্চে, হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েসের রেকর্ডে শত সহস্রবার সম্পূর্ণভাবে গীত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সরকারী তরফ হইতে তাহার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, নিয়মিত সংবাদপত্রপাঠকগণের হয়তো চোখে পড়িয়া থাকিবে যে, বিশেষ বিশেষ সভায় য়ুরোপীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণও এই গানটি জাতীয় সঙ্গীত এই কথা শুনিয়া এই গানটি গীত হইবার কালে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় কোন্ নীতির বলে এতদিন পরে বঙ্গীয় সেন্সার বোর্ড এই গানটির উপর নির্ম্মমভাবে কাঁচি চালাইয়া স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলেন? এই বেঙ্গল বোর্ড অফ্ সেন্সারের অন্যতম সদস্য হইতেছেন ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিজয় সিং নাহার। 'বাঙ্গালীর' প্রারম্ভিক গানের উক্ত লাইন কয়টার মধ্যে এতদিন পরে তাঁহারা কি করিয়া রাজদ্রোহ বা অন্যভাবে আপত্তিকর ব্যাপারের গন্ধ পাইলেন? আসন্ন শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিত্বের প্রলোভন কি শ্যামাপ্রসাদবাবুকেও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে?

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

ইংলণ্ডে ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলা

তৃতীয় ও শেষ টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ড দলের কাছে ৯ উইকেটে পরাজিত হয়েছে।

ওভাল মাঠে এই খেলা হয়েছিল। ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৪৭১ রান করে। এই ৪৭১ রানের মধ্যে হ্যামণ্ডের ২১৭ ও ওয়ার্দিংটনের ১২৮ রানই উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় দলের নিসার ১২০ রান দিয়া ৫টী ও অমর সিং ১০২ রান দিয়া ২টী উইকেট পান। দিলওয়ার হোসেন চমৎকার উইকেট কিপিং করেন। তিনি প্রথম দিনে একটীও বাই রান দেন নি।

ভারতীয় দলের পক্ষে মার্চেণ্ট ও মুস্তাক আলি প্রথম ব্যাট করা আরম্ভ করেন। তাঁরা খুব সুন্দর ভাবে খেলে যথাক্রমে দুজনেই ৫২ রান করেন। দিলওয়ার হোসেন ও রামস্বামীও মন্দ খেলেন নি। কিন্তু আর সকলে বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় ভারতীয় দলের সকলে ২২২ রানে আউট হ'ন। ইংলণ্ড দলের সিমস্ ৭৩ রান দিয়া ৫টী ও ভেরিটী ৩০ রান দিয়া ৩টী উইকেট পান।

১৫০ রানের বেশী তফাৎ হওয়ায় ভারতীয় দলকে 'ফলোঅন্' করতে হয়। মার্চেণ্ট ও মুস্তাক পুনরায় খেলতে নামেন। তাঁরা তাড়াতাড়ী রান তুলবার আশায় খুব জোর পিটিয়ে খেলতে থাকেন। তাঁরা যথাক্রমে ৪৯ ও ১৭ রান করেন। তারপর দিলওয়ার হোসেন ও অমর সিং খেলতে নামেন। দিলওয়ার এই খেলায় ৫৪ রান করেন। অমর সিংএর খেলা দেখবার মত হয়েছিল। তিনি ২৩ মিনিটে ৪৪ রান করেন। তারপর মেজর নাইডু খেলতে আসেন। ইনিংস্ পরাজয়ের হাত থেকে তাঁর ভারতীয় দলকে রক্ষা করবার চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসা না করে পারা যায় না। তিনি নিজে ৮১ রান করে তাঁর ১০০০ রান পূর্ণ করেন। ভারতীয় দলের মধ্যে একমাত্র মার্চেণ্টই এর আগে নিজের সহস্র রান পূর্ণ করেন। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১২ রান করে সকলে আউট হ'ন। ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন ৭টী উইকেট পান।

ইংলণ্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৬৪ রান করে বিজয়ী হ'ন।

ভারতীয় দল পরাজিত হ'লেও তাঁদের গর্ব্ব করবার যথেষ্ট কারণ আছে। মার্চেণ্ট, মুস্তাক, নিসার, অমর সিং ও নাইডুর মত খেলোয়াড় ইংলণ্ডের কোন খেলোয়াড়ের চেয়ে নিকৃষ্ট যে নয় তা ভাল ভাবেই প্রমাণ হয়েছে।

টেনিস্ প্রতিযোগিতা

কোলকাতার সাউথ ক্লাব প্রত্যেক বছরের মত এবারও ভারতের বাহিরে থেকে টেনিস্ খেলোয়াড় আনবার ব্যবস্থা করেছেন। ভারতবর্ষে একমাত্র সাউথ ক্লাবই এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এনে খেলা দেখিয়েছেন। এবার তাঁরা জাপান, জার্ম্মানী প্রভৃতি প্রত্যেক রাষ্ট্রের বড় বড় খেলোয়াড়দের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা অন্যান্য খেলার জন্য আসতে পারবেন না। তবে যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডের মলফরয় ও ষ্টেডম্যান এবং ফ্রান্সের এণ্টনী জেন্‌টিন্‌এর নামই উল্লেখযোগ্য।

মলফরয়—ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেনিস ক্যাপ্টেন ছিলেন। নিউজিল্যাণ্ডের হয়ে ইনি ১৯৩২ সালে উইম্বলডনের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন এবং চতুর্থ রাউণ্ডে ওঠেন। ১৯৩৪ সালে ইনি ব্রিটেনের বিখ্যাত খেলোয়াড় এফ, জে, পেরীকে হারিয়ে দেন।

ষ্টেডম্যান—ইনি নিউজিল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষ হয়ে ইনি তিনবার ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় খেলেন। মলফরয়কে জুটী নিয়ে ইনি বিখ্যাত জার্ম্মান যুগল হেন্‌কেল ও ল্যাণ্ডকে হারিয়ে দেন।

জেন্‌টিন্—ইনি ফ্রান্সের বিখ্যাত খেলোয়াড়। ১৯২৫ সালে ইনি ফ্রান্সের হয়ে ডেভিস কাপে স্পেনের বিপক্ষে প্রথম খেলেন। ১৯৩৪ সালে বার্ণার্ডকে জুটী নিয়ে ইনি প্যারিসে "ইণ্টারন্যাশনাল চাম্পিয়ানসিপ্" লাভ করেন। এছাড়া আর একজন আসবেন তাঁর নাম এণ্ডরুজ। ইনি ১৯৩০-১ সালে ভারতে খেলে গেছেন।

এই সব খেলোয়াড়রা বোধ হয় ১০ই ডিসেম্বর নাগাদ বোম্বাই এসে পৌছাইবেন।

সাঁতার

কোলকাতায় সন্তরণ সমিতি অনেক আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের মধ্যে একতা নেই। এদের মধ্যেও দুইটী এসোসিয়েসান আছে। একটী বেঙ্গল অলিম্পিক অপরটী বি, এস, এ। দুইটী এসোসিয়েসন ও এতগুলি সমিতি থাকলেও জনসাধারণকে এরা এখনও সাঁতারের উপকারিতা বোঝাতে পারে নি। তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পেয়েছি গত অলিম্পিকে ভারতীয় ওয়াটার-

গোলো টীম যাবার কথা হওয়াতে। সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে ২০ হাজার টাকা উঠান সম্ভব হয় নি। অথচ চীন দলের খেলায় এক কোলকাতার লোক বোধহয় একলক্ষ টাকা খরচ করেছে। এই ত' অবস্থা। এর পরও কি করে বলা যায় যে সন্তরন বিভাগ জনসাধারণের মধ্যে পপুলার হয়েছে ?

কর্ম্মকর্ত্তারা নিজেদের অবস্থা যে বুঝতে পেরেছেন এই যথেষ্ট। কেননা তাই সেদিন কোলকাতার বিশিষ্ট সন্তরন সমিতির প্রতিনিধি-দের একটা সভা ডাকা হয়েছিল এবং কি করে বাঙলার সন্তরন বিভাগটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে তার আলোচনাই হয়েছিল। একটা অস্থায়ী কমিটিও গঠন করা হয়েছে। বাঙলার প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারেও কমিটিই হয় কিন্তু কোন কাজ হয় না। এদের ভবিষ্যতে যে কি হ'বে তা বলা বড় কঠিন। ফলেন পরিচীয়তে।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

আমেরিকাই এবার বার্লিন অলিম্পিকে পুরুষদের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশী পয়েণ্ট পেয়ে সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করতে পেরেছে। এদের সবচেয়ে বড় এ্যাথলেট জেসী ওয়েন্স এর জন্যেই এ সম্ভব হয়েছে। ইনি ১০০ মিটার লংজাম্প ও ৪০০ মিটার দৌড়ে অলিম্পিকে নতুন রেকর্ড করেছেন। তা ছাড়া ৮০০ মিটার, ২০০ মিটার, ১১০ মিটার হার্ডল, ৪০০ মিটার হার্ডল, হাইজাম্প, পোল ভোল্ট প্রভৃতি অনেক প্রতিযোগিতায় এদের খেলোয়াড়রা জয়ী হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সম্মান লাভ করতে পেরেছে।

গ্রেট ব্রিটেন যা সম্মান লাভ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লাভলক্-এর ১৫০০ মিটার দৌড়ে পৃথিবীর নতুন রেকর্ড করা। তা ছাড়া উইটলক্ ৫০,০০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড করেছেন।

জার্ম্মানী মেয়েদের প্রতিযোগিতায় সব চেয়ে বেশী পয়েণ্ট লাভ করেছে।

এবার মোট ৫টা বিষয়ে পৃথিবীর ও ১৬টা বিষয়ে অলিম্পিকের নতুন রেকর্ড স্থাপন হয়েছে।

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা

বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় কোলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ান মহামেডান দল দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইণ্ডিয়ান ফুটবল লীগকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। মহামেডান দল বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় ডিভিসনের টীমের বিরুদ্ধে ভাল খেলতে পারে নি। তবে তারা যে ভবিষ্যতে আরো ভালো খেলতে পারবে আমরা আশা করি। এই প্রতিযোগিতায় কোলকাতা থেকে আর একটা বাছাই দল গেছে। তাদের নাম হচ্ছে "অল্ ব্লু"। এরাও দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠেছে।

ডায়হামস দল ওয়ারউইক দলের কাছে হেরে গিয়ে এই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে।

আর একটা শক্তিশালী মুসলমান দল এই প্রতিযোগিতায় খেলেছে। তারা হ'চ্ছে 'ব্যাঙ্গালোর মুসলিম'। এই দলে মহামেডান স্পোর্টিং এর ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় রহমৎ ও হাবিব এবং মাসুম ও ইষ্টবেঙ্গলের মহিয়ুদ্দিন খেলেছে। এরা দ্বিতীয় রাউণ্ডে লিন্‌কন্‌স্ দলের কাছে হেরে গেছে।

গ্রেহাম শীল্ড

কাষ্টমস্ 'রিক্রিয়েসন্ এবার গ্রেহাম শীল্ডের ফাইনালে বি, জি, প্রেসকে ২—১ গোলে হারিয়ে শীল্ড পেয়েছে। বি, জি, প্রেস যদিও ভালই খেলেছিল তবু শেষ পর্য্যন্ত গোল করতে পারে নি।

মিসেস জ্যারেট

আমেরিকার বিখ্যাত মহিলা সাঁতারু মিসেস্ জ্যারেটকে মদ্য পানের অভিযোগে

গান

কথা :—শ্রীনিত্যানন্দ দাস

মন্দির মম, ওগো প্রিয়তম,
শূন্য আজিকে, তোমা বিনে।
সুরভি বাতাস, সুনীল আকাশ,
করে উপহাস, নিশি দিনে।
ফাল্‌গুণে বনে কত ফুল মেলা,
মনোরম শুধু বাতাসে উতলা,
কেঁদে মরি আমি আজিগো একেলা,
তব স্মৃতি জাগরণে।
মুছাইবে কবে নয়ন সজল,
আঁধার এ মরু করিবে উজল,
কেঁদে যায় প্রিয় জীবন কেবল,
ফুলহীন উপবনে।

আমেরিকার কমিটি বার্লিন অলিম্পিকে যোগ দিতে দেন নি। এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করবার জন্য আমেরিকা দলের ২২০ জন এ্যাথলেট সই করে একটা দরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু আমেরিকান কমিটি তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলাতে রাজী হ'ন নি।

মিসেস্ জ্যারেটের বয়স এখন ২২ বৎসর। তিনি ১৪ বৎসর বয়েসেই অলিম্পিকে ১০০ মিটার ব্যাক্ ষ্ট্রোকে পৃথিবীর নতুন রেকর্ড করেন। এ পর্য্যন্ত আমেরিকার হয়ে তিনি সব অলিম্পিকেই যোগ দিয়েছিলেন।

এছাড়া তিনি একজন অভিনেত্রী। ১৯৩৪ সালে তিনি বিয়ে করেন। তার পর থেকে তিনি মঞ্চে ও পর্দ্দায় অভিনয় আরম্ভ করেন। পর্দ্দায় তিনি ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের একজন এ্যাক্‌ট্রেস্।
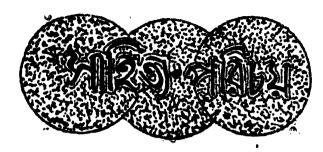
টাকাকড়ি—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঘোষ এম্-এ, বি-এল্। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং। মূল্য দেড়-টাকা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঘোষ সুচিন্তিত প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে সুপরিচিত। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের তিনি অন্যতম গবেষক এবং শ্রীযুক্ত বিনয় সরকার মহাশয়ের উৎসাহে ও পরিচালনায় যে কয়জন সদস্য ধনবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন, রবীন্দ্র নাথ ঘোষ তাঁদেরই একজন বিশিষ্ট সহকর্মী। ভারতের ও বিভিন্ন দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী, ব্যাঙ্কিং ও বীমা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের উপর তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সেগুলি যথাসময়ে 'আর্থিক উন্নতি', 'উদয়ন', 'বিষাণ' ও 'প্রবর্ত্তক' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা শুধুই গল্প পড়েন না তাঁরা একথা জানেন।

তরুণ গ্রন্থকারের এই প্রচেষ্টাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাই। প্রথম কারণ, বইখানি বাংলা ভাষায় লিখিত। ৺পণ্ডিত নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয় কুমার সরকার, অনাথ গোপাল সেন ও আর দু একজন পণ্ডিত ব্যক্তির রচিত বাংলা ভাষায় অর্থনীতি ও ধনবিজ্ঞানের বই ছাড়া এ ধরণের বই এখনো বিরল এবং আরো হওয়া উচিত। সহজ ও সরল ভাষায় ধনবিজ্ঞানের জটিল তথ্যগুলিকে সর্ব্বসাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে উপস্থাপিত করে লেখক আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন।

বইখানি দুশ' পৃষ্ঠার এবং এতে ষোলটী অধ্যায় আছে। টাকাকড়ির গোড়ার কথা, তার কাজ ও বৈশিষ্ট্য থেকে আরম্ভ করে, গ্রেশাম বিধি, দ্বিধাতুমান, পেপার কারেন্সী, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা, বিল-ভাঙ্গানো, রূপার বাজার এবং সর্ব্বশেষে কারেন্সী-ষ্টেবিলাইজেশন, গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অটাওয়া চুক্তি এবং ভারতের টাকাকড়ি প্রভৃতি আধুনিকতম সমস্যা, মতামত ও তথ্যগুলি রবীন্দ্র বাবু অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন। অর্থনীতি ও ধনবিজ্ঞানের রীতি ও নিয়মগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে চিরকালই নীরস ও দুর্ব্বোধ্য হয়ে থাকে। কিন্তু গ্রন্থকারের লেখনীগুণে বইখানি সহজ-বোধ্য ও সত্যই রীতিমত চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা এখনও সম্পূর্ণ রচিত হয়নি। রবীন্দ্র বাবু কয়েকটি নিজেই সৃষ্টি করেছেন এবং পাঠকের সুবিধার জন্য সকল জায়গাতেই বাংলা ও ইংরেজী প্রতিশব্দ একত্র দিয়েছেন। মাতৃভাষায় রচিত এই ধনবিজ্ঞানের নূতন বইখানি পড়ে আমরা গ্রন্থকারের আগামী পুস্তক 'আর্থিক চিন্তার ইতিহাস'-এর সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম। 'টাকাকড়ি' ছাত্রমহলে ও সাধারণের কাছে আপনারই গুণমূল্যে বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সমাদর পাবে, এ কথা নিঃসংশয়।

শ্রীসন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

রক্তপিয়াসী—বিচিত্র রহস্য সিরিজের চতুর্থ গ্রন্থ। সম্পাদক—শ্রীমিহির কুমার সিংহ, প্রকাশক—মডার্ণ পাবলিশিং সিণ্ডিকেট, ১৩।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। মূল্য বারো আনা।

হাটে বাজারে যে সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস রোমাঞ্চ কাহিনী বলিয়া প্রচারিত হয়, তাহার অধিকাংশই রোমাঞ্চ ছাড়া আর সব কিছুর উদ্রেক করে। বিচিত্র রহস্য সিরিজের কর্তৃপক্ষেরা প্রতি মাসে বাংলায় এই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের তদন্ত-কাহিনী প্রকাশিত করিয়া নির্দোষ আমোদপিপাসু পাঠকবর্গের অবসর বিনোদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

এ বইখানির আখ্যানভাগ একটু সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাকে আরও জটিল ও রহস্যময় করা যাইত বলিয়া বিশ্বাস করি। যাহা হউক, একশত পৃষ্ঠার পুস্তকে লেখক অতি সুন্দর ভাবে তাঁহার প্লট্ জমাইয়াছেন। প্রথমে পর পর কয়েকটি পৈশাচিক নরহত্যার ঘটনা সংস্থাপন করিয়া তিনি পাঠকচিত্ত সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছেন। পরিশেষে এই বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের একটি সাধারণ সংযোগ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন কলিকাতার সুদক্ষ তদন্তকারী মিঃ ঘোষ। তাঁহারই বুদ্ধিচাতুর্য্যে এই কলিকাতার উপকণ্ঠে যে বিভীষিকাপূর্ণ রক্তপিয়াসীর নিষ্ঠুর লীলা চলিতেছিল, তাহার চমকপ্রদ মীমাংসা হইয়া যায়। মোটের উপর উপন্যাসখানি বিশেষ ভালো লাগিয়াছে।

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বস্তির নিঃশ্বাস

শেষ পর্য্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেস সদস্যগণ এখন যত পারেন শোক করুন। কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শোকের মধ্যেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর ত্যাগ বা কংগ্রেস সেবাকে আমরা খাটো করিতেছি না। আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন জরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার অগ্রগতির পথ রোধ করে। এইরূপ অবস্থায় প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই কর্ত্তব্য জীবনের গতি-পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ান। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া সারা ভারতের কংগ্রেস সেবকগণের পিট-চাপড়ানীতে শ্রীযুক্ত আচারী সে কথা ভুলিতে বসিয়াছিলেন। ডাঃ রাজনের ধাক্কায় তাঁহার সে ভ্রান্তি ঘুচিয়াছে ইহাতে দেশেরও কল্যাণ হইল এবং তিনিও বৃদ্ধ বয়সে বৈবাহিকের সহিত যোগ দিয়া গ্রাম সেবা করিবার মহৎ অবসর লাভ করিলেন।

অতঃপর!

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় "নূতন ডাক্তার" শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকা হইতে ফিরিয়া চিৎপুর হইতে তিনটী রঙিন মার্সলারাইজড্ সিল্কের লুঙ্গি কিনিয়াছেন। কিন্তু বিভ্রাট বাধিয়াছে এই যে তাঁহার অনভ্যস্ত কটিদেশ হইতে এই লুঙ্গি বারাংবারই স্খলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই জন্য তিনি নাকি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে "আর্ম্মি ও নেভি" কোম্পানীতে ভাল কটি-বন্ধের ফরমাস দিয়াছেন।

কন্‌টিনেন্‌টাল্ ব্যাঙ্ক

গত শনিবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় কলিকাতার মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল ৯৩, রাসবিহারী এভিনিউ রোডে কন্‌টিনেন্‌টাল ব্যাঙ্ক অফ্ এসিয়া লিঃ-এর বালিগঞ্জস্থিত শাখার উদ্বোধন কার্য্য সমাপন করেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটী যে ভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই গৌরবের ও আনন্দের বিষয়। শ্রীযুত অমিয় কুমার সোম, বি-এল এবং আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুত অজিত কুমার সোম বি-এ, এই শাখার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশাকরি তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত এই নবশাখা প্রতিষ্ঠানটী শীঘ্রই প্রসার লাভ করিবে। ঐ সভাতে স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ও বিজ্ঞ ভদ্রমোহদয় লইয়া একটা পরামর্শ সমিতি গঠন করা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের তরুণ ম্যানেজিং ডাইরেকটার শ্রীযুত হেমেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ, বি-এল ও সেক্রেটারী এন, কে, পাল চৌধুরী বি-এর কার্য্যদক্ষতা প্রশংসনীয়।

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন :—

কুমার নরেন্দ্র নাথ রায়, ভাগ্যকুল।
শ্রীযুত হরিদাস মজুমদার।
রায় বাহাদুর টি, সি, রায়।
" " টি, সি, দত্ত।
" " রমা প্রসাদ চন্দ।
শ্রীযুত সূর্য্যকুমার সোম, এম, এল, এ,
ডাঃ—এস, সি, রায়
ডাঃ—এস, সি, রায়, পি-এইচ-ডি, বার-এট-ল।
শ্রীযুত জে, সি, দাস।
" " হরিশ চন্দ্র সরকার।
" " সুরেন নিয়োগী
" " অক্ষয় কুমার সরকার
ডাঃ—এন্, আর, ঘোষ
শ্রীযুত পবিত্রীপ্রসন্ন চাটার্জ্জি

চক্রতীর্থ

চক্রতীর্থের একাদশ অধিবেশন বিগত ২৩শে আগষ্ট রবিবার ১১নং চক্রবেড়িয়া রোড সাউথে হইয়া গিয়াছে। "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমনোজ বসু, শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্ল সরকার, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীজয়েশ চন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীরবীন্দ্র কুমার বসু, শ্রীসত্যনাথ মজুমদার প্রভৃতি।

প্রথমে শ্রীউমাপদ চট্টোপাধ্যায় একটি কবিতা পাঠ করিবার পর তরুণ সাহিত্যিক শ্রীঅনুপম কৃষ্ণ বসু "বাজীমঙ্গল" শীর্ষক তাঁহার একটি স্বরচিত মৌলিক রস-রচনা পাঠ করিয়া সমবেত সভ্যগণকে আনন্দদান করেন; সভাপতি মহাশয় অনুপম বাবুর রচনাটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীকরুণাময় বসু, তাঁহার একটি অতিসুন্দর mystic কবিতা পাঠ করেন। শ্রীদেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একটি ছোট গল্প পাঠ করেন, গল্পটি মনস্তত্ত্বের দিক হইতে অতিসুন্দর হইয়াছিল; সভাপতি মহাশয় ও মনোজ বাবু গল্পটি সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যগণের সহিত আলোচনা করেন। তৎপরে শ্রী প্রফুল্ল সরকার কবি বিমল চন্দ্র ঘোষের "তথাগত" শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হয়।

সঙ্গীত সম্মিলনী

আগামী ২৯এ আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় ৯১এ নিউ পার্ক ষ্ট্রীটে সম্মিলনীর মাসিক সঙ্গীত সভার অধিবেশন হইবে। ইহাতে শ্রীযুক্ত মিহির বরণ ভট্টাচার্য্যের ছাত্রছাত্রীর ঐক্যতান বাদন,

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

...পদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্বে। আপনার মহত্ত্ব আমি জীবনে ভুলবো না। আমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন—

সুবো। এতে মহত্ত্ব-টহত্ত্ব কিছু নেই—আমারই বরং গরজ। যাক্—আপনি নিশ্চিন্ত হোন্—আমিও নিশ্চিন্ত হলুম। আমি শুধু জান্তে এসেছিলুম কি ভাবে আপনি এটাকে নিতে পেরেচেন। জীবনে ভুল ভ্রান্তি অমন হয়—তা নিয়ে জট্ পাকালে চলে না। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্—আমি মোটেই mind করি নি। হ্যাঁ—বে বোধ-হয় শীঘ্রই হোচ্ছে—আপনাকে যেতে হবে কিন্তু—আমি নিজে এসে যথাসময়ে কার্ড দিয়ে যাবো। কি কথা কচ্চেন্ না যে? যেতেই হবে আপনাকে—"না" বোল্লে ছাড়্‌চিনে। আপনি না গেলে আমরা সুখী হোতে পার্ব্বো না।

বিশ্বে। বেশ,—আপনারা যাতে সুখী হন—চেষ্টা কর্ব্বো—

সুবো। ব্যস্—ব্যস্—ধন্যবাদ! একটু trouble দিলুম—কিছু মনে কর্ব্বেন না—নমস্কার।

বিশ্বে। নমস্কার। [সুবোধ চলিয়া গেল] যাক্, সব চুকে বুকে গেল। এদিক্-কার দেনা পাওনা একেবারে শোধ! তাই কি? কি যেন একটা দুর্নিবার শক্তির প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুক্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! কে যেন আর্ত্তকণ্ঠে অহঃরহঃ আমাকে আহ্বান কচ্চে। সে কণ্ঠ যে আমার অতি পরিচিত—সে ব্যথিত অসহায় মুখের ছবি যে শয়নে স্বপনে আমাকে আত্মহারা কোরে দ্যায়। একি আমার কামনা বিকৃত দুর্ব্বল হৃদয়ের প্রতিধ্বনি—মস্তিষ্কের বিকার? হবে!

[বসুদেবের প্রবেশ]

বসু। কি হে, ব্যাপার কি? সুবোধ বাবু কি duel লড়তে এসেছিলেন না কি?

বিশ্বে। না, তিনি আমাকে ক্ষমা করেচেন!

বসু। তাহোলে তিনি সব শুনেচেন?

বিশ্ব। আমি ত তোমাকে বলিচি বসুদেব ভারতী দেবীর সম্বন্ধে আমি কখনও শ্রদ্ধা হারাতে পার্ব্বো না! ছলনা করা তাঁর স্বভাব নয়—তিনি সত্য গোপন করেন নি—খুব সম্ভব তিনি অকপটে তাঁর ভুল স্বীকার করেচেন্। ভুলই বা কি? হয়ত আমিই তাঁকে না বুঝতে পেরে অন্যায় করেছিলাম,—তিনি সেটা বুঝতে পেরে, আমার প্রতি কৃপা করে রুষ্ট হন্‌নি, নীরব ছিলেন, হয়ত আমার অভদ্র ব্যবহারে স্তম্ভিত হোয়ে গিয়েছিলেন। সামান্যা নারী হোলে, এ লজ্জাকর ব্যাপার গোপন কর্ত্তেন,—তাতে কোনও বাধাই ত তাঁর ছিলনা কিন্তু তিনি সুবোধ বাবুকে যথাসময়ে তা প্রকাশ করেচেন। বসুদেব, আমি তাঁর অন্তরের শুচিতায় মুগ্ধ হোয়ে গেছি—আমার মুক্তিস্নান হোয়ে গ্যাছে!

বসু। হ্যাঁ—এই অতি আধুনিক যুগেও তোমার এই "ভারতী-সুবোধ-সংবাদ" বেশ একটু রহস্যজনক বটে—আশ্চর্য্যজনক বোলতেও রাজী আছি! তা এখন ত পালা শেষ—এইবার ঘরে ফিরে চলো।

বিশ্বে। হয়ত শেষ, কিন্তু তবুও কে যেন বোল্‌চে—হয়ত এখনও সব শেষ হয় নি। বসুদেব, আমি ভারতী দেবীর বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত এখান থেকে যেতে পার্ব্বো না! কেন—তা জিজ্ঞাসা কোরো না—তার উত্তর আমি নিজেই জানি না—তোমাকেও দিতে পার্ব্বো না।

বসু। কেন, ছেলেমানুষী কচ্চো? বাড়ীতে "মা" কত উতলা হোয়ে আছেন ভাবো দেখি? আর পণ্ডিত মশায়ের সেই মুখ ত তুমি চোখে দেখো নি?

বিশ্বে। চোখে দেখি নি বটে, কিন্তু কল্পনা কর্ত্তে পারি। বসুদেব, আমি বড় অভাগা! কেউ যেন আমার মতন এ বয়েসে বিবাহের পূর্ব্বে রমণীর সংস্পর্শে না আসে। হয়ত ভাগ্যবান্ কচিৎ কেউ তাতে লাভবান হোয়ে জীবন ধন্য কোর্ত্তে পারে কিন্তু বেশীর ভাগেরই আমার মত জীবন অকালে দগ্ধ হোয়ে যায়। এই বাইশ বছর বয়েসেই জীবনযুদ্ধে আমি শ্রান্ত—আমায় বিশ্রাম দাও।

[বিশ্বেশ্বর ইজিচেয়ারে ঢলিয়া পড়িয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন—মাধব প্রবেশ করিল]

মাধব। আচ্ছা বাবু, ঐ যে বাবুটী এসেছিলেন—উনিই বুঝি খুড়ো ঠাকুরের সতীন?

বসু। আবার বথামো কোর্ত্তে এলি?

মাধব। তাহোলে ওঁকেই কেন বুঝিয়ে বোল্লে না, খুড়োঠাকুর বড্ড বায়না নিয়েচেন—ইনিই খুড়ীঠাকুরুণকে বিয়ে করুন্—তিনি বরং আর একটী দেখে-শুনে পছন্দ কোরে নিন্। ও সব মেয়েমানুষই ত সমান্! ভদ্দরলোক বুঝিয়ে বোল্লে, কথাটা রাখ্‌তেন!

সেতার, বেহালা, গীটার প্রভৃতি বাদ্য একক ও সমবেত সঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে।

সঙ্গীতের জন্য দান

...এ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে সঙ্গীত সম্মিলনীর সম্পাদিকা মিসেস্ বি, এন, চৌধুরী জানাইতেছেন যে, কলিকাতার রঘুমল চ্যারিটী ট্রাষ্ট বাঙ্গলায় ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে সম্মিলনীকে দুইশত টাকা দান করিয়াছেন। এই দান ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

বিশে। [সহসা ইজিচেয়ারে উঠিয়া বসিয়া] বসুদেব, শুনচো কে আমায় "বিশেশ্বর—বিশেশ্বর" বোলে ডাকচে? শুনতে পেলে না? ওহো, আজ যে আমার জন্মতিথি! বাবা আমায় ডাকচেন, আশীর্ব্বাদ কোর্ব্বেন বোলে ডাকচেন। আমি ঠিক শুনতে পেয়েছি। আমি হতভাগা, এইখান থেকেই তাঁকে প্রণাম কোর্ব্বো—তাঁর আশীর্ব্বাদ নেবো!

[চেয়ার হইতে উঠিয়া নতজানু হইয়া বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—বসুদেব ও মাধব পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

বসুদেব, আমি আশীর্ব্বাদ পেয়েছি—এইবার হয়ত জীবনযুদ্ধে জয়ী হোতে পার্ব্বো! মাধব, তোর অশিক্ষিত সরল মন একবার আমাকে দিতে পারিস্? আমার এ শিক্ষা-কলুষিত মন নিয়ে ঠিক্ ধারণা কোর্ত্তে পাচ্চি নে—জননীর আহ্বান বড়, না, রমণীর আকর্ষণ বড়? পিতৃস্নেহ বড়, না, পিতৃত্বে অধিকারী হবার আহ্বান বড়? এই দুই আকর্ষণের রুদ্ধ আবেগে আমার বুক কেঁপে উঠচে—বসুদেব, আমার হাত ধরো!

চতুর্থ দৃশ্য

[প্রবোধ বাবুর বাটীর একটি প্রশস্ত কক্ষ।]

[প্রবোধ বাবু, সুবোধ বাবু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন—কিশোরীগণ Dagger Dance বা তরবারি নৃত্য দেখাইতেছিলেন]

—কিশোরীগণের নৃত্যসহ গীত—

"(আমরা) বাঁশী ছেড়ে অসি ধ'রেচি—
জয়-গৌরবে বুক ভরেচি— !
দামিনী অসি-ফলকে ঝলকে
অশনি অসি-ফলকে চমকে
দুষ্কৃত দলনে লাঞ্ছনা-হরণে
চণ্ডীরে বরণ ক'রেছি— !"

প্রবোধবাবু। সুবোধকে আপনাদের সঙ্গে পরিচিত কোরে দিলুম—আমাদের আজকের সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সার্থক হোলো। আপনারা আইন আদালতের উজ্জ্বল রত্ন—অনুগ্রহ কোরে পদধূলি দিয়েচেন—এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কচ্চি।

রমেশবাবু। প্রবোধবাবু একটু অতিরিক্ত বিনয়ী! কি বলো হে ধনেশ?

ধনেশবাবু। উনি চিরকালই ঐ রকম! তার ওপর একটু বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাবী!

প্রবো। দক্ষিণাবাবু এখনো আস্চেন না কেন? এই যে নাম কোর্ত্তে কোর্ত্তেই! আসুন—আসুন,—আস্তে আজ্ঞা হয়—

[দক্ষিণাবাবু প্রবেশ করিলেন]

পরেশবাবু। দক্ষিণে বাবু, এত late যে? এমন চমৎকার Dagger Danceটা miss কোল্লেন্?

প্রতিভাদেবী। আপনার স্ত্রীকে আনলেন না যে বড়?

দক্ষি। জানেন্ বোধ করি, তিনি হোচ্চেন—আমার Vernacular Wife—হাফ্ পর্দ্দানসীন! যদিও তিনি আমাকে "রাজ-মিস্ত্রী" বোলে খেলো কোত্তে চেষ্টা করেন—তবুও সেই খেলো জিনিষটাকে সহজে পর্দ্দার বা'র হোতে দ্যান্ না!

শ্যামলীদেবী। Vernacular ত Engineer সাহেবকে "রাজমিস্ত্রী" বানিয়ে ছাড়বেই। তা, পর্দ্দার বাইরেটার তাঁর এত ভয় কেন বলুন ত?

দক্ষি। ভয় ঠিক্ নয়; তবে তাঁর হোচ্চে অনেকটা ভূদেববাবুর মত! বলেন, বাড়ীতে আলো হাওয়া যথেষ্ট আছে—বাইরে কেবল ধূলো আর ধোওয়া!

শ্যামলী দেবী। এটা বোধহয় আমাদের ওপর কটাক্ষ?

দক্ষি। না, না, তা মনে কোর্ব্বেন না।

গান

কীর্ত্তন

শ্রীবংশী আশ

(সখি) কি হেন মাধুরী তা'রি।
(যারে) না দেখি নয়ানে, রাখহ ধেয়ানে,
বারেক স্বপনে হেরি॥
মোহন অঞ্জন রাগে, কাহার দরশ মাগে,
চকিত হরিণী সম আঁখি;
অগুরু চন্দন ভালে, গৃহত্যাজি আইলে,
বিজন তটিনী পরি॥
বিরহ বিধুর ধ্বনি, বিহগ কূজন শুনি,
আবেশে আকুল হিয়াতার;
যাহার মূরতি স্মরি, ক্ষণেক রহিতে নারি,
হইলে কানন চারী॥

কটাক্ষ তিনি আমাকে ছাড়া আর কারুরই ওপর বাজে খরচ করেন না!

প্রতিভাদেবী। আপনার স্ত্রীভক্তি বোধ করি একটু অ-সাধারণ?

দক্ষি। হ্যাঁ, সাধু ভাষায় যাকে "স্ত্রৈণ" বলে! আমার স্ত্রী উপস্থিত থাকলে, আপনাকে ধন্যবাদ দিতেন নিশ্চয়!

প্রবো। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল! আমাদের আজকের সম্মিলনীর আর একটি ছোট-খাটো উদ্দেশ্য আছে। আপনারা অনেকেই জানেন বোধ হয়, এই আমাদের বিশিষ্ট অতিথি দক্ষিণাবাবুর মেয়ের সঙ্গে সুবোধের বে' অনেকদিন থেকেই স্থির হোয়ে আছে! এর মেয়ে এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার কোরেচে! চমৎকার মেয়ে—নামটিও চমৎকার শ্রীমতী ভারতী—চমৎকার চিঠি লিখতেও পারে। সুবোধকে লিখতো। মনে হয় ঠিক যেন মেয়ে-রবিবাবুর লেখা—যদিও আমি পড়িনি—শুনেছি! আপনারা সকলেই যখন আজ আমার মাননীয়

অতিথি—তখন আপনাদের সামনেই দক্ষিণাবাবু আজ সুবোধকে আশীর্ব্বাদ কোর্ব্বেন। আপনাদের এতে অভিমত কি?

সকলে। এতে আর মতামত কি? এ অতি উত্তম প্রস্তাব—শুভকার্য্য—

দক্ষি। কিন্তু আমি ত এর জন্তে প্রস্তুত—

প্রবোধ। কোনও চিন্তা নেই। আমারও এ কথাটা আগে মনে হয় নি—এদের দেখেই মনে পড়ে গেছে! সুবোধ একবার এদিকে এসো ত? ওরে, ধানদুর্ব্বোর থালাটা নিয়ে আয় ত?

দক্ষি। কিন্তু—

প্রবো। আজকের দিনে বার বার "কিন্তু" কোর্ত্তে নেই। কি বলেন আপনারা? এ ত একটা মামুলি ব্যাপার—আসল পাকাপাকি ত অনেক দিন থেকেই হোয়ে আছে! [ভৃত্য ধানদুর্ব্বার পাত্র লইয়া আসিল] আসুন, আশীর্ব্বাদ কোরে ফেলুন—ঐ শুধু ধানদুর্ব্বো দিয়েই হবে [ধানদুর্ব্বা হাতে তুলিয়া দিলেন] সুবোধ, এগিয়ে এসো—[দক্ষিণাবাবু কেমন-ধারা হইয়া গেলেন—সুবোধকে অন্যমনস্কভাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন—সুবোধ নমস্কার করিলেন—উপস্থিত সকলেই করতালি দিয়া শুভকার্য্য অনুমোদন করিলেন]

প্রবো। যাক্, একটা শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হোলো! বে'র দিনে সকলেই অবশ্য দয়া কোরে পদধূলি দেবেন!

রমেশবাবু। বে'-টা তাহোলে হোচ্চে কবে?

প্রবো। এই মাসের ২৫শে—আর দিন দশেক পরেই আর কি! এইবার আর এক দফা নাচ-গান হোক্, কি বলেন? মেয়েরা সব গেলেন কোথায়?

পরেশবাবু। ওই পাশের ঘরেই আছেন। কাপড় বদলাতে গেছেন—এবার next item Butterfly Dance কি না? প্রজাপতি-নৃত্য—চমৎকার!

[মজলিস পুরাদমে চলিতে লাগিল—কিশোরীরা লজ্জিত হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিলেন—দক্ষিণাবাবু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন]

—প্রজাপতি-নৃত্যসহ গীত—

"আমরা সূর্য্য কিরণে উড়ে বেড়াই প্রফুল্ল প্রজাপতি,
বধূর মধুর প্রণয়-কোরকে ফোটাই গো প্রাণপতি!

রাষ্ট্রীয় পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচন

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের (Council of State) সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন। বাঙ্‌লার অমুসলমান সাধারণ কেন্দ্র হইতে অদ্যাবধি চারিজন প্রার্থী নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। নদীপুরের রাজা ও শ্রীযুক্ত সতেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মৌলিক ব্যতীত নিউ ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ডাঃ সুরেশ চন্দ্র রায় ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার রায় চৌধুরী নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে প্রচার কার্য্য সুরু করিয়াছেন।

ইন্দ্র ধনুর লহর তুলি,
রূপ সায়রে পড়ি ঢলি,
আমরা আলোর ঝর্ণা গো',
আমরা পুলকবর্ণা—
প্রিয় পরশ ছোঁয়া অলকজালে আমরা হীরক মতি,
নীলাম্বরীর ফাঁকে-ফাঁকে কুড়ুই শতেক চোখের নতি!"

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দক্ষিণাবাবুর বাটী

[দক্ষিণাবাবু ও বনজ্যোৎস্না কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন]

দক্ষি। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এমন ঠকা জীবনে ঠকিনি! আই-সি-এস, জজ, ব্যারিষ্টার, উকিলে ঘর ভর্ত্তি,—মহিলারাও ছিলেন—আমায় এমন বাগিয়ে ধর্ল্লে—হাতে ধানদুর্ব্বো অবধি তুলে দিলে—আমি যেন কেমন-ধারা হোয়ে গেলুম—কলের পুতুলের মত যেমন নাচালে, তেমনি নাচলুম! এটর্ণীর চাল বটে! আমাকে পাকে-প্রকারে বুঝিয়ে দেওয়া হোলো যে এ বে দিতেই হবে—এর জন্তে ওজর আপত্তি উঠলে বিশেষ সুবিধে হবে না। অতগুলো ভদ্রলোকের সামনে কথা দেওয়া, পাকাদেখা হোলো—ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত আদালত অবধি গড়ালেও ভাল ভাল সাক্ষী সাবুদের অভাব হবে না। এমন কি ভারতীর চিঠি লেখা-লিখির পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হোলো—ফাঁক কোথাও কিছু রাখেন নি। খুব সংক্ষেপে অথচ গুছিয়ে কাজের কথাগুলি সকলকেই শুনিয়ে দেওয়া হোয়ে গেল। তুমি যা বলো—সত্যিই আমার রাজমিস্ত্রীর বুদ্ধি, এতদিনে সেটা বেশ বুঝতে পার্ল্লাম্—ডাক্‌সাইটে এটর্ণীর বুদ্ধির কাছে ভেসে গেলাম!

বন। আচ্ছা, এর সঙ্গে সুবোধেরও কি যোগ ছিল? তোমার কি মনে হোলো?

দক্ষি। মনে ত হয়, ছিল। প্রবোধ বাবু ডাক্ দেবামাত্রেই উঠে এলো—কোনও কথাটি কইলে না—একটুও ইতঃস্ততঃ কল্লে না—দিব্বি মাথা হেঁট করে আশীর্ব্বাদ নিলে।

বন। তবেই ত! ভারতীর কথায় ভাবে যা বুঝলুম—সুবোধও ত ভারতীর অবস্থাটা ভালভাবে বুঝতে চায় নি। বরং যেন একটু পালিয়ে যাবার ভাবও দেখিয়েছিল। আমি ত কোনও কুল কিনারা খুঁজে পাচ্চি নে!

দক্ষি। কুল-কিনারা আর কি,—সুবোধের সঙ্গেই বে দিতে হবে।

বন। সে কি গো? তাই বা কেমন করে হবে? না—না, সুবোধের সঙ্গে বিয়ে যে আর হবার নয়। তুমি এই সাদা কথাটা বুঝতে পাচ্চোনা কেন?

দক্ষি। আর তুমিও এই সাদা কথাটা বুঝতে চাইচো না কেন—সুবোধের সঙ্গে বে না দিলে, লোকসমাজে আমার আর মুখ দেখাবার যো থাকবে না। অপদস্থ ত যৎপরোনাস্তি হোতেই হবে—তাই কি ওরা এটর্ণী—অমনি ছাড়বে না—আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড বাঁধাবে।

বন। আমার মেয়ে আমি যদি ওদের ঘরে বিয়ে না দিই, তা হোলে তার জন্যে আদালতে নিয়ে যাবে কিসের জন্যে?

দক্ষি। আমার মেয়ে ততদিন ছিল—যতদিন পর্য্যন্ত না কথা দিয়েছিলুম—এখন বাগদত্তা কন্যা Contract হোয়ে গেছে—শ্রাদ্ধ যে অনেক দূর গড়িয়েচে!

বন। ষাট্-ষাট্—কি অলুক্ষণে কথা বলো? তা আমরাই না হয় কথা দিয়েছি—মেয়ে ত কথা দ্যায় নি! মেয়ে বড় হোয়েচে—তারও ত একটা মতামত দেবার অধিকার আছে!

দক্ষি। মেয়ে বড় হোলেও এখনও minor-এর গণ্ডী পার হয় নি—তার মতামতের কোনও মূল্য নেই। আর তাও যদি ধরো—সুবোধের সঙ্গে চিঠি লেখা-লিখি করে আগেই ধরা দিয়ে বসে আছে! বে না দিয়ে কোনও উপায় নেই!

বন। তুমি যে জড়িয়ে পরেই মুস্কিলে ফেল্লে! নইলে, আমি কি সুবোধের বাবার তোয়াক্কা রাখতুম্—না, আইন আদালতের মুখ চাইতুম্। এখন একদিকে আমার মেয়ের ধর্ম্ম নিয়ে কথা—আর একদিকে তোমার বড় মুখ ছোট হবে, সকলের কাছে অপমান অপদস্থ হবে—সেই ভয়। এই যো-টানাতেই যে আমি কাবু হোয়ে পড়ছি। হ্যাঁ গো, এরই মধ্যে যদি মাষ্টার মশাইকে আনিয়ে আমরা ভারতীর বিয়ে দিয়ে দিই?

দক্ষি। Adding insult to injury! তাতে আদালতে আমার লাঞ্ছনার মাত্রা আরও বেড়ে যাবে নিশ্চয়, তাছাড়া আর কোনও সুবিধেই হবে না! আর মাষ্টার মশাইও বোধহয় তোমার মেয়েকে বে কর্ত্তে চায় না—চাইলে, এতদিনের মধ্যে একদিন না একদিন এসে দেখা কর্ত্তো।

বন। লজ্জায় বোধ হয় আসতে পাচ্চে না।

দক্ষি। লজ্জা কিসের? সে ত আর জানে না—মনেও হয়ত করেনি—যে ভারতী সব কথা প্রকাশ করে দেবে? তবে সুবোধের সঙ্গে যে বে'র কথা অনেকদিন থেকেই স্থির ছিল—তার সঙ্গে ভারতীর অনেকদিন থেকেই মেলামেশা—এটা জেনে গেছে বটে। কাজেই ইচ্ছা থাকলেও, ভারতীর সঙ্গে বে'র আশা যে ছেড়ে দিয়েচে। তা ছাড়া অন্য কারণেও বে' কোর্ত্তে তার আপত্তি থাকতে পারে।

বন। ও কোন কাজের কথাই নয়। তাকে ডেকে নিয়ে এসে সব পরিষ্কার কোরে বোললেই ত চুকে যায়। কিন্তু তুমি যে বোলচো—মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে বে' দিলে আরও বেশী কোরে গোল বাধবে—তোমাকে ধরে যে আরও টানাটানি কর্ব্বে? সেই ত হোয়েচে আমার মুস্কিল—আমার একদিকে মেয়ে, একদিকে তুমি—আমি যে বড় ফাঁপরে পড়েচি। তুমি যদি একটু শক্ত হোতে—একটু ভরসার কথা শোনাতে পার্ত্তে?

দক্ষি। না, শক্ত হবার আমার উপায় নেই। সত্যি বোলতে কি, তুমি যে কারণটা এত গুরুতর বোলে ভাবচো—সেটার উপর জোর দিতে আমি মোটেই বল পাচ্চিনে। যে বে কোর্ব্বে সেই—সুবোধ যখন ওটাকে একটা কারণ বোলেই মনে কচ্চে না, তখন আমিই বা সেটাকে ধরে কেমন কোরে জোর করি বলো? এখন ভরসার মধ্যে সুবোধ—সে যদি বে কোর্ত্তে না চায়? কিন্তু সে নিশ্চয়ই তার বাপকে ইঙ্গিতে হয়ত এমন কথা বলেচে যে এ বে'তে আমাদের বা ভারতীর আপত্তি উঠতে পারে। তাই প্রবোধবাবু এই চাল চেলেছেন। এখন আমি নিজে বাপ হোয়ে সুবোধকেই বা তার বাপের অবাধ্য হোতে বলি কেমন কোরে? আর সেই বা তা শুনবে কেন?—তারও ভারতীকে বে কোর্ত্তে খুব ইচ্ছে? (ক্রমশঃ)

খুচ্‌রো খবর

নৃত্য-শিল্পী মহারাজ বসু

গত রবিবার ২৩শে আগষ্ট ইণ্ডিয়ান জার্ণালিষ্টস্ এসোসিয়েসনের বাৎসরিক সভার কার্য্যাবশেষে বিবিধ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তন্মধ্যে তরুণ নৃত্য-শিল্পী শ্রীমহারাজ বসুর প্রাচ্য-নৃত্য সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সোদর প্রতিম বন্ধু মহারাজ প্রাচ্য-নৃত্যকলা চর্চ্চায় উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক ইহাই কামনা করি।

শ্রীমহারাজ বসু

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্সের মালিক কে ?

গেল ২৬শে শ্রাবণ সহযোগী 'ফরিদপুর হিতৈষিণী' এক জবর খবর দিয়েছেন। "খেয়ালী"-র প্রদত্ত সংবাদটি বেমালুম হজম কোরে তার ওপর একটু রঙ ফলিয়ে সহযোগী লিখেছেন :—

নিউ থিয়েটার্স শরৎচন্দ্রের "বিজয়া"র চিত্ররূপ দিচ্ছেন, একথা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করেছি। বর্ত্তমানে জানা গেল, এই বইখানিতে কর্ত্তৃপক্ষ একটু নূতনত্ব কোরেছেন। আসল বইখানি আরম্ভ হবার আগে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বইএর প্রযোজক শ্রীযুক্ত দীনেশ দাস এবং নিউ থিয়েটার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যতীন মিত্র এই তিনজন পর্দ্দায় সামনে এসে দাঁড়াবেন। তারপর শ্রীযুক্ত শরৎবাবু বলবেন—"আমি তোমাদের 'ম্যানুস্ক্রিপ্ট' দেখলুম্ আমার "বিজয়াকে কি করলে ?"

যতীন মিত্র সেকথার উত্তরে বল্লেন—আমাদের তো সবই প্রস্তুত আছে—এখন শুধু আপনার আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা করছি।" তারপর শরৎবাবু "বিজয়া" কে পরিচালনা করেছেন প্রশ্ন করায় যতীনবাবু উত্তর দিলেন —"দীনেশ দাস"। তাতে শরৎবাবু বেশ খুসী হয়ে বল্লেন—"হ্যাঁ, দীনেশকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। দীনেশের উপর আমার 'বিজয়ার' ভার দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি।" তারপর নিউ থিয়েটার্স তাঁর সমস্ত বইয়েরই ভাল রূপ দিয়েছেন, এই সব কথা আলোচনার পর দৃশ্যটি শেষ হবে এবং আসল বই আরম্ভ হবে।"

শ্রীযুক্ত যতীন মিত্রকে নিউ থিয়েটার্সের সত্ত্বাধিকারী বানিয়ে সহযোগী যে উর্ব্বর মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছেন তা' সত্যই কৌতুহলোদ্দীপক! সহযোগীর জ্ঞাতার্থে আমরা জানাচ্ছি যে মিত্তির মশাই নিউ থিয়েটার্সের সত্ত্বাধিকারী নন—তবে তাঁকে Power Behind The Throne বলা যেতে পারে।

নিউ থিয়েটার্স

"মিলিওনেয়ার" যে একখানা খুব ভাল ছবি হ'য়েছে—তা' আজ সবাই বল্‌ছে। শুধু ভাল তা নয়, এ একখানা নতুন ধরণের ছবি। ছবির কর্ত্তাদের মনে দুর্জ্জয় সাহস না থাকলে এ রকমের ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ 'কমেডি' কেউ তোলায় সাহসী হ'তেন কিনা বলা যায় না—অন্ততঃ এতদিন পর্য্যন্ত কেউ সাহস করেন নি। ছবিখানা হিন্দিওয়ালাদের যখন মনকে জয় কোরেছে, তখন অতি সহজেই যে বাঙলাওয়ালাদের মনে আনন্দ দিতে পারবে—এ ধারণা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। সেজন্যে আমরা ছবিখানার বাঙ্‌লা সংস্করণ তোলার কথা কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম। এখন শুনছি কর্ত্তৃপক্ষ ছবিখানাকে বাঙ্‌লাতেও রূপ দেবার কল্পনা কোরেছেন। বাঙ্‌লাতেও "মিলিওনেয়ার" বা "ক্রোড়পতি" রূপোলি পর্দ্দার গায়ে যে বেশ জমে উঠবে—এ বিশ্বাস আমরা করি।

* * *

হেমচন্দ্র "অনাথ আশ্রম" নিয়ে ব্যস্ত। গেল হপ্তা থেকে "অনাথ আশ্রমের"-র হিন্দী সংস্করণের শুটিং সুরু হ'য়েছে। ছবিখানা বাঙলাতেও তোলা হবে; আর তার প্রাথমিক কাজ হিন্দী সংস্করণ একটু এগুলেই আরম্ভ হবে।

* * *

যতীন মিত্তির ও দীনেশ দাশের অক্লান্ত চেষ্টায় "বিজয়া" প্রায় শেষ হ'তে চলল। মিত্তির মশাইয়ের কাজের যে একটা পদ্ধতি আছে, যার ফলে লোকদের তিনি যেমন খাটিয়ে নিতে পারেন, নিজেও তেমনি খাটতে পারেন—একথা তাঁর শত্রুরাও বোধ হয় স্বীকার কোরতে কুণ্ঠিত হবে না। মিত্তির মশাইয়ের "বিজয়া" তাঁর গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দিক—এই আমাদের শুভেচ্ছা।

কালী ফিল্মস্

"টকী অফ্ টকীজে"র শুটিং প্রায় শেষ হ'তে চলল। এর বাঙলা নাম হ'য়েছে নাকি "দস্তুর মত টকী"। মঞ্চের মত নাটকখানা যা'তে পর্দ্দায়ও দস্তুরমত জমে ওঠে—তার জন্যে শিশিরকুমার চেষ্টার কসুর কোরছেন না। ষ্টুডিও মহলে সবাই শিশিরকুমারের এ একাগ্রতা দেখে বিস্মিত হ'য়েছেন। সবায়ের মনে একটা ভয় ছিল গাঙ্গুলী মশাই শিশিরকুমারকে নিয়ে হয়ত' এবার বিপদে পড়বেন। কিন্তু বিপদে পড়া দূরে থাকুন, শিশিরকুমার দিন রাত্তির এই ছবি তোলা নিয়ে যে অমানুষিক পরিশ্রম কোরছেন—তা' তার কর্ম্মীরা ছাড়া কেউ বুঝবে না। আমরা শিশিরকুমারকে তাঁর এই সুবুদ্ধির জন্যে ধন্যবাদ দিই। যিনি শিশিরকুমারের সঙ্গে এ ছবির টেক্‌নিক্যাল পরিচালকরূপে কাজ কোরছেন—ইনি আর কেউ নন, ইনি কালী ফিল্মসের নন্দদুলাল মজলিসী মুখুয্যে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

এ হপ্তায় "সোণার সংসার"—হিন্দী ও বাঙলা—একটা খুব বড় সেটে তোলা

হ'চ্ছে। এ সেট্‌টি হ'চ্ছে স্যার শঙ্করনাথ নামে কাল্পনিক রোগগ্রস্থ একজন মহৎ হৃদয় অথচ ভীতু লোকের প্রাসাদের কিয়দংশ। এখানে "সোণার সংসার" গল্পের আর একটি মোড়। কারণ এখানে ভাগ্যবিতাড়িতা 'রমা' যে স্বামী ও পুত্রের কাছ থেকে দস্যু কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন হ'য়েছিল তাকেই এখানে ধাত্রীরূপে দেখা যাবে এবং এখানেই আঠারো বছর পরে মাতা-পুত্রের মিলন হবে।

বাঙ্‌লা ও হিন্দীর দুই চরিত্র-অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী ও মজাহার খাঁ শঙ্করনাথের ভূমিকায় এ দৃশ্যে সুন্দর অভিনয় কোরেছেন শোনা যাচ্ছে। আর রঘুনাথরূপে ধীরাজ ও বিজয় কুমার ও রমার ভূমিকায় ছায়া ও রামপিয়ারী এ দৃশ্যে যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় কোরেছেন বলে প্রকাশ।

* * *

"বাঘে সিপাহী"-র আলিপুরে একটা বাগানবাড়ীতে বহির্দৃশ্য তোলার সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানার শূটিং কারবার শেষ কোরেছেন।

রাধা ফিল্মস

এদের "বিষবৃক্ষে"র কাজ শেষ হ'তে আর দেরী নেই। ফনি বর্ম্মা যে "বিষবৃক্ষে"র রোপণ কোরলেন—তা' থেকে যদি অমৃতের উদ্গার হয়, তা' হ'লেই তাঁর প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হবে। ছবিখানা শুন্‌ছি প্রাইমা ফিল্মস্ সরবরাহের ভার নিয়েছেন।

রজনী

লোকে আজকাল যে ছবির 'কোয়ালিটি' বুঝতে শিখেছে—তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ "রজনী"। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর-লেখনী, দেবদত্তের অকাতর অর্থব্যয়, বিধুভূষণের প্রচারকার্য্যের পটুতা, সমর ও গীতার মুন্সিয়ানা সবেরই জবাই হ'য়েছে জ্যোতিষের অপটু হাতের দোষে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-কন্যা "রজনী"কে কতগুলো অবিবেচক লোকের হাতে পড়ে এরূপভাবে বিকৃত হ'তে হয়েচে।

দেবদত্ত ফিল্মস

দেবদত্ত ফিল্মসের অন্তর্বিপ্লবের যতদিন না অবসান হয়, ততদিন এখানে রীতিমত কাজ চল্‌বে না।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

এখানে কোলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়দের নিয়ে 'সি-এ-পি'র যে "আলিবাবা" ছবি তোলার কথা আমরা আগে লিখেছিলাম—তার আনুষঙ্গিক কাজ প্রায় শেষ হ'য়েছে। ছবিখানা কোলকাতায় যখন মুক্তি পাবে—তখন "নটীর পূজা'র মত আর একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি কোরবে—তা' সত্য, তবে "নটীর পূজা" যে চাঞ্চল্য এনেই নিভে গিছ্‌ল—আশা করি, "আলিবাবা" সে সৌভাগ্য লাভ কোরবে না!

মা

শ্রীপ্রভা দে, সরস্বতী

অতি সন্তর্পণে দুয়ার খুলে সুনয়না উঠোনের ওপর নেমে এল। স্বচ্ছ চাঁদনী রাত্রি, শুধু শীতের কুয়াশায় চারিদিক একটু আবছা দেখা যাচ্ছে। নীল আকাশ, তার গায়ে লাখো লাখো তারা, চাঁদের ছোট বোন সব। দূরে, মাঠের বটগাছটায়, একপাল কাক কলরব করে উঠল। ওরা ভাবল, ভোর হ'ল বুঝি! সুনয়না বুঝি কার নিশিডাক শুনেছে।···দাঁড়াও, আমি আসছি। আর ডেকো না অমন করে। সুনয়না ধীর পদে এগিয়ে চলল···

পাড়াগাঁয়ে তাদের বাড়ী। বাড়ীময় পাকাধানের গন্ধ, ক'দিন হ'ল কেটে আনা হয়েছে। পুকুরের ধারে নারকেল গাছ, খেজুর গাছ, সুপারী গাছ। গাছের পাতা বেয়ে ছোট ছোট শিশিরবিন্দুগুলো টপ্ টপ্ করে জলে পড়ছে। পড়েই গড়ে তুলছে কতগুলো ক্রমবিকাশী বৃত্তরেখা, যে রেখা মিশছে যেয়ে পুকুরের অপর পারে। যে রেখার ভাঁজে ভাঁজে চাঁদের আলো উথলে উঠছে ঢেউ খেয়ে।

সুনয়না পুকুরের ধার বেয়ে মাঠের পথে পা বাড়াল। একটা শেয়াল ভয় পেয়ে, পাশ কাটিয়ে, লেজ গুটিয়ে, দে দৌড়। পাশের বাড়ীর কুকুরটা অযথা ডেকে মরছে। এক একটা দমকা হাওয়া আসছে, তীরের মতো বিঁধছে তার গায়। পথের ওপরে শীতজর্জ্জর শুকনো ঘাস, তার ওপরে পড়েছে হিমশীতল শিশির, সুনয়নার পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। পথ ছেড়ে সে চলল ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে। কাটা ধানের গোছাগুলো বিঁধল পায়ে কাঁটার মতো! সুনয়না ফিরে এল আবার পথের ওপরে।

খানিকটা গিয়েই রেলের লাইন। বাঁশী বাজিয়ে, আগুন ছড়িয়ে, একটা গাড়ী আসছে। চাঁদের আলোর পাশে এন্‌জিনের সার্চলাইট একেবারে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ বলে মনে হল। তবু, সেই সার্চলাইট যখন সুনয়নার মুখের ওপর এসে পড়ল, তার মনে হ'ল গাড়ী শুদ্ধ লোক তাকে এই পলায়মান অবস্থায় ধরে ফেলেছে। উদ্‌ভ্রান্ত, উচ্চকিত হ'য়ে সুনয়না দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ীটা বেরিয়ে গেল বোঁ করে।

ভীতু, সর্ব্বহারার মতো ভীতু সে। এই ভয়ের সাথে বরাবর সে যুদ্ধ করে আসছে, জয়ী হ'তে পারল কই? তাই না সেদিন তার স্বামী তাকে তার রাত্তিরের গতিবিধি জিজ্ঞেস করায় সে কেঁদে ফেলেছিল। তাই না আজও পথের ওপর দাঁড়িয়ে তার মনে হ'ল, না, ফিরে যাই। কিন্তু, এ কী অসহ্য, উন্মাদ প্রেরণা, যা তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে!

বিয়ের পর আটটি বছর কেটে গেল, এখনও সে বন্ধ্যা। মাদুলী, চিকিৎসা, পূজা-পার্ব্বণ,—কিছুই তার এই নির্লজ্জ বন্ধ্যাত্বকে দূর করতে পারল না। সংসারের সবাই তাকে বেকসুর খালাস দিত যদি তার স্বামী আর একটি বিয়ে করত। স্বামী তাকে ভালবাসে, আর একটা বিয়ে করে সুনয়নাকে কষ্ট সে দেয় নি। তবে, মস্ত ট্র্যাজিডি এই যে, সুনয়না স্বামীর জন্য একটুও ব্যস্ত নয়। সে জানে, পূর্ণিমার পর অবধারিত অমাবস্যার নিশ্চয়তা নিয়ে সে জানে, ছেলে তার হবে না। যে পাপ সে করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত আজীবন করতে হবে। হাসি পায়, সুনয়না একদিন নিজের সদ্যপ্রসূত সন্তানকে হত্যা করেছিল বলে আর তার ছেলে হবে না!

আগে পিতা, তারপর পুত্র, তারপর মাতা। সুনয়নার ছেলে হয়েছিল বিয়ের আগে। যাকে সে মনে ভেবেছিল কামনা, আজ পরিণত বয়সে, নিজের জীবনের বিফলতায়, সেই কামনা অপূর্ব্ব মাধুরীতে রাঙিয়ে উঠেছে। পালিয়ে যাবার দিন সেই জারজ সন্তানের পিতা সুনয়নাকে অভিশাপ দিয়েছিল, তুমি বন্ধ্যা হবে। কোনদিন তুমি সুখী হতে পারবে না। সেদিন এই কথাটির অর্থ ততোটা হৃদয়ঙ্গম করতে সুনয়না প্রস্তুত ছিল না। বরং, সেই অধিকারহীন পিতার ওপরে সে বিজাতীয় ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। বলেছিল, এ কী করলে তুমি··· এই তোমার ভালবাসা! তবে আজ, আমাদের হাসি পায়, সুনয়না সেই অভিশাপকে শুধু মাত্র সত্যি বলেই স্বীকার করেনি, অভিশাপকে আশীর্ব্বাদ বলে মাথা পেতে নিয়েছে।

অতীতের সেই বেদনাপূর্ণ কাহিনী স্মরণ করতে করতে সুনয়না এগিয়ে চলেছে। চলেছে সেইখানে, যেখানে সে একদিন নিজের ছেলেকে মাটির তলায় পুঁতে রেখে এসেছিল। কী করে ব্যাপারটা সকলের অগোচরে ঘটেছিল সে নোংরা কাহিনীর বিবৃতি দিয়ে কাজ নেই।

তারপর কতোদিন, কতোরাত্রি, কার কাতর ধ্বনি, কার অসহায় দু'টি হাতের নীরব ভাষা তাকে কাঁদিয়ে তুলেছে।···মনে পড়ত মনের কোণায় প্রেমের সেই প্রথম আনাগোনা, সেই অবাধ্য—মধুর আশা, সেই লাজরাঙা প্রকাশভঙ্গিমা। সেই কারণে অকারণে মনের

দোলায় দোল খাওয়া······তারপর, তারপর, এক নতুন, নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা।

ভয় তাকে পেয়ে বসেছিল। তার দুর্ব্বল নারীহৃদয় নিজেকে নিঃশেষ করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তবে, নিজের দেহ-নিংড়ানো ক্রমবিকাশমান মানব শিশুকে হত্যা করতে তার কুণ্ঠা ছিল অপরিসীম। কী এক বিপুল আনন্দে তার দেহ-মন দিবানিশি আপ্লুত হয়ে উঠত। তারপর— ওঃ! সে কথা সে আজ ভাবতেও পারে না। কেন, কার চোখ রাঙ্গানীতে, কার ভ্রূকুটিতার নবজাত শিশুকে সে হত্যা করে ফেলল! নিশ্চিহ্ন করে দিল সব চিহ্ন, মুছে ফেলল পাপের পর্য্যুসিত গ্লানি।···সত্যিই কি তাই? সে কি আপন হৃদয়ে আজ মুক্ত। না, প্রথম পাপের (?) প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে, যে দ্বিতীয়, নৃশংস পাপ সে করে বসল, তারই বিষাক্ত অনুতাপে আজ সে পুড়ে পুড়ে মরছে। ওগো, কে এর জবাব দেবে, কে করবে এ সমস্যার সমাধান!······

একটা অতি পুরাতন জামগাছ। তারই তলায় সুনয়না হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। গাছের তলায় পরিপূর্ণ অন্ধকার, ছায়া পেরিয়েই চমৎকার জ্যোৎস্না। ভোর হ'তে তখনও অনেক দেরী। এই গাছের তলাতেই সুনয়নার ছেলে ঘুমিয়ে আছে।

অন্ধকারে সুনয়নার সেই মূর্ত্তি দেখলে যে কোন সাহসী লোক ভয় পেয়ে যেত। চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল, চুলগুলো আলুথালু, ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত। গায়ের কাপড় অবিন্যস্ত, ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপছে। সব মিলে যেন এক বীভৎস প্রেতিনী মূর্ত্তি। সুনয়নার ভয়ে তার চতুষ্পার্শের অন্ধকার কেঁপে উঠল বুঝি।

···আর হৃদয়? সেই প্রেতিনীর মাতৃহৃদয়? সমস্ত গরল অনুতাপের তীব্র আগুনে সোনা হয়ে উঠল। নিঃশব্দ, আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠে সুনয়না বলতে লাগল, ওগো তুমি এস, ফিরে এস······টপ্ টপ্ করে ফোঁটার পর ফোঁটা জল তার মুখ গড়িয়ে পড়তে লাগল। আজ তার চেতনা বিক্ষুব্ধ, আজ তার নয়নে জ্ঞানের জ্যোতি।

ওঃ! যদি সে এক্ষুণি মাটি খুড়ে তাকে বের করে নিয়ে আসতে পারত!···যদি পারত! পারবে না সে, পারবে না? বন্য, হিংস্র, বাঘের মতো, নখ দিয়ে সে মাটি খুঁড়বে, তবু, তবু, সে পারবে না? নিশ্চয় পারবে। মৃত শিশুর দেহে নিজের নিষ্পেষিত বুকের তাপ দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করে দেবে। চুমোয় চুমোয় রাঙ্গা ঠোঁট দু'টিতে কথা ফোটাবে। মানুষের পরিহাস, ভ্রূকুটি, অপমানের অন্তরালে, সুনয়না তাকে লুকিয়ে রাখবে।

আজ প্রথম সুনয়না তার জারজ সন্তানের পিতার উদ্দেশ্যে মিনতি জানাল। বলল, ওগো, তোমার অভিশাপ সর্ব্বাঙ্গীন সফল হয়েছে। তুমি এস, আমার খোকাকে বাঁচিয়ে তুলতে তোমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। তুমি আমায় ক্ষমা করে যাও, বলে যাও আমি নারী, আমি মা।···কেন, কেন তুমি, তোমার পৌরষ নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়ালে না? কেন তুমি ছিনিয়ে নিলে না তোমার দেওয়া খোকাকে। কেন তুমি সমগ্র জগতকে তার নিষ্ঠুর বিধান হ'তে বিচ্ছিন্ন করে তোমার বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করলে না? তুমি ভীরু, তুমি কাপুরুষ, আমার চেয়েও দুর্ব্বল তুমি?···না গো না, তোমার তিরস্কার করব না। আমায় পাপ স্বীকার করতে দাও, বলতে দাও আমি হত্যাকারিণী। ঈশ্বরের বিধানে আমার শাস্তি তোলা রইল, তার ভাগ তোমায় নিতে হবে না গো, হবে না। তুমি শুধু এস, একটিবার এস······আমি যে আর পারি না গো······

কুৎসা, অপমান, নিন্দাকে তুচ্ছ ক'রে মা হবার দুরতিক্রম্য সাহস আজ আমার বুকে নাচছে। তুমি এস, দেখে যাও এই নাচন, দেখে যাও আমার হৃদয়ের নব-উন্মোচন। ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য্য হয়ে যাই, সামান্য একটা মাংসপিণ্ডের প্রতি আমার এতো দরদ কেন। তার ভবিষ্যৎ, তার জন্মের কলুষ, জীবনের নিদারুণ পরিণাম······এ সমস্ত ছাড়িয়েও কেন এই অফুরান মমতা? একী অসহ্য অনুভব, একী অতিন্দ্রীয় উচ্ছ্বাস? তুমি পিতা; তোমার অধিকারের চেতনা নিয়ে, তোমার দায়িত্বের গর্ব্ব নিয়ে, তুমি আমায় অভিশাপ দিয়েছিলে।

কিন্তু আমি যে মা, শুধুমাত্র আমি মা। তাই তো আজও আমার বুকজোড়া ব্যথা। তাইতো বারেবারে এই গাছতলায় ছুটে আসি। তাই তো স্বামীর প্রতি, সংসারের প্রতি, আমি বিরাগী।......হঠাৎ মোরগের ডাক শুনে সুনয়নার চেতনা ফিরে এল। দেখল, পূর্ব্বদিক লাল করে সূর্য্য উঠছে...

আজি কি তোমার মধুর মূরতি

(ডি, পি, এস্)

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু প্রগতি-প্রভাতে
নব্য ললনে ! অয়ি অপরূপে !
নিখিল নারীর সভাতে।
ফুটবল মাঠে, সিনেমা, কলেজে,
প্রকাশিয়া তুমি কতই ছলে যে,
শতেক চিত্ত হরিছ নিত্য
লীলায়িত দেহ শোভাতে।
শত যুব-জনা বন্দনা মাঝে
হেরিনু প্রগতি প্রভাতে।

তরুণী তোমার চটুল চাহনি,
দোদুল বেণীর লহরে
আহ্বান শুনি কলেজ মেট্ আর
দাদার বন্ধু শিহরে।
স্পন্দন তোলে তোমার পরশ,
এতটুকু হাসি জাগায় হরষ,
এতটুকু কথা করে সিঞ্চন
অমিয় কর্ণ-কুহরে ;
ভঙ্গিতে আর ইঙ্গিতে তব
তরুণ বন্ধু শিহরে

নিত্য নবীন রঙের বিলাসে
ও তনু তোমার দীপ্ত।
লিপষ্টিক্ আর হাই-হিলে তব
এ্যারিষ্টোক্র্যাসি তৃপ্ত।
পথে, ট্রামে, বাসে দু-চার ডজন
তোমারে ঘেরিয়া তোলে গুঞ্জন,
রোম্যান্স-বিলাসী, মধুলোভী ছেলে
ও-রূপ-সিনান-সিক্ত
নিত্য নবীন বিজয়োল্লাসে
ও আঁখি তোমার দৃপ্ত।
প্রগতির জয় যাত্রার পথে
সাম্যের ধ্বজা

ছুটিয়াছ তুমি দু-পায়ে তোমার
সমাজ শাসন মাড়ায়ে।
শত পতঙ্গ আসে তব গেহে,
হাসিমাখা মুখ, লজ্জিত দেহে,
ব্যাঙ্কের আঁক শূন্য করিয়া
ড্যাম্‌লার কার উড়ায়ে
ছুটেছ রঙ্গে, তব আসঙ্গে
লক্ষ পরান জুড়ায়ে।

আয় ওরে আয়, আয় ধনবান্
তরুণীর প্রেম মাগিয়া,
হৃদয় দুয়ার, নব্য-ললনা
খুলেছে তোদের লাগিয়া।
আয় মাড়োয়ারী, আয় ম্যাড্রাসী
পাঞ্জাবী আয়, আয় রে পারসী
যশ, ধন, মান সম্পদ যার
আয় নব যুগে জাগিয়া
সবর্ণ-প্রীতি-আঁধার ঘুচেছে
সভ্যতালোক লাগিয়া।

তরুণী অঙ্গে নব-ছাঁদে শাড়ী
তনু-রেখাপাত প্রয়াসী,
কুন্তল চুমি কর্ণাভরণ
দোলন-ছন্দ-বিলাসী।
চল চঞ্চল চরণরঙ্গ,
চকিত চোখের চারু ভ্রূভঙ্গ,
নিতি নবরূপে উছল অঙ্গ
যুবজন জয়-তিয়াসী
রূপযৌবন যৌবন ঘেরি
তরুণ ভ্রমর পিয়াসী।

নারী প্রগতি

[নক্সা]

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী

বিরাট মহিলা-সম্মেলন। স্থান—টাউন-হল। দেশ দেশান্তর হতে দেশবরেণ্যা মহিলাদের সমাবেশ। এ নারী প্রগতির যুগ। প্রহরীও মহিলা। তবে নেতা পদবীর ও কর্ম্মী শ্রেণীর দু'চারজন পুরুষও বর্ত্তমান। গানে ও বক্তৃতায় "হলটা" মুখরিত। সেদিনকার এই বিরাট অনুষ্ঠান দেখিলে ঘোর নরম-পন্থীকেও স্বীকার করিতে হইত—ভারত বুঝি স্বাধীন হয়, কবি যখন গাহিয়াছেন—"না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি স্বাধীন হবেনা হবেনা।" সভামণ্ডপে ময়ুরপঙ্খী, আসমানী, শুকতারা ও বলাকা প্রভৃতি নানা রঙ-বেরঙের আধুনিক শাড়ী পরিহিতা নানা শ্রেণীর মহিলাগণ উপবিষ্টা। বাইরে—রাস্কুনীর মতো দণ্ডায়মান স্বল্প-কাল স্থায়ী দোকান গুলোর বিক্রেতা তীর্থ কাকের ন্যায় ক্রেতার প্রতীক্ষারত। প্রবেশ পথে জনকতক অনবগুণ্ঠিতা তরুণী অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। সবাই হাল ফ্যাসানে সজ্জিতা—কানে বৃহৎ দুল, মনিবন্ধে সোনালী রঙের ঘড়ি, বুকে "শেফার্ড" কলম, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, পরিধানে স্কার্ট শাড়ী আর পায়ে নাগরা। গোলাপের ন্যায় হাসিমাখা মুখমণ্ডলে সারাক্ষণ খর-যৌবনের একটা দীপ্তি বিদ্যমান।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা যুগবাণী দেবী, শ্রীমতী অতীতা সুন্দরী কর, শ্রীমতী অনাদিবালা সরকার, শ্রীআধুনিকা রায়, শ্রীযুগাদেবী, মিস্ প্রগতি গুপ্তা ও মিস্ ভাবী সেন প্রভৃতি নামজাদা মহিলাগণ সমভিব্যাহারে তিন-অশ্বযোজিত যুগরথে করিয়া সভামণ্ডপে হাজির। চারিদিক হতে উলুধ্বনি, সভানেত্রীকি জয়, up, up Precident ইত্যাদি নানা প্রকার উৎসাহ-পূর্ণ ধ্বনি উত্থিত হইল। সম্মেলনের কার্য্যারম্ভ হতেই অভ্যর্থনা সমিতির সভা-নেত্রী শ্রীযুক্তা ত্রিযুগা দেবী উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

সভানেত্রী মহোদয়া ও ভদ্র মহিলাগণ! আজ আপনারা দেশ দেশান্তর হতে শুভাগমন ক'রে এই সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করেছেন। সেজন্য আপনাদিগকে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। "ভারতে নারীর স্থান নির্দেশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। জগতের নারী জাগরণের দিনে আমাদের নিজেদের একটা স্থান করে নিতে হবে। কিন্তু আমাদের মধ্যেও আবার জটিল সমস্যা সমুপস্থিত—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের নারী নিয়ে। নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ মত প্রকাশ করতে না পারলে দেশাত্মবোধের বজ্র আঁটুনিতেও আমাদের দাবীর কোন মূল্যই হবে না। তাই এই সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা এখানে সমবেত হয়েচি। আশা করি সকলে একটা সম্মিলিত-দাবীর খসড়া ক'রতে সমর্থ হবো।"

সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা যুগবাণী দেবী সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আশা করি অধিক সময় ক্ষেপন না করেই আমরা একটা সম্মিলিত প্রস্তাব গ্রহণ করতে সমর্থ হবো। এখন যে কেহ মূল প্রস্তাবটা উত্থাপন করুন।"

প্রথমেই শ্রীযুক্তা অতীতাসুন্দরী কর বক্তৃতা করিলেন, আমি আপনাদের উপস্থিত সকলের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা। দীর্ঘ-কাল এ ভারতে আমার কেটেছে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা হতে আপনাদিগকে কয়েকটা কথা জানাচ্ছি। আবহমান কাল হতে নারী পুরুষের সেবা করে আসচে। পুরুষও নারীর জন্য নিজের রাজ্য, মান, গৌরব — এমনকি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েচেন—আজো তার রাশীকৃত দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

আমি প্রস্তাব কচ্ছি—

"যেহেতু নারী আবাহমান কাল হইতে পুরুষের সাথেই চলিয়া আসিতেছে, পুরুষও নারীর জন্য সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকারেও দ্বিধা বোধ করেন না, যেহেতু নারী অবলা ও পরানুগ্রহে পালিতা—সেজন্য এই মহিলা সম্মেলন পুরুষকে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে যে তাঁহারা যেন অদূর ভবিষ্যতে নারীকে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও বৈষয়িক—সর্ব্বক্ষেত্রে স্থান দেন।"

প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্তা অনাদি-বালা সরকার কহিলেন, আপনারা শুধু স্মরণ রাখবেন—দৈনন্দিনিক জীবনে আপনারা পুরুষের সাহায্য ব্যতিত চলতে অক্ষম। আর গার্হস্থ্য জীবনে পতিই স্ত্রীর পরম গুরু—এ কথাটিও ভুললে চলবে না। অতীতে যত নারী স্বামীর পদাঙ্কানুসরণ

করে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেছেন। আর, সীতা, সাবিত্রী বেহুলার মতো পুণ্যশ্লোকা নারীও পতি সেবার আদর্শে এ ভারত-ভূমি ধন্য করেছেন। আশা করি, আপনারা একমত হবেন।

মিস্ প্রগতি গুপ্তা কহিলেন, ভাবী ভারতের পক্ষ হতে আমাকে প্রস্তাবটীর বিরোধিতা করতে হচ্ছে। আমরা এখানে সমবেত হয়েচি—অতীতকে টেনে এনে ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে নয়, অতীতের আস্তাকুঁড়ে স্তূপীকৃত জঞ্জাল ফেলে তার গাঢ়তা বাড়াতে নয়—পরন্তু নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করতে—অস্তার আস্তাকুঁড়কে বাসোপযোগী করতে। অতীত সমাজ আমাদের জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে। তাকে সরাতে হবে, দরকার হলে নয়া সমাজের পত্তন করতে হবে। গার্হস্থ্য জীবনে "পতিই স্ত্রীর পরম গুরু"—একথাটি আমরা মানতে বাধ্য নই। পতি পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য হলে তাঁকে গুরু বলে মানবো কেন? তাঁদের দোষ ও গুণ বিচার করে ঘৃণা বা ভক্তি করার স্বাধীনতা সবারই আছে। আমাদের কর্ম্ম-শক্তি ও বুদ্ধিশক্তি বিদ্যমান—তবে আমরা অবলা কেন? আমরা পরানুগ্রহে পালিতা বলেই আমাদের যত দুর্গতি। তাঁরা পর নারী সংশ্রবে যেতে পারেন আর আমরা একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে কথা বল্লেই যতো দোষ। আমরা অন্ধকার গৃহকোণে রান্না করি, ছেলে মেয়ের বিরক্তি সহ্য করি আর পতির গঞ্জনা ভোগ করি। সারা জীবন তাঁরা আমাদের উপর প্রভুত্ব করেন। তাঁদের তিরোধানে আমরা সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্ভোগ হতে বঞ্চিত হই। মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? আমাদের এ দুর্ভোগ কেন? এটা কি সমাজের অন্যায় আব্দার নয়? আর অন্যায় সহ্য করবো না। কাহারো তাঁবে রইব না। যুগ যুগান্তরে রাশীকৃত অন্যায়—আইনের কৃপায় আজ অচল। শিশুদান, সতীদাহ প্রথা একেবারে উঠেই গেল। এতে ধর্ম্মের ও সমাজের মর্য্যাদা বেড়েছে। উপসংহারে একথা বলতে চাই যে, আমরা স্বাধীন হয়ে জন্মেচি—পুরুষের অধীন করার কি অধিকার? কাহারো অনুগ্রহ নিগ্রহের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকবো না—নিজেদের পায়ে দাঁড়াবো, প্রয়োজনবোধে অসহযোগের তূর্য্যনিনাদে পুরুষ-হৃদয় কম্পিত করে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদি তাঁরা সংসার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হন তা'হলে আমরা এক সুরে দাঁড়ায়ে একটা আপোষ নিষ্পত্তি করতে প্রস্তুত।

আমি প্রস্তাব কচ্চি——

"যেহেতু নারী কোন অংশে পুরুষের চেয়ে হেয় বা অনুন্নত নহে, সে জন্য এই মহিলা-সম্মেলন অবিলম্বে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, বৈষয়িক—সর্ব্বক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার

দাবী করিতেছে এবং এই সম্মেলন এই আভাসও দিতেছে যে এই দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতব্যাপী আন্দোলন চালাইতেও দ্বিধা বোধ করিবে না—এমন কি পুরুষের সঙ্গত্যাগ ও বিদ্রোহী হওয়ার মতও পোষণ করিতেছে।"

প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া মিস্ ভাবী সেন বক্তৃতা করিলেন, কামনার তীব্র উত্তেজনায় আমরা দিশেহারা হয়ে পুরুষের আহ্বানে ছুটে যাই। নিজেদের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়ি, আর চির-জীবন অনুতাপে জ্বলে পুরে মরি। এ ভুল আর আপনারা করবেন না। নারীত্বকে জলাঞ্জলি দেবেন না। যদি হৃদয়ে আকুল পিয়াসা জাগে—প্রেম বিনিময় করুন—তবে নিজেকে নিঃস্ব করে নয়। স্বাধীন ভাবে চল্‌তে শিখুন। যদি আপনাদের চিরন্তন দুঃখ কষ্টের অবসান করতে চান্, যদি অন্ধকার কক্ষের হেঁসেল হতে সভ্যতার আলোকে আসতে চান্, যদি আত্মপ্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র আকাঙ্খাও আপনার মনে জাগরূক হয়ে থাকে-তা'হলে আপনাদিগকে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করতেই হবে।

শ্রীআধুনিকা রায় কহিলেন, বর্ত্তমান ভারতের পক্ষ হতে উভয় প্রস্তাবের বিরোধিতা করাই সমুচিত বলে মনে করি। অতীত ভারতের শ্রীযুক্তা অতীতা সুন্দরী কর যে প্রস্তাব করেছেন তাতে অতীতের স্তূপীকৃত জঞ্জাল বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার যুগে আমরা অতীতকে আঁকড়ে ধরে কালোচিত ধর্ম্মকে অপমানিত করতে রাজি নই। তা'বলে অতীতকে একেবারে ভুল্‌লে চল্‌বে না। কারণ অতীতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূল্য অনেকখানি। আর মিস্ প্রগতি গুপ্তার প্রস্তাবেও এক-মত হতে পারিনি। তিনি যে নারীর দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করেছেন—সে বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই। তবে তিনি কখনো এর গূঢ় রহস্য ভেদ করেছেন কি? যুগ যুগান্ত হতে নারী পুরুষের সংসার ক্ষেত্রের বাধা-বহুল যাত্রা-পথে সাথী হয়ে চলেছে। দুঃখ কি শুধু নারীর? বর্ত্তমান অবস্থায় মিস্ প্রগতি গুপ্তার প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রগতি যুগান্তর আমার পূর্ব্ব মতান্তর এমন কি গৃহান্তরও হতে পারে। পুরুষ ছাড়া নারী চল্‌তে পারে না। নারীশিক্ষা ও মার্জ্জিত রুচি-সভ্যতার নিদর্শন। রাশীকৃত উমেদারের বেশে নারী কেরাণী হলে বেকার-সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠবে, আর দাম্পত্য জীবনের যোগসূত্র টুটে জীবনটা বিষময় হয়ে যাবে।

আমি প্রস্তাব কচ্ছি——

"যেহেতু নারী যুগ যুগান্ত হইতে বাধা বহুল যাত্রাপথে পুরুষের সুখ দুঃখের সাথী হইয়া চলিয়াছে, সেজন্য এই মহিলা সম্মেলন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও বৈষয়িক—সর্ব্বক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার দাবী করিতেছে এবং এই সম্মেলন এই ভরসাও করিতেছে যে তাঁহারা নারীকে সমস্তরে স্থান দিবেন।"

শ্রীযুগা দেবী প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া কহিলেন, অতীত এবং ভাবী ভারতে যা কিছু মতান্তর থাকুনা কেন—নরনারীর মায়ার বন্ধন আমরা অস্বীকার করতে পারিনে। এই বন্ধনই জগতের অস্তিত্বের আদি কারণ। আপনারা কি সৃষ্টির রহস্য ভেদ করেন নি? রাস্তার ধারে যে বৃক্ষটী দাঁড়িয়ে থাকে সেও জীবনের স্বার্থকতা খোঁজে। দীর্ঘকালের ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রে তাকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলে। পরার্থে, সে নিজেকে পত্রে পুষ্পে সুশোভিত করে, ফলভরে নত হয়ে ভাবে এখানেই তার জীবনের সার্থকতা। সর্ব্ব সুখ-দুঃখ বিজড়িত নারী জীবনের সার্থকতা "মাতৃত্ব"। সে সুখের ভাগি হতে হলে পুরুষের সহ-যোগিতা দরকার। নিজেদের মাঝে সংযোগ-শৃঙ্খল ছিন্ন না করাই উচিৎ। এ আমার অনুভূতির অভিজ্ঞতা—যুগ যুগান্তের তুচ্ছ মায়ার কান্না নয়। এই মিলন মহোৎসবে যোগ দিন, দেখবেন—আকাশভরা রঙে বাতাসভরা সুরে, হৃদয়ভরা সুখস্বপ্নে আপনাদের মধ্যে নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হবে, আর অদৃশ্য লোক হতে পরমপিতা পরমেশ্বরের অযাচিত আশীর্ব্বাদ

আপনাদের উপর বর্ষিত হবে। আশা করি আপনারা এপ্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন।

শ্রীযুক্তা অতীতা সুন্দরী কর বিমর্ষভাবে কহিলেন, না—কিছুতেই না, এ প্রস্তাবে মেয়েদের বিশেষত্ব নষ্ট করা হয়েছে। এতে নারীকে উৎসন্নের পথে চালিত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

মিস্ প্রগতি গুপ্তা মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, এ প্রস্তাবে কোন কারণে আমরা একমত হতে পারিনে। এতে অতীতের ন্যায় বর্ত্তমানে, আর প্রগতির যে ক্ষীণ আলো মিট মিট করে জ্বলচে তাও যে-কোন মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হতে পারে। এতে লক্ষ স্থানে পৌঁছাবার আশা সুদূর পরাহত। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা যুগবানী দেবী কহিলেন, সব প্রস্তাব গুলোই আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন। আমার বিশ্বাস শেষ প্রস্তাবেই সমতা রক্ষা করা হয়েছে। ইহাই আমাদের গ্রহণ যোগ্য। বৃহৎ সঙ্ঘবদ্ধ মতের খাতিরে মহৎ উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যক্তিগত মতকে বলে দেওয়া উচিত। আশা করি আপনারা শেষ প্রস্তাবটী গ্রহণ করবেন। কাহারো আপত্তি আছে ? [সবাই চুপ]

তা হলে ধরে নিতে পারি প্রস্তাবটী গৃহীত হলো। সভা ভঙ্গ হলো। কেহ বা আনন্দে, কেহ বা বিমর্ষভাবে সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।

শ্রীদুর্ব্বাসা

Slam bidding :—স্ল্যামের Bonus এত বেশী যে অধিকাংশ সময়ে একটী ভাল খেলোয়াড়কে হারতে হয়-যদি তার স্ল্যাম ডাকা ভুল হয় অথচ একটী সাদাসিধে খেলোয়াড় অনায়াসে জিতে যান যদি তার স্ল্যাম ডাকা ঠিক হয়। কাজে কাজেই যখন কোন খেলোয়াড় 'গেম' থেকে ছোট স্ল্যামে উঠবেন তখনই তার ক্ষতির দায়িত্ব প্রায়ই স্ল্যাম Bonus এর সমান সমান অবস্থায় পৌঁছে, আবার যখন ছোট স্ল্যাম থেকে বড় স্ল্যামে উঠেন তখন তার ক্ষতির দায়িত্ব প্রায় দ্বিগুণ অবস্থায় পৌঁছে। অতএব ক্ষতি এবং লাভ এই দুই অবস্থার তুলনা করে দেখলে দেখা যায় যে যখন সমান সমান অবস্থা হয় তখন ছোট স্ল্যাম ডাকা উচিত আর বড় স্ল্যাম দ্বিগুণ অবস্থা দেখে ডাকা কর্ত্তব্য।

এখন স্ল্যাম ডাকার প্রথম সোপান হচ্ছে যে টেক্কাগুলি কোথায় অবস্থিত তা জানা, তারপর সাহেবগুলির পরিচয় নেওয়া কিংবা কোন্ রঙ নেই বা কোন্ রঙের একখানি আছে এই অবস্থা বিশেষভাবে জানা। টেক্কাগুলির অবস্থা চার-পাঁচ ফোর্সাই এর ডাকের দ্বারা জানা যায় কিন্তু কোন্ রঙ নেই বা একখানি আছে সেটা জানবার কোন উপায়ই ছিল না সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেক স্ল্যাম নষ্ট হয়ে গেছে। এই অবস্থা দূর করিবার জন্য Mr. Culbertson বর্ত্তমান বৎসরে তার Blue Book নামক পুস্তকে ডাকের ধারা বাড়াইয়াছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'asking bids'। এই ডাকের তিনটী বৈশিষ্ট্য আছে ১। asked suit হবে একটী নূতন রঙে ২। এইটী ডাকা হবে চার বা তদূর্দ্ধ ডাকে ৩। উভয় খেড়ীর ডাক হলে পর। যথা "ক" একটী হরতন খেড়ী ডাক দিলেন একটী ইস্কাবন, তারপর "ক" বললেন চারিটী রুহিতন এই ডাকটী হলো asking bid কিন্তু এটি মনে রাখা দরকার যে যদি "ক" ডাকেন এক হরতন আর তার খেড়ী ডাকেন তিনটী ইস্কাবন বা চারিটী রুহিতন কিংবা চারিটী চিড়িতন—এই ডাকটী কখনও asking bid নয়। তবে তিনের levelএ থাকলে একবার মাত্র ডাকটীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যদি উভয় খেড়ীর মধ্যে ডাক হয়ে থাকে। যথা "ক" এক ইস্কাবন "খ" দুইটী হরতন আবার "ক" তিনটী চিড়িতন এইবার "খ"কে ডাকতেই হবে যদি বিপক্ষদল না ডাকে। এই যে বাধ্যতা ইহাকে এখন asking bid বলা হয়। আগামী বারে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।

Ordnance Indian Club—এই club এর সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে ইছাপুরে (Ishapore) একটী অকসন্ সিমলিকেট প্রতিযোগিতা বের হচ্ছে। নাম-গ্রহণের শেষ দিন হচ্ছে ১৩ই সেপ্টেম্বর এবং এদের ঠিকানা

Mr. A. C. Bhattacharjee
Hony Secy.
Ordnance Indian club
Ishapore.

প্রতিবারেই এদের প্রতিযোগিতা বেশ সুষ্ঠুরূপেই পরিচালিত হয়ে থাকে এজন্য আশা করি ব্রীজ-ক্রীড়ক মাত্রেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন।

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

দুই বন্ধু

বন্ধু ! বন্ধু আজকের বন্ধু কালকে শত্রু হতে পারেনা একথা তুমি বলতে পার। তবু বন্ধু বন্ধুর জন্মে কায করে, সাহায্য করে, প্রাণ দেয়।

হলিউডেও এনেছে বন্ধু বন্ধুর জন্মে মহিমাময় মিলন, তৈরী করেছেও সুতীক্ষ্ণ শত্রু। এদের উদাহরণ মেলে গণ্ডায় গণ্ডায় ! তাদের কথা লিখতে গেলে খাতার পাতা ভর্ত্তি হয়ে যায়।

বন্ধুত্ব আছে এদের, আনা মারকেল আর এলিনর পাওয়েল-এ। আনা মারকেল মেয়েটির বোধহয় শতখানেক ছবিতে এর

জিন হারলো

মধ্যে নামা হয়ে গেছে। দিনকতক আগে গিয়েছিল বেড়াতে নিউ ইয়র্কে। প্রথম যে লোকটির সঙ্গে ওর দেখা হোল তার নাম হচ্ছে এলিনর পাওয়েল। বন্ধু ওর !

বন্ধুর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ! ভারী আনন্দ ! এলিনর বলে তোমার জন্মে ষ্টুডিওতে বলেছি ; আমার এ ছবিতে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। জানেন তো এলিনর পাওয়েলের একখানা ছবিতে আনা মারকেল ওর সঙ্গে নেমেছিল।

আমার কথা, ওদের আজকের বন্ধুত্ব কালকে কোন চরমে উঠবে তা কে বলতে পারে ? এ নামের বাজারে কে কবে চারম্ আনবে, কেউ তা জানে না।

বেনির আয়

জ্যাক্ বেনি। আমেরিকায় তার ভারী নাম। আমরা তাকে দেখেছি "ব্রডওয়ে মেলডি অব ১৯৩৬" ছবিতে।

দুঃখ ওর ভয়ানক। যা রোজগার করে, তার অনেক খানি প্রণামি দিতে হয় ইনকাম্ ট্যাক্সের পায়।

এক পাউণ্ডে যে কুড়ি শিলিং এ আমরা সবাই জানি। সেই কুড়ি শিলিংএর ষোল শিলিং বেনিকে দিতে হয় ইউনাইটেড ষ্টেটস্ গভর্ণমেন্টকে।

বেনির আমেরিকায় রেডিও কোম্পানীতে যেমন নাম তেমনি প্রতাপ। ওখানকার আর্টিষ্ট হিসেবে বেনি হচ্ছে প্রথম-নম্বরের। ওর নতুন চুক্তি রেডিওর সঙ্গে হয়েছে। সেই চুক্তি অনুসারে সপ্তাহে আধ ঘণ্টা রেডিওর মাইকএর সামনে কাজ করার জন্মে বেনি পাবে তিন হাজার পাউণ্ড। সপ্তাহে একবার বছরে বাহান্নবার। এই বাহান্নবার আধ ঘণ্টা ধরে কাজ করার জন্মে ওর আয় হোল এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাউণ্ড। শতকরা আশী ভাগ যদি ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌কে দেওয়া যায় তাহলে বেনির আয় হোল একত্রিশ হাজার দুশো পাউণ্ড। আর ইউনাইটেড ষ্টেটস্ পেলে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশ পাউণ্ড। এ রকম আয়ের ওপর ট্যাক্স শুধু বেনির একার নয়। ইউনাইটেড ষ্টেটস্এর উচ্চ হারের ট্যাক্সই এই রকম।

ট্যাক্সের অত্যাচারে জর্জ্জ আরলিস তো আমেরিকাই ছাড়ল।

মিছে ভয়

এডি ক্যাণ্টার হচ্ছে আর একজন লোক, যার ছায়া জগতে যেমন নাম, রেডিও জগতেও ঠিক তেমনি নাম। কাজেই এডির বেশী আয়ের জন্মে ইনকাম্ ট্যাক্সের দাবীও খুব বেশী মাত্রায় মেটান উচিত। কিন্তু এডিকে তা দিতে হয়নি, কারণ বেশী আয়ের মত ওর পরিবারেও খুব লোকজন বেশী এবং তাই ইনকাম্ ট্যাক্সের সেলামী কমেতেই মিটল।

মনে পড়েছে আর একটা কথা ! হলিউডে একটা কথা উঠেছে এডি নাকি শীঘ্র

এডি ক্যাণ্টর

হলিউডে ফিরে আসছে ওর নতুন ছবি "পনি বয়"তে অভিনয় করতে।

মিসেস এডি ক্যাণ্টার সেদিন এক হোটেলে ভোজের জন্মে বন্দোবস্ত করেছিল। ওদের বিয়ের এই বাইশ বছর পূর্ণ হওয়ার সেই স্মরণীয় দিনটিকে সম্মান করার জন্মে

এই ভোজের আয়োজন। এডি কিন্তু দিলেন সব পণ্ড করে।

লোকের মুখে মুখে গুজব রটল এডির আদর্শ প্রেমের বন্ধন এইবার ছিন্ন হোল। যাক্ গুজবটা অত সহজে নষ্ট হোতনা যদি না লোকে জেনে ফেলত যে এডি সেদিনই সপরিবারে হাওয়াইতে গেল স্মরণীয় দিনের উৎসব সম্পন্ন করতে।

কাজের নিয়ম

হলিউডের ষ্টুডিওগুলো যখন ষ্টুডিওর বাহিরে গিয়ে ছবি তোলে, তখন তাদের কাজের নিয়ম বেশ জানবার মত। কিছুদিন আগে আমি 'র‍্যামোনা' ছবি আবার তোলা হচ্ছে এ খবর আপনাদের দিয়েছিলাম।

ক্যালিফোর্ণিয়ার এক মাঠে ষ্টুডিও থেকে অনেক দূরে এ ছবি তোলা হচ্ছে। এ ছবি টোয়েন্টিএথ সেঞ্চুরী ফক্সের ছবি। এখান থেকে কোন থিয়েটারে যেতে চাও, তা পাবে সেই সত্তর মাইল দূরে কিম্বা চুল কাটবার জন্যে নাপিতের দোকান চাও, তাও চল্লিশ মাইলের আগে পাবে না। কাজেই এখানকার জীবন কাটছে খুব সাধারণভাবেই।

রবার্ট মণ্টগোমারী

এক রকম নিয়ম প্রত্যেককেই মেনে চলতে হয়। যেমন সকাল সাড়ে পাঁচটার সময়ের সকলকেই উঠতে হবে, অর্থাৎ সূর্য্য ওঠবার আগে। ৬·১৫র মধ্যে প্রাতরাশ খেয়ে সুটিং-

জেনেট গেনর

এর জায়গায় হাজির হতে হবে। কাজ চলবে ১২৷৷০টা পর্য্যন্ত, তারপর লাঞ্চ খাওয়া। ১টা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত জোরে কাজ চলবে। তারপর ছুটী। ওরা বলে কি আমোদেই কাটে এই সময়টা, এখন থেকে ডিনার খাওয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত।

এতকাল ধরে আর্টিষ্টদের চুক্তি হোত এজেণ্টদের কাছে কিম্বা প্রডিউসারের অফিসে, এ নিয়ম বুঝি বদলালো, কারণ আজকাল চুক্তিপত্র সই হতে দেখছি নার্সিং হোমএ।

সম্প্রতি ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ জুনিয়ার ডরোথি ওল্ড ফিল্ডের সঙ্গে লণ্ডন নার্সিং হোমে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। জানেন তো ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ জুনিয়ার এখন নিজেই প্রডিউসার।

ঠিক ওইরকম আর একটা উদাহরণ আমি আপনাদের দিচ্ছি।

ক্যাথারিণ মারলো একটি কুড়ি বছরের নাচিয়ে গাইয়ে মেয়ে। নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে তার এক রুগী বন্ধুর সঙ্গে এলো দেখা করতে। স্যামুয়েল গোল্ড্‌উইন ছিলো তখন ওই হাসপাতালে, অস্ত্রোপচারের পর আরোগ্যের পথে। মেয়েটিকে তারী পছন্দ হোল। রূপোলী পর্দায় এই তো রূপ।

সেইখানেই মেয়েটির সঙ্গে চুক্তি হোল। "ডডস্‌ ওয়ার্থ" ছবিতে ওয়ালটার হাষ্টন আর রুথ চ্যাটারটন এর সঙ্গে মারলো নাববে খুব ভাল একটা অংশে।

ডডস্‌ ওয়ার্থ

ক্যাথারিণ মারলোকে নিয়োগ করার পর স্যামুয়েল গোল্ড্‌উইনের ইচ্ছে ছিল 'ডড্‌স্ ওয়ার্থে" ও কেমনভাবে অভিনয় করে সেটা বিশেষভাবে নজর রাখবে।

কিন্তু তা হোল না। স্যামুয়েল গোল্ড্‌উইনকে বিশেষভাবে নিরাশ হতে হোল। শরীর সারল না, কাজেই হাসপাতাল থেকে ফেরাও হোল না।

স্যামুয়েল গোল্ড্‌উইন! জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ষ্টুডিওর রাজদণ্ড যার হাতে তার একটা ক্ষুদ্র অভিলাষ পূর্ণ হবে না।

তাই তিন হাজার মাইল টেলিফোন তারের ভেতর দিয়ে কথা চলল। ষ্টুডিওর সেটের কথা পৌঁছে দিলে স্যামুয়েল

গ্রেটা গার্বো

গোল্ড্‌ইনের কানে। স্যামুয়েল শুনলে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্য্যন্ত সেই চিরপরিচিত শব্দগুলো আর 'ডড্‌স্ ওয়ার্থে'র প্রথম দিনকার স্যুটিংএর সমস্ত কথাগুলো।

টেলিফোনের তার গিয়েছে সাটওের লাউড স্পীকার থেকে হাসপাতালে স্যামুয়েলের ঘরে, রুগীর ঘরে। এ রুগী ফিল্ম-প্রডিউসার আর এক জগতের লোক।

খুচরো খবর

নরম্যান টুরাগ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের সঙ্গে অনেকদিনের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। কয়েক সপ্তাহের ভেতরে ডেরিল এফ জানুক নরম্যানকে পরিচালনার ভার দেওয়া বই গুলির নাম শীঘ্রী প্রকাশ করবেন। নরম্যান টুরাগএর একখানা বই আপনারা ক'লকাতায় এখনও দেখতে পাবেন; সে বইখানার নাম হচ্ছে 'ষ্ট্রাইক মি পিঙ্ক।' এডি ক্যাণ্টারের ছবি।

* * *

হল্‌মোহর হচ্ছেন ফটোগ্রাফির একজন অথোরিটি। 'এ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম' ছবি তোলা ভাল হওয়ার জন্যে ১৯৩৬ সালে একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। 'লেডিস ইন লাভ' ছবি খানার ফটোগ্রাফি পরিচালনা করার জন্যে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স ওঁকে ধার নিয়েছেন। এ ছবিতে নামবে জেনেট গেনর। শীঘ্র ছবি তোলা আরম্ভ হবে। ই এইচ, গ্রিফিফ এ ছবি পরিচালনা করবেন। উইলফ্রেড লসন নাম করা ইংরাজ চরিত্র-অভিনেতা। এ ছবিতেই তিনি প্রথম নামবেন।

* * *

গ্রেটা গার্বো নামছে 'বিলাভেড্' ছবিতে এ ছবির হিরো হচ্ছে চার্লস্ বয়ার।

এলিনার পাওয়েল নামছে জেমস ষ্টুয়ার্ট এর সঙ্গে 'বর্ণ টু ডান্স', ছবিতে। 'ইজি টু লাভ' নামটি বদল করা হয়েছে।

* * *

মেট্রো গোল্ড্‌ইন মায়ারের ছবি 'লাভ অন দি রান' ছবিতে নামছে জিন হারলো আর রবার্ট মণ্টোগোমারী।

তরী ও তুফান

শ্রীসুশীল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ছোটোখুড়ির ভাই। চরিত্রহীন। চরিত্রহীন, কারণ তার ইতিহাস সকলে জেনে ফেলেছে। কিন্তু ভজহরি, সে? কিন্তু থাক্ সে কথা।

অন্দরে প্রবেশ ক'রে কার অন্তরে সে আঘাত দিয়ে এলো? সে কথা তা'রা ছাড়া আর কেও জানে? বাসন্তীর মায়ের সঙ্গে দেখাও তো সে ক'রে এলোনা! না করুক্।

ভদ্রলোকটি বললেন—কি চললে?

বলবার ইচ্ছাটাকে গোপন ক'রে তাকে ব'লতে হ'লো—হ্যাঁ, যাই।

সাঁকোয় উঠে সে একবার পিছু ফিরে চাইলো। ওই তো জানলাটা, খোলাই র'য়েছে তো, কিন্তু বাসন্তীকে দেখা যায় না কেন? সে ভাবলো—ছায়া এখন হয়তো অমনি ক'রে কাতর অনুনয়ে তাকেই ডাকচে। ওই লাল ফুলটার মতো টুলটুলে তার চাউনি। তার কাছে বাসন্তী লাগে কোথায়।

ইস্কুলের বেলা হয়েচে। বুকে বই চেপে ধ'রে মাথা নিচু ক'রে ঐ তো যায় মেয়েরা ইস্কুলে। ওই তো একদল ছেলে তাদের পিছুপিছু হেসে হৈহৈ ক'রে হেটে চ'লেছে। সেই পুরাতন দিন। যে-দিন ভজহরিও এমনি ক'রেই পথ নিয়েছে।

অমিয় ডাক্তার, ভজহরি তোমায় জবাই করতে পারে। তোমার হাত থেকে সিরিঞ্জ কেড়ে তোমার চোখের মণির মধ্যে ইনজেকসন দিয়ে' দিতে পারে। তুমি চেনো না তাকে। মহেশদা, একটু তাড়াতাড়ি করুন। নগেন, ভাই তোর দুটি পায়ে পড়ি, খোঁজটা নে। বিদ্যুৎদের ওখানে একবার যা, একলাখ ভাই, না হা যত তুই বলিস্। প্রবীর, আশীটাকা মাইনে পেয়ে অহঙ্কার করো না।

একি, এরি মধ্যে এতটা পথ সে হেঁটে ফেলেছে। পথ ফুরিয়ে গেলো। ভজহরি বৈঠকখানার সিঁড়িতে পা দিয়েছে। একি, কাকা এখনো খান্ নি? মিণ্টু চৌকীর ওপরে দাঁড়িয়ে গলার বোতাম আটকে দিচ্ছে।

বাসন্তী, ছায়া, বিদ্যুৎ!

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ভজহরি দেখে—আশ্চর্য্য!

ছোটোখুড়ি কেবল হাসচে। ব্যাপার কি? খুড়িমার মুখটা হাসি হাসি। পিসিমা ফটাস্ ফটাস্ ক'রে কুলোয় ডাল ঝাড়ছেন আর হাসচেন। ব্যাপার কি? ভজহরি কিছুই বুঝতে পারলো না

কুয়ো তলায় গিয়ে চোখে মুখে জল দিল। পাখিটা গলার মধ্যে কেমন যেন একটা ঘড়-ঘড় আওয়াজ করছে।

মণি খিল্‌খিল ক'রে হেসেই আটখানা, আহ্লাদি-প্যাটার্ণ-এর মেয়ে: বলি, এই জন্যে?

—কি জন্যে। ভজহরিরও দেখাদেখি একটু হাসি পেলো।

—ছি ছি, বিয়ে মানুষেই করে। কিন্তু···

পিসিমা ধমক দিলেন। ননদের সস্নেহ অনুযোগে মণি ভয় পেলো না। তার হাসির মাত্রা ক্রমেই ঔজিয়ে চ'লেছে।

ভজহরি ব'ললো—ব্যাপার কি পিসিমা?

পিসিমা ব'ললেন—কিছু না। যা, বাইরে যা।

ভজহরি কিছুতেই যেতে চাইলো না। অগত্যা তাকে যেতেই হ'লো।

ও-ঘরে গিয়ে ভজহরি ব'সেচে। ব'সে ব'সে ভাবছে—তবে তাকে আর কষ্ট ক'রে কথাটা পাড়তে হ'লো না। কিন্তু এরাই বা জানলো কী ক'রে! আশ্চর্য্য! চৌকীর ওপরে ব'সে টিকটিকিটার দিকে চোখ রেখে সে পা দুলাচ্ছে। এিক, বেড়াল নাকি? ও হরি, তুমি। দেখি, দেখি প্রণাম করি এসো।

ছোটো খুড়ি হেসে ফেললো।

—চৌকীর নিচে কি আবার?

—আজ যে পিঠে হবে। গুড়ের হাড়ি বের করছি। তোমার মিষ্টি মুখ করানো হবে যে, মেথর বিয়ে করবে! ব'লে মণি চাপাগলায় হেসে ফেললো পাছে ননদ শুনে ফেলেন।

—কে ব'ললো, ছোটখুড়ি তোমাদের?

—যে-ই বলুক না কেন! শুনেছি, সত্যি কিনা বলো।

হ্যাঁ, সত্যি। আরে, শোনোই শেষটুকু, কাকা শুনেছেন?

চেঁচিয়ে হেসে উঠলো মণি। ভজহরির আহ্বান তার কানে গেলো না। দৌড়ে সে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে: ও দিদি, সত্যি না বলে? শোনো গিয়ে। হাসতে হাসতে সে যেন কুটিকুটি হ'য়ে যায়।

কুলো থামিয়ে পিসিমা শুধোলেন: কি, হ'লো কি?

—ওই শুনুন, ব'ললো সত্যিই নাকি মেথর বিয়ে করবে।

পিসিমার বিশ্বাস হয় না। তিনি মনে করেন অসম্ভব। মণির দাদা একটা চরিত্রহীন পুরুষ, সে যা ব'লবে তাই-ই কি মেনে নিতে হবে!

কিন্তু ভজহরি যে স্বীকার ক'রেছে তা শুনেও তাঁর মনে বিশ্বাস করবার একটা রেখাপাত হয় না। মণি বিশ্বাস করবার চেষ্টা ক'রতে গিয়ে প্রচণ্ড ভাবে হেসে ফ্যালে। ভজহরি ঘর থেকে শুনছে। তার কেমন কেমন একটু লজ্জা করে। বেরিয়ে আসবার জন্যে তার ভেতরটা হাপায়, ছটফট করে। ব'সে ব'সে সে গা মোড়ামুড়ি দিচ্ছে, একটু হাই তুললো। বিকেল হ'য়েছে, কাকা এই এসে পড়লেন আর কি! ভজহরির অতিরিক্ত লজ্জা করছে। যদিও সে কাকার কাছ থেকেই মত নিতে এসেচে তথাপি কাকা এসে প'ড়ে শুনে কি ভাববেন ভেবে তার যেন কেমন অস্বস্তি মনে হয়। ঘরের মধ্যে স্যাতসেতে আবহাওয়ায় ব'সে তার কেমন শীত শীত লাগছে।

ভজহরি বেরিয়ে এলো।

পিসিমা ব'ললেন—এসব শুনছি কি রে? কথাটা গোপন রেখে আর লাভ নাই, ভজহরি আত্মসমর্পণের মতো ক'রে ব'লে ফেললো—কেন, কি হ'য়েছে কি তাতে। মেথর কি মানুষ নয়?

পিসিমা আকাশ থেকে পড়লেন—অ্যাঁ, তবে···

—তবে আর কী পিসিমা? আশ্চর্য্য হবার কী আছে? আমি না হয় পথটা দেখিয়েই দি! সমাজ শিখুক, কালে আবার এমন হ'য়ে আসবে যখন ঘরে ঘরে···

—হ্যাঁ, ঘরে ঘরে তোর মতো অবধূত জন্মাবে, কেলেঙ্কারি করিস্ না ভজা। বংশের নাম আর ডুবাস না। লোকে মুখে থুথু দেবে।

ভজহরি তবু দমল না: কী যে বলো পিসিমা! একি সত্যিই মেথর? জানো না কিনা তাই!

মণি অতিরিক্তভাবে গম্ভীর হ'য়ে ও-দিক্‌টায় ব'সে কাণ খাড়া ক'রে আছে। সে-ও এর আগে কথাটাকে এমন প্রচুর ভাবে বিশ্বাস করে নি। তা'য়ো এখন আশ্চর্য্য লাগে।

—মিথ্যে মেথর আবার কেমন জীব, জানিনা তো? মণি কেমন ক'রে যেন কথাটা জিগগেস করে।

ভজহরি সে কথার কোনো উত্তর দিলো না। সে এখন শুধু মাত্র পিসিমার সঙ্গে কথা কইতে ব'সেছে আর তাঁকে দিয়ে কাকার মতটা নেয়াবার চেষ্টা করবে।

—জানো, তার বিদ্যে? বেথুনে প'ড়ছে, আসচে বার বি-এ দেবে!

পিসিমার ভালো লাগে না, বলেন—বি-এ দিক্ কি নিকে দিক্ অতশত জানিনা, হ্যাঁ। যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড, এমন কেও শুনেছে কোথাও? আবার তিনি হাতের বাড়ি দিয়ে দিয়ে ডাল ঝাড়তে শুরু করেন।

ভজহরির কেমন ধাঁধাঁ লাগে। কিন্তু সে দমে যাবার পাত্র নয়। সে কিছুতেই এ সুযোগ-এর অপব্যয় করবে না।

পিসিমা আবার বলেন—দুপুর বেলা মণির দাদা এসেছিলো, বললো ভজহরি নাকি মেথর বিয়ে করবে। কিন্তু তা বিশ্বেস করিনি, ভাবলাম···

ভজহরি বাধা দিলো: ভাববার আর কি আছে। আমি যদি দেখি এতে আমার উন্নতি হ'তে পারে, তোমরা আমায় বাধা দিয়ে বেঁধে রাখতে পারবে? কখনোই না। আমার যা মনে হবে করবোই। দেখে নিয়ো তোমরা! কাকাকে ব'লবো, তাঁর যদি ইচ্ছে হয় মত দেবেন, নইলে আমিই নিজেই তার মত দেবো।

মণির মুখের অথবা ঠোঁটের হাসি শুকিয়ে ম্লান হ'য়ে এসেছে।

পিসিমা না ব'লে পারলেন না: ছি, ছি, ছি।

কিন্তু এ ছি ছি-তে ভজহরির মনে কিম্বা মুখে ঘৃণিত বোধের কোনো ছায়া ঘনিয়ে ওঠেনা। সে নির্ব্বিকার চিত্তে, একান্ত উদাসীনভাবে ব'সে থাকে—কে কি বলছে, তার কানে সমস্ত কথা যেন বাজেই না। কিন্তু সে শুধু ভাবে কাকাকে সে কী ব'লে বোঝাবে।

—তুই যে এতোটা ব'য়ে গেছিস তা জানি না, ভজহরি! দুধ কলা খেয়ে এখন ফোঁস ফোঁস ক'রে গর্জ্জে উঠছিস্। লেখাপড়া শিখে তবে তোর কী এমন লাভ হ'লো! মূর্খ থাকতিস্—জানতাম, একটা প্রবোধ থাকতো মনে। কিন্তু শোন, ও-সব বাজে প্রলোভন ভোল্। পিসিমা থামলেন।

—জানো না কিনা তাই তোমাদের মত নেই। কত টাকা পাওয়া যাবে একবার ভেবে দেখো তো! কলকাতা সহরে পাঁচটা বাড়ি, ব্যাঙ্কে কোটি-কোটি টাকা, তার ওপর মেয়েটাও কাণা-খোঁড়া নয়! শুনে কথা ব'লো। রক্তসন্ধ্যা দেখেই আঁৎকে উঠলে তো আর চলে না! ব'লে ভজহরি একটু ন'ড়ে বসে।

পিসিমার রাগে সর্ব্বশরীর রি রি করে ওঠে। কিন্তু সে রাগকে ভজহরি তোয়াক্কাই করে তারা!

মণির আর ভাল লাগছিলো না। সে সরে গেলো। তার অনেক কাজ আছে।

খুড়িমা পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে সমস্তই শুনছিলেন। কিন্তু তাঁর কথাটা ভালো লাগে না। এতক্ষণে উঠে এলেন। তাঁকে দেখে ভজহরি মাথা নিচু করলো।

খুড়িমা ব'ললেন—মেথরানীর টাকা দেখেই ভালো লেগে গেলো? বুঝলেন দিদি, এইজন্যে ছেলেদের কলকাতায় ছেড়ে দিতে নেই। কেন, ফরিদপুরে কি কলেজ ছিল না? না, ভাইপো তাঁর কলকাতায় পড়বে। পড়ুক। এখন মেথরাণী, কুমোড়নি, ঝি মাগীদের পেছন পেছন ছুটতে শিখেছে। আসুন না কোর্ট থেকে, মুখের ওপর আমি ঠিক এই কথাই বলবো। ব'লে তিনি ভজহরির পানে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে কুয়োতলায় চ'লে গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খুড়িমা ফিরে এলেন, তাঁর মুখে অবসাদের একটা অস্পষ্ট রেখা, বার্দ্ধক্যের একটা সকরুণ ইঙ্গিত। থপ ক'রে ব'সে পড়লেন, আচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ব'ললেন: সেই আমি পৈ-পৈ ক'রে নিষেধ ক'রেছিলাম মনে আছে দিদি? কলকাতায় পাঠিয়ে কাজ নেই। এখন ম্যাও ধরে কে? মণির ভায়ের কথা নিয়ে আর কী হবে? ভজহরি সে-মুখ বন্ধ ক'রেছে। যদ্দিন ফরিদপুরে ছিলো বালতী, তবু মুঠোয় থাকলে ফেরানো সম্ভব ছিলো। হ্যাঁ, সে মেথরাণীটার নাম কি? তোমার ইয়ের নাম আকালুর মা, না সাতকড়ির ভাজ? যত সব! খুড়িমার সমস্ত শরীর দিয়ে আগুণ বেরিয়ে আসে যেন।

ভজহরির মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। কি ক'রে সে খুড়িমাকে বোঝায় সে মেথরাণী নয়। মেথর নাম তার একটা কলঙ্ক। চাঁদে কি কলঙ্ক নেই? জ্যোৎস্নায় নাইলে তবে জাত যাবে? সে যে বেথুনে ফোর্থ ইয়ার! তার দিল্ তো এখন নর্দ্দমার পাঁকে নয়, নর্ম্মদার বাঁকে রাখেশ সে-দিন ব'লেছিলো। কেমন ক'রে সে এ-সব কথা খুড়িমাকে বোঝায়? তাকে পথ বাৎলে দেবার দুনিয়ায় কি কেও নেই! ছায়া তুমি আছো। শিগগির এসো ছায়া, ভজহরিকে উদ্ধার করো! প্রতিদানে সে তোমার মাথায় মুকুট পড়িয়ে দেবে। সর্ব্বাঙ্গে আভরণ, কাঁচুলি, নিচোল। সে প্রতিদানে নিজেকে তোমার চরণে উৎসর্গ ক'রবে। তুমি এসো ছায়া!

সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এলো।

কাকার আসতে আজ দেরি হ'চ্ছে।

আজ রোববার।

চোখদুটো ডগমগে রাঙা ক'রে কাকা বৈঠকখানায় ব'সে আছেন। ভজহরি তাঁকে দেখেই ভয়ে যেন কুঁকড়িয়ে গেলো। সে বুঝলো কাকার শুনতে কিছুই বাকি নেই। যে কথা ব'লতে সে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলো, তা' না ব'লতেও যেন সম্পূর্ণ ক'রে বলা হ'য়ে গেছে! ভজহরি ফিরে যাবার একটা দুর্ব্বল চেষ্টা ক'রলো। কাকা পেছন থেকে ডাকলেন—ভজা! উঃ, কী আওয়াজ! ছাদ যেন ছিঁড়ে যায়!

ভজহরি দাঁড়ালো। কিন্তু এগিয়ে যাবার সামর্থ তার রইলো না।

কাকা বললেন—এ-সব শুনছি কি?

নির্ব্বাক।

—কি, কথা ক'স্ না যে!

চুপচাপ।

—কে এ-সব বুদ্ধি দিলো!

সাড়া নেই।

—বল্, কে দিলো?

তথাপি নীরব।

ভজহরির কান্না পেয়েছিলো বোধ'য়। সে ঘাড় হেঁট ক'রে সমস্ত পাতাল যেন মুখস্ত ক'রে ফেলেছে। কাকার মুখপানে চাইবার এতটুকু দুঃসাহস তার নেই। চ'লে যাচ্ছিলো কিন্তু যাওয়া তার হ'লো না হয়তো। কাকা ব'ললেন—লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি হ'য়েছে? একটা মেথরাণীকে···

ভজহরির অসহ্য ঠেকলো—মেথরাণী নয় কাকা। বেথুনে ফোর্থ ইয়ারে···

—রেখে দে তোর ফোর্থ ইয়ার, থার্ড ক্লাশ ছোকরা কোথাকার। কলকাতায় পড়বো বায়না উঠলো। পড়াশুনা তো যথেষ্ট হ'য়েছে জুটেছে মাত্র একটা ল্যাজ। ব'সে ব'সে ডিগ্রি চুষে বেঁচে থাকবে কতদিন? চাকরী ক'রতে হবে না?

—তাদের অনেক টাকা আছে কাকা। ভজহরি আর চুপ ক'রে সহ্য করতে পারলো না।

হুম্। মুখে একটা আওয়াজ ক'রে কাকা ব'সে রইলেন। তাঁর বিশ্বাস হয়তো হ'লো না। কিন্তু ভজহরি কি মিথ্যা কথা ব'লছে? তিনি যা ছুঁয়ে শপথ করতে বলেন, ভজহরি রাজি আছে।

কাকার যেন বিতৃষ্ণায় সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত: শিখেছিলে শুধু smoke করা। ঠোঁট দুটোকে তো আর ঠোঁট ব'লে চেনবার উপায় নেই। দাঁতগুলো তো পাকা তরমুজের বিচি। অকথ্য, অকথ্য! কিন্তু ও-সব বাজে বুজরুকি বাদ দাও। বিয়ে টিয়ে করা হবে না। বাঙলা দেশটা শিখেছে বিয়ে ক'রতে, টাকা উপায় করতে নয়। খাঁটি বাঙালী হ'য়ে বেঁচে থেকে লাভ নেই। একটু ভেজাল মিশিয়ে নাও। মেয়োর বুদ্ধিতেও চ'লতে নিষেধ করি। গান্ধী যা বলবেন তাই শিরোধার্য্য হওয়া অন্যায়। নিজের বুদ্ধি বিবেচনা খাটাও, বোঝো তারপর ভালো বুঝলে তার application!

ভজহরি দাঁড়িয়ে রইলো।

কাকা বললেন—কিছুদিন এখানে থেকে যাও। এখন কলকাতায় গিয়ে লাভ নেই। বাজারের দিকে একটা ষ্টেশনারী দোকান দিয়ে দেবো ভাবছি। তাই দেখাশুনা করো। ছোট বৌর ভায়ের মতো শুধু রাস্তা প্রেম ক'রে বেড়ালে চ'লবে না। আমার কাছে শোনো।

ভজহরি চুপ ক'রে রইলো। এ-মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো মনের জোর তার কোথায়? কাকা গম্ভীর প্রকৃতির লোক—কোনোদিনই তিনি ভজহরিকে মার তো দূরের কথা একটা ধমক পর্য্যন্ত দেন নি। তার এ-মূর্ত্তি দেখে সেইজন্যে ভজহরি দুনিয়া আজ অন্ধকার দেখছে। ছায়া সে কতদূর? তার কাছে যাবার পথে এত কণ্টক কেন? এই তবে সত্যিকার প্রেম। এ প্রেমের ভ্যালু শ্রীরাধার প্রেমের চেয়েও নিশ্চয়ই বেশি। রাধা পদে-পদে বাধা পেয়েও কেমন ক'রে আয়ান ঘোষকে কলা দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ লাভ ক'রেছিলো। চমৎকার! ভজহরিও বিশ্বের মুখে দেবে চুণ কালী, আর নিজে হবে দিগ্বিজয়ী বীর। সেই তার বীরত্ব। চণ্ডীদাস, তুমি অমর হ'য়ে আছো। কেন? পদাবলী তোমার কতটুকু যশ সংগ্রহ ক'রে দিতো, যদি না তুমি পেতে রামীকে! রামীই তোমার কবিতা, তোমার প্রতি পদে রামীর গন্ধ পাওয়া যায়। প্রতি পদে তোমার পাওয়া যায় রামীর প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণের গর্জ্জন, উন্মত্ততা। তুমি বেঁচে থাকো। আর আজ হ'তে বেঁচে থাকুক ভজহরি ভাদুড়ি। যদিও সে কবিতা লেখে মাঝে মাঝে রবি ঠাকুরকে কিম্বা এই আমাকেই ঠুকে, যদিও সে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পয়ারের ওপরেই খোঁড়াচ্ছে, তথাপি সেই তার গান,—সেই তার ছায়াকে ডাকা আকুল কাকুতিতে। মন্তর না জানলে কি পূজা হয়না? যে বলে হয় না, সে পুরোহিত শ্রাদ্ধের মন্তরে বিয়ে দ্যায়। সে মন্তরের অর্থ জানে না, জানে শুধু বুলি আওড়াতে, আর টিকি নাড়তে। পেশাদারী পৌরহিত্যকে বলা যায় ভিক্ষাবৃত্তির অন্য একটি ধারা কিম্বা পন্থা। ভজহরি দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে।

কাকা ব'ললেন,—কি, তোর মত কি? ষ্টেশনারী দোকান দিবি?

ভজহরির জীবনে এত বেশি ক্রোধ আর কোনো দিন হয়নি, সে ব'লে ফেললো—না। যদি দোকানই দেওয়াবেন তবে থার্ড ক্লাশএর পর নাম কাটিয়ে নিলেই হ'তো। আমি পারবোনা।

—বেশ। খুব শান্ত কণ্ঠস্বর: না দিলি। কিন্তু শর্টহ্যাণ্ড শেখ। না, তাও না? তবে কি? বিয়ে, বেশ বিয়ে কর্। বাসন্তীর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা তার মা সেদিন বলছিলো। তাই কর্। তার আগে তোর রোজগারের পথটা চিনে নিতে হবে তো? ব'লে কাকা তার মুখের পানে চাইলেন।

ভজহরি ঘাড় হেঁট করে আছে। বিয়ে সে করবে নিশ্চয়। তাই ব'লে ঐ বাসন্তীকে? যার কোনো অর্থ নেই, যে বিয়ের কোনো মানে হয় না। পড়ে তো ভারী সেকেণ্ড ক্লাশ-এ। আর ছায়া আসচে বার বি-এ দেবে। জীবনের সঙ্গী, একটু লেখাপড়া জানা চাই বই কি? একটা চিঠি লিখতে দশটা বানান ভুল, হাতের লেখা বুঝতে আধঘণ্টা সময়। ভোঃ! বাসন্তীর বাঙলায় বিদ্যে কতটুকু, ঐ তো 'চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ!' কিম্বা 'দুই শিশু যম সম' ঐ প্যাটার্ণের। আরে ভোঃ। ভারতচন্দ্রও কবি আর কড়িঙও পাখী। ছায়া বি-এ-তে

বাঙলা পড়ে। রবীন্দ্রের 'শকুন্তলা' সম্বন্ধে marvellous criticism, সঙ্কলন, ইত্যাদি আরো কত কী? কার সঙ্গে কিসে, এ যেন ধানে আর তুষে তুলনা। কাকার মাথাটাই ঠিক নেই। সেই আকবরের আমলের বুদ্ধি তো, হবে না কেন?

ভজহরি দাঁড়িয়ে রইলো।

কাকা ব'ললেন—আচ্ছা যা। কিন্তু কলকাতায় আজ যাওয়া হবে না। অনেক কথা আছে।

—যা বলবার এখুনি ব'লে নিন্, কাকা! আমার আজ যেতেই হবে। আমি ও-দিকে সমস্ত কথা দিয়ে এসেছি, তারা বিয়ের দিন দেখে ফেলেছে। না গেলে চলবে না। ব'লে ভজহরি ন'ড়ে দাঁড়ালো।

কাকা এইবার চোখে অন্ধকার দেখলেন—, তার মানে? সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে এখানে ফাজলামো ক'রতে এসেছিস্? শূয়ার। যা এক্ষুনি যা। বাঁদর কোথাকার। যা···

ভজহরি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পথে নেমে এলো।

রবিবার। সকাল বেলা। বন্ধুবান্ধবরা গেল কোথায়? খানিকক্ষণ এদিকে ওদিকে চাইলো, কেও নেই। ও কে, তারক না? তাকে ডাকছে চীৎকার ক'রে চায়ের দোকানটা থেকে! সঙ্গে ওরা কারা? দীনেশ, মাখন। ওরা অত হাসচে কেন? ভজহরি এগিয়ে এসেচে।

—এই জন্যে কাল অতো গান্ধীর ফর্-এ চীৎ করছিলি। শুভ শুভ! শতং জীব। এসো ভেতরে উঠে এসো। ওহে, আরাক কাপ চা দিয়ো। কড়া ক'রে দুধ বেশি, চিনি বেশি। এসো ভাই ভজহরি, আমাদের নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে যাবে তো? যৌতুক কি কি দিচ্ছে! ঝাড়ু-বালতী না আর কিছু? হাজারের এত প্রশ্ন আর তাড়াহুড়ায় ভজহরি চোখে অন্ধকার দেখলো। (ক্রমশঃ)

নটনাথ
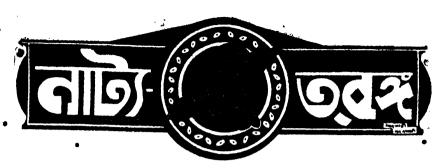
নাট্য-নিকেতনের নৃত্য গীতবহুল নতুন নাটক "আলাদীন"এর অভিনয় দেখতে যাবার আগে সত্যিই আমাদের সন্দেহ ছিল যে এ-শ্রেণীর নাটক বাংলার রঙ্গমঞ্চে কতটা সাফল্যলাভ করবে। কিন্তু অভিনয় দেখে আমাদের স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে, বহুলাংশে এ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আরব্য উপন্যাসের গল্পের আখ্যানভাগে মনোহারিত্ব বা কোনো গভীর সমস্যার আলোচনার বিষয় কিছু নেই; আরব্য-রজনীতে পাওয়া যায় নানা ভোজবাজী খেলায় চোখ ধাধানো এবং তাক-লাগানো বিষয়ের সমাবেশ। বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে এই রকম ভৌতিক এবং অলৌকিক ব্যাপারের পরিকল্পনা এবং তাকে বাস্তবতায় রূপান্তরিত করার বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আমাদের মনে ছিল। নাট্য-নিকেতনের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার এবং অর্থ খরচ করে এ-বিষয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চে একটা নতুনত্বের হাওয়া বইয়েছেন—আমাদের এ-কথা বলতেই হবে।

নাট্য-নিকেতনে "আলাদীন" নাটকের যে গল্প তা সংক্ষেপে এই:—দর্জ্জির ছেলে আলাদীন সরল সহজ মনে এ জগতের বুকে খেলা করে বেড়াচ্ছিল—সে ভালবাসতো লুৎফা নামে একটী মেয়েকে। সে তারই মতো এ জগতের কুটীলতা মলিনতা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিল—আর আলাদীনের উচ্ছল প্রেমের প্রতিদান তার কুমারী মনের সকল সত্বা দিয়েই দিয়েছিল। সুখের সংসার গড়ার বিষয় তারা একরকম নিশ্চিন্ত ছিল, কেননা, তারা দু'জনে যখন একসঙ্গে বসতো, খেলা করতো তারা অনুভব করতে ভু'লে যেতো এ পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতার কথা; তারা ভাবতো যে দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়েই জীবন সাঙ্গ করে দেবে—এর চেয়ে আর বেশী কিছু দরকার যে আছে তা মনে তারা করতো না।

কিন্তু তাদের সকল সুখের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল জীনের আবির্ভাবে। জীনের সত্বা শয়তানের আত্মা। সে তার মোহবলে আলাদীনকে ভুলপথে চালিয়ে আলাদীনকে একেবারেই নরকের পথে শয়তানের সহযাত্রী করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আলাদীনের মনে লুৎফার মুখখানি সকল সময়েই ভেসে ছিল। তাই আলাদীন তার অতল প্রেমের জোরে জীনের প্রভাব কাটিয়ে নিজেকে আবার সুখের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।

নাটকের মধ্যে এই ছোট কাহিনীটুকু রূপে-রসে, নাচে-গানে বিজড়িত হয়ে দর্শকদের আনন্দ দেয়। গল্পের গতি বেশ স্বচ্ছন্দ, কোথাও এতটুকু হোঁচট খেতে হয় না, কোন জায়গাতেই বিরক্তি আসে না। কিন্তু নাচ-গানের বাহুল্যের জন্যে মাঝে মাঝে গল্পের রস পেতে বাধা মনে হয়। এই ত্রুটীর অবশ্যি আর একটা কারণ আছে। নাচ-গান যা এই নাটকের প্রাণ বলে ধরা যেতে পারে—তা প্রায় সবটুকুই একেবারেই অতি সাধারণ শ্রেণীর। দু'একখানি ভাল নাচ

দেখে আমাদের চোখ তৃপ্ত হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু গানের সুর একেবারে স্থান-কালের অনুপযোগী। "আলাদীন" শ্রেণীর নাটকে যে সুর-সঙ্গত হলে দর্শককে তৃপ্তির রসে ভাসিয়ে দিত তার অভাব ঘটেছে।

আবার আরেক দিক দিয়ে এই দোষ ঢেকে গেছে—অপরূপ দৃশ্য পরিকল্পনায় এবং সাজসজ্জার চমৎকারিত্বে। নানা রঙের চিত্ত-চমকপ্রদ কৌশলের পরিকল্পনা যে আমাদের মুগ্ধ করেছে তাতো আমরা আগেই বলেছি। এবং আমরা মুক্ত কণ্ঠে আবার বলি যে নাট্য-নিকেতনের এ বিষয়ে শ্রম বিফল হয়নি। ফুলের পাপড়ির ভেতর থেকে মঞ্চের ওপর লাস্যময়ী নর্ত্তকীর আবির্ভাব এবং জীনের ভস্মসাৎ হওয়া—এ-সত্যিই এ দেশের মঞ্চের ইতিহাসে অভিনব।

অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করি। "আলাদীন" নাটকের বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণ নাট্য নিকেতনের তরুণ শিল্পীদের সাহায্যে করা হয়েছে। কাজেই অভিনয়ের দিকে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত না হলেও একেবারে নিচু স্তরের অভিনয় "আলাদীন" নাটকে হয়নি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে আমাদের জীনের ভূমিকায় রবি রায়ের অভিনয়। সত্যি ভারী সুন্দর। ভূমেন রায় এই নাটকের প্রযোজক এবং স্বয়ং নেমেছেন নাম ভূমিকায়। আলাদীনের জীবনে গোড়া থেকে শেষ অবধি অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে—এবং সেই বিভিন্ন ঘটনার যথাযথ ভাব প্রকাশে কৃত-কার্য্যও তিনি হয়েছেন। তবে তিনি যা আমাদের দিয়েছেন তার চেয়েও বেশী তাঁর কাছে আমরা আশা করেছিলাম। মনি ঘোষ মনসুরের অংশে বেশ মানানসই রূপ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। ললিত মিত্রের "বাদশা" অতি সাধারণ। "খাঁ সাহেব-হাফেজ মিয়া" ইত্যাদি যাঁরা এই নাটকের হাল্কা রসের খোরাক জুগিয়েছেন, তাঁদের অভিনয়ে হাস্য-মুখর প্রেক্ষা-গৃহ তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। অন্যান্য পুরুষ চরিত্রগুলো চলনসই বলা যেতে পারে।

স্ত্রী-ভূমিকাগুলোর অভিনয়ে কেউ আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। নতুন একটি মেয়ে অরুণা, যিনি "মাণিক পরী" রূপ নিয়ে পাদ-প্রদীপের সামনে এসেছিলেন, দেহে রূপবতী হলেও, তাঁর চরিত্রের সুষ্ঠুরূপ দিতে পারেন নি। সুরের তালে তালে নাচের পা তাঁর ঠিক চলে, কিন্তু দর্শকদের তৃপ্তি দেয় না। কি যেন একটা অভাব আছে। লুৎফার ভূমিকায় বীনাপাণি, মায়ামুনার ভূমিকায় নিরুপমা এবং ফুলপরীর ভূমিকায় চারুবালা জোর করে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দুর্গারাণীর গান চোখ বুজে শুনলেই ভালো লাগবে, নচেৎ নয়। মেয়েদের মধ্যে আর যাঁরা আছেন তাঁরা একেবারে অচল।

গানের সুর-সংযোগ আমাদের মনঃপুত হয়নি—আগেই বলেছি। নাচের পরিকল্পনার কৃতিত্বে নীহারবালা আমাদের প্রশংসা দাবী করতে পারেন। দৃশ্যপট-সাজসজ্জা অভিনব, চমৎকার।

শ্রীমতী রাণীবালা গৌরবের সোণালী পথে এগিয়ে চলেছেন দিন দিন। কালী ফিল্মসের হ'য়ে ইনি এখন হিন্দী "আশিয়ানা", "মডার্ণ লেডী" ও বাংলা "টকী অফ টকীজে" অভিনয় কোরছেন। ওপরের ছবিখানা "টকী অফ্ টকীজ"-র শান্তার ভূমিকার প্রতিকৃতি।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৮ই ভাদ্র ১৩৪৩—3rd. September, 1936. } ৩৬শ সংখ্যা

সুভাষচন্দ্র

বাঙ্গলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় বর্ত্তমানে কার্সিয়াংয়ে অন্তরীণ আছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য যে ভাল নয় এ-কথা সর্ব্বজন-বিদিত। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তাঁহার রোগ যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করিতেছে তাহা বোধ হয় সরকার পক্ষ বুঝিয়াও বোঝেন না। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলিয়াছেন যে, সুভাষবাবুর তালুগ্রন্থীর প্রদাহ ছাড়া আর কোন পীড়া দেখা যায় নাই। কার্সিয়াংয়ের ডাক্তার ও দার্জ্জিলিংয়ের সিভিল সার্জ্জন তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। চিকিৎসা অর্থে সরকার পক্ষ কি বোঝেন তাহা আমাদের জানা নাই। আমাদের মতে চিকিৎসার সঙ্গে সেবা-যত্নও প্রয়োজন। আত্মীয়-স্বজনের সেবা-যত্নের সঙ্গে সিভিল সার্জ্জনের ঔষধই প্রকৃত চিকিৎসা। অতএব এই প্রকার চিকিৎসা বন্দী অবস্থায় কি প্রকারে সম্ভব?

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

দেশের বর্ত্তমান শান্তিময় আবহাওয়ায় কেন যে সুভাষ চন্দ্রকে এ ভাবে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে তাহার যথাযথ কারণ আজ পর্য্যন্ত সরকার পক্ষ জনসাধারণকে জানান নাই। তাঁহাদের কেবল এক উত্তর—"জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য"। জনসাধারণের মঙ্গল কিসে হয় তাহা কি তাহারা নিজেরা বুঝে না? তবে কেন তাহারা তাঁহার মুক্তির জন্য এত ব্যগ্র? প্রকাশ্য আদালতে বিচার করিবেন না, কোন জজ দিয়াও তদন্ত করিবেন না, অথচ নিজেদের ইচ্ছামত তাঁহাকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক করিয়া রাখিবেন,—এই দুর্ব্বোধ্য নীতিকে সরকারের খামখেয়াল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবী লইয়া আমাদের সরকারের দরবারে দাঁড়াইবার অভিপ্রায় নাই। যিনি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—ত্যাগই যাঁহার জীবনের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—তাঁহার কাছে নিজের জীবনের মমতা কতটুকু তাহা আমাদের অবিদিত নাই। সুতরাং অযথা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার ত্যাগকে আমরা ছোট করিতে পারি না বা চাই না।

শরৎচন্দ্রের আত্মসমর্পণ

বঙ্গীয় কংগ্রেস জাতীয় দল কংগ্রেস নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদেরই মতের অনুরূপ। বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন যদি না করা হয় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ নীতি যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রথমেই বাঙ্গলার কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি ও বঙ্গীয় কংগ্রেস জাতীয় দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয় কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহার সাদরে বরণ করিয়া লইয়া যে নূতন সমস্যার উদ্ভব করিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষয়। কংগ্রেসের "Petty Disputes and Squabbles" এর অবসান কল্পে, তিনি বাঙলা কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতি পদে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নাম সমর্থন করিয়াছেন। শুধু সমর্থন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হ'ন নাই উপরন্তু ডাঃ রায়ের উপর ইলেক্‌শনের সমস্ত ভার দিয়া তিনি সিমলার শৈলশিখরে ছুটী অতিবাহিত করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শরৎ বাবু ও তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ডাঃ বিধান রায়ের দলের কূটনীতির কাছে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। রাজনীতিতে কূটনীতিরই জয় অনিবার্য্য।

এদিকে সহযোগী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কংগ্রেস নির্ব্বাচন নীতিকে সমর্থন করিয়া মহাবিপদে পড়িয়াছেন। কর্ম্মকর্ত্তা সুরেশ বাবুর মত কিম্বা কর্ম্মসচিব মাখম বাবুর বঙ্গীয় কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রস্তাব সমর্থন করিবেন তাহা লইয়া সহযোগী মহা চিন্তায় পড়িয়াছেন। সহযোগীর পক্ষে 'না বর্জ্জন, না গ্রহণ' নীতিই শ্রেয়ঃ।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিরণ শঙ্করের চালে আজ "আনন্দবাজার" দলের মধ্যেও কি মত বিরোধের সৃষ্টি হইল? বঙ্গীয় কংগ্রেসের মিলন যে কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছে তাহা আজ বেশ ভাল ভাবেই প্রতীয়মান হইতেছে। সমান সংখ্যক সভ্য লইয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে যেমন অনেকে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেমনই অনেকে আবার নিরাশ হইয়া নিরপেক্ষতার ভাব অবলম্বন করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। অভিমান করা যে রাজনীতিক্ষেত্রে অচল, তাহা আমরা বারংবার জানাইতেছি।

যে দল বা ব্যক্তির 'aggressivaness' নাই তাহাদের রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করাই সঙ্গত।

বাঙ্গলার বাহিরে ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন লইয়া অনেকটা মাতামাতি ও ছুটাছুটির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পণ্ডিত জহরলাল সোৎসাহে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু নিদ্রিত বাঙ্গলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ আজ ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। সহযোগী "বসুমতী" নিদ্রিত বাঙ্গলার অসহায় অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেনঃ—"যিনি বাংলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী সেই শ্রীকিরণ শঙ্কর রায় বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে কোনরূপ আন্দোলন চালাইবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার দলের অপরাপর লোকেরও সেই অবস্থা। কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু মহাশয়ের সময়াভাব। হাইকোর্ট বন্ধ না হইলে তিনি দেশের দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসর পাইবেন না।" সহযোগী "বসুমতী" বিস্মৃত হইয়াছেন যে, হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই পূজাবকাশের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু তত্রাপি চুঁচড়ায় কোন একটী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করা ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ সভায় যোগদান করিবার সময় তিনি পান নাই। শরৎচন্দ্র যদি একান্তমনে কংগ্রেসী কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে না পারিবেন তাহা হইলে অযথা নির্ব্বিকার জগন্নাথদেবের ন্যায় কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় বিরাট ব্যক্তিত্বের অবমাননা করিলেন কেন? কয়েক মাস পূর্ব্বে যে বিধানচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি মিঃ সত্যমূর্ত্তিকে শ্লেষপূর্ণ পত্র লিখিয়া স্বীয় মতস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিয়াছিলেন আজ সেই বিধানচন্দ্রকে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সর্ব্বময়কর্ত্তা করিয়া নিজে বাঙ্গলার রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিধানচন্দ্রের তল্পিদাররূপে বিরাজ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন দেখিয়া অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

সহযোগী "বসুমতী" আক্ষেপ করিয়া অবশেষে বলিতেছেন যেঃ "অনেক যত্নে সৃষ্টি-করা মিলনসূত্র শরৎ বাবু সহজে ছিন্ন করিতে রাজী নহেন।"

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার

অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জার্ম্মাণী ৫৮৪ পয়েন্ট, যুক্তরাষ্ট্র ৩৮৯ পয়েন্ট ও ইতালি ১৫৫ পয়েন্ট পেয়ে যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু "ফিল্ড এ্যাণ্ড ট্রাক্" প্রতিযোগিতার সম্মান ক্রীড়াজগতে সবচেয়ে বেশী দুষ্প্রাপ্য। এবার এ সম্মান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছে! এই শ্রেণির মোট ২৩টী খেলা এবার অলিম্পিকে হয়েছিল। তার মধ্যে ১২টীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জয়লাভ করেছে! জার্ম্মাণী ও ইতালি প্রত্যেকে তিনটীতে জয়লাভ করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। নারীদের "ফিল্ড এ্যাণ্ড ট্রাক্" প্রতিযোগিতায় জার্ম্মাণী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটী বিষয়ে প্রথম হ'য়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

গতবারের মতন এবারও জাপান সাঁতারে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছে। জাপান তিনটী বিষয়ে প্রথম হ'য়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মহিলাদের সাঁতারে হল্যাণ্ড প্রায় সমস্ত বিষয়ে প্রথম হয়েছে। কেবল জাপানের মাইহাটা একটী বিষয়ে প্রথম হয়েছে।

বাইচ্ প্রতিযোগিতায় জার্ম্মাণী ও বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় কোন রাষ্ট্র কিরূপ পদক পুরস্কার পেয়েছেন তার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হ'ল। ভারতবর্ষ মাত্র ১টী সুবর্ণ পদক পেয়েছে। কিন্তু এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যাঁদের ভাগ্যে সুবর্ণ পদক ত' দূরের কথা রৌপ্য পদকও জোটেনি। যেমন বেলজিয়াম, অষ্ট্রেলিয়া ফিলিপাইন, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি।

দেশ	সুবর্ণপদক	রৌপ্যপদক	ব্রোঞ্জপদক
জার্ম্মাণী	৩৩	২৬	৩০
আমেরিকা	২৪	২০	১২
হাঙ্গেরী	১০	১	৫
ইতালি	৮	৯	৫
ফ্রান্স	৭	৬	৬
ফিন্ল্যাণ্ড	৭	৬	৬
সুইডেন	৬	৫	৯
জাপান	৬	৪	৮
হল্যাণ্ড	৬	৪	৭
গ্রেটব্রিটেন	৪	৭	৩
ভারতবর্ষ	১	—	—

ভারতীয় হকিদল

অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি দল এবার সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করে ইউরোপের কতিপয় প্রসিদ্ধ সহরে খেলার ব্যবস্থা কোরেছে। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী তারা ফ্রাঙ্কফুট দলের সহিত খেলেছিলেন। খেলার মাঠের অবস্থা ভাল না থাকায় ভারতীয় দলকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু শেষকালে তারা খালি পায়ে খেলে ফ্রাঙ্কফুট দলকে ৫—২ গোলে হারিয়ে দিয়েছে।

ভারতীয় দল সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি দেশের দিকে রওনা হ'বে। ভারতে ফিরে তারা বোম্বাই, দিল্লী, ম্যাড্রাস, কোলকাতা প্রভৃতি বড় বড় স্থানে কয়েকটা এক্জিবিসন্ ম্যাচ খেলবে। টিকিট বিক্রয় সমূহের অর্থ হকি ফেডারেশনের ভাণ্ডারে যাবে।

ভারতীয় ক্রিকেট দল

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের শোচনীয় পরাজয়ের পর তারা হ্যাম্পশায়ার দলকে ২ রানে হারিয়েছে। এই জয়ের প্রথম গৌরব প্রাপ্য প্রধানতঃ সি, এস, নাইডু ও সুটে ব্যানার্জ্জির। দ্বিতীয় ইনিংসে

সুটে ব্যানার্জ্জি

ইহারা দুজনে জুটি হয়ে ভারতীয় দলের সবচেয়ে বেশী রান তোলে। তাছাড়া ছোট নাইডু প্রথম ইনিংসে ৯১ রানে ৫টী ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৩ রানে ৪টী উইকেট নিয়ে ভারতীয় দলের জয় সম্ভব করেছে। তার ব্যাটিং ও বোলিং দেখে বিলাতের দু একজন ক্রিকেট সমালোচক বিশেষ প্রসংশা করেছে। ১৯৩২ সালে ভারতীয় দল এই দলের কাছে এক ইনিংস ও ১০৩ রানে হেরেছিল।

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ১৯২ রান করে। তার মধ্যে মার্চ্চেন্টের ৭৬ ও জয়ের ৫০ রানই উল্লেখযোগ্য। কেনিডি ৪৬ রানে ৪টী উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল ১৯৯ রান করে। তার মধ্যে ছোট নাইডু, জয় ও ব্যানার্জ্জি

যথাক্রমে ৫৮, ৪৬ ও ৪৪ রান করে। হারমান ৫৯ রানে ৫ উইকেট পান।

হ্যাম্পশায়ার দল প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ২৩৮ ও ১৯১ রান করে।

হ্যাম্পশায়ার দলকে হারিয়ে ভারতীয় দল কেণ্ট দলের সঙ্গে খেলে। এই খেলায় ভারতীয় দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। ভারতীয় দল প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ১৭৩ ও ১৪৮ রাণ এবং কেণ্ট দল প্রথম ইনিংসে ৫২৩ রাণ করে। কেণ্ট দলের এ্যাসডাউন ও ফ্যাগ যথাক্রমে ১১৭ ও ১৭২ করে নিজেদের শতাধিক রাণের গৌরব অর্জ্জন করেছে। কেণ্ট দল এই খেলায় এক ইনিংস ও ২০২ রাণে জেতে।

নিউজিল্যাণ্ডগামী-ক্রিকেট দল

আগামী নবেম্বর মাসে ভারতীয় আর একটা ক্রিকেট দল নিউজিল্যাণ্ডে খেলতে যাবে। নবাবনগরের জাম সাহেব এই দল নিয়ে যাচ্ছেন। সম্ভবতঃ তিনি নিজেই এই দলের অধিনায়কত্ব করবেন।

নিউজিল্যাণ্ড যাবার আগে এই দল বোম্বাইতে হিন্দুজিমখানা ও ইসলাম জিমখানার সঙ্গে দু'টী ম্যাচ্ খেলবেন।

নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা যাবেন বলে ঠিক্ হয়েছে :—দলীপ সিংজী, বিজয় মার্চ্চেণ্ট, অমর সিং, কোলা, মণিলাল, গাপকর, ইন্দ্রনাথ সিংজী, বিজয়ীন্দ্র সিংজী, মেহেরোমজী প্রভৃতি।

সিমলা ডুরাণ্ড কাপ

মোহনবাগান ও ভবানীপুর ক্লাব এবার সিমলায় ডুরাণ্ড কাপ খেলতে যাবে তা এক রকম স্থির হ'য়ে গেছে। মোহনবাগান দল আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর সিমলা যাবে। এই প্রতিযোগিতায় হামিদ ও হাবুল ভট্টাচার্য্য মোহনবাগানের হয়ে খেলবে।

মোহনবাগান দল এর আগে তিন বার ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। ১৯২৫ সালে তারা প্রথম ডুরাণ্ড খেলতে যায়। সেবার তারা বিশেষ কিছু করতে পারেনি। ১৯২৬ সালে তারা সেমিফাইনালে সেরউড ফরেষ্টারের কাছে হারে। তারপর ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় রাউণ্ডে স্যাণ্ডিঘোনিয়ান্সের কাছে হেরে যায়।

ভবানীপুর ক্লাবও এবার ভাল টীম্ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে।

এরিয়ান্স দল সিমলায় ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় খেলতে যাবে বলে একটা গুজব উঠেছিল কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে যে তারা দিল্লীতে মহেন্দ্র কাপ খেলায় যোগ দেবে।

রোভার্স কাপ

রোভার্স কাপের সেমি ফাইন্যালে কে, এস, এল, আই এর কাছে কোলকাতার শীল্ড বিজয়ী মহামেডান দল ২—১ গোলে হেরে গেছে। কে, এস, এল, আই দল ডারহাম বিজয়ী আফগান দলকে হারিয়ে সেমি ফাইন্যালে উঠেছিল।

বিবিধ

শিশির কুমার ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

গত রবিবার মহারাজা কাশীমবাজার পলিটেক্‌নিক্‌ ইনষ্টিটিউট্‌ হলে শিশির কুমার ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রথম বাৎসরিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় গায়ক গায়িকাদের মধ্যে অনেকে প্রতিযোগী হিসাবে এই উৎসবে যোগদান করেন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল আধুনিক বাংলা

কুমারী মীরা দে সরকার

গান, বাউল ও কীর্ত্তন। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল হয়েছে এইরূপ :—

বালক, বালিকা

আধুনিক বাংলা গান।

প্রথম—তরুবালা ব্যানার্জ্জি। নচিকেতা ঘোষ।

দ্বিতীয়—আরতি রায়।

বাউল।

প্রথম—তরুবালা ব্যানার্জ্জি।

দ্বিতীয়—আরতি রায়।

কীর্ত্তন।

প্রথম—তরুবালা ব্যানার্জ্জি।

কুমারী কল্যাণী চ্যাটার্জ্জি

মহিলা।

আধুনিক বাঙলা গান।

প্রথম—কল্যাণী চাটার্জ্জি।

দ্বিতীয়—মীরা দে সরকার।

বাউল।

প্রথম—মীরা দে সরকার।

দ্বিতীয়—কল্যাণী চাটার্জ্জি।

কীর্ত্তন।

প্রথম—মীরা দে সরকার।

দ্বিতীয়—কল্যাণী সরকার।

সাধারণ।

আধুনিক বাঙলা গান।

প্রথম—নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয়—সচ্চিদানন্দ ঘোষ।

বাউল।

প্রথম—ধনী মুখার্জ্জি।

দ্বিতীয়—বিমল ঘোষ।

কীর্ত্তন।

প্রথম—নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য।

প্রতিযোগীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গান গেয়েছেন সাধারণ বিভাগে নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য, বালিকা বিভাগে কুমারী তরুবালা ব্যানার্জ্জি ও মহিলা বিভাগে কুমারী মীরা দে সরকার। তবে এ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সম্মানের দাবী করতে পারেন কুমারী মীরা দে সরকার। বিশেষতঃ তাঁর বাউল আর কীর্ত্তন দুখানি সুর তাল ও লয়ের সমন্বয়ে হয়েছিল সত্যই অপূর্ব্ব। এ বিষয়ে চর্চ্চা রাখলে কুমারী মীরা অদূর-ভবিষ্যতে আরও বেশী নাম করবেন। ভাল গান গাওয়ার জন্য পুরুষ বিভাগের মুট বিহারী চ্যাটার্জ্জি একটি অতিরিক্ত পুরস্কার লাভ করেন।

এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের কাজ করেছিলেন কাজী নজরুল ইস্‌লাম, উমাপদ ভট্টাচার্য্য, অনিল বাগ্‌চী, কমল দাশগুপ্ত, ও জগৎ ঘটক।

সভায় সঙ্গীতানুরাগী অনেক লোকের সমাবেশ হয়েছিল এবং অনেকেই শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য শিশির কুমার ইন্‌ষ্টিটিউটের সুদক্ষ সম্পাদক শ্রীসুধীর বসু ও তাঁর সহকারী

অপর দিকে কিংস রেজিমেণ্ট ওয়ার উইক দলকে হারিয়ে সেমিফাইন্যালে উঠেছে। তারা এবার লিন্‌কন্‌ দলের সঙ্গে খেলবে।

কে, এস, এল, আই দলই যে 'রোভার্স কাপ' বিজয়ী হ'বে তা এক রকম সুনিশ্চিত।

ইয়ঙ্গার কাপ

মোহনবাগান দল ইষ্ট বেঙ্গলকে ২—০ গোলে হারিয়ে এবার ইয়ঙ্গার কাপ পেয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল দল একটী সেম্‌সাইডএ ও একটী পেনাল্টীতে গোল খায়।

সরযূ কাপ

বি, জি, প্রেস এণ্ডরু ইউল কে ৩—০ গোলে হারিয়ে এবার সরযূ কাপ পেয়েছে।

সাঁতার

কাশীর বিখ্যাত সাতারু রবীন চাটার্জ্জি গত জুলাই মাসে হাত বেঁধে সাতারে নূতন রেকর্ড করেছিলেন। কোলকাতায় প্রফুল্ল ঘোষ সেদিন রবীন চাটার্জ্জির রেকর্ড ভেঙ্গে নিজের নতুন রেকর্ড করেছেন। রবীন বাবু আগামী শনিবার প্রফুল্ল বাবুর রেকর্ড ভাঙ্গবার জন্যে লাহোরে সাতার কাটবার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর এ ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক এই আমাদের শুভেচ্ছা।

মিহির গাঙ্গুলী ষোল আনা প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

সাহায্য রজনী

আগামী শুক্রবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় খিদিরপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নব নাট্য মন্দির সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "রীতিমত নাটক" ও 'শেষ রক্ষা' অভিনীত হইবে। শিশির কুমার বিশ্বনাথ ও কঙ্কাবতী যথাক্রমে দিগম্বর, সুহৃদ ও স্বাগতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

ফ্যাক্টরী একাউন্টস্ অফিসের আমোদ-উৎসব

নিখিল ভারতীয় একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষায় ফ্যাক্টরী একাউন্টস্ অফিসের শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র ও শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ শীলের সাফল্যে উক্ত অফিসের কর্ম্মচারীবৃন্দ বিগত ২৯শে আগষ্ট শনিবার একটি আমোদ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু ঘোষের ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ চমৎকার ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাদের ক্রীড়া-কৌশলে মুগ্ধ শ্রীযুক্ত যতীশ বাবু ও শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব বাবু কল্যাণীয়া কুমারী অন্নপূর্ণা ও মীরাকে দুইখানি পদক প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত সুশীল বাবুর "গীতা-বন্দনা" বেশ ভালই হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাঁশী বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল এবং পরে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় দুইটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এস্প্লানেড ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশ বাবুর "নাম-রহস্য" নামক হাস্য-কৌতুকপূর্ণ প্রবন্ধটী সকলেই মুগ্ধভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন। পরিশেষে জলযোগান্তে উৎসব ভঙ্গ হয়।

শোক সংবাদ

সুপ্রসিদ্ধ ইন্‌কর্পোরেটেড্ একাউণ্ট্যাণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী প্রজ্ঞা দেবীর শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। স্বামী ও পুত্রের সম্মুখে সধবাবস্থায় মৃত্যু বড়ই করুণ ও শোকাবহ।

প্রজ্ঞা দেবীর বয়স ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার একটী কবিতা আমাদের এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি এই লেখাটী আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র বর্ত্তমান। আমরা তাঁহাদের এই গভীর শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান এই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুন।

কমার্শিয়াল্ মিউজিয়াম

গত মঙ্গলবার বাঙ্গলার স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেসনের নব স্থাপিত কমার্শিয়াল মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। তিনি মিউজিয়ামের প্রত্যেক

রূপতরঙ্গ

[বিলাসী]

নিউ থিয়েটার্স

নীতীন বসুর "দিদি" শশীকলার স্তায় অতি সঙ্গোপনে বেড়ে চলেছে। "দিদি" প্রায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি এল, অথচ অনেকেই জানে না "দিদি" বলে একখানা ছবি তোলা হ'চ্ছে। নতীনবাবু চিরদিনই নীরব কর্ম্মী—কিন্তু তাঁর এবারকার নীরবতা দেখে আমরাও নির্ব্বাক্! আমরা শুধু ভাবছি, "ভাগ্যচক্র" তাঁকে আজ যে যশের আসনে অধিষ্ঠিত কোরেছে—"দিদি" হয়ত' তার অনেক উঁচুতে নীতীনবাবুর স্থান নির্দ্দেশ কোরবে।

* * *

প্রমথেশ বড়ুয়ার "মায়া" শেষ হ'তে দেরী নেই। প্রমথেশবাবু যে ছবিতেই হাত দেন তা' সোনা ফলে যায়। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস "মায়া-"র মায়াজালে আগেকার মত এবারও দর্শকরা অভিভূত হবে। "মায়া-"র রূপদাতা সুকুমার দাশগুপ্তের গল্প লেখার মুন্সিয়ানার পরিচয় আগেই সবাই পেয়েছেন—এবার প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় তাঁর কল্পনা-সুন্দরী "মায়া" তাঁর মনকেও রঙীন স্বপ্নজালে যে মশগুল কোরবে তা' বলাই বাহুল্য।

* * *

হেম চন্দ্র "ক্রোড়পতি" ছবি তুলে নিউ থিয়েটার্সের সম্মান অক্ষুন্ন রেখেছেন। আর, চারিদিক থেকে প্রশংসার বাণী তাঁর মনকে কোরে তুলেছে আরও সতেজ। তাঁর আগামী ছবি "অনাথ আশ্রম" হিন্দীতে সুরু হ'য়েছে। মনে অদম্য উৎসাহ নিয়ে এবার তাঁর ছবি উঠছে—আর সবাই তাই দেখে বিস্ময়াভিভূত

দৃষ্টান্তটি মনোযোগ সহকারে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। কলিকাতার মত সমৃদ্ধিশালী সহরে কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নূতন করিয়া তাঁহাকে বলিবার কিছুই নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের এই নব প্রচেষ্টাকে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের দপ্তর হইতে আর্থিক সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে কলিকাতা কর্পোরেশন মিউজিয়ামের সুযোগ্য কর্ম্মসচীব তাঁহার সহকর্ম্মীদের লইয়া ইহাকে যে একটী জীবন্ত ও অতুলনীয় ইন্‌ষ্টিটিউশন্ করিয়া তুলিতে পারিবেন স বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

হবেন—এ মনের জোর হেমচন্দ্র সম্প্রতি পেয়েছেন।

* * *

এদিকে অনোয়ার সা রোডের কর্ম্মীবৃন্দও নিশ্চেষ্ট নেই। বড় ষ্টুডিওর বড় ডিরেক্টারদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্‌বার জন্যে এঁদের উদ্যোগ আয়োজনও কম নয়। "বিজয়া" এঁদের প্রায় শেষ হ'য়ে এল। পঞ্চপাণ্ডবের পাঞ্চজন্যের বিজয়বাণীতে "বিজয়া-"র বোধনে বাঙলার নরনারীকে যে বিমুগ্ধ কোর্‌বে তার গুঞ্জরণ দিকে দিকে ধ্বনিত হ'চ্ছে।

কালী ফিল্মস্

"টকী অফ্ টকীজে-"র শুটিং অর্দ্ধেকের ওপর প্রায় শেষ হ'য়ে এল। ছবি তোলার আগে অনেকে অভিযোগ কোরেছিলেন যে, শিশিরকুমারকে নিয়ে হয়ত' গাঙ্গুলী মশাই এবার হাঙ্গামায় পড়বেন। তাঁরা যা' মনে কোরে একথা বলেছিলেন তা' সত্য না হ'লেও—গাঙ্গুলী মশাই যে একেবারে হাঙ্গামায় পড়েননি একথা বিশ্বাস কোর্‌তে আমরাও পারি না। কারণ, শিশিরকুমারের এমন উৎসাহ কেউ কখনও দেখে নি—তিনি দিনরাত্তির শুটিং নিয়েই মশ্‌গুল আর সেই সঙ্গে গাঙ্গুলী মশাইকেও নাওয়া খাওয়া ভুলে তার শুটিংয়ের তদ্বির কোর্‌তে হ'চ্ছে। আমরা আশা করি শিশিরকুমারের এ উৎসাহ চির উদ্দীপ্ত থেকে তিনি সকলের ধারণাকে ভ্রান্ত কোর্‌বেন।

* * *

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

পূজোর আগেই "সোনার-সংসার" মুক্ত করবার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ উঠে পড়ে লেগেছেন। দেবকী বসু এখন যে গতিতে শুটিং চালিয়েছেন—এরকমভাবে যদি কাজ চালাতে পারেন তা' হ'লে বাঙলা "সোনার সংসারে-"র পূজোর আগে মুক্তিলাভ ঘটে উঠবে আশা করা যায়। আমরা শুনলাম, শ্যার শঙ্করনাথের বাড়ীর দৃশ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী ও মজাহার খাঁ যথাক্রমে বাঙলা ও হিন্দীতে অতি চমৎকার অভিনয় কোরেছেন। আর এই দৃশ্যে চমৎকার হাস্যরস জুগিয়েছেন হিন্দী ও বাঙলাতে নন্দ কিশোর ও তুলসী লাহিড়ী।

দেবদত্ত ফিল্মস

এদের ষ্টুডিওর ভেতর অন্তর্বিপ্লবের অবসান হ'য়েছে। এই গোলমালের ভেতরও এদের ফিল্ম-জয়েনার ভোলানাথ আঢ্য "জোড়া ঘুঘু" নামে একখানা দু'রীলের হাসির ছবি তুলে ফেলেছেন। ছবিখানা "রজনী-"র সঙ্গে দেখানোর ব্যবস্থা চলছে।

শোনা যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ-পরিচালকের পদে কালী প্রসাদ ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান কোরেছেন। আর ছবি তোলার জন্যে এঁরা নিয়েছেন রাধা ফিল্মের ওয়াদীকরকে। পূর্ব্বে আমরা শুনেছিলাম যে, এখানে ছবি তোলার জন্যে প্রবোধ দাসকে নেওয়া হবে; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে ওয়াদীকরের এখানে যোগদানে আমরা বিস্মিত হ'য়েছি। প্রবোধের "সেলিমা" "পরপারে" ও "লয়লা-মজনু" ছবি দেখে শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর আলোকচিত্রশিল্পীরূপে অভিহিত কোরেছে। অথচ ওয়াদীকরের ছবি দেখে আমরা ব্যথাই পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষ যে কিরূপে ওয়াদীকরকে মনোনয়ন কোর্‌লেন তা' আমাদের ধারণার বহির্ভূত।

ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুন্যালের এসেসর নির্ব্বাচন

কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুন্যালে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে এসেসর নিয়োগ পূজার পূর্ব্বেই সমাধা হইবে। প্রার্থীদের তোড়জোড় দেখিয়া মনে হইতেছে যে, বর্ত্তমান এসেসর মিঃ আর, এম, সেনগুপ্ত ও ভূতপূর্ব্ব এসেসর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেই একজন নির্ব্বাচিত হইবেন। অপর প্রার্থীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য; সুতরাং তাঁহার ন্যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে এই নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ না হওয়াই সমীচীন ছিল। শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায় পুরাতন কংগ্রেস-কর্ম্মী হিসাবে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার ন্যায় প্রবীন ব্যক্তির পক্ষে চাকুরীর উমেদারী করা শোভন নহে।

বিগত নির্ব্বাচনের সময় তদানীন্তন রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়কে সমর্থন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "Nothing will please me more than to find you re-elected Assessor of the Calcutta Improvement Trust Tribunal." (কার্শিয়াং হইতে ২৫।৪।৩৪ তারিখের পত্র হইতে উদ্ধৃত)। আমরা আশা করি যে মুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দী শরৎচন্দ্রের মতামত সমর্থন করিয়া অমৃতলালের নির্ব্বাচনে সহায়তা করিবেন।

শ্রীঅজিত সেন

ইনি সাধারণের কাছে এখনও বিশেষ পরিচিত না হ'লেও "রামকান্ত" ছবিতে সহকারী আলোকচিত্র ও আলোক-শিল্পী রূপে এর কাজ দেখে সবাই খুসী হবেন মনে হয়।

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বন। না, সে আর হোতে পারেনা। (আ)চ্ছা, আমি যদি সুবোধের বাপকে গিয়ে (সব) কথা বুঝিয়ে বলি—তাতে কি গোল (মি)টতে পারে না?

দক্ষি। তুমি বোলবে—প্রবোধবাবুর (সা)মনে গিয়ে?

বন। উপায় কি? তুমি সঙ্গে কোরে (নি)য়ে যাবে—আমিই সব বোলবো। তাঁর স্ত্রী নেই—নইলে তাঁর কাছে গিয়েই ত (স)ব বোলতে পার্ত্তুম?

দক্ষি। তাতে কোনও ফল হবে না—(ব)রং তাঁর ঝোক আরও বেড়ে যাবে। আর, (ত)াছাড়া আমি তোমাকে প্রবোধবাবুর কাছে নিয়ে যেতে পার্ব্বো না।

বন। বুঝিচি, তোমরা কেউ আমার (ম)নের কথা বুঝতে পাচ্চো না—বুঝতেও (চ)াইচো না। বেশ!—আমি মেয়েকেও তার (ধ)র্ম্ম খুইয়ে বিয়ে দিতে বোলতে পার্ব্বো না। এখন মধুসূদনই আমার ভরসা—তাঁর ওপরই নির্ভর করে আমি আজ থেকে মুখ বুজে (থা)কবো—তোমরা ভাল-মন্দ কোনও কথা আর আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। যে ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে আমি আকুলি-বিকুলি কচ্চি, সেই ধর্ম্মই যদি এর বিহিত করেন, ত কর্ব্বেন। যে সতীরাণী আমার অন্তরে থেকে প্রতিদিন পূজো নিচ্চেন, যাঁর কথা মনে কোরে, তোমার অপমানিত শুকনো মুখের ছবি কল্পনাতে দেখতেও আমি আজ এমনি অবশ হোয়ে পড়চি—তিনি নিশ্চয়ই আমার মনের কথা বুঝবেন—তিনি নিশ্চয়ই কুমারীর ধর্ম্ম রক্ষা কর্ব্বেন! এখন তিনিই আমার আশ্রয়—আমি আজ থেকে তাঁকেই আমার মনের ব্যথা জানাবো—আর কাউকে নয়।

[বনজ্যোৎস্না চলিয়া গেলেন]

দক্ষি। বুনো, তোমাকে যতই দেখচি, ততই মুগ্ধ হচ্চি! এই যে সুবোধ, এসো।

[সুবোধের প্রবেশ]

সুবো। আপনার কাছে আমার একটা apology কর্ব্বার দরকার আছে। আপনি হয়ত মনে করে আছেন—কালকের সেই আশীর্ব্বাদের ব্যাপারটায় আমার কোনও হাত ছিল—কিন্তু সত্যি বোলচি আমি ওর বিন্দু-বিসর্গ জানতুম না—আপনারি মত যাকে বলে quite innocent ঠিক তাই। অবিশ্যি আপনাদের দিক থেকে এ বিয়েতে আপত্তি উঠতে পারে—শুধু এইটুকু মাত্র বাবাকে জানিয়েছিলুম। তা নইলে আমিও জানতুম—এ party আমার বিলেত থেকে ফিরে আসবার দরুণই হোচ্চে—ওর মধ্যে আর কোন মতলবই নেই। যদিও ছেলে হোয়ে বাপের সম্বন্ধে কিছু বলা হয়ত ঠিক হোচ্চে না, তবুও ওই উকিলি ফন্দী আমি ঠিক হজম কর্ত্তে পারি না। কাল রাত থেকেই আপনাকে একথাটা জানিয়ে দেবার জন্যে ছটফট্ কচ্ছিলুম—কিন্তু কাল আর partyর গোলমালে সুযোগ হোয়ে উঠলো না—আজ সকাল হোতেই ছুটে এসেছি।

দক্ষি। ও, তাহোলে তুমিও জানতে না? বেশ—বেশ, আমি মনে করি—

সুবো। তবে আমারও ভেতর দিক থেকে অন্য একটা জোর ছিল—সেই জন্যেই বাবা ডাকতেই—আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আপনার আশীর্ব্বাদ নিয়েছিলুম। আজ সেই কথাটাই আপনার কন্যাকে প্রথম বোলবো বলে এসেছি। আশা করি এবার আর তাঁর আপত্তি হবে না—সব গোল মিটে যাবে।

দক্ষি। তাই যাক্ বাবা—আমারও এই নিয়ে ঘরে বাইরে বড় অশান্তি হোয়েচে। ভারতীকেই বুঝিয়ে বলো—সে বুঝলেই বোধ করি সব ঠিক হোয়ে যাবে। ভারতী ওই পাশেই—তার পড়বার ঘরে আছে। আচ্ছা, সে-ই এখানে আসুক না কেন—আমি যাচ্ছি। ওরে ভারতী, এই ঘরে একবার আয় ত. সুবোধবাবু এসেছেন—তোকে কি বোলবেন। হ্যাঁ বাবা, মিটিয়ে ফ্যালো—পারো যদি—নইলে, এই এক Co-tuitionএর ফলেই অস্থির হোয়ে পড়িচি—এর ওপর আবার তোমরা পুরো-দস্তুর Co-education চালাতে যাচ্ছো—তখন যে ব্যাপারটা আরও মর্ম্মান্তিক জটিল হোয়ে উঠবে দেখচি! ঐ যে ভারতী আসচে—বসো।

[দক্ষিণাবাবুর প্রস্থান—ভারতী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল]

সুবো। আসুন্—বসুন্। আমি সেদিন নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নি—একটু রূঢ় ব্যবহার করে গেছি—কিছু মনে কর্ব্বেন না—আমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন।

[ভারতী নীরবে চেয়ারে বসিল—সুবোধ অল্পদূরে আর একখানি চেয়ারে বসিল]

সুবো। দেখুন আজ অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে একটা বলবার মত কথা বোলতে এসেছি—আমার খুব বিশ্বাস আপনি সে কথাটা শুনে আর "না" কোর্ত্তে পার্ব্বেন না। আমি গিয়েছিলুম আপনার মাষ্টার মশাই বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা কোরে তাঁর মন জানতে। দেখা কোরে বুঝলুম তিনি খুব অনুতপ্ত—আমার কাছে ক্ষমা পর্য্যন্ত চাইলেন—এমন কি তিনি আমাদের বিবাহে উপস্থিত থাকতেও রাজী হোয়েচেন। কেমন,—আর ত আপনার কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।

ভার। আমার আপত্তি কি—তাঁর আমাকে বিয়ে কোর্ত্তে চাওয়া-চাহির ওপর নির্ভর কচ্ছে বলে মনে করেন?

সুবো। তাই বৈ কি একরকম! তিনি নিশ্চয় বুঝেচেন— আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান-টুকু মাত্র বাকি—কাজেই তিনি আপনাকে বিয়ে কোর্ত্তে পারেন না—বিয়ে কোর্ত্তে চান্ না—তার কল্পনা পর্য্যন্ত এখন তিনি মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েচেন!

ভার। অর্থাৎ আপনি বোলতে চান্—তিনি যদি আমাকে বিয়ে কোর্ত্তে না চান্—তখন আমার আর অন্য গতি নেই?

সুবো। গতি না থাক্—আপনার যা আপত্তি—যেটাকে আপনি একটা মস্ত বড় ব্যাপার বোলে মনে করে আছেন—সেটা ত চলে গেল? বিশ্বেশ্বরবাবুই ভুল বুঝে এই গোল বাধিয়েছিলেন—তিনি যখন এ ব্যাপার থেকে স'রে গেছেন, তখন আমাদের যা সম্বন্ধ ছিল—তাই পাকাপাকি হোতে আপত্তি কি?

ভার। আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, Mr Chatterjee—তাঁর মতামতের ওপর এখন আর আমার অদৃষ্ট নির্ভর কচ্চে না। তিনি আমাকে গ্রহণ না কোল্লে'ও—আমাকে এ জীবনে না কুলোয়, পরজীবনেও, অপেক্ষা করে থাক্তে হবে। আমি এখন মনে-প্রাণে তাঁদেরই কুলবধূ!

সুবো। আপনি এতদূর এগিয়েছেন জান্‌লে—বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা কর্ব্বার পণ্ডশ্রম আমি কখনই কোর্ত্তাম না। শুধু আপনাকে অসুখী না কোরে, আপনাকে Reasoningএর মধ্যে এনে এ বিবাহ হোক্—এই আমি চেয়েছিলুম। নইলে,—বাবা রয়েচেন—তিনি যা বোলবেন—আমাকে মানতেই হবে! আমি যাচ্চি—

[সুবোধবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

ভার। যাবেন না—আজ অনেক কথাই আপনাকে আমার বলবার আছে। ব্যাপার যা ঘোটেচে—আমি সব শুনেচি। এইমাত্র বাবা-মার কথাবার্ত্তাও শুনছিলুম। আপনারা ইচ্ছে কোল্লেই আমার এই দেহটা—যদি বিয়ের দিন পর্য্যন্ত সেটা বজায় থাকে—দখল কোর্ত্তে পারেন। এতে আপনাদের বাধা দিয়ে কেউ কিছু কোর্ত্তে পার্ব্বে না। বাবাও হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আপনাদের দিকেই হবেন। বাধা দেবার মধ্যে মা আর আমি। পাছে বাবাকে অপদস্থ হোতে হয় এই ভয়ে, মা আর এর কোনও কথাতেই থাকবেন না বোলেচেন। রইলুম শুধু আমি—কিন্তু আমার কথার ত কোনও মূল্যই আপনারা দিতে চাচ্ছেন না। তবে, এও বোলে রাখি আপনারা দেহ-ই হয়ত দখল কর্ব্বেন—আর কিছুই পার্ব্বেন না—মন ত দূরের

কথা, দেহ স্পর্শ কর্ত্তেও পার্কেন না। আপনি হয়ত ভাবচেন্—আমার এ সব বানানো কথা—কিন্তু আমি জানি এতে একতিল মিথ্যে নেই। আপনি হয়ত অনেক মেয়ে মানুষ দেখেচেন—কিন্তু, সব মেয়েমানুষ ত আপনার দেখা নেই!

সুবো। দেখুন্—আমি আপনাকে বিশ্বাস কল্লেও, সংসার আপনার কথা এত সহজে বিশ্বাস কর্ত্তে চাইবেনা। আমাকে ত সংসারেই বাস কর্ত্তে হয়। আপনি কি আমাকে বাপের অবাধ্য হোতে বলেন?

ভার। না, অবাধ্য হোতে বলি না। কিন্তু তাঁর ত শুধু জেদ বজায়? সেটা বজায় না থাকলে তাঁর ত সত্যি কোনও ক্ষতি হবে না। ক্ষতি শুধু বোলতে পারেন আপনার। কিন্তু আপনার ক্ষতিও আমার তুলনায় কিছুই নয়—আমি যে বেঁচে থাক্‌তে এ জীবন আর কাউকে দিতে পার্ব্বোনা—শুধু এইটুকু অকপটে বিশ্বাস করুন। নারীধর্ম্মের যে এমন ভয়াবহ রূপ—এর আগে আমিই কি কল্পনা কোর্ত্তে পার্ত্তুম? আমার আজ চারিদিকে অন্ধকার—আমি আজ বড় অসহায়। যাঁকে মুহূর্ত্ত আমি স্বামীর অধিকার দিয়েছি—আমাকে রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা করা যাঁর ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ উচিত ছিল, কেন জানিনা তিনি নিরীহ ভদ্রলোক সেজে এমন নীরব রইলেন! আমিও প্রতিজ্ঞা করেচি—তাঁর কোনও সাহায্যই আমি নিতে পার্ব্বো না—আমি নিজেই পথ খুঁজে নেবো! শুধু আপনি—আপনি আমার সহায় হোন্?

সুবো। আমি—আপনার সহায় হবো?

ভার। হ্যাঁ—আপনিই! নইলে আমাকে সাহায্য কর্ব্বার যে কেউই নেই!

সুবো। আমি আপনাকে কি সাহায্য কর্ত্তে পারি?

ভার। আমাকে তাঁর দেশের বাড়ীতে রেখে আস্‌বেন—এ আর কেউ পার্ব্বে না—কেউ পাল্লেও হবে না—আপনাকেই নিয়ে যেতে হবে।

সুবো। আমাকে আপনার এত বিশ্বাস কি জন্তে বোল্‌তে পারেন?

ভার। আপনি শিক্ষিত, আপনি আমাকে স্নেহ করেন—আপনাকে বিশ্বাস কর্ব্বো না ত কাকে বিশ্বাস কর্ব্বো?

সুবো। কেন আপনি বিশ্বেশ্বরবাবুদের দেশের বাড়ীতে যেতে চাচ্চেন—তিনি ত এখানেই রয়েচেন!

ভার। দেখুন, আমার আজ আর এ সৌখীন প্রেম-অভিমান নয়! তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেই—আমার সব সমস্যা ঘুচবে না। আপনি আপনার বাবাকে চেনেন—সে সমস্যাও দূর হবে না। তা ছাড়া, আপনি আর একদিকের খবর হয়ত কিছুই জানেন না। ওদের নিষ্ঠাবান হিন্দুর পুণ্যের সংসার। ওর জ্যেষ্ঠ সংযমী আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাঁর পত্নী ব্রহ্মচারিণীর ব্রত নিয়ে ওকে একবছর বয়স থেকে সন্তানের ন্যায় মানুষ করেছেন—তিনিই ওঁর মা। ওঁর
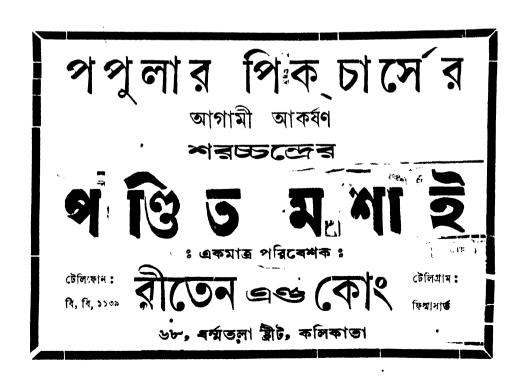
দাদা এসেছিলেন ওকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে—উনি যান্ নি। ওর দাদা আশাভঙ্গের মনস্তাপ নিয়ে ফিরে গেছেন। তাঁরা যখন শুন্‌বেন—আমিই একদিক দিয়ে তাঁদের মনস্তাপের কারণ—তাঁরা তখন মোটেই ভাল চোখে আমাকে দেখতে পার্ব্বেন না। তাঁদের আশীর্ব্বাদ না নিয়ে, আমি তাঁদের কুলবধূ হোতে পার্ব্বো না—হোলেও আমার তা সইবে না। এখন আমি ত শুধু আমার স্বামীকে চাইনা—চাই তাঁদের সকলকে পেয়ে, আমার স্বামীকে পেতে। আমার এক ভয়—তাঁরা যদি আমাকে গ্রহণ না করেন—কিন্তু আমার যে আর অন্য পথ নেই।

সুবো। আপনি ত দেখ্‌চি—মনে-মনে অনেক দূর এগিয়েচেন। কিন্তু সকল দিক কি বেশ কোরে ভেবে দেখেচেন? সেই পল্লীজীবন কি আপনার সহ্য হবে?

ভার। ভেবেচি সুবোধবাবু—বেশ ভাল করেই ভেবেচি। আমি লজ্জাহীনার মত অনেক কথাই কইচি—আমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন। আমি আপনাকে ভেবেচি—আপনাদের ঐশ্বর্য্যের কথা ভেবেচি—আমার এই ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত এত-দিনকার জীবনের কথাও ভেবেচি। ভেবে, আমি দারিদ্র্যকেই বরণ করে নিয়েচি। আমাকে শুরু গৃহবাসের কষ্ট সহ্য কোর্ত্তেই হবে। এ যে আজ আমার তপস্যার বস্তু হোয়ে দাঁড়িয়েচে। উপায় ত নেই!

সুবো। কিন্তু আপনি আমার দিকটা ত মোটেই ভাব্‌চেন না?

ভার। ভাব্‌চি বৈ কি। আপনার প্রাণ আছে—আপনি সহ্য কোর্ত্তে পার্ব্বেন—আপনাকে সইতেই হবে। এ আমার রহস্যময় বিধিলিপি—এ রহস্যের কথা আজও আমি ভাল কোরে বুঝতে পারিনি—কিন্তু এইটুকু বুঝতে পেরেচি আমার আর অন্য পরিত্রানের পথ নেই। আপনি আমায় রক্ষা করুন।

সুবো। আপনি আমাকে পিতৃদ্রোহী হোতে উত্তেজিত কচ্চেন—সে-টা কি বুঝতে পাচ্চেন না?

ভার। পিতৃদ্রোহী হোলেও, ধর্ম্মদ্রোহী হবেন না—এ আমি নিশ্চয় কোরে বোল্‌তে পারি। আপনি এক অসহায় অবলার ধর্ম্ম রক্ষা কোরে যে পুণ্য সঞ্চয় কর্ব্বেন—তাইতেই আপনার সেই ক্রটীর মার্জ্জনা হবে। আপনি আমার মুখে বার বার "ধর্ম্ম" কথাটার উল্লেখ শুনে কি মনে কচ্চেন জানি না—কিন্তু তার শাসন যে এমন কঠিন তা এর আগে এমন কোরে কে জান্‌তো? সে আমাকে নিশিদিন উদ্‌ভ্রান্ত কোরে রেখেচে—আহার নিদ্রা কেড়ে নিয়েচে—তার নির্য্যাতন আমি আর সহ্য কর্ত্তে পাচ্চি নে—সে আমাকে তিলে-তিলে, পলে-পলে আমার অনির্বার্য্য নিয়তির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? [উত্তেজনার আধিক্যে হাঁপাইতে লাগিলেন]

সুবো। দেখুন্—আজ আমি যাচ্চি। আপনাকে এর আগে এমন কখনো দেখিনি—তবুও মনে রাখবেন, আমি দেবতা নই, মানুষ—তাই আজও বোলতে পাল্লাম না, এরপর আবার আপনার সঙ্গে কি ভাবে দেখা হবে।

[সুবোধ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল—ভারতী নীরবে বসিয়া রহিল—বনজ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া সুবোধকে কি যেন বলিতে চাহিলেন কিন্তু কিছুই না বলিয়া ম্লান দীপশিখাটির ন্যায় অচঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—সুবোধ যাইতে যাইতে একবার মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল]

ভার। [উঠিয়া আসিয়া] মা—!

[নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

[বনজ্যোৎস্নাও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি ভারতীর মাথার উপর রাখিলেন] (ক্রমশঃ)

শেষ-ফাগুন

দিলীপ দাশগুপ্ত

অন্তর মোর পূর্ণ করেছ, গড়েছ ভাগ্যবান
লক্ষ্যটি তাই ব্যর্থ করনি, করেছ মাল্যদান।
ফাগুণের আসা চঞ্চল সমীরণে
অঞ্চল ঢেকে দাওনি মনের বনে,
ভুবন ভরিয়া আনন্দ রয় দিকে দিকে নিরবধি
কৌতুক তাই নিজে রচিয়াছ ভুলে যাও তারে যদি

হে মোর স্বপ্ন, হে মোর আকাশ প্রিয়তমু জগতের
প্রেম দেহ-নেহ সূর্য্যের তলে একাকিনী মরতের
রজনীগন্ধা ফোটে ধীরে ধীরে যবে
তুমি মোর বুকে নতমুখী হয়ে ক'বে—
'ফুল ফোটে আর আমি ফুটিয়াছি আমারে চয়ন কর—
না হ'লে মিছেই ঝরে পড়ে যাবো পৃথিবী এমন তর।'

* * *

তুমি বিশ্বের নব উর্ব্বশী, আমি সন্ধ্যার দীপ
অমাবস্যার কাজলী মেঘেতে পড়াও সোণালী টিপ
পূর্ণিমা রাতে তুমি প্রেমময়ী মোর
রচি নব নব চির মিলনের ডোর;
তোমারে স্মরিয়া অশ্রু ঝরেছে অপরূপ বেদনায়
তুমি কাঁদ নাই, দিয়েছিনু যবে অভিনব সে বিদায়?

মামুলি

শ্রীসমর মিত্র

সৌরেশ মাতাল। অল্পবয়সে সে মদ ধরেছে, তায় আবার খায়ও পরিমাণে যথেষ্ট। লোকে ওকে বলে চরিত্রহীন, মাতাল;—লোকের ভালমন্দ বলাতে ওর কিছু যায় আসে না।

বিছানায় শুয়ে লিভারের যন্ত্রণায় ও আজ ক'দিন ছটফট্ কর্চ্ছে। সন্ধ্যের দিকে একটু বাড়ে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে, একটা অসীম বেদনার ভারে নুয়ে পড়ে,—লতার মত। যখন একটু কম থাকে, সামনের কাঁচের আলমারীর দিকে সে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কত রাত্রেই না, বন্ধুর মত তা'কে মদ ঘুমিয়েছে

নার্শকে সৌরেশ অনুনয় করে একটুখানি মদ দেবার জন্যে, কিন্তু ইলা তা'কে দেয় না। ইলা ওকে সন্ধ্যে বেলার কথা মনে করিয়ে দেয়, মাঝে মাঝে তিরস্কার করে, রাগ করে কৃত্রিম কিনা কে জানে?

রোজকার মত, আজও বিকেলের দিক হ'তে, সৌরেশের ব্যথাটা বেড়েছে, আর অন্য দিনের চাইতে যেন বেশী। ইলা গরম জলের ব্যাগ দেবার সাহায্য করছিল। সৌরেশের বিবর্ণ, সুন্দর মুখের দিকে চাইছিল,—কি সান্ত্বনা দেবে সে? নার্শ হ'লেও তা'র হৃদয় ব'লে একটা জিনিষ ছিল।

"বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে কী আপনার"? মিস্ সেন, ওরফে ইলা বল্লে।

"মিস্ সেন" সৌরেশ চোখ বুজিয়ে-ই ডাকলে।

"বলুন"

মরবার একটা ওষুধ দিন"—অনেক কষ্টে, সৌরেশের মুখ থেকে বেরুলো।

"একটু চুপ করে থাকুন, কথা বলবেন না"—ব্যগ্রকণ্ঠে ইলা বল্লে

"মিস্—মিস্—উঃ! বড় যন্ত্রণা—আর পাচ্ছিনা যে—" কাটামাছের মত সৌরেশ বিছনায় এপাশ-ওপাশ কর্ত্তে লাগল।

ইলা কী করবে? সে সৌরেশের একটী হাত শক্ত ক'রে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রইল। কী ব'লে সান্ত্বনা দেবে সে? কেন এমন নিজেকে হত্যা কর্লে এই অল্প বয়সে? সৌরেশের অসুখে সে আরও দুবার এসেছে, এই নিয়ে তিনবার। ডাক্তার মুখার্জ্জি ও'কে কত করে বুঝিয়েছেন, কত বারণ করেছেন তা'কে মদ খেতে;—ইলা নিজেও ত তা'কে কতবার বলেছে, কিন্তু সৌরেশ তা শুনে কই? সৌরেশের জীবন যে একটা রহস্য দিয়ে ঘেরা, ইলা তা বুঝেছে, কিন্তু কী সে রহস্য? কোনদিন সে জান্তে চায়নি; সৌরেশ নিজে কখন কাও'কে কোন কথা বলেনি।

সৌরেশের জীবন, ইলার কাছে একটা প্রশ্ন। ওর আশ্চর্য্য লাগে যে, কেন সৌরেশ বন্ধু বান্ধবহীন, আত্মীয় স্বজনহীন হ'য়ে একলা এই বৃহৎ বাড়ীতে পড়ে থাকে? আর সব থেকে ওর বেশী বিস্ময় যে—সৌরেশ এখনও বিয়ে করেনি কেন? জান্তে ওর প্রবল ইচ্ছা হয়। কিন্তু সৌরেশ যদি কিছু মনে করে, যদি বলে,—তোমার জানবার কোন আবশ্যক নেই।

"উঃ! মিস্ সেন—" সৌরেশ চোখ চাইল।

"বলুন;—নাম ধরেই ডাক্‌বেন আমাকে"—ইলা, তা'র হাতটায় নিজের অজান্তে হয়ত একটু বেশী চাপ দিয়ে ফেললে।

"ডাক্তার কী বল্লেন? মরবো ত?" অসহনীয় ব্যথায় নমিত হ'য়ে এল সৌরেশের চোখ—।

ইলার ঠোঁট দুটী কেঁপে গেল। চোখের কোলে অশ্রু টলটল্ করতে লাগ'ল। বললে—"ছিঃ! ও কথা বল্‌ছেন কেন? শীঘ্রই ভাল হবেন"—শেষের কথাগুলো বলবার সময় ওর স্বর বিকৃত হওয়ায়, সৌরেশ দেখলো, ওর চোখে জল। ইলা একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়'ল।

সৌরেশ বল্লে, "ইলা তুমি না নার্শ?"—

"কিন্তু মানুষ ত?"—ইলা বল্লে, তখনও তা'র ভাঙ্গা সুর।

"কিন্তু তোমরা যে নিষ্ঠুর নারী, তাই"—বলা আর হ'লনা; ঠোঁট কামড়ে, বিবর্ণ মুখে খানিকটা চুপ ক'রে পড়ে রইল, কোথায় বুঝি মোচড় দিতে আরম্ভ করেছে

খানিকটা নিঃশব্দে থাকার পর, ইলার মনে হ'ল, সৌরেশ ঘুমিয়ে প'ড়েছে। তখনও ওর হাতে সৌরেশের হাতটী ধরা রয়েছে। ইলা আস্তে ওর হাতটী মুক্ত ক'রে উঠে দাঁড়ালো।

সৌরেশের মাথার জান্‌লা নিঃশব্দে খুলে দিয়ে, ইলা আগতপ্রায় সন্ধ্যার দিকে চেয়ে রইল। কতকগুলো তারা জ্বলেছে, পশ্চিম দিকের খানিকটা নরম আলো, যাই-যাই করেও যেতে পার্চ্ছে না। দূরের বাড়ীগুলো হতে শাঁখের শব্দ ঘনায়মান সন্ধ্যাকে বন্দনা জানাচ্ছে।

ইলা ভাবলে, এবার সৌরেশ সেরে উঠলে তাকে বিশেষ অনুরোধ কর্ব্বে, যা'তে ও আর মদ না খায়। কিন্তু পরক্ষণেই অজানিত বিপুল শঙ্কায় নিজেই কেঁপে

উঠলো,—"পারবে তো?" না,—না, যেমন ক'রেই হোক তাকে ফেরাতে হবে, তাকে—সৌরেশকে সারাতেই হবে, কিন্তু ডাক্তার মুখার্জ্জি যেন কেমন আশাহীন হ'য়ে পড়ছেন। ডাক্তারের মোটে তা হওয়া উচিৎ নয়! না হয় কাল অন্য কাউকে আন্‌তে বল্‌ব। পরক্ষণে, ইলা ভাবলে, তাও কী হয়? ডাক্তার মুখার্জ্জি যতক্ষণ না বলেন, ততক্ষণ কী আর অন্য কা'কেও ডাকা চলে? অন্য কেউ হ'লে হয়ত সে এতটা নির্ভর কর্ত্তে পারতো না, কিন্তু তাঁকে কী অবিশ্বাস করা চলে? ইলা ভাবলে পৃথিবীর সব লোক যদি ডাক্তার মুখার্জ্জির মত হোত। তিনি না থাকলে ইলার জীবনে কত কী না ঘটতো। হয়ত তার নিজের বলতে এতটুকু সংস্থান থাকতো না। অনেক পুণ্য করলে তবে অমন লোকের সাহায্য পাওয়া যায়। ইলা যোড়হাতে কা'র উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম করলে!

(২)

ইলা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বল্‌লে, "তারপর?"

"তারপর?—তারপর—জয়ন্তীদের বাড়ী প্রায়ই যেতাম। তা'র আগে আমি কারুর বাড়ী বড় একটা যেতাম না। প্রথমতঃ ভাল লাগতো না, দ্বিতীয়তঃ একটু লাজুক ছিলাম। কিন্তু কিসের মোহে যেন আমার সকল কুণ্ঠার বাঁধ ছাড়িয়ে, এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম যে, সেখান থেকে ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব হল।"—সৌরেশ এত কথা বলার পর ডাক্‌লে, 'ইলা'।

সৌরেশ আজ কদিন একটু ভাল আছে। ডাক্তার বলেছেন এ যাত্রায় বোধহয় ও রক্ষা পেয়েছে, ভয়ের আর কিছু নেই, তবে ভবিষ্যতে সাবধান না হ'লে মুস্কিল। কথায়, কথায়, আর ইলার অনুরোধে, তা'কে নিজের জীবন কাহিনী শোনাতে বলেছে। ইলা ও'কে মদ খেতে বারণ কর্চ্ছিল, সেই প্রসঙ্গে এত কথা এসে পড়েছে।

ইলাকে সৌরেশের ভাল লাগে। তার এই দুর্দ্দিনে ইলা তাকে না দেখলে, যত্ন না করলে, নিশ্চয়ই ও অনেক কষ্টে পড়তো। অবশ্য টাকা দিলে অন্য নার্স পাওয়া যায় সত্যি, কিন্তু এমনি সেবা, এমনি পরিশ্রম? —না তা পাওয়া যেত না।

"কি বলুন"—ইলা উত্তর দিলে।

"শুনতে ভাল লাগছেনা—না?"

"কেন শুনছি ত, বলুন"—ইলা মাথার কাছে বসে হাওয়া কর্চ্ছিল।

"তারপর,—একদিন তাদের বাড়ীতে গেছি, কী একটা কাজে ঠিক্ মনে নেই, সেইদিন আমি প্রথম বুঝতে পারলাম ও আমায় ভালবাসে, নিজেকে প্রশ্ন ক'রে নিজেই চমকে উঠলাম, দেখলাম আমারও ওকে বড় প্রয়োজন, ওকে ছেড়ে আমার একটী দিনও চল্‌বে না।

তারপর,—চল্ল ভালবাসার প্রহসন,—হ্যাঁ, প্রহসন-ই বলতে হবে বৈকি—তা ছাড়া আর কী? সে প্রহসন, যবনিকা পড়ার সঙ্গে, সে গেল ভুলে, আর আমি তা আজও ভুলতে পারলাম না। মৃত্যুর পরেও তা পার্ব্ব কিনা জানিনা।" একটু থেমে আবার বলতে সুরু করলে, "তা'কে না পাওয়ার ব্যথা তত বেশী নয়, কিন্তু তার ঘৃণা,—? না আমি সইতে পারলাম না। আচ্ছা তুমি বলতো ইলা, তা কী পারা যায়? যা'কে একদিন সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলাম,—শুধু বেসেছিলাম কেন? এখনও—; যাক্। তা'র ঘৃণা, উপেক্ষা কি সহা যায়? তুমি পার?—বলতো ইলা, পার তুমি?" সৌরেশ রীতিমত হাঁফিয়ে পড়েছিল, বললে "একটু জল দাও ত ইলা"—

ইলা জল দিতে গিয়ে, নিজের চোখের জমা জল মুছে নিলে।

পূর্ব্বের কথার জের টেনে সৌরেশ বলতে লাগল,—"তাই আমি আর কারুর দিকে না চেয়ে ডুবতে আরম্ভ করলাম, সামনে পেলাম বন্ধুর মত মদ তাই খেতে শিখলাম। চরিত্র বলে যে কিছু থাকতে পারে তখন আর সে জ্ঞান রইল না, মনে হল চরিত্র বলে কিছু নেই,—কিন্তু মনে মনে জানি সচ্চরিত্রের দাম কত। ইলা,—আমি আর যাই হই, চরিত্রহীন হয়ত হতাম না, কারণ যে শুধু জয়ন্তীকে পাবার জন্যে তা নয়, নিজেরই কেমন একটা মোহ ছিল, সচ্চরিত্রের ওপর। তবে আজকাল, আগেকার মত মদ খেয়ে যেন সুখ পাই না। মনটা ভারী শ্রান্ত হ'য়ে পড়ছে দিন দিন, এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, একটী বিয়ে করে

সংসারী হই, আর আমার মত লোকের সঙ্গে যে পেরে উঠবে, তারই হাতে নিজেকে ছেড়ে দি। কিন্তু এত নীচে নেমে গেছি, যে আর তা হয় না। দুবছর আগেও হয়ত হ'তে পারত"—বলে সৌরেশ হতাশায় ম্লান হ'য়ে এল, গভীর অবসাদে তার গলা বুজে এল।

"তাই করুন না কেন, আর একবার ভাল হ'তে চেষ্টা করুন—" ইলা বড় আগ্রহে কথা কয়টা বল্লে।

"কী জান ইলা, সব সময় মনে হয় ভাল হ'য়ে কী হবে? কা'র জন্যেই বা ভাল হব।" গভীর হতাশের স্বর—

"নিজের জন্যেও ত হতে পারেন"—ইলা বল্লে।

"নিজের জন্যে?" সৌরেশ হাস্লো। "কিন্তু মজুরী পোষাবে না"—

"আচ্ছা তিনি এখন কোথায়"? ইলা প্রশ্ন করলে।

"তিনি?—জয়ন্তী? সে এখন সুখেই আছে। বিয়ে-ও হয়েছে শুনেছিলাম,—এতদিনে বোধকরি ছেলের মা'ও হয়েছে।" একটু চুপ ক'রে থেকে সৌরেশ বল্লে, "বেশ মজার—না?" সৌরেশ হাস্লো।

—'কি'? ইলা বল্লে

"এই তোমরা"—

'কেন'?—

"বেশ গাছে উঠিয়ে মই কেড়ে নিতে পার?"

ইলা কিছু বল্লে না, চুপ করে রইল। এই অসহায় লোকটার বিরুদ্ধে অনেক কথা বল্‌বার থাকলেও বুঝি, ইলা তা বল্‌তে পারলে না।

"ইলা"—

"আজ্ঞে—বলুন"—ইলা ইচ্ছে করে অন্য দিকে চেয়ে রইল।

'রাগ করলে? কী কর্ব্ব বলো, মনটা বড় অবিশ্বাসী হ'য়ে গেছে। জগতে কারুর ওপর বিশ্বাস নেই,—এমন কী নিজের ওপরেও না। তবে—"

তাকে বাধা দিয়ে ইলা বল্লে, "এমন একটা লোক খুঁজে দেখুন না, যে আপনার ভার নিতে পারে"—

"কে আর নেবে—? না আমার সন্ধানে তেমন লোক কই?—তুমি নেবে ইলা?—যে কটা দিন বেঁচে আছি নেবে"—একান্ত পর নির্ভরতার সুর।

ইলার মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। সে চুপকরে রইল।

"বলবো আমি ডাক্তার মুখার্জ্জিকে"? ইলার দিক্ থেকে কোন জবাব না পেয়ে সে বললে "নাঃ! যাক্ তোমার জীবন আমি নষ্ট করে দেবো কেন—কি বলো?" একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

ইলা অসহ্য কান্নায় ফেটে পড়লো। ও উঠে চলে যাচ্ছিল, সৌরেশ তার হাত ধরে ফেল্লে, বল্লে, "আমার মত চরিত্রহীনের

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

ফ্রেডি বারথোলোমিউ

অবশেষে সব গণ্ডগোল চুকল। ফ্রেডিকে নিয়ে মামলার নিষ্পত্তি হোল। চুক্তিতে ঠিক হোল ফ্রেডি থাকবে ওর খুড়ির কাছে। তাই বলে সেখানে মায়ের স্থান হবেনা—এ নয়। ওর হলিউডের বাড়ীতে, মা, বাপ, দুই বোন যারা ফ্রেডির ফিল্মের রোজগারের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, তারা প্রত্যেকেই থাকতে পাবে।

এই যে ওদের ঝগড়া, ওদের মামলা মা আর মাসীতে ফ্রেডিকে নিয়ে, তা সত্যিই বিশ্রী। এই ফিল্ম-ষ্টারএর কেরিয়ারএর ওপরেও একটু ঘা দিলে আমিরিকান কিম্বা ব্রিটীশ দু দলই ফ্রেডির মায়ের এই পরাজয়ে মনে মনে কষ্ট পেলে, ওরা কেউই চায়নি মায়ের পরাজয় হোক। তবু আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে: তুমি কার জয় চাও!—আমি বলতে পারব না। এবং তার কারণ যুক্তি অনুসারে দুজনের দাবী ষোল আনাই ঠিক। ব্রিটীশ অভিনেতরা

ফ্রেডি বারথোলোমিউ

বোধ হয় চেয়েছিল মিস মাইলিসেণ্ট বারথো-লোমিউটরই জিত হোক।

সে যাক! ফ্রেডির রূপ আছে, গুণ আছে, অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা আছে, আরো আছে সারা জগতের ফিল্ম-ফ্যান, যারা ফ্রেডিকে ভয়ানক ভালবাসে; তাদের নিশ্চয়ই ও ভুলবে না। ওর নিজের যা ভাল মনে হবে ও তাই করবে।

বিলির বিপদ

ফ্রেডির এতদিন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে আর একজনের নাম লোকে বলে; সে হচ্ছে বিলি মক্ষ যে "এ্যানথনি এ্যাডভাস" এ অভিনয় করেছে।"

বিলিও মনের দিক থেকে সুখী নয়। সে সুখী নয়। বাইরের চেয়ে ঘরের ভাবনা বেশী তার। ঘরের প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাধা দেবে কিসে সে। এযে তার ভাই—জমজ ভাই, সেই দাঁড়াচ্ছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে।

বিলি মঞ্চএর ভাই ববি মঞ্চ। দুই জমজ ভাই আছে ওয়ার্ণার ব্রাদাস ষ্টুডিওতে। ববি আর বিলি। এই ববি ছিল সেদিন পর্য্যন্ত বিলির 'ষ্টাণ্ড-ইন'।

ওয়ার্ণার ব্রাদাস´ ছবি তুলবে 'দি প্রিন্স এ্যাণ্ড দি পপার'। এই বইতে দুজনেই নামবে। ববির 'ষ্টাণ্ড-ইন-এর কাজ ঘুচে গেল, এইবার হবে অভিনেতা। বিলির তাই ভাবনা। ওয়ার্ণার ব্রাদাস´ এখনও ঠিক করেনি বিলি আর ববি কে কোন পার্টএ নামবে। বিলি বা ববি কে প্রিন্স বা, কে পপার সাজবে বলা শক্ত!

ওদের স্ক্রিপ্ট লেখা এখনও চলছে।

সস্তায় বাড়তি লোক

এই দিনকতক আগে গ্রুচো মার্কস আর চার্লি রাগলস্ একটু মজা করেছিল। ছবিতে যারা 'এক্ট্রা' সাজে তাদের নাম কেউ করে না, করবার দরকার করেও না তাই। তুমি যদি ওদেশে যাও, দেখবে ষ্টুডিওর বাহিরে কত শত মেয়ে পুরুষ একটু চান্স্ পাবার জন্যে বসে আছে। অবশ্য এর জন্যে পয়সা পায়। শুধু এক্‌ষ্ট্রার পার্ট নিয়ে রোজগার করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। বড় অভিনেতা—নাম করা অভিনেতা বা অভিনেত্রী কেউ কোনদিন 'এক্‌ষ্ট্রা' সাজেনা। ছবিতে ভিড় করার জন্যে দাঁড়ায় না। আর দাঁড়াবে বা কেন? গ্রুচো আর চার্লি একটু আমোদ করতেই দাঁড়িয়েছিল। সে ছবির নাম আমি বলে

মুখে ক্ষমা চাওয়া হয়ত ধৃষ্টতা, তবু বল্‌ছি ক্ষমা কর্ত্তে কী পার্ব্বে না ইলা?" অসহায়ের মত চোখ তুলে চেয়ে রইল।

ইলার আর যাওয়া হ'লনা। উত্তেজনায় বসে পড়লো। সৌরেশের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে। বললে, "আমায় পেলে তুমি ভাল হবে ত"?

সৌরেশ হেসে, মনে তাকে ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে বললে "হবো, কিন্তু তুমি আমার সহায় থেকো, তাহলেই পার্ব্বো—"।

বাহিরে তখন ডাক্তার মুখার্জ্জির জুতার শব্দ শোনা গেল—

ছিঙ্কি—'ইওরস ফর দি আস্কিং'। পার তো চিনে নিও।

জিন হারলো

আর একটা নতুন খবরও কিন্তু পেলুম। জিন হারলো সেজেছে,—'এক্‌ট্রা' সেজেছে শুনেছ।

পরিচালক জোসেফ ষ্ট্যানলি "উই ওয়েণ্ট টু কলেজ' ছবিখানা পরিচালনা করছেন। ওই ছবিতেই ফুটবল খেলার একটা দৃশ্য আছে।

ছবি তোলা চলেছে ভয়ানক, ভীড়ের দৃশ্য তোলা হচ্ছে। হঠাৎ জোসেফ আবিষ্কার করলে—ভীড়ের মধ্যে জীন হারলো।

জীন হারলো যে কেমন করে এলো সে কথা জোসেফ জানত না।

আমি বলছি শোনো—মিস জিন হারলোর ছবি উঠছে "সুজি" আমরা সবাই জানি। "সুজি" সুটিংএ কিছুক্ষণ কাজ করার পর জীন পায় অবসর। তাই ও বেড়াতে

জিন হারলো

আসে মেট্রো গোল্ড্‌ইন মায়ার ষ্টুডিওতে। ষ্টুডিওর মাঠে চলেছিল বিরাট খেলা। জীন হারলো গিয়ে বসল দর্শকদের ভিড়ের মাঝখানে। কে তাকে চিনবে! সাধারণ বেশে তো আর বসেনি। আগাগোড়া ঢাকা ছিল মেক-আপে মুখখানা। প্লাটিনাম চুলে ছিল নামান টুপি।

সেদিন সুটিং শেষ হোল। সন্ধ্যেবেলায় ছবি ছাপা হয়ে যাবার পর পর্দ্দায় পড়তে দেখা গেল জীন হারলো বসে রয়েছে এবং খেলা দেখতে দেখতে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

ওদের দেশে প্রত্যেক দিনের কাজ সন্ধেবেলা পর্দ্দায় ফেলে ওরা দেখে।

হেনরি উইলকক্‌সন

হেনরি উইলককসনের মত একটা চেহারা ছায়াছবিতে খুব কম মেলে। যেমন ওর পুরুষালী চেহারা তেমনি অভিনয় ক্ষমতা। তবু ওর গুণের আদর তেমন পায়না। বাস্তবিক কেন যে পায়না তা বলা শক্ত।

হেনরিকে যাদের মনে নেই তাদের বলছি। হেনরি নেমেছিল "ক্লিওপেট্রা" ছবিতে ক্লদেৎ কলবার্টএর সঙ্গে। তারপর নামে লরেটা ইয়ংএর সঙ্গে 'দি ক্রুসেড্‌স' ছবিতে। দুখানা ছবিই পরিচালনা করেন সিসিল বি দে মিলে। ষ্টেজের এই নাম-করা অভিনেতাটিকে প্রথম ছবিতে নামান সিসিল বি দে মিলেই।

সে যাক্। কয়েকমাস আগে ও যায় ইংল্যাণ্ডে এ্যানা টেনের সঙ্গে ছবিতে নামতে। সে ছবির নাম 'এ ওম্যান এ্যালোন।' ছবি তোলা অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। আমরা এখনও সে ছবি দেখিনি।

হেনরি আবার হলিউডে ফিরে এসেছে। এখন ও যে ছবিতে নামছে তার নাম হচ্ছে 'দি নাইট অব দি মহিক্যানস।' এ ছবির হিরো ও নয়, একটা চরিত্রে নেমেছে মাত্র।

নতুন কিছু

হলিউড হচ্ছে ফ্যাসানের জায়গা, নতুন কিছু করার জায়গা। যেখানে নিত্য নতুন জিনিষ তৈরী হচ্ছে, নতুন কিছু তৈরী করবার প্ল্যান লোকের মাথায় ঘুরছে, সেখানে নতুন কিছু করে লোকের একেবারে চমক লাগিয়ে দেওয়া ভারী শক্ত। প্যাটরিক নোয়েলস কিন্তু চমকে দিয়েছে সবারে।

ওর নতুন জিনিষ হচ্ছে গ্রামোফোন রেকর্ড নেমন্তন্ন।

কথাটা ঠিক হয়ত বুঝতে পারলে না। প্যাটরিক বাড়ী নিয়েছে টলুকা লেকের ধারে, ভারী চমৎকার বাড়ী সেটা। সেদিন প্যাটরিক ঠিক করলে একটা পার্টি দেবে। তাই তার নিমন্ত্রণ-পত্র হোল গ্রামোফোন রেকর্ডে।

নোয়েলস প্যাটরিক আর তার স্ত্রী গ্রামোফোন রেকর্ডে তাদের কথা ধরিয়েছিল। কথাগুলো স্বামী স্ত্রীতে বলেছিলো এই রকম —"আমরা একটি পার্টির বন্দোবস্ত করেছি আপনার এবং আপনার স্ত্রীর উপস্থিতি একান্ত-ভাবে প্রার্থনা করি।"

এরল ফ্লিন

ওকেও ছাপিয়েছে এরল ফ্লিন। অর্থাৎ এই নতুন কিছু করার কৌতুকটা লোকের মনে আরো ধরিয়েছে।

এরল ফ্লিন কাজ করছে প্যাটরিক নোয়েলসএর সঙ্গে ওয়ার্ণার ব্রাদার্সএর ছবি "দি চার্জ্জ অব দি লাইট ব্রিগেড"এ। প্যাটরিকের ওই রেকর্ডের নিমন্ত্রণ-পত্রটি যেমনি ফ্লিনএর কাছে পৌছল। ফ্লিনও নিজের কথা ধরালে আর একখানা রেকর্ডে। তার কথাগুলো ছিল—"মিঃ ফ্লিন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে প্রকাশ করছে, এ পার্টিতে সে আসতে পারবে না।" তারপর ছিল, এরল কেন আসতে পারবে না তারই নানান রকম কারণ ও যুক্তি। রেকর্ডখানা ছাপা হবার পর একখানা রেকর্ড গেল নোয়েলসএর কাছে। এতে আর নোয়েলস কি করতে পারে।

শেষের কথা হচ্ছে এই ফ্লিন পার্টিতে গিয়েছিল এবং উৎসব আমোদে রীতিমত যোগও দিয়েছিল।

বর্ষার আদ্য চিত্র

শ্রীমতী প্রজ্ঞা দেবী

আষাঢ়ের সাথে এলো ঘন বরষা,
আকাশেতে নেচে ওঠে রণ সহসা,
তোর গগণেতে সাজে, কালো-সন্ধ্যার ;
গাইবে যে ভৈরবী, কাঁদে মন তার।

নেমে এলো বর্ষায় নরকের দুখ,
ফুৎকারে নিভে গেল দুনিয়ার সুখ ;
মানবের বিপ্লব চারিদিকে প্রায়,
দেহ ভরে ঝিন্‌ঝিন্ প্রাণ যায় যায়।

বৃষ্টিতে ছেলেগুলো ঘরে বন্ধ,
দুমদাম্, ভাঙাচোরা, জোর দ্বন্দ্ব ;
রাতদিন ঝুপ ঝুপ, মূক প্রাণী দল
পথেঘাটে কাঁপে শীতে, চোখ ভরা জল।

মশকের সাথে হয়ে খুঁদি পোকা গণ
মানাদের শমনের মত অগনন
শুয়ো পোকা কেন্নোরে দেখি আশ্‌পাশ্ ;
হায় কোথা নিস্কৃতি মন হাস্‌ফাস্।

খাদ্যের দুঃখেতে বৈরাগী মন,
পচা আলু, পচা আম, মাছি ভন্‌ভন্ ,
যাও আছে বাজারেতে তাও রেখে ছাই,
দাম হাকে দশ গুণ নবাবের ভাই।

কুঞ্জের বীথি কোথা কই ফুলবাস,
স্যাঁতস্যাতে ভাপসায় লাগে মনে ত্রাস,
কর্দ্দমে ডুবে রয় ভর্ত্তি গোরথ,
হায় ঐ আমাদের পল্লীর পথ

দিবারাতি বাইরেতে দিয়ে আছি চোখ,
চুপিসারে ভেতরেতে ঢোকে এসে রোগ ;
পেট করে ভুটভাট্ ব্যথা সারা গায়,
ভয়ে মরি ম্যালেরিয়া যদি দেখা দেয়।

যদি কিছু গুরুভার খাওয়া হোলোরে,
মহামারী এসে কয়, 'ওহে চলোরে' ;
বর্ষাটা টেনে টুনে হই যদি পাশ,
শরতের সাথে তবে হ'বে উল্লাস।

কতভাবে কতরূপ ক'রে সন্ধান,
কত কবি গে'য়েছেন বর্ষার গান,
খুজি নাই বুঝিয়াছি তাই লিখি আজ
সত্যের ছবি যাহা মর্ত্তের মাঝ।

খুচরো খবর

জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্‌এর সফার আছে তবু ও নিজে গাড়ী চালায়, এমনি ওর সখ।

* * *

ল্যারি ক্র্যাব নাম-করা সাঁতারু। অভিনয় করতে পারে ভাল, আইনজ্ঞ হবার ইচ্ছেও আছে

* * *

জন বিল খুব চালাক আর্টিষ্ট।

* * *

হুট গিবসন্ কোনদিন ডবল নিয়ে কাজ করেনা ; ওর ষ্টাণ্টের ব্যাপার হলে তো কথাই নেই।

শ্রীদুর্ব্বাসা

মিঃ গর্ডন রীভের নূতন পদ্ধতি :—মিঃ গর্ডন রীভ সম্প্রতি একটি নূতন পদ্ধতি বের করেছেন। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কোন রঙে ডাক দেওয়ার চেয়ে ফেরাই এ ডাক দেওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তবে কোন রঙের তিনখানি তাস নিয়েও ডাক দেওয়া যায়, যদি সেই তিনখানির মধ্যে দুইখানি পিট পাওয়ার যোগ্য হয়, অর্থাৎ কি না যদি সেই রঙে টেক্কা ও সাহেব থাকে। তাঁর পদ্ধতির আনুকূল্যে মিঃ গর্ডন রীভ বলেন যে, বহু সংখ্যক হাত পর্য্যবেক্ষণ করে তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, মোট 'গেম'-যোগ্য হাতের মধ্যে শতকরা ৭০টি হাতে ফেরাই এর ডাকেই গেম করা যায়, অবশ্য তন্মধ্যে কয়েকটি হাতে রঙের ডাকেও খেলা করা যায়। তবে মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে ১০০টি গেমযোগ্য হাতের মধ্যে মোট ৪০টি হাতে ফেরাই-এর ডাক দিয়ে, আর বাকি ৬০টির মধ্যে ২০টি ইস্কাবন, ২০টি হরতন, ১০টি রুহিতন আর বাকি ১০টি চিঁড়িতন রঙ ডেকে গেম করা যায়।

জর্জ্জ র‍্যাফ্ট্‌এর নতুন ছবির নাম হচ্ছে 'ইভ্‌নস ফর্ দি আস্কিং'।

* * *

মিস্ র‍্যাল্‌ফ-এর প্রথম ছবি হচ্ছে 'দি ব্যারেটস্ অব দি উইম্‌পোল্ ষ্ট্রীট'। আরো ছবিতে আমরা ওকে দেখতে পেয়েছি, যেমন "ডেভিড কপারফিল্ড", "ক্যাপটেন ব্লাড" "লা মিজারেবল।"

ফেরাইএ ডাক দেওয়ার সুবিধা :—ফেরাই-এর ডাকে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যেতে পারে।

(১) যে কয়খানি পিট নিয়ে মুখ্য রঙ (major suit) বা গৌণ রঙে (minor suit) গেম করা যায় তদপেক্ষা কম পিট নিয়ে ফেরাই-এ গেম করা যায়, কেননা মুখ্য রঙে চারখানি এবং গৌণ রঙে পাঁচখানি রঙে ডাক দিয়ে খেলা করা আবশ্যক, কিন্তু ফেরাই-এ তিনটির খেলা হলেই গেম।

(২) এই ডাকের ফলে ডাকদারের হাতে কি বড় তাস আছে নিরূপণ করা বিপক্ষদলের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক।

(৩) এই জন্য প্রতিপক্ষ অনেক সময় ডাকদারের হাতের tenace holding-এর কোন তাস খেলে ফেলেন।

(৪) বাধা দেবার অভিলাষে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী খেলার দরুণ অর্থাৎ প্রতি-পক্ষের শক্তির পর্য্যায়ে চতুর্থ তাসখানি খেলায় ডাকদার বিপক্ষদলের হাতের বিভাগ বা অনারের পিট বিশেষভাবে জান্‌তে পারেন।

(৫) ক্রীড়া-কৌশলের (Clever Play) দ্বারা ডাকদার অনেকগুলি অদৃশ্য পিট (invisible trick) করিয়ে নিতে সুযোগ পান্।

(৬) আর, বিপক্ষদল অন্ধের মত খেলতে বাধ্য হন বলে ঐ অদৃশ্য পিট বেড়ে ওঠে।

(৭) যেরূপ প্রাথমিক দুইটি চিঁড়িতন ডাক (Two club forcing bid) দ্বিতীয় ব্যক্তির ডাক বন্ধ করে, সেইরূপ প্রাথমিক ফেরাই এর ডাক অধিকাংশ সময় দ্বিতীয় ব্যক্তির ডাক বন্ধ করে।

(৮) ফেরাই-এ প্রাথমিক ডাকের পর ডাকদারের খেঁড়ীর পক্ষে ডাক দেওয়া অতীব সহজ, কেননা তাঁর জানা আছে যে ডাকদারের হাতের বিভাগ ৪—৩—৩—৩ বা ৪—৪—৩—২ কিংবা এই প্রকারের কোন বিভাগ, কাজে কাজেই তিনি অতি অনায়াসেই তাঁর হাতের যে কোন লম্বা তাসওয়ালা রঙ নিয়ে ডাক আরম্ভ করতে পারেন। এতদ্ব্যতীত জানা আছে যে কোন সুক্রীড়ক কখনও কোন রঙের বিবি, × না থাকলে ফেরাই-এর ডাক দিতে সাহস করেন না।

ফেরাই ডাকের অসুবিধা :—আবার ফেরাই-এর ডাকে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলিও ভোগ করতে হয়।

(১) ফেরাই-এর ডাকের দরুণ ডাকদারের খেঁড়ী তাঁর হাতের বিভাগ বা অনারের পিট কয়খানি জানতে পারেন কিন্তু সেই অনারের পিটগুলি যে কোন রঙে বা কিসে আছে জানতে পারেন না।

(২) এবং উক্ত কারণে না জানার দরুণ তাঁর গেম অবধি ডাকের পর অনেক সময় বিপক্ষদল টেক্কা সাহেব সমেত কোন রঙে নয়খানি অবধি পিট টেনে নেন্।

(৩) আবার, বিপক্ষদলের বহু তাসওয়ালা রঙ বা অনারের পিটের কোনটিই তাঁদের তুরূপ করে নেবার ক্ষমতা থাকে না।

(৪) সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক চালের ফল স্বরূপ ক্রীড়কের হাত জানার সুবিধা ডাকদার যেমন পান বিপক্ষদলও তদ্রূপ পেয়ে থাকেন।

(৫) ব্রীজ খেলায় চুপ করে প্রতিপক্ষকে বাধা দেবার একটি ধারা বর্ত্তমান, ক্রীড়কেরা সাধারণতঃ যাকে "Silent trap mode of Defence" বলে থাকেন। বিপক্ষদলের এই শুদ্ধ প্রতিরোধে এই ফেরাইএর ডাক অপেক্ষা অন্য কোন ডাক অধিকতররূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে না।

(৬) এবং এই শুদ্ধ প্রতিরোধে কোন ক্রমে যদি ডাকদার পক্ষ তাস পাশাতে (discard) বাধ্য হন, তা হলে সে হাতে ডাককারীর সমূহ বিপদ এবং সে হাত তাঁদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মিত্র :—ইনি Calcutta, Wanderers-এর জনৈক প্রবীণ সভ্য। আমাদের বীরেশ্বর বাবু

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মিত্র

একজন সুক্রীড়ক ও কয়েকবার স্থানীয় প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালেও উঠেছেন এবং ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে কলিকাতার বহু প্রতিযোগিতাতেই তিনি যোগদান করে থাকেন। ইনি ব্রীজখেলা আরম্ভ করেছেন বহু বৎসর পূর্ব্বে। কার্য্যব্যপদেশে জীবনের অনেকাংশ বেহারেই কাটিয়েছেন এবং সেখান থেকেই বহুদিন পূর্ব্বে তিনি ব্রীজ-ক্রীড়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ব্রীজ অনেকেই খেলে থাকেন কিন্তু এঁর যথার্থ পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য এই যে প্রবীণ হলেও ইনি তরুণ এবং তরুণসুলভ উপভোগ্য অমায়িকতায় এবং ক্রীড়কসুলভ ঔদার্য্যে এখানকার ব্রীজমহলের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন।

প্রতিদান

আই. বি

কবি রূপে এলে সমাজরক্ষী,
নিখিল নারীর বরাতে,
তরুণ বঙ্গ, একি গো রঙ্গ!
উদয় হয়েছ ধরাতে।
নাহি আর সেই আধ আধ বুলি,
খুলিয়া সহসা দু চোখের ঠুলি,
নিঃশেষ করি কবিতার ঝুলি,
রস-রসায়ন ছড়াতে।
(এলে) সমাজের রথ ভাঙ্গিয়া গড়িতে
বাটালী, হাতুড়ী, করাতে॥
হে তরুণ, তব 'বব'করা চুল
আর জুলফীর বহরে,
ভাব নাহি কেহ তোমারে শাসিতে,
এই অপরূপ সহরে।
দাদার বন্ধু সাজিয়া কখন,
আদি রস কথা কয় সিঞ্চন,
তরুণী-চিত্ত করিতে হরণ,
কত না কষ্ট সহ'রে।
ভঙ্গীতে জাগে শতেক রঙ্গ
পচা কবিতার লহরে॥
রন্ধনশালে ছিনু যতদিন,
ছিল ওরা সব তৃপ্ত,
শাসনের নামে করিত সদাই
মসী দিয়ে মুখ লিপ্ত।
ভণ্ডামী আর নষ্টামী ভরা,
সমাজের নামে শাসনের কারা,
ভাঙ্গিয়া সমূলে এসেছি আমরা,
নবীন ক্ষমতা দৃপ্ত।
(তাই) সমান দাবীর পরোয়ানা পেয়ে
সহসা অতীব ক্ষিপ্ত॥

পথে, ট্রামে, বাসে বেড়াতে শিখেছি
প্রগতির জের বাড়ায়ে,
সমাজশাসন দলিয়া চলেছি,
"হাইহিল" জুতা চড়ায়ে।
শুধু নিতি নব "রোমান্স" বিলাসী,
তোলে গুঞ্জন কাঁদি আর হাসি,
সাজিয়া অতনু যত শিশু শশী,
কলেজের ফিস্ উড়ায়ে।
চকিত চোখের চারু ভ্রূভঙ্গে
পদতলে পড়ে গড়ায়ে।
থাক্ ওগো থাক্ ঝুলির ভিতরে,
রোষের রসেতে গলিয়া—
নিজেরে এমন হেয় করে বোকা!
সব কথা খুলে বলিয়া।
ভিন্ দেশীদের আহ্বান মিছে,
চেয়ে দেখ আগে ঘরে কিবা আছে,
হাজার বছরে বীর্য্য গিয়াছে,
শালিনতা গেছে ভুলিয়া।
কামনা-কালীয়দহের বিষেতে
গিয়াছে অতলে তলিয়া॥
নব যুগে এলে নব অবতার
শিখেছ কেবল "জেলাসী",
সকল জাতির বেশ করি ধার—
হয়েছ ভূষণ-বিলাসী।
আর্শীতে কভু হেরেছ কি হায়,
কোথা হতে আজ নেমেছ কোথায়?
নিতি নব নব রূপ-সজ্জায়,
চিত্ত উঠিছে উলসি।
ওগো কবি, রাখ বড় বড় কথা
জোটাতে দড়ি ও কলসী॥

আমাদের অভিনয়ে সাফল্যের অন্তরায় কোথায়?

শ্রীমৃণাল ঘোষ

এই প্রবন্ধে সুবিখ্যাত গায়ক-অভিনেতা শ্রীযুক্ত মৃণাল ঘোষ আমাদের দেশের ষ্টুডিও সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত ঘোষের এই প্রবন্ধটি পাঠকগণ পড়িয়া যে বিশেষ আনন্দ পাইবেন, তাহা সত্য।

কেন? কেউ কি একবার ভাবেন? না—তার দরকার কি! কিন্তু এটুকু ভাবা উচিত যে, আমাদেরই কোন কোন ছবি খুব ভাল হয়, আবার আমাদেরই কোন কোন ছবি খুব খারাপ হয় কেন! এই 'কেন'র উত্তর আমি কিছু দিচ্ছি।

প্রথমতঃ বাঙ্গলা ছবির কে যে Director সেটা বোঝা মুস্কিল,—বিশেষ করে অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলিতে। ডিরেক্টর বেচারীদের হয় মুস্কিল, ছবি নিয়ে। (অবশ্য এটা তাঁদের ভয়ানক দুর্ব্বলতা) কারণ ম্যানেজার তিনি আসেন ছবির 'ডিরেক্শান' দিতে। প্রোপাইটার এসে feelings দেখিয়ে দেন তারপর Sound Man—তিনিই বা বাদ যান কেন? তিনিও হাতে একটা ছড়ি অভাবে ফুটরুল নিয়ে ব্যাণ্ড মাষ্টারের মত হাত নেড়ে কখনও Music ঠিক করেন, কখনও বা অ্যাকটিং করে আর্টিষ্টকে ধমকে বলেন, কি হে এই জিনিষটা আর পারছ না! এদিকে ডিরেক্টার বেচারী দেখলেন বে-গতিক; দল ভারি দেখে আর্টিষ্টকে বল্লেন বল 'বল যে-রকম বলছে বল।' তারপর ইলেক্‌ট্রিসিয়ান থেকে আরম্ভ করে গাড়ীর Driver পর্য্যন্ত বলে—উঁ, হু, এইভাবে বল্লে ঠিক হতো স্যার। (বল মা, তারা দাঁড়াই কোথা?) কার কথা শুনি? তারপর আছে clique—একজনকে নামিয়ে আর একজনকে উঁচু ক'রে তোলা। আর্টিষ্ট যদি নিজে কিছু কর্ত্তে যায়, অমনি cut—retake সঙ্গে সঙ্গে রক্ত চক্ষে বল্লেন 'কিহে?' আর আমাদের এদেশের ডিরেক্টারগুলিও নেহাৎ মেনিমারা, (অবশ্য সকলের কথা নয়); তবে অধিকাংশই তাঁরা ভাবেন 'দরকার কি বাবা গোল বাধিয়ে, তার চাইতে, যার যাবে তার যাবে মান গেলে টাকাটা ঘরে আনি। এজন্য দায়ী কে—ডাইরেক্টার? বোধ হয় নয়। কি বলেন? পারলেন না বলতে? তবে শুনুন।

কোন এক অবাঙ্গালী কোম্পানীর ম্যানেজার কোন বাঙ্গালী ডিরেক্টারকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'কি বোসা, আজ স্যুটিন্ কোরলো না'। ডিরেক্টারমশাই হাত কচলাতে কচলাতে বল্লেন, 'আজ্ঞে light নেই, weather বড় খারাপ।' 'আরে weather খারাপ তো হামার কি। আপনে স্যুটিন্ কোরো।' আর শান্ত-শিষ্ট ডিরেক্টার মশাই লেগে গেলেন কতকগুলি ফিল্ম নষ্ট করতে। কিন্তু কেন! এটুকু Moral Courage তাঁর হলোনা যে একটু জোর ক'রে বুঝিয়ে বলেন। ভয় হয়, যদি চাকরী যায়! দয়ার পাত্র হয়ে চাকরী না করাই উচিৎ। বিশেষ করে' কাণ্ডজ্ঞানহীন ষ্টুডিওর মালিক ও তার অনুচরবৃন্দের কাছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন কেন বলছি শুনুন।

মৃণাল ঘোষ

কোন এক কোম্পানীর এক ছবিতে গানের taking ছিল। বাদকরা তাদের যন্ত্রপাতি এনে সুর মিলিয়ে বাঁধছিল। হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বল্লেন—'কিহে কি করছ, বাজাও না, Scene হচ্ছেনা যে!' একজন বল্লে 'স্যার সুরগুলো মিলিয়ে নিচ্ছি।' 'আরে থাক তোমার সুর মেলান, আগে বাজিয়ে নাও পরে সুর মিলিয়ো।' এই সব বাধা বিঘ্নের মধ্যদিয়ে আমাদের Director ও artistদের ছবি শেষ করতে হয়। এখন আপনারা কি আশা করতে পারেন, ঐরকম তীক্ষ্ণ বোধশক্তিওয়ালাদের কাছ থেকে? তারপর চল্লো Health-drink-এর পালা। ছেলে বেলায় কি একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম, যে কর্ত্তা গিন্নিকে বলছেন 'ওগো শুনছ—মোহন-বাগান গোল দিয়েছে', লাল্ লা লাল্ লা লা বলে নাচতে আরম্ভ করে দিলেন। পাশে ছোট ছেলে বাপের ঐ অবস্থা দেখে বলছে, 'ও-মা বাবা নাচে, তুমি ও নাচনা'। সেরূপ Director টল্‌বল্—Recordist নল্ বল্ Camera Man—এই ছবি তোল, ছবি তোল। এই সব অবস্থার ছবি তোলা হয়। অবশ্য সব Studioতে এই রকম হয় কিনা জানিনা। যা হ'ক কি করে ভাল ছবি হবে বলুন? তারপর আজকাল ১০০৲ টাকায় Hero পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর

প্রযোজনায়

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

অহীন্দ্র চৌধুরী

বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

শৈলেন চৌধুরী

শীতল পাল

কঙ্কাবতী

রাণীবালা

●

টকী অফ্ টকীজ

রঙ্গমঞ্চের যুগান্তকারী নাটক নবরূপে সজ্জিত রূপোলি পর্দায় অবিলম্বেই আত্ম-প্রকাশ করিবে।

যুগধর্ম্ম

শ্রীহরি দাশগুপ্ত

আষাঢ় মাসের পয়লা। কিন্তু আকাশে তেমন মেঘ নেই—যা দেখে মন "কান্তা-বিরহ-বিধুর" হয়। পাতলা মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। মেঘ চারদিকে ধীরে ধীরে ছুটোছুটি করছে। রোদ নেই; আঁধারও তেমনি নেই। প্রকৃতির উপর চলছে রোদ ও আঁধারের লীলা। কোনটাকে কোনটা যেন হারাতে পারে না। দু'জনেই দু'জনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তবে বৃষ্টির মধ্যে তাকে না ধরলেও চলে। মেঘের আভরণ ভেদ করে স্বর্গ থেকে যেন কোয়াসার জল বিক্ষিপ্ত হয়ে বাতাসের সঙ্গে নাচতে নাচতে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে।

রবিবার।

স্কুল-কলেজ-কাছারী ছুটী। Devotion-এর দিন কিনা!—বাসায় বাসায় তাদের আসর জমেছে, হোষ্টেলের ছাত্রেরা বারান্দায় জটলা পাকিয়ে বসে নানান রকমের আলাপ করছে, মেয়ে-হোষ্টেলের মেয়েরা Prayer সেরে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে গল্প-গুজব হাসি-তামাসা করছে। কেউ বা "অর্গ্যান" খুলে গাইতে আরম্ভ করেছে—

হে প্রিয় আমার
আজ প্রভাতে
আসিবে এ পথে
ছিল যে গো কথা তোমারই সাথে।
আজি এ আষাঢ় প্রভাতে!......

মোট কথা, দিনটা সবাই উপভোগ করছে।

হোষ্টেলের সঙ্গীদের বাঁধাবাঁধির মধ্যে যারা নেই, আর যারা সদ্য স্কুল-কলেজ ছেড়ে চাকুরীতে ঢুকেছে, কিম্বা ভবঘুরে জীবন বরণ করে নিয়েছে তাদেরও আজ আনন্দের অন্ত নেই। রবিবারের দিনে পুরাণো বন্ধুদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ তারা পাবে। কিন্তু বাধা ঠেকেছে—সেই বৃষ্টি, বিশ্রী বৃষ্টি! ছাতা নিয়ে বার হওয়াও মুস্কিল।—ভারী ছাতা! Waterproof গায়ে দিলেও গরম; সহ্য হয় না।.........

তবে এ-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে অনেকে আপন মনে রাস্তা বেয়ে চলেছে।

প্রতুল waterproofটা হাতে নিয়ে একটি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বার হয়ে পড়লো।

কোথায় যাবে—কোন ঠিক ঠিকানা নেই। প্রতুল এবার বি-এ ফেল করেছে। তার বাবার টাকা আছে তাই তার কোন চিন্তা নেই। নিশ্চিন্ত মনে পথ বেয়ে সে চলেছে। গায়ে আদ্দির ঢোলা পাঞ্জাবী, পরণে বাসন্তী মিলের ফুল পাড়ের ধুতি। পায়ে কানপুরী স্যাণ্ডেল। চোখে চশমা তো আছেই।

খানিকটা অগ্রসর হয়ে গুণ গুণ গাইতে গাইতে চললো।

বৃষ্টি ধীরে ধীরে একটু একটু বাড়ছে। তার সেদিকে লক্ষ্য নেই, বৃষ্টিতে ভেজা যেন ষ্টাইল। ওয়াটারপ্রুফ হাতেই আছে—অথচ তার সেদিকে খেয়াল থেকেও নেই।

বৃষ্টি আরো চেপে এলো।

প্রতুল দেখতে পেলো—"পল্টন" রোডের ওদিক থেকে একটী মেয়ে আসছে। বেশ up-to-date, পরণে skirt শাড়ী, ব্লাউজের হাত পাঞ্জাবীর হাতের মতো ঢিলা লম্বা, পায়ে হাইহিলের জুতো, হাতে একখানি রবিবাবুর "পরিশেষ"।

তারও ছাতা নেই। অথচ রাস্তায় বার হবার প্রয়োজন তারও প্রতুলের মতোই বেশী।

প্রতুল তাকে চেনে। নাম তার অমিতা। অমিতা প্রতুলেরই সহপাঠিনী। সেও এবার বি-এ পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি।

প্রতুলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে একটু মুচকি হেসে বললে—নমস্কার মিঃ দত্ত, ভাল আছেন তো? বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?

কতগুলো তোষামুদে জুটে আরও lineটা নষ্ট করে দিলে। বাবুদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। পদলেহনই একমাত্র গৌরবের বস্তু জেনে নিজেকে ধন্য মনে করে। তাদের Personality আসবে কোথা থেকে? কাজেই যা পায় তাই লাভ। আর এও বলতে হয়, ছবি তাদের বাজারে মার খাওয়াই উচিত—কারণ যাদের দিয়ে, নাম-যশ-অর্থ, তাদেরই ফাঁকি দেওয়া! কেন আজ N. T. র এত নাম, কাদের জন্যে? N. T.-র artist-দের জন্য। তারা aritistদের সম্মানও যেমন দেয়, N. T.-র artistরা দাবীও করে, নিতেও জানে সম্মান। দুঃখের কথা, কোন এক প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী, তাঁর প্রাপ্য টাকা চাইছেন, 'বাবুজি, আপকো গোড় পাকাড় তা হুঁয়, মেহেরবাণী করকে হামারা তানখা দে দিজিয়ে।' এই তো আমাদের artistদের Mentality। যেসব artistদের এরূপ Mentality তাদের দ্বারা কি ভাল ছবি আশা করেন? আপনারা আমাদের গালাগালি করেন, বিদ্রূপ করেন, দুঃখ যে দর্শকরা অনর্থক আমাদেরই দোষারোপ করেন। কিন্তু একবার যদি ভাবেন যে বাস্তবিক একটা ছবি যাঁরা ভাল ক'রেছেন আর একটা ছবিই তাঁদের এত খারাপ হয় কেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু বৃষ্টি আসছে যে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

—আমি একটু অসীমাদের বাসায় যাবো। অসীমার "পরিশেষ" বইখানি ফেরৎ দিতে হবে। সে খবর পাঠাচ্ছে বারবার, কিন্তু আমি সময় করে উঠতে পারছিনে।

—অসীমা বোস তো ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তার বাসা যে এখান থেকে অনেক দূরে। আপনি তা বৃষ্টির আগে সেখানে পৌঁছুতে পারবেন না।

—তাতে আর কি হবে—সামান্য বৃষ্টি। ওসবকে care করলে কি চলে ?

—না, না, এতে আপনার অসুখ করতে পারে। আপনি আমার waterproofটী না হয় নিয়ে যান, আমি একসময় গিয়ে নিয়ে আসবো'খন।

—না, না, সে কি হয়, কিন্তু আপনি—?

—আমার ভিজবার অভ্যেস আছে, সেজন্যে আপনি চিন্তা করবেন না।

—Thank you.

বলে অমিতা প্রতুলের waterproofটী নিয়ে গায়ে জড়িয়ে পথ চলতে সুরু করলো।……

প্রতুল সারাটি রাস্তা বৃষ্টিতে ভিজে কোন মতে অঞ্জনের বাসায় পৌঁছুলো। অঞ্জনের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। অঞ্জন তার চেয়ে একটু বড়; তার উপর ছোকরাদের আধুনিক ফ্যাসান্ সে একেবারেই পছন্দ করে না। প্রতুলকে দেখে সে বললে, প্রতুল যে! তুমি বৃষ্টিতে ভিজে কোথায় চলেছ ? তোমার বুঝি একখানা ছাতা কেনবার পয়সাও নেই।

—ও-সব কে করছে মশাই। ছাতা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কে ?

—তা কেন বেড়াবে! শেষে যখন অসুখে পড়বে তখন সব ফ্যাসান বার হয়ে যাবে।

—না, না,—কিছু হবে না, কিছু হবে না। সত্যি কথা কি জানেন—ও সব ছাতা-কাতা নিয়ে চলা ফেরা করা বড় হ্যাঙ্গাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঙ্গামই বটে। সাইকেল নিয়ে বেড়াবার সময় যখন কোথাও cycle punctured হয় তখন বাবুদের cycleটি কাঁধে করে আনতে কোন কষ্টই হয় না, আর আত্মসম্মানে ঘা পড়ে না!

—আচ্ছা, আপনার কাছে স্বীকার করলুম—আমার দোষ হয়েছে। আমায় আপনার ছাতাটি দিন আমি বাসায় যাই।

—নাওনা, মন্দ কি! তোমার waterproofটি কোথায় গেল ?

—Waterproof ? waterproofটি আমাদের একজন fellow-girlকে দিয়েছি, বেচারী বৃষ্টিতে ভিজছিল কিনা!

—ও বুঝেছি, তিনি তোমার চেয়ে আরো এক ধাপ উঁচুতে। আচ্ছা, এরকম ফ্যাসান তোমরা কেন যে করতে যাও, আমি বুঝিনে। আর এমন পরোপকার-বৃত্তি মনে স্থান দেওয়া তো অন্যায়…।

—তা আর কি করবো; যখন একটা কাজ করে ফেলেছি।

—আচ্ছা, বেশ, আমার ছাতা নিয়ে বাড়ী যেতে হয় যাও, দেখো, সেটি আবার কাউকে দান করে ফেলোনা যেন!

প্রতুল একটি মুচকি হেসে অঞ্জনের ছাতা খানি নিয়ে বাসায় ফিরে গেল।

দুপুর বেলা খাওয়ার পর প্রতুল অমিতা-দের বাসার দিকে ছুটলো।

বৃষ্টি তখনো ধরেনি। আকাশের অবস্থা তেমন সুবিধে নয়। খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে—সে অমিতাদের বারান্দার উঠেছে এমনি সময় ঝড়বৃষ্টি সুরু হলো খুব বেগে।

প্রতুলের সঙ্গে অমিতার পরিচয় আছে, কিন্তু তাদের পরিবারের আর কারো সঙ্গে সে পরিচিত নয়; তবে অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয়

"আর্ত্ত পূজারী হাঁকে"—

শ্রীঅপ্রকাশ মিত্র

আলম-বাজারে কদলীর চাষ, হ'য়েছিল পারিপাটি
বুড়া শালিকের, বুদ্ধির দোষে, হোল তা'র স্বাদ মাটি!
কেহ বা হাসিল, কেহ বা কাঁদিল, কেহ দিল টিট্‌কারী
কত কুমীরের চোখে বহে জল—অপরূপ বলিহারী!

জীর্ণ দেহের অন্তর ছাপি', হিয়া আজ ক্ষুধাতুর—
রেণুর-পরশে, তনুর পালিশ, বেদনা হইল দূর!
কা'র অভিশাপে জানিনা বন্ধু, রাহুতে গ্রাসিল চাঁদ—
কূলে না ভিড়িতে, সুখতরী আজ ঘটাইল পরমাদ!

কলা নাই, তবু কদলীর ক্ষেত্রে, ফলিতেছে নাকী ঘাস—
তারি গোড়া ধরি' করে নাড়ানাড়ি, একদল পাতিহাঁস:
হাঁসের কপালে শাঁস নাই ভাই, বলিয়াছে বিধুমুখী
ঘাসের মুখায়, সজোরে গুতায়, এক 'জোড়া ঘুঘু' সুখী।

দেবালয়ে আজ থেমেছে কাঁসর, মুখর ঘুঘুর ডাকে
'আমারে বাঁচাও দীনের বন্ধু'—আর্ত্ত পূজারী হাঁকে!

করে নিতে সে যেমন জানে আর কেউ হয়তো তেমনি জানে না।

অমিতার ছোট বোনটী বাইরে দাঁড়িয়ে-ছিল। ওপর থেকে টীন বেয়ে জলের যে ধারা পড়ছিল—সে সেখানে হাত দিয়ে জল ধরবার চেষ্টা করছিল। জল ছিট্‌কে দূরে পড়ে যাচ্ছিল, আর সে নিজে আপনমনে হাস্‌ছিল।

প্রতুল পেছন থেকে তার হাতখানি ধরে বল্‌লে, জলে অমন্ করে খেল্‌তে নেই, অসুখ করবে তাহলে।

একজন অপরিচিতকে দেখে সে হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

প্রতুল বললে : তোমার নাম কি ?

—হাসি।

—হাসি, বাঃ বেশ নামতো। কিন্তু তুমি হাস্‌চনা যে। হাসি একটু মুচ্‌কি হাসলো।

—আচ্ছা হাসি, তোমার দিদি কোথায় ?

—আমার দিদি, রাণুদি—না অমি দি ?

—অমি দি—

—অমিদি বেড়াতে গেছে, একটু পরেই আসবে।

প্রতুল দেখলো—Waterproof গায়ে জড়িয়ে সেই দুর্য্যোগের ভেতর দিয়ে অমিতা এসে পৌছলো।

—O sorry, আপনি বুঝি এখনো বাসায় যেতে পারেন নি।

—না, আমি খেয়ে দেয়ে এসেছি।

—আমার একটু দেরী হয়ে গেল। অসীমা কি আর ছাড়তে চায়। সেখানে খেয়ে-দেয়ে তারপর আস্‌ছি। কী বিশ্রী দিনটা হয়েছে আজকে।

—আচ্ছা, আমি যাই তাহলে।

—মাঝে মাঝে আসবেন।

প্রতুল শূন্যমনে বাড়ী ফিরে গেল। এমন ব্যবহার সে প্রত্যাশা করেনি। সে ভেবেছিল—অমিতার কাছে গেলে হয়তো দু'একটি মিষ্টি কথা শুনবে। হাজার হোক্—তার সহপাঠিনী। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে—দুজনে বেশ freely বেড়াবে, হাস্‌বে, খেলবে…

মোটের ওপর তারা হবে একে অন্যের সাথী! কিন্তু একি তার ব্যবহার?

এই দুর্য্যোগের মধ্যে সে তাকে বিদায় দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করলোনা। শুধু একটিবার "Thanks" দিয়েই তার সব আশা পূরিয়ে (?) দিলে।………

না—সেদিন হয়তো তার সময় ছিল না। অন্য engagement ছিল—নিশ্চয়। আরেক-দিন সে যাবে—তার কাছে।………

সেদিনও রবিবার।

বৃষ্টি লেগেই আছে।

প্রতুল একখানি গাড়ী করে অমিতাদের বাড়ী পৌছুলো। অমিতা সে দিনেও বাসায় ফেরেনি তখনো।

খানিকক্ষণ বৈঠকখানায় বস্‌বার পর দেখলো—একজন ভদ্রলোকের ছাতায় করে সে বাড়ী ফিরছে। ভদ্রলোকটী আর কেউ নয়—অঞ্জন। অঞ্জন প্রতুলকে দেখে বললে কি হে প্রতুল—তুমি এখানে যে!

—এই বেড়াতে এলুম আর কি।

অমিতা বললে: উনি আমার class-mate। তার উপর আপনার মতো আমার সেদিন তিনি waterproof দিয়ে বৃষ্টি থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

ও তাই নাকি। তা'হলে আমি—

আচ্ছা, যান, thank you, Sir, for your kind help.

অঞ্জন একথার জন্য প্রস্তুত ছিলনা। বললে, thanks দেবার কিছু নেই এতে। একখানি ছাতা বইবার ভার যদি নিতে পারতেন—তা'হলে আর এই কথাগুলো খরচ হোতনা।

অঞ্জন তাড়াতাড়ি চলে গেল।

অমিতার উপর তার ঘৃণা এসে গেছে।

প্রতুলকে অমিতা বললে: এ ভদ্রলোক

তরী ও তুফান

শ্রীসুশীল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভজহরি ধপ ক'রে ব'সে প'লো। ওকি, ওকে? ওই, আমরা যাকে রমণীমোহন ব'লে চিনি তিনি না? মুচকে মুচকে হাসচেন? তারই এ কীর্ত্তি। তিনিই প্রচার ক'রেছেন।

ভজহরি তাঁর পানে চাইলে—কি হে?

—এই কেটে যাচ্ছে। কিন্তু no blood-shed, স্যানিমিয়া ভাই স্যানিমিয়া! তোমাদেরই এখন রক্তের জোর বেশি। আমরা তো ভীরু, আমাদের 'খুন যেন নীল জল'। তোমার মতো সমাজের সঙ্গে এমন ভাবে বুক ফুলিয়ে একা বীরত্ব দেখাবার শক্তি আমাদের কৈ? তাই তো বলি তোমার রক্তই লোহিত। ব'লে তিনি মাথাটা হেলিয়ে দুলিয়ে হেসে উঠলেন।

ভজহরি একটু টিপ্পনি কাটলো—তুমিও তো অনেক দেখিয়েছো ভাই। একা আমি আর কি!

ভদ্রলোকটি হেসে মাথা দোলালেন।

ভদ্রলোকটির কাশ্মীর প্রস্থানের ঘটনা কেহ অবগত নয়। আর এর সঙ্গে কারোই চেনা জানা নেই। চায়ের দোকানে ক্ষণিকের একটু আলাপের ফলেই, এবং তারকদের ভজহরিকে নিয়ে আলোচনা করা নিয়েই, তার মেথর বিয়েটা রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ে ভদ্রলোকটির মুখ থেকে। এবং তারই ফলে চায়ের কাপে তুফান ব'য়ে উঠে।

ভজহরি কথাটা চেপে গেলো। কলকাতার হারুর চায়ের দোকানের কথা তার মনে প'ড়ে গেলো, আপন ঘরে বন্দীর মতো ভজহরির নিজেকে প্রবাসী ঠেকলো, মনটা তাই খাঁ খাঁ ক'রছে, কি যেন একটা ফাঁকি তার জীবনের আনাচে-কানাচে উঁকি-ঝুঁক ক'রে ঘুরে উঠলো। প্রবীর, ভাই তোমরা কতদূর? নগেন তুমি চাঁদের মতো স্বপন হ'য়ে উঠলে কেন? মহেশদা, মানস, রাখেশ এলো সবাই!

—ও কিরে? চা খা! হ্যাঁ, তোর বৌ-র নাম কি? শ্বশুরের? খাশুড়ির? বল্‌ই না বাপু!

ভজহরি কিছুই ব'লবে না। কলকাতার জন্যে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছে। সহরটা কিছু একটা যাদু জানে। কিসের মায়া-তুলি বুলিয়ে পরকে আপন ক'রে সে নিতে পারে। বিদেশীকে কলকাতা ক'রে নেয় নিজের। চমৎকার!

তারক ব'ললো—সত্যি, ভজা তুই ব'দলে গেছিস্।

মাখন ব'লে—বদলায় নি। রঙীন হ'য়েছে। কয়মচার মতো, ভেতরটা ভারি টক্। কিন্তু শ্রাবণের কাঁইই বিয়ে। ব'লে যা, রথাহুতের মতো গিয়ে হুমড়ি দিয়ে প'ড়বো।

দীনেশ ব'ললো—নেমন্তন্ন-চিঠি ছাপছিস তো? কি লিখবি? চলতি মাসের অমুক তারিখ আমার বে', অমন ধারা চঙ্ আর বোকামি চিঠিতে না থাকে ভাই! সাদাসিধে ভাবে গুছিয়ে লিখিস্, ড্রাফ্‌ট্ ক'রে দেবো?

মাখন বাধা দিলো: রেখেদে তোর ড্রাফট্। ভজা তোর চেয়ে বিদ্বান। কি বলিস ভজা!

ভজা কিছু বলে না। কিন্তু তার একটু লজ্জা করে, এদের ছেলেমানুষি দেখে।

তারক বলে: দিল্লীকা লাড্ডু। যো খায়া উর যো নেহী খায়া দোনা পস্তায়গা। এরপর যেন repentance না আসে।

মাখন বলে: দিল্লীকা লাড্ডু, দিল্লীকা লাড্ডু শুনি, কিন্তু ব্যাপারটা কি রে?

দোকান শুদ্ধ সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

মাখন অপ্রতিভ হ'য়ে প'ড়েছিলো কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে ব'ললো: যেমন মজুমদারের একটা আর্ট দেখেছিলাম 'দিল্লীকা লাড্ড' ব'লে, সেই রকমের কিছু?

তারক সে কথা চাপা দিয়ে ব'ললো,—কিন্তু ভজহরির নাম-ধাম কিছুই শুনলাম না। তা তোর বাসার ঠিকানা দিয়ে যা, যেতে তো হবেই আমাদের।

ভজহরি এ-জন্তে প্রস্তুত ছিলো। নিজের বাড়ীর ঠিকানা সবাইকে দিয়ে তাদের কবল থেকে বেরিয়ে সে পথ নিলো।

কিন্তু—বিশেষ একটা কিছু আশা করেছিলেন বলে আমার মনে হয়। Nonsense!!

না, উনি বেশ লোক, তবে আধুনিকতার পক্ষপাতী তিনি নন।

আপনি তাঁকে চেনেন?

হ্যাঁ।

Sorry, excuse me. তিনি কিন্তু আমার সময়ে সাহায্য করেছেন, am grateful to him; তা আপনার কি কোন কথা আমার সঙ্গে……?

না, তেমন বিশেষ জরুরী কিছু নেই।

Good-bye আমার আজকে Mr. Dutt-এর সঙ্গে engagement আছে বেলা দু'টোয়। উঠি তাহলে, আজকের মতো।

প্রতুল উঠলো মনে দারুণ ব্যথা নিয়ে।

একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস তার বুকখানি নাড়া দিয়ে বয়ে গেল।—এ তা'হলে যুগেরই ধর্ম্ম!

পুরাতণকে জয় করিয়া
নূতনকে বরণ করিয়া
লও—এই হইতেছে
দেশের আবহাওয়া।
তাই
আজ আমরা নূতনের
পথে অগ্রসর হইতেছি।
আর তাই
মাসিক-পত্রিকা বলিতে
চিত্রালীর
নাম লোকে আগেই করে
চিত্রে, গল্পে, প্রবন্ধে
রসরচনায়, কবিতায়
চিত্রালীর
বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ পূর্ব্ব
শ্রাবণ সংখ্যা
প্রত্যেক ষ্টলে পাইবেন
প্রতি সংখ্যা ছয় আনা
বার্ষিক (সডাক) পাঁচ টাকা
পরিচালক:
ন্যাশন্যাল নিউজপেপার্স লিঃ
৯, রামময় রোড, কলিকাতা।

একবার বাসন্তীর ওখানে যাবে? বাসন্তীর সেই 'ভুলো না' কথাটা তাকে এখনো পীড়া দিচ্ছে, কিন্তু সে নিরুপায়। ছায়া যে আবার ও-দিক থেকে তাকে কেবলই ইসারা করছে। দেখতে দেখতে সে সাঁকোর ওপর উঠে এলো। নাঃ, আর যাবেনা। তার সঙ্গে কালই শেষ দেখা সে ক'রে এসেছে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে ভজহরি নেবে এলো। রাত হ'তে এখনো অনেক দেরি। তার আগে আর একটা গাড়ী? হঠাৎ তার মনে হ'লো আছে হয়তো। কিন্তু খাওয়া দাওয়া ক'রে পাবে কি? থাক গে, রাত্তির বেলা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে। ভোর বেলাই কলকাতা। গিয়ে দেখবে হয়তো প্রবীর মুখের মধ্যে আস্ত একটা ব্রাশ চালিয়ে দিয়ে দাঁত মাজছে। মহেশদা হয়তো ঘুম থেকেই ওঠেন নি। নগেন হয়তো সেই আরো ভোরে বেরিয়ে গেছে, মানস হয়তো গম্ভীর হ'য়ে পেপার পড়ছে, রাখেশটা তার ঘরে ট্রেসপাস ক'রে ফিল্‌ম্ ফান্ এর ছবি দেখছে। কি মধুই আছে ছবি গুলোতে, রাখেশ দেখে দেখে সমস্ত যেন নিঙড়ে নিতে চায়। যত সব অসভ্যতা। হলিউড গোল্লায় গেছে। যেখানে বিয়ে করা মহা অপরাধ, বিয়ে-ভাঙা সেইটেই অভিজাত। আজ বোধ'য় বিদ্যুৎ ছায়াদের ওখানে নেমন্তন্ন খাবে। রবিবারের বাজার। মহাফুর্ত্তি ওদের।

দেখতে দেখতে সে বাসায় চ'লে এলো। পিসিমাকে বললো—আজই কলকাতায় যাবো। মণির আজ মুখটা ভার-ভার। খুড়িমার তো মুখে ওষ্ঠা নেবেছে—গালদুটো ফুলেই আছে গোবিন্দের মায়ের মতো।

পিসিমা সামান্য দু'টো পিঠে ক'রে দেবেন ব'লে বিলি-ব্যবস্থা ক'রছেন তার। মণিকে আজ একটু বয়স্থা ঠেকছে—সে আর খুকি নেই যেন! কোমরে কাপড় জড়িয়ে চাল গুঁড়োচ্ছে।

দুপুর বেলা মণির সঙ্গে ভজহরির একটু আড়ালে দেখা হ'য়ে গেল। মণির সর্ব্বাঙ্গে একটি স্বামী-সোহাগের বিজ্ঞাপন, সেই গর্ব্বে সে যেন ফেটে পড়ে; রোদে ব'সে চাল গুঁড়োতে গুঁড়োতে তার 'গালদু'টো টুকটুক করছে আপেলের মতো। ক্ষিদেয় নাড়ি জ্বলছে, তারি প্রভাবে ঠোঁট দু'টো শুকিয়ে উঠেছে। ঘরে ঢুকে সে বার করছে কত-কী। হঠাৎ তার হাসি পেলো ভজহরিকে দেখে, ফিক ক'রে তড়িতের মতো খানিকটা শাদা দাঁত দিয়ে হেসে ফেললো। ভারি মার্‌-ভেলাস্, গ্র্যাণ্ড! ভজহরি তাই তার পানে কোন ছন্দে চেয়েছিল বলা সহজ নয়। কোন সুর তার বুকে ককিয়ে উঠেছিল জানানো কঠিন, কারণ সমাজ বিদ্যমান। সে সম্বোধন ক'রলো: ছোটোখুড়ি, শোনো?

ছোটখুড়ি অবাধ্যতা করলেন না। ভজহরি ব'ললো বসো।

—না বাপু কাজ আছে, ব'লে ঝামটা দিয়ে শরীরটাকে একটা মোচড় দিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন কিন্তু ভজহরি খপ্ ক'রে, হ্যাঁ সত্যি, খপ্ ক'রে তার হাতটা ধ'রে ফেললো: শোনোই না!

মণির মুখ নিমেষে ম্লানিয়ে এলো। হঠাৎ যেন সমস্ত দীপ্ত আকাশে নেমে এলো—ঘোর কৃষ্ণপক্ষ। মণির মুখে আতঙ্কের একটা ইঙ্গিত, সর্ব্বদেহে স্তিমিত শক্তি। ভজহরি ব'ললো—আজ চ'লে যাচ্ছি।

চ'লে যাচ্ছো? সে কথার তাৎপর্য্য? চলে যাবে যাক্। কিন্তু মণি যেন ভজ-হরির হাতে আত্মসমর্পণ ক'রেছে এমনি একটা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ব'ললো, তার ব'লতে হ'লো,—যাচ্ছো? তা' আসচো কবে!

ভজহরির হাসি পেলো: এই বিয়ের পরই যদি-না একঘরে হই। যদি আসতে নিষেধ না থাকে। আচ্ছা ছোট-খুড়ি, এলে আসবার সময় তোমাদের জন্যে কি আনবো?

—অর্থাৎ? চোখদু'টো তার বড়ো হ'য়ে উঠ্‌লো।

—এই ধরো উপহার! ভক্তির একটা চিহ্ন। কি তোমার পছন্দ? মুর্শিদাবাদী জওলা শাড়ী? তোমায় বেশ মানাবে মনে হয়। তোমার কি পছন্দ বলো।

ঠোঁট উল্টে আহ্লাদীর মতো মণি ব'ললো—আমার আবার পছন্দ। কেন, তুমি বুঝি খুব টাকা পাচ্ছো যৌতুক?

ভজহরি যেন চ'মকে উঠ্‌লো: যৌতুক? তার মানে? সবই যে আমার। শুনলে কি তবে য়্যাদ্দিন? অজস্র টাকা ছোট-খুড়ি! অঢেল! সব আমার অর্থাৎ আমাদের, এই তোমারো।

মণির শুনতে সত্যি ভালো লাগলো। সে ব'ললো—কাপড় আমার ঢের আছে, কাপড় দিয়ে হবে কোন ছাতা।

—তবে?

—মটর-মালা, ঝুমকো, এই না! বেশ; আসবার সময় যা-ইচ্ছে এনো। ব'লে মণি তাড়াতাড়ি করছিলো। ভজহরি ব'ললো: a good suggestion, মটর-মালা তো, গলার সঙ্গে লেগে থাকবে না, একটু ঝুলো? ঠিক এমনি এই তোমার মতো ভাজ-ভাজ গলায় কার সঙ্গে তুলনা দ্যায় কবিরা জানো! শাঁখ, শাঁখ, শঙ্খ। গ্র্যাণ্ড, সেই তোমায় ভালো। কানে রূপার ঝুমকো, হালকা মোতির ঝলমলানি, আচ্ছা? আর একটা কথা—খুড়িমাদের,...ও ছোটখুড়ি, আরে মুস্কিল! আচ্ছা যাও। ব'লে ভজহরি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো আবার প্রথম থেকে।

(ক্রমশঃ)

"এইতো লক্ষ্মীমেয়ে—খেয়ে ফেল দুধটা।"
জোয়ান ক্র্যাফোর্ড বল্‌ছে বোনঝি
লি সিউয়ারকে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ ৯, রামময় রোড, কলিকাতা | টেলিফোন পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে ভাদ্র ১৩৪৩, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

মিলনের রন্ধ্রপথে

২৭শে আগষ্ট কলিকাতা হাইকোর্ট বন্ধ হইবার পর হইতে ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাঙলা কংগ্রেসের আসন্ন নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নাটকীয় দ্রুততার সহিত বহু সমস্যার সাময়িক সমাধান হইয়াছে। কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু নিখিল ভারত কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যরূপে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুকে মনোনীত করিয়াছেন। এই মনোনয়ন বাঙলার কংগ্রেস-কর্ম্মীরা সকলেই সাদরে সমর্থন করিয়াছেন। "তাঁহার সৎসাহস, কংগ্রেস-নিষ্ঠা এবং জাতীয় আদর্শবাদে প্রগাঢ় অনুরাগের জন্য তিনি বাঙলার জনপ্রিয় নেতা।" সহযোগী 'আনন্দ-বাজারের' ন্যায় আমরা তাঁহার মনোনয়নে সুখী হইয়াছি।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনের সময় নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের নূতন ব্যাখ্যা প্রকাশের পর বাঙলার অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলালের মঙ্গল করস্পর্শ অনুভব করিয়া আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর শারদ অবকাশের অবসরের মধ্যে কূট-আইনজ্ঞ শরৎচন্দ্র নিখিল ভারত কংগ্রেসী ইস্তাহারের মধ্যে এক গভীর ন্যায়ের ফাঁকির গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক সঞ্চালনের ফলে যে 'ফরমুলা'র উদ্ভব হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অভিনব। তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি অবিচলিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে "নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন কেবল এক তরফা আন্দোলনের বিরোধী আর কংগ্রেস যখন নিশ্চয়ই এক তরফা প্রতিষ্ঠান নহে, সকল জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়েরই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান তখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে তাহা নিশ্চয়ই এক তরফা দোষ-পুষ্ট হইতে পারে না এবং ইহাতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের আপত্তিরও কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে না। অতএব বাঙ্গলার কংগ্রেসী পাণ্ডারা কংগ্রেসের সার্ব্বজনীন ঔদার্য্যের মহিমা অটুট রাখিয়াই অতঃপর সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবেন।"

শরৎচন্দ্রের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এই যে ন্যায়ের ফাকি উদ্ভুত হইয়াছে তাহাতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের উপর আনুগত্যের ভাব পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া বাঙলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেই বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি তীক্ষ্ণধী আইনজ্ঞ নেতাদিগকে কোনঠাসা করিয়া শরৎচন্দ্র যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি বাঙলার প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্ম্মীর শ্রদ্ধার্জ্জন করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রশ্ন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ভাষ্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হইলে পর বাঙলার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে বাঁটোয়ারা ও মন্ত্রিত্ববর্জ্জন প্রসঙ্গে বাঙলার সুস্পষ্ট মনোভাব দৃঢ়তার সহিত ঘোষিত হইয়াছে। এতদ্প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন :—"আমার মনে হয়, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অগ্রাহ্য করাও যেরূপ অত্যাবশ্যক, নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে মন্ত্রিত্বগ্রহণ বর্জ্জনও ঠিক তদ্রূপই অত্যাবশ্যক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি নূতন শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করিবার সিদ্ধান্তের সহিত নূতন শাসনতন্ত্রের অধীনে মন্ত্রিত্বগ্রহণের সিদ্ধান্তের কোন সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। এই আশা এবং বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে অন্তরে পোষণ করিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব যে, বাঙ্গলার কংগ্রেসকর্ম্মীরা কখনই সামান্য অর্থ ও তুচ্ছ পদমর্য্যাদার মোহে স্বদেশের স্বার্থ বিকাইয়া দিবে না।"

শরৎচন্দ্র আবেগময় কণ্ঠে আবেদন করিয়াছেন যে, তুচ্ছ অর্থ ও পদবীর লোভে বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা যেন স্বদেশের স্বার্থ বিক্রয় না করেন। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বা বর্জ্জন সম্বন্ধে বাঙলার কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতামত শরৎচন্দ্রের ন্যায় মোটেই সুস্পষ্ট নয়, বরং বিপরীতমুখী। প্রকাশ যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় ও শ্রীযুক্ত তুলসী চন্দ্র গোস্বামী মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী। শরৎচন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে বঙ্গীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ই প্রার্থী বাছাই ব্যাপারে এক প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তাই হইবেন। সুতরাং মন্ত্রীত্ব গ্রহণ বা বর্জ্জন সম্পর্কে তাঁহার মতামত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করাই উচিৎ। ইহা আনন্দের বিষয় যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রসঙ্গে উভয় দলই এক সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রীত্ব প্রশ্ন সম্বন্ধে বিধানী দলের মতামত অদ্যাবধি অপ্রকাশ্য রহিয়াছে। সুতরাং ইহাও তো সম্ভব হইতে পারে যে, মন্ত্রীত্ব-বিরোধী দল মিলনমোহাচ্ছন্ন শরৎচন্দ্রের অনুরোধে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন এবং সাময়িক মিলনের রন্ধ্রপথে মন্ত্রীত্বকামী প্রার্থীবৃন্দ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন। যেখানে মতের বা আদর্শের মিল নাই সেরূপ স্থলে মিলন কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। তবে শরৎচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্ব যদি বিধানচন্দ্র প্রমুখ মন্ত্রীত্বকামী নেতৃবৃন্দকে স্বীয় মতানুগামী করিতে পারে, তাহা হইলেই বাঙলা কংগ্রেসের সকল বিরোধের অবসান হইবে—ইহা সুনিশ্চিত। তবে ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে, "One should not hallo till one is out of the wood" সুতরাং প্রার্থী-মনোনয়ন, নির্ব্বাচন-সংগ্রাম ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ পর্ব্ব সমাপ্ত না হইলে আমরা বাঙলা কংগ্রেসের এই অপূর্ব্ব মিলনের জয়গান করিতে পারি না।

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার

ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ইংলণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট খেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। কেণ্ট দলের কাছে শোচনীয় ভাবে হেরে ভারতীয় দল সাসেক্স দলের সঙ্গে খেলে। এই খেলায়ও ভারতীয় দল ৮ উইকেটে হেরেচে। ভারতীয় দল প্রথমে ব্যাট করে মোট ৩০৯ রান করে। এই ৩০৯ রানের মধ্যে দিলওয়ার হোসেনের ১১২ রান ও মার্চ্চেণ্টের ৫২ রানই উল্লেখযোগ্য। দিলওয়ার হোসেন ইংলণ্ডে মাত্র কয়েকটী ম্যাচ খেলেছেন। তার মধ্যে প্রায় অধিকাংশ খেলাগুলিতেই তিনি নিজের খেলার পারদর্শিতা দেখিয়ে ভারতীয় দলের সম্মান রেখেছেন। মার্চ্চেণ্টের কথা না বলাই ভাল। কারণ তাঁর মত বিচক্ষণ খেলোয়াড় ভারতীয় দলে নেই বল্লেই হয়।

সাসেক্স দলও প্রথম ইনিংসে প্রত্যুত্তরে ৪৭৯ রান করে। এই ৪৭৯ রানের মধ্যে মেলভিল্

দিলওয়ার হোসেন

ও জন্ ল্যাংগ্রিজ যথাক্রমে ১৫২ ও ১৬৮ রান করেন। ভারতীয় দলের বোলারদের মধ্যে জাহাঙ্গীর খাঁ ১০৩ রান দিয়ে ৪টী উইকেট পান।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল মোট ২৩৯ রান করে। এই ২৩৯ রানের মধ্যে উজীর আলীর ১১৯, রামস্বামীর ৬০ ও

উজীর আলী

দিলওয়ার হোসেনের ৫০ রানই উল্লেখযোগ্য। উজীর আলী এ পর্য্যন্ত কোন খেলায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক হ'য়ে ভারতবর্ষে অষ্ট্রেলিয়ান দলের সঙ্গে যে ভাবে খেলেছিলেন তাতে আমাদের তাঁর উপর যে একটা খুব বড় রকম

আশা ছিল তা বলাই বাহুল্য। যা হ'ক, তিনি পর পর ২টী খেলা যেভাবে খেলেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। এই ইনিংসে সাসেক্স দলের জ্যাস্ ল্যাংগ্রিজ ৪৭ রানে ৭টী উইকেট নিয়ে তাঁর নিজের দলকে জয়ী করতে পেরেছেন। সাসেক্স দল দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৭১ রান করে।

সাসেক্স দলের কাছে ভারতীয় দল ৮ উইকেটে হেরে নিখিল ইংলণ্ড দলের সঙ্গে ড্র করে। ইংলণ্ড দল প্রথমে ব্যাট ক'রে মোট ৩৭৭ রান তুলেছিল। এই ৩৭৭ রানের মধ্যে ভ্যালেণ্টাইন্ ১১৫ ও টড্ ৭৯ রান করেন। ভ্যালেণ্টাইন ১২০ মিনিটে ১১৫ রান তোলেন। তিনটী ওভার বাউণ্ডারী ও ১৫টী বাউণ্ডারী করেন। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ৩৭২ রান তোলে। উজীর আলী এই খেলাতেও তাঁর নিজের শতাধিক রান তোলেন। তাঁর ১৫৫ (নট্ আউট্) মার্চ্চেণ্টের ৬৮ ও রামস্বামীর ৪৩ রানই উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় দলের বোলারদের মধ্যে একমাত্র ব্যানর্জ্জির বল সবচেয়ে ভাল হয়েছিল। ব্যানার্জ্জি ৯৪ রানে ৪টী উইকেট্ পান।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড দল ৩ উইকেটে ২১২ রান কোরে ডিক্লেয়ার্ড করে। এই ২১২ রানের মধ্যে এমস্ ১০৭ রান করেন। এমস্ মাত্র ৬৮ মিনিটে নিজের শত রান পূর্ণ করে একটা নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। এই নূতন রেকর্ড স্থাপন করার জন্যে তিনি এ বছর লরেন্স কাপ পেয়েছেন। এর আগের রেকর্ড ছিল ৭০ মিনিট্। ইংলণ্ড দল ২১২ রানে 'ডিক্লেয়ার' করায় ভারতীয় দলের রানের চেয়ে ২১৮ রান তফাৎ ছিল। কিন্তু সময় ছিল মাত্র ১৬০ মিনিট। ১৬০ মিনিটে ভারতীয় দলের ২১৮ রান করা সম্ভব হয় নি বলেই খেলাটী ড্র হয়। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ১৫২ রান তোলে।

মার্চ্চেণ্ট

মার্চ্চেণ্ট ও দিলওয়ার হোসেন যথাক্রমে ৬৪ ও ৬৯ রান করেন। তাঁরা দু'জনেই নট্ আউট্ থাকেন।

জাহাঙ্গীর খাঁ

এই খেলার ফল থেকে বেশ বোঝা যায় যে ভারতীয় দল খেলায় একেবারে অপটু নয়। তাদের এই "টুরের" ব্যর্থতার কারণ অন্য। এ সম্বন্ধে আমরা আগামীবারে আলোচনা ক'রব।

কোলকাতায় ক্রিকেট খেলা

বড়দিনের সময় কোলকাতায় ভারতের নানা যায়গা থেকে তিনটী বিশিষ্ট ক্রিকেট দল খেলতে আসছে। তার মধ্যে রাউলপিণ্ডি থেকে ২টী ও মান্দ্রাজ থেকে ১টী। তারা ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব, মহারাজা কুচবিহারের একাদশ, জাষ্টিস্ মন্মথ মুখোপাধ্যায়ের একাদশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খেলবে বলে স্থির হ'য়েছে।

রোভার্স কাপ

রোভার্স কাপ খেলা শেষ হয়েছে। এ বছরও গত বারের মতই কিংস্ রেজিমেণ্ট জয়ী হয়েছে। এরা ব্রুকশায়ার দলকে ২—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। ব্রুকশায়ার দল কোলকাতার শীল্ড বিজয়ী মহামেডান

দলকে যে ভাবে হারিয়ে ফাইন্যালে উঠেছিল তাতে সকলেই আশা করেছিল সে প্রফশায়ার দলই বুঝি বা শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হ'বে। কিন্তু প্রচণ্ড কিংস্ রেজিমেণ্টের দলের খেলার কাছে শেষ পর্য্যন্ত তাদের হারতেই হয়েছে।

জবাকুসুম কাপ

মোহনবাগান দল জবাকুসুম কাপের ফাইন্যাল খেলায় এরিয়ান্স দলকে ১—০ গোলে হারিয়ে জয়ী হয়েছে। এর আগে মোহনবাগান দল ৪টী কাপ ফাইন্যালে জয়ী হয়েছে। সুতরাং এইটী নিয়ে তাদের ৫টী হ'ল। আরও একটা কাপের ফাইন্যালে উঠে তারা বসে আছে সেটি হচ্ছে বেল কাপ। তাদের এই সাফল্যে আমরা বিশেষ গৌরবান্বিত।

লিবার্টি কাপ

ভবানীপুর ক্লাব লিবার্টি কাপের ফাইন্যালে জর্জ্জ টেলিগ্রাফ দলকে ৩—১ হারিয়ে দিয়েছে। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তারা যে ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় বেশ ভাল ফল দেখাতে পারবে সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

সাতার

প্রতি বছরের মত এবারও পূজার আগে কোলকাতার বিভিন্ন সাতারের ক্লাবের বার্ষিক জলক্রীড়ার আয়োজন চলছে। বার্লিন অলিম্পিকে এ দেশের বিশিষ্ট সাতারুরা যেতে পারেন নি বলে যে হতাশার সঞ্চার হয়েছিল তা অবশ্য অনেকাংশে প্রশমিত হয়েছে। গত রবিবার হেদুয়ায় সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের দ্বাদশ বার্ষিক স্পোর্টসের যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে বেশ উৎকর্ষতা দেখা গিয়াছে।

যে সব সাতারের ব্যবস্থা হয়েছিল তার মধ্যে ১৫০০ মিটারএ মদনমোহন সিংহের নামই উল্লেখযোগ্য। তিনি গত বছরেও এই ১৫০০ মিটার সাতারে জয়ী হয়েছিলেন। মেয়েদের সাতারে বাণী ঘোষই এতদিন শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু এবার ৫০ মিটার সাতারে কুমারী লীলা চাটার্জ্জি বাণী ঘোষ প্রভৃতিকে হারিয়ে নূতন রেকর্ড করতে পেরেছে। ৫০ মিটার সাতারে সময় লেগেছে ৪১ ১/৫ সেকেণ্ড।

সেণ্টাল সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগে সুবোধ-বালা কাপের ফাইন্যাল ওয়াটার পোলো খেলা শেষ হয়েছে। হাটখোলা ক্লাব অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্মশানেশ্বর সুইমিং ক্লাবকে ৩—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। শ্মশানেশ্বর (সুইমিং ক্লাব কলেজ স্কোয়ার ও সেণ্ট্রাল) সুইমিং ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব ভাল ভাল সাতারু দ্বারা গঠিত। সুতরাং তাহাদের জয়লাভ সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে ফল বিপরীতই হয়েছে। হাটখোলা দলের জয়লাভের সম্মান একমাত্র যামিনী দাসেরই প্রাপ্য।—এ রকম খেলা সহজে দেখা যায় না। রাজারাম সাহুর ও জি ঘের খেলাও বেশ ভালই হয়েছিল। তিনটি গোলের মধ্যে রাজারাম একাই দুইটী দিয়েছিল।

ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের সম্বর্দ্ধনা

বোম্বাই কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভারতীয় হকিদল বোম্বাই নগরীতে পৌছিলে, কর্পোরেশন ধ্যানচাঁদ ও তাঁর সঙ্গীয় খেলোয়াড়দিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

দারাকে সম্বর্দ্ধনা

লায়ালপুর মিউনিসিপাল কমিটি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির করেছেন যে, বিখ্যাত হকি খেলোয়াড় দারা লায়ালপুর পৌছিলে মিউনিসিপালিটি তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন।

নন্দরাণীর সংসার

বিজয়—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
বিকাশ—জীবন গঙ্গোঃ
মহিমারঞ্জন—মনোরঞ্জন ভট্টাঃ
মতিলাল—রতীন বন্দ্যোঃ
পরেশ—যোগেশ চৌধুরী
পূর্ণিমা—পুতুল
জ্যোৎস্না—শান্তি গুপ্তা
সৌদামিনী—প্রভা
নন্দরাণী—আসমানতারা

রঙমহলের নূতন নাটক "নন্দরাণীর সংসার"-এ যোগেশ দা' নাটকথানিকে নূতন ভাবধারায় রূপায়মান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন দেখিলাম। কিন্তু ঘটনার অনৈক্য হেতু সে রূপদানে তিনি সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারেন নি। তবে তিনি ঘটনাটিকে প্রথম হইতে এমনভাবে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন যে নাটকখানির শেষ কথা শোনা না পর্য্যন্ত ঘটনার গতির যবনিকা কোথায় পড়িবে তাহা দর্শকরা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বর্তমান যুগে যোগেশদা'র কাছ হইতে ইহার চেয়ে ভাল নাটক আমরা প্রত্যাশা করি—সেদিক দিয়া তিনি আমাদের পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই।

একটি রসিক বন্ধু বলিতেছিলেন—"যাহার কয় মাস আগে টাইফয়েড হইয়াছিল; হয় ত' প্রলাপের মুখে যাহা বলিয়াছেন—কেহ তাহা নোট করিয়া থাকিবে। রোগ মুক্তির পরই দুর্ব্বল অস্থিকে তাহাই হজম করিয়া থাকিবেন।"

শ্রীমতী নন্দরাণী—পুত্রকন্যার জন্ম দিয়াই খালাস; স্বামীর প্রেম পায় নাই। অস্থি-চর্ম্ম সার, মুখখানি সদাই ব্যাজার। দেখিতেও ঠিক যেন 'পারনিসাস্ এনিমিয়া'র পেসেণ্ট! দুটি কন্যা আজিও বাঁচিয়া আছে—জ্যোৎস্না ও পূর্ণিমা। একটি বিবাহ করিয়া তাহার বাহন লইয়া সর্ব্বদাই দুঃখী; অপরটি একটি শিক্ষিত অথচ 'খ্যাপাটে' এক যুবকের সঙ্গ পাইল। সে বলে,—"পূর্ণিমা আমি তোমায় ভালবাসি"। কিন্তু সে কেমন ধারা ভালবাসা, কোথায়, কখন, কেমন করিয়া ঘটিল—দর্শক তাহার আঁচ পাইল না।

বিধবাবেশিনী সৌদামিনী—যেন একটি মাংসপিণ্ডের বস্তা। শুনিলাম ইনি কুলত্যাগ করিয়াছিলেন—মূল কারণ অজ্ঞাত। ভর্ত্তৃ-পরিচয়হীন এই 'জবালার' গর্ভে যাহার উদয়—বছর আঠারো পরে সেই পুত্রের সহিত মাতার মিলন। যেন বন্যারবুকে একটি ঘুমন্ত শিশু ঢলিয়া পড়িল!

অপর চরিত্রগুলিও যেন এক একটি প্রহেলিকা! এরা কেন এলো, কেন গেল, এত কথা কাটাকাটিই বা কিসের—বোঝা গেল না!

নাট্যকার যোগেশচন্দ্র একটি বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন—সেই সাবেকী ঢংএ। এ যেন জগন্নাথের রথ—সেই একই পরিচিত পথে গড়গড়িয়ে চলা ফেরা! ইহার কোন নূতনত্ব নাই।

রতীনের সেই আপন-ভোলা, বাক্য-বাগীশ আধপাগলাটির রূপ—আমার বেশ লাগিল।

ধীরাজ ভট্টাচার্য্য—সৌদামিনীর অবৈধ পুত্র রূপে বিজয়ের ভূমিকায় বেশ একটি স্বাভাবিক রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এর দেখিতেছি এখন বৃহস্পতির দশা! এখন কাল্ না খাইলে বাঁচি!

প্রসাধনে ও পারিপাট্যে ফিটফাট—শান্তি গুপ্তার এখনও বেশ জৌলুষ আছে। জীবন গাঙ্গুলী একে দেখিলাম 'ম্যানেজ' করিয়াছেন বেশ!

পুতুলের মুখের সেই মিষ্টি হাসিটুকু—এই মেঘে ঢাকা নাটকখানির একমাত্র বিদ্যুৎ পুলক!

শক্তিমান নট মনোরঞ্জনের 'মহিমারঞ্জন' অভিনয়-মহিমায় সত্যই অপূর্ব্ব। কিন্তু ঘোলাটে প্লটের ঘূর্ণাবর্ত্তে এমন সুন্দর অভিনয়ও ব্যর্থ হইল।

শ্রীমতী প্রভা যেন—'fish out of water'!

সেন সাহেব কয়েকটি সেট্-সিন লইয়া বেশ একটু Experiment করিয়াছেন দেখিলাম। জ্যোৎস্নার Dressing Room-এর ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে, Cubismএর চুনকামে হয় ত' খানিকটা নূতনত্বের আমেজ আছে—, কিন্তু আর্ট নাই। Rhythm এবং Proper Balancingএর অভাবে বাঁকা দরজা-জানালাগুলি Cubistic Atmosphereএর সঙ্গে, সমান ভাবে মিশে Harmonyর সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রেক্ষা-গৃহে বসিয়া অভিনয় দেখিলে সেন সাহেব এ ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারিবেন। Proportion-এর অভাবে, Dressing-roomটি হইয়াছে যেন জাহাজের খোল! মহিমারঞ্জনের বাড়ীর বাগান সংলগ্ন বারান্দা—যাহার সম্মুখে গ্রামের দৃশ্য (Panorama) দেখা যাইতেছে, সেই বারান্দায় একটি বসিবার

যবনিকা

শ্রীমণি দত্ত

সকাল হতেই সুবিনয় আল্‌সারের বেদনাটা বেশ ভাল করেই অনুভব করছিল। এ রোগ তার দেহে প্রায় দুবছর হল প্রবেশ করেছে। কেমন করে ধীরে ধীরে তার দেহে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারে নাই। পেটের ভেতর এমন অস্বাভাবিক বেদনা হওয়ায় সুবিনয় কষ্টে বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে রইল।—সমস্ত মুখ তার-বেদনায় কালো হয়ে উঠল, প্রত্যেক শিরা উপশিরা বিদ্রোহ করতে চায়, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। মাথার বালিশটা পেটের তলায় চাপা দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। না, ডাক্তার ডাকা নেহাৎ দরকার। কেইবা ডাক্তার ডাকে ?

সুবিনয় জোর করে বিছানায় উঠে বসল। সমস্ত ঘরটায় একটা পারিপাট্য বিশৃঙ্খলা। কাউকে ডাকা দরকার—সুবিনয় বিছানা থেকে উঠে দেয়াল ধরে ধরে দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল, পেটের ভেতর যেন অজস্র ছুঁচ কে বিঁধিয়ে দিচ্ছে, সোজা হয়ে দাঁড়ান চলে না, বাড়ীটা অস্বাভাবিক রকম দুলতে লাগল, ভুমিকম্প নাকি ?—পায়ের তলা থেকে সব সরে যাচ্ছে—চোখের সামনে সমস্ত অস্বাভাবিক রকম কালো হয়ে উঠল,—না এখানেই শুয়ে পরা যাক্—সুবিনয় পড়ে গেল। চৌকাঠে মাথাটা লেগে—ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল......সব ভুলে যাচ্ছে, নিজের অস্তিত্ব, নিজেকে—মৃত্যু—এই বুঝি মরণ—কালো জমাট অন্ধকার—হীম শীতল ! !

শরৎ কালের প্রভাত। মিঠে ঠাণ্ডা বাতাস মায়ের মত স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায়। আবছা কুয়াশা মহানগরীর বুক জুড়ে বসেছে, গভীর রহস্য যেন লুকান রয়েছে, অপ্রকাশের সৌন্দর্য্য—চারিদিকে ! ভোরের হাওয়ায় সুবিনয়ের চেতনা ফিরে এল। একি মেঝেতে শুয়ে কেন ?—সুবিনয়ের হাসি পেতে লাগল। মাতালের পরিণাম—কাল রাত্রিতে নিশ্চয় খুব মদ খেয়েছিল। মাথাটায় অত্যন্ত বেদনা—ওকি মেঝেতে লাল কি জমাট বেঁধে রয়েছে। রক্ত ?—রক্ত কোথা থেকে এল—উঃ শরীরেও বেদনা হয়েছে ভীষণ। আস্তে আস্তে স্মৃতির দরজা খুলে গেল—না মদ সে খায়নি কাল,—মাতালও হয়নি,—আল্‌সারের বেদনা-ভূমিকম্প। সুবিনয় উঠে বসল। বড় ড্রেসিং আয়না-টার সামনে গিয়ে দাঁড়াল,—কালো কোঁকড়ান চুলগুলোর ওপর,—মুখে রক্ত জমাট হয়ে বসে গেছে। ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। পেটে বেদনা একেবারে নেই—তবে মাথাটা কেমন যেন ভারী লাগছে। আলমারীটা খুলেই সুবিনয়ের মনটা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। প্রায় এক বোতল মদ কেমন করে যে রয়ে গেছে কিছুতেই সে বুঝতে পারল না। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে আপন মনে গুণ্ গুণ্ করতে করতে সুবিনয় বাথ-রুমের দিকে একটা তোয়ালে কাঁধে ফেলে চলল।

স্নান শেষ করে এসে—সুবিনয় দেখলে মাথায় বিশেষ লাগে নি—কপালটার ওপরটা ফুলে যদিও রয়েছে খুব বেদনা নেই। অভুক্ত বাসি খাবার কিছু গলাধঃ-করণ করে বোতল আর একটা গ্লাশ নিয়ে সুবিনয় বিছানাটার ওপর আরাম করে বসে—একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল্লে। তারপর চলল গ্লাশের পর গ্লাশ,—ডাক্তারের মানা সব কিছু ভুলে গেল—আল্‌সারের বেদনা সেটা মনে হল কিছুই নয়।

মদ খেলে নাকি আলসার হয় ?—তাহলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবারই আলসার হোত, ওবুধের সঙ্গে কে না মদ খেয়েছে ?—সুবিনয় একটা সিগ্রেট বের করে কম্পিত হস্তে ধরিয়ে শোফায় এলিয়ে পড়ল।

সিঁড়ি দিয়ে কে যেন ওপরে উঠছে—সুবিনয় ভাবলে নিশ্চয় কোন পাওনাদার।—উঃ বেটাদের জ্বালায় একটু আরাম করবার উপায় নেই—বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেই ভাল হত। দারোয়ান বেটা কি ?—সবাইকেই লটান ওপরে আসতে দেয়।—সুবিনয় আপন মনেই হেসে উঠল—দারোয়ানকে আজ বছর খানেক হল ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বেঞ্চের (বোধকরি পাথরের Garden Bench) ঠিক দুইপাশে, ঠিক Candle-stick-এর উপর দেখিলাম দুইটি ঝাউ-গাছ, পিলসুজের মত দুইটি Base এর সঙ্গে ফিট করা রহিয়াছে।

গান গুলি অতি বস্তুহীন অক্ষম রচনা। সুরগুলিতে প্রাণ নাই, এবং যাঁহারা গাহিয়া ছিলেন তাঁদের কণ্ঠে সুরের কোন হদিশ পাওয়া গেল না।

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

—

ঘরে ঢুকল চঞ্চল,—সুবিনয়ের বহু আগের বন্ধু।

—আরে কি মনে করে?—সুবিনয় জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে।

চঞ্চল কথার কোন জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল: ডাক্তার না তোকে মদ খেতে একেবারে বারণ করেছে? তা সত্বেও মদ খাস কি জন্যে? আলসারেই মরবি তুই।

মরব? এত শীগগির?—দূর এখন আরও অনেকদিন মদ খাব তারপর:—সুবিনয় টেনে টেনে হাসতে লাগল।

চঞ্চল একটা চেয়ার টেনে বসল।—বিছানার ওপর মদের বোতল ও গ্লাশ দেখে তার সমস্ত মন ব্যথায় ভরে উঠল। এই সেই সুবিনয়—ভাল ছেলে বলে যার খ্যাতি ছিল। লোকের কাছে গর্ব্ব করে বলত সুবিনয় আমার বন্ধু। বি-এ-তে ভাল করে অনার্স পেয়ে সুবিনয় পাশ করেছিল। বাপের সম্পত্তিও কম ছিল না। কলকাতার মত জায়গায় দু-দুখানা ভাড়াটে বাড়ী, নগদ টাকা, গাড়ী—সবই ছিল। এম-এ, পড়ার সময় কোথায় কোন এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয়—তারপর আস্তে আস্তে মদ, কুসংসর্গ.........

চঞ্চল দেখলে সুবিনয়—আরাম করে সিগ্রেট টানছে।—মদ কি তুই কিছুতেই ছাড়তে পারবি না সুবিনয়? চঞ্চল জিজ্ঞাসা করলে।

—ওটা ছাড়া আর যা' কিছু বলবি—সবই শুনতে রাজি আছি ভাই।—জবাব দিলে সুবিনয়।

—তোর যে এরকম অধঃপতন হবে তা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি। বাপের সম্পত্তির আর কিছু বাকী নেই—। বাস্তু ভিটেখানা, তাও—বেশী দিন থাকবে বলে মনে হয় না,—দেনায় দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রী হবার বন্দোবস্ত তবু তোর মদ খেতে ইচ্ছে যায়—ছিঃ!—

—যা খুশী হয় তাই বলেই গাল দে চঞ্চল,—কিন্তু মদ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না—ছাড়বও না। আমায় সর্ব্বনাশের নেশায় পেয়ে বসেছে,—এর শেষ নেই।—সুবিনয় উত্তর করলে। শোফা থেকে উঠে বোতল থেকে কতটা মদ গলায় ঢেলে দিয়ে আবার বলে ওঠে: আমি নিজেকে ভুলে যেতে চাই চঞ্চল কিন্তু পারিনা,—মদে আমার ঠিক্ ভুলে যাবার মত নেশা হয় না।

—রেণুকে এখনও ভুলতে পারিস নি

সুবিনয় বাধা দিয়ে বল্লে: ওঃ একটা কথা ভুলেই গেছলুম, কিছু টাকা দিতে পারিস?—আগের টাকা গুলো আর এ টাকাটা একসঙ্গেই দিয়ে দেব—ওমাসে নিশ্চয় পাবি।—

পাওয়ার কথা হচ্ছে না, কিন্তু মাসের এখন শেষ আমার হাতে একটাও টাকা নেই।—চঞ্চল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—! সুবিনয়ের মাথায় মদের ধোঁয়া আস্তে আস্তে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। চঞ্চলের কথাগুলো সমস্ত মাথায় ধ্বনিত হতে লাগল। আজ

বাঙ্গলার ছায়া ক্যাবিনেট

আসন্ন শাসনতন্ত্রে যে মন্ত্রী-মণ্ডল ত হইবে তাহার গঠন প্রসঙ্গে বহু স্থানে আলাপ আলোচনা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত তুলসী চন্দ্র গোস্বামী ও স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও পত্র বিনিময় হইতেছে। আমাদের রাজনৈতিক সংবাদদাতা যে ছায়া-ক্যাবিনেটের সংবাদ দিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে জানাইলাম:—

মন্ত্রীমণ্ডল

১। জনৈক ইউরোপিয়ান সদস্য। (নাম বর্ত্তমানে অপ্রকাশ্য)
২। স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন।
৩। নবাব মহিয়ুদ্দিন ফারোকি।
৪। নবাব মুসরাফ্ হোসেন।
৫। মিঃ সাহিদ্ সুরাবর্দ্দি।
৬। মৌলভী ফজলুল হক।
৭। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়।
৮। মিঃ নরেন্দ্র কুমার বসু।
৯। স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়।
বা
মিঃ কিরণ শঙ্কর রায়।

বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যানসেলর মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলা এসেম্ব্লির সভাপতির পদপ্রার্থী বলিয়া প্রকাশ।

সুবিনয়?—একটা মেয়ের জন্য নিজের এমন অমূল্য জীবনটা নষ্ট করবি?

সুবিনয় শব্দ করে হেসে ওঠে: রেণু?—রেণুকে কবে ভুলে গেছি,—আর তোরা কি ভাবিস একটা মেয়ের প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আমি মদ ধরেছি,—দূর এ আমার নেশা—!

চঞ্চলের আর ভাল লাগছিল না। ঘরের ভেতরকার অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মাঝে সে হাঁফিয়ে উঠছিল, এবার সে উঠে পড়ল—

—আজ তাহলে আসি সুবিনয়?—

সে কোথায় নেমে এসেছে—কেন? কার দোষে?—রেণুকে ভাল বেসেছিল সে,—রেণুর কাছেই সে পেয়েছিল প্রেমের গভীর স্বাদ। তার হৃদয়-যমুনা উদ্বেল করেছিল এই রেণু! দিনের পর দিন—একটানা আনন্দের মাঝখান দিয়ে স্বপ্নের মত তার দিনগুলো কাটছিল। কোথা থেকে কি হয়ে গেল?—কোথায় গেল রেণু? কোথায় গেল তার স্বপ্নের মায়াপুরী? কেমন করে ধীরে ধীরে নেমে এসেছে—এই নিম্নতম স্থানে। মদকে সত্যি সুবিনয় ঘৃণা করত। কেমন করে মদ ধরল—ভুলে যাবার ওষুধ কে তাকে

প্রথম শেখাল? ওষুধের বিবক্রিয়া তার শরীরে আরম্ভ হয়েছে, তার জীবনী শক্তি,—তার সমস্ত কিছু আজ ধ্বংসের মুখে ছুটে চলেছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।...সমস্ত অন্তর মথিত করে একি গভীর ব্যথা,—সুবিনয় কিছুই বুঝতে পারছে না—এ কিসের ব্যথা?—কিসের জন্তে তার সমস্ত হৃদয় হাহাকার করে উঠছে?

উঃ, মেয়েরা অভিনয় করতে পারে সুন্দর। রেণু বলত সুবিনয়কে ছাড়া সে কিছুতেই বাঁচতে পারে না। রেণুই তার হৃদয়ের ভালবাসাকে সজাগ করে তুলেছিল। সে ত ব্যস্ত ছিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর ভেতর। হঠাৎ ধূমকেতুর মত রেণুর আবির্ভাব। বইয়ের কারা-প্রাচীরের ভেতর সে ত নিজেকে বন্দী করে রেখেছিল। প্রেমের সোনার কাঠীর স্পর্শে—রেণুই তাকে বাইরে নিয়ে এল।—কিন্তু এত বড় অভিনয় সে কি করে করল?—

সুবিনয় চমকে উঠল। এ কি চিন্তা সে করছিল,—ছিঃ ছিঃ,—একটা মেয়ের চিন্তা,—যে তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে—যে তাকে বঞ্চিত করেছে। এ চিন্তা তার করা উচিত নয়,—চিন্তাকে ডুবিয়ে দিতে হবে, ভুলে যেতে হবে সব। সুবিনয় বিছানা থেকে উঠে বোতলের বাকী মদটা খেয়ে ফেলল। এবার সে ঘুমুবে,—খুব ঘুম তার পাচ্ছে। মৃত্যুর মত শান্তিময় সুন্দর একটা ঘুম তার দরজায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে,—তাকে ঘুমিয়ে পরতে হবে, আত্ম বিস্মৃতির দেশে তাকে চলে যেতে হবে।—টলতে টলতে সুবিনয় বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। হ্যাঁ ঘুম তার আসছে, সুন্দর নিটোল একখানা ঘুম,—একটানা অনেকক্ষণ ধরে!—

ওই যে পাশের বাড়ীতে মেয়েদের চিৎকার থেমে আসছে, মোটর ও ট্রামের শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসছে, ঢং ঢং করে ঘড়িতে কটা বাজল—আঃ জ্বালাবে, থামবে না নাকি?—বেশী শব্দ হলে ঘুম আসবে না,—শরীর অবশ,—দেহেতে অনাবিল ক্লান্তি। সমস্ত ঘুরছে, বাড়ী, কলকাতা সহর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইডেন গার্ডেন, লেক্, পাওনাদার, চঞ্চল, রেণু—সব ঘুরছে—ঘুম তার আসছে—সুন্দর নিটোল ঘুম!!

পরদিন সুবিনয় ভোর হতেই বের হল টাকার সন্ধানে,—হাতে একটা পয়সা নেই,—মাসের শেষ! কোথাও টাকা সে পেল না। বাজারে এমন দেনা তার হয়েছে যে কেউ টাকা ধার দিতে চায় না। যারা দেয় তারা না পাবার আশা করেই দেয়। হ্যাঁ টাকা সে পেতে পারে—বাস্ত ভিটেখানা বন্ধক দিয়ে...কিন্তু মন কিছুতেই সায় দেয় না—! এ বাড়ীর প্রত্যেক জায়গায় তার বাপ মার স্মৃতি জড়ান। প্রত্যেক ইটটী বাপের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া—পারবে না সুবিনয় এই স্মৃতিটুকুকে নষ্ট করে দিতে। যতই উচ্ছৃঙ্খল সে হোক না কেন—যতই নিচে সে নেমে আসুক না কেন—তার দ্বারা একাজ সম্ভব হবেনা।

সুবিনয় অভাবকে এত বড় করে কোনদিন দেখেনি—। টাকা হাতে পেয়ে কিছু বিবেচনা না করে সে উড়িয়ে দিয়েছে, মুঠো মুঠো ধূলোর মত। দৈন্য নিয়ে গর্ব্ব করবার মত কিছু নেই তা' সুবিনয় আজ বেশ ভাল করে বুঝেছে। তবু নিজেকে সামলাতে কোনদিন পারেনি। টাকা পায় সে অনেকের কাছে, অভাবে পড়ে সুবিনয় তাদের কাছেও টাকা চেয়েছে—পায় নাই. দেখিয়েছে নানা রকম অজুহাত। কে দেবে?—তারা বোকা নয়—টাকা যখ নিয়েছিল তখনি তারা ঠিক জানে সুবিনয়ে টাকা ফেরৎ দিতে হয় না।

সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে ঘুরে সুবিন কোথাও টাকা পেলনা। টাকা তার চাই—টাকা যে তার প্রয়োজন। সর্ব্বনাশের নেশা তাকে যে পেয়ে বসেছে—তার রক্তের মাঝে অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলায় নৃত্য! রোধ করবার মত শক্তি যে হারিয়ে ফেলেছে!—টাকা তার চাই। একজন পারে তাকে রক্ষা করতে—আজও সে পারে তার জীবনের চাকাটা ঘুরিয়ে দিতে—রেণু তাকে পারে বাঁচাতে। মানুষের মত মানুষ হয়ে যে বাঁচতে পারে—সুন্দর নিখুঁত একটী সংসার রচনা করে সে আবার সজীব হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু... সব অলীক, মিথ্যা—কল্পনার রঙীন ফানুস!

সুবিনয়ের মাথায় নূতন একটা খেয়াল চাপল। বহুদিন রেণুদের বাড়ীর দিকে যায় নি। ওপথ দিয়ে ওপাড়ায় যাওয়া সে বহুদিন ছেড়ে দিয়েছে। রেণুর মার কাছে টাকা চাইলে হয় না?—কেমন করে চাইবে? কতদিন সে ওদের বাড়ী যায় নি—প্রায় দুবছর। কেমন করে কাটিয়ে উঠবে আবার নূতন করে পরিচয়ের জড়তা! না তবু তাকে চাইতে হবে। মান অপমান—প্রয়োজনের কাছে ভূয়ো—অর্থশূন্য। তার টাকা চাই—যেমন করে হোক টাকা তাকে জোগাড় করতেই হ'বে।

লেক্ রোডের ওপর মস্ত বড় বাড়ী। বাড়ীতে আজ কিসের উৎসব। চারিদিক আলোয় আলোময়—ছাদের ওপরে ত্রিপল খাটিয়ে ছাউনি করা হয়েছে। সবাই ব্যস্ত। কিসের এত ঘটা—সুবিনয় ভাবলে, রেণুর মার কাছে সে টাকা চাইবে—তা ওসব চিন্তায় কি দরকার। পুরনো দিনে মত সুবিনয় সদর পার হয়ে একেবা দোতালায় গিয়ে উঠল! পথে দেখা রেণু সঙ্গে!

—সত্যি, আমি ভেবেছিলুম বিনয় আজ তুমি নিশ্চয় আসবে। যতই কে রাগ করে থাক আমার ওপর, এখবর পেয়ে তুমি আসবে।

বোকার মত সুবিনয় জিজ্ঞাসা করলে; কিসের খবর?

—ঠাট্টা করছ বুঝি?—তোমার কাছে আজ সকালে লোক যায়নি?—রেণু জিজ্ঞাসা করলে।

—লোক? আমার কাছে?—না যায়নি ত।—

—বাঃ রে আজ যে আমার বিয়ে।—রেণু লজ্জায় রাঙা হয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—বিয়ে?—বেশ বেশ খুব খুসী হলুম।—সুবিনয় টেনে টেনে হাসতে লাগল।

রেণু সুবিনয়কে একটা ঘরে এনে বসাল। রেণুও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

—উঃ! কি রোগা তুমি হয়েছ বিনয়দা,—চোখের কোণে কালী পড়ে কি অদ্ভুত চেহারাই হয়েছে। সুবিনয় ঠোঁটের কোণে হাসি এনে বললে: সত্যি নাকি?—তা বয়স ত হচ্ছে।

—দুবছরে এমন কি তোমার বয়স বেড়ে গেল বিনয়দা'—রেণু ভুরু কাঁপিয়ে প্রশ্ন করলে!

সুবিনয় কোন উত্তর দিল না। ভাবছিল, সেই অজিতের সঙ্গে রেণুর বিয়ে। ধূমকেতুর মত, ভুমিকম্পের মত এই অজিত তার জীবনে প্রবেশ করে—সাজান সুন্দর স্বপ্নকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে।

—অজিত বাবুর সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হয়েছে ত?—সুবিনয় জিজ্ঞাসা করলে!

রেণু লজ্জিত ভাবে বললে: না, সুধীন রায়ের সঙ্গে—বিলেত থেকে আই-সি-এস পাশ করে এসেছেন। সুবিনয় গম্ভীর ভাবে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলে তারপর বললে: তোমার মাকে একবার ডেকে দেও ত?—বড্ড দরকার।—রেণু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাকে ডাকতে।

সুবিনয় টাকা কিছু পেল। উৎসব গৃহের কোলাহলের মাঝখান থেকে সুবিনয় বেরিয়ে এল। উঃ এ সব সে নিজের চোখে দেখতে পারবে না।

ট্যাক্সি থেকে বোতল দুতিন মদ নিয়ে সুবিনয় ঘরে এসে ঢুকল। আজ তার উৎসব—মহা উৎসব! আনন্দ। স্ফুর্ত্তি আজ সে করবেই,—রেণুর আজ বিয়ে! একি কম আনন্দের কথা। সুবিনয় চেয়ারটায় বসেই বোতলগুলো কর্ক-স্ক্রু দিয়ে খুলে ফেলল। তারপর চলল—আনন্দের অভিসার গ্লাশের পর গ্লাশ।

নিবেদন

"খেয়ালীর" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মানার্থে আগামী শুক্র ও শনিবার (১১ই ও ১২ই) ন্যাশন্যাল নিউজ-পেপার্স লিঃ-এর অফিস ও প্রেস বন্ধ থাকিবে। এবং বুধবার ১৬ই সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্ম্মা পূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকিবে। আগামী সপ্তাহে এতগুলি ছুটীর একত্র সমাবেশের ফলে "খেয়ালী" আগামী বৃহস্পতিবারের পরিবর্ত্তে শুক্রবার ১৮ইসেপ্টেম্বর বাহির হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"খেয়ালী"

সুবিনয় টলতে টলতে উঠে আলমারিটা খুলে কম্পিত হস্তে একটা ফটো বের করে নিয়ে এল!—ছবিটা হাতে নিয়ে সে আপন মনে বকতে লাগল: রেণুর ফটো এ নয়—সে রেণু মারা গেছে।—সত্যি সে রেণু আমায় ভালবাসত—খুব ভাল বাসত,—বলত আমার ছাড়া সে বাঁচবে না একদিনও! হঠাৎ কি মনে করে—মুখ ঢেকে সুবিনয় ছেলে মানুষের মত কেঁদে উঠল।—ছিঃ কি দুর্ব্বল সে।

পেটের মধ্যে অসংখ্য ছুঁচ ফোটানোর মত বেদনা আরম্ভ হল—উঃ!—সুবিনয় যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে উঠল। আবার সেই বেদনা। এই আনন্দের দিনে একটু স্ফুর্ত্তি করবে তারও উপায় নেই। বিছানাটায় এসে সুবিনয় শব্দ করে শুয়ে পড়ল।...সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। না না আজ বেদনা হলে চলবে না—আজ তাকে মশগুল হতে হবে। সুবিনয় উঠল…বোতল থেকে আবার মদ ঢাললো—সোফাটায় হেলান দিয়ে বসতে চেষ্টা করল…না অসহ্য বেদনা,—এমনি বেদনা মানুষেরও হয়?… আয়নাতে সুবিনয়ের চেহারাটা ভেসে উঠল—রোগা হয়েছে সে—চোখের কোনে তার কালী পড়েছে—তাতে রেণুর কি?—সুবিনয় হাতের গ্লাশটা ছুঁড়ে মারল আয়নাটার ওপর—গভীর আর্ত্তনাদ করে গ্লাশটা ও আয়নাটা ভেঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

দুতিনবার পড়তে পড়তে সুবিনয় বাথ-রুমে এসে হাজির হল,—সুইচটা কিছুতেই খুঁজে পায় না—পেটের নাড়ী ছিঁড়ে বমি বেরিয়ে এল। সুইচ টিপে আলোটা জেলে সুবিনয় বসে পড়ল—অসম্ভব রকমের বমিতে সমস্ত বাথ-রুম ভরে গেল…লাল বমি—সুবিনয় মাথাটা নীচু করে দেখলে…জবা ফুলের মত লাল রক্ত—সমস্ত শরীর তার ক্লান্তিতে ভরে গেছে। উঠতে সুবিনয় কিছুতেই পারছিল না। আবার এক ঝলক রক্ত—শুধু রক্ত, লাল, প্রিয়ার গালের রঙের মত, রঙীন আপেলের মত লাল। সমস্ত ঘরময় উৎকট গন্ধ।

সুবিনয় কিছুতেই বসে থাকতে পারছিল না—তার ঘুম আসছে যেন কত রাত সে ঘুমোই নি…ঘুম আসছে…উঠতে সে পারবে না।…সমস্ত শিরা উপশিরা ভীষণভাবে টানছে…সুবিনয় শুয়ে পড়ল রক্ত ও বমির মাঝখানেই—আরাম করে শুয়ে পড়ল—তার ঘুম পেয়েছে—কাল ঘুম—হয়ত এঘুম তার আর ভাঙ্গবে না।

ব্যস্ত। তাঁর আনুসঙ্গিক কাজ শেষ হ'য়েছে—ষ্টুডিও খালি পেলেই তিনি "মুক্তি-স্নানে" রত হবেন।

* * *

জ্যোতিষ মুখুজ্যে অপ্রতিহতগতিতে হিন্দী "তরুণী" শেষ কোরে ফেলেছেন। প্রকাশ যে, জ্যোতিষবাবু এই ছবিখানা শেষ কোরেই অন্য একটি ষ্টুডিওতে যোগদান কোরবেন। এ কথা কী সত্য!

বিলাসী

ইন্টারন্যাশন্যাল ফিল্ম ক্র্যাফ্ট

বি ইউনিটের নিউ থিয়েটার্স রিলিজ "বিজয়া"র শূটিং প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। ছোটাই মিত্তিরের ছোটাছুটি কমবে আপাততঃ কয়েকদিনের জন্যে। তবুও তিনি বসে থাক্‌বার লোক নয়—পঞ্চ-পাণ্ডব লমভিব্যাহারে এর ফাঁকে তিনি নিশ্চয়ই তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্য্যধারা নিয়ে মন্ত্রণা-সভা বসাবেন। আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর মুখে "বিজয়া"র বিজয়বাণী শুনে আমরাও আশা কোরছি—এ ছবিতে ছোটাই মিত্তিরের গৌরব ছোট হবে না বরং আগের চেয়ে অনেক বাড়বে। আমরা সেই সোণালী দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

কালী ফিল্মস্

শিশিরকুমার ঢাকায় অভিনয়ার্থে আহূত হওয়ায় "টকী অফ্ টকীজে"র শূটিং আপাততঃ বন্ধ রয়েছে। ইত্যবসরে গুণময় বাঁড়ুয্যের "পরভৃতিকা" শূটিং দিন রাত চলছে এবং কাজও এগিয়েছে অনেকটা।

* * *

সুশীল মজুমদার "মুক্তি-স্নানে" উদ্যোগে

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

এদের আগামী ছবি "আলিবাবা" চিত্রজগতে একটা বৈচিত্র্য আন্‌বে নিশ্চয়ই। নৃত্য-গীত-মুখর এই নাটকখানা কোলকাতার আভিজাত্য সম্প্রদায় 'সি-এ-পি' নামে বহুবার অভিনয় কোরে দেশের নরনারীর মনে এক বিপুল আনন্দ আনে। ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স সেই দলকেই নিয়ে "আলিবাবা" চিত্রে রূপান্তরিত কোরেও যে চিত্ররাজ্যে এক নব-প্রেরণা আন্‌বে—এ বিশ্বাস আমরা

করি। সাধারণের অবগতির জন্তে এতে কারা নাম্‌ছেন তা' জানানো গেল—শ্রীমতী সাধনা বসু, মিসেস্ জি, এল, রায়, মিসেস্ মিলি মুখার্জ্জি, কমল বিশ্বাস, এবং পরিচালক মধু বোস স্বয়ং।

* * *

এদের "বাঙ্গালী" ও "বেজায় রগড়" উত্তরায় এখনও বেশ চল্‌ছে। শনিবার থেকে ছবিখানা পঞ্চম সপ্তাহে পড়বে অথচ এখনও পর্য্যন্ত জনসমাগমের অন্ত নেই।

রাধা ফিল্মস্

কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু দৃশ্য গেল হপ্তায় তোলা হ'য়েছে। এ দৃশ্যে সেদিন ছিলেন কুন্দ—কাননবালা, সূর্য্যমুখী—শান্তি গুপ্তা, কমলমণি—মীরা ও নগেন্দ্র—জহর গাঙ্গুলী।

* * *

"বিষবৃক্ষে"র পর এদের বাঙলা ছবি তোলা হবে "বিদ্যাপতি"। শোনা যাচ্ছে এরা অপরেশচন্দ্রের "ছিন্নহারে"র স্বত্ব কিনেছেন। আরও প্রকাশ যে, এই ষ্টুডিও শীগ্‌গির নাকি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওর একটা ইউনিটে বাঙলা ছবি তুলবেন। খবর সত্য কিনা তা' সঠিক জানা যায় নি। কর্ত্তৃপক্ষ জানবেন কী?

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন্

এদের "রামকান্তে"র দালালীর বহর যেন একটু কমে আস্‌ছে। আলোকচিত্রশিল্পি ও সম্পাদক পি, স্তাণ্ডেল তার হাতলটা একটু জোরে ঘুরিয়ে দালালকে খানিকটা চরকি পাক খাওয়ালে' কেমন হয়! পান্নালাল বাবু কী বলেন?

বঙ্গবাসী থিয়েটার্স লিঃ

এই নামে একটি যৌথ-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ইটালী টকী হাউসের বাড়ীর মালিক মিঃ এইচ, কে, দাস খুব সম্ভবতঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে ব্রতী হবেন। অন্য ডিরেক্টার হ'চ্ছেন কোল্‌কাতার চিত্র-জগতে সুপরিচিত মিঃ এস্, আর হেমাদ। মিঃ দাস শাল্‌কিয়ার "মায়াপুরী"র সত্ত্বাধিকারী। এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি অধুনা বন্ধ 'হাওড়া সিনেমা'-র পরিচালনাভার গ্রহণ কোরেছেন এবং চন্দ্র ফিল্মসের "পরপারে" ছবি নিয়ে আসচে ১৮ই সেপ্টেম্বর-এর শুভ-উদ্বোধন হবে! মিঃ হেমাদ ও মিঃ দাসের মিলিত চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি যে সাফল্য গৌরবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—এ বিশ্বাস আমরা করি।

তরুণ ব্যথা

শ্রীকালী সেন

দুঃসহ বেদনা ভরে যৌবনের দীপ্ত দিন গুলি,
কাটিতে চাহেনা আজি হে লতিকা তোমার বিহনে
স্মরণীয় অতীতেরে হে নিঠুরা গিয়াছ কি ভুলি'?
বিশুষ্ক মরুর প্রান্তে ফেলে গেছ যে ব্যর্থ জীবনে।
মনে পড়ে একদিন তোমার ও দুটি বাহুলতা
অধীর আগ্রহভরে এ কঠিন হৃদয় আমার
বেঁধেছিল আলিঙ্গনে, মর্ম্মে কত অকথিত কথা
নিঃশব্দে লুকায়েছিল, বলা আজো হ'ল নাকো আর?
অকস্মাৎ কোথা হ'তে নেমে এল বিপ্লব শর্ব্বরী
উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি অরণ্যের আর্ত্ত কোলাহল
দুঃখের ভীষণ মূর্ত্তি আগ্নেয়-মশাল হস্তে করি
ভস্মীভূত করে গেল সপ্নময় শান্ত বনতল।
তোমার কি মনে পড়ে হে লতিকে প্রেয়সী আমার
বিচ্ছেদের অশ্রুরাজি বিচ্ছেদের দুরন্ত আধার।

বিবিধ

মিঃ রঙ্গস্বামীর অভ্যর্থনা

গত শনিবার ৫ই সেপ্টেম্বর পাঁচ ঘটিকায় ইম্পিরিয়াল রেঁস্তোরার মলিন রুজে "ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স" পত্রিকার ম্যানেজিং সম্পাদক মিঃ সি, এস, রঙ্গস্বামীকে "ইন্সিওর‍্যান্স এণ্ড ফাইনান্স রিভিউ" পত্রিকার ম্যানেজিং সম্পাদক ডাঃ এস সি রায় মিঃ রঙ্গস্বামীর বিলাত গমন উপলক্ষ্যে এক প্রীতিভোজে অভ্যর্থিত করেন। বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং ভদ্রব্যক্তি এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রীদুর্গা প্রসাদ খৈতান, শ্রীঅমৃতলাল ওঝা, শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার, "ইন্সিওর‍্যান্স ওয়ার্ল্ড" পত্রিকার শ্রীসুরেশ রায়, "আনন্দবাজার" পত্রিকার বাণিজ্য-সম্পাদক শ্রীযতীন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায়ের আদর আপ্যায়নে সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

নূতন এটর্ণী

আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কিশোর চন্দ্র রায়চৌধুরী বিগত এটর্ণীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী-পদে বৃত হইয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গৌরবময় হউক ইহাই আমরা কামনা করি।

শিল্প-ভবনে মন্ত্রীর অভ্যর্থনা

গত রবিবার সন্ধ্যায় ২০৮ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ "শিল্প-ভবনে"র স্বত্বাধিকারী মেসার্স এ, বর্ম্মণ এণ্ড কোং, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী নবাব স্যার কে, জি, এম, ফারোকী মহাশয়কে এক অভিনন্দন পত্র দান করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানের শেষে প্রচুর জলযোগে উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে আপ্যায়িত করেন।

বন্যাপীড়িতের সাহায্যার্থে জলসা

মুর্শিদাবাদ বন্যাপ্রপীড়িত নরনারীর সাহায্যকল্পে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর ওআই, ডব্লিউ সি, এ হলে মহারাজা কাশীমবাজারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র লাল ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে এক বিরাট জলসার অনুষ্ঠান হইবে।

বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী ও গায়কগণ, যথা—মহারাজা বসু; মনিবর্দ্ধন; লতিকা রায়; দিপীকা দে; অমলা ঘোষাল; আব্বাস উদ্দিন; মণিকা রায়; অনিল দত্ত প্রভৃতি এই জলসা-অনুষ্ঠানে নৃত্য এবং সঙ্গীতে যোগদান করিবেন। এবং ইহার পর যাদুকর মিঃ পি, সরকার তাঁহার অলৌকিক যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিবেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে সোদর প্রতিম বন্ধু মহারাজা বসু ও তাঁহার সহিত লতিকা রায় ও মণিকা রায় আগামী ৩রা অক্টোবর আজমীরে যে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনী হইবে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। মহারাজার এই সম্মানে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।

আবরণের ভিতর নগ্নতা

শ্রীগণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ 'বারওয়ারী ঠাকুরদা' হরিতারণ ভট্টাচার্য্যি পর্য্যন্ত মুখ ফুটে সেদিন কেষ্ট ঘোষের মুখের ওপর প্রতিবাদ করে বল্লেন, 'ভাল কচ্ছিস না কেষ্ট, এই বয়সে বিয়ে করলে কুফল পাবি—তা আমি বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে আগে থেকেই বলে রাখছি। ছেলে তোর বড় হয়েছে, বরং তার বিয়ে দিয়ে বউমা নিয়ে সুখে-শান্তিতে ঘর সংসার কর।'

মুখ কাঁচুমাচু করে কেষ্ট বল্লে, 'তা ঠাকুর্দা সাধে কি আর বিয়ে কচ্ছি গা, দায়ে পড়েই করতে হচ্ছে—নইলে আমার আবার বউয়ের দরকার কি?'

—'ও…' বলে ঠাকুরদা একটু মুচকী হাসলেন, বল্লেন, 'দেখ কেষ্ট, দায়ে পড়ে বিয়ে কচ্ছিস বলে আমাকে ঠকাতে পারবিনে।… হাজার হোক তোদের চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশী বুঝলি।…এই বয়সে বিয়ে করে কি দায় থেকে উদ্ধার পাবি জিজ্ঞেস করি? বামুনের ছেলে, বলে রাখছি—এ কাজে ক্ষান্ত দে কেষ্ট, নইলে পরে পস্তাবি।'

কেষ্ট আস্তে আস্তে বলতে সুরু করলে, 'ব্যাপারটা কি জানলে ঠাকুর্দা; দশটা নয়, পাঁচটা নয়—একটি মাত্র ছেলে, তা বলতে নেই যদি কিছু একটা হয়েই পড়ে শেষে… বংশটাও…'

ঠাকুরদা খেঁকিয়ে উঠলেন, 'থাম থাম—ঢের হয়েছে। বুড়ো বয়সে আর আমার কাছে ধিঙ্গিপনা করিস নি কেষ্ট।…বংশ রক্ষা করবার ভাণ করে গ্রামের মাঝে আর আদিখ্যেতা দেখাস্ নি। ছেলের বয়স হয়েছে, বরং তার বিয়ে দিয়ে বংশ রক্ষা করবার ব্যবস্থা করগে—যা।'

কেষ্ট তৎপরতার সহিত বাধা দিয়ে বললে, 'না না—আমি কি তাই বলছি গা, বুঝলে কি না ঠাকুর্দা; আজ বাদে কাল আমার যদি ভাল মন্দ কিছু একটা হয়…কে দেখবে শুনবে? তিনকুলে কে আমার আছে? ছেলে তো বিদেশে পড়ে থাকে।—তবু ঘরে যদি একটা বউ মানুষ থাকে, মরবার সময় মুখে তো এক ফোঁটা জলও দিতে পারবে। তা ছাড়া স্থাবর অস্থাবর গুণোতো ছেলেটার জন্যে আগলে বসে থাকতে পারবে।'

ঠাকুরদা বুঝলেন একে উপদেশ দিতে যাওয়া নিস্ফল। সেইজন্য আর কোন কথাটি না বলে গম্ভীরমুখে চলে গেলেন। কেষ্টদাসও তাই চাচ্ছিল।

কেষ্ট ঘোষের বয়স আজ পঁয়তাল্লিশের ওপর হ'বে। স্ত্রী মারা গেছে আজ হ'ল তিন বৎসর। একটি মাত্র ছেলে, তাও সে বাড়ী থাকে না। কল্‌কাতার কোন এক প্রেসে কাজ করে। বৎসরান্তে দু'চার দিনের জন্য দেশের বাড়ীতে থেকে আবার তার কর্ম্মস্থলে ফিরে যায়। বাবার ওপর ছেলের কোনকালে আস্থা বা বিশ্বাস ছিল না। মায়ের ওপর বড় টান ছিল। কিন্তু মা মারা যাবার পর থেকে বাবার খবর লওয়া পর্য্যন্ত সে অনাবশ্যকীয় বলে মনে করে নি। বাবার কথা একরকম সে প্রায় ভুলেই গেছল, কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি হঠাৎ বাবার হাতে লেখা একখানা চিঠি পেয়ে সে হতভম্ব অবাক হ'য়ে গেল।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ,

বাবা জীবন অদ্যাবধি তোমার কোন সমাচার অবগত না হইয়া বড়ই চিন্তিত আছি। সাংসারিক কাজের সুবিধার জন্য তোমার নূতন মাকে ঘরে আনিয়াছি। এতদিন কাজে ব্যস্ত থাকায় পত্র দেওয়া হইয়া উঠে নাই। যাহা হউক, তুমি যেন তজ্জন্য রাগ করিও না। বড় হইয়াছ, বুদ্ধি হইয়াছে সবই বুঝিতে পারিবে। তোমায় বেশী কিছু বলিবার নাই। যত শীঘ্র পার কিছুদিনের ছুটী লইয়া এখানে আসিবে। তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবে। আর অধিক কি লিখিব। এখানকার কুশল জানিবে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও।

ইতি তোমার চির হিতাকাঙ্খি পিতা
শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ।

একটা জবাব দেওয়া উচিৎ মনে করেই সে বাবার চিঠির উত্তর দিল।

প্রণাম শত কোটী নিবেদনমিদং

বাবা, আপনার পত্র পাইলাম। মনে করিয়াছি আপনার লেখা পবিত্র পত্রটি ছাপাইয়া কাঁচ দিয়া বাঁধাইয়া শয়ন শয্যার প্রান্তে টাঙ্গাইয়া রাখিব এবং প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ফুল চন্দন দিয়া পূজা করিব। আমি ভাল আছি এবং বড় হওয়ার দরুণ আপনার পত্রের প্রতিটি অক্ষর মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আর অধিক কি লিখিব। আপনাদের এই দূর হইতেই করজোড়ে প্রণাম জানাইলাম।

ইতি আপনার চির হতভাগ্য পুত্র
শ্রীসুবোধ কুমার ঘোষ।

পত্রের এত শীঘ্র জবাব পেয়ে কেষ্ট দাস আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে হাঁক দিল, 'ও বউ, দেখে যাও—দেখে যাও তোমার ছেলে কি সুন্দর চিঠি লিখেছে।…হু হু হবে না; ছাপাখানার কলে কাজ করে,…লেখা জোখা নিয়েই তার কাজ বুঝলে কি না…… অ বউ— শুনছো!'

—'যাই গো যাই—একটু তস্ সয় না, বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েছে।' হন্তদন্ত হ'য়ে মোহিনী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মন্দই বা কি দেখতে! রংটা একটু ময়লা—তা হ'ক। কালো রংয়ে চোখের মহিমা বোঝা যায়। তা মোহিনীর চোখ দুটো হরিণের মত না হ'লেও ওরই মত চঞ্চল। কালো রংয়ের ওপর নিটোল স্বাস্থ্য… ওইটেই মোহিনীর বিশেষত্ব।

—'কি, হয়েছে কি?' বলে মোহিনী এসে দাঁড়াল কেষ্টদাসের পাশে।

ঠোঁটের ডগায় হাসির ঢেউ তুলে কেষ্ট বললে, 'তোমার ছেলে চিঠি লিখেছে।'

—'আমার ছেলে!' মোহিনী অবাক হ'য়ে বলে, 'আমার আবার কবে ছেলে হ'লো গো?'

কেষ্টদাস ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'সেই যে গো কলকাতায় চাকরী করে বলেছিলুম, মনে নেই বুঝি? হা হা… দেখেছ এরই মধ্যে সব ভুলে গেছ।'

—'হাঁ হাঁ, কিন্তু সে তো শুনেছি আমার চেয়ে বয়সে বড়!'

—'ছিঃ ছিঃ—ও কথা বলতে নেই; তাতে কি, তবু সে তোমার ছেলে।' বলতে বলতে কেষ্টদাস নিজে গম্ভীর হ'ল।

মুখটাকে এক অপরূপ ভঙ্গীতে বেঁকিয়ে মোহিনী বললে, 'বাঃ, বেশ যা হোক, যে হ'লো আমার চেয়ে বয়সে বড়—আমি হলাম কিনা তার মা! বুড়ো বয়সে তোমার ভীমরতি ধরেছে নইলে অমন কথা মুখে আনো!'

কেষ্টদাস কোন দিকে যাবে খুঁজে পেলে না। দিশেহারা হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তবে শুনি সে তোমার কে হয়?'

—'তাও বলে দিতে হবে? এটুকুও নিজের বুদ্ধিতে বুঝতে পারো না,—হবে আবার কে?' তরল হাসিতে মুখটাকে ভরিয়ে নিয়ে স্বামীর কাণে কাণে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'আমার সতীনের ছেলে'।

—'কিন্তু হরেদরে তো সে একই।' কথাটা বলে কেষ্টদাস উচ্চরবে হেসে উ'ঠল। মোহিনীও পিছু হটবার নয়, ঘাড় বেঁকিয়ে স্বামীকে ভ্যাক্ করে দারুণ এক কটাক্ষ ছুড়ে মারলে ঠিক লক্ষ্যভেদী বানের মত। বুড়ো কেষ্টদাস হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল। মোহিনী আর সেখানে দাঁড়াল না। বুড়োর চো'খের সামনে দুনিয়াটাকে নিতম্বের পাকচক্রে এক পাক ঘুরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

দুপুরের রোদ। গাছের তলায় বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু ফাঁকায় গা যেন পুড়ে যায়। স্নানটি সেরে সবে মাত্র কেষ্টদাস আরশী চিরুণী নিয়ে বসেছে এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, 'বলি কেষ্টদা বাড়ী আছ না কি হে!'

কেষ্টদাস সাড়া দিয়ে বললে, 'কে—?'

—'আমি পুলিন'। বলতে বলতে সোজা ভেতরে ঢুকে এসে পুলিন দাবাটার ওপর ধপ করে বসে প'ড়ল।

—'তা হঠাৎ দুপুর বেলা কি মনে করে ভায়া?' চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কেষ্টদাস জিজ্ঞেস করলে।

—'আর দাদা গেরোর কথা বল কেন, মুদীর দোকান করিনি তো, যেন দানছত্র খুলেছি। ব্যাটারা ধার করে জিনিষ খেয়ে খেয়ে দেখছি আমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। কেনরে বাপু পয়সা যখন দিতে পারবি নি তখন ও শুয়োরের গু' না খেলেই নয়।' খানিক থেমে এদিক সেদিক তাকিয়ে বললে, 'বৌদি কোথায়, অন্তঃপুরে নাকি?' আপন রসিকতায় পুলিন নিজেই হেসে উ'ঠল, ডাকলে, 'অবৌদি—বৌদি শুনছো, কোথায় গেলে গো?'

ঘোমটা মাথায় মোহিনীকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। আড় চোখে পুলিন নিমেষের জন্যে দেখে নিলে। কণ্ঠ থেকে ভাষার জলপ্রপাত গড়িয়ে প'ড়ল সঙ্গে সঙ্গে, 'যাই বল দাদা, সত্যি কথা বলতে কি, বৌদি আমার রূপে গুণে লক্ষ্মী। গাঁয়ের লোক শত মুখে সুখ্যাতি করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ দাদা, এই গাঁয়ের লোকেরাই একদিন বিয়ের আগে তোমায় কি না বলেছিল;—বলেনি শুধু এই পুলিন। বলবোই বা কেন, হাঁড়ির খবর তো তারা কেউ জানে না। জানি, এই সংসারের ভার এমন বৌদির হাতে না পড়লে যে দু'দিনেই তছনছ হ'য়ে যাবে। …তা বৌদি আমায় দেখে আবার ঘোমটা কেন?—আমি যে তোমার ঠাকুরপো হইগো। তুমি তো জান না, আমরা দুটি দাদা ভাইয়ে যে এক প্রাণ,—কি বল দাদা?'

কেষ্টদাস সায় দিয়ে বললে, 'গাঁয়ে ঘরের বউ, বুঝেছ কি না ভায়া; লজ্জা-টজ্জা প্রথম প্রথম একটু হয় বৈ কি।…তা দু'দিন আবার আসা যাওয়া করলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

—'তা যা বলেছ দাদা, লজ্জা একটু থাকাও দরকার। দেখ না, রমেশের বউ কি বেহায়াপনা করেই না বেড়ায়। সহরের মেয়ে এতই কিরে বাপু? বলতে নেই এসব দেখে শুনে আমাদেরই লজ্জায় মাথা কাটা যায়।'

বৌদির অদর্শনে পুলিন চম্‌কিয়ে উ'ঠল। বুঝলে, কথার ফাঁকে কখন সরে পড়েছে। অনেক ভেবে চিন্তে প্রাণ ঢেলে মিষ্টী সুরে

ডাকলে 'কোথায় গেলে গো,—বৌদি···
অ-বৌদি !'

কোথায় মোহিনী তার পাত্তাই নেই। পুলিন দেখলে আসলে তারই দোষে ব্যাপারটা দিকে বিপরীত হয়েছে।

মোলায়েম কণ্ঠে পুলিন বললে, 'দাদা একটু জল খাওয়াও না, বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

কেষ্টদাস সশব্দে হেসে উঠল, 'আমিই যদি জল খাওয়াব, তবে বিয়ে করলুম কি করতে হে? বৌদি রয়েছে, বৌদিকে বল না দিয়ে যেতে। তা ভায়া জল কেন, বেলা হয়েছে আহারটা এখানে সেরে গেলেই হ'ত?'

—'না দাদা, বৌদিকে আর এত বেলায় কষ্ট দোব না!' পুলিনের স্বরে সহানুভূতির আমেজ। 'অ বৌদি!' দরদী গলায় পুলিন ডাকলে, 'এক গ্লাস জল দিয়ে যাওনা ভাই!'

মোহিনী একগ্লাস জল দিয়ে গেল।

—'তা ভায়া শুধু জলই খাবে, একটু মিষ্টি মুখে দিলে হ'ত। কেষ্টদাস বললে।

—'না না কোন দরকার নেই। বৌদি নিজের ইচ্ছায় যা দিয়ে গেছে তার বেশী এক চুলও নয়।' বলে একটু হেসে নিঃশেষে জলটুকু চুমুক দিয়ে টেনে নিলে।

সন্ধ্যাবেলা দোকানটিতে জলছড়া দিয়ে সবেমাত্র পুলিন ধুনা জ্বেলে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে, এমন সময় কেষ্টদাস গিয়ে হাজির।

কেষ্টদাস বললে, 'ভাই কিছু জিনিষ দিতে হবে!'

—'হাঁ হাঁ এক্ষুণি, বল কি কি চাই?' পুলিনের কণ্ঠস্বরে খাতির যেন চলকে ওঠে।

—'কিন্তু ভাই পয়সা এখন দিতে পারবো না!'

—'ওইতো মুস্কিল করলে দাদা। এই ভরা সন্ধ্যেবেলা ধারে কি করে মাল ছাড়ি বল দেখি।'

কেষ্টদাসের আশাটা কেমন যেন দমে গেল।

পুলিন অভয় দিয়ে বললে, 'তা যখন এতটা কষ্ট করে এসেছ তখন তোমায় আমি ফেরাবো না। দাদা তুমি বলেই তাই, নইলে অন্য কেউ হলে ক্যাট্‌ক্যাট্ করে দু'কথা শুনিয়ে দিতুম।' বলে পুলিন ট্যাক থেকে দুটা পয়সা বার করে বাক্সটার ফুটোয় গলিয়ে ফেলে দিতে দিতে বললে, 'জানলে কিনা দাদা বউনি না করে ধারে মাল দেওয়া শাস্ত্রে বারণ আছে।'

—'হেঁ হেঁ হেঁ, তাত ঠিক; তবে কিনা ভায়া তুমি বলেই আসা।'

যাবার আগে পুলিন দু'খানা সাবান কেষ্টদাসের হাতে গুজে দিয়ে বললে, 'এ দু'খানা সাবান বৌদিকে দিলুম দাদা। গরীব মানুষ, দিতে থুতে পারি না, নইলে বৌদিকে সাজাতে গোজাতে চিরকালের সখ আমার। বৌদিকে আমার নাম করে বলো এ দু'খানা তাঁকে মাখতে দিলুম।'

—'এর এক-এক খানার দাম কত করে?' উৎফুল্ল মুখে কেষ্টদাস সাবানের গন্ধ শুকতে শুকতে জিজ্ঞেস করলে।

পুলিন সগর্ব্বে জবাব দিলে, 'দামের কথা জিজ্ঞেস করো না দাদা, দাম আমি এর নেবো না; নইলে এ সাবানের বিক্রী কত! সহরের মেয়েরা এ সাবান মাখে। খাস বিলেতের সাহেবেরা এ সাবান তৈরী করেছে—যা তা নয়!'

কেষ্টদাস অবাক হ'য়ে পুলিনের গর্ব্বো-স্ফীত মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

—'ভুলে যেওনা দাদা, মনে করে দিও; বলো যে আমি মাখতে দিয়েছি।'

যেতে যেতে কেষ্টদাস বললে, 'বলবো বই কি ভায়া। এ সাবান তো তোমার বৌদি কখনও মাখে নি, দেখো সাবান পেয়ে ও কত খুশী হবে।' চকিতে সাবান দুটোর দিকে হর্ষ-ভরা দৃষ্টি ফেলে বললে, 'তা ভায়া তুমি আর আমাদের ওদিকে যাও না কেন?'

—'আর দাদা কাজের ভিড়িকে যাওয়া হয়ে ওঠে না'।

—'তা যেও একদিন বুঝলে'।

—'হাঁ যাবো বই কি; ফাঁক পেলেই একদিন যাবো'।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে পুলিন আজকাল বৌদির সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে। ইদানীং মোহিনী ওকে দেখে মোটেই ঘোমটা দেয় না। কেমন হেসে হেসে চোখ নাচিয়ে ঠাকুরপোর সঙ্গে অনর্গল কথা কয়ে যায়। দু'টিকে এক সঙ্গে দেখলে মনে হয় যেন ওরা কতদিনের পরস্পরের পরিচিত।

কেষ্টদাস বাড়ী ছিল না।

কথায় কথায় পুলিন সে দিন ফস্ করে বলে ফেললে, 'বৌদি মাইরি বলছি, তোমার মতন ত্রিভুবনে আর একটিও মেয়ে দেখলাম না। ও পাড়ার পটলি তোমার রূপের কাছে মোটেই দাঁড়াতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি বৌদি তোমার চাঁদ মুখখানার পানে তাকালে লোভ হয়।'

লজ্জায় মোহিনী দেহটাকে কুঁকড়ে নিয়ে মৃদু হাস্যে মাথাটা নীচু করে নিলে।

আড় চোখে পুলিন মোহিনীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে বললে, 'সত্যি কথা য', তা আমি বলবো তাতে আমায় লোকে ভালই বলুক আর মন্দই বলুক।'

—'তুমি যেন দিনকে দিন কেমন হচ্ছ ঠাকুর পো।' আনত চোখের দৃষ্টি হেনে মোহিনী বললে, 'আমার বাপু এসব শুনলে বড় লজ্জা করে।'

পুলিন হাসলে না; গম্ভীর মুখে বললে, 'তোমাদের তো লজ্জা হবেই, কেননা তোমরা হচ্ছ মেয়ে মানুষ। তোমাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কিন্তু আমরা হচ্ছি পুরুষ মানুষ, তার ওপর তুমি হও বৌদি।

মাইরি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করবো না তো কার সঙ্গে করবো শুনি?'

—'যাও বাপু তোমার সঙ্গে আর বকতে পারি নে। কথায় তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা দায়।' বলেই মোহিনী হাসিমুখে দাওয়া ছেড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

পিছু পিছু ঢুকল পুলিন। প্রাণের সবটুকু দরদ ঢেলে ডাকলে, 'বৌদি।'

মিনতি ভরা এ স্বর। মোহিনী গলে গেল। ওর দিক চেয়ে বললে, 'কেন ঠাকুর পো!'

'—রাগ করলে আমার ওপর?' ব্যথায় কণ্ঠস্বর যেন অভিমানে ভেঙ্গে পড়ে।

ব্যাপারটাকে সহজ করে নিতে মোহিনী সশব্দে হেসে উঠল, বললে, 'শোন কথা একবার, রাগ করতে যাবো কেন?'

—'না সত্যি বলছো মাইরি?'

—'হাঁ গো হাঁ, সত্যি বলছি না তো কি মিথ্যে বলছি।'

—'আচ্ছা যদি একটা পান খাওয়াও, তাহলে বুঝবো রাগ করো নি।' বলতে বলতে পুলিন মোহিনীর কাছে এসে ঘেঁসে দাঁড়াল।

—'ও—এই কথা' মোহিনী হেসে ফেললে, 'তা, আগে বল্লেই তো হ'ত। ... আচ্ছা একটু সবুর করো আমি এক্ষুণি সেজে দিচ্ছি।'

পান সেজে মোহিনী দিতে গেল। নেওয়া দূরে থাকুক, পুলিন আড়ষ্টভাবে মোহিনীর পাশে ধপ্ করে বসে পড়ল, বললে, 'না বৌদি রাগ তুমি নিশ্চয় করেছ। রাগ তোমার এখনও যাই নি।'

মোহিনী চেয়ে দেখলে পুলিনের মুখটি যেন কেমন ম্লান। জোর গলায় বললে, 'মাইরি বলছি ঠাকুরপো রাগ আমি মোটেই করি নি।'

সাহস করে পুলিন বললে, 'আচ্ছা তা হলে পানটা খাইয়ে দাও। তা যদি পারো তা হলে বুঝবো রাগ করো নি।' কথাটা বলে সে সাগ্রহে মোহিনীর মুখের পানে করুণ নয়নে চেয়ে রইল।

ওর মুখে পানটা তুলে দিতে দিতে মোহিনী হেসে বললে, 'নাও এতক্ষণে সাধ পূর্ণ হ'লো তো?'

থপ্ করে মোহিনীর হাতটি ধরে পুলিন বললে, 'না মাইরি এখনও সাধপূর্ণ হয় নি।' গাঢ় তার স্বর।

এত চঞ্চলতা, এত হাসি—কোথায় যেন নিমিষে, হারিয়ে গেল। মোহিনীর মুখে কথা নেই। সারা শরীরটা থম্ থম্ করছে। চোখের তারা দুটো স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেছে।......পুলিন নিবিড় ভাবে মোহিনীকে নিজের কোলের ওপর টেনে নিতেই সে নিস্তেজ হ'য়ে এলিয়ে পড়ল। দৃঢ় আলিঙ্গনের চাপে তার কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে কেঁপে উঠল।

—'ঠাকুর পো!' মোহিনীর স্বরে নিঃশ্বাসের কম্পনতা।

—'কি?'

—'না না'। নিজেকে মুক্ত করে শশব্যস্তে মোহিনী অবিন্যস্ত কাপড়টা আঁকড়ে ধরে দেহটাকে দুমড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

পুলিন বুঝলে এতদিনের সব কৃত্রিম আদর স্নেহ মুহূর্ত্তের আকস্মিক উন্মাদনায় চিরতরে কদর্য্যরূপে ধরা পড়ল। লক্ষ্য করলে এ দু'দিনে বৌদির কাছে সে যেন কতদিনের অচেনা হয়ে গেছে।

কেষ্টদাস বলে, 'কি গো, কই আগে তো এতটা ঘোমটা দিতে না ঠাকুরপোকে দেখে। আজ আবার হ'লো কি? কি হে পুলিন, ব্যাপার কি তোমার বৌদির, বলতে পারো?'

—'কি জানি দাদা'। মুখখানা শুকিয়ে পুলিন বলে, 'বৌদির মতি গতি বৌদিই জানে।'

প্রাণখোলা হাসি খেলে যায় কেষ্টদাসের মুখের ওপর দিয়ে, 'তা যা বলেছ ভায়া,—ওদের মতি গতি বোঝা বড় শক্ত। সেই যে বলে না,

> সব কিছু জানতে পারো—
> নারীর মন চিনতে নারো।'

মনে মনে পুলিন চঞ্চল হয়ে ওঠে। 'আচ্ছা দাদা আজ তাহলে উঠি।'

—'কি হে এই তো সবে এলে, এখুনি যাবে কি? বসো বসো তামাক টামাক খাও।'

—'না দাদা মাপ করতে হবে, আর বললে চলবে না। রাত অনেক হয়ে যাবে তাহলে'। বলতে বলতে পুলিন বেরিয়ে গেল।

—'তা হলে আসছো নাকি হে কাল সকালে।' কেষ্টদাস হেঁকে বললে; পুলিনের কাছ পর্য্যন্ত সে স্বর আর পৌঁছাল না, ব্যর্থতায় ফিরে এল।

গভীর রাত

কেষ্টদাস অকাতরে ঘুমুচ্ছে। চারিদিক শুন্‌শান্। সমস্ত গাঁটা নিস্তব্ধতায় আর অন্ধকারে থম্‌থম্ করছে।......

—'ওগো শুনছো!' ঘুম-ভাঙা স্বরে, নিঃশ্বাস মিলিয়ে মোহিনী ডাকলে। অবচেতন আর চেতনের মাঝামাঝি হ'তে কেষ্টদাস জবাব দিলে, 'হু।'

—'পেটটা বড় কন্‌কন্ করে উঠলো। একবার ঘাটে যাচ্ছি। দরজাটা ভেজান থাকবে, একটু সজাগ হয়ে ঘুমিও বুঝলে?' ঘুমের ঘোরে কথাটা কেষ্টদাস শুনতে পেলে না। মোহিনী ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারে না। পেটটা ঘুলিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি হারিকেন জেলে দরজাটা ভেজিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। যেতে যেতে মোহিনী অন্ধকারের ভেতর এক অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়িয়ে
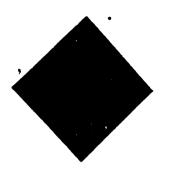
পড়ল। হারিকেনটা তুলে ধরতেই ও বিস্ময়ে চমকে উঠল, 'একি ঠাকুর পো!—এত রাত্তিরে তুমি এখানে?'

পুলিন আস্তে আস্তে মোহিণীর কাছে সরে এল, বললে, 'হাঁ আমি এখানে। তুমি এখানে? এ্যা, বলো মাইরি—জবাব দাও?' হারিকেনের আলো লেগে স্পষ্ট বোঝা গেল পুলিনের চোখ দু'টো ঘোলাটে, রক্তজবার মত লাল। শিকারের গন্ধে মুখখানা স্ফীত হয়ে উঠেছে।

মোহিণীর ভয় হয়ে গেল, কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'আমি ঘাটে এসেছি ঠাকুর পো।'

—'বেশ করেছো, ভালই হয়েছে মাইরি; কষ্ট করে আর তোমার কাছে যেতে হ'লো না। তুমি আপনিই এসেছো···হা হা হা'। পৈশাচিক আনন্দের হাসি অন্ধকারের বুকে তীক্ষ্ণ হয়ে বেজে উঠল।—'সেদিনের সাধ আর পূর্ণ করলে না মাইরি—'

পুলিনের দু'টি ব্যগ্র বাহু মোহিণীকে ধরতে গেল। মোহিণী সভয়ে চীৎকার করে উঠল, 'ঠাকুর পো!' সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল। ভীতকণ্ঠে অনুনয় করে বললে, 'একি করছো ঠাকুর পো! আমায় ছেড়ে দাও,··· তোমার দু'টি পায়ে পড়ি আমায় যেতে দাও!······'

হারিকেনটা ঠিকরে পড়ল একদিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ করে মদের তীব্র ঝাজ। মোহিণী আর্তনাদ করতে গেল কিন্তু পারলে না। পুলিনের ঠোঁট দু'টি সজোরে তার ঠোঁট দু'টিকে চেপে ধরে ফেললো। নিঃশ্বাস নিতে পারে না মোহিণী। নড়বার উপায় নেই। নিবিড় বাহু বেষ্টনে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। ভয়ে, নিষ্ফল আক্রোশে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

অন্ধকারের ভেতর থেকে অকস্মাৎ দুটো লোক ছুটে এল। একজন ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'মুখের ভেতর কাপড় গুজে দে, নইলে মাগী চেঁচাবে···ব্যস্ আর দেরী নয়,—গোয়াল পাড়ায় মাঠ দিয়ে সোজা—'

সঙ্গে সঙ্গে মোহিণীকে কোলে তুলে নিয়ে লোক ক'জন অন্ধকারের অন্তরালে নিমিষে মিলিয়ে গেল।

* * *

পুলিশের তদন্ত চলল। কিন্তু মোহিণীর কোথাও পাত্তা পাওয়া গেলনা। দুঃসহ অপমান মাথায় নিয়ে গ্রামের মাঝে কেষ্টদাস চিরকালের মত হেঁট হয়ে রইল।'

পুরো দু'টি বছর নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে!

মোহিণী আর বন্দিনী নয়। বাজারে আজ তার চাহিদা কত। নাম বদলে রেখেছে সুরা সুন্দরী। অপরের মনস্তুষ্টির জন্য সে কি না করতে পারে? সিগারেট দাও, মদ দাও—কিছুই বাদ যায় না। কিন্তু সব ওই টাকার খাতিরে।

কলিকাতার বিখ্যাত হাটে সে বসেছে রূপ-যৌবনের দোকান খুলে। নতুন মৌচাক। দলে দলে লোক আসে অন্ধাবস্থার মৌমাছির মত। নিজে যেমন সুসজ্জিত, বৈঠকখানাও তেমনি সুশোভিত। মাশুলের ওপর নির্ভর করে কৃত্রিম ভালবাসার প্রাবল্য।

জোর আড্ডা চলেছে। লাল-চোখের দল স্ফূর্তিতে চুর হয়ে টর হয়ে আছে। মাঝে বসে সুরা সুন্দরী হরদম খোরাক জোগাচ্ছে।

একজন বললে, 'নিশ্চয়ই ওর প্রেমে পড়েছে।'

বিকৃত কণ্ঠে প্রশ্ন এল, 'কার প্রেমে রে?'

কে একজন পাশ থেকে বললে, 'সুবোধের।'

নামটা শুনে সুরার বুকটা ধরাস্ করে উঠল। সুবোধের কোন হুস ছিল না, যেহেতু মাত্রার পরিমাণটা আজ তার পেটে একটু বেশীই পড়েছে। হঠাৎ নিজের নামোল্লেখ শুনে চীৎকার করে উঠল, কি হয়েছে রে বটা?'

বটা বললে, 'সুরা তোর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

'—তাই নাকি?' সুবোধের নেশা-মুখে হাসি ভেসে উঠল। চোখ মেলে তাকাতে গেল, কিন্তু নেশার আটায় চোখের অর্দ্ধেকটা তার ওপর থেকে বন্ধ। যতটুকু ফাঁক ছিল, ততটুকু দিয়েই ও ঘাড় তুলে দৃষ্টি ফেললে সুরার মুখের ওপর। দু'জনেই পরস্পরের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইল।

—'মাইরি বলছি—তুমি নিশ্চয় সতী।' বলতে বলতে সুবোধ যেখানে ছিল সেইখান হ'তেই সটান্ সুরা সুন্দরীর কোলের ওপর শুয়ে পড়ল।

সিনেমা

: লেখক :
মজাহার খাঁ
*
: অনুবাদক :
সত্যেন দত্ত
*

প্রত্যেক জিনিষেরই তার নিজস্ব সময় ও সে সময়ের গণ্ডীর মধ্যেই তার প্রয়োজনীয়তা আছে। সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান কাল, ও তার পরবর্ত্তী কিছু সময়ের জন্যই জীবিত থাকেন এবং তারপরই তাঁহাদের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সিনেমা শিল্পও এই সাধারণ নিয়মের বাহিরে নয়। ম্যাজিক লণ্ঠন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান নির্ব্বাক যুগের পরিসমাপ্তিরও তাহার নিজস্ব সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং আজ সেই সমস্তই সবাক-চিত্র অধিকার করিয়াছে। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র নির্ব্বাক-চিত্র যাহা করিয়াছে ইহা আমাদের সন্তুষ্ট করিয়াই গিয়াছে। স্বপ্নের মতই ইহা আসিয়াছিল এবং স্বপ্নের মতই বিলীন হইয়াছে।

টকী কি? টকী কিছু হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বহুর আনন্দ উপভোগের এবং কতিপয়ের বিলাসিতার উপকরণ।

সিনেমা-শিল্প আজ বিশ্বের দরবারে স্থান পাইয়াছে। এবং ইহা যে কেবলমাত্র ব্যবহারিক-শিল্প হিসাবে নব-অনুভূতি আনিয়াছে তাহা নহে; পরন্তু, রাজনীতি, শিল্পে ও সঙ্গীতেও ইহা নব-জাগরণ আনিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে, সাধারণের গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির উপায় স্বরূপ ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ বিহীন সাধারণ লোক, যাহারা ইতিহাসেও অজ্ঞ, এবং গণতন্ত্রের প্রতি যাহাদের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কিছুই নাই, তাহারাও গণতন্ত্রের ভক্ত হইয়া উঠিল। চিত্রাঙ্কনে বা সঙ্গীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও আমরা মুক্তির সেই সোপানই দেখিতে পাই।

সিনেমা লিপিবদ্ধ করে মানুষের ভাব। মানুষ বর্ত্তমানে যা করে এবং ভবিষ্যতে করবার যা প্রচেষ্টা রাখে। ইহা চিন্তার বিকাশ ও মনন শক্তির রূপ দান করে।

দরজীর দোকান যে সাম্যভাবের অন্তর্ভুক্ত। সিনেমাও তাহাই এবং ইহার একই পর্য্যায়ে 'ব্যারণ' ও (আভিজাত্য সম্প্রদায়) পাশাপাশি বসিতে পারে। এবং ইহা অসম্ভব মনে হইলেও সম্ভাবিতরূপে বলা যাইতে পারে যে সিনেমা সর্ব্বজনের প্রতি সমদৃষ্টি দিয়া কতিপয়কে (আভিজাতকে) বড় করে নাই এবং সর্ব্বজনকে বড় করিবার প্রচেষ্টায় ইহা সর্ব্বসাধারণকে জনসাধারণের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছে।

আধুনিক সিনেমা এরূপ একটি পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় প্রবেশ করিতেছে যে, নির্ব্বাক যাহাই হউক না কেন, ইহা রহিয়া যাইবে এবং সবাক বিলুপ্ত হইবে, এবং শীঘ্র বা বিলম্বে সমগ্র মনুষ্যজাতি এরূপ একটি পুণর্গঠনের সম্মুখীন হইবে যাহা কেবল —চিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটাইবে তাহা নহে চিত্রামোদীদেরও মনের পরিবর্ত্তন ঘটাইবে।

সিনেমার পর্য্যায় ও জাতীয়তার পর্য্যায় একই হইয়াছে। মনুষ্যের ইতিহাসে ইহার পূর্ব্বে কখনও, একটি সুন্দর চিত্র প্রযোজনায় তাহাদের জাতীয় গর্ব্ব এতটা তীক্ষ্ণ, আত্মপরায়ণ, প্রবল ও উদ্বেলিত হয় নাই যতটা চিত্র-প্রযোজকদের বিজয়ে হইয়াছে এবং ইহা বিশ্বমৈত্রীর মত, যাহার বলে পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্যে জাতিতে ও বিভাগে কোনও পার্থক্য থাকিবে না।

সৌখীন নারীবৃন্দ সিনেমায় দৃষ্ট রুচি অনুযায়ী মত তাহাদের রুচি পরিবর্ত্তন করে

মজাহার খাঁ
ভারতের ইনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। এই প্রবন্ধে খাঁ সাহেব সিনেমা শিল্পের গতি সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

এরূপ আর কিছুতেই করে না। পূর্ব্বের মেয়েরা তাহাদের ওড়ানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, প্যারিসটুপি ও উচ্চহিলের জুতা ব্যবহার করে। কোন কর্ম্মী এরূপ করাইতে পারে না। কোন ছাপার কথাও তাহাদের এই পথ দেখাইতে পারিত না; কিন্তু চলচ্চিত্রে ইহা সম্ভব। যদি দেশের লক্ষ লোকেরা এক পথ অবলম্বন করে তাহা হইলে অন্যেরাও তাহা অবলম্বন করিবে অন্যথা দুঃখ পাইবে।

জাতীয় অনুপ্রেরণায়—ভারতীয় সিনেমা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে এবং ইহা নিশ্চিত এরূপ দিন আসিবে যখন ভারতীয় চিত্র বিদেশীর সহিত প্রতিযোগীতা করিবে।

সিনেমার ভবিষ্যত বৃহৎ। ইতিহাস যাহা জানেনা উহা সেইরূপ সমগ্র জগতে, শিল্পে, রাজনীতিতে বা সমাজে পরিবর্ত্তন আনিবে। কিরূপে ইহা সংঘটিত হইবে আমরা অপেক্ষা করিয়া দেখিব।

তরী ও তুফান

শ্রীসুশীল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ছায়ার সঙ্গে বাসরে তার একটিমাত্র কথা বলা হবেনা হয়তো। বিদ্যুৎদের দল সারারাত কী জ্বালানই জ্বালাবে! হাসি-গান, কিচির-মিচির! ছায়া কুঁকড়ে, ঘাড় গুঁজে কেমন মোলায়েম হ'য়ে লতার মতো তার পাশে শুয়ে থাকবে। ভাবতে ভারি সুন্দর লাগে। একটিমাত্র কথা ব'লতে ভজহরির কতো ইচ্ছে হবে কিন্তু নিরূপায়। যদি-বা সে অতি ধীরে তার হাতটা টানতে চেষ্টা করবে অম্‌নি ও-দিক থেকে বিদ্যুতের হাসির খলখলানি মুখরিত হ'য়ে সমস্ত ঘরটাকে যেন ছিঁড়ে ফেলবে। ভজহরি চুরি ক'রে হাতটা টেনে নেবে নিজের বুকের মধ্যে যেখানে হৃৎপিণ্ডটা থোকে। ছায়ার হয়তো ইচ্ছে হবে—ঘুরে শুই, কিন্তু ভজহরির কি দোষ, তার-ই বান্ধবীরা যত নষ্টের মূল, তাকে এমন ক'রে বাধা দিচ্ছে। ভজহরি, শুধু তখন উষার আলোর আরাধনা করবে ছায়াকে পাশে নিয়ে। কখন রাত পোহাবে? তার ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা হ'চ্ছে। তার-পর ফুলশয্যা……কিন্তু কাকা ডাকলেন।

হঠাৎ আবার তাঁর এ আকস্মিক আহ্বানে ভজহরি ঘাবড়ে গিয়েছিলো কিন্তু কাকা আর কিছুই না ব'লে শিগগির ক'রে কাকে নেয়ে নিতে অনুরোধ (হুকুম নয়) ক'রলেন। কারণ বেশি বেলা করলে শরীর খারাপ হ'তে পারে। সারারাত আবার ট্রেন-জার্নি আছে।

ভজহরি নাইতে গেল।

ওদিকে এলাহি কাণ্ডকারখানা। লুচি-বেলা, পুলি তৈরী, মাংসের একটা চমৎকার গন্ধ, আরো কতকী! আজ বৃষ্টিটা নেই কিন্তু শ্যাওলায় উঠোনটার বুক ভারি পেছল।

ভজহরির চোখের সামে দিয়ে মণি চমৎকার ভঙ্গিতে উঠোন মাড়িয়ে ঘরে গেল। ভজহরি মাত্র একবার সেদিক পানে চেয়ে চোখটা নাবিয়ে নিলো। আজ দেড় বছর থেকে মণিকে দেখেও যেন তার দেখা শেষ হয় না, রাথেশের 'ফিল্‌ম-ফান্' দেখার মতো।

মেথর বিয়ে? অসম্ভব! কাকা তা-ই কেবল ভাবছেন। ভজহরির কি মাথা খারাপ হ'লো? নাই-এর নিচে কাপড় নাবিয়ে দিয়ে কাকা ভুড়িতে তেল, মালিশ করছিলেন। ভজহরি কুয়োতলায় নাইছে। মাঝে মাঝে তার প্রতি একটি কটাক্ষ হেনে কাকা ভাবছেন ভবিষ্যত। অসম্ভব!! অবশেষে তিনি না ব'লে পারলেন না: তুই বিয়ে করবি, তোকে রাঙা বৌ এনে দিচ্ছি, ওরে শুনছিস্ ভজা!

ভজহরি মাথায় ঝর-ঝর ক'রে এক বালতি জল উপুড় ক'রে দিয়ে ব'ললো—কি ব'ললেন কাকা?

—বলছিলাম মেথর বিয়ে বাদ দে। কেন, হিন্দুর ঘরে কি মেয়ের অভাব? বারেন্দ্র বামুনের তো আকাল পড়ে নি। নবদ্বীপ ঠাসা ঘর—আর তাই বা কেন, এই ফরিদপুর বোঝাই কত মেয়ে, তাই তোকে যোগাড় ক'রে দেয়া যাবে।

ভজহরি ব'ললো—বুঝলেন কাকা, শুধু বিয়ে ব'লে' এ বিয়ে নয়। এ একটা রোজগারের পন্থা। কত টাকা পাবো শোনেন নি? অঢেল! সহরে পাঁচ-ছ খানা বাড়ি। ব্যাঙ্কে অজস্র টাকা! সবই তো আমার হবে!

কাকা এর ওপর আর কী ব'লবেন? চুপ ক'রে গেলেন।

নমস্কার জন্মভূমি! আজ তোমার সঙ্গে হয়তো আমার শেষ দেখা। জীবনে তোমার বুকে আমার আর ঠাঁই হবে না বোধ'য়। তোমায় ছেড়ে আজ আমি চ'লেছি প্রবাসে।—জানি, তুমি নিত্য-নিয়ত আমায় টানবে পিছনে—তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'তে আমি আর পারবোনা! কলকাতা, তোমায়ও নমস্কার। তুমি যাদু জানো। বিদেশীকে তুমি নিজের ক'রে নিতে কৌশলী। আমি তোমার উদ্দেশে যাত্রা ক'রেছি।

ঘরের দেয়ালে টাঙানো গান্ধীর ফোটোতে একটা নমস্কার ঠুকে ভজহরি ঘুরে দাঁড়ালো: আরে, ছোটখুড়ি! চললেম। জীবনে তোমাদের সঙ্গে এই হয়তো শেষ

দেখা। তোমাদের মুখ ম্লান দেখতে আমার বুকখানা টাটায়, কিন্তু উপায় নেই যে! প্রথম আমি যেদিন তোমায় দেখেছি, ব'ললে বিশ্বেস করবে না ছোটখুড়ি, সেই-দিন থেকেই আমার তোমায় বড় ভাল লেগেছে। তোমায় আমি দান ক'রেছিলাম বন্ধুর আসন। তোমরা আমায় ভুলে যেয়ো না যেন। আজ চিরবিদায় নেবার দিন এলো, বড় দুঃখ হ'চ্ছে······

মণি বাধা দিলো, ফিক্ হেসে উঠলো : থাক্ থাক্ আর থিয়েটার করতে হবে না, এবার যাত্রা করো। গাড়োয়ান হাঁকছে ওই শোনো।

—যাত্রা। যাত্রা করতেই হবে। কিন্তু তার আগে এসো একবার···ব'লে ভজহরি এগিয়ে এলো।

মণি কিসের ভয়ে যেন দু'পা পিছিয়ে যাচ্ছিলো। ভজহরি ব'ললো—এসো এক-বার প্রণামটা সেরে নি। মাথা হেঁট ক'রে পায়ে হাত বুলিয়ে মাথায় ঠেকাতে ঠেকাতে উঠে দাঁড়ালো—আচ্ছা চ'ল্লেম।

বৈঠকখানায় কাকা, পিসিমা, খুড়িমা ফিস্ফিস্ ক'রে কিসের যেন ষড়যন্ত্র করছেন। ভজহরির পায়ের শব্দে সমস্ত কথা তাঁদের ফুরিয়ে গেলো।

প্রণাম পেয়ে পিসিমা আশীর্ব্বাদ করলেন : কবে আসচিস্? বৌ নিয়ে সোজা এখানেই উঠবি তো?

কাকা বললেন—বৌমাকে নিয়ে এসো। আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু···

খুড়িমা ব'ললেন (মনে মনে)—পোড়া কপাল আমার! মুখে ব'ললেন—আসচো তো শিগগির?

অ্যাঁ, তবে চির বিদায় নয়? সে আবার আসবে? এর কারণ? কাকারা এমন মোলায়েম হ'য়ে পড়লেন হঠাৎ। মেয়ে তো নেই ঘরে। এক ঘরে হ'লে ব'য়ে গেছে। সেই জন্যেই হয়তো ভজহরিকে ত্যাগ করবেন না।

কাকা আরো ব'ললেন,—দিন ঠিক হ'লে চিঠি দিয়ো, আমার তো যেতে হবে!

ভজহরি ঘাড় কাৎ ক'রে পথে এসে দাঁড়ালো।

পথে তারকদের দেখে গাড়ী দাঁড়ালো।

ভজহরি হুমরি দিয়ে পড়ে সব্বাইকে নিমন্ত্রণ করলো ; তোরা সব যাবি। কাকাও যাচ্ছেন হয়তো। ঠিক যাবি কিন্তু। মাখন কই, তাকেও যেতে বলবি। ট্রেন-ফেয়ার গিয়ে নিস্। দিন ঠিক হ'লে জানাবো তোদের। কিন্তু একটা কথা। ওখানে গিয়ে ছ্যাবলামি করিস্ না, বুঝলি? জানিস্ তো, up-to-date মেয়ে, B. A. দেবে এবার। পথে টিটকিরি তাদের সহ্য হয় কিন্তু এ সব হয়তো সইবে না। আমার ওপর একটা ব্যাড নোশান্ হ'য়ে যাবে। খুব গম্ভীর থাকবি। আচ্ছা, যাস্ ভাই। চ'ল্লাম, আর দেরী নেই গাড়ীর।

Via আলিপুর। বাসন্তী, কেমন মজা? তোমাকে ভজহরি গ্রাহ্য করে না। যেচে চুমু দিতে আসে যে তার কতদূর অধঃপতন এবং স্খলন হয়েছে, ভজহরি বোকা হ'লে কি হবে সব বোঝে। নির্লজ্জ কোথাকার! ঢঙ্ শিখেছো খালি। ইস্কুলে পড়া বিদ্যা ঐটুকুই। একটা সংযম নেই। trash! তোমার সবই হয়েছে, প্রকাশ্যে এখন পথে দাঁড়ালেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

তারপর গাড়ী আরো এগিয়ে গেলো। এখন পথ শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই জানে না। ভজহরি মনে মনে কবি হয়ে উঠলো; গুণ গুণ করে গান গায় নিজের রচিত, সদ্য রচিত। দু একটা নমুনা :—

অন্ধকারে পথ দেখিয়ে
তোমার পানেই টানছো প্রিয়ে
সে যে অনেক দূর
(তোমার) মনের গোপনপুর।
হাতছানিতে টানবে নাকি?
রইবে মনে কেবল ফাঁকি?
মেঘ ডাকে গুড়গুড়
সে যে গো মধুর ‖

এ গানের যে অর্থ কোনখানে নিহিত আছে জানি না। ভজহরি যেমনটি ভেবেছিলো হুবহু তুলে দিলাম, সেজন্যে দায়ী ভজহরি ভিন্ন আর কেও নয়।

দূরে একটা আলো দেখা যায় :
আলোর মাঝে চোখের যেন করুণ ইশারা
বুকের মাঝে বাজছে আমার দারুণ সাহারা।

গাড়ীর গায়ে টোকা দিতে দিতে এবং এই রকম গান করতে করতে ভজহরি চ'লেছে কার উদ্দেশে? সে কি ছায়ার? সে কি ট্রেনের কিম্বা ষ্টেশনের?

ব্যস্। একটা ইটে বেধে গাড়ীটা থেমে গেলো। এই ষ্টেশন, প্লাটফর্ম নেই তবু আরভেলাস্।

শূন্য বুকে রচবো তোমার ফুলের বিছানা।

তারপর কলকাতার দিকে। উঃ, কী স্পীড। ফিফটি-সিক্সটি, তারো বেশী। অন্ধকারগুলো যেন ছুটে ছুটে পালাচ্ছে! দানোর মতো প্রকাণ্ড গাছ হাঁদার মতো পাক খেয়ে স'রে যায়। কী বাতাস! ছায়ার নিঃশ্বাস্ বোধ'য়। কিন্তু ঠাণ্ডা যে! ছায়া যে শীতল! প্রশ্নের সঙ্গেই উত্তর তার মুখে মুখে ছুটে চ'লেছে।

লাইনের আশপাশের গাঁয়ের একটা শান্ত মূর্ত্তি। দু'একটা করুণ আলো চেয়ে আছে ট্রেনের যাত্রীদের দিকে। গ্রাম যে বেঁচে আছে, তার অস্তিত্ব যে অন্ধকারে বিলীন হ'য়ে যায় নি তারই একটি দুর্ব্বল ইঙ্গিত যেন।

ভজহরির ঘুম পাচ্ছে। পেছনে ফেলে এসেছে ছোটকাকার কর্ম্মস্থল। এখন আরামে সে শুয়ে প'লো। এবার ভিড়টা কিছু কম।

স্বপ্নের মতো কতো দেশ বিলীন' হ'য়ে গেছে। শুণে ওঠা অসম্ভব। অবশেষে......

—কোন ষ্টেশান? ভজহরি লাফিয়ে উঠলো।

এইবার ডাইরেক্ট কলকাতা।

নাঃ প্রবীর আজ আর ক্যানা খাবে না। কলতলায় কেও নেই। এরা কি তবে মেস্‌টা ছেড়ে দিলো নাকি? বা রে মজা! ভজহরি দৌড়ে ওপরে উঠে এলো। তাই বলো! সব কম্প্লিট? এত শিগ্‌গির ওরা সব সেরে নিয়েছে। প্রবীর লাফিয়ে উঠলো : এসেচিস্? সাতাশে শ্রাবণ বিস্যুৎবার সেট্‌ল্‌ড। ও মহেশদা, রাখেশ, মানস, নগেন কাম্ অন্। ভজহরি এসেছে।

এত ফুর্ত্তি বাপস্! ভজহরিরও বেশ আমোদ লাগে। আজ সতেরৈ সোমবার আর কটাদিন? দিন দশ।

ভজহরি ব'ললো। 'কত কথা পুষ্প প্রায় বিকশি' উঠিতে চায় কত অনুরাগে' কিন্তু সমস্ত কথাই গলার কাছে একটা পুঁটুলি হ'য়ে যেন আটকে গেলো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। ভজহরি ব'সে রইলো। সুটকেশটা কাৎ হ'য়ে রয়েছে ভেতরটা হয়তো ভেঙ্গে একাকার। চড়াইটা ফুড়ুৎ ফাড়ুৎ ওড়ে। ওরও আনন্দ। সাঁয়ে পুজো, হোক না দু'মাস দেরী, আসছে তো, শেলিই না বাতাসকে ডেকে ব'লেছে—

"Oh wind
If winter comes, can spring be far behind?"

—বধূ—

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বৌটি আমার ছন্দময়ী চঞ্চলা ও চুলবুলে
কমলালেবুর রোয়ার মত ঠোঁট দুটি তার টুলটুলে
গাল দু'টি তার নরম নরম,
জানেনা সে লজ্জা সরম,
ঢেউয়ের মত কল্‌কলিয়ে হাসে রে সে প্রাণখুলে।
পুষ্প-পেলব হাত দুখানি টুক্‌টুকে আর তুলতুলে।

রক্ত-জবা শাড়ীখানি মানায় তাকে মন্দ না,
নিবিড় কালো খোঁপার ফুলে আনে মদির গন্ধ না?
বাঁকা বাঁকা ভুরুর তলে,
ডাগর দু'টি চক্ষু জ্বলে,
চাউনিতে তার পরাণ টানে—জাগায় মধু-ছন্দ না?
আলতা পরা পায়ের তোড়া গায় রে কাহার বন্দনা?

সোণার মত কপালটিতে সিন্দুরেরি টিপটি তার,
মনে করায় চাঁদের কণা কোজাগরী পূর্ণিমার।
হাসিতে তার বাজে বাঁশী,
চোখের পরে ওঠে ভাসি,
প্রস্ফুটিতা পদ্ম যেন বুকের পরে পদ্মীমা'র।
আনন্দেরি উৎস সে যে হাস্যে গড়া মুখটি তার।

আমি যখন বুকের পরে আদর করে নেই টেনে,
ঠোঁট দুটি সে এগিয়ে আনে ঠোঁটের পরে চোখ হেনে।
বুকটি আমার বুকের পরে,
তুলে ধরে সোহাগ ভরে,
আদর টাদর যখন যাহা হরষ ভরে নেয় মেনে।
আজো তারে চিন্‌তে নারি হয় তো সে তাক নাও চেনে।

এমনিতর বৌটি আমার চল্‌তে পথে ভয় করে,
বুকটা কাঁপে থর থরিয়ে—ভুলে নয়ন জল ঝরে।
যদি ছেড়ে যায় সে মোরে,
কেমন করে রাখবো ধরে,
মরণ রাজার দুর্গ হতে আন্‌বো তাকে জয় করে?
নয় কী দেব জীবনটারে তাহার মাঝে লয় করে?

কেউই আর বেশি দূরে নেই। সব আসচে। আনন্দ, ছায়া, পুজা। এ বছরটা তার শুভই কাটছে। 'বৃষ' রাশির এ বছরটা ভালোই যাবে—পাঁজি লিখেছে। পরীক্ষায় পাশ করলো, তারপর থেকে একটা মাঙ্গলিক শাঁখের ধ্বনি তার কানে গুনিত হ'য়ে ওঠে পাগলা করে তুলেছে। কে বলে পাঁজি মিথ্যে? সায়েন্স, বাবা যে সে নয়। নটি-ক্যাল য়্যালমানাক্ চার বছর আগে পাবলিশড হয় কিন্তু পরে দেখা যায় হুবহু ফলছে। ভবিষ্যদ্বাণী ফলবেই if based on science। মুখস্থ সায়েন্স খাটাও, কেঁপে উঠবে দুর্দিনে। বিজনেস্ ফোরকাষ্টিং হবে না? আলবৎ হবে,, হতে বাধ্য। কেন, সায়েন্স নেই? ভজহরি আর্টস-এ গ্রাজুয়েট হ'লে কি হবে; ছেলে বেলা থেকেই ওর সায়েন্স-এ একটা ন্যাক্ আছে; সায়েন্সকে ও ভাল বেসেছে, যেমন ও ভালো বাসে ছায়াকে। সায়েন্স কী না ক'রেছে, ওয়্যারলেস, এরোপ্লেন, টর্পেডো, ডিক্টাফোন, টেলিফোন, ব'লে কি শেষ করা যায়? মেয়েরাও সায়েন্স-এর দিকে ঝুকেছে। কোমড়ে কাপড জড়িয়ে আর বাট্না বাটবে না, ঘর নিকোবে না; প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাশ-এ ক্রিম তৈরী করবে। বিষাক্ত জিনিষ ম্যানুফেক্চার করবে। এপ্রন্ পরে মরা কাটবে। আকাশে উড়ে গৌরীশঙ্কর এক্স-পিডিশনে যাবে, মেরু স্পর্শ করবে। হু যা-তা নয়। বছরটা ওর ভালো যাবেই, পাঁজি মিথ্যা হয় না। যে বলে মিথ্যা সেই মিথ্যুক! মেরি করেলি দুখানা ভাল বই লিখে কী সৎ কাজ ক'রেছে? ম্যাডাম ক্যুরি রেডিয়াম বের করে জগৎকে তাক্ লাগিয়ে দিলো। মেয়েরা আর পিছে পড়ে নেই। হু! ছায়াকে ফের-পিক্তি ও সায়েন্স পড়াবে।

মহেশদারা এসে পড়লেন। ভজহরি তখন খালি গায়ে ব'সে চোখদুটো ঘোলাটে ক'রে দূরে একটা ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়েছিলো। চিন্তায় উত্তেজনায় তার বুকটা অত্যধিক স্পন্দিত হচ্ছে। ভজহরি চোখ নাবালো; এই যে মহেশদা, আসুন একটা প্রণাম করি। রাখুন জাত-জন্ম, বয়সে তো কাকার সমান? দিন্ দিন্ প্রণাম করি একটা! বলে মহেশদার পায়ে হাত ঠেকিয়ে সশ্রদ্ধ হাতখানা মাথার ওপর দিয়ে উঠিয়ে নিলো।

প্রবীরদের বেজায় হাসি পেয়েছে। ভজহরির চোখ এড়ায় নি, ভজহরির গা জ্বলে যায়—বোকারা হাজার বার হাসে। রাখেশ 'ফিল্মফান'-এর বাঁধা খদ্দের, সে সেইটে নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। মানস গম্ভীর থাকতে পারে।

মহেশদা আশীর্বাদ করলেন—শতং জীব।

ভজহরি দাত বার করে হেসে ফেললো: ও আশীর্বাদ চাই না মহেশ দা। বলুন ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।

—তথাস্তু। মহেশ দা ব'সে পড়লেন, তোমার শরীর ভালো তো? সব মতামত নিয়ে এলে?

ভজহরি ঘাড় অনেকটা কাৎ ক'রে দিলো।

—কাকা কি বললেন?

—কি আর ব'লবেন? বললেন—মত্ আছে। ভালোই তো। ব্যস্।

মহেশ দা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন—অত সহজে মত্ পেয়ে গেলে?

ভজহরি দাঁত আবার বার করলো: অত সহজেই কি হয়? বোঝালাম সমস্ত বৃত্তান্ত, খুঁটিনাটি জানালাম—

—যথা।

—এই সমস্ত আর কি, মেয়ে কি করে, কি পড়ে; মেয়ের বাবা কি করেন?

প্রবীর ব'লে উঠলো,—ব'ললেতো মেস্এর সুইপার?

ভজহরি রেগে উঠলো,—ভাখো প্রবীর, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। সুইপার! সাধ্যি আছে অমন লোককে সুইপার রাখার? মাসে ক'টাকা রোজগার? ওঁর সেকেণ্ড-এ তার তিন গুণ।

মানস হাসতো কিন্তু হাসি চেপেও সে গম্ভীর থাকতে পারে। রাখেশ মাথা তুলে একটিবার অপাঙ্গ দৃষ্টি হেনে ভজহরির মুখটা দেখলো, এবং হেসে ফেললো।

প্রবীর তো গড়িয়ে পড়লো বিছানার ওপর। ও আবার একটু বেশি হাসে।

মহেশদা উদ্ধত ভজহরিকে শান্ত করলেন,—বাদ দাও ওদের কথা? ওরা

আবার মানুষ, দুনিয়ার মানুষ থাকি তো আমি আর তুমি। হ্যাঁ, এবার তোমার দাদার কাছ থেকে মত্ নাও, তবেই আমরা ফাইন্যাল কথা দেবো।

ভজহরি লাফিয়ে উঠলো : আজই আমি ভাগলপুর চললাম। আপনারা করুন না কাজ, মতএর আবার কথা কি? দাদা ঠিক মত দেবে।

মহেশদা তাতে রাজি আছেন, তিনি বিপিন ভঞ্জকে আজ ফাইন্যাল ওয়ার্ড দিয়ে আসবেন। কিন্তু ভজহরি যেন ওঁকে ক্যাসাদে না ফেলে, এটুকু প্রতিশ্রুতি তিনি ভজহরির কাছে চান।

দুপুর বেলা ভজহরি ঘরে শুয়ে বিড়ি টানছে, একি, হ'তে পারে না, আশ্চর্য্য তো, দাদা? ভজহরি বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠলো : হঠাৎ, তুমি এখানে?

—এই এলাম। নাটোর গিসলাম বন্ধুর বিয়েতে। এই তো এলাম আসাম মেইল-এ। ব'লে ভজহরির 'দাদা' (নাম জানিনা, হয়তো রাধহরি কিম্বা বলোহরি—যাই হোক) ব'ললেন।

ভজহরি যেন হাতে চাঁদ পেলো। দুই হাতে তারা যেন কুড়িয়ে উঠতে পারছে না। বললো,—কদিন আছো তো কলকাতায়?

তিনি হেসে ব'ললেন—না রে পাগলা, আজই যাবো। সাতটার ট্রেনেই যেতে হবে। মাত্র একদিনের ছুটি নিয়েছি। শনিবারটা ছুটি ছিলো—সেক্রেটারীর ছেলে বিলেত থেকে এসেছে সেই উপলক্ষে। তা না হ'লে একবার ফরিদপুর যেতাম।

ঠাকুর-চাকর তো ঘুমোচ্ছে। মেস্-এ দাদাকে খেতে বলা আর ঠাট্টা করা একই কথা গিয়ে দাঁড়ায়। ভজহরি উঠলো। দাদাকে নাইতে যেতে ব'ললো,—সে দোকান থেকে কিছু কিনে আনতে যাবে। নিজে কলতলা দেখিয়ে দিয়ে ব'ললো—এন্তার ঢালো, কোনো বাধা নেই, আবার তো সাড়ে তিনটের জল আসচে।

দাদা একটু হাসলো।

ভজহরি দোকান থেকে কিছু খাবার কিনলো। এক ঠোঙা, দই, চারটে সন্দেশ, পুড়ি কিম্বা পরোটা ঠিক জানিনা। তার পর মেসে ফিরে এসে দ্যাখে দাদা চুল উল্টে রেডি।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভজহরি দাদাকে নিয়ে ব'সলো—শুনছো তো দাদা, সাতাশে বিয়ে করছি?

দাদা একটু আশ্চর্য্য হ'লেন, ভ্রুকটা হয়তো সামান্য কুঁচকেছিলো, বললেন—তাই নাকি? বেশ তো।—

তোমার মত চাই। আজই ভাগলপুর যাচ্ছিলাম—তোমার কাছে। কিন্তু সশরীরে তুমি এসে প'ড়লে ভালই।

—কাকার কাছ থেকে মত নিয়েছিস্?

—হু, এই তো আজ সকালে এলাম। কাকাতো শুনেই গ্ল্যাড!

কিন্তু গ্ল্যাড হবার তাৎপর্য্য কি তা তিনি বুঝতে পারলেন না।—একটি খোরাক বাড়ানোতে যে আনন্দ আছে তা তিনি জানেন না। তাই ভজহরির পানে চেয়ে রইলেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। ভজহরি চুপ করে রইলো। তিনি আবার যখন জিজ্ঞেস করলেন : কার সঙ্গে বিয়ে, ভজহরি লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু তার বুকের চঞ্চলতাকে দমন ক'রে মুখে সে গম্ভীর হ'য়ে উঠলো, দাদাকে তাক্ লাগিয়ে দিতে ওর ভারি মজা লাগে, বললো,—মেয়ে এইবার বি-এ দেবে!

সত্যি শুনে তাঁর আশ্চর্য্য লাগলো। আবার ভাবলেন—আশ্চর্য্যই বা কি। তাঁর বন্ধু সুপ্রসন্ন নন্-ম্যাট্রিক্ কিন্তু সরলা সোম এম-এ পাশ করেই কেমন সুপ্রসন্নকে নিয়ে রেঙ্গুন চ'লে গেলো। বেশ সুখেই আছে নাকি! নিজের ভেতরের বিস্ময় চাপা দিয়ে ব'ললেন—দেশ কোথায়? মেয়ের বাবা কি করেন?

ঠোঁট উল্টে ভজহরি ব'ললো—কি জানি কোথায় দেশ। মেয়ের বাবা দারুণ কণ্ট্রাক্টার। অনেক টাকা, সব আমার হ'চ্ছে জানো তো?

আরো বিস্ময়, সেটাই স্বাভাবিক। ব'ললেন,—কারণ?

—কারণ? জাতে মেথর, সৎব্রাহ্মণ পাত্র চায়। দাঁওটা ছাড়ি কেন? সব টাকা যখন উইল ক'রেই দিচ্ছে।

তিনি শুধু একটা আওয়াজ করলেন—হু।

—তোমাকেও শেয়ার দেবো, বুঝলে দাদা? রাসবিহারী অ্যাভিন্যু-এ তো আগে একটা বাড়ি হাঁকাবো, তারপর অন্য কথা। ইস্কুল মাষ্টারীতে চিরকাল চলবেনা তোমার। থাকবো এক সঙ্গে। তিনি একটু আনন্দিত হ'লেন—হবারই কথা।

—কিছু ভেবোনা দাদা। তারা তো আর সত্যি মেথর নয়। ওটা ওদের পরিচয় মাত্র।

ভজহরির দাদা গরীব ইস্কুল মাষ্টারের চেয়ারে ব'সে হঠাৎ এরোপ্লেনের স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর মনে ঈর্ষা যে জেগেছিলো না, তা নয়। জাগাই স্বাভাবিক! যদি তাঁর কপালে এমনি জুটতো। আঃ, তবে কি আর একদিনের ছুটি, জীবন ভোর মুক্তি! ভাবতে ভারি সুন্দর! ভজহরির ওপর তাঁর হিংসে হ'লো।

ভজহরি ভাবলো পাঁজি মিথ্যা হয় না, কখনই না। ঠিক দাদাও আজই এসে হাজির। সব হাতের কাছে জুটে যাচ্ছে! টাকা খরচ হ'লো না, একা একা এতটা পথ ছায়াছায়া ভাবতে ভাবতে ট্রেন-জার্নি নেই। ফলতেই হবে। বৈজ্ঞানিক যুগ এটা, যা-তা নয়।

জীবনকে যে মধুর ক'রে ভাবতে শিখেছে তার জীবন যদি ব্যর্থ যায় তাহ'লে নিরীহ ভগবান তার জন্যে দায়ী। ভজহরি তার জীবনকে অজস্র মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশে বিভক্ত ক'রে তার ওপর মধু ঢালছে, তথাপি সে হয়তো ব্যর্থ হবে। ভগবানকে তাহ'লে শূলে চড়ানো উচিৎ, ফাঁসি দেয়া কর্ত্তব্য অথবা গিলোটিন-এ·······

—আচ্ছা দাদা, যদি মেথর বিয়েই করি, তাতে ক্ষতি আছে? বিলেতে গিয়ে আমাদের দেশের কত ছেলে ট্যাকে মেম গুঁজে বেশে ফিরে আসে, না? সেটা যদি দোষের না হয় তবে এতেই বা কী অপরাধ? মেথররা তো হিন্দু, আমাদের স্বজাতি! ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন সংস্কার, তা চলবে কিন্তু এতেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

অপঠিত

কত গল্প আসে ষ্টুডিওতে কত জায়গা থেকে। সারা জগতের লোক কত গল্প পাঠায় ষ্টুডিওর দরবারে। কিন্তু কে তাদের পড়ে!—গল্পকে ফিরতে হয় তার অবগুণ্ঠন না খুলেই তার নিজের জন্মভূমিতে কিম্বা ডেড্ লেটার আফিসে।

বেটী ফার্ণেস

প্রত্যেক বড় ষ্টুডিওতে এই গল্প গ্রহণ করবার একটা নিয়ম, একটা রীতি আছে। যার তার গল্প একটা খামের মধ্যে বন্ধ হয়ে এলেই, ষ্টুডিও তা গ্রহণ করেনা, এমন কি পড়েও না।

কোন অজ্ঞাত কুলশীলএর গল্প ষ্টুডিও খোলে না। যদি কোন রকমে ভুলক্রমে কারোর লেখা গল্পটির খামখানা ষ্টুডিও খুলে ফেলে বা তারা খোলা দেখে, লেখার ফটো তুলে নেয় এবং তারপর লেখাটি মালিকের কাছে ফেরৎ পাঠায়।

কোন গল্প—তার দাবীসত্ব, তার দাম ঠিক হওয়া না অবধি এবং লেখকের প্রমাণ অর্থাৎ সেই লেখকই লিখেছেন কি না, এ প্রমাণ না পেলে কোন ষ্টুডিওই কোন গল্পই গ্রহণ করে না।

গল্প যা ষ্টুডিও নেয় তা প্রায়ই ম্যাগাজিন থেকে বেছে নেয়। তা ছাড়া নাম করা লেখকের লেখা তো আছেই যার মধ্যে গল্পের সত্যিকার জিনিষ আছে, তাও আসে শত শত। আরো আছে গল্পের এজেণ্ট। খারাপ যে কত খারাপ হতে পারে তা এরাই বেছে বার করে আনতে পারে।

প্রত্যেক ছোট গল্পের জন্যে ষ্টুডিও দেয় পঁচিশ পাউণ্ড। এই পঁচিশ পাউণ্ডের 'আশায়' যারা গল্প পাঠায় তারা নিশ্চয়ই ঠকে।

জিন হারলো

একখানা পূর্ণাঙ্গ ছবির নাটক যদি কেউ পাঠায়, আর সে নাটক যদি ষ্টুডিওর পছন্দ হয় তা হলে সে পায় বার হাজার পাউণ্ড।

ফেরর ফাঁকি

লোকের যখন পয়সা হয়, তার টাকা এসে ভরতে থাকে যত সিন্দুকে, আত্মীয়ও এসে তত জুটতে থাকে বাড়ীতে। আত্মীয় আর বন্ধু এসে জোটে আর মেশে; তারা যে শুধু বড় লোকের আশ্রয়ে থাকব বলে আসে তা নয়, তার অর্থেরও কিছু ভাবী কালের দাবী অন্তরে অন্তরে করে থাকে।

এতো গেল সাধারণ কথা।

রবার্ট ইয়ং

হলিউডে কি ঘটে থাকে তা বলছি। যখনি দেখা যায় কোন বিবাহিতা ষ্টারএর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হোল তখনই এই ভাগাভাগির ব্যাপারটা খুব বড় করে দেখা দেয়। রুডি ভ্যালী এই জিনিষটা বুঝেছিল খুব চরমে। টাকার ভাগাভাগি নিয়ে ওদের গণ্ডগোল চলল অনেকদিন। অবশেষে এই সেদিন মিটমাট হোল। ফে ওয়েব-এর ইচ্ছে ছিল এই সম্পত্তির ব্যাপারটা একটু দূরে রাখতে অর্থাৎ রুডি ভ্যালি যাতে কোন দাবী না করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টিকল না। রুডিকে মোটা রকম টাকা দিতে হোল।

ক্লার্ক গেব্‌ল

গেব্‌লের বিপদ

ক্লার্ক গেবলের সঙ্গে ওর স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি চলছিল অনেকদিন ধরে এ খবর আমরা জানি। গেবল কয়েকদিন আগে লস এঞ্জেলসের কোর্টকে জানিয়েছে যে, ও এবং ওর ত্যক্তা স্ত্রীর মধ্যে বিষয়ের ন্যায্য ভাগ হোক। স্ত্রীর সঙ্গে আর ওর কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

গেবল দাবী করে যে তার ধারণা নির্ভুল। এবং সে ধারণা হচ্ছে যে তার স্ত্রী আগেকার সমস্ত চুক্তি দূরে রেখে দিতে চাচ্ছে ও অনেক বেশী অর্থ চাইছে। তাই তিনি চান আগেকার সে চুক্তি যেন কোন রকমেই বাতিল না হয়ে যায়। তাঁর স্ত্রী কোন রকমই এর অন্যথা না করতে পারেন।

গেরী কুপার

গেবলের এই কথায় ওর স্ত্রী ভয়ানক চমকে উঠেছে। সে তো এমন কথা ভাবেনি বা কারোর কাছে বলেনি। তার আজকের দিনে কোন কথাই বলবার নেই। বিচ্ছেদ! বিচ্ছেদ! গেবল আনছে ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের মামলা, ভাগাভাগির মামলা!

সাহসী গ্যারী

গ্যারী কুপারের নাম খুব। হলিউডের দশজন হিরোর নাম করতে গেলে গ্যারীর নাম খুব ওপরে বসবে।

গ্যারী নতুন যে ছবিতে নামছে তার নাম হচ্ছে 'দি জেনারেল ডায়েড এ্যাট ডন।'

মেডেলিন ক্যারল

এ ছবিতে একটি মেয়ের গায়ে হাত তুলতে হবে গ্যারী কুপারকে। গ্যারী অনেক ছবিতেই নেমেছে কিন্তু মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে গ্যারীকে কোনদিনই হয়নি। গ্যারীর ভারী বিশ্রী লাগছে।

ম্যাডেলিন ক্যারল নামছে এ ছবিতে। ব্রিটীশ ছবিতে ও নামও কিনেছে খুব। এই ক্যারলকেই বোধ হয় আঘাতটি খেতে হবে। কত লোক আছে যারা মেয়েদের আঘাত করার কথা তত বড় করে ভাবেনা। কিন্তু সুন্দরী ক্যারলকে আঘাত করার কথা খুব কম লোকেরই ভাল লাগবে।

সে যাক।

অনেক চিন্তা, অনেক আলোচনার পর পরিচালক আর ষ্টুডিওর কর্তারা ঠিক করলেন দৃশ্যটাকে এই ভাবে নেওয়া হবে—প্রথমে গ্যারী ম্যাডেলিনকে মারবে, লোক মনে করবে ভয়ানক মারছে কিন্তু পরেই দেখবে—না কিছু না শুধু একটা চড় দিলে। আঘাতটাকে যদি মারাত্মক ভাবে না কিছু করতে হয়, গ্যারী তাতে রাজী আছে।

এডওয়ার্ড আরনল্ড

এডওয়ার্ড আরনল্ড যে ছবিতে নামছে তার নাম হচ্ছে "পিঙ্কারটন দি ডিটেক্‌টিভ"। আলেকজান্দার হল ছবিখানা পরিচালনা করছেন। গল্পটি লেখা হচ্ছে উইলিয়াম র‍্যানকিনের।

তিনখানা ছবি

মেট্রো-গোল্ডউইন-মায়ার ষ্টুডিওতে তিনখানা ছবি আরম্ভ হোল, 'লাইবেলড লেডি', 'দি লঙ্গেষ্ট নাইট' আর 'চেনড লাইটনিং।' 'লাইবেলড লেডি' ছবিতে নামছে জীন হারলো, উইলিয়াম পাওয়েল, মির্ণা লয়, স্পেনসার ট্রাসি ও আরো অনেকে। জ্যাক কনওয়ে ছবিখানা পরিচালনা করছেন।

কোর্টল্যাণ্ড ফিজ সিমনদের নভেল থেকে নেওয়া ছবি হচ্ছে 'দি লঙ্গেষ্ট নাইট'।

'হুইসপারিং ইয়ং' বলে আর একখানা ছবি উঠছে যেখানা পরিচালনা করছে এরল ট্যাগার্ট। এতে নামছে রবার্ট ইয়ং, ফ্লোরেন্স রাইস, জুলি হেডন এবং আরো অনেকে।

ষ্টুয়ার্ট আরউইন, বেটী ফারনেস, এডমণ্ড গুয়েন, রবার্ট আর্মস্ট্রং নামছে 'চেনড লাইটনিং' ছবিতে। এডুইন এল মেরিন ছবিখানা পরিচালনা করছেন।

খুচরো খবর

'স্পন অব দি নর্থ' ছবি তোলা আরম্ভ হোল। পরিচালনা করছে হেনরি হেথাওয়ে। নামছে এতে ক্যারল লম্বার্ড আর ক্যারী গ্রান্ট।

* * *

ডব্লিউ সি ফিল্ড আগে ছিল ষ্টেজের

মার্গো হচ্ছে মেক্সিকোর মেয়ে। ষ্টেজে ওর নাম আছে। রেডিও পিকচারস 'উইনটারসেট' ছবিতে নায়িকা সাজাবে বলে চুক্তিতে বদ্ধ করেছে। বারগেস মেরেডিথ নামবে নায়ক হয়ে।

* * *

বেটি গ্রেবল গিয়েছিল বেড়াতে জ্যাকি কুগানের সঙ্গে; ফিরেছে। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী-ফক্সের ছবি 'পিগস্কিন প্যারেড' এ নামবে।

ভাজিনিয়া উইডলার হচ্ছে প্যারামাউণ্টের শিশু ষ্টার। 'সেক্রেড গার্ডেন' ছবিতে নামছে।

শ্রীদুর্ব্বাসা

একটী সমস্যা:—নিয়ে আর একটি সমস্যা দেওয়া হল, নলুন তো কি ভাবে খেলবেন? হরতন রঙ, 'দ' খেলবেন। সম্মিলিত হস্তে 'উ' এবং 'দ', কে সকল বাধা সত্ত্বেও ছয়খানি পিট নিতে হবে।

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, দশ; হরতন—দশ, নয়, আটা; রুহিতন—বিবি, নয়, দশ, আটা; চিড়িতন—টেক্কা, বিবি, পাঞ্জা।

ডাক হয়েছে নিম্নলিখিতরূপ,

ইস্কাবন—টেক্কা, চৌকা, দুরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—চৌকা, দুরি।
চিড়িতন—পাঞ্জা, তিরি।

ইস্কাবন—সাহেব, ছক্কা, পাঞ্জা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—সাহেব, পাঞ্জা।
চিড়িতন—দশ, নয়।

ইস্কাবন—বিবি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, তিরি।
চিড়িতন—আটা, ছক্কা, দুরি।

ইস্কাবন—সাতা, তিরি।
হরতন—ছক্কা, চৌকা।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—টেক্কা, গোলাম, সাতা।

কয়েকটী হাতঃ—(১) মনে করুন আপনার হাত নিম্নলিখিতরূপ, এখন আপনাকেই প্রথম চাল দিতে হবে, কি পেড়ে খেলবেন?

'দ'	আপনি
একটি হরতন	ডবল্‌।
'উ'	'পূ'
দুইটী হরতন	পাশ।

এ ক্ষেত্রে আপনার খেলা উচিত হরতনের দশ, কেন না বিপক্ষদলের হাতে খুব সম্ভব চারখানি করে হরতন বর্ত্তমান, সুতরাং সেই কারণেই হরতন পেড়ে খেলাই প্রকৃত পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। অতঃপর রঙ শেষ হয়ে গেলে রুহিতনের মত খেলাই যুক্তিযুক্ত।

(২) আবার মনে করুন আপনার হাত হচ্ছে এইরূপ, নিম্নলিখিতরূপ ডাক চল্‌লে প্রথমে কি পেড়ে খেল্‌বেন?

ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, দশ, পাঞ্জা; হরতন—গোলাম, নয়, তিরি; রুহিতন—গোলাম, দশ, ছুরি; চিঁড়িতন—সাহেব, আটা, পাঞ্জা।

ডাক হয়েছে এইরূপ,

'দ'	'প'
একটি হরতন।	একটি রুহিতন।
আপনি	'পূ'
পাশ।	পাশ।

এ হাত নিয়ে আপনার পক্ষে হরতনের তিরি পেড়ে খেলাই যুক্তি সঙ্গত। এই খেলায় 'দ' নিশ্চয়ই বুঝে নেবেন যে তাঁর খেঁড়ীর হাতে দুইখানির বেশী হরতন আছে, অন্যথা কখনই তিনি এই রঙে চাল দিতেন না। তারপর যেহেতু 'প' রুহিতনএ ডেকেছেন, তাঁর হাতে হরতনের সাহেব, দশ, সাতা, পাঞ্জা কিংবা বিবি, দশ, আটা, চৌকা এই ধরণের হাত থাকা সম্ভব, সুতরাং আপনার এই চালে প্রতিপক্ষকে দুইবার বাধাদানের ক্ষমতা নষ্ট করবে।

(৩) এ ক্ষেত্রে 'দ' রুহিতনএর খেলা খেল্‌ছেন। (১) 'প' প্রথমতঃ ছোট ইস্কাবন পেড়ে খেল্‌ছেন [illegible] (২) দ্বিতীয় হাতে 'প' ছোট চিঁড়ি[illegible]ছেন। এখন নিম্নলিখিতরূপ হাত দুইটী নিয়ে 'দ' কি করবেন? যথাক্রমে 'উ' এবং 'দ'র হাত এইরূপ,

(১) ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম।

ইস্কাবন—×, ×, ×।

চিঁড়িতন—সাহেব, ×, ×।

চিঁড়িতন—×, ×।

(১) প্রথম ক্ষেত্রে 'দ' সাহেব মারবেন, তার কারণ তিনি আশা করবেন যে সমান সমান অবস্থা এসে পড়তে পারে।

(২) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাহেব না ফেলাই যুক্তি সঙ্গত এবং পারেন তো 'প' যে তাসখানি দেবেন তার উপরের তাসখানি দেবেন; কেন না কোন রকমে যদি 'পূ'র হাতে পিট তুলে দেওয়া যায় তা' হলে সম্ভবতঃ সাহেবের পিটখানি আস্‌তে পারে।

ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতার গণ্ডগোলঃ—স্থানীয় ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীবৃন্দ জানাচ্ছেন যে অধুনা কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতাতেই ডুপ্লিকেট ব্রীজের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ঘটে এবং এজন্যই প্রতিযোগী ও টুর্ণামেণ্ট কমিটির মধ্যে অযথা গোলোযোগের সৃষ্টি করে, সুতরাং সত্বর এই গণ্ডগোলের নিরাকরণ বাঞ্ছনীয়। আমাদের মনে হয় ব্রীজ এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রেরিত ডুপ্লিকেট ব্রীজ খেলার নিয়ম-কানুন জানা কোন ব্যক্তি যদি প্রতিযোগিতার স্থলে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থেকে সম্যকরূপে বিচার করেন তবেই এই গণ্ডগোল দূরীভূত হয়। আশাকরি ব্রীজ এসোসিয়েশনের সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন।

গ্যারী কুপার ও ম্যাডুলিন ক্যারোল
নেমেছে এঁরা দু'জনে প্যারামাউন্টের "জেনারল ডায়েড এ্যাট্ ডন" ছবিতে। কোলকাতায় আস্‌ছে ছবিখানা খুব শিগ্‌গির।

• • •

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ রিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ, ৯, রামময় রোড, কলিকাতা — টেলিফোন পার্ক ৩৩৪

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible], ৩৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১লা আশ্বিন ১৩৪৩, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

বাঙ্গলা বনাম জহরলাল

গত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় নূতন শাসনতন্ত্রের সহিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়া একটী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপ গোজামিল ইস্তাহারের বিরুদ্ধে আমরা পূর্ব্বে অনেক কথাই বলিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গলা কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয় "এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন বর্ত্তমানে না তুলিলেই চলিবে" বলিয়া এ প্রসঙ্গ ধামাচাপার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারই নেতৃত্বে বাঙ্গলা দেশের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কমিটিতে এই সমস্যার সমাধান করিয়া একটী প্রস্তাবও পাশ হইয়াছিল। বাঙ্গলার অধিকাংশ কংগ্রেসী সভ্যই যখন বাঁটোয়ারার বিরোধী, তখন জনমত অনুসারে চলিতে গেলে বাঙ্গলার কংগ্রেসকে বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেই হইবে। অথচ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই প্রকার আন্দোলনের বিরোধী। অনেকেই বাঙ্গলা কংগ্রেসের এই প্রকার কৌশলের তারিফ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু অচিরেই যে গণ্ডগোল বাধিবে এ ভয় আমরা করিয়াছিলাম।

অপকর্ম্মের জন্য ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল বাঙ্গলা কংগ্রেসের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা বাঙ্গলাদেশের নাই। কংগ্রেসের মন্ত্রী-সভার অস্থায়ী সদস্য এবং নিখিল ভারতীয় পার্লা-মেণ্টারী কমিটির সভ্য হিসাবে আমি কর্ত্তৃপক্ষকে বাঙ্গলার কথা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিব এবং বাঙ্গলার মত যে সারা ভারতে গৃহীত হইবে, এ আশা আমার আছে।"

বাঙ্গলার প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই চেষ্টা যে আনন্দের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রী-সভা যে এত সহজেই এই প্রাধান্য মানিয়া লইবে তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। বাঙ্গলার জনমত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যে কি ভাব পোষণ করেন তাহা গত নির্ব্বাচনেই কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা সম্যকরূপে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা "না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতি ত্যাগ করিতে সহজে স্বীকৃত হন নাই। বাঁটোয়ারা গণতন্ত্র-বিরোধী ও জাতীয়তার পরিপন্থী জানিয়াও গত ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী সভ্যগণকে উহার বিরুদ্ধে ভোট দিবার অধিকার প্রদান করা হয় নাই। এবং নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে অবিলম্বে শাসন-তন্ত্রের সহিত বাঁটোয়ারার ধ্বংস কামনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহা স্থায়ী করিবার ব্যবস্থাও আছে। কাজেই শরৎ বাবুর যুক্তির কাছে তাঁহারা যে আত্মসমর্পণ করিবেন এ আশা না করাই ভাল! সুতরাং শরৎবাবুর যুক্তি যদি বিফলকাম হয়, তবে তিনি কোন পন্থা অব-লম্বন করিবেন? কংগ্রেস মন্ত্রীসভার মতবাদ তিনি বাঙ্গলা দেশকে জবরদস্তিভাবে মানিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিবেন না, কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজের নেতৃত্বে বাঙ্গলা কংগ্রেসের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দেশ-বন্ধুর পদানুসরণ করিবেন?

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে শরৎ বাবু সিমলা যাত্রা করিবার প্রাক্কালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কা[illegible] পণ্ডিত জহরলালের নিকট হইতে উক্ত পত্র পা[illegible] আরো প্রকাশ যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়

সমিতির সর্ব্বদলের নেতৃস্থানীয় সভ্যবৃন্দ শরৎবাবুকে পণ্ডিত জহরলালের পত্রের সঙ্গত উত্তর দিবার পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন; এবং শরৎবাবু যে পন্থা অবলম্বন করিবেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি তাহা সমর্থন করিবে বলিয়া বেসরকারীভাবে মত প্রকাশ করিয়াছে। আমরা শরৎবাবুর উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

দুইটী বিশিষ্ট নিয়োগ

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুনালের অন্যতম এসেসরপদে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন আগতপ্রায়। আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে, বিভিন্ন পদপ্রার্থীদের মধ্যে বর্ত্তমান এসেসর মিঃ আর, এম, সেনগুপ্ত ও ভূতপূর্ব্ব এসেসর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে একজনের জয়লাভ সম্ভবপর। বর্ত্তমানে প্রকাশ মিঃ পি, বানার্জ্জি বলিয়া কলিকাতা হাই-কোর্টের জনৈক ব্যারিষ্টার উক্তপদের উমেদারীতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ব্যানার্জ্জি সাহেব নির্ব্বিরোধী ভদ্রলোক ব্যতীত উক্ত পদের জন্য তাঁহার অন্য কোন যোগ্যতা কিম্বা কৃতিত্ব আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। কলিকাতা হাই-কোর্টের বিলাত-ফেরতাদের চা-চক্রের অন্যতম সভ্য হিসাবে ব্যানার্জ্জি সাহেবের সুনাম থাকিলেও এবং দু-একজন কংগ্রেসী কাউন্সিলার তাঁহাকে লইয়া দুবাকিয়া করিলেও তাঁহার জয়লাভ সুদূরপরাহত।

ভূতপূর্ব্ব এসেসর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের নিকট যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

83, LANSDOWNE ROAD,
CALCUTTA.

Dear Sir,

I am a candidate for the post of an assessor to the Calcutta Improvement Tribunal.

In 1932, with the permission of my friend and leader Sj. Subhas Chandra Bose, I resigned my seat in the Corporation and was elected its representative on the Tribunal. While signifying his approval from the Central Jail, Jubbalpore, Subhas Chandra wrote "I shall do my best to help you from here—that goes without saying". Mr. Sarat Chandra Bose wrote from the same jail on 18.X.32 "While congratulating you on your well-deserved election I cannot but feel that the ratepayers of Ward XXI have lost an energetic and devoted representative who championed their cause so earnestly and well. I shall watch your new career with interest and I have no doubt that you will render as good an account of yourself in the Tribunal as you did in the Corporation".

Unfortunately for me when the time for re-election came in 1934 the Congress party was divided and I lost my seat through no fault of mine.

With my legal training and previous experience at the Tribunal I am in a position to render better service should it please you to put your trust and confidence once more in me.

Thanking you.

Yours faithfully.

উক্ত পত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এক সময়ে অমৃতলাল বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের অশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে অমৃতলাল বর্ত্তমানে সে স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুভাষচন্দ্র অদ্যাবধি অন্তরীণাবদ্ধ হইলেও অগ্রজ শরৎচন্দ্র বর্ত্তমানে বাংলা কংগ্রেসের অধীশ্বর। আমাদের রাজ-নৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে শরৎচন্দ্রের কৃপাকণা বর্ষিত হইলে বিপুল ভোটাধিক্যে অমৃতলালের জয়লাভ সুনিশ্চিত। আমাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত মতের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা আশা করি যে মুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দী শরৎচন্দ্রের মত বর্ত্তমানে সমর্থন করিয়া অমৃতলালের সাফল্যে সহায়তা করিবেন।

প্রকাশ যে করপোরেশনে প্রথম ডেপুটী এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদপ্রার্থী হইয়াছেন ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মেয়র মিঃ এস এম ইয়াকুব। সাম্প্রদায়িক উগ্রতাবর্জ্জিত মিঃ ইয়াকুব উক্তপদের যোগ্যতম প্রার্থী। আমরা আশা করি শরৎচন্দ্র তাঁহার নির্ব্বাচনেও সহায়তা করিয়া যোগ্যতমের যোগ্যতার মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

শ্রীদুর্ব্বাসা

প্রাথমিক ফেরাই-এর ডাকঃ—

সর্ব্বসময় সর্ব্বক্ষেত্রে ভাল্‌নারেব্‌ল বা নন্‌-ভাল্‌নারেবল এই দুই অবস্থাতেই প্রাথমিক ফেরাই-এর ডাক নিয়ে ভাল খেলোয়াড়দের মধ্যে মতান্তরের ভাব লক্ষ্য করা যায়। আমরা কিন্তু দেখেছি যে অধিকাংশ সময় হাতের বিভাগ এমন ভাবের আসে, যাতে কোন রঙের ডাক দিলে ভবিষ্যতে অনেক গোলমালের সৃষ্টি করে, অথচ পক্ষান্তরে উক্ত ক্ষেত্রে ফেরাই-এর ডাক দিলে সকল গোলমাল সহজেই দূর করা যায়। মনে করুন আপনি পেয়েছেন, ইস্কাবন—টেক্কা, সাতা, পাঞ্জা; হরতন—বিবি, দশ, তিরি; রুহিতন—টেক্কা, বিবি, আটা, চৌকা; চিড়িতন—সাহেব, গোলাম, দুরি।

এখন এ-ক্ষেত্রে আপনি যদি ফেরাই-এর ডাক না দিয়ে রুহিতন ডাক আরম্ভ করেন, আর আপনার খেঁড়ী যদি একটি ফেরাই-এর ডাক ডেকে প্রত্যুত্তর দেন তবে আপনার পক্ষে ডাক দেওয়া এবার অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ আপনার হাতটি এত ভাল যে আপনারা অনায়াসে 'গেম' করে নিতে পারেন যদি আপনার খেঁড়ীর ফেরাই-এর ডাকটি উচ্চতম শক্তির (maximum strength) উপর নির্ভর করে হয়ে থাকে, অর্থাৎ তাঁর হাতে যদি দুই-খানি অনারের পিট থাকে। কিন্তু তাঁর ডাক যদি নিম্নতম (minimum strength) উপর ভিত্তিস্থাপন করে, অর্থাৎ তাঁর হাতে যদি ১+ অনারের পিট থাকে, তা'হলে দুইটী ফেরাই-এর ডাকেই আপনাদের অবস্থা শোচনীয় হবে তা' তিনটির ডাকের কথা তো দূরে যাক্। আবার দেখুন অন্য কোন রঙে ডাকবার বা পুনরায় রুহিতনে ডাক দেবার ক্ষমতা আপনার নেই; কাজে কাজেই আপনাকে দুইটী ফেরাই-এর ডাক দিতে হচ্ছে। এই ডাকের দরুণ হয় আপনাদের 'গেম' নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নয় আপনাদের বিশেষরূপে খেসারৎ দিতে হবে।

কিন্তু আপনি যদি ফেরাই-এর ডাকটি প্রথমে ডাক্‌তেন তা'হলে আপনাদের কোন
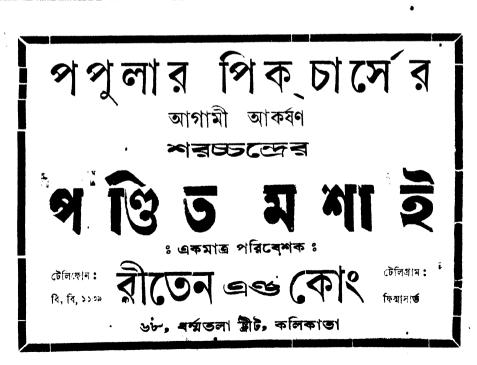
ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, কারণ খেঁড়ীর হাত খারাপ থাকলে, অর্থাৎ নিম্নতম শক্তির হলে তিনি পাশ দিচ্ছেন আর তাঁর হাত ভাল হলে, অর্থাৎ উচ্চতম শক্তির হলে তিনি দুইটী ফেরাই-এ ডেকে নেবেন, আর আপনি তিনটি ডেকে গেম করবেন। এখানে একটি প্রশ্ন হচ্ছে এই যে খেঁড়ী কেন একটি ফেরাই-এর ডাকে ছেড়ে দেবেন। এর উত্তর এই যে আপনার একটি রুহিতন ডাকের পর তিনি একটি ফেরাইয়ের ডাক দিচ্ছেন, তবে এক্ষেত্রে তাঁর ছেড়ে দেওয়ায় বিশেষ কোন ক্ষতি আছে বলে মনে হয় না। তবে ভাল্‌না-রেবল অবস্থার কথা যদি আসে তা'হলেও এই ডাকে কোন বিশেষ ক্ষতি দৃষ্ট হয় না। যদিও পূর্ব্বোক্ত হাতটি ভাল্‌নারেবল অবস্থায় ডাকবার পক্ষে একটু দুর্ব্বল, তথাপি ইহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আসে না। তবে এই হাতটির মধ্যে একটি বিবি বেশী থাক্‌লে ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

বোসপাড়া এপোলো ক্লাবঃ—ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সদস্য-ভুক্ত বোস্‌পাড়া এপোলো ক্লাবের উদ্যোগে আগামী অক্টোবর মাসে কলিকাতায় একটি অক্‌শন্‌ সিঙ্গলিকেট ও একটি অক্‌শন্‌ ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতা বের হচ্ছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার এদের প্রতিযোগিতায় নাম দিবার শেষ দিবস। অন্যান্য জ্ঞাতব্য-তথ্য সেক্রেটারী, বোস্‌পাড়া এপোলো ক্লাব, ৯, বোস্‌পাড়া লেন, বাগবাজার থেকে পাবেন। এদের প্রতিযোগিতা প্রতি বছরেই সাফল্য মণ্ডিত হয় এবং এ বারেও যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। আমরা ব্রীজ-রসিকদিগকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে অনুরোধ করি।

শান্তি ইন্‌ষ্টিট্যুটঃ—ব্রীজ এসো-সিয়েশনের সভ্য শান্তি ইন্‌ষ্টিট্যুট [illegible] পরি-চালনায় কয়েকটী বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা বের হয়েছে। তন্মধ্যে "তরুণদের উপর তাস খেলার প্রভাব" এই চমৎকার বিষয়েও রচনা আহ্বান করা হয়েছে, যাতে ব্রীজ ক্রীড়ক ও আমাদের এই প্রবন্ধের পাঠক সাধারণের উৎসাহ থাকা সম্ভব বলে আশা করা যায়। এই বিষয়ে বাঙলায় কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে ১৬ই নভেম্বরের মধ্যে এদের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ব্রীজ খেলার ভাল মন্দ নিয়ে বহু সংঘর্ষ হয়েছে এবং আজকাল আরও ব্যাপকভাবে হচ্ছে সুতরাং এ বিষয়েও যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হবে তার সন্দেহ নাই। কেউ তাস খেলার ফল দেখাবেন ভাল, কেউ বা মন্দ; পাঠকেরা কি বলেন? সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন এবং কোন প্রবেশ মূল্যও নাই। অন্যান্য বিষয়েও রচনা আহ্বান করা হয়েছে, তার এবং এর যাবতীয় তথ্য সম্পাদক, শান্তি ইন্‌ষ্টিট্যুট, ২৬, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, বহুবাজার থেকে পাবেন।

চিঠি পত্রঃ—ত্রিভুবন রোড, বোম্বাই থেকে শ্রীশান্তিলাল সাহা তাঁর মূল্যবান

"কল্লনা ও আল্লনা"—প্রথম সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩৪৩)—সম্পাদক শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দাম শুধু দশ পয়সা।

মানতেই হ'বে এই পত্রিকাটিতে স্বাতন্ত্র্য আছে। এতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি গল্পেই নতুনত্বের ছাপ চোখে পড়ল। দেবীপ্রসাদের প্রথম গল্প "উর্ম্মিলার" ভাব ও ভাষা সুন্দর। আধুনিক সাহিত্যিকরা যাকে গদ্য-কবিতা বলেন, সেই সংজ্ঞা অনুসারে এটিকে একটি ভালো গদ্য-কবিতা বলা যেতে পারে। অজিতরঞ্জনের ও অমিয়কৃষ্ণের লেখাগুলি প্রথম পড়ে' বেশ আরাম পাওয়া যায়। তাদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী বেশ ভালোই। তবে প্লটে বিশেষ নতুনত্ব নেই। অজিত রায়ের প্রথম অনুবাদটি মন্দ লাগল না, তবে "লেডি অফ শ্যালট"কে এ রকম নির্ম্মমভাবে হত্যা করার কোনও অর্থ হয় না। সব চেয়ে খারাপ লাগল সুধীররঞ্জনের গল্প দু'টো। "অশরীরীর আহ্বানে" কেন যে সাণ্ডাদের বংশের সবাই উন্মাদ হ'য়ে যায় তার কোনই সঙ্গত কারণ জানা যায় নি, আর "ভেনাসের এনগেজমেণ্টে"র মাথা-মুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। তাঁর ভাষা ও প্রকাশ করার ভঙ্গী অত্যন্ত আড়ষ্ট। ভবিষ্যতে "কল্লনা ও আল্লনার" সম্পাদক মহাশয় যদি লেখকের লেখা মনোনয়নের সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানী না হ'ন তা হ'লে পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান। পরিশেষে কামাক্ষীপ্রসাদের "পাগলের ডাইরি" ঐটিই একমাত্র রচনা যা'কে ঠিক গল্প বলা যায়। তাঁর প্লট অভিনব, ষ্টাইল সুন্দর, এবং প্রকাশ করার ভঙ্গি সহজ ও সুস্থ। 'সংবাদিকা' ও 'পরিচয়'তেও নতুনত্ব আছে। মলাটের ছবিটি বেশ ভালো ও চিত্তাকর্ষক। ছাপা ও সৌষ্ঠব অতি চমৎকার। সে হিসেবে দাম বেশ কম বলেই মনে হ'ল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকার উন্নতি কামনা করি।

গানের মালা— (প্রথম ভাগ) শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর বর্ম্মন, চুঁচড়া। মূল্য পাঁচ সিকা।

গান ও স্বরলিপির পুস্তক আজকাল বাজারে অনেক পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকের মধ্যে রাগরাগিণীর বিশেষ কোন আভাষ পাওয়া যায় না। তবে আলোচ্য পুস্তকের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার সব গানগুলিই রাগরাগিণীযুক্ত।

সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভূমিকার এক যায়গায় লিখিতেছেন।

"রচনার দিক দিয়া গানগুলি অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ উপযোগী ......প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তকটী পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিলে লেখকের প্রতি উপযুক্ত সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।"

পুস্তকের গানগুলি এবং তাহার সুর ও স্বরলিপি গ্রন্থকার রচিত; তবে তিনি অন্ধ বলিয়া তাঁহার নিজের লিখিবার উপায় নাই। তাঁহাকে এ বিষয়ে তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দে মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

সময়ের অপব্যবহার করেও পত্র লিখে জানিয়েছেন যে আমাদের ব্রীজ সমস্যা তাঁর অত্যন্ত ভালো লাগে এবং আমাদের ব্রীজ খেলা প্রবন্ধ তিনি নিয়মিতভাবে পড়ে থাকেন; তাঁর এই সহজ সারল্যে ও সহৃদয় পত্রের জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য মনে করি। আমরা যে পাঠকবর্গকে এবম্প্রকার আনন্দদানে সমর্থ হই, তা' জ্ঞাত হলে শুধু সার্থক অনুভব করি। ব্রীজ বিষয়ক যে প্রশ্ন তিনি করে পাঠিয়েছেন তা' এ প্রবন্ধে প্রকাশ না করে পত্র মারফৎ জানানো গেল। যা' হোক এই সুযোগে পাঠকদের নিকট থেকে আমরা জানতে চাই, যে আমাদের এ প্রবন্ধে তাঁরা কি কি বিষয়ে আলোচনা দেখতে চান,—জানতে পারলে আমরা পাঠকদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টান্বিত হব বলে আশ্বাস দিতে প্রস্তুত।

বিবিধ

নির্ব্বাচনের তোড়জোড়

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের পালা-মেণ্টারী কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গৃহে হইয়াছিল। প্রকাশ যে, উক্ত অধিবেশনে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম গ্রহণ করা হইবে। ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে সকল প্রার্থীদের নাম পাওয়া যাইবে তাহাদের আবেদন পত্রগুলি স্ব স্ব জিলা কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রেরিত হইবে। জিলা কংগ্রেস কমিটি-গুলিকে এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে যে, আগামী ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের মতামত পালামেণ্টারী কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে। তৎপরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পালামেণ্টারী কমিটির পূর্ণ অধিবেশন হইবে এবং তাহাতে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্রকেও আহ্বান করা হইবে। সেই অধিবেশনে যে সকল প্রার্থী মনোনয়নের ছাপ পাইবেন তাঁহাদের নাম সুপারিশ সহ নিখিল ভারত পালামেণ্টারী বোর্ডে প্রেরিত হইবে।

উক্ত অধিবেশনে আরও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে (Council of State) আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে এবং কংগ্রেস প্রার্থীদের আবেদন পত্র প্রেরণ করিবার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইবে।

"নাট্য শশিশেখর"

মন্মথমোহন বসু

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার বাঙলা পাঠ্য নির্ব্বাচনের সময় একটি প্রস্তাব উঠিয়াছিল মহাকবি গিরীশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল" নাটকখানি পাঠ্য করা হউক্। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন আমাদের চির-পরিচিত 'মাষ্টার মশাই' মন্মথবাবু। তাঁহার মতে নাটকখানি নাকি অতি অশ্লীল (যে হেতু তাহাতে "ধর্ মুখ পোড়া" প্রভৃতি কথা আছে) ও একেবারে রাবিশ। স্বামী বিবেকানন্দ যে বিল্বমঙ্গলকে "One of the greatest dramas of the world" বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকে রাবিশ বলিতে মন্মথ-বাবু যে একটুও বিচলিত হইলেন না, ইহা আশ্চর্য্য !! শুনিয়াছি আমাদের জনপ্রিয় তরুণ ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায় ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের সুযোগ্য সেক্রে-টারী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র—উভয়েই গিরীশ সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ, তাঁহাদের হাতে বিষয়টির নিরপেক্ষ বিচার হইবে বলিয়া আশা করিতে পারি কি ?

অধ্যক্ষ ভূপতিমোহন সেনের সংবর্দ্ধনা

দীর্ঘকাল কঠিন রোগভোগের পর সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া কলেজের কাজে যোগদান করায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ও ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান ছাত্রমণ্ডলী মিলিয়া কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন মহোদয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে সম্প্রতি একটি ষ্টিমার-পার্টির আয়োজন করিয়া-ছিলেন। অধ্যাপক হেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত (বায়লার), অধ্যাপক হিরণ্কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অধ্যাপক এম্-এম্-হক, অধ্যাপক সদানন্দ ভাদুড়ী, অধ্যাপক তারকনাথ সেন, অধ্যাপক গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, এবং অধ্যাপক শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আশুতোষ ও বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক অশোক শাস্ত্রী (বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক হুমায়ুন কবির (বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায় (রিপণ), অধ্যাপক সুকুমার ভট্টা-চার্য্য (আশুতোষ), কবিরাজ ধীরেন্দ্রনাথ রায় কবিশেখর, ও বেস্তুর রহমন, জিতেন্দ্রনাথ বসু, গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ, হীরেন ভঞ্জ, ভূপেন দত্ত, নিখিল চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কলেজের ভূতপূর্ব্ব বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দ পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যক্ষ সেন মহোদয়ের মত সৌম্যমূর্ত্তি, প্রিয়দর্শন, মধুরভাষী অমায়িক ভদ্রলোক,—কৃতী, জনপ্রিয় অধ্যাপক,—সুধী, প্রতিভাবান্ গবেষক—ও সুযোগ্য অধ্যক্ষ—বর্ত্তমান বাঙালী শিক্ষিত সমাজে বিরল। তাঁহার এই সংবর্দ্ধনায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। অধ্যক্ষ সেন মহোদয়ের মহীয়সী সহধর্ম্মিণী মিসেস্ সেন মহোদয়া উক্ত সংবর্দ্ধনায় যোগদান করায় উৎসবটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী

সহযোগী "ঢাকাপ্রকাশ"এর (২১শে ভাদ্র, রবিবার) সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভারতী, শাস্ত্রী মহাশয় বৎসরাধিক পূর্ব্বে ঢাকায় যাইয়া দুইটি অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিয়াছিলেন; সম্প্রতি সে দুইটি গণনাই অতি অদ্ভুত ভাবে মিলিয়া গিয়াছে। গত বৎসর (১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসে) তিনি ভাওয়ালের মধ্যমকুমার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের মামলা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, আগামী বৎসরে (১৩৪৩ সালে) কুমারের জয় অবশ্যম্ভাবী। আর ঐ সময়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার মিঃ এ, এফ, রহমনের বিষয়ে বলিয়াছিলেন যে, আগামী ১৩৪৩ সালের মধ্যে তাঁহার পদোন্নতি অনিবার্য্য। এই দুইটি গণনাই অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে। কুমার ভাওয়াল-মামলায় বিজয়ী হইয়াছেন; এবং মিঃ রহমানও "পাব্লিক সার্ভিস

কমিশনে"র সদস্য হইয়াছেন। আমরাও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার একটি গণনা সাফল্যের কথা জানি। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে প্রথম বর্ষণের তারিখটি (৯ই জুন, রবিবার ১৯৩৫) তিনি নির্ভুল ভাবে গণনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতী মহাশয়ের কৃতিত্বে আমরা বিশেষ আনন্দিত। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া উত্তোরোত্তর গৌরবময় সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকুন।

প্রীতি-সম্মেলন

গত রবিবার সন্ধ্যায় বন্ধুবর কুমার বিশ্বনাথ রায় তাঁহার কাশীপুরস্থ ভবনে এক বিরাট প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের বহু কাউনসিলার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়বৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

দি এশিয়া মিউচ্যুয়াল ইনসিওরেন্স কোং

দি এশিয়া মিউচ্যুয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের লাইফ ইনসিওরেন্স শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে গত রবিবার এলবার্ট হলে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং লাইফ ইনসিওরেন্স শাখার উদ্বোধন করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই প্রভিডেণ্ট কোম্পানী স্থাপিত হয়; চতুর্থ বৎসরে এই কোম্পানী ১০ লক্ষ টাকার অধিক কাজ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোম্পানী ক্লাইভ ষ্ট্রীটে নিজ ভবন নির্মাণ করিয়াছে।

শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ মিত্র, কুমার এইচ, কে, মিত্র, সুরেশচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পি, ডি, রায় চৌধুরী, ভগীরথ দাস, কে, কে, নন্দী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বেঙ্গল ডেণ্টাল এসোসিয়েসান্

গত ২৮শে আগষ্ট বেঙ্গল ডেণ্টাল এসোসিয়েসানের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী ১৯৩৬-৩৭ সনের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাঃ আর, আমেদ—সভাপতি, ডাঃ এস্, সি, সেনগুপ্ত ও ডাঃ আর, এন্, ঘোষ—সহসভাপতিদ্বয়, ডাঃ এ, এন্, বোস্, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, ডাঃ এন্, সি, বাড়ুরী—সহ-সম্পাদক।

সাহায্যাভিনয়—

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ঝড়োহাওয়া' নামক উপন্যাসখানিকে ২৪পরগণা জেলার পানিহাটী মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বিভূতিকুমার মুখোপাধ্যায় নাটকাকার দান করিয়াছেন। আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় (সাড়ে ৬টা) আগড়পাড়া সেন ষ্টেটস্থ সারস্বত সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চে সোদপুর লাইব্রেরীর গৃহ-নির্ম্মাণ ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে উক্ত নাটকখানি অভিনীত হইবে। শৈলজানন্দবাবু ও বিভূতিকুমার বাবু উভয়েই অভিনয় করিবেন। অভিনয়ের

পুরাতণকে জয় করিয়া
নূতনকে বরণ করিয়া
লও—এই হইতেছে
দেশের আবহাওয়া।
তাই
আজ আমরা নূতনের
পথে অগ্রসর হইতেছি।
আর তাই
মাসিক-পত্রিকা বলিতে
চিত্রালীর
নাম লোকে আগেই করে
চিত্রে, গল্পে, প্রবন্ধে
রস-রচনায়, কবিতায়
চিত্রালীর
বৈশিষ্ট্য অদৃষ্ট পূর্ব্ব
শ্রাবণ সংখ্যা
প্রত্যেক ষ্টলে পাইবেন
প্রতি সংখ্যা ছয় আনা
বার্ষিক (সডাক) পাঁচ টাকা
পরিচালক:
ন্যাশন্যাল নিউজপেপার্স লিঃ
৯, রামময় রোড, কলিকাতা।

স্থানটি আগড়পাড়া রেল ষ্টেশনের নিকটেই অবস্থিত। সর্ব্বসাধারণের সাহায্য প্রার্থনীয়।

জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগার

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রবিবার ৫॥০ ঘটিকায় ডাঃ জে, এম্, দাশগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগারের ষড়বিংশতি বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল।

কুলদাবাবুর পত্নী-বিয়োগ

দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন সেন গুপ্তের পত্নী শ্রীমতী শোভারাণী দেবী গত ৩০শে আগষ্ট বরিশালে সোলগ্রামে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা কুলদাবাবুকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ডাঃ প্রমথ ব্যানার্জ্জি

ডাঃ প্রমথ ব্যানার্জ্জি গতকল্য প্রাতে ভিয়েনা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ভিয়েনাতে অস্ত্র চিকিৎসার পর তাঁহার চক্ষুরোগের সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

বিরাট জলসা

গত শনিবার মুর্শিদাবাদ বন্যাপ্রপীড়িত নর-নারীর সাহায্যকল্পে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে ওয়াই, ডব্লিউ, সি এ, হলে এক বিরাট জলসা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনের 'রূপকুমার নৃত্য' এবং মহারাজ বসু ও লতিকা রায়ের 'মদন ভস্ম' নৃত্য বিশেষ ভাবে উপভোগ্য হইয়াছিল।

বঙ্গীয় বালক ফুটবল সঙ্ঘ

আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকায় বিডন স্কোয়ারে বঙ্গীয় বালক ফুটবল সঙ্ঘের (Bengal Boys Football Association) দ্বিতীয় বাৎসরিক সভা এবং পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান হইবে। ভাগ্যকুলের জমিদার রায় গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন এবং পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

রুদ্রের কাছে মানি

শ্রীবিভুদান রায় চৌধুরী

সেদিন শ্রাবণ বর্ষা আকাশে
ঝরে বারি ঝর ঝর,
রুদ্ধ বাতাস পেয়ে স্বাধীনতা
করিতেছে সর সর।
আমি একা বসি বাতায়ন পথে
হেরিতে ছিলাম রণ,
প্রকৃতি আজিকে বড় একা বুঝি
তাই কাঁদে উপবন।
ধূলা-মাথা-ধরা হয়েছে সিক্ত
নাহি আর তার গর্ব্ব,
রুদ্রের কাছে মানি পরাজয়
বিলায়েছে তারে সর্ব।
আমি দেখি আর হাসি,—
উন্মাদ পেয়ে হাসির আভাষ
দেয় বুঝি সব নাশি।
কটাক্ষ করি' বিজলী চক্ষে
হাসিয়া ভয়াল হাস্য
কহিল সে হাঁকি, কি হে কবিবর;
থাকিবে এখনও ঘরের ভিতর,
আমায় তোমার এত ভয় ডর
কহ কি তোমার ভাষ্য?
বিদ্যুতে আজি বেড়ি চারিধারে,
ভয়-বিহ্বল করেছি সবারে
তুমি কবি হয়ে ঘরের ভিতরে
খুলিবে না কেন আস্য?

শুনি ভয়ালের গর্ব্বের বাণী
বাহিরিয়া গৃহ হিতে,
কহিলাম ডাকি, 'শোন্‌রে পাগল,
বিজ্ঞান বলে লভেছি যা বল,
পারিবিনা তুই হইতে সফল,
হানিলেও বাজ চিতে।
মানুষের মুখে শুনি এই কথা
রাগিয়া রক্তে পূর্ণ,
কহিল হাঁকিয়া বজ্রের স্বরে
বিজ্ঞান তোরে বাঁচাতে কি পারে
যদি আমি আসি' ঘেরি চারিধারে
দেই মাথা করি চূর্ণ?
বলিতে বলিতে রুদ্র-রুষিল
হানিয়া অগ্নি চক্ষে,
কাঁপাল ধরণী ঘোর গরিহাসে
পাতাল প্রাণীরা সবে মহা ত্রাসে
ঢালিল প্রবল জল মহারোষে
আনি দিল ভয় বক্ষে।
কহিলাম ডাকি শোন হে করাল
তোমারে চিনেছি আমি,
হানিও না আর গম্ভীর বাজ
তোমারে চিনেছি ওহে নটরাজ
যদি নাহি খোল ধ্বংসের সাজ
পৃথিবী যাইবে নামি।

নিউ সিনেমায় বিশ্বকর্ম্মা পূজা

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার নিউ থিয়েটার্সের কর্ম্মচারীবৃন্দ ধর্ম্মতলায় "নিউ সিনেমা" গৃহে যথারীতি মহাসমারোহে বিশ্বকর্ম্মা পূজা সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় প্রচুর আহারাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সহরের চিত্র সংক্রান্ত এবং অন্যান্য বহু লোক ভূরিভোজে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ

গত বুধবার সন্ধ্যায় ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ব্যবসায় বিভাগের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক জলসার অনুষ্ঠান হয়।

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

"গৃহদাহ" এই শনিবার থেকে হবার কথা ছিল—কিন্তু হবে না। এ মাসের ২৬শে হবে। আর আসচে হপ্তাটা সংস্কার কার্য্যেই কেটে যাবে 'চিত্রা'-র। এখন কথা হ'চ্ছে, লোকেরও মনে আসচে অনেকদিন পরে নিউ থিয়েটার্সের ছবি আসচে—ছবিখানা কেমন হবে? আমাদের মনে হয় সোজা উত্তর—বড়ুয়া ও এন্-টির ছবি খারাপ হ'তে পারে না। এখন ফলেন পরিচীয়তে।

*　　*　　*

বড়ুয়ার "মায়া" হিন্দী ও বাঙলা সংস্করণ শেষ হয়েছে। বাঙলাদেশে এ ধরণের কাহিনী নিয়ে ছবি এর আগে আর ওঠে নি। বক্তীর যে সকল দৃশ্যের কল্পনা এতে চিত্রান্তরিত হ'য়েছে—শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, তা সত্যিকারের ভাবুকের মন ছাড়া রূপায়মান হয় না। এদিকে শিল্পী সমন্বয়েও ছবিখানা অতুলনীয়। সুতরাং ছবিখানা যে বাঙলার চিত্রশিল্পে এক নতুন ভাবের আদান প্রদান কোরবে—এ অনুমান করা অতি সহজ।

*　　*　　*

দেবকী বসু যে নিউ থিয়েটার্সে ঘোরাঘুরি কোরছেন—এ খবর আমরা অনেকবারই দিয়েছি, কিন্তু সে সময় এ খবর দেওয়া নিয়ে অনেকে অনেক রকম গোঁসা কোরেছিলেন। কিন্তু এখন বোধ হয় আমাদের আগেকার কথায় সত্যতার আভাষ পেয়ে নিশ্চয়ই লজ্জিত হবেন। কারণ, এবারকার খবরের খবর হ'চ্ছে দেবকী বসু আবার নিজের পুরনো কর্ম্মস্থল এন্-টিতেই আবার ফিরেছেন।

নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

নিউ থিয়েটার্স রিলিজ "বিজয়া" মুক্তির পথ চেয়ে রয়েছে। ১০ই অক্টোবর থেকে "বিজয়া" দেখানো হবে বলে প্রচারিত হয়, কিন্তু এখন শুনছি "বিজয়া"-র বিজয়-বাণী প্রচারিত হ'তে বিলম্ব আছে। "বিজয়া"-র ট্রেলার এখন "চিত্রা" ও "রূপবাণী"তে দেখানো হ'চ্ছে—সত্যি সুন্দর ট্রেলার হ'য়েছে—নতুন ধরণের ট্রেলার। হ্যাঁ, একটা খবর আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের দিই—একেবারে sure tip. "চোর কাঁটা-"র সেই তাসের আড্ডায় লোকটির সেদিন আর এদিনের পরিচয় যদি পেতে চান তা হলে সকলেরই "বিজয়া"-র ট্রেলার দেখা উচিত। কারণ শোনা যাচ্ছে আসল ছবিতে শরৎচন্দ্র, দীনেশ দা' ও আমাদের আলোচ্য সেই লোকটি আজ নিউ থিয়েটার্স বি ইউনিটের সর্ব্বময় কর্ত্তা যতীন মিত্তিরকে দেখা যাবে না। সামান্য Extra থেকে একটা ষ্টুডিওর হর্ত্তাকর্ত্তা হওয়ার ইতিহাস পৃথিবীর চিত্রশিল্পে বিরল। মিত্তির মশাই এ দিক থেকে সবাইকে চমৎকৃত কোরেছেন—এ কথা স্বীকার কোরতেই হবে।

কালী ফিল্মস্

হিন্দী "তরুণী"র শেষ কাজের জন্যে জ্যোতিষ মুখুজ্যে কয়েকদিনের জন্যে রাঁচি গিছলেন—তা' বলে কেউ যেমন ভুল করেন না, যে তাঁকে রাঁচি পাঠানো হয়েছিল। কারণ, খবর পাওয়া গেল, সম্প্রতি সুস্থ শরীরে বাহাল তবিয়তে সম্পাদনা-কক্ষে দিনের অর্দ্ধেক সময় তিনি কাটাচ্ছেন।

*　　*　　*

"টকী অফ টকীজ" সবাই ভেবেছিল পুজোর আগেই দেখতে পাবে, কিন্তু তা' বোধ হয় হ'য়ে উঠবে না। যে তুফান মেলের গতিতে এ ছবির শুটিং চলেছিল তা' যদি সম্প্রতি ছ্যাকড়া গাড়ীর স্পীডেও চলত তা হ'লে ছবিখানা শেষ হ'লেও হ'তে পারত। কিন্তু কোলকাতায় থিয়েটার আর বাইরে থিয়েটারে এমনিভাবেই যদি শিশিরকুমারের দিন কাটে তা হ'লে বায়োস্কোপের কাজটা কখনই বা তিনি দেখেন!

কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চ্যাটার্জ্জী প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় সঙ্ঘের বাণী প্রচার প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙলার তথা ভারতের আজ সর্ব্বাপেক্ষা যাহা বড় অভাব, তাহা হইতেছে ধর্ম্মাভাবের।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত কিশোরী ব্যানার্জ্জী, ডাঃ চারু বসু, সত্যানন্দ বসু, কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, ডাঃ সরসীলাল সরকার, অধ্যাপক মন্মথ বসু, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, শ্রীশ রায় চৌধুরী, সুধীরকুমার লাহিড়ী, হরিদাস মজুমদার প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস

এদের বাঙলা "সোণার সংসার" পুজোর আগেই "উত্তরা"য় মুক্তি পাবে ঠিক হ'য়েছে। ছবিখানাকে সব দিক থেকে ভাল করবার জন্যে দেবকী বসু আপ্রাণ চেষ্টা কোরেছেন এবং এ ছবিখানার জন্যে এক অপূর্ব্ব শিল্পী-সমাবেশ হ'য়েছে—এ কথাও সত্যি। শিল্পীদের নাম আগেই আমরা জানিয়েছি—তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ছবিখানার শেষাংশ এখন তোলা হ'চ্ছে। দেবকী বসুর অস্তমিত গৌরব যদি আবার পুনরুদ্ধানিত হয়—তা' হ'লেই রক্ষে!

রাধা ফিল্মস

এদের "বিষবৃক্ষ"এর শূটিংয়ের স্পীড্ খুব বেড়েছে। কারণ, শোনা যাচ্ছে, ছবিখানা পুজোর আগে মুক্তির জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন। "রূপবাণী"তে পুজোর আগেই ছবিখানা মুক্তি পাবে বলে গুজব।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চাস

মধু বোসের পরিচালনায় এদের এ বছরের অভিনব আকর্ষণ "আলিবাবা"র শূটিং অনেকটা এগিয়েছে। ছবিখানার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যাতে বাঙলার চিত্র-রাজ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে যায় তার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্টা কোরছেন—এরূপ আমরা শুনেছি।

দেবদত্ত ফিল্মস

এদের অন্তর্বিপ্লবের অবসান হ'য়েছে। ছবি তোলার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা কোরচেন এবং শিগ্‌গিরই যে কাজ সুরু হবে এরকম আশ্বাসও পাওয়া গেছে।

পপুলার পিক্‌চাস

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে সতু সেনের পরিচালনায় ও সুধীর বাসের তত্ত্বাবধানে শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিত মশাই" তোলা অনেকটা এগিয়েছে।

বেঙ্গল টকীজ

পপুলার পিক্‌চার্সের সত্ত্বাধিকারী যামিনী মিত্তিরের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানটি মঞ্চের শ্রেষ্ঠ সাফল্যমণ্ডিত নাটক "সরলা" চিত্রে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা কোরছেন। অনতিবিলম্বেই ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে "সরলা"র শূটিং বসবে। নাম ভূমিকা ছাড়া এতে কারা কোন চরিত্রে নামবেন তাও ঠিক হয়েছে। শশিভূষণ—তুলসী লাহিড়ী, গদাধর—অহীন্দ্র চৌধুরী, বিধুভূষণ—জীবন গাঙ্গুলী, নীলকমল—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, রমেশ—তারাকুমার ভাদুড়ী, শ্যামা—প্রভা, দিগম্বরী—সুশীলা, প্রমদা—মনোরমা, প্রমদার মা—ব্র্যাকী।

রবি রায়ের সম্মান রজনী

আসচে শুক্রবার জনপ্রিয় নট রবি রায়ের সম্মান রজনী উপলক্ষে "নাট্য-নিকেতন" রঙ্গমঞ্চে এক অভিনব আয়োজনের ব্যবস্থা হয়েছে। শুক্রবারের প্রমোদ-সূচী নীচে দেওয়া হল।

(১) সঙ্গীত—কঙ্কাবতী ও নীহারবালা, (২) 'রঘুবীর', 'সীতা' এবং 'মা' (দৃশ্যাভিনয়) —শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও প্রভা (৩) "পোষ্যপুত্র", (৪) "খনা"। এ দু'খানি নাটকে নামবেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রবি রায়, ভূমেন রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, জীবন গাঙ্গুলী, জহর গাঙ্গুলী, ইন্দু মুখার্জ্জি, আশু বোস, নীহারবালা, নিরুপমা, চারুবালা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি।

"কেদার রায়ে"র কনক-জয়ন্তী

গেল শনিবার সন্ধ্যায় "নাট্যনিকেতনে" "কেদার রায়ে"র কনক-জয়ন্তী অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর পৌরহিত্যে এবং সাংবাদিক ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে যে সকল শিল্পী "কেদার রায়ে"র অভিনয়ে একদিনও অনুপস্থিত থাকেননি তাঁদের পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। "কেদার রায়ে"র এই সাফল্যের জন্যে আমরা ক্যালকাটা থিয়েটার্সের কর্ত্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরলোকে চানী দত্ত

বাংলার ছায়াছবির রাজ্যের অন্যতম আলসকর্ম্মী রমেশচন্দ্র দত্ত ওরফে চানী দত্তের অকালমৃত্যুর সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হ'য়েছি। গেল সোমবার এই শোকাবহ ঘটনা ঘটে। বাংলার শ্রেষ্ঠ চিত্র প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সে চানী দত্তের যে অসামান্য দান আছে তা বাংলার ছায়াছবির খবর যিনি রাখেন তিনিই জানেন। নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে দেবার পর তিনি ইদানীং নিজেই ছবি তুলছিলেন এবং কত তাঁর শেষ অবদান "থাস দখল"। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

নির্ব্বাচন প্রার্থীরূপে রাজবন্দী

কয়েকদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী আলোচনা প্রসঙ্গে প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় আসন্ন নির্ব্বাচনে রাজবন্দীদের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রার্থীকে দাঁড় করাইবার কথা বলেন। এ বিষয় আমরা সত্যেন্দ্রবাবুর সহিত একমত। নির্ব্বাচনের পর কংগ্রেসী সভ্যরা রাজবন্দীদের বিষয়ে যে কতদূর ভাবিবার অবসর পাইবেন তাহা আমাদের জানা নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিজেদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিকারের ভার তাঁহাদের নিজেদের হাতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। অন্ততঃ ছয়-সাতজন প্রার্থী তাঁহাদের মধ্য হইতে মনোনয়ণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে উত্তর কলিকাতা হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী করা প্রয়োজন ও বাঞ্ছনীয়। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে যাঁহারা অবরুদ্ধ তাঁহাদের প্রতি জনমতের আস্থা আছে কিনা তাহাও সরকার পক্ষের জানা দরকার। এবিষয়ে আমরা বাঙ্গলা কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী বোর্ড ও ডিষ্ট্রিক্ট কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুক্তি

"খেয়ালী" প্রেসে—প্রীতি—সম্বর্দ্ধনা

"খেয়ালী"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সাত মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর দমদম জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

"খেয়ালী"র মানহানি মামলায় আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল-কে-সেন শ্রীযুক্ত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে ১৮ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। আপীলে জেলাজজ মিঃ এ-এন-সেন শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জনকে বেকসুর মুক্তি দিয়া যোগজীবন বাবুর দণ্ডাদেশ ১৮ মাস হইতে ৯ মাসে হ্রাস করেন। হাইকোর্টে বিচারপতিদ্বয় মিঃ কানলিফ ও মিঃ হেণ্ডারসন যোগজীবনবাবুর আপীল অগ্রাহ্য করিলে ৯ মাস দণ্ড ভোগের জন্য তিনি কারাবরণ করেন।

সাত মাস কারাভোগের পর তাঁহার দুই মাস দণ্ডকাল মকুব করা হইলে গত শুক্রবার যোগজীবনবাবু মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

যোগজীবনবাবুকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রবিবার দিন ১১নং চক্রবেড়িয়া রোডস্থিত খেয়ালী প্রেসে এক প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাংবাদিক, চিত্র-প্রযোজক, পরিবেশক এবং প্রদর্শক, কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার সর্ব্বপ্রথমে কয়েকখানি সুন্দর হাসির গান গাহিয়া উপস্থিত ভদ্র মহোদয়দিগকে বিমুগ্ধ করেন। তাহার পরে আহারাদির পর অনেক রাত্রিতে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী (কালী ফিল্মস), হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন ঘোষ (রাধা ফিল্মস), এস-আর হেমাদ (এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটারস্), মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় এবং খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় (গ্রীভেন এণ্ড কোং), সুধীরেন্দ্র সান্যাল এবং মজাহর খাঁ (ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস), কুমুদরঞ্জন দাস (কালী ফিল্মস), সুধীর দাস (পপুলার পিক্‌চারস্), শভু সেন (রঙমহল), মনোমোহন ঘোষ (ম্যানেজার—"শ্রী"), এইচ ব্যানার্জ্জি (পূর্ণ থিয়েটার), পি ভাণ্ডেস (ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টস), কৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি (গ্লাসগো প্রিণ্টিং ওয়ার্কস), দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ (কর্পোরেশনের কাউন্সিলার) অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, অশোকনাথ শাস্ত্রী এবং গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ অনাথনাথ রায় এবং কবিরাজ সুশীলকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক: দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী), বিনয় বসু (সম্পাদক: মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী), কুলদা রঞ্জন সেনগুপ্ত, চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর বসু, কানাই দত্ত, মাখনলাল সেন এবং প্রভাত গাঙ্গুলী (আনন্দবাজার), হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ (বসুমতী), নিমাই চরণ বসু, অতুলানন্দ দত্ত, জ্ঞান মিত্র, ডাঃ ধীরেন সেন, অধ্যাপক খগেন সেন, প্রমোদ সেন, শচীন ঘোষ, ব্রজেন গুপ্ত, নীরেন সেন ও অবিনাশ সেন (এ্যাড্‌ভান্স), কুমুদিনী নিয়োগী, কালীপদ বিশ্বাস এবং যতীন মুখার্জ্জি (এসোসিয়েটেড প্রেস), চারু সরকার (ইউনাইটেড প্রেস), ফণি মুখার্জ্জি (ভারতবর্ষ), বিজয় দাশগুপ্ত (কেশরী) কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক (বন্দেমাতরম), জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, অজিত দে (সলিসিটার), কিশোর রায়চৌধুরী (সলিসিটার), মোহাম্মদ মোদাব্বের (মোহাম্মদী), রামাদাস চট্টোপাধ্যায় (সিষ্টোফন ল্যাবরেটরী)। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু, অনিল রায়, অবিনাশ চন্দ্র সেন।

মুক্তি

শ্রীসুধীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অজয় ছবি আঁকত, আঁকতে ভালবাসতও খুব—কিন্তু তার চেয়েও ভালবাসত এক-জনাকে—সে শিপ্রা। শিপ্রা নামটা ওকে মানিয়েচে ভাল—খরস্রোতার মতই ওর জীবনের ধারা, স্রোতের বেগের মতই ওর সহজ স্বচ্ছন্দ গতি। শিপ্রা কাজে অকাজে আসে অজয়ের ছবি আঁকবার ঘরে; এসে সরল স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়ায় অজয়ের পেছনে,—অজয়ের হাতের তুলি থাকে হাতে, ছবিতে পায় না রঙ; মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর মুখের পানে, সে দৃষ্টি লাগে শিপ্রার লাজুক দুটি চোখে, তার রঙ ধরে ওর মনে, ওর প্রাণে; শিপ্রা হাসে আর বলে,—কিগো শিল্পী—এতদিনে আদর্শ কি তোমার মিলল? অজয় কথা বলে না। শিপ্রা হোল অজয়ের সাতরঙে রাঙা রামধনু, মনের আকাশে রঙের হোরি খেলে সহসা আবার রামধনুর মতই অদৃশ্য হয়ে যায়। অজয় ছবি আঁকে ভাল কিন্তু শিপ্রার কাছে সে গুলো যেন লজ্জায় বোরখা পরে সরে যেতে চায়, শিপ্রা বলে,—শুধু ছবিই আঁক, এমন ছবি আঁকতে পার শিল্পী, যে তোমার তুলির ছোঁয়ায় হবে জীবন্ত, সর্ব্বদেহে জাগবে তার প্রাণের হিল্লোল। অজয় বলে,—সে ছবি ত' আমার সামনে—তুলির আঁচড়ে ওর রঙ ধরে না—ওর রঙ মনে; শিপ্রা ত্বরিত গতিতে ঘর ছেড়ে চলে যায়—অজয় অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে ওর আষাঢ়ের কালমেঘের মত একরাশ এলিয়ে পড়া কাল চুলের দিকে,—মনে চলে মায়াজালের সৃষ্টি—অজয় আবার কাজে মন দেয়।

শিপ্রা বড় ঘরের মেয়ে, বিশেষতঃ ওর বাপ মা হ'লেন প্রগতি দলের পক্ষপাতী; কাজেই মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষা, চলাফেরা সম্বন্ধে প্রাক্ আধুনিক ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না; অজয়েরা এতদূর না হ'লেও ওদের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়াচ ছিল—তা ছাড়া শিল্পী, ওদের মনের সব কটা জানালাই খোলা। শিপ্রা অজয়কে ডাকে, শিল্পী; অজয় উত্তর দেয়, কি-গো শিল্প,—এমনি সহজ ও স্বচ্ছন্দ ওদের মেলামেশা—এমনি সাবলীল ছন্দে কাটে ওদের দিন-গুলো।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক আর্ট প্রতিযোগীতায় ছবি এঁকে পাঠিয়েছিল অজয়; হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত—সেই প্রতিযোগীতায় অজয় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রেচে এবং একটা মোটা রকমের স্কলারশিপ্ পেয়েচে ইটালী যাবার জন্যে। অজয় সে সময় বাড়ী ছিল না, শিপ্রা এসেছিল ওদের বাড়ী অজয়ের খোঁজে, এমন সময় টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত—টেলিগ্রামটা খুলে পড়তেই হঠাৎ শিপ্রার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; অজয়ের মাকে ডেকে সমস্ত কথা এক নিঃশ্বাসে বলে জিজ্ঞাসা ক'রলে,—শিল্পী কোথায় গেচে মাসিমা; অজয়ের মা ব'ললেন,—এইত' ছিল সে ঘরে। শিপ্রা জানে অজয়ের যখন ছবি আঁকতে আঁকতে আসে ক্লান্তি—তখন সে যায় নদীর ধারে;—সে ছুটল টেলিগ্রাম হাতে; অজয় তখন একমনে বসে কি যেন ভাবচে।

নদীর সারা বুক কিসের আনন্দে ফুলে ফুলে উঠচে, ঢেউয়ের মুখে মুখে জাগচে ভাষা। সবুজ ঘাসের উপর পা দু'টো ছড়িয়ে দিয়েচে শিপ্রা, মুখখানা তার অজয়ের বুকের কাছে—অতি কাছে, দু'খানা হাত অজয়ের গলায় মালার মত জড়ান, দু'টো মুখ মুখোমুখি।

শিল্পী?

কি?

একটা কথা বলি—?

বল।

অনেকক্ষণ যায় কেটে,—কিন্তু সেই কথাটি আর বলা হয় না।

"চুপ ক'রে গেলে যে?"

"ছিঃ, এসব কি দুষ্টুমি!"

"তবে তুমি কি চাইছ?" অজয় হাসে।

"কিছুনা, মুক্তি।" সলজ্জ হাসির রঙে শিপ্রারও মুখখানা রাঙা হ'য়ে উঠে।

"ওসব তত্ত্বজ্ঞানীর কথা কালকের জন্যে তোলা থাক শিল্প, আজকে আমি মুক্তি চাইনে, মুক্তির চাইতে বন্ধনকেই যেন প্রিয় ব'লে মনে হ'চ্ছে।"

শিপ্রা কোন কথা বলে না, অজয়ের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নেয়।

বিদায়ের দিন সকলকে যথারীতি প্রণাম আশীর্ব্বাদ ক'রে অজয় রওনা হ'ল। সকলের মনই কেন যেন ভারাক্রান্ত। শিপ্রাকে ছেড়ে যেতে অজয়ের মনটা বারে বারে মুষড়ে পড়ছে, কিন্তু শিপ্রার চোখে কোন সজলতা ছিল না—ছিল একটা অনাবিল আনন্দের ঝিকিমিকি, এটা যেমনি অস্বাভাবিক তেমনি সুন্দর।

সন্ধ্যাবেলা দৌড়ে নদীর ধারে যায় শিপ্রা,—অজয় নেই—সারা প্রাণটা হা-হা করে উঠে। যে জিনিষটা কাছে থাকতে শিপ্রা বুঝতে পারেনি, মূল্য দেয়নি—দূরে যেয়ে সে যে অনেকখানি দুর্ম্মূল্য হ'য়ে গেল! এক্ এক্ দিন অজয়ের ছবি আঁকা দেখতে দুপুর বেলা শিপ্রা চ'লে

আসে, –দেখে টেবিলের উপর একখানা ভাঙা তুলি শুষ্কমুখে পড়ে আছে—যেন তারই দিকে চেয়ে।

খান তিনেক চিঠি লিখেছিল অজয় কিন্তু কোন উত্তরই পায়নি। আজ দু'বছর পরে চিঠি লিখতে বসল শিপ্রা। চিঠি লেখা হ'য়ে গেল; বার দু'য়েক পড়ে সে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেললে খণ্ড খণ্ড ক'রে, মনে মনে ভাবল, চিঠি লিখেই বা কি হবে! কিন্তু ঐ দু'ছত্রের চিঠির জন্যে যে এক ইটালীবাসী যুবকের চোখ দু'টো মাঝে মাঝে অশ্রুসজল হ'য়ে উঠে।

দেখতে দেখতে দুই, তিন, চার পাঁচটি বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে,—অজয় ফিরে এসেছে। এক্‌একবার তার ইচ্ছা হোত-শিপ্রাকে দেখে—কিন্তু আজ যেন সেটা এক মস্ত বড় অসম্ভব। পরঘরবাসিনী শিপ্রা—কোথায় যে তার ঘর,—কেমন যে সে আছে—মনটা বারে বারে সেই কথাটাই জানতে চায়।

রাত্রি দিন একটা ছোট ঘরে বসে বসে ছবি আঁকে অজয়। কত নারী এসেছে বিচিত্র বেশে—কল্যাণ শুভ্র হস্তে দিয়ে গেছে আল্পনা,—কিন্তু সে আলিম্পনা চোখে লাগে মনে ধরে না, অজয়ের মনটা অনেকটা' কঠিন হয়ে উঠেছে—যেন একটা আর্শী—ছায়া পড়ে দাগ পড়ে না।

সমুদ্র দেখবার সাধ হ'য়েছে অজয়ের—তাই পুরীতে এসেছে। সে সমুদ্র দেখে অবাক হ'য়ে, লোকে অবাক হ'য়ে দেখে তাকে। এ লোকটা কী! ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ব'সে ব'সে সমুদ্র দেখছে,—ও দেখে কি? পাগল নয় ত! অমনি খামখেয়ালী হ'য়ে গেছে অজয়, যখন যা করে তার আর বিরাম নেই বিরক্তি নেই। দিনের পর দিন রাতের পর রাত বসে বসে ছবি আঁকে অজয় ক্ষিধে, তেষ্টা, বিশ্রাম কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। এই যে উন্মাদনা, ছবি আঁকবার এই যে পাগলা নেশা তাকে কে ধরাল! সকাল থেকে আরম্ভ ক'রে সারা দিনটা একখানা ছবির উপর তুলি বুলিয়ে—অজয়ের শিল্পীমন বাইরের আলো বাতাসের পানে ছুটে যেতে চাইল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল অজয়—সমুদ্রের ডাক্ যেন তার কানে পৌচেছে। অজয়ের তুলির রঙের ভাণ্ডার যখন ফুরিয়ে আসে তখনই সে বেরিয়ে আসে ঐ বিস্তীর্ণ বালুবেলায় ঐ সমুদ্রের ধারে। উপরে অনন্ত আকাশ, সামনে অনন্ত বারিধারা,—অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মীটুকু তার চঞ্চল বুকে পড়ে এক অপূর্ব্ব বর্ণ-বিলাসের সৃষ্টি ক'রেছে। অজয়ের শিল্পীমন পরাজয় মানে বারবার—এই অপরূপ বর্ণচ্ছটায় জলের উপর সোনালী রূপালী খেলা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে; দূরে আকাশের কোল ঘেসে রয়েছে একখানা ঢেউ-খেলানো সাদা মেঘ—তার মধ্য দিয়ে সূর্য্যদেব অস্ত যাচ্ছেন—যেন স্বপনদেশের রাজপুরীর উদ্দেশে ওর যাত্রা, অজয় ভাবে,—জগতে এত রঙের ভাণ্ডার তবু কেন বৃথাই তুলি নিয়ে বসে থাকি বদ্ধ ঘরের ভিতর—ব্যর্থ আয়োজন করি রঙ ফোটাবার,—অজয়ের নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। নিজের হীনতার মাঝখানেই শিপ্রাকে তার মনে পড়ে। ইটালী থেকে এসে তার সঙ্গে শুধু একবার দেখা হোয়েছিল বোটানিকাল গার্ডেনে; সঙ্গে একজন কে ছিলেন সাহেবী পোষাক পরা—বোধ হয় ওর স্বামী। দু'জনে মুহূর্ত্তের জন্য চোখাচোখি হ'য়েছিল—মুখের কোন কথা হয়নি, তবুও সেই নীরব দৃষ্টির মধ্যেই তাদের সব কথা ভাষা পেয়েছিল। শিপ্রার স্ফূর্ত্তীদীপ্ত চেহারাখানায় নানা রঙের ঝিলিমিলি,—অজয়ের মনে হ'ল—শিপ্রা যেন আকাশের রামধনু—বাইরে ওর যত রঙ যত বর্ণবিলাসই থাক অন্তরের রূপ হ'চ্ছে বরষা।

এমনি বসে বসে ভাবছে এমন সময় একটি ভদ্রলোক তার পাশে এসে দাঁড়ালেন বললেন,—একটু আসবেন ক্যামেরাটা নিয়ে। কথা ক টা তাড়াতাড়ি বলবার প্রচেষ্টায় একটু যেন তুৎলে গেল।

* * *

ভদ্রলোক শ্মশানে এসে দাঁড়ালেন, বললেন,—এই এ্যারই একটা ফোটো তুলতে হবে।

কি রকম ভাবে তুলতে চান ?"

"সে আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।"

"আমি বলি কি—চিতায় তুলে দিন মুখের কাপড় আলগাকরে—তারপরে ঐ মর্ত্তমতী মৃত্যু ও মৃতকে একসঙ্গেই তুলে ফেলন ; কি বলেন ?"

ভদ্রলোকটি যথারীতি কর্ত্তব্য সমাধা ক'রলেন। চিতার উপর শব উঠল,—অজয় কালো কাপড়ের নীচে ফোকাস ঠিক ক'রছে তখন। আস্তে আস্তে মৃতার মুখের উপরকার কাপড় রিয়ে দেওয়া হ'ল—অজয় উঠল চমকে—একি! কে এ!!

মশাই একস্‌পোজার দিন, এদিকে যে সব শেষ হ'য়ে গেল!"

এ কণ্ঠ অজয়ের কানে গেল না—পায়ের তলার মাটিটা যেন সরে গেছে এইভাবে সে সেখানেই ধপ ক'রে বসে পড়ল।

চিতা ধুইয়ে দেওয়া হ'ল ;—তবুও অজয় ঐ খানেই বসে। ভদ্রলোক ব'ললেন নিজমনে, লোক যে পাগল বলে সে দেখছি মিথ্যে নয় ; কাছে যেয়ে বললেন,—চলুন, বাড়ী রেখে আসি আপনাকে। কোন কথা অজয় ব'লল না, চোখে তার অশ্রু নেই, বুকে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস বাজে না। একেই কি মুক্তি বল শিপ্রা ? অজয়ের চোখে একটা পাগলের দৃষ্টি ; ভদ্রলোক চমকে প্রশ্ন করলেন,—বৌদিকে আপনি চিনতেন নাকি ?

"কে !"

"এই যে বলছেন—শিপ্রা।—"

অজয় সে কথায় কোন উত্তর দিল না।

তারপর দু'তিন দিন কেটে গেছে—স্নান ঘুম কিছু তার নেই : আঁকছে চতুর্দ্দশী শিপ্রার কৈশোরিকা মূর্ত্তি তিলে তিলে প্রাণ ঢেলে। ঘুমে চোখ ভেঙে পড়ছে—তবু-ও সে ওঠে না'—ছবি আঁকার শেষ যে এখনও হয়নি।

দুরন্ত সাগর—মাঝে ছোট একটা দ্বীপ। সাগরের অনন্ত বালুবেলায় উপর বসে একটা কিশোর আঁড় বাঁশী বাজাচ্ছে—বাঁশীর সুরে সমস্ত ভুবন আকাশ মম মম ক'রছে—উপরে একখানা কালমেঘ উড়ে আসছে যুবতি মনের ব্যথার মত। ছোট্ট সেই দ্বীপের উপর পা দু'খানা ঈষৎ ভেজে আলগাভাবে বসে আছে এক কিশোরী,—আঙুলের ফাঁক বেয়ে তার টস্‌ টস্‌ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ; আর এই দু'টি মিলনব্যাকুল কিশোর কিশোরীর মাঝখানে উন্মত্ত সাগর অধীর হ'য়ে ফুলে ফুলে গর্জ্জন ক'রছে—নরনারীর চিরন্তন হাহাকারের মত। ছবির এই কিশোর কিশোরীর মূর্ত্তি ঠিক যেন কৈশোরের ছাঁচে ঢালা অজয় আর শিপ্রা।

ছবি শেষ হ'য়ে গেছে,—রাত্রি তখন গোটা তিনেক হবে। ছবিখানা হাতে ক'রে অজয় বেরিয়ে গেল। অনেক ডাকা

তরুণ সাহিত্য ও আদর্শবাদ

শ্রীমোহজিৎ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য জগতে তরুণ সাহিত্যের একান্ত অভাব। কিন্তু সাহিত্য সর্ব্ববিষয়ে সুন্দর হইলেও সর্ব্বত্র তরুণের উপযোগী নহে। শিশুসাহিত্য শিশুর আনন্দের জন্য, তাহার কল্পনাশক্তি তখন বাস্তব নহে, বিশ্বাস তখন তাহার আপেক্ষিক নহে, সে চায় কিছু অবাস্তব, কিছু অতিরঞ্জিত ও কিছু জাকজমক। বঙ্গসাহিত্যে, শিশুসাহিত্যের অভাব নেই। রাক্ষস-খোক্কস, ভূত-পেত্নী, আফ্রিকাবাসী, অরণ্যবাসী সমস্তই অদ্ভুত বিষয় তাহাদের চিত্তাকর্ষক—কিছু হাসি, কিছু সাহস, কিছু দুষ্টামী তাহাদের প্রিয়—তাহাতে বাস্তব শিক্ষার উপকরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু সেগুলি তাহাদের কল্পনাকে আকর্ষণ করে।

এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে, এই সাহিত্য তরুণের উপযোগী কিনা। শিশু-সাহিত্যে থাকে 'হাল্কা' জিনিষ, বৃহৎ ব্যাপারের মাঝে সকলেরই এই হাল্কা জিনিষ উপভোগ্য, কিন্তু এই হাল্কা জিনিষকে যদি মুখ্য সাহিত্য বলিয়া তরুণের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তবে তাহাতে চরিত্রের দৃঢ়তা ও বাস্তবতা বাড়ে না। তাহাদের মন সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ, তাই এই অবাস্তব কল্পনাময় সাহিত্য তাহাদের সাময়িক আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু জীবন যাত্রার পক্ষে এ সাহিত্য হয় সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও অসম্পূর্ণ।

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যকে এখন মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। গল্প ও উপন্যাস এবং 'কবিতা। নাটক সাহিত্য, বঙ্গ সাহিত্যে তত উন্নত নয় এবং নাটকপ্রিয় ব্যক্তির সংখ্যাও প্রচুর নয়। এখন এই গল্প, উপন্যাস ও কবিতাগুলিকে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এইগুলি তরুণদের আদৌ উপযোগী নয়।

এই সমস্ত আধুনিক নভেল ও কবিতা সাধারণের মন হরণ করিতে পারে, এতে কিছু সৌন্দর্য্য থাকতে পারে, কিন্তু এ'গুলি শিক্ষার দিক দিয়ে একান্তই মূল্যহীন। তরুণের মন সাধারণতঃ চঞ্চল, কোমল, আদর্শপ্রিয় ও অনুকরণশীল—পৃথিবী তাহার নিকট তখন সবেমাত্র রূপ বিকীর্ণ করিতে থাকে, সমস্ত প্রকৃত অপ্রকৃত বস্তু তখন তাহার নিকট শুদ্ধ-নির্ম্মল বলিয়া প্রতীয়মান হয়! অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাহার হৃদয় আনন্দ ও আদর্শ অনুসরণ করে। এই সময়ে যদি তাহাদের আদর্শ কিছু না দেওয়া যায়, তবে বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা উন্নত চিত্তবৃত্তির আকাঙ্খা হারাইয়া ফেলে। তরুণ কেবলমাত্র আনন্দ চায় না, সে চায় আদর্শ, অনুকরণীয় বিষয় বস্তু।

এই হেতু প্রত্যেক সাহিত্যে সম্পূর্ণভাবে এক নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠা প্রয়োজন—যাহাতে থাকিবে বিমল আনন্দ, বাস্তবতা ও আদর্শবাদ। কি আদর্শ, কোন দেশের আদর্শ বা কাহার আদর্শ অনুকরণীয়, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভবপর নয়, তবে এই মাত্র বলা প্রয়োজন, কেবল বাস্তবতায় সমাজ ও জাতি গঠিত হইতে পারে না—তাহারা উন্নত শীর্ষেও আরোহণ করিতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুরই থাকিবে আদর্শ, প্রত্যেক বিষয়েরই শ্রেষ্ঠতম—আদর্শই শেষ এবং আদর্শই সম্পূর্ণ।

এই আদর্শ সাহিত্য গড়িয়া উঠিলে, দেশের অতি আধুনিক লেখক লেখিকা ও কবিদের লেখাও অনেক সংযত হইয়া আসিবে। কারণ নোংরা অপরিচ্ছন্ন সাহিত্য চিন্তাশীল লোকেরা প্রায়ই আদর করেন না—সেগুলি সমাদৃত হয় তরুণদের সমাজে। নোংরা তাহারাও অপছন্দ করে, সকলেই করে; সুতরাং তাহারা চায় আদর্শ, কিন্তু এই আদর্শ সাহিত্যের অভাবে, তাহাদের মন ক্রমে এই সমস্ত দূষিত দ্রব্যে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, এবং তদ্দারা জীবনে ও চরিত্রে দৃপ্তি তেজ ও শক্তি আনিতে পারে না।

হাঁকির পরে সেই সেদিনকার ভদ্রলোকটী বেরিয়ে এলেন; রাত্রি তিনটেয় এই ভাবে এই পাগলটাকে তিনি বুঝি প্রত্যাশা ক'রেন নি,—একটু কর্কশ কণ্ঠেই ব'ললেন,—কি দরকার মশাই!

অজয় একটু হাসল,—বলল, ক্ষমা ক'রবেন—সেদিন ফোটোটা তুলতে পারিনি বলে,—তারই পরিবর্ত্তে এইটে দিয়ে যাচ্ছি—এই-ই আমার শেষ কীর্ত্তি—এই-ই আমার তাজমহল।

অজয় চলে গেল। যতদূর চোখ যায় ভদ্রলোক দেখলেন সীমাহীন বিস্তীর্ণ বালুবেলা—আধফালি চাঁদের আলোয় চিক্ চিক্ ক'রছে,—ঐ স্বপ্নপুরীর যাত্রীকে আর দেখা যায় না,—সমুদ্রের গর্জ্জন কানে

শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর

প্রযোজনায়

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

অহীন্দ্র চৌধুরী

বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

শৈলেন চৌধুরী

শীতল পাল

কঙ্কাবতী

রাণীবালা

●

টকী অফ্ টকীজ

রঙ্গমঞ্চের যুগান্তকারী নাটক নবরূপে সজ্জিত রূপোলি পর্দায় অবিলম্বেই আত্ম-প্রকাশ করিবে।

কামিনী

শ্রীঅনাদি ভট্টাচার্য্য

স্থানটী অতি মনোরম। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়, তার গায় মাথায় হচ্ছে আলো ছায়ার খেলা। পাহাড়ের ধারে মাঠ, সবুজ ঘাসে ভরা। পাশ দিয়ে তার কুলুকুলু তানে বয়ে চলেছে স্বচ্ছতোয়া অলকানন্দা—উদাস মনেও এ যেন পুলকের পরশ লাগায়। নামটী তার 'মায়া মঞ্জিল', বোধ হয় কোন কবি এই নামে স্থানটীকে সার্থক ক'রে তুলেছেন। এখানে আকাশে বাতাসে মিশে আছে যেন মায়া আর মমতা, শান্তি আর স্বচ্ছন্দতা। তাই বুঝি সংসার তাপদগ্ধ পথিকের দল শান্তির আশায় আসে হেথায়—তরুণ তরুণী বুঝি বা আসে ভবিষ্যতে সুখের ঘর তৈরীর সোনার স্বপন বুকে নিয়ে আর আসে তরলমতি সরল ছেলেরা বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, কঠোর সাধনা ত্যাগ ক'রে, হেসে খেলে তাদের অবকাশ গুলিকে কাটিয়ে দিতে।

শরৎ সন্ধ্যা। শিউলি বকুল তাদের ঘোমটা খুলেছে। মায়া মঞ্জিলে হয়েছে নন্দনের শোভা। নানা দেশের, নানা বয়সের লোকও হয়েছে হেথায় জড়। সন্ধ্যাসকাল নদীর ধারে ও পাহাড়ে বেড়ানই তাদের কাজ—কেউবা একা একা, কোথাও জোড়ে জোড়ে, নিরালায় বসে থাকতে দেখা যায় কেবল একটী তরুণীকে। সে আসে ধীরে, থাকে নিরালায় আর কখন যে যায় তা জানা যায় না। তরুণীটী ফুল দিয়ে ঘেরা কালজল দীঘির বাঁধান ছোট ঘাটটীর ওপর বসে। সে যেন মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য। কিন্তু হায়! তারও চোখে জল! একি তার হৃদয়ানন্দের উচ্ছ্বাস 'হৃদয় বল্লভের সব ভুলান মন মজান আদরের জন্য; তানয়, সে কাঁদছে, ফুলে ফুলে কঁদছে। তার পেলব গালদুটী চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে—তার প্রতি নিঃশ্বাসটী যেন বলছে "ওগো, আমি আজ রিক্তা, আমি যে আমার বলতে যা কিছু সব হারিয়েছি।"

তরুণী কুসুম কামিনী। ছেলেবেলা থেকে দিবাকর নামে ফুটফুটে একটী ছেলের সঙ্গে তার বড় ভাব। যখন ভালবাসা কি বোঝবার মত বয়স তা'র হয়নি তখন থেকে দিবাকরের চেহারা, দিবাকরের ভাব ভঙ্গী, দিবাকরের যা কিছু সবই সে ভালবাসতো, তাছাড়া তারা থাকতো খুব কাছাকাছি। দিবাকর কিন্তু তাকে বড় আমোল দিত না; সে ছিল চঞ্চল ও তীক্ষ্ণ।

এমনি ক'রে তাদের শৈশব কাটলো। ক্রমশঃ তাদের দেহ ও মন পরিপুষ্ট হল—এই বুঝি তাদের যৌবন। আজ দিবাকর সুকুমার তরুণ যুবক; কুসুম কামিনী ও সুন্দরী তরুণী। দুটীকে দেখলে মদন আর রতি ব'লে ভ্রম হয়। তা ছাড়া কামিনীর শৈশবের নামহারা ভালবাসা আজ নাম পেয়েছে। আজ সে দিবাকরকে পেতে চায় যেমন ক'রে রতি অনঙ্গকে পেয়েছে। আজ সে দিবাকরকে ভালবাসতে চায় যেমন ক'রে উষা অনিরুদ্ধকে ভালবেসেছিল। তাই আজ আকাশ বাতাস যখন হাসির গানে মাতোয়ারা তখন সেও মোহন হাসি হেসে তার অনিন্দ্য সুন্দর রূপ যৌবনের অভিনব ডালি সাজিয়ে নিজে উপযাচিকা হ'য়ে তার প্রিয়তমের হাতে তুলে দিতে ব'য়ে এনে কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর দিবাকর তার তাকিয়েও দেখলে না; শুধু অবজ্ঞার হেসে তার প্রাণের দান, প্রেমের দান দিয়ে তারই চোখের উপর সখী নলিনীর ধ'রে প্রেম জানাতে লাগলো। এ দৃ তার অসহ্য তাই সে ছুটে এল কাল দী কালো জলে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে স জ্বালা জুড়োতে।

ঐ বুঝি সে নামছে—এক, দুই, এল সে সবশেষ ধাপে, যেখানে দীঘির বাতাসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। এইবার নামলো ঐ ডুব দিলে। সবশেষ দেহ দীঘির কোলে তলিয়ে গেল। কা কিন্তু মরে নি—প্রেম যে অমর। মরজীবনের পূজা যে তখনও সারা তাই তা'র রূপান্তর হলো সে আজ কুসুম।

মানুষ দিবাকর তার প্রেমের অবজ্ঞায় ফেলে দিলেও স্বয়ং প্রেমের করছে তার পূজা গ্রহণ। কামিনী জীবন লাভ করলে। ঐ যে মর্ম্মর দীঘির ধারে গাছ ভ'রে গন্ধে দিক কামিনী ফুটে আছে ও আর কি কুসুম কামিনী তার প্রেমের অর্ঘ্য গোপনে শ্রীভগবানের জন্য সাজিয়ে ঐখানে তার মর দেহের হয়েছে স্মৃতি এখনও যায় নি তাই দিনের আ সঙ্গে ঝর ঝর ক'রে সে ঝরে পড়ে আঁ হৃদয় মানুষের কাছে পায় সে অবহেলা, তবু রোজই সে ঝ'রে পড়ে—বুঝি এতে তৃপ্তি।

—

বাংলা ছবি

শ্রীদেবাশীষ সেনগুপ্ত

আজ বাংলার ছায়াশিল্প তার শৈশবাবস্থা কাটিয়ে ধীরে ধীরে কৈশোরে উপনীত হচ্ছে—তার সে আধ-আধ ভাষা আজ আর নেই ; যে অসম্পূর্ণতা যে অভাব উন্নতির পথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল সেও তার মাথা নিচু করেছে—তবু কই তার সে কৈশোরের উচ্ছল ভঙ্গী ? কই তার সে লীলায়িত ভাষা ? কই সে মাধুর্য্য ? এর জন্য দায়ী কারা ? আজও এমন বাংলা ছবির সংখ্যাই বেশী, যা দেখে আর যা মনে হয়—একথা মনে হয় না যে তার জন্যে আমরা গৌরবান্বিত।

দু'শ্রেণীর দর্শকের কথা উল্লেখ করি :—এক শ্রেণী—যাঁরা বাংলা ছবি দেখা অসভ্যতা মনে করেন, চৌরঙ্গী অঞ্চলের ছবিঘর গুলিই যাদের Purse খালি করে। দ্বিতীয় শ্রেণী—যাদের কৈফিয়ৎ যে বাংলা ছবি তারা দেখেন নেহাৎ দায়ে পড়ে—স্বদেশী শিল্পকে সাহায্য কর্ব্বার জন্যে, নইলে বাংলা ছবিতে রসসৃষ্টি ? —রাম ! রাম ! অবশ্য এদের আচরণ সমর্থন যোগ্য নয় তবে একথা নিশ্চয়ই চিন্তনীয় যে এদের এরূপ মনোভাবের সুযোগ কারা দিয়েছেন ? ছায়াশিল্প ব্যবসায়ীরাই নন্ কি ? আর এক শ্রেণীর দর্শক আছেন যারা টেক্‌নিক্ ফেক্‌নিকের ধার ধারেন না—সু-অভিনয়ের ললিতকলার প্রয়োজনীয়তা যারা বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করেন না (অর্থাৎ যা তাদের বোধগম্য নয়—শিক্ষিত দু'একজন আবার অস্কার ওয়াইল্ডের দোহাই দিয়ে বলেন, "All art is quite useless and expresses nothing but itself") যারা শুধু চান বিরাট ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে সেটিং, নাচ-গান, হাসি-ঠাট্টা, নগ্নপ্রায় সুন্দরীদের কামনা-উদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী, চটুল কটাক্ষ—ইত্যাদি। অবশ্য বোম্বাই কায়দাও দু'একটা থাকা চাই। এই শ্রেণীর দর্শকদের রুচির পরেই ব্যবসায়ীদের বেশী নজর, মিনার্ভা, রূপমহল তো ওদের জন্যে টিকে আছে—সেখানে অভিনয় পাল্লা দেয় তাদের ট্যাকের কড়ির সঙ্গে। আবার একশ্রেণীর দর্শক আছেন যারা শুধুই চান বারকয়েক 'হরি, হরি' শুনতে এবং তার সংখ্যা যত বেশী হবে ছবিও হবে তত সুন্দর। এদের পরেও কারও কারও নজর বেশ তীক্ষ্ণ অর্থাৎ যেন তেন প্রকারেণ বার কয়েক হরিনাম শুনিয়ে দিতে পারলেই হল। অথচ বাংলার শ্রেষ্ঠ ছায়াশিল্প-ব্যবসায়ী 'নিউ থিয়েটার্স লিঃ'র দুখানা ছবি 'দেবদাস' ও 'ভাগ্যচক্র' কি সাফল্যই না লাভ করেছে—সকল শ্রেণীর দর্শক ও সমালোচক সানন্দে বরণ করে নিয়েছে ; অর্থও এ দুখানা ছবি দিয়েছে প্রচুর।

বাংলাদেশেও সমালোচকের দায়িত্ব বড় কম নয়। দর্শকেরা তাঁদের কাছ থেকে 'ভাল কি মন্দ' এই সাধারণ মত জানতে চান না—তাঁরা চান প্রতি অংশ বিশ্লেষণ করে তার দোষত্রুটী বিচার করা। সমালোচকেরা কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সে নির্ভীকতার পরিচয় দিতে পারেন না—তবে তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টাই করেন। সকল শ্রেণীর দর্শক ছবি দেখতে যাওয়ার আগে সাধারণতঃ তার সমালোচনা পাঠ করেন। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'ভাগ্যচক্র' বা 'দেবদাস' এর মত উচ্চাঙ্গের ছবি আলোচ্য-শ্রেণীর দর্শকদের কামনাকে নিরাশ কল্লেও আনন্দ দানে বঞ্চিত করে না এবং অনেকেই একাধিকবার সে রসাস্বাদ করতে দ্বিধা বোধ করেন না। শিশু যদি কুখাদ্য চায় তবে তাকে বিনাদ্বিধায় তাই দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয় তার সে আবদার কৌশলে প্রত্যাখ্যান করে তাকে সৎশিক্ষা দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি যেন মনে হয় কয়েকজন চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী উচ্চাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছবি তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা কর্চ্ছেন—কিন্তু তাঁদের সে প্রচেষ্টা তবু সফল হয় না। এর কারণ কি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল ছায়াশিল্প সংশ্লিষ্ট সকলেই পরিচালকের পদ দাবী করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুল প্রচারিত বহুগঠিত নাটক বা উপন্যাস তাঁদের চিত্রের জন্যে নির্ব্বাচিত হয়। চিত্রনাট্য প্রস্তুত করতে গেলে অনেকাংশই সামান্য সামান্য অদল বদল করতে হয়,—অংশ বিশেষ বাদও দিতে হয় ভাল ফল পাবার জন্যে। অনেক সময় বেশ চিত্তাকর্ষক অংশই বাদ দেওয়া হয়—ফলে নাটকের অভিনয় বা উপন্যাসের আখ্যানভাগ মনে যে দাগ রেখেছে দর্শকরা তার কিছু চিত্রপটে না দেখতে পেয়ে ক্ষুণ্ণ হন। তাঁরা শুধু ঐ অসম্পূর্ণতাটুকুই দেখেন। অথচ ছায়াছবিটী যদি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয় তবে এ ত্রুটী ত্রুটীই নয়—সমালোচকদের কাছে এ ত্রুটী সকল সময়ে ত্রুটী বলে গণ্য হয় না তবে সাধারণ দর্শকবৃন্দ ঐ ছবি দেখে আশানুরূপ আনন্দ পান না। উদাহরণস্বরূপ এখানে দু'খানা ছবির নাম করলে বোধহয় অন্যায় হবে না—'অন্নপূর্ণার মন্দির' ও 'মহানিশা'। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' এর প্রকৃত আখ্যান ভাগের সঙ্গে ছায়াছবির চিত্রনাট্যের যে কত অমি

—কবি মশক—

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

বাংলা দেশের খাল-বিল নালা-ডোবা ও পুকুরে ভাই,
ভরিয়া গিয়াছে কাব্য-কচুরী-পানা ;
দলে দলে কোটি মশক-বাহিনী মশানে শ্মশানে তাই
ভন্ ভন্ করে নাড়ি জোড়া জোড়া ডানা।

কবি-মশকেরা ভাবে মনে মনে আকাশে বাঁধিবে বাসা ;
কচুরী পানায় যদিও তা'দের বাস ;
পঙ্কের পচা গন্ধের মত উৎকট তা'র আশা,
বিলাসের মোহে আনিছে সর্ব্বনাশ।

সরস্বতীরে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায়ে ভাবিছে তা'রা
খুব ফাঁকী দিয়ে করেছে কাব্য-চুরী
চালাকী-ধর্ম্মে কবি হ'তে চায় হায়রে আত্মহারা
আপনার বুকে আপনি হানিছে ছুরী।

ম্যালেরিয়া হ'তে ভয়াবহ এই মশকের দংশন
শির-দাঁড়া'হয় অচিরে বক্রাকার
পৌরুষ হীন শুষ্ক তালুতে সুর উঠে ভন্ ভন্
পঙ্কিল পাপে শ্বাস্ উঠে আত্মার।

জননীর স্নেহ, ভগিনীর প্রীতি, প্রেয়সীর প্রেমসুধা
কবি-মশকের ভাগ্যে জোটেনি কভু,
বালু দিয়ে গড়া উষর মরমে ধু ধু জ্বলে কাম ক্ষুধা
কচুরীপানার রাজ্যে তাহারা প্রভু।

প্রেমহারা এই নির্জ্জীব যতো কবি-মশকের দল
নারীর শ্লীলতা করিয়াছে হানি ভাই
নারীর গর্ভে জনমিয়া পুণঃ টানে তাঁরি অঞ্চল
ভুলে যায় সেই বহ্নিতে হ'বে ছাই।

যে আগুন জ্বলে বাংলা দেশের কোটি জননীর বুকে
যে আগুনে নিতি কাঁদিছে নির্য্যাতিতা
কবি-মশকেরা সে আগুন নিয়ে খেলা চায় কৌতুকে!
ভুলে যায় সেই আগুনই তাহার চিতা।

জননী তোমার স্নেহ ভুলে যাও হওগো সর্ব্বনাশী
টুটি টিপে মারো নিজ হাতে সন্তানে
জ্বলে পুড়ে যাক্ মশকের দল, কাব্য-পানার রাশি
জ্বালো জ্বালো চিতা কাব্যের এ শ্মশানে।

ও অসামঞ্জস্য তা এই উপন্যাসখানির পাঠকমাত্রেই জানেন—বিস্তৃতভাবে তা আলোচনা করে আর এ প্রবন্ধ বাড়াতে চাই না। তবে হ্যাঁ! অন্নপূর্ণার মন্দির প্রতিষ্ঠা হল কোথায়? সতী বর্ত্তমানে সাবিত্রীকে বিবাহের প্রস্তাব করা কি বিপ্রর মত ধীসম্পন্ন যুবকের পক্ষে ন্যায় সঙ্গত হয়েছে—সতীর মন জেনেও—মিষ্ট ভৎর্সিত হয়েও? ইত্যাদি। 'মহানিশা' সম্পর্কে এই কথা বল্লেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে, এই শিল্পীসমন্বয়েই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত 'মহানিশা'র একবিন্দু রসও এই চিত্রখানি পরিবেশন কর্ত্তে পারে নি।

আর এক কারণ—নটনটী নির্ব্বাচণ। নাটকে টাইপ নির্ব্বাচণ করা আজকাল একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নটনটীদের অমত কি? তাদের পয়সা পেলেই হল—তাই রাত্রিভর ষ্টেজে অভিনয় করে সকালে তারা ছোটেন ক্যামেরা ও মাইকের সামনে দাঁড়াবার জন্যে। রাত্রে কেউ অভিনয় করলেন গণিকার অংশ, কেউ মাতাল লম্পটের অংশ, কয়েক প্রহর পরে তাঁরাই এসে উপস্থিত হবেন সীতাসাবিত্রী সেজে বা রামলক্ষণ সেজে। অভিনয়কলার আজ এই দুর্দ্দশা—যেন ছেলেখেলা। দু'একজন নটনটীর কথা জানি যাঁদের নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করবার সময়টুকু পর্য্যন্ত নেই (ক্ষমতার কথা দূরে থাক্)। এক মাসের মধ্যে এরা এক ডজন ছবিতে নামবেন—আর সেই একঘেয়ে একধারায় অভিনয় করে চলে যাবেন। পরিচিত মুখের সংখ্যাও বড় বেশী—তাদের দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায়। আজকাল প্রায় প্রতি ছবিতেই তো দেখি—জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, কানন বালা, রাণীবালা, বীণা, অহীন্দ্র চৌধুরী ইত্যাদি। অহীন্দ্র বাবু বা শ্রীমতী কাননবালার অভিনয়ে তবু কিছু নবভাব কিছু মাধকতার সৃষ্টি হয় কিন্তু আর কারও বিশেষ করে প্রথমোক্ত নটের সে বালাই নেই। ইনিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশীসংখ্যক ছবিতে নেবেছেন অথচ যে কোনও দু'খানি ছবিতে দু'রকম অভিনয় কর্ত্তে সমর্থ হন নি। যা'হক শ্রদ্ধেয় পরিচালকদ্বয় মিঃ ডি, জি ও তিনকড়ি বাবুর প্রচেষ্টায় নব নব মুখের আস্বাদ পাচ্ছি—

কে বলতে পারে অদূর ভবিষ্যতে নব নব তারকার অভ্যুদয় হবে কিনা?

বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্প সকল অন্তরায় কাটিয়ে উন্নতির সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করুক—এই তো আমাদের কামনা। আজ যারা বাংলা ছায়াছবি দেখতে চান না—মনে বড় আশা জাগে একদিন তারাই বিদেশী ফেলে দেশী-রস মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ কর্ব্বেন, প্রতি কণা তাদের হৃদয়ে মধু-রস সৃষ্টি করবে—যেবে তাঁদের প্রচুর আনন্দ যাতে তাঁরা বলতে পারেন "হ্যাঁ অজ বাংলার ছায়াশিল্প সকলদিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত—সার্থক আমাদের অর্থব্যয়।" বাংলার অভিনয় ধারা নবযুগে নব নব ভাবধারার সৃষ্টি করুক, বাংলার ছায়াশিল্প বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগী হক্। বাংলার প্রকৃতির মাধুর্য্য, বাংলার কীর্ত্তি, প্রাচ্যের আধুনিক সভ্যতা, বাংলার মহামানব, বাংলার সঙ্গীত,—এদের নিয়ে নব নব চলচ্চিত্রের সৃষ্টি হক্, এদের তুলনা কোথায়? 'মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা।' অভাব কিসের? রত্নগর্ভার সকল রত্ন এই নব শিল্পকে মহিমামণ্ডিত করে তুলুক। বাংলার নটনটীরা অজস্র প্রশংসা অর্জ্জন করুক—দিকে দিকে তারা সম্মানিত হক্। আজ যারা প্রদীপের ভাতি নিয়ে পরিচয় দিচ্ছেন। চন্দ্রালোকসম তাদের নাম মধুময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক। উঠুক—জহর, ধীরাজ, মোহন, ছবি ওঠুক—উমা বীণা মায়া, ছায়া; উন্নতির পথে সকলের প্রচেষ্টা দ্রুত অগ্রসর হক্। দূরে যাক ক্লার্কগ্যাবল্, রোমান কোলম্যান, এমিল জেনিংস, মুছে যাক মন হতে—গ্রেটা, মার্লিন, ক্র্যাফোর্ড, জিঞ্জার রোজার্স, ক্লদেৎ কলবার্ট—তাদের স্মৃতিতেই জাগরিত হক্ প্রমথেশ, দুর্গাদাস, পাহাড়ী, অহীন্, ভূমেন—উমা, চন্দ্রা, জ্যোৎস্না, কানন, মলিনা।

———

তন্দ্রী ও তুফান

শ্রীসুশীল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শুদ্ধাশুদ্ধের কথা কে ব'লচে তোকে!

—কেন, ছোটোখুড়ি! সেদিন বলছিলো: তুমি না গোঁড়া হিন্দু ছিলে হঠাৎ মেথর বিয়ে করছো কি ক'রে?

—তুই কি জবাব দিলি?

—আমি? মুখের ওপর ব'লে দিলাম,—গোঁড়া আমি এখনো আছি ছোটখুড়ি, কেন মেথররা কি হিন্দু নয়? আমি খৃষ্টান, ইহুদি, পার্শি বিয়ে করতাম—দোষের ছিলো, কি বলো, দাদা! হিন্দুর ছেলে, হিন্দু ছাড়া আর কাউকে ঘরে ঠাঁই দেবো না, না বা মনে।

দাদা তাই বলেন। কিন্তু তাঁর একটু হিংসে হ'য়েছে।

ভজহরির দাদা শুয়ে পড়লেন; সাতাশে বিয়ে? আমাকে তা'হলে আসতে হবে। গিয়ে ছুটির একটা দরখাস্ত করি। দিন তিনের ছুটিই যথেষ্ট, না রে?

—তা ছাড়া আবার কি? না হয়, চাকরির দফা রফা ক'রেও চ'লে আসতে পারো। কি হবে ছাতার চল্লিশ টাকায় বিদেশে প'চে ম'রে? চেনা লোকের মুখ নেই, না আছে বাঙলা দেশের মতো এমন উদারতা, এমন নিরীহপনা, পরের দুঃখে গ'লে পড়া! স্বার্থ নিয়ে অন্ধ হ'য়ে ব'সে সব গাড়ী গাবায়! বাদ দেও ওদের কথা! স্রেফ চাকরিতে একটা রেজিগনেশন লেটার ছেড়ে চলে আসবে।

দাদার আর কিছু বলবার ছিলো না; কোথায় অবজেক্ট, তার ঠিকানা নেই, মিথ্যা ইমেজের ওপর দৃষ্টি রাখলে, দৃষ্টিটা শুধু রাখাই হবে, কাজের হবে কি? হাচোড় পাঁচোড় ক'রে অবশেষে খুঁজতে গেলে অবজেক্ট-এর হদিস্ তো মিলবেই না, মিয়ার ভেঙে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। আমও যাবে ছালাও যাবে। কাজ নেই।

ইলেকট্রিক কারেন্ট-এর এলাকায় ম্যাগনেট এসে পড়লে ম্যাগনেটটাই ঘোরে,—সেটা ঘুরবে ব'লে আসে না, আসে ব'লেই ঘোরে—আর স্ব-ইচ্ছায় ঘোরে না ঘুরতে বাধ্য হয়;—ভজহরির না হয় ভাই হ'য়েছে কিন্তু তার দাদার অপরাধ কি? তিনি তো ম্যাগনেট নন্। তাই চাকরির দফা রফা না ক'রে তিনি না হয় এমনিই এলেন।

ভজহরি ক্রমেই তাঁর চোখে সুদূরের তারকার মতো অপূর্ব্ব রহস্যে পরিণত হয়ে উঠছে। এই নেবে, এই জ্বলে। ব্যস্ নিভে গেলো। অর্থাৎ তিনি ঘুমিয়ে প'ড়লেন।

ভজহরিও শুলো। তার ঘুম পায়নি। কি ক'রে ঘুম তার পাবে? ঘুমোবার দিন তো যথেষ্ট প'ড়ে র'য়েছে সুমুখে—ভবিষ্যতে,—ছায়ার বুকে মাথা পেতে সে এন্তার ঘুমিয়ে নিতে পারবে। আজ সে একটু জেগে থাকুক্। সে স্বপ্ন দেখুক্—জ্ঞানে। সে বুঝে বুঝে ভুল বুঝুক। সে জেগে জেগে ঘুমিয়ে পড়ুক। তাকে সজাগ ক'রে দেবার দিন ঘনিয়ে আসুক। ছায়', তুমি কোথায়? আরো তুমি কতদূর? (পাশ বালিশটাকে চেপে ধ'রলো) বহু দূর? মিথ্যে, ছায়া তুমি কাছে আছো। আমার যত কাছে আমি নিজে, তুমি তারো বেশি নিকটে বিরাজো। তুমি এসো, তুমি এসো।

তুমি ঘুমোও। ভজহরি ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

মস্ত একটা রোদের আঁচল থেকে জানালা দিয়ে এক ফালি ছিড়ে এসে ভজহরির কপালে প'ড়েছে, একি প্রিয়ার সোহাগ, ছেলের

বিস্ময় লাগে মোর

শ্রীসুধীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বিস্ময় লাগে মোর—
চারিদিকে হেরি ধরণীর মায়া-মোহ-বন্ধন ডোর।
দেখি বসে বসে পলে পলে টুটে জীবন হতাশ্বাসে
মরনেরে তবু উড়াই অবিশ্বাসে।
জানি মনে জানি এ জীবন নয় কিছুতেই অক্ষয়
তবু পদে পদে মরনেরে করি ভয়।
ঝটিকায় হায় নিভে যাবে ঐ জীবন প্রদীপগুলি
তবুও সভয়ে ভীরুদীপশিখা আড়াল করিয়া চলি;
তবু রাখি মনে বাঁচিবার ক্ষীণ আশা
জানি মনে জানি সকলি স্বপ্ন, মায়া ও অন্ধ দুরাশা

যে চলে গিয়াছে তার স্মৃতিটুকু অক্ষয় করিবারে
, মমি করিয়াছি,—স্তম্ভ তুলেছি তার কবরের পরে।
দেখি বসে-বসে মমি পচে গলে, মনুমেণ্ট পড়ে ভাঙি
তবু রাখি মনে বাঁচিবার আশা—স্বপ্ন কতই রাঙি।
প্রিয়ারে বেড়িয়া কতনা স্বপ্ন কতনা রঙীন চুমা
শ্রাবণ মেঘের সজল গণ্ডে রামধনু সম রাঙা।
চিনি ওগো চিনি চিরন্তনীরে—বিষাদে বিলীন বরষা
তবু রাখি মনে ও রাঙা রঙের ক্ষীণা আলোকের ভরসা।
অন্তরলীনা বরষা এখনি জানি মনে জানি পড়িবে ভাঙি
তবু আঁকি বসে স্বপ্নতোরণ, রামধনু শুধু রাঙি।

আদর কিম্বা জননীর শুভাশীর্বাদ? না, একি বিধাতার ক্রূর আক্রোশের প্রতিনিধি?

ভজহরির নাক ডেকে উঠলো।

—বাপস্! প্রবীর চম্‌কে উঠলো; আরে ছ'ভায়ে যে পাল্লা দিয়েছে, ওহে রাখেশ, দেখে যাও কাণ্ডটা!

এরা ভজহরির দাদাকে চেনে। ইতি-পূর্ব্বে বহুবার এই মেস-এ এর শুভাগমন ঘটেছে।

দাদা প্রবীরের কণ্ঠস্বরে জেগে উঠলেন; দূরের ঐ গাছটার মাথায় খানিকটা সোণালী রোদ, নিচে ছায়াচ্ছন্ন, শুধোলেন; কটা বাজে মশাই?

জামাটা মাথার ওপর দিয়ে বার ক'রে দিতে দিতে প্রবীর জবাব দিলো; ছটা! কেন, কাজ আছে নাকি?

সে কথার জবাব না দিয়েই চীৎকার ক'রে উঠলেন তিনি: এই ভজা, ওঠ, ওঠ। আমার কাপড়টা মেলে দেওয়া আছে নিয়ে আয়। নেহাৎ এসে প'ড়েছেন মশাই, [illegible] টা'র ট্রেনটা…যা রে শিগগির, [illegible] জামুড়ি পরে দিস্।

—আপনি আজই চললেন?

—হ্যাঁ, আবার আসবো, আস্‌চে উইক-এ। তাঁর সময় নেই, খানিকটা লাফিয়ে নিতে পারলে যেন স্বস্তি পান। তাড়াহুড়ো ক'রে নেই অভ্যেস, কি বিপদেই যে তিনি প'ড়েছেন! কাণ্ড!!

দাদার ব্যবস্থা করে দিতে মিনিট দশের ভেতর তিনি রাস্তায় নেবে গেলেন। মহেশদা ইত্যাদি কারো সঙ্গেই তাঁর দেখা হ'লো না—না হোক।

প্রবীররা মাথায় হাত দিয়ে ব'সলো। ভজহরির দাদাকে হাতের কাছে পেয়েও তাঁকে কিছু বলা হ'লো না। তাঁকে জানানো হ'লো না তাদের সকল কথা। না হোক্।

ভজহরির কাছ থেকে মহেশদা জানতে পারলেন যখন যে, তার দাদা এসেছিলেন। তিনি নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, তাঁর দেখা হ'লো না তার দাদার সঙ্গে। এতে তিনি বিশেষ দুঃখিত নাকি। কারণ নিজে কানে যদি মতটা শুনতে পেতেন তা'লে এনার্জি পেতেন, প্রেরণা পেতেন, এবং পেতেন উৎসাহ;—যা পাচ্ছেন তার চেয়ে বেশি। কিন্তু ভজহরি জানালো দাদাটা তার নাকি অমনি একটা কেমন ধারা আক্কেলের ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব আবার অন্তর্ধ্যান। এখন না এলে কি তার চলে না? কিন্তু দাদা তার মত দিয়েছে। দাদা তার আসচেও আসচে উইক-এ, প্রবীরকে জিগগেস করলেই নাকি তিনি সত্যি মিথ্যা জানতে পারবেন।

মহেশ বিশ্বাস ভারি কড়া মেজাজের লোক। তিনি নাকি হেঁয়ালি পছন্দ করেন না, যে কথাটার সত্যতা প্রমাণের জন্যে বহু evidence জোটানো হয়, সেটা নাকি গোড়া থেকেই একেবারে ছায়ার মতো মিথ্যে!

ভজহরি বললো,—কি যে বলেন ছাই! সত্যি আপনি যেন কেমন ধারা, মাইরি মহেশদা, জিগগেস করুন না প্রবীরকে। এই প্রবীর, বল না……

—বিরক্ত ক'রো না ভাই এখন, চিঠি লেখা শেষ করতে দাও। প্রবীর বুকে একটা বালিশ দিয়ে উপুর হয়ে শুয়ে শুয়ে কতদূরে চিঠি লিখছে জানি না। সে চিঠি তার

প্রিয়ার সমীপে কিম্বা প্রেয়সীর করপুটে তাও অজ্ঞাত। যাই হোক!

ভজহরি তাকে বিরক্ত করতে অধিক সাহস পায় না।

মহেশদা তবু নাকি বিয়ের জোগাড়-যন্ত্র শুরু করছেন।—ভজহরিকে আশ্বাস দিলেন। দিয়ে তাঁর নিজের যতকিছু কাজ তাই নিয়ে সন্ধ্যা কাটাতে কুটুরির উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

ভজহরির সঙ্গে নগেনের দ্যাখা প্রায় হয় না ব'ললেই চলে। সে এখন ভয়ানক ব্যস্ত। নতুন একটা কোম্পানী ষ্টার্ট দিচ্ছে সেই দিকে তার অনেক কাজ করতে হয়; হয়তো সে কোম্পানীর ম্যানেজারীতে সেই লেগে যাবে। বলা যায় না, লোকটার বরাৎ জোর খুব। যাই হোক্ বিদ্যুৎদের খবর কি তা সে হয়তো আর আনতে পারলো না। মামার বাড়িতে দিনে একবার দ্যাখা করতে যেতে পারে না, কেমন ধারা ছেলে যে ও হ'য়েছে! আশ্চর্য্য!! সেই সঙ্গে ওদের কুশলটাও জেনে আনতে পারে তো! না, রাতদিন, ইন্‌সিয়োর!

ভজহরি নড়বড়ে চৌকীর ওপর ভর দিয়ে প্রবীরের আনা একটা নতুন ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছে প্রবীরের কতটা বাকি! শেষ হ'লে দু'একটা কথা তো তার সঙ্গে বলা যায়।

খুট্ ক'রে লাইটটা জ্বেলে দিয়ে ভজহরি দাঁত বার করলো; অসুবিধে হচ্ছিলো কিনা, জ্বেলে দিলাম! লেখ্।

প্রবীর কোনো রকমে তার মুখে একটু চেয়ে আবার শুরু করলো লিখতে।

সন্ধ্যা তখন হ'য়েছে।

ঘটনাটার আগাগোড়া সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। মাথুর কনট্রাক্টর আছে, আর তার Private Secretary বিপিন ভঞ্জরও অস্তিত্ব আছে। মহেশদার সঙ্গে এই চেনা-শোনা, বন্ধুত্বের কথাও মিথ্যা নয়।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে এসে মহেশদা জানালেন: রোববার দিন পাকা দ্যাখা, তারা দেখতে আসবে না। ভজহরিকেই নাকি যেতে হবে। বিষ্যুৎবারের বার-বেলায় বিয়েও ঠিকই হবে।

ভজহরির আনন্দ হ'লো যথেষ্ট কিন্তু সে তা প্রকাশ করলো না, কালিকলমেও তাই—তাও অপ্রকাশিত রইলো।

আজ সেই রোববার। মেস্-এ একটা সোড় প'ড়েছে—সাজো সাজো। ভজহরির আজ বিবাহের প্রথম অধ্যায় অথবা অবতরনিকা। সে আজ সেজে নেবে প্রাণ ভ'রে। কিউটিকুরা ঘাড়ে-গর্দ্দানে চোখে-মুখে কয়েক পোঁচ চালিয়ে তৈরি হ'য়ে দাঁড়ালো: চলুন মহেশদা।

মহেশদাও কেরাণী-কোটটা গায়ে দিয়ে বাবু সেজে রেডি হ'য়ে ছিলেন; বললেন—চলো। কিন্তু শোনো, বিপিন তোমাকে যা-যা জিগগেস্ করবে স্মার্ট হ'য়ে উত্তর

দেবে, খিতিয়ে যেয়ো না। বন্দুর বিত্তে, কি কি সাবজেক্ট ছিলো বি-এতে বিশদ-ভাবে বুঝিয়ে ব'লো। আজ তোমার কঠোর পরীক্ষা, সম্পূর্ণ পাশ-ফেল নির্ভর করছে তোমার ওপর কিন্তু। দেখো ভাই ডুবিয়ো না আমাদের। চলো। কই হে প্রবীর, তোমাদের হয়ই না যে! মানস্ নেবে এলো। রাধেশটা গেলো কোথায়? নগেন তো‥‥হ্যাঁ হ্যাঁ হাঁটো না তুমি? চলো ট্রামে যাই। পয়সা নিয়েছো।

ভজহরি ঘাড় কাৎ করে নাবতে শুরু করলো।

পার্ক-সার্কস্এর একটা ট্রামে উঠে প'লো দল বেঁধে। বাঁই বাঁই ক'রে ছুটেছে ট্রাম্ রাস্তা ফাঁকা পেয়ে।

ভজহরি শুধোলো টালিগঞ্জ এদিক দিয়ে?

—কে বললে তোমায় টালিগঞ্জ যাচ্ছি? বিপিন টালিগঞ্জে থাকে? যাচ্ছিতো বিপিনের ওখানে। ব'লে মহেশদা বাইরে তাকালেন।

এনট্যালী মার্কেট ছাড়িয়ে ট্রাম একটু এগোতেই ঘণ্টা বাজিয়ে ওরা নেবে প'লো, বাঁ দিকের লালবাড়িটার ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে। ডানের নতুন রাস্তাটায় ঢুকে খানিকটা এগিয়েই সুমুখের বাড়ির বারান্দায় উঠে মহেশদা কলিং বেল টিপলেন্।

ভজহরির বুকটা কেঁপে উঠ্লো। পকেটের রুমাল বের করতে ওর ভয় হ'লো, কোঁচা দিয়েই মুখটা একটু মুছে নিলো।

দরজা খুললো চাকরে। হুকুম পেয়ে ভেতরে গেলো বাবুকে ডাকতে। বাবু এলেন, ইনিই বিপিন ভঞ্জ। বেঁটে কদ্দের লোক, রংটা ধবধবে শাদা, শাদামুখের ওপর এলোচুলের মতো রাশিকৃত গোঁফ, ললাট প্রশস্ত, বললেন: এসেছো? কই বর কোনটি?

ভজহরি ঘাড় নিচু করলো।

বিপিন ভঞ্জকে সবস্তই শেখানো পড়ানো আছে এখন তিনি যা করেন। মহেশদা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন: এইটি নাও, বাজিয়ে নিতে হয় নাও।

বিপিনবাবু একটু হেসে চিৎ-করা ইজি চেয়ারটায় ব'সে প'ড়লেন: শোনো এদিকে।

ভজহরি উঠে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্রশ্ন—কি পাশ ক'রেছো? বি-এ অনার্স ছিলো কিসে?

উত্তর—আজ্ঞে অনার্স নিইনি।

প্রশ্ন—নাও নি? কেন?

উত্তর—নিরুত্তর।

প্রশ্ন—কেনো বলো! (ধমকের মতো ক'রে)

প্রবীররা মুখ টিপে হাসছিলো মহেশদার ভারি মজা লাগে, বললেন—বলো ভজা, বলো কেন!

বিপিনবাবু। কি করছো পাশ করে!

ভজা। কিছু না।

বিপিনবাবু। সমস্তদিন কি করো।

ভজা। কিছু না।

বিপিনবাবু। ঘুমোও?

ভজা ঘাড় কাৎ করলো। ভাবলো—উঃ, কী ভীষণ পরীক্ষা!

বিপিনবাবু রুখে উঠলেন—কিছু করো না? কিছুর চেষ্টা? ছেলের activity দেখতে চাই আমরা, আমরা চাই ছেলের অনাস থাকবে।

—আজ্ঞে……ভজহরি আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিলো।

বিপিনবাবু থাকিয়ে দিলেন: আজ্ঞে আবার কি? সাজগোজ দেখে আমরা এর পছন্দ করবো না। আমরা চাই কনফিয়েন-শাস ফেলো, অ্যাক্টিভ্। (মহেশদার পানে চেয়ে, হাসি গোপন ক'রে) এ ছেলে চ'লবে না মহেশ, বুঝলে?

মহেশদা বুঝলেন।

ভজহরির হঠাৎ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হ'লো: চলবে বলুন সার, এবার থেকে অ্যাক্টিভ হবো।

—দারোয়ান! বিপিনবাবু হাঁকলেন, দারোয়ান আসতে না আসতেই ভজহরি তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে প'ড়েছে। দারোয়ান এলো। বিপিনবাবু ভজহরিকে দেখিয়ে হুকুম করলেন ঘাড় ধ'রে পথে বের ক'রে দিতে।

দারোয়ান হতভম্ভ হ'য়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু আর একটি ধমক খেয়ে সে ভজহরিকে একটা ঝাঁকি দিয়ে টেনে তুললো তারপর ঘাড়ের ওপর একটি হাত রেখে, আর এক হাতে ভজহরির বাঁ হাতটা ধ'রে তাকে টেনে নিয়ে চ'ললো। ভজহরি শক্তি প্রয়োগ ক'রেছিলো কিন্তু বৃথায়। রাস্তার লোকগুলো দাঁড়িয়ে গেলো; কেয়া হুয়া।

—চোরি কিয়া বাবু! ব'লতে দারোয়ানের বাধলো না। মনিবের হুকুম পেয়ে সে তাকে টেনে এনেছে, এখন বিনা হুকুমেই তার পেটে লাঠির একটা গুতো দিলো। ভজহরি কেবলমাত্র তার মুখপানে কাতর দৃষ্টিতে একবার চাইলো, কিছু বলবার শক্তি তার নেই। রাস্তার লোকগুলো ঘুষি পাকিয়ে মারতে এসেছিলো কিন্তু ভদ্দরলোকের ছেলে ব'লে ক্ষমা ক'রে, শাসিয়ে, জীবনে যেন কখনো আর না করে উপদেশ দিয়ে প্রস্থান করলো।

রাত্তির বারোটা বেজেছে। কার্জন পার্ক-এর একটা বেঞ্চে ব'সে ভজহরির আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হ'লো। দু'হাতে গলাটা চেপে ধ'রলো, খানিকক্ষণ দম বেরুলো না। হাত ছেড়ে দিলো, গলা খুস্ খুস্ করছে, কাশলো। সমস্ত সহর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। কলকাতার এ-রূপ সে ত্যাখেনি। দু-একটা বস্. আরো কটা ট্যাক্সি শব্দ ক'রে চ'লে যায়। ভজহরি দাঁড়ালো, ঐ যে পুলিশ, এদিকেই আসছে। ভজহরি কোথায় লুকোবে, নইলে কপালে আরো কিছু আছে হয়তো। না, মোড়ে ঘুরে গেলো। বেঞ্চের নিচে ঘাসের ওপর শুয়ে তার ভয় হ'লো সাপে কামড়াবে না তো? এই কিছু আগে সে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো, সে-কথা হয়তো ভুলে গেছে। এমনিই হয়। গলায় দড়ি দিয়ে মরবে ব'লে হাতে দড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো কে যেন, গাছে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়বে ইচ্ছে ছিলো, জঙ্গলে ঢুকে শুকো পাতার সর সর শব্দ শুনে চমকে উঠলো, ত্যাখে প্রকাণ্ড গোখরো, সর্ব্ব শরীরে তার কাঁটা দিয়ে উঠলো ভয়ে সে ফিরে এলো ঘরে।

ভজহরির খিদে পেয়েছে। পকেটে টাকা আছে গোটা পাঁচেক। কিছু কিনে সে অনায়াসেই খেতে পারতো, কিন্তু তখন ইচ্ছে করেনি। অপমানের আঘাতে তার ভেতরটা ব্যথিত হ'য়ে উঠেছিলো, এখনো ব্যথা আছে কিন্তু খিদেও যে তার পাচ্ছে। কিউটিকুরা, সত্যি কেউটের মতো যেন তাকে দংশন করছে। এ মহেশদার ষড়যন্ত্র, নিশ্চয় ষড়যন্ত্র, নইলে তাঁরা হা হা ক'রেও উঠলেন না একটিবার? আমাকে অপদস্ত, অপমানিত? উত্তেজনায় ভজহরি উঠে ব'সলো। চোখে সে দেখছে সরষে ফুল—আজ সে চিনতে পারলো। তার সমস্ত মনে চিন্তা ফুটে উঠছে বিষাক্ত হ'য়ে ধুতরা ফুলের মতো! মানস, অ্যায়সা দিন নাহি রহেগা!

আবার শুয়ে পড়লো: প্রবীরও নিশ্চয় আছে এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে—প্রবীর তাকে ফ্যান্ খাওয়ালো। শালা গরু পেয়েছে তাকে? ভজহরিকে সে চেনে না। নিউ মার্কেটএ কিনে, লেইক মার্কেটে বেচে দিতে পারে ভজহরি তাকে। রাখেশটা মিচ্কি শয়তান! ডুবে ডুবে জল খাওয়া বার করবে ভজহরি তার। চেনে না সে।

জাহাজটা সেন্‌ট্রির মতো পাহারায় হাঁক ছেকে উঠল ছেড়ে গলায়। কি বিকট আওয়াজ। এই কলিকাতা! এই ভারতের প্রধান সহর। এই কেরাণীর কর্ম্মস্থল, পলাতকের আশ্রয়, নিরপরাধের শাস্তির কাঠগড়া। এই কলিকাতা।

ওই গঙ্গা। পবিত্র জল লোকে বলে। ভজহরি বলে অপবিত্রের আখড়া। এত নেয়ে ধুয়েও তো কাউকে সে পবিত্র হ'তে ত্যাখেনি। কত গণিকা, কত গোপন-প্রেমিকা, কতো মহেশ দা, কতো প্রবীর—নেয়ে গায়ের ময়লা জমিয়েছে—মনের অপবিত্রতা ঘোচেই ঘোচেনি। এই গঙ্গা তারপর ভজহরি ঘুমিয়ে প'ড়েছিলো। সহসা মুখরিত সহরের কর্ম্ম-নিরত হবার সময়ে তার ঘুম গেলো টুটে। উঠে গঙ্গার দিকে চ'ললো।

গঙ্গার কিনারে বেলা প্রায় দশটা পর্য্যন্ত ব'সে রইলো বৃথায়। শুধু ঢেউএর পর ঢেউ, গঙ্গায় আর যেন কোনো কাজ নেই—আকাশের ছায়া ছিঁড়ে ফেলা ছাড়া। রাত-দিন একটুকরো আকাশকে সে ভেঙে খান-খান ক'রে দেয়। চাঁদপাল ঘাট থেকে গার্ডেনে একটা ফেরি ছাড়বে, তারি যাত্রীর ব্যস্ততা। নিজেকে ওদের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে তার ইচ্ছে হ'লো। সেও একটা টিকিট কিনে ব'সলো। গঙ্গার বাতাস! জলে ছোটো ঢেউ-এ কচুরিপানা ভেসে চ'লেছে। ফেরি এপার ওপার করতে করতে ওপারে গিয়ে গার্ডেনে নাবিয়ে দিলো।

বহুলোকের সমাগম। কত রকমের মুখ, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সামঞ্জস্য নেই, আশ্চর্য্য !! সমস্ত পৃথিবীতে যতলোক তত রকমের মুখ, তত রকমের ডিজাইন—ভগবান এতও জানে।

ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে ভজহরি লাজ পাম্-হাউস্এ ঢুকলো। চমৎকার। এই প্রথম ভজহরি বাগানে এলো। তার ভারি ভালো লাগছে। ওদিকে একটা বেঞ্চ। হেটে গিয়ে সে সেইটের ওপর ব'সলো। নির্জ্জন জায়গা। কেউ নেই। একা ব'সে অনেক, কিছু ভাবতে ভারি সুবিধা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে এলো বাসন্তীর কথা। সে যেচে চুমু দিতে এসেছিলো ভজহরি উপেক্ষা ক'রেছে। সেই পাপে, নিশ্চয় সেই পাপে, তার এই কঠোর শাস্তি। হ্যাঁ, সে আজই ফরিদপুর যাবে, আলবৎ যাবে। বাসন্তীর কাছে মার্জ্জনা চাইবে। কত ছলে, কৌশলে এই বাসন্তীকেই সে উপভোগ ক'রেছে—সে ঋণ সে শুধবে। বাসন্তীকে সুযোগ দেবে, সে যেন এবার ভজহরিকে উপভোগ করতে পারে।

বেলা পড়ে এসেছে। সারাদিন অনাহার। সমস্ত দেহ দুর্ব্বল। হ্যাঁ, তবু সে হাটবে, ফেরি ধরবে, যাবে ওপারে। রাত্তের ট্রেনে যাবে ফরিদপুরে—বাসন্তীর কাছে যে ঋণে সে ঋণী তা সে শুধবে।

ভজহরি ফেরি পেয়েছিলো। আসবার সময় তার এতো দেরী মনে হয়নি। কিন্তু এখন সে ভাবে জল কেটে ষ্টিমার এগোতে পারে না। রেলিঙ-এর ওপর ভর দিয়ে কত ঢেউ সে গুণেছে যার সংখ্যা নেই।

দুপয়সার হোটেলে ঢুকে খেতে চেষ্টা ক'রেছিলো কিন্তু ভেতরে কিছু না গিয়ে, ভেতর থেকেই সব যেন উঠে আসতে চায়। তাই সে চেষ্টায়ো অকৃতকার্য্য হ'য়ে সোজা ষ্টেশনে চললো।

সারারাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। ভোরে যখন ফরিদপুরে গাড়ি এসে দাঁড়ালো তখন ভজহরির যেন আরো লজ্জা ক'রে উঠলো। দেশের লোককে সে কি বোঝাবে? তারদের কি ব'লে সে থামাবে? কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা না ক'রে সে নেমে প'লো।

তারপর শেয়ারে একটা গাড়িতে উঠে সহরের ভেতর ঢুকতে শুরু করলো। বাসন্তীর কাছে সে কী ব'লে গিয়ে দাঁড়াবে? তার অপরাধ বাসন্তী মার্জ্জনা করবে তো?

আলিপুরের রাস্তার ওপর সে গাড়ি থেকে নেমে প'লো। যতই বাসন্তীর বাড়ির দিকে এগোয় গতি ততই তার মন্থর হ'য়ে আসে। তথাপি তাকে এগোতে হবে। সে বাসন্তীর কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করবে।

বাড়ির ভেতর ঢুকে শোনে রান্না ঘরে কড়ার আওয়াজ। একটু ইতঃস্তত ক'রে সে চ'ললো।

বাসন্তীর মা। ভজহরি শুধোলো: কেমন আছেন?

তাঁর মুখখানা ভার ভার, না ব'ললে নয় এই ভাবে ব'ললেন: ভালোই।

একটু থেমে ভজহরি ব'লে ফেললো: বাসন্তী কৈ?

কোনো জবাব নেই। ভজহরি আবার জিগ্‌গেস করলো: বাসন্তী কোথায়, নাইতে গেছে?

বাসন্তীর মা রেগে উঠলেন, তাঁর চোখ দু'টো ছলছল জলে: না, সে গাইতে গেছে? ওই কুলাঙ্গার, দাদুকে ব'ললাম অমন লোককে ঠাঁই দিস্ না, না বন্ধুত্ব ফলাতে গেলেন। এখন কাণ্ডটা দ্যাখো। লোকে বিদ্রূপ করছে। দাদু বাসন্তীর দাদার নাম।

ভজহরি কিছুই যেন বুঝতে পারলো না: কি হ'য়েছে কি?

—ওই ছোঁড়াটা পরশুদিন রাতে বাসন্তীকে নিয়ে পালিয়েছে। আমার মুখে চুণকালী দিয়েছে।

ভজহরি চীৎকার ক'রে উঠলো—কেস্ করুন্।

সমাপ্ত।

শ্রীপবিত্রপাবন পতিতুণ্ডী

আর্ল ক্যারল

আর্ল ক্যারল হচ্ছে ওদেশের একজন নাম-করা লোক। ষ্টেজে ওর বেজায় প্রতিপত্তি। এতকাল ষ্টেজের জন্যে কাজ করা—ও যত করেছে, কিম্বা ষ্টেজে অবদান ওর যত আছে, এমন খুব কম লোকেরই আছে।

সেই ক্যারল ষ্টেজ ছাড়বে, এবং তা চিরকালের জন্যেই। এই রকম ঠিক করে ফেলেছে। তবে ফিল্ম বা ষ্টেজ জগতে এমন কথা অনেকেই বলে এবং শেষ পর্য্যন্ত ঠিকও রাখতে পারে না। সে যাক্।

আর্ল ক্যারল আসছে ছায়াছবিতে। খুব শীঘ্রী হলিউডে আসবে। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের এডভাইসারী বোর্ড এর মধ্যে আর্লও হবে একজন। ডেরিল এফ জানুক-এর কাছে আর্ল চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এডভাইসারী বোর্ডের মেম্বার হওয়া ছাড়া ওর একটা কাজ থাকবে তা হচ্ছে সহকারী প্রডিউসারের কাজ। 'দি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফলিজ' ছবিতে আর্ল থাকবে সহকারী প্রডিউসার।

মরিচ মস্কোভিচ

মরিচ মস্কোভিচ রাশিয়ার একজন বড় অভিনেতা। রেডিও পিকচার্সে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে 'পিতার' পার্ট করবে বলে। সে চরিত্রটির নাম হচ্ছে 'এসড্রাম'। ছবিখানার নাম হচ্ছে 'উইন্টার সেট।' হিরো সাজছে বারজেস্ মেরিডিথ আর হিরোয়িন হচ্ছে মার্গো। এডওয়ার্ডো সিয়ানেলি নামছে এ ছবিতে।

"দি গার্ডেন অব আল্লা"

ডেভিড ও' সেলজিক-এর ছবি শেষ হয়ে এল। এ ছবি বহুরঞ্জিত ছবি আমরা জানি। এ ছবি মার্লিন ডিয়েট্রিক এর ছবি এও আমরা জানি। চার্লস বয়ার নেমেছে এতে হিরো

মার্লিন ডিয়েট্রিশ

হয়ে; আরো নেমেছে সি আব্রে স্মিথ, ব্যাসিল র‍্যাথবোন, জোসেফ শ্চাইল্ড ক্রথ এবং টিলি লশ্ প্রভৃতি। পরিচালনা করেছে রিচার্ড বলস্লেওস্কি। এই পরিচালকই পরিচালনা করেছিল গ্রেটা গার্বোর "পেণ্টেড ভেল" সবই জান! এই "গার্ডেন অব আল্লা" ছবি তুলতে খরচ হয়েছে কত জান?

—চার লক্ষ পাউণ্ড!

দি এ্যাডভেনচারস অব টম সায়ার

কত ছেলেই যে আসছে! দিনের পর দিন ভিড় বেড়েই যাচ্ছে। তবু আজও কোন কিছু ঠিক হোলনা।

চারশো জনেরও বেশী এসেছে সেদিন পর্য্যন্ত ডেভিড ও' সেলজিক-এর সঙ্গে দেখা

করতে। কতকগুলি ছোট ছোট ছেলের দরকার সেলজিঙ্ক-এর 'দি এডভেন্চারস্ অব টম সায়ার' ছবিতে বড় বড় পার্ট করার জন্যে। ডেরিলের বড় প্রোডাকশন, বড় ব্যাপার! তোড়জোড়ও তার অনেক রকমের।

কত উৎসাহী ছেলে এলো:—কত রকম টাইপের তারা। কত ছেলে এলো এজেন্টের সঙ্গে। কত এলো কাগজে নাম বেরোন ছেলে। আবার কত এলো বাপের হাত ধরে, গর্ব্বের দুলাল হয়ে। তবু আজও পর্য্যন্ত পার্ট কটা পড়ে রইল। না মিলল টম সায়ার, না মিলল তার বন্ধু হাকল বেরী ফিন্; টমের সুইট হার্ট বেকী থ্যাচার। না জুটল সেই ভাই বদমাইস সিড আর জোয় হারপার। আজও পর্য্যন্ত পার্ট কটা সবই খালি পড়ে রয়েছে।

সিডনি আর ফণ্ডা

সিলভিয়া সিডনি আর হেনরি ফণ্ডা স্ক্রিনটিম হিসেবে খুব ভাল। তাই

সিলভিয়া সিডনি

'ইউনাইটেড আর্টিষ্ট'এর প্রেসিডেন্ট ওয়ালটার ওয়াগনার মনে করে ওদের দুজন আরো একখানা ছবিতে একসঙ্গে নামবে। ছবিখানির নাম 'ফ্রি টাইমস্ লুন্ডার' ফণ্ডা আর সিডনি সাজবে হিরো আর হিরোয়িন।

হেনরি আর ফণ্ডা এখন লণ্ডনে। ওরা ফিরে এলেই ছবি তোলা আরম্ভ হবে। আরো একখানা ছবি ওদের জন্যে ঠিক করা সে ছবি হবে ইতালীয় ভাষায়। এই খানাই হবে ওয়াগনারের প্রথম ইতালীয় ছবি।

দুই চরিত্র

দুজন চরিত্র তাদের পোষাক বদলেছে। সিল্কের কিমনো বদলে গায়ে উঠল আমেরিকান মিলিওনেয়ারের পোষাক। দুজন চীনে চরিত্র এইবার হোল আমেরিকান মিলিয়নেয়ার।

মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের ছবি উঠছে 'লাইবেল্ড লেডি' এ খবর আমি দিয়েছি। এতে নামছে জীন হারলো, উইলিয়াম

জিন হারলো

পাওয়েল, মির্ণা লয়, স্পেনসার ট্র্যাসি; আর পরিচালনা করছে জ্যাক কনওয়ে এ খবরও আমরা জানি। ওপরের দুজন লোকও এতে নামছে এ খবরও সেদিন পেয়েছি। ওরা হচ্ছে ওয়ালটার কনোলি আর চালস্ গ্রেপ-উইন। একজন পুবের ব্যবসাদার অপরে খবরের কাগজ প্রকাশক। ওরা দুজনেই পল মুনির ছবি 'গুড আর্থ'এ নেমেছিল।

সার্লি টেম্পলের ছবি

'দি পুয়োর লিটল রিচ গার্ল' আর গানে ভারী নাম পেয়েছে। তাই আবার গান লিখতে হুকুম হয়েছে ম্যাক গর্ডন আর হ্যারি রেভেলের ওপর। ওরাই গান লিখেছিল "দি পুয়োর লিটল রিচ গার্ল" ছবিতে। টোন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সে সার্লি টেম্পলের এ ছবিখানার নাম হচ্ছে "ষ্টোয়্যাওয়ে।"

খুচরো খবর

এম, জি, এম-এর ছবি "আরসিন লুপিন"এ ভদ্রলোক বদমাইস সাজবে উইলিয়াম পাওয়েল আর স্পেনসার ট্রাসি সাজবে ডিটেকটিভ।'

* * *

"বিগ ব্রডকাষ্ট অব ১৯৩৭" ছবি তোলা আরম্ভ হবে শীঘ্রি শীঘ্রি। এখানা প্যারা-মাউন্টের ছবি। পরিচালনা করবেন মিচেল লিসেন। অভিনয় করবে এতে জ্যাক্ বেনি, বার্ণস্, অ্যালেন এবং বব বার্ণস্।

* * *

ইউনাইটেড আর্টিষ্ট ছবি তুলছে "বোগস্ অব ১৯৩৭."

* * *

টোন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স জানিয়েছে "ষ্টার ফর এ নাইট" ছবিখানা বাজারে মুক্তিলাভ করবে অন্য নাম নিয়ে। সে নাম হচ্ছে "দি হলি লাই।" এর প্রধান অংশে নামচে ক্লেয়ার টেভর, জেন্ডার ওয়েল এবং আরলিন জজ প্রভৃতি।

* * *

ম্যাডেলিন ক্যারলএর চুক্তি আছে ওয়ালটার ওয়াগনারএর সঙ্গে অনেকদিন। চালস্ বয়ার নামবে-এই ছবিতে হিরো সেজে। ছবিখানার নাম "হিষ্ট্রি মেড এ্যাট নাইট। পরিচালনা করবে ফ্র্যাঙ্ক বরজেগ।

* * *

ফিলিপ কুপার এখনও লস এঞ্জেলস্-এর স্কুলে পড়ে। স্যামুয়েল গোল্ডউইনের প্রোডাকশন 'কাম, এ্যাণ্ড গেট ইট' ছবিতে নামবে। বিকি ম্যাকগুয়ার নামে একখানা কমেডি ছবিতে ও প্রথম নামে।

খেয়ালী চিত্রপট

ওপরের ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে, বিদায়ের এ একটি করুণ দৃশ্য। প্রিয়তমাকে মানচিত্র দেখিয়ে বলছে—"কোথায়, কোথায় সে যাবে" আর বলছে—"ফিরে না আসা পর্য্যন্ত যেন সে উতলা না হয়"। এখানা প্যারামাউন্টের "টিল্ উই মিট্ এগেন" ছবির একটি দৃশ্য আর ওরা দু'জন হ'চ্ছে গারট্রুড মাইকেল ও হারবার্ট মারশ্যাল। ছবিখানা শনিবার থেকে 'গ্লোবে' মুক্তি পাবে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম	ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ	টেলিফোন
'ন্যাশনালিটি'	৯, রামময় রোড, কলিকাতা	পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষ, ৩৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই আশ্বিন ১৩৪৩, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ভাঙ্গনের পূর্ব্বাভাষ ?

বাঙ্গলা কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী কমিটির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি প্রতিনিধিমূলক নহে ইহা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা কংগ্রেসের বহু-বিঘোষিত মিলনের ভাঙ্গনের পূর্ব্বাভাষ কিনা তাহা সঠিকভাবে না বলিতে পারিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে শরৎচন্দ্র ও বিধানচন্দ্রের অপরূপ মিলনের ফলে যে পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহা কলিকাতায় কোন কংগ্রেস কমিটিকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ইতিপূর্ব্বে উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠনে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মধ্য কলিকাতাও এই পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কার্য্যকরী সমিতিতে যে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই তাহা তাঁহাদের বিগত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের বিবরণীতেই প্রকাশ। উত্তর ও মধ্য কলিকাতা যাহা মৃদুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন দক্ষিণ কলিকাতা তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন—যে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের ওয়ার্কিং কমিটি জেলা আমরা দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যদের সৎসাহস ও স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা করি।

শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজার সভাপতিত্বে বর্দ্ধমান জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা কলিকাতার বিভিন্ন জিলা কংগ্রেস কমিটির মতেরই অনুরূপ। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্রের ন্যায় একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্ম্মী পদত্যাগ করিয়াছেন। নদীয়া জিলা কংগ্রেস কমিটিতে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু প্রভৃতি বহু সদস্য ইতিমধ্যে পদত্যাগ করিয়াছেন। উপরোক্ত ঘটনাগুলি হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বহু-বিনিন্দিত মিলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এক ব্যথিত বিদ্রোহের সূচনা প্রকট হইতেছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে যখন বাংলা কংগ্রেসের রত্নপঞ্চকের ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল তখন কলিকাতার বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিই সেনগুপ্তের নেতৃত্বকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। রত্নপঞ্চকের কৌশল ও ধনভাণ্ডার কলিকাতার বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির নিস্বার্থ একাগ্রতার বিরুদ্ধে সফলকাম হইতে পারে নাই।

পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় যাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই ঢাকা ও তৎসংলগ্ন জিলাবাসী। পশ্চিম বঙ্গের কোন কংগ্রেস কর্ম্মীই উক্ত সমিতিতে স্থান পান নাই। পদমর্য্যাদার বলে নদীয়ার অধিবাসী কেবল একমাত্র শ্রীযুক্ত সুরেশ মজুমদার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে বিরাজ করিতেছেন। কলিকাতার বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটি হইতে শ্রীহেমন্ত বসু, শ্রীবিনয় বসু, শ্রীপরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বা শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কেহই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট পার্টির স্বল্প পরিসরের মধ্য হইতে সমস্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ও পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতিদ্বয় যে অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই

শোচনীয়। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলার অগণিত কংগ্রেস কর্ম্মীর মধ্যে কেহই এই বহু-বিঘোষিত পার্লামেন্টারী বোর্ডের কার্য্যকরী সমিতিতে সভ্য হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই।

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতি ঘোষণা করিয়াছেন যে পার্লামেন্টারী বোর্ডের ওয়ার্কিং কমিটি জেলা কংগ্রেস কমিটির স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে কলিকাতার বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিগুলি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতেই বি-পি-সি-সি ও জিলা কমিটীর সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। পুনরায় অনুরূপ সংঘর্ষের সূচনা দেখিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি।

প্রকাশ যে, কলিকাতার বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে কলিকাতার বিভিন্ন কংগ্রেস কর্ম্মীর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সম্মেলনে কলিকাতার বিভিন্ন জিলা কমিটি একযোগে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলে আমরা খুসী হইব। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু দক্ষিণ কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তিনি আজ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অস্থায়ী সভাপতি। শরৎচন্দ্রের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সকল সদস্যের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা থাকিলেও পার্লামেন্টারী বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি যে প্রতিনিধিমূলক নহে—ইহা ঘোষণা করিতে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

সিমলা হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেস জাতীয় দলের অসামান্য সাফল্যের জন্য যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে বহুলাংশে অজ্ঞতা-প্রসূত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কংগ্রেসে জাতীয় দল যখন বিগত এসেম্ব্লি নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত ছিলেন তখন শরৎচন্দ্র অন্তরীণাবদ্ধ। সুতরাং তাঁহার এই অজ্ঞতা স্বাভাবিক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাংলা কংগ্রেসের এই অপূর্ব্ব মিলনের সাফল্যে আমরা বিশেষ সন্দিহান। ইতিমধ্যেই যে বিক্ষোভের সূচনা হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ মুখর হইয়া উঠিতেছে। এবং জহরলাল-শরৎচন্দ্রের পত্র-বিনিময় পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে এই অপরূপ মিলনসৌধ হয়ত ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।

শরৎচন্দ্রের উত্তর

বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় কমরেড্ প্রেসিডেন্ট জহরলাল নেহেরুর নিকট সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে যে উত্তর দিয়াছেন সহযোগী "বসুমতী"র ভাষায় তাহাকে "ভাওয়ালের মামলার রায়ের তুলনায় ছোট হইলেও আকারে ক্ষুদ্র বলা যায় না"। শরৎ বাবু তাঁহার পত্রে রোয়েদাদ সম্বন্ধে বঙ্গীয় কংগ্রেসের মনোভাব ব্যাখ্যায় কংগ্রেসের সংশোধিত নীতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে নব-সংস্কৃত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলনও অপরিহার্য্য। বাঙ্গলার জনমত কিছুতেই অস্পষ্ট নীতি বরদাস্ত করিতে পারিবে না—ইহা ঘোষণা করিয়া শরৎ বাবু বাঙ্গলার জনমত পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যুক্তির সারবত্তায় ও ভাষার ঋজুতায় শরৎচন্দ্রের উত্তর তাঁহার মনীষার পরিচায়ক। পণ্ডিত জহরলাল' নেহেরুর আত্মজীবনীতে ব্যক্ত অভিমত ও বাংলা কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের নিকট লিখিত পত্রের আশ্বাসবাণী বিশ্লেষণ করিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রসঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র যে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয়। অতঃপর পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও ওয়ার্কিং কমিটি শরৎচন্দ্রের এই পত্র সম্বন্ধে কি পন্থা অবলম্বন করেন তাহাই বিবেচ্য। ওয়ার্কিং কমিটি যদি শরৎচন্দ্রের তথা বাঙ্গালার অভিমত নতশিরে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা কংগ্রেসের প্রাধান্য গৌরব প্রজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং শরৎচন্দ্রের মিলনী প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যদি ওয়ার্কিং কমিটির সহিত শরৎচন্দ্রের সংঘর্ষ থাকে তাহা হইলে শরৎচন্দ্র কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন? ইতিমধ্যেই বাঙ্গলা কংগ্রেসে গুপ্ত-কক্ষের মন্ত্রণা-গৃহে জল্পনা চলিতেছে যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ওয়ার্কিং কমিটির অভিমতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে রাজী নন। সুতরাং বাঙ্গলা কংগ্রেসের মিলন সম্পর্কে উল্লসিত হইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

—:•)*(•:—

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

অমরনাথ

গত ১৯শে ও ২০শে সেপ্টেম্বর ভূপালে যে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সভা হয়ে গেল, তাতে দুটো প্রধান বিষয়ের সাময়িক-সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। (১) অমরনাথের ব্যাপার (২) তিনটী নূতন-এসোসিয়েশনের-অন্তর্ভূক্তি। এই বৈঠকে প্রায় সব প্রদেশেরই সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

অমরনাথের প্রসঙ্গ উঠিলে দক্ষিণ পাঞ্জাবের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ এ এস ডি মেলো নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি করেন বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের মিঃ যশধনওয়ালা প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া ছিলেন :—ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড পর্য্যটন সম্পর্কে বিশেষতঃ যে সকল ব্যাপারের ফলে বিগত জুন মাসে অমরনাথ ভারতে ফিরিয়া আসে—সেই সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত করিবার ব্যবস্থা হউক।

দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :—

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড পর্য্যটন সম্পর্কিত সমগ্র ব্যাপার বিশেষতঃ অমরনাথের সম্পর্কিত শৃঙ্খলা করার ব্যবস্থা এবং যে সকল ব্যাপারের ফলে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা দিয়াছে, তাহার তদন্তের জন্য বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারপতি এবং বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার জন বোমণ্ট (চেয়ারম্যান) স্যার সিকান্দার হায়াত খাঁ (ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি) এবং পি সুব্বারাঁওকে (মাদ্রাজ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি) লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক। বোম্বাইয়ে তদন্ত অপ্রকাশ্যভাবে চলিবে। কমিটির সিদ্ধান্ত

অমরনাথ

প্রেসিডেণ্টকে জানান হইবে এবং তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

আমরা এই নিরপেক্ষ তদন্তের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিয়া রইলাম।

সাঁতার

আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে—রবিবার সাত মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। অন্যান্য বছরের চেয়ে এ বছর প্রতিযোগিতা খুব বেশী হয়েছিল।

মোট আঠাশজন সাঁতারু এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। তার ভেতর একজন ব্যতীত সকলেই নির্দ্ধারিত পথ অতিক্রম করে। এই আঠাশজন প্রতিযোগিদের মধ্যে চারজন বালিকা সাঁতারু (কুমারী সাবিত্রি খাণ্ডেলওয়ালা, কুমারী প্রভা চাটার্জ্জি, কুমারী লীলা চাটার্জ্জি ও কুমারী বাণী ঘোষ,) এবং চারজন বালক সাঁতারু (পাঁচুগোপাল সামন্ত, নৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী, রমেশ খাণ্ডেলওয়ালা ও এস, বি, মুখার্জ্জি) বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এই নির্দ্ধারিত পথ অতিক্রম করে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে।

এই প্রতিযোগিতার ফলাফল :—

১ম—দুর্গাচরণ দাস (কলেজ স্কোয়ার); সময়—৫৩ মিঃ ৫৩ সেঃ।
২য়—মদনমোহন সিংহ (আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাব); সময়—৫৫ মিঃ ৪ সেঃ।
৩য়—মন্মথ ঘোষ (আর্য্য-মিশন);
৪র্থ—ক্ষুধীরাম মালিক (শ্মশানেশ্বর স্পোর্টিং)।
৫ম—কাশীনাথ কেশরবাণী (সেণ্ট্রাল)।
৬ষ্ঠ—মোহিতমোহন দে (কলেজ স্কোয়ার)।
৭ম—চুণীলাল দাস (মুখার্জ্জিপাড়া ক্লাব)।
৮ম—হাবুলচন্দ্র দাস (পাথুরিয়াঘাটা স্পোর্টিং)।
৯ম—কমলেশ মিশির (ভাগীরথী সঙ্ঘ)।
১০ম—যজ্ঞেশ্বর দে (কলেজ স্কোয়ার)।
১১শ—শচীন্দ্রভূষণ মুখার্জ্জি (আনন্দ স্পোর্টিং)।
১২শ—কুমারী বাণী ঘোষ
১৩শ—বংশীবদন মল্লিক (কলেজ স্কোয়ার)।
১৪শ—পাঁচুগোপাল সামন্ত (খিদিরপুর সুইমিং ক্লাব)।
১৫শ—কৃষ্ণধন ঘোষ (আনন্দ স্পোর্টিং)।
১৬শ—নিত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী (খিদিরপুর)।
১৭শ—কুমারী লীলা চাটার্জ্জি (সেণ্ট্রাল)।
১৮শ—শম্ভুনাথ মল্লিক (রায়বাগান স্পোর্টিং)।
১৯শ—বরেন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জ্জি (বালি রিভার টমসন্ স্কুল)।
২০শ—দেবেন্দ্রনাথ বসু (সুবারবন এ সি)।
২১শ—শ্যামসুন্দর দাস (আনন্দ স্পোর্টিং)।
২২শ—সুবোধচন্দ্র বিশ্বাস (স্পোর্টিং ইউনিয়ন, সিলেট)।
২৩শ—রমেশ খাণ্ডেলওয়ালা (সেণ্ট্রাল)।
২৪শ—সুধীরচন্দ্র কুমার (তালতলা ইন্)।
২৫শ—অজিতকুমার রায় (সুবারবন এ সি)।
২৬শ—কুমারী সাবিত্রি খাণ্ডেলওয়ালা (সেণ্ট্রাল)।
২৭শ—কুমারী প্রভা চক্রবর্ত্তী (সেণ্ট্রাল)।

বৌবাজার সন্তরণ সমিতি

বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির সাঁতারুগণ বোম্বাই নগরে খেলতে গিয়ে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। তারা যতগুলি ওয়াটারপোলো ম্যাচ এ পর্য্যন্ত খেলেছে তারমধ্যে একটা ছাড়া প্রায় সবগুলিতেই জয় লাভ করেছে। সে দলটীর কাছে তারা হেরেছে সেটা হচ্ছে বোম্বাইয়ের হিন্দু ও পার্শী মিলিত দল। এই দলের কাছে তারা ৫-২ গোলে হেরেছে কেবল তাদের নিজেদের গোল রক্ষকের জন্যে। তার খেলা মোটেই ভাল হয় নি। তাছাড়া বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়রাও খুব ফাউল করে খেলেছে যাতে কোলকাতার দলের খেলা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

তবে তারা বোম্বাইয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দল ক্যাথেড্রাল ওল্ড বয়েজদের যে ভাবে হারিয়েছে তাতে বোম্বাইয়ের লোকেরা বিশেষভাবে চমকৃত হয়েছেন। এই খেলায় কোলকাতার দল বোম্বাই দলকে ১২-২ গোলে হারিয়ে এই কথাই প্রমাণ করেছে যে বাঙলায় ওয়াটারপোলো খেলা তাদের চেয়েও কত উচ্চাঙ্গের।

কোলকাতার বৌবাজার দলের রাজারাম সাহু ১০০ গজ সাঁতারে ৫৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে জয়ী হয়েছেন। প্রফুল্ল মল্লিকও ওয়াগ্নির ন্যায় একজন দক্ষ সাঁতারুকে বুক সাঁতারে দুই লেংথে হারিয়ে দিয়েছেন। আশু ডাইভিং বিষয়ে লেওয়েটের নিকট হেরে গেছে। রীলে রেসে বৌবাজার দল খুব অল্পের জন্য জয়লাভ করেছে।

ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতা

ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতা গত ১৯শে সেপ্টেম্বর আরম্ভ হয়েছে। কোলকাতা থেকে মোট চারটী দল এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য সিমলায় গিয়াছে। এই চারটী দলের মধ্যে তিনটী দলের যাওয়ার সার্থকতা আমরা বুঝি কিন্তু একটা দলের বিষয় আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। সে দলটা হচ্ছে সিটি এথলেটিক্ ক্লাব। এই দলটা সেখানে বেড়াবার জন্যেই বোধ হয় গিয়েছিল। খেলার ফল দেখেই বোঝা যায় যে এদের দৌড় কতদূর। এরা সেকেণ্ড রয়্যাল স্কটস্ দলের কাছে ৯—০ গোলে হেরে গেছে।

আর তিনটী দলের মধ্যে মোহনবাগান দল য়োর্ডারস্ ফুটবল ক্লাবকে ৩—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। খেলাটী অবশ্য মোটেই ভাল হয় নি। তা ছাড়া এই য়োডারস্ দল একেবারে বাজে টীম। তবে তারা ঐ অঞ্চলের টীম বলেই বোধহয় ডুরাণ্ড খেলবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। মোহনবাগান দল যে-তিনটী গোলে জয়ী হয়েছে—তার দুটী দিয়েছেন নন্দ চৌধুরী আর একটী কুমার।

মোহনবাগান দলকে এবার দ্বিতীয় রাউণ্ডে শক্তিশালী রয়্যাল কোর সিগন্যাল দলের সঙ্গে খেলতে হ'বে। যদি তারা এই খেলায় জিততে পারে তাহলে তাদের আরও প্রবলতর দলের সঙ্গে খেলতে হ'বে। তাদের খেলতে হবে কিংস রেজিমেণ্ট বনাম আর্গাইল দলের বিজয়ীর সঙ্গে। কিংস

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত সুভাষচন্দ্র

কার্সিয়াং হইতে পত্র

কার্সিয়াং হইতে অন্তরীণাবদ্ধ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকারকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার অংশ বিশেষ নিম্নে প্রকাশিত হইল। সুভাষচন্দ্র বর্ত্তমানে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত।

Censored and Passed ,
Supt. of Police
Darjeeling

19. 9. 36.

My dear Akshoy,

At the present moment I am down with another attack of influenza (or perhaps dengue). The weather has been wretched during the last 8 or 10 days and makes one feel anything but happy.

Yours affectionately,
Subhas

Akshoy Kumar Sircar Esq.
Calcutta.

রেজিমেণ্টই এবার সকলের চেয়ে শক্তিশালী দল। অবশ্য আর্গাইল দলও কম নয়। তবে মোহনবাগান দল মিলিটারী দলকে-চিরকালই হারিয়ে এসেছে। সেজন্য এ-খেলাটা বেশ ভালই হ'বে বলে আশা করি।

কোলকাতার আর একটী দল এই প্রতিযোগিতায় বেশ পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছে।—সেটী হচ্ছে এরিয়ান্স ক্লাব। এরিয়ান্স ক্লাব এ কোম্পানী ডরলেটস্‌কে ২—১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠেছে। তাদের দিকে বিশেষ কোন শক্ত টীম নেই। সুতরাং তাদের সেমি-ফাইন্যালে উঠবার বেশ আশা আছে।

ভবানীপুর ক্লাব দ্বিতীয় রাউণ্ডে গ্রীনহাওয়ার্ডস দলকে ৯—০ গোলে হারিয়ে কোলকাতার তথা বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। মোহনবাগান ও এরিয়ান্সের মতন এরাও যে নিজেদের খেলার বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে কৃতকার্য্য হবে সে আশা আমাদের ছিল।

জাপান এ্যাথলেটগণের কৃতিত্ব

অদ্য বোম্বাই সহরে বার্লিন প্রত্যাগত জাপান এ্যাথলেটগণের সহিত বোম্বাইস্থ ভারতীয় এ্যাথলেটগণের প্রতিযোগিতা হয়। ভারতীয়গণ কোনরূপেই জাপানীদের সমকক্ষতা করিতে পারেন না। ম্যারাথন রেস বিজয়ী কিটি সন অসুস্থতার জন্য দৌড়াইতে পারেন নাই। নিম্নে ফলাফল দেওয়া হইল

১১০ মিটার হার্ডল—১ম মুরাকামী ২য় কুকী, ৩য় আহাচী সময় ১৪।৩।৫ সেঃ; ৪০০ মিটার হার্ডল—১ম চো, ২য় অহিহারা

৩য় ইুমাই—সময় ৫২।২,৫ সেঃ; গোলা নিক্ষেপ :—১ম মাৎসুনো, ২য় এবে। দূরত্ব—৩৯ ফুট ১ ইঞ্চি

৩০০ মিটার দৌড় :—১ম মুরাকুসে; ২য়, টানাকা, ৩য় সনপৎ (বোম্বাই)

সময়—৯ মিঃ ২১ সেঃ

লং জাম্প :—১ম হারাডা, ২য় তাজিমা, ৩য় টানাকা—দূরত্ব :—২৩ ফুট ৩।১৪ ইঃ।

১০০ মিটার দৌড় :—১ম ওসিয়োকা, ২য় তারিজচা, ৩য় সুজোকী—সময় ১০ সেঃ

হাই জাম্প :—১ম আর্দা, ২য় আলাকুমা, ৩য় তারাক—উচ্চতা :—৬ফুট ৩ইঃ

৮০০ মিটার দৌড় :—১ম নাকামুর, ২য় আউচী, ৩য় তোমী সময় :—২ মিঃ ৫।১৫ সেঃ

নীয়ামুতুল্লা কাপ

কলিকাতার 'কালীঘাট ক্লাব' এলাহাবাদে নীয়ামুতুল্লা 'কাপ বিজয়ী হ'য়েছে। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ই, আই, রেলওয়ে রিক্রিয়েশন্ দলের সঙ্গে কালীঘাট ক্লাবের এই ফাইন্যাল খেলাটি হয়। খেলা আরম্ভ হবার পাঁচ মিনিটের ভিতর কালীঘাট ক্লাবের লেফ্ট আউট—'নন্দী' একটি সুন্দর সেণ্টার কোরলে দুয়া হেড্ কোরে প্রথম গোল করেন। তারপর প্রথমার্দ্ধে জন্ নিজের চেষ্টায় আর একটি গোল করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে 'দুয়া' একটি এবং নন্দী একটি গোল করেন। রেলওয়ে দল অতিশয় ফাউল গেম্ খেলেছে। শেষ অবধি কালীঘাট ক্লাব ৪—০ গোলে জয়ী হয়।

শ্রীদুর্ব্বাসা

অকসন্ ও কন্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট ঃ—সাধারণতঃ ব্রীজ খেলোয়াড়দের একটি অদ্ভুত ধারণা বর্ত্তমান যে কন্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট খেলা অক্শন্ ডুপ্লিকেট খেলার চেয়ে ঢের বেশী শক্ত , কিন্তু একটু বিবেচনা করে দেখলেই বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে উক্ত ধারণা সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। প্রথমতঃ কন্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট খেলায় ডাকের সময় প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক বাধাদানের একটি ধারা পাওয়া যায়, যা' অক্শন্ ডুপ্লিকেটে পাওয়া যায় না বল্লেই হয়। দ্বিতীয়তঃ কন্ট্রাক্ট খেলায় 'প্রিমিয়াম্' এত বেশী যে অনায়াসেই স্লাম বাধা দেবার জন্য ১০০০ বা ১২০০ পয়েন্ট ক্ষতি স্বীকার করা যায়, অথচ অক্শনের বেলায় ২০০ পয়েন্টের বেশী হলেই জয়লাভের আশা নিষ্প্রভঃ হয়ে যায়। কাজে কাজেই অক্শন্ ডুপ্লিকেট খেল্তে হলে ডাকের ধারা দেখে ডাক দেওয়া উচিত কি অনুচিত তা' বিবেচনার বিষয়। তা' না হলেই যে বিপদের আশঙ্কা বেশী, নিম্নের হাতগুলি থেকেই বুঝতে পারবেন। এই হাতগুলি কলিকাতার কোন একটি ডুপ্লিকেট টুর্ণামেন্টে খেলা হয়েছিল। 'ক' নং হাত দেখুন।

এই হাতে ডাক হয়েছিল নিম্নলিখিতরূপ,—

'উ'	'পূ'	'দ'	'প'
১টি চিড়িতন।	১টি হরতন।	ডবল।	পাশ।

এই খেলাতে 'পূ'কে ৪০০ পয়েন্ট খেঁসারৎ দিতে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে 'পূ' যদি আহ্বানকারী ডবল (Informatory Double) দিতেন, তাহলে তাঁর খেঁড়ো 'প' নিশ্চয়ই চার তাসওয়ালা যে কোন রঙে ডাক দিতেন ;—ফলে তাঁদের এত বেশী খেঁসারৎ দিতে হত না। এবং তদ্ব্যতীত অতি অ[ল্প] আয়াসে হয়তো তাঁরা প্রতিপক্ষদের গে[ম] আটকাতে পারতেন। মূলতঃ অধিকাং[শ] ক্ষেত্রে বাধা দেবার জন্য চার তাসওয়া[লা] কোন রঙে ডাক না দেওয়াই বিধেয়। অথ[চ] এই হাত নিয়েই অন্য ঘরে 'পূ'র পাশ দেবা[র] ফলে 'দ' তিনটী ফেরাইএর ডাক ডেকে নি[জে] খেলা করেছিলেন।

ক

উ:
ইস্কাবন—সাহেব, নয়, ×।
হরতন—বিবি, আটা।
রুহিতন—গোলাম, ×।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, গোলাম, ×, ×, ×।

প:
ইস্কাবন—গোলাম, দশ, ×, ×।
হরতন—নয়, ×, ×।
রুহিতন—সাহেব, দশ, ×, ×।
চিড়িতন—×, ×।

পূ:
ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, ×।
হরতন—সাহেব, গোলাম, ×, ×
রুহিতন—×, ×, ×, ×।
চিড়িতন—×, ×।

দ:
ইস্কাবন—×, ×, ×।
হরতন—টেক্কা, দশ, সাতা, ছক্কা।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, ×।
চিড়িতন—টেক্কা, ×, ×।

আর একটি হাত দেখুন। 'খ' নং হাত দেখুন।

ডাক হয়েছে এইরূপ,

'প'	'উ'	'পূ'	'দ'
১টি চিড়িতন।	ডবল।	পাশ।	পাশ

খ

উ:
ইস্কাবন—টেক্কা, ×, ×, ×।
হরতন—সাহেব, বিবি, ×
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, ×, ×।
চিড়িতন—গোলাম, ×।

প:
ইস্কাবন—×, ×।
হরতন—টেক্কা, ×, ×।
রুহিতন—বিবি, ×, ×।
চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, আটা, ×, ×

পূ:
ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, ×, ×,
হরতন—×, ×, ×, ×
রুহিতন—গোলাম, ×।
চিড়িতন—নয়, ×।

দ:
ইস্কাবন—বিবি, ×।
হরতন—গোলাম, ×, ×।
রুহিতন—দশ, নয়, আটা, ×।
চিড়িতন—বিবি, দশ, সাতা, ×।

এ ক্ষেত্রে 'প' পক্ষ ২০০ পয়েণ্ট খেলায়ৎ দিয়েছিলেন। কিন্তু যদি 'উ' ডবল না দিয়ে রুহিতন ডেকে যেতেন তবু তাঁদের গেম হত না। কাজে কাজেই এ ক্ষেত্রে 'উ-দ'-পক্ষ লাভবান্ হচ্ছেন্।

কণ্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেটের একটি হাতঃ—নিয়ে কণ্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেটের একটি হাত উদ্ধৃত করা গেল। 'প' তাস বণ্টন করেছেন; উভয় দলই ভাল্‌নারেব্‌ল। 'গ' নং হাত দেখুন।

উ:
ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম, চৌকা।
হরতন—নাই।
রুহিতন—বিবি, দশ, ছক্কা, চৌকা।
চিড়িতন—বিবি, আটা, সাতা, দুরি।

প:
ইস্কাবন—তিরি।
হরতন—বিবি, গোলাম, সাতা, চৌকা
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, আটা, তিরি, দুরি।
চিড়িতন—টেক্কা, নয়।

পূ:
ইস্কাবন—নয়, ছক্কা।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, দশ, ছক্কা, পাঞ্জা, দুরি।
রুহিতন—সাতা, পাঞ্জা।
চিড়িতন—সাহেব, দশ, তিরি।

দ:
ইস্কাবন—দশ, আটা, সাতা, পাঞ্জা, দুরি।
হরতন—নয়, আটা, তিরি।
রুহিতন—নয়।
চিড়িতন—গোলাম, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা।

নিয়ে দুইটি ঘরের ডাক সম্পূর্ণভাবে দেওয়া গেল।

১নং ঘরে।

'প'	'উ'
একটি রুহিতন।	একটি ইস্কাবন।
চারিটি হরতন।	চারিটি ইস্কাবন।
ডবল	পাশ

'পূ'	'দ'
দুইটি হরতন।	দুইটি ইস্কাবন।
পাশ।	পাশ।
পাশ।	পাশ।

এ ঘরে 'উ-দ' পক্ষ নয়খানি পিট পেলেন। ২০০ পয়েণ্ট থেকে অনারের দরুণ ১০০ পয়েণ্ট বাদ গেল, অর্থাৎ 'প-পূ' পক্ষ মাত্র ১০০ পয়েণ্ট পেয়ে গেলেন।

২নং ঘরে

'প'	'উ'
একটি রুহিতন।	দুইটি ইস্কাবন।
চারটি হরতন।	পাশ।

'পূ'	'দ'
তিনটি হরতন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।

এ ক্ষেত্রে 'প-পূ' দল মোট এগারোখানি পিট পেয়েছিলেন। ফলতঃ 'প-পূ' দল সর্ব্বসমেত ৬৫০ পয়েণ্ট পেয়ে গেলেন

১নং ঘরে 'উ'-এবং 'দ' বেশ চমৎকার-ভাবে ডাক দিয়েছিলেন। মাত্র ১০০ পয়েণ্টের পরিবর্ত্তে তাঁরা বিপক্ষদলের হরতনের গেম নষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অথচ এই হাত নিয়ে তাঁরা এগারোখানি হরতনের পিট পানই। উপরন্তু, 'উ' যদি রুহিতনের দশে 'ফিনাস' করতেন, (যেহেতু ইহার সফলতার উপরই গেম নির্ভর করছে সেহেতু তাঁর করা উচিত) তা' হলে তাঁর খেলা হয়ে যেত।

দুইটি হাত ও তার ডাকঃ—আপনার হাতে আছে নিম্নলিখিত তাস আর 'ডাক চলল এইরূপ, আপনি কি ডাক্‌বেন?

'উ'	'পূ'
একটি চিঁড়িতন।	পাশ।

'দ'	'প'
একটি ফেরাই।	পাশ।

'উ'র হাতঃ—ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, আটা, চৌকা; হরতন—গোলাম, দুরি; রুহিতন—বিবি, সাতা; চিঁড়িতন—সাহেব, গোলাম, আটা, সাতা, পাঞ্জা।

এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে পাশ দেওয়াই বিধেয়। যদিও চিঁড়িতন ব্যতীত তাঁর

হাতে আর একটি ডাকযোগ্য রঙ আছে, তথাচ তাঁর আর ডাক দেওয়া উচিত নয়, যেহেতু তাঁর খেঁড়ী একটি ফেয়াইএ নিষেধাত্মক ডাক দিয়েছেন। 'উ'র হাতে মাত্র তিনখানি অনারের পিট আছে এবং 'দ'র হাতে একটি ফেয়াই ডাকের উপযুক্ত উচ্চতম সংখ্যক অনারের পিট থাকলেও তাঁদের গেম হওয়া অসম্ভব। এখন যদি 'উ' চার তাস সমেত ইস্কাবন রঙে ডাক দেন, তবে তাঁর খেঁড়ী নিম্নতম সংখ্যক অনারের পিট নিয়ে একটি ফেয়াইএর ডাক দিয়ে থাকলেও পুনরায় ডাকতে বাধ্য হচ্ছেন। সুতরাং এই ডাকের ফলে তাঁরা একটি বা ছুইটী পিটের দরুণ খেঁসারৎ দিতে বাধ্য হলেন। 'উ'র হাতে প্রত্যেক রঙেই অনারের পিট আছে সুতরাং একটি ফেয়াইএর খেলা তিনি অনায়াসেই করতে পারেন, কিন্তু বেশী বড় ডাকে উঠতে তাঁর আদৌ ইচ্ছা নাই।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এরূপ ডাক

'উ'	'পু'
পাশ।	পাশ।
'দ'	'প'
একটি ইস্কাবন।	পাশ।

এইবার 'উ' কিসে ডাক দেবেন, তাঁর হাতে আছে

ইস্কাবন—বিবি, দশ, নয়, পাঞ্জা; হরতন—তিরি; রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, আটা, সাতা, ছক্কা; চিড়িতন—নয়, ছুরি।

এই হাতে তিনটী রুহিতনে ডাক দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। কোন রঙে সাড়ে-তিনখানি অনারের পিটের কম নিয়ে বাধ্যতামূলক প্রথম ডাক দিতে হলে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত সুযোগ নাই বললেই হয়। প্রথম ডাকে 'উ'র পাশ দেওয়া যুক্তিসম্মত সন্দেহ নাই, কিন্তু 'দ' যখন প্রথম দুইজনের পাশ দেবার পরও তৃতীয় হাতে একটি ইস্কাবনে ডাক আরম্ভ করে শক্তিজ্ঞাপন করলেন, তখনই 'উ' বুঝতে পারলেন যে, এ হাতে 'গেম' তো অবশ্যম্ভাবী উপরন্তু স্লামের আশাও বর্ত্তমান। তাঁর এই 'forcing take out' ডাক 'দ' সহজেই বুঝতে পারবেন, যেহেতু তিনি প্রথমে পাশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে ইস্কাবন ডাকের উপযুক্ত সাহায্যকারী তাস বর্ত্তমান। এই তিনখানি রুহিতন ডাকে সহজেই গেমে পৌঁছান যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্লাম-সম্ভাবনা ঘোষণা করে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

দক্ষিণ কলিকাতা হইতে

সভ্য পদপ্রার্থী

প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচনে সভ্য পদপ্রার্থী হইবেন।

পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি প্রতিনিধিমূলক নহে

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির অভিমত

——:(০):——

গত শনিবার সন্ধ্যায় ৯৮নং বেলতলা রোডে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশন হয়। কাউনসিলার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটী গৃহীত হইয়াছে:—

১। পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি যেভাবে গঠিত হইয়াছে এই সভা তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিতেছে, কারণ সভার মতে উহা প্রতিনিধিমূলক হয় নাই।

২। পার্লামেণ্টারী বোর্ডের ওয়ার্কিং কমিটি জিলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন বলিয়া এই কমিটী তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিতেছেন।

প্রকাশ, ৩১ জন সদস্য লইয়া একটি জিলা কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী কমিটী গঠিত হইয়াছে।

ক্যালকাটা সানডে ক্লাব:— আগামী রবিবার ২৭শে সেপ্টেম্বর এদের প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা হবে বলে ঘোষিত হয়েছে। সেমি-ফাইন্যালে উঠেছেন ল্যান্সডাউন ক্লাবের দুইটী টিম এবং ওরিয়েণ্টাল ব্রীজ ক্লাবের দুইটী টিম,—এরূপ সংঘটন সচরাচর ঘটে না। ল্যান্সডাউন ক্লাব এই কৃতিত্ব অনেকবার অর্জ্জন করেছেন কিন্তু ওরিয়েণ্টালের পক্ষে ইহা খুবই সম্মানজনক এবং উক্ত ক্লাবের সভ্যগণের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। মি: বাসেট্ ক্লাবটিকে গঠন করেছেন খুব ভাল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেন যে তিনি ওরিয়েণ্টাল্ ছেড়ে অন্য ক্লাবে গমনোন্মুখ হয়েছেন তা' আমরা বুঝতে পারলুম না। তিনি কি ভুলে গিয়েছেন যে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়:'? যাই হোক সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশ বসুর তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতাটী ভালই চলেছে।

বিলাসী

বড়ুয়ার বিলেত যাত্রা

ভারতের প্রিয় পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া বিলেত যাচ্ছেন। তিনি প্যারিস প্রভৃতি ওখানকার বিশিষ্ট জায়গাগুলো পরিভ্রমন কোরে ইংলণ্ডে যাবেন। বড়ুয়ার এ ভ্রমন সখের না জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্যে তা' ঠিক জানা যায়নি। তবে একথা ঠিক পাশ্চাত্যের ফিল্ম টেকনিকের কিছু যে তিনি মনের ভেতর বেঁধে আনবেন—এ ধারণা করা বোধ হয় অসমীচীন নয়। তিন মাসের ভেতরই তিনি ভারতের মাটীতে পা দেবেন—আশা করা যায়।

চারু রায়ের শোক

পরিচালক চারু রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের আত্মহত্যার খবর পেয়ে আমরা বিশেষ মর্মাহত হ'লাম। ছেলেটি সেণ্ট পলস স্কুল হোষ্টেলে থাকত। গেল মঙ্গলবার সকালে পোটাসিয়াম সাইনেড খেয়ে সে আত্মহত্যা করে। আমরা চারু রায় ও মায়া রায়কে এই শোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা।

কালী ফিল্মস

'টকী অফ টকীজ'-র কাজে আপাততঃ ভাটা পড়েছে। মঞ্চের চাপে শিশিরকুমার ব্যস্ত—টলিউডে তাই আর তিনি আসার সময় পাচ্ছেন না। আমরা ভেবেছিলাম এবং গাঙ্গুলী মশাইয়ের ইচ্ছে ছিল ছবিখানা পুজোর বাজারের আর একটি আকর্ষণ হবে—কিন্তু সে সাধে তাঁর বাধ পড়ল। তবে শুনছি আসছে হপ্তায় শিশির কুমার বহিদৃশ্য তোলবার জন্যে হাজারিবাগ রওনা হবেন। এই প্রসঙ্গে আমরা আগেও বলেছি আজও বলছি মঞ্চের আবহাওয়া পর্দায় যতবেশী ঢুকতে না পারে ততই মঙ্গল।—এতে কোম্পানীর লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

নিউ থিয়েটার্স

নীতীন বসুর ছবি যাকে আমরা আপাততঃ "দিদি" বলে ডাকছি, তার কাজ বেশ ধীরে ধীরে চলছে। নীতীন বাবু তাড়াহুড়ো পছন্দ করেন না। তিনি বোঝেন বছরে যদি একখানাও ছবি তিনি তোলেন তা'তে ক্ষতি নেই—যদি ছবিখানা দশ-খানা ছবির পয়সা যোগায় আর 'কোয়া-লিটি'র দিক থেকে অন্যান্য প্রডিউসারদের ভাবিয়ে তোলে।

প্রমথেশ বড়ুয়ার "মায়া"-র ওপর এখন কাঁচি ছুরির প্রলেপ চলছে। ষ্টুডিও মহলে কান-ঘুষো শোনা যাচ্ছে—বড়ুয়ার "মায়া" তার মোহিনী শক্তিতে সবাইকে নাকি 'মায়া'র জালে বাঁধবে। "মায়া"র হিন্দী সংস্করণ আসছে শনিবার ২৬শে মুক্তি পাবে। এখানা দেখে সবাই যে বড়ুয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে—এ আশা আমরা করি। আর বাঙলা সংস্করণ বেরুতে বোধ হয় বড়দিন হবে।

"অনাথ আশ্রমে"-র কাজ নিয়েই হেমচন্দ্র এখন ব্যস্ত। "ক্রোড়পতি"-র যিনি বরাত ফিরিয়েছেন "অনাথ আশ্রমে"-র যে তিনি একটা সুরাহা কোরবেন—এ সবাই জানে।

"গৃহদাহ" ও "বিজয়া"

নিউ থিয়েটারসের "গৃহদাহ" ও নিউ ইণ্ডিয়ার "বিজয়া"—এ দু'খানা ছবি দেখবার জন্যে চিত্রপ্রিয়েরা হ'য়ে উঠেছেন উৎকণ্ঠিত। 'চিত্রা'য় আমূল সংস্কারকার্য্যের জন্যে "গৃহদাহ" আর হপ্তা'র জন্যে আপাততঃ পেছিয়ে গেল অর্থাৎ ৩রা অক্টোবর ছবিখানার মুক্তির সম্ভাবনা আছে। আর "বিজয়া"-র বিজয়-বার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হবে ১৭ই অক্টোবর।

"সোনার সংসার"

এদিকে আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়ায় পুজোর বাজারে "সোনার সংসার" পাত্‌বার ইচ্ছে হ'য়েছে 'উত্তরা'র। এর মুক্তির দিন খুব সম্ভবতঃ ১০ই অক্টোবর। "সোনার সংসার" খুব ভাল ছবি হবে—এ আশা সবাই কোরছেন। "মীরাবাঈ"য়ের বহুদিন পরে দেবকী বসুর বাঙ্‌লা ছবি আস্‌ছে—তাই এ ছবিখানা দেখবার ইচ্ছেও সবায়ের কম নয়!

তা' হ'লে ওরা, ১০ই ও ১৭ই বাঙলার চিত্রপ্রিয়দের অতি আনন্দের দিন। কারণ, এ বছরের তিনখানা ভাল ছবি দেখবার আশা তারা রাখে।

কালী ফিল্মস

গুণময় বাঁড়ুয্যের "পরভৃতিকা"র কাজ অনেকটা এগিয়েছে। এদিকে হিন্দী "তরুণী", সেও প্রায় শেষ। মুখুয্যে মশাই বল্‌ছিলেন শনিবারের মধ্যে শুটিং তিনি শেষ কোরবেনই কোরবেন।

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

মধু বসু "আলিবাবা" অনেকটা তুলে ফেলেছিলেন, কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে শব্দ-যন্ত্রের কাজ মধুবাবুর মনোমত না হওয়ায় তিনি ঐ দৃশ্যগুলো পুনর্গ্রহণ কোরবেন ঠিক কোরেছেন।

দেবদত্ত ফিল্মস্‌

এই প্রতিষ্ঠানে তড়িৎ বসু যোগদান কোরেছেন। তড়িৎ বাবু একজন উৎসাহী ও গুণী ব্যক্তি; একে দেবদত্তের কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, ইনি এখানে প্রথমে বঙ্কিম-চন্দ্রের "ইন্দিরা" তুলবেন।

* * *

১৯শে ফ্রান্সের কন্‌সাল জেনারল সপারিষদ এই ষ্টুডিও পরিদর্শন করেন। দেবদত্ত ও গোকুল শীল অতিথিগণকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন।

পপুলার পিক্‌চার্স্‌

নতু সেন শরচ্চন্দ্রের "পণ্ডিত মশাই"কে নবরূপে রূপায়মান করবার জন্যে যথেষ্ট খাটছেন। এতে বিভিন্ন ভূমিকায় নাম্‌ছেন—বৃন্দাবন—রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জ-রবি রায়, কুসুম—শান্তি, ব্রজেশ্বরী—রেণুকা ঘোষ, বৃন্দাবনের মা—প্রভা, কুঞ্জের শাশুড়ী—রাজলক্ষ্মী, অন্যান্য অপ্রধান ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল দাস প্রভৃতি নাম্‌বেন।

রাধা ফিল্মস্‌

এদের "বিষ বৃক্ষে"র কাজ প্রায় শেষ হ'তে চলল। অভিনেতৃ সম্মিলনে ছবিখানার চমৎকারিত্ব আছে। মনে হয় ছবিখানা লোকের মনে রেখাপাত কোরবে।

কজ্জন শূণ্য টলিউড্‌

'টলিউড' ষ্টুডিওর সঙ্গে কজ্জনের সম্বন্ধ ছিন্ন হ'য়েছে। আসল কারণ কী তা' এখনও রহস্যাবৃত। পত্রান্তরে প্রকাশ, বর্ত্তমানে কোম্পানীর সঙ্গে শ্রীমতীর একুশ মাস চুক্তি থাকা সত্বেও তাঁর অশোভন আচরণের জন্যে কর্তৃপক্ষ তাঁকে কাজ থেকে বরখাস্ত কোরতে বাধ্য হ'য়েছেন।

ফ্লাইং পোষ্টার

রাস্তায় পোষ্টার মারা নিয়ে বেশ গণ্ডগোল চলেছে। রাস্তায় থিয়েটার বায়োস্কোপ ও অন্যান্য পোষ্টার যারাই মারছে তাদেরই উচ্চ জরিমানা করা হ'চ্ছে আর ভবিষ্যতে যা'তে পোষ্টার না মারে তার জন্যও পুলিশ থেকে সাবধান কোরে দেওয়া হ'চ্ছে। এ সম্বন্ধে আমরা আসচে হপ্তায় বিশদভাবে আলোচনা কোরব।

বিবি

সঙ্গীত সম্মিলনী

আগামী শনিবার ২৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় সঙ্গীত সম্মিলনীর মাসিক সঙ্গীত সভার অধিবেশন হইবে। এবারকার প্রোগ্রামের ভিতর রাশিয়ান নৃত্যশিল্পী—ভী, ভ্লাডিমিরোভার নৃত্যই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুভাষচন্দ্র
দার্জ্জিলিংএ পরীক্ষার্থ নীত

দার্জ্জিলিংএর সংবাদে প্রকাশ যে বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুকে কার্শিয়াং হইতে দার্জ্জিলিংএর মিউনিসিপ্যাল ল্যাবরেটারীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তাঁহাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করার পর পুনরায় কার্শিয়াংয়ের গীদ্দাপাহাড়ে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে

কালীমাতা হাইস্কুল

গত রবিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মিঃ ডি, কে, বোসের সভাপতিত্বে কালীমাতা হাইস্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সমস্ত উৎসব তালিকার মধ্যে কুমারী আভালতা সরকারের "ভিখারিণী মেয়ে" আবৃত্তি অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল। এই বালিকাটীর বয়স মাত্র ১০ বৎসর। ১০ বৎসরের বালিকার মুখে এরূপ আবৃত্তি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

শারদীয়া প্রীতি সম্মিলনী

কেশব সেন ষ্ট্রীটস্থ ওয়াই, এম, সি, এ শাখায় আগামী শনিবার ২৬শে সেপ্টেম্বর একটি প্রীতি সম্মিলনী হইবে।

এই উপলক্ষে পাহাড়ী সান্যাল, সাইগল, বীরেন দাস প্রভৃতি বিখ্যাত গায়কগণের

গান

অমৃতকুমার দত্ত

ভোরের স্বপনে কে তুমি দিয়ে দেখা
লুকালে সহসা।
মোর তপনের রাঙা আলোকে যেন
ঘিরিল তমসা।
না ফুটিতে মোর কলার কলি
পথিক হাওয়া সম গেলে গো চলি,
গেলে ভাসিয়া করুণ রাগিনী যেন
বিষাদে অলসা॥
জেগে দেখি হায় ঝুরিছে বনভূমি
ছড়ায়ে ফুলদল,
ওগো অতিথি ঝরা পাতায় আছে ছেয়ে
তোমার পথতল।
মুখর আমার গানের পাখী
নীরব হ'ল হায় বারেক ডাকি,
যেন ফাগুনের জ্যোৎস্না-হাসিত রাতে
নামিল বরষা॥

গান, ও কাজি নজরুল, মন্মথ রায়ের আবৃত্তি এবং সর্ব্বশেষে অখিল নিয়োগী রচিত প্রহসন "নাট্যকার" অভিনীত হইবে।

জলসা

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গ্লোব রঙ্গমঞ্চে খালসা কলেজের সাহায্যার্থে একটী বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে কুমারী লীলা দেশাইয়ের অপরূপ প্রাচ্য ও কথাকলি নৃত্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল। তাঁহার পেলব তনুর সাবলীল ভঙ্গিমা, নৃত্যের অপূর্ব্ব ছন্দ, দেহের লীলায়িত সুষমা সমবেত জনমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। কুমারী লীলা একজন সম্ভ্রান্তবংশজাতা বিদুষী মহিলা। ভারতের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

অদৃষ্টের পরিহাস

শ্রীঅশ্বিনী কুমার লাহিড়ী

এই প্রবন্ধে যাঁহার চরিত্র লইয়া আজ আলোচনা করিব তাহা উপস্থিত জন সাধারণের নিকটে অখ্যাত অজ্ঞাত তুচ্ছ হইলেও ইহার এমন একটা দিক আছে যাহা দেখিতে জানিলে বা দেখাইতে জানিলে বিশেষ কাজে লাগিতে পারে। মানুষ যে সত্য সত্যই অবস্থার বা অদৃষ্টের দাস তাহার জলন্ত প্রমাণ এই চরিত্রে পরিস্ফুট! কেমন অভ্যাস হইয়া যায়, ক্ষয় হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এমন কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাইবার মত অবশিষ্ট থাকেনা, যাহা হইতে আসল বস্তুর একটা উৎকৃষ্ট নিশানা মিলিতে পারে। তিনি যে একদিন অধিপতি ছিলেন আজ তাঁহার এই হীনবেশ দেখিয়া ধারণা করিতে ত পারা যায়ই না, বরঞ্চ এ যেন চিরভিখারী—এই যা' দেখিতেছি ইহাই পরম সত্য!

আমাদের এই প্রবন্ধ কথিত—চরিত্রবান ব্যক্তির নাম শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময় এই কি না সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে; তথাপি দুই একটি কথা এখন হইতে লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলে, পরে পুরাতন ও পর্য্যু্যষিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে

হরিচরণ বাবু পাণিহাটীর প্রতাপশালী জমিদার ৺ তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধর। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৃষ্ণ চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অপুত্রক মাতুলের অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াছিলেন এবং ভবানীপুরের মুখোপাধ্যায় পরিবারে (হরিশ মুখোপাধ্যায়) বিবাহ করেন; এক্ষেত্রেও মাতুল নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া হরিচরণ বাবু মাতুলের সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং ভবানীপুর অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে হরিচরণ বাবু বংশ মর্য্যাদায়, অর্থে, ঐশ্বর্য্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, ভাগ্য বিড়ম্বনায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাঁহাকে যখন সামান্য কয়েকটা টাকা উপার্জ্জন করিতে প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিতে দেখি তখন সত্যই মনে হয় অদৃষ্টের একি নির্ম্মম পরিহাস! আজ জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন সে পথেও তাঁর কৃতিত্ব বড় কম ছিল না। নটরূপে, নাট্যকাররূপে নাট্যাচার্য্য ও পরিচালকরূপে একদিন তিনি নিজেকে যে ভাবে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন তাঁহার সেই অমিতাভ প্রতিভা আজ কোথায়? আজ যাঁহারা শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে যশ ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেইত এই হরিচরণের মন্ত্রশিষ্য; একদিন এই হরিচরণের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই না তাঁহারা আজ বিশারদ হইতে পারিয়াছেন, এক এক জন এক একটা দিকপাল! কিন্তু হরিচরণ—

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীপূর্ব্বে হরিচরণ উত্তর কলিকাতার অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় ক্রাউন থিয়েটারে প্রথমে সখীরূপে, পরে— উর্ম্মিলা ও সীতার ভূমিকায় এবং লক্ষ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া একখানি পদক প্রাপ্ত হন। বহুবাজার ড্রামাটিক ক্লাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চারিখানি নাটকে ওসমান পশুপতি, নবকুমার ও রাজরাজ এবং রিজিয়া নাটকে বক্তিয়ারএর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া

স্বর্গীয় নাট্যাচার্য্য নিলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি স্বুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। হরি-রাজের ভূমিকার অভিনয় দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হরিচরণকে একটী মূল্যবান ড্রেস উপহার দেন এবং ওয়েলডন থিয়েটারে কালপরিনয়ে মনিন্দ্রের ভূমিকায় হরিচরণের অভিনয় দর্শন করিয়া ৺অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী মহাশয় সাধারণের সম্মুখে আনন্দ প্রকাশ করেন ও হরিচরণকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। কোরিন্থিয়ান বোর্ডে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদ প্রসাদ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি নাট্যাচার্য্যগণের সম্মুখে রোশিনারা নাটকে ঔরংজীবের পার্ট অভিনয় করিলে তৎকালীন সংবাদ পত্রে যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহাতে দানীবাবুর অভিনয় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে এই মত প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত রঘুবীরে রঘুবীর, প্রতাপাদিত্যে চণ্ডীবর রডা বিক্রমাদিত্য ও ভবানন্দ, সাবিত্রী নাটকে মাণ্ডব্যতস্বরা, পাণ্ডবগৌরবে ভীম, জনায় বিদূষক, প্রফুল্লে যোগেশ, হারানিধিতে হরিশ, দুর্গাদাসে দিলীর খাঁ, মেবার পতনে গোবিন্দ সিংহ, সাজাহানে ঔরঙ্গজীব, দেবলা দেবী নাটকে করুণসিংহের ভূমিকায় যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীদুর্গা, অলীকবাবু, চণ্ডীদাস (নিত্যগোপালবাবুর) রাজা বাহাদুর, হালখাতা প্রভৃতি বহু নাটক নাটিকা ও প্রহসনে বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বহু সম্প্রদায়ে অধ্যক্ষতা করিয়াছেন, হরিবাবু প্রতিভাবান, বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার চরিত্র, তাঁহার শক্তি সত্য সত্যই অনন্যসাধারণ! কিন্তু ঐশ্বর্য্য না হয় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে,—তা বলিয়া প্রতিভার লোপ এত শীঘ্র হয় কিসে? অখণ্ড জ্যোতিষ্করূপে যিনি একদিন প্রকাশিত ছিলেন তাঁহার আজ একি মূর্ত্তি। ছবির পর্দায় যদিও তাঁহাকে ফুটিতে দেখিতে পাইতেছি,—সে কিন্তু অতি নগণ্য অতি জঘন্য তুচ্ছ চরিত্রে। এমন কি Casting এ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত থাকে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, হরিবাবু একদিন যাহা ছিলেন এখন আর তাহা নাই তাই তাঁহার এই দুর্দ্দশা? ইহা আমাদের বিশ্বাস হয়না, হয় না এই জন্য যে, যেটুকুর মধ্যে তাঁহাকে ফোটান হয় সে টুকুর ত তিনি পূর্ণরূপ দিয়া থাকেন; তখন অধিকতর উচ্চ প্রকাশের জন্য তাঁহার শক্তির ব্যবহার করিলে প্রতিষ্ঠান বিশেষ হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে পারেন অধিকন্তু রাহুগ্রস্ত এই নিষ্প্রভ রবিকে একবার বিকাশ মুর্ত্তিতে দাঁড় করাইতে পারিলে চিত্রজগতেরও সমূহ উন্নতি সাধন হয়। তবে অন্তরায় বহু। তাঁহাকে তাড়াইয়াছে তাহারা, যাহারা একদিন তাঁহার হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ছাত্রদের নিকটে সম্ভ্রম রক্ষা করিতে গিয়া তিনি আজ অনেক দূরে সরে দাঁড়াইয়াছেন। ইহার উপর তোষামদ Sir বলিয়া মান রক্ষা করিয়া বা মনরক্ষা করিয়া নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে যে ধাতুর দরকার তাহা হরিবাবুতে বিলক্ষণ অভাব। উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় তাঁহার নিকটে নাই, আর নাই বয়স ও মর্য্যাদার মাত্রা লঙ্ঘন করিয়া হাস্য পরিহাসে তরল রসিকতায় বিভাগীয় কর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিয়া রেফের মতন মাথায় চড়িবার আধুনিক ইচ্ছা! নির্দ্ধারিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আজ তিনি কেবল মাত্র কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু যদি কোন বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী দুইয়েরই মূল্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণের কলঙ্ক-কালিমা অপসারিত হইয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন আলোকজ্জ্বল হইয়া উঠে।

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

জীবন সিন্ধু কলরোলে ধায় মরণের গেয়ে গান
দুইধারে ঢেউ ভেঙে ভেঙে করে ভালোবাসিবার ধ্যান।
এপারে ওপারে ছায়া নেমে আসে বাহুমেলে বেদনার
দীপ জ্বেলে ডাকে "আয়, আয়, আয়" মায়াময় সংসার।
পেছনপানেতে মধুস্মৃতি লয়ে কার আঁখি ছলছল
জীবনসিন্ধু সেকথা না মেনে বহায়েছে কল্লোল।
ওপরে দেবতা, নীচেতে মানুষ ধরি রাখিবার ছলে
পৃথিবীর বুকে ফুটায়েছে ফুল ভাসি নয়নের পলে।
মরনের শিশু ছায়া মেলে আসে; যৌবন এসে কয়,
"আমার বুকেতে নীড় রচ প্রিয়, যাবার নাহি সময়।"
জীবনসিন্ধু ফেনায়িত হয়ে সাথী করে নেয় সব
দুইধারে শুধু ভোগের রূপেতে চলে মরণোৎসব।
আকাশ কাঁদিয়া ঢালে জলধারা পৃথিবী কাঁদিছে হায়
জীবনসিন্ধু অসীমের পানে চিরদিন ধেয়ে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি

শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

(১)

ভালো লাগে না। সমীর আবার পাশ ফিরে শোয়। কয়েক মিনিট নির্জ্জীবের মত পড়ে থাকে! নিঃসঙ্গ জীবন! নেই একটা সুললিত ছন্দ, একটা স্বচ্ছন্দ গতি! ভারবাহী জন্তুর মত বোঝাস্বরূপ জীবনটাকে কোনমতে ক্লেশে টেনে নিয়ে চলা। অসহ্য একাকীত্বের অব্যক্ত বেদনা ওর কণ্ঠ চেপে চেপে ধরে, প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

—হঠাৎ ও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বিছানার ওপর। খোলা জানালা দিয়ে সামনের উদার নীলাকাশের পানে চেয়ে থাকে। মগ্ন দৃষ্টি! কত কি ভাবনা ওর মস্তিষ্কে জটলা পাকায়—সিগারের ধোঁয়ার মত বিসর্পিল, অস্থায়ী।—সংসারে যারা সবার চেয়ে আপন জন তাদের ও হারায় খুব শৈশবে। কিন্তু সে রিক্ততা কোনদিন ওর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয়নি। কেননা, তাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ ও পায়নি। একটু বয়সেই 'হবেনা-হবেনা' করে একমাত্র সন্তান ওকে জন্ম দিয়ে মা মারা গেলেন। পালনের ভার গিয়ে পড়লো বৃদ্ধ বাপের ওপর। তিনি ছিলেন পাকা ব্যবসাদার মানুষ। সংসারের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার সুযোগ ও সময় তিনি পাননি। তবু-স্ত্রীর অকাল বিয়োগের শোকটা তার জীবনে মারাত্মকভাবে আক্রমন করলো। একদিন তিনিও নিষ্ঠুরের মত ওকে একলা ফেলে রেখে স্ত্রীর অনুগামী হ'লেন। রেখে গেলেন সহরের ওপর একখানা বিরাট বাড়ী, আর ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা টাকার অঙ্ক!—তারপর? তারপর ওর বয়োঃবৃদ্ধি—পাঠ্যজীবন, পরে অর্থোপার্জ্জনে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ। অতি সাধারণ—বৈচিত্র্যহীন!—ওর জীবনের আলো-ছায়া পড়া চলার পথে কত নর-নারী বিচিত্রবেশে ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। কত জনকে ও কত ভাবে পেয়েছে, কিন্তু অন্তরের মনি-কোঠায় তাদের একজনকেও ও সানন্দে বরণ করে তুলে নিতে পারেনি—কতকটা আশঙ্কায়, কতকটা অজ্ঞতায়।......দেয়ালের ঘড়িটার টং টং পাঁচটা আওয়াজে সমীর চমকে ওঠে। ধড়মড়িয়ে বিছানা হ'তে নেমে পড়ে। টেবিলের ওপর থেকে ষ্টেথিসকোপটা তুলে নিয়ে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—হাঁসপাতালের দিকে।

পশ্চিম দেশের ছোট হাঁসপাতাল। নাতিবৃহৎ একখানি দোতালা বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। 'বেড'এর সংখ্যা কম। পাশে গা-ঘেঁষা লম্বা ব্যারাকটা নার্সদের বাসস্থান। অদূরে সমীরের ঝরঝরে তকতকে ছোট-খাটো বাংলো। সামনে এক টুকরো বাগান। তার ভেতর কতকগুলো সিজন ফ্লাওয়ারের ভীড়। একটা 'নাম না জানা' বিলাতি লতানো ফুলের গাছ বাংলোর রাণীগঞ্জ টাইলের ছাদের ওপর উঠে গিয়ে এক চতুর্থাংশ দখল করে শুয়ে আছে।

সমীর হাঁসপাতালের গেটে ঢুকতেই, দারোয়ান আভূমি সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়ায়। ও হাতের ষ্টেথিস্কোপটা একটু উঁচু করে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে, সোজা হলের ভেতর গিয়ে ঢোকে। প্রত্যেক ওয়ার্ড ঘুরে-ঘুরে দেখে চলে। সতর্ক দৃষ্টি!—হঠাৎ একটা 'বেড'এর সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। টেবিলের ওপরকার কাগজটা দেখে ও চমকে ওঠে। একি! বারোটার সময় ও প্রেসক্রিপসন্ লিখে দিয়েছে, এখনো রুগী ওষুধ পায়নি। সমীরের মাথা তেতে ওঠে।—ডাকে—'বয়'।—বয় এসে দাঁড়ায়।

ও জিজ্ঞাসা করে—'নার্স কাঁহা গিয়া'?

'উপরমে হুজুর!'

—কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে ও গম্ভীরভাবে বলে—'হু,—উস্‌কো বোলাও, ডাক্তারবাবু ডাক্‌তায় জলদি বোলাও।'—বয় চলে যায়।

সমীর ডিস্‌পেন্সিং রুমে গিয়ে নিজেই তাড়াতাড়ি ওষুধটা তৈরী করে নিয়ে যখন ঘরে আসে, দেখে নার্স চুপটি করে 'বেড'-এর পাশে দাঁড়িয়ে। ও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, সোজা রুগীর কাছে গিয়ে তাকে ওষুধ খাওয়ায়। নার্স একবার অপরাধীর সুরে বলে—'আপনি সরুন, আমি খাওয়াচ্চি'।—ও সে কথার উত্তর দেয় না, যেন কথাটা ওর কানে যায়নি এমনি ভাব। রুগীকে সন্তর্পণে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, গা থেকে 'খসে পড়া' কম্বলটা বুক পর্য্যন্ত টেনে দেয়। তারপর সশব্দে পা ফেলে ঘর ছেড়ে বাইরে আসে।

নার্স সেইভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে সমীরের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। সমীর তখন ঘরের ভেতর ইজিচেয়ারে শুয়ে। চোখদুটি নিমীলিত। নার্স কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে কম্পিতস্বরে বলে—'ঘরে ঢুকতে পারি কি?'

—'আসুন'—ও চোখ বুজিয়ে থেকেই উত্তর দেয়।

নার্স নযুপদক্ষেপে ঘরে এসে ঢোকে। ডাকে—'ডক্টর দেব!'

সমীর হঠাৎ সোজা উঠে বসে, ঝাঝালো সুরে বলে—'বলুন কি বলবার আছে আপনার?'

নার্স চমকে ওঠে। মুখ দিয়ে কথা ফোটে না।

—'এতক্ষণ কি করছিলেন?'—সমীর প্রশ্ন করে।

'ওপরে ছিলুম।'

—'কেন ওপোরেতো আপনার ডিউটী ছিলো না!'

—'না, ওপরের নার্সের মাথা ধরেচে। তাই তার ডিউটীটা—'

—'বুঝিচি—মাথা ধরেচে!' কথার মাঝে বাধা দিয়ে সমীর শ্লেষের ভঙ্গীতে বলে—'বেশ, তা তিনি আমায় দয়া করে খবরটা দিয়ে উপকার করতে পারতেন। তাঁর হয়ে আপনিও ও কাজটা পারতেন, এবং আশা করি তাতে আপনার বন্ধুত্ব অটুটই থাকতো—বন্ধুত্বের চেয়ে প্রাণের মূল্য বেশী, এটা জানেন?'

নার্স নির্ব্বাক—নিশ্চল! রুদ্ধ কান্নায় তার গলা বুজে আসে। সমীর একবার তার মুখের ওপর জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে চলে—'এসব বিষয়ে ইউরোপীয়ান নার্সরা খুব সতর্ক! আমাদের native নার্সের ভেতর যথেষ্ট গলদ!—যাঁরা কর্ত্তব্যকর্ম্মে এতটা অচেতন, তাঁদের উচিত এসব গুরুতর কাজে হাত না দেওয়া, অন্যপথ ধরা—there are so many source of income.—আপনি এখন যেতে পারেন!

নার্স যায় না।—'ডক্টর দেব!'—কয়েক মুহূর্ত্ত পর রুদ্ধ কণ্ঠে বলে।

সমীর বিরক্তি হয়ে ওঠে—রুক্ষস্বরে বলে—'বলুন, আরো কি বলবার আছে আপনার—আলাতন!'

নার্স চুপ করে থেকে মুখ তোলে। সজল দৃষ্টিটুকু সমীরের মুখের ওপর ফেলে বিনীতভাবে বলে—'ডক্টর দেব! আমি আপনাকে কথা দি'চ্চি, আর কখনো এমন হবে না।—আমাকে আপনার মাপ করতেই হবে, এই চাকরিটা আমার জীবিকা।'

'আচ্ছা, আপনি এখন যান—আমার অনেক কাজ আছে'—সমীর পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে।

(২)

সারাটা রাত্রি সমীরের চোখের পাতা পড়ে না। নার্সটার কথা ওকে অস্বস্তি দেয়। তার ডাগর চোখদুটির কোলে শীর্ণ জলরেখা, দুটী চোখে ঝরে-পড়া মিনতি মাখানো মুখখানি ওকে বিচলিত করে তোলে। না—ওর কথাগুলো বড়ো রূঢ় হয়েছে। যদিও—সে দোষী। কিন্তু—আহা বেচারী পেটের দায়ে পরের অধীনস্থা!

পরদিন সকালে—

নার্স—উষা তখন নিজের ঘরের সামনে অপ্রশস্ত রোয়াকটীতে চেয়ারে বসে। তার ঢলঢলে কমনীয় মুখখানিতে বিষণ্ণতার সুস্পষ্ট রেখা! মাথার চুলগুলো রুক্ষ, অবিন্যস্ত; কতকগুলো কপালে, কানে এসে পড়েছে।—হঠাৎ জুতোর শব্দে ও চমকে ওঠে, পাশের দিকে চেয়ে দেখে—ডক্টর দেব! একি! তিনি তার বাড়ীতে—সর্ব্বনাশ। না, তার তো এখন ডিউটী নেই—তবে কি?—আশঙ্কায় তার বুক দুরু-দুরু করে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঠোঁটের কোণে শুষ্ক-হাসির রেখা টেনে এনে বলে—'আসুন।'—আরো কতো অভ্যার্থনিক বচন ওর মনে আসে—মুখ ফুটে বলতে পারে না।

সমীর সোজা রোয়াকে উঠে আসে। উষার সামনে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত সুরে বলে—'উষা দেবী আমি মহা বিপদে পড়েচি।'

'বিপদ!—আপনার?'—উষা বলে।

সমীর আবহাওয়াটাকে তরল করবার জন্য হেসে বলে—'না, সে ধরণের বিপদ নয়'—একটু চুপ করে থেকে বলে—'কাল আপনাকে রাগের মাথায় কতকগুলো কড়া কথা বলেচি, সে জন্যে আমি অনুতপ্ত-ক্ষমাপ্রার্থী! কাল সারাটা রাত চোখের পাতা পড়েনি—আমি ক্ষমা চাইচি।'

রুদ্ধশ্বাসে উষার বুক ভরে ওঠে, আয়ত চোখের কোলে শীর্ণ জলরেখা! হেসে বলে—'না, আমি ক্ষমা করতে পারবো না। আমার চোখে আপনি এমন কিছু দোষ করেন নি, যাতে আপনি আমার কাছে নিচু হবেন। দোষ করেচি, বকেচেন। এতে আপনার অন্যায় কিছুই হয়নি, বরং আমারি—'

সমীর অধীর হয়ে ওঠে—'না-না আমি ওসব বড়ো বড়ো কথা শুনতে চাই না—শুধু আপনি বলুন আমায় মাপ করেচেন।'

—'কি আশ্চর্য্য! এতে কিন্তু আমায় অপরাধী করে তুলচেন—আচ্ছা তাই।'

—'তাই নয়! পরিষ্কার ভাষায় বলুন, আমায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিন।'

উষার লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে ওঠে—'আচ্ছা মাপ করলুম'—ও মাথা নত করে বলে—'আপনি আচ্ছা লোক! আমার নরকের পথটা পরিস্কার করলেন।'

সমীর হেসে বলে—'আর, আমার স্বর্গে যাওয়ার পথটা সোজা হয়ে রইলো'—

'তা হ'লে আপনাকে স্বার্থপর বলা চলে—সমস্ত পুরুষ জাতটাই তাই'—

'না-না ওকথা বলবেন না! আমার মত একজন নগণ্য পুরুষকে সামনে রেখে, সমস্ত পুরুষের বিচার করবেন না। মারতে হয় লাঠিটা আমার মাথায় মারুন।' ও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। তারপর উভয়েই নীরব! এতক্ষণে উষার খেয়াল হয়—ওমা, তাইতো সমীরবাবুকে বসতে বলা হয় নি। ত্রুটী সংশোধনার্থে বিনীতভাবে বলে—'বসুন,

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?'—চেয়ারটা এগিয়ে দেয়।

সমীর চেয়ারে বসে।—'চা আনবো ?'—উষা জিজ্ঞাসা করে—

'আপনার যদি হয়ে গিয়ে থাকে তবে আর দরকার নেই। একেবারে বাড়ীতে গিয়েই—'

'না আমারো হয়নি'—উষা বাধা দিয়ে বলে—'বসুন, এক্ষুণি হয়ে যাবে।'

উষা ভেতরে চলে যায়।

সমীর একলা চুপটি করে বসে থাকে। ওকে কতো কি চিন্তা ঘুলিয়ে ওঠে।—মেয়েটা কিন্তু বেশ! কথাগুলো ভারি মিষ্টি! সারা দেহে কেমন একটা কমনীয়তা যা দর্শন-দুর্লভ! মুখখানি ঢলঢলে; পরন্তু ঠোঁট দুটীতে সহনীয় গভীর শুদ্ধতা! চাপা চিবুকটী, স্নিগ্ধ সুক্ষ্ম দুটী ভুরুর নীচে ভাসাভাসা দুটী চোখ মুখখানিকে আরো বিশেষ করে তুলেছে।—আচ্ছা, তার ছন্নছাড়া জীবনে স্বাভাবিকতার ধারা আনা যায় না? ছন্দবদ্ধ করা যায় না তার ছন্দহারা গতিকে। পারে না এই মেয়েটা? পারে—নিশ্চয়ই পারে, সব মেয়েরা পারে, এই মেয়েটীও পারে, কিন্তু—

উষার কণ্ঠস্বরে ওর চমক ভাঙ্গে—'ঘরের ভেতর আসুন'

—'ঘরের ভেতরে যাবো? কেন, বাইরেই ছিল ভালো।'

—'তাহ'লে টেবিলটা আবার টেনে নিয়ে যেতে হয়।'

—ও— সমীর ঘরে যায়। চেয়ারে বসে বলে—'আপনি তো খুব এক্সপার্ট—এরি মধ্যে চা কমপ্লিট, টেবিলের ওপরকার ডিস্ দুটির দিকে চেয়ে বলে—'আবার এতো হ্যাঙ্গামা করচেন কেন?'

'এ আর কি এতো হ্যাঙ্গামা!' উষা সলজ্জ সুরে বলে—'সামান্য একটু মাখন মাখান রুটী আর কয়েক টুকরো ফল—কই আরম্ভ করুন।'

'হ্যাঁ—এই যে খাচ্চি' বলে কতকটা আনাড়ির মত ও চায়ের কাপে সশব্দে এক চুমুক মারে। 'আপনার কই?' মুখ তুলে ও জিজ্ঞাসা করে।

উষা নিরুত্তর! নতমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সমীর আবার বলে—'আপনারটাও নিয়ে আসুন। আমি খাবো আর আপনি—ও বুঝতে পেরেচি, নিশ্চয় আপনার পুরুষের সামনে বসে খাওয়া অভ্যেস নেই। অনেকের লজ্জা হয় বটে! সেটা কিন্তু তাদের নারীমনের দুর্ব্বলতা—যান যান নিয়ে আসুন। আমরা তো এখন বন্ধু—লজ্জার বালাই না রাখাই ভালো কি বলুন?'—

শেষের কথাটায় উষা যেন চমকে ওঠে—মেয়েমানুষ পুরুষমানুষের বন্ধু? কে জানে হয়তো হবে!—অগত্যা নিজের কাপটা নিয়ে আসে। 'ডক্টর দেব'এর অনুরোধ! সমীর বাবুর অনুরোধ হ'লে হয়তো পারতো এড়িয়ে যেতে—অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটী করতো না।

(৩)

ক্রমশঃ ওদের দুজনকার মাঝখানে বন্ধুত্বের একটা নিগূঢ় বন্ধন এসে দাঁড়ায়। উভয়ের ভেতরকার 'আপনি' সম্বোধনরূপী অন্তরায়টাও নিবিড় অন্তরঙ্গতার কোন্ শুভক্ষণে লোপ পেয়ে পরিণত হয় 'তুমি'তে। তখনকার দুজনের মাঝখানকার সম্বন্ধকে 'প্রেম' বললে ভুল হবে—বন্ধুত্বই আছে। তার পরিণতিকে 'প্রেম' আখ্যা দেওয়া যায়।

সমীর রোজই সকালের চায়ের পালাটা সেরে আসে উষার বাড়ীতে। তার মূলে আছে ওর সঙ্গ-লাভ। সেটুকু উভয়েই বোঝে, স্বীকার করেনা মুখ ফুটে। যদিও সমীরের আকর্ষণটাই বেশী।—সেই সঙ্গে চলে দুটো কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান। আদানের চেয়ে প্রদানের ওজনটাই বেশী হয়ে ওঠে। কথাগুলো, সবই অসংলগ্ন—প্রথম আবিসিনিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা নিয়ে দু চার কথা, তারপর রবি ঠাকুরের সদ্য-প্রকাশিত একখানি কবিতার নম্র সমালোচনা, শেষ পর্য্যন্ত হাঁসপাতালের কথাই যবনিকা ফেলে। সমীর নিজের কথার ভেতর যথাসম্ভব জানাতে চায় ওর জীবনের শূন্যতা, অসহ্য একাকীত্বের বেদনা! উষা সংক্ষেপে ওর কথার উত্তর দেয়। হয়তো কখনো দু-একটা কথা বলে—তাও তার ভেতর নিজস্বতার যথেষ্ট অভাব। সমীরের কথারই একটা লঘু রূপান্তর!

সমীর চায় না তা। স্বল্পভাষিণী উষার এই অকারণ কুণ্ঠাভাব ওকে অসহিষ্ণু করে তোলে। কেন ওর কথায় এতো সঙ্কোচ, উত্তর এতো সংক্ষিপ্ত। ও প্রার্থনা করে উষা ওর সঙ্গে অবাধ অকুণ্ঠচিত্তে মেলামেশা করে। উষাকে ও কিছুতেই ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারছে না। উষা ওর কাছে উষার মতই ঝাপসা, অর্দ্ধ বোধ্য! অথচ সে তো অসাধারণ কিছু নয়। সাধারণ চোদ্দআনা মেয়ের মত সময় বিশেষে লাজুক, নম্র, মিশুকে। তবু—কোথায় যেন একটু পার্থক্য।

সমীরের মৌন আহ্বান ও শুনতে পেয়েছে! নিশ্চয়ই পেয়েছে। কিন্তু ওর কথা-বার্ত্তা, ভাবে-ভঙ্গীতে কোনো খানেই বাচালতা প্রকাশ পায় না—ক্ষণিকের জন্যও নয়। অথচ অবিদিত এমন স্রাবও ও তার চোখে মুখে দেখতে পায় না। তবে কি উদাসীন? না, ঠিক তা-ও নয়। সে যে কেমন—তা সমীর ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম! শুধু অন্তরে অনুভব করে। এবং সেইজন্যই ওর অস্বস্তি! রাতের শেষের শুকতারার মত সে অচঞ্চল, দূরাগত বাঁশীর সুরের কম্প্রমূর্চ্ছনার মত সে মর্ম্মস্পর্শী! তেমনি মনোরম—লোভনীয়!

সমীরের সুপ্ত প্রাণে এসে লেগেছে দক্ষিণের মাতাল হাওয়া। ওর জীবন নানা

রঙে রঙীন! একটা দিন ওর কাছে মূল্যবান। গত দিনের জন্য ও নিরালায় নিঃশ্বাস ফেলে, আগত দিনকে সাদরে বরণ করে নেবার জন্য ও অধীর-ব্যাকুল! নিঃসঙ্গ এক একটা মুহূর্ত্ত ওর বুকের ওপর দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে হেঁটে চলে যায়। উষার সাহচর্য্য ওকে করেছে দিশাহারা। উষাকে সুখী করতে ও পারে না এমন দুঃসাহসিক কাজ জগতে নেই। এ সুযোগ ও ছাড়বেনা কিছুতেই। নিজেকে—ওর সমস্ত নিজত্বকে উষার প্রেমের গভীরতার মাঝে সানন্দে বিলিয়ে দেবে। ও হবে নিঃস্ব—রিক্ত! সে রিক্ততার পেছনে আছে পরিপূর্ণতার অবিমিশ্র সুখাবেশ—গভীর পরিতৃপ্তি।

ওর জীবনকে স্বার্থকতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবে। ওর বুভুক্ষু আত্মার তৃপ্ত্যার্থে উষাকে ও দেয়—কিছু নেই। উষা ওর সর্ব্বস্ব! কিন্তু—সে উষার? উষার বুকে ওর মত আকাঙ্ক্ষার তীব্র দাহন সুরু হয়েছে? ওর মত ব্যাকুলতা?—না—উষাকে ও সাধারণ মেয়ের মাপকাঠিতে মাপবে না। কুট সমালোচকের মত উষার প্রেমের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে বসবেনা! ও উষাকে ভালবাসে এইটাই ওর দিক থেকে সব চেয়ে বড়ো কথা—ওর জীবন-যৌবনের গৌরব!

উষা ওকে আঁধার থেকে টেনে এনেছে দিনের আলোকে! উষা ওর জীবনদাতা—উষা দেবী।

...চাঁদিনী রাত! বাংলোর সামনে উদার মাঠের ওপর আলোর বন্যা। সমীরের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে, স্নায়ুতে ওঠে অবিশ্রান্ত কোলাহল, শিরা-উপশিরায় আসে অসহ্য চাঞ্চল্য। এই শুভ-মুহূর্ত্তে ওর প্রাণ চায় একটী মেয়ের সঙ্গলাভ। তার কোমল-পেলব হস্তের প্রেমস্পর্শ, পাতলা ঠোঁটদুটী পার হয়ে আসা দুটো নতুন কথা।—ও পা বাড়ায় উষার বাড়ীর দিকে। আজিকার চাঁদিনী রাতকে ও বিফল হতে দেবেনা কিছুতেই—ওর যৌবন দেবতার শুভ-আশীর্ব্বাদ।

উষাকে ও বিনীতভাবে জানায় ওর হৃদয়ের অভিলাষ। উষা সর্ব্ব-সম্মতি জানায়।

সামনের উদার ময়দান চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত—সমীরের জীবনের মত!—দুজনে চলে। সমীর ধীরে ধীরে তার একখানি হাত নিজের হাতের ওপর তুলে নেয়। উষা নীরব নিথর। তার হাতখানি বরফের মত হিম, অকম্পিত—সমীর অনুভব করে। মধুকণ্ঠে ডাকে—'উষা'—সাড়া মেলে না।

আবার ডাকে 'উষারাণী'—উষা যেন শিউরে ওঠে—উত্তর দেয়—'উঁ'।

'কি ভাবচো?'—সমীর প্রশ্ন করে।

'না, কিছু না—চলো'—

চলে—কিছুদূর এগিয়ে উঁচু ঢিপির কাছে গিয়ে সমীর বলে—'এসো, এখানে একটু বসা যাক্—অনেকটা হাঁটা হয়েচে।'

উষা আপত্তি করে না।

সমীর উষার বসবার যায়গাটা পকেট থেকে রুমাল বের করে পরিষ্কার করতে যায়। উষা বাধা দেয়—'থাক—আমি নিজেই নিচ্চি'—ব'লে নিজের আঁচলটা বুলিয়ে বসে পড়ে।

সমীর ক্ষুণ্ণ হয়।

...কথায় কথায় উচ্ছ্বাসের মুখে ও জানায় নিজের একাকীত্বের অসহ্য বেদনা! তার সঙ্গে একটু ভালবাসা—ওর যৌবনোচ্ছ্বসিত পেলব ক্ষীণ দেহলতাটী তুলে নেয়—নিজের বুকের ওপর, ঠাণ্ডা ঠোঁটদুটীতে এঁকে দেয় একটী সোহাগ রেখা!—উষা-নীরব, নিথর, নিশ্চল, পাষাণ! বাধা দেয় না অথচ প্রতিদানের প্রবল স্পৃহাও ওর চোখে-মুখে ফুটে ওঠে না! সমীর ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

উষার স্বভাবে-আচারে, ভাবে-ভঙ্গীতে, কথা-বার্ত্তায়—সব কিছুতেই বেশ একটা শৃঙ্খলতা। কোনোখানে নেই উচ্ছৃঙ্খলতা—উদ্দামতা! সমীর চায় ওকে উচ্ছৃঙ্খল করতে—ওর পাওয়াকে সম্পূর্ণ করতে।

(৪)

সেদিন—সন্ধ্যার পূর্ব্বে।

উষা তখন নিজের ঘরে ছোট রাইটিং টেবিলটার সামনে চেয়ারে বসে। হাতে কলম কি যেন লিখছিলো। দরজা ভেতর থেকে ভেজানো। সবটুকু বন্ধ হয়নি। দুটো দরজার মাঝখানে স্বল্প একটু ফাঁক।

সমীর আসে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্বল্প ফাঁকটুকু দিয়ে উষার অবস্থিতি লক্ষ্য করে।—তারপর ধীরে—অতি সন্তর্পণে, যাতে উষা না জানতে পারে এমনভাবে দরজার একটা পাল্লা খুলে ঘরে ঢোকে। পা টিপে টিপে উষার পেছনে এসে দাঁড়ায়। উষা আদৌ জানতে পারে নি—সমীর থপ্‌ করে ওর চোখদুটো টিপে ধরে। উষা চমকে ওঠে—'মাগো। কী ভয়ানক লোক।'

সমীর ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে যায়, মৃদুস্বরে বলে—'কে বলোদিকি আমি?'

'বারে তুমি আবার কে হতে যাবে! তুমি তুমি-ই।'

—'আমি তোমায় ভাবি'—সমীর বলে 'আ বোলবোনা, পরেরটা তোমায় বলতে হবে।'

'বা! বেশ লোক যা-হোক! তোমা কথা তুমিই জানো, আমি তার কী বলবো।'

সমীর ওর চোখ থেকে হাত সরি নেয়, সামনে দাঁড়িয়ে বলে—'আচ্ছা—উষা তোমার মনে কোনো কথা জাগেনা—এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়?'

—'কী কথা?'

'এই আমাদের বন্ধুত্বটা আরো নিবিড় ভাবে বাঁধতে,'—

—উষা নিরুত্তর, নিরুদ্বেগ!

সমীর উচ্ছ্বাসের গতি রোধ না করে বলে চলে—অবশ্য তখন আমাদের দুজনকার মাঝখানের সম্বন্ধটা ঠিক বন্ধুত্ব থাকবে না। একটু ঘোরালো হয়ে উঠবে সাধারণে তার নাম দেবে—'বিবাহ' আর আমাদের দুজনের দুটো নতুন পরিচয় হবে—একজন হবে স্বামী আর একজন স্ত্রী!—দুজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অদম্য উৎসাহে গড়ে উঠবে একটা ছোট্ট সংসার! তুমি থাকবে ঘরের কাজে ব্যস্ত, আর আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকবো তোমার কর্ম্ম-শ্রান্ত মুখখানির দিকে। কখনো বা তোমার কাজের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে বসবো। আর অভিমানে তোমার ঠোঁটদুটো ফুলে উঠবে, মুখখানিতে নেমে আসবে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। হাতের কাজ ফেলে রেগে বিছানায় গিয়ে উপুর হয়ে শুয়ে পড়বে। আমি চাইব মাপ—কত কাকুতি, মিনতি, কান মলা, নাকেখৎ! তোমার ফুলে ওঠা ঠোঁটদুটো বসিয়ে দেবো নিজের ঠোঁটের চাপে। তারপর—তারপর পরস্পরের আশ্রয়ে আমাদের ছোট্ট সংসারে পড়বে একটা নবীন অতিথির শুভ-পদার্পণ! তার ফুলের পাপড়ির মত পাতলা তুলতুলে ঠোঁটদুটোতে থাকবে মধুভরা। ছোটদুটো স্নেহ-ব্যাকুল বাহু সময় অসময়ে চাইবে আমাদের জড়িয়ে ধরতে। তাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে নিত্য নতুন আব্দার, মান-অভিমান। তার নামকরণ নিয়ে ছোট-খাটো তর্ক-যুদ্ধের পালা!

আমাদের দুজনের পরিচয় আবার তখন যাবে পাল্‌টে—আমার হবে—পিতা আর তোমার—মাতা! কী সুন্দর!

উষা নীরব, নিস্পৃহ! সমীর অধীর-ব্যাকুল হয়ে ওঠে।—

'উষা—উষা, আমার কথায় সাড়া দাও'—ওর হাতদুটো নিজের হাতে সাবেগে তুলে নিয়ে কাতরকণ্ঠে বলে—"আমায় নিরাশ কোরো না—চুপটী করে রইলে যে? কথা কও—কথা কও!"

'কী বলবো?' উষার স্বরে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে অসহায়তা!

'বলো, আমিও তাই চাই। তুমি আমি অভিন্ন!'

উষা নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সমীরের চঞ্চল চোখদুটোর পানে। উন্মাদনা নেই, অস্থিরতা নেই; সাধারণ, অতি সাধারণ! শুধু আয়ত চোখদুটোর কোলে চিক্ চিক্ করছে—একটী শীর্ণ জলধারা, পুরন্ত ঠোঁটদুটো ঈষৎ কম্পমান! সে দৃষ্টি সমীরের বুকটা ব্যথিয়ে তোলে।—পরক্ষণেই মনে হয়, তবে কি উষার নীরব নিবেদন! হ্যাঁ, তাই-ঠিক তাই। সোহাগ করে ওর চিবুকটী নেড়ে দিয়ে বলে—'জানি গো রানি, তুমিও ঐ চাও। সব মেয়েরা চায়—শাশ্বত পিপাসা! মেয়েদের রক্তে জাগে সন্তান সৃষ্টির দুর্জ্জয় নেশা! তোমাদের রক্তের কাণায় কাণায় জীবসৃষ্টির উন্মাদনা!

একটু থেমে বলে—তুমি আমায় কতো ভালোবাসো, মুখফুটে না বললেও, তোমার ঐ চোখদুটোর মৌনভাষা পড়তে পারি। আমি জানি তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো—খু-উ-ব।

—'আচ্ছা, এখন আসি, কেমন? আবার সন্ধ্যের পর আসবো—রাগ করলে নাকি?'

না—উষা মাথা নাড়িয়ে জানায়।

সমীর সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

উষা তেমনি ভাবে বসে—সমাগত সন্ধ্যার পানে চেয়ে থাকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।—

ঐ ম্লান-ধূসর সন্ধ্যা। সে যেন ওর সই—ওর জীবনের প্রতিচ্ছবি।...ও বসে থাকে।

সন্ধ্যার কালো আঁচলে সারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন। হালকা মেঘের ফাঁক দিয়ে একটী তারা ফুটে ওঠে। উষা চমকে ওঠে—মনে পড়ে একখানি মুখ। ঠিক ঐ তারাটীর মত সমুজ্জ্বল, নিষ্কলুষ, একক। সে ওর বত্রিশ নাড়ি ছিন্ন করা নারী-জীবনের সার্থকতার চরম মূর্ত্তিমতী প্রমাণ! ভুল ওর জীবনে, ওর স্নায়ুতে। শিউরে ওঠে উষা। প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়ায়। তারপর অলস পাদুটো টেনে নিয়ে টলতে টলতে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে।

সমীর আসে।—সোজা ও উষার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। সমস্ত ঘরখানি

নিস্তব্ধ অন্ধকার। একটু করে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের কপাট পর্য্যন্ত। সমীর সহজস্বরে ডাকে—উষা-উষা।'

মেলে না সাড়া। ভাবে তবে কি উষা ঘুমিয়ে পড়েছে? কিংবা—

ঘরে ঢুকে হাতড়াতে হাতড়াতে দেওয়া-লের সুইচটা টিপে দেয়। সারা ঘরটা দিন হয়ে ওঠে। কই উষা নেই তো! তবে কি পাশের ঘরে সে? অসম্ভব নয়। সতর্ক-দৃষ্টিতে পাশের ঘরের পানে চেয়ে দেখে। না নেই। ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকে—'উষা-উষা।—মেলেনা উত্তর, ঘরের কঠিন দেওয়ালগুলো পুনরাবৃত্তি করে ওঠে। সমীরের বুকটা ধড়াস করে কেঁপে ওঠে। ছুটে বাইরে রোয়াকে এসে দাঁড়ায়। চারিদিকে—যতদূর চোখ যায় নিবিড় দৃষ্টিতে দেখে—উষা—তার উষা? কোথাও নেই। আবার ঘরে এসে ঢোকে। উদভ্রান্তের মত তাকায় চারিপাশে, টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়।—টেবিলের ওপর ঐ কাগজটা। কি যেন ওতে লেখা—অস্পষ্ট চোখে পড়ে। চকিতে হাতে তুলে নেয় কাগজখানা। একি। উষা লিখছে?—কা'কে?

'বন্ধু,

চললুম আমি। কোথায়? জানিনা, জীবিকার খোঁজে। নিজের জন্যে নয়, একটী ছেলের। সে আমার বড় আপন জন—পেটের ছেলে—স্বামীর দান। তুমি নিশ্চয় আশ্চর্য্য হবে। আমার স্বামী? পরলোকে। তার জন্যে আমার কোনো দুঃখু হয় না। সে বেশ গেছে—বেঁচেছে। মরণের পথে তিল তিল করে এগিয়ে, শেষে একদিন সত্যিই সে মৃত্যুকে আঁকড়ে ধরতে পেরেছিলো। —ভালোবাসা পেয়েছিলুম কি—না? না তা পাইনি। ঐ জিনিষটা জগতে বড়ো দুর্লভ, সবার কাছে পাওয়া যায়না। তবে যা পেয়েছি, তার জন্যে আমি তার কাছে কৃতার্থ। সে আমার নারীজীবনকে স্বার্থকতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছে—মাতৃত্ব গৌরবে গৌরবান্বিত করে। বন্ধু, আমার জন্যে চোখের জল ফেলোনা। সে ফেলা মিথ্যে হবে। আর একান্ত প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে—আমার সাহচর্য্য যেন তোমার বুকে দাগ ফেলতে না পারে। বিদায়—বন্ধু, বিদায়।

ইতি

উষা।

সমীরের মাথার ওপর যেন ঘরের ছাদখানা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো—পায়ের তলায় পৃথিবীটা দুলে উঠলো। ওর মুখ থেকে একটা অস্ফুটস্বর বেরিয়ে এলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো না, নিস্পন্দের মত বসে রইলো চেয়ারের হাতল-দুটো প্রানপণ শক্তিতে চেপে ধরে। চোখের পলক পড়ে না, মুখে কথা সরে না, —একটা উত্তপ্ত নিঃশ্বাসও নয়।

হরিষে-বিষাদ

শ্রীবরেন্দ্র নাথ বসু

এ কি কম আপেক্ষের কথা। সাহিত্যিক-নামটা বেশ সুপ্রচলিত—অথচ আজ পর্য্যন্ত একটা অভিনন্দন পত্র পেলুম না। কত আশা ছিল—কিন্তু সবই বিফলে গেল। ধারণা ছিল সাহিত্যিক-সুনামটা বাজারে একটু চলন হয়ে গেলেই—ভুরিভুরি অভিনন্দন পত্র আসতে সুরু হবে—নিজে দেখে উঠবার সুবিধে হবে না। তখন একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করতে হবে—যদিও প্রাইভেট সেক্রেটারীকে উপদেশ দেওয়া থাকবে যে, তরুণী মহলের চিঠি গুলো যেন সোজা আমার কাছে আসে। কিন্তু আজ সে সমস্তই আকাশ কুসুম।

মনের গোপন কোণে আরও একটা আশা ছিল—যদিও সেটা নিতান্ত গূঢ় কথা—তবুও ব্যর্থতার মন-যন্ত্রণার ভারে আর কোন কথা গোপন করতে ইচ্ছে করছে না। আশা ছিল যে, দু-একটি তরুণীও আমার ভাগ্য-গগনে উদয় হবেন—এক একটি মেঘলা দিনে মেঘের ফাঁকে অপ্রত্যাশিত তারার মত। একান্তে বলে রাখি, আমার এ ধারণাটা সাহিত্যিকদের কাছ থেকে পাওয়া। অনেক গল্প পড়েছি—তাতে দেখেছি তরুণীরাও সাহিত্যিককে অভিনন্দন জানাতে আসেন—আর সেই আন্তরিক অভিনন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের হৃদয়-প্রসূত শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য সাহিত্যিকের পায়ে উজাড় করে দিয়ে যান।

এই আশাপথ চেয়ে আজ অনেক দিন বসে আছি—কিন্তু আশা আর সুফল হল না। এক এক সময়ে মনে হয়—আজকালকার তরুণীরা কি সাহিত্য চর্চ্চা ছেড়ে দিয়েছেন—তা' না হলে আমার লেখা কি তাঁদের প্রাণে ভক্তির, বিস্ময়ের সঞ্চার করে না। যদি নিজে আসতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেন—অন্ততঃ শ্রীহস্তের গোল গোল অক্ষরে পরিপাটি করে সাজান একখানা চিঠি দিতে তাঁদের কি এমন বাধা থাকতে পারে। আবার ভাবি—নাঃ এই প্রগতির যুগেও উঁই ধরেছে—তরুণীরা কালের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে নিতান্ত পেছিয়ে পড়েছেন—তা না হলে সাহিত্যিককে অভিনন্দন জানাবার মত সৎসাহস তাঁদের নেই।

এ কালের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রকারান্তরে বলেছেন—মেয়েরা সবলকে ভক্তি করে আর দুর্ব্বলকে ভালবাসে তাঁর মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণের এই সত্যের ওপর অনেকটা ভরসা রাখতুম। শুনেছি নারী-চরিত্রের মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁর দ্বারা প্রমাণিত সত্যের ওপর আস্থা স্থাপন করে আমার ঘরটিকে সাজিয়েছিলুম—অর্থাৎ ঘরটাকে অগোছাল করে রাখবার যত রকম আবিষ্কৃত এবং আমা দ্বারা উদ্ভাবিত পন্থা, কোনটাকেই অবহেলা করিনি। মোটের ওপর ঘরটাকে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড় করিয়েছি অপ্রয়োজনের অমরাবতী।

যদিও এরকম করার মধ্যে নিগূঢ় একটা উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—উদ্দেশ্য ছিল, কোন তরুণী যদি আমার ঘরে এসে আমার উদাসীন চরিত্রের পরিচয় পান—হয়তো আমার এই দুর্ব্বলতা দেখে—তাঁদের মনে যে ভাবের উদয় হওয়া উচিত—সেই ভাবে প্রণোদিত হয়ে—আমার বিশৃঙ্খল জীবনটাকেও হয়তো গুছিয়ে তুলবার ভারটাও নিতে পারেন।

কিন্তু আজ এই পাঁচ ছ বছরের সাধনায় কোন সুফলের আশা না দেখে—নিজের ওপর নিজে বিরক্ত হয়ে অভিনয়ের জাল গুটাতে সুরু করলুম। কিন্তু ঘরের আমূল সংস্কার আমার একা দ্বারা অসম্ভব দেখে মেসের চাকরটিকে কিছু বক্‌শিশের লোভ দেখিয়ে কাজে নেমে পড়লুম।

ঘরটার সমস্ত জঞ্জাল যখন টেনে এনে দরজার গোড়ায় জমা করলুম—দেখলুম অন্ততঃ একটা ঝুড়ির প্রয়োজন—চাকরটা ছুটল নীচে—একটা ঝুড়ির সন্ধানে—আমি তখন টেবিলটা সাজাতে ব্যস্ত। এমন সময় দরজার সামনে চটির আওয়াজ। চমকে উঠলুম—মুখটা ফিরিয়ে দেখতে সাহস হ'ল না। আজ আমার ঘরের সাজান বিশৃঙ্খলাকে নিজ হাতে একে একে শৃঙ্খলিত করলুম বলেই কি অপ্রত্যাশিতের আগমন। চটির আওয়াজ শুনেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল—কিছুই যেন শুনতে পায়নি—এমনি ভাণ করে টেবিলই সাজাতে লাগলুম—টেবিল একবার সাজান হয়ে গেল—তবুও সেগুলোকে নিয়ে আর একবার নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। মনে মনে আশা—আজ যে অপ্রত্যাশিতের মত এসেছে—সে চলে যাক্।

এমন সময় চাকরটা ঝুড়ি হাতে করে এসে হাজির—তারপর শুনলুম—"অরবিন্দ-বাবু কি এই ঘরে থাকেন।" কিন্তু এ কি হ'ল। কোথায় মনের সমস্ত সুপ্ত

তন্ত্রিগুলোতে জাগরণের সাড়া দেবার সেই ঝঙ্কার—কোথায় সেই সুদূরের আহ্বান। তবে কে এসে হাজির হ'ল—পাওনাদারতো আমার নেই।—চাকরটা বললে' "হ্যাঁ, বাবু এই ঘরের মধ্যেই আছেন—আপনি আসুন।" তারপর স্তম্ভিত হয়ে দেখলুম একটি কদাকার যুবক এসে ঘরে ঢুকল—সোজা আমার সামনে এসে নমস্কার করে বললেন, "আপনার নাম কি অরবিন্দবাবু"। আমি তখনও বিস্ময়ে বাহ্যজ্ঞান রহিত—আমার "না" কি "হ্যাঁ" বলবার মত অবস্থা ছিল না। একবার মনে হ'ল স্বপ্ন দেখছি না তো। আবার মনে হ'ল স্বপ্ন দেখলে কি আর এই কদাকার লোকটাকে দেখতুম—দেখতুম আমার মানসী তরুণী ঈষৎ লজ্জায় রাঙিয়ে উঠে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন—সারা অঙ্গ দিয়ে লাবণ্যের ঝরণা বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর চটির আওয়াজে আমার সমস্ত মন সমস্ত ইন্দ্রিয় যে একে তরুণী বলে মেনে নিয়েছে—আর সেই জায়গায় এসে দাঁড়াল এই কুৎসিত বাস্তব লোকটি।

যুবকটি বোধ হয় আমার ওই রকম হতবাক অবস্থা দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল—বললে, "আমি এসে কি কিছু অন্যায় করেছি।" কিন্তু ততক্ষণ আমি প্রকৃতিস্থ হয়েছি—বললুম, "না না কিছু-মাত্র না—আপনি বসুন।" তারপর আমি বাইরে গিয়ে বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে এসে বললাম, "আপনার প্রয়োজন।" আমার প্রশ্ন শুনেই যুবকটি একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল—আমতা আমতা করে বললে, "একটু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম—তবে আপনার যদি কোন অসুবিধে হয়—তাহলে আমি আর আপনাকে বিরক্ত করব না।" আমি বললাম, "না—না—আমার কোন অসুবিধে হবে না—আপনি বসুন—গল্পগুজব করা যাক্—আজকে কাজ করবার মত মনের অবস্থা নেই—তবুও আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে করতে বেশ সময়টা কেটে যাবে"—তারপর চাকরটাকে উদ্দেশ করে বললুম, "ওরে যদু দুকাপ চা এনে দে তো।" তারপর যুবকটির দিকে আর একবার চাইলুম—দেখলুম যতটা কুশ্রী বলে প্রথমটা মনে হয়েছিল—ঠিক ততটা কুশ্রী নয়—তবে বেশভূষার মধ্যে বাহুল্য না থাকলেও বেশ একটা আভিজাত্যের গন্ধ আছে। মনে হ'ল বেশ পয়সা আছে—হয়তো সাহিত্য-চর্চ্চার সখ হয়েছে—তা বলে আমাকে গল্প লেখা শেখাবার মাষ্টার রাখবে নাকি। বলা যায় না, গান শেখে মাষ্টার রেখে—আর্ট শেখে মাষ্টার রেখে—হয়তো গল্প লেখার মাষ্টার রেখে শেখার প্রচলন এবার হবে।

তারপর একে একে শুনলুম তিনি মস্ত জমীদারের একমাত্র পুত্র—পড়েন স্কটিশচার্চ্চ কলেজে—থার্ড ইয়ার আর্টসে। সাহিত্যের দিকে একটু ঝোঁক আছে—তবে তিনি লেখেন না—পড়েই সাহিত্য পিপাসা নিবারণ করেন। তবে গল্প লেখা শেখবার মাষ্টার রাখবার জন্যে আসেন নি—এসেচেন অন্য একটা বিশেষ কাজে—কিন্তু বলতে বিশেষ লজ্জা বোধ করছেন। কিন্তু আমি কোন আঁচই করতে পারলুম না তাঁর উদ্দেশ্যটা কি। আমার প্রশস্তি এতক্ষণ তাঁর মুখ থেকে আকণ্ঠ পান করলুম—কিন্তু তা' ছাড়াও একটা উদ্দেশ্য আছে—সেটা ব্যক্ত করতে উদ্যত হলেই—তাঁর কানদুটো লাল হয়ে ওঠে—চোখটা আমার চোখ থেকে নামিয়ে নেন।

আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে একটু বিরক্ত হয়ে বললুম, "আমার কাছে আপনার কি এমন কথা বলবার আছে যা বলতে অত লজ্জা পাচ্ছেন।"

আমার স্বরে বিরক্তির আভাষ পেয়ে যুবকটি বলতে লাগল—কতকটা মরিয়া হয়ে, "দেখুন, যখন বলতেই হবে তখন আর লজ্জা করব না—কিন্তু আমার একটা অনুরোধ—আমি যতক্ষণ বলে যাব—আমায় কোন প্রশ্ন করবেন না—একবার বাধা পেলে আর বলতে পারব না—তবে শুনুন"—বলে যুবকটি চোখদুটো নীচু করে—হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলতে লাগল—"আমাদের কলেজে একটি মেয়ে পড়ে—তার নাম শোভনা সেন—পড়ে ফার্ষ্ট ইয়ারে। থাকে আমাদের বাড়ীর খান চারেক পরের বাড়ীতে। সেই মেয়েটিকে আমি একটু ইয়ে করি—অর্থাৎ তাকে আমার বেশ লাগে—তাকে দেখতে আমার বড় ভাল লাগে—তার সঙ্গে আলাপ করবার আমার ভয়ানক ইচ্ছে। কিন্তু তার সঙ্গে পরিচিত হবার কোন সুযোগ পাচ্ছি না। আমি তাকে যে খুব লক্ষ করি—আমার মনে হয় এটা সে বেশ বুঝতে পারে—কিন্তু আমার দিকে একবার ফিরেও চায় না। হয়তো আমার এই কুৎসিত চেহারাটা দেখে আমায় ঘৃণা করে। কিন্তু মানুষের বাইরেটাই কি সব—তার বাইরে সে যদিও
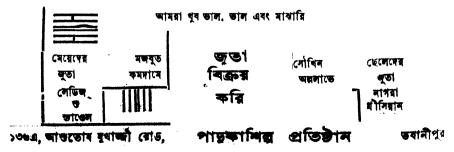
অসুন্দর—কিন্তু ভেতরে যদি সুন্দর হয়—তাহলেও কি তাকে ঘৃণা করতে হবে? কিন্তু আমি যে আমার মনের কথা তাকে জানাতে পারছি না—তাই আপনার কাছে এসেছি—আপনি আমায় একটু সাহায্য করুন—তার জন্যে আপনাকে আমি সন্তুষ্ট করব। আপনি আমাকে আর তাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবেন—আমার নামটা ঠিক রাখবেন—তার নামটা একটু বদলে দেবেন। কিন্তু আর সমস্ত ঠিক রাখবেন। হ্যাঁ—আপনাকে আর একদিনের ঘটনা বলি—এটাও গল্পের মধ্যে চালিয়ে দেবেন—তাহলে সে আরও ভাল করে বুঝতে পারবে। এই দিন তিনেক আগেকার কথা—আমি যাচ্ছিলুম ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে—শোভনা তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল—আমি তার দিকে চেয়ে হাঁটছিলুম। ওই রকম করে ওপর দিকে চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্যাস পোষ্টে ধাক্কা খাই। আর সে অমনি খিল্ খিল্ করে হেসে ঘরের মধ্যে চলে গেল। দেখুন সে আমায় বুঝল না—এটাকে একটা মজার ব্যাপার বলে মনে করলে। আর আপনাকে কি বলব—তবে আমার কথাটা বেশ ফুটিয়ে তুলবেন—আমার মনের কথাটা যেন সে বেশ বুঝতে পারে—তাহলেই আমি প্রতিদান পাব।"

বুঝলুম এতদিন পরে ঠিক অভিনন্দন পেয়েছি—আমার সাহিত্যিক প্রতিভা আজ প্রকৃতই ধন্য হয়েছে। কি বলব ঠিক বুঝতে না পেরে বললুম, "আপনিতো পয়সাওয়ালা লোক—তায় আবার শিক্ষিত—ঘটক দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠান—আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হতে পারে।"

যুবকটি একটু ব্যথিত হয়ে বললে "বিয়ে হয়তো তার সঙ্গে আমার হতে পারে—কিন্তু তাকে তো সম্পূর্ণ নিজের করে পাবনা—তার ওপর কড়া শাসনের একটা চাপ চাপিয়ে হয়তো পাব তার দেহটা—কিন্তু তার মনটা তো পাব না। না-না তাকে আমি ও ভাবে নির্য্যাতিত করতে পারব না। কিন্তু স্থির বিশ্বাস—আপনার মত একজন সাহিত্যিকের কলম থেকে আমার মনের কথা যদি সে জানতে পারে—তাহলে সে আমায় ভালবাসবেই বাসবে। আপনি এর জন্যে যত টাকা চাইবেন, আমি দিব। আপনার হাত ধরে বলছি আমাকে এটুকু সাহায্য করুন"—বলে সে আবেগের সঙ্গে আমার হাত দুটো চেপে ধরল। আমি হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বললুম, "আহা আপনি কি ছেলে মানুসি করছেন—ছাড়ুন—আমি একটু ভেবে দেখি—আজকে আমি কোন জবাব দিতে পারব না—আপনি বরং দুদিন পরে আসবেন—সেদিন আপনাকে পাকা কথা দেব"—

যুবকটি চলে গেল। আমি বন্ধুকে ডেকে বললুম, "ওই যে বাবুটি এসেছিল—ওকে বেশ করে চিনে রেখেছিস তো—আচ্ছা এরপর যেদিন আসবে—আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবি—আমি দেশে গেছি—ফিরতে মাস দুয়েক দেরী হবে।" বন্ধু চলে যাচ্ছিল—তাকে আবার ডেকে বললুম, এক কাপ চা এনে দিতে। ব্যর্থতার বুকজোড়া হাহাকার তাতে যদি একটু চাপা পড়ে।

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

পিকফোর্ড-ল্যাস্কি

পিকফোর্ড-ল্যাস্কি প্রোডাকশান বোধ হয় বন্ধ হোল। 'ওয়ান রেনি আফটারনুন' আর 'দি গে ডেসপেরাডো' ছবি তোলা হয়ে গেলেই হয়ত লোকে আর পিকফোর্ড-ল্যাস্কি প্রোডাকশানএর নাম শুনতে পাবে না। 'দি গে ডেসপ্যারাডো'র নাম ইংল্যাণ্ডে অন্য নাম নিতে পারে। এ কথা যাক!

মেরী পিকফোর্ড আর জেসি ল্যাস্কি দুজনেই যে ওদের প্রোডাকশানের মাথা এ কথা আমরা অনেকদিন ধরেই শুনে আসছি। এইবার ওদের ভাবের ঘরে ভাঙ্গন ধরেছে। ওদের আর মনের মিল হচ্ছেনা।

সেদিন হলিউডের সবাইকে চমকে দিয়েছে। মেরী নাকি একেবারেই ঠিক করে ফেলেছে যে ও আর এ দলে থাকবে না। ছবি তোলা ওর বন্ধ হোল। ছবি তৈরী করবার ইচ্ছে এবং ক্ষমতা মেরীর অনেকদিন থেকেই আছে কাজেই মেরী আর ল্যাস্কির চুক্তি আর বেশী দিন থাকবে না শুনে আমি সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি।

ল্যাস্কি আর মেরী

জেসি ল্যাস্কি ছবির রাজ্যে অনেক দিনের লোক। ছায়াছবিতে আসা ওর সেই পুরানো যুগে। প্যারামাউণ্টের যেদিন গোড়ার ভিত্তি জমে সেদিন থেকে ও ছিল প্যারামাউণ্টে। এক কথায় ল্যাস্কিও একজন প্যারামাউণ্টের স্থাপন-কর্ত্তা।

আর মেরী! মেরী ছিল সারা দুনিয়ার ছায়ারসপিপাসুর প্রিয়তমা। ছায়াজগতের পাটরাণী।

দুজনের কেউ কারো কাছে ছোট হবে না। কারোর নিজের মত বা আদেশ টেকবে না এ পিকফোর্ড বা ল্যাস্কির কেউই সহ্য করতে পারেনা, পারবে না।

কাজেই ওদের দুজনের মতানৈক্য হয়ত সত্যি। হয়ত তাই এই বৈষম্য, খবরটাও সত্যি।

আর এক গুজব

আর একটা কথা শোনা যাচ্ছে মেরী নাকি ইউনাইটেড আর্টিষ্ট ষ্টুডিওর প্রেসিডেন্ট হবে। জানেন তো মেরী হচ্ছে ইউনাইটেড আর্টিষ্টের একজন বড় অংশীদার।

মেরী হচ্ছে একজন দক্ষ স্ত্রীলোক। স্বাধীনভাবে ছবি প্রযোজনা করতে পেলে ভাল ছবিই জনসাধারণকে উপহার দেবে। মেরীর মত প্রবর্দ্ধক যার মনে আছে আলোর আয়নার উজ্জ্বলতা, মার্বেল মেজের মসৃণতা তার যুগ্ম-প্রযোজক হওয়া পোষায় না—ভালও লাগে না; অপরের বাধা দেওয়া ও সহ্য করতে পারেনা। সফলতার পথে এগিয়ে যেতে অপরের পদক্ষেপ দেখতে পারেনা। ডাইরেক্টার, ষ্টাফ আসবে আর যাবে ওর হাতের সইয়ের ওপরে। অপরের খুচরো উপদেশ ভালবেসে ওর ভ্যানিটি-বক্সে তুলে রাখে। অপরের অন্যায় আদেশ হাই হিল জুতোর তলায় গুড়িয়ে মারে।

চার্লির শরণাগতা

পলেট গডার্ড সোণার বাটী নিয়ে জন্মায় নি। আলালের ঘরে দুলালী নয়। চার্লি ই করেছে ওকে মহিমাময়ী। ভাণ্ডারে ভরেছে সোণার বাসন। সিন্দুকে তুলেছে রত্ন আর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। এই পলেট গডার্ডএর অভিনয় দেখেছ? অদ্ভুত! অদ্ভুত! অপরূপ! জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যাবতারের প্রতিভা থেকে জন্ম নিয়েছে পলেটের এই ছায়ারূপ।

পলেট গডার্ড

দেখো ওর অভিনয়। তোমরা চোখের সামনে যে কোন বড় অভিনেত্রীর, পাশে বসাবেই। আমি ওকে কোহিনুরের মালা পরালাম। আমার ভাষা কুলোচ্ছেনা।

যে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে কত হাজার হাজার মেয়ে রাজানুগ্রহ পাবার জন্তে দাঁড়িয়েছিল, সেই প্লাটিনামের ফটক খুলল পলেটের সামনে। অন্ধকার রাত্রি কেটে সোণার ঊষা দেখা দিল। কত ক্ষুদ্র প্রতিভা অতলে তলাল। জয়মাল্য পড়ল পলেটের গলায়।

চার্লির আবার ছবি

চার্লি বলে; ও আবার ছবি তৈরী করবে। আবার সঙ্গে নামবে প্রিয়তমা পলেট। থাকবে ওরই সুর, ওরই পরিচালনা। আর বেশী দেরী নেই অল্প কিছুকাল পরেই। চার বছর ধরে আর অপেক্ষা করতে হবে না।

আরো বলেছে; পলেট নাবেকে অন্য ষ্টুডিওতে অন্য ছবিতে যেখানে সে থাকবে না। পলেটকে ধার দেবে। পলেটের প্রতিভাকে প্রণাম করে বারা পার্ট দেবে শুধু তাদেরই। পলেটের পরের ছবি হবে টকি। চার্লির অন্যান্য ছবির মত এখানা বাক্‌হীন হবে না।

চার্লিও বলে, পলেটও বলে, তারা বিয়ে করেনি। ওয়ালটার উইনচেলএর মত নাম-করা লেখক লিখেছেন কিন্তু, পলেট নিজে মুখে তাঁর কাছে বলেছে, চার্লি আর তার বিবাহ হয়ে গেছে এবং সে বিবাহ হয়েছে ১৯৩৪ সালে।

স্ত্রীলোকের বয়স

কে ফ্রান্সিস জানিয়েছে যে লস এঞ্জেলস-এর কাগজওয়ালা ভুল করেছে। বয়স ওর ঠিক না জেনে এক মারাত্মক ভুল করেছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস মোটেই জন্মায় নি। ফ্রান্সিস বলে—দুঃখের জগতে আমি এসেছি অল্পদিন, ১৯০৫ সালে। আমি বলছি, ছ-ছটা বৎসর বাড়িয়ে ওকে ক্ষতি গ্রস্ত করা হয়েছে। ওদের মত মেয়েদের বয়স বাড়ে না এটা তোমার জানা উচিৎ ছিল।

'এঞ্জেল অব মার্সি' ছবিখানি অনেক দিনের। ওই ছবিতেই ফ্রান্সিস নাম করে। ফ্রান্সিসের আসল নাম অন্য। তাই দিন কতক আগে ওই নকল নামটার জন্তে ফ্রান্সিস রেজেষ্ট্রী করেছে।

জন্মের পর কে ফ্রান্সিসএর নাম হয় ক্যাথারিণ গিবস্। তারপর ছবির নাম। ওতেই ফ্রান্সিস পরিচিত। তিন স্বামী ছিল ওর। প্রথম জে ডুইট ফ্রান্সিস, উইলিয়াম গ্যাসটন দ্বিতীয়,- তৃতীয় লিউ ম্যাক্সিনার। লিউ ম্যাক্সিনারকে আরো লোকে চেনে কেনেথ ম্যাক্‌কেনা বলে। কেনেথ হচ্ছে অভিনেতা, পরিচালক।

শেষ কথা তিন স্বামী ফ্রান্সিসের পরিত্যক্ত হয়েছে। ওর রূপ আছে ওর যৌবন আছে বয়স আরো কমুক আর কমুক।

মির্ণার মিলন।

মদনের শর তূণ হতে যেমন ছোটে তেমনি ছুটছে আজও হলিউডে। এ অব্যর্থ

শরের লক্ষ্য ঠিক আছে; ভয়ও আছে। কে জানে কে কবে এই বেঁধা শর তুলতে কোর্টে ছুটবে। হলিউডের ডাইভোর্সের মামলা তো কথায় কথায়। মদন বুঝি হার মেনেছে।

সে যাক! এখন নতুন মিলনের মানুষগুলোকে চিনুন।—:

মির্ণা লয় গৌরবান্বিতা, সমুজ্জলা, মায়াময়ী। সোনার স্বপন ওর চোখে। বিয়ে করেছে আরথার হর্ণব্লেকে। হর্ণব্লো হচ্ছেন এখন প্যারামাউন্ট' ষ্টুডিওর এক্সি-কিউটিভ। এবং অনেক বছর ধরে স্যামুয়েল গোল্ডুইনের সঙ্গে কাজ করছেন। কাজেই পাকা লোক, কাজে এবং বিয়ের ব্যাপারেও। হর্ণব্লোর বিয়ের অভিজ্ঞতা অনেক দিনের, মির্ণার কিন্তু একদিনেরও নয়।

হেন্‌রি আর একজন

পুরুষের প্রভায়, দীপ্ত চেহারায় গরীয়ান হচ্ছে হেন্‌রি উইলককসন। নাম করেছে 'ক্লিওপেট্রা' ছবিতে। তার চেয়েও নাম পেয়েছে "দি ক্রুসেড্" ছবিতে। ইংল্যাণ্ডের ছেলে ও, প্রেমে পড়েছে আমেরিকার মেয়ে শীলা ব্রাউনিংএর সঙ্গে। বিয়েও হোল।

শীলার যৌবনে জয়ের বাসনা অত্যন্ত প্রবল। তাই চুম্বকের আকর্ষণ নিয়ে বাসা বাঁধল হেন্‌রির প্রশস্ত বুকে।

কোরিন আর জর্জ্জ।

কোরিন গ্রিফিথ বিয়ে করেছে অনেকবার। প্রথম বিয়ের ঘণ্টাও বেজেছে অনেক দিন আগে। এখন বিয়েতে ওর নতুন কিছু মজা নেই, তবে লাভ আছে।

জর্জ্জ মার্শালএর সঙ্গে সেদিন ওর-নিউইয়র্কে বিয়ে হয়েছে। মার্শাল—ধনীলোক—ক্রোড়পতি। ধোপার ব্যবসায়ে নামে এবং অর্থে হয়েছে বড় লোক।

নতুন কনে

হলিউডের খুব বিশ্বাস যে জন-ব্লনডেল এরপর কার কনে হবে তা ঠিক করে ফেলেছে। ব্লনডেল বিচ্ছেদ মামলা রুজু করেছিল; কয়েকদিন আগে জর্জ্জ বার্ণেসএর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার রায় জন ব্লনডেল পেয়েছে। আর অল্পদিন পরেই ডিক পাওয়েলএর সঙ্গে ওর মিলনের ঘণ্টা বাজবে এ আমি বলে দিচ্ছি।

ডিক হচ্ছে অবিবাহিত। স্ত্রীকে নিয়ে থাকবার মত জায়গা ওর বাড়ীতে নেই। তাই ডিক বাড়ী বদলাচ্ছে শুনেছি। আসছে বড় বাড়ীতে। যেঁখানে থাকবে ও, জন ব্লনডেল, আরো—আগামী কালের নবাগত জনেরা।

খুঁচরো খবর—

১। চার বছর আগে জুয়ানিটা কুইগ্‌লে ট্যাপ ড্যান্স করে এলিনর পাওয়েলের সঙ্গে। 'বর্ণ টু ডান্স' ছবিতে অভিনয় করা নিয়ে হবে ওর ন'বার ছবিতে নামা।

* * *

২। 'যদি রোড টু নোহোয়্যার' ছবিতে নামবে জ্যাক হোল্ট। ছবিখানা কলোম্বিয়ার।

* * *

৩। কলোম্বিয়ার ছবি 'কন্টিনেন্টাল'এ নামবে ডলরেস দেল রিও।

* * *

৪। 'এ ফুল ফর ব্লনডস' ছবিতে নামবে ভিক্টর ম্যাকল্যাগলেন আর উইলিয়াম হল। যিনি বার্ণস্ হবে হিরোয়িন।

প্রেম পূজারী

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী

শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা। কলিকাতার একটী বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ জন সাধারনের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত সম্মুখে বড় বড় হরপে লেখা "প্রেমপূজারী"। কতলোকের সেপথে চলাফেরা। কেহবা টিকিট ক্রয়ে ব্যস্ত। কেহবা গানের মোহে বাহিরে কান পাতিয়া "রাগ রাগিনী" নির্ব্বিকার চিত্তে হজম করিতে লাগিল। বসন্তও সেপ্পথে চলিল "প্রেম পূজারী" কথাটি বিদ্যুতের মতো তাহার চোখের উপর চমক দিয়া উঠিল। প্রত্যেক তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে এর অননুভূত স্পন্দন দেখা দিল। অতৃপ্ত প্রেমের অতীত স্মৃতি তাহার হৃদয় কবাটে আঘাত করিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট কিনিয়া সে গৃহোভ্যন্তরে হাজির হইল। আর একান্ত মনে ইতঃস্তত রঙ-বেরঙের কারুকার্য্যে চোখ বুলাইতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কল কল্লোলে প্রেক্ষাগৃহ প্রানবন্ত হইয়া উঠিল। সম্মুখের সিটে একজোড়া কিশোর কিশোরী মনের আনন্দে কৌতুক রঙে মত্ত দেখিয়া বসন্তের মনটা অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনিমেশ লোচনে তাহাদের দিকে চাহিয়া ভাবিল—আজ যদি "ছায়া" থাক্‌তো!

পরক্ষনেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে মনে মনে কহিল, এই ছন্নছাড়া জীবনের অতীতকে টেনে এনে ভবিষ্যৎটাকে অন্ধকার করি কেন? এই অন্ধকারময় হৃদে ক্ষীণ আশার আলো জ্বালিয়ে লাভ কি?—এতে যে অন্ধকারের গাঢ়তাই প্রকাশ পাবে। নারী হৃদয় যে কুসুমের চেয়েও কোমল আবার বজ্রের চেয়েও কঠিন। সেদিনকার আমি তার আপন জন—আজ তার কতপর।

আলোক চিত্র আরম্ভ হইতে পাঁচ মিনিট বাকী। সবে মাত্র প্রচার দৃশ্য আরম্ভ হইয়াছে—"গুনে গন্ধে অজন্তা, রূপ

সাধনার হিমাদ্রী, সর্ব্বজয়ে পাইয়েকশ" ইত্যাদি। এক দৃষ্টিতে সে চিত্রপটের দিকে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ পাশের আসন খোলার শব্দ হইল। পরক্ষণেই চুড়ির রিনি রিনি শব্দ ও আজানুলম্বিত অলকরাজির সুগন্ধে তাহার চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। চোখ ফিরাইয়া দেখিল, এক অনবগুণ্ঠীতা তরুণী। চোখে তার সোনালী চশমা; মনিবন্ধে ছোট্ট ঘড়ি, পরনে নটরাজ সাড়ী, আর সারাদেহে, সারাক্ষন পূর্ণ যৌবনের গর্ব্ব প্রতিফলিত। সে তরুণী আর কেহ নহে—তাহারই চিরবাঞ্ছিত ছায়া—যার জন্ম সে ভবঘুরে, এ নিদারুন দুঃখে পতিত, পাগল নামে অভিহিত। আজ সে পাশে উপবিষ্টা। এ যেন স্বপ্নাতীত ব্যাপার। নেহাৎ পরিচিত অবজ্ঞায় ছায়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বসন্ত মনে মনে ভাবিল, "আলাপ করবো? যদি সে অবজ্ঞায় জবাব না দেয়, তা'হলে লোক গুলো ভাববে আমি অপরিচিত তরুণীর প্রেমাকাংখী, শেষে পুলিশেও দিতে পারে।"

আবার উত্তেজিত হইয়া ভাবিল, না! না!! আমার ভুল। সে কি যৌবনের প্রেম-স্বপ্ন বিস্মৃত হতে পারে?

সে এক দৃষ্টিতে ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ভরসা ছিল—সেদিনকার মুক্ত আকাশের চাঁদোয়ার তলায় নিরীহ, নিরাপদ প্রশান্ত প্রান্তরের প্রাণ খোলা ভাব বিনিময়ের স্মৃতি টুকু স্বীয় আকাঙ্খা প্রকাশের ইচ্ছা তাহাতে প্রবল হইয়া উঠিল।

সাতিশয় আগ্রহে ছায়ার মুখের কাছে স্বীয় মুখ হাজির করিয়া কহিল, তুমি ছায়া না মায়া? কত বিনিদ্র দুঃখের রজনী অশ্রুজলে কাটিয়েছি। কত দিন তোমার দেখার জন্যে ঘাটে মাঠে পাগলের মতো ছুটেছি"।

পরমুহূর্ত্তে অনুতপ্ত হইয়া কহিল, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, এ পাগলের প্রলাপ এ ব্যর্থ প্রেমিকের হৃতশোচ্ছাস, প্রেম ভিখারির করুন আবেদন।

বলিতে বলিতে ছায়াকে জড়াইয়া ধরিতে গেল। সর্ব্বাঙ্গ তাহার ধড়ো পাখীর ন্যায় ঠক্, ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পাগল প্রায় হইয়া কতকি বলিল।

ছায়া তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, আপনি কে? ভদ্রতা শেখেননি? আপনার বাড়ীতে মা-বোন নেই? মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানেন না?

বসন্ত উন্মাদের মতো বকিতে আরম্ভ করিল, ছায়া! এ উত্তপ্ত দগ্ধ বক্ষে তোমার ক্ষীন দুর্ব্বল সুকোমল হাত খানা দিয়ে স্পর্শ এর উত্তাপ কত নিঠুর কত অসহ্য—এর শক্তি নির্দ্দেশ তাপমান যন্ত্রের ক্ষমতার বাইরে।"

পরক্ষনেই কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, ছায়া! এ ব্যথাক্লিষ্ট বক্ষে তোমার মধুর আলিঙ্গনে দুঃখের জগদ্দল পাথরটা নামিয়ে নাও। আর যে সইতে পারিনে। আমার শ্বাস রোধ হয়ে আস্‌চে। উহু উহু! অসহ্য অসহ্য! ছায়া। আমায় আলিঙ্গন কর, আমায় বাঁচাও। একবার বল, "তুমি আমার।"

তখনো বিশ্রামের পাঁচ মিনিট বাকী। ছায়ার চেঁচামেচি শুনিয়া দর্শকের দল বসন্তের দিকে ছুটিয়া আসিল। শত কণ্ঠের অভিসম্পাতে ও তীব্র কটাক্ষে তাহার জীবনান্ত হইয়া উঠিল।

হিন্দুস্থানী হাঁকিল, স্সালাকো মারো।

কলেজের ছাত্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, Rascal, brute, I will kick you out.

রসিকবাবু কহিলেন, পরকীয়া প্রেমের আর জায়গা পেলে না।

সরলা নাম্নী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, হাঁগা! অত বড় মিনসে শেষে এ কাণ্ডটা করলে? রাস্তা ঘাটে চলা দায় হয়ে পড়ল দেখ্‌চি।

মিন্টুর দিদিমা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া মন্তব্য করিলেন, "অত বড় মাগী মিন্‌সের পাশে বসেইবা কেন? যেমনি মাগীর সাহস—তেমনি তার পরিণাম। বেশ হয়েচে।"

কর্তৃপক্ষ তাহাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিলেন। পুলিশ হাত ধরিতেই বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে বসন্ত কহিল, ছায়া। প্রেম আছে বলেই প্রাণটা সজীব আছে, নচেৎ এতোদিনে মরুভূমি হয়ে যেতো। তোমার দেওয়া ব্যথা এ বুকে কত কাল ধরে বাজচে। হাত দিয়ে স্পর্শ মধ্যাহ্ন মরুভূতলের চেয়েও উত্তপ্ত। তীক্ষ্ণ শাণিকায় বক্ষ চিরে দেখাতে পারি—এ হৃদে শুধু তোমারই স্থান।

পরক্ষণেই অস্থির ও চঞ্চল হইয়া কহিল, ছায়া!! একবার বল "তুমি আমার।" তাপিত প্রান শীতল হয়ে যাক্। প্রেমের বন্যা বয়ে যাক্। সমস্বরে ধ্বনিত হোক "তুমি আমার, তুমি আমার।"

আবার কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমি ছায়াকে ভালবাসি। আমায় ছেড়ে দাও সিপাহীজি তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও।

পুলিশ চিরাভ্যস্তেবৎ হাঁকিল, চুপ রাও, আবি মার ডালেগা।

* * *

বসন্ত কারাগারে। সেদিনকার ঘটনাটা তাহার নিকট আরব্য উপন্যাসের অলীক কাহিনী বলিয়া বোধ হইল। নানা অবান্তর দুশ্চিন্তা বসন্তের বক্ষস্থল তোলপাড় করিয়া তুলিল। দখিনে হাওয়ায় কম্পমান বাহিরের কাঁঠাল গাছটার অর্থহীন মর্ম্মর ধ্বনি ও নিশাচর বাদুড়ের চিঁ চিঁ শব্দ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সারারাত্রি অনাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তার প্রবল আবেগে শরীর মন তাহার অবসাদ গ্রস্ত হইল।

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

শ্রীশ্রীপাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতার রাজপথ—ভিখারী গাহিতে ছিল]

—ভিখারীর গীত—

"চল্ রে ফিরে আপন্ ঘরে—
ধূলা-খেলার সাধ মিটেছে, আসল খেলা
খেল্‌বি পরে!
যাহার যাহা পাওনা দেনা,
বুঝে-পড়ে মিটিয়ে দেনা,
কড়া-ক্রান্তি কেউ ছাড়ে না,
কেউ ভাবেনা পরের তরে!
তুই শুধু কর পরকে আপন,
হ'রে পরের মনের মতন,
পরের ব্যথায় ব্যথী যে জন,
ঘুচবে ব্যথা তাহার বরে!"

[গান শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে সুবোধ প্রবেশ করিয়া চলিয়া যাইবে—চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া মনি-ব্যাগ হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া]

সুবো। [ভিখারীকে] ওহে, ধরো।
[টাকা দিলেন]

ভিখারী। এ যে পুরো এক টাকা বাবা? [সুবোধ কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন] জয় হোক্, বাবা, জয় হোক্! [ভিখারী—"চল্ রে ফিরে আপন ঘরে—" গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল]

[গোপাল প্রবেশ করিল]

গোপা। যাক্ বাবা! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলুম্—থিয়েটার বায়স্কোপের প্লাকার্ড মারা শহরের দেওয়াল দেখে চোখ জুড়ুল! এমন শহর আর আছে? থিয়েটার কোর্ত্তে হয়, থিয়েটার করা শিখতে হয়, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে বুঝতে হয়, ত বেশী নয় এক পয়সায় একখানা কাগজ কিনে পড়ো—একদম মুরুব্বি বনে' যাবে! আর Gesture-Posture শিখতে চাও ত, বালিগঞ্জের Mortgage Avenue পার হোয়ে সোজা লেকের ধারে চলে যাও—যত রাত্তির গভীর হবে তত ভাল ভাল Pose দেখতে পাবে—মেধা থাকে ত আদায় করে নিয়ে আর একটু ওদিকে টালিগঞ্জের মাঠে ফিল্ম ষ্টুডিওতে গিয়ে হুবহু উগরে দাও—ঘুম থেকে উঠেই দেখবে—first class film actor হোয়ে গ্যাছো—তোমার জোড়া নেই! ডি, এল, রায় লাখ কথার এক কথা বোলে গেছে—"এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি"। এইবার একটা ভাল শশুর দেখে বিয়ে করে ফেলা যাক্—পয়সাওয়ালা 'বিধবা শাশুড়ী হোলেও চলবে—বিয়ের ক'নে থাক্ আর না থাক্—বিয়ের যৌতুক বোলে একখানা থিয়েটার কিম্বা বায়স্কোপ হাউস্ করে দেওয়া চাই যোদ্দা—তাহোলে আর আমায় পায় কে?

[বিশ্বেশ্বর ও বসুদেবের প্রবেশ]

বসু। কি গো বিশুবশ'—আর কতক্ষণ Morning Walk কর্ব্বে—এদিকে যে বেলা দশটা বাজলো?

গোপা। ["বিশু" নাম কাণে যাইতেই ছুটিয়া গিয়া বিশ্বেশ্বরের হাত ধরিয়া] তোমার নাম বিশু?—ভাল নাম ত বিশ্বেশ্বর? দেখি দেখি—মুখ তোলো না—ভাল করে দেখি!

বসু। তুমি কে হে ছোক্‌রা?

গোপা। হ্যাঁ, এ সেই "বিশু" না হোয়ে আর যায় না? আমি—আমি এই বিশ্বেশ্বরের" Duplicate! চমৎকার Duplicate part play করে এসেছি—কিন্তু শেষ অবধি টিকতে পাল্লাম না—drop পড়বার আগেই পালিয়ে এলুম!

বসু। তুমি কি বোল্‌চো হে?

গোপা। ওঁর একজন খ্যাপা-খ্যাপা দাদা আছে ত? আর একজন খুব সুন্দরী মা—কেবল "বিশু-বিশু" কোরে কাঁদে? উনিও ত পালিয়ে এসেচেন—তাদের কাছে ফিরে যেতে চান্ না? কালিন্দী বলে—"ওকে রাধায় পেয়েচে!"

বিশ্বে। কালিন্দী কে?

গোপা। কালিন্দী—কালিন্দী, আবার কে? কালিন্দী নাম শুনে কিস্‌কিন্দী কালো মনে করো না—সেও খুব সুন্দরী—তবে তোমার মায়ের মতন অতটা নয়,—সে "মা" নয় কি'না? সে বলে—সে-ও রাধা! তোমার দাদা আমাকে তার পায়ে ধরিয়ে ছেড়েচে!

বসু। তুমি কি বিশু কাকাদের বাড়ী গিছলে না কি?

গোপা। তা নইলে আর বোল্‌চি কোথা থেকে? পলাশপুরের বাড়ী ত? হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি ঠিক ধরেচি! তা তারা আমায় খুব যত্ন আত্তি কর্ত্তো গো—একদিন ভারি ফ্যাসাদ হোলো কি না!

বিশ্বে। ফ্যাসাদ কি? তাঁরা সব ভাল আছেন ত?

গোপা। ভাল আছে,—তবে তোমার দাদা বোধ হয় আর বেশীদিন বাঁচবে না—তোমার মা-টাও মরে যাবে! কালিন্দী মর্ব্বে না—সে আমারই মত vagabond কি না!

বিশ্বে। বসুদেব, আমি যাচ্চি......

বসু। আহা, দাঁড়াওনা এক মিনিট—আমিও যাবো। [গোপালের প্রতি] ক্যাবাদ কি বোল্‌ছিলে?

গোপা। ফ্যাসাদ বৈ কি! একদিন ওর জন্মতিথি-পুজো না কি ছিল—বাবা ঠাকুর পুজোর ফুল নিয়ে "বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বর" বোলে ডাকৃতে ডাকৃতে বেরিয়ে এলো—মা ঠাক্‌রুণ কত বোঝালে—বুঝতে কি চায়—বলে—এই যে আমার কাছে ছিল—বড় রোগা হয়ে গেছে, দেখলুম। তারপর মশাই ওকে না পেয়ে—বলে আমাকেই সেই ফুল মাথায় ছুঁইয়ে দেবে। বামুন ঠাকুরের সে মুখ তোমরা দেখোনি—আমার ত দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো—আমি কি সে ফুল নিই? শেষকালে কালিন্দীর কথায়—ওর মায়ের মাথায় সেই ফুল দিলে—বলে ওর মায়ের ভেতর উনি নাকি লুকিয়ে আছেন। বামুন ঠাকরুণ আগেই আমার হাত ধরেছিল গো—ওরে বাবা, যেন বিদ্যুতের হল্কা আমার ভেতরটায় ঢুকতে লাগলো—হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তবে বাঁচি। সেইদিন থেকেই বুঝলুম —না বাবা—ওর Duplictae part play করা আমার কর্ম্ম নয়—তার পর দিনেই কাউকে কিছু না বোলে লম্বা দিলুম আর কি!

বিশ্বে। বসুদেব, আমি সত্যিই হতভাগা—একটা মরীচিকার মোহে এখনও এখানে পড়ে আছি!

গোপা। তা আছো—আছো—বেশ করেচ। সত্যি কথা বোলবো মশাই, তোমাদের বাড়ীটা একটা দানা বাড়ী—সর্ব্বদাই যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে। এখানে আছো—বেশ আছো। তোমার মা কাঁদবে বটে, আমার মা-ও অমনি কাঁদে, তা কাঁদুক্—ও মা-রা ত কাঁদবার জন্যেই জন্মেচে!

বসু। ওহে ছোক্‌রা, চলো না আমাদের সঙ্গে। বাসায় বসে ধীরে সুস্থে সব কথা তোমার শুনবো এখন। অনেকদিন তাঁদের কথা শুনিনি!

গোপা। আমাকে একটা থিয়েটারে কাজ করে দিতে পারেন ত, যাই। চুপ করে বসে থাকলে—সেই সব কথা খালি মনে পড়ে—মনটা কেমন খাঁ-খাঁ করে।

বসু। আচ্ছা চলো—তোমায় আমার ম্যাজিকের দলে ভর্ত্তি করে নেবো এখন। কেমন?

গোপা। আপনি বুঝি ম্যাজিক্ করেন? —তা সে-ও ত বেশ, নয়? আচ্ছা—আপনি মুণ্ডু কাট্‌তে পারেন? আমার এই মুণ্ডু থেকে ধড় অবধি কেটে অন্য একটা মুণ্ডুওয়ালা ধড় জোড়া লাগিয়ে দিতে পারেন? ম্যাজিক ওয়ালারা ত কত মুণ্ডু কেটে ফের জোড়া দ্যায়। আমার এই মুণ্ডু আর ধড় নিয়ে মুস্কিলে পড়েছি কি না—খালি তাদের সব মনে পড়ে—খালি কালিন্দীর কথা মনে হয়। এই ধড় অবধি যদি বদলে দিতে পারেন ত নিশ্চিন্দি হই!

বিশ্বে। ভাই, তুই একবার আমার কাছে আয়—তোকে বুকে চেপে ধরি।

গোপা। না মশাই, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে ভাল করিনি দেখচি! আবার সেই সব মনে পড়চে—কালিন্দীর পায়ে ধরা মনে পড়চে। পালিয়ে এলুম—তবুও রেহাই নেই। না—না—পালাই—পালাই—আর সে-সব কথা কইবো না। যাই—যাই—

[সুরে—তন্ময় হইয়া]

"যাই গো ওই বাজায় বাঁশী
প্রাণ কেমন করে—
একলা এসে কদমতলায়
দাঁড়িয়ে আমার তরে!"

[গোপাল গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল]

[বিশ্বেশ্বর ও বসুদেব উভয়েই অন্যমনা হইয়া মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া রহিলেন—পরে বসুদেব বলিলেন]

বসু। বাঁশী সত্যিই বাজে কিন্তু শোন্‌বার ভাগ্যি ক'জনের হয়? কেমন, নয় বিশু কা'?

[বিশ্বেশ্বর কিছুই বলিলেন না—শুধুই শূন্য মনে চাহিয়া রহিলেন]

বসু। চলো, আজ রাত্রেই বেরিয়ে পড়া যাক্।

বিশ্বে। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] চলো।

তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

[সুবোধবাবুর কক্ষ—কক্ষটী সবুজবর্ণের আলোকে ঈষদালোকিত—সুবোধবাবু একাকী বসিয়া ভাবিতেছিলেন]

সুবো। [স্বর্গগতা জননীর প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া] মা, আজ কেবল তোমাকে মনে পড়চে। দুঃখের দিনেই তোমাকে মনে পড়ে। আজ যদি বেঁচে থাকতে— আমার এই উত্তপ্ত ললাটে তোমার সেই স্নেহ-শীতল হাতখানির স্পর্শ আমার অর্দ্ধেক জ্বালা দূর করে দিতো।

[প্রাচীর গাত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রতিকৃতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন]

[ধীরে ধীরে চেয়ারে আসিয়া বসিয়া] আমার প্রতি তাঁর এই শঙ্কা শূন্য অগাধ বিশ্বাসই আমার দিক থেকে আমাকেই একবারে নিশ্চেষ্ট করে ফেল্‌চে। আর ত আমি তাঁর গতি রোধ কর্ত্তে পারি না— বাবাকে বলেও নয়—নিজের চেষ্টাতেও নয়। আমাকেই যে তিনি একান্ত নির্ভর কোরে বসে আছে। না—না, অতটা নীচে নেমে যেতে পার্ব্বো না। একেই কি বলে অদৃষ্টের পরিহাস? [কিয়ৎক্ষণ পরে] আর আমি তাঁকে অবিশ্বাসও কোর্ত্তে পাচ্ছি নে—সে শক্তিও আমি হারিয়েচি। সেই অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখে ছলনার ছায়া ত দেখতে পাচ্চি না। আজন্ম ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিতা যে কঠোর দুঃখের জীবনই বেছে নিয়েচে? এ ত তপস্যাই বটে।

[উঠিয়া গিয়া কার্ড-বোর্ডে আঁটা ভারতীর একখানি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বাহির করিয়া আনিয়া দেখিতে দেখিতে]

এই ক্ষুদ্র বালিকার কুসুম কোমল হৃদয় কিসে এমন ওলট পালট হোয়ে গেল? কি সে বস্তু—যাতে এমন বজ্রের কঠোরতা লুকোনো ছিল? সে যাই হোক্—তাকে ত আর তুচ্ছ বোলে উড়িয়ে দিতে পাচ্ছি না। কুমারীর দেহ প্রস্ফুটিত হোলেই কি পুরুষের প্রথমস্পর্শ সেখানে নারী-ধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে? জানি না এর স্বরূপ কি? জানি না এর তত্ত্ব হৃদয়ের কোন্ রহস্যময় গুহামুখে নিহিত? কিন্তু যিনি আজ এর প্রভাব অতিক্রম কোর্ত্তে না পেরে এক হাতে দুঃখের অমৃত, আর একহাতে প্রেমের ঐশ্বর্য্য নিয়ে জীবন পথে প্রথম পদক্ষেপ কোর্ত্তে মনঃস্থির করেচেন—তাঁকে ত আর আমি অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে পাচ্ছিনে। [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] আজ বুঝতে পাচ্চি—কে তুমি সৌম্য স্নিগ্ধ গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ—সংযম সাধনার তপঃফল সর্ব্বশরীরে আবদ্ধ কোরে আচম্বিতে চোখের সামনে এসে উপস্থিত হোয়েছিলে। তোমারই কুলবধূ হবার জন্যে ভারতীর এই দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বৃত্তি। তোমারই কনিষ্ঠের মুখে তোমার মুখের সাদৃশ্য আজ চিনতে পেরেচি। তুমিই কি ভারতীকে তোমার কুলমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে অলক্ষ্যে আকর্ষণ কচ্চো? মুহূর্ত্তের দর্শনে তুমি ত আমাকেও মুগ্ধ কোরে দিয়েছিলে—তুমি ত আমাকেও জয়ধ্বনি উচ্চারণে আশীর্ব্বাদ কোরেছিলে? সে কিসের জয়? সে জয়ের কি এই রূপ? সে জয় অর্জ্জন কর্ত্তে হোলে এতখানি মূল্যই কি দিতে হবে? আবার দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলে? তোমার তপঃসিদ্ধ রসনা কি অজ্ঞাতে কঠিন সত্য উচ্চারণ করেছিল? [সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া জননীর প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া] মা—মা বোলে দাও—সন্তানকে কি ভাবে দেখতে চাও—মানুষেরও ওপর—সে যে বড় কঠিন —না, শুধু মানুষ—শুধু মানুষ—

[মোটা সাদা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ভারতীর প্রবেশ]

ভার। মা সন্তানকে মানুষই দেখতে চান সুবোধবাবু—

[সুবোধ স্তম্ভিত হইয়া ভারতীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

সুবোধ। [ক্ষণপরে] আপনি? এত রাত্তিরে? আপনার সঙ্গে কে আছেন?

ভার। কেউ না—

সুবোধ। জানেন—আমি আজ প্রকৃতিস্থ নই?

ভার। আমার ত কোনও ভয় নেই সুবোধবাবু। আমি যে এক পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশের কুলবধূ।

[সুবোধ ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়া বসিয়া পড়িলেন—ভারতীকে বসিতে বলিলেন না—ভারতী দাঁড়াইয়াই রহিলেন]

ভার। আপনি আজ সকালে বোলে এসেছিলেন—আপনি দেবতা নন্, আপনি মানুষ—তাই তখন বোলতে পারেন নি, কি ভাবে আবার আমাদের দেখা হবে। তাই আমি নিজেই দেখা করে—মানুষের কাছ থেকে মানুষেরই মত উত্তর পাবার জন্যে একা এসেচি।

[সুবোধ সে কথার উত্তর না দিয়া ভারতীর প্রতিকৃতিখানি হাতে লইলেন—তাহার পর জননীর প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া যেন শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন—তাহার মুখমণ্ডল আত্মত্যাগের দুঃখের মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—]

(ক্রমশঃ)

অভিমানিনী

শ্রীপ্রসাদ বসু

ভেবেছিনু মনে কহিব না কথা,
হেরিব না তব পানে,
আঁখি যদি বাদ না সাধিত, হায়,
কে চাহিত ও নয়ানে?
আমিত' আছিনু নীরব হইয়া
মরমের ব্যথা মরমে বহিয়া,
কি করিব বল, মুখর কণ্ঠ—
ডাকে তোমা গানে গানে।
ভাবিছ কি তুমি হার হ'ল মোর?
তব তরে ভাবো, ঝরে আঁখি লোর?
না গো না, নয়নে কি হ'য়েছে যেন,
কী হ'য়েছে, কে তা' জানে!

খেয়ালী চিত্রপট

গারট্রুড্‌ মাইকেল্‌ প্যারামাউন্টের মেয়ে—রূপে ও গুণে
দিন দিন নামের সোণালি পথে এগুচ্ছে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'অ্যারিটি' | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ ৯, রামময় রোড্, কলিকাতা | টেলিফোন পার্ক ৩২৪

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই আশ্বিন ১৩৪৩, ১লা অক্টোবর ১৯৩৬

আসন্ন কলিকাতা সম্মেলন

গত রবিবার সন্ধ্যায় এলবার্ট হলে কলিকাতার বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তা ও বিশিষ্ট কর্ম্মীবৃন্দের এক ঘরোয়া বৈঠক বসে। উক্ত সভায় বঙ্গীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কলিকাতা-নিবাসী বিভিন্ন কংগ্রেসকর্ম্মীর এক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমরা গত সংখ্যার 'খেয়ালী'তে এই সম্মেলন সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়াছিলাম তাহা অনুমোদন করিয়া পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মতি জানাইয়াছেন। কলিকাতার কংগ্রেস কমিটীগুলির সম্পাদকগণ উক্ত সম্মেলনের উদ্যোক্তারূপে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিবার প্রচেষ্টা আমরা পূর্ণভাবে সমর্থন করি। স্থানীয় কর্ম্মীদের সহিত যোগসূত্রবিহীন ও দরদশূন্য কলিকাতা প্রবাসী ও বিহারী মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দের অবসর বিনোদনের ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হইয়া বাঙলার বহু আদর্শবাদী কংগ্রেসকর্ম্মী আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। বিলাসব্যসনমোহমুগ্ধ যে সমস্ত নেতৃবৃন্দের কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতার মসৃণ রাজপথের গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ তাঁহারা সমস্ত বাঙলার জনগনমনঅধিনায়ক হইবার বর্ত্তমানে যে স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেছেন তাহার সম্যক সঙ্কোচনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। শৈলাবাসের স্নিগ্ধ নিরবচ্ছিন্ন অবকাশেই যাঁহাদের রাজনীতি চর্চ্চা করিবার স্পৃহা ও অবসর হয় জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কংগ্রেসে বর্ত্তমানে তাঁহাদের স্থান নাই।

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যে সমস্ত বীর পুরুষ অদৃশ্য হইয়াছিলেন বা কংগ্রেসের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া কাউন্সিল ও এসেমব্লীতে বিরাজ করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শরৎচন্দ্রের স্নেহাকাঙ্খী হইয়া রাতারাতি কংগ্রেস-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙলা কংগ্রেসের বিধানীদলের কোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মন্ত্রী-বিশেষের নির্ব্বাচনের সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কংগ্রেস-প্রীতির অপূর্ব্ব পরিচয় দিতেছেন। যতদিন কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দ এইরূপ বর্ণচোরা জীব বিশেষকে প্রশ্রয় দিবেন ততদিন তাঁহাদের সমস্ত দাবী অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত হইবে।

অতীতে কলিকাতার বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিগুলি মুষ্টিমেয় ধনগর্ব্বিত নেতৃমণ্ডলীর দুরাকাঙ্খাকে সংযত করিয়াছিল। আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহারা অনুরূপভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

নোয়াখালী কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিগত অধিবেশনে বঙ্গীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল। ক্রমশঃ বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে যে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহ ধূমায়মান হইয়া উঠিতেছে তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে বিধান-কিরণ শাসিত ও শরৎচন্দ্রের আশীষপূত বঙ্গীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড বাংলার সত্যকার কংগ্রেস-কর্ম্মীদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার

ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতা

কোলকাতা থেকে যে চারিটী দল সিমলায় ডুরাণ্ড খেল্‌তে গিয়েছিল তার ভেতর তিনটী দলকে উক্ত প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। তিনটী দলের ভেতর সিটি এ্যাথলেটিক্‌ দলের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। বাকী দুটী দল মোহনবাগান ও ভবানীপুর এ রকম শোচনীয় ভাবে হেরে যাওয়াতে বাস্তবিকই একটা দুঃখের কারণ হয়েচে। এখন যে দলটী সিমলায় আছে সে হচ্ছে এরিয়ান্স। এই এরিয়ান্স দলে এবার মহামেডান স্পোর্টিং দলের ভূতপূর্ব্ব দু'জন বিখ্যাত খেলোয়াড় রহমৎ ও হাবিব খেল্‌ছেন। এই দু'জন খেলোয়াড় যোগ দেওয়াতে এরিয়ান্স ক্লাব বেশ শক্তিশালী দল হয়ে উঠেছে।

ভবানীপুর ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ডে গ্রীন হাওয়ার্ডস দলের সঙ্গে গত শুক্রবার খেলে। এই খেলায় ভবানীপুর ক্লাব ৪-০ গোলে হেরে গেছে। প্রথমে ভবানীপুর ক্লাব বেশ ভালই খেলতে থাকে। কিন্তু খেলার প্রথম তিন মিনিটে তাদের বিখ্যাত হাফ ব্যাক্‌ গুহ পায়ের গোড়ায় বিশেষ ভাবে আঘাত পান। এবং সেই আঘাতের ফলে তাকে খেলার মাঠের বাইরে চলে আসতে হয়। ভাগ্য বিপর্যয় একেই বলে। অচেৎ ভবানীপুর ক্লাব, এত বেশী [illegible]বার টীম নয়। তাদের এই [illegible] বাস্তবিকই দুঃখিত।

মোহনবাগান দলও রাউলপিণ্ডির রয়াল সিগন্যাল দলের কাছে ১-০ গোলে হেরে সিমলা থেকে কোলকাতায় ফিরে এসেছে। মোহনবাগান দলের বিপক্ষ দলের চেয়েও ভাল খেলে এভাবে হারা উচিত হয় নি। তার উপর তারা আবার একটী পেনালটী মিস্‌ করেছে। খেলার ২০ মিনিটের সময় মোহনবাগান দল একটী পেনালটী পায়, গোলকিপার কে, দত্ত এ পেনাল্‌টী সটটী করে। তাহার সটটী এত আস্তে হয় যে সিগন্যাল দলের গোলকিপার তা অতি সহজেই ধরে ফেলে। আশ্চর্য্য ভারতের এই শ্রেষ্ঠ হিন্দুদল এখনও পেনাল্‌টী সট করতে শেখে নি। এই ত' সেদিন কোলকাতায় আই, এফ, সিল্ডের সেমি-ফাইন্যালে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে মোহন-বাগান দল পেনাল্‌টী পেয়েও তাতে গোল করতে পারলে না। যাদের এই অবস্থা তাদের বিদেশে গিয়ে এভাবে অপদস্ত হয়ে আসার কি দরকার। নিজেরা না তৈরী হয়ে যাওয়াই বা কেন? যে দলের ফরোয়াডরা ১০ গজ দূরে clear বল পেয়েও সট করতে পারেনা তাদের এত দম্ভই বা কিসের? সিমলার এই খেলায় ও, দেব যে ভাবে মিস্‌ করেছে তা অবশ্য মোহনবাগান খেলোয়াড়দের পক্ষেই সম্ভব। কারণ তারা বড় টীমের বড় খেলোয়াড়।

মোহনবাগান ভবানীপুর ও সিটি এ্যাথলেটিক দলের পরাজয়ের পর একমাত্র এরিয়ান্স ক্লাবই বাঙলার মান রাখতে পেরেছে। এরিয়ান্স দল তৃতীয় রাউণ্ডে চেশায়ার দলকে ২—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। এরিয়ান্স দলে এবার ভারতের দু'জন বিখ্যাত খেলোয়াড় রহমৎ ও হাবিব খেলেছে। রহমতের নাম বোধ হয় ফুটবল জগতে কারও অজানা নেই। সেই রহমৎ সেদিন এরিয়ান্সএর হয়ে যেভাবে খেলেছে তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এবং তারই জন্যে এরিয়ান্স দলের জেতাও সম্ভব হয়েছে। এরিয়ান্স দলের এই দু'টি গোল দিয়েছে রহমান ও রহমৎ।

এই রহমৎ ও হাবিবএর খেলা নিয়ে যে একটা গোলমাল বেঁধেছিল তা অবশ্য শেষ হয়ে গেছে। চেশায়ার দল হেরে গিয়ে ডুরাণ্ড কমিটির কাছে একটা protest করেছিল (ফি অবশ্য ২০ টাকা দিয়ে) যে হাবিব ও রহমৎ এরিয়ান্স ক্লাবের মেম্বার নয়। ডুরাণ্ড কমিটি অবশ্য এ বিষয় জানবার জন্য আই, এফ, এ-কে তার করে। তারের উত্তরে আই, এফ,

এসেসর নির্ব্বাচন সমস্যা

আসন্ন এসেসর নিয়োগ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বা শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়কে সমর্থন করিবার জন্য কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ব্যারিষ্টার মিঃ পি ব্যানার্জ্জিকে সমর্থন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সুতরাং এসেসর নির্ব্বাচন সমস্যা যে ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

...জানায় যে এরা অনেক দিন থেকেই এরিয়ান্সের মেম্বার সুতরাং চেষ্টায় দলের অভিযোগটাকে অগ্রাহ্য ক'রে ডুরাণ্ড কমিটির অভিযোগ ফী ২০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। এরিয়ান্স দলের এই জয়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর উল্লসিত হ'বার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তারা যে ভবিষ্যতে এই প্রতিযোগিতায় আরও ভাল ফল দেখাবে সে বিষয়ে আমরা একপ্রকার নিঃসন্দেহ।

এই প্রতিযোগিতায় আর্গাইল দল বিখ্যাত রোভার্স হোলডার কিংস রেজিমেণ্ট দলকে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। আমরা অবশ্য প্রথমে আশা করেছিলাম যে এই কিংস রেজিমেণ্ট দলই এবার জয়ী হ'বে। কিন্তু ফল দাঁড়াচ্ছে অন্য রকম। দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত।

সাঁতার

গত শনিবার ও রবিবার কোলকাতার চারটী বিশিষ্ট ক্লাবের বার্ষিক জলক্রীড়া সুচারুরূপে শেষ হয়েছে। এই চারটীর মধ্যে একটী কেবল মাত্র মেয়েদের। নিম্নে কয়েকটী ফলাফল দেওয়া হ'ল।

খিদিরপুর সুইমিং ক্লাবের ফলাফল:—

১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক (সাধারণের)—১ম—এন সি মালিক (এম এস এ ক্লাব সেক্সন); ২য়—বি এন দাস (কলেজ স্কোয়ার); ৩য়—জি সি দাস (কলেজ স্কোয়ার); সময়—১ মিঃ ৩৮ সেঃ।

১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল (সাধারণের)—১ম—মদন সিংহ (আনন্দ স্পোর্টিং); ২য়—ডি দাস (কলেজ স্কোয়ার); ৩য়—ডি মিত্র (ন্যাশনাল সুইমিং এসোঃ ক্লাব বিভাগ) সময় ১ মিঃ ১০-২/৫ সেঃ।

১০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক (সাধারণের)—১ম—জি সি দাস (কলেজ স্কোয়ার) ২য়—অমর সি দত্ত (বীণাপাণি ইউনিয়ন) ৩য়—এম বসু (এম এস এ ক্লাব সেক্সন) সময়—১ মিঃ ৪০-২/৫ সেঃ।

৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল (সাধারণের)—

১ম	এম সিংহ	(আনন্দ স্পোর্টিং)
২য়	দুর্গা দাস	(কলেজ স্কোয়ার)
৩য়	এম এম দে	(ঐ)

সময় ৫ মিঃ ৩১ সেঃ

শৈলেন্দ্র মেমোরিয়ালের ফলাফল:—

৪৪০ গজ ফ্রি ষ্টাইল (সাধারণের):—
১ম—দুখীরাম মালিক (শ্মশানেশ্বর)
২য়—সি সাহু (শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল)
৩য়—কে ডি মুখার্জ্জি (ঐ)

সময়—৬ মিঃ ২৯ ১/৫ সেঃ

১১০ গজ ফ্রি ষ্টাইল (সাধারণের)
১ম—এস এম দাস (শ্মশানেশ্বর সুইমিং ক্লাব)
২য়—এম এম রহমন (শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল)
৩য়—এন এন ব্যানার্জ্জি (আনন্দ স্পোর্টিং)

সময়—১ মিঃ ১৬ ৪/৫ সেঃ

৫৫ গজ ফ্রি ষ্টাইল (সাধারণ বালিকাদের) ১ম—কুমারী রমা সেনগুপ্তা (খেলাঘর), ২য়—" এস এল পাল (বৌবাজার) ৩—" কনকলতা (শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল) সময়—৪৫ ৩/৫ সেঃ

তালতলা ইনষ্টিটিউট্ এর ফলাফল:—

এক লেংথ ব্যাক ষ্ট্রোক (সাধারণের)
১ম—এন সি মালিক (ন্যাশনাল)
২য়—জি দাস (কলেজ স্কোয়ার)
৩য়—এস এন সিংহ (সেনট্রাল)

সময় ১ মিঃ ১২ ১/৫ সেঃ

পাঁচ লেংথ ফ্রি ষ্টাইল (সাধারণের):—
১ম—মদন সিং (আনন্দ স্পোর্টিং), ২য়—ডি দাস (কলেজ স্কোয়ার), ৩য়—কে কেশরবাণী (সেনট্রাল),

সময়—৫ মিঃ ২৯ সেঃ

এক লেংথ ফ্রিষ্টাইল (সাধারণের):—
১ম—ডি দাস (কলেজ স্কোয়ার)
২য়—ডি মিত্র (ন্যাশনাল)
৩য়—এ বি ব্যানার্জ্জি (কলেজ স্কোয়ার)

সময়—৫৪ ৩/৫ সেঃ

মেয়েদের

রবিবার মেয়েদের হেদুয়ায় দ্বিতীয় বার্ষিক সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাহাতে 'এ' বিভাগে কুমারী লীলা চ্যাটার্জ্জি সেণ্ট্রাল 'বি' বিভাগে কুমারী রমা সেনগুপ্তা (খেলাঘর) 'সি' বিভাগে কুমারী সরস্বতী সাহা (সেণ্ট্রাল) বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছে। মেয়েদের মধ্যেও যে সাঁতারের এত তোড়জোড় লেগে গেছে এ বাস্তবিকই আনন্দের কথা। প্রতিযোগিতার কয়েকটী ফলাফল দেওয়া হ'ল।

'এ' বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল:—
কুমারী লীলা চ্যাটার্জ্জি মিঃ ৪৮,৩/৫ সেঃ
৫০ মিটার ব্যাক্ ষ্ট্রোক্
কুমারী লীলা চ্যাটার্জ্জি ৫৪ সেঃ

'বি' বিভাগ

৫০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল
কুমারী রমা সেনগুপ্তা ৪৫, ২/৫ সেঃ
৩৫ মিটার ব্যাক্ ষ্ট্রোক্
কুমারী রমা সেন গুপ্তা ২৫ সেঃ

'সি' বিভাগ

৫০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল
কুমারী সরস্বতী সাহা ৫৪, ২/৫ সেঃ

রংমশাল

ছেলেমেয়েদের সচিত্র নূতন মাসিক পত্রিকা

আশ্বিনের মাঝামাঝি প্রথম সংখ্যা
বাহির হইবে

চিত্রে, গল্পে, উপন্যাসে, দেশবিদেশের
কথায়, প্রবন্ধে, কবিতায়, বিজ্ঞানে, শিল্পে

এককথায়

অপরূপ ও অভিনব রচনাসম্ভারে সজ্জিত হইয়া শিশু
সাহিত্যের নূতন যুগ সূচনা করিবে।

সম্পাদক ঃ শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্র নাথ সেন এম-এ

কার্য্যালয়—১৫৪, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

শ্রীশ্রীপাদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুবোধ। [শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে রে] ব্রাহ্মণ, তোমার আশীর্ব্বাদ বাণীরই র হোক্। [পরে ভারতীর প্রতি] শুন্, আপনার একখানি ছবি অনেকদিন কেই আমার কাছে রোয়ে গেছে— খনি আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান্—

ভার। [অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে] কেন, আপনি ভদ্রমহিলার ছবি ঘরে রাখেন না, কি ?

[সুবোধ বিস্ময়ে মুখ তুলে চাহিল]

যদি কখনও সুদিন আসে—আপনার ছবিও আমি ঘরে রাখবো, জান্‌বেন। আপনি কি পঞ্চবটীর পর্ণকুটীরে রাম সীতার ছবি দেখেন্ নি—কুটীর দ্বারে নিদ্রাহীন চোখে ধনুর্দ্ধারী জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ? ও ছবি আপনি রেখে দিন। আমি চল্লুম— আমি আপনার উত্তর পেয়েচি—প্রস্তুত হোয়েই থাক্‌বো।

[ভারতী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

[সহসা সুবোধবাবুর বাটীর কক্ষান্তর হইতে করুণ যন্ত্র-সঙ্গীতের ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতে লাগিল—সুবোধবাবু স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন]

সুবো। [পরে স্বপ্নোত্থিতের মত ধীরে ধীরে] অপূর্ব্ব বালিকা। ছবিও ফেরত নিতে চাইলে না। "নিদ্রাহীন চোখে ধনুর্দ্ধারী জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ।" আজ মানবীকে হারিয়ে দেবীকে ফিরে পেলাম। ছবি থাক্—কিন্তু [ড্রয়ার খুলিয়া ভারতীর পত্রগুলি বাহির করিয়া] তাঁর লেখা এই-চিঠি—এসব ত আর আমি রাখতে পারি না—? [বাতিদানে বাতি জ্বালিলেন—দীপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—চিঠিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন—পরে] শত্রুর শেষ রাখতে নেই। এদের শেষ এমনি কোরেই হোক্—

[পত্রগুলি দীপশিখায় ধরিলেন]

[তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—বিশ্বম্ভরের চণ্ডীমণ্ডপ

[চণ্ডীমণ্ডপের সোপানের দুই পার্শ্বে জাহ্নবী ও কালিন্দী বসিয়াছিলেন—চণ্ডী-মণ্ডপের ভিতর হইতে ধূপধুনার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল]

জাহ্ন। গোপালটা ছিল—সে-ও চলে গেল! তাকেও ধরে রাখতে পাল্লাম্ না। নিজের ছেলেকেই বড় ধরে রাখতে পাল্লুম্—তা সে ত পরের ছেলে! বৃথায় "মা" হয়েছিলুম!

কালি। ব্রহ্মচারিণীর কি "মা" হওয়া সাজে দিদি?

জাহ্নু। তা না সাজুক—তুইও ত ছিলি—তুইও ত ধরে রাখতে পাল্লিনে বোন্?

কালি। আমি ত আর "মা" নই, আমায় কি দায় পোড়েচে? পা ছুঁতে দিয়েছিলুম তাই ঢের! তাও কি দিতুম্—নেহাৎ ছোঁড়াটার নামে নাম মিলে গেল—নামেরও ত মান রাখতে হয়?

জাহ্নু। তুই বুঝি তোর স্বামীকে কেবল ওই টুকটুকে পা দুখানি ধরাতে ভালবাসিস্?

কালি। কে না বাসে? পায়েও ধরাতে হয়, পায়ের ধূলোও নিতে হয়! আমি তাঁর দাসী, তিনি আমার দাস—আমি দেবী, তিনি দেবতা। দাসী হোয়ে আমি দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ি—দাস হোয়ে তিনি দেবীর প্রসাদ ভিক্ষে করেন। বড় মজার সম্পর্ক নয় দিদি?

জাহ্নু। কি জানি ভাই, তোর মতন অতটা বুকের পাটা নেই!

কালি। তাই শুধু এ জন্মে ছাবা আর দেবী হোয়েই রইলে! একটু যদি আমার মত প্রেম শিখতে?

জাহ্নু। তোর প্রেম কাকে বলে শুনি?

কালি। কামনা আর ভক্তি মিশিয়ে প্রেম হয়! তুমি যে খোঁড়া, এক পায়ে চলো?

জাহ্নু। কেমন করে জান্‌লি?

কালি। চোখে দেখে!

জাহ্নু। চোখে কি সব দেখা যায় ভাই! আমিও তোরই মতন দুই পায়েই হাঁটি! তবে তুই যমুনা—আর আমি গঙ্গা! তুই তাঁর বুক থেকে বেরিয়েচিস্—বুকেই আছিস্—আমি তাঁর পা থেকে বেরিয়েচি—তাই শিব আমাকে মাথায় ধরেচে। তুই কৃষ্ণের মুখ চেয়ে-চেয়ে কালো—আমি শিবের স্পর্শে শাদা—নইলে তরঙ্গ দুইয়েতেই আছে ভাই! —তবে তুই একটু কোচকে, আর আমি একটু ভারিক্কি, এই যা তফাৎ!

কালি। এই যে বেশ কথা জানো দেখচি।

জাহ্নু। আমি যে পণ্ডিত মশায়ের বৌ, জানিস্ না?

কালি। আচ্ছা, তুমি তোমার পণ্ডিত-মশাইকে বেশী ভালবাসো, না ছেলেকে বেশী ভালবাসো?

জাহ্নু। তোর ছেলে থাক্‌লে ও কথা জিজ্ঞেস্ কোত্তিস্ নে রে!

কালি। কেন?

জাহ্নু। ও কথার উত্তর মুখ দিয়ে বের কোর্ত্তে নেই। মেয়ে মানুষ মুখ বুজে ওই কথার উত্তর চিরকালই দিয়ে এসেছে—চিরকালই দেবে। ও ছাড়া মেয়েমানুষের আর কিছুই নেই—ওই তাদের বিদ্যে বুদ্ধি, ধর্ম্মকর্ম্ম, অভাব অভিযোগ, আশা ভরসা—ইহকাল পরকাল! ওই নিয়েই মেয়েমানুষের চিরকালের রূপ—ওর আর একাল নেই, সেকাল নেই—ওই তাদের চিরকালের! তুই ত শুধু এ জীবনে স্বামী-মন্তর জপ্ কোর্ত্তে এসেছিস্—তাই কর। ওই মন্তর

—প কোর্ত্তে কোর্ত্তেই সব বুঝতে পার্ব্বি—
কিছুই আর কাউকে বোলে দিতে হবে না!
কালি। [তন্ময় হইয়া]

স্বামী—স্বামী—স্বামী
দিগ্বিজয়ী মহামন্ত্র কে দিলে রে কাণে?
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তার
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজিল রে বাঁশী —!
কালিন্দীর কুলে কুলে একি কলরব?
এ কি বংশী রব?
পঞ্চ-প্রাণ শিখা উর্দ্ধমুখে বাহিরিতে চায়
মিশাইতে চায়
কোন মহাপ্রপঞ্চের পাবক সাগরে?

[একটু থামিয়া]

কে তুমি সুন্দর, মম মানসমোহন,
বলিষ্ঠ, বিশালবক্ষ, বিদ্যুৎবরণ?
অধরে মধুর হাস্য, নয়নে চন্দন,
সুধাকণ্ঠে জুড়ায় শ্রবণ—?
আধ হর, অর্দ্ধেক মদন,—
রমণীর জাগ্রত মরণ—
সর্ব্ব অঙ্গে করিয়া বহন
অমৃত আশীষ দিতে করো আকর্ষণ
যুগে যুগে অনুক্ষণ, হে চির নূতন—!
তোমা বিনা সকলি আঁধার
রমণীর তুমি অহঙ্কার!
তোমা বিনা কে রাখিবে মান—
ধনজন সকলি শ্মশান!
দাসীরে মহিষীপদে করিতে বরণ
প্রেয়সীরে নিত্য আকিঞ্চণ!
লৌহের কঙ্কন—
স্পর্শে তব হয় যে কাঞ্চন!
সিঁথির সিন্দুর—
সূর্য্যের আলোক ছটা বদন ইন্দুর!
করো মোর প্রণাম গ্রহণ,
নিয়ে চলো তব নিকেতন!

[বিশ্বম্ভরের প্রবেশ—জাহ্নবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

বিশ্ব। বাহবা! তোমরা ত বেশ মজায় আছো দেখ্চি! থাকতেই হবে। গদাধর হেসেচেন—আজ নারায়ণের মুখে হাসি দেখিচি যে! তিনি হেসেচেন—আজ ত্রিভুবনকে হাসতে হবে! জানো না—দ্বাদশ বর্ষের অনশন ব্রতে ক্ষিপ্ত মহর্ষি দুর্ব্বাসা দশ সহস্র শিষ্য নিয়ে কৃষ্ণার কুটীরে আতিথ্যে উপস্থিত হোয়েছিলেন? কৃষ্ণা কেঁদে আকুল হোয়ে দীনবন্ধুর শরণ নিয়েছিলেন! গোবিন্দ সখীর আমন্ত্রণে স্থির থাকতে না পেরে কৃষ্ণার শূন্যস্থালী অন্বেষণ করে শাকান্নের কণা মুখে দিয়ে তৃপ্তির উদগার তুলেছিলেন। বিশ্বেশ্বরের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে বিশ্ববাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তি হোয়েছিল—দামোদরের তৃপ্তিতে বিশ্ববাসীর উদর তৃপ্ত হোয়েছিল—দুর্ব্বাসার পারণ হয়েছিল। আজ আমার ঘরের দামোদর হেসেচেন! আজ আমার ঘরেও দুর্ব্বাসার পারণ হবে রে কালিন্দি!

কালি। [আচ্ছন্ন ভাবে] দুর্ব্বালা কে?

বিশ্ব। দুর্ব্বালা তুই, দুর্ব্বালা উনি, দুর্ব্বালা আমি—সব ক্ষিধেয় চুই চুই কচ্চি দেখচিস্ নে?

জাহ্ন। বোসো না এইখানে একটু?

বিশ্ব। না, না বোসবো না, বোস্‌বো না। অনেকদিন পরে—নারায়ণের মুখে হাসি দেখিচি। সে কি পরিহাসের হাসি? না, না—মধুর হাসিতে সারা মুখ যে ভরে গেল! দেখতে হোলো—দেখতে হোলো!

[প্রস্থানোদ্যত]

জাহ্ন। [উৎকণ্ঠিত হইয়া] বাইরে কোথায় যাচ্চো?

বিশ্ব। হা-হা-হা! ভয় পাচ্চো? ভয় নেই—ভয় নেই! আসচি—আসচি! আমি এখনই আসবো—তোমার ভয় নেই—আমি এখনই ফিরবো!

[বিশ্বম্ভর চলিয়া গেলেন]

[কালিন্দী উচ্ছ্বসিত করুণকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন]

"পথ আমারে ডাক্ দিয়েচে
রইতে'নারি ঘরে,—
বাঁশের বাঁশীর মেঠো সুরে
প্রাণ যে কেমন করে।
পথের ছায়া, পথের আলো,
বোলচে কে রে বাসরে ভালো—
ঘরের কোণে, সঙ্গোপনে
কেন রাখিস্ তোরে ধ'রে!
পায়ের রাঙা পরশ দিয়ে
পথটিরে যে রাঙাইয়ে—
পথের কাঁটায় রক্ত-কমল
ফুটবে থরে থরে!

[গাহিতে গাহিতে কালিন্দী চলিয়া গেলেন]

জাহ্ন। ওই পাগলিটা যাই ছিলো, তাই ওর সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে মনটা হাল্কা করি। ও যে স্বামী হারা হোয়েছে, তা কথাবার্ত্তায় ঘুণাক্ষরেও ওকে জানতে দিই নে। এমন স্বামীপ্রেমে তন্ময়—তাতেই যেন ডুবে আছে! কিন্তু আজ এরা সব আমাকে ফেলে গেল কোথায়? এ কি! আমার বাঁ চোখ নাচচে কেন? উনি বোললেন—দামোদর হেসেচেন! বিশু ফিরে আসবে বোলে ওর মনে কি আশ্বাস হোয়েচে? ওর মন যা বলে, তা ত কখনো মিথ্যে হয় না? নিশ্চয়ই বিশু ফিরে আসবে! ওই যে কার পায়ের শব্দ না? হ্যাঁ—হ্যাঁ, ও বিশুরই পায়ের শব্দ। বিশু—বিশু—

[উঠিতে গেলেন—এমন সময় বিশ্বেশ্বর ও মাধব প্রবেশ করিল]

বিশ্বে। মা, মা,—এই যে আমি এসেছি—[জাহ্নবীর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িলেন]

জাহ্ন। বিশু—বিশু—[বিশ্বেশ্বরের দিকে চাহিতে চাহিতে] ওগো, বিশু ফিরে এয়েছে—কোথায় তুমি? [অবসন্ন ভাবে ঢলিয়া পড়িলেন]

বিশ্বে। মা, মা। [অসহায় আর্ত্তকণ্ঠে] মাধব—মাধব?

মাধ। ভয় কি ঠাকুর? ডাকুন—ডাকুন—"মা-মা" বোলে ডাকুন!

ক্রমশঃ

বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড

প্রতিনিধিমূলক নহে—নোয়াখালীর অভিমত

শ্রীযুক্ত প্রসন্নমোহন চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে নোয়াখালী জিলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে এই সমিতি তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

এই সমিতির মতে প্রার্থী নির্ব্বাচন ব্যাপারে জিলা কমিটির মনোনয়নই বলবৎ হওয়া উচিত।

এই সমিতি ইহাও মনে করে যে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি প্রতিনিধিমূলক নহে এবং ইহা যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে ইহা বাঙ্গলার জনসাধারণের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারে না।

খিদিরপুর সুইমিং ক্লাব

গত শনিবার ২৬শে সেপ্টেম্বর মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে উপরুক্ত ক্লাবের বার্ষিক জলক্রীড়া প্রদর্শন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

উক্ত প্রতিষ্ঠানটী খিদিরপুরের প্রায় সমস্ত জনহিতকর কার্য্যের সহিত জড়িত আছে বলিয়া আমরা জানি। এমন কি উক্ত ক্লাবের উদ্যোগেই খিদিরপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাহা আমরা অবশ্য রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিলাম। শুধু প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই ক্ষান্ত না হইয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধানকল্পে এই তরুণ যুবক-প্রতিষ্ঠান নিজেদের সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়া খিদিরপুর তথা কলিকাতাবাসীর মুখোজ্জ্বল করুক এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সেদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন:—কুমার বিনয়েন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী, বিজয় সিং নাহার, তুলসী চরণ রায়, ডাঃ এস-কে বসু, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ও মহম্মদ আলি খাঁ।

জে, সি, ব্যানার্জ্জি

গত রবিবার অপরাহ্নে হাওড়া টাউন হলে অল্ বেঙ্গল মিউনিসিপাল এসোসিয়েশনের সভ্যগণ মিঃ জে-সি ব্যানার্জ্জি মহাশয়কে চা পানে আপ্যায়িত করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সঙ্গীত সম্মিলনী

গত শনিবার বৈকাল সাড়ে ছয়টায় নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ 'সঙ্গীত সম্মিলনী' হলে উক্ত সম্মিলনীর মাসিক সঙ্গীত সভার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানের কার্য্য তালিকার মধ্যে শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ বাবুর অর্কেষ্ট্রা ও রাশিয়ান নৃত্যশিল্পী কুমারী ভী, ভলাডিমিরোভার নৃত্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্ব্বাচন

শ্রীযুক্ত অমর ঘোষকে লিখিত সুভাষচন্দ্রের পত্র

আগামী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার নির্ব্বাচনে পূর্ব্ব গণ্ডীতে শ্রীযুক্ত অমর কৃষ্ণ ঘোষ সভ্যরূপে দাঁড়াইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্‌সম্পর্কে কারসিয়াংয়ে অন্তরীণাবদ্ধ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

C/o দি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অফ্ পুলিশ
দার্জ্জিলিং
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় অমরবাবু,

আমি শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে আপনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার বোর্ড পুনর্নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার দৃঢ় ধারণা এবারও আপনি জয়লাভ করিবেন এবং ইহাই আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। আমার এমতাবস্থায় আমি আপনার কোনও সাহায্যে লাগিব না—এমন কি আপনার সমর্থনকারীদের উপরও আমার কোনও হাত আছে কিনা তাহাও জানি না। যাহা হউক, আমি আশাকরি গতবারের মত এবারও আপনার বন্ধুবান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকগণ আপনাকে এই নির্ব্বাচনে জয়ী করিবেন। আপনি এই বোর্ডের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইলে গঠনমূলক কার্য্য করিতে পারিবেন। আমার শুভেচ্ছা জানিবেন।

কয়েকদিন যাবৎ আমার শরীর ভাল নাই। আশা করি আপনারা সব ভাল।

আপনাদের বিশ্বস্ত
সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ
কলিকাতা

ডাঃ এস, সি, রায়

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে ডাঃ এস্-সি রায় নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার পদ ত্যাগ করিয়া ভারত ইন্সিওরেন্সের কলিকাতা, আসাম ও রেঙ্গুন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাঃ রায় এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে জয়যুক্ত হউন এই আমরা কামনা করি।

দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র সম্মিলন

গত শনিবার দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় ছাত্রজীবনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দেন।

শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়া একটী ছোট

বাঙ্গলা বক্তৃতায় ছাত্রদিগকে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইতে উপদেশ দেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরী বাঙ্গলার ছাত্র সম্প্রদায়ের অভাব সম্বন্ধে একটী বক্তৃতাও করিয়াছিলেন।

উদ্যোক্তাগণকে এই সম্মেলনের সাফল্যের জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।

দমদমে সাংবাদিক সম্মিলন

সাংবাদিক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র চাটার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত জে, এন, ঘোষালের সাংবাদিক জীবনের ৩০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত যে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা বাঙ্গলার সংবাদপত্র জগতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব।

উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন বঙ্গীয় বেতনভুক সাংবাদিক সঙ্ঘ। এই উপলক্ষে দমদমার "অক্ষয় কাননে" সমস্ত দিবস ব্যাপী আনন্দ উৎসব চলিয়াছিল। ভারতীয় সংবাদপত্র সেবায় সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় শ্রীযুক্ত ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত চাটার্জ্জীকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া বঙ্গীয় বেতনভুক বার্ত্তাজীবি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে মানপত্র ও রৌপ্য নির্ম্মিত প্লেট, কাপ ও একজোড়া রেশমী ধুতি ও চাদর প্রদান করা হয়। ইহাই ছিল ঐ দিনের উৎসবে প্রধানতম ব্যাপার।

উৎসবের প্রকৃত কার্য্যাদি আরম্ভ হয় বেলা এক ঘটিকায়। ঐ সময় বার্ত্তাজীবি সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার শ্রীযুক্ত চাটার্জ্জিকে ও শ্রীযুক্ত ঘোষালকে মাল্যদানে বিভূষিত করেন এবং তৎপর মিঃ বি দাস্যাল, শ্রীযুক্ত ঘোষালকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশেষ-ভাবে রচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুত মজুমদার তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সময়োপযোগী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দানের পর মানপত্র পাঠ করেন।

সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কে, এম, নিয়োগী (সহঃ সভাপতি) অনুষ্ঠানে সাহা-য্যের জন্য ষ্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, বসুমতী, এডভান্স ও আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ এবং শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইনের বিশেষ প্রশংসা করেন। শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মাখনলাল সেন, তুষারকান্তি ঘোষ, মুলচাঁদ আগরওয়ালা, প্রফুল্ল কুমার সরকার, মৃণালকান্তি বসু, কে, এম, বন্দ্যো-পাধ্যায়, চারুচন্দ্র সরকার, হরিদাস মজুমদার, বরদাপ্রসন্ন পাইন, কে, কে, ঘোষ, রায় প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, পশুপতি

পার্লামেণ্টারী বোর্ড প্রতিনিধিমূলক নহে
বাংলার বিভিন্ন জেলার অভিমত

বঙ্গীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড প্রতিনিধিমূলক নহে এই অভিমত প্রকাশ করিয়া যে সমস্ত জেলা ঘোষণা করিয়াছে বা যে সমস্ত জেলার কর্ম্মীদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কংগ্রেস কমিটিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি
উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি
মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি
বর্দ্ধমান জিলা কংগ্রেস কমিটি
নদীয়া জিলা কংগ্রেস কমিটি
নোয়াখালী জিলা কংগ্রেস কমিটি

তন্মধ্যে

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির বিভিন্ন দলের কর্ম্মীবৃন্দ একমত যে বঙ্গীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড প্রতিনিধিমূলক নহে এবং ইহার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

বিলাসী

"পূজারিণ"

"পূজারিণ" সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই শুনেছিলাম—সেজন্যে তার সাফল্য সম্বন্ধে আমরা সংশয়াকুল মন নিয়েই সেদিন 'নিউ সিনেমায়' ছবি দেখতে গিছলাম। "পূজারিণ" আমাদের পূর্ণভাবে তৃপ্তি দেয় নি একথা বলতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করিনা।

এই চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় খুঁত যে এর চলার গতি অতি মন্থর—যেন চলছেনা। যিনি নায়িকার ভূমিকায় নেমেছেন, সেই চন্দ্রাবতীর অভিনয় এ ছবিতে সকলকেই খুসী করতে পারবে না। চন্দ্রার expression চমৎকার। কিন্তু ছবির ভাষায় কথা বলার সময় তিনি ভাল করে পেরে উঠেন নি।

ছবির পরিসমাপ্তি যে ভাবে দেখানো হয়েছে—তা অবিশ্যি "দেনা পাওনা" বইতে নেই। তবে যাদের জন্যে এ ছবি তোলা

ভট্টাচার্য্য, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রমোহন সেন, হরেন ঘোষ, অক্ষয় কুমার সরকার, যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ বহু-বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনে যোগদান করিয়া-ছিলেন।

রাজবন্দী

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে অদ্য ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় সংশোধিত আইনে ধৃত ৫৮ জন রাজবন্দী মুক্তিলাভ করিবেন।

এই ৫৮ জন রাজবন্দী গত দশ মাস যাবৎ বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের নব স্থাপিত সুখচর ও

তাদের জন্যে এইরকম শেষ করা দরকার—তা আমরা স্বীকার করি।

অভিনয় সকলেরই বেশ সুন্দর। সাইগল জীবানন্দর অংশে উপযুক্ত নির্ব্বাচন। চন্দ্রাবতীর কথা আগেই বলেছি। পাহাড়ী সান্যাল এবং রাজকুমারী যথাক্রমে নির্ম্মল ও হেমলতার ভূমিকায় মানানসই অভিনয় করেছেন। ছোটখাটো ভূমিকাগুলো বেশ সুঅভিনীত। হ'য়েছে।

আবহাওয়া-সঙ্গীত ত্রুটীবিহীন। সাইগাল এবং কৃষ্ণচন্দ্র দের গানগুলো তৃপ্তিদায়ক।

ক্যামেরা এবং শব্দযন্ত্রের কাজ এন-টির গৌরব ক্ষুন্ন করবে না। তবে প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনা আমাদের খুসী করতে পারে নি। মিত্তির মশাইয়ের কড়া শাসনের আওতায় পড়ে প্রফুল্ল রায় মশাই যে "পূজারিণে" কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন না তাতে আমরা ক্ষুন্ন হয়েচি।

গৌরিপুরের Detenne Training Campএ শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। গভর্ণমেন্টের নিয়মানুযায়ী এই রাজ বন্দীগণ ছয় মাস practical training ও বাকী চারমাস Commercial operationএর কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

আরও প্রকাশ যে বাঙ্গলা সরকার শুধু শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না উপরন্তু মুক্তিলাভের পর এই সকল রাজবন্দীগণকে স্বাধীন ব্যবসা চালাইবার জন্য ঋণ দিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

নিউ থিয়েটার্স

ষ্টুডিও খালি পেয়ে নীতীন বসু তাঁর "দিদি"র কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়েছেন। যে সতর্ক পথ ধরে "দিদি"কে নিয়ে তিনি এগুচ্ছেন—তা'তে মনে হয় নীতীনবাবু এই ছবিকে '৩৭ সালে কেউ হয়ত' টেক্কা মারতে পারবে না। তার ওপর এর মস্ত আকর্ষণ এতে দু'জন বিদুষী ও সুন্দরী অভিনেত্রীকে দেখা যাবে—কমলেশকুমারী ও লীলা দেশাই।

নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

'একটা নতুন কিছু কর'—এই হ'চ্ছে আমাদের আনোয়ার শা রোডের বড়কর্ত্তা যতীন মিত্তিরের বড় কথা। তাই শোনা যাচ্ছে "বিজয়া"তে তিনি 'ক্রেন্ শট্' দেখাবেন—যা' নাকি আজ অবধি কোনও দেশীয় ছবিতে দেখা যায় নি। এর জন্যে দু'দিন দু' রাত্তির অবিশ্রান্ত শ্রম কোরতে হ'য়েছে। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হ'ক।

চিত্রা

'চিত্রা'র আমূল সংস্কারকার্য্য দিনরাত চলেছে। নতুনভাবে চিত্রগৃহটির রূপ দেবার জন্যে এবং ভেতর বাইরের কারুকার্য্য, আসনের আরামপ্রদ ব্যবস্থায় সকলের মনে অপার আনন্দ দেবে। তদুপরি আসছে ফেব্রুয়ারী থেকে এই ছবিঘরটিতে 'এয়ার কুলিং প্লাণ্ট' বসাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। কোল্‌কাতার দু'টি বিদেশী ছবিঘরে এই ব্যবস্থা বর্ত্তমানে আছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

"সোনার সংসারে"র মুক্তি ১০ তারিখে হবে উঠবে কিনা সন্দেহ। দেবকী বসুর এবার হয় উত্থান নয় পতন—সেজন্যে ছবিখানাকে যথাসাধ্য ভাল করবার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। দেখা যাক্, কোথায় জল কোথায় দাঁড়ায়।

* * *

প্রকাশ যে জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যে অনেক

ঘোরাঘুরির পর মিঃ খেম্‌কার করুণা উদ্রেক কোর্‌তে সমর্থ হ'য়েছেন। তিনি এখানে যোগদান কোরেছেন এবং শীঘ্র একখানা বাঙলা ছবি তুল্‌বেন মনে হয়।

কালী ফিল্মস্‌

গেল রোববার প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী "টকী অফ টকীজে"-র দলবল নিয়ে হাজারিবাগ গেছেন। এখানে যে দৃশ্যগুলো তোলা হবে তাই নিয়েই ছবির গোড়া পত্তন হবে এবং নাটকের কাহিনীর চিত্রনাট্যে একটু বৈষম্য দেখা যাবে। এখানে প্রথমেই দেখতে পাওয়া যাবে অধ্যাপক দিগম্বর মজুমদাররূপে শিশিরকুমার হাজারিবাগের সেণ্ট কলোম্বাস কলেজে লেক্‌চার দিচ্ছেন। তারপর শাস্তার মোটর দুর্ঘটনা—যার ফলে বসন্ত ও শাস্তার প্রেম বিনিময়—পলায়ন এবং থিয়েটারে যোগদান। আমাদের মনে হয় গোড়ার দিকটা এইভাবে আরম্ভ হওয়ায় গল্পটার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও বেড়ে গেছে।

পুজোর বাজারে যাতে এদের একেবারে ফাঁক না যায় তার জন্যে এরা পুজোর বাজারে হয় উত্তরা না হয় শ্রী-র দর্শকদের "রেশমী রুমাল" উপহার দেবেন। প্রহসন হিসেবে "রেশমী রুমাল" মঞ্চ-বিলাসীদের খুব হাসিয়েছিল—পর্দায়ও ছবিখানা জমবার সম্ভাবনা খুব বেশী। ছবিখানা প্রায় চার রিলের হবে এবং পরিচালনা কোর্‌বেন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।

* * * *

সুশীল মজুমদারের "মুক্তিস্নানে"-র শুটিং সবে সুরু হ'য়েছে। এতে যিনি নায়ক সাজছেন তিনি নির্ব্বাকযুগের সেই "চোরকাঁটা"-র নায়ক রাজীব রায়। শিক্ষা ও দীক্ষায় এর ভেতর একটা বৈশিষ্টের ছাপ আছে—যা' আমাদের দেশের খুব কম অভিনেতার ভেতরই দেখা যায়। সুতরাং নায়ক নির্ব্বাচনে সুশীলবাবুর মনোনয়ন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিচ্ছি।

ফার্ষ্ট ন্যাশন্যাল পিক্‌চার্স

যামিনী মিত্তিরের অন্য ইউনিট ফার্ষ্ট ন্যাশন্যাল পিকচার্স নামে অভিহিত হ'য়েছে। এরা ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে "সরলা" ছবি তোলা সুরু কোরেছেন—এ খবর আগেই আমরা জানিয়েছি এবং কে কোন ভূমিকায় নামবেন তাও লিপিবদ্ধ কোরেছি। "সরলা"-র নাম-ভূমিকায় কে নামবেন তা' এতদিন ঠিক হয়নি কিন্তু এখন জেনেছি সরলা সাজছে অরুণা—'আলাউদ্দীনে'র মানিক-পরী। পরদায় এর নাম হয়ত' অরুণা থাক্‌বেনা সরলা হবে।

নোটিশ

শারদীয়া সংখ্যা "খেয়ালী" আগামী ১৪ই অক্টোবর মহালয়া দিবস প্রকাশিত হইবে। সেইজন্য আগামী ৮ই তারিখে "খেয়ালী"র আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হইবে না—সঃ খেঃ

"চন্দ্রনাথ"

শরৎচন্দ্রের "চন্দ্রনাথ"-কে ছায়া কর্ত্তৃপক্ষ পায়োনিয়ার ষ্টুডিওতে তোলার ব্যবস্থা কোর্‌ছেন। হয়ত' নরেশ মিত্তিরের ভাগ্যে পরিচালনার ভার পড়বে। এখন চরিত্র নির্ব্বাচন প্রভৃতির আনুষঙ্গিক পর্ব্ব চলেছে।

এন্‌, টি-তে কানন

নিউ থিয়েটার্সে কাননবালার যোগদান নিয়ে আমাদের ইংরেজী সাপ্তাহিকে 'স্ক্রীন প্যারোট' বহুদিন পূর্ব্বে যে মন্তব্য পেশ কোরেছিলেন তা'তে গোঁসাভরে একজন আমাদের 'প্যারোট'কে কলমের খোঁচায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। 'প্যারোট' এই বাজে কথায় কান না দিয়ে শুধু বলেছিল যে, সময়ে তার কথাই বাঙ্‌লার চিত্রামোদীরা মেনে নেবে এবং 'ফিল্মটক্‌স'কে সবাই ভূঁয়ো বলে উড়িয়ে দেবে। আজ আমরা 'স্ক্রীন প্যারোটে'-র সঙ্গে জোর গলায় ঘোষণা কোর্‌ছি কানন আসচে ১লা নবেম্বর থেকে 'রাধা'-র কুঞ্জ ত্যাগ কোরে এন্‌টি-তে যোগদান কোর্‌বে। এবার 'ফিল্মটক্‌স' আমাদের এই সংবাদে কোন পথ অবলম্বন কোর্‌বেন তাই দেখবার জন্যে উদগ্রীব রইলাম।

রাত্রি

শ্রীহিমাংশুকুমার গুপ্ত

সূর্য্য যবে অস্ত যায় প্রান্তরের শেষ প্রান্তে
শ্রান্ত দেহে এলাইয়া শেষ রশ্মি জাল
অজানা দিগন্ত পানে পর্ব্বত বনান্তে
অভিশপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আসে রাত্রিকাল
আলোকের আশীষ বর্ষণ ক্ষান্ত করি
ক্রূর হিংস্র অন্ধকার নিষ্ঠুর ছায়ায়।
ধরণীর উচ্ছৃখাল দিবসেরে স্মরি
উঠে বারবার বন বনান্তে ছড়ায়॥
কেহত চাহেনা অন্ধকার, আলো চায়
উদার উন্মুক্ত নীল আকাশের বক্ষ হতে
যুগ যুগ তপস্যায় দেবতার আশীষের প্রায়
রাত্রির ব্যথার জ্বালা মুছাইয়া দিতে
নহে নহে নহে আলো আনে অন্ধকার
নিজের স্বরূপ দিতে রূপসীর প্রসাধন প্রায়
অন্ধকার যদি নাহি আসে বারবার
দিবসের এত রূপ রহিত কোথায়?
তবু মনে হয় শুধু আলো ছিল ভালো
অস্তাচলে শেষ দেখা দিয়ে যায় যবে
বিনিদ্র অতন্দ্র রাত্রি স্মরি
শিহরিয়া উঠি ভাবি আলো পাবো কবে॥

"গৃহদাহ"

চিত্রার সংস্কারকার্য্যে বিলম্ব ঘটায় "গৃহদাহে"-র মুক্তির দিন ধার্য্য হ'ল ১ই। আমরা সাগ্রহে সেই শুভদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

প্রথম পরিচয়

শ্রীগণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতকাল। সবেমাত্র ধূসর রংয়ে ঘনীভূত হ'য়ে সন্ধ্যাটা নেমে এসেছে। বৈদ্যুতিক আলোর ছটায় দিল্লী ষ্টেশনটা এতক্ষণে প্রসাধন শেষে নারীর রূপের মত কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে ঝল মলিয়ে উঠলো। ট্রেনের আনাগোনা আর লোকেদের গতি চঞ্চল মুখরতায় সমগ্র ষ্টেশনটা সজাগ,...গম্‌গম্‌ করছে।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রাচুর্য্যে একটি বাইশ বছরের বাঙালী যুবক সর্ব্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে এক নম্বর প্লাটফর্মে একটা বেঞ্চের ওপর স্থিরভাবে বসে রয়েছে।

এমন সময় দীর্ঘ দৌড়ের পর টুক্‌রো আলোর ঝিলিক ছড়িয়ে ক্যাল্‌কাটা মেল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকলো এক নম্বর প্লাটফর্মের ওয়েষ্টে।

ছেলেটার মনে অখণ্ড তন্ময়তা বারেকের তরে গেল থেমে। দীর্ঘায়িত দৈত্যরাজার পানে একবার চেয়ে পুনরায় আপন কার্য্যে জড়িয়ে গেল।

পিছন থেকে কে যেন এমন সময় জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি বাঙালী ?'

অভাবিত এ প্রশ্ন! কণ্ঠস্বরের নারীসুলভ কোমলতায় ছেলেটা বিস্ময়ে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে,...একটী বাঙালী মেয়ে!

আপাদ মস্তক এক ঝট্‌কায় দেখে নিয়ে বল্‌লে, 'হাঁ, আমি বাঙালী।...কেন বলুন দেখি, কোন দরকার আছে কি ?

অসঙ্কোচে মেয়েটা আগে থেকেই ওর পানে সাগ্রহে তাকিয়েছিল, এখন তারই ওপর একটু হাসি জুড়ে দিয়ে বল্‌লে, 'হাঁ দরকার আছে।'

যুবকটী দেখলে মেয়েটী বেশ সাহসী ও সহজ, কোন সঙ্কোচ নেই। ভাবলে, ক্যাল্‌কাটা মেল থেকে যখন নেমেছে তখন খুব সম্ভব কলিকাতাবাসীই হ'বে।

ভদ্রজনিত রীতিতে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, 'হাঁ বলুন কি দরকার ?'

লজ্জায় টনক্‌ পড়লো মেয়েটির চোখ দু'টীতে। একটি একটি ক'রে বল্‌লে, 'আমি ক'লকাতা থেকে আসছি। ভেবেছিলুম একলাই যেতে পারবো। কিন্তু এখানে এসে শুনছি, তালকটোরা এখান থেকে অনেক দূর—আ'র রাস্তাটাও নাকি খুব নির্জ্জন, তাই—'

বাকীটা যুবকই মীমাংসা করে দিলে। হেসে বল্‌লে, 'তাই একলা যেতে সাহস পাচ্ছেন না। আমি বাঙালী, যদি বাড়ী গিয়ে পৌছে দিয়ে আসি তাহলে বড় ভালো হয়, তাই না ?'

মেয়েটি অবাক! এ রকম উত্তর যে একজন ভদ্রমহিলার মুখের ওপর কেউ দিতে পারে তা সে আশাই করে নি। অবনত মস্তকে মৃদু কণ্ঠে শুধু বল্‌লে,'—হাঁ।'

চেয়ে দেখলে ছেলেটা ওরই পানে তাকিয়ে হাসছে। অনাবিল, স্বচ্ছ সে হাসি।

—'আচ্ছা জিনিষ-পত্তর কি সঙ্গে এনেছেন ?'

ঘাড় উঁচিয়ে মেয়েটা বললে, 'ওই একটা বেডিং আর একটা সুটকেশ।'

কিছুই আশ্চর্য্য নয়, আশায় বুক বেঁধে পূর্ব্ব হ'তেই দু'টো কুলি সশরীরে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত হাল্‌কা—মাল দু'টোকে ঘিরে পাহারা পর্য্যন্ত চলেছে।

ঠাট্টা ক'রে, ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কি ওই বৃহৎ মাল দুটোকে বইবার জন্য দুটো কুলিকেই নিযুক্ত করেছেন ? না আপনার সম্মানের মূল্য বাড়াতে স্বেচ্ছায় এসেছে ওরা ?

মেয়েটী মৃদু হেসে বল্‌লে, 'একজনের ওপরই ভার দিয়েছি, অপরজনের কথা তো বলতে পারি না।'

—'আপনি বলতে না পারলেও, গায়ের গন্ধ শুঁকে ওদের এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা পেকে গেছে। তারই জোরে ওরা টের পায় টাকা পয়সার ঝনঝনানি।'

বলতে বলতে ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে বেডিং আর বাক্সটা দু'হাতে তুলে নিয়ে ডাকলে, 'আসুন!'

মেয়েটী হতভম্ব!

কুলি দু'টো হৈঁই হৈঁই করে উঠলো, 'বাবুজি ইয়ে আপ কেয়া করতে হেঁ। মাঈজী হাম্‌লোকোঁকো পহলে দে—' বলতে বলতে ওদেরই মধ্যে একজন ছোঁ মেরে বেডিং আর সুটকেশটা কেড়ে নিয়ে বললে, 'আইয়ে মাঈজী!' মুখে তার সাফল্যের হাসি।

—'দেখলেন তো' ছেলেটি হাসতে হাসতে বল্‌লে, 'মাঈজী নামটা ব্যাটার আগে মনে পড়লো। বাবুজির গন্ধ শুঁকেই বুঝেছে।'

বাহরে আসতেই টাঙাওলায়া ছেঁকে ধরলো। অবাক কণ্ঠে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, 'এখানে ট্যাক্‌সী পাওয়া যায় না ?'

—'ক্বচিৎ, তবে এখানে বড় একটা পাওয়া যায় না। এখানে এই টাঙাই একমাত্র সম্বল। দরকার নেই ট্যাক্‌সীতে—আসুন!'

একটা টাঙার ওপর মেয়েটীকে বসিয়ে নিজে গিয়ে কোচয়ানের পাশে বসলো। চোখ মুখ বিকৃত ক'রে মেয়েটী বল্‌লে, 'ইস্‌, এ যে বড্ড নীচু!'

হাসির বেগ দমন ক'রে ছেলেটী বললে, 'উপায় নেই। দিল্লীতে এলে এ অসুবিধাটুকু সকলকেই ভোগ করতে হয়। কুতুবমিনার দেখে যে স্মৃতিটুকু তারা এখান থেকে নিয়ে যায় তার সঙ্গে এটাও তাদের চিরকাল মনে থাকে।...তা আপনি বেশ শক্ত করে ধরে থাকুন; নইলে অনভ্যাসে বলা যায় না, পড়েও যেতে পারেন।'

ভীত হ'য়ে মেয়েটী সবিস্ময়ে বললে 'এমনও হয় না কি?'

উচ্ছ্বসিত হাসি ছেলেটীর মুখ দিয়ে হড়হড় করে বেড়িয়ে গেল। অতিকষ্টে ধীর স্থির হ'য়ে বললে, 'না হলেও হতেই বা কতক্ষণ!'

কাজ কি বাপু! সাবধানের বিনাশ নেই! জড়সড় হ'য়ে মেয়েটী নড়েচড়ে বাগিয়ে বসলো।

টাঙা ছেড়ে দিয়েছে। কোম্পানি বাগানের (কুইন্‌স গার্ডেন) পাশ দিয়ে তখন 'ফোয়ারার' দিকে ছুটে চলেছে।

চুপচাপ।

হুহু করে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। হাড়ের ভেতর কাঁপন লাগিয়ে দেয়। রক্ত চলাচল যেন থেমে যায়। হাত পা অসাড় হয়ে আসে।

'আচ্ছা, আপনি কি এর আগে কখনো দিল্লী এসেছেন? বোধ হয় এই আপনার 'প্রথম পদার্পণ?' ছেলেটী বল্লে—

—'হাঁ এই আমার প্রথম।'

—'বেড়াতে এসেছেন বোধ হয়?'

—'হুঁ'—

বলে মেয়েটী সেন্টেড্ রুমাল খানা নাক-মুখের ওপর চেপে ধরলো।

—'তাহলে আপনাদের কলেজে এখন ছুটি বলুন?'

নির্ব্বিকার চিত্তে জবাব এল, 'কলেজে আমি পড়ি না।'

একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা আজ যদি না আমি থাকতাম, তাহলে কি হ'ত বলুন দেখি?'

অদ্ভুত ছেলে! অদ্ভুত এ প্রশ্ন! মেয়েটী যতই ওর ঘনিষ্ঠতায় আসে ততই তার আশ্চর্য্য লাগে। হাসতে হাসতে বললে, 'হ'ত আর কি—এই বিদেশে বিভূঁয়ে একটু কষ্ট হ'ত।

—'আমি রোজই থাকি। কাজকর্ম্মের পর ওই আমার আড্ডা। রাত দশটা অবধি খবরের কাগজ পড়ি। আর তাছাড়া ষ্টেশনে ঢুকতে পয়সাও লাগে না। সকলেই একটু আধটু চেনে শোনে। একদিনের ব্যাপার তো নয়।'

একটু থেমে বলতে লাগলো, 'আমার দেখা না পেলেও আপনার কোনই অসুবিধা হ'ত না। এতখানি পথ যখন একলা আসতে পেরেছেন তখন আপনি নিশ্চয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে অনায়াসে পৌঁছাতে পারতেন। আর তা ছাড়া ক'লকাতার মেয়েরা তো খুব Straight Forward শুনেছি। গায়ে ক্ষমতা না থাকলেও মনের জোর আছে এ, অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখুন, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা নাকি ঠিক তাদের উল্টো। দিনে দুপুরে পুকুর ঘাটে জল আনতে গিয়ে চুরি যায়!'

চাপা কণ্ঠস্বরে মেয়েটী বললে, 'আপনাকে এ সব কথা বল্লে কে?'

ছেলেটী এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি যে মেয়েটী রুমালে নাক ঢেকে দম আটকে বসে আছে। অনর্থক কষ্ট দিলুম আপনাকে সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে। আমার কাছে যেটা আরামের, অপরের পক্ষে সেটা অসহ্য। যাক গে। কি বলছিলুম,......হাঁ—এ সব বলে নি কেউ। আপনাদেরই বাঙলাদেশের কাগজে এসব কথা বেশ স্পষ্ট করে লেখা থাকে।'

সবিস্ময়ে মেয়েটী হাসতে হাসতে বললে, 'আমাদের বাঙলা দেশ মানে? বাঙলা দেশে কি আপনার ভাগ নেই?'

উত্তর এল, 'ছিল এক সময়ে। কিন্তু এখন তামাদি হয়ে গেছে।'

—'তার মানে, অনেকদিন হ'ল আপনি বাঙলা দেশ ছাড়া এই ত?'

—'অনেকদিন বলে অনেকদিন,...আজ প্রায় চোদ্দ বছর হ'ল।'

—'দেশের জন্য মন কেমন করে না?' মেয়েটীর কণ্ঠে সমবেদনায় কোমলতার ভাব প্রকাশ পেল।

—'হলেই বা আর কি করি বলুন। দেহের খোরাক জোগাতেই ফতুর হয়ে গেছি। মনের খবর নিতে সময় কই?'

এ কথায় কোনই জবাব নেই। নীরবে মেয়েটী তাই শুধু ছেড়ে আসা রাস্তার পানে চেয়ে রইলো।

'ঘণ্টা-ঘর' অতিক্রম ক'রে 'নয়া সড়কের' ভেতর দিয়ে গাড়ী এসে ঢুকলো 'চউড়ি বাজারে'। নীচে দোকান বাজার, ওপরে একতালা ভর্ত্তি সান্ত্বনা-প্রদায়িনী সর্ব্ব-নাশিনীরা সর্ব্বাঙ্গে সার্টিফিকেট্ এটে পথিকের হোঁচট্ খাবার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলেছে...

মেয়েটার মনে কেমন যেন খট্‌কা লাগলো। সন্দিগ্ধমনে ছেলেটার মুখের পানে তাকিয়ে বিচলিতকণ্ঠে বললে, 'এখান দিয়ে আমাদের যেতে হবে না কি? আর রাস্তা নেই?'

ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে ছেলেটী বললে, আছে। কিন্তু দিল্লী নিউদিল্লী যাতায়াতের মাঝে এই একমাত্র সোজা রাস্তা। এর হাওয়া গায়ে লাগাতেই হবে। ভাববেন না, দেশ বিখ্যাত রাস্তা দিয়েই আমরা চলেছি... ওই দেখুন আপনার সামনে রয়েছে 'জুম্মা মস্‌জিদ।'

মেয়েটী সাগ্রহে মস্‌জিদের গম্বুজটার ওপর দৃষ্টি ফেললে। বুকখানা নিমেষে তার ভার ফেলে দিয়ে সহজ অবস্থায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু আরও হাল্‌কা হয়ে গেল, যখন বাজার ছাড়িয়ে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় এসে পড়েছে।

আনন্দের আতিশয্যে মেয়েটী বললে, 'আপনার সঙ্গে আলাপ তো হ'ল, কিন্তু পরিচয় তো নেওয়া হ'ল না!'

হাসতে হাসতে ছেলেটী বললে, 'তার সূত্রপাত আগে তাহলে আপনার তরফ থেকে হ'ক।...আপনার নাম?'

—'আদৃতা গাঙ্গুলি।'

শুনে ছেলেটী আকাশ পানে তাকিয়ে হাসলে।

আদৃতার সন্দেহ হ'ল, ছেলেটী পাগল না কি? বিস্মিতকণ্ঠে বললে, 'হাসছেন যে বড়ো?'

হাসতে হাসতে সে তখন বললে, 'আমার নাম কি জানেন?...শ্রীপাঁচু গোপাল দাস। বড্ড সেকেলে নাম। বাপ মা সব দিক দিয়ে ফাঁকি দিয়ে গেছেন যেমনি, পিছিয়েও রেখে গেছেন তেমনি। আপনাদের ওসব নামে সত্যই বেশ মানায়। কিন্তু দুঃখ হলে কি হবে—বড়ো সান্ত্বনা যে ওইখানে,...কাণা ছেলে হয়ে পদ্মলোচন নামে আমার কি সার্থকতা?'

—'আপনি কি করেন এখানে?'

—'মোটর মেরামতের কাজ করি।'

—'আপনার আত্মীয় স্বজন?'

—হাঁ, আছেন কাকা আর খুড়ি। বাপ মা মারা যাবার পর ওরাই আমাকে অভাগা জেনে দয়া করে এখানে সঙ্গে করে এনেছিলেন। আমি তখন খুব ছোট। কিন্তু চিরদিন ওদের দয়ার ওপর নির্ভর করে এ হতভাগা গলগ্রহের বোঝা বাড়াতে পারলে না। বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি হ'ল। সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজের বোঝা এখন নিজেই তুলে নিয়েছি।'

এই সহজ কথাটার ভেতর যে কতখানি দুঃখ ও ব্যথা প্রচ্ছন্নরূপে জড়িয়ে আছে তা' যেমনি আন্তরিক তেমনি মর্ম্মান্তিক। নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করে যুবকটী আহত হয়েছে; একটু স্নেহ বা সহানুভূতি কোথাও পায় নি। অভাবের সময় না পেয়ে পেয়ে প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। কথাবার্ত্তা বাস্তবের মত সুস্পষ্ট। মনে হয় সে বিদ্রোহী—কিন্তু কারুর কাছে কোন আবেদন নেই, কোন অভিযোগ নেই।

—'আপনি একবার দেশ থেকে ঘুরে আসুন! হাজার হ'ক জন্মভূমি—নিজের দেশ!' সুমিষ্ট কণ্ঠে কথা ক'টা বলে আদৃতা পাঁচুর মুখের ওপর উত্তর প্রতীক্ষায় চোখ দু'টো তুলে দিলে।

রুদ্ধ আবেগে পাঁচুর বুভুক্ষিত অন্তরটা কেঁপে ওঠে...এমন ক'রে কেউ তো তাকে কোনদিন জন্মভূমির কথা বলে নি!...এত মিষ্টি স্বরের জন্মভূমি এতদিন কোথায় ছিল? পাঁচু তন্ময় হ'য়ে ডুবে যায়...এ কিসের বেদনা, এ কিসের অনুভূতি!

আবার সে শুনতে পেলে আদৃতার কণ্ঠস্বর! জন্মভূমির প্রতিনিধি হ'য়ে তারই দেশের মেয়ে তাকে শোনাতে এসেছে সুদূর দেশের মহিমা:

—'সেই কবে ছেলেবেলায় এসেছেন বলুন দেখি!...সে কি আজকের কথা—উঃ, চোদ্দ বছর দেশ ছাড়া! দেশকে ভুলে এ রকম করে থাকতে মন কেমন করে না? আমরা হ'লে কিন্তু থাকতে পারতাম না।'

পাঁচু নিরুত্তর। অন্যমনস্কের মত দৃষ্টি তার উদাস-বিহ্বল।

টাঙ্গা তখন নিউ-দিল্লীর দীর্ঘায়িত একটা পথ ধরে অভিভূতের মত গড়াতে গড়াতে চলেছে। এ চলা বুঝি আর থামবে না।

দু'পাশে সারি সারি গভর্ণমেন্টের কোয়ার্টার।, রাত ন'টা, তবু সব নিঝুম নিস্তব্ধ। নিরাশ্রয় পথিক শীতে কাঁপতে কাঁপতে সকাতরে চেয়ে দেখে শান্তির নীড় বেঁধে সুপ্তির আরামে সব স্তব্ধ। কোন ঘর থেকে দৈবাৎ হয়তো খানিকটা নরম আলো জানালায় কাঁচ রাঙিয়ে হতাদরে ঘাসের ওপর এসে শুয়ে পড়েছে। রাস্তার ধারে বিজলী বাতির পোষ্টগুলো মোহাচ্ছন্নের মত ঝিমিয়ে পড়েছে। একটি লোক নেই। নির্জ্জন রাস্তাটা অনাদরে খাঁ খাঁ করছে....

এমন সময় তাদের টাঙার পাশ দিয়ে সোঁ করে একটা মোটরকার ঝড়ের মত চকিতে মিলিয়ে গেল। হাওয়ায় কাঁপন লেগে টাঙার লোক ক'জন উঠল কুঁকড়ে। দুরন্ত বাতাস তাই না দেখে তীক্ষ্ণ দাঁত গুলো উঁচিয়ে ধরে উপহাস ভরে ছুটে চললো—হি-হি-হি!

ভালো করে র‍্যাপার খানা গায়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে আদৃতা জিজ্ঞেস করলে, 'আর কতদূর—'!

—'আর বেশী দূর নয়, এসে পড়েছি... ওই দেখা যাচ্ছে।'

একটু চুপ থেকে পরক্ষণেই বললে, 'কেন, আপনার কি খুব শীত করছে?'

—'করবে না;—বাব্বা যে হাওয়া—পৌঁছাতে পারলে বাঁচি।'

বলে পা দু'টো উৎসাহভরে গদিতে তুলতে গিয়ে আদৃতা হতাশায় তৎক্ষণাৎ নামিয়ে নিলে। সোয়াস্তিতে একটু বসবারও জো নেই। উল্টে আবার পড়ে যাবার ভয় আছে। উঃ...সত্যি তাই যদি হয়!... না না, সে এক বিশ্রী কেলেঙ্কারী!...বলাও যায় না, সাবধানে থাকা ভালো।...শক্ত ক'রে আদৃতা টাঙাটাকে চেপে ধরে বসে রইলো।

—'হাঁ এই যে এসে পড়েছি।...টাঙা রোক্‌কে।...বলুন আপনার ঠিকানাটা কি?,

আদৃতা প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়িতে বললে, 'অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলি।'

—'তাত হ'ল, কিন্তু বাড়ীর নম্বর কত?'

লজ্জিত হ'য়ে আদৃতা এবার সবগুলো একসঙ্গে বললে, '১৫নং—এ' ক্লাস কোয়ার্টার।'

নম্বরের পর নম্বরের সারি। খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হ'ল না। বেডিং আর সুটকেস্‌টা তুলে নিয়ে পাঁচু বাড়ীখানার পানে তাকিয়ে বললে, 'চলুন! গেট্ খোলা আছে। ভেতরে আলোও জ্বলছে।'

আদৃতা প্রতিবাদ করে বললে, 'কিন্তু এসব আপনি কেন? বাড়ীর চাকর এসে নিয়ে যেতো।'

মৃদু হেসে পাঁচু বললে, 'তা হ'ক গে—এতে দোষ নেই। আপনি চলুন—আর দাঁড়াবেন না।'

এর ওপর কথা চলে না। নীরবে আদৃতা বাড়ীর ভেতর গিয়ে ঢুকলো। ভেজান দরজাতে হাত রাখতেই ঘরখানা বিস্ময়ে ও আনন্দে সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। আদৃতার কাকা অবিনাশবাবুর গলা যেন উৎসাহের ঝলকে ভেঙ্গে পড়তে চায়:

'ওরে কে আছিস্ দেখে যা, আদৃতা এসেছে—আদৃতা!...ওরে ও পণ্টু, মাকে তোর ডেকে দে শীগ্‌গীর···আদৃতা এসেছে।' ···আয় আয়—দেখ দিকিনি' আমরা সব ভেবেই অস্থির। আর কে এসেছে?'

—'মা, মা—দিদি এসেছে!'

হন্তদন্ত হ'য়ে আদৃতার কাকীমা ছুটে এল।

'ও মা গো!···এ্যা, এত রাত্তিরে আসবি তা কি করে জানবো! সকালের ট্রেনে এলি না,—লোক ফিরে এল। তা এলেছিস, বেশ কোরেছিস—একখানা তার তো করে দিতে হয় মা?—তোরা সব সয় বাছা!—ওরে অ মণ্টু!···ঘুমিয়ে পড়েছে? ডেকে দে টপ্ করে। সকাল থেকে দিদি আসবে আসবে আসবে করে 'ছেলেটা নেচে কুঁদে সারা'

কাকীমার পায়ে একটা প্রণাম ঠুকে আদৃতা সহাস্যে উঠে দাঁড়াল, 'না কাকীমা ওকে আর উঠিয়ে কাজ নেই। ছেলেমানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমুক। সকালে উঠে দেখবে এখন।'

—'তা কার সঙ্গে এলি? এমন জানলে ষ্টেশনে লোক পাঠিয়ে দিতাম। দেখ দিকিনি শুধু শুধু কর্ম্মভোগ!'

—'একলা আসিনি কাকীমা, লোক আমি সঙ্গে করেই এনেছি।'

কাকীমা গোলক ধাধায় পড়ে গেল। আশ্বস্ত হ'য়ে বললে, 'তাই বল। মোহনকে সঙ্গে এনেছিস্ বুঝি?···তা গেল কোথায় হতভাগাটা, দেখছি না তো?'

মোহন হচ্ছে আদৃতাদের সাবেকী চাকর। কাকীমাকে অবাক ক'রে দিয়ে আদৃতা বললে, 'না, তাকে আনি নি। এসেছি আমি একলাই। তবে—'

কথাটা শেষ না করেই আদৃতা পিছন ফিরে তাকালে। মনে করেছিল পাঁচুবাবু হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন। বেডিং আর সুটকেশটা রাখা রয়েছে অথচ পাঁচুবাবু নেই। আদৃতার মনে পড়ে গেল স্ফূর্ত্তির হট্টগোলে সত্যই তাঁকে বিনা অভ্যর্থনায় বাইরের ঠাণ্ডায় ফেলে রাখা হয়েছে।

ব্যস্তসহকারে ঘরের বাইরে এসে দেখলে, টাঙাখানা চলে গেছে, উপরন্তু পাঁচুবাবুকেও দেখা যাচ্ছে না। তবে কি তিনি চলে গেলেন নাকি? উঃ—এত বড়ও মানুষ্যর

ভুল হয়? কি মনে করলেন তিনি…, ছিঃ! ছিঃ!

আদৃতা মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, 'পাঁচুবাবু, পাঁচুবাবু!'

টাঙাখানাকে বিদায় দিয়ে পাঁচু অন্ধকারে একটা অর্জ্জুন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ-বিহ্বল নেত্রে বাড়ীটার পানে চেয়েছিল। তন্ময় হ'য়ে শুনছিল আদৃতাকে ঘিরে তার কাকা ও কাকীমার আনন্দ-বিহ্বল ব্যস্ততা, ছেলেদের হাসিখুশী, চঞ্চলতা,…আর কেমন যেন অবশ হ'য়ে আসছিল, কল্পনায় ভাসছিল হয়তো এমনি—ঠিক এমনি একটা বাঙলাদেশের সংসারের অপার স্নেহ ভালবাসার ভেতর আপন সত্তাকে ছড়িয়ে দিতে…

অকস্মাৎ আদৃতার ডাকে ও চমকে উঠতেই অন্তরটা ঠেলে একটা উষ্ণশ্বাস নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল…ওরও আছে এক কাকা ও খুড়ি! তারা আর এরা! সে আর আদৃতা! হাসতে হাসতে পাঁচু অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়াল, 'কি বলছেন?'

আদৃতা যেন স্বর্গ পেয়ে চকমকিয়ে উঠলো' 'উঃ, কি বিপদেই না ফেলেছিলেন! মনে করেছিলুম—বুঝি চলে গেছেন। আসুন,—ভেতরে আসুন!'

আদৃতার পিছু পিছু কৌতুহল বশতঃ সকলেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। অবিনাশ বাবু এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে বললেন, আপনিই বুঝি আদৃতাকে পৌঁছে দিতে এসেছেন? ওঃ তা আসুন—আসুন! বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?…উঃ হাওয়া নয়তো যেন বরফ!'

মন্ত্রমুগ্ধের মত পাঁচু ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো। আদর আপ্যায়নের ত্রুটি রইলো না। গরম এক কাপ চা খেয়ে স্থির হ'য়ে বসে রইলো।

আদৃতা বললে, 'আপনি আসবেন মাঝে মাঝে। আপনার সঙ্গেই এখানে আমার প্রথম পরিচয়।'

কথাবার্ত্তায় ঠিক হ'ল ফোর্ট আর জুম্মা মসজিদ দেখতে যেতে হলে রবিবারে যাওয়াই ঠিক। কাকার সঙ্গেই সব পরামর্শ চলছিল আদৃতার। কাকীমা বাড়ীর ভেতর আহার আয়োজনে ব্যস্ত। পণ্টু ও শিণ্টু দিদির কাছ ছাড়া হতে রাজী নয়।

আদৃতা উৎফুল্ল হ'য়ে বললে, 'তাহলে তৈরী পাঁচুবাবু? আপনার ওপরই সমস্ত দেখাবার ভার। আসতে ভুলবেন না যেন। শেষে যে না বলবেন তা হবে না।'

পাঁচু সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইলো।…সত্যি সে কোথায় এসে পড়েছে! কথা কইতে সঙ্কোচ আসে! এদের সঙ্গে ওর যোগাযোগের কোথায় যেন মস্ত বড় ভুল জেগে রয়েছে। এ

তো ঠিক তা নয়, এ তো সবিনয় কৃতজ্ঞতা... তার উপকারের প্রতিদান!

একটু পরেই অবিনাশবাবুর বড় ছেলে নিখিল নৈশ আড্ডা থেকে বাড়ী ফিরলো। আদৃতাকে দেখে ওর আনন্দের সীমা নেই। বয়সে সে আদৃতার চেয়ে বড়।

একথা সেকথার পর শুনলে আদৃতা একলাই এসেছে, কিন্তু এইখানকারই এক-জন বাসিন্দা তাকে পৌঁছে দিতে এসেছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পাঁচুর আপাদমস্তক চকিতে লক্ষ্য ক'রে নিখিল বললে, 'ওঃ তাই না কি? বেশ বেশ, আপনি বুঝি শহরে থাকেন? কিন্তু কই আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না!

প্রসঙ্গটাকে চাপা দিতে আদৃতা বলে উঠলো, 'তুমি দেখ নি তাতে কি? শহরে কত লোক থাকে, তুমি কটাকে চেনো? থাক তো এই এক টেরে পড়ে।'

—'চা খেয়েছেন?'

এতক্ষণ পরে পাঁচু কথা কইলে, হাঁ খেয়েছি।'

ভেতরে ভেতরে পাঁচু চঞ্চল হয়ে উঠলো। নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি।'

—'এক্ষুণি যাবেন কি? সবিস্ময়ে আদৃতাও উঠে দাঁড়াল।

—'না রাত হয়ে যাচ্ছে। একলা আবার এতখানি রাস্তা যেতেও তো হবে।'

বাইরে তখন শীতের হাওয়া চটফট করছে। আদৃতার মনে পড়লো ঠাণ্ডার সেই একটা উৎকট ঝলকানি। একলা মানুষ, তায় আবার এতখানি রাস্তা। মনে মনে দারুণ শিউরে উঠে আদৃতা নিরুপায়ে মুষড়ে গেল, 'তাইতো এখন কি করা যায়! আচ্ছা—গাড়ী পাওয়া যায় না?'

—'না। তার কোন দরকার নেই, আমি বেশ যেতে পারবো'।

বলে বেরুবার মুখে হঠাৎ কি মনে পড়তেই পাঁচু মুখ ফিরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। হাত দু'টো জোর করে সবিনয়ে বললে, 'আচ্ছা, তাহলে আসি—নমস্কার!'

—'কিন্তু রবিবারে আসছেন তো?—'

আদৃতার অনুচ্চ কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যেই আটকে গেল। বাইরের হাওয়ায় মুক্তি পেয়ে পাঁচু তখন আলো-আঁধারে পথ বেয়ে হন্‌হন্ ক'রে এগিয়ে চলেছে।

নারীর প্রেম

সৌমিত্র দাশগুপ্ত

শোন শিশির! আমি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসিনি—সংসারই আমাকে বের ক'রে দিয়েছে। তাইতো জীবন আমার নিঃসঙ্গ, নিরালা।

শিশির, তুমি জানতে চেয়েছ কেন আমার জীবনটা আমি এক অখ্যাত পল্লীতে কাটিয়ে দিতে বসেছি, দেশের পর কি আমার টান নেই? আত্মীয়-স্বজন কি আমার ভাল লাগেনা? আমি কি কাউকে ভালবাসিনি।

তোমার শেষ প্রশ্নটার উত্তর দিতে গেলেই তার সাথে অন্য প্রশ্নেরও উত্তর এসে যাবে। আঠারো বছর বয়সে আমার জীবনে এল মনীষা। তাকে আমি ভালবেসেছিলাম, সেও আমাকে ভাল বেসেছিল। এই কটা কথাতেই সব শেষ হয়ে যেত কিন্তু শেষ হলনা।

জান শিশির, মিলন আমাদের হ'লনা—মনীষার বাবা তাকে বিয়ে দিলেন আমার চেয়ে উপযুক্ত পাত্রে। তারপর অনেকদিন তার খোঁজ করিনি।

চার বছর পরে তখন আমি এক কলেজের প্রফেসর...একদিন এক ভদ্রলোক এলেন আমার কাছে। তিনি আমার কাছে কি বলেছিলেন সব এখন বলতে পারবোনা... তবে তার সারমর্ম এই..."মনীষার অবস্থা খুব খারাপ, একবার দেখতে চায় আমাকে শেষ দেখা।"

তার অবস্থা শেষ ক'রেই দিয়ে এলাম। ঠিক করলাম জীবনে কোনদিন বিয়ে করবোনা। মা কত সেধেছিলেন বিয়ে করবার জন্যে,—মরার শেষ দিন পর্য্যন্ত বলেছিলেন বিয়ে করবার কথা, কিন্তু আমার জেদ আমি ছাড়তে পারিনি, প্রতিজ্ঞা রয়েছে অটল...এমনকি আজও।

মা মারা যাবার দু-বছর পরে একবার দেশে যাই। পাড়ার পাঁচু বাবু এসে বল্লেন, "সত্যেন আমার মেয়ে উর্ম্মিলা এবার ম্যাট্রিক দেবে, তোমার তো গরমের ছুটী অনেকদিন—এর মধ্যে যদি ওকে মাঝে মাঝে একটু ইংরেজী পড়িয়ে দিতে—"

বাবার বন্ধু পাঁচু বাবু, তার কথাটা রাখতে হল। ছুটীর ভেতর যে-কদিন দেশে ছিলাম, রোজই উর্ম্মিলাকে পড়িয়ে দিয়ে এসেছি।

হাঁ, ম্যাট্রিক উর্ম্মিলা ভালভাবেই পাশ করেছিল। পাশ ক'রে চিঠিও দিয়েছিল পাশের খবর জানিয়ে। আমার জন্যেই নাকি তার পাশ করা সম্ভব হয়েছে ভালভাবে...।

আমিও জবাব দিয়েছিলাম, "খবর জেনে খুবই খুশী হয়েছি।" কিছুদিন না যেতেই আর এক চিঠি এল তার। কত যে অবাস্তর কথা সব লিখেছিল তা' আজ আর মনে নেই—শুধু শেষের লাইন দুটো মনে আছে, মনে গাঁথা আছে—তা আজও ভুলতে পারিনি।

শুনবে শিশির—সে কি লিখেছিল? লিখেছিল,"......ভালবাসা বোধটা আমার জন্মেছে। হৃদয়ে আমার আপনার জন্যে যে

আসন পেতেছি, সে আসন চিরদিনের তরে পাতা থাকলো।"

জানো, চিঠি পড়ে' অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, মনে আঘাতও পেয়েছিলাম খুব। সে চিঠির জবাব দিলাম উর্ম্মিলার বাবার কাছে—আমার পক্ষে কাউকে ভালবাসা কি বিয়ে করা অসম্ভব জানিয়ে।......তারপর উর্ম্মিলার খোঁজ নেবার কোন প্রয়োজন মনে করিনি—দেশে আর কোনদিন যাবার ইচ্ছেও জাগেনি।

এ ব্যাপারের পরেও কলেজে অনেকদিন পড়িয়েছি। এক পুজোর ছুটীতে বন্ধু অনুরোধ ক'রে লিখলে যে এবার একমাসের জন্যে দিল্লীতে তার ওখানে পুজোর ছুটীটা কাটিয়ে আসতে। নিঃসঙ্গ জীবনে বন্ধুর সাথে কিছুদিন কাটিয়ে আসবো তা'তে তো আনন্দ আছে। পুজোর ছুটী আরম্ভ হতেই বন্ধুর ওখানে চলে গেলাম। যখন কোলকাতা থাকত বন্ধু, তখন তার বাড়ী কতদিন কাটিয়ে এসেছি। তাদের বাড়ীর প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার জানাশোনা। দু-তিন বছর পরে সবাইকে দেখে বেশ ভালই লাগলো।

কথা বার্ত্তা, আলাপ-আলোচনায়, জীবনটা ভরে উঠেছিল, মনে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম—যাক্, ক'দিন বেশ ভালই কাটবে—কিন্তু তা' আর হয়ে উঠলোনা। বন্ধু বললে, তার বোন লীনা নাকি মনের গোপন কোণে আমায় স্থান দিয়েছে। তাকে বিয়ে করবার কথা বললে সে নাকি বলে—সত্যেন বাবু ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবোনা"......

আর সবচেয়ে অবাক হলাম, যখন শুনলাম বন্ধু কোলকাতা ছেড়ে দিল্লী আসবার সময়ে আমার যে ফটো নিয়ে এসেছিল, সেইটেকে লীনা রোজ ফুলের মালা দিয়ে সাজায়।

বন্ধু জানালে আমাকে দিল্লী আনবার কারণই নাকি এই;—লীনার সঙ্গে আমার বিয়েটা পাকাপাকি ক'রে ফেলতে চায় সে।

আমি কিছুই বললাম না কিন্তু মনে খুবই যন্ত্রণা পেলাম, অসহ্য যন্ত্রণা। জান শিশির সে-দিন রাতের অন্ধকারে দিল্লী ছেড়ে পালালাম আত্মীয়-স্বজন, দেশ ছেড়ে চলে এলাম বেহারী মুল্লুকের এক গ্রামে।...

তারপর কত বছর কেটে গিয়েছে—কিন্তু আমি আজও পড়ে রয়েছি এই বিদেশে, শুধু সব ভুলে যেতে—নির্জ্জনতায় একেবারে নিজেকে মিলিয়ে দিতে।...

মনীষা আজ নেই, উর্ম্মিলা কোথায় জানিনে, লীনা আজও আমার ফটো পুজো করে কিনা তা জানবার কোন প্রয়োজন বোধ করিনে, কিন্তু—

আর এ পুরণো কথা আমায় মনে করিয়ে দিওনা শিশির; বুকের আগুন যে তাতে আবার জ্বলে ওঠে।

শ্রীদুর্ব্বাসা

Sign Off Bid :—Sign of bid সম্বন্ধে বহুবার আমরা আলোচনা করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এখনও অধিকাংশ কণ্ট্রাক্ট খেলোয়াড় এই ডাক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের ধারণা এই যে, খেঁড়ীকে ডাক বন্ধ করতে আদেশ দেওয়া ব্যতীত এ ডাক আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ডাক খেঁড়ীর ডাক থামাবার আদেশ স্বরূপ নয়, ইহা একটি সতর্কতার বাণী। যখনই কোন ক্রীড়ক এই ডাক দিতে চান্ তখনই বুঝতে হবে তিনি তাঁর খেঁড়ীকে বলতে চাচ্ছেন্, "বন্ধু, আমার হাতখানি বিশেষ ভাল নয়, সুতরাং যদি ডাক দেবার ইচ্ছা হয় তো নিজের হাত বুঝে ডেকো।" অধিকন্তু ডাকদারের ডাকে এমন কিছুই বোঝা যায় না, যাতে ডাক শুনা মাত্রই তাঁর খেঁড়ী তাঁকে ডাকতে বারণ করছেন। তবে তাঁর খেঁড়ীর উচিত ডাকদারকে তাঁর হাতের অবস্থার তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেওয়া। এরূপ করবার পর যদি ডাকদার আরও অগ্রসর হন তো হতে পারেন, তার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। এখন ধরুন আপনার হাত এইরূপ,—

ইস্কাবন—সাহেব, দশ, সাতা ; হরতন—বিবি, ছক্কা, পাঞ্জা, দুরি ; রুহিতন—টেক্কা, গোলাম ; চিঁড়িতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, নয়।

এই হাত নিয়ে আপনি ডেকেছেন একটি চিঁড়িতন, আপনার খেঁড়ী উত্তর দিয়েছেন একটি রুহিতন। এখন আপনি এই হাতে একটি ফেরাই ব্যতীত আর কি বলতে পারেন। তার কারণ (১) প্রথমতঃ পুনরায় চিঁড়িতনে ডাক দেবার অবস্থা আপনার নাই, (২) অন্য কোন রঙে ডাক দেবার ক্ষমতা আপনার নাই, (৩) রুহিতন রঙে সাহায্য করবার ক্ষমতাও উপস্থিত নাই, (৪) এবং সর্ব্বশেষে হাতের অবস্থা এমন নয় যে দুইটী ফেরাইএ ডাক দেওয়া যায়। এখন এ ক্ষেত্রের এই ডাকটি কি ডাক বন্ধ করবার আদেশ, তা নয়।

এই ডাকের তাৎপর্য্য এই যে, "বন্ধু, যদি তোমার ডাকটি minimum হাতের অবস্থায় ডাক হয়ে থাকে তাহলে নিম্ন ডাকের উপর ডাক থাকাই ভাল (Low contract), আর তা যদি না হয় তবে অন্য কোন রঙে বা ফেরাইএর ডাকে সাহায্য করতে পারি।

আবার ধরুন, আপনি একটি হরতনে ডাক দিয়েছেন, আর আপনার খেঁড়ী একটি ফেরাইএ ডাক দিয়েছেন ; তদুত্তরে আপনি দুইটী চিঁড়িতনে ডাক দিলেন, আর আপনার খেঁড়ী দুইটী ইস্কাবন বললেন। এই ডাকটিকে 'Sign off bid' বলে। কিম্বা, আপনার একটী ফেরাই-এর ডাকের পর আপনার খেঁড়ী যদি চিঁড়িতন ডাকেন, এবং পুনরায় আপনার দুইটী ফেরাইএর ডাকের পর আপনার খেঁড়ী যদি তিনটী চিঁড়িতনে ডাক দেন, তবে বুঝতে হবে যে এই ডাকটি 'Sign off' ডাক। এই ডাকের দ্বারা ডাকদারকে তাঁর খেঁড়ী বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, "আমার হাত ফেরাইএ খেলবার উপযুক্ত নয়, অধিকন্তু তোমার হাতের অনারের পিঠ নিয়ে দুইটী ফেরাইএর চেয়ে তিনটী চিঁড়িতনে খেলা যাবে ভাল, তবে এর পরেও যদি তুমি ডাক দাও তো নিজের হাতের শক্তি বুঝে দিও।"

পক্ষান্তরে ডাক যদি এইরূপ হয়,—মনে করুন আপনার একটি ইস্কাবন ডাকের পর খেঁড়ী একটি ফেরাইএ ডাক দিয়েছেন এবং অতঃপর আপনার দুইটী হরতনে ডাক দেওয়ায় আপনার খেঁড়ী উত্তর দিয়েছেন তিনটী ইস্কাবনে, তাহলে এই ডাকটি Sign off নয়। এই ডাকের অর্থ এই যে, "বন্ধু, তোমার হাতে যদি ডাকযোগ্য দুইটি রঙ থাকে, তাহলে ইস্কাবন রঙে আমাদের গেম নিশ্চিত বর্ত্তমান।" খেঁড়ীর প্রথম ডাক—একটি ফেরাইএর ডাকে তাঁর হাতের মূল্য ডাকদার জানতে পারছেন, তারপর দুইটী হরতনের ডাকের পর যদি তাঁর খেঁড়ী দুইটী ইস্কাবনে ডাক দিতেন তবে সেটী Sign off ডাক হত, কিন্তু তিনটী ইস্কাবনের ডাকের দ্বারা গেম সূচিত হচ্ছে। অতএব এইটী যেন Sign off ডাক বলে কেউ ভুল না করেন।

বেনিয়াপুকুর মিলন সঙ্ঘ :—

ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত বেনিয়াপুকুর মিলন সঙ্ঘের উদ্যোগে শীঘ্রই সিঙ্ লিকেট অক্শন ব্রীজ প্রতিযোগিতা বের হবে। অদ্য এদের প্রতিযোগিতার নাম গ্রহণের শেষ দিবস। এদের ঠিকানা, বেনিয়াপুকুর মিলন সঙ্ঘ, ২১, বেনিয়াপুকুর রোড, কলিকাতা। যদিও এদের প্রতিযোগিতা প্রথমে এই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেছে, তবু আয়োজনের উৎসাহ দেখে মনে হয় সাফল্য ও সুনাম এদের করায়ত্ত হবেই।

এসোসিয়েশনের নূতন সভ্য:—ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সম্পাদক মহাশয় জানাচ্ছেন্ যে, সম্প্রতি নিম্নলিখিত সমিতিগুলি এই এসোসিয়েশনের সভাভুক্ত হয়েছেন। কলিকাতা থেকে মোট চোদ্দটি সমিতি এবং ঘুঘুডাঙ্গা ও ভারতের রাজধানী সুদূর দিল্লী থেকেও এক-একটি সমিতির যোগদানে এই এসোসিয়েশনের শক্তি-বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেছি।

(১) বেঙ্গলী ক্লাব—কাশ্মীর গেট, দিল্লী।
(২) ইয়ং ফ্রেণ্ডস—ঘুঘুডাঙ্গা, ২৪পরগণা।
(৩) ইণ্টারন্যাশন্যাল্ ব্রীজ এসোসিশেন্।
(৪) সান্ধ্য মজলিস্।
(৫) সেণ্ট্রাল্ ক্যাল্কাটা ক্লাব।
(৬) নেপিয়ার স্পোর্টিং।
(৭) ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড ক্লাব।
(৮) ই, বি, আর ম্যান্সন্ ইষ্টিটুট্।
(৯) এস, এম, এণ্ড সি।
(১০) ভেনাস্ এণ্ড কমরেডস ক্লাব।
(১১) মিরাকেল্স ক্লাব।
(১২) ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন্।
(১৩) সাউথ ইণ্ডিয়া ক্লাব।
(১৪) বেনিয়াপুকুর মিলন সঙ্ঘ।
(১৫) ডজন্ ফ্রেণ্ডস।
(১৬) ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব।

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

পরলোকে আরভিং থ্যালবার্গ

আজকের দিনে আরভিং থ্যালবার্গ-এর নাম যদি কেউ বলে শুনিনি, সে ছায়া-জগতের এখনও নতুন লোক। যারা মেট্রো গোল্ড্‌উইন-এর নাম শুনেছে, যারা মেট্রোর ছবি দেখেছে তাদের কাছে থ্যালবার্গের পরিচয় নতুন করে দেওয়া যায় না। আরভিং থ্যালবার্গ মেট্রোর সুবিখ্যাত প্রডিউসার, অভিনয় কলাকুশলী নর্মা শিয়ারার-এর স্বামী একথা কি আমায় ছায়ারসপিপাসু জনের কাছে নতুন করে বলতে হবে?

সেই থ্যালবার্গ এই সেদিন নিউমোনিয়া রোগে মাত্র সাইত্রিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্রুকলিন সহরে থ্যালবার্গের জন্ম হয়। ছায়াছবিতে প্রথম জীবনে ইউনিভার্সাল পিকচার্স করপোরেশানে যোগ দেন। নিজের অসামান্য গুণ, ধৈর্য্য এবং প্রতিভাবলে থ্যালবার্গ একদিন পরিচালকের স্থান অলঙ্কৃত করে।

ও কাজ একদিন তিনি ছেড়ে দিলেন। এখন বড় পরিচয় হচ্ছে মেট্রোর প্রোডাকশান-চিফ। সারা দু'নয়ার সিনেমা জগতের লোক অন্ততঃ এই বলেই জানে।

দুনিয়ার দরবারে তার ছবির অবদান বহু মূল্যের এবং নানান রকমের। কিছুকাল আগে কলকাতায়, লোকে তাঁর দেওয়া যে ছবি দেখেছে তার নাম হচ্ছে 'ব্যারেট্স্ অব উইমপোল ষ্ট্রীট।'

থ্যালবার্গের নতুন অবদান 'রোমিও জুলিয়েট।' এই সেদিন ও ছবি তোলা শেষ হয়েছে। থ্যালবার্গের এই হচ্ছে শেষ ছবি।

দুটি শিশু সন্তান রেখে থ্যালবার্গ পরলোকে চলে গেলেন। এ শোক শুধু তাদের নয়, নরমার নয়, মেট্রোর নয়; সারা জগতের ফিল্ম-ফ্যানের, যারা তার অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে শিখেছে।

থ্যালবার্গ! তোমার আত্মা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করুক, তোমার নাম অমর হোক!

মুসোলিনীর অভিযান

যে নাম আছে ইউনিয়েন সোসিয়েলিষ্ট রিপাবলিক্স-এর ছবির, হলিউডের ছবির

গ্যারী কুপার

ডেনাহামের ছবির কিম্বা উফার ছবির সে নাম আনবে মুসোলিনি তার ইতালির ছবিতে। ফ্যাসিজমে উগ্র স্পর্শমণির প্রভা ফোটাবে দেশে দেশে, হিয়ার হিয়ার।

আজকে হলিউড বল্লে, ডেনহাম বল্লে, এলিষ্ট্রি বল্লে যদি কেউ ছবির কারখানার মুলুক ভাবে তাহলে কালকে রোমের নাম

কল্পে ওই রকম একটাও ভেবে নেবে,—রোমের নামান্তর রাজশক্তির অপূর্ব্ব প্রভুত্বের এই অভিলাষ।

তাই একশ পাঁচ একার জমির ওপর কাজ চলেছে দিনে রাতে বিরাম বিহীন বরষার মত। হাজারে হাজারে টাকার বেলুন উড়ছে। যাচ্ছে উড়ে দেশ দেশান্তরে। মুসোলিনীর নাকি জয়যাত্রা সুরু হোল। ছায়ালোকের আকাশে আসমানী রঙ বদলালো। মুসোলিনীর এই উচ্চ ঘোষণা দম্ভভরে এবং গর্ব্বভরে। আবিসিনিয়া জয়ের পর এই তার উর্ব্বর মস্তিষ্কের বহু প্রসারী কল্পনার দ্বিতীয় অভিযান।

যারা ভেনিসের একজিবিশনের খবর রাখে, তারা এইবার রাখবে রোমের ষ্টুডিওরও।

ইতালীর ষ্টুডিও

ইতালীর ষ্টুডিও। সারা জগতের নবতম আধুনিক ষ্টুডিও। টন টন সেলুলয়েডের ফিতের গাড়ী বেরোবে আর ঢুকবে দিনের পর দিনে! ল্যাবরেটারীর কাজ চলবে দিনে আর রাতে। তাই বসছে প্ল্যান্ট, প্ল্যান্ট আর প্ল্যান্ট।

সহরের মাঝখান থেকে তুমি ঘোড়া নিয়ে দৌড়ে যাও পনের মিনিট পরে তুমি পৌঁছে যাবে ষ্টুডিওর অন্দরে। আর টাকা!—ষ্টুডিও তৈরী হতে কত টাকা খরচ হচ্ছে জানো? হিসেব করো—২০০০,০০০ পাউণ্ড।

পাকা কথাবার্ত্তা আর বন্দোবস্ত হয়েছে অনেকের সঙ্গে। আমেরিকান প্রডিউসার ওয়ালটার ওয়ানগার-এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ! ইউনাইটেড আর্টিষ্টের ছবি বাজারে চলেছে ওরই অঙ্গুলী সঙ্কেতে। ওয়ানগারই হচ্ছে ইউনাইটেড আর্টিষ্টের একমাত্র ভার প্রাপ্ত প্রভু—সর্ব্বময় অধীশ্বর। কথা উঠেছে মেরী পিকফোর্ড নাকি ইউনাইটেড আর্টিষ্ট ষ্টুডিওতে ওয়ানগারের স্থান পূরণ করবে। এ খবর আগেই আমি দিয়েছি।

ওয়ানগার ইউনাইটেডের ষ্টুডিও ছেড়ে আসবে ইতালীতে। ইতালীর ছবি উঠবে ওরই কথায়—কলমের খোঁচায়।

ওয়ালটার ওয়ানগারের কথা বাদ দিলেও হলিউড থেকে আসবে আরো অনেক লোক জন। কত টেকনিসিয়ানরা, কত কর্ম্মচারীরা কত ষ্টারেরা। শুনলুম ফ্রেডারিক মার্চ্চ নাকিও আসবে।

ওয়ালটারের মতলব অনুযায়ী মুসোলিনীর পলিটিসিয়ানী মাথা স্বীকার করে নিয়েছে যে ছায়াছবির ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন লোকের অর্থাৎ

ফ্রেডারিক মার্চ্চ

ক্যামেরাম্যান, ডিরেক্টার, ষ্টার, সাউণ্ড রেকর্ডার যেই হোক তার আয়ের ওপর ইতালী গভর্ণমেণ্ট কোন করই বসাবে না। ইতালী ষ্টুডিও শীঘ্রী সুনাম অর্জ্জন করতে পারবে তার আর একটা কারণ হচ্ছে সারা ইউরোপের মধ্যে ওই একটা জায়গা আছে যেখানে 'কলার ফটোগ্রাফি'র আদর্শ জায়গা বলে ধরা যায়।

হ্যামলেট

যাক্! এতদিন পরে পর্দ্দার ওপর 'হ্যামলেট' নাটক ছবিতে রূপান্তরিত হবে। তবে সে ছবি হবে না হলিউডে, হবে না ডেনহামে, হবে না রোমে। এ ছবি তৈরী

সহযোগী

কুমারী শান্তি মুখোপাধ্যায়

স্তুতি নয় সখা, গুণগান নয়, কাব্যের মাঝে তব—
পেয়েছি আমার মরমের ছবিখানি,—
লহ' মোর নতি প্রাণভরা দান শ্রদ্ধায় অভিনব
প্রীতিভরা পূজা-সুন্দর তারে জানি।
নীরব হৃদয় উপভোগ করে তোমার বহ্নি-শিখা—
ভাষার মাঝারে জন্ম দিলে গো যা'রে;—
মণ্ডিত করি, গৌরবে ভরা সুন্দর তব লিখা
আমার বুকের তুচ্ছ শ্রদ্ধা-হারে।
ভাষাময়ী হ'ল রুদ্ধ আবেগ ব্যক্ত করিতে প্রাণ—
উচ্ছ্বাসময় দিকে দিকে হয় সারা—;
কশাঘাতে তা'রে জাগাবে কি সখা তুলি ভীম কলতান
মান অপমান হ'ল সেই জাতি হারা!
তোমার প্রতিটি লিখায় পেয়েছি রুদ্রের নব বেশ
দরদীর ব্যথা, শিব সুন্দর গান;—
পূর্ণ হউক বুকের রচনা উল্লাস-উন্মেষ
সার্থক হোক পবিত্র লিখা-দান!
কর' ক্লেদ দূর বহ্নি শিখায় পবিত্র খরশান
অপূর্ব্ব তব বিদ্যুৎ সম গানে
বক্ষের সুর তুল' অভিনব, বাঁচাতে জাতীয় মান
জননী, জায়া ও ভগিনীর সম্মানে,
ভাষায় আগুন ঢেলে দাও সখা—মিথ্যা রচনা যত
'কবি মশকে'র, ছারখার করি দিয়া,—
তব রচনার পশ্চাতে রবে শ্রদ্ধায় ভরা শত
আমার মতন নারীর নীরব হিয়া।
তৃপ্ত কামনা বাস্তব বলি' আনিয়াছে সেই ক্লেদ
দীন অভিহীন মশক কবিরা আজ
সভ্যভাবের-বহ্নি—বাতাসে তা'দের স্বৈরী স্বেদ
পুড়ায়ে দিয়ো গো মিথ্যা কামনা সাজ।
মন্ত্র বিষাণে গান গুঞ্জন তোল' সখা নব নব
স্বর্ণ চন্দনে নমস্য হোক টীকা—
বুকের অর্ঘ্য উচ্ছ্বসিত করি' প্রসারিণু করে তব
সার্থক হোক অপূর্ব্ব তব লিখা।

[* 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "কবিমশক" কবিতাটি উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার সাধারণ রচনার গুণাবধারণ—]

করবে 'ইউনিয়েন অব সোভিয়েট সোসিয়েলিষ্ট রিপাবলিকস্।'

এন ভি এক—নাম তোমাদের সকলের শোনা নেই। এ হচ্ছে রাশিয়ার খুব মস্ত নাম করা প্রডিউসার। 'দি রোড টু লাইফ' প্রভৃতি নাম-করা নীরব ছবির সুনাম অর্জ্জন করা যার জন্যে সম্ভব হয়েছে। দিন কতক আগে মস্কোর এক খবরের কাগজে লিখেছে—

সুবিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটকখানি দু'শ বছর আগেকার ছবি নিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আমি ছবির জন্যে আলাদা ভাবে ভাষান্তর করেছি।

যে ছবির সবাক সংস্করণ আজও ওদের দেশে তৈরী হোলনা, তাই সম্ভব হোল সুদূর রাশিয়ায়।

আজ পাঁচ বছর ধরে এন ভি এক 'হ্যামলেট' নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এতদিন পরে ছায়াছবিতে রূপান্তরিত করার মত হোল।

এন ভি এক-এর কাছে আরো ওর দেশ ঋণী, কারণ সোভিয়েট সাম্রাজ্যে প্রথম রঙীন চিত্র দেশের লোকের চোখে আনে এন ভি একই। সে ছবির নাম হচ্ছে 'নাইট-এ্যাঞ্জল,' 'লিটল নাইট-এ্যাঞ্জল।'

খুচরো খবর

চীনে এক্টরের নাম 'লি টাং ফু'। দি জেনারেল 'ডা'য়েড এ্যাট ডন' ছবিতে গ্যারী

ক্লার্ক গেবল

কুপারের সঙ্গে নেমেছে। লোকটি তিরিশ বছর ধরে অপেরা গাইছে।

* * *

'ইয়াঙ কাম' এক রকম বাজনা। আড়াই হাজার বছর আগে তার জন্ম হয়েছে। 'দি জেনারেল ডায়েড এ্যাট ডন' ছবিতে বাজান হয়েছে।

* * *

ক্লার্ক গেবল আগে ছিল ষ্টেজের সুপার।

জন ফোর্ডের পরের ছবি হচ্ছে 'দি প্লাউ এ্যাণ্ড দি ষ্টার'। নামবে এতে বারবারা ষ্ট্যানউইক।

* * *

রবার্ট টেলর ডাক্তারী ছেড়ে এ্যাক্টর হয়েছে।

* * *

এরিক ব্লোর স্ক্রীনের নাম-করা কমেডিয়ান। এক সময়ে লণ্ডনের ষ্টেজ থেকে লোকের আজ্ঞায় বিদায় নিতে হয়।

রক্তের টান

শ্রীহরিদাশ গুপ্ত

দশ বৎসরের বালিকার জন্য জনৈকা বয়োজ্যেষ্ঠা অভিভাবিকা শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা-গ্রাজুয়েট হইলে ভাল হয়। জাতি-বর্ণের কোন বাঁধাবাধি নাই। ন্যূনতম বেতন গ্রহণযোগ্য উল্লেখ করিয়া শীঘ্রই মিঃ এফ এন গুপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম, নিকট আবেদন করুন"

শীলা স্থানীয় কাগজে উক্তরূপ বিজ্ঞাপন খানি দেখতে পেয়ে আগ্রহের সঙ্গে সেখানি দু'তিনবার পড়ে নিলে। বয়স তার হয়েছে। বি, এ পাশ করেছে—অনেকদিন আগে। জাতিবর্ণেরও কোন বাধা নেই; এবার হয়তো তার চাকুরীখানি মিলতে পারে। দুর্বিবহ হয়ে উঠেছে তার জীবন। কিছুতেই যেন দিন কাটতে চায়না। এ চাকুরিটী পেলে স্বচ্ছন্দে তার দিনগুলো চলতে পারবে। সে রাইটিং প্যাডটি খুলে লিখতে আরম্ভ করলো -একখানি আবেদন। তারপর তক্ষুনিই পোষ্ট অফিসে যেয়ে সেখানি ডাকে ফেলে দিয়ে এলো......

দরখাস্ত receive করছেন Mrs. Gupta। একদিনের মধ্যে রাশি রাশি আবেদন তার কাছে এসেছে, কিন্তু কাউকে যেন তার পছন্দ হয় না। শীলার আবেদনখানি পড়ে মিস গুপ্তা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সুন্দর লেখা—সরল, স্বচ্ছ অথচ ঝঙ্কারময়। লেখিকা নিশ্চয়ই প্রতিভাশালিনী। তিনি নিজেও গ্রাজুয়েট, কিন্তু সাত জন্ম ধরে তপস্যা করলেও হয়তো তারই স্তরে পৌঁছতে পারবেন না।

Mr. Guptaর অফিস থেকে ফিরবার অপেক্ষা না করে তিনি তাকে চিঠি লিখে দিলেন।

মহাশয়া,

আপনাকে আপনার প্রার্থীত পদে নিযুক্ত করা হোল। অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী ২৫শে জুলাই, নয় ঘটিকার সময় আমার গৃহে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন।

ইতি, মিসেস এন গুপ্তা,
C/o মিঃ গুপ্ত।

শীলার বুকখানি আনন্দে নাড়া দিয়ে উঠলো। সে তবে চাকুরীখানি পাবে। আরো দুটি দিন তাকে কাটাতে হবে। তারপর সেই সরল বালিকার সঙ্গিনী, সে মনে মনে একটী পবিত্র সরল বালিকার সুন্দর একখানি মুখ কল্পনা করতে লাগলো।......

২৫শে তারিখ। সকাল হয়নি তখনো। শীলা শয্যাত্যাগ করেছে। তার চোখে ঘুম নেই। সে যে চাকুরীতে হাজির হতে চলেছে!...ঘড়ি যেন আজ কিছুতেই বাজতে চায়না। সবে মাত্র সওয়া আটটা। না—আর দেরী করে লাভ নেই। সে এক খানি কালো-পাড়ের শাড়ী পরে হাটতে সুরু করলো। F. N. Guptaর বাড়ী। বেশী দূর নয়। ক'মিনিটের মধ্যে সে সেখানে যেয়ে পৌঁছলো। Mr. Gupta Deputy Magistrate হলেও তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটী চালে

থাকেন। Bodyguard—boy—চাপরাশী আয়া, মালী ইত্যাদিতে ঘরখানি ভর্ত্তি হয়ে আছে।…

শীলা সেখানে পৌছে তার নাম লেখা একটা কার্ড চাপরাশীর হাতে দিল, বললে; মায়জীকো দেনা।

শীলা স্ত্রীলোক। তার উপর আভিজাত্যের লক্ষণ যেন তার চেহারায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, তাই bodyguard কিংবা অন্ত কেউ তাকে কোন প্রশ্নই করলো না। সে গেট পার হয়ে উঠানে একখানি ফুল গাছের কাছে যেয়ে একটা ফুলের রূপ দেখতে লাগলো। ভারী সুন্দর ফুল, কিন্তু গন্ধ নেই। আমাদের পলাশের মতো গুণহীন। কিন্তু বিলিতি ফুল, তাই তার আদর যথেষ্ট—গুণের জন্ম না হলেও সৌন্দর্য্যের জন্ম।

Mrs. Guptaর খাবারের plate তখনো ফুরোয়নি। শীলার কার্ড পেয়ে তিনি তাঁর কাঁটা চামচটি হাতে নিয়েই বার হয়ে এলেন।

শীলা তাকে good morning দিলে। তিনি এগিয়ে এসে তাকে hand-shake করে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন।

Mr. Gupta তাঁর শোবার ঘরেই ছিলেন। তাঁর সকাল বেলার চা' সেখানেই serve করা হয়েছিল। চা খাওয়া শেষ করে তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে সেদিনকারই একখানি Statesman পড়ছিলেন। পরনে তখনো night gown আছে।

শীলাকে আরেকটা ঘরে বসিয়ে Mrs. Gupta, Mr. Guptaকে বললেন একবার এদিকে এসো রুবির টীচারকে দেখতে। কি fine selectionই আমি করেছি। বেশ elderly; বয়েস আমাদের চেয়ে ঢের বেশী হবে। তিনি লিখেছেন তিনি নাকি 1910এ বি, এ, পাশ করেছেন। তখন আমাদের জন্মও হয়নি। মিঃ গুপ্ত তেমনিভাবে বললেন; All right তাঁকেই appointment দাও।

—বাঃ, তুমি বুঝি একটু দেখবেও না তাকে?

—তোমার উপর আমার আর কি করবার আছে?

Your decision is final my darling.

শীলার জন্ম চা আনা হোল, চায়ের টেবিলে বসে Mrs. Gupta শীলার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করলেন। কথা প্রসঙ্গে শীলা বললে—সে বড় দুর্ভাগিনী, তার সবই ছিল আজ সব হারিয়ে জীবনের শেষ সীমায় এসে তাকে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ম চাকুরী খুঁজতে হচ্ছে। বাড়ী ঘর ঠিকানা তার কিছুই নেই বললে চলে… শীলার জন্ম Mrs. Guptaর মনে দয়া হোল। বললেন আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে বাইরের ঘরটা আপনাকে দেওয়া যেতে পারে। আপনি হবেন রুবির মাষ্টার আর আমার old companion.

শীলা কোন আপত্তি করলো না।… সে রুবির মাষ্টার। তাকে পড়ায়। বড় ভাল মেয়ে, অসাধারণ তার ধী-শক্তি। তাকে পড়িয়ে সে আনন্দ পায়। ছোট্ট মেয়ে অথচ শিখবার কী গভীর আগ্রহ। শীলা তার জীবনের সকল দুঃখ ভুলে গেল।—

Mrs. Gupta শীলার উপর ভারী খুসী। যখন তার যা দরকার অমনি তাকে তা' দেন। কিন্তু Mr. Gupta তাকে সন্দেহের চোখে দেখেন। আরেকটি নারী তাঁদের সংসারে এসে পড়েছে যার কুলশীলমান তার জানা নেই।—

সেদিন ছিল একটা "tea party" শীলা সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছিল। ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল অনেক রাত। রুবি তার পড়ার ঘরে অনেকক্ষণ ধরে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

Mr. Gupta Mrs. Guptaকে বললেন এ রকম teacher তুমি ঠিক করেছ যার

"পারিনা সহিতে আর্ত্ত নিরন্নের নিত্য হাহাকার!"

শ্রীঅখিলচন্দ্র ঘোষ

আমার জননী কাঁদে, মা আমার কাঁদে অবিরল,
আমার ভগিনী কাঁদে কত স্নেহ আদরের বোন,
আমার প্রেয়সী কাঁদে দু'নয়নে বহে বন্যাজল
আমার স্বদেশ কাঁদে আর কাঁদে সপ্তকোটী মন!

আমি যে পারিনা ভাই, সহিতে যে পারিনাকো আর!
নিস্ফল কান্নার স্রোতে ভেসে চলে সব সত্তা মোর,
পারিনা সহিতে আর্ত্ত নিরন্নের নিত্য হাকাকার,
কি নিয়ে কবিতা লিখি? কোথা পা'ব ভাব-স্বপ্ন ঘোর?

কোনো সুখ নাই বন্ধু এ জীবনে কোনো সুখ নাই,
কত চিতা জ্বলে গেল থামিলনা মৃত্যুর উৎসব
বিষাক্ত বাতাসে ওড়ে ভস্মীভূত সভ্যতার ছাই
তবু আছে আত্মম্ভরী সমাজের প্রাণহীন শব!

এই ত বিষয় বস্তু, সাহিত্যের নিত্য উপাদান!
বৃথাই খুঁজিয়া মরি এ অরণ্যে আদর্শের পথ,
মুমূর্ষু জাতির মাঝে কে রাখিবে জাতীয় সম্মান?
সভ্যতার মৃত আত্মা পড়ে আছে ভগ্ন-মনোরথ!

তবু দিকে দিকে হেরি অর্ব্বাচীন বালখিল্যদল,
মৃতা নির্য্যাতীতা যতো তরুণীর হৃদয় হরণে—
রচিছে কুৎসিত কাব্য দোষদুষ্ট-সাহিত্যের মল
আর্ত্তা-রমণীর বক্ষ নিস্পিষিত করিয়া চরণে।

সাহিত্য লক্ষ্মীর কান্না, অনাদৃতা ভারতীর গীতি—
কে শুনেছে কান পেতে, উপযুক্ত কে আছে সন্তান?
সিংহচর্ম্ম আচ্ছাদিত গর্দ্দভেরা রচিয়া দুর্নীতি—
কামান্ধ বর্ব্বর সম জীবাত্মার করে অপমান!

ঐ শোন্ কাঁদে মাতা, অভাগিনী নারীর ক্রন্দন,
ঐ শোন দিকে দিকে ভগিনীর ভীরু আর্ত্তনাদ,
ওরে মৃত তবু তোর কাঁপেনাকি বক্ষের স্পন্দন
আসন্ন ধ্বংসের দিনে নেমে আসে ক্রুর দুঃখবাদ।

ছিন্ন কন্থা পরিহিতা ভিখারিণী দেশ মাতৃকার
রে অযোগ্য সন্তানেরা চেয়ে দেখ ম্লান মুখপানে,
বাণীর কমল বনে তোর ঘৃণ্য সাহিত্যান্যকার
থামা ওরে মূর্খদল আত্মহত্যা করি বিষপানে!

চরিত্র সম্বন্ধে আমার ভয়ানক সন্দেহ হয়। আয়ুষ্মতী সে, কিন্তু তার স্বামী কোথায় কেউ জানে না। সিন্দুর পরে মাথায়। মনে হয় হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু—! তাকে আমি না রাখাই ভাল মনে করি। শেষকালে আমার মেয়েটিও জাহান্নামে যাবে। Mrs. Gupta বললে! তোমার এ look o suspicion আমি মোটেই পছন্দ করিনে।

শীলা এসে ঘরে ঢুকলো। light জ্বলেছে দেখে Mr. Gupta তাকে ডেকে বললেন Mrs. Sen, Mrs. Sen! শীলা সেখানে এসে দাঁড়ালো।

Mr. Gupta বললেন I doubt your movements. You may better shift elsewhere ; (আমি আপনার গতিবিধি সন্দেহ করি। আপনি অন্য কোথাও চেষ্টা করুন)।

শীলা চোখে মুখে আঁধার দেখলো। এতদিন পরে যে একটি আশ্রয় পেয়েছিল, আজ যে সেই আশ্রয়শূন্য হলো। আবার তার ঘর হলো উদার পৃথিবী, চন্দ্রাতপ হলো নীলাকাশ।

দুঃখ নেই। দুঃখের মধ্যে যে কাটিয়েছে। দুঃখকে জয়ও করেছে খানিকটা। এতদিন সুখের মধ্যে থেকে আজ সে কেমন করে দুঃখকে বরণ করবে? সে জন্য তার মনে ভয়ানক চিন্তা হোল। কী সে করবে।

Mr. Gupta তার আত্মসম্মানে ঘা' দিয়েছেন। তাঁরা সব কিছু বলতে পারেন।— Deputy Magistrate, বড়লোক License তাঁদের তো আছেই চিরদিনের জন্য।

শীলা বললে: আপনার যদি আমায় ভাল না লাগে আমি কালই যেতে পারি। যে পথে ছিলুম, আবার সেই পথে যেয়ে দাঁড়াবো এই বই তো নয়।

Mrs. Gupta বললে না; না তা' কেন হবে? আপনি রুবির teacher, তার শিক্ষার ভার আপনার উপর, আপনি regular হলেই হবে যথেষ্ট।

—Regular? regular তো আমি আছিই। তবে আমিও মানুষ। দুনিয়ায় আমার আত্মীয় কেউ নেই! কারো সঙ্গে আমি মিশতে চাইনা, তবু যারা আমায় ডাকে, তাদের সঙ্গে বসে দু'একটি কথা বলাও যদি irregularity হয় তাহলে আমার এখান থেকে যাওয়াই ভাল, মা—।

শীলার চোখে জল দেখা দিলে। Mrs. Guptaর মনে বাস্তবিক দুঃখ হলো। Mrs. Sen বড়ই দুঃখিনী। Mr. Guptaর কথায় তিনি বড়ই wounded হয়েছেন।

শীলা যখন ঘুম থেকে উঠলো। তখনো আকাশের চাঁদ অস্ত যায়নি। হাস্নুহানার গন্ধ বাতাসের সাথে ভেসে এসে তার নাকে লাগছে। কী মিষ্টি গন্ধ! তার পুরানো হারানো দিনের কথা মনে পড়লো। এমন একদিন ছিল, যখন রোজ সন্ধ্যায় শিশিরসিক্ত সদ্য হাস্নুহানার থোকা তুলে এনে সে তার ঘরে রেখে দিত, আর Mr. Sen তার চুলের খোঁপায় একটি একটি করে ফুল সাজিয়ে দিয়ে বলতেন;—ফুলে তোমায় বেশ মানায় শীলা।

শীলা তখন দর্পনে তার চেহারাখানি দেখে নিয়ে ফুলগুলি ঠিক করে দিতে দিতে একটু একটু হাসতো। স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগলো তার সেই অতীত দিনগুলো। বেশীদিন নয়। এ জন্মেই সে পেয়েছিল এমন আনন্দের আস্বাদ, কিন্তু অচিরে সে সব হারিয়েছে, অথচ সবই তার ছিল, ইচ্ছা করলেই সব সে পেতো। কিন্তু বড় অভিমানিনী সে, তার উপর আত্মসম্মান জ্ঞান অসামান্য প্রবল।...

Mr. Senকে ছেড়ে সে চলে এসেছিল একদিন শুধু তিনি তার উপর দুর্ব্ব্যবহার করেছিলেন বলে,—তার আদরের কন্যা— স্নেহের দুলালী বুকজুড়ানো ধন সেই "এমিলি" তাকে সে ত্যাগ করেছিল জন্মের মতো। তারপর সে তাদের ভুলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বুকের ভেতর হাহাকার অব্যক্ত বেদনা চিরদিনের জন্য জমাট বেঁধে আছে।...

Mrs. Senএর মৃত্যুর খবর সে পেয়েছে খবরের কাগজে। কিন্তু Emilieর সম্বন্ধে সে কিছু জানেনা।

এই Mrs. Gupta ঠিক এমিলিরই মতো। সেই ছোট এমিলিও হয়তো এতদিনে ঠিক তারই মতো হয়েছে।

...সেদিন তার সকল সন্দেহই ঘুচে গেছে। Emilieর হাতের একটি আঙুল জন্ম হতেই এতটুকু বিকৃত। Mrs. Gupta যখন সেদিন রাত্রে একটি বই তুলে নিচ্ছিলেন, তখন সে তা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কিছু বলবার সাহস তার হয়নি। তার প্রতি Mrs. Guptaর অনুকম্পার মূলও হয়তো তাই। সে নিজে যা জানেনা, তার অন্তর থেকে কে যেন তা' তাকে কানে কানে বলে দিয়েছে। শীলার অবস্থা ঠিক তেমনি। শীলাও প্রথমদিন থেকেই Mrs. Guptaকে ভালবেসে ফেলেছে।

কিন্তু আজ তাকে যেতে হবে। Mrs. Gupta যে Emilie তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তা ছাড়া Mr. Gupta তাকে জবাব দিয়েছে।...কিন্তু এই যদি Emilie হয়?...

কোন মুখে সে তাকে তার পরিচয় দেবে? সে তো তাকে জন্মেথেকেই ফেলে গেছে। আজ এতদিন পরে সে যদি তাকে তার পরিচয় দিতে যায় তা'হলে Emilie হয়তো তার উপর হবে ভয়ানক রাগ। কিন্তু না—সে জন্যতো Emilieর বাবাই দায়ী। তিনি যার সর্ব্বস্ব নিয়েছিলেন। তিনি আরেকজন নারীর প্রণয়ভিক্ষার্থী হয়ে তার পত্নীর অবমাননা করেছিলেন। তার উপর তাকে ঘর থেকে বার হয়ে যেতে বলাতেও কুণ্ঠা করেন্‌নি। তাই সে চলে এসেছে। এজন্য তার কোন দোষ হয়নি।...Emilie

ও নির্দ্দোষ। Mrs. Guptaই যদি Emilie হয় তবে ভালো। Emilie তার মাকে দেখেছে এই গৌরবও হয়তো সে করতে পারবে একদিন। সে ঠিক করলো—একখানি চিঠি সে লিখবে—Emilieকে।

কালিকলম নিয়ে লিখলো :—

Emilie,

সত্যিই যদি তুমি Emilie হও, তাহলে আমার আশীষ নিয়ো। তোমার অভাগিনী মা কেন তোমায় ফেলে চলে গিয়েছিল তা' হয়তো তুমি শুনেছ।—তোমায় বুকে করে আমার ইচ্ছা ছিল সব যন্ত্রণা ভুলবো, কিন্তু তোমার উপর অধিকার আমার চেয়ে তোমার বাবারই নাকি ছিল বেশী। তাই, তোমায় বাধ্য হয়ে তাঁর কাছে রেখে আসতে হলো। তারপর কী করে আমি জীবন কাটিয়েছি তা' বলবার সময় এখন নয়। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না জানি না।...দুঃখের বোঝা বইতে সংসারে এসেছিলাম, তোমার কাছে এসে সেই দুঃখ ভুলেছিলাম—আজ আবার চলেছি—সেই দুঃখকে বরণ করে নিতে। তুমি সুখী হও, মা আমার। মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা তুমি—আশীর্ব্বাদ করি স্বামীর সোহাগ তোমার সেই দুঃখ ভুলা'ক।

ইতি, লীলা সেন।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে Mrs. Gupta তাড়াতাড়ি লীলার ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘর খোলা জিনিষপত্র সব ঠিক তেমনিই আছে।—লীলা নেই। তার টেবিলে একখানি চিঠি।

গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লীলার চিঠিখানি পড়ে Mrs. Gupta কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। মা—মা—তিনি তবে তাঁর মা। দেবী এসেছিলেন তাঁর ঘরে, তিনি তাকে চিনতে পারেননি। Mrs. Gupta আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।

Mr. Gupta আর্ত্তনাদ শুনে সেই ঘরে এসে দেখলেন Mrs Gupta. সংজ্ঞাহারা হয়ে মেঝেয় পড়ে আছেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন্ না।

তার হাতের মুঠোর ভিতর তখনো তা'র মার চিঠিখানা ছিল। Mr. Gupta চিঠিখানা পড়ে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার মন দুঃখে পরিপূর্ণ হলো। পবিত্রতার জন্য যিনি সকলের সেরা আসন দাবী করতে পারেন, তিনি তাকে অমূলক সন্দেহ করেছেন—সেজন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন। ডাক্‌লেন—Emilie। Emilie।

চেতনা হলে Emilie বললে, আমার মাকে ফিরিয়ে আনো—আমার মা—যাকে আমি চিরজীবন খুঁজে বেরিয়েছি, তাকে আমি কাছে পেয়েও হারালুম। মা!—মা!

Mr. Sen মরবার সময় Emilie আর Guptaকে সব কথাই বলে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের দোষ স্বীকার করে গেছেন। আর বলেছেন—Mrs. Senএর সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা যেন তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। নইলে তাঁর আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হবেনা, মুক্তির সোপানে পৌছেও সোপানাবলী অতিক্রম করতে পারবে না।...

Mr Gupta মোটর হাঁকিয়ে রাস্তায় বার হয়ে পড়লেন।

Mr. Senকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেলনা।...Parkএর সামনে মানুষের ভিড় দেখে তিনি সেখানে মোটর থামালেন।—দেখলেন একটি মৃতদেহ বার করে নিয়ে আসছে ক'জন লোক। যারা তাকে চেনে তারা বলাবলি করছে খুব বড়লোকের মেয়ে ছিলেন ইনি। কিন্তু ভাগ্যদোষে আজ এমনি করে তিনি আত্মহত্যা করলেন।

Mr. Gupta এগিয়ে গিয়ে দেখলেন লীলা সেনেরই মৃতদেহ। সে উন্মত্তবৎ সেই মৃতদেহের উপর লাফিয়ে পড়লো।...সবাই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো। Mr. Guptaও তার স্বামীর অনতিকাল পরেই Taxiতে করে বা'র হয়েছে। Parkএ এসে সে যখন শুনতে পেলো এখানে কে একজন জলে ডুবে মারা গেছে, Mr. Gupta তার কাছে বসে কাঁদছেন তখন আর্ত্তনাদ করতে করতে সে ছুটে গেল। তারপর তার নিস্পন্দ মায়ের বুকের উপর পড়ে খুব করে কাঁদলো—

—মা আমাদের মধ্যে রক্তের টান ছিল বলেই তোমায় না চিনে না দেখেও আমি তোমায়ই বেছে নিয়েছিলাম। আজ তোমায় চিনেছি—এসো মা—অভাগিনীকে মাতৃস্নেহের সুধা পান করতে দাও—মা! মা!

বাংলার হিরো

শ্রীসমিরেন সেন

বাংলা দেশে হিরো নেই। যারা আছে
র্য্যায়ে নয়। হিরো
। বাংলার ছায়াছবিতে

আছে ভাল জানি।
রোর কারোর। তবু
লতেই হবে যে, যার
টিং করে না ভাল।
ঃ ভাল তার চেহারা

রার চেয়ে হিরোয়িণ
শ হিরো নেই। যা
? রকম আর কিছু।
এবং প্রচুর পরিচিত
া যাক!—সে হচ্ছে
নাম আছে,—বক্স-
।· গুণেরও গরিমা

গোলাপের গুঞ্জনা।
কে আমি বলছি,
। তোমার সুশ্রী ও
ষ্ঠ হাত এসে রেখা
র চোখে দীপ্তি নেই।
মাথা ঢাকতে ওপরে

সজো না! তোমার
তুমি হিরো সাজো
য় দেখে মনে হয়েছিল
লাভেই এ বাড়ীতে
নয়। এ কথা মনে
—প্রথম, ছবির উদ্দেশ্য-
বুঝের অভিনয় আর
দি মীরার মায়ের সঙ্গে
টাই দেখাবে ভাল। সরযুর হাত ধরে বুড়ো মহিম প্রেম জানাবে' টানাটানি করবে—এ সত্যিই বিশ্রী লাগে দেখতে এবং শুনতে।

আর অভিনয়! মূক ছবির দিনে সত্যি তুমি ভাল অভিনয় করতে। সবায়ের ভাল লাগত। আর এই সবাকের যুগে তোমার অভিনয় একটাও আমার ভাল লাগে নি। একমাত্র 'ভাগ্যচক্র' যার উদ্দেশ্যহীন চরিত্রে তুমি অবুঝের অভিনয় করলেও, তোমার বচন ভঙ্গী ছিল সিনেমার উপযোগী। আর কোন ছবিতেই তুমি তোমার মেলো-ড্রামাটিক আবৃত্তি একেবারে মুছে ফেলতে পার নি। ফ্রেডারিক মার্চের ছবি দেখতে তুমি নাকি বড্ড ভালবাস! তার আবৃত্তি কি তোমার পছন্দ হয় না।

এরপর ধীরাজ! তোমার নাম করতে হবে। বাংলা দেশের তুমি আর একজন হিরো, যার নাম আমরা অনেকদিন থেকে শুনে আসচি। সেই নির্ব্বাক ছবির দিনে দুর্গাদাসের পর তুমিই ম্যাডানের অঙ্গন আলোকিত করেছিলে। কত ছবিতেই না অভিনয় করলে! কত রকম সে চরিত্র! কিন্তু কি করলে। নাম কিছু পেয়েছ!—যা পেয়েছ সে হচ্ছে বদনামের বোঝা।

সুন্দর তোমার চেহারা মানি। আরো মানি, কি করে ভাল অভিনয় করব তার চেষ্টাও আছে। তুমি কি চেননা তোমার চোখ দুটোকে। আমি কি বলব? সে কথা বলেছে তো অনেকে অনেক রকমে। ছায়াছবিতে পুরুষেরা তোমায় ঘৃণা করে, মেয়েরা ধিক্কার দেয়, ওঁরা দেখে তোমার চলা, বলা, চাওয়া সব মেয়েদের মত। তাই এ পুরুষ কিম্বা মেয়ে কেউই সহ্য করতে পারে না। তোমার ওই কম্পমান ভীরু ভীরু চটুল চাহনি, পেলব কমনীয় কণ্ঠে মৃদু ভাষণ, ধীর পায়ে মরাল গমন কার ভাল লাগবে বল?

তোমার সেই "ল্যাব, ল্যাব" আজও আমি ভুলতে পারিনি, ধীরাজ। বোটে করে এলে তুমি আর 'লব'। আমার মনে হোল লবের পাশে বুঝি তার বনের কোন ডার্লিং। ভাগ্যিস সেই ডার্লিং এর ওপরের গায়ে কোন বসন ছিল না! ছিঃ ছিঃ তা হলে লোকে কী ভাবতো বলতো!

অপরের কথা ছেড়ে দাও ধীরাজ। কে কি বলে, পারো তো তাদের মুখ থেকে শুনতে চেষ্টা ক'রো। আমার কথা হচ্ছে তোমার দুখানা ছবি আমার ভাল লেগেছে। তুমি দুবারই সেজেছ কেষ্ট। তুমি যে বাংলার ছায়াছবির কেষ্ট। শুনেছি বাংলার এক নাম করা ডাইরেক্টার তোমায় ভালবাসে। তুমি তার ছবির হিরো। দেখো আর 'ল্যাব, ল্যাব' ক'রো না। অদূর ভবিষ্যতে তোমার ফিরে যাওয়া আশ্রয় ষ্টেজের লোকেরাও চিনে ফেলতে পারে।

ধীরাজ সিড চ্যাপলিনের কথা তোমার মনে আছে? তার ছবির গল্পের কথা তোমার কোন পরিচালক ভাবতে পারে না। আমার মনে হয় তুমি সেই রকম গল্প আর চরিত্রে নাম কিনবে।

এরপর হিরো জহর। বাংলার ষ্টেজের দুরন্ত দুলাল—দুলাল।

আর একদিন বলব বন্ধু আজ ক্ষমা কর। বাংলার হিরোর সবায়ের নাম একসঙ্গে করতে গেলে আমার এই মাপের জায়গা টুকু ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে যাবে। তাই এইবারের মত থামলুম।

সংখ্যা -

ভারতে সুপরিচিত

নারিকেল

তৈল

গন্ধ গৌরবে

অপ্রতিদ্বন্দ্বী

জুয়েল

অফ্ ইণ্ডিয়ার

অতুলনীয় প্রসাধন দ্রব্যে

শারদীয় উৎসব

পূর্ণ করুন

22 KT. রোল্ড গোল্ড

গ্যারান্টি ৩ বৎসর

নূতনত্বের অপূর্ব্ব সমাবেশ

পূজা সেল   পূজা সেল

শারদীয় পূজায় বিশেষ করিয়া

মহিলাদের

আধুনিকতম রুচিসঙ্গত

গহনার অতি

আয়োজন।

নেকলেস্, এয়ারিং, ব্রুচ্

ইত্যাদি

নানাপ্রকার রোল্ড গোল্ড

ও ক্যারেণ্ট গোল্ডের

গহনা।

যাবতীয় শোভন

দ্রব্যাদি

আশাতীত সুলভ মূল্যে

বিক্রয় হইতেছে।

পছন্দের জন্য সারা বাজার

ঘুরিতে হইবে না, আপনাদের

যাহা কিছু রুচি সম্মত তাই

আমরা জয় করিয়াছি।

দেরী করিয়া হতাশ হইবেন না,

এই অনুরোধ।

ন্যাশনাল রোল্ড এণ্ড

ক্যারেট গোল্ড সিণ্ডিকেট

৭০ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"খেয়ালী"

ফার্স্ট ন্যাশন্যাল পিকচার্সের প্রথম ছবি "সরলা"-র
একটি দৃশ্যে শ্রীমতী সরলা ও তারা ভট্টাচার্য্য।
পূজোর সময় ছবিখানা চলবে "শ্রী" চিত্রগৃহে।

মূল্য—চার আনা মফঃস্বলে—পাঁচ আনা
Price -/4/- Mofussil -/5/-

পরিচালক
টেলিগ্রাম ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ টেলিফোন
'ভ্যারিটি' ৯, রামময় রোড, কলিকাতা পার্ক ৩২৪
প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ণধার

শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী

কে বলে খেয়ালী তুমি ? ধ্রুবপদ তোমার সঙ্গীত—
এ নহে হেঁয়ালী কথা ;—যতদূর শুনেছি শ্রবণে,
বুঝেছি তোমার বাণী, দেবতার প্রাণের ইঙ্গিত,
দেশের কল্যাণ লাগি'—সত্য বার্ত্তা জানি যাহা মনে।
দুর্দ্দিনের অন্ধকারে দুর্গত যে দেশের তরণী
চলেছে বন্দর পানে এ তুফানে বাহি' জীর্ণ হাল,
তোমার প্রদিপ্ত রশ্মি ক্ষণে ক্ষণে দেখায় সরণি
কুয়াশার তন্দ্রা টুটি',—আশায় ফুলিয়া উঠে পাল !
কর্ণধার ! তবু বলি হুঁসিয়ার—আরো হুঁসিয়ার,
বহু যাত্রী তব সঙ্গে এ দুর্য্যোগে দেয় আজি পাড়ি ;
রাখিয়া সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, শক্ত হাতে কাটায়ে পাথার,
তীর্থ-মন্দিরের তীরে পার করো সবারে কাণ্ডারি।
কে বলে খেয়ালী তুমি ? মিথ্যা কথা, রাখো এ হেঁয়ালী ;
আঁধারে উঠুক ফুটি শক্তিমন্ত্রে তোমার খেয়ালী।

সুভাষচন্দ্র

ওগো তরুণের প্রিয় বান্ধব দেশের প্রিয়
শ্রদ্ধায় আজ তোমার চরণে প্রণাম করি ;
'দেশবাসীদের অন্তর ভরা শ্রদ্ধা নিয়ো
"শতায়ুর্ভব," কর্ম্মের জয় পতাকা ধরি' ;
হে সুভাষ তুমি সর্ব্বহারার ব্যথার সাথী
দরদীবন্ধু, তাই আজ হ'লে বন্দী তুমি
হাসি মুখে কত আঘাত সহেছ বক্ষ পাতি
ধন্য তোমারে বক্ষে ধরিয়া জন্মভূমি।

স্বেচ্ছায় তুমি করেছ বরণ নির্য্যাতনে
দলিত ক্লিষ্ট পতিত জাতির দুঃখ দেখে
দেশের সুপ্তি ভাঙ্গাতে গিয়াছ নির্ব্বাসনে
বাংলা মায়ের শুভাশিষ টীকা ললাটে এঁকে।
হে বিজয়ী বীর স্বদেশাত্মার মুক্তি পথে
রাজৈশ্বর্য্য ফেলে রেখে গেছ তুচ্ছ করি'
প্রবল আত্মা সারথী তোমার কর্ম্মরথে
বাঙ্গালীর তরে রাখিয়াছ প্রেম মর্ম্মভরি।

আত্ম জীবনে যশাকাঙ্খায় মত্ত হ'য়ে—
ভোল নাই কভু দেশজননীরে অন্ধ সম
নির্ভয়ে তাই স্বরাজ মন্ত্রে দীক্ষা লয়ে
সর্ব্ব ত্যাগের ব্রতে ব্রতী হ'লে হে প্রিয়তম।
শারদোৎসবে তোমারে আজিকে বরণ করি
এস ফিরে ভাই দীর্ঘায়ু আর সুস্থ মনে
যৌবনে যোগী এস গৈরিক পতাকা ধরি'
নব জীবনের নব আশা দাও জাতির মনে।

কাস্তে-হাতুড়ী জিন্দাবাদ

উনপঞ্চাশী

বাইরে বেশ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বারটাও ছিল রবিবার—কারও আফিস যাবার তাড়া নেই। আর তার উপর খুড়োর চায়ের ভাণ্ডারও ছিল অফুরন্ত। কাজেই তর্কটা বেশ জমে উঠেছিল।

রাইচরণ তৃতীয় কাপটা শেষ করে বেশ গম্ভীরভাবে বললে—"দেখ, ও-নিয়ে আর টানাটানি করে কোন লাভ নেই। ডাক্তার বদ্দিতে যখন রকম বেরকম ওষুধ দেবার পর হালে পানি পায় না, তখন বলে—nature এর উপর ছেড়ে দাও। হিন্দু-মুসলমান problem এরও সেই অবস্থা। যে নেতার পেটে যত বিদ্যে ছিল, সব উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হয়েছে, Unity Conference হয়েছে, Round Table হয়েছে, খিলাফৎ হয়েছে, জিন্নার সঙ্গে রাজেন্দ্র প্রসাদের মুখ শোকাশুকি হয়েছে, মহাত্মাজীর blank chaque হয়েছে—কিছুতেই কিছু হয় নি। কাজেই ও-নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করে বিশেষ লাভ নেই। যা হবার তা' হবে।"

পল্টু তরুণ কমুনিষ্ট। সে বলে উঠল—"চিকিৎসা হয়েছে না ছাই হয়েছে। যা হয়েছে এ পর্য্যন্ত তা সব আনাড়ীর চিকিৎসা। কাজেই ফলও হয়েছে অশ্বডিম্ব। হিন্দু মুসলমানকে যদি কেউ মেলাতে পারে ত তা' ঐ Hammer and Sickle!

ভট্‌চায এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। ধাঁ করে চায়ের কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখে সে সোৎসাহে বলে উঠল—"ঠিক বলেছিস্ পল্টু! যদি কেউ কিছু করতে পারে ত ঐ Hammer and Sickle। মারো মাথায় হাতুড়ি, আর দাও কাস্তে দিয়ে দাড়ী কেটে, ব্যস। তৎক্ষণাৎ মিলন।"

পল্টু চোটে গেল। বললে—"আলো-চাল আর কাঁচকলা-খেকো বুদ্ধি কিনা। তার দৌড় আর কতদূর হবে। দেখ ভট্‌চায। কাস্তে দিয়ে শুধু যে দাড়ীই কাটা যায়, তা নয়; টিকিও বেশ কাটে। আর ঐ ঘণ্টা-নাড়া হাতে হাতুড়ী খেলবে না।"

ভট্‌চায নীরবে বাকি চা-টুকু শেষ করে নিলে। তারপর নিতান্ত ভাল মানুষটীর মত বললে—"আহা। চটিস কেন পল্টু, আমি ভাল কথাই বলেছিলুম। তা তোর মনঃপুত না হয়, ত তুই তোর পেটেণ্ট ডাওয়াইটীরই ব্যাখ্যা কর। কাস্তে আর হাতুড়ী দিয়ে তুই কি রকম হিন্দু মুসলমানের amalgam তৈরি করবি, তা শুনে আমরা ধন্য হই।"

পল্টু বললে—"হিন্দু-মুসলমানে মিলছে না, এ কথার সোজা মানে হচ্ছে এই, যে দু দলের যে সমস্ত মাতব্বরদের একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা হচ্ছে তাঁদের সবাই ইংরেজের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়েছেন, পয়সা রোজগার করেছেন, এবং আপাততঃ ইংরেজী শাসনের কারখানায় বড় বড় foreman হবার চেষ্টায় আছেন।

তাঁদের মন্ত্রী হওয়া চাই, legislative assemblyর মেম্বার হওয়া চাই, সরকারী চাকরী পাওয়া চায়—তা' না হলে তাঁদের আরামে দিন কাটবে না। এখন দু দলে মাতব্বরের সংখ্যা যত, সরকারী চাকরীর সংখ্যা ত আর তত নয়। কাজেই কামড়া-কামড়ি অনিবার্য্য। নিত্য নূতন চাকরী আদায়ের principle আবির্ভাব হচ্ছে। যাঁদের লোকসংখ্যা বেশী তাঁরা বলছেন, লোকসংখ্যার অনুপাতে চাকরী দাও, যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি বেশী, তাঁরা বলছেন বিদ্যাবুদ্ধির মাপে চাকরী দাও…যাঁদের বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা নেই, এবং বিদ্যা-বুদ্ধিরও অভাব, তাঁরা রাজভক্তির দোহাই দিচ্ছেন। ইংরেজও নিজের সুবিধা মত এক একটা principle মেনে নিচ্ছে। যাদের অসুবিধা হচ্ছে, তারাই চীৎকার করছে।" চাকরী ত আর অফুরন্ত নয়, কাজেই দু দলের চাকরীর উমেদারদের ভিতর মিল অসম্ভব।"

খুড়ো একটা হাই তুলে বললেন—"তা হলে ঘুরে ফিরে ত সে একই কথা আসছে বাপধন—মিলন অসম্ভব! তোমার কাস্তে হাতুড়ী কাজে লাগল কই?"

পল্টু একটু হেসে বললে—"স্থির হোন, খুড়ো। এইবারে কাস্তে হাতুড়ী আসছেন। মাতব্বরদের দল ছাড়া বাকি যত হিন্দু মুসলমান আছে, তাদের প্রধান সম্বল হচ্ছে ঐ কাস্তে আর হাতুড়ী; অর্থাৎ তারা হচ্ছে চাষী আর মজুর।

সরকারী চাকরীর উমেদার তারা নয়; কে কাউন্সিলে গিয়ে বাহার দিয়ে বসবে অথবা ইংরাজী ইডিয়ম ছুঁড়ে মেরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কাৎ করে দেবে, সে ভাবনা তাদের নেই। সুতরাং মাতব্বরেরা যে সব ব্যাপার নিয়ে আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি করেন, সে সব ব্যাপার নিয়ে এদের মাথা ঘামাতে হয় না। এদের ভাবনা কেমন করে এদের মজুরি বাড়বে, মাঠে বেশী ফসল হবে, আর

জমিদার মহাজনের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে এরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে বেঁচে থাকবে। এ সব ব্যাপারের সঙ্গে দাড়ী, টিকি, কলমা গায়ত্রী কোন কিছুর সম্বন্ধ নেই। এখানে হিন্দু মুসলমান সকলেরই এক স্বার্থ। সুতরাং এই সমস্ত স্বার্থ কেমন করে রক্ষা করা যেতে পারে শুধু তাই নিয়ে যদি আন্দোলন করা যায়, তা'হলে হিন্দু মুসলমান সবাই তাতে সমান ভাবে যোগ দেবে। সবাই বুঝবে যে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, সকলেরই স্বার্থ এক; আর সেই এক স্বার্থের অনুসরণ করতে করতে আসবে প্রকৃত মিলন।"

ভট্চায এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এইবার বলে উঠল—"সাবাস! সাবাস! কাস্তে হাতুড়ী জিন্দাবাদ!"

রাইচরণ একটু বিরক্ত হয়ে বললে—"শুধু ঠেঁপোমি করলেই ত হয় না। কথাটা একটু ভেবে দেখা উচিৎ।"

ভট্চায বললে—"বৎসগণ! ক্রুদ্ধ হয়ো না। ভাবতে গেলেই আমার ভাব লেগে যায়। পল্টুর বর্ণিত কাস্তে হাতুড়ীর মহিমা শুনতে শুনতেই আমি ভাব নেত্রে অদূর ভবিষ্যতের ছবি বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলুম। বেশ বুঝতে পারলুম নদী, নালা, খাল, মাঠ, জঙ্গল, পাহাড়, কল, কারখানা সমস্তই দেশসুদ্ধ সব লোকেরই সম্পত্তি বলে গণ্য হয়েছে। জমিদার, মহাজন কলওয়ালার বালাই ঘোটেই নেয়, আর দেশের লোকের প্রতিনিধি হিসাবে পল্টুর কাস্তে-হাতুড়ী বাহিনী দেশ-শাসনের ভার নিয়েছে। লোকের পেট ভরেছে; সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; পাছে কেউ চুরি করে সুখের মাত্রা অপরের চেয়ে অযথা বাড়িয়ে নেয়, এ বিষয়ে খপরদারির আর অন্ত নেই। কিন্তু—"

পল্ট হেসে উঠল—"এই যে! খুঁজে খুঁজে একটা "কিন্তু" ঠিক বের করেছ! নৈয়ায়িক পণ্ডিতের বংশ কি না—একটা ফাঁকি বের করতে না পারলে ওর বংশ-মর্য্যাদাই যে নষ্ট হয়ে যায়!"

ভট্চায বললে—"না ভাই পল্টু; তোমাদের ফাঁকিটা এতই স্পষ্ট যে তার ধরবার জন্যে নৈয়ায়িকের দরকার হয় না। পেটের জ্বালা যে কত বড় জ্বালা তা এই গরীব বামুনের ছেলেকে আর বুঝাতে হবে না; কিন্তু পেটের জ্বালা মিটলেই যে মানুষের সব অভাব মিটে যায়, তার যে অহঙ্কার নষ্ট হয়ে যায় বা পরের ঘাড়ে নিজের মতামত চাপিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কমে যায়, তার ত কোন প্রমাণ পাই নে। মানুষের মনটা যদি উদরের By product হতো, তা হলে পেটের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হয়ত মনের তৃপ্তিও আসত। কিন্তু লক্ষণ দেখে ত তা মনে হয় না। কাজেই যে রোগের উৎপত্তি মনে, পেটের উপর পুলটিস লাগালে তা সারবে কেন?

খুড়ো বললেন—"তাই ত রে। পল্টু ত যাহোক একটা হেস্ত নেস্ত করে এনেছিল। ভট্চায আবার কি ফ্যাসাদ বাঁধালো? শেষে কি হিন্দু-মুসলমান মেলাবার জন্যে mental hospital খুলতে হবে না কি?"

ভট্চায বললে—"প্রায় তাই বটে। এই ত সেদিন মুসলমানদের একজন মস্ত বড় পাণ্ডা ব্যবস্থা পরিষদে বলে বললেন—তাঁদের ধর্ম্মটা হচ্ছে একেবারে ভগবানের খাস-দপ্তর থেকে আমদানি। আর বাকি সব ধর্ম্মের উৎপত্তি অন্যত্র। এ রকম মনোভাব যদি শিক্ষিত মানুষের ভেতর থাকে, ত মুর্খ কাস্তে-হাতুড়ী-ওয়ালাদের ভিতর থাকবে না কেন? এখন একদল কাস্তে-ওয়ালা যদি মনে করে তারা ভগবানের পুষ্যিপুত্তুর, আর বাকি সবাই ত্যাজ্যপুত্তুর, তা হলে অপর একদলও ঠিক তাই মনে করতে পারে; দু-দলের পেট ভরা থাকলেই যে তারা সকলকেই পুষ্যিপুত্তুর বলে মনে করবে, তার ত কোন মানে নেই। কাজেকাজেই কে পুষ্যিপুত্তুর আর কে ত্যাজ্যপুত্তুর তার একটা মীমাংসার জন্যে কাস্তের সঙ্গে কাস্তের যুদ্ধ লেগে যেতে কতক্ষণ?

পল্টু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এইবার বলে উঠল—"ভুল করছ ভট্চায। আমার pointটাই তুমি ধরতে পার নি। আমার pointটা হচ্ছে—"

খুড়ো টীপ্পনি কেটে বললেন—"Something which has no position no magnitude."

খুড়োর বিশাল ভুড়িটার দিকে দেখিয়ে পল্টু বললে—"না খুড়ো মশাই, আমার pointএর magnitude ঠিক আপনার ভুড়িটার মত না হলেও একেবারে যে নেই তা বলা যায় না। আমি বলছিলাম এই যে রাতারাতি যদি মানুষের পেটের জ্বালা মিটে যায়, তাহলে তাদের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা কমুনিষ্ট ব্যবস্থার সময়েও থাকতে পারে বটে, কিন্তু ঐ অবস্থা আনবার জন্যে যদি হিন্দু মুসলমানে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা করে, তা'হলে সেই চেষ্টার ফলে তাদের পরস্পরকে জানবার সুবিধা হবে; আর ভাল করে জানাজানি হলেই বাজে জিনিষ নিয়ে তারা আর মারামারি করতে যাবে না।"

ভট্চায বললেন—"আবার যে ন্যায়ের ফাঁকি চালাচ্ছ, বাপধন! কোন্টা বাজে জিনিষ আর কোন্টা কাজের জিনিষ তাই নিয়েই ত মাথা-ফাটাফাটি। তোমার কাছে ধর্ম্মমতগুলো বাজে জিনিষ বলে মনে হচ্ছে বলেই যে তোমার কাস্তে-হাতুড়ী পন্থী সকলেরই তাই মনে হবে, তা ধরে নিচ্ছ কেন? আর একসঙ্গে অনেক কষ্ট সহ্য করেছ বলেই যে দুজন লোকের বা দু দলের লোকের ষোলআনা মনের মিল হয়ে যায়, তাই বা কে বল্লে? তা যদি হতো,

ত Irish Republicanরা মাইকেল কলিন্সকে খুন করতো না। মুসলমানেরা অপরের সঙ্গে লড়বার সময় এক; কিন্তু তাই বোলে মিয়া মুল্লির লড়ায়ে মাথা ফাটা-ফাটি ত কম হয় নি! আসল কথা ত আমার এই মনে হয় যে মানুষ যতক্ষণ নিজের মতকে অভ্রান্ত ভেবে তা' জোর করে পরের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করবে, ততক্ষণ সে capitalistই হোক্, আর communistই হোক, ধর্ম্মের গোঁড়ামি, আর মাথা ফাটাফাটি অনিবার্য্য।"

খুড়ো বলে উঠলেন—"হায় রে। আবার সেই অনিবার্য্য। যাতে ওটা নিবার্য্য হয়, তার একটু পন্থা বাৎলে দাও না বাপ।"

ভট্‌চায হেসে বল্লে—"অজ্ঞানের নিবারণ হয় জ্ঞানে। বিনামূল্যে জ্ঞান আমি দিতে রাজী আছি, কারণ বাবুদের ঐ ব্যবস্থা। কিন্তু পল্টু তাঁয়ার কাস্তে-হাতুড়ি ধারী নধী শৃঙ্গীয়া তা নেবে কি? সোজাকথা বলতে গেলে মহাত্মাজী থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত জহরলাল পর্য্যন্ত সবাই যে বলেন—চুপ। চুপ

পরিবর্ত্তনের পথে কংগ্রেস

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর দুস্তর পথ বাহিয়া জাতীয় মহাসমিতি আজ যে সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে তাহা যেমন একদিকে ভারতের রাষ্ট্রনীতিজগতে একটা ভাব-বিপ্লবের সূচনা করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি তাহা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও একটা পরিবর্ত্তনের আভাষ দিতেছে। রাষ্ট্রজগতেই এই পরিবর্ত্তনের ফল অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে, না সামাজিক জীবনেই এই বিপ্লবের ফল হইবে সুদূর প্রসারী তাহা পলিটিক্যাল গনৎকারগণের হিসাব-নিকাশের অন্তর্ভূক্ত। তবে কংগ্রেসের স্থাপনা হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার ইতিহাস-বিবর্ত্তন আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, ব্রিটীশ-শাসন-তন্ত্র হইতে ক্ষমতা আদায় করিয়া আত্মবশ শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, তাহা আজ বৃহত্তর পৃথিবীর চিন্তাধারা হইতে খোরাক সংগ্রহ করিয়া সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের পথে ব্যাপকতর স্বাধীনতার পথ খুঁজিতেছে। তাই কংগ্রেসের রাজনীতির নোঙর আজ তাহার ক্ষুদ্র ঘাটের সীমা ছাড়াইয়া পাড়ি জমাইয়াছে সেই মহাসমুদ্রে যেখানে তাহার লক্ষ্যস্থল শুধু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা আহরণ নয়, বা ইংরাজ শাসক-তন্ত্রের পরিবর্ত্তে দেশীয় শাসক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়, তাহার লক্ষ্যস্থল সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার এমন একটা ওলোট-পালট সৃষ্টি করা যেখানে গণ-শক্তি প্রত্যক্ষভাবে আপন কর্ত্তৃত্ব আপনিই গ্রহণ করিতে পারিবে এবং কেবলমাত্র তাহাদ্বারাই জাতীয় স্বাধীনতা সার্থক ও সফল হইয়া উঠিবে। অর্দ্ধশতাব্দীর রাজনীতির ইতিহাসে এই বিপ্লব শুধু এদেশের পক্ষেই যুগান্তকারী নয়, ইহার শেষফল সমগ্র জগতের ইতিহাসের পক্ষেও যুগ-পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে।

* * *

১৮৮৫খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয় তাহার আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল শাসন ব্যবস্থার কতকগুলি স্থূল ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন ও নিখিল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জগতে পরস্পর ভাব আদান প্রদান দ্বারা একটা অখণ্ড ঐক্য স্থাপন করা। কিন্তু যিনি কংগ্রেসের প্রথম পরিকল্পনা করেন সেই মিঃ হিউম কংগ্রেসকে করিতে চাহিয়াছিলেন এমন একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান যাহার কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকিবে ইংরেজী শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর আদর্শানুযায়ী একটা ফেরঙ্গ নীতিচালিত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। কিন্তু তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের পরামর্শ অনুসারেই কংগ্রেসকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের রূপদান করা হইল—একটা Official Oppositionএর অস্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া হিসাবে এবং এই আদর্শানুসারে বৎসরের পর বৎসর কংগ্রেসের কাজ কেবলমাত্র মূলতঃ আবেদন ও নিবেদনেই সীমাবদ্ধ থাকিতে লাগিল। গৌণভাবে এদেশে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তণ করা তখনকার দিনের কংগ্রেস নেতাগণেরও সুদূর স্বপ্নরাজ্যের কল্পনাপটে প্রতিভাত হইয়াছিল। ১৯০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেস প্রধানতঃ সরকারী কাজের ক্ষীণ সমালোচনাই করিয়া আসিয়াছিল এবং আসর জমাইবার জন্য শাসন-সংস্কারের কথঞ্চিত নিতান্তই পোষাকী হিসাবে কংগ্রেসের কার্য্যনীতি ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত রাখা হইয়াছিল। মোটকথা অবসর বিনোদনের একটা আভিজাত্য সুলভ পলিটিক্যাল-বিলাসই ছিল কংগ্রেসের যথার্থ স্বরূপ। কংগ্রেসের দাবী তখন পর্য্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্রিটিশ শাসক-বর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই, কারণ এই দাবীর

মধ্যে জাতীয়তাবোধের অনুভূতি ছিল না, ছিল বিদেশী মতবাদ-দ্বারা প্রভাবান্বিত নিতান্ত হালকা চিন্তাধারার অভিব্যক্তি।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র সংঘাতে যে আদর্শ ও চিন্তা বাঙ্গালার শ্যামায়মান বনভূমির মেদুর আবহাওয়ায় পুষ্ট হইয়া উঠে, বাস্তবিকপক্ষে তাহাই প্রথম কংগ্রেসকে প্রচলিত চিন্তা-শৈথিল্যের জগত হইতে স্বাধীন ও সুস্পষ্ট চিন্তার পথে পথ নির্দ্দেশ করে। যাহা ছিল জাতীয়তা-বর্জ্জিত রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে তাহা কৃত্রিম অশন-ভূষণের ঐশ্চর্য্য পরিহার করিয়া কঠোর মাটির জগতে মাটির খাঁটি মানুষের মধ্যে নামিয়া আসে। কংগ্রেসের ইতিহাসে তাই ১৯০৫ খৃঃ অব্দই জাতীয় আন্দোলনের আরম্ভ-যুগ ইহার পূর্ব্বে আমরা কংগ্রেসে যে ক্ষীণ রাজনৈতিক তত্ত্ব-কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি তাহার মধ্যে ছিল নির্দ্দোষ ও নিরাপদ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নিষ্ক্রিয় অভিব্যক্তি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাহার গুরু-গর্জ্জন আসন্ন ঝটিকার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল তাহা ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রাণময় রূপ। কিন্তু তবু তখন পর্যন্ত পুরাতন-পন্থী কংগ্রেস নেতাগণ জাতীয় আন্দোলনের অব্যর্থ গতি প্রতিহত করিতে করিতে চেষ্টার কসুর করেন নাই। কারণ ইহার পরিণতি যে সরকারের সহিত সঙ্ঘর্ষ তাহা তখনকার দিনের সাবধানী আইননীতি নেতাগণের বুদ্ধির অগোচর ছিল না। ১৯০৫ সালের বেনারস কংগ্রেসে সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বাঙ্গালীর দাবী "স্বদেশী" সমর্থন করিলেও চরম পথ "বয়কট" সমর্থন করিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ ফিরোজশা মেটা, গোখলে, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যুষিত কংগ্রেসে তীব্র জাতীয়তা ভাবপুষ্ট চরম-মতবাদ প্রচারে বাধার অন্ত ছিল না। কিন্তু মহারাষ্ট্রের তিলক ও বাংলায় বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ প্রমুখ বাম-পন্থী নেতাগণের নেতৃত্বে চরম-মতবাদ ক্রমশঃই কংগ্রেসে প্রসার বিস্তার করিতে লাগিল। এই সময়েই রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামের অর্থনৈতিক দিকটাও ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। এই মত সঙ্ঘর্ষের ফলে কংগ্রেস তরণী মাঝে মাঝে নিমজ্জমান-প্রায় হইয়া উঠিত। কিন্তু তবুও চরম-পন্থীগণ ঐক্যের জন্য জাতীয় আদর্শ-পূত মত বিসর্জ্জন দিতে রাজী হয়েন নাই। এই মত-সঙ্ঘর্ষের ফলেই কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয়-আন্দোলন ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল ও পুরাতন-পন্থীগণও ক্রমেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দের সুরাট কংগ্রেসে যে দক্ষযজ্ঞ অভিনীত হইল তাহাতে চরম-পন্থী জাতীয়তা বাদী ও পুরাতন পন্থী নরম-মতবাদীগণের একটা শক্তিপরীক্ষা হইয়া গেল। অতঃপর নরম-পন্থী ও চরমপন্থীগণের মধ্যে প্রত্যেক কংগ্রেসেই একটা বোঝা পড়া হইত; বস্তুত ১৯১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দুইদলই কংগ্রেসের আধিপত্যের জন্য তুমুল শক্তিপরীক্ষাই ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু ১৯১৮ খৃঃ অব্দ হইতেই নরমপন্থীগণ জাগ্রত জনমতের গর্জ্জমান ভাবধারার সহিত ছন্দোরক্ষা করিতে না পারিয়া কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন ও চরমপন্থীগণ কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ভারত রাজনীতি জগতে চরম-পন্থা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই জাতীয়-আন্দোলন বিপুল হইতে বিপুলতর শক্তি সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলনের পথ ঘুরাইয়া দেয়। সামাজিক আন্দোলনে যাহার আরম্ভ তাহাই ঘটনা-বিবর্ত্তনে রাষ্ট্রীয়-আন্দোলনের পথে জাতীয় আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইয়া পরিশেষে স্বাধীনতা' আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

১৯২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেসে যে জাতীয়তার যুগ চলিতেছিল গান্ধীজির নেতৃত্বে তাহা ক্রমে স্বাধীনতা-আন্দোলনের যুগে পরিণতি লাভ করে। কারণ প্রধানতঃ গান্ধীজির নেতৃত্বেই Self determinationও স্বাধীনতা চিন্তা ব্যাপকভাবে কংগ্রেসের গৃহীত নীতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভারতের প্রত্যেক স্তরের মধ্যে ইহা প্রসার লাভ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে একটা বাস্তবরূপ দান করিয়াছে। অবশ্য অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে ও "সন্ধ্যা" ও "বন্দেমাতরমের" মাঝ দিয়া বাঙ্গালা দেশে এই স্বাধীনতা চিন্তা বহু পূর্ব্বে পরিস্ফুট হইলেও ব্যাপকভাবে সমগ্র কংগ্রেসের আদর্শ এই নীতিদ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই। ইহা একটা সুদূর রাজনৈতিক কল্পনা হিসাবেই রহিয়া গিয়াছি লা অসহযোগের যুগে এই আদর্শ যে ভাবে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূলীভূত কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমাদের রাজনীতির কর্মধারাও এই আদর্শ উপলব্ধির জন্য ক্রমশঃ ডেমোক্র্যাসির পথে পরিচালিত হইয়া জনসাধারণের সাথে একটা যোগসূত্র গ্রথিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। গান্ধীযুগের ১৯২৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রথম আটবৎসর Democratisation of congress এর যুগ বলা যাইতে পারে; কারণ এই যুগে স্বাধীনতা-আকাঙ্খার মধ্য দিয়া জাতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আদর্শ ও কল্পনার ঐক্যদ্বারা একটা জাতীয় সমীকরণ প্রচেষ্টা সফল হইয়া উঠিয়াছে।

আবার এই কয়বৎসর হইতেই কংগ্রেস জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার প্রতীকরূপে অযুত নর-নারীর সশ্রদ্ধ সমর্থন লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই যুগের একটা বিশিষ্ট অধ্যায় ১৯২৯ খৃঃ অব্দের লাহোর কংগ্রেস; কারণ ইহার সভাপতির আসন হইতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভারতবর্ষের

কাম্য যে পূর্ণ স্বাধীনতা তাহা অকুণ্ঠভাবে প্রচার করেন। কংগ্রেসের আদর্শ ও চিন্তাধারা এইরূপে দ্রুত গতিতে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে এবং যে সকল বিষয়ে কংগ্রেসের আদর্শ অস্পষ্ট ছিল তাহাও ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া কংগ্রেসের সমগ্র চিন্তা ও আদর্শকে একটা সংহতরূপ দান করে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আদর্শ স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও ইহার কর্ম্মধারার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের একটা চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল। জাতীয় আন্দোলনকে সংহত রূপ দান করিয়া একটা কেন্দ্রীভূত শক্তিতে পরিণতি করিবার জন্য বিরোধী স্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা গান্ধী-আন্দোলনের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু এই আত্মবোধ যখন তীব্রতম হইয়া জাতির প্রাণের পঞ্জর স্পর্শ করে তখন এইরূপ সামঞ্জস্য-প্রচেষ্টার প্রয়োজন দূরীভূত হইয়া যায়। সুতরাং স্বাধীনতা আন্দোলন যখন বাস্তবিকই জাতির পক্ষে একটা জীবন-মরণ সমস্যায় পরিণত হইল তখন কৃত্রিম সামঞ্জস্যের প্রয়োজনও আর রহিল না। ফলে কংগ্রেসও ক্রমশঃ জাতীয় সমস্যার মূলীভূত প্রশ্নগুলির প্রতি মুখো-মুখি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু যাহা হউক গান্ধীবাদের সামঞ্জস্য-নীতি মূলগতভাবে কংগ্রেসের এই democratisation processকে বহুল পরিমাণে বাধা প্রদান করিতেছিল। কিন্তু আসল ডেমোক্রাসির উদ্বোধনের পক্ষে যে এইরূপ সামঞ্জস্য-প্রচেষ্টা অনেক সময় জাতীয় আদর্শকে পথ-চ্যুত করে তাহা পণ্ডিত জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতাগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ক্রমশঃ কংগ্রেসের মধ্যে আর একটা চিন্তাধারায় প্রকাশ দেখা গিয়াছে যাহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ শুধু শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন নয়, বস্তুতঃ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের যথার্থ আদর্শ উপলব্ধি করা। ১৯২১ খৃঃ অব্দে গান্ধী-আন্দোলনে যে ভাবধারা ক্ষীণ স্রোতে প্রবাহিত হইয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাব-জগতের আলোকের সন্ধান দিয়াছিল, বিগত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে তাহা আপন পরিণতি খুঁজিয়া পাইয়াছে; তাই আজ কংগ্রেসে সুরু হইয়াছে—আসল ডেমোক্র্যাসির উদ্বোধন।

পরিত্রাণ

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

অনুপমা আশ্রয় পাইল।

বিশেষ কোন আশা না রাখিয়াই সে একটা চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল পরিতোষকে,—যেমন আরো দু-এক জায়গায় লিখিয়াছে।

কিন্তু পরের দিনেই চিঠির জবাব আসিল। একই সহরের মধ্যে চিঠির জবাব অবশ্য একবেলা ওবেলার মধ্যে আসিতে পারে—সে কথা নয়। চিঠির জবাব তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া উত্তর পাঠাইতে বেশী বিলম্ব হয় নাই এইটুকুই আনন্দের ও বিস্ময়ের নয় কি?

কিন্তু চিঠির জবাব লিখিয়াছে স্বয়ং পরিতোষ নয়। লিখিয়াছে তাহার ম্যানেজার। যে বাড়িটির কথা অনুপমা বলিয়াছিল, সেটি এখন সারান হইতেছে। ম্যানেজার সবিনয়ে সেকথা জানাইয়া লিখিয়াছে যে, আপাততঃ অনুপমা তাহার ছেলে ও ভাইকে লইয়া পরিতোষের নিজের বাড়ীর এক অংশে বাস করিতে পারে। যাহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে যে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা একথা জানাইতেও ভোলে নাই।

পরিতোষ নিজে না লিখিয়া ম্যানেজারকে দিয়া চিঠি লিখাইয়াছে ইহাতে অনুপমার অপমান বোধ করিবার কথা। কিন্তু অপমান বোধও সময় হিসাবে মানায়। অনুপমার সে সময় নয়।

আর সত্যই অনুপমা তাহার চিঠি পাইবা-মাত্র সাগ্রহে নিজে তাহার চিঠির জবাব দিবে এ আশা করিয়া যদি সে চিঠি দিয়া থাকে তাহলে তাহার নিজেকেই ধিক্‌।

মনের কোণে তেমন কিছু থাকিলে বুঝি সে এ চিঠি লিখিতেই পারিত না।

সে সব দিনের কথা সত্যই কি তাহার মনে আছে, না তাহা মনে করিয়া রাখিবার মত!

সহৃদয় উদার দশজনের উপকারী লোক, বিশেষ করিয়া তাহার স্বামীর এক কালের বন্ধু বলিয়াই অনুপমা তাহার কাছে বিপদের দিনে সামান্য একটু সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছে।

সাহায্যও এমন কিছু বেশী নয়। পরিতোষের একটি ভাড়াটে বাড়িতে মাত্র কয়েক মাসের জন্য সে থাকিতে চাহিয়াছে। তাও একেবারে অমনি নয়। ভাড়াটা কিছু কম করিয়া দিয়া মাত্র। কিছুদিন ধরিয়া

খালি পড়িয়া আছে বলিয়া অনুপমার ভাই শরৎ আসিয়া একদিন খবর দিয়াছিল।

অনুপমা তাহার পর কয়েকদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে এ বিষয়ে পরিতোষকে কিছু বলা যায় কিনা! তারপর একদিন একটা চিঠি ভাইকে দিয়া নিজের নামেই লিখাইয়াছে। অনুপমা কোন প্রকার দুঃখের কাঁদুনি অবশ্য সে চিঠিতে গায় নাই। তাহার সে স্বভাব নয়। প্রয়োজনও ছিলনা। সে শুধু তাঁহার বাবার মৃত্যু সংবাদটা দিয়া জানাইয়াছে যে, কয়েক মাস পরে তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া দেশের বাড়িতেই আশ্রয় লইতে হইবে। শুধু ভাইএর পরীক্ষার পূর্ব্বের কয়েকটা মাস কলিকাতায় থাকিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার বাবার মৃত্যুর দরুণ, যে বাড়িতে এখন তাহারা আছে সে বাড়িতে থাকা আর তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আয়ে কুলাইবে না। পরিতোষের ছোট বাড়িটা ত খালিই পড়িয়া আছে। কিছু কম ভাড়ায় হইলে তাহারা কয়েকটা মাস এখানে থাকিতে পারে।

কম ভাড়ার কথাটা লেখার মধ্যে হয়ত একটু আত্মপ্রতারণা ছিল। অনুপমা হয়ত জানিত যে পরিতোষ যদি রাজী হইয়া চিঠির জবাব দেয় তাহা হইলে ভাড়া সে লইবে না। কিন্তু এটুকুর বেশী আত্মপ্রতারণা যদি কোথাও থাকে তাহা হইলে তাহা অনুপমার অজ্ঞাত।

পরিতোষ আদৌ জবাব দিবে কিনা সে বিষয়ে একটু সন্দেহ অবশ্য ছিল। তাহার স্বামীর মৃত্যু ত হইয়াছে সাত বৎসর। এই সাত বৎসর আর কোন সম্বন্ধ দূরের কথা, খোঁজ খবরও নাই। পরিতোষ ভুলিয়া না গেলেও আর নতুন করিয়া পরিচয়ের সূত্রপাত না করিতেও চাহিতে পারে।

কিন্তু পরিতোষ জবাব দিয়াছে। অবশ্য ম্যানেজারকে দিয়া চিঠিটা সে না লিখাইলেই পারিত। এটুকু তাচ্ছিল্যের মতই দেখায়। কিম্বা—অনুপমার হঠাৎ একটা কথা মনে হইয়া একটু কৌতুকও হইয়াছে—তাচ্ছিল্যের মত দেখাইবার চেষ্টাও হতে পারে।

বাড়িতে আশ্রয় দিবার প্রস্তাব করিয়া ম্যানেজারকে দিয়া চিঠি লেখান একটু অদ্ভুত বই কি! নিজের বাড়িতে থাকিতে দিবার প্রস্তাবের জন্যই ম্যানেজারকে দিয়া চিঠি লিখাইতে হইয়াছে—এমনও ত হইতে পারে!

কিন্তু তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ অনুপমা এ প্রস্তাবে রাজী হইয়াছে। কয়টা মাস বইত নয়! একটা আশ্রয় পাওয়া লইয়া কথা!

কিন্তু কয়দিন বাদে আশ্রয় পাওয়াটাই একমাত্র কথা বলিয়া কি জানি কেন মনে হইল না।

কয়দিন ম্যানেজারই আসিয়া খোঁজ খবর লইতেছে।

"পরিতোষ বাবু বলে পাঠালেন—আপনাদের মাঝের ঘরের ফ্যানটা মেরামত হইতে গেছে, আপাততঃ একটা টেবেল ফ্যান পাঠিয়ে দিলে…

অনুপমা ম্যানেজারের সামনে বাহির হয়। সে হাসিয়া বলিয়াছে—"আপনি বলুন গিয়ে ফ্যান আমাদের দরকার নেই। আমরা ফ্যান ত আগেও ব্যবহার করতাম না।

ম্যানেজার সঙ্কুচিতভাবে বলিয়াছে,—"না, না, সে কি হয়"!

বিস্ময়সূচক আপত্তিটা, আগে ফ্যান না ব্যবহার করার কথায়, না ফ্যান দরকার নাই বলার বোঝা যায় না। কিন্তু অনুপমার এই লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে ভালো লাগে নাই, তাহাতে যেন সত্যই ব্যাপারটা লজ্জাকর হইয়া ওঠে। অনুগ্রহকে অন্য একটা অশোভন রূপ দিবার ইচ্ছা তাহার নাই।

সে বলিয়াছে—আচ্ছা তাহলে পাঠিয়েই দেবেন।"

ম্যানেজার আবার আসিয়াছে পরের দিন খোঁজ লইতে। "পরিতোষ বাবু বলে পাঠালেন"।

অনুপমা তাহার কথা মাঝখানেই বন্ধ করিয়া হাসিয়া বলিয়াছে—"আপনার পরিতোষ বাবু রোজ রোজ বলে পাঠান কেন? নিজে একদিন এলেই ত পারেন। এমন কিছু দূরও ত নয়!"

কথাটা এমনভাবে বলিয়া ফেলিবে অনুপমা নিজেও ভাবে নাই, বলিবার ইচ্ছা ছিলনা। বিশেষ ম্যানেজারের কাছে। সরকার মশাই লোকটি অমনিই কি ভাবে কে জানে, চতুর সাবধানী লোক! মুখে তাহার কোন ভাবান্তর হয় না, কিন্তু অনুপমাকে এতখানি সম্মানের সহিত এমন ভাবে আশ্রয় দেওয়ায় কোন কৌতূহল কি তাহার জাগে না? জাগে নিশ্চয়। মনে মনে কি যে একটা গড়িয়া লইয়াছে কে জানে! কথাটা অমন ফস্ করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে অনুপমা নিজেই জানিত না। সে নিজেই অবাক হইয়াছে।

কিন্তু ম্যানেজার যে উত্তর দিয়াছে তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

"পরিতোষ বাবুর যে অসুখ!"

অনুপমার কোন উত্তর না পাইয়া যে কথাটা বলিতে আসিয়াছিল তাহাই জানাইয়া ম্যানেজার আবার জানাইয়াছে।

"তিনি বলে পাঠালেন—খোকাকে একটু বেড়াতে যেতে দিতে পারেন, রোজ! আমাদের চাকর এসে বিকেলে নিয়ে যাবে কি"!

অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া বুঝি সায় দিয়াছে। ম্যানেজার চলিয়া যাইবার পর মনে পড়িয়াছে, কি অসুখ সে কথাটা জিজ্ঞাসাই করা হয় নাই। করা উচিৎ ছিল।

দুইভাগে ভাগ করা একই বাড়ি। ভিতরের দোতালায় বারান্দার একটা দরজা

খুলিয়া দিলে অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। প্রথম দিন আসিয়া দরজাটা তাহাদের দিক হইতে বন্ধ দেখিয়া অনুপমা খুশীই হইয়াছে। এক বাড়িতে বাস করিতে হইলেও সে কথাটা স্মরণ রাখিবার কোন অস্বস্তিকর প্রয়োজন থাকিবে না।

দুপুরবেলা কি খেয়ালে ছেলেটিকে লইয়া অনুপমা নিজেই সে দরজা খুলিয়া ওদিকে প্রবেশ করিয়াছে।

দোতালায় লম্বা রেলিঙ দেওয়া বারান্দা চারিদিকের ঘরগুলির সামনে দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। একটা চাকর বাকরের দেখাও নাই।

ঘরগুলির পরিচয় না জানিয়া অনুপমা আগাইয়া গিয়াছে। পরিতোষের ঘর খুঁজিয়া লইতেও অবশ্য তাহার বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু দ্বিধা আসিয়াছে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া। মনে হইয়াছে এমন ভাবে না আসিলেও চলিত! সরকার মশাইকে দিয়া খবর দিয়া বিকালে আসিলে কিছু ক্ষতি ছিল না।

অসুখের খবর শুনিয়া অন্তত: কৃতজ্ঞতার দরুণই না দেখিতে আসাটা অবশ্য অন্যায়; কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা তাহার জন্য করা চলিত বোধ হয়।

কিন্তু এখন আর ফিরিয়া যাওয়াও বোধহয় চলে না। পথে চাকর বাকরের সঙ্গে দেখা হইতে পারে। তাহারা হয়ত পরে পরিতোষকে জানাইতে পারে! তখন কথাটা ভাল শুনাইবে না।

অনুপমা দরজায় ঘা দিয়াছে আস্তে।

কাহারও সাড়া পাওয়া যায় নাই। অনুপমা চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছে। এখনও কোনও লোকজনের দেখা নাই। এখনও সে ফিরিয়া গেলে পারে। আবার ঘা দিবে কিনা সে বিষয়ে তাহার সত্যাই দ্বিধা জাগিয়াছে।

ভয় তাহার সত্যাই একটু মনে আছে। সারা সকাল সে বিষয়ে একেবারে কিছু না ভাবিয়া সে পারে নাই। পরিতোষ যদি সত্যাই পুরাতন দিনের কথা তোলে। আশ্রয় চাহিয়া চিঠি লেখার সময় এসব কথাকে সে আমল দেয় নাই। পরিতোষের ম্যানেজারের মারফৎ জানান প্রস্তাবে রাজী করার সময়ও মনের অস্ফুট দ্বিধাকে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। সে কোন্ অতীত যুগের কথা। কত স্মৃতির স্তর তাহার উপর জমিয়া আছে। পরিতোষ শিক্ষিত ভদ্রলোক। সেই অতীত যদি তাহার কাছে এখনো জীবন্ত হইয়া থাকে তবুও সে নিশ্চয় তাহাকে পুরাতন পৃষ্ঠা হইতে টানিয়া বাহির করিবে না। সেটুকু সংযম ও সুরুচি নিশ্চয় তাহার আছে, ইহাই অনুপমা ভাবিয়াছে।

কিন্তু এখন মনে হয়, সংযমের ও সুরুচির পালিশ আর মানুষের কতটুকু গভীর! সে পালিশ ভেদ করিয়া অনাবৃত মূর্তি কি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না!

পরিতোষ এখন তাহাকে নিজের হাতের মুঠায় পাইয়াছে বলিলেই হয়। নিজে হইতে দেখা করিতে আসিয়া সে আরো—

এখন যদি পরিতোষ ঠিক শোভনতার সীমা না মানিয়া চলে। সহসা যদি বলিয়া বসে—"এ বাড়িতে ত তোমার অনেকদিন আগে আসবার কথা অনু! সেই এলে, কিন্তু তখন যদি আসতে?"

পরিতোষ সেদিন একটু উদ্দামই ত ছিল। সে উদ্দামতা এখনও তাহার আছে কি! যদি সে বলিয়া বসে,—"সেদিনের কথা মনে পড়ে অনু, ষ্টীমার ট্রিপ থেকে ফেরার পথে যেদিন তোমায় নামতে দিতে চাইনি, বলেছিলাম সবাই নেমে গেলে একেবারে নিয়ে চলে যাব! খোঁজ পাবেনা কেউ! সেদিন যদি সত্যি ধরে রাখতাম! তাহলে! তাহলে আমাকে এমন করে জীবন কাটাতে হত না! তোমাকেও এমন ভাবে আশ্রয় নিতে আসতে হত না!"

উত্তর অবশ্য অনু তৈয়ার করিয়াই আসিয়াছে—প্রথমে এইটুকুই বলিলে চলিবে—"ওসব কথা আর কেন!"

তবু যদি পরিতোষ না থামিতে চায়, যদি তখনকার মত উত্তেজিত হইয়া ওঠে বলে,—"ওসব কথা আর কেন—বেশ ওসব কথাকে ভদ্রভাবে চেপে রাখতে হবে কেমন? ভেতরে পুড়ে যদি খাক্ হয়ে যায় ওপরের পালিশ ঠিক থাকা চাই! ভদ্রতার শোভনতার দোহাই মেনেই তোমায় হারিয়েছি, আজও তাই মেনে চুপ করে শিষ্টতার অভিনয় করে যেতে হবে! কেন, কেন? বলতে পারো!"

এসব চিন্তা এমন গুছাইয়া তাহার মন হইতে কেমন করিয়া বাহির হইতেছে জানিতে পারিলে অনুপমা নিজেই একটু চমকাইয়া উঠিত নাকি! কিন্তু সে তাহা জানে না বোধ হয়।

পরিতোষের অশান্ত উচ্ছ্বাসের জবাবে সে একটু কঠিনই হইবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে—শান্ত কণ্ঠে অথচ দৃঢ় স্বরে বলিবে—"তোমার ঘরে কি এইসব শুনতে এসেছি মনে কর!"

পরিতোষ তাহাতেও না থামিতে পারে। তখনকার দিনে সব সময়ে নিজেকে সে সম্বরণ করিতে পারিত না। নিজেই বলিত, "আমাদের রক্তের ধারা একটু আলাদা অনু, চারিধারে পুকুর ডোবাই দেখে আসছ, আমাকে তারই মাফসই মনে কোরো না। আমাদের বংশে পা গুণে গুণে কেউ চলেনি। হঠাৎ এমন একটা কিছু করে বসতে পারি, যা তোমার বেড়া দেওয়া গণ্ডীকাটা জগতের ধারণা চুরমার করে দেবে।" সেদিন অবশ্য সে তেমন কিছু

(শেষাংশ ৬৫এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

কানন

মৃণাল [illegible]

জ্যোৎস্না

সাংবাদিকের টলিউড পরিক্রমা

পরিব্রাজক : সুধীরেন্দ্র সান্যাল

ধর্মতলার মোড়ে ছিল ঠাঁই, বরষ ঘুরিতে শেষ
টালিগঞ্জের 'রিজেণ্ট-কাননে' আজো চলে তা'রি জের !
ছায়া-পথে যা'র শুধু চলা-ফেরা, ছায়ালোক বার মাস,
ছায়ার-পরশে, অতীত হরষে, অন্তরে পরকাশ !
ছায়া-মায়াবীর সুখ-স্মৃতি ভরা, মায়া-লোক ভালবাসি—
মায়াবী-নটের মায়াবিনী প্রিয়া, তাই কাছে ছুটে আসি।
অন্তরে কা'র কী আছে, না জানি ; বদনেতে চারু হাস
সাংবাদিকের সেইটুকু লাভ, তা'র বেশী নাই আশ !
অতীতে যা'দের পেয়েছিনু প্রীতি, নবীনেরা তা'রি সাথে—
দিয়াছে অঢেল স্নেহের পুলক—মিলিয়াছে হাতে হাতে।

রেণুকা

*

রাধার কুঞ্জে আজো জ্বলে আলো, চেরাগের রোশনাই,
ম্লান কিছু তবু, তাহার স্মৃতিটি, ভোলা ত' যায় না ভাই !
নিত্য সকালে, চোখ বুজে দেখি, করিনি একটু ভুল—
নব-আনন্দে মুখর 'চিত্ত'—হরিপদে মশ্‌গুল !
অন্তরে যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, তারও আজ ক্ষমা চাই—
ব্যথিত চিত্তে সান্ত্বনা দিতে—হরিপদ ভুলি নাই !
দেখেছিনু হেথা 'তড়িৎ'-চমক—মেখলা আধারে ভাসে
ফুটিল সে রেখা বরষা কাটিতে, ভিন্ন শারদাকাশে।
রাধার কুঞ্জে, আজি একান্তে, আজো সখি 'নীহারিকা'
ভুবন-ভুলানো চাহনির মাঝে, জ্বালে প্রাণে প্রেম-শিখা !
রাণা-কুম্ভের ভাঙ্গিয়াছে বুক, 'মীরা'র পরিত্রাণ
রাধা-কৃষ্ণের যুগল-চরণে, লভিল সে নির্ব্বাণ !
'রাজেন বাড়োড়ী' পরাজয় মানে, 'চপলা'র প্রেম-Raceএ।
আলম-বাজারে 'জ্যোতিষ চন্দ্র,' শিঙা ফুকিয়াছে শেষে !

তড়িৎ বসু

মীরা

পদ্ম

মায়া

শিশু

জ্যোতিষ মুখো

শিলা

[illegible]
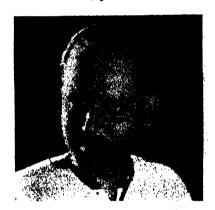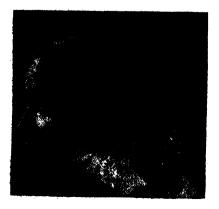
কুসুমের 'রেণু' ঝরিবার আগে, রাধার বরাত জোর
বুদ্ধির দোষে বুড়া শালিখের, নয়নে বহিছে লোর!

*

ছায়ার রাজ্যে সব-ই কী মিথ্যা, শুধু ঝুটা ভোজবাজী,
দেবতার ঠাঁই, হেথা নাই ভাই—দানবের কারসাজী!

*

বাল-খিল্যের 'ব্রিগেড' দেখিতে, চল যাই এইবারে
পি-এন-গঙ্গো, সাঙ্গো-পাঙ্গো—কভু না বচনে হারে!
'মুক্তি-স্নান,'এর সঙ্গী খুঁজিতে, নবীন পথিক চলে—
স্রোত-মুখে তাই, প্রেম-সরোবরে—'শিলা'-লিপি ভাসে জলে!
'সুশীল'-সুবোধ, বন্ধুটি মোর, এর বেশী বলিব না
সখা 'সুকুমার'—এখন কুমার, ছাড়িয়াছে 'আশীয়ানা'!
মধু লোভে তাই 'মজ্‌লিশি-মুখো-মক্ষিকা-' রাখে ভুল্—
'পদ্মে' অরুচি; ধুতুরার প্রেমে, আজ তাই মশ্‌গুল্!
মাকাল ফলের চেয়ে ঢের ভালো, 'শিশু'র মুখের হাসি!
সেই দু'টি আঁখি, চকিত চাহনী আমি শুধু ভালবাসি!
'দস্তুরমত নাটক'-এর গতি, কত তা'র হেরফের—
'শিশির ভাদুড়ী' রাখিয়াছে নাকী আজ মান বোতলের!
মায়া-কাননের মায়া-নটী শুনি, নিজরূপে গর্ব্বিতা
বাবুরাম রোড, ছাড়ি যাই চল্—ভিন্ পথে আজ্ সিধা।

*

বাঙালীর রচা, পুষ্প-বিতানে, আজো আছে সৌরভ
নত-মস্তকে, তারি গুণ গাই—বাঙালীর গৌরব!
এই সে 'এন্-টি'—কাননে তাহার থরে থরে ফোটা ফুল—
কা'রে ছাড়ি কা'র দিকে ছুটে যাই, শুধু হয় দিক্ ভুল!
'পুতুল'?—খেলার ক্রীড়নক ভাল; তূনে তা'র ভরা তীর—
শরাহত প্রিয়া, বন্দী সে হিয়া—'কমলেশ' কুমারীর।
আরো আছে এক খেলোয়াড় ভাল, 'হেম' করে প্রাণপণ
রূপসী 'চন্দ্রা', ক্লান্তি কাতরা, তবু তা'র পায় মন।

উমা

মলিনা

যমুনা

একদিন ছিল বুকভরা প্রেম ; আজ তাহা নিঃশেষ !
ঢালিতে ঢালিতে শূন্য কুম্ভ আছে আজ অবশেষ !
তা'রি পাশে ধায় তারকা আর এক, দ্যুতি তার পড়ে খসি'—
ম্লান তবু সেই, দীপ্ত-গগনে—আজো শোভে 'উমাশশী !'
কে বলে মলিন, 'মলিনার' আঁখি—তন্দ্রা-আবেশ হারা
অমরাবতীর উর্ব্বশী নহে—পৃথিবীর অপ্সরা !
যদি 'যমুনা'য় তুফান উঠেছে, নাচে তাই 'প্রমথেশ'
কমলে নহে, মুকুটে শোভিত—রাজ অধিরাজ বেশ !
আর একজনে, ভুলিতে পারিনা ; কাজ করে ঘর বার,
নব-মল্লিকা সন্ধান চলে—'মল্লিক' বঁধুয়ার !
'মীরা-পাহাড়ী'-র দ্বন্দ্ব মিটেছে, উদ্বাহে পরিণতি
ভাগ্য-চক্র ! ললাটের লিপি ! রোধে কে তাহার গতি !

অমর মল্লিক

*
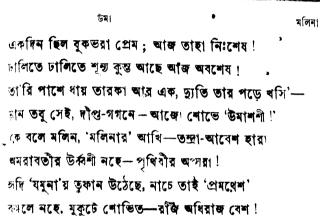
আনোয়ারশা'তে চলে শুনি রাতে, মহা ধুমধাম ভারী
চণ্ডী ঘোষের মমত কাটায়ে, চলে আসি তাড়াতাড়ি ।
নহে মজলিশ্—কর্ম্মবীরের কঠোর সাধনা চলে—
বাঘ ও বাছুরে, করে গলাগলি, এইখানে দলে দলে !
পথ মাঝে নাকী, কাননে আর এক উঠিয়াছে কল-রোলে
শুনি, 'আলিবাবা' আর দস্যুর দলে—বেধেছে গণ্ডগোল !
দুখের সাগরে পাড়ি দিতে তাই 'মজ্জিনা' ধ'রে হাল
ঝাড়ু হাতে তাই, আব্দালা মিছে, সাফ্ করে জঞ্জাল !

চন্দ্রা

*

রিজেন্ট পার্ক-এ, এইখান হ'তে, চল যাই হোল রাত,
(শুনি) খেমকা-রাজের ঠাণ্ডা গারদে—'দেবকী'র ছাড়ে ধাত !
সুন্দরী সেরা 'বিমলাকুমারী'—গোলাপ সে বাশোরার,
শুধু চোখে দেখা—সাবধান করে, তাও আজ কারদার !
নহে সে রম্ভা, রূপসী 'মেনকা', চোখে নাই শরাসন
স্নিগ্ধ-মধুর চাহনীর মাঝে, তৃপ্তিতে ভরে মন !
আজি একান্তে, নয়ন-প্রান্তে, তা'রি পাছে ধায় তীর—

পাহাড়ী

বিমলা কুমারী

মেনকা

ছায়া

হাস্যে-লাস্যে, মধুর ভাষ্যে— অপরূপ 'পিয়ারী'র !
কান্না-সন্ধানে ঝামেলা অঢেল—'ছায়া', সেই মোর ভালো,
মনের রূপালী পর্দ্দার পাতে, ঢালে সে সোণালী আলো !
বৃন্দাবনের বিলাস দেখেছ— দেখনিক লীলা তা'র
দেবকী বোসের গোপন-মনের, লীলা বোঝা ভাই ভার !
'জীবন-নাটকে' যবনিকা টানি, ফিরে আসে নিজ ঘরে—
নব 'সংসার'-এ নানা সুখ, তবু হেথা নাহি মন ধরে।
পঞ্চ-ফুলের অমৃত-পিয়াসী মধু-লোভী প্রজাপতি—
চির-চঞ্চল ভ্রমরের মন, নানা ফুলে তার গতি !
জমিদারী চলে ঢিমে তেতালায়, আপ্‌শোষে 'গোস্বামী'
বাধা নাহি দেন, শুধু বেদনায় কাঁদিছে সে দিবা-যামী !

*
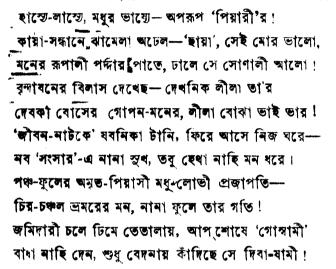
আলমবাজারে, শেষ হোক আজ, ছায়া-মায়াবীর গান,
ভোলা আড্ডির 'জোড়া-ঘুঘু' নাকি লভিল পরিত্রাণ !
সভ্য-ব্যাধের ক্ষুধা বড় ভাই তার চেয়ে 'বিধুমুখী'—
ঊর্ম্মি-মুখর, সাগর-সলিলে, সাতারু সে মহা সুখী !
নকল 'ছায়া'র পরশ হেথায়, তবু তাও ঢের ভালো
ঘরোয়া-বধুর মধুর ব্যাভারে, করে নাকী ঘর আলো !
'হরি ভক্তের' স্বপন টুটেছে, রাধার কাননে পাড়ি
কত রূপসীর মুখ ভার হোল, কতজনা দেয় আড়ি !
দেবালয়ে শুনি, বোধনের সুর, নব আনন্দে মাতে
ব্যর্থ পূজারী লভিল চেতনা—'মন্মথ' শরাঘাতে !

*

আজ, পাবলিসিটির বাজে জয় ঢাক, মায়া-পুরী রূপে আলো
তবু লোকে বলে ঢাকের বাজনা, থেমে গেলে লাগে ভাল !
সকলের মন পাই নাই ভাই, করিয়াছি প্রাণপণ—
যেটুকু দিয়াছ—সেই মোর ভাল, তৃপ্তিতে ভরে মন।

দেবকী বসু

সুশীল মজুমদার

প্রতিহত

শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক

গরাণহাটা ষ্ট্রীট, রাত্রি।

হুস্ করে একটা ট্যাক্সি এসে থামল।

সুরথ স্ত্রীকে বললে, নাম।

মুখ তুলে সজল চোখে সুমিত্রা একবার চারিদিক চেয়ে দেখল। গলির মুখে মুখে, বারান্দায়, পুঞ্জ পুঞ্জ নারী। কুৎসিত মুখে উৎকট প্রসাধন। প্রত্যেকটি পথিকের মুখে চাদের লোলুপ শাণিত দৃষ্টি এসে পড়ছে।

একটা বেসুরা গান, একটা বিশ্রী থল্‌থল্ হাসি। সেই ঘৃণিত আবহাওয়া যেন একটা নাংরা রুমালের মত সুমিত্রার নাক মুখ চেপে ধরে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ করে তুলতে চাইল। ট্যাক্সির সিটে লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদের সুরে সুমিত্রা বলে উঠল, এখানে কেন?

—এখানেইত! ব্যভিচারিণী মেয়েদের এখানে ছাড়া আর জায়গা কোথায়?

সুমিত্রার লুণ্ঠিত দেহটা বার দুই কেঁপে উঠল। একান্ত বিস্ময় করুণ একটী ভিজে সুর বেরিয়ে আসে, ব্যভিচার? হঠাৎ একটা—

তিক্ত ব্যঙ্গের সুরে সুরথ বলে উঠল, হ্যাঁ, আজ দেখে ফেলেছি বলেই হঠাৎ একটা চুমা নয়?

তুমি না আই-এ, পাশ! এই তোমার শিক্ষা!

সুমিত্রা উত্তর দিলনা।

আবার সেই বীভৎস আবহাওয়াটা ওর উপর চেপে বসে। ওর মনে হলো সামনে যেন উদ্যত-ফণা এক গোক্ষুর সাপ, কিন্তু ও শিশুর মত অসহায়, রোগীর মত দুর্ব্বল। হঠাৎ কেউ যদি জোর করে ওকে চুমা খেতে চেষ্টা করে কি করবে ও! আত্মীয়ের থেকে এ রকম ব্যবহার কে আশা করতে পারে।

সুরথের আবার খেয়াল চাপল।

ট্যাক্সির উপর সহসা দাঁড়িয়ে উঠে বললে, নাম এখানে।

সিটটাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে সুমিত্রা পড়ে রইল।

এখনও নাম, রাস্তার লোকের সামনে আর 'সিন" করতে হবেনা। যেমনি করে টেনে গাড়ীতে এনে তুলেছি তেমনি করে এখানেও নামাব, বলে রাখছি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুমিত্রার হাত ধরে সুরথ টানতে থাকে।

ড্রাইভারটা বলে উঠল, দেরী হোতা বাবু।

একটা টাকা ছুড়ে দিয়ে এক ঝটকায় সুমিত্রাকে সুরথ নামিয়ে নেয়।

আবার চারিদিকে একবার চোখ পড়তে শিউরে উঠে সুরথের দেহের উপরেই সুমিত্রা ভেঙ্গে পড়ল।

সুমিত্রার ডান হাতের কব্জিটা শক্তমুঠোয় চেপে ধরে গলির মুখে সুরথ পা বাড়ায়।

বেঁকে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বললে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ওর কণ্ঠস্বরে একটি করুণতম হাহাকার ধ্বনিত হয়ে উঠে। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর, ছেলের মৃত্যুতে মার যে-হাহাকার আগুনের শিখার মত আকাশের দিকে লকলকিয়ে উঠে।

—আর সতীপনা করতে হবেনা, বলে সুমিত্রার হাতটা মোচড় দিয়ে একটা দরজা দিয়ে সুরথ ভিতরে ঢুকে পড়ল। দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটীকে বললে, এস।

মেয়েটী প্রথমে বোকার মত চেয়ে থাকে। তারপর চোখে মুখে রহস্য ঘনিয়ে সুরথদের পেছু সিড়ি ভাঙ্গে।

—এই? বলে একটা দরজার কাছে সুরথ এসে দাঁড়ালো।

—হ্যাঁ, বলে মেয়েটা ঘরে ঢুকে সুইচটা টিপে দিল, হেঁসে বললে, আসুন।

সুমিত্রার নিজে চোখকেই অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। এ সম্ভব! মাথার ভিতর বুঝি ওর আগুণ জ্বলে উঠল। পড়ন্ত ফলের মত সুমিত্রার দেহটা শিথিল হতেই ওকে টেনে নিয়ে ভিতরে নিচের বিছানায় সুরথ বসল গিয়ে।

সমস্ত গৃহ সজ্জাটা বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত একবার সুমিত্রার চোখে এসে পড়ে, পরক্ষণেই সুরথের কোলে ও মুখ লুকাল।

মায়ের কাছ থেকে মার খেয়ে মা'কেই জড়িয়ে ধরবার মত সুমিত্রার এই শিশুর মত সুরথের কোলে মুখ লুকানতে কি যে যাদু ছিল! সুরথের বুক দুলে ওঠে। এই দুর্দ্দান্ত গোঁয়ার-গোবিন্দ সুরথ, রাগের মাথায় স্ত্রীকে যে বেশ্যার ঘরে টেনে নিয়ে এসেছে।

বিছানার এক সুদূর প্রান্তে মেয়েটী বসেছিল, মেঝের উপর পা গুটিয়ে। চোখের ইঙ্গিতে সুরথকে জিজ্ঞেস করলে এ কে?

সুরথ খানিক চুপ থেকে বললে, আমার স্ত্রী।

মেয়েটী একটু অবাক হয়। চোখ বুজে কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করে বোধ হয়।

সুরথ বললে তোমার নাম কি?

—তরলা।

—কতদিন তুমি এ-পথে এসেছ? কি করে এলে এখানে? সুরথ লক্ষ্য করে অবাক হয় যে, এ অবস্থায়ও তরলা ওর দিকে মাঝে মাঝে কটাক্ষ হানতে ত্রুটী করছে না। দেখতেও মন্দ নয়, ডিমের মত মুখের ডৌলটি। নামের খাতিরেই বোধ হয় একটু চঞ্চল চোখ, পাতলা ঠোঁট দুটি। ছ্যাকড়া গাড়ীর আবহাওয়াটা

এখনও মুখে পুরোপুরি আসেনি। স্নিগ্ধ ভদ্রত্বের একটি রেশ এখনও মুখে লেগে আছে।

তবু বয়স ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা।

তরলা ওর মুখের সপ্রশ্ন ভাবটি একটু উসকিয়ে নিয়ে বললে, কেন এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন?

সে জেনে তোমার কি হবে? আমি শুনতে চাচ্ছি, তুমি বলবে। পয়সা দেব।

তরলার দেহটা অনিচ্ছায় একটু সর্পিল হয়ে ওঠে, মুখ নেমে পড়ে।

উত্তপ্ত কণ্ঠে সুরথ বললে, কি, বলবে ত?

একটু নীরব থেকে মুখ তুলে তরলা বললে, সে কী আর শুনবেন! খুব বেশী দিন এপথে আসিনি, কথাও এমন কিছু নয়:—

একটা নোট বের করে তরলার দিকে এগিয়ে দিয়ে সুরথ বললে, যা-ই হয় বল, দেরী কোরোনা।

নোটটা প্রথমে তরলা নিলেনা।

বিছানার উপর নতমুখে মনোযোগী হয়ে আঁচলের কোনটা আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে কি ও ভাবতে থাকে। খানিক পরে ও মুখ উঠাল। এবং সুরথের থেকে সুমিত্রার দিকে দৃষ্টি নামিয়ে নোটটা হাতের মুঠায় তুলে নিয়ে ও পাকাতে থাকে।

সুরথ বল্‌লে বল।

আনাড়ি অভিনেতার ভীত মুখের ভাব তরলার মুখে নেমে আসে।

—আমার স্বামীরা দু'ভাই ছিলেন। আমার স্বামীই বড়। লেখাপড়া বেশী না জানলেও বেশ ভাল মাইনায় এক সওদাগরী অফিসে তিনি কাজ করতেন। আমার বিয়ের সময় দেওর এম-এ, পড়ছিল। সংসারে আর শুধু এক বিধবা মা। আমি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতেই, আমার বিয়ে হল। ম্যাট্রিক পাস করবার আগে বিয়ে হতে আমার ও বাবার দু'জনেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু ভাল সম্বন্ধ পেয়ে জোর করে মা বিয়ে দিয়ে দিলেন।

পড়াশোনায় ছোট বেলা থেকেই আমার খুব ঝোঁক ছিল। বরাবর ক্লাশে ফার্ষ্ট হয়েও এসেছি। কাজেই একেবারে হাল ছাড়লাম না। স্বামীকে বললাম আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দাও। বারটা থেকে চারটা অবধি ক্লাস হয় এমন, বিস্তর ইস্কুল কোলকাতায় আছে তারই একটাতে দাও। আমার পড়াশোনার জন্য তোমাদের সংসারের কাজের আমি ক্ষতি করবনা। তিনি রাজী হলেননা, বললেন, মেয়ে মানুষের বেশী লেখা-পড়া শিখে কি হবে, যা শিখেছ ও-ই ঢের। উনি একটু সেকেলে ধরণের, সকল বিষয়েই। কথায়, চালচলনে, পোষাকে। আজকালকার ছেলেদের থেকে একেবারে ভিন্ন রকমের। কিন্তু আমার দেওর ছিল উল্টা। সমস্ত বিষয়ে আধুনিক। মেয়েদের লেখাপড়া, পোষাক, তাদের নাচগান, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি নিয়ে খবরের কাগজ সামনে করে প্রায়ই দু'ভায়ে তর্ক হোত। তর্ক অনেক সময় ঝগড়ায় প্রমোশন পেত, তখন শাশুড়ী এসে থামিয়ে দিতেন। এ সমস্তই আমার দেওর প্রবল আন্তরিকভাবে সমর্থন করত।

স্বামীর প্রধান বক্তব্য ছিল যে, এই করে ইউরোপ আমেরিকার মত দেশটা রসাতলে যাচ্ছে।

পড়তে না পেয়ে মনে ভয়ানক রাগ হোল, দুঃখ হোল। ইস্কুলের বইগুলি সঙ্গে এনেছিলাম। দুপুরে নির্জ্জনে সেগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম আর টপ টপ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত। যখন মনে হোত আমি ছাড়া ক্লাসের আর সব মেয়েরাই পাশ করে যাবে মন ভয়ানক খারাপ হয়ে যেত। শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে দেওরকে বললাম, ও খুসী হয়ে রাজী হ'ল। বললে বেশতো। আমি তোমায় বাড়ীতে পড়াব বৌদি। ইস্কুলে দাদা না দিতে চায় না-ই দিল বাড়ীতে পড়ে তুমি পরীক্ষা দেবে। তোমাদের মেয়েদের আর কি ল্যাঠা।

আমাদের বাসা কলেজ স্কোয়ারের খুব কাছেই। ছুটির ঘণ্টাগুলিতে ও আমাকে পড়িয়ে আবার ক্লাশ করত গিয়ে। প্রথমেই যাতে বাধা না পড়ে সেজন্য দু'জনে পরামর্শ করে ব্যাপারটা গোপনে রেখেছিলাম। কারণ শাশুড়ীও মেয়েদের লেখাপড়া পছন্দ করিতেন না। দুপুরে উপরে তিনি ঘুমিয়ে থাকতেন, নীচের তলায় আমরা পড়াশোনা করতাম। একেবারে নির্জ্জন। প্রথম প্রথম আমার একটু লজ্জা করত। কিন্তু ক্রমেই তা কেটে গেল। গোড়ায় বেশ পড়াশোনা হোত এবং দেওরও ক্লাশ কামাই করত না। কিন্তু দিনে দিনে পড়াশোনার চেয়ে গল্পই হোত বেশী এবং বুঝতে পারতাম ও ক্লাশ কামাই করতে আরম্ভ করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কত দেশের কত বিষয়ের গল্প ও করে যেত বুভুক্ষু কাণ দিয়ে আমি তা শুনে যেতাম। প্রাণ ধরে বলতে পারতাম না যে তোমার ক্ষতি হচ্ছে, এবার তুমি ক্লাশে যাও। দেওরই ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী, বন্ধু, বহির্জ্জগতের মিলন সেতু। ক'লকাতায় আমার বা স্বামীর দিকের প্রায় কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না, বাইরেও আমি মিশতে পেতাম না। 'দেয়ালচাপা হয়ে সারাক্ষণ বাড়ীতে বসে থেকে একটু আলাপ, দুটো মনের কথা বলবার জন্য আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। তখন হাস্যে, গল্পে, কৌতুকে আমার নিঃসঙ্গতার সমস্ত অভাব নিঃশেষে ও মিটিয়ে দিত। ও যেন ছিল আমার তৃষ্ণার জল। ওর দিকে চেয়ে আমার হৃদয় মন স্নিগ্ধ সরস হয়ে উঠত। পড়াশোনার আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা বাইরের জগতের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্খা সমস্তইত

ওর থেকে মিটেছিল! মাঝে মাঝে আমরা সকলে সিনেমায় যেতাম। পরদিন দুপুরে ওই নিয়ে গল্প করতে কী ভাল লাগত!

স্বামীর থেকে এর কিছুই আমি পাইনি। এই জন্যেই বোধ হয় ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটাও অন্তরের ছিল না, ছিল শাস্ত্রের। স্বামীর কথা ভেবে মনে আনন্দ হোত না, এতটুকু তৃপ্তি জাগত না মনে। চেষ্টা করেও পারতাম না। কোন কিছুতেই ওর সঙ্গে আমার মিলেনি। দেওরের সুন্দর মুখের দিকে চাইলে বুক কেমন করে উঠত। চেয়ে চেয়ে আশ মিটত না। সমস্ত মন ওরই চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। নির্জ্জনে থাকলে চারদিক ওর গল্পে হাস্যে যেন শব্দময় হয়ে উঠত, চোখ বুজলেই ওর মুখ ভেসে উঠত চোখের সামনে। স্বামীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সজ্ঞান হয়ে চেষ্টা করেও আমার মন ফিরাতে পারিনি। ও যেন সব দিক থেকে সব রকমে আমায় আকর্ষণ করেছিল। সন্দেহ হোত একেই বুঝি ভালবাসা বলে!

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠতাম।

কতগুলি জড়িত কণ্ঠের কী রকম বিশ্রী হল্লা ভেসে আসে। সুমিত্রা একটু কেঁপে উঠে সুরথের আরও ঘন হোল।

—একদিন একটা মাসিকের একটা অসংযত ছবি সামনে করে কথা হচ্ছিল, ছবিটা নিয়েই। হঠাৎ আমার মুখটা টেনে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে ও গোটাকতক চুমা খেয়ে ফেললে। এত আকস্মিক যে, নিজেকে সম্বরণ করতে আমি সময় পেলাম না। কিন্তু তারপরেই কি পেরেছি?—পারিনি। পাপের পথ এত পিছল যে একবার পা দিলে আর রক্ষা নেই।

সুরথ স্ত্রীর একটি বাহুমূল নেড়ে দিয়ে বল্‌ল শুনছ?

সুমিত্রা নিস্তরঙ্গ দিঘীটির মতই পড়ে রইল।

কেঁদে বল্‌লে, এখনও আমায় নিয়ে চল বাইরে। এখনও চল। সেদিকে চেয়ে কী রকম একটু হেসে তরলা ফের বলতে আরম্ভ করল, মন এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, ভবিষ্যৎ এমন অস্পষ্ট হয়ে ওঠে! চারদিকের পরিস্থিতি একটু একটু করে সে পথে ঠেলে দেয়, পঙ্কমলিন একেবারে নিম্নতম ধাপ পর্য্যন্ত। আমিও নিজেকে রক্ষা করতে পারলাম না। নিজের অজ্ঞাতসারে কেমন একটা আচ্ছন্ন, অচৈতন্য অবস্থায় ডুবে গেলাম।

কিন্তু পাপ যে চিরকাল চাপা থাকে না, এও আমাদের পক্ষে সত্য হোল। শাশুড়ী জানতে পারলেন, দেওরকে ডেকে বিস্তর ধমকে দিলেন। কিন্তু ও মাকে একটুও ভয় করত না, তিনিও অত্যন্ত ভালমানুষ ছিলেন। সাফ বলে দিল, একথা যদি দাদা জানতে পারে তা'লে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। শাশুড়ী ভয়ে চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখের উপর আমাদের অনাচার চলতে লাগল। এখন মনে হ'ল বেশ্যা আমি, আমারও লজ্জা করে, কিন্তু তখন কী এক সুখে, কী এক মোহে যে পশু বনে গেছলাম! কিন্তু এমনি সহজে পাপ কোন দিন নিষ্কৃতি পায়নি। একদিন কী কারণে অসময়ে বাড়ী ফিরে স্বামী আমাদের বদ্ধঘরে আবিষ্কার করলেন। দরজা খুললে, আমাদের দেখে তিনি যে-সুরে 'এ কি' বলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কোনদিন আমি ভুলব না তা!

বিস্ময়ের সঙ্গে এমন একটা বুকভাঙ্গা হাহাকার ধ্বনিত হোল যে আমরা মুখ তুলে ওর দিকে একবার চাইতে পারলাম না পর্য্যন্ত! দু'জন দু'দিকে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম। চাইব কী করে?

প্রতিবাদের আমাদের কী আছে? আমাদের মুখের রেখায় পাপের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ছিল যে। এক মুহূর্ত্তে, বাদলা রাতের বিদ্যুৎ-চমকে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ তেমনি সজল পরিষ্কার হয়ে উঠল। কিন্তু ধাপে ধাপে যখন পাপের পথে নেমে গেছলাম।—

না চাইলেও সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তার সেই তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টি অনুভব করে ভিতরটা শীতল হয়ে আসছিল। আমার স্বামী হঠাৎ বলে উঠলেন' যাও, আমার বাড়ী থেকে এখুনি দু'জনে বেরিয়ে যাও, এখুনি বলে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

দেওর এতক্ষণ যেন নিঃসাড় হয়ে গেছল, বললে, বেশ ত। কুছ্ পরওয়া নেই।—বলে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

শাশুড়ী এলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম। কিন্তু তখন যদি স্বামীর পা ধরে মার্জ্জনা চাইতাম হয়ত তাঁর দয়া হোত। হোত না হোত কিন্তু সেই আশা আমি একেবারে নিবিয়ে ফেলতে পারি কী করে! আমার সমস্ত ভবিষ্যতের আকাশ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, তবু আত্মাভিমান আমাকে বাধা দিল, হায়! হিন্দু নারীর জীবনে ঈশ্বরের পরেইত স্বামীর সর্ব্বময় স্থান! সকল অসম্মান, দুঃখ কষ্ট জ্বালা থেকে যে রক্ষা করে, এ পৃথিবীতে যে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় তারও পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে আমার তখন লজ্জা হোল! দেওর গাড়ী নিয়ে এল। নিজের বাক্স বিছানা বই সব ওঠাতে লাগল তাতে। শেষে গাড়ীতে উঠে হাঁক দিয়ে বললে, আসবে ত এস।

ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে স্বামী বললে, যাও।

বাইরে এসে দেয়ালে মুখ রেখে আমি কাঁদতে লাগলাম। শাশুড়ী বললেন, এবার

তুই ওদের মাপ কর। ছেলেমানুষ না বুঝে যা করেছে—

এ-কথায় স্বামী যেন একেবারে ক্ষেপে গেলেন, বললেন, চুপ কর তুমি, ওকালতি করতে হবেনা। এদ্দিন কি চোখের মাথা খেয়ে ছিলে? ছেলেমানুষ!

ঠেলে আমাকে গলিতে বের করে দিয়ে আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ দরজার কড়া ধরে আমি কাঁদতে লাগলাম, কতকাল কাঁদতাম জানিনা। কিন্তু আশে পাশে জানলা দরজায় নানা মুখের আবির্ভাব হতে লাগল। পারলামনা গাড়ীতে উঠে বসি।

এক কাপড়ে স্বামীর ঘর থেকে চির-কালের জন্য বেরিয়ে এলাম। তারপরে একটা বোর্ডিঙে সাত আট দিন, কিন্তু টাকা?

একটা সস্তা ঘর দেখে আমরা চলে এলাম। দেওর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে গোটা দুই টিউশানি জুটিয়ে নিলে। তাতেই কোন রকমে চলত। প্রথম কয়েকমাস ওর থেকে যে প্রাণঢালা প্রেম ও আদর পেয়েছি খুব কম মেয়েমানুষের ভাগ্যেই হয়ত তা জুটে থাকে। কিন্তু তবু আমার মুখ একটু মলিন হলেই হাসি ফোটাতে কী যে ও না করেছে এবং কী যে ও না করতে পারত ভাবতে পারিনা। এমন সময় সংবাদ পেলাম স্বামী আবার বিয়ে করেছেন। ও বললে কুঁচ পরওয়া নেই।

আমার প্রতি ওর ভালবাসা আরও গভীর আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। কিন্তু আমি ভেঙ্গে পড়লাম।

আশ্চর্য্য যেদিন থেকে ঘর ছেড়েছি সেদিন থেকেই স্বামীর প্রতি আমার ভালমানুষ নির্ব্বিরোধ স্বামীর প্রতি একটা অন্তর্নিহিত আকর্ষণ মনে মনে অনুভব করছিলাম এবং দেওরের কুলপ্লাবিনী ভাল-বাসায় স্রোতের নীচে তা বেড়েই চলেছিল। সেদিন যা একান্ত সুলভ ছিল যাতে আমার অধিকার ছিল তখন তাই আকাশের চাঁদের মত সুদূর সুদুর্লভ মনে হোত। স্বামীর ঘরে আবার ফিরে যাবার আমার গোপন ভীরু আশা একেবারে উৎপাটিত হয়ে গেল এ সংবাদে।

কিন্তু কোন জিনিষেরই উচ্ছ্বাস চিরস্থায়ী হয়না।

আদর সোহাগের মাঝে আমার জন্য ও কত ত্যাগ করেছে সে কথা দেখা দিতে লাগল। পড়াশোনা, মা-ভাই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সবই ত আমার জন্য ওর ত্যাগ করতে হয়েছে। এবং ধীরে ধীরে সমস্ত কথাবার্ত্তায় এই অভিযোগই বড় এবং প্রধান হয়ে উঠতে লাগল।

চুপ করে শুনে যেতাম এবং বুক গুড়িয়ে যেত।

ওর একটা টিউশানি এই সময় চলে গেল। শত চেষ্টায়ও দ্বিতীয় আর একটা জুটাতে পারল না। একটি একটি করে গায়ের গয়না খুলে দিতে লাগলাম এবং তা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল ও যখন পড়ল লম্বা অসুখে। আমার এবং ওর এক বন্ধুর অক্লান্ত চেষ্টায় ও ভাল হয়ে উঠল বটে, কিন্তু অভাবে পড়লে মানুষের কী পাশব পরিবর্ত্তন হতে পারে তার পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠলাম। রাত পোহালে খাবার চিন্তা অথচ কোন দিক থেকে একটি পয়সা আসবার উপায় নেই, চারিদিক অন্ধকার। সর্ব্বক্ষণ খিটমিট করতে লাগল। অন্তঃসত্বা অবস্থা দেখেও একদিন রেগে মারতে পর্য্যন্ত কসুর করলে না। এই অবস্থায়ই একদিন বাইরে গিয়ে আর ফিরে এলোনা, সাত আটদিন চলে যায় ওর দেখা নেই। আমার অবস্থা তখন আসন্ন হয়ে এসেছে। হাতে একটি পয়সা নেই, একা ঘরে থাকবার ভয়, আর ওর এবং নিজের চিন্তায় শুধু পাগল হয়ে যেতে বাকী ছিলাম।

একদিন ওর বন্ধু এসে খবর দিলেন, ভায়ে ভায়ে মিল হয়েছে, এবং ভাল দেখে বিয়েরও আয়োজন হচ্ছে।

কেঁদে বন্ধুর পা জড়িয়ে ধরে বললাম, আমাকে বাঁচান, এ ক'টা দিন আমার কাটিয়ে দিন। তারপর আমার কপালে যা থাকে তাই হবে।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার আত্মীয় স্বজন কি এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে এ অবস্থায় আশ্রয় নিতে পারি! কেউ ছিলনা। আর থাকলেই বা কী হতো! এই কালামুখ নিয়ে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব? যার কাছে কোন লজ্জা ভয় নেই সেই মা-ও চলে গেছেন।

উনি রাজী হলেন।

কয়েকদিন পরে বললাম, এ অবস্থায় রাত্রে একা থাকতে বড় ভয় করে, ঠিকও নয়। একটি বুড়ো গোছের মেয়ে মানুষ যদি রাতে আমার কাছে শোয় তবে বড় ভাল হয়, উনি তাতেও রাজী হয়ে চলে গেলেন তখন সন্ধ্যা।

কিন্তু সেই রাত্রেই গোটা দশেকের সময় আমার প্রসব হোল। একেবারে একা, পাশে যারা থাকে সব তেতলায় তখন ঘুমিয়ে। কণ্ঠ চিরে ফেললেও আমার ডাক সেখানে পৌঁছাবে না। কিন্তু ডাকব কি, কথা বলবারও তখন আমার ক্ষমতা নেই। অসহ্য বেদনার অবসাদে, আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে আমি পড়ে রইলাম।

জ্ঞান হয়ে দেখলাম, দিন। সুরিঝি আমার ছেলেকে কোলে করে বসে আছে। ও পাশের বাড়ীর ঝি এককালে আমারও ছিল। সেই টানে রোজ একবার ভোরে এসে আমার খোঁজ করে যেত।

হেসে বললে ওমা আমি এসে দেখনু কি তুমি চোখ বুজে পড়ে আছ কত ডাকনু তা তোমার হুসই নেই। চোখের জলে

বিশ্ববিখ্যাতা নর্ত্তকী টিলি লস্ক সেল্‌জনিক ইণ্টার-ন্যাশন্যালের "গার্ডেন অফ্ আল্লা" রঙীন ছবিতে অপূর্ব্ব নৃত্যকলা প্রদর্শন কোর্‌বেন্।

মুখ ভেসে আছে। আর চুক্‌চুক করে ছেলে তোমার বুক···

তরলা থেমে গেল।

সুরথ নরম গলায় বল্‌লে, এ্যাঃ; ভারী মুস্কিলে পড়েছিলে ত?—দু চারিদিন যেতেও যখন দেওরের সেই বন্ধু এলেন না, ভয়ানক ভাবনায় পড়লাম। সুরিকে তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে জানলাম পুলিশে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। শুনতে মরণ যেন তার কালো বীভৎস মূর্ত্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সেই আর কি, 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।'

আর কোন উপায় না দেখে দেওরের কাছে সুরিকে দিয়ে এক চিটি পাঠালাম। ছেলে হবার খবর জানিয়ে লিখ্‌লাম, এ তোমার ছেলে, তার ভরণপোষনের ব্যবস্থা করতে আইনতঃ ধর্ম্মতঃ তুমিই বাধ্য।

ও উত্তরে জানাল ছেলে ওর বন্ধু হরিশেরও হতে পারে। এত শিক্ষিত হয়ে মানুষ যে এত নীচ হতে পারে, ভাবতে পারিনি। বিয়ের পর ও ভাল চাকরী পেয়েছে অনায়াসে। সারাদিন রাত কাঁদলাম। কিন্তু জীবন ভোর কাঁদলেও কোথা থেকেও ত একটা পয়সা আসবে না। শেষ সম্বল, গায়ের শেষ অলঙ্কারটি, হাতের শেষ দু'গাছি চুড়ি সুরিকে খুলে দিলাম। দিনের পর দিন নিজের অনশনে চললেও ক্ষুধায় ছেলের এতটুকু কান্না শুনলেও ত বুক জ্বলে ওঠে।

মাস দুই চলল কোন রকমে।

শেষে একদিন বাড়ীওয়ালা সমস্ত জিনিষ কেড়ে কুড়ে রাস্তায় বের করে দিল। আবার এক বস্ত্রে ঘরের বের হ'লাম। কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাতের রেলিং ঘেঁসে সারাদিন অনাহারে মায়ে পোয়ে বসে বসে কাঁদলাম। কত হাজার হাজার লোক সামনে দিয়ে চলে গেল।

দু'টো কি তিনটে পয়সা বোধ হয় পেয়েছিলাম। আর কেউ একবার ডেকে জিজ্ঞেসও করলে না। সহরের লোক এমনি জঘন্য উদাসীন স্বার্থপর—আমাকে কাঁদতে দেখে এক পানওয়ালী সে রাতে আমায় আশ্রয় দিল। প্রথম দু'চারদিন আমাকে ও আমার ছেলেকে সে খুবই আদর যত্ন করল। কিন্তু সে বেশ্যা। একদিন তার পাপ অভিলাষ সে আমাকে জানাল। আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলাম। আমাদের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে খুন হয়ে যাচ্ছে। উঃ, সে কি অবস্থা।

তরলা খানিক চুপ করে রইল। তারপর একটা ঢোক গিলে বললে কিন্তু কোথা যাব। ছেলেটা যদি না থাকত তা'লে হয়ত দুঃস্থ মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য যে-সব জায়গা আছে তারই একটাতে উঠতাম গিয়ে। কিন্তু এই কলঙ্ক ঘাড়ে করে, গিয়ে সেখানে দাঁড়াতে কিছুতেই মন সরল না। যদি ম্যাট্রিকটা পাশ হতাম তাহলেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম।

তারপর কেমন করে ধীরে ধীরে এ পঙ্কে যে ডুবে গেলাম—আবার তরলা খানিকটা চুপ করে রইল।

—কিন্তু যার জন্যে......ছেলেকে আমি বাঁচাতে পারিনি।

ওর চোখের দিগন্তে অশ্রুর আভাষ দেখা দিল। সুরথ মুখ দিয়ে কী রকম একটা শব্দ করে ওঠে। তারপর সবাই চুপ! ঘর একেবারে নীরব! সে-নিস্তব্ধতা বুঝি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করা যায়!

একটা কাক ডেকে উঠল।

রাস্তায় জল দেবার শব্দ হচ্ছে।

সুরথ সুমিত্রার মাথাটি নেড়ে দিয়ে বল্‌লে, এই ওঠ। সুমিত্রা যেন গভীর ঘুমিয়েছে।

ভোরের চাঁদের মত ওর মলিন স্নিগ্ধ মুখটার দিকে খানিক চেয়ে সুরথ তুমি ওঠ ভোর হোল, এ-কণ্ঠ সে-সুরথের নয় স্ত্রীকে যে বেশ্যা পাড়ায় নিয়ে এসেছে।

ওরা এসে রাস্তায় দাঁড়াল।

আসবার সময় তরলার দিকে সুরথ একবার ফিরে চেয়েও দেখেনি।

ওর সঙ্কেতে একটা ট্যাক্সি এসে সামনে দাঁড়াল। তাতে উঠে বসে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে সুরথ বল্‌লে এস। একটা বিদ্যুৎ চিরে গেল সুমিত্রার সজল চোখে।—তোমার সঙ্গে? তুমি, যে-তুমি আমায় বেশ্যার বাড়ী নিয়ে এসেছ! আমি তোমার স্ত্রী, এমন অপমান আমি—

অশ্রুবাষ্পে আবরুদ্ধ হয়ে গেল সুমিত্রার কণ্ঠ। টস্‌টপ করে মুক্তার মালার মত চোখের জল গড়িয়ে পড়ল সেই ঘৃণিত পথে।

এই দৃশ্যে ট্যাক্সিতে বসে সুরথ যেন শরবিদ্ধ হতে লাগল। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে সুমিত্রার কাছে ঘেষে বল্‌লে, এবার আমায় মাপ কর সুমিত্রা। জানত আমি চিরকাল গোঁয়ার, অশিক্ষিত, খেয়ালী; খেয়ালের বশে—তোমাকে ওই অবস্থায় দেখে, মাথায় রক্ত চন করে উঠল। জানি তুমি নির্দ্দোষ। তবু ভাবলাম দেখাব পাপ কী ভীষণ।

—তুমি সরে যাও আমার কাছ থেকে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সুমিত্রা বল্‌লে, তরলার থেকে আমার নির্য্যাতন কম হয়নি। ওর সহায় কিছু ছিলনা, আমার আমি দাঁড়াব নিজের পায়ে···আমার বন্ধনও কিছু নেই

বলে ও বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চল[illegible]

সুরথের পা যেন আঠায় জড়িয়ে [illegible]গল সেই রাস্তায়। ভগ্ন কণ্ঠে বল্‌লে তুমি শুনে যাও...

সুমিত্রা তখন ট্রামে উঠেছে। কণ্ডাক্‌টার ঘণ্টা টিপল, বাজল ঠন্‌ঠন্—চলল ট্রাম।

শূন্য দৃষ্টিতে সেদিক একটু চেয়ে থেকেই সুরথ প্রাণপণে দৌড়াল ট্রামের দিকে।

পূজার আনন্দ

শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

পূজা আসিয়াছে। বৎসরান্তে যেমন আসিয়া থাকে, এবারও তেমন করিয়াই আসিয়াছে। শুনা যায়, মা'র আগমনে বাঙ্গালা দেশে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। অন্ততঃ একদল লোককে জোর করিয়া ঐ কথা ঘোষণা করিতে হয়। কিন্তু সত্যই কি মা আর বাঙ্গালা দেশে আসিয়া থাকেন? না, বাঙ্গালা তাঁর আগমনে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়?

যে আনন্দ দেখে দেখুক, যে আনন্দ উপভোগ করে করুক—কিন্তু আমরা, বাঙ্গালার দরিদ্র অধিবাসীবৃন্দ—তাহার কিছুই দেখিতে বা উপভোগ করিতে পাই না।

হাঁ—একদিন ছিল, যখন সত্যই মা বাঙ্গালা দেশে আসিতেন। তখন বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে মহাসমারোহে মায়ের পূজা হইত এবং যে বাড়ীতে পূজা হইত সে বাড়ীতে কয়দিন ধরিয়া দীয়তাং ভুজ্যতাম্ চলিত। গ্রামের ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলে তিনদিন মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইত। তখনও বাঙ্গালা দেশে তথাকথিত আভিজাত্য প্রবেশ করে নাই তখনও লোক বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উপবাসে থাকিয়া পূজা বাড়ীতে যাইয়া দ্বিপ্রহরে মায়ের প্রসাদ ভক্ষণ সম্মানজনক কার্য্য বলিয়াই মনে করিত। সপরিবারে গৃহে অন্নাহার না করিয়া নিমন্ত্রণ বাটীতে যাইয়া আহার করা তখন পর্য্যন্ত লোক অগৌরবের কথা বলিয়া ভাবিতে শিখে নাই।

মহা সমারোহে পূজার কথা বলিয়াছি। সমারোহ অর্থে এখনকার মত চপ, কাট্‌লেট, কালিয়া, পোলাওএর দিন তখন ছিল না। লোক তখন নিমন্ত্রণ বাটীতে যাইয়া ভীমনাগের সন্দেশ, নবীন দাসের রসগোল্লা বা কৃষ্ণচন্দ্রের রসোমালাই খাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত না। তখন উত্তম চাউলের অন্ন, ঘণ্ট, শুক্তা, ডাল, ডালনা, মাছ, মাংস অম্ল প্রভৃতি দ্বারাই লোক নিজ নিজ উদর পূর্ণ করিত। গব্যদ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ সংযুক্ত চাউলের পরমান্নই উপাদেয় বস্তু ছিল। নারিকেল ও চিনির প্রস্তুত রসকরা তখন মিষ্টান্নের স্থান অধিকার করিয়াছিল। দধিকে জল বলিলেও চলিত, তাহাই তখন লোক সাগ্রহে গ্রহণ করিত। সম্পত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জিলাপি ও বঁদিয়ার ব্যবস্থা হইত—ইহাই যথেষ্ট এবং পর্য্যাপ্ত বলিয়া সকলে বিবেচনা করিত। তখনও আমাদের রন্ধনশালায় হিন্দুস্থানী বা উড়িয়া পাচক প্রবেশ করে নাই। আমাদেরই গৃহের মাতা, ভগিনী ও কন্যারা পরস্পরের গৃহে যাইয়া তিন দিন অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া ব্যঞ্জনাদি পাক করিতেন। পুরুষগণ নিজেরাই অন্নপাক করিয়া লইতেন। কাহারও গৃহিনীর পক্ষে উত্তম ব্যঞ্জন রন্ধন করা তাহার পক্ষে গৌরবের কথাই ছিল।

এ দৃশ্য এখনও বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া যায় নাই—কোন কোন গ্রামে এখন পর্য্যন্ত সেই পুরাতন ভাবই প্রচলিত আছে। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত ও সভ্য ব্যক্তিরা আর দ্বিপ্রহরে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিতে যান না। সন্ধ্যায় বা অপরাহ্নে কোন প্রকারে যাইয়া সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট যাঁহারা অসভ্য ও অভদ্র বলিয়া বিবেচিত, তাঁহারাই দ্বিপ্রহরে ২ বা ৩ মাইল পথ পুত্রকন্যা সহ রৌদ্রে গমন করিয়া নিমন্ত্রণ বাড়ীতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মায়ের পূজা কি আর আছে? কলিকাতার মত সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রায়ই বারোয়ারী বা সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজাই লোকের দেখিবার জিনিষ হইয়াছে। কোন ধনীর গৃহে আর পূজা হয় না। কাজেই পূজার প্রসাদ গ্রহণের নিমন্ত্রণের বালাই আর নাই বলিলেই হয়। বারোয়ারী বা সার্ব্বজনীন পূজার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। সার্ব্বজনীন পূজায় ঢাক ঢোল বাজে, পুরোহিত পূজা করেন—সকল ব্যবস্থাই প্রায় হয়—কিন্তু প্রসাদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ নাই। যেথানে বারোয়ারী পূজার প্রাচুর্য্য আছে সেথানে খুব জোর সরায় প্রসাদ সাজাইয়া তাহা বাড়ী বাড়ী বিতরণ করা হয়। লোক কিরূপ শ্রদ্ধার সহিত সেই প্রসাদ গ্রহণ করে, তাহা আর প্রকাশ করিয়া লাভ নাই। অধিকাংশ স্থলেই ফল মূল, মিঠাই প্রভৃতি বিতরিত হয়। প্রসাদ বলিয়া সাধারণতঃ আমরা যে ভাত, ডাল, তরকারী বুঝি, তাহাও বিতরিত হয় না।

আমাদের পূজার আনন্দ গেল কোথায়? মুখে আমরা যতই সাম্যবাদ, শ্রমিক তন্ত্রবাদ কৃষক তন্ত্রবাদ প্রভৃতির বুলি আওড়াই না কেন প্রকৃতপক্ষে আমরা দিন দিন স্ব-তন্ত্রবাদীই হইয়া পড়িতেছি। আজ যাঁহারা কলিকাতা সহরে বড় বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া ধনী বলিয়া পরিচিত হইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তবে আমরা কি জানিতে পারিব? প্রত্যেকেরই গ্রাম্য বাসস্থান ছিল এবং প্রত্যেকের গৃহেই পিতামহ, প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ-প্রপিতামহের আমলে সমারোহের সহিতই দুর্গাপূজা হইত। কিন্তু আজ আর হয় না কেন?

আমরা সকলেই সহরমুখী হইয়াছি।

পূজার সময় থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া অর্থ ব্যয় করি ; সস্তা ভাড়ায় পুরী, কাশী, শিলং গিরিডী বা দেওঘর যাইয়া অর্থের অপব্যয় করি—কিন্তু কেহই গ্রামে গমন করি না। গ্রামের বাড়ীতে যে দুর্গোৎসব হয়, তাহার ভার পড়ে দরিদ্রতম জ্ঞাতির উপর। তিনি কয়েক বৎসর অতি কষ্টে পূজা সম্পন্ন করিয়া শেষে তিনিও পূজার পাট উঠাইয়া দিয়া আমাদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিতে বাধ্য হন। ইহা আমাদের জাতিগত, চরিত্রের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই পথ হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত হইতে হইবে। ধনীরা যদি পূজার সময় মসুরী, শিলং, ওয়ালটিয়ারে না যাইয়া দেশের বাড়ীতে যাইয়া সমারোহের সহিত দুর্গাপূজায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে গ্রাম কি আর জনহীন হয়—না বাড়ীর অঙ্গন জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া থাকে ? তিন দিনের পূজা বটে—কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে পূজার এক পক্ষ কাল পূর্ব্ব হইতে পূজার আয়োজন না করিলে দুর্গাপূজা করা সম্ভব হয় না। সে জন্য বহু লোকজনের প্রয়োজন। গ্রামের লোক সানন্দে ও সাগ্রহে পূজাবাড়ীতে যাইয়া কাজ করিয়া থাকে। পূজার সময় গৃহকর্ত্তা সকলকে একখানি করিয়া নববস্ত্র প্রদান করিয়া এবং সকলকে কয়দিন ধরিয়া নিজগৃহে খাওয়াইয়াই সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। গ্রামের দরিদ্র কৃষক মজুরগণও ঐ একমাত্র নূতন কাপড়ের লোভে ও পূজার তিন দিন মায়ের প্রসাদ পাইবার লোভে কয়দিন ধরিয়া পূজাবাড়ীতে কাজ করিয়া থাকে। ইহাই ত বাঙ্গালার গ্রামের আদর্শ এবং সেই আদর্শ লইয়াই ত বাঙ্গালী এতদিন সুখে ও স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিয়া আসিয়াছে। আজ আপনি যত ধনই উপার্জ্জন করুন না কেন, আপনার অভাব আর কিছুতেই মিটিবে না। অভাবের পরিমাণ বাড়াইলে অভাব যে দামোদরের উদরের ন্যায়ই বর্দ্ধিত হয়।

বাঙ্গালী জাতির এখন কর্ত্তব্য কি? পূজার এই অবকাশে সকলকে ভাবিতে হইবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অসার চাকচিক্য দেখিয়া আমরা যে পতঙ্গের মত দলে দলে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া গিয়া পুড়িয়া মরিতেছি—ইহাই কি চিরদিন করা চলিবে? না আবার আমাদের স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এখনও বাঙ্গালার গ্রামগুলি লুপ্ত হয় নাই। ধনী ও দরিদ্র সকলে যদি একযোগে গ্রামগুলির প্রতি আকৃষ্ট হই—তবে গ্রামগুলির লুপ্তশ্রী ফিরিতে বিলম্ব হইবে না। আনন্দময়ীর আগমনের আনন্দ শুধু নিজেরা উপভোগ করিব না—গ্রামের সকলকে লইয়া সপ্তাহ কাল ধরিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়া নিজেরা ধন্য হইব এবং গ্রামস্থ সকলকে ধন্য করিব। এই আদর্শ লইয়াই ত আমাদের পিতৃপুরুষগণ গ্রামে বাস করিয়া মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন। আমরাই বা কেন, অযথা সে পথ ত্যাগ করিয়া দুঃখময় পথ অবলম্বন করিব?

আমরা সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে জানি, আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি পূজার সময় দেশভ্রমণে যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা যদি নিজগ্রামে ও নিজগৃহে দুর্গাপূজা করিয়া ব্যয় করেন, তবে তাঁহাদের দ্বারা কত লোক উপকৃত হয়, কত দরিদ্রের বালকবালিকা মহাপূজার সময় নববস্ত্র লাভ করিয়া মহানন্দ লাভ করে—কত গ্রাম্য জরাজীর্ণ গৃহের সংস্কার সাধিত হয় ও কত লোক তিন দিন দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করে। দেশে ত নানাদিক দিয়া নানাপ্রকার আন্দোলন চলিতেছে—দেখিতে দেখিতে বারোয়ারী বা সার্ব্বজনীন পূজার সংখ্যা হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে—সেই সঙ্গে কি আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদিগকে পূজার সময় দেশভ্রমণরূপ অপব্যয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারি না! পূজার আনন্দ থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া উপভোগ করা যায় না—পূজার আনন্দ শিলং বা মসুরী পাহাড়ে আরোহণ করিয়াও পাওয়া যায় না—সেই অপার্থিব আনন্দ লাভ করিতে হইলে আমাদের গ্রামগৃহে ফিরিয়া গিয়া পূজামণ্ডপে বসিয়াই তাহা পাইতে হইবে—তাহা পাইবার অন্য কোন উপায়ই নাই।

গল্প-রচনার উপাদান

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও একটি লাইন লিখিতে পারি নাই। সাজ-সরঞ্জাম লইয়া লিখিতে বসিলেই সংসারের অসংখ্য অভাব-অভিযোগ কোন সুযোগে মনের মুকুরে প্রকট হইয়া ওঠে বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার সমাধান করিতে পারি নাই। আজকাল গৃহিণী উঠিতে-বসিতে অক্ষমতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া যে-সমস্ত বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। একটা কিছু না করিলে আর চলে না। যা'হোক একটা কিছু—মুটেগিরি, মুটেগিরিই সই।

হায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি। তোমার যে এতদূর অধঃপতন স্বচক্ষে দেখিব এ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। ছেলে-বেলায় পড়িয়াছিলাম—"লেখাপড়া শিখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।" গাড়ি-ঘোড়া চড়িবার আশা করি নাই, করিয়াছিলাম কোন রকমে দু'বেলা দু'মুটো সংস্থান করিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিব। যিনিই কথা কয়টি লিখিয়া থাকুন তাহা কত বড় মিথ্যা-প্রচার অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ফলে সেটুকু প্রকাশ করিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ হইতেছে না। অধীত পুস্তকের জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিয়া মনের আয়তন হয়তো বাড়িয়াছে, চুল চিরিয়া তর্ক করিবার ক্ষমতা হয়তো মিলিয়াছে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের সম্ভ্রম-সঙ্কোচ, গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-আহরণ করিবার অভিনব পন্থার হদিস মিলিল কই? একদিককার অভাব দূর করিতে যাইয়া আর একদিক যে আপনা হইতেই অনাবৃত হইয়া পড়ে।......

বিকাল বেলায় রাস্তা অতিক্রম করিয়া যাইতেছি পিছন হইতে কে যেন ডাকিল: শুনচেন্ দাদা?—

পশ্চাৎ ফিরিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। একটু দাঁড়াইয়া কী করিব ভাবিতেছি এমন সময় অপরিচিত একটি লোক আমার কাছে আসিয়া বলিল: আপনার নাম পরমেশ মিত্র?

—আজ্ঞে হাঁ। উত্তর দিয়া মনে মনে ভাবিলাম ভদ্রলোকটি নিশ্চয় কোন পত্রিকার সম্পাদক। কলিকাতার মত মহানগরীতে এত লোক থাকিতে আমার নাম মনে করিয়া রাখার উপস্থিত আর কোন কারণ মনে আসিল না। আশাও হইল অর্থপ্রাপ্তির কিছু সুযোগ হয়তো মিলিবে। বলিলাম: আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারচি না। এর আগে কোথায় দেখেচি বলুন তো?

অপরিচিত ভদ্রলোকটি সোৎসাহে বলিল: আমার গতিবিধি সর্ব্বত্র। বিশ্ববাসীর উপকার করাই আমার পেশা।

তর্ক করিলাম না। সম্পাদকের অবাধ গতিবিধি সত্যই তো সর্ব্বত্র। লেখার বিনিময়ে অর্থ-প্রদান করিয়া তাঁহারা মানুষের অশেষ কল্যাণ করিতেছেন ইহাতেও কোনরূপ সন্দেহ নাই। তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম: আমাকে আপনার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাস করতে পারি কি?

—নিশ্চয়, একশোবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কওয়ার চেয়ে চলুন ওই সামনের চায়ের দোকানে। ধীরে সুস্থে সব ক[illegible] হবে'খন।

চায়ের দোকানে ঢুকিয়া দু'কাপ [illegible] দিবার কথা বলিয়া একটু অপেক্ষাকৃ[illegible] নির্জ্জন জায়গায় আসিয়া বসিলাম। চা[illegible] চুমুক দিয়া ভদ্রলোকটি বলিল: আপ[illegible] ভারী চমৎকার লেখেন, মশাই। ছেলেবে[illegible] থেকে আপনার লেখা আমি পড়চি।

এইবার ভদ্রলোকটির আপাদমস্তক বে[illegible] মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া লইলাম ভদ্রলোকটির বয়স অনুমান চল্লিশের কি[illegible] উপর হইবে। ভদ্রলোকটি এতক্ষণ অভিন[illegible] করিতেছিল মন্দ নয়। যত গণ্ডগো[illegible] বাঁধাইয়া দিল "ছেলেবেলা হইতে আপনা[illegible] লেখা পড়িতেছি" এই কথা ক[illegible] উচ্চারণ করিয়া। ভদ্রলোকটি আমা[illegible] ডাকিয়া আনিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন [illegible] তো? অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে এরূপ মাত্রাজ্ঞানহী[illegible] স্তুতিবাদ করার কী যে অন্তর্নিহিত অ[illegible] তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সন্দেহ হই[illegible] নিশ্চয় কোন মতলব লইয়া ভদ্রলোক[illegible] আমার পিছনে ঘুরিতেছেন। একটু বির[illegible] হইয়াই বলিলাম: কী জন্যে আপনা[illegible] শুভাগমন চটপট করে বলে ফেলুন দিকি[illegible] আমার আবার অন্য দরকার আছে।

—সত্যি বলচি কয়েক বছরের ম[illegible] আপনি বেশ নাম করে ফেলেচেন। লোক[illegible] মুখে শুনতে পাই আপনার অর্থ-সমাগম বেশ ভালোই হচ্চে।

—সে তো সুখবর। কিন্তু আপনা[illegible] তাতে কী সুবিধে?

—আমার সুবিধের কথা আমি মোটেই ভাবচি না, ভাবচি আপনার। মানুষের মরাবাঁচার কথা কেউ বলতে, পারে না। দুর্দ্দিনের জন্তে আপনার কিছু—

ভদ্রলোকটির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম: সঞ্চয় করবার মত কোন সংস্থানই আমার নেই। আপনি বুঝি ইন্সিয়োরেন্সের দালাল? এ-কথাটা আগে বললেই এক কথায় সমস্ত জিনিষের নিষ্পত্তি হয়ে যেতো বলিয়া ভদ্রলোকটিকে কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া চা-ওলার পয়সা মিটাইয়া রাস্তায় নামিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার মহানগরীর পথ-ঘাট গ্যাসের আলোয় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত দেহ লইয়া গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় মন্থর গতিতে কেরাণীর দল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তণ করিতেছে। সামর্থ্য বলিয়া কোন জিনিষ তাহাদের নাই, জীবনের উচ্ছ্বসিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণধারার উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিবসের অভ্যাসের ফলে তাহারা তাহাদের নীরস বিলুপ্ত-প্রায় দেহটিকে লইয়া মহানগরীর বিস্তৃত পথ অতিক্রম করে।

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম রাতে গৃহে ফিরিয়া যেমন করিয়া হউক একটা গল্প শেষ করিতে হইবে। কারণ যে-কয়টা টাকা গল্প-লেখার পারিশ্রমিক হিসাবে পাইয়াছিলাম তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। গল্পের প্রতিবাদ্য বিষয়ও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং কল্পনাও চিন্তাশক্তির সাহায্যে ইহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে একটা বাস্তবরূপ দিতে ত্রুটি করি নাই। মাঝখান হইতে এই অপরিচিত ব্যক্তির আকস্মিক আবির্ভাব এবং অবান্তর কথাবার্ত্তায় আমার সকল্পিত গল্পের ঘটনাপুঞ্জে ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া একাকার হইয়া গেল। মন শূন্যতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, চিন্তাশক্তিতে হঠাৎ আঘাত লাগায় কল্পনাশক্তিও ক্রমশঃ বেঁকিয়া দাঁড়াইল এবং মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী কেমন যেন অবশ হইয়া আসিল। গল্প লিখিবার চেষ্টা উপস্থিত ত্যাগ করিতেই অকস্মাৎ মনের মধ্যে একটি কথা উঁকি মারিয়া উঠিল: সাধারণ মানুষের জীবন-ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই গল্প বা উপন্যাস রচনার শ্রেষ্ঠ মাল মসলা। যে নিখুঁতভাবে বাস্তব চিত্র অঙ্কন করিতে পারিয়াছে তাহার গল্প তত উপভোগ্য হইয়াছে। গত দশ মিনিট ধরিয়া এই কথাকয়টি আমার কাণের কাছে অস্পষ্ট গুঞ্জন করিয়া ফিরিয়াছে, যদিও কোন নূতন তথ্য ইহা হইতে আবিষ্কার করিতে পারি নাই। একবার মনে হইল এই কথাকয়টির উপর নির্ভর করিয়া গল্প লিখিলে কেমন হয়? সাধারণ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার জীবনের ঘটনাসমূহ খুটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেই চলিবে। নিজের সংসারের কথা লিখিতে আর ইচ্ছা হয় না। যাহা জানি তাহা বহু গল্পের মধ্যে আভাষ-ইঙ্গিতে বহুবার প্রকাশ করিয়াছি, বলিবার মত আর কিছু বাকি রাখি নাই। এই মুহূর্ত্তেই আমাকে একটি সাধারণ লোকের খোঁজ করিতে হইবে—সম্পূর্ণ অপরিচিত সাধারণ লোক। অর্থের জন্য তাহার কাছে হাত পাতিব না, শুধু তাহার জীবনের কাহিনীটুকু শুনিবার দাবী করিব মাত্র। ইহার বিনিময়ে মান-সম্ভ্রম যদি ক্ষুণ্ণ হয় তাহাও শ্রেয়। মানুষের জীবনের কাহিনী শুনিবার আশায় পথে পথে আজ যামিনী যাপন করিব।...

গভীর রজনী। নিস্তব্ধতাকে মন্থন করিয়া একটা ভয়াবহ শূন্যতা মহানগরীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। জনসমুদ্রের বিপুল বাহিনীর সে অট্ট-কোলাহল আর কর্ণগোচর হয় না। কচিৎ দু'একটি লোক নিস্তব্ধ নগরীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অনিচ্ছাকৃত অপরাধে সঙ্কুচিত হইয়া দ্রুত পদসঞ্চালনে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। ট্রাম-চলাচল বহু পূর্ব্বেই থামিয়া গিয়াছে, নৈশ গগণ বিদীর্ণ করিয়া মোটর বাস্ পথিকের মনে একটা শঙ্কা জাগাইয়া চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া যায়।

সাধারণ লোকের সাক্ষাৎ-লাভের আশায় মহানগরীর বিস্তৃত পথ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ফিরিয়াছি। অবশেষে হাজরা রোডের মোড়ের মাথায় ব্যর্থ অন্বেষণে হতাশ হইয়া দাঁড়াইলাম। নিকটবর্ত্তী একটি গ্যাস-পোষ্টের কাছে একটি মধ্যবয়স্ক লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মনে আশার সঞ্চার হইল কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে তাহাকে একটি চলন্ত ট্যাক্সিতে উঠিতে দেখিয়া মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। মিনিট পনেরো বাদে দ্বিতীয় ব্যক্তিটির আবির্ভাব হইল এবং সে আমার পাশ দিয়া দ্রুত অতিক্রম করিয়া গেল। তাহার হাবভাব এবং মুখের অস্বাভাবিক বিকৃত চেহারা দেখিয়া কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। এবং তাহাকে সাধারণ লোকের পর্য্যায় ফেলিতে মন যেন কেমন সঙ্কোচবোধ করিতেছিল।

ইহাদের কথা চিন্তা করিতে করিতে মনের মধ্যে যে কিরূপ অস্বস্তিবোধ করিতেছিলাম তাহার বিশ্লেষণ করিবার সামর্থ্যও তখন আমার ছিল না। গভীর রজনীতে একজন তস্করের মত সুযোগের আশায় ওৎপাতিয়া থাকিয়া অপর একজন অপরিচিত ব্যক্তির জীবনের জীর্ণ-ইতিহাসের আবৃত্তি শুনিবার সে-অপরিসীম আগ্রহ

বিপুল ধৈর্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখা যে কত বড় দুরূহ বিড়ম্বনা তাহা যাহারা ভুক্তভোগী নহে তাহাদের কেমন করিয়া বুঝাই। আর এমনই ভাগ্য-বিপর্য্যয় যাহাদের সাক্ষাৎ পাইলাম—কোন প্রয়োজনেই তাহারা আসিবে না।

আর একটু অগ্রসর হইয়া গ্যাস্‌-পোষ্টের ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। রাস্তায় জনমানবের নামগন্ধ নাই। বাতাস গুমরিয়া মরিতেছে এবং মাঝে মাঝে দূরে ক্বচিৎ দু'একটি মানবের অস্পষ্ট ছায়া ছায়াবাজীর ন্যায় দ্রুত মিলাইয়া যাইতেছে। অবশেষে মানুষের একটি অস্পষ্ট ছায়া আমার গ্যাস্‌-পোষ্টের নিকটবর্ত্তী আসিতেই আলোতে তাহার মুখমণ্ডল দেখিয়াই আনন্দে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম: এইরূপ একটি লোককে আমার একান্ত প্রয়োজন। অপরিচিত লোকটির বয়স যে কত তাহা জোর করিয়া বলা কঠিন—২২ কিংবা ৩২ একটা কিছু হইবে। গ্যাসের আলোকে তাহার বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বা নিষ্প্রভতা কিছুই ধরা যায় না। চোখে পড়িল শুধু তাহার আয়ত চক্ষুদুইটির প্রশান্ত গম্ভীরতা।

আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেই পশ্চাৎ হইতে তাহার জামার কলারটি চাপিয়া ধরিলাম। অকস্মাৎ বাধা পাইয়া লোকটি ভয়ে এবং আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল এবং নিজেকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দুই হস্ত প্রসারিত করিল। তাহাকে অভয়-বাণী শুনাইবার অভিপ্রায়ে মোলায়েম-কণ্ঠে বলিলাম: ভয় পাবেন না আপনি। খুন, চুরি, ভিক্ষা কোনটাই আমার পেশা নয়। একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলাম: একরকম ভিক্ষুকই বটে, কিন্তু অর্থের ওপর আমার কোন লোভ নেই। একটা জিনিষ আপনার কাছে শুধু জানতে চাই—শুধু একটা জিনিষ—আপনার জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস।

অপরিচিত ব্যক্তির চক্ষুদুইটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এবং চোখের পলকে দু'পা সরিয়া দাঁড়াইল। বুঝিতে পারিলাম লোকটি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছে। জনবিরল পথে নিশীত রাতে হঠাৎ এইরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন করিলে লোকে প্রশ্নকারীকে পাগল বলিয়া ভ্রম করিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি। তবুও অতি বিনীতকণ্ঠে বলিলাম: আপনি যা ভাবচেন প্রকৃতপক্ষে আমি তা নই। আমি পাগল নই। আমি একজন গল্প-লেখক। কালকেই একটি পত্রিকার সম্পাদককে একটা লেখা দেবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েচি। কাল যদি না দিতে পারি আমার সংসারের কয়টি প্রাণী না খেতে পেয়ে মারা যাবে। শুধু আপনার জীবনের ঘটনাগুলো আমায় জানান এবং সেইগুলো হবে আমার গল্প রচনার উপাদান। সত্যি বলচি আপনাকেই আমার একান্ত প্রয়োজন—আপনার জীবনের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আপনার সরল স্বীকারোক্তি। এ সময়ে অন্ততঃ আমাকে নিরাশ করবেন না।

বুঝিতে পারিলাম লোকটির সে সন্ত্রস্তভাব কাটিয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল: আপনাকে জানাবার মত আমার কিছু নেই। আমার জীবনের ঘটনাগুলো অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ।

আশান্বিত হইয়া বলিলাম: তা হোক, ওইটুকু আমি শুনতে চাই।

—বেশ, শুনুন বলিয়া অপরিচিত ব্যক্তিটি যাহা বলিল তাহাই হুবহু নিম্নে প্রদত্ত হইল: পঁইত্রিশ বছর আগে আমি ধরণীর প্রথম আলো দেখি। বাবার একটা ব্যবসা ছিল সেটা আমি যখন আই, এ, পড়ি নষ্ট হয়ে যায়। বাপ-মায়ের আমিই একমাত্র সন্তান। ছ'বছর বয়সে আমি সর্ব্বপ্রথম স্কুলে যাই। কুড়ি বছর বয়সে বি, এ, পাশ করে রেলওয়েতে চাকরি নিই। দশটা পাঁচটা আফিস করি। দশ বছর চাকরি করে মাইনে দাঁড়িয়েচে একশো। পঞ্চান্ন বছরে যখন রিটায়ার করবো প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের হাজার দশেক টাকা নিয়ে ঘরে বসবো এইটুকু যা আশা আছে।

প্রশ্ন করিলাম: বিয়ে করেন নি?

—হাঁ, বিয়ে একটা হয়েছে বটে—বলবার মত নয়। রোমান্সের কোন গন্ধ নেই। বাবা মেয়ে দেখে এসে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারপরই বাবা মারা যান।

—ছেলেপিলে?

—দুটি—একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স বছর নয়েক। ইচ্ছে আছে বড় হলে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবো। মেয়েটি ছ'বছরের, বাড়িতেই পড়ে। সংসারে কোন অশান্তি নেই। উচ্চ আশা-আকাঙ্খাকে নিজের অবস্থা অনুযায়ী খর্ব্ব করে এনেচি, সকাল সাতটায় উঠি, চা খেয়ে বাজারে বেরুই। তারপর ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসাই। অফিসের ফেরত কোথাও দাঁড়াই না, সটান বাড়ি ফিরি। আজকে এক আত্মীয়ের হঠাৎ বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম ফিরতে তাই রাত হয়ে গেল।

ভদ্রলোকটির জীবনের আনুপূর্ব্বিক সাধারণ ঘটনাগুলি স্বকর্ণে শুনিয়া সত্যসত্যই নিরাশ হইতে হইল। দুঃখ ও ক্ষোভে চক্ষু দিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। শুধু এইটুকু শুনিবার আশায় নিশীথ নগরীর জনবিরল পথ কত আগ্রহে অতিক্রম করিয়াছি, পথ-শ্রমজনিত সকল ক্লেশ তুচ্ছ করিয়াছি, কত উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্ত্ত কী করিয়া যে অতিবাহিত হইয়াছে—ইহা স্মরণ করিয়া নিজের হটকারিতায় হাত কামড়াইয়া মরিতে ইচ্ছা হইল। বিংশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের

ইহাই কি তবে তাহার জীবন যাত্রার সত্য পরিচয়? সুখ-কল্পনা, ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-বৈচিত্র্য, অসন্তোষ পৃথিবী হইতে চিরতরে তিরহিত হইয়া গেল নাকি? মনে হইল এরূপ মানুষের জীবন কেমন করিয়া সম্ভব? কেমন করিয়া স্বীকার করিয়া লই এই ব্যক্তির উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, নিরাশায় মুহ্যমান হইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলাম: আপনার জীবনে আর কোন ঘটনা ঘটেনি? আর একবার ভাল করে ভেবে দেখুন। আপনার জীবনের ওপর কারুর কোন আক্রোশ নেই? আপনার স্ত্রী আপনাকে কখনও প্রতারণা করেনি? কিংবা আপনার আফিসের কোন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আপনার উন্নতিতে ঈর্ষাপরবশ হয়ে কোন কিছু—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া লোকটি বলিল: আমার জীবনে ওর কোনটাই ঘটে নি। আমার জীবনের ধারা শান্ত, সমতালে আবর্ত্তিত। অতি বড় দুঃখ কিংবা আনন্দের উচ্ছ্বসিত নদির স্রোত কোনটাই আমার জীবন-আকাশে দেখা দেয় নি।

—সত্যি করে বলুন আমি যে বিশ্বাস করতে পারচি না।

এইবার লোকটি বেশ বিরক্ত হইয়াই বলিল: সত্যিই তাই, আজ রাত পর্য্যন্ত কোন অঘটনই আমার জীবনে ঘটে নি। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতই আমার জীবনে প্রথম বিস্ময়, প্রথম ব্যতিক্রম। যদি কিছু লিখতে হয় তো ওই সম্বন্ধেই লিখে দেবেন বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল।

* * *

মোহাবিষ্টের ন্যায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই এবং সে রাত্রে কেমন করিয়াই বা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। এই ঘটনার পর সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রার উপর কোনরূপ বিদ্রূপ বা কটাক্ষপাত করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ আসে।

আত্মহত্যা

শ্রীসুশীল রায়

প্রতিমা ওপরের ঘরে ব'সে চিঠি লিখছে। বাবার কাছে, দাদার কাছে, মা-র কাছে, ছোটো-বোন টুনির কাছে,—সবার কাছে জনে জনে সে চিঠি লিখছে। লিখছে, জীবনে যদি সে মনের ভুলেও কাউকে কোনদিন কোনো আঘাত দিয়ে থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে তাকে যেন ক্ষমা করা হয়!—আর আজ এই-যে সে একটি সঙ্কল্প পালনের জন্যে বদ্ধপরিকর হ'য়েছে, তার জন্যে তাকে যেন করা হয় মার্জ্জনা! এ তার নাকি না হ'লে উপায় নেই, হ'তেই হবে; কেন হ'তে হ'বে তার জবাব দেবার মতো ভাষা সে আপাততঃ পাচ্ছেনা। তবে, আজ সে কেন এ-সঙ্কল্পবদ্ধ হ'লো, তা সকলেই নিশ্চয় বুঝেছে, প্রতিমা তা আর খুলেই-বা কি ব'লবে! কিন্তু এমন নাকি হ'তোনা; অযথা তার ঘাড়ে অত বড়ো অপবাদ যে-পৃথিবীতে দিয়ে থাকে, সে-পৃথিবীর নিঃশ্বাস তার কাছে বিষাক্ত, সেখানে থাকতে সে নাকি ইচ্ছুক নয়, তাই তার মহাযাত্রা! রাত্র এখন বারোটা বেজে গেছে। আর ঘণ্টা দু-এর মধ্যেই—প্রতিমা আতঙ্কে পাংশু হ'য়ে উঠলো! অ্যাঁ, আর মাত্র দু-ঘণ্টা? তার সমস্ত শরীরের মধ্যে রক্তচলাচল অকস্মাৎ যেন বন্ধ হ'য়ে গেলো! সে কি? মোটে দু-ঘণ্টা? দু-ঘণ্টায় তার এতো কাজ হবে? এখনো যে অনেক কাজ তার করার আছে! চিঠি যে সবার কাছে এখনো লেখা হ'লোনা! এখনো যে সে পরিপাটি-রূপে তৈরী হ'য়ে নিতে পারেনি! হঠাৎ এখনি যদি অনুপম এসে শিষ দেয়! নাঃ, বড় মুস্কিল হ'লো প্রতিমার, বড্ড মুস্কিল হ'লো! আগের দিনের চিঠিপত্র, গোপনীয় ডায়রি, কোথায় যে কি প'ড়ে আছে, তার ঠিক নেই! সব তো তাকে সংগ্রহ ক'রে বিনষ্ট ক'রে ফেলতে হবে! নইলে—নইলে—প্রতিমা ব্যাকুল হ'য়ে চারিদিক তাকাতে লাগলো—নইলে সব্বাই তাকে পরিপূর্ণরূপে জেনে ফেলবে, জেনে ফেলবে তার নানাবিধ গুপ্ত তথ্য, তার নিজস্ব গোপন জীবন! প্রতিমা দ্রুত হাতে চিঠি লিখে ফেলতে আরম্ভ করলো! উঃ, ঘড়ির দিকে সে-যেন তাকাতে পারেন এত নিষ্ঠুর দ্রুততায় ঘড়ি চ'লতে এর আগে কোনদিন তো সে দেখেনি!

ঠিক। অনুপম এসে গেছে, রাস্তায় সে শিষ শুনতে পেলো যেন! প্রতিমা উঠে জান্‌লার কাছে গেলো, মাথা নিচু ক'রে তাকালো রাস্তায়! চারিদিকে সে তাকালো কিন্তু কই? অনুপম কোথায়? তবে কি এ মস্তিষ্ক বিভ্রম?

প্রতিমা ফিরে এলো। চেয়ারটি নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে সে ব'সলো! আত্মহত্যা, আজ সে আত্মহত্যা করবে। শুধু সে একা নয়, অনুপমও থাকবে তার সঙ্গে! দু-জনেই একসঙ্গে যখন লোক চোক্ষ হীন হ'য়েছে একসঙ্গেই তাহ'লে তারা—

প্রতিমা আবার উঠে জানলার কাছে গেলো। রাস্তায় বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে। পীচএর রাস্তা হাল্‌কা সবুজ গ্যাসের আলোয় উজ্জ্বল কৃষ্ণতায় ঝলমল করছে! চমৎকার! চমৎকার রাত্রি আজ! এমন মধুর রাত্রে অনুপমের সাথে পাশাপাশি ব'সে কতকথা বলার কত-যে আনন্দ, তা প্রতিমা গুণে উঠতে পারছেনা! কিন্তু, প্রতিমা নিঃশ্বাস ফেললো, কিন্তু সে-সব কথা ভুলে থাকা

দী

মহা-পূজার

শ্রেষ্ঠতম

অবদান

উত্তরায়

দেখিতে ভুলিবেন না

ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর

-বাঞ্ছিত অভিনব সমাজ-চিত্র

সোনার সংসার

নৃত্যে, গীতে, অভিনয়ে—এই চিত্রখানি আপনার অন্তরে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিবে

ভালো! আজ অনুপমের সাথে সে একসঙ্গে আত্মহত্যা ক'রে সকলকে জানিয়ে যাবে—বৃথা অপবাদ দেওয়ার পরিণাম কত নিদারুণ!

প্রতিমা ফিরে এলো! চিঠি লেখা সে কোনো-গতিকে শেষ করলো। চিঠিগুলো আশাতীত রকমের সংক্ষিপ্ত হ'য়ে গেলো কেমন যেন, বলার কথা সব প্রতিমা কেন জানি ভুলে যাচ্ছে।

চিঠি লেখা সাঙ্গ ক'রে সে দেরাজ টেনে তার ভেতর থেকে তার গোপনীয় চিঠিপত্র বেছে বের ক'রে নিলো। যাক্ নিষ্কৃতি! এখন অনুপম এলেই হয়। প্রতিমা ঘড়ির দিকে তাকাতেই ঘড়ি ঢং ক'রে একটা বেজে উঠলো। প্রতিমার বুকের ভেতরেও অমনি দারুণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো! তার সর্বাঙ্গে শির-শির ক'রে শীত করে উঠলো ভয়ানক!

জানলা দিয়ে বাইরে অনুভব ক'রে দেখলো বৃষ্টি থেমে গেছে। একটার সময়ই তো অনুপমের আসার কথা! তবে সে এলোনা কেন? তবে কি সে রাজি নয়, সে কি প্রতিমার এই চরম যুক্তি মেনে নেয়নি? সে যে কাল চিঠি লিখেছে তা কি সে পড়ে দেখেনি!

অনুপমের ওপর প্রতিমার ভয়ঙ্কর রাগ হ'লো। এত রাগ হ'লো তা বলবার নয়। মিছিমিছি তাকে প্রতিমার সঙ্গে জড়িয়ে এই-যে কুৎসা দিকে দিকে রাষ্ট্র হ'য়েছে, এ-তে কি অনুপম ব্যথিত নয়? প্রতিমা অনেক ভেবেচিন্তে বুদ্ধি ঠিক করলো, ঠিক করলো—তারা মরবে! সেই কথা জানালো অনুপমকে, আসতে ব'ললো রাত একটা নাগাদ, তবু সে আসতে পারলো না? মৃত্যুকে তার এত ভয়! প্রতিমা একাই মরবে, যা থাকে বরাতে! আরো কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করবে অনুপমের জন্তে যদি তখনও সে না আসে তা হ'লে সে একাই, হ্যাঁ, একাই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।

জানলার কাছে প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে নীলাভ-বাতি টিমটিম ক'রে জলছে! সাদা আলো প্রতিমা সহ্য করতে পারছেনা ব'লেই নীল-বাল্‌ব জ্বেলে দিয়েছে। প্রতিমা রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে, একটি প্রাণীর সাড়াশব্দ সে পাচ্ছেনা। পাচ্ছেনা সে একটি মানুষেরও চিহ্ন।

ধ্যেৎ। প্রতিমা রাগে দ্বলতে জলতে বিছানার ওপর পড়লো। কাপুরুষ, এতবড়ো কাপুরুষ সে?

ও কি? শিষ না? প্রতিমা জানলার কাছে যেতেই—ঠিক, অনুপম এসেছে। গ্যাস পোষ্টএর নিচে দাঁড়িয়ে চোরের মতো অনুপম ওপর দিকে তাকাচ্ছে। প্রতিমা হাত ইসারা করলো।

ধীর পদবিক্ষেপে প্রতিমা সিড়ি ভেঙ্গে বাগান পেরিয়ে অনুপমের সামে এসে একবার পিছনে তাকিয়ে নিয়ে ব'ললো—কি রাজি?

—নিশ্চয়। অনুপম অস্বাভাবিক ভারি গলায় ব'ললো।

—তবে চলো। প্রতিমা অনুপমের একটা হাত ধ'রে নিলো।

ভিজা পথের ওপর দিয়ে দিয়ে তারা ধীরে ধীরে হেঁটে চ'ললো। এগিয়ে চ'ললো। এগিয়ে চ'ললো তারা ছুটিতে ক্রমাগ্রে সমুখে। তারা দু-জন দু-জনের হাত চেপে ধ'রে আছে, কিন্তু কেউই কোনো কথা বলার ভাষা আবিষ্কার করতে পারছে না।

বর্দ্ধমান-রোড দিয়ে তারা ডায়মণ্ড-হারবার্‌এর রাস্তায় এসে পড়লো। ট্রাম লাইন বিষাক্ত সাপের মতো চকচক্ করছে। তারা, দু-জন কোনো কথা না ব'লে ট্রাম লাইন ধরে বরাবর বেহালার পথ নিলে।

এমন মূক হ'লো কী ক'রে তারা, সেকথা তারা নিজেরাই জানেনা কিন্তু। ভগবান যেন সব কথা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন।

অনুপম ব'ললো—অসহ্য।

—কি অসহ্য? রুদ্ধগলায় প্রশ্ন করলো প্রতিমা।

অনুপম দীর্ঘনিঃশ্বাসের শেষে ব'ললো—এই অপবাদ! তোমায়-আমায় এই মিথ্যা অপবাদ! এতো মিথ্যে কথাও মানুষে জানে! বলে, তুমি-আমি নাকি এক আত্মা হ'য়ে উঠেছি! বলে কিনা, তুমি-আমি চুপিচুপি প্রেম করছি! কী ভয়ানক মিথ্যে বাদী তারা—বলো তো!

প্রতিমা ব'ললো—সত্যিই! আশ্চর্য্য লাগে বড্ড!

—শুধু কি তাই? বলে, আমরা গোপনে চিঠি লেখালেখি পর্য্যন্ত করেছি! ক'রেছি তো ক'রেছি, তারা বলার কে? তারা দেখেছে চিঠি?

প্রতিমা ব'ললো—হু!

—শুধু কি ওই টুকুতেই ক্ষান্ত হ'য়েছে? —অশ্লীল যা-তাও যে রাষ্ট্র ক'রেছে। অনুপম উত্তেজিত গলায় ব'ললো।

প্রতিমা অনুপমের হাত চেপে ধ'রে ব'ললো—সেইজন্তেই তো, শুধু সেইজন্তেই আজ আমি এইপথ বেছে নিয়েছি।

—ঠিক ক'রেছো। চলো যাই দু-জনে। দু-জনে আজ ম'রে জানিয়ে যাই কত বড়ো নিন্দুক তারা। অনুপম রাগে রীতিমতো হাঁপাতে লাগলো।

প্রতিমা অনুপমকে দৃঢ় হাতে চেপে ধ'রলো।—চেপে ধ'রলো সে কঠিন ক'রে। অনুপমও প্রতিমার নরম হাতটি বুকের কাছে তুলে নিলো।

হাঁটতে হাঁটতে মাঝেরহাটের ব্রিজের ওপর তারা উঠে এসেছে। এদিকে ওদিকে কাছে দূরে লাল ও সবুজ বাতি জ্বলছে। নিচে অজস্র রেলের রাস্তা।

অনুপম আর প্রতিমা দু'জনে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। কোথায় তারা চ'লেছে, কোথায় তারা যাবে এর কিছুই তাদের জানা নেই। শুধু জানা আছে, তারা আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যা ক'রে তা'রা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। আত্মহত্যা করার পথ আছে নানা, কিন্তু কোন্ পথ তারা অবলম্বন ক'রবে কিছুই তাদের ঠিক নেই! দুজনে তাই হয়ত দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ!

হঠাৎ প্রতিমা ব'ললো—সঙ্গে কিছু এনেছো?

অনুপম তৎক্ষণাৎ ব'ললো—কি?

—"সায়ানিড্"? কিংবা, কিংবা একখানা ক্ষুর? আনোনি? একটা রিভলভারও না?

অপরাধীর মতো অনুপম ব'ললো—না তো!

—তবে? তাহ'লে এখন উপায়? অসহায়কণ্ঠে প্রতিমা ব'ললো: তাহ'লে এখন কি করা যাবে?

—সে-ও তো ঠিক কথা! অনুপম প্রতিমার দিকে ফিরে ব'ললো,—তাহ'লে, তাহ'লে, এক কাজ ক'রলে হয় না? আজ ফিরে যাই চলো, আসচে-কাল—

—না, না, সে হবেনা, তা কখনই হ'তে দেবোনা! ভয়ানক উত্তেজিত গলায় আরম্ভ ক'রলো প্রতিমা—আজই, একুণি, যেমন ক'রে হোক, আমি আজই, আজই—

প্রতিমার গলা ধ'রে এলো। অনুপম তার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহার্দ্র কম্প গলায় ব'ললো—ছিঃ, কেঁদোনা! কেঁদোনা, ছিঃ! কাঁদতে নেই যে আজ!

—উঃ, কি ভয়ানক, কি ভয়ানক! সবাই লেগেছে আমাদের পেছনে! আমাদের বেঁচে থাকতে দিতে ইচ্ছে নেই কারু! প্রতিমা ভিজা গলায় ব'ললো!

অনুপম ধীরে ধীরে ব'ললো—ঠিক ব'লেছো, বেঁচে থাকতে দিতে কারো ইচ্ছে নেই! সে-কথা আমি বুঝেছি, এবং বুঝেছি ব'লেই তোমার চিঠি পেয়েই আমি ঠিক করলাম, মরবো! এক সঙ্গে মরবো আমরা। আমি নানাদিক তাকিয়ে কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তুমি সে-উপায় যখন আবিষ্কার করলে, তখন আমিও তাতে রাজি না হ'য়ে পারলাম না। এসো, এসো, দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

—কোথায় যাবো?

—তা'বলে দাঁড়িয়ে থেকে তো লাভ নেই! এগোই চলো! অনুপম প্রতিমার হাত ধ'রে টান্‌লো।

—কোথায় যাবো? প্রতিমা আবার ব'ললো।

অনুপম ব'ললো—চলো তো! একটা পন্থা আবিষ্কার করা যাবেই, যেমন ক'রেই হোক্! আচ্ছা—অনুপম দাঁড়িয়ে গেলো: এক কাজ করলে হয়না?

—কি? প্রতিমা তার মুখের দিকে তাকালো।

—ইয়ে, কি ব'লছিলাম—এই, এসোনা দু-জনে দু-জনের গলা চেপে ধরি! দু-জন দু-জনের দম বন্ধ ক'রে দু'জনকে মেরে ফেলি! অনুপম সম্পূর্ণ আন্তরিক গলায় ব'ললো!

—তাহ'লে সে তো আর আত্মহত্যা হ'লোনা! প্রতিমা বেঁকে ব'ললো।

অনুপম একটু থেমে ব'ললো—অতটা বিচার ক'রতে গেলে এখন কি চ'লবে, প্রতিমা? আত্মহত্যা না হোক্, আমরা ম'রতে চাই!

—নিশ্চয়! প্রতিমা দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়ালো!—ব'ললো; বেশ, তবে তাই!

—রাজি?

প্রতিমা ব'ললো—হ্যাঁ।

দু-জনে দু-জনের গলা চেপে ধ'রলো! দু-জন দু-জনের সম্পূর্ণ বিক্রম চালনা ক'রে আপ্রাণ পরিশ্রম আরম্ভ ক'রলো। হঠাৎ অনুপম তার গলা ছেড়ে দিলো। প্রতিমা খুক্ খুক্ ক'রে আরম্ভ করলো কাশতে। অনুপমের গলাও সে দিলে ছেড়ে।

অনুপম ক্ষীণ গলায় ব'ললো—প্রতিমা, গলায় লাগেনি তো?

প্রতিমা ব'ললো—উঁহুঁ!

অনুপম ব'ললো—নিশ্চয় লেগেছে। নিশ্চয় দাগ ব'সে গেছে!

এতক্ষণে প্রতিমা ব'ললো—অত জোরে চেপে ধ'রতে আছে?

অনুপম ম্লান হাস্‌লো।

প্রতিমা ব'ললে—না, এটা সুবিধে লাগছে না। তার-চে চলো, এক কাজ করি: এখন কোনো ট্রেন আসবে না?

—কি ক'রে বলি বলো। অনুপম উদাস গলায় ব'ললো।

—এত রাত্তিরে হয়ত এদিকে ট্রেন চলেনা, না? প্রতিমা উৎসুক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো।

—হয়ত না। নির্ব্বিকারে ব'ললো অনুপম।

—তাহ'লে, তাহ'লে কি উপায় হবে বলো তো! একবার যখন বেরিয়েছি, তখন আর কিছুতেই আমি ফিরে তো যেতে পারবো না। কি হবে, অনুপম!

অনুপম ব'ললো—মরতে বড্ড্ই ইচ্ছে ক'রছে, না?

—ইচ্ছে কি আর করছে? তবে, না ম'রে আর উপায় নেই। বেঁচে থাকতে আমি পারবোনা, কিছুতেই পারবো না! এসো, এখান থেকে লাফিয়ে পড়ি। ওই লোহার ওপর পড়লে কিছুতেই বেঁচে থাকবো না, নিশ্চয়ই মরবো। দেবে লাফ? প্রতিমা উত্তেজিত গলায় ব'ললো।

—উঁহু। অনুপম স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রতিমা অসহায়কণ্ঠে ব'ললো: কেন? তাহ'লে তুমি আমার সঙ্গে ম'রবেনা, তবে কেন রাজি হ'লে আগে! ছিঃ, এতো কাপুরুষ তুমি?

অনুপম ব'ললো—ভুল বুঝো না। এখান থেকে লাফ দিয়ে পড়লে মানুষ মরে না, জখম হয়!

—না, মরেনা! নিশ্চয় মরে! প্রতিমা অস্বাভাবিক দৃঢ়তা প্রকাশ করলো।

অনুপম ব'ললো—তুমি মেয়ে, তুমি ম'রতে পারো; কিন্তু আমি যে ম'রবো না, এ আমি জানি!

—তবে অন্য কোনো উপায় ভেবে ঠিক করো! আর তো দেরি করা চলেনা! আর, এ-রকম রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিকনা। কেউ যদি দেখে ফেলে। তার ওপর পুলিশও তো থাকতে পারে কাছে-ভিতে! প্রতিমা অনুপমের দিকে তাকালো।

গ্যাসের যেটুকু আলো অনুপমের মুখের ওপর প'ড়েছে তাও তাকে ভীষণ হিংস্র ব'লে দেখাচ্ছে! যেন সে ক্ষুধিত ভীষণ শার্দ্দুল! মানবতার কোমল একটু আভাষ পর্য্যন্ত দেখার সুযোগ নেই।

অনুপম ব'ললো—এসো। এসো, ওদিকে যাই, ওই অন্ধকারে। ওখান দিয়ে 'হাটতে' হাটতে সাপেও তো কাটতে পারে!

প্রতিমা ব'ললো—দুজনকে এক সঙ্গে? সে কি সম্ভব?

—অসম্ভবও সম্ভব হয় মাঝে মাঝে, প্রতিমা! ভয়ানক রুক্ষ গলায় ব'ললো অনুপম!—তুমি এসো।

তারা দু'জন অন্ধকার মাঠের মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চ'ললো। দু-জনে পুনরায় তারা নির্ব্বাক হ'য়েছে।

দূরের বড় রাস্তা দিয়ে অসময়ে একটি ভারি বাস্ সখেরবাজারের দিকে চ'লে গেলো। আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় নিশ্চল অগণ্য তারকা চুপচাপ পৃথিবীর দিকে হাত বাড়িয়ে ঝুলে আছে।

রেল লাইনের দিকে তারা হাটতে আরম্ভ করলো। সুমুখে পড়লো রেলিঙ। অনুপম নির্ব্বিবাদে পেরিয়ে গিয়ে, হাত বাড়িয়ে প্রতিমাকে তুলে নিলো, কিন্তু প্রতিমার কাপড় রেলিঙের সঙ্গে আটুকে যাওয়ায় অনুপমের শক্তির অপচয় হ'লো অযথা।

অনুপম ব'ললো—কাপড় ছিঁড়ে গেলো না তো?

—একটু ছিঁড়েছে। যাক্ গে, অনেকদিন পরছি, আর কতদিনই-বা টিকবে!

অনুপম হাস্‌লো। কিন্তু কোনো কথা না ব'লে তাকে নিয়ে এগিয়ে চ'ললো! রেল লাইন ধ'রে তারা ক্রমশঃ এগোচ্ছে।

প্রতিমা ব'ললো—কোথায় যাচ্ছি?

—মরতে।

—তবে চলো।

তারা চ'ললো। ক্রমশই তারা চ'ললো! উদ্দেশ্যহীন পথের সন্ধানে তারা অনবরত ধাওয়া করলো! একটি সিগন্যাল পোষ্টের গায়ের কাছ দিয়ে যেতে যেতে তারের সঙ্গে পা বেধে প্রতিমা রীতিমতো প'ড়ে গেলো। অনুপম ব'ললো—এঃ, প'ড়ে গেলে? পা কেটে গেছে? জ্বালা ক'রছে?

উঁহু, চলো। প্রতিমা উঠে দাঁড়ালো।

হঠাৎ নিঃশব্দ রাত্রে সিগন্যাল পোষ্টের মাথার দিকে দারুণ শব্দ হ'তেই দু-জনে চ'মকে উঠলো। প্রতিমা ভয়ে পাংশু হ'য়ে অনুপমকে জড়িয়ে ধরলে।

অনুপম নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললো—হ'য়েছে। এখানে ব'সো।

—তার মানে? প্রতিমা জিজ্ঞাসা করলো।

—সিগনাল ডাউন দিলো। এইবার ট্রেন আসবে। তৈরী হ'য়ে নাও! অনুপম কম্পিতগলায় ব'ললো।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

—বাঁচা গেলো, বাঁচা গেলো তাহ'লে। এতক্ষণে সন্ধান মিললো! প্রতিমা ব্যথিত-আনন্দের স্বরে করুণ ক'রে ব'লে উঠলো: কিন্তু ট্রেন আসতে কত দেরি হবে?

—কত আর? এই তো এসে পড়বে!

প্রতিমা ব'ললো—এসো, লাইনে গলা দিয়ে শুয়ে পড়া যাক্!

—উঁহুঁ, সহ্য হবে না। ওতে মনের ভয়ানক জোর দরকার, অত জোর নেই! ট্রেন যেই কাছে এসে পড়বে অমনি দু-জনে লাফিয়ে গিয়ে পড়বো লাইনের ওপর? আচ্ছা?

—তাই বেশ! প্রতিমা কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিলো।

অনুপম ব'ললো—দু'জনে হাতে হাত

আশ্রম-মৃগ

[তিন রীলের হাসির ছবির জন্য লেখা]

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বড়লোকের একমাত্র ছেলে নাম ক্যাবলা-কান্ত। ছেলেবেলা থেকে কবিতা লিখবার ভারি সখ। তাই বন্ধুরা ডাকে 'কপিবর'। বালিগঞ্জে বাড়ী। বাপ থাকে দেশে। ক্যাবলার ইচ্ছে—লোকে প্রাইভেট টিউটার রেখে বি, এ; এম, এ পাশ করতে পারে সেইবা কেন একজন নাম-করা কবিকে প্রাইভেট টিউটার রেখে কবিতা লিখতে শিখতে পারবে না?

সেই অনুসারে কবিবর গজেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে "Poetry Laboratory" তৈরী হচ্ছে। বর্ষার কবিতা লিখতে হবে—সুইচ্ টিপলেই হ'ল—অমনি খাঁচায় পোষা ময়ূর নাচতে লাগল, দাদুরী ডেকে উঠল—মেঘ গর্জ্জনের শব্দ হ'তে লাগল—কৃত্রিম কথন ফুল ফুটলো। ব্যস্—স্ফূর্ত্তিতে বসে চেয়ারে হেলান দিয়ে—বর্ষায় বিরহের কবিতা লেখ।

তখনো ষ্টুডিও শেষ হয়নি। ক্যাবলা-কান্ত মনের আনন্দে ষ্টুডিওর পাশে এক গাছে উঠে আপন মনে প্রেমের কবিতা লিখছে। ওদিকে চিড়িয়াখানা থেকে একটা বনমানুষ খাঁচা ভেঙ্গে পালিয়ে এসেছে। সে লাফিয়ে গাছে উঠে ক্যাবলাকান্তের খাতাখানা টেনে নিয়ে—তারপর আপন মনে তাতে আঁচড় কাটতে লাগলো। ক্যাবলা খাতা ফিরিয়ে আনতে গেলে—দাঁত খিচিয়ে এসে বানরটা তার চাদর কেড়ে নিলে। ক্যাবলাকান্ত কপির ভয়ে—ষ্টুডিওতে পালিয়ে এসে—কবির স্মরণাপন্ন হ'ল। কবিবর বল্লেন ও সেকেলে-ক্যাবলাকান্ত নামে—সে কিছুতেই কবি হ'তে পারবে না। তার নাম পালটে রাখতে হ'বে 'হরিণ'। ক্যাবলা স্পষ্ট দেখতে পেলে সে যেন শকুন্তলার হরিণ। সেই সুন্দরী তাপস কন্যার হাত থেকে—গুচ্ছ গুচ্ছ তৃণ চর্ব্বণ কচ্ছে। আনন্দে সে চীৎকার করে উঠলো ইউরেকা, ইউরেকা।

কবিবর তাকে একটি প্রেমের কবিতা লিখতে দিয়ে চলে গেলেন। এমন সময় এসে ঢুক্‌লো— ক্যাবলার প্রাণের বন্ধু উদ্দীপনা ঘোষক। সে এসে জানালো সাতদিন ধরে ক্যাবলার লিখিত কবিতা সে ভারতবর্ষের সমস্ত কাগজে ছাপতে পাঠিয়েছে। এগুলি যখন প্রকাশিত হ'বে তখন—সাহিত্য-জগতে একটা রীতিমত সাড়া পড়ে যাবে।

সেই মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকলো এক পিয়ন। তার পেছনে এক মুটে—, ঝাকা ভর্ত্তি ফেরৎ-কবিতার পেকেট। সে হুড় হুড় করে সেগুলো ক্যাবলার টেবিলের উপর ঢেলে দিলে। দেখা গেল—তা'রই মাঝে ক্যাবলা কোথায় তলিয়ে গেছে!

উদ্দীপনা তাড়াতাড়ি একটি চিঠি খুলে পড়লো—। ক্যাবলা ততক্ষণে চিঠির পেকেট ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে—চিঠিখানা টেনে নিলে—। তাতে লেখা আছে—

কবিবর,

প্রেমের কবিতা লিখেছেন; কিন্তু জীবনে কখনো প্রেমে পড়েছেন কি? অভিজ্ঞতা না জন্মালে কিছুই লেখা উচিত নয়।

সম্পাদক—বিস্ফোটক
সাহিত্য ভবন।

ক্যাবলা বল্লে, ঠিক বন্ধু—আমি চল্লুম।

উদ্দীপনা বল্লে,—কোথায়—

ক্যাবলা ছাতাটা হাতে নিতে নিতে বল্লে—প্রেমে পড়তে—

বর্ষাকাল। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ক্যাবলা আপন মনে ছাতা মাথায় পথ চলেছে। হঠাৎ সে দেখতে পেলে তার কিছু আগে আগে একটা মেয়ে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। এটাকে একটা মহা সুযোগ মনে করে—সে ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে তার মাথায় গিয়ে ছাতা ধরলো। কিন্তু মুখের দিকে চাইতেই

ধরে দাঁড়িয়ে থাকবো। কাছে এলেই ওয়ান-টু থ্রী ব'লেই—ঠিক। প্রতিমা অনুপমের হাত ধরলো: কে ওয়ান টু-থ্রী ব'লবে?

—আমিই ব'লবো। কিন্তু তার আগে দু-জনে বিদায় নিয়ে নি দু-জনের কাছে! অনুপম ঘুরে দাঁড়ালো।

দু-জনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে দু-জনের চোখ মুছলো। লোহার-পথে ভারি ইঞ্জিন দারুণ শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসচে। অন্ধকারের রাত্রে একটি সার্চ লাইটও নেই!

দু-জনে হাত ধরাধরি ক'রে লাইনের দিকে মুখ দিয়ে দাঁড়ালো। দারুণ বিক্রমে খানিকটা অন্ধকারের পিণ্ড ছুটে চ'লে আসচে। প্রতিমার দেহের সমস্ত রক্ত কে যেন চুষে নিলো, তার মাথার মধ্যে অজস্র ঝিঁঝি-পোকা ঝমঝম ক'রে বেজে উঠ্‌লো। অনুপমের বন্ধন থেকে সে মুক্ত চাইলো!

—ওয়ান—টু—উ—

নিমেষের মধ্যে লোহার নিষ্ঠুর চাকা অনুপমকে টুকরো টুকরো ক'রে দিলো। প্রতিমা দুই হাতে দুই কান চেপে সেইদিকে তাকিয়ে বলে উঠ্‌লো—ইস্!

তার চক্ষুস্থির। একটি বেটে ভদ্রলোক একগাল খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। তার গিন্নির শাড়ী লুঙ্গির মত করে পরে বাজার করে ফিরছেন। হতাশ হ'য়ে ক্যাবলাকান্ত সেই-খানেই বসে পড়লো।

পরদিন ষ্টুডিওতে বসে ক্যাবলাকান্ত কবিতা লিখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছে—এমন সময় হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে উদ্দীপনা এসে ঢুক্‌লো—বল্ল, "Three cheers for our poet" এইবার এমন সুযোগ জুটে গেছে—উঠে পড়। ক্যাবলা অবাক হ'য়ে বল্লে, ব্যাপার কি? উদ্দীপনা বল্লে, আমাদের পাড়ার ঠাকুর্দ্দা তার কলেজে-পড়া নাতনীর জন্যে শিক্ষয়িত্রী রাখতে চান... চল...চট্ পট...।

ক্যাবলা অবাক হ'য়ে বল্লে, শিক্ষয়িত্রী? তা আমি কি করবো? উদ্দীপনা তার হাতের প্যাকেট খুলে তার থেকে একটা মেয়েদের পরচুলা বের করে ক্যাবলার মাথায় পরিয়ে দিয়ে বল্লে, এবার বুঝতে পেরেছিস্?

ক্যাবলা ফিক্ করে হেসে বল্লে,—হ্যাঁ—

ট্যাক্সি এসে ঠাকুর্দ্দার ফটকের সামনে দাঁড়ালো। দেখা গেল—শিক্ষয়িত্রী-বেশী ক্যাবলাকান্ত ও উদ্দীপনা কার থেকে নেমে কড়া নাড়লে।

একটা মোটা কালো ঝি এসে দরজা খুলে দিল। ক্যাবলা তার চেহারা দেখেই পালাতে যাবে—উদ্দীপনা তারে ধীরে ধরে ফেল্লে, বল্লে, খাবড়াস্‌নে—ক্রমশঃ প্রকাশ—ওর সঙ্গে তোর প্রেম করতে হ'বেনা।

ওদিকে ঠাকুর্দ্দা আর নাতনী কথা হচ্ছিল। সেদিন ডাকে একখানা চিঠি এসেছে পাত্রের পিতা বিবাহ উত্থাপন করেছেন—আর পাত্রের একটা ফটো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঠাকুর্দ্দা বল্লেন, শুকু, তোর পছন্দ [illegible]

শুকু বল্লে, পছন্দ হয়েছে কিনা তা কি করে বলবো? কিন্তু কী চমৎকার। মরিশ সিভ্যালিয়ারের হাসি, রোমান নেভারোর নাক, ফ্রেডারিক মার্চের কপাল, কেরি গ্রাণ্টের ঠোঁট—এ আমি নিয়ে চল্লাম ঠাকুর্দ্দা—এই বলে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় ঝি উদ্দীপনা আর শিক্ষয়িত্রী-বেশী ক্যাবলাকান্তকে নিয়ে এলো। উদ্দীপনাই আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলে। ঠাকুর্দ্দা নাম জিজ্ঞেস করতেই ক্যাবলা বলতে যাচ্ছিল ক্যাবলাকা—কিন্তু আচম্‌কা উদ্দীপনার ধাক্কা খেয়ে বল্লে, আজ্ঞে—হরি—ণ! উদ্দীপনা শুধরে নিয়ে বল্লে, আজ্ঞে হরিণ সেন বি, এ···গাইতে বাজাতেও অদ্বিতীয়। ক্যাবলা হয়তো পুরুষের মত—পায়ের ওপর পা তুলে-নাচতে সুরু করেছে—উদ্দীপনা চিম্‌টি কেটে থামিয়ে দিলে। ঠাকুর্দ্দা—উদ্দীপনাকে সিগারেটের কৌটো বের করে দিলেন। ক্যাবলাও নিতে যাচ্ছিল—। কিন্তু উদ্দীপনা তার হাত টেনে নিলে।

যাই-হোক—উদ্দীপনা চলে আস্‌তে ঠাকুর্দ্দা—নাত্‌নীকে ডেকে পঠালেন। নাতনী চঞ্চল মেয়ে—ছুটে এসে ক্যাবলার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে, আপনাকে কিন্তু দিদি বলে ডাক্‌বো। কোন মেয়েকে এমন কাছাকাছি ক্যাবলা কখনো পায়নি। তার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

পরদিন সকাল বেলা ক্যাবলাকান্তের যখন ঘুম ভাঙলো, সে চেয়ে দেখলো টেবিলের ওপরকার ঘড়িতে আটটা বেজেছে। সে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে মাথার পরচুলাটা খুলে বালিশের তলায় রাখলে। তারপর—পাশের বাথরুমে গেল স্নান শেষ করতে—ভাব্‌লে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে Make up শেষ করবে।

ঠিক এমনি সময় শুকু এসে ঘরে ঢুকলো দেখলো ঘরে কেউ নেই। তারপর হঠাৎ বালিশটা সরাতেই পরচুলাটা বেড়িয়ে পড়লো। সে ভারী ভয় পেয়ে গেল। খুট করে পাশের দরজায় একটা শব্দ হ'লো। ক্যাবলাকান্ত ঘরে এসে ঢুকলো। শুকু চট করে আলমারীর পাশে লুকোলো। হঠাৎ তার কি মনে হলো। কাল যে ছোট্ট ফটো খানা এসেছিল—তা যে নিজের বুকের মধ্যে লকেটে পুরে রেখেছিল। সেই ফটো বের করে—ক্যাবলার সঙ্গে মেলাতে লাগলো। দেখলে—একই লোক। তখন সে ফিক্ করে হেসে ফেল্লে।

ক্যাবলা তাড়াতাড়ি প্রসাধন শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এলো। শুকুও হাস্তে হাস্তে তার পেছন পেছন এলো। ঠাকুর্দ্দা তাদের জন্যে অপেক্ষা কচ্ছিলেন। বেয়ারা এসে জিজ্ঞেস করলে চা তৈরী করবে কিনা।—ক্যাবলাকান্ত মেয়েলী কাজে নিজের গুণপনা দেখাবার জন্যে বল্লে, আপনারা বসুন আমি যাচ্ছি চা তৈরী করতে—। ক্যাবলা পাশের ঘরে চলে গেল।

ঠাকুর্দ্দা ও নাতনী সেইখানে বসে শুনতে লাগলো পাশের ঘরে শব্দ হচ্ছে—ঝন্—ঝন্—ঝনাৎ……

ঠাকুর্দ্দা ও নাতনী গেল ছুটে দেখতে—গিয়ে যা দেখল তা'তে ঠাকুর্দ্দার চোখ কপালে উঠলো। কাপ…সসার…খাবার…জিনিষ পত্র…সব ভেঙ্গে চুরমার—আর তারি মধ্যে ক্যাবলাকান্ত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে। ঠাকুর্দ্দা যত রাগতে চায় ব্যাপার দেখে—শুকু তত খিল্ খিল্ করে হাসে…।

সেইদিন বিকালে বাগানে বসে ঠাকুর্দ্দা নাত্নীতে কথা হচ্ছিল। ঠাকুর্দ্দা বল্লে, আমি কিছুতেই ও মাষ্টারনীকে রাখবো না। নাতনী বল্লে, কিন্তু আমার যে ওকে ভারী ভাল লেগেছে ঠাকুর্দ্দা—! ঠাকুর্দ্দা রেগে বল্লে, তা হলে ওকে গলায় ঝুলিয়ে রাখগে। শুকু খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্লে, রাখবোই ত'—তারপর লকেট খুলে ফটোটা একবার দেখে নিলে!

ঠাকুর্দ্দা রাগে গস্ গস্ করতে করতে চলে গেল—শুকু তার পেছন পেছন ছুটল।

ক্যাবলাকান্ত একটা ফুল গাছের আড়ালে লুকিয়ে সব শুন্ছিল। সে ভারী দমে গেল। এমন সময় একটা লোক দেয়াল টপকে তার সাম্নে লাফিয়ে পড়ল। ক্যাবলা চমকে উঠলো। কিন্তু তাকিয়ে দেখলে—উদ্দীপনা। উদ্দীপনাকে সব কথা খুলে বলতে সে বল্লে, তুই ভয় পাস্নে—আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে,—কি?

উদ্দীপনা বল্লে, বুড়োর বড্ড ভূতের ভয়। আমাদের বাসা থেকে—ছাদ দিয়ে দিয়ে এ বাড়ীয় আসা যায়। আমি আজ রাত্তিরে বুড়োকে ভূতের ভয় দেখাব। তা হ'লে এই খালি বাড়ীতে বুড়ো ভারী ভয় পাবে আর তোকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। ক্যাবলা মাথা নেড়ে বল্লে, সেই ভালো।

যে কথা সেই কাজ। রাত্তির তখন বারোটা। বুড়ো অনেক রাত্তির জেগে বই পড়ে। বুড়ো যেই শুতে যাবে—অমনি দমকা হাওয়ায় আলো গেল নিভে—। সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও সুরু হ'ল—। কালো কালো মেঘের-ফাকে-আলা চাঁদের আলোতে দেখা গেল—কালো একটা লম্বা মূর্ত্তি—বারান্দা দিয়ে ঘুরছে। বুড়ো খাটের ওপর বসেই ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। হঠাৎ একটা মড়ার মাথার খুলি একেবারে বিছানার ওপর এসে পড়ল। এইবার ঠাকুর্দ্দা রাম-রাম চীৎকার করতে করতে—শিক্ষয়িত্রীর ঘরে—একেবারে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। ক্যাবলা ততক্ষণ—ঘরের দরজা খোলা রেখে উদ্দীপনার কাণ্ডটা দেখছিল।

বুড়ো এসে একেবারে ক্যাবলাকে জড়িয়ে ধরে রাম রাম জপ করতে লাগলো। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল সে যাকে জড়িয়ে ধরেছে সে একটি মহিলা। প্রথমে সে লজ্জিত হ'ল—তারপর—ফোক্‌লা দাঁতে ফিক্ করে হেসে ফেল্লে, বল্লে,—তোমার হাতটিতো বেশ নরম!—আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না হরিণ, আমার মনের হরিণ···আমার বনের হরিণ···ক্যাবলার চোখ গিয়ে উঠলো কপালে!

তখন থেকে সুরু হ'ল ঠাকুর্দ্দা আর নাতনীর প্রেম নিয়ে খেলা। ঠাকুর্দ্দা জানে ক্যাবলা মেয়ে ছেলে, তাই তার সঙ্গে প্রেম করতে চায়। আর নাত্‌নী জানে শিক্ষয়িত্রী পুরুষ মানুষ তাই সে যখন তখন—গলা জড়িয়ে ধরে বলে, দিদি আমায় পড়াবেন না?

ক্যাবলাকান্ত কিছু কিন্তু বুঝতে পারেনা—কেবল দুজনের মাঝখানে পড়ে হাবুডুবু খায়।

সেদিন ঠাকুর্দ্দা বাজার থেকে একশিশি কলপ এনে চুলে লাগিয়ে—ফিট বাবু সাজছে—এমন সময়—ঝিটা বাইরের ঘর ঝাট দিতে এসে অচেনা লোক মনে করে চীৎকার করে উঠল। ঠাকুর্দ্দা তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—চুপ কর সদু—আমি রে আমি—তোর মনিব। ঝি কর্ত্তার কাণ্ড দেখে ঝাটা হাতে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কর্ত্তা জিজ্ঞেস করলে—মিসি বাবা কোথায় র‍্যা! ঝি আঙুল দিয়ে শিক্ষয়িত্রীর ঘর দেখিয়ে দিলে।

ঠাকুর্দ্দা পা টিপে টিপে ক্যাবলার ঘরের সামনে হাজির হ'ল। আজ সে নটবর বেশ সেজেছে। পরণে শান্তিপুরের ফিন্ ফিনে ধুতি—গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী—হাতে মার্কেটের ফুল—রুমালে ভুর ভুরে আতরের গন্ধ। ক্যাবলা বসে বই পড়ছিল বিকেলের দিকটা। শকুন্তলা তখনো কলেজ থেকে আসেনি। আস্তে আস্তে গিয়ে কর্ত্তা ক্যাবলার গা' ঘেসে বস্‌ল। হাতের ফুলের তোড়া থেকে একটা ফুল নিয়ে—খোঁপায় পরিয়ে দিলে। তারপর তার মুখের দিকে এগিয়ে যাবে—যাবে—হঠাৎ থমকে গিয়ে বল্লে, একি—তোমার মুখে দাঁড়ি?

ক্যাবলা ভুলে সেদিন দাঁড়ি কামায়নি। তাই খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি উঠেছিল।

এমনি ভাবে ধরা পরে সে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল—কিন্তু কর্ত্তা তার চুলটা ধরে ফেল্লেন। পরচুলা কর্ত্তার হাতেই রয়ে গেল—ক্যাবলা তো প্রাণভয়ে বারান্দা দিয়ে লম্বা দৌড়—। সিড়ি দিয়ে নিচে নামতে যাবে—একেবারে শুকুর সাম্‌না সাম্‌নি পড়ে গেল। শুকু তার অপরূপবেশ দেখে—চটকরে তার হাতটা ধরে ফেল্লে। এমন ভাবে ধরা পড়ে গিয়ে ক্যাবলাকান্ত ভারী ঘাবড়ে গেল। বল্লে—এই—আমি—আমি—শুকু ফিস্ করে হেসে ফেলে বল্লে, হ্যাঁ-তুমি—তুমি হরিণ। এই শকুন্তলারই মনের হরিণ—। এই বলে বুক থেকে লকেটখানি বের করে তার সামনে ধরলে। ক্যাবলা অবাক হয়ে দেখলে—তার নিজের ফটো যা তার বাবা শুকুর ঠাকুর্দ্দাকে পাঠিয়েছিল সম্বন্ধের জন্যে!

এইবার ক্যাবলাকান্ত একগাল হেসে ফেল্লে। দু'জনের মুখ—কাছাকাছি এসে একেবারে জোড়া লেগে গেল।
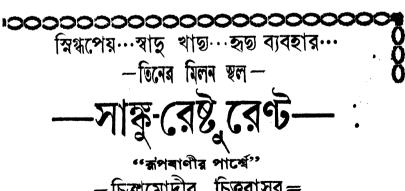
নারীর লজ্জা

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

সত্যি কথা বল্‌লে দেখি
তোমরা ভারী চটো,
তোমরা বেজায় চটো!
কোণটি ঠাসা করবে মোদের
এই তোমাদের 'মটো',
সেইটি কেবল 'মটো'!
গলাবাজী, কলমবাজী,
তাইতে দেখি নিত্যরাজী,
আমরা খারাপ, আমরা পাজী
প্রমাণ করতে ছোটো!
একটু ঈষৎ স্পষ্ট কথায়
তিড়বিড়িয়ে ওঠো।

তোমরা নারী,—নারীর লজ্জা
কাগজ খুলে পড়ো,
আশা করিই পড়ো?
অপমানের কাঁটা গায়ে
বিঁধছেনা যে বড়,
লাগছে না যে বড়,
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে
কলঙ্কদাগ নারীর নামে,
কোথায় সভা? ডাইনে বামে
কী আন্দোলন করো?
সমাজচ্যুতা নির্য্যাতিতার
গৃহ কোথায় গড়ো?

পর্দ্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলে
খোলা আকাশ তলে
বিপুল ধরাতলে।
দুঃখিনীদের কান্না কোথায়
ডুবল কোলাহলে,
গভীর কোলাহলে?

নৃত্য-গীতি-শিল্প-রেখা,
অনেক বিদ্যা, অনেক লেখা,
অনেক কিছুই হ'ল শেখা,
পরিশ্রমের বলে।
ভুললে শুধুই ব্যথা কোথায়
নারীর চোখের জলে!

নয় কি তারা কেউ তোমাদের
মানুষ তারা নয়,
গণ্য তারা নয়?
দাসীর মতন ভাবো তাদের,
তাইত' মনে হয়,
দেখেই মনে হয়!
কুশ্রী তারা, গরীব তারা,
ড্রইংরুমের নেই ইসারা,
মোটর বিলাস, সুরের ধারা,
বর্ণ পরিচয়,
নেই ব'লে কি, করবে তাদের
নারীত্বে সংশয়?

কী অসহায় তারা,—তাদের
কী দুঃখে দিন কাটে,
কী কষ্টে দিন কাটে!
সীতা যেন বন্দিনী আজ
শত্রুপুরীর ঘাটে;
বিপজ্জনক ঘাটে!
একটি রাত্রে তাদের মাথায়
আজীবনের বোঝা চাপায়
যে পশুদল, বাড়ীর হাতায়
তোমার যদি হাঁটে,
লাগাও চাবুক,—বোন্ যে তোমার
তেপান্তরের মাঠে!

আমরা পুরুষ, ভালো কিছু
করতে গেলেও দোষ,
বলতে গেলেও দোষ!
সপ্তরথীর ছুটবে তখন
শব্দভেদী রোষ,
ভ্রূকুঞ্চনের রোষ!

হিল্-উঁচু-শু, স্কার্ট শাড়ীতে,
ট্যাক্সী, বাসে, ট্রাম গাড়ীতে,
মেমের সঙ্গে পাল্লা দিতে,
দিলুত দেখি খোস্!
পাটের ক্ষেতে কাঁদিস্ যারা
নারীই তারা নোস্।

স্তাবক দলের বন্দনাতে
উচ্ছ্বসিত হিয়া—
গুঞ্জরিত হিয়া,
নাগরিকায় পূজে তারা
পল্লী বিসর্জ্জিয়া,
বিস্মরণে দিয়া।

তাই ব'লে কি মহোৎসবে
তুমিও নিমজ্জিত হবে?
নারী-জাতির অগৌরবে
অমর্য্যাদা নিয়া
লজ্জা যদি লজ্জা না পায়,
ধিক্ প্রগতিপ্রিয়া!

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টসের
প্রথম অর্ঘ্য
হাস্যরসের প্রস্রবণ
আগত প্রায়
প্রযোজক
শ্রীপান্নালাল পাঠক
আলোক চিত্রশিল্পী
পি, স্যাণ্ডেল

বাংলার ফিল্ম শিল্পে বাঙ্গালী বনাম অবাঙ্গালী

শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ
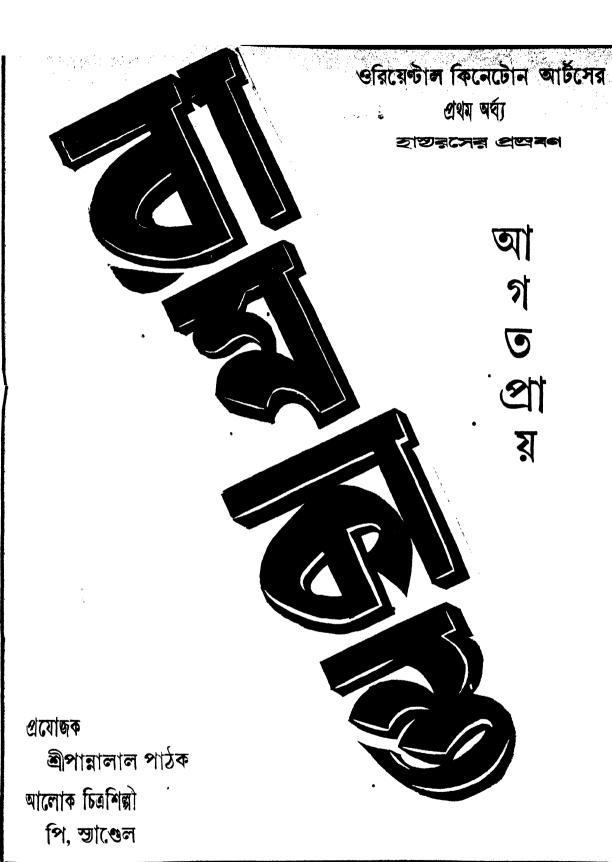
পূজোর বাজারে একটু অপ্রিয় সত্যের আলোচনায় প্রয়াসী হ'য়েছি ব'লে হয়ত অনেকেই আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু মুখবন্ধেই আমার একটি নিবেদন আছে সেটি আশা করি আপনাদের উপস্থিত বিরক্তি থেকে নিবৃত্ত ক'রবে। প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নিয়মে যেমন বিরহ আছে ব'লে মিলনের মাধুর্য্য প্রকাশ পায়, বর্ষার ঘন অমানিশার পর বলেই, শারদ পূর্ণিমার হসিতচ্ছবি আমাদের কাছে এত সুন্দর বোধ হয়, শীত ও গ্রীষ্মের আতিশয্যের মধ্যবর্ত্তী বলেই যেমন ঋতুরাজ বসন্ত আমাদের কাছে এত প্রিয় মনে হয়, সেইরূপ অপ্রিয়ের আভাস মাঝে মাঝে না থাক্‌লে প্রিয় বোধ হয় শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ হত না।

আমি অনেকের মত মামুলি ধারায় 'আমাদের ফিল্মে অনেক গলদ আছে' ইত্যাদি বলে ফিরিস্তি না দিয়ে একটা জীবন্ত ও বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হ'তে সাহসী হ'য়েছি। ভূতের নাম শুনেই অনেক পালান, কিন্তু আমি এগিয়ে এসেছি—দেখব বলে এটা সত্যিই ভূত না ভুল—না মনের বিকার। আমি জানি অনেকেই হয়ত বল্‌বেন—Fools rush in where angels fear to tread—তবুও আশা করি আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরে আমার এ তুচ্ছ লেখা পড়ে দু চার মিনিট ভাববেন আমরা কোন পথে যাচ্ছি! তা যদি মামুলি ধরণে শ্মশান বৈরাগ্যের মতও ভাবতে পারেন তবেই বুঝব আমার লেখা সার্থক হ'য়েছে। আপনাদের ওপর মতের প্রভাব বা প্রতিষ্ঠা ক'রব সে দুরাশা আমার নেই, কাজেই সে ভুল ধারণা আমি পোষণ ক'রতে পারিনা।

আজ বাংলায় ফিল্মশিল্পের যথেষ্ট প্রসার হ'য়েছে। ফিল্মশিল্প বলতে শুধু চিত্র নির্ম্মাণ ও চিত্রপ্রদর্শনই বোঝায় না—প্রচার-শিল্প ও চিত্র-পরিবেশনও ফিল্ম শিল্প পর্য্যায় ভুক্ত। ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে বাংলা পিছিয়ে ছিল কিন্তু বাংলার নিজস্ব ধারা নিজস্ব সম্পদ এখন পশ্চিম ভারতকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভাবের উৎকর্ষে বৈশিষ্ট্য বিকাশের নৈপুণ্যে এই শতধা বিভক্ত বাংলা অনেকের আচার্য্যের স্থান নিতে পারে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথা শতবার স্বীকার ক'রবো যে ফিল্মশিল্পে পশ্চিম ভারতে New Theatres বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। এটা আরও আমাদের শ্লাঘার কথা যখন ভাবি যে এ প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর। অনেকে হ'য়ত বল্‌বেন—অবশ্য তাঁদের বল্‌বার যুক্তি আছে তা অস্বীকার করিনা—যে New Theatres এর সাফল্যের মূলে শুধু পুরুষকার নয় অদৃষ্টেরও অনেক হাত আছে। একাধারে সারদা ও কমলার আশীর্ব্বাদ ক'জনের ভাগ্যে জোটে; বাণীর পুত্র চঞ্চলা কমলার বিরাগ ভাজন হয় ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাদের উপর বাণী ও কমলার আশীর্ব্বাদ শ্রাবণের বারিধারার মত বর্ষিত হয়, বিশ্বকর্ম্মা অকাতরে তাঁর উৎসাহ ও নৈপুণ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার যাঁদের জন্য খোলা রেখেছেন তাদের আর ভয় কি? সমালোচকের নৃশংস স্তর হতে অনেক ঊর্দ্ধে তাদের স্থান।

আমরা ফিল্ম জগতে বাঙ্গালীর গৌরবে গৌরবান্বিত হই কিন্তু নিজেরা জানিনা বাঙ্গালী বলতে আমারা কতটুকু বুঝি! Risley ও অন্যান্য নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে বাংলা ভাষাভাষী Mongolo—dravidian race যদি বাঙ্গালী হয় তবে পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর প্রমুখ বাংলা ভাষাভাষী, পুরুষানুক্রমে যাদের বাংলার মাটী বাংলার জল বাংলার হাওয়া বাংলার ফল অস্থিমজ্জার গঠন করেছে সেই পশ্চিম ভারতীয় বঙ্গবাসীর স্থান কোথায়? যাঁরা মাতৃভাষা ও কৃষ্টিতে বাঙ্গালী অথচ পশ্চিম ভারতীয় সামাজিক অনুশাসন পালন করেন, সামাজিক বন্ধন যাঁদের পশ্চিম ভারতের সঙ্গে তাদেরই বা স্থান কোথায়? বাংলার মুসলমানরাও বাংলা ভাষাভাষী, পুরুষানুক্রমে বাংলায় তাদের বসবাস কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ বাংলার কৃষ্টি হ'তে বহুদূরে তাদেরই বা আমরা অনেকে বাঙ্গালী বলিনা কেন? কেহ হয়ত ব'লবেন যা'রা

নিজেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন তারাই বাঙ্গালী। যদি এই কথাই স্বীকার করি তবে বঙ্গসমাজের ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন বহু বাঙ্গালীর স্থান কোথায়? মোটকথা আমরা যারা "বাংলার জন্য বাঙ্গালী" বা "বাঙ্গালীর জন্য বাংলা" বলিয়া চীৎকার করি আমাদেরই বাঙ্গালী সংজ্ঞার কোন বিশেষ ধারণা নেই।

আমাদের নিজের গণ্ডীর ধারণা নাই অথচ আমরা বাঙ্গালী বনাম অবাঙ্গালী প্রভৃতির নানারূপ মুখরোচক তর্ক তুলি।

তর্কের খাতিরে আপাততঃ আমরা বাঙ্গালী ব'লতে বেশীর ভাগ লোক যা বুঝি অথচ প্রকাশ ক'রতে পারি না তাই মোটামুটি সাব্যস্ত করে নিয়ে দেখতে পাই একটা শিল্পের প্রসারতার সঙ্গে প্রাদেশিকতা খুব কড়াকড়ি রকম খাটান যায় না। ফিল্মশিল্প আজ বাংলার বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর অর্থ বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিশ্রমে উন্নত হয়েছে। কিন্তু যে সব তথাকথিত অবাঙ্গালীর চেষ্টায় উৎসাহে ও উদ্যমে বাংলার ফিল্মশিল্প অগ্রসর হয়েছে ও অনেকের অন্ন-সমস্যার সমাধান ক'রেছে, বাংলার স্বার্থের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে তাদের এখন হেয় প্রতিপন্ন করে, একমাত্র বাঙ্গালীর চেষ্টায় সব হয়েছে এ কথা বলা ভুল হবে। আমি কারো নাম উল্লেখ ক'রে গাত্রদাহের সৃষ্টি ক'রব না, কিন্তু প্রায়ই আমরা দেখি যে আমরা অনেক কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত কাজ করে ফেলি। আমাদের কথায় ও কার্য্যধারায় কোন ঐক্য পাওয়া যায় না। যে প্রতিষ্ঠান উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে "এ প্রতিষ্ঠান আমাদের নিজস্ব বাঙ্গালীর নিজস্ব, অতএব আসুন বাঙ্গালী আসুন আপনাদের নিজের প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যান"—তাদেরই মূলে দেখা যায় অবাঙ্গালীর অর্থ, অবাঙ্গালীর সাহায্য অবাঙ্গালীর পৃষ্ঠপোষকতা তাদের প্রধান ভিত্তি, কোন কোন স্থলে অবাঙ্গালীর নাম অবাঙ্গালীর খ্যাতি ও পরিশ্রম এ প্রতিষ্ঠানকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। তবে হয়ত জিজ্ঞাসা ক'রবেন এত জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার আস্ফালন কেন? উত্তরে আমি ব'লতে চাই এই "বাঙ্গালী" "বাঙ্গালী" বলে চীৎকারে তিনটি স্বার্থ বহুস্থানেই বিদ্যমান। প্রথমতঃ ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর সহানুভূতি লাভের প্রয়াস—ব্যবসায়ের দিকে এতে অবশ্য একটু সুবিধে আছে। দ্বিতীয়তঃ তারা ভাবেন এই চীৎকারে অবাঙ্গালীর নিকট বহু বহুপ্রকার ঋণ সাধারণের দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসার বাহিরে চলে যাবে। এতে এক চক্ষু হরিণের মত একটু আত্মপ্রসাদও হবে যে আমরা বেশ নিরাপদে আছি কারণ অনেক স্থলেই তাঁদের ধারণা উত্তমর্ণকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব। এটা নিজের বিশ্বাসঘাতী প্রবৃত্তিকে ইন্ধন দিয়ে ক্ষণিক সুখানুভবের প্রয়াস। তৃতীয়তঃ এই চীৎকার নিজের স্বজাতীয় বা বাঙ্গালী বেতনভুক কর্ম্মচারীকে হস্তপদ বন্ধন ক'রে ন্যায্য প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করবার একটা হীন প্রচেষ্টা। ভাবপ্রবণ জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালী জনসাধারণ ও সমালোচকের চোখে ধূলো দিয়ে স্বজাতি উৎপীড়ন ক'রে স্বার্থসিদ্ধি করার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্য একথা আমি স্বীকার ক'রব যে যাঁহারা "বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান" "বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান" বলে উচ্চকণ্ঠে অনুক্ষণ চীৎকার করেন তাঁদের সকলেরই যে তিন স্বার্থ তা নয় কম বেশী প্রায়ই তাঁদের এক বা একাধিক স্বার্থ দেখতে পাই।

যারা চীৎকার করেন না, তাদের মধ্যে কয়েকজনের মূলধন প্রধানতঃ বাঙ্গালীর বা মূলধন তথাকথিত অবাঙ্গালীর হ'লেও বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে তারা কারবার করেন। কিন্তু তাদের কারো কারো একটা inferiority complex আছে। যে কোন পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতীয় কিম্বা পশ্চিমভাবাপন্ন বাঙ্গালী হাওড়া ষ্টেশনে ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদে সেখানে গেলেই মোটা বেতনে সমকক্ষ (বাঙ্গালীর অন্ততঃ তিন গুণ বেতনে) স্থায়ী কর্ম্মচারী হন—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বিনা যোগ্যতায় বা বিনা পরিশ্রমে বাঙ্গলার অর্থনষ্ট ক'রে যান—আর পরিশ্রমী ও উপযুক্ত বাঙ্গালী কর্ম্মিগণ স্বল্পবেতনে কায়ক্লেশে খেটে কোনরূপে সংসার চালিয়ে হাঁ করে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে হয়ত বলেন—হা রে বঙ্গদেশ! তথাকথিত বাঙ্গালী ও

ভারতলক্ষ্মীর নবতম নৃত্যগীতমুখর বাণী-চিত্র “আলিবাবা”-র একটি দৃশ্য: কাশিম—কমল মিত্র, সাকিনা—ইন্দিরা রায়, আবদাল্লা—মধু বোস। ছবিখানা পরিচালনা করেছেন মধু বোস।

কালী ফিল্মস্-এর কৌতুক-চিত্র "রেশমী রুমালে"-র কয়েকটি দৃশ্য।

ওপরের ছবিতে বিভিন্নাংশে আছে—ডাঃ হরেণ মুখার্জি, জয়নারায়ণ মুখার্জি সাবিত্রী (পঙ্কী) কমলা, প্রভা, ঊষা দেবী, প্রকাশমণি প্রভৃতি। ছবিখানা শীঘ্রই এখানে দেখাবার ব্যবস্থা চলছে

ফিরে-পাওয়া কৈশোরের রাত

শ্রীকরুণাময় বসু

নারিকেল কুঞ্জতালে দেখাযায় সাগরের পাড়,
সবুজ জলের রেখা, সাগরের ফেনা আর ছায়া,
ধূসর পাহাড় শ্রেণী, সূর্য্যাস্তের উদাস বিস্তার
করুণ চোখের মতো বেদনার আনে নীলমায়া।
ক্ষীণালোক গোধূলিতে আকাশের রূপালি গুঞ্জন
নিঃশব্দ ওপার হ'তে ভেসে আসে জলের মর্ম্মরে,
জোনাকির ঝিকিমিকি, ক্ষীণশব্দ কপোত কূজন
একখানি ছবি আঁকে মেন আর আলোর নিঝরে।
দূরে দূরে দেখা যায় লবঙ্গ ও জাফরান বন,
শীতল সবুজ গন্ধ ছায়াঢাকা আঙ্গুরের ক্ষেতে
আঁকা বাঁকা পথগুলি রূপসীর চোখের মতন
মিনতি আকড়ি ধরে পথিকের দূর পথে যেতে।
এখানে বসিয়া থাকি ঝিকিমিকি বালুকার তীরে,
স্রোত গুলি বয়ে যাক বহুদূর স্মৃতিহারা দেশে,
স্মৃতি? সেত' সত্য নয়, এইম্লান সন্ধ্যাটিরে ঘিরে
কতো কথা মনে আসে, ছবি আঁকি কাহার উদ্দেশ্যে?
স্বপ্ন সব মুছে গেছে, কৈশোরের রোমাঞ্চিত রাত
এই স্বর্ণ-গোধূলিতে ফিরে বুঝি এসেছে দৈবাৎ।

খাঁটী বাঙ্গালী মালিক ও কর্ম্মকর্ত্তারা দেখেন না এ অনুপযুক্ত ও অযোগ্য ভিন্নজাতি স্পৃহায় কার লাভ?

খাঁটী বাঙ্গালী ও বঙ্গবাসী তথাকথিত অবাঙ্গালী মালিক ও কর্ম্মসচিবদের অধিকাংশ স্থলেই একজন সমালোচকের মতে প্রধান দোষ—'almost criminal weakness for rank aliens of doubtful merit'। বাংলার মাটীর এমনি গুণ যে আমরা মুখে যাই বলি মাঝে মাঝে ভুল ক'রে ঔদার্য্যে যীশু খ্রীষ্ঠ হ'য়ে বসি—এক গালে যে এক চড় বসায় তৎক্ষণাৎ তাকেই অন্য গাল ফিরিয়ে দিই। তা নাহলে যে ব্যক্তি স্পর্দ্ধা ক'রে ব'লেছিল ও কাগজে কাগজে লিখে বেড়িয়েছিল যে বাংলায় গল্প লেখক নেই। চিত্র-নাট্য প্রণেতা নেই, চিত্র পরিচালক নেই। তাকেই বাংলার বরণীয় প্রতিষ্ঠান বঙ্কিম চন্দ্র রবীন্দ্র নাথ ও শরৎ চন্দ্রের সাধের বাংলার বাংলা ছবির গল্প লেখকের উচ্চাসনে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে বসিয়েছেন। ভেরী নিনাদে চৌদিকে প্রচার করেছেন যে সেই অবাঙ্গালী তথাকথিত গল্প লেখক বাংলার উল্লিখিত মনীষিগণের উচ্চতর বা তুল্য স্থান পেতে পারেন। গত বৎসরও আমি লিখেছিলুম "জানিনা বন্দেমাতরমের ঋষির পূত আত্মা এ দৃশ্য কেমন উপভোগ কচ্ছেন"। এক বৎসর চলে গেছে সেই বাঙ্গালী বিদ্বেষী তথাকথিত গল্প লেখক গোটাকতক পিপীলিকার ন্যায় সমালোচকের আস্ফালনকে তুচ্ছ করে বাঙ্গালী ও বাংলার সাধের প্রতিষ্ঠানের অর্থে পুষ্ট হ'য়ে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন ক'রে সর্ব্বসমক্ষে প্রণাম দিয়েছে যীশুর উপদেশ যদি কেউ পালন করে ত সে বাঙ্গালী ও বাংলার বরণীয় প্রতিষ্ঠান।

যে বিজাতীয় দুর্বৃত্ত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী বঙ্গললনাকে প্রতিপত্তিবান বাঙ্গালী স্বামীর স্নেহ পাশ হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে পাশব বৃত্তি চরিতার্থ ক'রে নিয়ে বেড়িয়েছিল ও পরে দলিত-কুসুমের ন্যায় ফেলে দিয়ে লজ্জাবনত বাঙ্গালীকে ব'লে বেড়াত বাঙ্গালীর মধ্যে পুরুষ নেই—তাকে তথাকথিত অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙ্গালীর সম্মানার্থে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেয় নি, ঘৃণা ভরে তার দিকে ফিরেও চায় নি. কিন্তু বাংলার বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান সকল বিষয় জেনেও নিষ্প্রয়োজনেও তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে ও বুঝিয়ে দিয়েছে বাঙ্গালী জানে আততায়ীর নিকট কেমন ক'রে গলা বাড়িয়ে দিতে হয়।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ক'রে আর লাভ নেই। আমি আপনাদের শুধু বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বাঙ্গালীর ও বাংলার ফিল্মশিল্পের স্বার্থই আমাদের প্রধান কাম্য। বাস্তবিক প্রয়োজন স্বার্থ ও উন্নতির জন্য অবাঙ্গালীর সাহায্য ও প্রচেষ্টা প্রত্যাখান করা বা অস্বীকার করা বাতুলতা। অবাঙ্গালীর গুণ নিজের হীনতা ও সঙ্কীর্ণতার আবরণে ঢেকে অকারণ বাহাদুরি নেওয়ার চেষ্টা একটা মানসিক বিকৃতির পরিচয় মাত্র। সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ সামনে রেখে জাতীয় স্বার্থে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে তবেই বোধ হয় সব দিক রক্ষা হয়।

সভ্যতায় বর্ব্বরতার বীজ!

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

মানুষ তুমি উজলি ভূমি,—
কতনা খেল্ খেলালে!
সাজিয়ে সঙ্ মাখিয়ে রঙ্
কতনা ঢঙ্ দেখালে।
ছিলে শাখায় গিরি গুহায়
দিলে জনম সভ্যতায়;
কতনা বেশ পরিলে গা'য়
সেকালে আর একালে,
সাজিয়ে সঙ্ মাখিয়া রঙ্
কতনা ঢঙ্ দেখালে॥

একদা তাই বলিলে ভাই
পশুতে আর মানবে—
আছে তফাৎ লক্ষ হাত
দেবতা আর দানবে।
তবু যে হায় স্বার্থ ঘায়
ছদ্মবেশ খুলে লুটায়,
পশুরও মন লজ্জা পায়—
মৃত্যুময় আহবে;
দেখিতে পাই তফাৎ নাই
দেবতা আর দানবে॥

কেতাবে যাহা লিখিলে তাহা
কর্ম্মে কভু করনা,
সর্ব্বনাশা মনের ভাষা
মুখেতে কর ছলনা;
সভ্য ব'লে কতনা ছলে
দুর্ব্বলেরে চরণ তলে
নিষ্পেষিত করিলে বলে;
নাড়িয়া মিঠে রসনা
মৈত্রী বাণী শুনালে দানি
কেতাবে লেখা ছলনা॥

তোমরা পুন বলিলে শুন,
মানুষ যত জগতে
কোরোনা চুরি, মেরোনা ছুরী
ভায়ের বুকে মরতে,
ভুলেও মনে পরের ধনে
কোরোনা লোভ, মরণ পণে
করিও ত্যাগ অসৎ জনে
বরণ করি' মহতে
একদা তুমি উজলি ভূমি
কহিয়াছিলে জগতে॥

মনের মত ধর্ম্ম কত
রচিলে শত দেউলে,
দিবস রাতি দ্বন্দে মাতি'
প্রগতি পথে এগুলে,
মর্ত্ত্য'পরে দম্ভভরে
শানিত ছুরী ধরিয়া করে
চলেছ যেন পরস্পরে
সাপেতে আর নেউলে;
দ্বন্দে রত দেবতা কত
রচিলে শত দেউলে॥

শ্রীভগবানে জীবন-দানে
গড়িতে তুমি শিখালে
রচিয়া গীতি দেউলে নিতি
অমিয় বাণী বিলালে!
এপারে বসি' গ্রহের রশি
বরাতাকাশে বাঁধিলে কসি'
হেরিয়া নভে হাঁসিল শশী
অমিলে মিল মিলালে,
শ্রীভগবানে জীবন দানে
পূজিতে তুমি শিখালে॥

আজিও তাই দেখিতে পাই
গড়িয়া নর-দেবতা,
ভাগ্য ঠুকে মরিছে ধুকে;
শিখালে তুমি যে কথা
জপিছে প্রাণে; মোহের টানে
একুল হ'তে অকুল পানে
যাহার আজো হয়নি মানে
আদ্যিকালের যে কথা
অজ্ঞতম মূর্খ সম
গড়িছে নর-দেবতা॥

মর্ত্ত্যে তাই তুলনা নাই
তোমারি সেই কথাতে
নাই যে কুল লক্ষ ভুল
উল্টা ঠিক্ ধরাতে।
চলেছ ছুটি' ধরিয়া টুটি
নিরন্নের হরিয়া রুটি
কাঁদিছে তা'রা ধুলায় লুটি
দৈন্যে ভাঙা বরাতে;
বাহবা বাহা কতনা আহা
করিছ লীলা ধরাতে!

রঙীন ফানুষ

শ্রীসন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়

পার্ক সার্কাসে কংগ্রেস্ একজিবিশন্ বসেছে। একে আমোদ প্রমোদ, আনন্দ উৎসব, তার ওপর রাজনৈতিক আন্দোলনের আমেজটুকু ত আছেই। আজ শনিবার, দলে দলে লোক, কেউ ট্রামে, কেউ বাসে, ভাড়া গাড়ী, ট্যাক্সিতে স্ত্রী-পুরুষ দল বেঁধে সকলেই কড়েয়ার দিকে ছুটেছে। এদের মধ্যে কলকাতার বাইরে থেকে, সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে যারা এসেছে, তা'দের মধ্যে অনেকেই হয়ত জানে না, একজিবিশন্ বস্তুটাই বা কি! কিন্তু উৎসাহ, কারুরই কম নয়, গাড়োয়ানের দ্বিগুণ ভাড়ায় রাজী হ'য়ে, সাত সকালে দু'মুঠো ভাত মুখে গুঁজে, পুঁটলিতে কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করে এরা সকলেই ছুটে এসেছে—জগতের আনন্দ বিতরণের বুভুক্ষু কাঙালী এরা।

বড়বাজারে এক পাইকারী মশলার দোকানে পাঁচুগোপালের খাতা লেখা কাজ। অন্ধকূপ গুদামের একপ্রান্তে বসে তেলের ডিবে জ্বালিয়ে সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত যাবতীয় মাল আমদানি ও কাটতির হিসাব পাঁচুকে রাখতে হয়। সন্ধ্যাবেলা কর্ত্তা এলে সারাদিনের হিসাব তাঁকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়ে তবে সে ছুটী পায়। রবিবার দিন খালি দোকান বন্ধ থাকে, সেইদিন পাঁচুর ছুটী, এছাড়া তার একঘেয়ে, নিরানন্দ জীবনের আর ব্যতিক্রম নেই। মাস কাবার হ'লে বাইশ টাকা মাইনে তার বরাদ্দ, পুজোর সময় পার্ব্বনী বাবদ পাঁচ টাকা বেশী পায়।

আজ শনিবার হলেও দু'টোর সময় দোকান বন্ধ হয়েছে। কর্ত্তা'র অসুখ বেড়েছে, তাঁর ছোট ছেলে আজ দোকানে বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না, অগত্যা পাঁচুগোপাল ছুটি পেল। দোকান থেকে বেরিয়ে তার হঠাৎ একজিবিশনের কথা মনে পড়ল, পাশের বাড়ীর যতীনবাবু সেদিন মেলা দেখে ফিরে কত গল্প করছিলেন, মোমের মানুষ, পুতুল নাচ, কলের ঘোড়া, আরও কত কি। পকেটেও খুচরো ক'আনা পয়সা রয়েছে, তরুদি' উল কিনতে দিয়েছিল, ভাবলে এখনও ট্রামে উঠে পড়া যাক, পয়সা পরে শোধ করলেও চলবে। পাঁচু যখন পার্ক সার্কাসে পৌঁছল তখন প্রায় তিনটে বাজে। চারিদিক লোকে লোকারণ্য, গাড়ী-ঘোড়ার বিষম ভিড়, এত ঠেলাঠেলির মধ্যে চলাও মুস্কিল। আট আনা পয়সা প্রবেশ মূল্য দিয়ে সে যখন একজিবিশনে ঢুকল তখন তার পকেটে একটা কপর্দ্দকও নেই। তা হোক্, সে ত আর বড়লোকের মত এখানে জিনিষ কিনতে আসেনি, পাঁচটা জিনিষ দেখতেই এসেছে।

গেট্ দিয়ে ঢুকে সামনেই নজরে পড়ল উঁচু কাঠের মঞ্চের ওপর বিরাট এক কাগজের হাতী—হাতীর পেটের ভেতর বসে কয়েকজন লোক রোশনাই বাজাচ্ছে—তা'দের মাথায় জরীর তাজ পরা গায়ে লাল কোর্ত্তা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে পাঁচু খানিকক্ষণ তাই দেখলে। কী মিষ্টি আওয়াজ, চৌধুরীদের বিয়ে বাড়ীতেও তো সে অনেকবার রোশনাই শুনেছে, কিন্তু এর কাছে সে বাজনা লাগেই না। আর একটু এগিয়ে যেতেই মস্ত এক দেবদারু গাছের তলায় পাল খাটিয়ে কোন মাড়োয়ারী সমিতি জল বিতরণ করছে। দুপুর রোদে এতটা পথ এসে পাঁচুর জল তেষ্টা পেয়েছিল, আঁজলা ভরে যতটা পারে জল খেয়ে নিয়ে পাশেই গাছ তলার একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। একজিবিশন্ ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না, পয়সা দিয়ে ঢুকেছে যখন ধীরে সুস্থে দেখলেই হবে—বরং একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্।

সামনে মস্ত কাপড়ের দোকান, কাঁচের শো-কেসের ভেতর হরেক রকমের সাড়ী সাজান রয়েছে, বেশীরভাগই সিল্কের, জমিতে ঘন জংলা কাজ; কালো মতন চোখে চশমা পরা একজন দোকানদার হলদে কাগজের বাক্স থাকে থাকে সাজিয়ে রাখছে। পেছনে একদল মেয়ে সঙ্গে এক প্রবীন ভদ্রলোক দোকানে ঢুকলেন। চশমা পরা দোকানদারটীর মুখে কাষ্ঠ আপ্যায়িতের হাসি, ব্যস্ত সমস্ত হয়ে মেয়েদের বসবার জন্ম চেয়ার এগিয়ে দিলে।

সকলের পেছনে লাল সাড়ী-পরা মেয়েটির মাথার চুল এলো খোপায় জড়ান, প্রায় কাঁধের ওপর নেমে এসেছে কাণের লম্বা দুলের ঝুমকোর শেষ-প্রান্তটুকু খালি চুলের ফাঁকে দেখা যায়, কোমরের কাছ দিয়ে আঁচলা পিঠের দিকে উঠে গিয়েছে, পায়ে সাদা চামড়ার হিলতোলা চটী। ঘাড়ের ওপর ঝুরো ঝুরো চুল এসে পড়েছে, তার ওপর মোটা সাদা বেলফুলের মালা—মুখটা ঠিক যেন আরবী ঘোড়ার পিঠে রাজপুত্রের পাশে সাহ'জাদার মত—চারপাশে কারবাইড্ ল্যাম্প জ্বলছে, সব আলোর আলো। বরণডালার ওপর ঘিয়ের দীপ, মঙ্গল ঘট, শ্বেতশঙ্খ...গালের ওপর যেন আগুনের তাপ লাগল। চারিদিকে কী ভীষণ হৈ চৈ, অফুরন্ত কলরব, বহুদূরে—সব অস্পষ্ট...রাত্রের অন্ধকারে কপালের চন্দন ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা, মিষ্টি বেলফুলের গন্ধ, লাল সাড়ীর আঁচলখানা সাদা ধবধবে বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে...মুখে চাপা দিয়ে কাশতে কাশতে

শরৎ জননীর শুভ আগমনে—
প্রিয়জনকে—
প্রীতি উপহার—

দানে, আনন্দ
উপভোগ করুন

জবাকুসুম

কেশ প্রসাধনের অতুল সম্পদ।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

ছবি ঘরের মালিকগণ!

বিদেশী টকী মেসিন রাখিয়া মেরামতের অর্থব্যয় ও পরে ঋণগ্রস্থ হইয়া ব্যবসা বন্ধ করার প্রয়োজন নাই :—

সিষ্টোফোন

টকী যন্ত্র ব্যবহার করিলে জানিবেন যে, ইহা দেশীয় প্রস্তুত, বিদেশী অপেক্ষা কম্মঠ, পটু ও স্থায়ী। সমগ্র ভারতে বহু পরিমাণে আমাদের মেসিন চলে।

সিষ্টোফোন লেবরেটরী লিঃ
১১৫এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সেদিন দোকানের বিশু চাকরটার কাপড়ে যেমন রক্তের ছোপ লেগে গিয়েছিল···

"এ লতি, ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? অত হাঁ করে কি দেখছিস্।"

আশার ক্ষণ-ভঙ্গুর স্বপন বাস্তবের কঠিন স্পর্শে নিমেষে চূর্ণ হল!

* * *

"কি, কি···কিছু···ন-মনে···ও! তা-তাইত!

ডামির গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, গলায় কোঁচান চাদর ঝোলান, পরিপাটি করে কাপড় পরা—যেন কেত'দুরস্ত নব্য যুবকটি। সুবাসিত কেশ তৈলের বিজ্ঞাপন—একহাতে তেলের বোতল, অপর হাতে ছড়ি। পাঁচু একটু অন্যমনস্ক হয়ে, আর একটু হ'লেই ঘাড়ে পড়েছিল আর কি! চোখ মেলে, চারিদিক দেখতে দেখতে হাটায় যথেষ্ট বিপদ আছে। ভদ্রলোকটির কী ভীষণ ভুঁড়ি, তার ওপর কত মোটা সোনার চেন্ ঝুলছে পেছনের অসহায় শীর্ণ মেয়েটি বোধহয় ওর কন্যারত্ন। অগাধ সম্পত্তি, ফেলোয়া কারবার, অমন দশ বিশটা ঘড়ি, ঘড়ির চেন্ কেননা নিশ্চয়ই দেবে। বিকেলে মোটরে করে গঙ্গার ধারে হাওয়া খাওয়া···ভগ্নস্বাস্থ্য, অত অত্যাচার চলবে না···সূক্ষ্ম কাশ্মিরী শাল, ছোটবাবুর বিয়েতে পাল মশাইরা যেমন দিয়েছিল, হাঁটুর ওপর থেকে পায়ের নীচে অবধি ঢেকে থাকবে...সজল, করুণ চোখ দু'টি মিনতি ভরা, গালে ম্লান পাণ্ডুর আভা···গ্যাস্ পোষ্টগুলো শন্ শন্ করে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে...না ওকে ছেড়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব···পাঁচু সস্নেহ আদরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলবে, "তোমার ভাবনাই বা কিসের? পৃথিবীর কোন সুখেরই ত অভাব নেই আমাদের! দেখ, তোমায় আমি কত ভালবাসি—ছিঃ কাঁদ কেন?" অক্লেশে এই রকম কত কথাই সে বলে যাবে-প্রত্যেকটী কথা উচ্চারণ করতে সে অসহ্য মানসিক উদ্বেগ, সে নিদারুণ যন্ত্রণা আর নেই, যাতে তার সাধারণ, দৈনন্দিন জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছিল।···

ভদ্রলোকটি একজায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁতে সুতো বোনা দেখছিলেন, বেশী লোক জমতে দেখে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন।

পাঁচুর একজিবিশনে এই রকম লোকের ভীড় ঠেলে টো টো করে ঘুরতে আর ভাল লাগছিল না। একটা সুবিধে গোছের বসবার জায়গা পেলে চুপ করে বসে হরেক রকম লোকের শোভাযাত্রা দেখে ঢের বেশী আনন্দ পাওয়া যেত। কত নানা ধরণের লোক যেন উদ্বাস্ত হয়ে ভীড় ঠেলে উদ্দেশ্যহীনের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশীর ভাগ লোকই বেশ-ভূষার পারিপাট্যের দিকে রীতিমত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে বলে মনে হয়, পাঁচুর গায়ে কিন্তু কোরা মার্কিনের অর্দ্ধমলিন সার্ট, গলার অর্দ্ধেক বোতাম নেই, কাপড়টা অনেকদিন হল ধুয়ে পরিস্কার করে নেবে মনে করেছিল, কিন্তু রবিবার ছাড়া সময়ই হয়নি, এমন জানলে কে আজ একজিবিশন্ দেখতে আসত? হেঁট হয়ে চলতে চলতে পায়ের জুতোটার দিকে নজর পড়ল—নাঃ এ জুতোটা দিয়ে আর কতদিন চলবে? এত চারিদিকে ছিঁড়ে গিয়েছে আর মেরামত করাও যায় না, অথচ নতুন কেনবারও পয়সা নেই। গেল মাসে অনেক কষ্টে দুটো টাকা জমিয়েছিল, আর একটা কাপড় না কিনলেই নয়, তাও খরচ হয়ে গেছে।

পাশেই একটা বড় মার্ব্বেল পাথরের দোকান। লাল দালুর ওপর তুলো দিয়ে ফার্মের নাম লেখা রয়েছে, ইটালিয়ান্ হবে বোধ হয়, নামটা পড়া পাঁচুর বিদ্যের কুলোয় না। কত সুন্দর সুন্দর পাথরের কাজ, প্রতিমূর্ত্তি, মানুষ ও জন্তুর, ছেলেদের নানা ধরণের খেলনা পাশাপাশি সাজান রয়েছে।

তুমি এসো আজি মনের আঙিনা বাহি

খন্দে আলী মিয়া

জীবনের মোর বিজন-গহনে
কে তুমি বাজালে বীণা
মনে পড়ে মোর কবে শুনেছিনু
সুর যেন তার চিনা,
বসি বাতায়নে ছিনু আনমনে
তোমার হেরিনু পথে
গুঞ্জরি গীতি তরুণী পথিক
চলেছো অরুণ রথে।
ভাবি আর চেয়ে দেখি বারব
কবে যেন তুমি ছিলে আপনার
তোমাতে আমাতে আজিকে হে প্রিয়া
নহে কভু পরিচয়;
কালে আর কালে জনমে জনমে
ছিনু আমি তোমাময়।

তোমার মনের ভাঙিয়াছে ঘুম
মোর মৃদু পরশনে
তাই বুঝি তব বেপথু পরাণ
শিহরায় খনে খনে,
তুমি বাজায়েছ বীণাখানি তব
আমি গাহিয়াছি গান
একদা দু'জনে ছিনু পাশাপাশি
আজি মরু ব্যবধান।
তুমি ভুলে গেছ সে দিনের কথা
মোর মনে তাগো আনে আকুলতা
নিরজনে আজ সপ্ত সাগর
বুক মোর উথলায়,
জীবনের স্রোতে যারা এলো ভাসি
তারা আজ নাহি হায়।
বাতাসে বাতাসে অশেষ হরষ
রঙ লাগিয়াছে নভে
ফুলেতে পাতায় জেগেছে কামনা
সাজি মধু উৎসবে,
বন বীথিকার আঙিনা আজিকে
সবুজে গিয়াছে ভরি
আজ তুমি এসো হে প্রিয় বন্ধু
সুর তোলো গুঞ্জরি';
সে দিন তোমারে যে-কথা বলিনি
সেই সুরে তব বাজে কিঙ্কিনী
হেথা দুইজনে বসি মুখোমুখি
চোখে চোখে রবো চেয়ে
তুমি এসো কাছে আমার মনের
আঙিনার পথ বেয়ে।

একজন সাহেব, দোকানদারই হবে বোধ হয়, ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাঁচুর ঢুকতে সাহস হল না। দু'জন তরুণী একটি ছোট ছেলের

ফোন-১৭৫১ বড়বাজার
টেলিগ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
এণ্ড গ্রাণ্ড সন্স অব লেট বি, সরকার
সন এণ্ড
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার
ও
রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা
আমরা পৃথক হইয়া এই দোকান খুলিয়াছি। আমাদের এখানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত হাল ফ্যাসানের নানাবিধ নূতন নূতন ও অভিনব ডিজাইনের জড়োয়া ও একমাত্র গিনি সোণার গহণা বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে। পুরাতন গহণার বদলে নূতন গহণা দেওয়া হয় এবং আমাদের প্রস্তুত গহণা ব্যবহারান্তে ফেরৎ দিলে সোণার বাজার দরে তাহা ফেরৎ লওয়াও হয়। মজুরী এবার আরও কমান হইয়াছে।
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সচিত্র ক্যাটলগ পাঠান হয়।
সকলের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
১২৪.১২৪-১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের
মোড়

হাত ধরে দোকান থেকে বেরুল, শাড়ী-পরা অথচ যেন মেম মেম ভাব, বাঙ্গালী কিনা ঠিক বোঝা গেল না। দু'জনের মধ্যে একজন একটু বেশী লম্বা, একজন পরেছে চাঁপাফুল রঙের সিল্কের শাড়ী, আর একজন ময়ূরকণ্ঠি, জরির ফুল-তোলা পাড়। তাড়াতাড়িতে একজনের আড়ালে পড়ে মুখটা ভাল করে দেখাই গেল না—সামনে এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখায় চূড়ান্ত অসভ্যতা। অগত্যা পাঁচু তাদের ঠিক পেছনে পেছনেই চলতে লাগল। ভিড়ের মধ্যে মেয়েমানুষের, অপরিচিত হলেও, কাছে কাছে চললে ততটা অশোভন দেখায় না।

'চাঁপা': "সুজিৎ বাবুর কী আক্কেল! একসঙ্গে বেরুবেন বলেছিলেন, আসলে কি অপমান হত?"

'ময়ূরকণ্ঠি': "আমায় কিন্তু আগে থেকেই খবর পাঠিয়েছিলেন, রোটারী ক্লাবে কি মিটিং আছে, ৫টার মধ্যে ফেরা অসম্ভব।··· আমার ঐ কালো এবনাইটের ম্যাডোনাটা কেনবার ভারী ইচ্ছে হয়েছিল—যা দাম!"

'চাঁপা': "তোকে আবার কখন খবর দিলেন? আমি ওসব attitude এর কোন অর্থই বুঝি না। রোটারী ক্লাব থাকলেও আমাদের engagement ও আগে ঠিক হয়েছিল।"

'ময়ূরকণ্ঠি': "এতে তোমার দোষ ধরা মোটেই উচিত নয়—ক্লাবে আজ চীফজাষ্টিসকে নাকি At home দেওয়া হচ্ছে। নিজের ভবিষ্যতের দিক ত আগে দেখতে হবে।"

পাঁচু আশ্চর্য্য হয়ে কথোপকথন শুনতে শুনতে চলছিল···মাঝে ছাই সব কথা শোনাও যায় না, লোক যা ঘাড়ের ওপর পড়ে—কি বিশ্রী গোলমাল।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে কেমন মজা হয়, কিন্তু তা কী করে সম্ভব। ছোট ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, মাঝে মাঝে মুখ তুলে এটা ওটা কি জিজ্ঞেস্ করছে। আচ্ছা ভিড়ের মধ্যে ছেলেটা যদি হঠাৎ হারিয়ে যায় কিংবা হঠাৎ যদি মেয়ে দুটিকে গুণ্ডায় তাড়া করে! সে সকলের আগে গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে ওদের উদ্ধার করবে, যে রকম করে পারে ছেলেটিকে খুঁজে এনে দেবে। মেয়ে দুটির চোখে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ, দৃষ্টি, হাত ধরে ওকে কত ধন্যবাদ দেবে। পাঁচু ওদের বুঝিয়ে বলবে কৃতজ্ঞ হবার কিছুই দরকার নেই, সাধারণ ভদ্রতার খাতিরেই সে ওটুকু কষ্ট স্বীকার করেছে, তাও বা এমন কি আর? 'ময়ূরকণ্ঠির' সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হবে, অল্প একটু ঠোঁটের কোনে হাসি টেনে 'চাঁপা' ওর হাত ধরে চায়ের দোকানে একসঙ্গে গিয়ে বসবে।

পুতুল নাচ হচ্ছে—সকলেই দেখবার জন্যে উৎসুক, কি বিষম ঠেলাঠেলি—এক বৃদ্ধের হাত থেকে কী কতকগুলো কাগজে-মোড়া জিনিষ মাটিতে পড়ে গেল, পাঁচু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিনিষগুলো ভদ্রলোকটির হাতে তুলে দিলে। বৃদ্ধ একটু হাসলেন মাত্র, "থাক্, থাক্, আমিই নিচ্ছি। হাঁ করে পেছন ফিরে চলেছে, উজবুক দেখতেও পায় না। কানা নাকি!"

ছোট ছেলেটি একটা পানওয়ালার পাশে দাঁড়িয়ে ঘাড় উচু করে পুতুল নাচ দেখবার বৃথা চেষ্টা করছে। মেয়েদুটি অন্যমনস্ক হয়ে কথা কইতে কইতে এগিয়েই চলেছে। পাঁচু একটা দোকানের আড়ালে দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ছেলেটি তখনও উৎসুক দৃষ্টিতে পুতুল নাচের 'রাবণ বধ' দৃশ্য দেখতে মহা ব্যস্ত। আরও খানিকদূর গিয়ে হঠাৎ 'চাঁপা' ফিরে দাঁড়াল, ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক দেখছে! 'ময়ূরকণ্ঠি' পাশের দোকানে যেখানে বিনামূল্যে তেলের স্যাম্পেল বিতরণ হচ্ছে সেই দিকে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল। পাঁচু চট্ করে গিয়ে ছেলেটির হাত ধরলে বল্লে, "খো···খোকা ত-ত তুমি হারিয়ে-গে-গেছ?" খোকা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ব্যাপারটা যেন বুঝতে পেরে কেঁদে উঠল। পাঁচু আর দেরী না করে, একরকম টানতে টানতেই ছেলেটিকে নিয়ে 'ময়ূরকণ্ঠির' কাছে হাজির করলে। 'চাঁপা' দূর থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। ছেলেটির গালে মৃদু একটা চড় মেরে বললে, "দুষ্টু ছেলে তুমি যেখানে সেখানে চলে যাও কেন?

অপরিচয়

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যে কোনো দিনের যে কোনো' খনে
বাহিরে আসিলে অকারণে,
কত সে জনতা ফেরে দেখি
রাজপথ' পরে আনমনে।
কেহ বা সুখী কেহ বিষণ্ণ,
যৌবন জরা-অনুগামী—
ধনী, দরিদ্র, ভালো বা মন্দ,—
কাহারেও নাহি চিনি আমি।

জানিতে ভারী সাধ হয় মনে
অজানা যত নরনারী,
যা'দের দেখি এবেলা ওবেলা
নিত্য ধরার পথচারী।
চিনিতাম যদি অপরিচিতরে—
সার্থক হ'ত আমার প্রাণ,
তাদের ব্যাকুল সুখের শোকের
করিতাম মধু গরল পান।

কত বিচিত্র হায় ধরিত্রী!
পূর্ণ অথচ শূন্য—
কত বড় ফাঁক জীবনে আমার
ব্যবধানবোধে ক্ষুণ্ণ।

তোমায় আমি একশ' বার বলেছি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।" 'ময়ূর কণ্ঠি' ছেলেটিকে কাছে টেনে আদর করে বল্লে, "আহা ওকে মারছ কেন? এই ভিড়ের মধ্যে বড়ো লোকই হারিয়ে যায়, তা ওতো ছেলে মানুষ। না রবি তুমি কেঁদনা, চুপ কর।"

পাঁচু হতভম্বের মত চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল, চাঁপা' এগিয়ে এসে তার আপাদ-মস্তক বেশ করে নিরীক্ষণ করে বললে, "তুমি রবিকে কোথায় দেখতে পেলে, কি করছিল ও? আমরা খুঁজছিলুম দেখে বুঝি তুমি ওকে কাঁদতে দেখে আমাদের কাছে নিয়ে এলে?'

পাঁচু তখনও নির্ব্বাক, আশার স্বপন এমন ভাবে কার্য্যে পরিণত হতে দেখে সে কাঁদবে কি হাসবে, কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। 'ময়ূরকণ্ঠী' তাকে উদ্ধার করলে। ছেলেটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, "লোকটি রবিকে খুঁজে করে আমাদের কাছে ধরে না নিয়ে এলে আমাদের কি বিপদেই পড়তে হত বল দেখি। এই লোকে-লোকারণ্য, এর মধ্যে ছোটছেলেকে খুঁজে পাওয়া কি সহজ কথা।" পাঁচুর দিকে চেয়ে বল্লে, "তুমি আজ যা আমাদের উপকার করলে তা আমরা বলে বোঝাতে পারব না। তুমি যখন ওকে দেখতে পেলে তখন কি রবি আমাদের দেখতে না পেয়ে কাঁদছিল?" পাঁচু নিঃশ্বাস চেপে মুখ লাল করে কোনরকমে বলে ফেলল, "হুঁ"।

তারপর 'চাঁপা' আর 'ময়ূরকণ্ঠি' নিজেদের ভেতর খানিকক্ষণ কি বলাবলি করলে, পাঁচু তখন মনের ভেতর ভাবছিল কী বলে মেয়ে দুটির সঙ্গে সে ভাব করবে।

'চাঁপা' তার হাতের ব্যাগ খুলে একটা টাকা পাঁচুর হাতে গুজে দিয়ে বললে, "তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ কিন্তু এর বেশী আর আপাততঃ কিছু দিতে পারলাম না বলে কিছু মনে কোরো না…" 'চাঁপা' আরও কি বলতে যাচ্ছিল, 'ময়ূরকণ্ঠি' বলে উঠল, "ঐ নীলিমাদিরা যাচ্ছে না? অমিতবাবুও সঙ্গে এসেছেন দেখছি। চল, ওদের ধরা যাক্, এখুনি আবার ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

পাঁচু নিষ্পন্দ নির্ব্বাক হয়ে কাঠের প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরুল না। তার হাতটা রি রি করে জ্বলে উঠল, মনে হল হাতের ওপর কে যেন একটা জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলে দিলে। ছি, মেয়েদুটি তাকে কী ভাবলে, বেশভূষা দেখে হয়ত মনে করে থাকবে লোকটা ভিখারী, কিছু পাবার আশায় হয়ত অমন উপযাচক হয়ে ছেলেটাকে খুঁজে দিয়ে গেল। টাকাটা কেন সে নির্বোধের মত হাত পেতে নিলে, কেন সে ছুড়ে ফেলে দিতে পারলে না?… চেঁচিয়ে বলে উঠতে ত পারত, "ওগো আমি দীন দুঃখী হলেও তোমাদের কাছে ভিক্ষার লোভে আসিনি। তোমাদের দেখে আকৃষ্ট হয়ে দুটো মিষ্টি কথার আশায় তোমাদের সামান্য উপকারটুকু করেছি।" সেজন্য তোমাদের এমন করে অপমান করবার ত অধিকার ছিল না, এই রকম কত কথাই তার বলবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সবই অব্যক্ত রয়ে গেল, নীলকণ্ঠের গলায় তীব্র হলাহলের মত সেই বাক্যগরল অসহ্য জ্বালা সয়েও তাকে কণ্ঠেই ধারণ করতে হল।

রাত্রি হয়ে এসেছে, দোকানে দোকানে, গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে, চারিদিকে আলোর রামধনু সৃষ্টি হয়েছে। পাঁচু আর চলতে পারছিল না, মনে করেছিল সামনে যেখানে কোন বসবার জায়গা দেখতে পাবে, আগে গিয়ে বসে ক্লান্ত পা দুটোকে একটু বিশ্রাম দেবে। হঠাৎ তার পিঠে কে মৃদু ধাক্কা দিলে, আশ্চর্য্য হয়ে পেছন ফিরে দেখে…

"মাইরি, কতক্ষণ থেকে এই ভিড়ের মধ্যে ঘুরছি, একলা আর ভাল লাগে না, চলনা বাড়ী ফেরা যাক্। হাঁ করে চেয়ে রইল, ন্যাং! ন্যাকা!…কিছু জানে না। বলে "কন্য গেল ধান ভেনে…"

পাঁচু কোন কথা না বলেই তার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হল—খালি মনে পড়ছিল তার চাঁপার কথা…মুখে কী রকম একটা চারু কমনীয়তা…ঈষৎ উদ্ধত হলেও কথায় কী শান্ত মাধুর্য্য…গলায় সরু সোনার হার চিক্ চিক্ করছে, বাদামী রঙের কবেট্রটার ওপর কী যেন লেখা ছিল…বুকে ব্লাউজের নীচে রুমাল রাখে কেন?…কি মিষ্টি গন্ধ, কে একরাশ জুঁই ফুল যেন ডালা উজার করে সামনে ঢেলে দিলে।…মুখে কিসের একটা কাটা দাগ…কতকগুলো ব্রণ উঠে শ্রীহীন মুখটাকে যেন আরও কুৎসিত বীভৎস করে তুলছে…দাঁতে কালো রঙের ও কিসের ছোপ?…'ময়ূকণ্ঠি' হাসলে ঠোঁটের পাশে গালের ওপর কি সুন্দর একটি ছোট টোল খায়…

দুর্গন্ধময়, পচা পুকুর—ছোট, সরু অন্ধকার গলি…একজিবিসনে ঢুকতে কত বড় একটা আলোর ডোম্ জ্বলছিল। চাওয়াই যায় না, চোখের ভেতর কী রকম করতে থাকে…গ্যাসের পরিমিত আলোয় যতদূর বোঝা যায় পাশেই কতকগুলো সারবন্দি খোলার ঘর। মাথা নীচু করে তবে ঘরের ভেতর ঢুকতে হল…তেলমশলা ও কেরাথয়েরের মিশ্রিত গন্ধ—দরজার কাছে একটা হারিকেন জ্বলছে—চারিদিক কী ভয়ানক শুদ্ধ। একজিবিসনের দারুণ হট্টগোল আর কানে আসে না।

"চুপ করে দাড়িয়ে রইলে কেন গো? বিছানা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না, এদিকে এতক্ষণ ধরে বসবার জায়গা ত খুঁজছিলে। বস স্থির হয়ে, আমি আসছি।"

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পঁচুর সমস্ত শরীর যেন টলছিল। পায়ের শিরাগুলোর যেন রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে—মাথার ওপর কে একটা বিশ মন ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে।

"আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়া গিয়েছে। তুমি এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছ? দেখ, মুখে একটাও কথা নেই—তুমি বোবা নাকি গা।

গলায় কিসের নরম, শীতল স্পর্শ—আবার সেই অসহ্য মাথা ঘষার গন্ধ—গন্ধটা ওকে পাগল করে দেবে নাকি—কপালে কাঁচা উচ্ছির টিপ, চুলের তলায় কপালের ওপর তেল চক্ চক্ করছে, [illegible] হিংস্র লোলুপ দৃষ্টি।

পঁচু আর সহ্য করতে পারছিল না হাতের মুঠোর মধ্যে সে রৌপ্য অঙ্গার তখনও জ্বলছে। জোর করে বিছানার ওপর টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাতালের মতন টলতে টলতে সে দরজা দিয়ে অন্ধকার গলির পথে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় নেমে তার কানে গেল, কে যেন বলছে, "বলি হ্যালো চাঁপা, তোর বাবু এরি মধ্যেই চলে গেল। মিনসে কিছুই দিলে না বুঝি?"

পৃথিবীর বাস্তব জীবনে অবাস্তবের কতকগুলো রঙীন স্পর্শ বড়ই বিসদৃশ বোধ হল।

সাতরাজার ধন—মাণিক!

=শ্রীচিত্রগুপ্ত বিরচিত=

জানালার শার্সী ঝনঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া একটি বল আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল!...

আসন্ন তন্দ্রার মায়া কাটাইয়া রায়-গিন্নি উঠিয়া গিয়া ভাঙা শার্সীর মধ্য দিয়া পথের দিকে তাকাইলেন,—কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাগে গজ গজ করিতে করিতে বলটি তুলিয়া রাখিলেন। বলের অধিকারী বল লইতে আসিলে ভালভাবেই জানিয়া যাইবে কাহার কাঁচ সে ভাঙ্গিয়াছে!...সহরের বাড়ী ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের খর্পরে পড়ার ফলে শহরের উপকণ্ঠে এই বাড়ীটি কিনিয়া কয়েকদিন হইতে তিনি বাস করিতেছেন কিন্তু ইতিমধ্যেই পাড়ার লোকে তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আড়ালে রায়বাঘিনী বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে দরজায় ভীরু করাঘাত শুনিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া তিনি কট্‌মট্ করিয়া তাকাইলেন। একটি ছেলে। ছেলেটি কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "বাবা আস্‌চেন্ আপনার শার্সীর কাঁচ পরিয়ে দিতে। অসাবধানে আমিই ওটা ভেঙ্গে ফেলেছি।"

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে রাস্তার মোড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। রায়-গিন্নী দেখিলেন একখানি বড় কাঁচ এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম হাতে লইয়া একটি লোক সত্যই তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। চোখাচোখি হইতেই ছেলেটি চেঁচাইয়া বলিল, "এই বাড়ী।"

ক্ষতিপূরণের আশ্বাসে এবং অপরিচিত ছেলেটির সুবিবেচনা ও সত্যকথনে খুশী হইয়া রায়-গিন্নী তাহাকে বলটি ফিরাইয়া দিলেন। ছেলেটি আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

লোকটি আসিলে রায়গিন্নী তাহাকে ভাঙা শার্সী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বেশ ভালো ক'রে এটে দিও বাপু।"

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া মাপিয়া কাঁচ কাটিয়া জানালার কাঠ চাঁচিয়া পিন্ দিয়া কাঁচ পরাইয়া পুটিং দিয়া আঁটিয়া মায় স্পিরিট দিয়া কাঁচের উপর হইতে নিখুঁত করিয়া পুটিংএর দাগ উঠাইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম লোকটি বলিল:—

"পুরোপুরি আট আনাই দেবেন মা।"

রায়-গিন্নী আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন, "তার মানে?"

লোকটি আমতা আমতা করিয়া বলিল:—

"আপনার ছেলে অবিশ্যি আমায় বলেছিল, মা ছ'আনার বেশী দেবেন না। কিন্তু দোকানে আমি একগাদা হাতের কাজ ফেলে আপনি ডেকেচেন বলে আগে ছুটে এলুম—আর খাটুনিটা নিজের চোখেই দেখলেন তো!"

"আমার ছেলে!" রায়-গিন্নী কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।...

(২)

ছেলেটির নাম মাণিক। গরীব বিধবা দিদিমার একমাত্র নাতি। পিতামাতা নাই—পাড়ার স্কুলে সে বিনা বেতনে পড়িত। একদিন হেডমাষ্টার মহাশয়ের নিকট কি একটা নতুন রকমের বুদ্ধির পরিচয় দেওয়ার ফলে তিনি তাহাকে স্কুলে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই হইতে সে দুপুর রৌদ্রে বল খেলিয়া, ফল পাড়িয়া মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার রায়-গিন্নী এবং ছবি-বাঁধাই-ওয়ালাকে বোকা বানানোর কাহিনী শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে সে লোকের ভালো করে না। সময় সময় সে গায়ে পড়িয়া লোকের খুব ভালোও করিয়া থাকে। একদিনের

শ্রীমতী সাধনা বসু

শিক্ষা, দীক্ষা, আভিজাত্যে ও বংশ গৌরবে ইনি গৌরবান্বিতা। নাচে ও গানে ইনি সমপারদর্শিনী। ভারতলক্ষ্মীর হাস্যগীতমুখর "আলিবাবা" ছবিতে এর বহুবিখ্যাত ভূমিকা মর্জিনাতে প্রথম চিত্রাবতরণ কোরবেন। মধু বোস এর পরিচালক।

কাহিনী বলি, "সেদিনও এইরকম গ্রীষ্মের দুপুর। নিয়মিত দ্বিপ্রাহরিক ভ্রমণের সময় একটি বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে মাণিক দেখিল ঠিক সদর দরজার উপর একটি লোক একটি আলমারী লইয়া ধস্তাধস্তি করিতেছে কিন্তু ভারী আলমারীটাকে একটুও নড়াইতে পারিতেছে না। দেখিয়া মাণিকের মনে দয়া হইল। সে আগাইয়া গিয়া বলিল, "কি দাদা একলা যে এটাকে নিয়ে ঘেমে উঠ্‌লেন। হাত লাগাবো নাকি?" লোকটি যেন বাঁচিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। মাণিক মহোৎসাহে হাত লাগাইয়া দিল। কিন্তু আলমারীটা বোধ হয় বড্ড ভারী ছিল। তাই ঘন্টা খানেক ধরিয়া দুজনে দুইদিক ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সেটাকে এক ইঞ্চিও নড়াইতে পারিল না। শেষে হতাশ হইয়া লোকটি বলিল, "না ভাই বৃথাই তোমায় খাটালুম এটা ঘরে আর ঢুক্‌বে না, এইখানেই পড়ে থাক্।"

মাণিক অবাক হইয়া বলিল, "সেকি দাদা আমি যে ঘণ্টাখানেক ধ'রে এটাকে বাইরে বার করতে চেষ্টা করলুম! এ্যাঃ আগে বল্‌তে হয়।"

তাহার কথা শুনিয়া লোকটি ঘুসি তুলিয়া তাহার দিকে আসিবার উপক্রম করিতেই সে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

(৩)

এই ভাবেই মাণিক দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছিল কিন্তু সহসা বিধাতার মনে কি খেয়াল হইল, তিনি মাণিকের সহিত একটু রসিকতা করিয়া ফেলিলেন, অর্থাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার একটি চাকুরী জুটাইয়া দিলেন।

সেদিন ছিল রবিবার। মাণিক সকালবেলা ক একটা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া পাড়ার দয়াল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। দয়ালবাবু ছিলেন সুরসিক ব্যক্তি এবং পাড়ার সকলের সরকারী ঠাকুর্দ্দা। মাণিক যাইতে যাইতে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িয়া গেল। ঠাকুর্দ্দা তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিলেন। মাণিক আসিয়া কাছে দাঁড়াইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালবেলা কোথায় চলেছিস্?"

ঠাকুর্দ্দা মাণিককে একটু স্নেহের চোখে দেখিতেন।

মাণিক প্রশ্নটা এড়াইবার জন্য ঢোক গিলিয়া বলিল, "এই একটু ইয়েতে—মানে ইয়ে। আপনি কেমন আছেন?"

ঠাকুর্দ্দা সুখে ছিলেন না। তাঁহার ছেলেগুলি একটিও মানুষ হয় নাই—মাতাল গেঁজেল হইয়া বাড়ী ছাড়িয়াছিল। মেয়েগুলিকে তাহাদের শাশুড়ীরা ছেঁচকি পোড়া করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় দিয়াছিলেন। থাকিবার মধ্যে তাঁহার গৃহে ছিলেন একমাত্র ঠাকুরমা। তা তিনিও এমন যে তিনি না থাকিলেই ঠাকুর্দ্দা ভালো থাকিতেন।

মাণিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "দেখ, অনেক কষ্টে সংসারে সুখ খুঁজে পেয়েছিলুম, তা এখন আবার তাতেও গোল বেধেছে। সংসারে যখন দেখলুম কোথাও সুখ পাইনা তখন মাথায় এক প্ল্যান এলো। গ্রীষ্মকালে দুপুর রোদ্দুরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতুম—তারপর যখন সহ্য করতে পারতুম না তখন এসে দাঁড়াতুম ছায়ায়। রোদ্দুর থেকে ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে যে সুখ পেতুম সে আর কি বোলবো। শীতকালে করতুম ঠিক উল্টোটা—রাতদিন জলে পড়ে থাকতুম। আর বড্ড শীত ধরলে লেপের মধ্যে ঢুকে সুখের আস্বাদ নিতুম। কিন্তু এখন মুস্কিল হয়েছে কি জানিস্। ক্রমাগত এই ক'রে ক'রে শেষে ওটা প্র্যাক্‌টীস হয়ে গেছে। শীত গ্রীষ্মে রোদে জলে এখন আর কষ্ট হয়না। কাজেই জীবনের একমাত্র সুখটুকু ভেগেছে। এখন কি করি বল দেখি?"

শুনিয়া মাণিক একটু ভাবিয়া বলিল, "হয়েছে! আপনি এক কাজ করুন ঠাকুর্দ্দা। আপনি ক'নম্বর জুতো পায়ে দেন?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "সাত নম্বর, কেন?"

"তা হলে আপনি চীনে বাড়ী থেকে ওর চেয়ে ছোটো একজোড়া—ধরুন পাঁচ নম্বর বুটজুতো কিনে আনুন সেইটে সকাল

বেলা পায়ে এঁটে সারাদিন ঘুরে বেড়াবেন। রাত্তিরে শোবার আগে সেই বুট যখন খুলবেন—দেখবেন কী সুখ!"

ঠাকুর্দ্দা খুশী হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে মাণিক, তোর এত বুদ্ধি তবু তুই টাকা রোজগারের চেষ্টা করিস না? এই দেখ আজকের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে লিখেচে। এক সাহেবের চাই বেশ চালাক চতুর চট্‌পটে, আর জোয়ান এক বয়। চাকরী খুব উঁচুদরের না হ'লেও মাইনে দেবে পঁচিশ টাকা—দেখনা চেষ্টা ক'রে। সাহেব সুবোর কাছে চাকরী করলে মাইনে ছাড়া টাকাটা সিকেটা মাঝেমাঝে উপরিও মিলবে। এ চাকরী যদি যোগাড় কর্ত্তে পারিস্‌ তবেই বুঝবো তোর বাহাদুরী।"

নিজে হাতে টাকা রোজগার করিবার কল্পনা মাণিককে হঠাৎ উৎসাহিত করিয়া তুলিল। সে ঠাকুর্দ্দার নিকট হইতে সাহেবের নাম ঠিকানা টুকিয়া ও বুঝিয়া লইয়া সেদিনকার মত বাড়ী চলিয়া গেল।

(৪)

সোমবার সকালে দিদিমাকে বুঝাইয়া রাজী করিয়া মাণিক চাকরীর চেষ্টায় কলিকাতার পথ ধরিল। বলিয়া গেল নিয়মিতভাবে পত্রাদি দিবে এবং মধ্যে মধ্যে ছুটী লইয়া বাড়ী আসিবে।

সাহেবের নিকট পৌঁছাইবার পূর্ব্বে পথে কি ভাবিয়া মাণিক থমকিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি পরণের জামা ও কাপড়ের স্থানে স্থানে খাঁমচাইয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর একটা বাড়ীর দেওয়ালে ঠুকিয়া কপালটায় কালশিরা পড়াইল। শেষে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়া দরওয়ানের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পাশ কাটাইয়া দৌড়াইয়া একেবারে সাহেবের কামরায় ঢুকিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব রাগিয়া তাহাকে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল—

"You sir advertisement paper, Want smart boy. I want sir. Very poor. Give me."

রাগ ভুলিয়া এবং প্রায় হাসিয়া ফেলিতে ফেলিতে সাম্‌লাইয়া লইয়া সাহেব হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার বেশভূষা ও চেহারার অবস্থা অমন কেন?

মাণিক কিন্তু ইংরাজী ছাড়িল না। বলিল,

"Your advertise কা কলমে much boy come at gate, বোধ হয় hundred. I alone fight them. All defeat, fly. I alone come in. Therefore you see I strong than all sir."

তাহার শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়া না হউক তাহার রকম সকম দেখিয়া সাহেবের কেমন কৌতুক বোধ হইল। তাহার উপর তিনি ছিলেন বেপরোয়া ব্যাচিলার মানুষ। তাই সুপারিশ এবং পরিচয়-পত্রের অভাব সত্ত্বেও সাহেবের নিছক খেয়ালেই মাণিকের চাকুরীটা সত্য সত্যই জুটিয়া গেল। মাণিক মহানন্দে তাহার চাকুরী প্রাপ্তির সংবাদ ঠাকুর্দ্দাকে জানাইয়া কাজে লাগিয়া গেল।

(৫)

এবার কিন্তু মাণিকের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে রীতিমত মন দিয়াই চাকুরী করিতে লাগিল। সাহেবের কৃপায় সে খাইতে পায় ভালো—পোষাক পাইয়াছে মনের মত এবং সবার উপর সাহেব কাজের জন্যই হউক বা আমোদের জন্যই হউক যখন যেখানে যান মাণিককে তাঁহার টু-সীটার গাড়ীর পিছনের সীটে বসাইয়া সঙ্গে লইয়া যান। এমন কি সিনেমায় যাইলে তাহাকে নিম্নশ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দেন। শিলংএ গল্‌ফ খেলিতে যাইবার সময় সার্ভেণ্টদের কামরায় চড়াইয়া তাহাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। একে মাণিক চোর নয়, তাহার উপর তাহার সেবা যত্নে অবিবাহিত সাহেব তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই মাণিক বেশ সুখেই চাকরী করিতে লাগিল।

কিন্তু পরিবর্ত্তন যতই হউক মাণিকের স্বভাব তো? তাই হঠাৎ একদিন তাহার পূর্ব্ব স্বভাব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া সাহেবকে তাহার উপর চটাইয়া দিল।

আফিসে একটি চাকরী খালি হওয়ায় খেয়ালী সাহেব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন এবং স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন বিবাহিত লোকদিগের আবেদন অগ্রাহ্য হইবে। তিনি নিজে অবিবাহিত বলিয়া অবিবাহিতদিগের প্রতিই তাঁহার পক্ষপাত ছিল। বিজ্ঞাপন পড়িয়া অনেকেই দরখাস্ত পাঠাইল। একটি লোক কিন্তু স্বয়ং আসিয়া মাণিককে জানাইল সে সাহেবের দর্শন-প্রার্থী। মাণিক বিজ্ঞাপনের কথা জানিত। সাহেবের বিজ্ঞাপন তাহার পছন্দ হয় নাই। তাহার ইচ্ছা ছিল বিবাহিত লোকেই চাকরীটা পায়। সে লোকটীর হাতে লেফাফা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চাকরীর জন্তে এসেছেন?"

লোকটী বলিল, "কেন?"

মাণিক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বিয়ে হ'য়েচে?"

লোকটি বলিল, "ভাগ্যিস্‌ হয়নি, সেই ভরসাতেই তো এসেচি।"

মাণিক নির্লিপ্তের মতন বলিল "তাহ'লে ফিরে যান। আপনার কোন আশা নেই। বিবাহিত লোককেই চাকরী দেওয়া হবে। কাগজওলারা ভুল ছেপেছে। এইমাত্র টেলিফোনে কাগজওলাদের সাহেব খুব গালাগাল দিয়েচেন। সাহেবের মেজাজ এখন ভয়ানক গরম।

লোকটি চলিয়া গেল। দিন দুই পরে কিন্তু সে আবার আসিল এবং সে সময় সাহেব মাণিককে কোথায় পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া তাহার সাহেবের সহিত সাক্ষাতের সুযোগও জুটিয়া গেল।

সাহেব কিন্তু তাহার দরখাস্ত পড়িয়া মুখ মচকাইলেন। বলিলেন, "তুমি ভুল ক'রেছো বাবু। বিবাহিত লোকদের জন্যে এ চাকরী নয়।"

লোকটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "সে কি সাহেব? তবে যে আপনার বয় সেদিন ব'ললে—"

"কি ব'লেচে সে?"

লোকটি তখন মাণিক তাহাকে যাহা বলিয়াছিল, সব বলিল। আরও বলিল, বিবাহ করিয়া সাহেবকে খুশী করিয়া এবং কাঁদিয়া কাটিয়া চাকুরীটি যোগাড় করিবার আশায় সে তাহার বহুদিনবাঞ্ছিত এক দরিদ্র বিধবার কন্যাটীকে কাল বিবাহ করিয়াছে। কারণ সে জানিত ও চাকরীটি পাইবার যোগ্যতা এবং উপযুক্ত প্রশংসা পত্র তাহার আছে, তাই মাণিকের কথায় সে চাকরী পাওয়ার একমাত্র প্রতিবন্ধকটি দূর করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়াছিল। লোকটি কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "সাহেব একটা পেট নিয়ে উপোস করছিলুম এখন দু'টো পেট ভরাবো কি দিয়ে?"

ঠিক এই সময়ে মাণিক আসিয়া উপস্থিত হইল।

ব্যাপার শুনিয়া এবং মাণিককে সম্মুখে পাইয়া সাহেব মাণিকের উপর রাগিয়া অগ্নিশর্মা হইলেন লোকটিকেও যা' তা' বলিয়া গালি দিলেন। বলিলেন, "ওর কথা শুনে তুমিই বা দুম ক'রে বিয়ে ক'রে বসলে' কোন আক্কেলে। তোমার মতন লোক ঢুকলে আমার আফিস তো দুদিনে উঠে যাবে।

সে মেয়েটি সাগর-দুহিতা

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

এখন সকাল হোল কাঁচা রোদে রমণীয় আজ এই সোণালি সকাল।
সাগর-বীচের 'পরে শুধু বালি—শুধু বালি—বালি আর বালির পাহাড়
এই পথে হেঁটে যাওয়া মানুষের সারি সারি কত না পায়ের দাগ আঁকা
আঁকা-বাঁকা কত দাগ—তা'দের চিনিনে আমি; শুধু চিনি একসারি তা'র।

কাল সে এ-পথ বেয়ে হেলে দুলে চলে' গেছে—চলে' গেছে কি জানি কখন!
কখন মোমের মত দু'খানি পায়ের চাপে বালুকণা শিথিল হয়েছে;
সাগরের সাদা জলে হয়ত পড়েছে ছায়া-রঙিন্ শাড়ীর ছায়া তা'র,
কি জানি কখন কাল, সেই মেয়ে হেঁটে গেছে—হেঁটে গেছে কি জানি কখন!

চপল ঢেউএর মত সে-মেয়ে কখন আসে, কখন দোলায়ে যায় বেণী,
লাল শাড়ী উড়ে পড়ে অবোধ শিশুর মত আলুথালু বাতাসের বেগে,
ওড়ায় বালুর কণা, আবার পাহাড় গড়ে, আর গড়ে গভীর সুড়ং।
সে-মেয়ে চপল মেয়ে, সে-মেয়ে কঠিন মেয়ে, সেই মেয়ে সাগর-দুহিতা!

এখন সকাল হোল, আমি তো চিনেছি আজ সরম পায়ের দাগ তা'র।
সাগর-জলের ঢেউ ও-দাগ মোছেনি আজো—ও-দাগ মুছিবে ঠিক কাল।
কালও সকাল হবে—সোণালি সকাল হবে—কাঁচা রোদে সোণালি সকাল;
সাগরের লোণা জলে—আর লোণা হাওয়া লেগে, ও-দাগ মুছিবে ঠিক কাল।

অবশেষ লোকটীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিতান্ত হৃদয়ের কাছে বাধ্য হইয়াই তাহাকে চাকরীটি দিলেন এবং অনেক কাণ্ডের পর মাণিকের চাকরীটি সে যাত্রা যাইতে যাইতে রহিয়া গেল।

(৬)

এদিকে মাণিক সেই যে কলিকাতায় চাকুরী করিতে গিয়াছে তাহার পর অনেকদিন কাটিয়া গেলেও সে দিদিমাকে না দিয়াছে একখানি পত্র, না আসিয়াছে স্বয়ং। সুতরাং দিদিমা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। শেষে প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া মরিয়া হইয়া তিনি একেবারে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন ঠাকুর্দার নিকট। মাণিকের ঠিকানা দিতে হইবে। তিনি নিজে যাইবেন তাহার সহিত দেখা করিতে। মাণিক তাঁহাকে ভুলিলেও তিনি তো তাহাকে ভুলিতে পারেন না।

অবশেষে মাণিকের ঠিকানা লইয়া তিনি সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। দরওয়ান জিজ্ঞাসা করিল তিনি কি চান? তিনি বলিলেন তিনি মাণিককে চান—তিনি মাণিকের দিদিমা।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরওয়ান একলাফে একেবারে দশহাত পিছাইয়া গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জোরে জোরে 'রাম নাম' উচ্চারণ করিতে লাগিল। দিদিমা তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমাগত 'রাম নাম' উচ্চারণেও তিনি বিদায় হন না দেখিয়া শেষে দরওয়ান তাঁহাকে বলিল তিনি ফিরিয়া যাউন। মাণিক এতক্ষণ তাঁহাকে লইয়া ঘাটে গিয়া পৌঁছিয়াছে। দাহ করিবার বিলম্ব নিশ্চয়ই হইবে না—তাঁহার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। সে আরও প্রতিজ্ঞা করিল সে মাণিককে বুঝাইয়া যথাসময়ে ভালো করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ শান্তি করিতেও বলিবে।

ব্যাপারটা হইয়াছিল এই। কলিকাতার আবহাওয়ায় আসিয়া মাণিককে এদানী রেসে পাইয়াছিল। পরপর দুইটা শনিবার সে সাহেবের নিকট বাজে অছিলায় ছুটী লইয়া রেস খেলিতে গিয়াছিল। আজ আর অন্য কোন অছিলায় ছুটী লইবার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া মাণিক একেবারে কাঁদিয়া গিয়া পড়ে যে তাহার বাড়ী হইতে লোক এই মাত্র সংবাদ দিয়া গিয়াছে যে তাহার দিদিমা মরিয়া গিয়াছেন। তাহাকে বাড়ী গিয়া দিদিমার দাহ কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অগত্যা বাধ্য হইয়া সাহেব তাহাকে ছুটী দিয়াছেন। দরোয়ানও ব্যাপারটি এইরূপই জানিত। সুতরাং সে সদ্যো মৃতা দিদিমার প্রেতাত্মাকে তাহার নিকট আসিতে দেখিয়া অমন আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাই হউক মৃতা দিদিমা অনেক কষ্টে নিজেকে জীবিতা বলিয়া প্রমাণিত করিয়া এবং দরওয়ানকে নগদ একটাকা ঘুস্ দিয়া সেবারকার মত সাহেবের নিকট মাণিকের কাচুপির কথা ফাঁস না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া বিদায় লইলেন। দিদিমা তাহার কাঁচা ঘাড়টা না মটকানোতে এবং নগদ একটা টাকা দেওয়াতে কৃতজ্ঞ দারোয়ান সত্যই ঘটনাটা চাপিয়া গেল।

কিন্তু হায়! মাণিকের চাকরীতে বোধ হয় শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কারণ চাকরী তাহার গেলই।

কিছুদিন হইতে একটি কুমারীর প্রতি সাহেবের পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে। সাহেব তো আর বাঙ্গালী নয়, যে কবিতা লিখিয়াই প্রেমের সমাপ্তি ঘটিবে? মেমের সহিত সাহেব আলাপ জমাইয়া তুলিলেন এবং তাহার জন্মদিনের নিমন্ত্রণও পাইলেন। এবং মেমের কাছে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাহার জন্মতিথিতে তিনি, মেমের জীবনকে বসন্ত আসিয়া যতবার অভিনন্দিত করিয়াছে তাহার প্রত্যেক বারের জন্য একটি করিয়া গোলাপ ফুল উপহার পাঠাইবেন। অর্থাৎ সাদা কথায় মেমের যত বয়স ততগুলি গোলাপ ফুল পাঠাইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে মাণিককে ডাকিয়া তিনি কতকগুলি ফুল মেমের বাড়ী বিকালে গিয়া দিয়া আসিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিয়া টাকা দিয়া দিলেন। মাণিক যথা সময়ে কাজ সারিয়া আসিল। তাহার পর রাত্রে তিনি কামাইয়া কামাইয়া গালের মাংস প্রায় তুলিয়া ফেলিয়া এক ঘণ্টা ধরিয়া টাই বাঁধিয়া অবশেষে সাজ সমাপ্ত করিয়া একলা গাড়ী করিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে চলিলেন আজ মাণিককে সঙ্গে লইলেন না। কারণ আজকের পক্ষে মাণিক নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় তৃতীয় ব্যক্তি। তাহাকে না লওয়ার ফলে গাড়ীর accessories চুরী যাইলে আজ তাহার সে ক্ষতি সহিবে।

সাহেব চলিয়া যাইবার পর মাণিক দরোয়ানের সহিত বেশ করিয়া গল্প জমাইয়া তুলিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় যে মুচির নিকট সে ধারে জুতা সারাইয়া লইয়াছিল সে আসিয়া পয়সা চাহিল। কিন্তু পয়সা দেওয়ার পরিবর্ত্তে সে অসময়ে পয়সা চাহিতে আসিয়াছে বলিয়া মাণিক মার-মুখো হইয়া উঠিল। বেচারী মুচি বলিল যে অনেকদিন হইয়া গেল জুতা সারানো হইয়াছে, অথচ মাণিককে সে ঠিক একা কোন দিন ধরিতে পারে না। আজ দূর হইতে সাহেবকে একা গাড়ী লইয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে আসিবার সুযোগ পাইয়াছে। উত্তরে মাণিক বলিল,—

"ওরে গাধা তা নয়। তোকে জুতো সারানোর পয়সা দেবার আগে যার কাছ থেকে জুতো কিনেছি তার দেনা শোধ করতে হবে তো? জুতোওলার পালা যে আগে পড়ে এটা বুঝিস্ না? জুতো কেনার দাম আগে দেবো, তারপর তুই এসে তোর

পয়সা নিয়ে যাস্। এখন যা বিরক্ত করিস নি।"

তাহার যুক্তির উত্তরে মু'চি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সাহেবের গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। দরোয়ান শশব্যস্তে গেট খুলিয়া ধরিল। সাহেব গাড়ী হইতে মাণিককে দেখিয়াই লাফাইয়া নামিলেন এবং বিনাবাক্যে মাণিকের উপর ঘু'সি মারিয়া ফে'লিয়া লাথির পর লাথি চালাইতে লাগিলেন। মু'চির পয়সা না দেওয়ার জন্য মারিলেন? তাহা নয়। সে কথা যখন চলিতে'ছল তখনো তো আসেন নাই। কারণটা অন্যরূপ।

সাহেব জানিতেন মেমের বয়স কুড়ি বছর। তাই তি'নি মাণিককে বলিয়া দিয়াছিলেন এককুড়ি গোলাপ ফুল দিয়া আসিতে। মাণিক বু'ঝয়াছিল মেমসাহেব কিছুদিন পরে তাহার মনিবেরও মনিব হইবে তাই এই ভাবী মহামনিবের সম্মুখে মাত্র কু'ড়টী গোলাপ ফুল লইয়া যাইতে তাহার মন সরে নাই তাই সে বু'দ্ধ করিয়া নিজের খরচে আর এক ডজন ফুল কিনিয়া ইহাতে তোড়া করিয়া মেম সাহেবের বয়ের হাতে দিয়া আসিয়াছিল। মাণিক খুব ভক্তি করিয়াই দেবতার মাথায় ফুল চড়াইয়াছিল। সে ফুল পড়িলও বটে কিন্তু যথাস্থানে নহে। ক্রুদ্ধ মেম সাহেবের হাত হইতে নি'ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়া আছড়াইয়া পড়িল উঠানের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মাণিকের অদৃষ্টও সা'হেবের হাত হইতে ছিটকাইয়া পথে পড়িয়া চু'রমার হইয়া গেল! প্রেরিত ফুলের সাহায্যে তাহার বয়সের উপর অবিশ্বাসী সাহেব মর্ম্মা'ন্তক ঠা'ট্টা করিয়াছেন ধরিয়া লইয়া অ'ভিমানিনী মেম সাহেব তাঁহার সহিত একটিও কথা কহেন নাই। শেষে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া মেম সাহেবের জননীর নিকট অপমানিত হইয়া সাহেব ফিরিয়া আসিয়াছেন!

মায়াতরু

কালী সেন

আমারে আশ্রয় দাও প্রণয়ের স্বপ্নমায়া তরু,
তোমার যৌবন শাখে আমি যেন ফুল হ'য়ে ফুটি';
এ ব্যর্থ জীবন কাঁদে চারিদিকে নিরাশার মরু
ঊষর বালুর বুকে নিত্য আমি অনাদরে লুটি'।
তোমার সবুজ স্নিগ্ধ পল্লবিত প্রেম স্বপ্ন শাখে
হে প্রিয় এ একনিষ্ঠ পূজারীর স্থান যেন থাকে।

মাণিককে মারিয়া মারিয়া ক্লান্ত হইয়া শেষে সাহেব তাহার পাওনা চুকাইয়া এবং অতিরিক্ত এক মাসের মাহিনা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

সদ্য চা'করী হারাইয়া মাণিক সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর দিকেই চলিতেছিল। পথে দোকানে রেডিওর গান হইতেছে শুনিয়া সে ক্ষানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া শুনিল। তাহার পর হঠাৎ তাহার মনে হইল। চাকরী গিয়াছে তাহাতে ক্ষতি কি? সে গান শি'খবে। তাহাতে চাকরীর লাঞ্ছনা সহিতে হইবে না অথচ খাতিরের সহিত রেডিওতে টকীতে গ্রামোফোনে গান দিয়া সে প্রচুর উপার্জ্জন করিতে পারিবে।

তখনও সব দোকান বন্ধ হয় নাই। মাণিক তাড়াতাড়ি এক বাদ্য-যন্ত্রের দোকানে ঢুকিয়া সস্তা দেখিয়া একটি হার্ম্মো'নিয়ম এবং একখা'নি "সরল-হার্ম্মোনিয়ম-শিক্ষা" কিনিয়া লইল। বাড়ী গিয়া দিদিমাকে বলিল চাকুরী করিয়া আর ক'টাকা উপার্জ্জন হইবে। তাহার চেয়ে গান গাহিয়া সে ঢের বেশী রোজগার করিতে পারিবে। কাজেই পরদিন হইতে সে দিবারাত্র হার্ম্মো'নিয়ম বাজাইয়া এবং তারস্বরে চীৎকার করিয়া গলা সাধিতে লাগিয়া গেল।

তা'হার পর কি হইল বলুন দেখি? তাহাও বলিয়া দিতে হইবে? ছিঃ! মাণিক যে এখন লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছে সেখানকার মরিস কলেজে গান শি'খবে বলিয়া। বিশ্বাস হইতেছে না? মাণিক টাকা কোথা পাইল? মশায় এত জানেন, আর এটা বোঝেন না যে মাণিকের মতন ছেলে দিবারাত্র গলাসাধা সুরু করিলে পাড়ার লোকের কি অবস্থা হয়? বেচারারা সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া বিছানায় শোয় একটু ঘুমাইবে বলিয়াই তো। সুতরাং তাহারা মাণিকের মতন ছেলেকে ঘাটাইতে সাহস না করিয়া তাহাকে বুঝা'ইল যে তাহার গানের প্রতিভাকে অযত্নে নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে লক্ষ্ণৌ চলিয়া যাওয়া উ'চিৎ। এবং তদুদ্দেশে তাহারা চাঁ'দা করিয়া লক্ষ্ণৌ এর টিকিট কিনিয়া তাহাকে নিজেরা গিয়া ডেরাডুন এক্সপ্রেসে তু'লিয়া দিয়া আসিয়াছে।

জহর গাঙ্গুলি ও কাননবালা

এদের দুজনকে দেখা যাবে 'রাধা'-র "বিষবৃক্ষে" নগেন্দ্র ও কুন্দর ভূমিকায়।

পুত্র চাই—

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী

কিছুদিন হইল আমাদের দেশে জনবৃদ্ধি সমস্যা লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান অন্নসমস্যার জন্য এই জনবৃদ্ধিই নাকি দায়ী—এইরূপ অভিমত বহু বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল মহাজনের মুখ হইতে অমৃত ও আশ্বাস বাণী সম নির্গত হইতেছে। উপদেশ স্থলে প্রজনন সম্বন্ধে নৈতিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। সুযোগ বুঝিয়া সুচতুর বৈদ্যগণ প্রজনন-বন্ধকারী নানাবিধ ঔষধ বিক্রয় করিয়া নিজেদের বিনা বাধায় আগত পুত্রকন্যার ভবিষ্যত সংস্থান করিতেছেন। অপব্যয় এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হইলেও মা ষষ্ঠী কৃপা বিতরণে বিরূপা হইতেছেন না—হয়ত হইবেনও না। তাই গুর্জ্জর নেতার আর্ত্তনাদের সঙ্গে সমস্ত দেশ গুমরিয়া মরিতেছে। দেশ বুঝি আর রক্ষা হয় না!

অথচ আমরা প্রজনন বন্ধ করিতে যখন আকাশ পাতাল বিদীর্ণ করিতেছি তখন ইয়োরোপীয় জাতি সমূহ এই প্রজনন বৃদ্ধি করিতে কতই না প্রয়াস পাইতেছে! বেকার সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ না হইলেও সন্তান তাহাদের চাইই। সাম্রাজ্য বাদী রাজ্য সমূহের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির যে অদম্য আগ্রহ তাহাতে হাজার হাজার সন্তান বলির প্রয়োজন!

কিন্তু তাহাতে বাধা অনেক। গত এক শতাব্দী ধরিয়া ইয়োরোপে নারী জাগরণ এত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে যে, প্রায় সর্ব্ব ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিয়াছেন। পারলামেণ্টে তাঁহারা পুরুষদের সহিত রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, আদালতে বিচারকের আসনে বসিয়া সুবিচার করিতেছেন, উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার হইতে কেরাণী ও কুলী পর্য্যন্ত সকল কাজেই তাহারা পুরুষের পাশাপাশি থাকিয়া কাজ করিতেছেন। ইহা ছাড়া ভোটদান ব্যাপারে ইহারা বহু দেশে পুরুষের সমান দাবী লাভ করিয়াছেন। বাহিরের এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসার ফলে ইয়োরোপীয় জাতি সমূহ আর একটা ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষা মেয়েদের "ঘরছাড়া" করিয়াছে, জীবনের আনন্দ সম্পূর্ণভাবে একস্থানে এক অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়া পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করিতে তাহারা নারাজ। সন্তান প্রজননে তাহাদের একটা বিতৃষ্ণা আসিয়াছে—তাহাতে পারিবারিক যে বন্ধন আসিবে তাহা ভাবিয়া তাহারা মাতৃত্ব হইতে নিজেদের দূরে রাখিতেছে। ফলে রাষ্ট্রপতিদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাইয়াছে—তাহারা সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য যেরূপ নর শক্তির (man power) প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন—ইয়োরোপের মায়েরা তাহা পূরণ করিতে পারিতেছেন না। তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রপতিরা নারী জাতির নিকট সন্তান দাবী করিতেছেন—রব উঠিয়াছে "মা লক্ষ্মীরা পুত্র দাও! পুত্র দাও!! ফরাসী গভর্ণমেণ্ট মায়েদের উৎসাহ দিয়া মাভৈঃ স্বনে বলিয়াছেন—নির্ব্বিবাদে পুত্র প্রসব করিয়া যাও, সাংসারিক প্রয়োজনে প্রথম চারজন রাখিয়া বাকী সন্তানদের আমাদের অর্পন কর! অর্থাৎ ফ্রান্সের মায়েরা কোন মতে চার সন্তানের ভরণ পোষণ করিয়া পঞ্চম সন্তান হইতে প্রত্যেকের দায়িত্ব ষ্টেটের উপর চাপাইতে পারেন। হিটলার চাবুক হস্তে মেয়েদের গৃহের দরজায় পৌঁছাইয়া দিয়া কড়া পাহারায় তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। মুসোলিনীও তাহার পদাঙ্ক অনুসরন করিতেছেন—বলিতেছেন—"গৃহের কাজ কর্ম্ম ও বৎসরে বৎসরে রাষ্ট্রকে সন্তান দান ছাড়া বাইরে তোমাদের কোন কাজ নাই।"

গত বৎসর হারেমে (Harem) যে International Women Congress হইয়াছিল তাহাতে বৃটীশ পারলামেণ্টের সভায় ভাই কাউণ্টেস্ এষ্টোর (Astor) এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন এবং দুঃখ করিয়া বলেন—

"I pity the German and Italian women whose only rights are making children by order of the Dictator rulers of their countries."

সন্তান প্রসবের পর—
জননীর পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরাইয়া
আনিবার পক্ষে রচিটোনই
একমাত্র নিরাপদ ও নির্ভর-
যোগ্য টনিক।
রচিটোন
রচিটোন ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং রক্তক্ষয় দ্রুত
ভাবে সম্পূরণ করিয়া শরীরে নব বল ও
জীবনীশক্তি উদ্দীপিত করে। রচিটোন
সেবনে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পায়।
রচিটোন কেবল উপকারই করে, কখনও অপকার
করে না।
টোন অতিশয় ঘনীভূত টনিক বলিয়া স্বল্প-
মাত্রায় ব্যবহারেই বেশ সুফল পাওয়া যায়।
সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত।
অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহা ইউরোপ ও
আমেরিকায় যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছে।

দুঃখ তাহারা করিয়াছেন—এবং প্রতিবাদও করিয়াছেন। কিন্তু সামাজিক কল্যাণে কিম্বা পারিবারিক মঙ্গলের জন্ত তাঁহারা এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা করিয়াছেন আপন আপন জাতিকে জগতের দরবারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্ত। ধনবাদী এই রাষ্ট্র সমূহের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা অনুভূত হইবে।

জার্ম্মেনী

গত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মেনীর রাষ্ট্রশক্তি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে, ইয়োরোপীয় অধিকতর শক্তিশালী জাতি সমূহের ষড়যন্ত্রে জার্ম্মেনীকে একরকম নিরস্ত্র করা হয়। নিভৃতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ১৯৩৫ সালে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট এই শক্তিপুঞ্জের ফতোয়া অগ্রাহ্য করিয়া দেশে বাধ্যতা মূলক সামরিক শিক্ষার প্রচলন করেন এবং জার্ম্মেনীর কারখানায় রাত্রি দিন হাজার হাজার লোক কাজ করিয়া এয়ারোপ্লেন, যুদ্ধজাহাজ, কামান বন্দুক ইত্যাদি যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতেছেন। সরকারী বিবরণে যে হিসাব পাওয়া যায় তাহা অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাস যোগ্য নহে। কেননা সামরিক শক্তির পরিচয় রাষ্ট্রপতিরা প্রকাশ করা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করেন না।* বর্ত্তমান জার্ম্মেনীর আধুনিক রণ সজ্জার যতটা খবর পাওয়া যায় তাহাতে

সৈন্য সংখ্যা—১২ লক্ষ (রিজার্ভ বাদে)।

রণ সজ্জায় সজ্জিত এয়োরোপ্লেন ৫ হাজার।

* Under the Nazi Administration orders have been issued and enforced punishing with death, the discloser of information about the German armed forces.—D. M. Year Book 1936.

* ইহা ছাড়া সহস্রাধিক Commercial machines আছে এবং সেগুলিকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধোপযোগী করা যাইবে।

যুদ্ধ জাহাজ—৩৫ হাজার।

এই সকল আকাশপোত ও যুদ্ধ জাহাজগুলি এমন আধুনিক ভাবে সজ্জিত যে অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা বিরাট জাতির অস্তিত্ব ধরা পৃষ্ঠ হইতে লোপ করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। জার্ম্মেনীর বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে এয়োরোপ্লেন পরিচালনা এবং বিষাক্ত গ্যাস প্রস্তুত প্রভৃতি রাসায়নিক বিদ্যা বাধ্যতামূলক ভাবে শেখান হইয়া থাকে। নানা বিভাগে জার্ম্মেনীর নরনারী রাত্রি দিন পরিশ্রম করিয়া জাতির রণ সম্ভার বাড়াইয়া তুলিতেছে। যুদ্ধ আসন্ন—বলিষ্ঠ সন্তান দাও, সন্তান দাও বলিয়া হিটলার জার্ম্মেণীর গৃহের দরজায় দরজায় নারীদের সজাগ করিয়া তুলিতেছেন

ইটালী

গত মহাযুদ্ধে ইটালী প্রায় ৫৬ লক্ষ নরনারী যুদ্ধে এবং যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান ইটালী সমর সজ্জায় ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশ সমূহ হইতে কোন অংশে পশ্চাৎপদ নহে। বর্ত্তমান ইটালীতে—

সৈন্য সংখ্যা—১২৷৷৹ লক্ষ।

সমরোপযোগী খ-পোত—২৷৷৹ হাজার।

আলোচ্য বর্ষে ৪২০টী চেজার (chaser) ৩৩০টী বোমা নিক্ষেপকারী আকাশ পোত (Bombers) এবং ৪০০ স্কাউটীং (Scouting) মেসিন নির্ম্মিত হইতেছে। বর্ষশেষে ইটালীর খ-শক্তি সাড়ে চার হাজার এয়োরোপ্লেন সজ্জিত হইবে। ইহা ছাড়া ৪ কোটী ৭০ লক্ষ (৭০ কোটীর টাকার উপর) পাউণ্ড ব্যয়ে ইটালী তাহার নৌশক্তি দৃঢ় করিবার জন্ত দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের মধ্যে ইটালীর নৌশক্তি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

এই সমস্ত রণ সম্ভার নির্ম্মাণ শেষ হইলে মুসোলিনীর বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ মানুষ চাই। কাজেই ইটালীয়ান মায়েদের ঘরের বাহিরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিয়া প্রজনন শক্তি হারাইলে চলিবেন না। "মা লক্ষ্মীরা গৃহে ফিরিয়া যাও, সুস্থ সবল শিশুর জন্মদান কর; ইটালীর বিশ্ব আধিপত্যের পথ সুগম করিয়া বীর প্রসবিনী জননী রূপে আদৃতা হও!"

ফ্রান্স

ফরাসী রাষ্ট্রপতিরা সর্ব্বাপেক্ষা মুস্কিলে পড়িয়াছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দির বিপ্লবের কোন ফাঁকে যে ফরাসী বিদুষীগণ 'ঘরছাড়া' হইয়াছিলেন, তাহার সন্ধান রাখেন না। বিলাসীতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় ফরাসী মহিলাগণ এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, আজ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাদের গৃহে ফিরাইয়া সুস্থ যুদ্ধপোযোগী সন্তান প্রজননের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। প্রজনন সংখ্যা (birth rate) অন্যান্য দেশের তুলনায় কম বলিয়া ফ্রান্সে সৈন্য সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ১৯৩৫ সালে ২৬শে জুনের চেম্বারের অধিবেশনে যুদ্ধমন্ত্রী Colonel Fabry বলিয়াছেন যে—

"the very existence of France is at stake"। তাই ফরাসীরা সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কার বাদী ফ্রান্স কর্তৃপক্ষগণ মুসোলিনী অথবা হিটলারের মত চাবুক অথবা চুলের মুঠো ধরিতে পারিতেছেন না। তাই তাঁহারা পুরস্কার প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া করজোড়ে বলিতেছেন—"মা লক্ষ্মীরা, এমন ছন্নছাড়া ভাবে চলিও না—গৃহের দিকে ফিরিয়া তাকাও, নিঃসঙ্কোচে সন্তান প্রসব কর, পুত্র তোমাদের আমোদের ভাগ বসাইবে না। জন্মিলেই আমরা লইয়া যাইব—লালন পালন করিব। মাভৈঃ—শুধু সন্তান দাও, তাহা না হইলে মুসো-হিটলারের উদরগত হইয়া ফরাসী দেশ জাহান্নামে যাইবে! অতএব পুত্র দাও।"

পরিত্রাণ

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ

করে নাই। তাহার স্বামীর সামনেই শুধু একদিন হাসিয়া বলিয়াছিল—"একসঙ্গে একদিন কবে স্কুলে পড়েছিলে বলে খুব সুবিধেটা পেয়ে গেলে বিনয়। বন্ধুত্ব তোমার সঙ্গে কোনদিন এমন কিছু গভীর ছিল না, কিন্তু তারই নামে আমার হাত পা বাঁধা হয়ে রইল।"

স্বামী বুঝি খুব খানিকটা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"চিরকাল সমান পাগল রয়ে গেলে!"

পরিতোষ গম্ভীরভাবে বলিয়াছে—"পাগল হতে আর পারলাম কই!"

তারপর বুঝি অদ্ভুতভাবে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"তুমি আমায় এখানে এমন রোজ আসতে দাও কেন বলত বিনয়! তোমার মনে কি সত্যি কিছু হয় না? অনুর সঙ্গে আমার পরিচয়টা কিরকম ছিল তুমি ভালরূপেই জান। ওর কথার ওপর রাগ করে ওকে অপমান করে অমন নির্ব্বোধের মত অতদিন সরে না থাকলে, তোমার আজ এখানে স্থান হবার কথা নয়, তবু তুমি আমায় বিশ্বাস করে আসতে দাও। তোমার বন্ধুত্বর লোভে যে আসিনা তা ত বোঝ!"

বিনয় হাসিয়া বলিয়াছে—"তোমায় আমি চিনি যে"

পরিতোষ অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়াছে—"হুঁ তোমার চেনাই রয়ে গেলাম।"

আজ পরিতোষ সত্যই অসংযত হইয়া উঠিতে পারে। বলিতে পারে—"শুনতে আপনি বলেই শুনতে হবেনা মনে করছ কেন? চিরদিন আমি নিঃশব্দে মুখ বুজে থাকব এমন ধারণা আমিই গড়ে তুলেছি, আজ আমিই ভেঙে দেব। তোমার ধারণা-মত ভালো হয়ে বঞ্চিতই হয়েছি। আজ খারাপ হতে বাধা কি! আজ তোমার এই আশাটাকে আমি যদি নিজের মত মানে করে নিই অনু! সেইমত আয়োজনই যে করেছি তা কি বোঝনি। তুমি চাইবামাত্র সাগ্রহে তোমায় ডেকে এনেছি, অন্য কোথাও নয় নিজের বাড়িতে স্থান দিয়েছি—সে কি শুধু আমার উদারতা আর মহত্ব মনে কর অনু?

অনু বলিবে—"আমি তাইত মনে করতে চাই।"

"না অনু, নিজেকে ভুল বুঝিও না। আর তোমার নিজেরও কি কোন কিছু বোঝবার নেই! কোন ভুল তোমার সংশোধন করবার, কোন অন্যায়ের প্রতিকার করবার! কোনখানে আজ ত তার বাধা নেই অনু! আজ যদি আবার আমি তোমায় চাই।

অনুপমা এ পরিণতির কথাও ভাবিয়া রাখিয়াছে। প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে ইহার জন্যও।

ছেলেটিকে যে এবার পরিতোষের দিকে আগাইয়া দিবে। বলিবে—"ভাল করে চেয়ে দেখো, নিজেকে তুমি ভুলে যাচ্ছ!"

না ইহার পর আর বোধহয় কিছু বলিবার প্রয়োজন থাকিবে না। অনুপমা, ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া নূতন করিয়া সাহস পায়।

দরজায় এবার একটু জোরেই সে ঘা দিয়াছে। ভিতর হইতে পরিতোষই সাড়া দিয়াছে—"কে?"

তাহার চাকরবাকর এরকম দরজায় ঘা দিয়া বোধ হয় ঘরে প্রবেশ করেনা।

অনুপমা এবার দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতে দ্বিধা করে নাই।

পরিতোষ ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কি একটা বই পড়িতেছিল। প্রথমে খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—স্মিতমুখে।

"আমায় এটা খুব বেশী লজ্জা দিলে! আমারই যাওয়া উচিত ছিল আগে!"

"না না, তোমার অসুখ শুনলাম!" অনুপমা নিজেই একটি সোফায় বসিয়াছে—"আমি জানতাম না!"

"অসুখ! না, অসুখ এমন কিছু নয়, তবে কদিন একটু নড়াচড়া ঘোরা-ফেরা বারণ।"

হাসিয়া তাহার পর বলিয়াছে—"পুরাণ একটা ব্যথা আছে বহুদিনের সঙ্গী মাঝে মাঝে চাড়া দেয়। তখন একটু জব্দ হয়ে থাকতে হয়!—খোকা এত বড় হয়েছে!"

কথাগুলা যে বাহিরের আবরণ মাত্র তাহা দুজনেই বুঝি জানে। দুজনেই পরস্পরকে লক্ষ্য করিতেছে, বিচার বিশ্লেষণ তুলনা করিয়া দেখিতেছে সবিস্ময়ে! সহজ আলাপের একটা পর্দা শুধু উপরে ফেলা।

বিস্ময়ের কারণ আছে বই কি! অনুপমা ঠিক পরিতোষকে এরকম দেখিতে আশা করে নাই। পরিতোষকে বুঝি তাহার চিনিতেই একটু কষ্ট হইয়াছে।

উপর হইতে দেখিলে চেহারায় এমন কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু কোথায় কিসের যেন অভাব ঘটিয়াছে—কিসের তাহা অনুপমা বুঝিতে পারে না। পরিতোষের গলার স্বর কথার ভঙ্গিতে পর্য্যন্ত তাহার ইঙ্গিত আছে অথচ ঠিক ধরা যায় না।

পরিতোষ আবার বলিয়াছে—"তুমি ত বিশেষ কিছু বদলাও নি।"

অনুপমা কথার মোড় ফিরিবার সম্ভাবনায় এবার নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু না, কোন কিছু ঘটে নাই।

পরিতোষ অন্য কথায় ফিরিয়া গিয়া বলিয়াছে,—"তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না ত!"

"না, কষ্ট কিসের! কষ্ট করেও কটা মাস যেখানে হোক থাকতে হ'ত। এত ভালো থাকবার আশাইত করিনি!"

"কোথায় যাবে এরপর!"

"কোথায় আর! দেশের বাড়িতে।"

"দেশে একটা বাড়ি আছে তোমার বাবার, না?" বলিয়া পরিতোষ কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেছে। এই অন্যমনস্কতাটা অনুপমা গোড়া হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। ঠিক বুঝিতে পারে নাই। এও কি একটা ভান। হৃদয়ের দুর্ব্বার আবেগকে গোপন করিবার একটা ছল!

হঠাৎ তাহাদের সম্বন্ধে আবার সচেতন হইয়া পরিতোষ ছেলেটিকে কাছে ডাকিয়াছে—"শোন এদিকে!" অনুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে "কি নাম রেখেছ ওর!"

"বাদল।"

"শোন বাদল! শুনে যাও।"

বাদল ভীত সঙ্কুচিতভাবে পরিতোষের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখের দিকে খানিক তাকাইয়া থাকিয়া পরিতোষ বলিয়াছে—"মুখ অনেকটা বিনয়ের মত না?"

না, গলার স্বরে কোন কম্পন নাই, কোন রুদ্ধ আবেগের পরিচয়ও না।

অনুপমা মুখে হাসিয়া বলিয়াছে—"হ্যাঁ আছে একটু!" মনে মনে সে কি একটু বিস্মিত হইয়াছে!

বাদলকে পাশে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াই পরিতোষ আবার অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। পাশের বইটা একবার তুলিয়া লইতে গিয়া আবার রাখিয়া দিয়া বলিয়াছে—"তোমাদের তাহলে কষ্ট হচ্ছে না কিছু,—হলে জানিও।"

"হ্যাঁ জানাব ম্যানেজারকে।"—অনুপমার কণ্ঠ কি একটু শুষ্ক!

পরিতোষ কোন উত্তর দেয় নাই।

ফার্ষ্ট ন্যাশনাল
পিক্‌চার্সে'র
প্রথম অবদান

স্বর্গীয় তারক গাঙ্গুলীর

সরলা

ঃ পরিচালক ঃ
চারু রায়
ঃ আলোক-শিল্পী ঃ
বিভূতি দাস

ঃ ভূমিকায় ঃ
অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
তারাকুমার ভাদুড়ী, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়,
তারাকুমার ভট্টাচার্য্য
প্রভা, মনোরমা, সুশীলা,
হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
শ্রীমতী সরলা

বাঙ্গালী ঘরের
চিরন্তন ব্যথার
কাহিনী

— শুভ-উদ্বোধন —
২১শে অক্টোবর ১৯৩৬
A POPULAR PICTURES RELEASE

ঃ সুর-সংযোজনা ঃ
নিতাই মতিলাল
পরিচালিত
সুর-সঙ্ঘ

অনুপমা আবার বলিয়াছে—"আচ্ছা আজ তাহলে উঠি।"

পরিতোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছে—আচ্ছা! একটু সারলেই আমি যাব একবার।

অনুপমা আর কিছু বলে নাই। ছেলের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেছে।

দরজার বাহিরেই ম্যানেজার দাঁড়াইয়া ছিল কে জানিত। অনুপমা প্রথমতঃ একটু বিরক্তই হইল, ম্যানেজারের এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকার কি প্রয়োজন।

কিন্তু ম্যানেজারের প্রশ্নে যে বিস্মিত হইল—

"আপনি কি ভেতরে গেছলেন?"

কথা গুলা নয়, গলার স্বর ও মুখের ভাবই কেমন অদ্ভুত। অনুপমা বিরক্তি ভুলিয়া অবাক হইয়া বলিয়াছে—"হ্যাঁ—কেন?"

"না কিছু নয়।"

অনুপমা কিন্তু তাহাতে আশ্বস্ত হয় নাই। ম্যানেজারের মুখের ভাবে একটা কি রহস্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

সে একটু রূঢ় ভাবেই বলিয়াছে—"কিছু নিশ্চয়ই। কেন জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন।"

ম্যানেজার তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকাইয়া থাকিয়া বলিয়াছে—"আপনি তাহলে বুঝতে পারেন নি।"

"কি বুঝব।"

"তাহলে বলছি, চলুন।"

মাানেজার তাহার সঙ্গে বারান্দার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়াছে। তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছে—আমি জানলে আপনাকে যেতে দিতাম না অমনভাবে। কখন কি বেঠিক বলে ফেলেন"

"বেঠিক বলে ফেলেন।" অনুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেরী হয় নাই।

"এরকম—?" তাহার প্রশ্ন সে শেষ করিতে পারে নাই।

"হাঁ, এই একবছর হয়েছে। অনেক সময়ে ঠিক থাকেন, আবার এক এক সময়ে সামলান শক্ত হয়। কিছু বেঠিক এখন বলেন নি ত?"

না বেঠিক কিছু পরিতোষ বলে নাই; অনুপমার সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এরূপ অবস্থাতেও পরিতোষ তাহার সহিত একেবারে সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিয়াছে। তাহার সম্ভ্রমের মর্য্যাদা সে রাখিয়াছে। মনের উপর কোন শাসন যখন নাই তখনও তাহার মুখ হইতে কোন বেফাঁস কথা বাহির হয় নাই, কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই—উদ্বেল অতীত স্মৃতির।

অনুপমার মুখ নিজের পরিত্রাণের আনন্দেই যেন ছাইএর মত সাদা হইয়া গেছে।

যাহা কিছু সে কল্পনা করিয়া ভীত হইয়াছিল, সম্বন্ধের যে জটীলতা অতীত জীবনের জের টানিবার যে সম্ভাবনা—সে বিষয়ে এবার সমস্ত দুর্ভাবনা হইতে সে মুক্ত।

নিশ্চিন্তভাবে এবার সে ক'টা মাস কাটাইয়া দিতে পারে।

কিন্তু মাঝের দরজা খুলিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে অনুপমার আর এক দণ্ড এখানে থাকিতে ইচ্ছা করে না কেন? কেন পরিতোষের এই দুর্ভাগ্যে সমবেদনার চেয়ে আর একটি অনুভূতি তাহার বড় হইয়া ওঠে।

নতুন স্যার

জাহান্‌-আরা বেগম চৌধুরী

লেখিকা

অনাদি চক্রবর্ত্তী তাঁহার একমাত্র কন্যা রাণুর নয় বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়া গৌরী-দানের পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

রাণুর শ্বশুর এলাহাবাদে একজন বড় ডাক্তার। পুত্রকে বিলাত পাঠাবার পূর্ব্বে বিবাহ না দিয়া কিছুতেই পাঠান হইবেনা ইহাই গৃহিণীর ধনুর্ভাঙ্গা পণ ছিল। সুন্দরী পাত্রীর সন্ধানে এবং পুত্রকে বিলাত পাঠাইবার উদ্দেশ্যে হরিশঙ্করবাবু কিছুদিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া বসিলেন।

কলিকাতা সহরে পাত্রীর অভাব হয়না—বিশেষ করিয়া যেস্থলে পাত্রপক্ষ ধনী। কয়েক দিনের মধ্যেই রাণুর সহিত হরিশঙ্কর বাবুর পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। প্রথম শুভলগ্নেই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। বিবাহের সাতদিন্ না কাটিতেই নিরঞ্জন বিলাত যাত্রা করিল।

অনাদি চক্রবর্ত্তীকে বড়লোক বলা যায়না। মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ মাত্র। হরিশঙ্কর বাবু বড়লোক—এলাহাবাদে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি—এই কথাটি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনের এক নিভৃত কোণে খোঁচা দিয়া তাঁহাকে সজাগ রাখিত। এইজন্য প্রাণ খুলিয়া তিনি কাহারও সহিত মিশিতে

পারিতেন না। কাজেই অনাদিবাবুর সহিতও পারিলেন না। দুই বৈবাহিকের সদ্ভাবও রহিল না। অনাদি চক্রবর্ত্তীর বুঝিতে দেরী হইলনা যে তাঁহার বড়লোক বৈবাহিক তাঁহাকে অবহেলা করেন।

কলিকাতায় থাকা কালে অনাদিবাবু প্রায়ই বৈবাহিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও নিরঞ্জনের সংবাদ লইতে যাইতেন। পরে আর হরিশঙ্করবাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা দরকার মনে করিতেন না। চাকর আসিয়া খবর দিত "বাবু এখন ব্যস্ত আছেন।"

এই উপেক্ষায় অনাদিবাবুর মন ভাঙিয়া গেল। গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—ভবিষ্যতে রাণুকে কোনদিনও ঐ অভদ্র পরিবারে পাঠাইবেন না। ইহার পর হইতে রাণুর বিবাহ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা তাঁহাদের বাড়ীতে হয় নাই। রাণুও এই বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিল। হয়ত তাহার বুঝিবার শক্তি তখন ছিলনা।

সে নিয়ম মত স্কুলে যাইত। ছুটীর পর বাড়ী ফিরিয়া নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়াই আবার পার্কে ছুটিত। তাহার সহিত ছুটিয়া—লাফাইয়া কেহ পারিয়া উঠিতনা। এমনি করিয়া একটির পর একটি দিন চলিয়া গিয়া রাণুকে বয়সের উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপে উঠাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘ সাত বৎসর দুই বৈবাহিক কেহ কাহারও খবর জানিতেন না।

রাণু ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। কলেজেও ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই।

সে যখন স্নান করিয়া একথোকা কোঁকড়ান ভিজে চুল পিঠের ওপর ফেলিয়া দিয়া বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া টিপ পরিত তখন তাহারই মনে হইত, সত্যিই সে বড় সুন্দর।

কলেজে আসিয়া প্রথম শ্রেণীর মাঝামাঝি জায়গাটি সে দখল করিয়া বসিল। ক্লাশের মেয়েদের সহিত আলাপ জমাইতে তাহার বিশেষ দেরী হইল না। একদিন রাণুর সিঁথির মাঝখানে সরু সিঁদুর রেখা আবিষ্কার করিয়া ইলার কৌতুহল বাড়িয়া গেল। সে বলিল নিশ্চয়ই রাণুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে—এতদিন সে তাহার নিকট গোপন রাখিয়াছে।

ইলা অভিমানে ফুলিতে লাগিল। রাণু বলিল—সে নিজে কোন দিন সিন্দুর পরে নাই। মা তাহাকে রোজ পরাইয়া দেন। মা বলিয়াছেন সিন্দুর নাকি তাহাকে পরিতে হয়—মানত আছে। ইলা তাহাকে বুঝাইয়া দিল বিবাহের পূর্ব্বে সিঁথিতে সিন্দুর পরা হিন্দু সমাজে একেবারেই অসম্ভব। তাহার পর ইহারা নিজে নিজেই স্থির করিয়া লইল যে নিশ্চয়ই রাণুর অল্প বয়সে বিবাহ

হইয়া গিয়াছে—এই জন্যই তাহার স্মরণ নাই। পরে এই লইয়া আর কেহ মাথা ঘামায় নাই।

একদিন ক্লাশে বলিয়া শোনা গেল—বিজ্ঞানের প্রফেসর আট মাসের ছুটিতে যাইবেন এবং আগামী সপ্তাহে তাঁহার স্থান অধিকার করবেন নতুন একজন প্রফেসর! এ প্রস্তাব কাহারও যেন মনঃপূত হইল না। আবার নতুন প্রফেসর! লেকচার বুঝতে না পারলে একজন নতুন লোককে কি করিয়া প্রশ্ন করা যায়! সঙ্কোচ কাটিতে আবার কিছুদিন যাইবে। এই ভাবিয়া সকলেই একটু নিরুৎসাহ হইয়া গেল।

যথা সময়ে এক তরুণ প্রফেসরের আবির্ভাব হইল। পরিধানে সাহেবী পোষাক। গোঁপ দাড়ি কামানো—ফর্সা রং—লম্বায়ও সাধারণের তুলনায় একটু বেশী। মুখশ্রী সুন্দর। এক কথায় সুপুরুষ বলা যায়।

কিছুদিন পর দেখা গেল নতুন প্রফেসরের লেকচার বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না। গম্ভীরভাবে ক্লাশে ঢুকিয়া লেকচার দিয়া—তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যান। একটুকু দেরী করিতে তাঁহার সাহস হয় না যদি কেহ কিছু প্রশ্ন করিয়া বসে—তবেই তো বিপদ! সামনা সামনি এত গুলো মেয়ের প্রশ্নের উত্তর তিনি কিছুতেই দিতে পারিবেন না। একদিন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে লেকচার দিতে গিয়া—তাঁহার দৃষ্টি পড়িল রাণুর উপর—ত্রস্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। রাণুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সেদিন বাড়ী ফিরিয়া নতুন প্রফেসর কোন কাজে মনযোগ দিতে পারেন নাই। রাণুর বড় বড় করুণ চোখ দুটি কেবলই তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। জনহীন গৃহে ইজি চেয়ারে শুইয়া অতীত জীবনের কত কথাই আজ মনে পড়িয়া হৃদয়খানা গুমরাইয়া উঠিল।

এখন প্রায়ই নতুন প্রফেসরের দৃষ্টি রাণুর দৃষ্টির সহিত একত্র হইয়া যায়! রাণু চম্‌কাইয়া উঠে—যদি কেহ দেখিয়া ফেলে! পরের দিন রাণু ঠিক্ করিয়া আসে সে সামনে বসিবে না। কিন্তু দেখা যায় কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহা হইয়া উঠে না।

নোটিশ

পূজা উপলক্ষে "খেয়ালী" আফিস দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকিবে। আগামী ৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে "খেয়ালী" আবার যথারীতিভাবে প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"খেয়ালী"

তিনমাস কাটিয়া গেল। পড়াশুনায় আর রাণুর মন বসে না। প্রফেসর লেকচার দেন—রাণুর লেখা হয় না—সে যেন ভালো করিয়া বুঝিতেই পারে না। হাঁ করিয়া প্রফেসরের দিকে তাকাইয়া থাকে। লেক্‌চার শেষ হইলে দৃষ্টি বিনিময় হইয়া যায়—রাণু অপ্রস্তুত হইয়া নড়িয়া বসে। প্রফেসর চলিয়া গেলে—সমালোচনা হয় "আজ নতুন Sir কি রকম পড়ালেন!" রাণুর খুব ভালো লাগে নতুন স্যারের গল্প শুনতে—বলিতে সে কিছুই পারিত না—"নতুন স্যার" বলিতেই যে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠে।

বাড়ী ফিরিয়া রাণু শুইয়া পড়ে—হাতমুখ ধুইবারও আর ইচ্ছা হয় না। ক্ষুধাও কমিয়া গিয়াছে—খাবার দেখিলেই গা জ্বলিয়া উঠে। পড়ার সময় হইলেই মনে হয় মাথা ধরিয়াছে। এখন প্রায় সব মেয়েরাই নতুন স্যারের সঙ্গে নানান্ রকম আলোচনা করে। কত প্রশ্ন করে উত্তরও পায়। রাণু কলেজে যাইবার আগে প্রস্তুত হইয়া যায় আজ সে নিশ্চয়ই নতুন স্যারের সহিত কথা কহিবেই। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও সে পারে না—জিভ জড়াইয়া যায়।

পূজার ছুটির সময় হইয়া আসিল। একদিন বাড়ী ফিরিয়া রাণু যাহা শুনিল তাহাতে হৃদয় যেন ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মা রাণুকে কোলের কাছে বসাইয়া সযত্নে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার বিবাহের ইতিহাস খুলিয়া বলিলেন। তার-পর একখানা চিঠি রাণুর কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া পড়িতে বলিলেন। এতকাল পর হরিশঙ্করবাবু ক্ষমা চাহিয়া অনাদিবাবুর নিকট পত্র দিয়াছেন। এবার পূজার সময়
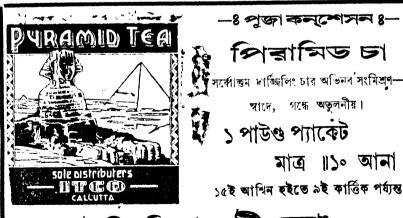
রাণুকে পাঠাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন—২/১ দিনের মধ্যেই লোক পাঠাইতেছেন। চিঠি পড়িয়া রাণু হতভম্ব হইয়া গেল। কি করিবে সে!

পরদিন যন্ত্রচালিতের ন্যায় কলেজে ছুটিল। নতুন স্যারকে প্রাণ ভরিয়া একবারটি শেষ দেখা দেখিয়া আসিবে। ইলা নতুন স্যারকে জিজ্ঞাসা করিল "এবার ছুটিতে কোথায় যাবেন স্যার?" "এখনও ঠিক করিনি কিছু।" নতুন স্যারও অনেক মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন—কে কোথায় যাইবে। অনেকেই অনেক দেশের নাম করিল। হঠাৎ রাণুর পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোথায় যাবেন? রাণু দুবার ঢোক গিলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া ধীরে ধীরে কহিল—"অমৃতসহর।" ইলা অবাক হইয়া বলিল—"অমৃতসহর?" রাণু কহিল "হ্যাঁ।" রাণু একবার মাত্র শুনিয়াছে—তাহার শ্বশুরালয় বহু দূরে—এলাহাবাদে। সে তাড়াতাড়ি এলাহাবাদ ভুলিয়া গিয়া অমৃতসর বলিয়া বসিল।

তাহার পরদিন ইলা বেড়াইতে আসিয়া-ছিল বলিল—আজ নতুন স্যার ক্লাশে আসেন নাই দেখিয়া তাহারা খোঁজ করিয়া জানিয়াছে বাড়ী হইতে জরুরী তার আসায় স্যার একদিন আগেই দেশে চলিয়া গিয়াছেন।

ঠিক্ সময় মত রাণুর খুড়শ্বশুর আসিয়া পৌঁছিলেন—এবং ঐ রাত্রেই রাণুকে লইয়া রওনা হইলেন। শ্বশুরবাড়ীর আদর যত্নে ও এক হাত ঘোম্‌টার ভিতর রাণুর সারাটাদিন্ কাটিয়া গেল। রাত্রি দশটার পর—একদল সমবয়সী আসিয়া রাণুকে জোর করিয়া নিরঞ্জনের ঘরে ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল; সম্মুখেই নিরঞ্জনকে দেখিয়া রাণু চমকাইয়া বলিয়া উঠিল—"এ্যা—স্যার—?" নিরঞ্জনও উদ্বেগভরে রাণুর হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—এ্যা—আপনি—তু—মি?"

——

প্রত্যাশী

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

আমার আশার কোথাও ত ছেদ নাই,
শত-বিফলতা-বিজয়ী হয়েছি তাই।
ছেড়ে ও ছাড়ে না
হেরে ও হারে না
হেন দুর্ব্বার জনে
কেমনে এড়াবে বুঝিয়াও প্রাণপণে?
মানি পরাভব এতদিনে দিলে ধরা,
ফুলহারে মোরে বরিলে স্বয়ম্বরা।
তবু মনে হয়
এত পাওয়া নয়
এ যে দস্যুর হাতে
আপনারে দিয়া মারিলে আত্মঘাতে।
মুক্তির মাঝে তোমারে যে পেতে চাই,
ফেলি জয়মালা তাই দূরে সরে যাই।
আপনার টানে
যদি মোর পানে
কোনো দিন এস ভেসে
মানিব তখন বরিয়াছ ভালবেসে।

——

স্কুলসমূহে দন্তরোগ

ডাঃ রণেন্দ্র নাথ ঘোষ, ডি, ঈ, ডি, পি, (প্যারিস), পি জি আর, ডেণ্ট (ইংলণ্ড), আরও কতিপয় অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের সাহায্যে সমগ্র কলিকাতায় স্কুল সমূহে কিছুদিন হইতে দন্ত পরীক্ষা করিতেছেন। গত ৭ মাসে তিনি ১০,০০০ হাজারের বেশী ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষের মতে, গড়ে শতকরা ৭০ জন ছাত্র ছাত্রী দন্তরোগে আক্রান্ত হয়।

ডাক্তার ঘোষের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।

—•—

প্যারামাউন্টের "শিপ্ ক্যাফে" ছবিখানা কোল্‌কাতা বেশ সমাদর পেয়েছে। ঐ ছবিরই একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে কার্ল ব্রিসন্ ও মেরী ক্রিশ্চিয়ান্‌স-কে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
৯, রামময় রোড্, কলিকাতা | টেলিফোন পার্ক ৩২৪

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে কার্ত্তিক ১৩৪৩, ৫ই নভেম্বর ১৯৩৬

মিলন-সৌধ ও বাঙ্গলার বিভীষণ

নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বারাণসী অধিবেশনে বাঙ্গলা কংগ্রেস ও তদ্‌সম্পর্কীয় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে গান্ধী-পন্থী বড়কর্ত্তারা যে মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক উত্থাপিত ও সর্ব্বসম্মতভাবে গৃহীত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ২রা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড সমর্থন করেন নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত প্রার্থীগণের মনোনয়নও অনুমোদন করেন নাই। প্রকাশ যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাব সমর্থন করিতে প্রস্তুত থাকিলেও শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ও সর্দ্দার প্যাটেলের তীব্র বিরোধিতার জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বাঙ্গলা কংগ্রেসের প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

প্রকাশ যে, সিমলায় হোটেল সিসিলের ঘরোয়া বৈঠকে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই শরৎবাবুকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়া বারাণসী অধিবেশনে তিনি শরৎচন্দ্রের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। বারাণসী অধিবেশনে শরৎবাবু স্পষ্টভাবেই এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গান্ধী-পন্থী বড়কর্ত্তাদের নির্দ্দেশ অনুসারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আগামী ৬ই নভেম্বর আহূত হইয়াছে। এই সভায় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ২রা সেপ্টেম্বরের বাঁটোয়ারা সম্পর্কীয় প্রস্তাব আলোচিত হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য অদ্য ৫ই নভেম্বর কলিকাতায় আগমন করিয়া বাংলা কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি শরৎচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।

পণ্ডিতজী এতদিন বাদে বাঙ্গলায় আসিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছেন ইহা আনন্দ ও সুখের বিষয় হইলেও বারাণসীতে বাঙ্গলার সর্ব্ববাদীসম্মত দাবী যেভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমানে বাঙ্গলার পক্ষে গান্ধী-পন্থীদের অঞ্চলবদ্ধ কংগ্রেস সভাপতির সম্বর্দ্ধনায় আন্তরিকতার সহিত যোগদান করা সম্ভবপর নহে। বাঙ্গলার বুকে উপর্য্যুপরি যাঁহারা শক্তিশেল নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখপাত্র হিসাবে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সংশয়ময় অধি-বেশনে যোগদান করিবার জন্য যিনি আসিতেছেন তাঁহার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। কার্য্য-শেষে তাঁহার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আসন্ন অধিবেশনে যোগদান যদি সন্দেহাতীত বলিয়া প্রমাণিত হয় তখন তাঁহার যথোপযুক্ত বিদায় সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা যাইতে পারে।

বাঙ্গলা কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গত ২রা সেপ্টেম্বর বাঁটোয়ারা সম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়া-ছিলেন তাহা নাকচ করিয়া কেন্দ্রীয় কমিটির মতানুবর্ত্তী হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রসন্ন হইয়া বাঙ্গলা কংগ্রেসের মনোনীত তালিকা অনুমোদন করিবেন। এই মনোভাব প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করিয়া গান্ধী-পন্থী বড়কর্ত্তারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আসন্ন অধিবেশনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিলন-মোহমুগ্ধ শরৎচন্দ্রের সরলতায়

অন্তরালে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সংখ্যা গরিষ্ঠ উপদল গঠন করিয়াছেন ইহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং কিরণশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কার্য্যকরী সমিতির ২রা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাব নাকচ করিতে পারেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ২রা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাব ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গৃহে ১৬ই আগষ্টের চুক্তির পরিণতি। ১৬ই আগষ্টের চুক্তিতে বাঁটোয়ারা বর্জ্জনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন। বর্ত্তমানে যদি ২রা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাব নাকচ হইয়া যায় তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের বহু আকাঙ্খিত মিলনসৌধের ভিত্ত তিরোহিত হইবে এবং বাঙ্গলা দেশের কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হইবে এই আশঙ্কা অমূলক নহে।

মন্ত্রীত্ব-প্রয়াসী বৈধানিক দলের চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হইয়া শরৎচন্দ্র যে অপরূপ মিলন সৌধ গঠন করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তির দৃঢ়তার কঠোর পরীক্ষার সময় আজ সমুপস্থিত। যাঁহাদের সহিত মতের ঐক্য নাই, হৃদয়ের সখ্যসূত্র নাই তাঁহাদের সহিত মিলন অসম্ভব কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ২রা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় বোর্ডে প্রেরিত হইবার পর পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ভগ্নিপতি মিঃ আর এস পণ্ডিত কলিকাতায় আসিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের মনোভাব বহন করিয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নিখিল ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহ কামনায় অতি ভক্তির প্রাবল্যে বৈধানিক দল বর্ত্তমানে কি পন্থা অবলম্বন করেন তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাষ্টিং ভোটের বলে কুমিল্লার শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্ত মনোনয়ন পাওয়াতে ক্যাপ্টেন দত্তের দল ডাঃ রায়ের পক্ষে ভোট দিবেন। সুতরাং আগামী কল্যকায় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের ফলাফল সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ প্রকাশ করিবার কারণ নাই, যেহেতু দলগত সঙ্কীর্ণতার অনুবীক্ষণ যন্ত্রে নিরীক্ষণ করিলে ডাঃ রায়ের দলের জয়ই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহার ফল যে কতদূর শোচনীয় তাহা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্যদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বহুচিন্তার পর সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাব দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সহিত নাকচ করিলে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্যগণ নিজেদের হাস্যাস্পদ করিবেন ও দেশেরও ঘোর অনিষ্ট করিবেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইব্যুন্যালের এসেসর নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, গত নির্ব্বাচন এক জটিল সমস্যায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সিমলা হইতে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সমর্থন করিয়া পত্র লেখেন এবং ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ব্যারিষ্টার মিঃ পি, ব্যানার্জ্জিকে সমর্থন করিবার জন্য তাঁহার দলগত সদস্যগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ডাঃ বিধান চন্দ্রের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই তবে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু অমর বাবুকে সমর্থন করিবার অনুজ্ঞা প্রেরণ করিয়া নিজেকে কতদূর হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন তাহা কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনে ভোট গণনার ফলাফলে প্রমাণিত হইয়াছে। নেতার অনুজ্ঞা-প্রাপ্ত প্রার্থী মোটে ৫ ভোট পান। ফলে মিঃ আর, এস, সেনগুপ্ত সর্ব্বাধিক ভোট পাওয়ায় কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের মনোনীত প্রার্থী

বলিয়া ঘোষিত হন। তদনুযায়ী মিঃ আর, এন, সেনগুপ্ত কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় কংগ্রেস-মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সাহায্যে বিপুলভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হন। বাস্তবতার জ্ঞান হারাইয়া এবং দলগত নিষ্ঠা পরিহার করিয়া শরৎচন্দ্র অমরেন্দ্রবাবুকে সমর্থন করিয়া নিজের পরাজয় নিজেই আহ্বান করিয়াছেন। মিলনের পটভূমিকায় আদর্শবাদের ব্যর্থ চিত্র অঙ্কন করিলে নেতৃত্বের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই প্রসঙ্গে কতিপয় কংগ্রেস সদস্যের আচরণ বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। মিঃ পি, ব্যানার্জ্জি দলীয় বৈঠকে পরিত্যাক্ত হইলেও মহারাজ-কুমার মিঃ বি, এন্ রায় চৌধুরী ব্যতীত বৈধানিকদলের ৭জন কাউন্সিলার মিঃ ব্যানার্জ্জিকে সমর্থন করেন। দলগত শৃঙ্খলার দিক হইতে এইরূপ আচরণ অতীব শোচনীয়! আমরা ভবিষ্যতে এই সকল সদস্যের নাম প্রকাশ করিব।

*   *   *

অকটোবর মাসের প্রারম্ভে বঙ্গীয় রাষ্ট্র সভার আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী প্রার্থী নির্ব্বাচন পর্ব্বের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে 'খেয়ালী'-তে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল যে দক্ষিণ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু এবং উত্তর কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেস প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবেন। বসু-ভ্রাতৃদ্বয় উক্ত কেন্দ্র হইতে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে মনোনীত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, বাঙলার উদারনৈতিক দলের নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু কয়েকটি সর্ত্তে কংগ্রেসী পক্ষে যোগদান করিবার জন্য এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড তাঁহার সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই এবং উত্তর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে মনোনীত করিয়াছেন। প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু ইহাও জানাইয়াছেন যে যদি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু উক্ত কেন্দ্র হইতে দাঁড়ান তাহা হইলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না।

*   *   *

দক্ষিণ-মধ্য কলিকাতা কেন্দ্র হইতে মিঃ জে, সি, গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদ কংগ্রেস মনোনয়ন প্রার্থী হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটিদ্বয়কেই লইয়া উক্ত কেন্দ্র পরিব্যপ্ত। সুতরাং উক্ত কেন্দ্রে প্রার্থী মনোনয়ন ব্যাপারে উভয় কংগ্রেস কমিটিরই মত প্রকাশের অধিকার আছে। তদনুযায়ী মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তকে মনোনীত করেন। অপরপক্ষে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদ্‌কে মনোনীত করেন। প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ডে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত ৮—৭ ভোটে মনোনীত হইয়াছেন। কলিকাতার কেন্দ্র হইতে পূর্ব্ববঙ্গ বাসীকে মনোনীত করা সমর্থনযোগ্য নয়। ঢাকার অধিবাসী যদি কলিকাতার কেন্দ্রে মনোনয়ন পান, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো কলিকাতার অধিবাসী প্রার্থীকে ডেরা ইস্মাইল খাঁর কেন্দ্র হইতে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে।

*   *   *

হাওড়ার কেন্দ্রে দুইটি প্রার্থীর মধ্যে শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইন ও ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইনের আসনে ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় ও এটর্ণী শ্রীযুক্ত শৈল মুখোপাধ্যায় প্রার্থী ছিলেন। অর্থ স্বাচ্ছন্দ্যে, সুধজনোচিত আদর্শে ও কর্ম্মদক্ষতায় শৈলবাবু সর্ব্বজনসমাদৃত প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু বৈধানিকদলের প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন ভোটাধিক্যে মনোনীত হইয়াছেন। কংগ্রেসের সঙ্কটময় সময়ে পলাতক পাইন মহাশয়ের মনোনয়নে উক্ত কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসের পরাজয় হইলে আমরা বিস্মিত হইব না। গ্রাম্য কেন্দ্র হইতে জিলা কমিটি শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায়কে মনোনীত করেন কিন্তু প্রাদেশিক বোর্ড তাঁহার মনোনয়ন নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

*   *   *

কুমিল্লার কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্ত ডাঃ বিধান চন্দ্রের Casting Vote এর বলে মনোনীত হইয়াছেন।

*   *   *

মুন্সীগঞ্জ কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় ৮—৭ ভোটে মনোনীত হইয়াছেন। জিলা কংগ্রেস কমিটি উক্ত কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে মনোনীত করেন। শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের যোগাযোগের ফলে মিঃ গুপ্ত ধীরেশ বাবুর বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় কিরণবাবু একটি ভোটের আধিক্যে মনোনীত হন এবং ইহারই প্রতিদান স্বরূপ কিরণবাবুর দল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদের বিপক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তকে সমর্থন করেন।

*   *   *

বর্দ্ধমান—বীরভূম— মেদিনীপুর প্রভৃতি মিউনিসিপ্যালিটির কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু জিলা কংগ্রেস কমিটিগুলির সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু বৈধানিক দল জিলা কংগ্রেস

কমিটীর মনোনয়ন 'too late' এই অজুহাতে জেলা কংগ্রেসগুলির মনোনয়ন উপেক্ষা করিয়া শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীকে উক্ত কেন্দ্র হইতে মনোনীত করিয়াছেন। প্রকাশ যে, বহু কংগ্রেস কর্ম্মী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও শ্রীযুক্ত তুলসী চন্দ্র গোস্বামী জমিদার কেন্দ্র হইতে মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। গোস্বামী মহাপ্রভুর এই মন্ত্রী-প্রীতি প্রহেলিকাময়!

* * *

বর্দ্ধমানের মহারাজকুমার ও মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অস্বীকার করিলেও বৈধানিক দল জাতীয়তাবাদী সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুর বিরোধিতা করিতে সক্ষম করেন। মুর্শিদাবাদ—নদিয়ার সংযুক্ত কেন্দ্র হইতে শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসুর বিপক্ষে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের Casting Vote এর বলে ডাঃ নলিনাক্ষ্য সান্ন্যাল প্রাদেশিক বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন।

* * *

পাবনা—বগুড়ার কেন্দ্র হইতে জিলা কংগ্রেস কমিটি আর্য্যাস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়কে মনোনীত করেন। প্রাদেশিক বোর্ড শ্রীযুক্ত রায়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে মনোনীত করিয়াছেন।

* * *

কেন্দ্রীয় বোর্ড আসন্ন রাষ্ট্রীয় সমিতি ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের অধিবেশন পর্য্যন্ত প্রাদেশিক বোর্ডের মনোনয়নের অনুমোদন স্থগিত রাখিয়াছেন। প্রাদেশিক বোর্ডের মনোনয়নের অনুমোদন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় বোর্ডে আলোচিত হইবার সময় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায় আপত্তি জানান যে, প্রাদেশিক বোর্ডের মনোনয়ন বিধি-সম্মত হয় নাই কারণ, উক্ত মনোনয়ন মাত্র প্রাদেশিক বোর্ডের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতেই গৃহীত হইয়াছে—সমগ্র প্রাদেশিক বোর্ডের সমক্ষে মনোনয়ন প্রস্তাব আদপেই উত্থাপিত হয় নাই। তদনুযায়ী শ্রীযুক্ত রায়ের মতে প্রাদেশিক বোর্ডের নামে বর্ত্তমান মনোনয়ন বিধি-সম্মত হয় নাই। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড শ্রীযুক্ত শৈলেন রায়ের এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া প্রাদেশিক বোর্ডের বর্ত্তমান মনোনয়ন প্রস্তাব স্থগিত রাখেন।

এই সপ্তাহে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উপস্থিতিতে বাঙলা কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়ন পর্ব্ব হয় তো শেষ অঙ্কে উপনীত হইবে নয় তো নাটকীয় ধারায় বিপরিতগামী হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বের অগ্নি-পরীক্ষা সমুপস্থিত।

বিলাসী

গৃহদাহ

প্রযোজক : নিউ থিয়েটার্স লিঃ।
কথা ও কাহিনী : শরৎ চট্টোপাধ্যায়।
পরিচালনা : প্রমথেশ বড়ুয়া।
চিত্রশিল্পী : বিমল রায়।
শব্দযন্ত্রী : মুকুল বসু।
সঙ্গীত পরিচালক : রাইচাঁদ বড়াল।
ভূমিকায় : অচলা—যমুনা, মৃণাল—মলিনা, সুরেশ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মহিম—প্রমথেশ বড়ুয়া, কেদারবাবু—অমর মল্লিক, অন্যান্য চরিত্রে—কৃষ্ণচন্দ্র দে, হরিমতি, অহি সান্যাল, ইন্দু মুখার্জ্জি প্রভৃতি।
চিত্র পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন।
শুভ-উদ্বোধন : 'চিত্রা', শুক্রবার ১৬ই অক্টোবর '৩৬।

বড়ুয়ার ছবি "গৃহদাহ" যখন মুক্তি পাইনি, তার আগে চিত্ররাজ্যে এক চিত্ত-উত্তেজনার ভাব আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু যেদিন সংস্কৃত 'চিত্রা'য় সে তার আবরণ উন্মোচন কোরল সেদিন কিন্তু দর্শকরা তাকে আর তেমনভাবে গ্রহণ কোরতে পারল না—অবশ্য যারা সমজদার তারা বললে—না বড়ুয়ার এতে কোন দোষ নেই—টেকনিকের দিক থেকে ছবিখানা সত্যই অনবদ্য ; তবে গল্প এত Complicated আর একই ঘটনার গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ যে তাকে এর বেশী সুস্পষ্ট করা সাধ্যাতীত। আমরা শেষোক্ত শ্রেণীর দর্শকদের সঙ্গে একমতাবলম্বী। তিনটি চরিত্রের মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে শুধু যে গল্পের আখ্যায়িকা এবং চরিত্রগুলির মানুষরা যে কী প্রকৃতির—তা' সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিশ্বাস চলে; কিন্তু চিত্রের পক্ষে ঐ গল্পটি একেবারে অবোধ্য ও অসঙ্গত বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা বড়ুয়াকে বড় ডাইরেক্টর বলতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ কোরছি না, কিন্তু গল্প

মলিনা

নির্ব্বাচনের অক্ষমতার জন্যে বিশেষভাবে নিন্দা কোরছি।

আর দু'টো জিনিষ বড়ুয়াকে ছাড়তে হবে—এ তাঁর অভিনয়-প্রীতি ও যমুনা-প্রীতি। প্রথম কথা আমরা বহুবার বলেছি, আজও বলছি যদি ছবিতে মুখ দেখাবার স্পৃহা তিনি দমন কোরতে না পারেন তা' হ'লে তাঁর এ জয়যাত্রার কুসুমাবৃত পথে কণ্টকের

অমর মল্লিক

আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নয়! এ ছবিতে মহিমের ভূমিকায় আগের চেয়ে তিনি ভাল অভিনয় কোরেছেন স্বীকার করি—কিন্তু তবুও ছবির অন্তরালে তাঁকে আমরা পূর্ণভাবে দেখতে চাই। দ্বিতীয় কথা, যমুনাকে আমরা বাঙলা ছবির নায়িকারূপে এখন কিছুদিন দেখতে চাই না। 'দেবদাসে'র পার্ব্বতী দেখার পর অচলায় অচল অভিনয় যদি আমাদের দেখবার সৌভাগ্য না হ'ত, তা' হ'লে এই অবাঙালী মেয়েটীর ওপর আমরা ভাল ধারণাই পোষণ কোরতাম। অচলা চরিত্রের মনস্তত্ব যে কী—যমুনা কেন, আমাদের দেশের যে কোন অভিনেত্রীকে হজমী গুলির সঙ্গে হজম করিয়ে দিলেও তারা বুঝতে পারতো না—তবুও এখানকার কোনও শক্তিমতী অভিনেত্রী হয় তো কতকটা আনন্দ সাধারণকে দিতে পারতেন। হ্যাঁ, তবে কার অভিনয় আমাদের ভাল লেগেছে? সত্যিই ভাল লেগেছে মলিনার মৃণাল—অবর্ণনীয় তাঁর চরিত্রসৃষ্টি। এর পরেই উল্লেখযোগ্য অমর মল্লিকের কেদারবাবু। এ চরিত্রটিকে শিল্পী অতি সঙ্গোপনে যে Study কোরেছেন তার পরিচয় পরিস্ফুট হ'য়েছে। ছোট ভূমিকাগুলোর মধ্যে অহি সান্যালের চাকর সবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছে। অন্যান্য চরিত্রগুলো মোটের ওপর ভালই। কিন্তু সুরেশের মত একটি কঠিন ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী যে অভিনয় কোরেছেন তা' দেখে আমরা এই অভিনেতাকে দোষ না দিয়ে নিউ থিয়েটার্সের কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা কোরতে চাই—এর চেয়ে ভাল

অভিনেতা তো রাস্তাঘাটে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে এই চরিত্রে একে "নামানোর সার্থকতা কী? হরিমতির গান "গৃহদাহে"-র অন্যতম আকর্ষণ।

ছবিখানার আলোকচিত্র খুব উচ্চ শ্রেণীর হ'য়েছে। আলোছায়ার অদ্ভুত সামঞ্জস্য ও কোমল চিত্রের জন্য বিমল সবারের মনে বিমল আনন্দ দিয়েছে।

শব্দযন্ত্রের কাজও মুকুলবাবুর গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সঙ্গীত পরিচালনা সম্বন্ধে নতুন কিছু বল্‌বার নেই—সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় রাইচাঁদ ছবিখানার ঘটনা-তন্ত্রীগুলোতে এমনভাবে ঘা দিয়েছেন—যা তাঁর নিজস্ব জিনিষ বলেই সবাই স্বীকার কোরে নিয়েছে।

সম্পাদনা ও পরিস্ফুটনাগারের কাজ, সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট সম্বন্ধে অভিযোগ করবার আমাদের কিছুই নেই।

পাহাড়ী

বিজয়া

প্রযোজক: নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

চিত্র-নির্ম্মাতা: নিউ থিয়েটাস লিঃ

কথা ও কাহিনী: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবর্দ্ধক: সতীন্দ্র নাথ মিত্র

পরিচালক: দীনেশ দাশ ও অমর মল্লিক

চিত্র-শিল্পী: পঙ্কু চৌধুরী

শব্দযন্ত্রী: লোকেন বসু

সঙ্গীত পরিচালক: তিমির বরণ ভট্টাচার্য্য

প্রধান চরিত্রে: বিজয়া—চন্দ্রাবতী, নলিনী—আরতি, রাস[বিহারী]—অমর মল্লিক, নরেন—পাহাড়ী সান্যাল, [বিলাস]—শ্যাম লাহা, দয়াল—ইন্দু মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

চিত্র-পরিবেশক: প্রাইমা ফিল্মস্

প্রথম মুক্তি: 'রূপবাণী', বুধবার ২১শে, অক্টোবর '৩৬।

বাঙলায় বিজয়া-উৎসব শেষ হ'য়েছে। কিন্তু 'রূপবাণী'র "বিজয়া"-র বিজয়-বাণী আজও দিকে দিকে মুখরিত। "বিজয়া" ছবি জন্ম নিয়েছে একদল লোকের সম্মিলিত শক্তি

চন্দ্রাবতী

ও ঐকান্তিক আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে। সেইজন্যেই শরৎচন্দ্রের এই Drawing Room Dramaখানা যা পর্দ্দায় রূপান্তরিত করা দুঃসাহসিকতার নামান্তর মাত্র—তাও রূপোলী পর্দ্দায় রূ শ্রী মণ্ডিত হয়ে উঠেছে প্রবর্দ্ধনার কারুকলার গুণে। "বিজয়"-র ভেতর আমরা একটা জিনিষের খুব বেশী সন্ধান পেইছি, যেটা বাঙলা ছবির মধ্যে খুব কমই দেখা গেছে—সেটা হ'চ্ছে, গল্প বলার ভঙ্গি। "বিজয়া"-র কথক দর্শকদের গল্পটি এমনভাবে বর্ণনা কোরেছেন, তা'তে তাঁর সুক্ষ্মসাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কথকঠাকুরটি কে তা' আমরা সঠিক জানিনা—তবে তিনি যিনিই হ'ন—তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি। "বিজয়া"-র গল্প অংশের পুনরুল্লেখ এখানে নিস্প্রয়োজন—কারণ এই গল্পের সঙ্গে বাঙলার আবালবৃদ্ধবণিতার পরিচয় আছে।

পরিচালনাকার্য্যে দীনেশ দাশ ও তাঁর সহযোগী অমর মল্লিক নতুনত্ব কিছু দেখাবার চেষ্টা না কোরে মোটামুটিভাবে এই কাজ সমাধা কোরেছেন। আমাদের মনে হয় প্যাঁচ দেখিয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বাহাদুরি পাওয়ার চেয়ে—সাধারণ দর্শকদের মনস্তুষ্টি কোরে তাঁরা বুদ্ধিমানেরই কাজ কোরেছেন।

আলোকচিত্রের কাজে পঙ্কু চৌধুরীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কোরতে পারলুম না। অন্য কোনও ষ্টুডিওর ছবি হ'লে হয়ত আমরা এতটা সমালোচকের কষ্টিপাথরে আলোক-চিত্রের বিচার কোরতাম না কিন্তু 'এন-টি'-র ছবি বলেই এ কথা আমাদের বলতে হ'চ্ছে। পঙ্কুর ছবির সবচেয়ে বড় দোষ আমাদের চোখে পড়ল—সর্ব্বত্র আলোছায়াপাতের অসমতা।

শব্দযন্ত্রের কাজ খুব ভাল বলতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা নেই।

তিমির বরণের সুর-সংযোজনার ভেতর বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর আবহাওয়া সঙ্গীতের ভেতর যে মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হয়,

দুয়া (শ্যাম লাহা)

তা' আমাদের নিজস্ব জিনিষ। অনুকরণ-প্রিয়তার দিক থেকে এর প্রচার অনাস্বাদিত।

"বিজয়া"-র সম্পাদনা চমৎকার। রসায়নাগারের কাজের আরও উন্নতি হওয়া উচিৎ ছিল। সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট প্রশংসনীয়।

এবার অভিনয়ের কথা। সবচেয়ে ভাল অভিনয় কোরেছে পরেশের ভূমিকায় শ্রীমান্ পরেশ। শরৎচন্দ্রের সেই সরল বালক পরেশকে শ্রীমান সত্যই জীবন্ত কোরে

তুলেছে। বিজয়ার অংশে চন্দ্রাবতী সুন্দর অভিনয় কোরেছেন—এমন কী স্থানে স্থানে. তাঁর অত্যুজ্জ্বল অভিনয় দেখে আমাদের তাঁকে এবারও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিতা করবার ইচ্ছে হ'চ্ছিল—কিন্তু তা' সম্ভব নয়। চন্দ্রমুখীর সে চক্‌চকে চোখ কোথায়? এযে তার কঙ্কাল! চন্দরের সেই গৌরবময় আসনের ভার কেমন কোরে এর হাতে ন্যস্ত করি। চন্দ্রা সত্যই এখনও তুমি চিত্রাপ্রিয়দের মন অনেকটা অধিকার কোরে আছ, কিন্তু তুমি যদি তোমার হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কোর্‌তে না পার, তা' হ'লে বোধহয় তোমার নাম তাদের মন থেকে মুছতে আর দেরী নেই। এরপরই উল্লেখযোগ্য রাসবিহারীরূপে অমর মল্লিক। স্বার্থান্বেষী কূট ভূমিকায় মল্লিক মশাই অভিনয় দক্ষতার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা' দেখে আমরা বিশেষ প্রীত হ'য়েছি। পাহাড়ী সান্যালের নরেন সুঅভিনীত হ'য়েছে। এই ভূমিকায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য গতি নাট্যনিপুণতা সবারেরই মনে রেখাপাত কোরেছে। বিলাসের অংশ চলনসই। ইন্দু মুখুয্যের হরলাল সম্বন্ধেও আমাদের ঐ কথা। নতুন হিসেবে আরতির নলিনী মন্দ বলা যায় না। অন্যান্য চরিত্রগুলো সুঅভিনীত হ'য়েছে। সুতরাং অভিনীত চরিত্রগুলো ছবিখানার প্রাণসঞ্চারে বিশেষ-ভাবে সাহায্য কোরেছে। যাঁর ওপর চরিত্র নির্ব্বাচনের ভার ছিল তাঁর সুক্ষ্ম-দর্শিতার পরিচয় পেয়ে আমরা খুসী হ'য়েছি।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, "বিজয়া"-র সব বিভাগের সঙ্ঘবদ্ধ কাজ এই ছবিখানায় সাফল্য এনেছে—তাই আজ বাঙলার আবালবৃদ্ধবণিতা "বিজয়া"-র প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মন্দ কি!

"বিজয়া"র আগে "মন্দ কি" নামে সুনির্ম্মল বসুর এক রীলের একখানা নক্সা দেখানো হয়। নক্সাখানি মোটের ওপর মন্দ নয়! আর আলোক-চিত্র, শব্দ প্রভৃতি মন্দ কী।

লাহিড়ী—পণ্ডিত, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—অধ্যাপক, রাধিকানন্দ মুখার্জ্জি—জমিদার, আঙুরী—নর্ত্তকী ইত্যাদি।

প্রথম মুক্তি—"উত্তরা" ২১শে অক্টোবর, ১৯৩৬।

দেবকী বসু

সোনার সংসার

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস
প্রযোজক—বি এল খেমকা
কাহিনী ও পরিচালনা } দেবকী বসু
সুরশিল্পী—কৃষ্ণচন্দ্র দে
চিত্রশিল্পী—শৈলেন বসু
শব্দযন্ত্রী—সি এস নিগাম
পরিবেশক—এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটার্স
প্রধান ভূমিকায়—ছায়া দেবী—রমা, মেনকা—অলকা, অহীন্দ্র চৌধুরী—স্যার শঙ্করনাথ, জীবন গাঙ্গুলী—রমেশ, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য—রঘুনাথ, তুলসী

দেবকী বাবু বাংলার মাটীতে এসে অনেকদিন বাদে ছবি তুলছেন, শুনে যাঁরা খুসী হ'য়েছিলেন, তাঁদের যে হতাশ হতে হবে না "সোনার সংসার" দেখে একথা নিঃসন্দেহ। তবু ওরই মধ্যে একটা মস্ত বড় 'কিন্তু' আছে। দেবকী বাবুর পরিচালনায় তোলা ছবি মনে হলে আমরা আশা করতে পারি যে সেই ছবিখানি সকল দিক থেকেই উঁচু দরের ছবি হবে। আমরা জিজ্ঞেস করি যে "সোনার সংসার"কে সেই কষ্টিপাথরে

বাচাই করলে সেকথা কি প্রমাণিত হ'বার কোন আশা আছে? ছবিখানি যে জনগন-মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে—তা এ ছবির আখ্যান ভাগের বিশেষত্বে না হলেও—আখ্যায়িকার চিত্রপটে প্রতিফলিত রূপে হবে। গল্পের মূল বস্তু—রমেশের সোনার সংসারে আগুন লেগে সোনার সংসার ছারখার এবং তারপরে বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের অবসানে সেই সোনার সংসারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এরই মাঝে যোগ করে দেওয়া হয়েছে 'প্যারাডাইস'-এর হাস্য-কৌতুক, নর্ত্তকীর নগ্নদেহ, লাইলী-মজনুর

ছায়া দেবী
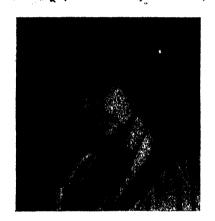
চটকদারী হালকা রসের গান, এমনি আরো কিছু। ফলে দেখা গেছে যে গল্পের আসল ধারা হাস্যরসের প্রাবল্যে চাপা পড়ে শুকিয়ে গেছে। এই কারণে ছবির গল্প জমে উঠলেও কলা-শিল্পের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দেবকী বাবুর পরিচালনা বলতে যে উঁচু স্তরের কলা-শিল্পের পরিচয় আশা করা যায় তা "সোনার সংসার"-এর মধ্যে আমরা পাইনি। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে যে—কলা-লক্ষ্মীকে ক্ষুণ্ণ করে কেবল লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিপুত ছবি তৈরী করা দেবকী বাবুর পক্ষে হয়তো বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

"সোনার সংসার"-এর প্রথমাংশের বিভিন্ন ঘটনা সংস্থাপন অতিশয় দৈর্ঘ্য-দোষ দুষ্ট। এই অংশের ওপর আরেকটু কাঁচি চালালে বেশী উপভোগ্য হবে। আপাতদৃষ্টিতে হালকা

অহীন্দ্র চৌধুরী

রসের জন্যে এই সব স্থানে ছবি ভাল লাগলেও অকারণ দৈর্ঘ্য সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। "প্যারাডাইসে"র দৃশ্য সংস্থাপন বিশেষ ভাবে বড় হয়ে গেছে। ছবির মূল কথা "প্যারাডাইসে"র কথা নয়—সুতরাং "স্বর্গীয়" দৃশ্য গুলো বেশ কিছু কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ছবি যদি সত্যিই না ভাল হয় তাহলে বাঙ্গালী চিত্ররসিকদের নারীর নগ্ন পৃষ্ঠ তো দূরের কথা, বক্ষ বা অন্য কোন অঙ্গ দেখিয়েও ভোলানো সম্ভব নয়; আমাদের মনে হয় শ্রীমতী আঙ্গুরীর সেই বিশেষ দৃশ্যটী অন্ততঃ রুচির খাতিরেও বাদ দেওয়া উচিৎ। দেবকী বাবুর ছবির গতি সাধারণতঃ যেমন ধীর হয় "সোনার সংসার"এর গতিও তেমনি, তবে কৌশলী পরিচালনার গুণে বিশেষ একঘেয়ে মনে হয় না। ছবিখানার ভেতর ট্রেনের দৃশ্যের যে Back Projection এর প্রবর্ত্তন করা হ'য়েছে তা' সত্যই দর্শনীয় বস্তু হ'য়েছে।

ক্যামেরার কাজে শৈলেন বসু সুন্দর হাতল ঘুরিয়েছেন। প্রশংসনীয় তাঁর আলো ছায়ার সামঞ্জস্য বিধান, আরো প্রশংসনীয় তাঁর আসল দৃশ্যপট থেকে ক্যামেরার দূরত্ব ব্যবধান জ্ঞান। তবে একটী খুঁত তাঁর কাজে যা চোখে পড়েছে তা হচ্ছে কোন কোন জায়গায় পর্দ্দার ছবিতে হলদে ছোপ নজরে পড়ছে। তবে এ ত্রুটী রসায়নাগারের গাফিলতির জন্যেও ঘটতে পারে।

শব্দধর সি এল নিগাম যে কাজ করেছেন তাতে তাঁকে দোষী করার বিশেষ কিছু নেই; তবে আজকের দিনে এর চেয়েও ভাল কাজ লোকে আশা করে।

অন্ধ-শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্রের সুর-সংযোজনা "সোনার সংসার"এর এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ। মনোরম এর মূর্চ্ছনা, সুন্দর এর সঙ্গত। দ্রুতগামী ট্রেন দৃশ্যে, রমেশের গৃহে ডাকাত পড়ায় বা স্বামী-স্ত্রীর বিরহ মিলন বা মান

মেনকা

অভিমানের অভিনয়ে যে আবহাওয়া-সঙ্গীত সঙ্গত করা হয়েছে তা শুধু উপভোগ্যই—বর্ণনীয় নয়। বিভিন্ন গান গুলির সুরও বেশ শ্রুতিমধুর।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে সবায়ের আগে মনে পড়ে অহীন্দ্র চৌধুরীর স্যার শঙ্কর নাথের ভূমিকার অভিনয়। এত ভাল অভিনয় এর আগে তিনি কোন ছবিতে করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। রমেশের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় সুন্দর—শেষাংশে তার যথোপযুক্ত অঙ্গসজ্জা চিত্তাকর্ষক। ধীরাজের রঘুনাথ সন্তোষজনক। তুলসী লাহিড়ীর অভিনয়ে ছ্যাবলামোর ঘোর থাকলেও নিন্দনীয় নয়। "প্যারাডাইসের" সভ্যগণের মধ্যে বিনয়

গোস্বামী ও সত্য মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রতীন বঁড়ুয্যের অধ্যাপক চরিত্রোপযুক্ত সৃষ্টি। পুলিশ ইন্স্‌পেক্টরের ভূমিকায় প্রফুল্ল মুখুজ্জ্যে ভাল অভিনয় করেছেন।

স্ত্রীভূমিকাগুলোর মধ্যে মেনকার অভিনয় আমাদের খুসী করেছে সকলের চেয়ে বেশী। শান্ত সুন্দর মুখশ্রী এই মেয়েটির— ভারী মিষ্টি মৃদু এর কথা বলার ভঙ্গী। রমার ভূমিকায় ছায়া দেবীর অভিনয় সন্তোষজনক—তবে রমাকে ডাকাতে হরণ করবার সময়ে যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় শেষ দৃশ্যেও—অথচ বলা হয়েছে এর মধ্যে আঠারো বছর কেটে গেছে। রমার যৌবনে বার্দ্ধক্যের ছেঁয়াচ লাগানো পরিচালকের কল্পনায় বোধ হয় উদিত হয় নি। এটা তাঁর অমার্জ্জনীয় ত্রুটী। ছায়া দেবীর গান দুখানি সুন্দর গাওয়া হয়েছে। কমলার (ঝরিয়া) "বৈষ্ণবী" চরিত্র অনাবশ্যক সৃষ্টি। আঙুরীর নাচ লোভনীয়। ছোটখাটো চরিত্রগুলো প্রায় সবই সুঅভিনীত।

সম্পাদনা ত্রুটীবিহীন হয় নি। প্রথম দিকে বহুলাংশে এবং শেষ দিকে কোন কোন স্থানের সম্পাদনা আশু প্রয়োজন। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা এবং স্থান-নির্ব্বাচন যথোপযুক্ত।

সরলা

কাহিনী—৺ তারক নাথ গাঙ্গুলী
প্রযোজক—যামিনী মিত্র
পরিচালক—চারু রায়
আলোক চিত্র শিল্পী— বিভূতি দাস
শব্দ-যন্ত্রী—গফুর
ব্যবস্থাপক—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
গীতিকার —শৈলেন রায়
সুর-সংযোজক—নিতাই মতিলাল
পরিচালিত 'সুর-সঙ্ঘ'
চিত্র-পরিবেশক—রীতেন এণ্ড কোং

ভূমিকা-লিপি : শশিভূষণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিধুভূষণ—তারাকুমার ভট্টাচার্য্য, গদাধর—অহীন্দ্র চৌধুরী, নীলকমল—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, জমিদার—তারা কুমার ভাদুড়ী, প্রমদা—প্রভা, সরলা—সরলা, শ্যামা—মনোরমা, দিগম্বরী—সুশীলা, কীর্ত্তনওয়ালী—রাধারাণী, ইত্যাদি।

প্রথম মুক্তি : 'শ্রী', ২১শে অক্টোবর, ১৯৩৬।

ফার্ষ্ট ন্যাশনাল পিকচার্সের প্রথম ছবি 'সরলা' আমাদের মতে একটা প্রথম শ্রেণীর ছবি না হ'লেও একেবারে অচল নয়। অবশ্য এর জন্য দায়ী প্রযোজক মশায় নিজে। কেননা তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ছবি তুলেছেন যে তাতে এর চেয়ে ভাল হ'বার আশা করাই বৃথা। তার পরও বাজারে যেসব ছবি এখন চলছে তার মাঝে এ ছবিকে মুক্তি লাভ করতে দেওয়াও বিশেষ যুক্তিযুক্ত হয়নি।

'সরলা'র আখ্যানভাগ হচ্ছে দুই ভায়ের সংসারকে কেন্দ্র করে। বড় শশিভূষণ রোজগার করে সংসার চালায় আর ছোট বিধুভূষণ সঙ্গীত চর্চ্চা করে দিন কাটায়। বড়বৌ প্রমদার তা সহ্য হয় না। স্বামীর কাণে কুমন্ত্রনা দিয়ে একদিন দেবর ও ছোটজা সরলাকে পৃথক করে দিলেন। পৃথক করেই প্রমদা ক্ষান্ত হলেন না, তাঁর ভাই গদাধরচন্দ্রকে দিয়ে

আরও নানারকম নূতন অত্যাচার সুরু করলেন। এদিকে বিধুভূষণ অনেক কষ্টে যাত্রাদলে একটা কাজ পেলেন তাও আবার কোলকাতায়। নিয়মিত টাকা আসতে লাগল সরলার নামে কিন্তু গদাধরচন্দ্রের দৌলতে তা আর সরলার হাতে পৌঁছায় না। দুঃখে কষ্টে সরলা শেষে অসুখে পড়লো এবং তারপর এই করুণ আখ্যান-ভাগের পরিসমাপ্তি কি ভাবে ঘটলো তাই এই চিত্রে দেখান হয়েছে।

'বাঙ্গালী'র পরিচালক চারুবাবু যে এভাবে এই করুণ আখ্যানভাগকে জবাই করবেন তা আমরা মোটেই আশা করি নি। তাঁর পরিচালনার মধ্যে এমন কিছুই পেলাম না যাতে তিনি দর্শকদের মনে রেখাপাত করতে পেরেছেন।

অভিনয়ের দিক্ থেকে ধরতে গেলে একমাত্র মনোরঞ্জনবাবুর শশিভূষণই আমাদের ভাল লেগেছে। অহীন্দ্রবাবুর গদাধর একেবারে ছ্যাবলামী হয়েছে। নীলকমলের ভূমিকায় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় ভাল না হ'লেও একেবারে বাজে নয়। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে চিত্রজগতে নবাগতা অভিনেত্রী সরলার অভিনয় মন্দ হয়নি। সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠবের অধিকারিণী হয়েও তিনি অঙ্গসঞ্চালনে আড়ষ্টভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। প্রভা ও মনোরমার অভিনয় নেহাৎ চলনসই। অন্যান্য ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।

ক্যামেরার কাজ নিন্দনীয় নয়। শব্দ-যন্ত্রী গফুরের কাজ অতি সাধারণ।

নিতাই মতিলাল পরিচালিত সুর-সঙ্গের কাজ মন্দ নয়।

"সরলা" নির্ব্বাক যুগের মত সাফল্য লাভ না করলেও মনে হয় বাঙ্গালী সংসারের করুণ আলেখ্য এই ছবিখানা 'শ্রী'তে কিছুদিন চলবে।

বাগী সিপাহি

প্রযোজক—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস
পরিচালক—এ, আর, কারদার
চিত্র-শিল্পী—শৈলেন বসু
শব্দযন্ত্রী—নিগাম
ভূমিকায়: গুল হামিদ, মজহর, মহম্মদ ইসাক, বিমলা কুমারী, কুপার, ললিতা, ইন্দুবালা প্রভৃতি।
প্রথম মুক্তি 'প্যারাডাইস' সিনেমা, ১৬ই অক্টোবর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসের এই ছবিখানি আমাদের বিশেষ ভাল লাগেনি। কারণ পর্দার ওপর এই ছবির যে রূপ প্রতিফলিত হয়েছে তা একেবারে একঘেয়ে। ছবির গতির কোন সামঞ্জস্য নেই। তাছাড়া অভিনেতারা এত গলার জোর দেখিয়েছেন যে কা'রও পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে বসে থাকা বেশ কষ্টসাধ্য।

বিমলা কুমারী

অভিনয়ের মধ্যে মহম্মদ ইসাক ও বিমলা-কুমারী যথাক্রমে খাকান ও ফরিদার ভূমিকায় বেশ শান্ত ও সংযত অভিনয় করেছেন। বিমলাকুমারীর চেহারা ও সুন্দর কথা বলার ভঙ্গিমা যে ছবির একটা আকর্ষণীয় বস্তু তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

ক্যামেরার কাজ ও রেকর্ডিং খুবই প্রশংসনীয় এবং তার চেয়ে প্রশংসনীয় হচ্ছে বিরাট জমকালো সেটিং ও সাজ সজ্জা।

অমর জ্যোতি

চিত্র-প্রযোজক—প্রভাত সিনেটোন্
কথা—কে, নারায়ন কালে
পরিচালক—ভি, শান্তারাম
চিত্রশিল্পী—ভি, অবধূত
ভূমিকায়: সৌদামিনী—দুর্গা খোটে, নন্দিনী শান্তা আপ্তে, রেখা—বাসন্তী, রাণী—করুনা দেবী, দুর্জয়—চন্দ্র মোহন, সুধীর—বি, নন্দ্রাকার, শেখর—কে, নারায়ন কালে ইত্যাদি।
প্রথম মুক্তি: নিউ সিনেমা, ১৭ই অক্টোবর।

প্রভাতের "অমর জ্যোতি" আজও নিউ সিনেমায় অমর হয়ে এগিয়ে চলেছে। বাস্তবিক এ শ্রেণীর ছবি অনেক দিন দেখা

যায় নি। ছবির দিক থেকে যে কয়টী গুণের দরকার তা এই ছবিটীর মধ্যে সবই পাওয়া যায়। এর প্রথম দিকের ৫।৬ রীলকে নিশঙ্কচিত্তে 'masterly technique' বলা যায়। তবে আমাদের চোখে যা একটু বিসদৃশ ঠেকেছে তা হচ্ছে অযথা একে ১৫ রীলে টেনে নিয়ে যাওয়া। মোট কথা একটু বাদ-সাদ দিলে এযে একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বই তা আমরা জোর কোরেই বলতে পারি। "অমর জ্যোতি"র গল্পাংশ হচ্ছে সৌদামিনী নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের কাহিনী নিয়ে। স্বামীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে সর্ব্বগুণসম্পন্না স্ত্রী সৌদামিনী রাণীর দরবারে বিচার প্রার্থী হন। কিন্তু সুবিচারের পরিবর্ত্তে ক্রীড়নক রাণীর মন্ত্রী দুর্জ্জয় কর্ত্তৃক তাঁর নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হয়। কেন না স্বামীই তখন স্ত্রীর প্রভূ ও সর্ব্বময় কর্ত্তা—তার বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলে না। ফলে একদিন সৌদামিনীকে একমাত্র পুত্র সুধীরকে স্বামীর কবলে হারিয়ে রাজ্যের বাইরে যেতে হ'ল এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের এই অত্যাচার অবিচারের কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে সৌদামিনী একটী দস্যু দল গঠন করে প্রথমেই দুর্জ্জয়কে বন্দী করে রাখেন। এইভাবে একদিন রাজকুমারী নন্দিনীও বন্দী হ'য়ে ক্রমে সৌদামিনীর শিষ্যা হয়ে নিজ দলের অভিষ্ট মত প্রচারের সঙ্কল্প করেন। তার পরে মাতা পুত্রের পরিচয়হীন মিলন প্রভৃতি দেখিয়ে এই চিত্র শেষ করা হয়েছে।

অভিনয়ের দিক থেকে ধরতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে মিসেস্ খোটের অভিনয়। তাঁর অভিনয় দেখে আমাদের স্বতঃই বিখ্যাত দেবী চৌধুরাণীর কথা মনে পড়ে। এবং বইএর আখ্যান ভাগ খানিকটা ঐ ধরণের। এই ধরণের অভিনয় একমাত্র দুর্গা খোটের দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে। শান্তা আপ্তে ও বাসন্তীর অভিনয় ও গান চমৎকার। দুর্জ্জয়এর ভূমিকায় চন্দ্রমোহনের অভিনয় আমাদের ভালই লেগেছে কিন্তু "অমৃত মন্থন"-এর মত উঁচুদরের হয়নি। অবশ্য মেক্‌আপটা তাঁর প্রশংসনীয়।

আবহাওয়া সঙ্গীত ও রেকর্ডিং সুন্দর। এবং সবচেয়ে বেশী সুন্দর হচ্ছে সাজসজ্জা ও বিরাট সেট্।

ফটোগ্রাফী খুব উচ্চাঙ্গের না হ'লেও ভালই হয়েছে।

"দিদি" হয় ত বাঙলায় সিনেমা-শিল্পকে আর এক যুগ এগিয়ে দেবে।

* * *

প্রমথেশ বড়ুয়ার হিন্দী "মায়া" বোম্বেতে মুক্তিলাভ কোরেছে। ছবিখানাকে এক শ্রেণীর দর্শক উচ্ছ্বসিত প্রসংসা কোরছেন—আবার আর এক শ্রেণী বলেন ছবির গল্প দুর্ব্বোধ্য। যা' হ'ক শিল্পকলার দিক থেকে ছবিখানা যে প্রমথেশের যশ সৌরভ বিকীর্ণ কোরেছে—একথা সবাই স্বীকার কোরেছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রের পদত্যাগের সঙ্কল্প

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উপস্থিতিতে আগামী কল্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব বিবেচিত হইবে।

পাঞ্জাব পরিভ্রমণের পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সপরিবারে গতকল্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অদ্য প্রাতে কলিকাতায় আসিবেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে লাহোর হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ২রা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাব বি-পি-সি-সির আসন্ন অধিবেশনে অগ্রাহ্য হইলে তিনি রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিবেন। আরও প্রকাশ যে, পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বর্ত্তমান সম্পাদক ও বি-পি-সি-সির বহু সদস্যও শ্রীযুক্ত বসুর পন্থা অবলম্বন করিবেন।

শরৎচন্দ্রের এই দৃঢ় সঙ্কল্প আমরা পূর্ণভাবে সমর্থন করি। তবে আমরা আশা করি শেষ মুহূর্ত্তে বৈধানিক দলের চৈতন্য উদয় হইবে।

নিউ থিয়েটার্স

নীতীন বসুর "দিদি"-র কাজ অনেকটা এগিয়েছে। পূজার আগে আমরা এই ছবির মিলের ডিরেকটারদের দপ্তরের একটা সেট্ দেখে নীতীনবাবুর রুচির বিশেষ পরিচয় পেয়েছি। সেট্টি আড়ম্বরহীন—অথচ তার টেবিল, চেয়ার, ঘরের আসবাব পত্রের ভেতর সুন্দরমত স্থানে রয়েছে। নীতীনবাবু আমাদের সেই সেট্টির তাৎপর্য্য যা' বর্ণনা কোরলেন তা' শুনে মনে হ'ল নীতীনবাবুর

কালী ফিল্মস্

"দস্তুরমত টকী"-র কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। বড়দিনের বাজারে এবার এই ছবিখানা একটি প্রধান আকর্ষণ। আমরা ভয় কোরেছিলাম ছবিখানা যদি মঞ্চের অনুরূপ ভাবে তোলা হয় তা' হ'লে এর সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া আশ্চর্য্য নয়! কিন্তু চিত্রনাট্য দেখে আমাদের ধারণা বদলে গেছে। ছবিখানাকে গাঙ্গুলী মশাই চিত্রের জন্যে নতুন ছাঁচে ঢেলেছেন এবং সত্যিই

তা'তে মুন্সিয়ানার ছাপ পাওয়া যায়। কাহিনীর চমৎকারিত্বে, অপূর্ব্ব শিল্পী সম্মেলনে এ ছবিখানা এ বছরের শেষ কটা দিন আর আসছে বছরের গোড়াটা চিত্রপ্রিয়দের যে অপার আনন্দ দেবে একথা বলাই বাহুল্য।

* *

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় এদের ছ' রীলের হাসির ছবি "রেশমী রুমাল" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। এতে অভিনয় কোরেছেন ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি, জয়নারায়ণ, দেবীদাস বঁ ড়ুয্যে, ললিত মিত্র, প্রভা, পক্ষী, উষা দেবী, প্রকাশমনি, কমলা প্রভৃতি।

পপুলার পিক্চার্স

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত এদের তৃতীয় ছবি "পণ্ডিত মশাই" তোলা প্রায় শেষ হ'য়েছে। শরৎচন্দ্রের এই অভিনব গল্পটি সুষ্ঠুভাবে রূপ দেবার জন্যে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। ছবির শুটিংয়ে কয়েকদিন হাজির থেকে আমরা বুঝেছি—পরিচালনায় সতু সেনের নাম এবার হয় ত' চিত্ররাজ্যে বেশ কায়েমী-ভাবেই স্থান পাবে। ছবিখানার চরিত্র নির্ব্বাচন হ'য়েছে বিশেষ লোভনীয় তার ওপর তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীও নাকি একটা টাইপ ভূমিকায় নামছেন। এসব দেখে মনে হয় "পণ্ডিত মশাই" এবার কোল্‌কাতার লোকদের বেশ প্রশংসাই অর্জ্জন কোরবে।

মতিমহল থিয়েটার্স

মতিমহল থিয়েটাসের পক্ষ থেকে মতিলাল চামারিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে জ্যোতিষ বঁাড়ুয্যেকে দিয়ে প্রভাবতী দেবীর "রাঙা বউ" চিত্রে রূপান্তরিত কোরছেন। নির্ম্মলেন্দু, মনোরঞ্জন, ছায়া, মেনকা প্রভৃতি শিল্পীরা এতে বিভিন্ন ভূমিকায় নামছেন।

দেবদত্ত ফিল্মস্

এই ষ্টুডিওতে জি, সি, টকীজের "ইন্দিরা"র আনুষঙ্গিক কাজ প্রায় শেষ হ'য়েছে। তড়িৎ বসু তড়িৎ গতিতে কালী পুজোর পর থেকে শূটিং চালাবেন।

বীকন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

এই নব-গঠিত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছি। বীকন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা মাত্র অল্পদিনের; সুতরাং উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিঃশেষ যাহা উপরোক্ত বিবরণীতে দেখিলাম তাহাতে এই প্রতিষ্ঠানটীর ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারেনা।

কোম্পানী উক্ত বৎসরে মোট ৪২৩০০৲ টাকার বীমা ১৭৭টী প্রস্তাবে পাইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৪৪টী প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ঐ প্রস্তাব গুলির মোট মূল্য ৩৪৯০০৲ টাকা ও এই ১৪৪টী গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা কোম্পানীর বৎসরে চাঁদা আদায়ের পরিমান ১৭৪১।৶০ আনা। কোম্পানীর আলোচ্য বৎসরে মোট আদায় ২৪৩৭৶০ আনা এবং মোট খরচ প্রায় ২৩০৬৲ টাকা। যে-কোন নূতন কোম্পানীর প্রথমাবস্থায় এই হারে খরচ কোন মতেই অযৌক্তিক নহে।

প্রথম বৎসরে কোম্পানীর lapse ratio মাত্র শতকরা ৪ভাগ—অর্থাৎ এমন কিছুই নহে। কোম্পানী দুর্দ্দিনে দাঁড়াইবার জন্য একটী life fund তহবিল খুলিয়াছেন। এই তহবিলে সঞ্চিত অর্থ খুব বেশী না হইলেও কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে এইরূপ তহবিল প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা এবং যথার্থ প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসার্হ। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীকে কোন দাবী মিটাইতে হয় নাই। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাবধানতার সহিত বীমা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই প্রতিষ্ঠানটী প্রভিডেন্ট কোম্পানী এবং বিনা ডাক্তারী পরীক্ষাতেই বীমা প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

কোম্পানী ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ সচেষ্ট এবং আশা করা যায় অতি শীঘ্রই দেশের সকল স্থানে ইহার শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা বীকন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

বিকানীরে দুর্গোৎসব

সুদূর রাজপুতনার মরুভূমির অন্তর্গত বিকানীরে এই বৎসর দুর্গোৎসব হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙ্গালী অধিবাসীদিগের দ্বারা মায়ের পুজা বেশ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিমাখানি কলিকাতা হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। নবমীর দিন রাত্রিতে একটী নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থানীয় রামপুরিয়া হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত শিবকালী সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে বিকানীরে এই প্রথম দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। বিজয়া দশমীর দিন বিকানীরের বহু সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারি ভদ্রলোক মিছিলে যোগদান করিয়াছিল।

বাংলার আর্থিক প্রগতি

শ্রীবাণভট্ট

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর্থিক প্রগতির যে বিপুল প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে তাহাকে এযুগের একটা বিশেষ শুভলক্ষণ বলা যাইতে পারে। গত ১৯৩১ সাল হইতে সারা দুনিয়ার কৃষিশিল্প ও ব্যবসা বানিজ্যক্ষেত্রে ক্রমে এক আর্থিক সঙ্কট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে এবং তাহাতে সর্ব্বত্রই জনসাধারণের জীবনে অতীব দুঃখ দুর্দ্দশা সূচিত হয়। এই মন্দার কবল হইতে তথাকথিত উন্নতিশীল দেশগুলিও মুক্ত রহে নাই। তবে প্রথম হইতেই আজ পর্য্যন্ত ইহার স্থায্য প্রতিকারে সচেষ্ট থাকায় উহা তাহাদিগকে তেমন বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু ভারতের মত অধঃপতিত দেশে উহা অত্যধিক প্রচণ্ডভাবেই দেখা দিয়াছে। এবং এই কারণে কৃষি-পণ্যের মুল্য হ্রাস হইয়া ও শিল্প-বাণিজ্যের সকলস্তরে অবনতি ঘটিয়া এদেশে দুঃখ দারিদ্রের নির্ম্মম হা হুতাশ নানাদিক দিয়াই প্রচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে আর্থিক মন্দার তীব্রতা এইরূপ স্থায়ী ভাবে অনুভূত হওয়ার কারণ অন্যদেশের মত এদেশে ইহার সম্যক প্রতিকারের জন্য বিধিসঙ্গত চেষ্টা বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। এই কৃষিপ্রধান দেশে প্রাচুর্য্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়া এবেইত বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না তাহার উপর এই নূতন বিপদপাতে মাথা পিছু আয় যৎপরোনাস্তি কমিয়া গিয়া সর্ব্বসাধারণের দুইবেলা রীতিমত আহার জুটিতেছে না, অধিকন্তু অর্থাগমের ক্ষেত্র বিশেষভাবে সঙ্কোচিত হইয়া বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাঙ্গলা দেশে এই দুরবস্থা এক্ষণে এমন জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ইহার আশু প্রতিকারের উপরই ভবিষ্যতে সকলের সমষ্টিগত কল্যাণ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য একান্ত-ভাবে নির্ভর করিতেছে। এজন্য অচিরেই এবিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেশের হিতাকাঙ্খী মাত্রই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ও অভিরুচির উপর ইহা সম্যকভাবে নির্ভর করিলেও তাহারা এতদিন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের উপযোগী তেমন কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। তবে স্যার জন্ এণ্ডারসন্ বাংলার শাসন ভার গ্রহণ করার সাথে এবিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি কথঞ্চিৎ নিয়জিত হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে বাংলার গভর্ণরের চেষ্টায় একটি আর্থিক তদন্ত বোর্ড গঠিত হইয়াছে। বাংলার গ্রামগুলির যথাযথ উন্নতির জন্য রুরেল ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন; কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেকগুলি আইন প্রণীত হইয়াছে। অধিকন্তু পাটের মূল্য বৃদ্ধির জন্য বিপুল আড়ম্বরে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা গভর্ণমেণ্টের এইসব কার্য্যনীতি ও তাহাদের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বাংলা দেশের প্রকৃত আর্থিক উন্নতি বলিতে প্রধানতঃ কৃষি ও কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিই বুঝায়। এ প্রদেশের মোট জন সংখ্যার ভিতর শতকরা ৯২ জন লোক গ্রামে বাস করে তাহাদের ভিতর আবার ৭০ জনই কৃষক। গ্রামে বাস করিয়া চাষ আবাদের কার্য্য করাই এই ৭০ জনের পেশা। দেশের অধিকাংশ বলিতে তাহা-দিগকেই বুঝায়। কৃষক ছাড়া বাংলাদেশে বর্ত্তমান সময়ে অন্য যে সব শ্রেণীর লোক রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগকেই জীবিকার জন্য সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষকদের অবস্থার উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে কৃষি ও কৃষিজনিত আয়ই এদেশের মোট জনসমষ্টির ভিতর শতকরা প্রায় ৯৫ জন লোকের প্রয়োজনীয় অর্থাগমের সত্যকার সংস্থান।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এহেন কৃষির যথোপযুক্ত উন্নতির ব্যবস্থা এদেশে এতদিন বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। সর্ব্বত্র এর নিদারুণ দুরবস্থার ভিতর সম্পূর্ণ অনুন্নত প্রণালীতে চাষাবাদের কাজ পরিচালিত হইতেছে। ফলে কৃষি হইতে উপযুক্ত অর্থাগম মোটেই হইতেছে না। ফলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে প্রতি বৎসর দুঃখ দারিদ্র ও বেকার সংখ্যা বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। কাজেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকৃত আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ কৃষির দিকেই একান্তভাবে আমাদের দৃষ্টি নিয়োজিত করিতে হইবে। কিন্তু দীর্ঘদিনের হেলা অবহেলার ভিতর দিয়া এদেশের কৃষি সম্বন্ধে যে সব মারাত্মক ত্রুটী বিচ্যুতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সুসঙ্গত কার্য্য-নীতি দ্বারা তাহা সম্যক অপসারণ করিতে না পারিলে প্রকৃত আর্থিক উন্নতি অসম্ভব। নিম্নে আমরা এ প্রদেশে কৃষির মূলগত গলদ ও বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থার কারণ উল্লেখ করিলাম। ইহা হইতেই সকলেই এবিষয়ে আমাদের প্রধান সমস্যা যে কি তাহা

হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিবেন। কারণগুলি এই—

(১) জমি জমার বহুধা বিভক্ত শোচনীয় অবস্থা

(২) প্রয়োজনীয় জলসেচ ব্যবস্থার অভাব

(৩) চাষাবাদের প্রাচীন অনুন্নত প্রণালী

(৪) কৃষিপণ্য বিক্রয়ের অব্যবস্থা

(৫) অপরিমিত পুরাতন ঋণের বোঝা

(৬) কৃষকের পক্ষে প্রয়োজনমত অল্প সুদে ঋণ পাওয়ার অসুবিধা

(৭) সর্ব্বপ্রযত্নে কৃষকের ন্যায্য স্বার্থ-সংরক্ষণে গভর্ণমেণ্টের উপেক্ষা।

পূর্ব্বে আমরা স্যার জন এণ্ডারসনের আমলে গভর্ণমেণ্টের যে সব কার্য্য-নীতির উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে উপরে উদ্ধৃত গলদগুলির মধ্যে কয়েকটী অন্ততঃ বর্ত্তমানে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেচ ব্যবস্থা দ্বারা ভূমির উন্নতি বিধানের জন্য তাহারা ডেভেলপ্‌মেণ্ট এ্যাক্ট প্রনয়ণ করিয়াছেন, কৃষি ঋণ সমস্যার প্রতিকারের জন্য এগ্রিকালচারেল ডেটার্স এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কৃষকদিগকে সময়মত অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার জন্য জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। অধিকন্তু বাংলার অন্য প্রধান কৃষিপণ্য পাটের বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধির জন্য পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যনীতি গ্রহণ করা অর্থই কাজ করা নয়। শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে হইলে দশজনকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য দেশের আর্থিক উন্নতিকল্পে অনেক কিছু আইন প্রণয়ণ করিবার প্রয়োজনীয়তা গভর্ণমেণ্ট অনেক সময় উপলব্ধি করিয়া থাকেন কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদিগকে সফল করিয়া তুলিবার গরজ-বোধ তাহাদের বেশী নাই। এইজন্য বাহ্যিকভাবে যত আড়ম্বর ও তোড়জোড়ই এইসব কার্য্যনীতির ভিতর দিয়া প্রকাশ হউক না কেন ইহাদের দ্বারা আজ পর্য্যন্ত আমাদের কৃষির গলদ বিশেষ কিছুই বিদূরিত হইতেছে না। আইন প্রণয়ণ করা হইতেছে যথেষ্ট, কিন্তু একদিকে এই সব আইনের মূলগত ত্রুটী বিচ্যুতি ও অপরদিকে তাহাদিগকে সুসঙ্কল্পিতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার শৈথিল্য উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনাই ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

প্রথমে ভূমির উন্নতি বিধানের কথাই ধরা যাউক। কৃষিপ্রধান দেশে অধিকাংশ লোকের আর্থিক সুখসমৃদ্ধির মূল ভিত্তি ভূমি ও তাহার উর্ব্বরতা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া ও তাহা হইতে অধিকতর ফসল লাভ করিয়াই প্রতিদেশে সর্ব্বসাধারণের স্বাচ্ছান্দ্য বিধান হইতেছে। প্রধানতঃ সেচ ব্যবস্থা দ্বারাই তাহা সাধিত হইয়া থাকে আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে নদীসম্পদ ছিল তাহা হইতেই ভূমির উর্ব্বরতা বিধান হইত। বাংলার অসংখ্য নদী নালার পর্য্যাপ্ত জলধারা গ্রামের খালবিল ও জলাশয়ে ছড়াইয়া পড়িত, এবং তাহতেই কৃষকদের পক্ষে আবাদী জমির জন্য সময়মত জল সংগ্রহ করা অনেক স্থলেই সহজ হইয়া উঠিত। কিন্তু সে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা আজ আর নাই। দেশের নদী নালা শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করায় ভূমির উর্ব্বরতা বিশেষভাবে লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের প্রায় ২৫০০০ বর্গ মাইল পরিমান জমি ইতিমধ্যেই অনাবাদী পতিত ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তাছাড়া প্রায় স্থলেই চাষাবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতেছে না। ধান্য আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রধান কৃষিপণ্য কি সেচ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে জমিতে ধান্য উৎপন্ন হয় কম। আমাদের দেশের জমিতে প্রতি একরে গড়পড়তা ধান্য উৎপন্ন হয় ৮ হন্দর কিন্তু স্পেনদেশে তাহার পরিমাণ ৫০ হন্দর, ইটালীতে ৩৭ হন্দর, জাপান ৩২ হন্দর ও যুক্তরাষ্ট্রে তাহার পরিমাণ ২০ হন্দর। অন্যত্র এইরূপ বেশী ফসল হওয়ার মূলে তাহাদের উন্নত সেচ ব্যবস্থাই নিহিত রহিয়াছে।

এই অবস্থায় দেশের হাজামাজা নদী নালার সংস্কার করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে দেশের সর্ব্বত্র নূতন খাল কর্ত্তন করিয়া লাভজনক কৃষির উপযোগী সেচ ব্যবস্থা করা আজ দেশের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও এ প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট সেচ ব্যবস্থার কাজে বিশেষ তৎপর হইতেছেন না। পুলিশের জন্য বিপুল খরচ বরাদ্দ করিয়া ও শাসনকার্য্যের নানাদিকে অযথা ব্যয় বাহুল্য করিয়া এবিষয়ে যা কিছু অর্থ মঞ্জুর করা হয় তাহা প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে নিতান্ত সামান্য। সেচ ব্যবস্থার জন্য বাঙ্গলা সরকারের খরচের পরিমাণ পৃথিবীর প্রত্যেক উন্নতিশীল দেশে এই উদ্দেশ্যে যে অর্থব্যয় করা হয় তাহার তুলনায় নিতান্ত সামান্য ত বটেই, ভারতের অনেক প্রদেশের তুলনায়ও তাহা অতি সামান্য। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট তত্রত্য ভূমির উন্নতি বিধানের জন্য যে চেষ্টা ও উদ্যম দেখাইতেছেন বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে সেরূপ করিতেও দেখা যাইতেছে না। টাকা না থাকার অজুহাত দিয়াই তাহারা এতদিন এসব কর্ত্তব্য ধামাচাপা দিয়া আসিয়াছেন। ফলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কিছুই করা হয় নাই।

স্যার জন এণ্ডারসন্ গভর্ণর হইয়া আসিবার পর ১৯৩৪ সালে বাংলাদেশে সেচ ব্যবস্থার জন্য একটী আইন প্রণীত হয় তাহা বেঙ্গল ডেভেলপমেণ্ট এ্যাক্ট নামে পরিচিত। টাকার অভাবে গভর্ণমেণ্ট সেচ ব্যবস্থার কার্য্য

চালাইতে পারেন না বলিয়া এই আইনে তাহারই একটা প্রতিকারের পন্থা নির্দ্ধারিত হয়। এই নূতন আইনে স্থির হয় যে গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ খরচপত্র করিয়া স্থানে স্থানে জমিজমার সেচ ব্যবস্থা করিবেন। ও পরে উক্ত কার্য্যে জমির উন্নতি বিধান হইলে বর্দ্ধিত ফসলের অর্দ্ধেকভাগ গ্রহণ করিয়া ব্যয়িত টাকা আদায় করিবেন। প্রকারন্তরে একটা নূতন কর স্থাপন করিবার অভিপ্রায় ইহার অন্তরালে থাকায় বাংলার জনসাধারণ এই আইন পাশ হওয়ার কালে উহার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ জানাইয়াছিল। কিন্তু মন্ত্রী খাজা নাজীমুদ্দিন সাহেব অবিলম্বে দেশে বিপুল আড়ম্বরে সেচ ব্যবস্থার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া ব্যবস্থাপক সভায় তাহা পাশ করিতে সমর্থ হন। বাংলার অগণিত কৃষক-সমাজের মঙ্গলের জন্য খাজা সাহেবের সে আবেগ উচ্ছাসময় বক্তৃতা আজও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার সে অতুলনীয় উৎসাহ ও উদ্যম কেবল আইন প্রণয়ণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে বাস্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা দেখি নাই। নূতনভাবে কর প্রদানে বাধ্য করিয়াও যদি গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত অনতিবিলম্বে সেচ ব্যবস্থা দ্বারা বাংলার কৃষক-কুলের জমিজামার প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতেন তবে দেশের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইত এবং তাহাতে লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিরও উপায় হইত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই আইনের সুমহান উদ্দেশ্য কেবল সরকারী পুঁথিতেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে কার্য্যতঃ তাহা বিশেষ কিছুই সাধিত হয় নাই, ভবিষ্যতে যে হইবে তাহার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছেনা। সরকারী রিপোর্টে পুনঃপুনঃ এই আইন প্রণয়ণের সার্থকতা বিশ্লেষণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট আত্মপ্রসাদলাভ করিতেছেন এবং শীঘ্রই তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে বলিয়া আশা দিতেছেন—কিন্তু কৃষকদের সে আশা মায়া মরীচিকা মাত্র।

এপ্রদেশে কৃষক সমাজের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের পুরাতন ঋণ মোচন ও বর্ত্তমান সময়ে কৃষি কার্য্যের প্রয়োজনে তাহাদিগকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থাও একান্ত আবশ্যক। নানাকারণে ঋণগ্রস্থ হইয়া দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড স্বরূপ কৃষককুল আজ বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অপরিমিত ঋণের জন্য তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা যে কেবল চরম সীমায় পৌছিয়াছে তাহা নহে, এই সমস্ত ঋণের চাপে কৃষিকার্য্য পুরামাত্রায় কর্ম্মশক্তি নিয়োগেও তাহারা অসমর্থ। কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলায় আর্থিক তদন্ত বোর্ড এবিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এ প্রদেশের মোট কৃষি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৯৭ কোটি টাকা। এক্ষণে কৃষি পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক রকম হ্রাস পাওয়ায় দেশের কৃষক শ্রেণী কথঞ্চিৎ পরিমাণেও মহাজনের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। ফলে দেয় ঋণের বোঝা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বত্র এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

দীর্ঘকাল পরে এবিষয়ে অবহিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট গত বৎসর একটী এগ্রিকালচারের ডেটার্স এ্যাক্ট বা ঋণ লাঘব আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান আইনের মূল নির্দ্দেশ এই যে, পল্লী অঞ্চলের প্রয়োজন মত শীঘ্রই গভর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে কতকগুলি ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপন করিবেন। উক্ত বোর্ড যথারীতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া খাতক ও মহাজনের ভিতর আপোষ মীমাংসার প্রণালীতে কৃষিঋণ লাঘব করিতে সচেষ্ট হইবেন। মহাজনরা রাজী না হইলে দরকারবোধে তাহাদিগকে আপোষ নিষ্পত্তিতে বাধ্য করা হইবে। উক্ত উপায়ে দেয় ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাইলে খতকগণ তাহাদের সুবিধামত ১০।১৫ কিংবা ২০ বৎসরের কিস্তিবন্দী হারে বাকী ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে।

সকলেই জানেন যে ব্যবস্থাপক সভায় এই আইন যথারীতি পাশ হওয়া সত্বেও নানা কারণে উহা অনেকেরই মনঃপূত হয় নাই। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা মহাজনদের ন্যায্য স্বার্থক্ষুন্ন হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান আইন কার্য্যকারীভাবে প্রয়োগ করা হইলে দেশের ঋণগ্রস্থ কৃষক সামান্য পরিমানে উপকৃত হইবে সত্য, কিন্তু পরিণামে উহা দ্বারা ঋণ সম্বন্ধে কোন স্থায়ী উন্নতি সাধিত হওয়া অসম্ভব। ১৫।২০ বৎসরে কিস্তিবন্দীহারে ঋণ পরিশোধের সুবিধা পাইয়াও যদি কোন কৃষক তাহার দেনা মিটাইতে না পারে তবে সে অবস্থায় তাহাকে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করা ও তাহার জমিজমা বিক্রয় করা ছাড়া কোন সুসঙ্গত ব্যবস্থার নির্দ্দেশ গভর্ণমেণ্ট দিতে পারিতেছেন না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটী নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে বাংলার প্রতি কৃষকের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় মাত্র ৮৪৲ টাকা। ব্যবসা বাণিজ্যের দুরবস্থ ও শস্যাদির মূল্য হ্রাস হেতু এই প্রকার আয়ের অঙ্ক আরও কমিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় দেশের অধিকাংশ কৃষক বৎসরে কিছু টাকা সঞ্চয় করা দূরের কথা কায়ক্লেশেও নিজেদের দৈনন্দিন খরচ নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে না। অতএব বর্ত্তমান আইনের বিধান অনুযায়ী কিস্তিবন্দী হারে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা হইলেও বহুসংখ্যক কৃষক তাহাদের দেনা মিটাইতে পারিবে না। তাহা ছাড়া একথাও সত্য যে দেশের সামান্য সংখ্যক লোক যদি বাস্তবিক পক্ষে এই ব্যবস্থা অনুসারে ঋণমুক্ত হওয়ার সুবিধাও পায় তবে তাহাদের স্বাভাবিক অল্প আয়ের দরুণ তাহারা অচিরেই পুনরায় ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িবে। কাজেই ঋণ সালিশী আইনের দ্বারা কৃষিঋণ মোচনের আশা বৃথা বলিলেও অত্যুক্তি করা

হয় না। তাছাড়া গভর্ণমেন্ট উপযুক্ত সংখ্যক সালিশী বোর্ড গঠনে যেরূপ অযথা বিলম্ব ও শৈথিল্য দেখাইতেছেন তাহাতে এই আইন কোনদিন বিপুলভাবে কার্য্যকরী হইবে কিনা সন্দেহ।

কৃষিঋণের বিপুলভার হইতে কৃষককুলকে মুক্ত করিতে হইলে উপযুক্ত সংখ্যক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনই সমীচীন পন্থা। সকলেই অবগত আছেন যে বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নতিশীল দেশেই তত্রত্য কৃষক সমাজের হিতার্থে ঐরূপ ব্যাঙ্ক বহুলভাবে স্থাপিত হইয়াছে। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের বিশেষত্ব এই যে উহা ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমি বন্ধক রাখিয়া দীর্ঘদিনের মেয়াদে প্রয়োজনানুসারে টাকা ধার দিয়া থাকে। অপর পক্ষে কৃষকেরা ঐ টাকা লইয়া প্রথম মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে ও পরে ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ অনুযায়ী উন্নত বিধি ব্যবস্থায় জমি চাষাবাদ করিয়া তাহার বর্দ্ধিত আয় হইতে ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধ করে। দুই বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেন্ট ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও পাবনায় তিনটি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ১৯৩৫ সালের প্রথমভাগে যশোহর ও বীরভূম জেলায় এইরূপ আরও দুইটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু মোট ৫টী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে কি হইবে উপযুক্ত মূলধনের অভাবে তাহাদের কোনটীই আজ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে কার্য্যারম্ভ করিতে পারে নাই। সমবায় বিভাগের ১৯৩৪-৩৫ সালের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে ১৯৩৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক-গুলিতে দেশের কৃষকদের পক্ষ হইতে জমি বন্ধক দেওয়ার স্বর্ত্তে মোট ৪ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য ১৬০০ আবেদন আসিয়াছিল। এই আবেদনগুলির মধ্যে ৯৬২টী ভবিষ্যতে বিবেচনা করিবার জন্য ফেলিয়া রাখা হইয়াছে; ৩৭২টী খারিজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অবশিষ্ট ২৬৬ জন আবেদনকারীকে মোট ১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইবে এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ৬৫ জন আবেদনকারী মাত্র ২৩৫৩৫৲ টাকা পাইয়াছে। প্রায় ১০০ কোটি টাকা কৃষিঋণের মধ্যে এরূপভাবে যদি বৎসরে মাত্র ১ লক্ষ টাকা পরিমাণ ঋণমোচনের ব্যবস্থা হয়, তবে সমস্ত পুরাতন ঋণভার হইতে বাংলার কৃষকদিগকে মুক্ত করিতে গভর্ণমেণ্টের কয়েক সহস্র বৎসর লাগিবে তাহা ইহা হইতেই অনুমেয়।

কৃষিজাত পণ্যসামগ্রী উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের অসুবিধা বাংলাদেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ার একটী প্রধান কারণ। বিক্রয়ের জন্য ফসল তৈয়ার হইলে তাহার ন্যায্য দাম উৎপাদনকারীরা পায় না। ইহার মূলে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার গলদই নিহিত রহিয়াছে। অথচ লক্ষ লক্ষ কৃষকের স্বার্থের দিকে চাহিয়া আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিকার পন্থা নির্দ্দেশিত হইতেছে না। বিক্রয়ের জন্য ফসল তৈয়ার হইলে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য তাহার যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া। কিন্তু অন্য দেশে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেও আমাদের দেশে তাহা করা হইতেছে না। শস্য উৎপন্ন হইলেই দরিদ্র কৃষক তাহা সুসময়ের আশায় ধরিয়া রাখিতে পারেনা। স্বার্থান্বেষী ব্যাপারী ও ব্যবসাদারেরা যে নামমাত্র মূল্য দিতে রাজী হয় তাহা পাইয়াই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বাংলার প্রধান অর্থকরী কৃষিপণ্য পাটের কথা ধরা যাউক। পাট ফসলের আয়ের উপরই অধিকাংশ কৃষকের আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে নির্ভর করে। পাট বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়া সম্বৎসরের খরচপত্র নির্ব্বাহ ও পুরাতন ঋণ পরিশোধের আশা সকলেই রাখে। কিন্তু একদিকে আর্থিক মন্দা অপরদিকে বিক্রয়ের অব্যবস্থা এই দুই কারণে গত কতিপয় বৎসর যাবৎ পাটের উপযুক্ত মূল্য একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। ১৯২৯ সালে পাটের দাম বেশ চড়া ছিল। কিন্তু ১৯৩০ সাল হইতে উহা ক্রমেই বিশেষভাবে পড়িতে থাকে। ফলে ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত কয় বৎসরে মাত্র ১৫ কোটি টাকা বাংলার কৃষকদের হস্তগত হইয়াছে। গড়ে প্রতি কৃষকের ভাগে বৎসরে এই আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১৩৲ টাকা। এই সামান্য আয় যে বাংলার কৃষকদের বর্ত্তমানে দুঃখ দারিদ্র্যের প্রধান কারণ তাহা বলাই বাহুল্য। পাট উৎপাদনকারীদের বঞ্চিত করিয়া নিজেরা অত্যধিক পরিমাণে লাভবান হওয়ার জন্য পাটকলের মালিকরাও বড় বড় ব্যবসাদাররা যে নানারূপ কারসাজি অবলম্বন করে—তাহা কেবল এদেশ বলিয়াই সম্ভপর হইতেছে। প্রথমতঃ কলিকাতার ফাটকা বাজারে তাহাদের সুবিধামত নিম্নতম মূল্যে তাহারা পাটের মূল্য বাধিয়া দেয়, পরে অল্পদরে পাট কিনিয়া তাহা বিক্রয় বা ব্যবহার করিয়া লাভবান হয়। এই কারসাজির ফলে এই দুর্দ্দিনেও পাটের কলগুলি অংশীদারগণকে বৎসরে উচ্চহারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে কিন্তু পাটের উৎপাদনকারীরা দিন দিন অতীব দুঃখ দারিদ্র্যে পতিত হইতেছে। এইভাবে বঞ্চিত হইয়াও কৃষকেরা উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য আজও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিতেছে না অধিকন্তু এই অবস্থায়ও পাটের অতি উৎপাদন দ্বারা নিজেদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিতেছে।

এহেন দুরবস্থায়ও দেশে প্রয়োজনমত ফসল উৎপাদন বিষয়ে কোন সুশৃঙ্খল নীতি

প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে ও বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে গভর্ণমেণ্ট এতদিন বিশেষ কিছুই অবহিত হন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাংলার সমবায় বিভাগের চেষ্টায় কয়েকটী ধান ও পাট বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা কার্য্যতঃ সফল না হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে স্বেচ্ছামূলকভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের যে স্কীম গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও নানা কারণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণে যখন গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম সচেষ্ট হন তখনই অনেকে বলিয়াছিলেন যে বাধ্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্ত্তন না করিলে ইহা দ্বারা কোন প্রকৃত সুফল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সে কথায় তাহারা কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অশিক্ষিত চাষাভুষাদের ভিতর স্বেচ্ছামূলক নীতি যে কার্য্যে সফলকাম হইবার নয় তাহা এক্ষণে বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৩৫-৩৬ সালে মোট ৬০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু পাট হইয়াছিল ন্যূনপক্ষে ৮০ লক্ষ বেল। এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৬-৩৭ সালেও গভর্ণমেণ্ট পাটচাষীদিগকে পুনরায় মাত্র ৬০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু গভর্ণমেণ্টের শেষ বরাদ্দ হইতে জানা যায় যে, এবৎসরও ৭৭ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। কাজেই দুইবারই পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে। এই নিয়ন্ত্রণ-স্কীম কার্য্যে সফল করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রচারকার্য্য বাবদ বহু টাকা খরচ করিয়াছেন। অনেক নূতন কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু কার্য্যতঃ উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই সাধিত হয় নাই। বস্তুতঃ পাটের অতি উৎপাদন বন্ধ করিতে হইলে বাধ্যবাধকভাবে নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রবর্ত্তন করা ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই। কিন্তু কেন যে গভর্ণমেণ্ট সেইরূপ সুসঙ্কল্পিত ভাবে কার্য্যে অবতীর্ণ হইতেছেন না তাহা আমরা বুঝিতে সত্যই অক্ষম।

মাদাম বার্পতিহস্ত

শ্রীবসন্ত কুমার আঢ্য

লু বাঁ ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঢুকে প্রথমেই আমি চাইলুম ঘড়িটার পানে। প্যারী-গামী ডাকগাড়ীর জন্যে আমাকে দুঘণ্টা দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

যেন মাইলের পর মাইল হেঁটে এসেছি, হঠাৎ এমনি একটা ক্লান্তিবোধ করলুম। যেন দেয়ালেই এমন একটা আকর্ষণের বস্তু পাবো, যার পানে তাকিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিতে পারবো এই আশায় চারিদিকে চাইতে লাগলুম। তারপর বাইরে গিয়ে ষ্টেশনে ঢোকবার ফটকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, কি করে এই সময়টা কাটানো যায়।

সামনেই দেখলুম ছোট ছোট বাবলা জাতীয় গাছের ছায়ায় শীতল দীর্ঘ এক রাজপথ। গাছগুলোর পেছুতে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের বাড়ী। পথটা দূরে এক পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে দেখলুম, লম্বা গাছে-ঘেরা খানিকটা জমী, যেন সেটা একটা পার্কের শেষ প্রান্ত।

মাঝে মাঝে এক আধটা বেড়াল রাস্তা পার হয়ে আস্তে আস্তে সরু নদী পেরিয়ে চলে যাচ্ছে ঝোপের ভেতর। একটা কুকুর বাচ্চা, এক টুকরো খাবারের খোঁজে প্রত্যেক গাছের গুড়ি শোকবার জন্যে এমন জোরে ছুটে যাচ্ছিল, যেন প্রত্যেক গাছের গুড়িতেই তার মাথা ঠুকে যাচ্ছে। পথে কোন মানুষের দেখা পেলুম না।

একটা গভীর হতাশা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলোকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললে। করি কি? ছোট্ট, নির্জ্জন সহরের কোন্ বৈচিত্র্য আমার এই সময়টা ভরিয়ে তুলতে পারে? প্রায় ভেবে নিয়েছিলুম যে লম্বা, একঘেয়ে বৈকালটা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপের মদে ভর্ত্তি একটা গ্লাস আর অবোধ্য স্থানীয় সংবাদ পত্রখানা নেড়েচেড়েই কাটবে, এমন সময় হঠাৎ দেখলুম সরু একটা গলি থেকে একখানা শববাহী গাড়ী মোড় ফিরে বড় রাস্তা ধরে আমারই দিকে আসছে।

শব যাত্রাও তখন যেন আমাকে স্বস্তি দিলে। সেটা দেখেও অন্ততঃ মিনিট দশেক কাটবে। কিন্তু হঠাৎ আমার মনোযোগ দ্বিগুনভাবে আকৃষ্ট হোল। শববাহী গাড়ীখানার সঙ্গে রয়েছেন জন আষ্টেক ভদ্রলোক; দেখলুম তাঁদের মধ্যে একজন কাঁদছেন আর বাকী সবাই কি সম্বন্ধে যেন একটা পরামর্শ করতে করতে চলেছেন। এদের সঙ্গে কোন পুরোহিত দেখলুম না। ভাবলুম হয়ত—

শোককারীদের তাড়াতাড়ি চলা থেকে অনুমান করলুম যে মৃতব্যক্তির অন্তেষ্টিক্রিয়া সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে না বা ওর সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নেই।

আমার অলস কৌতূহল কত উদ্ভট কল্পনাই করতে লাগলো। শেষে যখন গাড়ীখানা আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন অদম্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে এই আট জনের অনুবর্ত্তী হবো বলে মনস্থির করে ফেল্লুম। এতে ঘণ্টাখানেক অন্ততঃ নিশ্চয়ই কাটবে; তখুনি তাদের দলে ভিড়ে পড়লুম। সময়োপযোগী শোকের ম্লানিমা মুখে ফুটিয়ে তোলবার কোন আবশ্যকতাই ছিল না।

পাশেই যে দুজন ছিলেন তাঁরা আমাকে দেখে অবাক হয়ে নিজেদের ভেতর চুপিচুপি কি বলাবলি শুরু করলেন। বোধহয় তাঁরা সন্দেহ করেছিলেন আমি এই সহরের অধিবাসী নয়। নিজেদের সন্দেহের কথাটা তাঁরা সামনের আর দুজনকে বলতেই তাঁরাও অবাক হয়ে আমার মুখপানে তাকাতে লাগলেন। তাঁদের দৃষ্টির ঘায়ে বিব্রত হয়ে, তাঁদের সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যে, কাছে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বল্লুম "ভদ্র মহাশয়রা, আপনাদের কথায় বাধা দেওয়ার জন্যে মাপ চাইছি। কিন্তু অনুষ্ঠানবিহীন অন্তেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপার দেখে কেমন একটা অদম্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে আপনাদের দলে যোগ না দিয়ে পারলুম না। বিশেষ করে এই জন্যে আরো মাপ চাইছি যে আমি মৃতব্যক্তির সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

একজন ভদ্রলোক বল্লেন "আমরা শোক প্রকাশ করছি একটি মহিলার মৃত্যুতে।"

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম "এ তো অনুষ্ঠানবিহীন অন্তেষ্টিক্রিয়া, নয় কি?

আর একজন ভদ্রলোক, যিনি আমার কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে এতক্ষণ উন্মুখ হয়েছিলেন, তিনি বল্লেন "আপনার কথার সত্যি জবাব দিতে হলে হাঁ, না, দুটই বলতে হয়। ধর্ম্মযাজক আমাদের প্রবেশের অনুমতি দেন নি।"

আমার মুখ থেকে বিস্ময়ের অস্ফুট শব্দ আপনিই বেরিয়ে এলো। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার রহস্যজনক বলে মনে হোল। আমাকে বাধিত করে আমার পাশের ভদ্রলোকটী নীচু গলায় বল্লেন "হাঁ, এর পেছুতে রয়েছে সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই মহিলাটি আত্মহত্যা করেছেন, তাই ধর্ম্মের শেষ সান্ত্বনা আর আশীর্ব্বাদ থেকে ইনি বঞ্চিত হয়েছেন। ওই যে প্রথমেই যিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে চলেছেন উনিই এই যুবতীর স্বামী।"

ইতস্ততঃ করে আমি বল্লুম "আপনার কথা শুনে আমার ভেতরে জেগেছে যেমন কৌতূহল তেমনি বিস্ময়। এর আদ্যোপান্ত জানতে চাইলে অসভ্যতা হবে না তো? তা যদি মনে করেন তাহলে ধরে নিন, আমি যেন কিছুই জানতে চাইনি।"

পরিচিতের মতই আমার হাতখানা ধরে ভদ্রলোক বল্লেন "না, না, কিছুমাত্র নয়। দল থেকে একটু পেছিয়ে পড়ুন। আমি আপনাকে সবই খুলে বলছি। শুনলে অবশ্য আপনি দুঃখিতই হবেন। সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছোতে খানিকটা সময় লাগবে। দূরে যে লম্বা গাছে ঘেরা জমীটা দেখছেন আমাদের ওখানেই যেতে হবে।"

তারপর তিনি বলতে সুরু করলেন

"এই যুবতীর নাম মাদাম পল আবো। এই জেলার সব চেয়ে ধনী ব্যবসায়ী মসিয়ে ফন্তানেলের মেয়ে ইনি। যখন এর বয়েস মাত্র এগারো তখন ফন্তানেল পরিবারের একজন চাকর একে বাড়ী থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। প্রায় মৃত অবস্থায় মেয়েটিকে পাওয়া যায়। ফলে রুজু হোল ভীষণ এক মামলা। জেরায় প্রকাশ হোল, প্রায় তিন-মাস হতভাগ্য এই মেয়েটিকে জানোয়ারটার

লজ্জাকর অত্যাচার সইতে হয়েছিল। বিচারে হতভাগার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোল।

"কলঙ্কের কালিমা গায়ে মেখেই মেয়েটির বয়েস বাড়তে লাগলো। যেন ওর স্পর্শে কলঙ্কিত হতে হবে, এই ভাবে নিঃসঙ্গতার মাঝে পরিত্যক্ত হয়েই মেয়েটির দিন কাটতে লাগলো। সহরের লোকের চোখে ও ডাইনী, প্রেতিনীরূপেই প্রতীয়মান হোল। ঘৃণায় সঙ্কুচিত নিঃশ্বাসের সঙ্গে লোকে বলতো "ফন্‌তানেল্‌ পরিবারের ছোট্ট ওই মেয়েটাকে জানো?" পথ দিয়ে একা চলবার সময় এমনি অভদ্র প্রশ্নের বাণ অজস্রভাবে মেয়েটির ওপর বর্ষিত হোত। তার ওপর লোকের কৌতুহলী চাউনির বাণে মেয়েটির নিঃসঙ্গ, নিষ্প্রাণ মন নিয়ত আহত হোত। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যায় এমন ধাত্রী মিললো না, আর অন্য বাড়ীর চাকরগুলো পর্য্যন্ত তার কাছ থেকে তফাতে থাকতো। যেন মেয়েটির কলঙ্কের সংক্রামতায় তাদের অঙ্গ কলঙ্কিত হবে।

"প্রায়ই দেখা যেতো, তার কাছ থেকে নিরাপদ ব্যবধানের পারে, অন্য সব মেয়েরা হাসছে, খেলছে আর ছোট্ট এই মেয়েটি একা খেলছে মলিনতাকে সাথী করে। বিষাদ-মাখা সতৃষ্ণ নয়নে মেয়েটি চেয়ে থাকতো; সমবয়সীদের খেলার আনন্দে উজ্জ্বল মুখের পানে। তাদের দলে যোগ দেবার অদম্য ইচ্ছার প্রেরণায় সে ভীত, নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে যেতো তাদের দিকে। এই সঙ্কোচ, ভয়ের মূলে থাকতো, অমার্জ্জনীয় কোন অপরাধ করে ফেলার সচেতনতা। হঠাৎ কাছাকাছি বেঞ্চ থেকে ছুটে আসতো অতি সাবধানী মা আর ধাত্রীর দল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পবিত্র শিশুদলের পবিত্রতা রক্ষার বন্দোবস্ত হয়ে যেতো পাকাপাকি ভাবে, ধাত্রী আর মেয়েদের আকর্ষণে তার কাছ থেকে দূরে নীত হয়ে। ছোট্ট ফন্‌তানেল্‌ এই ভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখাত হয়ে নিঃসঙ্গতার মাঝে নির্ব্বাসিত হোল। দুঃখের ঘায়ে তার মন ভেঙে যেতো, তার চোখ থেকে জলের ধারা নেমে আসতো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে ছুটতো মায়ের আঁচলে মুখ ঢাকবার জন্যে। "তার বয়স যত বাড়তে লাগলো, তার জীবনের জটিলতা ততই বাড়তে লাগলো। সাক্ষাৎ সংক্রামক ব্যাধির মত অন্য যুবতীরা তাকে পরিহার করলে। ভেবে দেখুন তো! ছোট এই মেয়েটির কিছুই জানতে বাকী ছিল না—কিছুই তার অজানা ছিল না। ফুল শয্যায় নারাঙ্গী ফুলের তোড়ায় তার কোন অধিকার ছিল না। বই পড়বার মত শিক্ষা প্রায় তার হয়নি, তবু বিয়ের রাতে অনভিজ্ঞা মেয়েদের ভয় দূর করবার জন্যে মায়েরা যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত মেয়েদের দেয়, তাও তার অজ্ঞাত ছিল না।

শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সে যখন পথে বেরোত তখন তার দৃষ্টি পথেই নিবদ্ধ থাকতো। আর তার মন লজ্জার রহস্যময় সচেতনতার ভারে সব সময়েই ভারী হয়ে থাকতো। তার মনে হোত এই সব যুবতীরা—যাদের পবিত্রতা সম্বন্ধে বাপ মায়ের যথার্থ ধারণা ছিল না—নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে তার লজ্জাকর ইতিহাসের আলোচনা করছে আর তার পানে বিদ্রূপভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। হঠাৎ যদি সে মুখ তুলে তাদের পানে চেয়ে ফেলতো, তাহলে তারা নির্ব্বিকার ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে মোটেই দেরী করতো না।

জন কয়েক পুরুষ ছাড়া কেউ তাকে দেখে মাথা নোয়াত না। অন্য মেয়েদের মায়েরা যেন তাকে চেনেই না, এমনি ভাণ করতো। যে চাকরটার বর্ব্বরতা তার লজ্জা, সর্ব্বনাশের কারণ, তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে পাড়ার গোটা কতক ছোঁড়া তাকে তো "মাদাম বাপতিস্তে" বলেই ডাকতো।

কথা যে প্রায় বলতোই না, তাই কত যন্ত্রণা যে সে মুখ বুঁজে সইতো, তার খবর কেউ পেতো না। হাসির ক্ষীণতম আভাসও তার মুখে কোনদিন পাওয়া যেতো না। তখন কি তার বাপ মাও মেয়ের সামনে নিজেদের বিব্রত বোধ করতো; যেন তার ওপর তাদেরও চিরন্তন একটা আক্রোশ আছে, যেন তার কলঙ্কের দুরপনেয় ছাপই তাদের বংশগরিমাকে ম্লান করেছে।

দেখতে সে ছিল সুন্দরী কিন্তু মলিন; তার দেহ ছিল লম্বা ছিপছিপে আর তার মধ্যে ছিল একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ। কদর্য্য ব্যাপারটা না ঘটলে আমার হয়তো তাকে ভালই লাগতো।

"মাস আঠারো আগে এই সহরে এলেন এক নতুন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। তাঁর সঙ্গে এলো তাঁর খাস-সহকারী। যুবকটি ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। গুজব শোনা যেতো যুবকটি এক-কালে লাত্যা পল্লীর নাম করা আমোদ-প্রিয়াদী ছিল। মাদমোয়াজেল ফন্তানেদের সঙ্গে দেখা হতেই যুবকটি তার প্রেমে পড়ে গেল। যখন তার কানে মেয়েটির পূর্ব্ব বিবরণ উঠলো তখন যুবকটি কেবল বল্লে "ওঃ—এই জন্যেই তো আমি ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হচ্ছি। আমার পূর্ব্বে পুরুষের সঙ্গ পেয়েছে এমন মেয়েকেই আমি পছন্দ করি। আমাকে পাওয়ার পরেও অন্য পুরুষের সঙ্গ কামনা করবে, এমন মেয়েকে আমি পছন্দ করতে পারি নে। ওই মেয়েকে বিয়ে করলে আমার মন অকারণ অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে।

"সে মেয়েটির প্রণয় প্রার্থনা করলে। তারপর বিয়ের প্রস্তাব করতেই সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হোল। পূর্ব্ব ঘটনার কথা ভুলে দুপক্ষের যাওয়া আসা সুরু হোল। আর পাঁচজনের কেউ কেউ তাদের বাড়ী আসতে লাগলো; কেউ বা পূর্ব্বের মতই ঘৃণাভরা

প্রিয়া ও পৃথিবী

শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র দেবনাথ

প্রিয়ার নয়নে হেরিয়া প্রেমের আলো,
মাটির পৃথিবী তোমারে বেসেছি ভালো।
স্বরগের হাসি গান,
কোমল পরশে ভরিয়া উঠিল অবিরাম, অফুরান !
শত ব্যর্থতা নিরাশায় নাহি মরণের কালো ছায়া,
মাটির ধরায় মজিয়াছে প্রাণ ঘিরেছে সবুজ মায়া।

প্রিয়ার অধরে পেয়েছি স্বরগ সুধা,
কয়েছে অমর মিটায়েছে মোর ক্ষুধা !
পারিজাত নাহি চাই,
ও দুটী ওষ্ঠ অধরের মাঝে হাসিটুকু যদি পাই।
নিখিলের রূপ নিঙারিয়া বুঝি স্বপন-সুরভি নিয়া,
নামিয়া আসিল ধরার কাননে আমার রূপসী পিয়া !

পৃথিবী আমারে যে রূপ দেখাল আজ,
নেশায় পাগল, তুলনায় কিবা কাজ ?
পৃথিবীর আলো, হাসি
তাহারি মুখের প্রতিরূপ জানি প্রাণ দিয়া ভালবাসি।
কুন্তলে তার যে কথা জাগায় যে বাণী শোনায় দুল,
মরমে রচিল আসন তাহার, করিলনা কোথা ভুল।

ভূধর, সাগর, নীহার, চাঁদের আলো,
মধুর মিলনে লাগিয়াছে সব ভালো !
পাপিয়ার কলরব
আর কিছু নহে আমাদেরি ওই অভিসার উৎসব !
ঊষার আলোয় একা মোর চোখে ধরিয়া প্রিয়ার ছবি,
মাটির পৃথিবী রস জোগাইয়া করিয়াছে মোরে কবি !

নির্ব্বিকার ভাব অবলম্বন করে দূরে সরে রইলো। কিন্তু আস্তে আস্তে সব বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে গেল। সমাজে তাদের স্থান হোল।

"আমি বলছি, বিশ্বাস করুণ; মেয়েটি তার স্বামীকে দেবতার মতই ভক্তি করতো। বুঝতেই তো পারছেন, স্বামীই তাকে আবার পাঁচজনের একজন হতে সহায়তা করেছে। অসাধারণ মানসিক শক্তির বলে সে সাধারণের বিরুদ্ধ মতের সঙ্গে যুঝে তাকে জয় করেছে। তারপর যখন তার আসন্ন মাতৃত্বের সংবাদ পাওয়া গেল তখন অতি বড় নীতিবাদীর বাড়ীর দ্বারও তার কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল। যেন মাতৃত্বের স্পর্শে তার সব কলঙ্কের স্খালন হয়ে গেছে। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত; কিন্তু পৃথিবীর নিয়মই এই।

"অবাধ নদীস্রোতের মত সবই চলেছিল ভালোর দিকে। এমন সময় এসে পড়লো "ব্যাং পেওনের" ভোজ পর্ব্ব। অন্যান্য কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত, আমাদের নব-নিযুক্ত প্রধান কর্ম্মচারী, প্রথা মত তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। তারপর তাঁর খাস সহকারী পল আমোর সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় পদক বিতরণের পালা। জানেন তো এসব ব্যাপারে—বিশেষ করে যেখানে সহরের সব মেয়েরা বারান্দায় ঝুঁকে আগ্রহের সঙ্গে পারিতোষিক বিতরণ দেখে—কি রকম রেষারেষি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে থাকে। প্রথমেই এলেন মরমিলোর সঙ্গীত পরিচালক। তাঁর ঐক্যতান বাদনের দল মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা পদক পেলে…সবাই তো আর প্রথম শ্রেণীর পদক পেতে পারে না।

"খাস-সহকারী তাঁর হাতে পদকখানা দেবামাত্রই লোকটা পদকখানা তাঁর মুখে ছুড়ে মেরে চিৎকার করে বল্লে "ও পদক রেখে দে তোর ওই ঘৃণ্য বাপতিস্তের জন্যে। ওর মত আমারও প্রথম শ্রেণীর পদকে অধিকার আছে।"

"লোকজন সব চিৎকার করে হাসতে লাগলো। লোকগুলোর সদাশয়তা বা ভব্যতার নামগন্ধও ছিলনা। সবাইকার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো হতভাগিনীর ওপর। চোখের সামনে কোন মেয়েকে—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে চঞ্চল নয়—রীতিমত পাগল হয়ে যেতে দেখেছেন কি? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আমরা দেখলুম। সে একবার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো, আবার তখুনি বসে পড়লো। তারপর লোকের বিদ্রূপ বাণের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে পড়বার মত একটু ফাঁকের খোঁজে চারদিকে চাইতে লাগলো। হলের পেছুদিক থেকে কে চেঁচিয়ে বলে উঠলো "এই যে মাদাম বাপতিস্তে!" তারপর লোকের মুখ আলগা হয়ে গেল। সেই ভয়ঙ্কর কাহিনী অবজ্ঞা, কদর্য্য বিদ্রূপ, মিথ্যার ডালপালা সমেত লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। চারদিকে রীতিমত একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। হতভাগিনীকে একবার

বেশ করে দেখবার জন্তে লোকজন সব' চেয়ারে উঠে দাঁড়ালো। স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের তুলে ধরলো। তাদেরই একজন ফিস্ ফিস্ করে শুধোলে "কোন্‌টি? নীল জামা পরা উনিই নাকি?" ছোট ছোট ছেলেগুলো পর্য্যন্ত মুর্গীর ডাক ডাকতে লাগলো। চারদিকে যেন বাজনা বাজা সুরু হয়ে গেল।

তার নড়ন চড়ন পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গেল। নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করে, সে নিজের আসনে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলো। সে না পারলে নড়তে, না পারলে চলে যেতে; আত্ম গোপন করবার মত জায়গাও সেখানে ছিল না। জ্বলন্ত সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্নতা থেকে বাঁচাবার জন্তেই যেন সে চোখ বুজলে। তার বুকখানা হাপরের মত দুলতে লাগলো, সবেগে তার নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো। তার সেই সময়ের শোচনীয় অবস্থা দেখে বুক ফেটে যায়।

এদিকে সস আমো জানোয়ারটার টুটি টিপে ধরেছিল; শেষে দুজনেই মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে ধস্তাধস্তি সুরু করে দিয়েছিল। সভার কাজ তখন একদম বন্ধ হয়ে গেছে।

একঘণ্টা পরে হামো দম্পতি চলেছিল নিজেদের বাড়ীর দিকে। অপমানের পর থেকে মেয়েটি একবারও মুখ খোলেনি। কিন্তু ঝড়ের মুখে অস্থায়ী বেতস পত্রের মত তার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। পথে নদীর ওপর ছিল সেতু; সেখানে পৌছে হঠাৎ মেয়েটি সেতুর রেলিঙের দিকে ছুটলো আর স্বামী বাধা দেওয়ার আগেই ঝাপিয়ে পড়লো নদীর জলে। খিলানের নীচে ছিল গভীর জল। দুঘণ্টা পরে যখন তাকে পাওয়া গেল তখন হতভাগিনীর দেহে প্রাণ ছিল না।" ভদ্রলোক চুপ করলেন; তারপর আস্তে আস্তে বল্লেন

"এ না করেও তার কোন উপায় ছিল না। পৃথিবীতে এমন জন কতক লোক আসে যাদের পক্ষে মৃত্যুই একমাত্র সান্ত্বনা। পুরুৎ ঠাকুর কেন যে মৃতের শেষকৃত্য করতে রাজী হননি এখন বোধ হয় তা বুঝতে পারছেন। রাজী হলে এতক্ষণ সহর শুদ্ধ লোক এখানে এসে জুটতো। কিন্তু আত্মহত্যা যার তার কারণের জন্তেই আমরা জন কয়েক ছাড়া কেউ শব যাত্রায় যোগ দেয়নি।"

আমরা গোরস্থানের ফটকে এসে পৌছোলুম। অজানা, মৃত এই হতভাগিনীর কথা ভেবে মন আমার আকুল হয়ে উঠলো। যতক্ষণ না কফিন কবরে নামানো হয়, ততক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। এতক্ষণ তার স্বামী ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল, আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলুম।

জলভরা বিস্মিত চোখের চাউনি সে আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ করলে; তারপর বল্লে "ধন্যবাদ!" প্যারী গামী ডাক গাড়ীর জন্তে দুঘণ্টা দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলে আমি দুঃখিত হইনি। *

* মোপাসাঁ থেকে।

ক্লার্ক গেবল

হারানো সুর

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

ফ্রেডরিক মার্চ

রুডলফ ভ্যালান্টিনোর মৃত্যুর পর—তাঁহার সমকক্ষ একজন সুযোগ্য অভিনেতার আজো অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রায় অধিকাংশ সুশ্রী ও সুযোগ্য অভিনেতা সম্বন্ধে সাধারণে উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়াছে। ভাবিয়াছে, ধূমকেতু-সদৃশ উদয়ে এই অভিনেতা বক্স-অফিস তথা অজস্র তরুণী-হৃদয় যুগপৎ ভাঙিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই।

বিশেষজ্ঞদের বিচারে—আজো কেহ ভ্যালান্টিনোর শূন্য সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন নাই। সিনেমা-দর্শকের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে এক ভ্যালান্টিনো ব্যতীত—সিনেমা শিল্পের ইতিহাসে আর কোনও ব্যক্তি পারেন নাই। ভ্যালান্টিনো সহস্র সহস্র সিনেমাগামী দর্শকের চিত্তে আজো অমর হইয়া বিরাজমান।

কিন্তু কেন? অবশ্য তাঁহার বিস্ময়জনক ব্যক্তিগত আকর্ষণ ছিল, এবং সম্ভবতঃ তিনি-ই সর্ব্বপ্রথম ফিল্ম অভিনেতা, যাহার আকর্ষণী শক্তির সহিত 'menace' নামক বস্তুটি সংযুক্ত ছিল। উত্তরকালের বহু নটেরও অবশ্য এই গুণ ছিল বা আছে। ভ্যালান্টিনোর চিত্রাদিতে এই 'menace' বস্তুটি এত প্রচ্ছন্ন থাকিত যে অনেক সময় তাহার অস্তিত্ব সাধারণে বুঝিতে পারিত না। যে সব ফিল্মে এই 'menace' বস্তুটির আধিক্য থাকে ও বালকত্বের স্পর্শযুক্ত রোমান্টিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়,—সেই সব ফিল্ম সাধারণতঃ দর্শক চিত্তে বিশেষ আঘাত করে। দর্শক কল্পনা-কুশল,—তাঁহারা অনেক সময় নায়ক-নায়িকা যে কল্পলোকের অধিবাসী তাহা বিস্মৃত হয়। উপন্যাস-নাটকও বর্ত্তমানে ফিল্মের নায়ক-নায়িকা অনেকের চিত্তে স্বপ্ন মায়াজাল বিস্তার করে,—তাহাদের চোখে কল্পনার মোহময় অঞ্জন।

ঘটনা ও স্থানকাল ও পাত্রানুযায়ী এই প্রকার সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা অসম্ভব নহে, সমস্তই সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। ইহাও স্বীকার্য্য যে যদি আজ ভ্যালেন্টিনো জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি এই সার্ব্বজনীন জনপ্রিয়তার অধিকারী থাকিতেন না।

অভিনয়ের গতি ও প্রকৃতি গত কয়েক বৎসরে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ঠিক পুরাতন মাপকাঠিতে তাহা আর পরিমেয় নহে। ভ্যালান্টিনো সু-অভিনেতা ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন না। হয়তো ভবিষ্যতে তাঁহার আরো উন্নতি হইত ও উন্নততর অভিনয় দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ নট বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। ভ্যালান্টিনোর সময়ে—ছোটখাটো ভূমিকায়

গেরি কুপার

খ্যাতিসম্পন্ন শক্তিশালী অভিনেতা বড় একটা অবতরণ করিতেন না। ভ্যালান্টিনো প্রতিভাশালী নট ছিলেন—হয়ত পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে তিনিও পরিবর্ত্তিত হইতেন, কিন্তু তাহা হইলে—যে গভীর রহস্য তাঁহাকে ঘিরিয়া গঠিত হইয়াছিল তাহা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইত। তিনি হয়ত আরো মানবীয় (human) সহজ বোধ্য ও প্রাণবান্ (সুতরাং রহস্য-মাধুর্য্যহীন) হইতেন।

ভ্যালান্টিনোর দ্বারা অভিনীত ফিল্ম যাহাদের স্মরণে আছে তাঁহারা জানেন যে তাঁহার প্রায় সকল ছবিই মূলতঃ বীর-রসবহুল (অবশ্য অন্য রসের অভাব ছিলনা)। এই সব কাহিনী বিশেষ করিয়া এই কারণেই মনোনীত হইত। সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার অভিনীত ভূমিকা ক্রটি-বিচ্যুতি-হীন হইত না।

পল মুনি

দৈনন্দিন জীবনের মানুষ ক্রটী-বিচ্যুতি হীন হইতে পারেন না। নায়কের এই সব অক্ষমতা দর্শকের কাছে বিশেষ আদর ও প্রশংসনীয়। শক্তিশালী নট যথাযোগ্য অভিনয় দ্বারা দর্শক চিত্তে স্থায়ী আসন রচনা করিয়া তুলেন।

বর্ত্তমান কালের নায়কগণ অবশ্য নিজেদের উপর অসাধারণত্ব আরোপ করিতে তত উৎসুক নহেন। 'বার্কলে স্কোয়ার' নামক অ-সাধারণ রোমান্টিক কাহিনীতে লেসলী হাওয়ার্ড নায়কের চরিত্র চিত্রনে, মানবতার যে অপূর্ব্ব সুন্দররূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা হয়তো জনপ্রিয়তার চরমতম মুহূর্ত্তেও ভ্যালান্টিনোর সকল সম্মান ও শক্তিকে ধূলি-লুণ্ঠিত করিতে পারিত।

জন্ গিলবার্ট, রোনাল্ড, কোল্ম্যান, র‍্যামন নোভারো, জন ব্যারীমুর, ক্লার্ক গেবল, ফ্রেড্রিক্ মার্চ্চ, গ্যারী কুপার, হার্ব্বার্ট মার্শাল, ক্লাইভ ব্রুক, লেস্লী হাওয়ার্ড, আইভর নভেলো, কন্‌রাড ভীড,-জর্জ্জ র‍্যাফ্ট, ফ্র্যান্স টোন, পল মুনী, ওয়ারনার ব্যাক্সটার, চার্লস ফ্যারেল, রিচার্ড বার্থেলমেস্ প্রভৃতি বহু অভিনেতা সমভাবে জন-প্রিয় ও শক্তিমান্।

ইহাদের মধ্যে অধুনা মৃত জন্ গিলবার্ট ও রিচার্ড বার্থেলমেস, রোনাল্ড কোলম্যান প্রভৃতি পুরাতন যুগের অভিনেতার নামও রহিয়াছে। ইহাদের উল্লেখযোগ্য অভিনয় অসংখ্য দর্শকের চিত্ত জয় করিয়াছে সন্দেহ নাই, এবং বোধহয় একমাত্র জন্ গিলবার্ট-ই, টকির আবির্ভাব না হইলে ভ্যালান্টিনোর সমকক্ষ হইতে পারিতেন। ইহা ব্যতীত উপরি উল্লিখিত যে কোনও নটের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও আছে। হার্ব্বার্ট মার্শালের কণ্ঠস্বর, ভিক্টর জেমীর সমবেদনা ও সহানুভূতিপূর্ণ গভীর কালো চোখ, চার্লস্ ফ্যারলের শিশু-সুলভ-চাপল্য, কোমল ও কঠিন পল মুনি, এবং বহু গুণ সম্পন্ন আরো অনেক শক্তিমান নট। ইহাদের একজনেরও সহিত অন্যের কোনও

জন ব্যারিমুর

মিল নাই, একজনের সহিতও ভ্যালান্টিনোর সাদৃশ্য নাই।

ইঁহারা প্রায় সকলেই বিভিন্ন ধরণের ভূমিকা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছেন এবং অভিনয় নৈপুণ্যে হয়ত ভ্যালান্টিনো অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নহেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনও যে কথনো ভ্যালান্টিনো সদৃশ সম্মান, সৌভাগ্য ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারিবেন না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—এবং এ বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই।

বর্ত্তমান কালের অভিনেতাদের কোনও ব্যক্তিগত অসম্পূর্ণতা অক্ষমতা, বা অপরাধ নাই। তাঁহাদের বহু প্রকারের ভূমিকা অভিনয় করিতে হয়, এবং যখন তাঁহারা

কন্‌রাড ভিড

চার্লস ফ্যারেল

শ্রেষ্ঠত্বের শিখর চূড়ায় আরোহণ করিবার যোগ্য হইয়া উঠেন, তখন সাধারণ শ্রেণীর দর্শকের চোখের ঘোর কাটিয়াছে, তাহারা আর তাঁহাকে পূজা করিতে পারে না।

জাগতিক চরিত্র সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত করিতে হইলে তাহার সকল প্রকার সম্পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা চিত্রণেরও প্রয়োজন থাকে, এবং সেই চরিত্র নিখুঁতভাবে অভিনীত হইলে তবেই আমরা তাহা বাস্তব ও বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া স্বীকার করি।

কেহ অবশ্য যেন মনে করিবেন না যে এতদ্বারা আমি প্রাচীনকালের অভিনেতৃদের অভিনীত ভূমিকাবলী প্রাণহীন হইত, বলিতে চাই, আমি ঠিক তাহা বলিনা, তবে অনেক ক্ষেত্রে তাহাতে যে বাস্তব জগতের স্পর্শ থাকিত না তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। তদানীন্তন অভিনয় ও বর্ত্তমানকালীন অভিনয়ের প্রভেদ সুস্পষ্ট। তৎকালীন ও আধুনিক সংলাপের যদি সংমিশ্রণ করা যায় তাহা হইলে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইবে। যে সব আলঙ্কারিক ভাষা তখন পর্দার গায়ে উঠিত, তাহা যদি আজ কথিত হইত তাহা হইলে করুণতম মুহূর্ত্তেও অট্টহাস্যে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত।

সুতরাং ভ্যালান্টিনোর সমসাময়িক হারাণো সুরের জন্য চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেও আমরা বর্ত্তমান্ যুগের প্রাণবান্ অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ করিতে আনন্দ ও উত্তেজনা বোধ করি।

যে বীণার বিশ্ব-বিমোহন সুরে ভ্যালান্টিনো সমগ্র জগৎকে এক সুরে বাঁধিয়া দিলেন সেই বীণা পূর্ণ সুরে অকস্মাৎ ছিন্ন তার হইয়া গিয়াছে,—আজ তাহা সুরহারা হইয়া মূর্চ্ছিত।

নূতন কোনও ভ্যালান্টিনোর সন্ধান অবশ্য চলিবেই, কিন্তু যে সুযোগ, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে ভ্যালান্টিনো যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন, সেই

র‍্যামন নোভারো

সুযোগ ও সম্ভাবনা জীবনে বোধ করি একবার মাত্রই আসিয়া থাকে।

কে জানে, বর্ত্তমানে সেই আবহাওয়া হয়ত সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চিরকালিনী

[মধুর ও করুণরসাশ্রিত নাটক]

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশে। মা—মা—ওঠো—আমায় তিরস্কার করো—

জাহ্নু। [ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া বিশেশ্বরকে দেখিতে দেখিতে] সত্যিই ত বড্ড রোগা হোয়ে গেছিস—

[বিশেশ্বরের মাথা কোলে টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিলেন—চোখের জল গণ্ড বহিয়া বিশেশ্বরের মাথার উপর পড়িতে লাগিল]

মাধ। যাক্ ঠাকুর—নেয়ে-ধুয়ে শুদ্ধু হোয়ে গেলে!

জাহ্নু। হ্যাঁ রে, রাস্তায় ওঁর সঙ্গে দেখা হোলো?

বিশে! না মা, দেখা কোর্ত্তে সাহস হোলো না। দূর থেকে দেখলুম—মাঠের ধারে রাস্তার দিকে চেয়ে একলা দাঁড়িয়ে আছেন। বসুদেবকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে এসেচি।

জাহ্নু। দেখা কোর্ত্তে হয় রে বোকা—তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌তে হয়। তিনি বড় অস্থির হোয়ে উঠেচেন! আমার চেয়েও যে তোকে উনি এত বেশী ভাল বাসতেন—তা কাছে থেকেও এতদিন বুঝতে পারি নি! বসুও কি তোর সঙ্গে এসেচে?

বিশে হ্যাঁ মা, সে-ই দাদাকে নিয়ে আসচে।

জাহ্নু। বৌকে আন্‌লি নে?

মাধ। দেখলে খুড়োঠাকুর, মাঠাকরুণ ঠিক বোলেচেন! আমিও বলেছিলুম মা, খুড়ীঠাকরুণটীকে বিয়ে কোরে বাড়ী নিয়ে চলো—তা খুড়োঠাকুর যে বিয়ে কোর্ত্তে চাইলে না!

জাহ্নু। তুমি কে বাবা?

মাধ। "বাবা" বোলে ডাকলেন্—আবার "কে" জিজ্ঞেস্ কোর্ত্তে হয়? আমি আপনার একটা অযত্নে-অবত্নে ছেলে, মাঠাকরুণ! ওরা একাই মা-কে দেখবে—আমি চাষার ছেলে বোলে কি ঠকে যাবো?

বিশে। মা, তুমি আমায় বোকলে না?

জাহ্নু। ওরে খোকা, তুই বুঝবি নে রে—তুই বুঝতে পার্ব্বি নে! আজ যদি আমার শাশুরী বেঁচে থাক্‌তেন-

[বিশেশ্বরকে আরও কোলের কাছে টানিয়া লইলেন]

মাধ। আমি চাষার ছেলে হোলে কি হয়—বুদ্ধি আছে, ঠিক্ এচে-এচে সব নিয়িচি! নাঃ, এ্যাদ্দিনে বুঝি বাবুকে ছেড়ে এই খানেই আড্ড' গাড়তে হোলো!

[বিশ্বম্ভর ও বসুদেবের প্রবেশ]

বিশ্ব। এই যে বিশেশ্বরবাবু, চুপি চুপি পালিয়ে এসে অভয় দুর্গে আশ্রয় নিয়েচ দেখচি—

বিশে। দাদা! [বিশেশ্বর উঠিয়া প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন]

বিশ্ব। বিশু—না-না! [আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া কঠিনভাবে আত্মসম্বরণ করিয়া] কাছে আসিস্ নে—কাছে আসিস্ নে—তোর প্রণাম আমি নিতে পার্ব্বো না—[বিশেশ্বর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—ইতি মধ্যে জাহ্নবী উঠিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইলেন]

না-না, মায়ে-পোয়ে একযোট হলেও নয়—

জাহ্নু। ওকে এবার ক্ষমা করো।

বিশ্ব। ও কি করেচে জানো?

জাহ্নু। ও যে আমাদের "বিশু" তা ভুলে যাচ্ছো কেন?

বিশ্ব। [সে কথায় কাণ না দিয়া] বিশেশ্বর, চোরের মত দাঁড়িয়ে থেকে নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না। বসুদেবের কাছে আমি সব শুনেছি! তোমার ভাবী-পত্নীস্থানে তুমি এক ব্রাহ্মণ কন্যার মুখ-চুম্বন করেছিলে—তুমি ভাবচো, সেই তোমার গুরুতর অপরাধ? তোমার সে অপরাধ আমি ক্ষমা কোর্ত্তে পার্ত্তাম—কিন্তু তোমার তারপরের আচরণ—পুরুষ মানুষের অযোগ্য। তুমি কুলাঙ্গার—আমি তোমায় ক্ষমা কোর্ত্তে পার্ব্বো না। বসুদেব, তুমিও আমার শিষ্য হোয়ে, ওকে সৎপথে চালাতে পারো নি—তোমার ওপরও আমার অভিযোগ কম নয়, তা জেনো।

বসু। পণ্ডিতমশাই, আপনি কি বোলচেন, ঠিক বুঝতে পাচ্চিনে। বিশুকাকা, গোড়ায় অবিশ্যি একটা গুরুতর অপরাধ কোরে ফেলেছিলেন—তা মানচি—কিন্তু তারপর ওঁর ব্যবহার—ভদ্রলোকের যা হওয়া উচিত, তা ত ঠিকই হয়েচে। তিনি যে একজনের বাক্‌দত্তা—তা উনি আগে জান্‌তেন না—পরে জানতে পেরেছিলেন।

বিশ্ব। মূর্খ, সে বাক্‌দানের মূল্যের চেয়ে কুমারীর দেহ-মনের পবিত্রতা যে কত উচ্চে—তা বোঝবার তোমাদের শক্তি কোথায়? ও পত্নীস্থানে সেই বালিকাকে স্পর্শ কোরে তার কুমারীত্ব অপহরণ করে নিয়েছিল —সেই অপহরণের অপকার্য্যকে বিবাহের মন্ত্রে অগ্নিশুদ্ধ করাই ওর সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম—তার কাছে তোমাদের অন্য সকল যুক্তিই তুচ্ছ—অধর্ম্ম—পাপকার্য্যের প্রশ্রয়!

বসু। কিন্তু তিনি যে অন্যের অনুরাগিনী

বিশ্ব। মিথ্যা কথা! তোমরা সে বালিকাকে বোঝবার কোনও চেষ্টা করেছিলে? তোমাদের নিশ্চেষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত নেই!

বসু। তিনি নিজেই যে সব কথা সুবোধবাবুকে প্রকাশ কোরে দিয়েছিলেন—

বিশ্ব। তাই যদি—তাতেই বা কি আসে যায়? সে বালিকা—তার হৃদয়ের কোন যুক্তি মানা এ ক্ষেত্রে তোমাদের ধর্ম্ম নয়—তা জেনো। দেহের পবিত্রতা রাখতেই হবে—হৃদয়ের গতি সাধনার ফেরে—দেহকে রক্ষা কল্লে তবে সেই পথ খোলা থাকে, নইলে জন্মের মত বন্ধ হোয়ে যায়। ও যদি মানুষ হোতো, তা হোলে যে দেহ ও স্বামীত্বের পৌরুষ নিয়ে স্পর্শ করেছিল, তাকে ছলে-বলে-কৌশলে অধিকার করাই ছিল ওর ধর্ম্ম! বালিকা—বালিকার কর্ত্তৃপক্ষেরা স্বীকার করুক বা না করুক, বালিকাকে পত্নীত্বে স্বীকার করাতে বাধ্য করাই ওর মনুষ্যত্ব! তা না কোরে, ও যে দুষ্কার্য্য কোরেচে—আমি মানুষ হোয়ে কিছুতেই তা ক্ষমা কোর্ত্তে পার্ব্বো না।

বসু। পণ্ডিত মশাই,—আপনি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ হোয়ে—আমরা যে কল্পনায় আন্‌তে পাচ্চি নে—

বিশ্ব। পার্ব্বে কোথা থেকে? তোমরা যে ইংরিজি পড়ে অধঃপথে গেছ! তোমাদের ভদ্রতা তামসিক কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র ধর্ম্ম যে কি বস্তু—তা বোঝবার শক্তিও যে তোমরা হারিয়েচ। তোমাদের পান্‌সে চোখের জল একটুতেই ঝরে, একটুতেই শুকোয়, তোমরা ভাবের বুদ্‌বুদ্ নিয়ে খেলা করো—তার গভীরতা কতক্ষণ—কতটুকু তোমাদের কাছে? বসুদেব, সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল নয়, তামসিক ভদ্রতাই দুর্ব্বলতা। ব্রাহ্মণের ভয় নেই—সে ধর্ম্মকে জীবন-পণেও রক্ষা করে, তাকে বিলাসের আলস্যে ক্ষণিকের মোহ বলে উড়িয়ে দ্যায় না। আমি যদি সেই কন্যার পিতা হোতুম, কি কর্ত্তুম জানো? আমি ওই বাবুটীর সঙ্গে যেমন কোরেই হোক্ তার বিবাহ দিতুম—যদি তার পূর্ব্বে—জাহ্নবী পালাও—পালাও, শুন্‌লে সহ্য কোর্ত্তে পার্ব্বে না—হ্যাঁ হ্যাঁ—যদি তার পূর্ব্বে বাবুটীর মৃত্যু হোতো—তাহোলে কন্যাকে বিধবা বোলেই জানতুম। এই আমার ধর্ম্ম—এই আমার সাত্ত্বিকতা! বসুদেব, আর আমায় উত্ত্যক্ত কোরো না—আমি নিরুপায়!

[জাহ্নবী বিশ্বেশ্বরের হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন]

জাহ্নবি, দাঁড়াও—আমার শেষ কথা এখনও বলা হয় নি। বিশ্বেশ্বর, তুমি যে অন্যায় করেছিলে,—তার প্রতিবিধানের উপায় তোমার হাতেই ছিল। সে চেষ্টা যদি কোর্ত্তে, তাহোলে সেই অন্যায় ধর্ম্মের গৌরবে পরিণত হোতো। তা না কোরে তুমি আমার ব্রাহ্মণ বংশের অভিমানে ঘা দিয়েছ, অধর্ম্ম করেচ—আমি তা সহ্য কোর্ত্তে পার্ব্বো না। আমি তোমাকে পরিত্যাগ কর্লুম। জাহ্নবি, আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিচি—তুমি তোমার পথ বেছে নিতে পারো।

[জাহ্নবী ক্ষণেক ইতঃস্তত করিলেন—পরে]

জাহ্ন। বিশ্বেশ্বর—আমার আশীর্ব্বাদ তোমার সঙ্গে রইল—[স্খলিতপদে ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন]

বিশ্বে। দাদা, আমার মায়ের জীবন ভিক্ষা দাও—আমায় ক্ষমা করো—

বিশ্ব। মাতৃঘাতী সন্তান—বুঝতে পেরেচ ত? তবুও ক্ষমা নেই! [ক্ষণেক পরে] হ্যাঁ—হ্যাঁ, ক্ষমা কোর্ত্তে পারি—যদি সেই বালিকাকে ধর্ম্ম-পত্নী কোরে সঙ্গে আন্‌তে পারো—

বিশ্বে। সে যে অসম্ভব—হয়ত তার বিয়ে হোয়ে গেছে।

বিশ্ব। তাহোলে শুধুই তোমাকে পরিত্যাগ কর্ব্বো না—অভিশাপে দগ্ধ কোরে—

[ভারতী, কালিন্দী ও সুবোধের প্রবেশ]

ভার। বাবা—বাবা—সন্তানকে রক্ষা করুন—

[বিশ্বম্ভরের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িলেন]

বিশ্ব। জাহ্নবী—জাহ্নবী, কে এলো ছাখো ত—?

[জাহ্নবী ত্রস্তে প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—]

কালি। ওমন কোরে দাঁড়িয়ে রইলে যে? তোমার ছেলের বৌ এসেচে, দেখচো না?

[জাহ্নবী এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভারতীকে উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন]

বিশ্ব। দেখি, দেখি—অনেকদিন থেকে দেখবার সাধ দেখি—

[জাহ্নবী ভারতীকে উঠাইয়া অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন]

এই মুখ দেখেও চিন্‌তে পারিস্ নি রে?

ভার। মা, আপনার সন্তানের বিচার আপনারা কর্ব্বেন—আমায় কিন্তু আপনাদের গ্রহণ কর্ত্তেই হবে—[জাহ্নবী ভারতীর চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন]

বিশ্ব। জাহ্নবী, শৈশবে তুমি যে ওই মুখটার শিশুমুখ চুম্বন করেছিলে, তার মাহাত্ম্য যাবে কোথায়? [ভারতীর প্রতি] মা, তোকে যে গ্রহণ কর্ব্বার জন্যে ব্যাকুল আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছি। তুই কি বুঝবি মা—তুই আমাকে কতখানি রক্ষা করেচিস্। তুই আমার বিশুকে বাঁচিয়েচিস্—জাহ্নবীকে বাঁচিয়েচিস্—আমাকে বাঁচিয়েচিস্। 'বিশু' আয় ভাই, বুকে আয় [অগ্রসর হইয়া বিশ্বেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া] নারায়ণ—নারায়ণ! কালিন্দি, দেখচিস্, ছাখ্-ছাখ্, দুর্ব্বাসার পারণ ছাখ!

সাধ। [বসুদেবের প্রতি] বাবু, এমন

গুরুমশয়ের পাঠশালায় পড়েও এই মেয়েটার ভাজ ধরে ভালুক নাচিয়েই বেড়ালে ?"

বিশ্ব। [ভারতীর প্রতি] কার সঙ্গে এলে মা ? তোমার পিতামাতার অনুমতি নিয়ে এসেচ ত ?

ভার। বাবার অনুমতি নেওয়া হয় নি, শুধ্ মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসেচি। সে-সব কাজ আপনাকেই কোর্ত্তে হবে। যার সঙ্গে এসেচি—তিনি দেবতা। দেবতার ত পরিচয় দিতে হয় না, বাবা ?

বসু। তাই-ত, সুবোধবাবু যে ? ভারি আশ্চর্য্য ত ?

[অগ্রসর হইয়া সুবোধকে অভিবাদন জানাইলেন]

বিশ্বে। তাই-ত ! [সুবোধকে অভিবাদন করিলেন]

সুবো। বিশ্বেশ্বর বাবু—আপনি ভাগ্যবান। আপনাদের সংস্পর্শে এসে নিজেকেও আজ ভাগ্যবান বোলে মনে করচি !

বিশ্ব। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় ! মা, মা, তুই কে মা ? তুই যে আজ আমাকেও আচ্ছন্ন করে দিলি !

সুবো। [অভিবাদন করিয়া] ব্রাহ্মণ, চিন্‌তে পারেন কি ? বোলেছিলেন—আবার দেখা হবে !

বিশ্ব। দেখা হবে—দেখা হবে, নয় ? এসো—এসো তোমাকে যে চোখ দিয়ে দেখবো, সে চোখ আমার কাছে নেই ! এসো—এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

[সুবোধের হাত ধরিয়া পূজা-গৃহের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন]

[জাহ্নবী ভারতীকে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন]

বসু। কিছু বুঝতে পাচ্ছো, বিশুকা ? সুবোধবাবু ওকে তোমাদের বাড়ী ব'য়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন—এ যে চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস কোর্ত্তে পার্ত্তুম না !

বিশ্বে। বসুদেব, এতক্ষণ আমি দাদাকে দেখেই অবাক্ হোয়েছিলাম—এখন কে যে বড়, বুঝতে পাচ্ছি নে !

কালি। কে বড় শুনবে ? সবার বড় এই মেয়েমানুষের মন—যা তোমার মা—তোমার ভারতীর ভেতর চিরকালিনী হোয়ে থেকে তোমাদের চিরকাল এমনই মুগ্ধ কোরে রেখে দেবে !

[জাহ্নবী ভারতীকে লইয়া প্রবেশ করিয়া]

জাহ্ন। আর তুমি বুঝি কেউ নয় ?

কালি। আমি যে "মা" হোতে পেলাম না দিদি, একচোখ কাণা হোয়েই রইলুম !

জাহ্ন। না বোন্—একটু আগে আমরা গঙ্গা আর যমুনা ছিলুম—এইবার সরস্বতী এসে যোগ দিয়েচে—আমরা তিন বোনে মিশিয়ে এক হোয়ে গেলুম !

মাধ। বাবু গো, এই বেলা ত্রিবেণীতে একটা ডুব দিয়ে ঘর যাই চলো !

[পূজাগৃহের দ্বার খুলিয়া বিশ্বম্ভর ও সুবোধ বাহিরে আসিলেন—ধূপ-ধূনার গন্ধে গৃহ আমোদিত হইতে লাগিল]

বিশ্ব। সুবোধ, তোমাকে দেবদর্শন করিয়েচি—তোমার জীবন ধন্য হবে। আত্মত্যাগ মানুষেরই ধর্ম্ম—তুমি সেই ধর্ম্ম পালন করেচ—তুমি বিশ্বেশ্বরের চেয়েও ভাগ্যবান !

সুবো। ভারতী, এই ব্রাহ্মণের কৃপায় এতদিন পরে তোমার ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝতে পারচি ! সে তোমাকে যেমন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, আমাকে আজ তেমনই শান্ত কোরেচে !

বিশ্ব। সুবোধ, আমি তোমায় দীক্ষা দান কোর্ব্বো। তারপর, তোমাকেই আমার ভারতী মাকে সম্প্রদান কোর্ত্তে হবে—তুমিই ওদের বিবাহে সম্প্রদান কর্ব্বার যোগ্য ব্যক্তি—আমাকে কন্যাকর্ত্তাদের আমন্ত্রণ করে সেই ব্যবস্থাই কোর্ত্তে হবে। কালিন্দি, তুই এই বিয়ের এয়ো হবি, কেমন ?

কালি। বেশ !

ভারতী ধীরে ধীরে সুবোধকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

বিশ্ব। জাহ্নবী, আজ আনন্দের দিনে একটা কথা মনে পোড়চে। বিশু যখন তোমাকে "মা" বোলে ডাক্‌তো, আমি এক-একদিন কান পেতে শুনতুম। আমার মনে হোতো কি জানো ? মনে হোতো, একটা মেয়ে যদি থাক্‌তো, তাহোলে আমিও তাকে ওমি কোরে "মা" বোলে ডেকে, মাকে ডাকার সাধ মিটিয়ে নিতাম। নারায়ণ এতদিন পরে আমার সেই সাধ মেটালেন ! এই বড়লোকের মেয়েটা যেচে আমাদের গরীবের ঘরে এসে উঠেচে। এখন থেকে প্রাণ ভোরে ওকে "মা" বোলে ডেকে, ওর গরীবের ঘরে থাকার সব দুঃখ ভুলিয়ে দোবো। সুবোধ, চুপ কোরে দাঁড়িয়ে কেন ভাই ? আজ কি মনের ভেতর দুঃখ রাখতে আছে ? আজকের এই আনন্দ-সাগরে ক্ষুদ্র জীবনের সুখ দুঃখ ভাসিয়ে দিয়ে আনন্দময়ী প্রেমময়ীর চরণে শরণ নাও। কালিন্দি, সুবোধকে একখানা গান শুনিয়ে দিতে পারিস্ ?

—কালিন্দীর গান—

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে,
(শ্যামাপদ নীলকমলে, কালীপদ নীলকমলে)
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হোলো কামাদিকুসুম সকলে !
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
পঞ্চ তত্ত্ব, প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে !
কমলাকান্তের মনে আশাপূর্ণ এতদিনে,
তায় সুখদুঃখ সমান হোলো, আনন্দ সাগর উথলে !

—যবনিকা—

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড (সাউথ), কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৬শে কার্ত্তিক ১৩৪৩—১২ই নভেম্বর—১৯৩৬ } ৪৩শ সংখ্যা

"বাক্যবীরের বেশে তুমি কোর্‌লে বাঙ্‌লা জয়"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ২রা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সম্মতিতে ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রচেষ্টায় বাঙ্‌লা ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মধ্যে মর্ত্ত-সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বিগত ৮ই নভেম্বরের অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে, শরৎবাবু উক্ত সামঞ্জস্য সাধনে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বাঙ্‌লার রাষ্ট্রীয় কমিটীর মত পরিবর্ত্তন করিয়া কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের মত বাঙ্‌লাকে গ্রহণ করাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি যে এ বিষয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছেন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙ্‌লার রাষ্ট্রীয় কমিটী যদি স্বমতে দৃঢ় থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারা বাঙ্‌লার জনসাধারণের মতানুযায়ী কার্য্য করিতেন।

পণ্ডিত জওহরলালের বাঙ্‌লা পরিভ্রমণ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে :— "বাক্যবীরের বেশে তুমি কোর্‌লে বাংলা জয়"। ২রা সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবের সমর্থনকল্পে অভিনব ভাষ্যের অবতারণা করিয়া শরৎচন্দ্র যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং লাহোরে বাঙ্‌লার বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়া যে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন উড্‌বার্ণ পার্কের কংগ্রেসী বৈঠকে পণ্ডিত জওহরলালের নির্দ্দেশকে নতমস্তকে বরণ করিয়া শরৎচন্দ্র বাংলা কংগ্রেসে একতা স্থাপন করিলেও তিনি স্বীয় ব্যক্তিত্বের অবমাননা করিয়াছেন।

পাঞ্জাব ও মধ্য-প্রদেশ শরৎচন্দ্রের অনুগামী হইয়া নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্থাপিত করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্রের আত্মসমর্পণে সেই ধ্বজা অবনমিত হইল এবং ভবিষ্যতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নেতৃবৃন্দের কর্ম্মপদ্ধতি অধিকতর স্বৈরাচারমণ্ডিত হইবে। বাঙ্‌লার বাহিরের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের চাপে পড়িয়া বাঙ্‌লার কংগ্রেসী দলের হিন্দু সমাজের সহিত নাড়ীর যোগ ছিন্ন হইয়াছে।

আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতির তল্পিদার রূপে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হয় তো নির্ব্বাক বিস্ময়ে দর্শন করিবেন :—

> "ওই তব সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া অকারণ
> গুনিতেছে লহরী কি রণ পয়োধির ?"

শ্রীদুর্ব্বাসা
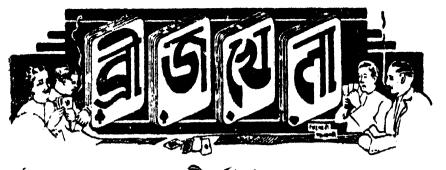
থেটা বেটা ক্লাবের গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতা ঃ—ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সভ্য উত্তর কলিকাতার থেটা বেটা ক্লাবের উদ্যোগে কণ্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট উক্ত ক্লাবের নিখিল ভারত গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতায় নামদানের শেষ দিবস হয়ে এল, খেলাও আরম্ভ হবে শীঘ্রই। এখন থেকেই কলিকাতার ব্রীজ-মহলে উৎসাহের সাড়া পড়ে গিয়েছে বেশ। ডুপ্লিকেট কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ খেলায় ভারতবর্ষে যে সকল প্রতিযোগিতা চলে কলিকাতার গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতা তন্মধ্যে অন্যতম, শ্রেষ্ঠতম বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই প্রতিযোগিতায় সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রীজ খেলোয়াড়েরা খেলতে আসেন। গত বৎসর বিজয়ী হয়েছিলেন সুদূর হায়দ্রাবাদের প্রতিযোগীরা এবং ফাইন্যালে পরাজিত হয়েছিলেন কলিকাতার ল্যান্সডাউন ক্লাব। বাহিরের দল বিজয়ী হয়েছিলেন বলেই এ অবশ্য স্বীকার করা যায় না যে, বহিঃপ্রদেশের ডুপ্লিকেট কণ্ট্রাক্ট খেলার standard কলিকাতার standard অপেক্ষা ভাল। অবশ্য বিজয়ী যাঁরা হয়েছিলেন গৌরব তাঁদের প্রাপ্য বটেই, কিন্তু এতে কলিকাতার খেলোয়াড়দের অগৌরবের কিছুই নাই। সাধারণ যাঁরা ব্রীজ খেলার মর্য্যাদা বুঝেন না কেবল তাঁরাই বলে থাকেন যে আমাদের এখানকার খেলার standard ভাল নয়। যেখানে সত্যই কোন জিনিষটা ভাল নয় সেখানে সেইটাকে ভাল বলে প্রতিপন্ন করতে যাওয়ার চেষ্টা প্রশংসনীয় হতে পারে না কিন্তু যেখানে সত্য, যেটা ভাল সেখানে শ্লাঘা করাটা দোষের হলেও স্বরূপ আলোচনায় বোধ হয় কোন ক্ষতি নাই। এমন একদিন অবশ্য ছিল যখন কলিকাতায় এই কণ্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট খেলার প্রচলন হয় নি, কয়েকটি বিশিষ্ট ক্লাবের কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় এই খেলা খেলতেন কিন্তু আজ বছরের উপর হতে চলল এই খেলার চর্চ্চা বেশ ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। এখন এই খেলা কোন ক্লাব বিশেষে বা খেলোয়াড় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এখন প্রায় প্রত্যেক ক্লাবই, এমন কি ছোট ছোট ক্লাব গুলিতেও এ খেলা চলেছে এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সংখ্যাও দিন দিন বেশ বাড়ছে। আশা করা যায় আগামী গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতায় খেলার standard বেশ সুরক্ষিত হবে। তবে কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ খেলতে গেলে যে সকল শিক্ষার প্রয়োজন সেই ধরণের শিক্ষাকে রীতিমত আয়ত্ব করা চাই। আমাদের দেশে একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে "তাস, দাবা, পাশা তিনই কর্ম্মনাশা" কিন্তু ব্রীজ খেলার বেলা এ কথাটি খাটে না কারণ যাঁরা এই খেলা জানেন তাঁরা এই নিন্দাবাদের বিরুদ্ধে বরং মেনে নেবেন যে এই খেলা পূর্ণমাত্রায় বিজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত। যাঁরা বোঝেন না বা জানেন না তাঁরা অবশ্য ব্রীজের মর্য্যাদা দিতে পারবেন না। যা' হোক কিন্তু ব্রীজ খেলা যখন সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলে থাকে তখন এই বিজ্ঞানের আয়ত্বের নিমিত্ত যথেষ্ট শিক্ষার আবশ্যক। বিশেষতঃ আবার ব্রীজ খেলার ভিতরে ডুপ্লিকেট কণ্ট্রাক্ট খেলা বিশেষ জ্ঞান ও বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। এ কারণ যথেষ্ট পড়াশুনা না থাকলে ডুপ্লিকেট ব্রীজ শুধু দেখেই আয়ত্ব করা অসম্ভব এবং শিখলেও তার গভীরতা হবে অল্প। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রীজখেলা খেলতে গেলে যে সকল বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তার সন্ধান যাঁর জানা নেই খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। তবে একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে theoretical জ্ঞান যদি অভ্যাসের দ্বারা পরিপুষ্ট না হয় তা' হলেও খেলার সময় অনেক গোলযোগ ঘটে থাকে। গোল্ড কাপের খেলা আরম্ভ হতে যদিও বিশেষ দেরী নেই আমাদের

বিশ্বাস উদ্‌যোগী প্রতিযোগীরা যদি আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে থাকেন তবে খেলার standard যে খুব ভাল হবে এবং প্রতি-দ্বন্দ্বিতা বেশ উপভোগ্য হবে তার কণামাত্র সন্দেহ নেই।

সমস্যার সমাধান:— বিগত ২৫শে ভাদ্র ৩৭শ সংখ্যায় "খেয়ালীতে" প্রকাশিত ব্রীজ সমস্যার সমাধান নিয়ে প্রদত্ত হল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনেকেই এই সমস্যাটির নির্ভুল সমাধান করতে সমর্থ হন নাই।

স্বচ্ছন্দে চিড়িতন খেলে নেবেন; আবার যদি তিনি ইস্কাবন পাশিয়ে যান তা'হলে 'উ' ইস্কাবনে একখানি পিট পেয়ে যাচ্ছেন। অতএব 'প' একখানি রুহিতন পাশালেন এবং 'উ' ও 'পূ' যথাক্রমে একখানি ইস্কাবন ও একখানি রুহিতন পাশিয়ে গেলেন। সুতরাং 'দ' এর পর ইস্কাবন পেড়ে খেলায় 'উ' টেক্কা দিয়ে পিট ধরলেন। এখন 'পূ'র তাস দেবার উপর পরের চাল নির্ভর করছে। মোটের উপর ডাককারীদের খেলা হয়ে যাচ্ছেই।

এখন দ্বিতীয় পিটের বেলায় 'পূ' যদি

ইস্কাবন—টেক্কা, চৌকা, দুরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—চৌকা, দুরি।
চিড়িতন—পাঞ্জা, তিরি।

ইস্কাবন—সাহেব, ছক্কা, পাঞ্জা
হরতন—নাই।
রুহিতন—সাহেব, পাঞ্জা
চিড়িতন—দশ, নয়।

ইস্কাবন—বিবি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, তিরি
চিড়িতন—আটা, ছক্কা, দুরি।

ইস্কাবন—সাতা, তিরি।
হরতন—ছক্কা, চৌকা।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—টেক্কা, গোলাম, সাতা।
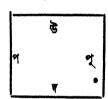
হরতন রঙ, 'দ' খেলবেন। সকল বাধা সত্ত্বেও মিলিত হস্তে 'উ' এবং 'দ'কে ছয়খানি পিট নিতে হবে।

'দ' প্রথমে ইস্কাবনের তিরি, পেড়ে খেলবেন। এর উপর নিশ্চয়ই 'প' এবং 'উ' ছোট তাস দিয়ে যাবেন, তার ফলে 'পূ' ইস্কাবনের বিবি দিয়ে পিট ধরবেন। এখন যদি 'পূ' রুহিতন পেড়ে খেলেন, তবে 'দ' তুরূপ করে পিট নিয়ে চিড়িতনের টেক্কার পিটখানি নিয়ে নেবেন এবং রঙের আর একখানি পিটও ধরে নেবেন। অতঃপর এ ক্ষেত্রে যদি 'পূ' একখানি চিড়িতন পাশিয়ে যান তা'হলে বিপক্ষদল 'উ'র হাত দিয়ে

ইস্কাবনের বিবির পিট নিয়ে রুহিতন না খেলে চিড়িতন পেড়ে খেলেন, তা'হলে খেলতে হবে নিম্নলিখিতভাবে। 'দ' এই চিড়ের পিটখানি ধরবেন এবং রঙ চালবেন। এ ক্ষেত্রে সকলেই রুহিতন পাশিয়ে যাবেন; অতএব 'দ' যদি পুনরায় রঙ খেলে যান তা'হলে এমন অবস্থা এসে যাচ্ছে যেন 'পূ' রুহিতন পেড়ে খেলেছেন, আর 'দ' তুরূপ করেছেন। পরের চালগুলি প্রায় পূর্ব্বের মতই চলবে। এ সমস্যাটির সমাধান করতে হলে একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদাই উদ্দেশ্য থাকবে 'পূ'কে নিষ্কাশিত (squeezed) করা, তা না হলে সমাধান অসম্ভব।

রাজসাহী জেলায় ঘোড়ামারা পোঃর অন্তর্গত "ফোর ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাবের" পক্ষ থেকে শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসাক ও শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ধর, চুচুড়া খড়ুয়া বাজার থেকে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হাবড়া শিবপুর থেকে শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় আমাদের এই সমস্যার নির্ভুল উত্তরদানে সমর্থ হয়েছেন। এদের প্রত্যেকেরই সমালোচনা আমাদের চমৎকার লেগেছে।

ভেনাস্ ক্লাব:—বিগত ৩রা অক্টোবর শনিবার আটটার সময় এই ক্লাবের পুরস্কার বিতরণী সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ব্রীজ এসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ঐই সভার সভাপতির কার্য্য পরি-চালনা করেন। নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে বিজয়ীদলকে মেডেল ও কাপ বিতরণ করা হয়।

অকসন সিঙ্গলস্—মিডনাইট ক্লাব।

অকসন ডুপ্লিকেট—হাওড়া সান্ডে ক্লাব।

কণ্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট—শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাব।

সম্পাদক মহাশয়ের যথারীতি রিপোর্ট পাঠের পর যামিনীবাবু একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর বক্তৃতা করেন। সে প্রসঙ্গে যথার্থই তিনি বলেন যে ভেনাস ক্লাব এই বৎসরে ব্রীজ জগতে আপনাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করেছেন। তদ্ব্যতীত তাঁদের নিজেদের ক্লাবের প্রতিযোগিতাটিও কোনরূপ পক্ষপাত দুষ্টভাবে পরিচালিত হয় নাই। এজন্য তিনি তাঁদের অভিনন্দিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গোল্ড কাপের কথাও উল্লেখ করেন এবং কলিকাতার প্রত্যেক ক্লাবকে এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার জন্য উৎসাহিত করেন। পরিশেষে ভেনাস্ ক্লাবের চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারে সুপ্রচুর ভূরিভোজনের পর অনুষ্ঠানটির সমাধা হয়। পুরস্কার বিতরণ সভায় ব্রীজ

এসোসিয়েশনের সম্পাদক যতীশবাবু, সহকারী সম্পাদক মণিবাবু, সুবিখ্যাত সাংবাদিক শুকুমারবাবু, নীতীশবাবু, সত্যকেতুবাবু, বিশ্বনাথবাবু প্রভৃতি ব্রীজ জগতের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। ভেনাস্ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ সমবেত সকলের প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও অভ্যর্থনা প্রদর্শন করে-ছিলেন।

ক্যালকাটা সান্‌ডে ক্লাব :— ঐ দিন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় এই ক্লাবেরও পুরস্কার বিতরিত হয়। এই সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন এসোসিয়েশনের জনপ্রিয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশ বসু। ফাইন্যালের দুইটী পুরস্কারই ল্যান্সডাউন ক্লাব লাভ করেন; আর, সেমি-ফাইন্যালের পুরস্কার প্রাপ্ত হন ওরিয়েণ্টাল ব্রীজ ক্লাব। পুরস্কার বিতরণী সভায় যামিনীবাবু, মণিবাবু, সত্যবাবু, অনিলবাবু, বিশ্বনাথবাবু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণের পর সভাপতি মহাশয় তাঁর মনোরম বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে কয়েকটি কথা বলেন তার সার মর্ম্ম নিম্নে দিলাম।

তিনি বলেন, "আপনাদের অনুষ্ঠিত এই মঙ্গল যজ্ঞে আমাকে পৌরাহিত্যপদে বরণ করায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আমাকে সভাপতিপদে বৃত করিয়া আপনারা ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসো-সিয়েশনের প্রতি যে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন তজ্জন্য আপনাদের কার্য্যকরী সমিতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এসোসিয়েশনের প্রতি আপনাদের এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এক ক্লাব হইতে অন্য ক্লাবে সংক্রামিত হইয়া এসোসিয়েশনকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করুক। এই মহানগরীর এবং পরে বাঙ্‌লার ও ভারতের অন্যান্য ব্রীজ ক্লাবগুলি ইহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়া ইহা শক্তি ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তুলুক। আপনাদের সমবেত চেষ্টায়, আপনাদের ঐকান্তিক যত্নে আমার স্বপ্ন ফলবতী হইয়া উঠুক ইহাই আমার একান্ত কামনা।—"

পরিশেষে তিনি ল্যান্সডাউন্ ক্লাব ও ওরিয়েণ্টাল ব্রীজ-ক্লাবের ক্রীড়ানৈপুণ্যের এবং ক্যাল্‌কাটা সান্‌ডে ক্লাবের কার্য্যকরী সমিতির সুন্দর পরিচালনায় ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতাটি শেষ করেন।

বাংলা ভাষার প্রভাব

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

সমগ্র ভারতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা দু'শতের উপর তন্মধ্যে আমাদের এই বাংলা ভাষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এর বৎসামান্য আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিও আছে। রবীন্দ্রনাথের মূল গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য ইউরোপের অনেক মনীষী বাংলা শিক্ষা করেছেন। লণ্ডনে বাংলা ভাষার একজন ইংরেজ অধ্যাপক বলেছেন "এক বৃটিশ সাম্রাজ্যে দুটি ভাষা, প্রথম ইংরাজি, দ্বিতীয় বাংলা।" শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় তাঁর "বর্ত্তমান জগৎ" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে তিনি রাশিয়ার কোন একটি লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখেন যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রন্থই সেখানে অতি যত্নে সজ্জিত আছে। এইসব দৃষ্টান্তে মনে হয় বিদেশে বাংলা ভাষার আদর আছে। তবে সে যে কতটুকু তা বিচার করে দেখবার মত অবস্থা আজও হয়নি। কিন্তু বাংলা ভাষার জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে এর আদর কতটুকু এবং নিজের প্রদেশ এই বাংলা দেশে এর প্রভাব কতখানি তা চিন্তা করে দেখবার বিষয়।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভা (Indian National Congress) সর্ব্ব ভারতের এক-মাত্র প্রতিপত্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব আগে বাঙ্গালীরাই করেছেন। কিন্তু তাঁরা বাংলা ভাষাকে কংগ্রেসের ভেতর চালাবার চেষ্টা করেন নি। হিন্দী ভাষাভাষিগণ প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসে হিন্দী চালাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এর যে কোন অধিবেশনে অন্য ভাষাভাষিগণ বক্তৃতা করতে উঠলেই তাঁরা হিন্দী হিন্দী বলে চীৎকার করতে থাকেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গত অধিবেশনে হিন্দীকে কংগ্রেসের ভাষা করে নেবার জন্যে একটা প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু পাশ হয়নি। না হলেও কংগ্রেসের অনেক কাজ এবং অনেক বক্তৃতা এখন হিন্দীতেই হয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হবার যোগ্যতা এবং দাবী বাংলারই সবচেয়ে বেশী একথা বাঙ্গালীরা মুখে না বললেও মনে মনে বলে থাকেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে-মাতরম" এবং রবীন্দ্রনাথের "জনগন মন অধিনায়ক" গান দুটি ছাড়া কংগ্রেসে বাংলা ভাষার আর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। হিন্দীভাষিগণ বলে থাকেন ভারতের অধিকতর সংখ্যক লোক এই ভাষায় কথা বলে। অর্থাৎ দশ কোটি। আর বাংলা ভাষায় কথা বলে সাত কোটি লোক। কিন্তু আগ্রাই হিন্দী এবং পাটনাই হিন্দী এক নহে। তাদের সাহিত্যও বিভিন্ন। এ ছাড়া ঐ দুই প্রদেশের মুসলমানগণ উর্দ্দু ভাষায় কথা বলেন। কাজেই উপ-রোক্ত সংখ্যাও নির্ভুল নহে। কিন্তু তাঁদের উৎসাহের অন্ত নেই। তারা ভারতে হিন্দী প্রচারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় এবং

বহু পুরস্কার বিতরণ করছেন। আবার এর পিছনে আছে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহাত্মা গান্ধীর অফুরন্ত সাহায্য। এর মধ্যেই দু একটি বিষয়ে, বিশেষ করে অর্থনীতি বিষয়ে পুস্তক এবং পাঠক সংখ্যা বাংলা অপেক্ষা অনেক বেশী হয়ে গেছে। এই সকল পুস্তকের অনেক লেখক পাঞ্জাবী মাদ্রাজী প্রভৃতি ভিন্ন ভাষাভাষী। অথচ সারা ভারত ঘুরে এলেও অবাঙ্গালীদের মধ্যে কোন বাংলা সাহিত্যের সেবক দেখতে পাওয়া যায় না। যে সব বাংলা বই অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হচ্ছে অনেক স্থলে তার মৌলিক দাবীকেও অস্বীকার করা হচ্ছে। দু একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলা ভাষাকে তাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। এই হল ভারতে বিশ্বসাহিত্য বলে গণ্য বাংলা সাহিত্যের আদর।

এখন এর নিজের প্রদেশের কথা ধরা যাক। বৃহত্তর বঙ্গ হিসাবে আসাম প্রদেশকে বাংলার সঙ্গে ধরা যেতে পারে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখেছেন "আসামী ভাষা ও বাংলা ভাষা।" বাস্তবিক জেলা ভেদে যেটুকু উচ্চারণের বিভিন্নতা আসামী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মাত্র সেইটুকু পার্থক্য। কিন্তু ঐ ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষা সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারেনি। সিকিন রাজ্য বাংলা দেশের অন্তর্গত। কিন্তু বাংলা ভাষা সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। অথচ হিন্দী অবাধে রাজত্ব করছে। দার্জ্জিলিং জেলার অধিবাসীদের উপর বাংলা ভাষার প্রভাব অতি অল্প নিজের প্রদেশেই যার এই অবস্থা সে অপরের প্রদেশ জয় করবে কিরূপে?

কলকাতা সহর বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু। তার জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র, তার "Culture House"। অথচ হিন্দী না জানা মফঃস্বলের কোন লোক কলকাতায় এলে যেটুকু অসুবিধায় পড়ে বাংলার বাইরের কোন বাংলা না জানা লোক কলকাতায় এলে সেটুকু অসুবিধাও ভোগ করে না। কলকাতার ছেলে একটু রাস্তায় বেড়াতে শিখলেই লিখতে পড়তে পারুক না পারুক বলবার মত চলন সই হিন্দী, সে আয়ত্ব করে নেয়। সে বুঝতে পারে এ না শিখলে তার চলবে না। কোন প্রদেশে গিয়ে সেখানকার ভাষা শিক্ষা না করে অনায়াসে ব্যবসা বাণিজ্য চালান কেবল এই বাংলা দেশেই সম্ভব। শিক্ষিত কৃতবিদ্য হাজার হাজার বাঙ্গালী বাংলার বাইরে গিয়ে বাংলা ভাষা প্রচার করতে পারেন নি। আর অশিক্ষিত নিরক্ষর অবাঙ্গালী এখানে জনমজুরী করতে

আষাঢ়ের সন্ধ্যায়

শ্রীসুধীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ়ের সন্ধ্যায়—
জানি প্রিয় তাও জানি,—
মনে পড়েছিল বিগত দিনের বিস্মৃত স্মৃতিখানি।
তুমি ভেবেছিলে মনে—
তব চরণের চিহ্ন অন্বেষণে
কেটে যাবে মোর দিনগুলো অবশেষ।
তব স্বপ্নের সে সুখ-সৌধ আকাশ ছুয়েচে রাতে
নয়নে লেগেছে মেঘ-মেদুরের মায়া
তখন আকাশে আধ আলো আধ ছায়া।
বাস্তব-কারা-অর্গল টুটে স্বপ্ন কেমনে যেন
মুক্তি পেয়েছে আষাঢ়ের সন্ধ্যায়
পুলকের সেই উচ্ছল বন্যায়
অঞ্চলে বাঁধি পথের পাথেয় স্মৃতির গুঞ্জন
অলস অবস মন
ভেসে চলেছিল অজানা নিরুদ্দেশে।
তুমি বসেছিলে খোলা বাতায়নে আধনিমিলিত আঁখি
তখনো চন্দ্র মেঘতলে ছিল ঢাকা
নয়নে তোমার স্বপ্ন-কুয়াসা আকা ঃ
তুমি যেন আছ চেয়ে অতীতের এক কোন সীমান্ত পানে
হারাণদিনের হারানিধি সন্ধানে ;
পেয়েছে তাহারে অজানা দুরন্ত ক্ষ্যাপা সাগরের তীর—
যেথা কৌতুকে তুমি বেঁধেছিলে নীড়।

আমোদ সপ্তাহ

স্বর্গ-সাধ

শ্রীপরিমল গুহ ঠাকুরতা

(Walter Savage Landorএর "Hope of Heaven"এর অনুবাদ)

মৃত্যু আসিয়া শিয়রে দাঁড়ায়ে,
'কি যেন বলিল মোর কানে কানে,
মরমে পশিল এই কথাটুকু
'ভয়' কথা কভু রাখিওনা মনে।

এসে তাদের মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

নিজের ভাষা অপরকে শিখান মানে নিজেকে অপরের নিকট পরিচিত করিয়ে দেওয়া। নিজের জাতির অন্তরের রূপ ও বৈশিষ্ট্য অপরকে জানিয়ে দেওয়া। কয়েক বৎসর হ'ল বিলাতে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য জগতের সমস্ত ভাষার বিলোপ সাধন করে কেবল ইংরাজি ভাষার প্রচলন করা। সেই উদ্দেশ্যে ভাষাকে আরও সহজ করা হবে। অক্ষর এবং ব্যাকরণের কড়াকড়ি কমিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ এখন in, atএর প্রয়োগ নিয়ে যে বাধ্যবাধকতা আছে ভবিষ্যতে তা থাকবে না। এই উদ্যমশীলতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। লণ্ডন প্যারিস প্রভৃতি সহরে পৃথিবীর সকল দেশের লোক বাস করে। কিন্তু সেখানকার প্রাইমারি স্কুলে ঐসব দেশের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। আর আমাদের এই কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলে সকল ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয়। তার জন্য ব্যয়ও হয় প্রচুর। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দী ভাষার চেষ্টাও প্রশংসনীয়। এই ভাষাই আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আটপৌরে। আমাদের বাংলা ভাষা হয়েছে যেন সৌখিন। ব্যবহারিক জগতের নিত্য প্রয়োজনে লাগুক না লাগুক লাইব্রেরির সেলফে জমা থাকলেই হল। এক কথায়, বিশ্বসাহিত্য বলে আমরা যতই গর্ব্ব করিনা কেন প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে বাংলা ভাষা হিন্দী ও উর্দ্দুর অনেক নীচেয় পড়ে গেছে। দেশের নেতৃবৃন্দ ও সাহিত্য সেবকগণ অবহিত না হলে ভবিষ্যতের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে।

স্বর্গীয়া কুমারী নীলিমা বসু

গত পূজা অবকাশে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কুমারনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা বিখ্যাত রেকর্ড ও রেডিও আর্টিষ্ট ৺নীলিমা বসুর নিজ গ্রাম সোদপুরে (টাকী, ২৪ পরগণা) নীলিমা-স্মৃতি-সংসদ কর্তৃক তাঁর দ্বিতীয় বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। ধূপ-ধূনার মাঝে অতি মনোরম আরতি-নৃত্যের সহিত ৺নীলিমা বসুর একখানি সুবৃহৎ আলোক-চিত্র পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হয়। তৎপর তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী কুমারী জ্যোৎস্না বসু একখানি উদ্বোধন-সঙ্গীত দ্বারা দর্শক-সাধারণকে মুগ্ধ করেন। এক মিনিট কাল নগ্নপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া সকলেই তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ, অন্যান্য বক্তৃতা এবং শ্রীযুক্ত সুনীল দাস-গুপ্তের একখানি চমৎকার অর্গান-বাদ্যের পর ৺নীলিমা বসুর কয়েকখানি বাংলা, হিন্দী ও উর্দ্দু রেকর্ড-সঙ্গীত জনসাধারণকে শোনান হয়। এই উপলক্ষে নীলিমা-স্মৃতি-সংসদ কর্তৃক "রঘুবীর" এবং "ষোড়শী" এই নাটক দুইখানি অভিনীত হয়। এমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক অভিনয় এই অঞ্চলে খুবই আকস্মিক। ৺নীলিমার নিজ গ্রামে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এই সংসদের বহুবিধ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক। আমরা আশা করি, টাকী, সোদপুর প্রভৃতি গ্রামের প্রত্যেক যুবক, বৃদ্ধ এই সংসদের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহাকে আরও সমগ্রভাবে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যথাশক্তি সহায়তা করিবেন।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

নীতীন বসুর "দিদি"-র কাজ অনেকটা এগিয়েছে পুজোর ভেতর। শোনা গেল, নীতীনবাবু ছবিখানাতে সেটের যে কারিকুরি দেখাচ্ছেন—শিল্পকলার দিক থেকে তার স্থান হবে বহু উঁচুতে। এ ছাড়া অভিনেতৃ সম্মেলনেও ছবিখানা হ'য়েছে বিশেষ লোভনীয়।

*　*　*　*

হেম চন্দ্রের "অনাথ আশ্রমে"-র কাজ সবে মাত্র শুরু হ'য়েছে। প্রথমে তিনি এর হিন্দি সংস্করণ তুলবেন। বাঙ্‌লা সংস্করণ পরে তোলার সম্ভাবনা আছে। হিন্দিতে নায়ক-নায়িকা সাজছেন নাজামুল হোসেন ও উমা।

নিউ থিয়েটার্সে গৃহীত "বিজয়া"-র একটি দৃশ্যে আরতি, ইন্দু মুখার্জ্জি ও পাহাড়ী সান্যাল "রূপবাণী"-তে ছবিখানা চলছে।

কালী ফিল্মস্

এদের "দস্তুরমত টকী" এখন শেষের কোঠায় এসে পৌঁচেছে। প্রকাশ যে, ছবিখানা দেখে কর্তৃপক্ষ বিশেষ খুসী হ'য়েছেন এবং তাঁদের বিশ্বাস, "দস্তুরমত টকী" বাঙ্‌লার চিত্ররাজ্যে নিশ্চয়ই 'দস্তুরমত চাঞ্চল্যের উদ্রেক কোরবে।

*　*　*

এদের হিন্দি "প্রফুল্ল" ও হিন্দি "তরুণী" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

*　*　*

গুণময় বাড়ুয্যের "পরভৃতিকা"-র কাজ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শেষ হ'য়েছে। সুনীল মজুমদার "মুক্তি স্নানে" এখনও ঠিকভাবে গা ভাসাতে পারেন নি—তবে শিগ্‌গির যে ভাসাবেন একথা সত্য।

*　*　*

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী এদিকে একখানা ছ'রীলের পৌরাণিক কাহিনীর প্রাথমিক কাজে ব্যস্ত আছেন। এ ছবিখানা বোধ হয় "রেশমী রুমালে"র সঙ্গে দেখানো হবে।

রাধা ফিল্ম

বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" তোলা শেষ হ'তে আর বেশী দেরী নেই। অপূর্ব্ব অভিনেতৃ সম্মেলনে "বিষবৃক্ষ" যে 'রূপবাণী'-তে অমৃত ফল প্রসব কোরবে এখন থেকে এ ধারণা করা অসমীচীন নয়।

জি-সি-টকীজ

দেবদত্ত ষ্টুডিওতে এদের "ইন্দিরা"-র আনুষঙ্গিক কাজ চলেছে। তড়িৎ বসু ছবিখানা ভালরূপে তোলার জন্যে অভিনেতৃ সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী হ'য়েছেন। শোনা যাচ্ছে, কালী ফিল্মস্ ছেড়ে রাণীবালা এখানে এসেছেন এবং একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় কোরবেন।

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন্ আর্টস্

এদের "রামকান্ত" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। এরপরে এরা অমর চৌধুরীর

পরিচালনায় "ডাক্তার ডাম্ব" নামে একখানা হাসির ছবি তোলবার ব্যবস্থা কোরছেন।

পপুলার পিকচার্স

"পণ্ডিত মশাই" এ মাসের মধ্যেই "শ্রী"-তে মুক্তি পাবে। শরৎচন্দ্রের "দেবদাস," "গৃহদাহ" ও "বিজয়া"-র পর "পণ্ডিত মশাই" আসছেন—আমাদের বিশ্বাস, এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা সুধীর দাসের অক্লান্ত চেষ্টায় "পণ্ডিত মশাই"ও তাঁর পূর্ব্বানুগামীদের মত ছায়াপটে নিজের সুনাম প্রচার কোরবেন।

"বিজয়া"

শরৎচন্দ্রের মানস-কন্যা "বিজয়া" "রূপবাণী"-তে বিজয়-গৌরবে চলছে। "বিজয়া"-র মুকুলিত জীবনে পরিচয় হ'য়েছিল দু'জনের সঙ্গে বিলাস ও নরেন। বিলাস চেয়েছিল বিজয়ার প্রেম ও অর্থ দুই-ই আর নরেন বিজয়ার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করেনি—তাই সে পেয়েছিল বিজয়ার সব কিছু। "বিজয়া"-র কাহিনী আবালবৃদ্ধ-বণিতা সবাই একত্র বসে দেখে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ কোরতে পারেন। আমরা "বিজয়া"-র দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

"সোনার সংসার"

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার "সোনার সংসার"এ ক্রমাগত সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এত দর্শক সমাগম হ'চ্ছে যে "উত্তরা"য় ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নি। নানা রসের সংমিশ্রণে ছবিখানি সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকেরই অন্তর স্পর্শ করে। প্রায় বারোখানি গান এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সুর—ছবিখানির মাধুর্য্য আরো বাড়িয়েছে।

বাঙালী দর্শক প্রাণ খুলে হাসতে জানে না! নিত্য অভাব এবং নিত্য দুঃখ দুর্দ্দশার মাঝে আমাদের জীবনে নাকী হাসির অবসর নেই! কিন্তু আমরা জোর কোরে বলতে পারি—"সোনার সংসার"এ—বাঙালীর সামাজিক জীবনের যে চিত্র প্রতিফলিত হ'য়েছে—তাতে দেখতে পাবেন, আমাদের হাসির উৎস একেবারে শুকিয়ে যায় নি!

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর সোনার সংসার চিত্রে 'অলকার' ভূমিকায় মেনকা

"গৃহদাহ"

যাঁরা ভালো ছবি দেখতে চান—তাঁদের "গৃহদাহ" চিত্রায় দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। একটা মনস্তত্ত্ব মূলক ঘটনাকে পরিচালক যে অভিনয়রূপে রূপায়িত কোরেছেন—তা' সত্যই প্রশংসনীয়।

"সরলা"

বাঙালী জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। প্রত্যেক বাঙালী সংসার এই ছবি দেখে যদি নিজ নিজ ভুল বুঝতে পারেন—তা' হ'লেই এদের ছবি তোলা সার্থক একথা আমরা একশোবার বলব। 'শ্রী'তে ছবিখানা দেখানো হ'চ্ছে।

বার্ষিক সংখ্যা

*
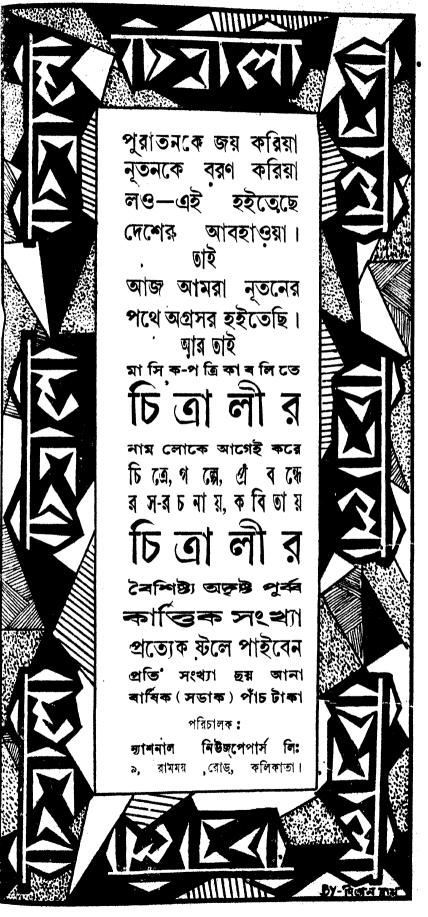
"খেয়ালী" বার্ষিক সংখ্যা আগামী ৩১শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হইবে। মফঃস্বলের এজেন্টগণ উক্ত সংখ্যা কি পরিমাণে লইবেন তাহা আগামী ২৩শে নবেম্বরের মধ্যেই আমাদের জানাইতে হইবে এবং ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে সেই হিসাবে তাঁহাদের অগ্রিম টাকাও জমা দেওয়া বিধেয়। যে সকল এজেন্টগণ এখনও পাওনা টাকা পরিশোধ করেন নাই তাঁহাদেরও জ্ঞাত করা হইতেছে—তাঁহারা যেন এই মাসের ভিতরই উক্ত পাওনা পরিশোধ করেন। এই নির্দ্দেশানুযায়ী যাঁহারা কাজ করিতে পারিবেন না—তাঁহাদের আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে তাঁহাদের বার্ষিক সংখ্যা প্রেরণে আমরা অক্ষম। আমরা আশা করি, আমাদের এই কাজের সুবিধার জন্য মফঃস্বলের এজেন্টরা আমাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

বার্ষিক সংখ্যার মূল্য

কলিকাতায়—।০ ও মফঃস্বলে ।/০ আনা

*

বিজ্ঞাপনদাতারা এখন হইতে

।

(সি, বি)

'কয়েকমাস ধরে কলকাতায় বক্সিং বেশ জমে উঠেছে। বাঙ্গালীদের ভিতর বি, ডি, চ্যাটার্জ্জী, এফ, কে, মিত্র, জে, কে, শীল ইত্যাদি বক্সিংএ বেশ নাম করেছিলেন। কিন্তু যদিও তাঁদের বক্সিং-আসরে দেখা যায় কিন্তু কোন অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। এদের বক্সিংএ একটু নাম হতে না হতেই বিদায় গ্রহণ করার ব্যবস্থা। কারণ এঁদের নাকি বয়েস হয়ে গেছে। কিন্তু গত শনিবার চৌরঙ্গীর উপর মিঃ মার্টিন যে বক্সিংএর আয়োজন করেছিলেন তাতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের ভেতর দু একজন ছাড়া প্রায় সকলেই ওদের চেয়ে বয়সে বড়। থাক্ আক্ষেপের বিশেষ কিছু নেই, কারণ খেলাধুলার ব্যাপারে বাঙ্গালীরা বড় জোর তিরিশ বছর অবধি একটু উৎসাহ দেখাচ্ছে। গত শনিবার চৌরঙ্গীতে যে বক্সিংএর আয়োজন হয়েছিল তাঁর উদ্যোক্তা হচ্ছেন মিঃ মার্টিন। ইনি আগেও কলিকাতায় স্থানীয় এবং বিদেশী বক্সারদের বক্সিংএর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উদ্যমের জন্য আমরা কলিকাতায় ভারতের এবং ভারতের বাইরের নামকরা বক্সারদের বক্সিং দেখতে সুযোগ পাচ্ছি এবং পাব। যদিও বাঙ্গালী খুব কমই ছিলেন তাহলেও সেদিন প্রায় চার পাঁচ হাজার দর্শক সমবেত হয়েছিলেন। সেদিন সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি ফাইটের ব্যবস্থা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ছিল গান্‌বোট জ্যাক্ বনাম 'ইয়ং ফ্রিস্কোর ফাইটটি। প্রথমে সন্তোষ দে (কলিকাতা) বনাম ডবলু [illegible] (কলিকাতা) এই ফাইটটি হয়। সন্তোষ দে বিখ্যাত বক্সার মিঃ পি, এল রায়ের ছাত্র। ছয় রাউণ্ড ফাইট হবার ঠিক থাকলেও রেফরী চারবার সাবধান করার পর পঞ্চম রাউণ্ডে আবার ফাউল করায় মিঃ দেকে বসাইয়া দেন এবং মিঃ জেমস্‌কে বিজয়ী ঘোষণা করেন। এতে বিশেষ করে বাঙ্গালী দর্শকরা খুব মনঃক্ষুণ্ণ হ'ন

দ্বিতীয় ফাইটটি হয় 'কিড' ম্যাকলেনানের (সাণ্ডারল্যাণ্ড) সহিত ইয়ং ট্রেসির (লণ্ডন)। যদিও ছয় রাউণ্ড ফাইট হইবার কথা ছিল কিন্তু ট্রেসি চতুর্থ রাউণ্ডে আহত হওয়ায় কিড জয়ী হয়।

তৃতীয় ফাইটটি ছিল এক্‌পেনের (কলিকাতা) সহিত বব্ গগারলির (কলিকাতা ফায়ার ব্রিগেড)। বব্ দ্বিতীয় রাউণ্ডে 'নক্-ডাউন' হওয়াতে ছয় রাউণ্ড ফাইটটি এখানেই শেষ হয় এবং পেন জয়ী হয়।

চতুর্থ ফাইটটি হয় ইয়ং উড (কলিকাতা) বনাম সার্জেণ্ট সি, বেলেটী (কলিকাতা পুলিশ)। উড সমকক্ষ না হওয়ায় বেলেটি ছয় রাউণ্ড ফাইটে জেতেন।

পঞ্চম ফাইটটি হয় অল্ রসের (সিঙ্গাপুর) সহিত সার্জ্জেণ্ট পরটুনের (কলিকাতা পুলিশ)। ছয় রাউণ্ড ফাইটে সমান সমান পয়েণ্ট হওয়ায় আর একটি রাউণ্ড হয় এবং তাহাতে অল রস্ জয়লাভ করে।

ষষ্ঠ ফাইটটি হয় রবিন সরকারের (কলিকাতা) সহিত ইয়ং টায়লের (ফিলিপাইন দ্বীপ)। রবিন সরকার বাংলা দেশে বক্সিং করে বেশ নাম করেছেন।' বক্সিংএ উন্নতি করবার জন্য এর খুব চেষ্টা আছে। ইনি ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করবেন বলে আশা করা যেতে পারে। মিঃ সরকার বেঙ্গল ফেদারওয়েট চ্যাম্পিয়ন এবং ইয়ং টায়লে প্রাচ্যের ভূত-পূর্ব্ব ফেদার ওয়েট চ্যাম্পিয়ন। এই ফাইটটিও ছয় রাউণ্ড হয়েছিল। যদিও রবিন সরকার জয়ী হতে পারেন নি তাহলেও তাঁকে হারাবার জন্য টায়লেকে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল। টায়লে এই ফাইটের পর বিলাতী বাজনার সহিত তালে তালে 'স্কিপিং' করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন।

তারপর প্রধান এবং শেষ ফাইটটি আরম্ভ হয়। এই ফাইটে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল গান্‌বোট জ্যাক্ (ইউ, এস, এ) এবং ইয়ং ফ্রিস্কো (ফিলিপাইন দ্বীপ)। প্রাচ্যের মিডল ওয়েট চ্যাম্পিয়নসিপের জন্য এই বারো রাউণ্ড ফাইটটি দর্শকদের নিকট খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল। জ্যাক্ দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আসেন এবং এই সময়ের ভিতর ভারতীয় এবং ভারতের বাহিরে যে সকল নামকরা বক্সার ভারতে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কেবলমাত্র দুইবার পরাজিত হন। জ্যাকের বয়স ৩৬ বৎসর এবং ওজন ১১ ষ্টোন। ইয়ং ফ্রিস্কোর বয়স প্রায় ২৬ বৎসর। কয়েক মাস পূর্ব্বে সিঙ্গাপুরে ইনি জ্যাক্‌কে পরাজিত করেন। অনেক নামকরা বক্সারদের সঙ্গে ইনি ফাইট করেছেন। এর ওয়েট ১১ষ্টোন ৮ পাউণ্ড। প্রথম ৬ রাউণ্ড ফ্রিসকো জ্যাককে প্রায় কোনঠাসা করে ধরেছিল। কিন্তু জ্যাক ভালভাবে নিজেকে গার্ড করতে পারায় ফ্রিসকো বেশী পয়েণ্ট পায় নি। শেষের ৬ রাউণ্ড জ্যাক বেশ ভাল হিট করেছিল। জ্যাকের বাঁহাতের পার্ট-গুলি খুব শক্তিশালী। ফাইটের শেষে রেফারী জ্যাককে জয়ী ঘোষণা করেন এবং দর্শকগণ হর্ষধ্বনি করিয়া তাহা সমর্থন করেন।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে

অধ্যাপক শ্রীগৌরিনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, পি, আর, এস

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বোদ্ধা বলিয়া যাঁহাদের আভিজাত্য আছে এমন কয়েকজন বাঙ্গালী সমালোচকের মুখে একথাটী প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রচলিত ধারার সংস্কার একান্ত অপেক্ষিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সঙ্গীতধারা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহার গতি এতই শ্লথ ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে যে, যথোচিত সংস্কার না করিলে উহা বোধহয় লুপ্ত হইয়া যাইবে। আশঙ্কাটি তাঁহারা এরূপে উপস্থাপিত করেন যাহাতে প্রতীত জন্মে যে, কালবিলম্ব ব্যতিরেকে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক কার্য্যে ব্রতী হইতে না পারিলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অদূর-ভবিষ্যৎ নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন। সমালোচকগণ যে কেবল তাঁহাদের আশঙ্কার কথা নিবেদন করিয়াই স্থির আছেন, তাহা নহে, যথাসাধ্য শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার সাধনেও তাঁহারা দৃঢ় পরিকর হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব যে পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার সত্যই কোন বীজ আছে কি না এবং সংস্কারেরই যদি প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার রীতি কিরূপ হইবে।

ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে উহা মার্গ ও দেশী ভেদে দ্বিবিধ। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতে—এই ত্রিবিধ স্বরে গীত বেদগানই মার্গ সঙ্গীত। সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রখ্যাত টীকাকার কল্লিনাথ বেদগানকেই মার্গ সঙ্গীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে যুগ-প্রবাহের সঙ্গে সামগান সপ্তস্বরে গীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; তবে একথা স্বীকার্য্য যে অদ্যাবধিও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, বেদগান ত্রিবিধ স্বরেই গীত হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন প্রদেশে গীত সঙ্গীতপদ্ধতিকে "দেশী" সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। একথা সত্য যে মার্গ সঙ্গীতই দেশী সঙ্গীতের উপজীব্য। গম্ভীর ও উদাত্ত বস্তুকে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমরা যতই হারাইয়াছি, যুগধর্ম্মের প্রভাবে মূলীভূত আদর্শ ততই বিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আদর্শ বেদগান ধীরে ধীরে "আলাপ" ও "ধ্রুপদে" এবং পরে বিলম্বিত খেয়াল, টপ্পা বা ঠুম্‌রীতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই যে বিবর্ত্তন তাহা বিশিষ্ট সম্প্রদায় বা "ঘরওয়াণার" সুরশিল্পিগণের সাধনায় বিভিন্ন অপরূপ মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। গুরুশিষ্য-ক্রমে রাগ ও সঙ্গীতের ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্বশক্তি-অনুসারে উপজীব্যবস্তুর গৌরব অব্যাহত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতীয় শাস্ত্রের বা সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাঁহারা সবিশেষ সচেতন তাঁহারা জানেন যে বস্তু বিশেষকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দিবার চেষ্টা না করিয়া ভারতীয়েরা চিরদিনই পুরাতনের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। সকল সময়ই যে পুরাতনের বিশিষ্টরূপ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে—তাহার জন্য দায়ী, অবশ্য, শিল্পিগণের দুর্বলতা—কিন্তু কোনদিনই পুরাতনের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হন নাই। যাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং পারেন নাই বলিয়া সৌন্দর্য্যের হানি হইল এই বিবেচনায় মনে ত্রুটী ও অসন্তোষ অনুভব করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রকারান্তরে বৈচিত্র্যসমাবেশে সাধ্যমত যত্ন লইয়াছেন। ফলে পুরাতন অটুট না থাকিলেও নবীন কোথাও তাহার মর্য্যাদা বা গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। সংক্ষেপে মার্গ ও দেশী সঙ্গীতের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা আলোচনা করা হইল। এখন, মূল প্রশ্নটীর বিষয় আলোচনা করা যাক্।

বর্ত্তমানে সাধারণতঃ বাংলায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে রীতিতে গীত হইতেছে সে রীতির আবিষ্কার পুরাতনের সংস্কার করেই হইয়াছে। কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি? চিরাভ্যস্ত রীতি কি আমাদের তৃপ্তিবিধানে ক্ষীণশক্তি হইয়াছে যে সংস্কার করিতেই হইবে। অথবা প্রচলিত রীতিতে গান গাহিবার ক্ষমতা আমরা হারাইতেছি তাই অন্যরূপে রূপায়িত করিয়া গাহিতে হইবে? প্রথম কল্প ও সত্য বলিয়া মনে হয় না। যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিষয় বিশেষের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন তখনই অপেক্ষিত হইয়া থাকে, যখন প্রচলিত রীতি আর আমাদের আনন্দ দিতে সমর্থ নহে; অন্যথাভাবে, কিন্তু, সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কল্প স্বাভাবিক ও সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, যদি স্বীকার করা যায় যে আমরা পুরাতন রীতিতে গাহিবার শক্তি হারাইতেছি তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে—যে রীতিতে আমরা গাহিতেছি তাহার সহিত বর্ত্তমানে প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির সম্বন্ধ কিরূপ? বর্ত্তমানে

যে ভাবে বাংলায় হিন্দুস্থানী গান গাওয়া হইতেছে তাহার মধ্যে প্রধানভাবে দুইটী বস্তু লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, শুদ্ধরূপে গান গাহিবার প্রথা যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ, একশ্রেণীর গান গাহিবার সময় উহার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর গানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার যেন বিশেষ যত্ন চলিতেছে। যে কোনও রাগের রূপ বা ছায়া ফুটাইয়া তুলিতে হইলে অন্ত রাগের রূপ যাহাতে উহার মধ্যে না আসিতে পারে সে দিকে বিশেষ প্রণিধান আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায়ই এদেশে দেখা যায় যে, কোনও রাগ গাহিবার সময় নিয়মিতভাবে রাগান্তরের সন্নিবেশ চলিতেছে। অবশ্য মিশ্ররাগের গান পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল—এই যুক্তির সাহায্যে বর্ত্তমানে প্রচলিত রাগসাঙ্কর্য্য দূষনীয় নহে, একথা বলিয়া যাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, করুন; কিন্তু, সহৃদয় সামাজিক যে ইহা অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না তাহা যুক্তিসহ ও স্বাভাবিক। এখন দ্বিতীয় কথাটীর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক্। একজন সমালোচক একবার গায়কবিশেষের প্রশংসা প্রসঙ্গে বলিলেন—খেয়ালের বড় বড় তানের মধ্যে যদি ঠুমরীর ছোট ছোট তানগুলি সমঞ্জস করিয়া ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে উহা অধিক শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে। আমরাও শুনিয়াছি যে ধ্রুপদ গাহিতে গাহিতে কেহ কেহ খেয়াল বা ঠুম্‌রীর ছায়াপাতও করিয়া ফেলেন। এই যে প্রয়োগ, ইহা কি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সঙ্গীতের মূলঘাতী নহে? যদি মূলঘাতী হয়, তাহা হইলে এরূপ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য ত বুঝিতে পারা যায় না। যদি অবশ্য তর্ক উঠে যে এরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, কারণ ইহাতে গানগুলি শ্রোত্রসুখকর হয়—তখন আমাদের বক্তব্য এই যে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্যই প্রাণ; সুতরাং গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া খেয়ালের বা ঠুম্‌রীর লঘুভাব ইহার মধ্যে আনিলে ধ্রুপদের শোভা কিরূপ হইবে—আর সে শোভা কতখানিই বা তৃপ্তি দিবে। গতপ্রাণ-জীব নানাবিধ ভূষণে অলঙ্কৃত হইলেও নয়নানন্দকর হয় কি? সুতরাং বিচার করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন আমরা অনুমোদন করি না। আমরা স্বীকার করি যে গুরু যেরূপ বিদ্বান্ হন, ছাত্র সকল ক্ষেত্রে সেরূপ গুণী হন না—গুরু যে সকল সৌন্দর্য্যের পরিকল্পনা করেন, ছাত্র তাহা নিয়মিত শিক্ষা ফলেও গ্রহণ করিতে পারেন না, কিন্তু ধারার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পরিবর্ত্তনের চেষ্টা প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইহাতে প্রাচীন ক্রিয়াসিদ্ধ শিল্পিগণের সাঙ্গীতিক আদর্শবাদক ও অবদানকে উপেক্ষা করার জন্ত রুচি ও আভিজাত্যে বিকৃতি ও উন্মার্গগামিতার পরিচয় দেওয়া হয়।

শ্যামবাজার—কালীঘাট

(নক্সা)

শ্রীঅজিত নাথ লাহিড়ী

সবে শীতের আমেজ পড়িয়াছে—সকাল সন্ধ্যায় একটু গা শিরশিরিয়ে ওঠে। এমন সময় হঠাৎ একদিন "নকুড়মামা"র সাথে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। এইখানেই একটা কথা বলিয়া রাখি—নকুড়মামার নাম সত্যই নকুড় মামা নয়—তাঁহার নামটা আমার ঠিক মনে নাই। হয় জনার্দ্দন, না হয় গোবর্দ্ধন। পাড়ার লোকে পরশুরাম বিরচিত "কচি-সংসদে"-র উপমা লইয়া তাঁহাকে এই নাম উপাধি দিয়াছিল যেহেতু তিনি ৮ শারদীয়া পূজার সময় হইতেই পুলওভার, মাফলার, ওভারকোট ইত্যাদিতে বিভূষিত হইয়া কলিকাতার (দার্জ্জিলিং নয়) রাজপথে বিচরণ করিতেন। লোকটী নাকি এককালে প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন—এবং স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে এই গরম পোষাক কটিই সম্বল—তাই বনিয়াদি চাল বজায় রাখিতে তাঁহাকে এই সব ব্যবহার করিতে হইত। এই হেন 'নকুড়মামার' সহিত দেখা—রাত বারোটায় ডবল-ডেকার বাসের দ্বিতলে। 'চিত্রা'র কল্যানে বাসে ইলেক্‌ট্রন্ পর্য্যন্ত ধরিবার যায়গা নাই—তাহার উপর নকুড়মামা! একবার ইচ্ছা হইল নামিয়া যাই—কিন্তু সন্থ দুইটী আনি খরচা করিয়া কালীঘাটের টিকিট কিনিয়াছি—ইচ্ছা থাকিলেও নিবৃত্ত হইলাম। নকুড়মামা কহিলেন,—'বায়োস্কোপে লোকে আসে কেন হ্যা?—' সদুত্তর দিতে পারিলাম না। কহিলাম,—"সময়টা ত কাটাতে হবে—"

—"হ্যাঃ—তার জন্ত আবার গাঁটের পয়সা খরচা কোরে—ধাকাধাক্কি কোরে—দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ধ'রে এই সব ছেলে ছোকড়াদের হ্যাকামি—উচ্ছন্নে গেল দেশটা—" এই বলিয়া পকেট হইতে একটা দিয়াশলাই বাহির করিয়া কহিলেন,—'একটা সিগারেট দাওত হে?'—সিগারেট দিলাম। ভদ্রলোকটী ধোঁয়ার নেশায় মুখের আগল খুলিয়া গেল। কহিলেন,—'অনেক দিন পরে দেখা—কি ক'রছ হে আজকাল?—'

—"কি আর ক'রবো?—সবাই যা করছে—বায়স্কোপ কোম্পানির দরজায় দরজায় লাঠি খাচ্ছি—"

নকুড়।—"বিয়ে টিয়ে ক'রেছ?—"

কহিলাম,—"কই আর সুযোগ পেলাম—মেয়েদের মাবাপকেই ভোলাতে পারি না—ত মেয়ে—"

—"বিয়ের আগে মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ কি হে?—"

—"বায়োস্কোপ দেখেন না বুঝি—মা-বাপরা ত ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড—মেয়েরাই ত সব—"

নকুড়মামা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—"সিগারেটটা ত মন্দ নয় হে—আর একটা দাও ত—"

সিগারেট দিলাম। নকুড়মামা তিন সেকেণ্ড নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনটা টান দিলেন। সিগারেটের আগুন তিনভাগ নীচে নামিয়া আসিল। তারপর কহিলেন,—'কথাটা যা বলেছ—একেবারে খাঁটি সত্য কথা। আজকালকার বাপমাদের দেখাই যায় না—তাঁরা যেন পর্দার ভিতর ঢুকে যাচ্ছেন। কিন্তু যাই বল বায়োস্কোপ জিনিষটা লাগে বেশ—মগজের ভাবনা গুলোর গোড়াতে বেশ একটু নাড়া দিয়ে যায়—"

—"অ্যাঁ—বলেন কি? শেষকালে আপনিও কবি হ'য়ে উঠলেন, নকুড়মামা—"

—'আরে ভাই বয়সটা যাই হোক—জাতটা ত সেই বাঙ্গালী—আমাদের মজ্জাগত ভাব প্রবণতা যাবে কোথা?—"

বুঝিলাম নেশা জমিয়াছে। নকুড়মামা আবার কহিলেন,—'এই দেখনা কেন—সেদিনকার ব্যাপারের কথা বলি। কি একটা ফিল্ম কোম্পানী, নামও কি ছাই মনে থাকে—আজকাল যেমন পথে-মাঠে-ঘাটে বায়স্কোপ কোম্পানীর ছড়াছড়ি। হ্যাঁ, সেদিন এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ—উনি নাকি কোন এক ফিল্ম কোং-এ কাজ করেন। আমার ত জানই একটু মৌতাতের অভ্যাস আছে—বনেদী চালটা ত আর ছাড়তে পারিনা। সেদিন রেস থেকে আচমকা কয়েকটা টাকা পাওয়া গেল। ভাবিলাম একটু বিলাতী নেশা করিয়া যাওয়া যাক; ঢুকিলাম এক সাহেবী মাতালদের আড্ডায়। জমিয়াছে বেশ নাচ, গান, হাসি-হুল্লোড়। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম আমারি মত আরো কয়েকটা বক বিরাজ করিতেছেন হংসমধ্যে। জানই ত ও জিনিষটা পেটে পড়িলে বেবাক দুনিয়াটাকেই কুটুম্ব বলিয়া মনে হয়। একটা ভদ্রলোকের হঠাৎ কি খেয়াল হইল—আমাকে বলিলেন,—'মশায় আপনাকে ফিল্মে বেশ মানায়—কি জানি কেন লোকটাকে খুব ভাল লাগিয়া গেল। মন্দ জমলো না ব্যাপারটা—অবিশ্যি শেষ পর্য্যন্ত ম্যানেজার ব্যাটা জোড় করিয়া আমাদের তুলিয়া দিল। যাহোক্ শেষ পর্য্যন্ত উঁহাদেরি গাড়ী করিয়া বাড়ী পৌঁছিলাম। আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া পাছে গিন্নি টের পান ভয়ে উপরে উঠিতেছিলাম—এমন সময়ে কেমন যেন মাটীটা ভয়ানক দুলিয়া উঠিলো ব'লিয়া মনে হইল। কয়েকদিন আগে কোয়েটা ধ্বংস হইয়াছে। ত্রাসে চীৎকার করিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িলাম—যা হয় হউক এই ভাবিয়া। কিছুক্ষণ বাদে ইঁটের চাপের বদলে বর্ষণ হইল—গিন্নীর ঝঙ্কার। সে আর শুনে কাজ নেই—তোমরা সব সভ্যতার যুগের মানুষ—ও রকমটা আর কখনো শুনিবে না বোধ হয়। যাহোক কোন রকমে উপরে পৌঁছিলাম। বিছানায় শোয়া মাত্রই নাসিকা গর্জ্জন। কিন্তু ভগবান সেদিন কপালে লিখিয়াছিলেন অন্যরূপ—একটু পরেই সদর দরজায় ভীষণ কড়ানাড়ার শব্দ। গিন্নীর জন্য উঠিতে হইল। দরজা খুলিতেই দেখি—ফিল্ম কোম্পানীর সেই ভদ্রলোকটী—আমাকে দেখিয়াই জড়াইয়া ধরিলেন। কহিলেন,—'বাবা শিবলোচন—এমনি করেই ফাঁকি দিয়ে পালাতে হয়'—বলিয়াই ক্রন্দন। নেশার ব্যালান্স যেটুকু ছিল—নিঃশেষ হইয়া গেল। ভদ্রলোকটী জড়িতকণ্ঠে কহিলেন—'সাইরি! তুই না গেলে ফেন্তী বসতে দেবে না—চল্ না ভাই—'

পিছনে চাবির ঝুনঝুনীতে বুঝিলাম যে গৃহকর্ত্রী নীচে আসিয়াছেন।—কহিলাম,—"কি পাগলের মত বকছেন মশায়—আমি ত কস্মিনকালেও আপনাকে চিনি না—যান্—যান্—ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত্রি শেষে আর চলাচলি ক'রবেন না,—" ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা।

—'ছলনা করছো দয়াময়! এই সেদিন ফেন্তীকে নিয়ে বালীর বাগান বাড়ীতে এত সাইফেল—সব ভুলে গেলে সোনার চাঁদ—এই রইলুম মাটী কামড়ে'—বলিয়া সত্যিই সেই ভদ্রলোক দরজার সামনে ফুটপাতে শুইয়া পড়িলেন—এবং সঙ্গে সঙ্গেই নাসা-গর্জ্জন। পাড়ার যত ছিল ছেলে বুড়ো, যুবক—সবাই বেশ দাঁড়াইয়া উপভোগ করিতেছিল। আশে পাশের জানালাগুলোও বন্ধ ছিল না,—সেখানে ছিলেন মেয়েরা। কাঁদ কাঁদ হইয়া সমাজের কাছে ক্ষমা চাহিলাম কহিলাম,—'হে পাড়ার যুবকযুবতী! বৃদ্ধ-বৃদ্ধা — কচিকাঁচা — শুন সর্ব্বলোক! চরিত্রের দোষ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব না—যেহেতু আমার চরিত্র ভগবান গড়িতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু আজ আমাকে কেন্দ্র করিয়া যে দৃশ্য আপনাদের গোচর হইল—এবং আপনাদের মনের কাগজে আমার সম্বন্ধে যে রিমার্ক আপনারা করিয়া লইলেন সেই সম্বন্ধে দুচারটী কথা আপনাদের বলিব।...আরেকটা সিগারেট দাওত হে—' নকুড়মামা দম লইলেন। গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে—নোটবুক থাকিলে নোট করিয়া লইতাম।...সহসা বাহিরে তাকাইয়া দেখি—আমার নির্দ্দিষ্ট ট্রাম আসিয়া গিয়াছে। উঠিয়া কহিলাম,—"আজ চল্লাম নকুড়মামা—বাকীটুকু আর একদিন শুনিব—"

নকুড়মামার সহিত আর দেখা হয় না—তাই বাকীটুকু বোধ হয় শোনা হইল না।

সন্ধি

শ্রীনীরোদ রায়

হাত তুলিয়া ঘড়ি দেখিল প্রায় সাড়ে পাঁচটা। আধঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছে—জোরে পা ফেলিয়া সমীর দুই মিনিটেই এতটা পথ অতিক্রম করিয়া ফেলে। ঘরে ঢুকিয়াই ডাক দেয়—তনু।

যাই সমীদা—জবাব আসে রান্নাঘর হ'তে। কোঠায় ইজি চেয়ারে সমীর বসে। সম্মুখে আসিয়া তনিমা দাঁড়ায়—স্কার্টশাড়ী, ব্লাউজ, জুতা; সব ঠিক্।

তনিমা বলে—এই তোমার পাঁচটা, না সমীদা? তোমার জন্ত কখোন থেকে চা'র জল ফোটাচ্ছি, এতক্ষণ বোধ হয় সব জল শুকিয়ে গ্যাছে—কথার সুরে একটু আহ্লাদের আভাষ।

—আর বলোনা সে কথা। সমীর একটু হাসিয়া বলে, জিতুর সাথে রাস্তায় দেখা। ও যত বাজে কথা ব'লে আমার পিছু নিলে। আমিও বেগতিক দেখে—বালীগঞ্জ যাচ্ছি, পিসিমার বাড়ী—বলে রাস্তা ঘুরে এতটা আসতে দেরী হয়ে গ্যাছে। আর—এখনও তো ঢের দেরী, তাছাড়া 'চিত্রা' তো বাড়ীর সামনেই— সিট্ যখন বুক্ করা আছে তখন—।

—আচ্ছা তা যাক্ গে। আজ তোমাকে একটা জিনিষ দেখাবো—আজ আর তুমি জিত্‌তে পারবেনা। রোজ-ই তুমি আমাকে 'ডাউন' করেছো—আজ দেখবো। বলিয়াই টক্ টক্ জুতোর শব্দে তনিমা পড়ার কোঠায় ঢুকিয়া পড়ে।

সমীর ব্যাপারখানা ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ঠাওরাইল সিনেমা-সংক্রান্ত একটা কিছু—যাহা লইয়া দৈনিক ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। একখানি সুন্দর সাপ্তাহিকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তনিমা কোঠা হইতে বাহির হইয়া আসে।

—এই দেখ কী লেখা রয়েছে—'কাননের আনন নাকি ভারী সুন্দর!' সমীরের চোখের সম্মুখে ছবিখানা খুলিয়া ধরে।

—আরে ওরকম সব পত্রিকাই লিখে থাকে, নইলে যে ওদের কাগজ চলে না। সমীর প্রতিবাদ করে তাচ্ছিল্যের সুরে।

—আচ্ছা থাক্, তোমায় আর বোঝাতে হবে না। বইখানা বন্ধ করিয়া বলে,—তোমার আর আমার কোনদিনও মিল্ হবেনা, তুমি আমার সব কথারই উল্টো জবাব দাও।

মুখ গম্ভীর। সমীর বুঝিতে পারে না, রাগ না অভিমান।

—রাগ কল্লে? তনিমার হাতটা হাতে তুলিয়া সমীর শুধায়।

—না, রাগ করবো কেন? অভিমান-মিশ্রিত জবাব আসে।

—কেন রাগ কর আমার ওপর তনু? সবার মতামত কখনও এক হয় না। যার যে রকম রুচি সে সেরকম বলবেই। তুমি বল্‌বে 'কানন' ভাল আর আমি বল্‌বো 'উমা' ভাল। উমার একটি পোজ আমার ভাল লাগে—তাই উমা ভাল। আর তোমার কাননকে পছন্দ হয়—তাই তোমার কাছে ভাল। এসব বাজে কথা নিয়ে কেন শুধু শুধু কথা কাটাকাটি কর তনু?—আমি এলেই তুমি এমন একটা কিছু করবে যাতে গোলমালের সৃষ্টি হয়। তুমি বোঝনা তোমার সাথে একটা কিছু হলেই আমার ভারী খারাপ লাগে।

সমীর এতগুলি কথা একসাথে বলিয়া ফেলিল, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু করে নাই। সে তনিমার মুখ গম্ভীর দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না। আজ দুইটী বৎসরে সে তনিমার মনের সাথে মিশিয়া গিয়াছে—যেন দুইটি তার একসুরে বাঁধা। তনিমার সমস্ত সুখ-দুঃখ তাহারই উপর প্রতিফলিত হয়। তাই সে আজ দরদী!

তনিমা নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া গেল। নিশ্চয়ই সমীরের মনে আঘাত লাগিয়াছে। কেন সে তাহাকে ব্যথা দিল? মনে ভাবিল—সমীদা আমার উপর রাগ করিতে পারেনা। কতদিন কত ব্যথা দিয়াছি কোনদিনও রাগ করে নাই—আজ অভিমান মাত্র।

—আচ্ছা আর রাগ করবোনা সমীদা,—একটু বোস চা নিয়ে আস্‌চি। এই দুইটী কথা বলিয়া তনিমা রান্নাঘরে চলিয়া যায়। দুই পেয়ালা চা হাতে করিয়া পরদা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করে।

—নাও, শীগগীর চুমুক দাও—দেরী হয়ে গেল ওদিকে। সমীরের সম্মুখে পেয়ালা ধরে।

পেয়ালা খালি হইয়া গেল—অথচ সমীরের মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইলনা দেখিয়া তনিমা বুঝিল তাহার সমীদা'র অভিমান এখনও ছাড়িয়া যায় নাই।

—রাগ করেছো সমীদা? কাছে আসিয়া তনিমা শুধায়। কথায় মিষ্টি ভাব।

—না-তনু, রাগ করি নি। তোমার ওপর আমি কি রাগ করতে পারি। তবে—তোমার দেয়া আঘাত আমায় বড্ড লাগে তাই মনে খুব দুঃখ হয়। আর—তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমিও নিজে দ্বিগুণ ব্যথা পাই।

দুইজন নিস্তব্ধ। দেওয়ালে ঘড়িটা টং টং করিয়া ছয়বার বাজিয়া উঠে। সমীর হঠাৎ

উঠিয়া দাড়ায়। বলে—সিনেমায় যাবে না? চল। তনিমার মুখের দিকে তাকাইয়া সমীর হাসিয়া ফেলে।

তনিমার মন আনন্দে মাতিয়া উঠে সমীরের হাসি মুখ দেখিয়া। সম্মুখে আসিয়া তনিমা একটুখানি দুষ্ট-হাসি হাসিয়া বলে—চল।

—দিলু যাবে না? সমীর জিজ্ঞাসা করে।

—না, ও থাক্। তনিমা জবাব দেয়।

দুইজনে ফুটপাথে নামিয়া পড়ে।

* * *

পরদিন।

কলেজ হইতে সমীর বরাবর তনিমাদের বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। 'পিরিয়ড' গুলি একে একে কি ভাবে কাটিয়া গেল—কিছুই সে বুঝিল না—এমনই আনমনা হইয়া পড়িয়াছিল। কালকের ব্যাপার যেন তাহাকে একটু বেশী চিন্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মাথার প্রত্যেকটী শিরায় যেন রক্ত একটু জোরে চলাচল করিতেছে।

হয়তো তনিমা তাহার উপর অভিমান করিয়াছে—হয়তো বা রাগ করিয়াছে—হয়তো বা মনে ব্যথা পাইয়াছে। না—একটা কিছু হইয়াছে নিশ্চয়। কাল ঝোঁকের মাথায় সে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। না—তনিমা তো সিনেমা-হলে বেশ ভাল ছিল। কত হাসাহাসি করিয়াছে। রাগ থাকিলে কি সে এত হাসিত? রাস্তায় এত গল্প করিত? সমীর আর ভাবিতে পারেনা—ঠিক্ করিল আজ একটা কিছু নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবে।

সমীর সোজা তনিমার পড়ার-ঘরে ঢুকিয়াই সোফায় বসিয়া পড়ে। তনিমা তাহার বইগুলি একটু সাজাইয়া রাখিতে-ছিল—হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সমীরকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠে,—নিজেকে সাম্‌লাইয়া বলে—আজ যে বই হাতে 'ডাইরেক্ট' এখানে, সমীদা? চা খেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি, না?

—হ্যাঁ, তাই। সমীর হাসে।

—কাল কেমন দেখলে 'পরপারে'? তনিমা শুধায়।

—আর ওসব বাজে কথা উঠিওনা—শেষে ঝগড়া হবে বলে দিচ্ছি। সমীর জবাব দেয়।

তনিমা আসিয়া সোফার পাশে বসে। সমীরের দু'টী হাত টানিয়া আনে কাছে; বলে—ভয় নেই ঝগড়া হবেনা। এই ছবিতে তোমার 'উমা'ও নেই আর আমার সাধের 'কানন'ও নেই। তনিমা মুচকি দুষ্টু-হাসি হাসে।

সমীর আরও কাছে টানিয়া আনে তনিমার নরম দু'টী হাত। বলে—আর তোমার সাথে ঝগড়া করবোনা তবু — বল, তুমিও আর ঝগড়া করবেনা। তনিমার মাথা ঢুলিয়া পড়ে সমীরের বুকের উপর। সমীর বুঝিতে পারে—রাজী।

——

চলচ্চিত্র সংগঠন ও প্রযোজক

শ্রীবংশী আশ

মানুষের মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্যই ভাষার সৃষ্টি। এবং সেই ভাষার সাহায্যেই মানুষ তার কল্পনাকে লোকের মনের মধ্যে এঁকে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তা'তে তা'দের চোখের সামনে দেখার সুযোগ হ'য়ে ওঠে না। হয় শুধু পড়ে বা শুনে কল্পনায় বাস্তবতাটুকু অনুভব করা। আজ কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত কোরে লোকচক্ষুর সামনে ফুটিয়ে তোলার জন্য ছায়াছবির জন্ম হয়েছে। প্রথম যখন সে জন্মায় তখন জন্মেছিল শুধু তার রূপ নিয়েই—কণ্ঠে কোনও বাণী ছিল না। এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠে এসেছে বাণী এবং জড়তাও ভেঙ্গে গেছে অনেকদিন। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে এখনও তা'কে বলে শিশু। অবশ্য এ কথাটা ওঠে তখনই যখনই আমরা তা'কে তা'র আসল রূপ ও বাণীতে প্রাণবন্ত ক'রে গড়ে তুলতে অকৃতকার্য্য হই।

কেন আমরা অকৃতকার্য্য হই? তা'র প্রধান কারণ—আমাদের ত্রুটি উপযুক্ত সংগঠনকারী ও চরিত্র নির্ব্বাচনে।

ছায়াচিত্র সংগঠন কার্য্যে প্রয়োজন—লেখক, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক, ধারারক্ষী, আলোক-চিত্রশিল্পী, সহকারী আলোক-চিত্রশিল্পী, স্থির-চিত্র-শিল্পী, শব্দযন্ত্রী, সহকারী শব্দযন্ত্রী, ব্যবস্থাপক, রূপসজ্জাকর, পটশিল্পী, পরিস্ফুটনাধ্যক্ষ, সম্পাদক—ইত্যাদি।

লেখক (Author) তাঁর কল্পনাকে ভাষায় ব্যক্ত করেই মুক্ত হন। তারপর তাকে চিত্রোপযোগী করবার জন্য দেওয়া হয় চিত্রনাট্যকারের (Scenario writer) হাতে। তিনি তার অবাস্তর জিনিষগুলি বাদ দিয়ে উপযুক্ত দৃশ্য এবং ঘটনার সমন্বয়ে একটী পরিকল্পনা করে দেন। এখন সেই পরিকল্পিত ঘটনার চরিত্র নির্ব্বাচনের ভার আসে পরিচালকের (Director) হাতে—কেন না তাঁকেই তাদের গতিবিধির রাশ হাতে নিতে হয়। নির্ব্বাচন শেষে সুরু হয় মহলা। মহলায় চরিত্রের গতি বা ভাব-ভঙ্গির শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া সঙ্গীত এবং সঙ্গীতের ভার অর্পণ করা হয় সঙ্গীত-পরিচালকের (Music Director) হাতে। তখন আসে নির্ম্মাণ কার্য্যের পালা। আলোক-চিত্রশিল্পীর (Cameraman) পরামর্শে পরিচালকের নির্দ্দেশানুযায়ী দৃশ্য

নির্ম্মাণের ব্যবস্থার ভার নিতে হয় ব্যবস্থাপককে (Production manager)। তিনি পটশিল্পীকে (Set-in-charge) বুঝিয়ে দেন দৃশ্য কি ভাবে তৈরি হবে। পটশিল্পী তাঁর কর্ম্মীবৃন্দের দ্বারা সেই ভাবে দৃশ্য (Set) তৈরি করে দেন। পরে উপযুক্ত আসবাব পত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা; দৃশ্যে আবশ্যক মত চরিত্রদের (Actor or Actress) সময়মত হাজির করা, তাদের এবং সংগঠনকারীদের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে নজর রাখার ব্যবস্থাও ব্যবস্থাপককে করতে হয়।

চিত্র গ্রহণের পূর্ব্বে রূপসজ্জাকরের (Make-up man) প্রয়োজন চরিত্রদের আবশ্যক অনুযায়ী সজ্জিত করবার জন্য।

চিত্র গ্রহণের স্থান (Locations) ঘটনা অনুযায়ী স্থির করা হয়। তার মধ্যে অন্তর্দৃশ্য (Interior Set) এবং বহির্দৃশ্য (Exterior Location) দুইই থাকে। অন্তর্দৃশ্য অর্থাৎ গৃহ, ট্রেন, প্রাসাদ প্রভৃতির আভ্যন্তরিক দৃশ্য বা পাহাড়, জঙ্গল (যেখানে শব্দ গ্রহণের কোনও কাজ থাকে) প্রভৃতির দৃশ্যগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে গড়ে নিতে হয়; এবং বহির্দৃশ্য অর্থাৎ পথ, মাঠ, নদী, ঝরণা, বাগান প্রভৃতি দৃশ্যগুলি আবিষ্কার করে নিতে হয়। এই আবিষ্কারের সময় একটা জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হয় যে, শব্দ-যন্ত্র-বাহক গাড়ী (Sound truck) যাতে অনায়াসে সেই স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় এবং শব্দগ্রহণ কার্য্যে কোনও অসুবিধা না ঘটে। আর যেখানে শব্দের কোনও সম্বন্ধ নেই—সেখানে এত মাথাও ঘামাতে হয় না।

আলোক-সম্পাত না হ'লে চিত্রগ্রহণ করা যায় না। সেজন্য অন্তর্দৃশ্যে আলোক সম্পাতের ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করা হয় এবং তার জন্য উপযুক্ত আলোক-শিল্পীও (Electricians) থাকেন। বহির্দৃশ্যের জন্য এক প্রকার চকচকে রূপালী কাগজ ব্যবহৃত হয় যার দ্বারা সূর্য্যরশ্মি ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের উপর প্রতিফলিত করা হয়।

শ্রীবংশী আশ

চিত্রগ্রহণ কালে উল্লিখিত সংগঠনকারীদের মধ্যে সম্পাদক ও পরিস্ফুটনাধ্যক্ষের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কেন না তাঁদের কাজ পরে; কিন্তু বাকী সকলকেই প্রয়োজন হয়।

পরিচালক আলোক-চিত্রশিল্পীকে বুঝিয়ে দেন, তিনি কি জিনিষ দর্শকের (Audience) চোখের সামনে ফোটাতে চান। এবং চরিত্রের রূপ সম্বন্ধেও অভিনেতাদের সেই ভাবে বুঝিয়ে দেন। এ বিষয়ে পরিচালকের যে পরিমাণ দক্ষতার প্রয়োজন হয়—অভিনেতারও সেই পরিমাণে আয়ত্ত করবার ক্ষমতা থাকা দরকার।

আলোক-চিত্রশিল্পী পরিচালকের চাহিদা অনুযায়ী সেই রূপের ছায়া গ্রহণের জন্য তাঁর যন্ত্রটীকে (Camera) উপযুক্ত স্থানে স্থাপন কোরে আলোক-সম্পাতের স্থানগুলি নির্দ্দেশ কোরে দেন এবং ব'লে দেন, চরিত্রকে কতটুকু স্থানে (Camera field) চলাফেরা বা ভাবের অভিব্যক্তি করতে হবে। পরে তিনি ছায়ার উপযুক্ত আলোক গ্রহণের ক্ষমতা নিরূপণ কোরে মণিমুকুরের (Lens) ছিদ্রটীকে (apperture) সেইভাবে নিরূপিত করে দেন, এবং নিরীক্ষক যন্ত্র (Look through) সাহায্যে দেখে যান যে চরিত্র তার কোন ব্যতিক্রম করছেন কি না।

চরিত্রকে সব সময় চোখের সামনে স্পষ্ট (Focus) কোরে রাখার জন্য আবশ্যক হয় সহকারী আলোক-চিত্রশিল্পীকে (Asst-Cametaman)। কেন না যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে সমানভাবে স্পষ্ট কোরে রাখা আলোক-চিত্রশিল্পীর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এজন্য তাঁর সহকারীকে সর্ব্বদা চরিত্রের চলাফেরা বা গতির ওপর লক্ষ্য রেখে স্পষ্টীভূত-করা যন্ত্রটীকে (Focussing Disc) নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

চিত্র গ্রহণের সঙ্গেই শব্দ গ্রহণ (Sound Recording) করা হয়। যে স্থানে চরিত্র
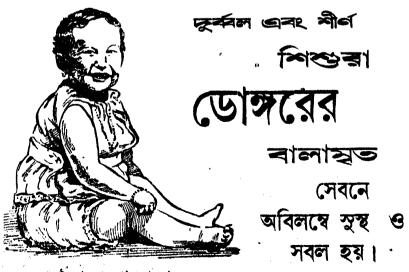
কথা বলে, সে স্থানে তার মাথার উপর শব্দগ্রাহক যন্ত্রটী (Microphone) ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কথা সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে শব্দবর্দ্ধক যন্ত্র (Amplifier) সাহায্যে বর্দ্ধিত হয়। শব্দযন্ত্রী (Sound Recordist) নিয়ামক-যন্ত্র দ্বারা সেই বর্দ্ধিত স্বরকে স্বাভাবিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন ও স্বরের বেগ অনুযায়ী আলোক নিরূপিত করে দেন। এই আলোক স্বর অনুপাতে কম্পিত হয় এবং সেই কম্পমান ছায়া মণিমুকুরের সাহায্যে যন্ত্র অভ্যন্তরস্থিত ফিতায় (Film) প্রতিফলিত হয়।

নির্ব্বাক যুগে চিত্রগ্রাহক যন্ত্র হাতে চালাবার প্রথা ছিল। কিন্তু আজকাল সবাকচিত্রের যুগে তাহা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হয়। কারণ চিত্র এবং বাণী দু'টি আলাদা যন্ত্রে গৃহীত হয়—এবং সেই দু'টি যন্ত্রের গতি (Speed) সমান রাখবার জন্য সহকারী শব্দযন্ত্রীকে (Asst. Recordist) শব্দযন্ত্র বাহক গাড়ী থেকে ও'দু'টি যন্ত্রকে চালিত করতে হয়। কেন না এই সামঞ্জস্যতা না থাকলে, মুখ হাঁ করার আগে কিম্বা পরে কথা বের হয়ে যায়।—(অবশ্য এটা আবার সম্পাদকের দোষেও হয়)

যা'তে সম্পাদনা কার্য্যে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য ধারারক্ষী (Continuity man) যন্ত্র চালিত হ'বার আগে সকলে প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসা কোরে চালাবার হুকুম দেন। (অবশ্য পরিচালকের আদেশ অনুযায়ী) যন্ত্র চালিত হ'লে তিনি একটী দু'পাল্লা কাঠ খণ্ডে (Slate) কোন্ দৃশ্য নেওয়া হচ্ছে লিখে চিত্রগ্রাহক যন্ত্রের সামনে ধরেন ও সহকারী শব্দযন্ত্রী গতির সমতা (Speed) হয়েছে জানালে তিনি সেই কাঠখণ্ডের দ্বারা একটী শব্দ করেন। এই শব্দটী সমতার (Synchronisation) সাঙ্কেতিক চিহ্ন; এবং এই চিহ্ন সাহায্যে সম্পাদক (Editor) রূপ ও বাণীকে একত্র করেন।

চিত্রগ্রহণ একদিনে শেষ হয় না বা ধারাবাহিকভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য তোলা হয় না। যখন যে দৃশ্য সুবিধামত পাওয়া যায় বা যে দৃশ্যে ঘটনা বেশী থাকে সেগুলিই আগে শেষ করা হয়। দৃশ্যে চরিত্রের প্রবেশ ও বাহির হওয়া এবং দৃশ্যের ধারা সম্বন্ধে ধারা-রক্ষীকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে উহা দৃষ্টিকটু (jerky) না হয়। গৃহীত দৃশ্যে ঘটনার যে অংশ বাকী থাকে, অপর দিন সেই অংশে চরিত্রের পোষাক, পরিচ্ছদ এবং দৃশ্যের আসবাব-পত্র ইত্যাদি যাতে পূর্ব্ব-দিনানুযায়ী হয় এজন্য ধারারক্ষীকে ঐ সব জিনিষগুলির উপরও বিশেষ নজর রাখতে হয়। এ কার্য্যে ধারারক্ষী স্থিরচিত্রশিল্পীর (Still cameraman) কিছু সহায়তা পান। কারণ প্রত্যেকটী নূতন দৃশ্যের একটী কৃত্রিম স্থির-চিত্র (still photo) নেওয়া হয়, প্রচার কার্য্যের (Publicity) জন্য। এই স্থির চিত্রের পরিস্ফুটন, (Developing) বর্দ্ধন, (Enlarging) বা রং দেওয়ার (Colouring) কার্য্য সবই স্থিরচিত্রশিল্পীকে করতে হয়। সমস্তদিন ধরে যে দৃশ্যের যা কিছু চিত্র গ্রহণ করা হয়। ধারারক্ষী সেগুলি কি ভাবে কোন্ দৃশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হবে তাহা একটী খাতায় (continuity sheet) লিখে সহকারী আলোকচিত্রশিল্পীকে দেন; তিনি সেটা গৃহীত ফিল্মের সঙ্গে রসায়নাগারে পাঠিয়ে দেন। পরে ধারারক্ষী পরিচালকের নিকট খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থাপককে জানিয়ে দেন,—পরদিন কোন্ দৃশ্যে কাজ হ'বে এবং তার জন্য কি কি আসবাব-পত্র বা কোন্ কোন্ চরিত্রের প্রয়োজন হবে।

পরিস্ফুটনাধ্যক্ষ (Laboratory in-charge) তাঁর কর্ম্মীদের সাহায্যে সেই ফিল্ম-গুলিকে রসায়ন (Chemical) দ্বারা ধুয়ে

পরিস্ফুটিত করেন—এবং এই পরিস্ফুটিত ছাঁচগুলি (Negatives) ধারারক্ষীর লিখিত কাগজটীর (Continuity sheet) সঙ্গে সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেন।

সম্পাদক (Editor) সেই লেখা অনুযায়ী ছাঁচগুলি ঠিক আছে কি না এবং ভাল হয়েছে কি না দেখে তারিখ, দৃশ্য ও ছবির নাম লিখিত এক একটী বাক্সে ভরে জমা করতে থাকেন।

চিত্র গ্রহণ কার্য্য যখন সম্পন্ন হ'য়ে যায়, সম্পাদক তখন সেই জমা করা ছাঁচগুলি ধারারক্ষীর লেখা অনুযায়ী গ্রথিত করতে থাকেন। এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ দক্ষতা আবশ্যক—কেননা ছবির ধারা বা গতির জন্য তাঁকেও দায়ী হ'তে হয়। সেজন্য তিনি যেগুলি অনাবশ্যক মনে করেন সেগুলি বাদ দেন, এবং নূতন কিছু আবশ্যক হ'লে পরিচালককে জানিয়ে দেন।

সম্পাদনা শেষ হ'লে,—গ্রথিত ছাঁচগুলি মুদ্রণের (Printing) জন্য আবার রসায়নাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হ'য়ে গেলে পরিস্ফুটনাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও পরিচালক ছবিটী একবার নিজেরা দেখে নেন—কোথাও কিছু গলদ আছে কিনা—পরে সেটা রাজ-অনুমতির জন্য চলচ্চিত্র রেজেষ্ট্রী বিভাগীয় (Board of Censors) কর্ম্মচারীর সামনে প্রদর্শিত হয়—এবং অনুমতি পত্র পাওয়া গেলে তবে দর্শকদের সামনে দেখান হয়।

ছবির মূল্য দর্শকদের রুচির উপর নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বাস্তবিকই একটা ভাল ছবি হয়ত দর্শকরা পছন্দ করলেন না—অথচ একটা মাঝারী ছবি দিনের পর দিন আগ্রহের সহিত দেখতে লাগলেন। কিন্তু তাই বলে দর্শকদের মধ্যে সকলেই সমান ন'ন, তাঁদের মধ্যে অনেক গুণীও আছেন যাঁরা যথার্থ গুণীর আদর বোঝেন।

এখন প্রযোজককে (Producer) নির্ব্বাচনের সময় দেখতে হ'বে—প্রথমতঃ যে বই তিনি নেবেন তার ঘটনায় বৈচিত্র্য কিছু আছে কি না! চলচ্চিত্র রেজেষ্ট্রী বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হ'বে কি না! এবং চিত্রা মোদীদের মুগ্ধ করতে পারবে কি না!

দ্বিতীয়তঃ—তিনি যে পরিচালক নির্ব্বাচিত করবেন, আমাদের দেশে তাঁকে চিত্রনাট্যকারের কাজও করতে হয়। সুতরাং দেখতে হ'বে তাঁর কল্পনাকে রূপ দেওয়া, চরিত্রকে শিক্ষা দেওয়া বা পরিকল্পনার ক্ষমতা আছে কি না! ছবির গতি (Tempo) বা ধারা (Continuity) সম্বন্ধে জ্ঞান আছে কিনা! চরিত্র নির্ব্বাচনের সময় কল্পনার রূপ অনুযায়ী চরিত্র নির্ব্বাচনের ক্ষমতাও তাঁর প্রয়োজন। কারণ ইনিই চলচ্চিত্রের কর্ণধার, এবং এরই দক্ষতায় চিত্রমোদীরা দৃষ্ট চিত্রের ঘটনা বুঝতে সক্ষম হ'ন।

তৃতীয়তঃ—আলোক-চিত্রশিল্পী ও শব্দযন্ত্রী। যাঁদের কলা-নৈপুণ্যে দর্শক কল্পনার বাস্তব রূপ চোখের সামনে দেখতে পান, বা তাদের ব্যক্ত ভাষা শুনতে পান; তাঁদের দায়িত্বও কম নয়। সে ক্ষেত্রে দেখতে হয়, আলোকচিত্রশিল্পীর দৃশ্য-সৌন্দর্য্য (Composition) বা চরিত্রের রূপানুরূপ ছায়া-গ্রহণ (Correct Exposure) সম্বন্ধে জ্ঞান আছে কি না।

শব্দযন্ত্রীরও সেরকম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও স্বরের মাধুর্য্য, (Softness and Sweetness) স্বরের বিস্তার (modulation of voice) দৃষ্ট ব্যক্তি বা ঘটনা অনুযায়ী শব্দের (Effect Sound) তারতম্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে কিনা দেখা দরকার।

এরকম প্রত্যেকটী কর্ম্মী বা চরিত্র যদি উপযুক্তভাবে নির্ব্বাচিত হ'ন তা'হলে সে প্রতিষ্ঠানের ছবি কিছুতেই (অন্ততঃ বিচারের দিক থেকে) খারাপ হ'তে পারে না। এবং এই নির্ব্বাচনের জন্য প্রযোজকেরও দরকার এসব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করা—নচেৎ তাঁর পক্ষে চলচ্চিত্র শিল্প-ব্যবসায় উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না।

প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি !

শরৎচন্দ্রের মানস-কন্যা
"বিজয়া"র প্রতি আশীর্ব্বাণী

"কাল রূপবাণীতে আমাদের বিজয়ার চিত্রাভিনয় দেখে এলাম। শ্রীমান অহর মল্লিকের রাসবিহারী অত্যন্ত ভাল লাগলো। মনে হলো যেন ঠিক এমনি কল্পনাই করেছিলাম। এঁরা বিজয়া নাটক ও দত্তা উপন্যাস দুটিই কাজে লাগিয়েছেন। এতে এঁদের রসবোধের প্রশংসা না করে পারা যায় না। নীচে বহু দর্শকের সমবেত আনন্দ কলরবে এক বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া গেল যে বহুলোকেরই এঁরা প্রীতি ও সমাদর লাভ করেছেন। আমার অনেক গল্পই নিউ থিয়েটার্স কোম্পানির হাতে দর্শকের কাছে উচ্চ খ্যাতি লাভ করেছে, সুতরাং এ আশাও রাখি যে এ ছবিখানিও তাঁদের তেমনি আসনেই অব্যাহত থাকবে। ইতি ২০শে কার্ত্তিক ১৩৪৩॥

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

* চন্দ্রাবতী   পাহাড়ী *

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

বিজয়া

নিউ থিয়েটার্সের বিজয়-কীর্ত্তি

দেখিয়া সকলেই স্বীকার করিতেছেন—সকল দিক দিয়া বিচার করিলে "বিজয়া"-র মত নিখুঁত ছবি এ বছরে একখানিও প্রস্তুত হয় নাই।

*

সপরিবারে মাতা, পিতা, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি এক সঙ্গে বসিয়া এই ছবি দেখিতে পারেন—এ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন।

"রূপবাণী"তে চলিতেছে

"বিজয়া" সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অভিমত

"শুধু নিউ থিয়েটার্সের ছবি দেখিতেই যাঁহারা ভালো-বাসেন - তাঁহারাও "বিজয়াতে" নূতনত্বের সন্ধান পাইবেন।"

—অ্যাড্ভান্স

× × ×

"শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজয়া' নিউ থিয়েটার্স্ কর্ত্তৃক সাফল্য-মণ্ডিতরূপে চিত্রাকারে পরিণত করা হইয়াছে।

আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চিত্রটি সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য বস্তুতে ভরপুর।"

—অমৃতবাজার

× × ×

"ছবিখানি দেখিয়া আমরা আশাতীত প্রীতি লাভ করিয়াছি। ছবিখানির মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা প্রত্যেকের অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারে না এবং এইজন্যই ছবিখানি সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকের প্রশংসা অর্জ্জন করিবে—এ-কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।"

—আনন্দবাজার

× × ×

"Bejoya" has appealed to me as one of the most neatly produced films I have seen in recent months. The easy flow of the story as well as talented performances from well-known artistes have placed the production in the front rank of screen entertainment.

Chandrasekhar,
Editor-in-Chief—"DIPALI"

মনস্তত্ত্বমূলক সংলাপের ভেতর দিয়ে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি আজও পর্য্যন্ত আমাদের দেশের চিত্ররাজ্যে সংঘটিত হয় নি। নিউ থিয়েটার্সের "বিজয়া" এই অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হয়েছে এবং এই জন্যেই ছবিখানা বাঙ্গলাদেশের ছায়াজগতে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক—"খেয়ালী"

× × ×

* "BIJOYA" *

"Bijoya" possesses all the necessary elements of a successful social picture. Such a lucid and masterly treatment of a tough theme deserves high encomiums.

B. Ray Chaudhury
Editor—VARIETIES WEEKLY.

× × ×

পরিচালনার দিক দিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশ রঞ্জন দাস ছবিখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার কোন চেষ্টাই বাকী রাখেন নাই।

—বসুমতী

× × ×

অনেক ছবি দেখবার নিমন্ত্রণ আসে, ছবিও দেখি কিন্তু মনে থাকে কটা?

'বিজয়া' দেখে মন বলছে হ্যাঁ, অনেকদিন মনের কোনে তার আসন থাকবে।

শিক্ষিতা তরুণী মনের দ্বন্দ্ব খুব কম ছবিতেই এমন ভাবে ধরা পড়েছে। তা ছাড়া শরৎ বাবুর বই নিউ ইণ্ডিয়ার প্রডাক্‌শন্। হবেই বা না কেন?

শ্রীশিশির কুমার বসু
সম্পাদক—"অগ্রদূত"

শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে "বিজয়া"-র প্রশংসা

"বিজয়া" বাঙলার শ্রেষ্ঠ সামাজিক-চিত্র

প্রথম শ্রেণীর রুচি-জ্ঞান না থাকিলে শরৎ চন্দ্রের "বিজয়াকে" চিত্ররূপ দেওয়া কঠিন। নিউ থিয়েটার্স নূতন করিয়া প্রমাণ করিলেন, শরৎ চন্দ্রের কথা-সাহিত্যকে জীবন্ত করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে। অতি বড় নিন্দুকও "বিজয়া" দেখিয়া সুখী হইবেন।

শ্রীশিশির কুমার মিত্র
সম্পাদক—"শিশির"

× × ×

নিউ থিয়েটার্সের "বিজয়া" দেখে প্রচুর তৃপ্তি পেয়েছি। উপন্যাসের চরিত্রগুলি চিত্রে যে যথাযথভাবে রূপায়িত হয়েছে, এইটিই সবার চেয়ে আনন্দের কথা। অভিনয়ের দিক দিয়ে অমর মল্লিক ও চন্দ্রাবতী বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চিত্রগ্রহণ হ'য়েছে নিখুঁৎ ও স্পষ্ট, চন্দ্রাবতীকে এত সুন্দর এর আগে আমরা দেখিনি।

সুশীল রায়
সম্পাদক—"নাচঘর"

× × ×

'বিজয়া'র চিত্ররূপ হয়েছে যেমনি মধুর, তেমনি প্রাণস্পর্শী। কি প্রযোজনায়, কি পরিচালনায়, কি অভিনয়ে, নিউ থিয়েটার্সের শিল্পী ও টেকনিসিয়ানদের গৌরব কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। বিশেষ ক'রে রাসবিহারীর ভূমিকায় অমর মল্লিকের অভিনয় হয়েছে এই ছবিখানির একটী অমূল্য সম্পদ। রূপবাণীর রূপের আগারে 'বিজয়া'র রোমান্স যে আনন্দ সৃষ্টি করবে তা থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রত্যেক রসপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে দুর্ভাগ্য বলেই আমার মনে হয়।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল
সম্পাদক—"বাতায়ন"

অভিনয় যখন আর অভিনয় থাকেনা···জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে এক হয়ে যায় সেই ধরণের সামাজিক ছবিই শিক্ষিত মনকে তৃপ্তি দেয়।

'বিজয়া' সম্পর্কে এই কথা জোর করে বলতে পারছি।

Jyotish Chandra Ghose
Editor—"Ruprekha"

× × ×

The story has been presented in a straight forward manner with deft touches and fine acting. It will be enjoyed by all,—in fact it is a picture for the whole family.

P, Gupta
Ed.—FILMS & STARS,

× × ×

নিউ ইণ্ডিয়া চিত্র সঙ্ঘের তৈরী, প্রাইমা ফিল্ম কোম্পানীর দ্বারা পরিবেশিত শরৎ চন্দ্রের "দত্তা"র চিত্রনাট্য রূপান্তর "বিজয়া" রূপবাণীতে দেখে এবং শুনে এসেছি। ছবিটী যে জনপ্রিয় হয়েছে, তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। শরৎদার রচিত বাক্য প্রতিবাক্যের গুনতো আছেই, তার উপর শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী এবং বিশেষ ক'রে শ্রীঅমর মল্লিকের অভিনয় যথাক্রমে নরেন, বিজয়া, ও রাসবিহারীর ভূমিকায় প্রশংসনীয়। শুধু অমর মল্লিকের অভিনয় দেখবার জন্যেই "বিজয়া" দেখা উচিৎ। দীনেশ দাসের নিয়ন্ত্রণও সুষ্ঠু। 'বিজয়া'র দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই।

শ্রীগিরিজা কুমার বসু

"বিজয়া" একবার দেখিলে আবার দেখিতে হইবে

"বিজয়া" বাঙলা ও বাঙ্গালীর নিজস্ব চিত্র

আজ সন্ধ্যায় রূপবাণীতে 'দত্তার' ফিলিম্ দেখিলাম, সমস্ত বিষয়টী অতি সুচারুরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, বুড়ো রাসবিহারীর ভূমিকাটী খুব স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহার ক্রূর ও জটিল্ প্রকৃতি লম্বা আধপাকা দাড়ির অটুট গাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়া চমৎকাররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, যতরূপ অবস্থার বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া এই ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ্ করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটীতে স্বীয় অন্তরের ক্ষোভ অদ্ভুতরূপে গোপন করিয়া কোন অবস্থায় সে বাহ্যিক নৈরাশ্য বা দুঃখ প্রকাশ করে নাই, সর্ব্ব অবস্থার সঙ্গে সে নিজেকে মানাইয়া লইয়া তাহার চরিত্রের ক্রূরতার মধ্যে এমন একটা সংযম দেখাইয়াছে যাহাতে তাহার স্বতঃসিদ্ধ খলতা একটা ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে, এই নির্লজ্জ, অক্ষুব্ধ চরিত্রটী অভিনয়ের গুণে নাট্যমঞ্চে একটী বিস্ময়কর ও দর্শনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শেষ অঙ্কে যখন সে জল খাবারের অনুরোধ এড়াইয়া গেল, সেই স্থানে মাত্র তাহার সংযমের বাঁধ একটু শিথিল হইয়াছিল। ক্ষুদ্র চরিত্রের মধ্যে পরেশের ভূমিকাটী চমৎকার হইয়াছে, তাহার সারল্যে একটা বাল্যস্বভাব মাধুর্য্য সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইয়া দর্শকগণের কাছে তাহাকে দর্শনীয় করিয়া তুলিয়াছে। নরেন ও বিজয়ার মান অভিমান এবং বিলাসের গুণ্ডামী ও তাহার সঙ্গে তাহার পিতার প্রতিপদে সংযম এই সমস্ত মিলিয়া দৃশ্যগুলিকে চিত্তাকর্ষক করিয়াছে। আজ সন্ধ্যা খুব আনন্দে কাটাইলাম বলিতে হইবে।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন

'Bijoya has pleased me.'

M. Das Gupta. A. R. C. A.

(London)

× × ×

New Theatres B. Unit has demonstrated in "Bijoya" that it is no worshipper of names. "Bijoya" is a bewitching product of a perfectly poised team work of men and women who have neither the glamour of a princely inheritance nor the tradition of a rocketeering past. I congratulate those who have blended beauty and economy in this artistic production.

A. K. Sircar

× × ×

কুমারী বিজয়ার প্রেমবিধুর অন্তরের ব্যথাকে অবলম্বন ক'রে শরৎ চন্দ্রের "দত্তা" রচিত। "বিজয়া" ছায়াছবিতে যে রস যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে, তা রসপিপাসু ব্যক্তি মাত্রকেই আনন্দ দিবে।

শচীন সেন

"বিজয়া" অভিনেতৃ সম্মিলনে অপূর্ব্ব!

"বিজয়া"-র বিজয়-বাণী দিকে দিকে মুখরিত!

এইমাত্র "বিজয়া" সিনেমায় দেখে অতিশয় আনন্দলাভ করলাম। চমৎকার হয়েছে।

উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

× × ×

"বিজয়া"র চিত্ররূপ দেখে খুসি হ'য়েছি এ কথা অসঙ্কোচে বলা চলে যদি কঠোর সমালোচকের চশমাখানি খুলে প্রশান্ত মনে দেখা যায়।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

× × ×

"বিজয়ায়" রাসবিহারীর এবং পরেশের অভিনয় নিখুঁৎ সুন্দর। বহির চরিত্র মূর্ত্ত দেখিলাম।

শ্রীরাধারাণী দেবী

× × ×

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ

প্রিয়বরেষু—

"বিজয়া" দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। গল্পটী সুকথিত ও অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জ্জিত হওয়ায় ছবিখানি উপভোগ্য হইয়াছে। গল্পের নাটকীয় ধারা ও পাত্র পাত্রীদের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর সবাক ছবির প্রধান যে আকর্ষণ, "বিজয়ায়" পূর্ণমাত্রাতেই আছে।

ভবদীয়—

শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

× × ×

"বিজয়া" দেখিতে আসার আগে নিজের মনেই ভাবিতেছিলাম—শরৎ চন্দ্রের একখানি নাতিবৃহৎ উপন্যাসে মানব মনের যে চিরন্তন রহস্যের কথা, অনুভূতির কথা, তাহার অনবদ্য-লেখনীতে প্রকাশ করিয়াছেন—স্বল্পসময়ের বিধিবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হইবে? হয়ত বা কোথাও একান্ত অবাঞ্ছিত কাট ছাঁট দেখিয়া হতাশ হইতে হইবে। কিন্তু "বিজয়া" দেখিয়া মনে হইল কোথাও রসপরিবেশনের কোন ত্রুটী হয় নাই—অব্যাহতভাবে শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা এই চিত্রনাট্যখানির আছে।

রাসবিহারী ও নরেন্দ্রের ভূমিকা অতিসুন্দর হইয়াছে—পূর্ণাঙ্গ অভিনয় আগাগোড়া স্বাভাবিকতায় ভরা—কোথাও এতটুকু আড়ষ্ট ভাব নাই। "বিজয়া"র অভিনয়ের মধ্যে দেখিতে পাই শরৎ চন্দ্রের মানস-কন্যা বিজয়া একেবারে জীবন্ত।

আর একটা বড় কথা "বিজয়া" শুধু সবান্ধবে নহে সপরিবারে দেখিয়া তৃপ্তি ও আনন্দ পাইবার সুযোগ বাঙ্গালীকে দিয়াছে।

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

× × ×

বিজয়া দেখে অভিভূত হয়েছি।

যে ছবি দর্শকদের মন আকর্ষণ করতে পারে তার প্রশংসা-পত্রের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। "বিজয়া" সম্পর্কে অকুণ্ঠিত-চিত্তে এই কথা বলতে পারি যে ছবিখানি দেখিবার পর চন্দ্রাকে বাঙ্গলার মালিন বলে অভিহিত করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মন্মথ রায়

অমর মল্লিক

আরতি

শ্যাম লাহা

চাকুরীগত প্রাণ

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

কারবার করা? আরে রাম রাম!
কারবারীদের খাতির আছে?
ঘুরে ঘুরে মরো, খোসামোদ করো
রাম শ্যাম যদু মধুর কাছে!
রোদে পোড়ো, শীতে কাঁপো, জলে ভেজো,
পাওনা টাকার তাগাদা ক'রে
কোনো মাসে এলো দুশো, কোনো মাসে
হাপিত্যেশেই রইলে প'ড়ে!
কোনো মাসে লুচী, কোনো মাসে কচু,
ওঠা আর পড়া লেগেই আছে!
বেশী দেনা হ'লে জেলে যেতে হবে,
পালিয়ে বেড়াও, ধরে বা পাছে!

তার চেয়ে ভালো বাঁধা-মাইনেটি,
সোনায় সোহাগা বেশীই হ'লে!
কমই যদি হয়, তবুও তা ভালো
ফিক্সড ইন্‌কাম্ কমেনা ব'লে!
মাথার ওপরে পাখা ঘোরে, জ্বলে
দিনের বেলাতে বিজলী আলো,
সিঁড়ি ভাঙা নেই, বেল্ দিলে লিফট্
তুলে দ্যায়, কার না লাগে ভালো?
ঘণ্টি মারিলে 'বয়' ছুটে আসে,
করো ফরমাস্ যে যত পারো,
দাড়ীতে বেয়ারা নেই যার, দেখো
হুকুম করায় কায়দা তারও!

কাগজ, কলম, পেন্সিল, নিব্,
পিন, ক্লিপ, কালী, চাইলে পাবে,
খস্‌খস্ ঢাকা ঠাণ্ডা ঘরটি,
গরমের দিনে কোথায় যাবে?
কামাই করিলে চটে বড়বাবু,
কাজে ভুল হ'লে সাহেব রাগে,
হয়ত খিঁচোয়, চ'লে যেতে বলে,
ক্রমে সয়ে যায়, কিছু না লাগে!

মাস গেলে পাও বাঁধা মাইনেটি,
করো বাবুয়ানী, সায়েব সাজো!
কড়া কথা যদি সহিতে না পারো,
কর সরকারী, বাসন মাজো।

স'য়ে যদি যাও, তৈল খরচ
ক'রে যদি যাও, সবুরে ফলে,
মেওয়া কি রকম, দেখে নিয়ো দাদা,
বাড়ী করা হয়, গাড়ীও চলে।
বাঁধা মাইনের সাধা যে আরাম,
হাঁদাগুলো তারে পালায় ছেড়ে,
'গোলামী কখনো করবনা' ব'লে
খোলে মণিহারী দোকান ভেড়ে!
চাকরী করার খাতির আলাদা,
জজ হ'তে ক্ষুদে কেরাণীটার
গোত্র যে এক, সবাই চাকর!
স্বাধীন থাকার জ্বালা দেদার!

গৃহিনী বলেন 'পোয়ে ডান্স যাব,'
'সেক্ দেখালেনা' 'হ'লনা সাদী'!
বন্ধুরা চায় সাব্‌স্ক্রিপ্‌শন্,
নাতি দেখাতে যে এসেছে দাদী।
ছেলের ভাতেতে ভোজ দিতে হবে,
চেঞ্জে যাবারো খরচ আছে,

সিগারেট খাওয়া একলা হয় না,
দিতে হয় কেউ থাকিলে কাছে,
ট্রাম বাস ভাড়া, আইবুড়ো ভাত,
ঝি রাঁধুনীদের মাইনে গোটা,
পাঞ্জাবী করা, ড্রাইং ক্লিনিং,
কম দামে কেনা পুরোণ সোনা,—

হাজার রকম ব্যয় যে রয়েছে,
ডাল ভাত খাওয়া দুবেলা ছাড়া,
ঘরে ও বাইরে তাগাদা রয়েছে,
চা জলখাবার-রোগের তাড়া!
বাকী ফেলা চলে, দেনা পাওয়া চলে,
শুধু মাইনেটি থাকিলে বাঁধা।
তুমি যে বাঙালী, জন্ম-চাকর,
অবাঙালীভূত নওত, দাদা!
তাদের ত' নাম-করণ করেছ
ড়-কারান্তের নানান্ ঢঙে!
চাকরী, চাকরী, কর জপমালা
দুনিয়া হেরিবে নতুন রঙে।

রূপসজ্জা ও অভিনয় কলা

মূল লেখক :—মজহার খাঁ   অনুবাদক : – শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত

রূপসজ্জা আর অভিনয় জিনিষটে ভারতবর্ষে মোটেই নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি এদুটো শিল্প চর্চ্চায় পশ্চিম দেশ আমাদের থেকে খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার অনেক নবীন লেখকের চোখ ঝলসে গেছে। আরোও অনেকের সঙ্গে তাঁরাও প্রায়ই বলে থাকেন যে এদুটো জিনিষ ভারতবর্ষ নাকি পাশ্চাত্যের কাছ থেকেই ধার করেছে। কিন্তু এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এবিষয়ে আমার একটা বিশিষ্ট কৌতূহল আছে বলে অবসর সময়ে এরজন্যে কিছু কিছু পড়াশোনা করে থাকি। এবং সেই জন্যে জানতে পেরেছি যে এদুটো শিল্পের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা বহুকাল আগে থেকেই পরিচিত। আর এমন দিনেও এর আরাধনা আমাদের দেশে ছিল যখন নাকি ইউরোপীয়রা একটা বর্ব্বর জীবন যাপন করতো। এদেশের প্রাচীন পুস্তকগুলোতে একথার প্রমাণ আছে। বহু প্রাচীনকালে 'নিরৎ' আর 'ভারূপ' বলে অন্যান্য চারুকলার সঙ্গে উপরি উক্ত শিল্পদুটোর চর্চ্চা করা হতো। অভিনয়কেই সে সময়ে বলা হতো 'নিরৎ' আর 'ভারূপ' হলো রূপসজ্জা। নাটক রচনা যেমন ভারতের অতি প্রাচীন এবং নিজস্ব সম্পদ তেমনি এদুটো শিল্পও।

এদুটো শিল্প সম্বন্ধে এদেশের ইতিহাসে যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তার থেকে নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয়ে যায় যে একমাত্র ভারতবর্ষেই এবিষয়ে 'প্রাচীনত্ব' দাবী করবার অধিকারী। পুরাকালেও যুদ্ধ বিগ্রহে গুপ্তচর বিভাগ দেশের অনেকখানি কাজ করে দিতো। গুপ্তচর বিভাগের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিলো। সৈনিকের আড্ডায়, শত্রুর শিবিরে গিয়ে এরা বিপক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করে আনতো। এবং এর জন্যে শুধু রূপসজ্জায়ই নয় অভিনয়েও দক্ষতা দেখাবার প্রয়োজন হতো। অধিক আর বলতে চাইনে একথা।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এমন সব লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা প্রতিনিয়তই রূপসজ্জা আর অভিনয়-বিদ্যার পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের সহরে এবং গ্রামে এমন অনেক ব্যবসায়ী ভিখারী আছে যারা নাকি কাঙ্গালী অভাবগ্রস্থ বা পীড়িতের অভিনয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে করে আমাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে থাকে। প্রায়ই এরকম ঘটে যে, একজন লোক হয়তো এসেছে আমার কাছে—সে তার কল্পিত কাহিনী এমন করুণ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করলো যে, শেষ পর্য্যন্ত তাকে কিছু দিতে বাধ্য হলাম। অথচ এ ঘটনার ঠিক অব্যবহিত পরেই হয়তো দেখি লোকটা নিতান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই স্ফূর্ত্তি করে বেড়াচ্ছে! বাস্তবিক তাদের অভিনয় আমাদের এতোটো প্রবঞ্চিত করে যে দয়াপরবশ হয়ে ওদের সাহায্য করতে হয়।

এই শ্রেণীর ভিক্ষুকদের কেউ কেউ এমন নিখুঁত অভিনেতা যে তাদের দেখে অতি বড়ো পাষাণহৃদয় ব্যক্তির অন্তরও গলে যায়। অনেক ভিক্ষুকদের দেখি তারা দুটো যষ্টিতে ভর করে খঞ্জের মতো ঘুড়ে বেড়ায়। এইসব কূট অভিনেতারা তাদের পা গুড়, তৈল আর কিছু রঙ মাখিয়ে এমনভাবে তৈরী করে তোলে যে তা' দেখতে অতি কদর্য্য, রীতিমতো বীভৎস বলে ভ্রম হয়। আবার অনেক খঞ্জ, অন্ধ বা দুঃস্থের রূপসজ্জা করে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই অভিনয় করে যায় নিজ নিজ অংশ।

শুধুমাত্র ভিক্ষুকেরাই নয়, চোর ডাকাত বা ফেরারী আসামীরাও এই রূপসজ্জা আর অভিনয়ের আরাধনা করে থাকে। চিত্ররাজ্যে প্রবেশ করবার আগে আমি পুলিশ ইন্সপেকটরের চাকুরী করতাম এবং সেই জন্যে এধরণের নানাবিধ ঘটনারই সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। নীচে একটিমাত্র ঘটনার কথা বলছি।

'হিসার' ডিস্ট্রিক্টের একটা দুর্দ্দান্ত ডাকাত এক সময়ে পুলিশদের এতোই

বিব্রত করে তুলেছিলো যে তাকে দমন করবার জন্যে একটি অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীকে সে অঞ্চলে পাঠাতে হয়েছিলো। এই রিজার্ভ বাহিনীতে আমিও ছিলাম বলে জীবনের একটি শান্তিহীন চাকরীর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে পেরেছিলাম। অনেক বারই অনেক রকম রূপসজ্জার সাহায্যে সেই দুর্দ্দান্ত ডাকাত আমাদের চোখের সামনে থেকেই অন্তর্দ্ধান হ'তে পেরেছিলো আর এরজন্যে একাধিকবার আমরাও বোকা বনে গেছলাম। এমন কী যখন তাকে শেষ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হলো তখনও সে পীড়িত ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে! সে কিছুই জানে না তার এরকম ভঙ্গী আর সহায়হীনতার অভিনয় সেই মুহূর্ত্তেও এমন চমৎকার হয়েছিলো যে প্রথম দৃষ্টিতে আমরা কিছুতেই স্বীকার করতে পারি নি যে এই সেই লোক যার পেছনে আমরা এতোদিন ধরে ঘুরে মরছি। বস্তুতঃ ওর একজন সহকারীর জন্যেই ওকে ধরা পড়তে হয়েছিলো।

সেক্সপিয়ার বলেছেন জীবন একটা নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রত্যেক মানুষই একজন অভিনেতা। এটা বাস্তবিক খাঁটী কথা। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে 'ষ্টাইল' কাকে বলে জানেনা, ঘরের আব-হাওয়ার ভেতর নিমজ্জিত হয়েই সেই অনুযায়ী সে নিজেকে বাড়ীর চালচলনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। এমন কী প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকেও প্রয়োজন ঘটলে মাঝে মাঝে অভিনয় করতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যখন তিনি কোন নতুন জায়গায় গমন করেন তখন স্বতঃই তিনি সে জায়গায় হাবভাব, রীতিনীতি বা আবহাওয়া আয়ত্ব করবার বা অনুকরণ করবার চেষ্টা করে থাকেন। এটা অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা কখনো বলতে পারিনে আলোচ্য শিল্পচর্চ্চা এদেশে পাশ্চাত্যের দান। এই শিল্পচর্চ্চার অভিজ্ঞতার হিসেবে ভারতবর্ষ সবসময়েই গর্ব্ব করতে পারে তার যথেষ্ট প্রমান আমাদের চারধারেই আছে, শুধু আমাদের চোখ খুলে দেখলেই হয়!

সম্পাদকের দপ্তর

মাননীয় "খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

বেতার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত অভিযোগটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রচার করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আজকাল বেতার প্রোগ্রামের যেরূপ দিন দিন উন্নতি সাধন হইতেছে তাহাতে যদি কোন বিশেষ দিনে অর্থাৎ কোন পর্ব্বোপলক্ষে কোন রসহীন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। বেতার কর্ত্তৃপক্ষগণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ইদানীং যেরূপ কলাকুশলী শিল্পীদের সমাবেশে নানাবিধ উপভোগ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছেন সেজন্য অবশ্য তাঁহাদের ধন্যবাদ। কিন্তু গত ২২শে অক্টোবর মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় তাঁহারা "বালটিকুরী রামকৃষ্ণ নাট্য সমাজ" নামে যে যাত্রাদলটিকে বেতার আসরে বায়না দিয়াছিলেন তাঁহারা সেদিন শ্রোতাদের তৃপ্তি না দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্তি পরিবেশন করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানটি ছিল "ভার্গব-বিজয়" যাত্রাভিনয়। এরূপ নিম্নশ্রেণীর ও পীড়াদায়ক অনুষ্ঠান ইতিপূর্ব্বে আর বেতারে হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। অনুষ্ঠানটির পরিচালক মহাশয় ৺পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের এইরূপ একখানি সুলিখিত ও সুচিন্তিত নাটকের ভিতর, ইহার তুলনায় অতি নিম্নশ্রেণীর কোন একখানি নাটক হইতে কতকগুলি অবান্তর ও ভাঁড়ামীর দৃশ্য সংযোজিত করিয়া যে অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। তারপর অভিনয়—এরূপ নিম্নশ্রেণীর অভিনয় পূর্ব্বযুগের তথাকথিত কোন কোন পেশাদার যাত্রাদলেই এবং পল্লীগ্রামেই সম্ভব। ভীষ্মের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করিতেছিলেন তাঁহার অভিনয় শুনিয়া হৃদয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কোন রসের উদ্রেক হয় না। আবৃত্তি জ্ঞান ত দূরের কথা অভিনেতাটির জিহ্বার জড়তা এখনও কাটে নাই। সুতরাং নাম ভূমিকাই যখন এইরূপ, তখন অন্যান্য ভূমিকাগুলি সম্বন্ধে কিছু আশা করা বিড়ম্বনা। তবু উঁহাদের মধ্যে অম্বা ও পরশুরামের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অম্বার সুনিপুণ বাচনভঙ্গী ও পরশুরামের উদাত্ত কণ্ঠস্বর প্রশংসনীয়। অবশ্য গঙ্গার ভূমিকা উচ্চাঙ্গের না হইলেও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই তিনজন অভিনেতাই শুধু সেদিনের অনুষ্ঠানটিকে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও সাফল্যমণ্ডিত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক বেতার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, কোন ছুটির দিন যে দিন অধিকাংশ শ্রোতাই বন্ধু ও আত্মীয়গণ পরিবৃত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে কিছু আনন্দ উপভোগের আশায় বেতার যন্ত্রের নিকট বসিবার অবসর পান, সে সময় যদি এইরূপ পীড়াদায়ক অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় তাহা হইলে বড়ই আক্ষেপের বিষয়! আশা করি তাঁহারা ভবিষ্যতে এই বিষয়ে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন যাহাতে এইরূপ কদর্য্য ও রসহীন অনুষ্ঠান আর পরিচালিত না হয়।

আর একটি কথা—উপরোক্ত অনুষ্ঠানটির সঙ্গীত পরিচালকের নাম দেখিলাম শ্রীকালিপদ পাঠক। ইনি কি আমাদের বেতারের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের অন্যতম সুগায়ক কালিপদ পাঠক মহাশয়? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বাস্তবিক অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাঁহার মত একজন বিখ্যাত সুর-শিল্পীর অধিনায়কত্বে কি করিয়া এইরূপ নিম্নশ্রেণীর অনুষ্ঠান সম্ভব হইল!

৩৭।২, মনোহর পুকুর রোড।
বালিগঞ্জ—কলিকাতা।
৬.১১.৩৬

গুহ

দোলোরেস দেল রিও
কলোম্বিয়ার তারকা

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, হাসময় রোড (সাউথ), কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৪৩—১৯শে নভেম্বর ১৯৩৬ } ৪৪শ সংখ্যা

আত্মসমর্পণ না আত্মহত্যা ?

গত সোমবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের নির্ব্বাচন অভিযান সুরু হইয়াছে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু "কামাল পাশা" ও "স্বাধীনতা সংগ্রাম" প্রভৃতি গালভরা বুলি লইয়া ও বুকভরা আশা বহন করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া একই বাক্যে মিলন-ফর্ম্মুলার উচ্ছ্বাস প্রকাশ ও নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মিলনব্যাধি শরৎচন্দ্রের মন ও প্রাণকে এরূপ নিবিড় ভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে, তিনি মিলনমোহে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। "Bengal's heresy of yesterday has surrendered to India's orthodoxy of today"—শরৎচন্দ্রের স্মরণীয় বক্তৃতার অংশ বিশেষকে বিকৃত করিয়া মিলন মরীচিকার দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও তিনি আজ অন্ধ। মিলনের যে বীজাণু তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে বর্ত্তমানে তাহা উদ্‌ঘাটিত করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। সুতরাং যতদিন মিলনের বীজাণুর বিষক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে ততদিন শরৎচন্দ্রকে মিলন-মোহ-বিরচিত শূন্য সৌধে নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিতে দেওয়াই শ্রেয়। শরৎচন্দ্র কামালপাশা, স্বাধীনতা ও মন্ত্রীত্ব বর্জ্জনের কল্পনায় বিভোর থাকুন—আর তাঁহার কল্পনা বিলাসের তন্ময়তার রন্ধ্রপথে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রীত্ব-গ্রহণের সরঞ্জাম সুশৃঙ্খলভাবে গঠন করুন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে তাঁহার কল্পিত মিলন-সুখ উপভোগের অবকাশ দিয়া আমরা পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতির কিঞ্চিৎ পরিচয় জনসাধারণকে জানাইয়া দিতে চাই। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার জাবর কাটিয়া যিনি আজ প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন তিনি বিগত তিন বৎসরের রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে সেই শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার পরিচয় দিয়াছেন কি? তাঁহার সদ্যবিকশিত কংগ্রেস-প্রীতি প্রশংসনীয় হইলেও দেশবাসী কি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে না যে, সুরেন্দ্রনাথের সহিত নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইতে দেশবন্ধুর জীবদ্দশা কাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসে তিনি পূর্ণভাবে যোগদান করেন নাই কেন? গত এপ্রিল মাসে কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে যখন শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মনোনীত সদস্যগণ নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হন, তখন ডাঃ রায় প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে বহু কংগ্রেস-প্রার্থীর বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এবং নির্ব্বাচনের পর মিঃ রুনা ও অমারেবল মিঃ বি কে

কংগ্রেস স্থায় anti-congress ও reactionery elementsদের সহিত যোগাযোগ সাধন করিয়া অল্ডারম্যান পদপ্রার্থীদের পরাজিত করেন। তৎকালে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু জোড়াসাঁকোর রাজবাড়ীর মন্ত্রণা-বৈঠকের উল্লেখ করিয়া যে dishonourable tactics ও strange alliancesএর উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কংগ্রেস-প্রীতি প্রতীয়মান হয়। যিনি প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াছিলেন—এমন কি, এই বিরোধিতা সদর্পে সমর্থন করিয়াছিলেন, তিনি আজ প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অধীশ্বর—তাঁহারই মুখে আজ কংগ্রেসের জয়গান—শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার নিরর্থক বুলি! যে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতি রায়-রুনী প্যাক্টের প্রবর্তক সেই পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মনোনীত প্রার্থীরা কামালপাশার আদর্শ ও স্বাধীনতার আদর্শ কি পরিমাণে বহন করিবার শক্তি ধারণ করিতে পারে তাহা শ্রদ্ধেয় শরৎ বাবু বলিতে পারেন কি? রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় ও রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র সেনের স্থায় সরকারী উপাধিধারী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞাস্য যে, তাঁহাদের মধ্যে কয়জনকে staunch Congressmen আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে? হাওড়ার পলাতক পাইন মহাশয় সম্বন্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্রের অহেতুক প্রীতির কারণ কি? এই স্বনামধন্য পাইন মহাশয় কি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে হাওড়া মিউনিসিপালিটির প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তা নিয়োগ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিজয় ভট্টাচার্য্যের স্থায় একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্ম্মীর বিরোধিতা করিয়াছিলেন? মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় ও বর্দ্ধমানের মহারাজকুমারের বিরোধিতা করিতে কম্পিতহৃদয় বিধানচন্দ্র বিরত কেন? বহুভাবে বিপর্য্যস্ত মৌলবী ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন—ফারুকির স্থায় সরকারী সভ্যদের বিরোধিতা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেও হিন্দু মন্ত্রীর বিরোধিতা করিতে বাংলা কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতি ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? বাংলার কংগ্রেস জীবিত না মৃত? যাঁহারা বিজয়প্রসাদের স্থায় ব্যক্তিত্ববিহীন মন্ত্রীর বিরোধিতা করিতে সাহস পান না, তাঁহারা আবার কামালপাশা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন! বাংলা কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ড ভাগ্যান্বেষী ও স্বপ্ন-বিলাসীদের অপরূপ মিলনভূমি ও ক্রীড়াকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

CORRUPTING INFLUENCE OF LEGISLATURE

Spain Today . And Bengal Tomorrow

স্পেনে যে অন্তর্বিপ্লব চলিতেছে তৎসম্বন্ধে Edward Conze কর্ত্তৃক লিখিত ও লণ্ডনের Martin Secker And Warburg Ltd. কর্ত্তৃক ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত 'Spain Today' নামক তথ্যপূর্ণ পুস্তকে স্প্যানিস্ পার্লামেণ্টে মন্ত্রীত্বকামী Socialist দলের যে অধোগতি হইয়াছিল তাঁহার বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। স্পেনের পটভূমিকাকে ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া বাংলার মন্ত্রীত্বকামী কংগ্রেসী-বীরবৃন্দ সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য সম্যকভাবেই প্রযোজ্য। বাংলার মন্ত্রীত্বকামী বীরবৃন্দ কি বলেন?

In Parliament (*Assembly*) the class deputy, (*Congress member of the assembly*) newly elected, arrives full of vigour, and of the desire to do something. But he soon finds that much fuss is made of him, that he is flattered, and that quite imperceptibly he acquires the feeling that he is an important person differing from his former workmates by his outstanding abilities and the width of his outlook. The intricacies of the Parliamentary machine damp his revolutionary vigour, and he becomes either tired or cynical. He finds that not all the "bourgeois" (*bureaucracy*) are wicked, that quite a number of them, when met socially are nice and agreeable people. His social contacts with nice individuals make him forget the social functions of bourgeoisi (*bureaucracy*) and their responsibility for the hunger and the exploitation of his former workmates. New facilities open for making money easily, and many former workers seize these with a greedy hand. In this way a genuine socialist (*Congressite*) by the incessant action of almost imperceptible corrupting influences, gradually changes into an upholder of the existing order of society—untill the existing order has no further need of him, and he ends like Severing or J. H. Thomas. *(Thambe or Ragkabendra Rao)*

—Italics are ours.

(SPAIN TODAY—Revolution And Counter Revolution

—By Edward Conze Page 67)

প্রেম ডোরে বাঁধা ঝুলনা ঝুলনা!

বিধান—বিশ্বাস—হোমস্ আঁতাত

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতি-পরিচালিত উপদলের স্বরূপ

১৯৩৪ সালের ১৮ই এপ্রিলের কর্পোরেশনের সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে নিম্নে প্রকাশিত পত্রখানি বাংলা কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বর্ত্তমান সভাপতি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের পরিচালিত সভ্যদিগের নিকট ও গভর্ণমেণ্ট মনোনীত ও ইউরোপীয় সভ্যদিগের নিকট পাঠান হইয়াছিল :—

URGENT WHIP.

For Corporation Meeting of 18th April '34.

1. Every one is requested to be present in his seat at least 5 minutes before 5 p. M.
2. Nominated Councillors will first take their oaths.
3. Mayor will probably make a statement regarding the Government letter calling for a representation under Sec. 19 re : the Mayor and Deputy Mayor election meeting.

   Government want the representation by the 26th instant.

   (A requisition is ready for a special meeting on or before the 21st instant for the purpose of making the representation).
4. Mayor will probably suggest an adjournment, in view of the Government letter and of the motions (items Nos. 119 and 120) of Mr. Nalin Ch. Paul and the Hon. Mr. B. K. Basu.

   It may not be necessary in that case to move these motions.
5. Otherwise, Mr. Nalin Paul will first move.
6. If this is lost, or over-ruled, Mr. Basu will move.
7. If this again is lost or over-ruled, Mr. Maguire will simply move an adjournment. For 6 & 7, previous leave will have to be taken to take the motions out of turn.

   Members are requested to support the above motions.
8. All failing, if meeting proceeds, support proposals made by Mr. N. R. Sarker, Mr. N. C. Pal, Mr. B. K. Basu, Mr. C. C. Biswas and Mr. Holmes

N. C. Paul

B. N. Rai Chaudhury.

N. C. Paul ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পরিচালিত কংগ্রেসী উপদলের সম্পাদক ছিলেন।

আলিঙ্গনাবদ্ধ শরৎচন্দ্র ও বিধানচন্দ্র

"খপ্ করে জ্বলে
দপ করে নেভে
ভোলা মহেশ্বর"
—বিধানচন্দ্র

"মেরেছ কলসীর কানা
তাই বলে কি—
প্রেম দেবোনা"
—শরৎচন্দ্র

বিগত এপ্রিল মাসে কর্পোরেশনের সাধারণ নির্ব্বাচনের পর অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু রায়-রুণী প্যাক্টের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম। তৎসহ পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের প্রত্যুত্তরও প্রকাশিত হইল। উক্ত বিবৃতিদ্বয়ের বিশ্লেষণের ও বিচারের ভার বাংলার জনসাধারণের উপর অর্পিত হইল।

Sj. SARAT CHANDRA BOSE'S WRATH

Like The Proverbial Spark Kindles Suddenly And Disappears Equally Quickly

Dr. B. C. Roy's statement :—

I have read the statement issued by Sj. Sarat Chandra Bose in the "Advance" of date regarding the election of Aldermen of the Calcutta Corporation which was held yester day. I would not have worried to take notice of the statement had Sj. Bose put all the blame on me and spared the others, because I know that hard words break no bones and I am long used to them. I also know that Sj. Sarat Chandra Bose's wrath, like the proverbial spark kindles suddenly and disappears equally quickly. Time alone would have shown him where the truth lay.

DISHONOURABLE TACTICS And STRANGE ALLIANCES

No Compromise With Anti-Congress & Reactionary Elements

Sj. Sarat Chandra Bose's statement :—

The Congress Party in the Corporation of Calcutta has been defeated at the election of Aldermen. It set up five staunch Congressmen as its candidates but only one of them has been elected. It refused to make any compromise with anti-Congress and reactionary elements. It refused to make any compromise with ignoble and corrupt practices. It refused to adopt unfair and dishonourable tactics or enter into strange alliances. Though it has gone down in the first round the Congress Party may well claim that it has gone down with colours flying.

Dr. B. C. Roy's statement

But he has attempted to hide his disappointment at not being able to get his "staunch Congressmen" nominees elected, by using harsh words regarding certain individuals who have been working with me.

10. 4. 36. B. C. Roy.

Published in "Advance" April 11. 1936.

Sj. Sarat Chandra Bose's statement :—

The defeat of the Congress party in the Corporation this evening has its lessons which the Calcutta public in general and Congress-minded men in particular would do well to bear in mind. The defeat is undoubtedly due to the fact that at the meeting held last night at the Jorasanko Rajbati which was attended by Dr. Bidhan Chandra Roy, Mr. Nalini Ranjan Sarker, Mr. Kiron Sankar Roy, Mr. Baren Dutt, Mr. Amar Bose, Mr. Nalin Pal, Mr. Bidhu Sarkar, Mr. Sndhanshu Kumar Mitter and others, it was decided to set up Messrs. F. Rooney, B. K. Basu, Kartick Chandra Mallick and Haji Mohammed Akbar as candidates for Aldermanship of the Corporation as against the Congress candidates. Most of the gentlemen named above have claimed in the past and still claim to be Congressmen. It is therefore, up to them to explain to the citizens of Calcutta as to why they thought fit to set up non-Congress and anti-Congress candidates for election as Aldermen of the Corporation of Calcutta. I repeat again that it would be well to bear in mind the lessons of the defeat.

9. 4. 1936. (Sd.) Sarat Chandra Bose

Published in the "Advance" of April 10, 1936.

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক

'বন্দে মাতরম্' ও 'স্বদেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক পাবনা-বগুড়ার সংযুক্ত কেন্দ্র হইতে বেঙ্গল এ্যাসেম্‌ব্লির আসন নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি সাফল্যলাভ করিলে আমরা সাংবাদিক হিসাবে আনন্দিত হইব।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার পুজা ও উৎসব

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বৈদ্যনাথ ধাম—কুণ্ডা রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার ত্রিকালীন মহাপূজা ও উৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে একটী মেলা হইয়া থাকে ও বহু দেশ দেশান্তর হইতে লোক সমাগম হইয়া থাকে। মাতার পূজা ও উৎসবে ৪.৫ দিন দরিদ্র নারায়ণের সেবা বিশেষভাবে হইয়া থাকে। এ বৎসরও ৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নবেম্বর সোমবার হইতে ১২ই অগ্রহায়ণ, ২৮.শ নবেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত বিশেষভাবে উৎসব ও আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইতেছে! চণ্ডীর গান, ভাগবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা, নাম সঙ্কীর্ত্তন, যাত্রা বায়স্কোপ বাজী, ম্যাজিক, সাওতালী নাচ, লাঠিখেলা ঝুমুর নাচ, ইত্যাদি যেমন হয় তাহারও ত্রুটি হইবে না। দেওঘর ষ্টেশন হইতে সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য মোটর লরীর ব্যবস্থা হইতেছে। ইতিমধ্যেই বহু লোক সমাগম হইতেছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর এই মাতৃ-পূজা ও সাধু উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।

৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৪৩ সাল। শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার ত্রিকালীন মহাপূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ দেবীভাগবৎ পাঠ ও সমাগত নিমন্ত্রিত ভক্তগণকে প্রসাদী বিতরণ। রাত্রি ৮টা হইতে দীর্ঘ রজনী ব্যাপী চণ্ডীর গান, জামতাড়ার প্রসিদ্ধ ঝুমুর সাওতালী নাচ, ম্যাজিক, বাজী, বায়স্কোপ প্রদর্শন।

৮ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা, হোম, চণ্ডীর গান সমাগত ও নিমন্ত্রিত ভক্তগণকে প্রসাদী বিতরণ।

শান্তা মজুমদার

শান্তার পত্র

শ্রীযুক্তা স্বাগতা দেবী
সমীপেষু—

শ্রীচরণেষু বৌদি,

অমৃতবাজারে দেখিলাম তোমরা আমার একখানি ছবি ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছ—আমি নাকী হারাইয়া গিয়াছি!

আচ্ছা ভাই বৌদি, তোমার ঢং দেখে আমার মাঝে মাঝে হাসি পায়!

আমি কী হারাইবার মেয়ে?

যে, প্রয়োজন হইলে কোমর বাঁধিয়া লড়াই করিয়াছে, চেষ্টা পাইলে যে, গৃহস্থ সজাগ থাকিতেও তাল গাছে চড়িয়া রস খাইয়াছে, কত মধুলোভী পতঙ্গকে, মৌচাকের লোভ দেখাইয়া, হাঁটু জলে নাকানি-চোবানী দিয়াছে, কত দুর্জ্জয় শক্তিশালীকে খোলারের চাপে কুপোকাৎ করিয়াছে—সে কীনা এই এতবড় একটা সহরের বুক হইতে রাতা-রাতি সাফ হইয়া যাইবে?

আচ্ছা, কিছুদিন আগে, কোথায় আমি পড়িয়া ছিলাম বল ত?

তোমাদেরই প্রতিবেশী গাঙ্গুলী মশাইয়ের করুণায়, আমি একদিন নরক হইতে স্বর্গের পথ দেখিলাম। সেই পথে তর তর করিয়া খাসা উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রলোভন বড় শক্ত বৌদি! আমার এই পোড়-খাওয়া যৌবনের মধ্য পথে আর একজন মৃগনয়নী করিয়া আমার চোখে যেন ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিল। কিরণময়ীর মত একদিন মাঝরাত্রে, আমার নাগরকে লইয়া, আশ্রিতের আশ্রয় ত্যাগ করিলাম।

আলমবাজারের এক দেবালয়ে আজ আমায় অনিয়া রাখিয়াছে।

আশে-পাশে কী কিচির-মিচির মিষ্টি ডাক। এরা আমায় কী যেন injection দিয়াছে। লোকে বলে, আমায় নাকী T. B.-তে ধরিয়াছে!

আর আমার মত বালাই—চোখের আড়াল হইলেই ত' তোমরা বাঁচ! এমন পাড়া-বখানো মেয়ে, ঘরে রাখিয়া লাভ কী বৌ-দি! দিন কতক আমায় প্রাণ খুলিয়া এই দেব-আঙিনায় চরিয়া বেড়াইতে দাও। আর মানুষ ত' অনেক দেখিলাম। সকলের চোখেই সেই লোলুপ-দৃষ্টি! একা মানুষ, ক'টাকে সামলাই বল ত?

কাগজে ছবি ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন দিয়া আর ঢলাঢলিতে কাজ নেই। দাদাকে বলিয়া ওটা বন্ধ করিও।

ইতি হতভাগিনী—
শান্তা

"বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য" পুস্তক হইতে "কুণ্ডেশ্বরী মাহাত্ম্য" অভিনীত হইবে।

৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার—সন্ধ্যা ৭টার সময় কলিকাতার চণ্ডীর গান ও পৌরাণিক যাত্রা অভিনীত হইবে।

১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার—কলিকাতা হইতে সমাগত বন্ধুবান্ধব ও ভক্তগণের মিলন উৎসব ও রামময় আশ্রমের পরিচালকগণের নিয়মিত কার্য্যাদির সম্বন্ধে সভা সাধারণের উপস্থিত প্রার্থনীয়।

তুমি আর আমি

সুসত্ত্ব বসু।

তুমি আর আমি বসে আছি হেথা
মুখোমুখি ছুটো জানালায়,
মাঝখানে শুধু ব্যবধান রচে
বাঁকা পথ;—এই নিরালায়!
তুমি আর আমি বসে আছি চুপে
কোন কথা নেই—নেই কাজ,
বর্ষার শেষে তোমার আমায়
এ যেন নূতন মিলন আজ।
আমার বুকের গোপন কথাটি
চোখে চোখে কই ইসারায়,
তোমার চোখের ভুরুতে তোমার
মরমের কথা মুরছায়!
কেতকীর বনে দেখতে পাইতো
তোমার চুলের সুরভি বয়,
নীলা কলরবে মোর মনে হয়
শারদ বাতাস কাকলীময়!
গোধূলির রঙে প্রতিদিন আমি
হেরি কপোলের লালাভায়,
অশোকের ফুলে সাজানো রয়েছে
তোমার চিকন অলক পাশ।
আমার হিয়াতে ফোটেনাকো যেন
নিরাশার শত শতদল,
আজ হতে সখি নব প্রণয়ের
আধফোটা কুঁড়ি মেলুক দল!

পপুলার পিক্‌চার্সের "পণ্ডিত মশাই" চিত্রের একটী দৃশ্যে
প্রভা, গিরিবালা ও রথীন বন্দ্যো।

[বিলাসী]

নিউ থিয়েটার্স

হেমচন্দ্রের "অনাথ আশ্রমে-"র কাজ এবার বেশ জোর গতিতেই এগুচ্ছে। এদিকে নীতীন বসুর "দিদি" প্রায় সমাপ্তির মুখেই এসে পৌছেছে। ছবিখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে নীতীনবাবুর চেষ্টার অন্ত নেই—একথার সত্যতা তাঁরাই বুঝতে পারবেন যাঁরা একদিন মাত্রও "দিদি"র শুটিং স্বচক্ষে দেখেছেন।

কালী ফিল্মস

এদের "টকী অফ টকীজে"র শুটিং এ হপ্তার মধ্যেই শেষ হবে। ছবিখানার খানিকটা দেখে আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে, যদি ছবিখানা এ বছরে মুক্তি পায় তা' হ'লে হয়ত শেষে বেশ এই কথার সত্যতা যথার্থরূপে প্রমাণিত কোরবে অর্থাৎ এ বছরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হ'লেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবির পর্য্যায়ভুক্ত হবে।

* * * *

রাণীবালা এই ষ্টুডিও পরিত্যাগ কোরে দেবদত্ত ষ্টুডিওতে তিন, মাসের চুক্তিতে আবদ্ধা হ'য়েছিল "ইন্দিরা"-র একটা অপ্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে। অবশ্য তার এখানে যোগ দেওয়ার মূল-হেতু অর্থ—একথা আমরা পূর্ব্বেই জানিয়েছিলাম। কিন্তু রাণী আবার স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কোরে নতুন চুক্তিতে সই কোরেছে।

* * *

জ্যোতিষ মুখুজ্যে পরবর্ত্তী ছবি "খনা"-র আনুষঙ্গিক কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন।

হাজারিবাগে হুলুস্থুলু কাণ্ড!

অধ্যাপক দিগম্বর মজুমদারের ভগ্নি শান্তা অপহৃতা

ড্রাইভার বসন্তকুমার সেন নিরুদ্দেশ

মজুমদার-পরিবার শোক মগ্ন

[নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত]

হাজারিবাগ, তারিখ নাই

সম্প্রতি হাজারিবাগ কলেজের অধ্যাপক দিগম্বর মজুমদারের একমাত্র ভগিনী কুমারী শান্তা মজুমদার কোনও দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক অপহৃতা হওয়ায় সহরে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে আরও আশ্চর্য্যজনক বিষয় হইতেছে যে, যেদিন শান্তা অপহৃতা হন, সেইদিন হইতে দিগম্বর বাবুর ড্রাইভার বসন্তকুমার সেনও নিরুদ্দেশ!

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, এই দুর্ঘটনার দিনে কুমারী শান্তা সব দিনকার মতই মোটরে সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হন; কিন্তু রাত্রি অধিক হইলেও তিনি প্রত্যাবর্ত্তন না করায় সকলেরই মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগে। তখনই দিগম্বরবাবু শান্তার অন্বেষণে বাড়ীর বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে খোঁজে বাহির হন এবং বেশী দূর না গিয়া শান্তা যেখানে রোজ বেড়াইতে যাইতেন সেই শৈল শিখরের নীচে গিয়া দেখিলেন তাহাদের মোটরখানি পড়িয়া রহিয়াছে—কিন্তু যাত্রী কেহ নাই।

তারপর আজ কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে দিগম্বরবাবু শান্তার কোন খোঁজ না পাইয়া অর্দ্ধ-উন্মাদাবস্থায় পরিণত হইয়াছেন। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভগ্নি শান্তা বসন্ত ড্রাইভারের সঙ্গে পলাতকা হইয়াছে। তাই এই কয়েকদিনের মধ্যেই নারীজাতির উপর তাঁর ভীষণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। পত্নী স্বগতাকে নিয়ে এ সম্বন্ধে সদাসর্ব্বদা কুৎসিত ইঙ্গিত করিতেও তিনি ছাড়েন না। সাধ্বী স্ত্রী মুখ বুজে এ অত্যাচার সহ্য করে—কারণ, সে জানে যদি শান্তাকে সে আবার স্বামীর কাছে ফিরাইয়া আনিতে না পারে তাহা হইলে আজীবন এ অত্যাচার তাঁকে সহ্য করিতেই হইবে।

[বিজ্ঞাপন]

পপুলার পিক্‌চাস

এদের "পণ্ডিত মশাই" আসছে ২৮শে নভেম্বর নব-সংস্কৃত ও নতুন শব্দযন্ত্র সন্নিবেশিত 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোরবে। "পণ্ডিত মশাই" শরৎচন্দ্রের বাঙ্‌লার পল্লী জীবনের এক করুণ কাহিনী। গেল হপ্তার পপুলারের কর্ত্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে ছবিখানা দেখালে তিনি বিশেষ পরিতৃপ্তিলাভ করেন এবং কর্ত্তৃপক্ষকে একথাও জানান যে, নিউ থিয়েটার্স'ই তাঁর সমস্ত বইয়ের, চিত্রে যথার্থ রূপ এতাবধি দিয়েছেন। "পণ্ডিত মশাই" দেখে এই প্রতিষ্ঠানের ওপরও শরৎচন্দ্র বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং এদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। "পণ্ডিত মশাই"য়ের ভূমিকা-লিপি বণ্টনও খুব লোভনীয় হ'য়েছে। সকলের অবগতির জন্যে সম্পূর্ণ ভূমিকা এখানে দেওয়া হ'ল—বৃন্দাবন—ধীরাজ বাঙ্গুজ্যে, কুঞ্জ—রবি রায়, ঘোষাল মশাই—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, তারিণী—যোগেশ চৌধুরী, গোপাল ডাক্তার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নিধু খুড়ো—প্রফুল্ল দাস, উদ্ধব—মনি চট্টোপাধ্যায়, কেশব—নৃপেন চক্রবর্ত্তী, গোবর্দ্ধন—চৈতন রায়, বৈরাগীদ্বয়—ভবানী দাস ও গিরিন চক্রবর্ত্তী, চরণ—সাগরিকা, কুসুম—শান্তি গুপ্তা, বৃন্দাবনের মা—প্রভা, ব্রজেশ্বরী—রেণুকা ঘোষ, ঐ মা—রাজলক্ষ্মী, তারিণীর স্ত্রী সুশীলা, বৃন্দাবনের পিসি—গিরিবালা, মনোরমা—উষাতারা, পাড়ার পিসি—প্রকাশমনি।

* * *

এরা ,এরপরে খুব শিগ্‌গিরই প্রভাত মুখুজ্যের "রত্নদীপ" চিত্রাকারে রূপ দেবার ব্যবস্থা কোরছেন। এ ছাড়া শরৎচন্দ্রের "অরক্ষণীয়া" ও "পরিণীতা"র স্বত্ব এরা গ্রন্থকারের কাছ থেকে কিনেছেন।

কমলা টকীজ লিঃ

রীতেন এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই

নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি জন্মলাভ কোরেছে। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ বারান্তরে প্রকাশিত হবে। তবে. এটুকু এখনই বলা যেতে পারে যে, আপাততঃ পর পর এরা চারখানা ছবি তুলবেন এবং প্রথম ছবি হবে নরেশ সেনগুপ্তের "রাজগী" উপন্যাস অবলম্বনে ও সুকুমার দাশগুপ্ত তা' পরিচালনা কোরবেন।

"শ্রী"

এই চিত্রগৃহটি আসচে ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর বন্ধ থাকবে সুসংস্কৃত ও নতুন শব্দযন্ত্র আরসীয়্যান্ (?) সংস্থাপনের জন্যে। এই সব পরিবর্ত্তনের ফলে "শ্রী". যে আরও সুশ্রী হবে—একথা বলাই বাহুল্য।

বেঙ্গল এ্যামেচার ফিল্মস্

এই নামে কোল্‌কাতার আর একটা চিত্র-প্রতিষ্ঠান জন্মেছে। শোনা যাচ্ছে, এদের প্রথম ছবি "পরিণতি" এবং তা'তে নামবেন ভদ্রঘরের মেয়েরা। আর পরিচালনা কোরবেন শৈলেন বসু।

মতিমহল টকীজ:

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর 'ঘূর্ণী হাওয়া' উপন্যাস অবলম্বনে "রাঙা-বৌ" একখানি সামাজিক বাংলা ছবি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে তোলা হ'বে। সম্প্রতি এর মহলা চলচে। এই ছবিতে—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মনী ঘোষ, জীবন গাঙ্গুলী, ছায়া, মেনকা ও বীণা প্রভৃতিকে বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোরতে দেখা যাবে।

উত্তরায় "সোনার সংসার"—

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার এই সর্ব্বরসপুষ্ট ছবিখানি এবার উত্তরায় 'ষষ্ঠ সপ্তাহে' পড়লো। সারা সহরে ইতিমধ্যেই এই ছবিখানি যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। "উত্তরা"র দর্শক সমাগমের বিরাম নেই এবং আমরা আশা করি বহু সপ্তাহ ধরে 'সোনার সংসার', এই অঞ্চলের আসর গরম রাখবে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস স্বত্ত্ব

সম্প্রতি হীরেন বসু বোম্বে থেকে কোল্‌কাতায় এসেছিলেন সগর ফিল্মের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের কয়েকখানা উপন্যাসের স্বত্ব কিনবার জন্যে। তিনি এ বিষয়ে কৃৎকার্য্য হ'য়ে শরৎচন্দ্রের "বড়দিদি", "চন্দ্রনাথ", "বিজয়া" ও "বামুনের মেয়ে"-র হিন্দী চিত্র স্বত্ব গ্রহণ কোরেছেন। আমরা শুনলাম, হিন্দী চিত্ররূপের জন্য হীরেন বসু প্রত্যেকখানা উপন্যাস চার হাজার কোরে কিনেছেন।

"বিজয়া"

"রূপবাণী'-তে "বিজয়া" চলছে ভাল। লোকে ছবিখানাকে সাদরে গ্রহণ কোরেছেন—কদরেরই কথা, কারণ সবদিক থেকে বিচার কোরলে "বিজয়া" গুণী ও জ্ঞানীর মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে। আসচে ১২ই ডিসেম্বর থেকে "বিজয়া". 'পূর্ণ' ও 'রূপবাণী'তে এক সঙ্গে চলবে। উত্তর কোল্‌কাতার মত দক্ষিণ কোলকাতাতেও ছবিখানা যে কলারসিকের মনে আনন্দ দেবে, একথা বলাই বাহুল্য।

নারী প্রগতির লক্ষ্য কি?

শ্রীপ্রমোদ কুমার সেন

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে যাঁহারা নারী প্রগতির অগ্রণী ছিলেন তাঁহারাই বোধ হয় বিশ্বব্যাপী নারী জাগরণের রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যাহাতে নারী পুরুষের সহিত সমানাধিকার পায়; চাহিয়াছিলেন সরকারী ও অন্যান্য কার্য্যে নারীর প্রবেশাধিকার, ভোট, ইত্যাদি। এক্ষণে প্রায় দেশেই, এমন কি পর্দ্দার রাজ্য তুরস্কেও, আজ নারী সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সহিত প্রতিযোগীতা করিতেছে। পূর্ব্বে আমরা দেখিতাম নারী শিল্পী, লেখক, শিক্ষয়ত্রী, এক্ষণে আমাদের মহিলা এঞ্জিনিয়র, বৈমানিক, ডাক্তার প্রভৃতির কাহিনী পাঠ করিলেও আর চমক লাগেনা। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চমক লাগে যখন আমরা পড়ি যে নারী পুরুষের সহিত—জীবন সংগ্রামে নহে—রণক্ষেত্রেই একযোগে যুদ্ধ করিতেছে। যখন শুনিয়াছিলাম যে রুষিয়া একটা নারী বাহিনী গঠন করিয়াছে, কিংবা বহুনারী যুদ্ধের বিমান পোতগুলি পরিচালনে শিক্ষিত হইতেছে এবং প্যারাসুট দ্বারা বিমান পোতগুলি হইতে নামিবার অদ্ভুত কৌশল দেখাইতেছে, তখন হয় ত' আমরা বিস্ময় প্রকাশ করিতাম;—কিন্তু এক্ষণে আমরা দৈনন্দিন সংবাদে পাঠ করিতেছি যে স্পেনের নৃশংস অন্তর্যুদ্ধে পুরুষের সহিত নারীও যুদ্ধ করিতেছে। স্পেনীয় যুদ্ধের যে সকল চিত্র আসিতেছে তাহাতেও দেখা যায় যে, কোন পক্ষ জয়ী হইয়া কোন গ্রাম বা সহরে দখল করিলে নারীদিগকেও পুরুষের ন্যায় পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। বিগত জার্ম্মান যুদ্ধের সময়েও বোধ হয় এইরূপ ব্যাপার ঘটে নাই।

আর আশ্চর্য্য যে, স্পেনের জন জাগরণের যে সকল নেতাদের নাম শুনা যাইতেছে তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইতেছেন একজন মহিলা। ইহাকে অনেকে আধুনিক "জোয়ান অব্ আর্ক" বলে। ফরাসী বীরাঙ্গনা যেমন ফরাসী কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, স্পেনীয় বীরাঙ্গনা ডোলোরেস ইবারুরি তেমনি স্পেনীয় শ্রমিক ও কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। একটা দরিদ্র কৃষক পরিবারে ইনি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সে জনৈক খনি মজুরের সহিত ইহার বিবাহ হয়। স্বামীর শিক্ষায় ইনি সমাজতন্ত্রবাদে উৎসাহী হ'ন। পরে ইনি রুষিয়া গিয়া রুষ-নারীদের

স্বাধীনতা লাভ দেখিয়া, স্পেনীয় কৃষকদের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করেন; তাহাদের কুসংস্কার মুক্ত করিয়া নূতন আশার সংস্কার করেন। ইনি রণক্ষেত্রেও যুদ্ধ করিয়াছেন এবং এক্ষণে ফ্রান্সে আসিয়া ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে সহানুভূতি জানাইতেছেন। ইহার ভাষা ফরাসীরা বুঝেনা, কিন্তু তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি ও বক্তৃতার ভঙ্গী দেখিয়াই তাহাদের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা জাগে।

তুরস্কের নব জাগরণের কাহিনীতেও আমরা খালিদ হালোমের বীরত্বের পরিচয় পাই। গত বৎসর ইনি ভারত ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য নারীর এরূপ ব্যক্তিগত বীরত্বের কাহিনী বিভিন্ন দেশের ইতিহাসেও পাওয়া যায়, কিন্তু নারী যে ব্যাপকভাবে পুরুষের সহিত যুদ্ধ করে ইহা দেখা গেল প্রথম বোধ হয় স্পেনে। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাচীন কালে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহা কৃত্রিম। দৈহিক গঠন ভিন্ন, অন্য সব বিষয়েই নারী পুরুষের সমকক্ষ। অবশ্য প্রাকৃতিক বিভেদ কেহ অস্বীকার করেনা, কিন্তু ইহা হইতেছে মনোবৃত্তির কথা। নারী প্রগতির উদ্দেশ্যই ছিল নারী অন্তরের মহিমা—স্বাধীনতা, শৌর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি প্রকাশ করা। নারী পুরুষের ন্যায় স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে ইহা নানা জাতির মধ্যে দেখা যায়। যেমন ব্রহ্মদেশে নারীরা কর্ম্ম করে আর পুরুষেরা অলসভাবে বসিয়া থাকে। কাজেই নারী প্রগতির অন্যতম উদ্দেশ্য আর্থিক স্বাতন্ত্র লাভ হইলেও, ইহা আসলে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে নারীর সমাজে ন্যায্য অধিকার লাভ, যে অধিকার লাভে পুরুষ তাহাকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত করিয়াছিল—এমন কি তাহাকে সম্পত্তিভুক্ত করিয়া লইতেও দ্বিধা বোধ করে নাই।

পৃথিবীর বর্ত্তমান সন্ধিক্ষণে যেমন আমরা কোন কোন দেশের নারীকে যোদ্ধবেশে দেখিতেছি, তেমনি গত মহাযুদ্ধের সময়ে পুরুষকে বাধ্য হইয়া নারীকে বহির্জ্জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দিতে হইয়াছিল। যুদ্ধে দলে দলে পুরুষকে যোগদান করিতে হইল, কাজেই দেশের কাজ আর চালায় কে? বিলাতের সাফ্রিজিট আন্দোলন যাহা করিতে পারে নাই যুদ্ধই তাহা করিল—নারী পাইল সমাজে রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত পূর্ণ-অধিকার। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শান্তির সময়ে নারী এই অধিকার লইয়া মাতামাতি করে না, তাহারা গৃহস্থালী জীবন লইয়া সন্তুষ্ট থাকে। অপরপক্ষে প্রয়োজন মত তাহারা বহির্জগতের কর্ম্মক্ষেত্রেও যোগদান করে,—যেমন বিলাতের পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্য ছয়টী সন্তানের জননী হইয়াও রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার প্রেরণা অনুভব করেন। অবশ্য সাধারণ নারীর পক্ষে এ কথা প্রযুজ্য নহে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও যেমন গণ্ডায় গণ্ডায় অদ্ভুত কর্ম্মা লোক পাওয়া যায় না, সাধারণ নারীর মধ্যেই তাহার অন্যথা হইবে কি করিয়া? কিন্তু সাধারণ পুরুষের যেমন কতকগুলি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার আছে, তাহা হইতে নারীকে এতাবৎ কাল বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল বলিয়াই আমরা মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতে এবং পরে অন্যান্য দেশে নারী বিদ্রোহ ও নারী জাগরণ দেখিয়াছি।

প্রত্যেক ব্যাপারে একটা প্রতিপক্ষ থাকে। নারী প্রগতি সম্বন্ধেও প্রতিপক্ষের অভাব নাই—বিশেষতঃ আমাদের দেশে। তাঁহারা বিশেষ করিয়া আধুনিক জার্ম্মানী ও ইটালীর দোহাই দিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে নারী-প্রগতির চাকা ঘুরিয়াছে। হিট্‌লার ও মুসোলিনি বলিতেছেন যে গৃহই নারীর স্থান—ইহাতে গোঁড়া দল একান্ত উৎফুল্ল হ'ন। কিন্তু ঐ বীরপুরুষদ্বয় যে কামানের খাদ্য যোগাইবার জন্য ঐ নীতি বাতলাইতেছেন একথা খুব অল্পলোকে মগজে প্রবেশ করে। আমরা আরও ভুলিয়া যাই যে, পৃথিবী এখনও হিট্‌লার ও মুসোলিনির কীর্ত্তির পরিণতি দেখে নাই।

অপর পক্ষে ইহাও বিবেচ্য যে নারী প্রগতির ফলে কিছু সামাজিক বিশৃঙ্খলা আসিতে পারে এবং পশ্চাত্য দেশগুলিতে তাহার কিছু নিদর্শন দেখা যাইতেছে। কিন্তু নারী প্রগতির পূর্ব্বে যে নিখুঁত সামাজিক সুশৃঙ্খলা ছিল ইহা কি কেহ হলফ করিয়া বলিতে পারেন? প্রতি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার সাময়িক কিছু অসামঞ্জস্য ঘটিতে পারে—কিন্তু মানুষের মূল প্রকৃতি বদলাইবে কি করিয়া? ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রুষিয়া। সেখানে যখন বিপ্লবের পর নারীকে পূর্ণভাবে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হইল, তখন রুষিয়ার কুৎসায় জগৎ মুখরিত হইল। এমন কি রটনা করা হইল যে নারীকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, মিথ্যা রটনার কথা ছাড়িয়া দিলেও সামাজিক ব্যাপারে রুষিয়া যে পরীক্ষা করিয়াছে তাহা একেবারে অভিনব। বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তান পালন প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্র নারী ও পুরুষ উভয়কে চরম স্বাধীনতা দিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে কি লক্ষ লক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদ হইত? এরূপ সহজ উপায় থাকা সত্ত্বেও, রুষিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা আমেরিকার বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অপেক্ষা ঢের ঢের কম ছিল।

কিন্তু একটা বিষয়ে পরীক্ষার পর রুষিয়া পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন করিতেছে। তাহা হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক জীবন। রুষিয়া চাহিয়াছিল গোষ্ঠিজীবন গঠন করিতে —গৃহ থাকিবে না, গৃহে অগ্নি জ্বালানর প্রয়োজন হইবে না, সন্তান পালনের ভার মাতা পিতাকে লইতে হইবে না। কিন্তু

(সি, বি)

বিশ্ববিখ্যাত মেলবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাব বিদেশে জয়পতাকা উড়াবার জন্য স্বদেশ ছেড়ে বেরিয়েছে। যদিও 'আগে অনেক বারই তারা বিদেশ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরেছে তবে এবার অষ্ট্রেলিয়ার তাদের পূর্ব্বগৌরব অক্ষুন্ন থাকবে কিনা এবিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হয়ে পড়েছে। এম, সি, সি দল অষ্ট্রেলিয়াতে প্রথমে যে কয়টি ম্যাচ খেলেছিল সেগুলির সব-গুলিতেই প্রায় জয়ী হয়েছে কিন্তু ভিক্টোরিয়া ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে মেলবোর্ণে যে খেলাটি হয় তাতে 'ড্র' হয়েছে। তারপর "নিউ সাউথ ওয়েলস্" দলের সঙ্গে এম, সি, সির যে খেলাটি আরম্ভ হয়েছে তাতে এম, সি, সির পরাজয় হবে বলেই মনে হয়। এবার কিন্তু ঝড় বৃষ্টির জন্য ক্রিকেট খেলা তেমন জমতে পারছে না। কোন কোন দিন বৃষ্টি কিংবা ঝড়ের জন্যে খেলা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। তাতে যে এম, সি, সি দলের কিছু অসুবিধা হচ্ছে তা স্বীকার করতেই হবে। অলইণ্ডিয়া ক্রিকেট দলও যে এই ঝড় বৃষ্টিতে অসুবিধা ভোগ করেছে তা ওদেশের নিন্দুকেরা এখন নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। ঝড় জল যেরকম অত্যাচার সুরু করেছে তাতে এম, সি, সি দল যে নিরুপদ্রবে পরের ম্যাচগুলি খেলতে পাবে তাত মনে হয় না।

মেলবোর্ণে এম, সি, সি দলের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া দলের যে খেলাটি হয় সেটি অমীমাংশিত ভাবে শেষ হয়েছে। এম, সি, সি, দলের এবারকার ভ্রমণে অষ্ট্রেলিয়ার ষ্টেটগুলির ভিতর ভিক্টোরিয়াই প্রথম এম, সি, সির সঙ্গে 'ড্র' করার সম্মান লাভ করেছে। ভিক্টোরিয়া দলের 'লি' এবং 'গ্রেগরী' তাদের দলের সম্মানলাভের জন্য দায়ী। এরা দুজন যদি অত ভাল না খেলতেন তাহলে হয়ত এই খেলা সমান হয়ে শেষ হতনা। ভিক্টোরিয়া দল প্রথম ইনিংসে ৩৮৪ রাণ করেন। তার ভিতর 'লি' করেন ১৬০ রাণ এবং 'গ্রেগরী' করেন ১৪৮ রাণ। এম, সি, সি দল প্রথম ইনিংসে ৩৪৪ রাণ করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেটে কেবলমাত্র ৩৬ রাণ করেন। প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যার ভিতর 'বার্ণেট' এবং 'হার্ডষ্টাফ' উল্লেখ-যোগ্য রাণ করেন। বার্ণেট করেন ১৩১ রাণ এবং হার্ডষ্টাফ করেন ৮৫ রাণ। দলের ক্যাপ্টেন এ্যালেন কেবল ১২ রাণ করেন। এই খেলায় এম, সি, সি দলের 'ভোস্' এবং 'বার্ণেট' আহত হন।

নিউ সাউথ ওয়েলস্ এবং এম, সি, সি, দলের চারদিন ব্যাপী খেলাটি আরম্ভ হয়েছে। যদিও এখন একদিনের খেলা বাকী তাহলেও খেলায় পরিণাম যে কি হবে তা এখনই বেশ ধারণা করা যাচ্ছে। নিউ সাউথ ওয়েলস্ দল প্রথম ইনিংসে ২১৩ রাণ করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২৬ রাণ করেন। প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যার ভিতর 'ম্যাকেবের' ৯৩ রাণ এবং 'রবিনসনে'র ৯১ রাণ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসে 'চিপারফিল্ডের' ৯৭ রাণ করে সকলের চেয়ে বেশী রাণ করেন এবং শেষ অবধি নট আউট থেকে যান। বড়ই দুঃখের বিষয় যে 'চিপারফিল্ড' অন্ততঃ সেঞ্চুরী করবার সুযোগ পেলেন না। এম, সি, সি দল প্রথম ইনিংসে কেবল মাত্র ১৫৩ রাণ করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দুই উইকেটে ৯৫ রাণ করেন। প্রথম ইনিংসের রাণসংখ্যার ভিতর 'হামণ্ড' ৩৯ রাণ করে সব চেয়ে বেশী রাণ করেন। এম, সি, সি দলকে জিততে হলে এখন ৩৫৩ রাণ দরকার। যদিও এখন আটটি উইকেট হাতে আছে এবং একদিনের খেলা বাকী তাহলেও এম, সি, সি দলের জেতার আশা একেবারেই নেই।

ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে 'ব্রিসবেনে' যে টেষ্টখেলা আরম্ভ হবে তার তোড়জোড় এখন থেকেই সুরু হয়েছে। এম, সি, সির ক্যাপ্টেন এ্যালেন টেষ্টদল বাছাই করবার

এক্ষণে প্রায় ২০ বৎসর পরীক্ষার পর রুষিয়া দেখিয়াছে যে ইহা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধ। তাই আবার জনসাধারণকে পারিবারিক জীবনযাপন করিতে উৎসাহিত করা হইতেছে, বিবাহকে মানিয়া চলিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

ইহাতেই বুঝা যায় যে, ভাবী সমাজে গৃহের স্থান থাকিবে—কিন্তু নরনারী কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। মানুষ সমাজ বা রাষ্ট্রের তাড়নায় না চলিয়া জীবনের গভীর সত্যের অনুপ্রেরণায় চলিবে। ইহাই হইতেছে মানব জীবনের সার্থকতা ও পূর্ণতা—এবং নারী-প্রগতির মূল আদর্শ হইতেছে এই সত্যোপলব্ধি। সাময়িক ব্যভিচারের ভয়ে এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবার চেষ্টা আরও অনর্থের সৃষ্টি করিবে। প্রগতিকে মানিতেই হইবে, এবং স্বেচ্ছায় মানিলে অহেতুক অশান্তি ভোগ করিতে হইবে না।

জন্ত তাঁর দলের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। এই জন্ত তিনি রবিনস্, ওয়ারেট, হ্যামণ্ড এবং লেল্যাণ্ড কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার এই টেষ্ট খেলায় যে বেশ রেষারেষি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অষ্ট্রেলিয়া বিশেষ করে চেয়ে আছে ব্র্যাডম্যানের দিকে আর ইংলণ্ড চেয়ে আছে হ্যামণ্ডের দিকে। অবশ্য দুশ্চিন্তা দুদলেরই আছে। একা ব্র্যাডম্যানকে দিয়ে যেমন অষ্ট্রেলিয়ার চলবে না তেমনি একা হ্যামণ্ডকে দিয়েও ইংলণ্ডের চলবে না। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া যতদূর সম্ভব দেরী করে নিজেদের টেষ্টদল ঘোষণা করবে বলেই মনে হয়। এম, সি, সি দলের আহত খেলোয়াড়দের জন্ত টেষ্টদল বাছাই করা একটু কষ্টকর হবে। যাই হ'ক এই প্রবল প্রতিযোগিতার পরিণাম কি হবে তা ঠিক করে বলা শক্ত।

হ্যারল্ড লারউড্

হ্যারল্ড লারউড্ ভারতবর্ষে ক্রিকেট শিক্ষা দিতে আসছেন। তাঁকে আনছেন পাতিয়ালার যুবরাজ ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সম্মতি নিয়ে। ভারতবর্ষে এসে লারউড্ যে চারমাস থাকবেন তার জন্তে তাঁকে যাতায়াতের প্রথমশ্রেণীর ভাড়া এবং ২৫০ পাউণ্ড দিতে হয়েছে। সবচেয়ে মজার জিনিষ হচ্ছে যে যদিও তিনি নভেম্বর মাস থেকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করবেন কিন্তু তাঁকে গত ১৫ই অক্টোবর থেকে হিসেব করে প্রাপ্যটাকা দিতে হবে। অবশ্য এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই কারণ ওবিষয়ে তর্ক করলে উত্তর পাওয়া যাবে 'আসছে এই ঢের'।

ফ্রেড্ পেরী

ইংলণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত এ্যামেচার টেনিস্ খেলোয়াড় 'ফ্রেড্ পেরী' টাকার লোভে এতদিনে প্রফেশনাল্ হলেন। তিনি প্রফেশনাল হয়ে খেলে বছরে 'একলক্ষ ডলার পাবেন। তিনি গ্রেট ব্রিটেনের হয়ে গত তিনবৎসর পরপর 'ডেভিস কাপ' জিতে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'লন টেনিস' খেলোয়াড় বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন।

বোমণ্ট তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট

ইংলণ্ড পর্য্যটনকারী দলের বিখ্যাত খেলোয়াড় অমরনাথকে অবাধ্যতার অজুহাতে ভারতে ফেরত পাঠানোতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে এদেশে তুমুল সমালোচনা হয়। দেশে ফিরিয়া অমরনাথ ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের নিকট একটি বিবৃতি পাঠান তাহা প্রকাশিত হইলে তদন্ত কমিটির জন্ত আন্দোলন তীব্র হইয়া ওঠে। ১৯শে ও ২০শে সেপ্টেম্বর ভূপালে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের এক বৈঠক হয় এবং স্যার জন বোমণ্ট, ডাঃ সুব্বা রাও ও স্যার সেকেন্দার হায়াত খানকে লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। স্যার সেকেন্দার জানান যে, কমিটির কাজে যোগদান করিবার মত অবসর তাঁহার নাই। ফলে অপর দুইজন সদস্যই তদন্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

প্রকাশ, বোমণ্ট তদন্ত কমিটির উভয় সদস্যই কমিটির রিপোর্ট স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অবিলম্বে রিপোর্ট ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ভূপালের নবাবের নিকট পাঠান হইবে।

আরও প্রকাশ, কমিটি অমরনাথকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন নাই বটে, কিন্তু কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ক্যাপ্টেন ও ম্যানেজার অমরনাথের বিরুদ্ধে অনাবশ্যক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার ফলে বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং উহা ভারতীয় টিমের অসাফল্যের অন্যতম কারণ। কমিটি বলিয়াছেন, ভিজিয়ানাগ্রামের কুমার সামাজিক হিসাবে চমৎকার লোক, কিন্তু ক্রিকেট খেলোয়াড় ও ক্যাপ্টেন হিসাবে তিনি তেমন যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। ম্যানেজার যে টীমের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন নাই ও আরও বিবেচনা খাটাইতে পারেন নাই তজ্জন্ত কমিটি ম্যানেজারেরও সমালোচনা করিয়াছেন। কমিটির মতে মেজর সি কে নাইডুও সমালোচনার অতীত নহেন, কিন্তু কমিটি বিজয় মার্চেন্ট ও মিঃ রামস্বামীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা চমৎকার খেলোয়াড়জনোচিত মনোবৃত্তি দেখাইয়াছেন এবং টীমের সাফল্যের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন, ভবিষ্যতে যেন সামাজিক পদ মর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া কাহাকেও ক্যাপটেন মনোনীত না করা হয়, ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং অন্যান্য যোগ্যতা বিবেচনা করিয়াই যেন ক্যাপটেন মনোনীত করা হয়। প্রকাশ, আর্থিক হিসাবে ভারতীয় টিমের বিলাত যাত্রা নেহাৎ বিফল হয় নাই; এক শত পাউণ্ড লাভ থাকিবে। যে সকল সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কমিটি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা নাকি রক্ষা করা হইবে না।

প্রকাশ, কমিটি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, অমরনাথ যদি ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহাকে আন্তর্জ্জাতিক খেলায় খেলিতে দেওয়া উচিত।

অবিমা

(ভাস)

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ

উপোদ্ঘাত

পুরাকালে সিন্ধুনদের তীরে সৌবীর নামে এক রাজ্য ছিল। সৌবীর-রাজ বৈরন্ত্যনগরাধিপতি কুন্তিভোজের অনুজা সুচেতনার পাণিগ্রহণ করেন। কুন্তিভোজের আর একটি ভগিনী সুদর্শনার সহিত কাশিরাজের বিবাহ হয়। সুদর্শনা অগ্নিদেবের কৃপায় একটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনী সুচেতনার পুত্র প্রসবকালেই স্বর্গত হওয়ায় সুদর্শনা আপন পুত্রটিকে সুচেতনার হস্তে প্রদান করেন। ইহাতে সৌবীররাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মহাসমারোহের সহিত পুত্রটির জাতকর্মাদি ক্রিয়া সম্পাদন-পূর্ব্বক উহার নাম রাখেন—বিষ্ণুসেন। বিষ্ণুসেন অগ্নির অনুগ্রহে অলোকসাধারণ রূপ-লাবণ্য ও বাহুবলের অধিকারী হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুসেন যখন অতি অল্পবয়স্ক শিশুমাত্র তখন একবার সৌবীররাষ্ট্রে ভীষণ উৎপাত আরম্ভ হয়। ধূমকেতু নামে এক অসুর প্রজাগণের মধ্যে অত্যন্ত অত্যাচার করিতে থাকে। সৌবীররাজ এই দুর্ব্বৃত্তের অমানুষিক অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ অসুরের উৎপাতে সমগ্র সৌবীররাষ্ট্র উৎসন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। এই সময় একদিন কুমার বিষ্ণুসেন তাঁহার সমবয়সী শিশুদিগের সহিত ধূলা মাখিয়া নানারূপ বাল্যক্রীড়া করিতে ছিলেন। তাঁহার রক্ষিপুরুষেরা একবার একটু অমনোযোগী হইয়াছে দেখিয়া কাকপক্ষধর * শিশু কুমার সহসা দৌড়াইয়া ঐ ধূমকেতু রাক্ষসের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাক্ষস শিশুটিকে দেখিয়া ভাবিল, বাঃ! এ যে একেবারে মুখের ভিতর খাবার আসিয়া ঢুকিল! সোল্লাসে শিশুটিকে গ্রাস করিতে যাইবে, এমন সময় সহসা সেই অস্ত্রশস্ত্রহীন, অসহায় শিশুটির বজ্রসম কঠোর প্রহারে অসুর নিজেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ধূমকেতু প্রায়ই অবি অর্থাৎ মেষরূপে বিচরণ করিত। তাহাকে বধ করায় বিষ্ণুসেনের নূতন নাম হইল "অবিমারক"।

* সেকালে ছোট ছোট ছেলেরা "কাকপক্ষ" বা লম্বা লম্বা জুলপি রাখিত। ইহাই ছিল প্রাচীন প্রথা। রামায়ণ-মহাভারতেও ইহার উল্লেখ আছে।

ইহার পর অনেক দিন গত হইয়া গেল বিষ্ণুসেন অবিমারক পূর্ণবয়স্ক যুবাপুরুষ. মধ্যে একবার সৌবীররাজ অবিমারকের সহিত কুন্তিভোজের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুরঙ্গীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু কুরঙ্গী তখন নিতান্ত বালিকা বলিয়া কোনরূপ পাকা কথা হয় নাই। সহসা সৌবীররাষ্ট্রে মহা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। দৈবাৎ চণ্ডভার্গব নামে এক অতি কোপনস্বভাব ব্রহ্মর্ষি সৌবীররাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অরণ্য মধ্যে তাঁহার কাশ্যপ নামক এক শিষ্য ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে সৌবীররাজও মৃগয়ার্থ ঐ স্থলে আসিয়া পড়েন। তখন শিষ্য-মৃত্যুতে বিচলিত-হৃদয় ব্রহ্মর্ষি চণ্ডভার্গব সৌবীররাজের প্রতি অতি কঠোর বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে থাকেন। রাজাও বিনা কারণে তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রহ্মর্ষিকে বলেন—"যেহেতু আপনি বিনা অপরাধে আমার নিন্দাবাদ করিতেছেন, অতএব বুঝিলাম যে, আপনি তপস্যার যোগ্য পাত্র নহেন আপনি ব্রহ্মর্ষির আকৃতিধারী চণ্ডাল মাত্র।" রাজার এই অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্যে প্রজ্জলিতপ্রায় হইয়া চণ্ডভার্গব তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—"যেহেতু তুমি ব্রহ্মর্ষি-শ্রেষ্ঠ আমাকে চণ্ডাল বলিতে দ্বিধা করিলে না, অতএব স্ত্রীপুত্র সহ তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হও।" তখন অনুতপ্ত ও ভীত হইয়া সৌবীররাজ শাপ মুক্তির জন্য ব্রহ্মর্ষির বহু অনুনয় করিলে তিনি বলেন—"আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে। সংবৎসরকাল তোমায় চণ্ডালত্ব ভোগ করিতেই হইবে। এই একবৎসর আত্মগোপন করিয়া থাকিলে বৎসরান্তে সপরিবার তোমার শাপমুক্তি হইবে।"—এই বলিয়া তপঃপ্রভাবে তাঁহার শিষ্যটীকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া চণ্ডভার্গব সৌবীররাজ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সৌবীররাজও পুত্র অবিমারক ও পত্নী সুচেতনার সহিত চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রীগণের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া অজ্ঞাতবাসে গমন করিলেন।

গ্রন্থারম্ভঃ

সৌবীররাজ প্রচ্ছন্নভাবে বসবাস করিতেছিলেন কুন্তিভোজের রাজধানী বৈরন্ত্যনগরে। কুরঙ্গী এতদ্দিনে বেশ বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কুন্তি-ভোজও কন্যার বিবাহের জন্য একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিলেন। নানা রাজ্য হইতে রাজদূতগণ নিজ নিজ রাজ্যের কুমারগণের সহিত কুরঙ্গীর বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া বৈরন্ত্যনগরে আসা যাওয়া করিতেছিল। কুন্তিভোজ নিজ মহিষী ও অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শে স্থির করিয়াছিলেন যে;

তাঁহার দুইটি ভগিনীপতিই—সৌবীররাজ (সুচেতনার স্বামী) ও কাশিরাজ (সুদর্শনার স্বামী)—বৈবাহিক সম্বন্ধের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র। এই দুইজনের মধ্যে আবার সৌবীরেন্দ্রের সহিত দ্বিতীয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও ছিল।—সৌবীরপতির ভগিনীই কুন্তিভোজের মহিষী। অতএব, সর্ব্বসম্মতিক্রমে অবিমারকের সহিত কুরঙ্গীর বিবাহ দেওয়া উচিত বলিয়া নিশ্চয় হইল। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সৌবীরাধিপ সপরিবারে নিরুদ্দেশ। তখন হতাশচিত্তে কুন্তিভোজ স্থির করিলেন যে, কাশিরাজ-পুত্র (অর্থাৎ সুদর্শনার দ্বিতীয় পুত্র) জয়বর্ম্মাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে এমন সময় এক মহা অনর্থ উপস্থিত। কুন্তিভোজের অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা কুরঙ্গী উদ্যান ভ্রমণে যাইয়া ফিরিবার পথে অঞ্জনগিরি নামক রাজহস্তীর সম্মুখে পড়িয়া যান। হস্তীটি তখন মত্তাবস্থায় ছিল। চারিদিকে হাহাকার উঠিল। কিন্তু সহসা এক রমণীয়াকৃতি যুবাপুরুষ নিরস্ত্র অবস্থায় আসিয়া হস্তীর কবল হইতে রাজকন্যাকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার পরিচয়ে জানা গেল যে, তিনি অন্ত্যজ জাতিতে উৎপন্ন। অথচ তাঁহার প্রিয়দর্শন আকৃতি ও নানাগুণবিশিষ্ট প্রকৃতি দেখিয়া সকলেরই মনে সন্দেহ জন্মিল যে, যুবক নিশ্চয়ই উচ্চকুলসম্ভূত ও বিশেষ গুণবান্—কোন বিশেষ কারণে সাময়িক আত্মগোপন করিতেছেন মাত্র। এই সন্দেহের বশে রাজমন্ত্রী ভূতিক যুবাপুরুষটির প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য চর নিয়োগ করিলেন।

অবিমারক যে শুধু রাজকুমারীকে হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি মত্ত অঞ্জনগিরিকেও বিনা অস্ত্রে অতি সহজে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার এই অপরূপ রূপ, মধুর ব্যবহার অসীম করুণা, অদম্য সাহস, অসাধারণ পরাক্রম, অলৌকিক কৌশল ও অদ্ভুত আত্মগোপনের কথা রাজা-রাজমহিষী হইতে আরম্ভ করিয়া নগরের প্রতি ঘরে ঘরে আলোচিত হইতে থাকে। আর মদনদেবের অনুগ্রহে প্রথম দর্শনের পর হইতেই অবিমারক ও কুরঙ্গী পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তদনুসারে কুরঙ্গীর ধাত্রী জয়দা ও ধাত্রীকন্যা সখী নলিনিকা অবিমারকের বাসস্থানে গোপনে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশের গুপ্তপথের সন্ধান দিয়া আসেন। সেই পথে চোরবেশে রাজভবনে প্রবেশ করিয়া অবিমারকও কুরঙ্গীর সহিত মিলিত হ'ন।

প্রায় একবৎসর এইরূপভাবে অবিমারক রাজপ্রাসাদ মধ্যে কুরঙ্গীর গৃহে গোপনে বাস করিলে পর সংবাদটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল;—মহারাজ কুন্তিভোজের কর্ণেও পৌঁছিল। বিপদ্ বুঝিয়া যথাকালে অবিমারকও অগ্নি কর্ত্তৃক প্রচ্ছাদিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কন্যান্তঃপুরের দ্বারে দ্বারে কড়া পাহাড়া বসিল। নিরাশহৃদয়া কুরঙ্গী কেবল কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন।

অন্তঃপুর হইতে নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইয়া অবিমারক বুঝিলেন—প্রিয়ার বিহনে জীবন ধারণ অসম্ভব। তখন তিনি আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় অগ্নিপ্রবেশ করিলেন। কিন্তু পিতা অগ্নিদেব সন্তানকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন—অগ্নিজ্বালা তাঁহার নিকট মলয়-জপকের মতই শীতল বোধ হইল। তখন তিনি এক পর্ব্বতে উঠিয়া উহার উপর হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পতনের পূর্ব্বে পর্ব্বত নির্ঝরের জলে স্নানপূর্ব্বক শেষবারের মত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, এমন সময় পর্ব্বতশিখরে মেঘনাদ নামক এক বিদ্যাধর ও তাঁহার পত্নী সৌদামনীর আবির্ভাব হইল। বিদ্যাধর ধ্যানবলে অবিমারকের জন্ম-কর্ম্ম প্রভৃতির পূর্ব পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি বন্ধুভাবে আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। অবিমারকের আত্মবিসর্জ্জনের সঙ্কল্প দূর করিয়া দিয়া তিনি প্রীতিবশতঃ কুমারকে একটি অন্তর্দ্ধান-কারক অঙ্গুরী প্রদান করেন। উহা দক্ষিনাঙ্গুলীতে ধারণ করিলে মানব অদৃশ্য হয় ও বামে ধারণ করিলে আবার প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ অঙ্গুরী হস্তে দিয়া সন্তুষ্ট নামক নিজ বিদূষকের সহিত অবিমারক অদৃশ্যভাবে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, কুরঙ্গী নির্জ্জনে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার উদ্যোগে রতা। এমন সময়ে সহসা প্রচণ্ড মেঘগর্জ্জন হওয়ায় ভীতচকিতা রাজকুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অবিমারক আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক কুরঙ্গীর সহিত মিলিত হইলেন। এবার আর কেবল প্রণয়ি-প্রণয়িনীর মিলন নয়—যথাশাস্ত্র গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

এদিকে মহারাজ কুন্তিভোজ অবিমারকের অদর্শনে একরূপ বাধ্য হইয়াই কাশিরাজ ও সুদর্শনের পুত্র জয়বর্ম্মার সহিত কুরঙ্গীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। যত শীঘ্র কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রস্থ দেখিতে পারেন, ততই তাঁহার মঙ্গল। কেবল মহিষীর এ বিবাহে তত ইচ্ছা নাই। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বিষ্ণুসেনের (অবিমারকের) অবস্থা পূর্ণভাবে না জানিয়া জয়বর্ম্মার হস্তে কন্যা সম্প্রদানে তাঁহার মোটেই আগ্রহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আর অধিকদিনও অনূঢ়া কন্যা গৃহে রাখিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না। কি জানি—কখন কি ঘটে! বিশেষতঃ একবার

কন্যার উপর একটু সন্দেহের ছায়াও পড়িয়াছিল। অগত্যা তিনি এ বিবাহে সম্মতি দিলেন।

বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। কাশিরাজমহিষী সুদর্শনা পুত্র জয়বর্ম্মা সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেবল যজ্ঞ-দীক্ষিত কাশিরাজ স্বয়ং আসিতে পারিলেন না। ঠিক এই সময় চরগণ সংবাদ আনিল যে, সৌবীররাজ পুত্রকলত্রসহ প্রচ্ছন্নভাবে বৈরন্ত্যনগরে বাস করিতেছেন। সংবাদ শুনিয়া কুন্তিভোজ স্বয়ং অমাত্য . ভৃতিকসহ সৌবীররাজের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তখন সৌবীররাজের অভিশাপ ও তজ্জনিত অজ্ঞাতবাসের কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। দুই রাজায় মিলন হইল বটে, কিন্তু অবিমারকের অতর্কিত অন্তর্ধানে সৌবীররাজ বড়ই বিপন্ন। সভায় বসিয়া উভয়ে পুরাতন কথার আলোচনা ও ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে বিশেষ ব্যস্ত, এমন সময় সহসা দেবর্ষি নারদ অবিমারকের সংবাদ লইয়া রাজদ্বয়ের নিকট আগমন করিলেন। কুন্তিভোজ যখন জানিলেন যে, অবিমারক পূর্ব্বেই তাঁহার জামাতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ক্রোধসত্ত্বেও তাঁহার মনে আনন্দের উদ্রেক হইল। কিন্তু হরিষে বিষাদ! জয়বর্ম্মার সহিত কুরঙ্গীর বিবাহ স্থির। ইহার অন্যথায় কাশিরাজের কোপসম্ভাবনা যথেষ্ট। সুদর্শনা ত' ইহার পূর্ব্বাভাস দিতে কুণ্ঠিতও হইলেন না। তখন দেবর্ষি সুদর্শনাকে একান্তে লইয়া গিয়া তাঁহার পুত্র অবিমারকের জন্মরহস্য হইতে বর্ত্তমান প্রেমলীলা পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সুদর্শনা এই ব্যাপারে একটু আতঙ্কিত হইয়া দেবর্ষির নির্দ্দেশ যথাযথভাবে পালনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তখন দেবর্ষি প্রস্তাব করিলেন যে, সুমিত্রা নাম্নী কুরঙ্গীর কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত জয়বর্ম্মার বিবাহ সমারোহে সুসম্পন্ন হউক। তাহা হইলে আর কাশিরাজের কোপের কোন কারণ জন্মিতেই পারিবে না। এ প্রস্তাবে সকলেই আনন্দে সম্মতিপ্রদান করিলেন।

অনন্তর কন্যান্তঃপুর হইতে অবিমারক ও কুরঙ্গী আনীত হইলেন। উভয়ে সভাস্থলস্থিত দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে প্রণাম করিবার পর, দেবর্ষির আশীর্ব্বাণী শ্রবণে বরবধূ নিজ নিজ জীবন ধন্য বোধ করিতে লাগিলেন।*

* শাস্ত্রী মহাশয় ভাসকৃত অবিমারকের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। আমরা ভবিষ্যতে "চিত্রালী"তে উহা ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব বলিয়া আশা করি।

খেয়ালী-সম্পাদক।

বাংলার আর্থিক দুর্গতি

শ্রীযামিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া, সমগ্র জগতে যে দারুণ অর্থ কষ্ট চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে বাংলা দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না যে, আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি বাংলার কোনও ক্ষতি করে নাই। বস্তুতঃ বাঙ্গালী স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হইয়াই এই দুরা-বস্থাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালীর কর্ম্মহীনের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়-মান হয়—বাঙ্গালার আর্থিক দুর্গতি অবশ্যা-ম্ভাবী ফল। সেদিন বাঙ্গালী জীবিকার্জ্জনের যে পথ বাছিয়া লইয়াছিল, আপাততঃ দৃষ্টিতে সে পথ খুব মধুর হইলেও, তাহাই বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে কারণেই হউক ইংরেজ বাঙ্গালা দেশকেই কেন্দ্র করিয়া রাজকার্য্য ও ব্যবসায় কার্য্য পরিচালনা আরম্ভ করে এবং বাংলা দেশেই প্রথমে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বাঙ্গালী সে সুযোগ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। দুই এক পাতা ইংরেজী শিখিলেই বড় বড় চাকরী মিলিত, আর বাংলার সন্তান সহজ, নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট জীবিকার্জ্জনের পথের সন্ধান পাইয়া দলে দলে ইংরেজী শিখিতে লাগিল। ফলে এইরূপ হইল যে, তাহারা শিক্ষার আদর্শ ভুলিয়া গেল এবং এ, বি, সি, ডি শিক্ষাকেই অর্থকরী শিক্ষা-হিসাবে গ্রহণ করিল। পিতা হইতে পুত্র, পুত্র হইতে প্রপৌত্র একই সুরে চলিল। এইরূপে বঙ্গপ্রতিভা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইল। এখনও পর্য্যন্ত ভারতের বড় বড় সহরে বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রধান প্রধান পদে বিরাজ করিতেছে বলিয়া আমরা গৌরব অনুভব করি। কিন্তু আমরা একথা ভুলিয়া যাই যে, আমাদের এই অর্থহীন দাম্ভিকতাই আমাদের সমাজে হাজার হাজার দরিদ্র মধ্যবিত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর চাকরীর অভাব হয় নাই। প্রথমতঃ রাজকার্য্যে ভারতের সর্ব্বত্র বাঙ্গালীর প্রয়োজন ছিল, তারপর ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও বাংলাদেশে নূতন নূতন রেলপথ ও ষ্টীমার পথ উন্মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই কাজ পাইয়াছে—বাংলার কয়লার খনি আবিষ্কারেও চা বাগান, পাটকলে অনেকের জীবিকার্জ্জনের সংস্থান হইয়াছিল। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালী নূতন করিয়া কোথাও কাজ পাইতেছে না, উপরন্তু প্রাদেশিকতার কড়া আইনে বাংলার সন্তান আজ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিতাড়িত। তাই উদরান্ন সংস্থানের সমস্যাই আজ তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৎসর বৎসর শত শত বাঙালীযুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়-পত্র গ্রহণ করিয়া যখন অর্থান্বেষণে কর্ম্মক্ষেত্রে ধাবিত হয়—চাকুরী না পাইয়া তাহাদের জীবন ব্যর্থ মনে হয়—জীবিকার্জ্জনের কোন উপায়ই খুঁজিয়া পায় না। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় প্রহর হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙালী নিরুদ্বেগে দিনাতিপাত করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, কিন্তু সেই নিরুদ্বেগে জীবন যাত্রাই আজ তাহাকে নিঃসহায় করিয়াছে।

আজ বেকার সমস্যা শুধু বাংলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতে এবং ইউরোপের বড় বড় দেশেও এই সমস্যা ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ও আমাদের দেশের বেকার-সমস্যার স্বরূপ একই প্রকার নহে। ইউরোপ শিল্প প্রধান দেশ। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারে যন্ত্রদানবের সৃষ্টি হওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক কর্ম্মহীন হইয়াছে। যে সকল দেশে শত করা ৭০ হইতে ৮০ জন লোক শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান—এখনও প্রায় শত করা ৭০ জন কৃষিকার্য্যে জীবিকানির্ব্বাহ করি-তেছে। মাত্র কয়েকটী বড় বড় সহরে যন্ত্রদানব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারও শৈশব অবস্থা বলা চলে। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সহিত আমাদের দেশের কোন তুলনাই হইতে পারে না। তবে আমাদের দেশের বেকার-সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাই উপলব্ধি করিবার বিষয়। পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, অল্পায়াসেই স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জনের পথকেই আমরা জীবনের কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলেও আমাদের

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা জটীল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আমাদের অবস্থানুযায়ী চলিতে পারিতেছি না। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত জনসাধারণের একটা নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে—যাহাকে অনুসরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। আমি পাশ্চাত্য শিক্ষাকে নিন্দনীয় মনে করি না—তবে সে শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রসার না করিয়া সীমবদ্ধ করাই শ্রেয়।

একদিন বাংলার পল্লীগ্রামকেই আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর সৌর্য্য, বীর্য্য, ধন, ঐশ্বর্য্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ আমরা হাজারে হাজারে সেই পল্লীজীবনকে পরিত্যাগ করিয়া সহরে ছুটিয়া আসিতেছি। কিন্তু একথা চিন্তা করি না যে সহরে অর্থ সৃষ্টি হয় না—আদান-প্রদান চলে মাত্র। এই নাগরিক জীবনযাত্রার প্রলোভনই আমাদিগকে নিরন্ন করিয়াছে, দরিদ্র করিয়াছে। আমরা আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত উপজীবিকা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছি, তাই বাংলার দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব, অনাটন ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। শিল্প ও কৃষি জাতির প্রাণ, কিন্তু আমরা বাংলার বস্ত্রশিল্প, বয়নশিল্প, রেশমশিল্প, প্রভৃতি ঘৃণাবোধে পরিত্যাগ করিয়া দেশকে, জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি। আর বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার লোক বাংলার বুকের উপর বসিয়া অর্থ শোষণ করিয়া লইতেছে—আমরা নিশ্চেষ্টমনে বসিয়া আছি। গত ৩০ বৎসরের হিসাবে আমরা দেখিতে পাইব—বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব কয়েকটি শিল্প পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে আত্ম-প্রবঞ্চিত হইয়া দেশের ও জাতির দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে। পাশে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—

উপরোক্ত হিসাব লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে গত ৩০ বৎসরে বাংলার ৭,৮৬,৮০৬ জন লোক উল্লিখিত মাত্র কয়েকটা উপজীবিকা

গ্রাম্য শিল্পজীবি বাঙ্গালীর সংখ্যা হ্রাস

শিল্পের নাম	বৎসর	উপজীবির সংখ্যা	মাসিক মাথা পিছু আয়	১৯০১ সন হইতে কর্ম্মত্যাগীর সংখ্যা	বাৎসরিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ
শিল্ক	১৯০১	৫০,৩৯৩	?		
	১৯১১	৪৮,৭৮৩	৪০		
	১৯২১	১৩,৫৮৭	৩৫		
	১৯৩১	৫,৬৪২	২৭	৪৪,৭৫১	১,০৪,৭১,৭৩৪
বয়ণ	১৯০১	৩,৬২,৭৪০	২০		
	১৯১১	২,৭৬,৪১৯	২২		
	১৯২১	২,১১,৩৫৪	২৪		
	১৯৩১	১,৭১,৬৯২	২০	১,৯১,০৪৮	৩,০৫,৬৭,৬৮০
কাঁসার বাসন	১৯০১	৪৮,২৬১	২৫		
	১৯১১	৩৬,৪৭৪	২০		
	১৯২১	৩২,১৪২	১৬		
	১৯৩১	৭,২৫৭	২০	৪১.০০৪	৭৩,৮০,৭২০
পাদুকা	১৯০১	?	?		
	১৯১১	৪৪,৭৩৫	২৮		
	১৯২১	৩৬,৬৯৩	২৩		
	১৯৩১	২৪,৪৯১	২০	২০,২৪৪	৩৬,৪৩,১২০
কর্ম্মকার	১৯০১	?	?		
	১৯১১	৬৮,৪১৬	২৩		
	১৯২১	৫৭,৩১৪	২০		
	১৯৩১	৪২.৬১৩	১৮	২৫,৮০৩	৪৪,৩৯,১২২

শিল্পের নাম	বৎসর	উপজীবির সংখ্যা	মাথিক মাথা পিছু আয়	১৯০১ সন হইতে কর্ম্মত্যাগীর সংখ্যা	বাৎসরিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ
মৎস্যজীবি	১৯০১	?	?		
	১৯১১	৫,৬২,৬৭৮	২৫		
	১৯২১	৪,৪৮,৩৭৩	২২		
	১৯৩১	২,৬৮,০২৯	২০	২,৯৪,৬৪৯	৭,৪৮,৪৩,৯৫৩
বারুজীবি	১৯০১	?	?		
	১৯১১	৬০,৯২১	২০		
	১৯২১	৫২,৬৪৬	২২		
	১৯৩১	৩৬,৪৬৮	২০	২৯ ৯৭৬	৪১,২৩,৪২০
ধান ভানা	১৯০১	২,১০,০০০	৬		
	১৯১১	১ ৮৭,২৩৪	৬		
	১৯২১	১,৭১,৮৪৪	৭		
	১৯৩১	১ ৪৭,০২৪,	৬	৬২,৯৭৬	৩০,২২,৮৪৮
মৌমাছি ও পশুপক্ষীর পালন	১৯০১	৭৮,৪৪৬	২০		
	১৯১১	৪২,৬৫৯	১৫		
	১৯২১	১৪,৫০২	১৫		
	১৯৩১	১,৫৬৮	১২	৭৬,৮৭৮	৬৪,৫৭,৭৫২

ভারতে বিদেশী পণ্যের আমদানী

	১৯৩৩—৩৪	১৯৩৪—৩৫	১৯৩৫—৩৬
সুতার বস্ত্র	১৭,৭৪,৩৪,১৯৭	২১,৭৬,১৪,৯৩৫	৩০,৬৭,২৬,৩৫৮
কৃত্রিম সিল্ক	১,৯০,২৩,৩৯৯	৩,০৪,০২,৮৪৫	২,৭২,১১,৬৩১
লৌহ লক্কড়	২,৪৩,৫৭৫	২,৭৪,৭৫২	৩,২৬,২৩৬
কল কব্জা	১২,৭৬,৯৩,৪১১	১২,৬৩,৬৭,১৭৮	২১,৫২,৯৪,৪৪৭
কাঁচের বাসন	১,২২,১৩,৪৪৪	১,৩২,৫৬,৪৩৬	১,৩৯,৩৯ ৯২৫
ঔষধপত্র	১,৯৩,৪২,১৫৪,	১,৯১,৯০,০৩৬	
সিগারেট	১৯,০৫,৬৩২		২৮,১০,০৪৬

পরিত্যাগ করিয়া দেশের বাৎসরিক ন্যূনপক্ষে ১৩॥ কোটী টাকা লোকসান করিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে এই আর্থিক ক্ষতি হয়ত খুব অধিক নহে, কিন্তু গোটা জাতির পক্ষে ইহা যে কি ভীষণ মারাত্মক তাহা সহজেই বোঝা যায়।

গত ৩০ বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা আত্মচেতনার ও আত্ম প্রতিষ্ঠালাভের ভাব জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি, বাংলা সে সুযোগ হেলায় নষ্ট করিয়াছে। বোম্বাই, আমেদাবাদ কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া কাপড় প্রস্তুত করিয়াছে আর বাংলাদেশ অম্লানবদনে তাই খরিদ করিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশ বোম্বাইকে কি দিয়াছে? বাংলাদেশ সমগ্র ভারতবর্ষকে কয়লা সরবরাহ করিত, কিন্তু বোম্বাই অধিক লাভের আশায় সস্তায় আফ্রিকার কয়লা খরিদ করিতেছে—আর বাংলার কয়লা ব্যবসায়ী হাত গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালীর উৎসাহ নাই, বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ তাহার নিজ নিজ শিল্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছে—আর বাঙ্গালীর ছেলে চাকরী করিয়া তাহার তথাকথিত শ্রমলব্ধ অর্থ গচ্ছিত করিয়া চলিয়াছে। বাংলায় অর্থ নাই একথা বলা চলে না—কারণ এখনও বাঙ্গালীর ১০৪ কোটী টাকা গভর্ণমেণ্টের ক্যাস সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে নিয়োজিত আছে। অথচ বাঙ্গালী ব্যবসায়ে টাকা পায় না, নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করা দূরে থাক, আজ অর্থাভাবে বাঙ্গালী পরিচালিত কয়েকটী শিল্প প্রতিষ্ঠান নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করিতে পারে না, অথচ তাহারই অর্থ বিদেশী-পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির রসদ যোগাইতেছে। এই কলিকাতা সহরে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কয়েকটী বড় বড়

কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার কর্ণধার অবাঙ্গালী ও ইউরোপিয়ান। শুনা যাইতেছে ঐ সকল মূলধনের অধিকাংশ অংশই বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী-পরিচিত ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখিতেছে, আর সেই অর্থ অবাঙ্গালীর শিল্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির পুষ্টি সাধন করিতেছে।

শ্রমে বিমুখ, আত্মশক্তিতে সন্দিহান, আত্মবীর্য্যে আস্থাহীন, উদ্যমহীন বাঙ্গালী যুব সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে চারিদিকে নৈরাশ্যই প্রতিলক্ষিত হয়। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার যুব-শক্তি যে পথে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই আত্ম-প্রেরণা যে এত শীঘ্র এরূপভাবে প্রতিহত হইবে তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। আজ তাহার নিশ্চিন্ত, মোলায়েম, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলে কে বলিবে বাংলায় দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অনাটন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, হাহাকার দেশময় তাণ্ডবলীলা সুরু করিয়া দিয়াছে? বাঙ্গালী সেদিন স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিয়া বিদেশী দ্রব্যকে বর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু আজ আবার তাহার বিলাসিতার সামগ্রী বিদেশী না হইলে চলে না। স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালী যে শিল্প, ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল, আজ তাহাকে বাঙ্গালী অবহেলা, তাচ্ছিল্য করিতেছে। একে প্রতিযোগিতার যুগে নূতন করিয়া কোন শিল্প আরম্ভ করা দুরূহ, তাহার উপর স্বদেশী দ্রব্যে বাঙ্গালীর অনাদর, অনাস্থা লক্ষ্য করিলে ত কোন ভরসাই পাওয়া যায় না। আজ সস্তার মোহে আমরা জাপানকে প্রচুর অর্থ পরিবেশন করিতেছি এবং অন্যান্য দেশ হইতেও প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী আমদানী করিতেছি। গত তিন বৎসরে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র বস্ত্র, কৃত্রিম সিল্ক, লোহার জিনিষ, সিগারেট, ঔষধপত্র প্রভৃতির জন্য কি পরিমাণ অর্থ বিদেশীর হস্তে তুলিয়া দিয়াছে তাহার একটা হিসাব দেওয়া হইল।

বৎসর বৎসর এই যে হাজার হাজার টাকা আমরা বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিতেছি, দেশের এই দারুণ অর্থহানী সম্পূরণ বা আর্থিক সঙ্গতি বিধানের উপায় কি?

বাংলার আর্থিক দুর্গতির প্রকৃত স্বরূপ অবহিত হইয়া আজ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এ পর্য্যন্ত অনেকেই বর্ত্তমান সমস্যার সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন এবং আমাদের সম্মুখে কর্ম্মতালিকাও অনেক আছে, নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। দেশকে, জাতিকে উন্নত করিতে চাই ব্যক্তিগত ও সংহত প্রচেষ্টার।

মুক্তি

(বনফুল)

সবাই তাকে ডাকে 'লিলি' নামে।

বনের ধারে ছোট্ট তার কুঁড়ে খানি; সামনে 'শিলার' নদীর মাঝে উঁকি দিয়ে মুগ্ধা কিশোরীর মতো যেন সে নিজের রূপেই পাগল! আসন্ন বসন্তের আগমন বার্ত্তা বাতাসের মুখে ভেসে আসছে—ফাগুয়ার ছোপে গাছ পালা রঞ্জিত, ঠিক যেন অভিসারের বেশে সজ্জিত!

দীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর সে তার বাবা, মাকে চোখে দেখেনি—এইটুকু মাত্র জানে যে তাঁরা স্বর্গে গিয়েছেন? স্বর্গে যাবার পথ সে আবিষ্কার কর্ত্তে পারেনি—কোনদিকে—কোথায়—

সহরের লোহার কারখানায় কাজ করে সে,—চারদিকের কোলাহল, সমবয়সী মেয়েদের হাসি, তার কাছে ভালো লাগেনা একটুও—বন্ধুদের সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত ওর প্রাণ! ওদের কথাতে মাঝে মাঝে হাসতে চেষ্টা করে কিন্তু সে হাসি যেন ঠিক কান্নারই রূপান্তর—!

কর্ম্মশ্রান্ত প্রাণ, ব্যথাক্লুব্ধ মন তার কিছু কালের জন্য শান্তি লাভ করে কুটীর প্রাঙ্গনে 'শিলার' তটে এসে। শেষ সূর্য্যরশ্মির ম্লান আলো 'শিলারের' জলের উপর নাচতে নাচতে কখন যে মিলিয়ে যায় সে টেরও পায়না! বুক চিরে তার প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, চোখ অশ্রু সজল হ'য়ে ওঠে—উন্মত্তের মতো সে লুটিয়ে পড়ে নদী সৈকতে—

বছর ঘুরে আসে! আবার প্রচণ্ড শীতের মাঝে বসন্তের আগমন সূচিত হয়—

অর্দ্ধছিন্ন পোষাক প'রে সে কাঁপতে কাঁপতে সহর অভিমুখে চলে। লাল ঠোঁট তার ক্রমে ক্রমে নীল বর্ণ হয়—সমস্ত মুখে যেন কে নীল পোঁচ লাগিয়ে দিয়েছে। গত রজনীর প্রকৃতির রুদ্র নর্ত্তনের ছাপ প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়! হাত, পা অসাড় হয়ে আসে—গরীবের প্রাণ সব সহ্য হয় নইলে গরীব কথার চলন কেন—

রাতের দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়—তার নিরাভরণ শয্যায় সে সুপ্ত! স্বপ্নের ইন্দ্রজাল তার তন্দ্রাভরা চোখে ভেসে উঠছে!, বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য—বরফে দিগন্ত আচ্ছন্ন? ঝড়ের সো সো শব্দে কানে তালা লাগছে!

এমন সময় দরজা জোরে কে যেন ঠেলতে লাগলো—ভয়ার্ত্তকরুণ আর্ত্তনাদে বোল্লো "ওগো কে আছো—একটীবার দরজা খোলো—আমায় বাঁচাও!" ভেঙে গেল তার ঘুম; মনে হোলো স্বপ্ন জীবন্ত রূপ ধ'রে তাকে ডাকছে! ভাবলো যে স্বপ্নে আজ আমি এতো পাগোল কেন—তবুওতো স্বপ্ন; সত্যিকারের রূপ ওর কোথায়! কিন্তু তার চিন্তা ধারার বাধা দিয়ে আবার আর্ত্তনাদ

ভেসে আসলো "ওগো অচেনা ওগো বন্ধু আমায় বাঁচাও"। তবেতো এ স্বপ্ন নয়; ধড়মড় ক'রে উঠে তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালালো, শ্লথ বসন খানিতে তার নগ্ন শরীর ঢাকলো—খিলো দরজা খুলে। প্রচণ্ড বাতাসের সাথে ঘরের ভেতরে প্রবেশ কোর্লো এক সুন্দর যুবক; তার হাতের আলো ঠিকরে পড়লো ওই প্রশান্ত দেবোপম মুখে! অবাক দৃষ্টিতে সে রইলো চেয়ে ওই মুখের দিকে—নিস্পন্দের মতো। কতক্ষণ যে মোহাবিষ্ট ছিলো তা' জানেনা হঠাৎ ওই যুবকের কথায় তার চমক ভাঙলো—স্বপ্নের কোন স্বর্গ লোক থেকে একেবারে মর্ত্তে পতিত হোলো! যুবক জিজ্ঞাসা কোরলো "তোমার নাম কী? তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।" তারপরে আস্তে আস্তে তার কোমল পেলব হাতখানা নিজের হাতের ভেতরে চেপে ধরে তাকে সামনের দিকে টেনে নিলো! কোথা থেকে রক্ত এসে তার ব্রীড়াবনত মুখে ফাগুয়ার ছোপ লাগিয়ে দিলো! প্রাণের ভেতরে বসন্তের আহ্বান জাগিয়ে তুললো। সে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা কোর্লো কিন্তু কথা বেরোলো না শুধু ঠোঁট দু'টী কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো!

পরদিন ভোরে সেই যুবক তার গন্তব্যপথে চলে গেল—যাবার আগে তাকে বোল্লো "আবার আমি আসবো সিজি"। অশ্রু সজল নেত্রে সে তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে কি যে বলেছিলে তা' সে নিজেই বুঝতে পারেনি!

তারপর থেকে সে আর কাজে মন লাগাতে পারেনা—প্রাণ এক অসীম হাহাকারে কেঁদে ওঠে! জমাট দীর্ঘশ্বাস তার বুককে হাল্কা করে বেরিয়ে আসে।

বর্ষার জলধারা সিনারের শীর্ণ বুককে ভরিয়ে দেয়! রূপসী যুবতীর গর্ব্বিত চলন ভঙ্গের মতো তার দীপ্ত অবাধ গতি! কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ জল উদ্দাম নৃত্যে ছুটে চলে কাস্পিয়ান সাগরের দিকে!

আসন্ন মাতৃত্বের ছাপ তার সারা দেহে পরিলক্ষিত হয়! কারখানাতে মেয়েরা তার দিকে চেয়ে হাসে—কেহবা তীব্র শ্লেষের সাথে জিজ্ঞেস করে "ব্যাপার কী"! সেও চুপ করে ভাবে 'ব্যাপার কী'!

শেষে একদিন সব গুপ্ত রহস্যের দ্বার তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়! কারখানার মালিক তাকে ডেকে—সব কথা বুঝিয়ে তাকে বিদায় দেন! মুখ তার লাল হয়ে ওঠে! নীরবে সে তার কুটীরে ফিরে যায়! "সিনারে"র নির্জ্জন তটে এসে বসে। জলের প্রচণ্ড গতির দিকে চেয়ে চুপকরে একমনে কী যেন ভাবে। সূর্য্যের শেষ আলো তার মুখে এসে প'ড়ে তাকে দৈনিকের সময় নির্দেশ ক'রে দেয়—কিন্তু সে দিকেও যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই!

আকাশে প্রচণ্ড মেঘ ক'রে আসে বাতাস ডাকে সো সো—সিনারের বুকে অসংখ্য ঢেউ জেগে ওঠে! প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যে আজ যেন পৃথিবী চঞ্চল! তার বুকের মাঝে যৌবনের নব শিহরণ জেগে উঠেছে! নট-রাজের নূপুর সিঞ্জনে তার বুকের রক্তে দোল লেগেছে!

পরদিন সবাই আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলো 'সিজির' সেই ছোটো কুঁড়ে টুকুর অস্তিত্ব নেই—শুধু ভিটে টুকুর ওপর দিয়ে ফেনিল জল উদ্দাম নৃত্যে করতালি দিতে দিতে বিজয়ীর আনন্দে ছুটে চলেছে!

গোর্কির ছায়া অবলম্বনে—

ছায়াচিত্রে আলোক-রশ্মি

শ্রীঅজিত সেন

পদার্থের নিজস্ব কোন আলো নেই। তাদের ভিতর এমন একটা শক্তি রক্ষিত আছে যার সাহায্যে আলোকের বিভিন্ন অংশকে তারা ইচ্ছামত গ্রহণ বা বিকিরণ করতে পারে। আলোর কতগুলি অংশ পদার্থের ভিতর আত্মগোপন করে, আর অন্য অংশ বাইরে আত্মপ্রকাশ করে এবং তার ভিতর দিয়েই পদার্থের রূপ আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়। একটি লাল ফুলের কথা ধরা যাক। লাল ফুল সূর্য্যের লাল আলো ভিন্ন অন্য সমস্ত আলোগুলিকে নিজের ভিতর লুকিয়ে ফেল্তে পারে, তাই অবশিষ্ট লাল আলোতেই সে আমাদের চোখে ধরা দেয়। যে পদার্থ আলোর সমস্তগুলি অংশকেই লুকিয়ে ফেলবার ক্ষমতা রাখে, তাদের আমরা দেখি কালো, কারণ আমাদের চোখের তারায় প্রতিফলিতকর কোন আলোই আর তার থাকে না। সেইরূপ যে পদার্থকে আমরা সাদা দেখি, সে সবগুলি সাধারণ আলোকেই বাইরে প্রতিফলিত করে।

আমাদের কাজ প্রধাণতঃ সাদা আলো নিয়ে। সাদা আলোর সৃষ্টির গোড়ার কথা তাই আমাদের জানতে হবে। আলোক-বিশ্লেষণের সাহায্যেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে। রামধনু প্রকৃতির বিস্ময়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই বিস্ময়কে খণ্ড খণ্ড করে সাদা আলোর বিশ্লেষণতত্ত্ব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, কেমন করে হয় রামধনুর সৃষ্টি? এক একটি জলবিন্দুর ভিতর সূর্য্যের শ্বেত রশ্মি এমন একটি বিশেষ কোণ (angle) সৃষ্টি করে প্রতিফলিত হয়, যে জলবিন্দুর ভিতরকার লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন আলো বিভক্ত হয়ে আমাদের চোখে ধরা দেয়, যে বৃষ্টির সময় কিংবা পরে আকাশের দিকে তাকালে আমরা রামধনু দেখি, আর বিস্ময়ে তারই পানে চেয়ে থাকি, প্রিয়ার তনুর সাথে তার মিল খুঁজি, তাকে নিয়ে লিখি গল্প এবং কবিতা।

আবার একটি অন্ধকার ঘরে এক টুকরো সূর্য্যালোক যদি একটি ত্রিকোণ কাঁচের উপর ফেলা যায়, এবং তাতে প্রতিফলিত আলোকরেখা পশ্চাতের একটি সাদা পর্দার উপর ধরা যায় তবে সেই শ্বেত সূর্য্যালোকটুকু বিভিন্ন রঙে রাঙা হয়ে আমাদের চোখে দেখা দেবে পর্দার উপরে। যে রঙগুলো আমাদের চোখে ধরা দেবে সেগুলি সাধারণতঃ হবে বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলদে, জরদা এবং লাল। এই বর্ণসমাবেশকে বলে "স্পেকট্রাম" এবং সূর্য্যরশ্মি হতে এর উৎপত্তি বলে একে বলা হয় সোলার-স্পেকট্রাম।" এই বর্ণসমাবেশের ফলেই "শ্বেত বর্ণের উৎপত্তি।...দৃশ্যমান স্পেকট্রামের একদিকে থাকে বেগুনী রঙ, অন্যদিকে থাকে লাল রঙ এই দুটি রঙ আমাদের চোখের সামনে অদৃশ্য থাকে।

স্পেকট্রামের অদৃশ্য লাল সীমান্ত আমাদের চামড়া স্পর্শ করে এবং উত্তাপ অনুভব করতে সাহায্য করে। এই জন্য একে বলে "হিট্ স্পেকট্রাম।" আবার অদৃশ্য বেগুনী সীমান্তকে বলে 'আলট্রাভায়োলেট স্পেকট্রাম'" এই শেষোক্ত স্পেকট্রাম নিয়েই আমাদের কাজ।

সাধারণ ফিলিম্ কিংবা প্লেট (চিত্রপট বা ধাতু পাত্র) যে রাসায়নিক সংমিশ্রনের সাহায্যে তৈরী হয় স্পেকট্রামের বেগুনী সীমান্তই তাদের রৌপ্যকনিকার উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী এবং লাল সীমান্তের "দিকে ক্রমশঃই তার কার্য্যক্ষমতা ক'মতে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় লাল, জরদা, হলদে এবং সবুজ রঙ নীল এবং বেগুনী অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। পূর্ব্বে কিন্তু সাধারণ চিত্রপটে বা সাধারণ cine filmএ সমস্ত রঙ বিশিষ্ট কোন দৃশ্য চিত্রান্তরিত করলে, ঠিক উলটো ব্যাপার দাঁড়াত। আমাদের চোখে বিভিন্ন রঙগুলি যে ভাবে প্রতিফলিত হতো চিত্ররূপে হতো অন্যরূপ, বেগুনী এবং নীল সব চেয়ে উজ্জল হয়ে উঠতো।

বর্ত্তমানে ব্যবহৃত Panchromatic ফিলিমে" বা প্লেটে (চিত্রপটে বা ধাতু পাত্রে) রঙিন চিত্রের প্রকৃত দৃশ্যে যে ভাবে দৃষ্ট হয়, উক্ত চিত্রপটে সেগুলি যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ কৃত্রিম আলোর সাহায্যে কোন বস্তুর চিত্ররূপ নিতে উক্ত চিত্রপট বা ধাতু পাত্র বিশেষ উপযোগী। বিভিন্ন প্রকারের রঙিন চিত্র তুলতে, ঘরের ভিতরে অথবা বাইরে সঠিক রঙের সমাবেশ করতে, আলো ও ছায়ার নানা খেলা পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তুলতে Panchromatic ফিলিমের এক অভিনব আবিষ্কার।

ক্যামেরায় ক্লোজ-আপ্ চিত্র গ্রহণের কালে কোনরূপ রূপসজ্জার সাহায্য না নিয়েও Panchromatic ফিল্মে তোলা ছবি এমন রক্তমাংসের বাস্তবতা নিয়ে ফুটে ওঠে

—"চিরন্তনী"—

(কথিকা)

শ্রীশরৎ ভট্টাচার্য্য—(উৎপল)

ফুল ফোটে কুমারীদের মত বুকভরা অসীম, উদ্দাম, অনাবিল, প্রেমানন্দের আকাঙ্খা নিয়ে সুদূরের অর্চনা মধুর কোন্ পরশ প্রত্যাশী হ'য়ে। তরুশাখার নবীন পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে ফোটে তারা মাজলীকির অস্পষ্ট-সুর শুনে—দিগন্তের মাঝে রঙীন্ বসন প'রে—আর বক্ষোপূর্ণ-প্রেমের সিঞ্চিত সিক্ত সুধা স্ফীতির আবেগে ছন্দহীন হ'য়ে সারা অঙ্গ দুলিয়ে দেয় তারা উদাসী বাতাসের অধীর হিল্লোলে···।

দোলনাবেগে সুধা-স্ফীতি উছলে পড়ে অধরে এসে—দিগন্তের কাছে বার্ত্তা পেয়ে মধুপ কুমারের দল চঞ্চল হ'য়ে ছুটে এসে নির্লজ্জের সম বাধা বিপত্তি জলাঞ্জলি দিয়ে চুম্বনে লুটিয়ে পড়ে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে তা'দের দলদেরা রঙীন্ অধর থেকে আর বিশ্বস্রষ্টার অসীম প্রশংসা করে। সেনাপতির সাহায্য দিয়ে পাখী তা'দের পুলক গুঞ্জরণে সায় দেয় সুমধুর কণ্ঠ দিয়ে উষসী ললাট হ'তে তার ছিটিয়ে দেয় সিন্দুর বিন্দু—সুযোগের মাঝে গভীর দূত দক্ষিণার দ্বার খুলে—অস্পষ্ট—মিলন মাঙ্গলীকীর সুরে—ব'নের ঋতু রাণীকে সচকিতে জাগিয়ে তোলে—বসন্তের ওড়না টেনে রাণী 'ফুলকুমারীদের বরণ করে, তখন অপূর্ব্ব নৃত্যের ভঙ্গিমায় লজ্জা ও আবেশে শিথিল হয়ে বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখে তা'রা অভিমানের কথা—মধুপদের আচরণের।

কাল ব'য়ে যায় উদ্দাম আকাঙ্খায় অতৃপ্ত আস্বাদনে—রাত আসে—চাঁদের আয়নায় রূপের আভা পড়ে তা'দের—সেই রাত ও জ্যোছনার বাসরে সেই অতৃপ্ত প্রেমের বাণী শোনাবার সঙ্গী না পেয়ে—দূতের সাথে প্রেমালাপে মত্ত হ'য়ে বিরহ ঘোচায় তা'রা······।

গভীর চিরন্তনী প্রবাহের ফাঁক দিয়ে উৎসব হঠাৎ থেমে যায়—ঋতুর প্রচণ্ড রাজা—সদলে সুসজ্জিত হ'য়ে অনাহূতের মত, যখন দখল ক'রে বসে তা'দের বনানী···।

দিকে দিকে সাঙ্কেতিক সাড়া দিয়ে পাখীরা বিষাদের সুর সৃষ্টি করে, উষসী লুকিয়ে পড়ে মেঘের বুকে মসীময় অবগুণ্ঠন টেনে, ঋতুর রাণী গুটিয়ে নেয় বসন্তের আঁচল—দূত দক্ষিণের দ্বার বন্ধ ক'রে দেয়, সংঘর্ষ হয় তা'র ঋতুর প্রচণ্ড দূতের সঙ্গে—পরাস্ত হয় সে। শেষে উন্মত্ত হ'য়ে ইতস্ততঃ ক'রে ফেলে বনের বাসর আর মধুপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে অভিমান নিয়ে ফিরে যায় আপন লজ্জিত ঘরে।

ফুলরাণী? শঙ্কিত হৃদয়ের ভীরু মিনতি জানিয়ে একে একে লুটিয়ে পড়ে তারা গাছের তলে বেদনাপূর্ণ অশ্রু-সজল চোখে আর ভাবে হয়ত বা চিরন্তনী এই—

রাজা তখন ছিন্ন ভিন্ন ক'রে তাদের পদদলিত করে।

যে সে প্রকৃত বাস্তবকেও অনেক সময় হার মানায়। যেমন নীল আকাশে কালো মেঘের দল ভেসে চলেছে। Panchromatic ঠিক সেই ভাবে নিজের চিত্রপটে তাকে প্রতিফলিত করে নেবে, একটুও ব্যতিক্রম হবে না। বস্তুতঃ রঙিন দৃশ্য চিত্রে রূপান্তরিত করতে Pancromatic আদর্শ স্থান অধিকার করেছে। সেই জন্য আজ প্রত্যেক Studio:তে Panchromatic কত সমাদরে প্রচলিত হয়।

নহি অন্য আর কিছুর প্রত্যাশী

শ্রীহিমাংশু কুমার গুপ্ত

জীবনের যেই প্রান্তে শ্রান্ত দেহে উপস্থিত আজ,
মনে হয় কিছু নেই শুধু শূন্য নাই কিছু কাজ।
যেন কোন মরুর মায়ায় দিকে দিকে চলেছি ছুটিয়া
পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাস, করুণ ক্রন্দন, দুহাতে লুটিয়া
ক্লান্ত মন বহিতে অপার
বেদনার তীব্র গুরুভার॥

অভিমানে রুদ্ধ কণ্ঠ উর্দ্ধপানে উঠিছে রোষিয়া
অব্যক্ত ব্যথার বাণী দিকে দিকে গর্জ্জিয়া ঘোষিয়া

অনন্ত আকাশ পানে দৃষ্টিপাত করি বারবার
অসীম বেদনা ভরা কৃষ্ণমেঘ ভরা চারিধার
গর্জ্জিয়া ভাঙিয়া পড়ে
মোর মত বেদনার ভারে॥
ধরণী ভাসায় তার ব্যক্ত অশ্রুধার
শঙ্কা বাধা তুচ্ছ করে গতিবেগ তার॥

তারপর শান্ত স্তব্ধ সেই দিন বর্ষণের পরে
কালো মেঘ ভেসে যায় দূর দূরান্তরে
ফেলে যায় নীল বিষে জর্জ্জরিত অসীম আকাশ
দুর্ব্বাসার উগ্রশাপ নভোময় করিয়া প্রকাশ॥

সে চিরবিদায় দিন
মোর লাগি আসিবে যেদিন
আমি যাব সকলেরে চুপি চুপি বলে
মোর লাগি এক বিন্দু শুভ্র অশ্রুজলে
কেহ যেন ধোয়াইয়া মোর অভিমান
ভুলাইয়া দেয় যত ঘৃণা অপমান॥

একবার মনে মনে
একান্ত গোপনে
ভাবে যেন মোর যত দুঃখ গ্লানি রাশি
নহি অন্য আর কিছুর প্রত্যাশী॥

খেয়ালী
খেয়ালী

শ্রীদুর্ব্বাসা

অনুসন্ধিৎসু ডাক বা asking bid :—এই ডাকের বিষয় কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে "খেয়ালীতে" একবার লিখেছিলাম কিন্তু সে সময় এ সম্বন্ধে সবিশেষ এবং সম্পূর্ণরূপে না বলায় আমার কয়েকজন বন্ধু ও পাঠকের মধ্যে অনেকেই অনুযোগ করে পাঠিয়েছেন যে, এই ডাকের বিষয় আলোচনা আরও যত নিগূঢ় হয় তজ্জন্য চেষ্টা করতে। তাঁদের অনুরোধেই এই ডাকের বিষয় আরও কিছু বলব। তার পূর্ব্বে পাঠকবর্গের প্রতি আমার এই অনুরোধ যে, এই প্রবন্ধটি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁরা যেন ধৈর্য্য-সহকারে পড়েন এবং জিনিষটি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম না করে খেল্‌বার সময় ইহা প্রয়োগ না করেন, তার কারণ এই যে এই ডাকের ভাষা বা ধারা যদি দুই খেঁড়ীর মধ্যে সঠিকরূপে জানা না থাকে তা'হলে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই বেশী।

সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই যে হাতে কোন রঙের একখানি বা একেবারে নেই বা টেক্কা সমেত দুইখানি, কিম্বা সাহেব সমেত দুইখানি তাস বর্ত্তমান, এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও বল্‌বার মত ভাষা না থাকায় অনেক গ্রাম নষ্ট হয়ে যায়। এই অভাব দূরীকরণার্থে মিঃ কালবার্টসন এই অনুসন্ধিৎসু ডাক বা asking bidএর সৃষ্টি করেছেন, যার দ্বারা আমরা অনায়াসে আমাদের হাতের এই অবস্থা বলতে পারি বা আমরা হাতের এই অবস্থা খেঁড়ীর ডাকের প্রত্যুত্তরে বলে দিতে পারি।

কোন্‌টি অনুসন্ধিৎসু ডাক :—

যখন উভয় খেঁড়ীর মধ্যে ঠিক হয়ে গেল কোন রঙে খেলা হবে অর্থাৎ trump suit ঠিক হয়ে গেলে পর যে ডাক চার বা তদূর্দ্ধে ডাকা হবে সেই ডাক হবে অনুসন্ধিৎসু ডাক। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। বলুনতো কোনটি অনুসন্ধিৎসু ডাক ?

'উ'—একটি ইস্কাবন।—চারটি রুহিতন।

'দ'—দুইটি ইস্কাবন।

এখানে চারটি রুহিতনের ডাক হল asking bid এবং রঙ হল ইস্কাবন।

'উ'—একটি ইস্কাবন।—চারটি রুহিতন।

'দ'—তিনটি ইস্কাবন।

এখানেও চারটি রুহিতনের ডাক হল asking bid এবং রঙ হল ইস্কাবন।

'উ'—একটি ইস্কাবন।—তিনটি হরতন।

'দ'—দুইটি হরতন।—চারটি রুহিতন।

এখানেও চারটি রুহিতনের ডাক হল asking bid এবং রঙ হল হরতন।

'উ'—একটি রুহিতন।—চারটি চিড়িতন।

'দ'—তিনটি চিড়িতন।—চারটি ইস্কাবন।

এই চারটি ইস্কাবনের ডাক হল asking bid এবং রঙ হল চিড়িতন।

'উ'—একটি ইস্কাবন।—পাঁচটি চিড়িতন।

'দ'—চারটি ইস্কাবন।

এখানে পাঁচটি চিড়িতন হল asking bid এবং রঙ হল ইস্কাবন।

'উ'—একটি চিড়িতন।—ছুইটি হরতন।—চারটি রুহিতন।

'দ'—ছুইটি চিড়িতন।—ছুইটি ফেরাই।

এই চারটি রুহিতনের ডাক হল asking bid এবং রঙ হবে চিড়িতন কেন না এ ক্ষেত্রে চিড়িতন রঙটিকে খেঁড়ী সাহায্য করেছেন।

'উ'—একটি ইস্কাবন।—তিনটি ফেরাই।

'দ'—তিনটি ইস্কাবন।—চারটি হরতন।

এই চারটি হরতনের ডাক হল asking bid এবং রঙ হল ইস্কাবন।

'উ'—একটি চিড়িতন।—ছুইটি হরতন।—চারটি রুহিতন।

'দ'—ছুইটি চিড়িতন। তিনটি হরতন।

এই চারটি রুহিতনের ডাক হল asking bid এবং রঙ হল হরতন,—চিড়িতন নয়, কারণ হরতন রঙটিকে খেঁড়ী শেষে সাহায্য করেছেন।

'উ'—একটি ফেরাই।—চারটি রুহিতন।—ছয়টি চিড়িতন।

'দ'—তিনটি রুহিতন —পাঁচটি রুহিতন।

এই ছয়টি চিড়িতন ডাকটি asking bid এবং রঙ হল রুহিতন।

তবে একটি মাত্র ডাক আছে যেখানে চারের বা তদূর্দ্ধে না গিয়েও অনুসন্ধিৎসু ডাক দেওয়া যায়। যেমন ধরুন,

'উ'—একটি হরতন।—তিনটি ইস্কাবন।

'দ'—তিনটি হরতন।

এই তিনটি ইস্কাবনের ডাক হল asking bid, কিন্তু নিম্ন ক্ষেত্রে নয়। যেমন ধরুন,

'উ'—ছুইটি হরতন।—তিনটি ইস্কাবন।

'দ'—তিনটি হরতন।

এই যে তিনখানি ইস্কাবনের ডাক এই ডাকটি কিন্তু asking bid নয়; কারণ 'উ'র হাত হয়তো ছুই-রঙ বিশিষ্ট, কাজে কাজেই. তিনি ভাবতে পারেন যে হরতন অপেক্ষা ইস্কাবনে হয় তো ভাল খেলা হতে পারে এই জন্তেই 'উ' ইস্কাবন ডেকেছেন। তবে এ ক্ষেত্রেও asking bid হত যদি 'উ' তিনখানি ইস্কাবন না ডেকে চারখানি ডাকতেন।

আবার কোন রঙে যদি ছুইটির ডাক দিয়ে প্রাথমিক ডাক হয়, তবে একটি বেশী বাড়িয়ে দিয়ে ডাক দিলেই asking bid হবে। যেমন ধরুন,

'উ'—ছুইটি রুহিতন।—পাঁচটি চিড়িতন।

'দ'—তিনটি রুহিতন।

এখানে পাঁচটি চিড়িতনের ডাক হল asking bid, কেন না 'উ'র চারটি চিড়িতনের ডাকে 'দ' ভাবতে পারেন যে চিড়িতনে Suit preference হয়েছে, অর্থাৎ রুহিতন অপেক্ষা চিড়িতন ডাকে ভাল খেলা হবার সম্ভাবনা।

ব্রীজের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে ছুটি প্রশ্নের উত্তর ঃ—জনৈক পাঠক ব্রীজের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর নিয়ে দেওয়া হল।

(১) ডাক চলবার সময় বা ডাক শেষ হয়ে গেলে প্রাথমিক চাল দেবার পূর্ব্বে যে কোন খেলোয়াড় ডাক কি ভাবে হয়েছে, কে কি ডাক দিয়েছেন বা ডবল রি-ডবল কেউ করেছেন কিনা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কিন্তু প্রাথমিক চালের পর শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে কটার ডাক এবং ডবল রি-ডবল হয়েছে কি না।

(২) ডাক হয়ে গেলে পর যদি বিপক্ষদলের কোন ব্যক্তি 'পাশ' ছাড়া কোন রঙের ডাক দেন, তা হলে ডাকদার তাঁর খেঁড়ীকে তাঁর চাল দেবার সময় যে কোন বিশিষ্ট রঙে (Specified suit) চালতে বাধ্য করতে পারেন।

শান্তি ইন্‌ষ্টিটুট :—শান্তি ইন্‌ষ্টিটুটের উদ্যোগে "তরুণদের উপর তাস-খেলার প্রভাব" বিষয়ক যে রচনা প্রতিযোগিতা বের হয়েছিল, তার শেষ দিন ছিল ১৬ই নভেম্বর সোমবার। কিন্তু প্রতিযোগী সাধারণের অনুরোধে ২৩শে নভেম্বর রচনা গ্রহণের শেষ দিবস বলে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং উক্ত দিবসের পূর্ব্বে যাতে রচনাগুলি সম্পাদকের নিকট পৌছায় সে বিষয়ে প্রতিযোগীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে। এদের ঠিকানা :—২৬, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

জোয়ান ক্রফোর্ড

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

নরমা নামবে না

আরভিং থ্যালবার্গ মারা গেছে বেশ কিছু দিন। তার মরণের শীতল স্পর্শ আজও ছায়াজগতের অনেক মূল্যবান কাজকে অকেজো করে রেখেছে। কে জানে এভাবে কতদিন রাখবে!

আরভিংএর অবদান অনেক, তাকে ভুলতে অনেক সময় লাগবে, জানি। তবু একথা ভাবতেও ভাল লাগেনা, যে নরমা শিয়ারারএর মত মেয়ে ছবি থেকে দূরে থাকবে।—নরমা থাকবে, ছবি থেকে দূরে থাকবে; আজকে ওর কাছে ছবির কথা বলতে পারবে না, পারবে না; কেউ তা সাহস করেনা।

সেই কতদিন আগে। সবাক যুগ তখন প্রথম পা দিলে। শিল্পীর মডেলের প্রাণে নব অনুপ্রেরণা জাগল। শিল্পীর মডেল তারও চোখে নানান রঙের ঘোর, অন্তরে অমৃতের পরশ—এলো ষ্টুডিওর অন্দরে। দিন যায়, মাস যায়,—আরভিং—এই আরভিং থ্যালবার্গ তাকে রূপোর পর্দায় রূপায়িত কল্লে' চোখে সাতটা রঙের অমর প্রভা আনিয়ে। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত গল্প বাছা, ওকে পরিচালনা করা, ছবির প্রবর্দ্ধনা করা, আর নরমার নামের বিশ্বব্যাপী প্রচার চল্লো থ্যালবার্গের মাথার আর কলমের জোরে। সেই থ্যালবার্গ—নরমা শিয়ারারএর স্বামী, আজ নেই। পারবে না—পারবে না, নরমা বলছে, কিছুতেই পারবে না অভিনয় করতে। কে জানে!

পরের বছরে

কথাটা উঠেছিল অনেকদিন আগেই। কথা ওঠে আর কথা উড়ে যায় যেমন হলিউডে এটাকেও অনেকে তেমনিই ভেবেছিল। তাই জোয়ান কথাটা সেদিন একটু পাকা করেই দিলে, আরো বল্লে: আমি ষ্টেজে নামব, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করব, হৃদয় দিয়ে অনুভব করব ষ্টেজ টেক্‌নিকএ আর স্ক্রীণ টেকনিকে কতটুকু তফাৎ।

জোর গলায় লেকচার দিলে, আমার প্রথম কথা হচ্ছে একটি ছোট আমেরিকা ষ্টক কোম্পানীর হয়ে অভিনয় করা—একটি সিজ্‌ন ধরে; ফ্রাঙ্কট টোন আমার সঙ্গে থাকবেই, তা নয়ত আমার অভিনয় করাই হবেনা। এবং আরো বলে দিচ্ছি এই নিউ ইয়র্ক সহরে একবার এসে ফ্রাঙ্কটএর সঙ্গে নেমে ষ্টেজে অভিনয় করে যাব।

লেসলি হাওয়ার্ড চায়…যে, আমি লণ্ডনে গিয়ে ষ্টেজ অভিনয় শুরু করি। সে দেখিয়েছে লণ্ডনে অনেক ছোট ছোট কোম্পানী আছে যাদের সঙ্গে আমার অভিনয় করার সুবিধে তো হবেই এবং তাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী জায়গায় অভিনয় করলে খুব বিচক্ষণ দর্শকও পাবনা।

আজকে আমি বোধ কর্চ্ছি, আমার ভেতরে অত্যন্ত অভাব; ষ্টেজে অভিনয় আমাকে শিখতেই হবে এবং পুরোপুরি ভাবে। স্ক্রীণের অন্যান্য ষ্টারএর মত আমি যেতে চাইনা। আমি যার ষ্টেজে অভিনয় করব, কত রকম ভুল করব। বিচক্ষণ ক্রিটিকের চোখ থেকে দূরে দূরে থাকব।

একটা কথা আমি বলেছি; ক্রাফোর্ড-এর স্বামী ফ্রাঙ্কট লণ্ডনের ষ্টেজে অভিনয় করার জন্যে একটা তার পেয়েছে।

গার্ব্বোর নতুন মেক-আপ

গ্রেটা গার্ব্বো যে 'ক্যামিলী' ছবিতে নামছে এটা আজকে পুরোনো কথা, অর্থাৎ সবাই জানে সাইলেণ্ট ছবির যুগে, ওই ছবিই হয়েছে দুবার। দুবারই হয়েছিল ভাল। দুবারই যে দুজন নামে, তারা তখনকার ছিল শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। সেই ক্যামিলিতে নামছে গ্রেটা গার্ব্বো, বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।

গ্রেটা এবার এক মেক আপ নিয়েছে, তা অদ্ভুত এবং অপরূপ। ষ্টুডিওর লোকেরা বলে, এ মেক-আপে নাকি পর্দার অন্তরালে রূপসজ্জার আর একটা উন্নত অধ্যায় খুলে যাবে।

এ মেক-আপ উদ্ভাবন গার্ব্বোর ছবির ক্যামেরাম্যান উইলিয়াম ড্যানিয়েলস্ এবং এ কাজকে সম্ভব করতে প্রচুর সাহায্য করেছে মেট্রো গোল্ড্‌উইন মায়ার ষ্টুডিও রূপসজ্জাকরদের প্রধান ব্যক্তি জ্যাক ডন।

জ্যাক বল্লে: এই মেক-আপ প্রচার হলে, লোকে অন্য সব রকমের মেক-আপ করা

লোকে ভুলে যেবে। এই গ্রীজ পেন্টের আইডিয়া, লোকে আর পছন্দ করবে না।

জ্যানিয়াল্‌স আর ডন এ রূপসজ্জার জন্যে যে উপায় সম্ভব করেছে তা 'পুরোণো ধরণের তো নয়ই, উপরন্তু স্পঞ্জ দিয়ে সে লাগাতে হয়।

কলিনএর স্বামী

যারা জানেনা তাদের বলছি, কলিন-মুরের স্বামীর নাম হচ্ছে অল স্কট। ওদের হৃদয়ে ছিল প্রচুর প্রেম, মনে ছিল অগাধ মিল, একদিন তা ভাঙল। তাই সেদিন কোর্টে বিচার হয়ে সকল বাধন চূর্ণ হোল। বিয়ে ?—বিয়ে আর ভাল লাগেনা এই রকমই লোকে বল্লে।

কলিন মুর এখন ছবি থেকে দূরে। পর্দ্দায় আজকাল ওর মুখ আর কেউ দেখতে পায়না। 'ডল্ হাউস'ই হচ্ছে কলিনের বর্ত্তমানে শেষ ছবি। ওই ছবির গৌরবেই আজকাল দিন কাটছে ওর।

আর মেরিয়ন মাস, তার ওপর নজর পড়েছে অলএর। অলএর প্রেমেই সে মশগুল। ওদের প্রেমের গতি যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে বিয়ের বাদ্য শুনতে বোধ হয় আর লোকের দেরী নেই।

মেরিয়ন মাস ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের ছবিতে কাজ করেছে অনেকদিন, খাতিরও পেয়েছে যথেষ্ট। তারপর একদিন বেটি ডেভিস মেরিয়নএর সমস্ত নাম আর ষ্টুডিওর ভালবাসা জয় করলে। তারপর কলোম্বিয়া ষ্টুডিওতে অভিনয় করবার জন্যে ঢোকবার পর মেরিয়নকে আর একবার প্রথম শ্রেণীতে তোলবার চেষ্টা হয়েছে।

এই হচ্ছে মেরিয়ন মাসের এখনকার খবর।

পিকফোর্ডের প্রেম

প্রেমের খবর যে প্রধান খবর একথা হলিউড বলে। ছবির আলোচনা আর প্রেমের আলোচনা এই দুটোই জানে ওরা

গ্রেটা গার্বো

বেশী। শুনেছি ওখানকার রেস্তোরার চায়ের ধোঁয়া আর সিগারেটের ধোঁয়া প্রেমের বাষ্পই ছড়ায়।

কত খবরই শোনা যায়। সেই প্রেমের খবরটা নাকি বাজে। মেরী পিকফোর্ড কিছুতেই স্বীকার করবে না যে ও চালস (বাডি) রোজার্সের প্রেমে পড়ছে। অবশ্য এ অস্বীকার অনেকেই করে, তাই বলে কি সব কথাই সত্যি না সবাই মেনে নেয়।

সবাই বলছে বিয়ে ওদের হবেই। আর একথাটাও তো খুব সত্যি যে চালস রোজই 'পিকফেয়ারে' দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মেরীর বাড়ীর নিমন্ত্রন—হরেক রকমের ডিনার কই কিছুতেই তো বাদ দেয় না বাডি।

তাইতো হলিউডের লোক ধরে নিয়েছে চালস বাডির সঙ্গে মেরী পিকফোর্ডের বিয়ে হবে এবং তা নতুন বছরে।

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস আর মেরী পিক-ফোর্ডের নামানুযায়ী মেরীর বাড়ীর নাম হচ্ছে 'পিকফেয়ার', তবে কি এবার হবে 'পিক রো।'

বন্দী হবে প্রাণেশ্বর

মিলাউকির একজন লোক, নাম তার ফ্র্যাঙ্ক হোয়াইটম্যান, প্রেমে পড়েছে লুপে ভ্যালের, তাই এলো সেদিন হলিউডে। বিয়ে করতে চায় লুপে ভ্যালেকে।

বিয়ে হোল না। লুপের শান্তি ভঙ্গের অপরাধে তার হোল জেল। মনে তার শান্তি নেই। শুনলুম, সেখানে সে বল পাকিয়েছে, এবং বলেছে জনি উইসমুলারকে সরে দাঁড়াতে হবে। আমি চাই লুপেকে। আর
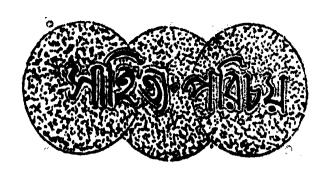
শিশু গল্পিকা—সম্পাদক শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার। দেব সাহিত্য কুটীর হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

বইখানা খুলে প্রথমে নজর পড়ল সুধীর বাবুর লেখা ভূমিকা,—যেটী একান্তই পড়বার জিনিষ। সে ভূমিকার পর আর অন্য কিছু মুখবন্ধের প্রয়োজন নেই। তবে যারা এ বইখানা আজও কেনেন নি অথবা পড়েন নি, তাঁদের অবগতির জন্য বলছি যে শিশু গল্পিকা সত্যিই পড়বার মত এবং উপহারে দেবার মত বই—যা পেলে ছেলে মেয়েরা অন্য জিনিষ পাওয়ার চেয়ে ঢের বেশী খুসী হবে। এতে আছে ইতিহাসের গল্প, পুরাণের গল্প, বিবিধ গল্প, রূপকথা, এ্যাড্ভেঞ্চার, বিজ্ঞানের গল্প হাসির গল্প, এবং সর্ব্বোপরি ভূতের গল্প। ভূতের গল্প সম্বন্ধে যতই মতভেদ হোক্, ও না হলে কোনো গল্পই জমেনা।

বাংলা দেশের খ্যাতনামা অনেক লেখকই শিশু গল্পিকায় লিখেছেন। ছবিও আছে প্রচুর, তাদের মধ্যে ত্রিবর্ণ চিত্র অনেক গুলি। ছাপা ও বাঁধাই এত ভালো যে রীতিমত লোভনীয়। শিশু-মনের সব রকম খোরাকই এতে মিলবে। সাড়ে তিনশ' পৃষ্ঠার বই মাত্র দেড় টাকায় পেলে অভিভাবক ও ছেলে-মেয়েরা উভয় তরফই খুসী হবেন। সম্পাদক, লেখক, চিত্রশিল্পী ও মুদ্রণকার সকলেরই কৃতিত্বের প্রসংশা করছি পরিশেষে।

শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদুইন—সম্পাদক শ্রীরবি মজুমদার। প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅসিত বসু। কার্য্যালয় পি ২৭৩ রাসবিহারী এভেনিউ কলিকাতা। দাম চার আনা।

প্রচলিত মাসিক পত্রিকার মতন এ পত্রিকার সাধারণের কাছে কোন circulation নেই। এমন কি পরিচালক সঙ্ঘের (Den of Diomonds) সভ্য ছাড়া কাহারো লেখা পর্য্যন্ত ছাপান হয় না। আমাদের দেশে ক্লাব ও এসোসিয়েসনের ছড়াছড়ি কিন্তু সাহিত্য চর্চ্চার প্রচেষ্টা খুবই বিরল। এদের এই প্রকার উদ্যমকে আমরা প্রশংসা না করে থাকতে পারি না।

খোস গল্প—শ্রীঅমিয় কুমার রায় চৌধুরী। প্রকাশক—এম, সি, সরকার, কলেজ স্কোয়ার। দাম ছয় আনা।

আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের গল্পের বই খুবই কম পাওয়া যায়। যাও পাওয়া যায় তাতে প্রকৃত শিক্ষার বিষয় কিছুই থাকে না। কিন্তু আলোচ্য এই পুস্তকে শিক্ষার বিষয় বিশেষ কিছু না থাকিলেও ভাষা ও বিষয়বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও সরল। আমরা এই প্রকার বইএর বহুল প্রচার কামনা করি।

কাঁটা—শ্রীনিত্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। দাম একটাকা চার আনা।

নিত্য নারায়ণ বাবু যে একজন সুলেখক তা আমরা তাঁর পূর্ব্বের লেখা রাশিয়া ভ্রমণ, তুষার তীর্থ অমরনাথ প্রভৃতি হ'তে জানতে পেরেছি। এই বইখানি তিনি কতকগুলি গল্পকে একত্রে সমাবেশ করে বাহির করেছেন। এবং একটী গল্পের নামানুযায়ী বই খানির নামও রাখা হয়েছে 'কাঁটা'। 'কাঁটা'র প্রত্যেক গল্পটাই করুণ রসের দ্বারা পরিবেশিত। প্রত্যেক গল্পের ভাষার তারতম্য থাকলেও 'কাঁটার শেষ রেখা যে মনের উপর প্রাধান্য লাভ করে থাকবে একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।

লুপেকে লিখেছে—'আমার বাড়ী নাও, গাড়ী নাও, নাও নাও মোর যৌবন।

বেচারী! আমি জানি লুপে ওর একখানাও চিঠি খোলেনি।

খুচরো খবর

'আফ্রিকা স্পিকস্' ছবিখানা তোলার জন্যে দায়ী হচ্ছে ওয়ালটার ফুটার। আফ্রিকার গল্প নিয়ে আর একখানা ছবি ওয়ালটার তুলবে; তার নাম এখনও ঠিক হয়নি। পল বরসন নামবে এতে।

* * *

'ফুটথেলাকে পেছনে রেখে যে ছবি উঠবে তার নাম হচ্ছে 'ক্যান ইউ হিয়ার মি মাদার।' ছবি পরিচালনা করবে হার্ব্বার্ট স্মিথ। ছবিখানা ব্রিটিশ ছবি।

* * *

'ইউ উইলি উইস্কি' হচ্ছে ছবির নাম, শার্লি টেম্পল নামছে এতে।

* * *

মির্ণা লয়এর বাপ হচ্ছে আমেরিকান, আর মা মেক্সিকান। ১৯০৬ সালে ওর জন্ম।

* * *

ম্যাডেলিন ক্যারলএর স্বামীর নাম হচ্ছে ক্যাপটেন ফিলিপ এষ্টলে।

উপরে : দেবার্চ্চনার্থে জন্য পুষ্পপাত্র হস্তে শান্তি গুপ্তা। সত্যই এর মুখে যেন শান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। পপুলার পিকচার্সের "পণ্ডিত মশাই"-এ ইনি নায়িকা কুসুম। নীচে : ঐ ছবিরই একটি দৃশ্যে গোবর্দ্ধনবেশী চেতন রায় শিশুমনকে পাপের বিষে কেমন কোরে জর্জ্জরিত কোরছে তাই দেখা যাচ্ছে। এই শনিবার থেকে ছবিখানা 'শ্রী'-তে দেখান সুরু হবে।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড (সাউথ), কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৩—২৬শে নভেম্বর ১৯৩৬ } ৪৫শ সংখ্যা

বাংলা কংগ্রেসের গ্রহমণ্ডল

বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রার্থী মনোনয়ন ব্যাপারে চৌৎপুরের ফুলওয়ালী সহযোগী "আনন্দবাজার" ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ও তাঁহার অনুগামীদের স্বেচ্ছাচারনীতি সম্বন্ধে যে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ব্যক্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্বের চাপে পড়িয়া সহযোগী "আনন্দ বাজারের" 'বুক কাটেত মুখ ফোটেনা' অবস্থা হইয়াছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জাতীয়দলের সম্পাদকের পত্রের উত্তরে যে কঠোর ও তিক্ত জবাব প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াই হয়ত জাতীয়দলের শুষ্ক হৃদয়ে সজীবতার সঞ্চার হইয়াছে। বহু চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত মিলনের ভিত্তির অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পরিণাম স্মরণ করিয়া সহযোগী "আনন্দবাজার" আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে জগন্নাথ দেবের ন্যায় পুরোভাগে স্থাপন করিয়া স্বীয় পার্লামেণ্টারী প্রভুত্ব কায়েমী করিয়া জাতীয়দলের সম্পাদককে স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোন দলের অস্তিত্ব মানেন না। বিধানচন্দ্রের এই চপেটাঘাতে চমকিত হইয়া জাতীয়দলের সম্পাদক ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ও ক্ষুণ্ন মনে এক বিশাল বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং সহযোগী "আনন্দবাজার পত্রিকা" মিলনমোহঘোর হইতে সদ্যজাগরিত হইয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছেন যে, "ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ কংগ্রেস জাতীয়দলের প্রার্থীদিগকে মোটেই আমল দিতেছেন না এবং কেবলমাত্র নিজেদের দলভুক্ত প্রার্থীদিগকেই মনোনয়ন করিবার জিদ করিতেছেন।" ইহার ফলেই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এতদিন পরে, সহযোগী এই কঠোর সত্য উপলব্ধি করিয়া বিগত সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিনিন্দিত মিলন ভিত্তির ফাটলের আতঙ্কে শঙ্কিত হইয়া বাঙলা কংগ্রেসের তথা পার্লামেণ্টারী কমিটার সদস্যদিগকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় যে কংগ্রেস জাতীয়দলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ভুয়া মিলনের মোহে ও বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের অবি-বেচনার ফলে সেই জাতীয়দল যে নির্ব্বীর্য্য অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন প্রভৃতি প্রবর্ত্তকদিগকে ব্যথিত করিয়াছে। লাজপৎ রায়ের স্মৃতি সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু চারিত্রিক বিশুদ্ধতার সম্বন্ধে গালভরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পরিচালিত শ্রীযুক্ত

নলিনীরঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট ও শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইন কর্ত্তৃক অনুসৃত উপদলের তল্পীদাররূপে নির্ব্বাচন সংগ্রামে কি প্রকারে অবতীর্ণ হইতে পারেন তাহা আমাদের অবোধগম্য। বাঙলা দেশের উর্ব্বরক্ষেত্রেই শুধু জোড়া ডিক্‌টেটারের উদ্ভব সম্ভব হয়—জোড়া ডিক্‌টেটার যে নিয়ামক-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা হৃদয়ঙ্গম করা বাঙলার কংগ্রেসের সদস্যগণের সম্ভব হয় নাই। ডাঃ বিধানচন্দ্র ও শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর মতানৈক্যের ফলে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার মীমাংসার জন্য আগামী রবিবার প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভা আহুত হইয়াছে। প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ডে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের দলই প্রবল, সুতরাং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রার্থীদিগের মনোনয়ন বাহাল থাকাই সম্ভব। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জাতীয়দলভুক্ত প্রার্থীদের সম্বন্ধে যে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে ডাঃ রায় ও তাঁহার অনুগামীদল জাতীয়দলের প্রার্থীদের ছাঁটিয়া ফেলিয়া নিজেদের ইচ্ছামত প্রার্থী মনোনয়ন করিবেন।

ডাঃ রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, শরৎচন্দ্রের ন্যায় ভাবাবিষ্ট নেতার পক্ষে সে প্রেমপাশ ছিন্ন করা দুঃসাধ্য। কৌশলী বিধানচন্দ্র রায়ের চক্রান্তে প্রবেশ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের অকাল পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঙলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিধান-নলিনী-কিরণ কই এই শব্দভেদী প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুধু হাহাকারই প্রতিধ্বনিত হইত। আর আজ এলবার্ট হলের জনসভায় শরৎচন্দ্রের আবরণে বিধান-চন্দ্র বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জনমতের প্রবল বাত্যায় যে বিষবৃক্ষ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সমূলে বিদূরিত হইয়াছিল শরৎচন্দ্রের স্নেহসিঞ্চনে পুনরায় সেই বিষবৃক্ষ আরোপিত হইয়াছে। আর শরৎচন্দ্র স্বয়ং সেই বিষবৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বিষফল উদগীরণ করিয়া নিজে নীলকণ্ঠ হইয়া স্বাধীনতা ও কামালপাশার স্বপ্ন দেখিতেছেন!

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের (Council of State) আসন্ন নির্ব্বাচনে মিঃ সুরপৎ সিং কংগ্রেস প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছেন। ১২৬২ জন ভোটারের মধ্যে স্বয়ং মিঃ সুরপৎ সিংকে লইয়া মোট ৭০ জন অবাঙালী ভোটার আছেন। ইহা আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের বিষয় যে যে কেন্দ্রে বাঙালী ভোটারদের প্রাবল্য এরূপ অত্যাধিক সেই কেন্দ্রেও বাঙলা কংগ্রেসের কর্ণধারগণ কোন বাঙ্গালী প্রার্থী বাছাই করিতে পারিলেন না। মিঃ সুরপৎ সিংয়ের জয় সুদূর-পরাহত জানিয়াও কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কপালে মনোনয়নের ছাপ আঁকিয়া দিলেন। ব্যারিষ্টার মিঃ সুশীলকুমার রায়চৌধুরী অন্যতম প্রার্থী এবং তাঁহার জয়ও সুনিশ্চিত। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ব্যারিষ্টার মিঃ সুশীলকুমার রায় চৌধুরীর মনোনয়ন পত্রের প্রস্তাবক ও সমর্থক-রূপে স্বাক্ষর করিয়াছেন। শেষ মুহূর্ত্তে মিঃ সুরপৎ সিংকে কংগ্রেস মনোনয়নের ছাপ দিয়া তাঁহারা কী সুশীলবাবুকে একটু বিব্রত করেন নাই?

এলবার্ট হল জনসভায় রায়-রুণী প্যাক্টের প্রবর্ত্তক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলী যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন বিধানচন্দ্র তাহার পাশ কাটাইয়া ভিন্ন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। শরৎচন্দ্রের পক্ষপুটে আশ্রিত বিধানচন্দ্র জাতীয়দলের গুপ্তশত্রু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের স্বদলদ্রোহিতার সুযোগ লইয়া যদি বাঙলা কংগ্রেসে মন্ত্রীত্বলোভী দল গঠনে সফলতা-লাভ করেন তাহা হইলে দেশ ও কংগ্রেসের ঘোর অনিষ্টসাধন হইবে।

(সি, বি)

এম-সি-সির প্রথম পরাজয়

এম, সি, সি এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলার ফলাফল সম্বন্ধে যা ধারণা করা হয়েছিল শেষ অবধি তাই সত্যি হল। সিডনীতে এই খেলাটি হয়েছিল। এম, সি, সি ১৩৫ রাণে হেরে গেছে। নিউ সাউথ ওয়েলস প্রথম ইনিংসে ২৭৩ রাণ করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২৩ রাণ করে। এম, সি, সির প্রথম ইনিংসে হয় ১৫০ রাণ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে হয় ৩১১ রাণ। এম, সি, সি দলে লেল্যাণ্ড এবং হ্যামণ্ড একসঙ্গে ১৬৭ রাণ করেন। লেল্যাণ্ড এবং হ্যামণ্ড যদি এত সুন্দরভাবে খেলে বেশী রাণ না ক'রতেন তাহলে এম, সি, সিকে আরও শোচনীয়ভাবে হারতে হত। হ্যামণ্ড একলা দ্বিতীয় ইনিংসে ৯১ রাণ ক'রে তাঁর দলকে অপমানের হাত থেকে কতকটা বাঁচিয়েছেন। নিউ সাউথ ওয়েলসের বিজয়ের জন্য এই দলের বিখ্যাত বোলার 'ওরিলি' অনেকাংশে দায়ী। তিনি প্রথম ইনিংসে ৫৩ রাণে তিনটি উইকেট নেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে কেবলমাত্র ৬৭ রাণে পাচটি উইকেট নেন। ওরিলিই যে একরকম এম, সি, সি, দলের পরাজয়ের কারণ একথা বললে অন্যায় বলা হবে না।

এম-সি-সি বনাম অষ্ট্রেলিয়ান একাদশের খেলা

গত ২০শে নভেম্বর সিডনীতে অষ্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে এম, সি, সি দলের চারদিনব্যাপী খেলা শুরু হয়েছে। এম, সি, সি দলের যে ভাগ্যবিপর্য্যয় আরম্ভ হয়েছে তাতে মনে হয় যে এই খেলাটিতেও এদের হারতে হবে। এম, সি, সি দল প্রথমে ব্যাট করতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় দিনে প্রায় আধ ঘণ্টা খেলে প্রথম ইনিংস শেষ করে এম, সি, সি দল ২৮৮ রাণ করেন। এই খেলাটিতে এ্যালেনের জায়গায় রবিন্স ক্যাপ্টেন মনোনীত হয়েছেন। প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে অষ্ট্রেলিয়া দলের বিখ্যাত বোলার 'চিপারফিল্ড' ৬৬ রাণ দিয়ে ৮টি উইকেটে নেন। প্রথম ইনিংসে এম, সি, সি দলের সব চেয়ে বেশী রাণ করেন লেল্যাণ্ড, আমিশ এবং রবিনশ (ক্যাপ্টেন)। এরা যথাক্রমে ৮০, ৭৬ এবং ৫৩ রাণ করেন। দ্বিতীয় দিনে বাকী সময়ে অষ্ট্রেলিয়া দল ব্যাট ক'রে ২ উইকেটে ২২১ রাণ করেন। তৃতীয় দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দল সারাদিন ব্যাট ক'রে ৮ উইকেটে ৫৪৪ রাণ করেন। এম, সি, সি দল অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়া দলের ২৫৬ রাণ বেশী আছে এবং দুইটি উইকেট হাতে আছে। অষ্ট্রেলিয়া দলের জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত ব্যাট্স্‌ম্যান ব্রাডম্যান ৬৩ রাণ ক'রে আউট হয়ে যান। ব্যাডকক্ ৩০৪ মিনিট খেলে একাই ১৮২ রাণ করেন। ব্রাউন করেন ৭১ রাণ। যদিও খেলার কথা কিছু বলা যায় না তাহলেও মনে হয় যেন এই খেলাটিতেও এম, সি, সি দলের পরাজয় সুনিশ্চিত। অষ্ট্রেলিয়ার রাণ সংখ্যা দেখে যদি এম, সি, সি দল একটু হতাশ হয়ে পড়ে তাহলে তাদের কোন দোষ দেওয়া যায় না।

কোলকাতায় প্রথম আন্তর্জ্জাতিক ক্রিকেট খেলা

গত ২২শে এবং ২৩শে নভেম্বর টালা পার্কে বেঙ্গল জিমখানা দলের সঙ্গে ইউরোপীয়ান স্কুল দলের'—একটি দুইদিনব্যাপী ক্রিকেট খেলা হয়ে গিয়েছে। কলিকাতায় এটি একটি আকর্ষণীয় এবং প্রতিনিধিমূলক খেলা বলা যেতে পারে। বেঙ্গল জিমখানা এক ইনিংস এবং ৬৪ রাণে জয়লাভ করে। জিমখানা দলে এক ইনিংসে ২৩২ রাণ করেন। তার মধ্যে আমান করেন ৪৪ রাণ, এ, দেব ২৭ রাণ, এবং কে, বসু ২৯ রাণ। ইউরোপীয়ান স্কুলদলের প্রথম ইনিংসে ৮৪ রাণ হাওয়ায় তাদের 'ফলো অন্' করতে হয় এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৪ রাণ করে। এই খেলাতে জিমখানা দলের কমল ভট্টাচার্য্য এবং জে, এন ব্যানার্জ্জী প্রশংসনীয় বল করিয়াছিলেন। এরা দুজন যথাক্রমে ৪৫ রাণ এবং ৫৯ রাণ দিয়ে প্রত্যেকে ৯টি উইকেট নিয়েছিলেন।

৺বিজয় দাস ভাদুড়ী

বিখ্যাত বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় বিজয়দাস ভাদুড়ী গত শনিবার সকালে তাঁর শ্যামবাজারের বাড়ীতে মারা গিয়েছেন। তিনি প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে টাইফয়েড রোগে ভুগছিলেন মৃত্যুর সময় তাঁর ৫৭ বছর বয়স হয়েছিল। প্রায় দুবছর পূর্ব্বে তাঁর কনিষ্ঠ ভাই শিবদাস ভাদুড়ী মারা যান। আজ মোহনবাগানের ক্লাবের যে যশ এবং গৌরব তার জন্য শিবদাস এবং বিজয়দাস অনেকাংশে দায়ী। চিরস্মরণীয় ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব, আই, এফ, এ শীল্ড জয়লাভ ক'রে ভারতীয়দের গৌরব বাড়িয়েছিলেন। সেই ১৯১১ সালে শিবদাস এবং বিজয়দাস মোহনবাগান

ক্লাবের পক্ষে খেলেছিলেন। ফুটবল খেলা যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা প্রায় সকলেই ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম জানেন। যদিও অনেকের ভাগ্যে এই দুই ভাইয়ের খেলা দেখার সৌভাগ্য হয় নি তাহলেও তাঁদের চাতুর্য্য-পূর্ণ খেলার নিপুণতার কথা সকলেই জানেন। বিজয়বাবু জীবনের শেষদিন অবধি মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন। তিনি অনেক ছোট ক্লাবের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেদিনও যখন লেখকের সহিত বিজয় বাবুর কোন ফুটবল মাঠে দেখা হয়েছিল তখন তিনি মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল খেলার উন্নতির কথা আলোচনা করেছেন। তখন কে জানত যে এই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা।

কুস্তি প্রতিযোগিতা

গত রবিবার বেলা ৪টার সময় মিঃ মার্টিনের বক্সিং ষ্টেডিয়ামে একটি কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। এই প্রতিযোগিতাটি বাঙ্গালাদেশ এবং বিহারের হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন নির্দ্ধারণ করবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতাটির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন 'এড্‌মণ্ড ক্রেমার' এবং 'বংশী সিং'। ক্রেমার 'জারমান্ লায়ন' নামে খ্যাত এবং বংশী সিং 'বেঙ্গল টাইগার' নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রতিযোগিতার সময় মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধান বিচারকের কার্য্য করেছিলেন। প্রায় দশ হাজার লোক এই কুস্তি দেখবার জন্য সমবেত হয়েছিল তবে তারমধ্যে অধিকাংশই বেহারী। ষ্টেডিয়ামের বাইরে চৌরঙ্গীর উপর এত জন সমাগম হয়েছিল যে কিছুক্ষণের জন্য গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল। কুস্তি আরম্ভ হবার আগে 'ঘোষেস কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনের' মেম্বার সত্য মজুমদার, রমেন বসু এবং মণি রায় নানারকম শারীরিক ব্যায়াম দেখান। তার ভিতর মিঃ মণি রায়ের ব্যায়াম প্রদর্শনই সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছিল। ক্রেমার এবং বংশী সিংএর প্রধান কুস্তি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার আগে এবং পরে আরও সাতটি সাধারণ কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। প্রথমে ফজুল দিনের সঙ্গে আব্দুল রসিদের একটি প্রতিযোগিতা হয়। যদিও ১৫মিনিট হবার কথা ছিল কিন্তু ২মিঃ ৫৫সেকেণ্ডের ভিতর ফজুল দিন রসিদকে হারিয়ে দেয়। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতাটি হয় আনওর আলি খাঁর সঙ্গে সেখ আবদুল্লার। ১৭মিনিট লড়বার পর সমান সমান হয়ে শেষ হয়। তৃতীয়টি হয় মাস্‌প্রিকা পণ্ডিতের সঙ্গে আরনণ্ড করেস (ইতালী)। পণ্ডিত বেশ ভাল কুস্তিগীর বলে মনে হল। পণ্ডিত দুমিনিটের ভেতর আরনল্ডকে দিল হারিয়ে। কিন্তু আরনল্ড চিৎ হয়ে মাটিতে না পড়ে কুস্তির জায়গা ঘেরা দড়ির উপর পড়ায় অনেকের মনে তার হার সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। রেফারী সেই জন্য আবার লড়তে বলেন। এবারও এক মিনিটের ভিতর আরনল্ড দড়ির উপর চিৎ হ'য়ে পড়ে এবং হেরে যায়। তারপর ক্রেমার এবং বংশী সিংএর ২০মিনিট ব্যাপী কুস্তি আরম্ভ হয়। বংশী সিং চেহারায় এবং ওজনে ক্রেমারের চেয়ে বেশী থাকায় কুস্তিটি বেশী জমতে পারছিল না। এদের দুজনেরই কুস্তি লড়বার সময় কোন রকম বিশেষ প্যাঁচ দেখা গেল না। এই কুস্তির বিশেষত্ব দেখলুম যে ক্রেমার কেবল হাঁটুর উপর এসে পড়ছিল এবং বংশী সিং পেছন থেকে তার নেংটীর ভিতর হাতদিয়ে ধরে টানছিল। ক্রেমারকে বংশী সিংএর টানের জোরে দড়ি ছিঁড়ে যাওয়াতে তিনবার নেংট বদলাতে হয়েছিল। ১৮ মিনিট লড়বার পর ক্রেমার এবং বংশী সিং পড়তে পড়তে প্রায় চার ফুট নীচে পড়ে যায়। ক্রেমারের উপর বংশী সিং পড়ায় তাহার কিছু হয় নি কিন্তু ক্রেমারের ডান হাত জখম হইয়া যায়। কিন্তু ক্রেমার আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্য হাতে অসহ্য যন্ত্রনা সত্বেও বাকি দুমিনিট কুস্তি করে এবং শেষ অবধি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। প্রতিযোগিতার পরই ক্রেমারকে হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। পঞ্চম প্রতিযোগিতাটি হয় জালিম শিখের সঙ্গে ছুনিয়া সিংয়ের। ছুনিয়া সিং চার মিনিটের ভেতর জালিমকে হারিয়ে দেয়। তারপরের কুস্তিটি হয় আবদুল হক বনাম মহম্মদ খালিল। হক্ ২০ সেকেণ্ডের ভেতর খালিলকে হারিয়ে দেয়। সপ্তম

(আধুনিক জাইস-আইকন্ আরনীম্যান ৭ শব্দযন্ত্র সম্বলিত)

টেলিফোন : বড়বাজার ১৫১৫] [১৩৮-১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার

শনিবার, ২৮শে নভেম্বর ১৯৩৬ প্রথমারম্ভ

শরৎচন্দ্রের চিরমধুর

পণ্ডিতমশাই

পপুলার পিক্‌চার্সের প্রযোজনায় কালী ফিল্মসে গৃহীত

ভূমিকায়		পরিচালক
তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী	প	সতু সেন
যোগেশ চৌধুরী	ণ্ডি	প্রধান যন্ত্র-শিল্পী
মনোরঞ্জন ভট্টা		মধু শীল
রবি রায়		শব্দযন্ত্রী
রতীন বন্দ্যো	ত	জগদীশ বসু
চৈতন রায়		চিত্রশিল্পী
প্রভা		সুরেশ দাস
রেণুকা ঘোষ	ম	দৃশ্যপট
সুশীলা		পরেশ বসু
সাগরিকা		সম্পাদনা
শান্তি গুপ্তা	শা	বৈদ্যনাথ মুখো
(রাধা ফিল্মের সৌজন্যে)		সঙ্গীত
	ই	কমল দাস গুপ্ত

শনি, রবি ও ছুটীর দিন
৩, ৬-১৫ ও ৯৷৽টায়

অন্যান্য দিবস
৬-১৫ ও ৯৷৽টায়

এখন হইতে অগ্রিম প্রবেশ-পত্র পাইবেন

[বিলাসী]

কালী ফিল্মস্

গুণময় বাঁড়ুয্যের "পরভৃতিকা"র শুটিং জোর চলেছে এবং ছবি আধাআধি শেষও হ'য়েছে।

সুনীল মজুমদারের "মুক্তিস্নানে"-র শুটিং সবে সুরু হ'য়েছে। "মুক্তিস্নানে"-র অংশ বণ্টনের দিকে সুনীলবাবু এবার বেশ নতুনত্ব দেখাবার চেষ্টা কোরছেন। আসচে হপ্তায় এই ছবির সম্পূর্ণ চরিত্র-লিপি আমরা প্রকাশ কোরব।

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী "বামনাবতার" ও "হারানিধি" দু'খানা ছবি এক সঙ্গে তুলবেন—এ খবর পূর্ব্বেই আমরা জানিয়েছি। চক্রবর্ত্তী মশাই এখন ছবি দু'খানার আনুষঙ্গিক কাজ ও চরিত্র নির্ব্বাচনে ব্যস্ত আছেন।

জ্যোতিষ মুখুয্যে "খনা" তুলবেন একরকম ঠিক হ'য়েছে। তাই তিনি সম্প্রতি এর চিত্রনাট্য তৈরির জন্যে মনোনিবেশ কোরেছেন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

মধু বোসের পরিচালনায় এদের নৃত্য-গীতমুখর "আলিবাবা" প্রায় শেষ হ'তে চলল। সম্ভ্রান্ত বংশীয় নরনারী অভিনীত এই ছবিখানা বাঙ্লার চিত্রশিল্পের প্রাণে যে নব-উন্মাদনার সৃষ্টি কোরবে—এ ভবিষ্যদ্বাণী আজ নিঃসঙ্কোচে সবাই কোরতে পারে।

রাধা ফিল্ম

এদের "বিষবৃক্ষ" আস্চে বড়দিনে 'রূপবাণী'-র রূপোলি পরদা ঝলসে তুলবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী, হরিপদের কলাকুশলী প্রযোজনা ও শক্তিশালী অভিনেতৃ সম্মেলনে ছবিখানা যে বড়দিনের বাজারে রসিকজনের মনোমন্দিরে আনন্দের রেওয়াজ তুলবে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

দেবদত্ত ফিল্মস্

তড়িৎ বসু "ইন্দিরা"র আনুষঙ্গিক কাজ প্রায় শেষ কোরে ফেলেছেন। চরিত্র-নির্ব্বাচনও প্রায় শেষ হ'য়েছে। শোনা যাচ্ছে, ছবি বিশ্বাস ও জ্যোৎস্না গুপ্তা সাজছেন এই ছবির নায়ক-নায়িকা।

পপুলার পিক্চার্স

এদের "পণ্ডিত মশাই" এই শনিবার থেকে "শ্রী" চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। আমরা ছবির কিয়দংশ দেখে বুঝেছি যে, ছবিখানা সকলের মনের ওপরই দস্তুরমত রেখাপাত কোরবে।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস্

এই প্রতিষ্ঠান "রামকান্ত" শেষ কোরে "ডক্টর ডম্বি" নামে একখানা তিন রীলের হাসির ছবি অমর চৌধুরীর পরিচালনায় তুলছেন।

দেবকী বসু সম্মানিত

মাননীয় মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর উপস্থিতে "দি পিক্চারগোয়ার্স এসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল" "সোনার সংসার" চিত্রের পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসুকে একখানা পদক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন।
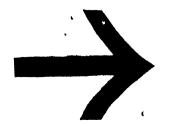
প্রতিযোগিতাটি হয় সালদিন গোরির সঙ্গে আলেকজেণ্ডারের। দুজনেই বেশ কৌশলী কুস্তিগীর এবং এই কুস্তিটি বেশ জমেছিল। ১০মিনিট হবার ঠিক থাকলেও ৮মিনিটে আলেকজেণ্ডার জিতে যান। শেষ কুস্তিটি হয় সম্পত্ পেপিয়ানের সঙ্গে চন্দর দীপ সিংএর। দুজনেই সমকক্ষ কুস্তিগীর বলে মনে হল। দশ মিনিট লড়বার পর সম্মান দুজনে ভাগ করে নেয়।

অলকার চিঠি

পলাশপুর। বর্দ্ধমান
২২শে নভেম্বর ১৯৩৬।

ভাই বিজয়া দি'—

চিনবে কীনা জানিনা। আমি অলকা।

আমার বাবা বেঁচে থাকতে একদিন। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হোয়েছিল। আমি গরীবের মেয়ে, কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় কোরতে তোমার বাধে নি। শেষে বন্ধুত্বের বন্ধন আমাদের ব্যবধান ভুলিয়ে দিলে! এই গরীব বোনটিকে একদিন তুমি মনে স্থান দিয়েছিলে। তাই আজ সাহস কোরে এ চিঠিখানা লিখছি।

তোমার জীবনে কত ঝড়-ঝাপ্টাই না গেল! শেষে, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায়, তুমি তোমার বাঞ্ছিতকেই পেলে।

তুমি শুনে আশ্চর্য্য হ'বে তোমার অলকারও বিয়ে হোয়ে গেল। এবং গরীবের ঘরে নয়, রাজ-রাজড়ার ঘরেই। আজ আমি স্যার শঙ্করনাথ রায়ের নাতনী। এও খেয়ালী বিধাতার এক আশ্চর্য্য লীলা।...নয় কী? নইলে, ক'দিন আগে, কেই বা জানতো, তুমি বিলাস বাবুর অঙ্কলক্ষ্মী না হোয়ে, শেষে নরেন বাবুকেই স্বামীত্বে বরণ কোরবে?

বিয়ের পর ফুল-শয্যা! সুখ-নিশি-প্রভাত হোল।

সকালে জানালা খুলে দেখি, বাতায়ন-পথে একখানা খোলা-চিঠি। পড়ে বুঝলুম, বিয়ের পর সেই তোমার প্রথম চিঠি—নরেন বাবুকে লেখা।

কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই—গাঁটছড়া যার এখনও খোলে নি, তোরঙ্গ-প্যাঁটরার মত স্বামী যার অঞ্চল-বন্দী, তার রাত না পোহাতেই, সাত তাড়াতাড়ি এ নভেলীপনা কেন? তুমি কলেজে পড়া মেয়ে, আমি মুখ্যু! বাবার কাছে যা একটু আধটু মাতৃভাষা শিখেছি। অত শত জানিনা। কিন্তু আমাদের পাড়া-গাঁয়ের সমাজে একে বলে বেহায়াপনা!

বিচ্ছেদ না ঘটলে চিঠি লেখার মানে হয় না।

বোধকরি তোমার এ চিঠিখানা বাথ-রুমে বসে লেখা। এত নির্লজ্জ ত' তুমি ছিলে না। চিঠিখানা শুধু স্বামীর হাতে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হওনি। ছাপাখানার দৌলতে —বাতায়নে, বাতায়নে তার প্রচার! ধন্যি মেয়ে, বিজয়া দি'!

যেদিন ঐ ফুটো মাইক্রোস্কোপটা কিনেছিলে, সেদিনই জানি মাথাতেও তোমার মস্ত ফুটো!

রাসবিহারী দাদা আর বিলাস কাকা আজ পাশে নেই জানি। কিন্তু নরেনবাবু ত' আছেন! বাড়ীর হাল চাল বুঝি আজও বদলায় নি?

দাঁড়ী-পাল্লাটার উপর বড্ড রাগ নয়?

তুমি লিখেচ, "প্রকৃত সৌন্দর্য্য দাঁড়ী-পাল্লার ওজনে মেপে নেওয়া যায় না"। কথাটা সত্যি! কিন্তু বিয়ের পর আয়নায় মুখ খানা কী একবার দেখেছ? শরৎদা' বিজয়াকে পাঠিয়েছিলেন সালঙ্কারা কোরে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের দ্যুতিতে যার দেহমন একদিন টলমল কোরতো—ব্রাহ্ম গার্ল্স ছাড়বার পরই তার সে দ্যুতি নষ্ট হোয়েচে। সত্যি, সেদিনকার সে সৌন্দর্য্য দাঁড়ী-পাল্লায় ওজন করা যেত না।

কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আজ তোমার কী আছে বিজয়া!

এক আউন্স জাপানী সিল্কে মোড়া, ক' খানি হাড়ের টুকরো।...কেমন এইত'? বলি, দাঁড়ি-পাল্লায় তা' ওজন করা যাবে না কেন?

তুমি হয় ত' আশ্চর্য্য হচ্ছ এই ভেবে, যে আমি এতটা প্রগল্‌ভা হলুম কী কোরে!

কিন্তু তুমি যে সৌন্দর্য্য নিয়ে খোঁটা দিয়েছ ভাই!

যার জীবন কেটেচে অভাবে-অনশনে, একটা জরাজীর্ণ বস্তীতে—তুমি বোলবে তার এত দেমাক কেন?

কিন্তু আমার স্বামী বলেন—পাঁকের বুকেই সত্যিকারের পদ্মফুল ফোটে!

তাকে চিনতে হয়। কিন্তু সব লোকের ত' সে চোখ থাকে না ভাই।

আর যাই কর, গোলাপের সঙ্গে তুলনা কোরে আর লোক হাসিওনা বিজয়া।

ফুল ফোটে, ফুল ঝরে! জীবনের এই ত' ধারা। সে কুঁড়ি ফুটেছিল অনেক কাল আগে, শরতের মানস-লোকে, দলগুলি তা'র বহুকাল ঝরে গেছে—পড়ে আছে একরাশ কাঁটা। কালের তুলা-দণ্ডে, আজ তার দর যাচাই কোরতেও লজ্জা বোধ হয়।

অলকা বস্তীতে মানুষ হোয়েছে। আর যাই হোক, পিসপোর্ড বা তুলোভরা stunt গুলো তার ধাতে সইবে না! ওটা তোমাদের সভ্য-সমাজের জন্যই থাক ভাই।

—স্বামী আমার একটু কাব্য বাতিক-গ্রস্ত লোক। তাই উত্তরার রূপ-মহলে আজও আমাদের দিশি প্রথায় 'মধু চন্দ্র' চলচে। একদিন নরেন বাবুকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এসোনা ভাই! দেখবে তোমার অলকা একটুও বদলায় নি।

হয়ত' তুমিও আমায় বলবে, এও আর এক বেহায়া। সবাই বলে—পোড়ার মুখীর কী রূপ!

কিন্তু আমি ভাবি, ভগবান, রূপ ও সৌভাগ্য দুই যদি দিলে—তবে হিংসুটিদের এত চোখ টাটায় কেন?

যে কোন পাল্লায় আমার রূপ তুমি মেপো বিজয়া! আমি নালিশ কোরবো না। কিন্তু দুনিয়া শুদ্ধ লোক যে সৌন্দর্য্যের পাদ-মূলে আত্ম নিবেদন কোরে ধন্য হোল, —তার সত্যকারের মূল্য টুকু দিতে শিখো।

আজ তবে আসি ভাই। নরেন বাবুকে আমার নমস্কার দিও। ইতি

তোমারই—অলকা

শ্রীদুর্ব্বাসা

অনুসন্ধিৎসু ডাকের জের :— গত বারের পত্রিকায় অনুসন্ধিৎসু ডাকের একটি অবস্থা নিয়ে আলোচিত হয়েছে, এবার আর একটি অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা হবে। যখন কোন খেলোয়াড় তাঁর খেঁড়ীর কথিত রঙে সাহায্য না করে স্বাধীনভাবে অন্য রঙে ডাক দেন এবং সে সময় যদি উক্ত ক্রীড়কদ্বয়ের মধ্যে একজন কোন রঙে চারিটি বা তদুর্দ্ধ সংখ্যার ডাক দেন এবং সেই ডাকের নিম্ন ডাক যদি শক্তিব্যঞ্জক ডাকের পর্য্যায়ভুক্ত হয়, তবে ঐ চারিটী বা তদূর্দ্ধ সংখ্যার ডাকটি হল অনুসন্ধিৎসু ডাক ও উভয় খেঁড়ীর মধ্যে সর্ব্বশেষে যে রঙটি বলা হয়েছে সেটি হবে তুরূপ বা রঙ। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

(১) 'উ'—একটি রুহিতন।—চারটি চিঁড়িতন।

'দ'—একটি ইস্কাবন।

এখানে এই চারটি চিঁড়িতনের ডাকটি হল অনুসন্ধিৎসু ডাক, কেন না এখানে যদি তিনটি চিঁড়িতন ডাকা হত তা'হলে সেটি হত শক্তিব্যঞ্জক ডাক; আর রঙ হল ইস্কাবন কারণ ইস্কাবন রঙটিই উভয় খেঁড়ীর মধ্যে শেষবারে ডাকা হয়েছে।

(২) 'উ'—একটি ইস্কাবন।—চারিটি চিঁড়িতন।

'দ'—দুইটি রুহিতন।

এখানেও এই চারিটি চিঁড়িতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক, আর রঙ হল রুহিতন। যদি তিনটি চিঁড়িতন ডাকা যেত তাহলেই হাতের যথেষ্ট শক্তির ঘোষণা করত।

(৩) 'উ'—একটি চিঁড়িতন।—দুইটি চিঁড়িতন।—পাঁচটি রুহিতন।

'দ'—একটি ইস্কাবন।—দুইটি হরতন।

এই পাঁচটি রুহিতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক এবং হরতন হল রঙ, কারণ ঐ রঙটি উভয় খেঁড়ীর মধ্যে শেষবারে ডাকা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যদি চারটি রুহিতনের ডাক হত তাহলে সেটি শক্তিব্যঞ্জক অর্থাৎ 'Suit forcing' ডাক হত।

(৪) 'উ'—দুইটি ইস্কাবন।—চারটি চিঁড়িতন।

'দ'—দুইটি কেরাই।

তিনটি চিঁড়িতনের ডাক শক্তিব্যঞ্জক ডাক বলে চারটি চিঁড়িতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক এবং উভয় খেঁড়ীর মধ্যে মাত্র ইস্কাবন রঙই ডাকা হয়েছে, অতএব ইস্কাবন হল তুরূপ।

(৫) 'উ'—দুইটি ইস্কাবন।—তিনটি ইস্কাবন।—পাঁচটি চিঁড়িতন।

'দ'—তিনটি রুহিতন।—তিনটি কেরাই।

এ ক্ষেত্রেও চারটি চিঁড়িতনের ডাক হল শক্তিব্যঞ্জক ডাক, এজন্য পাঁচটি চিঁড়িতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক এবং সর্ব্বশেষে উভয় খেঁড়ীর মধ্যে ইস্কাবন ডাক হয়েছে বলে ইস্কাবন হল তুরূপ। ইস্কাবন রঙে দ্বিতীয়বার ডাক দেবার প্রধান কারণ হল এই যে ইস্কাবন রঙটিকে তুরূপ করতে হবে। এখন মনে করুণ 'উ' যদি পুনরায় ইস্কাবন না ডেকে একেবারেই অনুসন্ধিৎসু ডাক দিতেন তাহলে ইস্কাবনের পরিবর্ত্তে সে ক্ষেত্রে তুরূপের রঙ হত রুহিতন, কেন না সে ক্ষেত্রে উভয় খেঁড়ীর মধ্যে কথিত শেষ রঙ হত রুহিতন—ইস্কাবন নয়। ইস্কাবন রঙটিকে তুরূপ করার জন্য 'উ' ঐ রঙে পুনর্ব্বার ডাক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ব্রীজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর :—'Call Out of Rotation' সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হল। ব্রীজ খেলার সাধারণ নিয়মানুযায়ী যাঁর ডাক দেবার কথা তিনি না ডেকে যদি অপর কেহ ডাক দেন তা'হলে সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ডাক চলবে। যথা,

(১) যাঁর ডাক দেবার কথা তিনি না ডেকে যদি অপর কেহ ডাক দেন এবং তাঁর পরবর্ত্তী ব্যক্তি যদি সেই ডাকের পর ডাক দেন তা'হলে ডাক যে ভাবে চলছে সেই ভাবে পর পর চলবে।

(২) যাঁর ডাক দেবার কথা তিনি না ডেকে যদি অপর কেহ 'পাশ' বলেন তা'হলে যাঁর ডাকবার কথা তাঁর কাছ থেকেই ডাক আরম্ভ হবে এবং যিনি পূর্ব্বে পাশ বলেছেন তাঁর ডাকের সময় তাঁকে পাশই বলতে হবে।

(৩) যাঁর ডাকবার কথা তিনি না ডেকে যদি অপর কেহ কোন রঙের বা কেরাই-এ ডাক দেন, তাহলে যাঁর ডাকবার কথা তাঁর কাছ থেকেই ডাক আরম্ভ হবে, তবে যিনি ডাক দিয়েছিলেন তাঁর খেঁড়ীর ডাকের সময় এলে তাঁকে (খেঁড়ীকে) পাশ দিতে হবে।

সাহিত্য ও শিক্ষা

শ্রীমনোজেন্দ্র কুমার রায়

সাহিত্য জগতে আজকাল দলাদলি সুরু হইয়াছে। যাহা নিছক ছিল রসের জিনিষ তার মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে সাহিত্য বিষয়-বস্তুর জন্য বাদ-প্রতিবাদ। সাহিত্য জাতীয় শিক্ষার মুখ্য মন্ত্র, তাই চিন্তাশীল অনেকেরই মতে সাহিত্য হইবে শিক্ষার বাহন। তাঁহাদের মতে নোংরামি সাহিত্য নয়—সাহিত্য আদর্শ, সাহিত্য মহিমা-মণ্ডিত। কিন্তু এই বাদ প্রতিবাদের প্রধান কারণ, সাহিত্য জগতে নোংরামি ঢুকিয়াছে এবং এই হেতুই আধুনিক সাহিত্য লোকের কুশিক্ষার কারণ।

সাহিত্যের নোংরামির কারণ কিন্তু বিদেশী সাহিত্যের সংমিশ্রণ। যাহা হিন্দুদের আদর্শ তাহা বিদেশী সাহিত্যের আদর্শ নয়। তাই বিদেশী প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া সাহিত্যের গতিও ধরিয়াছে ভিন্ন প্রকার। রামায়ণ, মহাভারতের আদর্শ এখনও সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকিলেও জীবন যাত্রা পরিচালনে তাহাদের প্রভাব হইয়াছে ক্ষুণ্ণ—সাহিত্য জগতে তার প্রভাব অচল। অথচ, এই বিদেশী ভাব আদান-প্রদান বন্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাই ক্রমে সাহিত্যে নোংরামিও নানা প্রকার বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সচল হইয়া আসিতেছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মোঁপাসা, বোকাসিও, হ্যামসুন, হার্ডি, বার্ণাড্ শ প্রভৃতিদের চিন্তা ও ভঙ্গির ধারা অলক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের গতি প্রভাবান্বিত করে। শ' অত্যন্ত আদর্শ বিদ্বেষী, আর রাশিয়ান লেখকদের মধ্যে সাহিত্য-ধারা সমস্ত বলশেভিক্ প্রকৃতির রূপ। মোঁপাসা ও বোকাসিওর সাহিত্য, যৌন মিলনের স্বচ্ছ, সুন্দর আনন্দ—তাহাতে আদর্শতার স্থান নাই—শুধু আনন্দের ধারা, সৌন্দর্য্যের উপভোগ।

বাংলা সাহিত্যও এখন এই বিমল আনন্দের ধারাকে সাহিত্যের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে—অথবা অলক্ষিতে ইহার ধারা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে আর তাই আদর্শ নেই, সাহিত্যও তাই শিক্ষার বাহন নয়।

অথচ সাহিত্যে আদর্শবাদ কথাটা অত্যন্ত ভূয়ো, নিতান্ত অর্থহীন। 'আদর্শ' শব্দটার উৎপত্তি ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের একটা মত হইতে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন 'সংযম শিক্ষা'। কিন্তু বিষয়টার একটু মজা এই যে এমন কি এই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের আধিপত্যের সময়েও শৃঙ্গার রস ও আদিরস তখনকার সাহিত্যের অঙ্গ ছিল। তাহার কারণ সাহিত্য সে কালেও শিক্ষার বাহন ছিল না, ছিল শুধু রসের ও আনন্দের ক্ষেত্র।

এই আদর্শবাদ কথাটার উৎপত্তি মোটা-মুটি, যদি অল্পদিনের কথা ধরা যায়, তবে বলা যাইতে পারে বঙ্কিম সাহিত্যের কিছু পূর্ব্বে। কারণ, এমন কি ভারতচন্দ্রের কবিতায়ও আমরা 'আদিরসের কুৎসিত ও অতি কদর্য্য চিত্র মাকাল ফলের ন্যায় 'দিক শোভমান' দেখিতে পাই। তৎপরে 'মাইকেল মধুসূদনের কাব্যাদিও কোনও সর্ব্বজন হিতকর মহৎ উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করেনা'। কবি হেমচন্দ্রের গ্রন্থে সর্ব্বরসের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের অভাব সম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান। 'তদুপরি তাঁহার গ্রন্থাদিও কোনও মহৎ উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করে না।'

কেবল বঙ্কিম বাবুর সময় হইতে আমরা এই আদর্শবাদ বা সাহিত্য ও শিক্ষা প্রভৃতি কিছুর আভাস পাই। কিন্তু এই আদর্শবাদ দেখাইবার জন্য তাঁহাকে কতকগুলি অস্বাভাবিক চরিত্র কল্পনা করিতে হইয়াছে—যেমন 'রোহিণীর চরিত্র, সমাজের পঙ্কিল চিত্র, ভ্রমর চিত্র সমাজে অহিতজনক কল্পিত অস্বাভাবিক চিত্র।' এই আদর্শবাদের মোটামুটি কারণ ধরা যাইতে পারে—বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা। অথচ মোটামুটি দেখিতে গেলেও তাঁহার সাহিত্য, 'হিতকর কোনও বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশ করে না, কোন গ্রন্থেরই তাহা প্রধান লক্ষ্য নয়।' তাহা ছাড়া এমন কি এই একনিষ্ঠতারও বিরুদ্ধে প্রশ্ন শুনিতে পাই, তাঁহার নায়িকার মুখে নানা স্থানে। প্রতাপ থাকিলে নায়িকার সহজজাত বৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, তাই প্রতাপকে পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইল। একনিষ্ঠার চরিত্র আঁকিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু দেখাইলেন একনিষ্ঠতা মনের সহজ বৃত্তি নয়, কিন্তু এই একনিষ্ঠতাকে জোর করিয়া শ্রেষ্ঠ দেখান'র জন্য তিনি আঁকিলেন অসতের ও অসতীর করুণ উপসংহার।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই যে আদর্শবাদের প্রচেষ্টার কারণ সম্যক আলোচনা আমরা সময়ান্তরে করিব, কিন্তু এখানে শুধু এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তখন ক্রীশ্চান্ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যে শ্রেয়ঃ ও আদর্শ ইহাই প্রতিপন্ন করা তখনকার ছিল এক রকম প্রথা বা রীতি।

এ সমস্ত ছাড়াও যদি প্রশ্ন করা যায়—সাহিত্যের নোংরামি কি, তবে তার উত্তরে বলা যাইতে পারে 'যৌন মিলনের চিত্র অঙ্কন।' অনেকের মতে যৌন

প্রসঙ্গ

গল্প-দাদা স্মৃতি সন্ধ্যা

গল্প-দাদা পরলোক গমন করেছেন, কিন্তু তাঁর স্মৃতি আজও রেডিও-শ্রোতার মনে আঁকা রয়েছে—শিশু মহলে তাঁর সরস গল্প-ধারা আমাদের মনে চিরদিনই জাগরূক থাকবে—বিশেষতঃ রেডিওর জন্যে তাঁর প্রাণপাত পরিশ্রম—তা সহজে ভুলে যাবার নয়। গত ১৭ই নভেম্বর, মঙ্গলবার দিন ছিল তাঁর মৃত্যু-তিথি। সেই উপলক্ষ্যে রেডিও কর্তৃপক্ষগণ ঐ দিন সন্ধ্যায় তাঁর স্মৃতি সন্ধ্যা উৎসব অনুষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর পরিচালনায় এই স্মৃতি-সন্ধ্যা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কিন্তু সেদিনকার প্রোগ্রাম শুনে আমরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছি। যত বাজে আর্টিষ্ট এবং বক্তা দিয়ে সেদিনকার সান্ধ্য-স্মৃতি অনুষ্ঠানকে এরূপ হাস্যকর করে তুলবার অর্থ আমরা খুঁজে পাইনে। দেশে গল্প-দাদুর ভক্ত ভালো আর্টিষ্ট কী অভাব—না তাঁর 'গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবের অভাব? স্মৃতি-সন্ধ্যাকে কতকগুলো বাজে আর্টিষ্ট দিয়ে প্রহসনে ভরিয়ে না তুলে' একটা কিছু উপভোগ্য ভালো আয়োজন করা কী রেডিও কর্তৃপক্ষের নিকট এতই দুরূহ।

আমরা সেদিনকার 'স্মৃতি-সন্ধ্যা'র প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করছি—তা হলেই বোঝা যাবে সেদিনকার অনুষ্ঠান কতখানি ফাঁকি দিয়ে সারা হয়েছে।

অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকায় প্রথমে অর্কেষ্ট্রা বাজালেন বালীগঞ্জ প্রেস অর্কেষ্ট্রা পার্টি। এদের বাজনা ইতিপূর্ব্বে আমরা শুনি নি। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও মোটের ওপর ভালোই হয়েছে—কিন্তু সঙ্গে যিনি বাঁশি বাজাচ্ছিলেন তিনি বোধহয় সবে বাঁশিতে ফুঁ দিতে শিখেছেন। প্রথমেই স্কেল মেলাতে পারেন নি—ফলে বাঁশির সুর চলছিল যেন কোন ভালো গানের সঙ্গে বেতালা শিষের আওয়াজ! একে বাদ দিয়ে চললেই অর্কেষ্ট্রাটি অমৃতো ভালো।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র বক্তৃতা দিলেন গল্প-দাদু সম্বন্ধে। অল্প কথায় এর বক্তব্য মন্দ হয় নি—personal কথাগুলি একটু কমালে ভালো হত।

পরের গানখানি ভালোই গাওয়া হয়েছিল।

মেজদিদির বক্তৃতার ভেতর আমরা তাঁর নাটকীয় সজল কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারি নি।

পরের আবৃত্তি একেবারে অচল। কোনদিন আবৃত্তি করেছেন বলে বোধ হলনা।

পুলিন বাবুর সামরিকী চলন সই।

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেন গল্প-দাদু রচিত একখানি গান—অতি বিশ্রি—রচনাকেই হত্যা করা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষের আবৃত্তি অচল।

তারপরে যিনি বাঁশি বাজালেন—তিনি আরও কিছুদিন সাধনা করুন। মাঝে মাঝে অতি বিশ্রী কর্ণ-পীড়াদায়ক বেসুরা আওয়াজ বার হচ্ছিল। তাল জ্ঞানও কম—দম একেবারেই নেই।

শ্রীনির্ম্মল মিত্রের গান ভালোই হয়েছে।

পরের গানখানি গল্প-দাদা সম্বন্ধে রচিত—যেমনি বাজে লেখা তেমনি গায়ক!

এরপর কুমার হিরণ্য কুমার মিত্রের গল্প-দাদা সম্বন্ধে লেখা দুলাইন পাঠ করা হল।

মেজদি ধন্যবাদ জানালেন পরিচালিকাকে।

শ্রীদেবাশীষ সেনগুপ্ত গল্প-দাদার কবিতা আবৃত্তি করলেন—মন্দ হয় নি।

রেডিও কর্তৃপক্ষকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এইরকম নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোগ্রাম কী 'গল্প দাদা'র স্মৃতি রক্ষার্থে যথেষ্ট? আমরা আশা করি ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ এই ধরণের উদাসীনতা হতে বিরত হবেন।

শ্রীপ্রতিমা রায়

মিলনের চিত্র অঙ্কনে সমাজে চরিত্রগত বিশুদ্ধি ঘটিতে পারে, সেই জন্যে সাহিত্যে যৌন মিলনের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা প্রয়োজন।

কিন্তু এর বিরুদ্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক পর্ব্বে এই যৌন মিলনের নানা প্রকার পরিস্ফুরণ। এটা ভাল কি মন্দ বলার পূর্ব্বে একটা কথা মনে হয় 'Art follows life' লোকে আনন্দ পায় জীবনের অভিব্যক্তি করে সাহিত্যে। সংস্কারবদ্ধ জীবনে কিন্তু জীবনের এই নিগূঢ়তম অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে তখন আসে মামুলি কথায় গালাগালি। কিন্তু যদি এরূপ বলা যায় যে সাহিত্যে 'এরূপ হওয়া উচিৎ' তবে আর্টএর মর্য্যাদা হানি হয়। আর্ট মুক্ত, স্বাধীন, সুন্দর—যদি সমস্ত নোংরামী বাদ দিয়া সাহিত্যকে ইংরাজী সাহিত্যের Puritan যুগের মতন করা হয় তবে আর্ট হইবে বিকৃত ও অর্থহীন

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

বিনয়ী নাইট

কিছুকাল আগে এক অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্রলোক হলিউডে আসে বেড়াতে। সে-লোকের নাম তখন লোকে এমন করে শুনতে চায়নি। আজ কিন্তু তাকে সবাই ভাল-বাসে। সবাই আলোচনা করে আর বলে, হ্যাঁ, বিনয়ী বটে আর ফ্রেড্রিক হার্ডউইক। এখন অনেক আমেরিকান ছবিতে একে দেখতে পাওয়া যায়।

ষ্টুডিও দেখবার জন্যে বেড়াতে এসে হোল চরিত্রাভিনেতা। কত দাম্ভিক ইংরাজ আসে বেড়াতে আমেরিকায় আর হলিউড ষ্টুডিওতে—এসে মুগ্ধ হয়ে যায়। আর তারাই যখন দেশে থাকে তখন ভাবে বুঝি হলিউডটা অতি ক্ষুদ্র, ওদের দেশের ষ্টুডিওর কাছে কিছু নয়।

হার্ডউইক কিন্তু অন্যপ্রকারের। তার পক্ষে ভাবা যা সম্ভব হোত তার চেয়ে সে হলিউডকে অনেক বড় ভাবে। তাইতো সে বলেছে আমায় মিষ্টার হার্ডউইক বোলো, আর নয়। কাজেই হলিউড সহর তাকে সম্মান করলে।

হলিউডের আশ্রমবাসী

ওয়ালটার হাসটনকে সবাই চেনে। কাজের অবসরে সে থাকে লুকিয়ে, সাধারণ লোক চক্ষুর অন্তরালে।

ছবির কাজ যখন শেষ হয়ে যায়; হাসটন ফেরে তখন সেই পাহাড়ে, সান বেয়নারডিনোর ওপরে। অবসর অনেক, একখানা ছবিতে কাষ করার পর অবসর মেলে অনেকখানি; হাসটনের কাটে তখন এই পাহাড়ের ওপরে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ীতে।

জোয়ান ক্রফোর্ড

হাসটনের অত্যন্ত সখের বাড়ী। তাতে আছে সখের সব সরঞ্জাম। প্রকাণ্ড পুকুর তাতে কাটো সাঁতার; টেনিস কোর্ট, খেলো মনের সুখে; নয়নের তৃপ্তি বাগান, বেড়াও প্রাণ ভরে। সে যেন কবির কল্পনা।

ফ্রেডি বারথোলোমিউ

আরো আছে ছোট্ট একটি কারখানা; সেখানে চলে ছোটখাটো জিনিষ বানানো, আর হাসটনের খেয়াল অনুযায়ী নানান রকম আসবাব তৈরী করা।

নানান রকম আসবাবের জিনিষ তৈরী করা, হাসটনের চিরদিনের খেয়াল।

জোয়েল ম্যাক্রিয়া

হলিউডের আশ্রমবাসী অভিনেতা ওয়ালটার হাসটন একা নয় আরো আছে অনেকে। জোয়েল ম্যাক্রিয়া—সেও চায়না লোকজনের মাঝখানে থাকতে। পাহাড়ের ওপর হাজার একার জমীর মাঝখানে তার বাড়ী; সিমি ভ্যালির মুর পার্ক এর খুব কাছে। হলিউড থেকেও বেশী দূরে নয়, কয়েক মাইল হবে।

পুরাণো আমলের ক্যালিফোর্নিয়ার চাষাদের যেমন বাড়ীর ধরণ হোত ম্যাক্রিয়ার বাড়ী ঠিক সেই ধরণের তৈরী করা। সে বাড়ীতে টেলিফোন নেই। বন্ধুবান্ধবের অসঙ্গত আবদার শুনতে হয় না। পাঁচজনে বিরক্ত করে না। জোয়েল ম্যাক্রিয়ার দিন কাটে অবাধে, শান্তিতে।

ছবি শেষ হয়ে গেলে, ম্যাক্রিয়া আসে স্ত্রী, ছেলে পুলে নিয়ে। ছবির কাষ শেষ হওয়ার পর, এই সময়ে অবসরের আরাম নিরিবিলিতে উপভোগ করে।

আর খবর যদি কেউ নেহাৎ পাঠাতে চায় কিম্বা খুব জরুরী হয় তাহলে তাকে টেলিগ্রাম করতে হবে গ্রামের পোষ্ট অফিসে। সে পোষ্ট অফিস জোয়েল ম্যাক্রিয়া যেখানে থাকে সেখান থেকে চার মাইল দূর।

সাহসী জন বোলস

একদিন খেলা চলছিল দুজনে—জন বোলস আর উইলিয়াম লি ব্যারণ এ। এই উইলিয়াম রেডিও ষ্টুডিওর প্রোডাক্শন চিফ।

গল্ফ খেলা তখন সবে আরম্ভ হয়েছে। বল মারবার কায়দার কথা কইতে কইতে তারা যুদ্ধের গল্পে এসে পঁহুছিল,—কি ভাবে তারা যুদ্ধের কাজ করেছিল. আর খবর পাঠিয়েছিল।

জন বোলস্ ছিল যুদ্ধের গুপ্তচর আর উইলিয়াম লি ব্যারণ ছিল যুদ্ধের পত্র-প্রেরক, কাজেই তাদের মধ্যে এই সহজ আলোচনা উঠেছিল। বোলস্ আরম্ভ করলে এমন উত্তেজনা পূর্ণ যুদ্ধের গল্প যে উইলিয়াম মোহিত হয়ে গেল; বল্লে কাগজে লিখে ফেল জন, আমি এ গল্পের ছবি তুলব।

কাজেই বর্ত্তমানে বোলস্-এর কাজ হচ্ছে রাতে অনেকক্ষণ জেগে বসে থাকা এবং স্মৃতিশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মনের পথে অনেক দূর পেছিয়ে যাওয়া।

এ গল্প তৈরী হবে, আমরা ছবিতে দেখব; কেমন করে তৈরী হয়েছিল একথা কেউই জানব না।

ক্ষুদ্রিজনের আহার

ষ্টুয়ার্ট আরউইন কাজ করছিল বেটি ফারনেসের সঙ্গে। ষ্টুয়ার্ট এর ভারী সখ ফারনেসকে খাওয়ায়। তাই একদিন নিমন্ত্রণ করলে ষ্টুডিওতে খাবার ঘরে। দুপুর বেলা সে খাবে এবং সঙ্গে যাকে খুসী নিয়ে আসবে, এই রইল কথা।

বেটি ভুল বুঝেছিল। তাই সেদিন যখন দুপুরে খেতে গেল সঙ্গে রইল রবার্ট আর্ম্মষ্ট্রং, পরিচালক এডমণ্ড গুয়েন, সহকারী পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, সহকারী ক্যামেরাম্যান, এক ডজন ছবির ষ্ট্যাণ্ড-ইন, ইলেক্ট্রিক কাজের ছেলেরা এবং প্রপার্টি বয়েজরা। সে কি-রকম লোক! সবাই বসল খেতে। ষ্টুয়ার্টএর বিল হোল দু পাউণ্ড এগার শিলিং ছ পেন্স

ষ্টুয়ার্ট কিন্তু এতখানি ঠকবার আশা করেনি।

একটি উচু জায়গায়

জোয়ান ক্র্যাফোর্ড একদিন উচু ছাতের ওপর অসহায় অবস্থায় আটকে পড়েছিল।

ব্যাপারটা হচ্ছে:—এই বিখ্যাতা মেয়েটি তাহার খাবার ঘরের ছাতের ওপর রৌদ্র-রশ্মি [illegible]বার জন্ত আর একটি ছাদ তৈরী

বেটী ফারনেশ

করায়। সেই কাঠের বাড়ীর ছাদে ওঠবার একমাত্র উপায় হচ্ছে দড়ির মই।

জোয়ান সেদিন ছাদের ওপরে দড়ির মই দিয়ে উঠল। এই প্রথম দিন! দড়ির মইতে ছাদে ওঠা এর আগে আর কোন অভিজ্ঞতা তার ছিল না। ওঠার পর আর নামতে পারলে না। দড়ি গেলো ছিড়ে। নিরুপায় অসহায় সে সবাইকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে। কে তাকে নামাবে?

ফ্র্যাঞ্চটটোন ফিরলো ঘরে। খোঁজা খুঁজির পর, দেখল ছাদে জোয়ান। ফ্র্যাঞ্চট ছাদে উঠল, নতুন মই লাগাল আর, তার প্রিয়তমাকে রক্ষা করল সূর্য্যের উগ্র আলোর রশ্মি থেকে।

জন বোলস্

জোয়ান নামল—ফ্র্যাঞ্চটের কোলে তার মাথা। ফ্র্যাঞ্চট দেখলে, সূর্য্য-রশ্মিতে ডার্লিং-এর মুখ কালো হয়ে গিয়েছে।

হলিউডের আরো আশ্রমবাসীরা

মন্টিকোর সান্টা বারবারা পাহাড়ের ওপরে দি স্যান ইসিড্রো হচ্ছে রোনাল্ড কোলম্যান এর অধিকারে। ছবির কাজ হয়ে গেলে অলস মধ্যাহ্নে আর নির্জ্জন রাত্রিতে পবিত্র শান্তিতে রোনাল্ড কোলম্যানের দিনগুলি কাটে এই গৃহে।

লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকবার জন্তে শুধু জোয়েল ম্যাক্রিয়া, রোনাল্ড কোলম্যান প্রভৃতির শান্তির আবাসস্থল নেই, আরো আছে অনেক বৃটিশ অভিনেতা, অভিনেত্রীদের; যেমন মারলে ওবেরণ, হার্ব্বার্ট মার্শাল, ফ্র্যাঙ্ক লটন, ইভলিন লেয়ি, ডেভিড নিভেন প্রভৃতি।

খুচরো খবর—

গ্রেটা গার্কো খুব জোরে দৌড়তে পারে।

* * *

ম্যাক্স ইভানসের বাড়ীতে একটি ছোট্ট সুটিং গ্যালারী তৈরী করা আছে।

* * *

বারবারা পিপারকে সাতার কাটতে শেখায় বিখ্যাত সাতারু গারট্রুড এডারলি।

* * *

জিনজার রোজার্স ছবি তুলে নিজের ডাইরী রাখে আর বন্ধুবান্ধবের ছবি তোলে।

* * *

ফ্রেডি বারথেলোমিউ ছোট্ট একটি দ্রুতগামী বোট তৈরী করছে।

* * *

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের ছবি 'লাভ-ফ্লাইট' উইণ্ডি ব্যারি, লরেন্স টিবেট আর সঙ্গে নামছে আরথার ট্রিচার এবং পলিন ফ্রেডারিক।

* * *

জানো, পাওনেল ব্যারিমুর খুব ভাল বক্সার ছিল।

ট্রামে-বাসে

শচীন কর

দশটায় অফিস বেরুতে হয় সাড়ে ন'টায়।

সকালবেলা হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বাজারে ছুটে যাই। মাছওলা, তরকারীওলার সঙ্গে দর কষাকষি করতে গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, কোনদিন তাতে দু'পয়সা বাচে, কোনদিন চেঁচামেচি হয় বৃথা।

তারপর স্নান মানে খানিকটা চুবিয়ে নেওয়া আর খাওয়া অর্থাৎ নাকে-মুখে কোন প্রকারে চারটে গোঁজা। গিন্নী বলেন—"ওগো একটু জিরিয়ে যাও, অমন করে খেয়েই ছুটোনা, ওতে শরীর টিকবে কেন"—হায়, গিন্নি যদি অফিসের বড়বাবু হতেন!

ট্রামরাস্তা থেকে বাসা একটু দূরে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ের ঘড়িটার দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, সেটার কাঁটাটাও ট্রাম-বাস, গাড়ী-ঘোড়ার মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে তখন মরিবাঁচি জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে থাকি; যে কোন সময় যে কোন একটা চলন্ত মোটরের তলায় পড়ে যে অফিস পর্ব্বে যবনিকাপাত হয়ে যেতে পারে সে কথাও ভাববার সময় হয়ে ওঠেনা, এম্নি হয় রোজ, দিনের পর দিন।

সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চড়ি একটা পয়সা বাঁচাতে। তার মানে যাতায়াতে দু'পয়সা এবং মাসে প্রায় একটা টাকা। কোম্পানীকে একটা টাকা কম দেই সুতরাং গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে ছুটে গিয়ে যে গাড়ীতে বসে একটুখানি পাখার হাওয়া খাব সে আশা করাই বৃথা এবং করিনে। শুধু একটুখানি বসবার জায়গা যদি জোটে তাহলেই ভাগ্য মানি। বসতে না পেলে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, কোনদিন তাও হয়না—যেতে হয় বাদুর ঝোলা হয়ে—এই নিয়মেই সবে মেনে নিয়েছি, নির্ব্বিচারে।

রোজ রোজ যারা ট্রামে চ'ড়ে অফিসে যান তাঁরা প্রায় সবই পরিচিত হয়ে-গিয়েছেন। নাম জানিনে কারো, কে কোথায় কোন্ অফিসে কাজ করেন তাও জানিনে তবু তাঁদের চিনি। বাড়ীতে বসে' চোখ বুজে অফিসের রাস্তাটা ভাবতে গেলেও প্রায় সঠিক্ বলতে পারি কে কোন্ রাস্তার মোড়ে নাব্‌বেন, কোথায় চড়বেন।

পরিচয়ের আড়াল থাকা সত্ত্বেও রকম-বেরকমের আলাপ আলোচনায় আমাদের বাধে না। কার অফিসের বড় সাহেব একবারে সোনার মানুষ, কার হাড়ভাঙা খাটুনি এবং অনন্যসাধারণ কর্ম্মতৎপরতা থাকা সত্ত্বেও শুধু হদ্দ পাজি ছোটবাবু বেটার "লাগানো" স্বভাবের জন্যেই প্রমোশনটা হচ্ছেনা, কোন্ এক অখ্যাত জিতেন লাহিড়ী মাইনেটা বাড়িয়ে নিলে শুধু ধাপ্পা দিয়ে—এসব ব্যক্তিগত আলোচনা নিত্য নিত্য মুখর হয়ে ওঠে ট্রামের পথে। পাশে বসে যিনি জিতেন লাহিড়ীর ধাপ্পার কাহিনীটা বর্ণনা করে যাচ্ছেন কোন বন্ধুর কাছে, তিনি একবারও ভাবেন না যে অচেনা অবন্ধুর দল যারা সেখানে আছেন তাদের মধ্যে কেউ হয়ত জিতেন লাহিড়ীকে জানেন—চাইকি কেউ হয়ত লাহিড়ীর পরমাত্মীয় হবেন।

তারপর আলুর দর জগুবাবুর বাজারে কত, আর হগসাহেবের বাজারে কত, শরৎ বসু কেন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি, কোন্ রেফারীটা পেজোমি না করলে মোহনবাগান নির্ঘাত শিল্ডটা পেয়ে যেতো ইত্যাদি, এত আলোচনাই যে এই আধাঘণ্টার মধ্যে বিরাট মহাকাব্যের আকার ধারণ করে ওঠে তার হিসেব রাখা দায়।

চক্রবেড়ের মোড় থেকে যে প্রৌঢ়-ভদ্রলোকটি, কাঁচাপাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চক্‌চকে টাক আর একটি সুপুষ্ট ভুঁড়ি নিয়ে ট্রামে চড়েন—তিনি বোধ হয় এক খেলাধূলা ছাড়া দুনিয়ার আর সব ব্যাপারেই কিছু কিছু ওয়াকিবহাল। তন্মধ্যে সাহিত্য-আলোচনা আর নাট্য বিচারেই তাঁর সমধিক সুস্পষ্ট। ভদ্রলোক একবার বোলতে আরম্ভ করলে—আর আরম্ভ তিনি করবেনই—অন্য সব স্তব্ধ হয়ে যায়, যেহেতু কথা তাঁর শুনতে হবেই। অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাক্‌লেও নিস্তার নেই, হাত ধরে একটা ঝাকুনি দিয়ে বলবেন—"শুনছেন মশাই, ভাদুড়ীর দিগম্বর"...তারপর আর কি, দিগম্বরের অভিনয় দেখে যদি না থাকেন তবু ক্ষতি নেই, এম্নি করেই বোঝাতে সুরু করবেন তিনি!

নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমরা তার আলোচনা শুনে যাই। তাঁর আলোচনা না শুনলে বোঝা শক্ত সে কী জিনিষ—হাত-পা ছোঁড়ার কী কায়দা কথার কী সে মার-প্যাঁচ! তাঁর আলোচনা রসাল হয়ে উঠবার আরও একটা কারণ সেটা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অপরিসীমতা। সাহিত্যের আড়ালে যে সাহিত্যিকটি রয়েছেন তাকে তিনি বিশেষ করেই জানেন, এবং যবনিকার অন্তরালের প্রায় প্রতিটি অভিনেতা-অভি-

নেত্রীর পারিবারিক সুখ-দুঃখের কাহিনী তাঁর নখদর্পণে!

সেদিনকার আলোচ্য বিষয় ছিল অমিতাভ ঘোষের গল্প "মনিমালা"। দিন ছ'সাত আগে গল্পটি বেরিয়েছে "পরিচিতি" নামে সাপ্তাহিক কাগজে। গল্পটিতে নাকি প্রচলিত সাহিত্যিক সংস্কার বর্জ্জন করা হয়েছে তাতে সাহিত্যের নামে অশ্লীলতাই উঠেছে প্রকট, বাংলার আকাশ বাতাস পঙ্কিল আবর্ত্তে গেছে ডুবে—তরুণ তরুণীর ভবিষ্যৎ তাই মসীলিপ্ত হয়ে উৎকট বিভীষিকার সৃষ্টি করছে—এম্নি ধরণের সুচিন্ত্র সমালোচনায় এই এক সপ্তাহের মধ্যেই তিন চারখানা কাগজ মুখর হয়ে উঠেছে।

অমিতাভ ঘোষ সাহিত্য ক্ষেত্রে অখ্যাত, তার নামটার সঙ্গে কারো পরিচয় নেই, তবু সে-ও যে উন্মার্গগামী সাহিত্যিকদেরই একজন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই; তার রচনা কাঁচা হলেও গল্পের বিষয় বস্তু অশ্লীলতার গৌরবে পরিপক্ক!

চক্রবেড়ের মোড়ের ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করেন—"দেখেছেন মশাই, গেল সপ্তাহের 'পরিচিতি'? মনিমালা গল্পটা পড়েছেন কি?" বল্লুম—"পড়েছি"। জবাব শুনে যেন ভদ্রলোকের উৎসাহ বেড়ে গেল, বল্লেন—"এগুলোকে কি আপনারা সাহিত্য বলেন?" কিন্তু কী বলি তার জবাব না পেয়েই ভদ্রলোক বল্তে থাকেন "এসব অকালপক্কুরা ত আদা নুন খেয়ে লেগেছে, যা কিছু অশ্লীল বা অস্বাস্থ্যকর তাই লিখবে বলে কিন্তু সম্পাদকদের বলি, এদেরও কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই? গল্পই নয় দুটো বেশী চান পাঠক-পাঠিকারা কিন্তু তাই ব'লে গল্পের নামে আজে বাজে যা-তা দিয়ে কাগজ ভরাতে হবে তারই বা কী মানে আছে?"

পাশের ভদ্রলোকটি বোধহয় দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাটা ট্রামের পথেই সেরে নিচ্ছিলেন। আলোচনাটা কুরুচির ব্যাখ্যান রসাল হয়ে উঠছে মনে করে তারও ঘুম যায় চটে। বলেন—"সময় করে দুটো গাল-গপ্প যে পড়ব তার কি আর জো আছে? তা মশাই, এই 'মনিমালা'র ঘটনাটা কী বল্তে পারেন"—সুতরাং তাকে গল্পটি সংক্ষেপে বলতে হয়:—

মনিমালার যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স মাত্র দশ। বিয়ের ছ'মাস পরেই স্বামী হীরেন্দ্র উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত চলে যান মনিমালারই বাবার টাকায়। বছর দুই শ্বশুরের সঙ্গে পত্রালাপ চলে কিন্তু বোধহয় শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পত্রালাপ যায় বন্ধ হয়ে। আরও বছর দুই পরে মনিমালার নামে পর পর তিন চারখানা চিঠি আসে কিন্তু তারপর আর কোন খবর নেই। পত্র লিখেও আর জবাব পাওয়া যায় না, অনুসন্ধানে জানা গেল হীরেন্দ্র তার নিজের বাড়ীতেও আর পত্র লেখে না। শেষে খবর পাওয়া গেল সে বিলেতেই আবার বিয়ে করে সেখানেই চাকরী একটা জুটিয়ে নিয়েছে, দেশে ফেরার আর ইচ্ছে নেই। এদিকে মনিমালা সম্প্রতি এম্, এ পাশ করে কোন মেয়ে ইস্কুলে শিক্ষকতা করছে। স্বামীকে জানবার সুযোগ তার হয়নি, শুধু এই কথাটাই জানে একদিন তার বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ফিরে এসে ঘর সংসার করবেন সে সম্ভাবনা আর নেই। কিন্তু হাজার হোক মনিমালা মেয়ে মানুষ, ঘর-সংসার করার প্রতি তার একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আছে। সুতরাং হালে তারও দু' একটি পুরুষ বন্ধু জুটেছে এবং তাদেরই একজনের সঙ্গে কী করে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় সেই সমস্যার মীমাংসাই গল্পের প্রতিপাদ্য।

"মেয়েটার কপাল খারাপ স্বীকার করি"—চক্রবেড়ের মোড়ের ভদ্রলোকটি বলেন—"কিন্তু তাই বলে, হাজার হোক হিন্দু ঘরের মেয়ে, হিন্দুমতে তার বাবা ত একদিন তাকে সম্প্রদান করেছিলেন? দ্বিতীয়বার বিয়ে হলে এই মেয়ের বাবাকে যে দত্তাপহরণের পাপে পাপী হতে হয় এই সোজা কথাটা কি এম, এ পাশ করা মেয়ের মনে একবারও জাগেনা? তারপর ধরুন, বিয়ে যদি হয়েই যায় আর হীরেন্দ্র লোকটি যদি একদিন হিন্দু আইনের জোরে ফিরে এসে স্বামীত্বের দাবী করে তখনকার সিচুয়েশানটা তাহলে কী দাঁড়ায়? যত-তব করে যা-তা লিখে গল্প একটি খাড়া করে দিয়ে শ্রীমান লেখক ত খালাস, কিন্তু এর কুফল যে সমাজে কতখানি বর্ত্তে সেই কথাটা......"

অসম্ভব উত্তেজনায় ভদ্রলোক হাঁফিয়ে উঠেন। পকেট থেকে নস্যের কৌটা বা'র করে তা থেকে খানিকটা নস্য টেনে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করেন—"আরে মশাই এসব কথা বলা ভালো নয়, তা কথাটা যখন উঠল, তখন বলেই ফেলি। এই লেখক অমিতাভ আমাদের পাড়ারই হরি ঘোষের ছেলে। ফার্ষ্ট ইয়ার না সেকেণ্ড ইয়ারে ত শুনছি কতদিন থেকেই পড়ছে। বুড়ো বাপটা টাকা খরচ করে ফতুর হয়ে গেল, মনে মনে ভাবছে, ছেলে আমার বিদ্যা-দিগগজ হয়ে উঠছে কিন্তু ছেলের কীর্ত্তিতে এদিকে যে পাড়ায় মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছে"...

অসম্ভব রকম কৌতূহলী হয়ে উঠলুম, বল্লুম, "তাই নাকি? তা গল্পের সঙ্গে এই অমিতাভ ঘোষের কী সম্বন্ধ?" "সম্বন্ধ বলে সম্বন্ধ" ভদ্রলোক দাঁত বা'র ক'রে হাস্তে হাস্তে বলেন "মনিমালার প্রেমের আখ্যানে—যেখানে গল্পটা জমাট বেঁধে উঠেছে—অমিতাভর

যে সেখানেই সম্বন্ধ! মনিমালাত সাজানো নাম, আসলে উনি যে প্রতিভারাণী দেবী সে কথা আর কেউ জানলেও আমাকে ফাঁকি দিবি তুই অমিত ছোঁড়া—হুঃ।"

বল্লুম—"তাহলে একটা সত্যি ঘটনা বলুন"—

"সত্যি আবার নয়!" ভদ্রলোক বলতে থাকেন—"মশাই, বিবাহিতা স্ত্রী, স্বামী নয় বিদেশেই আছেন, নয় খবরই এসেছে আবার বিয়ে করেছেন কিন্তু তাই বলে তুই কি বলে···মশাই, আমি কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তোর, যা-খুসী তুই কর, দরকার কী আমাদের ওতে মাথা গলাবার কিন্তু তাই নিয়ে গল্প লেখা কেন? বিনিয়ে বিনিয়ে মেয়েটার দুঃখটাকে বড় ক'রে দেখালেই আমরা দশজন জেনে নেবো, প্রতিভার সঙ্গে অমিতের বিয়ে···হেঁ হেঁ হেঁ, এই আর কি, চারপো কলি ত জানেন না, শুধু শুনেছেন, এবার দেখুন, কিন্তু আর সময় নেই, এসে পড়েছি"—ভদ্রলোক ডালহৌসীর মোড়ে নেবে গেলেন।

ট্রামে বসে বসে ভাবছি—অমিতাভ বোধ আমারই ছদ্মনাম, আর মনিমালাও নিছক কল্পনা। কিন্তু ভদ্রলোক আমার পিতৃ পরিচয়ত জানেনই এমন কি প্রতিভার সঙ্গে আমার রোমান্সটার খবর পর্য্যন্ত রাখেন! সাতজন্মেও প্রতিভারাণীকে জানিনে কিন্তু তাহলেও ভাবছি, ভাগ্যিস গিন্নী ট্রামে ছিলেন না, নইলে এতক্ষণে সতীন-কাঁটার বিষে······

বাঞ্ছিত

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

দীর্ঘ দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে তিনকড়ি যখন জেলের বাহিরে মহানগরীর রাজপথে এসে দাঁড়ালো তখন সোনালী রোদের আভায় শরতের আকাশ ঝলমল করছে।

বন্ধ ঘরের ভেতর বহুদিন সে বাইরের রূপ দেখেনি। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে একবার খোলা হাওয়া উপভোগ করে নিলে।

বাড়ীর পথে অগ্রসর হতে দুএকজন পরিচিত লোকের সঙ্গে তার দেখা হোল, সবাই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে—বড় জোর দু'একজন জিজ্ঞেস করলে—কি হে, তিনকড়ি শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরলে কবে? এরই মধ্যে সাধ মিটে গেল—আবার কবে যাবার ইচ্ছে আছে।

তিনকড়ি খোঁচাগুলি বেমালুম হজম করে গেল—দু'একবার হয়ত নিজের বাহুটা একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো, কিন্তু জেলের ঘানি টেনে তা শিথিল শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

তিনকড়ি তার পুরাণো বস্তিতে গিয়ে দেখলে সেখানকার বহু পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। মানিকতলার সে পচা পুতিগন্ধময় আবর্জ্জনা ভরা গলিটার আর চিহ্ন মাত্র নেই—ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের পিচ বাধানো বড় প্রশস্ত রাস্তা—বড় বড় প্রাসাদসম অট্টালিকা—রেডিও গান চলছে—গ্যারাজে সব মোটর—দরিদ্রের আবাস-ভূমি পাল্টে গিয়ে আজ সেখানে ধনীর বিলাস ভবন। দিনের সূর্য্য যেখানে প্রবেশ করতে পারতো না—হাওয়া বাতাস যেখানে অবরুদ্ধ ছিল, আজ সেখানে শরতের উচ্ছ্বাস আলোক রেখা—দক্ষিণের মৃদু মন্থর সমীরণ!

তাদের দলের সর্দ্দার কানাইয়া, ওসমান বিবি—হরেণ, পরেশ কারুর আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

কোথায় যাবে সে?

তিনকড়ি, ভাবতে লাগলো—তার স্ত্রীই বা কোথায় উঠে গেল?

জেলে যাবার পর হরিমতী দিন সাতেক তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল—আজ বছরখানেক তার কোন পাত্তাই নেই।

রাস্তায় জীতুরামের সঙ্গে দেখা!

জীতুরাম ছিল তাদেরই বস্তির একজন সহবাসী। সে দুঃখ করে বললে যে, তিনকড়ির স্ত্রী হরিমতী পরেশের সঙ্গে কোথায় উধাও হয়ে গেছে—কলকাতার বাইরেই কোন স্থানে আছে বোধ হয়!

তিনকড়ির মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে গেল—চোখ দুটো রক্তবর্ণ আকার ধারণ করলে—শীর্ণ বাহুদুটি একবার যেন কঠিনতর হতে চাইলে—কিন্তু ক্ষণিকের এই উত্তেজনা!

তার চেহারার ভীষণ আকৃতি ধারণের সঙ্গে সঙ্গে জিতুরাম সরে পড়েছিল।

যাক—সব শেষ! তিনকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে—মর্ম্মের যত ক্লেষ—যত ক্রোধ—যত জ্বালা সে একটি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই বেরিয়ে গেল।

আর কেউ নেই—সংসারের আর কোন আকর্ষণই তার নেই। লক্ষ্যহীন ভাবে সে তার পা দুটো চালিয়ে দিলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

মহানগরীর রাজপথে একে একে সব গ্যাসগুলি জ্বলে উঠলো। এই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের সময়ই সে পূর্ব্বে শীকারের সন্ধানে বার হোত! গলির ভেতর কত অসহায় পরিবারের দিনের গ্রাসাচ্ছাদন-

টুকু সে অপহরণ করেছে—নরহত্যার রক্তে তার ছুরিকাখানি রঞ্জিত হয়ে উঠেছে—কিন্তু কেন?

হরিমতী তার বিবাহ করা স্ত্রী নয়—তবুও শুধু তারই মনোরঞ্জনে সে কুন্ঠিত হয়নি জগতের সর্ব্বপ্রকার ঘৃণিত কাজ সম্পাদন করতে।

ক্ষুধার জ্বালায় তিনকড়ির সর্ব্বশরীর তখন আনচান করছে—সমস্ত দিন আজ অনাহারে পথে পথে রৌদ্রের মাঝে কেটেছে। জীবনে তার লক্ষ্য নেই—উদ্দেশ্য নেই—রাত্রি বাসের স্থান নেই—এখন সে কি করবে?

নাঃ, উদরের দাবী অসহ্য বিরক্তকর!

জেলের ভেতর এ ভাবনা ছিল না—শত অত্যাচারের মাঝেও দিনের অন্নের ভাবনা ভাবতে হোত না।

নাঃ, তাই ভালো—জেলেই সে যাবে। বাইরের আলো বাতাস আজ তার কাছে অসহ্য বিরক্তিকর! সবাই তাকে ঘৃণা করে—সমাজে তার কোন স্থান নেই—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা অন্নের ভাবনায় অনাহারে দিন কাটাতে হয় না।

তিনকড়ি স্থির করলে জেলেই সে যাবে।

আলমারিতে স্তরে স্তরে সাজানো ভালো ভালো আহার্য্য সামগ্রী। কতলোক পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত এগুলির সদ্ব্যবহার করছে। তিনকড়ির ভারী লোভ লেগে গেল।

কিছু খাওয়া যাক্—ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠছে। কিন্তু প্রবেশ পথে পেল বাধা।

তার রক্তবর্ণ চক্ষু—অবিন্যস্ত চুলগুলি—শতছিন্ন মলিন বেশভূষা—দারোয়ান দিলে বাধা! এই হঠো হিয়াছে—

ক্লান্ত পদে আবার সে এগিয়ে চলে। মস্তিষ্কখানি গভীর চিন্তাজালে জড়িত—কেমন করে জেলে যাওয়া যায়! চুরি?—না চুরি সে আর করবে না—দীনের অন্ন সে আর অপহরণ করবে না। তবে?—

সো-কেসে সাজানো রয়েছে নানা জাতীয় মূল্যবান সুদৃশ্য শাড়ী! বেনারসী—জার্জ্জেট—নামও সে অত জানে না—তবে বোঝে নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান—পথের 'পর থেকে কুড়িয়ে নিলে সে একটুকরা পাথর—মারলে শো-কেসের কাঁচ লক্ষ্য করে।

ঝন্ ঝন্ শব্দ করে পথের পর কাঁচ ভেঙে পড়লো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে

চারদিকে হৈ হৈ ব্যাপার—দোকানদার ছুটে এলো বেরিয়ে!—পুলিশ—পুলিশ—লাল পাগড়ীর আগমন হল সঙ্গে সঙ্গেই।

কে ভেঙেছে—কোন শালা লোগ্?

জনতার ভেতর থেকে একজন তিনকড়িকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো—এই-এই সেই বদমায়েস লোকটা—আমি নিজে চখে দেখেছি!

পুলিশ ধমক দিয়ে বলে উঠলো—তুমি একেবারেই বোকা—ও যদি ঢিল ছুড়তো তা হলে কি ও এখানে এখনও দাঁড়িয়ে থাকতো?

তিনকড়িকে এবার পুলিশ ধরলে না। কিন্তু তিনকড়ি ধরা দিতে চায়

তিনকড়ি চলেছে—নতুন মতলব মাথায় নিয়ে।

ক্ষুধার তাড়নে সর্ব্বশরীর তার টললে—পা আর চলে না! পথের' পর এক রেষ্টুরেন্ট—ছোটখাটো গোছের—প্রবেশ পথে দারোয়ানের বাধা নেই। গিয়ে ঢুকলো সে।

চা-কেক্ চপ-কাটলেট—হরদম অর্ডার দিয়ে চলেছে সে। দোকানী সন্দেহ করলে—চা কেক্ দিয়েই সে চাইলে পয়সা।

তিনকড়ি স্পষ্ট জবাব দিলে—পয়সা?—পয়সা কোথায় পাবো?

—শালা জচ্চুরি করতে এসেছো এখানে?—

তিনকড়ি জবাব দিলে—জচ্চুরি করতে আসি নি—খিদে পেয়েছে, পয়সা নেই—তা বলে খাবো না—তোমার না পোষায় আমাকে জেলে দাও!

লোকটা যেন কি! দোকানদার পুলিশ হাঙ্গামে না গিয়ে ঘা দুচার বসিয়ে দিয়ে দিলে দোকান থেকে তাড়িয়ে।

তিনকড়ির দুঃখ মার খাওয়ার জন্য নয়—জেলে সে যেতে পারছে না!

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটি সুসজ্জিতা আধুনিকা তরুণী—হাতে লেডীস্ ছাতা!

তিনকড়ি কি খানিকক্ষণ ভাবলে—তারপর তার সামনে এগিয়ে গিয়ে মারলে তার ছাতায় একটান।

হৈ হৈ শব্দে চতুর্দ্দিক থেকে লোকজন এসে তাকে ঘিরে ফেললে—কিল্-চড়-চাপড়-লাথি অপর্য্যাপ্তভাবে তার'পর বর্ষিত হোল। পুলিশ এসে ধরলে এখানা হাত!

চলো শালালোক থানামে—শালা লোক চোট্টাভি হ্যায়—মেয়েটি একবার তিনকড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে তারপর পুলিশকে অনুরোধ জানালে তাকে ছেড়ে দিতে।

সজোরে রুলের একটা গুতো দিয়ে পুলিশ বললে—হঠো শালা হিয়াছে—

তিনকড়ি মেয়েটাকে জানালে অভিসম্পাত—তার যাত্রায় বাধা দেওয়ার জন্যে।

নাঃ! এতো চেষ্টা সত্ত্বেও তিনকড়ির আকাঙ্খা পুরোণ হয়না। বার বার প্রতিবারই পুলিশ তাকে ধরতে চায় না।

পথ চলতে চলতে আলোকিত এক সিনেমা হাউসের সামনে এসে সে থম্‌কে থেমে গেল।

ভিতর থেকে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সুন্দর এক সঙ্গীতের সুরের মূর্চ্ছনা। তার বিরাক্ত অন্তরকে খানিকটা তা তৃপ্তি দিলে। কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ সিনেমা গৃহের ভিতর প্রবেশ করে সে চীৎকার করতে সুরু করে দিলে। নিমেষে একটা ভীষণ হৈ চৈ! গেট্ কিপাররা তাকে নিয়ে এলো ধরে—ম্যানেজার দেখে বললেন—লোকটা

একেবারে পাগল। ছুটো ধমকানী দিয়ে এবারও তাকে ছেড়ে দেওয়া হোল।

তিনকড়ি এলো আবার মহানগরীর রাজপথে—বিরাট কর্ম্মকোলাহল মুখর জনতার মাঝখানে। মুক্তি আজ সে চায় না—রাজপথের হাওয়া বাতাস আলো তাকে যেন বিদ্ধ করছে—তার অন্তর চাইছে সেই বদ্ধ জেলের ঘরে—অসংখ্য পাপীর মাঝে—যেখানে আকাশ নেই—বাতাসের প্রাচুর্য্য নেই—সেই বদ্ধ ঘরই তার কাম্য—সেখানেই সে যেতে চায়—কি' তাতেও প্রতিমুহূর্ত্তেই বাধা পড়ছে।

গৃহহীন, আত্মীয় হীন, জীবনের আশা-আকাঙ্খা-কামনাহীন— লক্ষ্যহীন — কোথায় যাবে সে? কোথায় তার স্থান?—

মন্দিরে শেষ আরতির ঘণ্টা তখন বাজছে।

অগণন নরনারী ভক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলি-অন্তরে মায়ের আরতি দেখছে—প্রাণের দুঃখ-জ্বালা-আশা-আকাঙ্খা শ্রদ্ধানত হিয়ায় মার পাদমূলে অর্পণ করছে।

ভক্তির সুর-উচ্ছ্বাস সেখানকার আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তুলেছে। ধূপধুনার ধোঁয়ায় মায়ের ঘরখানি ভরে গেছে—চন্দনের স্নিগ্ধ সুবাস—ফুলফলের বিচিত্র সম্ভার—পঞ্চ প্রদীপের অর্চ্চিত অগ্নিশিখা মায়ের মন্দিরকে পবিত্রতায় ভরিয়ে তুলেছে।

তিনকড়ি ধীরে ধীরে ভক্ত-শ্রেণীর এক পাশে এসে দাঁড়ালো।

মনের সমস্ত ক্ষত, স্নেহ, আবর্জ্জনা সে লুটিয়ে দিলে মায়ের চরণ তলে। পবিত্রতায় মন তার উঠলো ভরে। অসংখ্য পাপ-ক্লিষ্ট তার মন—নরহত্যার শোনিতে-রঞ্জিত কঠোর তার হৃদয়, আজ কোমলতায় ভরে গেল।

আশা নেই আকাঙ্খা নেই প্রবঞ্চনা নেই আজ মন তার পরিপূর্ণ হয়ে. ওঠে ভক্তি ধারায় অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে।

জোড় হস্তে তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে সে চেয়ে রইল মায়ের চির-পবিত্র আনন পানে।

শেষ আরতির সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা তার টুটে গেল—পিছনে সে অনুভব করলে কঠিন অঙ্গুলির স্পর্শ—ফিরে তাকিয়ে দেখে লাল পাগড়ী।

বিচারে তিনকড়ির পুনরায় তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হোল।

পিয়াসা

শ্রীঅমিয় কুমার রায়চৌধুরী

১

“তুমি কি ভেবে দেখেছ, যে কথা বলেছিলাম—” ? জয়ন্ত বল্ল।

মায়া, মায়া বসু, চকিতে একবার মুখ তুলে চাইল, তার মুখের উপর দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল। সে চুপ করে রইল, কিছু বল্লনা। শুধু আঁচলের খোটটা আঙুল দিয়ে নাড়তে লাগল। জয়ন্ত বলে যেতে লাগল—আমি যাচ্ছি, “মোকা হারু” জাহাজে—তোমায় যে রকম বলেছিলাম। যথেষ্ট ভাববার সময় তুমি পেয়েছ। আমার সঙ্গে কি তুমি আসবে না?

কথাবার্ত্তা হচ্ছিল বাগানে। ফুল-ভরা সুন্দর বাগানটির মাঝে, ফিকে-সবুজ, কচি-কলাপাতা রংএর শাড়ীটা পড়ে মায়াকে দেখাচ্ছিল “পুষ্পবনে পুষ্পময়ী ঋষি কন্যা” প্রায়।' হাঁ, মায়া ফুলের মতই সুন্দরী। ফুলের মতই তার বিকাশ, কিন্তু এ ফুলের সৌরভ কেউ নেয় নি, যার নেবার অধিকার আছে সেও না। মায়া বিবাহিতা,—কল্যাণ বসুর স্ত্রী। 'মায়া—নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ তার মধ্যে, কিন্তু কৈশোরের লালিমাটুকু এখনও সর্ব্বাঙ্গে বর্ত্তমান—দেবতার নির্ম্মাল্যের মত স্নিগ্ধ ও সুন্দর। তার ঘন কাল চুলের গোছা কুঁকড়ে এসে পড়ে গালের উপর। 'হাওয়া লেগে সেগুলি উড়তে থাকে ফুরফুর করে, হালকা মেঘের মতন। তার মাথাটি ছোট্ট, মুখে একটা বিষাদের রেখা।

জয়ন্ত বল্ল—প্রায় দুমাস আগে সে তোমার কাছে এসেছিল। এর মাঝে তোমার খোঁজ নেবার অবসর তার হয় নি। নয় কি? তবু সে তোমার স্বামী।

তাঁর কাচের মত স্বচ্ছ চোখ দুটি তুলে মায়া জানাল হাঁ।

“তবে কেন ইতস্ততঃ করছ মায়া? তোমার জীবনে সে কিছুমাত্র interested নয়, তোমার জীবনে সে আর নেই, গত কয়েক বছর ধরেই নেই। তার জীবনেও তোমার কোন অস্তিত্ব নেই—তোমায় সে চায় না, কোন প্রয়োজন নেই তার। তুমিই সেদিন বলেছিলে যে, জীবন যে কি—তা আমিই তোমায় জানিয়েছি।” মায়া অস্পষ্টভাবে, মিষ্টি স্বরে বল্ল—“হাঁ তুমি বুঝিয়েছ জীবন কি। তুমি না থাকলে নিস্তব্ধতার নির্জ্জন অন্ধকারে আমার জীবন বয়ে যেত চিরকাল—কোনদিন আলো দেখতাম না। তুমি যদি আমার জীবনে দেখা না দিতে কি হোত কে জানে।” মায়া একটু দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল, কথা তার জড়িয়ে এল।

"তাহলে মনস্থির কর। এ-বাঁধন কেন, নতুন ভাবে জীবন যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হও। তোমার প্রতি আমার এ টান যে শুধু মোহ নয়, আমি যে কতদূর তোমায় ভালবাসি, তার যথেষ্ট পরিচয় তুমি পেয়েছ। মেয়েরা আমার কাছে নতুন কিছু নয়, তুমি তা জান, কারণ তুমি জান যে অনেক মেয়ের সঙ্গেই আমি মিশেছি। অনেক মেয়ে দেখেছি আমি, কিন্তু তুমিই আমায় প্রথম আবদ্ধ করতে পেরেছ—কোন্ মেয়েকে নিয়ে যে জীবন যাপন করা যেতে পারে, তা তোমায় পাবার আগে ভাবিনি। কারণ সাধারণ মেয়েদের মধ্যে পদার্থ নেই কিছু, কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তুমি হচ্ছ আমার একটা ডিস্‌কভারী। তোমায় আমার চাই, তাছাড়া তোমায় আমি ভালবাসি। সময় নষ্ট করো না। তুমি শুধু একবার হাঁ বল্লেই, আমি আর একটি Passage Book করে আনি। আমি তোমার সঙ্গে থাকব। ভয় কি? শুধু একবার হাঁ বল, জোর করে তোমায় আমি অধিকার করতে চাই না। তুমি রাজী হলেই হয়, সঙ্গে আমার নতুন জীবন, তার সবটা দেব তোমায়। তোমার সমস্ত নিস্বতা, সমস্ত অপমান দূর হবে। জীবনের অনাবিল স্রোত —তার মাঝে তুমি আর আমি। মনে আঘাত লাগবে? সংস্কারে বাধবে? তার কষ্ট হবে? মানুষের জীবনে পরিবর্ত্তন হলেই প্রথমে অসুবিধা একটু হয়। কিন্তু তা অতি অল্পসময়ের জন্ত। সময় থাকেনা কারুর জন্ত; জীবনে যদি সুখ না পেলে, জীবনকে যদি অনুভব না করলে, তবে সে জীবনের সার্থকতা কি? তুমি কি চাও আমি জানি, তোমার বুকে কি কথা ফুলে উঠছে তা জানি। তোমার সে অভাব আমি পূর্ণ কোরব। আমাকে না হলে তোমার চলবে না···তা আমি জানি, কারণ তোমাকে না হলেও আমার চলবে না।

মায়ার মন দুলছিল ঝড়ে। সে একবার জয়ন্তর দিকে তাকাচ্ছিল, আর একবার তাকাচ্ছিল বাগানের দিকে। জয়ন্ত,...তার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, বয়স ত্রিশ—লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, সুন্দর চুল, মুখে সংবংশের ছাপ...জ্ঞানী...চোখ দুটো জল জল করে... সে তাকে দেবে বলেছে জীবনের স্বাদ। জয়ন্তর টাকা আছে, সুযোগ আছে...আর আছে জীবনকে উপভোগ করবার ইচ্ছা!

পাশাপাশি তার আর একজনের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল সুদীর্ঘ তিনটি বছরের কথা···কল্যাণ আর তার মাঝের ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কল্যাণ শুধু টাকা উপার্জ্জনে ব্যস্ত। তিন বছর হোল সে বর্ম্মায় গিয়ে কাঠের (Timber) কারবার করছে। এতদিন হয়ে গেল—এই দুবছরে মাঘোৎসবের সময় ছাড়া তাদের দেখাশোনা হয়নি। গত বারমাসের মধ্যে সে তার স্বামীর কাছ থেকে বারটি চিঠিও বোধহয় পায় নি। জয়ন্ত ঠিকই বলেছে। কল্যাণ আর তাকে চায় না। কল্যাণের জীবনে মায়ার একটুও স্থান নেই।

ক্ষোভে ও দুঃখে তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। চোখ তার জলে উঠল, তার ভেতরের উপেক্ষিত যৌবন ফোঁস করে উঠল। তার ঠোঁট দুটো একটু কাঁপল, সে বলল জয়ন্তকে—বেশ...আমি যাব তোমার সঙ্গে। অনেক অপেক্ষা করেছি। আমার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে আজ। আমার এ নিঃসঙ্গ জীবনে পূর্ণতা তুমি দিয়েছ। তুমি আমার স্বামী নও, তাছাড়া তুমি সব কিছু। কিন্তু আজ নির্লজ্জের মত বলছি, যে টুকু বাকী আছে, নাও তুমি, স্বামীত্ব যদি চাও, দিচ্ছি··· তোমায় অদেয় আমার কিছু নেই। অতীতের মায়া মরে গেছে। তাকে প্রাণ দিয়েছ তুমি। হাঁ, আমায় পাবার তোমার দাবী আছে। মি আমার জন্ত যথেষ্ট করেছ, তুমি আমায় ভালবেসেছ কিন্তু একদিনও অসম্মান কর নি, আমি নিজেকে স্বেচ্ছায় তোমার কাছে সমর্পণ কোরব, সেই দিনের জন্ত অপেক্ষা করেছ। বন্ধু আমার, প্রিয় আমার, তোমার এ ভালবাসা ও যত্নের প্রতিদান দেব, যতদূর সাধ্য আমার···

মায়া তার ডেস্কের উপর গালে হাত দিয়ে বসল, আজ সে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। ভালমন্দ বিচার তার নেই···জীবন সে চায়। প্যাড ও কলমটা টেনে নিয়ে সে লিখতে বসল, তার শেষ চিঠি···কল্যাণের কাছে।

কল্যাণকে কি বলে সে বোঝাবে, কল্যাণ যে তাকে বিশ্বাস করেছিল। বড় শক্ত কাজ, তা হলেও তাকে করতে হবে একাজ···হাঁ, এই নিঃসঙ্গ, বৈচিত্র্যহীন জীবনের যবনিকা সে টেনে দেবে। অন্ধকারে সে হাঁপিয়ে উঠেছে, তার আলো চাই। টাকাই সব নয়। মনে পড়ল তার জয়ন্তর কবিতা :—

তুমি কহিতেছ দুহাত পশারি, এই চাই,
এই চাই,
জীবন মরণ, যৌবনলীলা, অফুরান,
শেষ নাই।

এতদিন মায়া প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সামাজিক এ সম্বন্ধটাকে বজায় রাখতে। কিন্তু সে আদর্শ আজ বিসর্জ্জন দেবে। প্রতিনিয়ত এ অবহেলা ও মানসিক দ্বন্দ্ব সে সইবেনা আর। তারা বিয়ের দিন ঠিক করেছিল যে, তাদের সব কিছু হবে Perfect, তাদের টেনিস্ লন থেকে জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত। এই জন্যই আজ সাত বছরের বিবাহিত জীবনের ফলেও, তাদের কোন সন্তান হয়নি। তবু তারা দুজনেই সন্তানের জন্য পাগল ছিল···তবে যে প্রাণীটি পৃথিবীতে আসবে তার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করে তাকে এনে দুঃখ দিয়ে কোন লাভ নেই। তারা ঠিক করেছিল, তারা হবে আদর্শ পিতামাতা। তারা তাদের সন্তানের যতটা দরকার, তা সঞ্চয় না করে, তাকে আনবে না—এই তারা ঠিক করেছিল। এবং এইজন্যেই সে শুধু সমাজে 'কল্যাণের স্ত্রী' এই পরিচয় নিয়ে থাকতে চাইতো না, তার পরিচয় হচ্ছে কল্যাণের সন্তানের মা হিসাবে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, বিবাহিত জীবনে সে নারীত্বের সে গৌরবটুকু পায় নি। তার মনের অবস্থা কেউ বুঝবে না, যদি কোন মেয়ে এ অবস্থায় পড়ে থাকে, সেই শুধু বুঝবে।

চমৎকার ফুলবাগান। তিল তিল সৌন্দর্য্যের সার দিয়ে বিশ্বকর্ম্মা গড়েছিলেন তিলোত্তমাকে। মায়ার বড় প্রিয় এ বাগানটিকে সে সুন্দর করে তুলেছিল, শুধু অর্থ দিয়ে নয়, নিপুণ দক্ষতা ও যত্ন দিয়ে। ঘরে বসলে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে।

বাড়ীটা খুব বড় না হলেও বেশ প্রশস্ত। ঘরগুলি Low-ceilinged হলেও' আলো, বাতাসের ব্যবস্থা প্রচুর—একটা মায়াপুরী। আসবাব পত্র খুব সাধারণ; তাতে মেহগনি পলিস্ করা, পর্দাগুলি ফিকে সবুজ রেশমী কাপড়ে তৈরী। মায়ার ঘরবাড়ী সাজাবার একটা Taste ছিল—যা সকলের থাকেনা। সব কাজই তার সুন্দর। মায়া যেখানেই থাক না কেন, সঙ্গে নিয়ে যেত একটা মায়াপুরীর আবহাওয়া।

মায়া চিঠি লিখছে। জানালার নীচে রজনীগন্ধা গাছগুলো তাদের সুন্দর ফুলের ডাটাটার ভরে দুলছিল মৃদু হাওয়ায়··· কতগুলো ভোমরা গুণ গুণ করে তাদের প্রেম জানাচ্ছিল ফুলগুলিকে। পাঁচ বছর ধরে এক অপূর্ব্ব পুলকের আশায় মায়া এ সুন্দর নীড় গড়ে তুলেছিল···কিন্তু হোল না, বাসা বাঁধাই বিফল হোল।

"আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমাদের মধ্যে অসত্য থাকবে না, আমার সন্দেহ নেই যে তুমি তোমার কথা রেখেছ। আমার সত্যপালনের জন্ত এই চিঠি তোমার লিখছি। তুমি বুঝবেনা, কত যুদ্ধ করেছি আমি এর সঙ্গে। আমার কথা বিশ্বাস কর। তোমার মনে থাকে গতবার যখন এসেছিলে কতকরে বলেছিলাম তোমার থাকতে আমার সঙ্গে। তোমার কাজের ক্ষতি বিশেষ হোত না, একটা লোক রেখে দিলেই চোলত। কিন্তু তুমি সে সুধা কানেই তোলনি। এবং যদি বা তুমি দুএকদিনের জন্ত আস, তোমার মন পড়ে থাকে কর্ম্মক্ষেত্রে···টাকা রোজগার করাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য।

তোমার জীবন তুমি পেয়েছ, টাকা রোজকারেই তুমি জীবনটাকে অনুভব কর। জীবনকে তুমি এ'ভাবেই দেখেছ। কিন্তু জীবন তা' নয়, অন্ততঃ আমার কাছে। আমার দিকে ফিরে তাকাবারও সময় নেই তোমার···আমি শুধু অপেক্ষাই করেছি··· আমার জীবন ছিল নিঃসঙ্গ। এ নিঃসঙ্গতা দূর করেছে জয়ন্ত। তুমি তাকে চেন, চমৎকার লোক নয় কি?

সে আমার জীবনে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এনেছে। তুমি যে ব্যবধান গড়ে তুলেছ, সে তা পূর্ণ করেছে। সে আমার চার—

সে আমার জন্য সব দিয়েছে। আমিও তাকে চাই। তুমি যেদিন এই চিঠি পাবে, সে সেদিন সমুদ্র যাত্রা করবে, আমিও যাব তার সঙ্গে।

তুমি কোর্টের সাহায্যে বিবাহবিচ্ছেদ কোরো—সত্যিকারের Divorce,—আমাকে বাঁচাতে যেও না, সত্য কথা প্রচার কোরো। কারণ দোষ আমার, তোমার নয়। কিন্তু জীবনকে আমি অনুভব করতে চাই। তুমি চাও না আমায়, সে চায়...।"

এইরূপে তার যা বলবার ছিল সে লিখল, বাড়ীঘর ও জিনিষপত্রের ব্যবস্থা কিরূপ হবে তাও লিখল। লিখে খামে ঠিকানা লিখে, বন্ধ করে, এয়ার মেলে রওনা করে দিল চিঠিটা। বর্ম্মা থেকে আসতে সময় লাগে কম করে তিন দিন, রেলে...ষ্টীমারে। কাজেই কল্যাণ যদি প্রথম জাহাজ ধরে তাহলেও সে যখন পৌঁছাবে, মায়া তখন জয়ন্তর সঙ্গে অনেক দূরে চলে যাবে।

* * *

যাবার দিন দু একটি সঙ্গের জিনিষ বাদে, সব জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে Book করে। একটা উত্তেজনায় মায়ার শরীর কাঁপছিল—ভালও লাগছিল। সে বাগানে পায়চারী করছিল।...এই বাগানের প্রতি ঘাসের মধ্যে রোমান্স মেশানো আছে। এই বাগানে সে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করেছে একদিন কল্যাণের জন্য। কল্যাণ—তখন দীপ্ততরুণ—সবে Forestry পাশ করেছে। কি তীব্রভাবে কল্যাণ তাকে ভালবেসেছিল। কল্যাণএর স্পর্শে সমস্ত মনের দলগুলি তার ফুটে উঠত।—সেই কল্যাণ আজ তার স্বামী—কিন্তু কল্যাণ আজ তার "হিরো" নয়। কল্যা তার বাবার কাঠের কারবারের দেখা শোনা কোরত। বৃদ্ধ চান নি কল্যাণ মায়াকে বিয়ে করে। কিন্তু তাঁর দিন শেষ হোল, মারা গেলেন তিনি। কল্যাণ তার একবছর বাদে মায়াকে বিয়ে কোরল। কি আনন্দে কেটেছিল তাদের দিনগুলি। আজ তার মনে হোল বৃদ্ধের অভিশাপ হয়তো লেগেছে...তাই হয়তো তাদের বিবাহিত জীবন এত দুঃখময়। শেষবার সে বৃদ্ধের ছবির নীচে ধূপ জ্বালাতে চল্ল। নির্নিমেষ নেত্রে সে ছবির দিকে তাকাল। অশরীরি কি কথা বলতে পারে! কি প্রশান্ত মুর্ত্তি। সে তাকাতে পারল না, ছবির নীচে হাঁটু গেড়ে বসে কেঁদে ফেল্ল—বাবা! ক্ষমা করুন আমায়, সত্যিই আমি আপনার বংশে কালি দিতে চলেছি। আমি আপনার পুত্রবধূ হবার যোগ্য নই, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আমায় মুক্তি দিন... মুক্তি দিন।

জয়ন্তর গাড়ীটা গাছে ঘেরা পথের বাঁকে গেট দিয়ে যখন হর্ণ দিয়ে ঢুকল, মায়া একটু চেয়ে দেখল। গত বারমাস এইরকমই হয়েছে। জয়ন্ত তার শূন্যতা দূর করেছে, তার মনের ক্ষতকে সারিয়ে তুলেছে। সে ছোট মেয়ের মত Lawn পার হয়ে তার কাছে দৌড়ে গেল এবং নিজেকে জয়ন্তর খুব কাছে এগিয়ে দিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বল্ল—"তুমি এসেছ, আমি খুব সুখী হয়েছি। আমি একা থাকতে পারিনা মোটে। এবাড়ীর ঘর দুয়ার, ছবি, আসবাবপত্র সকলে যেন আমায় গিলতে থাকে।" জয়ন্ত তার হাত ধরে বাংলোর দিকে যেতে যেতে বল্ল—সবই বুঝি মায়া। বড় শক্ত কাজ। পুরাতনকে ছেড়ে যেতে হলেই মন ব্যাকুল হয়। আর একটু ধৈর্য্য ধর। তখন নতুন পুরাতনের জায়গা অধিকার করবে। অতীতের স্মৃতির বাহন নিতে গিয়ে, বর্ত্তমানের সুখের আবেশ মূর্ত্ত হয়ে উঠবে আমাদের জীবনে। আর নিরালায় থাকতে হবে না। তোমার সব ব্যথা, সব অভাব দূরে যাবে। আমার ভালবাসা তোমায় সব সময় ঘিরে রাখবে।...জয়ন্ত চলে গেল। যাবার সময় তাকে তৈরী হয়ে থাকতে বলে গেল। আজ রাত্রেই তারা রওনা হবে।

মায়ার চিন্তার জাল ছুটে গেল। কাকড় বিছানো রাস্তায় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে খাকী সার্ট ও সর্ট পরা একজন লোক তার উদ্দেশ্যে টুপটা নাড়ল। দেখতে সে সুন্দর নয়—অপরূপ তবে স্বাস্থ্যবান। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল—মায়া! ডারলিং!

মায়া বল্ল: কিন্তু আজ তো কোন ট্রেন ছিল না।

"আমি এরোপ্লেনে এসেছি। তোমার জন্য মন বড় চঞ্চল হয়েছিল। তোমার অভাব আমি সব সময় অনুভব করি, আজ তাই এসেছি হঠাৎ, তোমায় চমকে দেব বলে। আমার বর্ম্মী বন্ধু প্রতুলতেজ পাইলটের কাজ করে। তারই গাড়ীতে এলাম।"

"তু—তুমি কি আমার চিঠি পাওনি?" মায়ার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ছিল।

"চিঠি?...না, Train timeএর আগেই রওনা হয়েছিলাম। তোমার চিঠি নিয়ে কি হবে আমার, তোমাকেই যখন পাচ্ছি

সশরীরে। সত্যি, বাগান আর লনটা চমৎকার দেখতে হয়েছে···আরও সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। কতদিন তোমায় পাইনি। তবু একটা দিন তোমার কাছে থাকতে পাব। কালই প্রতুল আবার রওনা হবে ব্যাঙ্গালোরের দিকে।

* *

আপত্তির একটা ঢেউ মায়ার মনে আছড়ে পড়ল। সেই এক কথা। মোটে একদিনের জন্য আসা। সে আসবে শুধু একদিনের জন্য তাকে জাগিয়ে দিতে। তারপর নিষ্ঠুরের মত চলে যাবে; তার ক্ষুধা জাগিয়ে। না, এবার তো তা হবে না। আর তাকে দিন গুণতে হবে না। সে কল্যাণকে সব খুলে বলবে। সে বল্ল, —"ওগো', শুনছ—আমি বলছিলাম—

কল্যাণ একটা হাত মায়ার কাঁধে রেখে, পাশাপাশি বাড়ীর দিকে চলল "লন" অতিক্রম করে। বল্ল—বড় গরম —চল আমাদের লেকে স্নান করে আসি। কতদিন ওখানে স্নান করিনি। এস, তাড়াতাড়ি।···নাও চটপট কর। যাও দৌড়ে। এঃ তুমি একেবারে কুঁড়ে হয়ে গেছ।

মায়াকে জোর করে একরকম ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, সে গেল জিনিষ পত্র উঠিয়ে রাখতে চাকরের সাহায্যে। ব্যর্থ রাগে ও ক্ষোভে মায়া নিজের ঘরের ভিতর গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল।

মায়া বালিশে মুখ গুজে কেঁদে ফেল্ল। এই স্বার্থপর লোকটা তাকে সুখী করতে পারেনি। কিন্তু বার বার বাধা দিয়েছে। মায়ার জীবনে স্বামী আজ প্রধান অন্তরায়। ও খালি নিজের সুখ নিয়ে ব্যস্ত। জানে ঘরে একটা পুতুল আছে, তাই একদিন খেলতো। বেশ তো, আজকের দিনটা ওর হোক, ও যা খুসী করুক,

কিন্তু তারপর মায়া হবে মুক্ত। মায়া উঠল। অন্যমনস্কভাবে জামা কাপড় বদলে Bathing Suit পরতে লাগল। কতদিন ব্যবহৃত হয়নি এগুলি।

কল্যাণ ততক্ষণে প্রস্তুত হয়ে, অস্থির-ভাবে বারান্দায় পায়চারি করছিল, ঠিক মায়ার দরজারই সামনে।

মায়া চেঁচিয়ে বল্ল এই, তুমি ভিতরে এসনা...কারণ ঘরে এলে মায়ার Pack করা জিনিষপত্র কল্যাণ দেখে ফেলবে।

হো হো করে হেসে দরজায় টোকা মেরে বল্ল, আসলেই বা ক্ষতি কি! আমি আসছি কিন্তু।

মায়া ভাবল কল্যাণ ঘরে প্রবেশ করবে, কিন্তু তা সে করলনা। যাই হোক, মায়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে, Swimming Costume এর উপর একটা শাড়ী আর ব্লাউজ জড়িয়ে নিয়ে তোয়ালে ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে দরজা খুলে বেরুল। কল্যাণ বসেছিল একটা আরাম কেদারায়, তাকিয়ে মায়া দেখল, তার স্বামীর শরীরের গঠন, প্রশস্ত বুক, চওড়া কব্জি...। কল্যাণ হেসে ফেল্ল, তারপর হাতটা গুটিয়ে বল্ল—দেখছ কি! এই দেখ। এই বলে সে তার মনিবন্ধ ও স্ফীত মাংসপেশীর নাচ দেখিয়ে দিল। বা! বা! তোমার Biceps কি চমৎকার। তাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই কল্যাণ তাকে একরকম টেনে নিয়ে চল্ল, একটি শিশুর মত।

প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে তারা ডাইভ করে চল্ল। কল্যাণের একটা হাত Steering এ, অন্য হাতটি দিয়ে সে মায়ার একটি হাত চেপে ধরে গাড়ী চালাতে লাগল। সে কোন কথাই বলছিলনা, শুধু মায়ার দিকে মাঝে মাঝে একটু তাকিয়ে চালাচ্ছিল। বৃক্ষবহুল অপ্রশস্ত পথগুলি অতিক্রম করে গাড়ীটা পাঁচিলে ঘেরা একটা Compound এর ভিতরে মায়ার হাতে একটু মৃদু চাপ দিয়ে সে লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ী থেকে, মায়াও নাবল।

তাদের এই গোপন স্নানের জায়গাটিতে তারা প্রায় দুবছর পরে এল। চারধারে ঘন গাছে ঘেরা তার মাঝে প্রকাণ্ড একটা পুকুর—কল্যাণের "লেক"। ঘাটের পাশে ঘন গাছ দিয়ে ঘেরা ঝোপ—সে গুল্মরাজির মধ্যে একটি তারের জালতি দেওয়া Green House, ভিতরে নানারূপ ফার্ন জাতীয় গাছ আর গোটা দুই বেঞ্চি। কল্যাণ আর মায়ার এটি ছিল প্রথম যৌবনের স্বপ্নাগার। তাদের বিবাহিত জীবনের কত দুপুর ও সন্ধ্যা কেটেছে এখানে, মৃদু আলাপনে। মায়ার মনে হচ্ছিল...সেই দিনগুলির কথা...সে যেন মোটে দুদিন আগেকার কথা। প্রথমে তারা ঘাটে এসে বসল। কল্যাণ একটি বাহু প্রসারিত করে দিল, মায়ার সুগঠিত কাঁধের উপর। মায়া হঠাৎ Spring এর মত দুহাত সরে গেল, তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল। অকস্মাৎ তার মেজাজ গরম হয়ে উঠল, কল্যাণের স্পর্শে তার সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে উঠল ... । নিজেকে সে ধিক্কার দিল—সে কেন এল এখানে। এখানে না এলেই ভাল ...। পুরোণো দিনের স্মৃতির টুকরোগুলি একটা ভাঙ্গা রেকর্ডে গ্রামাফোন পিনের মতন তার মনে বার বার বিঁধে খচখচ করছিল।

কল্যাণ ভাঙ্গল নিস্তব্ধতা...সরে যাচ্ছ কেন মায়া,...এযে সেই পুরোণো জায়গা, আমাদের মেলামেশার সেই স্বর্গপুরী...মনে আছে—সেই পিকনিকের কথা...ঐ গাছতলায় সন্ধ্যাবেলায় আমি বাঁশী বাজিয়েছিলাম, আর তুমি করেছিলে গান।

কল্যাণ তাকে চুমো খেল। মায়া কাঠের মত শক্ত করল নিজেকে। কল্যাণ চুমো খেলো একটা প্রাণহীন মাংসের পুতুলকে।...মায়া ভাবল ও যা করুক, সে বাধা দেবেনা। আজ রাতেই সে চলে যাবে কত দূরে—কল্যাণের আয়ত্তের বাইরে। মায়ার আর এ ছলনায় পা ভাল লাগে ন

কল্যাণ থামল, বল্ল, নাও চট করে তৈরী হয়ে নাও। এই বলে সে নিজের তোয়ালে ও জিনিষপত্র নিয়ে চলে গেল

দূরে একটা ঝোপের পর্দার আড়ালে। মায়া যন্ত্রচালিতের মত প্রস্তুত হোল। কল্যাণ ফিরে এসে যখন ডাকল, তার মাথায় একটা ওলট পালট হয়ে গেল। মায়া ভাবছিল, কল্যাণ যেন তার স্বামী নয় সম্পূর্ণ অপরিচিত; সে নিজে যেন. কল্যাণের স্ত্রী নয়, একটি আঠারো বছরের কুমারী। কল্যাণের কথা শুনে সে এগিয়ে গেল।

মায়া দেখল স্পষ্ট, কল্যাণ তার দিকে তাকাল না, শুধু মুহূর্ত্তের জন্য একটু ভেবে সে স্বচ্ছ জলে লাফ দিল। মায়াও নাবল, কল্যাণের পাশে মায়া চলেছে, তার দিকে সবুজ Costume পরে। ধবধবে তার পায়ের রং, ঘন কালো চুল শরীরের গঠন ঠিক Fragonard এর আঁকা তরুণীর দেহ সৌষ্ঠবের মত। কল্যাণ একবার পাশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর পুকুরের অপর পারে দিয়ে উঠল সাতরে। শীতের দিন, কনকনে জলে সাতার কাটার পর রোদটা বড়ই ভাল লাগল। তারা তাজা ঘাসের উপর গিয়ে বসল। চারধরে গাছপালা... সৌন্দর্য্যের আবহাওয়া—বেরসিক লোককেও করে তোলে রসিক। এই তো জীবন, এইরকম জীবনই তো সে চেয়েছিল। নিজের ক্ষমতা তার লুপ্ত হোল, কিসের মাদকতায় অথবা চিরন্তন অভ্যাস বশতঃ সে নিজেকে তার স্বামীর দিকে এগিয়ে দিল। মুহূর্ত্তের জন্য—তার পরেই তার মনে পড়ে গেল ভুলে যাওয়া কথা, জয়ন্তর কথা; নিরাশ হয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেল্ল। না, না, হতে পারে না, কোন লাভ নেই। কল্যাণের জন্য অপেক্ষা করে জীবনকে আর ব্যর্থ করা চলে না। জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কোরে কল্যাণ চলে যাবে কাল সকালে...তারপর আবার নিঃসঙ্গ জীবন। কল্যাণের সঙ্গে এই মুহূর্ত্তগুলিতে সে যে মাদকতা অনুভব করছে, তার অনুপস্থিতিতে সেগুলো হবে প্রচণ্ড নেশা ও উগ্রক্ষুধা। Victoria Cross এর একটা বইয়ে সে পড়েছিল একটি নায়িকার কথা, মনে পড়ল সে লাইন গুলি"—Fiercely, with one of this swift waves, which were part of her unreasoning nature, she hated him, she wished she had never seen him"

তার নিজের অবস্থাও আজ সেইরকম। অকারণ ঘৃণায় সে নিজেকে সরিয়ে নিল কল্যাণের বাহু থেকে। কল্যাণকে দেখে তার সর্ব্বাঙ্গ জলে যেতে লাগল, ক্ষোভে। প্রাণপণে মায়া চেষ্টা করল কল্যাণকে সব খুলে বলতে। কিন্তু বলতে গিয়ে তার আটকে গেল···কেন তা সে জানে না। মনের মধ্যে একটা নিয়ত দাহনে সে জর্জ্জরিত হয়ে কেঁদে ফেল্ল—এক ধাক্কা দিয়ে

কল্যাণকে সরিয়ে সে পাগলের মত বিছানা দিয়ে দেহটাকে ঢেকে, ফটকের কাছে ছুটল, তারপর গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে রওনা হোল। কল্যাণ বিহ্বলের মত বসে রইল।

* * *

মায়া বিকেলে দরজা খুলে দেখল তার স্বামী বসে রয়েছে আরাম কেদারায়। ক্লান্তিতে তার দুচোখ ভরা ঘুম, অবসাদে তার দেহ আচ্ছন্ন, হাওয়ায় তার চুল উড়ছিল প্রশস্ত কপালে। মায়া থমকে দাঁড়াল, হঠাৎ তার মনে হোল, সে আজ কিছু খায়নি। খাবার ঘরে গিয়ে দেখল, টেবিলে সব সাজানো, দীলিপ স্পর্শও করেনি। অনুশোচনায় মায়ার মন ভরে গেল···লোকটা অতটা পথ অতিক্রম করে এল, খায়নি কিছু। তাছাড়া মায়া এসেছে গাড়ী নিয়ে, কাজেই বেচারাকে চার মাইল পথ হেঁটে আসতে হয়েছে।

পাশে তিন পায়া টেবিলে একটা চিঠি লেখার প্যাড, আর একটা ফাউনটেন পেন্। চিঠিটা অসমাপ্তই রয়ে গেছে। দীলিপ লিখেছে···

"মায়া, তুমি কি জাননা, আমি তোমায় কত ভালবাসি। তোমাকে আমি জীবনে প্রথম ভালবেসেছি, তারপর অন্য কোন মেয়ের দিকে একবারও তাকাই নি, তুমি তা' জান; জান নাকি? তুমি আছ বলেই তো আমার এত আনন্দ, তাই তো বিদেশে খাটবার মত বুকে বল পাই। তুমি আমায় একেবারে অধিকার করে ফেলেছে...তোমায় আমি কখনও ছাড়তে পারবনা। আমার শরীর যখন বিদেশে, আমার মন থাকে তোমার কাছে। আমি চাই, তোমাকে নিবিড় করে চাই······

মায়া ডাকল—ওঠ! শুনচ? দীলিপ ধড়মড় করে চমকে উঠল, লজ্জায় তার গাল লাল হয়ে উঠল। মায়ার হাতে তার চিঠি। মায়া বল্ল—খাওনি কেন? উত্তর এল, তুমি খাওনি তাই।

দীলিপ হাত বাড়িয়ে দিল। সে দৃষ্টি সে আহ্বান মায়া অগ্রাহ্য করতে পারল না; তার স্বামীর কাছে এগিয়ে গেল। দীলিপ আর একবার চেষ্টা কোরল মায়াকে আলিঙ্গন করতে। মায়া বাধা দিল না, তার চুম্বনের প্রতিদানও দিল; তারপর হঠাৎ নিজেকে মুক্ত করে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল না, না—এ হতে পারে না; আমি তোমায় একটা কথা বলতে চাই সোজাসুজি, শোন। আমি...

দীলিপ তার ঠোঁট চেপে ধরে বল্ল—শুনতে আমি চাই না কিছু। তোমার সঙ্গে এই রকম ভাবে আমায় থাকতে দাও। এই যদি আমার জীবনের শেষ দিনও হয়, তাও আমি চাই···এই রকমে তোমার পাশে থাকতে...।

দীলিপের চুম্বনের স্রোতে মায়া কথা বলবার অবকাশই পেল না; হতাশ হয়ে সে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল করে দিল।

দীলিপ বল্ল শুধু চুমো খেয়ে পেট ভরে না, চল খাই গিয়ে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দীলিপের কি হয়েছে আজ, হাসি তার ফুরোয় না, যত মজার গল্প আর প্রসঙ্গ। মায়া অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকতে চেষ্টা কোরল। কিন্তু দীলিপের হাসির ছোঁয়াচ লেগে তাকেও হাসতে হোল···কিন্তু মনে একটা কাঁটা।

মায়ার উত্তরের অপেক্ষা না করে দীলিপ অনর্গল ছেলে মানুষের মত বকে যেতে লাগল, তার দুএকটা হয়তো মায়ার মনে একটু আঁচড় টানছিল।

মায়া হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল—বল্ল, যাই, কাজ কর্ম্ম আছে। দিলীপ বাধা দিল না। মায়া যাবার পর সে লাইট নিবিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের দুয়ার ভেজিয়ে শুয়ে পড়ল। মানসিক উত্তেজনা ও অবসাদে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

* * *

একটা গাড়ী এসে থামল। মায়া ছুটে গেল...জয়ন্ত এসেছে। ক্ষীণস্বরে সে বল্ল—সে এসেছে। জয়ন্ত গম্ভীর হোল, বল্ল—আসুক, সে জানে কি?

উত্তর হোল—বোধ হয় না।

জয়ন্ত—তবে জানাওনি কেন। যাও বল গিয়ে। জীবনকে উপভোগ করতে হলে ভীতু হলে চলবে না। আমার কোন পাপ

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের
নবতম অবদান
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের
আলিবাবা
ঃ পরিচালক ঃ
মধু বোস
সঙ্গীতে
নৃত্যে
অভিনয়ে
এক অপূর্ব্ব
মায়াজাল
সৃষ্টি করিবে।
মর্জ্জিনার ভূমিকায়
শ্রীমতী সাধনা বোস

করছি না, জীবনকে পূর্ণভাবে অনুভব করতে চলেছি। তোমার স্বামী বেরসিক হলেও সে sportsman—তার সঙ্গে বোঝা পড়া করা দরকার। মায়া—আস্তে ও শুনতে পাবে। আমি পারবো না; আমায় ভুল বুঝোনা, সারাদিন ধরে আমি বলতে চেষ্টা করেছি···পারিনি...মুখে কথা আটকে গেছে।

জয়ন্ত—হু! তবে আমিই যাচ্ছি, তাকে বলতে। তার কোন অধিকার নেই তোমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার। সে তোমায় পাবার যোগ্য নয়। সে জীবনকে অনুভব করতে জানে না। সে তোমায় ভালবাসেনা।

"ভালবাসেনা" কথাটা মায়ার মুখে চাবুক মারল; সে রুদ্ধস্বরে বল্ল—বল কি করতে হবে। দোহাই তুমি যেওনা, যা বলবার আমিই বলব। একটি দিন তাকে শাস্তি দাও।

মায়ার অসীম বল বুকে এলে চল্ল দীলিপকে বলতে! সত্যিই তো দীলিপের কোন অধিকার নেই তার উপর। কিন্তু!···দীলিপ সারাদিন কি ভালবাসাই বেসেছে তাকে আজ! মায়া নিষ্ঠুরের মত তাকে নিরাশ করেছে।···না, না···এসব অসুস্থ মস্তিষ্কের উত্তেজনা। জীবন তার চাই, চাই আনন্দ... দীলিপকে বলতেই হবে।

* *

মায়া ফিরে এল, বল্ল—পারলাম না। জয়ন্ত ক্ষমা কর আমায়—আমি দিলীপকে ভালবাসি, তোমাকেও ভালবাসি। তবে দীলিপ আজ আগে এসেছে...First Come First Served···বিদায় বন্ধু! আমি তোমার যোগ্যসঙ্গিনী নই, জীবনকে তোমার মত রঙ্গিন করে দেখবার স্বপ্ন আমার আছে, কিন্তু সাধ্য নেই। তুমি বুঝবে না, আমি কত বুঝেছি!...তুমি একটা ধূমকেতু, আমার মত নারী তোমার আটকাতে পারবেনা, সুখী করতে পারবে না।

মায়া কেঁদে উঠল। তার হাতটি জয়ন্তের হাতের মুঠোয় থর থর করে কেঁপে উঠল। জয়ন্ত বল্ল, তবে তাই হোক মায়া, একবার শেষ ভেবে দেখ।

মায়া আকুল হয়ে বল্ল—আর ভাবিও না আমায়, যা খুশী কর আমায় নিয়ে। আমার আমিত্ব লোপ পেয়েছে। মনের যে অবস্থা নিয়ে তোমায় আহ্বান করেছিলাম —সে মায়া মরে গেছে। তুমি বিরাট, তুমি পুরুষ, তুমি আমায় ভুলতে পারবে··· আমি যতই শিক্ষিতা হইনা কেন আমি মেয়ে···দুঃখ আমাদের জন্মসাথী। তুমি যা হয় ঠিক কর এবার।

জয়ন্ত বল্ল—মায়া, জোর করে আমি তোমায় ক্ষুধার্ত্ত বাঘের মত অধিকার করতে চাইনা। শোন, আমি লম্পট নই; আমিও Sportsman···শোন, তুমি আমার সঙ্গে গেলে যা হোত, না যাওয়াতে তোমার উপর ধারণা আমার আরও উচু স্তরের হোল। সত্যি—তোমার মত মনের অবস্থায় পড়লে আমি পাগল হয়ে যেতাম। বিদায়···।

* * *

মায়া ফিরল, কিন্তু সব অন্ধকার। দীলিপ" বারান্দায় নেই তার দুয়ার ভেজান, বাত্তি নেভান···কোথাও নেই সে। তবে কি দীলিপ সব জানে? মায়া তার স্বামীর ঘর তন্ন তন্ন করে খুজলে, শেষে মেঝের কোনে একটা কারপেটের উপর তার স্বামীকে দেখতে পেল, বড় ভয় হোল তার। সারাদিনের দুর্ব্ব্যবহারে লোকটা কি আত্মহত্যা কোরল। নীচু হয়ে সে ডাকল—ওগো

(শেষাংশ ৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাগর পাখীর ডানা

দিলীপ দাশগুপ্ত

সাগর পাখীর কেঁপে ওঠে ডানা
ডাগর তাহার চোখেতে যে মানা
আকাশে তাহার ছায়া যেন পড়ে
বাতাসে আকুল 'ক্যামেলিয়া' ঝরে
গন্ধের সুরে ধীরে শোনা যায়
ছন্দের মতো মৃদু সুর হায়
শাপে যেন কার সাগরের বুকে
কাঁপে আর কাঁপে বেদনার সুখে
হেলেন তাহার আখির স্বপনে
মেডেন্-হেয়ার্ পাতার কাঁপনে
কুয়াশার মাঝে যায় তা' হারায়ে
উষার প্রথম শিহর জাগায়ে
ভালো লাগে সেই সাগর পাখীর
আলো মরে গেল যাদের আঁখির

সাহারার বুকে লেগে
শিহরায় জেগে জেগে
বাদলের সন্ধ্যায়—
অভিনব লজ্জায়।
ভেনাসের নিঃশ্বাস
একাকিনী মধুমাস।
প্রভাতীকালের তারা
তারা যেন প্রিয়হারা।
সাগরের বুকে রেখে
বারেবারে যারে দেখে
অরফীউসের গানে
কেন তাহা কেবা জানে!
ডানা কেঁপে কেঁপে চলা—
হ'ল নাকো কিছু বলা।

আমাদের সত্যিকার জীবন ভোগবিলাসের নয়

বলচেন : জিন হার্লো   লিখচেন : কিরণশঙ্কর গুপ্ত

জিন হারলো

[মায়াবিনী মেয়ে এই জিন হার্লো, চোখে যার যাদু। চুল কালো, চোখে আলো। কী ভালো নয় জিজ্ঞাসা করি আপনাদের! পরীর দেশে হলিউডে ষ্টারদের দিনগুলো সাধারণতঃ কী করে কেটে থাকে এখানে তারই একটু আভাস দিচ্ছেন চাক্রবর্তী।]

আমি অনেককেই অনেক সময়ে বলতে শুনেছি যে চলচ্চিত্রের ষ্টারদের ভোগ-বিলাসী জীবন দেখে তাদের নাকি রীতিমতো হিংসে হয়। অত্যন্ত ভালো কথা! মেট্রো-গোল্ডুইন মেয়ারে আমার নিজের কর্ম্মময় দিনগুলোর একটা ছোট্ট নক্সা এখানে আমি এঁকে দিচ্ছি, আপনারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রুটিনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে দেখতে পারেন এটা।

সর্ব্বপ্রথম ভোরের ঘড়ির ছয়টা পনেরো মিনিটের থেকেই আরম্ভ করা যাক। আমার মনিব আজকে এতো সকালে আসবেন না সুতরাং একটু দেরী হলে কোন ক্ষতি নেই।

এরকম আরামদায়ক কল্পনা করে ঘড়িটাকে দশ-পনেরো মিনিট এদিক ওদিক করে রাখলে চলবে না; নটার সময়ে সমগ্র দলবল সাগ্রহে 'সেট'এ প্রতীক্ষা করতে থাকে এবং আমি সেখানে না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রোডাকসানের (production) কাজ আর হয়ে ওঠেনা।

কাজে কাজেই যত আরামেরই হোক্ না কেন, ছটা পনেরোয়ই অগত্যা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে হয় আমাকে। সাত তাড়াতাড়ি পোষাক প'রে ভোরের খাওয়া খেয়ে নিতে হয়। সাড়ে সাতটার সময় আমি একেবারে মেট্রো ষ্টুডিয়োর প্রসাধন কক্ষে। আঙ্গুল বুলিয়ে মাথার চুলগুলো আলগোছে ঠিক করেনি, পরিচ্ছদাগার থেকে ভালরকম ইস্তিরি করা জামাকাপড় বেছে এনে আবশ্যকমত সাজগোজ করি। আর তারপর এখানে দ্বিতীয় এক কাপ কফি খেয়ে নিয়ে সেদিনকার নির্দ্দিষ্ট দৃশ্যগুলোর জন্যে আমার নিজের পার্টগুলো একবার দেখেনি। ওদিকে নটা বাজলো বুঝি! ঠিক নটার সময় আমাকে 'সেট'এ কাজের জন্যে তৈরী থাকতে হয়।

তারপর অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গেই ছবির কাজ আরম্ভ হয়ে থাকে। পরিচালক এবং ক্যামেরাম্যানের গঠন প্রণালীর জন্যে, আলো আর 'সেট' সাজাবার জন্যে, মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিয়ে সেদিনের দৃশ্যগুলো তোলা হয়। পরিচালকের মনমত হওয়া চাই সব। আর এরজন্যে অনেক দৃশ্যই পুনঃ পুনঃ তোলা হতে থাকে।

দুপুর বেলা Lunchএর জন্যে ছুটী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু খাবার খাওয়ার এই একটি ঘণ্টা যে বিশেষ স্বাধীনতা এনে দেয় তা' নয়। এ সময়টুকু তো আমার চুল আর 'মেকআপ' পুনরায় ঠিক করতে আর বিকেলের পার্টটা দেখে নিতেই কেটে যায়। Lunch এর সময়ে কোনরকমের গুরু আহার করা আমার অভ্যাসের বাইরে। সাধারণতঃ একবাটি 'সুপ' কি এক কাপ চা হলেই যথেষ্ট। কারণ আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে এসময়ে খাবারের পরিমাণ অল্প হলেই নিজের কাজে আমার ভালরকম একনিষ্ঠতা আসে।

একটার সময়ে 'সেট'এ ফিরে গিয়ে আবার কাজ আরম্ভ করতে হয়। তখন থেকে একেবারে সন্ধ্যা ছটা, ছটার পর

সেদিনকার মতো কাজ শেষ হলো—তবু যাহোক। এই তো গেল আমার ফিল্মের হয়ে মোটামুটি কাজ করবার কথা; কিন্তু আমার সত্যিকার কাজের পরিসমাপ্তি হয়নি তখনো।

সেটের কাজ শেষ করে পরিচ্ছদাগারে ফিরে গিয়ে আমাকে অন্যান্য দিনের ব্যবহার করবার Costume গুলোও পরীক্ষা করে নিতে হয়। তারপর প্রক্ষেপণ গৃহে ঢুকে সেদিনকার তোলা ছবির দৃশ্যগুলো দেখি একবার। তারপর আবার প্রসাধন কক্ষে ফিরে 'মেকআপ' অপসারিত করে রাস্তায় চলবার উপযুক্ত পোষাক পরিধান করে বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হই আরকী।

বাড়ী পৌঁছে রীতিমত অঙ্গমর্দ্দন করে স্নান সমাপন করি! তারপর রাতের উপযোগী করে মস্তক প্রক্ষালন ইত্যাদির জন্যে 'হেয়ার ড্রেসারের' কাছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটিয়ে ভালো করে খেয়ে নিয়ে পরের দিনের দৃশ্যগুলোর পার্ট দেখেনি। সকালেই শুতে যেতে হয়, তার কারণ বিশ্রামের অভাব আর ক্যামেরার নির্দ্দয় ক্লান্তিকর আলো চোখ দুটোকে যেন আগে থেকেই ঘুমের প্রলেপ মাখিয়ে রাখে।

পিয়াসা

(৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শুনছ! তবু কোন উত্তর না পেয়ে সে দীলিপের নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা হাত দিয়ে দেখতে গেল। তার হাতে ঠেকল গরম একফোঁটা জল, কারপেট ভিজে গেছে। মায়া তার মনের দ্বার খুলে দিল—ওগো, তুমি কাঁদছ? আমায় ক্ষমা কর, বড় কষ্ট দিয়েছি তোমায়, না? মায়া দীলিপের মাথাটা কোলে টেনে নিল, দীলিপ রুদ্ধস্বরে বল্ল—আমি ভাবিনি মায়া ফিরে আসবে তুমি। মায়া তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বল্ল—তুমি কি জানতে …! দীলিপ বল্ল—হাঁ।

মায়া…"তবে আমায় বলনি কেন?"

দীলিপ— আমি জোর করে চাইনি তোমায়; সারাদিন ধরে কত ভালবাসি তোমায় তা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। তাতে কোন ফল হোলনা দেখে ভাবলাম, তোমার যা মনে হয় তাই কর। সত্যিই তো তোমায় সুখী করতে পারিনি—অন্যে যদি তোমায় সুখী করতে পারে আমার আপত্তি কি?

মায়া বল্ল এখন বুঝতে পাচ্ছি, সত্যিই আমি জয়ন্তকে চাইনি। চেয়েছিলাম তোমায় কিন্তু তোমায় পাইনি। তাই দুরন্ত অভিমানে মনে করেছিলাম তোমায় ভালবাসিনা। জয়ন্তকে যত চুমো খেয়েছি, সে সমস্ত তোমারই জন্য সঞ্চিত ছিল। যা হয়ে গেছে ক্ষমা কর আমায়। তবে এবার আমি আর শুনছিনা, আমি এবার তোমার সঙ্গে যাবই…এই একা থেকেই তো আমার দেহমন পাগল হয়ে উঠেছিল তোমার জন্য। না, তুমি কোন বাধা দিওনা। আমি চাই না এ বিলাস ও আসবাব, আমি চাই তোমাকে। তুমি খাটবে ওখানে, আর আমি এখানে থাকব, তা' হবে না—আমিও থাকব তোমার পাশে। একটা ছোট ঘর নিয়ে, কষ্টে থাকতে পারব আমি। আর অপেক্ষায় রেখো না, মা হতে সাধ গেছে আমার।

মায়া লজ্জায় আর বলতে পারলনা। দীলিপ বুঝল—বল্ল, মায়া, আর আমায় যেতে হবে না বর্ম্মায়, তোমার কাছেই থাকব। কারবারে যথেষ্ট লাভ হচ্ছে। ওখানে লোক নিযুক্ত করে ভেবেছিলাম হঠাৎ একদিন তোমায় আশ্চর্য্য করে দেব এসে। কিন্তু তার আগেই পেলাম তোমার চিঠি। তখনই প্রতুলের এ্যারোপ্লেনে করে চলে এলাম, একবার শেষ চেষ্টা করতে; আমি জানি তুমি আমায় ভালবাসো। এসো…আর আর কোন ব্যবধান থাকবে না—আমাদের।

পরিচালক
ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
৯, রামময় রোড, কলিকাতা

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি'

টেলিফোন পার্ক ৩২৪

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৬

সাধু শরৎচন্দ্র !

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু পদত্যাগ করিয়াছেন। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট সদস্যবৃন্দও শরৎ চন্দ্রের অনুগমন করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র প্রভৃতির পদত্যাগের ফলে বহু আয়াসলব্ধ ঐক্যের ভিত্তি ধ্বংস হইয়াছে এবং ডাঃ বিধানচন্দ্রের অনুগামী দলের প্রাবল্য হেতু পার্লামেণ্টারী বোর্ডে জাতীয় দলের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য মনোনয়ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কাণ্ডারীগণ যে দলগত গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন না তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ মিলন-মরীচিকার অনুধাবন করিয়া স্বীয় মত-স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলেন। সুখের ও আনন্দের বিষয় যে শেষ মুহূর্ত্তেও শরৎচন্দ্রের মিলন-মোহঘোর কাটিয়াছে এবং তিনি বৈধানিক দলের ষড়যন্ত্রের নাগপাশে নিজেকে আবদ্ধ না করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ পদত্যাগ করিয়াছেন। আমরা মিলন-বার্ত্তা উন্মেষের আরম্ভ হইতেই সতর্কবাণী দিয়া আসিতেছিলাম যে, রায়-রুণী-প্যাক্টের প্রবর্ত্তক ও সমর্থকদিগের সহিত আদর্শবাদী কংগ্রেস-কর্ম্মীর মিলন অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইতিপূর্ব্বে শরৎচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামিগণ আমাদের এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন নাই বরং মিলন-মোহ-চক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে আত্মসমর্পন করিয়া এক স্বপ্নলোকে বিরাজ করিতে-ছিলেন। ষড়যন্ত্রীদের কঠোর আঘাতে শরৎচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামিবৃন্দের মিলন-স্বপ্ন টুটিয়াছে দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। শরৎচন্দ্রের Moral Lepers-দের সহিত সহযোগীতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমাদের অবোধগম্য। মন্ত্রীত্ব-প্রয়াসী প্রচ্ছন্ন মডারেটদিগের সহিত স্বাধীনতাকামী শরৎচন্দ্রের সহ-যোগীতা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। বিপরীতমুখী আদর্শের উপাসকদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন যে সম্ভব নহে শরৎচন্দ্রের ন্যায় বিচক্ষণ নেতার পক্ষে ইহা বুঝিতে যে এত বিলম্ব হয় তাহাও বিস্ময়ের বিষয়। যাহা হউক, শেষ মুহূর্ত্তেও যে শরৎচন্দ্র মন্ত্রীত্বকামীদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিলেন তাহাতে আমরা অতীব আনন্দিত ও প্রীত হইয়াছি। আমরা রাহুগ্রাসমুক্ত শরৎ-চন্দ্রকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু এতদ্প্রসঙ্গে আমাদের সন্দেহশঙ্কুলমনে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বিধানচন্দ্রের উক্তির—Sj. Sarat Chandra Bose's wrath like the proverbial spark kindles suddenly and disappears equally quickly প্রতিধ্বনি উকিঝুঁকি মারিতেছে। রায়-রুণী প্যাক্টের ফলে কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী পরাজয়ের পর শরৎচন্দ্র অনুরূপ তেজস্বীতাপূর্ণ বিবৃতি প্রদান করিয়া-ছিলেন কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার প্রদীপ্ত রোষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল এবং তিনি বিধানী দলের সহিত আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন। পাঞ্জাব পরি-ভ্রমনের সময় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া আসিয়া বাংলার শ্যামল ক্ষেত্রে পদার্পন করিতে না করিতেই শরৎচন্দ্র Bengal's heresy বিস্মৃত হইয়া India's orthodoxyতে আত্মসমর্পন করিলেন—উডবার্ণ পার্কে পণ্ডিত জহরলালের আতিথ্য গ্রহণে কোমলহৃদয় শরৎচন্দ্র স্বীয় সঙ্কল্প বিসর্জ্জন দিলেন—দলগত অনুগামীদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া এবং

কোন কোন ক্ষেত্রে দলগত অনুচরদিগকে শত্রুপক্ষে নিক্ষেপ করিয়া শরৎচন্দ্র বাংলা কংগ্রেসের মিলন-বেদীতে আচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মিলনের স্তবগানের মধ্যে অপর পক্ষের অভিনয় পরিস্ফুট হইলেও আচার্য্যরূপী শরৎচন্দ্র অন্ধ হইয়া রহিলেন। যাহা হউক, মিলনের বিষক্রিয়া যে এত শীঘ্র এইরূপ তীব্র প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হইবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন শরৎ-বিধানের প্রেমালিঙ্গনে তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলীর যুক্তি-পূর্ণ প্রশ্নাবলীর উত্তরে রায়-রুণী প্যাক্টের প্রবর্ত্তক পার্লামেণ্টারী অধিপতি বিধানচন্দ্র গালভরা আদর্শের কথা বলিয়া শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের অন্তরালে আত্ম গোপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বাংলা কংগ্রেসের শঠতাপূর্ণ মিলনের অভিনয়ের অবসানে আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি—কারণ, যেখানে আদর্শগত পার্থক্য আছে আমরা সেইরূপ মিলনে বিশ্বাস করি না। আর, শরৎচন্দ্রকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে—Truth emanates from the glorious minority of one. আদর্শবাদী নেতা শরৎচন্দ্রকে আমরা সেই আদর্শের অনুসরণ করিতে বলি।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পদত্যাগ

মিলনের অবসান ! নব রূপে নবরত্ন ! বিশিষ্ট সদস্যদের সংশ্রব বর্জ্জন

বহুবিনিন্দিত মিলনের পরিণতি ও জটিল অবস্থার উদ্ভব

গত রবিবার পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভা-অধিবেশনের পর জনমত বিরোধী বৈধানিক দলের স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দ বাংলা কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ড হইতে সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গত রবিবার পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভায় ব্যালট সাহায্যে গৃহীত ভোটের জোরে যাহারা মনোনীত হইয়াছেন এবং যাহাদিগের মনোনয়নকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা কংগ্রেসের বহু বিনিন্দিত মিলন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে তাঁহাদের ও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। মিঃ পি ব্যানার্জ্জি (২৪ পরগণা পল্লী), প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর হালদার।

২। শ্রীযুত নলিনী অধিকারী (দিনাজপুর), প্রতিদ্বন্দ্বী—শ্রীযুত নিশীথনাথ কুণ্ডু।

৩। শ্রীযুত নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পাবনা) প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী।

৪। শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায় (ঢাকা) —প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত ধীরেশ চক্রবর্ত্তী।

৫। শ্রীযুত কামিনী কুমার দত্ত (ত্রিপুরা), প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

৬। শ্রীযুত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র (নোয়াখালি)—প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত হরেন্দ্র সুর

৭। শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ (ময়মনসিংহ)—প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায়।

৮। ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায় (ফরিদপুর), প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত সুরেন্দ্র বিশ্বাস।

৯। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল (প্রেসিডেন্সী সহর কেন্দ্র), প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না—মনোনয়ন দেওয়া হইবে কিনা এই বিষয়ে ভোট গৃহীত হয়।

গত রবিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া এবং দক্ষিণ কলিকাতার কেন্দ্র হইতে এসেম্বলি নির্ব্বাচনে স্বীয় নাম প্রত্যাহার করিয়া পার্লামেণ্টারী বোর্ডে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু ও তাঁহার অনুগামিগণের ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত খাদি-দলের পদত্যাগের ফলে প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড রায়-রুণী নাটকের নটরাজের ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিণত হইল।

[বিলাসী]

পণ্ডিত মশাই

সুধীর দাসের প্রযোজনায় পপুলার পিকচার্স কর্তৃক কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত

কথা ও কাহিনী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা ও চিত্র-নাট্য } সতু সেন

প্রধান যন্ত্র-শিল্পী—মধু শীল

শব্দযন্ত্রী—জগদীশ বসু

আলোক-চিত্র-শিল্পী—সুরেশ দাস

সুর-শিল্পী—কমল দাশগুপ্ত

ভূমিকা লিপি: বৃন্দাবন—রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ...—রবি রায়, ঘোষাল মশাই—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, তারিণী—যোগেশ চৌধুরী, গোপাল ডাক্তার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নিধু—প্রফুল্ল দাস, চরণ—সাগরিকা, কুসুম—শান্তি গুপ্তা, বৃন্দাবনের মা—প্রভা, ব্রজেশ্বরী—রেণুকা ঘোষ, ব্রজেশ্বরীর মা—রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি।

পরিবেশক—রীতেন এণ্ড কোং

প্রথম মুক্তি—"শ্রী", শনিবার, ২৮শে নভেম্বর '৩৬

পণ্ডিত মশাই পল্লী-জীবনের এক নিখুঁত আলেখ্য। নেই এতে নাচওয়ালীর ঘুঙুরের রিণিঝিনি আওয়াজ আর চটুল চাহনী; নেই এতে যৌবনোদ্গম যুবতীদের যৌবন-বিচ্ছুরিত আধ-আলো, আধ-ছায়া; নেই এতে হাইহিল্ জুতো, প্যারাসোল আর পেখম-তোলা ব্লাউজ।—আরও সব কত কী! তবে "পণ্ডিত মশাই"-এ আছে কী? "পণ্ডিত মশাই"-এ আছে পল্লীর একটি সরল আড়ম্বরহীন জীবনের মধুর কাহিনী—রূপ, রস ও গন্ধে তা' রূপ পরিগ্রহ কোরেছে জীবন্ত মূর্ত্তি নিয়ে। সস্তা দামের বস্তা ভরানোর কোনও উপাদান নেই এতে, তাই দাঁড়ি-পাল্লার মাপকাঠিতে ওজন কোরে এর গুণাগুণ কেউ নির্দ্ধারিত কোরতে পারবেন না।—সে নিজগুণেই নিজেই বিকশিত।

"পণ্ডিত মশাই" শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এর কাহিনীর সহিত বাঙলার পাঠকসমাজের পরিচয় আছে অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে—তাই গল্পটির আমূল পুনরুল্লেখ না কোরে সংক্ষেপে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ কোরছি। কুসুম যখন পাঁচ বছরের তখন তার বিয়ে হয় বৃন্দাবনের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের পরই কুসুমের মায়ের দুর্নাম রটায় বৃন্দাবনের বাপ গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ কোরে, ছেলের আবার বিয়ে দেন। এদিকে গর্ব্বিতা কুসুমের মাও একজন আসল বৈরাগীর সঙ্গে মেয়ের কণ্ঠি-বদল করান কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে সে বিধবা হয়। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে গৌরদাস, ও' বৃন্দাবনের দ্বিতীয় স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পপুলার পিকচার্সের "পণ্ডিত মশাই" চিত্রে কুসুমের ভূমিকায় নেমেছে শান্তি গুপ্তা

এখন বৃন্দাবন পঁচিশ, ছাব্বিশ বছরের যুবক আর কুসুম ষোড়শী। বৃন্দাবন জমিজমার তদারক করে আর পাঠশালায় দুঃখী চাষাভূষোদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখায়। কুসুম দুঃখী বোকা ভাই কুঞ্জনাথের গলগ্রহ হ'য়ে অতিকষ্টে দিন কাটায়। তবে এই কয়বছরের ভেতর এই দুই পরিবারের মনের কালি অনেকটা মুছে গেছে—এমন কী বৃন্দাবনের মা বউকে আবার ঘরে নেবার জন্যে কুঞ্জনাথের বাড়ীতেও গেলেন কিন্তু কুসুম সে প্রস্তাব ঠিকভাবে গ্রহণ না করায় এদের পুনর্মিলন তখনকার মত সম্ভবপর হয় নি। এদিকে বৃন্দাবনের মায়ের সাহায্যে সনডাঙ্গায়

অবস্থাপন্ন গোকুল বৈরাগীর মেয়ে ব্রজেশ্বরীর সঙ্গে কুঞ্জনাথের বিয়ে হয়।

এমনিভাবে নানা ঘটনার ভেতর দিন চলে। এদিকে বৃন্দাবনদের গ্রামে বাড়লো মহামারী দেখা দিল—এতে গ্রামশুদ্ধ উজাড় হ'তে লাগল। বৃন্দাবন মাকে অন্যত্র নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরল—কিন্তু গৃহদেবতাকে পরিত্যাগ কোরে তিনি অন্য কোথাও যেতে রাজী হ'লেন না। বৃন্দাবনের গৃহেও বিসূচিকা রোগ দেখা দিল—তা'তে বৃন্দাবন মা হারালো, একমাত্র পুত্র চরণকেও হারালো। চরণের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কুসুম নিজের দেমাক ভুলে ছেলেকে রক্ষা কোরতে এসেছিল—কিন্তু তা' পারেনি। তাই সে নিজ হাতে ছেলেকে তুলে দিল চিতায় তুলে দেবার জন্যে। তারপর বৃন্দাবন আর সে বাড়ল ত্যাগ কোরে কোথায় চলে গেল তা' কেউ জানে না।

এই হ'চ্ছে গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। এই জিনিষটাকে চিত্র-নাট্যকার বাহুল্যাংশ ছেঁটে কেটে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন যে ঘটনার পর ঘটনা তা' চোখের সামনে জীবন্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

পরিচালনা কার্য্যে সতু সেন সত্যই আমাদের চমৎকৃত কোরেছেন। টিকি, তেলক ও খোলকরতালের ভেতরও যে এমন মধুর রস সঞ্চিত থাকে তা' কেউ ধারণাই কোরতে পারে নি এতদিন। এমন পেঁয়াজ রসুন বর্জ্জিত ছবির পরিচালনা এমন সুষ্ঠুভাবে সেন মশাই কোরেছেন, তার জন্যে তাঁর সাহস ও গুণ দু'য়েরই আমরা প্রশংসা করি। মোট কথা, ছবিখানার পরিচালনা হ'য়েছে ঝরঝরে—তকতকে।

আলোকচিত্রের কাজেও সুরেশ দাস আমাদের মুগ্ধ কোরেছেন। তার কাজ আগাগোড়াই সুন্দর—কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর রাত্রি ও শ্মশানের দৃশ্যের আলোছায়ার সামঞ্জস্য;

শব্দযন্ত্রের কাজ দু' এক জায়গা ছাড়া উচ্চশ্রেণীরই হ'য়েছে।

আবহাওয়া সঙ্গীতে ও ভাব-সঙ্গীত (Mood Music) ছবিখানার অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। এ বিষয়ে কমল দাশগুপ্ত সত্যই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন

অভিনয় কোরেছেন রবি রায় কুঞ্জনাথের ভূমিকায়। তার বোকা অথচ সময়ে বুদ্ধিমানের দুই বিভিন্নরূপের পরিকল্পনা হ'য়েছে নিখুঁত। রবিবাবু এর চেয়ে ভাল চিত্রাভিনয় এর পূর্ব্বে করেন নি—এই আমাদের ধারণা। রথীন বাড়ুয্যের

পপুলার পিকচাসের "পণ্ডিত মশাই" চিত্রে কুঞ্জনাথের ভূমিকায় রবি রায়

সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ বাড়ুয্যে মশায়ের মতই প্রশংসা পাবার যোগ্য। রসায়নাগারের কাজ, সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট সম্বন্ধে অভিযোগ করবার কিছু নেই।

অভিনেতৃবর্গের ভেতর সবচেয়ে ভাল বৃন্দাবনও আমাদের ভাল লেগেছে। তার ভেতর বৈষ্ণবভাবটা বেশ ফুটে উঠেছে। শান্তির কুসুম দেখে কেউ নিন্দে কোরবে না এবং তার চলাফেরার ভেতর জড়তা আগের চেয়ে অনেক কমেছে দেখে

সবাই খুশী হবে। প্রভার বৃন্দাবনের মধুর ভেতর মাঝে মাঝে মঞ্চের সুর বেজে উঠলেও, মোটের ওপর তার অভিনয় সবাই পছন্দ কোরবে। চরণের ভূমিকায় ছোট মেয়ে নাগরিকা সবাইকে মুগ্ধ কোরেছে। রেণুকা ঘোষ ব্রজেশ্বরী মন্দ করেন নি---কিন্তু তাঁর গলাটি 'মাইকে' লাগ খায় না আর ক্যামেরা-ভূতকে তিনি বড় বেশী ভয় কোরছিলেন দেখলুম। অন্যান্য ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্ল দাস, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি এক একটি 'টাইপ' সৃষ্টি কোরেছেন। বৈরাগীদ্বয়ের গান ভাল লাগল।

মোটকথা "পণ্ডিত মশাই" একখানা দেখবার মত ছবি হ'য়েছে। সবাই মা, বাপ, ভাই, বোন, ছেলেপিলে প্রভৃতিকে নিয়ে এই ছবি একসঙ্গে দেখে আনন্দ উপভোগ কোরতে পারেন।

পরিশেষে আমরা এই ছবির সাফল্যের জন্যে দায়ী অন্য দু' ব্যক্তি—প্রযোজক সুধীর দাস ও প্রচার-কর্ত্তা হারু চাটুয্যেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কোরে বিদায় গ্রহণ কোরছি।

শ্রীগিরিজা নাথ পাল চৌধুরী

নদীয়ার দানবীর কৃষ্ণ পান্তির বংশধর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী নদীয়া ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগিরিজা নাথ পাল চৌধুরী বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ কমার্স কেন্দ্র হইতে আসন্ন এ্যাসেম্ব্লি নির্ব্বাচনে পদপ্রার্থী হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

নিউ থিয়েটার্স

আমরা যা' বলেছিলাম তাই সত্যি হ'ল। দেবকী বসু নিউ থিয়েটার্সে ঢুকেছেন। তার এবারকার কর্ম্মস্থল হবে বোধ হয় 'বি' ইউনিটে। দেবকীবাবুর নিজের লেখা "বৈষ্ণবী" নামে একটা গল্প এখানে প্রথম তোলা হবে। এতে কারা অভিনয় কোরবেন তা' ঠিক না হ'লেও উমা, পাহাড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র এবং হয়ত' কাননকে এই ছবিতে দেখা যাবে।

* * *

হেমচন্দ্র "অনাথ আশ্রমে"-র কয়েকটী বহিদৃশ্য তোলবার জন্যে সম্প্রতি কলিয়ারী অঞ্চলে গেছেন।

"মায়া"

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "মায়া" তার মায়াজাল বিস্তার কোরবে বড়দিনের বড় আদরে। "মায়া" নতুন ধরণের ছবি—প্রতি দৃশ্যেই লোকে আনন্দ পাবে অফুরন্ত।

কালী ফিল্মস

এদের "টকী অফ টকীজ-"র ট্রেলার 'শ্রী'-তে দেখলুম। সত্যিই নোতুন ধরণের

'ট্রেলার'। ছবির শিল্পীবৃন্দ এক জায়গায় সমবেত হ'য়েছেন আর পরিচালক শিশির ভাদুড়ী তাদের অভিনয় জিনিষটা কী তাই সবাইকে বোঝাচ্ছেন। 'বিশ্বনাথ, রাণী ও কঙ্কাকে সম্বোধন কোরে তিনি বলছেন এরূপভাবে যদি অভিনয় কোরতে পার তা' হ'লেই তোমরা সফল হবে। অন্যদিকে প্রযোজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ও জ্যোতিষ মুখার্জ্জিকে এইখানে দেখা গেল—দাঁড়িয়ে তাঁরা শিশিরকুমারের বক্তৃতা শুনছেন। তারপর ছবির কয়েকটা দৃশ্য দেখে বোঝা গেল ছবিখানার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। 'ট্রেলার' দেখে দর্শকদের বিপুল হর্ষধ্বনি অন্ততঃ তা' জানিয়েছে।

* * *

শোনা যাচ্ছে, সুশীল মজুমদারের "মুক্তি-স্নানে"-র নায়িকা শীলার স্থলে এই ছবিতে রাণী নায়িকা সাজছেন। এ পরিবর্ত্তন কেন? আর পরিবর্ত্তন ভাল কী মন্দ তাও আমরা জানিনা। তবে এটুকু আমাদের মন্তব্য যে রাণীকে দিয়ে সব ছবিতে অভিনয় করানো অভিনেত্রী ও প্রতিষ্ঠান দু'দিকেরই ক্ষতিজনক।

* * *

গিরিশ ঘোষের সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক "হারানিধি"র আনুষঙ্গিক কাজ নিয়ে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী এখন বিশেষ ব্যস্ত। অংশ বণ্টন এখনও পাকাপাকি ঠিক না হ'লেও এই ছবিতে তিনকড়ি, অহীন্দ্র, রাণী, মায়া, ঊষা, প্রভা, সাবিত্রী প্রভৃতি কালী ফিল্মসের অভিনেতৃবৃন্দ নামবেন।

রাধা ফিল্মস

এদের "বিষবৃক্ষ" আসছে বড়দিনে যে 'রূপবাণী'-তে দেখানো হবে তা' এক রকম ঠিক। এতে অভিনয় কোরছেন বাঙলার অনেকগুলো জনপ্রিয় অভিনেতৃ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কানন, শান্তি, মীরা, রেণুকা রায়, জহর, ভূমেন, কুমার মিত্র, তারক বাগচি, জানকী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। এখন ছবিখানার সম্পাদনা চলছে। বাঁড়ুয্যে মশাই ও বর্ম্মা মশাই নিজেরা সম্পাদনা-ব্যাপার তদারক কোরছেন। সুতরাং ছবিখানা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা এখন থেকেই পোষণ করা বিচিত্র নয়!

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চাস

মধু বোসের "আলিবাবা" অর্দ্ধেকের ওপর তোলা হ'য়েছে। নতুন বছরের গোড়াতেই ছবিখানা যা'তে মুক্তি পায় তার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা কোরছেন। আমরা আগে জানিয়েছিলাম ফিরিঙ্গিপাড়া 'ফার্ষ্ট এম্পায়ারে' ছবিখানার শুভ-উদ্বোধন হবে। তা' যদি হয় তা' হ'লে বাঙলার চিত্রশিল্পে এ একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

ভারতী পিক্‌চাস

এদের "চন্দ্রনাথে"-র প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। শিগগিরই নরেশ মিত্তির ছবিখানার শুটিং সুরু করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন! ছবি তোলার আগেই এরা শুভানুধ্যায়ীদের "চন্দ্রনাথে"-র বিজ্ঞাপন অঙ্কিত কলম উপহার দিয়ে নিজেদের কাজের সক্রিয়তা প্রকাশ কোরেছেন।

পরিচালক ও শিল্পী অভিনন্দিত

গেল রোবিবার 'উত্তরা' চিত্রগৃহের জমিদার মিঃ ডি, পি, ঘোষ, "সোনার সংসারে"-র পরিচালক দেবকী বসু অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়াকে এক একটি পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

বিজয়ার জবাব

কৃষ্ণপুর, হুগলী
২৫এ নভেম্বর, ১৯৩৬

স্নেহাস্পদাসু,

ভাই অলকা, তোমার চিঠি পেলুম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, গোড়াতেই তুমি যদি তোমার পরিচয় না দিয়ে ফেলতে, তা'হলে আমার বুঝতে কষ্ট হ'ত, তুমি কোন্ অলকা! সেই লক্ষ্মী শান্তস্বভাব অল্পভাষী দৃষ্টিনির্ব্বিষ মেয়েটি আজ হঠাৎ কাদের সংস্পর্শে এসে এমন অসংযতবাক্ এবং অশিষ্ট হয়ে উঠল, তাই ভাবছি।

যখন তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, তখন তুমি খুব ছোট্ট ছিলে। কিন্তু এতদিনেও যে তুমি পাঠশালার লেখাপড়া না হোক্, অন্ততঃ সামাজিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সহবৎটুকুও শিক্ষা করবার সুযোগ পাওনি, তা আমি ধারনায় আনতে পারিনি। যাকে তুমি চিঠির গোড়াতেই 'দিদি' ব'লে সম্মান দিয়ে বসলে, তার দৈহিক সৌন্দর্য্য নিয়ে ঠাট্টা করবার নীচ প্রবৃত্তি তোমার কোথা থেকে জন্মাল? চিঠির ভাষা এবং ভাব, দুইই যদি তোমার কাব্যব্যতিক-গ্রস্ত (গ্রন্থ?) স্বামীর এম্-এ, বি-এল্, বি-কম্ পাশকরা বেকার 'চন্দ্রাহত' বন্ধুদের কাছ থেকে ঋণং-কৃত্বা সংগ্রহ ক'রতে হয়, তা'হলে এমন চিঠি লেখার চেয়ে না-লেখাই যে ছিল ভালো ভাই।

একে গরীবের ঘরের মেয়ে, হঠাৎ ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পেয়েছ; তায় তোমার প্রথম যৌবন; তার ওপর তোমার দাদামশাই থেকে সুরু ক'রে তোমার স্বামী, স্বামীর বন্ধুগুলি, এমন কি তোমার শ্বশুর শাশুড়ী পর্য্যন্ত খেয়ালী বিধাতার কৃপায় বদ্ধ পাগল। কাজেই তোমারও মস্তিষ্কের সুস্থতা যে

অব্যাহত থাকতে পারেনা, তা আমার ভালো রকমই জানা থাকলেও তোমার নিজের বোধ হয় সে-খবর জানা নেই। এবং তা নেই ব'লেই তুমি ভুলে যেতে পেরেছ, আমি তোমার দিদি, বয়েসে তোমার থেকে অনেক বড়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই আমি আজ প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতাকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে এসেছি। আমাকে আর স্মরণ করিয়ে দিতে হবেনা যে, ব্রাহ্ম গালর্সের সেই কিশোরী মেয়েটি আমি আর নই। যৌবনের প্রথম জোয়ারে তুমি আজ গা-ভাসান দিয়েছ; স্বামী এবং স্বামীর বন্ধুদের নিয়ে 'মধু চন্দ্রোৎসব' চালাচ্ছ রোজ রাতেই। কিন্তু বড় বোন হিসেবে তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আজ যে পতঙ্গবৃত্তি মানুষের দল তোমার স্তাবকতায় পঞ্চমুখ, তারা তোমার দেহের মধু নিঃশেষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় যে এক নিমিষে অন্তর্হিত হয়ে যাবে, তার কোন হদিসই তুমি খুঁজে পাবেনা।

Bengal—Then And Now

1926

Extract from the speech of His Excellency Lord Lytton, Governor of Bengal, delivered at Dogachia (24 Pergannas) on 13th January, 1926 :—

"I know that the touch of Government is almost as bad as the touch of Malaria itself ; and if you are found to be receiving support from a tainted source, possibly the support of the public will fall away."

1936

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জাগ্রত জনমত যে কিরূপ ছিল, বাঙ্গলার তদানীন্তন গভর্ণরের বক্তৃতায় তাহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। আজ বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে মন্ত্রীত্ব-কামী রায়-রুলী উপদল কি বলিবেন যে তাঁহাদের হীন ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা আজ কোথায়?

তখন তোমার দৈহিক সৌন্দর্য্যের পাদমূলে আত্মনিবেদন ক'রে ধন্য হবার জন্যে একজন 'বুধকান্ত'ও তোমার দ্বারস্থ হবেনা। তাই, অত গর্ব্ব ভালো নয়; মনে রেখো, তুমি যাকে আজ সৌন্দর্য্য মনে করে আত্মবিস্মৃত হয়েছ, তা আসলে সৌন্দর্য নয়, তা হচ্ছে—যৌবনের মাদকতা।

সৌন্দর্য্যকে দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখে তারাই, যারা [নিশিযোগে পল্লীবিশেষের দীপালোকশোভিত কক্ষে ব'সে গিল্টি গহনা-মণ্ডিত দেহের খড়িমাখা মুখের পানে রঙিন চাউনি হেনে বলে—"মোইরি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমায় বড়ো ভালোবাসি"]

॥লের চেয়ে বুটের সম্মান দেয়। গুণাগুণ নির্দ্ধারণ না ক'রেই হীরের ওপরে ট্রাস্‌শের স্থান দেয়। দামী গরদের চেয়ে তার চেক্‌নাই জাপানী সিল্কের আদর দের কাছেই বেশী; ভেতর যতই ফোঁপরা হাক্ না কেন, ওপর-চাক্‌চিক্য থাকলেই লকাতার হাটে তার খরিদ্দারের অভাব বেনা এদেরই কৃপায়। হেট, সাহিত্য, টপাথের রসিকতা, বস্তির সৌন্দর্য্য, বং তাড়িখানার গা-জুয়াড়ী—এগুলো াজও যে বুক ফুলিয়ে বাহাদুরী ানাতে পারছে, এ কেবল এই শ্রণীবিশেষের সমঝদারদের দৌলতেই। াড়িপাল্লায় কয়লা, চাল, ডাল, মাল-মশলা জন হয় ব'লেই সৌন্দর্য্যকেও এরা ঐ াড়িপাল্লা দিয়েই ওজন ক'রতে চায়—দের বিদ্যেবুদ্ধি ঐ দাঁড়িপাল্লা পর্য্যন্তই! সৌন্দর্য্য যে কেবল রূপেই পর্য্যবসিত নয়, া যে গুণের ওপরই বেশী নির্ভর করে, গালাপের সৌন্দর্য্য যে খালি রঙে বা পাপড়ী গুলোতেই শেষ হয়ে যায় না, তার সুগন্ধই য তাকে বেশী ক'রে তোলে,—সস্তাদরের ভাড়ামো ক'রে লোক হাসাতে পারাতেই য আর্টের সার্থকতা হয়না, তা যে aesthetic pleasure-সম্পাদনের ওপরই নির্ভর করে, এ-সব তথ্য এদের জানা নেই; এরা যে হেটো জীব; ভুষিমাল বা পাটের গাঁট নিয়েই এদের কারবার। তোমার দেহকে তাই এদের ভালো লেগেছে—তোমার যৌবননদীতে তাই এরা সানন্দে সাতার কাটছে। আর এদেরই কৃপাহস্ত প্রদত্ত শক্ত দ্বারা উদরপূর্ত্তি ক'রে তোমারও বুদ্ধি এমন পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তোমার প্রতি তাদের এই পৈশাচিক প্রেমকে তুমি অনায়াসে ব'লতে পারছ, "সৌন্দর্য্যের পাদমূলে আত্ম-নিবেদন"। আর এই আনন্দেই ডগমগ হয়ে আমার মতো পূজ্যজনের দেহ নিয়ে বিদ্রূপ ক'রতে তোমার ভদ্রতায় এতটুকু বাধে নি। তুমি যদি আমার আপন বোন হ'তে, তাহ'লে আমি তোমার কান ধ'রে শিখিয়ে দিতুম, কার সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয়।

মক্ষিধর্ম্মী হেটোজীবদের কৃপায় কল্‌কাতায় তোমার রূপের কলুসের দাম ত' যা-হোক-এক-রকম নির্দ্ধারিত হয়েছে, কিন্তু তোমার পলাশপুরী পল্লী-অঞ্চলের সংবাদ তো বিশেষ আশাপ্রদ ব'লে মনে হচ্ছে না। 'সোনার সংসারে'র নতুন-বৌকে নাকি তাদের মনে ধরছে না? কোথায় নাকি তোমাকে তারা সাতদিনের জন্যে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গিয়ে চার দিনের পরেই বিদেয় ক'রে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে? হোক্ তোমার দাদামশাই জমিদার; কিন্তু এমনভাবে খরচা না পোষালে জমিদারী যে লাটে উঠবে! তখন কোথায় থাকবে তোমার জারিজুরি আর যৌবনের গরব! আর এ-দশা হবেই না বা কেন? যা বাতিকগ্রস্ত "স্বর্গবাণী" জীবদের সংসারের মধ্যে জড়ো করা হয়েছে, তাতে অতি-বড় উনপঞ্চাশী না থাকলে সুস্থ শরীরে তাদের সান্নিধ্য উপভোগ ক'রতে গেলে বায়ুবৃদ্ধির চাপে ব্রহ্মতালু চৌচির হয়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়।

আর এক কথা! তোমার পালক-পিতা নাকি সম্প্রতি তোমার কুরুচিক্লিষ্ট অন্তরের পরিচয় পেয়ে তোমাদের শক্ত পরিবারের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ এবং স্বাস্থ্যকর আবহের মধ্যে নিজেকে সহজ-ভাবে সঞ্জীবিত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহ'লে তোমার দুর্ভাগ্যে আমি যথার্থই মর্ম্মাহত।

সোনার সংসার—পল্লীর প্রাণ—তাদের ঘরের তুমি টুকটুকে বৌ—কিন্তু ভাই তোমার যথাযথ সম্মান তারা দিতে কুণ্ঠিত হয়েছে শুনে মর্ম্মাহত হয়েছি। তুমি আমায় দিদি বলে ডেকেছ—কবি গেয়েছেন "শিশু যেমন মাকে ডাকে, নামের নেশায় ডাকে"—তুমিই আমায় ডেকেছ

কাউনসিল অফ্ ষ্টেটের নির্ব্বাচন

কাউন্‌সিল অফ্ ষ্টেটের-নির্ব্বাচনে বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে

শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার রায়চৌধুরী
নশীপুরের রাজা বাহাদুর,
মিঃ জে, সি, ব্যানার্জ্জি
ও
শ্রীবিনোদ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের

প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছে। ইঁহাদের মধ্যে দুই জনের সাফল্য আশা করা যাইতে পারে।

কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী মিঃ সুরপৎ সিংয়ের জয় সুদূরপরাহত।

নামের নেশায়—তাই তোমায় সব দোষ ক্রটী ভুলে তোমায় বলতে ইচ্ছা করে—হেটো জীব, ভুষিমাল বা পাটের গাঁট নিয়ে যাদের কারবার, যারা জানে কেবল তুলাদণ্ডে ওজন কোরতে সব জিনিষ, তারাত চাইবেই কেবল তোমার অস্থির যৌবনের আশ্রয় নিয়ে মধু চন্দ্রোৎসব চালাতে। আমি বলি তাতে কি শান্তি আছে ভাই? তোমার পালক পিতা তোমাকে বস্তি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাগলা গারদের মধ্যে আবদ্ধ কোরে দিয়েছেন—সাথী কোরে দিয়েছেন কতকগুলো পাগলা যুবককে—এ'ত' সোনার সংসারের প্রকৃতরূপ নয় এবং সেই জন্যেই তোমার পলাশপুরী পল্লী-অঞ্চল বাসীরা তোমায় দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন—এ কথা যে আজ আমার প্রাণে কত কঠিন হয়ে বাজছে তা তোমায় লিখে বোঝাবার আমার শক্তি নেই। যাদের ঘরে তোমার দিদির আদর অভ্যর্থনার অভাব হচ্ছে না তাদেরই ঘরে তোমার এ হেনস্থায় আমার মাথা লজ্জায় ঘৃণায়, নত হয়ে পড়ছে। তুমি আমায় দিদি বলে যদি না ডাকতে তাহলে এত কথা তোমায় বলবার প্রয়োজন হতো না। তুমি কি আজ-ও বুঝতে পারছ না কেন তোমার পালক পিতা তুলাদণ্ডের মোহ কাটিয়ে ছুটে চলে আসতে চাইছেন—সংযত জীবনের মধ্যে। তাই তোমায় শেষবার বলছি দৈহিকরূপ ভগবান মানুষকে দিয়েছেন ক্ষণিক আত্ম-তৃপ্তির জন্য কিন্তু যেরূপ বিকাশ পায় আত্ম-সাধনার মধ্যে দিয়ে সেই থাকে চিরন্তন হয়ে; তারই ওপর গড়ে ওঠে সোনার সংসার এবং তাকে তুলাদণ্ডের দ্বারা মাপা যায় না। আজ এইখানেই থামা যাক কি বল? আমার সাদর স্নেহাশীষ নিও। ইতি

তোমার দিদি

"বিজয়া"

[বাক্যে যে দ্বন্দ্বের বিকাশ, কালি-কলমে যার উচ্ছ্বাস, কেশ-বিজড়িত 'মুষ্টি-যুদ্ধে' তার পরিণতি হবে এই আশঙ্কায় "খেয়ালী"র অঙ্গনদ্বার বন্ধ হ'ল। বিজয়া অলকার প্রত্যাশিত মুষ্টিযুদ্ধ হাতিবাগানের মোড়ে অনুষ্ঠিত হ'লে আমরা সেই জয় পরা-জয়ের সংবাদ প্রকাশ ক'রব। সঃ খেঃ]

শিশির কুমার ইনষ্টিট্যুট

গত রবিবার পার্ক ইনিষ্টিটিউসনে শিশির কুমার ইনষ্টিট্যুটের চারুকলা বিভাগীয় সম্পাদক শ্রীমিহির গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শ্রীরবীন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও তাঁহার সহকারী শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের "এই কি লেটেষ্ট" ও শ্রীপ্রবোধ মজুমদারের "জন্মতিথি" কৌতুক নাটিকা দুইখানি অভিনীত হইয়াছিল। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, কুমার হিরণ্য কুমার মিত্র ও শ্রীক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী শিশির কুমার ইনষ্টিট্যুটের এই বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

নিখিল বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলন—

নিখিল বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১৯৩৭ সালে জানুয়ারী মাসের ২রা, ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই তারিখে হইবে এবং ইহার আনুসঙ্গিক সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা এই মাসের আগামী ২০শে তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। সঙ্গীতের প্রতিযোগিতায় entry করিবার শেষ দিন ১০ই ডিসেম্বর। গত বৎসরে যেরূপ প্রতিযোগীর সংখ্যা হইয়াছিল তাহাতে বুঝা যায়, এ দেশে সঙ্গীতের চর্চ্চার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা আরও বলি যে গত বৎসরের সঙ্গীত সম্মেলন অধিবেশনের পর আমাদের কাগজের ভিতর দিয়া নানারকম সমালোচনা প্রকাশ করিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে। প্রকাশ যে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ওস্তাদ আবদুল করিম সাহেব ও পণ্ডিত ওঙ্কার নাথজী এ বৎসরের সঙ্গীতের অধিবেশন অলংকৃত করিবেন।

গায়ক গায়িকাদের সম্মান

লাক্ষ্মৌতে এক কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রদর্শণী উপলক্ষে বহু অর্থাদি ব্যয়ে বাঙ্গলার বিখ্যাত গায়কগায়িকাদের আহ্বান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে মিস ইন্দুবালা, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি মহীশূর থেকে মিস ইন্দুবালা জয়ের গৌরব লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; আশা করি এবারও তাঁর ললাটে সে গৌরবটীকার তিলক আঁকা থাকিবে।

গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

গত ২৮শে নভেম্বর শনিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী অনারেবল স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হাঁসপাতালে বৈষ্ণব ওয়ার্ডের শুভ-উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষে এরূপ সুবিধা পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই, তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির রাজানুমোদন লাভ কল্পে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার সম্মান প্রদর্শনার্থে উক্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

বি, ওয়াই, এম, এ,

গত রবিবার ২৩নং রাসবিহারী এভিনিউস্থ 'মধু মহলে' কালীঘাট বি, ওয়াই, এম, এর অষ্টম বাৎসরিক উৎসব এবং বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ক্লাব হলটি সুচারুরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রায় পাঁচশত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মাননীয় মিঃ বি, কে, বসু সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং মিসেস্ জে, সি, মুখার্জ্জি পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধানাথ রায়ের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর কুমারী রেবা মুখার্জ্জি সভাপতি মহাশয়কে এবং মিসেস মুখার্জ্জিকে মাল্যপ্রদান করেন। তাহার পর সমিতির সম্পাদক মিঃ সি, বি, চ্যাটার্জ্জি কর্ত্তৃক বিবৃতি পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে মিস্ মণিকা রায়, কুমারী সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা, বিভূতি চ্যাটার্জ্জি, শচীন চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতির গানের পর মাষ্টার কান্ট্ এবং কুমারী লীলা অতি সুন্দরভাবে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন এবং কুমারী সাবিত্রী একটি নৃত্য প্রদর্শন করেন। জলযোগের পর অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীযুক্ত ফণী চ্যাটার্জ্জি এবং সুবিমল বসু এই বৎসরের সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন:—মেসার্স জে, সি মুখার্জ্জি, পি, মুখার্জ্জি, শচীন ব্যানার্জ্জি, কল্যান বসু, সুকুমার মিত্র, ধরণী বসু, ব্যোমকেশ রায় প্রভৃতি

কারমাটার গৌর প্রতিষ্ঠান

গত ২৭শে কার্ত্তিক (১৩ই নভেম্বর) শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় কারমাটার (ই, আই, আর) গৌর প্রতিষ্ঠান ভবনে সার্ব্বজনীন ৺কালীপূজা ও গৌর নিবাস

প্রাঙ্গনে নবগৌর বিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় সাঁওতাল পরগণায় দেওঘর, মধুপুর, জামতাড়া ও মিহিজাম অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

জামতাড়ার সাবডিভিসন্যাল অফিসার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ মহাশয় পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মিসেস ঘোষ পারিতোষিক বিতরণ করেন।

গৌর প্রতিষ্ঠানে নানা জাতির দরিদ্র বালকবালিকাগণকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে দাতব্য স্বাস্থ্য বিভাগ, বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিচালিত হইয়া থাকে।

উৎসব প্রারম্ভে সভাপতির মাল্যদানের পর বালকবালিকারা উদ্বোধন সঙ্গীত করে। তৎপরে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া অভিভাষণ পাঠ করেন।

তারপর ছাত্র ছাত্রীদের বাঙলা ও সংস্কৃত আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদির পর সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিলে সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর জ্ঞানেন্দ্রবাবুর প্রযোজনায় এবং শ্রীমতী বাসন্তী বসুর আনুকুল্যে বালক-বালিকাদের দ্বারা 'বৃন্দাবনলীলা' অভিনীত হয়। সুকণ্ঠি কুমারী গৌরীর শ্রীরাধার ভূমিকাভিনয় মনোরম হইয়াছিল।

পরদিন শনিবার মধ্যাহ্নে দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা করান হইয়াছিল। সন্ধ্যায় বিসর্জনান্তে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'জনা' অভিনীত হয়। রবিবার মধ্যাহ্নে পুনরায় অন্ধ, খঞ্জ, ব্যাধিগ্রস্থ ইত্যাদিকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পরে সন্ধ্যায় জয়দেব ও প্রসিদ্ধ বেহালা বাদক রতনলাল দাঁর পরিচালনায় "বেজায় রগড়" অভিনীত হয়। "বেজায়

শ্রীবসন্তকুমার সেন

শ্রীমতী শান্তা সেন

প্রেমের দোলায় দোদুল দোলে

হাজারিবাগের শান্তা অপহরণ কাহিনীর নাটকীয় পরিসমাপ্তি

বসন্ত-শান্তার মধুচন্দ্র উদ্‌যাপন

এতদিন পরে হাজারিবাগের সেই নাটকীয় ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। বসন্তকুমার এতদিন পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়াছিল। কিন্তু এইভাবে জীবন-যাপন করার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়: জেনে সে একদিন শান্তার কাছে প্রস্তাব করিল যে, সে দিগম্বরবাবুর কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিবে তাহাতে সে ক্ষমা পায় ভাল, নচেৎ তাঁহার হাতে রিভলভার দিয়া বুক পাতিয়া দিবে মৃত্যুর জন্য। কিন্তু দাদার এরূপ অবস্থা দেখিয়া সে কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে প্রকাশ যে, স্বাগতা দুই একবার শান্তার সহিত তাহার বাটীতে সাক্ষাৎও করিয়াছে এবং স্বামীকে মত করাইয়া তাহারা শান্তার বাড়ীতেই একত্র থাকিবে এরূপও জল্পনা কল্পনা হয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন স্বাগতা শান্তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া সেখানে পাঞ্জাবী বসন্তকে দেখিয়া আর ঘরে না ঢুকিয়া চলিয়া গেলেন। ব্যাপারটা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। শান্তা তখন এই অশান্তির আগুন চিরতরে নিভাইবার জন্য—সেও দাদার কাছে গেল ক্ষমা-ভিক্ষাথিনীরূপে। শান্তাকে বহুদিন পরে দেখিয়া দিগম্বরবাবুর মন গলিয়া গেল। এমন সময় সেখানে বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল দিগম্বরবাবুর নিকট হইতে শাস্তি গ্রহণ করার জন্য। বসন্তকে দেখিয়া তাঁহার মস্তক খারাপ হইয়া উঠিল। তিনি শান্তাকে ক্ষমা করিতে পারেন; কিন্তু বসন্তকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তাই বসন্ত তাঁহার হস্তে রিভলভার দিয়া নিজ কর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইল। দিগম্বরবাবু রিভলভারের ঘোড়া টিপিয়া—কিন্তু স্বাগতা তখন তাঁহাকে শান্তার কপালের দিকে দেখাইলেন। শান্তার কপালে সিন্দুর দেখিয়া দিগম্বরবাবুর হাত হইতে রিভলভার পড়িয়া গেল—তিনি শান্তা ও বসন্তকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন। বসন্ত ও শান্তার এই মধুময় জীবন শান্তির হউক—এই আমাদের একমাত্র আশীর্ব্বাদ। আর আমরা শুনলাম, বসন্ত-শান্তার মধুচন্দ্র উৎসব শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে—এই উপলক্ষ্যে তারা বাংলার জ্ঞানী ও গুণী সবাইকে নিমন্ত্রণ করিবেন। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।—বিজ্ঞাপন

রগড়ে" মামা, মামী, ভাগনে, বাঙাল জমিদার ও ঝিএর ভূমিকায় যথাক্রমে অনিল দত্ত, সমীর মজুমদার, রাধারমন মুখার্জ্জি, নিতাই ঘোষ, বিভূতি দাঁ বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। বিভূতি দাঁর অভিনয়ের জন্য ডাঃ সুধীর ঘোষ একটি রৌপ্যপদক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এই দিবসত্রয়ে উদীয়মান নৃত্যশিল্পী শ্রীমান সমীরকুমার মজুমদার তাঁর ইন্দ্রনৃত্য, মন্দিরানৃত্য, সূর্য্যনৃত্য, সাগরনৃত্য প্রভৃতিতে সুন্দর কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন।

এই উৎসবের মূলে গৌর প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ডাঃ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ মহাশয়ের নিপুণ হস্ত ও মস্তিস্ক না থাকিলে ইহা এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত কিনা সন্দেহ!

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলন অধিবেশন

গত ৪ঠা হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত মজঃফরপুরে নিখিল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মিলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিহার শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সৈয়দ আব্দুল আজিজ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞগণ যোগদান করেন। সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়ালি মহম্মদ (বর্দ্ধমান ষ্টেট্) বি, কে, দেওধর (বোম্বে) আগা সামসুদ্দিন হাইদার (লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজ) ছাত্রছাত্রীগণের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিচারক মনোনীত হইয়াছিলেন। ৭ই নভেম্বর অপরাহ্নে সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা এবং প্রবন্ধাদি পাঠ হয়। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রমুখ ভারত শ্রেষ্ঠ গুণীগণ এই সভায় যোগদান করেন এবং উক্ত কমিটির সভ্য মনোনীত হন। সমাগত সঙ্গীতবিৎগণের মধ্যে সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মজঃফর খাঁ, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনায়েৎ খাঁ, আব্দুল আজিজ খাঁ, ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী, নারায়ণ রাও ব্যাস, ভি, এন পটবর্দ্ধন, গণপৎ রাও, দিলীপচাঁদ বেদী, নাসির খাঁ, ওয়ালি মহম্মদ, শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র, কুমার গন্ধর্ব্ব, মিসেস বালা সরস্বতী, আগা হাইদার, বি, কে দেওধর, ছোটে খাঁ, মুস্তাক আলি, আশা ওঝা, শান্তা সমলাদী, এন কৃষ্ণমূর্ত্তি, বীণাপাণি মুখার্জ্জি, অমলা নন্দী, সুষমা দে, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অনাথনাথ বোস, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৮ই নভেম্বর রাত্রিতে প্রতিযোগীতায় কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর প্রসাদ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সম্মিলন এতাদৃশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ গুণীগণের তিনি যেরূপ সম্মান করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসনীয়।

(সি, বি)

অষ্ট্রেলিয়া একাদশ বনাম এম-সি-সি

শেষ অবধি অনেক কষ্টে এম, সি, সি দল পরাজয়ের অপমানের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। অষ্ট্রেলিয়া দল যদি চতুর্থ দিনেও খেলত তাহলে হয়ত এম, সি, সি দলকে হারতে হত কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া দল স্পোর্টিং স্পিরিট দেখিয়ে তৃতীয় দিনে ৫৪৪ রাণ করার পর চতুর্থ দিনে ডিক্লেয়ার করে—এম, সি, সি-কে ব্যাট করতে দেয়। এম, সি, সিও চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায়—খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এম, সি, সি,র খেলোয়াড় যদি অষ্ট্রেলিয়ার রাণের বহর দেখে ঘাবড়ে যেত তাহলে তাদের দলকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচতে পারত না। এম, সি, সি দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৪৫ রাণ করে, তার মধ্যে এমস্ রবিনস এবং ওয়ার্দিংটন যথাক্রমে ৩৭, ৩৩ এবং ২৮ রাণ করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাণ করেন লেল্যাণ্ড। ইনি নট আউট থেকে ১১৮ রাণ করেন। লেল্যাণ্ড যে দলের সম্মান বজায় রেখেছেন একথা ঐ দলের কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। এম, সি, সি প্রথম ইনিংসে ২৮৮ রাণ করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৪৫ রাণ করে। অষ্ট্রেলিয়া দল এক ইনিংসে ৮ উইকেটে ৫৪৪ রাণ করে ডিক্লেয়ার করে। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

সুটে ব্যানার্জ্জি

অল ইণ্ডিয়া ক্রিকেট টীমে মনোনীত বাঙ্গলার একমাত্র ক্রিকেট খেলোয়াড় সুটে ব্যানার্জ্জি কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হিন্দুদের দলে খেলবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে বোম্বাই গিয়েছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট টীম্ নির্ব্বাচন

অনেক জল্পনা কল্পনার পর আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর 'ব্রিসবেনে' এম, সি, সির সঙ্গে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট টীম্ মনোনীত হয়েছে। ব্রাডম্যান্, ব্রাউন, ব্যডকক্, চিপারফিল্ড, ফিঙ্গলটন্, ম্যাকেব্, ম্যাককরমিক্, ওল্ডফিল্ড, ওরিলি, রবিনসন, ওয়ার্ড এবং সিভার্স এদের ভেতর থেকে ফাইন্যাল টীম ঠিক হবে। গ্রিমেটকে কেন টীমে নেওয়া হল না এবং সিভার্সকে কেন টীমে স্থান দেওয়া হল এই ব্যাপারটা অনেকের অবসর সময়ের আলোচনার বিষয় হয়েছে।

বৈয়গ্র্য

শ্রীগণেশ চ্যাটার্জ্জি

সমরেশের জীবনটা গ্রামান্তের সরোবরের মত, আলস্যের রসে কানায় কানায় ভরা। তিনপাশে ঘন বাঁশঝাড় পরম নিশ্চিন্ততার ছায়া ছড়িয়েছে, চতুর্থপার্শ্বে নেমে এসেছে প্রাণের কোলাহল-মুখর এক সরু পথরেখা। এই সঙ্কীর্ণ-পথের বাতায়নটুকু দিয়ে সে দেখেছে বিধাতার এই বিচিত্র সৃষ্টিখানাকে; এই বনস্পতি এই পুষ্প, তার ঘরের স্নেহ মধুরতা তার বাইরের দুর্বোধ্য বিশালতা। তার নবকিশলয়ের অবচ্ছেদে পড়ে সূর্য্যের রশ্মি; চন্দ্রের কিরণ লেখা, বসন্ত বাতাসের মদির কুসুম গন্ধ। তার তরুণ মনে জাগত ভাষাহীন আভাষ, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বদিগন্তের পাণ্ডুর আভার মত।

অভাবের ভাবনায় সে ব্যস্ত ছিল না, করেনি সে বেদনা বোধের কঠিন সাধনা। পশুর মত স্বাভাবিক ছিল তার জীবনের সঙ্গে দেনাপাওনার সম্বন্ধ। যা চোখের বাইরে সেখানে সে আপন অন্ধত্ব মেনে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল, অঙ্গে অঙ্গে যার স্পর্শ অনুভব করা যায় না সেই অনঙ্গের সঙ্গ সে প্রার্থনা করেনি। তার সরসী-জীবন ছিল অবিক্ষুব্ধ স্বচ্ছ অগভীর।

কিন্তু একদিন অপ্রত্যাশিত, স্বপ্নাতীত এল বন্যা। বাঁশঝাড় সেই কল্লোলিত প্রবাহের পদমূলে মাথা নত করল। পথ-রেখা মুছে গেল। একূল ওকূল দুকূলে মিশে গেল। নিরাসক্ত পুষ্করিণীর পঞ্জরে পঞ্জরে লাগল এই বেগোন্মাদনার সংঘাত। একদিক কর্দ্দমে কদর্য্য হয়ে উঠল, অপরদিক গতিস্রোতে উন্মত্ত হয়ে উঠল।

কূলে প্রথম ভাঙন ধরল পত্রের আঘাতে। বন্ধু অবনীশের আমন্ত্রন-চিঠির মধ্য দিয়ে হাজারিবাগ হাতছানি দিয়ে ডাকল। একদিন সন্ধ্যায় স্যুটকেশ সমভিব্যাহারে সমরেশ বনতলীর বক্ষে বিছানো লাল পথে পা দিল। দীর্ঘ পঞ্চবিংশতিবর্ষ জীবনে আজ সে প্রথম কলিকাতায় ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন হতে মুক্তি পেল, নাগরিক সভ্যতার প্রশংসা ও লাঞ্ছনার নাগরদোলার ঘুড়ো-খেলা হতে ছুটি পেল। অকারণে সে হাসল, অকাজে অপথে পা বাড়াল, অসুরে গান ধরল এবং অবশেষে অতিশয় অসময়ে অযাচিত ভালবাসল।

একদিন কর্ম্মহীন মন্থর মধ্যাহ্নে তারা সবাই মিলে গেল বনভোজনে। সে, অবনীশ, অবনীশের তরুণী বোন ঊষা আর ঊষার নবোদ্ভিন্নযৌবনা বন্ধু ও প্রতিবেশিনী অমিতা। বিস্তর আঁকাবাঁকা নামধাম কীর্ত্তিকলাপহীন বন পথে পথে, বহু কণ্টকের সবিনয় প্রার্থনা উপেক্ষা করে, অসংখ্য অজানা আশঙ্কা জয় করে অবশেষে এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীদল পাহাড়ের কোল ঘেরা একটুকরো উন্মুক্ত ভূখণ্ডে উত্তীর্ণ হল। সামনে ধূম্রবরণ মহাশৃঙ্গ পর্ব্বত যেন মর্ত্ত্যে রুদ্রের সমাধিমগ্ন প্রতিমূর্ত্তি। চতুর্দ্দিকে শ্যামল, কোমল পুষ্পিত শান্ত বনরাজি।

এই ভীমকান্তের গম্ভীর সঙ্গমে অমিতার সঙ্গে হল সমরেশের আলাপ। অমিতাকে গান শেখাবার ভার সে নিল। আলাপের আলতো আবরণ উড়ে গেল গানের ঝাপটা হাওয়ায়। মুদারা, উদারা, তারার ধাপে ধাপে অতিক্রম করল পরিচয়ের সিংহদ্বার। রাগিণীর অনুরাগে ধীরে ধীরে পার হয়ে এল অন্তরঙ্গতার তোরণদ্বার। ঝঙ্কারের ব্যঞ্জনায় অন্তরের অর্ঘ নিবেদন করে দিল প্রেমের বেদীমূলে।

দিনের পর দিন কেটে গেল, হাসি গল্পে, বিনয়ে, অনুনয়ে, ছলনায় অভিমানে। সমরেশের রাত্রির স্বপ্নের কোরক মুকুলিত হয়ে উঠে দিনে অমিতার চোখের আলোয়। অমিতার লাবণ্যের শিখায় তার বাসনার প্রদীপ জ্বলে উঠে। অমিতার প্রতপ্ত যৌবনের সান্নিধ্যে সে বোধ করে মরুপথে দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মৃগতৃষ্ণিকা।

একদিন সে তার এই নবমুকুলিত প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করে ছোট্ট একটি রচনা তৈরী করল। অমিতাকে বলল, আমি একটা গল্প লিখেছি। অমিতা বলল দেখি। সমরেশ তার হাতে দিল একটা ফুলস্কেপ পেপার। অমিতা নীরবে পাঠ সমাধা করল, শেষে মন্তব্য করল, এই কি আপনার গল্প। সমরেশ তার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, এটা আমি ছাপাব। অমিতার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল, সে বলল—না। সমরেশ বলল, কেন? অমিতা বলল যদি বাড়ীর লোকে জানতে পারে।

সমরেশ মুখে চুপ করে রইল। তার মন কিন্তু অপরিস্ফুট ভাষায় বলে গেল, জানল, জানল না হয় তাতে ক্ষতি কি? আমার এই গল্প আমি এমনি লিখব যা চিরদিনকার বিশ্বসাহিত্যে ললাটললামভূত হয়ে থাকবে, প্রেমের অমরাবতীতে পারিজাতের মত গন্ধে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। সমরেশের মনটা হল কতকটা সদ্যপঙ্কোত্থিত

পক্ষী শাবকের মত। ওড়ার শক্তি নাই কিন্তু তার বহনের বোধ আছে। অমিতাকে সে ভালবাসে কিন্তু বুঝতে পারে না প্রতিদানে অমিতা তাকে ভালবাসে কি না? এই না-ধরা না ছোঁয়া অবস্থায় সে একটা অশ্বস্তিতে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু এই রহস্যকে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলার মত না ছিল তার সাহস বা তাকে অপসারিত করার মত শক্তি। আলো-আঁধারে সে রইল মুহ্যমান।

কিছুদিন পরে বাড়ী ফেরবার জরুরি তাড়া এল। সে ঠিক করল যাবে, নবতৃণের মাঝে আকণ্ঠমগ্ন গাভী কণ্ঠের রশিতে টান পড়লে যেমন ঠিক করে, এখন গোঠে ফেরাই ভাল। যাবার আগের দিন অর্দ্ধরাত্রি অবধি অনিদ্র-নয়নে সমরেশ ভাবল বিদায়ের আগে সে এমন একটা কথা অমিতাকে বলে যাবে যার প্রদীপ্ত কিরণ চিরদিন অমিতার অন্তর উজ্জ্বল করে রাখবে। বীণাপানীকে মনের বেদনা নিবেদন করে বলল, করুণা করে ক্ষণিকের জন্য আমাকে অর্পণ করো তোমার বাণীর দুর্লভ প্রসাদ, ধূমকেতুর মত আমার হৃদয়ে জ্বালিয়ে দাও ভাষার বুদ্বুদ স্ফুলিঙ্গ। দুর্ব্বলের প্রার্থনায় দেবী প্রসন্ন হন না, তিনি তাঁর নির্দ্দয়তার মহত্বেই বিরাজিত থাকলেন।

সমরেশ তার অমর শেষ কথা না বলেই কলিকাতায় ফিরে এল। সেখানে সে তার চিরাভ্যস্ত পরিবেশে, পথপাশে খোলা জানালার ধারে উৎসাহহীন চিত্তে উদাস নেত্রে বসে বসে ভেবে স্থির করতে পারল না, অমিতাকে সে কেন বিয়ে করতে পারবে না। সে স্বপ্ন দেখল, একদিন তার ঘরে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল, লাজাঞ্জলি বর্ষিত হল, অগ্নিদীপে বেদমন্ত্রে অমিতাকে চুম্বন দানের অধিকার অর্জ্জন করল, অমিতাকে সে তার সারাক্ষণের নির্ব্বিরোধ সাথীরূপে পেল।

স্বপ্নের পর এল বিস্মৃতি। অমিতাকে সে ভুলল। জীবনের পুনর্ব্বার সে তার পূর্ব্বতন নিরপরাধি ছন্দ ফিরে পেল। শুধু মাঝে মাঝে তার এই মেঘাচ্ছন্ন জীবন তরবারির মত শাণিত অমিতার স্মৃতির বিদ্যুত রেখায় বিদীর্ণ হত। মোহ মুদ্গর হাতে বীরের মত সে তাকে সহ্য করে যেত।

বছর দুয়েক পরে সে আবার পেল বন্ধু অবনীশের আর একখানা চিঠি। সে লিখেছে অমিতার শুভবিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেছে। সমরেশ মুখে বলল বিধাতার এই নিদারুণ আঘাত সে হাসিমুখে বহন করবে, আর মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করল অক্ষমতার মধুমক্ষিকা দংশনের তীব্র জ্বালা। বাহুবন্ধনে বিলীন যায় বক্ষের স্পন্দন তার দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে পারত সে আজ একেবারে তার অনাত্মীয় অসম্পর্কিত হয়ে উঠল। জর্জরিত সর্পের মত ব্যর্থ অনুশোচনায় সে নিজেই নিজেকে বারংবার দংশন করতে লাগল।

তারপর অবশেষে যখন তার সমস্ত বিষ সে নিজের উপরই নিঃশেষ করে দিল, যখন জগদ্দল পাথর খানা তার চেতনাকে সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত করে দিল, তখন সে সহসা লাভ করল এক উদ্দীপনা। লেখা-পড়া সে বেশীদূর করেনি, কৈশরে সে শিখেছিল মূর্ত্তিরচনার কলা। আজ সেই বিদ্যাকে সে স্মরণ করল। তাদের বাড়ীর পিছনে ছিল কিছু পোড়া জমি, সেখানে খাড়া ছিল কয়েকটা অসংস্কৃত ঘর। তারই একটাকে সে কলি ফিরিয়ে মনের মত সাজিয়ে নিল। দরজার সামনে পুতুল দুটো ললিত গোলাপলতা। তারই একটু সামনে পাতল রজনীগন্ধার বিছানা। পশ্চিমে জানালার সামনে রইল একটা কামিনীকুসুমের গাছ, তার চারিপাশ ঘিরে গণ্ডী রচনা করল কৃষ্ণকলি আর হাসনাহানা।

বাইরের আয়োজন যখন শেষ হল তখন সে লাগল মনখানাকে মার্জ্জনা করতে। মনের মধ্যে অসাধ্য সাধনায় সে সোনা ফলাবে। বৃন্তমুখেই যে সাধের কুঁড়ি ঝরে গেছে সেই বেদনার বৃন্তেই সে আরাধনার কুসুম মঞ্জরিত করে তুলবে। যে মাটীর অমিতাকে সে পায়নি মাটী দিয়েই তাকে সঞ্জীবিত করে তুলবে। আপন বুকের পাঁজর দান করে, সে অমিতাকে সৃষ্টি করবে।

একদিন একটা মূর্ত্তি গড়ে তাকে রঙের গৌরবে রঞ্জিত করে শেষ করল। তাকে জানালার সামনে একটা টেবিলে বসাল। সূর্য্য তখন অস্ত যায়। গাঢ় লাল আভার আকাশ খানাকে যেন দিকবধূর চেলীর আঁচলের মত দেখাচ্ছে। বিহঙ্গেরা নীড়ে ফিরে এসেছে। কোলাহল যেন একটা অন্তিম প্রণামে মাথা নত করেছে। আরতির ধূপ-ধোঁয়ার মত অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। সমরেশ বাগানে গেল। নিয়ে এল একগুচ্ছ ফুল। প্রতিমূর্ত্তির চারিপাশে তাদের মেলে ধরল। তারপর অনিমেষ প্রেক্ষণে তার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসল।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে মৃদু সৌরভ ভেসে এল। অমিতার মধুর কণ্ঠ বীণার বেজে উঠল। অমিতা এসেছিল কলিকাতায়, যাবার আগে সমরেশের সঙ্গে দেখা করতে এল। অমিতা একবার ডাকল। সমরেশের মর্ম্মে প্রবেশ করল সেই আহ্বান। সমরেশ সাড়া দিল না, মাটির প্রতিমার সামনে নির্ব্বাক বসে রইল। তার মন তার মনের অমিতাকে বলল কথায় তোমাকে আমি কিছু বোঝাতে পারব না, তোমায় সব চেয়ে ভাল বোঝাবে আমার এই বাক্যহীন উত্তর।

সম্পাদকের দপ্তর

মাননীয় 'খেয়ালী'র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়,

পনেরো দিন আগে আমি নিম্নলিখিত চিঠিখানি 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' পাঠাইয়া ছিলাম। কিন্তু কি কারণে জানি না তাঁহারা ছাপাইলেন না। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি আপনার পত্রিকায় স্থান দিলে বাধিত হইব।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়

আপনার শারদীয়া সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর লিখিত "বাঙলা সাহিত্যে নারী" শীর্ষক প্রবন্ধের ২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"জয়শ্রী ভিন্ন মহিলা সম্পাদিত আর কোন মাসিক পত্রের সন্ধানই পাওয়া যায় না এবং ২৫৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "বীণাপানি রায় এম-এ, জয়শ্রী সম্পাদনার ভার নিয়েছেন।" এবং শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত "বাংলার নারী প্রগতি" শীর্ষক প্রবন্ধের ২৩৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"জয়শ্রী আজ নারীর সাহিত্য রচনার রস-সম্পদ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছে।" লেখিকারা বর্ত্তমানকাল ব্যবহার করেছেন। তাঁহাদের আমি জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা গত আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসের "জয়শ্রী" পাইয়াছেন কি না। আমি এই বছরে বৈশাখ মাসে বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দিয়া এই বছরের গ্রাহিকা হই। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ দুই মাসের "জয়শ্রী" পাই। তারপর এই পর্য্যন্ত আর পাই নাই। দুই তিন খানা চিঠি দিলাম উত্তর পাইলাম না, রিপ্লাই কার্ড ফিরিয়া আসিল কিন্তু "জয়শ্রী" আর আসিল না। তারপর "জয়শ্রী" কার্য্যালয়ে লোক পাঠাইয়া দিলাম, লোকটি সংবাদ দিলেন যে "জয়শ্রী" উঠিয়া গিয়াছে। এই জন্য বলি লেখিকাদের উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। শিক্ষিতা মহিলার এই রকম ব্যবহার অত্যন্ত লজ্জাকর ও ঘৃণাজনক। সমস্ত বছরের মূল্য লইয়া তারপর বেমালুম "জয়শ্রী" উঠাইয়া দেওয়া সম্পূর্ণ জুয়াচুরী। শিক্ষিতা মহিলার এত অধোগতি হইয়াছে ইহা আমরা আশা করি নাই। ১৩০১ সালে তখনকার ভারতী-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় নববর্ষে আর "ভারতী" বাহির হইবে না এই মর্ম্মে মুদ্রিত নোটিসসহ আগামী বর্ষের অনেকগুলি অগ্রিম মণিঅর্ডার ফিরাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী ভারতীর সম্পাদিকা হইয়া "ভারতী" চালান। তাঁহারা বীণাপানি রায় এম-এর মত ব্যবহার করেন নাই। তখনকার ও এখনকার শিক্ষিতা মহিলাদের এই প্রভেদ। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রটি আপনার সুবিখ্যাত "আনন্দবাজার পত্রিকায়" ছাপাইবেন যাহাতে লোকে এম-এর নাম শুনেই প্রতারিত না হন।

শ্রীসুধাময়ী ব্যানার্জ্জি

C/o Satya Dayal Banerjee M. A. B. L.
Hooghly

অমিতা একবার দেখল তার একাগ্র-তন্ময় মূর্ত্তি। দেখল ফুলে পূজা করা তার আপন প্রতিমূর্ত্তি, দেখল সেই মূর্ত্তির ললাটে, অধরে স্তনচূড়ায় জলে ওঠা সূর্য্যের শেষ রশ্মি। আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর তার আঁখি করুণ অশ্রুতে ছলছল করে উঠল। নিঃশব্দে সে এসেছিল, নীরবেই আপন চরণ-চিহ্ন অবলুণ্ঠিত অঞ্চলে বিলুপ্ত করে ফিরে গেল।

অমরাবতী নারী সম্মিলনী

শ্রীপ্রেমরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
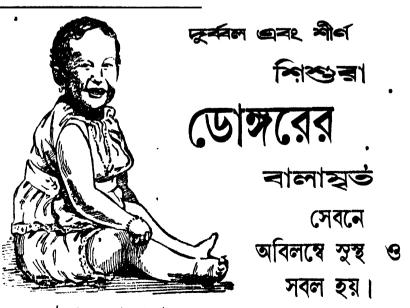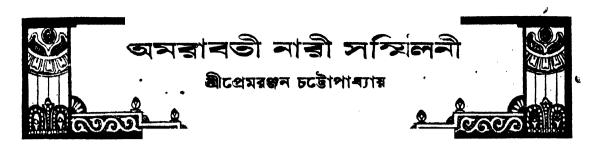
স্বর্গ অতি চমৎকার জায়গা। সব রকম চিজ্ এখানে মিলে, কোনকিছুরই অভাব নেই। শীত গ্রীষ্ম কিছু নেই,—চিরবসন্ত এখানে বিরাজমান। চব্যচোষ্যলেহ্য আহার, পারিজাতের মৃদুমন্দ হাওয়া আর অপ্সরীদের নাচ-গান ইত্যাদি আহার-বিহারে সর্ব্বদাই দেবতারা মসগুল থাকেন।

মহানিশ্চিন্তে দেবতারা দিনরাত Bray খেলে থাকেন। Brayই নাকি স্বর্গে সবচেয়ে উঁচুদরের তাসখেলা, কারণ এ'খেলার নূতন নিয়মানুসারে প্রত্যেক sideএ দুজন করে বসতে হয়, কাজেই প্রতিপক্ষকে একযোগে আক্রমন কর্ত্তে বেশ সুবিধে হয়।

সবাই সুখে আছে সত্য কিন্তু সময় আর সুখ নেই যম বেটার। ইদানীং আবার তার কাজকর্ম্ম কিছু বেড়েছে। Head clerk চিত্রগুপ্ত চশমা এটে, খাতাপত্র নিয়ে সবসময়ই ব্যস্ত থাকেন, বেচারার একটুকুও নাচ-গান অথবা Bray খেলার ফুরসুৎ নেই।

কিম্ভতকিমাকার যম-কিঙ্করগণ ডাণ্ডা নিয়ে সর্বসময়ই প্রস্তুত হয়ে আছে। বেটা যম সবসময়ই কাজ খোঁজেন,—ছুতানাতা করে কাকে কি শাস্তি দেওয়া যায়।—কিন্তু বাছাধনের সে চালাকী আর খাটছে না, কারণ পৃথিবী থেকে তা'র লোক নেওয়ার কাজ বেড়েছে বটে, কিন্তু শাস্তি দেওয়ার কাজ আজকাল কমে গিয়েছে।

পূর্ব্বে শাস্তির ১নং ধারা অনুসারে, কোন পাপকাজের চিন্তা করলেই শাস্তি পেতে হত কিন্তু আজকাল মানুষ বড্ড চালাক হয়েছে, মৃত্যু সন্নিকট বুঝতে পাল্লেই, তা'রা মনে মনে নানা সৎচিন্তা কর্ত্তে থাকেন,—যেমন "কিছুদিন বেঁচে থাকলে এখানে একটা পুকুর কাটিয়ে দেব—ওখানে একটা দেবালয় প্রতিষ্ঠা করব" ইত্যাদি।—কাজেই মানুষের মনের পাপপুণ্য কাটাকাটি যাওয়ায় এদিকে যম বড় সুবিধে কর্ত্তে পাচ্ছেন না। যদিও তিনি স্বর্গের Legislative councilএ এই আইন সংশোধনের অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ায় যমের কাজ বেড়েছে সত্য কিন্তু ও'রা অজ্ঞান অবস্থায় মরে বলে শাস্তির ঘর ও'দের খালিই থেকে যায়,—সুতরাং মানুষকে অক্ষতদেহে স্বর্গে পৌছতে দেখে যে, বাছাধনের চোখ টাটাবে তার আর বিচিত্র কি!

(২)

এহেন সুখের স্বর্গেও কিছুদিন হ'ল অসন্তোষের সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। পৃথিবীর ন্যায় সেখানেও স্ত্রী স্বাধীনতার ঢেউ লেগেছে।

মেয়েদের মুখপত্র "স্বাধীন বাণী"তে Female emancipation সম্বন্ধে দু'-চারটা কড়া প্রবন্ধও বেরিয়েছে।

স্ত্রী স্বেচ্ছাচারীতার পূর্ণবিকাশ ইউ-রোপে,—সেখানে German দেশের Dictator স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারীতার উচ্ছেদ করবার সঙ্কল্প করেছেন বলে, এখানে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। প্রতিবাদ-সভা করে বেশ গরম গরম বক্তৃতা করা হয়েছে। কয়েকটী প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে—শুনা যায় শীঘ্রই নাকি তার একখণ্ড খসড়া Berlinএ প্রেরণ করা হবে।

(৩)

সেদিন "মহিলা সমিতি'র সভা হয়ে গিয়েছে'—তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, তা'রা আর কোন পুরুষের অধীনে থাক্‌বে না।

সমিতির প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও গঠন করা হয়েছে। Secretary শীতলাদেবী তীব্র ভাষায় বলেছেন—

"কেন,—কিসের জন্য আমরা পুরুষের অধীনে থাকিব!—স্বার্থপর পুরুষ পদে পদে আমাদিগকে ছোট করিয়া রাখিয়াছে,—নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য।—আমাদিগকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী বলা হয় সত্য কিন্তু প্রিয় ভগ্নিগণ।—বলিতে বুক ফাটিয়া যায় যে, অর্দ্ধাঙ্গিনী শব্দের তাৎপর্য্য পুরুষগণ এখনও সম্যকভাবে বোঝেন নাই, নতুবা ঘরকন্নার কাজ, রান্নাবান্না ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব তাহারাও সমভাগে গ্রহণ করিতেন।—সতীত্ব সতীত্ব বলিয়া পুরুষ চেঁচায় বটে, কিন্তু ইহা সেকেলে ঢং—যত দোষ নারীর বেলায়'—পুরুষ শত অপরাধ করিয়াও সমাজের মাথায় বসিয়া নারীর সামান্য অপরাধের বিচার করিয়া থাকে।—কেন?—কিসের জন্য আমরা এই সব লাঞ্ছনা সহ্য করিব?"

প্রমান স্বরূপ নারায়ন ও শিবঠাকুরের কথা উল্লেখ কল্লেন, নারায়ন নাকি মর্ত্তে এসে গোপীদের নিয়ে কি সব কাণ্ডকারখানা

করেছিলেন,—শিবঠাকুর মোহিনীমূর্ত্তির পিছু নিয়েছিলেন।

উপসংহারে তিনি বল্লেন, "আমাদিগকে অবরোধ-প্রথা বর্জ্জন করিয়া অবাধ মেলামেশা করিতে হইবে, তাহা হইলেই ভাবের আদান প্রদান করিয়া নারীজীবনের চরম উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইব"।

ঘনঘন করতালির মধ্যে "শীতলাদেবী" আসন গ্রহন ক'রলেন। President মনসাদেবী, লক্ষ্মীকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন,—বেচারা যেই বলেছে যে, "আপনারা কেউ স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিবেন না"—আর যায় কোথায়!—অমনি চারিদিক থেকে Shame! Shame ধ্বনি আরম্ভ হল—অগত্যা লক্ষ্মীকেও চুপ কর্ত্তে হল।

ক্রমে ক্রমে অসন্তোষের বহ্নি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। Divorce system অনুমোদন করে দেবীরা Council এ এক Bill উত্থাপন করিয়েছিলেন, কিন্তু পাশ হয়নি বলে তা'রা নানারূপ আন্দোলন আরম্ভ কল্লেন।

তা'রা মত প্রকাশ কল্লে যে, নিজেদের Council এ না ঢোকা পর্য্যন্ত এর কোন প্রতিকার হবেনা।

সমস্ত পুরণ সামাজিক নিয়ম গুলোকে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। পুরণ যা—তা সবই পুরণ। নারীজাগরণের অন্তরায় এ সমস্ত নিয়ম কানুন সব কিছুই বাদ দিতে হবে। কোন নিয়ম মুখে মুখে বল্লে চলবেনা,—আইন দ্বারা আষ্টে পিষ্টে বাঁধতে হবে।

অনেকে বল্লে Divorce system প্রচলন না হ'লে কিছুতেই চলবেনা। পুরণ একটা জিনিষ নিয়ে চিরকাল থাকা যায়না,—মন যখন যা চাইবে, তখনি যদি তা'কে তা না দেওয়া যায়, তা'হলে মনের স্বচ্ছ গতিকে বাধা দেওয়া হয়—কাজেই মনের উৎকর্ষ সাধন চাপা পড়ে যায়।

কয়েকজন দেবতা ঐসব বিষয়ে সাহায্য ক'রে মেয়েদের ভিতরে খুব নাম কিনেছেন। কতগুলো দুষ্টু দেবতা কিন্তু ও'দের পারিবারিক নানা কথা উঠিয়ে, তা'দের এ সমস্ত মেয়েলি ব্যাপারে যোগ দেওয়ার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করে থাকেন।

(৫)

সেদিন দুপুরবেলা, নারায়ণ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা আর শিবঠাকুর এই কজনে মিলে বেশ হল্লা করে Bray খেলছিলেন। নারায়ণ বেশ আমুদে দেবতা, তিনি সব সময়ই নানারকম রসিকতা করে থাকেন।

শিবঠাকুরকে বাঁদিকে বসিয়ে, তিনি আচ্ছাকরে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন এ'দিকে শিবঠাকুরের নম্বর ৮০তে উঠেছে। তিনি আবার একটুকুতেই ঘাবড়ে পড়েন, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করেন না—আর ঘাবড়ে পড়লেই মনটাকে চাঙা করে তোলবার জন্য দু'একটান বড় তামাক সেবন করে থাকেন। শিব-

ঠাকুরের এ'অভ্যেস অনেককাল থেকে, এবং এ'জন্য ভগবতীর তরফ থেকে তিনি অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেছেন, কিন্তু জিনিষটা ছাড়তে পারেন নি।

নন্দী ভৃঙ্গি বড় তামাক আর কল্‌কে নিয়ে সব সময়ই প্রস্তুত থাকে, কারণ কোন সময় যে শিবঠাকুর ফরমায়েস্ করেন তার কোন ঠিক নেই কিনা!

একেত নারায়ণ খেলায় বিষয় নিয়ে শিবঠাকুরকে নানারূপ বিদ্রূপ বর্ষণ আরম্ভ করেছেন, তার ওপর আবার ৮০র উপরে নম্বর উঠেছে, কাজেই শিবঠাকুরের অবস্থা সঙ্গীন!...তিনি বল্লেন, ওরে নন্দী ভৃঙ্গি—একটু সেজে নিয়ে আয়ত রে—না, একটা Minus thirteen না নিলে আর চলছেনা—ভাবটা এই যে, Minus thirteen নেওয়াটা তা'র ইচ্ছার ওপর নির্ভর কচ্ছে যখন ইচ্ছে তখনই নিতে পারেন।

নারায়ণ ব্যাপার দেখে, কড়া-বিড়িটানা কালঠোঁট বেঁকিয়ে একটু মুচকি মুচকি হেসে একটা কড়া-বিড়ি ধরিয়ে টানতে আরম্ভ কল্লেন।

ব্রহ্মা জোর দু'টিপ্ নস্যি নাকে পুরে কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে—বাইরে গিয়ে ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক ঝেড়ে এলেন।

ইন্দ্র সবসময় Scissors সিগ্‌রেট খেয়ে থাকেন, এসময়েও তারও একটু মৌতাত করবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু ও'খানে সবাই তা'র গুরুজন, তাদের সামনে ত আর সিগরেট খাওয়া যায়না!—কাজেই মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখলেন।

ব্রহ্মা গম্ভীরভাবে বল্লেন,—আচ্ছা, এখন আরম্ভ হোক। শিবঠাকুরের নেশা জমে আস্‌ছিল,—তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন, —এই একটু দেরী কর ভাই;—আর একটান মেরে নি।

সবেমাত্র খেলা আরম্ভ হয়েছে, এরি মধ্যে কিছুদূরে সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের উত্তেজিত চিৎকার শোনা যেতে লাগল।

ইন্দ্র বল্লে, ব্যাপার কি!—সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকিতে চড়ে নারদ এসে উপস্থিত! নারায়ণ জিজ্ঞাসা কল্লেন,—ব্যাপার কি ঠাকুর?

নারদ চোখমুখ লাল করে বল্লেন,—সর্ব্বনাশ হয়েছে!—মেয়েরা meeting করে তা'দের সামাজিক দাবীদাওয়া সব ঠিক করে ফেলেছে,—আর আপনারা এখানে আছেন জানতে পেরে দাবী পেশ করবার জন্য এ'দিকে আসছে।—যদি তা'দের দাবী পূরণ না করেন তা'হলে এখনই সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবে।

শিবঠাকুর চোখ ঢুলু ঢুলু করে বল্লেন, হুঁ, তাইত সে'দিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে দেখি, কার্ত্তিক আর গণশা মেঝেতে পড়ে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদছে—নন্দীকে জিজ্ঞেস কল্লুম, ওরা কাঁদছে কেনরে?—নন্দী বল্লে "মা ঠাকুরুণ তা'দের সম্মিলনীর সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছেন,—এ'বেলার পাক আর খোকাদের খাইয়ে-দাইয়ে ঘুমপাড়াবার জন্যে আপনাকে বলে গিয়েছেন।

—আমিত শুনে একেবারে থ খেয়ে গেলুম।

নারায়ণ নারদকে বল্লেন, ব্যাপার বড় সুবিধে নয়,—আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে ও'দের এখানে আস্‌তে বারণ করুণ, আর ও'রা কি চায় জেনে আসুন।

দেবরাজ ইন্দ্রের চোখে-মুখে দারুণ দুশ্চিন্তার ভাব ফুটে উঠল। তিনি বল্লেন —চারিদিকের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে রাজ্যশাসন করা আর চল্‌বেনা।—আপনারা যা হয় একটা পরামর্শ দিন; চিরদিনত আপনাদের পরামর্শ নিয়েই কাজ করে আস্‌ছি।

পিতামহ ব্রহ্মা বহুদর্শী দেবতা। তিনি বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বল্লেন; আরে ও'সব কিছু নয়,—তোমরা আবার একটু

বিদায় বেলায়

শ্রীআদিত্য নারায়ণ সিংহ

একান্ত অবেলায়
আমারে দাওগো বন্ধু গোপনে বিদায়।
আমারে করিও ক্ষমা
শুধু এই কথা মোর বক্ষে রেখ জমা।
মনে পড়ে জীবনের মধুর প্রভাতে
তুমি এলে রাণী মোর আলোক সম্পাতে
এলে তুমি স্বপনের রূপে
জ্বালালে প্রণয়-শিখা অতি চুপে চুপে।
তারপর কোথা তুমি কোথা তব প্রাণ
বারে বারে কর মোরে ঘৃণা অপমান।
বিচিত্র রূপের মাঝে ধরা দিতে চাও
প্রাণভরা হাসি নিয়ে বারতা সুধাও।
ওগো মোর আলকের রাণী,
আলোকেই জন্ম তব জানি তোমা জানি।
ছলনার নাহি তব সীমা,
তুমি মোরে দেখাইবে প্রেমের মহিমা?
তব কথা স্মরি,
বারে বারে বক্ষ মোর উঠিছে শিহরি।
অনন্ত অসীম এই ধূসর সন্ধ্যায়
আজি তাই মাগি বন্ধু' গোপনে বিদায়
ওগো প্রহেলিকা,
তোমার আমার মাঝে কৃষ্ণ যবনিকা।

হ'লেই ঘাবড়ে পড়,—এ ত অতি সামান্য সামান্য কথা; শুম্ভ-নিশুম্ভ থেকে আরম্ভ করে কত বড়বড় অসুর হিট্‌লারী মেজাজে এখানে রাজত্ব কল্লে,—কই পাল্লে তা'রা কিছু কর্ত্তে! তা'দের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার সবই ত প্রচার কর্ত্তে চেষ্টা করেছিল, এমন কি জোর-জবরদস্তি পর্য্যন্ত চালিয়েছিল,—হেঃ এ ত মেয়েমানুষ।

নারায়ণ বল্লেন,—পিতামহ দেখছি কোন খবরই রাখেন না,—কাগজ পড়া বুঝি

একরম ছেড়ে দিয়েছেন!—ব্যাপার যে কতদূর গড়িয়েছে তা ত আর জানেন না! বেকার সমস্যা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, আর ক'দিন পর দেশশুদ্ধ সবাইকে অনাহারে থাকতে হবে। ছেলেরাই চাকরী পাচ্ছেনা তার ওপর আবার মেয়েরা চাইছে চাকরী। বলুন কোত্থেকে এত চাকরী জোটাবো? চাষবাস—ব্যবসা—বাণিজ্য এসবত আর কেউ কর্ত্তে চায়না। আপনিত জানেন, এই চাষবাসের জন্যে আমি কি কষ্টই না স্বীকার করেছি! এত বড় যে বাঁদরের দেশ বৃন্দাবন—ক্ষেতে বীজটি বুনবার পর্য্যন্ত যো নেই,—বাঁদরে সব খেয়ে ফেলে, সেখানেও চাষবাস আর গো-পালন করেছি। অবস্থা তখন বেশ স্বচ্ছল ছিল।

এ'দিকে মেয়েরা হৈ চৈ আরম্ভ করেছে। সব রকম মেয়েলি শিক্ষার পৃথক বন্দোবস্ত কর্ত্তে চাইলুম কিন্তু মদনদেব আর কতগুলো মেয়ে ঘোর আপত্তি করলে;—বল্লে, "ও সবের দরকার নেই,—সবাই graduate হব। ও'দিকে রাহু তার দলবল নিয়ে ধর্ম্ম ত্যাগের হুমকি দিচ্ছে।—আর অসুরদের কথা যে বল্লেন,—আমিত শুনলুম যে, ওরা নাকি দল পাকিয়ে আবার আসছে।—একেত রক্তবীজের গুষ্ঠি দিন দিন বাড়ছে, তার ওপর যদি দল পাকিয়ে এখানে এসে বসতে পারে, তা'হলে যোগ্যতা থাকুক আর না থাকুক শতকরা ৬০টি চাকুরী চাইবেই—তখন কি করবেন?

শিবঠাকুর এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলেন, তিনি চড়চড় করে কলকেফাটা একটান মেরে বল্লেন,—নাঃ—শান্তি নেই, কোথাও শান্তি নেই!—মনে করেছিলুম, এত হুজুগ-হাঙ্গামার থেকে লাভ কি, তার চাইতে বরং শস্যশ্যামলা শান্তিপূর্ণ বাংলায় চলে যাব, তাও হ'লনা

ব্রহ্মা বল্লেন, কেন? সেখানে আবার কি হয়েছে? শিবঠাকুর বল্লেন, জানত, গিন্নি ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতিবার শরৎ কালে সেখানে যেয়ে থাকেন! ও'বার যখন যান, আমি কার্ত্তিককে বল্লুম,—দেখরে বাবা ধনুকবানটা রেখে যা,—ওখানে ওটা অস্ত্র-আইনের আমলে আসে।—বেটা আমার কথা শুনলে না,—ফল যা হয়েছিল তাত বুঝতেই পাচ্ছ।

আসবার সময় সরস্বতী তা'র বীনাটী এক মাড়োয়ারীর কাছে বাধা রেখে কিছু টাকা আনলে,—কুবেরত আর নেই যে, তা'র কাছ থেকে আনবে!—তিনি যে America গিয়ে বসেছেন, আর ফিরবার নামটি পর্য্যন্ত নেই।—সেই টাকা দিয়ে কিনলে কিনা একখানা জাপানী কাপড়,—আমি বারণ করেছিলুম,—ও কাপড় কিনিসনে মা, দেখতেই বাহার টিঁকবে না। কই পারলে দু'মাস পরতে!

এমন সময় নারদ ফিরে এসে মস্ত এক ফিরিস্তি দাখিল কল্লেন। নারায়ণ বল্লেন, পড়ুন ত' দেখি কি লিখেছে। নারদ পড়তে সুরু করলেন,—"এতদ্বারা অমরাবতী মন্ত্রি-সভাকে জানান যাইতেছে যে, আমরা অমরাবতী নারী সম্মিলনী সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছি যে, বর্ত্তমান নারী জাগরণের অন্তরায় কুসংস্কারপূর্ণ পুরাতণ সামাজিক রীতিনীতিগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং এই সম্মিলনী কর্ত্তৃক প্রস্তুত নিম্নোক্ত বিধিগুলি আইন-প্রনয়ন দ্বারা সমাজে প্রচলন করিতে হইবে।

যদি বিলগুলি পাশ না হয়, তাহা হইলে আমরা সত্যাগ্রহ করিতে বাধ্য হইব এবং তীব্র আন্দোলন চালাইব।

প্রস্তাবিত বিল

স্বর্গললনাদিগকে হিলওয়ালা জুতা ও গাউন পরিধান করিতে হইবে। ব্যবস্থা পরিষদে নারীজাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক (শতকরা ৩০টি) আসন রাখিতে হইবে। সহশিক্ষা প্রচলন করিতে হইবে।

(ক) গতপ্রায় যৌবনে বিবাহ ও তৎপূর্ব্বে (খ) পরকীয়া প্রেমচর্চ্চায় কোন বাধা থাকিবে না। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলন করিতে হইবে।

এই সমস্ত বিধিগুলি আইনে পরিণত হইবার পর যদি কেহ কার্য্যকালে বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে সে আইনে দণ্ডনীয় হইবে।

১নং ২নং ৩নং ও (৪ক) বাধ্যতামূলক থাকিবে ও ৬নং অদ্য হইতেই কার্য্যকরী হইবে। ইহার সঙ্গে নারদ আরও দু'খানা
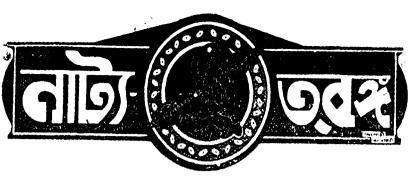
শ্রীনটশেখর

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ :—

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের বিগত বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভ্যগণ মহাকবি ভাসের **"বালচরিত"** রূপক ও বোধায়নকবির **"ভগবদজ্জুকীয়"** প্রহসনের অভিনয় করেছিলেন। গোড়াতেই অভিনয়ের একটা অঙ্গহানি দেখে আমরা কম বিস্মিত হইনি। ভরতনাট্যশাস্ত্রে অভিনয়ের আগে জর্জ্জর উৎসবের বিধান দেখতে পাওয়া যায়। আজ সাত আট বছর ধ'রে পরিষদের অভিনয়ে এই জর্জ্জর উৎসবটি একরকম অপরিহার্য্য হ'য়েই দাঁড়িয়েছিল। রসগ্রাহী সুধী দর্শকেরা এ নূতনত্বটুকু বেশ উপভোগও করতেন। কিন্তু এবছর কোন্ অপরাধে এই জর্জ্জরকে বাদ দেওয়া হ'ল, তার কৈফিয়ৎ আমরা এই জর্জ্জরের প্রবর্ত্তক অশোক শাস্ত্রী ম'শায়ের কাছে দাবী করতে পারি নিশ্চয়ই।

পেশ করলেন। প্রথম খানায় মনসা দেবী তাঁর স্বামী জরৎকারুর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমোদন চেয়ে পাঠিয়েছেন। অপর খানায় জরৎকারু মনসা দেবীর প্রতি দাম্পত্যের অধিকার দাবী করিয়াছেন।

সমস্ত শুনিয়া নারায়ণ, ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্ত্তে লাগলেন।

নারদ আমতা আমতা করে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

সভাস্থলে অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তিই এর অভাব অনুভব ক'রে বিস্ময় প্রকাশ ক'রেছিলেন—আমাদের প্রতিনিধি তা' বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন।

অভিনয়ের সাফল্যের জন্য কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু মহাশয়—যিনি "দামকের" ভূমিকায় রূপ দিয়ে অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর আহার্য্য (make-up) ও আঙ্গিক অভিনয় হ'য়েছিল একেবারে অনবদ্য—এমন কি স্থানে স্থানে হাঞ্চ্ব্যাক অফ্ নোটার্ ডাম্—এর ভূমিকায় লন চ্যানীর অননুকরণীয় অভিনয়কে মনে করিয়ে দিচ্ছিল। তিনি হল্লীশনৃত্যের দৃশ্যটিকে যেভাবে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিলেন, তা'তে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন না জানিয়ে থাক্‌তে পারছি না। আরও শুনলাম গোপবালক ও বালিকাদের নৃত্য ও গীতের পরিকল্পনা ও শিক্ষার ভার তাঁর উপরেই ছিল। এজন্যও তিনি আমাদের অবিমিশ্র প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

এরপরই বৃদ্ধ গোপের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রূপসজ্জার দিক থেকে বলরামের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্যকে মানিয়েছিল অতি চমৎকার। আমাদের কেবলই মনে হচ্ছিল—কেন একে কৃষ্ণের ভূমিকা দেওয়া হ'ল না। অবশ্য কৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুকুমার ভট্টাচার্য্যের অভিনয়ও মন্দ হয় নি। কংসের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্যের অভিনয় ভাল। তবে তাঁর মোগলাই দাড়ি দেখে মনে হচ্ছিল যে, সংস্কৃত পরিষদে এমন একজনও লোক নেই যিনি প্রাচীন ভারতের রূপসজ্জার একটুও খোঁজ রেখে থাকেন। সত্য হ'লে আপশোষের কথা সন্দেহ নেই। অশোক শাস্ত্রী ম'শায় ত' "কথাকলি" থেকে "বলিনিজ" নৃত্য পর্য্যন্ত সকল প্রকার নৃত্য ও অভিনয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখেন দেখেছি। আর তাঁর নিজের গণ্ডীর মধ্যে এত সব গলদ্ হয়—এদিকে কি তাঁর একটুও নজর পড়ে না? না—গাঁয়ের মধ্যে যোগীর ভিক্ষা মিলে না? দেবকীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যকে মানিয়েছিল সুন্দর। নন্দগোপের ভূমিকায় পণ্ডিত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন ও বসুদেবের ভূমিকায় কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চলনসই অভিনয় করেছিলেন। অবশিষ্ট ভূমিকা অনুল্লেখযোগ্য।

নান্দী গানে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় আসর মাৎ ক'রেছিলেন। বিশেষ ক'রে তাঁর সঙ্গে দানীবাবুর পাখোয়াজ-সঙ্গত আমাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছিল। নারদবেশী বিষ্ণুবাবুর গান-দু'খানিও সুগীত হ'য়েছিল। হল্লীশ নৃত্য-গীতের ত' কথাই নাই। এমেচার ক্লাবে এত সুন্দর নাচ ও গান যে ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে তৈরী হ'তে পারে, তা' আমরা প্রথমটা কল্পনায়ও আন্‌তে পারি নি।

মোটের উপর বালচরিতের অভিনয় আশাতীত সাফল্যমণ্ডিত হ'য়েছিল। "ভগবদজ্জুকীয়" প্রহসনটি খুব উচ্চ শ্রেণীর হ'লেও এদিনের বালচরিত অভিনয়ের পর বিশেষ আসর জমাতে পারে নি। তবে তা'তে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি। আমরা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি!!!
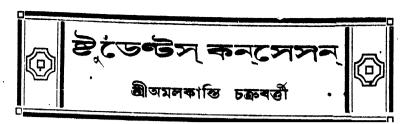
ষ্টুডেণ্টস্ কনসেসন

শ্রীঅমলকান্তি চক্রবর্ত্তী

(১)

শেষে তাই ঠিক হ'ল—ষ্টুডেণ্টস্ কন্‌সেসনই যাওয়া হ'বে। অনর্থক বেশী পয়সা খরচ করা মোটেই ন্যায় সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে পারলে কোন মতেই ছাড়া উচিৎ নয়—তা একটু কষ্ট হয় হোক ভি আচ্ছা। তবে একটা অন্তরায়—আমরা তিনজন, কিন্তু চারজন দরকার। হরেন আবার আমাদের মধ্যে একটু ভীরু প্রকৃতির—সেও যেতে বিশেষ রাজী হয় না। কিন্তু যেখানে মেজরিটি, সেখানে কোন কথাই উঠতে পারে না। আমি আর নরেশ একমত হ'য়ে ওকে একেবারে আউট-ভোটেড করে দিলুম। শেষে বেচারী আর কি করবে, রাজী হ'য়ে বললে "দেখিস্ ভাই, আজকাল বড় ধরছে।" নরেশ উৎসাহ পেয়ে বললে "হাঁ, হাঁ সে তোমাকে আর ভাবতে হ'বে না। তুই কি হচ্ছিস্ দিন দিন?" আমিও বেশ একচোট হেঁকে বললুম "ওইত ওর দোষ। কলেজে পড়ছে কিন্তু স্কুলের ভাবটা কিছুতেই গেল না। কেবল ভয় ওর মজ্জাগত দোষ। নরেশ বললে "আমরা তিনজন—আর একখানা টিকিট বেচতে পারব না, বলিস কি? আমি স্কুলে যখন পড়তুম তখন অমন ঢের ঢের টিকিট অনেককে বেচতে নিজে চোখে দেখেছি। ও একখানা টিকিট—আর ভাবতে হ'বে না হিজিলি ঠিক হ'য়ে যাবে।" হয়তঃ যাবে কিন্তু হরেনের হতাশ ভাব আমি আর সহ্য করতে পারলুম না—মনটা যেন হঠাৎ কেন চমকে উঠল—কিন্তু ওই অনুকুলে ভাবটা রাখলুম চেপে। বাইরে প্রকাশ করতে সাহস করলুম না। তারপর আবার একেবারে ধুয়ে পুছে ফেলে দিলুম ওই ভাবটাকে মন থেকে— কেন না এড্‌ভেন্‌চার করতে গেলে একটু মনের বিকার হওয়া স্বাভাবিক ভেবে। আমার মনের ভাবটা নরেশ হয়তঃ বুঝতে পেরে বললে "কি বিজন তুইও কি হরেনের দলে ভিড়ে গেলি নাকি? বড় যে চুপ ক'রে ভাবছিস্।" আমি কখনও দমে যাই না। অমনি ব'লে ফেললুম "তাও কখন হয়? যখন একবার ভেবেছি কনসেসনে যাব তখন আর ব্রহ্মার ব্যাটা বিষ্ণু এলেও আমাদের এ প্ল্যানটা উল্টাতে পারবে না।" নরেশ যেন হাতে একেবারে চাঁদ পেয়েছে ভাব নিয়ে লাফিয়ে বললে "নিশ্চয়, এই টোয়েণ্টিয়েত সেনচুরির ছেলে কেন সেকেলেদের মত ভীরু, কাপুরুষ হ'তে যাবে? ও বাবা, বাইরে যেও না জুজুবুড়ি ধ'রে খাবে এ ভাব এখন আর রাখলে চ'লবে না।" আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম যে নরেশ বিজ্ঞের মত ফাঁকা আওয়াজ করছিল। তার কি ভয় নেই? নিশ্চয় আছে? তবে বাগে পেলে নেহাৎ মূর্খও অনেক উপদেশ দেয়। যাক্ বাজে কথা। আমি বললুম "হ্যাঁ রে নরেশ, তুই যে বলেছিলি তোর কোন্ এক আত্মীয় নাকি শেয়ালদ ষ্টেশনে টিকিট-কালেক্টর?" এবার নরেশ রেগুলার ইমোশনাল হ'য়ে বললে "ব্যস্ আর ভাবতে না। আমার পিসিমার খুড়তুত দেওরের শালা বিলাস বাবুই ত আছেন। আমি ওকে একেবারে ভুলেই গেসলুম। আমিও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলুম বটে, কিন্তু নরেশ মহাত্মার আত্মীয়ের ঘটা শুনে মনটা যেন ভাঁর ভার ঠেকতে লাগল। ভাবলুম—তাই বলে রণে ক্ষান্ত দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং এবারও মনোভাব প্রকাশ ক'রে নিজেকে ভীরু দলে ফেলতে মোটেই ইচ্ছে গেল না। তখন হরেনের অবস্থা ভাবতে লাগলুম—বোধহয় সে ভাবছিল "সংসর্গ দোষঃ গুণাঃ ভবন্তি, এবং আরও কত কি।" যাক্ কলেজ থেকে ফার্ম নিয়ে যথা সময়ে ফিলআপ্ ক'রে দিলুম। সমস্ত মত ফারম এসে পৌঁছুল— তিনজনে ব্যস্ততায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে একটা মিটিং করে ফেললুম যে থার্ড ক্লাসেই যেতে হ'বে কেন না একখানা টিকিটত আবার বেচতে হ'বে? নরেশ বললে "যখন কন্‌সেসনে যাচ্ছি তখন সব দিক দিয়েই হওয়া উচিত।" হরেনের মনোভাব বিশেষ সুবিধেজনক মনে হ'ল না। সে কেবল গোবীর গনেশের মত হুঁ না ক'রে যাচ্ছিল—অর্থাৎ তার বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে সে যে নাচার হ'তে চলেছে এই ভাবটা। আমি বললুম "এতদুর যখন এসেছি তখন একটা হেস্ত, নেস্ত, ক'রে তবে ছাড়ব। কলেজের ছেলেরা কিনা ক'রতে পারে?" নরেশ আমার কথায় ডিটো দিয়ে বললে "নিশ্চয়।" কত বড় কাজ ক'রতে যাচ্ছি ভেবে বুকটা ফুলে উঠল দু'হাত—একটা বিজয় গর্ব্ব অনুভব ক'রলুম। এখন মনে আর কোন দুর্ব্বলতা নেই। কলেজে যেতে হয় তাই যাই কিন্তু মন আমার অলক্ষিতে বিচরণ করে বেলে। ভাল ভাল প্রফেসারের লেকচার আর ভাল লাগে না। মনেহয়—একঘেয়ে, প্রাণহীন। এখন আমি অজানা কোন্ আনন্দের ইঙ্গিতে হ'য়ে যাই তন্ময় কলেজের কথা আর ভাবি না—ভাবি

ক'লকাতা ছেড়ে কোন্ দূরবর্ত্তী, অচেনা যায়গার কথা। এমনই ক'রে বসে বসে ভাবি, কখন ঘণ্টা পড়ে তাও জানি না। তখন যেন বাস্তব ছেড়ে চ'লে যাই ক্লোন্ স্বপ্নলোকে—কখনও আনন্দের ইঙ্গিতে হাসি কখনও হ'য়ে পড়ি তন্ময়।

কলেজ বন্ধ হ'য়ে গেল—যাওয়ার দিন ঠিক হ'য়ে গেল। ঠিক হ'ল এসপ্ল্যানেডে তিনজন একসঙ্গে মিলব—কারণ তিনজনের বাড়ী তিন দিকে। টাইম রাত আটটা ঠিক হ'ল।

যাওয়ার দিন সময় আর কাটতে চায় না। জিনিষ পত্তর সেই কখন গুছিয়ে ফেলেছি। মনে হ'চ্ছে আকাশ বাতাস সব ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় দেরী ক'রে দিচ্ছে। কতবার উঠি, বসি কিছুতেই ভাল লাগে না—মনে হয় সবই যেন ফাঁকা, সবই যেন নিষ্ঠুর। ইতিমধ্যে বাড়ী থেকে সাবধান হওয়ার কথা শুনে আরও হচ্ছিল অসুবিধে—আসছিল বিরক্তি। কেউ বললে "রাস্তায় খুব সাবধান", কেউ বললে "দেখে শুনে যেও—তুমি যে ছেলে, কত মানত ক'রে তবে তোমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।" কেউ বললে "মালের উপর নজর ক'রো।" ইত্যাদি। প্রত্যেককেই নানা রকম উত্তর দিতে শেষে ভাষাও ঠিকমত খুঁজে পাচ্ছিলুম না। যাক্ কারুকে এমন কথাও বলতে হ'ল "সে ভাবতে হ'বে না—এখন আর আমি ছেলে মানুষ নই।" ইত্যাদি।

সন্ধ্যে ছটা হ'তে না হ'তেই আমি খেতে বসলুম। দাদা আমার ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন "কটায় ট্রেণ যে এত তাড়াতাড়ি করছিস্?" আমি তখন গোগ্রাসে খাচ্ছিলুম। ভাত মুখে পুরতে পুরতে বললুম "সাড়ে দশটায়।" দাদা হেসে বললেন "ও! ছটায় না গেলে বোধ হয় ট্রেণ ধরা যাবেনা?" দাদাকে বোঝাতে বোঝাতে হ'য়ে গেল খানিকটা দেরী। বাড়ীতে আর একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, কেবলই ভাবছিলুম নরেশ আর হরেনের কথা—তারা আবার ঠিক টাইমলি এসে পৌঁছুবেত? যাক্ রওনা হবার উদ্যোগ করছি এমন সময় আমার ছোট ভাগ্নী, বেলা আমার কাপড় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কিছুতেই ছাড়ে না—মহাবিপদ। কত মটর গাড়ী, পুতুল দোব বললুম—না কিছুই নয়, কেবলই বলতে লাগল "তোত মামা, আমি দাব"। ভাবলুম এ আবার কি মহাবিপদে ফেললেন ভগবান। অনেক ক'রে তবে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল—অবশ্য একটা ভাল পুতুল এনে দোব এই প্রতিশ্রুতিতে। আঃ রে! ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সাতটা—আমার আত্মারাম কাঠ হ'য়ে গেল। বাসে যেতে অনেক সময় লেগে যায়।

বাস ড্রাইভারগুলোর কত যে ফাইন হয় তবুও তারা দেরী করে। সেদিন মেসো মশায়কে কি বিপদেই না ফেলেছিল। ড্রাইভার ব্যাটা বললে "আপ ঘাবড়াইয়ে ম্যৎ, ঠিকসে লে যায় গা।" কিন্তু শেষে দৌড়ে দৌড়ে প্রাণান্ত ক'রে তবে ট্রেণ ধরতে হ'ল। এই জন্যেই ড্রাইভারগুলোকে কেউ বিশ্বাসও করে না, ভালও বাসে না।

এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছুলুম—এসে দেখি ঠিক সাড়ে সাতটা বেজেছে। অনেকটা ভয় কেটে গেল। মনে মনে ভাবলুম "যা হোক এসে পড়েছি টাইমলি—বাবা, যা বিপদেই পড়া গেছল। পেছনে তাকিয়ে দেখি নরেশ মূর্ত্তিমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। আমি বললুম "যাহোক তুই ত এসে পড়েছিস, হরেন কোথায়?" নরেশ বললে "হরেন এখনও আসে নি।" আমি বললুম "যা বলিস ভাই হরেনটা একটা ইডিয়েট।" তখন নরেশ বললে "আমি ভাই ওসব বিষয়ে খুব পার্টিকুলার—আমার বাবাও তাই।" তারপর নরেশ হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললে আরে এ যে দেখি আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি? হরেন ত এখনও এল না? বিজন তুইও একটা ইডিয়েট, মিছি মিছি কেন হরেনকে টিকিটগুলো রাখতে দিলি, দেখত কি বিপদেই ও আজ ফেললে?" আমার তখন এত রাগ হ'য়ে গেল তা আর বলবার নয়। রেগেই বললুম "হরেনইত বললে যে ওই টিকিট রাখবে—তুইও ত তখন কিছুই বললি নি। যত দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে পারলেই হল। নরেশ বললে

যাকগে যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, এখন চল এগিয়ে দেখি হতভাগাটা এল কিনা!" কি আর করি, যত কিছু পাপং নয়োক্তবে চাপং ভেবে দু'জনে তখন তা'কে পই পই করে খুঁজতে লাগলুম। কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না—সাড়ে আটটা হ'য়ে গেল, তবুও না। ভীষণ রাগ হ'য়ে গেল, পাইত হরেনকে তখন শেষ করি আর কি! ওর উদ্দেশ্যে কত ইডিয়েট, ষ্টুপিড বললুম কিছুতেই মনে শান্তি পেলুম না। কেমন যেন লাগতে লাগল—একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। হয়ত ছুরি থাকলে একটা বিপরীত কাণ্ড ক'রে ফেলতুম। খুঁজতে খুঁজতে দু'জন দু'ধারে চ'লে গেছি। আমি খুঁজছি এমন সময় দেখি ইডিয়েটকে সঙ্গে ক'রে নরেশ এসে উপস্থিত। তখন আমি এত রেগে গেছি যে আর কথা বলতে পারলুম না—ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিলুম। এর মধ্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার বড় সাধের মণি-ব্যাগটী কে যেন দয়া ক'রে চক্ষুদান দিয়েছেন। আসতে আসতে নানারকম বাধায় মনটা এবার গেল একদম বিগড়ে—এক নিমিষে শত আশা হ'য়ে গেল চুরমার—শরীরটা কোন্ ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় হ'য়ে গেল অচল। তবুও যা হ'বার হ'য়ে গিয়েছে ভেবে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে নিলুম—রীতিমত যুবাপুরুষ ভয় পেলে চলবে কেন? দুঃখই যে জীবনের পরশমণি।

শেয়ালদা ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলুম শেষে অনেক ক'রে। অসংখ্য লোকের ভিড়। কত রকম লোক কত রকম ভাষায় কত কি যে বলছে—তার ঠিক নেই। তবে একটা কথা কানে এল, একজন ভদ্রলোক বলছেন "না, না লাগেজ আর দরকার নেই, ও আর ধ'রতে পারবে না। পাঁচ ছ খানা টিকিট রয়েছে আর ভাবতে হ'বে না"। আমার ভয়ানক হাসি পেল, নরেশ মহাত্মার সেই 'ও আর ভাবতে হ'বে না' মনে পড়ায় ভাবলুম "তা হ'লে দেখছি নরেশের মত লোকও আছে!" এখন আমাদের টিকিট বেচতে পারলেই সব গোলমাল চুকে যায়। নরেশ টিকিট নিয়ে কত লোককে অনুরোধ ক'রে শেষে অশেষ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও অকৃতকার্য্য হ'ল। আমি তখন কোন রকম ক'রে টিকিটখানা একজন বুড়োর কাছে এলুম গছিয়ে। মনে একটু আশার সঞ্চার হ'ল। গাড়ী ছাড়তে তখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরী। বস্‌বার যায়গা যে পাবনা তা এসপ্ল্যানেডেই বেশ বুঝেছিলুম।

গাড়ীতে উঠলুম—বস্‌বার যায়গাও বড় জোর পাওয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল। মুহূর্মুহু এই অসম্ভব জোচ্চুরীর কথা ভাবতে লাগলুম। হরেন তখন অসম্ভব গাম্ভীর্য্য নিয়ে পাথর মূর্ত্তির মত নিশ্চল হ'য়ে আছে বসে—কোন কথা মুখে নেই। আমার এসব মোটেই ভাল লাগেনা।

গাম্ভীর্য্য জিনিষটা যে কি তার মানে আমি কিছুতেই বুঝিনা। বেশ হাসব, কথা বলব তবেত আমোদ হ'বে? ব'সে ব'সে চুপ ক'রে ভাবা আমার ধাতে মোটেই সহ্য হ'বে না। একথা ব'লে আমি রীতিমত প্রশংসা পেয়েছি ব'লেই গর্ব্ব ক'রে থাকি—গাম্ভীর্য্য জিনিষটা দিই মন থেকে দূর ক'রে। আমার মতে, যারা কুটিল তা'রাই গম্ভীর। তবে ডুপ্লিকেসি নিয়ে যারা ডিল করেন তাঁদের কথা ছাড়া, কেন না তাঁ'রা দু'রকম ব্যবহারেই অভ্যস্ত। যাক্, আবার নূতন ক'রে কোন বিপদ না আসে, সেইটিই এখন চিন্তার বিষয়। নরেশ তখন ব'ল্লে "বিজন, ম্যাগাজিনটা দে তো, চুপ ক'রে বসে থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।" তারপর তিন জনেই বেশ ম্যাগাজিন প'ড়ে যাচ্ছি কোন গোলমাল নেই হঠাৎ 'মশায় টিকিট' শুনে চমক ভাঙ্গল। ম্যাগাজিনটা আঙ্গুল দিয়ে ঠিক রেখে তাকিয়ে দেখি আমি যে বুড়োকে টিকিটটা গছিয়ে এসেছি সেই বুড়োও আমাদের একই কম্পার্টমেণ্টে এসে উঠেছে—সুতরাং এবার ফুল কনসেসনের পালা। ভগবানকে আমি তখন ভয়ানক ভাবে ডাকছি; যেন চেকার ঐ বুড়োর কাছে টিকিট না চায়—যেমন শতকরা নিরানব্বুই পয়েণ্ট নাইন পার্সেণ্ট ডেকে থাকে। সুফলের আশায় তা'রাও ব'সে থাকে, আমরাও তাই—। কোন রকম বৈলক্ষণ কিছু নেই। ঠিক যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই রাত হয়—পড়বি ত' পর রেলের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা, ক্রু সাহেব সেই বুড়োর কাছে টিকিট চেয়ে বস্‌ল। ভাবলুম লোকটা নিশ্চয়ই কোন যাদুবিদ্যা পারদর্শী, তা না হলে ওই বুড়োর কাছেই বা সবার আগে টিকিট চাইতে গেল কেন? আমি ত এই ধারণা করে গ্যাট হ'য়ে ব'সে রইলুম—তারপর কোন দৃশ্য আসবে তা চোখের উপর একেবারে বেপরোয়াভাবে জল্ জল্ ক'রতে লাগল। টিকিট দেখেই ক্রু ভেংচি কেটে বললে "আপনার আবার কোন্ কলেজ?" "ওই যে তিনজন বাবু কি খাতা পড়িচেন—ওদের যা আমারও তাই" ব'লেই লোকটা অনর্থক হাসতে লাগল—সে হাসিতে না আছে সরলতা, না আছে সৌহার্দ্দ্য। মনে হল বেহায়া বুড়োকে ঘা কতক লাগালে তবে মনের দুঃখ যায়। হরেন বেচারা তখন রেগুলার কাঁপছে। আর নরেশ? সে মেরে গিয়েছে একেবারে থ, শত আস্ফালন তা'র গিয়েছে অতল বিস্ময় জলে ডুবে। আমি তখন গম্ভীর হয়ে ব'সে আছি 'বিপদে ধৈর্য্য হারিওনা' ভাবটী নিয়ে। চেকার আমাকে জিজ্ঞেস করলে ঠাট্টার চরম ভাষা নিয়ে "মশায় ওই লোকটার কম্বিনেশন কি? ও বোধ হয় আপনার সাথে"—। কথাটা বেশ বুঝতে পারলুম। আমি বা কমে ছাড়ি কেন? একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব। বেশ গম্ভীর হ'য়ে মজা করে কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্‌লুম "আইনতঃ চারজন দরকার, তাই তিনটে কলেজের ছেলের একটা পঞ্চাশ কি ততোধিক বয়েসের লোকের সঙ্গে ছাত্র হিসেবে অপরূপ কম্বিনেশন। এই সামান্য ব্যাপারটা যে চেকার সাহেব বুঝতে পারবেন না তা ধারণাই করিনি। তবে, বলাই বাহুল্য যে কোনদিন যদি ষ্টুডেণ্ট লাইফে ষ্টুডেণ্টস কনসেশন কোথাও যেয়ে থাকেন, আপনারাও আমাদের মতই হয়ত করেছেন.........

চেকার আমার কথাটা শুনে অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সরল হৃদয় ও অমায়িক চেকার আমাদের পুলিশের হাতে হ্যাণ্ড ওভার ক'রে দিলে। আমরা তখন অটল, নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুল ষ্টুডেন্টস্ কনসেসন উপভোগ ক'রতে লাগলুম—ঠিক যেন এ আমাদের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মত। এদিকে গাড়ী তার গন্তব্য পথে হুস হুস ক'রে চ'লে যাচ্ছে—কানে শব্দ এল, কেন না চেকার আমাদের পুলিশের হাতে হ্যাণ্ডওভার ক'রে কানে শোনাবার ব্যবস্থাটা রোধ ক'রতে পারে নি।

—গান—

শ্রীহেমন্ত কুমার মল্লিক

তোমায় প্রিয় বিদায় বেলায়
ঝরিতে দিবনা আঁখি!
সলাজ হিয়ায় গোপন বেদনা
গোপনে রাখিব ঢাকি!
কহিব না আমি একটি কথা
সহিব এ প্রাণে সকল ব্যথা
নয়ন সলিল গোপন করিয়া
নয়নেতে সব মাখি॥
যদি কোন দিন বেদনার মতো
তোমার ছবিটি জাগে
পরাণ যদি গো গুমরে গুমরে
পরশ তোমার মাগে।
অধরে মাখিব তব মধু হাসি
স্মরণে জাগাবো তব রূপ রাশি;
নিভৃত পরাণে তোমার মূরতি
নীরবে লবো গো আঁকি॥
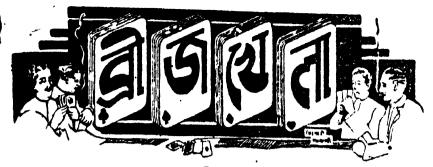
শ্রীদুর্ব্বাসা

থেটা বেটা ক্লাবের নিখিল ভারত গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতা:—থেটা বেটা ক্লাবের নিখিল ভারত গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে। উক্ত ক্লাবের টুর্ণামেণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শচীভূষণ রায়ের অক্লান্ত চেষ্টায়, ক্রীড়াপরিচালকদের সুপরিচালনায় ও প্রতিযোগীবৃন্দের সহযোগিতায় প্রতিযোগিতার খেলা বেশ সুষ্ঠুরূপেই সফলতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। ব্রীজামোদীসাধারণের আনন্দ দানের নিমিত্ত এই প্রতিযোগিতার খেলা পরিদর্শনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। যে কেহ এই টুর্ণামেণ্টের সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট আবেদন করলে খেলা দেখবার জন্ত কার্ড পেতে পারেন। এদের ঠিকানা, ২২৫নং অপার সারকুলার রোড, শ্যামবাজার। যাঁরা প্রতিযোগিতার খেলা দেখে বিশেষ কিছু শিক্ষা করতে চান্ বা আনন্দলাভ করতে চান, আশা করি তদ্‌ব্যক্তিমাত্রই এই সুযোগ নষ্ট করবেন না। ব্রীজসাধারণকে প্রথম শ্রেণীর ব্রীজ খেলা পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়ায় এরা যথার্থই ব্রীজরসিকদের ধন্যবাদার্হ। নিম্নে এই প্রতিযোগিতার বিশেষ বিবরণ দেওয়া হল।

প্রথম রাউণ্ড

(ক) স্যাটার্ণ ক্লাব বনাম থেটা বেটা ক্লাব (১)

(খ) শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাব বনাম সাউথ ক্যালকাটা ব্রীজ ক্লাব। (বালিগঞ্জ)

(গ) ক্রফ্‌ফোর্ডস্ ক্লাব (১) বনাম ক্যালকাটা ওয়াণ্ডারারাস (১)।

(ঘ) টু নো-ট্রাম্পস্ বনাম নীলকুঠি এমেচারস।

(ঙ) এস অফ স্পেডস্ বনাম ক্রফ্‌ফোর্ডস ক্লাব (২)।

(চ) কালীপতি মেমোরিয়াল ক্লাব (২) বনাম থেটা বেটা ক্লাব (২)।

(ছ) ঘুঘুডাঙ্গা বনাম লুনার এণ্ড ফ্লুলস্ কমবাইণ্ড ক্লাব।

(জ) হাইড রোড ইন্‌ষ্টিট্যুট বনাম ল্যান্সডাউন ক্লাব (২)।

(ঝ) ক্যালকাটা ওয়াণ্ডারার্স (২) বনাম জি, এল, ক্লাব।

দ্বিতীয় রাউণ্ড

(ক) বনাম ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল্ ক্লাব। ছত্রভঙ্গ বনাম নর্থ ক্লাব (১)। ল্যান্সডাউন ক্লাব (১) বনাম কালীপতি মেমোরিয়াল ক্লাব (১) ট্রাগলারস্ বনাম সান্ধ্য সঙ্ঘ।

(খ) বনাম (গ)।

(ঘ) বনাম পপুলি মিরাবিলিস (মেদিনীপুর)।

(ঙ) বনাম (চ)।

(ছ) বনাম (জ)।

(ঝ) বনাম নর্থ ক্লাব (২)।

ক্যাপ্টেন মায়ার্স ফোর বনাম মিঃ ডারলি মেটাল ফোর।

এবারে প্রথম দুই রাউণ্ডের বিবরণ দেয়া হল, পরে তৃতীয়, চতুর্থ, সেমিফাইন্যালের বিবরণ দেওয়া হবে। গত বর্ষের বিজয়ীদল হায়দারাবাদের ফিনিক্স ক্লাবের খেলা পড়েছে চতুর্থ রাউণ্ডে ও সমগ্র বিহারের এবং সমগ্র উড়িষ্যার বিজয়ীদলেরও খেলা পড়েছে চতুর্থ রাউণ্ডে। আরও আনন্দের বিষয় এই যে মেদিনীপুর থেকেও 'পপুলি মিরাবিলিস' নামে একটি শক্তিশালী দল এই প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছেন। পরে এতৎসম্পর্কে আরও আলোচনা করা যাবে।

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডী

যাদুকর ক্যামেরা

নির্ব্বাক যুগের পর সবাক ছবি এলো ; লোকের তৃপ্তি নেই। লোক চায় আরো আরো ; চায় নতুন কিছু।

আলো ছায়ার কাজ আজকে কত উন্নতি হয়েছে! তবু লোকে কি তৃপ্তি পাচ্ছে। এই আলো ছায়াকে মনের মত করে নানান ভাবে ধরবার জন্যে কত রকমই না ফিলটার তৈরী হয়েছে। আরো হচ্ছে দিনের পর দিন।

চিত্রকর যেমন রঙ মেশায় নানান রঙে রঙে, সম্প্রতি ছায়া ছবিতেও তেমনি আলোর রঙে রঙ মেশানো চলেছে। চলচ্চিত্রে এটাই হচ্ছে আধুনিকতম চমকপ্রদ খবর। একটি গোল ধাতুতে অনেক গুলো স্বচ্ছ ফিলটার লাগান আছে। ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে নানান গতিতে সেটা লেন্সের সামনে ঘোরান হয়, তারই ফলে আলো ছায়ার তারতম্য।

ফিলটারের গতির তারতম্য অনুসারে মানুষের চেহারা বদলায় পলকে পলকে। অর্থাৎ আলোর মানুষ অন্ধকারে আসছে, অন্ধকারের মানুষ আলোতে যাচ্ছে। সূর্য্যের সোনার আলো ডুবে যাচ্ছে, তৈরী হচ্ছে মেঘ মায়া, সবুজ ঘাসের বন হচ্ছে শুকনো সাদা, এমনি উল্টোপাল্টা।

কাল ফ্রিয়াণ্ড একজন জার্ম্মাণ ক্যামেরা-ম্যান ; ওদেশে বেজায় তাঁর নাম, তারই মাথা থেকে উদ্ভব হয়েছে এ জিনিষের। ধীমান, অসাধারিক এই আলোক চিত্রকরের তোলা ছবি হচ্ছে 'মেট্রোপলিস'।

কাল এসেছিল হলিউডে, ছবি পরিচালনা করতে। থাকতে পারলে না, তাই আবার ফিরে এলো তার ক্যামেরাতে।

পল মুনি আর লুইস রেনার-এর ছবি 'দি গুড আর্থ' কালেরই তোলা।

সেসু আবার

পুরোণো দিনে যারা খুব ছবি দেখত আর ছবির খবর রাখত তারা সেসুর নাম করলে চিনতে পারবে।

সেসু হায়াকায়া ছিল নির্ব্বাক ছবির যুগে হলিউডের বড় অভিনেতা। প্রায় বছর দশেক আগে জাপানে ফিরেছিল এবং সেখানে এতদিন ধরে ছবি প্রযোজনা করছিল। এইবার ফিরেছে হলিউডে।

মেয়ে ডিরেক্টর

ডরোথি আরজনার একজন নাম করা মেয়ে-চিত্রপরিচালক। যাদের ডাইরেক্টার হবার ইচ্ছে আছে তাদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে সে বেশ চমৎকার কয়েকটা কথা বলেছে।

(১) প্রত্যেক পরিচালকের আত্মপ্রত্যয় থাকা চাইই চাই ; অর্থাৎ যে কোন গল্পকে একটা ভাল ছায়াছবিতে পরিণত করতে পারবে এ বিশ্বাস থাকা চাইই। এবং যে ছবি তুলতে যাচ্ছে তার সম্পূর্ণ একটা সমষ্টিগত আইডিয়া থাকা চাই।

(২) ছবি তৈরীর যন্ত্রপাতির কার্য্য এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের দরকার। তা নয়ত ভাল ছবি তৈরী করাই যায় না।

(৩) আরো একটা দরকারী কথা জানতে হবে যে ছায়াছবি পরিচালনা করা হচ্ছে আর্টিষ্টকে একটিং শেখানো নয়। শুধু কি করে অভিনয় করবে এটুকু শেখালে চলবে না। মাথার ভেতর ছবি রাখতে হবে কি করে, দর্শকের চোখের সামনে ছবিখানি প্রকাশ করব।

(৪) ছবিখানি তৈরী করতে গেলে তার গোড়ার কাজ আগে শিখতে হবে। খাতার পাতায় খণ্ড দৃশ্য হতে খণ্ড দৃশ্যে কিভাবে এগোন যাবে তারই একটা খসড়া কাগজে কলমে করতে শিখতে হয়। আর পুরোপুরি জানতে হবে ছায়াছবির যন্ত্রগুলিকে, কারণ ছায়াছবি প্রস্তুতের আসল জিনিষই হচ্ছে যন্ত্র। ছায়া-ছবি দর্শকের কাছে মনোরম করে প্রকাশ করবে ওই যন্ত্র।

(৫) সুটিং এর নিয়ম। অর্থাৎ কোথায় এবং কিভাবে ছবি তুলব তার একটা খসড়া তৈরী করতে হয়। এবং এই নিয়মের একটা যুক্তি থাকা চাই। যে ছবি তুলবে তার খরচের একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকবে। সম্পাদনা পরিচালককে শিখতেই হবে। ভাল সিনারিও লিখবে এবং ছবির ভাব লিপিবদ্ধ করবার সময় প্রডিউসারের চোখ নিয়ে কাজ করবে তবেই ভাল পরিচালক হিসেবে নাম করতে পারবে।

বড় ঘরের মেয়ে

সম্প্রতি—বোধ হয় এই প্রথম, এভাবে দাবী কেউ করেনি। এঞ্জেলা কসেট, ছোট্ট বারো বছরের মেয়ে ; ছবিতে নেমেছে এই সেদিন 'সান্স ফর এ ট্রেজার' ছবিতে। এ্যান হাডিংএর ছবি সেখানা।

এঞ্জেলার ভারী গর্ব্ব যে সে হচ্ছে নাতনী-সার জন হ্যালিডে ক্রমএর। এই হ্যালিডে ছিলেন রাজার বাড়ীর ডাক্তার। বর্ত্তমান

রাজা জন্মাবার সময় কুইন মেরীকে দেখা শোনা করেছিলেন।

কয়েকটা পথ

ষ্টুডিও জগতে কি করে নাম করা যায় তা বলে দিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক মরগান।

মরগান বলেছে :—

১। কোন অভিনেতাকে তার স্ত্রীর সামনে বোলনা যে তোমার অমুক ছবিতে প্রেমের অভিনয় ভাল হয়েছিল।

২। কোন মেয়েকে তার সামনে তার রূপের প্রশংসা কোরনা। তাতে তাকে বৃথা অহঙ্কারী কোরে তুলবে।

৩। কখনও কোনও ষ্টারকে বোল না যে তার নতুন ছবি তুমি দেখনি।

৪। কারুকে বোলনা তোমার শেষের ছবি। সবসময়ে বোলো তোমার বর্ত্তমানের ছবি।

৫। ষ্টুডিওর অফিসে যারা কায করে তাদের খাতির কোরো। কে বলতে পারে, দিন কতক পরে সেও তোমার 'বস' হতে পারে কিনা।

৬। যদি তুমি প্রেমের গুজব বাজারে না রটাতে চাও তাহলে, যার সঙ্গে তোমায় জড়িয়েছে তার ওখানে আর যেও না।

৭। কখনও কারুকে জিজ্ঞাসা কোরনা যে সে নতুন করে ষ্টুডিওর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে কিনা।

৮। ষ্টুডিও ব্যবসার সম্বন্ধে কোন কথা কারোর কাছে বোলনা।

ফ্র্যাঙ্ক মরগ্যানের মতে এই আটটা যে মনে রাখতে পারবে সেই 'ফিল্ম পাড়ার' এক জন অত্যন্ত প্রিয় শিশুকে লোক হতে পারবে।

উটের জন্যে

পল রবসন্ নামছে একখানা আফ্রিকার দৃশ্য-সম্বলিত ছবিতে। ছবির সব দৃশ্য গুলিই তোলা হয়েছিল ব্রিটীশ ষ্টুডিওতে কিন্তু আর হোলনা। দরকার অনেক উটের। ষ্টুডিও ভাড়া পেতে পারে মোটে পনেরোটা উট। কাজেই তাদের যেতে হোল সুদূর আফ্রিকায়।

একটা দৃশ্য, যার ছবি হবে পাঁচশ ফুট সেলুলয়েডের ফিতে অর্থাৎ আমরা পর্দায় দেখব সাড়ে পাঁচ মিনিট। তাকে সম্ভব করতে এই দলকে যেতে হোল সুদূর আড়াই হাজার মাইল সাহারার উত্তপ্ত বালুর অন্তর ভেদ করে।

পর্দায় সামান্য কয়েক ফুট ছবির জন্যে তারা কত কষ্ট করলে। আর ও ছবি যখন আমরা পর্দায় দেখব; হয়ত বলব : যাঃ কিছু হয়নি।

ছবির পোষাক

ক্যামেলি ছবির গল্প হচ্ছে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের গল্প। তাই এর পোষাক আর এর সেট ভাবতে অনেকের অনেক দিন কেটেছে।

এ ছবিতে গ্রেটা গার্বো পরবে চব্বিশ রকম পোষাক, বব টেলর পরবে চোদ্দ রকম। সাতাশটা পোষাক তৈরী হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের জন্যে। তিনশ'পঞ্চাশটা হয়েছে পুরুষ বাড়তি লোকের জন্যে। নানান মেয়ে চরিত্রের জন্যে আর মেয়ে এক্‌ট্রাদের জন্যে পোষাক হয়েছে তিনশ'।

খুচরো খবর

'ড্রিমিং লিপ্স' ছবিতে এলিজাবেথ বার্গনার 'রাম্বা'-নাচ নেচেছে।

* * *

ক্যামেলি ছবিতে সেটের ওপর প্রথম দিন অভিনয় করতে হয়েছিল রবার্ট টেলরকে প্রেমের অভিনয়। সেদিন ও ছিল ভারী লাজুক।

* * *

জিনজার রোজার্স আর জেমস্ ষ্টুয়ার্ট পরস্পরকে 'ভালবাসছে' এই কথাই লোকে আজকাল বলছে।

* * *

'দি সিঙ্গিং মেরিন' ছবিতে নেমেছে ডিক্ পাওয়েল।

* * *

'লেডিস্ ইন্ লাভ' ছবিতে হল মোহর ক্যামেরাম্যান হিসেবে যত টাকা মাইনে পেয়েছে এত টাকা আজ পর্য্যন্ত পায়নি।

যৌন-বিজ্ঞান—আবুল হাসানাৎ, আই, পি, কর্ত্তৃক প্রণীত এবং প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান, ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ৪॥• টাকা

বাংলা ভাষায় যে সত্যসত্যই যৌন ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞান-পুস্তক দেখতে পাওয়া যাবে তা আমাদের আগে ধারণা ছিল না। পাশ্চাত্য দেশে যৌনবৃত্তি সম্বন্ধীয় আলোচনাকে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এটা নিতান্ত গোপনীয় বস্তু। একেই ত' আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম, তার উপর যৌনবৃত্তি, যা এখনও গোপনীয় বস্তু, তা নিয়ে লেখক যে এমন সরল বাংলা ভাষায় সত্যের বিবৃতি করে সাধারণের জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা করেছেন তাতে আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি।

বইখানিতে যৌন-বৃত্তি সংক্রান্ত প্রায়ই সকল জটিল সমস্যা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।, তার ভেতর কয়েকটা বিষয়ের নাম আমরা দিচ্ছি—যেমন, যৌনবোধ সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস, যৌনবোধের সংজ্ঞা, যৌনবোধের বিকাশ, রতি জীবন, প্রজনন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, বেশ্যা প্রথা প্রভৃতি।

বিখ্যাত মনো-বৈজ্ঞানিক ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় এই বইখানির ভূমিকা লিখে যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

বইখানির মধ্যে কয়েকটা বিষয় আমাদের মতের সঙ্গে মেলেনি। তার মধ্যে দুটী বিষয় আমরা এখানে জানাচ্ছি। প্রথমটা হচ্ছে লেখক এই পুস্তকে অনেক পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। পাঠকদের পক্ষে এই সব পারিভাষিক শব্দ সব সময়ে বোঝা বড়ই কষ্টসাধ্য। অথচ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করে যথাযথ ইংরাজী শব্দগুলিই বোধ হয় পাঠকদের পক্ষে সহজে বোধগম্য হ'ত। অবশ্য লেখকের এই কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টাকে আমরা ধন্যবাদ দিই।

দ্বিতীয়টা হ'চ্ছে লেখক এক স্থানে গণোরিয়া রোগ সম্বন্ধে লিখেছেন যে "দূষিত-যোনি বেশ্যা সহবাসেই এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, অন্য কোন কারণে নহে।" বেশ্যা ছাড়া আর কারও দ্বারা এ রোগ সম্ভব নয় একথা নিতান্তই ভুল। কেন না যার শরীরেই এই রোগের বীজাণু আছে তার দ্বারাই এই রোগের উৎপত্তি হয় এবং হবে। সুতরাং "অন্য কোন কারণে নহে" একথা লেখা যুক্তিহীন।

মোটের উপর বইখানি যে একটা উচুঁদরের বিজ্ঞানের শিক্ষণীয় পুস্তক তা আমরা জোর করেই বলতে পারি। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্বেত-প্রজাপতি

দু শ্রেণীর লেখক আমাদের কাছে বই পাঠিয়ে থাকেন—সমালোচনার জন্য। এক শ্রেণীর, যাঁরা সাহিত্যিক বা সাহিত্য-স্রষ্টা। অপর শ্রেণী যাঁরা অসাহিত্যিক এবং অনধিকারী।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে একদল লোক দেখা যায়, যারা জীবনে কখনও হাইস্কুলের চৌকাঠ পর্য্যন্ত মাড়ায়নি, পাঠশালায় পণ্ডিতের কুকুর মারা লাঠির ঘায়ে যাদের গায়ের চামড়া থেকে পণ্ডিতের ছাপ পর্য্যন্ত মেলায়

এরা বাল্যে বাপের বাক্স ভাঙে, লুকিয়ে কোকেন বিক্রী করে, কৈশোরে পকেট কাটে, গড়ের মাঠে বা কার্জ্জন পার্কে লাক্ষৌওয়ালাদের ক্রীড়নক হয়ে ছোট্ট একটি দু'য়ানী বা সিকির বিনিময়ে বীভৎস নারকীয় লালসায় দেহ বিনিময় করে, যৌবনে, বস্তী বা পাড়া বিশেষে দালালী করে। দেহ-বিলাসিনীদের অন্নে পুষ্ট হয়ে কাপ্তেনের খোঁজে নিত্য নূতন ধনীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বেড়ায়।

হয় ত' শেষ বয়সে, কাব্যবাতিকগ্রস্ত কোন অন্নদাতার তথাকথিত সাহিত্য কণ্ডুতির আদর্শে, একদিন এরা লেখনীও ধরে বসে। হয় ত' তাদেরই অনুগ্রহে সে লেখা ছাপাও হয়।

দুই যুগল সাহিত্য-জারজের লেখা এই শ্রেণীর একটুকুরো বিষ্ঠা, ডাকযোগে আমাদের অফিসে এসে পড়ে। বলাই বাহুল্য, সে নর্দ্দামার জঞ্জাল, ঝাড়ুদারের ঝাঁটার মুখে, আমাদের অফিসের নর্দ্দামার বুকেই আশ্রয় পেয়েছে।

শাস্ত্রে বলে, পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ করবার জন্যেই পুত্রের প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু এই মহাগ্রন্থের দুই যুগল রত্ন, দেখা যাচ্ছে, শুধু বাপ-মা নয়, তাদের চতুর্দ্দশ পুরুষকে নরকস্থ করবার জন্যই কম্পিটিসানে সকলের উদ্দেশ্যে বিষ্ঠা ছড়িয়েছে!

বইখানির নাম দেখা যাচ্ছে "শ্বেত প্রজাপতি।" প্রকাশ করা হয়েছে চন্দ্রনগর থেকে। উপহার হয়েচে অগ্রগতির তিন রত্নকে!

আমি শুধু ভাবচি বিশ্বকর্ম্মা কবে তাঁর বিরাট কারখানা থেকে একটি বিরাট রোলার পাঠাবেন। সেই শুভদিনটির দিকে তাকিয়ে আছি, যে-দিন সেই রোলারের চাপে চাপে, নরকের এই ক্রিমি-কীটের দল, পিষে পিষে একেবারে ছাগলাদ্যে দাঁড়িয়ে যাবে!

ফটো : প্যারামাউন্ট

রে মিল্যাণ্ড ও গার্ট্রুড মাইকেল
"দি রিটার্ণ অফ্ সোফি ল্যাঙ্"-এ সুন্দর অভিনয় কোরেছে। ছবিখানা এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে এখন দেখানো হ'চ্ছে।

পরিচালক
টেলিগ্রাম 'ক্যাপিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন
৯, রামময় রোড্, কলিকাতা — পার্ক ৩২৪
প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৩৬

কামিনীকুমার ও তস্য ভ্রাতা

ত্রিপুরা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বল্লভ পন্থকে শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্তের মনোনয়ন সম্পর্কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে কুমিল্লার বহু-বিঘোষিত কামিনীবাবুর কংগ্রেস-প্রীতির স্বরূপ যথাযথভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

নেতৃত্ব গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া যে সমস্ত দাম্ভিক জাতির ও কংগ্রেসের মানমর্য্যাদা ধূলায় লুটাইয়া দিতে কুণ্ঠিত নন বা স্বজাতির সম্বন্ধে হীন উক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করেন না জাতির জীবন মরণের এই সন্ধিক্ষণে এই সকল বহুরূপী জননায়কদের স্বরূপ চিনিয়া রাখা জাতির প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। বৈধানিক-চক্রের অন্যতম নায়ক ক্যাপ্টেন্ নরেন্দ্র নাথ দত্তের দম্ভ এতই গগনস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে যে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চরিত্রে কালিমা লেপন করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। বাঙ্গালী চরিত্রকে কালিমা-লিপ্ত করিয়া কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে ক্যাপ্টেন্ দত্ত যে পত্র লিখিয়াছিলেন এই সংখ্যায় অন্যত্র সেই পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল। সেই পত্রে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে—Bengalees are unfortunately becoming poorer and consequently jealous and ...n-minded

সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে হীনচেতা ও পরশ্রীকাতর বলিয়া অভিহিত করিতে যে হীন-মনা বাঙ্গালীর বাধে না তাঁহার সম্বন্ধে কংগ্রেসের ও জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সময় কী হয় নাই? বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে এই মনোভাব আজ বৈধানিক-চক্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই মনোভাব প্রবল হইয়া উঠাতেই রায়-খেম্‌স আঁতাত ও রায়-রুণী প্যাক্টের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। বৈধানিক-চক্র আজ সেইজন্য কংগ্রেসের অনুজ্ঞাকে অমান্য করিয়া যাঁহারা জুবিলী কমিটীর সদস্য হইয়াছিলেন তাঁহাদের এসেম্‌ব্লি নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের ছাপ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সন্দেহজনকভাবে জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই কামিনীবাবু যে আইন অমান্যব্রত জলাঞ্জলি দিয়া সরকারী নোটিশ পালন করিবার জন্য প্রথম ট্রেনেই কুমিল্লা পরিত্যাগ করেন তাহা কুমিল্লা জেলা পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। কামিনীবাবু রজত-জয়ন্তী কমিটীর ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ছিলেন ও বর্ত্তমানে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের সরকারী মনোনীত সদস্য। লোকাল বোর্ডের নির্ব্বাচনে কামিনীবাবু কংগ্রেস-প্রার্থী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থী শ্রীযুক্ত বিনয় বর্দ্ধনকে সমর্থন করিয়াছিলেন ও বর্ত্তমানে তপশীলভুক্ত জাতির প্রাথমিক নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরকারী প্রার্থী কংগ্রেস-পন্থী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মণের বিরোধিতা করিয়া কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থী শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র মণ্ডলকে সমর্থন করিয়া নিজে নির্ব্বাচন বৈতরণী পার হইবার আশা করিতেছেন। অথচ বৈধানিক-চক্র কামিনীবাবুকেই কংগ্রেসের মনোনয়নের ছাপ দিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ ও তস্য ভ্রাতা কামিনী কুমারের স্বরূপ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও যে বৈধানিক দল তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেছেন ইহা হইতেই কি মন্ত্রীত্ব-মোহ-মরীচিকা-লুব্ধ বৈধানিক চক্রের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে নাই।

মিলন-মোহ-পাশ ছিন্ন করিয়া আজ রাহুমুক্ত শশীর ন্যায় শরৎচন্দ্র বৈধানিক চক্রান্ত ছিন্ন করিয়া যদি কংগ্রেসকে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলেই বাঙলার কংগ্রেস প্রকৃত জাতীয় কল্যাণের প্রতীক হইতে পারিবে। শরৎচন্দ্র কী সেই ব্রতে ব্রতী হইবেন না বিধানচন্দ্রের উক্তিকে সমর্থন করিয়া ভোলা মহেশ্বরের ন্যায় গপ্ করিয়া জলিয়া দগ্ করিয়া নিভিয়া যাইবেন? বাঙলায় জাতীয়তাবাদী

নব-নির্ব্বাচিত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

বসুদলের অসামান্য সাফল্য লাভ।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচনে (A. I. C. C.) নব-নির্ব্বাচিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর অনুগামীদলই সংখ্যা গরিষ্ঠ। আমরা নিম্নে বসুদল, রায়দল, খাদিদল ও শ্রমিক-দলের অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের নাম প্রকাশ করিলাম। ইহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে খাদি দল এবং শ্রমিক দলের একাংশ নৈষ্ঠিক বসু-দলের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

বসুদল

১। আসরফ উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী
২। নগেন্দ্র নাথ ঘোষ
৩। রাজ কুমার বসু
৪। সুভাষ চন্দ্র বসু
৫। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
৬। শরৎ চন্দ্র বসু
৭। শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৮। আবদুল মালেক
৯। ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত
১০। জ্ঞানরঞ্জন সরকার
১১। বসন্ত কুমার মজুমদার
১২। যতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস
১৩। রঞ্জন কুমার মিত্র
১৪। হরেন্দ্র নাথ ঘোষ
১৫। সুরেশ চন্দ্র মজুমদার
১৬। হেমন্ত কুমার বসু
১৭। সুধীর কুমার ঘোষ

খাদিদল

১। অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী
২। অবলাকান্ত গুপ্ত
৩। পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত
৪। ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ
৫। প্রফুল্ল চন্দ্র সেন
৬। বসন্তলাল মুরারকা
৭। সীতারাম সাকসেরিয়া
৮। পঞ্চানন বসু
৯। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রমিক দল

১। দেবেন্দ্র নাথ সেন (বসু)
২। কৃষ্ণ বিনোদ রায় (ঐ)
৩। ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)
৪। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় (রায়)
৫। সুধীন্দ্র কুমার প্রামানিক (বসু)
৬। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (রায়)

রায়দল

১। কমল কৃষ্ণ রায়
২। কিরণ শঙ্কর রায়
৩। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী
৪। পুরুষোত্তম রায়
৫। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়
৬। রামসুন্দর সিং
৭। রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
৮। কালীপদ মুখোপাধ্যায়
৯। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল
১০। ডাঃ যতীন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত
১১। সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরপেক্ষ

১। কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁ
২। সুরেন্দ্র মোহন মৈত্র

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ হইতে প্রমাণ হয় যে বসু—খাদি—শ্রমিক সম্মিলিত দলভুক্ত ত্রিশজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ও রায়দল ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদের সম্মিলিত শক্তি হইতেছে মাত্র তের জন। কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ ও শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মৈত্রকে আমরা কোন দলভুক্ত করি নাই।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আগামী বর্ষের সভ্য নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। তন্মধ্যে বসু-খাদির সম্মিলিত দল হইতে ২৫৯জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রায়দল ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে ১৫০ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং জানুয়ারী মাসে যে কর্ম্মকর্ত্তা ও কার্য্যকরী সমিতির নির্ব্বাচন হইবে তাহাতে বসু-দলের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধায় বাঙ্গালী জাতির অবমাননা

Telegrams
"INJECTULE"

Telephone
358, 359 CAL

THE BENGAL IMMUNITY CO., LTD.

MANUFACTURERS OF SERUM, VACCINES, ORGANO-THERAPEUTIC
PRODUCTS, PHARMACEUTICAL PREPARATIONS, ETC.

Repd 5.10.36

Managing Director:
Capt: N. N. DUTTA, M.B.

153, DHARAMTALA STREET.

Calcutta, 2nd October, 1936.

My dear Dr. ████,

Thanks very much for your letter dated 30.9.36 and good wishes.

You have probably observed that lately there has been a regular crazes in Bengal for starting Chemical & Biological manufacturing concerns owing to the success of a very few in the line. I am sorry to say that some of the concerns have already wound up and some are on the way to liquidation. I should not say anything now for those which have lately been started.

You have already been to our Laboratory and I shall like to take you once more any day and show you how works are being carried on efficiently and economically. We cannot exist to-day or to-morrow without efficiency and economy. I know that you would not believe in "Bazar" gossips. You know that Bengalees are unfortunately becoming poorer and consequently jealous and mean-minded.

I would surely like to appoint any suitable Shareholder - if available.

Re:- Bi-Vita-B:- I could not trace out any of your order pending. I shall make further enquiry on this matter on hearing from you as to the exact date of the order.

With thanks again and best wishes,

Yours sincerely,

N N Dutta

[বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

আজ থেকে "গৃহদাহ" দশম সপ্তাহে পড়লো। এ ছবির নতুন পরিচয় কিছু দেবার নাই—একে চিত্ররসিক এবং চিত্র-সমালোচক সমাজে সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করেছে। আরো কিছুদিন ছবিখানি যে বেশ চলতো তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বোধ হয় শীঘ্রই একে "চিত্রা" থেকে সরাতে হবে। কারণ, বড়ুয়া পরবর্ত্তী ছবি "মায়া" অনেকদিন থেকেই এখানে মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

* * *

চণ্ডী ঘোষ রোডের দ্বিতীয় সাউণ্ড ষ্টুডিও তৈরী শেষ হয়েছে। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই ষ্টুডিওতে বোধ হয় সবার আগে হেমচন্দ্রের "অনাথ আশ্রম"-এর অন্তর্দৃশ্যগুলো তোলা হবে।

নীতীন বসুর "দিদি"-র কাজ বেশ দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে। গেল সপ্তায় উভয় ভাষাতেই দিদির সভানেত্রীর মৃত্যুদৃশ্য তোলা হয়েছে। প্রথমে হিন্দী ছবির জন্যে কমলেশ কুমারীর "মৃত্যু" দৃশ্য তোলা হল; তারপরে বাংলা ছবির জন্যে চন্দ্রাবতীর "মৃত্যু" দৃশ্য তোলা হল। দুই ছবিতেই যথাক্রমে কমলেশকুমারী এবং চন্দ্রাবতী খুব সুন্দর অভিনয় করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। দুই নায়িকার সঙ্গে সঙ্গে ভানু বাঁড়ুয্যে, বিক্রম নাহার, অমর মল্লিক, নবাব এবং দুর্গাদাস বাঁড়ুয্যে ছিলেন। এঁরাও নিজেদের ভূমিকায় উপযুক্ত রূপ দিয়েছেন। নীতীনবাবুর এই ছবিতে এ দেশের চিত্র-রসিক সমাজ যে নতুনত্বের সন্ধান পাবেন তা নিঃসন্দেহ।

পরিচালক হেমচন্দ্র তাঁর ছবির নায়ক-নায়িকা নাজামুল হোসেন এবং উমাশশী ও চিত্র-শিল্পী ইউসুফ মুলজীকে সঙ্গে নিয়ে কয়লাখনি অঞ্চলে ছবির কয়েকটা দৃশ্য তুলতে গেছেন। হেমচন্দ্রের আগের ছবি "মিলিওনেয়ার" দেখে যাঁরা তার ছবি আবার দেখবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন, তারা নিশ্চয় খুশী হবেন "অনাথ আশ্রম" দেখে। "অনাথ আশ্রম"-এ একটী ছোট ছেলেকে দেখতে পাওয়া যাবে বিশিষ্ট একটী চরিত্রে—এই ছেলেটি যে রকম সুন্দর অভিনয় করেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি—তাতে মনে হয় সে অভিনয়-ক্ষমতা নিয়েই যেন পৃথিবীতে এসেছে।

* * *

আসছে ১৯৩৭—৩৮ সালে কতগুলো ছবি তৈরী হবে তা শীঘ্রই কর্তৃপক্ষ স্থির করবেন। এরপর থেকে নিউ থিয়েটার্সের ছবি বেশ নিয়মিতভাবে পর্দায় ঝলসিয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর আমরা যথাসময়েই দেব।

* * *

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়াকে আজকাল যেন একটু চিন্তিত দেখা যাচ্ছে। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল যে 'চিত্রা'য় মুক্তিলাভ করার আগেই "মায়া"-তে নতুন কতগুলো দৃশ্য জুড়ে দিয়ে ছবিখানাকে আরো মনোহর করতে চান। এই ব্যাপার নিয়ে বড়ুয়া রীতিমতো মাথা ঘামাচ্ছেন। অবশ্য এর জন্যে কর্তৃপক্ষকে অনেকখানি আর্থিক ক্ষতি সইতে হবে—তবে আমরা জানি যে ভাল ছবি তৈরী করা বিষয়ে নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষ কখনই কার্পণ্য করেন না।

আনোয়ার শা রোড ষ্টুডিওতে মিত্তির মশাই তাঁর আগামী বাংলা ছবি "বৈষ্ণবী"-র কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

* *

জোর গুজব, শ্রীঅমর মল্লিক শীঘ্র একখানি তিন রীলের হাসির ছবি তুলবেন। অনেকেই জানেন না বোধহয় যে, 'রূপবাণী'তে "বিজয়া"র সঙ্গে "মন্দ কি" নামে যে ছোট হাসির ছবি দেখানো হচ্ছে তা মল্লিক

বিশ্বাসঘাতক গুপ্ত সাহেব পদত্যাগ করেন নাই কেন?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ড হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ পঁচিশ জন সদস্য পদত্যাগ করিলেও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত অদ্যাবধি পদত্যাগ করেন নাই। দক্ষিণ-মধ্য কলিকাতার ভোটারগণ কী এই বহুরূপী বিশ্বাসঘাতককে সমর্থন করিবেন?

মশায়ের পরিচালনায় তোলা এবং আগাগোড়া ছবিটা—যায় তার কাহিনী, চিত্র-নাট্য থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত তৈরী করতে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

কালী ফিল্মস্

কয়েকদিন আগে "টকী অফ টকীজে"র বাণী থিয়েটারের 'হরধনু ভঙ্গ' অভিনয়ের দৃশ্যটি তোলা শেষ হ'য়েছে। আর দু' একটা ছোট খাট দৃশ্য তুলতে পারলেই ছবিখানার কাজ শেষ হবে।

* * *

গুণময় বাঁড়ুয্যের পরিচালনায় "পরভৃতিকা"র কাজ প্রায় তিনভাগ শেষ হ'য়েছে। "পরভৃতিকা" সত্যই চিত্রের উপযোগী গল্প—এখন সাফল্য নির্ভর কোরছে গুণময়ের হাতযশের ওপর। আমরা আশা করি, এতখানি সুযোগ পেয়ে তিনি তা' নিশ্চয়ই সদ্ব্যবহার কোরে নিজের যোগ্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরবেন।

রাধা ফিল্মস

এদের "বিষবৃক্ষ" আস্‌চে ১৫ই ডিসেম্বর রূপবাণীর রূপোলি পর্দ্দায় রূপ পরিগ্রহ কোরবে। ছবিখানা আমাদের মনে হয় সাধারণের কাছে বিশেষ প্রিয় হবে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের এ গল্পটিতে সিনেমার উপযোগী মালমশলার অভাব নেই—তার ওপর এই ছবিতে এমন কতগুলি অভিনেতৃর যোগাযোগ হ'য়েছে, যাদের সুনাম আছে বাজারে যথেষ্ট।

* *

হরি ভঞ্জ আপাততঃ হিন্দী "মানময়ী গার্লস স্কুল" তোলা স্থগিত রেখে অপরেশ মুখুয্যের "ছিন্নহার" তোলবার মতলব কোরেছেন। ছবিখানার কাগজপত্রের কাজ শেষ হ'য়েছে—এবার শিল্পী নির্ব্বাচন পালা শেষ হ'লেই শুটিং আরম্ভ হবে।

এবার এরা প্রভাত মুখুয্যের রোমাঞ্চকর গল্প "রত্নদ্বীপ" তুলবেন। চিত্রনাট্য লেখা হ'চ্ছে—এদিকে শিল্পী মনোনয়ন কার্য্যও চলছে। সতু সেন ছবিখানার পরিচালনা কোরবার ভার পেয়েছেন।

মতিমহল টকীজ

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে এদের "রাঙা বৌ"-এর শুটিং গেল সোমবার থেকে সুরু হ'য়েছে। আমরা শুনলাম পরিচালক জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যে ছবিখানাকে সকল দিক থেকে সাধারণের উপযোগী করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন।

নীতীন বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের আগামী চিত্র "দিদি"র দুইটী প্রধান ভূমিকায় সাইগল ও লীলা দেশাই

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

এদের মধু বোস পরিচালিত "আলিবাবা"-র শুটিং প্রায় শেষ হ'য়েছে। আসচে ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়াতেই ছবিখানা রূপবাণীতে মুক্তি পাবে।

পপুলার পিক্‌চার্স

এদের "পণ্ডিত মশাই" ছবি সাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হ'য়েছে। বাস্তবিকই "পণ্ডিত মশাই"-এর গল্প এত দুর্ব্বল থাকা সত্ত্বেও পরিচালক সতু সেন ও শিল্পীদের সমবেত চেষ্টায় এখানা ছবির মত ছবি হ'য়েছে।

ফাষ্ট ন্যাশন্যাল পিক্‌চার্স

যামিনী মিত্তিরের নতুন কোম্পানীর দ্বিতীয় ছবি হবে মঞ্চ-সাফল্য নাটক "পথের সাথী"। এই ছবির শিল্পী নির্ব্বাচন প্রভৃতি প্রাথমিক কাজ শেষ হ'য়েছে। নববর্ষের নবীন আলোকে এদের নব-যাত্রা সুরু হবে। চারু রায় ছবিখানা পরিচালনা কোরবেন শোনা যাচ্ছে।

জি-দাস-টকীজ

তড়িৎ বসু এদের আগামী আকর্ষণ "ইন্দিরা"-কে সব দিক থেকে সুন্দর কোরে তোলবার জন্যে চিত্রনাট্য ও শিল্পী নির্ব্বাচনে এখনও রীতিমত ব্যস্ত আছেন।

উদয়শঙ্করের বিরুদ্ধে গুপ্ত নিন্দুকের ঘৃণ্য মিথ্যা-প্রচার

বিশ্ববিখ্যাত প্রাচ্য-নৃত্যশিল্পী, বাঙ্গালীর গর্ব্ব উদয়শঙ্কর সহসা স্বীয় শিল্পীদলকে ইউরোপে পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করায় শ্রীযুক্ত শঙ্করের বিরুদ্ধে স্বার্থপরায়ণ কুচক্রীরা ঈর্ষা-প্রণোদিত বহু মিথ্যা গুজব রটনা করিতেছে। শ্রীযুক্ত শঙ্করের দলের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত দুলাল সেন সম্প্রতি ইউরোপ হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন—তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত শঙ্করের দল সম্বন্ধে যে সকল গুজব রচনা করা হইয়াছে, যথা—শঙ্করের দল নাকি ইউরোপে "stranded", শ্রীমতী সিমকি দল ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং বহু বিশিষ্ট শিল্পীও দল পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইত্যাদি—তাহা যে একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা কথা তাহা চিঠিখানি পড়িলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, যাঁহারা হীনস্বার্থ সিদ্ধির আকাঙ্খায় বা একান্ত গর্হিত ঈর্ষার পরবশ হইয়া এইরূপ ঘৃণ্য কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের আচরণ অমার্জ্জনীয় এবং অতিশয় নিন্দনীয়।—সঃ খেঃ

16th. November, Amsterdam, 1936.

পরম পূজনীয়… ..

গত সপ্তাহে Haag সহর থেকে দাদাকে একখানা চিঠি দিয়েছি কেন তা বোধ হয় জেনেছেন। আমি আবার আপনাকে জানাচ্ছি, যে বিষয়ে দাদাকে লিখেছি সেটা করতে দাদাকে বলবেন—বড় দরকার। কলকাতায় নাকি উদয়শঙ্করের নামে বদনাম বেরিয়েছে যে তার কোম্পানী Stranded আর সিমকী নাকি তাকে ছেড়ে নিজের দেশে Parisএ চলে গেছে আর আমরা সব তার কোম্পানী ছেড়ে দিয়েছি। এই সব কাজে গুজবএর এক ফোঁটাও সত্যি নয়। কোম্পানী Stranded হওয়া দূরে থাক কোম্পানীর ২ বছরের জন্যে Americaতে Contract আছে। প্রথম বছর প্রায় ২মাস আর দ্বিতীয় বছর প্রায় ৪ মাস; তার উপরন্তু এখন আমরা Europeএ Tour করছি। এখন Hollandএ আছি, এখানে আজ থেকে ৭ দিন show হবে Amsterdamএ, তারপর Poland যাব, তারপর Germany। এই সব বাজে কথা কলকাতায় কে যে রটিয়েছে তা জানতে পারিনি। সিমকী ছেড়ে দেওয়া দূরের কথা, তার নতুন নাচ তৈরী হয়েছে এবং তার সুর ওস্তাদ দিয়েছেন। হাঁা কেবল ওস্তাদ দেশে ফিরে গেছেন কারণ তাঁহার শরীর ভাল নয় আর মন টিক্‌ছিল না। আর মহারাজার ছুটিও শেষ হয়ে গেছল। এই বুড় বয়সে কারই বা বিদেশ ভাল লাগে; তাঁর বয়স ৬৬ বৎসর। তাঁর খাওয়ার বড়

কালী ফিল্মসের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

টকী
অফ্‌
টকীজ

দস্তুরমত টকী

ঃ শ্রেষ্ঠাংশে ঃ

শিশির ভাদুড়ী এম-এ
অহীন্দ্র চৌধুরী
কঙ্কাবতী বি-এ

ভ্রাতার স্নেহ—
ভ্রাতৃজায়ার মমতা
তাকে বাঁধতে পারেনি
স্নেহের জালে।.........
এক অপরিচিত যুবকের
প্রেম ডোরে ধরা দিয়ে
সে গৃহত্যাগিনী হ'ল।...........

তারপর!...........ফিরে এল সে
সীমন্তে সিন্দুর আর প্রিয়তমের
হাত ধরে দাদা ও বৌ'দির
আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার জন্যে
পেলও সে তা'।......

ঃ শ্রেষ্ঠাংশে ঃ

রাণীবালা
বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
শৈলেন চৌধুরী

টকী
অফ
টকীজ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা } শিশির ভাদুড়ী

যে কথা আমরা জানি না।

পুরাকালে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, মথিত সমুদ্র হ'তে বেরিয়ে এলো অমৃত, যা পান করে দেবতারা হ'লেন অমর, সৌন্দর্য্যশালী ও কান্তিমান। মানুষ সমুদ্র মন্থন করতে পারে না, কিন্তু অমৃতের সন্ধান তারা পেয়েছে। প্রকৃতির ফসল মন্থন করে তাদের দেহ যে লোহিত আসব তৈরী করে, তাকে আমরা বলি রক্ত। সে রক্ত দান করে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্য; সে রক্ত মানুষকে কর্ত্তে চায় অমর।

যখন আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি, একটা অসহায় জীবন নিয়ে, জীবনের বিরুদ্ধে তখনই সুরু হয় মৃত্যুর-মন্ত্রণা। রোগের বীজাণু-জগতে সাড়া পড়ে যায়, তারাই মৃত্যুর অগণিত সৈন্যদল কি না? তখন থেকেই চলতে থাকে দেহের উপর তাদের আক্রমণ। দেহরক্ষী যে সব প্রহরী তখন এগিয়ে এসে তাদের বাধা দেয় তারা দেহের রক্তকণিকা।

উপমা নয়, উপাখ্যান নয়, এ নির্ভুল সত্য কথা। মৃত্যুর আক্রমণ বার বার ব্যর্থ করে দিয়ে, রক্ত আমাদের দেহকে সুরক্ষিত দুর্গের ন্যায় ঘিরে রাখে। তাই দেখতে পাই রক্তহীন দুর্ব্বল দেহ নিয়ে মৃত্যু দিন রাত করতে থাকে টানা হেঁচড়া। সে দেহকে রক্ষা করতে হ'লে দ্রুত রক্ত সঞ্চারের প্রয়োজন। প্রতিদিনের আহার্য্যকে জীর্ণ ক'রে তা থেকে রক্ত জমিয়ে নেওয়া ভগ্নদেহের পক্ষে অসম্ভব। তাই দেহকে তখন এমন জিনিষ গ্রহণ করতে যা আমাদের ক্ষুধাকে বাড়িয়ে দিয়ে, খাদ্য-বস্তুকে হজম করে দেয়; যাতে রক্তের উপাদান থাকে প্রচুর আর প্রত্যক্ষ, আর যা এই জীর্ণদেহে নূতন বল ও জীবনীশক্তি এনে মৃত্যুদূতকে হারিয়ে দেয়। সে রকম জিনিস আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্য নয়, তা হচ্ছে একমাত্র "রচি" কোম্পানীর রচিটোন"। এর অসীম কার্য্যকারিতার গুণে দেশ বিদেশে নরনারীরা বহুল পরিমানে "রচিটোন" ব্যবহার করছেন। 'রচিটোন নূতন উদ্দীপনা ও শক্তি এনে দিয়ে, রোগজীর্ণ রোগীকে নূতন মানুষ তৈরী করে দেয়, এর আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় মানুষ পুনর্যৌবন লাভ করে।

—•—

কষ্ট হতো। কোন মাংস খেতেন না। সেই জন্তে খবরের কাগজে এই বাজে খবরের বদলে সত্যি ঘটনা লিখতে দাদাকে বলেছি। আমরা গত কাল সন্ধ্যার সময় Haag সহর থেকে এখানে এসেছি। আর বেশী লিখবার নেই।.........

ইতি—
আপনার স্নেহের
দুলাল।

ই-বি আরে সস্তায় ভ্রমন

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী আগামী বড় দিন ও ইংরাজী নব বর্ষ উপলক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হারে যাত্রী-সাধারণের যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকল শ্রেণীর, বিশেষ করিয়া দরিদ্র বাঙ্গালীর জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার যথাসম্ভব হ্রাসে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

উপরোক্ত সাধারণ concession ব্যতীত ইহারা যথা ইচ্ছা তথা ভ্রমণ করিবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণ হারের তুলনায় নামমাত্র মুল্যে এই ব্যবস্থায় একখানি টিকিট ক্রয় করিয়া যাত্রী কোম্পানীর অন্তর্গত রেলপথে যথা ইচ্ছা তথা গমন করিতে পারেন। পনের দিন এই টিকিট ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এইরূপ সুবিধা-জনক ভ্রমণ ব্যবস্থা করায় আমরা ই-বি আরের কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ দিই।

নাট্য নিকেতনে 'গোরা'

আমরা শুনলাম আগামী ১৯শে তারিখে নাট্য নিকেতনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "গোরা"র প্রথম অভিনয় হ'বে। "গোরা"র নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেটার অনুমোদন করেছেন। চরিত্রলিপি নিম্নলিখিতভাবে হ'বে বলেই স্থির হয়েছে। নরেশ মিত্র—হারাণ, অহীন্দ্র চৌধুরী—পরেশ; ভূমেন রায়—গোরা; জহর গাঙ্গুলী—বিনয়; রবি রায়—মহিম; শান্তি গুপ্তা—সুচরিতা; মনোরমা—বরদাসুন্দরী; রাজলক্ষ্মী—আনন্দময়ী ও চারুবালা—ললিতা। আরও শোনা গেল যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী জনপ্রিয় গান এই নাটকটীতে সংযোগ করা হয়েছে এবং সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত অনাদি ঘোষ দস্তিদার মহাশয় তার সুর সংযোজনা করবেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী

বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান অন্যতম প্রার্থী

বঙ্গীয় এসেম্‌ব্লির আসন্ন নির্ব্বাচনে ২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্রে বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বীরেন রায় অন্যতম প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বিবৃতিতে প্রকাশ যে, পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উক্ত কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন।

রায়-যুগলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে প্রবল হইবে তাহা অনুমান করা স্বাভাবিক। কারণ যদিও অতীতে ডাঃ রায় স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করিয়া উক্ত কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তথাপি বর্ত্তমানে রায়-রুণী প্যাক্টের প্রবর্ত্তক হিসাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাঙ্গলার জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত নহেন। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত বীরেন রায় বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসাবে উক্ত কেন্দ্রে বিশেষ সুপরিচিত। তদুপরি প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত বীরেন রায় মন্ত্রীত্ব-গ্রহণ-বিরোধী। বিগত নিখিল বিশ্ব স্বায়ত্ব শাসন সম্মিলনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

তিনি ঐ সভায় ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের স্বায়ত্ব শাসন প্রণালী কত উন্নত ছিল এবং এখন ইউরোপ হইতে প্রাপ্ত স্বায়ত্ব শাসন প্রণালী কি অবস্থায় আছে তাহা বিশদ এবং প্রাঞ্জলভাবে জার্ম্মাণ ভাষায় বুঝাইয়া দেন। ঐ সম্মিলনীতে সুসজ্জিত জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টের সভাগৃহে অন্যান্য দেশের জাতীয় পতাকার সহিত ভারতের জাতীয় পতাকার বিশেষ স্থান দিতে শ্রীযুক্ত রায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

জার্ম্মাণীতে অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত রায় জার্ম্মাণীর বহু সহরের সভাসমিতিতে বিমানযোগে যোগদান করেন এবং ভারতবর্ষের যুবক আন্দোলন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। নিখিলবিশ্ব স্বায়ত্ব শাসন সভার সভাপতি মিষ্টার হ্যারিস তাঁহার অভিভাষণে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত রায়ের উদ্যমশীলতা এবং কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মিউনিক, ষ্টুডগার্ট ও বার্লিনের মেয়র, বিখ্যাত জেপেলিন, নির্ম্মাতা ও পরিচালক ডাক্তার একেনার ও এরোপ্লেন নির্ম্মাতা ডাক্তার ক্লেম, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর সমারফেল্ড, ড্রেসডেন একাডেমির বৈজ্ঞানিক প্রফেসর হাউশোফার প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সহিত শ্রীযুক্ত রায় ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করেন। সমগ্র জার্ম্মাণীর সভাপতি এবং ভাগ্যনিয়ন্তা হার হিটলারের সহিত তাঁহার নিজকক্ষে শ্রীযুক্ত রায় প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য আলাপ করেন। ভেনিসের শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট সেণ্ট সারের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করেন। ইউরোপের নূতন সমাজতন্ত্র এবং সমাজ-তন্ত্রবাদ যে ভাবে চলিতেছে সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বীরেন রায় ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

সুতরাং ২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্রে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত বীরেন রায়ের মধ্যে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে তাহার ফলাফল সম্বন্ধে বর্ত্তমানে ভবিষ্যদ্বাণী করা দুরূহ।

শ্রীদুর্ব্বাসা

অন্য অবস্থায় অনুসন্ধিৎসু ডাকঃ—গত দুই সংখ্যার পত্রিকায় অনুসন্ধিৎসু ডাকের (asking bid) দুইটি অবস্থার বিষয় আলোচিত হয়েছে, এবার তৃতীয় অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলব তৃতীয় অবস্থাটি হচ্ছে এই যে যদি বিপক্ষদলের কথিত রঙে ডাক দেওয়া যায় তা'হলে সে ডাকটিকেও অনুসন্ধিৎসু ডাক বলা হয়। এই প্রকার অনুসন্ধিৎসু ডাকের প্রয়োগ প্রণালী তিন প্রকার, যথা—(১) প্রথম ব্যক্তির ডাকের পর দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি ডাক দেন আর তাঁর কথিত রঙ যদি তৃতীয় ব্যক্তি ডেকে নেন্ তা'হলে সেই ডাকটি অনুসন্ধিৎসু ডাক হবে এবং তুরূপ হবে তাঁর খেঁড়ী অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি যে রঙ ডেকেছেন। (২) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির পর পর ডাকের পর যদি প্রথম ব্যক্তি বিপক্ষদলের কথিত রঙের মধ্যে যে কোন একটি ডাক দেন তাহলে সেটি হবে অনুসন্ধিৎসু ডাক, আর তুরূপ হবে উভয় খেঁড়ীর মধ্যে যে রঙ শেষবার বলা হয়েছে। (৩) আর তৃতীয়তঃ, যদি ঐরূপ ডাক প্রয়োগ করা যায় নিম্নতম অবস্থাতে তাহলে সেটি হবে অনুসন্ধিৎসু ডাক, আর তুরূপ হবে দুই খেঁড়ীর মধ্যে যে রঙটি শেষবার বলা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

১) 'উ' . 'পূ' 'দ'

হরতন। একটি ইস্কাবন। দুইটি ইস্কাবন।

এই দুইটী ইস্কাবনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক, কেন না ইহা বিপক্ষদলের কথিত রঙ; আর তুরূপ হল হরতন

(২) 'উ' 'পূ'

একটি হরতন। একটি ইস্কাবন।

দুইটি ইস্কাবন।

'দ' 'প'

দুইটি রুহিতন পাশ।

এক্ষেত্রেও এই দুইটি ইস্কাবনের ডাক অনুসন্ধিৎসু ডাক এবং রুহিতন রঙটি হল তুরূপ।

(৩) 'উ' 'পূ'

একটি হরতন। একটি ইস্কাবন।

দুইটি ইস্কাবন।

'দ' 'প'

একটি ফেরাই। পাশ।

এক্ষেত্রেও দুইটি ইস্কাবনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক এবং তুরূপ হল হরতন, কারণ দুই খেঁড়ীর মধ্যে হরতন রঙই শেষবার বলা হয়েছে।

(৪) 'উ' 'পূ'

একটি চিড়িতন। একটি রুহিতন।

তিনটি রুহিতন কিম্বা তিনটি হরতন।

'দ' 'প'

একটি ইস্কাবন। দুইটি হরতন।

এ স্থলে এই তিনটি রুহিতন বা তিনটি হরতনের ডাক হবে অনুসন্ধিৎসু ডাকের পর্য্যায়ভুক্ত; কারণ দেখা যাচ্ছে যে প্রতিপক্ষ দুইটি রঙেই ডাক দিয়েছেন, প্রথমে যে রঙটিই ডাকা হোক্ না কেন সেইটাই হবে অনুসন্ধিৎসু ডাক। আর তুরূপ হচ্ছে ইস্কাবন কারণ ইস্কাবন রঙই উভয় খেঁড়ীর মধ্যে সর্ব্বশেষে কথিত হয়েছে।

(৫) 'উ' 'পূ'

একটি হরতন। পাশ।

দুইটি হরতন। পাশ।

'দ' 'প'

একটি ইস্কাবন। দুইটি চিঁড়িতন।

তিনটি চিঁড়িতন।

তিনটি চিঁড়িতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক এবং হরতন রঙ হল তুরূপ। এ
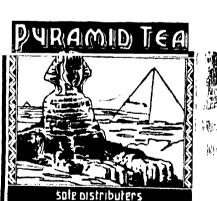
খেয়ালী মানহানি মামলার পরিণতি

হাইকোর্টে পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবী

সাউথ সুবার্ব্বাণ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান

—বনাম—

"খেয়ালী"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও প্রকাশক ও ন্যাশনাল নিউজপেপারস লিমিটেড

বেহালা মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গ এক প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বীরেন রায় "খেয়ালী"র তদানীন্তন সম্পাদক ও প্রকাশক যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সুকোমল বসু ও শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সরকার ও ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিমিটেডের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে (Original Side) ৫০,০০০ টাকা দাবী করিয়া এক মানহানির মামলা দায়ের করেন।

গত শুক্রবার ৪ঠা ডিসেম্বর মাননীয় বিচারপতি মিঃ আমীর আলী উক্ত মামলা খারিজ করিয়া দিয়াছেন এবং বিভিন্ন পক্ষকে স্ব স্ব খরচার জন্য দায়ী করিয়া ও সেই খরচা বহন করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। (The Hon'ble Mr. Justice Amir Ali on 4th December 1936 struck out the suit directing each party to bear and pay its own costs)

মিঃ আমীর আলির এজলাসে মামলার শুনানী উত্থাপিত হইবার প্রাক্কালে বিভিন্ন পক্ষের এটর্ণীদের মধ্যে নিম্নলিখিত পত্র ব্যবহার হয়ঃ—

(1) Suit Dismissed
(2) Each party to bear its own costs

বাদীর পক্ষে এটর্ণী ছিলেন এ, পি, রায় এণ্ড কোং। 'খেয়ালী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও প্রকাশকের পক্ষে এটর্ণী মেসার্স মিত্র এণ্ড মিত্র ও শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় মামলা পরিচালনা করেন। এটর্ণী শ্রীযুক্ত অজিত কুমার দে ন্যাশনাল নিউসপেপার্স লিমিটেডের পক্ষ সমর্থন করেন।

মেসার্স সুধীররঞ্জন দাশ, ডি, এন, ব্যানার্জ্জি ও পি, সি, বসু ব্যারিষ্টারগণ যথাক্রমে ন্যাশনাল নিউস্ পেপার্স লিমিটেডের, 'খেয়ালী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও প্রকাশকের পক্ষে, খসড়াদি করিয়া মামলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রে এই তিনটি চিড়িতনের ডাক একেবারে নিম্নতম অবস্থায় বলা হয়েছে।

(৬) 'উ' 'পূ',
একটি হরতন। পাশ।
দুইটি কেরাই। পাশ।

'দ' 'প'
একটি ইস্কাবন। দুইটি চিড়িতন।
তিনটি চিড়িতন।

এ ক্ষেত্রেও তিনটি চিড়িতন নিম্নতম অবস্থায় ডাকা হয়েছে, কাজে কাজেই এই ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক, আর তদ্রূপ হল ইস্কাবন।

শক্তিব্যঞ্জক ডাক ও অনুসন্ধিৎসু ডাকঃ—আবার আমাদের জানা আছে যে, সাধারণতঃ বিপক্ষদলের

কথিত রঙে ডাক দিলেই সেটি হবে শক্তি-ব্যঞ্জক ডাক এবং পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে ডাকটি অনুসন্ধিৎসু ডাক। সুতরাং এই দুই ডাকের অবস্থা সম্যকরূপে উপলব্ধির নিমিত্ত সবিশেষ আলোচনার প্রয়োজন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা এ বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হল।

(১) 'উ' 'পূ' 'দ'

পাশ। একটি ইস্কাবন। দুইটি ইস্কাবন।

এই দুইটি ইস্কাবনের ডাক কিন্তু অনুসন্ধিৎসু ডাক নয়। কারণ যিনি দুইখানি ইস্কাবনের ডাক দিয়েছেন তাঁর খেঁড়ী কোন ডাক দেন নাই, অতএব ইহা শক্তিব্যঞ্জক ডাক। কেন না, খেঁড়ীর ডাকের পর যদি তাঁর পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিটি ডাক দেন এবং তারপর ক্রীড়ক যদি তাঁর প্রতিপক্ষের কথিত রঙটি ডাকেন, তবেই সেটি হবে অনুসন্ধিৎসু ডাক, নচেৎ শক্তিব্যঞ্জক ডাক। আবার দেখুন,

(২) 'উ'	'পূ'
একটি চিঁড়িতন।	একটি হরতন।
দুইটি রুহিতন।	পাশ।
'দ'	'প'
একটি ইস্কাবন।	পাশ।
দুইটি হরতন।	

এই দুইটি হরতনের ডাক কিন্তু অনুসন্ধিৎসু ডাক নয়, কারণ ইহা প্রথম সুযোগেই বলা হয় নাই। 'উ' যদি দুইটি রুহিতন না বলে দুইটি হরতনের ডাক দিতেন তবেই সেটি অনুসন্ধিৎসু ডাক হত, অথবা তাঁর পাশ দেবার পর 'দ' যেমন দুইটি হরতন বলেছেন সেইরূপ বলতেন তা' হলেও ঐটী অনুসন্ধিৎসু ডাক হত। কিন্তু ঐরূপ না করায় উক্ত ডাক এক্ষেত্রে 'দ'র হরতনে পিট ধরবার ক্ষমতা প্রকাশ করছে এবং খেঁড়ীর ডাক চালাবার আদেশ ঘোষণা করছে।

(৩) 'উ' 'পূ' 'দ'

একটি চিঁড়িতন। একটি ইস্কাবন। তিনটি ইস্কাবন।

এই তিনখানি ইস্কাবনের ডাক অনুসন্ধিৎসু ডাক নয়, কারণ ইহা নিম্নতম অবস্থায় বলা হয় নাই। কাজে কাজেই ইহাতে তিনি প্রকাশ করছেন, "বন্ধু, আমারই ইস্কাবন রঙ যিনি উহা ডেকেছেন তাঁর বোধহয় ভূয়ো ডাক (Psychic bid), আমি ইস্কাবন রঙেই খেলতে চাই।"

—ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। স্বামীর নিকট হইতে উপর্য্যুপরি লাঞ্ছিতা হইয়া রমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। এবার সে ঠিক করিয়াছে, আর কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিবে না। যতকিছু বলেনা ততই বাড়িয়া যাইতেছে। হইলই বা স্বামী তাহা বলিয়া এরূপভাবে অপমান করিবার তাহার কোন অধিকারই নাই। আজ পর্য্যন্ত সে কখনও তাহার একটা কথার অমান্য করে নাই, অথচ সামান্য ঘটনা-গুলোকে কচলাইয়া তিক্ত না করিয়া ছাড়িবে না। রমা উচ্ছ্বসিত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল,—স্বামী! স্বামী! এই নিষ্ঠুর পুরুষগুলো স্বামী! ভগবান্ ধন্য তুমি! রমা কাঁদিয়া ফেলিল।

আজ কয়েক বৎসর নিখিল রমাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। শাশুড়ি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাহার একরকম ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। স্বামীর হাতে পড়িয়া অবধি দৈনন্দিন কত লাঞ্ছনাই না সে পাইতেছে।

বিবাহের পূর্ব্বে কত আকাশ-কুসুম কল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করিয়া রমার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর আজ সেগুলি নিছক কল্পনা হইয়া রমাকে উপহাস করিয়া উঠিল। রমা ভাবিল,—এরূপভাবে তাহার বাঁচিয়া থাকার কোনই মানে হয় না। সেই ভোর হইতে গাধার খাটুনি, তাহার উপর ছেলের খ্যান্ খ্যানানি, এই সব—আরও কত কী! তাহার উপহারস্বরূপ সে পায়—লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান—উঃ, অসহ্য! সে আর পারিবে না এ রকম ভাবে বাঁচিয়া থাকা—নাঃ, কিছুতেই না!

আজ সে কী এমন দোষ করিয়াছিল যাহার জন্য স্বামীর নিকট হইতে এত লাঞ্ছনা পাইল; তাহার অপরাধ, কাজের মাঝে ছেলে আসিয়া বিরক্ত করিতেছিল, তাই সে ছেলের কান মলিয়া কষিয়া এক থাপ্পড় দিয়াছে।

ইহাতে স্বামী তাহাকে কত কটু কথাই না বলিয়াছে, উপরন্তু পিঠে একটা সবেগে কিলও মারিয়াছে, যাহার জন্য এখন তাহার পিঠের ব্যথা মরে নাই। মা হইয়া ছেলেকে সে মারিয়াছে, শাসন করিয়াছে, ইহাতে স্বামী আসিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিবে? ভাবিতে ভাবিতে রমা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মনে মনে স্থির করিল,—সে মরিবে না, কিছুতেই মরিবে না,। কেন সে মরিবে? কাহার, কিসের জন্যে? সে মরিলে কাহার কী ক্ষতি হইবে! কেবল ছেলেটার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। রমা মরিবে না, সে বাঁচিয়াই থাকিবে। এই নিষ্ঠুর স্বামীকে সে বুঝাইয়া দিবে যে রমাকে শুধু বিবাহ করিয়া আনিয়াছে মাত্র, দাসী করিয়া আনে নাই। তাহার যতখানা অধিকার রমারও ঠিক ততখানাই অধিকার আছে। সে রোজগার করিয়া রমাকে খাওয়ায় বলিয়া তাহার মাথাটা কিনিয়া রাখে নাই। সেও বসিয়া খায় না, কাজ করে—তাহার হইতেও বেশী কাজ রমা করে। কথাগুলা ভাবিতে ভাবিতে রমা দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিল, ভাবটা এই: সে যদি নিখিলকে এখনি সামনাসামনি পাইত তাহা হইলে একটা কিছু হেস্তনেস্ত না করিয়া ছাড়িত না!—রমা কী রকম শক্ত মেয়ে তাহা এবার সে বুঝাইয়া দিবে। স্বামীর নিকট বিনা কাজে কোন কথাই সে বলিবে না,—তাও বলিবে খুব গম্ভীর হইয়া। স্বামীকে সে আমলই দিবে না। নারীর ব্রহ্মাস্ত্র—স্বামী। ইহাই রমা ঠিক করিয়া রাখিল। মোটকথা যেমন করিয়াই হোক রমা তাহাকে জব্দ করিবেই। মনে মনে সমস্ত আঁচাইয়া রমা চারিটা বাজিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

চারিটা বাজিয়া পাঁচটার ঘরে ঘড়ির কাঁটা চলিয়া গেল, অথচ নিখিল আসিল না। রমা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, নিখিলকে আজ সে শাস্তি দিবেই কাজেই যত সময় কাটিতে লাগিল রমার ততই ভয় হইতেছিল,—পাছে তাহার রাগের মাত্রা কমিয়া যায়!

অবশেষে ছয়টা বাজিল তবুও নিখিলের দেখা নাই। রমা আস্তে আস্তে উঠিয়া তাহার সন্ধ্যার কাজে মনোনিবেশ করিল।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় রমা সমস্ত কাজ শেষ করিয়া শ্রমক্লান্ত দেহখানাকে শয্যায় এলাইয়া দিল। এরপর নিখিলের জন্য রমার ক্লান্ত দেহখানা চিন্তার ভারে ব্যথিত হইয়া উঠিল, তাহার আর শয্যায় স্থির হইয়া শুইয়া থাকা হইল না।—আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাহার স্বামী গৃহকোণে কোথাও লুকাইয়া নাই তো? এই ভাবিয়া রমা গৃহের আনাচে-কানাচে স্বামীর সন্ধান করিয়া বিফল মনোরথে শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিল এবং করযোড়ে দেবতার নিকট জানাইল,—নির্দ্দয় হ'য়ো না প্রভু, অবলা সরলা নারীর অন্তরের ব্যথা বুঝো ঠাকুর। এই

বলিয়া রমা পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিল। সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহখানা নানারূপ উৎকট চিন্তার ভারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহার কিছুতেই ঘুম আসিল না। —স্বামী কখন সেই দশটার সময় খাইয়া আফিস গিয়াছে, অথচ এখন ফিরিবার নাম নাই, নানারূপ দুঃশ্চিন্তায় রমার কান্না পাইতেছিল। এমন সময় কাহার পায়ের মৃদু শব্দে রমা ভীত, সন্ত্রাস্ত হইয়া উঠিল। সহসা আগন্তুকের একটী ছোট গলার আওয়াজ শ্রুত হইতেই রমার ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল।

নিখিল ধীর পদক্ষেপে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাগজে মোড়া একটী জিনিষ টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া রমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। রমার সারা-মুখে ছড়িয়ে-পড়া চুলগুলিকে একহাতে সরাইতে সরাইতে নিখিল ডাকিল—রমা!

রমা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। ভিতরে ভিতরে সে গুমরাইতেছিল, কী করিয়া অকস্মাৎ ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে তাহাই সে ভাবিতেছে।

পুনরায় নিখিল ডাকিল—রমা, ও রমা!

রমা নিস্তব্ধ।

তারপর একটু নাড়া দিয়া—রমা রাগ করেছ?

এরপর আর রমা কথা না বলিয়া পারিল না। তাহার কি রকম একটা লজ্জা আসিল, যত কিছু কল্পনা নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া ফুলের মত রমার অন্তরে মিলাইয়া গেল। তবুও রমা ঈষৎ রাগে কপোল কুঞ্চিত করিয়া কহিল—না, রাগ করবো কেন? রাগ করবো কার উপরে?

—ওঃ বুঝেছি, তাহোলে তুমি রাগই করেছ! অল্প হাসিয়া নিখিল বলিল।

—ত্যাখ, শুধু শুধু রাগিওনা বলছি, রাসি দশটার সময় 'আমি তোমার কী করলাম বলত!

—রমা, একটা কথা বলব? নিখিল জিজ্ঞাসা করিল।

বিরক্তি ভাবে রমা বলিল—কী, বলনা!

—তুমি একটু রাগ কর লক্ষ্মীটী, তোমার রাগ যে আমার বড্ড ভালো লাগে!

পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃতি হইয়া রমা হাসিয়া ফেলিল। অকারণ সে হাসিকে চাপা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া রমা বলিল—কথায় মন গলাতে চাও, না?—সে মেয়ে আমায় পাওনি।

—তবে তুমি রেগেছ?

রমা এবার কোন কথাই বলিল না। নিখিল তাহার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া টেবিলে-রাখা কাগজে মোড়া জিনিষটা রমার নিকট লইয়া আসিয়া কহিল—রমা, ত্যাখ না, তোমার জন্য কেমন একটা জিনিষ এনেছি!

রমা বিছানায় মুখ গুজিয়াই কহিল—তোমার দিকে চাইতে বলছ তো? তা সেটা পরিস্কার করে বললেই হয়, অত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবার তো কোন দরকার নেই,—কিন্তু আমি চাইব না। বলতে পার, তুমি আজ আমায় কেন; কিসের জন্য মেরেছ?

—লেগেছে বুঝি খুব? নিখিল আদরের সুরে কহিল।

—না লাগেনি! দেখি না তোমার কানমলে লাগে কি না?

—দেবে রমা, কান মলে দেবে? দাওনা! এই বলিয়া নিখিল রমার নিকট তাহাকে আগাইয়া আনিল। রমা কিন্তু সেইরূপ ভাবেই বিছানায় মুখ গুজিয়া শুইয়া রহিল। রমাকে নাড়া দিয়া নিখিল কহিল—রমা এই শাড়ীটা একবার পড়তো, দেখি তোমায় কেমন মানায়!

—বুঝেছি, কাপড় দিয়ে ভোলাতে চাও, না? তা হবেনা, আগে বলতে হবে কেন তুমি গায়ে আজ হাত তুললে।

ওঃ, এই কথা? তুমি যে আমার বৌ রমা! সে কথা কী ভুলে যাচ্ছ, তোমায় ভালোবাসি বলেই তো আদর করে, ঠাট্টা করে একটা কিল···।

রমা এবার বিছানা হইতে মুখ তুলিয়া নিখিলের পানে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিল,—যাও, দুষ্টু! পুনরায় একপাশে মুখ ফিরাইয়া কহিল—হ্যাঁ, ঠাট্টা বৈকী! সেদিনও অমনি বললে—বিয়ে করে কী অন্যায়ই না করেছি! রমা মুখখানিকে বেশ একটু কী রকম করিয়া কথা কয়টী বলিল।

নিখিল উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, কহিল—সেও তো ভালো-বাসি বলেই!

রমা শুইয়া ছিল, এরপর উঠিয়া বসিয়া কহিল—বেশ, তুমি আমায় মেরেছ, সে কথা আমি ভুলিনি! তবে তুমি যদি আমার একটা অনুরোধ রাখ তবে তোমার সব কথাই আমি মেনে নেবো।

—অনুরোধ! অনুরোধ নয়, বল দাবী। নিখিল কহিল।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয়ই!

তবে পুরী বেড়াতে চল, রেবারা যাচ্ছে, বেশ হবে!

—এক কিলে পুরী! সর্ব্বনাশ! দুই কিল হলে তো কাশীবাস ইত্যাদি ভূমণ্ডল রাতারাতি পর্য্যটন করাতে দেখছি! নিখিল হাসিয়া উঠিল।

—তাই যদি করাই, ক্ষতি কী? এই বলিয়া রমা নিখিলের বক্ষে মুখ লুকাইল।

প্রিয়া ও প্রকৃতি

শ্রীসমর মিত্র

সকাল বেলাকার রোদে সারা আকাশ গেছে ভরে। শরতের রোদ, মিষ্টি চাঁদের আলোর মতই। এলোমেলো পেঁজা-তুলার মত ফাঁকে বেরিয়ে পড়ছে নীলচে আকাশ। এই মেঘ আর এই রোদ দেখে, যেন ঘরে থাকতে ইচ্ছে ক'রে না। মনে হয় ধানের ক্ষেতের ওপর দিয়ে চলতে সুরু করি;—যার নেই কোন শেষ, যার নেই কোন ঠিকানা। কিংবা চুপ করে বসে থাকি ঝরণার ধারটিতে, নির্জ্জন বনপ্রান্তে। শুন্‌বো কেবল তার ঝির্ ঝির্ শব্দ। এমন জায়গায় যাই, যেখানে পাখীর গান, প্রকৃতির হাসি কলরব ছাড়া আর কিছু নেই; যেখানে নেই ভালবাসা ঘৃণা।

প্রকৃতির বুকে তৃপ্তি। সে তৃপ্তি মনের স্তরে স্তরে ফুটে উঠবে। অতৃপ্ত এই সংসার—তৃপ্তি আছে যেখানে, সংসারে সে জায়গা একান্ত কম—খুঁজে না পাওয়া সংজ্ঞার মত।

মনে হয় পথ চলব একা, নিতান্ত একা, মাথার ওপর থাকবে টুক্‌রো টুক্‌রো শরৎ মেঘের কুচি—পরস্পরে খেল্‌বে তারা লুকোচুরী খেলা—নীল আকাশের বুকে। যেতে যেতে হয়ত পড়'ব ব'সে, ভাঙ্গা আলের ধারে, দেখবো তাদের খেলা; মনে মনে আঁক্‌বো, সিংহ, বাঘ, ভগবানের মুখ, আর প্রিয়ার এলো খোঁপা। মুহূর্ত্তে বদলে যাবে সব, তাসের ঘরের মত পড়বে ভেঙ্গে। হয়ত একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসবে বুক হতে; দেখবো পায়ের তলায়, ধানের গোড়ায় জল দাঁড়িয়ে,—ছ, একটা ধেনো চিংড়ি খেলা কর্চ্ছে; স্বচ্ছ জলে পড়েছে মেঘের ছায়া। শরতের মেঘের তলায় দেখবো, বকেরা সাদা ডানা মেলে লঘুছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন নীল সাগরের বুকে, সাদা পাল তুলে পান্‌সীগুলা চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছে।

আবার চুল্‌বো,—একাই। রাত্রির বুকে ফুটে উঠবে তারার মালা; অবাক হ'য়ে নির্জ্জন প্রান্তে দাঁড়িয়ে খানিক্ষণ দেখ'ব তাদের। দেখতে, দেখতে, হয়ত ঘুমিয়ে পড়'ব। ঘুম ভাঙ্গবে খানিকটা পরে, মনে হবে, তা'রা দুষ্টু চোখে হাস্‌ছে। কার মত?—মনে পড়বে আমার প্রিয়ার চোখদুটী।

আবার চল্'ব। হয়ত আসবো একটা ঝরণার ধারে। নির্জ্জন বনপ্রান্ত ঝরা-পাতায় ভরা। পায়ের তলায় পাতাগুলা শব্দ ক'রে উঠবে আর্ত্তনাদের মত, হয়ত মাথার উপর দিয়ে একটা ভীতা ঘুঘু, উড়ে যাবে। তার ক্ষিপ্র ত্রস্তগতি দেখে মনে পড়বে কী কাউকে—?—পড়বে,—আমার প্রিয়াকে;—যেন লোকের সাড়া পেয়ে, আমার উষ্ণ বাহু থেকে, পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীটুকু।

ঝরণা বইবে ঝর ঝর করে। শ্যামল সুন্দর পাথরের বুক হ'তে পড়ছে দুধের মত সাদা জল; কিন্তু চোখ বুজিয়ে এর শব্দ শুন্‌তে শুন্‌তে মনে কী পড়বে না, আমার প্রিয়ার উচ্ছ্বসিত হাসি। পড়বে—না হ'লে বাঁচব কেমন করে? প্রকৃতির বুকে আমার প্রিয়ার সাড়া।

বনফুল হয়ত ফুটে থাকবে ঝরণার কোলে। পাপ্‌ড়িগুলো তা'র দুলবে হাওয়াতে। প্রিয়ার রাঙ্গা ঠোঁটদুটী কী পড়বে মনে। মনের চোখে কী ধাধা লাগবে না? কথা বলবার সময়, প্রিয়ার রক্ত-রঙ্গীন পাতলা ঠোঁটদুটীর পানে চেয়ে থাক্‌তাম অনিমেষ,—তেমনি কী মনে হবে না?—তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে কী উঠবে না আমার ঠোঁটদুটী—? হয়ত ফুলটী ছিঁড়ে নিয়ে ঘ্রাণ নেবার ছলে, চেপে ধ'রব, আমার শীতল তৃষ্ণাতুর ঠোঁটে। হয়ত আমায় চোখ আসবে বুজে; কা'র স্পর্শ জাগবে আমার মনে? বুকের কাছে, কা'র উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব কর্ব্ব?—হয়ত আমার প্রিয়ার—ই।

আবার আমার চলা হবে সুরু। আকাশের কোণ ভ'রে জমে উঠবে হয়ত কালমেঘের রাশি, মনে পড়বে অভিমান-ভরা একখানি থমথমে মুখ। তারপর বইবে বাতাস, মনে হ'বে এ বুঝি, প্রিয়ার আমার অভিমান অবরুদ্ধ নিশ্বাস; তারপর হয়ত আসবে বৃষ্টির ধারা, ভিজিয়ে দেবে আমার সারা অঙ্গ,—তখন কী মনে পড়বে না আমার প্রিয়ার অশ্রু?—যা আমার দেহ মন দিয়েছিল ভিজিয়ে। আজকের এই বৃষ্টির জলে মুছ'ব না তো;—থাকবে, এ যে আমার প্রিয়ার অশ্রু।

পথ আর ফুরোবে না; চলবো আমার চলার পথে এগিয়ে;—হয়ত এসে পড়বো বরফ-ঢাকা দেশে। নরম তুলার মত বরফ ঢেকে ফেলবে আমার সারা দেহ, শীত একটু লাগবে, কেঁপে উঠবে সারা দেহ,—উঠুক, মনে হবে, প্রিয়ার শীতল দেহ আমাকে জাপটে ধরেছে।

প্রকৃতির বুকে আমার প্রিয়ার ছবি! নির্জীব নয়—সজীব। সোনার কাঠির স্পর্শে, আমার প্রিয়া উঠবে প্রকৃতির বুকে, তা'র হাসি, গান, তার উচ্ছ্বাস নিয়ে। প্রকৃতির বুকে হয়ত পা'ব, আমার বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া প্রিয়াকে, তা'র প্রাণকে,

দেহকে, তা'র নিবিড় স্পর্শকে। প্রকৃতি রাখবে আমায় মরণের হাত হ'তে ঠেলে—দূরে। প্রকৃতির অশ্রু মনে করিয়ে দেবে, আমার প্রিয়ার অশ্রুময়ী মুখটী। প্রকৃতির বুকে আমার প্রিয়া—প্রিয়াই, মানসী নয়। মানসীর দেহ নেই,—প্রকৃতি। প্রিয়ার আছে দেহ, সে জড় নয়, সে জানে স্নেহ-ভালবাসা। সে জানে ঘৃণা উদাসীনতা। তাই,—ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়'ব, দুরন্ত ঝড়ের মাঝে। ঝিলিক দিয়ে বিদ্যুৎ হানবে অদূরে, ঝড়ধূলার সাথে, সমস্ত প্রকৃতি হ'য়ে উঠবে অন্ধকার;—পথ চলায় হবে কষ্ট,—প্রিয়াকে কী এবার মনে পড়বে?—পড়বে—; হাসিকান্না, সুখদুঃখ নিয়েই ত সংসার, মৃত্যুর করাল ছায়া, ভালবাসার সমুচ্ছল, এই নিয়েই ত জীবন। সমুদ্রের উত্তাল, উদ্দীপনা, পুকুরের শান্ত গভীরতা, এই নিয়েই ত প্রকৃতি।

ঘুরতে, ঘুরতে, হয়ত এসে পড়'ব, মরুভূমির মাঝে। মায়া-মরু লক্ষ্য ক'রে ছুটবো। স্বপন দেখ'ব রঙ্গীন,—ছবি আঁকবো যত রকম উজ্জ্বল রং আছে পৃথিবীতে তাই দিয়ে। মূর্ত্তি গড়বো,—যা সকলের চাইতে সুন্দর—এমন কী তাজ সুন্দরীর চাইতেও—। তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে ছুটবো,—' ওই হোতা জল বলে,'—কিন্তু কী পাব? জল? হয়ত হাসি পাবে? তখন কী মনে পড়বে,—প্রিয়া আমার শুধুই চাঁদের হাসি, ঝরণার গান নয়,—প্রিয়া আমার ঝড়বাদলের সুর,—মরুর বুকে মরীচিকা—।

মিলন-বৈচিত্র্য

(গল্প)

শ্রীনির্ম্মলপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়

সেদিন চন্দ্রগ্রহণ। কাশীতে আর লোক ধরে না। জন কোলাহল সহস্র সহস্র দেবালয়ের শঙ্খ, ঝাঝর, ঘণ্টা প্রভৃতির ধ্বনিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। সে রাত্রে দুলাল কিছুতেই ঘুমের সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। অনেক কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ছাদের উপর পায়চারী সুরু করিয়া দিল। চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়া বা সেই যোগে গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না, কিন্তু নিদ্রাহীনতাই অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাক "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ" করে কোন মতে জাগিয়া রহিল। রাত্রি দুটোর পর গ্রহণ ছাড়িলে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ভিড় জমিয়া গেল। দিগন্ত ব্যাপিয়া শুধু "হর—হর মহাদেও" শব্দ আকাশ বাতাস ঝঙ্কৃত করিতে লাগিল। সেই মধুময় নামের ঝঙ্কারেই বুঝি দুলাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি হইতে স্নানার্থী ও স্নাত নর-নারীর যাতায়াতের ভিড় লাগিয়া গেছে—কখন শেষ হইবে কে জানে।

পূর্ব্বাকাশে আলো দেখা দিয়াছে—কিঞ্চিৎ পরেই বোধকরি রাঙ্গা রবির দেখা পাওয়া যাইবে। দুলাল অভ্যাস মত গঙ্গার শোভা দেখিয়া নিজ বাসাবাড়ী বাঙ্গালীটোলার পথ ধরিয়া দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে ফিরিতেছে। বাড়ীর অনতিদূরে আসিলে তাহার জামার পশ্চাৎ ভাগে একটু টান পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অজ্ঞাত কণ্ঠস্বর "ছোটদা!" ডাক তার কানে পৌঁছিল। সে পিছন ফিরিয়া দেখিল একটী আট-নয় বৎসরের অনুসন্ধিৎসু বালিকা। অমনি জিজ্ঞাসা করিল "কি খুঁকি কাকে খুঁজছ?" ভয়ে ও লজ্জায় বালিকার চোখ হ'তে কোঁটা কতক অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল—কোন উত্তরই সে দিতে পারিল না। কি ব্যাপার, দুলালের বুঝতে বাকী রহিল না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি তোমার ছোটদার সঙ্গে গঙ্গা স্নান করতে এসেছিলে?" বালিকা উত্তর দিল "হু"। দুলাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের বাড়ী কোথায়? কোত্থেকে এসেছ?" বালিকার পিতা মেদিনীপুরে ওকালতী করিতেন তাই সে "মেদনীপুর" বলিয়া কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শান্ত্বনা দিয়া দুলাল তাহাকে যত্নসহকারে কাছে টানিয়া লইয়া চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—"তুমি কেঁদ না রাণী—চল আমার বাসায় খাওয়া দাওয়া করবে, তারপর তোমার ছোটদার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

বালিকা একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"দিদিমাও এসেছেন" দুলাল মৃদু হাসিয়া বলিল—"বেশ—বেশ, আমি তাঁকেও খুঁজে দেব লক্ষ্মী।" বাস্তবিক বালিকার রূপ লক্ষ্মীর চেয়ে কোন-অংশে কম নয়। দুলালের মুখ দিয়ে সত্য কথাই বেরিয়ে গেছে। দুলাল নাম জিজ্ঞাসা করিলে বালিকা উত্তর দিল "অনু।" "বাঃ বেশ নামত" বলিয়াই দুলাল দেখিল সে নিজ বাড়ীর সম্মুখে। অনুকে লইয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

বৈশাখ মাস। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্য অস্ত যায় যায়। পুরীর সমুদ্র তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত।

জনৈকা ষোড়শী, সঙ্গে শুধু একটা আধ-বুড়ো পশ্চিমা দারোয়ান। ষোড়শী আপন মনে পরিভ্রমণ করিতেছে। বংশী-নিঃসৃত পূরবীর সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিল—ষোড়শীর গতিরোধ হইল। সে ইতঃস্তত চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুরখানি বোধকরি তার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। তাই বুঝি সে উৎস সন্ধানে চঞ্চল হইয়া পড়িল। দূরে সমুদ্র সৈকতে শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট ছবির ন্যায় একটি মূর্ত্তির পশ্চাৎভাগ তাহার দৃষ্টি-গোচর হইল। অমনি দারোয়ানকে কহিল—"লীলুসীং তোম্ হিঁয়া বইঠো—হাম্ তোড়া ওধার ঘুমকে আতেহে" লীলুসিং উত্তর দিল—"যো হুকুম মাইজি" বলিয়া সে নিকস্থ ঘাটে বসিয়া পড়িল। ষোড়শী দ্রুতগতিতে ঐ মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিল। তখন বাতাস একটু এলোমেলো ভাবেই বহিতেছিল। দূরবর্ত্তী মূর্ত্তিমান যুবকের সযত্ন-সজ্জিত কুঞ্চিত কেশগুলি বাতাসের তালে তালে যেন তাহার অজ্ঞাতসারে কাহাকে ইশারায় ডাকিতেছিল। দ্রুত পাদবিক্ষেপ ও দৃষ্টির চঞ্চলতা বশতঃ ঠিক যুবকের পশ্চাৎভাগের অনতিদূরে একটা ছোট পাথরে হোঁচট্ লাগিয়া ষোড়শী পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে "ওঃ" কাতরধ্বনি শ্রুত হইল। বাঁশী থামিয়া গেল। যুবক চকিতে চাহিয়া ছুটিয়া আসিবা মাত্রই সে তাড়াতাড়ী উঠিয়া পড়িল। লজ্জায় মুখমণ্ডল আরক্তিম। কোন কথা না বলিয়া এতক্ষণ সে গায়ের বালিগুলি ঝাড়িতেছিল। কি এক অব্যক্ত আগ্রহে যুবক যেন কিছুর অপেক্ষা করিতেছিল কিন্তু সে যেন নিজকে আর চুপ্ করাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না। সমবেদনার সুরে জিজ্ঞাসা করিল—"লাগেনি ত?" উত্তর হইল "না"

যুবক। আপনি এদিকে কোথায় আস্‌ছিলেন?

ষোড়শী। বেড়াতে।

যুবক। আপনার বাড়ী?

ষোড়শী। মেদনীপুর।

যুবক। তা—এখানে কি ক'রে এলেন?

ষোড়শী। changeএ।

যুবক। তা—তা আপনি সঙ্গে লোক আনেন নি কেন?

ষোড়শী। প্রয়োজন মনে করিনি।

যুবক। কিন্তু আপনি স্ত্রীলোক—

ষোড়শী। জানি এবং জেনেই এসেছি। পুরুষ একলা আসতে পারে আর স্ত্রীলোক পারবেনা কেন শুনি?

যুবক। বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীলা নারীদের কাছে এর উত্তর—নাই বটে, কিন্তু আমি, আপনার অন্যায় সাহসকে প্রশংসা করি না।

ষোড়শী। আমি কিন্তু প্রশংসা পত্র নিতে আসিনি।

যুবক। ক্ষমা ক'রবেন, আমি অনধিকার চর্চ্চা করে ফেলেছি।

ষোড়শী। তা না হয় বলুন—কিন্তু আপনার বাঁশীটা কি আর একবার শুনতে পারি না?

যুবক। ও—বুঝেছি' ঐ বুঝি আপনার প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ?

ষোড়শী। অনেকটা সত্য।

যুবক। তবে আপনার পতনের কারণ আমিই?

ষোড়শী। ঠিক না হলেও কতকটা তাহাই। বাঁশীতে আপনার বেশ control আছে ত। এ আপনার কতদিনের অভ্যাস?

যুবক। সে অনেক দিনের—তখন আমি schoolএ পড়তাম।

এত কথা বার্ত্তার মাঝে যুবক এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল হঠাৎ ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিয়াই বিস্মিত হইয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবে বা ভাষায় কিছু প্রকাশ করিবার কোন শক্তিই ছিলনা তাহার। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। অবিবাহিত যুবক যুবতীর এই নির্জ্জন বাক্যালাপ আর বুঝি ভাল দেখায় না। তাই যুবক আত্মসম্বরণ করিয়া সৌজন্যতার সহিত ধীরে ধীরে বলিল—"দেখুন, সন্ধ্যার কালো ছায়ার অন্তরালে আর আমাদের থাকা উচিৎ নয়। আপনি একাকিনী—স্ত্রীলোক, চলুন আপনাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসি।"

ষোড়শী। সে চিন্তায় আপনার প্রয়োজন নেই—সঙ্গে দারোয়ান আছে।

যুবক। আছে? বেশ—বেশ, কিন্তু সে কোথায়?

ষোড়শী। ঐ ঘাটে অপেক্ষা করছে।

"যাক্ নিশ্চিন্ত হলুম" বলিয়া যুবকের অন্তরে এক নবীন আকাঙ্খার তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল। যুবক নীরব—যুবতী মুগ্ধা। এভাবে যবনিকা পাত হওয়াটা বড়ই অশোভন দেখায়, তাই যুবতী এই অকারণ নিস্তব্ধতার শান্তি ভঙ্গ করিয়া বলিল "তবে এবার বাঁশীটা ধরুন।" অনন্যোপায় হইয়া যুবক বাঁশীতে ফুঁ দিল। অমনি দারোয়ানের ধরা-গলায় "মাইজী" ডাকে সব পণ্ড হইয়া গেল।

শুক্লা রজনী। রাত্রি নয়টা। আতস-বাজীর আলোর দাপটে চন্দ্রের সম্মান বুঝি আর অক্ষুণ্ণ থাকেনা। মাঝে মাঝে তোপের গুরুগর্জ্জন শান্তিপ্রিয় নগরবাসীর শান্তি ভঙ্গ করিতেছিল। নহবতের সুরে কান ঝালা-পালা। অতিষ্ঠ নাগরিক নিবৃত্তি চায়। কিন্তু তাকি হয়? ধনী Advocateএর মেয়ের বিয়ে। কত হোম্‌রা-চোম্‌রা ধনী-নির্ধনীর সমাগম হইয়াছে তা নির্ণয় করা বড় সহজ কথা নয়। বাজীকর, হর-বোলা, সঙ্গীতজ্ঞ, তার্কিক, রসিক, ভক্ত প্রভৃতির বিভিন্ন আসরে সমাগত জনমণ্ডলীর রুচি অনুযায়ী আপনা-আপনিই বিভক্ত হইয়া গেছে। কোন বিষয়েই ত্রুটি নাই। সকলেই আনন্দে বিভোর। কিন্তু যে বর, সে এ-সময় নিরানন্দ কেন? কেন সে প্রাণখোলা হাসি হাসে না? আনন্দের কোন চিহ্নই তাহাতে পরিলক্ষিত হইতেছে না কেন? নিশ্চয়ই তার অন্তরে কোন আকাঙ্খায় আঘাত লাগিয়াছে।

কিন্তু সেটি কি? বোধ হয় কোন বাঞ্ছিতার বাঞ্ছা পরিত্যাগের শেষ চিন্তা। বর মর্ম্মাহত। নিজ ভাগ্যে ধিক্কার এবং ভগবানের নিন্দাবাদ ছাড়া কোন ভাবই তার ছিল না। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"হায় অজ্ঞাত-কুলশীলা রমণীর অনুপম সৌন্দর্য্য কেন আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল—যদি বা পড়িয়াছিল তবে সে আমার হইল না কেন?" নানারূপ চিন্তায় নিমগ্ন বর নির্ব্বাক। মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল এসব পরিত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিতার অনুসন্ধানে সে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে। কিন্তু উপায় ছিল না। কন্যাটি যে ছিল তার পিতার বাগ্‌দত্তা। এ সংবাদ সে এতদিন ঘুণাক্ষরেও জানিত না বা তাহার পিতারও মনে ছিল না। হঠাৎ মাস খানেক পূর্ব্বে মেদিনীপুরের Advocate তারাচরণ আসিয়া বাল্যবন্ধু শিবনারাণবাবুর নিকট সব কথা প্রকাশ করিয়া কন্যার বিবাহের দিন স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। কন্যা বাগ্‌দত্তা কাজেই শিবনারাণবাবুর বলিবার বিশেষ কিছু ছিল না। তিনি সম্মত হইয়াছিলেন।

দুলাল পিতামাতার একমাত্র সন্তান। ভিন্ন মত হইলে পাছে তাঁদের সম্মানের হানি হয়—এই ভয়ে নেহাৎ অনিচ্ছা সত্বেও কোন আপত্তি করে নাই। এত যে মনোবেদনা এসব কিছুই হইত না যদি দুলাল একবার ভাল করিয়া তার বাঞ্ছিতার ঠিকানা জানিয়া লইত। জানিবার চেষ্টা হয়ত সে করিয়াছিল কিন্তু প্রশ্ন করিবার মত ঘটনা বা সুযোগ তার ভাগ্যে ঘটে নাই। যাক বিবাহ সম্বন্ধে প্রজাপতির সিদ্ধান্তই চরম। মানুষের হাত এতে কিছুই নাই। লগ্ন সমুপস্থিত। বর-সভার একান্তে বসিয়া জমিদার শিবনারাণবাবু বড় আরামে গড়গড়ায় টান দিতেছিলেন। এমন সময় বৈবাহিক তারাচরণ উপস্থিত হইলেন। সভাসদগণের অনুমত্যানুসারে দুলালকে বরণ করিয়া তিনি ছাদনা তলায় লইয়া গেলেন। সমাজ ও শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি মন্ত্রপাঠ ও কর্ম্মপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইল। এইবার শুভদৃষ্টি। বর-কন্যা উভয়ের হাতে একটী করিয়া মালা। উভয়েই একটি শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত। লোক চক্ষুর অন্তরালে চারি চক্ষু এক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকল জ্বালা সকল চিন্তা বিদূরিত হইল। দুলাল বিস্ময়ে অবাক্। "একি! এ যে সেই বারা নসীর পথ-ভোলা বালিকা অনু, এ যে সে পূরবীর সুরে আকর্ষিতা, এ যে পরিচিতা-আমারই বাঞ্ছিতা।"

আমার বুকের প্রিয়া—

সুনীল মুখার্জ্জি

চাঁদের মত স্নিগ্ধ তুমি জ্যোছনার মত করুণ
মিথ্যা তোমার মুখের বাণী নয়ন দুটি অরুণ।
পাগল করা রূপ তোমার কণ্ঠ ভরা সুর
কোমল তোমার দুটি বাহু স্পর্শে হয় দূর।
রঙিন তোমার মুখের হাসি রঙিন ছবি দিয়ে
বেড়াও তুমি চাঁদের সাথে রঙ তুলিকা নিয়ে।
কোমল কর সারা অঙ্গ নরম তুলির সাথে
আঁকছ কেমন নূতন ছবি শুভ্র দুটি হাতে।
কথার ছলে ভুলিয়ে রাখ পরশ জাগাও ঠোঁটে
নিত্য পাওয়ার ভ্রমর আমার তারি পিছে ছোটে।
নূতন প্রেমের নূতন ছবি যা এঁকেছ বুকে
ভাসিয়ে দিও নরম তুলি সকল কাজের ফাঁকে।
মরুর পথে জল দেখে হায় পথিক যেমন ধায়
তোমাকে পাওয়া আমার চাওয়া ঠিক কি
তাই নয়

—•—

শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবনের নিখুঁত আলেখ্য

পণ্ডিত মশাই

শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে সমস্বরে অভিনন্দিত

পণ্ডিত মশাই

বাঙলার সাময়িক-পত্রগুলিতে উচ্চ-প্রশংসিত

পণ্ডিত মশাই

সমগ্র পরিবারের একমাত্র মধুর গল্প

পণ্ডিত মশাই

বাঙলা ও বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখে বিজড়িত কাহিনী

পণ্ডিত মশাই

ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর ধর্ম্ম উদ্রেককারী সামাজিক ছবি

পণ্ডিত মশাই

ঝরঝরে তকতকে পরিচালনায় তোলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র

পণ্ডিত মশাই

পপুলার পিকচার্সের নবতম নিবেদন

পণ্ডিতমশাই

আপনাদের সকলেরই দর্শনপ্রার্থী—তাঁকে সত্বর অভিনন্দিত করুন।

শনি, রবি ও ছুটীর দিন
৩টা, ৬টা ও ৯॥টা।
অন্যান্য দিন
৬॥ ও ৯॥টা

শ্রী
চিত্র গৃহে
জয়মাল্য
বিভূষিত
দ্বিতীয় সপ্তাহ

অগ্রিম
প্রবেশ-পত্র
সংগ্রহ
করুন।

গ্রেডিস্ জর্জ—প্যারামাউন্টের তরুণী অভিনেত্রী

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

অবিচার

আমেরিকায় একখানা বই বেরোয় তার নাম হচ্ছে 'হু ইজ হু'। নামটা শুনে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছেন বইখানা কি!—কে বা কাহারা কি, এবং তাহারা কি জন্য পরিচিত।

সম্প্রতি এই বইখানা আবার ছাপান হয়েছে। নতুন নাম পড়েছে তাতে দেখলাম সার্লি টেম্পল এর। গার্বো, জোয়ান ক্র্যাফোর্ড, জেনেট গেনর এবং নেলসন এডির পরিচয়ের পাতা অনেক বেড়েছে। কিন্তু নাম পড়েনি ক্লার্ক গেবল আর মে ওয়েষ্ট এর, অথচ কত লক্ষ লোক আছে তাদের প্রশংসার গুন গান করতে। এমনিই বিচার।

পথের বিপদ

ক্লদেৎ কোলবার্ট, ছায়ালোকের প্রিয়তমা;—পথের প্রচণ্ড বিপদকে মাথা

সার্লি টেম্পল

পেতে নিতে হয়েছিল। এই খবর নিয়েই সেদিন সহরে হুলুস্থুলু পড়েছিল সহরের মোড়েতে মোড়েতে, কাফেতে কাফেতে।

ক্লদেৎ বেরিয়েছিল পথে মোটর গাড়ীতে,—সেই চালাচ্ছিল। পাশে ছিল তার স্বামী ডাক্তার জোয়েল প্রেসম্যান। অবাধ আনন্দে প্রবল বেগে গাড়ী যখন ছুটে চলেছে তখন কোথা থেকে এলো এক প্রচণ্ড ধাক্কা, তারপর ঝিম, ঝিম, ঘুম। গোলমাল, ভিড় আর ব্যাটনের গুতো।

পুলিশ ছুটলো পেছনে সেই পলাতক গাড়ীটির। খোঁজ খোঁজ রব উঠল চারিদিকে। ক্লদেৎ-এর গাড়ীতে ধাক্কা দিয়েছে, সে যে তাদের সবায়ের ডার্লিং।

দেড় ঘণ্টা বাদে পুলিশ খবর নিয়ে এসে বল্লে 'হ্যাঁ পেয়েছি।'

—'কোথায় কোথায়'?—

সে এক ষ্টুডিওর ছুতোর। তার কাজ যেতে পারে। তবে ক্লদেৎ-এর আঘাত খুব সাংঘাতিক নয়, এই যা।

রহস্যময়ী রসিকা

রবার্ট টেলর! অনেক মেয়ের স্বপ্নের কামনা, ঘুমের দেবতা। লাখে লাখে চিঠি

ছোটে ওর বাড়ীতে, বলে, আমি তোমায় ভালবাসি, খুব ভালবাসি।

বেশী দিন আগেকার কথা বলছিনা। বব একখানা চিঠি পায় একটি মেয়ের কাছ থেকে। তাতে লেখা ছিল, বব অমুকদিন রাতে আটটা থেকে দশটা পর্য্যন্ত এক রেস্তোরাঁয় থাকবে। আর পত্র প্রেরক, এই মেয়েটি ভাল করে সামনা সামনি একবার দেখবে। লেখক আরো লিখেছিল যে বব, জানতে যেন না চায় যে, সে কে আর তার কি পরিচয়। সে শুধু একবার মাত্র তার সামনে দিয়ে চলে যাবে এই টুকুই মাত্র ববের সন্ধানের সুত্র।

সেদিন বব গিয়েছিল সন্ধ্যায় রেস্তোরাঁতে। ঘড়িতে বেজে গেলো আটটা, নটা, দশটা, টেবিলের সামনে হেঁটে গেলো এক দুই, বিশ, পঞ্চাশ। সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়া। সবের মনে এলোনা কে এই মেয়েটি।

নিনো আর এলিসা

পাসাডেনার সাণ্টা ফি ষ্টেশনে এসেছিল ওরা দু'জনে; নিনো মার্টিনি আর এলিসা ল্যাণ্ডি। এলিসা এসেছিল তার গায়ক এই ভাবী স্বামীটিকে ট্রেনে তুলে দিতে।

খবর ওদের ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে তাই আজ আর নতুন করে সে সব নিয়ে আলোচনা করতে রাজী হোলনা। বিদায় দিলে আর বিদায় নিলে দুজনেই হেসে। আমি জানি ওদের কথা আছে এই শীত-কালেই বিয়ে হবে, এবং তা হয় ইটালিতে না হয় নিউ ইয়র্কে।

বর্ত্তমান চুক্তি অনুসারে এপ্রিল মাসে নিনো মার্টিনিকে হলিউডে ফিরতেই হবে। জেসি এল ল্যাস্কির যে ছবি হলিউডে উঠবে, নিনো সে ছবির হিরো।

আলির নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী

আলির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ওরা আবার আর একজন মেয়ের নাম করছে। প্রতিদ্বন্দ্বী

ক্লদেৎ কলবার্ট

ওদের রোজই তৈরী হয় আর রোজই হার মেনে যায় বাড়ী।

এবারের মেয়েটির নাম ডিনা ডারবিন। হলিউডের একখানা ছবিতে নামছে। ডিনার নাম হচ্ছে গানে। ও রকম গান নাকি ওখানকার কোন ছোট ছেলে মেয়ে গাইতে পারে না। এডি ক্যাণ্টার ওকে আবিস্কার করেছে।

ওকে নাচতে হবেনা

চার্লস বোয়ারএর আজকাল সুদিন। ওদেশের চলচ্চিত্রের আজকাল যারা গৌরব-ময়ী অভিনেত্রী চার্লসকে আজকাল তাদেরই হিরো সাজতে হচ্ছে।

'গার্ডেন অব আল্লা' ছবিতে চার্লস নামছে হিরো সেজে। গ্রেটা গার্বোর 'বিলাভেড' ছবিতে হিরো সাজবে চার্লস। এ গল্প হচ্ছে নেপোলিয়ন আর মেরী ওয়ালিউস্কার রোমান্স।

সম্প্রতি ঠিক হয়েছে চার্লস নামবে জিনজার রোজার্সে'র সঙ্গে। চার্লসকে যে নাচতে হবেনা এ আমি ঠিক জানি।

খুচরো খবর

ক্লার্ক গেবল হচ্ছে দক্ষ 'মেকানিক', তার মোটর গাড়ীর সব রকম কলকব্জা সারাবার দরকার হলে নিজেই সে সারে।

প্রার্থনা

শ্রীমতী পারুলরাণী ঘোষ

বুক ভরে ব্যথা
দিয়েছ যেমন,
কহিবারে দিও শকতি।
ছলনায় ভুলে
হারায়ে না ফেলি;
তোমারি উপর ভকতি।
মরণ সময়
পাই যেন দেখা,
হে মোর হৃদয় স্বামী।
অভাগী বলিয়া
ঠেলনা হে দূরে,
ওগো অন্তর যামী।

এলিসা ল্যাণ্ডি ঘুরেছে পৃথিবীর অনেক জায়গা।

* *

জোয়ান ক্র্যাফোর্ড আগে নাচত।

* * *

রোজালিণ্ড রাসেল হচ্ছে নিরামিষাশী।

* * *

ফ্রাঞ্চট টোন একজন দক্ষ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়।

* * *

ফ্রাঙ্কিস লিষ্টার আর ডায়না চার্চিল নামছে 'আওয়ার সেলফস্ এ্যালোন' ছবিতে; পরিচালনা করবে ব্রায়ান ডিসমন হার্সট।

* * *

'জাম্প ফর গ্লোরি' ছবিখানা পরিচালনা করছে রাউল ওয়ালস্।

সেনাপতি ষষ্টিচরণ সেন

হোসনে আরা বেগম

কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার ষষ্টিচরণ সেন।
ভলান্টিয়ার সে সাধ করে হয় নাই,
খেয়ে দেয়ে দুটি দিন বাড়াইতে পরমাই
কংগ্রেসে ঠাঁই নিয়াছেন।

কুড়ে ঘরে মাসী তার রয়
রয় আর দশজনে কয়!
ষষ্টি আমার সায়েক ছেলে—গান্ধীরাজার চ্যালা।
বেকাল কথা কও যদি তার দেখবে তখন ঠ্যালা।
মুখ বাঁকিয়ে বুদ্ধা মাসী কয়
ভূভারতে এমন ছেলে আর হবার নয়।
বাপ মা হারা ছেলে
ভাবি শুধুই বুদ্ধি এমন কেমন করেই পেলে।

কংগ্রেসের আখড়ায় ষষ্টিচরণ শুয়ে
চ্যাটায় পেতে ভূঁয়ে
আপন মনে আকাশ পাতাল ভাবে চক্ষু বুঁজে।
ভাবে, কিন্তু পায় না কিছুই খুঁজে
কেমন করে দিন চলে তার, ক্ষুধায় কিবা খায়?
দেশের নামে ধন মিলিবে?
সেদিন যে গো অনেক আগে ফুরিয়ে গেছে হায়।
ভাবতে গিয়ে ষষ্টিচরণ পায় না খুঁজে কুল
একটী পরে চিন্তা আর এক মাথায় ঢুকে গিয়ে
বাধায় হুলস্থুল।
কুল না পেয়ে ষষ্টি ডোবে ঘুমের সাগর মাঝে।

ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখে ষষ্টিচরণ সেন:
ঘুচে গেছে দুর্দিন।
হয়েছে সে সিপাই-শালার সম্রাট ভারতের।
অঙ্গের তার হাড়গুলো সব গিয়াছে ঢাকিয়া
চর্বি আর মাংসের স্তূপে
ত্রিশকোটী লোক পূজে তারে নিত্য ধুনা ধূপে।
সুন্দরী কত তরুণী আসিয়া তাহার আঙিনাতে
ভীড় করে দিবা রাতি
ভিড় করে যত মানব অপ্সরী
ষষ্টিচরণ হাসে আর খেলে তাহাদের সাথে সদা
পথে চলে কভু তাহাদের হাত ধরি।
শত দাস দাসী তার
কেহ ছোটে কাজে কেহবা অকাজে
ষষ্টিচরণ এসব তুচ্ছ হিসাবের ধারে না ধার।
খুশীতে ষষ্টি ষোল খানা হয় নিজের দেহটী হেরি।
এমন মাংস লাগিল কেমনে শুষ্ক হাড়েরে ঘেরি।
এবার দেশেতে গিয়া
লিগবিগ সিং বলিত তাহারে
যে সব মুর্খের দল
তাহাদের সব একটী ধমকে কাঁপাইয়া দিবে হিয়া।

একটী বিপদ আছে—
মাসিমা বুড়িটা কাঁপিতে কাঁপিতে
আসিয়া বসিবে কাছে।
কহিবে বিনয় করি
দুইটী হাতেতে ধরি
মাথা খা বাবা ষষ্টিচরণ, আমার কথাটা শোন
বুড়ো হয়ে গেছি—মরিতে শুধুই বাকী
বল দেখি তুই—হিসেব করেই বল
এই বয়সে একলা আমি কেমন করেই থাকি?
একটী বিয়ে কর
রাঙা টুকটুকে একটী বউ—পুতুলের মত বউ
আন দেখি তুই ঘরে।
তাহার রূপের লাল জলুসে উজল হউক ঘর।
কি বলিস তুই? মেয়ে নেইক দেশে?
হাসালি তুই! অবাক করলি শেষে?
ঘোষেদের খেঁদি ওপাড়ার গেঁদি—ওদের চিনিস নাকো?
চিনবি কি করে? সারাটী বছর বিদেশে বেভূঁয়ে থাকো।
বাপ মা হারানো গরীবের মেয়ে
খেঁদিটা লক্ষ্মী অতি।
কাজেতে যেমন, ধরমেও তাহার তেমনি সদাই মতি

অমন মেয়েটী নাই
সাত পুরুষ তোর ধন্য হয়ে যায়—ওরে যদি ঘরে পাই।

ন্যা-ছেঁড়া ঠিক ধনুকের মত ষষ্টি ছিটকে ওঠে।
রাগেতে তাহার দেহটা ভীষণ কাঁপে।
মাসিয়ে কয়:
বুড়ো হয়ে গেলে, তবুনা বুদ্ধি হয়।
জানো না মোটেই এই যে ষষ্টি আগের ষষ্টী নয়
খেঁদি গেঁদি বুঁচি এদের আমি করতে পারি কি বিয়ে?
তুমি একে বারে ইয়ে
যারে বলে 'ওল্ড ফুল'
বোকামিতে ভূভারতে কেহ নাই আর
তোমার সমতুল।
মাসি বলে তাই নেহাত রেহাই পেলে;
অন্য কেহ যদি কহিত এ-কথা
পাঠায়ে দিতাম জেলে।
মাসী তার ভয়ে কাঁপে
আর ষষ্টি কাঁপে রাগে
হেন কালে এক সুন্দরী আসে নবীন অনুরাগে

সুন্দরী সে অভিজাত সমাজের।
ষষ্টিচরণে বাহুতে আঁকড়ি কয়,
শান্ত হও হে, রাগ কোর না ডারলিং
উঠ তাড়াতাড়ি যেতে হবে দূর পথ
ত্রস্ত হইয়া ষষ্টি উঠিয়া বিস্ময়ে চেয়ে দেখে
কোথায় স্বপ্ন? কোথায় সুন্দরী মেয়ে?
মাটির বুকেতে ধূলিতে আছে সে শুয়ে
পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সেপাই শান্ত্রী এবং সার্জ্জেণ্ট কিং।
আরো আছে জমাদার দুশমন সিং।
একটী সেপাই কণ্ঠ তাহার ধরি
কহে ছাপরাই বুলি।
অর্থ তাহার এই:
শ্বশুর বাড়ীতে যাইতে হইবে—সময় মোটেই নেই।
তারপরে তার কণ্ঠ ধরিয়া বলায় টানিয়া তুলি।
দুহাতে তখন ষষ্টিচরণ ঝাড়িল পিঠের ধূলি।
সেপাহীর হাতে বন্দী থাকিয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে কয়:—
মাসীগো, তোমার ষষ্টিচরণ আজ আর তোমার নয়।

ডাক্-ডুমাডুম—লেখক: মোহাম্মদ মোদাব্বের। প্রকাশক—মোহম্মদী বুক এজেন্সি, ৯১, অপার সারকুলার রোড কলিকাতা।

আলোচ্য বইখানির লেখক আমাদের কাছে অপরিচিত নন। এর আগে তাঁর লেখা "হীরার ফুল" ও "মুক্তি মন্ত্রে মুসলিম নারী" নামক দু'খানি বইই আমরা পড়েছি এবং এঁর জ্ঞানের কিছু আভাষও পেয়েছি। "ডাক্-ডুমাডুম" যদিও লেখা হয়েছে বালক বালিকাদের জন্তে তাহলেও এইটা পড়ে বড়রাও বেশ আনন্দ পাবেন। মোটকথা শিশু সাহিত্য রচনায় লেখকের যথেষ্ট হাত আছে। আমরা এই প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রচারের উন্নতি কামনা করি।

এ বছরের সেরা গল্প—শ্রীমণীন্দ্র বসু—সম্পাদক। শ্রীগুরু লাইব্রেরী—প্রকাশক। মূল্য এক টাকা।

বইখানি কয়েকটি ছোটো গল্পের সমষ্টি। লেখকেরা সকলেই সমকালিক এবং তাঁদের মধ্যে অনেকগুলির পত্রিকা-সাহিত্যে সুনাম আছে। ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুনীল রায়, মণীন্দ্র বসু, লীলাময় বসু, রমা দত্ত প্রমুখ লেখকদের গল্প আমাদের ভালোই লেগেছে। তেরোটী গল্পই আধুনিক ভঙ্গীতে লেখা। যাঁরা অতি আধুনিক লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে চান, তাঁরা এ বইখানি পড়বেন এবং পড়ে তৃপ্ত হবেন।

চক্রী—বিচিত্র রহস্য সিরিজের পঞ্চম গ্রন্থ। শ্রীমিহিরকুমার সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ১৬।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্ হইতে মডার্ণ পাবলিশিং সিণ্ডিকেট্ হইতে প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

বিচিত্র রহস্য সিরিজের সব কয়খানি বই আমরা পড়েছি, এবং আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি 'চক্রী' হল তাদের মধ্যে সেরা বই। ভাষার সাবলীল ভঙ্গীতে, গল্পের বর্ণনায় ও রহস্যজালের সূক্ষ্ম সূতা বয়নে 'চক্রী' পাঠকদের মন মুগ্ধ করবে। শেষের

দিক্-না

শ্রীরবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

.সুতরাং লম্বা এক প্রস্থ চা খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়তে হ'লো," কোনো রকমে পাঞ্জাবী আর চটীটা গায়ে-পায়ে লাগিয়ে; সঙ্গে বিলাসী। ধিকি ধিকি ঠেলা গাড়ীর মত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গলি, মোড়, ব্যাক্ পেরিয়ে, বাম দিক চেপে বিলাসীকে ঠেল্তে ঠেল্তে, বচসার কশাঘাতে এক গা ঘামিয়ে উঠা গেল—কালাচাঁদ মিস্ত্রির জুতার দোকানে। পূজার বাজার, তায় সন্ধ্যা রাত্রি, তার উপর উপযুক্ত কমিশন্,…ঘরে-বাইরের নরনারী বিশেষতঃ স্ত্রী স্বাধীনতার যথেষ্ট স্বাধীনত্ব, ও আরো অনেক কিছুর কিছুত্ব সব একসঙ্গে গাদাগাদি হ'য়ে জটলা পাকিয়েছে দোকান ঘরের চেয়ারে বেঞ্চিতে এবং সিমেণ্ট বাঁধানো মেজেতে। উঠে পড়ে ভীড়ের ভয়ে নেমে যাওয়া ঠিক নয় সুতরাং দাঁড়িয়ে পড়তে হ'লো ঘেঁসাঘেঁসি। মাথার ওপর ছ্যাক্‌রা ফ্যানের ভন্-ভনানি,… আশপাশের দু একটা অসংযত আঁচল ছিট্‌কে এসে কাঁধের ওপর দিয়ে লুটিয়ে পড়ে…লক্ষ নেই; বিলাসীর চোখকে এড়াতে পারেনা: দু একটা মিঠে কড়া 'চিমটি'!…হঠাৎ মনে হ'য়ে যায় 'তাই-তো,' অগত্যা দু একবার গলা খাঁকরী'……তারপর নাকিসুরের খিন্-খিনে স্বর, হঠাৎ যেন দেখতে পেয়ে: সরী, কিছু মনে করবেন না…লক্ষ করিনি। প্রত্যুত্তরে চোখদুটো ঘুরিয়ে নিয়ে, ডান হাত দিয়ে কপালের উপর দোদুল্যমান চুলগুলো মাথার উপর দিকে সন্নিবেশিত ক'রে নিতে হয়; ঠিক এমনি সময় দৃষ্টি পড়ে দোকান-দারের: আসুন, কি চাই,…ওরে সাত্‌রা টুল দুটো বাবুর দিকে এগিয়ে দে'ত।

বিলাসী ঝুপ ক'রে ব'সে পড়ে;—ঝড়ো জলে-ভেজা পাখীর মত বৃক্ষশাখা থেকে ঝুপসি খেয়ে হঠাৎ যেরূপ মাটিতে প'ড়ে যায়। পাশের "টুলটা" তফাতে টেনে নিয়ে বলতে হ'লো: একজোড়া লেডীস্ স্লিপার!

তারপর চুপ্ চাপ্। মিনিট প'নের বাদে হঠাৎ যেন জেগে উঠে দোকানদারের কর্ম্মচারীর প্রশ্ন হ'লো: আপনাকে কি দে-বো?

—স্লিপার একজোড়া।

—আপনার পায়ে?

—না।

আরো পাঁচ মিনিট কেটে যাবার পর বেরিয়ে এলো এক জোড়া জরীমোড়া স্লিপার। বিলাসীর ঝক-মকানি পা দুটো এগিয়ে গেল অতি আড়ষ্টভাবে। তারপরই আরম্ভ হ'লো দোকানদারী বুলি:

—পা দুটো একটু চেপে বসান! —হাঁ ঠিক হ'য়েছে, এক পা চলে দেখুন।

বল্‌লাম: না, না আর চলতে হবে না, লাগছে না ত?

উত্তর এলো চাপা স্বরে: না।

—কত দাম?

—পাঁচ টাকা বারো আনা,…কমিশন্ দু আনা বাদ,…পাঁচ টাকা দশ-আনা।

দিকে রহস্য এত ঘনিয়ে উঠেছে যে ধরা শক্ত। তারাপ্রসন্ন বাবুর প্রকৃত শত্রু কে, এবং তাঁর হত্যা-ষড়যন্ত্রের পিছনে কোন্ কুটিল চক্রান্তকারী লুকিয়ে আছে! যাঁরা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে থাকেন, তাঁদের অনুরোধ করি এই পাকা রচনাটি পড়তে, এবং বিচিত্র রহস্য সিরিজের নিয়মিত পাঠক হতে।

আমার ভ্রু জোড়া চিকিড় খেয়ে গেল… দামটা যেন একটু বেশী। বিলাসীর মুখের দিকে চাইতে তার আঁখির কোমল পল্লব ছুটো ধীরে ধীরে নুইয়ে পড়লো। চটি জোড়া যে তার পছন্দ হ'য়েছে এটা বেশ বোঝা গেল। না হবারও কোনো কারণ ছিল না,…লাল ভেল্‌ভেটের ওপর সোনালী জরীর সাপ-খেলানো কারুকার্য্য, মাঝখানে রঙিন অভ্রের নীলাভ জলজলে তারকা—বিলাসীর হাসির মত ফুটে রয়েছে। পায়ের পাতার ওপর নীলাম্বরী শাড়ীর মত নীলাময়। বিলাসীর দুটি কোমল শ্রীচরণে মানিয়েছে বেশ। সুতরাং চোখ কান বুজিয়ে ফেলে দিতে হ'লো দামটা। বেরিয়ে আসছি, শুনতে পেলাম: ও মশাই টাকাটা অচল,…বদলে দিন

—অ্যাঁ অচল! কি রকম!

—এই দেখুন না।

(হাতে নিয়ে, বাজিয়ে): তাই'তো… মুস্কিল করলো! এখন—

মনটা গেলো বেঁকে। রাগ হ'লো "সহচরীর" সম্পাদকের ওপর, ভদ্রলোক গল্প গল্প ক'রে পাগল করে তুলেছিলেন; টিউশ্যানি বন্ধ ক'রে… পেয়ালা পেয়ালা চা নিশ্বাস ক'রে,… দু প্যাকেট ক্যাভেণ্ডার পুড়িয়ে,…রাত্রির বুকে ব'সে পার্কারের নিব খ'ইয়ে পাতার পর পাতা গল্পে ভ'রে উঠলো, আর তার দক্ষিণা হ'লো গোটা কয়েক টাকা তাও একটা অচল! নাঃ দোকানদারের মত বাজিয়ে নেওয়াই উচিত ছিল! ভদ্রতার স্থান নেই, এই ছিটকে আসা ঢাল-তরোয়াল হীন সম্পাদকগুলোর কাছে। উঃ! ভদ্রলোক সম্পাদক বটে! কিন্তু যাই হোক্ টাকাটা;…ব্যাগটা হাতড়াতে হ'লো… একখানা চেক্ পঞ্চাশ টাকার, আনা বারো পয়সা, সিগারেটের পাইপ, দু একটা কুপন ইত্যাদি আরো অনেক কিছু কিন্তু "অনেক কিছুর" প্রয়োজন কী? চোখে পড়লো, বিলাসীর আঁচলের খুঁট্টা,…কি যেন একটা বাঁধা। মুখের দিকে চাইতে চাপা হাসিটা গালের পুরুষ্ট মাংসের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ছড়িয়ে গেল। উঃ কী ছলনাময়ী!… নোট্‌টা পাঁচ টাকার অনেক ক'শে মুচড়ে আঁচলের খুঁট থেকে বেরিয়ে এলো অনেক গোঙানি খেয়ে। পাশের মেয়েটা হেসে ফেললো। তাড়াতাড়ি ঝঞ্ঝাটটা মিটিয়ে দিয়ে রাস্তার ফাঁকা (দোকানের থেকে ফাঁকা) হাওয়ায় এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সুরু হ'লো উল্টা যাত্রা। ক্যাভেণ্ডার ধরিয়েছি, পাশের বাড়ীর বৌটা এসে হাজির হ'লো একেবারে আমার সামনে। কোনোরূপ সঙ্কোচ নেই, বোধ হয় পূর্ব্বের আলাপ ছিল ব'লে। বিলাসী তখনও বাথরুমে। প্রশ্নটা যেন ঘুমিয়ে এলো: কি জুতো কিনলেন?

—সামান্য এক জোড়া চটি।

—দেখি কি রকম সামান্যটা?

কাগজের মোড়াটা সামনে এগিয়ে দিলাম। সবে মাত্র দড়িটা খুলেছে, বিলাসী যেন দমকা হাওয়ার মত বেরিয়ে এলো।

—আমার চটি দেখতে দেবো না?

কাউন্‌সিল অফ ষ্টেটের নির্ব্বাচন।

ফলাফলের অনুমান।

গত সপ্তাহে কাউন্‌সিল অফ ষ্টেটের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রার্থীদের সাফল্য ও অসাফল্যের তদানীন্তন অনুমানের পর বিগত সপ্তাহে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সংখ্যক ভোটারগণ ভোট দিয়াছেন তাহা হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার রায়চৌধুরী
মিঃ জে, সি, ব্যানার্জ্জি
শ্রীযুক্ত বীরেন রায়
ও
শ্রীযুক্ত বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

মধ্যে যে কোন দুই জনই নির্ব্বাচিত হইবেন।

অদ্য ১০ই ডিসেম্বর ভোট প্রদানের শেষ দিন।

ছোট চাকরটা এসে দরজা খুলে দিল। বিলাসী ছুটে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ে দরজাটা ঝনাৎ ক'রে বন্ধ করে দিলে। পাশের বাড়ীর বৌটা জানালায় মুখ বাড়িয়ে শুধালো: সাহিত্যিকের বৌ এলি নাকি?

বিলাসীর যেন চার পা গজিয়ে উঠলো: হাঁরে এলুম কেরাণীর বৌ।

—যাবো?

—আয়।

সবে মাত্র চটী জোড়া টেবিলের একধারে রেখে সামনের চেয়ারটায় ব'সে একটা

—না দিস তো ব'য়ে গেলো, ভারী তোর চটি!

—তোরটা তো হালকা, তা হ'লেই হ'লো।

—হাল্‌কা তো ভালরে, পায়ে বেশ লাগে না, আর তোর ঐ পাঁচ মোন্ লোহাভারী চটিটা ঠেলবে, না "পা"টা ঠেলবে?

—দরকার নেই আমার ঠেলাঠেলির কাজ, ঘরে সাজিয়ে রাখবো।

—আলমারীর মধ্যে রাখিস্।

—আলমারীতে কেনো? আয়রন্ চেষ্টে রাখবো।

বৌটা হাস্‌তে হাস্‌তে হাততালি দিয়ে উঠলো: ও মা কিচ্ছু জানেনা, আয়রন্ ফেষ্ট! আয়রন্ ফেষ্ট! কি লজ্জার কথা মা, কিচ্ছু জানে না।

বিলাসী থতমত খেয়ে গেল: তবে কি বলে?

—বলবো কেনো?

—হাঁ গো, কী বলে গো?

বললাম: যা হোক একটা বলে।

বৌটা আমায় সাবধান ক'রে দিল: খবরদার আপনি বলবেন না।

বিলাসী ঝেজিয়ে উঠলো, এত বড় অপ্রস্তুতে পড়া তার কাছে বোধ হয় আজ প্রথম হ'লো। স্বরটা একটু কর্কশ ক'রে বললো: দরকার নেই আমার জেনে··· বেঁচে থাক্ বাংলা ভাষা। ইংরেজের ফ্যাড়াং-ফোড়ং ভাষা নিয়ে লাভ কী?

বৌটা হার মানতে চাইলো না: তবে আগে নিয়েছিলি কেনো? উহু বাবা আয়রন্ ফেষ্ট! তোর বিদ্যের দৌড় বোঝা গেছে, আর বলিস নি, লোক হাসবে!

বিলাসী এবার সত্যই রেগে উঠলো: কাঁদবে না তো তা হ'লেই হ'লো, তোর কথা শুনলে যে লোকের গায়ে জ্বর আসবে। আমার তো তবু ভাল।

—ভাল ত কত! আয়রন্ ফেষ্ট···উঃ কী ঘেন্না! ব'লে বৌটা 'টপ' ক'রে চটির যোড়াটা বিলাসীর হাত থেকে ছো মেরে তুলে নিল। পাঠকপাঠিকা এবার এদের তর্ক-সমস্যার কথাটা চট্ ক'রে ভেবে নিন্। চটি জুতা থেকে আয়রন্ ফেষ্ট তারপর হাসি কান্না তারপর জ্বর আসা-আসি ইত্যাদি আরো হয়তো অনেক কিছুতে গড়াতো, ভাগ্যিস বৌটা চটি জোড়াটা তুলে নিল, তাই রক্ষা।

* * *

বেলা তিনটা না বাজতে বাজতেই বাথরুমের ধারে সাবান কাচার হুপা-হুপ্ শব্দ লেগে গেছে। যত রাজ্যের বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে, গেঞ্জি, রুমাল, টাইটুবড়ি আরো অনেক কাপড় জাতীয় টুক্‌রা-টাক্‌রা সব এসে জড় হ'য়েছে। রজকের পয়সাটা মারা যায় আর কী! সামনের এক ফালতী রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ীর সেই বৌটা, কোলে একটা ফুটফুটে, টুকটুকে বছর খানেকের ছেলে; সেটা ওরই। গল্প জমিয়েছে, ওদের বাড়ীর বৌটার মুখশ্রী ভাল, অমুকের বৌটা একটু খাঁদা, অমুকের টা একটু টেরা, ইত্যাদি পরচর্চ্চা পরনিন্দা, যেগুলো নারীজাতির দৈনন্দিন্ জীবনের চণ্ডী পাঠে লাগে।

আমার সাড়া পেয়ে বিলাসী মাথার ঘোম্‌টাটা একটু টেনে দিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে গা থেকে পাঞ্জাবীটা ফেলে দিয়ে অভ্যাস মত জিজ্ঞাসা করতে হ'লো: চায়ের জল হ'য়েছে?—না। ক'রে দিচ্ছি,···শেফালী দেখনা ভাই, উনুনটা হয়তো ধ'রে গেছে···যদি পারিস্ তো কেট্‌লিতে তিনকাপ্ জল দিয়ে বসিয়ে দে···রান্নাঘরেই আছে।

শেফালী আমাকে শুনিয়ে ব'লে উঠলো: আমি কী তোদের চাকর নাকী, ইচ্ছে হয় তোর স্বামী তৈরী ক'রে নিক্—যার চারটে না বাজতে বাজতেই চা চা ক'রে প্রাণ ফেটে যায়। আমি পারবো না।

বিলাসী হেসে উঠলো: ওরে তুই চাকর নস্ রে, তুই ঝি, এবারে কিন্তু তোর ব্যকরণ ভুল, সেদিনে আমার ভুল বড্ড ধ'রেছিলে না?

—ওকে ভুল বলে না রে, ওটা হ'চ্ছে কথার মাত্রা,; বল্‌তে বল্‌তে শেফালী ছেলেটাকে কোল্ থেকে নামিয়ে রেখে রান্নাঘরে দৌড়ে গেল।

আমার লেখবার টেবিল থেকে রান্নাঘরের খানিকটা অংশ বেশ ভালরকমই দেখা যায়। উনুনটা তখনও বোধহয় ঠিক ধ'রেনি, শেফালী চায়ের জল ভরা কেট্‌লিটা বসিয়ে দিয়ে হাওয়া করতে লেগে গেছে। বৌটা সত্যই চট্‌পটে, ইতস্ততঃ উড়ে যাওয়া রঙিন প্রজাপতির মত। ধরা দেয় না, ছোঁয়া দেয়। লেখবার ফ্লাট ফাইলটা টেনে নিয়ে কলম ধরবার ষড়যন্ত্র ক'রছি এমন সময় আগমনীর সুর বেজে উঠলো বাথরুমের ধার থেকে। বিলাসী চীৎকার ক'রে উঠলো: ওগো, ছেলেটাকে একবার ধরো না গো।

কলম ফেলে উঠে পড়তে হ'লো। বুকের ওপর তুলে নিয়েও ছেলের বেসুরো চীৎকার আর থামে না। জীবনে কখন কাহাকেও কোলে ক'রেছিলাম ব'লে ত মনে হয় না। অনভ্যাসের দোষে মুখফিরে 'আয় পাখী' বুলি ছাড়া আর কোনো কথা বেরুলো না। শেফালী হাসতে হাসতে রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো।

তাড়াতাড়ি তার বুকের ওপর ফেলে দিয়ে বললাম: উঃ কী ছেলে বাবা, কিছুতেই আর থামতে চায় না!

শেফালী বললো: থামাতে জানলে ত' থামবে, একটা হোক্, তখন বুঝতে পারবেন!

হাঁপ ছেড়ে বললাম: আর হ'য়ে কাজ নেই' একলা বেশ আছি।

—যা হবার তা হবেই, আপনি না বললে কী আমি শুনবো?

—যদি হ'তো, তাহ'লে পূর্ব্বেই হতো।

—শরীরে কিছু আছে; যে তাড়াতাড়ি হবে? বরফের মত জমিয়ে নিয়ে ছাঁচে ঢেলে দিন, তারপর দেখুন একটা তৈরী হ'য়ে গেছে। হাত পা চোখ কান বিশিষ্ট একটা সজীব মাংসপিণ্ড। যেটার নাম হয় মানুষ। বলতে বলতে শেফালী হো হো করে হেসে ফেললো। আমি বললাম যদি সেটা মানুষ না হ'য়ে অন্য কিছু হয়?

—তাহ'লে সেই 'অন্য কিছুটা' আপনাকে হ'তে হবে।

—তার মধ্যে কোনো নিশ্চয়তা আছে?

—আছে বৈকি, যেটা বংশ পরম্পরায় হ'য়ে আসছে, আপনি আবার সেই মানুষের পেটে "অন্য একটা কিছু" খুঁজতে চাচ্ছেন সুতরাং আপনাকে তাহ'লে সেই "অন্য একটা কিছুর" মধ্যে হতেই হবে। সোনা দিয়ে কেউ শিসের "গয়না" খোঁজে?

কি একটা বলতে যাবো, শেফালী ছুটে গিয়ে রান্নাঘরে হাজির হ'লো। কেট্‌লীর ঢাকনাটা খন্ খন্ ক'রে কেঁপে উঠেছে। ফাইল্‌টা টেনে নিয়ে বললাম। কলম ঘ'সে ঘ'সে একটা লাইন বেরিয়ে শেষও হ'য়েছে, আধ-সেরি কেট্‌লীতে এক কেট্‌লী চা এসে হাজির হ'লো, সঙ্গে একটা ফকফকে কাঁচের পেয়ালা।

শেফালী চা ঢালতে ঢালতে বললো: আপনার জন্যে এবার একটা টীনের ড্রাম উনুনে বসিয়ে রেখে দেবো, যখন ইচ্ছে তখন খাবেন আর কোনো হাঙ্গামা থাকবে না, বেশ সুবিধেই হবে। পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বললাম: সে ত' ভালই হয় কিন্তু তার মাল মশলাগুলো যোগাবে কে?

—যিনি খাচ্ছেন তিনি যোগাবেন।

এরপর আর কথা চলে না, চুপ ক'রে থাকতে হ'লো। শেফালী আরো এক কাপ চা ঢেলে দিয়ে চলে গেল। পরের ইতিহাসটা জানা থাকে না।

পূজার দিন পাঁচেক বাকি। সেদিন বিলাসীর সঙ্গে সারাদিন গল্প করে শেফালী যখন বাড়ী গেল তখন বেশ রাত হ'য়েছে। শেফালীর স্বামী বিষধরের চড়া গলার কর্কশ স্বরটা বেশ ভাল ভাবেই কানে এসে বাজলো—তোমাকে কি রোজ রোজ আমার ব'লে দিতে হবে?

—কি?

—আজও জিজ্ঞাসা করছো কী? তোমার বাবা কী আমাকে মাইনে ক'রে চাকর রেখে দিয়েছেন যে, তোমার রোজ রোজ স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?

শেফালীর আবছা কথাগুলো কান পেতে শুনতে হ'লো: তোমার দুটি পায়ে পড়ি, চেঁচিয়ো না, একটু আস্তেই বলো না, কী হ'য়েছে?

বিষধরের স্বরটা বোধকরি আর এক মাত্রায় চ'ড়ে গেল: আস্তে কেনো, আমি কি কারুকে ভয় করি?

—না, না তুমি ভয় করো না আমি জানি, কিন্তু কি হ'য়েছে বলো?

—তোমাকে বলেছি ঐ গুলিখোর সাহিত্যেকের বিধবা বৌটা, যেটা আজ মাথায় সিঁদুর দিয়ে সধবা সাজছে তার সঙ্গে তোমার অত মেলা মেশা কেনো?

—কেনো? কে বললে বিধবা?

—বলবে আবার কে, ওদের সেই চাকরটা, যেটা ওদের কাজটাজ ছেড়ে দিয়ে আজকাল বাড়ী বাড়ী মদ বিলি ক'রে বেড়াচ্ছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)
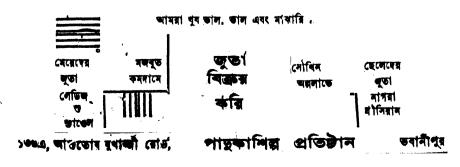
কলোম্বিয়ার সুন্দরী মেয়ে মার্গুরাইট্ চার্চিল। যৌবন এর ধরে রাখা যাচ্ছে না আবরণের ভেতর। মেয়েটি এখন অভিনয় কোর্ছে "লিজিয়ন্ অফ্ টেরার" ছবিতে।

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লি

কার্য্যালয়—৯, রাজময় রোড (সাউথ), কলিকাতা

প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১লা পৌষ ১৩৪৩—১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৬ } ৪৮শ সংখ্যা

নিশার স্বপন শেষে

বিগত করপোরেশন নির্ব্বাচনের সময় হইতে আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে বহুভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছিলাম যে, বৈধানিক উপদলের সহিত মিলন সম্ভবপর নহে, সম্ভবপর হইলেও এই মিলন মঙ্গলময় হইবে না। তৎপরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ম্মকর্ত্তা ও কার্য্যকরী সমিতি গঠন সম্পর্কে যে মিলন-ফরমুলা রচিত ও গঠিত হইয়াছিল আমরা কোন-কালেই সেই মিলনে বিশ্বাস করিতে পারি নাই এবং তদনুসারে সেই মিলনের জয়গানও করি নাই। রায়-রুণী-প্যাক্টের প্রবর্ত্তক ডাঃ রায়কে মিলনের মোহে প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অধীশ্বর করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন আশা করি শরৎচন্দ্র বর্ত্তমানে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বহুবিনিন্দিত মিলন-সৌধ অবশেষে চূর্ণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বল্লভ পন্থের নির্দ্দেশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই বাঙলার কংগ্রেসকে দুর্ব্বল ও বাঙলার স্বার্থ-বিরোধী বহুলোকের পথ পরিষ্কৃত করিয়া ডাঃ রায় নির্ব্বাচন রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই শঙ্কটময় সময়ে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উপর বাঙলায় কংগ্রেসের নামে নির্ব্বাচন পরিচালিত করিবার সমস্ত ভার আপনা আপনিই আসিয়া পড়িল। বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার ন্যায় প্রবেশ ও প্রস্থানের কসরৎ ডাঃ রায় বহুবার দেখাইয়াছেন সুতরাং তাঁহার এই বর্ত্তমান প্রস্থানে আমরা বিস্মিত হই নাই। বিগত করপোরেশন নির্ব্বাচনের সময় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যখন সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছিলেন তখন মেঘের অন্তরাল হইতে ডাঃ রায়ের ইন্দ্রজিতের ন্যায় অভিযান বাঙলার কংগ্রেস কর্ম্মীরা ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হন নাই। তদুপরি জোড়াসাঁকো রাজবাটীর মন্ত্রণাকক্ষে যে রায়-রুণী-প্যাক্টের পরিকল্পনা হইয়াছিল তাহা শরৎবাবু অতি সহজে বিস্মৃত হইলেও বাঙলার জনসাধারণ ভোলে নাই।

পন্থজীর নির্দ্ধারণ অনুযায়ী স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্তের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্তের, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথের ঘোষের ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের মনোনয়ন নাকচ হইয়াছে। কার্ত্তিমান কামিনী বাবু মনোনয়নের ছাপ হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের মনোনয়ন নাকচে ব্যক্তিগতভাবে আমরা দুঃখিত হইলেও দলগত আনুগত্যের দৃষ্টিতে আমরা সুখী হইয়াছি কারণ, ইহা আমরা সত্যেনবাবুর ব্যক্তিগত পরাজয় বলিয়া মনে করি না—সত্যেনবাবুর অনুসৃত উপদলের পরাজয় মনে করি। আমরা তাঁহাকে বহুবার বৈধানিক-মোহচক্রের মায়া কাটাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি কোনমতেই সে মায়া কাটাইয়া

উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপদলগত অপকর্ম্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। টাঙ্গাইলের শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ ঘোষের সহিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের যেরূপ যোগাযোগ আছে তাহাতে তাঁহার নির্ব্বাচন মাকচ সুখের বিষয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ অবাঙ্গালী সুতরাং বাঙ্লার আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব; সেইজন্যই বোধ হয় তিনি সকলক্ষেত্রে বিধানীদলের স্বৈরাচার উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নলিনী অধিকারী ও ডাঃ নলিনাক্ষ্য সান্যালের মনোনয়ন মঞ্জুর করিয়া তিনি বাঙ্লার লোকমতকে অবজ্ঞা ও উপহাস করেন নাই ত? বাঙলা কংগ্রেসের রন্ধ্রগত শনি শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় ঢাকার কংগ্রেসী মহলে যেরূপ অপ্রিয়, তাহাতে তাঁহার জয় সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সন্দিহান! আর যাঁহাদের সরকারী মন্ত্রীর আবাসে যাতায়াত আছে সেইরূপ প্রার্থীকে কংগ্রেসের ছাপ থাকা সত্ত্বেও বাঙলার জনসাধারণ বরণ করিয়া লইবেন কিনা তাহার শেষ মীমাংসা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হইয়া যাইবে।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের কেন্দ্র হইতে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও নদীয়া ইন্‌জিনীয়ারিং ওয়ার্কেসের শ্রীযুক্ত গিরিজা নাথ পাল চৌধুরী উভয়েই প্রতিষ্ঠাবান্ ও শক্তিশালী ব্যক্তি। মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি ও কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাদের মধ্যে একজনকে সমর্থন করিলে স্যার হরিশঙ্কর ও ইঁহাদের মধ্যে একজন নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কংগ্রেসী মনোনয়নের শেষ পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়াছে—শেষ বিচারের ভার বাঙলার জনসাধারণের উপর অর্পিত হইয়াছে।

"বিষবৃক্ষে" কুন্দনন্দিনী সেজেছে কাননবালা

[বিলাসী]

এখানি তাঁর হাতে তোলা দু'নম্বর ছবি সেই হিসেবে পরিচালনা উচ্চশ্রেণীর না হ'লেও একান্ত নিন্দার নয়।

"বিষবৃক্ষ"

প্রযোজক—রাধা ফিল্ম কোম্পানী

গল্প—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য } ফণী বর্ম্মা

আলোক-চিত্র-শিল্পী—বীরেন দে

শব্দ-যন্ত্রী—নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ

সুর-শিল্পী—পৃথ্বীশ ভাদুড়ী

ভূমিকা-লিপি—কুন্দনন্দিনী-কাননবালা, সূর্য্যমুখী-শান্তি গুপ্তা, কমলমনি-মীরা দত্ত, হীরামালিনী—প্রমীলা, নগেন দত্ত—জহর গাঙ্গুলী, দেবেন দত্ত-কুমার মিত্র, শ্রীশ—ভূমেন রায়, তারানাথ—জানকী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

চিত্র-পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস্

প্রথম মুক্তি—'রূপবাণী' ১৫ই ডিসেম্বর '৩৬।

বঙ্কিমচন্দ্র "বিষবৃক্ষে"র শেষে লিখেছেন "আমি বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে-গৃহে অমৃত ফলিবে।" আমরাও বলি রাধা ফিল্ম কোম্পানী যে "বিষবৃক্ষ" তৈরি কোরলেন তা' যেন দর্শকদের মন আনন্দে ভরিয়ে তুলে রূপোর আমদানি করে ভারে ভারে।

"বিষবৃক্ষ" বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। বাঙ্‌লার ছোট বড় সবাই-ই সূর্য্যমুখীর অপূর্ব্ব স্বামীভক্তি, তাঁর স্বার্থত্যাগ; কুন্দনন্দিনীর সোনার সংসার ছারখারের কথা পরে বিষ খেয়ে বিষোদ্গার, দেবতুল্য নগেন দত্তের পদস্খলন, দেবেন দত্তের লম্পটতার কথা জানে। সুতরাং সে কাহিনীর পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

"বিষবৃক্ষে"-র পরিচালনা কোরেছেন ফণী বর্ম্মা। আগেও এই প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে একখানা ছবি ইনি পরিচালনা কোরেছেন।

নিউ থিয়েটার্সের আগামী বাণী-চিত্র "দিদি"র নাম-ভূমিকায় চন্দ্রাবতী। এই ছবির পরিচালক নীতীন বসু।

কোরেছেন বলে। আমাদের মনে হয় বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের এই উদারতা কখনই নিষ্ফলে যাবে না। তাঁর এই দোষে গুণে তোলা "বিষবৃক্ষ" রূপবাণীর রূপোলি পর্দায় যে অমৃতফল প্রসব কোরবে—এ ধারণা করা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের আগামী বাণী-চিত্র "মায়া"র একটী বিশেষ দৃশ্যে—পাহাড়ী, শচী সান্যাল প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে। চিত্রায় ২৩শে থেকে ছবিখানা চলবে।

নগেনের ভূমিকায় নেমেছে জহর।

শব্দযন্ত্র ও আলোক-চিত্রের কাজ একেবারে অপ্রশংসনীয় নয় যে আলোক-চিত্রী ছবির প্রথমেই ঝড়জলের দৃশ্যটি অত সুন্দর তুলেছেন তাঁর কাজের আরও প্রশংসা করবার আমাদের ইচ্ছে ছিল। পরিস্ফুটনাগারের কাজ চলনসই।

সাজসজ্জা, দৃশ্যপট সম্বন্ধে অভিযোগ করবার কিছু নেই। সম্পাদনার সম্পাদক মশাই আরও কাঁচি চালালে ছবিখানার গতি আরও বাড়তে পারে। আবহাওয়া-সঙ্গীত মোটের ওপর চলনসই। অভিনয়ের দিক থেকে শান্তি গুপ্তার সূর্য্যমুখী সুঅভিনীত হ'য়েছে। কাননবালার কুন্দর কথাগুলো বেশ মিষ্টি। মীরার কমলমণি চলনসই। প্রমীলার হীরা আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি—এই চরিত্রটি "বিষবৃক্ষে"র একটি বিশিষ্ট চরিত্র কিন্তু প্রমীলার মত সাধারণ মেয়ের পক্ষে এ চরিত্রের রূপ দেওয়া বিশেষ দুরূহ। নগেনের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর বৈশিষ্ট্যবিহীন অভিনয় আমাদের খুশী কোরতে পারে নি। দেবেন্দ্র রূপে কুমার মিত্র চরিত্রটির conception ঠিকভাবে ধরতে পারেন নি। ভূমেনের শ্রীশ মন্দ নয়। অন্যান্য ছোট-খাট ভূমিকা সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই।

পরিশেষে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা হরিপদ বাঁড়ুয্যেকে অভিনন্দিত কোরছি তাঁর অসীম সাহসের জন্যে। কারণ এত বড় একটা Heavy গল্পকে কতকগুলি নবীন কর্ম্মীর ওপর বিশ্বাস কোরে ভার দিয়ে তিনি তাঁদের উৎসাহিত

কীর্ত্তিমান

রচনা ও পরিচালনা—অখিল নিয়োগী

আলোক-শিল্পী—অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দ-যন্ত্রী—অবনী চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকায় : ঠাকুর্দ্দা—তুলসী চক্রবর্ত্তী, খোকা—অজিত চট্টোপাধ্যায়, বন্ধু—পূর্ণেন্দু ভাদুড়ী, ডাক্তার—জানকী ভট্টাচার্য্য, বৌ—লক্ষ্মী, পিসিমা—চপলা প্রভৃতি।

চিত্র-পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস

প্রথম মুক্তি—'রূপবাণী'—১৫ই ডিসেম্বর '৩৬।

হাসির ছবির দিক থেকে "কীর্ত্তিমান" বেশ কৌতুকপ্রদ।

পপুলার পিকচার্সের—"পণ্ডিত মশাই" চিত্রের একটী দৃশ্য। 'শ্রী'-তে চলছে।

ঠাকুর্দ্দার আদরের-দুলাল, বাপের মাথার-মণি—পিশিমার নয়ন-তারা—খোকা......... ঠাকুর্দ্দার পেন্‌সনের টাকা আন্‌তে গিয়ে কি করে রেস্ খেলে সমস্ত টাকা হারালো এবং তারপর খোকা চ্যবনপ্রাশ খেয়ে কী কোরে অফিম খেয়েছে বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল সেটাই এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।

ছবিখানার পরিচালনা, আলোক-চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজ এবং অভিনয় মোটের মন্দ বলা যেতে পারে।

প্যারাডাইসে "খুনী কোন্?"

রাধা ফিল্মসের বাংলা ছবি "কণ্ঠহার"-এর হিন্দী রূপান্তর এই "খুনী কোন?"। নেমেছেন এতে বাংলা ছবির প্রায় সকল শিল্পীরাই—কেবল ব্যতিক্রম, রণলালের ভূমিকায় আবদুল্লা কাবুলি, মুরারীর ভূমিকায় স্বরাজ প্রসাদ এবং রঞ্জিনির ভূমিকায় সারা থাতুন। হিন্দী ছবিতে মোহিনীর ভূমিকা বাতিল করা হয়েছে। হিন্দী ভাষাভাষীদের জন্যে কয়েকটী দৃশ্য পরিবর্ত্তন করা হয়েছে—যেমন একটী নরেন্দ্রের আশ্রয়দাতার গৃহ দাহ। অবিশ্যি ছবি যাদের জন্য তোলা এ তাদের ভালোই লাগবে—অন্ততঃ সেদিন 'প্যারাডাইসে' করতালিমুখর প্রেক্ষা-গৃহ তারই সাক্ষী দেয়।

অভিনয়ে ভালো লাগলো—ভূমেন রায়, কাননবালা এবং আবদুল্লা কাবুলিকে। ইন্‌সপেক্টার বিনয়ের সহকর্ম্মী এবং গৌরী কান্তের অংশে শিল্পীদ্বয়ের অভিনয় চলনসই। সারা থাতুনের রঞ্জিনি আমাদের মোটেই ভালো লাগেনি। তুলসী চক্রবর্ত্তী ও তাঁর কর্ম্মচারী এবং মাধোর ভূমিকায় যাঁরা নেমেছিলেন তাঁদের অভিনয় অনুল্লেখযোগ্য নয়।

শব্দ-নিয়ন্ত্রণ এবং ফটোগ্রাফী ভাল। পরিচালনা নিতান্ত সাধারণ স্তরের—পরিচালক কোন কৃতিত্বই দেখাতে পারেন নি। সম্পাদনা ত্রুটীবিহীন নয়—বিশেষ করে জুয়ার আড্ডার এবং জমিদারের বাড়ী পোড়ার দৃশ্য দুটীর আরো একটু সংস্কার প্রয়োজন। রসায়নাগারের কাজ চলনসই।

মোটের ওপর দর্শক সাধারণ ছবিখানিকে দেখে আনন্দ পাবে বলে আমাদের আশা আছে।

নিউ থিয়েটাস´

নীতীন বসুর "দিদি"-র কাজ অপ্রতিহত গতিতে চলেছে। এই ছবির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এতদিন পর্য্যন্ত বাঙলা ছবির ধারা যতটা বাঁধা ছিল—সে বাঁধ ভেঙ্গে "দিদি" তার অসামান্য তেজস্বিতায় নিজের স্থান বহু উঁচুতে কোরে নেবে—এরূপ ধারণাই সবাই কোরছে।

* * *

প্রমথেশ বড়ুয়ার হিন্দি "কপাল কুণ্ডলা"-র আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হ'য়েছে। চরিত্র নির্ব্বাচনের পালা শেষ হ'লেই শূটিং সুরু হবে।

* * *

প্রকাশ যে অমর মল্লিক শীঘ্রই আর একখানা তিন রীলের হাসির ছবি তোল্‌বার ব্যবস্থা কোরছেন। তাঁর ২৪ ঘণ্টায় তোলা "মজা কী" সবায়ের প্রশংসা পেয়েছে—সুতরাং এবারও মল্লিক মশাই যে সবাইকে আরও খুসী কোরবেন, সে বিশ্বাস তাঁর ওপর আমাদের আছে।

কালী ফিল্মস্

গেল শনিবার 'উত্তরা'য় সারারাত্রিব্যাপী "টকী অফ টকীজ"-র শূটিং হ'য়েছিল। বাণী থিয়েটারের দর্শক গমনাগমন ও টিকিট বিক্রয়ের দৃশ্যটি ঐ দিন রাত্তির ১২টা থেকে সকাল ৭টা পর্য্যন্ত মহাসমারোহে তোলা শেষ হ'য়েছে। এই দৃশ্যটি তোলার বিশেষত্ব—পর্দ্দায় যখন এই দৃশ্যটি দেখানো হবে তখন অনেকগুলো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দর্শক হিসেবে দেখা যাবে। তাদের মধ্যে আবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য: নন্দ মুখুয্যে (ক্যালকাটা প্রিণ্টিং), ফুলু মুখুয্যে (এক্সিবিটার্স সিণ্ডিকেট), হারু চাটুয্যে (রীতেন এণ্ড কোং), মনমোহন ঘোষ (উত্তরা ও শ্রী), সুশীল মজুমদার (পরিচালক) প্রভৃতি। সকল অভিনেতাদের সুনাম আমরা কামনা করি।

স্মৃতি বার্ষিকী

দক্ষিণ কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন হোমিও-প্যাথিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী গত

ডাঃ প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের হোমিওপ্যাথিক হলে ...ত হইয়াছিল। কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ডাঃ ডি, এন্, ব্যানার্জ্জি, ডাঃ বি, বি, বসু, ডাঃ হরেন ঘোষ, ডাঃ এন্, চ্যাটার্জ্জি, ডাঃ এম, এন, গুহ, ডাঃ পি, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুলদারঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী ও শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য।

সভা ভঙ্গের পর প্রফুল্ল বসুর সুযোগ্য পুত্র ডাঃ বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে জলযোগে পরিতুষ্ট করেন।

জি-সি-টকীজ

এদের "ইন্দিরা"-য় চরিত্র নির্ব্বাচন প্রায় শেষ হ'য়েছে। শোনা যাচ্ছে, কাননবালা দেবদত্ত ষ্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন। আর শোনা যাচ্ছে "ইন্দিরা"-য় ইনি নামছেন একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়। এ ছাড়া জ্যোৎস্না, উমাতারা, বিনয় গোস্বামী, অহীন্দ্র চৌধুরীও আছেন।

মিডল্যাণ্ড ক্রিকেট ক্লাব

খিদিরপুরে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর সভাপতিত্বে ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় মিডল্যাণ্ড ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্টা হইয়াছে। খিদিরপুরের বহু উৎসাহী, উদ্যোগী ও ক্রীড়ামোদী যুবক উক্ত ক্লাবে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গোলকেন্দ্র ঘোষ সহকারী সম্পাদক, শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ বসু ও শ্রীঅখিলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে কোষাধ্যক্ষ, ক্যাপ্টেন ও গ্রাউণ্ড সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ইরীন বিহারী মুখোপাধ্যায়, মোহিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার বসু ও মিলনকুমার মুখোপাধ্যায়কে লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

হুগলী জিলা শিক্ষক সম্মিলনী

গত রবিবার অপরাহ্নে কোন্নগর বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে মাননীয় বিচারপতি ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্রের সভাপতিত্বে হুগলি জিলা শিক্ষক সম্মিলনের অধিবেশন হয়। কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি ও তাহার সংস্কার সাধন সম্পর্কে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের অভিভাষণ বিশেষত্ববিহীন হইয়াছিল।

হুগলি জিলার বহু শিক্ষক ব্যতীত শ্রীযুক্ত নৃসিংহদাস বসু, কবিরাজ অনাথনাথ রায়, বর্দ্ধমান বিভাগের ইনস্পেকটার অফ স্কুলস্ রায় বাহাদুর ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সুধীর বসু ও শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা ও উৎসব

৭ই অগ্রহায়ণ সোমবার হইতে বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ড রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা, উৎসব ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবা মহাসমারোহে, সুচারুরূপে সমাধা হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বত পরিবেষ্টিত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ কুণ্ড। গ্রামখানি অকস্মাৎ বহুজন-সমাগম, নাচ, গান, গনেশ অপেরা পার্টির যাত্রা, বায়স্কোপ, পুষ্প পতাকা ও আলোক মালায় সুশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্য মুখরিত হইয়াছিল। দলে দলে সাঁওতাল ভীল মহানন্দে নাচ গান দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। ইহাদের মুখের অকলঙ্ক হাসি ও আনন্দ উল্লাস আশ্রমবাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। দরিদ্র নারায়ণের সেবা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। আশ্রমের সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও আশ্রমের সভ্যগণ যথাবিহিত সম্মান ও আদর আপ্যায়নে অভ্যাগত জনসাধারণের সকলকেই বিমোহিত করিয়াছিলেন। হরিবাবুর আদর আপ্যায়ন

এবং যত্নের কথা এবং বিদেশে বাঙ্গালীর এই মাতৃপূজা বহুদিন আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিত থাকিবে। আশ্রমের উন্নতি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। এই উৎসব উপলক্ষে হরিপদবাবু জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যয়ও সার্থক হইয়াছে।

হুগলি কলেজ শতবার্ষিকী

কলেজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় বেশ সুন্দর হইয়াছিল। দর্শকবৃন্দ সুদীর্ঘ আটঘণ্টা যাবৎ মন্ত্রমুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়াছিলেন। স্থানাভাবে অনেককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। চাণক্য, কাত্যায়ন, সেকেন্দার সাহ, হেলেন, ভিক্ষুক, বাচাল প্রভৃতির অভিনয় সত্যই উল্লেখযোগ্য। চাণক্যের ভূমিকায় শ্রীমান অলকা নাথ ধর অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি তার অভিনয়ে সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষরা এবং দর্শকবৃন্দরা তাহাকে প্রথম স্থান প্রদান করিয়াছেন। তিনি সত্যই সুদর্শন সুদক্ষ অভিনেতা। ইনি শুধু অভিনেতা হিসাবে খ্যাত নহেন ইনি একজন চিত্রশিল্পী। শিল্পকলায়ও যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কয়েক বার ইউনির্ভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক পাইয়াছেন। ইনি হুগলী জেলার গৌরব জনপ্রিয় সাহিত্য রসিক সাহিত্যসেবী সরকারী উকিল ৺ দীননাথ ধরের পৌত্র।

খেলার মাঠে

(সি, বি)

এম, সি, সি ও কুইনসল্যাণ্ড

গত শুক্রবার ২৭শে নভেম্বর থেকে 'ব্রিস্‌বেনে' এম, সি, সির সঙ্গে কুইনস্‌ল্যাণ্ডের একটি চারদিন ব্যাপী খেলা সুরু হয়েছে। এম, সি, সি দল প্রথম ব্যাট করেন। প্রথম দিনেই এম, সি, সির প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় এবং কুইনস্‌ল্যাণ্ড ব্যাট করতে আরম্ভ করে। চা পানের আগে অবধি এম, সি, সি বেশ ভালভাবে খেলতে থাকে এবং পাঁচ উইকেটে ২০২ রাণ কিন্তু তার পরে খুব খারাপ খেলা হয় এবং শেষ পাঁচ উইকেটে কেবল ১৩ রাণ হয়। এরকম দুর্ভাগ্য সাধারণতঃ দেখা যায় না। প্রথম ইনিংসে এম, সি, সির ২৫১ রাণ হয়। এই রাণ সংখ্যার ভিতর সেল্যাণ্ড একাই ৯৮ রাণ করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে সেল্যাণ্ড কেবল ২ রাণের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারলেন না। হ্যামণ্ড করেন ৩৬ রাণ এবং এমস করেন ৪১ রাণ। ঐ দিনেই কুইনসল্যাণ্ড ব্যাট্‌ করতে আরম্ভ করেন এবং একজনও আউট না হয়ে ৭১ রাণ করবার পর প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে স্থানীয় দল বেশ ভাল ভাবেই খেলতে এবং লাঞ্চের আগে অবধি ১ উইকেটে ১৩৫ রাণ করে। লাঞ্চের পর রাণসংখ্যা যদিও খুব দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল কিন্তু শেষ অবধি ঐ দিনেই কুইনসল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয় এবং ২৪৩ রাণ করে সকলে আউট হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশী রাণ করেন ব্রাউন এবং রজারস্‌। ব্রাউন করেন ৭৪ রাণ এবং রজারস্‌ করেন ৬২ রাণ। দ্বিতীয় দিনেই এম, সি, সির দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হয়। ফ্যাগ করেন ৯ রাণ এবং বার্ণেট করেন ১০ রাণ। তৃতীয় দিনে ফ্যাগ এবং বার্ণেট ব্যাট করতে আরম্ভ করেন। এরা দু'জনে খুব সুন্দরভাবে খেলতে থাকেন এবং এরা দুজনে ৩৭১ রাণ করেন। তার মধ্যে বার্ণেট দুটী সেঞ্চুরি করে ২৫৯ রাণ করেন। এরা দুজনেই নিজের দলকে অনেকটা জয়ের আশা দেখিয়ে দেন। ফিসলক 'নট আউট' থেকে ৪১ রাণ করেন। তৃতীয় দিনে খেলার শেষে এম, সি, সি ৩ উইকেটে ৪৫৩ রাণ করেন।

অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট

অষ্ট্রেলিয়া দলের যে এভাবে শোচনীয় পরাজয় হ'বে তা আমরা এর আগে বুঝতে পারিনি। ডন্‌ ব্রাডম্যানের মত খেলোয়াড় যে শূন্য রাণে আউট হ'য়ে যাবে তাও যেমন ভাবা অসম্ভব তেমনি ভোসের মত বোলার যে এতগুলি উইকেট পাবেন তাও তেমনি অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে। যা হউক কোন দল কিরকম রাণ করতে পেরেছে তাই নিচে দেওয়া হ'ল।

ইংল্যাণ্ড দল

প্রথম ইনিংস

ওয়ার্দিংটন কট ওল্ডফিল্ড ব ম্যাককর্মিক

বার্ণেট ক ওল্ড ব ও'রিলি

ফ্যাগ ক ওল্ডফিল্ড ব ম্যাককর্মিক	৪
হ্যামণ্ড ক রবিনসন ব ম্যাককর্মিক	০
লেল্যাণ্ড ব ওয়ার্ড	১২৬
এমস ক চিপারফিল্ড ব ওয়ার্ড	২৪
হার্ডষ্টাফ ক ম্যাককেব ব ও'রিলি	৪৩
রবিন্স ক পরিবর্ত্ত ব ও'রিলি	৩৮
এলেন ক ম্যাককেব ব ও'রিলি	৩৫
ভেরিটি ক সিভার্স ব ও'রিলি	৭
ভোস নট আউট	৪
অতিরিক্ত	৮
মোট	৩৫৮

ও'রিলি ১০২ রাণে পাঁচটী উইকেট লইয়াছেন।

দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়ার্দিংটন ষ্টাম্পড ওল্ডফিল্ড ব ম্যাককেব	৮
বার্ণেট ক ব্যাডকক ব ওয়ার্ড	২৬
ফ্যাগ ষ্টাম্পড ওল্ডফিল্ড ব ওয়ার্ড	২৭
হ্যামণ্ড হিট উইকেট ব ওয়ার্ড	২৫
লেল্যাণ্ড ক ব্রাডম্যান ব ওয়ার্ড	৩৩
এমস ব সিভার্স	৯
এ্যালেন ক ফিঙ্গলটন ব সিভার্স	৬৮
হার্ডষ্টাফ ষ্টাম্পড ওল্ডফিল্ড ব ওয়ার্ড	২০
রবিন্স ক চিপারফিল্ড ব ওয়ার্ড	০
ভেরিটি এল বি ডব্লিউ ব সিভার্স	১৯
ভোস নট আউট	২
অতিরিক্ত	১৯
মোট	২৫৬

ওয়ার্ড ১০২ রাণে ছয়টী উইকেট ও সিভার্স ২৯ রাণে ৩টী উইকেট লইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া দল

প্রথম ইনিংস

ফিঙ্গলটন ব ভেরিটি	১০০
ব্যাডকক ব এ্যালেন	৮
ব্রাডম্যান ক ওয়ার্দিংটন ব ভোস্	৩৮
ম্যাককেব ক বার্ণেট ব ভোস্	৫১
রবিনসন ক হ্যামণ্ড ব ভোস্	২
চিপারফিল্ড ক এমস্ ব ভোস্	৭
সিভার্স ব এ্যালেন	৮
ওল্ডফিল্ড ক এমস্ ব ভোস্	৬
ও'রিলি ক লেল্যাণ্ড ব ভোস্	৩
ওয়ার্ড ক হার্ডষ্টাফ ব এ্যালেন	০
ম্যাককর্মিক নট আউট	১
অতিরিক্ত	১০
মোট	২৩৪

ভোস্ একাই ছয়টী-উইকেট লইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া দল

দ্বিতীয় ইনিংস

ফিঙ্গলটন, ব ভোস	০
ব্যাডকক, ক ফ্যাগ, ব এ্যালেন	০
সিভার্স, ক ভোস, ব এ্যালেন	৫
ওল্ডফিল্ড, ব ভোস	১০
ব্রাডম্যান, ক ফ্যাগ, ব এ্যালেন	০
ম্যাককেব, ক লেল্যাণ্ড, ব এ্যালেন	৭
রবিনসন, ক হ্যামণ্ড, ব ভোস	৩
চিপারফিল্ড, নট আউট	২৬
ও'রিলি, ব এ্যালেন	০
ওয়ার্ড ব ভোস	১
অতিরিক্ত	৬
মোট	৫৮

এ্যালেন ৫টী উইকেট লইয়াছেন।

ফিঙ্গলটন প্রথম-ইনিংসে ১০০ শত রান করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ভোসের প্রথম বলেই আউট হয়ে যান।

ইতিপূর্ব্বে ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় এক ইনিংসে কত কম রাণ উঠিয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯০২ সালে এজ বাষ্টনে অষ্ট্রেলিয়া	৩৬
১৮৮৭-৮ সালে সিডনিতে অষ্ট্রেলিয়া	৪২
১৮৯৬ সালে ভ্যালে অষ্ট্রেলিয়া	৪৪
১৮৮৬-৭ সালে সিডনিতে ইংল্যাণ্ড	৪৫

ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় কত বেশী রাণ উঠিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

১৯৩০ সালে	লর্ডস মাঠে অষ্ট্রেলিয়া (৬ উইঃ)	৭২৯
১৯৩৪	ওভ্যাল	৭০১
১৯৩০	ওভ্যাল	৬৯৫
১৯২৮-৯	সিডনিতে ইংল্যাণ্ড	৬৩৬
১৯৩৪	ম্যাঞ্চেষ্টারে (৯ উইঃ)	৬২৭
১৯২৪-৫	মেলবোর্ণে অষ্ট্রেলিয়া	৬০০

বোম্বাই কোয়াড্রাঙ্গুলার

কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার উদ্যোগ আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এসপ্লানেড ময়দানে দর্শকদের নিমিত্ত আসনের ব্যবস্থা হইতেছে। এসপ্লানেড ময়দানে ইহাই শেষ খেলা। বোম্বাইয়ে যে নূতন ষ্টেডিয়াম নির্ম্মিত হইতেছে, আগামী বৎসর হইতে সেখানেই কোয়াড্রাঙ্গুলার খেলা হইবে।

খেলোয়াড় বাছাইর জন্য যে খেলা হইতেছিল তাহা এই সপ্তাহেই, শেষ হইল। আগামী ১৯শে ডিসেম্বর শনিবার হইতে কোয়াড্রাঙ্গুলার খেলা হইবে। প্রথম খেলা হইবে হিন্দু ও মুসলমান দলের মধ্যে। ১৯শে, ২০শে ও ২১শে এবং পার্শী ও ইউরোপীয়ান দলের মধ্যে ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর দ্বিতীয় খেলা হইবে।

ইউরোপীয় দল যে ফাইনালে পৌঁছিবে, তাহাতে কাহারও বড় একটা সন্দেহ নাই। হিন্দু ও মুসলমান দলের শক্তি প্রায় সমান সমান।

টেরী রে—প্যারামাউন্টের তরুণী অভিনেত্রী

ওপারের ছায়া

শ্রীপতিতপাবন পতিতুণ্ডি

গাড়ীর ওপর রাগ

রবার্ট টেলরের আছে একখানা পুরোনো ভাঙ্গাচোরা গাড়ী। সে গাড়ী নিয়েই রবার্ট ঘোরে দিনে ও রাতে। এই গাড়ীই হচ্ছে রবার্টের যাতায়াতের একমাত্র সম্পদ কাজে এবং অকাজে।

গাড়ীর বয়স হোল পনের বছর। এই বয়সে গাড়ী কত কোম্পানীর অন্দরে প্রবেশ করেছে, কত লোকের হাতে সেলাম ঠুকে এসেছে ববের হাতে।

পুরোনো গাড়ী। রাস্তাকে যারা চিনেছে আর তাদের পরিবর্ত্তন দেখেছে অনেককাল ধরে, অনেক রকমে। তারা আর রাস্তার বুকের ওপর নির্দ্দয় এবং নির্ম্মম ভাবে ছুটতে পারে না। কিন্তু ববের গাড়ী সে হৃদয় আর সে শক্তি নিয়ে জন্মায়নি। কাজেই তার প্রবল বিক্রম আজও রাস্তা প্রবল ভাবে চিনতে পাচ্ছে।

বব বলে, তার গাড়ীর এই প্রবল শক্তির উপাদান সেই জুগিয়েছে। অর্থাৎ গাড়ীকে সারিয়েছে, ধুইয়েছে, নতুন চেহারা দিয়েছে, মোটরের শক্তিকে টেনে তুলেছে ঘণ্টায় ১১০ মাইল।

ববের রাগ হচ্ছে নতুন গাড়ীর অধিকারীদের ওপর, যারা ওর পুরোনো গাড়ী দেখে হাসে। একবার ও দেখাবে এ গাড়ীর কতখানি শক্তি।

আমোদ প্রমোদে শিশু

ডেরিল এফ জানুকের আজ আর নতুন করে পরিচয় দেবার কিছুই নেই। অত বড় প্রডিউসারের নাম শোনেনি ছায়া জগতের এমন লোক খুব কম আছে।

সেদিন ডেরিল এফ জানুকের ছোট দুই মেয়ে, বাড়ীতে এক সার্কাস পার্টিকে 'সো' দেখানোর জন্যে ঠিক করে। তাতেই আমন্ত্রিত হয়েছিল ছায়ালোকের এক গাদা ছেলে পুলে, অর্থাৎ ডেরিলিন আর সুসানের বন্ধুবান্ধব।

এসেছিল যারা তাদের নাম হচ্ছে, সার্লি টেম্পল, হ্যারি জো ব্রাউন (জুনিয়ার), ষ্টুয়ার্ট এরউইন (জুনিয়ার), হ্যারল্ড লয়েডের ছেলে, পেগি আর গ্লোরিয়া লয়েড, পেনি ও টনি মার্চ্চ, উইলি বাগেল্স্ ছেলে ম্যানি রবিনসন, ডিয়ন ষ্ট্যানউইক, রিচার্ড ডেরিল জানুক এবং মেলিন্দা মার্কে।

বাজনা যারা বাজিয়েছিল তাদের পরণে ছিল ক্লাউনের পোষাক।

নরমা শিয়ারারের ভবিষ্যৎ

অতএব সমস্ত আলোচনা বন্ধ হোক।

ঠিক হোল নরমা নামবে স্ক্রীণে। স্বামীর সমস্ত কথা অন্তরের মণিকোঠায় তুলে রেখে দেবে। বিয়োগ কাতুরা বিধুরা নরমা শিয়ারার আবার মুখে রঙ লাগিয়ে ভুনিয়ার ছায়া-রস-পিপাসুর মনোরঞ্জন করবে।

স্বামী আরভিং থ্যালবার্গের উপদেশ মনে রেখেই আবার ও ছবিতে নামবে। না নামলে ওর চলবে না যে। না নামায় ওর যে বিরাট ক্ষতি। 'নরমার অসুখ

নরমা শিয়ারার

হয়েছিল ভয়ানক, এখন তা সেরে গেছে। নতুন যে ছবিতে নামবে, তার নাম হচ্ছে 'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস্।' আর পরের ছবি যেখানা ঠিক হয়ে গেছে তার নাম হচ্ছে, 'ম্যারী এ্যানটয়নেট্।'

নরমা যে ছবিতে নামছে, তার কারণ থ্যালবার্গের দলিলে লেখা ছিল যে সে ছবিতে নামতে পারে। আর তা ছাড়া নরমার সমস্ত টাকা এখন মেট্রো গোল্ডুইন কোম্পানিতে খাটছে। ও অভিনয় ছেড়ে দিলে ক্ষতি হতে পারে তাই।

আর জেনেট গেনরের

আর একজন অভিনেত্রী যার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুদিন ধরে বেশ জল্পনা কল্পনা চলছিল। এ মেয়েটি জেনেট গেনর। জেনট গেনরের নাম আগে খুব ছিল, আজ-কাল কিছু পড়ে গেছে। বছর খানেক

জেনেট গেনর

কিম্বা আরো কিছুদিন আগে এ মেয়েটির নামে বক্স অফিস যত টাকা আনত তা যে-কোন ছায়ালোকের মেয়ের চেয়ে বেশী।

সেদিন পর্য্যন্ত জেনেট বলে আসছিল যে সে পর্দায় নামা ছেড়ে দেবে। তার ভাল লাগে না আর কোন নাম করা মেয়ের সঙ্গে একই ছবিতে নামা। কয়েক মাস আগে জেনেট একখানা ছবিতে নামে, তার নাম হচ্ছে 'লেডিজ ইন লাভ।' এ ছবিতে ওর সঙ্গে ছিল কনষ্টান্স বেনেট আর লরেটা ইয়ং। এরপর আর ওর ভাল লাগছে না একসঙ্গে নামা।

খবর পেয়েছি, ডেরিল জানুকের সঙ্গে ওর কথা হয়েছে যে অমন ধারা তিনজন মেয়ে ষ্টার নামা ছবিতে আর ওকে নামতে হবে না। ওর নতুন ছবি ঠিক হয়েছে—'এ ষ্টার ইজ বর্ণ'—সঙ্গে নামবে ফ্রেডারিক মার্চ।

পনিজ

ডেভ গুল্ড একজন নাম করা পরিচালক। সম্প্রতি ডেভ ওঁদেশের কোরাস মেয়েদের তিন ভাগে বিভক্ত করেছে। হলিউডে এই মেয়েদের কায হচ্ছে দল বেঁধে নাচা।

এলিনর পাওয়েল যে ছবিতে নামছে তার নাম 'বর্ণ টু ডান্স।' সেই এলিনর পাওয়েল—যার পায়ের নাচের তালে ওঠে তরঙ্গ, ওঠে ট্যাপ্টি-ট্যাপ-ট্যাপ। সেই এলিনর পাওয়েল-এর ছবিতে পনিজ আছে মোটে বারোটি, আর কুড়িটি আছে শো-গার্ল, বাকি সবই নর্ত্তকী।

গুল্ড বলেছে—যৌবনে ঢল-ঢল আর অঙ্গের লাবণি ধরে যে মেয়ের ভার হবে নব্বই থেকে একশ ছ পাউণ্ড, মাথায় উঁচুতে হবে চার ফুট এগার ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চির মধ্যে—সেই হবে 'পনিজ।'

গুল্ডের ধারণা, এই সব মেয়েরাই নাচবার উপযুক্ত। এদেরই নাচের তালে উদ্গ্রীব আঁখি ঝকমকিয়ে উঠবে, সোনার যুঁই ফুল ফুটবে।

বাডি ইবসেন এইরকম মেয়েদের দিয়েই তার প্রত্যেক নাচের ব্যাক গ্রাউণ্ড সাজায়।

সমান বেতন

গুল্ড আরো বলে—আমার ছবির নাচিয়েরা হচ্ছে পাঁচ ফিট ছ ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফিট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চির মধ্যে। তাদের ওজন হচ্ছে একশ ছ থেকে একশ পনেরো পাউণ্ডের মধ্যে। আমার কোরাস নাচের এরাই হচ্ছে মেরুদণ্ড। ট্যাপ নাচ বল, পা ছুঁড়ে নাচ বল কিম্বা এ্যাক্রোবেটিক নাচ সব এরাই আমার ছবিতে নাচে। এদের পা লম্বা; পায়ের সৌন্দর্য্য 'পনিজ'দের চেয়ে ভাল। নাচের অঙ্গ সঞ্চালন ও গতি 'পনিজ'দের ভাল হলেও এই সব 'শো গার্ল' এর পায়ের সৌন্দর্য্যের জন্যে আমার সুবিধে হয়।

'ভিগ ফিল্ড' ছবিতে নাচের চমকপ্রদ দৃশ্য এদের জন্যে সম্ভব হয়েছিল। লম্বা মেয়েরা—যারা মাথায় উঁচু হচ্ছে পাঁচ ফিট ছ ইঞ্চি থেকে ছ ফিট লম্বা, তাদের আমি

নাচিয়ে-মেয়ে বলি না। তাদের তাল এবং সুর বজায় রেখে চলতে শেখাই। এই সব মেয়েরা সাধারণতঃ একশ পনেরো থেকে একশ পঁচিশ পাউণ্ড ওজনে হয়।

শেষোক্ত মেয়েদের গুল্ড বলে—পোষাকে পরিচ্ছদে এই সব মেয়েদের দেখায় আদর্শ সৌন্দর্য্যময়ী।

ওর মতে এই তিন রকম মেয়েদের বয়স হয় আঠার থেকে বাইশ বছর। মাইনে কিন্তু এই তিন রকম মেয়েদের সবায়ের সমান।

চরিত্র বৃন্দের গল্প লেখা

কয়েকটি চরিত্র দুখানি ছবিতে এক সঙ্গে কায করে। পরে তারা ঠিক করে নিজেরাই গল্প লিখবে। গল্পটা হবে নাচ গানের। কারণ চরিত্র কটির খ্যাতি হচ্ছে নাচ গানের জন্যেই।

ওদের দেশের সিনেমার গল্প লেখে দুজনে তো বটেই এমন কি তিনজন চারজন মিলেও। এমন খবরও পেয়েছি যে, গল্প লিখেছে পাঁচ মিলেও। এরা আছে সাত-জনে—এলিনর পাওয়েল, ভার্জ্জিনিয়া ব্রুস, জেমস ষ্টুয়ার্ট, ফ্রান্সেস্ ল্যাংফোর্ড, বাডি ইবসেন, আনা মারকেল আর সিড সিল-ভার। এরা সবাই নামছে 'বর্ণ টু ড্যান্স' ছবিতে।

'ব্রডওয়ে মেলডি অব ১৯৩৬' ছবিতে এরা ছিল এবং পরেও এই রকম নাচ গানের ছবিতে ওরা সবাই এক সঙ্গে থাকবে।

সেদিন খবর পেয়েছি এরা গল্প লিখেছে, এবং মেট্রো গোল্ড্‌উইন মায়ার ষ্টুডিওর কর্ত্তাদের শুনিয়েছে। কর্ত্তারা শুনে খুসী হয়েছেন এবং চিত্র নাট্য করতে বলেছেন।

ছবির নাম এখনও ঠিক হয়নি। তবে ওরা বলে, দুটো ঠিক আছে তার মধ্যে একটা ওরা বেছে নেবে; এক—'ট্রাবলস্ অব এ ট্রুপার,' দুই—'মিউজিক্যাল ম্যাডনেস্'।

শ্রীদুর্ব্বাসা

একটি সমস্যা:—বহুদিন পরে আজ আমরা একটি সমস্যা দিচ্ছি। আশা করি ইহা পাঠকবর্গের আনন্দ বর্দ্ধনে সমর্থ হবে। ফেরাইএর খেলা 'দ'কে খেলতে হবে। প্রতিপক্ষ যতই বাধা দিক্ না কেন, 'উ' এবং 'দ'কে সম্মিলিত হস্তে দুইখানি পিট নিতেই হবে।

ইস্কাবন—সাহেব, পঞ্জা, চৌকা।
হরতন—টেক্কা, সাতা, তিরি, দুরি।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—ছক্কা।
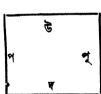
ইস্কাবন—নাই।
হরতন—দশ, নয়, ছক্কা, চৌকা।
রুহিতন—চৌকা।
চিড়িতন—বিবি, নয়, তিরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, নয়, সাতা।
হরতন—বিবি।
রুহিতন—দুরি।
চিড়িতন—টেক্কা, আটা।

ইস্কাবন—ছক্কা, তিরি, দুরি।
হরতন—আটা, পঞ্জা।
রুহিতন—তিরি।
চিড়িতন—পঞ্জা, চৌকা।

অন্য অবস্থায় অনুসন্ধিৎসু ডাক:—কোন ক্রীড়ক যদি কোন রঙে তিনটী ডাক দিয়ে তারপর অন্য কোন রঙে ডাক দেন, তাহলে শেষে যে রঙে ডাক দিলেন সেটি হবে অনুসন্ধিৎসু ডাক। যেমন,

(১) 'উ' — তিনটী রুহিতন। তিনটী ইস্কাবন।
'দ' — তিনটী হরতন।

এ স্থলে তিনটী ইস্কাবনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক, আর রুহিতন হল তুরূপ।

(২) 'উ' — তিনটী রুহিতন। পাঁচটি চিড়িতন।
'দ' — চাঁরটি ইস্কাবন।

খুচরো খবর

ছায়া ছবিতে প্রথম রোমিও সেজেছিল ফ্রান্সিস এক্স।

* * *

পর্দ্দায় প্রথম 'রোমিও জুলিয়েট' ছবি ওঠে ১৯৩৬ সালে, মেট্রো গোল্ড্‌উইন মায়ার ষ্টুডিওতে।

*

এলিজাবেথ বার্গনার নামছে ড্রিমির লিপস্ ছবিতে। এলিজাবেথ রম্বা নাচ নেচেছে।

'দি রোড ব্যাক' ছবি উঠছে জেমস ওহেল-এর পরিচালনায়।

এ ক্ষেত্রে পাঁচখানি চিড়িতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক, আর তুরুপ হল রুহিতন।

(৩) 'উ' 'দ'

তিনটী রুহিতন। তিনটী ফেরাই।

চারটি চিড়িতন।

এই চারখানি চিড়িতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক, আর তুরুপ হল রুহিতন।

তবে এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখা যায়,—যেমন ধরুন কোন রঙে তিনখানি ডাক দেবার পর আপনার খেঁড়ী তৎক্ষণাৎ সেই রঙে সাহায্য করলেন; অতঃপর ক্রীড়ক যদি পুনশ্চ অন্য কোন রঙে ডাক দেন তবেই সেই ডাকটি অনুসন্ধিৎসু ডাক হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তুরুপ হবে সেই রঙটি, যে রঙটি আপনাদের উভয় খেড়ীর মধ্যে বলা হয়েছে। যথা,—

'উ' 'দ'

তিনটী রুহিতন। তিনটী ইস্কাবন।

চারটি ইস্কাবন। পাঁচটি চিড়িতন।

এ ক্ষেত্রে এই পাঁচখানি চিড়িতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক আর তুরুপ হল ইস্কাবন।

ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে একবার অনুসন্ধিৎসু ডাক আরম্ভ হলে পরে যতগুলি ডাক দেওয়া হবে সবগুলিই অনুসন্ধিৎসু ডাক। যেমন,—

(১) 'উ'—একটি ইস্কাবন। চারটি চিড়িতন।—চারটি হরতন।—পাঁচটি রুহিতন।

'দ'—তিনটি ইস্কাবন। চারটি রুহিতন। চারটি ফেরাই।

এ ক্ষেত্রে 'উ'র চারটি চিড়িতন, চারটি হরতন এবং পাঁচটি রুহিতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক।

(২) 'উ'—একটি হরতন। চারটি চিড়িতন। পাঁচটি হরতন। ছয়টি চিড়িতন।

'দ'—একটি ইস্কাবন। চারটি ইস্কাবন। পাঁচটি ফেরাই।

এখানে 'উ'র এই চারটি চিড়িতন, পাঁচটি হরতন ও ছয়টি চিড়িতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক।

(৩) 'উ' 'পূ'

একটি ইস্কাবন। দুইটী চিড়িতন

চারটি রুহিতন। পাশ।

পাঁচটি চিড়িতন।

'প'

তিনটী ইস্কাবন। পাশ।

চারটি ফেরাই। পাশ।

এ ক্ষেত্রে 'উ'র এই চারটি রুহিতন ও পাঁচটি চিড়িতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক। যদিও বিপক্ষদলের কথিত চিড়িতন রঙটি শেষ বারে ডাক হয়েছে তবুও অনুসন্ধিৎসু ডাকের পর ডাকা হয়েছে বলে এটিকে অনুসন্ধিৎসু ডাকের পর্য্যায়ভুক্ত করতে হবে।

(৪) 'উ'—একটি ইস্কাবন। চারটি ফেরাই। ছয়টি রুহিতন।

'দ'—তিনটি ইস্কাবন। পাচটি ফেরাই।

এ স্থলে এই ছয়টি রুহিতনের ডাক হল অনুসন্ধিৎসু ডাক, কেন না উভয় খেঁড়ীর চারটি ও পাঁচটি ফেরহিএর ডাকের পর বলা হয়েছে।

নিখিল ভারত 'গোল্ড কাপ' প্রতিযোগিতাঃ— ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনে সদস্যভুক্ত উত্তর কলিকাতার থেটা বেটা ক্লাব কর্ত্তৃক কণ্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেটের নিখিল ভারত 'গোল্ড কাপ' প্রতিযোগিতার খেলা অনেকদূর এগিয়ে চলেছে। যদিও এখনও বাহিরের কোন দলই এই প্রতিযোগিতার খেলতে আরম্ভ করেননি, তথাপি আশা করা যায় যে অতি শীঘ্রই তাঁরা কলিকাতায় এসে পড়বেন এবং প্রতিযোগিতায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, কারণ স্থানীয় দলগুলির খেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বল্লেই হয়। এই প্রতিযোগিতায় ফলাফল নিয়ে প্রকাশ করা গেল তন্মধ্যে ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল ক্লাবের হাতে স্যাটার্ণ ক্লাবের ও ল্যান্সডাউন ক্লাব (২) এর হাতে হাইড রোড ইনষ্টিট্যুটের শোচনীয় পরাজয় আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে।

প্রথম রাউণ্ড।

স্যাটার্ণ ক্লাব ৪০০০ পয়েণ্ট পরাজিত করেছেন থেটা বেটা ক্লাব (১)কে।

শৈলেন্দ্র মেমোরিয়্যাল ক্লাব ৪০০০ পঃ পরাজিত করেছেন সাউথ ক্যালকাটা ব্রীজ ক্লাবকে।

ক্রুক্‌ফোর্ডস ক্লাব (১) ৪০০০ পঃ পরাজিত করেছেন, ক্যালকাটা ওয়াণ্ডারারাস (১)কে

ক্রুক্‌ফোর্ডস ক্লাব (২) ৬০০০ পঃ পরাজিত করেছেন এস্ অফ স্পেডসকে।

থেটা বেটা ক্লাব (২) ১৫০০ পঃ পরাজিত করেছেন কাশীপতি মেমোরিয়ালে ক্লাব (২)কে

লুনার এণ্ড ফুলস কমবাইণ্ড ক্লাব ৪০০০ পঃ পরাজিত করেছেন ঘুঘুডাঙ্গা ক্লাবকে।

ল্যান্সডাউন ক্লাব (২) ১৭০ পঃ পরাজিত করেছেন হাইড রোড ইনষ্টিট্যুটকে।

জি, এল, ক্লাব ৩০০০ পঃ পরাজিত করেছেন ক্যালকাটা ওয়াণ্ডারারাস (২)কে

নীলকুঠি এমেচারস্ এর অনুপস্থিতে টু নো ট্রাম্পস উঠেছেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ড।

ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল ক্লাব ৩০০ পঃ পরাজিত করেছেন স্যাটার্ণ ক্লাবকে।

ছত্রভঙ্গ ৪০০০ পঃ পরাজিত করেছেন নর্থ ক্লাব (১)কে।

কাশীপতি মেমোরিয়াল (১) ১৫০০ পঃ পরাজিত করেছেন ল্যান্সডাউন ক্লাব (১)কে।

সান্ধ্য সঙ্ঘ ৪০০০ পঃ পরাজিত করেছেন। ট্রাগলারস দলকে।

ক্রুক্‌ফোর্ডস ক্লাব (১) ৬৩৩০ পঃ পরাজিত করেছেন শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবকে
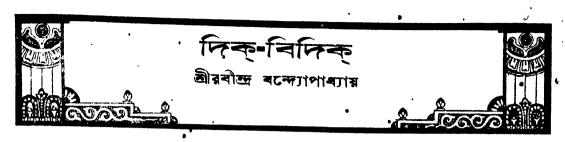
থেটা বেটা ক্লাব (২) ৮৬৮৬ পঃ পরাজিত করেছেন ক্রুকফোর্ডস ক্লাব (২)কে।

(গত সংখ্যার প্রকাশিতের পর)

—সে বাজে কথা বলেছে, কিছু জানে না ?

—সে কিছু জানে না, তবে তুমি জানো ? বেশ তবে তাই যদি জেনে থাকো তা'হলে ঐ বাড়ীতেই থেকো, এ বাড়ীতে তোমার আর দরকার নেই, যে বাড়ীতে একজন তিন মাস কাটিয়ে গেল, সে কিছু জানে না, আর জানো তুমি ? যেমন জুটেছে মদোমাতাল সাহিত্যিক, তেমনি জুটেছে তার গুণ-গায়িকা ! বাজারের একটা বিধবা মেয়েকে ধ'রে নিয়ে এসে, মাথায় সিঁদুর পরিয়ে পরিচয় দেয় কি না সাধ্বী সতী ? নিহাৎ কোলকাতা ব'লেই রক্ষে ! হ'তো যদি আমাদের গাঁয়ে তা হ'লে—

শেফালী তাড়াতাড়ি স্বামীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে (অনুমানে বোঝা গেল) বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো : তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ছি, একটু চুপ করো, শুনতে পাবে, শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী বাধাবে ?

বিষধর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গর্জ্জিয়ে উঠলো : কেনো আমি কী চোর ? যে ফিসির-ফাসুর করে বলবো ? মদো-মাতাল কোথাকার ! বটতলার সাহিত্যিক ! জানেনা আমি কে ?

শেফালীর বাঁধ ভেঙ্গে গেল, চিবিয়ে চিবিয়ে বললো : দেখো, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলো, মদো-মাতাল ও নয়, মদো-মাতাল তুমি, এখনও গন্ধ ভুর ভুর ক'রছে। যা'তা একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তুমি যে পার পেয়ে যাবে এটা স্বপ্নেও ভেবো না, পড়তে যদি অপরের পাল্লায় তাহ'লে দেখতে একবার কি কাণ্ডটা হ'তো ! নিহাৎ ভদ্রসন্তান তাই মুখ বুজে আছে, তোমাদের মত মদো-মাতালের সঙ্গে কথা বলতে ওরা ঘৃণা বোধ করে।

—কী—আমি মদো-মাতাল, তবে রে···

মাত্র একটা বোতল ভাঙ্গা শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। তারপর চুপ চাপ। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে দৃষ্টিটা ফাইলের খোলা পাতার ওপর নিবদ্ধ করলাম। বিলাসী কোথায় ছিল জানি না, আস্তে আস্তে এসে আমার চেয়ারের হাতলের ওপর একটা হাতের ভর দিয়ে ঝুকে পড়ে বললে : শুনলে ত' কথাগুলো ?

আমি উত্তর না দিয়ে বললাম : বোতলটা কোথায় লাগলো ?

—ঠিক দেখতে পেলুম না, জানলাটা আড়াল হ'চ্ছিল কিনা, খুব সম্ভব বুকে লেগেছে। এ রকম আর একদিনও হ'য়েছিল বুঝলে ? কিন্তু এতটা হয়নি, আজ অনেকটা খেয়ে এসেছে, পা দুটো টলছিল,···চোখ দুটো লাল জবা ফুলের মত ; আহা শেফালীর বড় কষ্ট, না।

মুখটা না তুলেই বললাম : হাঁ, ওকে এখানে আসতে বারণ করে দিতে পারো ?

—কতবার বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলেছি, শোনে না, বলে বাড়ীতে একলা থাকতে ভাল লাগে না।

—তা এই রকম ভাবে রোজ রোজ অপমান ঘাড়ে ব'য়ে লাভ কি ?

—শেফালী নিহাৎ ভাল মেয়ে, অন্য মেয়ে হ'লে অমন গুণ্ডা স্বামীকে কেউ পুছতো না, তুমি যেন বাড়ীওয়ালাকে কিছু ব'লো না।

—না বললে হবে কেনো ? তার আর একখানা বাড়ীর ভাড়াটের জন্য যে টিকতে পারছি না।

—না, না টিকে দরকার নেই, শেফালীর মনে হয়ত কষ্ট হবে।

—আচ্ছা বেশ, তা'হলে আর একটা বাড়ী দেখি, কি বলো ?

বিলাসী মুখটা কাচু মাচু ক'রে বললো, সে তুমি যা ভাল বোঝো, আমি বাপু ও সব বুঝি না। বললাম : বুঝেও দরকার নেই, ওকে ছাড়তে তোমার যে মন চাইছে না তা আমি বুঝেছি, আচ্ছা যা হয় হবে এখন একটু চায়ের জল বসিয়ে দাওগে।

বিলাসী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দিন দুয়েক কেটে গেছে, এর মধ্যে শেফালীকে একদিনও দেখতে পাইনি, বিলাসীও কোনো খোঁজ খবর নেয়নি। হয়তো অসুখ বিসুখ হয়ে থাকবে ! একদিন ভোর বেলায় দরজার কড়াটা হঠাৎ নড়ে উঠলো তার সঙ্গে ডাক এলো : সমীরেশ বাবু বাড়ী আছেন ?

—কে ? চাকরটা গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।—

আমি বাথরুম থেকে শুনতে পাচ্ছি : সমীরেশ বাবুকে একবার ডেকে দাওতো !

—আপনি বৈঠকখানায় বসুন, বাবু কলঘরে গেছেন, ব'লে সে বৈঠকখানার দরজাটাও খুলে দিল।

ডাকাডাকিতে বিলাসীর ভোরের নিদ্রাটা

ভেঙ্গে গেছে। আমি ঘরে এসে চাকরটাকে চায়ের জল চড়াতে বলে কাপড়টা ছাড়ছি; বিলাসী জিজ্ঞাসা করলো: বিষধর বাবুর গলা না?

—হাঁ।

—হঠাৎ ভোরবেলায় কি মনে করে?

—কি জানি, বোধ হয় টাকার দরকার হয়েছে।

বলা বাহুল্য ভদ্রলোক ইহার পূর্ব্বে আরো কিছুদিন এসেছিলেন টাকার দরকারে। বিলাসীর অনুরোধে দিতেও হয়েছে, ফিরতও দিয়েছেন কিন্তু তার মধ্যে একটা ছোট ইতিহাস আছে। সেটা উল্লেখ যোগ্য নয়। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বিলাসী উঠে এসে দেওয়ালে কান পাতলো।—বৈঠকখানার একধারে-পাতা তক্তাপোষের ওপর পাশের বাড়ীর বৌ,—শেফালীর স্বামী শ্রীযুক্ত বিষধর বাবু হাতে দু একটা ছোটো খাটো পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে বসে। আমি ঢুকতেই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠলেন: নমস্কার, আপনাকে একটু জ্বালাতন করতে এলুম, কিছু মনে করবেন না।

আমি সামনের চেয়ারটায় গম্ভীর ভাবে ব'সে পড়লাম, ভদ্রলোককে দেখে শেফালীর মুখটা চোখের ওপর ভেসে উঠলো। এই কি সেই বিষধর বাবু? শেফালীর স্বামী! বোতলটা কি ইনিই ছুঁড়েছিলেন? অসম্ভব, হ'তে পারে না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিষধর ইতস্ততঃ করে বললো: আপনি যদি কিছু না মনে করেন···

—বলুন না আপনার কি দরকার?

বিষধর বোধ হয় এবার একটু জোর পেলো, বললো: দেখুন আজ সাতটার গাড়ীতে আমি এলাহাবাদ যাচ্ছি...আসতে দিন দশেক দেরী হবে, এরা সব রইলো যদি একটু দেখা শুনা করেন—মানে ওর একলা থাকা কখনও অভ্যাস নেই কিনা, সেইটাই হচ্ছে গণ্ডগোল...ভাবলাম ওর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দি কিন্তু তাঁরা আবার হাওয়া খেতে গেছেন। বুঝলেন, না?—মানে যাকে বলে উভয়—

আশ্বাস দিয়ে বললাম তাতে আর কি হয়েছে, আচ্ছা বলবো 'খন আমার ওয়াইফকে কোনো চিন্তার দরকার নেই···আর বলতে গেলে একই বাড়ী তো...আচ্ছা—

আমি উঠে পড়তেই বিষধরও উঠে দাঁড়ালো: আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, বুঝলেন কি না, আপনাদের আবার সময়ের দাম আমাদের থেকে অনেক—

—না, না তা কিছু না, তবে হচ্ছে কী জানেন—

ঠিক এই সময় চাকরটা দু পেয়ালা চা এনে হাজির করলো। আরো পাঁচ সাত মিনিট দু একটা বাজে কথায় কেটে গেল। বিষধর পোঁটলা দুটো হাতে ক'রে "আচ্ছা নমস্কার" বলে প্রস্থান করলো। আমি উঠে গিয়ে লেখবার ঘরে চেয়ারটায় ব'সেছি বিলাসী যেন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো, চেয়ারটা ধরে ফেলে আমার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলো: কী বললে গো, টাকার দরকারে?

মৃদু হেসে বললাম: না, তুমি ত' সব শুনেছো দেওয়ালে কান পেতে!

বিলাসী আমার মুখের কাছে মুখটা একটু ঝুকিয়ে নিয়ে বললো: ভাল শোনা যায়নি, বলোই না কি বললে।

হাসতে হাসতে বললাম: ও এলাহাবাদ যাচ্ছে...ওর বউটাকে আমায় পাহারা দিতে হবে, যদি কেউ চুরি করে নেয়!

বিলাসী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল: তোমাকে কি রাত্রে শুতে হবে না কি?

—কোথায়?

শেফালীর ঘরে?

সেই কথাই তো ব'ললো।

বিলাসী বাধা দিয়ে বললে: না, না তোমায় শুতে হবে না, আমার একলা থাকতে ভয় করবে, সে আমি পারব না।

আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম ভয় কিসের! তুমি নয় চাকরটাকে নিয়ে শোবে!

না, না আমি পারবো না, লক্ষ্মী, তোমার দুটি পায়ে পড়ি ব'লে বিলাসী আমার গলাটা দু'হাতে আকড়ে ধরে মুখের ওপর তার মুখটা লেপে দিল। আমি বুকের ওপর টেনে নিয়ে তার দুটো ঠোঁটের ফাঁকে একটা গভীর চুম্বন এঁকে দিলাম। মনে হ'ল কর্কস্ক্রু দিয়ে একটা মদের বোতলের ছিপি টেনে বার করা হ'লো।' বললাম: পাগল তোমায় ছেড়ে কখনও থাকতে পারি! চুমুটা কেমন লাগলো বলো।

বিলাসী হেসে বললো: যাও তুমি ভারী দুষ্টু! কি যে বলো!

আমি হাসতে হাসতে বললাম: তোমার আগেকার স্বামী বোধ হয় এমন চুমু দিতে পারে নি?

—যাও, তার নাম আর ক'রো না।

—কেনো তোমার কষ্ট হয় বুঝি?

—জানি না বাপু ব'লে বিলাসী ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

সন্ধ্যা বেলা গৃহে ফিরতেই দেখলাম, শেফালী আবার জামা জোরা এঁটে মুখ খানা ধব-ধবিয়ে আমার আঙিনায় ফুটে উঠেছে, সঙ্গে বিলাসী—যে তার নামের মর্য্যাদা বাঁচিয়ে রেখেছে।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: শেফালী দুদিন ফোটেনি কেনো?

শেফালী হাসতে হাসতে বললো: আপনি যে গোড়ায় জল ঢালতে ভুলে গিয়েছিলেন?

—আজ কে ঢাললো!

পাষাণ থেকে টেনে বার ক'রে নিয়েছি।

—উঃ তা হ'লে শেফালীর ক্ষমতা আছে তো! আমার একলার-ই নেই!

—কে বললে নেই!

—সেই যে তুমি-ই তো বলেছিলে "আপনার শরীরে কি আছে।"

—না থাকলেও আছে বটে, কিন্তু আমাদের মত এতটা নেই।

—থাকবে কি করে, তোমরা পাষাণ থেকে শুষে নিচ্ছ আবার আমাদের কাছ থেকেও ছাড়ছো না।

শেফালী জোর দিয়ে বললো: পুরুষদের কাছে মেয়েদের শ্রেষ্ঠ—দাবী।

যাক্‌গে ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন, একবার দোকানে যেতে হবে, আমরাও সঙ্গে যাবো।

—ঐ কথাটাই তো এতক্ষণ ভাবছিলাম।

—কেনো আমাদের নিয়ে যেতে হ'লে আপনার গায়ে বুঝি জ্বর আসে!

—শুধু জ্বর! তার সঙ্গে ম্যালেরিয়া, শেষে যাকে বলে ধনুষ্টঙ্কার।

শেফালী আমার মুখের ওপর দপ ক'রে একটা হাত দিয়ে বললো: আপনার যত সব অলুক্ষণে কথা, নিন চলুন।

—একটু বিশ্রাম করতেও দেবে না!

—এসে করবেন, চলুন ব'লে শেফালী আমাকে এক প্রকার ঠেলে দিল। উঃ! আবার সেই দোকান! দিক্-বিদিক্ করতে করতে জীবনটা গেল। তাই ভাবি পৃথিবীতে যদি মেয়েদের সৃষ্টি না হ'তো!...

'স্মৃতি-তর্পণ'

শ্রীহিল্লোল'কুমার বিশী

যেদিন প্রথম বুঝিতে শিখিনু,
মদনের ফুলশর—
জীবনে প্রথম, সেইদিন প্রাণ
কেঁপেছিলো থরথর—
সেই দিন তুমি সমুখে আমার
ধরেছিলে প্রেম ডালা
কামনার যতো রঙীন কুসুমে
গেঁথেছিলে কোন মালা!
কণ্ঠে আমার পরাইয়া দিলে
সেদিনো বুঝিনি' আমি
সেই মালারূপ নিগড়ের চাপে
কাঁদিব দিবস-যামী!
তখনো বুঝিনি তখনো ভাবিনি
করে নাই কেহ মানা
প্রেমের মাঝে যে চলে ব্যবসায়
সেদিনো ছিলোনা জানা!
ভেবেছিনু এরে চরম আনন্দ
জীবনের বড় সুখ—
সে দিনেতে তাই দিয়েছিনু ধরা
হ'য়ে গিয়েছিনু মূক।
তোমার কোমল বুকের মাঝারে
আমার মাথাটী লয়ে—
জড়ায়ে যখন ধরিলে গো তুমি
কানে কানে কি যে ক'য়ে!
শিহরণ প্রাণে এসেছিল মোর
ক্ষণেকের তরে শুধু
উঠেছিনু কেঁপে, বুঝেছিনু বুঝি
প্রেমের নবীন মধু!
জানিনা কিছুই আবেগের ঝোঁকে
(মোর) পিপাসিত ঠোঁট দু'টী!
তব রক্তিম ঠোঁটের মাঝারে
কখন উঠিল ফুটি'!
মাথাটী তোমার বুকেতে ধরিনু
রাখিনু কোলের' পরে।
সুন্দর মুখ দেখিনু চাহিয়া
অপলক দৃষ্টি ভরে।
এতো সুন্দর তুমি যে আমার
ভাবিনি কখনো আগে
যেদিকে তাকাই কমলের প্রায়
মু'খানি তোমার জাগে।
তারপরে কতো গোপন মিলন;
তোমাতে আমাতে দেখা
কতো গাছ তলে, বাগানের মাঝে
(তার) আছে কিগো লেখাজোখা।
কতো রাতে তুমি আপনি এসেছ
মোর কাছে অভিসারে—
কতো রাতে মোরে টেনে নিয়ে গেছ
আমারে তোমার ঘরে।
কখনো তোমার পড়েছে খসিয়া
বুকের সুনীল বাস—
কখনো আপনি খুলিয়া দিয়েছি
কাঁচুলের ফিতা, ফাঁস।
পরশে আমার উঠিয়াছে জেগে
ঘুমন্ত দু'টী ফুল—
তাহার উপরে মাথাখানি থুয়ে
হ'য়েছে সকলি' ভুল।
বুকেতে বুকেতে, ঠোঁটেতে ঠোঁটেতে
দেহেতে দেহেতে কতো
হয়েছে মিলন; আজিও রয়েছে
সেদিনের স্মৃতি শত।
সেদিন যাইয়া তোমাদের বাড়ী
শুনিলাম তুমি নাই।
অবসন্ন মনে লেকের দিকে
চলিতে লাগিনু তাই।
নেবেছে আঁধার লেকের জলেতে
চলিয়াছি গুটী গুটি'।

আঁধার চিরিয়া তব হাসি যেন
কানেতে আসিল ছুটি'।
হৃদয় উঠিল কেমন করিয়া
চলিনু সমুখ পানে
দেখিনু তোমার নব অভিসার;
কথাও শুনিনু কানে!
সুহাসের গায়ে পড়েছ এলায়ে
বাহুলতা দেহ ঘিরি'!
দুই হাতে মোর মাথাটী ধরিয়া
সেথা হ'তে এনু ফিরি'!
তাহার পরেতে তোমার কাছেতে
গিয়েছি কতোই বার—
কথা কহ নাকো আগের মতন,
চাহ নাক' মোরে আর!
বুঝিতে পারিয়া দূরে সরে গেছি
বুক মাঝে লয়ে স্মৃতি!
মনোমন্দিরে বসাইয়া তারে!
আরতি করি যে নিতি।
জানেনা কখনো ফিরিবে কী মোর
প্রেম মাখা সেই দিন।
জানিনা কবে যে বাজিবে আবার
সেবি। তব প্রেম-বীন্।
কেটে যাবে মোর যৌবন, জানি
নিভিবে জীবন-আলো।
মরিবার কালে, বলিব চাহিয়া
সখি গো, প্রদীপ জ্বালো।
মরে গেছ তুমি মানস হইতে
চিতা ভস্ম গেছে ধুয়ে—
আপনার মাঝে আপনি মরেছ
কঙ্কাল গেছ থ্ য়ে।

শূণ্য মন্দির মোর

শ্রীবরেন্দ্র নাথ বসু

হঠাৎ বুকচেরা একটা দীর্ঘশ্বাসের মত মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, "শূণ্য মন্দির মোর", জগতে শত শত বিরহের গাথা রয়েছে—তবুও ওই কথাটি ঘুরে ফিরে মনের মাঝারে কুজন করে বেড়াতে লাগল—"শূণ্য মন্দির মোর"। এ যেন আধফোটা কমলের চার-পাশে ভ্রমরের ব্যর্থ গুঞ্জন, "শূণ্য মন্দির মোর"। মানুষের জীবনের অনাদি অনন্ত কালের ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস "শূণ্য মন্দির মোর"।

কে বলতে পারে কেন আজ আমার প্রাণেও কোমল নিখাদে বেজে ওঠা করুণ রাগিণীর মীড় মূর্চ্ছনার মত বেজে উঠল, "শূণ্য মন্দির মোর", আমার এই হৃদয় মন্দিরের বহিরাবরণ বাইরের মানুষকে প্রলুব্ধ করে—মানুষ ছুটে আসে এই সুন্দর মন্দিরের সুন্দরতম দেবতাকে দেখবার জন্যে, কিন্তু এসে দেখে মন্দির শূণ্য—মন্দিরের দেবতাশূণ্য অভ্যন্তরের আঁধারপিষ্ট নির্জ্জনতা, শূণ্যতা,—মানুষের উন্মুখ হৃদয়াবেগকে ব্যাহত করে। মানুষ ব্যর্থ অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেয়। চলে যায়—যে ধারে তার দুচোখ যায়—শূণ্য মন্দিরের দেবতার অন্বেষণে। কিন্তু দেবতার সন্ধান মেলে না। সে তখন ক্ষ্যাপার মত ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যাকে পায় তাকেই মনে করে তার সেই শূণ্য মন্দিরের দেবতা। কিন্তু নিস্ফল তার সন্ধান—তার 'দেবতার' সঙ্গে সাদৃশ্যে মেলে না—আবার সে মুখ ফিরিয়ে নেয়—আবার সে পথ চলে।

পথ চলার বিরাম নেই—সন্ধানের অন্ত নেই—তবুও দেবতার খোঁজ মেলে না—তখন সে হতাশ ভগ্নস্বরে বলে, "হামার দুখের নাহিক ওর।" এই চিরন্তন মর্ম্ম-ব্যথার প্রকাশ আজও আকাশ বাতাস ছেয়ে আছে—আজও বাতাস কেঁদে কেঁদে বলে যায়, "হামার দুখের নাহিক ওর"—বরষার ঝরঝর বরিষণ অবিরাম সেই চিরন্তন ব্যর্থতাকে রূপ দিয়ে বলে, "হামার দুখের নাহিক ওর।"

কেন এ দুঃখের অন্ত নেই—কেন মানুষ তার এই আপনি টেনে-আনা দুঃখকে পরিহার করতে পারে না—কেন তার হৃদয় মন্দিরের শূণ্যতাকে উপেক্ষা করতে পারে না। এ প্রশ্নের বোধহয় কোন উত্তর নেই—এ প্রশ্নের সমাধান নেই—এ প্রশ্ন সর্ব্বকালের—সর্ব্বদেশের—সর্ব্বজনের।

আজ আমার প্রাণেও বেজে উঠেছে সেই সুর—এ যে পঞ্চমে কুজিত ভৈরবী রাগিণীর করুণ উদ্বেলতা—এ যে মানুষকে শুধু কাঁদায়—মানুষ কেঁদে কেঁদে তৃপ্তি পায়। মানুষ চায় কাঁদতে—শত সুখের মধ্যে ক্রন্দনের একটু আভাষ পেলে মনে শান্তি পায়—শুধু কাঁদবার জন্যে।

আজ আমার মধ্যেও জেগে উঠেছে সেই ক্রন্দন—আজ শুধু আমার মন বলছে, "শূণ্য মন্দির মোর"—আমার মন্দির আজ শূণ্য।

একদিন এই মন্দির ছিল পরিপূর্ণ—দেবতার অনুষ্ঠানে—দেবতার অর্চ্চনায় কোথাও তিলবিন্দু ফাঁক ছিল না। শুধু সেই দেবতার মুখ চেয়ে মন কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে—দেবতার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নয়নের তিয়াষা আরও বেড়ে গেছে—তখন বলেছি, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল"—সেই দেবতার পরম সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠেছে—সেই অস্পষ্ট দৃষ্টির মধ্যে থেকে দেখেছি—দেবতার অধরে মৃদু হাসি। মনে ভেবেছি দেবতা আমার প্রতি সদয়। মন আনন্দে নেচে উঠেছে—দেবতাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছি—মনের উন্মত্ত আবেগে তাকে আমার সঙ্গে এক করে নিতে চেয়েছি। তার স্পর্শে হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা নিভে গেছে।

যখনই তার কাছ থেকে একটু দূরে গেছি—মনে হয়েছে,—তাকে বুঝি আমি হারালুম। সে বুঝি আমার কাছে থেকে দূরে চলে যাবে। ছুটে গিয়ে উন্মত্ত আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরেছি—তার মুখের দিকে দুটি মিনতিভরা চোখ তুলে বলেছি, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল"—দেখেছি দেবতার মুখে আবার সেই মৃদু হাসি—মনের মধ্যে শত শত শিহরণ ছুটে গেছে। দেবতাকে বুকের ওপর তুলে ধরেছি—বলেছি, "তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে—এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও"—আবার সেই মৃদু হাসি—আমার উন্মুখ মনকে উন্মত্ত করা সেই মৃদু হাসি।

আমার সুন্দর মন্দিরের সুন্দরতম দেবতাকে নিয়ে কত স্বপ্ন ভেঙেছি আর গড়েছি—তাইতেই তৃপ্তি—ভাঙার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ। সে আনন্দের আতিশয্যে জগতকে ভুলেছি—সকলকে ভুলেছি। জগত সংসার আমার কাছে এক হয়ে গেছে—রূপ পরিগ্রহ করেছে আমার ওই সুন্দরতম দেবতার।

দেবতার মুখপানে চেয়ে হেসেছি আর কেঁদেছি। হেসেছি—আমার মন পরিপূর্ণ বলে। কেঁদেছি—দেবতাকে পেয়েছি বলে। দেবতাকে পাওয়ার আনন্দ কাঁদার মধ্যে। মন খুলে কাঁদতে পাওয়া দেবতার পরম আশীর্ব্বাদ—সেই আশীর্ব্বাদে আমার জীবন পূর্ণতা লাভ করেছে—আমার দেবতাকে বুকে করে সেই মন্দিরের মধ্যে ছুটে বেরিয়েছি। বাইরে যাবার সাহস হয়নি—ভয় পেয়েছি—আমার সুন্দর দেবতার ওপর লুব্ধ দৃষ্টি কেউ যদি দেয়। কেউ যদি আমার দেবতার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখে তাহলে আমার দেবতা কলুষিত হবে। ভয় পেয়েছি—দেবতাকে গণ্ডিবদ্ধ করেছি—মন্দিরের সীমার মধ্যে দেবতার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করেছি—দেবতাকে একান্ত করে রেখেছি।

কিন্তু দেবতা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি—দেবতা আমার মনের সঙ্কীর্ণতাকে মেনে নিতে পারেনি—দেবতা হল রুষ্ট। চলে গেল মন্দির থেকে—সীমার মধ্যে আমার কাছে ধরা দিতে চাইলে না—গণ্ডির মধ্যে বাস করলে না। দেবতা চায় অসীম অনন্ত ব্যেপে বাস করতে—অসীমের মধ্যে নিজের প্রকাশ প্রতিপন্ন করতে। দেবতা বলে, "আমি আছি সকলের মাঝে—ধ্যানস্থ হয়ে

তরুণ

শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়

—এক—

অলকার হাসি পায়, হাসে অলকা। চোখের কোলে তার দুষ্টু হাসি, তার পাতলা ঠোঁট দুটো চক্ চক্ করে ওঠে; অলকা হাসে। হিষ্ট্রী ক্লাশ'এ লেক্‌চারার French Revolution এর কথা বলে চলেছেন;—অলকা শোনে না। তার চোখ ঐ কোনের ছেলেটির উপর। পাতলা ছিপছিপে শ্যামবর্ণ ছেলেটি, সমস্ত দেহটা তার মেয়েলি ভাবে ভরা। তাকে দেখে মনে হয় না যে লেক্‌চারের এক বর্ণও তার কানে ঢুকছে। বেশীর ভাগ সময় সে ব্যথা-ভরা চোখে উপর দিকে চেয়ে কি যেন ভাবে। মাঝে মাঝে অলকার দিকে চায়,—তার ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে,—একটুখানি শুকনো হাসি হেসে আবার নীরব হয়ে যায়। কখনও সে তার পাতলা লম্বা মেয়েলি আঙ্গুলগুলো নিয়ে খেলা করে, খেলা করে আর ভাবে। কি ভাবে তা সেই জানে!

—অলকা তাই হাসে; ছেলেটির ওরকম মেয়েলি ভাব দেখে তার হাসি পায়; সত্যি সে হাসি চাপতে পারেনা বলেই হাসে। 'কেন ওরকম করে?'—অলকা ভাবে।

বিজয় কিন্তু ভাবে অন্য রকম। অলকা নিশ্চয় তাকে ভাল বেসেছে। নয়ত কেন ও ওরকম ভাবে তাকায় এদিকে? এতো ছেলেতো ক্লাশে আছে; কিন্তু,—কিন্তু অলকা হাসে কেন ওরকম ভাবে। প্রফেসার বকে চলেন—'Equality, Fraternity and brotherhood were the watch words'—মিলিয়ে যায় তাঁর কথা। বিজয় মুখখানা চেষ্টা করে আরও করুণ,—আরও মেয়েলি করে তোলে। অলকা তাকে ভাল বেসেছে, বিজয় ভাবে।

—'ছেলেটির অভিনয় সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বেশ!'—অলকা হাসে।

"আপনার খাতাটা kindly একটু দেবেন?"—

বিজয় চমকে ওঠে—"আজ্ঞে আমায়,—তা, ইয়ে আমায় ডাকছেন?"—চোখ আরও করুণ হয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘ শ্বাস —

অলকা আবার হাসে। "হাঁ;—খাতাটা দিননা একটু, লেকচার ফলো করতে পারিনি, লিখে নেবো।"—

"কিন্তু ইয়ে,—আমিও ফলো করতে পারিনি কিনা—তাই"—

—"বেশ যাহোক আপনি!" অলকা হাসে।

...পরিচয়ের এই সূত্রপাত। বন্ধুত্ব নিবিড় হতে দেরী হ'ল না একটুও।

—দুই—

—"এই যে বিজয়, কোথায় চল্লে?"—

বিজয় দাঁড়ালো। অলকা তার টু-সিটারের ষ্টিয়ারিংএ বসে। তার ঈষৎ সোনালী রঙের চুলগুলো বাতাসে অল্প অল্প উড়ছে। বিকেল বেলার সোনালী রোদ তার মুখে পড়ে তাকে আরও উজ্জ্বল সুন্দর করে তুলেছে। নতুন রকমের জর্জ্জেটের সাড়ীটাতে অলকাকে কি সুন্দর মানিয়েছে! বিজয় ভাবল।

আমার স্বরূপকে চিনে নাও—আমি নিজে কারও কাছে ধরা দিই না—আমাকে খুঁজে নিতে হবে।"

নিষ্ঠুর দেবতা আজ আমাকে পরিহার করে চলে গেছে—ওই অসীমের মাঝে তাকে চিনে নেবার শক্তি আমার কই—আমি যে আমার দেবতাকে শুধু আমার মধ্যেই চাই। তাই আজ এই ব্যর্থতার হাহাকার—বুকফাটা ক্রন্দন, "শূণ্য মন্দির মোর"

—"কি বল্লে বিজয় ?—'Plaza'য় চলেছ চণ্ডীদাস দেখতে ? Chungwah'য় যাবে বিজয়, Chungwahয় ?—…কিং বলছ,—এনগেজমেণ্ট আছে। কেন,—কোথায় ?—না বিজয়, সে হবে না,—আজ তোমার সমস্ত এনগেজমেণ্ট Cancell করতে হ'বে for my sake at least,—কি বল্লে—, রাজি ?"—তবে চলে এস আর দেরী নয়। আজ সন্ধ্যাটা ময়দানে কাটাব আমরা—কি বল ? অলকা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলল :—"উঠে পড় বিজয় চট করে।"—

বিজয় গিয়ে অলকার পাশে বসল। অলকার উষ্ণ সান্নিধ্য বিজয়কে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত করে ফেললে। অলকা তার খুব কাছে—এত কাছে যে তার কাঁধ বিজয়ের কাঁধে ঠেকছে গাড়ীর দোলানিতে। 'আচ্ছা,—অলকা কি সেণ্ট মাখে !'—গন্ধটা তাকে কি রকম যেন অভিভূত করে ফেলেছে। বিজয়ের ভীষণ ইচ্ছে করে ঐ সেণ্টটা ব্যবহার করতে। ভারি সুন্দর মেয়েলি গন্ধ কিন্তু !

"আচ্ছা অলকা !—তুমি, ইয়ে—তুমি কি সেণ্ট ব্যবহার কর অলকা ? ভারি সুন্দর গন্ধটা।"—বিজয় জিজ্ঞেস করে খুব আস্তে—খুব মৃদু ভাবে।

অলকা হাসে—"কেন জিজ্ঞেস ক'রছ বিজয় ? তা,—হাঁা জিজ্ঞেস করাটা তোমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয় মোটেও। কেন বিজয়,—আমার বন্ধুরা বলে প্রসাধন সম্বন্ধে আমার বেশ জ্ঞান আছে। আমি Evening in Paris ব্যবহার করি বিজয় সুগন্ধি হিসেবে, আর Icilmaটা ব্যবহার করি মুখের জন্য। কেন বিজয়, আমার আশে পাশের গন্ধ তোমার ভাল লাগে না ? বেশ একটা Atmosphere গড়ে তোলে, নয় ?"—

"হাঁ,—সত্যি !—বেশ সুন্দর"—বিজয় বলে।

—গাড়ী হু-হু করে ছুটে চলেছে। অলকার শ্যাম্পু করা সুগন্ধি চুল কয়েকটা এসে বিজয়ের মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বিজয় বিহ্বল হয়ে পড়ে। গন্ধ মানুষকে এতখানি চঞ্চল করে তুলতে পারে ! অলকার গায়ের গন্ধ। 'Icilma—Evening in Paris'—বেশ ; বিজয় ভাবে। স্পীডে'এর মাথায় ময়দানের দিকে বাঁক ঘুরতে—বিজয়, টাল সামলাতে না পেরে একেবারে অলকার কোলে গিয়ে পড়ে। সে যেন অসহায় হয়ে পড়েছে—এক সেকেণ্ড সে চুপ করে পড়ে থাকে। অলকা—অলকার কাপড়—অলকার Icilma—তাকে পাগলের মত করে তোলে। বিজয় সামলে নিয়ে ঠিক হয়ে বসে।

"বড্ড absent minded তুমি বিজয়।" —অলকা হাসে।

বিজয় তার লম্বা চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে কি রকম মেয়েলি

ধরণে বেঁকে বসে চায় অলকার দিকে,—তার বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস নেবে আসে।

ছোট গাড়ীখানা একটা গাছ তলায় রেখে দিয়ে—অলকা বলে, "চল বিজয়, একটু ঘুরে আসা যাক। বেশ হাওয়া বইছে কিন্তু।"

—সমস্ত ময়দানে সন্ধ্যার অন্ধকার আসছে নেমে। এখানে সেখানে টুকরো-টুকরো আলো-অন্ধকার। কিছু দূরে,—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালএর চূড়াতে দিনান্তের আলো এসে পড়েছে, নীচেটা আলোয় আঁধারে আবছা। সমস্ত মিলে কেমন যেন স্বপ্নময় অবাস্তব একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুলেছে। ঐ দিকের ঐ বেঞ্চিটাতে বসে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণ তার তরুণী নায়িকার কাছে প্রেম নিবেদন করছে খুব মৃদুস্বরে। তাঁদের দুজনকে মনে হচ্ছে যেন ফ্রেমে বাঁধানো একখানা সুন্দর 'সিলুয়েট্' ফটো। গঙ্গার বুকে দূরগামী জাহাজগুলো মাঝে মাঝে 'ভোঁ' দিয়ে সুদূর সাগর পারের যাত্রীদের ডাকছে।

—"চলো বিজয় ঐ বেঞ্চটাতে বসি", অলকা বিজয়ের হাত ধরে টানলো। বিজয় চমকে উঠলো। তার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুত খেলে গেল। কি নরম! কি নরম অলকার হাতের পরশ। বিজয় যেন আর নিজেতে নেই। আচ্ছন্নের মত সে বলল—"চলো"—

দুজনে পাশাপাশি তারা বসলো। অলকা নানা রকম কথা বলে চললো,—স্পেনের বর্ত্তমান গৃহবিবাদ থেকে আরম্ভ ক'রে বার্লিনে XIth Olympiad'এ ভারতের সব দিক দিয়ে অসাফল্যের কারণ। বিজয়ের কিন্তু এ সব ভাল লাগে না। সে চায় একটু দীর্ঘশ্বাস, একটু উচ্ছ্বাস—একটা কাতর চাউনি। আজ সে অলকার দিক থেকে এতগুলো ইঙ্গিত পেয়েছে! অন্য ছেলে হলে এতক্ষণে 'প্রোপোজ' করে ফেলতে নিশ্চয়। আর সে?—সে এত সব সুবিধা হাতের কাছে পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারল না! না, পৃথিবীতে তার কোনও মূল্য নেই নারীর কাছে,—সে একটা অপদার্থ,—একটা fool!—বিজয় মরিয়া হয়ে উঠলো।...

"অলকা, —অলকা!"—বিজয় খুব গভীর ভাবে ডাক্‌লো। "কেন বিজয়,—কেন?"—অলকা আরও ঘেসে বিজয়ের কাছে গিয়ে বসলো।

নাঃ!—বিজয়ের মাথার ভেতর সব ওলোট পালোট হয়ে গেছে। তার সমস্ত প্ল্যান মাটী হয়ে গেল। কিছুতেই তার মুখ ফুটে ঠিক কথাটা বেরুলো না। আমতা আমতা করে সে বলল—"না, কাল হয়ে তোমার জন্মদিন,—নয়? আজ কলেজে তুমি বলছিলে যেন।"—

"Right you are!—আমি যে ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে। কাল একটা পার্টি দিচ্ছি বিজয়। তুমি নিশ্চয় যাবে কিন্তু সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায়। নিশ্চয় যেয়ো কিন্তু you pretty boy!"—

—তিন—

ভোর বেলায় (মানে বেলা আটটায়), বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিজয় ভাবছিল আর খানিকটা ঘুমিয়ে নেবে কিনা, এমন সময় বেয়ারাটা এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল—একখানা খাম। ওপরে মেয়েলি হাতের লেখা দেখে বিজয়ের কৌতূহল হল। বিছানায় বসেই সে চিঠিখানা খুলে ফেলল। চিঠি লিখেছে অলকা জন্মদিনে বিজয়কে খাবার অনুরোধ করে।

প্রিয় বিজয়,

আমার জন্মদিন আজ। সন্ধ্যেয় আসবে নিশ্চয়। তুমি না এলে আমার উৎসব অপূর্ণ থেকে যাবে।

তোমারই

"অলকা"

চিঠিখানা পড়ে বিজয়ের বুকটা ধবক করে উঠল। সত্যিই কি—সত্যিই কি তবে!—কি স্পষ্ট ইঙ্গিত! অলকা যেন বিজয়ের কাছে নতুন আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সে তারই—সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে তারই। এতে আর কোনও ভুল নেই।

ড্রইং-রুমে লনের দিকে জানলাটায় দাঁড়িয়ে অলকা তন্ময় হয়ে সূর্য্যাস্তের রঙীন

আলোর খেলা দেখছিল। উৎসবের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। সমস্ত দিন খাটবার পর এই সবে মাত্র অলকা অবসর পেয়েছে। এখনও অভ্যাগতরা কেউ এসে পৌঁছয় নি।

—বিজয় এসে দাঁড়ালো ড্রইং-রুমে। সে একটু আগেই এসে পড়েছে যদিও। আজ সে কলেজ যায় নি। সমস্ত দিন ধরে এই সময়টির জন্য অপেক্ষা করেছে। একটু শীগগির এসে পড়েছে,—তাতে এমন কিছু দোষ হয় নি। বিজয় গিয়ে অলকার পেছনে দাঁড়ালো। অলকা কিন্তু বিজয়ের আসাটা টের পায় নি;—সে তখনও একই ভাবে তাকিয়েছিল বাইরের দিকে তন্ময় হ'য়ে।

বিজয়ের মনে হ'ল সৌন্দর্য্যের রাণী তার সামনে দাঁড়িয়ে। এত সুন্দর অলকা—এত সুন্দর! দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাই বা কি চমৎকার;—সমস্ত শরীরটা দিয়ে যেন একটা গতির হিল্লোল ব'য়ে যাচ্ছে। জানলার ফাঁকে ফাঁকে রঙ্গীন আকাশকে Background এ ফেলে অলকার গভীর নীল রঙের সাড়ীটা কি সুন্দর ফুটে উঠেছে!—বিজয়ের মনে হ'ল unique।—

"অলক—অলকা!!"—বিজয় অলকার কাঁধের উপর একটা হাত রাখল।—চমকে পেছনে ফিরে অলকা খুসীতে ঝলমলিয়ে উঠল।

—"সে কি বিজয়,—তুমি!—এত তাড়াতাড়ি? তোমায় আমি,—তা ব'সো। এক কাপ কফি খাবে বিজয়?—তুমি সিগার খাও বিজয় না সিগারেট খাও?"—

বিজয় জোর করে নিজের মন স্থির করে ফেলল। আজকে আর বাজে কথা নয়। পরাজয় সে আজ কিছুতেই স্বীকার করবে না হাজার হোক অলকা মেয়ে মানুষ। ইচ্ছে থাকলেও মুখ ফুটে সে 'প্রোপোজ' করতে পারবে না নিশ্চয়। সে পুরুষ,—তারই'ত উচিৎ এগিয়ে যাওয়া।

—"না অলকা, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। এখন আমার কিছুই লাগবে না। ও সবের চেয়ে তোমার সঙ্গে এই সময়টুকু গল্প করলে আমার ভাল লাগবে বেশী। কিন্তু ইয়ে,—অলকা তোমাকে আজ কি সুন্দর দেখাচ্ছে! —বিজয় বলল।

"কেন বিজয়, অন্য দিন আমাকে সুন্দর দেখ না নাকি!—আমাকে সুন্দর দেখছ, না আমার পোষাক প্রসাধনকে সুন্দর দেখছ বিজয়?"—অলকা হাসল, সেই সেই রকম হাসি।

"—না, না অলকা, তুমি আমায় অতটা নীচ ভেবো না। তুমি সব সময়েই আমার চোখে কত সুন্দর অলকা, তা কি তুমি জান না?"—

"জানি—জানি বিজয়, খুব জানি। কিন্তু এখন, মানে বর্ত্তমানে কি করা যায় বলত বিজয়।"

—"অলকা, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে"—

"কি কথা বিজয়?"—অলকা জিজ্ঞাসা করে।

—"অলকা,—অলকা তুমি কি জান না আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি?—জান না তুমি অলকা, তোমাকে একদিন না দেখতে পেলে আমার অন্তর কেঁদে ওঠে! —তোমার জন্য আমি সব ছাড়তে পারি অলকা,—ভাই—বন্ধু—মান—সম্মান সমস্ত। অলকা বল তুমি,—বল তুমি আমাকে নিরাশ করবে না!!"—বিজয়ের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। তার সমস্ত শরীর আবেগে থর থর করে কাঁপছে।

—এদিকে অলকাকে যেন ভূতে পেয়েছে। সে হঠাৎ ভীষণ হাসতে আরম্ভ করেছে;—হাসতে হাসতে সে প্রায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়বে। হাসতে হাসতে চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে,—চোখেতে জল এসে পড়েছে।

—"বিজয়—বিজয়! তুমি এতখানি অভিনয় করতে পার? সত্যি আমি তোমাকে, —অলকা আবার খিল খিল করে হেসে ওঠে। "বিজয় তুমি কি বলছ? তুমি আমায় বিয়ে করবে? কিন্তু তা কি করে হবে বিজয়;—তোমাকে বন্ধু ভাবে পেতে খুবই ইচ্ছে করে সত্যি"। বিজয় তুমি হুবহু মেয়েদের মত,—মেয়েলি ভাব তোমাতে আছে যথেষ্ট। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করব কি করে বিজয়। তুমি নিজেকেই সামলাবে না আমাকে সামলাবে? না বিজয় তার চেয়ে তুমি যদি আমাকে বলতে অলকা! তুমি 'পোষ্ট গ্রাজুয়েটের' ঐ তটিনী দত্তকে বিয়ে কর, তবে তাও ছিল ভাল। তটিনী দত্ত গায়ে শক্তি রাখে বেশ। ছোরা খেলা লাঠি খেলায়ও ওর হাত খুব ভাল। তোমার মত দু'চারজন ছেলেকে -রাগ কোরোনা বিজয়,—ও জুজুৎসু মেরে কাৎ করতে পারে আমি বাজি রেখে বলতে পারি। তারপর বিজয়,—জান না তুমি যে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে অশোক সান্ন্যালের সঙ্গে?—সেই যে বিলেত গিয়েছিল Dairy farming শিখতে—সান্ন্যাল। তুমি তাকে নিশ্চয় জানো! আজকে তারও এখেনে আসবার কথা আছে।—এই যে,—বলতে বলতেই সশরীরে হাজির। এই যে অশোক, ইনি আমার বন্ধু বিজয় মুখার্জ্জি;—এস তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। আর বিজয়, এ-ই আমাদের কি বলে, ইয়ে সান্ন্যাল অশোক সান্ন্যাল।"——

—পরদিন হিষ্ট্রী ক্লাশে বিজয় লেকচার ফলো করেছিল ভাল ভাবেই—

অপরাধী

শ্রীচিত্তরঞ্জন পাণ্ডা

উপমা চোখে মুখে আঁধার দেখল। কি করে সে স্বামীকে বাঁচাবে? আজ কয়দিন ধরে তাঁর জ্বর। কিছুতেই উপশম হচ্ছেনা। উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ডাক্তারও আসেনা। কেনই বা আসবে? সে যে তাদের উপযুক্ত দর্শনি দিতে পারেনা। স্বামী সজলের জন্য সে নিরাভরণা—রিক্তা সেজেছে। ঘরে যে আর একটি কাণা কড়িও নেই।......

খাট থেকে সজল ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল—উপমা।

উপমা গিয়ে খাটের উপর সজলের পাশে বসল। উপমার একখানা হাত হাতে নিয়ে বুকের উপর রেখে সজল বলল; তোমাকে অনুপমা বলে ডাকব উপমা।

আবার সে সাধ কেন?

তোমার যে আর জোড়া নেই।

ওঃ, সে কথা।

এত দুঃখের দিনেও উপমার ঠোঁটের প্রান্তে হাসি দেখা দিলে। সজল এবার উঠবার চেষ্টা করে বলল: আমার তুলি রঙ নিয়ে এস।

সে কি? এই অসুখ শরীরে—?

তোমার ছবিখানা যে এখনো শেষ করতে পারিনি।

নাই বা হোল। সেরে উঠে করলেও তো চলবে।

যদি অসম্পূর্ণ রেখে যেতে হয়।

: তোমার যত সব অলুক্ষণে কথা।

ক্ষীণ বিবর্ণ হাসির সঙ্গে সজল বলল—মিছে আশা করছ উপা। দিন যে ফুরিয়ে এল। ওপারের ডাক আমি শুনতে পাচ্ছি। আমায় যেতে হবে সবাইকে যেমন যেতে হয়। তবে যাবার আগে এই দুঃখ রইল যে সারাটি জীবন আমার মতো অনুপযুক্ত স্বামীর হাতে পড়ে···।

উপমা সজলের মুখে হাত দিয়ে বললে: থাক থাক—তুমি আর অমন বাজে বকোনা। লক্ষ্মীটি, এখন একটু ঘুমোও।

উপমা ধীরে সজলের মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে দিতে লাগল।

পাখীর পালকের মতো নরম আঙুলের স্পর্শে সজলের তন্দ্রা এলো।

রাত গভীর। চারিদিকের মৌন স্তব্ধতার মাঝে দু'একটা রাতজাগা পাখীর কিচমিচ গান—ঘুমভাঙা পাখীর পাখা-ঝাপটানির শব্দ। রুগ্ন-স্বামীর শিয়রে বসে উপমা! কতো বিনিদ্র রজনী এমন করে কেটেছে তার ইয়ত্তা নেই।···

স্মৃতি :—জীবন-খাতার পুরানো পাতা-গুলো তার চোখের সামনে মেলে ধরে। সজল—তরুণ শিল্পী। সজল ছিল তার দিদির দেওর। তাদের বাসায় আসতো। উপমাকে দিত তার নিজের হাতে আঁকা ছবি। উপমার চোখে মুখে খুসির তরল হাসি ফুটে উঠতো বলতো:

—সজল দা, তুমি কি আমার ছবি ছাড়া অন্য ছবি আঁকতে পারনা?

—আগে পারতুম এখন আর তা হয়তো পারিনা।

—মানে?

—কবিদের মতো আমাদের একটা idea আছে—যাকে আমরা তুলির টানে রূপ দিই। তোমার মুখ চোখ আমার আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখনকার প্রতি ছবিতে তোমার চেহারা ফুটে ওঠে।

—ওঃ তাই বুঝি? আমি তোমার Ideal নাকি?

—যদি তাই হয় ক্ষতি কি? যাকে ভালোবাসি তাকে সহজে রূপরেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারি।

উপমা লজ্জায় লাল হ: অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলে সজল তার হাত ধরে বলল—কিছু মনে কোরোনা উপমা। তোমাকে পাবার আশা করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় নয়। আমি যে তোমাকে ভালবাসি।

উপমার গালে রং দেখা দিলে বললে:

—হাত ছাড়, এক্ষুণি মা এসে পড়বেন।

—যদি না ছাড়ি—এই বলে সজল তার কোমল হাতের পিঠে একটা চুমু একে দিলে। উপমা বুকে পুলকশিহরণ অনুভব করল।

সজল বলল—ছাড়তে পারি যদি আমার কথার জবাব দাও।

—আঃ, ওরা দেখলে বোলবে কি?

—তুমি জবাব দিলেই তো হয়ে যায়।

—কী?

—তুমি আমায় ভালোবাস?

—বাসি। এই বলে উপমা অন্য ঘরে চলে গেল। তার বুকের ভিতর একটা নূতন অনু ভূতির আলোড়ন সুরু হয়েছে। বিছানায় শুয়ে সে সজলকে মনে করতে লাগল। কেমন সুন্দর সুচেহারা! তাঁর চুমোর দাগটি যেন তার অন্তর ছুঁয়েছে। শুয়ে শুয়ে সজলকে ভাবতে লাগল।

আর সজল Studioতে গিয়ে শুধু উপমার ছবি আঁকতে লাগলো। লোকে তাকে পাগল বলে ডাকে। হ্যাঁ, শিল্পীরা কবিরা. প্রেমিকেরা এমনি পাগলই বটে।

তাদের ভালোবাসার কথা উপমার বাবার কানে গেল। তিনি রাগে রোষে বললেন এসব বিশ্রী অভিনয় আমার এখানে চলবে না। এক ঘরে আমি দুটো মেয়ে কিছুতেই দিতে পারি না। তিনি অন্য জায়গায় বিয়ের ঠিক করে আসলেন।

উপমার এত কান্নাকাটি তার মা'র সাধ্যসাধনা সব ব্যর্থ হোল। উপমা শেষে বিদ্রোহ জানালে। তার বাবার মুখের উপর বলল—সজলদাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে কোরব না।

তাঁরা তার কথায় কাণ দিলে না।......

উপমা উপায়ন্তর না দেখে গায়ে হলুদের দিন গভীর নিশীথে সজলের বাসায় গিয়ে হাজির হোল। সজল তাকে দেখে অবাক হয়ে বলল—উপমা !!

—হ্যাঁ আমি।

—সে কি! তোমার মুখ অমন শুকিয়ে গেছে কেন?

উপমা কিছু না বলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সজল চঞ্চল হয়ে বলল—উপমা, কি হয়েছে আমায় খুলে বল। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।

উপমা এবার সজলের মুখের পানে তাকালে। তার চোখের কোণে জল। রুদ্ধকণ্ঠে বলল—সজলদা! চল এখান থেকে আমরা চলে যাই।

—কেন?

—বাবা আমার বিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু আমি যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে কোরব না। আমাকে বাঁচাও সজলদা।

তার দু'কপাল বেয়ে ধারা নামতে লাগল।

সজলের বুক দুলে উঠল বলল—আমার জন্য তুমি তোমার মা-বাবা আত্মীয়স্বজন সবাইকে ত্যাগ করবে?

—হ্যাঁ সবাইকে—তাদের চেয়ে তোমার ভালবাসা আমার কাছে বড়ো। তোমার পাশে আমার স্থান দাও—আমায় অনাদর করো না। সইতে পারবো না।

সজল উপমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে—তবে তাই হোক্। সেদিন হাত-ধরাধরি করে দুজনে এক নূতন দেশের যাত্রী হোলো। আকাশের গায়ের অসংখ্য তারা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

কলিকাতার এক প্রান্তে তারা সুখের ঘর বেঁধেছে। সজল ছবি আঁকে—আর উপমা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তুলি এগিয়ে দেয়। দিন তাদের চলে কোন রকমে। উভয়ে উভয়ের পাশে রয়েছে এই তাদের যথেষ্ট। এর বেশী কিছু তারা চায় না। মা-বাবার কথা উপমার মনে পড়ে। কিন্তু সজলের সীমাহীন ভালোবাসায় আবার ভুলে যায়। কিন্তু সেই সজলকে যে সে হারাতে বসেছে। বিধাতার রাজ্যে এ অবিচার কেন? বিধাতার চেয়ে মানুষের অবিচার, নির্দ্দয়তা তার প্রাণে বেশী বাজে। গরীব বলে কেউ যে তাদের দিকে মুখ তুলে চায় না। কারুও দয়া সহানুভূতি পায় না। ভাবতে ভাবতে রাত কেটে যায়। রাস্তায় লোক-চলাচল সুরু হবার পূর্ব্বেই উপমা এক ডাক্তারের বাসায় গিয়ে হাজির হোল।

কানন রায়। নূতন পাশ-করা ডাক্তার। এখনো তেমন পসার ক'রে উঠতে পারেনি। উপমা ভাবলে হয়তো visitএর টাকা কম দিয়ে পারবে।

সকালে একটি স্ত্রীলোক দেখে ডাক্তারের কৌতূহল হোল। লালপেড়ে-সাড়ী সাধারণভাবে পরা। গায়ে একটা আধ-ময়লা সেমিজ। সিঁথিতে সিঁদুর। নিশ্চয় কোন ভদ্রঘরের গৃহিণী হ'বে। কিন্তু সঙ্গে কেউ নেই কেন? কুতূহলী হয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা কর'ল—আপনি কি চান?

—আমার স্বামীর অসুখ—যদি দয়া করে একবার—

—বেশ—বেশ—চলুন।

উপমা ডাক্তার নিয়ে আসল। ডাক্তার রোগী দেখে বললে—ভালো Treatment দরকার। আমি গিয়েই ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আঁচলের খুঁট থেকে একটি টাকা খুলে উপমা মিনতি-করুণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চাইলে। ঐ চাহনিতে তাদের রিক্ততায় বেদনার আভাস। কিন্তু ঐ দৃষ্টির চেয়ে তার অনাবৃত শুভ্র সুগোল পেলব হাতের কমনীয়তা ডাক্তারের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করল। উপমার অনুপম রূপ আর অতুলন দেহের লাবণ্য তার অন্তর স্পর্শ করল। বলল:—আপনার কাছ থেকে visitএর টাকা নাই বা পেলাম।

—তা' কি করে হয়?

—কেন হবেনা? আমি না নিলেইতো হয়ে যায়—এই বলে উপমার মুখের উপর একটা চঞ্চল আবিল দৃষ্টির ছায়া ফেলে ডাক্তার চলে গেল।···

ডাক্তারের ঐ নগ্ন চাহনিতে যেন উপমার নারীত্ব আহত হোল। ডাক্তারের এ অযাচিত অনুগ্রহে সে পীড়া পেল। এ কি সহৃদয়তা না এর অন্তরালে হয়তো—হয়তো কেন, গোপন উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে।···

সজলের কাৎরানি আরম্ভ হোল। উপমা স্বামীর কাছে গেল। উপমার হাতটা বুকে চেপে ধরে সজল বলল—আমার বুকের বেদনার উপশম হয় এমন কোন ওষুধ দিতে পারেনা তোমার ডাক্তার?

—অমন অস্থির হয়ো না। এক্ষুণি ওষুধ নিয়ে আসবে। এ ওষুধে নিশ্চয় সেরে যাবে।

ঔষধ নিয়ে এল ডাক্তারের চাকর। ঔষধ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেদনার উপশম হোল। সজলের ঘুম এলো। ঔষধের অভাবনীয় ক্রিয়া দেখে উপমা বিস্মিত হোল। ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার দেহ মন আনত হয়ে এলো।

পরদিন।

ডাক্তার বললে—সঙ্কট মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তবু নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। উপমা মুখ তুলে ডাক্তারের দিকে চাইল। তার চক্ষুতে কৃতজ্ঞতার অনন্ত মূক—শুদ্ধ ভাব। ডাক্তারও তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তারের দৃষ্টিতে প্রতিদান বিনিময় পাওয়ার ইঙ্গিত যেন স্পষ্ট রয়েছে।

উপমা বিচলিত হোয়ে বলল:—ডাক্তার বাবু আমাদের মতো গরীবের জন্ম আপনি আর এতো কষ্ট করবেন্ না। ঔষধ আমি নিজে গিয়েই নিয়ে আসবো।

—গরীব আপনি নন্। আপনার যে সম্পদ আছে তার মূল্য হয় না।

একটা চাবুকের আঘাত উপমার মর্ম্মে গিয়ে বাজলো যেন। তার ধৈর্য্যের সুযোগ নিয়ে এ ব্যঙ্গ। তার নারীত্ব সজাগ হয়ে মাথা তুললো। ইচ্ছা হোল ডাক্তারকে প্রত্যাঘাত করে। কিন্তু পারল না। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—স্বামীই আমার একমাত্র সম্পদ ওকে ভালো করে দিন। আমরা দু'জনে আপনার কাছে চিরজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।

—স্বামীর জীবন আপনি পাবেন। সে ভার আমার। কিন্তু তার বিনিময়ে···

—বিনিময়ে!! বিনিময়ে আপনি কি চান?

—শুধু ক্ষণিকের স্পর্শ—।

উপমা শিউরে উঠল। তার শরীরের রক্ত যেন জমাট বেঁধে যাচ্ছে। তার কতোক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হোল না। সর্ব্বাঙ্গে একটা বিজাতীয় ঘৃণা লিক্ লিক্ করছিল। একি মানুষ—না পশু? দৃঢ়কণ্ঠে কম্পিত ওষ্ঠধর চেপে উপমা বলল—আপনার অনুগ্রহ আমরা চাই না।···আমার স্বামী মরে তো মরুক, তবু···উঃ ভগবান! সে মাটীতে বসে পড়লো।

দ্বিধাজড়িতকণ্ঠে ডাক্তার বললে—আমার উদ্দেশ্য এখন আপনার সুপরিজ্ঞাত। আমি চলুম। আর হয়তো আসবো না।—যদি—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে ডাক্তার চলে গেল। আর উপমা রুগ্নস্বামীর পায়ের কাছে শুয়ে শয্যাতল সিক্ত করতে লাগল।···

আশার শেষ ক্ষীণ আলোটুকু নিবলো। ডাক্তার হয়তো আর আসবেন্ না। কিন্তু তার স্বামী—বিনা চিকিৎসায় তার স্বামী মরবে—এ যে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। হঠাৎ তার মনে পড়লো হাসপাতাল। গরীবের জন্ম তো হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু সেখানের Nurse-sistorরা কি তার মত যত্ন নেবে?

সেখানে যে দয়া দরদের অভাবের কথা সে শুনেছে! তাদের সেই অনুভূতিহীন সেবার চেয়ে এখানেই ভালো। প্রতিবেশিনী এক প্রৌঢ়া এসে বললেন—হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও মা। এমন করে বিনা ওষুধে এখানে রাখলে কি হবে?

উপমা শুধু তাঁর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো। তাঁরা কি কেউ তার অন্তরের ব্যথা বুঝবে? স্বামীকে ছাড়া যে সে একদিনও থাকতে পারবে না। মার কাছে অনেকদিন পরে সে চিঠি লিখলো।

মাগো,

আজ বড়ো বিপদে পড়ে তোমায় লিখছি। স্বামী মৃত্যুশয্যায়। আমরা অসহায় কপর্দ্দকহীন। ঔষধ পথ্যের খরচ জুটছে না। বিনা ঔষধে তিনি মারা যাবেন—এ দুঃখ রাখবার যে ঠাঁই থাকবে না। আমায় ক্ষমা করে দয়া করো।

তোমার স্নেহবঞ্চিতা উপমা।

চিঠির জবাব মিলল বাবার কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন—তুমি আমাদের বংশের কলঙ্ক। শুধু তোমার জন্য আমাদের মুখ ছোট হয়েছে। আমাদের কাছে কোন কিছুর প্রত্যাশা করো না।

রামেন্দ্রনাথ

চিঠির প্রতিটা অক্ষরে যেন রোষের তপ্ত-আগুন—যার দাহন অসহন তীব্র। উপমা মাথা ঘুরিয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। সংজ্ঞা ফিরে এলে দেখলো তার স্বামী অসহনীয় বেদনায় ছট্ ফট্ করছে—উৎকট যন্ত্রণায় সজলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। গোঙানি-কোৎরানিও যেন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছিল। শক্তি দুর্ব্বল ক্ষীণ, মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সংগ্রাম। উপমা অস্থির হয়ে স্বামীর বুকের উপর কেঁদে বলল—ওগো—ওগো তুমি অমন করো না। আমার যে আর কেউ নেই।

অতি কষ্টে সজল বলল ইঙ্গিতে—ডাক্তারের সেই ওষুধটি? উপমা বুঝতে পারল। কিন্তু সে নিরুপায়। ডাক্তারকে যে সে আসতে বারণ করে দিয়েছে। উপমা শুধু ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।... ..

ডাক্তার বাসায় ফিরে এসে ভাবতে লাগল উপমার রূপ আর যৌবন। মেয়েরা তার কাছে ভোগের সামগ্রী। এ পর্য্যন্ত কতো মেয়ের সর্ব্বনাশ সে করেছে। তার কুৎসিত কামনার ইন্ধনে কতো নারী তাদের ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়েছে। কিন্তু আজ উপমার কাছে সে হার মেনে গেল। উপমার অকলঙ্ক চরিত্রের দৃঢ়তার কাছে তার কলুষিত মনের দুর্ব্বলতা যেন মাথা নত করে ফিরে এলো।

—আপনি?

ডাক্তার উপমাকে তার সামনে দেখে বিস্মিত হোল।

—হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার।

ডাক্তার যেন তবু তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। উপমা তেমনি সহজ কণ্ঠে বলল—ডাক্তারবাবু, আমার স্বামীর প্রাণ দান করুন। সেজন্য আমি আমার জীবন যৌবন আমার সব দিতে প্রস্তুত।

উপমার মুখে একটা অলৌকিক আভা।

—আমায় অবিশ্বাস করবেন্ না—আমি কোনদিন মিথ্যা বলিনি।

ডাক্তার কোন কিছু না বলে উপমার সঙ্গে বের হয়ে গেল।

ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া—এ যেন দৈব-শক্তি। ঔষধের চেয়ে ডাক্তারের সেবাশুশ্রূষায় সজল প্রাণ ফিরে পেল। এ কয়দিন অধিকরাত্র পর্য্যন্ত ডাক্তার সজলের কাছে থাকত। উপমা জানত—ভালো করে জানত. ডাক্তারের এই অতি আদরের কারণ।...

সজল সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠেছে। তার সেই অর্দ্ধসমাপ্ত উপমার ছবিখানা নিয়ে অতৃপ্ত নয়নে ছবির দিকে চেয়ে আছে। কেমন নিখুঁত ছবি! কিছুই যেন বাদ পড়েনি। নিজের নৈপুণ্য দেখাবার জন্য সজল উপমাকে ডাকল। উপমার কোন সাড়া পেলে না। ভাবল হয়তো কারো বাসায় বেড়াতে গেছে। আবার ছবিতে মনোযোগ দিলে। ছবিটাকে সে জীবন্ত

করে তুলতে চায়।

উপমা ডাক্তারের বাসায় গিয়ে ডাক্তারকে বলল—ডাক্তার; ডাক্তার! আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে এসেছি।

—সে কি!

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি যে দেরী করতে পারছি না। স্বামী আমাকে খুজে হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বে। তাতে তার রোগ যে আরো বাড়বে।

ডাক্তার পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। সে শুধু অবাক হয়ে উপমার মুখের পানে চেয়ে রইল। নিজের নারীত্বের বিনিময়ে স্বামীর জীবন! তার উপায়হীনতার সুযোগ নিয়ে তার নারীত্বের অবমাননা। ডাক্তারের মনে বিবেক এলো। মন এক নূতন সম্পদে ভরে উঠলো। অনুতাপ অনুশোচনাভরাকণ্ঠে সে বলল—আপনি আপনার স্বামীর কাছে ফিরে যান্।

—এখন আর ব্যঙ্গ করে কী লাভ? আমায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ থেকে নিস্কৃতি দিন্।

তার স্বর যেন কাঁপছিল। ডাক্তার বললে—প্রতিশ্রুতি পালন আপনার হয়েছে। আমি শুধু আপনাকে দেখতে চেয়েছিলুম। আমার সে সাধ মিটেছে। আপনি ফিরে যান।

উপমা বের হয়ে গেল। তার প্রতি পদক্ষেপ অসংযত। যাবার সময় কি একটা জিনিষ তার সেমিজ থেকে পড়ে যায়। সে তা' সন্তর্পণে তুলে বুকের মধ্যে রাখল। ডাক্তারের দৃষ্টি এড়ালো না। সে বিহ্বল হয়ে তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তেমনি চেয়ে রইল। তার ভিতরে যেন সে এক নূতন উন্মেষ অনুভব করল।

খানিক বাদে সজল এসে হাজির। বলল—ডাক্তার, আমার স্ত্রীকে বাঁচান্।

আমার দেশ

শ্রীসন্তু সেন্ গুপ্ত

আকাশ ভেদী পাহাড় যেথা
উচে তুলে শির,
দাঁড়িয়ে আছে আর্য্য ভূমে
পূজ্য পৃথিবীর।
কবি যারে কাব্য মালা
আদর করে দেয়,
জগৎ যেথায় ধূলির কণা
মাথায় তুলে নেয়;
দূর বিদেশের পাগল ছেলে
দেখতে যারে আসে
শিল্পী যারে প্রাণের চেয়ে
অধিক ভালবাসে;
ভারত বলে খ্যাত যে দেশ
যুগ যুগান্ত ধরে,
সেই দেশটা দাঁড়িয়ে আছে
জগৎ উজল করে।
গ্রীষ্ম যেথায় রুদ্র মূর্ত্তি
কঠোর হয়ে ভাসে,
দস্যি ছেলে বর্ষা যেথা
পাগল হয়ে আসে।
(যার) শরৎ কালের মূর্ত্তি দেখে
জগৎ ভোলে খেলা
হেমন্ত যার বুকের পরে
কাটায় সারা বেলা।
শীত কালে যার ঠাণ্ডা হাওয়া
বুকের পরে লাগে,
বসন্ত যার বুকের পরে
পাখীর গানে জাগে।
সোনায় ভরা দেশটা সে যে
কবির মায়াপুরী,
(সেথা) আঁচল খানি পেতে বসে
স্বপন যাদুকরী।
ছয়টা ঋতু যার বুকেতে
আদর করে থাকে
হাসি কান্নায় পূর্ণ আছে
(তার) প্রতি শাখে শাখে।
ভোরের বেলা যাদের ঘোরে
তপন-তরী ভাসে,
বছর পরে যাদের কাছে
মায়ের লিপি আসে।
কীর্ত্তি যাদের দেশ-বিদেশে
অবাক হয়ে শোনে,
(সে দেশ) নদী-সাগর সবুজ ধানে
পূর্ণ মাঠে বনে।
(এই) দেশের কথা শুনলে পরে
ভেল্কী মনে করে,
অবাক হয়ে তাদের কথা
শোনে রাত্রি ভোরে।
ওই দেখ সে আঁধার হয়ে
দাঁড়িয়ে আছে আজ,
নুইয়ে মাথা চরণ তলে
পাচ্ছে শুধু লাজ॥

—আপনার স্ত্রী! আপনার স্ত্রীর কি হয়েছে?

—কি জানি। হয়তো এতক্ষণ সে বেঁচে নেই। এই বলে দুহাতে মুখ চেপে কেঁদে উঠল। ডাক্তারের দেহের সমস্ত উত্তাপ যেন নিতে যাচ্ছে। সেই যে এই নারীর হত্যাকারী। তার জন্যে—শুধু তার জন্যে ফুলের মতো পবিত্র একখানি জীবন ধরা থেকে বিদায় নিতে চলেছে। তাড়াতাড়ি একখানি ট্যাক্সি ডেকে দুজনে গিয়ে দেখলে—উপমার সর্ব্বাঙ্গ বিষে কালো হয়ে গেছে। তার বাক-শক্তি রুদ্ধ হয়ে

রাচ্ছিল। সে তখন ওপারের যাত্রী। ডাক্তারের দিকে চেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে সে যেন বলবার চেষ্টা করছিল—আমার স্বামীকে দেখো। তারপর তার ভাষা হারালো চিরতরে। সজল তার বুকের উপর পড়ে আকুল আর্তনাদ করে উঠলো।

—উপমা! উপা!

তার ক্রন্দন উপমার কাণে পৌছল না। তার শিথিল দেহ তেমনি পড়ে রইল। ডাক্তার অন্যদিকে মুখ ফিরায়ে ছিল। অস্ফুটকণ্ঠে সে যেন বলতে চাইছিল—আমি আমিই অপরাধী। এর হত্যাকারী আমি।

একটা বোবা ব্যথায় তার বুকের ভেতরটা যেন জলতে লাগল।...

সজলের পাশে উপমার ছবিখানি পড়ে ছিল ধূলায়। অদূরে তার ঘুমন্ত প্রিয়া—এ জীবনে তার আর ভাষা ফুটবে না।

ছবি আর উপমার দিকে চেয়ে সজল বলে উঠলো—তার মুখের তিলটি যেন বাদ পড়ে গেছে।...

সে তুলি নিয়ে ছবির পাশে বসলো।...

তার অন্তরের কান্না রুদ্ধ হয়ে গেছে।—চোখদুটো কাতরতায় ভরে উঠেছে...।

ডাক্তার সেখানে দাঁড়িয়ে—সজল আর উপমার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো—এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি?

রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ—লেখক শ্রীবিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়। ২২৩ডি চিৎপুর রোড থেকে "নবজীবন সংঘের" পক্ষে ইলা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম ১৲ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে কবি ও প্রবন্ধকার হিসাবে বিজয় বাবুর পরিচয় নতুন নয়, কিন্তু যে সব বিষয় তিনি ব্যক্ত করেন তার মধ্যে দিয়ে নতুনের সুর শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথের "দুই বোন", "মালঞ্চ", "বাঁশরী", "চার অধ্যায়" ও "শেষের কবিতাকে" অবলম্বন করে লেখক রবীন্দ্রনাথের "রিয়ালিজম্"কে তুলে ধরেছেন লোকচক্ষে। ছাত্রজীবনে পড়েছিলাম Resonanceএর বিষয় পদার্থ-বিজ্ঞানে, আজ মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের যে সুর এসেছিল প্রাণ থেকে, লেখক তাকে প্রতিধ্বনিত করেছেন অনুভূতির মধ্যে দিয়ে। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, বিজয় বাবু তারই (কবির) মনের কথাটির সন্ধান পেয়েছেন। ফ্রয়েডএর পদ্ধতি বিশ্লেষণ-মূলক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "মনের জীবন"কে বুঝেছেন শিল্পীর সহজ অনুভূতি দিয়ে। আরম্ভ করলে বইটা শেষ না করে ওঠা যায় না। এত জটিল তত্ত্বের আলোচনা, গল্পের মত স্বচ্ছ ও সহজরূপে মনের সামনে ভেসে ওঠে। লেখক বলেছেন মানুষের মনের কথা, তাই মানুষের মনে তা সাড়া দেবেই দেবে। "নারী যখন দুটি বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে পুরুষের কণ্ঠ, সে বাহুর বাঁধনকে এড়িয়ে যেতে পারে এমন পুরুষ সত্যই দুর্লভ।" আবার "নারীর তুলনায় এই জন্যই পুরুষ শক্তিহীন—দেহের দিক দিয়ে নয় হৃদয়ের দিক দিয়ে।"..."নারীর প্রয়োজন পুরুষকে ভোগের জন্য নয় সৃষ্টির জন্য।"

অকাট্য যুক্তি, মন-মাতানো ভাষা—অস্বীকার করার উপায় নেই। শেষে আছে—"ভালবাসার ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করবার কোন মাপকাটি থাকতে পারেনা। যা একের পক্ষে উচিত, অন্যের পক্ষে অনুচিত। ওখানে বাঁধাধরা নিয়মের রাজত্ব নেই।"

আজ বাংলা দেশ নানাপ্রকার ইজম্ ও ভ্রান্ত ধারণায় ভরে গেছে। সত্যি যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চান, এ বইটা তাদের পড়া দরকার। আধুনিক সমালোচকের দোষ "Misinterpret" করা—বিজয় বাবু দিয়েছেন প্রকৃত সমালোচকের পরিচয়। সমালোচক কে? নিন্দুক যে সে কখনও সমালোচক হ'তে পারে না—দরদী যে সেই করতে পারে সমালোচনা।

বিদ্রোহী কবি বিজয়লালের "বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ" পড়ে পাঠক পাঠিকা নির্মম সত্যকে পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। "রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ" পড়ে আজ সুধী সমাজ বুঝবেন মানুষ রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তি—যে সব ভাব মানুষের মনকে নিয়ত তোলপাড় করে, মনের মণিমঞ্জুষায় আবদ্ধ যে ভাষা ছটফট করে—লেখক তাকেই এনেছেন আলোতে। বিজয়বাবুকে আরও দেখতে চাই।

উপরে : আরতি　　নীচে : রাজকুমারী

উপরে : মলিনা　　নীচে : যমুনা

উপরে : ছায়া নীচে : বিমলাকুমারী

উপরে : মেনকা নীচে : কাননবালা

উপরে: কঙ্কাবতী — নীচে: শীলা হালদার

উপরে: রাণীবালা — নীচে: উমা দেবী

উপরে: শিশুবালা
নীচে: সাবিত্রী

উপরে: মায়া মুখার্জি
নীচে: মিত্তানর্মী

পরে : শান্তি গুপ্তা

নীচে : জ্যোৎস্না গুপ্তা

উপরে : মীরা দত্ত

নীচে : রেণুকা রায়

বীনাপাণি

পদ্মাবতী

ললিতা

সুনন্দা

উপরে : দেববালা

নীচে : চারুবালা

ইন্দিরা দেবী

পেসেন্স কুপার

হিন্দী "দিদি" চিত্রের একটি দৃশ্যে জগদীশ, অমর মল্লিক ও কাপুর। নীতীন বসুর পরিচালনায় ছবিখানা শেষ হ'তে দেরী নেই।
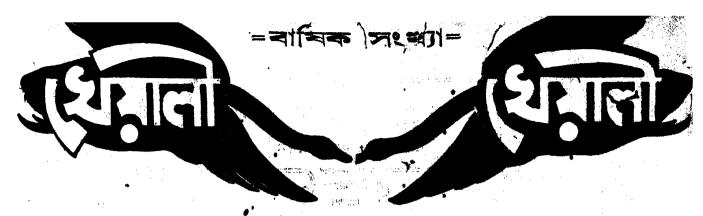
পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজ পেপার্স লিঃ

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষ সংক্রান্ত

ছয় বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু পরিচালিত "ফরোয়ার্ড"-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ও তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত সাংবাদিক দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া যে সমস্ত সাংবাদিকের উদ্ভব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের প্রচেষ্টায় ক্ষণস্ফূর্ত্ত খেয়ালের চরিতার্থে "খেয়ালী"র সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার জন্মদিনের আত্মকথায় নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল যে কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের মাদল বাজাইতে "খেয়ালী" জন্মগ্রহণ করে নাই এবং জাতির অগ্রগতির পথে কণ্টকবিদ্ধ পান্থগণকে কণ্টকমুক্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া যদি নিজেকে কণ্টকাঘাত সহ্য করিতে হয় তাহাতেও "খেয়ালী" কুণ্ঠিত হইবে না। শঠতার আবরণ উন্মুক্ত করিতে, বহুরূপীর স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও বাঙলার কংগ্রেসকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বণিকবৃন্দের অনুগৃহীত ব্যক্তিবর্গের কবল হইতে মুক্ত করিতে "খেয়ালী" বিগত বর্ষে যে সাংবাদিক দুঃসাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছে তাহা বর্ত্তমানে সর্ব্বজনবিদিত। সরকারী মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহরায়ের সহিত বাঙলা কংগ্রেসের ছোট, বড় ও মাঝারী পুচ্ছধারী কর্ত্তাদের যে যোগাযোগ লোকচক্ষুর অন্তরালে বিদ্যমান ছিল "খেয়ালী"র কঠোর লেখনী ঘাতে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে— বাংলার জনসাধারণ জানিতে পারিয়াছেন যে বাঙলা কংগ্রেসের বিধানী দলের গুপ্তদ্বার সরকারী মন্ত্রীর দপ্তরখানার পশ্চাদ্বারের সহিত সংযুক্ত।

আমাদের সাংবাদিক জীবনের শিক্ষাদাতা ও বাঙলার শ্রদ্ধেয় জননেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যখন মিলন মোহে বিভ্রান্ত হইয়া বিধানী দলের সহিত মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইলেন তখন বাঙলার সমগ্র সংবাদপত্রের মধ্যে একমাত্র "খেয়ালী"ই সেই ভূয়া মিলনের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করিয়াছিল এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর তদানীন্তন কার্য্যাবলীর কঠোর সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। সরকারী মন্ত্রীত্বের আশার ছলনে লুব্ধ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁহার অনুচর শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের সহিত আদর্শবাদী মন্ত্রীত্ব-বিরোধী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মিলন যে সম্ভবপর নয় তাহা শরৎচন্দ্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং "খেয়ালী" অপ্রিয় ও কঠোর সত্য বলিলেও বর্ত্তমানে তাহা নির্ম্মম সত্যে পরিণত হইয়াছে। জোড়া-সাঁকোর রাজবাটীর মন্ত্রণা-কক্ষে যে রায়-রুণী প্যাক্টের পরিকল্পনা ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল সেই রায়-রুণী প্যাক্টের জাতীয়তা-বিরোধী ভিত্তির উপর শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের যে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার প্রত্যাশিত ধ্বংসে আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি এবং ইহাতে বাঙলা কংগ্রেসের দলগত দূরদৃষ্টিতায় "খেয়ালী"র অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকট হইয়াছে।

বিগত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের সময় হইতে বিভ্রান্ত শরৎচন্দ্রের বহু আয়াসলব্ধ মিলনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে "খেয়ালী" নির্ভীক একাকিত্বের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। রাহুগ্রাসমুক্ত শরৎচন্দ্রের বর্ত্তমান নিরলস কর্ম্ম-প্রচেষ্টা "খেয়ালী"র অভিযানকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছে। যে মিলনের বিরুদ্ধে বাঙলার সমগ্র সংবাদপত্রের মধ্যে একমাত্র "খেয়ালী" কষাঘাত করিয়াছিল আজ সেই মিলনের ভগ্নস্তূপের উপর "বসুমতী", "আনন্দবাজার" ও "এ্যাডভান্স" অল্পবিস্তরভাবে শরৎচন্দ্রের অনুগামীরূপে আমাদের নীতিই অনুসরণ করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব পার্লি-মেণ্টারী অধিপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া না করিয়া কংগ্রেসের পতাকাকে অবনমিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মেঘমুক্ত শরৎচন্দ্র বর্ত্তমানে "নলিনী-বিজয়ে"র বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করাইয়া যে অদম্য উৎসাহ লইয়া নির্ব্বাচনসমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাহাই আমাদের বিগত বর্ষের অনুসৃত নীতির চরম পুরস্কার বলিয়া মনে করি।

ফৈজপুর ও বাক্যের বুদ্বুদ

শ্রীপ্রমোদ কুমার সেন

ফৈজপুর নামক গ্রামে পঞ্চাশৎ কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হইল। নেতৃবর্গের আনন্দের সীমা নাই যে অধিবেশন একটা অজানা গ্রামে হইলেও পরম সাফল্যলাভ করিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া কিছু টাকা লাভ হইয়াছে। অধিবেশনের কার্য্যও ঘড়ি ধরিয়া হইয়াছে—এবার বক্তৃতা বাহুল্য নাই। অন্যান্য অধিবেশনের বিবরণ সংবাদপত্রগুলির চার-পাঁচ পাতায় কুলায় নাই; এবার পৃষ্ঠা দুই-একের বেশী বিবরণ বাহির হয় নাই। বরং গাজন জমিবার আগে ঢাকের বাদ্দিই বেশী করিয়া শুনা গিয়াছিল।

এবার বক্তৃতা বাহুল্য নাই কারণ এমন খুব কম প্রস্তাব ছিল যাহা লইয়া বাদ-বিতণ্ডা হইতে পারে। কংগ্রেস এখন এমন অবস্থায় আসিয়াছে যখন কথার চেয়ে কাজেরই প্রয়োজন। অবশ্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হইবে কিনা লইয়া কিছু বিতণ্ডা আশা করা গিয়াছিল কিন্তু চরমপন্থীদল বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। কাজেই কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের ভবিষ্যৎ আপাততঃ শিকায় তোলা রহিল; নির্ব্বাচন শেষ হইলে হয়ত ইহা শিকা হইতে নামান হইতে পারে।

কংগ্রেসে অন্ততঃ তিলকনগরে এবার চাষাভুষার আমদানী ছিল বেশী, কাজেই নেতৃবর্গ ছিলেন কিছু পরিমাণে নিষ্প্রভ—অবশ্য এক জওহরলাল ছাড়া। ইহাতে কংগ্রেস গৌরবান্বিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু উঁহারা কতদূর কংগ্রেসের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে তাহা বৎসর খানেকের মধ্যেই বুঝা যাইবে। অবশ্য আমাদের দেশের কৃষক মজুরদিগের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এবং উপযুক্ত নেতার পরিচালনায় তাহারা অনেক দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এখনও তাহাদের মধ্য হইতে যুগোপযোগী নেতার আবির্ভাব হয় নাই। প্রফেসর রঙ্গ এবার কৃষক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন—ইনি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার ধমনীতে কিষাণ-রক্ত প্রবাহিত। কিন্তু ইহা সত্য যে তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময় কৃষক-দিগের মধ্যে কাটান না, তাঁহার বক্তৃতা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদেই শুনা যায়।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাইয়ের অধিবেশনের প্রাকালে আলাপরত পণ্ডিত জহরলাল ও শরৎ চন্দ্র বসু

জাতীয় আন্দোলনে এরূপ নেতাই পুরোভাগে থাকেন সত্য, কিন্তু এতদিনেও কৃষক বা শ্রমিকদের মধ্যে হইতে নেতার উদ্ভব হইতেছে না কেন? রুষিয়ার ষ্টালিন, জার্ম্মানীর হিটলার, ইতালীর মুসোলিনি, বিলাতের ম্যাকডোনাল্ড বা টমাসের ন্যায় সমাজের নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূত জাতীয় নেতা আমাদের দেশে কয়জন? এই কারণেই বোধ হয় আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলন সমাজের নিম্নস্তর সম্যকরূপে স্পর্শ করিতেছে না। উপরের স্তরের আন্দোলনের ঢেউ নিম্ন স্তরে মাঝে মাঝে পৌঁছিয়াছে কিন্তু জোয়ার কমিলেই সমাজ ও জাতির সর্ব্বাঙ্গ ভাটার টানে একেবারেই ভাসিয়াছে। এই জন্যই দেখা যায় যে তিন চারিটা স্বদেশী আন্দোলন সত্ত্বেও বিদেশী মালেই বাজার ছাইয়া আছে।

আর আন্দোলনের ব্যর্থতার ন্যায় সর্ব্বনাশা জিনিষ নাই। কিন্তু বার বার আমাদের দেশের আন্দোলন ব্যর্থ হইতেছে কেন? ভারতীয়গণ জাতীয় আন্দোলনে যে সাহস, শৌর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা খুব কম দেশেই—বিশেষতঃ যে দেশ সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র—পাওয়া যায়। তথাপি কেন আমরা এতদিনে সাফল্যলাভ দূরের কথা, সঙ্ঘবদ্ধ পর্য্যন্ত হইতে পারি নাই? আজ দেশের প্রকৃত অবস্থা ঢাকিয়া

কোনই লাভ নাই। আজ সমগ্র দেশে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও আধুনিক কুসংস্কারের বিষে জর্জ্জরিত। এ বিষ পান করিয়া দেশের জন্য অমৃত বিতরণের ক্ষমতা কোন নেতারই নাই। আদর্শ জাহির করিলে বা বাস্তবের নিন্দা করিলে ত' বাস্তব বদলায় না—কাজেই প্রথমে চাই ব্যাধির সম্যক পরীক্ষা।

পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন যে Independence is nearer—স্বাধীনতা নিকটবর্ত্তী তাঁহার বক্তৃতা ভাল করিয়া পড়িলেই বুঝা যায় তিনি দেশের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া বহির্জ্জগতের ঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্ত্তনে ভারত কিরূপে লাভবান হইতে পারে সেই বিষয়েই ইঙ্গিত করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সারাজগতে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যে মন্থন সুরু হইয়াছে ভারতকে তাহাতে যোগদান করিতে হইবে, এবং সেই মন্থনের ফলে যে অমৃতের আবির্ভাব হইবে ভারত তাহা পান করিয়া শক্তিমান হইবে।

এরূপ একটা অবস্থা উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা আছে একথা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, কিন্তু ইহার উপর নির্ভর করিয়া স্বরাজ লাভের আশা মহাত্মা গান্ধীর এক বৎসরের মধ্যে চরকা দ্বারা স্বরাজ লাভের আশার ন্যায়। জাতীর বর্ত্তমান অবস্থায় কোন নেতাই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে জাতীয় আন্দোলনের উপযুক্ত ফল কবে ফলিবে। তাহার কারণ সকলেই বুঝিতেছেন যে এতদিন কাজের কাজ হইয়াছে অল্প, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোঁজামিল দিয়া আসা হইয়াছে—এমন কি দেশের জাতীয় চেতনার সম্যক উদ্বোধন হয় নাই। সম্যক উদ্বোধন যে হয় নাই তাহার পরিচয় আমরা পদে পদে পাইতেছি। মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িকতার কথা ছাড়িয়া দিলাম, ভারতের প্রদেশগুলি আজ প্রাদেশিকতার বিষে জর্জ্জরিত। এমন নেতা খুব অল্পই আছেন যিনি এই দোষে দুষ্ট নহেন।

মোটের উপর বুঝা যায় যে, আমাদের নেতৃবর্গের অধিকাংশ জাতীয়-মন্ত্রে উদ্বোধিত হ'ন নাই, জাতীয় কল্যাণ তাঁহাদের কল্যাণ বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজনার বশে আন্দোলনে মাতামাতি করেন, এবং সুযোগমত স্বার্থসিদ্ধি করেন—ব্যক্তিগত স্বার্থ, পারিবারিক স্বার্থ ও প্রদেশগত স্বার্থ। এই হীন স্বার্থপরতার বিষে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, সমগ্র সমাজ এমন কি সমগ্র জাতি জর্জ্জরিত। নেতাগণ যদি সত্যই গণ-আন্দোলন চাহিতেন তাহা হইলে কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসর বয়সে Mass Contact Committee-র ভার মানবেন্দ্রনাথ রায়ের হাতে দিতে হইত না।

এক মানবেন্দ্র নাথ রায়, এক জওহরলাল, এক রঙ্গ বা তাঁহাদের কয়েকজন মাত্র অনুচর রাতারাতি চির-বিড়ম্বিত জনসাধারণের মধ্যে স্থায়ী জাগরণ আনিতে পারিবেন না। তাহার কারণ আছে বহু। কৃষকগণ বা শ্রমিকগণ যদি যথার্থভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই নেতাগণের মধ্যেই অনেকে স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের পীড়ন আরম্ভ করিবে। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের এই পীড়নের কথা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

এই কারণেই কংগ্রেসে পণ্ডিত নেহেরুর আবির্ভাবের পর হইতেই ভারতের অভিজাত সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায় চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের অধিকাংশ প্রজা ঠেঙ্গাইয়া, মজুর শোষণ করিয়া বা ধাপ্পাবাজি করিয়া আভিজাত্যের চাল দিতেন ও জাতীয় আন্দোলনে মুরুব্বিয়ানা করিতেন। তাঁহাদের সে সুখস্বপ্নের চমক ভাঙ্গিয়াছে। তাহার উপর বঙ্গের বাহিরে প্রদেশগুলি এরূপভাবে প্রাদেশিকতার বিষ উদগীরণ করিতেছে যে, যে বঙ্গদেশ এককালে ছিল জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী সে এ বিষয়ে একরূপ উদাসীন। আজ কংগ্রেসে বাঙ্গলার একজন নেতাকেও দেখা যায় নাই, দেখা গিয়াছিল কয়েকজন অতি উৎসাহী প্রতিনিধিকে।

জওহরলাল কি দেশের এই জড়ত্ব ও সংকীর্ণতা দূর করিতে পারিবেন? তিনি খুব বুদ্ধিমান, কর্ম্মশীল, উৎসাহী এবং বিচক্ষণ—কিন্তু "আপ ভালা ত' জগৎ ভালা" সর্ব্বক্ষেত্রে হয় না। তিনি গোঁজামিল ও ধাপ্পাবাজির আবহাওয়া হইতে কংগ্রেসকে কি উদ্ধার করিতে পারিবেন? ভণ্ড স্বার্থপর নেতা ও তথাকথিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদিগকে তিনি কি কংগ্রেস হইতে অর্দ্ধচন্দ্র দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন? অপর পক্ষে তিনি যদি বর্ত্তমান অবস্থা না বুঝিয়া শুধুই আদর্শ-মায়া মৃগের প্রতি ধাবমান হ'ন তাহা হইলে আবার ভারত বঞ্চিত হইবে।

সত্য কথা বলিতে কি এখন দেশে চাই সর্ব্বক্ষেত্রে ঐকান্তিক কর্ম্ম—যে কর্ম্ম স্বার্থ-প্রসূত নয়, যাহা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের, জনসাধারণের সত্য উদ্বোধনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। লোকমান্য তিলক প্রভৃতি স্বদেশী যুগের নেতারা সেই আদর্শের কথা বলিয়াছিলেন, যে, জাতীয় যুদ্ধে গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিতে হইবে এবং অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত সেগুলি রক্ষা করিয়া দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে হইবে, এবং এই উপায়ে অচিরেই জাতীয়তার আদর্শ সফল হইবে। দেশবন্ধুর কার্য্যে ভারত এই আদর্শের সাফল্য দেখাইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের পর জাতীয় কার্য্যের

গণ-সাহিত্য (?)

শ্রীসুবোধ রায়

আমার ধারণা ছিল যে "Slogan" বস্তুটির স্থান একমাত্র রাজনীতিক্ষেত্রেই। যেখানে সভা সমিতি মুহূর্ত্তে একটা ভাব দশ হইতে শতে এবং শত হইতে সহস্র মনে ছড়াইয়া দিতে হইবে সেখানে "গান্ধীজীকী জয়" "ভারতমাতাকী জয়" প্রভৃতি জয়ধ্বনির সাহায্য লওয়া ভিন্ন বোধ হয় গত্যন্তর নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এই Sloganএর অভিযান সুরু হইয়াছে। যেখানে নিজস্ব চিন্তা, শান্ত মননশীলতা ও নিভৃত অবসরের প্রয়োজন, সেখানেও কর্ণপটহবিদারী জয়ধ্বনি আসিয়া পৌছিতেছে :—

"জয় গণ-সাহিত্যের জয়।" বহুলোকই এই জয়ধ্বনির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়াছেন, এবং এই গণ-সাহিত্যকে আড়ং ধোলাই করিয়া, পালিশ করিয়া "প্রগতি-সাহিত্য" নাম দিয়া নানা স্থানে সভা-সমিতি ও প্রবন্ধাদি পঠিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিবার পরও "কাঁঠালের আমসত্তের" মত 'গণ-সাহিত্য' বস্তুটি আমার নিকট দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। প্রগতিবাদী সাহিত্য-সাথীরা হয়তো বলিবেন—"এযুগে গণ-সাহিত্য যে বোঝেনা, সে জাহান্নামে যাক্।" জাহান্নামে যাইতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই, কারণ সেখানে বহু পরিচিত লোকের সহিতই সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে গণ সাহিত্যটা বুঝিয়া গেলে ভবিষ্যতে অনেক সুবিধা হইতে পারে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই Slogan সৃষ্টি অবশ্য নূতন নয়—কেবল মাত্র গণতান্ত্রিক-বাদী সাহিত্যিকরাই যে এই দোষে দোষী তাহা নহে। কিছু কাল পূর্ব্বে আর এক-দল আর একটা কথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন—"অভিজাত সাহিত্য।" যে যুগে জাতি-ভেদ উঠাইয়া দিয়া না হউক, অন্ততঃ জাতিবিদ্বেষ উঠাইয়া দিয়া আমাদের সমাজকে সংহত ও শক্তিশালী করিয়া তোলা হইয়াছে, ঠিক সেই সময় সাহিত্যে এই ভাবে ভেদবিভেদ, জাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি সৃষ্টি করা কি সমীচীন? আমাদের বহু-দিনের দুর্ব্বুদ্ধিপুষ্ট ভেদবুদ্ধিটা কি অবশেষে সাহিত্যে আশ্রয় লইল!

এখন আসল প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সাহিত্যের উপর বিশেষ করিয়া কথা সাহিত্যের (নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির) উপর এইরূপ বিভিন্ন লেবেল্ মারিয়া শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আল-মারীতে সাজাইয়া রাখা চলে কি না? দলের সাহায্যে কোনদিন কি সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে? এসো আমরা সকলে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করি—এই বলিয়া একদিন সকলে কলম হাতে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেই কি গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করা যাইবে? এসো আমরা সকলে চাষ করি বলিয়া লাঙ্গল কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলে যত সহজে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয় সাহিত্য সৃষ্টিও কি সেইরূপে হইতে পারে? রাজা, মহারাজা, কোটাল, সওদাগরদের লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতেই হইবে, সরস্বতী তাঁহার বরপুত্রদের নিশ্চয়ই এইরূপ মাথার দিব্য দেন নাই, কিন্তু কলমের পরিবর্ত্তে লাঙ্গল এবং তুলির পরিবর্ত্তে কাস্তে বা হাতুড়ী ব্যবহার করিলে যে তিনি খুসী হইবেন সে কথাও কি গণ-তান্ত্রিক সাহিত্যিকরা হলফ্ করিয়া বলিতে পারেন?

যুগধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে কেহই পারে না। যেমন রাজনীতি, সমাজনীতি তেমনি সাহিত্যেও যুগধর্ম্ম ধীরে ধীরে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অতএব সাহি-ত্যের বিষয়বস্তুরও স্বাভাবিক ভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যাহারা একদিন হয়তো সাহিত্যক্ষেত্রে অপাংক্তেয় ছিল আজ তাহারা সসম্মানে আপনাদের আসন সুপ্রতি-ষ্ঠিত করিতেছে। কালিদাস, সেক্সপীয়ার্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোনও অভিজাত দল সভা সমিতি করেন নাই অর্থাৎ কোনরূপ দলবদ্ধ প্রতিজ্ঞা বা সভার 'রিজোলিউশন্'এর ফলে ইঁহাদের আবির্ভাব হয় নাই। সেইরূপ কোন গণ-তান্ত্রিক বাদী সাহিত্যিকদলের 'রিজোলি-উশন্'এর ফলেও গর্কি, কুপ্রিন্ হপ্টম্যান্ প্রভৃতি বিশ্বপ্রতিভার আবির্ভাব ঘটে নাই। যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও শক্তিবলে কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র্ প্রভৃতির আবির্ভাব

পরিবর্ত্তে আরম্ভ হইয়াছে স্বার্থবুদ্ধির বিকট-লীলা এবং নেতৃবর্গের অধিকাংশ হইয়াছেন দেশবাসীর ধিক্কারের পাত্র। আমরা বাক্যের বুদ্বুদ্ বা হৈ চৈর হিড়িকে যতই না কেন এই আদর্শ-বিচ্যুত হই, উহা ব্যতি-রেকে ভারতের সত্য শক্তিমান হইবার আশা নাই। ঘটনাচক্রে তাহার হাতে স্বাধীনতা আসিলেও তাহা হইবে চীনের ন্যায় গৃহযুদ্ধের উপলক্ষ ও জন-নির্য্যাতনের কলঙ্কময় পর্ব্ব।

...ভব হইয়াছে, ঠিক সেই নিয়মের অনু- বর্ত্তিতায় এ যুগের সাহিত্য প্রতিভাও জন্ম লইয়াছেন। কেবল যুগধর্ম্মের আদর্শ ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের ফলে ইঁহাদের রচিত সাহিত্যের বিষয়বস্তুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

আসল কথা সাহিত্যের বিষয়বস্তু লইয়া এইরূপ মারামারি ও মাথা ফাটাফাটি করার কোন সার্থকতা নাই। দরিদ্রের কথা, শ্রমিকের কথা, বস্তীর বর্ণনা লিখিলেই যে তাহা সাহিত্য হইয়া উঠিবে তাহার কোন মানে নাই। Treatmentই কথা সাহিত্যের প্রাণ। যে সোনার কাঠির স্পর্শে মরা বাঁচিয়া উঠে চাই সেই দরদী প্রাণের ও জাগ্রত মনের প্রতিভায় সোনার কাঠির স্পর্শ। ইহার অভাবে হাজার হাজার Volume বস্তীর বর্ণনা ও শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দ্দশা লিখিলেও তাহা কাহারও অন্তর স্পর্শ করিবে না, কালের প্রবাহে তাহা তৃণি মাসের ন্যায় বস্তাবন্দী হইয়া ভাসিয়াই যাইবে।

অতএব চাই প্রগতি সাহিত্য, চাই গণ-সাহিত্য, এই সকল ফরমাস্ না করিয়া যাঁহারা দেশে এই সাহিত্যের নবপ্রবাহ আনিতে চান তাঁহারা এই নূতন আদর্শের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দেশের লোকের মুদ্রিত নয়ন উন্মীলন করুন। গঙ্গার মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য ভগীরথকে কোনও বক্তৃতা করিতে হয় নাই। তিনি তাঁহার অন্তরের প্রেরণা ও শক্তিবলে ভাগীরথীকে মহেশ্বরের জটা হইতে নামাইয়া মর্ত্ত্যে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি আমাদের চির নমস্য। সেইরূপ এ যুগের কোন নব-সাহিত্যিক যদি এই নূতন আদর্শের সাহিত্যধারা প্রবাহিত করিয়া মৃতপ্রায় জাতিকে জাগাইতে পারেন তাঁহাকে আমরা বরণ করিব ও চিরদিন স্মরণ করিব। ইহাই তো চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির উপায়, কিন্তু তাহা না করিয়া নিজেরে ইচ্ছামত ও ফরমাস্ মত এক অর্থহীন অস্পষ্ট লেবেল্ মারিয়া সাহিত্যের মধ্যে ইঁহারা যদি দলাদলি সৃষ্টি করেন তাহা হইলে দল সৃষ্টি হইবে, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি হইবে না। প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের নিকট আজিকার দিনে আমার ইহাই নিবেদন।

শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার কথা

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গাঙ্গুলী

আজকাল সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া যে শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে, এই বাঙ্গলাদেশেই তাহার জন্ম। ইংলণ্ডে যখন সবেমাত্র শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতেই বাঙ্গলাদেশের চিত্ততটে সেই আন্দোলনের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করে। শ্রমিক আন্দোলনের মন্ত্র-গুরু যেমন ইংলণ্ডে রবার্ট ওয়েন ও রাস্কিন, বাঙ্গলাদেশেও তেমন সাম্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি প্রথম স্থাপন করেন "বন্দেমাতরম" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। "বঙ্গদর্শনে" ধারা-বাহিক রূপে "সাম্য" নামে প্রবন্ধ লিখিয়া ও তাহার পর পুস্তকাগারে উহা প্রকাশ করিয়া বঙ্কিম সর্ব্ব প্রথমে সাহিত্যের মধ্য দিয়া "সাম্য" মন্ত্র প্রচার করেন। পরে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী "সমদর্শী"তে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় সাম্যের গান শুনাইতে থাকেন। "সঞ্জীবনী"র মন্ত্র ছিল তখন "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" এবং তখন সাম্যবাদ যদিও আত্মপ্রকাশ করে নাই, তবুও সঞ্জীবনী"র দল ছিলেন "রিপাবলিকান" পন্থী। এই "সঞ্জীবনী" পত্রেই প্রথম কুলি আন্দোলনের উদ্ভব হয়। শ্রমিক আন্দোলনের দার্শনিক আলোচনাতেই যে এই কর্মী-দলের কার্য্য নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। কর্ম্মক্ষেত্রেও ইঁহাদের চেষ্টা কম ফলবতী হয় নাই। ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বরাহনগরের ত্যাগীকর্ম্মী ৺শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ই ভারতের শ্রমিক মঙ্গল অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শক।

শশিপদ বাবুর নানা মঙ্গল অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রমিক মঙ্গল অনুষ্ঠানগুলি ছিল প্রধান। বরাহনগর তখন বাঙ্গলাদেশের পাটকলের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; এখনকার ন্যায় তখন পাটকলের এত বিস্তার হয় নাই। এই পাটকলের শ্রমিকরা তখন অধিকাংশই বাঙ্গালী ও স্থানীয় বাসিন্দার মধ্য হইতেই গৃহীত হইত। শশিপদ বাবু এই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য নৈশবিদ্যালয় গড়িয়াছিলেন, বয়স্থ শ্রমিকদের মধ্যে সহজে জ্ঞান বিস্তারের জন্য ছায়াচিত্রে বক্তৃতার ব্যবস্থাও শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্যবর্দ্ধনের জন্য ওয়ার্কিংম্যান ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন করেন। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে "ভারত শ্রমজীবি" নামে একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মিস্ কলেট তাঁহার প্রসিদ্ধ ইয়ারবুকে এই পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিতেছেন "This Cheap Working class journal, now in its sixth year, has recently been enlarged in size and contains wood-cuts from English blocks" তখন এদেশে ব্লক প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল না। শশিপদ বাবু বহু অর্থ ব্যয়ে ইংলণ্ড হইতে উডকাট ব্লক করাইয়া আনিয়া শ্রমিকদিগের এই পত্রিকার শোভা বর্দ্ধন করাইতেন। শ্রমজীবিদিগের মধ্যে সঞ্চয় বুদ্ধি প্রণোদিত করিবার মানসে শশিবাবু "ডিষ্ট্রিক্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক" নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এই ব্যাঙ্কে এক আনা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইত বলিয়া পরে ইহা "আনা ব্যাঙ্ক" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আনন্দ মোহন বসু, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রমিকদের সুবিধার জন্য সিটি কলেজ (মৃজাপুর ষ্ট্রীটে) গৃহে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পর বৎসর ভবানীপুর ও রিষড়াতে এই স্কুলের শাখা স্থাপিত হয়। ইঁহাদের প্রচেষ্টার সুফল দেখিয়া মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী দক্ষিণ ভারতের বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত ৺বীরেশলিঙ্গম পান্টালু মান্দ্রাজে র‍্যাগেড স্কুল নামক শ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন; বোম্বাই সহরে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, সাপুরজী সোরাবজী বাঙ্গালী ও দয়ালদাস রতনসি ও আহামাদাবাদে ভোলানাথ সারাভাই, রনছোড় লাল ছোটে লাল, মহীপৎরামরূপরাম নীলকণ্ঠ ও শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা শ্রমিক মঙ্গল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলেন।

এই সময়ে একটি সূত্রে প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রচার উদ্দেশ্যে উত্তর আসাম যখন পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি আসামের কুলিদের দুর্দ্দশার কিছু আভাষ পান এবং কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু মহলে জ্ঞাপন করেন। শ্রমিক ও বিপন্নের বন্ধু ৺দ্বারকানাথের প্রাণ কুলিদের জন্য কাঁদিয়া উঠে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ কুলিদের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য আসামে গমন করেন। আসামের চা'বাগানগুলি তখন অত্যন্ত দুর্গম ছিল। দ্বারকানাথ কুলি সাজিয়া চাবাগানে প্রবেশ করিয়া কুলিজীবন সম্বন্ধে বহুতথ্য সংগ্রহ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার জীবন অনেক বার বিপন্ন হয়। ফিরিয়া আসিয়া দ্বারকানাথ "সঞ্জিবনী" পত্রে কুলি-কাহিনী ও "বেঙ্গলী" নামক ইংরেজী

দৈনিকে "Slave trade in Assam" নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন।

যখন দিনের পর দিন তাঁহার জলন্ত লেখনী হইতে অগ্ন্যুদগম হইতে লাগিল, তখন দেশময় মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন গৃহে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় সেই সময়ে আসামের কুলিদের অবস্থা বলিয়া সম্মেলনীর উদ্যোক্তারা বিবেচনা করাতে সভার প্রথম প্রস্তাব এই সম্পর্কেই হইবে স্থির হয় ও আসাম অঞ্চলের প্রতিনিধি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের উপর এই প্রস্তাব উত্থাপনের ভার দেওয়া হয়। বিপিনবাবু অপূর্ব্ব বাগ্মীতার সহিত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিন আইনের বলে ষ্টাম্প-হীন, রেজিষ্টারিবিহীন মৌখিক চুক্তির বলে কুলিদিগকে দাসরূপে খাটাইয়া লইবার অধিকার চা-করদের কিরূপে জন্মিয়াছে ও তাহার ফলে কুলিদের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা বুঝাইয়া বলেন ও এই প্রথার উচ্ছেদের জন্য আবেদন করেন।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বিপিন বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং কি করিয়া আড়কাটিদের হাত হইতে বহু কুলিকে রক্ষা করা হইতেছে তাহার বর্ণনা প্রদান করেন। মেদিনীপুরের রামকুমার জানা নামক এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের পরিবর্ত্তে কুড়ি বৎসর বয়স্ক অন্য একজন লোককে শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রামকুমার রূপে হাজির করিয়া এক আড়কাটি চুক্তি পত্র রেজেষ্ট্রি করিয়া লইয়া রামকুমারকে ভুল চুক্তির বলে চালান দিতে গিয়া ধরা পড়িয়া কুষ্টিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কি ভাবে দণ্ডিত হয়, তাহাও বর্ণনা করেন। দ্বারকাবাবু এই প্রসঙ্গে ডিব্রুগড় অঞ্চলের মাসিজান্দ চা বাগানের ম্যানেজার অ্যানডিং সাহেবের বিচারের উল্লেখ করেন। ঐ বাগানের দুইশত কুলি ও কুলি রমণীকে একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া অ্যানডিং বেত্রাঘাত করে। এই বেত্রাঘাত এতই নির্ম্মম হইয়াছিল যে, চারিজন কুলি তাহার ফলে মৃত্যু বরণ করে। এই গুরু অপরাধের জন্য অ্যানডিংএর মাত্র তিনমাস জেল ও আড়াই শত টাকা জরিমানা হয়।

এইরূপ বহু তথ্য দ্বারকানাথ আসাম হইতে সংগ্রহ করিয়া ইণ্ডিয়ান এ্যাসো-সিয়েশন হইতে বাঙ্গলা সরকারের নিকট এক মেমোরিয়াল প্রেরণ করেন। সেই মেমোরিয়াল হইতেও কিছু কিছু অংশ সভায় পঠিত হয়।

তাহার পর হাজারিবাগের উকিল হারিচাঁদ মৈত্র ও গিরিডির কালীকৃষ্ণচন্দ্র সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

সভাপতি মহাশয় সভার শেষ বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গে বলেন যে, "I have to congratulate you that in your very first resolution you have advocated the cause of the labourers in the tea gardens of Assam; I do not call them coolies' for I hate the name "Coolie" being applied to human beings; in passing this resolution you have given unmistakable indication of the sympathy, humanity and philanthropy which should be the guiding and animating principle of all men both as individuals and as forming communities."

এই সম্মেলনের আর একটী প্রস্তাবও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় বলিয়া যাহা স্থির হইয়াছিল, তাহাতে কুলির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রস্তাব ছিল না। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করেন যে এই সম্মিলনী হইতে কংগ্রেসকে এই বিষয়টি আলোচ্য বিষয়ের তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে অনুরোধ করা হউক। দ্বারকানাথ গঙ্গো-পাধ্যায় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রাদেশিক বলিয়া আলোচনা করিতে নারাজ বলিয়া কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার তীব্র প্রতিবাদ দ্বারকানাথ করেন। তিনি বলেন যে, প্রশ্নটি মোটেই প্রাদেশিক নহে। কারণ, আসামের কুলিদের শতকরা ২৭ভাগ পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ হইতে ও পাঁচ ভাগ মাদ্রাজ হইতে সংগৃহীত হইত। আসামে পনেরো হাজার মাদ্রাজী ও ছয়শত বোম্বাই বাসী কুলি সে সময়ে ছিল, তাহার প্রমাণ সভায় দ্বারকানাথ প্রদান করিয়া এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, এই সমস্যা সর্ব্বভারতের সমস্যা এবং সেইজন্য কংগ্রেসের তাহা গ্রহণ করা উচিত।

রহিমতুল্লা সিয়ানীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন কলিকাতা নগরীতে হয়। এই সভায় চা-বাগানের কুলিদের দাসত্ব মোচনের জন্য সর্ব্বপ্রথম আলোচনা কংগ্রেস হইতে হয়। বাঙ্গলার অন্যতম কংগ্রেসী নেতা ও স্থাপয়িতা দ্বারকানাথ বারো বৎসর পূর্ব্বে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কংগ্রেস সে আন্দোলনের যৌক্তিকতা এই অধিবেশনে স্বীকার করিলেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। তিনি বলেন যে, আসামের কুলিজীবন সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কুলি-জীবন দুর্ব্বিষহবোধে তিনি কুলি নর-নারীকে ষ্টীমার হইতে ব্রহ্মপুত্রে ঝাপাইয়া পড়িতে দেখিয়াছেন। এমন দুর্ব্বিষহ

ভারাক্রান্ত জীবন বোধ হয় পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। আসামের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর ও সুদূরস্থিত প্রদেশে কুলিদিগকে আটক রাখিবার ব্যবস্থা না থাকিলে সেদেশে শ্রমিক পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইবে এবং এদেশের একটি বর্দ্ধমান শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে—এই অজুহাতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এক আইনের বলে আসামে যাইতে স্বীকার করার পর কোনও কুলি যাইতে অস্বীকৃত হইলে, কিম্বা বাগিচা হইতে পলায়ন করিলে অথবা বাগিচায় প্রদত্ত কাজ করিতে অস্বীকৃত হইলে—এই সমস্ত দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং কুলিদিগকে এই অপরাধগুলির জন্য আদালতে অভিযুক্ত করিয়া দণ্ড দেওয়া হইতে থাকে। পরে আর একটি আইনের বলে পলায়নপর কুলিদের পুলিশ দিয়া ধরিয়া বাগানের ম্যানেজারের হস্তে সমর্পণ করার ব্যবস্থা হয়। এগুলি অত্যন্ত বর্ব্বর প্রথা। কুলিদের বেতনও অত্যন্ত কম এবং কুলিদিগকে যখন তখন কারণ অকারণে প্রহার করা হইয়া থাকে। এই নির্ম্মম প্রথার এখনই অবসান হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও ললিতমোহন ঘোষাল চা-বাগানের কুলিদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এইরূপ আন্দোলনের ফলে আসামের চীফ কমিশনার স্যার হেনরী কটনের দৃষ্টি কুলিদের দুর্দ্দশার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তিনি কুলিদের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য অনেকগুলি আইন প্রণয়ণ করেন। তাঁহার চেষ্টাতেই "ইণ্ডেঞ্চার সিষ্টেম" উঠিয়া যায় ও আড়কাটির অত্যাচার বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। কুলিদের দুঃখ মোচনে তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলে তিনিই ইংরেজ মহলের অপ্রীতির কারণ হন কিন্তু ভারতবাসী তাঁহার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা অপর্ণের জন্য ও তাঁহাকে জাতীয় মহাসভার সভাপতিরূপে বরণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

আজকাল শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে বড় বড় কথা শুনা গেলেও শ্রমিকদিগের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে ও জীবনের আশঙ্কা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেবা করিতে দ্বারকানাথের মত একজনকেও আজকাল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ইহার পর বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গলা দেশে পাটকল, মুদ্রাযন্ত্র, রেল ও ট্রাম প্রভৃতির শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া শ্রমিক ইউনিয়ন সৃষ্টির চেষ্টা চলে। ফোর্ট—গ্লষ্টার জুট মিলে একহত্যা কাণ্ডের সংশ্রবেই প্রথম পাটকলের শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য একদল কর্ম্মী চেষ্টা আরম্ভ করেন। সেই কর্ম্মিদলই ট্রামওয়ে ইউনিয়ন, প্রিণ্টার্স ইউনিয়ন, রেলওয়ে ইউনিয়ন প্রভৃতি গঠনে যত্নবান হন। এই দলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনেরই চেষ্টা উল্লেখযোগ্য—৺প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী, ৺জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় ৺রজত নাথ রায়, ৺প্রেমতোষ বসু, নিশীথ চন্দ্র সেন ও অশ্বিনী কুমার বন্দোপাধ্যায়। ইঁহারা সকলেই কংগ্রেসকর্ম্মী ও এক প্রেমতোষ বাবু ভিন্ন সকলেই ব্যবহারজীবি। ইঁহাদের কার্য্য প্রসার লাভ করে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। গান্ধী আন্দোলন আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে নারী শ্রমিকদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য ঝরিয়া অঞ্চলে দুইজন প্রসিদ্ধা নারী গমন করেন—একজন হইলেন বাঙ্গলার প্রথমনারী গ্র্যাজুয়েট কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যজন তদীয়া বান্ধবী সুবিখ্যাত মহিলাকবি ৺কামিনী রায়। তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফল "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গান্ধীযুগের প্রারম্ভে শ্রমিক আন্দোলনকে যাঁরা ব্যাপক করিয়া তুলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বামী দীনানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, জগদীশ চন্দ্র সেন, রামযশ আগরওয়ালা, কিরণচন্দ্র মিত্র, রাধারমণ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জ্জি, ৺কিশোরী মোহন ঘোষ, সন্তোষ কুমারী গুপ্তা ও প্রভাবতী দাশ গুপ্তার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আজকাল অগণিত কর্ম্মী আসিয়া শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু আজ এই প্রবন্ধবর্ণিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম স্রষ্টাদের স্মরণ না রাখিলে অন্যায় হইবে। ইঁহাদের ত্যাগে, ইঁহাদের প্রভাবেই আজ শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হইয়াছে। আমরা ইঁহাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণকরি ও আমাদের অর্ঘ অর্পন করি।

—কলেজের ছেলে, কলেজের মেয়ে—

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

কলেজের ছেলে, কলেজের মেয়ে দিব্য আরামে থাকো!
তোমাদের দেখে ঈর্ষা করিলে, দুঃখিত হ'য়ো নাকো!
ভাবনা বিহীন দিবস, রাত্রি, খুসির আমেজে ভরা,
নূতন প্রেমের আভাবে রঙীন স্বপন-মধুর ধরা;
নাহিত' চিন্তা অর্থের তরে, চ'লে আসে মাসে মাসে,
সন্ধ্যার ঝোঁকে উড়ে চ'লে যাও ডবল-ডেকার বাসে!
নগরীর যত সুখ,
তোমাদের কৃপা-দৃষ্টি লভিতে হ'য়ে আছে উন্মুখ!

সমুখে রয়েছে ভবিষ্যতের আলো-ঝলমল আশা,
রাজা-বাদ্‌শার সম্ভাবনাই মনে বাঁধিয়াছে বাসা!
এখন পেয়েছ বাতাসে আকুল দক্ষিণ-খোলা ঘর!
সের: ম দিয়ে সেরা প্রসাধন করিছ অতঃপর!
ফার্পো, পেলিটি, চাঙোয়া, এবং চায়ের দোকান যত,
নিউ মার্কেট, টকি, থিয়েটার, সবি করতলগত!
সখ ক'রে দল বেঁধে,
চলো বোটানিক্‌স্; সোদপুরে কারো বাগানেতে
খাও রেঁধে!

যে দিবসগুলি পেয়েছ আজিকে নির্ভাবনায় ঘিরে,
জমিদারী আর জজীয়তীতেও পাবেনা তা আর ফিরে!
আমাদের দিন কাটিয়া গিয়াছে! তোমাদের দেখে কাঁদি!
তোমাদেরও দিন কেটে গেলে, সুর ধরিবে এমনি 'বাঁধি'!
অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে এ শিক্ষা হ'ল কসা,—
বাঙালী জীবনে কলেজ-লাইফ বৃহস্পতির দশা!
যতদিন বেঁচে রবে,
এমনটি সুখ, এতটা ফুর্ত্তি, কখনো আর না হবে।

কত-কি কিনিছ,—ছবি ও কাগজ, কত-কি দেখিছ খেলা!
গড়ের মাঠের মত প্রাণ,—নাই সরিষা-ফুলের মেলা!
টিনের দালানে, খড়ের কুটীরে, যে টাকা জমিয়া ওঠে,—
ট্যাক্সি ও ট্রামে, প্রেজেন্টেশনে, তাই অপাত্রে লোটে!
ভালো আছ ব'লে হিংসা হ'লেও, দুঃখও বুকে জাগে,—
দেহ-মন-ধন অপচয় হেরি মরমে আঘাত লাগে!
বাঙালীর ছেলেমেয়ে!
তোমাদের পিতামাতার সঙ্গে দেশ আছে মুখ চেয়ে!

ঢুলে ঢুলে আজ চ'লে যাও পথে, জীবনটা নয় দোলা।
অবহেলাভরে ছড়াইয়া যাও চীনাবাদামের খোলা।
ধুতি-শাড়ী আর পাদুকা-বাহার,—আহারেতে রাজকীয়,
বোহেমিয়ানের উচ্ছৃঙ্খল জীবন এতই প্রিয়?
যেদিন সাঙ্গ হবে পড়া, ট্রাঙ্ক বাক্স বেডিং সাথে
চ'লে যেতে হবে,—ফিরে যেতে হবে, মাটি-ভরা আঙিনাতে।
ছাউনীতে ঠেকে মাথা,
প্রাসাদ-সমান হোষ্টেল স্মরি ভিজিবে চোখের পাতা।

এই রাজধানী, এ তোমার নয়, অবাঙালী-দল-করে।
কি করেছ গণ তাহারে তোমার করিয়া আনার তরে?
যত প্রবাসীর হর্ম্ম্যমালায় তোমার আবাস চাপা,
সেই তাহাদেরি অধীনে তোমার ভিক্ষাপাত্র মাপা।
এ তোমার নয়,—তোমার কেবল রূপালি নদীর পারে
শ্যামছায়াঢাকা গ্রামটি, ঝলে যা ভোরের অন্ধকারে।
দুঃখ ঘুচাতে তারো,
কলেজের ছেলে, কলেজের মেয়ে, বলো কী
করিতে পারো?

—•:×:•—

কথা-সাহিত্যের বর্ত্তমান রূপ

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

পশুত্ব থেকে মানুষ মনুষত্বের পদে উন্নীত হয়েছে মনের বিকাশের ফলে—এ কথা জ্ঞানী মনীষী প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। তারপর উন্নত মন দিয়ে মানুষ ধর্ম্ম তৈরি করেছে, সমাজ গঠন করেছে এবং তাদের রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রের পত্তন করেছে। ফলে মানুষ বাঁধা পড়েছে স্বকৃত বন্ধনে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পথ ধরেই তাকে চলতে হচ্ছে গ্রহ নক্ষত্রের মত। পশু পাখীর মত যা তা করতে, যে সে পথে চলতে সে পারে না। নদীর জলের স্রোতের মত আনুষ্ঠানিক নিয়মতান্ত্রিকতার ধারায় কালক্রমে মানুষ হয়ে পড়েছে অভ্যস্ত। রীতি নীতি কঠোরতা হয়ে গেছে অনেকখানি সহজ। অনেক নির্দ্দেশের ন্যায্যতা ও সত্যতা নিয়ে সে আর প্রশ্ন করে না। চুরি করা অপরাধ, পিতা মাতা ভক্তির পাত্র, এ সব সে নির্ব্বিচারে মেনে নিয়েছে।

মানব মনের প্রাথমিক উন্নতির পর এই ভাবেই জগৎ চলে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। কদাচ কোন কোন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে মাঝে মাঝে এক একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মানব ইতিহাসের সমগ্র রূপটি বদলায়নি, আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে মাত্র।

তারপর আজ বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ। এবি মানব-ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়? কেহ বলেন হাঁ, কেহ বলেন, না। রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, সমাজে আজ যে পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে কেহ কেহ বলেন এ আমূল পরিবর্ত্তনের লক্ষণ। রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ রাজ-দেবতার আসনে গণদেবতা উপবেশন করেছেন। রাজা তাঁরা হতে চান না। রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সকালে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে জগতের বারো আনা অশান্তির মূল দারিদ্রের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চান। জগৎ জুড়ে ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে ঐ একই বিপ্লব উপস্থিত। ইউরোপের যুবক সম্প্রদায় আজ বাইবেল, গীর্জ্জা এবং পোপের আধিপত্য অস্বীকার করতে বসেছেন। তাঁরা বলেন "In question of religion and morality no authority can exist outside the mind and conscience of the individual." তাঁরা বলেন "Voice of conscience is the voice of God." অন্যত্র সুসংবদ্ধভাবে এই আন্দোলন আরম্ভ না হলেও এই মনোভাব জগতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে, ভগবত-তত্ত্বালোচনায় শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশ অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের মন এবং বিবেকের অনুজ্ঞাকেই আজ বড় স্থান দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক ব্যাপারেও তা কালের কঠোর হস্ত রীতিনীতির বাঁধনের ওপর দারুণ আঘাত সুরু করেছে। চিরাচরিত সম্বন্ধের তারতম্য, আত্মীয়তার ভেদাভেদ ছিন্ন ভিন্ন হতে চলেছে। সনাতন নিয়মের বাঁধা পথে সমাজ আর চলতে চায় না। যে মঙ্গল সাধনের জন্য বিধি বিধান তৈরি হয়েছিল তাতে কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হচ্ছে, সুমুখের দিকে এগিয়ে না দিয়ে তারা পিছনের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে ইহাই এই নবযুগের যাত্রীদিগের ধারণা। যে পুরাতন মতবাদ বাধা দিচ্ছে সে হচ্ছে তাঁদের কাছে অসার ও অকিঞ্চিৎকর। সে হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী। কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে ধর্ম্মে সমাজে মানুষ হবে সম্পূর্ণ মুক্ত বাইয়ের এবং মনের দিক থেকে। বিন্দুমাত্র বন্ধনও সে সহ্য করতে চায় না। বন্ধনোন্মুখ পুরাতন নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে চুরমার করে দিতে সে তাই দ্বিধা বোধ করছে না।

এক সময়ের মনের মত করে গড়া

ধর্ম্ম ও সমাজ আজ তার মনঃপূত নয়। সে তাকে নূতন ছাঁচে ঢেলে নূতন করে গড়তে চায়। এই ভাঙা-গড়ার খেলায় যত অশান্তি যত বাধা বিঘ্নই বর্ত্তমানে দেখা দেয় না কেন ভবিষ্যৎ যে উজ্জল এই তার বিশ্বাস, অমঙ্গল রাত্রি শেষে মঙ্গল প্রভাত দেখা দেবে এই তার ধারণা।

এই সব নবচিন্তা ধারা উচ্ছসিত বন্যাধারার মত আজ বইতে সুরু করেছে কথা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। কাজেই কথা সাহিত্য এখন আর কথার কথা মাত্র নয়। ষোল বছরের নায়ক ও তের বছরের নায়িকার তরল লঘু প্রেমের কাহিনী সে আর বয়ে বেড়ায় না। শিক্ষিত বয়স্ক নরনারী জীবন সমস্যার বিশাল বোঝা মাথায় নিয়ে কথা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে আজ অবতীর্ণ। তাদের বিচার শক্তি, তাদের বিবেক, তাদের স্বাধীন মন হচ্ছে তাদের জীবনের পথ প্রদর্শক আর তাদের সাহায্য করছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান। তন্ন তন্ন করে ভাগ করে বিশ্লেষণ করে সে বুঝিয়ে দিচ্ছে যা তোমরা কাজে লাগাও তোমাদের ব্যবহারিক মন যেটুকু অসমগ্র মনের অল্পাংশ মাত্র। বৃহত্তর অংশ আছে অন্ধকারে ডুবে। সেই অন্ধকারের অতলতা থেকে যে নির্দ্দেশ মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে তারও কার্য্যকারিতা আছে। তাকে অগ্রাহ্য করা মানে মানে মানবধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করা। অবশ্য, এর যে কোন অপপ্রয়োগ হচ্ছে না তা নয়। যেমন একখানা পুস্তকে আছে সুখে স্বচ্ছন্দে এক দম্পতি ঘর সংসার করছে হঠাৎ স্ত্রীটির মনে পড়ল তার কোন বাল্য-বন্ধুর কথা। অমনি ঘর সংসার পুত্র কন্যাদি ছেড়ে চলে গেল তার কাছে। এইটাই নাকি তার জীবনের গোপন সত্য এবং সবচেয়ে বড় সত্য—যাঁরা অবহেলা করলে তার জীবনকেই অবহেলা করা হবে। যাই হোক শুধু বহি—প্রকৃতির নয় অন্তর প্রকৃতিরও সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত আজ সাহিত্যের পাতায় ফুটে উঠেছে।

পুরাতনীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাঁরা বলেন সেই আদিম যুগে মানুষের মনও প্রবৃত্তি যে অবস্থায় ছিল এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। কোন উন্নতি হয় নি। কতকগুলি সামাজিক অনুশাসন তাদের দাবিয়ে রেখেছে মাত্র। আজ যদি সেই শাসন দণ্ড উঠিয়ে দেওয়া হয় দেখা যাবে প্রবৃত্তির দিক দিয়ে পশুতে মানুষে বিশেষ পার্থক্য নেই। সুদীর্ঘকালের রীতি নীতিতে অভ্যস্ত মানুষ এমন কি অতি বড় সাধু এখনও ঘুমের ঘোরে এমন স্বপ্ন দেখে যা লজ্জাকর ও প্রকাশের অযোগ্য। তাকে যদি সত্য গ্রহণ করা হয় এবং বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা হয় তাহলে সেই আদিম যুগেই ফিরে যাওয়া হবে।

এ সব বাদ প্রতিবাদের ন্যায্যতা অন্যায্যতার বিচার করবে ভবিষ্যৎ। কালের কষ্টিপাথরে কোনটা ঠিক তা স্থির হয়ে যাবে। আমাদের গর্ব্ব এই যে মানুষের চলার পথের নির্দ্দেশ দেবার ভার নিয়েছে আজ কথা সাহিত্য। কালকার কথা সাহিত্য—বয়স যার একশ বছরের বেশী নয়—ভাষা জননীর যে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান—কিছুদিন আগেও যাকে সাহিত্যবলে গণ্য করা হবে কিনা বলে সুধীসমাজে বিচার চলছিল-আজ সে সর্ব্বেসর্ব্বা। এই সর্ব্বসর্ব্বা হবার যোগ্যতা সে সম্পূর্ণরূপেই লাভ করেছে। এখন সে আর রঙিন আকাশে ডানা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায় না। বাস্তবের কঠিন কঙ্করময় ভূমিতে পায়ে হেঁটে বেড়ায়। কলকারখানা থেকে ধান পাটের মাঠ, ধনীর সুরম্য অট্টালিকা থেকে শ্রমিকের দুর্গন্ধ অন্ধকারময় বস্তির খোলাঘর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সে চলাফেরা করে। কোথায় কতখানি সুখ কতখানি দুঃখ তা সে মাপকাঠি দিয়ে মেপে মেপে পাঠক সমাজকে জানিয়ে দেয়।

এ জগতের সব কিছুই মানুষের জন্যে। তারা মানুষেরই সুখের যোগান দিয়ে থাকে। তার উন্নতিতে সাহায্য করে। কিন্তু অনেকস্থলে দেখা যায় তাদেরই চাপে মানুষ ছোট হয়ে যাচ্ছে। কোথায়ও প্রাচুর্য্যের ভারে, কোথায়ও অভাবের তাড়নায়, কোথায়ও সমাজের কঠিন হৃদয়-হীনতায়, কোথায়ও ধর্ম্মের অত্যুগ্রতায়। এই দুঃস্থ অবস্থাকে নিপুনভাবে এঁকে সর্ব্ব সাধারণের সুমুখে ধরছে কথা সাহিত্য ক্লিষ্ট পিষ্ট সমাজের দুঃখ বেদনাকে ভাষা দিচ্ছে কথা সাহিত্য। কথা সাহিত্য হয়েছে আজ মানব সমাজের হৃদয়মনের আলেখ্য।

অফিস থেকে এসে জল-যোগান্তে একটু বিশ্রাম করছি, আমার মেয়ে কমলা হাসি-মুখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, "আজ একটা জিনিষ পেয়েচি বাবা, আচ্ছা বল দিকিনি কি?

এক মুহূর্ত্ত চেষ্টার ভাণ করলুম, বললুম, আন্দাজ করতে পারলুম না মা।

সে আমার হাতটা নিয়ে আদর ক'রে বললে, যদি জিনিষটা দেখাই তা হ'লে আমায় কি দেবে বল?—ব'লেই আঁচলের একটি লকেট আমার হাতে দিল।

—এ তুই কোথায় পেলি মা? আর এটা যার ভেতর ছিল সে কৌটোটা?

—কৌটো ত কৈ দেখিনি বাবা, কাঠের বড় বাক্সটার ভেতর এটা ছিল, আজ গুছোবার সময় পেয়েচি।

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, কৌটোটা অনেক-দিন আগেই নষ্ট হ'য়ে গেছে।

—এটা কার বাবা?

—এর একটা ইতিহাস আছে মা, তবে বলি শোন্।

আমরা তখন শান্তিপুরে থাকি।

সেদিন ছিল রবিবার। বিকেলে কয়েক-জন বন্ধু মিলে বাড়ীতেই আসর জমানো গেছে। আমি, অরিন্দম, শুভেন্দু, অমরকৃষ্ণ আর বিমলদা'। কিসের একটা আলোচনা হচ্ছিলো, এমন সময় বিমলদা' গেল চোটে। তর্ক করবার সময় সে ধৈর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কথারও খেই হারিয়ে ফেলতো। সেদিনও তাই হ'য়েছিল—তাই এক সময় সে গজ্ রাতে গজ্ রাতে উঠে চলে গেল। শুভেন্দুর কিন্তু একটা বদ্-গুণ ছিল। বিমলদা' যত চটত, সে ততই হেসে কুটি-কুটি হ'ত।

বিমলদা' চলে গেলে সে একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বললে, আচ্ছা, বিমলদা'র কি হ'ল বলত?

সকলকে স্তম্ভিত কোরে দিয়ে একটা মূর্ত্তি ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললে, আমারই মতন অবস্থা বোধ হয়!

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, আমায় চিনতে পারলে না?

এইবার চিনতে পারলুম। "আমায় চিনতে পারলে না" এই কথা বলার ভঙ্গীটি আমার পরিচিত। সেবারেও এসে বলেছিল, "চিনতে পারলে না?" এইবার নিয়ে তিনবার হ'ল। চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। আর হবারই কথা। অনেকদিন হ'য়ে গেল যে!

দেখলুম কাঁধের ঝুলিটি তার তেমনিই আছে—না, বোধ হয় আয়তনে একটু বড়ই হবে। বগলের বাঁশীটি কিন্তু এবার দেখতে পেলুম না। তার বদলে হাতে ছিল একটা বাঁশের লাঠি।

বললুম, সব কুশল ত?

শুধু ঘাড় নাড়লে।

বললে, লোকটাকে ক্ষ্যাপালে কেন?

বুঝলুম বিমলদা'র কথা বলচে।

তারপর শুভেন্দুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, এ লোকটার হাসিটা ভালো নয়।

শুভেন্দু তখন থ হ'য়ে গেছে।

আগন্তুক বললে, তোমরা মানুষ চিনলে না? অথচ মন খুলে 'পারিনি' বলতেও তোমাদের বাধে, এমনি তোমাদের অহঙ্কার। কিন্তু আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না। মানুষের দুদিনের কার্য্যকলাপ দেখে তার সম্বন্ধে একটা মতামত দাঁড় করাতে তোমাদের একটুও বাধে না, আশ্চর্য্য! অবাক্ হ'য়ে শুনছ কি? আমি তোমাদের শুধু কথা শোনাতে আসি নি। তারপর অরিন্দমের দিকে আঙুল দেখিয়ে নিঃসঙ্কোচে বললে, এই লোকটা তোমাদের দলে কতদিন রয়েচে? একে একবার পুরীতে যেন দেখিছি ব'লে মনে হচ্ছে। কি হে সমুদ্রে যখন চুবনি খাচ্ছিলে মনে পড়ে?

সকলের দৃষ্টি অরিন্দমের মুখের উপর। তার মুখ তখন রাঙা হ'য়ে উঠেচে। আগন্তুক বললে, থাক্ থাক্, বড্ড এলোমেলো কথা বলচি, না? দাও ত এক গ্লাস জল, বড্ড হাঁফিয়ে গেছি।

তাকে জল দেওয়া হ'লে সে এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা নিঃশেষ কোরে গ্লাসটা আমার হাতে দিতে বললো, রাগ ক'রলে?

তারপর একটু যেন কি ভেবে বললে, আজো আবার তোমায় ভোগাতে এসেছি... তারপর একটু থেমে বললে, ভয় নেই আজ আর কোথাও ছোটাবো না। মুখে সেই আশ্চর্য্য হাসি!

বললুম—আফিং?

—না, সে বালাই আর নেই—ছেড়ে দিয়েচি। একটু থেমে বললে, কিছু হাত-খরচা।

বললুম—আচ্ছা সে হবেখ'ন, আজ ত আর যাওয়া হচ্ছে না।

সে কিছুই না ব'লে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইল। এ সেই দৃষ্টি—যার সামনে আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলি। আজ ত এ নতুন নয়! এর আগে দুবার হ'য়ে গেছে। প্রথম যেবার এসেছিল, তখন আমার কৈশোর। হাতে একটা বাঁশের বাঁশী ছিল—সে বাঁশীর ফুঁয়ে ফুঁয়ে কি যে মধু ঝরেছিল সেদিন! তারপর সে যখন দ্বিতীয়বার এসেছিল—সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্যে—আঁখি ফুরিয়ে গেছ্‌ল—তাই চাইতে। আর আজ, এই। এর সঙ্গে যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়!

বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্যে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছলুম। আত্মস্থ হয়ে দেখি, বন্ধুদের সব পালিয়েছে, শুধু অরিন্দম নিতান্ত অপরাধীর মতন মুখ নিচু ক'রে চেয়ারটিতে ব'সে আছে।

হঠাৎ ছোট-ছোট একদল ছেলে-মেয়ে কোথা থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দোর-গোড়ায় হল্লা করতে সুরু ক'রে দিয়েছে। অন্য সময় যাকে সব চেয়ে নিরীহ দেখি সেই মিন্টুটাই কিনা বল্‌চে, অজিতকা' পাগ্‌লাটা কোথায় গেল বলনা।

এর আগেরবারে এদেরই দাদা-দিদিদের এমনি কোরেই এর পেছুনে লাগ্‌তে দেখেছি। ছেলেদের এ সনাতন অভ্যাস! এতে দোষ দেওয়া চলে না। তবুও ধমক দিয়ে তাদের তাড়াতে হ'ল।

ছেলের দলকে রাস্তা পর্যান্ত এগিয়ে দিয়ে এসে দেখি, অরিন্দম সেইখানটিতে ঠিক একইভাবে ব'সে আছে—আর, আগন্তুক নেই। ঘরটা পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা—একটু বেশীই লম্বা। পশ্চিম দিকে জানালাও নেই, দরজাও নেই, বড় ঘুপ্‌সী-পানা। তাই এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে দিকটায় এখন আর দৃষ্টি চলে না।

হঠাৎ আর্ত্তনাদ ক'রে সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই আগন্তুক। দেখি ডান হাতের মুঠোয় একটা কালো সাপের মাথা। আর সেই ভুজঙ্গ নিজের দেহ দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে তার বাহুটিকে আলিঙ্গন ক'রেছে। তার বাঁ পায়ে বুড়ো আঙুলের গোড়া থেকে টস্‌টসিয়ে রক্ত ঝরছে।

মুখদিয়ে বেরুলো আমার—"অরিন্দম কাঁচিটা শীগগির।"

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল, অরিন্দম তা এনে দিলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আগন্তুকের হাতটাকে সাপটা তার সমস্ত অঙ্গ দিয়ে এমন নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধ'রেছে—যার ভেতর দিয়ে কাঁচি ত দূরের কথা একটা ছুঁচও চলে না। হাতের হাড়টা যেন এখুনি ভেঙে যাবে এমনি অবস্থা।

উপায় কি!

আগন্তুককে বললুম তুমি মুঠোটা খুলে দাও, ওটা চ'লে যাক্।

সে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানালে, তোমরা র'য়েচ যে। যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করতে করতে বল্‌লে, বড্ড বিষ, ছেলেগুলো চলে গেছে? ওঃ ওরা আমাকে পাগল কোরে সেই যে আমার সঙ্গ নিয়েচে, আজ জীবন নিয়ে তবে ছাড়লে। তোমার কাছে হাত-খরচা কিছু নিতে এসেছিলুম, তাই দিয়ে আমার পথ-খরচা কোরো।

তারপর একবার ঘাড় তুলে নিজের হাতটার দিকে চেয়ে বল্‌লে, এটাকে ছাড়বার কথা বল্‌ছিলে? এখন ছেড়েও আর লাভ নেই। একটু থেমে বল্‌লে, যখন আফিং খেতুম তখন. বেটা একদিনের তরেও ছোঁয়নি—তা হ'লে টের পেত।

অতি কষ্টে কথাগুলি শেষ ক'রে ঝিমোতে লাগলো। মনে হ'ল যেন আরো কি বল্‌তে চাইছে। কিন্তু ঠোঁট দুটোই শুধু কেঁপে উঠলো, কথা আর বেরুলো না—শুধু ইঙ্গিতে দেখালে সেই ঝুলিটা।

কয়েকটা মুহূর্ত্ত শুধু। কিন্তু সে কী অপরিসীম মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় ছবিই না তার মুখে ফুটে উঠতে দেখেছি মা!

বল্‌লুম—অরিন্দম, মনেতে বল পাচ্ছি না, কাউকে ডাক না ভাই!

উত্তর যে দিলে সে অরিন্দম নয়, তোর মা। বল্‌লে, ঠাকুরপো আমায় ডেকে দিয়ে ওঝা ডাক্‌তে গেছে, তারপর হঠাৎ আঁৎকে উঠে দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বল্‌লে, ওঃ সাপটা যে ওকে জড়িয়ে রয়েচে!

বল্‌লুম, ঐ রকম কোরেই ওর শেষ হ'য়ে গেছে, আর ওঝা এসে কি ক'রবে?

তোর মা লণ্ঠনটা তুলে ধ'রে মুমূর্ষুর মুখটা দেখে বল্‌লে, এ যে চেনা মুখ গা,—এ সেই পাগলটা না?

তোর মাকে তখন তিরস্কার কোরে বলেছিলুম, পাগল বোলে আর সম্বোধন কোরো না ওকে, তাতে ওর অন্তরাত্মা শান্তি পাবে না। অসভ্য ছেলের দল ওকে ক্ষেপাবার জন্যে এসেছিল, ও তখন ঐ কোণের ভেতর চৌকির তলায় লুকিয়েছে। ছেলেদের যে ও এত ভয় করত তাতো আগে জান্‌তুম না। ছেলেদের দিলুম তাড়িয়ে, তারপর ও বেরিয়ে এল এই কালকে হাতে জড়িয়ে। পা-টা দেখিয়ে বল্‌লুম, ঐখানে ও ছোবল বসিয়েছে।

দুজনে নিতান্ত অসহায়ের মতন মুমূর্ষুর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম। কতক্ষণ কেটেছিল জানি না, দেখি অরিন্দম হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বল্‌চে ভেতরে যাও বৌদি, ডাক্তার সাহেব এসেছেন, ওঝা একটু পরে আস্‌বে।

সাহেব রোগীর নাড়ী পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে আঁৎকে উঠে, "O my lord, the devil is there" ব'লে একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ ক'রে পেছিয়ে এল ভয়ে। তারপর কোন রকমে একটু সাহস সঞ্চয় কোরে তাকে পরীক্ষা কোরে বল্‌লে Sorry, he has already expired.

ডাক্তার চ'লে গেল।

অরিন্দম বল্‌লে, সাপটা একটুও নড়েনি দেখেচ! ওটাও শেষ হ'য়ে গেল না কি?

বল্লুম—অরিন্দম, ওযার অপেক্ষা কোরে কাজ নেই আর—কোমর বেঁধে ফেল। শেষে আমাদের হাতেই ওর কাজটা সারা হবে কে জানত!

আমাদের হাতের নাড়া পেয়ে দেখি, সাপটা আল্‌গা হ'য়ে গেল—নাঃ, ওটাও নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।

মানুষেরও একটা বিষ আছে শুনেছি এ হয়ত তারই ক্রিয়া! দেখলুম, মুখটা ওর থেতো হয়ে গেছে।

চিতার কাঠটা ঠেলে দিতে দিতে অরিন্দম বল্‌লে, পুরীতে সে যখন ডুবে যাচ্ছিল্লো তখন সেইই নাকি ওকে বাঁচিয়েছিল। ঈশ্বরের কি বিচিত্র লীলারহস্য মা!

দাহ ক'রে যখন ঘরে ফিরলুম তখন ভোর হ'য়ে গেছে।

দুর্ব্বহ কেরাণী জীবনের উপর নিদারুণ অভিসম্পাতের মত মা ধীরে ধীরে উদয় হ'ল আর একটি সোমবারের সকাল—নিতান্ত একঘেয়ে একটানা। কিন্তু সেদিন আর অফিসে যাইনি মা। ঝুলিটা কাছে নিয়ে বসলুম, তোর মাও পাশে এসে ব'স্‌লো। তা থেকে বেরুলো একটা আফিংএর কৌটো, একটা পেন্সিল, একটা ছুরি, একটা আধ-পোড়া চুরুট, খান দুই কাপড়, একটা ছেঁড়া গেঞ্জি, আর একটি কৌটো আর ন্যাকড়া-জড়ানো বইয়ের মত কি একটা জিনিষ।

অনেকগুলো কাপড়ের ফালি জড়ানো—ভাজের পর ভাজ খুলেই চলেছি—শেষে ফালির চেয়েও বেশী কাগজ-জড়ানো, যা বেরুলো, তা বইও নয় খাতাও নয়—এক-খানা ভাজ করা কাগজে কি লেখা। এরই এত যত্ন? আশ্চর্য্য!

কিন্তু না, বিস্ময়ের ঢের বাকী ছিল তখনো।

মেয়ে বল্‌লে, চিঠিতে কি লেখা ছিল বাবা?

—চিঠিত নয় মা, ওটা এমনিই একটা লেখা, ঠিক ডায়েরী বলাও চলে না।

"হেডিং"এ লেখা ছিল—আমার জীবনের কয়েক পৃষ্ঠা

—সেটা কোথায় বাবা?

—সেটা থাকতো আমারি বাক্সে মা, তোর মা তাকে যত্ন কোরে একখানা গীতার ভেতর রেখে দিয়েছিল—অনেকদিন আর তা দেখা হয়নি, আচ্ছা দেখত মা আমার বাক্সটা।

কমলা উঠে গেল।

মিনিট কয়েক পরে ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে সে বল্লে, পেয়েছি বাবা, গীতার ভেতরেই ঠিক ছিল ত?

বললুম, তোর মা ছিল—যাকে বলে সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মী, কোন কাজে কখনো অবহেলা দেখিনি। আচ্ছা, পড়ত মা শুনি।

—তুমিই পড়না বাবা।

তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, বাবার মুখে গল্প শুন্‌তে খুব ভালো লাগে, না?

কমলা তার ডাগর চোখদুটি আমার মুখের উপর তুলে ঘাড় নাড়লে।

বললুম, তবে পড়ছি শোন্।

আমার যক্ষ্মা হ'য়েছিল—রাজযক্ষ্মা। হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি, কবরেজী প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র মন্থন ক'রে যখন একটুও সুধা উঠল না, যখন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-হোম-যজ্ঞ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ও নৈষ্ঠিক ক্রিয়াকলাপেও কোন সুফল ফল্‌ল না, যখন পুরী, সিমলা, আলমোরা, নাইনীতালেও আমার মধ্যে যক্ষ্মা ছাড়া ভালো কোনো পরিবর্ত্তনই আন্‌তে পারলে না, তখন আমার শুভার্থীরা আমার আশা একরকম ছেড়েই দিলে। আর ভুগে ভুগে আমারও মনের অবস্থা এত খারাপ হ'য়েছিল যে, দিনরাত কেবল মৃত্যু-কামনা করতুম।

কিন্তু না চাইতেই সব জীবের কাছে আসে একদিন, আমি কায়মনোবাক্যে চেয়েও তা পাইনি।

আমার খুড়তুতো দাদা ছিলেন পাটনার এ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন। তাঁর উপরে যিনি ছিলেন, তিনি সাহেব। এই সাহেবটি ছিলেন রিসার্চ স্কলার। দাদা ছিলেন তাঁর খুব প্রিয়।

তিনি বল্লেন তোমার ভাইকে আমি দেখতে চাই। তখন পাঁচ বছর ভোগা হ'য়ে গেছে। কিন্তু অত ভুগেও শরীরে তখনো একটু বল ছিল। যাওয়া গেল পাটনায়। সাহেব বল্‌লে, ১৮ বছরের মিয়াদ—অর্থাৎ কপালে আরো তেরটা বছরের দুর্ভোগ!

তারপর এক অলৌকিক ঘটনা।

পাটনায় হাসপাতালেই শুয়ে আছি। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। বোধহয় অমাবস্যার কাছাকাছিই কি একটা তিথি হবে। চৈত্র মাস। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি তেমন চলে না। যেন অন্ধকারের তৈরী একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালে দৃষ্টি আমার বাধা পেয়ে ফিরে আস্‌ছিল।

তারপর কখন তন্দ্রা এসেছিল জানি না—দেখলুম জটাজুটবিলম্বিত এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী মুর্ত্তি, গলায় ও বাহুতে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, বাম হাতে সুদীর্ঘ এক ত্রিশূল সিঁদুর মাখানো।

তিনি যেন বললেন, আমি ত্রিকূট পাহাড়ে থাকি—সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করিস। ব্যস্ তারপর উধাও। বিছানা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। ঠিক স্মরণ করতে পারলুম না, ঘুমিয়ে

ছিলুম, না, জেগেছিলুম। মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। দেখাই যদি পেলাম, তো কবে কোন্ সময় কোন্ জায়গায় দেখা হবে, কিছুই জানতে পারলুম না কেন?

পরদিন একথা দাদাকে বললুম। তিনি বললেন, ও স্বপ্ন। স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না। তবে, মনে যখন তোর একটা ধোকা লেগেছে, তখন ঘুরেই না হয় আয় একবার, জায়গাটাও তো দেখা হবে।

দাদাই আয়োজন ক'রে দিলেন ত্রিকূট যাবার। সঙ্গে একজন লোক দিলেন। বৈদ্যনাথধাম ষ্টেশনে লোকটির হাতে কিছু দিয়ে বললুম বাবা বৈদ্যনাথজীকে দর্শন কোরে বাড়ী ফিরে যাও। আমার সঙ্গে যেতে পাবে না।

লোকটা হাতে পায়ে ধ'রে খুব কাঁদাকাটা করতে লাগলো, বললে ডগ্‌দর বাবুকো হাম্ কেয়া বোলে গা বাবুজী? অর্থাৎ কি কৈফিয়ৎ দেবো ইত্যাদি। যেতে কিছুতেই চায় না। শেষে দশ টাকার একখানা নোট ঘুস্ দিয়ে খুব বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করলুম।

কিন্তু আশ্চর্য্য ত্রিকূটে গিয়ে যেন দ্বিগুণ বল পেয়ে গেলুম। হ'য়ত মনেতেই পেয়েছিলুম।

যে-পথ দিয়ে সাধারণতঃ সকলে ওঠে পাহাড়ে—তারই আরম্ভ যেখানে, সেখানে একটি মন্দির আছে। আর মন্দিরের পাশেই ঝরণা। ঝরণাটা যে কোথা থেকে আরম্ভ হ'য়েচে তা কেউ বলতে পারে না। পাহাড়ের পাদমূলে যে জায়গাটার কথা বলচি সেখানে এর মুখটা বাঁধিয়ে দেওয়া হ'য়েচে। এই স্বচ্ছতোয়া ঝরণার কোলে ব'সে কি ভাবচি এমন সময় একটা ১৫।১৬ বছরের পাহাড়ী ছেলে এসে বললে, বাবু গাইড?

পাহাড়ে যে গাইড দরকার হয় তা আমি ভুলেই গেছলুম।

সে আমায় ইতস্ততঃ করতে দেখে যা বল্লে, তার সার মর্ম্ম হ'চ্ছে এই যে, শীগগির সন্ধ্যে হবে। আর সন্ধ্যের পর থেকে এখানে বাঘের উপদ্রব হয়, সুতরাং একজন গাইডের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

আমি বললুম তোমরা বাঘকে ভয় করো না?

সে উত্তরে জানালে, যেহেতু তারাও মানুষ, তাদেরও ভয় বোলে একটা পদার্থ আছে, কিন্তু ঐ যে মন্দির দেখা যাচ্ছে, ওখানে বাঘের দেবতা আছেন। বৎসরের তিনটি নির্দ্দিষ্ট দিনে ওখানে তারা পূজা দেয়। তাই বাঘ আর সকলের উপর উপদ্রব করলেও, তাদের কিছু বলে না।

রোগে ভুগে ভুগে আমি একরকম মোরিয়া হ'য়েই উঠেছিলুম। তবুও যার জীবনের আশা সকলেই ছেড়ে দিয়েচে, তার নিজের দেহটার প্রতি মমত্ববোধ বোধহয় একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

মনে মনে বললুম, হে বাঘ-দেবতা, তোমায় কোনদিন পূজা আমি দিইনি। আমার জীবনের প্রতি মায়া নেই একথা বলব্ না। তবুও তোমায় নিজের গরজে বাঁচাতে হয় বাঁচিও। আজ আর আমার দিক থেকে কোন 'আপীল' নেই।

ছেলেটা যখন নানা কৌশলে নানারকম ভয় দেখিয়েও আমায় টলাতে পারলে না, তখন সে চলে গেল। যাবার সময় তার নিজের ভাষায় যে কথাগুলো বলতে বলতে গেল, তার ভাবার্থ এই যে, শের নামক জীবগুলির আজ একটা বিশেষ পর্ব্ব লেগে যাবে, কেননা, অনেকদিন পরে আজ তারা নরমাংস ভক্ষণে খুবই যে আনন্দিত হবে, তাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা তখন হ'য়ে গেছে। বোধহয় বন্দনায় সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সন্ন্যাসী মূর্ত্তিরই ধ্যান করছিলুম, [illegible] মানুষের কণ্ঠস্বরে চমক ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি, সম্মুখে এক গেরুয়াধারী প্রৌঢ় বয়সী বাঙালী সাধু।

সাধুজী বোধহয় আমাকে এই বিজনে নিঃসঙ্গ বসে থাকতে দেখে কিছু অবাকই হ'য়েছিলেন।

বললেন—দেওঘর যাবার শেষ মটর-খানাও তো চলে গেল বাবা, আপনি এখনো ব'সে?

বললুম—দেওঘর থেকেইত এই আসচি।

সাধুজী ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ কোরে বললেন, এই রাত্রে? কেন? বাঘের মুখে প্রাণ দিতে? বিয়ে-থাওয়া করা হয়নি বুঝি? বাড়ীতে কি মা-বাপও নেই? এ গোঁয়ার্ত্তুমি ভালো নয়; 'জানে'র মায়া প্রত্যেকেরেই থাকা উচিত।

সাধুজী আমায় নিঃসংশয়ে তাদেরই মধ্যে এমন একজন ভেবে নিয়েছিলেন যারা শুধু বেড়াবার উদ্দেশ্যেই ত্রিকূট আসে। এতে তার বুদ্ধিকে দোষ দেওয়া চলে না। কেননা, এরকম হামেসাই হ'য়ে থাকে। তবে রাত্রে কেউ আসে না। একবার শুধু একটি ২২।২৩ বছরের যুবককে সন্ধ্যার সময় পাহাড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তাকে নামতে কেউ আর দেখেনি। পরদিন তার পরনের কাপড় ও জামার কয়েকটা টুকরো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা গিয়েছিল। পরে সাধুজীর মুখেই একথা শুনেছিলুম।

সাধুজীকে যখন জানালুম যে তাঁর অনুমান ভুল, সাধারণে যে-যে কারণে ত্রিকূটে আসে, তার একটা কারণও আমার ঘটেনি, এবং আমার এখানে আসার এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, যা প্রয়োজন বিবেচনা করলে ধীরে সুস্থে তাঁকে বলতে পারি—তখন তিনি বললেন, ঐ-যে মন্দির দেখচ—ঐখানে আমি থাকি, আজ অমাবস্যা, আজ দেবতার এক বিশেষ পূজা আছে। তুমি আজ মন্দিরে প্রসাদ পাবে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

ভাবলুম সেই স্বপ্ন দৃষ্ট মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ যে সাধনার মেলে, তাতো আমার সেই জানা, তবুও অনন্ত লীলাময়ের দুজ্ঞের দুর্ভেদ্য রহস্যজাল ভেদ করবার কারো ক্ষমতা আছে কি? তাঁর অপার করুণার জ্যোতিঃ কোন্ দিক দিয়ে কখন্ কার উপর বিচ্ছুরিত হয় কে বলতে পারে?

সাধুজী চলে গেলেন।

কিন্তু মন আমার চঞ্চল।

মৃত্যুকে কামনাই করেছি, কখনো ভয় করিনি। ভাবলুম, উঠে যাই পাহাড়ের উপর, কী হবে মন্দিরে গিয়ে? সেখানে ঐ লোকটির সামনে সেই মহাপুরুষ যদি আমায় দর্শন না দেন? সংশয় জাগলো মনে।

প্রাণে এক অদ্ভুত উন্মাদনা অনুভব করলুম। স্থির করলুম, মন্দিরে যাবো না। কিন্তু এই অমাবস্যার নিঃচন্দ্র অন্ধকারে অজানা অচেনা পথে পাহাড়ে ওঠাও তো শুধু দুঃসাহসিক নয়, অসম্ভব।

তবুও সে স্থান ত্যাগ করলুম। কি জানি, সাধুজী যদি ফের আসেন! তখন আর পালাবার উপায় থাকবে না।

হাতড়ে হাতড়ে কতকটা উঠে হাঁফিয়ে পড়লুম। মাথায় তখন রক্ত চ'ড়ে গেছে। ভাবলুম, যার চোখের সামনে অনাগত তেরটি বৎসরের ব্যাধি-ক্লিষ্ট নির্ম্মম রূপ দিবারাত্র জাগছে তার এত সহজে বল হারানো চলে না।

একটু বিশ্রাম কোরে আরো খানিকটা হাতে বুকে ভর দিয়ে উঠলুম। তখন মোরিয়া হ'য়ে উঠেছি। অমাবস্যার রাত্রি—মহাপুরুষের দর্শনলাভের এইই ত প্রশস্ত সময়!

এই রকম কিছুদূর উঠি, আবার বিশ্রাম করি, আবার উঠতে থাকি।

দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি কানে আসে, বুঝলুম মন্দিরে আরতি হচ্ছে।

দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ হঠাৎ যেন একবার দোলা দিয়ে উঠলো—বোধ হয় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে। তারপর সর্ব্বাঙ্গ থর-থর কোরে কাঁপতে লাগলো; মাথার ভেতরে কে যেন তখন অবিশ্রান্ত যাঁতা ঘুরিয়ে চলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্দ্দম কাশি। তখন বুকে যেন কে আর একখানা যাঁতা নিয়ে বসেছে।

তারপর এক ঝলক...দু ঝলক...

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কার স্নিগ্ধ কর-স্পর্শে জেগে দেখি আমারই অভীপ্সিত দেবতা আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

তখন রাত্রির অন্ধকার ভালোভাবে কেটে যায় নি, অথচ উষার আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে ধীরে ধীরে উঁকি দিচ্ছে—এমনি অবস্থা।

পর মুহূর্ত্তেই চোখ দুটো কে যেন জোর কোরে বন্ধ কোরে দিলে—এত ঘুম। ঘুমিয়ে এত শান্তি জীবনে অনুভব করিনি।

তখন পাহাড়ের গায়ে উদয়-অরুণের তরুণ-আলোর ঝিকিমিকি।

চোখ খুলে দেখি সম্মুখে ফুলের সাজি-হাতে সাধুজী। দৃষ্টিতে তাঁর স্নেহের তিরস্কার।

যা ঘটেছিল তাঁকে জানাতে তিনি হেসে বললেন, দুর্ব্বল মস্তিষ্কে মানুষ ওরকম কত খেয়াল দেখে। তিরিশটা বছর এই ত্রিকূটে কাটিয়ে দিলুম, একটা দিনের তরেও ওরকম কাউকে দেখিনি। তারপর একটু হেসে বল্লেন, খুব বরাত জোর যে বাঘের পেটে যাও নি। কাল আরতি হ'য়ে যাওয়ার পর কত খুঁজলুম। ভাবলুম মানুষের মৃত্যু কখন কোথায় কি ভাবে যে বাঁধা থাকে, তা একটা তাজ্জব ব্যাপার। তোমাকে যে আবার দেখতে পাবো এ ভাবিনি। তোমার আয়ু দেখছি নিতান্তই ফুরোয়নি!

—সেই কামনাই কি করছিলেন সাধুজী?

জিহ্বার প্রান্তভাগ দাঁতে চেপে সাধুজী বললেন, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। তুমি ছেলে, মানুষ তাই ওকথা বললে, অমঙ্গল কামনা আমরা কখনো কাহারো করি না।

শরীরের যেন আর কোন গ্লানি নেই। সেই মহাপুরুষ তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে আমার সমস্ত বেদনা নিঃশেষে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছেন।

দেখলুম সাধুজী পূজার ফুল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। প্রাণে এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করছিলুম অপূর্ব্ব অননুভূত। প্রভাতের রূপ যে এমন অনির্ব্বচনীয় সুন্দর—এ উপলব্ধি তো কখনো হয় নি!

আমার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় নৃত্য কোরে উঠল প্রকৃতির আনন্দের এ বিপুল সমারোহ দেখে। পাখীর কাকলি, ভ্রমরের গুঞ্জন, ফুলের সৌরভ—এ সবের অপূর্ব্ব সম্মিলনে যে অদৃশ্য দেবীর আনন্দঘন রূপেরই আভাষ পাচ্ছিলাম—মনে মনে আমার অন্তরের প্রণাম তাঁরই চরণে নিবেদন করলুম।

ফুল তুলে ফেরবার সময় সাধুজী বলে গেলেন, মন্দিরে দেখা কোরো। বললুম, নিশ্চয়ই; বাঘের পেটে যখন যাইনি, তখন নিজের পেট রেহাই দেবে না।

সাধুজী হেসে বললেন, প্রসাদ পাবে।

তারপর তিন দিন সেখানে ছিলুম। রাত্রে সমস্ত চিত্তকে সজাগ কোরে রাখতুম মহা-পুরুষের প্রতীক্ষায়।

পাটনায় ফিরে গিয়ে দাদাকে যখন সমস্ত কথা বললুম, তিনি স্তব্ধ হ'য়ে সব শুনে বললেন, দাঁড়া, সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসি। সাহেব এসে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনলেন, তারপর আমাকে বেশ কোরে পরীক্ষা কোরে দাদার দিকে চেয়ে বললেন, yes, he is radically cured.

দাদার আনন্দ আর দেখে কে? তিনি

সেদিন আমায় মাথায় তুলে নাচতে বাকী রেখেছিলেন।

পরদিন সকালে শয্যা ছেড়ে উঠি উঠি করছি, বাবা এসে বল্লেন, তোকে সাহেব ডাক্‌ছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখা করবি। ব'লেই ব্যস্ত হ'য়ে চলে গেলেন।

গিয়ে দেখি সাহেবের কুটীরের সাম্‌নে যেন এক উৎসব লেগে গেছে। তিনখানা লরী দাঁড়িয়ে, নানারকম জিনিষপত্তরে বোঝাই একখানা, আর প্রায় চল্লিশ জন লোক দাঁড়িয়ে আছে আর। দুখানা লরীর কাছে।

সাহেব বল্লে, তোমাকেও যেতে হবে।

বাবা পাশেই ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বল্‌লেন, সাহেব যে ত্রিকূট অভিযানে চলেছেন।

সাহেবের অনুরোধে যেতে বাধ্য হলুম।

কিন্তু সমারোহ কোরে যে দেব-দর্শন মেলে না এ কথা সাহেবকে কেমন কোরে বোঝাবো?

বলাই বাহুল্য মহাপুরুষের দর্শন-লাভ সাহেবের ভাগ্যে ঘটেনি।

ফিরে এসে আরো দিনকতক পাটনায় ছিলুম। তারপর আরম্ভ হ'ল আমার নিরুদ্দেশযাত্রা। পথকেই বেছে নিলুম জীবনের সঙ্গীরূপে, ভাবলুম পথের হিসাব না কোরে চল্‌বো শুধু চলার আনন্দে। এ আনন্দই হবে আমার পাথেয়। চল্‌তে চল্‌তে পথের কোনখানে যদিই তাঁর দেখা মিলে যায়!

হঠাৎ একদিন দেখি, কতকগুলো ছেলে আমার পেছুনে লেগেছে। তাদের মধ্যে কেউ বল্‌চে, এই পাগলা, তোর ঘর কোথা? কেউ বল্‌চে, তুই অমন কোরে চল্‌চিস্ কেন, কেউ বা বল্‌চে, তোর মাথায় কি? কে একজন আমার কাছা খুলে দিয়ে বল্‌লে, এই পাগলা, তোর লেজ কেন। আর সকলে তখন হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। আমার এই বিপন্ন অবস্থা দেখে এক ভদ্রলোক ধমক দিয়ে ছেলেদের নিরস্ত ক'রলেন। তাই কি সহজে থাম্‌তে চায় তারা?

তারপর প্রায়ই এমনি হয়।

একদিন এক গ্রামের পথে চলেছি, দেখি পথের উপর দুটো মেয়ে কাঁধ ধরাধরি কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত আর হবে? বড়-জোর নয় কি দশ বছরের। শুন্‌লুম একজনে অপরজনকে বল্‌ছে, দেখ ভাই, লোকটা কেমন আপন মনেই হাস্‌চে! অপরজন বল্‌লে, ও বোধ হয় পাগল ভাই।

কি জানি কেন লোকে পাগল বলে আমাকে!

—থাম্‌লে কেন বাবা?

—এই খানেই যে শেষ মা!

কমলা এক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল। তারপর বল্‌লে, হ্যাঁ বাবা, সে কি সত্যই পাগল ছিল?

—না মা, পাগল সে ছিল না। তবে যত্নের অভাবে তার চেহারা ছিল রুক্ষ, ময়লা জমে জমে মাথায় গেছল জট পাকিয়ে। দাড়ি-গোঁফ তো আর কামাত না! কাজেই চেহারাটা ছিল কতকটা পাগলেরই মতন, তার উপর পায়ে থাক্‌ত না জুতো; কাপড়-জামা—তাও ছিল মলিন শতছিন্ন।

কমলা খানিকক্ষণ চুপ কোরে বসে রইল।

তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে ধরা গলায় বল্‌লে, আজ আর কিছু করতে ভাল লাগছে না বাবা।

তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে, সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লুম, নাই বা কর্‌লি আজ কিছু মা, কাল রবিবার আছে, মায়ে-বেটায় লেগে যাবো'খন কাজে।

পরক্ষণেই কমলা ব্যগ্রভাবে বল্‌লে, কৈ লকেটের কথা ত বল্লে না বাবা?

—তারই ঝুলির মধ্যে ওটা পেয়েছিলুম কিন্তু ওর রহস্য আমার কাছে আজো অনুদঘাটিত মা!

বিয়াত্রিচের স্বপ্ন

দিলীপ দাশগুপ্ত

স্বপ্ন দেখেছ বিয়াত্রিচে গো, চমকি উঠিলে কম
রাঙা প্রভাতের সূর্য্য গাহেনি গান—
সাগরের কূলে জলপরীদের কলতান আসে হেন
বন্দনা করে ভাঙে দেবতার মান।

ত্রিশাস্থিমাস্ কোটেমিতো তবু চোখে আসে কেন জল
আকাশের তারা ফুলের গন্ধ সম
নভোনীল ঐ আকাশের বনে ছুটে চলে অবিরল
কানাকানি করে : কোথায় হে নিরুপম! :

স্বপ্ন দেখেছ সত্যিই তুমি বিয়াত্রিচে গো ভাই
আধার ঝরিছে এখনও পৃথিবী গায়—
প্রতিধ্বনির ঘুম-কাতুরে সে চোখের কাজল নাই
ছেয়ে আছে তা যে আমাদের অভিনয়।

বিয়াত্রিচে গো! স্বপ্ন দেখেছ পাহাড়ের চূড়া বেয়ে
এখনও আসিছে মেরুর বুকের জ্বালা—
প্রভাত জাগেনি মেঘ মুড়ি দিয়ে সরোবর পানে চেয়ে
ঝরিয়া পড়েনি এখনও কুমুদ বালা।

সারা বিশ্বের ধ্যান ভেঙে তুমি দিওনাকো আজ রাতে
বিয়াত্রিচে গো, লক্ষ্মীটি বোজ চোখ—
শিশির বিন্দু ঝরালে বা কেন অশ্রুর বেদনাতে
মরে যাবে ভাই মরে যাবে যে আলোক!

গোপনে তোমায় ডাকে যে ডাকুক
নীরবে ওকের বনে
কান্নায় তার ব্যাকুল কুসুম দল—
ঘুম ভেঙে যদি বিদ্যুৎ আনে—নীলাভো চোখের কোণে
লজ্জায় তুমি হবে নাকি চঞ্চল?

অ্যান্ এক্সপেরিমেন্ট

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

(১)

বিপুলের থীসিসের মূল বক্তব্য এই :—

বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবারে ফাল্গুন মাসে বিবাহ সংখ্যা কম। কারণ বসন্তকাল মড়ক মহামারীর ঋতু, বাড়ীতে বাড়ীতে চিকেন্ পক্স, স্মল্ পক্স একটা না একটা লাগিয়াই আছে। রোগীর সেবা করিবে না, ছেলেমেয়ের বিবাহ দিবে? প্রকৃতিতে যে প্রেমের অরুণরাগ ফুটিয়া উঠে তাহাতে তরুণ মন গাছপালার পানেই ছুটিয়া চলে, বোটানি পড়ার সুবিধা হয়, পুষ্পের গর্ভকেশরের রেণু আঙুলের ডগায় মাখিয়া গালে বুলাইতে ভাল লাগে; কিন্তু ঘরের ভিতরে বিয়ে করিবার মত প্রণয়রাগ তেমন জমিয়া উঠেনা, যেমনটি জমিয়া উঠে ঐ আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে। গ্রীষ্মকালে নববধূকে লইয়া খালি গায়ে ছাদে শুইবার তেমন সুযোগ ঘটে না, অতএব উহাও অনুকূল নয়। কাজে কাজেই বিবাহ বেশি হয় বর্ষাকালে, যখন বাঙালীর মন সত্যসত্যই সজলমেঘ-মেদুরাম্বর তলে বিরহ বেদনায় মনব্যথাতুর হইয়া ভেকরবের সহিত সমসুরে গান ধরিয়া দেয়—তুমিও একাকী, আমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে, ইত্যাদি।

বর্ষা ঋতুতে বাংলায় ঘরে ঘরে এই যে তরুণ-তরুণীর বিরহভাব ও পরে বিবাহ ইহার পরম মিলন ঘটে অধিকাংশই পূজার ছুটিতে উৎসবমুখর কক্ষে কক্ষে, গ্রামে গ্রামে, মধুপুরে, গিরিডিতে, দেওঘরে, শিলংএ, দার্জ্জিলিংএ। এই সকল মিলনের পরিণতি ঘটে পরবর্ত্তী বৎসরের শ্রাবণ ভাদ্র মাসে। আর অগ্রহায়ণ মাসে বাকী যে সব বিবাহ হয় তাহার পূর্ণ মিলন বড়দিনের ছুটিতে, শীতের আমেজে সুদীর্ঘ রাত্রির নিভৃত অবকাশে। এবং আর এক প্রস্থ আঁতুড় ঘরের কাজ বাড়ে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে। খবর লইয়া দেখা গিয়াছে নার্সের উপার্জ্জন সবচেয়ে বেশি হয় শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত। এবং কলিকাতায় যাহারা ছিন্নবস্ত্রখণ্ড প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরে, অথবা যাহারা পুরাণো কাপড়ের বদলে বাসন বিক্রয় করে, তাহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছে যে, এই কয়মাস তাহাদের ব্যবসায়ে ভাটা পড়িয়া যায়।

অতএব শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাস বাংলার ভদ্রপল্লীতে সন্তান প্রসবের ঋতু। সন্তান-প্রসবজনিত মৃত্যু সংখ্যাও এই সময়ে অধিক। ইহাই কাঁথা সেলাইয়ের কাল, নার্সদের উপার্জ্জনের কাল ইত্যাদি ইত্যাদি—

থীসিসের title অর্থাৎ নাম—Periodicity of consummation of marriage among middleclass Bengalis as a study in social value. বাংলায়—মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহে বিবাহের পরমিলনের ঋতু পর্য্যায় ও তাহার সামাজিক মূল্য বিচার।

থীসিস্ সমাপ্ত করিয়া বিপুল ঠিক করিল এখানি আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেটের জন্য পাঠাইয়া দিবে; এদেশে উহা বুঝিবার মতো লোক এখনো হয় নাই, ও লাইনে কাহারো গবেষণাও নাই। কিন্তু ও ব্যাটারা আবার বৈজ্ঞানিক রীতিতে লেখা চায়, কেবল ষ্ট্যাটিস্টিকস্ চায়। এজন্য মিউনিসিপ্যালিটি ও শ্মশান ঘাটের আপিসে আপিসে খাতা খুলিয়া হিসাব দেখা দরকার, কিন্তু কেহই তাহাকে সে খাতা খুলিয়া দেখিবার সুযোগ দিল না। বিপুল নিরস্ত হয় নাই। সে জানে তাহার হিসাব ঠিকই হইয়াছে, ভ্রান্তির সম্ভাবনা খুবই কম। তবু শ্মশানঘাটে গিয়া কিছুদিন দেখা উচিত সন্তান-প্রসবজনিত পীড়ায় কয়জন প্রসূতি মরে প্রতি সপ্তায়। তাই বিপুল প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিমতলা ঘাটে বেড়াইতে যায় ও প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে।

* * *

সেদিন রাত্রি প্রায় ন'টা। ওপারের আলোকমালার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি বিপুল বসিয়া আছে। মনে তার কত কিছু ভাব, পেটে ক্ষুধা। সে সকালে দশটায় খাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। জলখাবারের পয়সা ছিল না, তাই কিছু খাওয়া হয় নাই। তার বাবা চল্লিশ টাকা পেন্সন্ পান, দাদা বিদেশে রেলে চাকরী করেন। কলিকাতার বাড়ীর একাংশ ভাড়া দিয়া দোতলায় তিনখানি ঘর লইয়া তাহারা বাস করে। বাংলায় এম্-এ পাশ করিয়াছে, অথচ চাকরী জোটে নাই। নিজের পায়ে সে দাঁড়াইবে এ প্রতিজ্ঞা আছে, একেবারে শক্তিহীন সে নয়।

কেবল এই থীসিস্‌টার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, তারপর যা হয় দেখা যাইবে। বিয়ের ভাল সম্বন্ধই আসিয়াছিল, সে স্রেফ্‌ জবাব দিয়াছে, কারণ থীসিস তা হইলে মাটি হইয়া যাইতে পারে। যাহারা থীসিস লেখে তাহারা নিজের জীবনের খাতা খুলিয়া তথ্য সংগ্রহ করে না, ডক্টরেটের মূল উপাদান পরকীয়া গবেষণা।

এমন সময় আবার সেই হৃৎকম্পকারী "হরি হরি বোল"। বিপুল সচকিতভাবে ফিরিয়া দেখিল, মৃতদেহ নারীর না পুরুষের। বধূর শব দেখিলেই সে তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যায়,—কত বয়স? কবে বিয়ে হয়েছিল? কেন মারা গেল? —ইত্যাদি তার প্রশ্ন।

এবার মৃতদেহ নারীর নয়; এক প্রাচীনের। বিপুলের কৌতুহল নাই, সে চুপচাপ বসিয়া রহিল। শববাহকদলের এক ছোকরা তার পাশে বসিয়া নীরবে একটি বিড়ি ধরাইল।

বিপুল অনেকক্ষণ বিড়ি খায় নাই, তাই ধোয়াটা ভালই লাগিল। সে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—মারা গেছেন আপনার আত্মীয় বুঝি?

—হ্যাঁ আমার দাদার খুড়-শ্বশুর।

—কি হয়েছিল?

—সে কথা আর বলবেন না মশাই, কিছুই হয় নি। মিলটনের কাছে কাজ করতেন, সার্জ্জাসমেন ছিল, হঠাৎ সাবেন-মেন্দোর পা পিছলে পড়লেন আর হার্টফেল।

—কি নাম?

—ও: সিদ্ধেশ্বর মিত্র, আপীসের পুরাণো কেরাণী, বড় সাহেব পর্য্যন্ত কনডোলেন্স মেসেজ পাঠিয়াছেন।

ছোকরা আরও অনেক কথাই বলিতেছিল। বসা বসিয়া ঘাড়ে ব্যথা হইয়াছিল, সুখ খুলিয়া তাই একটু ...ভ্যাতের উঠেছ। কিন্তু পাশে আর কোন সাড়াশব্দ নাই। ফিরিয়া দেখিল, ভদ্রলোক কখন নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছেন।

(২)

পরদিন একেবারে সটান মিলটনের আপিসে। দারোয়ানের কাছে বিপুল খবর লইল, আপিসের বড় বাবু অর্থাৎ হেড ক্লার্ক বাঙালী। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া কামরায় প্রবেশ করিল। হাতের দরখাস্ত খানি বাড়াইয়া টেবিলে ধরিল। বড়বাবু হরিনাথ সেন চোখ না তুলিয়াই লেখানি টানিয়া নিলেন, ভাবিলেন টাইপিষ্ট নীরেন আনিয়াছে চিঠিতে সই করাইতে। কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিয়াই অবাক্‌—লেখা আছে,—

Learning from the burning ghat that etc. অর্থাৎ শ্মশান ঘাট হইতে জানিতে পারিলাম মহাশয়ের অধীনে একটি কেরাণীর পদ খালি হইয়াছে—ইত্যাদি।

আয়ত চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া হরিনাথ বাবু চাহিয়া দেখিলেন এক সুদর্শন যুবক, মুখে বিষাদ ও আশার মাখামাখি ভাব,—bicoloured (দ্বিবর্ণ) টাইপের ছাপার মতো, খানিকটা লাল খানিকটা কালো।

বলিলেন,—একি! কি চান?

বিপুলের কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—আজ্ঞে,—একটা দরখাস্ত,—কাল নিমতলা ঘাটে জানলাম আপনাদের সিদ্ধেশ্বর বাবু মারা গেছেন, তাই যদি......

বড়বাবু কিছুকাল থ মারিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর হো হো করিয়া প্রবল অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন। সিধুবাবু মারা যাওয়ার দুঃখের ধাক্কা তখনো তাল করিয়া সামলাইতে পারেন নাই, কিন্তু এই অভিনব দরখাস্তখানি যেন হঠাৎ তাঁহার গভীর মনটাকে একটা ঝিলমিলি খাওয়াইয়া আবার ঠিক সহজভাবে দাঁড় করাইয়া দিল। মনে মনে তারিফ করিলেন—

সিধুবাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে সত্যই বড় বাবু বেশ মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। বছরের শেষে returns লিখিবার সময়, রাশি রাশি কাজ। সহসা মোটর আপিস সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ কেরাণী পাওয়া দুষ্কর। কি যেন ভাবিয়া শুধাইলেন,—

ইনুভয়েস্‌ লিখতে জানেন?

সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন কি শুধু মিথ্যা কথা বলিবার আর্টের অভাবেই সব পণ্ড হইবে। বিপুল অম্লান বদনে উত্তর করিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, দিল্লীতে এলেন্‌বারির আপিসে অনেকদিন কাজ করেছি।

—তার সার্টিফিকেট আছে?

—আজ্ঞে সঙ্গে নেই, পরে আনিয়ে দিতে পারি।

—টাইপ করতে জানো?

—আজ্ঞে জানি, তবে আমার হাতের লেখাই খুব ভালো।

—হু:, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আজকেই কাজে লাগতে পারবে?

—বলেন ত......

বাক্য শেষ করিবার প্রয়োজন হইল না, হরিনাথবাবু লিখিলেন appointed on forty, অর্থাৎ চল্লিশ টাকায় নিযুক্ত।

বিপুল কাজ করিতে বসিয়া গেল। ইন্‌ভয়েস্‌ সে কোন কালেই লেখে নাই, তবে বাড়ীতে একখানা ফীল্‌ডহাউসের মোটা বই আছে, তার বাবার। ভাবিল, কাল সে পিতার কাছে সব শিখিয়া লইবে।

আর ভাবিল, এইবার তার থীসিস্‌ শেষ হইবে। মাস তিনেক কাজ করিয়াই সে উহা ছাপাইয়া লইবে, এমেরিকায় ছাপানো কপি না পাঠাইলে ও তারা পড়িবেই না। নীরেনের কাছে ফিরিয়া বসিয়া বলিল, ভাই, আপনি একটু সাহায্য করবেন, এসব কাজ

কোন ক্লাসেই করিনি, তাহা মিছে কথা বলে এসেছি. এখন আপনার শরণাপন্ন।

নীরেন বিস্ময়ে বলে, সে কি! সত্যি?

—একেবারে সত্যি, আপনি একটু আধটু কাজ বুঝিয়ে দেবেন, চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।

নীরেন ভাবিল, লোকটা হয়ত পাগল। কি দুঃসাহস। তথাপি বিপুলের চেহারায় এমন একটি মাদকতা ছিল যাহা দেখিয়া পুরুষেরও মন ভুলিয়া যায়। নীরেন মনে মনে বলিল, আহা, ইনি যদি নারী হইতেন। মুখে বলিল, আচ্ছা, বসুন।

সন্ধ্যায় হরিনাথবাবুর পিছনে পিছনে অফিস হইতে বাহির হইয়া বিপুল পথে নামিল। বড়বাবুর মুখ ভার। বুঝিতে বাকী নাই যে এই ছোকরা তাঁহাকে একেবারে বোকা বানাইয়া চাকরি লইয়াছে,—মনে পড়িল সেই বাল্য-পঠিত প্রবচন, "যাহা কিছু চক্ চক্ করে তাহাই সোনা নয়।" অথচ ছেলেটির হাতের লেখা বড় সুন্দর, মুক্তার মতো ঝরঝরে, আর কোন বানান ভুলের বালাই নাই। ঘাড় না ফিরাইয়াই শুধাইলেন, ওহে তুমি বিয়ে পাশ বলছিলে, তা অস্ত লাইনে গেলে না কেন? একাজ কি হবে তোমার দ্বারা?

বিপুলের মুখ শুকাইয়া যায়। সে থতমত খাইয়া বলে,—আজ্ঞে, আপনি অনুগ্রহ করলে পার্বো বই কি! কাল রবিবার, বাবা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

একথায় বড়বাবু মাত্রেরই মন প্রসন্ন হয়। তিনি দাড়িতে মোচড় দিয়া বলিলেন, তা বেশ ত' আমি সকালে বাসাতেই থাকি। কিন্তু তুমি কি ও কাজ পারবে?

বিপুল আর কোন প্রকার তর্ক বিতর্ক করিল না। চট করিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিল,—আজ্ঞে, সন্ধ্যে আসি, আমি এই দিকে যাবো।

বিপুল বাঁয়ের গলিতে প্রবেশ করিল।

রবিবার সকালে হরিনাথ বাবুর বাসায় আসিল বিপুলের বাবা নয়, স্বয়ং শ্রীবিপুল বাহনু গুপ্ত। তাহার পিছনে একটি ভৃত্য, হাতে একথালা ভীমনাগের সন্দেশ।

মাঘের শেষ। তখনো বেশ শীত আছে। কলিকাতার আকাশ কালো ধোঁয়ার কালি হইয়া আছে। কন্‌কনে হাওয়ায় মন যেন জড়সড় হইয়া গৃহের কোণে একটি নিরিবিলি বহ্নিকুণ্ড খুঁজিতে চায়। বিপুলের মন তাই ঘরে ঢুকিয়াই একবার এ কোণে ও কোণে চোখ বুলাইয়া লইল। তাহার প্রবেশমাত্রেই বোধ করি জুতার শব্দ পাইয়া পাশের একটি ছোট্ট কক্ষের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল একটী অষ্টাদশী কিশোরী। সুন্দরী চঞ্চললোচনা কিশোরী।

(৩)

হরিনাথবাবু বলিতেছিলেন,—উঃ এ এযুগের ছেলেছোকরা কি মিথ্যেবাদী! তাহা মিছে কথাগুলো বলে আমাকে ঠকিয়ে চাকরীটা নিলে। কিচ্ছু জানে না, ওকে আমি নোটিশ দেবো।

কন্যা মেখলা পিতাকে চা দিতেছিল। বলিল, বিপুলবাবুকে নোটিশ দেওয়া আর চলে না, তা হলে অতগুলো ভীমনাগের সন্দেশ হজম হবে না যে, বাবা।

পিতা মেয়ের মুখে চাহিয়া কি যেন পড়িতে চেষ্টা করিলেন, এবং হাসিয়া ফেলিলেন। মেখলা হাসিল না। সে বলিল, কেন বিপুলবাবু ত বেশ ভাল স্কলার বলে মনে হয়, বরং ওর মাইনে বেশি হওয়া উচিত।

—ছুতোর তোর স্কলারের নিকুচি করেছে। আমার এখন ইনভয়েসের কাজ!

বলিয়া হরিনাথবাবু সহসা গাম্ভীর্য্য ধারণ করিলেন। খানিক চিন্তার পর কি যেন আবিষ্কার করিয়া বলিলেন, মেয়ে তখন নিজেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিল। তাহাকে বলিলেন,—তা ওর কাছে তোর পড়াটা না হয় বুঝিয়ে নিস্, একটা টিউটরের খরচ বেঁচে যায়…। বলিতে বলিতে তিনি উঠিলেন।

মেখলা যেন পিতার মুখ হইতে এমনধারা একটা কথার প্রতীক্ষা কয়েকদিন হইতে করিতেছিল। বিপুল সেদিন ভীমনাগের সন্দেশ পৌঁছাইয়া দিয়াই কাস্ত হয় নাই, অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। মেখলা একাই পড়িতেছিল, আর মিটি মিটি চাহিতেছিল। তারপর হঠাৎ বিপুলের নানাপ্রকার পরিচয় প্রশ্ন। মেখলা থার্ড ইয়ারে পড়ে। যৌবনের চুম্বক শক্তির আকর্ষণ বিপুলকে টানিল কি না জানি না, সে শুধু একজন মানুষ পাইল যাহার সঙ্গে তার থীসিসের আলোচনা চলিতে পারে। থীসিসের প্রকৃত বিষয়ের অর্দ্ধেক নারী। অতএব আজ তার জীবনে প্রথম সুযোগ মিলিয়াছে সেই নারীর অভিমতের সঙ্গে তার মত মিলাইয়া থীসিসটি সম্পূর্ণ করিবার। বিপুলের উৎসাহের তাই অন্ত নাই।

সন্ধ্যা ৭টায় বিপুলের আগমন। মেখলার পড়িবার ঘর। একখানি টেবিল, দুখানি চেয়ার, একটি টিপয়, দেয়ালে একটি র‍্যাক্, একটি টেবিল ল্যাম্প।

বিপুলের যেন আজ নূতন জীবন, নারীর সঙ্গে মুখোমুখি। এ যেন প্রদোষে, আলো-আঁধারের সঙ্গম-ক্ষণ!

বিপুল থীসিস্ পড়িতে লাগিল। নার্ভাস সে কোন ক্লাসেই নয়, লজিক ও যথেষ্ট পড়িয়াছে, তর্ক করিবার ক্ষমতা অসীম। কেবল সুযোগ পায় নাই, ক্লাসের বন্ধুরা হারিয়া গিয়া তাহাকে চাটি মারিয়াছে, বাড়ীতে মা-বাবা কেবল ধমক দিয়াছেন, বউ নাই, থাকিলে সে জানিত কাদের আর্গুমেন্ট বাকী থাকে।

মেখলা শুনিতে শুনিতে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল, ইংরাজি ভাষায় "রচনা। বাংলায় যাহা অশ্লীল শুনায়, ইংরাজিতে তাহা রিয়্যালিষ্টিক্ মাত্র। মোপাসাঁ পড়িতে পড়িতে মেখলার মনে ধাটা পড়িয়া গেছে,—তার মনের নীবি-বন্ধ সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার কাছে অশ্লীল বলিয়া কিছু নাই। মোটানিতে তার হাতে-খড়ি, হ্যাভলক্ ইলিসে পরিপক্কতা। সবই সায়েন্স মাত্র। শুধু সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

হাসিবার কারণ যে কি বিপুল খুঁজিয়া পাইল না। সে সত্যই সিরিয়স্—গম্ভীর-ভাবেই স লিখিয়াছে। তার অন্তরের সরলতাকে লঙ্ঘন করিয়া তার সাহিত্য-বুদ্ধি কোনকালেই মত্ত হইবার সুযোগ পায় নাই। তাই তার একান্ত সরলমনে মেখলার হাসি বিশ্রী ঠেকিল না, বিস্ময়কর অহেতুক বোধ হইল। অপ্রতিভভাবে থামিয়া শুধাইল,—হাসলেন যে?

মেখলার হাসির হিল্লোল এখনো মিলায় নাই, দুই গালে তখনো টোল খাইয়া আছে। সুকণ্ঠের সহিত চাপাহাসির রেশ মিলিত যে ধ্বনিটি বাহির হইল, তাহা অপরূপ,—যেন সুন্দরীর চামড়ার রংএর সঙ্গে প্রজাপতির পাখার রং মিলিয়া এক অভিনব ইন্দ্রজালের সৃষ্টি

মেখলা বলিল,—আপনার লেখা অতি চমৎকার, কিন্তু আপনার সত্যিকারের কোন অভিজ্ঞতা নেই। অতএব ও থীসিস্ একেবারে বাজে। আপনি ম্যারেজ কম-সাসেশান্-এর কিছুই জানেন না, থীসিস্ লিখে বসে আছেন। আমাকেই ওর সংশোধন করতে হবে দেখছি! বলিয়া মেখলা মুখে কাপড় চাপা দিল। তার চোখে চটুল চাহনি, তার কেশে বাতাসের চঞ্চলতা, তার শাড়ীতে ময়ূরের রং, তার বালা-চুড়িতে রিনিরিনি সুর, তার বক্ষের রেখায় রেখায় ক্রতথানের [illegible]। সমস্ত মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড আহ্বান না প্রচণ্ড বিদ্রূপ?

বিপুল দেখিল বিদ্রূপ। তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। সে গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ নিঃস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। মেখলা ভাবিল,—বুঝি শিকারের পূর্ব্বে বিড়াল বসিয়া আছে ওৎ পাতিয়া।

কিন্তু তাহাকে হতাশ করিয়া অবশেষে বিপুল বলে,—দেখুন, আমার অভিজ্ঞতা থাকুক আর নাই থাকুক, তার কৈফিয়ত দিতে আসিনি,—কিন্তু আমার ক্যালকুলেশনে ভুল কোথায়? আমার কন্‌ক্লুশন্ ঠিক কি না

—নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু কিছু অদল বদল আমি ক'রে দোবো। বলিয়া মেখলা সহসা গম্ভীর হইল, শরতে যেমন সহসা এক টুকরা সাদা মেঘ সূর্য্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়।

বিপুল বলে,—আমার থীসিস্ কাটাকুটি করবার কি অধিকার আছে আপনার?

—সে অধিকার আমি ক'রে নেবো।

আবার মেখলার মুখে দুষ্ট হাসি। তানপুরার ঝঙ্কারের মতো তার অস্তিত্ব সমস্ত কক্ষে গম্ গম্ করিতে লাগিল।

বিপুলের ডান হাত নিজের ডানহাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া মেখলা সহসা বলিয়া উঠিল,—আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আপনার থীসিস্ ভুল। আজ আর না, কাল এর ফের আলোচনা হবে। আপনি লেখাটা রেখে যান, আমি একবার ভাল ক'রে পড়ে দেখবো।

বলিয়াই বিপুলকে আর কোন কিছুর সুযোগ না দিয়া মেখলা একটা নমস্কার করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। বিপুল কিছুক্ষণ তড়িতাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, থীসিস্‌খানা রাখিয়া যাইবে কিনা, যদি হারাইয়া যায়! এমনও ত হইতে পারে যে মেখলা উহা আহার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের পড়িয়া শুনাইবে, তাহাদের অনেকেই হয়ত উহা অ্যাপ্রুভ (অনুমোদন) করিবে। একটা অনাস্বাদিত নূতন স্বাদ যেন বিপুলের রসনাকে সজল করিয়া দিল। সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেখাটা টেবিলের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(৪)

সবে ফাগুন পড়িয়াছে। কলিকাতার ফুটপাতের গাছেও তার প্রভাব। কচি কচি কিশলয়, তাহাতে দখিনা বাতাসের আনাগোনা। বিপুল দেখিল বাস্তবিকই মন এ সময়ে বাহিরে ছুটিয়া যায়;—প্রকৃতিতে যখন এত রস, তখন বিবাহ করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু দক্ষিণের পবন কেবল পথেই ঘুরিয়া বেড়ায় না, কলিকাতার জানালা গলিয়া কক্ষে কক্ষে তরুণ তরুণীর কেশে আঁচলের দোলা দিয়া যায়। তার মনও তাই চুপিসারে প্রবেশ করিল মেখলার অন্তঃপুরে।

সেদিন রবিবার। হরিনাথবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। বলিলেন, এসো বিপুল, বোসো। হ্যাঁ, তারপর তোমার ছাত্রী কি রকম পড়ছে, ওর ফিলজফিটা একটু ভাল ক'রে দেখো। আর রবিবারে ওকে খুব কতকগুলো টাস্ক দেবে।

বিপুল বোকার মতো ঈষৎ হাসিয়া মেখলার ঘরে প্রবেশ করিল। মেখলা চা সাজাইতেছে। বলিল,—উঃ কি নিখুঁত্ আপনি। আচ্ছা, আপনি জন্মেছেন কি-লগ্নে?

বিপুল সহজভাবে বলিল,—বোসেখ-মাসে, কেন?

মেখলা হিহি ক'রে হাসিয়া উঠিল। বলিল আপনার থীসিস্ ভুল।

এতক্ষণে চৈতন্য হইল। চকিতে বিপুলের চোখমুখ লাল হইয়া ওঠে। সে ভাবে,

এ মেয়েটা অত্যন্ত হ্যাবলা। মুখে বলে,—ও ভাবে আমাকে আক্রমণ করবেন না। ছিঃ

—যাক্ গে, এখন চা খান। বলিয়া মেখলা বিপুলকে এক ডিস্ গরম সিঙাড়া ও চা আগাইয়া দিল। তারপর কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য মাধুর্য্য মিশাইয়া নানা কথায় বিপুলকে বুঝাইয়া দিল যে, তার থীসিস বেশ ভাল হইয়াছে, তার নিজের মতের সঙ্গে নাইবা মিলিল।

বিপুল চোখ বুজিয়া আরামে শুনিতেছিল সহসা ডানহাতের উপরে একটা তীক্ষ্ণ চিম্‌টি খাইয়া, উঃ বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার হাত ঠেকিয়া অর্দ্ধপীত চায়ের পেয়ালা উল্টাইয়া গেল, টেবলক্লথ ও মেখলার শাড়ী ভিজিয়া একাকার। মুখের সিঙাড়া গিলিতে গিলিতে, হাসিতে হাসিতে মেখলার লাগিল বিষম। সে খক্ খক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে একেবারে গলদঘর্ম। রোষাভাসে বলিল,—nasty beast! তারপর ঢক্ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া নিজেকে কোনমতে সামলাইয়া নিয়াই বলিল,—ক্ষমা করুন।

বিপুল একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। ক্রুদ্ধ হইবে কি ঘৃণা প্রকাশ করিবে, কি নিজেরই ত্রুটি স্বীকার করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না।

এমন সময়ে মেখলা তাহার অতি সন্নিকটে আসিয়া তাহার দুইহাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—ও কিছু মনে করবেন না, বসুন। একটা কথা বলছি, রাখবেন বলুন।

ভ্রূকুটিভরে বিপুল বলে,—কি?

মেখলা বলে,—Let us experiment your thesis. (আপনার মতবাদ কার্য্যে পরিণত করি, আসুন)।

বিপুল বুঝিতে না পারিয়া বলে,—সে কি রকম?

—ইঃ ন্যাকামি করবেন! যান যান, বাবাকে বলবেন। বলিয়া মেখলা ঠোঁট ফুলাইয়া তার রাঙা গাল দুইটা আরও রক্তাভ করিয়া তোলে।

বিপুলের ব্যাপারখানা বুঝিতে আরও মিনিট কয়েক দেরী লাগিল। যখন বুঝিল তখন মুখে হাসির লুকোচুরি খেলা সুরু হইয়াছে। সে বলে,—আপনার বাবা কি রাজি হবেন?

চাহিয়া দেখে মেখলা অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু আজ যেন তার প্রতীক্ষা করিবার অধিকার জন্মিয়াছে।

ঘরে ঢুকিলেন মেখলার মা। কিছু ভণিতা না করিয়াই বলিলেন,—বাবা বিপুল তোমার হাতেই মেখলাকে দিতে চাই, এতে আর অমত কোরো না।

* * *

বিয়ে যেদিন হইল সেদিন ফাগুনের শেষ। পুরাতন বৎসরের জীর্ণপাতা ঝরিয়া গিয়া প্রতি গাছেই নব পল্লব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিপুল ভাবিতেছিল, এটা মড়কের মাস, এখানে বিয়েটা কি উচিত হইল।

চৈত্রের ২রা রাত্রে বিপুলের আকর্ষণে ঈষৎ প্রতিরোধ করিয়া মেখলা বলে,—তোমার থীসিস্...

বিপুল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। উপরের কড়ি-বরগা গুণিতে গুণিতে বলে,—চুলোয় যাক্।

এবং পর বৎসর পৌষের শেষাশেষি একদা একটি সদ্যজাত পুত্র সন্তান বিপুলের কোলে ধরিয়া দিয়া মেখলা তাহার সেই দুষ্টু হাসি হাসিয়া বলিল,—

—তোমরা জীবনের কোন প্রকার অভিজ্ঞতা না নিয়ে থীসিস লেখো এই বড় দুঃখ। কি কতকগুলো রাবিস্ লিখেছিলে বল দিখি। মানুষের মন বিশ্লেষণ করে তোমরা বিজ্ঞান রচনা করছো, এর চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে!

বিপুল সব সহ্য করিল। কেবল বলিল—তুমি আমার ডক্টরেট মাটি করে দিলে, মেখলা। কিন্তু তুমিও ঠকেছো জেনো। বড় প্রেমে কখনো ছেলে হয় না। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে তিলোত্তমার ছেলে হয় নি, কুন্দনন্দিনীর ছেলে হয় নি, শরৎ চাটুর্য্যের রাজলক্ষ্মীরও ছেলে হয় নি, "সৃষ্টির ইচ্ছাই প্রেম" নয়।

মেখলার খোকা কাঁদিয়া উঠিয়াছে। বিপুল আর কি বলিল শোনা গেল না।

নীতীন বসু পরিচালিত "দিদি" চিত্রে সায়গাল,
লীলা দেশাই, ভানু ব্যানার্জি, ও চন্দ্রাবতী।

• শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও কঙ্কাবতী

অধ্যাপক দিগম্বর ও তাঁর স্ত্রী স্বাগতা—এই দুই বিশিষ্ট ভূমিকায় এঁরা পর্দায় আত্মপ্রকাশ কোর্‌বেন কালী ফিল্মসের আগামী বহু-বিখ্যাত ছবি "দস্তুরমত টকী"-তে।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের অজ্ঞাত কয়েক পৃষ্ঠা

অধ্যাপক—শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, পি-আর-এস্
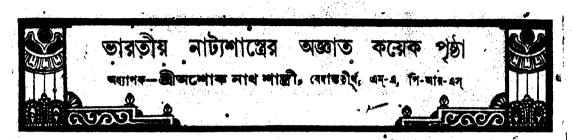
মানব জীবনের জীবন্ত অনুকরণই নাট্য। তাই নাট্যশাস্ত্রের সঙ্কলনকারিগণ দৃশ্যকাব্যের একটি সাধারণ নাম দিয়াছেন 'রূপক'। রূপক (drama) বলিতে সেই শ্রেণীর সাহিত্যকেই বুঝায়—যাহাতে একের (অর্থাৎ নট-নটীর) উপর অপরের (অর্থাৎ কবিবর্ণিত চরিত্র বা পাত্রের) রূপ (অর্থাৎ স্বরূপ) আরোপিত হইয়া থাকে। এ রূপারোপ একমাত্র দৃশ্যকাব্যেই সম্ভব—শ্রব্যকাব্যে নহে। অতএব, দৃশ্যকাব্যই 'রূপক' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

রূপকের বিষয় রূপণ বা রূপারোপ বা জীবনের অনুকরণ। কিন্তু যে মানবজীবনের অনুকরণ রূপকে করা হয়, সেই জীবনই একটা বিরাট বিচিত্র প্রহেলিকা মাত্র। আর এ কারণে অনুকরণাত্মক নাট্যসাহিত্যের স্বরূপও চির-কুহেলিকায় আবৃত। শুধু ভারত বলিয়া নহে, পৃথিবীর সকল দেশেই দৃশ্যকাব্য-সাহিত্যের উৎপত্তির কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু বিশ্ববিশ্রুত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষী নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আর কোন দিন কেহ পারিবেন বলিয়া ভরসাও হয় না। কারণ, এ বিষয়টির মধ্যে এতই বৈচিত্র্য বিদ্যমান যে, তাহার প্রত্যেকটি বিভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সমগ্র স্থিতিকালের মধ্যে সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে না। জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইয়া যেমন সকল দর্শন ও বিজ্ঞান মূক হইয়া গিয়াছে, জীবনের অনুকরণস্বরূপ রূপকের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সকল গবেষণা সেইরূপ ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই এ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিচিত্র মতবাদ সমূহ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধটিকে অনর্থক ভারগ্রস্ত করিতে চাহি না।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যত কিছু আলোচনা হইয়াছে, সে সকলেরই মূল ভরতের "নাট্য-শাস্ত্র।" বর্ত্তমানে ভরতনাট্যশাস্ত্রের যে সংস্করণ পাওয়া যায়, তাহাই মহর্ষির রচিত মূল গ্রন্থ কি না—সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু তাহা বলিয়াই বর্ত্তমানে উপলভ্যমান "নাট্যশাস্ত্র" খানিকে নিতান্ত আধুনিক যুগের রচনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এ পর্য্যন্ত কোন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত উহাকে টানিয়া খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর নিম্নে নামাইতে পারেন নাই। বরং উহা যে আরও প্রাচীনতর যুগের রচনা (অন্ততঃ উহার মধ্যে নানা যুগের রচনার বিভিন্ন স্তর বর্ত্তমান—ও এই সকল স্তরের মধ্যে কোন কোনটি যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগের রচনা) তাহা বিশ্বাস করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে। এ হেন ভরতের নাট্যশাস্ত্র দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাকে কোনরূপেই উপেক্ষা করা চলে না। নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, নাট্যসাহিত্য অনাদি। কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়ে নাট্যসাহিত্য অভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে না। যুগবিশেষে অবস্থা অনুসারে রূপক সাহিত্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পের প্রথম মন্বন্তরের প্রথম সত্যযুগে (১) চতুষ্পাদ ধর্ম্মের প্রকাশহেতু নাট্যের কোন প্রয়োজন না থাকায় উহা তিরোভূত অবস্থায় ছিল। পরে ত্রেতাযুগে জগতে একপাদ অধর্ম্ম সঞ্চারিত হইল দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করেন যে, শূদ্রজাতিসমূহের বেদাধিকার নাই,—অতএব তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তিনি যেন কোন সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেন। তদনুসারে পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদের অঙ্গসম্ভূত এই পঞ্চম 'নাট্যবেদ' সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আর তদবধি প্রতি কল্পের প্রতি মন্বন্তরের প্রতি ত্রেতাযুগে নাট্যশাস্ত্রের নূতন করিয়া অভিব্যক্তি ঘটিয়া

---

(১) বর্ত্তমান "শ্বেতবরাহ"কল্প=ব্রহ্মার একদিন (দিবাভাগ)=১৪ মন্বন্তর=১০০০ চতুর্যুগ=৪৩২ কোটি মানুষ বৎসর। পর্য্যায়-ক্রমে এক কল্পে সৃষ্টি ও তাহার পরবর্ত্তী এককল্পে প্রলয় ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পে সৃষ্টিপ্রবাহ বর্ত্তমান। ১ মন্বন্তর=১ মনুর অধিকারকাল=৭১ (বা মতান্তরে কিঞ্চিদধিক ৭১) চতুর্যুগ। চতুর্দ্দশ মনুর নাম যথাক্রমে—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি (বা উত্তমৌজাঃ, উত্তম"), তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য-(বা দৈব)-সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্ত্তমানে শ্বেতবরাহ কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগ চলিতেছে। কল্পারম্ভ হইতে ১৯৭২৯৪৯০৩৭ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

আসিয়াছে। ইহার সৃষ্টিকল্পে ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্যাংশ, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় ও অথর্ববেদ হইতে রস সংগৃহীত হইয়াছিল। এই নাট্যবেদ ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রথম শিক্ষা করেন মহর্ষি ভরত। পরে তাঁহার শত পুত্রকে অভিনেতা ও (ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি) অপ্সরাগণকে অভিনেত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া ভরতের (তথা ভারতের) প্রথম নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত হয়। সশিষ্য মহর্ষি স্বাতি "ভাণ্ডভাণ্ডে"র অর্থাৎ ঢক্কাজাতীয় বাদ্যের অধিকারে ও নারদাদি গন্ধর্বগণ গানযোগে (অর্থাৎ "তত" বা তারের যন্ত্র ও "সুষির" বা হাওয়ার যন্ত্রের অধিকারে) নিযুক্ত হ'ন। পরে শিবের আদেশে তণ্ডু (নন্দী) তাঁহাকে "তাণ্ডব"নৃত্য, পার্ব্বতী "লাস্য" নৃত্য ও পিতামহ ব্রহ্মা (বিষ্ণুকর্তৃক প্রবর্ত্তিত) নাট্যমাতৃকাস্বরূপিণী "বৃত্তি"-চতুষ্টয়ের উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে প্রাচীন ভারতে নাট্যবিদ্যা বিশেষ প্রসার লাভ করে।

তবে ইহা ত' গেল দেবলোকের কথা। দেবলোকে যে সকল দৃশ্যকাব্য অভিনীত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রথম রূপকখানির কোনরূপ নাম পাওয়া যায় না। তবে উহা বহুযুগব্যাপী দেবাসুর যুদ্ধের কোন একটি বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত—ইহাই মাত্র বুঝা যায়। দৈত্যগণের উপর দেবরাজ যে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি উজ্জ্বল রাখিবার জন্য দেবগণ "শক্রধ্বজমহোৎসবে"র আয়োজন করেন, ও সেই উপলক্ষেই দেবলোকে প্রথম নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হয়। অবশ্য এই অভিনয় দৈত্যগণের মনে যথেষ্ট বিক্ষোভ উৎপাদন করে, ও প্রতিহিংসা গ্রহণের অভিলাষে তাঁহারা নাট্যবিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হ'ন। কিন্তু অচিরেই দেবরাজের ধ্বজপ্রহারে তাঁহাদের শরীর জর্জ্জরিত হইয়া যায়। সেই হইতে ইন্দ্রধ্বজের নাম হয় "জর্জ্জর"; ও ক্রমে নাট্যাভিনয়ের উহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার পর বিশ্বকর্ম্মা শত্রুরোধক এক দুর্ভেদ্য নাট্যগৃহ নির্ম্মাণ করিলে তথায় পিতামহ-কর্তৃক রচিত "অমৃতমন্থন" নামক "সমবকার" (দৃশ্যকাব্যবিশেষ) ভরতের নাট্য সম্প্রদায়-কর্তৃক অভিনীত হয়। পরে হিমাচলে দেবাধিদেব মহাদেবের সম্মুখে অমৃতমন্থনের দ্বিতীয় অভিনয় হয়, ও তৎসহ পিতামহের আর একখানি রূপক "ত্রিপুরদাহ ডিম" (ডিম এক প্রকার দৃশ্যকাব্য) অভিনীত হইয়াছিল (২)। ইহার পরই দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় মহর্ষি ভরতরচিত "লক্ষ্মীস্বয়ংবর" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি পুরূরবাঃ এই অভিনয় দর্শনার্থ নরলোক হইতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নাটকখানিতে অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন, ও তাঁহার সখী অপ্সরঃপ্রধানা মেনকা বারুণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। পুরূরবার রূপে আত্মহারা হইয়া উর্ব্বশী অভিনয়ে নিজের পাঠ্যাংশ বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া দেবরাজ-কর্তৃক অভিশপ্তা হ'ন ও বহুদিন পুরূরবার প্রেয়সীরূপে নরলোকে অবস্থানপূর্ব্বক মর্ত্তে নাট্যকলার প্রথম প্রচার করেন (৩)। কিন্তু তাঁহার শাপমুক্তির পরেই নরলোকে নাট্যকলার বিস্মৃতি ঘটে। তাহার বহু বর্ষ পরে পুরূরবার পৌত্র মহারাজ নহুষ শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বলে ইন্দ্রত্বলাভ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ভরতের শত পুত্র ঋষিগণের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া রচিত একখানি অশ্লীল দৃশ্যকাব্যের প্রয়োগ করায় ঋষিশাপে পাতিত্য (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ নহুষের অনুরোধে মহর্ষি ভরত পুত্রগণকে মর্ত্তে প্রেরণ করেন। তথায় মানুষী অভিনেত্রীগণের সহিত মিশ্রণের ফলে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদের বংশজাত স্ত্রীপুরুষগণ সকলেই পরবর্ত্তী যুগে নটনর্ত্তকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। ইহারাই "নট", "শৈলূষ" বা "কুশীলব" জাতি নামে বিখ্যাত। ঋষিশাপে ইহারা কেবল শূদ্রত্বই প্রাপ্ত হয় নাই, পরন্তু অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল (৪)। এমন কি ইহাদের সেই জাতিগত কদাচার আজও পর্য্যন্ত নটসম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে নাই। আজিও জগতের সকলদেশেই নটগণ অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট অল্পাধিক ভাবে অপাংক্তেয় হইয়া আছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেবলোকে নাট্যের উৎপত্তি হইতে মর্ত্তে নাট্যের প্রথম প্রচার পর্য্যন্ত যে উপাখ্যান বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত করা গেল। নাট্যশাস্ত্রের এই উপাখ্যানটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নাট্যশাস্ত্র বলিতেছেন যে, বেদই নাট্যের উপাদান। আমরাও দেখিতে পাই যে, ঋগ্বেদে এমন কতকগুলি সূক্ত আছে, যাহাতে নাটকীয় কথোপকথনের আভাষ পাওয়া যায়। এ সূক্তগুলির কোন বিনিয়োগ নাই। উদাহরণ স্বরূপে—(১) পুরূরবা ও উর্ব্বশী, (২) যম ও যমী, (৩) সরমা ও পণিগণ, (৪) অগস্ত্য, লোপামুদ্রা ও তাহাদের পুত্র, (৫) ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও বৃষাকপি, (৬) ইন্দ্র, অদিতি ও বামদেব, (৭) ইন্দ্র, বসুক্র ও তৎপত্নী, (৮) বিশ্বামিত্র ও নদীগণ, (৯) ইন্দ্র ও মরুদ্গণ, (১০) নেম ভার্গব ও ইন্দ্র, (১১) অগ্নি ও দেবগণ, (১২) বশিষ্ঠ ও তাঁহার পুত্রগণ—প্রভৃতি সূক্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই

(২) ভরতের নাট্যশাস্ত্র, ১—৪ অধ্যায়, (বরোদা অথবা কাশীর সংস্করণ)।

(৩) মহাকবি কালিদাসের "বিক্রমোর্ব্বশী" ত্রোটক এই ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

(৪) নাট্যশাস্ত্র, বারাণসী সংস্করণ, ৩৬ অধ্যায়।

সূক্তগুলিকে বলা হয় "সংবাদসূক্ত" (dialogue hymn)। ইহা ছাড়া কয়েকটি সূক্তে "একজনের উক্তি" (monologue) নাটকীয়ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অথর্ব্ববেদেও একটি "সংবাদ-সূক্ত" দৃষ্টিগোচর হয়। অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলারের মতে এই সকল সংবাদসূক্তই নাট্যের প্রাচীনতম আদর্শ। বহু প্রাচীন যুগে যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে ঋত্বিক্‌গণ দুই দলে বিভক্ত হইতেন। একদল পুরূরবার উক্তির আবৃত্তি করিতেন, অপর দল উর্ব্বশীর, ইত্যাদি। অতএব, ঋগ্বেদ হইতে নাট্যবেদের পাঠ্যাংশ গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া নাট্যশাস্ত্রের যে বচন পাওয়া যাইতেছে, তাহা ত' আর অপ্রমাণ বলা চলে না। Dr. Hertel ত' উক্ত সংবাদসূক্তগুলিকে "mystery plays" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সামবেদে গীতের অংশ কতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানে বিশেষভাবে প্রতিপাদনের কোন প্রয়োজন নাই। অধ্যাপক Sylvain Levi-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও উহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর যজুর্ব্বেদের অভিনয়ের কথা। সোমযজ্ঞে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সোমবিক্রেতাকে ইষ্টকাদির প্রহারে জর্জ্জরিত করা হইত; ও অনেক সময় সে বেচারী সোমের মূল্যপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইত। ইহা সোমরক্ষক গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে সোমাহরণ ঘটনার অনুকরণাত্মক অভিনয়মাত্র। এইরূপ "মহাব্রত" যজ্ঞানুষ্ঠানেও অভিনয়ের যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়। শ্বেতবর্ণ-গোলাকৃতি চর্ম্মখণ্ড লইয়া বৈশ্য ও শূদ্রের বিবাদ ও অবশেষে বৈশ্যের জয়—ইহাই মহাব্রতের মূল ঘটনা। ইহার আনুষঙ্গিকভাবে এক ব্রহ্মচারী ও এক গণিকার পরস্পর গালাগালিরও বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগের, (যখন পূর্ণাবয়ব নাটক রচিত হইল) বিদূষক ও চেটীর কলহ ইহার সহিত বিশেষভাবে তুলনীয়। তাহার পর "অশ্বমেধ" যজ্ঞানুষ্ঠানে পুত্রলাভের আশায় ছিন্নশীর্ষ যজ্ঞাশ্বের সহিত প্রধানা রাজমহিষীর মিলন (=উর্ব্বরতানুষ্ঠানের রূপক) প্রভৃতি বহু যজুর্ব্বেদীয় অনুষ্ঠানে দৃশ্যকাব্যের উপাদান প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, যজুর্ব্বেদে নটশব্দের পর্য্যায় "শৈলূষ" শব্দটিও দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য Hillebrandt সাহেব এ সকল অনুষ্ঠানকে মধ্যযুগের রহস্যাভিনয়ের (mystery plays) সহিত তুলনীয় ধর্ম্মমূলক দৃশ্যকাব্যের বীজস্বরূপ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে Sten Konow, Keith প্রভৃতি গবেষকগণ এগুলিকে লৌকিক নির্ব্বাক্ আঙ্গিক অভিনয়মাত্র (popularmime) বলিতে চাহেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এতদূর অভিনয়ানুকূল অবস্থার সন্নিবেশ দেখা যায় যে, ইহাদিগকে শুধুই pantomime বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও বহু আখ্যান মধ্যে দৃশ্যকাব্যের পর্য্যন্ত উপাদান সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। দুই চারিটি সংবাদ সূক্তের আখ্যানাংশও কোন কোন ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকায় গদ্য অথবা পদ্যাকারে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, যথা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপোপাখ্যান শতপথ ব্রাহ্মণের উর্ব্বশী-পুরূরবার উপাখ্যান। এই উর্ব্বশী-পুরূরবার আখ্যান পরবর্ত্তী যুগে মহাকবি কালিদাসের অমৃতবর্ষিণী লেখনীমুখে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া "বিক্রমোর্ব্বশী" "ত্রোটক"রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অপ্সরাঃ শকুন্তলা ও দুঃষন্তের আখ্যান—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দৌষন্তি ভরতের আখ্যান—সম্ভবতঃ কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের মূল উপজীব্য। ইহা ছাড়া রসোৎপত্তির অনুকূল নৃত্য-গীত-বাদ্যের উল্লেখ অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায়। এমন কি ঋগ্বেদের [illegible] মণ্ডলেও জনমনোহারিণী নৃত্যকুশলা নারীর (নৃতু) বিবরণও পাওয়া যায়। কৌষীতকিব্রাহ্মণে নৃত্য-গীত-বাদ্যকে "কলা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আর "সুপর্ণাধ্যায়"-খানিকে Dr. Hertel একখানি সুবিস্তৃত পূর্ণাবয়ব দৃশ্যকাব্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গীত ও বাদ্য ব্যতীত কেবল নৃত্যও নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইত। মহাব্রতে বৃষ্টি উৎপাদনের জন্য অগ্নির চারিদিকে কুমারীগণের নৃত্য, বিবাহোৎসবে বরবধূর সৌভাগ্যকামনায় সধবা গৃহিণীগণের প্রমোদনৃত্য, মৃত্যুর পরে মৃতের অন্তিম স্মৃতিচিহ্নটুকু রক্ষা করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে শোকনৃত্য প্রভৃতির আভাষ বৈদিক সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। আর নাট্যের সহিত নৃত্যের সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়। Oldenburg প্রমুখ পণ্ডিতগণ নৃত্যকেই দৃশ্যকাব্যের মূল উপাদান বলিয়াছেন।

এই সকল আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈদিক সাহিত্যে নাট্যের উপাদান যথেষ্টই বর্ত্তমান ছিল। অবশ্য তাই বলিয়া "সুপর্ণাধ্যায়"কে একখানি পূর্ণাবয়ব রূপক বলিতে যাওয়াও সুবিবেচনার কার্য্য নহে। Windisch, Pischel ও Oldenberg বলেন যে, সংবাদসূক্তগুলির অন্তর্ভুক্ত ঋক্‌গুলি পূর্ব্বে নাটকীয় গদ্যাংশ (চূর্ণক) দ্বারা পরস্পর সংযোজিত ছিল, এক্ষণে কালক্রমে সেই সকল চূর্ণক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন অসংবদ্ধ পদ্যাংশ অবশিষ্ট আছে। এই পদ্যাংশগুলিও অতি প্রাচীন—ইন্দো-ইয়োরোপীয় যুগের গন্ধ এগুলিতে বেশ অনুভব করা যায়। পরবর্ত্তী লৌকিকযুগের গদ্য ও পদ্য—এই উভয়বিধ কাব্যই এই সংবাদসূক্ত হইতে ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। আবার Geldner প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে এগুলি চারণগীতিমাত্র (ballad)। পক্ষান্তরে Konow, Keith, Winternitz প্রমুখ গবেষকগণ এগুলিকে নির্ব্বাক্ অভিনয়

(pantomime) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও কোন কোন গবেষক (বেল্‌ভালকর প্রভৃতি) এই সকল পরস্পর বিরোধী মতের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—এই সকল সংবাদ-সূক্তাদির কোনটি বা চারণের গীত, কোনটি বা প্রাচীন আখ্যানের ক্রটিত অংশ, আবার কোনটি বা যাজ্ঞিক রূপকের কথোপকথনের অংশমাত্র। আমরা কিন্তু এরূপ চতুরতার সহিত গোঁজামিল দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে রাজী নহি। নাট্যশাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে গুলি যে শুধুই অলীক কাহিনীমাত্র নহে, তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ভারতীয় দৃশ্য কাব্যের উপাদান যে আদিতে বৈদিক সাহিত্য হইতে গৃহীত—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অধিকন্তু মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে যেরূপ যাজ্ঞিক দৃশ্যকাব্যের প্রচলন ছিল, ভারতেও যে তাহার অনুরূপ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত—এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে পার্থক্য এই যে, মেক্সিকোতে যাজ্ঞিক-রূপক শুধু দৃশ্যকাব্যেরই উৎপত্তিস্থল বলিয়া গণ্য হয়,—আর ভারতের বৈদিক সংবাদসূক্ত বা যাজ্ঞিক রূপক লৌকিক দৃশ্য ও শ্রব্য—এই উভয়বিধ কাব্যেরই উদ্ভবহেতু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

বৈদিক যুগের পর উঠে পৌরাণিক যুগের কথা। এ সম্বন্ধেও একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা এস্থানে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন হইবে না।

রামায়ণের বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সংস্করণে নট, নর্ত্তক, শৈলূষ, নাটক, ব্যামিশ্র প্রভৃতি পদের উল্লেখ আছে (অযোধ্যা কাণ্ড)। এমন কি সীতাদেবী শৈলূষগণের জঘন্য আচারের কথাও বলিয়াছেন। তিলক, টীকাকার বলেন "নট" অর্থে "সূত্রধার" ও "ব্যামিশ্র" অর্থে "প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত নাটক।" কিন্তু Keith প্রভৃতি গবেষকগণ এ সকল উল্লেখের মধ্যে হয় প্রক্ষিপ্তবাদ নয়ত মূকাভিনয়ের ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বের "নাটক" শব্দটিকে ইহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেন। নীলকণ্ঠ অনুশাসন পর্ব্বের "নটনর্ত্তক" পদটির অর্থ করিয়াছেন—ভরতাদি (অর্থাৎ অভিনেতা প্রভৃতি)। কিন্তু Keithএর মতে এ সকলই মূকাভিনয়। তবে শান্তি পর্ব্বে যে "রঙ্গাবতরণ" শব্দ পাওয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নীরব রহিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের খিল অংশ "হরিবংশে" নাট্যাভিনয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞে "ভদ্রনাদে" একজন কামরূপী নট অতি সুন্দর নাট্য-প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই ভদ্রের ছদ্ম-বেশে নাট্যাভিনয়ের ছলে বজ্রপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্ন বজ্রপুরাধিপতি দানবরাজ বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। এই সময় দুইটি নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। প্রথমটি অভিনীত হয় বজ্রপুরের

সাধানগর "স্থপুরে"। উহাতে রামায়ণের একাংশ নাট্যকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হয়। এ অভিনয়ে প্রদ্যুম্ন নায়কের ভূমিকা, শাম্ব বিদূষকের ও গদ পারিপার্শ্বিকের অংশ গ্রহণ করেন। আর নারী ভূমিকায় বার-নারীগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার পর দ্বিতীয় অভিনয় হয় খাস বজ্রপুরে। অভিনয় নাটকের নাম ছিল "রম্ভাভিসার"। প্রথমে নটবেশধারী প্রদ্যুম্ন, গদ শাম্ব নান্দী প্রয়োগ করিলে প্রদ্যুম্ন স্বয়ং গঙ্গাবতরণাশ্রিত মঙ্গল শ্লোক পাঠ করেন। পরে নাট্যপ্রয়োগ আরম্ভ হয়। উহাতে রাবণের ভূমিকায় শূর, নলকূবরের ভূমিকায় প্রদ্যুম্ন, বিদূষকের ভূমিকায় শাম্ব ও রম্ভার ভূমিকায় "মনোবতী" নাম্নী এক বারাঙ্গনা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ অভিনয়ে দৃশ্য-পটাদিরও অভাব ছিল না। যদুনন্দনগণ মায়াবলে কৈলাসপর্ব্বতের দৃশ্য পর্য্যন্ত হুবহু নকল করিয়াছিলেন। (ইহাকে পীঠমায়া বা stage-illusion ব্যতীত আর কি বলা সম্ভব?) Keith সাহেব ইহাকে আর mime বলিয়া উড়াইতে চাহেন নাই। তবে তাঁহার মতে হরিবংশ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর রচনা। অতএব, হরিবংশের বচনবলে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করার চেষ্টায় তিনি বিশেষ কোন যুক্তি খুঁজিয়া পান না।

এইরূপে পৌরাণিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠার সকল প্রযত্নই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা অগ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। এই সকল পৌরাণিক প্রমাণের কোন কোনটি তাঁহাদের মতে প্রক্ষিপ্ত; আর অবশিষ্টগুলি—হয় মূকাভিনয় নয় চারণগীতি, অথবা কথকতা, কিংবা পুতুলনাচ বা ঐরূপ এমন কোন একটা ব্যাপারের সূচক—যাহাতে নাট্যের কিছু পূর্ব্বাভাস থাকিলেও যাহা কোনরূপেই পুরাদস্তুর নাট্যাভিনয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে 'নট' শব্দের পর্য্যায় বাচক দুইটি শব্দের আলোচনা অপরিহার্য্য। প্রথম শব্দটি হইতেছে "ভারত"। মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রথম প্রচারক বলিয়া ভরতপুত্রগণ ও ভরতপুত্রগণের বংশজাত নটগণ "ভারত" নামে খ্যাত হ'ন। অতএব, প্রাচীন শাস্ত্রমতে "ভারত" শব্দের অর্থ 'নট'। কিন্তু এই সকল পাশ্চাত্য গবেষক বলেন, তাহা নহে—ভারতগণ "ভারত" শাখার প্রাচীন চারণ কবি (rhapsode) মাত্র। ইঁহারাই প্রথমে গীতাকারে মহাভারত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে ইঁহাদের রচিত বিচ্ছিন্ন গীতাংশ একত্র সংবদ্ধ ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া "ভারত" ও পরে "মহাভারতে"র রূপ ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ ইঁহারা শ্রব্যকাব্যের উদ্ভব কারণ হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু দৃশ্য কাব্যের সহিত ইহাদের সম্পর্ক কিছুই নাই। এমন কি ইঁহারা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে, "ভাট" শব্দটিও "ভারত" শব্দের অপভ্রংশ। পক্ষান্তরে, আমরা জানি যে, "ভাট" শব্দের সহিত "ভট্ট" (প্রাকৃত) ও "ভর্ত্তা" (সংস্কৃত) শব্দের সম্পর্কই নিকটতর। ভট্ট ও চারণগণের জীবিকা এক রূপ ছিল। ভট্টগণ সঙ্করজাতি—ক্ষত্রিয়পিতা ও বিপ্রকন্যা মাতার সংযোগে উৎপন্ন। তাঁহারা পতিত হইলেও নটগণের মত কদাচারী (জায়াজীব) ছিলেন না। দ্বিতীয় শব্দটি "কুশীলব"। সকলেই জানেন যে, মহর্ষি বাল্মীকিরচিত রামায়ণ মহাকাব্যের গান বা আবৃত্তির প্রথম প্রবর্ত্তক ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর যমজ তনয়—কুশ ও লব। তাঁহাদের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্যই "কুশীলব" শব্দটি নটের পর্য্যায়রূপে এ যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হয় কি? অবশ্য তাই বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে চাহিনা যে, রামতনয়দ্বয়ই নট-সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ ছিলেন; অথবা মাত্র এইটুকু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই কুশ-লবের রামায়ণ গানকে পুরাদস্তুর অভিনয়ের শ্রেণীভুক্ত করাকেও আমরা সঙ্গত মনে করি না,—বিশেষতঃ যখন বহু গবেষক "কুশীলব" শব্দটির মধ্যে নটের জাতিগত দুশ্চরিত্রতার স্পষ্ট আভাস পাইয়া থাকেন (কু—শীল +ব৺কুশীলব)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই শব্দটি ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতার পরি-পোষক একটি ক্ষুদ্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা। কারণ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি ও কুশীলবগণের (বিশেষতঃ নটস্ত্রীগণের) চরিত্রদোষের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন।

তর্কের খাতিরে না হয় মানিয়া লওয়াই গেল যে, রামায়ণ-মহাভারত-হরিবংশ-পুরাণাদির বিবরণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্ভরযোগ্য নহে; অথবা উহাতে মূকাভিনয়-জাতীয় অভিনয়ের আভাস ব্যতীত প্রকৃত নাট্যের কোন প্রসঙ্গই পাওয়া যায় না। কিন্তু মহর্ষি পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ী"-ব্যাকরণ-সূত্রে যে "নট" শব্দ ও "শিলালিন্" ও "কৃশাশ্ব" নামক দুইজন প্রাচীন নাট্যসূত্র-রচয়িতা নাট্যাচার্য্যের উল্লেখ রহিয়াছে, (৫) তাহাকে ত' আর মূকাভিনয় বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। Gold-stucker প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাণিনির বয়স খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীতে ফেলিলেও Keith উঁহাকে টানিয়া অনেক নীচে নামাইয়াছেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও ঋষিকে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব

(৫) বেল্ভালকরের মতে ইঁহারা ভরতের পূর্ব্ববর্ত্তী। অন্ততঃ বর্ত্তমানে উপলভ্যমান "নাট্যশাস্ত্র" অপেক্ষা এ দুইটি নটসূত্রের প্রাচীনত্ব স্বীকার্য্য।

পঞ্চম শতাব্দীর পরে স্থাপন করিতে পারেন নাই। বরং Levi প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কৃশাশ্বকে একজন ইন্দো ইরাণীয় বীর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আর শতপথব্রাহ্মণেও "শিলালী"র নাম পাওয়া যায়। অতএব, শিলালী ও কৃশাশ্বকে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীর পরে ফেলিতে পারা যায় না। আর তাহা হইলে ভারতীয় নাট্যোৎপত্তির উপর গ্রীক্ প্রভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে গ্রীসেও পুরাদস্তুর নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল—একথা এখন পর্য্যন্ত কোন গবেষক বলিতে সাহস পান নাই। Satyrikon-এর প্রবর্ত্তক Thespis, তৎপরবর্ত্তী Phrynikos,—Attic Tragedy-এর জন্মদাতা Aischylos ও তাঁহার অনুগামী Sophokles, Euripides প্রভৃতি,—Doric Farce ও Commedy-র সুবিখ্যাত রচয়িতা Phormis, Epicharmos, Deinolochos, Rhinthon প্রভৃতি,—Old Attic Commedy যুগের Chionides, Ekphantides, Magnes, Kratinos, Aristophenes, Pherekrates, Telekleides, Krates (the tragedian), Hermippos, Kallias, Hegemon, Eupolis প্রভৃতি গ্রীক্ নাট্যকারগণের কেহই খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। পক্ষান্তরে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্ব্বেও ভারতে একাধিক নটসূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

গ্রীক্ প্রভাবের কথা উঠিলেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে "যবনিকা"র কথা। এই একটি মাত্র শব্দকে কেন্দ্র করিয়া Weber, Windish-প্রমুখ পাশ্চাত্য গবেষকগণ এককালে বেশ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে অবশ্য "যবনিকা" শব্দটির উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় নাট্যে গ্রীক্ প্রভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার প্রবৃত্তি গবেষকদিগের মধ্যে আর বড় একটা দেখা যায় না। যবনিকার সহিত যবন শব্দটির (Ionian, Bactrian, Bactro-Persian Greek,—যবন) ব্যুৎপত্তিগত সম্বন্ধ থাকা খুবই সম্ভব। হয়ত পারস্ত বা ব্যাক্ট্রিয়া হইতে কারুকার্য্যখচিত পর্দ্দা ভারতে তৎকালেও আসিত; কিন্তু ঐগুলি প্রাচীন যুগে রঙ্গমঞ্চে ব্যবহৃত হইত কিনা সন্দেহ। কারণ, খৃঃ দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত কবিরাজ রাজশেখরের "কর্পূর মঞ্জরী" সট্টক (প্রাকৃতভাষাময় দৃশ্য কাব্য বিশেষ) ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীনতর সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে যবনিকা (বা জবনিকা) শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। এমন কি নবম শতাব্দীতেও বাচস্পতি মিশ্র ঐ অর্থে "তিরস্করণী" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রাচীন নাট্যগ্রন্থাদিতে ঐ অর্থে পটী, অপটী, প্রতিসীরা, তিরস্করণী (তিরস্করিণী) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা

যায়। অতএব, যবনিকা অর্থে গ্রীক্ বা পারসীক পর্দা বুঝাইলেও উহার সাহায্যে ভারতীয়-নাট্যে গ্রীক্ প্রভাব প্রমাণিত করা যায় না।

এইরূপে যবনিকার মায়া কাটান সম্ভব হইলেও কালিদাস-কৃত "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে উল্লিখিত সুন্দরী সশস্ত্রা যবনী প্রতিহারীগণের হাত হইতে এত সহজে নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই। "Periplus of the Erythraean Sea" নামক খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে রচিত একখানি গ্রীক্ পুস্তকে দেখা যায় যে, পশ্চিম ভারতের সুবৃহৎ বন্দর Barygaza-র (বর্ত্তমান Broach বা ভৃগুকচ্ছ) রাজগণের বিলাসের উপকরণ হিসাবে গ্রীক্ বণিকেরা নৌকা বোঝাই দিয়া যবনী বা ব্যাক্ট্রিয়ো পারসীয়ান্-গ্রীক্ সুন্দরী আমদানি করিতেন। আর পশ্চিম ভারতের অনার্য্য বিলাসপ্রিয় শক নরপতিগণ এই সকল অসামান্যলভ্যা মনোমোহিনী বিদেশিনী গণিকাপ্রায়া বীরাঙ্গনাগণকে (প্রকাশ্যে শরীর রক্ষিণীরূপেও অপ্রকাশ্যে নর্ম্মসঙ্গিনী হিসাবে) প্রতিপালন করিতেন। শকুন্তলায় এইরূপ যবনীর ছায়া যে দৃষ্ট হয়, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় নাট্যোৎপত্তির উপর গ্রীক্ নাট্যের প্রভাব স্বীকার করিবার উপযুক্ত বিশেষ কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ গ্রীক্ সুন্দরীর ভারতে আমদানী খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে (অর্থাৎ আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে) কোনরূপেই সম্ভব হয় নাই। অথচ তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে পুরাদস্তুর নাট্যাভিনয় যে চলিত, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

গ্রীক্ নাট্যের দুইটি প্রধান বিশেষত্ব—(১) দেশ-কাল-ঘটনার সমতা বা সামঞ্জস্য (unity), ও (২) কোরাস্ (chorus)-এর প্রবর্ত্তন। অথচ ভারতীয় নাট্যে এই দুইটি বিষয়েরই একান্ত অভাব। ভারতীয় নাট্যে দেশকালঘটনার সমতা প্রায় নাই বলিলেই চলে। দুইটি অঙ্কের ব্যবধানে একযুগ পর্য্যন্ত অতীত হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতীয় নাটকাদিতে বিশেষ বিরল নহে। এই সকল কারণে ভারতীয় নাট্যকে গ্রীক্ নাট্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া গণনা করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ বা তাহারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীতে ভারতে যে প্রকৃত নাট্যাভিনয় হইত, সে সম্বন্ধে প্রমাণাভাব না থাকিলেও সে সকল নাট্যাভিনয়ের কোনরূপ বিবরণ সংগ্রহ করা বর্ত্তমানে কঠিন। পৌরাণিক প্রমাণ বাদ দিয়া কেবল ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অভিনয়ের প্রাচীনতম বিবরণ ভগবান্ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সংগৃহীত হইয়াছে (৬)। ভাষ্যকারের মতে—পরোক্ষ অতীতের ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ দেখাইবার উপায় ছিল তিনটি—(১) শৌভিক বা শোভনিক গণ দর্শকসমক্ষে কংসবধ ও বলিবন্ধ প্রভৃতি অতীত ঘটনার প্রত্যক্ষ অনুকরণ করিয়া যাইতেন। (২) চিত্রের সাহায্যেও এই সকল অতীত ঘটনার অনুকরণ করিয়া দেখান হইত। (৩) গ্রন্থিকগণ এই সকল ঘটনার আবৃত্তি করিয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতেন। কংসবধ-পা ঠ আবৃত্তিকালে তাঁহারা দুইটি দলে বিভক্ত হইতেন, একদল হইত কংসের পক্ষ ও অপরদল হইত বাসুদেব-ভক্ত। শ্রোতৃগণের মনে গভীর ছাপ দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিজ নিজ অঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বর্ণলেপনও করিতেন। সাধারণতঃ, কংসপক্ষীয়গণ কালমুখ ও বাসুদেবের ভক্তবৃন্দ রক্তমুখ হইতেন।

উক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শৌভিকগণ কেবল আঙ্গিক অভিনয় করিতেন। পক্ষান্তরে গ্রন্থিকগণ বাচিক অভিনয়ের সহিত অল্পবিস্তর আঙ্গিক অভিনয়ও করিয়া যাইতেন। আর বর্ণ বিন্যাসের বিধান দেখিয়া মনে হয় যে, শেষোক্ত শ্রেণীর অভিনেতৃবর্গ নেপথ্যবিধি বা আহার্য্যাভিনয় সম্বন্ধেও একেবারে উদাসীন থাকিতেন না। শৌভিকগণ শুধুই মূকাভিনেতা ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। মহাভাষ্যের টীকাকার কৈয়ট বলিয়াছেন—"শোভনিক" শব্দের অর্থ "কংসাদির অনুকরণকারী নটগণের ব্যাখ্যানোপাধ্যায়"। কৈয়টের "ব্যাখ্যানোপাধ্যায়" শব্দটির অর্থ বিশেষ অস্পষ্ট। এই টীকাংশ হইতে ঠিক বুঝিয়া ওঠা যায় না যে, শোভনিকগণ ঠিক নাট্যাচার্য্যরূপে কংসাদির অনুকরণকারী নটগণকে শিক্ষাপ্রদান করিতেন, অথবা তাঁহাদের মূক অঙ্গবিক্ষেপের তাৎপর্য্য দর্শকগণকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। (বর্ত্তমান যুগে দক্ষিণ ভারতের "কথাকলি" নৃত্যে এরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়। একজন মূকাভিনয় করেন, ও তাঁহার অভিনের বিষয়বস্তু পশ্চাৎ হইতে গায়ক ও কথকের দল গীত ও আবৃত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন।) যদি প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শোভনিকগণকে অতি সুশিক্ষিত নট ও নাট্যাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অন্যথায়

(৬) যাঁহারা স্বর্গত মুঃ গণপতি শাস্ত্রীর মতের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্য পাণিনি ও কৌটিল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবি ভাসের গ্রন্থগুলিকেই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের বর্ত্তমানে উপলভ্যমান প্রাচীনতম নিদর্শন বলিবেন।

দি অটোফোকাল ক্যাটস্ আই

ক্যামেরা

উৎসুক সৌখীন ব্যক্তি, ব্যাক্‌টরিওলজির গবেষণা কার্য্য, রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষাকার্য, কারুশিল্প, পুরাতন ঐতিহাসিক পাণ্ডুপত্র

—এতদ্ভিন্ন—

অধ্যাপক ও বক্তা যাহারা গবেষণা কার্য্য প্রচার করিতে ইচ্ছুক অথবা নাম-করা বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণাবলী ধরিয়া রাখিবার পক্ষে

অত্যাশ্চর্য্য আলোকযন্ত্র

Operating Leica's BUILT-IN RANGE FINDER

Sight subject througn the rangefinder. If you see two images the picture is out of focus. Secure correct focus by turning lens mount until the two images become one — then just snap the shutter. Focus will be perfect.

১৩টি পরিবর্ত্তন কারী ও ৩০০ কল-কব্জা সম্বলিত

এই ক্যামেরা ব্যতিরেকে আলোক-চিত্রের কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়

ইচ্ছা করিলে দেখিয়া যাইতে পারেন

অথবা

পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

প্রত্যেক **লাইকা** সরবরাহকারীর নিকট পাইবেন

ষ্টকিষ্ট

দি ফটোগ্রাফিক ষ্টোর্স

এণ্ড এজেন্সী কোং লিঃ

১৫৪, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: ক্যাল ৪৪৬১ গ্রাম: গ্রেহাউণ্ড

বলিতে হয়—শোভনিকগণ নট ছিলেন না, মূক অভিনেতৃবর্গের কর্মব্যাখ্যা করিতেন মাত্র। যাহাই হউক, শৌভিক শব্দটির অর্থ স্থির না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ, গ্রন্থিকগণের ক্রিয়া পদ্ধতির বিবৃতিদর্শনে বেশ বুঝা যায় যে, আঙ্গিক, আহার্য ও বাচিক অভিনয় ভগবান্ পতঞ্জলির অবিদিত ছিল না। পতঞ্জলিকে বর্তমানে একরূপ সর্বসম্মতিক্রমেই "শুঙ্গ" রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের সমকালবর্তী (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগ) বলিয়া ধরা হয়। অতএব, ঐ সময়ে যে পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত রূপকাবলী ভারতে অভিনীত হইত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। কেবল ঐরূপ অভিনয় ব্যতীত নটস্ত্রীগণের চরিত্রহীনতার কথা, ও "ভ্রূকুংস" নামক স্ত্রীবেশধারী নর্তক বা নটের উল্লেখও মহাভাষ্যে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য গবেষকগণ কি ইহাকেও pantomime বলিয়া উড়াইয়া দিবেন ?

হিন্দু গ্রন্থগুলির স্থায় প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থেও অভিনয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ "সুত্ত" গ্রন্থগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পক্ষে "বিসূকদস্সন", "নচ্চ", "পেক্খা" প্রভৃতিতে যোগদান নিষিদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য গবেষকগণ বলেন যে, এগুলির সহিত অভিনয়ের কোন সাদৃশ্যই ছিল না, আর এই সকল "সুত্ত" গ্রন্থ তেমন প্রাচীন নয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞ বৌদ্ধ তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, এই সকল সুত্তগ্রন্থ খৃঃ পূঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে রচিত হয় নাই। ইহা ছাড়া "ললিতবিস্তরে" বুদ্ধের নাট্যকলাজ্ঞানের উল্লেখ আছে। বিম্বিসারের যে নাট্যাভিনয় হইত, তাহারও বিবরণ পাওয়া যায়। "দিব্যাবদান" ও "অবদান-শতকের" মধ্যেও নৃত্যকাব্যের প্রসঙ্গ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। অবদান-শতকে উল্লিখিত আছে—"ক্রকুচ্ছন্দ" নামক এক পূর্ববর্তন বুদ্ধের আদেশে শোভাবতী নগরীতে নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকালে রাজগৃহেও অভিনয় চলিত। "কুবলয়া" নামে এক অভিনেত্রী সেই সময় বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুককে বিপথগামী করিয়াছিল। অবশেষে বুদ্ধ তাহাকে এক কুৎসিতা বৃদ্ধা রমণীরূপে পরিবর্তিত করিয়া দেন। তখন অনুতপ্তা অভিনেত্রী ভিক্ষুণীর জীবন গ্রহণ করে। ললিতবিস্তর অবশ্য শ্রব্যকাব্যাকারে লিখিত। কিন্তু "সদ্ধর্মপুণ্ডরীক" গ্রন্থখানি সংবাদ বা সংলাপে (dialogue) গ্রথিত—নাটকীয়ভাবে পরিপূর্ণ। "মহাবংশে" পাওয়া যায় যে, "স্তূপ"-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে নাট্যাভিনয় হইত। আর এই সকল গ্রন্থের কোন খানিই খৃষ্টজন্মের পরবর্তীকালে সঙ্কলিত হয় নাই।

অজন্টায় 'ফ্রেস্কো' চিত্রের কথা না হয়, ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। ইহাতে নৃত্য-গীত-নাট্যসম্পর্কিত চিত্রের অভাব নাই। কিন্তু এগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তিব্বতেও অতি প্রাচীন লৌকিক নাট্যাভিনয়ের লুপ্তাবশেষ এখনও সম্প্রদায়ক্রমে রক্ষিত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আর সে গুলি ভারতের বৌদ্ধ আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত।

বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির স্থায় প্রাচীন জৈন গ্রন্থগুলিতেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নৃত্য-গীত-নাট্যদর্শনের নিষেধ কথিত হইয়াছে। তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বয়ং নাট্যকলায় বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন,—ইহারও উল্লেখ জৈনগ্রন্থে পাওয়া যায়।

হিন্দুদিগের ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণেও দৃষ্ট হয়,—শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম চতুঃষষ্টি ললিতকলায় পারদর্শী ছিলেন। আবার রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীরামচন্দ্রের নিকট শৈলুষজাতির কথাচাতুর্য্য উল্লেখ পূর্বক আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য গবেষকবৃন্দের নিকট হিন্দুর প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই। অতএব, এ সকল উক্তি তাঁহারা বিনা বিচারে ও বিনা যুক্তিতে পরবর্তী কালের প্রক্ষিপ্ত রচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বান্বেষীর তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রের আলোচনায় এইটুকু বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে নাট্যাভিনয় বিশেষভাবেই প্রচলিত ছিল। সে অভিনয়ে গণিকা অভিনেত্রীও নিয়োজিত হইত। আবার কখন কখন বা স্ত্রীভূমিকায় স্ত্রীবেশধারী পুরুষও অবতীর্ণ হইতেন (১)।

(১) এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারগুজা স্টেটে যে রামগড় পর্বত বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে "সীতাবেঙ্গা" ও "যোগীমারা" গুহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সুপরিচিত। এই দুইটি গুহায় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর অক্ষরে (ব্রাহ্মী-লিপি) খোদিত দুইটি শিলালেখ দৃষ্ট হয়। এই শিলালেখে দেবদত্ত নামক কোন রূপদক্ষ (অর্থাৎ নট) ও সুতনুকা নাম্নী কোন দেবদাসীর (অর্থাৎ নটী বা নর্তকীর) নাম পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সীতাবেঙ্গা গুহাটি ভরতনাট্যশাস্ত্রোক্ত কনিষ্ঠ পরিমাণের রঙ্গমঞ্চের আকারে কাটা। উহার পার্শ্বের যোগীমারা গুহাও নেপথ্যের (অর্থাৎ সাজ-

মহাভাষ্যের পরবর্তীযুগ হইতে ভারতে যে সকল নাট্যাভিনয় হইয়াছে, তাহাদের একটা মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ, ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, চন্দ্র, শ্রীহর্ষ, মহেন্দ্রবিক্রম-বর্ম্মা, ভবভূতি, বিশাখদত্ত, ভট্টনারায়ণ, মুরারী, রাজশেখর, ভীমট, ক্ষেমীশ্বর, কৃষ্ণমিশ্র প্রভৃতির পরিচয় ও নাট্যরচনা অনেকেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। হয়ত কোনো কবির আবির্ভাব বা রচনাকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের ধারা খুব বেশী বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল মহাকবি ভাসকে চাণক্য (কৌটিল্য) ও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেকটা স্থির নিশ্চয় হওয়া যায়। অন্যান্য অবশিষ্ট কবিগণের সময় দুই এক শতাব্দী এদিক্‌-ওদিক্‌ হইলে কোনরূপ বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

পাশ্চাত্ত্য গবেষকবৃন্দ ভারতীয় রূপকোৎপত্তি সম্বন্ধে বহু বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ বলেন—মৃত মহাপুরুষগণের স্মৃতিতর্পণোৎসব (রাম-কৃষ্ণ-শিব-দুর্গা প্রভৃতির উপাসনা এই উৎসবপ্রেরণাতেই পড়ে) নাট্যের উৎপত্তির কেন্দ্র। আবার কাহারও মতে পুতুলনাচ বা ছায়াবাজী (ছায়ানাট্য) প্রভৃতি হইতেই নাট্যের উৎপত্তি। অবশ্য নাট্যের উপর উপাসনা বা ঐ জাতীয় ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানের (যথা,—হোলি, রাসলীলা, দশেরা প্রভৃতি জাতীয় বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের প্রাচীন রূপ;—জর্জ্জর উৎসব প্রভৃতির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়) প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ছায়ানাট্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন (৮)। অতএব, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলির যে কোন একটিও রূপকোৎপত্তির কালসমস্যা সমাধানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। রূপক হইতেছে "লোকানুকৃতি।" তাই মানবজীবনের মত উহার উৎপত্তি চিরদিন রহস্যাবৃতই থাকিয়া যাইবে।

ঘরের) মত করিয়া সজ্জিত। ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, ঐস্থানে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে নাট্যাভিনয় চলিত। এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ মদীয় "মেঘদূতের যক্ষ ও যক্ষবধূ" শীর্ষক প্রবন্ধে (চিত্রালী আষাঢ় ১৩৪২) দ্রষ্টব্য।

(৮) ভারতীয় ছায়ানাট্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ মদীয় "প্রাচীন ভারতের ছায়ানাট্য" শীর্ষক প্রবন্ধে (খেয়ালী, নববর্ষ সংখ্যা, ১৯৩৫) দ্রষ্টব্য।

রাজপথে

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

ভোর হ'তে সন্ধ্যাবধি সহরের রাজপথে কত লোক আসে আর যায়,
অসংখ্য বিচিত্র মনু, কারণে ও অকারণে কেহ কাঁদে কেহ গান গায়;
কেহ ব্যস্ত তুচ্ছ কাজে মূর্খ অন্ধ অর্ব্বাচীন, কেহ করে নিত্য পরিশ্রম,
কারো চলে বেচাকেনা সুসজ্জিত বিপণাতে, অর্থ কারো বেশী কারো কম।

কোথাও বেকার যুবা ব্যথিত উদাস মনে পথ পানে রয়েছে চাহিয়া,
কোটোর প্রবিষ্ট চোখে ধুলি ধোঁয়ার পানে চেয়ে চেয়ে কেঁপে উঠে হিয়া;
জীবন বীমার কাজে ব্যস্ত দালালের দল পরস্পর ভাবে মনে মনে—
চাকরী জুটিল কা'র ট্যাঁকে কা'র বাজে টাকা কেমনে মিশিবে তার সনে।

চলেছে কেরাণী বাবু খেটে খেটে দেহ কাবু হতাশায় ম্লানছায়া মুখে—
ঘরেতে রয়েছে রোগী, বাড়িওলা টাকা চায়, ভাবনার বোঝা লয়ে বুকে,
অভিনেতা কবিদের চিনিতে লাগেনা দেরী নায় শুধু টেরী আর চুল
চাদর ধুলায় লুটে বিচিত্র অদ্ভুত জামা কারো ছোট কারো বড় ঝুল।

কেহ লাল, কেহ নীল, সবুজ বেগুনে কেহ, ধোয়াটে, হলুদ, সাদা কালো,
রঙীন ফানুস যেন স্বপ্নের আকাশে ওড়ে শূন্য বুকে জ্বলে ক্ষীণ আলো,
মরণার্ত্তনাদ করি' কেহ পড়ে গাড়ী চাপা, কেহ পুনঃ চড়ে সেই গাড়ী
কা'রো বা পৈত্রিক বাড়ী নিলামে বিক্রয় হ'ল, কা'রো ভাগ্যে জুটিল সে বাড়ী,

কোথাও শ্রমার্ত্ত কুলী হেঁটে চলে ছ' মাইল মাথায় বহিয়া গুরুভার,
হিসেবী বাবুর বাড়ী ছয়টা ভাবায় খণ্ড দুরদৃষ্টে জোটেনাকো তা'র!
মূক বলদের দল বন্ধু মহিষের সাথে অবিশ্রান্ত গাড়ী টেনে যায়,
তৃষ্ণার্ত্ত পশুর মনে কী প্রার্থনা জেগে উঠে, চালকেরা বোঝেনাতো হায়!

ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা দীনা ভিখারিণী মেয়ে পথে পথে ভিক্ষা মেগে খায়,
তা'রি পার্শ্বে দিব্য-যানে ধনগর্ব্বে গরবিনী বাঁকা ঠোঁটে ব্যঙ্গ কোরে যায়।
কোথাও বা মঠধারী মানুষে ঠকায় নিত্য গেরুয়ার করি অপমান
শ্রমিকের শ্রম রক্তে কেহ অর্থ উপার্জ্জিয়া রঙ্গালয়ে করে নৃত্যগান।

সহসা পথের মাঝে কাহারো মিলিল দেখা পুরাতন সহপাঠী সাথে
বহু কষ্টে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ওষ্ঠের ফাঁকে আলাপন হ'ল ব্যস্তভাবে;
চিনিতে পারিল কেহ, কেহ বা দিলনা চেনা, ব্যর্থ হ'ল কুশল জিজ্ঞাসা
অন্তরে বাহিরে চুরী একসাথে ক'রে গেল চুপে চুপে আশা ও নিরাশা,

নিঃসাড়ে কাহারো হাত পকেটে ঢুকিল কারো অভাবের খুজিতে সঞ্চয়,
কেহ সর্ব্বহারা হ'ল বক্ষে হানি' করাঘাত অর্দ্ধ আয়ু হয়ে গেল ক্ষয়।
দাসীপুত্র কোতো বাবু চলে রাজপথ বেয়ে, গজভুক্ত কপিথের মত
মা'র বুকে রক্ত-ওঠা অর্থ দিয়ে সাজে বাবু মনে মনে আঁটে ফন্দী কত।

চায়ের দোকানে বসি' মত্ত জুয়াড়ীর দল স্বপ্ন দেখে দৌড়ের ঘোড়া,
শনির নীরব দৃষ্টি শনিবারে বলে যায় অদৃষ্ট তা'দের হায় পোড়া!
'বল হরি হরি বোল'—অদৃষ্টের পরিহাস কারো মরে বংশের দুলাল
কোথাও বা বরযাত্রী চলে মহা সমারোহে মর্ম্মে রচি' সুখ স্বপ্ন জাল।

সারা অঙ্গে ক্লেদ পঙ্ক উন্মাদ চলেছে পথে রুক্ষ জটা ধুলায় ধূসর,—
অট্টহাসি হাসে কভু, হর্ষে কভু গাহে গান, কভুবা চেঁচায় ভয়ঙ্কর।
বিরাট বৈষম্যময় সহরের রাজপথে চলে কত বিচিত্র মানব,
কারো বুকে জাগে পশু, অর্দ্ধেক মানুষ কেহ, মূর্ত্তিমান কেহবা দানব।

—:o:—

শীকার

[একাঙ্ক নাটিকা]

শ্রীঅখিল নিয়োগী

[একটা বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গন। তোরণদ্বারের ভিতর দিয়া বাহিরে ভিক্ষু বিহার দেখা যাইতেছে—পাশ দিয়া একটি ছোট নদী রজত রেখার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। ওপারে অস্পষ্ট ভিক্ষুনী বিহার। ভিতরকার মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ভগবান বুদ্ধের বিগ্রহ। তলায় রাশি রাশি পুষ্প স্তূপিকৃত।

রাত্রি তখনও শেষ হয় নাই। নিশা ও উষার ঠিক সন্ধিস্থল। তোরণদ্বারের ভিতর দিয়া যে ছোট এক ফালি আকাশ চোখে পড়ে—সেখানে শুকতারাটি তখনও জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। ঠিক এমনি সময় দুই ঝুড়ি ফুল মাথায় লইয়া জীবক ও মৃগদাব চুপি চুপি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল]

জীবক। এই ত সঙ্ঘারাম ?

মৃগদাব। সেই রকমই ত' মনে হচ্ছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না ত!

জীবক। হাঁ, দেখতে পাওয়ার সময়ই বটে! তোমাদের মত নিশাচর ত' কেউ নয়!

মৃগদাব। তা' যা' বলেছিস ভাই—সর্দারের মাথায় কখন যে কি খেয়াল চাপে।—'যাও শেষ রাত্তিরে সঙ্ঘারামে গিয়ে ফুলের দোকান বসাও—ব্যস- এম্‌নি ছোটো—

জীবক। আরে ভাই খেয়াল ত' আর অমনি হয় না;—খেয়ালের পেছনে আছে —সোনার নেশা!

মৃগদাব। আমাদের সর্দারের কিন্তু এ অদ্ভুত বুদ্ধি! ডাকাতের থাক্‌বে হাতিয়ার—থাক্‌বে মশাল—আর মুখে থাক্‌বে মাভৈঃ রব—; তা নয়—শুধু একটু চোখের চাউনি—একটু মুচকি হাসি—ব্যস কিস্তি মাৎ—

জীবক। সেবার সেই অবন্তীর রাজকুমারের কথা মনে আছে ত? একদিনে সর্ব্বস্ব খুইয়ে একেবারে পথের ভিখিরি! আর সব চাইতে আশ্চর্য্য এই যে—এ দস্যু ধরা পড়ে না! কিন্তু চণ্ডপীড়ের নামে কাঁপে না—এমন লোকও এ তল্লাটে খুঁজে মিল্‌বে না!

মৃগদাব। আর এ-ও তেমনি আশ্চর্য্য—যে অত বড় দুর্দান্ত দস্যু—তার একমাত্র মেয়ে সোনালী! আরে তাজ্জব চিজ রে ভাই—সোনালী ত' সোনালী! রাম ধনুকের এক পোছ রঙ—কেউ চুরি করে এনে যেন ওর গায় বুলিয়ে দিয়েছে। চোখের চাউনি নয়ত আগুনের ফুলকি—! আর মুখের হাসি—

জীবক। সে যা-ই হোক কিন্তু ঐ পা' দুটির কাছে মাথা বিকোয় না এমন লোকও বড় চোখে পড়ল না। মনে পড়ে সেই রাজগৃহের ঘটনা?

মৃগদাব। সবই পড়ে ভাই—সেই গোপথ, বিশ্বচরার মন্দির, সপ্তপর্ণীর গুহা, তপোদারাম—কোনো কথাই ভুলিনি—কিন্তু আমি ভাবছি-এই বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে—গরুরায় রাজ্যে সর্দার এমন কোন রত্নের সন্ধান পেলেন যার জন্যে এই শেষ রাত্তিরে ফুলের দোকানের হাউনি [illegible] দরকার হ'য়ে পড়ল।

জীবক। আছে রে আছে—বনের সাপের মাথায়ই মণির খোঁজ মেলে। গেরুয়ার আশে পাশেই অনেক সময় হীরে জহরৎ ঢেকনাই দেয়।

মৃগদাব। আরে ভাই ব্যাপারটা খুলেই বল না—একবার দিল খোলসা করে হাসি।

জীবক। ব্যাপার আর কিছুই নয়—সর্দার খবর পেয়েছেন—সঙ্ঘারামে এক নাম-করা বৌদ্ধ ভিক্ষু আসবেন—আজকে—আর তাকে দর্শন করতে আসচেন-এক শ্রেষ্ঠী পুত্র নাম মাণিকলাল। গলায় তার এক পরশমণি—যার ছোঁয়া পেলে লোহা হ'বে সোনা—পেতল হ'বে সোনা—রূপো হ'বে সোনা—

মৃগদাব। [মুখ ব্যাদান করিয়া] অ্যাঁঃ—সব সোনা?

জীবক। হ্যাঁরে—হ্যাঁ—হাঁ করে রইলি যে! সব সোনা। কাজেই সর্দারের এবারকার শীকার এই মাণিকলাল।

মৃগদাব। কিন্তু ফুলের ঝুড়ি? এতে কি হ'বে?

জীবক। দেখ্ মৃগ, তুই বৃথাই এতদিন সর্দারের সাক্‌রেদী করেছিস্—কিন্তু বাজে কথা রাখ—ফুলের দোকান সাজিয়ে রাখতে হবে না?

মৃগদাব। ঠিক বলেছিস্—ভুলেই গেছ্‌লাম।

[দুইজনে মিলিয়া ফুলের দোকান সাজাইতে ব্যাপৃত হইল]!

মৃগদাব। কিন্তু যা বলিস্ ভাই, ধর্ম্মের নামে সব চলে।

জীবক। কেনরে আবার কি হল?

মৃগদাব। দেখ্‌লিনে শেষ রাত্তিরে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে আস্‌তে দেখে নগর-রক্ষক পথ আটকে দাঁড়াল। যেমনি বল্লুম সঙ্ঘারামের ফুল—ছেড়ে দিলে।

জীবক। এসব আমাদের সর্দারের আগে থাক্‌তেই জানা। কিন্তু ওদিকে আবার ফর্সা হয়ে গেল।

মৃগদাব। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কাজ শেষ। কিন্তু সর্দারের যে কখন দর্শন মিল্‌বে—আর সোনালী ঠাকুরুণকে আবার কোন বেশে দেখব—সেই হয়েছে আমার মস্ত বড় ভাবনা।

জীবক। তোর ভাবনা নিয়ে ত' তুই মাথা ঘামাচ্ছিল!—ওদিকে দেখ চেয়ে আবার কি কাণ্ড!

মৃগদাব। অ্যাঁ—তাইত! চল আড়ালে দাঁড়াই।

[তোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দেবদাসীগণ নৃত্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। চোখে তাদের মায়া কজ্জল, ডান হাতে দীপ—বামে সজ্জিত বরণডালা—চলনে অপরূপ গতি—মুখে সুমধুর সঙ্গীত]

হে অপরূপ বুদ্ধ তোমার চিত্ত মাঝে স্মরণ করি—

অভয় দিলে, তাইত তোমার ধূপের ধোঁয়ায় বরণ করি।

শতেক শিখার দীপের দীপে
মল্লিকা জুঁই পারুল নীপে
বরষ তোমার সত্য শিবে
চাইবে যুগল চরণ-তরী

হে অপরূপ নবীন তাপস তাইত তোমায় বরণ করি!

হে সুমহান মহান যোগী—মৃত্যু-জরা ব্যাধির অরি—

মৃত্যু-পিছল পৃথিমাঝে চিত্ত ভরি তোমায় স্মরি—

ধ্বংস লীলার বজ্র মাঝে—
তোমার অভয়-বুদ্ধ বাজে—
(সেত') মুক্তি পথের বন্ধ রাজে—
তাইত তবে বরণ করি—

পেলাম যদি অভয় তোমার আর কি মোরা মরণ ডরি!

[দেবদাসীগণ একে একে তাহাদের দীপাবলি এবং—পুষ্পাঞ্জলিতে ভগবান বুদ্ধের বিগ্রহের বেদী সজ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে সঙ্গীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রস্থান করিল]

জীবক। এইবার ত' পালা সুরু হল—এখন আমরা কি করি বলত?

মৃগদাব। আমি বলি কি এত বড় সঙ্ঘারামের এর পো-পালাটা একবার না দেখলে যে পুণ্য সঞ্চয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

জীবক। পেটুক!—তোর নজর চিরদিনই ঐ দিকে।

মৃগদাব। না ভাই আর সব পারি—কিন্তু উদরের ভেতর অগ্নিদেব যখন তীব্র জ্যোতি ছড়াতে থাকেন—সেইটেই ঠিক বরদাস্ত হয় না।

জীবক। তা কথাটা নেহাৎ খারাপ শোনাচ্ছে নারে—তার ওদিকে সর্দারেরও যে কখন আগমন হ'বে—তা' কে জানে! তবে কথাটা তোর মুখ থেকে বেরিয়েছে কি না!

মৃগদাব। দেখ চিরদিনই আমি সাচ্চা কথার লোক। কিন্তু প্রথমটা তুমি কিছুতেই তা' মানতে রাজী নও—জানি শেষ কালটা আমার মতে মত দিতে হ'বেই।

জীবক। দেখ মৃগ, তুই বোকা হ'লে কি হ'বে—বুদ্ধি তোর চিরদিন ঠিকই আছে—

মৃগদাব। নাও-নাও চল—

[দু'জনের প্রস্থান]

[দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ প্রবেশ করিল। মুখে তাহাদের বাণী—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি—
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—"

[আর একদিক দিয়া প্রবেশ করিল—ভিক্ষুনীগণ—তাহারা সমস্বরে বুদ্ধ স্তোত্র গাহিতে লাগিল। মন্দিরের ভিতর হইতে আরতির-শঙ্খ-ঘণ্টা দুন্দুভ সমস্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল—ধূপের ধোঁয়ায় ও নানা পুষ্পের গন্ধে সঙ্ঘারাম পবিত্র তপোবনে পরিণত হইল]

[স্তোত্র শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুক-ভিক্ষুনীগণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এমন সময় দুইটি বৃদ্ধ ও একটি বৃদ্ধার প্রবেশ]

১ম বৃদ্ধ। পাড়ার যে সন্ন্যাসীর কথা শুনে এলুম—এখনও এসে কি পৌছোসনি ভায়া—?

২য় বৃদ্ধ। আরতির শব্দ শুনে আমিও ত ছুটে এলুম—কিন্তু সব যে ফাঁকা দেখছি।

১ম বৃদ্ধ। তোমার সঙ্গে দেখা হল ভালই হল ভায়া—আমার কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে একটা মাদুলী চেয়ে নিতে হবে। বাতের ব্যামোয় কোমরটা ধসে পড়বার মতো হয়েছে দুপা এগুই ত' তিন পা পেছুই—

২য় বৃদ্ধ। আমিও ত ভাই তিন বছর অম্লশূলে ভুগছি—গিন্নি বল্লে যা মিনসে, সন্ন্যাসীর পায়ে ধরে একটা অষুধ চেয়ে আনগে—

বৃদ্ধা। হ্যাঁগা বাছারা—অমনি আমার জন্যে একটা, শেকড় চেয়ে নিয়ো দা ঠাকুরের কাছে—চোখে দেখতে পাইনে বাবা, একটি নাতি ছিল—ডবকা ছোঁড়া হাত ধরে নিয়ে বেড়াত। কি-কাল রোগেই ধরলে, বাছা আমার দুদিনেই— [ক্রন্দন]

১ম বৃদ্ধ। ভালো জ্বালা একেবারে কাঁদতে সুরু করলে যে!—জানিস্ দেবতা-স্থানে চোখের জল ফেললে কি হয়।

বৃদ্ধা। কি আর হবে বাছা—যা হবার তা ত হয়েই গেছে—শুধু চোখে যে দেখতে পাইনে—দুমুঠো কুড়িয়ে এনে দেবে এমন কেউ নেই—পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—

[একটি অবগুণ্ঠনবতীকে লইয়া আর এক বৃদ্ধার প্রবেশ]

২য় বৃদ্ধা। অষুধ-বিষুধ কিছু পেলে বাছারা—আমার এই নাত-বৌটির একটি শেকড় জোগাড় করে দিতে হবে। দেবের আশীর্বাদে বাছার কোলে আজও একটি ছেলে হ'ল না—

২য় বৃদ্ধ। ছেলে হ'ল না তা আমরা কি করবো—?

২য় বৃদ্ধা। না, বলছিলুম তোমরা সব বাচ্ছ সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে—তাই আমার জন্যেও যদি—

নিউ থিয়েটার্সের আগামী বাংলা "দিদি" চিত্রের একটি দৃশ্যে সায়গল, অমর মল্লিক ও চন্দ্রাবতী। ছবিখানা শীঘ্রই 'চিত্রা'য় আসছে।

শ্রীমতী ছায়া "সোনার সংসারে" একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবার পর "মতিমহল টকীজে"-র "রাঙা বৌ" ছবিতে নাম-ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন।

২য় বৃদ্ধ। হ্যাঁ, আমরা তোমার নাত-বৌয়ের শেকড়ের জন্তে বসে আছি কিনা—

১ম বৃদ্ধা। হ্যাঁ বাছা, আমি যে চোখে দেখতে পাইনে—

২য় বৃদ্ধ। চোখে দেখতে পাও না—সরষের তেল দাও গে, আমরা তার কি করবো?

[প্রথমকে গমনোদ্যত দেখিয়া] ও ভায়া যেয়োনা—যেয়োনা—দাঁড়াও—উঃ আবার বুঝি ব্যথাটা ওঠে।

২য় বৃদ্ধা। উঠবে না? মন্দিরে এসে অত আদিখ্যেতা? যাবে—যাবে—দেবতা আছেন না—?

২য় বৃদ্ধ। আরে মাগী গালাগাল দিচ্ছিস্ নাকি?

অবগুণ্ঠনবতী। অ ঠাকুমা, কি বচ্ছ—দেখছ না মিন্‌সে মার মুখো হয়ে উঠেছে।

২য় বৃদ্ধা। আসুক না মিনসে—সামনের দাঁত কটি ভেঙে দেবো—

[একটি বৃদ্ধকে টানিয়া লইয়া রণ-রঙ্গিণী বেশে একটি স্ত্রীলোকের প্রবেশ]

স্ত্রীলোক। আয় মিন্‌সে আয়—চল সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে।

১ম বৃদ্ধ। কি হ'ল আবার তোমাদের—এমন মারমূর্ত্তি কেন।

স্ত্রীলোক। আজ বাদে কাল চিতায় উঠবে—মিন্‌সে নদীর ধারের মেয়ে মানুষের স্নানের ঘাট থেকে নড়বে না রোজ ঐখেনে—আজ এমন শেকড় পরিয়ে দেবো বা ঠাকুরের কাছ থেকে—পায়ের নফর হয়ে থাকবি—

৩য় বৃদ্ধ। ভাখ, কিছু বলিনে বলে—আমি যা খুশী তাই করবো—তাতে তোর কি?

স্ত্রীলোক। রোস্—তোর যা খুশী তাই করছিস্—আজ আমার একদিন কি তোর একদিন!

[কোমরে কাপড় বাঁধিল]

১ম বৃদ্ধ। [দ্বিতীয় বৃদ্ধকে ধরিয়া] ওহে ভায়া সব গিন্নিই দেখছি একই ধাতে তৈরী—চল—এখান থেকে পালাই চল—

২য় বৃদ্ধ। উঃ আমার ব্যথাটাও আবার কেমন চড়ে উঠল—

১ম বৃদ্ধা। ও বাছা—আমি যে দেখতে পাইনে—আমার কি গতি হবে—

২য় বৃদ্ধ। মর মাগী—কের পেছু ডাকে?

স্ত্রীলোক। কি মিন্‌সে—এখন পেছুচ্ছিস্ যে বড়?

৩য় বৃদ্ধ। পিছুচ্ছি কোথায়? আমি যাচ্ছি স্নান করতে।

স্ত্রীলোক। স্নান করতে! তবে রে পোড়ার মুখো!

[ছুটিয়া গিয়া কোমরের কাপড় ধরিল]

৩য় বৃদ্ধ। ভাল হবে না বলছি ছাড়—ছাড়—ছাড়বিনে তবে এই ভাখ মজা—

[দুই হাতে স্ত্রীলোকের চুল ধরিয়া মারিল টান]

স্ত্রীলোক। ওরে মিন্‌সে খুন কল্লেরে—

[দুইজনে হুটোপুটি করিতে করিতে ফুলের দোকানের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল—ঠিক এমনি সময় জীবক ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল]

জীবক। ওরে মৃগ, ছুটে আয়—মাগী-মিন্সেতে সব ফুল নষ্ট করে ফেল্লেরে—[উভয়ের দিকে] কেমন ধারা লোক গা তোমরা? ঠাকুরের জন্ত আনা ফুল—তাই তোমরা দুপায়ে দলছ?

স্ত্রীলোক। [জিব কাটিয়া] ওমা তাইত! —তা এই মিন্‌সের জন্তেই ত যত অনর্থ!

৩য় বৃদ্ধ। দেবতার ফুল মাড়িয়েছে—ও মাগী আজ মরবে।

স্ত্রীলোক। বটে! আঁর দিন্সে বুঝি স্নানে বেরুচ্চে! চল্ মিন্‌সে, আজ আমার একদিন কি তোর একদিন—

৩য় বৃদ্ধ। যাচ্ছি, যাচ্ছি—ওই যে আর একটি বউ অষুধের জন্তে এসেছে—ওকেও তোর সঙ্গে নেনা—আহা একলা মানুষ—!

স্ত্রীলোক। ইঃ—আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে—চল্ মিন্‌সে চল্—

১ম বৃদ্ধা। ওগো আমার কি গতি হবে!

স্ত্রীলোক। আমায় কে পেছু ডাকে!

জীবক। পেছু ডাকবে না?—এযে দেবতার ফুল পায়ে দললে এর কি হবে?

স্ত্রীলোক। ফুল পাবে বাছা—আরো ফুল আসবে—

[ঠিক এমনি সময় একদল ফুলওয়ালী ফুল লইয়া নাচিয়া গাহিয়া প্রবেশ করিল]

ফুলওয়ালীদের গান॥

পূব হ'তে ফুল আনবো লুটে মৃদুল দখিন বায়।
গাঁথিসনে হায় অঞ্জলি যে দেবের যুগল পায়॥
আনব সুবাস আনব মধু—
সঁপব পরাণ—সঁপব বধূ
ভয় শুধু তোর কোমল পরাণ মূর্চ্ছা যদি যায়!
আলগোমে তোর কোমল শেকড়!
বলছি বধূ সইবে এতর—
কাশ, বেলি, জুই সাজবে ভালো দেবের চরণ ছায়।

[মৃগদাবের প্রবেশ]

মৃগদাব। [জীবককে] এ যে মেলা ফুলওয়ালী এসে হাজির হ'ল! আমাদের ঠাকরুণীর ব্যবসাটা এরা একেবারে মাটী না করে ছাড়বে না দেখছি।

জীবক। তাইত রে মৃগ, ব্যাপারটা এরা ত খুব ঘোরালো করে তুলছে না! এরাও সব সোনালী ঠাকরুণের ছোট সংস্করণ নাকি?

মৃগদাব। নারে—না। দেখছিসনে—চেহারা দেখে মালুম হচ্ছেনা তোর? ফুল বিক্রী করাই এদের পেশা—

জীবক। তা না হয় তোর কথাই মানলুম। কিন্তু ঠাকরুণ যদি এখনও না এসে পৌঁছন্ এরাই ত' সকলকার চাহিদা মেটাবে। ঠাকরুণ তখন ফুল বেচবেনই বা কার কাছে—দেখাই বা পাবেন কার!

মৃগদাব। তাই ত রে! তবে উপায়?

জীবক। উপায় আমায় বরাৎ আর তোর হাত যশ। [উভয়ের প্রস্থান]

স্ত্রীলোক। ও মিন্সে দাঁড়া—এই ফুল-ওয়ালীদের কাছ থেকে গুটী কয়েক ফুল কিনে নি। এ না পেলে ত' আবার দেবতা খুশী হবে না—কই গো বাছারা আমায় এক কড়ির ফুল দাও ত [ফুল-ওয়ালীগণ হাসিয়া এ ওর গায়ে ঢলিয়া পড়িল]

স্ত্রীলোক। ওমা রকম দেখনা—দেবে ফুল, না হাসতে সুরু করে দিলে—বলি আমি কি তোদের সঙ্গে রসিকতা কচ্ছি নাকি লা?

১ম ফুলওয়ালী। রসিকতা ত' তুমিই সুরু করলে ঠাক্রুণ।

স্ত্রীলোক। ওমা! আবাগীর কথা শোনো—আমি আবার কি রসিকতা করলুম তোদের সঙ্গে?

২য় ফুলওয়ালী। বলি ফুল ত' কিনবে ঠাক্রুণ, দিতেও আমরা পারি কিন্তু তোমার এক কড়ার ফুল ত' আমাদের কাছে মিলবে না।

৩য় ফুলওয়ালী। তাও কাণাকড়ি কিনা কে জানে।

স্ত্রীলোক। মর মুখপুড়ি,—তা না হয় দু' কড়িরই দে ওই গোটা আষ্টেক মল্লিকা দিস্ কিন্তু—

[ফুলওয়ালীগণ আবার হাসিতে লাগিল]

স্ত্রীলোক। [কপোলে তর্জ্জনী রাখিয়া] আবাগীদের রকম দেখনা—বলি কটা চাই তাই বল না—

৪র্থ ফুলওয়ালী। কটা আছে তাই না হয় শুনি—

স্ত্রীলোক। মর ছুঁড়ি—আবার হাসছে দেখনা।

৫ম ফুলওয়ালী। বলি সোনা-দানা কিছু আছে?

স্ত্রীলোক। অবাক করলি তোরা—তোদের কাছে কি ফুল মোহর দিয়ে কিনতে হবে নাকি?

৬ষ্ঠ ফুলওয়ালী। ঠাক্রুণ, এইবার সত্যি কথা বলেছ, এ মধু মালঞ্চের ফুল, কত বড় বড় শ্রেষ্ঠিপুত্র কোটালপুত্রেরা সোনা-দানা দিয়ে এই ফুল কিনে দেবতার পায়ে দেয়। ওকি এমনি মেলে?

স্ত্রীলোক। [মুখ বাঁকাইয়া] ইঃ নে মিন্সে চল আর ফুলে কাজ নেই। ঠাকুরকে বলে কয়ে অমনি এক টুকরো শেকড় চেয়ে নেবো'খন। [বৃদ্ধকে লইয়া প্রস্থান,]

[অন্য কয়েক সম্ভ্রান্ত নাগরিকের প্রবেশ]

মলয়। বিক্রম, তুমি দেবদর্শনের জন্যে ফুল চাইলে না। এই ফুলওয়ালীদের কাছে সব রকম ফুল মিলবে।

বিক্রম। সত্যি আজ গোটা সহর ঢুড়ে একটা ফুলের কুঁড়িও খুঁজে পেলুম না। ওগো ফুলওয়ালীরা, কি ফুল আছে তোমাদের কাছে?

১ম ফুলওয়ালী। এই যে নিন্ না—এ সব মধুমালঞ্চের ফুল—আপনাদের জন্যেই ত' তুলে রেখেছি—তা কি কি চাই আপনার? মালঞ্চ, অপরাজিতা, পলাশ, জুই, বেলী, কাশ, জবাব, থলকমল—সব পাবেন আমাদের সাজিতে—

বিক্রম। তা দাও—সবারই কিছু কিছু করে নিয়ে যাই—

[ফুলওয়ালীরা সাজি হইতে ফুল তুলিয়া নাগরিকের হাতে দিল] ঠিক এই সময়ে ভিতরে একটা গোলমাল শোনা গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একদল পথিক ছুটিয়া প্রবেশ করিল—

১ম পথিক। ওরে ঐদিকে ঐদিকে—সন্ন্যাসী ঠাকুর ভিড়ের ভয়ে খিড়কির পথ দিয়ে মন্দিরে যাচ্ছে—ওরে বটুকে—ও জনার্দ্দন—এই পথে এই পথে—

[দলে দলে লোক প্রাঙ্গনের এক পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য পথ দিয়া ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গেল সেই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তার নাত বৌ—আর ছুটাতে ছুটাতে আসিল সেই স্ত্রীলোকটী, বৃদ্ধ স্বামী তার হাতের মুটায় ধরা]

স্ত্রীলোক। চল্ মিন্সে চল্—দেরী হয়ে গেলে আর একটু শেকড়ও মিলবে না—মাগী মিন্সেতে ছুটেছে দেখ না—যেন কেউ কোনদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখে নি।

৩য় বৃদ্ধ। না মেলে নাই মিললো। তুই কি আমার কাপড়ের পুঁটলী পেয়েছিস্ নাকি—টেনে হিঁচড়ে চলেছে দেখ—

স্ত্রীলোক। নে এখন মুখ বন্ধ কর। দেবতার স্থানে আবোল্ তাবোল বকলে দিব খসে পড়বে নে চল। [প্রস্থান]

[যাত্রীর ভিড়ের চাপে সেই প্রথম বৃদ্ধা হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। বৃদ্ধার আর্ত্তনাদ শোনা গেল "ওগো বাছারা আমায় বাঁচাও"

"আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাই নে"—
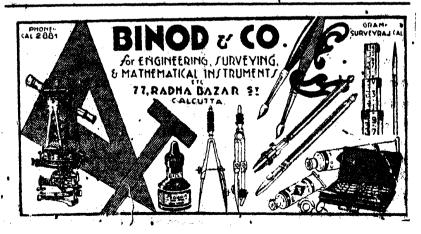
[ঠিক এমনি সময় তড়িৎ বেগে প্রবেশ করিল দিব্যদর্শন এক যুবক—উন্নত তার ললাট, চোখে অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রশস্ত বক্ষ, বাহুতে ক্ষিপ্রতা—চোখের পলকে ছুটিয়া গিয়া যুবক ভিড়ের মধ্য হইতে বৃদ্ধাকে বাহিরে আনিল ; এই যুবকই মাণিকলাল]

যুবক। মা, তোমার ভয় নাই। তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোমার কি কোথাও লেগেছে ?

[বৃদ্ধা তখনও কাঁপিতেছিল—কহিল]

৩য় বৃদ্ধা। না বাছা, এ বাঘের মতো বেঁচে গেছি। ভগবান তোমায় রাজরাজেশ্বর করুন—সোনার মুকুট তোমার মাথায় থাক—কিন্তু বাছা, দেবদর্শন কি অভাগীর কপালে নেই ?

মাণিক। দেবদর্শন তোমায় আমি করিয়ে দেবো। এখানে একটু দাঁড়াও মা তুমি—আমি দেবতার পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্তে কিছু ফুল কিনে নিয়ে আসি—

[ফুলের নামে ফুলওয়ালীরা আসিয়া মাণিকলালকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।]

১ম ফুলওয়ালী। এই নিন—পলাশ, অপরাজিতা, জুই, মল্লিকা [মাণিকলালের হাতে তুলিয়া দিতে গেল]

মাণিক। [হাত বাড়াইয়া লইয়া] কিন্তু ওর কিছুই আমি চাই—আমি চাই—

২য়া। কি কি—স্থলকমল ত ?—তা' এই নিন্ না—

৩য়া। স্থলকমল কেন হ'তে যাবে—চেহারা দেখেই বুঝেছি ওঁর চাই কাশ ফুল—তাও আমার সাজিতে মিলবে এই দেখুন—

[মাণিক মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল]

৪র্থা। হাসছেন যে বড় ? মনে করেছেন কারো কাছে নেই ? কিন্তু মল্লিকাকে ঠকাতে পারবেন না। মল্লিকা ফুল বুদ্ধদেবের বড় প্রিয়, সেথায় নালন্দার পথে—

মাণিক। দিচ্ছে কেন কষ্ট করছ—ও-ও-আমার চাইনে—আমি চাই অশোক ফুল—

৪র্থা। অ—শো—ক—ফু—ল !!

মাণিক। হ্যাঁ তাও শুধু আমায় ফুল নয়—চাই অশোক ফুলের মালা—

৪র্থা। [মুখ ভার করিয়া] সে আপনি কোথাও পাবেন না শ্রেষ্ঠীপুত্র—এখন ত'-অশোক ফুল ফোটবার সময় নয়। যে ফুল মধুমালঞ্চে ফোটে নি—সে ফুল কোথায়ও নেই—

[ফুলওয়ালীর বেশে বিদ্যুতের চমকের মতো হঠাৎ সোনালীর প্রবেশ। হাতে তার অশোক-গুচ্ছের মালা—পরণে রামধেনু রঙের শাড়ী—মায়াবিনীর চোখ, লীলায়িত ভঙ্গী, মুখে মধু, অধরে মেঘলা রাতের ক্ষণপ্রভার চমক]

সোনালী। আছে গো আছে। মধুমালঞ্চে যে ফুল ফোটেনি তা ফুটেছে মদন কুঞ্জে। কিন্তু তাতে মালা হয়েছে একটি, তাও আমার হাতে।

[সোনালীকে দেখিয়া মানিক চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল ; তার মুখের পানে ঠিক 'ফটিক জল' পাখী যেমন করিয়া তাকায় জলভরা মেঘের দিকে]

সোনালী। [মাণিককে] ওমা ! আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে রয়েছ কেন ? এ মালা আমি তোমায় দেবো না—

১ম ফুলওয়ালী। হ্যাঁগা কে তুমি ?

২য়া। ফুলওয়ালীর বেশ—

৩য়া। কিন্তু অচেনা মুখ—

৪র্থা। মনে হচ্ছে বিদেশিনী—

৫মা। [কাছে গিয়া হাত ধরিয়া] কিন্তু কোথায় পেলে এ মালা ?

সোনালীর গান—

পায়ের আঘাতে ফোটাল অশোক
কে গো সে বিরহিনী
আঁখি না তাহারে নিরখি কখনো
মন যে বলে চিনি।
ঊর্মির মতো উড়ায়েছে কেশ
রামধনু রঙা পরিয়াছে বেশ
বচনে নয়নে স্বপনের রেশ
বাজে যেন ঝিনিমিনি।
মন যে বলে চিনি।
তার বাগানের দখিন দুয়ার সদা
তব তরে খোলা

পথ চিনে যদি আস ক্ষতি নাই
হে পথিক পথ ভোলা
আকাশের নীলে উড়িছে আঁচল
নয়নে পরেছে মায়ার কাজল
খুলিয়াছে তার হৃদয় আচল
লও তারে তুমি চিনি
মন যে বলে চিনি।

[সোনালীকে প্রথম দর্শনেই মাণিক নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল এইবার তাহার অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর শুনিয়া, বিহ্বলের মত শুধাইল]

মাণিক। কে সে? যার পদাঘাতে অশোক ফুল ফোটে—উর্ম্মির মতো যার কেশপাশ—নয়নে স্বপনের বেশ—দেখেছ তুমি তাকে?

সোনালী। ওমা! বিরহিনীর নাম শুনে একেবারে বিরহি হয়ে উঠলে যে!

মাণিক। না না—গোপন কোয়োনা আমায় জানতে দাও—তার চোখে কি তোমারই মত বিদ্যুৎ খেলে—মুখে কি ঠিক এমনি মধু—গতিতে কি ঠিক এমনি ছন্দ—বল—বল—

সোনালী। হ্যাঁগা, তুমি কি কোনো রাজসভায় কবিতা লেখ? নইলে এমন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে শিখলে কোথায়?

মাণিক। কথা কি করে বলে জানি না—ছন্দ কি করে গাঁথে শিখিনি কিন্তু আজকের এই সময়টায় যদি কেউ আমার অন্তরের গোপন কথাটি জানতে চায়—আমি তা' অপূর্ব্ব ছন্দে লিখে বোধ করি তাকে শোনাতে পারি—

সোনালী। বল কি? আমার আবার ঠিক উল্টো! কবিতার কথা শুনলেই কেমন যেন গা বমি বমি করে—তা' আমি না হয় আগেই চলে যাচ্ছি—তারপর তুমি যা হয় আপন মনে বকতে থাক—

মাণিক। না না যেওনা, শোনো,—আজকের এই সময়টিতে আমি যদি একটি কথা বলি—যদি বলি তোমায় আমার খুব ভালো লাগছে—তবে কি তুমি—তুমি—রাগ করবে—?

সোনালী। নিশ্চয়ই করবো। ঠিক ঐ কথা আগেই আমায় আর একজন বলেছে যে!

মাণিক। তবে—তবে না হয়—তোমার হাতে গাঁথা ঐ মালা গাছি আমায় দাও—দেবদর্শন করে আসি—

সোনালী। কিন্তু এ মালাও যে সেই চেয়েছে, দেবদর্শনের মালা ত' এ নয়।

মাণিক। তোমায় যে পেয়েছে—এই মালার ক্ষতিটুকু সে আনন্দে স্বীকার করে নেবে—কিন্তু এই পাওয়াটাই হবে আমার মস্তবড় মূলধন।

সোনালী। তুমি না হয় মূলধন জোগাড় করে ব্যবসা ফাঁদতে বসেছ—কিন্তু আমার তাতে কি লাভ বলত! কত দাম দেবে এ মালার শুনি?

[ফুলওয়ালিরা ততক্ষণ অবাক হইয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল—প্রাপ্তির কোন আশা নাই দেখিয়া ১মা কহিল]

১মা। ওলো চল চল—দক্ষিণ দুয়োরে ভিড় জমেছে ফুল বেচবিত সেইখেনে চল—

২য়া। হ্যাঁ তাই চল্ চল্—

৩য়া। এই মধুমালঞ্চের ফুল—ক'জনে এর কদর বোঝে?

৪র্থা। আর এ ফুল কেনবার সামর্থ্যই বা কজনের? চললো চল, ও মল্লিকা—ও বিশাখা—

[ফুলওয়ালিদের প্রস্থান]

সোনালী। কৈ ওদের কাছ থেকে তুমি ফুল কিনে রাখলে না? দেব-দর্শন করবে কি দিয়ে?

মাণিক। অশোক ফুলের মালাই যদি না পেলাম ত' দেব-দর্শন আমার রইল—

সোনালী। কেন? অশোক ছাড়া কি আর ফুল নেই? মল্লিকা, অপরাজিতা, থলকমল, জবা—কত ফুল ত' ছিল ওদের কাছে রাজ্যের—যত লোক বুঝি শুধু অশোক ফুলই নিয়ে যাচ্ছে—?

মাণিক। রাজ্যের লোকের সঙ্গে আমায় কথা বোলোনা বলছি—

সোনালী। ও বাবা—আবার গুমোর আছে!—তা' রাজ্যিছাড়া না হ'লে কি আর কবিতা লিখতে চায়!—কিন্তু অশোক ফুল না হ'লে দেবদর্শন চলবে না কেন শুনি?

মাণিক। অশোক ফুলের মালাই যে আমার মানত—অকালের ফুল কিনা!—কোথায়ও পেলাম না। কিন্তু তোমারও ত' আবার কোথায় মানত আছে বলছিলেন—

সোনালী। বাজে বোকো না বলছি—আমি তোমার মত যার তার জন্যে মানত করতে গেলুম আর কি!

মাণিক। বারে এই খানিক আগেত তুমিই বল্লে!

সোনালী। বল্লুম আমার খুশী!

মাণিক। তবে মালাটী আমায় দাওনা দাওনা ফুলওয়ালী—

সোনালী। [বিদ্যুৎবেগে মাণিকের সম্মুখে আসিয়া] ফুলওয়ালী! কেন আমার কি নাম নেই!

মাণিক। তাই ত! আমি ভুলেই গেছলুম জিজ্ঞেস করতে—শুধু তোমায় দেখে এত ভাল লেগেছিল—যে আর কোনো নামের প্রয়োজন ছিল না।—

সোনালী। তবে কেন ডাকলে ফুল-ওয়ালী—?

মাণিক। ঐ ত' কেমন ভুল হ'য়ে গেছে—!

সোনালী। ভুল—ভুল—কেন অমন ভুল হয়? আমার অশোকের মালাটি চাইবার বেলা ত' ভুল হয় না।

ওয়া বৃদ্ধা। ও বাছা—আর কতক্ষণ দাঁড়াবো—তোমার ফুল কেনা কি হ'ল না বাবা—

মাণিক। এই যে যাই মা—কিন্তু মন্দিরের ভিড় ত' এখনো কমেনি—তুমি আর একটু দাঁড়াও—না হয় ঐখানে একটু বসে জিরিয়ে নাও—

ওয় বৃদ্ধা। আচ্ছা বাবা—তাই না হয় নিচ্ছি—কিন্তু বাবা আমায় ফেলে যেওনা—আমি ছচোখে কিচ্ছু দেখতে পাইনে—

মাণিক। না, তোমার কোন ভয় নেই। আমি রইলাম এখানে। [সোনালীর দিকে] কিন্তু তোমার নামটি কি তাত' বল্লে না?

সোনালী। ও কে আগে শুনি?

মাণিক। এক অন্ধ বুড়ী—ভিড়ের চাপে পড়ে গেছল—আমি টেনে তুল্লি—আমার সঙ্গে মন্দিরে যাবে বলে বসে আছে—

সোনালী। ও বাবা—আবার দয়া-মায়াও আছে দেখি শরীরে—

মাণিক। কেন বলত? এত' মানুষেরই কাজ—রুগ্নকে সেবা করা—আর্ত্তকে রক্ষা—

সোনালী। থাক্, পাঠশালায় গুরু মশাইয়ের কাছে খুব পুঁথি আউড়িয়েছ তা' বুঝতে পাচ্ছি—কিন্তু ছন্দ লিখিয়েদের ত' আমি মানুষের মধ্যে ধরি না—

মাণিক। ও—কিন্তু তোমার নামটি?

সোনালী। কি নাছোড়বান্দা বাবা—যা' ধরবে—ছাড়বার নামটি নেই—নাম কি—নাম—কি কেন তুমিইত' ডেকেছ ফুলওয়ালী বলে—

মাণিক। না—না ও নামে তোমায় সাজে না!

সোনালী। সাজে না? তবে কি সাজে? জগদম্বা?

মাণিক। বারে—আমি বুঝি তাই বল্লুম—?

সোনালী। আচ্ছা, কি বল্লে তাই বল না—

মাণিক। জানিনে যাও—

সোনালী। ওমা! আবার অভিমানও ত' আছে দেখছি! শুনবে আমার নাম?

মাণিক। [রাগিয়া] কী? গ্রহচক্র, মণ্ডলী, বারাহী, রেবও, মহাভৈরবী, ঝঙ্কেশ্বরী, একজটী, তক্ষিত, পর্ণশবরী?—আরো চাই?

সোনালী। না, ঢের হ'য়েছে—এইবার একটু হাঁফ ছেড়ে জিরিয়ে নাও—বাতাস করবো? [আঁচল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল]

মাণিক। [খপ করিয়া আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া] এইবার তবে নামটা বল—

সোনালী। আঃ—আঁচল ছাড়ো না—

মাণিক। উঁহু [চোখ বুজিয়া আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

সোনালী। [হাসিয়া] সোনালী গো—সোনালী—

মাণিক। সোনালী—সোনালী—[যেন নামটা মিষ্টি খাবারের মত চাখিতে লাগিল—তারপর হঠাৎ]

আচ্ছা দেখ—

সোনালী। কি হ'ল পায়ে কাঁটা ফুটল নাকি?

মাণিক। না, বলছিলুম কি—আমি তোমার নামটার শেষ অক্ষর বাদ দিয়ে যদি শুধু সোনা বলে ডাকি—

সোনালী। [মাথা দোলাইয়া] তবে মোটেই ভালো হয় না—

মাণিক। [ছুটিয়া গিয়া সোনার হাত চাপিয়া ধরিয়া] কেন বলত?

সোনালী। (চোখে বিদ্যুতের বাণ হানিয়া] পাগল নাকি?

ঐ দেখ যাত্রীরা সব আসছে।

[বাহিরে লোক সমাগমের শব্দ শোনা গেল—কিন্তু মাণিক ততোধিক ক্ষিপ্রতার সহিত সোনালীর হাত হইতে পলকে অশোক ফুলের মালাটি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধার হাত ধরিয়া কহিল]

চলমা—মন্দিরে যাবে চল—

সোনালী। ওকি, শ্রেষ্ঠীপুত্র আমার মালার দাম কৈ?

মাণিক। মালার দামের বদলে আমি তোমার কেনা হ'য়ে রইলুম সোনা—

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান]

সোনালী। আজকের শীকার হবে কি তবে এই তরুণ যুবা? কিন্তু তার নাম? নাম জানিনি অথচ নিজের নাম বলে দিয়েছি—সোনালীর জীবনে ত' এরকম ভুল কখনো হয়নি।

তুমি আছ

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কে বলিবে, তুমি নাই? বাতুল-প্রলাপ তাই! সে কি হয়? হ'তে সেকি পারে?
না থাকিলে তুমি প্রিয়া, চারিদিকে নিরখিয়া কেন সদা নেহারি তোমারে?
দিনে হ'য়ে সূর্য্যমুখী রহি' মন-মুখোমুখী, কর্ম্মহীন করিলে আমায়!
রজনীগন্ধা হ'য়ে মরমে ফুটিয়া র'য়ে, নিদ্রাহীন ক'রেছ নিশায়!
আঁখি-পথে প্রবেশিয়া কেঁড়ে লয় যারা হিয়া, তাহাদের বশ যবে হই,
প্রভাহীন সবে করি; চিত্ত-রাজাসন 'পরি সমুদিত হও জ্যোতির্ম্ময়ী।
হৃদি-পদ্মে নিশাগমে সুপ্ত রহি' প্রিয়তমে, সমধিক জানা'লে তোমায়।—
তপন মুদিলে আঁখি, আধার-সায়রে থাকি' মহিমা তাহার বুঝা যায়।

কৌমুদী নয়ন-মাঝ সাধিছে ধূমের কাজ, দিবসেও নেহারি আঁধার;
রূপে তব ডুবে থাকি' অভিজাত হ'ল আখি—কারণ ইহাই শুধু তার!
আমার নয়ন-আগে মুখপদ্ম তব জাগে, না পারি হেরিতে চাঁদ তাই।
ভুটি প্রেমলতা তব করি' গলে অনুভব, পুষ্পমালা ছিঁড়িয়া ফেলাই।
ফেননিভ শয্যাখানি কণ্টক-অধিক মানি, বুকে তব স্থান দেছ বলি'।
দেবতার অন্নপানে মন মোর নাহি টানে,—আমি তব অধরের অলি।
অয়ি মোর প্রাণেশ্বরী, কূলে কূলে আছ ভরি' এ-জীবন তটিনী আমার!
ধ্যানলোকে রূপায়িত, মম-বৃন্তে বিকশিত, স্মৃতির সায়রে সুধাধার।

"কথা কও" বলি' পাখী ডাকিত কি থাকি' থাকি', তুমি প্রিয়ে, না থাকিলে বাঁচি?
বিচিত্র ভূষণে সাজি' সঙ্গীত গাহিয়া আজি পাখী-সখি বেড়াত কি নাচি?
প্রিয়তমে, তাহা হ'লে, শোভিবারে করে গলে, যেতে তব মুখচন্দ্র-পাশ,
সৌরভ সঞ্চয় করি' উপবন কুঞ্জ ভরি' ফুটিত কি ফুল বারমাস?
পরশিতে কম অঙ্গে, খেলিতে কুন্তল-সঙ্গে, আচলে মারিতে কভু টাঁন,
না থাকিলে তুমি প্রিয়া, মলয়াদ্রি তেয়াগিয়া আসে কি সমীর এই স্থান?
না থাকিলে তুমি প্রিয়া, আছি আমি কি করিয়া? বাক্য কভু হয় অর্থহীন?
তুমি আছ, তাই মম দিবস মাসের সম, নহিলে ফুরা'ত কবে দিন!

পাশ্চাত্য সাহিত্যে নবযুগের ভাবধারা

শ্রীচিত্রগুপ্ত

প্রসিদ্ধ জার্মাণ মনীষি নোভালিস্ (Novalis) যে ব'লেছিলেন, "হৃদয়ই হ'চ্চে বিশ্বজগতে প্রবেশ করবার চাবি," (The heart is the key to the universe) সেই সত্যকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রে বর্ত্তমান যুগের মানুষ জগৎকে হৃদয় দিয়ে দেখ্‌তে আরম্ভ ক'রেচে।

এই যে অসীম ঔদার্য্যের সঙ্গে হৃদয় দিয়ে জগতকে দেখা, এর সম্বন্ধে চিন্তা করা, এইটেই হ'চ্চে বিংশ-শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিকতা-আন্দোলনের (Modernist Movement) গোড়ার কথা।

বিংশ শতাব্দীর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বেকার ভাবধারার বিপরীত সম্পূর্ণ নতুন যে এক উদার ভাব পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্যিকদের মনে দেখা দিলে, সেই কথা নিয়ে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার সাহিত্য-জগতে ভিক্টোরিয়ান্ যুগের অবসান হোলো। ইতিমধ্যে Beardsley, Ibsen, Nietzsche এবং Butler Victorian Conventionগুলির বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতে আরম্ভ ক'রেছিলেন, ফলে উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো ভাবধারার তিরোভাব ঘট্‌লো। কিন্তু তার স্থলে তখনি তখনি কোন নূতনের উদ্ভব হোলো না। উনিশশো খৃষ্টাব্দ থেকে উনিশশো চোদ্দ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাহিত্য জগতে কোন বিশেষ আন্দোলন বা ধারা দেখা যায়নি। এ সময়টায় কেবল গত যুগের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ধ্বংসমূলক সমালোচনাই চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। এ সময়ের বস্তুতান্ত্রিক মতবাদীরা লেখকদের কতকগুলো বিষয়ে মুক্তি দিলেন।

এখন আর কোন নভেলের নায়ক-নায়িকার মধ্যে চুম্বনের কথা থাক্‌লে লোকে গালাগালি দিতো না। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ছাড়া দু'জনের মধ্যে কোন রকম মিলনের কথা বইতে লেখা চল্‌তে পারেনা, এ রকম ধারণা আর লোকের রইলো না। সন্তানের ব্যক্তিত্বকে প্রবল আঘাত খর্ব্ব ক'রে দেওয়াই হ'চ্চে মাতাপিতার কর্ত্তব্য কিম্বা প্রাণপণে অর্থ উপার্জ্জন করা এবং সর্ব্বরকমে সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করতে চেষ্টা করাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা, এ-ধরণের ধারণা লোকের ক্রমে ক'মে আস্‌তে লাগ্‌লো। মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলে এবং পুরুষদের সঙ্গে ভাইবোনের সমানাধিকার পেতে আরম্ভ করলে। সুতরাং লেখকদের কলমের স্বাধীনতাও সঙ্গে সঙ্গে আপনি বেড়ে গেল।

পথতো খুল্‌লো। কিন্তু সেইটুকুই তো সব নয়! সেই পথ দিয়ে বিজয়াভিযানের অভিমুখে চল্‌বে যে পথিক, তার দেখা কৈ? ...

এই নতুন পথের প্রথম পথিক হ'লেন স্যামুয়েল বাট্‌লার। তাঁর মৃত্যুর পরবৎসর অর্থাৎ উনিশশো তিন খৃষ্টাব্দে সমস্ত সাহিত্য জগৎকে চমকিত ক'রে দিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ নতুন ধরণের বই 'The Way of All Flesh' বার হোলো। ইতিমধ্যেই ভিক্টোরিয়ানিজ্‌ম্‌এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে গেছলো। নবযুগের যুবকদের পিতারা তাঁদের পিতামহদের কাছ থেকে যে শাসন-পীড়িত কঠোর ব্যবহার পেয়ে এসেছিলেন, নিজেদের ছেলের ওপর তাঁরা তার থেকে অনেক বেশী উদার ব্যবহার ইতিমধ্যে করতে আরম্ভ ক'রেছিলেন। স্যামুয়েল বাট্‌লারের Way of All Flesh বইতে এই ধরণের মাতাপিতার কথাই দেখতে পাই। তিনি দেখিয়েচেন তাঁর বইয়ের নায়কের মাতা-পিতা তার ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করতে গিয়ে কি ভাবে ব্যর্থমনোরথ হ'য়েছিলেন। ধর্ম্মের নামে তার ওপর কি রকম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হ'য়েছিল, শিক্ষার নামে তাকে কি ভাবে প্রবঞ্চিত করা হ'য়েছিল এবং কর্ত্তব্যের নামে, সে যা-কিছু করতে ঘৃণা করতো—তাকে তাই করতে বাধ্য ক'রে এবং তার সুস্থ সহজাত প্রবৃত্তি (healthy instinct) থেকে তার যা করতে ইচ্ছে যেতো তাতে প্রবল ভাবে বাধা দিয়ে তাকে কি রকম পীড়া দেওয়া হ'য়েছিল এই বই খানিতে তা' তিনি খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েচেন। ভিক্টোরিয়ান্ যুগের গার্হস্থ্যজীবনের খারাপ দিকটা খুব খুঁটি-নাটীর সঙ্গে দেখিয়ে এই প্রথম একখানি ভালো বই এতদিনে প্রকাশিত হোলো। বইখানি ভালো এই জন্যে যে, লেখক এতে কোন বিদ্বেষ পোষণ ক'রে মাতাপিতাদের বৃথা আক্রমণ করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি শুধু দেখিয়েচেন যে স্নেহশীল মাতাপিতা ভিক্টোরিয়ান্ যুগের ধারণা অনুযায়ী তাঁদের সন্তানের প্রতি যে

ব্যবহারকে মঙ্গলজনক বিবেচনা ক'রেছিলেন তার মধ্যে কোথায় কতখানি গলদ ছিল।

এই সময়ে জন্ গলস্ওয়ার্দ্দী এবং আরো জনকয়েক নাট্যকারের সঙ্গে বিলেতের কোর্ট থিয়েটারে প্রায় দু'বছর ধ'রে অনবরত নাটকের পর নাটক দিয়ে মনীষি বার্ণার্ড শ' তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে খুব প্রতিপত্তি অর্জ্জন ক'রেছিলেন। তিনি পর বৎসরই অর্থাৎ উনিশশো চার খৃষ্টাব্দে বাট্লারের বইখানির খুব সুখ্যাতি ক'রে বল্লেন—

"কিম্ভূত রকমের আদর্শবাদিতা হ'চ্ছে সর্ব্বনাশের মূল। বাট্লারের নভেলের মাতাপিতারা সেই রোমান্টিক্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার দরুণই যত গোলমালের সৃষ্টি।"

শ' নিজেও তাঁর অভিনব বাণীমন্ত্রে নবযুগের চিন্তাধারাকে উদ্বুদ্ধ ক'রলেন। তাঁর মত হ'চ্ছে এই, যে, নিজের ওপর মানুষের যে কর্ত্তব্য আছে, সে যদি নিজের সহজ ও সরল মনোবৃত্তির সাহায্যে শুধু মাত্র সেইটুকুই ক'রে যায়—যা করতে গিয়ে বাট্লারের রচিত বইয়ের নায়ক ছেলেটি বাপমায়ের মতের বিরুদ্ধে যেতেও ইতস্ততঃ করেনি—তা'হলেই সে একদিন দেখবে সে তার প্রবৃত্তিকে সংযত করতে সক্ষম হয়েচে। তাই তিনি বলেন, যে, মানুষের সব চেয়ে বড় কাজ হ'চ্ছে নিজের ওপর তার কর্ত্তব্য সব আগে পালন করা।

শ' আরও বল্লেন যে একমাত্র ক্রমবিবর্ত্তন-বাদের থিওরীটি (The Theory of Evolution) ছাড়া আর সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মই আত্মার অনুপযোগী, কারণ মানুষের এই সমস্ত বিশ্বাসের মূলে আছে মাত্র একটি ফ্যাশন।

তারপরে তিনি তাঁর Man And Superman বইখানিতে দেখালেন যে এইভাবে তাঁর প্রদর্শিত দিক দিয়ে জীবনের দিকে তাকিয়েও ধর্ম্মপালন করা যায়। বার্ণার্ড শ' হ'চ্চেন একজন সমাজতন্ত্রবাদী। তিনি বিবাহের কথা, চিকিৎসকদের কথা, Salvation Armyর কথা, সাফ্রাজিসম্, প্রসঙ্গ প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে বহু বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশ করে এই সমস্ত বিষয়কে সাধারণের সহজ বুদ্ধির সামনে খাড়া ক'রে ধ'রেচেন। গলস্ওয়ার্দ্দী এবং গ্রাণ্‌ভিল্ বার্কারও ষ্টেজের মধ্যে দিয়ে এই ধরণের কাজ করেচেন।

উনিশশো চার থেকে উনিশশো আট খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকগত বিখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি 'The Dynasty' নাম দিয়ে Napoleonic War নিয়ে প্রকাণ্ড এক নাট্যকাব্য লেখেন। তা'তেও তিনি মানুষের ভাগ্যের পরিকল্পনা ক'রেচেন ক্রমবিবর্ত্তন-বাদের দিক থেকে।

তারপর বর্ত্তমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত এইচ্, জি, ওয়েলস্ও নতুন সৃষ্টি নিয়ে তাঁর সুপটু হাতে নতুন যুগের মানুষের অবিকল প্রতিকৃতি আঁকলেন। দীনহীন দরিদ্র দোকানদার, দুঃস্থ কেরাণী প্রভৃতির জীবনের সাধনার কথা, সংগ্রামের কথা, তাদের আত্মার কথাও তাঁর কলমের মুখে ফুটে উঠ্‌লো। গলস্ওয়ার্দ্দী সমাজের সম্পন্ন ঘরের কথা নিয়ে বই লিখ্‌তে লাগ্‌লেন। আর্ণল্ড বেনেট্ সাধারণ লোকের স্থূল জীবন কথাও অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁর জোরালো উপন্যাসগুলির প্রতি ছত্রে ব্যক্ত ক'রলেন।

তারপর উনিশশো আঠারো খৃষ্টাব্দে ডব্লিউ, এইচ, ডেভিস্ তাঁর Autobiography of a Super-Tramp বইতে যে-শ্রেণীর চিরন্তন adventureএর কাহিনী বিবৃত করলেন, তাও আধুনিক সাহিত্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। আর্ণল্ড বেনেট্, রোজ মেকলে এবং কম্পটন্ মেকেঞ্জী আশপাশের অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর সমাজের বিভিন্ন জীবন-ধারার কথা নিয়ে আলোচনা ক'রলেন। বলা বাহুল্য! এই সমস্ত লোকই আধুনিক ভাবধারা নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন।

উনিশশো পাঁচ খৃষ্টাব্দে শক্তিশালী লেখক জি, কে, চেষ্টারটন্এর Heretics নামে বইখানা আর এক নতুন দিকে আলোক নিক্ষেপ ক'রে সাহিত্য-জগতে আত্মপ্রকাশ ক'রলে। এই সময়ে হিলেয়ার বেলকের আবির্ভাবও সাহিত্য-জগতে অনেক নতুন দান এনে দিলে। তাঁর Europe and the Faith, James the Second, How the Reformation Happened প্রভৃতি বইগুলো প'ড়লেই আমরা দেখতে পাই যে সাধারণতঃ স্কুল-সমূহে কি রকম একদেশদর্শিতার সঙ্গে ইতিহাস পড়ানো হয়। জন্ মেসফিল্ড, ওয়াল্টার ডু লা মেয়ার, জোসেফ কনরাড প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকবৃন্দও আধুনিক যুগের সাহিত্যকে মহিমান্বিত ক'রেচেন।

তাছাড়া এডিথ সিটওয়েল্, যাঁর বিখ্যাত বই Wheels উনিশশো ষোলো খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাঁর কবিতাও বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জেরার্ড ভাইনস্, আলডুস্ হক্সলি, এবং পি, উইণ্ড্‌হাম-লিউইস্ও নতুন ধরণের বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন ক'রে নতুন রূপ দিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন রকমের কাব্য-সাহিত্যের সৃষ্টির পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

এদিকে আবার সাইকো-এনালিটিক্-স্কুলের লেখক জেম্‌স্ জয়েস্ (উনিশশো বাইশ খৃষ্টাব্দে যাঁর সর্ব্বজন-বিদিত বই Ulysses প্রকাশিত হয়), ডি, এইচ, লরেন্স (যিনি Sex-conflict এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ ক'রে অনেকগুলি উপন্যাস, গল্প, নাট্য এবং কাব্য রচনা করেচেন) এবং আরো অনেকে তাঁদের নতুন ধরণের চিন্তাধারায় আধুনিক সাহিত্যকে বিচিত্র রূপ-সম্পদে বিভূষিত ক'রেচেন।
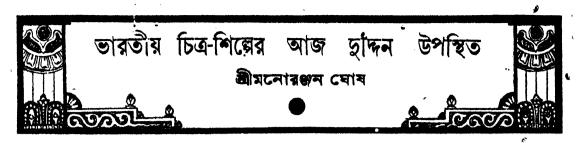
ভারতবর্ষের চিত্র-শিল্প আজ যে কত উচ্চস্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাই দিকে দিকে দেখিতে পাই যে দেশী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় বহু চিত্র-গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কোন দেশী ছবি দেখিতে যাইতেও অনেকে নাসিকা কুঞ্চন করিতেন বা পারত পক্ষে মার্কিনী ছবি পরিত্যাগ করিয়া দেশী ছবি দেখিবার নামও করিতেন না। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরাও আজিকার দিনে দেশী ছবির দিকে চোখ ফিরাইয়াছেন। ইহারা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক বর্ত্তমানে সিনেমা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহারা বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে অবসর সময়ে যদি একটু-আধটু স্ফূর্ত্তি না পাওয়া যায় তবে তো জীবনই অবহ হইয়া উঠে। তাহারা নিয়মিত অবসর সময়ে সিনেমা দেখিতে আরম্ভ করায় গড়পড়তা চিত্র-প্রিয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই সময়ে ভারতের চিত্রশিল্পের এই উন্নতির স্রোতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে বিদেশীয় বণিক। বিদেশীয় চিত্র-প্রতিষ্ঠান সমূহ এ দেশে আসিয়া ভারতীয়ের স্বার্থ নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তাহাদের দ্বারা দু এক স্থানে প্রাসাদোপম চিত্র-সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন; বোম্বাই নগরে ভারতীয় বণিকগণের আন্দোলনও এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সচেতন করিতে পারে নাই। যদি আরো কিয়ৎকাল এরূপ ভাবে বিদেশীয় চিত্রপ্রতিষ্ঠান এদেশে আসিয়া প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত হইবে। আজ শিল্পে ও বাণিজ্যে ভারতবর্ষ যে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সমগ্র জাতির সাধনা।

আট দশ বৎসর পূর্ব্বে যে বস্ত্র এখানে প্রস্তুত হওয়াও অসম্ভব বলিয়া মনে হইত এখন তাহা প্রায় প্রতি ভারতীয় মিলে প্রস্তুত হইতেছে। আজ যদিও বা ভারতীয় চিত্র-শিল্প তেমন উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে নাই তবু অদূর ভবিষ্যতে উহা যে মার্কিন চিত্র-শিল্পের সমকক্ষ হইবে এ আশা দুরাশা নহে। কিন্তু আমাদের সমগ্র জাতির সম্মিলিত সাধনা না হইলে উহা কোন মতেই সম্ভবপর হইবে না।

এ দেশের বিদেশীয় চিত্র-প্রতিষ্ঠান ও চিত্র-গৃহ, কাহাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করিতেছে একটু ভাবিয়া দেখিলেই উহা উপলব্ধি করা যায়। ভারতীয় চিত্র-শিল্প কি জাতির নিকট এই সহানুভূতি দাবী করিতে পারে না? গভর্ণমেণ্ট যখন এ বিষয় সম্পূর্ণ উদাসীন তখন জাতির কর্ত্তব্য তাহাদের সম্মিলিত সাধনা ও সহানুভূতি দিয়া এই শিশু শিল্পটিকে সযত্নে রক্ষা করা।

এ বিষয়ে ভারতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে (চিত্র প্রস্তুতকারক) চিত্র পরিবেশক ও চিত্র-প্রদর্শকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে কার্য্য করিতে হইবে, নতুবা ভারতীয় চিত্র-শিল্পের পরিণাম যে কি হইবে তাহা ধারণার অতীত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পূর্ণচ্ছেদ টানিবার পূর্ব্বে আরও একটী কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে। উহা বিদেশীয় ফিল্ম ব্যবসায়ী সমাজকে উদ্দেশ করিয়া। বিদেশীয় ফিল্ম ব্যবসায়ীগণ যদি নিজেদের ছবি নিজেদেরই চিত্রগৃহে প্রদর্শন করিয়াই চলে তাহার ফল তাহাদের পক্ষেই বিষময় হইয়া উঠিবে। কোন বিদেশী ছবি প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শকগণ যে লভ্যাংশ পাইত তাহা না পাইয়া স্বতঃই তাহারা বিদেশীয় ফিল্ম ব্যবসায়ীদিগের উপর বিরূপ হইয়া উঠিবে। তাহার ফল হইবে যে বিদেশীয় ফিল্ম-ব্যবসায়ীবৃন্দ অদূর ভবিষ্যতে এমন কোন ভারতীয় চিত্র প্রদর্শক পাইবে না যে তাহারা মার্কিনী ছবি second run বা তাহার পরে চালাইবার নিমিত্ত চুক্তি করিবে।

উপরোক্ত উপায়ে বিদেশী বণিক সমাজকে জব্দ করিতে হইলে অবশ্য ভারতীয় চিত্রব্যবসায়ীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। বাঙ্গলার চিত্র নির্ম্মাতা, পরিবেশক এবং প্রদর্শক—সকলকেই এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি।

এই সমস্ত নবযুগের সাহিত্য-যজ্ঞের হোতাদের কার্য্যাবলী প্রশংসনীয়। এরা কেউই Classicist-দের মতন বিরাট একটা সৃষ্টির আত্মপ্রসাদের মোহের বশে সাহিত্য সৃষ্টি করতে বলেননি কিম্বা Romanticist-দের মতন কল্পিত সৌন্দর্য্যের বল্গনা-সঙ্গীতে ছন্দো-মাধুর্য্যের কুহেলিকার সৃষ্টি করে মনকে চোখ ঠারতে চেষ্টা করেন নি। এঁরা বর্ত্তমান যুগের প্রাণের কথাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি ক'রে আধুনিক যুগের বাণীকে হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ ক'রেছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এদের এই আধুনিকতার আন্দোলন আর সব কিছুর ওপর জয়যুক্ত হ'য়ে নবযুগের ভাবধারাকে মহিমান্বিত করেচে।

দৈন্য-ক্লিষ্ট রঙ্গমঞ্চের পথ নির্দ্দেশ

শ্রীযামিনী মিত্র

ক'লকাতায় থিয়েটারের আজ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা একথা আজ থিয়েটার সংশ্লিষ্ট লোক কেন ক'লকাতার জনসাধারণও বেশ ভাল করে জানেন। এই অবস্থা তার আজ হ'ল কেন এই কথা সামান্য একটু আলোচনা করবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ।

আমার এবিষয় অভিজ্ঞতা অল্পদিনের তবুও যেটুকু অধিক বুঝেছি সেটুকু এর সার কত জানাবার চেষ্টা করবো।

আমার মতে এ'র প্রথম ও প্রধান কারণ দেশের অর্থ সঙ্কট অর্থাৎ কিনা দেশে এমন অর্থ নেই যাতে করে জনকতক লোকের চিৎকার বা কজন কুশ্রী স্ত্রীলোকের নাচ ও একটিং এবং হাত পা নাড়া ও মনস্তত্ব বিশ্লেষণের নাম করে অতি পুরাতন ভাব ও ভাষাপূর্ণ পচা নাটকের, অভিনয় দেখে। তবে এমন অর্থ তাদের আছে যা সত্যিকার দেখবার জিনিষ তার জন্য পয়সা খরচ করে। এর প্রমাণ ভাল ফুটবল ম্যাচ, ভাল বায়স্কোপ এমন কি ভাল থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য তাঁরা যে খরচ করতে কার্পণ্য করেন না তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তবু দু'একটার নাম কোরবো ফিল্ম—দেবদাস ও ভাগ্যচক্র থিয়েটার—মহানিশা।

এখন দেখা যাচ্ছে যে লোকে যাতা বইয়ের যাতা অভিনয়ে এক পয়সাও দিতে নারাজ হোলেও তারা যা চায় তা দিতে পাল্লে টাকা যা আশা করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা পাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠবে তবে তা দেওয়া হয় না কেন? এবং এইটায় হ'চ্ছে থিয়েটরের অবস্থার প্রধান কারণ—উত্তর হ'চ্ছে নানা কারণে—

১। কর্ত্তৃপক্ষের অর্থ ও সাহসের অভাব।

২। উপযুক্ত লোকের অভাবে।

৩। নামের প্রতি সাধারণের মোহ ও প্রীতি।

এবার একটু বিষদভাবে বলি।

আধুনিক কোন থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট capital নিয়ে থিয়েটার আরম্ভ করেন নি—প্রত্যেকেই কোনরকমে জোড়া তালি দিয়ে আরম্ভ করে মাছের তেলে (অর্থাৎ কোন থিয়েটারের উপার্জ্জিত টাকা থেকে) থিয়েটার চালাবার মতলবে গিয়ে ফল হ'য়েছে এই যে সে বই (যেহেতু জোড়াতাড়া দেওয়া) fail করায় চারিদিকে দেনা করে ফেলেন—সঙ্গে সঙ্গে ফেলেন আর্টিষ্টদের মাইনে বাকী। ফলে নতুন কিছু experiment করা তাঁদের পক্ষে হয় অসম্ভব—তখন তাঁদের একমাত্র আশা হয় কোন বড় লেখকের খ্যাতনামা নভেলকে নাটক ক'রে তার অভিনয় করা—কারণ তাঁরা ভাবেন হয়তো নভেলের ও লেখকের নামে যদিও বই কিছু কাটে।—কিছু কাটে সত্যি কিন্তু সেই কিছুতে থিয়েটার চলে না—কারণ থিয়েটারের মসিক ব্যয় হচ্ছে অন্ততঃ পক্ষে ৭০০০৲ টাকা। মাসে ৭০০০৲ শুনে আশ্চর্য্য হবেন না—৭০০০৲ থেকে খুব কমের মধ্যে যেমন ধরুণ না বাড়ীভাড়া ট্যাক্সসমেত ১৫০০৲ Electric Telephone (Registered) গাড়ীভাড়া ইত্যাদি ১০০০৲ বিজ্ঞাপন ও অভিনয়ের জিনিষপত্র ৫০০৲ থেকে ১০০০৲ অভিনেতা ইত্যাদি ৩৫০০৲ (খুব কম করে এটা সাধারণতঃ ৪০০০৲ থেকে ৫০০০৲ টাকা) এর উপর Copyright ও Production expense আছে কাজেই বুঝতে পাচ্ছেন টাকার অভাব ও দরকার
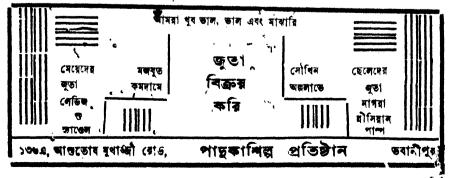
মত নতুন বই লিখিয়ে অভিনয় না করা কঠিন। এইবার ২নং অর্থাৎ উপযুক্ত লোকের অভাব। এইখানেই থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের সবচেয়ে বিপদ সাধারণের মুখে সর্ব্বদা শুনা যায় বুড়ী অমুককে দিয়েছে নায়িকার পাট—সুন্দরী তিলত্তমা সেজেছে শ্রীমতী মোটা হোঁতকা অমুক—চোখ বুজে বসে Play দেখতে হয়—। খুব সত্যি কথা, থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষ একথা যতটা অনুভব করেন দর্শক সাধারণ সিকিও করেন না কারণ তাঁরা তাঁদের Painted অবস্থায় দূরে বসে রংবেরংএর আলোর সাহায্যে দেখেন কিন্তু তাঁরা দিনের আলোর স্বরূপে তিনি যখন Reharsal দেন তখন তাঁদের হজম করেন—শুধুই কি তাই নায়িকার Descreption নিয়ে এর উপর আবার Author তাড়া করে বেড়ান —কিন্তু উপায় কি থিয়েটারে মেয়েরা আসেন —একটা বিশেষ পল্লী থেকে—সেখানকার তাঁদের নিজস্ব একটা বিশেষ ব্যবসা আছে এবং যিনি যেরকম সুন্দরী তাঁর সেরূপ পসার থিয়েটার যে মাহিনে দেয়—তার মাত্রা এমন কিছু নয় যে সেখান থেকে তন্বী সুন্দরী (যদি সত্যি সেখানে কেউ থাকেন) তাঁদের সেই ব্যবসা ছেড়ে এখানে আসবেন—যদি হঠাৎ —কোথাও থেকে কেউ এসে পড়েন দুচার দিন দেখবার পর তিনি ফের নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন—আবার কিছুদিন পর তাঁকে তাঁর পূর্ব্ব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিতও দেখা যায় তবে তখন তাঁর কদর থিয়েটারের টাকার উপরে। তবে ও—এক হ'তে পারে—মেয়ে বাদ দিয়ে —শুধু পুরুষ দিয়ে! নাটক হয় তো লিখিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু আমার মনে জয়-তা কাটে না।

তাহোলে—একমাত্র সমাধান হ'চ্ছে যদি সেদিন কোন দিন আসে যেদিন নামের জন্তে ঐ পাড়ার সুন্দরীরা থিয়েটারে যোগ দেন অথবা ভদ্র মেয়েরা সখীভাবে নাম ও সামান্ত allowanceএর জন্ত ও আর্টের খাতিরে stageএ join করেন—এটা হয়তো অনেকে বলবেন দুঃরাশা।—আমি বলি যদি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ ওপাড়ার মেয়েদের একেবারে না আনেন ও মাতাল বা দুশ্চরিত্র অভিনেতাদের রঙ্গমঞ্চে স্থান না দেন—তবে হয়তো এটা সম্ভব হতেও পারে কারণ পুরুষদের সঙ্গে public stageএ অভিনয় আজকাল প্রায়ই হ'চ্ছে—তবে এ পুরুষরা তাঁহাদেরই মধ্যেকার লোক এই জন্তেই বলছি—পুরুষ যাদের কর্ত্তৃপক্ষ নেবেন তাঁরা মদ্যপ বা চরিত্রহীন হ'লে চলবে না।

আমার মতে থিয়েটারের চলার পথের এই একমাত্র গতি—নান্য গতিরন্থথা।

এইবার তৃয় :—অর্থাৎ সাধারণের নামের প্রতি মোহ বা প্রীতি।

—এও একটা বড় কথা অমুক নামছে আরে চ দেখে আসি এটাও খুব আছে—ফলে সেই অমুককে কর্ত্তৃপক্ষ মাসে ৫০০৲ টাকা অন্ততঃ পক্ষে গুনতে হয়—অর্থাৎ সবাই পায় আর না পায় তাঁকে দিতেই হবে—তা তিনি খাতকের পাটেই নামুন আর ডাক্ত'রএর পাটেই নামুন—লোকে যে (হাসনাহানায় শিশিরবাবু) তাঁর সব কিছুর জন্য টাকা দিচ্ছে তা নয়—তবে—He is a seller কাজেই তাকে দমবন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত রাখতে হ'চ্ছে—

—আরও একটা কারণ আছে পূর্ব্বেই বলেছি টাকার অভাব হেতু—বড় কিছু করা যখন সম্ভবপর তখনও নাম করা অভিনেতা—নামকরা লেখকের নামকরা বই নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে কোন রকমে দিন গুজরান করতে হ'চ্ছে—

সর্ব্বশেষে থিয়েটারকে নূতন জীবন দিতে হ'লে সর্ব্বপ্রথম চাই অপর্য্যাপ্ত অর্থ যাতে করে দুখানা বই অন্ততঃ পক্ষে পর পর অভিনয় করা চলে।

চাই নূতন লোক মেয়ে অভিনেত্রী ও চরিত্রবান পুরুষ অভিনেতা ও কর্ত্তৃপক্ষ।

চাই নূতন লেখক যে নতুন যুগোপযোগী subject matter নিয়ে আধুনিক ভাষায় আধুনিকভাবে—নাটক লিখে দিতে পারেন—

—আর চাই দর্শকদের কাছে তাঁরা অমুক অমুক নামের কথা না ভেবে এই থিয়েটারে অন্ততঃ একবার পদার্পণ করে দেখা তাঁরা তাঁদের মনের মতন জিনিষ পেয়েছেন কিনা।

আইডিয়ালিজম্ ও চলচ্চিত্রের স্থান

শ্রীফণী মজুমদার

শিল্পে ও সাহিত্যে realism আর idealism নিয়ে দ্বন্দ্ব চলেছে বহুকাল থেকে। রবীন্দ্রনাথ বস্তুতান্ত্রিক নন বলে তাঁর প্রতি কটাক্ষ করতেও অনেক সমালোচক কসুর করেন নি। এ দ্বন্দ্ব যে আজও মিটেছে তা নয়—বরং চারিদিক থেকে নানাভাবে সমালোচনা করে সবাই মিলে একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করে তুলেছেন।

বস্তুতান্ত্রিকতা আমাদের দেশের কোন প্রাচীন কথা নয়—ইংরাজী realism শব্দ থেকেই এর উৎপত্তি। এক কথায় একে বলা চলে অনুকৃতি শিল্প। এদের মতে সমস্ত সৃষ্টিই হবে প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র যাকে দেখলেই চেনা যায়। কোন বস্তু বা প্রাণী বিশেষের হুবহু বাহ্যিক রূপটাকে ফোটানো—যথাদৃষ্ট বর্ণটি লেখাই হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য। অনুভূতির কোন স্থান নেই এতে।

Idealistদের মতে অনুভূতি ছাড়া পৃথিবীতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাঁরা বলেন অনুভূতির সঙ্গে বস্তুর এমন একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে যে অনুভূতি ছাড়া বস্তুটি যে কি তা বলবার কোন উপায় নেই। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যা কিছু আমরা জানার বিষয় বলি সে সবই তো আমাদের অনুভূতির বিভিন্ন রূপ মাত্র। তা ছাড়া এ গুলির অস্তিত্ব বোঝবার উপায় কৈ? এদের মতে কোন কিছুরই একটা বিশিষ্ট যথাস্থিত রূপ নেই—সেটা নির্ভর করে—যে দেখে, যখন দেখে ও যেমন করে দেখে তার উপর। রূপে গন্ধে, সত্যে কল্পনায়, হাসি কান্নায় যা সত্য, তা ক্রমশঃ আপনার রূপ অভিব্যক্ত করছে। সে রূপ স্থির নয়, তা চঞ্চল। তারা বলেন লোকে যা দেখে, যা অনুভব করে সে সমস্তই তাদের কল্পনার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় পরিবর্ত্তিত হয়ে রূপ-রস-গন্ধে ভরে ওঠে।

যতই থিয়োরির জঞ্জাল থাক্ না কেন এ কথা সত্যিই যে সমস্ত শিল্পেরই একমাত্র উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। আর এই রস জিনিষটি হৃদয়ের অনুভবের বস্তু তাই কোন বস্তুর যথাদৃষ্ট রূপটি ফোটনোয় রস সৃষ্টি হতে পারেনা—কারণ এর সৃষ্টি প্রাণের অনুভবের আলোড়নে।

নিছক realism দিয়ে রসসৃষ্টি সম্ভব হয় না—কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে রস সৃষ্টিতে realism থাক্‌তে পারে না। প্রকৃতির অনুভূতির মধ্য দিয়ে যে অলৌকিক আনন্দরস শিল্পীর মনকে স্পর্শ করে সেইটিই শিল্পী বিলিয়ে দেন প্রাণের আবেগে। স্বভাবের যে রূপটি অন্য অনেকে দেখে তার সঙ্গে শিল্পীর সৃষ্টিতে বাহ্যত কোন সাদৃশ্য না থাকলেও তাঁর অনুভূতির চমৎকারিত্ব স্পর্শ করে সকলের মনকে —সকলের সাম্‌নে খুলে ধরে এক নতুন দৃশ্য—শিল্পীর অনুভূতি দিয়ে তারা তখন একে অনুভব করে—আনন্দ পায়। সেই খানেই হয় যথার্থ রসসৃষ্টি, সেই খানেই শিল্পির সার্থকতা।

"গগনে অবঘন মেঘ দারুন
সঘন দামিনী ঝলকই
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগাই।"

আমরা বিদ্যাপতির এ গানে বাদলা রাতের যে রূপটি সবাই দেখি সেইটিই দেখতে পাই—ভাল লাগে, কিন্তু আরও ভাল লাগে এ দেখেই রবীন্দ্রনাথের মনে যে সুর জাগে তার অভিব্যক্তি!

"বাদল বাউল বাজায় রে একতারা,
সারা বেলা ধরে ঝরে ঝর্ ঝর্ ধারা।"

ঝর ঝর বৃষ্টির ধারা তার মনের বীণাকে বাজিয়ে তোলে—তার অনুভূতির সোনার কাঠির পরশে। মানব মনের ধরা ছোঁয়া যায় না এমন যে একটি অশরিরী আকিঞ্চন আছে তাসেই তিনি ফুটিয়ে তোলেন। আমরাও কবির অনুভূতির যথার্থ রূপটি দেখতে পেয়ে কান পেতে শুনি—শুনতে পাই 'বাদল বাউলে'র একতারার ঝঙ্কার।

এই যে বিষয়-বস্তুটি অতিক্রম করে একটা অপরিচিত দেশের সন্ধান দেবার শক্তি এইটিই শিল্পীর নিজস্ব। শিল্পী দর্শকের সঙ্গে সেই অপরিচিতার মিলন ঘটিয়ে দেন—যে তাকে নিয়ে যায় দূরে—বহুদূরে—প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই মৃদু হেসে কোন কথা না বলে শুধু অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখিয়ে দেয় ঊর্ম্মি মুখর সাগরের অচেনা অদেখা পারের দিকে 'দিক্ বধূ যথা ছলছল আঁখি অশ্রুজলে'।

চলচ্চিত্র শিল্পেরও এই idealism থেকেই জন্ম। চলচ্চিত্রে শিল্পীর বাদল বাউলের ঝঙ্কার কান পেতে কাউকে শুনতে হয় না অমনি এসে দর্শকের কানে পৌছায়। সমস্ত চিত্রখানি নিজের অনুভূতি দিয়ে তিনি রাঙিয়ে তোলেন—আর এর প্রতিটি রাগিনী দর্শকের মনোবীণায় ঝঙ্কার তোলে। সব চেয়ে বড় কাজ তাঁর দর্শকের মনে ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলা। তাই তাঁর অনুভূতি সাধারণের চেয়ে পৃথক—তাঁকে সব কিছুই দেখতে হয় এমন দৃষ্টিতে যা দর্শকের মনে

শ্রীভারতলক্ষ্মীর "আলিবাবা"-র একটি দৃশ্যে হুসেন ও মর্জিনা। মর্জিনা সেজেছেন শ্রীমতী সাধনা বসু।

ফুলশয্যার রাত্রি—মধুময় এই রাত্রি! জি-সি-টকীজের 'ইন্দিরা'-র একটি দৃশ্যে জ্যোৎস্না গুপ্তা ও বিনয় গোস্বামী। তড়িৎ বসু এই ছবির পরিচালক।

কল্পনা এনে দিতে পারে—ভাবাবেগগুলিকে প্রবাহমান করে।

চিত্রের নায়ক, জীবনটা তার মরুভূমি হয়ে উঠেছে—প্রতি দ্বার থেকে রিক্ত হাতে সে ফিরেছে দিনের পর দিন—। সমস্ত মানবকে সে দেখেছে তার নিজের অনুভূতি দিয়ে রাঙিয়ে—আঘাত পেয়েছে প্রতিপদে। তাই ক্লান্ত দেহটাকে টেনে চলেছে সে কোন সুদূরের উদ্দেশ্যে। দূরে বহুদূরে সে শুনেছে সুদূরের ব্যাকুল বাঁশীর তান---তাই এ পথা চলা—পথ জানা নেই—অবসন্ন দেহ—তবু সে উদাসীর বিরাম নেই। থামলেই সুদূরের বাঁশী যায় থেমে—ভিড় করে আসে অতীতের দীর্ঘ হাহাকার—। তাই তাকে চলতে হয়।

হঠাৎ আসে আকাশ ঘিরে মেঘ---তারই কোলে কালো চুল এলিয়ে দিয়ে আসে বৃষ্টি ঝড়ো হাওয়ায় আঁচলখানি দুলিয়ে।

সেই ঘন মেঘের ছোঁয়া লাগে তার চোখে---প্রাণে—উল্লাসে তার প্রাণ নেচে ওঠে—বলে 'ওকে যে আমি চিনি'। পৃথিবী আজ নতুন রূপ নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায় কতকালের পরিচিতের মত—নদীর জলে কালো মেঘের ছায়া পড়ে—ঝড়ো হাওয়া নদীর বুকে তোলে ঢেউ। আর সেই উন্মাদ আনন্দে প্রাণের মরুভূমির দুঃসহতা ভুলে সে খুলে দেয় ঘাটে বাঁধা নৌকা—বাঁধন হারা সে—।

পাড় থেকে শঙ্কাকুল নাবিকের দল চিৎকার করে ওঠে—'ওকি পাগল, এই ঝড়জলে'—আশঙ্কায় কথা তাদের শেষ হয়না।

কিন্তু পাগল সে তো নয়—সে যে প্রেমিক। ব্যর্থ প্রেম তার শতদিন পরে সফল হয়েছে—ওই বাদল তার প্রাণে এসে ধরা দিয়েছে আজি—তাকে ডাক দিয়েছে গানের সুরে সুরে। সে যে তার চির-পরিচিত।

সে তাই ওদের পিছু ডাকতে নিষেধ করে গেয়ে ওঠে—

"ওরা যে এই প্রাণের বনে মরুজয়ের সেনা—
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।"

সে তখন তার পরিচিতাকে ডেকে বলে—উর্দ্ধে তারই উদ্দেশ্যে দু'হাত বাড়িয়ে।

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে।
সে কথা আজি যেন বলা যায়।

চিত্রশিল্পীর এই অনুভূতি মুহূর্তের জন্যে হলেও দর্শকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় বৃষ্টির এই বিমোহিনী মূর্তির সাথে—তাকেও যেন সে হাতছানি দিয়ে ডাকে—নায়কের সুরে সুর মিলিয়ে তারও গেয়ে উঠতে সাধ যায়—

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়।

এই যে সমস্ত ঘটনা এড়িয়ে নতুন এক দৃশ্য চলচ্চিত্র-শিল্পী দর্শকের সামনে খুলে ধরেন—যেখানে বৃষ্টির বিমোহিনী রূপ সে নিজের চোখে দেখে মুগ্ধ হয়—তার সুর তার নিজের কানে শুনতে পায়—দেখে সর্বরিক্ত নায়কের প্রাণের উল্লাস—দেখে তারা বাঁধনহারা প্রাণের সানন্দ স্বীকার ঐ বৃষ্টির কাছে—দেখে নাবিকের আশঙ্কা—যার প্রাণে এ বৃষ্টির সুর ধরা পড়েনি—শোনে নায়কের আশ্বাস—শোনে তার গান—তার সাথে গেয়ে ওঠে আর ভাবে, ঐ যে আনন্দলোক—ওর দেখা যদি আমি পেতাম—যদি ওকেই আপনার বলে চিনে নিতে পারতাম—না চিনিয়ে দিলেও —এত প্রাঞ্জল প্রকাশ ভঙ্গী শুধু সম্ভব

সাহিত্যের মাধুর্য্য সিনেমার সৌন্দর্য্য

জি, সি, টকিজের

প্রথম অর্ঘ্য

সাহিত্য গুরুর

শ্রীপাদপদ্মে সিনেমার সুন্দরতম

শ্রদ্ধাঞ্জলী

পূজারী ঃ তড়িৎ বসু, এম, এ, বি, এল।

দেবদত্ত ফিল্মস্ ষ্টুডিও।

নরমার ভবিষ্যৎ

শ্রীসমীরণ সেন

নরমা শিয়ারার
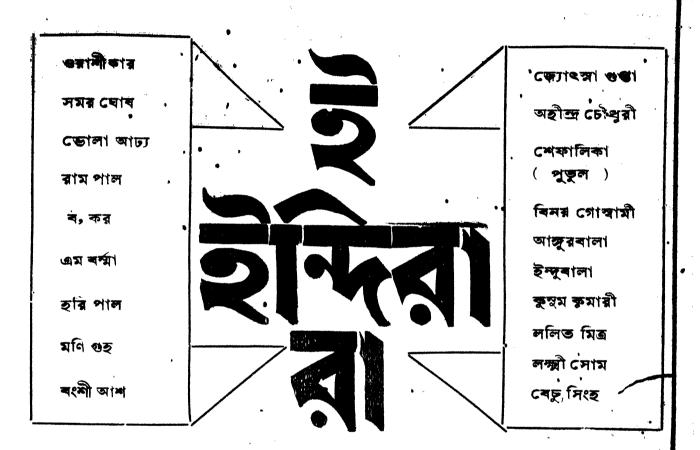
নরমা শিয়ারার আর ছবিতে নামবে না।

এমন কথা আমি বলেছিলাম আগে; বলছি আজও। বলেছিলাম সেদিন এজন্যে নয় যে সেটাই ছিল আমার মনগড়া ধারণা কিম্বা মনের ঘরে হিসেবের অনুমান; কিম্বা কারোর কারোর মতে publicity stunt. কথাগুলো বলেছিল নরমা নিজে, তার বহু নিকটতম অন্তরের বন্ধুদের কাছে, যারা নরমার স্বামী আরভিং থ্যালবার্গের মৃত্যুর পর বহুবার তাকে সান্ত্বনার স্তোকবাক্য শোনাতে গিয়েছিল। গত ছ'মাস ধরে নরমা নিজেকে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নানানভাবে ভেবেছে। কোন পথ পায় নি। তাই, তাই তার সঠিক সোজা উত্তর সে ঠিক করেছে। বোধ হয় তার চরম সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হয়েছে। তাই শেষ কথা—'রোমিও জুলিয়েট' নরমার অমর কীর্ত্তি;—ক্যানাডার ছোট্ট মেয়েটির, হলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠা 'সিনেমা সাম্রাজ্ঞীর গৌরবময় অবদান যুগযুগান্তরের অক্ষয়-সৌরভ নিয়ে এই নবতম বিজয় অভিযানটিকে উজ্জ্বল এবং স্বর্গীয় করে রাখুক।

অনেক লোক বলে, নরমা ফিরে আসবে, আবার তার সিনেমা-ফ্যানদের সন্তুষ্ট করতে মুখে পাউডার দেবে, ঠোঁটে লিপষ্টিক দেবে, রূপোলী পর্দায় প্রতিমা হয়ে আবার রূপায়িত হবে। কথাটা অত্যন্ত বাজে। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে, স্বামীর শোক ভুলে যেতে নরমা ভারী কাজে মন দেবে না, দেবে না। হাজার হাজার বাতির আলো ওর দেহের দৃশ্য হতে ঠিকরে প্রতিবিম্বিত হয়ে ক্যামেরার মণিমুকুরে ধরা দেবে না। "প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস" এবং "মেরী এ্যানটয়নেট"-এর কাগজ পত্র আবার উঠবে ষ্টুডিওর অফিসের লোহার আলমারীতে। এ বছরের শোক—চিরদিনের শোক—গীর্জ্জার ঘণ্টার মত বাজবে ওর বুকে দিনে ও দিনে। সত্যি! সত্যি! সত্যি কথা! নরমা বিদায় নিলে পর্দার অদৃশ্য হয়ে হতে।

সে এক আশ্চর্য্য রকমের অবিশ্বাস্যের গল্প—অপরূপ পূর্ব্বানুভূতি—অদ্ভূত পূর্ব্বাবরোধ, যা একদিন এক নারীর মানসিক অন্তঃদৃশ্যে ধরা দিলে, এবং যা—নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হোল! যে নারীর এ সত্য বোধ হোল সে হারালে—হারালে তার অতি প্রিয়তম আস্পদটিকে। করুণ ট্রাজেডী এমনি করেই জানিয়েছিল, তার আসার বহুদিন আগেই।

এ ব্যাপার সেদিন থেকেই ঘটেছিল যেদিন নরমার অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেও তার স্বামী থ্যালবার্গ, সেক্সপীয়রের অমর বিরহের অমূল্য নাটকে নামবার জন্যে ওকেই মনোনীত করে। ওই সময়ে সেক্সপীয়রের' আর একখানি কম মর্ম্মপীড়াদায়ক বিয়োগান্ত নাটক তোলবার কথা হোয়েছিল। নরমা সেইখানাই পছন্দ করেছিল। সেদিন ওকে পরীক্ষা করার জন্যে যখন 'ব্যালকনি'র দৃশ্যটি অভিনয় করতে বলা হোল, ও অভিনয় করলে,—সে অভিনয় নয়, ওর অনভিজ্ঞ অন্তরের অবর্ণনীয় আর্ত্তনাদ। দর্শকেরা তারিফ করে বল্লে 'নরমা তোমাকেই নামতে হবে।' সেদিন তারা জানেনি ওর অন্তর কেন অমন করে আর্ত্তনাদ করে উঠেছিল। থ্যালবার্গের দৃঢ় পণ, অনুপম অনুনয় নরমাকে জয় করলে। এ যে তার প্রিয়তমের কথা, তাই পারেনি নরমা থামাতে। আর থ্যালবার্গ? থ্যালবার্গ ভেবেছিল বুঝি লজ্জাশীলা নরমা জগতের শ্রেষ্ঠতম অভিনেত্রীদের সঙ্গে পা ফেলে নারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ করুণ বিচ্ছেদের চরিত্র রূপকে রূপোলী পর্দায় রূপায়িত করতে পারবে কিনা তাই ভেবে সন্দিহান হয়েছে। সে তো জানতো না—এ ভয়, কিসের ভয়।

নরমার কথা কেউ জানতে পারলে না। সে তো কারুকে জানায় নি, শুধু নিজের অন্তর দিয়েই বোঝবার চেষ্টা করেছিল।

হয়, চলচ্চিত্রে সমস্ত শিল্পকলার সঙ্গমে এর জন্ম বলে।

তাই idealistদের সব চেয়ে বড় কর্ম্মক্ষেত্র আজ চলচ্চিত্রে—এর সুষ্ঠু ও সরল প্রকাশভঙ্গীর জন্যে। তাই শিল্প জগতের এই নবজাত শিশুটি অগ্রজদের বর্ত্তমানেই নিজের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পেরেছে—সকল শিল্পকুশলীর দৃষ্টি পড়েছে তার দিকে।

—:×:—

একদিন বাধামুক্ত হোল; মনে মনে একদিন বল্লে: সমস্ত মিথ্যা, ভুয়ো, ভিত্তিহীন—বৃথা আশঙ্কা! ছবি যখন মেল্ ট্রেণের গতি নিয়ে এগোতে সুরু করলে, সবাই একবাক্যে বললে, নরমার কাজ হচ্ছে সুন্দরতম। তার বেদনা কিছুকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ল। এই ভাবে ওই আড়ম্বরপূর্ণ ছবিখানি গড়ে উঠল। আর ছবিখানি শেষ হবার আগে থেকেই পরিচালক জর্জ্জ কুকর থেকে আরম্ভ করে সামান্ত প্রপার্টি বয়েজরা পর্য্যন্ত জেনেছিল যে ছবিখানি চলচ্চিত্রের ভাগ্যবিপর্য্যয় আনবে। আরভিং থ্যালবার্গ আনন্দে আত্মহারা। থ্যালবার্গের আনন্দেই নরমার আনন্দ। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায় ছবি উঠতে থাকে পূর্ণাঙ্গ হবার পথে দিনের পর দিন। এমনি কাটে আনন্দে দিন। দিন এলো।

একটি মাত্র দৃশ্য বাকি তা হচ্ছে বিষ খাওয়ার দৃশ্য। গল্পের মর্ম্মপীড়ক নাটকীয়তা চরম পথে উঠেছে এইখানে।

সেদিন সেট থেকে সকলকে সরে যেতে বলা হয়েছিল। নরমা, কুকর আর থ্যালবার্গ তিনজনেই জানত এইটেই হচ্ছে শেষ গ্রহণ। এ দৃশ্য পুনরায় আর তোলবার দরকার হবে না। এই সেই দৃশ্য, যে দৃশ্য নরমাকে জুলিয়েট অভিনেত্রীদের শ্রেষ্ঠতম আসনে বসিয়েছে। চারিদিকে স্তব্ধতা—সারা ষ্টেজের ওপর পাথরের নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝি একটি নিশ্বাসের করুণ স্পন্দনও লোকের কানে বাজে। মহলা শেষ হয়ে গেল। নরমা বলতে আরম্ভ করলে, কোন এক বালিকার ভয়ের, আশঙ্কার, আগামী মৃত্যুর মানসিক আর্ত্তনাদের অমর লিপিগুলি।...জল—জল-সকলের চোখে শুধু বারি বিন্দু।

আরভিং থ্যালবার্গের স্মৃতি চোখের সামনে রেখে ও জীবন কাটাবে এবং তার প্রচুর অর্থ নানানভাবে নানান উপায়ে খাটাবে।

আজকে নরমার পর্দায় ফিরে আসার

ও-বছর ও এ-বছর

[বিলাসী]

দেখতে দেখতে বাংলা ফিল্ম-শিল্পের বয়স আর এক বছর বাড়ল।

শৈশবের গণ্ডী পেরিয়ে তার যৌবন আজ জোয়ারের জলের মত কানায় কানায়। রূপ, রস ও গন্ধে যে আজ সঞ্জীবিত। তার এই ভরা-যৌবনের জৌলুসে চিত্ররাজ্যের বাসিন্দারা আজ তাকে পূজো কোরেছে—তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে।

আজ ছত্রিশ সালের শেষ দিন। কালকের তরুণ-অরুণোদ্ভাসিত আলোকোজ্জ্বল দীপালোকে বাঙলা ফিল্ম-শিল্পের নব-যাত্রা সুরু হবে।......অজ্ঞাত বছরকে দূরে ফেলে এ বছর আরও এগিয়ে চলুক, বাঙলা শিল্পের জন্মদিনে এই আমাদের একমাত্র শুভেচ্ছা।

উনিশ'শ পঁয়ত্রিশ সালে মোটমাট পূর্ণ দৈর্ঘ্য ১৯ খানা, ২ রীলের দশখানা, ১ রীলের দশখানা, টকিকালে দু'খানা ছবি উঠেছে। সংখ্যার দিক থেকে গেল বছরের চেয়ে আলোচ্য বছরে একখানা ছবি বেশী উঠেছে সত্য—কিন্তু গেল বছর আমরা যে 'কোয়ালিটীর' ছবি পেয়েছি—এ বছরে কোন ছবিই সে 'কোয়ালিটীর' হ'তে পারে নি। গেল বছরের "দেবদাস" ও "ভাগ্যচক্রে"-র সঙ্গে, এ বছরের কোন ছবিরই তুলনা হয় না। এ বছরের নাম-করার মত ছবি

কোন আশা নেই, তবে কোন দিন যদি অন্তর দিয়ে অনুভব করে যে—বায়স্কোপ-এর সাধ ছিল ছবি তৈরী করা, নরম্যার ছবিতে নামা; তার সে সাধ পূর্ণ করতে আবার যদি ছায়া মায়া অঞ্জন সে চোখে দেয় তবেই উৎসুক—চিত্ররস পিপাসুরা আবার নরম্যাকে পর্দায় দেখতে পাবে। এই হচ্ছে উত্তর।

হয়েছে "গৃহদাহ" "সোনার সংসার," "মারী," "কালপরিণয়," "বিজয়া," "পরপারে" ও "পণ্ডিত মশাই"। এ বছরে কতগুলি ছবি উঠেছে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

নিখিল ভারতে বাঙালী চিত্র শিল্পের প্রবর্ত্তক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার

নিউ থিয়েটার্স

গৃহদাহ—(পরিচালক-প্রমথেশ বড়ুয়া। শ্রেষ্ঠাংশে—যমুনা বড়ুয়া, অমর,)

বিজয়া—(পরিচালক—দীনেশ দাশ। শ্রেষ্ঠাংশে :—চন্দ্রাবতী ও পাহাড়ী)।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র, নিউ থিয়েটার্স বি-ইউনিট।

মস্ক কী—(১ রীল্। পরিচালক—অমর মল্লিক। শ্রেষ্ঠাংশে :—প্রতাপ),

মায়া—(পরিচালক—প্রমথেশ বড়ুয়া; শ্রেষ্ঠাংশে :—পাহাড়ী ও যমুনা)।

নিউ থিয়েটার্সের আগামী চিত্র "দিদি"র দু'টি বিশেষ ভূমিকায় চন্দ্রাবতী ও লীলা দেশাই

কমলেশকুমারী

শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী স্বত্বাধিকারী কালী ফিল্মস্

কালী ফিল্মসের "টকী অফ্ টকীজে"র একটি দৃশ্যে শিশির কুমার ভাদুড়ী ছাত্রদের বক্তৃতা দিচ্ছেন

কালী ফিল্মস্

কাল পরিণয়—(পরিচালক—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। শ্রেষ্ঠাংশে—জহর, মায়া, রাণী)

অন্নপূর্ণার মন্দির—(পরিচালক—তিনকড়ি চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠাংশে—ছবি বিশ্বাস ও মায়া)।

ভোট-ভণ্ডুল—(৩ রীল। পরিচালক—জ্যোতিষ মুখার্জ্জি। শ্রেষ্ঠাংশে—শৈলেন ও ফুল্লনলিনী), সঙ্গীত চিত্র ১ খানা, টপিক্যাল ৩ খানা (ফুটবল খেলা চায়না বনাম ইণ্ডিয়া, চায়না বনাম অবশিষ্ট ও বড়লাটের কোলকতায় আগমন*)

রাধা ফিল্মস্

কৃষ্ণ-সুদামা—(পরিচালক—ফণি বর্ম্মা। শ্রেষ্ঠাংশে—কানন, অহীন ও ধীরাজ)

ঝিনঝিনিয়ার জের—(২ রীল। পরিচালক—ফণি বর্ম্মা। শ্রেষ্ঠাংশে—কুমার মিত্র)।

বিষবৃক্ষ—(পরিচালক—ফণি বর্ম্মা। শ্রেষ্ঠাংশে—কানন, শান্তি ও জহর)।

কীর্ত্তিমান—(১ রীল। পরিচালক—অখিল নিয়োগী। শ্রেষ্ঠাংশে—অজিত চট্টো ও লক্ষ্মী)।

* নিউ এম্পায়ারে এই টপিক্যাল দেখানো হ'চ্ছে। এই ছবিবিষয়ে এর পূর্ব্বে কোনও দেশী ছবি দেখানো হয় নি।

মিঃ বি, এল, খেমকা স্বত্বাধিকারী, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

পথের শেষে—(পরিচালক—জ্যোতিষ মুখার্জ্জি। শ্রেষ্ঠাংশে—জ্যোৎস্না ও জহর)।

সোনার সংসার—(পরিচালক—দেবকী বসু। শ্রেষ্ঠাংশে—জীবন, ধীরাজ, অহীন্দ্র, ছায়া, মেনকা)।

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ ম্যাঃ ডিঃ 'রূপবাণী'

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

বাঙ্গালী—(পরিচালক—চারু রায়। শ্রেষ্ঠাংশে—মীরা, ধীরাজ, মনোরঞ্জন)।

মেজাজ রগড়—(২ রীল। পরিচালক—চারু রায়। শ্রেষ্ঠাংশে—ঊষা ও কৃষ্ণ মুখার্জ্জি)।

একটি কথা—(৩ রীল। পরি-

চালক—তুলসী লাহিড়ী। শ্রেষ্ঠাংশে—তুলসী লাহিড়ী)।

পপুলার পিক্চার্স

আত্মদর্শন—(পরিচালক—সতু সেন। শ্রেষ্ঠাংশে—লীলা ও সুপ্রসন্ন)।

হ্যাপী ক্লাব—(৩ রীল। পরিচালক—তুলসী লাহিড়ী। শ্রেষ্ঠাংশে—তুলসী)।

কুহু-কেকা—(পরিচালক—চারু রায়। সঙ্গীত-চিত্র (১ খানা)।

পণ্ডিত মশাই—(পরিচালক—সতু সেন। শ্রেষ্ঠাংশে:—রতীন বন্দ্যো, শান্তি গুপ্তা, রবি রায়)।

ডি, জি, টকীজ

দ্বীপান্তর—(পরিচালক—ধীরেন গাঙ্গুলী। শ্রেষ্ঠাংশে—ঊষা ও মোহন)।

শ্যামসুন্দর—(২ রীল। পরিচালক—হেম গুপ্ত। শ্রেষ্ঠাংশে—বাণীবাবু)।

শ্রীদেবদত্ত শীল সত্বাধিকারী, দেবদত্ত ফিল্মস্

দেবদত্ত ফিল্মস্

রজনী—(পরিচালক—জ্যোতিষ ব্যানার্জি শ্রেষ্ঠাংশে—অহীন ও চারু)। সঙ্গীত-চিত্র (১ খানা).

চন্দ্র ফিল্মস্

পরপারে—(পরিচালক—যতীন দাস, শ্রেষ্ঠাংশে—জ্যোৎস্না, অহীন ও দুর্গাদাস)

শ্রীযামিনী কুমার মিত্র সত্বাধিকারী, ফার্ষ্ট ন্যাশন্যাল পিক্চার্স

ফার্ষ্ট ন্যাশন্যাল পিক্চার্স

সরলা—(পরিচালক—চারু রায়। শ্রেষ্ঠাংশে—সরলা ও তারা ভট্টাচার্য্য) সঙ্গীত-চিত্র (১ খানা)

রীতেন এণ্ড কোং

তরুবালা—(পরিচালক: সুনীল মজুমদার। শ্রেষ্ঠাংশে—জ্যোৎস্না ও জহর)। সঙ্গীত-চিত্র (১ খানা)

কোয়ালিটী পিক্চার্স

ব্যথার দান—(পরিচালক—হেম গুপ্ত। শ্রেষ্ঠাংশে—ইলা ও হেম)।

জোয়ার ভাঁটা—(২ রীল। পরিচালক—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য। শ্রেষ্ঠাংশে—লীলা ও বিনয় মুখুয্যে)।

মহানিশা ফিল্মস্

মহানিশা—(পরিচালক—নরেশ মিত্র শ্রেষ্ঠাংশে—জহর ও চারু)।

বড়ুয়া পিক্চার্স

শিবরাত্রি—(শ্রেষ্ঠাংশে—রেণুকা)।

পরিচালনায় আলোচ্য বছরে যথাক্রমে উল্লেখযোগ্য প্রমথেশ বড়ুয়া (গৃহদাহ ও মায়া), দেবকী বসু (সোনার সংসার), যতীন দাস (পরপারে), সতু সেন (পণ্ডিত মশাই)

আলোক-চিত্রে বিমল রায় (মায়া), শৈলেন বসু (সোনার সংসার,) সুরেশ দাস (পণ্ডিত মশাই), প্রবোধ দাস (পরপারে)

শব্দযন্ত্রে মধু শীল (কাল পরিণয়) মুকুল বসু (গৃহদাহ)।

সঙ্গীত পরিচালনায় রাই বড়াল (গৃহদাহ ও মায়া), তিমিরবরণ (বিজয়া) কৃষ্ণচন্দ্র দে (সোনার সংসার), কমল দাশগুপ্ত (পণ্ডিত মশাই, নিতাই মতিলাল (কুহু-কেকা)।

কারু-শিল্পে অনথ মৈত্র (মায়া), বটুবাবু (সোনার সংসার) পরেশ বসু (কাল পরিণয়)।

অভিনয়ে প্যাডী (মায়া ও বিজয়া), অমর (গৃহদাহ বিজয়া) দুর্গাদাস (পরপারে), অহীন্দ্র (সোনার সংসার) চন্দ্রাবতী (বিজয়া) মলিনা (গৃহদাহ), মেনকা (সোনার সংসার), শান্তি (পণ্ডিত মশাই) রবি রায় (পণ্ডিত মশাই) মনোরঞ্জন (বাঙ্গালী), রাণীবালা (কাল-পরিণয়)।

এই গেল গত বছরের হিসেব নিকেশ। আগামী বছরে যে চিত্র-শিল্প অগ্রগতি পথে আরও এগিয়ে যাবে তার আভাষ এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে—কালী ফিল্মসের "টকী অফ্ টকীজ" হবে নতুন ধরণের ছবি। এই ছবি সবচেয়ে বিশেষত্ব শিশিরকুমার যে ভূমিকায় নামছেন সে চরিত্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক সাদৃশ্য আছে। নিউ থিয়েটার্সের "দিদি" নতুন ধরণের গল্প আর এতে অভিনয় কোরছেন দুই বিদুষী মহিলা—সর্বোপরি এর পরিচালনা কোরছেন নীতীন বসু। শ্রীভারতলক্ষ্মীর "আলিবাবা"—ভদ্র নরনারী-অভিনীত চিত্র। সুতরাং নতুনত্বের দিক থেকে এই তিনখানা ছবির যা' পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা'তে ১৯৩৭ সালে সকলেরই চেষ্টা চলছে নতুন কিছু করবার জন্যে।